"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২.০০	টাকা ৩.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১.৫০	টাকা ১.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা .২৫	টাকা .০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৯ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Issued on 29th November, 1971

Friday, 26th November 1971 শুক্রবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 52 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রাণেশ মণ্ডল

এক নজরে

বিভাবতীর কাহিনী :

শ্যামদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত ফিল্ড মার্শাল সরিৎ তানারত একদা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐ দেশটির 'কঠিন মানুষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর শাসনকালে শ্যামদেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রায় ছিল না বললেই হয়। কিন্তু কেন যে ছিল না তার একটি কারণ ফিল্ড মার্শালের মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরেই প্রকাশ পায়। সে কাহিনীর সব অধ্যায় আজও শেষ হয়নি। ফিল্ড মার্শালের মৃত্যু হয় ১৯৬৩ সালে।

আরব্য রজনীর কাহিনীর বাদশাহদের মতো জীবনযাপন করতেন সরিৎ তানারত। তাঁর হারেমে বাস করত ১৩ থেকে ৪০ বছর বয়সের শতাধিক বালিকা ও নারী। তাদের কেউ কেউ হারেমে থেকেই পড়াশুনা করত এবং তাদের দেখাশুনা করত বয়োজ্যেষ্ঠরা। তানারতের মৃত্যুর পর ঐ শতাধিক বন্দিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মুখ থেকেই তানারতের রহস্য ও রোমাঞ্চভরা জীবনকাহিনী প্রকাশ পায়। তবে পরলোকগত রাষ্ট্রনায়ক তাঁদের কাউকেই বঞ্চিত করেননি, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যে বিপুল রাজস্ব তিনি ব্যক্তিগত সম্পদে রূপান্তরিত করেন তার একটি বড় অংশ তিনি ঐ হারেমবাসিনীদের মধ্যে বিতরণ করে যান, যে কারণে গাড়ি বাড়ি বা সারাজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রসদের অভাব তাদের কোনদিনই হবে না। যারা অল্পবয়সী ছিল, নতুন করে সংসারও পেতেছে তাদের কেউ কেউ।

তানারতের শত সঙ্গিনীর অন্যতমা, চব্বিশ বছর বয়স্কা শ্রীমতী বিভাবতী ত্রিয়াকুলের হারেম জীবনের কাহিনী সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে স্থানীয় এক ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায়। দশ বছর আগে, যখন তার চোদ্দ বছর বয়স, ফিল্ড মার্শাল সেই সময় তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, যে প্রস্তাব নানা কারণে তার ও তার পরিবারের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। বিভাবতী বলছে : আমার বয়স তখন পনেরো বছরও হয়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলে বয়সের তুলনায় একটু বেশিই দেখাত আমাকে। সে সময়, বন্ধুদের পরামর্শে, ষোল বছর বয়স বলে আমি এক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। ষোল বছরই ছিল ঐ প্রতিযোগিতার ন্যূনতম বয়স।

ফিল্ড মার্শাল ঐ প্রতিযোগিতার আসরেই আমাকে দেখে মুগ্ধ হন ও আমার মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। আমাদের তখন খুবই আর্থিক সঙ্কট চলছিল। বাবার সঙ্গে মার সবে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে এবং পাঁচটি সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মাকে নিতে হয়েছে। আমি ছিলাম মায়ের প্রথম সন্তান। তাই মায়ের দুঃখ লাঘব করতে, মা না চাইলেও আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম। এর জন্য আমার ওপর কোন পক্ষ থেকেই চাপ আসেনি।

তারপর, এক সামরিক ছাউনির আড়ালে প্রধানমন্ত্রীর বিশাল বাসভবনে যে জীবনযাপন শুরু করি তা অনেকটা মেয়েদের স্কুল বোর্ডিং-এ থাকার মতো। আমাদের ওপর কোনরকম উৎপীড়ন হত না এবং প্রধানমন্ত্রী যেদিন যখন আসতেন আমাদের কাছে, একটা কিছু উপহার নিয়েই আসতেন সঙ্গে। তাঁকে কোনদিনই একটা অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত মানুষ বলে মনে হয়নি।

বিভাবতীর ধারণা, হারেমে নারী সংগ্রহের ব্যাপারে তানারত নিজেই সবসময় উদ্যোগী ছিলেন না। অনেক সময় তাঁর পারিষদরাও প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করতে নতুন নতুন সুন্দরী সংগ্রহ করে আনতেন।

বিভাবতী এখন একজন সুপরিচিত গায়িকা এবং একটি রেস্তোরাঁর স্বত্বাধিকারিণী। প্রধানমন্ত্রীর কাছে যা পেয়েছিল সে তা তার কাজের প্রয়োজনেই লেগে গেছে। অতীত জীবনের জন্য সে খুব বেশি অনুতপ্ত নয়, শুধু মনে হয় তার, সে যেন বড় বেশি বুড়ো হয়ে গেছে। তবু, সে বলে, "ভগবানের কৃপায় যদি কোন মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসি, যে আমার সব অতীত ভুলে আমাকে গ্রহণ করবে, আমি তার সাধ্বী স্ত্রী হওয়ার ও আদর্শ মা হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

বিবাহের শর্ত :

গ্রীসের লক্ষ-কোটিপতি জাহাজ ব্যবসায়ী এরিস্টটল ওনাসিসের নিজস্ব জাহাজের চীফ স্টুয়ার্ড ছিলেন ক্রিস্টিয়ান কাফারাকিস, ১৯৫৮ থেকে '৬৮ সাল পর্যন্ত। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'দি ফেবুলাস ওনাসিস' গ্রন্থে শ্রীমতী জ্যাকুলিন কেনেডির সঙ্গে ওনাসিসের বিবাহের পূর্বে সম্পাদিত শর্তাবলীর যে-কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তা রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ওনাসিস অবশ্য ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এবং বলেছেন যে, কাফারাকিসকে তিনি চেনেনই না। কিন্তু ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্যাবলী সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলেননি।

কাফারাকিস বলেছেন, ১৭০ দফার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর শ্রীমতী কেনেডি ওনাসিসকে বিয়ের কথা দেন। ঐ চুক্তিনামার ১৯ ধারায় বলা হয়েছে, বিয়ের পর কনের শয়নঘর আলাদা হবে; ২৩ ধারায় বলা হয়েছে, বধূ নববিবাহিত স্বামীর সন্তানধারণে বাধ্য থাকবে না। টাকা-পয়সাসম্পর্কিত শর্তাবলীতে বলা হয়েছে, জ্যাকুলিন যদি কোনদিন ওনাসিসকে ত্যাগ করে, তাহলেও সে দু' কোটি ডলার, অর্থাৎ ১৫ কোটি টাকা পাবে, আর ওনাসিসের মৃত্যু পর্যন্ত স্ত্রী থাকলে পাবে ১০ কোটি ডলার, অর্থাৎ ৭৫ কোটি টাকা।

গ্রন্থটির অন্যান্য জায়গায় লেখা আছে, জ্যাকুলিনের বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি সবই খুব দামী সিল্কের এবং সেগুলি ভোরে একবার ও দিবানিদ্রার পর আর একবার বদল করা হয়। প্রতিবার স্নানের সময় লাগে দশটি নতুন তোয়ালে।

শতাব্দীর ঝড় :

নাম যাই হ'ক, আসলে ব্যাপারটা একই এবং তার সংহার-শক্তি সর্বত্রই সমান। অতলান্তিক মহাসাগর ও ক্যারিব উপসাগরে যা হারিকেন, প্রশান্ত মহাসাগরে যা টাইফুন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তাই সাইক্লোন।

১৮৭৬ সালে বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন আধঘণ্টার মধ্যে উপকূলবর্তী অঞ্চলে এক লক্ষ মানুষের প্রাণসংহার করেছিল। ১৯৪২ সালে ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে বহমান ঝড়ের তাড়নায় ত্রিশ ফুট উঁচু একটি জলের দেওয়াল বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে এসে মেদিনীপুরের উপকূলে পাঁচ হাজার বর্গমাইল স্থানের সব মানুষ ও বসতি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সাইক্লোন গত বছর পূর্ববঙ্গের উপকূলে সর্বনাশা আঘাত হেনে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের জীবন নিয়েছিল। এ-বছর আবার ১২০ মাইল বেগে ছুটে আসা ঝড়ের মুখে পনের ফুট উঁচু একটি জলের দেওয়াল ওড়িশার উপকূলে আঘাত হানে। এ-ঝড়েও মৃত্যুর সংখ্যা বারো থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে। আরও দুর্ভাগ্যের কথা, যারা মরলো, তাদের একটা বড় অংশ ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য আসা উদ্বাস্তু। মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে প্রাণরক্ষা করতে এদেশে ছুটে এসে তারা প্রকৃতির রুদ্র-রোষের বলি হ'ল।

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বার্তায় ঝড়ের পূর্বাভাস বেশ কিছু আগেই পাওয়া যায় বলে এবার মানুষ কিছুটা সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে মৃত্যুর সংখ্যা কম, কিন্তু সর্বস্বান্ত হয়েছে লক্ষাধিক পরিবার।

১৮।১১।৭১ —[illegible]

সম্পাদকীয়

সীমান্তে উত্তেজনা

কয়েকখানি ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্য থেকে জানা যায় সেখানকার রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের ধারণা যে, সপ্তাহের মধ্যে যদি নাও হয় তাহলে অন্তত একপক্ষের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বার বার ঘোষণা করেছেন যে ভারতবর্ষ যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধের দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হয় না, মূল কারণের গভীরে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা উভয় দেশের হালচাল দেখে অনুমান করেছেন যে যুদ্ধ অনিবার্য। গার্ডিয়েন পত্রিকার পশ্চিম জার্মানীস্থ সংবাদদাতা শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাকি বুঝেছেন যে যুদ্ধের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা বর্তমান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পশ্চিম জার্মানীর এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যতই তীব্র হয়ে উঠবে পাক জঙ্গীচক্র ততই ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য আকুল হয়ে উঠবে। এই সূত্রে মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেটস উইলিয়াম রজার্স পেশাদার সাংবাদিকদের এক ভোজসভায় বলেছেন—"আমাদের আশঙ্কা যে সীমান্তের এইসব সংঘর্ষ পাক-ভারত যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবলতর করে তুলছে—তবে আমরা কিন্তু যথাসম্ভব বাইরে থাকব, আর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বাসনা নেই।" শোনা যায় মার্জারেরও মৎস্যে অরুচি হয়। যুদ্ধে তাঁদের আসক্তি নেই একথা হয়ত সত্য তবে প্রচুর মাল-মশলা সরবরাহ করে গ্যালারীর দর্শকের মতো নিরাসক্ত ভঙ্গীতে খেলা দেখতে আপত্তি কোথায়।

এদিকে পাক প্ররোচনা সহ্য করা কঠিন। পাকিস্তানী বিমান একদিন জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে তিনবার এবং ত্রিপুরার সীমান্তে একবার বে-আইনীভাবে ভারতের আকাশসীমানা লঙ্ঘন করেছে। স্থলপথে প্রায় প্রতিদিনই ভারতের পূর্ব-সীমান্তের বিরাট অঞ্চলের একাধিক জায়গায় অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করে দিয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে তিক্ততা বৃদ্ধি করছে। ভারতের অভ্যন্তরে অজস্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এরা নানারকম তথ্য সংগ্রহ করছে, বিমানঘাঁটি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ফটোগ্রাফ তুলছে। নাশকতামূলক কাজে সহায়তা করার জন্য নানারকম লোক ভারতের বিস্তীর্ণ সীমানার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। তারা মাইন পুঁতে, এখানে ওখানে আগুন লাগিয়ে ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা ভারতকে উত্যক্ত করছে। ইতিমধ্যেই রেলপথের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। রাজস্থান সীমানায় পাকিস্তান দুই ডিভিসন সৈন্যসমাবেশ করেছে। পাকিস্তান চায় পায়ে পা বাঁধিয়ে একটা লড়াই শুরু করে দিতে, নানাভাবে উৎপাত সৃষ্টি করে উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে যাতে ভারতই সর্বাগ্রে হানাদার পাক সেনাদের তাড়িয়ে নিয়ে তাদের সীমানায় ঢুকে পড়ে। তাহলেই কাম ফতে। বিশ্বের দরবারে হাউমাউ করে কেঁদে ভাসিয়ে ইয়াহিয়া বলবেন, "ইয়া আল্লা, এ ক্যা কিয়া। ভারতবর্ষই যুদ্ধের জন্য দায়ী। আমরা অসহায়, নাচার, আমাদের ওপর এ কি অত্যাচার"। ইয়াহিয়ার দল অনেক পূর্বেই ভারতকে ফাঁদে ফেলার আয়োজন করেছিল, ২৫শে মার্চের পর যখন দলে দলে শরণার্থী ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিল তখনই ভারত যা হয় একটা এ্যাকসন নিতে পারে একথা তারা নিশ্চয়ই ভেবেছিল। কিন্তু ভারত চুপ করে সব সইছে, বিশ্বের রাষ্ট্রনায়করা অনেকদিন নীরবে খেলা দেখলেও ভারতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সর্বত্র ভারতের বক্তব্য স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানে কারো সহায়তা না পেলেও ভারত তার নিজস্ব আদর্শ ও নীতি অনুসারে কাজ করবে। অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি এবং নীতি সমর্থন করেছেন, এবং যাঁদের স্পষ্ট করে কিছু বলার অসুবিধা আছে তাঁরাও পরোক্ষভাবে ভারতের অবস্থা বুঝেছেন এবং ভারতের নীতির প্রায় সমতুল মত প্রকাশ করেছেন। এদিকে পাকিস্তান সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে ভারত সীমান্ত অঞ্চলে সশস্ত্র সেনাবাহিনী মোতায়েন করে রেখেছে। জম্মু ও কাশ্মীর সীমানার কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিটি মোটরকার ও প্রতিটি বাড়িতে স্লোগান লেখা আছে "ক্রাস ইনডিয়া" "ক্রাস ইনদিরা" ভারত ধ্বংস করো, ইন্দিরাকে খতম করো, পাক জঙ্গীশাহীর এইসব নানা কৌশলের সামনেও ভারত এখনও স্থির হয়ে আছে—কিন্তু ভারতের এই শীতল মনোভাব তার দুর্বলতার লক্ষণ নয়, যুদ্ধ যদি বাধে আমরা তার উপযুক্ত জবাব দেব, একথা বলেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ভারতের জনগণও কোনমতেই পাক বর্বরতা সহ্য করবে না। দিশেহারা পাক ফৌজের অগ্রগতি স্তব্ধ করার শক্তি ভারতের আছে।

পটভূমি

আসছে বছরের গোড়ায় পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন হবে-কি-হবে-না, এই নিয়ে যে জল্পনা চলছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে সি পন্থের ঘোষণায় তার দ্রুত অবসান ঘটা উচিত। ১৭ নভেম্বর সাংবাদিকসভায় দাঁড়িয়ে শ্রীপন্থ স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তিনি যে কারণ দেখিয়েছেন সেটা অনেকে আগেই অনুমান করেছিলেন— শরণার্থী সমস্যা। ঐ সমস্যা যতোদিন না মিটছে ততোদিন পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন হচ্ছে না।

কিন্তু যা উচিত তা তো সব সময় হয় না, তাই শ্রীপন্থের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন সম্পর্কে সব জল্পনারও অবসান হয় নি। বরং কোনো কোনো পক্ষ এই ঘোষণার পর বেশ চটে উঠেছেন। সবচেয়ে কড়া প্রতিবাদ এসেছে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কাছ থেকে। সেটা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ, গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন এবং বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পর থেকেই যে দল ক্রমাগত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে তার নাম মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। এমন কি পুজোর পর, অর্থাৎ অকটোবর থেকে এই দাবি নিয়ে গণ-আন্দোলন শুরু করে নভেম্বরে বিরাট জমায়েত করার কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিল সি-পি-এম। অকটোবর এসেছে, গেছে। নভেম্বরও যায়-যায়। সি-পি-এম এখনও তার প্রতিশ্রুত আন্দোলন শুরু করে নি। তবে তাই বলে নির্বাচনের দাবি তারা মোটেই ছাড়ে নি।

সি-পি-এম পলিটব্যুরো এ সম্পর্কে একটা কড়া বিবৃতিও দিয়েছে। নির্বাচন বন্ধ রাখার কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার যে শরণার্থী সমস্যার কথা বলেছেন পলিটব্যুরো তা আদপেই বিশ্বাস করে নি। তারা এই সিদ্ধান্তের মধ্যে পুরোপুরিই রাজনীতির গন্ধ পেয়েছে। তাই তারা বলছে জনগণের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে সি-পি-এমের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমন-পীড়ন চালানো সত্ত্বেও কংগ্রেস এখনও নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হতে সাহস করছে না। এই জন্যেই অন্যান্য রাজ্যে নির্বাচনের আয়োজন করলেও পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন বন্ধ রাখা হচ্ছে। সি-পি-এম এই সিদ্ধান্তকে এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণেরই আর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে চায়। তাই পার্টির পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরাতেও অনেক শরণার্থী এসেছে, ঐসব এলাকার সীমান্তে অবস্থা যথেষ্টই উত্তেজনাপূর্ণ, তবু সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে কী করে?

সি-পি-এম নেতারা অবশ্য শুধু বিবৃতি প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময় শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। সম্ভাব্য পাক আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্যে পশ্চিমবাংলায় যে নাগরিক পরিষদ গঠিত হয়েছে জ্যোতিবাবু সেই পরিষদের অন্যতম সদস্য। রাষ্ট্রপতি কলকাতায় এসে ঐ পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। ঐ সুযোগে জ্যোতিবাবু রাষ্ট্রপতির কাছে পশ্চিমবাংলায় ফেব্রুয়ারী মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। সেই সঙ্গে জ্যোতিবাবু জানতে চান, কেনই বা এই রাজ্যে ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হবে না? এবং তারপর তিনি প্রয়োগ করেন সেই অস্ত্র যা ইদানিং সি-পি-এমের তূণের সবচেয়ে মোক্ষম বাণ —"পশ্চিমবাংলার মানুষ কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক?"

নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখার জন্যে দিল্লী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রতিবাদে অন্যান্য বামপন্থী দলকেও এগিয়ে আসার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে সি-পি-এম। এখনও পর্যন্ত বিশেষ কেউ সেই আহ্বানে সাড়া দেয় নি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সবাই চুপ করেই থাকবে। গত জুনের পর থেকে অনেক দলই আশু নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। এখনও আবার তারা সেই দাবি জানাবে। সে-দাবি না জানালে তারা নিজেদের যথেষ্ট গণতান্ত্রিক বলে প্রতিপন্ন করতে পারবে না। তবু এ-ব্যাপারে সি-পি-এমকে অগ্রণী ভূমিকা নিতেই হবে। তার কারণ, এ-ব্যাপারে সি-পি-এমের ঠেকাটাই বেশি।

পার্টির চঞ্চল ও অধৈর্য কর্মীদের শান্ত রাখার জন্যে আশু নির্বাচন পার্টির পক্ষে এখনই প্রয়োজন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরেই দলের একাংশের মধ্যে পার্লামেণ্টারি পথ সম্পর্কে গভীর সন্দেহ দেখা দেয়। তখন তাদের এই বলে আশ্বস্ত করা হয় যে, নতুন নির্বাচন হলে সি-পি-এমের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। এ-বছর মার্চের নির্বাচনে সেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই অল্পের জন্যে পার্টির হাত থেকে ফস্কে যায়। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের আয়ু অবশ্য পার্টির পক্ষে সৌভাগ্যবশত খুব বেশি দিন হয় নি। কিন্তু ঐ মন্ত্রিসভার পতনের আট মাস পরেও, অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারীতে যদি নির্বাচন না-হয় এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ দীর্ঘতর হয়, তবে পার্টির মধ্যে পার্লামেণ্টারি পথ পরিত্যাগ করার জন্যে চাপ বৃদ্ধি পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তখন তাদের ঠেকিয়ে রাখা নেতাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে।

এই জন্যেই গত জুলাই থেকে ক্রমাগত সি-পি-এম নেতারা যথাসম্ভব শীঘ্র নির্বাচনের জন্যে দিল্লীর ওপর চাপ দিয়ে আসছেন। জুলাইয়ে পলিটব্যুরোর বৈঠকের ঠিক আগেই জ্যোতিবাবু যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির কাজে সি-পি-এমের সহযোগিতার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। সি-পি-এম একটি-মাত্র শর্তেই সেই সহযোগিতায় রাজী হয়েছিল—নভেম্বরে নির্বাচন। পলিটব্যুরোর বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবেও বেজেছিল একই সুর। পরে অবশ্য নির্বাচনের তারিখ নিয়ে সি-পি-এম কিছুটা আপস করেছিল। আগস্ট মাসে বাংলা বন্ধের সময় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে মার্কসবাদী নেতারা ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচনের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু

এখন যদি সেই ফেব্রুয়ারীতেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি না-পাওয়া যায় তবে সেটা অবশ্যই ভাবনার কথা। ফেব্রুয়ারী-মার্চে নির্বাচন না-হলে তারপরে আবার কবে হবে বলা মুস্কিল, কারণ তারপর গ্রীষ্ম-বর্ষার পালা এসে যাবে।

তা ছাড়া সি-পি-এম আর একটা বিষয়েও একটু উদ্বিগ্ন। মার্কসবাদীদের অনেকের আশংকা, কেন্দ্রীয় সরকার যদিও এখন বলছেন ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হবে না, তবু যদি তাঁরা মনে করেন অবস্থা অনুকূল তবে হয়ত হঠাৎ নিজেদের দলের সুবিধেমতো নির্বাচনের একটা তারিখ ঘোষণা করে দিতে পারেন। সি-পি-এম অবশ্যই সেটা হতে দিতে চায় না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষে যেটা অনুকূল সময় বলে বিবেচিত হবে সি-পি-এমের পক্ষে সেটা প্রতিকূল হওয়াই স্বাভাবিক। তাই এখন থেকে যদি ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচনে দিল্লীকে প্রতিশ্রুত করিয়ে রাখা যায় তবে পার্টির পক্ষে অনেকটা সুবিধে হয়।

*

এরপরে পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য এবং "এই রাজ্যের মানুষ কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক" প্রসঙ্গ। এটা সি-পি-এমের পক্ষে অবশ্যই কোনো নতুন "লাইন" নয়। অন্ততঃ গত এক বছর ধরে সি-পি-এমের প্রচার এই পথ নিয়েছে। পশ্চিমবাংলা দিল্লীর কলোনি, পশ্চিমবাংলা থেকে দিল্লী যে কর আদায় করে এই রাজ্য তার ন্যায্য বখরা পায় না, এমন কি "ইন্দিরা-ইয়াহিয়া এক হ্যায়"—এ সবই বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। গত নির্বাচনের ফলাফল দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেছে যে, সি-পি-এমের এই কেন্দ্র-বিরোধী ধুয়া থেকে দলের লাভ ভালোই হয়েছে। তার কারণ প্রথমতঃ, দিল্লীর বিরুদ্ধে এই রাজ্যের মানুষের নালিশের ন্যায্য কারণ আছে এবং দ্বিতীয়তঃ যতোই আমরা জাতীয় সংহতি বলে গলা ফাটাই না কেন আঞ্চলিকতা বা ইংরাজিতে যাকে বলে সাব-ন্যাশনালিজম তার আবেদন বড় কম নয়। সি-পি-এম নেতৃত্ব শুধু সেই সুযোগটুকুকে বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগিয়েছেন। আর হাজার হলেও, সি-পি-এম এখন ক্রমশ আঞ্চলিক দলের চেহারা নিচ্ছে। কারণ, পার্টির কার্যকর সব শক্তি এখন মূলত পশ্চিমবাংলা ও কেরলেই সীমাবদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে ভারতে বিভিন্ন "জাতির" বাস ও তাদের "আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার" সম্পর্কে সি-পি-এমের প্রস্তাবের কথা অনেকের মনে পড়তে পারে। এই বিষয়ে কিছুদিন আগেই বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, সি-পি-এমের আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে এই প্রসঙ্গে আলোচনা হবে. শ্রীপ্রমোদ দাশ-গুপ্তের এই ঘোষণার পর অনেক জল ঘোলা হয়েছে। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে এই ধরনের প্রস্তাব তোলায় নানা মহলে বেশ জোর আলোচনাও হয়েছে। সেই কারণেই কিনা ঠিক বলা মুস্কিল, তবে পার্টি কংগ্রেসে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হতে যাচ্ছে তার রূপ কিছুটা বদল হয়েছে।

অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির ১৯৫১ সালে গৃহীত কর্মসূচীতে "রাষ্ট্রের কাঠামো" শীর্ষক একটি অনুচ্ছেদ ছিল। তাতে বলা হয়েছিল :

"সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন জাতির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে বল-প্রয়োগের ফলে নয়, তাদের একটি সাধারণ রাষ্ট্র গঠনে স্বেচ্ছা-সম্মতির ফলে।"

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (যেটাকে অবশ্য সপ্তম কংগ্রেস বলা হয় অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির হিসেব ধরে) স্থির করা হয় যে, নতুন কর্মসূচী থেকে ঐ অনুচ্ছেদটি বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু ঐ জায়গায় নতুন কোনো অনুচ্ছেদ যোগ করা হবে তা তখনই স্থির করা হয় নি। এতদিন পরে, অর্থাৎ এই মাসের গোড়ার দিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। মাদুরাইয়ে আসন্ন নবম কংগ্রেসে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি পার্টির কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে :

"জনগণতান্ত্রিক ভারত হবে ভারতের বিভিন্ন জাতির স্বেচ্ছায় গঠিত এক যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতির সত্যিকার সাম্য এবং স্বশাসনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বজায় রাখার জন্যে এবং পার্টির কর্মসূচীতে যে গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তা গড়ে তোলার জন্যে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) কাজ করে যাচ্ছে। এই দল সবরকম বিভেদপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলনের বিরোধী।"

নতুন অনুচ্ছেদে বাদ পড়েছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার কথাটা। বিভিন্ন "জাতির" থিওরি যদিও অপরিবর্তিত তবু সি-পি-এম শেষে একটি নতুন বাক্য জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে—তা হল বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলনের বিরোধিতা। অর্থাৎ সি-পি-এম এই মুহূর্তে তার বিপক্ষের হাতে অপপ্রচারের কোনো নতুন অস্ত্র তুলে দিতে চায় না।

২১।১১।৭১ —[illegible]

দেশে বিদেশে

ঠিক বিজয়িনীর বেশে না হলেও অন্তত আংশিক সাফল্যের তুষ্টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শনিবার ১৩ নভেম্বর বেলা সওয়া নয়টার দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে এসে নামলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি থেকে আরম্ভ করে অনেক নেতা ও সরকারী পদাধিকারী। আর উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দরের আশে-পাশের গ্রামের অনেক অধিবাসী, যাদের কিছু অংশ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য শীতের রাতটা ওখানেই কাটিয়েছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধী এই সফরে গিয়েছিলেন, তাঁর নিজের ভাষাতেই বলতে গেলে, 'সাহায্য ভিক্ষা করতে বা চাইতে নয়, বুঝিয়ে বলতে,' নিকসন, হীথ, পম্পিডু ও ব্রান্ট এই চার প্রধানের সাথে এবং সেই সঙ্গে ক্রেইস্কি ও আইস্কেন্সের সাথে তিনি কথা বলে এসেছেন। পাকিস্থানের শাসকরা যে কত গুরুতর পরিস্থিতি ডেকে এনেছেন সেটা তিনি সম্ভবত বুঝিয়ে আসতে পেরেছেন।

কিন্তু তারপর কি? দূর দেশের রাজধানীতে রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে শিষ্ট আলাপ, লাল গালিচা, ভোজসভা, টেলিভিসন, সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি থেকে নয়াদিল্লীর কঠিন বাস্তব অনেক দূরের জগৎ। ফিরে এসেই প্রধানমন্ত্রীকে সেই ভিন জগতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে।

১৫ নভেম্বর তারিখে আরম্ভ হয়েছে পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশন। ঐ অধিবেশনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে প্রায় অর্ধশত সরকারী বিল পাশ করাতে হবে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ১৩টি অর্ডিন্যান্স। পার্লামেন্টের গত অধিবেশন থেকে এই অধিবেশন পর্যন্ত মধ্যবর্তী ১৩ সপ্তাহে এই ১৩টি অর্ডিনান্স জারি হয়েছে। এর আগে আর কখনও এত কম সময়ের মধ্যে এতগুলি অর্ডিনান্স জারি করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। যেসব বিল পাশ করাতে হবে সেগুলির মধ্যে বাংলা দেশের আশ্রয়প্রার্থীদের দরুন ট্যাক্স বাড়াবার প্রস্তাব, প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লোপের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব, পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি পুনর্গঠনের প্রস্তাব ইত্যাদি রয়েছে। বিলগুলির অনুমোদন করার জন্যে পাঁচ সপ্তাহ সময় পাওয়া যাবে। পার্লামেন্টের অধিবেশন হয় প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন। অর্থাৎ পার্লামেন্টের হাতে সময় মাত্র ২৫ দিন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, প্রতিদিন পার্লামেন্টের বৈঠক অবিরাম ২৪ ঘন্টা ধরে চালান হবে এবং শুধু বিলগুলি মঞ্জুর করান ছাড়া আর কোন কাজই করা হবে না তাহলে প্রত্যেকটি বিল পাশ করাবার জন্য গড়ে বারো ঘন্টার বেশী সময় পাওয়া যাবে না। পার্লামেন্টে শ্রীমতী গান্ধীর দলের যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তা নিয়েও এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি বিতর্কমূলক বিল অনুমোদন করিয়ে নেওয়া তাঁর সরকারের পক্ষে আদৌ সহজ হবে না।

দেশের মাটিতে শ্রীমতী গান্ধীকে যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সেগুলির একটি হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। দেশের অর্থনীতি যেভাবে চলেছে তাতে নয়াদিল্লীর উদ্বেগের কারণ দেখা দিচ্ছে। নির্বাচনের অব্যবহিত পরে দিল্লীর অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলিতে যে আত্মবিশ্বাস ও কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল এখন সেটা স্তিমিত হয়ে আসছে।

দাম বেড়েই চলেছে। রেকর্ড ফলন সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের দাম ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে ১৬ পয়েন্ট বেড়েছে। ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও কেরল ছাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচন আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে। দাম যেভাবে বাড়ছে সেটা সামলাতে না পারলে শাসক দলের পক্ষে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঐ নির্বাচনে নামা কঠিন হবে।

এমন কি খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতিটা যতখানি আশাপ্রদ বলে মনে হয় আসলে ততখানি নয়। গত বছর খাদ্যশস্যের ফলন পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ত্রিশ লক্ষ টন কম হয়েছে। ধানের ক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব'-এর স্বপ্ন এখনও সফল হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে বছরে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছবার আশা এখন মিথ্যা বলেই মনে হচ্ছে। তুলা ও পাটের উৎপাদন ১৯৬৭—৬৮ সালের যে চূড়ায় উঠেছিল সেখান থেকে অনেকটা নেমে এসেছে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত হল, এই দুটি পণ্যের ফলনের লক্ষ্যমাত্রায় ১৯৭৪ সালের মধ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে না।

আখের ফলন কমেছে। আগামী বছর চিনির গুরুতর অভাব দেখা দিতে পারে।

তৈলবীজের উৎপাদন এখনও ১৯৬৪-৬৫ সালের তুলনায় পাঁচ লক্ষ টন কম রয়েছে। তৈলবীজের ফলন বাড়াবার ব্যাপারে আমাদের কৃষিবিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারেননি।

শিল্পের উৎপাদনের হার যেভাবে বাড়ছে তাকে হামাগুড়ি দেওয়ার বেশী আর কিছু বলা চলে না। এই বৃদ্ধির হার যেখানে বছরে দশ বা ২০ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছিল সেখানে শেষ পর্যন্ত সেটা এক শতাংশে এসে দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ।

চতুর্থ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎটাই এখন অনিশ্চিত হয়েছে। বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৯৩ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে এবং এখনও প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৫ হাজার শরণার্থী আসছেন। এই শরণার্থীদের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী চ্যবনের ২০০ কোটি টাকার নতুন ট্যাকস চাপাবার কথা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭১-৭২ সালের শেষে বাজেটের ঘাটতি দাঁড়াবে অনুমান ১০০০ কোটি টাকা।

ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে উদ্বেগের আর একটি কারণ এই যে, রাজনৈতিক স্থায়িত্বের আশ্বাস সত্ত্বেও বিদেশী লগ্নীকারকরা ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদেশে বৈদেশিক আমদানির উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ভারতকে তার ফল ভোগ করতে হবে। বৃটেন ইউরোপের বারোয়ারি বাজারে যোগ দিলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর আরও এক দফা আঘাত আসার সম্ভাবনা আছে।

×

ইয়াহিয়া খাঁ কি নুরুল আমিনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন? কিছু কিছু লক্ষণ দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান নুরুল আমিন সম্প্রতি ইয়াহিয়া খাঁর কাছে এসেছেন। খাঁ সাহেব যখন আওয়ামী লীগের সদস্যদের খারিজ করে দিয়ে জাতীয় পরিষদের ৭৮টি আসনের জন্য নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন তখন ৮৮ বছরের বৃদ্ধ এই বাঙালী রাজনীতিক ছয়টি দক্ষিণপন্থী পার্টির একটি যুক্তফ্রন্ট খাড়া করলেন। এই ছয় পার্টি হল পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, জামাৎ-এ-ইসলামি, নিজাম-এ-ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও কায়ুম মুসলিম লীগ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এই ছয় পার্টি মিলে পূর্ববঙ্গে মোট ভোটের ১৩ শতাংশের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ঐ নির্বাচনে ৩৭১ জনকে দাঁড় করিয়ে একমাত্র নুরুল আমিন ছাড়া আর কাউকে জিতিয়ে আনতে পারেনি।

কিন্তু এবার নুরুল আমিনের যুক্তফ্রন্ট ইতিমধ্যেই ৪৬টি কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে এসেছে।

এইভাবে ভুয়া নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় ইয়াহিয়া খাঁকে সাহায্য করার দরুন নুরুল আমিন সাহেব তাঁর পুরস্কার চাইছেন। ইয়াহিয়ারও দরকার একজন বাঙালী রাজনীতিককে সামনে রাখা। অতএব পুতুল সরকারের বড় আসনে ইসলামাবাদের জঙ্গী ডিকেটটর তাঁর নুরুল আমিন সাহেবকে এনে বসাচ্ছেন, এই খবরটা চাউর হয়ে গেছে।

এই খবর পেয়ে খাঁ সাহেবের আর একজন সেবক জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো দারুণ গোসা করেছেন, তাঁর একজন চেলা হুমকি দিয়েছেন, ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রিত্ব না দিলে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। পাল্টা হুমকি দিয়ে নুরুল আমিন বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী করা না হলে পাকিস্তানকে আর রাখা যাবে না।'

বাংলা দেশে খান সেনারা যখন মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে, বাংলা দেশের বহু এলাকা যখন মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া খাঁর নিজের শিবিরেই যখন আসন্ন বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তখন সেদেশে এভাবে কালনেমির লংকাভাগ চলেছে। —পুণ্ডরীক

মঙ্গলকাব্যের এক নবাবিষ্কৃত কবি

প্রণব রায়

মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবরবি তখন অস্তায়মান। ইউরোপীয় বণিকগণ পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যে নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রসারে ব্যস্ত। বাংলাদেশে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রেরিত সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফারসী সাহিত্য ও কাব্যপাঠে নিমগ্ন; শাসনকার্যে একান্ত উদাসীন। বৃদ্ধ সম্রাট ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত—ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলের চেতুয়া বরদায় বিদ্রোহের বহ্নিশিখা সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই নায়ক ছিলেন তৎকালীন বর্ধমান চাকলার সরকার মান্দারনের অধীন চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ। চেতুয়া ও বরদা পরগণা বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত। বিদ্রোহী শোভা সিংহ পাঠান দলপতি রহিম খাঁর সহযোগিতায় মোগল প্রতিনিধি বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম বিদ্রোহী শোভা সিংহের ভয়ে ভীত হইয়া ঢাকায় ইব্রাহিম খাঁয়ের সাহায্যলাভের জন্য পলায়ন করিলে সমগ্র বর্ধমান, হুগলী ও মুকসুদাবাদে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ) দারুণ বিশৃংখলা ও অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি বা তাহার কিছু পরে বিদ্রোহিনায়ক শোভা সিংহের মৃত্যু হইলেও তাঁহার ভ্রাতা হেমৎ সিংহ ও রহিম খানের বাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিম ভূভাগের সমগ্র অঞ্চল অধিকার করিয়া লইল। অতঃপর ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমদ্দিন বাংলার সুবাদারী লাভ করিবার পর এই বিদ্রোহ কিছুটা প্রশমিত হইলেও বিদ্রোহের উৎসস্থল চেতুয়া-বরদা অঞ্চলে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। বজ্রকঠিন শাসক মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার শাসনভার লাভ করিয়া সমগ্র সুবা বাংলা তথা বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল চেতুয়া-বরদা অঞ্চলে সুশাসন ও শৃংখলা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সমগ্র সুবার এক পূর্ণাঙ্গ বন্দোবস্তের জন্য তিনি বাংলাদেশকে তেরটি চাকলা বা বিভাগে বিভক্ত করেন। বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত মেদিনীপুরের চেতুয়া-পরগণায় বন্দোবস্ত আরম্ভ হয় মুর্শিদকুলির শাসনকালের শেষদিকে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ—১৭২৪ খ্রীস্টাব্দ। মুর্শিদকুলির চেতুয়া বন্দোবস্তকালে সুদূর মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে যেসব রাজকর্মচারী রাজকার্যের জন্য এই অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন কবি প্রাণবল্লভ ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। প্রাণবল্লভের "জাহ্নবীমঙ্গল" কাব্যের একটি পুঁথি সম্প্রতি চেতুয়ার বাসুদেবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাসুদেবপুর গ্রামের অধিবাসী আজীবন সারস্বত সাধক ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রবংশীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় এই মূল্যবান ও ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত পুঁথিটিকে প্রাচীন পুঁথির এক ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক ও সাহিত্যসেবী মাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে চেতুয়ার ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রাণবল্লভের এই পুঁথিটির এক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে এবং বাংলা সাহিত্যে গঙ্গামঙ্গল কাব্যের মধ্যে 'জাহ্নবীমঙ্গল'কে একটি বিশেষ উৎকৃষ্ট গঙ্গামঙ্গল কাব্য বলা যায়। শুধু আকার ও কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়া নহে, এই পুঁথির পাতার মাঝে মাঝে ডায়েরী আকারে তৎকালীন বাংলা গদ্যে লিখিত অংশবিশেষ হইতে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে নবাবী আমলের রাজনৈতিক অবস্থার এক পরিচয় লাভ করা যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষ দশক বাংলার ইতিহাসে নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। মোগল প্রভুত্বের দুর্বলতার সুযোগে ভাগীরথীর কূলে কূলে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার ও বাংলার নবসংস্কৃতির জন্মভূমি কলিকাতার অভ্যুদয়—পরবর্তী বাঙালীর ইতিহাসকে যে প্রভাবিত করিয়াছে এই দশকের প্রারম্ভ হইতেই তাহার সূচনা দেখা যায়। শোভা সিংহের বিদ্রোহ এই নূতন যুগের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। কবি প্রাণবল্লভ এই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সন ১১০৪ সালে (১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে) তিনি "জাহ্নবীমঙ্গল" রচনা করেন। পুঁথির শেষ ১৭৪তম পত্রে গ্রন্থরচনার এই কাল লিপিকার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন তুলট কাগজের দোভাঁজ পত্রের দুই পৃষ্ঠায় লিখিত এই পুঁথিটি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া পরগণার বাসুদেবপুর গ্রামে সন ১১৩১ সালে (১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে) অনুলিখিত হইয়াছিল। নবাব মুর্শিদকুলির এক পদস্থ কর্মচারীরূপে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-নগরের (বর্তমান অম্বিকা-কালনা) অধিবাসী প্রাণবল্লভ ঘোষ সম্ভবত ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য চেতুয়ায় আগমন করেন (পুঁথিমধ্যে ডায়েরীর একস্থানে কবিকে 'আমলা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। রাজস্ব আদায়ের জন্য মুর্শিদকুলির কঠোর ব্যবস্থার ফলে চেতুয়ার বাসুদেবপুর গ্রামের
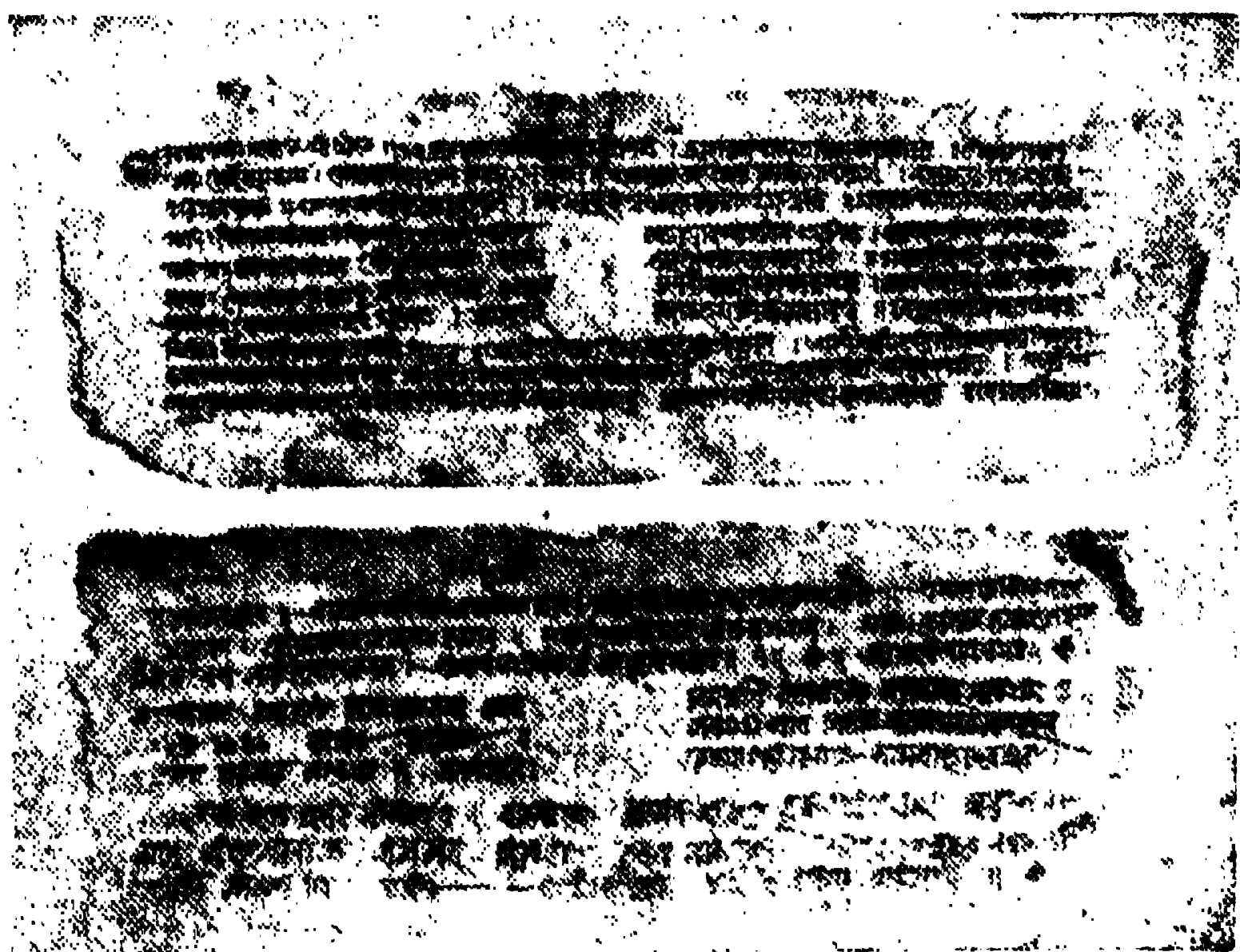
প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবীমঙ্গলে'র ১ম ও শেষ পৃষ্ঠা। শেষ পৃষ্ঠায় লিপিকাল প্রদত্ত। লিপিকাল ১৬৪৬ শকাব্দ, সন ১১৩১ সাল। রচনাকাল সন ১১০৪ সাল (বঙ্গাব্দ)

ব্রজবল্লভ রায়কে মুর্শিদাবাদের বন্দীশালায় বাস করিতে হইয়াছিল। ১১০১ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পুঁথির লিপি শেষ হইবার পর লিপিকার সীতারামদাস সুর এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে পুঁথির লিপিকার ও স্থানেরও উল্লেখ আছে—"সকাব্দা ১৬৪৬ তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ।। সন ১১০১ সাল লিখিত শ্রীসিতারামদাস সুর।। সাকিম পরগণে আম্বুয়া।। সাংগ হইল। চেতুয়া পরগণাতে গ্রাম বাসুদেবপুরে।। বেলা ছদণ্ড হৈল্যে পুস্তক সাঙ্গ হইল।। যাহাতে আমল শ্রীযুত ব্রজবল্লভ রায় মুর্শিদাবাদে বন্দখানাতে এসময় লিখিবার হইল পরমানন্দপুর বন্দবস্ত করিতে শ্রীযুত নারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুত বিশ্বাস" (উদ্ধৃত অংশে তৎকালীন বানান ব্যবহার করা হইয়াছে)। মনে হয় শ্রীযুত ব্রজবল্লভ রায় চেতুয়া পরগণার তৎকালীন জমিদার ছিলেন। রাজস্বের অনাদায়ে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের বন্দীশালায় প্রেরণ করা হইয়াছিল ও পরগণার বিলিব্যবস্থার জন্য নবাবের পূর্বানুমোদনানুযায়ী (পরমানন্দপুর) দুইজন পদস্থ রাজকর্মচারীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। পুঁথির শেষ পাতার অপর একস্থানে আছে—"চেতুয়া পরগণা বন্দবস্ত করিতে শ্রীনারায়ণ সিংহ ও শ্রীরাজবল্লভ বিশ্বাস আসীয়াছেন।" কবি প্রাণবল্লভ চেতুয়া বন্দোবস্তের জন্য পূর্বেই আগমন করিয়াছিলেন। জনৈক রামচন্দ্র রায় ও কবি যুগ্মভাবে চেতুয়ার রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ১১০১ সালের মাঘ মাসে (সম্ভবত উক্ত দুইজন পদস্থ কর্মচারীর অধীনে ইঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন)। কৃপারাম বসু নামক কবির অধীনস্থ এক কর্মচারীর ডায়েরী হইতে এই তথ্য জানা যায়। ডায়েরীর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীরামচন্দ্র রায় তশীলিতে বহাল শ্রীপ্রাণবল্লভ ঘোষ সাথুজ্যা বহাল হইলেন মাঘ মাসে" (পত্র ১২)...শ্রীরামচন্দ্র রায় শিকদারতশীল হইলেন মাঘ মাসে শিকদারী সনন্দ আইন শ্রীপ্রাণবল্লভ ঘোষকে শিকদারী...হইলেন (পত্র ৩৪)"। ১১০১ সালের ফাল্গুন মাসে কবি যে চেতুয়া গ্রামে ছিলেন তাহাও ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবত মুর্শিদকুলির চেতুয়া বন্দোবস্ত আরও কিছুকাল চলিয়াছিল।

প্রাণবল্লভ বর্ধমানের অম্বিকানগরে থাকাকালীন বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতার রাজ্য শাসনকালে (সন ১১০৪ সালে) "জাহ্নবীমঙ্গল" কাব্য রচনা করেন। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী এই স্থানটি একদিকে বৈষ্ণবধর্মের এক প্রধান পীঠস্থানরূপে যেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল অন্যদিকে ইহা ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে ভাগীরথী তীরবর্তী এই ভূভাগটির এক সুন্দর চিত্র এই কাব্যে পাওয়া যায়। অম্বিকাবাসীর 'গঙ্গাগাথা পদ্মমধু পানে'র অভিলাষ পূরণের জন্যই কবি এই কাব্য রচনা করেন। প্রবল প্রতাপশালী কীর্তিচন্দ্র ও তাঁহার মাতার প্রশংসাও কবি এই কাব্যে করিয়াছেন—

"যথায় ভূপতিবাবু রায়ের সন্ততি।
কীর্তিচন্দ্র মহারাজ জগতে খেয়াতি।।
যাহার জননী সতী কৃষ্ণপরায়ণী।
বহু রাজ্য সুশাসিত কৈল ঠাকুরাণী।।
...তাঁহার আশ্রিত বংশী ঘোষের নন্দনে।
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভণে গুরুর চরণে।।"

(পত্র ৭৯ পৃষ্ঠা ২)

আত্মপরিচয়ে কবি বংশী ঘোষের পুত্র ছাড়া আর কোন পরিচয় দেন নাই। ভণিতায় কবি একাধিকবার নিজেকে অম্বিকানিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন

"অম্বিকানগরে স্থিতি
কৃষ্ণপদে করি মতি
বিরচিল শ্রীপ্রাণবল্লভ"।

পুঁথিটির লিপিকর সীতারামদাস সুরের বাসস্থান ছিল পরগণা আম্বুয়া। এই আম্বুয়া প্রাচীনকালে 'আম্বুয়া মুলুক' নামে খ্যাত ছিল এবং ইহা প্রাচীন অম্বিকানগরের (বর্তমান অম্বিকা-কালনার) নিকটবর্তী ছিল মনে হয়।

"জাহ্নবীমঙ্গল" কাব্যটি এগার দিন ধরিয়া গাহিবার জন্য রচিত। ইহাতে মোট উনিশটি পালা আছে। প্রথম দুইদিন নিশাপালা এবং তৃতীয় হইতে দশম দিবস পর্যন্ত প্রতিদিন দিবাপালা ও নিশাপালা। দশম দিবসের নিশাপালার নাম 'জাগরণ'। ইহা কাব্যের দীর্ঘতম পালা। পরের দিন সকালে উনবিংশ পালার পর কাব্যসমাপ্তি। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যের ন্যায় 'জাহ্নবীমঙ্গলে'র পালাবিভাগে প্রচলিত কোন রীতি অনুসৃত না হইলেও বৈষ্ণব আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই কাব্যকে এগার দিনের গাহিবার উপযোগী করিতে চাহিয়াছিলেন। একাদশ সংখ্যাটিকে কবি একটি শুভসংখ্যা মনে করিতেন। কাব্যের মধ্যে কবি ইহা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যটির কাহিনী মূলত পৌরাণিক। রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মপুরাণের 'ক্রিয়াযোগসারে'র কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যটি রচিত হইলেও কবিত্বোৎকর্ষে ও কোন কোন স্থানে মৌলিক রচনায় কবির কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কাব্যের বহুস্থানে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

আড়াই শ বছরের প্রাচীন 'জাহ্নবীমঙ্গলে'র পুঁথিটি ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগের ঐতিহাসিক দলিলরূপে স্মরণীয় স্থান লাভ করিবার যোগ্য। বর্তমান নাগরিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বিজয় বৈজয়ন্তী যেখানে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে তিন শ বছরেরও অধিক প্রাচীন কবি প্রাণবল্লভের এই কাব্যটি সেখানে অকিঞ্চিৎকর ও অবহেলার সামগ্রী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন কাব্যামোদী সুধিবৃন্দ ও ঐতিহাসিকগণ যাঁহারা এখনও পল্লীর দুর্গম অঞ্চলে পাগলের ন্যায় প্রাচীন পুঁথি ও দলিলপত্রাদির খোঁজায় ঘুরিয়া বেড়ান, যাঁহারা বর্তমান কলকোলাহলপূর্ণ জীবনযুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া নিভৃতে অতীতের ইতিহাস ও ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে চাহেন কবি প্রাণবল্লভের এই অপ্রকাশিত পুঁথির পত্রগুলি তাঁহাদের নিকট যে অফুরন্ত আনন্দের উৎস হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি বোধ হয় পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর কালিমালিপ্ত ও কৃত্রিম সামাজিক জীবনের নিরাশ্য ও বিক্ষোভ মানসলোকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাই বহু পূর্বেই 'ভকত' লোকের জন্য অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন—

"জাহ্নবীমঙ্গল গীত অমৃত লহরী।
পিবত ভকত লোক কর্ণপুট ভরি।।"
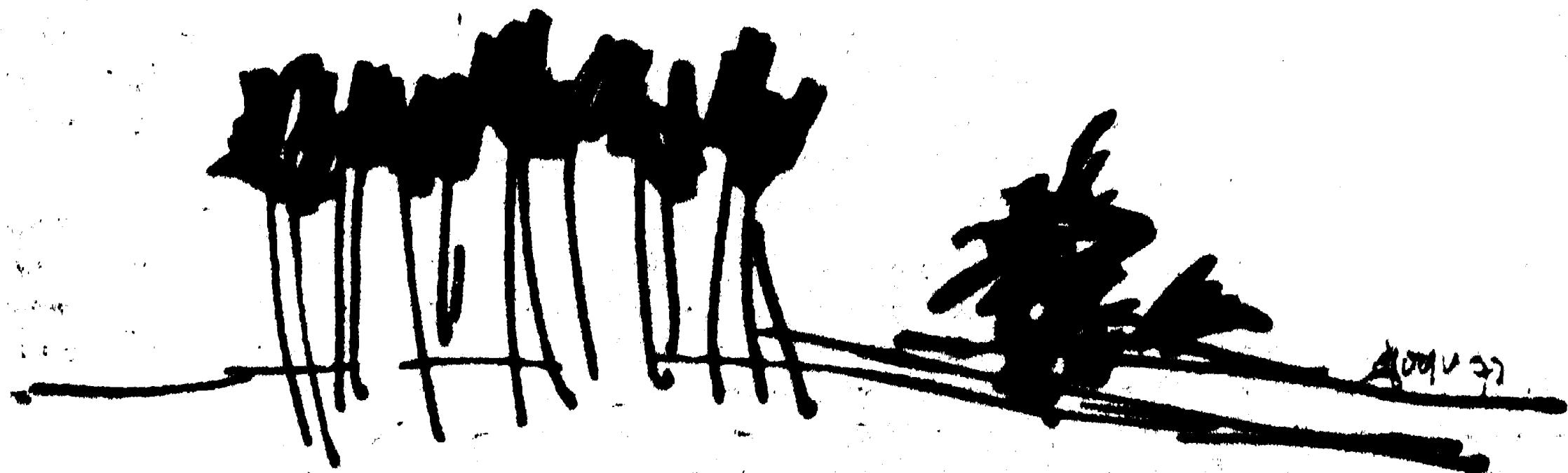
পদযাত্রা

শচীন বিশ্বাস

অবশেষে ওদের পদযাত্রা শুরু হল। দীর্ঘ অনিশ্চিত যাত্রাপথের শুরুতে বাড়ির নিচের বুড়ো গাবগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে রসিক কাঁদতে লাগল। ওর চোখের জল অন্যান্য যাত্রীদের চোখকেও অশ্রুসিক্ত ক'রে তুলল। ভুবন পিসী কাঁদতে লাগল। বড়বৌ ছোটবৌ কাঁদল। ছেলেমেয়েরা ঘুমভাঙ্গা চোখে কি হচ্ছে, কোথায় চলেছে বোঝার চেষ্টা করল। একটি বালিকা ভাবল 'কেউ কি মরেছে, না হলি বাবা মারা কান্তিচে ক্যা—!' একটু পরে সকলেই মিলিত কণ্ঠে হাউমাউ করে কাঁদল। রঘু সামলে নিয়ে ধরা গলায় বলল, 'আমার পেছু পেছু সব আসতি থাকো, কাঁদার অনেক টাইম পাবা, তখন ব'সে ব'সে কান্তি পারবা—কণা নামের মেয়েটা, কিছুটা বোধবুদ্ধিহীনা, থুথু করা বদ অভ্যাস, এখন যথারীতি থুতু ছিটাল।

পুব আকাশে জ্বল জ্বল করে যে তারাটা আলো দিচ্ছিল সেটা ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল। সকলের আগে রঘু, সঙ্গে ছোটবৌ কদম, ভুবন পিসী, তার বিধবা মেয়ে বাসনা এবং একদল বালক-বালিকা। একটু দূরে সকলের পেছনে রসিক ও বড়বৌ, বড়বৌয়ের কোলে একটা বাচ্চা ছেলে। জিনিসপত্তর পোটলাপুঁটলি প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু রয়েছে একমাত্র ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছাড়া। রসিকের মাথায়ও একটা বড় পুঁটলি। রসিক অবশ্য জানে না, এই পোটলায় মধ্যে কি কি আছে। এ-সবই বাঁধাবাঁধি করেছে রঘু ছোটবৌ বাসনারা। বড়বৌ মাঝে মাঝে তদারক করেছে।

উত্তরের মাঠের প্রান্তের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চড়পাড়া কাছে বাক্সার গলিতে নামল ওরা। আর সদর রাস্তা নয়, গ্রামের মধ্যকার বড় সড়ক ত্যাগ করে ওরা কানালের রাস্তা ধরল। বাক্সার গলি গলাকাটার গলির মধ্যদিয়ে ধলনগরের প্রান্ত ঘে'ষে এগিয়ে চলল। বাঁ হাতে পড়ে থাকল মীরপুর কাঞ্চনপুর আরও দূরে বোয়ালমারী নাবুদে গ্রাম। রাত গড়িয়ে আসা অস্পষ্ট আলোতে গ্রামগুলো কেমন যেন অচেনা অচেনা, রহস্যময়। রঘুর কড়া হুকুম, 'সূর্য ওঠার আগ দিয়ে সি-এম-বি-র পাকা সড়ক পার হতি হবি। পা চালাও, এই ত হুসেনপুরে পালাম বলে—।' ছেলেমেয়েরা তাড়া খেয়ে খেয়ে দৌড়াচ্ছিল। মেয়েরা হাঁটতে পারছিল না হাড়ের মত শক্ত মাটিতে হোঁচোট খাচ্ছিল—মাজা ঠ্যাং লেগে আসছিল। কিন্তু আতঙ্কও বিলক্ষণ ছিল, রাস্তায় যদি ধরা পড়ে যায়—! ওরা প্রাণভয়ে তাড়া খাওয়া জন্তুর মত দৌড়ে পালাচ্ছিল—নারী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলে—

রসিক সকলের পেছনে চলতে চলতে কত কি ভাবছিল। সব যেন তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে! এখনও কানে বাজছে কুতোর বসু আলির ভিটের বনজঙ্গল থেকে অসংখ্য শেয়ালের মিলিত সুর তুলে ডাকার শব্দ। ভুবন পিসী সারারাত ঘুমোয়নি। ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'রাত কিন্তুক শ্যাষ হতি চলল রে রসে'—রসিক তখন অন্যমনস্কভাবে বসে বসে হুকো টানছিল। কোন সাড়া দিল না। বড়বৌ উঠেছে। পোটলা-পুঁটলি বাঁধা শেষ। ভুবনপিসী বলল, 'অ বৌমা, ছাওয়াল পলরে হাগাও-মুতাও, চারডি পান্তাভাত খাতি দাও—!' রঘুও উঠেছে। ছোটবৌ কদমও—। নিম্নস্বরে ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ধরে ডাকা হচ্ছে কেউ উঠতে চায় না। শেষে রঘু প্রত্যেককেই টেনে টেনে তুলে দিল।

রসিক হুকো টানতে টানতে বলল, করিম চাচা যাতি চাইছিল—বলেই যেন কিছুটা সঙ্কুচিতভাবে বলল, বাবিনি মাকি বুঝতি পারতিছিনে—

রঘু মুখিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, তুমি নক কর দেখি দাদা, অত পিরীতি দেখাতি গেলি বাঁচতি পারবানা নে। বেল্টেপুরের হরেরামও ত যাতি চাইছিল। বেল্টেদে'র প্রাণবল্লভও ত আসতি পারে। এর যদি সব বেত্রম হলি ত' চলে না—

রসিক বলল, হর, বেত্রম আবার হবি ক্যা। কইচিল কিনা তাই কলাম। একটু চুপ করে থেকে বলল, লোকটা বড় বেসহায় রে রঘু, ছাওয়ালপলগুলোন কদিন কিছুই খাতি পায় না।

তুমার কয়চে—বড়বৌ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল।

রসিক চুপ করে থাকল। এতকাল ধরে দেখছে করিমচাচার সংসারকে, কবে খেয়ে আছে, কবে খাওয়া জোটেনি, সে কথা কি আর কারো বলার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এখন সকলেই প্রাণভয়ে ভীত, আতঙ্কের মধ্যে পালিয়ে যেতে হচ্ছে। সুতরাং কেউ কারো দিকে নজর দিতে পারছে না। দেড়িপাড়া থেকে রঘুর শ্বশুরকে নিতেই হবে। ঐ পথেই যেতে হবে, তাছাড়া ওখানে গিয়ে একটু বিশ্রামও নিতে হবে, হয়ত রাতখানা থাকতেও হবে, খেতে হবে—রঘুর অবশ্য ইচ্ছা নেই ঐসব জ্ঞাঞ্জাল বাড়ানোর। কিন্তু বুড়ো কালও কেঁদে কেঁদে বলে গেছে—

ঃ নিজির কতা ভাবো দাদা, যুদ্দ লাগলি কেউ কারো কতা ভাবতি পারে না। তুমিও আর কারো কতা ভাবতি পারবা না—এই তুমারে চুয়া কতা ক'য়ে দিলাম—

কানালের পাশ দিয়ে চলতে চলতে কতকালের সব পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। রসিকলালের বাবা রামলাল আর করিমচাচার বড় ভাই রহিমচাচা ছিল দুই বন্ধু। ধুমধাম ক'রে গাঁয়ের লোক খাইয়ে তারা বন্ধু পাতিয়েছিল। রসিক ছোটবেলা থেকে এই দুই বাড়ির গভীর আত্মীয়তা দেখে আসছে। দুই বন্ধু এই ডানপাশের ধলনগরের বিলে উঁড়ি ঘাস কাটতে আসত নৌকা করে। রসিক নৌকার উপরে বসে বসে নাল ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ত। রহিম চাচা সুর করে গলা ছেড়ে গান করত। মাঝে মাঝে বলত, কি বাজান, কাইম পাখির ডিম খাবা? এই বিলে কামি ডিম পাড়ে; ঐ শোন ডাকতিচে—। রহিমচাচা সত্যিই একদিন সাত আটটা ডিম কুড়িয়ে দিল। উঁড়ি ঘাসের মধ্যে বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছিল কাইম পাখি।

রসিক খেলো হুকোয় কুড়ুৎ কুড়ুৎ করে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, কিন্তুক ইডাও সত্যি কতা, পেরথম ধাক্কাডা করিমচাচাই আমাদের বাঁচাইচে—। রসিক আবার হুকোয় টান দিল। কেউ কোন কথা বলে না দেখে সে মুখ তুলে ঘরের টিমটিমে প্রদীপের আলোতে দেখল, সব মাথা গুঁজে মুখ গুঁজে শুয়ে বসে আছে। কদম দরজার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল। ঐ মেয়েটাকে পাঁচখানা গাঁ চুঁড়ে রসিক দেখেশুনে ঘরে এনেছে। বৌমা তার ভাঙা ঘর আলো করেছে। কিন্তু শত্রুরা যদি কদমের ইজ্জত নষ্ট করে। রঘু হয়ত রামদাখানা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা দেবে। তারপর! মিলিটারীর দালাল মোল্লাজী ও গিরি মহাজন শাসাচ্ছে। গরমেন্টের বিরুদ্ধে গেলে তার সর্বনাশ হবে। গরমেন্টের বিরুদ্ধে যাওয়া কাকে বলে রসিক জানে না। রঘু জানে। ভোট ভোট করে ওর চোখে ঘুম ছিল না। এখন সে ভীষণ আতঙ্কিত। করিমচাচা বলেছিল, 'আমি ত মরিনি, খুদা যদি দোয়া করে—।' রঘু লাফালাফি করছিল। 'ইন্ডিয়ায় চলে যাব, না হলি বাঁচা যাবিনে। শালাদের বাক্সে ভোট পড়েনি ত', পাগলা কুকুরের মত ব্যাভার করতিচে—।' করিমচাচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'থির হ্ রঘু, আমি জ্যান্ত থাকতি তোদের ক্যাশগাছ কেউ পর্শ করতি পারবি নে—।' করিমচাচা বুক দিয়ে আগলেছিল; ঠিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই সর্বনাশ হল। গ্রামে সেদিন ভীষণ ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি। পালা পালা, মিলিটারী আইচে—। মা'দের বিলের নাবাল জমিতে গিয়ে লুকিয়েছিল গ্রামের ছেলেছোকরার দল। কুতোর বন ঘুঘু-ডাঙার মাঠ—যে যেমন পেরেছিল পালিয়েছিল। ওর মধ্যেই কয়েকটাকে ধরে নিয়ে কুসুরে পালের বাবলাগাছের মধ্যে ওরা গুলি করল, গুড়ুম গুড়ুম। গুলি খেয়ে করিমচাচার বড় ছেলেটা পালাতে পালাতে চাষ দেওয়া জমির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে, গিয়েছিল। করিমচাচা পরদিন সকালে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখল, তার বড় ছেলে তারই জমির মধ্যে পড়ে আছে। রক্ত জমাট বেঁধেছে, চাষ দেওয়া জমির মাটি ভিজে রয়েছে। করিমচাচা বলল, স্বাধীনতার জন্য হাওয়াল আমার খুন ঢালিচে মাটিতে। স্বাধীনতার জন্যে রক্ত—কথাটা কোথায় শুনেছে যেন রসিকলাল। কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না—ছেলেমেয়েরা হাঁটতে না পেরে কান্নাকাটি করছিল; সেইদিকে তাকিয়ে তার বুকে ঠেলে কান্না আসতে লাগল।

রঘুর দু'টি, বাসনার চারটি, রসিকলালের চারটি—সব মিলে একটা দল, বড়বৌ বলে রাবণের পাল। জ্বালায় জ্বালায় জর্জরিত বড়বৌ আরও বলে 'শত্তুররা মরেও না, মলি ত' আমার হাড় জুড়ায়। সন্যারা এত সব হাওয়াল পাল আছাড় দিয়ে দিয়ে মারল, এই ব্যাক্কম্মাদের দেখতি পালো না—।' ভুবন পিসী শুকনো মুখ থেকে থুতু ছিটানোর ভঙ্গী করে বলল, 'বালাই সাট, আমার সুনারা মরবি ক্যা, তুরা মর না ক্যান্—।' কণার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, এখন ভুবন পিসীর থুতু ছিটানো দেখেই বোধহয় সেও থুথু করতে লাগল।

রসিক বলল, 'পিসী হাওয়াল পালরে চারতি করে হুড়ুম দিলি পারতা—। রঘু বলল, 'না না এখন না।' বড়বৌ বলল, 'পরে যখন পথের মদ্দি ভ্যাবাবিনি, তখন কি দিবানে—'

রসিক আর কথা বলল না। সত্যিই তাহলে বাপ পিতা-মো'র ভিটে ছাড়া হ'ল সে! উঠানের পাশের জামগাছটার কথা মনে পড়ল তার। ওখানে শীতের রোদ পোয়াতে পোয়াতে তার ঠাকুর্দা মারা যায়। বাবা মাঠ থেকে ঘাসের বোঝা মাথায় করে এসে গোয়ালঘরের সামনে বোঝা ফেলল এবং নিজেও পড়ল। তখন দেশ জুড়ে আকাল চলছে। আউশ ধান পাকার আর দিন পনের দেরি ছিল। বাবা তিনদিন কিছু খায়নি, তবুও তার অতি আদরের গরু দু'টির জন্যে মাঠে ঘাস কাটতে গিয়েছিল। বাবা গেল, পিছে নয়-দশ জমিও একে একে চলে গেল। সেই থেকে ওরা মাঠে জন-মজুরে খাটে, কানালে মাছ এলে খ্যাপলা জাল ফেলে। সুখ ছিল না বটে, কিন্তু অনেকেকদের ভিটেটা ছিল। সেখানে খেয়ে না খেয়ে ঘুমুতে পারত—

নামদে কাঞ্চনপুর মীরপুর—বাঁ হাতের গ্রামগুলো একে একে পার হয়ে ওরা কালী নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল। এই সেদিনও দুর্দান্ত স্রোত বইত, এখন ঢোঁড়া সাপের মত তেজহীন পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে যেন নদীটা। পায়ে হেঁটে পার হ'ল ওরা। কোথাও কোথাও কচুরি পানা জমেছে। বড় বড় কানাল দিয়ে এখন মাঠের জল বেরিয়ে যায়। ছোটোখাটো নদীগুলো শুকিয়ে গেল।

রঘু হুঁশিয়ার ক'রে দিল, হরেনপুর বাজারে হামলা হতি পারে, আমরা শান্তি-ডাঙার কোল কোল দিয়া যাবো—

নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভুবন পিসী বলল, 'হয়, ওদের কি ঘোমটোম নাই নাকি, হামলা করার জন্য বসে রয়চে'—

রঘু বলল, 'চুটটাদের আবার ঘোম!'

কিছুদূর এগিয়ে এসে স্কুলের মাঠের দিকে উঁকি মেরে দেখল সত্যিই কাকপক্ষিও জেগে নেই। মাঠটা পাড়ি দিতি পারলি—ওপাশে কুমোরপাড়া। বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে পা চালিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলেই লক্ষ্মীপুরের সি-এন-বি রাস্তা।

ভুবন পিসীর কথাই ঠিক। ওরা হয়ত সারাদিন ছিনতাই লুটতরাজ করে এখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। পাকা রাস্তা সামনে। আর একটা আতঙ্কের জায়গা। লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যদিও বা সম্ভব এই রাস্তায় যারা চলে তাদের হাত থেকে রেহাই নেই। রঘু বার বার সাবধান করে দিচ্ছিল, 'এই পথটুকুন খুব পা চালাইয়া যাতি হবি, মিলিটারীর টাক আসার আগ আগ দিয়ে পাকা রাস্তা পার হতি হবি—'

রসিক বলল, 'হয়, উরা ত' গরমেন্টের লোক, ছাড়ে কতা কবিনে, কতায় বলে, সাপের হাতে নেকা আর আর বাঘের সাথে দেকা—দেকা হলিই হালম্ করে ঘাড়ে পড়বিনি'—

ভুবন পিসী বলল, 'নে নে আর হাওয়াল পালরে ভয় দেকাস নে'—

ঃ ভয় কি মানসে দেকায় পিসী, ভয় দেকায় ভগমান—

বড়বৌ ছেলে টানতে টানতে হাঁফাচ্ছিল। বলল, 'মুরোদ না থাকলি ভগমানের দোষ তাই না? কেন, যেকুন দীনুরা ইন্ডিয়া চলে গেল, কত কইছিল না, তেকুন বাড়ির বার হতে আকড় ঠেকিচিল—একুন ভগমানের দুহাই পাড়তিচ?'

ঃ অমন করে কোসনে বৌ. পুড়ো মানুষের মনে চোট লাগে। সবই আমাদের কপাল—। না হলি দীনুরা ইন্ডিয়ায় যাইয়া আজ কত সুখ করতেচে—কি জানি তেকুন আলি হয়ত জামাইডাও বাঁচাতি পারত—

বাসনা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, তার স্বামীর কথা উঠতেই বলল, 'বাঁচাতি পারত না ছাই, হাঁপানির লোক আমার মারে'—

কথাটা সত্য নয়তে, [illegible] রসিকলাল পর্যন্ত আহত হ'ল। রঘু

বাসনাকে এক ধমক লাগাল, 'নক কর ত' এখন—বিদ্রূপ ক'রে না বাবি ত' মাঠের মধ্যি ফেলাইয়া যাবনে—

বাসনা বা আর কেউ কোন কথা বলল না। ছেলেপুলেরাও হয়ত অস্বাভাবিক কিছু একটা কল্পনা করছিল। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পায়ে পায়ে হাঁটছিল। কেবল কণা মাঝে মাঝেই থুথু করে থুতু ছিটোচ্ছিল।

পালপাড়ার পশ্চিম পাশের ছোট মাঠটা পাড়ি দিয়ে ওরা সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কের রাস্তায় উঠল। উত্তর-দক্ষিণ বহু বিস্তৃত পাকা সড়ক। কি সুন্দর রাস্তাটা। মন বলে কিছুক্ষণ বসে থাকি, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। একটা বাচ্চা কনক্রিটের সানের উপর বসে পড়ল। বড়দের গুঁতো খেয়ে সে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে গেল। উপরে ওঠার সময় যেমন কষ্ট হচ্ছিল, নামার সময়ও কম কষ্ট হচ্ছিল না। বলা যায়, ওরা হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ার মত উল্টোদিকের চাষ দেওয়া জমির মধ্যে নেমে দৌড়তে লগল। উত্তর প্রান্তের দিক থেকে একটা আলোর আভা দেখা যাচ্ছিল। রঘু ফিস ফিস করে বলল, 'পা চালাও সব, মিলিটারির ট্রাক আসতিচে—।' ওরা চাষ দেওয়া জমির আলপথ দিয়ে দৌড়তে লাগল। একটি ছোট মেয়ে ঢেলায় হুচোট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ছোটবৌ তাকে এক হাতে তুলে নিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আলোর রেখাটা বিস্তৃত হতে লাগল। ওরাও দৌড়তে লাগল। একটা ছোট গ্রামের প্রান্তে এসে ঝোপের পাশে ওরা বসে পড়ল, রঘু বলল, মাথা ছাপোড় করে শুয়ে বসে থাকো,—এই ধনে, মাথা ছাপোড় কর রে।' রসিকও দারুণ উত্তেজিত বোধ করছিল, বলল, 'ভরাপড়া ছাওয়াল মাথা ছাপোড় কর,—এত কই মাথা উঁচু করে থাকিস নে, তাও মাথা উঁচু করিস?' কণা একটা ঢিলের উপরে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে থুথু করে থুতু ছিটিয়ে দিল। তখন গাছপালার মধ্যে সি-এম-বি রাস্তা ধরে মিলিটারী ট্রাকগুলি যেতে শুরু করেছে। এক দুই তিন চার—কত কত, আর কত আচে দুনিয়ায় মিলিটারী! রঘু গুনছিল, রসিক ভগবানের নাম নিচ্ছিল।

মিলিটারী-ট্রাক চলে গেলে ওরা গা হাত পায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠল। একটি বালিকা বলল, 'মা, আমরা এ্যামবা মাটির মধ্যি শুলাম ক্যা'—বড়বৌ বলল, 'শোন কতা, সন্যারা গেল দেকলি নে, দেকতি পালি গুলি করত না?' মেয়েটি বলল, 'গুলি করলি কি হয় মা?' মা বলল, 'গুলি করলি মানুষ অক্কা পায়ে যায়। সে চল ওরা যাতি শুরু করেচে—ন্যাক এমুন মানুষ, মিয়াডারে ফেলাইয়া আগে আগে চলতিচ—।' রসিক দাঁড়াল। না, সে যায় নি। ভুবন পিসীকে বলছিল, 'তা নি পিসী, সত্যি সত্যিই দ্যাশ ঘর ছাড়ে আলাম গ! কি কও?'

ভুবন পিসী বলল, 'হয়, তাই ত' দেকতিচি, এখুন আমার বিশ্বেসই হয় না যে দ্যাশ ছাড়া হলাম। তোকে কয়, দ্যাশ ছাড়া হলি, লক্ষীছাড়া হবি'—

গ্রামের পথ। গেঠো পথ। পাকা সড়ক অনেকদূর ছাড়িয়ে এসেছে। এখন আর মিলিটারীর ভয় নেই। এখন গ্রামের মানুষ যদি না ধরে কেড়েকুড়ে না নেয়, অসুবিধা হবে না—

এতক্ষণ ছেলেমেয়েগুলো কিসের এক অজানা আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়েছিল। এখন সকলকে কথাবার্তা বলতে দেখে সব কাঁদতে শুরু করল। বেলা বেশ কিছুটা হয়েছে। পথ চলতে চলতে সকলেই ক্লান্ত। ছেলেমেয়েরা বলল, ক্ষিদে পাইচে—

রঘু বলল, 'খাওয়ার কথা বাদে অন্য কতা ক'—

পিসী বলল, 'দাঁড়া সুনা, বিয়েন হতি দে, ঐইযে গ্রামটা দেখা যায় না, ঐডা তুমাদের আজ্জা বাড়ি—।' রঘু বলল, 'চ' না, কত খাজা খাবি'—

বাসনা বলল, 'কৈ পাইনে ত', মাজা ঠাং বুক প্যাট সব লাগে গেল যে রে দাদা'—

রসিক বলল, 'অ পিসী ছাওয়াল মিয়াদের চারডি করে হুড়ুম-গুড় দিলিই পারতা—।' বড়বৌ বলল, 'খাবানি, তাওই বাড়ি যায়ে বসে বসে খাবি নি। অত সুখ করতি গেলি ত চলে না, ঘর ছাড়া যেকুন হয়চে তেকুন কষ্ট করতিই হবি'—

রসিক ঘামছিল, মাথায় বড় একটা বস্তা থাকার দরুণ ঘাড় শক্ত; হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'শুনলা পিসী, মিয়া মানষের কতা শুনলা? ছাওয়াল পলগুলোন খিদের জ্বালায় দাপাচ্চে—কয় কি! এ্যাঁ'—

ভুবন পিসী বলল, 'চুপ কর রসে, খাতি দিতি হয়, আমি দিবানে'—

রঘু ধলার হাত ধরে নিল, আয় ধলা, আমার কাচে আয়—। শোন, যে-দ্যাশে আমরা যাতিচি—সে দ্যাশখানায় কত কি দেখার জিনিস আচে—

দুর্গা বলল, 'কি কি আচে কাহা—?'

ঃ সে কত কি! উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি, মটরগাড়ি—চিড়িয়াখানা—

ধলা বলল, 'কাহা ক্ষিদে পাইচে'—

ঃ চল্ না কত খাবি—

ঃ হুড়ুম খাব, ভাত খাব—ধলা কাঁদতে লাগল। ধলার দেখাদেখি সোনা রূপা খোকা সকলেই কাঁদতে লাগল—

কণার বোধবুদ্ধি প্রখর নয়, ক্ষিদে পেলেও সে বলতে পারে না অনেক সময় তার মনেও থাকে না। সে থুথু করে থুতু ছিটোতে লাগল—

কদমেরও ক্ষিদে পেয়েছিল, বলল, 'এই মিয়াডতে আচ্চা রে, কেবল থুতু ছিটোয়'—

ঃ ভাত খাব কাহা, ধলা আবার বায়না ধরে—

ঃ চল্ না, কত খাবি—

ঃ ঐ দ্যাশে ভাত আচে?

ঃ কত ভাত! একেবারে রাঁধা ভাত পাবানে, সীমানাডা পার হতি পারলি হয়—

দৌড়পাড়ার রাজেন হালদার বিধ্বস্ত ভিটের উপর বসে রসিকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সি-এম-বি রাস্তার দুই-তিন মাইলের মধ্যে গ্রামগুলির উপর পরপর কয়েকদিন হামলা হয়ে গেছে। মিলিটারীরা ট্রাক থেকে গুলি করতে করতে বেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে নেমে এসে আগুন দিয়েছে, লুটপাট করেছে। আম, কাঠাল, জাম গাছের পাতা ছিঁড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। রাজেন ভিটের উপর বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বাড়ির দুটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুড়ি মা, চলতে পারে না, সেউ মিলিটারীর রাইফেলের আঘাত খেয়ে এখন একেবারেই উঠতে পারে না। বাড়ির অন্যান্য সকলে শেখপাড়ার জামির হোসেন মিঞার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। রাজেনের বুড়িমা হেলেপড়া চালা ঘরের মধ্যে বিছানার সঙ্গে মিশে পড়েছিল। তার শরীরে কেবল ক'খানা হাড় মাত্র অবশিষ্ট আছে। মাটির দেওয়ালের

অর্ধেকটা ভেঙে পড়েছে। উপরের চাল থেকে খড় খসে পড়েছে। আকাশ দেখা যায়।

উঠানের একপাশে একটা আম্রগাছ ছিল। তার ছায়ায় ছেলেমেয়েরা বসে পড়ল। সকলেই ক্লান্ত। ভুবন পিসী এক মুঠ করে মুড়ি, একটু করে গুড় দিল জল খাওয়ার জন্যে। বাড়িতে কিছুই বাসনপত্র নেই। লুটপাট হওয়ার পর যা ছিল বাড়ির অন্যান্যরা পালাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। কুয়ো থেকে জল তুলল একটা মাটির হাঁড়ি করে। দুই হাত এক করে সব জল খেল।

রঘু বলল, 'আপনি বুড়ির মায়া ছাড়ে দ্যান, বাচিত যদি চান'—

রসিক এক ধম দিল, 'ক'স কি করে রঘু, এমুন কতা তুই কাত পারলি! জ্যান্ত মানষের মায়া ছাড়ান দিয়ে ঘরে ফেলাইয়া যাতি কস?'

: তা' লি কি করবা? আমি আর দেরী করতি পারব না—

: বাঁশ দিয়ে ডুলি মত কিছু কর—

বাঁশের ডুলি করে ওরা যখন শেখপাড়ার দিকে রওনা হ'ল তখন বেলা বাড়ে গেছে। সারাদিনের অনাহারে আর পরিশ্রমে ছেলেমেয়েরা পড়েছিল সব নিস্তেজ হয়ে। রঘু গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আবার সব তুলে দিল। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করতে লাগল। বড়দের ধমক খেয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাঁটতে লাগল।

শেখপাড়া বেশী দূরে নয় বটে, তবে একখানা বিরাট মাঠ অতিক্রম করতে হল ওদের। ঠিক মাঠের মাঝখানে রাজেনের বুড়ী মা সূর্যের দিকে মুখ রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

একটা বাবলাগাছের গোড়ায় ডুলি সমেত বুড়িকে নামিয়ে রেখে ওরা আবার এগিয়ে চলল। সন্ধ্যা ঘোর হওয়ার আগেই ওরা শেখপাড়ার জামির হোসেন মিঞার বাড়িতে পৌঁছে গেল। রসিক বলল, 'পিসী ছাওয়াল পালরে দুড়ি ডাল ঘুটাইয়া খাওয়াও, ওরা যে মলো বলে দেকতিচ না?'

পূর্বে যে দলটা এসেছিল, তাদের রান্না করা ভাত ছিল, ভুবন পিসী নিজেই সেই ভাত নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের খেতে দিল। বলল, 'বড় বৌমা, রাঁধার জুগাড় করতি থাকো'—

অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ির বাইরের অংশে ওদের যাত্রার তোড়জোড় চলছে। একটা মিলিত চাপা কণ্ঠস্বর, ধমক গোঙড়ানি শিশুদের কান্না। জিনিসপত্র বাঁধা হচ্ছে। ওরা এখনই বের হবে। রাত কত হল কে জানে। মোরগ ডাকছে! হয়ত ভোর হয়ে এলো। ভোরের বাতাস এখন মিঠে মিঠে। জামির হোসেন মিঞা ভেতরের দাওয়ায় বিছানার উপর বসে বসে তামাক টানছিল। রাজেন ভেতরের উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মিঞাভাই, উটিচ নাকি'—

মিঞা কিঞ্চিৎ জোরে হুকো টেনে সাড়া দিল। রাজেন ধরা গলায় বলল, 'আমরা এখন যাতি চাই'—

মিঞা কোন উত্তর দিল না, কুড়ুৎ কুড়ুৎ করে হুকো টানতে লাগল। ছেলেরা কেউ বাড়িতে নেই। সব যুদ্ধে গেছে। কে কোথায় আছে, অথবা আদৌ আছে কিনা জামির হোসেন মিঞা জানে না।

: তুমি একবার বাড়-বাড়িত আসবা না?

মিঞা লুঙ্গিখানা পরনে এ'টে হুকো হাতে বাড়-বাড়িতে এসে দাঁড়াল। পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় ছেলেমেয়েদের হাত ধরে একটা বিরাট দল যাত্রার জন্যে তৈরী। এখন মিঞা সাহেবের অনুমতির অপেক্ষা। বাইরে পিঠেপোড়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মিঞা সকলের দিকে তাকাল। তার দাড়ির উপর দিয়ে কয়েক ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। রাজেন বলল, 'চললাম মিঞা ভাই, এতকালের বন্ধুত্তা, যাতি মন চায় না, কি করব কও—বড় বিপাকের মদ্দি আমাদের যাতি হচ্ছে—'। জামির হোসেন মিঞার বুক ফেটে কান্না আসছে। নিজের ছেলেরা কাছে নেই। অনেককালের বন্ধু লোক রাজেন—সেও চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে। বলল, 'তুমার পিতিজ্ঞার কতা মনে আচে ত?'

: আচে মিঞা ভাই, দ্যাশ স্বাধীন হলি পর, নিচ্চয় ফিরে আসব—

: আমার গা ছুঁয়ে কিসিম কর।

: এই তুমার গা ছুঁয়ে কচ্চি, নিচ্চয় ফিরে আসব—

দলটা তখন পিঠেপোড়া গাছের নিচের নাবাল জমিতে নামতে শুরু করেছে। জামির হোসেন মিঞা বলল, 'হুঁশিয়ার হয়ে যাসরে রসিক, পথ বড় খারাপ। খোদা হাফেজ।'

আবার সেই পথ। এবারে আরও বড় দল। দৌড়পাড়া ছাড়াও আরও কটা গাঁয়ের লোক এসে জুটেছে। প্রায় শ'খানেক মানুষের একটা বিরাট মিছিল এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে। কাঁচা রাস্তা, গ্রামের পায়ে চলা পথ ধরে ওরা হাঁটছিল। কখনও বা মাঠের আলপথ। সূর্য ওঠার আগে ওরা অনেকটা রাস্তা এগিয়ে যেতে চায়। এমনি করেই ছাড়িয়ে গেল হাড়ুলিয়া পাটকেবাড়ি ছালসা। সামনে খলসে কুণ্ডুর পাকা সড়ক। আর একটা সাংঘাতিক আতঙ্কের জায়গা। ঐ পাকা সড়ক পার হতে পারলে সেলিমপুর কাতলামারির মাঝখান দিয়ে ওরা নিরাপদ সীমান্ত বরাবর এগিয়ে যেতে পারে।

ওদের বুক কাঁপছিল যতই সি-এম-বি'র পাকা সড়ক এগিয়ে আসছে। রাজেন বলল, 'হালসা তরি ত' আলাম ভালই, বুঝেচ বাবাজি, এই খলসে কুণ্ডু পার হতি পারলিই আর পায় কেডা—

রসিক পথঘাট চেনে না। তার বুকের মধ্যে দারুণ তোলপাড় হচ্ছিল। বিশেষ ক'রে পাকা রাস্তা এবং মিলিটারী দেখলেই ওর বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। সে কোন উত্তর দিল না। একটু পরে বলল, 'একটা বিড়ি ধরান গো তাওই'—

: খাবা? ধরাই! আর ভাল লাগে না বাবা—। বুড়িডার শ্যাষ কাজটুকুনও করতি পারলাম না—গড়ো ধরিচিল—

: কি আর করবা তাওই সবই ভগমানের হাত—

: তাই দ্যাক একটু আগুনেও পা'লো না, জলও পা'লো না—

হঠাৎ সামনে একটা বিরাট আলোড়ন। সন্যরা আসতিচে, সন্যদের টক আসতিচে—! শুয়ে পড় মাথা ছাপোড় কর—নক কর কাঁদিস নে—এই এই! চারদিকে হাউমাউ কান্নার শব্দ। এই নিচুপে শুয়ে পড়, এই এই—

সি এম বি-র রাস্তা বেশ দূরেই ছিল। মিলিটারী লরীগুলো তীব্রবেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। কাছাকাছি আসতেই প্রচণ্ড শব্দ করে গোলাগুলি চলতে লাগল। ওরা সব মাঠের শুকনো ঢেলার মধ্যে মাথা গুঁজে পড়েছিল। কেউ কোন কথা বলছিল না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত মড়ার মত পড়ে থাকল। কোন ফাঁকে মিলিটারী ট্রাক দেখার জন্যে কণা উঠে দাঁড়িয়েছিল। থুতু ফেলানোর ক্ষীণ শব্দ শুনে বড়বৌ আতকে উঠে বলল, 'ওগ, কণা উটে পড়িচে যে—!' রসিক ঢেলার মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে কণার পা ধরে টান দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা বুলেট এসে কণার কচি বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে বের হয়ে গেল। কণা আর একবার থুতু ফেলতে ফেলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রসিক ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

মিলিটারীর ট্রাকগুলো চলে গেলে আবার ওরা পায়ে পায়ে চলতে লাগল। চাষ দেওয়া জমির আলের উপর বেনাঝাড়ের পাশে মুখ রেখে কণা পড়ে থাকল। একখানা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ওর মুখের উপরে ঢাকা দেওয়া। ওর নিথর শরীরের উপর কয়েক মুঠো মুড়ি ছিটানো। ভুবনপিসী ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

বাঙালী মেয়ের ফরাসী উপন্যাস

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

সম্প্রতি কলকাতার একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে বই খ‍ুঁজতে খ‍ুঁজতে ফরাসী ভাষায় লেখা একখানি উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ চোখে পড়ে। কৌতূহলী হয়ে বইটি বাড়ি নিয়ে এসে দ্রুত পড়ে ফেললাম। বইটির বিষয়বস্তুতে না হলেও রচনা-রীতিতে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। আরও অবাক লেগেছে, এর আগে এসম্পর্কে কোথাও কিছু পড়িনি। অনুসন্ধানে জানলাম, দেশ পত্রিকার (৩৭ বর্ষ, সংখ্যা ২০, ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৬) কাদার দ্যাভিয়েনের ফীচার 'ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা'য় মূল বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেরিয়েছিল। এ ছাড়া বাঙালী পাঠকমহলে বইটি প্রায় অপরিচিত এবং অবহেলিত।

লেখিকা গত শতাব্দীর খ্যাতনাম্নী বাঙালী-কন্যা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকে তাঁর ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত কবিতার দেশবিদেশে খ্যাতি হয়েছিল। আজ সাহিত্যক্ষেত্রে বিস্মৃতপ্রায় সেই লেখিকার নাম তরু দত্ত। ফরাসী ভাষায় তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করেছিলেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। উপন্যাসটির নাম 'কুমারী আরভ্যার-এর দিনপঞ্জী'। (Le Journal de Mlle. d' Arvers) Libraire Academique. Didier et Cie, Libraire Editeurs, Paris থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে। আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রকাশিত হবার পর প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত বইটি বাঙালী পাঠকমহলে অজ্ঞাত ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুস্তকতালিকা প্রস্তুতকারকের কাজ করতে গিয়ে রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বইটি দেখতে পান এবং স্বর্গত ডক্টর কালিদাস নাগের উৎসাহে এর বঙ্গানুবাদ করেন। অনুবাদ গ্রন্থে প্রকাশ-তারিখ দেওয়া নেই। তবে অনুবাদক-প্রদত্ত পরিচায়িকার তারিখ ১৯৪৯ সাল। এ থেকে অনুমান করি, বইটি ১৯৪৯ সালের কোনো সময়ে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মূল গ্রন্থের প্রকাশকাল (১৮৭৯) আর অনুবাদের প্রকাশকালের মধ্যে দীর্ঘ সত্তর বছরের ব্যবধান।

ডক্টর কালিদাস নাগ অনুবাদগ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন। তা থেকে জানা যায়, Garcin de Tassy, Madame Saffray, James Darmesteter প্রমুখ প্রবীণ ফরাসী লেখক-লেখিকাগণ তরু দত্তের মনীষা এবং শিল্পনৈপুণ্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। বাংলা উপন্যাসের আদি পর্বে ১৭।১৮ বছরের বাঙালী মেয়ের লেখা ফরাসী উপন্যাসখানির যথোচিত মর্যাদা দেশবাসী দেয়নি বলে ডক্টর নাগ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। উপন্যাসখানি ফরাসী ভাষায় লেখা বলেই যে মর্যাদার দাবি রাখে, তা নয়। ডক্টর নাগের মতে, 'ভাষা বিদেশী হলেও ভাবের রাজ্যে তরু যে তাঁর বাঙালী মানস-সম্পদ কিভাবে পরিস্ফুট করেছেন সেটি সমঝদার পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন।' অনুবাদক প্রসঙ্গকথায় বলেছেন, 'ইংরাজীতে ইংরাজ ব্যতীত পৃথিবীর অনেক জাতির সন্তানরা বই লিখেছেন, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে ফরাসী ব্যতীত ফরাসী ভাষায় এতবড় একখানি উপন্যাস লিখে গেছেন একমাত্র তরু দত্ত, এটা বাংলাদেশের বড় কম গৌরবের বিষয় নয়, বাংলা সাহিত্যেরও এ বইখানি অমূল্য নিদর্শন হওয়া উচিত। কারণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হয় এ-খানি ফরাসী ভাষায় লেখা বাংলা উপন্যাস।"

বইটি পড়ার পর সত্যি সত্যি মনে হয়েছে, এটি 'ফরাসী ভাষায় লেখা বাংলা উপন্যাস'। কারণ এর আগাগোড়া 'বাঙালী মানস-সম্পদের' অন্তর্দৃষ্টি প্রমাণ লক্ষণীয়।

আমাদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে বইটির রচনা-রীতি। সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কতকগুলি ডায়রী বা দিনপঞ্জীর মাধ্যমে কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। ফরাসী গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাক্‌সংযম এবং বুদ্ধির দীপ্তি বইয়ের সব জায়গায় বর্তমান। তদুপরি, গ্রন্থে স্বাদুতা এনেছে লেখিকার বাঙালী-সুলভ ভাবপ্রবণ মনের প্রতিফলন। বুদ্ধি এবং হৃদয়ের সমন্বয়ে রচিত উপন্যাসটির বিয়োগান্ত পরিণতি বর্ণিত প্রেমকাহিনীতে একটা নতুন মূল্য দান করেছে। কাহিনীর আরম্ভ, অগ্রগমন, ঘটনার জটিলতা বিজ্ঞাপিত হয়েছে সংক্ষিপ্তবাক্ দিনলিপিগুলির মাধ্যমে। এই দিনলিপিগুলিই বেদনাময় পরিণামে পাঠককে পৌঁছে দেয়। একক্ষেত্রে বর্ণনা কোথাও নেই। অল্পকথায় অনেককিছু বলার ফরাসী রীতি তরু দত্ত অল্প বয়সেই ভালো আয়ত্ত করেছিলেন। এমন পরিমিত-বাক্ উপন্যাস বাংলা ভাষায় চোখে পড়ে না। বিশেষতঃ, যে-যুগে লেখিকা উপন্যাসটি লেখেন তখন বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটেছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের মতো দীর্ঘ বর্ণনা-রীতি লেখিকা অনুসরণ করেননি। সংহত ইঙ্গিতময় বাক্য ব্যবহারে অতিকথনের পথ এড়িয়ে গেছেন। একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিই। উপন্যাসের নায়িকা মার্গেরীতের পরমাসুন্দরী দিদি... অন্য এক তরুণীকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় ছোট্ট ভাই গাস্তঁর

অনূদিত উপন্যাসের আখ্যানপত্র

তরু দত্ত

LE JOURNAL

DE

M^LLE D'ARVERS

NOUVELLE *ÉCRITE EN FRANÇAIS*

PAR

TORU DUTT

Jeune et célèbre Hindoue de Calcutta, morte en 1877.

OUVRAGE PRÉCÉDÉ D'UNE ÉTUDE

SUR LA VIE & LES ŒUVRES DE TORU DUTT

Par M^lle Clarisse BADER

« O dying voice of human praise! The crude ambitions of my youth
I long to pour immortal lays! great pæans of perennial truth!
A larger work! a loftier aim!... and what are laurel leaves and fame? »

PARIS

LIBRAIRIE ACADÉMIQUE

DIDIER ET C^ie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

35, QUAI DES AUGUSTINS

1879

মূল ফরাসী উপন্যাসের আখ্যানপত্র

সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে একরাত্রিতে রাগে ও ঈর্ষায় বিচারবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে ভাইকে গুলী করে হত্যা করে। এরপর তার বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার চিত্র লেখিকা একটিমাত্র বাক্যে ফুটিয়ে তুলেছেন—'আগুন! আগুন! আমায় পাগল করে দিলে......পুড়িয়ে মারলে আগুন আগুন.' (মার্গেরিতের দিনলিপি, ২রা জানুয়ারী, ১৮৬১)

এবার বইটির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। বইটি একটি বেদনা-মধুর প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের কাহিনী। বইটির আরম্ভ ২০এ আগস্ট, ১৮৬০ তারিখে মারগেরীতের দিনলিপি থেকে। তার শেষ দিনলিপির তারিখ ১১ই জানুয়ারী ১৮৬২। তারপর লেখিকার জবানীতে বাকি শেষকথায় জানা যায়, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২ তারিখে মার্গেরীতের ১টি ছেলে হয় এবং ১৭ই মার্চ রাত্রিতে সে স্বামীর বুকে মাথা রেখে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হ'ল। মোটামুটি দু'বছরের কাছাকাছি কাহিনীকাল সীমাবদ্ধ। প্রথম দিনের দিনলিপি থেকে জানা যায়, মারগেরীৎ তার ১৫ বছর বয়সের জন্মদিনে বোর্ডিং স্কুল থেকে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। ওখানে সব দিদিমণির সে প্রিয়পাত্রী। বিষণ্ণচিত্তে পরদিন তাঁরা তাকে বিদায় দিলেন। সে বাবার সঙ্গে বাড়ি রওনা হ'ল। তারপর বিভিন্ন তারিখের দিনলিপি থেকেই জানি পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক, দুনোয়ার প্রতি তার ভালোবাসা, দুনোয়ার মায়ের তার ওপর স্নেহ, তার কাছে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক লুই লেফ্যাব্রর প্রণয়-নিবেদন ও তার প্রত্যাখ্যান। দুনোয়ার ঈর্ষান্ধ হয়ে নিজ ভাইকে হত্যা এবং তজ্জনিত গ্লানি ও আত্মদহনে ঘটনায় জটিলতা এসেছে। শেষে দুনোয়ার ১৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং কারাবাসকালেই আত্মহনন। পুত্রশোকে তার মায়ের উন্মত্ত অবস্থা। ইতিমধ্যে মার্গেরীতের দীর্ঘকালীন অসুস্থতা। প্রায় মরণের মুখ থেকে সে বেঁচে উঠলো। এই পরিস্থিতিতেই তার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক লুই আবার ফিরে এল! পরম মমতায় তার মনের ক্ষত সে মুছে দিল। মাতাপিতার আশীর্বাদ নিয়ে তারা দুজন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'ল। বিয়ের আগেই অসুখে মার্গেরীতের শ[illegible] ভেঙে গিয়েছিল। তার আগের র[illegible] অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল। এই বিগতশ্রী ভগ্নস্বাস্থ্য প্রেমিকাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে লুই ভালোবাসার গভীরতাকে প্রমাণ করলো। তাদের দাম্পত্যসম্পর্কের মাধুর্য ও শান্তি তুলনাহীন। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। ভগ্নস্বাস্থ্য মার্গেরীতের সন্তানধারণের কষ্ট সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো। একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে অল্পকাল পরেই সে অতৃপ্তহৃদয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। অতৃপ্তহৃদয়ই বা বলি কি করে? স্বামী-পুত্র রেখে সধবা নারীর লোকান্তরগমন তো ভাগ্যেরই কথা। চিরবিদায় নেবার আগে সে ঘুমোতে গেল। ঘুমোবার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তার নিয়মিত অভ্যাস। গভীর রাত্রে সে চোখ বুজলো এবং 'তার নির্মল আত্মা উড়ে গেল ভগবানের বুকের পানে'। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটির আদ্যন্ত ভগবানের প্রতি নির্মল বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ লেখিকার খৃষ্টানুরাগ এখানে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। আর মাতা-পিতা, স্বামী, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে নায়িকার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার থেকে তাকে পরম স্নেহশীলা কোমলপ্রাণা বাঙালী মেয়ে বলেই মনে হয়।

আরেকটি কথা, নায়িকা মারগেরীতের অর্ধ-সমাপ্ত জীবনে যেন লেখিকার স্বল্পায়ু জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। তরু দত্ত মাত্র একুশ বছর বয়সে দুরন্ত যক্ষ্মারোগের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর উপন্যাসের নায়িকা মার্গেরীৎও তো স্বল্পায়ু। জীবন আরম্ভ করেই তাকে অর্ধপথে ছেদ টানতে হল। বইটি রচনার সময় হয়তো লেখিকা আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। নায়িকা মার্গেরীতের জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যেমন চিরবিচ্ছেদ ডেকে আনলো, লেখিকার জীবনেও তো তেমনি ঘটলো।

সোজাকথায়, বইটিকে আত্মজীবনমূলক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায়। মনে রাখা দরকার, এ উপন্যাস রচনাকালে ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস বা মার্সেল প্রুস্তের উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেনি। এঁদের উপন্যাসে আত্মজীবনীর প্রচুর উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এঁদের অনেক আগেই আঠারো বছরের বাঙালী মেয়ে তরু দত্ত আত্মজীবনমূলক উপন্যাস রচনা করে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সবশেষে লেখিকার জীবন সম্বন্ধে পাঠকদের সামান্য অবহিত করে বর্তমান প্রসঙ্গের ছেদ টানবো।

সম্ভবত ১৮৭০ সালের মে মাসে তাঁরা ইংলন্ডে এসে ব্রমটনে বাস করতে থাকেন। এখানে থাকাকালেই তরুর কবিতারচনা সুরু হয়। ১৮৭৩ সালে তাঁরা দেশে ফিরে আসেন। ১৮৭৪ সালের ২৩শে জুলাই যক্ষ্মারোগে দিদি অরুর মৃত্যু হয়। এই সময়ই সম্ভবতঃ তরুর উপন্যাসখানি রচিত হয়। তরুও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৭৭ সালের ২০শে আগস্ট মাত্র ২১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

শেষ করার আগে ডকটর কালিদাস

SON EXCELLENCE LORD LYTTON

Vice-roi de l'Inde, etc.

TÉMOIGNAGE

DE PROFONDE RECONNAISSANCE

GOVIN C. DUTT.

12 Maniktollah street.,
Calcutta, February 1878

মূল ফরাসী উপন্যাসের উৎসর্গপত্র

লেখিকার জন্ম কলকাতার ১২ নম্বর মাণিকতলা স্ট্রীটে। জন্ম তারিখ ৪ঠা মার্চ, ১৮৫৬। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। কর্ণওয়ালিস্ খ্রাইস্ট চার্চে ১৮৬২ সালে তরুর পিতা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ সালে দুই কন্যা তরু অরুকে নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেন। প্রথমে যান নীসে। ওখানে একটি Pensionnat-এ তরুর শিক্ষা আরম্ভ হয়।

নামের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলি, '...তরু দত্তের উপযুক্ত মর্যাদা আমরা এখনও দিতে পারিনি। স্বাধীন ভারতে এই ত্রুটি সংশোধন করা হবে আশা রাখি। *

---

* ফরাসী ভাষা প্রবন্ধ-লেখকের জানা নেই। অনুবাদের অনুসরণেই গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীর নামের উচ্চারণ ও বানান লিপিবদ্ধ হয়েছে। ওতে ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যেমন ফাদার দাঁতিয়েন বইটির বাংলা নাম করেছেন শ্রীমতী দারভার-এর দিনা-লেখ্য'। তিনি নায়িকার নামের উচ্চারণ লিখেছেন মার্গারিৎ, দুনোয়ার ভাইয়ের নাম লিখেছেন গাস্তো। তাঁর দেওয়া বানান ও উচ্চারণই আমরা সঠিক বলে মেনে নেব নিশ্চয়ই।

॥ অন্ধ রজনী ॥

অসীম ভট্টাচার্য

কখন চড়ুই পাখিটা তার কপালে
একটু বাতাস বুলিয়ে গেছে পালকে
যদিও বাহারী নয় তবুও সুন্দর।

চায়ের দোকানে ওকে পাওয়া যায়
এতটুকু কাঁকরের স্বাদ মেলে না বলে,
লেডিজ কেবিনে ওরা দুজনে
স্বপ্ন-কল্পনা বুনকে শাড়ীর আঁচলে,
ঘুমন্ত নিবে যাওয়া নিষ্প্রদীপ কলকাতা,
দুফোঁটা আলো হয়তো বা দেখা গেছে
কাল সন্ধ্যায় ওদের নিষ্প্রভ চোখে।

কে যেন শীতল করে দিল তার ঠোঁট দুটো
স্বরে মলিন কাশপুষ্পে সগর্বে লীন
আমার স্নেহে ভরপুরে যদিও সবুজ
সুদূরে গোধূলি ডাকে নীরব হাতছানি।

॥ সেই পুরনো তীর্থে ॥

অঞ্জন দেব

আমার উজ্জয়িনীর প্রাসাদ ভেঙে গেছে,
অলকানন্দার পাড়ে ঘর-বাঁধা হলো না।
তাই মনস্থির,
চলে যাব—তোমাদের ভাঙা মাটির ঘরে
যেখানে দেয়ালে দেয়ালে ফাটল।
খড়ের ছাউনি, শতছিন্ন আশ্রয়।।
আমার ভালো লাগে
এই মুহূর্তে,
সন্ধ্যার একটানা অন্ধকারে
ঝিঁঝি পোকার সুরে।
আমি খুঁজে পাব আমার পুরনো দিনের আমাকে।।

তোমাদের ভাঙা ঘরে ফিরে এসেছি
আমার পুরনো উজ্জয়িনী।
আমার প্রশস্ত অলিন্দের ছায়া
তোমাদের ভাঙা দাওয়ায়।
আমার বাগানের চেনা গন্ধটা
এখন-ও
বুনো ফুলের কাঁচা গন্ধে।
আমি ফিরে এলাম
পুরনো তীর্থে।
জানি আর ভাঙবেনা
আমার এই উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদ।।

॥ নীলকণ্ঠ ॥

রঞ্জিত সেনগুপ্ত

মানুষেরা চিরদিন নীলকণ্ঠের উপাসক।
মত্ত মাতালের মত বিষের সমুদ্রে
মানুষেরা চিরদিনই করে অবগাহন,
সোনালী মাছেদের মত
ডুব দিয়ে দিয়ে বিষহরির শীতল স্পর্শে
একটুখানি জুড়িয়ে নিতে চায়।
নীলকণ্ঠের নিঃশ্বাসের বিষ যুগ যুগ ধরে,
মানুষেরা আকণ্ঠ পান করে,
হাততালি দেয়—
আরক্তিম চোখে অমৃতের স্বপ্ন দেখে
হাত বাড়ায়, তারপর—
অন্ধকারের অতলস্পর্শী গভীরতায়
ডুব দেয়।

নিখিল সেন

এশিয়ার সাহিত্য

এশিয়ার সাহিত্য সম্পদ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শ্রীযুক্ত নিখিল সেন একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক, কিন্তু তিনি সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যকার। তাঁর ছোটগল্প, অনুবাদ ও মৌলিক উপন্যাসগুলি গুণগ্রাহী সমালোচকদের প্রশংসালাভ করেছে, কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে বিরাট কাণ্ড করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুলনারহিত। এশিয়া এক প্রাচীন মহাদেশ, এশিয়া একদা মানবসভ্যতার শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্মের পীঠস্থান। পৃথিবীর সর্বত্র যে সব ধর্মগুরু আজো শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত হন তাঁরা এই এশিয়াখণ্ডেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু, জরথুস্ত্র, কানফুসিয়াস, শঙ্কর, রামানন্দ, নানক, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী এই এশিয়ার মানুষ। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এশিয়াবাসী দরিদ্র হয়ে পড়ে। এবং যেহেতু দারিদ্র্য সর্বপ্রকার গুণনাশ করে তাই এশিয়াবাসীদের সবপ্রকার গুণও যেন সহসা অন্তর্হিত হল। এশিয়া যখন অন্ধকার তখন য়ুরোপে আলো জ্বলে উঠল। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল নয়া সভ্যতার প্রভাব। এশিয়ার কণ্ঠে পড়ল সাম্রাজ্যবাদী শোষকচক্রের ফাঁস।

কালক্রমে আবার চাকা ঘুরল, এই শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে তার ফলে সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপীয়দের একে একে স্বস্থানে প্রস্থান করতে হয়েছে। এশিয়ার সর্বত্র আজ নব জাগরণের সাড়া, নবজন্মের চেতনা। এই নবজন্মের উন্মেষের সঙ্গে এশিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত নিখিল সেন অসামান্য অধ্যবসায়ে এশিয়ার সাহিত্যের এক সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত মহাগ্রন্থ 'এশিয়ার সাহিত্যে' তিনি চীন, মঙ্গোল, তিব্বতী, জাপান, কোরীয়, ইন্দোনেশীয়, ভিয়েৎনাম, থাই, ফিলিপাইন, ইরানী, হিব্রু, তুর্কী, নেপালী, সিংহলী, বর্মী, জিপসী, পুশতো, বাংলা, উর্দু, বেলুচ, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, মালয়েশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ইতিহাসের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ভূমিকায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—'নানা কথা জিজ্ঞাসু বাঙালী পাঠকের কাছে এই রকম একখানা মাঝারি আকারের হ্যাণ্ড-বুকে বা মার্গনির্দেশক বইয়ের অবশ্যকতা ছিল।'

বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত সেন প্রধান প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য বিষয়েই আলোচনা করেছেন এবং তার ফলে এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় যে সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করেছে তার পরিচয়লাভ সহজ হয়েছে। ইতিপূর্বে শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বিভিন্ন ভাষার পরিচয়জ্ঞাপক এমনই একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, তারপর প্রকাশিত হল শ্রীসেনের 'এশিয়ার সাহিত্য'। সেদিক থেকে পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। লেখক স্বীকার করেছেন তাঁর উপাদানগুলি মৌলিক নয়, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সূত্রে গৃহীত। একথা বলাবাহুল্য, কারণ শুধু বর্তমান গ্রন্থের লেখক কেন যে কোনো মানুষের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলি ভাষায় জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। পূর্ণতর কোন বিবরণ বা গবেষণাপূর্ণ মৌলিক রচনার কৃতিত্বও তিনি দাবী করেননি তথাপি যেভাবে সমগ্র গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছে এবং যেভাবে সামগ্রিক পরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা কম কৃতিত্বের নয়। লেখক কর্তৃক লিখিত ভূমিকাংশটিও তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুলিখিত।

যদিচ লেখক এই গ্রন্থরচনায় কোনো অহমিকা প্রকাশ করেননি তথাপি উদাহরণ স্বরূপ যে বিশাল সাহিত্য নিদর্শন তিনি অনুবাদ করে গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা বিস্ময়কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব দৃষ্টান্ত কবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত। সব অনুবাদ তাঁর নিজের দ্বারা না হলেও তাঁর সংগ্রহের বাহাদুরী আছে।

এশিয়ার ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য বিষয়ে এই একনজরের বৃত্তান্ত নানা কারণে উপভোগ্য হয়েছে। লেখক নিজস্ব মন্তব্য বা বক্তব্য পেশ করে পাঠককে ভারাক্রান্ত করতে চাননি। কোনো বিশেষ আঙ্গিক বা রচনারীতির বিবরণ দিয়ে পাতা ভরাট করেননি অথচ সুকৌশলে সামগ্রিক ইতিহাস পরিবেশন করেছেন।

তিনি সর্বাগ্রে চীন সাহিত্যের কথা বলেছেন। 'চীন সাহিত্য আজকের নয়' একথা তাঁর এবং সেই সংগে বলেছেন চীনের প্রাচীরের—চীনের সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘতর। লেখক চীন সাহিত্যের অতি মনোরম বিবরণ দিয়েছেন, এই বিবরণের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কয়েকটি কবিতা দৃষ্টান্ত হিসাবে উধৃত করেছেন।

প্রাচীন চীনা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লী পো সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেকের মতে লী-পো চীনা কালিদাস। লী-পো-র বিখ্যাত 'নানকিং' নামক কবিতাটির স্বর্গতঃ বিনয়কুমার সরকারকৃত অনুবাদটি সংযোজিত করেছেন। পো-চু-ই, হ্যান য়ু প্রভৃতি কবিদের সম্পর্কিত আলোচনাটি সার্থক হয়েছে। চীনা ধর্মমত, চীনা দার্শনিকমত, জেনক ধ্যানধারণা প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনাগুলিও সুলিখিত। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে লু-সুনের কথা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। লু-সুন প্রগতিপন্থী চীনা সাহিত্যের অগ্রনায়ক। চেয়ারম্যান মাও সে তুঙও এই লু-সুন প্রসঙ্গে বলেছেন—

'লু-সুন ছিলেন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান সেনাপতি; তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, একাধারে তিনি মহান চিন্তানায়ক ও মহান বিপ্লবীও...

অবশ্য লু-সুন ছদ্মনাম, লু-সুনের আসল নাম চৌ-শু-জেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লু-সুনের মৃত্যু হয়। লেখক এই অংশটির আলোচনাশেষে গ্রন্থপঞ্জীতে বিনয়কুমার সরকারের 'চীন সভ্যতার অ আ ক খ' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। মনে হয় এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় আরো কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে।

শ্রীযুক্ত নিখিল সেন স্বয়ং সাহিত্যকার তাই তাঁর এই গ্রন্থটি নীরস ইতিহাসগ্রন্থে পরিণত হয়নি। জাপানী সাহিত্য-আলোচনায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত নোগুচির একটি কবিতা উধৃত করেছেন। সেই সংগে 'গেঞ্জীর কাহিনী' 'অন্তমান সূর্য' এমনকি আধুনিক লেখক ইয়ুকিও মিসিমার 'তরঙ্গ ধ্বনি' পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

জাপানী 'নো নাটক' ও 'তংকার'-এর তিনি পূর্ণাংগ পরিচয় দিয়েছেন। জাপানী 'হাইকু' জাতীয় কবিতার যে বৈশিষ্ট্যটুকু বিস্ময়কর লেখক তার বিবরণও দিয়েছেন।

ইরানী সাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আর এক প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস। ফেরদৌসী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম, সাদী, জালালউদ্দীন রুমি, নিজামী প্রভৃতি সবকটি অবিস্মরণীয় কবিপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লেখক দিয়েছেন।

ঘরের কাছে সিংহল। বস্তুতঃ সিংহলী সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ধারণা ছিল না, সেই দেশের অতুলনীয় সাহিত্যসম্পদের পরিচয় লেখক বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন।

অতি স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানী সাহিত্য, এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে লেখক সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাটুকুর প্রয়োজন ছিল। কারণ এই গ্রন্থে যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান যে সব ভাষার প্রাপ্য লেখক সেই সব ভাষা সম্পর্কে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন অকৃপণ হস্তে তা পরিবেশন করেছেন।

লেখকের বিবরণ থেকে জানা যায় আধুনিককালে তিব্বত বা মংগোলীয়ায় কোনো সাহিত্য নেই। যেটুকু তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা পরিবেশন করেছেন।

ভারতীয় প্রাচীন অধিবাসী বা আদিবাসীদের সাহিত্যের ইতিহাসটুকুর মূল্য অসীম। কারণ এই তথ্য একত্রে এইভাবে পাওয়া সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

লেখক পশতু সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিন্তু আফগানদের ভাষা ও সাহিত্য প্রসংগে অস্পষ্টতা থেকে গেছে। আফগানিস্তানের সাহিত্য কর্মের কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, বর্তমান আফগানিস্তানের লেখকদেরই বা বক্তব্য কি, কিংবা সেখানেও তিব্বত ও মঙ্গোলীয়ার মত আধুনিক সাহিত্যের ধারা শুষ্ক হয়ে পড়েছে এই প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি শ্রীযুক্ত সেনের এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। এই গ্রন্থটিকে আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করে উত্তরকালের গবেষকবৃন্দ হয়ত আরো বিস্তৃততর আলোচনা করবেন, উপস্থিত নিখিল সেনের গ্রন্থটি আমাদের পরম সম্পদ।

গ্রন্থটির মুদ্রণ এবং অঙ্গসৌষ্ঠব পরিচ্ছন্ন।

—অভয়ঙ্কর

এশিয়ার সাহিত্য — (আলোচনা) নিখিল সেন প্রণীত। প্রকাশক — বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা-৯। দাম আঠাশ টাকা মাত্র।

নতুন বই

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী (আলোচনা)—লীলা বিদ্যান্ত। প্রকাশকঃ অভী প্রকাশনী। ৭৫বি, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০। দাম সাত টাকা মাত্র।

শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত লক্ষ্ণৌ শহরের একটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ। দীর্ঘদিন তিনি নীরবে সাহিত্য-সাধনা করছেন, কিন্তু সম্ভবতঃ এতাবৎ তাঁর কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থে লেখিকা রবীন্দ্রনাথের রচনায় নারীচরিত্রাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই রচনাবলী ধারাবাহিকভাবে সাময়িকপত্রে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূজা থাকনির্বিশেষে চিরন্তনী-নারীর জন্য এবং তিনি বিশ্বাস করেন কবির জীবনে নারীর স্থান কোথায় সে সন্ধান তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। ভূমিকা অংশে তিনি কাদম্বরী দেবী ও ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর কথা উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি মনে করেন কবির জীবনে কাদম্বরীই অনন্যা। তার "কারণ—তিনি প্রাণ দিয়ে কবির প্রাণ কিনে নিয়েছেন"—ইত্যাদি। আমাদের মনে হয় কবির সাহিত্য-আলোচনায় এই প্রসঙ্গগুলি উত্থাপন না করলেই শোভন হত। কারণ সমস্ত ব্যাপারগুলি অনুমাননির্ভরক। শ্রীমতী বিদ্যান্তের সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে যে অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় আছে তা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে আর সেই কারণেই তাঁর ভূমিকা অংশের যেটুকু আমাদের কাছে ত্রুটি মনে হয়েছে তা উল্লেখ করলাম। লেখিকা অশেষ শ্রদ্ধা সহকারে যোগাযোগের 'কুমু', বিচারকের 'ক্ষীরোদা', চতুরঙ্গের 'ননীবালা', গল্পগুচ্ছের পয়লা নম্বর গল্পের 'অনিলা', গোরার 'হরিমোহিনী' প্রভৃতি অনেক খ্যাত অখ্যাত চরিত্র নিয়ে যেভাবে আলোচনা করেছেন তা সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে আর হয়নি। কবি নারীকে জায়া ও জননীরূপে দেখেছেন। দেখেছেন বিশ্বমায়ের বিশ্বময়ী রূপে। এই আলোচনাগ্রন্থের লেখিকা কাব্যধর্মী ভাষায় সেই সমস্ত ছোট বড় চরিত্রের নিখুঁত আলোচনা করে রবীন্দ্র

সাহিত্য আলোচনার বিরাট ভাণ্ডারকে পুষ্ট করলেন।

গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

The Bleeding Humanity (Eye-witness Story of East-Bengal refugees) — By: Sanjib Sarkar, Published by Ecumenical Christian Centre — Whitefield, Bangalore-India Price Rs. 2/-

'আলোক সরণি' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসঞ্জীব সরকার পূর্ববঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে কিছুকাল ঘুরে পূর্ব-বঙ্গের সাম্প্রতিক পৈশাচিক ঘটনাবলীর যতটুকু স্বচক্ষে দেখেছেন তার বিবরণ 'দি ব্লিডিং হিউম্যানিটি'—নামক এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক একুমেনিক্যাল ক্রিশ্চান সেন্টারের অনুরোধক্রমে ১৯৭১ খৃীষ্টাব্দের মে মাসে সীমান্ত অঞ্চলে কয়েক সপ্তাহ পর্যটন করে শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তাঁর এক মর্মন্তুদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য মানবিক দুর্দশার এই নিদারুণ ইতিহাস বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের চোখের সামনে তুলে ধরা। ভূমিকাংশে রেভারেন্ড টমাস যথার্থই বলেছেন — সম্ভবতঃ হিন্দু-মুসলমান খ্রিশ্চান এবং অন্য সম্প্রদায়ের কোটি কোটি বালক, বৃদ্ধ, অল্পবয়সী নর-নারীর দুর্দশার প্রকৃত বিবরণ হয়ত কেউই দিতে পারবেন না। একথা সত্য, তথাপি শ্রীযুক্ত সরকার সংক্ষেপে যে বক্তব্য বিশ্বের মানবদরদী সমাজে রেখেছেন তা প্রশংস-নীয়। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং আকারে সুবৃহৎ না হলেও গুরুত্বের দিক থেকে অনেক মূল্যবান, একথা বলা যায়।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ (জীবনী) : প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত। প্রকাশক : শ্রীকালিকানাথ চৌধুরী। ৫বি, মহেশ চৌধুরী লেন, কলিকাতা ২৫। দাম তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যের বহুতর মূল্যবান গ্রন্থ পুনঃমুদ্রণের অভাবে আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। আলোচ্য বইখানি সেই শ্রেণীভুক্ত। প্রথম প্রকাশিত হয় পূর্ববঙ্গের (বর্তমান পাকিস্থান) ঢাকা থেকে বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১২৮২ সালে (ইংরাজি ৭ই মে ১৮৬৫)। স্বর্গত দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বহু অনুসন্ধানের পর এই বই রচনায় ব্রতী হন। কয়েক বছরের মধ্যেই বইখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও পুনঃমুদ্রণের কোন ব্যবস্থাই দেখা যায় না। অথচ সাধক কবি রামপ্রসাদের মাতৃ-সাধনার অর্ঘ্য তাঁর মুখে মুখে রচিত গানগুলি এ বইখানির প্রধান বিষয়বস্তু। শুধু তাই নয়, এই প্রসাদী সংগীত আমাদের বাংলা-সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর নারায়ণ পত্রিকায় রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে লিখে-ছিলেন, 'রামপ্রসাদই বিশ্বকবি—কেননা তাঁর কাব্যে ও রচনায় যিনি বিশ্বব্যাপিয়া সেই বিশ্বপালিনীর মূর্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে।' রামপ্রসাদ প্রায় লক্ষ শ্যামাসংগীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য তার মাত্র ১৬২ খানি গান ছাড়া আর গানের কোন হদিশই আমরা পাই না।

দয়ালচন্দ্র ঘোষ বিরচিত 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'-এ ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান। কবি সাধক রাম-প্রসাদ ও তাঁর সাধন-সঙ্গীতগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা এর মধ্যে আছে যা কবি ও তাঁর ভাবতত্ত্ব অনুধাবনে পাঠকদের বিশেষ সহায়ক হবে। এই সঙ্গে আছে রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতও। তত্ত্বপিপাসু পাঠকদের ও সাহিত্য-দরদীদের বইখানি সংগ্রহ করে রাখবার মত। আর পুনর্মুদ্রণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে সে সুযোগ আমাদের দিয়েছেন এরই সম্পাদক সাংবাদিক প্রমথ চৌধুরী। এজন্য পাঠকবর্গের আন্তরিক অভিনন্দন তিনি অবশ্যই লাভ করবেন। বলা বাহুল্য 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' এ'দেশের পাঠকদের কাছে আদরণীয় হবে।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর (কাহিনী)—মনোজ দত্ত। এস দাস। মেদিনীপুর। আড়াই টাকা।

"আজ সাগরে এসে মিশলাম।
এতদিন খাল-বিল নদী দেখেছি।
এবার সাগর দেখছি......"

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একথা বলেছিলেন যুগ-ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। যদিও আলোচ্য বইখানির লেখক এর ভূমিকায় লিখেছেন যে এ বইখানি কিশোর উপযোগী—কিন্তু তবু আমাদের মনে হয় এ বই সকলের জন্যে। বিদ্যাসাগর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার একটি অনবদ্য গ্রন্থন। বিদ্যাসাগর ছিলেন আমাদের দয়ার সাগর—এক সর্বত্যাগী গৃহী সন্ন্যাসী। তাই রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। কিন্তু এই মহামায়ার সংসারের মায়াচক্রের মধ্যে থেকেও যদি কেউ ঈশ্বরকে ডাকতে পারে সে তো বিশ-মন পাথর সরিয়ে তবে তাকে ডাকে রা।" বিদ্যাসাগর জীবনের অনন্যসাধারণ ঘটনা থেকেই রচিত এ বইখানি উপভোগ্য ও রসোত্তীর্ণ। প্রচ্ছদপট ও ছাপা চিত্তাকর্ষী।

লাগে তুক লাগে তাক (কাব্যগ্রন্থ)—অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অশোক বুক সেন্টার। ১৬৭ এন রাসবিহারী এভি-নিউ, কলকাতা-১৯। দামঃ দু' টাকা।

চমকপ্রদ ছড়ার সংগ্রহ। এই সংকলনটি পাঠকের মনকে চাঙ্গা করে তুলবে নানা কারণে। প্রথমত, সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রতিফলন পড়েছে প্রতিটি ছড়ায়। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ছড়াই আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যাক, একটি ছড়ার চারটি পংক্তি।

শর্তপূরণ হচ্ছে না, তাই
বাঁচার জন্য বন্যা।
মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল,
লড়াই বাঁচার জন্য।

মাঝে মাঝে দু' একটি ছড়া বেশ দুর্বল। চিত্রনির্মাণে ও শব্দ সম্পর্কে আরেকটু তৎপর হলে, ছড়া লেখায় তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

সুরেন্দ্র সভাজনা ('৭৮)—সম্পাদনা : রণজিৎকুমার সেন, শ্রীসুরেন্দ্র নিয়োগী সংবর্ধনা সমিতি, ১০, রামমোহন রায় রোড, কলকাতা : ৯। পাঁচ টাকা।

সাহিত্যে ও স্বাদেশিকতায় স্মরণীয় মানুষ সুরেন্দ্র নিয়োগী। বরণীয়ও। এমন নতনম্র, এমন নিবেদিতপ্রাণ, এমন মহত্তো মহীয়ান, এমন দৃঢ়চিত্ত, এমন অজাতশত্রু, একের মধ্যে এমন বহু বড়-একটা দেখাই যায় না। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' যে মানুষটি নিজেকে নিবেদন করেছেন নিস্বার্থভাবে সেই মানুষটির সত্তর বর্ষ পূর্তিকে উপলক্ষ করে প্রীতিমুগ্ধ কবি ও কথাকারদের রচনা-সম্ভার নিয়েই এই গ্রন্থটির প্রকাশ। বহুজনের দৃষ্টি-প্রদীপে সুরেন্দ্র-চরিত্র শুধু উদ্ভাসিতই হয়নি—নন্দিত এবং বন্দিতও হয়েছে। বাংলাদেশের সাময়িক সাহিত্যও কম ঋণী নয় এই প্রচার-বিমুখ মানুষটির কাছে। বাংলা-সাহিত্যের সকল শ্রেণীর কথাকাররা এ বইয়ে সুরেন্দ্র-বন্দনা করেছেন গেয়েছেন জয়গানও। বলা বাহুল্য সুরেন্দ্র-অনুরাগী সকল শ্রেণীর মানুষদের কাছে এটি সমাদৃত হবে।

বাঙালী পরিচিতি—শান্তিরাম হাইত। বুনিয়াদি বইঘর। শ্রীরামপুর। মেদিনী-পুর। দাম আড়াই টাকা।

লেখক আবেগপূর্ণ ভাষায় বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন এই পুস্তিকায়। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের ধারাটিকে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক কাল সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হয়ত সকলে সমর্থন করতে পারবেন না, তবে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে তার আন্তরিকতার অভাব কোথাও ঘটেনি।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

লেখনী (কার্তিক '৭৮)—সম্পাদক : মহাদেব নন্দী। ৪, তারানাথ ভট্টাচার্য বাই লেন, চন্দননগর — ১৫। পঞ্চাশ পয়সা।

এদেশের সাময়িক পত্রিকা বিস্তর কিন্তু বিষয়গৌরবে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসাদগুণে বৈশিষ্ট্যের দাবি তুলতে পারে মাত্র কয়েকটি। কলকাতার বাইরে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'লেখনী' তার মধ্যে একটি বিশেষ করে অষ্টমবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বহু প্রাচীন। একটি পুজোয় এত সমারোহ, জাঁকজমক ও উৎসব বাংলাদেশের আর কোনো জায়গায় দেখা যায় না। পরাধীন ভারতে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের একটি বিশিষ্ট স্থান ও খ্যাতি ছিল ভারতীয় জনজীবনে। সেকথা স্মরণে রেখেও বলা যায় যে চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর খ্যাতি আবহমানকালের। এই জগদ্ধাত্রী পুজোর আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত ও সচিত্র কাহিনী এবং পুজো-সম্পর্কীয় নানান আলোচনায় এ সংখ্যাটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে চন্দননগরের বিস্তর জানবার মতো খবরও এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এক নজরে জানা যাবে চন্দননগরকে। লিখেছেন : হিমাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার দে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, সম্রাট সেন, বলাইকৃষ্ণ গোল, অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অনিল নন্দী, রঞ্জিত নন্দী প্রমুখ।

জগদ্ধাত্রী পুজোর পথের নিশানাসহ চন্দননগরের মানচিত্র এবং আলোকচিত্রগুলি বর্তমান সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বলা বাহুল্য ভ্রমণেচ্ছু ও তত্ত্বপিপাসু পাঠকসাধারণের কাছে এটি সমাদৃত হবে।

সময়ানুগ (প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা '৭৮)— সম্পাদক : কেদার ভাদুড়ী, দেবকুমার বসু, ১৩, টেমার লেন, কলকাতা : ৯। পঞ্চাশ পয়সা।

পঞ্চাশ পয়সায় পঞ্চাশ টন আনন্দ দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। হালের উঠতি কবিদের কবিতায় ভরা—কিছু প্রবীণ কবিও এদের শরিক হয়েছেন। প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ টন আনন্দের অনুষ্ঠান এর মধ্যে ঘটেছে কিনা কবিতা-অনুরাগী 'সময়ানুগ'কে সমাদরে নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন।

মন্দিরা—সম্পাদক : কল্যাণময় রায়চৌধুরী। কুচবিহার। এক টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংকলনে ছোটগল্প, বড় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন তরুণ সাহিত্য-পিপাসুরা। ছোটদের বিভাগও আছে।

অন্যদিন (সপ্তম সংকলন ৭৮) শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা : ৪৫। এক টাকা।

তরুণ কবিদের ত্রৈমাসিক মুখপত্রটি কবিতা ও কবিতা সম্পর্কীয় আলোচনায় ইতিমধ্যে কাব্য-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নামী অনামী কবিদের বিস্তর কবিতা এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন শিশির ভট্টাচার্য ও ভবানী মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতার জন্যে সহজেই পাঠকদৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রাপ্তিস্বীকার

আলোর জোয়ার (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)— সম্পাদনা : ফাল্গুনীচরণ মান্না। গড়বেতা, মেদিনীপুর। এক টাকা।

অভিনয় অগ্রণী (কার্তিক '৭৮)—সম্পাদক : দিলীপকুমার বাগ। ৮০ বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া : ১। কুড়ি পয়সা।

অম্পান (দ্বিতীয় সংকলন) —সম্পাদনা : পার্থসারথি গুপ্ত। ৬১ বেণী ব্যানার্জি এভিনিউ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা : ৩১। কুড়ি পয়সা।

ধানিয়াখালি মহামায়া বিদ্যামন্দির পত্রিকা— সম্পাদনা : সত্যকিঙ্কর কুমার, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ধনিয়াখালী, হুগলী।

সামসাবাদ-ধান্যখোলা বিদ্যাপীঠ পত্রিকা— সম্পাদক : রঞ্জিতকুমার বল। ধান্যখোলা, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর।

কুলটিকরী বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা— সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ জানা, কুলটিকরী, মেদিনীপুর।

কলকাতায় শিশু ভবন

শহর কলকাতায় শিশুদের জন্যে খেলার জায়গা, পার্ক বা তাদের আনন্দ বর্ধনের কোনো বিশেষ ব্যবস্থাও নেই। আবর্জনার শহর কলকাতায় এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল শিশু ভবন চৌরঙ্গী ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে।

শিশু ভবনটির নির্মাণ কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। সামনের বছরে ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ খুলবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ভেতরে নেহেরু চিলড্রেনস মিউজিয়মে পুতুল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে।

গত শনিবার ১৩ই নভেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দেশগুলির পুতুল গ্রহণ করা হয়—অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কম্বোজ, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, পশ্চিম জার্মাণী, ঘানা, হাঙ্গেরী, ইতালি, লেবানন, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সিরিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ও ভিয়েৎনাম। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পুতুলও এসেছে প্রচুর। ন্যাশনাল কালচারাল এসোশিয়েশানের উদ্যোগে কলকাতার শিশু ভবনটি সংগঠিত ও নির্মিত হয়েছে। ন্যাশনাল কালচারাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুগল শ্রীমল বলেন যে, ১৯৪৮ সাল থেকে তারা বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে তাদের স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে পেরেছেন। শিশু ভবন নির্মাণে প্রথম কিস্তিতে তারা পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলেন। তারপর ১৯৬৫ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে ভবনের জমি দান করেন। পরে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু জহরলাল নেহেরু স্মৃতি ভান্ডার থেকে তিন লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা দান করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও দান করেন এক হাজার টাকা। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার দান করেন এক লাখ টাকা। শিশু ভবনের ভান্ডারের লক্ষ্য তেত্রিশ লাখ টাকা।

শিশু ভবনের এক এক তলায় থাকবে পৌরাণিক কাহিনী, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি। শিশুদের মনোরঞ্জনে শিক্ষার জন্যে যা যা প্রয়োজন তার সব কিছু থাকবে এই শিশু ভবনে।

— বিশেষ প্রতিনিধি।
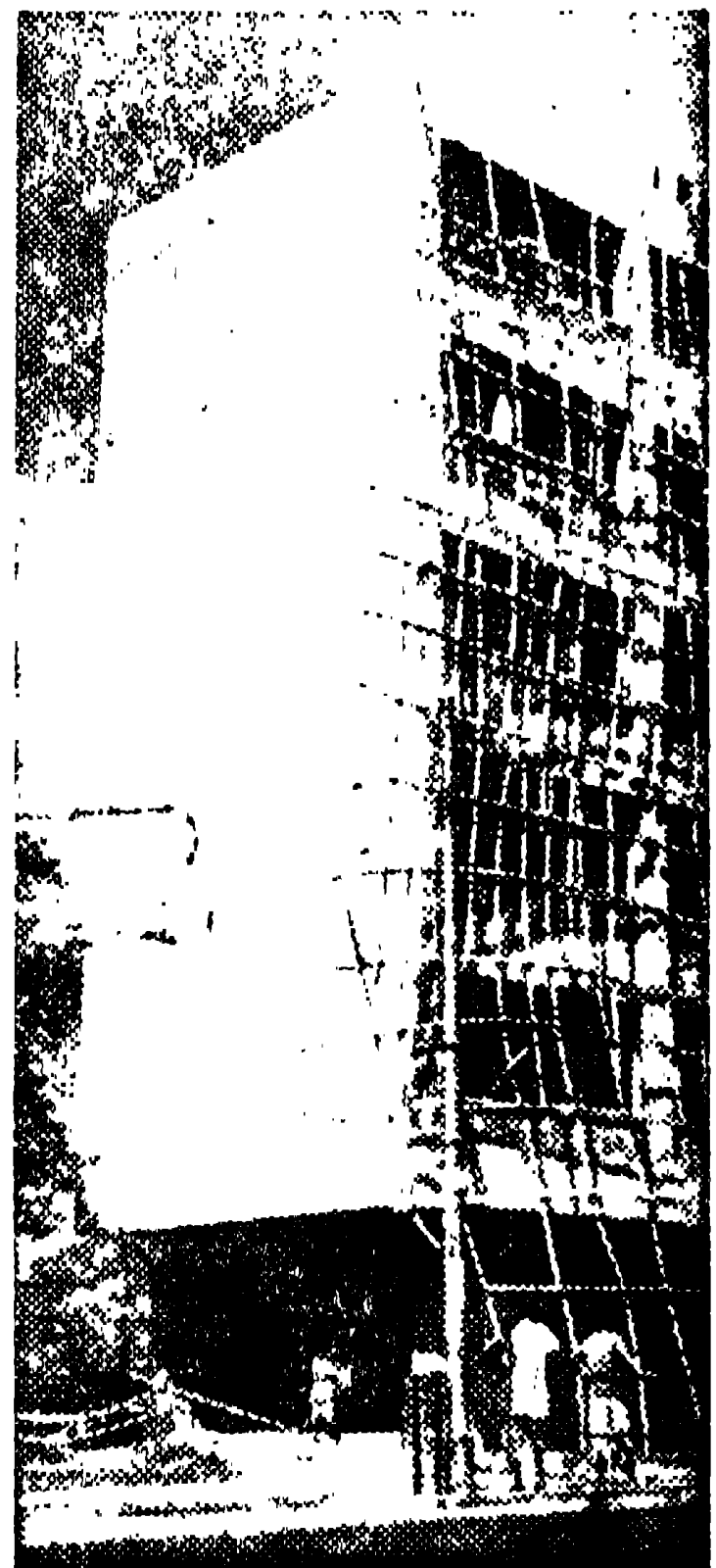
পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ৮ ॥

'তারপর?' গাড়ি ছাড়তে সুস্থির হয়ে বসে মহিলা বললেন, 'এবার বল দিকি তোর বিত্তান্ত। শুনি সব।'

বলল হেমন্ত।

সবই বলল।

যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বললেও কিছুই গোপন করল না। বাবার কথা, বাপের বাড়ির কথা, শ্বশুর বাড়ি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, শাশুড়ি জা ভাসুরদের লোভের বীভৎস চেহারা অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ—কালীদাসী ও নীলুর দয়ায় প্রাণ রক্ষা—শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়িতে বাবার ধর্ম-পরায়ণতা—সব।

নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল হেমন্ত। পাশে বসে থাকার জন্যেই হোক, অথবা এই লজ্জাকর কাহিনী বিবৃত করার সংকোচেই হোক, এতক্ষণ মুখ তুলে পার্শ্ববর্তিনীর দিকে চাইতে পারে নি। বলা শেষ হলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল যে দর-বিগলিত অশ্রু তাঁর কপোলকণ্ঠ বেয়ে তাঁর বুকের কাছের শাড়ি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে। এমন নীরব হয়ে বসে যে এতক্ষণ শুনেছেন ওর কথা—সে তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না বলেই।

হেমন্ত চুপ করলে গাঢ়, প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কি লগ্নেই জন্ম নিয়েছিলি বোন! যেটেরা পুজোর দিন ললাটের লেখন লিখতে এসে মুখপোড়া বিধেতা-পুরুষের বুঝি দুঃখ ছাড়া কোন সুখের কথা মনে পড়ে নি। ঝ্যাঁটা মারতে হয় অমন বিধেতার মাথায়!'

ততক্ষণে গাড়ি পেঁছে গেছে ওঁদের বাড়িতে।

আগেই পেঁছত, মধ্যে আনন্দময়ী-তলায় খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল বলেই এতটা সময় লেগেছে।

ওখান থেকে প্রসাদ চেয়ে নিয়ে, ওদেরই বলে জল আনিয়ে হেমন্তদের জোর করে খাইয়েছেন উনি। ভাবগতিক দেখে মনে হল এখানে মোটা রকমের দান-ধ্যানের বরাদ্দ আছে—পুজারীরা সকলে শশব্যস্ত ওঁর ফরমাস খাটার জন্যে।

বাড়ি পেঁছে গাড়ি থেকে নেমে হেমন্ত একটু অবাকই হয়ে গেল।

মহিলা যে ধনী—সেটা ওঁর বেশভূষা গাড়ি-জুড়ি কোচম্যান সইসের পোশাক-উর্দি দেখেই বোঝা গিয়েছিল—তবু ঠিক এতটা যে ধনী তা বাড়ি পেঁছবার আগে বুঝতে পারে নি হেমন্ত। আগাগোড়া মার্বেল পাথরের মেঝে, প্রত্যেক ঘরে বড় বড় আয়না, আর দামী বিলিতি ঝাড় ঝুলছে। তেমনি নানা আকারের—বড়ই বেশী—তেলে আঁকা ছবি, শ্বেত পাথরের মূর্তি—সায়েবী ধরনের চেহারা বলেই মনে হল হেমন্তর। বড় বেশী নিরাবরণ।...আর ঘড়ি যে কত এবং কত রকমের তার তো ইয়ত্তাই নেই।

বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে কাকেও দেখা গেল না। শুধুই যেন দাসী-চাকরের মেলা।

কিন্তু বাড়ির পুরুষরাই বা কৈ? আর সব অন্য আত্মীয়স্বজন?

ঘরের পর ঘর পেরিয়ে কারুকার্য-করা রেলিং ধরে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই সামনে যে ঘরখানা চোখে পড়ল সেটা প্রকাণ্ড। নিচের বড় দুখানা ঘরের ওপর এই একখানা ঘর। এর আসবাব আরও দামী, তবে যেন কেমন কেমন। এটা যেন ওর মনে হল—আর মুখে শোনা জমিদারদের জলসাঘর বা নাচঘরের মতো। ঘরের মাঝখানে বিস্তৃত পুরু গদির ওপর দামী জাজিম পাতা, তার ওপর নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র সাজানো। সব চেনেও না হেমন্ত, শুধু হার্মোনিয়াম আর ডুগি-তবলাটাই পরিচিত।

এইবার একটা কি খটকা লাগল ওর।

মহিলার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল—এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, মহিলার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হাতেও এয়োতির কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না—শুধু সোনার বাহার।

আরও লক্ষ্য পড়ল—গরদের শাড়িরও পাড় চওড়া বটে কিন্তু লাল পাড় নয়। কালা পাড়।

এটা খুবই অস্বাভাবিক, অনভ্যস্ত দৃশ্য। যা দেখতে অভ্যস্ত, যা দেখে এসেছে এতকাল তার সঙ্গে মেলে না। মন অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত, ভবিষ্যতের চিন্তায় অবসন্ন না থাকলে আগেই নজরে পড়ত।

দুই আর দুইয়ে যোগ দিয়ে চার-এ পেঁছতে খুব দেরি হল না।

এসব মেয়েছেলে সে দেখে নি কখনও তার এই একান্ত সীমিত জীবনে। এ ধরনের বাড়ি সম্বন্ধেও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না—তবু কিছু কিছু উড়ো কথা শুনেছে বৈকি, এর-ওর-তার মুখে। ছেলেবেলায় অনেকে এসেছে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী। মার সঙ্গে গল্প করার সময় টুকরো টুকরো কথা বলে গেছেন তাঁরা—সব আজ আর মনে নেই—তবু সেই সব জড়িয়ে একটা ধারণা হয়ে গেছে। সুতরাং মেয়েছেলেটি যে কি—তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

এই গত ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল তার মানসিক অবস্থায়। মৃত্যুর দ্বার থেকে, সর্বসমাপ্তির সীমা-রেখা থেকে ফিরে এসেছে বলতে গেলে। আবার একটু একটু করে আশা ও আশ্বাসের প্রাসাদ রচিত হয়েছিল মনের দিগন্তে। দিকদিশাহীন অকূল অন্ধকারে

জীবনের ভূমিপ্রান্ত একটুখানি যেন চোখে পড়েছিল কোথায়।

অকস্মাৎ এই একটা আঘাতে, মেয়ে-ছেলেটির পরিচয় অনুমান করার পর সব আশা যেন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে। সেই অস্পষ্ট আশ্বাসের ভূমিপ্রান্তটুকুও আর চোখে পড়ে না—সেই আঁধারের সমুদ্রেই তলিয়ে যায় চোখের নিমেষে।

আবারও একটা মেরুদণ্ড হিমকরা অবসন্ন ভাব বোধ হয়। পা-দুটো ভেঙে আসে।

ভেঙে আসে কিন্তু ভেঙে পড়তে দেয় না সে।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, 'আমি যাই দিদি, কিছু মনে করবেন না।'

প্রসন্ন কোমল মুখে বিস্ময়ের ভ্রূকুটি দেখা দেয়। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলা—বোধ করি ওর মনোভাব অনুমান করেই প্রশ্ন করেন, 'তার মানে?'

'না, আপনাদের জল খেতে পারব না। আমি বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরের বৌ। বিধবা।'

ক্রুদ্ধ হবারই কথা, কিন্তু মহিলার আশ্চর্য সংযম, কোন অপমান বা উষ্মা তাঁর মুখে ফুটল না। শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'আমাদের জল খাবে কেন ভাই, নলে সরকারী জল আসছে, কারুরই নিজস্ব জল নয়। আমাদের ছোঁয়া-ন্যাপা কিছুই খেতে বলছি না—অবিশ্যি ভাল বামুনের বামুন ঠাকুরই রাঁধে, বাঁকুড়ায় বাড়ি, ঘোষাল বামুন ওরা, জানাশুনো, এক-আধ ঘর শিষ্যি যজমানও আছে, নেহাৎ বড় সংসার, অভাবে পড়েই এই কাজ করতে এসেছে—চিঠিপত্তর আসে-যায়, ওদের জ্ঞাতগুষ্টি আসে—ভাল বামুন এতে কোন দু কথা নেই, দেখি তো কত সব সাদা সুতো গলায় ধোপা কাওরার ছেলে বামুন বলে চালিয়ে দিচ্ছে—বড় বড় বামুন বাড়িতে হাঁড়িতে কাঠি ঘুটছে—এ সে বামুন নয়। তা হোক, তাও খেতে বলছি না। সাজ-সরঞ্জাম সব আনিয়ে দিচ্ছি, নতুন বোগনো তোলা উনুন চাল-ডাল, শুদ্ধ কাপড় দিচ্ছি, চান করে নিজে দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে খাও, ছেলেটাকে খাওয়াও। চাও তো দারোয়ানকে দিয়ে এক ঘড়া গঙ্গাজল আনিয়ে দিতে পারি, ও-ও মিশির বামুন, আমাদের ছোঁয়া কি মাছ-মাংস কিছু খায় না—নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়।'

একটু চুপ করে থাকে হেমন্ত। লোভ বড় বেশী। বাঁচবার লোভ। বাঁচবার সম্ভাবনা। এই একমাত্র এখন পথ বাঁচার—এর আশ্রয়।

তা ছাড়াও, মানুষটা এতই ভাল, বলতে গেলে মৃত্যুর মুখ থেকেই ফিরিয়ে এনে জীবনের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। এর মনে ব্যথা দেওয়ার মতো অকৃতজ্ঞতাও বোধ হয় আর নেই।

তবু, শেষ পর্যন্ত সংস্কারেরই জয় হয়। আস্তে আস্তে বলে, 'কিন্তু সেও তো আপনাদের আপনারই অন্ন খাওয়া হবে। অন্নপাপ মহাপাপ। আমার ছেলে মানুষ হবে না পাপের অন্ন খেলে।'

'না খেলে মানুষ হবে? আগে বাঁচলে তবে তো মানুষ হবার কথা!...বাঁচাবে কি করে? বাঁচবেই বা কার অন্নে। চাকরি করতে গেলে কেউ চাকরি দেবে? এই আগুনের খাপরা চেহারা?—দেখলে তো সকালে। ভিক্ষে করে খাবে? সে কি অন্ন, কে দিচ্ছে বেছে যাচিয়ে নিতে পারবে? কার অন্নে কি পাপ আছে? আমরাই তো ভিক্ষে দিই। সে অন্নে যদি পাপ না থাকে এ অন্নেই বা থাকবে কেন? ইজ্জতের কথা বলছিলি—এই ডবকা বয়েস—এমন পথে পথে ঘুরে বেড়ালে ইজ্জৎ থাকবে? কে কোথায় হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে—কিম্বা কি মন্তর দিয়ে ফুসলে নে গিয়ে কার কাছে বেচে দেবে, সে তুই বুঝে নিজেকে বাঁচাতে পারবি? যে আমাদের ওপর আজ এত ঘেন্না শেষ পর্যন্ত সেই পথেই আসতে হবে হয়ত।'

আবারও ভেঙে পড়ে হেমন্ত, সেইখানে সিঁড়ির মুখটাতেই বসে পড়ে বলে, 'আমি কি করব তাহলে দিদি, কি করা উচিত—কিছুই যে বুঝতে পারছি না!'

'শোন, আগে প্রাণটা—প্রাণ থাকলে তবে ধম্ম। পাপ-পুণ্য সব কিছু। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আত্ম রেখে ধম্ম তবে পিতৃলোকের কম্ম—এসব তো শাস্তরেরই কথা। নিজেকে বাঁচা, ছেলেটাকে বাঁচা—পাপ-পুণ্যির হিসেব করার ঢের সময় পাবি। আমি মুখ্যু মানুষ, আমি যা বুঝি পাপের অন্ন একে বলে না। যদি পাপ করে থাকি সে আমি করেছি। তুই পরের সাহায্য নিয়ে খাচ্ছিস—সে পাপ তোকে পর্শ করবে কেন? আর তাই যদি মনে করিস—এটাকে ধার বলেই নে, পরে, ছেলে বড় হলে রোজগার করলে, কি তোরই যদি কোন ভদ্দরমতো রোজগারের পথ হয় — কড়া-ক্রান্তিতে শোধ দিস, না হয় কিছু বেশীই দিস—আমি হাত পেতে নোব।...মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করার সময় সে মহাজন কি করে টাকা পেয়েছে—একথা কেউ জিগ্যেস করে না। আপদকালে বাছবিচের করা যায় না। আর বিপদে না পড়লে কে টাকা ধার করতে যায় বল—?'

আর পারল না হেমন্ত।

আর সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

এই যে পাপের অন্ন—এ তো একটা ধারণা মাত্র।

এ সবই শোনা কথা। নানা লোকের নানা কথা শোনার ফলে একটা আবছা, অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে।

তার চেয়ে ক্ষুধা অনেক বেশী সত্য ও বাস্তব।

বেঁচে থাকার প্রশ্ন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

যা বলছে এই মেয়েছেলেটি তার একটি কথাও মিথ্যা নয়। এখান থেকে এখন বেরোলে—হয় ইজ্জৎ বিক্রী করা, না হয় গঙ্গার জল—এছাড়া আর কোন পথ নেই। কোন আশ্রয় নেই।

আস্তে আস্তে বলে সে, 'যা ভাল হয় তাই করো দিদি। আমি আর ভাবতে পারছি না।...আর জন্মে সত্যিই তুমি আমার দিদি ছিলে, নইলে এতটা বেইমানী, এতটা অপমান করার পরও তুমি আমাকে এমন

তারপর বলে, 'ও তুমি তোমার বামুন ঠাকুরকেই বলো, এক মুঠো ভাত ফুটিয়ে দিক—'

'না রে। অত নোলা দিস নি। আমাদের ও অংশের হেঁসেলে ছিষ্টি একাছত্তর হয়ে আছে।...আলাদাই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি সব, রেঁধে খা। যদি এর পর সব দেখে-শুনে প্রিবৃত্তি হয় আমাদের ওখানে খাস তখন। বরং এখন একটু শরবৎ করে দিক হরিদি, মুখে দে—ছেলেটাকে একটু দুধ খাওয়া। নেয়ে-ধুয়ে সুস্থির হয়ে বোস।'

।। ৯ ।।

ধীরে ধীরে সব পরিচয়ই পায় হেমন্ত।

পরিচয় নিজেই দেন মহিলা।

'আমার ভাল নাম একটা আছে বৈ কি। রসো, মনে করি—হ্যাঁ—মনে পড়েছে, সুকুমারী। আমার জন্মদাতা ঐ নাম দেছল। তা ও নাম ঘোড়ার ডিম আমার মনেও থাকে না, কেউ জানেও না। মা ডাকত গোপালী বলে—সেই নামেই এ টহরলে আমাকে জানে সবাই।'

আরও বলেছিলেন, 'না ভাই, কেউ ফুসলে বার ক'রে আনে নি, কিম্বা স্বেচ্ছায় কুলের বার হয়েও আসিনি। আমি এই ঘরেরই মেয়ে। আমার মা-দিদিমা সব এই লাইনের। তবে হ্যাঁ, উরি মধ্যে আমরা ভদ্দরভাবে কাটিয়েছি চিরকাল। আমি তো বামুনেরই জম্মোত—সেদিক দিয়ে বামুনের মেয়েই বলতে পারিস।...আমার মার বাবা ছিলেন কোন এক খোট্টা দেশের রাজা। দিন-কতকের জন্যে কলকাতায় ফুর্তি করতে এসে চোখে লেগে গিয়েছিল। এমনিও দিদিমা নামকরা গাইয়ে ছিলেন, খুব রোজগার ছিল সেকালে। এই যে এত সব আসবাবপত্তর দেখছিস—এত বোলবোলাও এ যেন ভাবিসনি সব আমার বাবুর পয়সায়। আমার বলতে নেই—তোর গুরুজনের আশীর্বাদে নিজেরই ঢের পয়সা আছে। এ গাড়িঘোড়া সমস্ত আমার—নিজস্ব। ঐ ওয়েলার জুড়িঘোড়া নিজে গিয়ে কিনেছি দেড় হাজার টাকা দিয়ে।

'হ্যাঁ, এ কাজ না করলেও চলে। তবে কি জানিস, এছাড়া তো জানি না কিছু, এই আমাদের জীবন। নৈলেই বা থাকব কেন, আর কি নিয়েই বা জীবনটা কাটবে। কেউ তো আমাকে বে করে ঘরের লক্ষ্মী করবে না। এ বরং ভাল ভাল ভদ্দর লোক আসে—পাঁচটা বড়লোক, নামকরা লোক—এক রকম সৎসঙ্গেই থাকি। আমার এখেনে মদ খাওয়া হুল্লোড় করা এসব চলে না একেবারে বারণ। ফুর্তি বলতে গান-বাজনার ব্যবস্থা আছে—যা পারো করো। আমাদের ইনিও মদফদ খায় না। আমিও গাইতে পারি তবে সে নামমাত্তর বাবুর বন্ধু-বান্ধব ইয়ারদের মধ্যে অনেক গাইয়ে আছে, পয়সা দিয়েও নিয়ে আসে ওস্তাদ গাইয়ে বাইজী। এছাড়া কিছু নয়। আর বারো বছর বয়সে এক বুড়ো জমিদার ধরেছিল, সেই প্রথম ধর্ম নষ্ট করে—তবে সেও বামুন, পাবনার উদিকে কোথাকার জমিদার—কী সিংহী যেন নাম, তবে বামুন, ওদের বারুন্দর বামুন বলে—সিংহী বামুন হয় তার আগে জানতাম না। তা সে ধর যোল বছর বয়সেই চুকে-বুকে গেছে। তারপর থেকেই এই এঁর কাছে—আজ চোদ্দ-পনেরো বছর একভাবে আছি বর-বৌয়ের মতো। কেউ বলতে পারবে না আমি কোনদিন এদিক-ওদিক চুলবুল করেছি কি অন্য দিষ্টিতে কোন পরপুরুষের দিকে তাকিয়েছি কোনদিন। আর ইনিও—ঘরের বৌ আর আমি, এছাড়া অন্য সব মেয়েছেলেকে মা বলে জানে।'

'তা তোমার ছেলেপুলে হয়নি দিদি?'

'ওমা হয়নি কে বললে, ষাট ষাট।...একটা মেয়ে হয়ে মরে গেছল, তারপর এই ছেলে। তা সে আমার বলাও ভুল, পাঁচ বছরের হতেই তাকে নিয়ে গেছে বাবু, কোথায় কোন সায়েবদের ইস্কুল আছে কোন পাহাড়ের ওপর, সেইখেনে ভর্তি করে দিয়েছে। নাড়াঘাঁটা নাওয়ানো ধোওয়ানো তো দূরের কথা, একটু চোখে দেখতে পজ্জন্ত পাই না তাই। এঁর এক কথা, ছেলেকে যদি মানুষ করতে চাও, আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে চাও—এখানে এ পাড়ায় আনা চলবে না। শীতকালে দেড়মাস বন্ধ থাকে ওদের ইস্কুল, সেই সময় কাশীতে নিয়ে আসা হয়, ওঁর বাড়ি আছে হাউজ কাটরায়, এই ছেলের জন্যেই কেনা—আমিও সে সময় সেখানে গিয়ে থাকি। ব্যস, ছুটিও ফুরোবে—ছেলেও চলে যাবে সেই পাহাড়ে।...বলব কি ভাই, এই যে দেখা হবে—ছেলে প্রেথম প্রেথম দু-তিন দিন লজ্জা লজ্জা করবে, আড়ষ্ট হয়ে থাকবে—যেন পরের ছেলে।...তা কি করব,, মনের দুঃখু মনেই চেপে রাখি, বলি ছেলে যদি মানুষ হয়, পাঁচ-জনের একজন হয়ে ওঠে—সে কত বড় ভাগ্যের কথা। এসবের গন্ধ যাতে না থাকে সেই ভাল। আমার একটু কষ্ট হয়—কী আর হবে। ছেলেমেয়ের জন্যে মা বাপকে অনেক ত্যাগ করতে হয়।'

তারপর একটু থেমে অপ্রতিভের মতো হেসে বলে, 'সেই জন্যই তো আরও তোর ছেলেকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নি। ঐ বয়েসে কতকটা ঐ রকম দেখতে ছিল। তবে সে আরও ফরসা, সায়েবের মতো রং তার।...'

গোপালীর এখন যিনি বাবু—এখন আর তখনই বা কি, ওর চোখে এই একমাত্র বাবু, একেই ভালবেসেছে সে, স্বামীর মতো দেখে; ছোটবেলার সে বন্ধকে কোনমতে সহ্য করেছে, এ পথের এই দস্তুর, এই ওদের জীবন—এই রকম একটা ধারণা নিয়েই—ইনি মারোয়াড়ী, ধন্নুবাবু, নাম। ধন্নুলাল আগরওয়ালা না কি যেন। অনেক রকম ব্যবসা আছে এদের, এমনি ওকালতি পাসও করেছেন—আদালতেও যান। একটু-আধটু যা দেখেছে হেমন্ত, কথাবার্তা যা কানে গেছে, তাতেই বুঝেছে খুবই উচ্চ-শিক্ষিত লোক।

আরও কিছুদিন কাটবার পর আরও বুঝল হেমন্ত—ধন্নুবাবু মানুষটিও ভাল, যাকে যথার্থ ভদ্রলোক বলে। এই যে এখানের এই বন্ধন—এর সঙ্গে চরিত্রহীনতার তত সম্পর্ক নেই, এটাকে কতকটা সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে, নিজের পদবী ও অবস্থার প্রতি কর্তব্য হিসেবেই পালন করছেন। ধনী বাড়িদের, তাঁর মতো ঐশ্বর্য-শালী ব্যক্তিদের এটা নাকি প্রয়োজন। রক্ষিতা না থাকলে অবস্থানুযায়ী প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না।

দিন মন্দ কাটছে না, আরামে আলস্যে। অনেকদিন—অনেকদিন কেন কোনদিনই এমন স্বাচ্ছন্দ্য পায়নি সে। বাপের বাড়িতে অন্নের অভাব ছিল না, তাই বলে খুব স্বচ্ছলতাও ছিল না। শ্বশুরবাড়ির দিনগুলো তো দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। সমস্ত রকম শারীরিক কষ্ট ও লাঞ্ছনার সঙ্গে অবিরাম অপমান ও গালিগালাজ সইতে হয়েছে। আহার তো প্রাণধারণের মতো শুধু। আজ সেসব কথা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

তবু হেমন্তর মনে মনে কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

এমনি পরের গলগ্রহ ও করুণার ভিখারী হয়েই জীবন কাটাতে হবে নাকি? এমনি নিষ্ক্রিয়ভাবে?

এখানে থাকলে ছেলেই কি তার মানুষ হবে?

গোপালী বলছে বটে যে সামনের শীতকালে যখন সে থাকবে না—সরকার মশাইকে বলে যাবে তার ছেলেকে একটা ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেবার জন্যে। কিন্তু যে পরিবেশে সে তাঁর ছেলেকে এখানে রাখতে ভরসা পায় না, সেই পরিবেশে কি হেমন্তর ছেলেই মানুষ হবে?

আর এমনভাবে কতদিনই বা কাটবে?

একজনের বদান্যতার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা কি উচিত?

গোপালী করেছে ঢের। আশ্রিতা কি করুণাপ্রার্থিনীর মতো ব্যবহার করে না কোনদিন, এক মুহূর্তের জন্যেও। নিজের বোনের মতো, সখীর মতোই দেখে। আত্মীয়ের মতো মর্যাদাতেই রেখেছে।

এ বাড়ির দাসদাসী বা অপর আশ্রিতারা এ ব্যবস্থায় কেউ খুশী নয়—সেটা খুব স্পষ্ট। 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছে', 'পথের ভিখিরী এসে বসেছেন রাজরাণী হয়ে'—এভাব তাদের মুখের ভঙ্গীতে চোখের চাহনিতে বুঝতে অসুবিধা হয় না হেমন্তর।

এ মনোভাব স্বাভাবিকও।

এই বিদ্বিষ্টের দল যে সুযোগ মতো একদিন ছোবল মারবে অন্তত মারার চেষ্টা করবে—সেটুকু না বোঝার মতো নির্বোধ নয় হেমন্ত।

লাগানী-ভাঙানীতে যে কতটা অনিষ্ট হয়—মানুষ যে কত সহজে পরের নিন্দায় বিশ্বাস করে—এ সম্বন্ধে এই বয়সেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে তার।

সুতরাং উচিত হচ্ছে মানে-মানে সরে পড়া।

আর তার আগে নিজের কোন একটা উপার্জনের ব্যবস্থা করা।

তবে সে ব্যবস্থা ওর দ্বারা সম্ভব নয়। কোন সহায়-সম্বলই নেই তার, জানেও না কিছু।

তাই গোপালীকেই ধরে সে। দু-একদিন অন্তরই বলে, জামাইবাবুকে একটু বলুন না দিদি, ওঁদের অনেক জানাশুনো, বুদ্ধিও বেশী, ওঁরা চেষ্টা করলেই একটা মতলব বাতলাতে পারবেন।'

প্রথম প্রথম গোপালী এ ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারেনি।

বলেছে, 'কেন লা, এখানে কি তোর পেছনে শোঁপোকা লাগছে? বিদেয় হবার এত তাড়া কেন?'

কেন যে তাড়া—দু-একদিন যেতে তাও খুলে বলতে হয়েছে হেমন্তকে। ও যে মানুষ—এর কাছে সংকোচ করে লাভ নেই! আর ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝিয়ে দিলে যথেষ্ট চাড়ও হবে না।

কারণটা শুনে গোপালীও সায় দিয়েছে।

মেয়েছেলেটির সহজবুদ্ধি অত্যন্ত ধারালো, ক্ষুরের মতোই শান দেওয়া মনে হয়। তেমনি তীক্ষ্ণ ও সাংসারিক জ্ঞানও। সে বলেছে, 'তা ঠিক। মানুষের মন না মতি। কে কী বললে, তোকে হয়ত বিষ নজরে দেখব। তখন একটা উচ্চ ছুতোনাতা করে তাড়ানো আর এমন কি কঠিন কাজ।...'

তারপর একটু ভেবে বলেছে, 'আচ্ছা দেখি। বলি ওঁকে।...বলেছি এক-আধবার, একেবারে যে বলিনি তা নয়। তবে তেমন আড় হয়ে পড়া গোছের ভাবে বলিনি। তাই উনিও গা করেন নি তত। এবার [illegible] কার পেছনে লাগতে হবে আর কি। [illegible] পারলে উনিই পারবেন—এটা ঠিক। ও [illegible] মনিষ্যি—লাট-বেলাট থেকে শুরু করে [illegible] নেই ও'র হাতের মুঠোয়।'

'বাবু' বা মালিকের গর্বে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গোপালীর—বলতে বলতে।

গোপালীকে আশঙ্কার কারণটা খুলে বলতেই কাজ হল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে ধন্যবাবুকে চেপে ধরল 'তোমারও একটা [illegible] অনেক শুনেছি, এখন তারকের মত একটা কি গতি করবে তাই বলো।'

ধন্যবাবু হেসে বললেন, 'গতি মানে কি? মরবার আগেই গতি?'

'ছি ছি' কী যে বলো। তোমার মুখে আটকায় না কিছু। ষাট ষাট এর মধ্যে মরবেই বা কেন?...তা নয়, সত্যিই এমন-ভাবে পরের বাড়ি বসে খেতে ওর লজ্জা হয় তো। ভদ্দরলোকের মেয়ে, গেরস্থবংশের মেয়ে। যতই থাক এ একরকম ভিক্ষের ভাত খাওয়া বৈ তো নয়। এর আর ভাগ্যি কি। আজ যদি তাড়িয়ে দিই, কাল তো আবার সেই রাস্তায় দাঁড়ানো।...এ লাইনে আসবে না ও, মরে গেলেও। আর সে আমি বলবও না আসতে। ছেলেটা বেঁচে থাক বড় হোক, মানুষ হোক—ওর ভাবনা কি? আবার নতুন করে সংসার গড়বে, আবার ভদ্দরভাবে নিজেদের সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই কটি বছর যাতে কোন গতিকে নিজের খাটুনির রোজগারে কাদায় গুণ টেনে কাটাতে পারে—সেই ব্যবস্থাটা করে দাও তুমি।'

ধন্যবাবু চিন্তিত মুখে বলেন, 'কীই বা উপায় করব বল দিকি, আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। মেয়েদের রোজগারের পথ তো গোনাগাথা, একটু লেখাপড়া জানলে মাস্টারী করতে পারত, এখন নতুন মেয়ে ইস্কুল হচ্ছে এদিকে-ওদিকে—মাস্টারণী পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তেমন তো কিছুই জানে না, তুমি বলছ বাংলা জানে সামান্য, তাও বাড়িতে পড়েছে—ইস্কুলে যায়নি কখনও। কী কাজ করবে ও বলো, আমিই বা কাকে কী বলব? দপ্তরে তো চাকরি করতে যেতে পারবে না। [illegible] বিদ্যা [illegible] না কি [illegible] বলো না? [illegible] এক রাঁধুনী হয়ে থাকতে পারে কারও বাড়ি। কিন্তু তাতে আর কত আয় হবে? তাতে কি ছেলে মানুষ করতে পারবে? [illegible]'

'[illegible]! [illegible] [illegible] কথা। [illegible]'

'[illegible]'

'কেন আর না [illegible], মানে মানে তো তোমার বাপু!'

গোপালী হাসতে হাসতে বাবুর জন্যে তামাক আনতে যায়।

দাসী-চাকর যতই থাক—এটি সে নিজে নিজে হাতে ধরিয়ে তৈরী করে নিয়ে আসে। ও'র খাবার কি জল কি তামাক আর কারও হাত দিয়ে আনায় না কখনও।

দিন দুই পরেই ধন্যবাবু একটা প্রস্তাব দিলেন।

ওঁর এক বন্ধু, ডাঃ বদরীনাথ দাস—বিখ্যাত মেয়েদের ডাক্তার। তিনি বলতে তিনিই জানিয়েছেন কথাটা।

আজকাল অল্প লেখাপড়া জানা মেয়েদের জন্য—বিশেষ এমনি অনাথা অবীরা ভদ্রঘরের মেয়েকে যাতে বাসনমাজা ভিক্ষে করা বা কুপথে উপার্জন করা ছাড়াও ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে পারে—সেইজন্যেই বিশেষ করে—কোম্পানী নাকি ধাত্রীবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। এখন যারা প্রসব করায় ধাই—সবই অশিক্ষিতা ও ছোট জাতের মেয়ে। পাড়াগাঁয়ে তো কথাই নেই—বেশীর ভাগই হাড়ি বা ডোমের মেয়েরা এই কাজ করে। তারা না জানে একবর্ণ লেখাপড়া আর না আছে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা সতর্কতা। পরিচ্ছন্নতা বোধ তো নেই-ই।

সেই কারণেই খাস সরকারের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল কালেজের আওতার মধ্যেই এটা শেখানো হচ্ছে। আঠারো মাস পড়তে হবে, তারপর পরীক্ষা। পাশ করতে পারলে সরকার থেকে অভিজ্ঞাপত্র বা সার্টিফিকেট পাবে। তখন নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসাই করুক বা কোন হাসপাতালে চাকরি করুক— পাশ করা ডাক্তারদের মতো বুক ফুলিয়ে টাকা আদায় করতে পারবে।

অনেক সময় হাসপাতাল থেকেও লোক এই ধাত্রী চাইতে আসে, সে ব্যবস্থাও করা যায় প্রথম প্রথম, তবে তাতে যা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ হাসপাতাল কেটে নেবে অবশ্য তাতেও খুব কম হবে না। উপরিটা বকশিশটা তো রইলই। আর স্বাধীনভাবে সাইন বোর্ড ঝুলিয়েও বসতে পারে, একটা ঝি ধার্য করে। প্রসব করানোর [illegible] কী শুশ্রূষা করার আলাদা। এখনকার দিনের লেখাপড়া জানা লোকেরা বড় একটা কেউ হাতুড়ে দাই ডাকতে চায় না—সবাই পাশ করা মেয়ে খোঁজে।

গোপালী উৎসাহের সঙ্গেই বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

সে আশা করেছিল হেমন্তও উৎসাহিত ও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু [illegible] সব শুনে যেন কাঠ হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ শুকনোমুখে চুপ করে বসে থেকে বলল, 'অমুকের মেয়ে হয়ে শেষে দাইয়ের কাজ করব, সাতকুল জাতের রক্ত-পুঁজ ঘাঁটব?'

গোপালী রাগ করল না। সে যে আহত বা ক্ষুব্ধ হয়েছে তাও দেখাল না।

তবে তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বললে, 'তাহলে কী করবে? কী করে খাবে আর খাওয়াবে ছেলেকে? আমাদের এখানে আমাদের হাতে তো আর খাবে না, কোন একটা বৃত্তিও শিখবে না তবে পয়সাটা কোথা থেকে আসবে শুনি?'

কাটাকাটা কথা গোপালীর।

'এখন লেখাপড়ার চল হয়েছে বটে, মাস্টারী করেও খাওয়া যায়—কিন্তু সে নিজে আগে লেখাপড়া শিখে পাশ করে মাস্টারী করার মতো তৈরী হতে হতে অন্তত সাত-আটটি বছর যার নাম—ধরে রেখে দাও।...

নিদেন খুব যদি চেষ্টা করো, চার-পাঁচ বছর তো বটেই। সে সময়টা খাবে কি, ছেলেকে মানুষ করবে কি করে? খাওয়াবে

কি? এ দেড় বছরের ব্যাপার—কোনমতে কেটে যাবে।'

'এই দেড় বছর ছেলে থাকবে কোথায়?' আরও কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে প্রশ্ন করে হেমন্ত।

'আমার কাছে থাকবে। ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। নইলে বাড়িতেও পড়াতে পারি। বামুনে রান্না করবে, বামুনে খাওয়াবে। হরিদি আছে, ভাল বামুনের মেয়ে। ভয় নেই—জাত মারব না ওর। আর ও তো বালক—এখনও পৈতে হয় নি, ওর এখন জাতই বা কি?'

'তুমি যখন থাকবে না—কাশীতে ছেলের কাছে যাবে—তখন?'

'ওকে নিয়ে যাব। এই একবারই তো, তোর দেড় বছরের মধ্যে তো দুবার হবে না।...সেও হরিদিই সঙ্গে যায়, সে-ই রান্না করে সেখানে।'

তবু মনঃস্থির করতে পারে না হেমন্ত। বলে, 'রান্নার কাজ-টাজ হয় না?'

'সে তো তোকে আগেই বলেছি' এবার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে গোপালী, 'কে রাখবে তোকে, এই বয়েস, এই রূপ?...তুই-ই কি মান ইজ্জত বাঁচিয়ে থাকতে পারবি?... আর রান্নার কাজে কত রোজগার করবি? খাওয়া-পরা তিন বড়জোর চার টাকা মাইনে। তাতে ছেলের খরচ চলবে?'

অগত্যা রাজী হতেই হয়।

সাঁইতে যদি স্বাবলম্বী হতে হয়, যদি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়, এ সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়।

পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি করার কত দুঃখ তাও জানে বৈকি।

হেমন্তর বাপের বাড়ির পাশে এক কায়েত জমিদারের বাড়িতে রাঁধুনী ছিল স্বর্ণ বলে, তার কোলে একটা ছেলে। ছেলেটার অসুখ করলেও সারা দিনে একবার খবর নিতে পারত না, ফেলা ভাত দুটো খাওয়া তার ওপর বাবুর ছেলেদের হাতে যখন তখন কারণে অকারণে চোরের মার—এইভাবেই মানুষ হত ছেলেটা। অথচ ঐ ছেলেটা খেত বলে তাঁরা মাইনে দিতেন না এক পয়সাও। ওর তারকের যদি ঐ অবস্থা হয়! বাপরে, মনে পড়তেই শিউরে ওঠে হেমন্ত।

আবারও সেই একই কথা বলতে হয় 'যা ভাল বোঝ করো দিদি, আমি আর কি জানি, কতটুকুই বা বুঝি!'

॥ ১০ ॥

প্রথমটা মনে হয়েছিল পারবে না।

পাঁচ-সাত দিন পরে এমন অসহ্য লাগত যে, মনে হত ছুটে পালিয়ে যায় কোথাও এখান থেকে। যা হোক করে খাবে, নিদেন ভিক্ষে করেও। কিম্বা গঙ্গায় ডোবাও ঢের ভাল এর চেয়ে। ছেলেটাকে তো রেখেইছে গোপালী, সে কিছু আর—ফেলে দেবে না মানুষ করবেই, যেমন করে হোক।

ক্রমশ ক্রমশ একটু একটু করে সয়ে এল।

পরিচয়ও হতে লাগল দু-একজনের সঙ্গে—তার থেকে সখ্য।

নতুন জগৎ, নতুন কর্মক্ষেত্রেরও একটা নেশা আছে, ক্রমশ সে নেশাও পেয়ে বসতে লাগল।

প্রথমেই, ওরা যাকে জাত-ধর্ম বলে তা ক্ষোয়াতে হল।

হোস্টেলে থাকা, ছত্রিশ জাতের মধ্যে। বামুনের মেয়ে একজন রান্না করে ঠিকই, মাছ-মাংসও খায় না হেমন্ত—তবে ছোঁয়া-লেপার কোন বাছবিচার রাখা যায় না। হরেক ধরনের হরেক জাতের মেয়ে আছে—ক্রীশ্চান য়্যাংলো ইন্ডিয়ান—সব রকম। য়্যাংলো ইন্ডিয়ান যে এডিথ এমিলি নাম—বড় ভাল মেয়ে। তার সঙ্গে গোড়া থেকেই খুব ভাব হয়ে গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলে, তবে বোঝে সব কথাই। অবশ্য তাদের আলাদা কিচেন। আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা, মুসলমান 'বয়' বা বাবুর্চি রান্না করে, ক্রীশ্চান মেয়েটি কিন্তু ওদের সঙ্গেই খায়। একটু আলাদা বসে, এই যা।

খাওয়া ছাড়াও, কাপড় ছাড়া বা স্নান করে শুদ্ধ হওয়া এসব মানা যায় না। ডিউটি পড়ে যখন তখন, তার সঙ্গে ক্লাস আছে, মধ্যে হয়ত কুড়ি মিনিট আধঘণ্টার বেশি খাওয়ারই সময় মেলে না। কাজ করতে করতেই খেতে আসতে হয়—খেয়েই ছোট আবার। এমনও হয়েছে, খেতে বসেছে ডেলিভারী কেসে ডাক পড়ল, খাওয়া ফেলেই ছুটতে হল। তখন কাপড় ছাড়তে গেলে আর সময়ে পৌঁছানো যায় না, সে জন্যে তৈরীই থাকতে হয় সর্বদা। তাকে এখনই কেউ প্রসব করাতে দেবে না, কিন্তু নিয়ম আছে। এতগুলো ডেলিভারী কেস না দেখলে পরীক্ষাই দিতে দেবে না। তাই সর্বদা, খাওয়ার সময়ও ডিউটির পোশাক ছাড়তে ভরসা হয় না।

ইডেন হাসপাতালে ওদের শিক্ষার ব্যবস্থা। এখানকার আইন খুব কড়া। বড় বড় ডাক্তার আসেন এখানে—কিন্তু তাঁদের জন্যেও নয়, মেম 'সিস্টার' আছেন এখানে, এরা সন্ন্যাসিনী, মানুষের সেবাব্রত নিয়ে সাতসমুদ্র পেরিয়ে এখানে এসেছেন, পয়সার জন্যে কাজ করেন না, বিনা বেতনে সেবা করেন। নিজের নিজের গুরুস্থানের বা সম্প্রদায়ের মঠ থেকেই বেশিরভাগ খরচা দেয় এঁদের—সুতরাং ফাঁকি কাকে বলে তাই জানেন না। নিজেরাও যেমন ফাঁকি দেন না, অপরের ফাঁকি সহ্যও করেন না। রাত্রে নার্স বা শুশ্রূষাকারিণীরা ঘুমোয় কিনা দেখার জন্যে এঁদের যিনি প্রধানা 'নাইট সুপার' খালি পায়ে, অনেক সময় মোজার ওপর কাপড়ের জুতো পরে—অন্ধকারে ভূতের মতো ঘুরে বেড়ান, অনেক সময় কালো পোশাক পরেও ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায়। যদি কাউকে ঘুমোতে দেখেন কি ঢুলতে—তাহলে সেই মুহূর্তেই তার চাকরি খতম, শিক্ষার্থিনী হলে সেইখানেই শিক্ষার শেষ।

হেমন্তর রাতজাগা একেবারে অভ্যাস ছিল না। ওর বিষম ঘুম পায়। ওকে বার বার বাঁচিয়ে দেয় ঐ এডিথ মেয়েটিই। এডিথ যেদিন না থাকে—সুশীলা। এডিথ সারারাত জেগে বাইবেল পড়ে। একই টেবিলের সামনাসামনি বসে ওরা, হেমন্ত টেবিলে কনুই দিয়ে দুহাতে মাথা রেখে বসে বসে ঘুমোয়। সে বসে দরজার দিকে পিছন ফিরে, সেদিকে মুখ করে বসে থাকে এডিথ। খাতায় রুল টানার একটা কাঠের রুল আছে, সেইটে সে হেমন্তর কনুইয়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখে। দরজার বাইরে নাইট সুপারের পোশাকের মৃদু খশখশানি শুনলেই সে রুলটাতে সামান্য একটুখানি ঠেলা দেয়। তাতেই সজাগ হয়ে ওঠে হেমন্ত, সামনের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন মেলাতে থাকে। কোন কোন দিন এডিথের দেখাদেখি একটা গীতা এনে রাখে—রুলের স্পর্শ পেলেই গীতায় মনোযোগ দেয়।

এডিথের সঙ্গে সবদিন ডিউটি পড়ে না। সেই দিনগুলোতেই খুব কষ্ট হয়। জোর করে চোখের পাতা টেনে ধরে, আঙুল দিয়ে চোখ রগড়ায়—ঘুম তাড়াবার যতগুলো পদ্ধতি জানা আছে সবগুলোই প্রয়োগ করে। তাতেও যখন হয় না কলে গিয়ে চোখে জল দিয়ে আসে।

কেবল সুশীলা থাকলে এসব কিছুই করতে হয় না। এতরকম মজার গল্প জানে সে—তাদের পাড়াগাঁয়ের স্থূল রসিকতা ও উদ্ভট গল্প সে সব কেঁদে বসলে ঘুম ছুটে পালায়। আর চুপি চুপি গল্প বলারও আশ্চর্য দক্ষতা তার, অত যে অবিশ্রাম বকে—তিন চার হাত দূরেও রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, কিছু শুনতে পায় না তারা। বিপদ হয় হেমন্তরই—হাসির শব্দ না ওঠে সে জন্যে মুখে কাপড় গুঁজে দিতে হয় এক একসময়। হেমন্তর মনে হয় শব্দ-ক্ষেপণেরই একটা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা আছে সুশীলার, যাকে বলতে যায় কেবল-মাত্র তার কানেই পৌঁছয়—বাতাসে পরি-ব্যাপ্ত বা তরঙ্গিত হয় না।

এ হেন মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্য হতে বাধা। যদিচ হেমন্তর নীতিবোধের নির্দেশে তা হবার কথা নয়। ওর শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারে বাধবারই কথা। সুশীলার সঙ্গে আলাপ হবার পর ওর ইতিহাস যখন জানা গেছে—সুশীলা কোনদিনই গোপন করার চেষ্টা করেনি এটা মানতেই হবে—তখন সে আলাপ এমনই প্রগাঢ় সখ্যে পরিণত হয়েছে যে আর হেমন্তর পক্ষে ব্যবধান বজায় রাখা সম্ভব নয়। বরং মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে যে এই আত্মাহুতিবাজ হাসিখুশী সবল মেয়েটি এখানে না থাকলে এই 'বনবাস' সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠত। এডিথ খুবই ভাল লোক। ওকে ভালও বাসে কিন্তু সে ঠিক বন্ধু নয়, ওদের থাকের মানুষ ও নয়। সে ইংরেজী লেখা-পড়া জানে, আগে এখানে এসেছে, ডাক্তারী বইও অনেক পড়েছে সে। সব বিষয়েই ওদের থেকে অগ্রসর। ধাত্রীবিদ্যার সঙ্গে শুশ্রূষা বিদ্যাও শিখছে সে—সে এখান থেকে বেরোলে অনেক ভাল চাকরি পাবে। আর সে চাকরিও নাকি একরকম ঠিক করাই আছে।

সুশীলার অদ্ভুত ক্ষমতা এ বিষয়ে। সে একদিনেই যে কোন লোকের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। একেবারেই পাড়াগাঁয়ের আবর মেয়ে যাকে বলে. মামার বাড়ি মানুষ হয়েছিল—দাদামশাই সামান্য একটু লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন. এই যা তফাৎ অপর গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে। নইলে অন্য কোন দিকেই সে শহুরে নয়—শহুরে হবার চেষ্টাও করে না। ওর সঙ্গে কথা কইলে এখনও যেন পানাপুকুরের গন্ধ পাওয়া যায়। হেমন্তর শ্বশুরবাড়ির থেকেও অজ পাড়াগাঁ ওদের দেশ:

কিন্তু হয়ত সেই জন্যেই—বুনো বলেই মেয়েটা বড় ভাল। ভারী সরলও। পরিচয় ও আলাপ হওয়ার তিনচার দিনের মধ্যেই গলগল করে নিজের সমস্ত ইতিহাস খুলে বলেছে সে। কায়স্থর মেয়ে—বাল্যে পিতৃ-হীন—মামারাই মানুষ করেছেন। তাঁদের অবস্থা ভাল নয়. সামান্য জমিজমা সম্বল করে সবাই বসে খেতেন—বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আয়ও নাম-মাত্রে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বেশী খরচ করে বিয়ে দিতে পারেন নি। এগারো বছরের মেয়েকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের এক দোজবরের হাতে ধরে দিয়েছেন।

অথচ হয়ত একটু চেষ্টা করলে ভাল পাত্র পাওয়া যেত। শ্যামবর্ণের মধ্যেও ওর চেহারায় ভারী একটা মিষ্টতা ছিল। মুখটি বড় সুকুমার, কবি কবি ভাব—আর সবচেয়ে সুন্দর তার চোখ দুটি। প্রতিমার মতো

টানা চোখ কিন্তু ভাবালু বা ঢুলু ঢুলু নয়—সে চোখের তারা দুটি সর্বদা যেন কী এক কৌতুকে নাচছে—এমনই চপল ও উজ্জ্বল। ওর চোখের দিকে চাইলে মনে হয় পৃথিবীতে শোক দুঃখ দুর্দশা অবিচার কিছু নেই—আছে শুধু অফুরন্ত মজা।

এই কারণেই শ্বশুরবাড়িতে—যৌবন লক্ষণ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রতি মনোযোগ দেবার লোক প্রচুর জুটে গেছে। আর তার ফলেই—সহজাত স্বাভাবিক যা তাই হয়েছে, একদা এক মামাতো দেওরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে সে। স্বামীকে তার তখন অতি বৃদ্ধ মনে হত—পাশে শুতে ভয় ভয় করত। সে জায়গায় কুড়ি বাইশ বছরের দেওরকে অনেক বেশী আপন অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে।

সে ছেলেটি অবশ্য অবিচার করেনি, কলকাতায় এনে স্ত্রীর মতোই রেখেছিল, স্ত্রী পরিচয়েই। ভদ্রপল্লীতেই ঘর ভাড়া করেছিল—এমনি কোন অসৎ ছাপ পড়তে দেয়নি তার মনে।

বছর চারেক এইভাবেই ঘর করেছিল ওরা, একটা বাচ্চাও হয়েছিল কিন্তু সুশীলারই ভাগ্যক্রমে বাঁচে নি। এর মধ্যে অশান্তি অনেক হয়েছে, ওর সেই দেওর বা স্বামী যাই বলো—তার ওপর চাপও বড় কম আসে নি। সুশীলার মামাশ্বশুর ও শাশুড়ী তখনও বেঁচে—তাঁরা ছেলেকে ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার করে বিয়ে-থা দিয়ে স্থিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বৈকি। কিন্তু এত কাণ্ডেও অমৃত ওকে ত্যাগ করেনি, দীর্ঘকাল বীরের মতো সমস্ত আঘাত-সংঘাত সহ্য করেছে। সে রেলের বড় ভাল চাকরি করত, টাকা তিরিশেকের মতো মাইনে পেত—সংসার ভালভাবেই চলবার কথা, চলতও। অভাব অভিযোগ ছিল না বলেই ওদের দুজনের মধ্যে কোন অশান্তি ছিল না।

কিন্তু সহ্যশক্তিরও সীমা আছে। মা-বাবা বুড়ো হচ্ছেন, তাঁরা চোখের জল ফেলেন, মাথা কোটেন পায়ের গোড়ায়—আত্মীয়স্বজনরা নিয়ত ধিক্কার দেয়, নানা-রকম সদুপদেশ দেয়। প্রত্যহ কেউ না কেউ আপিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে—অনুরোধ উপরোধ অভিযোগ অনুযোগ ও উপদেশ দৃষ্টান্তে জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

শেষ পর্যন্ত অমৃতকে হার মানতেই হল। ওর অবস্থা দেখে সুশীলাও বন্ধন খুলে দিল স্বেচ্ছায়। বলতে গেলে মিষ্ট সম্পর্কের মধ্যেই বিদায় নেওয়ার পালা চুকল। তবে অমৃত একেবারে ওকে পথে বসিয়েও যায়নি। বাবাকে বলে কয়ে তাঁর কাছ থেকে পাঁচশ টাকা আদায় করে ওকে দিয়ে গেছে, এ ছাড়া একেবারে আপিস থেকেই মাসে মাসে দশ টাকা করে মনি-অর্ডার আসবে এ ব্যবস্থাও করে দিয়েছে।

সুশীলা অমৃতকে সত্যিই ভালবাসত। সে তখনও তাকে কোন দোষ দেয়নি—এখনও দেয় না। বরং বলে, 'ভালই হয়েছে ভাই, যা কষ্ট পাচ্ছিল যা লাঞ্ছনা—সে চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না। আর সত্যিই তো—একবার একটা ভুল করে ফেলেছে—তাই বলে কি আর সারাজীবন মা-ভাইবোন-বাপকে ফেলে, আত্মীয়স্বজন থেকে বঞ্চিত হয়ে একঘরে হয়ে থাকবে? অবিদ্যে দিয়ে তো আর সারাজীবন কাটে না—বৌ ছেলেমেয়ে এগুলো চাই বই কি। শখ মিটে গেলেই তো লোকে ফেলে চলে যায়। সে তো তা যায়নি ভাই, যতক্ষণে আমি যাও বলেছি ততক্ষণে গেছে। না, সে অমানুষের মতো কোন কাজ করেনি, তাকে আমি এক তিলও দোষ দিই না।'

সে নিজের জন্যেও ভাবেনি তত, মানে খাওয়াপরার জন্যে ভাবেনি, দশ টাকা আয় একটা পেটের পক্ষে যথেষ্ট—শুধু ওর যেটা ভাবনা হয়েছিল—একা এই শহরে থাকবে কি করে! দেখবে কে! কোন কোন হিতৈষী উপদেশ দিয়েছিলেন কাশী বা বৃন্দাবন কি ঐ রকম কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করতে। কিন্তু সে ওর সাহসে কুলোয় নি। ইতিমধ্যে অনেকের মুখে অনেক গল্প শুনেছে সে, ঐসব 'তীর্থস্থানে' নাকি যেমন দেবতারাও আছেন তেমনি বদ লোক গুণ্ডাবদমায়েশও আছে। বরং তারাই বেশী। দেবতাদের দেখা যায় না—এরা প্রত্যক্ষ। তাদের পাল্লায় পড়লে ইহকাল পরকাল কিছুই থাকবে না।

আকাশ পাতাল ভাবছে, হঠাৎ ভগবানই অপ্রত্যাশিতভাবে একজন দেখবার লোক এনে দিলেন।

সহসা একদিন এক-পা হাঁটু পর্যন্ত ধুলো ও হাতে ক্যাম্বিশের ব্যাগ নিয়ে, ময়লা জিনের কোট গায়ে ওর স্বামী মুরারি এসে হাজির হল, অনেক খুঁজে খুঁজে নাকি এসেছে, অনেক কষ্টে বর্তমান ঠিকানা যোগাড় করে। সে একাও নয়—সঙ্গে বছর দুয়েকের একটি শিশু, সতাতো ভাগ্নে। বাড়িতে এক সৎশাশুড়ী ছিলেন, তিনিই এতদিন মুরারীকে ভাত জল দিতেন, তিনি হঠাৎ গত হয়েছেন—এখন দেখবার কেউ নেই। মুরারির শরীর খারাপ, ম্যালেরিয়ায় ভুগে দেহ একেবারেই ফোঁপরা হয়ে গেছে, নিজে হাতে রেঁধে খাবে সে ক্ষমতা নেই। বিশেষ এই দুধের ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে আরও বিপদ। মাত্র বছরখানেক আগে সতাতো বোন মারা গেছে, ছেলেটাকে দিদিমার কাছে ফেলে দিয়ে সে ভগ্নীপতি গিয়ে আবার বিয়ে করেছেন তিন মাসের মধ্যে। এদিকে যার ভরসায় রেখে গেছে—তিনিও সরে পড়লেন।

তাই একরকম অনন্যোপায় হয়েই মুরারি খোঁজখবর করে চলে এসেছে। বললে, 'বড়বৌ, আমি বুড়ো মানুষ, আমার কেউ নেই আর, তুমি যদি না দ্যাখো তো বেঘোরে মরতে হবে আমাকে।'

সুশীলা তো অবাক। প্রথমে ওর বিশ্বাসই হতে চায়নি কথাটা, মনে হয়েছিল ভুল শুনেছে, কিম্বা তামাশা—তারপর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে যখন বুঝল তামাশা নয়—অকৃত্রিম প্রস্তাব—তখন বলে উঠেছিল, 'ওমা, আমার হাতে খাবে কি, আমার তো জাত গেছে!'

'আমার আর জাত আর ফাত!' উত্তর দিয়েছিল মুরারি, 'বাঁচলে তো জাতের চিন্তে! না খেয়ে মরেই যদি গেলুম জাত রেখে কী করব? তা ছাড়া তুমি আমার বিয়েকরা বৌ, আমারই অন্যায় হয়েছিল বুড়ো বয়সে কচি মেয়ে বিয়ে করা—সেই জন্যেই তোমাকে চলে আসতে হয়েছে, তোমার এতে কিছু দোষ নেই। আর ঘর করেছ তো বেজাত কুজাতে নয়, আমারই ভায়ের সঙ্গে—তাতে জাত অশুদ্ধ হয় না। দোহাই বড়বৌ, তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে তাড়িয়ে দিও না, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না, ক্ষ্যামাঘেন্না করে একটু ঠাঁই দাও, আমি এই শেষ অবস্থায় আর কোথা যাব?'

সেই থেকে দুটি প্রাণীই ওর ঘাড়ে চেপেছে। দেশে গিয়ে থাকলে তবু একরকম করে চলে যেত বোধহয়, কিন্তু দেশে গিয়ে থাকা সুশীলার পক্ষে আর সম্ভব নয়, অসম্ভব ঘোঁট হবে, লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ থাকবে না। মুরারির শরীরেরও এমন অবস্থা নয় যে ছুটোছুটি করে কলকাতা আর দেশ করবে বারবার। দুচার টাকা খাজনা কি ফসলপত্র আদায় করবে। না গেলে কেউ বাড়ি বয়ে এক পয়সা দিয়ে যাবে না। আবার ইতিমধ্যেই কুলত্যাগিনী স্ত্রীর কাছেই এসে আছে, একথাটাও কি করে দেশে রটে গেছে—সেখানে মুরারির যাওয়াও এখন কঠিন। অপমানের শেষ থাকবে না।

ফলে এখন সুশীলাকেই উপার্জনের চেষ্টা দেখতে হয়েছে। অমৃত যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল—আর সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তার ওপর ভরসা করেই সুশীলা এখানে ভর্তি হয়েছে। সেখানেও সংসার চালাচ্ছে। উপরন্তু বরকে রেঁধে দেবার জন্যে দুটাকা মাইনে দিয়ে একটা ঠিকে রাঁধুনীও রাখতে হয়েছে।

সুশীলা হেসে বলে, 'আমি কমলিকে ছাড়লে কি হবে, কমলি ছোড়তা নেহি!... দ্যাখ দিকি, বর ছেড়ে পরের সঙ্গে বেরিয়ে এলুম খানিক খাতায় নাম লিখিয়ে—তাতেও রেহাই নেই, সেই বরই পিছু পিছু এসে জুটল! আবার দ্যাখ, বরেরাই বৌকে খাওয়ায়, চিরকাল শুনে আসছি বৌয়ের জন্যে হন্যে হয়ে রোজগার করতে ছোটে—আমার কপালে আমাকেই রোজগারের চেষ্টা করতে হচ্ছে, সাত্তকজাতের বস্তুপুঁজ ঘাঁটা কাজ—কী সমাচার না বুড়ো বরকে খাওয়াতে হবে! একেই বলে কপাল! আমার অদেষ্টে সব বিপরীত!'

বলে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে সুশীলা।

আবার বলে, 'ভাগ্নেটাও হয়েছে তেমনি! কে জানে বুড়োটা শিখিয়ে দিয়েছে কিনা, আমি গেলেই মা মা করে এসে জড়িয়ে ধরবে, আসবার সময় আঁচল ধরে আটকে রাখার কান্না জুড়ে দেবে। যত মনে করি মায়ায় জড়াবো না, ততই ছোঁড়াটা শক্ত করে গেরোয় পাক দেয়।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরবিন্দ-গীতা

সুকুমার বসু

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন সাধন-পথের মহান সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। স্বীয় মনোভূমিতে দিব্য-বিবর্তন ক্রিয়া, স্বীয় তপোবলে ত্বরান্বিত করে তিনি সর্বপ্রথম প্রমাণ করলেন যে বিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে জীবদ্দশায় ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব। এই চিরস্মরণীয় দিনে তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দময়ের অমৃত স্পর্শ উপলব্ধি করে জীবন্মুক্ত পুরুষের পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। এই দিনটিকে তিনি বলতেন—'বিজয় দিবস'। কারণ এই দিনে তিনি পার্থিব সব অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে, সেই অতীন্দ্রিয় শিবময় পরা-চেতনার (অতিমানস) মর্তে অবতরণের এক উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সাফল্যের মাধ্যমেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য 'বিশ্বমুক্তি প্রকল্পের' বুনিয়াদ গঠিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ দিব্য-দৃষ্টির অভাবে যে সমস্ত জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে দিব্য-নির্দিষ্ট পথে বা নিয়তি-নির্দেশে এগিয়ে চলে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সিদ্ধিদিবসে এবং মহাসিদ্ধির পর তিনি তা বলে গেলেন মানুষের কল্যাণে তাঁর দিব্য বাণীতে লাইফ ডিভাইন গ্রন্থে এবং সাবিত্রী মহাকাব্যে। সেই দিব্য-বাণীর ছায়ায় এবং আশ্রয়ে বর্তমান রচনাটি রচিত হল—তাঁরই আশীর্বাদে।

—লেখক

(১)

অভ্যুত্থান—মহামানবের।
কার' মুক্ত গুহাদ্বার—হৃদয়ের।
মানুষের মনে—
জ্যোতিধারা স্নানে—
হবে প্রস্ফুটিত—দিব্যাত্মার,
—সুপ্ত, অর্ধবিকশিত।
মহাদ্যুতি বিকিরণে,
দীর্ণ তমো-আবরণ।
প্রাণে প্রাণে আনে সঞ্জীবন।
নব-জাগরণে—
প্রজ্ঞার বোধন।
কামনা-বিহীন কর্মে—
যোগ দিব্য-মন্ত্র,
জপে পরা-মন্ত্র—
'মুমুক্ষু জীবের মুক্তি
বিশ্বের কল্যাণ'—
জপে প্রজ্ঞাবান।

(২)

নারায়ণ। পরম-ব্রাহ্মণ
বন্দী স্বভাবে অংশাত্মা,
ঊর্ধ্ব-চক্রে প্রকাশে সগুণে।
দিব্য-লীলা-বিবর্তনে
বাহ্য বিভু।
অনন্ত মাঝে [illegible]—
পদ্ম-[illegible]লীন—নিবর্তন।
কল্প-অন্তে—প্রতি-আবর্তন।
বিশ্ব-বিবর্তন—ঊর্ধ্বপথে
চলে, কার ইন্দ্রজালে?
স্বর্গের সুষমা নামে'
কেন ধরাধামে?
কেন শুভ্র ধূসর-ধরণী?
একি মধুগন্ধে ভরা
অণু-পরমাণু!
নিসর্গ-সুন্দর বিশ্ব,
প্রকৃতির প্রাণে প্রাণে
এ কোন প্রস্তুতি!

(৩)

মনোভূমি হতে ঊর্ধ্বে—
বিকশিত পারিজাতে—
অধিমানসের(১) দিব্যাঙ্গে—
কাঁদে আত্মার আপনা দূতে।
যেন ভগীরথ—
মূর্তিমান নীরব আকুতি—
কাঁদে কার পদ চুমি'।
'দাও সাড়া'—হে সৎ-চেতনা,
অমৃত আধার।
ওগো পরম-করুণা—
সাড়া দাও, সাড়া দাও
জীবনের পথে।
কোন ঊর্ধ্বলোক হতে
নামে' মহাস্রোত।
নামে' অতিমানসের(২) আলো
অধিমানসের দিব্যাঙ্গে।
আলোর জোয়ারে হ'ল
পরম-সম্ভব।
ভগীরথ অর্ঘ্য দিল—
মনোভূমি সিক্ত হ'ল—
তমসার অবসান—
জ্যোতিস্নানে।

(৪)

আসছে সে যুগ। যবে
পরা-আকর্ষণে মুক্ত হবে
দেবতারা—ধরণীর
পুরন্দর হতে।
অধোমুখী বিশ্ব-বিবর্তন
হবে ঊর্ধ্বমুখী—হবে লীন
অমৃত-সঙ্গমে—মহা উত্তরণে।
যাবে অন্তরালে—
দেবত্ব, দ্বন্দ্ব, ভেদ, নানাত্বের
বিচিত্র বিন্যাস—
যত কিছু দিব্য-পরিহাস।
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর—
সত্যশক্তি—
বিজ্ঞান ভাস্কর, আনন্দ-আকর।
সেই এক পিতৃ-পরিচয়,
দীপ্ত হবে ধ্রুবতারা সম
—সেই 'এক', সেই 'তৎ সৎ'
—কর্মবিবর্তনে।
প্রকৃতির সব কারিগরী
অন্তে যাবে চলি—
সুপ্ত রবে পরা-রাত্রি মাঝে।

(৫)

অবতরণ।
বিশ্বের মুক্তির তরে
নরে নারায়ণ—
বিধাতা-লিখন।
ঘুচাইতে ঘোর অন্ধকার
নামে অবতার।
শিখাইতে ব্রহ্মের বিজ্ঞান
আসে সত্যবান।

আত্মায় আত্মায় জাগরণ
—সেই দিব্য উত্তরণ।
পাঞ্চজন্যে আসে আমন্ত্রণ।
'উঠ, জাগ, মুক্ত কর'—
সুপ্ত যাহা আছে
অন্তঃপুরে। শোন ধ্বনি
অন্তরে তোমার—
তোমারি কল্যাণে কাঁদে
তোমারি হৃদয়ে বন্দী,
সেই সৎ-চিৎ,
সেই আনন্দ-আধার।
মুক্ত করি'—যেতে দাও তারে
অনন্তের পানে। ক'রো
আত্মদরশন।

(৬)

কোটি জীবনের মাঝে
অণুতে অণুতে বন্দী
—সতের চেতনা।
মুক্ত করো তারে।
ওহে মুক্তকচ্ছ—
নির্বাণেরে করি' তুচ্ছ
নির্মাণের হও অধিকারী,
বিধাতার বরে।
বিশ্বজনে করি' নিরঞ্জন—
দিব্য-কর্ম কর সম্পাদন।
সুপ্ত দেব-ভাব ব্যক্ত হবে
—নীতি-আচরণে।
অনেকের দলে—কিছু
পাবে ঊর্ধ্বগতি, পাবে
কিছু সমাধান—রহস্যের—
মুহূর্তের জ্যোতিস্নানে।
মনুভোর মৌ মৌ
হবে মনবন।
নিসর্গ-দোলনা মাঝে
জীবনের হবে উত্তরণ।

(৭)

ঊষার বোধন। (৩)
নব সূর্যোদয়ে—
চেতনার স্তরে স্তরে,
জ্যোতির পরশে—
হৃদয়ের অরবিন্দ মেলে দল।
দিব্য জাগরণ।
জ্যোতির্ময় নামে'—
ভূমার কল্যাণে।
তরঙ্গের সমুত্থান—
স্থাবরে জঙ্গমে,
অণু-পরমাণু মাঝে
—এ কোন প্রগতি!
ঊর্ধ্ব-অভিযান—
উত্তরণে।
কর্মযোগী, ধর্মব্রতী,
প্রজ্ঞাবান দেবজাতি
—সব নারায়ণ।
প্রকৃতি-পরাণে জাগে
সুপ্ত ভগবান।
দিব্য-ক্রোড়ে কর্মরত
অমৃত-সন্তান।
নিসর্গ-সৌন্দর্যে ভরা,
অপরূপ মধুক্ষরা,
সে দিব্য-জীবন।

"রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে
তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে" (৪)—
হবে প্রতি-আবর্তন—
নিয়তি লিখন।

---

(১) অধিমানস : 'Overmind"! 'In its nature and law the Overmind is a delegate of the supermind consciousness, its delegate to the Ignorance.'
—The Life Divine, P 255.

(২) অতিমানস : 'Supermind'! '......a wide calm and deep delight of all existence.... an eternal ecstacy".
—The Life Divine, P 878-9.

(৩) ঊষা : 'She harmonises with the dawns that shone out before and those that now must shine.' —(Rig Veda) The Life Divine, P 3.

(৪) শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা—৮/১৮।

বিজ্ঞানের কথা

শব্দতরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে অভিযান

বায়ুমণ্ডল বা মহাশূন্য পেরিয়ে খবর করা, কথা বলা বা ছবি পাঠানো এখন আর মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। এ-কাজগুলো অতি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে থাকে বেতার-তরঙ্গ। এমনকি লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের কোনো জিনিসের অবস্থান সম্পর্কেও বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে স্পষ্ট ধারণা করা চলে। বেশি দিন আগের কথা নয়, অ্যাপোলো অভিযানের নভশ্চররা যখন চাঁদের মাটিতে চলেফিরে বেড়াচ্ছিলেন তখন রেডার রেডিও ও টেলিভিশনের মারফৎ এমন একটা আয়োজন করা হয়েছিল যে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর মাটিতে বসেই গোটা ব্যাপারটা চোখের সামনে ঘটার মতো দেখতে পেয়েছিলেন। মার্কিনী ব্যোমযান যখন শুক্রগ্রহের পাশ দিয়ে গিয়েছিল বা সোভিয়েত ব্যোমযান যখন শুক্রগ্রহের মাটিতে নেমেছিল তখন এই পৃথিবী থেকেই সবরকমের যোগাযোগের সম্পূর্ণ একটি ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। আর শুধু খবর করা বা কথা বলা বা ছবি পাঠানোই নয়, বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে দূরের কোনো বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কেও ধারণা করা চলে (সেই বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা বেতার-তরঙ্গের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে)। মহাশূন্যের কোনো এলাকাই বেতার-তরঙ্গের অনধিগম্য নয়। হালের বিজ্ঞানীরা এই বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে এমনকি 'কোয়াসার'-এর সন্ধানও পেয়েছেন। রেডিও-টেলিস্কোপ নামে যে যন্ত্রটির সাহায্যে কোটি আলোকবর্ষ দূরের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে তা আসলে বেতার-তরঙ্গ ধরারই আয়োজন। বেতার-তরঙ্গ গোটা মহাবিশ্বকেই বিজ্ঞানীর নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু এমন যে সর্বত্রগামী বেতার-তরঙ্গ তা কিন্তু আমাদের চোখের সামনে বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে যে মহাসমুদ্র তার ভিতরের এলাকাটির কোনো সন্ধান দিতে পারে না। কারণ কী? জলের এলাকায় বেতার-তরঙ্গের চলাচল অত্যন্ত সীমিত। ঘোলা জলে আলোর পাল্লা কয়েক সেন্টি-মিটার মাত্র, বেতার-তরঙ্গের পাল্লাও তার চেয়ে খুব বেশি নয়। সমুদ্রের তলদেশের সন্ধান করতে হলে আলো বা বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে কোনো কাজ হবার নয়, তা সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু আলো বা বেতার-তরঙ্গ না হোক, শব্দ-তরঙ্গ কিন্তু বায়ুমণ্ডলের এলাকার চেয়ে জলের এলাকায় আরো দ্রুত

প্রকাণ্ড একটা চুরুটের মতো যে-জিনিসটিকে দেখা যাচ্ছে সেটি 'সোনার'। এই বিশেষ সোনারটি লাগানো ছিল সমুদ্র-গবেষণায় নিযুক্ত 'ডিসকভারি' নামে জাহাজের সঙ্গে। মেরামতীর জন্যে ওপরে তোলা হয়েছে।
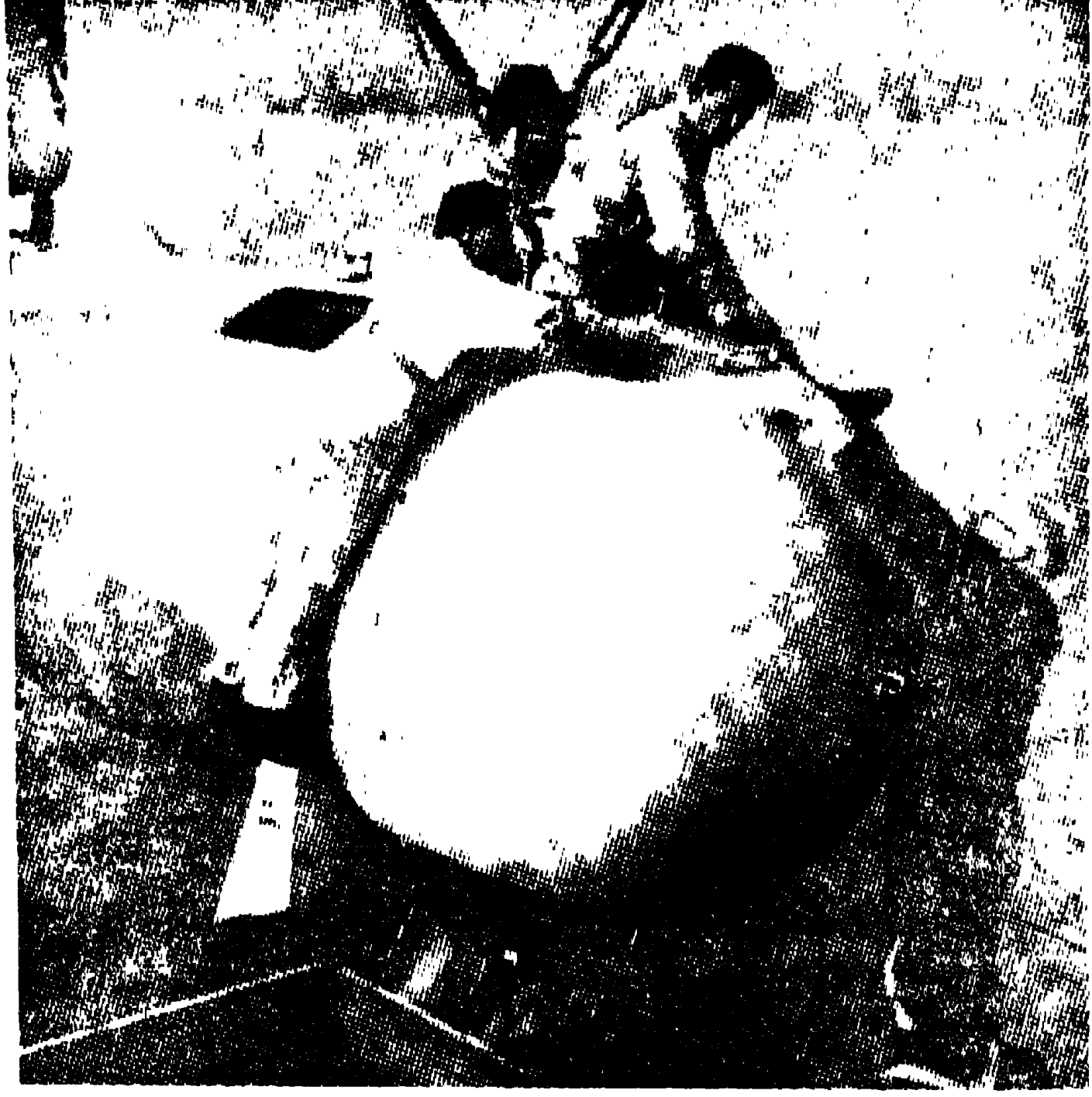
চলে ও আরো বেশিদূর পর্যন্ত পৌঁছয়। এ-অবস্থা জলের নিচের এলাকায় অনুসন্ধান চালাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা শব্দ-তরঙ্গের ওপরেই নির্ভর করছেন। উপ-কূলের কাছাকাছি ঘোলা জলের এলাকাতেও যেমন, মাঝ-সমুদ্রের নিরন্ধ্র এলাকাতেও তেমনি।

এজন্যে যে কৃৎকৌশলগত আয়োজনটি করা হয়েছে তার নাম 'সোনার'। এটি একটি ইংরেজী শব্দ। ল্যাটিন ভাষায় 'সোনাস' মানে শব্দ, ইংরেজিতে 'সাউন্ড'। বিশেষণে 'সোনিক'। এই মূল থেকেই 'সোনার' শব্দটি তৈরী। অর্থাৎ শব্দ-বিষয়ক কোনো একটা ব্যাপার। সোনার থেকে শব্দতরঙ্গ নির্গত হয়, এই শব্দতরঙ্গ কোনো বস্তুতে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে, এই প্রতিধ্বনিটি ধরবার আয়োজনও থাকে সোনারে, তা থেকেই ধারণা হয় বস্তুটি কত দূরে ও বস্তুটি কেমন।

এই আয়োজনটি যদি ঠিক থাকে তাহলে শুধু জলের এলাকায় কেন, অন্যত্রও একই উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার অবশ্যই চলতে পারে। ধরা যাক ইস্পাতের একটি ঢালাই হয়েছে। এই ঢালাইয়ের মধ্যে কোনো খুঁত আছে কিনা তা জানার উপায় কী? এই ইস্পাতের মধ্যে দিয়ে শব্দ-তরঙ্গের দূতকে পাঠানো যাক না কেন! কাঠামোর ভিতরটাও যদি সমানরকমের নিরেট ইস্পাতের হয় তাহলে শব্দ-তরঙ্গের গতি হবে একরকম। কিন্তু তার চলার পথে যদি মাঝেমধ্যে ফাঁকফোকর পড়ে তাহলে? তাহলে অবশ্যই শব্দ-তরঙ্গের গতি হবে অন্যরকম। এই হেরফের থেকেই ধরা পড়ে যায় কাঠামোর ভিতরটা নিখুঁত হয়েছে কি হয়নি। এই উদ্দেশ্যে যে বিশেষ মাপের শব্দতরঙ্গ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় 'আলট্রাসোনিক' বা শ্রবণাতীত। অর্থাৎ মানুষের কানে এই শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে না।

যদি পড়ত? তাহলে শুধু এই পশু-পাখির জগতই নয়, এই প্রাকৃতিক জগতও হয়ে উঠত অনেক বেশি হট্টগোলের জায়গা। কেন? না, যে শব্দ এখন আমরা শুনি না, তাও শুনতে পেতাম। রাত্রের অন্ধকারে একটা বাদুড় উড়ে যাচ্ছে। সামনে একটা তার বা সুতো, বাদুড় কিন্তু ঠিক টের পায়। কি ভাবে? এই শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে। বাদুড় উড়ে চলে শ্রবণাতীত শব্দ ছুড়তে ছুড়তে। সামনে যদি কোনো বাধা থাকে তাহলে তাতে ঘা খেয়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। বাদুড় তা শুনতে পায় ও সামনের বাধার অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়। এ-কারণে অন্ধকারে উড়বার সময়ে বাদুড়কে তাকিয়ে দেখতে হয় না। সামনে বাধা আছে কিনা তা সে শুনতে পায়।

এমনি দৃষ্টান্ত আরো আছে। একটা ঘূর্ণিঝড় তেড়ে আসছে। চোখের দেখায় তা টের পাবার আগেই অনেক পশুপাখি তা টের পেয়ে যায়। কি ভাবে? ঘূর্ণিঝড় তেড়ে আসার খবর তাদের কাছে পৌঁছয় শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের সাহায্যে। ঘূর্ণি-ঝড়ই এই শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের উৎস, অনেক পশুপাখিই এই শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গকে ভালো করেই চেনে। আজকাল অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহ ও রেডারের সাহায্যে

শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের বার্তা এসে পৌঁছবার আগেই, এমনকি ঘূর্ণিঝড়টি যখন সবে তৈরি হচ্ছে সেই তখনই, ঘূর্ণিঝড়ের খবর পেয়ে যাই (তাতে অন্তত আমাদের দেশে বিশেষ লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই, ওড়িষার সাম্প্রতিকতম ঘূর্ণিঝড় তার মর্মন্তুদ প্রমাণ)।

যাই হোক, সমুদ্রের তলদেশের খবর আনবার জন্যে এই শব্দতরঙ্গকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের এই পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে সমুদ্র—ইংরেজিতে বলা হয় হাইড্রোস্পেস। এখনো পর্যন্ত এই বিরাট এলাকা সম্পর্কে আমরা খুব একটা খবর রাখি না—তার একটা বড়ো কারণ, খবর রাখার মতো আয়োজনের অভাব। তুলনায় বাইরের স্পেস বা মহাকাশ সম্পর্কে আমাদের খবরের ভাণ্ডার কিন্তু রীতিমতো সমৃদ্ধ। কারণ, এক্ষেত্রে আয়োজনটিও বেশ বড়ো রকমের ও অনেক অগ্রসর।

তবে গত এক দশক ধরে সমুদ্রের তলদেশের খবর জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা খুবই তৎপর হয়েছেন। এবং, সঙ্গত কারণেই বেতারতরঙ্গ নয়, শব্দতরঙ্গের ওপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে পুরোপুরি। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে জলের নিচে শব্দতরঙ্গের প্রয়োগে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে এককথায় বলা চলে নাটকীয়। এ-সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথায় তার কিছু বিবরণ দিতে চাই।

যন্ত্রটির নাম 'সোনার'। যন্ত্রটির গড়ন কেমন হবে তা নির্ভর করে যন্ত্রটি ঠিক কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরে। হাতের মুঠোয় ধরা যেতে পারে এমন আকারের হওয়াও সম্ভব, যেগুলো সাধারণত ডুবুরীরা ব্যবহার করে থাকেন। আবার হতে পারে বিরাট আকারের ও জটিল গড়নের, যেগুলো সাধারণত সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গে লাগানো হয়। শেষোক্ত ধরনের সোনার সেটের পাল্লা হয়ে থাকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত।

জাহাজের সঙ্গে যে সোনার সেট থাকে তা লাগানো হয় জাহাজের তলদেশে। এমন একটি আয়োজন করা হয় (পদ্ধতিটি হচ্ছে যাকে বলা হয় জাইরোস্কোপীয়, একটি ঘুরন্ত লাট্টুর মতো ব্যাপার যার ফলে অক্ষদণ্ডটি সবসময়ে একই দিক নির্দিষ্ট করে) যাতে সোনার সেট থেকে নির্গত শব্দতরঙ্গের ধারা সমুদ্রের তলদেশের সঙ্গে বিচারে সবসময়ে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হয়।

সোনার সেটের মূল কাজটি কী? একটি শব্দতরঙ্গ তৈরি করে সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষেপ করা, সেই শব্দতরঙ্গ আবার যখন প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে তাকে গ্রহণ করা, এবং এই দুয়ের মাঝখানে কতখানি সময় পার হল তার একটি নির্ভুল হিসেব রাখার ব্যবস্থা করা।

শব্দপ্রেরক ব্যবস্থাটি বিদ্যুৎ-চালিত। সময়ের হিসেব রাখার ব্যবস্থা একটি চলন্ত

সমুদ্রের এই প্রাণীর নাম ডলফিন। ছবিতে দুটিকে খেলা করতে দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রে ডলফিনের চলাচল ও পরস্পরের সঙ্গে বার্তা-বিনিময় সোনার-এর সাহায্যে।

কাগজের চার্ট কিংবা ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপের সাহায্যে। সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে এলে তাকে গ্রহণ করে শব্দগ্রাহক। সেখানে সেটি রূপান্তরিত হয় বৈদ্যুতিক সংকেতে,, পরিবর্ধিত হয় এবং লিপিবদ্ধ হয় সেই একই সময়ের হিসেব রাখার ব্যবস্থায়। সোনার সেট থেকে শব্দ বেরিয়ে যাওয়া ও সোনার সেটে শব্দ ফিরে আসার মধ্যে কতখানি সময় পার হল তা থেকেই পাওয়া যায় জাহাজের তলদেশ থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত দূরত্বের একটা মাপ। অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতার মাপ। জাহাজ চলতে চলতে সমুদ্রের এই গভীরতার মাপও পর-পর নেওয়া হতে থাকে। পর-পর মাপগুলো সাজিয়ে ধরলেই পাওয়া যায় সমুদ্রের তলদেশের একটি মানচিত্র—অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশটি কোথায় কম-গভীর, কোথায় বেশি-গভীর, তার একটি সঠিক চেহারা। সমুদ্রের তলদেশের খাদ ও পর্বতের হদিশ এমনিভাবেই জানা গিয়েছে।

আবার সোনার সেটটিকে এমনভাবেও ব্যবহার করা চলে যাতে তার শব্দনিক্ষেপ খাড়াখাড়ি নিচের দিকে নয়, পাশের দিকে—ভূমির প্রায় সমান্তরাল দিকে। এটিকে বলা হয় 'পার্শ্ব-অনুসন্ধানী' সোনার সেট। এক্ষেত্রে শব্দতরঙ্গ সমুদ্রতলে গিয়ে পৌঁছয় কোণাকুণি। প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে কতখানি সময় নিচ্ছে তা থেকে পাওয়া যায় সমুদ্রের তলদেশের বিশেষ চেহারার একটি পরিচয়। চলমান জাহাজটি এমনিভাবে গোটা সমুদ্রের তলদেশের বিশেষ চেহারার হদিশ দিতে পারে।

পার্শ্ব-অনুসন্ধানী সোনার সেট ব্যবহার করতে গিয়ে গোড়ার দিকেই টের পাওয়া গিয়েছিল যে শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি কখনো কখনো সমুদ্রের তলদেশ থেকে নয়, মাছের গা থেকে ফিরে আসছে। এ থেকেই কিছুদিনের মধ্যে উদ্ভাবিত হল সমুদ্রের উপরিতলে ভাসমান জাহাজ থেকে সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চরমান মাছের ঝাঁকের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি। মাছধরার জাহাজে এ-ধরনের সোনার সেট থাকাটা আজকাল একটা সাধারণ ব্যাপার।

সোনার সেট থেকে নির্গত শব্দতরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হয়, একথা বলেছি। জাহাজটি গতিশীল, অতএব পর-পর পর্যবেক্ষণের ফলে গোটা একটি এলাকার ছবি ধরা পড়ে। সমুদ্রের তলদেশের ছবি পাবার জন্যে জাহাজের গতির ওপরে নির্ভর করতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু মুশকিল বাধে যখন পর্যবেক্ষণের বিষয়টিও হয় গতিসম্পন্ন—যেমন, মাছের ঝাঁক। সমুদ্রের তলদেশে মাছের ঝাঁক ছুটে চলেছে, কিন্তু জাহাজের গতি সে-তুলনায় এতই ধীর যে মাছের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, ফলে মাছের ঝাঁক অনায়াসেই পর্যবেক্ষণের এলাকার বাইরে চলে যায়। এই অসুবিধে কাটাবার জন্যে শব্দতরঙ্গকে অনেকখানি এলাকা নিয়ে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে পর্যবেক্ষণের বিষয়টি তার এলাকার বাইরে যেতে পারে না সর্বক্ষণের জন্যে ধরা পড়ে যায়। তখন এমন ব্যবস্থাও করা সম্ভব যে রেডারের পর্দায় এরোপ্লেনের ছবি ফুটে ওঠার মতো সোনার সেটের পর্দাতেও ফুটকি ফুটকি চিহ্ন মাছের ঝাঁকের ছবি ফুটে ওঠে।

তারপর সোনার সেটে আরও অনেক উন্নতি হয়েছে। পর্যবেক্ষণ এলাকার ছবিটি যাতে নানাভাবে ধরা যেতে পারে ও স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হতে পারে তার জন্যে হয়েছে নানা ধরনের ব্যবস্থা। ফলে সমুদ্রের তলদেশের ছবি এখন যতোটা স্পষ্টভাবে ধরা চলে তার সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় অ্যাপোলোর নভশ্চরদের চাঁদের মাটিতে হেঁটে বেড়ানোর ছবির সরাসরি তুলনা না চললেও একটির পাশে অপরটি একেবারে বাতিল করার মতো নয়।

সমুদ্রের ওপরে বিজ্ঞানীদের নজর এখন আরও বেশি। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, পৃথিবীর স্থলভাগের ভান্ডার ফুরিয়ে আসছে। ভবিষ্যতে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যে এই সমুদ্রের ভান্ডারের ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে, সমুদ্রের তল-দেশে চাষ-আবাদ করা হবে, বসবাসের উপনিবেশ গড়ে তোলা হবে, এমনি কত-কি। কিছু যে হবেই সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক না কেন, তার আগে সমুদ্রের এলাকাটিকে—যার নাম হাইড্রোস্পেস—খুঁটিয়ে জানা দরকার। আর সেই জানার দিকেই সোনার সেট সবচেয়ে বড়ো—এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র—সহায়।

'সোনার' যেমন একটি আশার দিক, সম্ভাবনার দিক, তেমনি অন্যদিকে আশঙ্কার দিকও আছে। সমুদ্রের জলকে ক্রমেই দূষিত করে তোলা হচ্ছে এবং তার ফলে সমুদ্রের গোটা প্রাণিজগতটিই লোপ পাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমন দিনও আসতে পারে সোনার সেটের পর্দায় হাজার চেষ্টা করেও মাছের ঝাঁকের একটি ফুটাঙ্কও ফুটিয়ে তোলা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল চিন্তিত। নিচের সংবাদটি লণ্ডন টাইমস পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের সমুদ্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে, পিকার্ড বলেছেন যে, সমুদ্রের জল ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় দূষিত করে তোলা হচ্ছে এবং এ-ব্যাপারটি বন্ধ না হলে সমুদ্রে আর প্রাণের কোনো চিহ্ন থাকবে না। প্রথমে মরবে বাল্‌টিক, তারপরে আড্রিয়াটিক, তারপরে ভূমধ্য।

অধ্যাপক পিকার্ড সমুদ্রের স্রোত নিয়ে গবেষণা করছেন। কাজেই সমুদ্রের দূষিত হওয়ার ব্যাপারটি তিনি যতোটা দেখেছেন ততোখানি অন্য কোনো বিজ্ঞানী নন। তিনি বলেছেন, প্রতি বছরে ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টন পেট্রোলিয়াম-জাত পদার্থ সমুদ্রে পড়ছে। এর মধ্যে ১৮ লক্ষ টন আসছে মোটরের নিঃসরণ থেকে। এই নিঃসরণ বায়ুমণ্ডলে হয়ে থাকে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই এসে পড়ে।

তৈলবাহী জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত হয় আরও প্রায় ১০ লক্ষ টন। বাকিটা আসে নদীতে ফেলা পেট্রোলিয়ম-জাত পদার্থ থেকে।

কাগজের কলগুলি থেকে যে-সব দূষিত পদার্থ নদীতে এসে পড়ে তার মধ্যে থেকে ৫,০০০ টন পারদ নদীবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ে।

এই সমস্ত দূষিত পদার্থ জলের উপরিতলের প্লাঙ্কটনের স্তরটিকে বিপন্ন করে তুলছে। এই স্তরটি লোপ পেলে অপেক্ষাকৃত বড়ো প্লাঙ্কটনও লোপ পাবে। তখন আর মাছও বাঁচবে না।

আগামী বছর স্টকহলম-এ জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে পরিবেশ সম্পর্কিত একটি সম্মেলন হবার কথা। এই সম্মেলনের সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তিনি কথা বলছিলেন। তাঁর মতো বহু বিশেষজ্ঞেরই ধারণা যে সমুদ্রের জল দূষিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে আগামী পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে সমুদ্রের জীবন লোপ পাবার আশঙ্কা রয়েছে।

শারীরবিদ্যা ও ভেষজে নোবেল পুরস্কার

এ-বছরের নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ডঃ আর্ল ডবলু সাদারল্যান্ড-এর নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি পুরস্কার পেয়েছেন, সহজ ভাষায় বলতে গেলে, হরমোনের ক্রিয়া কি-ভাবে ঘটে থাকে তৎসম্পর্কিত তাঁর গবেষণার জন্যে। হরমোন কী? হরমোন হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ যা মানুষের শরীরে বিভিন্ন কোষের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। কিছুকাল আগে পর্যন্তও শারীরবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, কোষের ক্রিয়ায় হরমোনের প্রভাব সরাসরি ঘটে থাকে, প্রয়োজনে হরমোন কোষে গিয়ে উপস্থিতও হয়। ডঃ সাদারল্যান্ড প্রথম আবিষ্কার করলেন, কোষের ক্রিয়ায় হর-মোনের প্রভাব সরাসরি ঘটে থাকে—কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। তিনি আবিষ্কার করলেন নতুন একটি রাসায়নিক পদার্থ, যা কোষের ক্রিয়ায় হরমোনের প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। কথাটা এতই নতুন যে, গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী-মহল প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ সাদারল্যান্ড দমেন নি। প্রত্যেক মৌলিক আবিষ্কারের মতো তাঁর এই আবিষ্কারও বহু পরীক্ষানিরীক্ষার সাফল্যের মধ্যে দিয়ে অবশেষে স্বীকৃতি লাভ করল।

সকলেই জানেন, হরমোনের ক্রিয়ায় গোলমালের দরুন মানুষের শরীরে অনেক-গুলো রোগ বাসা বাঁধে। যেমন, একটি হচ্ছে ডায়াবেটিস। ডঃ সাদারল্যান্ডের আবিষ্কারের ফলে এই রোগটি নিয়ে গবেষণার নতুন পথ পাওয়া গিয়েছে। শুধু এই একটিই নয়, ক্যানসার, কলেরা ইত্যাদি আরো অনেক-গুলো রোগ নিয়ে গবেষণার পথ।

বর্তমানে তিনি আছেন টেনেসির ভ্যানডারবিলট বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৫৫ বছর বয়স্ক ডঃ সাদারল্যান্ড গবেষণা শুরু করেছিলেন ২৫ বছর আগে।

—অয়স্কান্ত

ফাঁদ

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

মাকড়সা যেমন নিজের তৈরী জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে ডালিয়ারও আজ অনেকটা সেই অবস্থা। চারপাশে জালের যে ফাঁদ ডালিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা তো ওর নিজেরই তৈরী। ওই জাল ছিঁড়তে চায় ডালিয়া। ভাঙাতে চায় ওই ফাঁদ। কিন্তু পারে না। বরং আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়ে। ওর ওই রূপ-যৌবন শিক্ষা-চাকরি সবই আজ একটা নিছক ছলনা বলে মনে হয়। অপিস যাওয়া-আসা বাদ দিলে আজকাল পথে বেরুনোও প্রায় বন্ধই করেছে ডালিয়া। সাপ্তাহিক সিনেমা দেখার রুটিনটাও ন'মাসে ছ'মাসে দাঁড় করিয়েছে। পথে বেরুলেই অযাচিত হিতাকাংক্ষীর দল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। এসব ভালো লাগে না। এড়িয়ে চলতে চায় ওদেরকে। চাইলেই তো আর পারে না। কলকাতা শহরে আত্ম-গোপনের সুবিধেও অনেক, তেমনি ধরা পড়াও সহজ। ডালিয়ার বেলাতেও তাই হয় মাঝে মাঝে।

বহুদিন পর আজ একবার য়ুনিভার্সিটি পাড়ায় এসেছিল ডালিয়া। আজকাল এদিকে বড় একটা আসা হয় না। কেননা নিয়মিত পড়ুয়া-জীবন শেষ হয়েছে অনেকদিন। তারপরও অবশ্য দুটো বিষয়ে এম-এ পাস করেছে। যদিও প্রাইভেটে। তবু মাঝে মাঝে আসতো এখানে। দরকার না থাকলেও। চিরদিন পড়ায় আগ্রহী ডালিয়ার এই পরিবেশটাকে ভালো লাগতো। আজকাল ইচ্ছে থাকলেও আসা হয় না। সময় পায় না বলে। চাকরিটাই ওর সময়কে নিঙড়ে শুষে নিয়েছে। তার ওপর আর কোন ডিগ্রী নেবারও ইচ্ছে নেই।

তিনটে বিষয়ে এম-এ পাস করার পর বন্ধু শিউলি একদিন বলেছিল, আরেকটা বিষয় নিয়ে পাস করে ফ্যাল্।

হেসে ডালিয়া বলেছিল, মরে শি, কোয়াড্রুপেড্ হওয়ার বিপদ অনেক।

শিউলি বলেছিল, ধন্যি মেয়ে তুই। তোর পার্সিভিয়ারেন্সকে রেসপেক্ট না করে পারছি না। আমি তো বাপু একটা পাস করতেই হিমসিম খেয়ে গেলাম।

ডালিয়া বলেছিল, দ্যাখ্ শি আমি তো ঠিক পাস করার জন্যেই পাস করছি না। সাবজেক্টগুলো সম্পর্কে নলেজ গ্যাদার করাই আমার উদ্দেশ্য।

শিউলি বলেছিল, কর্ ভাই নলেজ গ্যাদার। আমার ভাই নলেজ-ফলেজের আগ্রহ নেই। একটা ডিগ্রী যা নিতে পেরেছি দ্যাটস্ এনাফ্ ফর মি। যাক্ ডিগ্রী বাড়িয়ে বাড়িয়ে জীবনের মানুষ সিলেকশানে আবার গোলমাল করে ফেলিস না।

আর আমরা ওই শিউলির দলেরই লোক।

এ পাড়ায় এলে ডালিয়াকে একটা নেশায় পেয়ে বসে। এক চক্করে ফুটপাথের পুরনো বইয়ের দোকানগুলোর সাজানো বইয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে নেবেই। ঘুরে দেখতে দেখতে পছন্দমাফিক কিছু না কিছু কিনেও ফেলে। কেনারও বাছবিচার নেই। সাহিত্য দর্শন জ্যোতিষতত্ত্ব থেকে সেক্সুয়াল বই পর্যন্ত কেনে। বই কিনে কিনে নিজের ঘরটায় বইয়ের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে। সেক্সুয়াল বই অবশ্য আজকাল আর কেনে না। আগে কিনত খুব। প্রথম যৌবনে য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে এসে মনের মধ্যে ছিল কেমন একটা উড়ু উড়ু ভাব। সেই সঙ্গে ওই বইগুলোর প্রতি একটা গভীর টান। ফুটপাথে এলে ওই বইগুলোর দিকেই নজর যেতো আগে। কিনেও ফেলতো। ব্যাগে করে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাড়ি আনতো। একেক সময় ভাবতো, এত বই প্রকাশ্যে বিক্রি হয় তা নিয়ে যেতে বা পড়তে এত রাখ্-ঢাক কেন? রাতে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে গোগ্রাসে বই পড়তো। বইয়ের মধ্যে নরনারীর বিচিত্র সব ছবিগুলো চেখে দেখতো। পড়তে পড়তে ছবি দেখতে দেখতে শরীর গরম হয়ে উঠতো। সময় সময় মাথা ঝিমঝিম করতো। দুনিয়াটাই তখন অন্যরকম মনে হতো। মাঝে মাঝে বই বন্ধ করে মানুষ নিয়ে চিন্তা করতো। কখনো-সখনো ঘুমের ঘোরে বিচিত্র সব স্বপ্নও দেখতো। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে ওই উত্তেজনা কেমন থিতিয়ে এলো। আজকাল ফুটপাথে এলে ওই বইগুলোর দিকে চোখ ঘোরাতেও ইচ্ছে করে না। যেগুলো কিনেছিল তার অনেক-গুলো দিয়ে চায়ের জল গরম করেছে। হয়তো বুক-সেলফের কোণে দু' একখানা আজও রয়েছে। কিন্তু সেগুলো আর খুলেও দেখে না।

আজও হেয়ার-স্কুলের গেট্ থেকে পুরো ফুটপাথটা চক্কর মেরে বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায় ডালিয়া। কেনার মতন কোন বই আজ পায়নি। দেরীও করতে পারছে না। ইভনিং শোর একটা টিকিট রয়েছে ব্যাগে। সত্যজিৎ রায়ের সদ্য মুক্তি পাওয়া বইটা দেখবে বলে কয়েকদিন আগেই টিকিটটা কিনে রেখেছে। আজকাল সিনেমা বা দেখে সত্যজিৎবাবুর বইই দেখে। তবু খানিকটা চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়।

উলটো ফুটপাথ থেকে সোজা রাস্তা পেরিয়ে এলো শিউলি। সঙ্গে অজয়। ওর বর। ডি, ভি, সি-তে ইলেকট্রিক্যাল এনজি-নিয়ার। শিউলি বললো, কিরে ডালিয়া চিনতে পারছিস?

ডালিয়া বললো, বাঃ রে, চিনতে পারবো না কেন? আমি কি ভুলো ধানের ভাত খাই?

শিউলি বললো, ওঃ......কদ্দিন পর তোর সঙ্গে দেখা। ভাবতেই পারছি না য়ুনিভার্সিটির সেই দিনগুলোর কথা। আর...ভাববোই বা কি করে! কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম কিনা!

শিউলি বাঁকা চোখে তাকায় অজয়ের দিকে। অজয়ের গোঁফের নিচে সামান্য হাসি। ডালিয়ার যেন মনে হয় শিউলি ওকে অজয়ের সামনে এভাবে খানিকটা খোঁচা দিতে চাইছে। তবু ডালিয়া হাসির ভান করে।

শিউলিই বলে আবার, য়ুনিভার্সিটি এসেছিলি বুঝি? আবার কোনো সাব-জেক্টে পরীক্ষা দেবার নেশায় পেয়েছে নাকি?

ডালিয়া বলে, আমরা কোলকাতায় থাকি। আমাদের আবার আসা-যাওয়ার কোনো কারণ থাকে নাকি? একটা বই নিতে এসেছিলাম।

—আয়না একদিন আমাদের ওখানে। গপ্পো-সপ্পো করা যাবে। ও'র আবার ছুটি ফুরিয়ে যাবে কিনা। ছুটি ফুরোলেই তো মাইথন ফিরে যেতে হবে। ভালো লাগে না ওখানে ওই পাহাড় আর জল দেখে দেখে। সোসাইটি নেই, রিক্রিয়েশান নেই। আগে যদি জানতুম বাবা আমাকে এমন বনবাসে দিচ্ছেন তবে এই বিয়েটা রিজেক্ট করে দিতুম।

শিউলি আবার তাকায় অজয়ের দিকে।

ডালিয়া বেশ অস্বস্তি বোধ করে। বলে, যাবো একদিন।

—বাড়িটা মনে আছে তো?

—বাঃ রে, মনে থাকবে না! তোদের বৌভাতে গিয়েছিলুম মনে নেই?

—সেও তো অনেক দিনের কথা।

—হলোই বা অনেকদিন। তোর বিয়ের কার্ডখানা তো রয়েছেই। খুঁজে বার করে নেবো ঠিক।

হঠাৎ শিউলি প্রশ্ন করে বসলো। হ্যাঁরে ডল্, তুই ভেবেছিস্ কি বলতো?

—মানে?

—বিয়ে করবি না?

ডালিয়ার মনে হয় শিউলি কেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অজয়ের সামনে ওকে এভাবে হেয় করাই যেন ওর উদ্দেশ্য। নিজেকে সংযত করে ডালিয়া।

—হুঁ...করলেই হলো।, ভাবছি এবার—

—কবে আর করবি? শেষকালে কি বুড়িয়ে যেয়ে মরতে চাস?

মনে মনে রাগে ফেটে পড়ে ডালিয়া শিউলির ওপর। ইচ্ছে হয় ওর গালে কষে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলে, এভাবে আমাকে অপমান করার অধিকার তোকে কে দিয়েছে শিউলি? আমি বিয়ে করি আর নাই করি তাতে তোর কি? কিন্তু না...। নিজেকে সামলে নেয় ডালিয়া। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অজয়ই ওর ভেতরকার আগুনটাকে দমিয়ে রাখে। মনের ভাবটাকে ঢাকতে মুখে একটু হাসির ভান করে।

—ভাবছি কি হবে বিয়ে করে? এই তো বেশ আছি। চাকরি করছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজের খুশী মতন। বিয়ে করা মানেই তো নিজের স্বাধীনতাকে বলি দেওয়া! একটা পুরুষের কাছে নিজের আত্মিক সত্তাকে বিকিয়ে দেওয়ার কোন মানে আমি খুঁজে পাই না। আমি চলি শি। আমার ট্রাম এসে গেছে। সময় পেলে যাবো একদিন।

কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায় নি ডালিয়া। সবেগে ট্রামে উঠে পড়ে। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। শিউলি আরও কিছু বলেছে কিনা শোনেনি। অজয়ের সামনে শিউলিকে অমন খোঁচা দিতে পেরে মনে মনে বেশ তৃপ্তি পায় ডালিয়া। অজয়ের ওই পাংশু মুখটা মনে করতেও ভালো লাগছে।

একটা বসার জায়গা পেয়ে যায় ডালিয়া। বসে শিউলির সঙ্গে নিজের বন্ধুত্বের ইতিহাসটা খতিয়ে দেখতে থাকে। শিউলিকে খোঁচা দিতে গিয়ে খানিকটা শালীনতাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল ডালিয়া। অথচ য়ুনিভার্সিটি-জীবনে ওই শিউলিই ছিল ডালিয়ার একমাত্র সত্যিকারের বন্ধু। একসঙ্গে বসতো ওরা। পোশাক পরতো একরকম। লাইব্রেরিতে কফি হাউসে যেতো একই সঙ্গে। ওদের এই একসঙ্গে চলা-ফেরাটা ক্লাশের ছাত্রছাত্রীমহলে খানিকটা আলোচ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষত ছাত্রমহলে। শিবাজি গুপ্তকে আজও মনে পড়ে ডালিয়ার। বেশ উচ্ছল প্রাণবন্ত চেহারা। য়ুনিভার্সিটির দেয়াল-পত্রিকায় ভালো কবিতা লিখতো।

একদিন করিডোরে ডালিয়া-শিউলিকে উদ্দেশ্য করে ওই শিবাজিই গদ্য কবিতায় বলেছিল, ছোট্ট একটি বাগান/দুটি ফুল ফুটেছে সেখানে/শিউলি আর ডালিয়া/যেন কম্পাসের দুটি কাঁটা/থাকনা ওরা বাগানে/তুলতে হাত সরে না আমার...

শিবাজির কবিতাটা মন্দ লাগেনি ডালিয়ার। কিন্তু ভালো লাগতো না ডালিয়ার পেছনে শিবাজির ওই ঘুরঘুর ফুরফুর করা।

শিউলি অবশ্য ডালিয়াকে বলেছিল, দ্যাখ্ই না একটু নাড়াচাড়া করে। ভালো না লাগে সুতো কেটে দিস্। বেচারি কেমন ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকে।

ডালিয়া একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, তোর ভালো লাগে তুই কর শি। আমার ওসব ভালো লাগে না।

শিউলি একটু রসিকতা করে বললো, আমার কি তোর মতন রূপ আছে ডল্? রূপ থাকলে তো মহারাজ শিবাজি আমাকেই রাজরাণী করতে চাইতো!

—তোর হেঁয়ালি রাখ শি। জীবন নিয়ে ছেলেমানুষী করা আমি একদম পছন্দ করি না। বলতে পারিস এখানে আমি

রিয়্যালিস্‌টিক্। কথায় পয়সায় কলেজ-য়ুনিভার্সিটিতে প্রেম করা যায়। কিন্তু তার কটা টেঁকে বলতো? বন্ধুত্ব দেখে ভুল করা উচিত নয়।

—তাহলে তুই লাভ্‌-এ বিশ্বাস করিস না?

—বিশ্বাস করবো না কেন? কিন্তু লাভ্‌ জিনিসটা অত লাইট নয় শি। আরেকটা কথা কি জানিস?

যে পুরুষগুলো মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করে তাদেরকে আমার ঠিক পুরুষ মনে হয় না।

শিবাজি গুপ্তকে একদিন স্পষ্টই বলে দিয়েছিল ডালিয়া। সেদিন গোলদীঘির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চীনেবাদাম খাচ্ছিল শিউলি আর ডালিয়া। শিবাজি গুপ্ত কি একটা ভূমিকা করতে করতে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল।

শিবাজিই বলছিল, এই দীঘির ধারে আপনাদের দুজনকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন?

শিউলি বললো, কি?

শিবাজি বলে, মনে হচ্ছে সরোবরের মাঝে দুটি লোটাস আপনারা। মানে আমি ঠিক বর্ণনা দিতে পারছি না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলো ডালিয়া, এক্স্‌কিউজ মি। একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। পথ চলতে চলতে কাব্যের ফুল অনেকের মনেই ফোটে। কিন্তু তাকে মনের মধ্যে চেপে রাখাটাই বোধহয় ভালো। নয়তো অনেক বিপর্যয় ঘটতে পারে। আশা করি মনে রাখবেন। আয় শি।

কিছুদূরে এসে শিউলি বললো, ওকে অমন করে না বললেও পারতিস।

—দ্যাখ শি, উচিত কথা বলতে দ্বিধা করার অর্থই হলো নিজের পার্সোনালিটিকে ছোট করে দেওয়া। জীবনে যদি কিছু করতে চাস তবে মাথাটাকে সব সময় উঁচু রাখবি।

আজও ডালিয়ার বাবাকে মনে পড়ে। বাবাই ওকে এই আদর্শের পথ দেখিয়ে গেছেন।

বাবা একদিন ওকে বলেছিলেন, অন্যায়ের কাছে নিজেকে কক্‌খনো ছোট করে দিবি না।

বাবা আজ বেঁচে নেই। কিন্তু ডালিয়া আজও ঋণী ওই আদর্শের জন্যে।

*

হাতিবাগানে ট্রাম এলো। নেমে পড়ে ডালিয়া। এতক্ষণ ট্রামে বসে থেকে বিগড়ে যাওয়া মনটা আবার বশে এসেছে। ব্যাগ খুলে একবার টিকিটটা দেখে নেয়। শো'র সময়ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ম্যাটিনি শো' শেষ হয়েছে। লোকজন বেরিয়ে আসছে।

—কিরে ডালিয়া না?

একটা প্রশ্ন আসে বাঁদিক থেকে। ফিরে তাকায় ডালিয়া। দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কমলা......? অস্ফুটে বলে ডালিয়া।

এই কমলাও পড়তো ডালিয়ার সঙ্গে য়ুনিভার্সিটিতে। ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সহপাঠিনীর সঙ্গে যেটুকু না থাকলে নয় ওর সঙ্গে ডালিয়ার তা ছিল।

—আছিস কেমন? কমলা বললো।

—এই তো চলছে কোনরকমে।

—চাকরিটা করছিস তো?

—হুঁ......চালাচ্ছি একরকম করে।

—দেখেশুনে এবার একটা বিয়ে কর। আর কদ্দিন চলবি এভাবে?

দমে যাওয়া আগুনটা আবার ডালিয়ার মাথায় জ্বলে ওঠে।

একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কেন খারাপ কি? বেশ তো চলে যাচ্ছে। ভাবছি বিয়ে করবো না।

—তাই কি হয়রে? শেষ জীবন কাটবে কি করে?

—কেন? বিয়ে যারা করে না তাদের কি চলছে না?

—চলবে না কেন? চলে নিশ্চয়ই। কিন্তু......মরবার আগে লোনলিনেস যে কি ভয়াবহ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যায়। তবু যদি আমেরিকার মতন আমাদের দেশেও বৃদ্ধ নিবাস থাকতো?

চুপ করে থাকে ডালিয়া।

কমলাই বলে আবার। বুঝি—বিয়ে করার অনেক ঝক্কি-ঝামেলা আছে। অনেক সময় মনে হয় আর পেরে উঠছি না। কিন্তু আমরা মেয়ে কিনা। আমাদের কাছে ওইটুকুই আনন্দ।

মনটা ডালিয়ার খিঁচিয়ে ওঠে কমলার ওপর।

তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তোদের হায়ার এডুকেশনটা কোন কাজে লাগেনি কমলা। তোরা এখনো সেই মিডল-এইজে পড়ে আছিস। সত্যি, লেখাপড়া শিখে তোরা কি করলি বলতো? তোদের সেই ট্রাডিশনাল আউটলুক এখনো বদলালো না। আচ্ছা—তোরা কি ভাবিস বিয়েটাই জীবনের সব? এজুকেশনটা তোদের কোন্‌ কাজে লাগছে? শিক্ষাদীক্ষা স্বাধীনতা সব কিছুই তো বিকিয়ে দিয়ে বসে আছিস। আগের দিনে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতো না। তখন তাদের বিয়ে করতে হতো নির্ভরতার জন্যে। আজ তো সে দিন নেই কমলা। তাহলে পুরুষরা যা পারছে আমরাই বা তা পারবো না কেন?

প্রসঙ্গ পালটে কমলা বলে, যাক ওসব কথা। ছবি দেখতে এসেছিস্‌ বুঝি?

—নারে ভাই। সময়ের অভাবে ওসব পাট চুকিয়ে দিয়েছি।

—বইটা দেখিস সময় করে। শুনছি সত্যজিৎবাবুর এই বইটা খুব ভালো হয়েছে। চলি ডল্‌। আমার টিকিট কাটা রয়েছে। কর্তার আপিস থেকে সোজা আসার কথা।

কমলা চলে গেল। একটা ট্রাম আসছিল। উঠে পড়লো ডালিয়া।

ডাহা মিথ্যে বলে কমলাকে এড়িয়ে এলো ডালিয়া। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে এলো। ডালিয়া নিরুপায়। শিউলি কমলারা যেন ওর জন্যেই এভাবে মিছিল করে দাঁড়িয়েছে। ডালিয়ার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আঘাত দিতেই যেন ওরা সবাই উঠেপড়ে লেগেছে। সিনেমায় ঢুকলে শো'র পর কমলা হয়তো ওকে টেনে নিয়ে যেতো। হয় রেস্টুরেন্টে নয়তো বাড়ি। সেখানেও আরেক প্রস্থ উপদেশের বহর। না না—ভালোই করেছে ডালিয়া মিথ্যে বলে। নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে রায় দেবার অধিকার কোনদিন কাউকে দেয়নি ডালিয়া। আজও নয়।

ব্যাগের ভেতরে টিকিটের অস্তিত্বটা এতক্ষণ ভুলে ছিল ডালিয়া। এবার যেন ব্যাগ ফুঁড়ে টিকিটটা বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগলো। না—পয়সার জন্যে নয়। পয়সার হিসেব ডালিয়া কোনদিন করে না। সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা করে ডালিয়া। ওই টিকিটটা যেন ওকে তাই মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু ডালিয়া নিরুপায়।

বাড়ি ঢোকার আগে টিকিটটা দলা পাকিয়ে নর্দমায় ছুঁড়ে দিল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করলো। ব্যাগটা ছুঁড়ে দেয় খাটের ওপর। সজোরে আলমারিটা খুলে ফেলে। আলমারির মধ্যে নানান রকমের দামি শাড়িগুলো পরপর সাজানো রয়েছে। বেনারসি... টাংগাইল... মুর্শিদাবাদ...কাঞ্জি-ভরম্‌......। চাকরি পেয়ে নিজের পছন্দ মতন ওগুলো কিনেছিল। বিয়ের পর পরবে বলে। কিন্তু আজ পর্যন্তও পরা হয়নি। শুধু কি তাই? একটারও পাট খোলা হয়নি। ওভাবে বেশিদিন থাকলে হয়তো পোকায় কাটবে। ডালিয়ার বহুদিনের কল্পনাটা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

বেনারসি শাড়িটা বের করে ডালিয়া। খানিক ভেবে গয়নার বাকসটাও বের করলো। গয়নাগুলোও ওই একই উদ্দেশ্যে কিনেছিল। কিন্তু কোন কাজেই লাগছে না। আজও ওগুলো অস্পৃষ্ট। জৌলুসও নষ্ট হতে চলেছে ধীরে ধীরে।

শাড়ি আর গয়নার বাকস নিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে আসে ডালিয়া। আয়নায় এপাশ-ওপাশ করে মুখটা দেখে। বাথরুমে যায়। ভালো করে সাবান ঘষে মুখটা ধুয়ে আসে। পাউডার দিয়ে মুখটা আরও সুন্দর করে তোলে। আলতোভাবে ভ্রূ আঁকে। ঠোঁটে লিপস্টিকের প্রলেপ দেয়। খানিক ভেবে বড় করে একটা টিপ পরে কপালে। আচ্ছন্নের মতন শাদা সিঁথিটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর বেনারসিটা পরে। তারপর একটা একটা করে গয়না। সাজ সম্পূর্ণ হলে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। নিজেকে যেন চিনতে পারে না ডালিয়া। কেমন একটা আচ্ছন্নতা ওকে ঘিরে ফেলে। কানের কাছে যেন শানাই বাজতে থাকে। সে শানাই যে ওর জন্যেই বাজছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ডালিয়া। শুধু কি শানাই? আরও কত কি......।

চমক ভাঙ্গে ডালিয়ার দরজার ওপর করাঘাতে।

—দিদিমণি তুমি এয়েচো?

বিন্দির মা-র গলা। ডালিয়ার কাজ করে দেয় বিন্দির মা। ডালিয়ার এই ফেরার সময় রোজ এসে চা বানিয়ে দেয়।

—বিন্দির মা, তুই আজ যা। আজ তোর ছুটি। আমার শরীরটা ভালো নয়। চা খাবো না। খেলেও নিজেই বানিয়ে নেবো।

ডালিয়া দরজা খুললো না। বিন্দির মা চলে গেল। ডালিয়া আবার ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। এই সাজটা কিছুতেই খুলতে ইচ্ছে করছে না। কানের কাছে এখনো শানাই বেজে চলেছে। এই সময় দাদার সেই কথাটা মনে পড়ছে। অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করে এম-এ'তে ভর্তি হবার সময় দাদা বলেছিল।

—তুই কি আরও পড়তে চাস্ ডল্।

একটু আশ্চর্য হয়ে ডালিয়া বললো, কেন বলো তো?

—না...মানে বলছিলাম কি বেশি পড়ে কি হবে? গ্র্যাজুয়েশানটা তো হয়ে গেছে।

আরও আশ্চর্য হয় ডালিয়া।

—হঠাৎ তোমার মাথায় এসব চিন্তা এলো কেন দাদা?

—না......মানে প্রয়োজন যখন নেই তখন শুধু শুধু ডিগ্রী বাড়িয়ে কি লাভ? বিশেষতঃ মেয়েরা বেশি ডিগ্রী নিলে বিয়ের ব্যাপারে খুব বেগ পেতে হয়।

দাদার কথায় জোরে হেসে ওঠে ডালিয়া।

—বেশ মজার কথা বলেছো দাদা। তোমার কথার কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না। তুমি বলতে চাইছো হাইলি-এজুকেটেড মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না? তারা সব আই-বুড়ো থেকে যাচ্ছে!

—আইবুড়ো থাকবে কেন? বিয়ে তাদের হচ্ছে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছিস আজকালের শিক্ষিতা মেয়েরা যেমন-তেমন ছেলেকে বিয়ে করতে চায় না।

—বাঃ রে! তা চাইবেই বা কেন? শিক্ষিতা একটা মেয়ে কি চাইবে না তার হাজব্যান্ড তার চাইতেও শিক্ষিত হোক? আর এ ব্যাপারে মেয়েদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেরও তো দাম থাকা উচিত।

প্রসঙ্গ পাল্টে দাদা বললো। সে যাই হোক। তুই তো আর চাকরি করবি না?

—নাই বা করলাম। আর পেলে করবো না কেন? আজকাল কোন্ মেয়েই বা চাকরি করে আত্মনির্ভর হতে চাইছে না? তোমরা চাও আমরা মেয়েরা আজও পঙ্গু হয়ে থাকি? আমাদের শিক্ষাকে রান্নাঘরে উনোনের পাশে বেঁধে রাখি?

—তা চাইবো কেন। আমায় ভুল বুঝিস না ডল্। ঠিক আছে—তোর যখন ইচ্ছে তুই পড়। আমার আর কি?

শেষ কথাগুলো যে দাদা প্রাণ খুলে বলেনি আজও মনে করতে পারে ডালিয়া। এও জানে সেদিন বাবা বেঁচে থাকলে দাদার কাছ থেকে ওই ধরনের কথা শুনতে হতো না। আর বললেও বাবাই তার উপযুক্ত উত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ডালিয়ার। স্কুল পেরুনোর আগেই বাবা মারা যান। মা কবে মারা যান মনে নেই। অন্ততঃ জ্ঞান হবার পর মাকে দেখেনি ডালিয়া।

এম-এ পাস করার পর দাদা আবার একদিন বললো, হাঁরে ডল্? এম-এ তো পাস করলি। এবার তাহলে বিয়ের একটা ব্যবস্থা করা যাক।

ডালিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, আমার বিয়ের ব্যাপারে তোমরা এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন বলো তো?

—ঠিক ব্যস্ত নয় ডল্। গোটা দুয়েক ভালো সম্বন্ধ এসেছে। তারা তো আর আমাদের জন্যে বসে থাকবে না।

—না থাকুক, বয়েই গেল। তোমাদের ভালো তোমাদের কাছে থাক্। আমার তাতে কি? যা তা একটা ছেলেকে আমি বিয়ে করতে পারবো না। তাছাড়া বিয়ে আমি এখন করবোই না।

যদি কোনোদিন কর্তব্য করার সময় আসে সেদিন করো। আজ নয়।

খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে দাদা বললো, আমি তোর মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছি না ডল্। তুই-ই না হয় কাউকে—

—দাদা......! আমাকে বিরক্ত করো না। দিন দিন বুদ্ধি-সুদ্ধি তোমার লোপ পাচ্ছে। আমি জানি কেন আজ আমাকে বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছো।

—তুই কি বলতে চাস্ ডল্?

—সেও কি আমায় খুলে বলতে হবে? সে তো তুমি নিজেও জানো। তবু যখন শুনতে চাইছো শোন। তুমি তো জানো উচিত কথা গলা বাড়িয়ে বলতে আমি কোনদিনই পেছপা নই।

বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে দাদা ডালিয়ার দিকে। ডালিয়া তখন ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মতন দাদাকে শেষ ছোবল মারতে উদ্যত। নিজেকে তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

—বাবা মরার আগে বাড়ির একটা অংশ যে আমার নামে উইল করে দিয়ে গেছেন সে তোমরাও জানো আমিও জানি। তাই আমার বিয়েটা তাড়াতাড়ি হ'লে পুরো বাড়িটাই তোমরা—

—ডল্......!

চীৎকার করে ওঠে দাদা।

—যা সত্যি আমি তাই বলছি। ষড়যন্ত্র—এ তোমাদের ষড়যন্ত্র! আমার বিরুদ্ধে তোমার আর বৌদির—

—আঃ ডল্......! সব কিছুরই একটা লিমিট আছে।

—হুঁ......আছে বৈকি! কিন্তু তা শুধু আমার বেলায় নয়। সবাইকেই তা মেনটেন্ করতে হয়।

*

তারপর বাড়িটা ভাগ হয়ে গেল।

ভাগ করার সময় দাদা অবশ্য বলেছিল ডালিয়ার পছন্দমতন ঘর বেছে নিতে। ইচ্ছে করলে ডালিয়া দোতলার সব চাইতে ভালো ঘরদুটো নিতে পারতো। কিন্তু তা ডালিয়াই নেয়নি। না নেওয়ার পেছনে দুটো চিন্তা তখন ওর মাথায় ভর করেছিল। প্রথমতঃ দাদা-বৌদির সংস্রব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে সরিয়ে নেওয়া, যেখানে বাইরের জগতের সংগে থাকবে না কোন যোগাযোগ। আরেকটা ভাবনাও তখন মাথায় এসেছিল। সে হলো দাদার জন্যে খানিকটা মমতা আর শ্রদ্ধা। বাইরে অবশ্য তা প্রকাশ করেনি ডালিয়া। কিন্তু বিশেষ করে এজন্যেই দোতলার ঘরগুলো দাদা-বৌদিকে ছেড়ে দিয়েছিল।

আর ডালিয়া? ডালিয়া নিজেকে নিক্ষেপ করেছিল নিচতলার একপ্রান্তে এই নির্জন পরিবেশে। একান্তই একাকীত্বের মাঝে নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। ডালিয়াই পাঁচিল তুলে দিয়েছে দুই তরফের মাঝে। সেই থেকে দাদা-বৌদির সংগে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যেন ওরা অপরিচয়ের অবগুন্ঠনে পরস্পর আবদ্ধ। বেশ খুশীই হয়েছিল ডালিয়া। নিজের এই একলা জগতে ডালিয়া সাজিয়ে-গুছিয়ে সময়ের প্রতি মুহূর্তে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারছিল। শুধু বিন্দির মা-ই ওর এই একলা জগতের একতারা। রান্না-বান্না চা-বানানো বাসন-মাজা সবই করে দেয় বিন্দির মা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের সুখদুঃখের কথা বলে কখনো-সখনো। ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হয় ডালিয়াকে।

ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন একটা জিনিস ভেবে ডালিয়া বেশ আশ্চর্য হয়। নিজের জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানের অনেক কিছু না চাইতেই হাতের কাছে পেয়েছে ডালিয়া। হয়তো আরেকটু হাত বাড়ালে আরও অনেককিছু পেতো। এজন্যে নিজেকে ডালিয়া খুবই ভাগ্যবতী মনে করে। খানিকটা গর্বও যে ওর মধ্যে দেখা না দিয়েছিল এমন নয়। মারা যাবার আগে বাবা বাড়ির অংশ ছাড়া ব্যাংকে ডালিয়ার নামে কিছু টাকাও রেখে গিয়েছিলেন। দাদা-বৌদির থেকে আলাদা হয়ে বসে খেলে সে টাকা হয়তো কবে ফুরিয়ে যেতো। কিন্তু না। এখানেও ভাগ্যই ডালিয়ার কাছে এগিয়ে এসেছে। শিক্ষা আর বিশেষতঃ রূপের জোরে জন-পঞ্চাশের প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে টপকিয়ে আমেরিকান ওষুধ কোম্পানির রিসেপ্‌শনিস্ট-এর চাকরিটা ডালিয়াই পেয়ে গেল। অবশ্য ডালিয়াই যে পাবে ভাবতে পারেনি। আর্থিক ভারসাম্যহীন সমাজে মেয়েরাও যে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছে, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এসে পুরুষদের সামিল হয়ে পুরুষদের দায়িত্বকে খানিকটা লাঘব করতে চাইছে, এতো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিল। মেয়েদের মুখে আর্থিক ক্ষয়িষ্ণুতার ছাপ আরো ভালো করে দেখেছিল ইন্টারভ্যুর দিন। হয়তো ডালিয়ার চাইতেও বেশি প্রয়োজনের বলি হয়ে অনেকে এসেছিল সেদিন। কিন্তু ওদের ফিরতে হয়েছে। ডুবতে হয়েছে অনিশ্চয়তের অন্ধকারে। আগে এসব ভাবলে মন খারাপ হতো ডালিয়ার। এখন আর ভাবে না। কেনই বা ভাববে? আজকের দুনিয়ায় কে-ই বা কার জন্যে ভাবছে?

চাকরি পেয়ে ডালিয়া যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছিল। মাস গেলে কয়েক গোছা টাকা। হ্যাঁ—আজকের দুর্মূল্যের বাজারেও একার প্রয়োজনের তুলনায় অফুরন্ত বৈকি। মাইনে পেয়েই কাপড় গয়না বই আরও কত কি। ওর নিজের জগৎটাতে প্রাচুর্যের পাহাড় জমেছে। চাকরিটাও মন্দ লাগছিল না: দামী আসবাবে সাজানো ডেস্কে বসে থাকা। সামনে ফোন। টেবিলে নানান রকম জার্নাল। নতুন যারা আসছে হাসিমুখে তাদের রিসেপ্‌শান জানানো। ফোন বাজলে

কথা বলা। বাদবাকি সময়টা নিজের খুশী-মতন ব্যয় করা। জার্নাল নয়তো বই পড়ে। নিদেনপক্ষে বসে বসে উল বোনা, সেলাইয়ের কাজ করা।

*

কিন্তু ডালিয়া কি শুধু এইটুকুই চেয়েছিল?

নিজেকে প্রশ্ন করে আজ কোন উত্তর খুঁজে পায় না। কোথায় যেন বিরাট একটা গরমিল হয়েছে। বিয়ে করবে না এমন প্রতিজ্ঞা তো কোনদিন করেনি ডালিয়া। শুধু কি তাই? বিবাহিত জীবন সম্পর্কে একটা কল্পনার জগতও রচনা করেছিল বহু-দিন আগেই। কিন্তু......। এই 'কিন্তু'র জবাব খুঁজতে গিয়েই কেমন যেন আলো থেকে অন্ধকারে ছিটকে পড়ে ডালিয়া। ওই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে চোখের সামনে কেমন একটা গরমিলের ছবি ভেসে উঠলো। তাই তো ওই শিউলি কমলা রমার বিয়েতে খুশী হতে পারেনি ডালিয়া। নিজের কাল্পনিক ছবিটাকে তো ওদের মধ্যে দেখতে পায়নি। এজন্যেই তো দাদার প্রস্তাবে বিরোধিতা করেছে। অথচ নিজেও কাউকে পছন্দ করতে পারেনি। নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করাটাও ওর মন থেকে সায় পায়নি। তাই তো আজ আবার শিউলির কথাই মনে পড়ছে। শিউলিই যেন সেদিন ডালিয়ার ভবিষ্যৎটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। সবে তখন চাকরি পেয়েছে ডালিয়া। শিউলির বিয়ে হয়নি তখনও।

একদিন শিউলি বলেছিল এবার না হয় নিজেই দেখেশুনে একটা ঠিক কর্। অফিসের ম্যানেজার বা পি-এ—

—আমাকে কি নভেলের হিরোইন হতে বলছিস শি?

—মানে......?

—মানেটা খুবই সোজা। ওইসব ম্যানে-জার পি-এর সংগে বার-রেস্তোরাঁয় যাওয়া যায়। ওদের নিয়ে জীবন কাটানো যায় না। সত্যি বলছি আমার ওসব ভড়ং ভালো লাগে না শি।

আজও মনে পড়ে আশিস সান্যালকে। ম্যানেজারের পি-এ। সুপুরুষ চেহারা। বয়সও অল্প। দামী পোশাক-আশাকে বেশ স্মার্ট। অথচ একটু লাজুকতা ওকে আরও মিষ্টি করে তোলে। ডালিয়ারও ভালো লাগতো ওই লাজুকতাটুকু। সিঁড়ির মুখে ডালিয়ার সংগে দেখা হলে আশিস সান্যাল কোন-দিন গুডমর্নিং বলে, কোনদিন সামান্য হেসে ডালিয়াকে অভিবাদন করে যেতো। অনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতো ডালিয়া।

হ্যাঁ—আজও জ্বলজ্বল করছে ডালিয়ার সামনে সেই দিনটা। অফিস ছুটির পর সিঁড়ি দিয়ে নামছিল ডালিয়া। পাশ দিয়ে তরতর করে নেমে এলো আশিস সান্যাল।

আশিসই বললো, বাড়ি ফিরছেন তো মিস্ মিত্র?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় ডালিয়া।

—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আসুন আমার গাড়িতে। কোম্পানীর কাজে আমিও ওদিকে যাচ্ছি। আপনাকে লিফট্ দিয়ে যাই।

আপত্তি করতে পারে না ডালিয়া। বিশেষতঃ আশিসের ওই লাজুক মুখটা ভেবে।

গাড়িতে উঠে ডালিয়া বলে, ধন্যবাদ আপনাকে।

জোরে দরজা বন্ধ করে আশিস বলে, এতে আবার ধন্যবাদের কি পেলেন মিস মিত্র?

—না......মানে কার্টেসি জিনিসটা আজ-কাল প্রায় চোখেই পড়ে না কিনা।

একটু জোরে হাসে আশিস্।

বলে কেমন লাগছে চাকরি?

—মন্দ নয়। তবে কাজ না থাকলে সময় আর যেতে চায় না।

—ভালো চাকরির চেষ্টা করছেন কোথাও?

—এই তো বেশ আছি। কি হবে আরও ভালো চাকরি পেয়ে?

—বাঃ—আপনি বেশ একটা নতুন কথা শোনালেন মিস মিত্র। কোন্ মানুষটা নিজের অবস্থার পরিবর্তন চায় না? এই তো দেখুন, আপনার পোস্টে এর আগের তিন তিনটে মেয়ে বেটার চান্স পেয়ে চলে গেল। তাছাড়া ...আজ না হয় একলা আছেন। এরপর—

ক্র্যাঁক করে থেমে পড়ে গাড়িটা। এতক্ষণ আশিসের কথার মধ্যে ডুবে ছিল ডালিয়া। চমক ভাংগলো। দেখলে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। আশিস সান্যাল নেমে পড়েছে। ডালিয়াও নেমে পড়ে। মুখটা ওর গম্ভীর হয়।

ডালিয়া বললো, গাড়িটা হঠাৎ এখানে নিয়ে এলেন মিঃ সান্যাল?

আশিস সান্যাল যেন চমকে ওঠে।

একটু হাসবার ভান করে বলে, এই সময়টায় চায়ের বড্ড নেশা কিনা। সারাদিন বড্ড কেবার গেছে। তাই......গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চাই।

ডালিয়ার ভেতরকার স্বভাবসিদ্ধ সেই বিদ্রোহী সত্তাটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায় আশিস সান্যালের ভেতরকার ওই ভিজে বেড়ালটাকে। ওর ওই লাজুকতাটা নিছক একটা মুখোস বলে মনে হয়। নিজেকে সংযত করে ডালিয়া।

গম্ভীর গলায় বলে, এক্সকিউজ মি মিঃ সান্যাল। মিস ডালিয়া মিত্রকে চিনতে আপনি ভুল করেছেন। আশা করি এমনি ভুল আর করবেন না।

কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায়নি ডালিয়া।

আজও ডালিয়ার চোখে ভাসে আশিস সান্যালের সেই মুহূর্তের অপমানিত পাংশু মুখটা। পরে অবশ্য খানিকটা অনুতপ্ত হয়ে-ছিল ডালিয়া। ভেবেছিল হঠাৎ অতটা কঠোর না হলেও পারতো সেদিন। কি-ই বা ক্ষতি হতো ওর সংগে এককাপ চা খেলে! ডালিয়া তো আর ঘরের বউ নয়। হয়তো আশিস সান্যালের মনে সেদিন কোন অভিসন্ধি নাও থাকতে পারতো। হয়তো নিছকই এক কাপ চা খেতে গিয়েছিল।

তারপর থেকে সিঁড়িতে ওঠার মুখে আর কোনদিন 'গুড মর্নিং' বলেনি আশিস সান্যাল। ডালিয়াকে দেখে হাসেনি। গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলে যেতো। আশিসের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মাথা নিচু করে জার্নাল পড়ার ভান করতো ডালিয়া। দু'একদিন পথ চলতি ডালিয়ার পাশ দিয়ে জোরে হর্ন বাজিয়ে ভোঁ করে গাড়ি চালিয়ে গেছে আশিস। মনে মনে হেসেছে ডালিয়া। আশিস সান্যাল যতই ওকে না দেখার ভান করুক ডালিয়া বুঝতো ওকে দেখেই অমনি করে গাড়ি চালাতো আশিস।

তারপর একদিন কোম্পানীই ওকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলো।

আর ডালিয়া?

আশিস সান্যাল যে সময়টায় অফিসে ঢুকতো বেশ কয়েকদিন সেই সময়টা এলেই ডালিয়ার মনটা উসখুস করতো। নিজের অজ্ঞাতে সিঁড়ির দিকে চোখ যেতো। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পারতো।

*

না—নিজেকে আর ভাবতে পারছে না ডালিয়া। একাকীত্বের বোঝাটা ওকে দিন দিন পাগল করে তুলছে। বেনারসী শাড়িটা খুলে ফেলে। ছুঁড়ে দেয় সোফার ওপর। সাধারণ একটা শাড়ি পরে। গয়নাগুলো টেনে টেনে খুলে ড্রেসিং টেবিলটায় ছুঁড়ে দেয়। এতক্ষণ গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছিল ওগুলো। শোকেসটায় চোখ যায়। মাসে মাসে শাড়ি-গয়নার সংগে নিউ মার্কেট থেকে বাচ্চাদের খেলনা ওই পুতুল হাতী ঘোড়া বাঘ এনে শো-কেস ভর্তি করেছিল। যেদিন ওরও বিয়ের পর—

চমক ভাংগে ডালিয়ার। পাঁচিলের ওপাশে দাদা-বৌদির ঝগড়া লেগেছে। মাঝে মাঝেই হয় অমন। কোনদিন কান দেয় না ডালিয়া। যদিও পাঁচিল টপকে ওই আওয়াজ এপারে আসে।

আজ ডালিয়া পাঁচিলের গায়ে কান পাতে। একটুও খারাপ লাগে না ওই ঝগড়া। ছটফট করতে থাকে ডালিয়া এপারে। ওদের ওই ঝগড়াকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। ইচ্ছে হয় পাঁচিলটা গুঁড়িয়ে দেবার। ছুটে যায় ওদের মধ্যে। যেয়ে বলে, আমিও তোমাদের... আমাকেও তোমাদের মধ্যে......। কিন্তু না......। এই পাঁচিল ডালিয়ার নিজের হাতে তৈরী। এ ফাঁদ ভাংগার সাধ্য নেই ডালিয়ার। এই পাঁচিলটাকে আয়না করে আজ নিজের মুখ দেখছে ডালিয়া। নিজেকে উপলব্ধি করছে। এ ওর একলার জগৎ। এখানে কারও ভাগ বসাবার অধিকার নেই।

দাদা-বৌদির ঝগড়া থেমে গেছে। চমক ভাংগে ডালিয়ার। ফিরে তাকায় নিজের ঘরটার দিকে। সন্ধ্যে হয়েছে, আলো জ্বালা হয়নি এখনো। পাঁচিল টপকে বাইরের আলোও আসে না এখানে। আসবেই বা কেন? এ যে ডালিয়ার লক্ষপুরী। অন্ধ-কারটা যেন গিলতে আসছে ডালিয়াকে। চার দেয়ালের ফাঁসটা যেন ওকে গলা টিপে মারতে আসছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর গয়নাগুলো যেন কিসের এক অব্যক্ত বেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। সোফায় বেনারসী শাড়িটা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। শো'কেসে কাঠমল্লী খেলনাগুলো যেন টস্‌টস্ করে চোখের জল ফেলছে।

গণ-সংগ্রামের প্রথম নায়ক

বিনয় মাহাতো

ভারতীয় গণসংগ্রামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে যোগদানের পূর্বে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন যোগাযোগ ছিল না। গান্ধীজীই প্রথম কংগ্রেসকে নিয়ে এলেন জনসাধারণের মধ্যে, আর তখন থেকেই কংগ্রেসের সংগ্রাম কেবলমাত্র কংগ্রেস দলের সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, তা রূপ নিল গণ-সংগ্রামের। তাই আজও আমরা ভারতীয় গণসংগ্রামের প্রথম নায়ক বলতে গান্ধীজীকেই বুঝে থাকি। কিন্তু গান্ধীজীর পূর্বেও ভারতবর্ষে গণসংগ্রাম ঘটেছিল। যদিও সেই সংগ্রামের ইতিহাস সভ্য ভারতবাসীর কাছে আজও অজ্ঞাত।

১৮৯৯ খৃঃ এই গণসংগ্রামের ব্যাপ্তি বিহার এবং বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অতিক্রম করে বৃহত্তর ভারতবর্ষে ছড়িয়ে না পড়লেও, বিহার এবং পশ্চিম-সীমান্ত বাংলার জনজীবনে এই সংগ্রামের প্রভাব অবিস্মরণীয়। এই সংগ্রামের প্রেরণা বিহার এবং বিহার সংলগ্ন অঞ্চলের আদি-বাসী সমাজের মনে বিদ্রোহের চিরউৎস-রূপে জাগ্রত এবং এই সংগ্রামের নায়ক বিরসামুণ্ডা আজও আদিবাসী সমাজে বিরসা-ভগবান রূপে পূজিত।

কে ছিলেন এই বিরসামুণ্ডা, কেমনই বা ছিল তাঁর সংগ্রামের ধারা? ১৮৭৪ খৃঃ রাঁচি জেলার তামার থানার অন্তর্গত চালকাদ গ্রামে, এক আদিবাসী মুণ্ডা পরি-বারে বীরনায়ক বিরসামুণ্ডার জন্ম। ছেলে-বেলায় পড়াশোনা করেন চাঁইবাসার এক মিশনারি স্কুলে। (এই সময়ে কাজ চালানোর মত কিছুটা ইংরাজীও তিনি শিখেছিলেন)। কিন্তু মিশনারি স্কুলের শিক্ষার আদর্শ কিশোর বিরসাকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। মুণ্ডা সমাজের দুঃখদীর্ণ অবস্থা, ইংরেজ শাসনের অবমাননাকর বন্ধন কিশোর বিরসার মনে জ্বালা সৃষ্টি করে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন গির্জার চূড়ার দিকে। তন্ময় হয়ে শোনেন গির্জার ঘন্টা। বিভিন্ন বিষয় তাঁর মনের মধ্যে এঁকে যায় নানা প্রশ্নচিহ্ন। ভিনদেশী ধর্মপ্রচারক, দিকু মহাজন, এইসব কি মুণ্ডা সমাজের উন্নতির সহায়ক, না প্রতিবন্ধক! কিশোর বিরসার মনে ঘোরতর সন্দেহ জাগে।

মনের মধ্যে এই সন্দেহ নিয়ে কিশোর বিরসা চাঁইবাসার স্কুল থেকে ফিরে এলেন গাঁয়ের কুটীরে। ফিরে এসে তাঁর মনে হলো প্রথমে মুণ্ডা সমাজের ভিতর থেকে কুসংস্কার দূর করতে না পারলে মুণ্ডা সমাজের উন্নতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই সম্প্রদায়কে দিকু মহাজন বা ধর্ম-ব্যবসায়ী খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করা। তাই গ্রামের কুটীরে বসেই বিরসা গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন তাঁর বাণী। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং খৃস্টান যাজকদের হাত থেকে মুণ্ডা সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য, ধর্মের নামে শোষণকারীদের হাত থেকে মুণ্ডাদের বাঁচাবার জন্য তিনি প্রচার করলেন এক নতুন ধর্মমত।

তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে শিঙবংগার প্রত্যাদেশ পেয়েছি। একমাত্র শিঙবংগা (মুণ্ডাদের আদিদেবতা) ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা করার প্রয়োজন নেই। আর এই শিঙবংগার পূজা করবেন মুণ্ডারা নিজেরা। এর জন্য কোন পুরোহিত ডাকার প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, প্রতিটি মুণ্ডাকে সৎ এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে হবে। মদ্যপান বর্জন করতে হবে, নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হবে, শুধু তাই নয়, প্রতিটি মুণ্ডাই ব্রাহ্মণদের মত উপবীত ধারণ করবেন।

শত শত মুণ্ডাযুবক বিরসার এই নতুন ধর্মে দীক্ষালাভ করে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। দিকুমহাজন এবং খৃস্টান যাজকদের প্রকৃত স্বরূপ তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিরসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সমগ্র মুণ্ডা সমাজ তরুণ নায়ক বিরসাকে জাতির ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করলেন। বিরসার এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকারও এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন। মুণ্ডাদের উপর আরম্ভ হল সরকারী দমন পীড়ন। এই দমন-পীড়নের মাত্রা যত বাড়তে লাগল আন্দোলনও তেমনি তীব্রতর হতে থাকল। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল। বিরসা ঘোষণা করলেন মহারাণীর কাল শেষ হয়েছে, এবার শুরু হল মুণ্ডারাজ। বিরসার নির্দেশে সমগ্র মুণ্ড সমাজ সরকারী খাজনা বন্ধ করে দিলেন। বিরসা তাঁর অনুচরদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে গ্রামে গ্রামে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য পাঠালেন। প্রচারকদল গ্রামে গ্রামে তাঁদের অবিরাম পরিক্রমায় জমিদারের খাজনাবন্ধ, বেগারখাটা প্রভৃতি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। বিরসার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সমস্ত মুণ্ডা জনতাকে এক নির্দিষ্ট দিনে নববস্ত্র পরিধান করে, শুচিশুদ্ধ হয়ে সশস্ত্রভাবে বিরসার গ্রাম চালকাদে উপ-স্থিত হতে বললেন। শরৎচন্দ্র রায় লিখেছেন, 'কয়েকদিন ধরে স্থানীয় মুরহু এবং নিকটবর্তী বাজারগুলিতে কাপড়ের চাহিদা এত বেড়ে গেছল যে, সমস্ত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।' বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগতদের জন্য চাল, ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে গোলা ভর্তি করে রাখা হল। এবং তাঁদের থাকার জন্য তৈরী হল অনেক ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর।
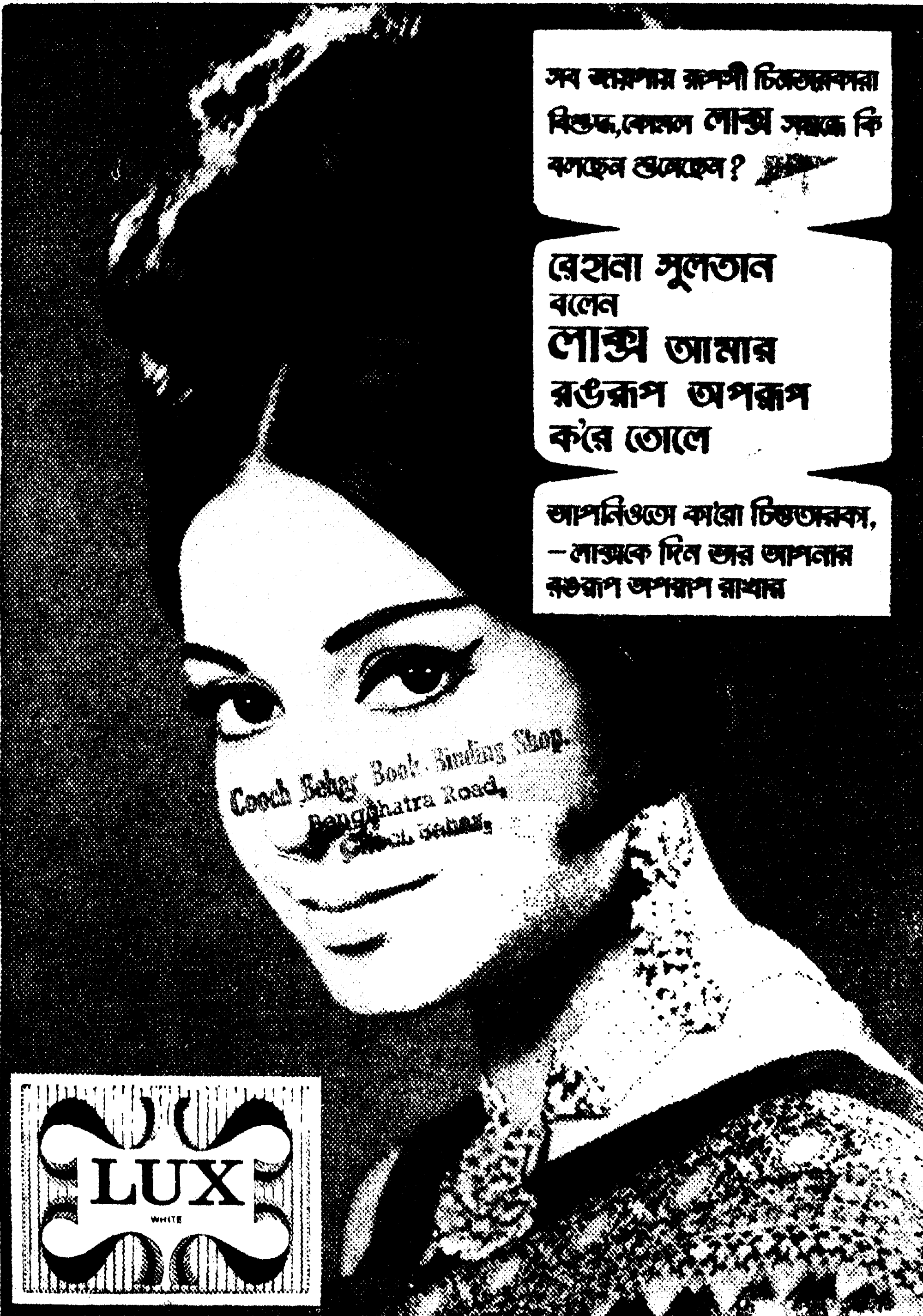
মুণ্ডাদের মধ্যে এই জাগরণ লক্ষ্য করে স্থানীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং মহাজনেরা ভয়ে মুণ্ডা অঞ্চল থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করল। স্থান-ত্যাগের পূর্বে তারা আসন্ন বিদ্রোহের খবর দিয়ে পুলিশকেও সতর্ক করে দিল। বিরসার এই সমস্ত কার্যকলাপ দেখে ব্রিটিশ সরকার সচকিত হয়ে উঠলেন। বিরসার নির্ধারিত দিনের পূর্বেই কয়েকশ পুলিশ এসে চালকাদ গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করল। এই নির্দিষ্ট দিনে দিকু মহাজনদের মুণ্ডা অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করাই ছিল বিরসার উদ্দেশ্য। কিন্তু আগেই খবর পেয়ে মহা-জনেরা পালিয়ে যাওয়ায় বিরসার আসল উদ্দেশ্য সফল হল না। এদিকে বিরসার অনুচরেরা দিকু মহাজনদের না পেয়ে অতর্কিতে পুলিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং পুলিশ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগেই তাদের কয়েক জনকে হত্যা করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ সুপার একদল সৈন্য এবং কয়েকটি হাতী নিয়ে মুণ্ডাদের গ্রামের উপর চড়াও হন। হাতীর সাহায্যে মুণ্ডাদের ঘর-বাড়ী তছনছ করে আগুন ধরিয়ে দেন। এর ফলে কয়েকশ মুণ্ডা পরিবার নিরাশ্রয় হন। বিরসামুণ্ডা সদলবলে আত্মগোপন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিরসা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। একদিন গভীর রাত্রে পুলিশ সুপার একদল সৈন্য নিয়ে বিরসার গ্রাম চালকাদে উপস্থিত হলেন। সবার অজ্ঞাতসারে বিরসার গৃহে প্রবেশ করলেন, এবং ঘুমন্ত বিরসাকে চেপে ধরে তাঁর মুখ দৃঢ়ভাবে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলেন। এই-ভাবে বন্দী বিরসাকে নিদ্রিত গ্রামবাসীর জাগরণের পূর্বেই রাতের অন্ধকারে হাতীর

পিঠে চড়িয়ে নিয়ে চললেন রাঁচি জেলের দিকে। রাঁচি নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁকে অবশ্য কয়েকদিন নিকটবর্তী খুন্তি থানায় রাখা হয়েছিল, বিরসার গ্রেপ্তারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে নিকটবর্তী সমস্ত গ্রাম থেকে সশস্ত্র মুন্ডারা বিরসার গ্রাম চালকাদ অভিমুখে রওনা হন। শরৎচন্দ্র রায়ের মতে এই ধরনের সশস্ত্র আগন্তুক বিরসা অনুরাগীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার।

নেতা বিরসা মুন্ডাকে শাস্তি দিলে মুন্ডারা ভীত হয়ে বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নিকটবর্তী খুন্তি জেলেই বিরসার বিচার আরম্ভ হল। সংবাদ পেয়ে বিপুল মুন্ডা জনতা বিরসার মুক্তির দাবীতে দুদিন ধরে খুন্তি জেল অবরোধ করে রাখলেন। মুন্ডাদের এই অনমনীয় মনোভাব দেখে ভীত পুলিশ কর্তৃপক্ষ গোপনে তাঁকে খুন্তি জেল থেকে রাঁচি জেলে স্থানান্তরিত করলেন। এই দেশপ্রেমী নায়ক যখন রাঁচি জেলে প্রবেশ করেন, তখন কারা-প্রাচীরের কিছু অংশ অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে। এই ঘটনা থেকে বিরসা যে শিশুভগবান প্রতিনিধি সে বিষয়ে মুন্ডাদের আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। রাঁচি জেলে থাকাকালীন অবস্থাতেই বিরসার বিচার আরম্ভ হয় এবং ভারতীয় দন্ড বিধানের ৫০৫ ধারা অনুসারে তাঁকে দু বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু দু' বছরের মেয়াদ পূর্ণ

হওয়ার পূর্বেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তীতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে বিরসা শুনতে পেলেন, চালকাদের নিকটবর্তী চুটিয়া নামক জায়গায় একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে, পুরোহিতদের সাহায্যে জমিদার এবং মহাজন সম্প্রদায় মুন্ডাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। বিরসা আর স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের সংগে পরামর্শ করে স্থির করলেন এই মন্দিরটার উপরই আক্রমণ চালানোর। অনুচরদের সংগে নিয়ে বিরসা একদিন এই মন্দিরটি আক্রমণ করলেন, তাঁর অনচরেরা মন্দিরের সমস্ত বিগ্রহ ভেঙে চুরমার করে দিলেন। সংবাদ পেয়ে পুলিশ কালবিলম্ব না করে চুটিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে বিরসার অনুচরদের সংগে পুলিশের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন হাতে-নাতে ধরা পড়লেও নায়ক বিরসা কোনক্রমে পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর প্রায় দু' বছর তিনি আত্মগোপন করে থাকেন।

এর পর ১৮৯৯ খৃঃ বিরসা আবার জনসমক্ষে উপস্থিত হলেন, এবং প্রধান অনুচরদের নিয়ে সমগ্র তামার অঞ্চল পরিক্রমা আরম্ভ করলেন। তিনি জনসাধারণকে সমস্ত প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জমিদারদের অস্বীকার করে বিদ্রোহের জন্য তৈরী হওয়ার আহ্বান জানালেন। বিদ্রোহের দিন ধার্য করলেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। ডিসেম্বরের শেষদিকে এই বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সেতু, সড়ক, থানা, তশিলদারী অফিস প্রভৃতি সরকারী সংস্থাগুলির উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়, স্থানীয় জমিদার এবং মহাজনেরাও আক্রমণকারীদের হাত থেকে রেহাই পায় না। খুন্তি, তামার, রাঁচি, বৈসা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর হত্যাকান্ড সংঘটিত হতে থাকে। শোনপুর পরগণার গভীর জংগল সমাবৃত এক গ্রামে, মিঃ সিজার নামে জনৈক ব্যবসায়ীকে গুলী করে মারা হয়। গুরহু এবং সারওয়াদা অঞ্চলের মিশনারিদের উপরেও প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয়। নুরজুতে একজন পুলিশ কনেস্টবল এবং চারজন চৌকিদারকে হত্যা করা হল, এবং খুন্তি থানা আক্রমণ করে একজন পুলিশ কনেস্টবলকে হত্যার পর ঘরবাড়ী সমস্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনার খুন্তিতে এসে পৌঁছলেন। এই সংবাদে নিকটবর্তী অঞ্চলের শত শত সশস্ত্র মুন্ডা যুবক, খুন্তির নিকটবর্তী দুমারী পাহাড়ের অরণ্য অঞ্চলে সমবেত হলেন। আত্মরক্ষার জন্য গাছ ও বাঁশ দিয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন এবং গাছের আড়ালে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে থাকলেন। এই বিদ্রোহীদের পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন বিরসা-ভগবান স্বয়ং।

১৯০০ খৃঃ ৯ জানুয়ারী সকালবেলা পুলিশ কমিশনার সৈন্য ও পুলিশের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এই বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হলেন। তিনি বিদ্রোহীদের যে মুহূর্তে আত্মসমর্পণের আদেশ দিলেন, সেই মুহূর্তে প্রতিরোধের অপর প্রান্ত থেকে শত শত বিষাক্ত তীর সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর উপর বর্ষিত হতে লাগল। অনেক সৈন্য ও পুলিশ হতাহত হল। গুলি চালনার ফলে বিদ্রোহীদেরও বেশ কিছু মারা গেলেন। বিরসা বুঝতে পারলেন তীরধনুক নিয়ে বন্দুকের সংগে মুখোমুখি যুদ্ধ সম্ভব নয়। তিনি স্থানত্যাগ করে বিদ্রোহীদের গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও নিকটবর্তী অরণ্যে আত্মগোপন করলেন। সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ অতিক্রম করে দেখতে পেলেন, বিদ্রোহীদের চারজন নিহত এবং তিনজন আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। আশ্চর্যের বিষয় কাছে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করলেন এই মৃত চারজনের মধ্যে তিনজনই পুরুষবেশী মুন্ডা যুবতী।

৯ জানুয়ারীর এই অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে, বিদ্রোহীরা রাঁচি জেলার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন। বিরসামুন্ডা নিজেও আত্মগোপন করলেন। এই অবস্থায়ও বিদ্রোহীরা বিক্ষিপ্তভাবে আরো কিছুদিন তাঁদের লড়াই চালিয়ে গেলেন। কিন্তু ৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে দুর্ভাগ্যক্রমে বিরসা পুনরায় ধরা পড়লেন। আরম্ভ হল বিচারের পালা। বিচারাধীন বন্দী অবস্থাতেই এই মহাপ্রাণ মুন্ডাজননায়ক মাত্র ২৮ বছর বয়সে রাঁচি জেলে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

জনৈক খৃষ্টান মিশনারী বিরসা-ভগবান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁর চেহারার সংগে যীশুখৃষ্টের চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। আমরা তাঁর কর্মধারার সংগে সাদৃশ্য অনুভব করি পরবর্তীকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক গান্ধীর কর্মধারার। গান্ধীজী যেমন সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা নৈতিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, তেমনি বিরসা-ভগবানও তাঁর আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অহিংসার নীতি অনুসরণ করেই তাঁর গোষ্ঠীজনতাকে সংঘবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়ে ছিলেন। শিকারপ্রিয় মাংসভোজী মুন্ডা সমাজকে হিংসা ত্যাগ করে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কোনপ্রকার সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে না গিয়ে, খাজনা বন্ধ আন্দোলনেরও প্রথম প্রবর্তক এই অখ্যাত নায়ক বিরসা-ভগবান। বিরসা-ভগবান পরিচালিত আন্দোলনে অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই অহিংসা নীতি বজায় ছিল না, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, গান্ধীজী পরিচালিত সংগ্রামের কি মাঝে মাঝে এই অহিংসা নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি। আগস্ট বিপ্লবে কি সম্পূর্ণ অহিংসা নীতি বজায় ছিল। টেলিগ্রাফের তার, সেতু, সড়ক, রেলপথ, ডাকঘর প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর কি আগস্ট আন্দোলনে কোন আক্রমণ চালানো হয়নি? তা সত্ত্বেও গান্ধীজী সমগ্র ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বণিতার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, —তাই তিনি জাতির জনক, বাপুজী। স্বজাতির মুক্তিরতে নিবেদিত-প্রাণ এই মুন্ডা যুবকও ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে, নিপীড়িত, অবহেলিত, আদিবাসী সমাজের মনে এক নবীন চেতনার সঞ্চার করেছিলেন, বাঁচার মত বাঁচার জন্য তাঁদের হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন, আর সেই জন্যই তিনি তাঁদের কাছে বিরসা-ভগবান। তাঁর সেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন আজও অটুট।

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

।। তিন ।।

রাতের আঁধার কাটেনি, ঊষার আলো ফোটে নি, ঘুম ভাঙল গাছে গাছে পাখিদের কল-কাকলীতে। তাড়াতাড়ি উঠে বিছানা তুলে নদীর ঘাটে মুখহাত ধুয়ে চললুম আশ্রমের পূব দিকে বেড়াতে।

আশ্রমের সীমা পার হতেই একদিকে কটি ছোট-বড় খেজুরগাছ আর একদিকে স্বর্ণলতার পাগড়ী মাথায় শেওড়াগাছের মাঝখানে কাঠকয়লার রাশি, ভাঙা হাঁড়ি-কলসী, ছেঁড়া কাঁথা বালিশ আর আধপোড়া বাঁশ চারদিকে ছড়ানো। নিত্যকালের সংসারের অনিত্যতার সাক্ষী মহা শ্মশান। শ্মশান পেরিয়ে খাঁড়ির আঁকাবাঁকা পাড় ধরে একটু যেতেই পূর্ব দিগন্ত সোনার রঙে রাঙিয়ে উঠলেন তিমিরবিদারী আলোকবিহারী জবাকুসুম সংকাশ দেব দিবাকর।

একটু যেতেই খাঁড়ির পারঘাট। পথে পথে লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তরি-তরকারীর ঝুড়ি মাথায় হাটুরেরা হন হন করে চলেছে হাটেবাজারে। দুধের বাঁক কাঁধে গোয়ালা, কেঁড়ে কাঁখে গোয়ালিনী হুপ হুপ নদী পেরিয়ে যাচ্ছে এ পাড় থেকে ওপারে, ওপার থেকে এ পাড়ে। আলু পেঁয়াজ আর চালের বস্তা বোঝাই গরু গাড়ীর গাড়োয়ান—'হেই হেই হেট হেট' করতে করতে হাঁটুজল নদী পেরিয়ে যাচ্ছে। ও পাড়ে রাখাল ছেলেরা আসছে গরুর পাল নিয়ে নদীতীরে সবুজ ঘাসভরা মাঠে চরাতে। ওদিকে সাঁওতাল ছেলেরা গরু চরাতে চরাতে বাঁশের বাঁশিতে ধরেছে মিষ্টি মধুর সুর। পোড়ামাটির রাঙা কলসী মাথায় স্বাস্থ্য-সুন্দর কালো কালো সাঁওতাল মেয়েরা আসছে নদীতে জল ভরতে। নদীর দু তীরে সবুজ মাঠে এখানে ওখানে বৈঁচি আর শেয়াকুলের ঝোপ: সাঁওতালদের ন্যাংটা খোকা-খুকুরা বাঁ হাতের নারকেলের মালায় টপাটপ তুলছে পাকা পাকা বৈঁচি আর শেয়াকুল। মিষ্টি মধুর ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে নদীর এপাড় থেকে ওপাড়ে। গাছে গাছে পাখিরা তুলেছে মধুর কলতান।

মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছি একা একা। ডানদিকে চেয়ে দেখি ঘন জঙ্গলে বড় বড় শিমুল গাছের ফাঁকে বেশ পুরানো একতলা দালানের কোণ। এই জঙ্গলের মাঝে আবার বসতি আছে না কি? জিজ্ঞাসা করতেই এক পথচারিণী মা কোলের ছেলে ভুঁয়ে নামিয়ে দু হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন—গাঁ লয় গো গাঁ লয়, উ তো মা বিশালক্ষীর থান। বড় জাগন্ত দ্যাবতা মা বিশালক্ষী।

গলায় আঁচল জড়িয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে পথের ধুলো ছেলের মাথায় ছুঁইয়ে কোলে তুলে নিয়ে পথ-চারিণী মা চলে গেলেন আপন পথে।

—বিশালাক্ষীর মন্দির? এ কোন্ বিশালাক্ষী? নানুরে বিশালাক্ষীর মন্দির, চণ্ডীদাসের ভিটা, রামী-ধোপানীর পাটের কথা জানি। দেখেছি রামীর ক্ষয়ে যাওয়া পাটধরা কাপড়, কাচা পাটা, চণ্ডীদাসের ভেঙেপড়া মাটির ঘরের স্তূপাকার ভিটা। এখানে আবার কোন্ বিশালাক্ষীর মন্দির? দেখতে হবে।
হবে।

বেলা হয়ে গেছে—খাওয়ার সময় ঠিক পৌছনো চাই। ফিরতে হল বেড়ানো স্থগিত রেখে।

তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানায় বসে স্বামীজী, পাশে হোমিওপ্যাথির বড় বাক্স আর দুখানা বড় বড় বই—মেটিরিয়া মেডিকা।

সামনের উঠোনে ভিড়। চাষাপাড়া, মেটেপাড়া, দুলেবাগদী পাড়া, সাঁওতাল-পাড়া—আশপাশের গাঁয়ের সব দুঃস্থপাড়া থেকেই ছেলে কোলে মা, মেয়ে কাঁধে বাবা, ভাইকোলে দিদি, বুড়ীর হাত ধরে বুড়ো, বাবার হাত ধরে মেয়ে, মাকে ধরে ধরে ছেলেরা এসেছে ওষুধ নিতে। একে একে কাছে ডেকে রোগ বিবরণ শুনে সকলকে ওষুধ দিলেন স্বামীজি। কেউ কেউ সাগু বার্লি কমলালেবু কেনবার পয়সাও পেল।

সবাই চলে গেলে ওষুধের বাক্স, বই তুলে রেখে এসে বসলুম স্বামিজীর কাছে। সকালের ভ্রমণ পথের কথা জানতে চাইলে সব বলে জিজ্ঞেস করলুম স্বামিজীকে—দেখলুম শ্মশানের পরে পারঘাটের দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে পুরানো দালান বাড়ীর কোণ। শুনলুম বিশালাক্ষীর মন্দির। লোক বসতির বাইরে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে ও কোন্ বিশালাক্ষীর মন্দির? আর কোন চণ্ডীদাস ছিলেন নাকি ওখানে?

ওষুধের বাক্স তোলা হতেই তার জায়গা দখল করেছিল গড়গড়া। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এক লহমা মুখপানে চেয়ে একটু হেসে স্বামিজী বললেন—না, কোন চণ্ডীদাস ছিলেন না ওখানে। অনেক কালের পুরানো গ্রাম্য দেবী। ওদিকটা পেছন। সামনের মাধবীতলার পথে দক্ষিণমুখে খানিকটা গেলেই বাঁ দিকে সরু মেঠো পথ। ঐ পথ বরাবর গেছে বিশালাক্ষী মন্দিরে। দেখে এসো। দুপুর রোদ্দুরে যেও না—বিকেলে।

এর পর জনসমাগম। একে একে নগেন, মৃগেন, অতুল, রাধা ও ফকির সামন্ত এসে বসলেন। চান্নাগ্রামের অনেক জমিজমার মালিক মস্তবড় বিষয়ী-ঘর সামন্ত বাড়ীর ছেলে এঁরা। সবাই বেশ স্বাস্থ্যবান জোয়ান পুরুষ। সবারই একটা না একটা বৈষয়িক সমস্যা—এসেছেন যুক্তি পরামর্শের জন্যে' একে একে শুনে প্রত্যেককেই সমাধানের আইনসঙ্গত সংযুক্তি দিলেন স্বামিজী।

অনেকক্ষণ পরে যাবার সময় জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চাইতেই পরিচয় দিলেন স্বামিজী।

বনপাসের জনপ্রিয় ওস্তাদ কারিগরের খরিদ্দার সবাই। তাঁর ভাই শুনে প্রত্যেকেই

ওস্তাদের দোকানে স্বামীজী

বেশ আদরে নেমন্তন্ন করলেন তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্যে।
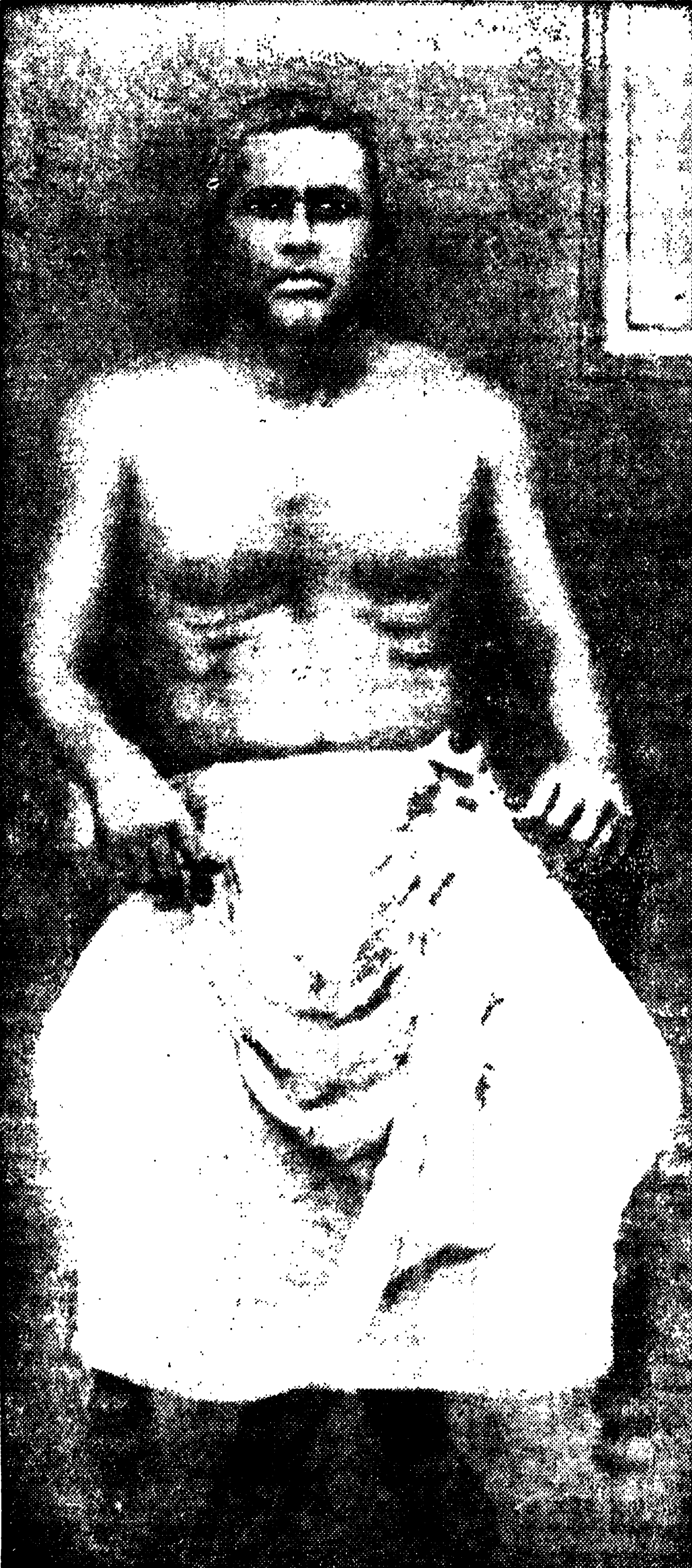
একে একে নমস্কার করলুম সকলকে।

বেলা এগারোটা। নাওয়া খাওয়া বিশ্রামের পালা। চারটের পর বেরিয়ে পড়লুম মাধবীতলার পথে।

।। চার ।।

আশ্রমের দক্ষিণ ফটক—মাধবীতলা। পর পর কটি ধনুকের মত বাঁকানো লোহার ফ্রেমের একদিকে মাধব আর একদিকে মালতীলতা জড়াজড়ি করে উঠে ঘন সবুজ পাতায় জায়গাটিকে করেছে যেমন ছায়াশীতল, ফুলে ফুলে করেছে তেমনি সৌগন্ধময়। এখান থেকে আশ্রমের বাইরে পথ গিয়েছে দক্ষিণমুখে। খানিকটা যেতেই বাঁদিকে সরু মেঠোপথ কখানি ধানক্ষেতের বুকচিরে উঁচু নিচু সবুজ ডাঙ্গার সিঁথি কেটে ঈশান কোণে ঢুকেছে জংগলের ভেতর। বড় বড় বট পাকুর বেল অশ্বত্থ, আম, জাম, শ্যাওড়া শিমুল গাছ, এখানে ওখানে শেয়াকুল, কেয়াকুল, বৈঁচি ঝোপ, ডাইনে বাঁয়ে কটি জবাগাছ ফুলে ফুলে লালে লাল। জঙ্গলের ভেতর প্রশস্ত আঙিনার মত অনেকখানি শক্তমাটির সবুজ মাঠ কাছুপের পিঠের মত মাঝখানে উঁচু। বাঁদিকে পুকুর, হয়তো এককালে বড় ছিল, এখন মজে হেজে ডোবার পর্যায়ে নেমেছে। মাঠের উত্তরসীমায় শিমুল পলাশের ঘন ছায়াতলে ছোটখাট শিখরহীন আয়তাকৃতি দক্ষিণদুয়ারী মন্দির। তিন খিলানের অপ্রশস্ত বারান্দা নাটমন্দিরের কাজ করছে। ছাদ নেই, পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের মাথা ত্রিকোণ, তার ওপরে টিনের দোচালা। মন্দিরের দরজা খোলা। ভেতরে দেবাসনে বিগ্রহের জায়গায় উপুড় করা হাঁড়ির মত সিঁদুরে চন্দন মাখানো পাঁচটি পোড়ামাটির মুন্ড, বড় বড় চোখ, টিকল নাক, ব্যাদিত বদন, লোল জিভ। আশেপাশে কটি পোড়া মাটির ঘোড়া। মুন্ডগুলির মাথায় ও বেদিতে নিত্যপূজার সচন্দন জবা ও বেলপাতা।

এই বিশালাক্ষী দেবী নানুরের সঙ্গে কতই না তফাৎ। পূজারীরা শক্তিমূর্তি বলে পরিচয় দিলেও নানুরে প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পসুষমামন্ডিত বীণাপুস্তক অক্ষমালা ধারিণী চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্তি। সত্যিই তো বিশালাক্ষী দেবী সরস্বতীরই নাম, তাই প্রার্থনা মন্ত্রে 'বিদ্যাং দেহি বিশালাক্ষী'। নামের সঙ্গে অমিল—ধর্মরাজ শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা, পঞ্চানানের মত গ্রাম্যমূর্তি কি করে এল এখানে?

মন্দির থেকে বেরিয়ে চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে দেখি মন্দিরের পশ্চিমে দুটি বিশাল শিমুল গাছের তলায় সিমেন্ট বাঁধানো বেদিতে মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ—

সাধক প্রবরস্যাদ্যা
পদপংকজ সেবিনঃ
আসনং কমলা কান্তস্য
অত্রে বাসীদ্ দ্বিজন্মনঃ

সাধকপ্রবর কমলাকান্তের আসন এখানে? এই বিশালাক্ষী মন্দিরেই সাধনা করেছিলেন তিনি? কত প্রশ্ন জাগে মনে।

উত্তর পাই কোথায়? সামনে চেয়ে দেখি এক গাছতলায় আসনের দিকে মুখ করে চোখ বুজে পদ্মাসনে বসে আছেন এক বয়স্ক লোক। লম্বা দোহারা চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা, কাঁচা-পাকা চুল, টিকল নাক, বড় বড় চোখ। পরনে শাদা ধুতি গায়ে শাদা চাদর, গলায় শাদা পৈতের গোছা।

কমলাকান্তের আসনে প্রণাম করে দাঁড়ালুম ভদ্রলোকের সামনে। অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে চাইলেন। শান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি। সামনে মানুষ দেখে যেন একটু চমকে উঠলেন, বললেন—কি খোকা, একা-একা এসেছ এখানে?

প্রণাম করে বললুম—হ্যাঁ, নতুন এসেছি কি না আশ্রমে, তাই দেখতে এলুম বিশালাক্ষী মন্দির। আপনার নিবাস? বয়স্ক লোক, সাহস হল না পরিচয় জিজ্ঞেস করতে।

একটু হেসে ব্রাহ্মণ বললেন—এই চান্না-গ্রামেই। সবাই আমায় স্মৃতিরত্ন বলে ডাকে। তোমার বাড়ী?

সব পরিচয় দিলুম। হাত ধরে পাশে ঘাসের ওপর বসিয়ে স্মৃতিরত্ন মশায় বললেন—কি দেখলে, কেমন দেখলে বল।

দেখার বর্ণনা দিয়ে বললুম—হতাশ হলুম দেবী মূর্তি দেখে। বিশালাক্ষী নামের সঙ্গে কোন মিল দেখতে পেলুম না মূর্তির। আশা করেছিলুম নানুরের মতই

প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের কোন মূল্যের মূর্তি দেখব।

স্মৃতিময় মশায় বললেন — আমাদের ধারণাও অনুরূপ। মনে হয় প্রাচীন মূর্তি কোনরূপে খোয়া গেলে এই আধুনিক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে স্থানীয় লোকেরা।

জিজ্ঞেস—করলুম—এই আসনটি কার?

স্মৃতিময় মশায় বললেন—সাধক কমলাকান্তের নাম শুনেছ তাঁরই সাধনা করবার পঞ্চমুণ্ডি আসন এটি। মহাজ্ঞানী মহাসাধক কমলাকান্ত বহু দিন ছিলেন এখানে। সেই সময়ে এই স্থানটিতেই সাধনা করতেন তিনি।

—শুনেছি সাধক কমলাকান্তের নাম আর তাঁর শ্যামাসঙ্গীত। তবে বেশি কিছু জানি না তাঁর কথা। কোথাকার লোক ছিলেন তিনি? এখানেই বা এলেন কেমন করে?—বললুম উৎসুক হয়ে।

আচ্ছা, শোন তবে—স্মৃতিময় মশায় আরম্ভ করলেন—কমলাকান্তের জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনায়। পুরো নাম—শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য। সুন্দর চেহারা সুপুরুষ। তবে খুবই গরীব, যাকে বলে—দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্য কিন্তু কাবু করতে পারে নি তাঁকে। ছোটবেলা থেকেই যজমানী করেন আর করেন লোকচক্ষের অন্তরালে মা আদ্যাশক্তির সাধনা। ভক্তির আবেশে মায়ের নাম গান করেন। উৎসমুখের মত স্বতঃউচ্ছ্বসিত হয়ে বের হয় অজস্র শ্যামাসঙ্গীত তাঁর মুখ থেকে। সে সব গান কি—পদই বা কেমন, আর সুর—পাষাণ গলে। প্রভূত কবিত্বশক্তি না থাকলে এমন পদ রচনা করতে পারেন না কেউ। অন্তরে প্রেরণা যোগাতেন মা, নইলে কি এমন হয়? বর্ধমানের মহারাজা তেজেশচন্দ্র ও'র গুণে মুগ্ধ হয়ে প্রথম সভাপণ্ডিত ও পরে গুরুপদে বরণ করে কোটালহাটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন এঁকে।

প্রাণের ভক্তি প্রেমের সহজ সরল আবেদন যেমন কমলাকান্তের গানে আর কোথাও তো তেমনটি শুনলুম না—দেখলুম না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও খুব ভালবাসতেন কমলাকান্তের গান গাইতে। বিশেষ করে—

আদর করে হৃদে রেখ
আদরিণী শ্যামা মাকে
তুই দ্যাখ আমি দেখি
আর যেন ভাই কেউ না দ্যাখে

গানটি গাইতেন প্রায়ই। এটি ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় গান।

কমলাকান্ত আবার ছিলেন অতিশয় সুকণ্ঠ। ভক্তিতে বিভোর হয়ে গান ধরলে গাছের পাতা ঝরত, পাষাণ গলত, পাষণ্ড মরত। একবার তাঁর কণ্ঠই পাষণ্ড দলন করে বাঁচিয়েছিল তাঁকে। শোন সে কথা—

এই কাছেই বাড়ী যখন, ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। হয়তো দেখেও থাকবে।

বললুম—শুনেছি তবে দেখি নি।

—এ্যাঁ, দেখ নি? এই তো কাছেই। আরও কাছে তোমাদের ওখান থেকে—বললেন স্মৃতিময় মশায়। খুসকরা থেকে দেড় মাইল দূরে ওড় গাঁ ছোট পল্লী। এর সামনে বিরাট ডাঙ্গা—উঁচু-নীচু বিশাল মাঠ, শুকনো খটখটে শক্ত মাটি, কোথাও ঘাসরাত্তি গজায় না, সবুজের নাম-গন্ধ নেই—বেম্মডাঙ্গা—যেন ঢেউ-খেলানো মরুভূমি। খুব দূরে—আকাশ যেখানে ছুঁয়েছে মাটিকে, সেখানে দেখা যায় দু-দশ ঘর বসতি আর গোটা কতক তাল গাছ। ঐ সব পল্লীতে যারা থাকে তারাও দিন-দুপুরেও কখনো ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গায় আসে না। ঠ্যাঙাড়ে দস্যু-ডাকাতের ভয়। এই মাঠে তারা যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে লুটপাট করে তরোয়াল লাঠি সড়কির ঘায়ে মেরে গর্তে ফেলে দিয়ে পালায়। সে কালে মস্ত বড় বিভীষিকা এই ওড় গাঁয়ে ডাঙ্গা। এ হেন ডাঙ্গার আবার তিনটে ভাগ—বড় ডাঙ্গা, মাঝারী বা মাঝের ডাঙ্গা আর ছোট ডাঙ্গা।

এই ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা পথে কাঁধে ছাতা বগলে লাঠি, এক হাতে চালকলা আর কিছু তরি-তরকারী বাঁধা পুঁটলি, আর এক হাতে ছোট গুড়ের কলসী নিয়ে একা চলেছেন কমলাকান্ত।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
ও মন ভাবনা করিস কিসের তরে?
ওরে অভয়াকে স্মরণ করে
শমন ভয় যে ভয়ে মরে।

অভয়া মায়ের কোলের ছেলে কমলাকান্ত, ভয়-ডর নেই একরত্তি। আপন মনে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে চলেছেন—

জবা ফুলের মালা
ওমা, কে দিয়েছে তোমার গলে?
যত সময় পথে নেচে যেতে যেতে
রয়ে রয়ে দোলে মালা রয়ে রয়ে দোলে
ওমা, কে দিয়েছে তোমার গলে।

রাত হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। মাঝডাঙ্গায় দুপুর-রাত কালো আকাশে লক্ষ তারার মাঝে সরু একফালি চাঁদ। এমন সময়ে হারে রে-রে শব্দে দিক-দিশে কাঁপিয়ে একদল ডাকাত আক্রমণ করল তাঁকে। কী ভীষণ চেহারা তাদের—ইয়া বলিষ্ঠ গড়ন, বড় বড় লাল চোখ, সর্বাঙ্গে তেলকালি মাখা, কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা, হাতে বড় বড় লাঠি, সড়কি, বর্শা, তরোয়াল।

দলবল নিয়ে ব্রাহ্মণকে ঘিরে ফেলে বজ্রের মত হুঙ্কার দিয়ে দস্যু সর্দার বললে—কে-রে তুই? বড় যে মালা দুলিয়ে চলেছিস, সঙ্গে কি আছে দে, নইলে এখুনি শেষ করে দেব। যাবি কোন গাঁয়ে? কে তুই?

কমলাকান্ত বললেন—গরীব বামুন, যজমানি করে খাই। শিষ্যবাড়ী থেকে ফিরছি ভাই, যাব কোটালহাটি। আমার কাছে তো আছে গামছায় বাঁধা চালকলা, ছাতা লাঠি আর গুড়ের কলসী। নেবে ভাই, নাও।

বাজখাই গলায় সর্দার বললে—ওকথা সবাই বলে, কোমরের থলিতে টাকা লুকিয়ে রেখেছিস। দে কি দিবি, সব দে।

—গরীব বামুন, টাকা কোথায় পাব ভাই? যজমানি করি, শিষ্যবাড়ী যাই, যা পাই, তাতেই চলে যায় কোনরকমে। তা যা পেয়েছি—এই-ই সব, আর কিছু নাই—বললেন কমলাকান্ত।

সর্দার বললে—অমন কথা ঢের শুনেছি। দে কি দিবি, সব দে।

—তা হ'লেই কি আমায় ছেড়ে দেবে?—কাঁপা গলায় শুধোলেন ব্রাহ্মণ।

সর্দার রাঙা চোখ বড় করে বললে—না। দিলেও তোকে মারব, না দিলেও। সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে মেরে ফেলে দেব ঐ গর্তর মধ্যে।

—তবে তাই হোক, এই নাও ভাই—কমলাকান্ত চাল-কলা বাঁধা পুঁটলি, গুড়ের কলসী, ছাতা-লাঠি সব একে একে তুলে দিলেন সর্দারের হাতে।

সর্দার দাঁত কড়মড় করে বললে—তা তো হল, এইবার তোকে মারব। তৈরী হ, ও ঠাকুর, তৈরী হ'।

কমলাকান্ত বললেন—সব পেয়েও খুশি হলে না ভাই, গরীব বামুনকে মারা চাই, তবে খুশি হবে? তাই হোক। তবে একটা কথা—জন্মের মত একবার মাকে ডাকি। আমার ডাকা শেষ হলে আমাকে মারিস।

—কি বলিস রে?—সর্দার জিজ্ঞেস করলে দলের সবাইকে।

—তাতে আর দোষ কি? ডাকুক ওর মাকে—বললে দলের সবাই। লাঠি সড়কি পাশে রেখে সবাই গোল হয়ে বসল ব্রাহ্মণকে ঘিরে। দস্যুদলের মাঝখানে কমলাকান্ত বসলেন যোগাসনে, গাইলেন—

আর কিছু নাই গো শ্যামা মা
কেবল তোমার দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি
দেখে হলাম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা
সুখের সময় সবাই তারা
বিপদকালে কেউ কোথাও নাই
ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।।

গান থামল। মধুর কণ্ঠে অন্তরের বেদনায় গাওয়া প্রাণের প্রেমভক্তির আকূতি সর্দারের মর্ম স্পর্শ করল। বললে—ওরে ঠাকুর, তুই তো আচ্ছা গানেওয়ালা, গা আর একখানা, শুনি। তারপর যা করবার তা করা যাবে।

আরও কাছে সরে এসে ঘিরে বসল সবাই।

কমলাকান্ত গাইলেন—

তোমার ভাল চিন্তা সদা
করিগো তোমার নিকটে
দুঃখে যাক্ সুখে যাক্
যে আছে লিখন ললাটে।।
বারে বারে ভ্রমণ করি, মা
আমার এই কর্মবাটে
কিন্তু দীন দেখে যদি দয়া কর
দীন দয়াময়ী নামটি রটে।।

গান থামল। সর্দার নীরব, দস্যুদল নীরব—দিক-দিগন্ত নীরব। তবু গানের মূর্ছনা যেন ওর গাঁয়ের ছোট বড় মাঝারি ডাঙ্গা ভরে গমগম করে ধ্বনিত হতে লাগল।

ভক্তকন্ঠের মধুর গান কঠিন পাষাণও পায় প্রাণ। সর্দার আর দলের আর সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—ঠাকুর, ও ঠাকুর, তুই কি দ্যাবতা না কিরে? শোনা আর একখানা গান শোনা ভাই।

কমলাকান্ত আরম্ভ করলেন—
মন, চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে
যার যে বাসনা মনের কামনা
সেখানে সকলই ঘটে।
অল্প পুণ্যে ভরা সাজিয়ে পশরা
এসেছ ভবের হাটে
যার যা উপায় পাঁচে মিলি খায়
কলঙ্ক তোমারই রটে।।

গান শেষ হল। পাষাণ গলল। নরঘাতী দস্যুসর্দার আর দস্যুদলের সবারই চোখে জল। ভক্তের মুখে মাতৃনামের অপূর্ব মহিমা তাদের নতুন প্রেরণা জাগাল। তারাও তো মায়ের সন্তান, তারাও শ্মশান-কালীর পুজো করে প্রসাদী সিঁদুরের ফোঁটা কপালে পরে ডাকাতি করতে বের হয়। করে কি—মায়ের সন্তান হয়ে মায়েরই অন্য সন্তানদের—আপন ভাই-বোনদের মারে। এ কী করে তারা?

সবাই বামুনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে—ঠাকুর, মহাপাপী আমরা, আমাদের মাফ কর্। এই নে তোর পোঁটলা-পুঁটলী, ছাতা, লাঠি, গুড়ের কলসী।

কমলাকান্ত কালো আকাশের দিকে চেয়ে দুহাত জোর করে বললেন—জয় মা কালী। ডাকাত দলও বলল—জয় মা কালী, জয় মা কালী।

সবাই সঙ্গে গিয়ে কমলাকান্তকে নিরাপদে পেঁৗছে দিল কোটালহাটিতে। তারপর? পরদিন সর্দার আর দলের সবাই লাঠি সড়কি আগুনে পুড়িয়ে ঢাল, খাঁড়া, টাঙি, তরোয়াল নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে কোটালহাটিতে গিয়ে কমলাকান্তের শিষ্য হল। পাষণ্ড দলন হল—নাম করা দুর্ধর্ষ বিশে ডাকাতের সদলে ডাকাতি ঘুচল।

এই শক্তিসাধক সুকবি, সুগায়ক, মহা ভক্ত কমলাকান্ত সাধনা করেছিলেন এখানে।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় চুপ করলেন।

সাঁঝ আসরে রূপকথা বলিয়ে ঠাকুমা, দিদিমা, ঠাকুরদা, দাদামশায়দের মতই গমকে ঠমকে রসে রসে টইটম্বুর করে বলছিলেন স্মৃতিরত্নমশায়। তানে লয়ে বিশুদ্ধ সুরে গাইছিলেন কমলাকান্তের পদগুলি। ভারী মিষ্টি লাগল।

বললুম—গানের চর্চা করেন বুঝি? মুখস্থ রেখেছেন তো বেশ।

হো-হো করে হেসে স্মৃতিরত্ন মশায় বললেন—না, না, গানের চর্চা করি না। তবে ভাল লাগে, তাই গুন-গুন করি একটু একটু। মনে থাকার কথা বলছ?—নামটা যে স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিটা একটু থাকতেই হয় বৈকি।

বললুম—আপনি তো কমলাকান্তকে দেখেন নি, তবে এসব কথা ঠিক দেখার মত করে জানলেন কেমন করে?

অল্প হেসে স্মৃতিরত্ন মশায় বললেন—দেখি নি ঠিকই, তবে শুনেছি আর পড়ে জেনেছি। এসব আজগুবি বলে ঠেলা যায় না। দস্যু, ডাকাত, ঠ্যাঙারের অত্যাচারে যখন সারা দেশ জর্জরিত, বিদেশী সরকার তখন ডাকাত দমন বিভাগ খুলেছিলেন। তাঁদের গেজেট আর রেকর্ড বই-এ দারোগা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেটদের বিবরণীতে ওড়-গাঁয়ের ডাঙ্গা, কমলাকান্তকে আক্রমণ ও পরিত্রাণের কথা লেখা আছে। তবে গানের প্রথম কলিটি মাত্র। সবটা জানতে হয়েছে কমলাকান্তের 'পদাবলী' থেকে।

পশ্চিম দিক-বধূর সিঁথের সিঁদুরে, পুবের মুখ ঘোমটা ঢাকা—কমলাকান্তের আসনে প্রণাম করে উঠে পড়লুম দুজনে।

চলতে চলতে মেঠোপথ শেষ হতেই স্মৃতিরত্ন মশায় বললেন—এসো একদিন চান্না গাঁয়ে। 'স্মৃতিরত্ন' বললেই বাড়ী দেখিয়ে দেবে যে কোন লোক। এসো, কেমন?

বললুম—নিশ্চয়ই যাব। আপনি কি রোজই আসেন বিশালাক্ষীতলায়?

—না, রোজ নয়, তবে প্রায়ই—বললেন স্মৃতিরত্ন মশায়। ঐ তো এতটুকু গাঁ, কথা কইবার লোকজন কম। তাই প্রায়ই বিকেলটা কাটিয়ে যাই নিরিবিলিতে।

হেসে বললুম—তবে তো ভালই হল। আপনার অভাব—কথা কইবার লোকের, আমার অভাব—কথা শোনাবার লোকের। জানেনও অনেক। মহাপুরুষদের কথা শুনতে ভাল লাগে খুব। বিরক্ত করব আপনাকে মাঝে মাঝে।

পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন স্মৃতিরত্ন মশায়—বাঃ বাঃ বেড়ে হবে হে। তুমি উদয়াচলে, আমি অস্তাচলে, জমবে ভাল। জানতো Two extremities meet at a point? তোমার মত নিষ্ঠাবান শ্রোতা পেলে বকর্-বকর্ করতে পারি খুব। চলি তা হলে, এসো একদিন।

প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চললুম আশ্রমের পথে।

সন্ধ্যার অনেকখানি পরে যথারীতি উঠোনে চৌকিতে বসলুম স্বামিজীর খাটিয়ার পাশে।

—দেখলে বিশালাক্ষী মন্দির; কেমন লাগলো?—জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী।

বললুম—হ্যাঁ, জায়গাটি বেশ নির্জন ছায়াচ্ছন্ন, কিন্তু হতাশ হলুম দেবীমূর্তি দেখে। কতদিনের মন্দির, এটির মূর্তি তো বেশ আধুনিক।

মুখপানে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে স্বামিজী বললেন—মন্দির অনেকদিনের। বৌদ্ধ ইতিহাস জান তো? ও ধর্মে কোন মূর্তিপুজো নাই। বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘ ছিল তাদের ত্রিশরণ। সবাই নিজে নিজে উপাসনা করত। হিন্দু ব্রাহ্মণদের হল মুস্কিল— চালকলা বাঁধায় ভাঁটা পড়ল। স্বার্থহানি। এই তো নষ্ট করাতে হবে. ও ধর্মকে। অনেক চেষ্টা করেও যখন মূলোচ্ছেদ করতে পারলে না. তখন বৌদ্ধ সাধুর বেশেই বৌদ্ধধর্মে ঢুকিয়ে দিল তান্ত্রিকতা-ব্যভিচার। হীনযান মহাযান—দুটো ভাগ হল। তান্ত্রিক দেবী তারা মূর্তি আসন পেল বৌদ্ধধর্মে। তাদেরই কোন বিশালাক্ষী মূর্তি ছিল এখানে।

তারপর নবাব আমলের বর্ধমানের দেওয়ান মানিকচাঁদ বৌদ্ধ বিশালালাক্ষীকে হিন্দু বিশালাক্ষী করে নিয়ে মন্দির তৈরী করিয়ে অনেক জমি জায়গা ব্রাহ্মণদের দিয়ে দেবসেবার ব্যবস্থা করে দেন।

বৌদ্ধযুগে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তার বহু নিদর্শন দেখা যায় এখনও। বৌদ্ধদের সময়ে নিশ্চয়ই পাথরের কোন সুন্দর বিশালাক্ষী মূর্তি ছিল এখানে। পরে হয়তো কোন-রকমে খোয়া গেছে। সে মূর্তি যে কেমন ছিল কোথায় গেল তা আজকাল কেউ জানে না। ওগুলো আধুনিকই বটে। হাড়ি ডোমদের ধর্মরাজের অনুকরণে কেউ বসিয়ে থাকবে।

।। পাঁচ

ভোরবেলা আর কোনদিকে নয়—চলেছি স্বামীজীর সঙ্গে বেড়াতে। স্বামীজীর বেড়ানো—আমার দৌড়। এক দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে কোনরকমে স্বামিজীর নাগাল পেয়ে বললুম আস্তে আস্তে—চান্নায় বেড়িয়ে আসব, স্বামীজী?

স্বামিজী বললেন—নিশ্চয়ই। যেদিকে খুশি বেড়াবে, তবে ফেরা চাই ঠিক সময়ে। যাও: দেখে এস গ্রামটা। এক্ষুনি নয়, সকালের খাবার খেয়ে যাবে। এখন বেড়াও এই মাঠে ঐ নদীর ধারে।

প্রাতর্ভ্রমণটা নদীর বাঁকে বাঁকে মাঠে মাঠেই সারতে হল। আশ্রমে ফিরে খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পড়লুম মাধবীতলার পথে।

সোজা দক্ষিণ মুখে খানিক দূরে যেতেই পথের পাশে ঘন সবুজ পাতায় ছাতা মেলে দাঁড়িয়ে এক জোয়ান বটগাছ। সুন্দর গাছটি, তরুণ বললেই হয়—কোন ঝুড়িই মাটি ছুঁয়ে গুঁড়ির আসন দখল করেনি এখনও। উজ্জ্বল সবুজ পাতার প্রতিটি স্তবকের মাথায় মাথায় কচি কচি লাল পাতা।

বটতলা থেকে রাস্তাটি দুভাগ—একটি গেছে সোজা দক্ষিণ, অন্য গরুর গাড়ী চলার মত একটু চওড়া রাস্তাটি ডানদিক বেঁকে গেছে পশ্চিমদিকে। যাই কোন দিকে? চললুম ডানদিকের রাস্তাটি ধরে। মোড় ঘুরতেই ডানহাতি একটু উঁচু ডাঙ্গার মত জায়গায় আম-কাঁঠাল গাছের ছায়ায় কখানি খড়ে ছাওয়া মেটেঘর। একটি এ ঘরের উঠোনের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে স্তন্য-পানরত ছেলে কোলে আধময়লা শাড়িপরা এক মা শাড়ির আঁচল মাথায় একটু টেনে দিয়ে বললে—কোথাকে যাবেন বাবু, কোত্থেকে আসছ আপুনি?

বললুম—আসছি আশ্রম থেকে, যাব চান্না।

মেয়েটি বললে—ই পথ লয় গো, ই পথ লয়। গাঁয়ের বাইরে দিয়ে ই পথ গেয়েছে হৈ খানো জকশান ইস্টিশানে। হৈ হামুত

যে রাস্তাটা গেয়েছে দখনে মুখে ঐটে দিয়ে যাও আপুনি, একেবারে গাঁ ভ্যাতরে যেয়ে পড়বে। মেয়েটি হাত তুলে আংগুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল রাস্তাটি।

বললুম—তোমাদের এটি কোন গাঁ, এ কি চান্না নয়?

হিঁ বাবু, এটাও চান্না গাঁ-ই বটে, মেটে বাগদীপাড়া, তাই গাঁয়ের বাইরে উত্তুর সীমেয়। আছ্রমে যে মানুষটি বাবাজীর কাজ করে এই ঘরেরই মানুষ, তেনারই ঘর এটি—বলে মাথার আঁচলটি আর একটু টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকল মেয়েটি।

বুঝলুম—পথ দেখিয়ে দিলে রেণুদার গিন্নি—রেণুবৌদি। পরে শুনেছিলাম শরৎ-কুমারী।

ফের ফিরে গিয়ে বটতলায় ধরলুম দক্ষিণের রাস্তা। একটু পরেই গিয়ে হাজির এক পুকুর পাড়ে। জল টলমলে বড় পুকুর, পাড়ের বালাই নাই—প্রায় রাস্তার সংগে সমান। চারি পাড়ে বড় বড় বাঁশঝাড়, এখানে-ওখানে দু-একটা বট অশ্বত্থ গাছ।

পুকুরের চারদিক প্রদক্ষিণ করেছে গরুর গাড়ী চলার রাস্তা। ঐ রাস্তার ধারে ধারে পর পর ছোট-বড় মাঝারি হরেক রকমের খড়ে ছাওয়া মেটে বাড়ী। কোনটা একতলা কোনটা দোতলা। সব বাড়ীতেই পাঁচিল ঘেরা বেশ প্রশস্ত উঠোন। মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়ীর করোগেট টিনের চৌচাল। একটি মাত্র একতলা পাকা বাড়ী—সামন্তদের বৈঠকখানা। রাস্তার এখানে-ওখানে দু-চারখানি খোলা গরুর গাড়ী নামানো। এখানে-ওখানে ধুলোবালি নিয়ে খেলা করছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। পুকুর ধারে বটতলায় ছায়ায় বসে হুঁকো টানছেন কজন বয়স্ক লোক, আর একদিকে সতরঞ্চ পেতে তাস খেলছেন কজন হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ জোয়ান।

তামাকের আড্ডায় গিয়ে—স্মৃতিরত্ন-মশায়ের বাড়ী কোনটি—জিজ্ঞেস করতেই এক বয়স্ক লোক বললেন—স্মৃতিরত্ন? মণীন্দ্র স্মৃতিরত্নের ঘর?

হেসে বললুম—স্মৃতিরত্নটুকুই জানি, নাম জানবার সৌভাগ্য হয়নি তো।

চল, চল—বলে সংগে নিয়ে গিয়ে-দেখিয়ে দিলেন স্মৃতিরত্নের বাড়ী।

সদ্য স্নান আহ্নিক সেরে স্মৃতিরত্ন-মশায় উঁচু দাওয়ায় সতরঞ্চে বসে তামাক টানছেন। নজর পড়তেই একগাল হেসে বললেন—আরে এস, এস। সকালবেলাতেই বেড়াতে বেরিয়েছ? বেশ বেশ—বস।

প্রণাম করে বসলুম শতরঞ্চে।

হুঁকোয় টান দিতে দিতে স্মৃতিরত্ন-মশায় বললেন—তারপর কি খবর বল।

বললুম—প্রথম খবর হচ্ছে—আপনি বলবেন, শুনব আমি। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে—আপনাদের চান্না গ্রাম দেখব।

হো হো করে হেসে স্মৃতিরত্নমশায় বললেন—বাঃ বাঃ বেড়ে খবর। কন্ট্রাক্টটা ভালে রেখেছ তো বেশ। বুড়ো মানুষ—ভুলেই গিয়েছিলুম। এখুনি নামে কালি লেগেছিল আর কি। তা প্রথম খবরটাই প্রথমে হোক। এতখানি এলে এই গরমে, বসে জিরোও খানিক। তারপর হবে দ্বিতীয় খবরটি।

তুমি হচ্ছ বনপাস কামারপাড়ার ছেলে। কত বড় তোমাদের গ্রাম। সারি সারি ঘেঁসাঘেঁসি কত সুন্দর সুন্দর দোতলা তিনতলা মাটির বাড়ী, দালান কোঠা, পাকা বাড়ী, কত বড় বড় দোকানপাট হাট-বাজার—ছত্রিশ পাড়া গ্রাম, সবাই বলি ছোট বর্ধমান।' তোমাদের একটা পাড়ারও সমান নয়—এইটুকুতো গ্রাম। ঐ পুকুরের চারটে পাড় ঘুরলেই গাঁ দেখা হয়ে যাবে। ঘর কতক চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে আর সামন্ত—এই এখানকার বাসিন্দা। তবে সবাই চাষী-বাসী, জমি-জায়গা আছে কিছু সকলেরই। তাই গতর খাটিয়ে চাষ আবাদ করে পাঁচটা পাঁচরকম ফসল ফলিয়ে চলে যায় সবারই।

ঐ যে সামন্তরা—বিরাট চাষী, কয়েকশ' বিঘা জমির মালিক ওরা। চাটুজ্জে বাড়ুজ্জেদের এখন আর তত নাই। চাষবাসে গ্রামটা আগের থেকে কিছু উন্নত হলেও একটা বিষয়ে কিন্তু বেশ অবনত হয়ে পড়ছে। বিদ্যা বিষয়ে। আমাদেরই ছোট-বেলায় সংস্কৃতের বেশ চর্চা ছিল এখানে। দু-দুটো টোল ছিল এইটুকু গাঁয়ে—চাটুজ্জে টোল আর বাঁড়ুজ্জে টোল। আশ-পাশ কত জায়গার কত ছাত্র এসে থাকত এখানে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আচার্য ঘরেই, যাকে বলে—গুরুকুলে বাস, অন্তেবাসী আর কি। সেটি গেছে। ধন-দৌলত পয়সা কড়ির নেশা পেয়ে বসেছে আজকালকার মানুষকে—তাই বিদ্যার কদর নাই। গ্রামের লোক হয়ে পড়েছে বিদ্যা-বিমুখ, বেদরদী—টান নাই কিছু বিদ্যার ওপর। কাজেই দেখাশোনার অভাবে আর অবজ্ঞায় টোল উঠে গেছে।

এই তো গ্রাম—দেখবার কি আছে এখানে? সময়ও লাগবে না এমন কিছু। সেই যাবার সময় একবার ঘুরে গেলেই হবে। এখন খবরটা আরম্ভ করবার আগে একটু শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। চল দেখি ওদিকে।

বৈঠকখানার ভেতরে আসনপাতা, সামনে এক থালা মুড়ি, গুড় আর বড় বাটিতে গরম দুধ।

বললুম—এ কী করেছেন? খেয়ে এসেছি যে।

—আশ্রমের খাওয়া তো—সে হয়ে গেছে কোন সকালে। তারপর এতখানি আসতে আসতে ভস্ম হয়ে গেছে সব। নাও, নাও খেয়ে নাও মুড়ি কটি—বলে স্মৃতিরত্ন-মশায় বসলেন কাছে।

খাওয়া হলে হাত ধুয়ে এসে বসলুম বাইরে।

স্মৃতিরত্নমশায় বললেন— এইবারে আরম্ভ কর প্রথম খবর।

বললুম—সে কি? কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী বলবেন তো আপনি।

—এই তো ঠকে গেলে ভায়া—হাসতে হাসতে বললেন স্মৃতিরত্ন মশায়, চুক্তিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হতে চাই না এই বয়সে। আমি শোনাব, তুমি শুনবে এই তো? কিন্তু প্রস্তাবনা যে তোমার অংশে প্রথমেই। কি শুনবে না জানলে শোনাব কী?

সত্যিই ঠকে গেলুম বুড়োর কাছে। চটপট বললুম—প্রস্তাবনাটা আরম্ভ হচ্ছে, শুনুন। আচ্ছা, ঐ যে আশ্রমের স্বামিজী—দেহসৌষ্ঠবে পাঞ্জাবীর মত, রং কাশ্মীরীর মত, কথাবার্তা হাবভাব বাঙ্গালীর মত,—কোন দেশের লোক উনি? বেছে বেছে এখানেই বা আশ্রম করলেন কি করে?

শেষ টান দিয়ে হাতের হুঁকো দেয়ালে রেখে স্মৃতিরত্নমশায় সামনে বসে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ চুপ করে। মর্মভেদী হাহাকারের মত একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস। সংগে সংগে যেন সচকিত হয়ে বললেন—বাঃ বেড়ে মিলিয়েছে তো। চোখ দেখেই বুঝে-ছিলুম নজর আছে। তা তোমার মনে এ প্রশ্ন জাগল কেন?

বললুম—এমনিই। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি স্বামিজীর নাম, আশ্রমের কথা। দর্শন পেলুম অল্প কিছুদিন আগে। কাছে থাকবার সৌভাগ্যও হল মাত্র এই কদিন। তা যাঁর কাছে থাকতে হয়, তাঁর পরিচয়টুকু জানবার ইচ্ছে হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। সব পরিচয় না জেনে কারুর সংগেই থাকা উচিত নয়, অনেক সময় ঠকতে হয়—বললেন স্মৃতিরত্ন মশায়।

বাড়ীর ভেতর থেকে ছোট ছোট দুটি হাতে ধরে বড় এক ঘটি ঠাণ্ডা জল এনে খুঁটির কাছে রেখে গেল একটি ছোট মেয়ে।

স্মৃতিরত্নমশায় উঠে চোখে মুখে বেশ করে জলের ঝাপটা দিয়ে আলগোছে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেলেন। তারপর গামছায় মুখহাত মুছে শতরঞ্চে বসে জিজ্ঞেস করলেন—জল খাবে?

বললুম—না, এই তো খেলুম একটু আগে।

দু-একবার কেশে গলা ঝেড়ে স্মৃতি-রত্নমশায় বললেন—এইবার আমার পালা কেমন? পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী কিছুই নয়, এইখনেরই লোক তোমাদের স্বামিজী। এই চান্না গ্রামই ওর জন্মস্থান। এই বাড়ুজ্জে-পাড়াতেই ছিলেন কালীদা—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই ছেলে। পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈতৃক বাড়ী এখনও আছে। ওর বোন রানী ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার পেতে সাঁঝ সলতে দেখায় বাপের ভিটায়।

—স্বামিজীর কাকা—তাহলে আমার দাদু হলেন আপনি। একেবারে রত্নদাদু জমবে ভাল আমাদের মজলিসটা—বললুম হেসে হেসে।

চকিতে গম্ভীর হয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে মুখপানে তাকিয়ে বললেন—এই-টুকু বয়সেই খুব চালাক ছেলে তো তুমি। বেশ ফাঁস লাগাতে পার।

—ফাঁস আবার কোথায় লাগালুম?—জিজ্ঞেস করলুম শুকনো মুখে।

দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরে স্মৃতিরত্ন-মশায় বললেন—এই গলায়, ফাঁস আবার লাগায় কোথায়? বলেই হেসে ফেললেন হা-হা করে।

ধড়ে প্রাণটা এল। হাতে হাতে তালি দিয়ে বললুম—তবে তো ভালই হল, পালাতে পারবেন না কোথাও। আচ্ছা দাদু, স্বামিজী কি ছোটবেলায় শাস্ত্রটাস্ত্র পড়া-শুনো করতেন খুব আর কোথাও সাধু-সন্ন্যাসী এলে তাঁদের কাছে বসে থাকতেন, মানে—সাধুসঙ্গ করতেন খুব?

—মোটেই না, খেলাধুলো, মারামারি, দল পাকানো, দলের সর্দারী, গুণ্ডামি, ডানপিটেমিতে ছিল ওস্তাদ। খেলার মধ্যে খুব প্রিয় খেলা ছিল ডাণ্ডাগুলি আর হাডু-ডু-ডু। হাডু-ডু-ডুতে যে দলে খেলত সে দল জিততই। ওকে ধরে রাখবে কে? এত শক্তি গাঁয়ের কোন ছেলেরই ছিল না। লেখাপড়ার ধারে কাছেও ঘেঁসত না, ঐ যেটুকু না করলেই নয়—দায়সারা আর কি! তবে বুদ্ধি ছিল ক্ষুরের ধার। চৌকোশ ছেলে। আর খাওয়া? খেতে পারত খুব—যাকে বলে রাক্ষুসে খাওয়া। নিমেষে উড়িয়ে দিত ভোজের ভুধর। বৌদি বলতেন—এটি আমার মধ্যম পাণ্ডব। সত্যিই রূপে গুণে যতীন ছিল ভীমসেন।

তা—অভ্যাসো মূর্ধ্নিবর্তিতে— খেলার ঝোঁকটি এখনও যায় নাই। দিন কতক থাকলেই দেখতে পাবে—সাঁওতাল ছেলেদের ডাণ্ডাগুলি খেলাতে দেখলে তোমাদের স্বামিজীও ওদের মত হয়েই খেলতে আরম্ভ করবে—বলে চুপ করলেন রত্নদাদু।

বললুম—হ্যাঁ দাদু, বলুন না স্বামিজীর ছোটবেলার ডানপিটেমির দু-চারটে নমুনা। স্মৃতিরত্ন মশায় একবারে উঠে গেলেন বাড়ীর ভেতরে। তখুনি ফিরে এসে বললেন— বেলা হয়ে গেছে, সাড়ে দশটা। এখন আশ্রমে যাও। এগারোটার মধ্যে না পৌঁছলে তুমুল হয়ে যাবে। তখন ডানপিটেমির নমুনোটা টের পাবে হাতে হাতে। আজ আর নয়, যাও। কাল শনিবার, বিকেলে যাব বিশালাক্ষীতলায়। মজলিসটা বসবে সেখানেই।

বললুম—তাহলে কাল প্রথমে আপনা-কেই নাম-ভূমিকায় আসরে নামতে হবে। আমার প্রস্তাবটা সারা হয়ে রইল।

—ও বাবা, বিচ্ছু কম নও তো—কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন স্মৃতিরত্ন মশায়,—বুড়ো মানুষ যদি ভুলেই যাই, আর একবার বলতে দোষ কি? জানতো 'আবৃত্তিঃ সর্ব-শাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী?'

বললুম—তা আর জানব কেমন করে? সংস্কৃত শিখলুম কই শেখান যদি তো জানতে পারি। তবে আসরে নেমে পার্ট ভুল গেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়—এটা জানি।

অট্টহাসি হাসতে হাসতে দুজনেই নামলুম দাওয়া থেকে। ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখা আর হল না। রত্নদাদুকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি পা চালালুম আশ্রমের দিকে।

আশ্রমে পৌঁছতেই স্বামিজী বললেন—দেখলে চান্না গ্রাম?

বললুম—গ্রাম আর দেখলুম কই? দেখলুম গ্রামের মানুষ স্মৃতিরত্ন মশায়কে। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতেই বেলা হয়ে গেল। ঘুরে-ফিরে গ্রাম দেখা আর হল না।

স্বামিজী হাসলেন, বললেন—আলাপ হল বুঝি মনীন্দ্র স্মৃতিরত্নের সঙ্গে?

পণ্ডিত লোক, লেখাপড়ার চর্চা করেন বেশ। জানেনও অনেক কিছু, বলতেও পারেন তেমনি। ভালই হয়েছে আলাপ হয়ে। বলবার কইবার লোক পেলে একজন।

বেলা দুপুরে। নাওয়া খাওয়া বিশ্রামের পালা শেষ করে বিকেলে খাড়ি পেরিয়ে গেলুম নতুন গাঁয়ে বেড়াতে।

বট অশ্বত্থ শিমুল, পলাশ, বকুল, আম, জাম—বড় বড় গাছের ছায়াতলে এখানে ওখানে কতকগুলি মেটে ঘর। খুবই ছোট গ্রাম। মাঝে মাঝে বড় বড় বাঁশঝাড়। ফুলে ফুলে বাবলা গাছের গায়ে হলুদ।

গোয়ালাদের গ্রাম। ঘরে ঘরে বড় বড় গোয়াল। গোয়ালে গোয়ালে গাই বাছুর ষাঁড় বলদ মোষ। এক চক্কর ঘুরেই গ্রাম দেখা শেষ হল। ফিরতি মুখে ঢুকলুম প্রথম দিনে দেখা বৈরাগীর আখড়ায়।

আখড়াধাড়ী নরহরি দাস গোঁসাই—গোলগাল বেটেখাটো চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বড় বড় ভাবালু চোখ, নাকে কপালে চন্দনের তিলক-ফোঁটা, রসকলি।

ঢুকতে দেখেই—আসুন, আসুন, বসুন—বলে গোঁসাইঠাকুর কম্বলের আসন পেতে দিলেন দাওয়ায়। দাওয়ার ওপাশে সলতে পাকিয়ে সন্ধ্যে দেখাবার যোগার করছেন মা-গোঁসাই।

দাওয়ায় বসে গোঁসাইজীর সঙ্গে পরি-চয়ের আদান-প্রদান হতে হতেই তুলসী-তলায় প্রদীপ জেলে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে শাঁখে তিনবার ফু দিলেন গোঁসাই ঠাকরূন। 'রাধে রাধে' বলে গোঁসাইজী উঠে দেয়ালে ঝোলানো শ্রীখোল কাঁধে নিয়ে তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসলেন মাটিতে। পাশে বসে ঠুং ঠুং মন্দিরা বাজিয়ে সুললিত কণ্ঠে গোঁসাই ঠাকরুন ধরেন—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিনু
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়
গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
সব তুহু করবি বিচার
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ মাহির নহি জগছাড়

স্থানে লয়ে সমে অপরূপ। বাঙালী হৃদয় অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া, আর এখন বাঙালী হৃদয় অমিয় মথিয়া নিমাই এনেছে ধারা। তাই কীর্তন সহজেই বাঙালীর মন থেকে সমস্ত জ্বাল-জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে ভরপুর করে তোলে এক স্বর্গীয় ভাবাবেশে।

হরি হরি, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ—বলে প্রণাম করে উঠে গোঁসাইজী বললেন—একটু মহাপ্রসাদ পান।

গোঁসাই ঠাকরুন ছোট রেকাবে ক্ষীরের নাড়ু আর জলের গ্লাস নামিয়ে রাখলেন আসনের সামনে।

প্রসাদ পেয়ে বিদায় নিয়ে ফিরলুম আশ্রমে।

রাত্রে খাটিয়ার পাশে চৌকিতে বসে বলতে হল বেড়ানোর কথা।

স্বামিজী হেসে বললেন—কী গান শুনলে?

বললুম—পদাবলী কীর্তন— ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের গান।

—ঈশ্বর কি জান?—জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী।

এত বড় একটা প্রশ্নে থতমত খেয়ে বললুম—জানব কেমন করে? ঈশ্বরকে কি জানা যায়?

স্বামিজী গম্ভীর স্বরে বললেন—মানুষের জানার বাইরে কিছুই নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললুম—জানার বাইরে না হলেও বলার বাইরে তো হতে পারে। পড়েছি—"ততো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

জ্যোৎস্না রাত। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল অন্ত-র্ভেদী দৃষ্টিতে স্বামিজী চেয়ে রইলেন মুখপানে। একটু পরে হুঙ্কারের মত 'হু' বলে গড়গড়ায় মন দিলেন।

।। ছয় ।।

শনিবার।

প্রাতঃকৃত্য, প্রাতর্ভ্রমণ, প্রাতরাশ যথা-রীতি শেষ।

দক্ষিণের বারান্দায় বসেছি স্বামিজীর একটু তফাতে, যদি কিছু ফাই-ফরমাস থাকে।

রোজকার মত লোকজনের আনাগোনা। কত দুঃস্থ রোগী এল, কত গেল।—কেউ ওষুধ নিয়ে, কেউ বা ওষুধ পথ্য দুই-ই নিয়ে।

শুকনো মুখ হেঁট করে উঠোনে বসে আছে কজন গ্রামীণ চাষী কৃষাণ মজুর।

—কি রে, কি খবর, অমন করে বসে যে?—শুধোলেন স্বামিজী।

কজন রইল চুপ করে, কজন আমতা-আমতা করে বললে—কিছু টাকা চাই বাবাজী, নইলে চলছে না।

—যা যা রোজ রোজ টাকা নেই—বলে ধমক দিলেও উঠল কি তারা? বরঞ্চ দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে টিপি-টিপি হাসি চাপতে থাকল।

খানিক বকেঝকে প্রত্যেককে দরকার মত টাকা দিয়ে বললেন—দিবি শীগগির শীগগির, নইলে জানিস তো?

টাকা পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল সবাই।

ওষুধের বাক্স তুলে রাখা হল ঘরের ভেতর আলমারিতে।

এমন সময় লাল ডুরে গামছা পরা মংলা মাঝি দুভাজ করা কাপড় গা ঢেকে এসে স্বামিজীর সামনে উঠোনে বসে ফুঁকিয়ে

কুঁকিয়ে বললে—একটা টাকা দে মারাংজিকা (সন্ন্যাসী)। পরশু থেকে মেলারি জ্বর হইচে, দুদিন কাজে সেতে লারচি। মুখ-টোরও সোয়াদ নাই কিছু খেতে লারচি। ইদিকে প্যাটে খিদে তো লেগেছে খুব—তবু খেতে লারচি। মেঝেন গ্যাচে সামরায় আসবে হ বেলায়—পশ্চিম আকাশে দিগন্তের একটু ওপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে মংলা।—বেলা পাঁচটা হবে আর কি?

—তা মনে করচি চাড্ডি চাল ফুটিয়ে লিয়ে দাকা-দামাড়ি (ভাত-ফ্যান) খাই। ইদিকে চাল নাই যে ঘরে। তা একটা টাকা দে—চাল লিয়ে আসি।

—দূরে শালা, চাড্ডি চাল ফুটিয়ে লিয়ে দাকাদামাড়ি খাই। আঁচলে মুড়ি নিয়ে খা এখন, দুপুরবেলায় ভাত খেয়ে যাস—বলে গড়গড়ায় নল মুখে দিলেন স্বামিজী।

আঁচল ভরে মুড়ি আর পাতার ঠোঙায় গুড় নিয়ে চলে গেল মংলা।

গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে স্বামিজী বললেন—এই সব লোক—কৃষাণ মজুর। কেউ বা ভাগে, কেউ বা মাহিন্দরী মুনিশ খেটে চাষ করে। বর্ষায় ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে চাষ করে ফসল ফলায় এরা প্রচুর। কিন্তু পায় কি? চাষের খরচ-খরচা মালিকের পাওনা বাদে যা থাকে তাতে ছ' মাসের খোরাক জোটে। তা আর ছ' মাস খায় কি? বাঁচে কি করে? ঋণ কর্জ করে পরিবার পালন করতে হয় এদের—এইসব অন্নপূর্ণার সন্তানদরে।

—ওই দরিদ্র সাঁওতাল—অটুট স্বাস্থ্য, দিনমজুরী করে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দিন আনে দিন খায়। একটা দিন না খাটতে পারলে উপোশ যায়। এরাই চার-পঞ্চমাংশ দেশের লোক। আর এদের পরিশ্রমেই মজা মেরে ফুর্তি করে গাড়ী-ঘোড়া চড়ে বেড়ায়, রাজবেশ পরে, রাজভোগ খায়, অট্টালিকায় বাস করে দেশের এক-পঞ্চমাংশের দল—ধনিকের দল। আর সবার ওপরে শোষণ শাসন চালিয়ে রাজত্ব করছে বিদেশী বেনের দল। এই কী দেশ—এই কী দেশের মানুষ? কী তোমরা বলতে পার? মানুষ না পশু? জোয়াল ঘাড়ে করে লাঙ্গল টানছ আর দু-মুঠো খেতে পাচ্ছ।

সুজলা সুফলা শস্য-শামলা বাংলাকে তথা ভারতকে এমন নির্জলা, নিষ্ফলা দুর্ভিক্ষ-করালা কালিমাময়ী কঙ্কাল-মালিনী করে তুলেছে কারা বলতে পারো?

দু'চোখে আগুন জ্বালা, কিন্তু গলার স্বর বেদনা-বিধুরে—ধরা-ধরা।

এক লহমা মুখপানে চেয়ে হাঁটুর ওপর দুহাতের পাতায় মুখ ঢেকে বসলুম স্তব্ধ হয়ে। এই তো সে বছর গান্ধীজী এলেন বোলপুরে। কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে শুনলুম তাঁর হিন্দি ভাষণ। তারপর যেদিন খদ্দর পরা শিক্ষকমশায় জ্যোতির্ময় সরকার, ইংসেশ্বর রায় ও আরও কজন টীম-টাকাজী স্কুল ছেড়ে গড়ে তুললেন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গোলামী শিক্ষার স্কুল ছেড়ে দলে দলে ভর্তি হয়েছিলুম সেই প্রতিষ্ঠানে। তাঁদের সকলের কথা সে এরই প্রতিধ্বনি।

কে ইনি? আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসী না আনন্দ-মঠের মায়ের সন্তান?

কতক্ষণে চমক ভাঙল স্ত্রীলোকের কণ্ঠ-স্বরে। দেখি বছর আষ্টেকের ছেলে পচুকে কোলের কাছে বসিয়ে স্বামিজীর ছোট বোন রানী দেবী কথা বলছেন স্বামিজীর সঙ্গে।

ফেরবার সময় স্বামিজীর কথায় রানী পিসিমা সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমাকে চান্না-গ্রাম দেখাতে।

প্রথমেই তাঁর বাড়ী, অর্থাৎ স্বামিজীর পৈতৃক ভিটা বা জন্মস্থান। খড়ে ছাওয়া দোতলা মাটির বাড়ী, সামনে প্রশস্ত উঠোন। ঐ উঠোনেরই এক ধারে চালাঘর বেঁধে হয়েছিল স্বামিজীর আঁতুড়ঘর—বললেন রানী পিসিমা।

বাড়ীর সামনেই রাস্তা। রাস্তার ওপারে রেলিং ঘেরা সিমেন্টে বাঁধানো বেদি দেখে জিজ্ঞেস করতেই রানী পিসিমা বললেন—স্বামিজীর প্রিয় গাই কুন্দীর সমাধি ওটা। শিশুকাল থেকেই কুন্দীর দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিলেন স্বামিজী। স্বামিজী কুন্দীকে ভালবাসতেন যত, কুন্দীও স্বামিজীকে ভালবাসত তত। গরু হলে কি হয়—স্বামিজীর গলার স্বর কুন্দী যেমন বুঝতে পারত, তেমন আর কেউ নয়। স্বামিজী একবার 'কুন্দী' বলে ডাকলেই যত দূরে থাক না লেজ তুলে ছুটে আসত কুন্দী। বয়েসকালে কুন্দী মরে গেলে খুব ধুমধাম করে স্বামিজী ওর সমাধি দিয়েছিলেন ঐখানে।

সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে রানী পিসিমা দেখিয়ে দিলেন সারা গ্রামটি। চিনলুম মগেন, নগেন, অতুল সামন্তদের বাড়ী। দেখা হল সবারই সঙ্গে। আশ্রমে ফিরলুম বেলা এগারোটায়।

নাওয়া খাওয়ার পর বিশ্রাম। আর বিশ্রাম কতক্ষণে যে চারটে বাজবে। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি এমন সন্ন্যাসী বা সন্তানদের ছোটবেলার কথা শুনতে। অবশেষে চারটে বেজেছে কি না বেজেছে, ছুটলুম বিশালাক্ষীতলায়।

তখনও রোদের জোর কমেনি। আশ্রয় নিলুম শিমুল গাছের শীতল ছায়ায়।

খানিক পরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ঢুকে শিমুলতলায় নজর পড়তেই স্মৃতিরত্ন মশায়—এই যে ভায়া, কতক্ষণ আগমন হয়েছে? বলে বসলেন সামনে।

কিছু না বলে শুধু হাসলুম। তারপর নমস্কার করে বললুম—এবার পালা আরম্ভ হোক।

চাদরে মুখ-হাত মুছে আঁচল ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে স্মৃতিরত্ন মশায় বললেন—হবে, হবে,—এত ব্যস্ত কেন? এখনও ঢের বেলা। বুড়োমানুষ, এই গরমে এত-খানি আসা,—একটু জিরোই, থামো।

লজ্জিত হলুম। সত্যিই তো—আমারই বলা উচিত ছিল বিশ্রামের কথা।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর—আঃ—বলে সোজা হয়ে বসে সুর করে আরম্ভ করলেন—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ
ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ
শুন শুন মহাজন করে অবধান
তত্ত্বজ্ঞানী যতীন্দ্রের বাল্য-লীলা গান।

হো-হো খুব হেসে উঠে বললুম—জয়, কথক ঠাকুর মশায়ের জয়। তা কথকতাটা কি পয়ার ছন্দেই চলবে নাকি ঠাকুরমশায়?

খুব একচোট হেসে স্মৃতিরত্নমশায় বললেন—না, না সে ভয় নাই, শোন, গদ্য ছন্দেই শোন। ছোটবেলায় যতীন খুব সুন্দর ছিল—নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা, টকটকে রঙ, বড় বড় চোখ, হাসি হাসি মুখ, আধ-আধ কথা—যে দেখত সেই ভাল-বাসত, আদর করত। কিন্তু তখন থেকেই দুরন্তপনার অঙ্কুর গজিয়েছিল ওর মধ্যে। বছর দশ-এগারো বয়সেই তা ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গড়ন, ভীমের মত বুকপাটা, ষাঁড়ের মত কাঁধ, গোলাগোল লম্বা লম্বা হাত, ডাগর ডাগর চোখ ছেলেটিকে ভয় করত না এমন কেউ ছিল না গাঁয়ে।

বিদ্যাচর্চার পরিবেশে থেকেও লেখা-পড়ায় যতীনের মন ছিল না মোটেই। নাম-মাত্র দায়সারা গোছের স্কুলেই বেরিয়ে পড়ত ডাণ্ডাগুলি নয় হাড়ু-ডু-ডু খেলতে। হাড়ু-ডু-ডুতে তার দল জিতবেই। তাকে ধরে রাখবে কে? তাকে ধরে রাখার মত শক্তি ছিল না কারুরই। আর ডান্ডাগুলি? মারের চোটে তার গুলি এতদূরে গিয়ে পড়ত যে সেখান থেকে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়েও কোন প্রতি-পক্ষই তার ডান্ডার কাছে গুলি পৌঁছতে পারত না।

দল বাঁধতে আর দলের সর্দারি করতে যতীন ছিল এক নম্বরের ওস্তাদ। সর্দারের পদটা তো তার একচেটে—চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত। সব সময়েই সব দলের সর্দার সে। সমবয়সীদের তো বটেই, বয়সে বড় ছেলে-দের দলেরও সর্দার—যতীন। সর্দার বলে সর্দার — একেবারে জাঁদরেল সর্দার। সব্বাইকে তার হুকুম মেনে চলতেই হবে—যা বলবে তা করা চাই-ই। একটু এদিক-ওদিক হলেই তুমুল কাণ্ড। চড়-চাপড় কিল, ঘুঁশি, থাপ্পড়, গাঁট্টার ঠেলায় প্রাণ যায় আর কি।

চাটুজ্জে খুড়োর আমবাগানে গাছ-ভর্তি কাঁচা-মিঠে আম। যতীন চাইল গিয়ে খুড়োর কাছে। খুড়ো দু' ধমক দিয়ে তাড়ালেন ওকে। আর যায় কোথা—সন্ধ্যে-বেলা বাগানে গিয়ে গাছে চড়ে সমস্ত কাঁচা-মিঠে আম পেড়ে কতক খেয়ে কতক কোঁচড়ে নিয়ে ফেরার পথে বন্ধু-বান্ধব সঙ্গী সাথী চেনা অচেনা যাকে পায় তাকে বিলিয়ে বাকিগুলি নোংড়া জায়গায় ময়লার ওপর ফেলে দিয়ে ভাল ছেলেটি হয়ে ঘরে ফেরে যতীন। সকালবেলায়

বাগানে গিয়েই তো চাটুজ্জে খুড়োর চক্ষুস্থির। তাঁর অতিপ্রিয় কাঁচা-মিঠে গাছে আম নেই একটিও। বুঝতে আর বাকি রইল না—ঐ দস্যিটারই কান্ড।

সেদিন থেকে ঐ দস্যিটা কারুর কাছে কিছু চাইলে আর 'না' বলত না কেউ।

কদিন থেকে ভুগে ভুগে ডোমপাড়ার ডোম বুড়ো মরেছে। তিন কুলে কেউ নাই তার। সৎকার করবার লোকের অভাব। বামুন পন্ডিতের গাঁ—ডোমের মড়া ছোঁবে কে? বেলা পর্যন্ত মড়া পড়ে আছে ঘরে। দস্যি যতীন দল বল জুটিয়ে নিয়ে গেল ডোমপাড়ায়। সমাজপতিরা হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন—সে কি রে, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে শূদ্রের মড়া, ডোমের মড়া ছুঁবি? জাত জন্ম খোয়াবি নাকি?

যতীন বড় বড় চোখ লাল করে সমাজপতিদের মুখের ওপর কাট্ কাট্ করে বলে উঠল—মড়ার আবার জাত কি? খিদে তেষ্টা গেল, বাহ্যে পেচ্ছাব গেল, কাজকর্ম গেল, মন গেল, প্রাণ গেল আর জাতটাই শুধু আঁকড়ে ধরে রইল মড়াটাকে? মড়ার জাত থাকে না, যারা মড়া পোড়ায় তাদের জাত যায়ও না। যাও, যাও, সরে পড়। অত বামনাই ফলাতে হবে না তোমাদের। তোমরা মড়া টেনে ফেলে দেব ভাগাড়ে, চিল শকুনি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, দেখব তখন বামনাই বাসা বেঁধে থাকে তোমাদের দেহের কোনখানটায়।

পালাতে পথ পান না সমাজপতিরা।

দেহে যেমন বল—যতীনের মনেও ছিল তেমনি দুর্জয় সাহস। ঐ যে দেখছ বাগানটা গাঁয়ের থেকে একটু দূরে, ওটা ভুত-বাগান। সবাই বলত—ঐ বাগানে গেছোভূত আছে গাছে গাছে। কত রকমের ভূত—ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, একঠেঙো—সব। পেত্নী শাকচুন্নীরও অভাব নাই। কতজন দেখেছে—রাত্রে গাছে গাছে শাদা কাপড় মেলে দিতে, কতজন শুনেছে—নাকি সুরে কত কথা কইতে। রাত্রে তো দূরের কথা। বিকেল হলে ও পথ মাড়াত না কেউ। প্রবাদ ছিল—

আগুন গোড়ালি, পাছু পা
হাড্ডি সার করাল হাঁ
কোটর চোখে আগুন জ্বলে
যাকে পায় ঘাড় মটকে
রক্ত গেলে।

—তা কি করে যায় বল—ও পথে?

এগারো বছরের যতীন শুনেছে সব। ভূত কত অদ্ভুত কাজ করে তাও শুনেছে সে। সখ হল ভূত ধরবে। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ হল রাত্রে তারা যাবে কি না তার সঙ্গে ঐ ভূত বাগানে ভূত ধরতে। বাপরে—শুনেই তো সব মূর্চ্ছো যাবার যোগাড়—তা আবার সঙ্গে যাওয়া। কেউ রাজী হল না। তবে? তবে তো বয়েই গেল। ভয়ডরের বালাই আছে কি ডাকাবুকো ছেলেটার বুকে? "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে। একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবারই অলক্ষ্যে যতীন একলা বেরিয়ে পড়ল গভীর রাতে অন্ধকারে। সারা রাত ভূতের সন্ধানে ঘুরে বেড়াল ঐ ভূত বাগানে। সকালবেলায় বাড়ী গিয়ে সবাইকে ডাক ছেড়ে বলল—যাঃ যাঃ, যত সব বাজে কথা, ভূত-টুত নাই। কত খুঁজলাম—একটারও দেখা পেলুম না। পেলে ধরে এনে দেখাতুম সবাইকে।

শক্তি, সাহস আর দুরন্তপনার কথা শুনলে, এবার শোন খাওয়ার কথা।

যেমন ভীমের মত চেহারা, অসুরের মত শক্তি যতীনের খাওয়াটিও ছিল রাক্ষসের মত।—একেবারে বক রাক্ষস। ভোজ্যের ভূধর উড়িয়ে দিত নিমেষে।

একবার গরুর গাড়ী বোঝাই কাঁঠাল বিক্রি করতে এসেছে বেপারীরা। গাছতলায় গাড়ী নামিয়ে পথে বসে বেচছে বড় বড় কাঁঠাল—এক একটার ওজন আধ মণ থেকে এক মণ পর্যন্ত। দাম—এক আনা আর দু আনা। যতীন খানেওলা ছেলে—দেখে শুনে তো নোলায় জল। এক ছুটে বাড়ী গিয়ে পয়সা চাইল মায়ের কাছে। খাবার লোক কোথা বাড়ীতে? শুধু মা আর ছেলে, বাবা থাকেন কর্মস্থলে—বাহরে। মাত্র দুজন খেতে—বড় কাঁঠাল কি হবে? মা এক আনা পয়সা দিলেন একটা আধমণি কাঁঠাল কিনে আনতে। যতীন কাঁঠাল কিনে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ীতে। নাকের কাছে পাকা কাঁঠালের ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ—নোলা সামলানো দায়। ডান হাতে খানিকটা ছাড়িয়ে একটার পর একটা কোয়া মুখে ফেলতে ফেলতে চলেছে যতীন। কিন্তু যাওয়ার গতিবেগের চেয়ে যে খাওয়ার গতিবেগ বেশি। কাজেই বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছতে আধমণি কাঁঠালের বাকি রইল মাত্র ছটি কোয়া। এখন হুঁশ হল ছেলের—কী যাঃ—মায়ের জন্যে? খাওয়া বন্ধ হল। তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে খোসাসমেত ঐ ছটি কোয়া মায়ের হাতে দিয়ে বললে—এই রইল মা, তোমার জন্যে।

মা খুব খুশিই হলেন—যতীন তাঁর খেতে পারে কেমন? না খেতে পারলে কি শরীরে শক্তি হয়? আবার ভয়ও হল—যদি হজম করতে না পারে? মা তাড়াতাড়ি দুটো পাকা কলা খেতে দিলেন ছেলেকে। কাঁঠাল কলায় জীর্ণ। আর কলায় জীর্ণ—ওর আবার ওষুধ, ওর আবার বিরেচক। যতীনের জঠরাগ্নিতে যা আহুতি পড়বে তাই ভস্মসাৎ।

আর একটি মজার খাওয়ার কথা শোন। বছর-দুই পরে—বছর-তেরো বয়স হবে যতীনের। কে বলবে তেরো বছরের—আঠারো বছরের মস্ত জোয়ান। কাকুতি-মিনতি, বকুনি-ঝকুনিতে কোনরকমে এখানকার পড়া শেষ করে যতীন ভর্তি হয়েছে বর্ধমান রাজস্কুলে। থাকে বোর্ডিং-এ। শিক্ষকমশায়রা বলেন—বয়স লুকিয়ে ভর্তি হয়েছে আঠারো বছরের ছেলে। মিথ্যে বলবার মিথ্যে সইবার ছেলেই নয় যতীন। পরের রবিবারে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে শিক্ষকদের চোখের সামনে মেলে ধরল জন্ম-পত্রিকাখানা।

বিস্ফারিত চোখে শিক্ষকমশায়রা এক বাক্যে বললেন—সাবাস বীর, হিরোয়িক ফিগার—মহাবীর হবে যতীন।

তা—শিক্ষকদের কাছে মহাবীরের বীরত্বের পরিচয়টা শোন।

বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট একজন শিক্ষক। তিনি জানেন সব ছেলেদের চেয়ে যতীন খায় একটু বেশি। যা রান্না হয় রাঁধুনীও যতীনের পাতে দেয় সবার চেয়ে একটু বেশি। আর আর ছেলেরা আড়-চোখে দেখে আর ফিসফিসিয়ে বলে—বনপার্বের ভীমসেন, কেউ বা বলে বক রাক্ষস। কানে গেলেও তোয়াক্কা করে না—হেসেই উড়িয়ে দেয়। তবে বেয়াড়া রকমের কিছু হলে দু একটা কিল ঘুঁষি। সঙ্গীরা তাকে ভালবাসে যেমন ভয়ও করে তেমনি।

অঘ্রান মাস—শনিবার। সোম মঙ্গল নবান্নের ছুটি। শনিবার হাফ স্কুল করে ছুটির পর বাড়ী যাবে সবাই। বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট শিক্ষক মশায়ের বাড়ী বীরভূম জেলায় বোলপুরের কাছাকাছি কোথাও হবে আর কি। বাড়ীতে নবান্ন—শিক্ষক মশায় এক কাঁদি পাকা কলা, এক হাঁড়ী ক্ষীর আর এক হাঁড়ী রসগোল্লা কিনে বোর্ডিং-এ রেখে গেছেন। স্কুলের ছুটির পর এসে নিয়ে যাবেন বাড়ী। সব দেখে যতীন গেছে স্কুলে। গেছে তো গেছে—পড়ায় কি আর মন বসে? ছুটির আধঘন্টাটাক আগে পায়খানা যাবার ছুতোয় ছুটি নিয়ে সটান বোর্ডিং-এ।

তারপর আর বলতে হয়? নবান্নের সমস্ত উপকরণগুলি জঠরাগ্নিতে আহুতি দিয়ে স্টেশনে গিয়ে খানা জংশনের গাড়ী ধরে একেবারে চান্নায় পাড়ি।

স্কুলের ছুটির পর আনন্দের হৈ হুল্লোড়ে বোর্ডিংবাসী ছাত্র শিক্ষক সবাই এলেন বোর্ডিং-এ। ঘরে ঢুকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট শিক্ষক মশায়ের তো চক্ষু ছানাবড়া। কলার কাঁদিতে শুধু এক কাঁদি খোসা, আর ক্ষীর রসগোল্লার হাঁড়ি চাটাপোঁছা। কার এ কাজ? নিশ্চয়ই ঐ ষোল নম্বরের রাক্ষসটার। কোথায় গেল সেটা? আর কোথায় গেল? শিক্ষক মশায় আবার বাজারে ছুটলেন ট্রেনের আগেই সব কেনাকাটা করতে।

বোর্ডিং-এ যতীনের সিট নম্বর ছিল—ষোলো।

(ক্রমশঃ)

কুলু মানালির পথে

নির্মল দত্ত

যাত্রা শুরু ঃ

কুলু-মানালি যেতে আগের দিনই বাসের আসন সংরক্ষিত করে রাখতে হয়। তাই সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম হোটেল থেকে।

তখন সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগ। সিমলায় বেশ শীত পড়তে শুরু করেছে। দীর্ঘ লাইন পড়েছে সংকীর্ণ পরিসরের টিকিট ঘরের সামনে। বিভিন্ন রুটের যাত্রী সবাই। কুলুর রুটের যাত্রীও আছে। তবে কম। তাই সঙ্গে সঙ্গেই রিজার্ভেশন পাওয়া গেল। টিকিট অবশ্য পরদিন বাসে উঠে তবে কাটতে হবে।

সকাল আটটায় বাস ছাড়বে। শীতের দেশের বেলা। তাই সকাল হতে না হতেই আটটা বেজে যায়। আগের দিন কুলি বলে রেখেছিলাম। রাত্রে জিনিসপত্র অধিকাংশই গুছিয়ে রাখা হল। পরদিন অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়ে উঠেই হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করে বেরিয়ে পড়ি কুলির পিঠে মালপত্র চাপিয়ে।

বাসস্ট্যাণ্ডে বাস খুঁজে বের করতে আর এক ঝামেলা। বাসের যে-নম্বর রিজার্ভেশন টিকিটে লেখা ছিল, সে-বাস তখনও এসে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছায় নি। বাস এল আটটার একটু আগে। কুলিরা বাসের মাথায় মালপত্র তুলে দিল। আমরা টিকিটে রিজার্ভেশনের নম্বর দেখে সিট নম্বর খুঁজে বের করে তাতে উঠে বসলাম।

যথাসময়েই বাস ছাড়ল। পাহাড় ঘুরে ঘুরে পথ। সিমলা শহরকে কখনও বা পাশে, কখনও বা সামনে, কখনও বা পেছনে রেখে বাস ছুটে চলল। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সিমলা শহর। এখন শুধু পাহাড়। আর পিচঢালা পাহাড়ী পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ী মানুষের দু একটি ঘরবাড়ী কোথাও বা ছোটখাট পাহাড়ী জনপদ।

যাত্রী আমরা মোট সওয়া ছ'জন। মিঃ হসন্ত পাকড়াশি, মিসেস পাকড়াশি অর্থাৎ আমাদের হেমাদি, তাঁদের কন্যারত্ন রিনি আর হেনাদির বোন বিপাশা। তার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশীয় এক দম্পতী মিঃ ও মিসেস মিশ্র এবং এই লেখক নিজে। রিনির বয়স বছর চার পাঁচ। তাই তাকে সওয়া জনই ধরে নেওয়া হয়েছে। সিমলায় উত্তরপ্রদেশীয় এই দম্পতীটি আমাদের সঙ্গী হয়েছেন।

বাস একটু এগুবার পরই সকলের যেন একটা খাই-খাই ভাব। সঙ্গে আপেল, কলা, পাউরুটি আর সন্দেশ ছিল। যার যেটা ইচ্ছে নিয়ে নিল। আমি ছুরি নিয়ে আপেল কাটতে যাচ্ছি, বিপাশা হাত থেকে আপেলটি কেড়ে নিয়ে বললে—আমি কেটে দিচ্ছি।

রিনি মিষ্টি পছন্দ করে না। বিপাশা ভালবাসে না পাউরুটি। কিন্তু আপেলে আপত্তি নেই কারো। আমার তো নেই-ই। আর আপেল এখানে পর্যাপ্ত। বাংলাদেশের আমের মত। অন্য জিনিসের চেয়ে আপেল খাওয়াও ভাল। আবার দামেও সস্তা। তাই আপেল সঙ্গে নিয়েছিও যথেষ্ট। তবে কুলুতে নাকি আপেল আরও ভাল, আরও দাম কম। বাংলাদেশে আপেল তো আর যথেচ্ছ খাওয়া যায় না। তাই এখানে এসে আপেলের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিচ্ছি।

হেনাদি আমায় উদ্দেশ্য করে বললেন—উনি ডাক্তার মানুষ তো! স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য বেশী। তাই শুধু আপেল খাওয়ার ঝোঁক।

—তা তো হবেই। টিপ্পনী কাটল বিপাশা।

পর পর অনেকগুলি আপেলের সদ্ব্যবহার করল সে। শুধু আমাকেই নয়, সকলকেই দিল।

বিলাসপুর-গোবিন্দসাগর ঃ

এমনি করে দুপুরে নাগাদ বিলাসপুরে এসে গেলাম। এইখানে বাস অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। বাসস্ট্যাণ্ডে বাথরুম, বিশ্রামাগার প্রভৃতি সবই আছে। দুপুরের আহার সেরে নেবার জন্যে বাস এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ায়। হোটেল-দোকানপাটও আছে। হোটেলে আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ রসদ আমাদের সঙ্গেই ছিল। শুধু দোকান থেকে কিছু পুরি বা লুচি কিনে আনলাম। তারপর বিশ্রামাগারে বসে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে নেওয়া হল।

গোবিন্দসাগর জায়গাটিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য করে তুলেছে মনোরম। পাহাড়ের গায়ে নীলাভ জলাশয়টির ধারে বেড়াবার লোভ সামলাতে পারা গেল না। যেটুকু সময় হাতে ছিল, তার মধ্যে ঘুরে নিলাম এর আশেপাশে। উত্তরপ্রদেশীয় দম্পতীটিকে দেখি, তাঁরা এখানে বসে আছেন। তাঁরাও টিফিনক্যারিয়ার খুলে আহার করছেন আর গল্প করছেন। আমাদের দেখে উভয়েই হাসলেন। মিঃ মিশ্র বললেন—আইয়ে।

এবার ওঁদের একটু পরিচয় দিই।

ওঁরা বিয়ে করেছেন সম্প্রতি। বিয়ের পর এই ওঁদের প্রথম বেড়াতে বেরুনো। মিঃ মিশ্র দিল্লীতে চাকরি করেন। তাঁর স্ত্রীও এক স্কুলের শিক্ষিকা। উভয়ে বেশ আলাপীও। মিসেস মিশ্রের সঙ্গে হেনাদির বন্ধুত্ব বেশী জমে উঠেছিল। কারণ হেনাদিও তো একই ডিপার্টমেণ্টের লোক—অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের।

ওদিকে বাস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। বাসের দিকে সকলে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলাম। ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। আমরা উঠে বসলাম নিজের নিজের সিটে। অনেকে হোটেল থেকে ছুটতে ছুটতে এসে উঠলেন বাসে।

বাস ছাড়ল। গোবিন্দসাগরের গা দিয়ে দিয়ে পথ। বিলাসপুরকে পেছনে রেখে বাস ছুটেছে। ভাখরা বাঁধেরই একটি অংশ গোবিন্দসাগর। এক কথায় গোবিন্দসাগর হল ভাখরার একটি রিজার্ভার। পাহাড়ে মাঝে এই জলাশয়, আর তার গা ঘেঁষে

বিলাসপুর শহর। নতুন গড়ে ওঠা জনপদ। এই রিজার্ভারের শতদ্রু আরও আগে—কীর্তিপুর থেকে।

সুন্দরনগর :

এবার সুন্দরনগর। সার্থক নাম। সৌন্দর্যে ভরে আছে সমগ্র সুন্দরনগর। বাস যখন সুন্দরনগরে এসে ঢুকল, তখন মনে হচ্ছিল, আমরা যেন শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে এসে পড়েছি। চারপাশে পাহাড় আর তার মাঝে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। আর সেই ভূমিতে শুধু ধানের চাষ। ধানের সোনালী শিষে সুন্দরনগর যেন গর্বে আত্মহারা। ও যেন আপনাতে আপনি বিকশিত হবে উঠেছে। এধার-ওধার ছোটখাট স্বচ্ছ জলাশয় আর ঝরণার জলের স্রোত বয়ে চলেছে সমগ্র এলাকা জুড়ে। এত জলের সুবিধা আছে বলেই চাষবাস এখানে ভাল। পাহাড়ী আর সমতলভূমির এ এক মিলনক্ষেত্র। অর্থাৎ পাহাড়ী ঝরণার জল আর সমতলভূমির চাষের সুবিধা, দুটোই এখানে রয়েছে।

বিপাশা আনন্দের আতিশয্যে যেন নিজেকে একেবারে হারিয়েই ফেলল। হঠাৎ আমাকে যেন প্রায় জড়িয়ে ধরেই বলল—বাঃ রে, কি সুন্দর! অপূর্ব!

হেনাদি বললেন, পাহাড় দেখতে দেখতে হঠাৎ শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির মত এই দৃশ্য সত্যিই চোখের সামনে এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করে ধরেছে।

বসন্তবাবু খুব রসিক হলেও বাইরে একটু গুরুগম্ভীর। বললেন শুধু, গণ্ডগ্রামের মেয়েদের দেখতে দেখতে হঠাৎ যদি সুসজ্জিতা শহরের মেয়ে চোখে পড়ে—তাহলে তাকে যেমন ভাল লাগে—এও ঠিক তাই।

বিপাশা বললে—কিন্তু গণ্ডগ্রামের মেয়েদের যে স্বাভাবিক রূপ আছে, তা অস্বীকার করতে পারবেন না। তার ওপর মাজাঘষা করলে তার রূপ কিছু উজ্জ্বল হয়—এও তাই।

বললাম—বিপাশার উপমা কালিদাসসম।

বিপাশা ভ্রূ কুঁচকে বললে—যাঃ!

হো-হো করে হেসে উঠল সকলে।

সুন্দরনগর পার হয়ে আবার সেই পাহাড়ী পথ। তবু রুক্ষতা কম। কারণ, এখানে যেমন আছে পাহাড়—তেমনি আছে নদনদী, গাছপালা, ফুল, সমতলভূমি। বিলাসপুরের পর থেকেই আমাদের পাশে পাশে চলে আসছে শতদ্রু। খুব একটা উত্তাল স্রোত নয় শতদ্রুর এখানে। শান্ত বললেই চলে।

মাণ্ডি :

সুন্দরনগর ছেড়ে আমরা মাণ্ডিতে এসে পৌঁছুলাম। মাণ্ডি বাসের জংশন স্টেশন। এখান থেকে বিভিন্ন পথে বাস চলাচল করে। কুলু-মানালি ছাড়াও পাঠানকোটেও যায় বাস এখান থেকে। পাঠানকোট থেকেও তাই কুলু যাওয়া যায় বাসে—সেও মাণ্ডি হয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া ন্যারো গেজের ট্রেনে পাঠানকোট থেকে যোগীন্দরনগর এসে সেখান থেকে বাসে কুলু। বাস এখানে বদল করে কুলুর বাসে উঠতে হবে। স্ট্যাণ্ডে বাস থাকতেই কুলির দল এসে ভিড় করে দাঁড়াল। মালপত্র নামাল তারা বাসের মাথা থেকে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম মালপত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে। তারপর সেগুলি ওঠানো হল আর একটি বাসে। বড় অব্যবস্থা এই বাসস্ট্যাণ্ডে। বিপাশা আর রিনিসহ হেনাদি এবং মিঃ ও মিসেস মিশ্রকে বাসে বসিয়ে রেখে আমি আর বসন্তবাবু স্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে বেরুলাম মাণ্ডি জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে। বিপাশা চেঁচিয়ে বললে—দাঁড়ান,
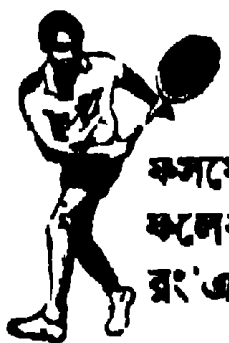
পাহাড়ের ধাপে ধাপে বাড়ী-ঘর—কুলুর নয়নাভিরাম দৃশ্য।

আমিও যাব। বিপাশা একরকম ছুটে এসেই আমাদের সঙ্গ নিল।

গল্পগুজবে একটু এধার-ওধার পায়চারি করে আবার বাসে এসে উঠি। বাস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। বেলা প্রায় তখন দেড়টা বেজে গিয়েছে।

আমি আর বিপাশা যে-সিটে বসে, ঠিক তার পেছনেই বসেছেন মিঃ ও মিসেস মিশ্র। এবার ওঁরা খুব খুশী। আমাদের ঠিক কাছেই বসতে পেরেছেন বলে। আগের বাসে ওঁরা সিট পেয়েছিলেন একেবারে পেছনের দিকে। আমাদের অপর পাশের সিটে হেনাদি আর বসন্তবাবু। কাজেই এবার কথায় কথায় পথ চলার ভারি সুবিধে। তবে জানালার দিকে বসার জন্যে কাড়াকাড়ি সবারই। বিপাশা ছাড়বে না। আমাকে সরিয়ে নিজে বসল জানালার দিকে। বিপাশার জন্য জানানো আদীম সব জানালার দিকে বসুক এই ঠিক হল। কাজেই ঘুরে-ফিরে আবার বসা হল। জানালার ধারে বসেই বিপাশার প্রথম কাজ শুরু হল আপেল কাটা দিয়ে। কেটে কেটে সবাইকে দেয় ও। মিসেস মিশ্র কলাকন্দ বের করে খাওয়ালো আমাদের। কলাকন্দ এ অঞ্চলের নামকরা মিষ্টি।

এবার কুলুর পথে চলেছি আমরা। মাণ্ডি পেরিয়েই প্যাণ্ডোয়ায় ঝুলন্ত ব্রিজ পার হতে হল বাস থেকে নেমে। খালি বাস পার হল। ব্রিজ পার হয়ে আবার চাপতে হল বাসে।

বিপাশার ওপর এই ঝুলন্ত ব্রিজ। এই ব্রিজ বা সেতুকে ঘিরে সুন্দর একটি জনপদ আর বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের তৎপরতা এপাশে-ওপাশে। বিপাশা শুরু হয়েছে মাণ্ডির আগে থেকেই। সেখানেই মিশেছে শতদ্রু আর বিপাশা! একটি নদ, আর একটি নদী। নদ আর নদীর এই মিলন—এ যেন প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ লীলা। সে কোন্ অনাদিকাল আগে কে জানে, এই মিলনের আকর্ষণে শতদ্রু আর বিপাশা একদিন ছুটে এসেছিল মিলনের আশায়। এই লীলাভূমিতে পাতা হয়েছিল হয়ত বাসরশয্যা। সেই মিলন-বাসর আজ এদিনেও প্রাণ ভরে দেখে নিলাম আমরা। মিটল চোখের পিপাসা।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি।

বিপাশা বললে—কি ভাবছেন?

বললাম—ভাবছি, মিলন না হলে তার সার্থকতা নেই। আর দেখছি জগতের বিশালতা—এ দেখার যেন শেষ নেই, দেখেও যেন তৃপ্তি নেই।

হেনাদি বললেন—ডাক্তারের কথাটা ভাল কিন্তু স্পষ্ট নয়। তাই সকলের পক্ষে বোঝা শক্ত।

বিপাশা বললে—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ দিদি, ওঁর কথা বোঝার চেয়ে না-বোঝাটাই যেন আরও স্পষ্ট।

বসন্তবাবু বাধা দিলেন—থাক, আর লাভ নেই কথা বাড়িয়ে।

পথের একপাশে পাহাড়, অন্যপাশে বিপাশা নদী। বিপাশা কত সুন্দর এখানে। পাথরে ভরা নদী। আর বিপাশার জল যেন সেই পাথরের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অনেক বাধা অতিক্রম করে প্রবল শক্তিতে আর গর্জনে কলকল ধ্বনি তুলে এগিয়ে চলেছে। বিপাশা কোথাও ক্ষীণ, কোথাও বিস্তীর্ণ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট-বড় অসংখ্য ঝরণার জল এসে পড়ছে হু/হু। বিপাশা যেন এখানে এক আরাধ্যা দেবতা—সে তার আপন ছন্দে, আপন গতিতে, আপন ভঙ্গিমায় তাথৈ নৃত্য করে চলেছে—আর ভক্তের দল এসে একে একে তাতে করছে নৈবেদ্য সমর্পণ। কুলুর এই পথটি কি অপূর্ব। বিপাশাকে পাশে রেখে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে বাস। পাহাড়ের মাঝে মাঝে সরকারী কৃষি আর বনবিভাগের অফিস। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ধানের গাছ, তাতে ধানের শিষ। পাহাড়শ্রেণী যেন থরে থরে সাজানো। মাঝে মাঝে একটু সমতল জায়গায় ধান ছাড়াও ভুট্টো, কপি, টম্যাটো, লঙ্কা, কুমড়ো, ভেণ্ডি এমনি নানান ধরনের তরিতরকারির গাছও চোখে পড়ে। তা ছাড়া আপেল গাছ তো আছেই।

বিপাশা একমনে সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। হেনাদিরাও নীরব। দৃষ্টি তাদের বাসের বাইরে। মিঃ ও মিসেস মিশ্র-দেরও বেশ সৌন্দর্যবোধ আছে। একটা করে সুন্দর দৃশ্য দেখে আর দুজনে তা নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়ে।

বিপাশাকে বললাম—আপেল কাটলে না?

সে উত্তর দিল—এখন আর নয়! এই দৃশ্য দেখে আপেল কাটার দিকে মন আর যাচ্ছে না।

সকলেই নিমগ্ন বাইরের দৃশ্যে। কাজেই খাওয়ার দিকে মন নেই আর কারোরই।

ভুন্টুর :

বাস ভুন্টুরে এসে থামতেই সে কি ভিড়! বাসে আর জায়গা হয় না—এমন অবস্থা। অবশ্য এ জায়গাটাও অনেকটা সমতল। তাই এখান থেকে বাসে দাঁড়িয়েও যাওয়া চলে।

যাত্রীরা সকলেই প্রায় স্থানীয় অধিবাসী পাহাড়ী। এদের মধ্যে উঠলেন এক দম্পতী। ভদ্রলোকের স্ত্রীটি বোধহয় পাঞ্জাবী। কপালে সিঁদুর, মাথায় ওড়না, সালোয়ার সাজপোশাক—[illegible] নিরাভরণও আছে, তবে অপূর্ব সুন্দরী। ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে স্ত্রীকে সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত। কোথায় বসবেন, কোথায় দাঁড়ালে কোন ধাক্কা না লেগে নিরাপদে যেতে পারেন—এই চেষ্টা। জায়গা অবশ্য বধূটি একটা পেলেন। তবে পাহাড়ী এক বৃদ্ধা রমণীর পাশে। সে এক দৃশ্য! পাশাপাশি দুজনের এক বৈচিত্র্যের দৃশ্য।

কুলু :

বিপাশা পাশে পাশেই চলেছে। বাস যখন কুলুর সমতল ভূমিতে নেমে এল, বিপাশা তখনও পাশে। কুলু বড় একটা উপত্যকা—অনেকখানি জায়গা জুড়ে সমতলভূমি। তার চারপাশেই পাহাড়। পশ্চিম পাহাড়ের নীচ দিয়েই বিপাশা বয়ে চলেছে পাথরে আছাড় খেতে খেতে। এখানে বিপাশার একপাশে পাহাড়—অন্য পাশে কুলুর এই সমতলভূমি।

আমরা যখন কুলু পৌঁছুলাম, সন্ধ্যা হতে তখনও বেশ দেরি আছে। কুলুর অধিবাসীদের একদল সামনের মাঠে বাজনা বাজিয়ে সঙ্গে তাদের এক আরাধ্য বিগ্রহ

নিয়ে নাচগান করে উৎসবে মেতেছে। দশেরা উৎসবের এই নাকি সূচনা।

সিমলার পর্যটন অফিস থেকে আমরা এখানে ট্যুরিস্ট বাংলোয় স্থান পাওয়ার জন্যে একখানা চিঠি এনেছিলাম। তা ছাড়া ঘর রিজার্ভেশনের জন্যে আগে থাকতে ইণ্টিমেশনও দেওয়া হয়েছিল সিমলার অফিস থেকে। কিন্তু এখানে এসে দেখি, সে ইণ্টিমেশন এখানে এসে পৌঁছায় নি। ট্যুরিস্ট বাংলোয় স্থান নেই—সব ভর্তি। কাজেই বেসরকারী একটি গেস্ট হাউসে স্থান যোগাড় করে নিতে হল। শুধু থাকার ব্যবস্থা সেখানে—খাওয়ার ব্যবস্থা হোটেলে করে নিতে হবে। অগত্যা মধুসূদন! মিঃ ও মিসেস মিশ্রও গেলেন তাঁদের জানাশোনা কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ীর খোঁজে। তাঁরা ওখানেই আশ্রয় পেয়েছেন বলে খবর দিয়ে গেলেন। খানিক পরে দেখি, ভুণ্টারে দেখা সেই সুন্দরী বধূটি আর তার স্বামীও গুটি গুটি এসে উপস্থিত হলেন এখানে। কুলিরা মালপত্র তুলে দিল আমাদের। কুলি নিয়ে সমস্যা সর্বত্রই—কি হাওড়া স্টেশন, কি কলুর বাসস্টান্ড। দুজন কুলির মত তিনজনে নিয়ে এসে প্রতিজনের দেড়টাকা হিসাবে সাড়ে চার টাকা চায়। সামান্য কয়েক গজ পথ বাসস্ট্যান্ড থেকে গেস্ট হাউস, তাই দেড় টাকা করে কুলি, তার ওপর আবার একজন বেশী। কাজেই ওদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি। শেষে তিন টাকা দিয়ে মিটমাট। এই সব জায়গাতেও ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে দাঁও মেরে নেওয়াতে এখানকার কুলিরাও বাদ নেই। তবে সাধারণ মানুষ এখানকার নিজেদের মত স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে— শান্তিপ্রিয়ও এরা। সিমলার অধিবাসীরা খুবই ভদ্র। আমাদের গেস্ট হাউসের মালিককে দেখে সে কথা স্পষ্টই মনে হয়েছে এবং অন্যান্যদেরও যাদের দেখেছি পথে-ঘাটে তাদেরও।

একটু পরেই সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে ঝাঁটা হাতে ঘর ঝাঁট দিতে এল আমাদের। মেয়েটি ভারী সুন্দরী—তাছাড়া হাসিখুশীও খুব। এই বাড়ীর গেস্ট হাউসের মালিকের কন্যা। প্রথমে এসে কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল আর আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—কি, ঘর ঝাঁট দিতে হবে?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। বিপাশা বললে— তবে ঝাঁট দাও। মেয়েটি ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করল। তারপর খাবার জল এনেও রেখে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আমরা নীচেই সামনের ওই বাড়ীটাতে থাকি। দরকার হলে ডাক দেবেন। আমার নাম সরযূকুমারী।

গেস্ট হাউসের মালিক ভদ্রলোক সামনের ওই ছোট বাড়ীটাতে থাকেন। আর এই নতুন বাড়ীটা অতিথিশালার জন্যে করেছেন। তাতে আয় মন্দ হয় না। তা ছাড়া ভদ্রলোকের আপেলের বাগানও আছে। এতেই সংসার চলে যায়।

দুই বাড়ীর মাঝখানে ফাঁকা ছোট মাঠটাতে সরযূকুমারীরা দেখি, খাটিয়া পেতে ভাইবোনেদের নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। কাজেই প্রয়োজনে ওদের ডাকতে অসুবিধা হয় না। একবার ওর ছোটবোনটাও এল— জলের গ্লাস রেখে গেল ঘরে কুঁজোর কাছে।

কুলুর পরিবেশটি বড় সুন্দর। কুলু— জেলার সদর হলেও স্থানটি একটি আধা শহর বা গঞ্জবিশেষ। তখন সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ। না শীত, না গরম। তবে রাত্রের দিকে বেশ শীত পড়ে। হোটেলে খেয়েদেয়ে এসে যে যার মত শুয়ে পড়লাম। সকালে বেশ শীতের মধ্যেই ঘুম ভাঙল। দেখি, গায়ে একটি কম্বল চাপানো। তাই হয়ত বেশ আরামেই ঘুমিয়েছি। হেনাদি বললেন, গায়ে কিছু না দিয়েই ঘুমিয়েছেন। তাই বিপাশা আবার রাত্রে উঠে কম্বলটা আপনার গায়ে দিয়ে দিয়েছে।

মুখ-হাত ধুয়ে যে যার মত পোশাক পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। তখনও রোদ ওঠে নি। মাঠ-ঘাট শিশিরে ভেজা। হোটেলে চা খেয়ে নিয়ে—সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির রাণী বিপাশাকে ভাল করে দেখতে গেলাম। জলে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক একজন এক একখানা পাথরের ওপর বসল।

বেলা বোঝা না গেলেও আস্তে আস্তে বেশ বাড়ছিল। আমরা একটু বাজারের দিকে যাব। তাই উঠতে হল। এখানে নাকি গরমের কোট-আলোয়ান-পুলওভার সস্তা। সেকথা প্রমাণিত হল বাজারে গিয়ে। বাজারটা একটু দূরে—আর এক পাশে। বাজারের নাম 'আখারা বাজার'। কুলুকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়েছে : যেখানে দোকানপাট প্রভৃতি আছে তা হল আখারা বাজার। আর অপর অংশটি হল সুলতানপুর। অফিস-কাছারি-হাসপাতাল প্রভৃতি এখানে।

আখারা বাজার বেশ জমজমাট। দোকান-পাট সারি সারি। টুপি তৈরীর দোকানও চোখে পড়ে। মেয়ে-পুরুষ সবাই একই ধরনের টুপি পরে। মেয়েরা বিনুনি করে চুল বেঁধে কাঁধের দুপাশে ঝুলিয়ে দেয়। তার ওপর দেয় টুপি। শালোয়ার-পাঞ্জাবী জাতীয় ঢিলে-ঢালা একধরনের পোশাক পরনে। কারো গায়ে ওড়না আছে, কারো নেই।

মেয়েদের দোকানপাটে জামাকাপড় দেখার সখ বেশী। কিনুক, আর না-ই কিনুক—দোকানে ঢোকা চাই। হেনাদি আর বিপাশা দোকানে ঢুকে জামাকাপড় দেখে। বিপাশা অবশ্য গায়ের একটি শালও কিনে ফেলল। বেশ দাম কম বলে। সরকারী এম্পোরিয়ামেও সব সাজানো থরে থরে। সেখানেও কাটে আর এক ঘণ্টা। এই করে বেলা বাড়ে।

বসন্তবাবু বিরক্ত বোধ করছিলেন রিনিকে নিয়ে। বললেন—মেয়েদের নিয়ে বাজারে আসা খুব বিপদ দেখছি।

হেনাদি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তা তো তোমরা বলবেই। কিন্তু সংসারে কি লাগবে না লাগবে সেদিকে নজর তো মেয়েদেরই।

আমরা ফেরার পথ ধরি।

বিপাশা জিজ্ঞাসা করে—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কুলুর উচ্চতা কত?

—প্রায় চার হাজার ফুট। কুলুই হচ্ছে হেডকোয়ার্টার—অর্থাৎ জেলার প্রধান শহর। কুলু হিমালয়ের দুই পর্বতশ্রেণীর মাঝে অবস্থিত। জায়গাটি চওড়ায় প্রায় এক মাইল—দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চাশ মাইলের কাছাকাছি। মার্চ মাসে অর্থাৎ বসন্তকালেই কুলুর দৃশ্য উপভোগ্য বেশী। ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে ফল-মূলেও। এখন তো আপেল প্রায় শেষ। জুন-জুলাইয়ে একটু গরম পড়ে। শীত অকটোবর থেকে। অন্য সময়ে নাতিশীতোষ্ণ।

হেনাদি বললেন—কুলুর ময়দানটি বড় সুন্দর। তার সঙ্গে সারি সারি এই পাইন গাছ। পাহাড়ের মাঝে এত বড় একটি ময়দান খুব কমই দেখা যায়।

বললাম—হ্যাঁ, একমাত্র নেপাল ছাড়া আমারও অন্য কোন পাহাড়ী জায়গা চোখে পড়েনি। কুলুর এই ময়দান জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে। কলকাতার গড়ের মাঠের মত আর কি! কুলুবাসীদের কাছে শরৎ আর বসন্তোৎসবই প্রধান। এর মধ্যে শরতের দশেরা উৎসবেই জাঁকজমক বেশী।

মানালি : দোকানপাট, বাজারহাট মানালির এই অঞ্চলেই।

বিভিন্ন বাদ্য-বাজনা, নাচগান সহকারে এরা এই উৎসব পালন করে। এই উৎসব উপলক্ষে ময়দান অঞ্চলে মেলা বসে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নরনারীরা আসে দলে দলে। দোকান-পাটে বেচা-কেনা চলে। প্রায় একমাসব্যাপী এই উৎসবের জন্যে সাজ সাজ রবও পড়ে যায় অনেক আগে থেকেই। খাবারদাবার জামাকাপড়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রভৃতির দোকানও বসতে সুরু করে অনেক আগে থেকেই।

—এখানে কোন মন্দির নেই?

—আছে। ওই যে কুলুর ঠিক অপর দিকেই পাহাড়ের মাথায় 'বিজলী মহাদেব'-এর মন্দির। মন্দিরে আছেন শিব। এই মন্দির দেখতে পায়ে হেঁটে চার হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে।

—থাক্ বাবা, দেখে আর দরকার নেই। প্রায় একসঙ্গেই বল্‌লে বিপাশা আর হেনাদি।

আমরা রামরিক গেষ্ট হাউসে ফিরে এলাম। এবার স্নান, খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম। পরদিন আমাদের মানালি রওনা হতে হবে।

হঠাৎ সরযূকুমারীর আবির্ভাব। কিছু দরকার আছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। বিপাশাই আগে-ভাগে বললে—না, দরকার নেই। দরকার পড়লে ডাকব। এতে সরযূকুমারী যেন একটু মনঃক্ষুন্নই হ'ল। তার প্রয়োজন নেই—একথা সে এত চটপট শুনবে তা হয়ত ভাবেনি।

পরদিন জিনিষপত্র আবার গুছিয়ে নেওয়া হল। আমার ট্রাঙ্ক-বেডিং বিপাশা নিজেই একরকম জোর করে গুছিয়ে দিল। তারপর রিনিকে হাত-মুখ ধুইয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে দিল। শিশুরা স্নেহের কাঙাল। তাই বিপাশার এই স্নেহভরা পরিচর্যা রিনিকে হয়ত মুগ্ধ করেছিল। তাই সে বিপাশাকে বল্‌লে—এবার মিণ্টি-মার সঙ্গে আমি যাব। হেনাদি বললেন—আচ্ছা, তাই যেও।

বিকেল পাঁচটায় বাস ছাড়ে। তার আগেই কুলি ডেকে গেষ্ট হাউসের টাকাকড়ি মিটিয়ে আমরা রওনা হলাম বাস-ষ্টপেজের উদ্দেশ্যে। সরযূকুমারীরা তখন ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখতে লাগল। আমরা এগিয়ে চলেছি। তারপর যতদূর চোখ যায় দেখি, ওরা একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। বাস-ষ্টপেজে মিঃ ও মিসেস মিশ্র এসে আগেই উপস্থিত হয়েছেন। ভুন্টুরের সেই দম্পতিটিও আমাদের সঙ্গে একই বাসে উঠলেন। বাস সেই মাণ্ডি থেকে আসছে। কুলু হয়ে মানালি যাবে। বাসে ভিড়ও খুব। একটু দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর বসার জায়গা একে একে হয়ে গেল।

মানালি :

কুলু থেকে মানালি তেইশ মাইল পথ। পৌঁছুতে হল রাত প্রায় সাড়ে আটটা। মানালির ট্যুরিস্ট লজে কুলু থেকেই এ্যাকোমোডেশন বুক করা আছে। কিন্তু কুলিরা বল্‌ল—ট্যুরিস্ট লজ অনেকদূরে। যাতায়াতেরও অসুবিধা। তাই বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে বাজারের মধ্যে একটা হোটেল-বাড়ীর ঘর ঠিক করা হল। খাওয়ার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। হোটেলে দেখি, জলের বড় অভাব। বাথরুমে জলের অভাবে সে স্থান ব্যবহার করাও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। হোটেল থেকে বালতি করে, অবশ্য জল দিয়ে গেল। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। আমরা বাংলাদেশের মানুষ। জলেই আমাদের চলাফেরা। কাজেই নির্জলায় আমাদের পোষাবে কেন!

বিপাশা কোন কথা বল্‌ছিল না। হেনাদি হেসে বল্‌লেন—বড়ই বিপদ এখানে।

রাত্রে দোকানে লুচি আর কলাকন্দ খেয়ে কাটালাম। সকালে উঠে আমাদের 'গরমপানি' দেখতে যেতে হবে। দেড়দিন পুরো এই ভেতো বঙ্গ সন্তানদের মুখে ভাত জোটেনি। তাই সকালে উঠে একটি ভাল হোটেলে দুপুরের ভাতের অর্ডার দিয়ে আসি। ডিমের ঝোল, ভাত, ডাল আর কপির তরকারি। চারজনের বরাদ্দ। ওর মধ্যে রিনিরও হয়ে যাবে। কতটুকুই বা আর খায় সে। হোটেলের বেয়ারাদের ব্যবহার ভাল। বার তিনেক সেলাম দিয়ে, কয়েকবার জো-হুজুর বলে অর্ডার নিল একজন বয়। পরে দেখলাম—সত্যি, প্রথমে যা তাদের দেখেছি—পরেও তাই। চারজনের খাওয়া বাবদ আঠারো এবং বকশিস সহ কুড়ি টাকা খরচ হলেও ওদের ব্যবহারের দাম বোধ হয় আরও বেশী।

ভুন্টুরের দম্পতিটি হয়ত অন্য কোন হোটেলে উঠেছেন। বাস থেকে নামার পর আর তাঁদের দেখা পাওয়া যায়নি। মিঃ ও মিসেস মিশ্র নিরামিষাশী। ও'রা দোকানে পুরী-মিঠাই আর ফলের ব্যবস্থা করে নিলেন।

মানালির প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর হলেও জায়গাটি বড় নোংরা। আর বড্ড বেশী মাছি। এখানে এত মাছি হবে, কুলুকে দেখে তা কল্পনাও করি নি। গতকাল মানালি ঢোকার মুখে টোল-ট্যাক্সও দিতে হয়েছে। জায়গাটিও পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু কিছু আছে। আশেপাশে একটু মফঃস্বলের দিকে আপেলের বাগানও আছে। এখান থেকে আপেল রপ্তানীও হয়। বিশেষ করে গোল্ডেন আপেলের প্রাচুর্য চোখে পড়ল এখানে।

গরমপানি :

সকালের দিকেই গরমপানি যাওয়ার সাব্যস্ত হল। ঠিক হল, হোটেলে যখন জলের অভাব, তখন গরমপানি থেকে স্নানাদি সেরে আসব। সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে বেরুলাম। মানালি বাজারে খোঁজ নিয়ে

জানা গেল, পথের দূরত্ব মাত্র এক ফার্লং। মানালির গা ঘেঁষেই বিপাশা বেয়ে চলেছে, তারই ওপর ব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে সুরু করি। এক ফার্লং পথ যেন আর ফুরোয় না। পথে লোক চলাচল খুবই কম। এক পাশে ভেড়া নিয়ে কেউ বা চরাতে চলেছে বা ভেড়ার ব্যবসায়ী তার ভেড়ার দল নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে সারা সংসার এমন কি, কোলের ছেলেটিকে চাপিয়ে কোন যাযাবর এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে চলেছে। কিংবা কেউ বাজারহাট করে বাড়ী ফিরছে।

তাদেরই কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করি—গরমপানি কেতনা দূর?

উত্তর আসে—থোড়ি দূর।

এগিয়ে যাই। থোড়ি দূর আর শেষ হয় না। আবার জিজ্ঞেস করি—গরমপানি কেত্‌না দূর।

ঐ একই উত্তর আসে—নাজিগ।

আরও অনেক পথ এগিয়ে যাই। আবার পথচারীকে প্রশ্ন করি—গরমপানি কেত্‌না দূর?

—এই পৌঁছ গিয়া।

কিন্তু পৌঁছে আর যেতে পারি না। মিসেস মিশ্রের যেন হাঁটতে বেশী কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলছিলেন না। আরও বেশ কিছুটা হেঁটে তবে গরমপানির পাহাড়ী পথ ধরি। জায়গার নাম 'বাঁশসুহোট'। সেখান থেকে পাহাড়ী পথ বেয়ে ওপরে উঠতে হবে। এই পথে ঝরণার জল নেমে আসছে প্রবল বেগে বিভিন্ন ধারায়। আর জলের স্রোতে ছোট ছোট ঘর বেঁধে তৈরী হয়েছে গমভাঙ্গা কল। পাহাড়ী গ্রামের মানুষ এই স্রোতের জলকে তাদের কাজে লাগিয়েছে। ঘুরছে বড় বড় যাঁতা—ভাঙছে গম। গরমপানি আরও ওপরে, পাহাড়ের মাথায়। তারও ওপরে নাকি 'ভৃগুমুনির হ্রদ'। এখানে নাকি ভৃগুমুনি তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু সে পথে যাওয়া কষ্টসাধ্য।

গরমপানি জায়গাটি বেশ ছোটখাট একটি গঞ্জ। এখানকার এই জলে আছে সালফার। তাই নাকি চর্মরোগ সারে এখানে স্নান করলে। দুটি বড় বড় চৌবাচ্চায় এই জল এসে পড়ছে। তাতে স্নান করছে নরনারী। একটি মেয়েদের, অপরটি পুরুষদের। জামাকাপড় ছাড়ারও জায়গা আছে সেখানে। দেখি, ভুন্টুরের সেই সুন্দরী বধূটিও স্নান করতে ঢুকলেন মেয়েদের দিকটায়। আর ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন—বাইরের দিকে দরজার সামনে। হয়ত আড়াল করতে চেয়েছিলেন তাঁর সহধর্মিণীর স্নানের রূপকে লোকচক্ষু থেকে। কিন্তু আড়াল পড়ে নি। বাইরে থেকে প্রায় সবটাই দেখা যায় স্নানের ঘাট। বধূটিকেও দেখা যাচ্ছিল, সে স্নানে নেমেছে।

চৌবাচ্চার জল নোংরা। তাই আমরা গেলাম আরও ওপরে উৎসমুখে স্নান করতে। সেখানেও অনেকে স্নান করছে— সার্বজনীন [illegible]

জল ঢেলে স্নান করে নিয়ে আড়ালে চলে গেল কাপড় ছাড়তে। মিসেস মিশ্র স্নান করতে চাইলেন না। মিঃ মিশ্রও না। হেনাদি ও বিপাশা স্নান সেরে কাপড় ছাড়তে গেলে সেই ফাঁকে বাকী আমরা দুজন স্নান সেরে নিলাম। রিনির স্নান তো আগেই হয়ে গিয়েছিল। তারপর কাপড়চোপড় শুকিয়ে নিয়ে ফেরার পথ ধরি।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে হোটেলে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে বেড়াতে বের হই। দূরে পাহাড় ফাটানোর কাজ চলছে—তারই ডিনামাইটের শব্দ। পথ-চলতি লোক সাবধান হয়ে পথে হাঁটছে। শহরের একদিকে বাঁশের মাথায় এক বাচ্চা ছেলেকে বসিয়ে খেলা দেখাচ্ছে এক পাহাড়ী খেলোয়াড়। তাকে ঘিরে মেয়ে-পুরুষ শিশুর ভিড়। দোকানে দোকানে গরম জামাকাপড়, আপেল চালানের কারবার—আর কত কি!

আমরা আজকের রাতটুকু কাটিয়ে ভোর পাঁচটায় যে-বাস ছাড়ে, সেই বাসে সিমলায়

যাব। শীতের দেশ। তাই ভোর পাঁচটায় অন্ধকারই থাকে। কুলি বলে রাখলাম—মালপত্র ওই ভোরে বাসে তুলে দেবার জন্যে। কুলি বেচারী বাড়ী গিয়ে যদি ঠিক সময়ে আসতে না পারে, তাই হোটেলের বারান্দাতেই শুয়ে রইলো।

এখানে শীত বেশী। বেশ ঘুমও এসেছিল। বিপাশা গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডেকে তুলল—কি যাবেন না?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। তাই তো সময় আর বেশী নেই। ওরা সবাই জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। আমিও তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলাম। বিপাশা ও মিসেস্ মিশ্র সাহায্য করলেন।

ফেরার পথ :

আমাদের কুলু হয়েই ফিরতে হবে। এখান থেকে কুলু হয়ে সিমলা একশো ছেষট্টি মাইল পথ বাসে। পোঁছুতে সেই বিকেল পেরিয়ে যাবে।

সেই একই পথ। আউট থেকে প্যানডোয়া পর্যন্ত পাহাড়ী রাস্তাটা বড় বিপজ্জনক। প্যানডোয়ার ঝুলন্ত ব্রিজ পার হতে হল হেঁটে। আউটে চেকিংও হল।

কুলু থেকে মানালির পথের দৃশ্য যাবার সময় দেখতে পাই নি সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল বলে। কিন্তু ভোরের আলোয় দেখি, সে দৃশ্য বড় সুন্দর! ভেড়ার পাল চলেছে পথ দিয়ে। দু'পাশে আপেল বাগান বা অর্চার্ড—আর তার গায়ে বিজ্ঞাপন টাঙানো বাগানের নাম অনুযায়ী (এক একটি বাগানের ব্যক্তিগত মালিকরা এক একটি নামকরণও করে রেখেছেন)। হিমাচল সরকারের কৃষি ও বন বিভাগের বিভিন্ন সাইনবোর্ড আর অফিস, পাহাড়ের গায়ে বাড়ীঘর। রাস্তার মাঝে মাঝে পাহাড়ী বস্তী আর জনপদ। ঘরের চালে ছড়ানো ভুট্টোর রাশি—গাছে গাছে ঝুলছে মিষ্টি কুমড়ো। ওপর থেকে পাহাড়ের নীচের পথ যেন আঁকাবাঁকা অজগর সাপের মত মনে হয়। আর বাড়ীগুলো যেন খেলনার বাড়ী। পাশে পাশে চলেছে বিপাশা। এই পথে মানালিতেই বাস চলাচল শেষ।

কুলু-মানালির পথ।

মানালির ধুণ্গারি মন্দিরের খ্যাতি সুবিদিত। এই মন্দিরে আছে হিড়িম্বার মূর্তি। এই প্রথম জানলাম—হিড়িম্বার মূর্তিও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার পুজো হয়। হিড়িম্বা নাকি এঁদের কাছে শক্তির দেবতা। অর্থাৎ শক্তির পুজো। সে মহাভারতীয় যুগের কথা। পান্ডারা বনবাসে দিন কাটাচ্ছেন। সেই সময়ে তাঁরা এখানে এসেছিলেন এবং হিড়িম্বার সহায়তায় রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিলেন।

মানালির আর একটি ঐতিহাসিক স্থান হচ্ছে ঝিন্না রাণার দুর্গ। এগারো হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের মাথায়। মানালির তদানীন্তন শাসক এইখানেই থাকতেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী এক রাজপুত্রের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন।

আবার কুলু! বাস থেকে সরযূকুমারীদের বাড়ী দেখা যাচ্ছিল। আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি—দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর সামনে। কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।

বিপাশা আমায় বললে—মন খারাপ লাগছে সরযূর জন্যে?

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। হেনাদি রসিকতা করে বললেন—তা একটু লাগছে বৈ কি!

খিদে লেগেছিল। বিপাশা আপেল কাটল। আপেল আর কলাকন্দ দিয়ে খিদে মেটালাম। তারপর মাঝে মাঝে বাস স্টপেজে চায়ের দোকান থেকে চা। এইভাবেই সারা পথ কাটল।

সন্ধ্যের একটু আগে এসে সিমলায় পৌঁছুলাম। তারপর সেখান থেকে আশ্রয়-লাভ ঘটল এক হোটেলে। এখান থেকেই আমরা ফিরে যাব দিল্লী হয়ে হাওড়া।

বসন্তবাবু ও হেনাদিরা গিয়েছেন মার্কেটিং-এ। মিঃ ও মিসেস মিশ্রও বেরিয়েছেন। বিপাশার শরীরটা ভাল নয় বলে সে আর যায় নি। মনটাও তার তেমন ভাল নয় লক্ষ্য করছি। জিজ্ঞাসা করলাম—শরীর কি খুব বেশী খারাপ হয়েছে? ওষুধ এনে দেব?

বললে—না! আর ডাক্তারি করতে হবে না। বেশ আছি।

—তবে হাসিখুশি দেখছি নে কেন?

—এমনিই। মনটা বড় খারাপ লাগছে। বেশ ক'দিন কাটল। আবার সেই অফিসের চাকরি—আবার সেই ট্রাম-বাসের দুর্ভেদ্য ভিড় ঠেলে ঠেলে যাওয়া-আসা—আবার সেই একঘেয়ে জীবন।

বিপাশার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

আমি তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

রিনির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ওরা আসছে।

গরমপানি : প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গরমপানির স্নানের চৌবাচ্চা এর ভিতরদিকে।

আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহীত

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্ত দায়টা পড়ল রাঘবের মাথায়। সেই ভারে ধূলিসাৎ হ'ল তার এতদিনের খ্যাতিসৌধ। রাঘবের কয়েক ধাপ অবনতি হয়। মেঘুর সনির্বন্ধ অনুরোধে এইখানেই ব্যাপারটা স্থগিত রইল। বড় সাহেবের কাছে মেঘুর প্রার্থনা ছিল সকলের পক্ষে। সবাই যেন ক্ষমা পায়। কিন্তু কিছু একটা না করলে শাসনযন্ত্রের কোন মর্যাদা থাকে না। তাই রাঘবকেই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। কামাই-এর দিক দিয়ে নয়, সম্মানের দিক দিয়ে। সে সর্দার, তাকে টিট রাখতে পারলে সবাই ঠিক থাকবে।

বুড়োদের সঙ্গে রাঘবের কাজকর্মের কোন সম্পর্ক রইল না। তাকে কাজ করতে হয় ছোট ছেলেদের নিয়ে। তার দলের কয়েকজন বেশ মুশকিলে পড়ল, যারা এতদিন গায়ে ফুঁ-দিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, অর্থাৎ নিরিখ মতো কাজ না করে পয়সা পেয়ে এসেছে। কারণ, নিরিখ যেমনই থাক, সেটা তো বুঝে নিত রাঘব। এখন তা বুঝে নেয় অন্য সর্দার। তার কাছে আর ফাঁকি চলে না। তাই কাজ করতে হয় তাদের। উপায় নেই তা না করে। মনের বিক্ষোভ মনেই মুষড়ে পড়ে থাকে।

পড়শীদের মারফৎ শুক্রীর কানে খবর এল মেঘু ছেলেটা তো মন্দ নয়। সবাই বলছে—বাগান থেকে অনেককে বার করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সর্দারকেও একমাস দিন-হাজিরা খাটতে হ'ত।

শুক্রীর শ্বশুরকুল, পিতৃকুলের দু-তিন পুরুষ সর্দারী করে আসছে। তার দু-ভাই এখনো সর্দার। আজ একটা বাচ্চার অনুগ্রহে তার মরদের কাজটা কোনমতে বজায় রইল। এমন খবরটা রসিয়ে কষিয়ে, ফলাও ক'রে শুনিয়ে গেল কারা? যারা তাকে খুশী করতে না করেছে এমন কাজ নেই। যারা তার ইঙ্গিতে দাসীর মতো কাজ ক'রে গেছে। মেঘুর নাম শুনে, মেঘুর পরোপকারের কথা শুনে শুক্রীর হাড় জ্বলে উঠল। যে আন্দাজ ক'রে নিল এর পিছনে মেঘুর একটা উদ্দেশ্য। সেই কল্পনাপ্রসূত সুপ্ত অভিসন্ধির অভ্যর্থনার জন্য, দরজার পাশ থেকে ঝাড়ুটা হাতে নিয়ে মেঝের ওপর বারবার পিটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলল—ও ভেবেছে এই ক'রে আমায় খুশী করবে! ঝাঁটার বাড়ি, জহরা (বেজাতক) ছেলের মুখে ঝাঁটার—

পড়শীরা পাথর হ'য়ে খাড়া রইল।

এইসব মেয়েরাই একদিন মেঘুর কথা, তার মায়ের কথা শুক্রীর কাছে কত ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছে। কিন্তু এখানকার মিতালিটা চলে ক্ষমতার পিছনে। শুধু এখানে কেন, অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাটা প্রযোজ্য। তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে অনেকের মতামতও বদলে গেছে। তারা ভাবে, এই শুক্রী একদিন মেঘুকে নিজের ছেলের মতো মরম করত, তাকে জামাই করবার আশায় ভরপুর ছিল। আজ সে তার নামে যা তা বলছে, তারই মুখের উদ্দেশে ঝাঁটা পিটছে!

চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে একজন প্রতিবাদ করল—জহরা হোইল কিমোন কোইরে লো? রাবণের বেটা হোইলে তোবে না মেঘু জহরা হোইতো। সাহেব তো রাখেছিল উয়ার—

আর যায় কোথা! দাওয়া থেকে এক লাফে শুক্রী পড়ল উঠানে। কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল—একবার এপাশ আর একবার ওপাশ, যেন তার কত কাজ। সেই সঙ্গে মুখও চলতে থাকল—ও কেন জহরা হবে! আমরা জহরা, আমাদের জ্ঞাতগুষ্টি জহরা। ও যে ডাঙ্গর মানুষের ছেলে।

সেখানে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করবার সাহস আর কারো হ'ল না। একে একে সবাই চলে গেল। শুক্রী ঢেঁকি ঘরে ঢুকে গালে হাত দিয়ে বসল। তার সামনে গত বছরের তুষু ঠাকুরের প্রতিমা, পাশে মনসা মূর্তি।

শর্মিষ্ঠা তখন ঘরের মধ্যে একখানা পাঠ্য বই নিয়ে বসে। মায়ের সঙ্গে পড়শী-দের কোন কথায় কান দেবার মতো মন তার ছিল না তখন। তার মন তখন এক অভূত-পূর্ব অনির্বচনীয় সংঘাত ও সংবেদনার সমাচ্ছন্ন। চোখের সামনে জবালার পুত্র সত্যকামের উপাখ্যান।

মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে জবালার শিশু, শিক্ষার্থী সত্যকাম। মহর্ষি জানতে চাইলেন তার পিতৃ পরিচয়। বালকের জানা নেই তা—মায়ের কাছে জেনে এসে নিবেদন করবে। ফিরে এসে বালক যা বললে তাতে আশ্রমের অপর শিক্ষার্থীদের মুখে ফুটে উঠল এক বাঁকা বিদ্রূপের চাপা হাসি। মহর্ষি মুগ্ধ হলেন সত্যাশ্রয়ী বালকের কথায়। নামগোত্রহীন প্রশান্ত সত্যকামের একই কথার ভিতর থেকে আসে স্বচ্ছ দুটি তথ্য। গুরু খুঁজে পেলেন এক—তাঁর মন ওঠে কেঁদে; শিষ্যরা বোঝে আর এক—তারা হাসে। মহর্ষি গৌতম তাকে গ্রহণ করলেন আপন সন্তান রূপে। সত্যকাম শিষ্যত্ব লাভ করল গৌতমের। তাপসের তপশ্চারণের মধ্যে বালক বড় হ'ল। বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল তার খ্যাতি। ভর্তৃহীনা জবালার গর্ভজাত সন্তান জাবালি। মহর্ষি জাবালি। মধ্য ভারতে যাঁর তপোবনের নাম ছিল জাবালি-পত্তন—অধুনা জব্বলপুর।

এও যেন সেই হাসি ও কান্না। তার মাঝে ফুটে উঠল সত্যের অপরূপ রূপ। একের ওপর বহুর বিদ্রূপ কটাক্ষে যে জন্ম এতটুকু হ'য়ে পড়েছিল, মাতাপুত্রের চোখের জলের স্পর্শে মহিমান্বিত হ'য়ে উঠল সে জন্ম। নতুন চেতনা উদ্ভূত প্রেরণাময় নতুন জীবন। এগিয়ে চলে, আরো এগিয়ে—ওপরে ওঠে, আরো ওপরে। দৃষ্টির বাইরে। যেখানকার সন্ধান শর্মিষ্ঠার জানা নেই। মন দিয়েও যার নাগাল পাওয়া যায় না।

শর্মিষ্ঠার দুটি গাল বেয়ে নামল চোখের জলের ধারা, ধুইয়ে দিল তার বই-এর পাতা। সেই ধারায় স্নান করিয়ে দিল সত্যকামের উপাখ্যান।

।। সতেরো ।।

যেমন সর্বত্র হ'য়ে থাকে, এখানকার গাছ-গাছড়া ও মানুষের জীবনেও সকল

ঋতুর প্রভাব তেমন ভাবেই বয়ে চলে। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে বারোটা মাস দুভাগে ভাগ করা, দুটো সীজন—কালটিভেশন আর ম্যানুফ্যাকচারিং সীজন। শীত পড়লে চা-গাছে নতুন অংকুর গজায় না, তাই পাতাও জন্মায় না। দু'দিন আগে যা গজিয়েছে তা'ও কুঁকড়ে যায় শীতের প্রকোপে। অতএব বন্ধ হ'য়ে যায় পাতা তোলা। সেই সঙ্গে বাগানের কল-কারখানাও বন্ধ। তখন থেকে শুরু হয় চা-খেতের কাজ।

কালটিভেশন সীজন। কিন্তু ধান বা গমের মতো নতুন চাষ নয়, আসলে এটা উদ্যোগ পর্ব—শুধু নামটাই তার অমন। প্রথমেই চা-গাছের ডগাগুলো দেওয়া হয় কেটেছেঁটে সমান ক'রে। অবশ্য তার অনেক রকম নিয়ম পদ্ধতি আছে। পাকা হাতের কাজ সেটা। ছাঁটাই করা ডগাগুলো পড়ে থাকে গাছের মাথায়, মাটির ওপর। সেসব তখনই তুলে ফেলে দিতে হয় খেতের বাইরে। নইলে ফাল্গুন চৈত্রে যখন চারপাশের মরা শুখনো পাতায় আগুন ধরে যায়, তখন সে আগুন খেত পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে চা-গাছ পুড়িয়ে দেবে। বাইরে থেকে যাতে খেতের মধ্যে আগুন না আসতে পারে তারও ব্যবস্থা আছে। চা-খেতের চারপাশে দশ-বিশ হাত জমি কোদাল দিয়ে চেঁচে দেওয়া হয়। তারপর একদিন শুখনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে আগুনটাকে অন্যদিকে চালিয়ে নিরাপদ ক'রে রাখা হয় চারধারের মাটি। কিন্তু খেতের মাঝেও তো আগুন জ্বলে উঠতে পারে। তাই কাঁচা অবস্থায় ডাঁটিগুলো কুড়িয়ে দূরে জমা ক'রে রাখে—শুখিয়ে গেলে জ্বালিয়ে দেয়। ডাঁটি কুড়ানোর কাজটা করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। রাঘব গেল ছেলেদের নিয়ে সেই ডাঁটি কুড়ানোর তদারক করতে।

এটা একটা বাজে কাজ রাঘবের পক্ষে। যে কাজ দিয়ে শুরু হয়েছিল তার সর্দারী জীবনের প্রথম বছর। মাত্র একটি বছর সে কাজ সে করেছিল। সেসব কথা তার মনে পড়ল। সবে জোয়ান হয়েছে সে। তাই মধ্যে শেখা হয়ে গেছে বাগানের সমস্ত কাজ। সব কাজ হাতে ধ'রে শিখিয়েছিল তার বাপ, দশরথ—সবাই ডাকত দাশু সর্দার। বড় আশা ক'রে দাশু প্রথম সন্তানের নাম রাখল রাঘব। সে আশার বাকি অংশ পূর্ণ হল না—বাকি তিনটি এল না তার ঘরে। একটার ওপর আর একটা মাইকী আনল তবুও না। অতএব দশরথের ঘরখানা খনখনে থাকত—ছেলেদের কলরবে নয়, তার দুটো বৌয়ের কলহ কোঁদলে। বিগত যৌবনা প্রথমার ছিল ছেলের গর্ব, বংশের গর্ব—দ্বিতীয়ার ছিল মাত্র একটি জিনিস, যৌবন। যেন কাঠের ফলকে খোদাই করা—সাঁওতাল মেয়ে, লখন্দ্রী—রাঘবের বিমাতা।

সকল বিবাদ বিসংবাদ শেষ হ'য়ে গেল রাঘবের মায়ের মৃত্যুর পর। সদ্য টাইফয়েড থেকে বেঁচে উঠে পথ্য পেল। তার অনতি-বিলম্বে এল এক পর্ব। সেই পরব পালন করতে কিছু বেশী খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল—হাঁড়িয়ার সঙ্গে চানা ও মুরগীর মাংস। অমন কাঁচা পেটে অত সহ্য হয় না। ভবিতব্য!

নিঃসন্তান লখন্দ্রী পূর্ণ করল তার মায়ের স্থান। তারপর একদিন গেল দশরথ। বিমাতার হাতে পড়ল রাঘবের ভূত-ভবিষ্যৎ, তার যা কিছু সব।

বাপ-মার দিক দিয়ে রাঘবের কোন খুঁত ছিল না। রাঘবরা ভূমিজ। কিন্তু তার বিয়ের সময় উঠল দশরথের সাঁওতাল স্ত্রী গ্রহণের কথা। সাঁওতালদের কি জাত আছে? তারা কি না খায়? সাঁওতাল মায়ের হাতে ভাত জল খাবার অপরাধে নিজের জাতের মেয়ে জুটল না রাঘবের অদৃষ্টে। রাঘবের জাত-কুটুমদের জন্য লখন্দ্রী যমের দক্ষিণ দরজা নির্দিষ্ট রেখে, এক খানদানী মেয়ে—শুক্রীর সঙ্গে রাঘবের বিয়ে দিল।

স্ত্রীভাগ্যে ধন—শুধু ধন নয়, যশমান, প্রতাপ, প্রতিপত্তি সবই সে পেয়েছিল, তা পেয়েও আসছিল, এমন কি লবকুশের পরিবর্তে যখন মেয়েটি জন্ম নিল, তখন নিজের জাতের মেয়ে নিয়েও তাকে সাধাসাধি করেছে অনেকে। লখন্দ্রীর অভিসম্পাতের মর্যাদা রক্ষা করতে তার জাত-কুটুমের কেউ যমের দ্বারস্থ হয়নি, বরং একে একে অনেকে তারই দ্বারস্থ হয়েছে। তখন জাতভাইরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—জাত ছেড়ে বিয়ে করবার জন্য ধর্মঠাকুরের রাগ হ'ল, তাই তার বাপের ঘরে তার বাকি তিন ভাই জন্ম নিল না। তার নিজের ঘরেও লব-কুশের কেউ আসবে না। উপদেশটা সে কান দিয়ে শুনলেও মন দিয়ে গ্রহণ করল না। দিনকতক সে বেয়েচেয়ে দেখবে, এবার শুক্রীর কি হয়। কিন্তু আর কিছু হ'ল না, হবেও না। কথাটা যখন সে ভাল ক'রে বুঝল, তখন শুক্রী তার মনের মধ্যে ভাল ক'রে শেকড় গেড়ে বসে গেছে। দাশু-সর্দার যা পেরেছিল রাঘব সর্দার তা পারল না।

ছেলেদের নিয়ে কাজ করতে এসে তার মনের মধ্যে অতীতের এতগুলো কথা জেগে উঠল, বেজে উঠল সবাক চিত্রের মতো।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল চা-গাছের ওপর। তার সকল ভাবনাচিন্তা থমকে দাঁড়াল। চা-গাছের মাথায় একটিও ডগা খাড়া হ'য়ে দুলছে না! সব ছাঁটাই গেছে। এবার তো সে কাটায় নি, কাটিয়েছে অন্য সর্দার। রাঘবের মনে হ'ল, তার মাথাটাও যেন কাটা গেছে। এতগুলো ছেলে চেয়ে দেখছে তার দেহের ওপর মাথাটা নেই।

কি লজ্জা! কি ঘৃণা!

গলার চারপাশে হাত বুলিয়ে রাঘব বুঝতে চেষ্টা করে তার মাথাটার অস্তিত্ব। মাথার ওপর হাত চালিয়েও সে মাথাটা খুঁজে পায় না। মাথাটা সে খুঁজে পায় না তার মধ্যে ভাবনা ঢুকে তাকে ভুলিয়ে দেয় তার মাথার অস্তিত্ব।

এই বাগানে তার ঊর্ধ্বতন দু-পুরুষ সর্দারী করেছে, রুটি পেয়েছে। অর্থাৎ এখানেই পোড়ানো হয়েছে, কবর নয়। তাদের বিত্ত, কর্মদক্ষতা ও মান-সম্মানের উত্তরাধিকারী হয়েছিল সে। চা-গাছের চারা লাগানো থেকে কলম-কাটা, পাতা-তোলা—কোন কাজটা সে না করেছে? কলমের কাজ তদারক করতে করতে যুগ কেটে গেছে। শ-খানিক লোকের হর্তাকর্তা ছিল সে।

এত লোক কোন সর্দারের হাতে ছিল না, কেউ পারে না এত লোকের কাজ দেখা শোনা করতে। তার গোড়-কলমে পুরানো গাছ নতুন হয়ে ওঠে, পোকায় ধরা নির্জীব গাছ সজীব হয়ে যায় তার বাছ-কলমে, লাইট-প্রুনিং, মিডিয়ম-প্রুনিং, ডিপ-প্রুনিং-এ চারপাশে ডালপালা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এক একটা গাছ চারটে গাছের মতো। তার পাত-কলমের গুণে এমন পাতা আসে যে একটা গাছের পাতায় একটা মাইকীর টুকরি ভরে যায়।

তার মতো এত রকমারী কাজ আর কার জানা আছে এ বাগানে? কলম শেষ হলে সে যায় গাছের গোড়ায় সার দেওয়াতে। প্রত্যেকটি গাছের জোর বুঝে সার দেবার ভাগ তার মতো আর কার জানা আছে? সার দেবার পরই আসে ড্রেন কাটার সময়—আকাশে কালো মেঘ জমাট বাঁধার আগেই শেষ করতে হয় তা।

খেতের মধ্যে জল জমে থাকলে সবুজ পাতা হলদে হয়ে যাবে, নষ্ট হয় গাছগুলো। এমন কায়দায় রাঘব নালা কাটিয়ে বাঁধ দেয় যাতে সবটা জল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে চুঁয়ে যায় মাটিতে। এমন আন্দাজে ড্রেন কাটায় যাতে সব বাড়তি জল গড়িয়ে যায় নদীতে। তারপর সে জমাদার বাবুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় বাগানের সমস্ত সেকসানে। তার নোট বুকে লিখিয়ে দেয়, কোন সেকসানে কোন ধরনের কলম কাটা হবে আগামী বছর—কত ইঞ্চির মাথায় গাছের ডগা ছাঁটতে হবে। এমন লোক কটা আছে এই বাগানে? আজ তার এই পরিণতি! রাঘব তার মাথা খুঁজে পায়—যে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে অপমানের ঝাঁঝায়, বোঝায়।

এর প্রতিকার!

এ কাজ ছেড়ে দিলেও রাঘবের সংসার চলতে পারে, বেশ ভালভাবেই পারে। কিন্তু তার উপায় নেই। তার সমস্ত টাকাপয়সা ছড়িয়ে আছে কুলিদের ঘরে ঘরে। পাল-পরবে বাড়তি খরচের জন্য পয়সার দরকার হয় তাদের। টাকা ধার নেয়—পালে-পরবে বকশিস পায়, শোধ করে। ধার নেয়—নেশা করে, বিয়ে করে, হাল গরুও কেনে। বীজ ধান নেয়—বাগানের জমিতে ধান জন্মায়, রাঘবের গোলা ভরে যায়। নিজের চাষের ধান বীজ ধানের ঋণ শোধের ধান। কাজ ছেড়ে দিলে তাকে চলে যেতে হবে বাইরে, গাঁয়ের কোথাও। তার সব আমদানী নষ্ট হবে। আবার নতুন ক'রে পত্তন করতে হবে সব কিছু। এখানে থাকবার সুখ তার নেই, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার উপায়ও নেই।

ছেলের দল বেশ ভয়ে ভয়ে গিয়েছিল রাঘবের সংগে। তার হাঁকডাকের কথা কারো অজানা নেই। তাই প্রথমে ভালভাবেই কাজ করছিল সবাই। একটু পরই তাদের চোখে পড়ল রাঘবের আনমনা ভাব। সুযোগের হেলাফেলা করে না শিশুরা। তারাও কাজে ঢিলে দিল। কাজ ফেলে পরে শুরু করল খেলা। সবাই ভুলে গেল এতবড় সর্দারের উপস্থিতির কথা। ছোটাছুটি করতে থাকল গাছের ডগাগুলো। সংগে সংগে উঠল হাসির কলরব।

রাঘব ফিরে তাকাল। তাদের খেলা দেখতে দেখতে মনে পড়ল তার শৈশবের কথা। একদিন তারাও অমন খেলেছে, সেজন্য মারও খেয়েছে। আবার বড় হয়ে সেও ছেলেদের নিয়ে কাজ করাতে গেছে, সেও কত বকাবকি করেছে, মেরেছে। দুটোর মাথা ধরে ঠুকে দিয়েছে, জমাদারবাবু এসে কশিয়েছে বেত।

সেদিন রাঘব কাউকে মারল না, বকলও না।

ওদের সংগে নিজেও হাসল। হাসতে হাসতে সে চলে গেল মথুরা-বৃন্দাবন। এত দুঃখের মধ্যে এত সুখ তার ভাগ্যে!

রাঘবের মন হঠাৎ ছুটে গেল নিজের ঘরে। অতীতের কতদিনের স্মৃতি ছবির মতো ভেসে উঠল তার চোখের সামনে।

কবে খড়ের গোলা বেঁধে মেঘু ও শর্মিষ্ঠা অমন ছোটাছুটি করেছে। শর্মিকে উঠানের মাঝখানে বসিয়ে, তার মাথার ওপর দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে মেঘু এপাশ থেকে গেছে ওপাশ, আবার ওপাশ থেকে এপাশ। শর্মি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থেকেছে। তারা দুজন—শুক্রী ও রাঘব, সেসব দেখেছে, কত হাসাহাসি করেছে। কবে রাঘবকে বুড়ী করে ওরা লুকোচুরি খেলেছে। পাতায় লতায় জড়িয়ে সাপ তৈরী করে এনে শর্মির গায়ের ওপর ছুড়ে ফেলেছে মেঘু, কবে সে একরাশ ফুল তুলে এনে সাজিয়েছে তাদের তিনজনকে। কবে শুয়ে শুয়ে শুক্রীর মুখে মেঘুর কথা শুনতে শুনতে কোথায় তলিয়ে গেছে রাঘবের বংশ মর্যাদার কথা। কত আশার, কত সুখের কল্পনায় ভরা সেসব কথা। সেসব বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমোতে ঘুমোতে জেগেও উঠেছে।

তারপর মেঘু বড় হ'ল। শর্মির সংগে মেলামেশায় কিছু গাম্ভীর্য দেখা দিল। হঠাৎ তাদের ঘরে আসা বন্ধ ক'রে দিল। তা নিয়ে কত কাণ্ডই না হল। সেই মেঘুর জন্য তার চাকরির অবনতি হ'ল। সেই মেঘু তার চাকরি রক্ষা করল—কত সুখ, কত দুঃখ দিল।

॥ ১৮ ॥

কালটিভেশানের কাজ শুরু হবার প্রথম দিকে দুটোই চলে—একদিকে প্রুনিং অপর দিকে প্লাকিং। অন্ততঃ একটা দুটো রাউণ্ড, যতক্ষণ না তৈরি পাতাগুলো উঠে আর।

তাই কালটিভেশন শুরু হলেও আরো দিন কতক কলঘরটা চালু থাকে—শেষের কাজটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর বন্ধ হয় রোলার, সিফটার, কাটার, সর্টার—একে একে সব মেসিন খোলা হয়, পরিষ্কার করা হয়, মেরামতও হয়।

নির্দিষ্ট দিনের আগেই বইখানা শেষ করে মেঘু হাজির হল বড়সাহেবের সামনে। সাহেব তাকে সঁপে দিলেন ফ্যাক্টরির ইঞ্জিনিয়ার ডেভিডের হাতে। ডেভিড দিল হেড ফিটার নিধিরাম কাকতির হাতে।

সারা জীবন খাটাখাটুনির ধকলে নিধিরামের দেহের রসকষ গেছে শুকিয়ে, তামাটে মেরেছে সোনার বর্ণ। ব্যবহার বড় অমায়িক। নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়ে মেঘনাদকে সে বুঝিয়ে দিলে কারখানায় লোহা-লক্কর, মেসিন ও যন্ত্রপাতি নিয়ে কি রকম সাবধানে কাজ করতে হবে। এবং তার অন্যথায় হাত পায়ের যে কোন অংশ এমন কি জীবন পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। খেসারতের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু, ততো আর যা যায় তার সমান হবে না। কয়েকটা ঘটনারও উল্লেখ করল। তারপর, মেঘুকে সংগে নিয়ে ঘুরেফিরে, সেখানকার সব কিছু দেখিয়ে দিল, চিনিয়ে দিল।

ঘুরেফিরে মেঘু দেখে নিল টি-ফ্যাক্টরির যত কল-কবজা, কাজকর্ম, পাওয়ার-হাউস, মেসিন-সপ। এয়ার-কনডিশনড্ ফার্মেণ্টিং হাউসে ঢুকে তার গা শিউরে উঠল। এই ঠাণ্ডা ঘরটা যে সত্যাই এমন ঠাণ্ডা সে তথ্য তার জানা ছিল না। খুবই আশ্চর্য হল, খুশী হল মেঘু গুমটির চারপাশে সেসব দেখতে দেখতে।

উইদারিং-হাউস থেকে পাতা নামিয়ে এনে চাপিয়ে দেওয়া হয় রোলার-মেসিনে—যাকে কলঘরের ছেলেরা বলে ঘানি। ঘানিতে তিরিশ-চল্লিশ মিনিট পেষাই করার পর সেই ভাঙা পাতাগুলো যায় সিফটারে চালতে—সরুগুলো চালনির ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে নীচে, তা যায় ফার্মেণ্টিং রুমে; বড়গুলো সিফটার থেকে তুলে নিয়ে আবার দেয় রোলার মেসিনে চাপিয়ে। পাতঠাসা মেসিন ঘুরতে থাকে প্রায় ঘণ্টা আধেক; তারপর পেষাই করা পাতা যায় ফার্মেণ্টিং রুমে। খানিক পরে সেখান থেকে অদ্ভূত রঙ ধরে তা ফিরে আসে, আবার বোঝাই হয় ঘানিতে পোনেরো-বিশ মিনিটের জন্য। তারপর সব রঙপাতা ঘানিটা থেকে নামিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ড্রাইং মেসিনের চলমান ট্রে-র ওপর। ওপর দিয়ে ভরানো হয় রঙপাতা, নীচে বেরিয়ে আসে তৈরি চা। গরম হাওয়ায় শুখানো বংলক্-টি—বিছিয়ে রাখা হয় তা মোজেকের পরিষ্কার মেঝেতে। ভাজা নিমপাতার মতো খাস্তা। পাতাগুলো মিয়িয়ে যায় একটু পর। তখন আবার সেসব ঢুকে যায় ড্রাইং মেসিনে। দুবার ফায়ারিং। আর তা মিয়িয়ে যায় না। তিনঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় মিলপাত্—বংলক্-টি। চা কিন্তু হয়ে গেল, আ ডেঅ

আর বাজারে চলবে না। তাই মিলপাত্ যায় সর্টিংরুমে। সেখানে বাজারের পছন্দসই করে মাল কাটা হয়, চালা হয়, করা হয় গ্রেডিং—অরেঞ্জ পিকো, ব্রোকন্ অরেঞ্জ পিকো, পিকো ফ্যানিং, সুসাং, পিকো ডাস্ট, ডাস্ট আরো কতরকম গ্রেড। যেমন পাতা প্লাকিং হবে, তেমনি হবে মিল চা, তার ওপর নির্ভর করে ভালমন্দ গ্রেডিং। ভালভাবে প্যাক করে রাখলে বছর, দুবছরেও তা নষ্ট হবে না।

ওসব হল ব্ল্যাক-টি। এই চা-ই তো সে এতকাল দেখেছে। শুনেছে বটে অনেক রকম চায়ের নাম। দেশ বিশেষে অন্ন চাহিদা। এখানে এসে দেখল তার একটা, গ্রীন-টি। এর জন্য যে পাতা আসে, তা আর উইদারিং-হাউসে যায় না। পাতা পেঁছনোর সংগেই শুরু হয় কাজ। পাতাগুলো জালের থলিতে বোঝাই করে মিনিট পাঁচেক চুবিয়ে রাখে ফুটন্ত গরম জলের ভ্যাটে। তারপর বিছিয়ে রাখে মেঝেতে। জলটা ঝরে গেলে পাতা চাপানো হয় ঘানিতে পেষাই করবার জন্য। বাকি কাজগুলো চলে আগের ধরনে। তবে এর আর গ্রেডিং হয় না।

সেসব দেখতে শুনতে মেঘুর মনে হল পুরানো দিনের কত কথা। বিনা প্রয়োজনে, বিনা হুকুমে কলঘরে কারো প্রবেশ নিষেধ। শিশুকাল থেকে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে সে। কিন্তু এই সুপ্রশস্ত ঘরগুলোর কোনটার মধ্যে ঢোকবার কোন প্রয়োজন, কোন কৌতূহল তার হয়নি কখনো। প্রয়োজন হয়তো হয়েছে কখনো কখনো, কিন্তু তা প্রমাণ করবার উপযুক্ত যুক্তি খুঁজে পায়নি। আশৈশব সে দেখে আসছে সমস্ত বাগান জোড়া লাইন পাতা, ট্রলি চলাচলের জন্য। বাগান থেকে গেছে গুমটিতে, কারখানার পাশ দিয়ে ঘুরে চলে গেছে সুবর্নশিরি ঘাটে। মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য কত রকম ট্রলি আসা-যাওয়া করে সেই লাইনের ওপর দিয়ে। তৈরী চা-এর পেটির জন্য বন্ধ ওয়াগন, কয়লার জন্য খোলা ডাব্বা, আরো কত রকম। লোক চলাচলের ব্যবস্থাও আছে। চারপাশ ফাঁকা মাথাঢাকা খুব উঁচু ট্রলি, তাতে জালের থাক বসানো—বাগান থেকে পাতা বোঝাই করে সেগুলো যায় উইদারিং-হাউসের সামনে।

হাজার হাজার গজ লম্বা চওড়া, তিন চারতলা উঁচু এক-একটা উইদারিং-হাউস—চারপাশ ফাঁকা, নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত এক হাত অন্তর অসংখ্য জালের থাক। প্রত্যেকটা জাল ফুট তিনেক চওড়া, লম্বায় ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা। তাতে কাঁচা-পাতা বিছিয়ে রাখে, বাতাসে একটু শুকিয়ে নেয়। ঠিক শুখানো নয়, একটু রস টানিয়ে নেওয়া। যাতে পাতা দোমড়ালে ভাঁজ খায় অথচ না ভাঙে। ভাঙলে চা হবে না।

শৈশবের কবে কখন সেই লাইন ধরে ঘুরতে ফিরতে মেঘু এসে পড়েছে

...মটিতে। এখানকার অতিকায় ঘর-বাড়ী-গুলো, এই বিরাট কারখানার ভিতরকার রহস্যময় সাজ-সরঞ্জাম আকর্ষণ করেছে তার মনকে। এগিয়ে গেছে কাছে। অমনি তাকে শুনতে হয়েছে কর্কশ কণ্ঠের নির্ঘোষ, দেখতে হয়েছে সশস্ত্র নেপালী চৌকিদারের রক্ত চক্ষু। এক-পা দু-পা করে পিছিয়ে গেছে, ছুটেও পালিয়েছে কখনো।

এখানকার এত নিয়মকানুনের, এত বাধানিষেধের ব্যূহ ভেদ ক'রে এসবের কোন ভিতরে একটু উঁকি দেবারও পন্থা মেঘু আবিষ্কার করতে পারেনি এতদিন। মনের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যেই গুমরে থেকেছে।

তার জীবনের এই ক'টা বছরের মধ্যে কতরকম ছোট-বড় মেসিন বাইরে থেকে এখানে এসেছে। সেসব নামানো ওঠানোর কত মহড়া সে দূর থেকে দেখেছে। লীফ-হাউস থেকে সবুজ পাতাগুলো ট্রলির ওপর উঠে ঢুকে গেছে এই বৃহৎ ঘরখানার মধ্যে, সেই পাতা যখন পেষাই হয়ে ফিরে গেছে ফার্মেন্টিং-হাউসে তখন তা চেনা যায় না! অ্যালুমিনিয়মের ট্রলির মধ্যে হামানদিস্তের থেঁত করা পানের মতো, তাতে রঙের একটু আভা। একটু পর রঙঘর (ফার্মেন্টিং-হাউস) থেকে তা ফিরে এসেছে এই ঘরে, তা দিয়ে তৈরি হয় নানা গ্রেডের চা। তারপর সেসব ছোট-বড় পেটিতে প্যাকিং হয়ে গেছে [illegible]শান ঘাটে, সেখান থেকে জাহাজে উঠে কোথায় গেছে কে জানে! তার পৃথিবীর শেষ ছিল ঐ সবনাশীর ঘাটে। একটু বড় হয়ে শুনেছে, চায়ের পেটি যায় বিলাতে, বিলেত—তার বদলে আসে টাকা। কোথা দিয়ে কেমন করে জাহাজ ভেসে যায় ওসব দেশে! বুঝতে চেষ্টা করেও কিছু পারে নি। তার মনের সমুদ্রে যেন পেটি বোঝাই জাহাজ ভাসতে ভাসতে চলে গেছে এক অজানা অনন্ত সাগরে। যেখানে ব্রহ্মপুত্রের জলধারা লয় হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত জলরাশির মধ্যে—কূল নেই, কিনারা নেই শুধু ওপর থেকে আকাশটা নেমে এসে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে জলের সীমান্তর—সেখানে কোথায় কলকাতা, কোথায় বিলেত! কোথায় পশু-পক্ষী, জীবজন্তু, মানুষ! কার জন্যই বা হয় এত চা?

সবই রহস্যময় থেকে গেছে—চোখের সামনে কলঘর, মনের মধ্যে সাগর পারের দ্বীপ। কোন মীমাংসা হয়নি তার। ক্লান্ত মন ফিরে এসেছে তার ক্ষুদ্র পরিসরে। চোখের সামনে আকাশ ঘেরা অসীম গণ্ডীর মধ্যে, দূরে হিমালয়ের তুষার স্তূপের ওপর, গাছের ডগায়, ঘরের চালে। তার দেহটা লুটিয়ে পড়েছে বিছানায়, কখনো বা মাঠে সবুজ ঘাসের জাজিমে। দুটো হাতের একটা গেছে মাথার নীচে, অপরটা চোখের ওপর। চোখের পাতা বুজে গেছে ঘুমের [illegible]ায়। নয়তো দূরে দূরে কত কিছু ভেবেছে।

তার মনকে একদিন আকৃষ্ট করেছিল রামের বনবাস, রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতার নির্বাসন, লব-কুশের কৃতিত্ব, সীতার পাতাল প্রবেশ, রামের দুঃখ বিলাপ, সে গলা ছেড়ে গেয়েছে—"পতিত পাবন সীতারাম।" আবার এদিকে কুরু-পাণ্ডব—কৌরবের হিংসা, পাণ্ডবের সহিষ্ণুতা, পাণ্ডবের কীর্তি, কুন্তীর বাৎসল্য, পঞ্চ পাণ্ডবের মাতৃভক্তি, অভিমন্যুর বীরত্ব, কর্ণের বীরত্ব, অর্জুনের কীর্তি—সে সখাদের নিয়ে, সখাদের সামনে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ করেছে, গলা ছেড়ে বলেছে—"কালি রণে কর্ণ বধ প্রতিজ্ঞা আমার।" সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাকে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে, কত মেহনত, কত অনুশীলনই না করতে হয়েছে। গাছের ডাল পাতা, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি করতে হয়েছে দু-খানা রথ, কত ছেলেকে শিখিয়ে দিতে হয়েছে কত কথা। রথের চাকা ডেবে যাবার জন্য মাটি খুঁড়ে জল ঢেলে তা নরম করেও রেখেছে। তবে হয়েছে কর্ণ বধ।

সেই রথ তৈরি করবার সময় শর্মিষ্ঠা এটা ওটা এগিয়ে দিয়েছে, কত মতলব দিয়েছে, কত সাহায্য করেছে। মেঘুর নিষেধ সত্ত্বেও, শর্মিষ্ঠা সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে তার মায়ের কাছে। দেখিয়ে দিয়েছে তাদের রণাঙ্গন, চারপাশে ঝোপঝাপে ঢাকা। দু'খানা রথ দেখে, যাত্রার মহড়া শুনে সে এত খুশী হয়েছিল যে, তা না করে কোন উপায় ছিল না তার। শর্বরী, বিলি আরো কতলোক ঝোপের আড়াল থেকে দেখেছে সে যাত্রা, শুনেছে তাদের গান। তার জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে সে পেয়েছে মায়ের ভালবাসা, উৎসাহ। রাবণ ও লছমী বাগান থেকে ফিরে বিলির মুখে সেসব বর্ণনা শুনে অবাক হয়েছে, খুশী হয়েছে। সবাই মিলে হাসাহাসি করেছে যাত্রার এক একটা কথা অনুকরণ করে।

ঘুম ভাঙলে মেঘু ভেবেছে তার বাল্য সখাদের কথা, শর্মিষ্ঠা ও শর্মিষ্ঠার সখীদের কথা। নতুন নতুন কল্পনার বোঝা মাথায় নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তখন কাউকে পাওয়া যায় না। যে যার কাজে ব্যস্ত তখন। বাগানে কাজ শুরু হয় সকালে, পাবনের হাজিরা শেষ হয় সূর্যের তাপ বেড়ে ওঠার আগে। পাতা তোলার মেয়েরা থাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। শর্মিষ্ঠাকে যেতে হয়েছে পড়তে। মাথার বোঝা মাথায় নিয়ে মেঘু ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। কখনো বা উদাস চিত্তে খানিক ঘুরেও বেড়িয়েছে একা একা। সে অভিযানও কম নয়। কত ভাবভঙ্গিতে সে পথে বেড়িয়েছে। যেমন অর্জুনের মতো গাণ্ডীব কাঁধে ঝুলিয়ে গেছে বনবাস।

বন্ধুরা ফিরে এলে শুরু করেছে তার কাজ। তখন রৌদ্রের প্রখর তাপে ঠাণ্ডা হয়েছে মেঘুর দেহমন। আর সকলের দেহমন।

প্রতিদিন মেঘু দেখে এসেছে সকলের যাওয়া। যায় যন্ত্র তাদের মন নিয়মে বাঁধা। অবকাশ নেই কোন আপসোসের। নির্দিষ্ট কাজ করে তারা ফিরে আসে। কোন মতে নাওয়া-খাওয়া শেষ করে মিলে যায় মেঘুর সঙ্গে। তারপর যায় নিত্য নতুন অভিযানে, যায় মনের খোরাক সংগ্রহ করতে।

যেন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মেঘু রোজই বিষাদ চিত্তে বিদায় দিয়ে এসেছে যাত্রীদের, অর্থাৎ কর্মরত বন্ধুদের। গাড়ীখানা চলে গেলে সে শুধু ভেবেছে—তারা কোথায় যায়? বুক ভরে রয়েছে শুধু স্তব্ধতা, এক বিরাট শূন্যতা। রেলগাড়ীতে যাত্রী তুলে দিতে দিতে একদিন তার মনও চড়ে বসল গাড়ীতে, হু-হু করে ছুটে চলল গাড়ী।

একদিন সেও গেল কাজে, বন্ধুদের সঙ্গলাভে তার মনের সেই শূন্যতা ভরিয়ে নিতে। বই নিয়েও বসল। রামায়ণ মহাভারত পড়বে ভবিষ্যতে। শিখিয়ে দেবে বন্ধুদের রাম-রাবণের কথা, কুরু-পাণ্ডবের কথা। এতদিন যা শিখিয়েছে তার চাইতে অনেক ভাল হবে সেসব কথা। খুব ভাল করে যাত্রা করবে, যাত্রার দল করবে। উৎসব পরবে যাবে বাগানে বাগানে, গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখান থেকে ডাক আসবে। টাকাও আসবে সেই সঙ্গে।

যাদের নিয়ে, যাদের জন্য মেঘু এত কাণ্ড করেছে তারা, তাদের মধ্যে একজন প্রিয়তম, তাকে ডুবিয়ে দিল অপমানের অথৈ জলের তলে। বিলি তাকে ভাসিয়ে তুলল সাতসমুদ্রের পাড়ে, সেই রহস্যময় দ্বীপটির পাড়ে। বিলি তাকে শুনিয়ে দিল তার পিতৃভূমির কথা।

নবচেতনার অরুণ আলোকে স্নান করে পবিত্র হয়ে উঠল মেধুর মনের যত বাসনা, জাগ্রত ও সুপ্ত বাসনা। তার সমস্ত জীবনের অজানা স্বপ্ন ও সাধনাকে সার্থক করে তুলতে চাইল দুটি ইচ্ছার মধ্য দিয়ে। ইংরেজী ভাষা দিয়ে জেনে নেবে তার পিতৃভূমির তথ্য, কলঘরে কাজ করে আয়ত্ত করবে তার পিতৃভূমির প্রেরিত বিদ্যার রহস্য।

এই না-দেখা, না-জানা কাজটা যতবড় কৌতূহলের বস্তু হয়েছিল মেধুর মনে ঠিক ততখানি ছোট আকার ধারণ করল তা জানার পর। তার চাইতে ঢের বেশী প্রশ্ন তার মনে জাগে গাছ-গাছের গোড়ায় গেলে, তার ডগার ওপর চোখ পড়লে, পাহাড়, জঙ্গল, আকাশের দিকে চাইলে। সেখানকার কুয়াশা, বৃষ্টি—জীব জগতের ওপর প্রত্যেকটি ঋতুর প্রভাবের কথা ভাবলে! সৃষ্টিকর্তার কত মহিমাই না তার চোখে পড়ে সেই খোলা অঙ্গিনায়! সেসব প্রশ্নের উত্তর, সেসব রহস্যের সমাধান আজও করে উঠতে পারে নি তার মন।

মানুষ ঘুমোয়, নয়তো স্বপ্ন দেখে। অর্থাৎ ঘুমানোর চাইতে বেশীর ভাগ সময় কাটে স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে। সেই অবস্থায় চলে যত সব বিষয়বস্তুর হিসাবনিকাশ, তার ঘাতপ্রতিঘাত টানা। বিষয়ের কোন আদি অন্ত থাকে না। ভূতাভূত, অধিভূত, অধিদেব ও অধিযজ্ঞ সকলেরই আবির্ভাব হয় সেই অবস্থায়। কিন্তু খুব কম লোকেরই তখনকার যত অনুভূতি সেসব মনে থাকে, অথবা খুব কম লোকই তা মনে রাখতে পারে। কিন্তু মেধু নিদ্রাবস্থায় যেমন দেখে, জাগ্রতাবস্থায়ও তেমনই ভাবে। তাই একটা হারিয়ে গেলেও অপরটা থেকে যায়। এবং যেটা থেকে যায় তারই বলে হয়তো হারানো জিনিসগুলো খোঁজ করে আনতে পারে। এইখানে তার নানাবিধ তীক্ষ্ণ চিন্তাধারার উৎস, ক্ষর ও অক্ষর সমাবিষ্ট চিন্তার উৎস ও প্রবাহিনী একাধারে বয়ে চলে।

গায়ত্রী মন্ত্র সে জানে না, তার তাৎপর্যও বোঝে না। কিন্তু সূর্যদেবের তেজ নিজের চোখে দেখে, নিজের সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে। পিতৃদেশে ভৃগু-পুত্রের মতো সন্ন্যাসীর অনুভূতি নিয়ে জগৎ সমীক্ষণ করে বেড়ায় নি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। তার সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় দৃষ্টিভূত হয়েছে ষড়ঋতুর আবর্তনে। বসন্তের লতাপাতার সবুজ অঙ্কুর অপর্যাপ্ত হয়ে উঠেছে বর্ষার উদার্যে, তাতে ঘোরতর রঙ ধরেছে শরৎ হেমন্তে, শীতের প্রকোপে হয়েছে পীত, তারপর বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরে পড়েছে মাটিতে। যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান সে দেখে নি। সেই ঝরা পাতায় দেখেছে আগুন, গ্রীষ্মের আকাশে পুঞ্জীভূত হয়েছে মেঘ, সেই মেঘ আকাশে ঘুরে ফিরে নামিয়ে এনেছে বৃষ্টি। পাতাভস্ম মাটির সঙ্গে মিশে তার সার বৃদ্ধি করেছে। আবার সেখানে গজিয়ে উঠেছে বসন্তের অঙ্কুর।

অনন্তকাল ধরে মানুষে চেয়ে দেখে ঐ সূর্য, ঐ চন্দ্র—কতভাবে দেখে আসছে, বন্দনা করে আসছে কত মন্ত্রে। বৈদিক ঋষিরা গেয়েছেন গায়ত্রী মন্ত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো
জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো
বিদ্ধি মামকম্।।
গামাবিশ্য চ ভূতানি
ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো
ভূত্বা রসাত্মকঃ।।

মেধু অতশত জানে না বটে, কিন্তু যেমন দেখেছে চোখের সামনে, তেমন নিয়তই ভেবেছে-জগতের সকল প্রাণ, সকল শক্তির উৎস, সূর্যদেব পূর্বে উদয় হয়ে আসেন ঊর্ধ্বে, অস্তমিত হন পশ্চিমে, সারাটা দিনের পরিবর্তন প্রবর্তন চোখে পড়ে, চোখে পড়ে আলো আর অন্ধকার। শৈশবে এলোমেলো কৌতূহল মনে জেগেছে, অত বড় দীপ্তিটা রাত্রির অন্ধকারে কোথায় কেমন করে লুকিয়ে থাকেন, আবার এই অন্ধকার ভেদ করে হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হন! বড় হয়ে জেনেছে পৃথিবীর কাছে আসেন, আবার দূরে সরে যান, এনে দেন ঋতুর পরিবর্তন। ফাগুনে ফাগুয়ার পরবে সজীব হয়ে ওঠে পাতা লতা, মানুষের মন, বৈশাখের পিঠে নেমে আসে বর্ষার সজল আশীর্বাদ। সূর্যদেব টেনে নেন তা—পৃথিবীর পিঠ থেকে উঠে যায় রস আকাশে বাষ্পের শূন্যতা পূর্ণ করতে, ব্যোমের ভাণ্ডার পূর্ণ হলে আবার তা নেমে আসে বৃষ্টির আকারে—বয়ে চলে প্রকৃতির ঊর্ধ্ব অধঃ জোয়ার ভাঁটা। সূর্যের প্রখর প্রতাপে হিমালয়ের মুকুট শোভা তুষার বিগলিত সলিল নেমে আসে নীচে, উপলখণ্ড ধৌত বিখণ্ডিত করে, পৃথিবীর শিরা উপশিরা রসসিক্ত করে মিলিয়ে যায় সমুদ্রগর্ভে। সেখান থেকে সূর্যদেব আবার তাকে তুলে নিয়ে মেঘযানে বোঝাই করে পাঠিয়ে দেন ধরিত্রীর দেহের ওপর দিয়ে হিমশৃঙ্গে। ঐ যে হিমালয়, তরুণোত্তম হিমশৃঙ্গ কবে কোন সহস্র কোটি বৎসর পূর্বে আদিত্যদেব তাকে ধাত্রীমাতার সদৃশ প্রসব করিয়েছিলেন টেথিস সাগরের গর্ভ থেকে; মাতার মৃত্যুর সহস্র কোটি বৎসর পর আজোবধি তাকে দুগ্ধ শ্বেত সুধায় মাতার ন্যায় পালন করে পুত্রের কলেবর বৃদ্ধির সহায়তা করেন। শিশু পুত্র শুয়ে থাকে অনন্ত নিদ্রায় মাতার কবর শয্যায়, যুগ-যুগান্তরে জেগে ওঠে, কেঁদে ওঠে, কেঁপে ওঠে—স্পন্দন-কম্পন ওঠে ধরিত্রীর সারা দেহে, স্ফীত হয়, সংকুচিত হয় দেহের বিভিন্ন অংশ। অতর্কিতে আতঙ্কে হাহাকার রব ওঠে জীবের অন্তরে, সর্বহারা জীব-জগতের অন্তরে।

মেধু ভাবে কেন এমন হয়? পুঞ্জীভূত পাপ! সে কেমন কথা? ব্যক্তিগত শারীরিক বিশৃঙ্খলায় আনে দেহের ধ্বংস, কুকর্ম বিনাশ করে সুকর্ম, সমাজ ও জাতির অকর্মে ঘটে জাতির ধ্বংস। পৃথিবীর অধিবাসীর যত পাপ, যত দোষ, যত ত্রুটি ধরিত্রী বহন করে তার বুকে, পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে তার অন্তরে যুগ-যুগান্তরে—একদিন ওঠে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ধরিত্রীর হৃদপিণ্ডের বিস্ফোরণে।

এমনই যেন কত তথ্যের সন্ধান সে পেয়েছে মহাভারতের অমৃত কথায়। কত গুণের, কত জ্ঞানের আধার মানুষ, তবু সম্মোহিত হয়ে ভুলে থাকে পূর্বপুরুষের সকল নির্দেশ, উপদেশ। অথচ চোখের সামনে দেখে জীবজগতের অপরাপর প্রাণীদের সহজাত বোধশক্তি মনুষ্যাপেক্ষা অধিকতর। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে, আহার অন্বেষণে, ফিরে আসে ঝড় ওঠার পূর্বে। লোকালয়ে পাখীরা ডেকে উঠে সংকেত দেয় মানুষকে ঝড়বৃষ্টি শুরু হবার আগে, জঙ্গলে নিম্নতম অধিবাসী পশুদের জানিয়ে দেয় বৃহত্তর শত্রুর আগমন বার্তা; ময়ূর পেখম ধরে নাচতে থাকে ইন্দ্রধনু উদয়ের পূর্বে; ফেউগুলো কেঁদে উঠে জানায় বাঘের আগমন। হাতীরা মাহুতদের সজাগ ক'রে দেয় আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায়। জঙ্গলে জীবজন্তুর সংকেত মানুষ বোঝে, তাদের মেনে চলে কিন্তু, লোকালয়ে মানুষ মানুষের সংকেত বোঝে না, বিজ্ঞের বার্তা মেনে চলে না, মূর্খের মতো অতি বিজ্ঞের ভাব দেখায়। সেখানে যে যত মূর্খ তত পণ্ডিত, যে যত পাণ্ডিত্য তত মূর্খ। মানুষ স্বর্গাদপি মর্তকে নরকে রূপান্তরিত করে অদৃশ্য স্বর্গের নেশায়-আশায় হা-হুতাশ ক'রে বেড়ায়। কত দুঃখকষ্ট ক'রে তার মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ রুদ্ধ ক'রে বসে থাকে।

(ক্রমশঃ)

কলকাতার প্রাচীন পেশা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে কলকাতা শহরে ধান জমি নেই। কিন্তু প্রায় ১৫০ বছর আগে কলকাতায় ধান চাষ হতো। বহু লোক ক্ষেত-খামারের ফসল নিজেরা খেয়ে কিছু বিক্রি করে সংসার চালাতো। যাদের নিজস্ব জমি ছিল না, তারা দিন-মজুর হিসাবে অপরের জমিতে খেটে কিছু উপায় করতো। বর্তমানে কলকাতা শহরে ধান চাষের কথা চিন্তা করা যায় না। কলকাতা শহরে চাষ করার বৃত্তি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রায় শতবর্ষ পূর্বে কলকাতা শহরের ৬৩৪জন লোকের বৃত্তি বা পেশা ছিল জমিতে চায করা, তা ছাড়া তারা ফুলের ও ফলের গাছ বসাতো এবং বাগান দেখা-শোনা করতো।

কলকাতা শহরে বহু পেশা বা বৃত্তি লুপ্ত হয়েছে যেমন, কূপ বা ইন্দারা খনন করার কাজ। বর্তমানে কলকাতা শহরে বোধ-হয় কূপ খননের লোক পাওয়া যায় না। কেননা, নলকূপ হয়ে ওই পেশা লুপ্ত হয়েছে। শতবর্ষ আগে কলকাতা শহরে ...জন এই কাজ করে পেট চালাতো। সকালে ইন্দারা থেকে জল তুলতে গিয়ে প্রায় দড়ি ছিঁড়ে ঘটি, ঘড়া, বালতি ভেতরে পড়ে যেত। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একদল লোক ইন্দারার ভেতরে নেমে ওই সব জিনিস তুলে দিত। ওদের পেশা বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে।

সেকালে কলকাতায় অধিকাংশ বড় টাকা বাড়িতে উঠন বা ঠাকুরদালান থাকতো। বহু বাড়ির উঠনে এবং মন্দিরের সামনে কথক ঠাকুর সুর করে কথকতা করতেন। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে কলকাতায় ২৪জন কথক বাস করতেন। কথকতা ক'রে তাঁরা সংসার চালাতেন। এই সময় কলকাতায় বহু পালকি ছিল। কলকাতায় ২৮৭৮ জন পালকি বেয়ারা বাস করতো। সে সময় মশালচী অর্থাৎ মশালবাহক ছিল ৩৫০জন। ধনীদের বাড়িতে, সরকারী দফতরে এবং আদালতে চলতো টানা পাখা। মানুষ পাখা টানতো। শতবর্ষ পূর্বে কলকাতায় ২.৯১৮ জন পাখা টেনে পেট চালাতো। বর্তমান কলকাতা শহরে মশালচী, পালকি-বেয়ারা এবং পাখা-টানার লোক দেখা যায় না। এইসব পেশা কলকাতা থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

কলকাতার কয়েকটি ব্যবসাও লুপ্ত হয়ে গেছে যেমন, প্রায় শতবর্ষ আগে কলকাতা শহরে হাতি কেনা-বেচা হতো। কলকাতায় তিনজন ব্যবসায়ী হাতি কেনা-বেচা করতেন। এই সময় বাংলাদেশে নীল-চাষ হতো। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ৩৪জন নীলের ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন।

প্রায় শতবর্ষ আগে কলকাতার প্রধান যানবাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি। এই সময় ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসা ছিল ২৫৫ জনের। শহরে কোচোয়ান ছিল ৩,৮৮৮জন এবং সহিস ছিল ৫২৯২জন। কলকাতা শহরে ওই সময় ঠেলাগাড়ির ব্যবসা করতো ১২৫ জন লোক। ঠেলাগাড়ি টানতো ৩০৩০জন। এবং এই সময়ে কলকাতায় ৫৮জনের ছোট-বড় কয়েকটি আস্তাবল ছিল।

বহু ব্যবসা, বৃত্তি বা পেশা বর্তমানে কলকাতা শহরে লুপ্ত হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও যেসব পেশা বা বৃত্তি প্রচলিত ছিল বর্তমানে সেই সব পেশা প্রায় উঠে যাবার মতো হয়েছে। যেমন ঢেঁড়াওয়ালা। সেকালে ডুম্-ডুম্ শব্দ করে ঢোল পিটিয়ে ঢেঁড়াওয়ালা পল্লীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তারপরে লোক জড় হলে সরকারী অথবা কোন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞপ্তি পল্লীবাসীর সামনে তুলে ধরতো। দোল-

ঢেঁড়াওয়ালা

যাত্রার পূর্বে কলকাতার বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশের লোক ঢেঁড়াওয়ালা সঙ্গে করে ঘুরতো। ঢোল বাজিয়ে লোক জড়ো করতো। তারপরে পুলিশ কর্মচারী চিৎকার করে জানিয়ে দিত পুলিশ কমিশনারের আদেশ-নামা। দোলের রং নিয়ে কোনরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে তারজন্য সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হতো। সেকালে আদা-লতে মামলায় জয়লাভ করার পরে অনেকে ঢেঁড়াওয়ালা দিয়ে ঢোল পিটিয়ে তার জয়ের কথা প্রচার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো। ঢেঁড়াওয়ালা ছিল সেকালের প্রচারের বাহন। বহু বিদেশী নিলামদার তাদের নিলাম ঘরে যেসব জিনিস-পত্র আছে তার বিবরণ ঢেঁড়াওয়ালা দিয়ে প্রচার করতেন। দেশীয় ব্যবসায়ীরাও ঢেঁড়াওয়ালা রাখতেন। কোন এলাকায় নতুন বাজার অথবা নতুন দোকান খুললে সেই অঞ্চলে ঢেঁড়াওয়ালা দিয়ে ঢোল পিটিয়ে সকলের কানে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সেকালে কোন পল্লীতে যাত্রাগান কিংবা তর্জা হবার আগে থেকে চারিদিকে

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী। সামনে পাল্কি বেয়ারা।

টানা পাখা টানছে বেয়ারা

ঢেঁড়াওয়ালার মাধ্যমে দশজনের কানে সেই সংবাদ প্রচার করা হতো।

বর্তমানের মতো সেকালে কলকাতার অলি-গলিতে হোটেল ছিল না। কিন্তু বহু জায়গায় যাত্রীনিবাস ছিল। সেকালে অনেকে যাত্রীনিবাস খুলে সংসার চালাতেন। যাত্রী-নিবাসের লোকেরা শিয়ালদহ এবং হাওড়া ইস্টেশনের যাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রাখতো। থাকা-খাওয়া এবং নিরাপত্তার নানারকম সুবিধার কথা বলে যাত্রী সংগ্রহ করাই ছিল তাদের কাজ। অনেকে যাত্রীনিবাসে ঘর ভাড়া নিয়ে নিজের হাতে রান্না করে আহার করতেন। হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি, হাতা, থালা, গেলাস এমন কি শিল-নোড়া পর্যন্ত যাত্রীনিবাসে পাওয়া যেত। যাত্রী-নিবাসের লোকেরা বাজার করে দিত। জল বয়ে আনতো। ঝি টুকিটাকি কাজও করতো। নানা কাজে যাঁরা কলকাতায় আসতেন তাঁদের অনেকেই যাত্রীনিবাসে রাত্ত কাটা-তেন। অনেকে নানা ব্যবসা উপলক্ষ্যে, মামলার জন্য কিংবা তীর্থযাত্রার পথে কলকাতায় যাত্রীনিবাসে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন।

প্রায় শতবর্ষ পূর্বে কলকাতা শহরে যেমন যাত্রীনিবাস ছিল, ঠিক তেমনি বহু মুসাফিরখানা বা সরাইখানাও ছিল। সেকালে হোটেল ও সরাইখানায় থাকার ব্যবস্থা থাকতো এবং তৈরি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের কত হোটেল, সরাইখানা, এবং যাত্রীনিবাস ছিল তাহা এখানে উল্লেখ করছি—শ্যামপুকুর ১, কুমারটুলি ৫, সুকিয়া স্ট্রীট ১, জোড়াবাগান ২৪, জোড়া সাঁকো ৬, বড়বাজার ২০, কলুটোলা ৪, মুচিপাড়া ১, বহুবাজার ১২, পদ্মপুকুর ১ ওয়াটারলু স্ট্রীট ৪, ফেণিকবাজার ১, তাল-তলা ২, পার্কস্ট্রীট ১ (মোট সংখ্যা ছিল ৮৩)।

সেকালে কলকাতা শহরে তামাক পরাতে তিন-চার রকম তালকরা গোলাকার পিণ্ড তামাক নিয়ে তামাকওয়ালারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। একসময় 'ফরসিওয়ালা' বলে হাঁক দিত একদল লোক। এদের কাঁধে থাকতো বাঁক। বাঁকের দু-দিকে পরপর সাজানো থাকতো নানারকম গুড়গুড়ির লম্বা নল। কারকারুন রাস্তায় গুড়গুড়িতে তামাক সেজে ঘুরতো। পথে ফেরিওয়ালা এবং দোকানদার অনেকে তাদের গুড়গুড়িতে টান দিয়ে তামাক খেয়ে তামাকওয়ালার হাতে একটি আধলা কিংবা পয়সা দিতো। সিগরেটের ব্যাপক প্রচলনের পরে তামাক সেজে খাওয়া কমে গেছে। এইসব লোককেও রাস্তায় আর দেখা যায় না। কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলে একটি গলি একসময়ে তামাকুপট্টী নামেও পরিচিত ছিল।

সেকালে প্রায় প্রতি রাস্তা এবং গলিতে ভিস্তি দেখা যেত। এরা কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে রাস্তা থেকে জল ভরে বহু বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতো। কলকাতার বহু বস্তিতে ভিস্তিরা বাস করতো। কলকাতার কয়েকটি রাস্তা এবং গলি ভিস্তি পাড়া নামে পরিচিত ছিল। যেমন—ভিস্তিতলা (কাশীপুর), ভিস্তিপাড়া (কলিন স্ট্রীট) প্রভৃতি স্থানেও ওদের নিয়ে গলির নামকরণ হয়েছিল।

সেকালে তামাক ও টানাপাখা নিয়েও গান রচিত হয়েছিল। একটি গানে বলা হয়েছিল :

> "টানা পাখা টাঙিয়ে দিয়ে
> বৈঠকখানায় বাতাস খাবে।
> কুন্দর তোড়া সামনে রেখে
> সটকা টেনে সাধ মিটাবে।।"

অঙ্গনা

বিজ্ঞাপন : সৌন্দর্য : আমরা

সেদিন একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। এক নামজাদা কোম্পানীর ডানলোপিলো সোফা-সেটের বিজ্ঞাপন। এক মহিলা একটি সোফা-কাম-বেডে গা এলিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত নয়নে রাজপথে জনতার মিছিল দেখছেন। তিনি যেমন চলমান জনতাকে প্রত্যক্ষ করছেন তেমনি তাঁকে ঘিরেও একটি ছোট-খাট ভিড় মাঝে মাঝেই পড়ে উঠছে। অধিকাংশ সেই ভিড়ে গা না ভাসিয়ে এক লহমায় সমস্ত ভিউটা নেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেউ এড়িয়ে যেতে পারছেন না। সকলেরই নজর আটকাচ্ছে বিজ্ঞাপনের সেই মহিলার দিকে। তিনি নির্লিপ্ত নন, তিনি উদাসীন নন, তাঁর চোখের তারায় সকলের প্রতি সাদর আমন্ত্রণ। আর সেই আমন্ত্রণে তিনি পণ্য-মাহাত্ম্যে সবাইকে অভিভূত করছেন। অপরের জন্যও যে সবাই অভিভূত হচ্ছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্যই এই অনুভূতি স্থায়ী নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয় এরকম একটা সোফা-কাম-বেড বাড়িতে থাকলে এমনি তৃপ্তিসুখ উপভোগ করা যায়। সেই মুহূর্তে একটা না পাওয়ার বেদনা মনের মধ্যে গুমরে ওঠে এবং পাশাপাশি এই জিনিসটি পাবার জন্য একটি তাৎক্ষণিক সংকল্প মনে দানা বাঁধে। চলতে চলতে হয়তো সেই সংকল্প ফিকে হয়ে আসবে এবং আরো দশটা জিনিস মাথায় ভিড় করে আসবে। কিন্তু বরাবর এমনিধারা চলতে পারে না। সেই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আবার সেই বিজ্ঞাপনের দিকে নজর পড়বে আর মনে পড়বে সেই পুরনো সংকল্পের কথা। এমনিভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং হয়তো একদিন ডানলোপিলোর সোফা-কাম-বেড ঘরেও এসে উঠবে। আর আমরা তখন তাতে গা ঢেলে দিয়ে সেই সুখ উপভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবো।

এই হলো এ যুগের বিজ্ঞাপন-মাহাত্ম্য। পণ্যের প্রতি আকর্ষণ করা এবং চাহিদা জাগানো এই দুটোই হলো বিজ্ঞাপনের আসল কথা। সে কাজে বিজ্ঞাপন যে পুরোপুরি সফল হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞাপন হলো পণ্যের প্রধান সহায়। আর বিজ্ঞাপনে নারীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বত্র যেমন সুন্দর মুখের জয় তেমনি নারীমুখের আবেদনও বিজ্ঞাপনকে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই বিজ্ঞাপনে নারীমুখ এবং নারীকণ্ঠ সবিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে পশ্চিমী দেশগুলিতে বিজ্ঞাপনে কাজ করার জন্য মহিলাদের একটি পেশার সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে কাজ করেন। এসব দেশে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের প্রচার ছাড়াও ফ্যাশান প্যারেডের ব্যবস্থা আছে। প্রতি বছর তিন-চার ঋতুতে নতুন পোশাকের মেলা বসে-যায়। শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উৎসাহীদের মধ্যে পরিবেশন না করে ফ্যাশান প্যারেডের মাধ্যমে সেসব দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। এর ফলে ফ্যাশানের সঙ্গে উৎসাহীর

সাক্ষাৎপরিচয় ঘটে এবং তা অঙ্গে ধারণ করলে তা কতটা মানানসই হবে সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা জন্মে। এমনিভাবে পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রতি ঋতুতে ফ্যাশানের বাজার হয়ে ওঠে জম-জমাট। এর পেছনে এই ম্যানিকিন অর্থাৎ মডেল গার্লদের দান বড় কম নয়। দান যেমন কম নয় তেমনি দামও ও'রা পান। ওদেশে ম্যানিকিনদের ভিন্ন কোন জীবিকার কথা ভাবতে হয় না। এই জীবিকাতেই ও'রা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। তবে এই জীবিকার একটা অসুবিধা হলো যে যতদিন রূপ-যৌবন থাকে ততদিন এই জগতে তার প্রাধান্য। রূপ-যৌবনে ভাটা পড়লে তার আর কদর থাকে না। সে জায়গায় এগিয়ে আসেন আর একজন।

কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করলেই ম্যানিকিন হতে পারে না। এজন্য ও'দের রীতিমতো ট্রেনিং নিতে হয় এবং ক্লাশ করতে হয়। ট্রেনিং শেষ করে বেরুনোর পর কাজের পালা। এখানে যার যেমন বরাত খোলে। একজন হয়তো কাজ করে অবসর পান না আবার কেউ হয়তো দু' একটা কাজ কোন-মতে ধরতে পারেন। কিন্তু ম্যানিকিনদের কেউ নিজের খেয়ালখুশিমতো চালাতে পারেন না। এজন্য আছে ও'দের অ্যাসো-সিয়েশন। সেখান থেকে ও'দের সর্বদিকে নজর রাখা হয়। মাঝে মাঝে এবং সুযোগ বুঝে ওরা নিজেদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর দাবি তোলেন এবং প্রচারকর্তাকে ও'দের দাবি পূরণ করে চলতে হয়। বলা বাহুল্য যে ম্যানিকিনরা ওদেশে পণ্যের প্রচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পশ্চিমী দেশগুলিতে যে সুবিধা আছে আমাদের দেশে তা নেই। তাই দীর্ঘদিন একাজে আমাদের মেয়েদের মধ্যে খুব একটা উৎসাহ দেখা যেতো না। এই কিছুদিন আগেও খুঁজলে-পাতলে হয়তো এরকম দু একজনের দেখা পাওয়া যেতো। এ ছাড়া আর সব জায়গাটুকুই দখল করে রেখেছিলেন বিদেশিনীরা। সেদিন এই জীবিকা সম্বন্ধে আমাদের কোন আগ্রহ ছিল না এবং এজন্য দায়ী মূলত আমাদের সংস্কার। আমরা লেখাপড়া শিখেছি এবং বাইরে চলতেফিরতে পারছি এটুকুতেই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। তারপর সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার কথা আমাদের মনের কোণে ছায়াও ফেলতো না। বরং একটা চাকরি ম্যানেজ করে মোটামুটি নিজেকে সেটেল করার চিন্তাই ছিল আমাদের বেশি। আর বাস্তবে হচ্ছিলও তাই। অথচ হাতের কাছে এমন একটা সুন্দর জীবিকার কথা একবার আমরা ভেবেও দেখতাম না। এজন্য আমাদের সংস্কার যতখানি দায়ী ঠিক ততখানি দায়িত্ব এ সংক্রান্ত যথার্থ জ্ঞানের অভাব।

এখন অবশ্য অবস্থা কিছুটা বদলেছে। নামকরা কোন মিলের শাড়ির তোয়ালের প্রভৃতি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় এদেশেরই মেয়েকে। আবার টুথপেস্টের বিজ্ঞা-পনে ঝকঝকে দাঁত নিয়ে তিনি আমাদের কাছে নতুনরূপে হাজির হন। প্রায় প্রতিটি রেডিও বিজ্ঞাপনে মেয়েদের গলা শোনা যায়। একতরফা প্রচারে কোন কিছুই আজ আর তেমন সাড়া জাগাতে পারে না। তাই অধিকাংশ বিজ্ঞাপনেই মেয়েদের স্থান দিতে হয়। ইদানিং আরো একটা জিনিস হয়েছে। ফ্যাশান প্যারেডের চল হয়েছে আমাদের দেশে। পৃথিবীর সব দেশের মতো এদেশেও ফ্যাশানের নিত্য ওঠাপড়া। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তার যতটা প্রচার ফ্যাশান প্যারেডের মাধ্যমে সাক্ষাৎ-পরিচয় দেখার তেমন উদ্যোগ এখনও গড়ে ওঠেনি। তবু হাল ফ্যাশান নিয়ে বড় বড় শহরে দু' একবার ফ্যাশান প্যারেডের আয়োজন হয়। এটা মন্দের ভাল বলতে হবে। এসব ফ্যাশান প্যারেডে গোড়া থেকেই আমাদের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে আসছে। এর ফলে জড়তা ক্রমেই কাটছে। এখান থেকে মডেল গার্ল হওয়ার দিকে কেউ কেউ ঝুঁকছেন।

বিদেশে প্রতি বছর সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতার আসর বসে এবং একাধিক। আমাদের দেশে সৌন্দর্য চর্চা যতটা প্রখর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ব্যাপারে কেউ ততটা উৎসুক ছিলেন না। সৌন্দর্যচর্চার ঐতিহ্য আমাদের অতি সুপ্রাচীন। আর এই জিনিস চলে আসছে রাজপ্রসাদ থেকে পর্ণকুটির পর্যন্ত। যার যেমন সাধ্য তিনি তেমনি সেজেছেন। যে কোন উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেনি সেই আদিবাসী রমণী একটা জবা ফুল খোঁপায় গুঁজে নিয়েছে। একে তার নিটোল দেহবল্লরী, অপরূপ কবরী এবং সর্বোপরি সেই রূপে লাল জবা নিঃসন্দেহে দেহের রঙের সঙ্গে সৌন্দর্যের ভাবরসের বিনিময় হতো। তার পাশাপাশি যে কোন সুশোভিতা তরুণী পথ হাঁটতে লজ্জা পাবেন। তা তিনি সাজসজ্জায় যত আধুনিকাই হন না কেন।

তাই সৌন্দর্যচর্চায় আমরা অত্যন্ত কুলীন কিন্তু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার কথা ঠিক আমরা ভেবে উঠতে পারিনি। বিদেশী সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অনুকরণে আমাদের দেশেও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসর বসতে শুরু হয়েছে। প্রতি বছর একাধিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সাড়া তেমন খুব একটা পাওয়া যায় না। প্রতিযোগীর সংখ্যা খুবই সীমিত। কলকাতায় সাড়া মেলে কম। কিন্তু অন্যান্য শহরে বিশেষত বোম্বাইয়ে মেয়েদের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ। কলকাতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা যেমন কম বোম্বাইয়ে তেমনি বেশি।

পশ্চিমী দেশে সাধারণত সৌন্দর্য প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকেই মডেল গার্ল গড়ে ওঠে এবং ভবিষ্যতে এ'রাই বিজ্ঞাপনে অংশ নেয় এবং ফ্যাশান প্যারেডে নিত্য-নতুন পোশাকে হাজির হয়ে দর্শকদের সঙ্গে মিতালি পাতান। বিশ্বসৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যিনি জয়লাভ করেন তাঁর তো কথাই নেই। তিনি সে বছর বিজ্ঞাপনের জগতে অদ্বিতীয়া নারী। পণ্যের প্রসারে সবাই তাঁকে কামনা করেন। এই সঙ্গে নানা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ-কারীদের মধ্য থেকেই প্রচারবিদরা বেছে নেন তাঁদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম। এতে দেখা যাচ্ছে যে, এসব দেশে সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতার সঙ্গে একটি পেশার যোগ আছে। এই প্রতিযোগিতা থেকে হয়তো মডেল গার্ল হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে এই মনোভাব থেকেই ওদেশে প্রতি-যোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সবাই যে এই একই মনোভাব থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন তা অবশ্য ঠিক নয়। ও'রা সংস্কারের দিক থেকে অনেকখানি মুক্ত। এবং সহজ মন নিয়েই সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতার আসরে হাজির হন।

এবার এমনি একটি সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতার আসর বসেছিল রাজস্থানে এবং সবাইকে পিছনে ফেলে একটি আদিবাসী তরুণী এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারিণীও এক আদিবাসী তরুণী। এমনিতে রাজস্থানে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা প্রতি বছর হয় না। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে এবং সেই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় আসর বসানো হয়েছিল। দুই আদিবাসী তরুণী সেখানে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন প্রথমত এধরনের প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং দ্বিতীয়ত সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে আধুনিকাদের পর্যুদস্ত করে। এখান থেকে আরো একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সকলের আগ্রহ বাড়ছে এবং তার ঢেউ অচিরেই কলকাতা শহরকেও স্পর্শ করবে। এবং জড়তার অবসানও হবে। কারণ, আমাদের মনে রাখতে হবে যে এর সঙ্গে একটি পেশার অদৃশ্য যোগসূত্র আছে। আর ফ্যাশান প্যারেডও দিনে দিনে বাড়বে তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পাচ্ছি। সারা দেশই এখন ফ্যাশান চর্চায় ডুবে আছে। হাল ফ্যাশান নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আর ফ্যাশান প্যারেডের মাধ্যমেই পোশাকের আবেদন সরাসরি ফ্যাশানবিলাসী সমীপে হাজির করা আজকের দিনের দুরন্ত কৌশল।

বাঙালী মেয়েদের অকারণ সংস্কারের বেড়া এবার আরো ভাঙবে। সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতায় আরো মেয়ে যোগদান করবেন এবং ও'দের মধ্য থেকে মডেল গার্ল হিসেবে সরাসরি পেশায়ও চলে আসবেন কেউ কেউ। এমনিভাবে জীবিকার একটা সহজ সুযোগ অনেকের হাতের কাছে এসে যাবে। ভবি-ষ্যতে কোন পণ্যের বিজ্ঞাপনে হয়তো দেখা যাবে আমার বা আপনার মেয়ের মুখ।

—প্রমীলা

অগ্রদূত পরিচালিত ছদ্মবেশী চিত্রে উত্তমকুমার এবং মাধবী চক্রবর্তী।

মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার ও চলচ্চিত্র শিল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বোম্বাই শহরের দুগ্ধসরবরাহ কেন্দ্র আরে কলোনীর কাছেই অতি শীঘ্রই একটি চলচ্চিত্র-নগরী গড়ে উঠতে চলেছে। এই নগরীর জন্যে নির্দিষ্ট ৮৬ হেক্টার (৮৬,০০,০০ বর্গমিটার) বিস্তৃত জমির প্রস্তুতিমূলক সংস্কারকার্য চার মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মহারাষ্ট্র সরকারের চলচ্চিত্র-নগরী সংক্রান্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গেল শুক্রবার, ১২ নভেম্বরের বৈঠকে মহারাষ্ট্র শিল্পোন্নয়ন পরিষদের (মহারাষ্ট্র ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন-এর) হাতে এর জন্যে আরও ১০ লক্ষ টাকা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আগে এই কাজের জন্যে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র-নগরী সংক্রান্ত কমিটির সদস্য ও রাজ্য সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী এম ডি চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, স্টুডিও নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় জমি বিলি সংক্রান্ত শর্ত ও নিয়মাবলী কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে চূড়ান্তভাবে স্থির করা হবে। এক কোটী টাকার এই প্রকল্পটি প্রথম পর্যায়ে ১৫টি স্টুডিও এবং পরে আরও ৮টি স্টুডিও নির্মাণ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জমি বিলির জন্যে ও'রা ৩৫টি আবেদনপত্র পেয়েছেন। প্রয়োজনবোধে আরও বেশী জমি উন্নয়নের কাজে ও'রা হাত দিতে পারেন বলে শ্রীচৌধুরী জানিয়েছেন। চলচ্চিত্র-নগরী নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই পুরোদমে চালু হয়েছে—রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে, জল-সরবরাহের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ প্রায়। বিদ্যুৎ-সরবরাহের জন্যে একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরের এই সংবাদ থেকে পাঠকদের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না, যে, মহারাষ্ট্র সরকার চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্যে কতখানি আগ্রহশীল। শিল্পটিকে একটি সুস্থ কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাকে যে কেন্দ্রীভূত করবার প্রয়োজনীয়তা আছে, এসম্পর্কেও তাঁরা সচেতন। তাঁরা জানেন, এই শিল্পটি শুধু যে সংস্কৃতির বাহন, তা নয়, এই শিল্প হাজার হাজার মানুষের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের চিত্তবিনোদনের গুরুদায়িত্ব বহন করে। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, এই শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা—যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রাও প্রচুর যোগান দেয়। মহারাষ্ট্র সরকার চলচ্চিত্রশিল্পের এই বহুমুখী গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েই যে চলচ্চিত্র-নগরী নির্মাণের ব্যাপারে যত্নবান হয়েছেন, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিকে চাইলে কি দেখি? পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের নাভিশ্বাস ওঠার সংবাদ রাজ্য সরকার প্রায়ই পেয়ে থাকেন। এবং তার ফলে সরকারের প্রচার ও তথ্য বিভাগীয় কর্তারা প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্নবোধ করে তড়িঘড়ি অনুসন্ধান সমিতি গঠন ক'রে ফেলেন। ১৯৬২ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ পর্যন্ত এ-রকম তিনটি কমিটি স্থাপিত হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি কমিটি যতশীঘ্র সম্ভব তাদের অনুসন্ধানকার্য শেষ করে সরকার বরাবর রিপোর্টও পেশ করেছে। তৃতীয় কমিটি—'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিল্ম কনসাল্টেটিভ কমিটি'—গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে। চলচ্চিত্র বিষয়ক সকল স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই কমিটির সদস্যপদভুক্ত করা হয় অন্তত ৪৩ জন ব্যক্তিকে। এই কমিটি পাঁচটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে সকল বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণের পরে সমিতি গঠিত হবার দেড় বছর বাদে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে একটি বিস্তৃত সুপারিশ সমেত রিপোর্ট পেশ করেন সরকারের কাছে। এবং আমরা জানি ও বিশ্বাস করি, এই কমিটির সুপারিশগুলিকে গুরুত্বানুসারে একের পর এক কার্যকরী করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু যে এই বিরাট ঐতিহ্যবাহী শিল্পটিরই অগ্রগতিতে সহায়ক হবেন, তাই নয়, অর্থানটনপীড়িত সরকারের অর্থ-ভাণ্ডারও সঙ্গে সঙ্গে আশাতিরিক্তভাবে স্ফীত হয়ে উঠবে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রকে, বোধ করি, এমন কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নেই, যিনি জানেন যে, চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সংগেই এই ১৭২টি শিল্পও অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠবে, যার ফলে বিক্রয়কর, উৎপাদনকর, আমদানী ও রপ্তানীকর, অকট্রয় প্রভৃতি নানাদিক দিয়ে সরকারের আর্থিক আয় বহুগুণে বেড়ে যাবে অবশ্যম্ভাবীরূপে। কাজেই আর কিছুর জন্যে না-হোক, রাজ্য সরকার নিজের অর্থভাণ্ডারকে স্ফীত করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ

প্রেক্ষাগৃহ

অনুরূপ ফিল্ম ফেডারেশনের কনসালটেটিভ কমিটি'র সুপারিশগুলিকে একের পর এক কার্যকর করে। এবং এই কাজ করবার প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে রাজ্য সরকারের একটি সাংস্কৃতিক দপ্তর গঠন করা।

চিত্র-সমালোচনা

(১) চলচ্চিত্রের মাদকতা ও অনুশীলন

সিনেমা স্টারদের প্রেমে পড়া আজকালকার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটি সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তমকুমার বা রাজেশ খান্নার সান্নিধ্যলাভের জন্যে উৎসুক, এমন তরুণী যেমন সংখ্যায় অজস্র, ঠিক তেমনই হেমা মালিনী বা অপর্ণা সেনের জন্যে পাগল, এমন তরুণদেরও গুনে শেষ করতে পারা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা যে শুধু চোখের এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনের নেশা ছাড়া আর কিছুই নয়, সবটাই ইনফ্যাচুয়েশন, এটা প্রমাণ করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়।

এই 'স্টার ইনফ্যাচুয়েশন'-এর কাহিনী অবলম্বন করেই রূপম চিত্র নিবেদিত ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'গুড্ডি' ছবিটি নির্মিত হয়েছে। নিবেদিতা বিদ্যামন্দিরের কিশোরী ছাত্রী কুসুম—যার ডাক-নাম গুড্ডি—সিনেমা দেখতে প্রচণ্ড ভালোবাসে। এবং এই সিনেমা দেখার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি থেকেই তার মনে জাগে ধর্মেন্দ্রের প্রতি হিরো ওয়ারশীপ অর্থাৎ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখা ধর্মেন্দ্রের প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগ; তার শয়নে-স্বপনে নিদ্রায়-জাগরণে তার চোখের সামনে জেগে আছে শুধু ধর্মেন্দ্র। তার বৌদি যে-নবীনের সঙ্গে একদিন তার বিয়ে দেবেন বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, সেই নবীনের দিকে তার মন নেই। অনুরাগী নবীন প্রথমটা বুঝতেই পারে না, কুসুম কেন এমনভাবে তাকে উপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে কুসুম স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে শুটিং দেখতে গিয়ে চাক্ষুষ রক্তমাংসের শরীরে ধর্মেন্দ্রকে দেখেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছে, তার অটোগ্রাফ নিয়েছে। ধর্মেন্দ্র সম্পর্কে কুসুমের আতিশয্য দেখে ওর বৌদি চিন্তিত হয়েছে এবং ওর মামা, মনস্তত্ত্ববিশেষজ্ঞ ডঃ গুপ্তকে জানিয়েছে। ডঃ গুপ্ত ব্যবস্থা দিলেন, কুসুম বা গুড্ডিকে ধর্মেন্দ্রের শুটিং খুব বেশী করে দেখানো হোক এবং ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ দেওয়া হোক। ধর্মেন্দ্রকেও ব্যাপারটা জানানো হল। এর পর বহু পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে গুড্ডি ধাতস্থ হল অর্থাৎ নিজের পাগলামির কথা বুঝতে পারল। কিন্তু অপরদিকে নবীন গুড্ডির ধর্মেন্দ্র-প্রীতি দেখে নিরাশ হয়ে ঠিক তখনই গুড্ডির জীবন থেকে সরে যেতে চাইল, যখন গুড্ডি নিজের মনকে নবীনের দিকে ফিরিয়ে এনেছে। কাজেই বেশ খানিকটা চোখের জলের পরে উভয়ের মিলনের মধ্যে ছবির সমাপ্তি।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও সমকালীনতা (হিরো ওয়ারশীপ জিনিসটা চিরকেলে হলেও সিনেমা হিরো বা স্টার ওয়ারশীপ ব্যাপারটাকে আধুনিক বলতেই হবে) ছবিটিতে একটি নতুন স্বাদ এনেছে। এবং ছবির মেজাজ বহুলাংশেই হাল্কা ও রহস্যমূলক এবং সেই কারণে উপভোগ্য। কিন্তু একেবারে শেষাশেষি, যেখানে নবীন ও কুসুমের মধ্যে মান-অভিমান ও কান্নাকাটির পালা, সেখানে হঠাৎ ছবির আবহাওয়া হয়ে উঠেছে থমথমে ও গুরুগম্ভীর। মান-অভিমান, কান্নাকাটি পর্যন্ত না নিয়ে গেলেই যেন ভালো ছিল।

ছবিটিকে গতানুগতিকতাবর্জিত ও তাজা (অফ-বীট ও রিফ্রেসিং) মনে হয় আর একটি কারণে। এর মূল চরিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে হিন্দী ছবিতে খুব-কম-দেখা শিল্পীদের দ্বারা। এক ধর্মেন্দ্র ছাড়া এতে আছেন সমিত ভঞ্জ, উৎপল দত্ত, জয়া ভাদুড়ী, সুমিতা সান্যাল প্রভৃতি শিল্পী, যাঁদের হিন্দী ছবিতে দেখা যায় না বললেই চলে। হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শকের কাছে এই নতুনত্বের মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

এপার ওপার চিত্রগ্রহণের অবসর মুহূর্তে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযোজক অরুণ রায় চৌধুরী।

আজকের নায়ক / জয়শ্রী রায়। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

নায়িকা কুসুম বা গুড্ডির চরিত্রে জয়া ভাদুড়ীকে যেমন মানিয়েছে, তেমনই আন্তরিক ও বাস্তবানুগ হয়েছে তাঁর অভিনয়। স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা এবং শাড়ী-পরা—দুভাবেই তিনি যেমন চমৎকার, তেমনটি আর কেউ হতে পারত বলে মনে করতে পারছি না। গুড্ডি-ঘটিত সমস্যার সমাধানে সার্থক অভিনয় করেছেন চশমা-পরা উৎপল দত্ত ডঃ গুপ্তের ভূমিকায়। গুড্ডির জন্যে নির্বাচিত পাত্ররূপে নবীনের ভূমিকায় সমিত ভঞ্জকে খুব একটা না মানালেও, তাঁর অভিনয় হয়েছে চরিত্রোচিত। বৌদির ভূমিকায় সুমিতা সান্যালকে দিব্য ঘরোয়া লেগেছে। অতিথি-শিল্পীদের মধ্যে চমৎকৃত করেছেন ওমপ্রকাশ। দাদার ভূমিকায় বিজয় শর্মার অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে জয়ন্ত পাথারের চিত্রগ্রহণ এবং অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পনির্দেশনার কাজ উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনাও ছবিটিকে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গতি দিয়েছে। বসন্ত দেশাই সন্ত সুরজাল ও গুলজার রচিত কাহিনী ও সংলাপের উপভোগ্যতাকে বর্ধিত করেছে।

রূপম চিত্র নিবেদিত, এন সি সিপ্পী প্রযোজিত ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রঙীন চিত্র 'গুড্ডি' বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও শিল্পীদের অভিনয়গুণে দর্শকউপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

(২) মোটর ড্রাইভার বেশে বীর নায়ক

চলচ্চিত্রের নায়কেরা অন্যায় করে না, অন্যায় সয় না, বুদ্ধি ও দেহশক্তি দিয়ে তারা একসঙ্গে বহু দুর্বৃত্তের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে, জুডো-যুযুৎসু প্রভৃতিতে তারা ওস্তাদ, তাদের শরীরের আঘাত-চিহ্ন মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায়, তারা স্থল-জল-অন্তরীক্ষের যে-কোনও যান চালানোয় দক্ষ, প্রয়োজন হলে তারা সাঁতার ফুটবল হকি ক্রিকেট টেনিস প্রভৃতি যে-কোনোও খেলায় অর্জুন পুরস্কার পেতে পারে, আবার কলেজ-ছাত্র থেকে শুরু করে অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, লেখক, বৈজ্ঞানিক, মিল-মালিক, শ্রমিক ইত্যাদি যে-কোনোও ভূমিকায় আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে যেতে পারে। কিন্তু মাদ্রাজের জেনাল পিকচার্স নিবেদিত, এস কৃষ্ণমূর্তি প্রযোজিত এবং এ সুব্বারাও পরিচালিত রঙীন ছবি 'রাখওয়ালা'র নায়ক দীপক একটি বক্সিং প্রতিযোগিতায় মাত্র দর্শক হিসেবে যোগদান করার পরে তার বন্ধুর উৎসাহে যেভাবে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর বিরুদ্ধে লড়ে গেল এবং সকলকে (দর্শকবৃন্দকেও) চমৎকৃত করে জয়লাভ করল, তা দেখে তাজ্জব বনে যেতে হয়।

প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে শিক্ষিত বেকার দীপক পুরস্কারস্বরূপ পেল একটি কাপ, নগদ পাঁচ হাজার টাকা, যা সে সঙ্গে সঙ্গে 'বাংলাদেশ' ফাণ্ডে দান করে দিল এবং নিজের প্রার্থনামতো পেল ধনী ব্যবসায়ী জাওলাপ্রসাদের বাড়ীতে মোটর-ড্রাইভারের কাজ। কিন্তু তার বিধবা মা যখন শুনলেন, তাঁর ছেলে শেঠ জাওলাপ্রসাদের কাছে কাজ পেয়েছে, তখন তিনি কেঁপে উঠলেন, কারণ তিনি জানেন, জাওলাপ্রসাদ লোক ভালো নয়। জাওলাপ্রসাদ শেঠ দৌলতরামের কাছে চাকরি করত এবং তাঁর সম্পত্তির লোভে তাঁর মৃত্যু ঘটায় ও তাঁর একমাত্র শিশুপুত্র সুরেশকেও মারবার চেষ্টা করে। বাড়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা তার প্রাণরক্ষা হয় এবং দীপকের মা তাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে থাকে। জাওলাপ্রসাদের সকল অসৎ কর্মের দোসর ছিল শ্যাম। তার নজর ছিল জাওলাপ্রসাদের মেয়ে চাঁদনীর ওপর। কিন্তু যখন সে দেখে চাঁদনী তার ভূতপূর্ব কলেজ-বন্ধু ও বর্তমানে তার মোটর-ড্রাইভার দীপকের প্রতি অনুরক্ত, তখন সে তার পথের কাঁটা দীপককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে সে অতর্কিতে জাওলাপ্রসাদের অতীত কীর্তির কথা শুনতে পায়। জাওলাপ্রসাদকে মুঠিগত রাখবার জন্যে দীপককে আপাতত বাঁচিয়ে রাখা দরকার, অতএব দীপক শ্যামের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পেল। এরপর শ্যাম সুরেশকে নিজের মুঠোয় রেখে খেলবার জন্যে জাওলাপ্রসাদের সামনে গিয়ে হাজির হল। এখন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। এরই ফাঁকে দীপকের সঙ্গে চাঁদনীর বিয়ে হয়ে গেল পুলিশের জ্ঞাতসারে এবং দীপক পুলিশেরই গোয়েন্দা বিভাগে কাজ নিল জাওলাপ্রসাদ ও শ্যামের রহস্য ভেদ করবার জন্যে। কি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দীপক সকল রহস্য

ভঙ্গ করতে সমর্থ হল, তাই নিয়েই ছবির সব ভাগ রচিত।

বলতে পারি, কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে একটি ঘটনাবহুল কাহিনী খাড়া করা হয়েছে একখানি রঙীন ছবি তৈরী করবার জন্যে। প্রযোজক ও পরিচালকের মাথায় ছিল, ছবিতে প্রেম, সাসপেন্স, কৌতুক, হত্যা, নাচ, গান—সবরকমই উপাদান থাকবে সকল শ্রেণীর দর্শকের দিকে লক্ষ্য রেখে। এসব দিকে লক্ষ্য তাঁরা নিশ্চয়ই রেখেছেন, কিন্তু সমগ্রভাবে কাহিনীচিত্রটি একটি সার্থক চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে পারবে কিনা, এই অতি-প্রয়োজনীয় দিকটি কিন্তু তাঁরা বেমালুম উপেক্ষা করে গেছেন। ফল যা হবার, তা হয়েছে।

শিল্পীদের মধ্যে আছেন ধর্মেন্দ্র, বিনোদ খান্না, মদন পুরী, জগদীপ, লীনা চন্দ্রাভারকর, ফরিদা জালাল প্রভৃতি। কিন্তু এই ঘটনাবহুল কাহিনীচিত্রে নাটনৈপুণ্য দেখাবার খুব বেশী সুযোগ কোথায়? যেটুকু সুযোগ আছে, তার সদ্ব্যবহার করতে এঁরা কেউই ছাড়েননি। বিশেষ করে ছবির সবচু অংশে কম্পাউন্ডার ও হোমিও-প্যাথিক বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় জগদীপ একাই একশো না হোন, তিনজন তো হয়েছেনই—রোগী, ডাক্তার ও নার্স।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। পি এল রায়-এর চিত্রগ্রহণকার্য দক্ষতার পরিচায়ক। টি কুমার চতুর সম্পাদনা এত দীর্ঘ (১৭ রীল) ছবিকে ক্লান্তিকর লাগতে দেয়নি। রাজেন্দ্রকৃষ্ণের গোটাদুয়েক গান কল্যাণজী-আনন্দজী দ্বারা সুরারোপিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করবে: এক, মেরা দিল তো বাংলাভাষা—মিল গায়া এবং দুই, কহসে দো, কহসে দো—

হিন্দী ছবির জগতে 'রাখওয়ালা'-কে দর্শকরা মনে রাখবে গুটিকয়েক গানের জন্যে।

—নান্দীকর

বিবিধ সংবাদ

তিন পয়সার পালা'র দুশ রজনী পূর্তি

নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিক নান্দীকারগোষ্ঠী তাঁদের 'তিন পয়সার পালা' নাটকটির দ্বিশততম অভিনয় পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করলেন গত ১০ নভেম্বর রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে। অনুষ্ঠানের শুরুতে নান্দীকার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁদের নাট্য সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করে বললেন, একে একে যখন পেশাদারী মঞ্চের দরজাগুলি অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই সময় রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ যে সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁদের আহ্বান জানালেন নাট্যাভিনয়ের, তখন তাঁরা সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। কেননা, এখানে তাঁরা স্বাধীনভাবে নাট্য সাধনা করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করে-

হিন্দী হাই স্কুলে সাউথ ক্যালকাটা জেসি প্রযোজিত বাংলা নাটক 'সে কি এলো সে কি এলো না'-র একটি নাটকীয় মুহূর্ত।

ছিলেন এবং আজ সে বিশ্বাস বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

তাঁরা বললেন, নানা রকম আর্থিক প্রতিকূলতা, বিরূপ সমালোচনা, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে তাঁরা অভিনয় চালাচ্ছেন। এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন এ দুর্দিন একদিন কেটে যাবেই। আর তাই তাঁরা আজ 'তিন পয়সার পালা' নাটকটির দ্বিশততম অভিনয় রজনী পালন করতে পারছেন। তাঁরা আগামী দিনগুলিতেও নাট্যদরদী শ্রোতাদের সহানুভূতি পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

নান্দীকারগোষ্ঠী ও এই উৎসবের সাফল্য কামনা করে বক্তৃতা দেন হিন্দী নাট্য-সংস্থার পক্ষে শাস্ত্রীজী, উৎপল দত্ত, তাপস সেন, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, সন্তোষ ঘোষ, খালেদ চৌধুরী, জি ডি আর-এর ভাইস কন্সাল, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অনুষ্ঠান শেষে রেশটেরই একটি নাটকের চলচ্চিত্ররূপ দেখানো হয় এবং সর্বশেষ মঞ্চস্থ হয় নান্দীকারের সুখ্যাত নাটক 'তিন পয়সার পালা'।

সে কি এলো—সে কি এলোনা : গত ৬ নভেম্বর শনিবারের সন্ধ্যায় সাউথ ক্যালকাটা জেসী সংস্থার সভ্যরা হিন্দী হাই স্কুল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে 'সে কি এলো—সে কি এলো না' নাটকের অভিনয় করেন। নাটকের রচয়িতা শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুজনেই এই সংস্থার সদস্য। এঁরা দুজনেই নাটকের দুটি মুখ্য চরিত্রে নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শীলা মুখোপাধ্যায়, সুনীতা আওয়াতরামানী, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, বীথিকা চট্টোপাধ্যায়, চিত্রলেখা চট্টোপাধ্যায়, অলোক বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, তরুণ গুপ্ত, অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতীক সেন ও অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নাটকটি বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পটভূমিতে ভারতে পাকিস্তানী গুপ্তচক্রের কার্যকলাপের উপর রচিত। এর প্রধান চরিত্র রহস্যময়ী নায়িকা অনিমা ছয় বৎসর আগে সবাই তার পূর্ব বাংলায় মৃত্যু হয়েছিল বলে জানতো। ছ বছর পরে এক দুর্যোগের রাত্রে তার প্রত্যাবর্তন(?) ঘটে। তার পরের দ্রুত আবর্তনশীল ঘটনায় সবাই হতচকিত হয়ে পড়ে।

নাটক রচনা ও পরিচালনার মুন্সীয়ানা দর্শকের একটি আকর্ষণীয় রহস্য নাটক দেখার সুযোগ এনে দেয়। নাটকের প্রায় সকল চরিত্রই সু-অভিনীত। এই প্রসঙ্গে লীনা চরিত্রের অভিনেত্রী শ্রীমতী সুনীতা আওয়াতরামানীর নিখুঁত বাংলা বাচনভঙ্গী সত্যই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে।

হিন্দী নাগিনা মাহাত্তোর আউটডোর : রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল-এর নাগিনা মাহাত্তোর হিন্দী চলচ্চিত্রায়ণ শুরু হয়েছে। পরিচালনা করছেন শ্রীতপন সিংহ। ছবিটি ইস্টম্যান কালারে তোলা হচ্ছে। বম্বেতে কিছু অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের পর গত মাসের শেষের দিকে এই ছবির আউটডোর সুটিং শুরু হয়েছে কার্শিয়াং অঞ্চলে।

যে সমস্ত জায়গায় এই ছবির এখন পর্যন্ত সুটিং হয়েছে সেইগুলো হোল তিন-ধরিয়া লোক শেড, লোক-ওয়ার্কশপ, ডাওহীল, রাইফেল্স রেঞ্জ ময়দান, তিনধরিয়া লুপ, গীদ্দা পাহাড় প্রভৃতি। এই পর্যায়ের সুটিং-এ যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন দিলীপকুমার, সায়রা বানু, অপর্ণা সেন, ওমপ্রকাশ, অনিল চ্যাটার্জী, স্বরূপ দত্ত, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জী, পান্না কাপুর, অলক রায়চৌধুরী, রসরাজ চক্রবর্তী অন্যান্য আরও অনেক শিল্পী। ছবির ক্যামেরাম্যান হলেন বিমল মুখোপাধ্যায়। এস ডি বর্মনের সুরে গান গেয়েছেন কিশোরকুমার ও লতা মঙ্গেশকর। এই মাসের শেষ পর্যন্ত সুটিং হবে।

হিন্দুস্থান স্টীলের দুটি তথ্যচিত্র

আজকের ভারতে ইস্পাতশিল্প উৎপাদনে হিন্দুস্থান স্টীল এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। সম্প্রতি সেই কর্মকাণ্ড রূপায়ণের ওপর তাঁরা দুটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। শ্যাম বেনেগাল-কৃত ছবিদুটির নাম : 'দি পালসেটিং জায়েন্ট' এবং 'স্টীল দি হোল ওয়ে অব লাইফ'।

প্রথম ছবিটিতে দেখানো হয়েছে ভারতে কীভাবে ইস্পাতশিল্পের প্রসার ঘটছে তারই ওপর। পরিচালক এ-ছবিতে খুবই সুন্দর ও তথ্যনিষ্ঠভাবে হিন্দুস্থান স্টীলের বিরাট কর্মসাধনার রূপটিকে সেলুলয়েডের ফিতেয় ধরে তুলেছেন। ছবিটি সাধারণভাবে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন এবং ওই বিষয়ের ছাত্রদের তো এ-ছবি ভাল লাগবেই, এমনকি সাধারণ মানুষেরও ভাল লাগবে। চিত্রগ্রহণের ব্যাপারে পরিচালক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া বনরাজ ভাটিয়ার সঙ্গীত ছবিটিতে যেন এক নতুন আমেজ এনেছে।

দ্বিতীয় ছবিটি ইস্পাতনগর দুর্গাপুরের ওপর রচিত। গ্রামীন কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন মানুষের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে ইস্পাতের ভূমিকার কথা এতে বলা হয়েছে। ছবিটির প্রয়োগকৌশল প্রশংসার যোগ্য।

১২টি আঞ্চলিক ভাষায় ডাব করা হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ-র ছবিদুটি পরিবেশন করবেন ফিল্মস ডিভিসন।

দেশবন্ধুর শততম জন্মজয়ন্তী পূর্তি উৎসব : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ 'মিলন মন্দিরে' ফেডারেশন হল সোসাইটির সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে মহাপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শততম জন্মজয়ন্তী পূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠানটি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে

ম্পন্ন হল গত ৭ নভেম্বর। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংস্থার প্রবীণ কর্মী দেশবন্ধুর সহযোগী প্রখ্যাত জনসেবক বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন অধ্যাপক ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর দেশবন্ধু রচিত কবিতা পাঠ ও আলোচনা করেন শ্রীরণজিৎ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি ডঃ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে দেশবন্ধুর স্বদেশ সেবা ও সাহিত্য সাধনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সভাপতি তাঁর স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর সান্নিধ্য এবং হৃদয়বত্তার কথা ব্যক্ত করেন। সর্বশ্রী ...মা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ...তুন লাহা রায় ও সোমেন বসু দেশাত্ম-বোধক ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে দেশবন্ধুর ভাবপ্রেরণার কথা উল্লেখ করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন রামনারায়ণ বণিক।

মিশ্র ইস্পাত সংগঠনীর নাটিকা 'বিচিত্রা'

মিশ্র ইস্পাত সংগঠনীর ক্লাব প্রাঙ্গণে ...মায়া কাজল' পুজো কমিটি শ্রীশ্রী-...মামায়ের আরাধনা উপলক্ষ্যে একটি ...নাজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ...ভিনীত হয় একটি নতুন ধরনের ...টক। কোনরকম পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগ ... দিয়ে মঞ্চবিহীন নাটিকাটিতে ...কসাধারণকে অংশগ্রহণ করবার জন্যে ...মন্ত্রণ জানান সংগঠনীর কর্মকর্তারা। গল্প ...টি বলে দেওয়া হয়, চরিত্র বলে দেওয়া ..., কিন্তু চরিত্রের সংলাপ কোন ...ওয়া হয় না। নির্ধারিত সময়ের ...ধ্য নাটিকার সমাপ্তি ঘটাবার জন্যেও অনু-...ধ জানানো হয়। অবশেষে রাম, শ্যাম ..., মধু সুন্দরভাবে নাটিকাটির পরি-...াপ্তি ঘটান। এই নতুন ধরনের নাটিকাটির ...স্থাপনের জন্য মিশ্র ইস্পাত সংগঠনীর ...া শ্রীহীরক রায় দর্শক সাধারণের প্রশংসা-...র্জন হয়।

এই নাটকে যাঁরা অভিনয় করে চরিত্র-...লোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন তাঁরা ...লেন তপন সরকার, অশোক রায়চৌধুরী, ...ক দত্ত, সুহাস দত্ত, হীরক রায় এবং ...কসাধারণ।

এলাহাবাদে সারস্বত সম্মেলন

কিছুদিন আগে এলাহাবাদে অখিল ...তীয় পরিষদ আয়োজিত সারস্বত ...বে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ...গিরি। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ...ধিক সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ...বেশ ছাড়াও পণ্ডিত ওঁঙ্কারনাথজীর ...গীতিক অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা-...নের জন্যে বিশেষভাবে এক সঙ্গীত-...র ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠান-...র ধ্রুপদী সীতারাম তেওয়ারী। বোম্বের গীতিনাট্য সম্প্রদায় ও কোলকাতা থেকে সংগীতশাস্ত্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এই সভায় আহূত হন। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর 'সামগান' ও পণ্ডিত কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্যের 'মঙ্গলাচরণ' সংস্কৃতজ্ঞ গুণীদের সাদর অভিনন্দন লাভ করে।

পরিশেষে সুরবাবে কুমার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী কল্যাণ রাগ এবং কণ্ঠসংগীতে শ্রীসিয়ারাম তেওয়ারী বাগেশ্রী রাগে ধ্রুপদ গেয়ে শোনান।

সোনার খাঁচা / উত্তমকুমার। পরিচালনা : অগ্রদূত। ফটো : অমৃত

চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের 'বন্দর'

সম্প্রতি চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্য-সভ্যা তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে বীরু মুখার্জির 'বন্দর' নাটকখানি মঞ্চস্থ করলেন হরিসাধন গুহের পরিচালনায়।

অভিনয়ে শিল্পীদের ত্রুটি ছিল। তবে নিষ্ঠা ও দলগত অভিনয়ের জন্য নাটকটি দর্শকদের খুশী করেছে। পরিচালক হরি-সাধন গুহ, শ্যাম মিত্র, রাখাল দাশগুপ্ত এবং মিনতি চ্যাটার্জি স্ব স্ব চরিত্রে সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রাখেন। তবে নাটক-টিকে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন পিন্টুর ভূমিকায় দিলীপ দে এবং তারাকালির ভূমিকায় শিশুকণা সাহা।

দেবকীকুমার বসু স্মরণে

১৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার রাত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেবকীকুমার বসু ইহলোক ত্যাগ করলেন। আর মাত্র ন' দিন পরে ২৫-নভেম্বরে তাঁর ৭৪তম জন্মদিবস পালিত হত। শারীরিক অসুস্থতা ইদানীং কয়েক বছর ধরে তাঁর গতিবিধিকে সীমিত করে রেখেছিল—সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা তাঁর সম্পূর্ণ বারণ ছিল। কিন্তু রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হৃদযন্ত্রের গতির অস্বাভাবিকতা তাঁকে কোনদিন চঞ্চল করে তুলেছিল বলে মনে হয় নি। এবং চিকিৎসকদের নিষেধ উপেক্ষা করেও তাঁকে কোন কোন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা গেছে। তাই তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাদের কাছে আকস্মিক বলেই বোধ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অকাল-পৌষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করে দেবকীকুমার বর্ধমান শহরে আসেন বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করতে। এইখান থেকেই ১৯১৭তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। শিশির-কুমার ভাদুড়ী তখন এই কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক। দেবকীকুমারের সাহিত্য ও নাটকের প্রতি আসক্তি শিশিরকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২১-এ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কলকাতার ছাত্র সমাজকে তুমুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। মহাত্মার ডাকে দেবকীকুমার 'গোলাম তৈরী'র শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বর্ধমান শহরকেই তাঁর কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। এই কাজে গণচিত্তকে জাগরিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি 'শক্তি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেন। 'বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী'র শেয়ার বিক্রীর জন্যে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ধমান শহরে গিয়ে যুবক দেবকীকুমারের—ওঁর বয়স তখন ২৯ বছর—সাক্ষাৎ পান ১৯২৭ সালে। দেবকীকুমারের সাহিত্য ও নাট্যজ্ঞানে চমৎকৃত হয়ে ধীরেন্দ্রনাথ ওঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ১৯২৮ সালে দমদম রোডে 'বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথম যে-নির্বাক ছবিটি তোলে, সেই 'ফ্লেমস অব ফ্লেশ' বা 'পদ্মিনী দি বিউটিফুল'-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনায় দেবকীকুমারের যথেষ্ট হাত ছিল। শুধু তাই নয়, এই ছবিতে দেশভক্ত প্রেমিক যুবক দেববর্মণ-এর ভূমিকায় দেবকীকুমার ধীরেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী প্রেমলতিকা দেবীর বিপরীতে অবতীর্ণও হয়েছিলেন। বৃটিশ ডোমিনিয়নের পরের ছবি 'পঞ্চশর'-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালকরূপে আমরা দেবকীকুমারকে দেখতে পাই। বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী কৃষ্ণগোপাল ছিলেন বৃটিশ ডোমিনিয়নের ক্যামেরাম্যান। তিনি ১৯২৯ সালের শেষা-শেষি দেবকীকুমারকে লক্ষ্ণৌ শহরে নিয়ে যান এবং সেখানে ইউনাইটেড পিকচার্স কর্পোরেশন নামে নব-প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থার হয়ে 'শ্যাডোজ অব ডেথ' নামে একটি ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনার ভার দেন। কিন্তু এই ছবির পরেই প্রতিষ্ঠানটির অপমৃত্যু ঘটায় দেবকীকুমার কলকাতায় ফিরে আসেন।
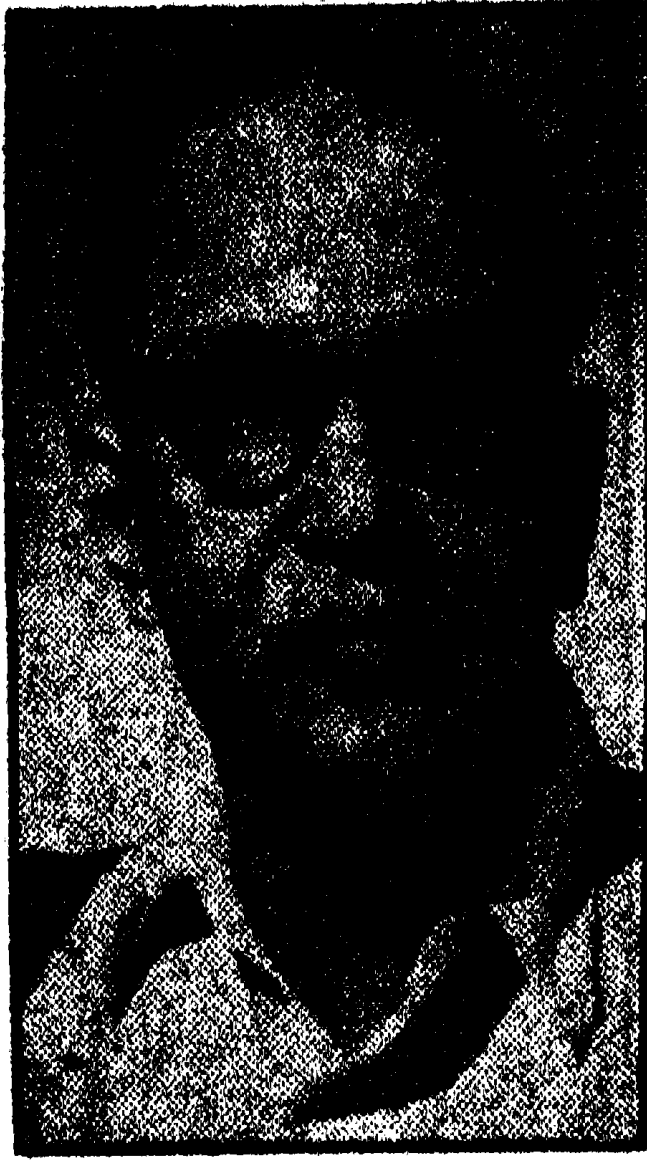
আসামের গৌরীপুর অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার স্বনাম-খ্যাত পুত্র প্রমথেশচন্দ্রের সঙ্গে দেবকী-কুমারের প্রথম পরিচয় হয় বৃটিশ ডোমি-নিয়নেই। প্রমথেশচন্দ্র কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরের একজন বিশিষ্ট সভ্য হিসেবে দমদম স্টুডিওতে প্রায়ই যেতেন এবং দেবকীকুমারের অনুরোধে 'পঞ্চশর' ও 'টাকায় কি না হয়' ছবি দুটিতে অত্যন্ত ছোট্ট ভূমিকাতেও সানন্দে অভিনয়ও করেন। লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে আসবার পর দেবকীকুমার প্রমথেশচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর বালীগঞ্জ মুলেন স্ট্রীটের বাসভবনের সংশ্লিষ্ট চত্বরে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত স্টুডিওতে বড়ুয়া পিকচার্স-এর পতাকা-তলে 'অপরাধী' নামে একটি নির্বাক ছবি পরিচালনা করেন। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই ছবিরই অন্তর্দৃশ্যে প্রথম ইলেকট্রিক আলো দৃশ্য ও চরিত্র আলোকিত করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। বড়ুয়া পিকচার্সের হয়েই ১৯৩২-এ দেবকীকুমার 'নিশির ডাক' নামে ছবিটি পরিচালনা করেন।

এর পরেই সবাক চিত্র-জগতে দেবকী-কুমারের সার্থক আবির্ভাব চিত্রামোদীদের যুগপৎ বিস্মিত ও সম্মোহিত করে। ১৯৩১ সালে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। কিন্তু 'দেনা-পাওনা' থেকে শুরু করে 'নটীর পূজা', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি ছবি মাত্র কতকগুলি দৃশ্যের সমন্বয়ে কাহিনী বর্ণনা ছাড়া পূর্ণাঙ্গীণ চলচ্চিত্রের রূপ তখনও গ্রহণ করতে পারে নি। এই সময়ে ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে দেবকীকুমার বসু পরি-চালিত 'চণ্ডীদাস' মুক্তিলাভ করল চিত্রা চিত্রগৃহে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা-শশী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অমর মল্লিক অভিনীত ছবিটি দর্শকমহলে যে কি বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তা আজকের দিনে কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। প্রথম আবহ-সঙ্গীতসমন্বিত এই ছবিটি দর্শকদের প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, সবাক চলচ্চিত্র কাকে বলে। ছবির মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে কাহিনী কিভাবে অগ্রসর হয়, দর্শকমনে গতিশীলতা কিভাবে সঞ্চারিত হয়, তা এই 'চণ্ডীদাস' ছবিতেই প্রথম উপলব্ধি করা গেল। এই ছবিই দেবকী-কুমার বসুকে ভারতবর্ষে সবাক চলচ্চিত্রের জনকরূপে প্রতিষ্ঠিত করল। বাংলা 'চণ্ডীদাস' -এর পরে হিন্দী 'পুরাণ-ভকত' তাঁকে এনে দিল সর্বভারতীয় খ্যাতি।

তত্ত্ব পূর্ণচন্দ্রের প্রাণীর জীবনের নাটকীয় অভিব্যক্তি ভারতব্যাপী দর্শকমহলকে মুগ্ধ করল। এর পরে 'মীরাবাঈ'-এর পুণ্যজীবন অবলম্বনে দেবকীকুমারের বাংলা ও হিন্দী চিত্র (রাজরাণী মীরা) অভিনয়ে-গানে-নাটকীয়তায় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি-রূপে অভিনন্দিত হল। 'মেরে জীবন মরণ কী সাথী, তোরে না বিসরাঁউ দিন-রাতি' গান গাইতে গাইতে মীরাবাঈ-এর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার দৃশ্য অবিস্মরণীয়। তেমনই অবিস্মরণীয় শত শত ভক্তের গান গেয়ে নির্যাতন সহ্য করার দৃশ্যাবলী। প্লে-ব্যাক প্রথা চালু হবার আগে এই গানের দৃশ্যগুলি কি কৌশলে তোলা হয়েছিল, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

এর পরে দেবকীকুমার পৃথ্বিরাজ কাপুর ও দুর্গা খোটেকে রাম-সীতা রূপে নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে হিন্দী 'সীতা' পরিচালনা করেন। উল্লেখ-যোগ্য যে, এই হিন্দী 'সীতা' ১৯৩৫-এর ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হয়ে ভারতের পক্ষে প্রথম 'সার্টি-ফিকেট অব মেরিট' অর্জন করে। আবার তিনি নিউ থিয়েটার্সে ফিরে এসে বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পটভূমিকায় 'আফটার দি আর্থকোয়েক' নির্মাণ করেন, এই ছবিতেও নায়ক-নায়িকা ছিলেন পৃথ্বিরাজ কাপুর ও দুর্গা খোটে। এই ছবি শেষ করে তিনি বোম্বাই চলে যান এবং জয়ন্ত পিকচার্সের হয়ে 'লাইফ ইজ এ স্টেজ' ছবি পরিচালনা করেন। আবার তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে যুগান্তকারী ছবি 'সোনার সংসার' নির্মাণ করেন। এই ছবিতে গুরু-গম্ভীর কাহিনীর পাশাপাশি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর চাতুর্যময় সংস্থাপন কি আশ্চর্য উপভোগ্যতার সৃষ্টি করে, তারই একটি পরীক্ষা করেছিলেন দেবকীকুমার। একদিকে অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া দেবী, জীবন গাঙ্গুলী, মেনকা অন্যদিকে সত্য বন্দ্যো-পাধ্যায়, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতির সোপ ফ্যাকটরী-লীলা এবং মাঝে রঞ্জিৎ রায় এবং আজুরীর নাচ। মনে হয়, এই ছবিতেই প্রথম ব্যাক-প্রোজেকসন ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই 'সোনার সংসার' ছবিতেই চূড়ান্ত খ্যাতি লাভ করবার পরে শ্রীবসু আবার নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন এবং বিরাট 'বিদ্যাপতি' ছবি সৃষ্টি করেন। কানন দেবী অভিনীত অনুরাধা চরিত্র তাঁর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। 'তব রথচক্রতলে প্রাণ দিব আমি'র দৃশ্য কি কখনও ভোলা যায় কিম্বা 'অংগনে আওব যব রসিয়া' গান? প্লেটনিক ভালোবাসার এমন আশ্চর্য রূপায়ণ চলচ্চিত্রে কদাচিৎই দেখা গেছে।

'বিদ্যাপতি'র পর তৈরী হয় 'সাপুড়ে' এবং তার পরে 'নর্তকী'। 'সাপুড়ে'র গান 'হলুদ গাঁদা ফুল রাঙা পলাশ ফুল, এনে দে, নইলে বাঁধব না বাঁধব না চুল'—সেদিন লোকের মুখে মুখে ঘুরত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, গীত-রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলামকে, যিনি আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে থেকেও নীরব হয়ে রয়েছেন। এর পরে দেবকীকুমার আবার বোম্বাই যান এবং সেখানে সিরকো প্রোডাকসন্সের হয়ে ছবি করেন 'আপনা ঘর'। এবং এরও পরে চুণীভাই দেশাই-এর হয়ে তিনি পর পর তিনখানি হিন্দী ছবি করেন, রামানুজ, মেঘদূত ও কৃষ্ণলীলা। রামানুজ ও কৃষ্ণ-লীলা তৈরী হয়েছিল কলকাতার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এবং মেঘদূত বোম্বাইয়ে। এই তিনখানির পরে তিনি পাইওনীয়ার পিক-চার্সের হয়ে দ্বিভাষী ছবি 'চন্দ্রশেখর' তৈরী করেন। এই ছবিতেই অশোককুমার প্রথম বাংলাদেশে বাংলা ছবিতে অবতীর্ণ হন।

এর কিছুদিন পরে চিত্রমায়া নাম দিয়ে শ্রীবসু নিজের প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন এবং 'কবি' ও 'রত্নদীপ' নামে দুখানি অসামান্য ছবি উপহার দেন। বলা যেতে পারে, এই ছবি দুখানি তাঁর পরিচালক জীবনের অমর সৃষ্টি। এর পরে তাঁর পরি-চালনায় মুক্তিলাভ করে 'পথিক' (১৯৫৩), 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' (১৯৫৪), 'ভালো-বাসা' (১৯৫৫), 'নবজন্ম' (১৯৫৬), 'চিত্র-কুমার সভা' (১৯৫৭) ও 'সাগরসংগমে' (১৯৫৮)। শেষেরটি ১৯৫৮ সালে ভারতে নির্মিত শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে প্রেসিডেন্টের স্বর্ণ পদক লাভ করে। এরই পরে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে শ্রীবসু চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতা অবলম্বনে (অভিসার, দুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য ও সামান্য ক্ষতি) চারটি স্বল্প দৈর্ঘ্য ছবিকে 'অর্ঘ্য' নামে দর্শক-বৃন্দকে উপহার দেন বটে, কিন্তু সেগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়ে তাঁর খ্যাতির যোগ্য হয়ে ওঠে নি।

ভারত সরকার ১৯৫৮ সালে তাঁর শিল্প প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

দেবকীকুমার ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের 'স্যার'। এমন কাউকে দেখি নি, যিনি তাঁকে ও ছাড়া অন্য নামে ডেকেছেন। এমন কাউকে জানি না, যিনি ওঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে না পড়েছেন। মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি একান্ত অনুগত, বৈষ্ণবজীবনদর্শনের একনিষ্ঠ ভাবুক, জীবন-প্রেমিক দেবকী-কুমার প্রেমিক ও কবির চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেছিলেন, ঈশ্বরপ্রীতির আনন্দধারায় নিজেকে সর্বসময়ে রেখেছিলেন ডুবিয়ে। আচরণে খাঁটি বাঙালী হয়েও তিনি ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক।

যদিও তাঁর সহধর্মিণী, দুই পুত্র ও কন্যাগণ প্রিয়জনবিরহ শোকে মুহ্যমান, তবু আমরা তাঁর পরলোকগমনে শোক করব না, তাঁর আত্মা তাঁর আরাধ্য চির-আনন্দময়ের সঙ্গে মিলিত হল, এই চিন্তা আমাদের মনে শান্তিবারি সেচন করুক।

—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলা

দর্শক

আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে জাপান পুরুষদের সিঙ্গলস ও মহিলাদের ডাবলস এবং প্রজাতন্ত্রী চীন মহিলাদের সিঙ্গলস ও পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পুরুষদের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের সিঙ্গলস ফাইনালে জাপানের খেলোয়াড়রা পরস্পর খেলেছিলেন। ইতিপূর্বে এই প্রতিযোগিতায় দলগত অনুষ্ঠানে জাপান পুরুষ বিভাগে এবং প্রজাতন্ত্রী চীন মহিলা বিভাগে খেতাব লাভ করেছিল।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : নবুহিকো হাসিগাওয়া (জাপান) ৩—২ খেলায় মিৎসুরু কোনোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : চেং হুয়াই ইং (প্রজাতন্ত্রী চীন) ৩—২ খেলায় পাক ইউং ওককে (উত্তর কোরিয়া) পরাজিত করেন।

অভিশপ্ত ফুটবল

ফুটবল যেন এক অভিশপ্ত খেলা। আজ যে পৃথিবীর নানা জায়গায় ফুটবল খেলা উপলক্ষ্য করে খণ্ডযুদ্ধ, অগ্নিকাণ্ড এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা হামেশাই বেঁধে যাচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। ইংল্যাণ্ডকে আধুনিক কালের ফুটবল খেলার জনক এবং পীঠস্থান বলা হয়। কয়েকশ' বছর আগে এই ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই ফুটবল খেলা দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎস হিসাবে সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবনকে এমন আতঙ্কিত এবং বিপর্যস্ত করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত দেশের রাজা ফুটবল খেলা সম্পূর্ণ বে-আইনী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের শান্তিপ্রিয় জনগণ দলে দলে গির্জায় প্রার্থনা জানাতেন 'হে ঈশ্বর, ছেলেদের সুমতি দাও, তারা যেন ফুটবল খেলার কুদৃষ্টি থেকে রেহাই পায়'। ইংল্যাণ্ডে কয়েকশ' বছর ফুটবল খেলা রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ ছিল।

ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে উত্তেজনা অন্যতম। এই উত্তেজনার বশে খেলোয়াড়, দর্শক, এমনকি দলের কর্মকর্তারাও সময়ে সময়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। দলের গোঁড়া সমর্থক এবং বিশেষ করে পেশাদার খেলোয়াড়দের কাছে জয়লাভই একমাত্র কাম্য। খেলার ফলাফলে দলের স্বার্থ কোনরকম ক্ষুন্ন হলে গোঁড়া সমর্থকরা তা সহজভাবে নিতে পারেন না; দলের জয়লাভই যে তাঁদের জীবনের জপমালা! অপরদিকে খেলার ফলাফল দলের প্রতিকূল হলে পেশাদার খেলোয়াড়রা আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় উত্তেজিত হন। ফুটবল খেলার উত্তেজনার পরিণতি কি ভয়ঙ্কর চেহারা নিতে পারে তার পরিচয় পাশের ছবিগুলি। প্রথম ছবিতে দেখ[illegible] বিশ্ববিশ্রুত 'ফুটবল সম্রাট' পে[illegible] উত্তেজনায় বিপক্ষের খেলোয়াড়ের মা[illegible] লক্ষ্য করে কি মারাত্মক বজ্রমুষ্টি নিক্ষে[illegible] করেছেন।

৪×৪০০ মিটার রীলেতে বিশ্বরেকর্ড : ১০ম ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ৪×৪০০ মিটার রীলেতে এই পূর্ব জার্মানী দলটি ৩ মিঃ ২৯.৩ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড করে। চিত্র পরিচয় (বাঁদিক থেকে) : মনিকা ৎসেট, হেলগা সাইডলার, রিটা কুনহে এবং ইসোলোরে লোসে।

সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রমেন ঘোষ (রেলওয়ে) এবং শোভা মূর্তি (মহারাষ্ট্র) সিংগলস, ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে ত্রিমুকুট সম্মান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য গতবারের (৩৫তম) জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রমেন ঘোষ পুরুষদের ডাবলস খেতাব এবং কুমারী শোভা মূর্তি মহিলাদের ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব লাভ করেছিলেন।

চ্যারিটি ক্রিকেট

দুঃস্থ সৈনিকদের সাহায্যার্থে আয়োজিত দুদিনের চ্যারিটি ক্রিকেট খেলায় সি এ বি সভাপতির একাদশ দল ৭ উইকেটে ক্যালকাটা ফুটবল এবং ক্রিকেট ক্লাবকে পরাজিত করে ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানী প্রদত্ত 'কার্লটন ট্রফি জয়ী' হয়েছে। এই প্রদর্শনী খেলায় কয়েকজন নামী খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—পঙ্কজ রায়, রমেশ সাকসেনা, জি বিশ্বনাথ, ডি গোবিন্দরাজ প্রভৃতি। প্রতি দল ১২জন করে খেলেছিলেন।

সি এ বি'র সভাপতি একাদশ দলের জয়লাভের মূলে ছিলেন দুই বোলার—অমিতাভ রায় (নট আউট ৩১ রাণ) এবং বরুণ বর্মণ (নট আউট ২৯ রাণ)। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫৪ রাণের মাথায় দশম উইকেট পড়ার পর এঁরা একাদশ উইকেটের জুটিতে ৩৪ মিনিটের খেলায় ৫৭ রাণ সংগ্রহ করেন এবং সেই সূত্রে দলকে প্রথম ইনিংসের খেলায় তিন রাণে এগিয়ে দেন। ভারতবর্ষের বর্তমান টেস্ট খেলোয়াড় জি বিশ্বনাথ তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি, তিনি প্রথম ইনিংসে ৬ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ রাণ করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ক্যালকাটা ফুটবল ও ক্রিকেট ক্লাব : ২০৮ রাণ (রণবীর সেন ৫৮ রাণ। অমিতাভ রায় ৫৫ রাণে ৩ এবং অশোক চক্রবর্তী ২৩ রাণে ৩ উইকেট) ও ১২৯ রাণ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আনন্দ শুক্লা নট আউট ৫৯ রাণ)।

সি এ বি সভাপতি একাদশ : ২১১ রাণ (১০ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পঙ্কজ রায় ৪০ রাণ। গোবিন্দরাজ ৬৫ রাণে ৫ উইকেট) ও ১৩২ রাণ (৫ উইকেটে। অম্বর রায় ৫২ রাণ)।

চিঠিপত্র

পঁচিশ চূড়া মন্দির প্রসঙ্গে

গত ৪ঠা কার্তিক শুক্রবার (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত পঁচিশ চূড়া মন্দির শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহীতোষ বিশ্বাস বাংলার মন্দির রীতির যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কে আমি পত্রিকা পাঠকদের কাছে কিছু মন্তব্য উপস্থিত করতে চাই।

লেখক বর্ধমান জেলার বহু প্রাচীন মন্দিরের সংবাদ পরিবেশন করে কালনার পঁচিশচূড়া মন্দির প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন—'এখানে ছোট-বড় তিনটি মন্দিরের গঠন সৌন্দর্য যেমন অপূর্ব তেমনি এর পঁচিশটি করে চূড়া যা বাংলার আর কোন স্থানে দেখা যায় নাই।' লেখকের এ তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ এবং পাঠককে এক বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। লেখকের বাংলাদেশের সকল স্থানের মন্দির দেখার অভিজ্ঞতা থাকলে একথা নিশ্চয়ই উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাছাড়া সারা বাংলার মন্দির দেখার সৌভাগ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করাও সম্ভব নয়। বাংলার মন্দিরের ওপর যাঁরা দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তাঁরাও কোন বিশেষ রীতির মন্দিরের ওপর এত বড় জোরদার কথা বলতে সক্ষম হন নাই। লেখক যদি বাংলার মন্দিরের ওপর একান্ত আগ্রহী হন তাহলে তাঁকে শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বাঁকুড়ার মন্দির' এই মূল্যবান পুস্তকটি পাঠ করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাই, এখানে তিনি বহুচূড় স্থাপত্য বাহুল্যের সুখাড়িয়া গ্রামের আনন্দ ভৈরবী মন্দির-এর একটি পূর্ণ পৃষ্ঠার আলোকচিত্রসহ ব্যক্ত করেছেন "......বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষে পঁচিশ চূড়া বিশিষ্ট একটি রত্ন মন্দিরের ছবি মুদ্রিত হয়েছে। এটি হুগলী জেলার সোমড়া সুখাড়িয়া গ্রামের আনন্দ-ভৈরবীর মন্দির। বাঁকুড়া জেলায় এ জাতীয় বহুচূড় মন্দিরের দৃষ্টান্ত বিরল বলে, আমাকে আমার বক্তব্য সুপরিস্ফুট করবার জন্য, পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে।' অমিয়বাবু এই পরিচ্ছেদ কেবল পঁচিশচূড় মন্দির কেন উনত্রিশ চূড়া মন্দিরের অস্তিত্বের কথাও ঘোষণা করেছেন, এ ছাড়াও তিনি তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে সোনামুখী গ্রামের বাজারপাড়ায় অবস্থিত শ্রীধর মন্দিরের সংবাদ জানিয়েছেন। এ মন্দিরটিও পঁচিশ চূড়া যুক্ত। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে শ্রদ্ধেয় পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৩৭৫ সালের ৮ই আষাঢ় সংখ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় 'সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির' শীর্ষক একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। যাই হোক মহীতোষবাবু যদি সত্যই মন্দির বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী হন তাহলে তাঁকে হাওড়া জেলার বাগনানে অবস্থিত আনন্দ-নিকেতন কীর্তি শাখার কিউরেটর শ্রদ্ধেয় তারাপদ সাঁতরার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাই। তারাপদবাবু দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক মন্দিরের আলোকচিত্র গ্রহণ, সংরক্ষণ ও গবেষণার কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন। ভবিষ্যতে মহীতোষবাবুর মন্দির বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করি। তাঁর রচনার মধ্যে আরো একটি ভ্রান্ত মতের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—'কয়েক বছর পূর্বে আমি হুগলী জেলায় আটপুর মন্দির সম্বন্ধে অমৃত পত্রিকায় লিখেছিলাম, পরে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মন্দিরটি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন এবং এই স্থানটি ভ্রমণকারীদের বিশেষ দর্শনীয় বলে গণ্য করেছেন। কালনার এই মন্দির-গুলির দিকেও সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন।'

লেখক আটপুর মন্দির সম্বন্ধে অমৃত পত্রিকার কোন সংখ্যায় লিখেছেন তার কোন সাল-তারিখ জানাননি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মন্দিরটি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন বলতে তিনি নিশ্চয়ই সংরক্ষণের কথা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা বাংলায় যে কয়টি মন্দির সংরক্ষণের কাজে হাত লাগিয়েছেন তার সংখ্যা মোট ৩৪টি। মহীতোষবাবু পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের হিস্টোরিক্যাল মনুমেণ্টস্ সিলেকটেড ফর রিপেয়ার্স অ্যান্ড কনষ্ট্রাক-সান ডিউরিঙ ৭০-৭১। এই বিজ্ঞপ্তিটি যদি পাঠ করেন তাহলে দেখবেন এর মধ্যে আটপুর মন্দির সংস্কারের কোন কথা বলা নেই।

—আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, হাওড়া

রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী প্রসঙ্গে

আপনার সম্পাদিত সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক, বলাই বাহুল্য অমৃত বিষয়বস্তু ও তার পরি-বেশনার গুণে আমাকে মুগ্ধ রাখে। অমৃতর নিয়মিত ফিচারগুলি, প্রবন্ধ ও সমালোচনা বিভাগ সকলেরই যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। গল্প বিভাগটিও মোটামুটি প্রশংসনীয়।

সম্প্রতি ১১ই কার্তিক (২৭ অক্টোবর) সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরি' প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। লেখক সুজিতকুমার সেনগুপ্তকে আমার অভিনন্দন জানাবেন। অত্যন্ত সরস ভঙ্গীতে রচিত হওয়ার ফলে প্রচুর তথ্য-সন্নিবিষ্ট থেকেও প্রবন্ধটি এতটুকুও ভারা-ক্রান্ত হয়নি। চৈতন্য লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগের কথা আমরা অস্পষ্টভাবে জানতাম। এ প্রবন্ধ পাঠে বোঝা গেল সম্পর্ক কত গভীর ছিল। অতীতে আমাদের সাহিত্য ও শিক্ষাজগতে চৈতন্য লাইব্রেরির অবদান এ বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভা সম্পর্কে লেখকের গবেষণা ভবিষ্যতেও একটি মূল্যবান সংযোজন হবে বলে মনে করি।

প্রবন্ধটি পাঠ করে মনে কতগুলি প্রশ্ন জেগেছে। আশাকরি লেখক চিঠিপত্র বিভাগে সেগুলির উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

(১) 'দাম্ভিক, স্বাতন্ত্র - অভিমানী, অভিজাত শ্রেষ্ঠ'...বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন।

(২) রেভারেন্ড আলেকজাণ্ডার ও বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি—যাঁরা সুরু থেকেই চৈতন্য লাইব্রেরির সাংগঠনিক কাজে যোগ দিয়ে-ছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে তাঁদের মনোভাব কেমন ছিল?

(৩) অমৃতে যে হ্যান্ডবিলটি ছাপানো হয়েছে, স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধটি পাঠ করার ঘোষণা জানিয়ে, সেই সভাটিতে পুলিশ এসে লাঠি চালায় বলে শুনেছি। সম্ভবত ঐ সময় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চলছিল। এ সম্বন্ধে লেখক কিছু জানাবেন কি?

(৪) চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে অনেক মূল্যবান বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ সে যুগের প্রায় সব খ্যাতনামা ব্যক্তি পাঠ করে গেছেন একথা আমরা জানলাম। কিন্তু কবিতা পাঠ কখনও হয়েছে কি লেখক এ সম্বন্ধে কিছু জানাননি। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই সে যুগের অন্যান্য খ্যাতিমান কবি যথা বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি এবং পরবর্তীকালের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কেউই কি কবিতা পাঠ করেননি?

(৫) প্রবন্ধটিতে সিস্টার নিবেদিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামীজীর সঙ্গে চৈতন্য লাইব্রেরির কোন সংযোগ ছিল কি?

বলরাম বসু,
কলিকাতা—৬।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষান্মাষিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষান্মাষিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩০ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 3rd December, 1971 শুক্রবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ **52 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅর্ধেন্দু রায়

'এক নজরে'

বালিকার প্রতিহিংসা : বিচারপতি ঐ চতুর্দশী বালিকাটিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেও অভয় দিয়ে বলেছেন—ভয় নেই তোমার, তোমার নাম কেউ কোনদিন প্রকাশ করবে না, আর বন্দী অবস্থাতেও তোমার লেখাপড়ার বা শরীর ও মনের চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর তোমার মুক্তির কথাও বিবেচনা করা হবে।

মেয়েটি অকপটেই দোষ স্বীকার করে। আদালতকে সে জানায় যে, পাঁচ বছরের মেয়ে রয়সিনকে সে হত্যা করেছিল। আর কেন করেছিল তাও সে যতদূর সম্ভব নিজের ভাষাতেই মাননীয় বিচারপতিকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

সে নিয়মিত স্কুলে যেত এবং ভাল মেয়ে বলেই পরিচয় ছিল তার। ছয় ভাইবোনের মধ্যে সে ছিল সবার বড় এবং মায়ের কাজে যতটা সম্ভব সাহায্য করত। কিন্তু তাদের সংসারে শান্তি ছিল না। মা বাবায় প্রায়ই ঝগড়া হত এবং বাবা সেদিন রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ মায়ের সব রাগ এসে পড়ল তার ওপর। তাকে জুতো দিয়ে মেরেছিল মা। সেই রাগেই সে বিকাল ৪টায় একটা প্লাষ্টিকের ব্যাগে ক'টা জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওদের বাড়ি ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টির একটি ছোট শহরে।

পথে রয়সিনের সঙ্গে দেখা হ'লে ও তার জন্যে কিছু চকোলেট কিনে নিয়ে সঙ্গে যেতে বলে। রয়সিনের বয়স মাত্র পাঁচ হ'লেও ওর সঙ্গে খুব ভাব ছিল। রয়সিন ওর কথায় রাজি হ'লে ওরা শহরের একটু দূরে একটা সেতুর ধারে বেড়াতে যায়। কিন্তু সেইখানে রয়সিনের পায়ে কাঁটা ফুটে গেলে সে কাঁদতে থাকে ও বাড়ি যেতে চায়। মেয়েটি তখন তাকে সেতুর নিচে একটা বসার জায়গায় নিয়ে যায় ও সান্ত্বনা দিতে থাকে। কিন্তু রয়সিনের কান্না না থেমে বাড়তেই থাকে। আর যত তার কান্না বাড়তে থাকে ততই তার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ইচ্ছা জাগ্রত হ'তে থাকে যা ঐ চোদ্দ বছরের মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত আত্মহারা ক'রে দেয়। সে প্রথমে রয়সিনের গলা টিপে ধরে, তারপর তাকে একটা মোটা লাঠি দিয়ে কয়েকবার আঘাত হানে। কিন্তু তাতেও তার জিঘাংসার নিবৃত্তি হয় না ব'লে সে একটি বড় পাথর দিয়ে রয়সিনের মাথা ভেঙে দেয় যাতেই তার মৃত্যু হয়।

পরদিন রয়সিনের মৃতদেহ পথচারীদের নজরে পড়লে হৈ-চৈ প'ড়ে যায়, আর ঐ মেয়েটি স্কুলে তার এক বন্ধুকে বলে যে সেই রয়সিনকে মেরেছে। সে বলে : আমি রয়সিনকে মেরেছি আমার মায়ের ওপর শোধ নিতে। মার নির্যাতন ও অপমান আমার সারা দেহে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

তৃতীয় বিশ্বের অভিশাপ : এই গ্রহ এখন তিনটি বিশ্বে বিভক্ত। একদিকে পশ্চিমী দুনিয়া, অপরদিকে কম্যুনিষ্ট শিবির। দুয়ের মধ্যে আছে তৃতীয় বিশ্ব, যার প্রায় সব দেশই সম্প্রতি-স্বাধীন, দরিদ্র ও অনগ্রসর। কিন্তু প্রথম দুই দুনিয়ার কল্যাণে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার শতাধিক দেশের অশান্তির আর শেষ নেই। সম্প্রতি ষ্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের (সিপ্রি) পক্ষ থেকে 'তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে অস্ত্রবাণিজ্য' শীর্ষক যে ৯১০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ১৯৫০ থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত অস্ত্রবাণিজ্যের হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বে দেশগুলির কাছে বৃহৎ শক্তিগুলির অস্ত্র বিক্রয় প্রতি বছরেই দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭০ সালে বৃহৎ শক্তিগুলি তৃতীয় বিশ্বের কাছে ১৫০ কোটি ডলার, অর্থাৎ, ১,১২৫ কোটি টাকা মূল্যের জঙ্গীবিমান, যুদ্ধজাহাজ ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। এটা ১৯৫০ সালের সরবরাহের তুলনায় সাতগুণ বেশি।

সিপ্রির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, তৃতীয় বিশ্বে বৃহৎ শক্তিগুলির অস্ত্র সরবরাহের আর্থিক মূল্য প্রতি বছর নয় শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেটা তৃতীয় বিশ্বের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জি-এন-পি) গড়ের প্রায় দুগুণ। তৃতীয় বিশ্বে অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে প্রথম স্থান, বলাবাহুল্য, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু তার পরের স্থানটিই সোভিয়েট ইউনিয়নের। এবং তৃতীয় বিশ্বে বৃহৎ শক্তিগুলি যে অস্ত্র সরবরাহ ক'রে থাকে তার দুই তৃতীয়াংশই আসে উল্লেখিত দুটি দেশ থেকে।

বিগত পঁচিশ বছরে যা কিছু যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে তা সবই হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে। একারণে 'সিপ্রি'র আশঙ্কা, পরমাণু যুদ্ধও হয়ত তৃতীয় বিশ্বের কোন স্থানীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে সংঘটিত হবে।

মদের দাম : ইংলণ্ডে সম্প্রতি কয়েক বোতল পুরানো মদ যে দামে বিক্রি হয়েছে তা অনেকের কাছেই একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ ব'লে মনে হবে। ১৯২৯ সালে তৈরি চ্যাটিউ মওটন রথসচাইল্ডের এক জেরোবোয়াম মদ বিক্রি হয়েছে ২,৮৫০ পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা মূল্যে। ক্রেতা নিউ ইয়র্কের পল মানো, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিবাহের দশম-বার্ষিকী দিনে ঐ মহামূল্য সম্পদটি উপহার দেবেন। এক জেরোবোয়াম হ'ল পাঁচ বোতল মদের একটি মোড়ক; জেরোবোয়াম বাইবেলে বর্ণিত এক শক্তিশালী পুরুষ, যে ইহুদিদের পাপকার্যে প্ররোচিত করেছিল।

মদ বিক্রেতাদের (শোথেবিজ) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রথসচাইল্ডের তৈরি মদ অন্য জাতের জিনিষ। তার ওপর ঐ সময়ের জেরোবোয়াম প্যাকেজ এমনই কায়দার যে, ঐ মদ ঠিক-মতো তৈরি হ'তে অনেক সময় লাগে। সুতরাং মানোদম্পতি ইচ্ছা করলে ঐ জেরোবোয়ামটি তাঁদের আরও অনেক পরের বিবাহবার্ষিকীর জন্য মজুত রাখতে পারেন।

শিল্পচোরের বঙ্গপ্রেম : বিশ্বখ্যাত শিল্পী ভারমীর-এর একটি অমর সৃষ্টি বেলজিয়ামের এক ব্যক্তি হস্তগত ক'রে ব্রাসেলসের এক সংবাদপত্র 'হেতভোক'-এর অফিসে টেলিফোনে জানায় যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ ছবির মালিক যদি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুত্রাণে চল্লিশ লক্ষ ডলার দিতে সম্মত না হন এবং ঐ টাকা হস্তান্তরের ঘটনাটি যদি ব্রাসেলসের টেলিভিশনে দেখানো না হয় তাহলে সে ছবিটি আমেরিকার একজন সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি ক'রে দেবে, যার নাম সে প্রকাশ করতে চায় না।

বীমা বিশেষজ্ঞরা অবশ্য তখনই জানিয়ে দেন যে অত অল্প সময়ের নোটিশে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে চোর যে প্রস্তাব দিয়েছে তার অভিনবত্ব ও মহত্ত্বের জন্য তাঁরা প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে রাজি আছেন। ছবিটি হ'ল সপ্তদশ শতাব্দীর আঁকা, নাম - দি লাভ লেটার। সংরক্ষিত ছিল ব্রাসেলসের ফাইন আর্টস প্যালেসে। দাম পঞ্চাশ লক্ষ ডলার।

১৮।১১।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওহে?

যেদিন ইয়াহিয়া খান আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ঈদ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন তার পর দিনই তাঁদের ট্যাঙ্কবাহিনী পূর্ব-ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে লড়াই করতে এগিয়ে এসে তেরখানি 'শাফে' ট্যাংক হারিয়েছে এবং তার পরদিন বয়ড়া অঞ্চলে চারখানি পাকিস্তানি স্যাবরজেট বিমান ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করলে আমাদের মশকতুল্য 'ন্যাট' বিমান তার তিনখানিকে ঘায়েল করেছে। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীরা তাঁদের কর্তব্য করছেন। অবিরাম গোলাবর্ষণ ও অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে পাক হানাদার দল। তারপর নিজের দেশের সর্বত্র সামরিক শাসন চালু থাকা সত্ত্বেও গোদের উপর বিস্ফোটকের মত জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে। চারিদিকে গেল গেল শব্দ। ব্ল্যাক আউট শুরু হয়েছে সর্বত্র। বেতারে জঙ্গী উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীত শুরু হয়েছে আর সবাই বুক চাপড়াচ্ছে—'ক্রাস ইনডিয়া' 'ক্রাস ইনডিয়া'। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ফিলমের নায়িকার মত কাতর কণ্ঠে চীৎকার শুরু হয়েছে 'মুঝে বাঁচাও', 'মুঝে বাঁচাও'। এখন শুধু অশ্বপৃষ্ঠে বাহাদুরের আবির্ভাব এবং দর্শকদের ঘন ঘন করতালি হলেই পালাটা জমজমাট হয়।

২৬শে নভেম্বর তারিখে চীনামন্ত্রী লুই সুই-চিং-এর সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় গলা কাঁপিয়ে ইয়াহিয়া খান বলেছেন—'আর দশ দিন। তারপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়ব, রণাঙ্গনে গিয়ে হাজির হব ভারতের সঙ্গে সম্মুখ সমরে।' এরপর তিনি ইতরের মত ভাষায় শ্রীমতী গান্ধীর উল্লেখ করে বলেছেন—'দ্যাট ওম্যান থিংকস সি ইজ গোয়িং টু কাউ মি ডাউন'। আমাকে দাবিয়ে রাখবে ঐ স্ত্রীলোকটি আমি সে মিঞা নই। একেবারে রণক্ষেত্রে চলে যাব। আমরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যে ফেরার আর পথ নেই, ইত্যাদি। এই গরমা গরম বক্তৃতার শেষে ইয়াহিয়া বলেছেন—শুধু বিশ্বে, আমারও বন্ধু আছে, সেই বন্ধুর নাম চীন।

এদিকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে খবর পাঠান হয়েছে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। এরপরই আবার শাফে ট্যাংক নিয়ে হিলি সীমান্তে রাত্রির অন্ধকারে হানাদার দস্যুরা এগিয়ে এসেছিল এবং একটি ট্যাংক এবং আশীজন সেনা খতম হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান এক অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তারা ছলে-বলে-কৌশলে ভারতীয় বাহিনীকে নিজেদের সীমানায় নিয়ে গিয়ে বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চায়, দেখুন ভারত কি রকম দুষমানি করছে। পাকিস্তানি প্রচারযন্ত্র বা অপপ্রচারযন্ত্র ভারতের প্রচারব্যবস্থার চেয়ে অনেক জোরদার। যার ফলে, গোড়ার দিকে তেমন সুবিধা না হলেও পাকিস্তানের বর্তমান প্রচারকৌশলে বিশ্ববাসী কিছুটা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আমাদের রাষ্ট্রচালকদের এদিকে নজর দিতে হবে, এখনও সময় আছে, পরে অনেক দেরী হয়ে যাবে এবং দুর্বল প্রচারব্যবস্থার জন্য অতীতে আমাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে যেমন ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি হয়েছিল এইবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটা সম্ভব। একালে প্রচারের কাল।

আমাদের একথা বোঝা প্রয়োজন যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলে যদি এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তাহলে কাউন্সিলের কিছুসংখ্যক সদস্য রাষ্ট্র পাক অপপ্রচারে আস্থা রেখে ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশকেই বলবে সংযম প্রকাশ করো, সৈন্য হটিয়ে নাও যে যার সীমানা থেকে। স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে দুটি রাষ্ট্র বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে কথা বলতে পারে আর বৃটেন চিরকাল যা করে এসেছে তাই করবে অর্থাৎ বড়ভাই যা বলছেন সেত' ন্যায্য কথা এই বলে হস্তকন্ডুয়ন করবে। বাদ-বাকী দশটি অস্থায়ী সদস্য দুভাগে বিভক্ত হতে পারে। যাই হোক সিকিউরিটি কাউন্সিল বা জেনারেল এসেম্বলীর যাই কেন সিদ্ধান্ত হোক না ভারতের নিজস্ব সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, এক কোটি শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথাটা ধামাচাপা পড়বে। পাক-ভারত বিরোধটাই বড় করে দেখান হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সামাজিক কমিটিতে চীন স্পষ্টভাবে পাকিস্থানের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করেছে। এই আলোচনায় একুশটি দেশ অংশ নেয় এবং আটটি দেশ ভারতকে সমর্থন করে। তাদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যতম।

পাকিস্তানি সীমান্ত সংঘর্ষকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সংঘাত বলেছেন। তিনি পাকিস্তানের হুমকীতেও স্বদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেননি। কিন্তু রাজনৈতিক মস্তান ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের আটমাসব্যাপী 'লেজে-গোবরে' অবস্থাটা চাপা দেওয়ার জনাই একহাত লড়তে চান। তিনি যে একজন জেনারেল সে কথা কি ভোলা যায়। তাঁকে অনেক মুরুব্বী মিষ্টি গলায় অনুরোধ করেছেন 'মুজিবের সঙ্গে একটা মীমাংসা করো'—কিন্তু সেপথে যাবার আগ্রহ ইয়াহিয়ার নেই। 'দিই লাফ'-দিই লাফ করতে করতে একবার ভারতকে ধ্বংস করার মারণযজ্ঞে তিনি মাতবেন। আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রতি পতঙ্গের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, পাকিস্তানি পতঙ্গের পাখাও অল্প আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করছে। ২৭-১১-৭১

পটভূমি

এটা অবশ্যই খুব সুলক্ষণ যে, পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সব কটি বড় রাজনৈতিক দলই সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দল তথা জনসাধারণের এই ব্যাপক সমর্থনের জন্যেই সীমান্ত বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকার এখনও দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেননি। গোটা দেশ যখন প্রায় একবাক্যে পাকিস্তানী ঔদ্ধত্যের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি তখন জরুরী অবস্থা ঘোষণাটা হয়ত অনেকটা অপ্রয়োজনীয় অথবা তার প্রয়োজন শুধু কতকগুলি প্রশাসনিক কারণে।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে বলে আমরা আজ যে সংকটের মধ্যে পড়েছি তার মোকাবিলায় পশ্চিম বাংলার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ভাষা ও সংস্কৃতির বাধনের ফলে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামে অন্যান্য সব রাজ্যের চেয়েই আমরা অনেক বেশি জড়িয়ে পড়েছি। সবার ওপর রয়েছে ভৌগোলিক কারণ। ধরুন কোনো কারণে আমরা যদি পূর্ব বাংলার সংগ্রামে জড়াতে নাও চাইতাম তবু আমরা তা এড়াতে পারতাম না। পশ্চিম বাংলার বুকেই আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে পশ্চিম বাংলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণাও জোগাচ্ছে নানাভাবে। এ-কথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না যে, পশ্চিম বাংলার অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের পথে একটি বিরাট সহায়। তা ছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার খেয়ে পাকিস্তান যে ভারতের ওপর মারমুখী হয়ে উঠেছে তারও প্রথম চোটটা এসে পড়েছে পশ্চিম বাংলার ওপর। পশ্চিম বাংলা সীমান্তেই দুই দেশের মধ্যে বড়ো রকমের ট্যাঙ্ক লড়াই এবং বিমান লড়াই হয়ে গেছে। ১৯৬৫ সাল ভারত-পাক লড়াইয়ের সময় কিন্তু এই রাজ্যের সীমান্তে এই ধরণের উত্তেজনা দেখা দেয়নি।

তাই আজকের সংকটে পশ্চিম বাংলার গুরুত্ব অপরিসীম। সুখের কথা, এই রাজ্যেও সরকার পাকিস্তানী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যে প্রায় সব কটি দলের কাছ থেকেই সমর্থন পেয়েছেন। রাজ্য কংগ্রেসের কথা আলাদাভাবে আলোচনা করার বোধ হয় দরকার নেই, কারণ স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার যখন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কৃতসংকল্প এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বিরাট নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছেন সেখানে কংগ্রেস দলের ভূমিকা কী হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু অন্যান্য দলও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই, বরং অনেকে কংগ্রেসের চেয়ে বেশ একটু এগিয়েই আছে। যেহেতু সেই সব দলের হাতে দেশ শাসনের ভার নেই, তাই তাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়াও সুবিধে, কারণ তাঁরা শুধু দাবি করেই খালাস।

যেমন ধরুন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন। অনেক দলই এই দাবি জানিয়েছে। এ সম্পর্কে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই দাবি দেশের জনমতের এক বিরাট অংশের মনোভাব প্রতিফলিত করেছে। একথা জানা সত্ত্বেও কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে এ-ব্যাপারে সরকারের ওপর বিশেষ প্রকাশ্য চাপ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ক্ষমতাসীন দল হিসেবে এই স্বীকৃতিদানের সুবিধে-অসুবিধের দিকগুলি অন্যান্য দলের চেয়ে কংগ্রেস নেতারা আরো ভালোভাবে জানেন।

তবু, অবস্থার চাপ বলে একটা ব্যাপার থেকেই যায় এবং সেই চাপটা বোধহয় পশ্চিম বাংলাতেই অনুভব করা যায় বেশি করে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের আমলে পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঐ প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন জানানো হয়। সরকার পক্ষই (যার প্রধান শরিক ছিল কংগ্রেস) প্রস্তাবটি আনেন। কিন্তু দেখা গেল, এই প্রস্তাব সব দলের পুরোপুরি মনঃপূত নয়। কারণ, অনেক দল (যেমন সি পি এম) শুধু বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি তুলেই ক্ষান্ত হতে চায় না। তারা চায়, ভারত সরকার মুক্তি সংগ্রামীদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করুন। কংগ্রেস দলের পক্ষে এই দাবিতে সায় দেওয়া খুব সহজ ছিল না। কারণ, আগেই বলেছি, দিল্লীর নীতির কথা মনে রেখেই দলকে এগোতে হয়। তবু কিন্তু পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে অস্ত্র সাহায্যের দাবিতে সায় দিতে হল তার কারণ দুটো: এক, বিধানসভায় সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব বেশি ছিল না এবং দুই, পশ্চিম বাংলার মানুষের মনোভাবের কথাটাও কংগ্রেসকে মনে রাখতে হয়েছিল।

•

বাংলাদেশের সংগ্রামে পশ্চিম বাংলার মানুষের সমর্থনের মধ্যে যে একটা ইমোশান বা ভাবাবেগের দিক আছে সেটা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কম্যুনিস্টদের এই ধরণের সমর্থনের পিছনে শুধু ভাবাবেগ বা আশু রাজনৈতিক বিবেচনা থাকলে চলে না, অনেক দ্বন্দ্ববাদী বিশ্লেষণের ভিতের ওপর তাকে দাঁড় করাতে হয়। যেমন ধরুন, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববাংলার জনগণ যে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী জমানার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, অনেকের কাছে ঐ সংগ্রামকে সমর্থন জানাবার পক্ষে এই কারণটাই যথেষ্ট। কিন্তু কম্যুনিস্টরা সমর্থন জানাবার আগে অনেক কিছু ভাববেন—যেমন, শেখ মুজিব বা আওয়ামি লীগের শ্রেণী-চরিত্র কী, এই সংগ্রামে জয়ের ফলে কোন শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা যাবে ইত্যাদি। আমাদের দেশের অনেক কম্যুনিস্টই শেখ মুজিব ও তাঁর আওয়ামী লীগ সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন। তার কারণ, শেখ মুজিব কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি নন, ফলে এই সংগ্রামকে যথার্থ বিপ্লবের প্রস্তুতি বলা চলে না। তাঁরা এটাকে বড়জোর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব বলতে চান, তার বেশি কিছু নয়।

সে যাই হোক, সি পি আই এবং সি পি এম উভয়েই যে বাংলাদেশ সংগ্রামের উৎসাহী সমর্থক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ-ব্যাপারে সি পি আই অনেকটা বেশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তার বেশি কিছু নয়।

সে যাই হোক, সি পি আই এবং সি পি এম উভয়েই যে বাংলাদেশ সংগ্রামের উৎসাহী সমর্থক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ-ব্যাপারে সি পি আই অনেকটা বেশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তার কারণ, পূর্ব বাংলায় সি পি আইয়ের সমধর্মী একটি কম্যুনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে। এত দিন পর্যন্ত অবশ্য ঐ পার্টি বেআইনী ছিল। কিন্তু মুক্তি সংগ্রাম সুরু হওয়ার পর পার্টি এখন আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মুক্তি সংগ্রামে তারা অন্যতম প্রধান শরিক। পার্টি আশা করছে, এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের দলগত শক্তি বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের সংগ্রামে আওয়ামি লীগের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব মেনে নিয়েও পূর্ব-বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি অবশ্য সর্বদাই একটি যুক্তফ্রন্ট তৈরির জন্যে সচেষ্ট থেকেছে। কিন্তু [illegible]

অস্থায়ী সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হওয়ায় সেই প্রচেষ্টা অনেকটা সফলও হয়েছে। এই উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এখন সত্যিই একটা জাতীয় চরিত্র লাভ করেছে।

ঐ উপদেষ্টামণ্ডলীতে পূর্ববাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিও স্থান পেয়েছেন। ফলে বাংলাদেশ সরকারের কার্য-কলাপ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐ পার্টি এখন অন্ততঃ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এর ফলেই সি পি আইও বাংলাদেশের সংগ্রামে অনেক বেশি সংশ্লিষ্ট। সি পি আই দাবি করে আসছে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। সি পি আই এও চায় যে, চূড়ান্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসুক। কারণ, অনেকেই এখন যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন তা যদি সত্যিই হয় তবে সেই সমাধান হবে শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য দলের সেখানে বিশেষ ভূমিকা থাকবে না।

সি পি এম অবশ্য এতটা সরাসরি বাংলাদেশের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত নয়। তার প্রধান কারণ, পূর্ববাংলায় সি পি এমের সমধর্মী কোনো পার্টি নেই। মৌলানা ভাসানির জাতীয় আওয়ামি পার্টির সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার জন্যে এক সময় চেষ্টা করেছিল সি পি এম। তাতে বিশেষ ফল হয়নি। তবে সি পি আইয়ের মতো সি পি এমও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের এবং অস্ত্র সাহায্যের দাবি জানিয়ে আসছে। এমন কি, এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সি পি এম আন্তরিকতার অভাব বলেও অভিযোগ করতে চেয়েছে। তার কারণ, সি পি এমের মতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের লড়াই লেগে যাবে, এ ধারণা ভুল।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি বা অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রণমূর্তি ধারণ করেছেন এবং পাক ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং, স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তান ভারত আক্রমণের আরো একটা সহজ অছিলা পেয়ে যেত এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে আসলে পাক-ভারত বিরোধ হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ পেয়ে যেত এই অনুমান হয়ত মিথ্যে নয়।

তবে বাংলাদেশের সংগ্রামে সি পি এম এবং সি পি আই উভয়ের সমর্থন থাকলেও এ-ব্যাপারে আবার দুই পার্টির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহও আছে। এবং সেই সন্দেহ পশ্চিম বাংলার রাজনীতির ওপরেও মাঝে মাঝে ছায়া ফেলেছে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের পতনের পরেই সি পি এম পশ্চিম বাংলায় একটি কংগ্রেস বিরোধী ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু যে-সব কারণে সি পি এমের এই আহ্বান সি পি আই প্রত্যাখ্যান করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাদেশ প্রশ্নে সি পি এমের মনোভাব। সি পি আইয়ের অভিযোগ ছিল, বাংলাদেশ সম্পর্কে সি পি এমের মনোভাব যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

তারপর আবার গত পয়লা জুলাই সি পি এমের পোলিট ব্যুরোর সদস্য শ্রীএ কে গোপালন সি পি আইয়ের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজেশ্বর রাওয়ের কাছে লেখা এক চিঠিতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানান। কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানেরও অন্যতম কারণ ছিল ঐ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। শ্রীরাও চিঠির উত্তরে জানতে চাইলেন: বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের এবং ঐ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কেই বা আপনাদের মনোভাবটা কী? পশ্চিম বাংলায় আপনাদের দলের পক্ষ থেকে যে-সব বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় আপনাদের দল শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে পাঠানোর বিরোধী। আমরা তো এর কারণ বুঝতে পারি না। তাছাড়া বাংলাদেশ সমস্যাকে আমরা একটা জাতীয় সমস্যা বলে মনে করি। কিন্তু আপনাদের দল এ ব্যাপারেও ভারত সরকার ও কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না। কংগ্রেস দল ও ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করে আমরা কি বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করতে পারব? তাই এই প্রশ্নেও আমরা আপনাদের মনোভাব ঠিক বুঝতে পারছি না।
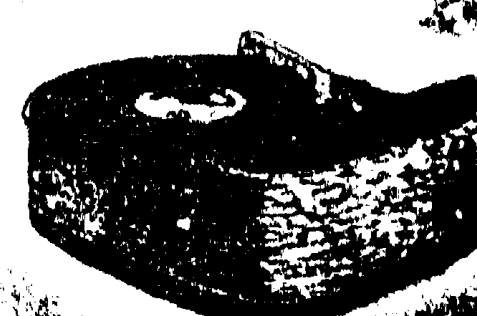
ইদানীং অবশ্য অবস্থা অনেকটা পাল্টেছে। সি পি এমের পোলিট ব্যুরো এবং সি পি আইয়ের জাতীয় পরিষদ, উভয়ের বিবৃতিতেই পাকিস্তানী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। সি পি এম স্পষ্টই বলেছে, ভারতের ঘাড়ে যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তা হবে পাক-মার্কিন চক্রান্তেরই ফল।

দুই কম্যুনিস্ট পার্টির বিবৃতিতেই অবশ্য আরো একটা মিল চোখে পড়ে। ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতি-রোধ করার আহ্বান জানাতে গিয়ে উভয়েই তুলেছে পশ্চিম বাংলার কথা। দুই কম্যুনিস্ট পার্টিরই ধারণা, পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে সরকার যে-নীতি অনুসরণ করছেন তা ঐ ধরণের ঐক্যের বিরোধী। ঐ নীতির সমা-লোচনায় সি পি এমের ভাষা অবশ্য একটু কড়া। কারণ তারা 'আধা-ফ্যাসিস্ট' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করেছে। তবে দুদলের দাবির মধ্যে অনেক মিল আছে। যেমন দুদলই গণ-আন্দোলন দমনের কথা তুলেছে, নতুন করের বোঝার বিরোধিতা করেছে। সি পি আই এমন কথাও বলেছে যে, যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তবে তা যেন গণ-আন্দোলন দমনের জন্য কাজে লাগানো না হয়। হত্যা সন্ত্রাস বন্ধের যৌথ চেষ্টা, দুই যুক্তফ্রন্ট এবং গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণের দাবিও এই প্রসঙ্গে এসেছে। জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে এই পাক আক্রমণ ঠেকাতে পারে তার জন্যে সব রকম দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যা-হারের দাবিও করা হয়েছে।

দুই কম্যুনিস্ট পার্টি যে এখন এই সব প্রসঙ্গ তুলেছে তার কারণ বোধ হয় এই যে, বর্তমান উত্তেজনার মধ্যে তারা পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ইস্যুগুলিকে হারিয়ে যেতে দিতে চায় না। বাংলাদেশের সংগ্রাম এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখানে তার চূড়ান্ত সাফল্যের আর বিশেষ দেরি আছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশ সমস্যার যদি একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যায় তবে তার প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই বর্তাবে প্রধানমন্ত্রী, তথা কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস দলের ওপর। এ-ব্যাপারে অন্যান্য দলের সমর্থন ও সহযোগিতা সত্ত্বেও এই কৃতিত্ব থেকে প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দলকে কেউই বঞ্চিত করতে পারবে না। অনেকের ধারণা, বাংলাদেশ সমস্যার একটা সন্তোষ-জনক মীমাংসা হয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বাংলায় তাড়াতাড়ি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ, বাংলাদেশ নীতির সাফল্যের হাওয়া পালে লাগিয়ে কংগ্রেস সহজেই নির্বাচনী দরিয়া পার হতে পারবে। তখন সেই সাফল্যের হাওয়া যাতে অন্য সব ইস্যুকে ভাসিয়ে নিয়ে না যেতে পারে সেই জন্যেই ওগুলিকে বিস্মৃত হতে দেওয়া উচিত নয়। —দেবব্রত

গত ২২শে নভেম্বর বয়রার কাছে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে অনুপ্রবেশকারী তিনখানা পাক স্যাবার জেট বিমানকে যাঁরা ভূপাতিত করেছিলেন, তাঁদের এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে (বাঁ থেকে ডাইনে)— ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আর ম্যাসি, ফ্লাঃ লেঃ এম এ গণপতি এবং ফ্লাইং অফিসার ডি ল্যাজারাস।

দেশে বিদেশে

ভারতীয় বাহিনীর হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে ১৩ খানি শ্যাফি ট্যাঙ্ক ও তিনখানি স্যাবার জেট বিমান হারাবার পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর দেশের উপর বৈদেশিক আক্রমণের রব তুলে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করেছেন, ওয়াশিংটনস্থিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত নবাবজাদা রাজা মার্কিন সাংবাদিকদের ডেকে আর্তস্বরে বলেছেন, 'যুদ্ধ এখন আর আসন্ন নয়, যুদ্ধ বেধে গেছে এবং ভারত পাকিস্থানকে টুকরো করে ফেলতে বদ্ধপরিকর', রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগা শাহী বলেছেন, ১২ ডিভিসন ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানের উপর হামলা করেছে, এবং এই আক্রমণের প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাকিস্তান ইতিমধ্যে সরকারীভাবে নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যানের বরাবরে পত্র দিয়েছে।

ইয়াহিয়া খাঁর ফৌজ যখন বাংলা দেশের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না, বাংলাদেশের বিভিন্ন খণ্ডে যখন মোট আট হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা মুক্তিবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে খান সেনারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে, পাকিস্তানী ফৌজের জবরদস্ত ঘাঁটি যশোর ক্যান্টনমেন্ট যখন যে কোন মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে যেতে পারে তখন মরিয়া হয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে একটা 'যুদ্ধ' আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে—যাতে তার মুরুব্বি দেশগুলি এই 'যুদ্ধ' থামাবার নাম করে আসল সমস্যা, অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রশ্নের একটা রাজনৈতিক সমাধান বার করার ও প্রায় এক কোটি আশ্রয়প্রার্থীকে নিরাপদে ও সসম্মানে নিজেদের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি চাপা দিতে পারে।

পাকিস্তানের এই উত্তেজিত প্রতিক্রিয়ার তুলনায় ভারতের প্রতিক্রিয়া খুবই অনুত্তেজিত, সংযত। গত ২১ নভেম্বর ও ২২ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বয়ড়া সীমান্তের কাছে যে ঘটনা ঘটে গেছে তাকে ভারত নিছক 'স্থানীয় ঘটনা' হিসাবেই গণ্য করতে চায় এবং পৃথিবীর অন্য দেশগুলিকে কিছুতেই একথা ভুলতে দিতে চায় না যে, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পাকিস্তানের শাসকদের বাধ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে পার্লামেন্টে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ভারত এখন পর্যন্ত সীমান্তের ঘটনাগুলিকে স্থানীয় ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করছে। শ্রীমতী গান্ধী একথাও বলেছেন যে, পাকিস্তানের অনুকরণ করে ভারত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবে না, যদি না অবশ্য পাকিস্তান আরও মারমুখী হয়ে উঠে ভারতকে এই ঘোষণা করতে বাধ্য না করে।

এদিকে, পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ যেন ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধাতে না পারলে আর কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না। সেদিন একটি চীনা প্রতিনিধি দলকে সাক্ষী রেখে তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে 'যেখান থেকে ফেরার আর রাস্তা নেই।' রাওয়ালপিণ্ডিতে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'দশ দিন পরে আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে না থাকতে পারি। হয়তো আমি লড়াই করতে চলে যাব।'

ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব লড়াই করতে এলে কি জবাব পাবেন তার পরিচয় অবশ্য ভারত গত ২১ ও ২২ নভেম্বর বয়ড়া সীমান্ত এলাকায় ভালভাবেই দিয়েছে। আগেকার আদেশ সংশোধন করে এখন ভারতীয় বাহিনীকে প্রয়োজনমত আত্মরক্ষার খাতিরে সীমান্ত অতিক্রম করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার প্রথম প্রয়োগ হল ঐ সীমান্তে। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, গত ২১ নভেম্বর পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক বাহিনী পিছনে গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য নিয়ে বয়ড়ার মুক্তঅঞ্চলের উপর আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে আসছিল। পাকিস্তানী ফৌজের এই আক্রমণাত্মক অভিযানে সীমান্তের এপারে ভারতীয় ঘাঁটিগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে। তখন স্থানীয় ভারতীয় সামরিক অধিনায়ক ঐ পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই সঙ্ঘর্ষে পাকিস্তান তার ১৩টি শ্যাফি ট্যাঙ্ক হারিয়েছে। এই ট্যাঙ্কগুলি আমেরিকান। একজন সামরিক পর্যবেক্ষকের মতে, পূর্ববঙ্গে মোট যত পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক আছে

তার এক চতুর্থাংশই পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব খণ্ডের এই যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেল।

এই খণ্ডে তিনখানি হানাদার পাকিস্তানী জেট বিমানকে ভূপাতিত করে ভারতীয় বিমান বাহিনী আরও চমকপ্রদ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। ২২ নভেম্বর বিকালে কলকাতা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে চব্বিশ পরগণা জেলার বয়ড়া গ্রামে সীমান্ত অঞ্চলের হাজার হাজার অধিবাসী হাওয়াই লড়াইয়ে পাকিস্তানী বিমানের এই বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়ে রয়েছেন। সেদিন বিকাল ২-৪৯ মিনিট নাগাদ বয়ড়ার আকাশে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে এল পাকিস্তানের চারটি স্যাবার জেট বিমানের ঝাঁক। ভারতের বিমান-বিধ্বংসী কামান গর্জন করে উঠল আর একটু পরেই দেখা গেল ভারতীয় বিমান বহরের খুদে ন্যাট বিমান পাকিস্তানী বিমানগুলির পিছু ধাওয়া করছে। স্যাবার থেকে গুলী ছুটল। ন্যাট তার জবাব দিল। ষোল মিনিটের মধ্যে দাউ দাউ আগুনে জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে নেমে এল একে একে তিনখানা পাকিস্তানী বিমান। দুটি বিমানের দুজন পাকিস্তানী বৈমানিককে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে দেখা গেল। বন্দী দুজনের পরিচয় পাওয়া গেল। একজন হলেন ফ্লাইট লেফটেনান্ট পারভেজ মেহেদি আর একজন ফ্লাইং অফিসার খলিল আমেদ খাঁ।

আর যে চারজন বীর ভারতীয় বৈমানিক এই আকাশযুদ্ধে দেশের জন্য অসামান্য বিজয়গৌরব অর্জন করলেন তাঁরা হচ্ছেন ফ্লাইট লেফটেনান্ট আর ম্যাসি, ফ্লাইট লেফটেনান্ট এম এ গণপতি, ফ্লাইং অফিসার ডি ল্যাজারাস, এবং ফ্লাইং অফিসার সোরেস। প্রতিরক্ষা উৎপাদন-মন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল পার্লামেন্টে এই যুদ্ধের বিবরণ দিলে সদস্যরা তুমুল হর্ষধ্বনি করে এই বীর বৈমানিকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পাকিস্তানের উত্তেজনার আসল কারণ হল, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর লড়াই এখন, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের ভাষায়, 'চূড়ান্ত পর্যায়ে' উঠেছে। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে, মুক্ত-অঞ্চলগুলিতে বাংলাদেশ সরকার অসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করছেন। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব খণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানী ঘাঁটি যশোহর যে কোন মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের হাতে এসে যেতে পারে। চালনা বন্দরে ঢোকার মুখে একটি গ্রীক জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর নৌযোদ্ধারা বন্দরটিকেই অচল করে দিয়েছেন। খাস ঢাকা শহরে প্রায় দুই হাজার গেরিলা তৎপর রয়েছেন বলে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন।

অবস্থাটা যে কতটা খারাপ হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল পূর্ববঙ্গে কর্মরত রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত ত্রাণকর্মীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ-কর্মসূচী দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গে ত্রাণকর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নটিই এখন প্রধান চিন্তার বিষয়। তিনি ঢাকা থেকে খবর পেয়েছেন, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নদীপথে জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত রাষ্ট্রসংঘের দুইটি জাহাজ মাইনের আঘাতে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেসব ত্রাণকর্মী ফিরে গেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ব্যাঙ্ককে বলেছেন ঢাকার পরিস্থিতি 'অত্যন্ত উত্তেজনাময়।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই চূড়ান্ত পর্যায়কে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের পোশাক পরিয়ে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ডেকে আনার যে ফন্দি এঁটেছেন ইসলামাবাদের মিলিটারী ডিকটেটর, সেটা এখন পর্যন্ত খুব বেশী দূর সফল হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সবচেয়ে বড় কথা হল, পাকিস্তান যদিও রাষ্ট্রসংঘে ভারতের নামে নালিশ করেছে তাহলেও বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা করার জন্য কোন দেশের তেমন আগ্রহ বা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এমন কি যে-চীনকে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে জাহির করা হচ্ছে, যে-চীন সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদে আসন পেয়েছে সেই চীনও পাকিস্তানের উপর 'ভারতীয় হামলার' ঘটনাটি বিবেচনা করার জন্য পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বলে নি। অন্যদের এই ঔদাসীন্য দেখে পাকিস্তান নিজেও নিরাপত্তা পরিষদে যেতে ভরসা পাচ্ছে না।

ওয়াশিংটনের কর্তারা অবশ্য তাঁদের অভ্যস্ত কায়দায় জল ঘোলাবার চেষ্টা করছেন। কোকা কোলা কোম্পানীর অন্যতম

ক্রোড়পতি মালিক মিঃ বেঞ্জামিন এইচ উল্সার্ট নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। মিঃ উল্সার্ট ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি ঐ পত্রে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার পুরানো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে—যে চুক্তির বলে 'পাকিস্তান অন্য দেশের দ্বারা আক্রান্ত হলে আমরা এমন কি নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' মিঃ উল্সার্ট কোন্ চুক্তির কথা বলছেন? মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র এই ধরনের কোন চুক্তির কথা স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই না করে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা ধাঁধা তৈরী করছেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান এবং সেন্টোর চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তার একটি সর্তে অবশ্য এই ধরনের সাহায্যের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই সর্তের মধ্যে পরিষ্কারভাবেই বলা ছিল যে, কোন কম্যুনিস্ট দেশ পাকিস্তান আক্রমণ করলে তবেই এই সর্ত পালন করা হবে এবং আক্রান্ত পাকিস্তানকে যে সাহায্য দেওয়া হবে সেটা দেওয়া হবে মার্কিন সংবিধান অনুসারে (অর্থাৎ কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়ে) এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ইচ্ছা করলে এই বিষয়গুলি স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে পারতেন। তা না করে তিনি ভারতকে একটা অস্পষ্ট হুমকী আর পাকিস্তানকে অস্পষ্ট আশ্বাস দিতে চাইছেন বলেই যেন মনে হয়।

চীনের প্রতিনিধি ফু হাও অবশ্য ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘের একটি কমিটিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে পাকিস্তানকে জোরাল সমর্থন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তিব্বতে বিদ্রোহ পাকিয়ে এবং 'তথাকথিত তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা নামে একটি সমস্যা' তৈরী করে তিব্বতের ব্যাপারে যেমন হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল তেমনি 'কোন একটি দেশ 'পাকিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা তৈরী করছে। ফু হাও যদিও যথেষ্ট কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন তাহলেও পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, তিনি ভারতের নামটা এড়িয়ে গেছেন। 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকার শ্রী টি জে এস জর্জ, এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের শ্রীসুমন দুবে প্রভৃতি হংকংস্থিত ভারতীয় সাংবাদিকরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, এবার চীন পাকিস্তানকে যে সমর্থন জানাবে সেটা খুব মেপে-বুঝে জানাবে।

পাকিস্তান 'যুদ্ধ', 'যুদ্ধ' বলে হাঁক ছাড়ার পর পিকিংস্থিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত এম এম রাইজার প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনিই পাকিস্তানের একমাত্র বাঙালী কূটনীতিবিদ যিনি এখনও স্বপদে বহাল আছেন। কিছুকাল আগে ইসলামাবাদের কর্তারা তাঁকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং চৌ এন-লাইয়ের হস্তক্ষেপে ঐ বদলী নাকি বন্ধ হয়ে যায়।

তবু, যেহেতু ইসলামাবাদের শাসকদের পক্ষে আজ কোন বাঙালীকে বিশ্বাস করা কঠিন সেহেতু রাইজার সাহেব যখন চৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারও গিয়েছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে চৌ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শুধুই 'উদ্বেগ', ভারতকে হুমকী নয়, এমন কি সাহায্যের মামুলী প্রতিশ্রুতিও নয়। অতএব বন্ধু চীনের উপর ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব ঠিক কতখানি ভরসা করতে পারেন তা তিনি সম্ভবত বুঝতে পারছেন না।

২৬-১১-৭১ —পুণ্ডরীক

চিঠি

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

অফিস ছুটির সময় বি ডি ও সুধীরবাবু নিজের ঘরে বসে এক মনে একটা লিস্টের দিকে তাকিয়েছিলেন। এই লিস্টে একটা বড়ো চেনা নাম নজরে পড়ল তাঁর। তিনি আশা করেননি, এতো বছর পরেও সেই যন্ত্রণার নামটার সংগে তাঁর আবার দেখা হবে!

নাম নয়, যেন করুণ শান্ত একটি নদী!

পৃথিবী এতো বিরাট। তবু এই নদী-তীরের দৃশ্যপট থেকে আজও কোথাও দূরে যেতে পারলেন না তিনি। যেখানেই গেছেন, সেইখানে দেখেছেন, এই নদীটার দিগন্তব্যাপী বিষাদ তাঁকে নিঃশব্দে ঘিরে আছে!

একটা মৃদু শব্দে নিজের জগতে ফিরে এলেন সুধীরবাবু। বেয়ারা ঘরে ঢুকল।—'স্যার মিটিঙের নোটিশটা?'

'ও হ্যাঁ, নিয়ে যাও. সই করে দিয়েছি।'

সুধীরবাবু নতুন এসেছেন এই ব্লকে। চেনাশোনা এখনও ঠিক হয়নি। সরকারী নিয়মে কাছের মালটিপারপাস গার্লস স্কুলের তিনিই এক্স অফিসিও সেক্রেটারী। তারই মিটিং। নোটিশে যাঁরা সই করেছেন, তাঁদের মধ্যে সেই নামটা চোখে পড়ল—

শুচিস্মিতা রায়—(টিচার্স রিপ্রেজেন্টে-টিভ)। মুহূর্তের জন্য একটা সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট বেদনা অনুভব করলেন তিনি।

আশ্চর্য! নিজের মনেই হাসলেন সুধীরবাবু। জীবনের কোন কোন ক্ষত তা হলে কখনো আরোগ্য হয় না! কিন্তু এই শুচিস্মিতা রায়ই যে ইউনিভার্সিটির সেই স্মার্ট সুন্দর শুভ্র শুচি. যাকে বহু ছেলে কামনা করতো. তা নাও হতে তো পারে।

নিজের মনেই সওয়াল করলেন সুধীর-বাবু। না, এ যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ শুচির বাড়ী এই অঞ্চলেই ছিল এবং নামটা খুব 'কমন' নয়।

বেয়ারা আবার এসে দাঁড়ালো।

সুধীরবাবু বললেন,—'এই ফাইল-গুলো বাসায় নিয়ে যাও। আমিও উঠছি।'

ছুটির পরে নদীধার দিয়ে নিজের কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিলেন সুধীরবাবু। যেতে যেতে গার্লস স্কুলের বিরাট এরিয়া, দোতলা প্রকাণ্ড বিল্ডিং, একটু দূরে সারি সারি টিচার্স কোয়ার্টার চোখে পড়ল তাঁর। হয়ত এমনি কোন কোয়ার্টারে শুচি থাকে। সাজানো গোছানো পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধ একটি ঘর। সুন্দর অথচ করুণ একটা অনুভব এই মুহূর্তে তাঁকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

সেই নাম. শুচিস্মিতা এবং এই নামটাই একটা পরিপূর্ণ ছবি। [illegible]

এতো মেয়ের মধ্যে সে নিজেই একটি উজ্জ্বল প্রদীপ। কোনদিন দেরি করে ক্লাশে ঢুকলেই সব শান্ত। যেন সবাই ওর পদধ্বনি শুনবে বলে কান পেতে ছিল।

একটু দীর্ঘ শীর্ণ পরিচ্ছন্ন পরিপূর্ণ চেহারা। গায়ের রং, উজ্জ্বল শ্যামল। সারা মুখ, যেন সকালের একটি টাটকা গন্ধরাজ। কী সুন্দর কালো দুটি চোখ। দীর্ঘ গ্রীবা, কয়েকটি রেখার কারুকার্য সেখানে। একটু অলস, একটু অযত্নে বাঁধা পুষ্প শিথিল খোঁপায় ভালোবাসার সব রহস্য, সব ঐশ্বর্য, সব শিল্প যেন ছায়াচ্ছন্ন ঘন অরণ্যের নিটোল কবিতা হয়ে উঠেছে।

অবশ্য দূরে থেকেই এই দেখা, এই মুগ্ধ ভালোবাসা, এই এক নিবেদন।

দেখাশোনা হোতো পথে আসতে যেতে। শ্যামবাজার থেকে সুধীর ট্রামে উঠত কলেজ স্ট্রীট আসবে। শুচি উঠত, বিবেকানন্দর মোড়ে। একই ইয়ারের ছাত্র দুজনেই, দুজনের একই সাবজেক্ট। হঠাৎ চোখাচোখি হোতো কখনো। কিন্তু সুধীর সোজা তাকাতে পারত না। অথচ দেখতে ভালো লাগত, লোভ হোতো। একটা চঞ্চলতা বোধ করত সে। এ যেন, ছোট্ট একটি ঘাসের ফুলের, সকালের রোদের দিকে তাকানোর মত সুন্দর বিস্ময়!

একদিন শুচি নিজেই পরিচয় করল অবশ্য নেহাৎ প্রয়োজনেই।

—আচ্ছা আপনি এইচ পি-র ক্লাশে ছিলেন? অন্ধকার করিডোরে সুধীর প্রথমে চিনতেই পারেনি, কে বা কার গলা। থমকে দাঁড়িয়ে অবাক।

শুচির গলার স্বর বাঁধা তানপুরোর মত আবার বেজে উঠল।

সুধীর কাঁপা গলায় বলল—ছিলাম।

—নোট নিয়েছেন? দিন না খাতাটা একটু। ওদের সঙ্গে কফি হাউসে আড্ডা দিতে গিয়ে ক্লাশটা—।

নিঃশব্দে সুধীর খাতাটা এগিয়ে দিল। শুচি বলল—চলুন—

সত্যি ভেতরটা বড্ড অন্ধকার, এতো জ্ঞানের আলো আজো সে অন্ধকার দূর করতে পারেনি।

শুচি আলোয় এসে দাঁড়াল, খাতাটা উল্টে-পাল্টে দেখে বলে উঠল,—বাব্বাঃ, কী সুন্দর হাতের লেখা আপনার?

সুধীর এতক্ষণে কিছু সাহস সঞ্চয় করেছে। হেসে বলল, ঐ পর্যন্তই। এর বেশি নয়।

—উঁহু, এর চেয়ে বেশি। ভাবছেন, আপনার খবর কিছু রাখি না। সুধীর ধন্য হয়ে গেল। শুচি একটু এগিয়ে গিয়ে আবার বলল—আপনারা হলেন প্রেসিডেন্সির নাম করা ছেলে। তা, খাতাটা কবে দিলে চলবে, বলুন?

—কাল দিলেই চলবে।

—ওমা! কাল? কেন?

সুধীর একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—আমার বইটই নেই তো। ঐ নোটই যা ভরসা।

শুচির গলার স্বরে বেদনা!—ও, আই এ্যাম স্যরি। এই দেশের কি ট্র্যাজেডি, যার বইটই নেই, তার পড়ার কতো আগ্রহ। আর যার বইটই সব আছে, এই যেমন আমি, তার পড়ায় না আছে আগ্রহ, না আছে ইচ্ছে। শুচি সুন্দর করে হেসে সুধীরের মুখের দিকে তাকাল।

সোমবারে ক্লাশে এসে, সকলের সামনেই শুচি সুধীরকে খাতাটা দিতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় একশ জোড়া চোখের কড়া সন্ধানী আলো এসে পড়ল সুধীরের মুখের ওপর। লজ্জায় মাথা নত করল সুধীর।

শুচি কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলল,—খাতার একধারে এই যে কোটেশনটা—'উই মাইট ওয়াক এলং দ্য ওয়ে অব লাইফ লাইক টু পিলগ্রীমস'—এটা কোথায় পেলেন?

সুধীর উৎসাহিত হয়ে বলল,—আমার জিদের একটা বই থেকে।

—পড়িনি তো। কোন বই?

—স্ট্রেট ইজ দ্য গেট।

—ভারি সুন্দর কথাটা। কিন্তু এমন ছেলেমানুষের মত খাতায় লিখে রেখেছেন কেন?

সুধীর হেসে বলল,—লিখে রাখলে মনে থাকে।

—কিন্তু, ঐ লাইক টু পিলগ্রীমস' কখনো পথে হেঁটেছেন? আমি কিন্তু হেঁটেছি। বলব, আপনাকে সে গল্প একদিন বলব। জানেন, কোটেশনটা ভীষণ ভালো লেগেছে আমার।

সুধীর সেদিন কোন লেকচার শোনেনি, কোন নোট নেয়নি। এক দুর্লভ গানের সুরে সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার!

এতোদিনের একটি নিভৃত ভালো লাগা, তখন গ্রীষ্মের প্রথম বৃষ্টির মতো মৃত্তিকার বুকে কী আশ্চর্য রোমাঞ্চ নিয়ে এলো!

সত্যি আশ্চর্য কথাটা—'উই মাইট ওয়াক এলং দ্য ওয়ে অব লাইফ'—না জীবনের পথে তিনি, শুচি কেউ পাশাপাশি তীর্থ যাত্রীর মত হাঁটেননি। কিন্তু—

সুধীরবাবু কোয়ার্টারে যেতে যেতে ভাবছিলেন, এই 'কিন্তু'টার সংজ্ঞা তিনি সারাজীবন জানতে পারলেন না।

ট্রামের জন্য সেদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল সুধীর। একটু তাড়া আছে। মেসে ফিরেই টিউসনে যেতে হবে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। কিন্তু ট্রাম বন্ধ হওয়ার মত সে বৃষ্টি নয়।

শুচি এসে দাঁড়াল। এখন একা। ওকে ঘিরে যে তৃষ্ণার্ত মৌমাছিদের ভিড় লেগে থাকে, তা তখন নেই। নাচের মুদ্রার মত দীর্ঘ সুন্দর আঙুলগুলো বইগুলোকে ঘিরে আছে। শুচি হেসে বলল,—আপনাকে দেখেই এলাম। কতক্ষণ? সুধীর হতাশার সুরে বলল,—মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে আছি।

পনেরো ঘণ্টা দাঁড়ালেও ট্রাম আসবে না। বৌবাজারের মোড়ে গুলি, ট্রামে আগুন, টিয়ার গ্যাস—

সুধীর অবাক হয়ে বলল,—গুলি! কেন?

শুচি হালকা গলায় বলল—আমি কি মশায় পুলিশ কমিশনার? কেন গুলি হয়েছে জানব?

—মহিলা পুলিশ কমিশনার কোথাও নেই। 'আই এ্যাম ডেফিনিট।'

শুচি হেসে গড়িয়ে পড়ল। —বেশ সুন্দর কথা বলেন তো আপনি। উন্নতি হয়েছে দেখছি। তা যাবেন কি করে?

—কেন? পদব্রজে।

—মাই গড। সে-ই শ্যামবাজার মোড়! কোথায় থাকেন ওখানে?

—একটা মেসে। বাড়ীটা অবশ্য জব চার্নকের আমলের।

শুচি সুন্দর করে হাসল। —তা মন্দ কি। হিসটোরিক্যাল ব্যাপার। কিন্তু এতো রাস্তা হেঁটে যাবেন?

—বেশি হলেও ক্ষতি নেই। জানেন তো, আমি গ্রামের ছেলে।

—খুব জানি। আমার বন্ধুরা কি বলে জানেন? শুচিটার টেস্ট পাল্টে গেছে। নইলে ঐ গেঁয়ো ছেলেটার সঙ্গে—

অপমানে সুধীর এখন পথের ধারের মাইলস্টোন ছাড়া আর কি!

শুচি গম্ভীর হয়ে বলল—কি? রাগ করলেন?

সুধীর উদাসীন গলায় বলল—না না রাগ করব আর কেন?

—তবে যে মশায়ের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল?—শুনুন আমি কিন্তু ওটা বানিয়ে বলেছি। বিশ্বাস করুন, তারটা একটু টেনে দেখলাম, দেখি কি সুর বাজে?—কি কথা বলছেন না যে? দেখুন, যার সেন্টিমেন্ট নেই তার কিছু নেই।—অ্যাই ট্যাকসি, এ্যা-ই।

ট্যাকসিটা ঘুরে এসে দাঁড়াল। শুচি বলল—উঠুন, সর্দারজী, শ্যামবাজার।

বিবেকানন্দ রোডের মোড় পেরিয়ে যায় দেখে সুধীর বলল, আপনি নামলেন না?

শুচি কি যেন ভাবছিল। বলল—চলুন আপনার মেসটা দেখে আসি।

সুধীর অবাক! ঠিক বিশ্বেস করল না। বলল—সত্যি যাবেন?

—তবে কি মিথ্যে যাব?

—সে পচা মেসে গিয়ে আপনার ভালো লাগবে না। নোংরা স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার। আর যাবেনই বা কেন?

শুচি যা বলল, সুধীরের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। বলল, যাব নিজের স্বার্থে। পড়াশোনা সত্যি কিছু হয়নি। নির্ঘাৎ ফেল। আপনি ভয়ঙ্কর ভালো ছাত্র, যদি একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দেন। আর—।

—আর কি?

—আর আমি ঠিক জানি, আপনি কখনো আমাকে জ্বালাতন করবেন না। 'বিলীভ মি', ঐ ওদের প্রেম নিবেদনের জ্বালায় আমি অস্থির, আমি টায়ার্ড। ওরা জানে না, আমি যাকে ভালোবাসি, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। সেটা কফি হাউসে ফ্লার্ট করা নয়, সেটা ছেলেখেলা

জন্য। সেটা ঐ 'উই মাইট ওয়াক এবং হ্যাভ ওয়ে অব লাইফ লাইক টু পিলগ্রীমস।'

সুধীর চমকে উঠল। তাহলে শুচির জীবনে একটা স্থির কেন্দ্রভূমি কোথাও আছে, যেখানে সে সত্য, সে খাঁটি, সে অপাপবিদ্ধ। কিন্তু একটা কথা তীরের মত তার বুকে বিঁধল, 'আপনি আমাকে কখনও জ্বালাতন করবেন না।' অর্থাৎ সুধীর কখনো শুচিকে ভালোবাসতে পারে না, সে যোগ্যতা তার নেই, সে ঐশ্বর্য তার নেই। সে শুধু পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের কাগজ পাওয়া একটা 'ভেরি গুড স্টুডেন্ট।' তার বেশি কিছু নয়, কিছু নয়! এ তার সারাজীবনের প্রতি একটা করুণ উপেক্ষা, একটা অপমান!

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে দুজনে উঠে আসছিল। কেউ কোন কথা বলছিল না। অন্ধ গলি। তাই দোতলায় ঘরটাও প্রায় অন্ধকার। বাইরে তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

শুচি ধপ করে তক্তপোষের ওপর বিছানায় বসে পড়ল।—বাব্বা, যা টায়ার্ড লাগছে এখন! আরে! এটা বেহালার বাক্স বলে মনে হচ্ছে। কে বাজায়? দেখি, দেখি।

সুধীর বলল—আমি একটু শিখি।

—সত্যি! ইস কী ভালো লাগছে। কদ্দিন ধরে শিখছেন?

—দেশে থাকতে থাকতে একটু বাজাতাম। ভালো করে শিখছি ফার্স্ট ইয়ার থেকে।

—ওমা! তবে তো অনেকদিন ধরে শিখছেন। আচ্ছা ধৈর্য তো আপনার। জানেন? আমিও ক্লাসিক্যাল শিখেছিলাম কিছুদিন; কিন্তু ঐ ধৈর্য নেই।

মেসের মেম্বারদের ফেরার সময় হয়নি এখনো। তাই বাড়ীটা চুপচাপ।

শুচি বলল—একটা রিকোয়েস্ট। না বলতে পারবেন না কিন্তু। —একটু বাজনা শুনব।

—এখন কিন্তু—

—কিন্তুটিন্তু শুনছি না বাপু! নিন, বেঁধে নিন একটু।

সুধীর বেহালাটা বেঁধে নিয়ে প্রথমে একটু আলাপ করল। বুঝতে পারছিল না, শুচি কি ধরনের শ্রোতা, বোঝে কিনা, উপলব্ধি আছে কিনা। কিন্তু একটু পরেই দেখল, শুচি চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে আছে। বড় ভালো লাগল সুধীরের। ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ আলাপ করল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কানা গলিটা ঢেকে গেছে। তবে বৃষ্টি পড়ছে না এখন।

শুচির গলার স্বর যেন দূরে থেকে ভেসে আসছে—ভীমপলশ্রীটা বড়ো করুণ লাগল। কেমন উদাসীন। তোমার হাত সত্যি ভারি মিষ্টি।

সম্বোধন শুনে সুধীর অবাক!

শুচি আবার বলল—হাতই বা বলব কেন? যে বাজায় সে মন। সে মন কবি নইলে এমন হয় না। জানো? এমন বাজনা শুনলে আমার কেন যেন কান্না পায়। তখন অনিত্যের কথা ভীষণ মনে হয়। ভালোবাসাটা এই কান্নার মত। তাই না?

শুচি চুপ করল।

সুধীর আগে বুঝতে পারেনি, শুচির এই আপাতঃ চপলতার আড়ালে, একটা শান্ত স্নিগ্ধ পৃথিবী কোথাও লুকিয়ে আছে! কিন্তু দুঃখও হোলো। শুচি অনিত্যকে ভালোবাসে, গভীরভাবে ভালোবাসে। সে নিবেদিত। সুধীরের জন্য একটি পুষ্পও অবশিষ্ট নেই।

সুধীরবাবু এতক্ষণে বাসায় এসেছেন। বেয়ারা আগে এসে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিল। ট্রাউজার ছেড়ে পাজামা পরে তিনি বারান্দায় বসলেন। কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখন নিজের সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগে।

বেয়ারা চা রেখে গেল। চা খেতে খেতে সুধীরবাবুর মনে পড়ছিল শুচি-ই প্রথম তাকে ট্রাউজার ধরায়। সেবার পুজোর সময়। ওকে সঙ্গে নিয়েই শুচি অনিত্যের জন্য ট্রাউজার আর সার্টের কাপড় কিনতে গেছল।

যেতে যেতে হালকা গলায় বলল,—এ্যাই, অনিত্যের ওপর জেলাসি নেই তো?"

সুধীর বলল,—কেন থাকবে?'

—রাইট। তোমাকে দেখে তেমন মনে হয় না। একদিন তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দোব অনিত্যের। দেখবে, খুব ভালো লাগবে। তোমরা দুজন যদি বন্ধু হও না, আমার কী যে মজা হবে! দেখ, অনিত্য সায়েন্সের লোক। কিন্তু সুন্দর বাংলা জানে। কী যে এক্সেলেন্ট চিঠি লেখে, সে তোমাকে বোঝাতে পারব না! দেখাব. ওর চিঠি একদিন দেখাব। তুমি কিন্তু কখখনো আমায় চিঠি লেখনি! এবার দেশের বাড়ী থেকে লিখবে। আসলে কি জানো? চিঠিতে মানুষটাকে ঠিক পাওয়া যায়। এই যে তুমি লাজুক, মুখচোরা। চিঠিতে হয়ত দেখব তুমি অনেক সহজ, অনেক সুন্দর করে মনের কথা লিখেছ। দূরে গিয়ে চুপচাপ কাউকে ভাবতে বেশ লাগে। এই ভাবাটাই তো সব! তাই না? —এ্যাই, আমরা এসে গেছি!'

কাপড় চোপড় কেনার পর কি খেয়াল হোলো শুচির। দোকানদারকে বলল,—এর ট্রাউজারে কতো কাপড় লাগবে বলুন তো?

সুধীরের প্রতিবাদ করে ওঠার আগেই দোকানদার লম্বাটা মাপার জন্য ফিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

সুধীর বিরক্ত হয়ে শুচিকে বলল,—'এটা কি হচ্ছে?' শুচি ধমক দিল—দাঁড়াও—। আচ্ছা এ রঙটা ওকে মানাবে?' নিন, মাপটা নিয়ে নিন। ট্রায়াল কবে?'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সুধীর রেগে বলল,—তোমার সঙ্গে যদি আর কখখনো কোথাও যাই। শুচি হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি!—দ্যাখো রাগ করে ট্রায়ালের দিন যেতে ভুলে যেওনা যেন। বড় দোকান। বাবাও আসে মাঝে মাঝে। একদিন দোকানদার হয়ত বলে বসবে শুচির সঙ্গের ভদ্রলোক ট্রায়ালের দিন তো এলেন না! তখন সব ফাঁস।

তারপর শুচি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, —তোমার চেহারাটা এতো সুন্দর, মানে মুখ চোখে এমন পোয়েট্রি আছে। লম্বা। ট্রাউজার পরলে কেমন স্মার্ট লাগবে। তা না, সেই মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। দূর, ওতে ইউনিভার্সিটির কোন মেয়েই তোমার দিকে তাকাবে না। প্রেমট্রেমে পড়াতো দূরের কথা। বি মডার্ন, স্মার্ট।—এ্যাই, ঘুরে দাঁড়াও তো একটু। হ্যাঁ, টাই পরলে বেশ লাগবে তোমাকে। সিনেমার হিরোর মত।

সুধীর গম্ভীর গলায় বলল,—আমি এই পরতেই ভালোবাসি।

শুচি হেসে বলল, — আমি ভালোবাসি না, বাসিনা, বাসিনা। কি? হোলো তো? আচ্ছা লোকে ভালোবাসলে কতো কিছু স্যাক্রিফাইস করে। আর তুমি, তুমি না হয় বড়জোর ট্রাউজার পরবে।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি? ইসৃ, বয়ে গেছে আমার'।

—যদি বলি, আমি ভালোবাসি। যদি বলি ভালোবাসি বলেই. তোমার ভালো দেখতে চাই, তোমাকে ভালো দেখাতে চাই, তোমার ভালো রেজাল্ট চাই, তোমার সম্মান চাই। তবে?

সুধীরবাবু শুচির কাছে সত্যি ঋণী। আধুনিক জীবন যাত্রার দিকে সে-ই তাকে তাকাবার শিক্ষা দিয়েছিল। নইলে কমপীটিটিভ পরীক্ষায় এতো ভালো রেজাল্ট হোতো না! গ্রামের কলেজের লেকচারার হয়েই জীবন কেটে যেত।

চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখলেন সুধীরবাবু। শুচির কথাগুলো আজ এতোদিন পরে তাঁকে বড়ো অস্থির করে তুলছে।

তখন শুচি মেসে প্রায়ই আসত। ততদিনে সে ঠাকুর চাকরের দিদি, কয়েকজন মেম্বারেরও। পরীক্ষাও ঘনিয়ে আসছে। পড়াশোনায় সত্যি মন দিয়েছে এখন। খুব সীরিয়াস। আগে থেকে এই সীরিয়াসনেস থাকলে শুচি ভালো রেজাল্ট করত। আসলে একদল বয়ফ্রেন্ডই ওকে নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে ওর খুব ক্ষতি করছিল। সুধীর ঠিক সময়ে ওকে সাবধান করিয়ে না দিলে, কি হোতো বলা যায় না।

এমনি সময় একদিন শুচি বলল,—চল না একটু কলেজ স্ট্রীট যাই।

সুধীর বলল,—না, আমার আদৌ সময় নেই।

শুচি শুকনো মুখে বলল—তার চেয়ে বল, ইচ্ছে নেই। বাব্বা. এতো করে বলছি।

সুধীর তাকালো। শুচির মুখটা কেন যেন করুণ। বলল—বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

বইয়ের দোকানে উঠে শুচি কথাটা খুলেই বলল।—দ্যাখো. কাল অনিত্যের জন্মদিন। ওর জন্য একটা বই কিনব। এই জন্যই তোমাকে ধরে নিয়ে এলাম। কি বই কিনি বলতো?

বইয়ের দোকানে এসে সুধীর শান্ত হোলো। কারণ বইয়ের ওপর তার দুর্বলতা প্রচুর।

—এ্যাই, বলো কি বই কিনব?

—বই? আচ্ছা, অনিত্য বাবু কি বই পড়তে ভালোবাসেন? উপন্যাস?

তুমি আছ কোথায়? বেশ গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের বই। বড় কঠিন ঠাঁই, বাবা।

—তবে তোমার সঙ্গে মেলে কি করে? তুমি তো হৈ হৈ করতে পারলে বেঁচে যাও।

শুচি হেসে বলল,—মেলে, ঐ কনট্র্যাস্ট কলে। আর সব মিললেই তো ফুরিয়ে গেল। এখন বলো, কি বই কিনি?

—কত টাকার মধ্যে?

—তুমি দ্যাখোনা।

সুধীর ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ইণ্ডিয়ান ফিলসফির সেকেণ্ড ভলুমটা চাইল। শুচি খুশি হয়ে বলল,—খুব ভালো হবে। ওকে তাক লাগিয়ে দোব। পড় বাবা, কত গুরুগম্ভীর বই পড়তে পারো দেখি!

বইটা নিয়েও শুচি যাচ্ছিল না। কি যেন ভাবছিল। একটু পরে বলল,—সুধীর, তোমাকে যদি একটা বই প্রেজেন্ট করি, তবে রাগ করবে?

সুধীর গম্ভীর হয়ে বলল,—শত্রুও যদি আমাকে বই প্রেজেন্ট করে, তাতে আমি খুশি হবো। কিন্তু কাল আমার জন্মদিন নয়। তুমি এসেছ অনিত্য বাবুর জন্য বই কিনতে।

শুচি করুণ মুখে বলল,—তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল। ধরো যেদিন তোমার জন্মদিন, সেদিন আমি কাছে থাকব না আর কাছে থাকলে তুমি কি বলবে? সেদিন তবু ভাববে, শুচি এই বইটা দিয়েছিল। পরীক্ষা হয়ে গেলে কে কোথায় চলে যাবে!—কি? এলিয়টের কবিতা কালেকশন পছন্দ?

শুচির মুখের দিকে তাকিয়ে সুধীরের মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল। খেলা ভাঙার দিনের সন্ধ্যা বেলা এখন ছায়া ফেলেছে উঠোনে। বলল,—বেশ। তবে কবিতার বই দিলে রবীন্দ্রনাথের দাও।

—কেন? ওরা তো এলিয়ট বলতে অজ্ঞান।

ওরা, অর্থাৎ ওর কফি হাউসের ছেলে-বন্ধুরা, যারা উঠতি কবি।

সুধীর বলল,—আমি অজ্ঞান হইনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মায়ের হাতের রান্নার মত। ওতে শুধু পেট ভরে না, স্নেহে, মনও ভরে। ও স্নেহটা আমায় কেউ দেয় না। না এলিয়ট, না বোদলেয়ার, না অন্য কেউ। —আচ্ছা, দেখুন 'পূরবী' আছে?

দোকানদার পূরবী বইটা বের করে দিল। বইটা খুলেই সুধীর একটা লাইন পড়ে শোনালো—'তাই যারা আজ রইলো পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়/তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো/বলে নে ভাই এই যা দেখা এই যা ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো'—।

শুচি স্তব্ধ। বলল,—কোত্থেকে যে এমন একটা লাইন বের করলে না?—সত্যি, তুমি যাতে হাত দাও তাই সোনা হয়ে ওঠে। বেহালায় হাত দিলে, কান্না বাজে। কবিতা পড়লে কেমন দূরত্ব, একটা বিষণ্ণতা—একটা করুণ ভালোলাগা!

আজ শুচি জানে না, সুধীর বাবুর জীবনে কিছুই সোনা হয়ে ওঠেনি। সে নিঃসঙ্গ, একটা শূন্য-শস্যক্ষেতের মত রিক্ত, দরিদ্র।

বহুদিন পরে বেহালাটা নিয়ে বসলেন সুধীরবাবু। এখন চারদিক শান্ত, থমথমে। রাত্রির প্রথম প্রহর গুঁড়ি গুঁড়ি অভ্র বিন্দুর মত নদী, মাঠ ও পথে বিছিয়ে পড়ছে। কখন 'জ্ঞা' ও 'নি' কোমল করে বেঁধেছেন। শুচির একদিন ভীমপলশ্রী শুনতে শুনতে চোখে জল এসেছিল।

মিটিঙে প্রেসিডেন্ট হরেকৃষ্ণবাবু সুধীর বাবুকে বললেন,—আসুন পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি মিস্—

শুচি হেসে বলল,—ওঁকে খুব ভালো করেই চিনি।

সুধীর বাবু বললেন—আমরা একই ইয়ারে এম এ পাশ করি।

হেসে বললেন বটে কথাটা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি বড্ড দুর্বল হয়ে উঠছেন। শুচি ঘরে যখন ঢুকল, তখন তাঁর মনে হোলো, কে যেন মুহূর্তের মধ্যে শেষ বিকেলের একরাশ বিষণ্ণ, শান্ত, নিরুত্তপ্ত আলো ছড়িয়ে দিল। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে শুচি। বিয়ে হয়নি। মাথার সামনের চুল পাতলা হয়ে গেছে। শরীরটা ঝড়ের শেষের রজনীগন্ধার ডাঁটার মত ক্লান্ত। সেই সুন্দর কালো, স্তব্ধ দুটি চোখের চারপাশে কালো রেখার ভিড়।

'এজেন্ডা' ধরে ধরে আলোচনা হচ্ছিল। শেষ হ'তে শুচি বলল,—হরেকৃষ্ণ বাবু, বাসন্তীর বি-টি পড়তে যাওয়ার ব্যাপারটা এজেণ্ডায় নেই কেন? বেচারা দু'দুবার চেষ্টা করে যেতে পারেনি। এবার না হ'লে আর হবে না।

প্রেসিডেন্ট বললেন,—হ্যাঁ, তাইতো দেখছি। তবে বুঝতে পারো মা, নানান ক্লিকে।

একজন সদস্য বললেন,—এক আধ দিনের ব্যাপার তো নয়। স্কুলের ক্ষতি হবে।

সুধীর বাবু বললেন,—তা কেন? টেমপোরারি ভ্যাকেন্সিতে আর একজন কাউকে নিলে হয়। স্টাডি লীভ ন্যায্য পাওনা।

সুধীর বাবুর কথায় সবাই সায় দিল। প্রেসিডেন্ট বললেন,—তুমি যখন জিদ ধরেছ, তখন তো করতেই হবে। তা কাকে নিতে চাও?

শুচি বলল, কেন? ঐতো হৈমন্তী রয়েছে। কদ্দিন আগে এ্যাপ্লিকেশন করে বসে আছে।

—আমারও একজন ক্যাণ্ডিডেট ছিল—আর একজন সদস্য বললেন। শুচি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—ঐ মিসেস চন্দ তো? দেখুন বুড়ো হাবড়া নিয়ে ক্লাশ চলে না। ইয়ং চাই, এনার্জি চাই। স্কুলটার রেজাল্টের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো?

একজন বলল,—কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন। ভালো ক্যাণ্ডিডেট আসে কিনা দেখা যাক।

শুচি গম্ভীর গলায় বলল,—ভালো ক্যাণ্ডিডেট বলতে কি বোঝেন আপনারা, আমি জানি না। আমি যা বুঝি, তা হোলো, কোয়ালিফিকেশন আর দেশের মেয়ে। দেখুন, বাইরের শহুরে মেয়েরা এখানে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে থাকবেনা। দুদিন পরেই চলে যাবে। তাতে স্কুলের ক্ষতি অথচ দেশের 'কোয়ালিফায়েড' মেয়েরা চান্স পাবে না—এ হয় না। এটা অন্যায়।

সবাই চুপ করে গেল। প্রেসিডেন্ট বললেন,—হৈমন্তীর দরখাস্তটা কোথায়? নিন্, ওকেই এখন নিয়ে নিন তা হলে।

সুধীর বাবু অবাক হয়ে ভাবছিলেন, শুচি এখনও সে-ই আগের মত, সে-ই গোঁ এখনও। সভাটা যেন শুচি-ই কণ্ডাক্ট করল। বোঝা যাচ্ছে, কমিটি শুধু নয়, হেড মিসট্রেস না হয়েও স্কুলের ওপর তার প্রভাব প্রচুর। এখানেও সম্রাজ্ঞীর মত মাথা উঁচু করে হাঁটা, এখানেও সে-ই ভালোবাসার জগতের অনন্যা নায়িকা!

সভা শেষ।

শুচি উঠে পড়ল।—চল, আমার ওখানে চা খাবে।—আসি হরেকৃষ্ণবাবু।

যেতে যেতে দুজনের কেউ কোন কথা বলছিল না। ওদের এতো কথা আছে, তাই হয়তো এই নীরবতা। সুধীরবাবু ভাবছিলেন, আজো শুচি সম্পর্কে তাঁর সেন্টিমেন্ট এতোটুকু ম্লান হোলো না! এই যে একটু পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটা, এই যে শুচির আনত দু'টি চোখের ভাষা, এই যে সঙ্গ, এ কেন তার প্রথম ভালো লাগার পুষ্প সৌরভ নিয়ে আসে! আশ্চর্য জীবন! যে সম্পর্ক একদিন শেষ হয়ে গেছে বলে তিনি ভেবেছিলেন, আজ দেখছেন, সে সম্পর্ক এক মৃত্যুহীন স্রোত। ওপরের বালির আবরণ সরালেই, ভেতরে স্বচ্ছ জলের স্পর্শ!

চলতে চলতে শুচি থামল। বলল,—তারপর? কোথায় ডুব দিয়েছিল এতো বছর?

সুধীর বাবু বললেন,—ডুব দিয়েছিলাম, আমি না তুমি? গলায় অভিমানের সুর বেজে উঠল।

—আমি? মাই গড।

—হঠাৎ চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেছলাম। পর পর দুটো চিঠি দিয়েছি। উত্তর নেই। তাই ভাবলাম, 'ম্যাটার এন্ডস হিয়ার?'

শুচি দুচোখ কপালে তুলে বলল,—চিঠি? আমাকে লিখেছিলে কবে? কোন ঠিকানায়?

—কলকাতার ঠিকানায়। আর কোন ঠিকানায় লিখব?

—বাড়ী বদল করেছিলাম, জানো? তারপর বছর চারেক এখানে। তা উত্তর পেলে না বলে খোঁজ করবে না? যদি মরে যেতাম এর মধ্যে? না, তোমার অভিমান কোন দিনই গেল না—কতো খুঁজেছি তোমাকে। চেনাশোনা যার সঙ্গে দেখা হয়েছে জিজ্ঞেস করেছি, এ্যাই, সুধীরের খবর জানো?—না, কেউ জানে না।

সুধীরবাবু বললেন,—ডবল্যু বি সি এস পরীক্ষা দিতে কলকাতা এসেছিলাম

একবার। ভাবলাম, খোঁজ করি। কিন্তু মনে হোলো, যা ফুরিয়ে গেছে, তাকে ফুরিয়ে যেতে দেওয়াই ভালো।

শুচি চলতে চলতে হঠাৎ আবার ঘুরে দাঁড়ালো—কে ফুরিয়ে গেছে?—মরুক গে যা খুশি ভাব তুমি। আমার বয়ে গেছে? তা, বিয়ে টিয়ে করেছ? করনি? কেন? দেখ, মাত্র কাল ফিরেছি। বোনের বিয়ের জন্য দিন পনের ছুটি নিয়েছিলাম। এসে শুনলাম কে এক সুধীরবাবু নতুন বি ডি ও হয়ে এসেছেন। বাসন্তীকে বললাম, দেখতে কেমন রে? তা বর্ণনা শুনে মনে হোলো তুমি হতে পারো।

তারপর শুচি গম্ভীর হয়ে খানিকটা যেন নিজের মনে বলে গেল—'তুমি আবার ফিরে এলে। আচ্ছা, বেহালা বাজাও এখন? তুমি বোধহয় ভগবানে বিশ্বাস করো না। কিন্তু আমি করি। এই দ্যাখো, তুমি আবার ফিরে এলে।'

কথাগুলো কেমন খাপছাড়া, অসংলগ্ন!

কোয়ার্টারটি সুন্দর ছিমছাম। শুচি বলল, 'বোসো। আরাম করে বোসো।—এ্যাই বাসন্তী!'

ওদিক থেকে বাসন্তী এসে দাঁড়ালো। শীর্ণা, শ্যামল, শান্ত। কিন্তু উজ্জ্বল মিষ্টি একটি মেয়ে।

শুচি বলল,—খাওয়া কি খাওয়াবি। তোর ডেপুটেশন আর তোর বোনের লীভ ভ্যাকেন্সিতে চাকরি। কিরে? খুশি হয়েছিস তো। এবার কি মজা! দাঁড়া, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি নতুন বি ডি ও, সুধীরবাবু।

বাসন্তী হেসে বলল,—চিনি ওঁকে।

শুচি আবার বলল, আমরা এক সঙ্গে পড়তাম। বেচারা আবার আমাকে—যাক সন্দেহ না বাবা। কতোদিন পরে দেখা হোলো। কী যে ভালো লাগছে।

সুধীরবাবু বললেন,—তখন যেন দেখেই দেখলে না।

শুচি হেসে বলল, —দাঁড়াও বাপু। তখন নিজেকে ম্যানেজ করতেই ব্যস্ত। —এ্যাই বাসন্তী, চায়ের জলটা চাপিয়ে দে না রে!

ছাদে বসেই কথা হচ্ছিল। শুচি হঠাৎ গম্ভীর। কি যেন ভাবছে, অথচ বলতে পারছে না।

মাথার ওপরে বিস্তীর্ণ, বিরাট, গম্ভীর আকাশ। নদীটা একটু দূরে দিয়েই চলে গেছে। উঁচু তীর। বহু দূরে চরভূমির নীল ছবি। পৃথিবীর সমস্ত নির্জনতা যেন এই সন্ধ্যায় জড়ো হয়ে উঠছে।

সুধীর বাবু নিজেই শুরু করলেন।—এবার তোমার কথা শুনি। অনিত্য বাবু কোথায়? বিয়ে তো আজো হয়নি বুঝেছি।

অনিত্যের কথায় শুচি হঠাৎ বেশ সতেজ হয়ে উঠল।

—মহারাজের জৈবিক গবেষণা এখনো শেষ হয়নি।

সুধীরবাবু বললেন,—সায়েন্স কলেজে তো?

—হুঁ, শীগ্‌গির আমেরিকা যাবে।

—যাক। যাওয়ার আগে বিয়েটা করে যাবেন তো? না অন্য কিছু?

শুচি কি জানি কেন ফুঁসে উঠল,—অন্য কিছু? কী যে বলো তুমি! ও পড়াশোনা রিসার্চ নিয়ে আছে। আমি ওর ধ্যান ভাংগাতে চাইনে। ওর জীবন যদি নষ্ট করব, তবে ভালোবাসলাম কেন? সুধীর, তোমাকে অতো 'কমন' ভাবতে কষ্ট হয়।

দুজনেই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় শুচি বলল,—তোমার কথা বলো।

সুধীর বাবু উদাসীন গলায় বললেন,—আমার কোন কথা নেই।

শুচি করুণ গলায় বলে উঠল,—তুমি সে-ই আগের মত কথায় কথায় রাগ কর। কেন যে আমাকে বুঝতে পার না?

সুধীরবাবু বললেন, —এবার আমি উঠব।

শুচি গম্ভীর হয়ে গেল। একটু থেমে বলল,—কতোদিন পরে দেখা হলো। অথচ তুমি মনটা খারাপ করে দিলে।

—মনটা আমারও খারাপ হতে পারে। তোমাকে এভাবে দেখব ভাবি নি। কেমন রোগা, ম্লান, বিবর্ণ লাগছে।

—এ্যাই দেখ, বয়েস হচ্ছে না?

—সেকথাটা তোমার বায়োলজির রিসার্চ স্কলারকে বল না?

শুচি করুণ গলায় বলল,—ফিরে ফিরে সে-ই একই কথা। তুমি অনিত্যকে ক্ষমা করতে পারছ না। কিন্তু কেন? তার দোষ কি? আমরা এখনো দুজন দুজনকে সত্যি ভালোবাসি। কোন খাদ নেই। বিশ্বাস কর। আচ্ছা, ওর চিঠি আসুক তোমাকে দেখাব। বুঝবে, কী গভীর করে ও আমাকে ভালোবাসে। কী কষ্ট হয় ওর আমাকে ছেড়ে থাকতে! কিন্তু সকলের চেয়ে বড় সাধনা। তুমি—।

সুধীরবাবু বললেন,—বেশ দেখাবে। কিন্তু পরের চিঠি দেখা আমার স্বভাব নয়।

—আমি দেখতে দিচ্ছি। আর ও এমন চিঠি লেখে না যে, তোমাকে দেখানো যায় না। আমরা কি এখনো ছেলেমানুষ? যাক, আগের বি ডি ও'র বাসায় আগে তো? যার এক রবিবার। সত্যি, তুমি আসাতে কি যে ভালো লাগছে! কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলাম। আবার দেখা-শোনা, আবার—। কেমন একটা জ্যামিতির সার্কেল তাই না? সুধীর, একটু খুশি হও। প্লিজ। তুমি কিছুতেই আগের মত করে কথা বলছ না।

রাত্রি হয়ে গেছে। সুধীরবাবু একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ মন নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বেশ কিছু দিন পরে এক রবিবারে সন্ধ্যায় শুচি এলো। বলল,—এ্যাই, মন-টন ভালো আছে তোমার?

সুধীরবাবু হেসে বললেন,—না থাকার কি আছে?

—কি জানি, সেদিন তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। কিছুতেই সেই আগের সুর তোমার গলায় বাজল না। কতো আশা করেছিলাম। আরে, বলতে ভুলে যাচ্ছি। অনিত্যের চিঠি এসেছে। এই নাও, পড়ো।

শুচি খাম থেকে চিঠিটা বের করে সুধীরবাবুর হাতে দিল।

সুধীরবাবু সংকোচের সঙ্গে বললেন,—আমি পড়ব?

—পড়বে, পড়বে, পড়বে। আমার কি কথা তুমি জানো না?

দেখ বেচারা আমার জন্য কি কষ্ট পাচ্ছে। বড্ড মায়া হয়, সুধীর। কিন্তু এর চেয়ে আমার কাছে ডিউটি বড়ো। ওকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেব না। দিতে পারি না আমি। একদিন ওর থীসিস নিয়ে পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। বায়োলজি বিজ্ঞানে ও একটা নতুন আবিষ্কার করবে। আর আমি একটা সাধারণ মেয়ে, আমার স্বার্থে ওর ধ্যান নষ্ট করব? তবে ভালোবাসলাম কেন? কেন?

সুধীরবাবু গোটা চিঠিটা ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। ভারী সুন্দর চিঠি।—শুচি, জীবন একটা দীর্ঘ পথ-যাত্রার মতো। সুধীরবাবু চমকে উঠলেন। আশ্চর্য কথাটা। তারপর—আমি যে পথে চলেছি তোমার ভালোবাসাকে শেষ সঞ্চয় করে। আমি জানি তোমার বড়ো কষ্ট হয়। কিন্তু এই কষ্টগুলোকে সহ্য করতে না পারলে বৃহৎ পৃথিবীতে আমার যে ঠাঁই হবে না! তোমার ভালোবাসা যেন আমাকে ঠিক পথে নিয়ে যায়, আমি যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। — তোমার স্মৃতির উৎসবের মধ্যে আমি আছি, আমি থাকব। আমি একদিন তোমার কাছে ফিরে যাব, সকল কাজ শেষ হলে। তুমি অপেক্ষা কর।'

সুধীরবাবু চিঠিটা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন,—সুন্দর। আমার ভুল হয়েছিল।

শুচি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—তবে? তবে? তুমি যে রাগ করেছিলে। এখন দেখলে! নাও, আরো কয়েকটা চিঠি। এগুলো অবশ্য আগেকার। জানো, এমন চিঠি কাউকে, মানে প্রিয়জন কাউকে, দেখাতে না পারলে ভালো লাগে না। আর আমার বন্ধু বলতে তো তুমি-ই। তুমি পড়। তুমি সত্যি এসব চিঠির 'বিউটি' বুঝতে পারবে। তুমি পড়লে আমি ভীষণ তৃপ্তি পাব—

সুধীরবাবু দেখলেন, গোটা ছয়েক চিঠি। নানান তারিখের লেখা। কিন্তু সব চিঠির-ই হাতের লেখাগুলো কেমন যেন! তবে অনিত্যবাবু সায়েন্সের লোক। অনেকের হাতের লেখা এমন হয়ও। কিন্তু ভদ্রলোকের অনুভূতি আশ্চর্য গভীর; ভালোবাসার এক নিপুণ শিল্পী।

—'তোমার রূপ, তোমার সৌন্দর্য, তোমার যৌবন আমার জীবনে একটা বিষণ্ণ সুর নিয়ে আসে। আমার ভয় হয়, তোমাকে একেবারে কাছে পেলে আমি সব হারিয়ে ফেলব। আমার সব স্বপ্ন, সব ছবি, সব গান শেষ হয়ে যাবে। তারচেয়ে এই ভালো, এই দূরত্ব! তোমার চিঠির মধ্যে এই যে

তোমাকে একান্ত করে পাওয়া, গভীর করে পাওয়া, এই আমার ভালো, এই আমার আনন্দ, এই আমার মধুর বিষাদ—'

আর একটা চিঠিতে—'তোমার ভালোবাসার মধ্যে আমি আমার নিজের আত্মার স্পর্শ পেলাম। যে ভালোবাসা মনকে এই আত্মার আকাশের দিকে নিয়ে যায়, সেই ভালোবাসাই অমৃত। তুমি কি আমাকে এমনি করে চিরকাল ভালোবাসবে! আজ এই স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রির অসীম নীরবতার দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্নটা মনে হলো—'

শেষ চিঠিতে—'তোমার চিঠিটা আমাকে সত্যি প্রেরণা দিয়েছে। আমি আবার জানলাম, কর্তব্যই ধ্যান। এই ধ্যান আমাকে বৃহৎ ও মহত্তের দিকে নিয়ে যাক। সকল দুঃখ বেদনায়, আমি যে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি শুচি! — এতো কথা বলছি, কারণ সম্প্রতি কিছু ঘটনা ঘটেছে। রিসার্চের ব্যাপারে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম যেখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার সত্যি আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম। আমি শান্ত হলাম। ভেবে দেখলাম, আমার একটা নিশ্চিত আশ্রয় আছে, দিনের শেষে সেখানে আমাকে ফিরতেই হবে। বুঝলাম, এতো দীর্ঘ বছর ধরে তোমার কাছে কেন আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি। পৃথিবীতে ভালোবাসার দান গ্রহণ করার মানুষ বড়ো কম। আমার সান্ত্বনা আমি তা পেয়েছি। —বাইরে বৃষ্টির শব্দ পাচ্ছি। অনেক দিন পরে তোমার চিঠির স্পর্শ নিয়ে আমি শান্ত মনে আজ ঘুমুতে যাব।'

কয়েকটি চিঠির মাঝে মাঝে এই অংশগুলি সুধীরবাবুর বড়ো ভালো লাগল। তাঁর মনে হোলো অনিতোর ভালোবাসার কাছে তাঁর ভালোবাসা বড়ো তুচ্ছ। তিনি এই গভীরতায়, এই প্রশান্তির অন্তরে তো পৌঁছন নি। তাই হোক, শুচির প্রতীক্ষা সফল হোক। দিনের শেষে ওরা বাসর ঘরে ফিরে যাক। তিনি এমনি করেই জীবন কাটিয়ে দেবেন, এমনি রিক্ত এমনি নিঃসঙ্গ, এমনি একাকী!

দুজনের অন্তরে একটা অব্যক্ত বেদনা, যন্ত্রণা, কান্না এই মুহূর্তে রাত্রির শিশিরের মতো নিঃশব্দে জমা হচ্ছে।

এক সময় শুচি ধীরে ধীরে বলল,—সুধীর তোমাকে সারা জীবন শুধু দুঃখই দিলাম। কি পেলে তুমি আমার কাছে, কি দিলাম তোমাকে!

সুধীরবাবু আস্তে আস্তে বললেন,—আমি কিছু চাই নি। কেন চাইব? আমি তো জানতাম তুমি অনিতোকে ভালোবাস।

শুচি কোন কথা বলল না। তেমনি চুপ করে বসে থাকতে থাকতে এক সময় বলল—একটু বেহালা বাজাবেন? সে-ই ভীমপলশ্রী।

সুধীরবাবু বেহালাটা নিয়ে এসে বাঁধলেন। না, ভীমপলশ্রী হাতে এলো না আজ। বারবার বেহাগ আসতে লাগল। জীবনে এখন ঋতু পরিবর্তনের পালা। অতীতে ফিরে যাওয়ার বেলা কখন শেষ হয়ে গেছে!

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সুধীরবাবুর। কে যেন কড়া নাড়ছে! হ্যাঁ, তাইতো।—কে? — টর্চ হাতে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন, দরজা খুললেন।—'কে তুমি?'

লোকটি নিঃশব্দে একটা চিঠি বাড়িয়ে দিল।—'চিঠি?' তাড়াতাড়ি টর্চের আলোয় চিঠিটা পড়ে ফেললেন সুধীরবাবু। 'শুচিদি অসুস্থ। অজ্ঞান হয়ে গেছে। এক্ষুনি চলে আসুন। এক্ষুনি। বাসন্তী।' সুধীরবাবুর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে তিনি জানেন। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরলেন। মানি ব্যাগটা পকেটে পুরলেন। না, সাইকেল নেওয়া ঠিক হবে না।

আশ্চর্য! এই পথটা এতো দীর্ঘ! যেন শেষ হতেই চায় না বা এ পথের কোথাও শেষ নেই!

এসে দেখলেন শুচি যেন ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু মুখের রেখা 'আন-ন্যাচারাল'। ব্যাকুল হয়ে বললেন,—কি হয়েছে, বাসন্তী।

বাসন্তী কান্না-কান্না গলায় বলল,—ও ঘর থেকে গোঙানির শব্দ পেলাম মনে হলো। ডাকলাম দুবার, সাড়া নেই। তাড়াতাড়ি এসে দেখি অজ্ঞান হয়ে গেছে। কেউ নেই এখানে। ছুটির দিন।—আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না। যা করবেন, তাড়াতাড়ি করুন।

সুধীরবাবু নাড়ীতে হাত দিয়ে দেখলেন, গতি মন্থর, অনিয়মিত। পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। একবার কি যেন হাতড়াল শুচি।

—আচ্ছা, ডাক্তারের বাড়ী কদ্দুর?

বাসন্তী বলল,—মাইল চারেক হবে। কিন্তু এতো রাত্রে—

—তোমাদের ঐ লোকটি কে?

—এখানকার গার্ড।

—ও যেতে পারবে?

সুধীরবাবু গোটা মানি ব্যাগটাই ওর হাতে দিয়ে বললেন,—তুমি দৌড়ে যাও। ওতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা আছে। ডাক্তারবাবুকে বলবে, যা খুশি ভিজিট তিনি নিন। শুধু দয়া করে এক্ষুনি, যত শীগগির পারেন যেন আসেন। যাও, দৌড়ে যাও।

সুধীরবাবুর মনে হলো, শুচি বিষ বা এই ধরনের কিছু খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কেন? কি এতো দুঃখ ওর! অনিতোর চিঠি এই তো পেয়েছে সেদিন। কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না সুধীরবাবু। আচ্ছা, কি খেয়েছে জানা গেলে যদি কোন প্রতিকার করা যেত! বালিশের নীচ, বিছানা, টেবিলের ওপরটা খুঁজে খুঁজে দেখলেন। না, কিছু নেই। ড্রয়ারটা টানলেন। সামনেই পাওয়া গেল একটা চিঠি। শুচির লেখা। সেটা সরিয়ে আরো খুঁজতে লাগলেন। তেমনি আবার কয়েকটা চিঠি। মনে হলো কোন চিঠির খসড়া। হঠাৎ একটা জায়গায় নজর পড়ে—'জীবন একটা দীর্ঘ পথ-যাত্রার মত। তোমার ভালোবাসা—' থাক, সুধীরবাবু সেগুলোও সরিয়ে রেখে আবার খুঁজতে লাগলেন। একি! হ্যাঁ, পেয়েছেন, ঘুমের বড়ির একটা শিশি।

একবার করুণ চোখে তাকালেন শুচির দিকে। আচ্ছা, কোনভাবে বমি করাতে পারলে ভালো হত। ততক্ষণে ডাক্তার এসে যেতে পারতেন।

বাসন্তীর দিকে তাকালেন একবার।—আচ্ছা, একটু গরম জল করাতে পারবে? সেঁক দিতাম।—এক্ষুনি আনছি স্টোভ আছে। বাসন্তী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

রাত্রি স্তব্ধ, বোধহয় ভোরের আলো এমনি স্তব্ধতা মৃত্যুর মতো সারা পৃথিবীতে জড়ো হয়। অপলক দৃষ্টিতে শুচির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন সুধীরবাবু। কপালে হাত রাখলেন। জীবনে শুচিকে এই প্রথম স্পর্শ করলেন তিনি। কিন্তু কি শীতল, কি করুণ, কি সমাহিত সেই স্পর্শ! হাতের সুন্দর আঙুলগুলি দেখলেন, যেগুলি স্পর্শ করার লোভ অতীত জীবনের কতো নির্জন মুহূর্তে তাঁকে পাগল করে তুলত!

বাসন্তী ঘরে ঢুকল।

সেঁক দিচ্ছিলেন সুধীরবাবু। পায়ের ওপর থেকে কাপড়টা একটু সরে যেতে সুন্দর, নিটোল দুটি পা চোখে পড়ল। এই চঞ্চল পা ফেলে ফেলে শুচি ইউনিভার্সিটির করিডোর দিয়ে যখন হাঁটত তখন দূর থেকে তাকিয়ে দেখত সুধীর। এমন সুন্দর হাঁটা, এমন সুন্দর পদক্ষেপ—সব যেন কবিতার মতো!

হঠাৎ কি ভেবে প্রশ্ন করলেন বাসন্তীকে — তুমি অনিতোবাবুর খবর জানো?

বাসন্তী সেঁক দিতে দিতে বলল,—অনিতোবাবু? উনি তো বিয়ে-টিয়ে করে কবে আমেরিকা চলে গেছেন।

—বিয়ে করে?—একটা অস্পষ্ট কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাসন্তী আবার বলল,—জানেন, শুচিদি মাঝখানে 'ইনসেন' হয়ে গেছলেন। কেবল চুপ করে গোঁ হয়ে বসে থাকত। তারপর ওষুধ-টোষুধ খেয়ে ভাল ছিল। কাল দেখলাম, আপনার ওখান থেকে এসে আবার তেমনি। জোর করে শুতে পাঠালাম। কিন্তু বোধ হয় ঘুমোয় নি।

সুধীরবাবু অবাক। গল্পের মত একটা জগৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ড্রয়ারটা আবার টানলেন, সেই চিঠিগুলো তুলে নিলেন হাতে। পড়তে লাগলেন। বুঝতে পারলেন, এগুলো অনিতোর নামে লেখা চিঠির খসড়া। এই চিঠিগুলোই আজ শুচি তাকে পড়তে দিয়েছিল। শুচি কখন

হারানো অনিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে। যে অনিত্যের জন্য শুচি নিজের সারা জীবন উৎসর্গ করেছিল, যে ভালো-বাসার কাছে সে খাঁটি ছিল, সত্য ছিল, পবিত্র ছিল! আশ্চর্য!

এখন বাসন্তী ওঘরে গিয়ে কাঁদছে। ডাক্তার এসে পোঁছয় নি। তা কাঁদুক। সুধীরবাবু অনুদ্বিগ্ন থাকতে চান। কিন্তু তবু চোখে জল আসে কেন? এই জীবনে যাকে প্রথম ও শেষ ভালোবেসেছিলেন তার চলে যাওয়ার মুহূর্তে, তবু নিজেকে অবিচলিত রাখতে হবে! তিনি অবিচলিত থাকতে চান। রাত্রি শেষ হতে চলেছে। নদী তীরের বাবলা বনে নিশান্তের শীতের বাতাস করুণ একটানা শব্দ করছে। লোনা মাটি শিশির পড়ে পড়ে ভিজে উঠছে এখন।

মৃত্যুর বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সুধীর-বাবু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শুচির মুখের দিকে। মাথাটা ধীরে ধীরে নোয়ালেন। মুখ রাখলেন শুচির বুকের ওপর। তারপর আস্তে আস্তে বিবর্ণ সুন্দর দুটি ঠোঁটে ভালোবাসার প্রথম ও শেষ স্পর্শ আঁকলেন!

ভোর হচ্ছে আকাশে। পূর্ব দিক ক্রমে ক্রমে লাল হয়ে উঠছে। শান্ত নদী, শান্ত তীরভূমি, শান্ত মাঠ, গ্রাম, পথ!

সুধীরবাবু ঝাপসা চোখে ধীরে ধীরে শুচির ওপর একটা সাদা চাদর ঢেকে দিলেন।

মন নেই—॥

জয়তী রায়

ইদানীং কিছুতেই মন নেই—
ছায়ার মতন এক সাবলীল ঘুম
আমাকে কিনেছে যেন নিজস্ব নিলামে।
ঠিক ঘুম নয়, আধো জাগা, আধো তন্দ্রালসে
আমি যেন গলাজলে স্থির ভেসে আছি
স্মৃতিকে জড়িয়ে।
প্রেম, বোধ, পারিপার্শ্বিকতা
একটু একটু ক'রে যে অবোধ চেতনায়
ফিকে হ'য়ে আসে
সেই স্তরে ছায়াচ্ছন্ন আমি।
স্বপ্নে যেন মনে হয় চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি ঃ
ভিতরে যাবার ডাক এখনও আসেনি,
তাই এত অনাগ্রহ আত্মায় এবং
অনিবার্য পরিপার্শ্বে।
আমি আর স্মৃতি শুধু স্বপ্নের চলমান রূপ—
ইদানীং কিছুতেই মন নেই,
ছায়ার মতন এক সাবলীল স্মৃতি
আমাকে কিনেছে যেন নিজস্ব নিলামে।

তখনো তো সময় ছিল ॥

গণেশ সেন

তখনোতো সময় ছিল
তোমার জন্য আমার জন্য
লীলা কমল হাতেই ছিল
তোমার জন্য আমার জন্য।

এ পাশে গ্রাম ও পাশে গ্রাম
মধ্যবর্তী রেলের স্টেশান
লুপ লাইন লেবেল ক্রসিং
চড়কতলা সবুজ বাতি
সন্ধ্যার কাক অজানা ফুল
ফুটেই ছিল ঝোপে ঝাড়ে
তখনোতো সময় ছিল
তোমার জন্য আমার জন্য।

বদল গাড়ী মুখোমুখি
এদিক তুমি ওদিক আমি
মধ্যিখানে ঘুমিয়ে ছিল
রক্তমাখা শিশুর দেহ
কুড়িয়ে নেবার সময় ছিল
সমস্ত দিন সমস্ত রাত
তখনো তো সময় ছিল
তোমার জন্য আমার জন্য।

বকুলতলা ॥

শংকর চক্রবর্তী

ভাঙাচোরা ভিতের ওপর একটা ছোটো পালক
আর কিছু নেই আগাছাদের বিষম হুটোপুটি
পাটেবসা সূর্যি থেকে একটু কণা আলোক—
তারই মায়ায় নাচছে সুখে ছোট্ট মোরগঝুঁটি

স্মৃতির বোঝা সংখ্যাতীত যন্ত্রণাতে আবিল
জীবনভরে রংমশালের দুঃসহ এই জ্বলা
স্বপ্নগুলো পাহাড়-প্রমাণ মৃত স্তূপের সামিল—
গন্ধে তবু প্রাণভরে যায় পথে বকুলতলা।

সাহিত্য সংস্কৃতি

বাংলা গ্রন্থের প্রকাশ-ব্যবস্থা

বাংলা পুস্তকপ্রকাশনে একটি নূতন উদ্যোগের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে নাকি সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কারণেই বাঙালীর পুস্তকপ্রকাশনশিল্প আজ এক নিদারুণ বিপদের মুখে। অনিশ্চিত আইনশৃঙ্খলা-ঘটিত পরিস্থিতি নাকি এই অবস্থার জন্য দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের অজস্র লেখক আজ প্রকাশক অভাবে তাঁদের গ্রন্থাদি প্রকাশ করতে পারছেন না। বাংলা গ্রন্থের বিক্রয় সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পুস্তকপরিবেশন ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থায় বিক্রয় ও বন্টন ব্যবস্থার কিভাবে উন্নতি সম্ভব তা বোধগম্য নয়। তথাপি বাংলা গ্রন্থের প্রচারে যে কোনও রকম উদ্যম প্রশংসনীয়।

বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এই কলকাতা শহরে অজস্র প্রকাশক আছেন। তাঁরা নানা শ্রেণীর গ্রন্থাদিও নিয়মিত প্রকাশ করে থাকেন। মুখ্যতঃ ব্যবসায়িক সুবিধা এবং অধিকতর লাভের দিক লক্ষ্য রেখেই তাঁরা যেসব জনপ্রিয় লেখকের গ্রন্থাদির অধিক বিক্রয় সম্ভব তাঁদের গ্রন্থাদি আগ্রহসহকারে প্রকাশ করেন। এই জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশে অনেক সুবিধা, বিক্রয়লব্ধ লাভের টাকা সহজে ঘরে ওঠে, বেশী বিজ্ঞাপন দিতে হয় না, অল্প খরচে বেশী লাভ জনপ্রিয় গ্রন্থকারের গ্রন্থপ্রকাশে, তাই তাঁরা জনপ্রিয় গ্রন্থকার শিকারে সদা সচেষ্ট। এদিকে পুরাতন যেসব গ্রন্থ অতীতে জনপ্রিয় ছিল সেইসব গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশে কারো উৎসাহ নেই। ফলে এ যুগের তরুণ আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হলেও প্রচলিত গ্রন্থের কোনো সংবাদই রাখে না। যাঁরা গবেষণার সময় তাঁরা অবশ্য ন্যাশানাল লাইব্রেরীর পুস্তকতালিকা থেকে কিছু কিছু অংশ বা উদ্ধার করে থাকেন এবং সেসব গ্রন্থের নাম তাঁদের রচনায় উল্লেখ করে থাকেন। আজ বাজারে প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকবৃন্দের উপন্যাস বা গল্পগ্রন্থ সহজে পাওয়া যায় না। তাঁদের আগের যুগের লেখকদের কথা কেউ জানে না, আর ভারতী পরবর্তী যে যুগ, সে যুগের মৃত লেখকগণের কথা দূরে থাক অনেক জীবিত লেখকও আজ লেখক হিসাবে মৃত। প্রকাশকদের ভাষায় এঁদের 'ডেড স্টক' বলা হয়। এই জাতীয় ডেড স্টকদের নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। সদাব্রত এবং প্রকাশন প্রতিষ্ঠান এক নয়। তাই জগদীশচন্দ্র গুপ্তের কোনো উপন্যাসই বোধহয় বাজারে পাওয়া যাবে না। জীবিত সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ না করাই শ্রেয়।

এর অবশ্য অনেক কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ বাঙালী পুস্তক-প্রকাশনের মালিকরা বিরাট মূলধনের অধিকারী নন; পুস্তকপ্রকাশনব্যবসা তাই ইন্ডাস্ট্রি নয়। সরকার পুস্তকপ্রকাশন ব্যবস্থায় কোনো সাহায্য করেন না। আগে কিছু কিছু গ্রন্থাদি সোস্যাল এডুকেশন অফিসারদের অনুরোধ করে পল্লী পাঠাগারের জন্য বিক্রয় করা যেত। এখন বোধহয় সে ব্যবস্থা ঠিক সক্রিয় নেই। নানা রাজনৈতিক দলের হাতে সরকারীযন্ত্র পড়ায় কর্তার ইচ্ছানুসারেই তাঁরা কর্ম করে থাকেন। দুই বাংলা বিভক্ত হওয়ার কথাটা স্বাভাবিক কারণেই ওঠে। বাংলা বিভক্ত হলেও অনেকদিন পর্যন্ত এপার-ওপারে পুস্তক চালান করা সম্ভব ছিল, আজ আর তা হয় না; রাজনীতির ব্যাপারে আবালবৃদ্ধবনিতা এমনই আচ্ছন্ন যে সৎ সাহিত্য পাঠের আগ্রহ সকলের নেই। এখন সৎ সাহিত্যের সংজ্ঞা কি—সেই প্রশ্নও উঠতে পারে। এছাড়া আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বেও ছাত্র-সম্প্রদায় বাংলা গ্রন্থের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভালো ভালো বই জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে তাঁরা কিনতেন। আজ ছাত্রসমাজের সেই পৃষ্ঠ-পোষকতা থেকে বাংলা সাহিত্য বঞ্চিত।

ইদানীং কাগজের দাম ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাছাড়া কাগজ সবসময় পাওয়া সম্ভব নয়। মুদ্রণ খরচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে চতুর্গুণ বেড়েছে। এছাড়া বাঁধাই ও অন্য সব-রকম আনুষঙ্গিক ব্যয় আছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম কমেছে কিন্তু যে দুটি একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার জন্য দেয় মূল্য অনেক বেশী। আগেকার কালে প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় পুস্তকের বিজ্ঞাপনে শতকরা পনের-কুড়ি ভাগ টাকা কমিশন দেওয়া হত। এখনও সেইসব ব্যবস্থা কয়েকটি পত্রিকায় চালু আছে।

এইসব কারণে বাঙালী প্রকাশন প্রতি-ষ্ঠানের অবস্থা সঙ্গীন। তাঁরা যদি কোনো-রকম দুঃসাহসিক পরীক্ষায় না নামেন তার জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তবে বাঙালীর প্রকাশনপ্রতিষ্ঠানগুলি যদি দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিবর্তন না করেন তাহলে বাংলা পুস্তকপ্রকাশন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অন্ধ-কারাচ্ছন্ন।

বাংলা গ্রন্থের প্রকাশকদের একটি সমিতি আছে আমরা জানি কিন্তু মার্কেটিং বা সেলস প্রমোশন প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতির ব্যবসানীতির কোনো ব্যবস্থা আছে বলে আমাদের জানা নেই। এইসব দিক থেকেও বাঙালী পুস্তক প্রকাশন সংস্থাগুলির সচেষ্ট হওয়া উচিত।

নয়াদিল্লীর ইণ্টারন্যাশন্যাল কালচারাল সেণ্টার যে আয়োজন করেছেন সেই অনুসারে উপন্যাস এবং অ-উপন্যাস দুই শ্রেণীর গ্রন্থ তাঁরা প্রকাশ করবেন। উভয় বাংলার প্রথম শ্রেণীর লেখকদের গ্রন্থাদি তাঁরা প্রকাশ করেন। এই সংস্থার একজি-কিউটিভ ডাইরেকটার শ্রীমতী রেখা মেনন বলেছেন কলকাতা থেকে কয়েকটি উত্তম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠানও নয়াদিল্লীতে চালান করা হবে। তাঁদের ধারণা এই ব্যবস্থার ফলে বাংলা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করা সম্ভব হবে এবং বাংলা গ্রন্থাদির বিক্রয় ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নেই, এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য নিশ্চয় ইণ্টারন্যাশন্যাল কাল-চারাল সেণ্টারের আছে। তাঁরা যদি সাফল্যলাভ করেন তাহলে বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকরাই উপকৃত হবেন। তাঁরা নাকি সম্ভব হলে পেপার ব্যাক গ্রন্থাদিও বিরাটভাবে প্রকাশের আয়োজন করবেন। বছরে ২৫ টাকা চাঁদা দিয়ে যদি ১৫০০ জন সদস্য সংগ্রহ করা যায় তাহলে তাঁরা বছরে চারখানি উপন্যাস এই সংস্থার সহায়তায় পাবেন। পেপারব্যাক প্রকাশন ব্যবস্থা হিসাবে এ প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বক্তব্য আছে। নয়াদিল্লীর এই প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের কি উন্নতি হবে তা এখনই বলা কঠিন। কিন্তু মাটির প্রদীপের সলিতার মত বাঙালীর যে প্রকাশন প্রতিষ্ঠানগুলি আজো টিকে আছে, সেগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে কি?

—অভয়ঙ্কর

নতুন বই

গিরীন্দ্রশেখর বসু (জীবনী)—দেবজ্যোতি-দাশ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা—৬। দাম দু টাকা।

মনোবিজ্ঞানী ও মনঃসমীক্ষক হিসাবেই গিরীন্দ্রশেখর এদেশে পরিচিত। তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির সম্বন্ধে স্বদেশবাসীর পরিচিতি স্বল্পই। তাছাড়া গিরীন্দ্রশেখর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিণত মসী চালনা করেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসকাররা সে বিষয়ের, বিশেষ কোন আলোকপাত করেননি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে গিরীন্দ্রশেখরের অবদান যে চিরস্মরণীয়, তা অস্বীকৃতি ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চরিতমালার ১০৮ সংখ্যক জীবনীগ্রন্থ গিরিন্দ্রশেখরের। বইটি হাতে নিয়েই ওপরের কথাগুলি বার বার মনে আসবে। লেখক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ গিরীন্দ্রশেখরের পূর্ণাঙ্গ মনের চরিত্রটিকেই বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনের সঙ্গে সাহিত্য ও আনুষঙ্গিক বহু বিষয়কেই তুলে ধরা হয়েছে। সাহিত্য সাধক চরিতমালায় পূর্বে প্রকাশিত জীবনীগুলির রচনারীতি থেকে শ্রীদাসের রচনারীতি অনেক আধুনিক। তিনি আরো কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থে তাঁর এই রচনাভঙ্গিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গ্রন্থের শেষে গিরীন্দ্রশেখরের প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচিতি ও প্রবন্ধের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ডেভিড হেয়ার (নাটক)—সুবোধ মুখোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। আড়াই টাকা।

'আংরেজি হটাও'র যুগে, অবক্ষয়-আদর্শহীনতা আর শিক্ষা-সংস্কৃতির নৈরাজ্যের কালে একজনকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, তিনি বাঙালীপ্রেমী ছাত্রবন্ধু মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিকৃত বিদেশীয়ানা ও কুসংস্কারের আঁধার থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে তিনি বাংলা ও বাঙালীর জীবনে 'নতুন আলো'র সঞ্চার করেছিলেন। ইংরেজি ভাষাশিক্ষার পাঠশালার দৃশ্য দিয়ে এই নাটকের শুরু এবং গ্রামে-নগরে শিক্ষা-বিস্তারকল্পে বিদ্যালয় স্থাপন ও বাংলা-ভাষায় পুস্তক রচনার প্রস্তাবনা দিয়েই নাটকে সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে—এই শুরু ও সমাপ্তির মধ্যে এসেছে অসংখ্য চরিত্র যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। বিস্মৃতপ্রায় যুগ জীবন এবং স্মরণীয় মানুষেরা এই নাটকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নাট্যকার সুবোধ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই এজন্যে সমাজকল্যাণকামী বন্ধু এবং নাট্যরসিকদের ধন্যবাদার্হ। নাটকটি স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত এবং ইতিমধ্যেই বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক কলকাতায় সাফল্যের সঙ্গে দুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক খুব বেশি নেই—ডেভিড হেয়ার এই অভাব অন্তত কিছুটা দূর করবে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অকাল্পনিক (কাব্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক দ্বি-মাসিক পত্রিকা: পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা, '৭১)—সম্পাদক: অমল ঘোষ। ৩০বি, চামিয়ার্স রোড, মাদ্রাজ-২৮। ১-২৫ টাকা।

প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী নানান রসের ও স্বাদের কবিতা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের কাব্যরসিকদের কাছে পৌঁছে দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আলোচ্য সংখ্যাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আন্তরিকতার ছাপ এর সর্ব অবয়বে। অন্তরঙ্গের প্রাণময়তা বহিরঙ্গেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শিল্পী গোপীনাথ দাসের আঁকা প্রচ্ছদে। তাই সহজেই পাঠক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সর্বভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা-ভাষারই প্রাধান্য। 'বাংলাদেশে'র কবিও আছে। নামী কবিদের কবিতা ভাষান্তরিত হয়েছে, প্রতিশ্রুতিবান কিছু তরুণ কবিদেরও। অনূদিত কবিতা ছাড়াও কিছু ইংরেজি মৌলিক কবিতা ও প্রবন্ধে এ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। সম্পাদক অমল ঘোষ ও নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ দুটি পরিচ্ছন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ও বলিষ্ঠ বক্তব্যের গভীরতার উজ্জ্বল নিদর্শন। আজকের যুগের বুদ্ধিজীবী কবিরা এই প্রবন্ধ দুটিতে সত্যকার জীবন-সত্যের মুখোমুখি হলেন—বিশেষ করে খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরীর যুগ-জীবনের সঠিক মূল্যায়নে। প্রবন্ধ দুটিতে প্রচুর ভাবনার খোরাক আছে।

মাসিক ভাণ্ডার (অকটোবর-নভেম্বর)—সম্পাদক: গোপাল হালদার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন। ২৩।এ নেতাজী সুভাষ রোড (আটতলা), কলকাতা-১। একটাকা।

মাসিক ভাণ্ডার পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র। নববর্ষের দ্বাদশ সংখ্যাটি 'নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ' সংখ্যা হিসাবে বৃহদাকারে শোভন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের চেহারা হতাশাজনক যখন ভারতের অন্য অঙ্গরাজ্যগুলি এই আন্দোলনের শরিক হয়ে সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। সমবায় সম্পর্কীয় নানান আলোচনায় আলোচ্য সংখ্যাটি পূর্ণ। লিখেছেন মনোরঞ্জন গুপ্ত, অমিয় মজুমদার, পার্থ সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ প্রামাণিক, সুনীলকৃষ্ণ ঘোষ, অজিত দে, সন্তোষকুমার দালাল, পতিতপাবন সরকার, বিশ্বানন্দ দাশগুপ্ত, বিশ্বপতি মৈত্র, পিনাকী সরকার প্রমুখ।

ছোটদের কাগজ—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ১৯ ললিতমোহন ভট্টাচার্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী। একটাকা।

কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত 'ছোটদের কাগজ' মাসিক পত্রিকাটি বিগত এগারো বছর ধরে শিশু ও কিশোরদের আনন্দ বিতরণ করে আসছে। ছোটদের কাগজে ছোটদের সঙ্গে বড়োরাও ছোটদের জন্যে লেখেন। আলোচ্য সংখ্যায় বিশিষ্ট লেখকরা হলেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বপনবুড়ো, শান্তিকুমার মিত্র, জ্যোতির্ময়ী দেবী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ। দেবব্রত সেনের 'রাবণের নাতি' লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের খবর

কলকাতায় বুলগারিয়ার কবি : মালাদেন ইসায়েভ একালের বুলগারিয়ার কাব্যজগতে সবচেয়ে পরিচিত নাম। বুলগারিয়ার লেখক সংস্থারও তিনি সম্পাদক। সম্প্রতি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারতসফরে এসেছেন। গত বুধবার (১৭-১১-৭১) তিনি কলকাতায় উপস্থিত হলে সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনের পক্ষ থেকে হিন্দুস্থান রোডে কবি লেখকদের এক সভায় তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়। সভাপতি সতীকান্ত গুহ অতিথি কবির সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন।

স্নিগ্ধ শুচি-সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশে কবিকে ঘিরে বসেছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালী কবি ও লেখকরা। বুলগারিয়ার শিল্প, সাহিত্য ও কাব্য আন্দোলন সম্বন্ধে একের পর এক প্রশ্ন করা হয় কবিকে। এভাবে আলাপ-আলোচনায় প্রশ্নোত্তরে কবিতা পাঠের ভেতর দিয়ে অনুষ্ঠানটি বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সকলের অনুরোধে কবি ইসায়েভ তাঁর দুটি কবিতা পাঠ করেন। ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেন ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীকান্ত গুহ, শান্তিময় ঘোষ, দিলীপকুমার বিশ্বাস, চন্দন সেন, গণেশ বসু, সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সামসুজ্জমান প্রমুখ কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অন্নদাশংকরের একটি ছড়া পাঠ করে শোনান সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনের পক্ষ থেকে আশিস সান্যাল কবিকে ধন্যবাদ জানান।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ১১ ।।

বিপদ এখানেও কম নয়। সর্বনাশের ফাঁদ পাতা চারিদিকেই।

ডাক্তার আছেন, ছাত্র শিক্ষার্থীরা আছে। তাদের মধ্যে সুপুরুষ, মিষ্টভাষীর সংখ্যা কম নয়। এই সুরূপা মেয়েটির দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, অন্তরে লালসার জাগ্রত হবে—এও স্বাভাবিক। হেমন্ত প্রাণপণে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে, একমনে ছেলের নাম জপ করে। ছেলেকে মানুষ করতে হবে দশের একজন করতে হবে; ছেলের চিন্তাই বর্মের মত কাজ করে।

তবে তাতেও ফল ভাল হয় না। ছাত্ররা অত নয়, চিকিৎসকরা বিদিবষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁদের লোলুপতা ও আক্রোশ দুই-ই বেড়ে যায়। এক একজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে নানা-রকম অনিষ্ট করার চেষ্টা করেন। তাঁদের পক্ষে সেটা খুব কঠিনও নয়।

বাঁচিয়ে দেন বদরী দাস। ধন্নুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু—এই হিসেবেই তিনি হেমন্তর ওপর নজর রেখে ছিলেন। তিনি এখানের হালচাল জানেন, কোন ডাক্তারের কি স্বভাব এবং কে কোথা দিয়ে কি কামড় দিতে পারে তাও তাঁর জানা আছে। হেমন্তকে দেখে যে অনেকেই লুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে এও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সহকর্মীদের চোখের পাতা পড়া দেখেই তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন। সেই কারণেই ওঁর পক্ষে ওকে বাঁচানোও সহজ, বিপদ কোনদিক থেকে আসতে পারে, কী পথ ধরে তা বুঝে আগেই তিনি তার প্রতিবিধান করতেন। আঘাত মধ্যপথেই প্রতিহত হয়ে ফিরে যেত।

সত্যি, পরবর্তীকালে যতই ভেবেছে হেমন্ত, ততই বদরীদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেছে, চোখে জল এসেছে বারবার। দেবতার মতো মানুষ ছিলেন তিনি, অন্তত হেমন্তর কাছে। ওকে 'মা হেমন্ত' বা 'হেমন্ত মেয়ে' বলে সম্বোধন করতেন, সেটা কথার কথা নয়, মৌখিক সৌজন্য সম্ভাষণ নয়—সম্পর্কটা তাঁর কাছে আন্তরিক ও সত্য হয়ে উঠেছিল। তিনি চিরদিন সে সম্বোধনের মর্যাদাও দিয়ে গেছেন।

শুধু যে হেমন্তকেই বাঁচিয়ে গেছেন বারবার তাই নয়—হেমন্তর জন্যে ওর অনুরোধে আরও অনেককে বাঁচিয়েছেন।

সবচেয়ে সুশীলা।

হেমন্ত গিয়ে বদরীবাবুকে না ধরলে তার তীরে এসে তরী ডুবত।

ওদের শিক্ষাপর্বের একটা সময়—শেষের দিকে, সেপটিক ওআর্ডে ডিউটি দেবার কথা। দিতেও হত প্রত্যেককেই।

সেটা তখন একটেরে ছিল একেবারে, চারিদিকে বড় বড় ঝাউ গাছে ঘেরা, একেবারে নির্জন। রোগীও খুব বেশী একটা থাকত না; জমাদারনীদের থাকার কথা, তারাও ভূতের ভয়ে সরে পড়ত। না হলেও নিচে তাদের আস্তানা ছিল আলাদা, নার্স বা সিস্টাররা এসে না ডাকলে তারা কেউ স্বেচ্ছায় আসত না। এখানের আব-হাওয়া দূষিত বলেই অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হত—বাইরের লোকজনের যখন তখন আসা নিষিদ্ধ ছিল পাছে আরও বিষ ছড়ায়। রোগিণী মারা গেলেও তাকে ড্রেস করিয়ে চাকাওলা গাড়িতে করে নার্সদেরই এনে বাইরে পৌঁছে দিতে হত। সেখান থেকে মর্গে নিয়ে যেত ডোমেরা।

এই ডিউটিটাই ছিল ভয়াবহ সকলের কাছে। বিশেষ, একাধিক রোগী থাকলে তবু একরকম, একটি রোগী থাকলে বেশী আতঙ্কের কারণ হয়। বহু লোক মরেছে এখানে—স্বভাবতই, তখন কোন কারণে সেপটিক হয়ে গেলে বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠত। এখনকার মতো ওষুধপত্র তখন বেরোয় নি। এই বহুলোকের মৃত্যুর ইতিহাস আর নির্জনতার দরুনই অনেক ভূতের গল্প গড়ে উঠেছিল এবং তখনও হচ্ছিল। এমন কি—অত শান্ত ও সাহসী এডিথেরও এখানে ডিউটি পড়ার সময় মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, হাতে করে ক্রুশটা চেপে ধরে বসে থাকত সে, সামনের বাইবেলে আর একটা হাত রেখে।

হেমন্তর ভাগ্যক্রমে ওর যখন ডিউটি পড়ে তখন দুতিনটি পেশেন্ট ছিল। তাদের মধ্যে একজনের ঘোরতর বিকার। বিষম চিৎকার করত দিনরাত—তাই ঘুমের কোন উপায়ও ছিল না। ঘুম পেতও না অত। আর ব্যস্ত থাকত বলেই—ভয় অত বুঝতেও পারে নি।

কিন্তু সুশীলা বেচারীরই অদৃষ্ট মন্দ। তার যখন ডিউটি পড়ল তখন একটিমাত্র রোগিনী, মৃত শিশু প্রসব করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কীভাবে রক্ত বিষিয়ে গেছে। পূর্ণ উন্মাদের মতো অবস্থা। প্রবল জ্বর, দিনরাত 'গা জ্বলে গেল,' 'গা জ্বলে গেল' করছে। সেজন্যে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে অচৈতন্য করে রাখা হয়েছে। এ পেশেন্টের পাশে বসে থাকা অত্যন্ত বিরক্তিকর। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বর দেখা ও সময় মতো মুখ ফাঁক করে ওষুধ খাওয়ানো। তাও রাত্রে দেবার মতো ওষুধ বিশেষ ছিল না। শুধু বলা ছিল যে যদি ঘুম ভেঙে যায়, আবার চেঁচামেচি শুরু করে তো জোর করে ঐ ঘুমের ওষুধ মিশনো মিকসচারটাই আর খানিকটা খাইয়ে দেবে।

সুশীলা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে পাড়াগাঁয়ের বৌ।

এতদিন শহরে থাকা সত্ত্বেও তার গ্রাম্য অভ্যাস ও বিশ্বাস কিছুমাত্র কাটেনি। সে ভূত পেত্নী শাঁকচুন্নি বেহ্মদত্যি সব বিশ্বাস করত। এই জনপ্রাণীহীন দোতলা বাড়ির ওপরতলায় সে একা—সঙ্গী বলতে এক মুমূর্ষু অচেতন রোগী। এই [illegible]—মৃদু আলোয়, রাত জেগে বসে [illegible] এতদিনের সব জনশ্রুতি মনে পড়বে—এ আর আশ্চর্য কি? [illegible] একরকম করে [illegible]

—রাত আর কাটতে চায় না। কেবলই মনে হয় জমাদারনীর মুখে শোনা সেই সাদা কাপড় পরা পেত্নীটা—যে নাকি প্রত্যহ রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত এই বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়—সে এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে, ওর ঘাড়ে আর গায়ে তার নিঃশ্বাস লাগছে।

শেষে আর থাকতে না পেরে, কতকটা শব্দ করার জন্যেই, কোথা থেকে এক গাছা ঝ্যাটা সংগ্রহ করে এনে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা ঝাউগাছকেই সপাং সপাং করে পিটতে শুরু করে দিলে, আর আপন মনে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে গালাগাল দিতে লাগল, 'হারামজাদী পেত্নী, তুই আর ভয় দেখাবার মানুষ পেলি না! বলি আমি তোর কী করেছি লা, আবাগী সব্বনাশী শতেক খোয়ারী!...মিছিমিছি আমার পেছনে লাগতে এয়েছ!...আমাকে তুমি চেনোনি এখনও, এই ঝ্যাংরা মেরে যদি এখান থেকে তোমাকে তাড়াতে না পারি তো আমার নামই নেই। আমার জন্ম মিথ্যে।...আমাকে বেজন্মা বলে ডাকে যেন সবাই!' ইত্যাদি।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে এক সিস্টার এসে পড়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে শুধোলেন, 'হোয়াট্‌স্‌ দ্যাট—সুশীলা? ওটা তুমি কি করছ?'

অপ্রতিভ হল বৈকি। প্রথমটা লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল কিন্তু সে ঐ কয়েক মুহূর্তই। ভয়ই পাক আর অপ্রস্তুতই হোক—ওর উপস্থিত বুদ্ধি ওকে ত্যাগ করেনি। আর দুষ্টবুদ্ধি ও কৌতুকবোধ তো সহজাত। সে সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ বিস্ফারিত করে ফিসফিস গলায় বলল, 'সাপ সিস্টার! স্নেক না কি যেন বলো তোমরা!'

'স্নেক! মাই গড্‌! কী বলিটেছ টুমি?'

'হ্যাঁ সিস্টার। তবে আর বলছি কি! এমনি সাপ নয়, তক্ষক!

তক্ষক জান? এত্ত বড় বড়, ছোট গো হাড়গেলের মতো দেখতে—টিকটিকির ধরন আর কি, চার পায়ে হাঁটে। মধ্যে মধ্যে আওয়াজ করে, 'তোক্‌খোক', 'তোকখোক'। শোন নি কখনও?'

'লিজার্ড বলো! এরকম স্নেক হয় নাকি?' সিস্টারের ভূতের ভয় নেই—কিন্তু সাপের ভয় আছে বিলক্ষণ; তার মুখ শুকিয়ে গেছে, 'পয়জনাস? বিষ আছে?'

'এমনি বিষ আছে কিনা জানি নে সিস্টার দিদি, তবে ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ে চোখ খুবলে নেয় লোকের। ছেলে-পুলে পেলে তো আর রক্ষে নেই।'

'মাই গড!' আবারও ঈশ্বর স্মরণ করে সিস্টার, 'এখানে? ডেকেছ টুমি?'

'না, মানে ঠিক চোখে দেখি নি', একটু ঢোক গেলে সুশীলা, 'শব্দ পেয়েছি। আওয়াজ করছিল, 'তোক্‌খোক্‌', 'তোক-খোক্‌'। তক্ষক খুব ভয়ানক সাপ—তুমি মহাভারত পড়নি, আমাদের ধম্মের বই—তোমাদের যেমন বাইবেল আর কি—তাতে পর্যন্ত তক্ষকের কথা লেখা আছে। খুই শুদ্ধই তক্ষক দিয়ে!'

বলতে বলতে আবার বেশ জোর পায় যেন।

সিস্টার নিজে গিয়ে লণ্ঠনের আলো ফেলে সেদিকের গাছগুলো দেখলেন, তারপর সেদিকের সব জানলা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন, কাল মর্নিংএ আমি সার্চ করাবো। ভেরী ডেঞ্জারাস। টুমি খুব সাবধানে ঠেকো। গড্‌স্‌ গার্ড!'

সেদিনটা তো দুর্গা বলে কেটে গেল। পরের দিন সকালে তক্ষকের খোঁজে খুব সোরগোল হল। বলা বাহুল্য—যা নেই, তা পাওয়া যাবে কি করে?

কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি আর কাটে না।

তক্ষকের দোহাই দিয়ে সুশীলা আর একটি সঙ্গিনী প্রার্থনা করেছিল কিন্তু তা দেওয়া যায়নি। নিদেন একটা জমাদারনী ওপরে থাকার কথাও বলেছিল, কেউ রাজী হয়নি।

রাত দশটা, এগারোটা, বারোটা।

সাদা কাপড়-পরা পেত্নীর বেরোবার কথা এই সময়টায়।

আর থাকতে পারে না সুশীলা। দরজার দিকে সামনে ফিরে বসেছে—যাতে পেত্নী এলে দেখা যায়। তাতেও নিশ্চিন্ত হত পারছে না, সব সময় ওনারা নাকি দৃষ্টিগোচর হন না।

এলোকেশী বলে একটি মেয়ে একখানা গল্পের বই যোগাড় করে দিয়েছে, 'রহমতুন্নেছা বিবির কেচ্ছা' নাম—বলেছে, 'ভারী মজার বই, বসে বসে পড়িস, রাত কোথা দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবি না।'

কিন্তু সে মজাদার কেচ্ছাতেও মন বসছে না।

রোগিণীর আজ বিকারের ভাব খুব বেড়েছিল, ডাক্তার নিজে এসে খুব কড়া ব্রোমাইড মিকশ্চার খাইয়ে গেছেন, সে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছে। জ্বর খুব বেশী, মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস করার কথা—বরফ নেই, বরফ নাকি রাত্রে আসেনি। সারা সন্ধ্যা 'গা জ্বলে গেল, গা জ্বলে গেল' করেছে—রক্তে বিষ ছড়িয়ে পড়লে নাকি এমনি হয়। সিস্টার একবার এসে ঠাণ্ডা জলে গা মুছিয়ে দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, 'জলপটি দাও, জ্বর কমে এলে সরিয়ে নিও।'

দরজার দিকে ফিরে বসেই বাতাস করছিল আর সভয়ে দেখছিল চেয়ে চেয়ে। রাত বারোটার পর জ্বর কমে গেছে মনে হতে পাখা রেখে টেবিলে আলোর কাছে এসে বসেছিল। বইখানা খুলে পড়বার চেষ্টাও করেছিল খানিক—কিন্তু ভয় ও বই সত্ত্বেও এক সময় কখন চোখদুটি তন্দ্রায় বুজে এসেছে তা টেরও পায়নি।

বোধহয় দশ-পনেরো মিনিটও হবে না।

বাথরুমে দুম্‌ করে একটা শব্দ হতেই চোখ চেয়ে দেখে রোগিনী কখন উঠে বাথরুমে চলে গেছে, বিকারের ঘোরেও জল কোন্‌দিকে পাবে সে-জ্ঞান টনটনে—বোধ করি গায়ের জ্বালা সইতে না পেরে গায়ে জল ঢালতেই গেছে কিন্তু দুর্বল শরীরে টাল সামলাতে পারেনি, পড়ে গেছে। সুশীলা পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে তোলবার জন্যে টানাটানি করছে—পেছনে মৃদু খস খস শব্দ হতে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে ফিরে দেখে পিছনে শাণিত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাইট-সুপার!

কৈফিয়ৎ একটা ছিল বৈকি।

রোগিণী বিকারের ঘোরে উঠে চলে এসেছে—ও ধরে রাখতে পারেনি—ইত্যাদি।

কিন্তু তাতে কোন কাজই হত না। কারণ, রোগিণী সেই পড়ে যাওয়ার জন্যেই হোক বা স্বাভাবিক কারণেই হোক, সেই রাত্রেই মারা গেল। সেজন্যে মূলত দায়ী করা হল সুশীলাকেই।

ওকে বার করে দেওয়া সুনিশ্চিত—করে দেওয়াও হত যদি না হেমন্ত ওর হয়ে গিয়ে বদরীবাবুর কাছে কেঁদে পড়ত।

বদরীবাবু প্রথমটা এর ভেতর নাক গলাতে রাজী হননি। বলেছিলেন, 'এটা একটা হাইনাস ক্রাইম হেমন্ত, মুমূর্ষু রোগীর পাশে বসে ঘুমিয়ে পড়া। এ-লোককে লাইসেন্স দিয়ে বাজারে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক? তার ওপর সিস্টাররা এসব ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্‌ট্‌—আমি বললেও সম্ভবত তারা শুনবে না। মিছিমিছি আমিই ছোট হবো।'

কিন্তু হেমন্ত নাছোড়বান্দা হয়ে চেপে ধরল। বলল, "এ-রুগী যে মারা যাবে আপনারা তো জানতেনই, এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। মিছিমিছি তার জন্যে আর একটা প্রাণ নষ্ট করবেন?...ও পাস করতে না পারলে ওকে বাসন মেজে ঝিয়ের কাজ করে স্বামীকে ভাগ্নেকে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া ঐ হানাবাড়ি, একটা অজ্ঞান পেসেণ্টের পাশে চুপ করে বসে থাকা—সেটাও একটু চিন্তা করুন। আপনাদেরই উচিত অন্তত দুজন লোক থাকার ব্যবস্থা করা।'

বদরীবাবুও সেটা বুঝলেন হয়ত। যাই হোক, তাঁর কথাতেই কাজ হল। উনি যুক্তি দেখালেন — সিস্টার যখন সুশীলাকে ঘুমোতে দেখেননি, সামনে টেবিলে একটা বইও খোলা ছিল এও মানছেন, তখন ওর কথা যে সবটাই মিথ্যে এটা ধরে নেবেন কোন্‌ বিচারে?...মিথ্যে যে বলেছে এটা প্রমাণ করতে না পারলে একটা কেরিয়ার এভাবে নষ্ট করা কি উচিত?

এই যুক্তিতেই সুশীলা বেঁচে গেল সে-যাত্রা। অবশ্য অপর কেউ এ-যুক্তি দিলে কি ফল হত তা বলা যায় না, বদরীবাবুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপরিসীম—নিজের বিশেষ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তর্কাতীত—সুতরাং তাঁর কথার ওপর মেম সিস্টাররাও কথা বলতে সাহস করলেন না।

।। ১২।।

এই দেড় বছর একমাত্র চিন্তা ছিল কী করে পাস করবে, স্বাধীনভাবে উপার্জন

করতে শুরু করবে—ওদের অনুগ্রহে ভিক্ষায় দিন কাটাতে হবে না।

কিন্তু শিক্ষার পর্ব শেষ করে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোবার পর দেখল আসল চিন্তার এই সবে শুরু—শেষ নয়। দুস্তর বৈতরণী তার সামনে—পিছনে যেটা পেরিয়ে এসেছে সেটা এ-তুলনায় একটা সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী বা খাল ছাড়া আর কিছু নয়।

পাস সে ভালভাবেই করেছে। যে-সাহেব সই করে অভিজ্ঞানপত্র তার হাতে দিয়েছেন, লোকে বলে শুধুমাত্র তার নাম করলেই গর্ভিণীর সুপ্রসব হয়। তিনিই মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন ওদের। বদরীবাবুও উপস্থিত ছিলেন, তবে সাহেবই আসল। সাধারণত কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়—এডিথ ওকে তার একটা আভাস দিয়েছিল, সেজন্যে হেমন্ত তৈরীই ছিল খানিকটা। সাহেব প্রশ্ন করেছিলেন, 'ধরো তোমাকে এক বড়লোকের বাড়ির বৌকে প্রসব করানোর জন্যে এনগেজ করেছেন, তার গর্ভবেদনা উপস্থিত, তাঁরা পালকী পাঠিয়েছেন, তুমি যাচ্ছ প্রসব করাতে, পথে যেতে যেতে দেখলে পথের ধারে গাছ-তলায় একটি ভিখিরি মেয়ে পড়ে ছটফট করছে— প্রসব হতে পারছে না—তুমি কি করবে?'

হেমন্ত মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি পালকী থামিয়ে আগে ঐ মেয়েটিকেই দেখব, চেষ্টা করব যাতে তার নির্বিঘ্নে ডেলিভারী হয়।'

'সে কি!' সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। 'এ তো খুব ইরেসপন্সিবল কথা হল! তারা তোমায় আগে এনগেজ করে রেখেছে, তুমিও কথা দিয়েছ, তোমার ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত আছে তারা—সেখানেও জীবনমরণ সমস্যা থাকতে পারে, শেষ মুহূর্তে তাদের এমন-ভাবে ডোবানো কি উচিত? তারা তখন কোথায় দৌড়বে লোক খুঁজতে!... ভিখিরির প্রাণের দাম ওর থেকে অন্তত বেশী নয়!'

একবার একটু বুক কেঁপেছিল বৈকি হেমন্তর।

তবে কি সে বেফাঁস কিছু বলে ফেলল?

কিন্তু এখন তার উপায় নেই, হাতের পাশা আর মুখের কথা—ফেললে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

সে দুর্গানাম স্মরণ করে দৃঢ়কণ্ঠেই উত্তর দিল, যাদের পয়সা আছে তারা যে-কোন মুহূর্তে অন্য লোক ডাকতে পারে, হাসপাতালে এলে ধাত্রীর অভাব হবে না, বড় বড় ডাক্তার ছুটে আসবে—কিন্তু যে-ভিখিরি রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে তার কি উপায় আছে বলুন! আমার তো মনে হয়, আমার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য তাকেই দেখা।'

সাহেবের মুখ প্রসন্ন হল এবার। আশীর্বাদ প্রকাশেই বললেন, বেঁচে থাক বেটি! আমার মুখ রেখেছিস!'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় সাহেব হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, 'এইটেই মনে রেখো তোমাকে আমরা সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি প্রধানত মানবসেবার জন্যে। পয়সা রোজগারটা গৌণ—সেবাই মুখ্য। কখনও যেন না টাকার কথাটা আগে ওঠে। তেমন ঘটনা জানতে পারলে—টাকার জন্য তুমি কর্তব্যে অবহেলা করেছ এ-অভিযোগ যদি আসে—এ-সার্টিফিকেট আমরা নাকচ করতে বাধ্য হবো।'

এ-পর্ব ভালভাবেই শেষ হল। এখন প্রশ্ন, 'এর পর?'

অবশ্য এই তারপরটারও প্রাথমিক ব্যবস্থা গোপালীই করল। সে বলল, 'এখানে বসা তোর ভাল হবে না। তাছাড়া আমারও অসুবিধে, যখন তখন লোক আসবে—সে বড় বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার। আমি পয়সার জন্যে দাইকে ঘর ভাড়া দিয়েছি সেও ভাল শোনায় না। আমি অন্যত্রে বাড়ি ভাড়া করে দিচ্ছি, ঝি রেখে দিচ্ছি—তুই সেখানে গিয়ে সংসার পেতে বোস, নতুন করে স্বাধীনভাবে জীবন শুরু কর।'

হেমন্ত হাসল। বলল, 'খুব স্বাধীন! বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে ঝিয়ের মাইনে পর্যন্ত তো তোমাকেই গুনতে হবে দিদি, আমি স্বাধীনভাবে সংসারটা শুরু করব কি দিয়ে?'

'নে, সে একটু প্রেথম প্রেথম চালিয়ে দিতে হবে বৈকি! ডাক্তারদেরও পাস করে বেরোলে ডাক্তারখানা সাজিয়ে দিতে হয় না? এর পর যখন মোটমোট টাকা ঘরে আসবে, তুই কড়াক্রান্তি আমাকে শোধ করে দিস, আমি হাত পেতে ঠিক নোব। দেখিস।'

'না দিদি, তোমার দেনা শোধ করতে পারবও না, চাইও না। তোমার কাছে দেনদার থাকব চিরকাল সেই আমার ভাল। আর জন্মে তুমি আমার সত্যিকার দিদি ছিলে, সে আমি বেশ বুঝে নিয়েছি।'

গোপালী ধনুবাবুকে বলে পটল-ডাঙ্গা অঞ্চলে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়ে দিলে। হেমন্ত প্রথমটায় একটু আপত্তি তুলেছিল, বলেছিল, 'একটা ঘরই তো ঢের দিদি—না হয় দুটো ঘর কোথাও নিচের তলায় দেখে দাও না। মিছিমিছি এখনই একগাদা—পঁচিশ টাকা দিয়ে বাড়ি ভাড়া করার দরকারটা কি? তাছাড়া অত দূরে—এদিকে থাকলে তবু তোমার কাছা-কাছি হত—'

'তুই বুঝিস না।' গোপালী বলেছিল, 'পাঁচটা ভাড়াটের মধ্যে থাকলে কারবার চালানো যায় না। এও তো ধর ডাক্তারদের মতোই—পাঁচটা লোক আসবে যাবে, তাদের বসবার জায়গা চাই—ঠাটবাট না থাকলে চলে? পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকলে কেউ ডাকবে না। বলবে, ও তেমনি দাই, কেউ ডাকে না, অন্ন হয় না। যে কাজের যা, ইজ্জৎটা আগে। ভড়ং না হলে কারবার চলে?...আর ইদিকে এই হেদো দর্জিপাড়া অঞ্চলে এখন তিন-চারজন পাস-করা দাই বসে গেছে। শুনেছি বাবুই বলেছিলেন, পটলডাঙ্গার দিকে বিশেষ কেউ নেই। তুই ওখানেই বোস, আমি দুপুরের দিকে একবার করে গিয়ে দেখে আসব'খন।...না হয় তো, তোর

কাজকর্ম না থাকলে, গাড়ি পাঠিয়ে দোব—তুইও এখানে চলে আসতে পারবি।'

ধন্মবাবু যে-বাড়িটি দেখেছিলেন, বড় রাস্তার ওপর অথচ খুবই ছোটবাড়ি। নিচে দুটো ওপরে দুটো ঘর। নিচের একটা ঘর বাইরের ঘর হিসেবে চলবে, তাতে তিনটে চেয়ার আর একটা টেবিলেরও ব্যবস্থা করা হল, বলা বাহুল্য ধন্মবাবুই পাঠিয়ে দিলেন সেগুলো—আর একটা ঘরে ঝি থাকবে। তিনতলায় খাপরার রান্নাঘর একটা আছে, কিন্তু হেমন্ত বললে, সে দোতালার বারান্দাতেই রাঁধবে তোলা উনুনে, একশো-বার ওপর-নিচে করতে হবে না তাতে। ঘর তো একটা বেশীই থাকছে—জলবৃষ্টি হলে উনুন ঘরে নিয়ে গেলেই চলবে। বিশেষ জল একতলায়—তেতলায় রান্না করলে সমস্ত জল টেনে টেনে ওপরে তুলতে হবে।

গোপালী দুদিন ধরে দুপুরের দিকে নিজে এসে হেমন্তর সংসার গুছিয়ে দিয়ে গেল। বিছানা কিনতে হল না, ওরা যাতে শুচ্ছিল, গোপালীর বাড়ি সেই বিছানাই পাঠিয়ে দিল সে। বাকী সব জিনিস কিনে, চাল ডাল ঘি তেল মশলা চিনি গুড় হাঁড়িতে জালাতে টিনে ভাঁড়ার সাজিয়ে, দুটো তোলা উনুন—কাঠকয়লা ঘুঁটে পর্যন্ত সব গুছিয়ে রেখে গেল। বড়লোকের মেয়ে, অকারণে পাঁচ-সাতটা দাসী-চাকর পোষে—কিন্তু হেমন্ত অবাক হয়ে দেখল—কাজকর্ম কোনটাই অজানা নয় তার। সংসারের সব কাজ জানে, গুছিয়ে করতেও পারে।

ইতিমধ্যে একটা সাইনবোর্ডও লেখানো হয়ে গেছে—সেটা ওরাই এসে দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে সেঁটে দিয়ে গেল। তারপর পুরুতমশাইকে দিয়ে দিন দেখিয়ে গোপালী নিজে সঙ্গে এসে থিতু করে দিয়ে গেল। ঝিও সেই একটা যোগাড় করে দিলে। রাতদিনের ঝি-ই একটা দরকার এখানে,—হেমন্ত যখন 'কল'-এ যাবে তখন বাড়িতে থাকবে, লোকজন এলে নাম-ঠিকানা জেনে রাখবে, কী দরকার, কখন আবার আসবে তারা খোঁজ করতে, ঠিকানা কি—সব লিখিয়ে নিয়ে রাখতে পারে এমনি একটি চালাকচতুর মেয়েছেলে। সেইরকমই পাওয়া গেল একজন, মাইনে একটু বেশীই—খাওয়া, বছরে দুখানা কাপড়, দুখানা গামছা—তিন টাকা মাইনে।

'কিন্তু এটুকু দিতেই হবে' গোপালী বলল, 'একেবারে গোবরগণেশ লোক দিয়ে এসব কাজ চলবে না। আর, সেও ধর্—কতই বা কম হত—বড়জোর একটা টাকা বাঁচত তাতে।'

ছেলেটাকে এ-বাড়ি পাঠাল না গোপালী, বলল, 'তুই কাজে যাবি, তখন কার কাছে থাকবে? একা ঝিয়ের ভরসায় ছেলে রাখা ঠিক নয়। ছেলেপুলেকে নষ্ট করে দেয় ওরা। তোর পসার জমুকে, একেবারে একটা ইস্কুলে ভর্তি করে সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করে দোব। কলকাতা শহরের বাইরে কোথাও।'

এইবার শুরু হল প্রতীক্ষা।

অনেক আশা বুকে নিয়েই শুরু হয়েছিল, অনেক কল্পনা। মুক্তির স্বপ্ন। পরমুখাপেক্ষিতা থেকে, পরানুগ্রহ থেকে মুক্তি। স্বাধীনভাবে নিজের মতো জীবন-যাপনের স্বপ্ন।

কিন্তু দিনের পর দিন কাটল, সে-স্বপ্ন সফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না কোথাও। আশামুকুলগুলি স্ফুটনোন্মুখ হওয়ার আগেই যেন শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে ঝরে গেল।

মনে হল এখনও তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি। অদৃষ্টদেবতার প্রসন্ন হওয়ার আশা সুদূরপরাহত।

চকচকে নতুন সাইনবোর্ড ধুলোয় রোদে বিবর্ণ হয়ে উঠল, বাইরের ঘরের চেয়ার-টেবিলের ধুলো মুছতে মুছতে ঝি ক্লান্ত হয়ে পড়ল—কিন্তু কেউই কোন 'কল' দিতে এল না তাকে।

পসার জমলে গোপালীর টাকা শোধ দেবে—এ-সংকল্প উপহাস হয়ে দাঁড়াল—কেননা উলটে আরও টাকা হাত পেতে নিতেই হচ্ছে গোপালীর কাছ থেকে। সেইটেই সত্য, রূঢ়বাস্তব।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। মাসের পর মাসও। কেউ একবার খোঁজ করতেও এল না।

কাজকর্ম নেই বলে ছেলেটাকে আনিয়ে নিয়েছে, মিছিমিছি পরের কাছে ফেলে রেখে লাভ কি? এখানে একটা বাড়ির নিঃসঙ্গ নির্জনতা তাকে যেন গিলতে আসে, হোক ছোট বাড়ি, তবু মনে হয় শূন্য বাড়িটা যেন গিলতে আসছে। ঝি অনুযোগ নয়, গঞ্জনা দিতেই শুরু করেছে, 'এমন ধারা চললে আমার মাইনে গুনবে কোত্থেকে। খাবেই বা কি। কাজকম্মের চেষ্টা দ্যাখো। হাত-পা নাড়ো একটু। ঘরের কোণে চুপ মেরে বসে থাকলেই চলবে?... পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে গিয়ে একটু দেখা করো না, জানিয়ে বলে এসো না যে আমি এখানে এইচি, তোমাদের পাড়ার লোক, কাজকম্ম দিয়ে দ্যাখো কেমন করি। তোমাদের ভরসায়ই তো এসে বসা! একটুক খোশামোদ চায় যে মানুষ।'

এতটা পারে না হেমন্ত। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানানো, তার দ্বারা হবে না। হবে যেটা সেটাই চেষ্টা করে—বদরীবাবুকে গিয়ে ধরে। হাসপাতালের খাতায় নাম-ঠিকানা লেখানোই আছে—কিন্তু সে কেউ চাইতে এলে তবে তো তাঁরা দেবেন।... বদরীবাবু বলা-কওয়াতে দুটো-একটা কাজ পেল তবু—তিন টাকা করে রোজ, তাও এক টাকা ও'রা কেটে নেন। হেমন্ত পায় দু'টাকা হিসেবে। অবিশ্যি সে-টাকাও কম নয়—কিন্তু মাসে পঞ্চাশ টাকা যার বেওজর খরচা, সে যদি দু-তিন মাস অন্তর দশ-বারো টাকা পায় তো চলে কিসে?

সংসারের পত্তনেই গোপালী হিসেবের খাতা একখানা ধরিয়ে দিয়েছিল, সেটা নিয়মিত রেখেও যাচ্ছিল হেমন্ত। মাস-দুয়েক পরে একদিন মিলিয়ে দেখল, গত দু মাসে মোট আয় তার একশো টাকাও হয়নি। একটি মাত্র ডাক পেয়েছিল পাড়া থেকে—বাকী সবই হাসপাতালের। অথচ ছ' মাসে খরচা হয়েছে তিনশোর কাছা-কাছি, এছাড়া গোপালীর যে আরও কত খরচ হয়েছে তা ঈশ্বর জানেন। এ-টাকাও সবটাই নিতে হয়েছে তার কাছ থেকে। চাইতে হয়নি অবশ্য, মাসের প্রথমেই সে নিজে থেকে কিছু টাকা বালিশের নিচে গুঁজে দিয়ে যায়, বাড়ি ভাড়া সোজাই পাঠিয়ে দেয় বাড়িওলার কাছে। এছাড়া মাসকাবারী জিনিসও মাঝেমধ্যেই পাঠিয়ে দেয়—আন্দাজে আন্দাজে, দরকার পড়বে বুঝে।

খুবই বিবেচনা গোপালীর—হেমন্তর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন আচরণই করে না কখনও, তবু—অথবা বলতে হয় সেইজন্যেই—এই প্রত্যেকটি দান নিতে হেমন্তর মাথা কাটা যায় যেন। যে অনেক করেছে, অনেক দিয়েছে—এমন নিঃশব্দে নিজে থেকে সসম্মানে দিয়েছে, তার যদি কোন দিন বিরক্তি আসে, কোন দিন কোন অবহেলা দেখায় কি খোঁটা দেয়—তাকে কোন দোষ দিতে পারবে না এটা ঠিকই কিন্তু সে-অপমান সেদিন মৃত্যুর অধিক বোধ হবে। সেই ক্লান্তি বা বিরক্তি এমনকি ঔদাসীন্য বোধ হওয়ার আগে যদি কোনমতে দুটো পেট চলবার মতোও ব্যবস্থাও হত! এই পঞ্চাশটা টাকাও উঠত।

একবাড়ি ছেড়ে একখানা ঘর ভাড়া করে উঠে যাবার কথাও পেড়েছিল গোপালীর কাছে। আয় যখন হচ্ছে না, খরচা কমানোই উচিত নয় কি? কিন্তু গোপালী উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। বলেছে, 'পাগল হয়েছিস তুই? তাহলে যাও বা আশা আছে, একদিন পসার জমাবার—তাও থাকবে না। বাড়ি ভাড়া টানতে না পেরে যাকে একখানা ঘরে উঠে যেতে হয়—তাকে আর কী ভরসায় লোকে ডাকবে? অপদাথ ভাববে না? আর তাতে তোর কটা টাকারই বা সুসার হবে? বড়জোর পনেরোটা টাকা? বাড়ি ভাড়া ছাড়া আর কোন খরচাটা বাঁচাতে পারবি তুই? অথচ ওতে যে ইজ্জতটা যাবে তার দাম পনেরো টাকার ঢের বেশী।'

এর ওপর কোন কথা কইতে পারে না হেমন্ত।

গোপালীর প্রবল মতামতের সামনে চুপ করে যেতে হয়।

এটাও মুখ ফুটে বলতে পারে না যে তার আর ইজ্জতটা আছে কোথায়? পরের হাততোলায় যাকে জীবনধারণ করতে হয়—ইজ্জতের প্রশ্ন তার কাছে বিদ্রুপের মতোই মনে হবে। ভিখিরির আবার মানইজ্জত!

বলতে পারে না। কারণ গোপালীকে একথা শোনানোও এক রকমের অকৃতজ্ঞতা। গোপালী মর্মাহত হবে। যে আত্মীয়ের মতো দেখে, আত্মীয়েরও বেশী—তার স্নেহোপহারকে ভিক্ষা মনে করা তাকেই অপমান করা।

কিছুই করা যায় না—রান্না-খাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া।

দুঃসহ কর্মহীনতার আলস্যে দিন কাটানো।

বদরীবাবুকে বারবার বিরক্ত করতে লজ্জা হয়। ভয়ও করে। যদি কোনদিন কোন রূঢ় কথা বলে বসেন? ছি ছি, সে-কথা ভাবাও যায় না।...আর সত্যিই। তাঁর এমন কত ছাত্রী কত আশ্রিতা আছে, ওরই বা কি এমন বিশেষ দাবী ও'র স্নেহের ওপর যে সকলকে ফেলে তিনি ওকেই দেখবেন শুধু?

এর মধ্যে একদিন খবর পেল—গোপালীর ঠিকানায় চিঠি এসেছিল একটা—সুশীলা যশোরের হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সেখানে বিনা ভাড়ায় বাসা পেয়েছে, এখানের সংসার তুলে স্বামী আর ভাগ্নেকে নিয়েই চলে গেছে সে। ওখানে সস্তাগণ্ডা খুব, যা মাইনে পায় তাতেই চলে যাবে একরকম করে। ওখানের লোকগুলিও খুব ভাল—হাসপাতালে যারা আসে, ছাড়া পেয়ে বাড়ি গিয়েও মনে রাখে—কলাটা মুলোটা আমটা কাঁঠালটা কিছু না কিছু দিয়েই যায় মাঝে মাঝে, কচু গুড় মাছ—এত আসে যে কিনতে হয় না।

আবারও একটা আশায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে হেমন্ত।

এবার আর লজ্জা বা আশঙ্কার কোন কারণ আছে মনে হয় না, সোজাসুজি বদরীবাবুকে গিয়ে ধরে, 'এমন করে আর ক'দিন চালাব আমি, আর পারছি না। পরের দয়ার ভাত গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। ও কল-ফল-এর আশা ছেড়েই দিয়েছি, আপনি আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিন ঐ সুশীলার মতো। বেঁচে যাই তাহলে আমি।'

'চাকরি করবে? করতে চাও সত্যি সত্যিই? কিন্তু তাতে কি তোমার কুলোবে? যশোরের সদর হাসপাতাল, সরকারী টাকা তাই ত্রিশ টাকা মাইনে হয়েছে, অন্য হাসপাতালে তো তাও পাবে না। তাতে চলবে তোমার? ছেলেমানুষ করবে কেমন করে—কি দিয়ে?'

'সুশীলারও তো তিনটে পেট। তার চলছে কেমন করে?' হেমন্ত জেদ করে।

শুধু পেট চলাই তো সব নয়। কলা-মুলো আম কাঁঠাল খাওয়া যায়, বেচা যায় না।...তোমার তো অনেক আশা, ছেলেকে ভাল করে মানুষ করবে। তার তো খরচ আছে। আচ্ছা, দেখি—'

একটু দমে গেলেও বেশ খানিকটা আশা নিয়েই ফিরল হেমন্ত। গোপালীকেও বলল কথাটা। গোপালী বলল, 'চাকরি করবি? পাড়াগাঁয়ে? থাকতে পারবি গিয়ে? —য়্যাদ্দিন কলকাতায় কাটানোর পর? তাছাড়া শরীর টিকবে কেন? ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরবি। তোর যদি বা টেকে—বিধবার গতর ভাঙ্গতে চায় না সহজে—ছেলে? ঐ তো তালপাতার সেপাই, ল্যাকপ্যাক সিং—ওকে যদি বাপের মতো ব্যামোয় ধরে?'

শিউরে ওঠে হেমন্ত। তবু মুখে জোর দিয়ে বলে, 'সেখানেও তো লোক বাস করছে দিদি—সেসব জায়গায়—তারা যদি পারে তো আমি পারবো না কেন? আর ছেলে, তাকে তো তুমি বলছ কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে—ইস্কুলেই থাকার ব্যবস্থা হবে।'

'কলকাতায় একা থাকলে ছেলে মানুষ করা শক্ত হবে তা তোকে পষ্টই বলে দিচ্ছি। যদি মানুষ করতে চাস—বাইরে কোথাও দিতে হবে।...পাদরী সায়েবদের ইস্কুলে দিলেই ভাল হয়—তা না হলেও অন্য দু-চারটে ভাল ইস্কুলও আছে, কিন্তু তাতে খরচ বেশী পড়বে। সে কি তোর ঐ পাড়াগাঁয়ের চাকরি করে হবে?'

তবুও হাল ছাড়ে না হেমন্ত। মনে মনে জপ করে—'সে আমি যেমন করেই হোক চালাব, নিজে না খেয়ে, একবেলা খেয়েও। তবু সে নিজের রোজগার স্বাধীনভাবে থাকা।'

আশা বা আশঙ্কা যতই থাক, সে-চাকরিও সহজলভ্য হয় না। একমাস দেড়-মাস কেটে যায়—কোন খবরই আসে না বদরীবাবুর কাছ থেকে। এর মধ্যে দুদিন গিয়ে দেখা করে এসেছে হেমন্ত, কিন্তু সেই এক কথাই শুনেছে, 'কৈ কোথাও তো কোন কাজ খালি দেখছি না। সন্ধানে আছি তো।'

এধারে অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে আসছে। গোপালীর কাশী যাবার সময় এসে গেল, সে চলেও গেল তার তারিখ-মতো। যাবার সময় হিসেব করে, টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিল অবশ্য কিন্তু হঠাৎ তারকের অসুখে বাড়তি প্রায় সাত-আট টাকা খরচ হয়ে গেল পনেরো দিনে। খরচ কমাবার আর কোন উপায় না দেখে ঝিকেই ছাড়িয়ে দিলে সে। পাশের বাড়ির একটা ঠিকে ঝিয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে তিন-চারদিন অন্তর সে ওর বাজারটা করে দেবে, মাসে চার আনা পয়সা দিতে হবে তাকে।

শেষপর্যন্ত, আরও মাসখানেক পরে বদরীবাবু ডেকে পাঠালেন ওকে।

চাকরি খালি আছে একটা, তারা ও'দের কাছেই লিখে পাঠিয়েছে—ও'রা যাকে দেবেন, তাকেই নেবে। কিন্তু হেমন্তর কি সে চাকরি চলবে?

কী কাজ তাও খুলে বললে না।

চব্বিশ পরগণার এক হাসপাতালে কাজ, সরকারী নয়, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতাল। সরকার কিছু সাহায্য করেন

এই মাত্র। পঁচিশ টাকা মাইনে, সেক্রেটারীর বাড়িতে একখানা ঘর তিনি দিতে পারেন দরকার হলে, ভাড়া লাগবে না। আর কোন সুবিধে নেই। নিজেকেই রেঁধে খেতে হবে। ডিউটির কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই—সকাল-বিকেল তো বটেই—ডাক পড়লে অন্য সময়ও যেতে হবে। আর কাজও, শুধু প্রসূতি দেখা নয়—ওসব হাসপাতালে প্রসব হতে বড় একটা কেউ আসে না—নার্সের কাজও করতে হবে। অপারেশনের সময় যন্ত্রপাতি সাজানো, এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত।

এক অপরিমাণ হতাশা যেন মাথা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে—হিমহিম মতো।

পঁচিশ টাকা! খাওয়া সে যত কমে হোক সারতে পারে—একবেলা আধপেটা খেয়েও মরবে না, ভগবান তাকে সে-স্বাস্থ্য দিয়েছেন—কিন্তু কাপড় আছে, সেমিজ আছে—চাকরি করতে গেলে ফিটফাট থাকতে হবে—ধোপার খরচটাও ধরতে হবে। সময় থাকলে নিজেই ক্ষারে কাচতে পারে, এখনও তো তাই কেচে নেয়—শ্বশুরবাড়ি থাকতে তো টিনটিন কেচেছে—কিন্তু যে-রকম ডিউটি শুনছে, সে-সময় পাবে কি? তাছাড়া একবেলাই হোক আর আধপেটাই হোক—এক মুঠো চাল ফোটাতে গেলেও উনুন চাই, কাঠকয়লা যা হোক কিছু দরকার। সেসব চালিয়ে কত বাঁচাতে পারবে? ছেলেকে ইস্কুলে রাখতে গেলে মাসে কম করেও দশ-বারো টাকা খরচা, যদি বা তা টানা যায়—সেখান থেকে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখতেও আসতে পারবে না। সেরকম বাড়তি টাকা আর হাতে থাকবে না।

তাছাড়া, অসুখ-বিসুখ আছে। সে-সময় বাড়তি টাকা কোথা থেকে পাবে? সেক্ষেত্রে আবারও সেই গোপালীর কাছেই হাত পাততে হবে। তাই যদি পাতবে তো চাকরি নিয়ে লাভ কি, সেই দূরদেশে যেখানে ভবিষ্যৎ কোন উন্নতির আশা নেই?

তবু মন স্থির করতে পারে না। অর্থাৎ একেবারে না-ও বলতে পারে না।

শেষে তার 'অধম তারণ' গোপালীকে গিয়েই জানায় কথাটা। কী করবে জিজ্ঞাসা করে।

গোপালী রেগে ওঠে এবার। বলে, 'পোড়ার দশা তোমার, তাই এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। কেন, এতই বিষ হয়ে পড়েছি আমরা? মরণ তোমার। এখনই তো কুলুবে না, তারপর? ছেলে বড় হলে কলেজে ঢুকবে, তোর ডাক্তারি পড়াবার শখ, ধর, যদি তাই পড়ে সে তো একগাদা খরচ বাড়বে। তখন চালাবি কোথা থেকে? ওখানে মাইনে বাড়বে ভাবছিস? এই পঁচিশে ঢুকছিস, হয়ত মরবার কালে দেখবি মাইনে বেড়ে পঁয়ত্রিশে দাঁড়িয়েছে। [illegible] [illegible] কাজ, বছর বছর মনিব বদল হবে, প্রত্যেকের মন জুগিয়ে চলতে হবে—নইলে চাকরিও থাকবে না। বে-চারিত্তিরের জন্যে এত করছিস—সেও তোকে বেচতে হবে।...বেচতেই যদি হয় তো চড়াদামে বেচবি—সে গন্তর পড়ে মরতে যাবি কেন? ওসব জায়গায় গিয়ে ঢোকা মানে তো কবরে সেঁধুনো—মরতে যাওয়া। ওখানে থেকে অন্য কোথাও চাকরির খোঁজ করতে পারবি—না বাইরের 'কল' পাবি দু-চারটে? চাকরি কলকাতার হাসপাতালে বিনা মাইনেয় করাও ভাল—অন্য দিক দিয়ে দু পয়সা আসবার আশা থাকে। জানা-শুনো হয়—বড়লোকের বাড়ি ডাক পড়তে পারে। ওখানে মরতে যাবি কিসের জন্যে?'

অগত্যা 'না'-ই বলে আসতে হয় বদরীবাবুকে। গোপালী যে একটাও বাজে কথা বলেনি তা নিজের মনেই বুঝতে পারে হেমন্ত।

বদরীবাবু হাসেন। বলেন, 'আমি জানতুম মা। ওদের আগেই বলে দিয়েছি যে, ঐ মাইনেতে কেউ যাবে না এখান থেকে।'

॥ ১৩ ॥

একেবারে কেউ আসে না। যা খবর নেয় না, এ-কথাটা অবশ্য ঠিক নয়।

পূর্ণ ঘোষ আসেন মধ্যে মধ্যে। ডাঃ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ, স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ।

বদরীবাবুর মতো অত নাম-করা নন বটে—তবে এঁরও খুব পশার, রোজগার খুব। ডাক্তার মহলে এক ডাকে চেনে সবাই।

হাসপাতালেই আলাপ। শিক্ষার্থিনী হিসেবে ওঁর কাছেও পাঠ নিতে হয়েছে কদিন। বক্তৃতা দিয়েছেন, হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কম নয়—পঞ্চান্নও হতে পারে। রগের দুদিকে চুলে পাক ধরেছে, তাহলেও স্বাস্থ্য ভাল, প্রচুর খাটেন এখনও, খাটতে পারেন। শরীর এখনও টসকায়নি কোথাও। দেখতেও খারাপ নন, আর সামান্য একটু ঢ্যাঙা হলে সুপুরুষই বলা চলত।

প্রথম থেকেই হেমন্ত নজরে পড়েছে ওঁর। 'সুনজরে'ই বলে সবাই কিন্তু হেমন্ত জানে সু-নজর এটা নয়। চোখের চাউনি ও অন্যান্য ভাবভঙ্গী বুঝতে ভুল হয়নি তার। প্রথম দিন থেকেই এর অর্থ সে বুঝেছে। তাই অকারণেই যখন গায়ে পড়ে আত্মীয়তা করতে আসেন—একটা অস্বস্তি বোধ করে সে।—এবং যতটা সম্ভব শীতল-কঠিন হয়ে থাকে। স্নেহবর্ষণে স্নেহের পাত্রের মনে যে কৃতজ্ঞতা জাগার কথা, তার বিন্দুমাত্র উত্তাপ অনুভব করেন না পূর্ণ-বাবু।

তবু হাল ছাড়েন না তিনি। এখনও ছাড়েননি। খোঁজখবর নিয়ে পটলডাঙার ঠিকানাও যোগাড় করেছেন, এসেওছেন কয়েকবার। যখনই আসেন ছেলের নাম করে সন্দেশ বা অন্যান্য মিষ্টি, কমলানেবু, গজা এসব নিয়ে আসেন। আমের সময় আম আনতেন। একদিন মাছও এনেছিলেন, সে মাছ নেয়নি হেমন্ত, গাড়ি থেকে নামাতেই দেয়নি। ভ্রূকুটি করে বলেছে, 'এ আনতে গেলেন কেন? আপনি জানেন না আমি বিধবা?'

'না—তা জানি। তবে তোমার ছেলে তো খেতে পারে।'

'সেই জন্য আপনি এতবড় মাছ এনেছেন? সওয়াসের দেড় সের ওজনের মাছ? তাছাড়া আমি মাছ রাঁধি না। ওসব ঝামেলায় যাই না। ছেলে যখন মাসীর বাড়ি যায়—তখন মাছ খেয়ে আসে। আমার কড়ায় কি উনুনে মাছ চাপেনি এখনও।'

'কিন্তু ছেলেটার স্বাস্থ্যের দিক তো তোমার দেখা দরকার। এ-বয়সে মাছ-মাংস না খেলে শরীর বলবে কি করে? একে তো ঐ রোগা পাতলা ছেলে—'

'গরীবের ঘরে, ভিখিরির ঘরে আর অত স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করলে তো চলে না। যা এক পয়সা নিজস্ব আয় নেই, তার ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই বা লাভ কি বলুন? রোজ যখন খাওয়াতে পারব না, এক-আধদিনের জন্যে মিছিমিছি আলাদা ব্যবস্থা করতে যাই কেন?'

'তুমি যে আবার—' একটু থেমে ঢোক গিলে পূর্ণবাবু বলেন, 'তুমি যে ঘোড়ার ডিম একেবারে সত্যযুগের মানুষ। সেইজন্যেই তো—। নইলে এ-লাইনের কোন বড় ডাক্তারের সঙ্গে একটু মাখামাখি করলে, মানে আর কি—তাকে অন্য দিকে কোন সুবিধে দিলে কি আর রোজগারের অভাব থাকে? যারা উন্নতি করেছে তাদের সকলকেই এটুকু মেনে নিতে হয়েছে।...ঐ যে দেখছ, পূর্ণিমা, এলোকেশী, সৌদামিনী হরিমতী—নিজেরা সব বাড়ি গাড়ি করে ফেলেছে—সকলকারই একটি করে ডাক্তার আঁচলে বাঁধা আছে। বদরীবাবু তো তোমার কাছে দেবতা—তোমাকে উনি মা বলেন, মেয়ে বলেন—ঠিকই, তোমাকে সেই চোখেই দেখেন হয়ত—তাই বলে ওঁরও কি আর এসব দোষ নেই? কুসুমের এত বোলবোলাও কিসের? বড়লোকের বাড়ি ছাড়া যায় না, প্রসব করানোর ফী করেছে পঞ্চাশ টাকা। একটা আপিসের বড়বাবুর মাইনে। তা তোমার তো ওসব—'

আবারও থেমে যান পূর্ণবাবু। ইঙ্গিতপূর্ণ থেমে যাওয়া।

এ-ইঙ্গিত কিসের তা বুঝতে বাকী থাকে না হেমন্তর। এরকম স্পষ্ট ইঙ্গিতের আগেই সে বুঝেছে ওঁর মনোভাব। কণ্ঠ-স্বরের কসরতে, শব্দপ্রয়োগের কৌশলে, চোখের স্থির অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন পূর্ণবাবু। কোন বড় ডাক্তারটি কে সে সম্বন্ধেও সংশয়ের কোন অবকাশ দেন না।

হেমন্ত কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয়, 'না, আমার ওসব চলবে না। এত নীচেই যদি নামব—আমার এ ভাতটা দোষ করছে কি? সসম্মানেই দিদি রেখেছে আমাকে, আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে চাইতে হয়নি এক পয়সাও।...আর বেশ্যাবৃত্তিই যদি ধরব—তাহলে সোজাসুজিই তো খাতায় নাম লেখাতে পারি, রক্তপাঁজ ঘাটতে যাব কেন? ...আয়নায় মুখখানা নজরে পড়ে রোজই—এ-মুখের এ-চেহারার কত দাম উঠতে পারে বাজারে তাও আন্দাজ করতে পারি বৈকি! এখনই 'তু' করে ডাকলে পাঁচ হাজার টাকা সেলামী আর একশো দেড়শো টাকা মাইনে দিয়ে অনেক বাবু ছুটে আসবে।...আপনি এ-ধরনের কথা আমার কাছে আর কখনও তুলবেন না।'

কিন্তু এই রকম ছোটখাটো প্রত্যাখ্যান বা অপমানে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হবেন এত পাতলা চামড়া পূর্ণবাবুর নয়। তিনিও অনেক পোড় খেয়ে খেয়ে এত বড় হয়েছেন—গরীবের ছেলে আজ লক্ষপতি হয়েছেন। বাড়ি গাড়ি জুড়ি—ভাড়াটে বাড়ি অনেক কিছু করেছেন। তিনি জানেন সংসারে সহজে কোন ভাল জিনিস পাওয়া যায় না, তা পেতে গেলে ঠুনকো মান-অপমান জ্ঞান রাখাও উচিত নয়।

পূর্ণবাবু তারপরেও বহুবার এসেছেন। তেমনিই মিষ্টি ফল বিস্কুট হাতে করে এনেছেন। চা খেতে চেয়েছেন, তার সরঞ্জাম সব নিজে এনে পৌঁছে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন তৈরী করার কৌশল। ওর হাতের রান্না খেতে চান এমন আভাসও দিয়েছেন। আসল কথাটাও পাড়তে দ্বিধা করেননি। খুব মোলায়েমভাবে, অনেক স্তর আবরণ দিয়ে পেড়েছেন কথাটা। অপরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কোন ডাক্তারের কৃপায় কোন দাইয়ের কত আয় হচ্ছে, কে কখানা বাড়ি করল—তার কিছু সত্য কিছু কল্পিত বিবরণ শুনিয়েছেন সাড়ম্বরে।

ও'র প্রস্তাবে রাজী হ'লে যে হেমন্তর কোন অভাব থাকবে না, ছেলে মানুষ হবে, নিজে পায়ের ওপর পা দিয়ে সুখে কাটাতে পারবে, ছেলের আখেরেও উন্নতি হবে, চাই কি ডাক্তারী শিখলে বিলেতে গিয়ে বড় ডাক্তার হয়ে আসতে পারবে—ভবিষ্যতের এই উজ্জ্বল ছবিকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলতে কোন ত্রুটি করেন নি তিনি।

তবে তার আগে কোন সাহায্য করতে রাজী নন তিনি। এতটুকু উপকারও করেন না কখনও। হেমন্ত বহুবার বলেছে—উনি সবিনয় হাস্যে উত্তর দিয়েছেন, 'আমার কি ক্ষমতা, আমার হাতে উপায় থাকলে কি আর তোমার জন্যে করি না কিছু? আমি কোন পেসেন্টকেই কারও নাম সাজেস্ট করি না, যার যাকে খুশি নেয়।' ইত্যাদি—

হেমন্ত বলে বটে—তবে বলা যে বৃথা তাও জানে। জানে যে ও'র করুণা উদ্রেক করতে গিয়ে কোন লাভ হবে না। শিয়াল শকুনি যেমন জীবজন্তুর মৃত্যু টে'কে বসে থাকে, পূর্ণবাবুও তেমনি ওর চরম দুর্দশাই ঠিক ক'রে আছেন। উনি এটুকু বেশ বুঝে নিয়েছেন যে নিরুপায় নাচার হয়ে পড়লে তবেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার সম্ভাবনা।— উপকার করলে কৃতজ্ঞতায় প্রেমে পড়বে সে আশা বিশেষ নেই। বিশেষ ডবল কিম্বা আরও বেশী বয়সের একটা লোকের সঙ্গে।

হেমন্ত এই কারণেই লোকটাকে দেখতে পারে না।

স্বার্থপর, কামুক লোক। মরতে চলল বলতে গেলে, গাঙ্গপানে পা রয়েছে—তবু এখনও এত লোভ নারীমাংসের ওপর!

কিন্তু অত বড় লোকটাকে—এককালীন শিক্ষক—স্পষ্ট ক'রে 'আমার বাড়ি এসো না' একথাও বলতে পারে না। আকারে ইঙ্গিতে অনেক অপমান করেছে। উনি তো এমন কিছু বড়লোক নন—বড়লোক যাদের বলা যায় ধন্নুবাবুর কৃপায় তেমন দু-চারজনকে দেখেছে সে, যুকে জীবিকার জন্যে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়—আর যাই হোক তারা ধনীপদবাচ্য নয়, ধন্নুবাবুর অপরিচিত সেই অতি ধনীসমাজের বহু লোকই ওর জন্য লালায়িত, লুব্ধ, যদি ধরা দিতেই হয় তাদের কাছেই দেবে। বেচতে যদি হয় নিজেকে চড়া দামে বেচবে—এসব কথাই কোন না কোন ছলে পূর্ণবাবুকে শুনিয়ে দেয় সে। তিনি যে এসব কথা বুঝতে পারেন না তাও নয়, কিন্তু নির্বিকার থাকেন। সব অস্ত্রই তাঁর নির্লজ্জতার বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

পূর্ণবাবু জীবনের পাঠশালায় সার্থকতার যে দুটি প্রধানমন্ত্র শিখেছেন তা হ'ল ধৈর্য ও অধ্যবসায়। কোন কারণেই নিরাশ হ'তে নেই, হাল ছাড়তে নেই। প্রতিকূলতা যত দুর্লঙ্ঘ্যই মনে হোক, নিজের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তা লঙ্ঘন করবার, জয় করবার—এ তিনি ভালই জানেন।

সেই মন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ হ'লও তাঁর।

হঠাৎ কলকাতায় এক ভয়ঙ্কর ডেঙ্গু-জ্বরের প্রাদুর্ভাব হ'ল। সাধারণ জ্বর নয়—ম্যালেরিয়ার মতো রয়ে বসে মানুষের রক্ত শোষণ করে না। ঘরে ঘরে জ্বর, আর ঘরে ঘরে দু-চারজন ক'রে মরতে লাগল। প্লেগের মতো শহর উজাড় হয়ে গেল না ঠিকই—কিন্তু এতেও ত্রাসের সৃষ্টি কম হ'ল না। সকলেরই মুখে এক কথা, শ্মশানে আর জায়গা হচ্ছে না।

এর মধ্যে আগে পড়ল গোলাপী। গোলাপীর বাড়িসুদ্ধই প্রায়। মুখে জল দেবার কেউ নেই বলে হেমন্ত ছুটে গেল। ছেলেকে নিয়ে যায় নি, ঠিকে ঝি তাকেই দেখতে বলে গিয়েছিল। সারাদিন ওখানে থেকে সেবা ক'রে পথ্য খাইয়ে রাত্রের ব্যবস্থা ক'রে সন্ধ্যার পর যখন বাড়ি ফিরল তখনই কম্প শুরু হয়ে গেছে। রাত্রে আর জ্ঞান রইল না, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। সকালে ঝি এলে দোর খোলা পায় না—পাশের বাড়ির লোককে বলতে তারা ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে দেখল যে মা ছেলে দুজনেই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

ওরই মধ্যে কোন মতে চোখ খুলে বললে, 'দয়া করে তোমরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও আমাদের। ডাঃ বদরী দাসকে খবর দিলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই—'

আর কিছু বলতে পারল না। পাড়ার লোক ভয়ে বিশেষ কেউ ঘেঁষ দিল না। ঝিটারই দয়ার শরীর— সে খানিকটা সাবু করে মাথার কাছে রেখে গেল, সেই সঙ্গে এক ঘটি জল।

পাশের বাড়ির ছেলেটি মেডিকেল কলেজে গিয়েছিল অবশ্য, কিন্তু বদরীবাবুর দেখা পায় নি। তাঁরও নাকি জ্বর হয়েছে, তিনি আসছেন না। দৈবক্রমে, অথবা ও'রই ভাগ্যক্রমে পূর্ণবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হেমন্তবালা? মিডওয়াইফ? তাদের দুজনেরই জ্বর? তাই নাকি ঠিক আছে। খবর দিয়ে ভালই করেছ। মেনি থ্যাংকস্। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তার একজন শিক্ষক। আমি যাচ্ছি এখনই। দেখছি কি করা যায়।'

দেখলেনও তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলেন না। বড় ডাক্তার ডাকলেন, মোটা টাকা দিয়ে ভাল নার্স রাখলেন। ঔষধ-পথ্যে টেবিল ভরে গেল— যাকে বলে রাজকীয় চিকিৎসা তাই শুরু করে দিলেন। একটি ঝি পাঠাতেও ভুল হ'ল না—দিনরাতের ঝি।

ফলে যখন জ্ঞান হ'ল হেমন্তর, দেখল পূর্ণবাবু উদ্বিগ্ন মুখে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছেন। সে উদ্বেগ আন্তরিক —তাও বুঝল। এটুকু চেনার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে তার।

চোখ চেয়ে আরও দেখল। ছেলের মাথার কাছে নার্স বসে বাতাস করছে। ওষুধের শিশি আর পুরিয়ার বাক্সে একটা টেবিল ভরে গেছে। নতুন টেবিল—এটা ছিল না ওদের। বেদানা আঙুর প্রভৃতি মূল্যবান ফল একরাশ। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে পথ্য তৈরী করছে, ঝি ঘর মুছছে।

চিন্তাশক্তি রোগে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন। তবু—দুর্বল মস্তিষ্কেও ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বেশী দেরি হ'ল না। প্রচুর পয়সা খরচ করেছেন পূর্ণবাবু। এ যে পূর্ণবাবুরই আয়োজন—তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতা, তাও বুঝতে পারল। গোলাপীর বাড়িসুদ্ধ জ্বর—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই, ধন্নুবাবুও নাকি সেদিন

সকালে জ্বর গায়েই এসেছিলেন, ওদের দেখেই চলে গেছেন—আর আসতে পারেন নি, অন্তত হেমন্ত যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ আসেন নি, তারাই কে কেমন আছে কে জানে, সবাই সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠছে কিনা—তাদের পক্ষে এসে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় এত রাজকীয় সমারোহ করা সম্ভব নয়।

আবারও অবসন্ন ও ক্লান্তভাবে চোখ বুজল হেমন্ত।

খাঁচা বড়ই লোভনীয় হয়ে উঠেছে। যে ফাঁদে পড়েছে তা থেকে মুক্তির একটিই পথ খোলা আছে—সে হল এই খাঁচায় ঢোকার পথ। চোখ কান বুজে একবার ঢুকতে পারলে নিশ্চিন্ত। কিন্তু—

আর কোন 'কিন্তু' নেই, হার তো মেনেইছে—একমাত্র চিন্তা ছেলে। সেটাই বুঝি শেষ অবলম্বন, ওপক্ষের শেষ বাধাও।

দিন বারো বাদেই নার্সকে জোর করেই বিদায় দিল হেমন্ত, কিন্তু ঝি বা রাঁধুনীকে দিতে পারল না। ছেলেটা, যাকে বলে ঝি-ঝি করছে, এত দুর্বল, এতই রোগা হয়ে পড়েছে—উঠে দাঁড়াতে পারে না, চলতে গেলে পা বেঁকে যায়। নিজেরও হাঁটু দুটোয় কোন জোর নেই। এ অবস্থায় নিজে উঠে পথ্য তৈরী করার কথা ভাবাও পাগলামি।

পূর্ণবাবুর দয়ার দান নিতে হয়েছে, হচ্ছেও। এ পাওনা তিনি উশুল করবেনই—এর দাম, ষোল আনার ওপর আঠারো আনা—সুদসমেত।

হেমন্তরও যেন লড়াই করার ক্ষমতা কমে এসেছে। শরীরে শুধু নয়—মনে মনেও দুর্বল হয়ে পড়ছে। একটা কথা আজকাল ওর প্রায়ই মনে পড়ছে। ওর মেজ জা গল্প করেছিল তার ছেলেবেলার গল্প। বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু তখনও শ্বশুরবাড়ি আসে নি, সেই সময়কার কথা। ছেলেবেলায় সাঁতার শিখেছিল, খুব ভাল সাঁতার জানে বলে একটা অহঙ্কার ছিল মনে মনে। একবার ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে গেছে মায়ের সঙ্গে, সেটা ভাদ্রমাস, অত খেয়াল ছিল না, পুকুরে সাঁতার কাটা আর নদীতে সাঁতার দেওয়া এক জিনিস নয় তাও জানত না—জলে নেমে সাঁতার কাটার লোভ সামলাতে পারে নি। দু'চার হাত এগোতেই স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল—প্রবল টান, সে টান এড়িয়ে ঘাটে ফেরা তার ক্ষমতার বাইরে। তবু প্রাণের দায়ে প্রথম প্রথম প্রাণপণেই যুঝেছিল, তাতে তীরের দিকে আসতে তো পারলই না, বরং হাত ভেরে গেল, আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভাগ্যে ওর বড় দাদা সঙ্গে ছিলেন—তিনি খানিক পরে ওর অবস্থাটা বুঝতে পেরে এগিয়ে গিয়ে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে আনলেন। কিন্তু তার আগে একটা অদ্ভুত অবস্থা হয়েছিল ওর মেজ জায়ের। সেইটেই তাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল, সেই মনোভাবটা। হাত-পা ভেরে এসেছে ঠিকই—কিন্তু তখনও যে একেবারে লড়তে পারছে না বা খিল ধরে গেছে তা নয়—তবু সেই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিল, এত কান্ড করে বাঁচবার চেষ্টা করার দরকার কি? কী লাভ? ডোবাও তো মন্দ নয়, ডুবে গেলেই তো হয়—কোন হাঙ্গামা থাকে না আর। সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়...কোন ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়—জীবনের প্রতি বীতস্পৃহা নয়—অকারণেই মনে হয়েছিল কথাটা—এত লড়াই করার চেয়ে ডুবে যাওয়াই ভাল, অনেক শান্তি।

তখন বোঝেনি হেমন্ত এ মনোভাবটা, এখন বুঝেছে। বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করে ডোবার কথাটা। দৈহিক ক্লান্তি যেন মনেও ছড়িয়ে পড়ছে। আর পারছে না সে, আর পারবে না। কী দরকারই বা এত হাঙ্গামা করার—হাল ছেড়ে দিলেই তো হয়। নিশ্চিন্ত হতে পারে সে। এও এক-রকমের মৃত্যু, ডুবে মরাই—কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? কিসের জন্যে এত কাণ্ড করছে সে?...

আরও কিছুদিন পরে সে যখন পূর্ণবাবুকে ঝি আর রাঁধুনী ছাড়িয়ে দেবার কথা বলল, তখন তিনি কিছুক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু এর কি খুব দরকার আছে হেমন্ত? মিছিমিছি এত কষ্ট করার? তুমি একটু দয়া করলেই তো আর কাউকে ছাড়তে হয় না।'

আজ আর জ্বলে উঠল না হেমন্ত, তার দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল না। কথাটা না বোঝারও ভান করল না। পূর্ণবাবু যতক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন হেমন্তও চোখ নামায় নি বা অন্যদিকে মুখ ফেরায় নি, ও'র চোখের ওপরই নিজের দৃষ্টি স্থির রেখেছিল—যেন পড়তে চেষ্টা করছিল ও'র মনের কথাগুলো—বৃথা লজ্জা বা সঙ্কোচ করেনি।

সে যে ও'র কথা বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে তা গোপন করার কোন প্রয়োজন বোধেনি।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীতে ঘরানার বিবাদ

মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী

সংগীত জগতে 'ঘরানা' শব্দটি অতি পরিচিত। ঘরানা বলতে একটি বিশেষ জায়গায় প্রচলিত অথবা ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত সংগীতের রীতি বা 'স্টাইল' বলা যেতে পারে; এবং এই স্টাইল বা রীতি একটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। এই জন্য ঘরানাগুলির নামকরণ কোন ব্যক্তি বা জায়গার নামানুসারে হয়ে থাকে।

সংগীতজগতে বিভিন্ন ঘরানার বিবাদ বহুকাল ধরে চলে আসছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে বংশপরম্পরায় সেই বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকাশ্য সংগীত সভাতেও এই বিবাদের চরম রূপ দেখা গিয়েছে। শিল্পের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিযোগিতা যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ তা বেশ উপভোগ্য হয়; কিন্তু যখন পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপ, গালাগালি এমন কি হাতাহাতি শুরু হয়, তখন তা অসহনীয় মনে হয়। এই বিবাদ নিতান্তই অর্থহীন। শিল্পীরা এটি (বিবাদ) পৈতৃক সম্পত্তির মত বংশ পরম্পরায় রক্ষা করে আসছেন এই বিবাদের কারণটি সঠিকভাবে না জেনেই। এর ফলে পরস্পরের প্রতি তিক্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিল্পের প্রসারও ব্যাহত হয়েছে।

ঘরানার উৎপত্তি কেমন করে হল এবং কেনই বা বিবাদের সৃষ্টি হল তার একটি সমীক্ষা করা যেতে পারে। এখন ঘরানা বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রাচীনত্ব পঞ্চাশ থেকে একশ বছরের মধ্যে। তবে প্রাচীনকালে যে ঘরানার প্রবর্তন ছিল না এ কথা বলা যায় না। ঠিক এই শব্দটি এত সংকুচিত অর্থে ব্যবহৃত হত না। অনেক ব্যাপক অর্থে এর প্রয়োগ ছিল। ভরত, নন্দীকেশ্বর, কোহল, নারদ, মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব এ'রা এক একজন প্রখ্যাত সংগীত-শাস্ত্রকার ছিলেন এবং বলা যেতে পারে এ'দের শিল্পকলাও বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। আধুনিক যুগের পরিভাষা অনুসারে এ'দেরও এক একটি ঘরানার প্রবর্তক বলা যেতে পারে। একটু অনুধাবন করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ভরত শিল্পে প্রথম রসসূত্রের প্রবর্তন করেন। ভরত 'রসসূত্রের' প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে আলোচনা করে তার ওপর আলোকপাত করেছেন। একজন যতটুকু অগ্রসর হয়েছেন আলোচনায়, আর একজন তার থেকে আরও অগ্রসর হয়েছেন। এইভাবে তাঁরা যুগে যুগে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে গিয়েছেন। ভরতের রসসূত্রের ওপরই মাতৃগুপ্ত, উদ্ভট, লোল্লট, শংকুক, ভট্টনায়ক, হর্ষ, কীর্তিধর, অভিনব গুপ্ত অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন।—অভিনব গুপ্ত রসসূত্রের ব্যাখ্যার শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছেন। এ'রা ভরতের অনুগামী হলেও অপরকে অশ্রদ্ধা করেন নি, বরং প্রয়োজন হলে অপরের উদ্ধৃতি তুলে তার সমালোচনা করেছেন।

নাট্যশাস্ত্র আছে যে, ভরত তাঁর একশত পুত্রকে এই বিদ্যা (নাট্য) শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে কোহল ছিলেন ভরতের পুত্রস্থানীয় ও শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। ভরত কোহলকেই উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। এইভাবে ভরতের উত্তরাধিকারীরা একটি রীতি বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একটি School এর সৃষ্টি করেছিলেন। নন্দীকেশ্বরও একটি School -এর সৃষ্টি করেছিলেন। এ'রা দুজনেই দুটি বিশেষ রীতির প্রবর্তন করেছেন—যে দুটি রীতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। সকল শিল্পই যে রস-সমন্বিত হওয়া দরকার এ কথা আচার্য ভরত বার বার বলে গিয়েছেন। অপর পক্ষে নন্দীকেশ্বর নাট্যের আঙ্গিকের দিকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরবর্তীকালে অনেক সংগীতশাস্ত্রকার আচার্য ভরত ও নন্দীকেশ্বরের দুটি ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন। তার জন্যে কোথাও কোন বিরোধের সৃষ্টি হয়নি। এই প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। শার্ঙ্গদেব নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণ দুটিকেই অনুসরণ করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি যুগধারাকে অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ তৎকালিক প্রচলিত রীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভরত, নন্দীকেশ্বর, কোহল, মতঙ্গ—এ'রা নাট্যজগতকে তাঁদের অবদানের দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্ট করেছেন। প্রত্যেকেই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তার ফলে কোন বিবাদের সৃষ্টি হয়নি। সকলেই আচার্য ভরতকে নাট্যগুরু বলে স্বীকার করেছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীনকালে নাট্যগুরুরা যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব মতবাদ ও নিজস্ব সৃষ্টিকে প্রচার করেছিলেন। এর ফলে শিল্পে যে যে রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল, তা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছিল। সুতরাং

...দাদীন মহারাজ

নবাবের সংগীতসভা
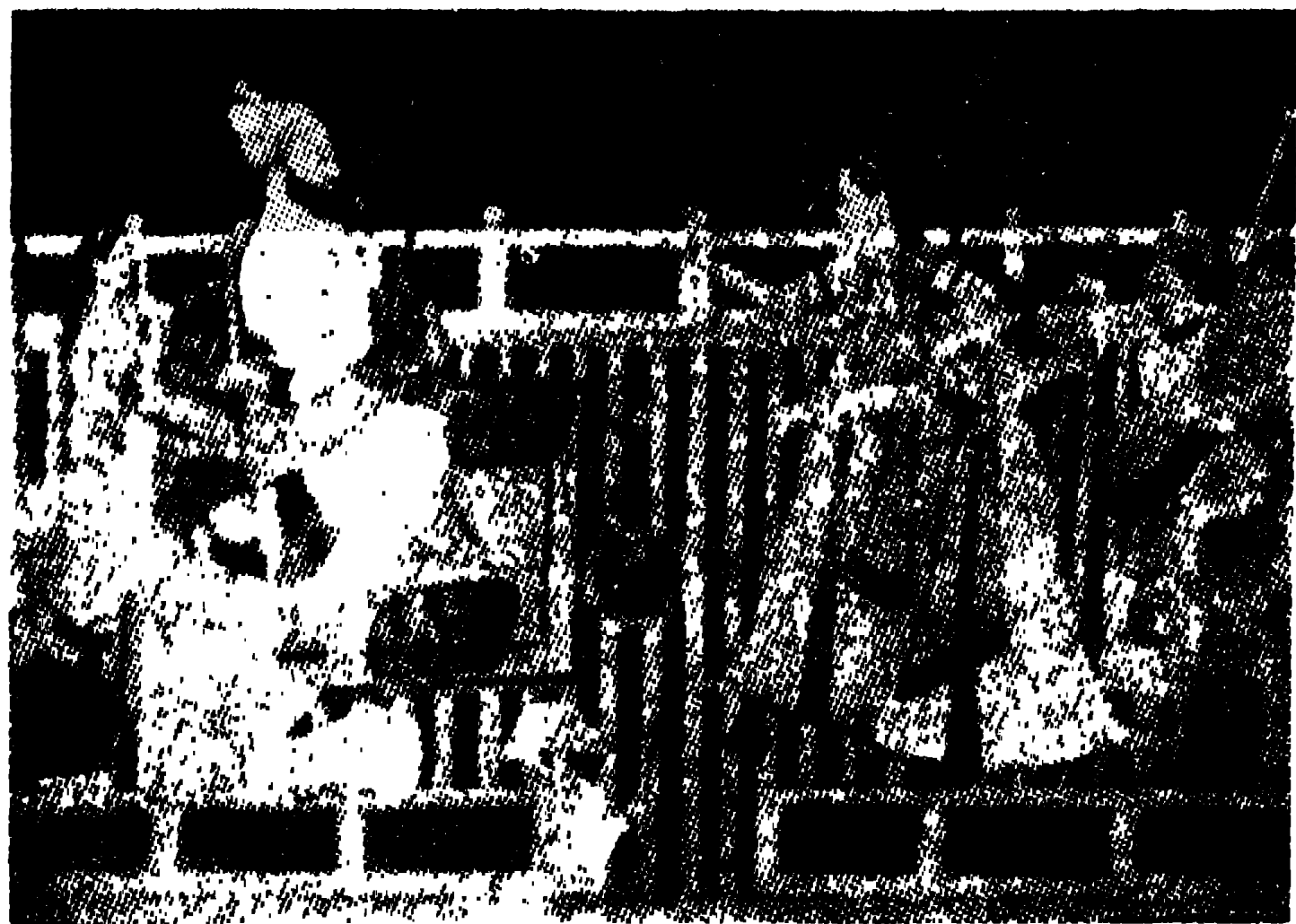
বলা যায় যে, এই 'ঘরানা' প্রথাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে তা এত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত না।

ব্যাপক অর্থে এই প্রথা ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই স্থানবদ্ধ দূষিত জলাশয়ের মত শিল্পের গতি কখনই ব্যাহত হয়নি। বরং স্বচ্ছ জলধারার মত এগিয়ে গিয়েছে। এই কারণেই মধ্যযুগের সঙ্গীতশিল্পের সঙ্গে প্রাচীনযুগের সঙ্গীতশিল্পের যোগসূত্র থাকলেও বহুল পরিমাণে তার রূপের পরিবর্তন হয়েছিল। অবশ্য নানা কারণে মধ্যযুগের শেষভাগে শিল্পকলা ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য মধ্যযুগের শেষভাগকে সঙ্গীতজগতের 'অন্ধকার' যুগ বলা যেতে পারে। কারণ দেশী ও বিদেশী শক্তির সংঘাতে সঙ্গীত কোন অতলে তলিয়ে গিয়েছিল তার সন্ধান পাওয়াই কঠিন।

নব্যযুগের সূচনাতে বড় বড় রাজা-মহারাজাদের আনুকূল্যে নির্বাসিতা সঙ্গীতদেবী আবার আবির্ভূতা হলেন। এই সময় থেকে 'ঘরানা'র বীজ উপ্ত হয়। এই সকল রাজা-মহারাজারা প্রতিভাধর গুণী শিল্পীদের বেতন দিয়ে নিজেদের সভায় আবদ্ধ রেখে সভা অলংকৃত করতেন। এঁদের অনেক রকম সখ ছিল। এঁরা অনেক সময় বিভিন্ন রাজ্যের গুণী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করাতেন। —এঁরাই এই প্রতিযোগিতার ব্যয়ভার বহন করতেন। শিল্পীদের শিল্পকলার যথাযোগ্য মর্যাদাও দিতেন। তবে নিজ রাজ্যের বেতনভুক শিল্পীদের সঙ্গে নিজের ঐশ্বর্য ও মর্যাদার প্রশ্নটি জড়িত থাকত। কারণ শিল্পীদের পরাজয় রাজ্যের পরাজয় বলে গণ্য হত। এর ফলে শিল্পীরা নিজ নিজ রাজ্যের পূর্ণ সমর্থন লাভ করতেন এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অনেক সময় তাঁরা শিল্পজনোচিত মনোভাব ত্যাগ করে বিবাদের রাস্তা গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। কখনও কখনও নিজেদের সম্মান রক্ষার্থেও এই বিবাদের সৃষ্টি হত। এই বিবাদ উত্তরাধিকারী সূত্রে শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যেও ভীষণ আকার ধারণ করত। এটি বিবাদের মূল কারণের মধ্যে অন্যতম।

'ঘরানা' সৃষ্টির কারণটি এক্ষেত্রে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসের দিকে পশ্চাদবলোকন করলে

কালিকা বা কালকা মহারাজ

দেখা যায় যে, মানুষ যুগে যুগে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নানা আয়োজন করেছে। তার মধ্যে শিল্প হচ্ছে অন্যতম। বংশসৃষ্টি হচ্ছে প্রধান আয়োজন। শিল্পের মধ্যে দিয়েও এই বংশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছে। প্রত্যেক শিল্পীই নিজের শিল্পকলাকে মহাকালের হাত থেকে রক্ষা করতে চান। সেইজন্য নিজের সৃষ্টিকে তাঁরা তাঁদের শিষ্যপরম্পরার মধ্যে প্রতিফলিত করে অমর করতে চান। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, সাহিত্য শিল্পীর অনুপস্থিতিতে মহাকালকে অতিক্রম করে শিল্পীর পরিচয় বহন করতে পারে। কিন্তু সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করে। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে সবকিছুই সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এ সুযোগ-সুবিধে ছিল না। এই কারণে এইসব সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা নিজের সৃষ্টিকে শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যে চলে কঠোর সাধনা। এই সাধনার দ্বারাই নৃত্য ও সঙ্গীতকে অনন্য করে তোলা হত। শিল্পগুরুরা শিক্ষার দ্বারা ও সাধনার দ্বারা নিজের সৃষ্টি ও ভাবধারাকে শিষ্যদের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত করে দিতেন। নিজের শিল্পবৈশিষ্ট্যকে শিষ্যদের মধ্যে প্রতিভাত করে তুলতেন। এর ফলে শিল্পের মধ্যে সৃষ্টি হত বিশেষ রীতি বা 'স্টাইল' যাকে 'ঘরানা' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই ঘরানার মাধ্যমেই শিল্পী তাঁর শিল্প বৈশিষ্ট্যকে মহাকালের দৃষ্টি এড়িয়ে যুগযুগান্ত বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে প্রচারের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তা বিবাদের পন্থা।

ঘরানা বিবাদের সৃষ্টি এই সময় থেকেই শুরু হয়। কারণ পরবর্তী শিষ্য সম্প্রদায় নিজ ঘরানার বৈশিষ্ট্য রক্ষায় এত দৃঢ়-সংকল্প ছিলেন যে সাধারণ শিষ্টাচারগুলিও তাঁরা ভুলে যেতেন। নিজেদের ঘরানাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য অনেক সময় অপরপক্ষের সঙ্গে বিবাদে রত হতেন। এর ফলে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল আজও তার শেষ হয়নি।

বিবাদের আরও একটি মূলগত কারণ এখানে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ধর্ম কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও সক্রিয়ভাবে বিবাদের ইন্ধন জুগিয়েছে। মধ্যযুগের শিল্পের প্রতিটি শাখা ও সাহিত্য ধর্মভিত্তিক ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টির মধ্যেও নিজ নিজ ধর্মের প্রভাব পড়ত। যিনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী তিনি শিল্পের মধ্যে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকেই ব্যক্ত করেছেন। যিনি শাক্ত তিনি শিল্পের মাধ্যমে শক্তির উপাসনা করেছেন। আবার যিনি ইসলামধর্মাবলম্বী তিনি শিল্পের মধ্যে আল্লাকেই পেয়েছেন। অনেক সময় সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের ফলে এক সম্প্রদায়ের শিল্পী অন্য সম্প্রদায়ের শিল্পীকে সহ্য করতে পারেন নি। এর ফলেও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাব শিল্পের ওপরও পড়েছে। এই বিবাদের ফলে শিল্প হয়ে পড়েছে গৌণ এবং ধর্ম হয়েছে প্রধান।

ঘরানার বিবাদের প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে কত্থকনৃত্যের দুটি ঘরানার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে. এ দুটি ঘরানা হচ্ছে লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর ঘরানা। এ ছাড়া আর একটি তৃতীয় ঘরানার উল্লেখ পাওয়া যায়। এটির নাম 'বেনারস' ঘরানা। এই ঘরানাগুলির মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে। তিনটি ঘরানারই তিনরকমের বৈশিষ্ট্য আছে এবং তিনটিতেই প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের আবির্ভাব হয়েছে। এব একজন শিল্পী তাঁদের শিল্প প্রতিভায় ঘরানাগুলিকে ভাস্বর করে তুলেছেন. তবুও বিবাদের অবসান হয়নি। লক্ষ্ণৌ ঘরানা ভাব বা অভিনয় প্রধান, জয়পুর ঘরানা তালপ্রধান এবং বেনারস ঘরানা আঙ্গিক প্রধান। প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক। লক্ষ্ণৌ ঘরানায় অভিনয়ের ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে গীত-ভজন-ঠুংরীর যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। জয়পুর ঘরানায় তালের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে নানা ধরনের 'তোড়া টুকরা' শোনা যায়। বেনারস ঘরানায় আঙ্গিকের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে ব্যায়ামসুলভ অঙ্গাভিনয় দেখা যায়। এর ভালোমন্দের বিচারের ভার

লক্ষ্ণৌ ঘরানার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শম্ভু মহারাজ

দর্শকদের নিরপেক্ষ মতামতের ওপরই ছেড়ে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, শিল্পীরাই দর্শকদের মতামতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এখন এ ধরনের বিবাদের কোন সার্থকতা নেই। কারণ এখন সে রাজাও নেই, সে রাজ্যও নেই অথবা সে যুগও নেই। নৃত্য বা সঙ্গীতশিল্প মুষ্টিমেয় কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের আর করতলগত নয়, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পীর মধ্যেও আবদ্ধ নয়। এখন জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিল্পের প্রসার হয়েছে। সুতরাং এখন শিল্পীদের এই রক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ করাই শ্রেয়। এখন পরস্পরকে বোঝা ও শ্রদ্ধা করার সময় এসেছে! তা না হলে শিল্পের প্রসার প্রতি পদক্ষেপেই ব্যাহত হয়ে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যাবে। সুতরাং শিল্পের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলার জন্যে চাই ভাববিনিময়। এইভাবে শিল্পের মানকে আরও উন্নত করতে হবে। নৃত্যের ক্ষেত্রে এ কথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নৃত্যে ঘরানার বিবাদ একটি দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে, এখনও এর অবসান হয়নি। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সকল বিভেদ এবং বিবাদ ভুলে নৃত্যশিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, তবেই এই শিল্পকলা কালকে অতিক্রম করে টিঁকে থাকতে পারবে।

ধাত্রী

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

যশোদার আর সহ্য হয় না। এতকাল কষ্ট পেয়েছে পেটের জ্বালায়, কি বাপের ঘর কি সোয়ামীর কুঁড়ে তার কাছে সবই সমান। সব জায়গায় ভাতের অভাব। সে কষ্টও এখন সহ্য হয়, খুব গায়ে লাগে না কিন্তু এ যন্ত্রণা এর তুলনা নেই। সমস্ত শরীর দেহ-মন, চিন্তা-চৈতন্যকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে এক ক্ষুদে দানব জঠর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অন্ধকার থেকে আলোয়। একজন আলো চায় অন্যকে মৃত্যু-আঁধারে ঠেলে দেবার জন্য। যশোদা ছটফট করে। তার ছটফটানি দেখে একমাত্র সঙ্গী বাঘাও একবার উঠছে, বসছে আবার হাই তুলছে কখনও ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করছে। আসলে বাঘাও পেটের জ্বালায় কাঁদছে। যশোদার মতো সেও খেতে পায়নি কদিনই।

এই মুহূর্তটা হঠাৎ ভাল লাগে যশোদার। এখন যন্ত্রণাটা বেশ কিছুটা কম। এই সময় মনে হয় কেশবেরও যদি চিন্তা কমে কি ভালই না হয়। লোকটা চিন্তা-ভাবনায় সারা হয়ে গেল। দুদিন শুধু জলের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেশ বসে থেকেছে উদ্ধার করতে আসবেই কেউ। একখানা নৌকার দেখা পেলেই হয়। আশ্চর্য, দুদিন ধরে জনমানিষ্যির সাক্ষাৎ নেই। যেন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তাবৎ লোকজন।

—হো-ও-ও-ও-ও মাজি ভাই-ই-ই-ই—কেশব সিং মাচার ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করেছে উদ্ধারের আশায়। তার চিৎকার নিস্তরঙ্গ ঘোলা জলের ওপর দিয়ে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়েছে এপার থেকে ওপারে। কেউ সাড়া দেয়নি। শুধু ক্রুদ্ধ গর্জনে অশান্ত ঢেউ সাপের ছোবলের মতো নদীর সামান্য জেগে থাকা পাড়ে আছড়ে পড়েছে অশ্রান্ত বেগে আর তার ফলে ভেঙে পড়েছে বিরাট চ্যাঙর নিয়ে পাড় বিকট শব্দে। বুঝি ব্যঙ্গ করে জবাব দিয়েছে কেশব সিংকে তার আকুল প্রার্থনায়। না, বাঁচার আশা নেই। কেউ নেই উদ্ধারের —উঃ বাবাগো মাগো, মলাম আমি, আর যে পারিনে বাথায় ককিয়ে উঠেছে যশোদা।

বুদ্ধি করে কেশব সিং জল ঘরের কানায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের খুঁটির ওপর বাবারি দিয়ে এই মাচাটা বানিয়েছিল মজবুত করে। তারপর রান্নাঘরের তাল-পাতার ছাপরাটা এনে বসিয়েছিল ওর মাথায়। এখন সেই উঁচু মাথাটা বাঁচিয়ে দিয়েছে তাদের। জলে ডুবে মরেনি এখনও তারা।

—ও বাবাগো! আর সহ্য হয় না গো! মেরে ফেলল আমায়! উঃ—উঃ—

অসহ্য আর্তনাদে পাগল করে তোলে কেশবকে। এই আসন্নপ্রসবা যশোদাকে নিয়ে কি করবে সে। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ধাই। অবিশ্যি তাদের ঘরে ছেলেমেয়ে হতে ওসব কিছুই লাগে না। আপনা-আপনিই হয়। পরমায়ু থাকলে বাঁচে নয়তো মরে। মা আর বাচ্ছা দুইই—কখনও একজন। কিন্তু কেশব চায় না তার বউ যশোদা মরুক বা তার প্রথম সন্তান যে আসছে সে পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়েই চলে যাক পৃথিবী ছেড়ে।

—মাজি ভাই-ই-ই-ই, হো-ও-ও-ও-ও! আমাদের বাঁচাও—ও-ও-ও—

কেশব সিং আবারও সাহায্যের আশায় প্রার্থনা জানাল সভ্য মানবসমাজের কাছে। আকাশ বাতাস চন্দ্র তারকা দশ দিকের দশ দেবতার উদ্দেশে। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। যে মানুষ গর্ব করে, তারাই বুদ্ধ চৈতন্য যীশুর উত্তরাধিকারী, মানুষকে উদ্ধারের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ, তারা কেউ এগিয়ে এল না বিপন্নকে বাঁচাতে। বরং আরো কয়েক হাজার কিউসেক বাঁধের জল ছেড়ে দিল কেশব সিংদের উদ্দেশে।

—ঘেউ—উ-উ-উ, ঘেউ ঘেউ—

কেবল কেশব সিং-এর আর্ত চিৎকারের জবাব দিল বিপদের একমাত্র সঙ্গী প্রভুভক্ত কুকুর বাঘা। ভয় নেই—আমি আছি শেষ পর্যন্ত! আমি তোমার অনাহারের সঙ্গী, মরণেরও সাথী।

সত্যিই কুকুরটাই ভরসা। কেশব সিং কোন উপায় না দেখে অকূল সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হল। সাঁতার কেটে দেড় দু মাইলের সমুদ্র পার হয়ে যাবে ডাঙায়, লোকালয়ে যেখানে মানুষ বাস করে। যে মানুষ বিপন্নকে বাঁচাবার জন্য অজস্র হিসাব-নিকাশ প্ল্যান পরিকল্পনা, সৈন্য সম্পদ হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছে উদ্ধারের মহান ব্রতে নিজেরাই নিমজ্জিত হয়ে।

—বাঘা, তুই আমার যশোকে দেখিস, আমি দেখি ড্যাঙায় গিয়ে নৌকো যোগাড় করে আনতে পারি কিনা!

—অ্যাউ—উ—, অ্যাউ—উ—উ—করে বাঘা লেজ নেড়ে ভরসা দিল মনিবকে। সে অন্তত মানুষের মতো তার যশোকে ডুবিয়ে মারতে বা না খাইয়ে মারতে চেষ্টা করবে না।

—উঃ, মলামগো! তুমি কোতায় যাচ্ছো আমাকে ফেলে! আমাকে গলা টিপে মেরে রেখে যাও না! উঃ—মাগো!

—তুই ভয় করিসনে যশো! আমি যাবো আর আসবো! নৌকো না পেলে কিছু খাবার দাবার ওষুদ না আনলে বাঁচবি কি করে!

—মাগো! তুমি এই স্রোতে পাতার সাঁতরে যাবা কেমন করে? মানুষে পারে

না কি এই ভীষণ বন্যায় সাঁতার দিতে! দেকচ না জলের ভীষণ ডাক, কি কল-কলানি!

—তা হোক তা নইলে শুকিয়ে মরতে হবে একদম। দু-দিন পেটে কি পড়েচে বল! কত আর না খেয়ে থাকা যায়? তা ছাড়া যেজা আসবে আমাদের ঘরে তার কথাভা ভাবতে হবে না!

হঠাৎ যেন ব্যথাটা কমে গেল যশোদার। সে আসছে। তাদের বুক নিঙড়ানো সাত রাজার ধন। তারা থাকবে না একদিন। থাকবে তাদেরই রক্তমাংসে গড়া ঐ বংশধর। সত্যিই তো বাঁচাতে হবে তাকে। যে আসছে! শুধোবে কেশবকে? কি বলে মানুষটা!

—এই শোন!

এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যশোদার কণ্ঠে বসন্তের সুর শুনে চমকে উঠল কেশব। এই মাত্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল যে মেয়ে, হঠাৎ সব ভুলে সেই মেয়েই মিস্টি গলায় ডাক দিল।

—কি বলবি বলো!

—আরো কাছে এসো না!

—কি!

যশোদা ফিক করে হাসল একটু। শুকনো রক্তহীন মুখটায় হঠাৎ এক ঝলক রক্ত এলো কোথা থেকে। তারপর ফিস ফিস করে বাতাসের কান বাঁচিয়েই যেন বলল—বল দিকিন খোকা না খুকী?

—তুই কি চাস বল তো বউ! চারদিকের অথৈ জল সমুদ্রের মাঝে ডগায় বাঁশের মাচায় বসে ক্ষণেকের জন্য পরিবেশ ভুলে এক সৃষ্টিশীল দম্পতির ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হল আর তখনই বিকট শব্দ করে পাড়ের ওপর যে বাঁশ ঝাড়টা নদীর জলে শিকড় ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছিল সারা শরীরটা থরথর করে কাঁপিয়ে সেটা ভেঙেগ পড়ল জলে। তার আঘাতে নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ উঠল উত্তাল-পাত্তাল। সেই ঢেউ এসে দোলা দিল এদের মাচাকে। কেঁপে উঠল যশোমতী। বুকটা দমে গেলে কেশব সিং-এর ক্ষণেকের জন্য। কিন্তু মুনিশ-খাটা চওড়া বুক আর পেশীবহুল শরীরটা চাংগা হয়ে উঠল তখনই। মনটাও সেই সংগে। যে আসছে তাদের ঘরে তাকে বাঁচাতে হবে না?

—গেলাম রে যশো! ঝপ করে শব্দ উঠল কেশব সিং-এর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার। পরনে একটা ছোট্ট গামছা আর মাথায় ধুতিটা পাগড়ি করে জড়িয়ে নেওয়া মানুষটা স্রোতের টানে এগিয়ে চলল লোকালয়ের দিকে।

—ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ— কুকুরটাও সংগে সংগে ডেকে উঠল চিৎকার করে মনিবের অমংগলের আশংকায় না পেটের জ্বালায় কে জানে!

যশোদা শুধু চমকে উঠল একবার। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হল। বিপুল স্রোতের সাথে দু মাইলের কোথাও উত্তাল কোথাও শান্ত সমুদ্র পার হয়ে ঐ মানুষটা তাকে আর তার যে সন্তান আসছে বাঁচাতে পারবে? যদি না পারে, যদি কিছু হয়ে যায়! এই বন্যার মাঝে তাহলে কি হবে? দু মাইলের মধ্যে কোন মানুষ আছে কি! সবাই আগে আগে ঘর ছেড়েছে। ঐ শুধু পড়ে আছে তার একঘর।

—বাগা, বাগা—আয়-আয়! তু-তু বাঘা একদৃষ্টে বাবলা গাছটার দিকে চেয়েছিল! জল পড়ছিল টস টস করে জিভ দিয়ে। কুকুরটা বাবলা গাছের মাথায় দেখছিল একটা কাঠবিড়ালীকে। বানের শুরুতে আশ্রয় নিয়েছিল আর পালাতে পারেনি। সেটাকে যদি বাঘা কোনরকমে নাগালের মধ্যে পায় তবে কয়েকদিনের উপবাস ভঙ্গ করতে পারে।

যশোদার ডাকে বাঘা নড়ল না, শুধু যশোদার দিকে চেয়ে লেজ নাড়ল। একটু কুঁই কুঁই শব্দ করল খিদের জ্বালায়, কয়েক হাত দূরেই বাঘার খাবার কিন্তু উপায় নেই। স্রোতের বিপুল বেগ দেখে বাঘাও ভীত সন্ত্রস্ত। সাঁতরে যাবার সাহস নেই। গেলেও গাছের ডগায় বসে থাকা কাঠবিড়ালী মুখে নেমে আসবে না।

সেইদিকে চোখ গেল যশোদার। আশ্চর্য! বাবলা গাছটায় এ কদিনে চোখ পড়েনি। যত রাজ্যের পিঁপড়ে আশ্রয় নিয়েছে ওখানে। গাছের সবুজ ডালগুলো কালো হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার পিঁপড়ের গায়ের রঙে। শুধু পিঁপড়ে নয় একটা সাপও এদিকের ডাল আশ্রয় করে জড়িয়ে পড়ে আছে মরার মতো। হয়তো বিষাক্ত সাপ। হিংসা ভুলে কাঠবিড়ালীর পাশে বিপদের মাঝে শান্ত হয়ে সহ-অবস্থান করছে।

—হো-ও-ও নৌকো ও-ও-ও-! হো-ও-ও-ও।

দূরের একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে এল যশোদার কানে। যশোদা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। কে কাকে ডাকে। তার ঘরের মানুষ নাকি। উঠে দেখতে গেল আর চিৎকার শোনা যায় না। শুধু একবারই। তারপর নিশ্চুপ। শুধু বন্যা-স্রোতের কল-কল শব্দ। অবিশ্রান্ত গতিতে বন্যার জল ছুটে চলেছে। হলদে হলদে ফ্যানার মুকুট পরে। কোথা থেকে ভাসিয়ে আনছে কচুরিপানা। একটা বাছুর ভেসে যাচ্ছে! আহা রে! কচি বাছুরটা মরে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

যশোদা উঠে দাঁড়াল। আর সংগে সংগে মাথাটা ঘুরে গেল। সারা শরীর যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেগ পড়ল। চিৎকার করে ডাকতে চাইল কাউকে। ডাকতে পারল না। এতক্ষণ যে ব্যথায় মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছিল তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বসে পড়ল যশোদা। অসহনীয় আর বাঁচবে না। ওঃ! একি ভীষণ কষ্ট। দম বন্ধ হয়ে আসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে সব। সব অস্পষ্ট হয়ে এল ধীরে ধীরে।

যশোদা একপাশে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে। তার কোলের কাছেই সদ্যোজাত শিশু পৃথিবীতে এসেই তীক্ষ্ণ কন্ঠে কাঁদতে শুরু করেছে। এ পাশে থাবা গেড়ে বসে বাঘা। জিভ তার ঝুলে পড়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নবজাতকের দিকে। জল পড়ছে টস-টস করে জিভ দিয়ে!

বাঘা এগিয়ে গেল। চারপাশে চাপ চাপ রক্ত। বাঘা মুখ লাগাল রক্ত লেহনে। রক্তের স্বাদ পেয়েছে ক্ষুধার্ত পশু। কাছেই রক্ত-মাংসের পিন্ড। বাঘার জিভে জল পড়ছে বেশী করে। আরো এগিয়ে গেল। জিভের জল পড়ছে নবজাতকের গায়ে মাথায়।

ধারাল তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো সক্রিয় হবার জন্য উন্মুখ হল। দু ফোঁটা লালা ঝরে পড়ল যশোদার ছেলের গায়ে মাথায়। তারপর অকস্মাৎ ক্ষুধার্ত পশু মাংসপিন্ডটাকে ছিন্নভিন্ন করার বদলে তার পাতলা সরস জিভ দিয়ে চেটে চেটে অঙ্গ মার্জনা শুরু করল ঠিক যেমন করে ধাই-মা সদ্যপ্রসূত সন্তানের দেহটা পরিষ্কার করে দেয় তার কুশলী হাতের সযত্ন সেবায়।

কারিতা — পুরুলিয়ার মুখোস প্রদর্শনী — কারিতানী
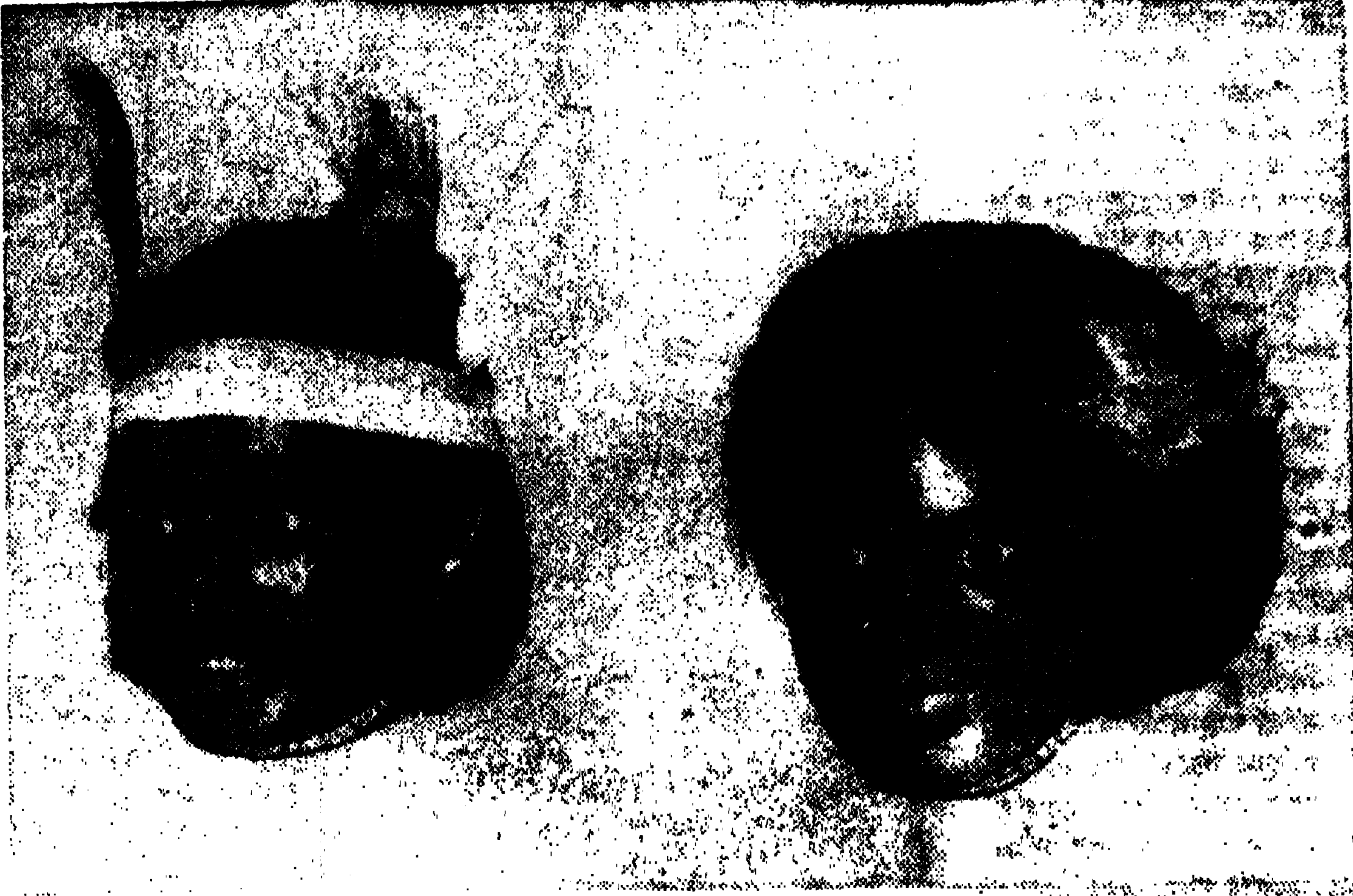
প্রদর্শনী

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট বোর্ড-এর উদ্যোগে ওড়কোর্ট হাউস স্ট্রীটের রিজিও-ন্যাল ডিজাইন সেন্টারে পুরুলিয়ার ছৌনৃত্যের মুখোশের একটি সুন্দর প্রদর্শনী ২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল।

পুরুলিয়ার বর্তমানে প্রায় ত্রিশটি পরিবার এই মুখোশ নির্মাণের কাজ করে। লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে এগুলির গুরুত্ব অনেকখানি। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যান হল ছৌ নৃত্যের বিষয়বস্তু। এই চরিত্রগুলি অভিনয়ের জন্য চরিত্রানুগ মুখোশ সৃষ্টি করা হয়। প্রদর্শনীতে প্রায় দেড় শতাধিক মুখোশ রাখা হয়েছিল এবং বিক্রয়ের জন্য আলাদা কাউন্টার রাখা হয়। রাম, রাবণ, সীতা, দুর্গা, শিব, হনুমান, রাক্ষস, গোঁফওগা, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, ভীষ্ম ইত্যাদি বহু চরিত্রের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত মুখোশ এখানে সাজানো হয়। শান্ত মূর্তির চাইতে ভয়ানক মূর্তি রচনাতেই দেখা গেল পুরুলিয়ার লোকশিল্পীদের দক্ষতা বেশী। গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে মুখোশগুলি অনেকের কাছেই যে সমাদর লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই:

মহাদেব
(পুরুলিয়ার মুখোস প্রদর্শনী)

ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে ছয়জন ভাস্করের ষোলখানি ছোট মাপের ভাস্কর্যের প্রদর্শনী ১৯ থেকে ২৫ নভেম্বর অবধি অনুষ্ঠিত হল। সমরেশ চৌধুরী ছোটমাপের ধাতুর টুকরো সাজিয়ে দুটি কনস্ট্রাকশন উপস্থিত করেছেন। মাধব ভট্টাচার্য জ্যামিতিক পরিচ্ছন্নতায় কাঠের তিনখানি কাজ উপস্থিত করেন। দুটি বাদ্যযন্ত্রের আমেজ বহন করে তৃতীয়টি আজকের দিনের মাৎস্যন্যায়ের অবস্থার প্রতীক। বিপিন গোস্বামীর শায়িত ফিগারের মধ্যে একটা গতিময়তা অনুভব করা যায়। শঙ্কর ঘোষের ছন্দ কাজটির রমণীদেহের ফর্ম বেশ আবেদনময়। উমা সিদ্ধান্তের দীর্ঘকায় দুটি কম্পোজিশন তেমন উৎসাহজনক লাগল না। তবে শর্বরী রায়চৌধুরীর তিনটি কাজই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তিন ধরনের কাজ পাখি ও জন্তু কাজ দুটি সরলীকরণ ও অ্যাবস্ট্রাকশন ঘেঁষা এবং আলাপরত বড়ে গোলাম আলির প্রতিকৃতিটির বলিষ্ঠতা চমকপ্রদ বলা যায়। অত্যন্ত সুসজ্জিত প্রদর্শনী।
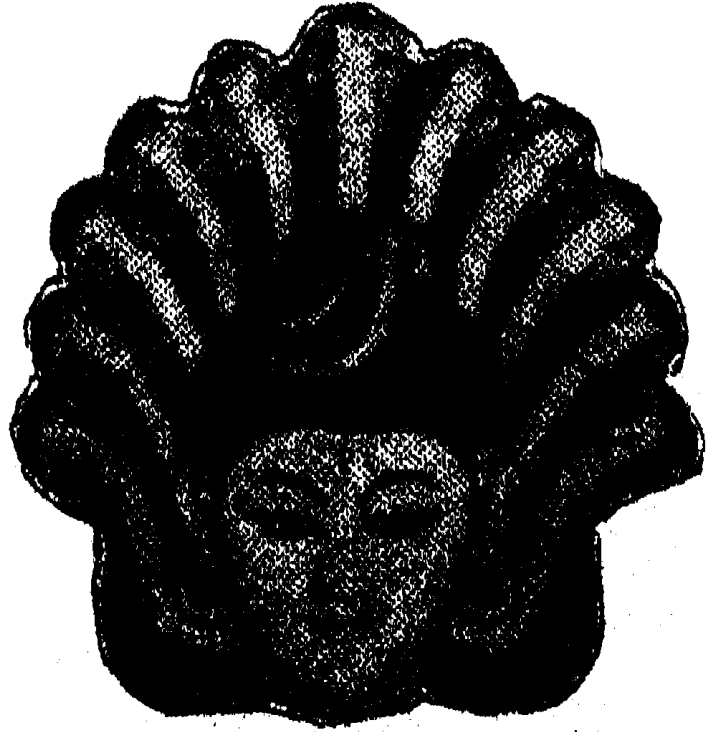
কালী
(পুরুলিয়ার মুখোস প্রদর্শনী)

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৭ থেকে ২৮ নভেম্বর অবধি অনুষ্ঠিত প্রশান্ত রায়ের প্রায় ষাটখানি ছবির প্রদর্শনী সকলের কাছেই অভিনন্দন লাভ করবে। শান্তিনিকেতন থেকে অবসরগ্রহণের পর এই প্রথম তাঁর এতগুলি ছবির একত্রে প্রদর্শনী হল। মূলতঃ শ্রীরায় অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের রীতি অনুসরণ করে ছবি এঁকেছেন। কোথাও কোথাও দুই রীতিকে একত্রিত করবার প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়। প্রদর্শনীতে শ্রীরায়ের বিভিন্ন বিষয় ও স্টাইলের মোটামুটি একটি পরিষ্কার নিদর্শন রাখা হয়। তাঁর রঙের ওপর দখল যে কতদূর তার আভাস অনেক ছবিতেই দেখা গেল। কম্পোজিশনের বাঁধুনিও চমৎকার। 'ড্রীম', 'পাপেট ড্রামা', 'উডেন ব্রিজ', 'বিসর্জন' ইত্যাদি ছবিতে তার প্রচুর সাক্ষ্য মেলে। কলকাতার কতকগুলি দৃশ্যে তিনি ভারি সুন্দর স্থানীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। 'বাড়িওয়ালা' ছবিতে বর্ষার জলে ভেসে যাওয়া রাস্তা তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। নিসর্গদৃশ্য রচনায় তাঁর দক্ষতার অনেকগুলি সুন্দর নমুনা ছিল। ভোরের বেলার নীল পাহাড় ছবিটি সম্ভবত সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের দৃশ্য। স্থির নিসর্গদৃশ্যের পটভূমিতে ট্রেনের গতিময়তা সুন্দর ফুটেছে। প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল অনেকগুলি রঙীন পোস্টকার্ড যা তাঁর প্রিয় নাতি ও অন্যান্য কয়েকজনকে দেওয়া। পার্বত্য দৃশ্য, সতমলভূমি, পাহাড়ের মধ্যে চলমান রেলগাড়ি, ছোট্ট ইঁদুরের উঁকি দিয়ে চাওয়া। কতকগুলি জাপানী প্রথায় আঁকা অপূর্ব মাছের ছবি এবং তাঁর স্বরচিত ছোটদের জন্যে লেখা একটি কাহিনীর চমৎকার ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে তাঁর কাজের আরেক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজের শাদাকে সুপরিকল্পিতরূপে ব্যবহার করে সুন্দর আলোকোজ্জ্বল বর্ণ সৃষ্টি করেছেন তিনি। এখানে তিনি কোন শিল্পরীতির সচেতন অনুসরণ করেন নি নিজের খেয়াল ও আনন্দে ছোট ছোট দ্যুতিময় ছবি এঁকে গিয়েছেন তাই হয়ত তাঁর অপেক্ষাকৃত বড়মাপের সুচিন্তিত কম্পোজিশনের চেয়েও এগুলি মনকে বেশী আকর্ষণ করে।

শিল্পী : প্রশান্ত রায়

●

বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচারের চিত্রকলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবির একটি বৃহৎ প্রদর্শনী ১৬ থেকে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সীনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ নিয়ে প্রায় সত্তরখানি ছবি এখানে উপস্থিত করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক রচনা ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পের কিছু বিখ্যাত নিদর্শনের নকলও উপস্থিত করা হয়েছিল। তবে পাশ্চাত্ত্য ধ্রুপদী শিল্পীদের ছবির নকলের দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে গোপা বোস, কুতকুম দেব, গোবিন্দ শর্মা ও সুস্মিতা সরকারের করা লিওনার্দো, মদিলিয়ানি, রেমব্রান্ট ও ভ্যানগগের ছবিগুলির নাম করা যায়। গোপা বোসের নীলশাড়ীপরা মেয়ের একটি প্রতিকৃতি ও বাসবদত্তা দাশগুপ্তের করা আরেকটি রমণীমূর্তি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিজয় মেননের 'গার্ল উইথ লীফ' আধুনিক রীতির চিত্ররচনার সুন্দর নিদর্শন। নিসর্গদৃশ্যটি মম্প্রিয়ানের গোড়ার দিকের ছবির স্টাইলে করা। এছাড়া স্টিল লাইফ ও নিসর্গদৃশ্যের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন এবং জুনিয়র সেকশনের রণিতা বলের প্যাস্টেলে আঁকা 'মাই পেট' সুন্দর নিদর্শন এবং শিক্ষক সুনীলমাধব সেনের বসন্ত এবং কেন্দ্রঘেঁষা দুটি স্কল দেওয়ালের এক কোণের শোভা বর্ধন করেছিল।

—চিত্ররসিক
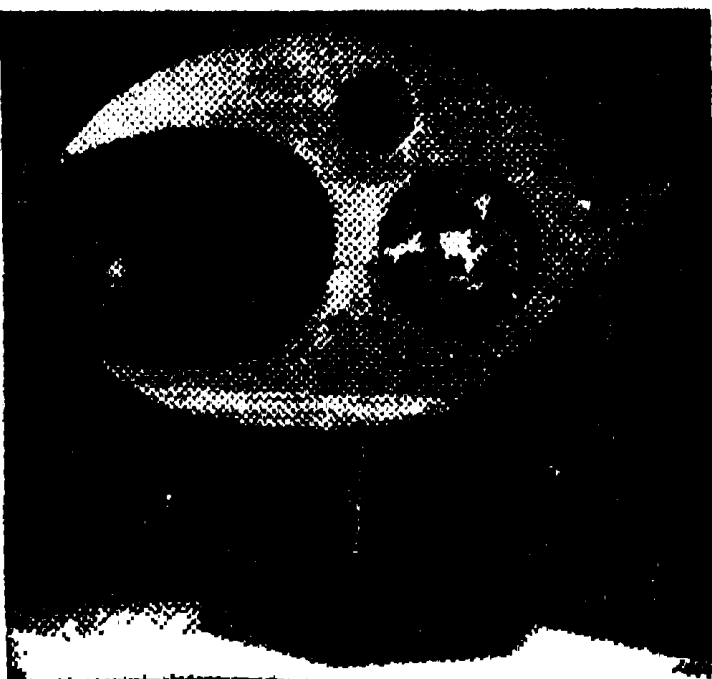
শিল্পী : মাধব ভট্টাচার্য

শিল্পী : শর্বরী রায়চৌধুরী

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ১৯ ।।

কারখানার সকল অংশ ও ছোটবড় সব মেশিন দেখার শেষে আসে কাজের কথা। নিধিরাম একে একে বলে কেমন করে সেসব কাজ হয়। তারপর সে যোগ দেয় কাজে। কিন্তু একটা অসুবিধে সে লক্ষ্য করল প্রথম থেকে। সেখানে কেউ তার চেনাজানা বা সমবয়সী নেই। সবাই তার চাইতে বড়।

প্রথমেই খোলা হয় রোলার মেশিন। অনেক লোকের সাহায্যে, অনেক কায়দায় সেটার ওপরকার অংশটা খুলে ফেলা হয়। মাটির সঙ্গে গাঁথা থাকে হাতীর পায়ের মতো তিনটে পায়া, তার ওপর ফ্রেমটা। এপাশ-ওপাশ থেকে মেঘু সব দেখে নেয়, কারো কাজে সাহায্য করতে যায় না।

ছোকরাগুলো এ ওর পানে চায়, মুখ টিপে হাসে। ফিসফিস করে বলে—বাবু! হাত নাই লগাবো, কাম্ শিখিব আহিছে।

—হাতে পায়ে কালি লাগি যাব।

—হাঁ রে, বগা রং কালা মারি যাবেক্।

—তোবেই হইছে কাম্ শিখা!

জগুয়া জানে মেঘুর কথা। সে জানায় বাগানের কাজে তার কেমন নাম।

ঝুমড়া ঝাঁজ দিয়ে বলে—বাদ দি, দু-ঘণ্টা কাজ করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ায় সব। কলঘরের মতো আটঘণ্টা কাজ করতে হলে গা-গতর ফেটে যেত। তার ওপর আছে রাত-জাগা কাজ। ওখানে তো তেমন নেই।

—নাই রে উ দুইতিনি হাজিরা মারি দিয়ে।

ক্র্যাঙ্ক্ স্যাফ্‌টায় ঠেস দিয়ে ঝুমড়া বলে—রাখ রাখ, দুই তিনি হাজিরা! নাই তো চারিঘণ্টা, থাকবা দি না আট ঘণ্টা —হাড়্‌ডি পিলপিলাই যাব।

—হঁয়া হঁয়া। স্যাফ্‌টের গোড়ায় একটা যোগান ঠেলে দিয়ে মঙ্গলা অনুমোদন করে ঝুমড়ার ভবিষ্যৎ বাণীর যাথার্থ্য।

মেশিন খোলা হলে আসে পরিষ্কার করবার পালা। পার্টস নিয়ে মেঘু বসে যায় মেঝের ওপর। নিঃসঙ্কোচে হাত ডুবিয়ে দেয় তেলকালিতে।

—আঁ—আঁ, করে ছুটে আসে ঝুমড়া। এটার সঙ্গে মিশে যাবে ওটার পার্ট, খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুব সাবধানে জিনিস-যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে হয় এখানে। মনে রাখতে হবে—এটা বাগান নয় যে, একটা কোদাল, একটা ছুরি চিনলেই হয়ে গেল। এখানে কথায় কথায় মিস্তিরিবাবুর ধমকানি আর ডেভি সাহেবের থাপ্পড়।

সসঙ্কোচে মেঘু জবাব দেয়—বেশ, যেখান থেকে তুলবো সেখানেই সাফ্ করে রেখে দেব।

মেঘুর বোকামিতে ঝুমড়া একগাল হেসে বলে—তবে আবার কালি লেগে ময়লা হবে যে রে!

—আচ্ছা, আলাদা রাখব, পরে দেখিয়ে দেব কোনটা কোথা থেকে তুলেছিলাম।

মেঘুর অতিবুদ্ধিতেও সে হাসে—অত সহজেই কি এসব চিনে নেওয়া যায় হে ছোকরা? আমরা দিনরাত নাড়াচাড়া করছি, আমাদেরই গুলিয়ে যায়।

অমন নয়, এমন নয়! মেঘু জানতে চায়—তবে কি করবে।

ওদের সবই অভ্যাসের ছকে বাঁধা। তার বাইরে আর কিছু বোঝে না। ঝুমড়া বিজ্ঞের মতো বলে—এই ডাব্‌বার মাল তুলে সাফ করে পাশেই রেখে দিবি, ওই ডাব্‌বার মাল ওখানে।

মেঘু এক-একটা জিনিস তোলে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর একটার পাশে ধরে, পরস্পরের সম্বন্ধ চিন্তা করে, পরিষ্কার করে, আবার অপরিষ্কার করে। ততক্ষণে ওপাশে ওদের হাত থেকে দশটা পার হয়ে গেছে। তারা দেখে ওর কাণ্ড!

—হাই রে, ছোকরাটা কি এত্‌না ভাবি আছে?

—বাবুদের ছোকরা মাফিক্ ছড়া বাঁধবেক।

হোহো করে সবাই হেসে ওঠে।

—হাঁ-হাঁ—গান, উর গানকা পাট্‌টি আছেরে।

—আরে নাহি, ছোকরাটা পগ্‌লা আছে। উআর মাই ভি পগ্‌লা আছিল্।

পগ্‌লা নাই আছিল্, অল্প মাথার দোষ আছিল্। হামদের লাইনের নজ্‌দির উদের ঘর, হামরা জানে। কথা কহি আছে, কহি আছে—আর নাই আর্। চোখু মুখু কিবা রকম হই যায়!

ফ্যাক্‌টরির ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড, সংক্ষেপে ডেভি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সে, অ্যাংলো-নেপালীও বলা চলে। অমন বর্ণ-সঙ্কর পাশ্চাত্য জগতের প্রায় সর্বত্রই বর্তমান। কিন্তু সেখানে তার কোন তারতম্য বা কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে না। কেউ ভ্রুক্ষেপই করে না। সঙ্করের দেশে কি করে তা হবে, রোঁয়া বাছতে গেলে তো কম্বলের শেষ। ওরাই মনুর সংহিতা নিঃসংশয়ে মান্য করে এগিয়ে গেছে। তাই জাতিধর্মনির্বিশেষে তারা স্বীয়রক্ত ও স্বামী রক্তের অবহেলা করে না। কিন্তু সেই সঙ্করের বংশধরেরা প্রাচ্য জগতে এসে, বা প্রাচ্যের প্রসঙ্গে শিবত্বের দাবী করে, এবং বিশুদ্ধতার বৈষম্য বজায় রেখে চলে। তার নির্দেশক সবিস্তর বর্ণনায় বাচনিক ব্যাখ্যানও বিদ্যমান।

তাই ডেভিডের স্বভাব বিশ্লেষণে যা মঙ্গলাচরণে সকলেই বলে থাকে, সে কিন্তু চালচলনে খাঁটি সাহেবের বাড়া। খাঁটি সাহেবরা লম্বা লম্বা পা-ফেলে ব্যস্ত গতিতে চলে, ট্রাউজার্সের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে রাখে—যেন সব সময় পিস্তলে হাত দিয়ে রয়েছে। দুটো চোখ সিধে ফেলে রাখে কারো মুখের ওপর, দাঁতে পাইপটা চেপে—ফাঁসফাঁস করে কথা কয়। দেখে-শুনে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায় সবাই। যেন কতই না [illegible] কতই না [illegible] দিয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞরা জানে—অমনই সাহেবদের [illegible] মেজাজ কিন্তু খুব ঠাণ্ডা। আসল ঠাণ্ডাদেশের লোক তো। কেউ আসে [illegible] স্বভাবের, নয়তো এখানে এসে স্বভাবটা খারাপ করে। মাথার ওপর এত বড় [illegible] চাপটা সত্য [illegible] পারে না তো। [illegible] ওরে বাবা! [illegible] আছে। [illegible] পায় না তার [illegible]। [illegible] কথায় হাত-পা চলে। —তবে কাজ সে জানে।

চুপচাপ এসে ডেভিড দাঁড়ায় মেঘুর পিছনে। জুতোয় রবারের সোল, তাই মেঘু জানতে পারেনি। ডেভিড নজর করে মেঘুর কৌতূহল—গানমেটালের বসটা ঘোরানো-ফেরানোর হাবভাব, পরিষ্কার করা। কাজের ঢিলামী দেখে স্বভাববশত জ্বলে ওঠে সে। ওপাশে সন্ত্রস্ত লোকগুলো, আড়চোখে তারা চেয়ে দেখে এপাশে। একটা ভয়াবহ দৃশ্যের আশঙ্কা করে। কান খাড়া হয়ে থাকে একটা আর্তনাদের উৎকণ্ঠায়। ডেভিডের মনে পড়ে বড়সাহেবের কথা—তার দৃষ্টি সংযত হয়, স্নিগ্ধ হয়। ছেলেটা হাজিরা-খাটতে আসেনি, এসেছে কাজ শিখতে। বদলে যায় তার মনের ভাবটা সে খুশী হয়, ফিরে যায়।

সেদিন ঐ পর্যন্তই। সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আশঙ্কা অনুযায়ী কিছুই ঘটল না। কেউ বুঝে উঠল না কি করে মেঘুর ঢিলেমিটা সাহেবের নজর এড়াল।

কিছুদিন কেটে গেল। এর মধ্যে অনেক মেসিন খোলা হয়েছে, পরিষ্কার হয়েছে, ক্ষয়ে যাওয়া পার্টসগুলো অদল-বদল করে ফিট করাও হয়েছে। মেঘুর কাজের ঢিলেমিতে কারো আর কোন সন্দেহ নেই। তা কেন, এখানকার কাজে সে থৈ পায় না। সহানুভূতিসম্পন্ন কোন কোন ছোকরার উপদেশেও সে চটপট কাজ করে না। পারে না তো করবে কি! এটাতো আর বাগান নয়, যাত্রাগানও নয়।

একদিন একটা ডবল-এ্যাক্‌শন রোলার মেসিনের পার্টস মেঘুই সাফ্ করছে। সেটা শেষ হবার আগেই, হঠাৎ পাশে সর্টিং মেসিনের দুটো ওয়ার্ম গিয়ার তুলে দেখতে লাগল সে। পাশ দিয়ে একবার ডেভিড ঘুরে গেল, আড়চোখে দেখতে দেখতে। আবার ফিরে এসে দাঁড়াল মেঘুর পিছনে। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ডেভিড চলে গেল।

এমন ক্ষেত্রে পত্রপাঠ দক্ষিণার কথাটাই সকলের জানা। দূর থেকে যারা দেখছিল সাহেবের হাবভাব, তারা ভেবে নিল আরো বড়রকমের কিছু একটা ঘটবে। বোধহয় সাহেব বেত আনতে গেছে।

সাহেবের বেত্রাঘাতে অভিজ্ঞ একটা ছেলের দয়া হয়। সে ছুটে এসে দাঁড়ায় মেঘুর সামনে। তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে—পালা! পালা এখান থেকে।

মেঘু হতভম্ব! সে উঠে দাঁড়ায়, জানতে চায়—কেন?

—সাহেব তোকে মারবে, হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

—কোথায় সাহেব?

—বেত আনতে গেছে, পালা!

—কেন মারবে?

সাহেবরা যখন মারে তখন মারবার জন্যই মারে। ক্ষমতা আছে তাই মারে। এর কোন প্রশ্ন আসে না, কৈফিয়ৎও জানা হয়নি। তার একটু ধাঁধা লেগে যায় জবাব দিতে। তবুও জবাব বাঁধাধরা। সে ধমক দিয়ে বলে—ঠিক মতো কাজ করিসনি, তাই মারবে। পালা—

—ঠিক মতো কাজ করিনি!

কথাটা মেঘু অবিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাসই বা করে কেমন করে? তবুও সে কোমরে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

—দাঁড়িয়ে রইলি যে! কি করবি?

—সাহেবকে জিজ্ঞাসা করব—কেন মারবে? ঘরশুদ্ধ সবাই আঁৎকে ওঠে!

—ছোকরা সকলকে মার খাওয়াবার ব্যবস্থা করছে!

—পালা তুই এখান থেকে। সবাইকে মার খাওয়াবি নাকি?

—তোদের কোন ভাবনা নেই, যা করবার আমি করবো।

—ওরে আমার মাতব্বর!

—এ্যাঁ! তুই এখানে মারামারি করবি নাকি?

—সাহেবের একথা খেলে মাতব্বরি বেরিয়ে যাবে।

—যা যা, সাহেবকে ডেকে আন—

ডেকে আর আনতে হয় না, সাহেব নিজেই আসে। তার চেহারাটা চোখে পড়ার আগেই যে যার কাজে বসে যায়। দুরুদুরু করে কাঁপে তাদের বুকের ভিতর, আড়চোখে চেয়ে দেখে ডেভিডের চাল-চলন। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে মেঘু। চোখ দুটো তার সাহেবের মুখের ওপর, ঘুরে বেড়ায় তার চলা-ফেরার সঙ্গে। ওদিকটায় ডেভিড দেখে বেড়াতে থাকে একটার পর আর একটা কাজ। কথাও কয় কারো সঙ্গে, হেড ফিটারবাবুর সঙ্গে। দু-একটা কথা মেঘুর কানেও আসে। সে আন্দাজ করে নেয়—কি যেন একটা ভুল বুঝেছে সবাই। কেউ অমনভাবে কাউকে মারতে আসে না। সে বেশ লজ্জিত হয় অমন বেপরোয়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। তখনি সে বসে পড়ে, হাত চালিয়ে কাজ করতে শুরু করে।

শীতের ক'টা মাস ডেভিডের কাজের অন্ত নেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, রাউণ্ড দেয়। তাকে দেখে সবাই সতেজ হয়ে ওঠে—নিজে-দের মধ্যে কত কাজের কথা কয়, চটপট আনাগোনা শুরু করে দেয়। ডেভিড বোঝে সেসব তার অভ্যর্থনা। নিজের অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে হলটার পা-দিয়েই তার টু-পয়েন্ট ফাইভ লেন্স দুখানা দিয়ে হলটার সমস্ত লোকের কার্যকলাপ সমেত একখানা নেগেটিভ তুলে নেয়—তারপর হঠাৎ ফিরিয়ে নেয় চোখ দুটো। যেন কিছুই দেখেনি। পরে মনে মনে এক-একটা অংশ ডেভেলপ করে। যেমন ছবি ওঠে তেমনি মেজাজ নিয়ে এক-একজনের সামনে হাজির হয়। আজও এপাশের লোকগুলোর চালচলন তার মনে নেগেটিভ থেকে পজেটিভ ছবিতে রূপায়িত হয়। একটু অস্বাভাবিক হলেও ওটা স্বাভাবিক! কারণ ডেভিড জানে ওদের দৌড়। মেঘুর প্রকৃতি তার অজানা। তাই মেঘুর অমন দাঁড়িয়ে থাকাটা যেন কেমন লাগে। কিছুতেই সেটা মন থেকে মুছে দিতে পারে না। তবুও স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে না সে। প্রথমেই ডেভিডের যাবার কথা মেঘুর সামনে। তাকেই যাচাই করে দেখার কথা প্রথম। এতগুলো কুলির সামনে, এতগুলো মিস্ত্রীর সামনে মেঘুর অমন দাঁড়াবার ভঙ্গি তার মন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। তবুও সে যেতে পারে না মেঘুর কাছে। তার মন তাকে নিষেধ করে দেয়। সে যেন কিছুই দেখেনি। নিজের মান বাঁচিয়ে এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখেও নেয় মেঘুর কাজ, হাবভাব। আজ যেন ডেভিড বেশী কথা বলে চলেছে। আজকের সবই অপরাপর দিনের উল্টো।

কত আশঙ্কা ছিল সকলের মনে, তার কিছুই হয় না। মেঘুর সামনেও একবার যায় না ডেভিড্। কেউ বুঝলো না কেমন করে মেঘুটা অমন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেমন করে সাহেবের চোখ থেকে এমন একটা ব্যাপার এড়িয়ে গেল।

মেঘু ছাড়া আর এমন কেউ সেখানে ছিল না, যে সাহেবের সামনে অমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কাজ যতই থাক, একটানা এতক্ষণ ডেভিড কলঘরে থাকে না। কিন্তু আজ আর তার কাজ ফুরোয় না। কি যেন একটার মীমাংসা না করে গেলে সেটা স্বীকার করে নেওয়া হবে। মেঘুর কথা সে মোটামুটি যা শুনেছে, তাতে বুঝেছে সে কাজের ছেলে। কিন্তু তাকে কলঘরে রাখা যায় কি না, সেটা যাচাই করে নিতে হবে। সেই যে ছেলেটা কোমর থেকে হাত নামিয়ে কাজে লেগেছে তারপর একবার ফিরেও তাকায় না ডেভিডের পানে। এত হম্বিতম্বি করছে ডেভিড তা যেন ওর কানেই যায় না—যাবার কথাও নয়। বড় অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায় ডেভিড। তার মান সম্মান সব ডুবতে যাচ্ছে। দু-চারবার মেঘুর পাশ দিয়ে হন-হন করে চলে যায়, তবুও মেঘুর চোখ ওঠে না। ডেভিডের অস্বস্তি আরো বেড়ে যায়, সে বিরক্ত হয়, রাগ হয় তার।

শেষ পর্যন্ত একটা পাক দিয়ে এসে ডেভিড থমকে দাঁড়ায় মেঘুর সামনে। যেন এতক্ষণ তাকে দেখেনি। ডেভিডের মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি গজায়। মেঘুর স্বভাবটা যাচাই করতে গিয়ে, লেগে যায় তার কাজের পরীক্ষায়।

খুব কড়া সুরে ডেভিড একটা প্রশ্ন করে মেঘুকে—তুমি ক'টা রোলার মেসিন্ ফিট করা দেখেছ?

রোলার-এর প্রেসার ক্যাপটা থেকে হাত তুলে উঠে দাঁড়ায় মেঘু। বলে—বারোটা, আর এটার অর্ধেকটা বাকী আছে এখনো।

—এটার বাকী কাজ শেষ হলে নিজে ফিট করতে পারবে?

—বোধহয় পারব।

—বোধ হয় না। একটা ধমক দিয়ে বলে—বড় সাহেব তোমাকে কাজ শিখতে দিয়েছেন আমার কাছে। হাঁ কি না বল।

একটুও সময় না নিয়ে মেঘু জবাব দেয়—হাঁ।

ডেভিড্ বিরক্ত হয়। যা আশা করেছিল তা শুনল না মেঘুর মুখ থেকে। সে বলে—

আচ্ছা, এটা নিজে ফিট করতে পারবে—সব—আজই?

মেঘু যেন 'না' বলতে জানে না। ডেভিড্ আরো বিরক্ত হয়। সে বলে—বেশ খাবার পর এসে শুরু করবে, আমিও সামনে থাকব।

লাঞ্চের আর দেরী নেই।' ব্যস্তভাবে ডেভিড্ বেরিয়ে যায় কারখানা থেকে।

সবাই ভয়বিহ্বল—তারা শুনেছে সব কথা। এতদিন তারা কলঘরে কাজ করে, এমন দায়ে কাউকে পড়তে হয়নি কখনো। আজই মেঘুর শেষ কলঘরে আসা।

ছুটে আসে নিধিরাম। সে বোঝে না—আজ কার শেষ! মেঘুর, না তার? তার কাছেই তো তাকে কাজ শিখতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একি অন্যায় সাহেবের। এই ক'দিনের মধ্যেই কি একজন আনাড়ী এতখানি আয়ত্ত করতে পারে! কারো ক্ষমতা আছে, একজন আনাড়ীকে এতখানি কাজ শেখাবার? পাগলার যখন খেয়াল চেপেছে তখন সে ছাড়বে না। সে প্রাণের দায়ে মেঘুকে ধরে বোঝাতে লেগে যায়—ওইটার পর এটা এমন ক'রে বসিয়ে দিতে হবে।

—বুঝলি?—দেখিস বাবা, আমার চাকরিটা যেন না যায়, ছেলেমেয়ে নিয়ে—

মেঘু তাকে আশ্বাস দিয়ে খেতে চলে যায়। ফিটার বাবুও যায়, কিন্তু খাওয়াতে আর তার রুচিও নেই তখন।

সাহেব নিশ্চয়ই আজ তাড়াতাড়ি কারখানায় ফিরবে। সবাই চটপট নেয়েখেয়ে কলঘরে আসবার সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কার অদৃষ্টে যে কি আছে! সকলের মাথাই ঝিমঝিম সেই ভাবনায়।

ডেভিড্ খেতে বসে দাঁতের চাপে মাংসের টুকরো পেষাই করতে করতে ভাবতে থাকে পাতা পেষাই করবার মেসিনের কথা, মেঘুর রোলার মেসিন ফিট করার কথা। বড় বাড়াবাড়ি করেছে সে। কিন্তু ওকে কলঘর থেকে বার করে দেবার আর কি মতলব আছে? ওকে কলঘরে রাখলে ইজ্জৎ বজায় রেখে সে কাজ করতে পারবে না, কাজ করাতে পারবে না। কথাবার্তায় ঠাণ্ডা, কিন্তু ভাবভঙ্গি বড় অবাধ্যের, একগুঁয়ে। অমন সে অনেক দেখেছে, এই ধরনের ছেলে যে কোন মুহূর্তে যা তা কাণ্ড ক'রে ফেলতে পারে। আজই যেন কিছু একটা হয়েছে। কেন তার অমন ভাব হ'ল, তাকে দেখেও তার কোন পরিবর্তন হ'ল না! খবরটা নেওয়া উচিত ছিল। তাতেও মুশকিল। সমুচিত ব্যবস্থা করতে না পারলে নিজেরই মান যেত। ওকে বোধ হয় মেরে তাড়ানো যায় না, মেরে টিট রাখাও যাবে না। মারাও যায় না বোধ হয় ওকে। তবে আর কি করতে পারে? নাঃ! ঠিকই করেছে সে।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ডেভিড্।

মিসেস্ ডেভিড্ বলে—কি গো, আজ যে কিছুই খেলে না, সবই পড়ে রইল।

—আর খাব না, ইচ্ছে নেই—বিশেষ কাজও আছে।

মিসেস্ ডেভিড্ জানে, এই ক'টা মাস তার দুপুরের খাওয়া এমনই হ'য়ে থাকে। সেটা তো মাঝামাঝি থেকে শুরু হবার কথা, এবার প্রথম থেকেই তাড়াহুড়ো লেগে গেল। বোধ হয় রেনফলের ফোরকাস্ট্ খুব সন্তোষজনক, দোলের আগেই টিপিং (প্রথম পাতা তোলা) শুরু হবে।

কারখানায় ফিরে এসে ডেভিড্ বোঝে সবাই অপেক্ষা করছে তার অভ্যর্থনায়। সব তোড়জোড় শেষ। নিধিরামের পাশে মেঘু। পাশাপাশি যোগাড়ীরাও আছে। এযেন একটা প্রদর্শনী উদ্বোধনের আয়োজন। ডেভিড্ খুশী হ'য়ে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ একটা কাজ ক'রে ফেলে। সে মস্ত একটা হাসি দেয়, সে সংবর্ধনা গ্রহণে, অনুমোদনে, অথবা বিনিময়ে।

ডেভিডের নির্দেশে কাজ শুরু হয়। কাজের শেষও হয়। নিধিরামের চাকরিটা তখনকার মতো বজায় থাকে। ডেভিড্ গম্ভীরভাবে ফিরে যায় নিজের কামরায়। সেদিন কেউ আর তাকে কলঘরে দেখতে পায় না। কিন্তু দিনান্তে ঘরে যাবার পূর্বে নিধিরামকে আবার দুশ্চিন্তায় ফেলে গেল। কালই মেঘুকে আর একটা অন্য ধরনের মেশিন ফিট করতে হবে।

ফিটারবাবু ঘেমে নেয়ে ওঠে। মেঘুকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। সেদিনও মেঘু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ডেভিড হতাশ! নিরুপায় হয়ে উপায়ের পথ চিন্তা করতে থাকে। একটার পর আর একটা পরীক্ষায় ফেলতে থাকে মেঘুকে। সেই সঙ্গে যেন চলে নিধিরামেরও পরীক্ষা। গুরু-শিষ্য, দুজনই একসঙ্গে পাশ করে এগিয়ে চলে।

একদিন মেঘু আটকে যায়।

—হয়েছে ফিট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ঠিক তো? ভাল করে দেখ।

ঠেলে-ঠুলে মেশিনটা এক পাক ঘুরিয়ে দেখে নেয় মেঘু। বললে—হ্যাঁ স্যার।

ডেভিড তখন গ্রিজ ক্যাপটার জায়গায় আঙুল দিয়ে বলল—এটা কোথায় গেল?

মেঘু জানে, এ ভুলটা রোজই হয়েছে। ডেভিড বা নিধিরাম কেউ লক্ষ করে নি

এটা। কিন্তু নিধিরামের মুখ ফ্যাকাসে হল।

কৈফিয়ৎ দেবার মত কথা মেঘুর ছিল। হাতের সামনে গ্রিজ ছিল না। তার ওপর ওটা এমন জরুরীও ছিল না। মেশিন ফিট করবার পরও পরিষ্কার করা হয়। মেশিন চালাবার আগেই ওটা ফিট করা হয়। কিন্তু ওসব কিছু না বলে, ত্রুটিটাই মেনে নিল। তাড়াতাড়ি সেটা লাগিয়ে মাথা হেঁট করে সে ডেভিডের সামনে দাঁড়ায় — যেন কত অপরাধ, অন্যায় করে ফেলেছে মেঘু।

সে ডেভিড আর নেই। মুখে যতই চোটপাট করুক না কেন, মনে মনে তাকে তারিফ না করে পারে না। এই কটা দিন কাজের মধ্যে ডেভিড বেশ ভালভাবে আবিষ্কার করে নেয় মেঘুর স্বভাব। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, অনিচ্ছা নেই তার কোন কাজে। মিষ্টভাষী, বিনয়ী। যেটা তার ঔদ্ধত্য মনে করেছিল ডেভিড, সেটা তার নির্ভীকতা। এমন ছেলের দ্বারা শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে না। সে ধীরে ধীরে পছন্দ করতে, ভালবাসতে শুরু করল মেঘুকে। যত বড় সাহেবই হোক, তার শিরা-উপশিরায় নেপালী রক্ত প্রবাহিত। মেঘুর ওপর তার রক্তের টান পড়ে। আরো একটা কথা ভেবে নেয়। একটা অর্বাচীনকে কাজের মানুষ করে তুলতে পারলে বড়-সাহেব খুশী হবেন, তাঁর আরো বিশ্বাস জন্মাবে ডেভিডের কর্মদক্ষতার ওপর। বিশেষ বেগ পেতে হবে না সেজন্য। ছেলেটা ভাল, বুদ্ধিও আছে।

যাকে এতদিন সে তাড়াবার চেষ্টা করছে তাকে বুকে তুলে নেয় ডেভিড। নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়।

।। কুঁড়ি ।।

নিধিরামের ছোট সংসার। স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে। যাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধে সমাজ তাকে স্বীকার করে না। চিরাচরিত প্রথায় সমান ঘরের মেয়ে নিয়ে সে সংসার পাতে নি। এটা তার লাগামবিহীন যাযাবর যৌবনের সংগ্রহ।

নিধিরাম কাকতি ভাল বংশের ছেলে। উপনামই তার পরিচয়। অসমীয়ারা বলে— আহোম শাসনকালে রাজদপ্তরে যারা লেখা-পড়ার কাজ করত তাদের পদবী ছিল কাকতি। মতান্তরে — অসমীয়া ভাষায় কাকত শব্দের অর্থ কাগজ, অতএব বার্তাবহ বা রাজদূতের পদবী ছিল কাকতি। অথবা, তেমন পদপ্রাপ্তির যোগ্য ছিল যারা কাকতিরাও তাদের অন্যতম। কথাটা এভাবে বলবার একটা কারণ আছে। কিন্তু নিধিরামের বাপ-ঠাকুরদাদার পদবী ছিল চাং-কাকতি। বলা বাহুল্য যে, কাকতির ওপর এই পদের মর্যাদা! উপনামের উপসর্গ, 'চা' শব্দটা (এখানে টেবিল জাতীয় জিনিস) নিধিরাম বাদ দিয়েছে। সে যদি হাকিম, অন্ততঃ হাকিমের দপ্তরে পেশকার হতে পারত তবেই না ঐ পদবীর মর্যাদা রেখে চলতে পারত। নিদেন কোন সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে—তাও তো হল না। তাই চাং-টাকে ভেঙে চুরমার করে নিজেও চুরমার হয়েছে। নয়তো নিজে চুরমার হবার সঙ্গে চাং-টারও সেই দশা হয়েছে।

আসামের কাকতির সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ সম্বন্ধ পাওয়া যায়। ওখানে স্থানীয় ভাষায় দুর্গাদেবীকে বলা হয় কুকতী। তাই দুর্গার উপাসকরা কাকতিয় —ওখানে ওটা ছিল শূদ্র জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি নাম।

নিধিরাম তখন গোয়ালপাড়া জেলায় মোটর লরীর হ্যাণ্ডিম্যান। ড্রাইভারের সঙ্গে লরীতে মালপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় হাটে, বাজারে-বন্দরে। বোরো, গারো, কোচ-কাছাড়িদের ঘরেও যায়, লাউপানি পান করতে। থাকে মেছপাড়ায়। বোরো জাতি উদ্ভূত বহু মেছ পরিবারের বসবাস সেই গাঁয়ে। ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছ-এর অপভ্রংশ মেছ। এক মেছ প্রতিবেশীর ঘরে নিধিরামের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। নাম তার তক্ষা। বোধ হয় তক্ষক থেকে তক্ষা। গোল মুখ, খেঁদা নাক, তেরছা টানা ছোট চোখ, বর্ণ তার পাকা সোনার।

মেছ হলে কি, জাতটার ঐতিহ্য আছে। এদেরই আদি পুরুষ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে পাণ্ডব সৈন্যদের বিধ্বস্ত করেছিল। নিধিরামের পূর্বপুরুষ তো সেদিনকার আহোম শাসকের দপ্তরে কলম পিষত।

তক্ষা মেছ জীবিকানির্বাহের জন্য খেতি কাম করে। ওটা বলার কথা তাই তক্ষা বলে বেড়ায়—আমি খেতি কাম করি। তার কর্তব্য লাঙ্গল চালিয়ে মাটি উল্টে দেওয়া, তারপর মই দিয়ে মাটির ঢেলাগুলো ভেঙ্গে দেওয়া। এর বাইরে যা কিছু কাজ সবই করে থাকে তার তিরি (স্ত্রী) রুমনী আর ছোয়ালি (মেয়ে) রুকনী। রমণী থেকে রুমনী, রুক্মিণী থেকে রুকনী। তা বলে তক্ষা কুঁড়ে নয়; এ রাজ্যে শ্রেণীবিশেষে স্ত্রী-পুরুষের কাজ এমন ভাবেই ভাগ করা। ঘর-কন্নার মতো ক্ষেতের কাজও হাল্কা, অতএব এসব মেয়েদের। তার ওপর বোনাবুনী ও তাঁতের কাজ। বিয়ের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এসব তো অবশ্য করণীয়। খাসিয়াদের গাছ কাটা, করাত চালানো, কাঠ কাটা, এবং চার-পাঁচ মাইল মাথায় বেঁধে হাটে গিয়ে তা বিক্রি করা, হাট-বাজার সবই মেয়েদের। ছেলেদের জন্য থাকে শুধু বর্শা বা তীর-ধনুক নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, আর ঘরে ফিরে পানাহার—কাকিয়াত পান। অবশ্য বর্তমানের চাপে পড়ে ওসবের কিছু হেরফের এখন হয়েছে।

তকষা কিন্তু রুমনীকে দিয়ে অতটা করায় না। গাছ-গাছড়া, কাঠ-খড়ি, কাটাকুটি, সেসব বহনের কাজও নিজেই করে। তার বাইরে তকষা আরো যেসব করে বেড়াত তার দাপটে আশ-পাশের পাহাড়-জঙ্গলের, এমন কি দূরে গারো পাহাড়, বিজনী পাহাড়ের জীব-জন্তুরাও তটস্থ থাকত। তার ঘরখানা যেন আদিম যুগের ব্যবহৃত বিবিধ কৌমের অস্ত্রশস্ত্র ও জংলী জীব-জন্তুর কঙ্কাল, চর্ম ও নখদন্তের যাদুঘর।

সেই ঘরে গিয়ে বসলেই নিধিরামের মন চলে যেত সুদূর অতীতে। তার ওপর লাউপানির বাটিতে চুমুক দেবার সঙ্গে শুরু হত, তকষার মুখ নিঃসৃত, প্রাচীন কাহিনী কিম্বদন্তী পুরুষ পরম্পরায় প্রচলিত—মহাভারতের দিন থেকে বর্তমান পর্যন্ত। অতীতের কথা সজীব হয়ে উঠত তার মুখের জোরে, আর বর্তমান তো নিজের হাতের মুঠোয়। তকষার বর্শার ঘায়ে পাহাড়ের বুকে আগুন জ্বলে ওঠে, ভেঙে চুরমার হয়ে পর্বতের বৃহদুপল খণ্ড খণ্ড হয়ে গড়িয়ে পড়ে। তার ধনুক থেকে যখন তীর নিক্ষিপ্ত হয় তখন বিজনী-পাহাড়ে ঝড় ওঠে। তার পূর্বপুরুষ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা কর্ণার্জুনের অপেক্ষা কম নয় কোন অংশে। তাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মেয়ে মণিপুরের চিত্রাঙ্গদা—তার 'সরু লরাটোর' (বাচ্চা ছেলেটার) হাতে অর্জুনের পরাজয়ের কথা কে না জানে? তকষা এমন ভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও কুরুপাণ্ডবের সঙ্ঘর্ষের কাহিনী বলে যেত, যাতে মনে হত, সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, অন্ততঃ প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা। এসব কথার উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে ফল ভাল হয় নি। কবে কোনদিন লাউপানি পান করতে করতে দু পক্ষের তর্ক উঠে এমন অবস্থা হয়েছে যে, অপর পক্ষকে আর কোনদিন লাউপানি পান করতে হয় নি। সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে পরবর্তী দিনে একনিষ্ঠ সেবক বা শ্রোতা ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় নি। বড়জোর কেউ কখনো জানতে চেয়েছে—তার এমন সব মারণাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এই গাজা (গাদা) বন্দুকটা রেখেছে কেন?

তার জবাবে তকষা হেসে উঠেছে—তা ঠিক। সব অস্ত্রই যখন আছে, তখন এটাই বা বাদ থাকে কেন? আসলে, এসবের সামনে এটা কিছু না।

মুখে এমন বলে বটে তকষা, কিন্তু কাজ করে উল্টো। যখন সরকারী পুরস্কার ঘোষণা হয়, যখন পাগলা হাতীর পাগলামি ছোটাবার জন্য তার ডাক পড়ে, তখন গাদা-বন্দুকটার মধ্যে বারুদের সঙ্গে বল গেদে নিয়ে যায় থলের ভিতর লুকিয়ে। বিষ মাখানো তীরের ফলা এফোঁড়-ওফোঁড় হতে পারে, কিন্তু হাতীর মৃত্যু যদি বধ না হয় তাতে!

তকষার ঘরে বসে তার সঙ্গে যুবক নিধিরামের মুখ যেমন চুমুক দিয়ে গেছে লাউপানির বাটিতে তেমনি তার কানও চুমুক দিয়ে গেছে তকষার মুখনিঃসৃত বাক্যরস। নিধিরাম তন্ময় হয়ে শুনেছে তকষার কথা। সুপ্রাচীন মেছ-কৌমের বংশগরিমার চাপা পড়ে গেছে অধুনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান নিধিরাম চাং-কাকতির বংশমর্যাদার কথা। লাউপানিতে সিক্ত অন্ত্র সারাদেহে বইয়ে দিয়েছে নেশার আমেজ, আর রুকনীর দেহসৌষ্ঠব তার মনের সন্নিতে এনে দিয়েছে প্রণয়ের স্পন্দন।

এমনই এক বৈঠকে বসে নিধিরাম নেশার ঝোঁকে, অথবা আনন্দের আতিশয্যে তক্‌ষাকে বলে বসে—এমন শ্বশুর যদি সে পায়, তার জীবন ধন্য হয়।

চোখের পাতা টেনে তক্‌ষা চেয়ে দেখে তাকে। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কী! তয় (তুই) আমার ছোয়ালী বিয়া করিবি?

—পালে (পেলে) তো ধন্য হ'ও (হই)।

—কী, তর ইমান হিম্মত আছে? ময় (আমি) দেখা পালে (পেলে) কাটি পেলাম (ফেলব)।

কথার সঙ্গে তক্‌ষার হাতটাও ঘুরে গেল কেটে ফেলার ভঙ্গিতে।

কি সর্বনাশ, না বুঝে কি ভয়াবহ প্রস্তাব সে করে বসল। নিধিরামের নেশাটা ছুটে গেল। কি জবাব সে দেবে? সন্ত্রস্ত মনের মধ্যে কিছু হাতড়ে পেল না।
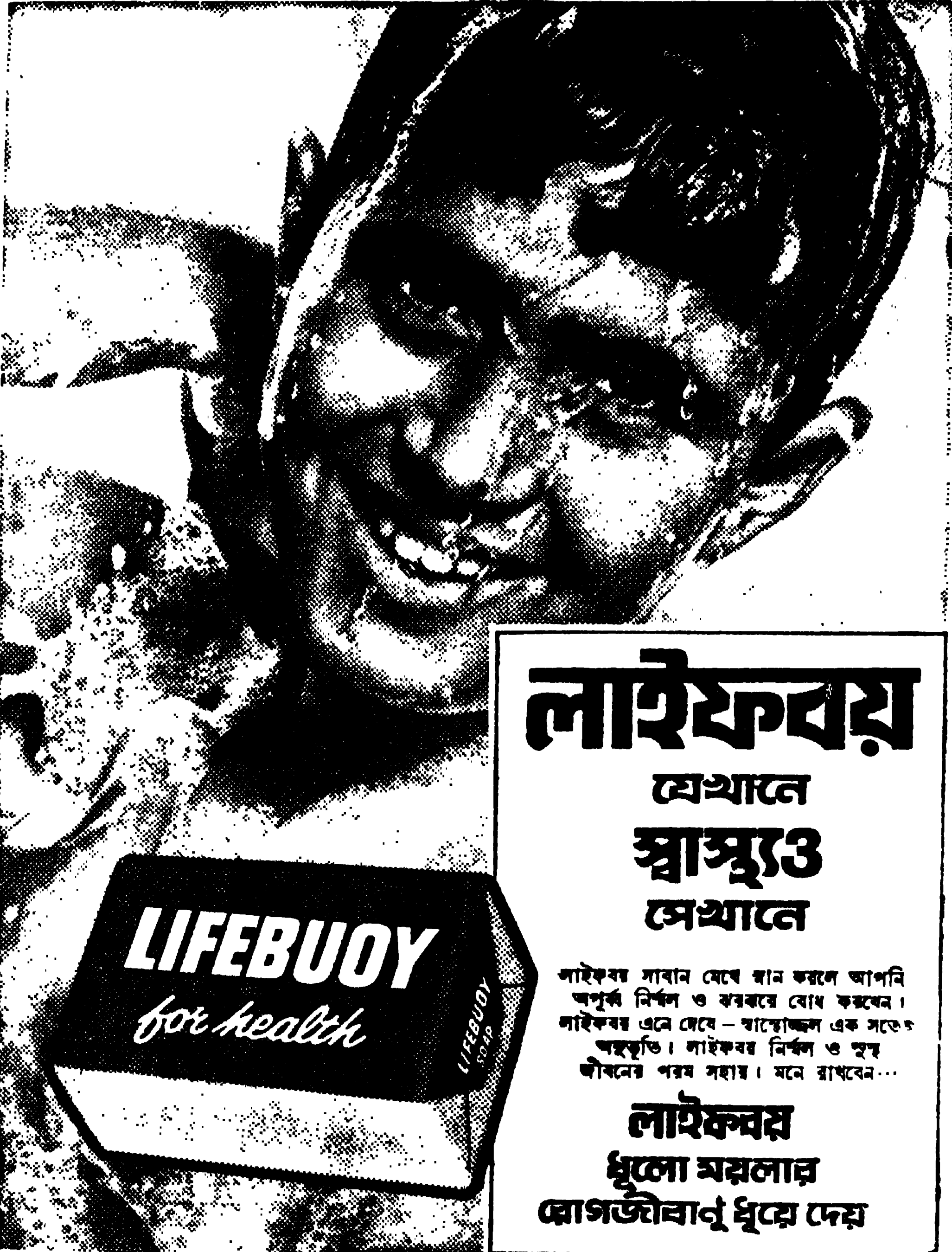
তক্‌ষা তার আগের কথার জের টেনে বলে চলল—তয় যদি পারা তো লই যা। কিন্তু ময় দেখা পালে (পেলে) কাটি পেলাম (ফেলব)।

হোঁসফোঁস করে তক্‌ষা তার বক্তব্যটা শেষ করল। সেই সঙ্গে নিজের বাটির অবশিষ্ট অংশটায় চুমুক দেওয়াও শেষ হল।

তারপর নিধিরামকে হুকুম করল বাটিটা আবার পূর্ণ করতে।

ঐখানেই স্থগিত রইল নিধিরামের প্রণয় প্রসঙ্গের আলোচনা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতেই নিধিরাম দেখল রুক্মিণীকে। সে হাসতে হাসতে তারই কাছে আসছিল। তাকে দেখে নিধিরামের নেশার খোয়ারিটা ভেঙে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল গত রাত্রের কথাটা। আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুকটা। এতদিন রুক্মিণীকে নির্জনে তার ঘরে পেয়ে সে কত কথা বলেছে, কত আদর যত্ন করেছে। কিন্তু তখন তার মুখে কোন কথা এল না।

রুক্নী হাসল—কিরে, কালি কি কথা হোল?

নিধিরামের মুখটা ফ্যাকাশে হ'ল, সে বললে—মোক্ (আমায়) কাটি পেলাব কইছে।

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে রুক্নী বললে—কী সর্বনাশ! কে তোকে কাটবে?

—তর বাপে।

—আমার বাবা! কেন কাটবে, কি করেছিস তুই?

—তক (তোকে) বিয়া করবা চাইছু, তক্ বিয়া করিলে মোক—

—তক্ কাটি পেলাব! নিধিরামের কথাটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে রুক্নী।

—হুঁ।

রুক্নী হাসতে হাসতে বললে—ভারি পণ্ডিত রে! বিয়ে করলে কেটে ফেলবে বলেছে, না বিয়ে করতে দেখলে?

নিধিরামের ভেবাচাকা লেগে গেল, সে বললে—তার মানে?

আবার হাসতে হাসতে রুক্নী বললে—তার মানে, তুই আমায় নিয়ে পালিয়ে যা।

পালিয়ে যাবে। রুক্নীকে নিয়ে? নিধিরাম বোকা বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল তার মুখের পানে।

রুক্নী একটু এগিয়ে নিধিরামের গায়ে ঝাকানি দিয়ে বললে—বল, আমায় নিয়ে পালিয়ে যাবি কিনা? কোন ভয় নেই, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বলেছে।

বিয়ে করতে দেখলে কেটে ফেলবে, পালিয়ে গেলে কিছু করবে না। নিধিরামের বিদ্যাবুদ্ধি ডিগবাজি খেতে থাকল।

মেয়েটা বুঝিয়ে দিলে সে আড়াল থেকে সব শুনেছে—তার বাপ তাকে খুব মরম ক'রে কথা বলেছে। তারা দুজন বিভিন্ন সমাজের। তাদের বিয়ে হয় কেমন করে? মেছ্ সমাজের পাঁচজনকে দিয়ে এই বিয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়ে নিতে হবে না? নিধিরামের অনেক খরচ হ'য়ে যাবে মেল (পঞ্চায়েত) ডেকে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে, তা মঞ্জুর করিয়ে নিতে। কত ঝঞ্ঝাট। এক-একদিনের এক-একটা বৈঠকের লাউপানি, খানাদানার খরচ? এমন ক'টা বৈঠকে এর শেষ হবে কে জানে? পরে আবার বিয়ের খরচ! কোথায় পাবি এত টাকা? রাইজর (সমাজে পাঁচজনের) অমতে বিয়ে দিলে তার বাবা একঘরে হবে, মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু পালিয়ে গেলে তার কোন দোষ থাকবে না।

রুক্নী নিধিরামকে ভালবাসে, সে কি মিথ্যা বলতে পারে, তাকে এমন ক'রে বিপদে ফেলতে পারে? বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে খতিয়ে দেখল রুক্মীর কথাটা। তারপর স্থির হল তার কর্তব্য, তাদের দুজনের কর্তব্য।

।। একুশ ।।

সেই রাত্রেই তারা দু-জন পালিয়ে আসে, যায় শিবসাগরে। রুক্মীর অত আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও নিধিরাম কোন শহরে থাকার বল-ভরসা পায় নি। এক চা-বাগানে মোটর-গাড়ীর ক্লিনারের কাজ যোগাড় করে সে নতুন জীবন শুরু করল। সে জানে, ওপরওলাদের সুনজরে থাকতে পারলেই সরকারী কোর্ট-কাছারির আইন-কানুন এমন সব রাজ্যের খাজনা-না-দেওয়া প্রজাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে পায় না। তবুও একটু সাবধান হতে হয়। নিধিরামের পৈতৃক নাম ছিল ভাতুরাম, তার বদলে বেছে নেয় আধুনিক নামটা। আর বাপ-দাদার উপনামটা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে তার বড় কষ্ট হ'ল। তাই চাংটুকু বাদ দিয়ে বাকীটুকু আঁকড়ে রইল। নিধিরাম শৈশবেই বাপ-মা হারায়। সেই সঙ্গে হারায় ছিটে-ফোঁটা জমিজমা। নিকট আত্মীয় সহায় করে তার গৃহ বৈরাগ্যে। আশৈশব সে দিনাতিপাত করে অপরের ঘরে খাটাখাটুনির কাজে। ওদিক দিয়ে কোন আকর্ষণই নেই তার। আছে শুধু নামের পাশে কাকতি। ঐ তার প্রথম ও শেষ এবং একমাত্র সম্বল। যত বিপদেই সে পড়ুক না কেন, ঐটুকু সে ছাড়তে পারে না।

নিধিরামের বাবা ছিল ধানকলের বড় মিস্ত্রী। বাপের মাথাটাও নিধিরাম পেয়েছে। তাই ক্লিনার থেকে সেও মিস্ত্রীর পদে উঠল। কয়েকটা বাগান ঘুরেফিরে শেষপর্যন্ত সুবর্নশিরি বাগানে এসে বেশ ভাল কাজই সে পায়।

দু-জনই দু-জনের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। সে অভাব এরা উপলব্ধি করে নি কখনো। সব সমাজের ওপরে, নয়তো বাইরে চা-বাগান যেন আর একটা সমাজ। অথবা, এরা দুজনে মিলেই একটা পৃথক সমাজ, একটি বাসার মধ্যে। গাছের ডালেও তো সুখী প্রাণীরা বাসা বাঁধে। তার চাইতেও অনেক নিরাপদ, সোয়াস্তিকর মানুষের বাসা। দুজনের অন্তর সুধা ঢালাঢালি করে দুজনের অন্তর-পাত্রে। তৃষিত হয় পান ক'রে, কথা কয় প্রবল প্রলাপের। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে হেলেদুলে স্ফীত হয়ে ওঠে বুক, বুকের বাসনা কামনা। আকুল ব্যাকুল দু'জোড়া চোখ চেয়ে থাকে। সে চেয়ে থাকা একান্ত একীভূত করে নিতে. স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছিল নিজের জাত-কুল থেকে—স্মৃতিশাসিত হিন্দু সমাজের এক ব্রাহ্মণ যুবক; আর পিতার অলক্ষিত অপ্রত্যক্ষ অনুমোদনে গৃহত্যাগ করেছিল আদিম মেছ্ কৌমের এক সরল নির্ভীক যুবতী। দুজনই কুল-বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায় পরস্পর রচিত এক সাম্যের মঞ্চে, যেখানে তাদের কেউ না ছোট, না বড়, মুগ্ধ মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকে দু'জন কামনার প্রাঙ্গণে।

যুবক ভাতুরা'মর কাছে তক্'বার যে কথা একদিন অতি মরমের বস্তু হয়ে এসে-ছিল, প্রৌঢ় নিধিরামের কাছে আজ তা নিতান্ত সরমের। একদিন সে ভেবেছিল যে চাংকাকতির চাং-টা বাদ দিয়ে সে কাকতিই আছে। অতএব, ঊর্ধ্বতন বর্ণ থেকে নেমেও সে অধ্বরবর্ণতেই আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তখনই বুঝতে পারল মনের অজ্ঞাতে সে জাত হারিয়ে বৈরাগী হয়ে বসেছে। তার যুবক পুত্র রথীরাম আজ পাণিগ্রহণ করে কোন সমাজে, তার যুবতী কন্যা মৃণালিনীকে পাত্রস্থ করে কোন্ সমাজে!

অপরাপর প্রদেশের ধরনে আসামে জাত সমস্যাটা, সাধারণতঃ, তেমন প্রকট, উৎকট নয়। সেটা সামাজিক স্তর ও শ্রেণী বিশেষের কথা। নিধিরামের বংশগত স্থান ছিল সে সবের অনেক ওপরে। তেমন স্তর থেকে নীচে নেমে এলে যে অনেক নীচে পড়ে থাকতে হয়, সেটা নিধিরাম উপলব্ধি করল এতদিন পর।

চাং-কাকতির যে চাংটা সে নিজ হাতে ভেঙে এসেছে, সেটাকে গড়ে তোলবার কোন পন্থাই খুঁজে পায় না। অথচ ছেলে-মেয়েদের নামিয়ে দেবার কথা ভাবতেও লজ্জায় নুয়ে পড়ে তার মাথা। নিধিরাম চেয়ে দেখে একই সমাজের বিন্যাস বৈষম্য। অর্থের বলে, জমির আভিজাত্যে কত লোক উঠে যায় ওপরে, নীচে পড়ে থাকে শুধু দরিদ্র কামলা, আর খেতি কাম করা মানুহ (মানুষ)। নিধিরামের মন রুখে দাঁড়ায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায় সমাজ। কিন্তু কেমন করে? সেখান থেকে সে নির্বাসিত, যেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে কি করে সেখানে ফিরে যায়? সেখানে যেতে পারলে তো ভাঙবে। গেলেই বা কে শুনবে তার কথা? কতখানি তার জোর? — সে নতুন সমাজ গড়বে! তার মন বলে যায়—তা গড়ো। ভেবে দেখ কি করেছ—ভেঙেছ না গড়েছ? গড়ো গড়ো. ভাঙো। একটা আর একটার নামান্তর মাত্র। ভাঙার মধ্যে গড়া শুরু হয়েছে মহাভারতের দিন থেকে, তারও আগে থেকে। কেন পিছিয়ে থাকবে? ভাঙলেই দেখবে, গড়েছ। বেশ তবে সে ভাঙবে। কিন্তু কি ভাঙবে, কাকে ভাঙবে? ভাঙার বস্তু হাতে পেলে তো ভাঙবে।

এমন ভাঙা-গড়ার ভাবনা-চিন্তার মাঝে মেঘু এল নিধিরামের সামনে। তার মতো দরদী, তার পুত্র-কন্যার মতো সমব্যথী কোথায় পাবে মেঘু?

প্রকৃতির আবর্তনে ভূগর্ভের কত রত্ন-সম্ভার মানুষের হাতের সামনে আসে। গালালিক শিলা, আগ্নেয়শিলা, স্ফটিকমণি খণ্ড খণ্ড হয়ে গড়িয়ে যায়, ভেসে যায়, মানুষের তল্লাসী-চোখের সামনে দিয়ে। মানুষ তা বেছে আনে, কত কাজেই না লাগায়। তেমনই যেন একখানা রত্ন মেঘু, কোথা থেকে ঠিকরে এসে পড়ল নিধিরামের সামনে। তার আশা সেও গড়ে-পিটে নেবে মেঘুকে। ভাঙার-ভাঙায় জোড়া লাগিয়ে দেখবে কিসের সৃষ্টি হয়। তাই ভেভিডের তাড়না থেকে মেঘুকে রক্ষা করতে এতটা যত্ন নিয়েছে সে। নিজের চাকরীটা বজায় রাখায় সঙ্গে মেঘুকেও

আগলে রেখেছে, তাকেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে। সারা দিন তাকে খাটিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও খেটেছে কত।

যে পাষাণখানা মেঘুর কপালটা এতদিন চেপে রেখেছিল সেটাকে সবাই একটু একটু করে টেনে সরিয়ে দিয়েছে। তবেই না এত অল্প সময়ের মধ্যে হয়েছে তার এতখানি সফলতা।

যারা জানে মেঘুর কথা তারা সবাই বলে—এমনই হয়। যখন সময় ভাল আসে তখন শত্রুরাও ভাল করে দিয়ে যায়, যখন খারাপ তখন শুভাকাঙ্খীর চেষ্টাতেও অশুভ ফল দেয়।

নিধিরামের ঘর থেকে যা কিছু পানাহারের জন্য আসে কারখানায় কাজের সময়, তার অংশ মেঘুকে না খাইয়ে সে খায় না।

মাঝে মাঝে নিজের ঘরেও নিয়ে যায়, খাওয়ায়। তাকে আপ্যায়িত করে ঘরের সবাই মিলে। সময়ের বড় অভাব মেঘুর, তাই সে যেতে চায় না—যেতে হয়, খেতে চায়না—তবু খেতে হয়। মেঘু তাকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করে, তার অবাধ্য হ'তে পারে না। তার স্ত্রীর কথা, তার সম্মানও রাখতে হয়। তাদের পুত্রকন্যার সঙ্গে স্নেহ-মমতার আদান-প্রদানও হয়, দুটো চারটে পড়া শোনার কথাও বলে। রেডিওর সামনে কান খাড়া করে বসেও থাকে, কখনো বা রেডিও বন্ধ ক'রে মৃণালিনীর গানও শোনে। এক কথায় লোক-লৌকিকতা রক্ষার জন্য যেমনটি দরকার, সবই করতে হয় মেঘুকে।

মেঘুর জীবনে সামাজিক আদান-প্রদানের এটা দ্বিতীয় দফা, দ্বিতীয় স্তর। একটু উন্নত ধরনের—একটু কেন, বেশ। তাই মেঘুর টিফিনের জন্য বিলিকেও এমন খাবার পাঠাতে হয়, যার ভাগ সেও নিধিরামকে দিয়ে খেতে পারে। তাই বিলিকেও রুক্নীর কাছে যেতে হয়, তার ছেলে-মেয়েকে আদর জানাতে। মেয়েটি বিলির ছাত্রী। তাই বিলির সামনে তার চাল-চলন কিছু ভয়ভক্তির আড়ষ্টতা জড়ানো। সেই আড়ষ্টতার আবাদে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে আন্তরিকতা।

মেয়েটির চেহারা নিজস্ব—নয়তো মা-বাবা মেশানো। সুডোল সুঠাম ষোড়শী। পাকা সোনার বর্ণ। সুগোল মুখের কেন্দ্রে চোখা নাক, দু-পাশে কাত হ'য়ে ভাসছে দু'টি চোখ—যেন তুলি দিয়ে আঁকা দু'টি ভুরুর নীচে। হাসলে চখা-চখী উড়ে এসে বসে সেই মুখে—তার পূর্বে যেন শান্ত নিস্তব্ধ সরোবর। গান গেয়ে যেন বিছিয়ে দেয় একখানা সুরের আসন।

ছেলেটি বাপের মতো। তামাটে বর্ণ, চেহারা চোখা, দেহটা ছিপছিপে লম্বা। বয়স, কুড়ি কি পঁচিশ। অল্প-স্বল্প লেখা-পড়া ক'রে এই বাগানেই কাজ নিয়েছে। মুহুরীর কাজ—সর্দারের ওপর, বাবু-কর্মের প্রথম স্তর। লেখাপড়ার দরকার নেই এতে। শুধু কুলি-মজুর খাটাতে পারলেই হ'ল। বাপের বেহালার উত্তরাধিকারী। অপূর্ব বেহালাবাদক। উৎসবের দিনে সে অপরিহার্য। সাহেব-মেমেরও কান খাড়া হয়ে ওঠে, যদিও তার বেহালা থেকে পাশ্চাত্য সুর নির্ঝরিত হয় না।

ছেলেটি জন্মের পর নিধিরাম বংশগত রাম ভক্তির জের টেনে তার নাম রাখল রথীরাম। মেয়েটির বেলা সে সবের বালাই ছিল না। নিধিরামের মানস সরোবরে যেন ভেসে উঠল একটি মৃণাল—তাই তার নাম রাখল মৃণালিনী। কিন্তু আজ সেই প্রস্ফুটিত মৃণালিনীর জীবন যেন কণ্টকাকীর্ণ। পদ্মের শুচিসৌরভে ভ্রমর পতঙ্গাই এগিয়ে আসতে জানে। মানুষ কাঁটার ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে দু'টি লোলুপ চোখে আমেজের আবেশ ঢেলে দিয়ে। শুধু মধুরই লোভে।

মৃণালিনীর এই আটপৌরে নামটা মিনি নামের তলায় চাপা পড়ে প্রায় পোষাকীর শামিল হ'য়ে ছিল। তা' ছাড়া আর একটা নাম তার আছে। রুক্নী তার নাম রেখেছিল—প্রমীলা। সেটা যেন এতদিন সবাই ভুলেই ছিল। যেদিন নিধিরাম মেঘুকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে আসে সেদিন হঠাৎ রুক্নীর মনে হ'ল মিনির সেই নামটা—প্রমীলা। তার বুকের ভিতরটা অপূর্ব আনন্দে হেলেদুলে যেন কি একটা উৎসবের আয়োজন করতে থাকে। সেদিন থেকে পুরানো নামটা নতুন হ'য়ে সকলের মুখে বাজতে থাকে। সেদিন থেকে মরচে পড়া নামটা অপূর্ব চাকচিক্য নিয়ে বাতাসের শিরায় শিরায় বিজলীর ঝিলিক দিয়ে কাঁপতে থাকে। রুক্নী কথায় কথায় মিনিকে ডাকে—প্রমীলা।

—প্রমীলা! মেঘুর খাবারটা নিয়ে যা মা।

—প্রমীলা! মেঘুকে চায়ের বাটিটা দিয়ে আয় মা।

—প্রমীলা, একটা গান শোনা—

রথীরাম তো একটা ছড়াই বেঁধে ফেললে। সময় সময় তাতে সুর যোজনা ক'রে বেহালার ছড়ে টান দিয়ে ছড়াটা রূপায়িত ক'রে তোলে গানে।

যখন মেঘু আসিলেন
নিধিরামের ঘরে,
(সুবর্ণশিরি উহ্য) উপকূলে সখীগণ
পুষ্পবৃষ্টি করে।

মিনি খেপে ওঠে, রুক্নী তা আড়াল থেকে উপভোগ করে। মেঘুর সামনে গান-বাজনা হাসি ঠাট্টার মাঝেও রথীরাম সুর ক'রে একটু বাজিয়ে নেয়। মিনি আড়ষ্ট হ'য়ে কটমট করে তাকিয়ে থাকে রথীরামের পানে, নয়তো রাগ ক'রে উঠে যায় সেখান থেকে। রাগটা কখনো চাপা থাকে, কখনো বা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

মেঘু হয়তো বোঝে, নয় তো বুঝেও বোঝে না। তবে ঐ সুরটা সে জানে। কারণ ওটা অতি পুরানো ছন্দ ও সুর। সেটা রথীরামের অমন ক'রে বাজানো, এবং সেই সঙ্গে প্রমীলার রাগ দেখানো ভাবটা সে লক্ষ করেছে।

নিধিরামের ঘরে মেঘু পায় একটা নতুনত্বের স্বাদ। ভালই লাগে তার। মনের অগোচরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে দু'খানা ছবি। রাঘবের নিষ্প্রভ ঘরের মাটির বেড়ায় সদ্য প্রলেপের পূতিগন্ধ, এদের পাকা ঘরের বিজলী কণার সঙ্গে ছিটকে আসে চুনের গন্ধের উগ্রতা। শর্মিষ্ঠাদের ঘরে আসা-যাওয়া শুরু হয় বাল্যে। সেখানকার সম্বন্ধে ছিল বাল্যের নিঃসঙ্কোচ চপলতা। ওখানকার পরিবেশে মেঠো গন্ধ। যত লেখাপড়াই শিখুক শর্মিষ্ঠা, শুধু তাই দিয়ে গন্ধ দূর করা যেতে পারে না। এখানে বয়সের গাম্ভীর্য মার্জিত আলাপ ও আচরণ, উন্নত পরিবেশ। এখানকার পরিবেশে সে এমন অনেক কিছু পেয়েছে যা দিয়ে জনসমাজে চলাফেরা করা যায়।

কিন্তু তার মনের মধ্যে একটি প্রশ্নই তখন মাথা চারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সব কথা তলিয়ে গেছে তাতে। নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তাই তার অনেক কাজ। তাই সময়টা এভাবে নষ্ট হ'তে দিতে পারে না, চায়ও না। তবুও যেতে হয়, যায়। অনু-

রাগ নয়, বিরাগও নয়। তবে কি? মেঘু বুঝতে পারে না তা; মনের কাছেও কোন জবাব দিতে পারে না।

।। বাইশ ।।

সভ্যতা ও বর্বরতা দুটোই প্রাচীন। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বহু মনীষী বর্বরের মধ্যে যেমন পেয়েছে সভ্য আচরণ, তেমন সভ্যের মধ্যেও পেয়েছে বর্বরতা। বর্তমান চোখের সামনে, কিন্তু পৃথিবীর আদিম অধিবাসীর উন্নত জীবন প্রণালীর বহু নিদর্শন পাওয়া যায় পর্বতে, কন্দরে, জঙ্গলে, ধ্বংসাবশেষের স্তূপে।

আনন্দ সাধারণ ও চিরন্তন। অনাদি কাল থেকে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে—জলে, স্থলে ও নভে। মানব সমাজে তা নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সাপেক্ষ। প্রকৃতির আবর্তন বিবর্তন প্রসূত দান গ্রহণ এবং ধর্মকর্ম পর্বের উল্লাসে তার বিকাশ ও প্রকাশ।

আসামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আজ আনন্দমুখর। বিভিন্ন কৌমের বসবাস সমন্বিত এই চা-বাগানও পিছিয়ে নেই সেই আনন্দ উপভোগ থেকে। তাই সুরের সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসে পল্লীগীতের কথা—

অতিকৈ চেনেহর (স্নেহের) মুগারে মহুরা
তাতোকৈ চেনেহর মাকো,
তাতোকৈ চেনেহর মাঘরে বিহুটি
নেপাতি কেনেকৈ থাকো!

মাঠে-ঘাটে, পাহাড়ের মাথায়, চলতে-ফিরতে, কাজ করতে করতে ঐ একই গান আসামের ছেলে-মেয়েদের মুখে। সারা আসামের আকাশে-বাতাসে মাঘ-বিহুর আগমনীর সুর ভাসতে থাকে পৌষের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। কেউ নিজের খেতের ধান কাটে, কেউ বা হাউড়ি খাটে (বিনা পারিশ্রমিকে জলপান খেয়ে কাজ করা)। মুঠো মুঠো ধান কাটতে কাটতে আনন্দ উৎসবের ধ্যান। বাংলা ও আসামের সর্বত্র এই নবান্ন অনুষ্ঠান। এখানে গানের কথাই বলে দেয় মাঘ মাসের বিহু কত প্রিয়, কত প্রিয় মুগার সুতো, তার চেয়ে প্রিয় মাকু। যে মাকু চালনার কৃতিত্ব এদেশের কুমারীদের বিয়ের যোগ্যতার মাপকাঠি। তারও অপেক্ষা প্রিয়, পৌষ-সংক্রান্তির পর, মাঘ বিহু। তা পালন না-করে কি থাকা যায়।

গৃহস্থের ঘরে ঘরে ঢেঁকি ওঠে আর নামে। পিঠা-পার্বণের কতই না আয়োজন। তাছাড়া কুমার-কুমারীদের বনভোজন, নাচ-গানও আছে। দিনের পর দিন কত আয়োজন শুধু একটি দিনের, একটি রাত্রির জন্য। পল্লীর মাঠে মাঠে ওঠে রকমারী ঘর—বাঁশের কাঠামো, খড়ের চাল ও বেড়া—মন্দিরের মতো, মুকুটের মতো। ছেলে-মেয়েদের নাচগান চলবে সেখানে সারা দিন-রাত ধরে। শেষ রাত্রে আহারান্তে ঘরটি জ্বালিয়ে দিয়ে যে যার ঘরে ফিরবে।

চীন জাপানেও এমন ঘর তৈরী করবার প্রথা আছে। কিন্তু তার তাৎপর্য ভিন্ন। সেখানে রাজকীয় ব্যাপার, হাজার হাজার টাকা খরচ করবে, বহু কলা-কৌশলের পরিচয় দেবে একটি ঘর তুলতে, শুধু একটি রাতের জন্য। তারপর হবে সব ভস্মীভূত। তবে হবে তৃপ্ত ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ। আসামে সেই ঘর জ্বালিয়ে দেবার পর কেউ ঘরে ফেরে, কেউ-বা ফেরে না। নাচে পরাজিত কুমারীর হাত ধরে নেমে যাবে মাঠে—সেখান থেকে ঘর, যদি হয় সে ঘর আশঙ্কার জালমুক্ত। তা নইলে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নিরুদ্দেশ।

চা-বাগানের কুলি-বস্তি পূর্ণ করেছে ভারতের বিভিন্ন আদিবাসীদের বংশধরেরা। তাদের সহজ-সরল আনন্দমুখর জীবন প্রবাহের সঙ্গে, প্রাকৃতিক আবর্তনপ্রসূত পান-ভোজন ও নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের সঙ্গে আসামের বিহু উৎসবের মিল আছে। তাই এখানকার চা-বাগানেও তা সমাদরে গৃহীত হয়েছে।

মেয়েরা ব্যস্ত। গান গায় ঢেঁকির তালে—ধান ভানে, চাল গুঁড়োয় চিঁড়া খোন্দে খৈ-মুড়ি ভাজে, নাড়ু বাঁধে—তিলের, নারিকেলের। নতুন টেকেলিতে (মাটির কলসিতে) ভরে রাখে আখের গুড়, দৈ-গাখির (কাঁচা দুধের দৈ)। এমন কত কি।

পুরুষরা ব্যস্ত—চাল-চানা, হাঁড়িয়ার ধান্দায়। কেউ তৈরী করে, কেউ-বা বায়নার টাকা হাতে ঘুরে বেড়ায় দরজায় দরজায়।

হাঁড়িয়াটা চাই-ই এদের। এটা না হলে কিসের উৎসব? আমোদ-প্রমোদ, বিয়ে-শাদি, উৎসব-পার্বন, কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা—এমন কি আড্ডাটাও তো জমে না এটা ছাড়া। সেদিক দিয়ে বিলেতী সাহেব। তবে খাওয়া পর্যন্ত, তারপর নয়। এরা আগে হাঁড়িয়া গেলে, পরে সেটাই এদের গিলে বসে। যে কাজে বসে তাও ভণ্ডুল করে ফেলে। তার মীমাংসার জন্যও চাই হাঁড়িয়া।

নেশাটা করে সকলেই, কিন্তু তৈরী করবার লোক নয় সবাই। অনেক ঝঞ্ঝাট তাতে। ধুতুরা-গোটার সঙ্গে অনেক গাছ-গাছড়া ভাগ মতো মিশিয়ে-মিশিয়ে পিষে এক-এক টেকেলির (মাটির কলসির) আন্দাজ লাড্ডু বেঁধে রাখে। কলসিতে থাকে ভাত পচানো জল। দরকার মতো এক কলসিতে একটা লাড্ডু ফেলে দিলেই হাঁড়ির মধ্যে গেঁজিয়ে ওঠে হাঁড়িয়া। খাবার আগে একটু গরম করে নিলে কাজ দেয় ভাল। স্থান বিশেষে ওটার নামও বদলে যায়, মাল-মশলারও কিছু তারতম্য থাকে। সমতলে কাছাড়িদের জিনিসটা বেশ কড়া। নাগাদের আরো বেশী। খাসিয়া পাহাড়ে মাফলং-এর মালটা যেমন দেখতে তেমনি কাজের—চেনা যায় না হুইস্কি কিনা। অনেকে ঠকে কিন্তু—দেখায়, চাখায় নয়। অসমীয়ারা বলে—লাউপানি, পচাটা ভাতের জল—অর্থাৎ পান্তাভাতের জল বলে রেহাই পায় চক্ষু লজ্জা থেকে। নেপালীরা বলে—রক্সি, নাগারা—জু, খাসিয়ারা —কাকিয়াত, আবররা —আপং। সুন্দর পোশাকী নামও আছে—মধু। আবর, মিসমি, নাগা—সব পাহাড়ই মধুময়।

অতিথি অভ্যাগতদের জন্য চা বা শরবৎ নয় সে সব স্থানে। আরো বড় লৌকিকতা—ধর্ম। ধর্মরক্ষা না করলে বেজার হবে তারা। হিল্লি-দিল্লী থেকে যিনি সেখানে গেছেন তাঁকেই জিবের ডগায় ঠেকাতে হয়েছে মধু।

নাক কেন কোঁচকায়, মুখ কেন বাঁকায়? মধুর স্বাদ জানে না!

ডিস্‌টিল্‌ড্‌-ও হয় মধু। তখন অসমীয়ারা বলে, 'ফটিকা'। সিগারেটের ছাই ফেলে কড়া করে নেয় কেউ। —ছাই! ইংরেজরা হুইস্কির গেলাসে ছাই ফেলে রসিকতা করে বন্ধুর সঙ্গে? কিন্তু এরা পেলো কোথা থেকে? তবে এরাও কম আধুনিক নয়! মনে পড়ে জাপানী বন্ধুর কথাটা। ইণ্টারন্যাস্‌ন্যাল্‌ লেবার অর্গানিজেশানের রিসার্চ অফিসার। কত গল্প বলেন নিজের দেশের সম্বন্ধে, এখানে একটা খাপ খায়:

প্রাচীনকালে, একদা এক সরাইওলা পরিমিত বিয়ার পান করে অপরিমিত নেশায় ঢুলে পড়ে। নেশাটা কেটে যেতে খবর নিয়ে জানলো—বিয়ার ভর্তি পিপার মধ্যে ঘটনাক্রমে ছাই পড়েছিল। সেই থেকে জাপানীরা নাকি ছাই মিশিয়ে বিয়ার কড়া করে। তা হলে ছাই মেশানো প্রথাটা যেমন প্রাচীন তেমনি প্রাচীন এদেশের হাঁড়িয়া প্রস্তুতকারকরাও।

আরও নেশা আছে। নেশার নাম ব্যক্তির নামের সঙ্গে জুড়ে বেড়ে গেছে আভিজাত্য। কানি (আফিম) খেয়ে হয়েছে কানিয়া, ভাঙ টেনে ভাঙুড়ি। যেমন, ঘটিরাম কানিয়া, বাটিরাম ভাঙুড়ি। বংশগত উপনাম উঠে গেছে নেশার কৌলিন্যে। আজকাল পারমিট ছাড়া আফিম পাওয়া যায় না। তাই কানিয়ার মান-কান রক্ষা করা বড় মুশকিল। পয়সার ঘাটতি হলে মনের পাল্লায় দু-দিকে ঝুলতে থাকে দুটো বস্তু—একদিকে কানি, অপরদিকে হাল গরু। কাকে রাখতে কাকে ছাড়ে! কানিটাই ঝুঁকে পড়ে। ভাঙুড়িদের কোন অসুবিধে নেই। ওটা মাঠে-ঘাটে গজিয়ে থাকে। শুধু আজলা ত্যাগ করে, তুলে এনে শুকিয়ে রাখলেই হল। তামাকটা

যাজে, ওটাতে মন ওঠে না কারো। ওতে হয় খইনি, সাদার গুঁড়ো।

ব্যোম শঙ্কর, কালি মা-তারা! নেশার বড় ফুর্তি নেই। —আছে আছে, আরো আছে। নাচগান! ওদিকে চলেছে নাচগানের মহলা প্রত্যেক লাইনে। যার যেমন প্রথা, সামর্থ্য। এক-এক লাইনের ছেলেরা ঘর বাঁধে এক-একটা মাঠে। আয়োজন—খিচুড়ি, চাল আর ডাল, নয়তো ডালের বদলে মাটি কলাই। মশলাও চাই। অসমীয়ারা তেমন পছন্দ করে না ওটা, তারা ব্যঞ্জনে মেশায় ক্ষার। কিন্তু এদের তা নয়। পাঁঠা কিংবা পায়রা, দৈ-গাঁথির, বুন্দিয়া- মিঠাই লাড্ডু। এমনই কিছু। তিনের সঙ্গে চার নম্বর লাইনও এবার হাত মিলিয়েছে। নাচেগানে তাক লাগিয়ে দেবে সকলকে। অনেক আগে মাস্টার আনানো হয়েছে শিবসাগর থেকে —আহোম শাসিত কালের কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্র।

অঘ্রানের প্রথম দিকে হাজির হয় সুন্দর ফোয়ান মাস্টার—গুণারাম কলিতা। যেমন ঐতিহ্যপূর্ণ নাম, তেমন গুণী লোক। বৌদ্ধ যুগে এই কলিতা জাতি ব্রাহ্মণের কাজ করেছে, মর্যাদাও পেয়েছে। তার ওপর গুণারামের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন আসাম রাজার নটনটীদের শিক্ষক।

এত বড় লোক গুণারাম! এমন লোক জীবনে চোখেও দেখেনি তাদের কেউ। চারপাশের মানুষ ভেঙে পড়ে গুণারামকে দেখবার জন্য। গুণারামও সকলকে দেখে আর স্ন্যাপ তুলে রেখে দেয়—কার সঙ্গে কার জোড় বাঁধার সম্ভাবনা। তার আশা, ঘরে-ঘরে ঘর বাঁধা। ভাঙা ঘরও জুড়ে দেবার বিদ্যা জানা আছে তার। তবে তো গুরুদক্ষিণা আসবে। নইলে খেয়ে পরে তিন মাসে তিন কুড়ি টাকায় কি হবে?

ক্রমে দর্শকের ভিড় ভেঙে যায়। থাকে শুধু তরুণ-তরুণীরা, গুণারামের ছাত্র-ছাত্রীরা। তখন গুণারাম গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করে—বীর্যবান ছাড়া আমার কাছে স্থান পাবে না। ব্রহ্মচারী চাই, নইলে আমার বস্তু গ্রহণ করতে পারবে না।

হঠাৎ ছেলেগুলো সতেজ হয়ে দাঁড়ালো —'এনোজ ফ্রুট-সল্ট' থেকে সঞ্জীবনী পালসার বিজ্ঞাপনের ভঙ্গিমায়। মেয়েরা নরম-নরম চোখ ফিরিয়ে একটু হেসে নিল, যার যার নিজের দেহের আড়ালে।

—গতিশীল অঙ্গ-বিন্যাস ও অঙ্গ-ভঙ্গি, তার সঙ্গে যুক্ত হবে নূপুরের ধ্বনি। সেই ধ্বনি-বিন্যাস জাগিয়ে তুলবে ছন্দ-স্পন্দন, তবে হবে নৃত্য। সজীব প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে তার প্রতিটি প্রকাশ।

হাঁ-করে সবাই চেয়ে রইল। কথার ভাব-ভঙ্গিটা ভালই লাগলো, কিন্তু বুঝলো না, ওটা কেমন করে হবে! নাচে তো পা নয়ে।

গুণারাম বুঝলো তাদের ভাব। কিন্তু অভ্যাস মতো কঠিন-বোধ্য ও কষ্টসাধ্য বস্তুটা সহজভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে সেটা কঠিনতর করে তুলল। সে বলল—নৃত্যগীত কি সহজ বস্তু! —বাছারা, অনেকখন দাঁড়িয়ে আছ। বহ্য বহ্য (বোস বোস), সব বুঝিয়ে বলছি। বলতে বলতে রাত প্রহর করে দিতে পারি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে!

গুণীর গুপ্ত বিদ্যার কথা অনেক শুনেছে তারা। সেই রহস্যের সন্ধানে মন উৎসুকভাবে অপেক্ষা করছে। সে না হয় ফাঁকে-ফুরসতে হবে। নাচ-গানটা নগদ লাভের। কিন্তু গুণারামের কথা সময় সময় ভাষার এমন কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে যা তাদের মতো শক্ত মাথার সংঘাতেও ভাঙতে চায় না। তবু তার কথাগুলো ভাল লাগছিলো সকলের। পণ্ডিতের কথা তো এমনই হবে। কথা নাইবা বুঝলো, এক-দুই-তিন হলেই ধরে নেবে। —সবাই স্থির হয়ে বসল।

নিজের গুরুত্ব বাড়াতে গুণারাম আরো গুরুগম্ভীরভাবে বললে—নৃত্যগীত কি সাধারণের জন্য? এসব দেবলোকের।

তবেই হয়েছে!

গুণারাম একটু চুপ করে রইল। সকলের মন মুহূর্তে তলিয়ে গেল হতাশার অথৈ জলের তলে।

—ভয় নাই, ভয় নাই! চট করে গুণারাম সকলকে টেনে তুলে নিয়ে বললে— তোমাদেরও আছে, বেশ ভাল রকমই আছে। বলছিলাম—নাচ তো অনেকেই দেখায়, কিন্তু শাস্ত্র জানে ক'জন? নাচের ধর্ম জানে ক'জন?

তার কথার প্রথম অংশটা সকলের দেহমন নাচিয়ে তুলেছিল, কিন্তু শেষেরটায় সবার দেহমন নাগরদোলায় দুলতে থাকলো। ওরে বাবা! নাচের শাস্ত্র! নাচেরও ধর্ম আছে? সেরেছে!

সকল বোঝাবুঝির রফা করতে গুণারাম বললে—নৃত্যগীতের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধটা জেনে রাখা চাই। তারপর যেমন খুশী কর।

তবে তো ঠিকই আছে! সবাই একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ভাল হয়ে বসলো।

—ইন্দ্রের কোন কাজটা নৃত্যগীত ছাড়া উদ্ধার হয়েছে? যেমনি বিপদে পড়েছেন, অমনি ডাক অপ্সরাদের! তাঁর সভায় অনন্ত-যৌবনা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, হেমা, সোমা, নাগদন্তা থেকে প্রৌঢ়া মিশ্রকেশী পর্যন্ত কত অপ্সরাই না ছিল। ধর্মরক্ষার জন্য কত কাজই না করিয়েছেন দেবরাজ তাঁদের দিয়ে!

অপ্সরাদের কথায় ছোকরাগুলো বেশ সতেজ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সব মিলিয়ে

যা বুঝলো তাতে আবার ভেঙে নেতিয়ে পড়লো। গুণারামের কথাগুলো সকলকে যেন নাকানি-চোবানি খাইয়ে নিস্তেজ করে দিল।

আবার তাদের চাঙা করে তুলতে, গুণারাম বললে—শরীরের সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেতনাবোধ ধরে রেখে তা নিয়োগ করতে হবে নৃত্যের ভঙ্গিমা প্রকাশে, তাকে সজীব করে তুলতে—তবে হবে নাচ: অন্তরের সমস্ত দরদ, সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ঢেকে দিতে হবে কণ্ঠে—তবে হবে গান।

কথাগুলো সব বোঝা যাক বা না যাক সবাই স্থির-উৎসুক হয়ে শুনলো। মোটামুটি বোঝা গেল—কি সব করলে তবে নাচগান হবে। আচ্ছা, তার জন্য ভাবনা কি? এমন গুণী মাস্টার আছে, সময় মতো সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দেবে নিশ্চয়ই।

গুণারাম বললে—এখন শুধু দম বাড়াবার জন্য কতগুলো জিনিস দেব। সে সব ভাল মতো রপ্ত হলে আসল চিজ ছাড়বো।

—হাঁ, তবে তাই হোক স্যার। বলে, সবাই সোৎসাহে উঠে দাঁড়ায় আর কি।

গুণারামের কথা তখনো শেষ হয়নি। তা না হলে কাজ শুরু করা যায় না। কারণ, এই ভূমিকার ওপরই কাজের গুরুত্ব নির্ভর করে। সে বললে—শরতের শুক্লা ত্রয়োদশীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেবে—আমার বিবাহ নৃত্য। রূপ, রস, গন্ধভরা অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় - পূর্বরাগ নৃত্য। বসন্তের নবোন্মুখ পুষ্পের জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে—আমার বসন্ত নৃত্য। যৌবন বাসনাবিন্যাস রোমাঞ্চ হয়ে উঠবে আমার স্বয়ংবর নৃত্যে।

যতটুকু বুঝলো তাতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে বাকী ছিল না কারো। তার ওপর মদনের মোক্ষম ছাড়লো গুণারাম। সে বললে—এমনই সে সব নাচ যাতে দর্শকের সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ জেগে উঠবে, নেচে উঠবে তাদের প্রাণ, প্রাণের স্পর্শ-লাভের দুর্দমনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায়।

ভাষার যত উৎকট আবরণেই ঢাকা থাক না কেন কথাগুলো, গুণারামের প্রকাশ-ভঙ্গি প্রাঞ্জল। সকলের প্রাণমন তার কথা শুনেই নেচে উঠলো—লাফিয়ে উঠতে চায় দেহ। তখনই জেগে উঠলো মনে কি একটা স্পর্শ লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। আর ওপাশে মেয়ে কটির বুকের মধ্যে শুরু হল এক অনির্বচনীয় স্পন্দন।

গুণারাম বেশ জানে—কখন বলতে হয় কোন কথা, দেখাতে হয় কোন ভাবভঙ্গি। হঠাৎ সে তিড়িং করে উঠে দাঁড়ালো নাচের ভঙ্গিতে—হাত পা নাড়া দিয়ে কত কি দেখিয়ে দিতে থাকলো। সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা মুদ্রার নাম বিশ্লেষণ করে বলেও গেল কত কথা। তারই উপসংহারে সে বললে—এদিকে নৃত্যমঞ্চে একজনের পায়ের তলায় আর একজন লুটিয়ে পড়বে শিথিল হয়ে। সবাই দেখবে—কে বিজেতা, কে বিজিত। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, দ্রৌপদীর মালা। দেখবে সবাই, দেখবে নৃত্যগীতের মাধ্যমে এই নবান্ন উৎসব কেমনভাবে রূপায়িত হয়ে উঠবে, দেখবে এর শুভ পরিণতি।

বাস্! এই তো চায় তারা!

গুণারামের কথা শেষ হল, সে বসে পড়লো। একটা মৃদু গুঞ্জরণ ধীরে ধীরে মুখর হয়ে ভেসে বেড়াতে থাকলো নাম-ঘরটায় একপাশ থেকে আর একপাশ পর্যন্ত।

দুটো লাইনের যত ছেলেমেয়ে সব ভিড়ে পড়লো গুণারামের আখড়ায়। প্রৌঢ়দেরও লোভ গজিয়ে উঠলো। তারাও শিং ভেঙে ছোকরাদের দলে ভিড়ে পড়বার উপায় ভাঁজতে থাকলো।

(ক্রমশ)

ধলভূমের ছড়া

বঙ্কিম মাহাতো

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম সীমানার
ারে এগিয়ে গেলেই ধলভূম। একদা
টি করদ বাফার রাজ্য, বর্তমানে
ারের সিংভূম জেলার একটি মহকুমা।
০০ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
স্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মেদিনীপুর
ার সংগে এই রাজ্যটি-ও যুক্ত হয়।
৩২ খৃষ্টাব্দে চুয়ার বিদ্রোহের পর
ভূমকে জুড়ে দেওয়া হয় মানভূম জেলার
া এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সিংভূম জেলার
া। এবং তারও পরবর্তী কালে ধলভূম
াটিকে দু'ভাগ করে এক ভাগ মেদিনী-
জেলায় যোগ করা হয়। যুগে-যুগে
নভাবে ধলভূমের শরীরী পরিবর্তন
ছে। কিন্তু পরিবর্তন ঘটেনি এব
তরধর্মের। ধলভূমের বাংলাভাষা কিংবা
লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে বিবর্তন
লে-ও ঝাড়খণ্ডী বঙ্গসংস্কৃতির
পটি অব্যাহত থেকে গেল। পুরু-
ার সঙ্গে সব দিক দিয়ে হরিহর-আত্মা
র্ক থাকলে-ও ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য
ার্গঠনের সুযোগে পুরুলিয়া বাঙলা
ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যের
টেনে ধলভূম অন্য ভাষা সংস্কৃতির
বিহারের কুক্ষিগত হয়ে থেকে গেল।
৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর
ই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত রথচক্র
ভাষা সংস্কৃতিকে নিঃশেষে গুঁড়িয়ে
ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আশ্চর্য,
ও ধলভূম সযত্নে তার ভাষা এবং লোক-
ত্যকে লালন করে চলেছে। ধলভূমের
ভাষা শব্দ এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্যে বাংলা
র অন্যান্য উপভাষাগুলো থেকে
ন্ন চরিত্রের। এর লোকসাহিত্য প্রাচুর্যে,
ত্র্যে এবং সম্পদগুণে অনায়াসেই লোক-
রসিক এবং গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ
ত পারে। তবে দুঃখের বিষয়, ধলভূমের
-গ্রামান্তরে ঘুরে লোকসাহিত্য-সংগীত
হের তেমন প্রচেষ্টা এখন অব্দি দেখা
নি। পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর
ার সীমান্ত অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট
ক্ত পণ্ডিত তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সহ-
গতায় কয়েকবার অভিযান চালিয়ে
কিছু লোকসংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ
ছেন। সেগুলোর ভেতর এতো বেশী
ভ্রুটি, বিকৃতব্যাখ্যা এবং গা-জোরী
ব্য রয়েছে যে সীমান্ত অঞ্চলের ভাষা-
সংস্কৃতির ওপর সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট যে-
কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হবেন।
তবে কিছু-না-র চেয়ে কিছু-হ্যাঁ যে হয়েছে
তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ধলভূমের ছড়া নিয়ে আলোচনা করব। ধলভূমের ছড়া-সংগ্রহ এখন অব্দি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সেদিক দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে সংকলিত ছড়াগুলোই ধলভূমের প্রথম প্রকাশিত ছড়া-সংগ্রহ হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। ধলভূমে ছড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতঃই কয়েকটি সুস্পষ্টভাগ সহজেই নজরে পড়ে : (১) সাধারণ ছড়া, (২) ঘুম-পাড়ানো ছড়া, (৩) ছেলে-ভুলানো ছড়া, (৪) রূপকথা-সম্পর্কিত ছড়া এবং সবশেষে (৫) খেলা-ধুলা-সম্পর্কিত ছড়া। এখানে আমরা সাধারণভাবে ছড়া নিয়ে আলোচনা করব।

বাঙলাদেশ এবং ধলভূমের মধ্যে ভাষা এবং সংস্কৃতিগত একটা মিল থাকায় কিছু কিছু ছড়ার ভেতর-ও আংশিক মিল পরিলক্ষিত হয়। একটি ছড়া নেওয়া যাক—

> আইসরে ছানাপনারা মাছ ধইরতে যাব
> মাছের কাঁটা পায়ে লাইগলে দোলায় চাপ্যে যাব।
> দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি গুণ্যে গুণ্যে যাব
> একটি কড়ি বেশি হলে লাড়ু কিনে খাব।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বইটির 'আয়রে আয় ছেলের পাল' ছড়াটির প্রথম তিনটি পংক্তির সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল সহজেই চোখে পড়ে—

> আয় রে আয় ছেলের পাল, মাছ ধরতে যাই
> মাছের কাঁটা পায়ে ফুটেছে, দোলায় চেপে যাই;
> দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি, গুণতে গুণতে যাই।

এই মিলটা কি-ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে বলা মুস্কিল। ধলভূমে বঙ্গীয় লোকেদের সরাসরি যাতায়াত বা আত্মীয়তা-বন্ধন এক রকম ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে-ও পুরোপুরি বঙ্গীয় পদবীধারী লোক গ্রাম-ধলভূমে খুঁজে পাওয়া যায় না। বইপত্রের যাতায়াতটা একেবারে হাল আমলের। অথচ এই ছড়া ঠাকুমা, তস্য ঠাকুমার মুখে যুগ-যুগে ধ্বনিত হয়েছে। আসলে লোকসংগীত, রূপকথা এবং ছড়ার প্রচার এবং প্রসার এমনই ব্যাপক হয়ে থাকে যে কবে কোন্ জায়গায় তার উদ্ভব এবং কি ভাবে কোথায় তার সম্প্রচার ঘটেছে, তা বলা সত্যিই সুকঠিন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ২' ভূমিকায় বলেছেন, 'একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠ-ও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় নাই অথবা প্রয়োজন নাই।'

বিশ্বদুনিয়ার ছড়ার মধ্যে শিশুমনের আশ্চর্য প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অর্থের সংগতি আছে কি নেই, বক্তব্য যুক্তি-নির্ভর কি না, ছন্দের বন্ধন শিথিল কিংবা বিধ্বস্ত হচ্ছে কি না, এতো সব তর্কের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার মতো ফুরসৎ কোন শিশুই পায় না। কল্পনার পাখনায় ডানা মেলে দিয়ে ভেসে-বেড়ানোর দিকে তার ঝোঁকটা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। প্রসংগ ছেড়ে প্রসংগান্তরে, এক বস্তু ছেড়ে অন্য বস্তুতে, বাস্তব ছেড়ে কল্পনার জগতে যাতায়াতের ক্ষমতা বুঝি-বা একমাত্র শিশু-দেরই আছে। শালপাতায় তৈরী বর-কনে কিংবা পুতুল বর-কনে নিয়ে যেমন তাদের নিভৃত আসর বসে, তেমনি কখনো-কখনো নিজেরাই বর-কনে সেজে আসর মাত করবার ব্যাপারে-ও সিদ্ধহস্ত। আবার মহুয়া পাতার থালা-বাটিতে ধুলোবালি দাসের ভূরিভোজের আসর-ও জমজমাট হয়ে উঠতে দেখা যায়। বর-কনের ব্যাপার, কি লোতন বহুর ব্যাপার, তাদের কল্পনার জগতে সত্যিই রোমাঞ্চকর। 'বউ' নামক জীবটির ভালোমন্দ গুণাগুণ বুঝি-বা তাদের দৃষ্টিতে-ও ধরা পড়ে।

> ন্যাংটা ভুটুং চুড়ুং চুটুং
> কাড়া বাখালের বউ;
> কেশব দাদার জোড়া পালকি
> হেম দাদার বউ।

বিশ্রী চেহারা, রুক্ষ কেশদাম, অর্ধনগ্ন বেশবাস—এহেন সাজের বউ দেখে তাকে 'কাড়া বাগাল' বা শেব রক্ষকের বক্ষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু কেশব দাদার জোড়া পালকি চড়ে যে-বউ আসছে, তাকেই হেমদাদার বউ বলে ভাবা যায়।

ধলভূমের ছড়াতে-ও বিয়ের প্রসংগ বার-বার এসেছে। তার সংগে আছে কন্যাসম্প্রদান এবং কন্যা বিদায়ের মতো শোকাবহ ঘটনা। শিশুমনে বিয়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং আনন্দময় ঘটনা। তাই ছোট শিশুদের ছড়াতে বিয়ের প্রসংগ আনতে ঠাকুমা দিদিমা কি মা মাসী পিসী কখনো ত্রুটি করেন না। তাঁরাও সেই মুহূর্তে যেন খোকা খুকুর ভবিষ্যৎ বিয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু খুকুর বিয়ের কথা ভাবতে গিয়ে বুক টনটন করে। খুকু তাঁদের ছেড়ে যাবে ভাবতে গিয়ে দু'চোখ যেন জলে ভরে আসে।

খুকু সিনাছেন গা দুলাছেন গলায়
পানের কাঠি
সন্দ খাব মা সন্দ খাব মা তা'ও বরং চ
খাব।
ধান শিষটি আইল রে ভাই পাপিষ্ঠি
গেল।
জাঙ্গুরে জাঙ্গুরে ঘাটেরে ভাই জাঙ্গুরে
জাঙ্গুরে ঘাটে,
কি করো জানিব ভাইরে খুকুর বিভা
হছে।
হাই শুন গো খুকুর মা বসুন গো মা
ডালে,
ডাল পাত ভাঙো দু'টি যমুনার থালে।
সেই থালে বস্যে কন্যার বাপ পাথুড়া
কন্যা দান করে।
কন্যা দান কইরতে কইরতে চখো
পড়ে লব
আন রে গামছা মুছাইব লর।

কন্যার বাপ 'পাথুড়া' বা ধূর্ত বা নিষ্ঠুর যাই হোন না কেন, তাঁর-ও যে পিতৃহৃদয় রয়েছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। কন্যা দান করতে গিয়ে তাঁর-ও দু'চোখ বেয়ে এতো বেশি জল ঝরে যে গামছা দিয়ে মুছতে হয়।

খুকুর বিয়ে হওয়া মানেই নতুন জামাই-এর আবির্ভাব। তার সম্মান রক্ষা করা, তার যোগ্য আদর করা একান্ত দরকার। 'ঝি-জামাই বাঁকা কাঠ'। বক্র কাষ্ঠখণ্ড যেমন সহজে সোজা করা যায় না, তেমনি একবার জামাই বেঁকে বসলে শত সাধ্য-সাধনাতে-ও তুষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই আদর যত্ন ভালো-ভালো খাবার দিয়ে জামাই বাবাজীবনকে তুষ্ট রাখতে হয়।

রমুহা বাড়িয়ে কে রে ভাই গাঁদার
গুন্দুর করে,
রমুহা শাগ ভাজ্যে দিব ঘি-মওরা
দিঞে।
ঘি-মওরার বাসে, জামাই গেল রুষ্যে।
জামাইকে ঘুরাই আইনবে জড় ধুতি
দিঞে,
বিটিকে ঘুরাই আইনবে দুয়াই শাখা
দিঞে।
আইজ থাকরে বর কন্যারা একটি ময়ুরে
খাঞে,
কাইল যাবে রে বরকন্যারা সংসার
কাঁদাঞে।
আগু কাঁদে মাসী পিসী পেছু কাঁদে
পর।
পর দেবতা লাগাই দিব যাবি পরের
ঘর।
বাপে দিবেক শাঁখা শাড়ি মায়ে দিবেক
তৈল,
অই শাড়ি পর্যে যাবি বাবুয়ার ঘর।
'বাবু, বাবু' ডাকে পড়্যেছে বাবু নাইখ
ঘরে,
হালের বাড়ি ফালে দিঞে মাছধরানি
গেছে।
তৈল দাও হলুদ দাও শুদ্ধ হঞে
আসি,
পান দাও সুপারী দাও খুকুর পুজোয়
বসি।

পাঠান্তর,

কে রে ছোলা বাড়িয়ে গাঁদার গুদুর
করে।
হিঙের বাসে জামাই গেল রুষ্যে।
জামাইকে নিঞে আন জড় ধুতি
দিঞে,
বিটিকে নিঞে আন দুয়াই শাঁখা
দিঞে।
আইজ থাকরে বরকন্যারা পেঁক মেজুর
খাঞে
কাইল যাবে রে বরকন্যারা সংসার
কাঁদাঞে।
আগে কাঁদে মাসীপিসী তারপর কাঁদে
পর,
পরদেবতা লিখে' দিলে যাবি পরের
ঘর।
পরের বেটা মার্যে দিল ধাঞে আইল
বাপের ঘর।
বাপে দিল সুরু শাঁখা মায়ে দিল
গিলাপ,
সেই গিলাপ পর্যে গেল সীতা
রাম রাম।

দু'টি ছড়ার মধ্যে দৈর্ঘ্যে এবং বিষয়-বস্তুর বিস্তৃতিতে যথেষ্ট অমিল থাকলে-ও মিলটা-ও সহজে নজরে পড়ে। রমুহা বাড়ি (বরবটি বাগান) কিংবা ছোলার ক্ষেত যাই হোক না কেন ফিসফিস কথাবার্তার আভাস দু'টোতেই আছে। প্রথম ছড়াটিতে জামাইকে খুশি করবার জন্য শাশুড়ী 'দেশ গুণে ভেশ'-এর মতো ঘি-মওরা দিয়ে বরবটি শাক ভাজলেন, জামাই মুখে দেওয়া তো দূরস্থান, গন্ধেই রেগেমেগে টং হয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পাঠান্তরে দেখছি, শাশুড়ী খুব সম্ভবতঃ গরীব, তাই ঘি-মওরার পরিবর্তে হিঙ দিয়ে কিছু রান্না করেছিলেন; জামাই হিঙের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে রাগ করে চলে যাচ্ছিল। বিয়ে বাড়ির ব্যাপার, রাগারাগি তো হবেই। জামাইকে জোড়া ধুতি, মেয়েকে জোড়া শাঁখা কবুল করে তবে রেহাই। বরযাত্রীদের ময়ুর খাইয়ে তুষ্ট করে আটকে রাখা হল। কিন্তু পরের দিন যথারীতি কনে-বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। মাসীপিসী আত্মীয় পাড়া প্রতিবেশীর চোখে জল। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। পরের বেটার মার খেয়ে মেয়ে শেষতক মা-বাপের কাছেই ফিরে আসে। পুরুষশাসিত সমাজে প্রাচীনকালে নারীর স্থান কোথায় ছিল, এখানে-ও তা সুস্পষ্টতঃ প্রতিফলিত হয়েছে।

কন্যা বিদায়ের সময়ের আর একটি ছড়া নেওয়া যাক—

উড়কি ধানের মুড়কি কনক ধানের
খই
গাছপাকা কলাপাকা গামছা-বাঁধা দই।
ও কিয়া ফুল ও কিয়া ফুল মাকে
দেখ হে,
মা বড় কুবুদ্ধ্যা আমার কাঁদ্যে কাট্যে
মরে,
সংসার বুঝিয়ে মা কার গরব করে।
আগু যায় মা ধব ঘোড়া পেছু যায়
মা ঝারি।
ঝারির চলনে আমরা চলিতে না পারি।
হাতের শাঁখায় লেপ লাগ্যেছে,
গলার গজমোতি রক্ত ফুট্যেছে।

মেয়ে ও জামাইকে পথে খাবার জন্য মা সরেস ধানের খই-মুড়কি, গাছপাকা কলা আর অত্যন্ত ঘন গামছা-বাঁধা দই দিয়েছেন। কিন্তু মায়ের চোখে জলের ধারার বিরাম নেই। তাই মেয়ে তার কেয়াফুল-পাতানো সইকে ডেকে মায়ের যত্ন-আত্তি করার কথা বলে যাচ্ছে। মায়ের যেন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তাই কান্নাকাটি করছেন। সংসারে
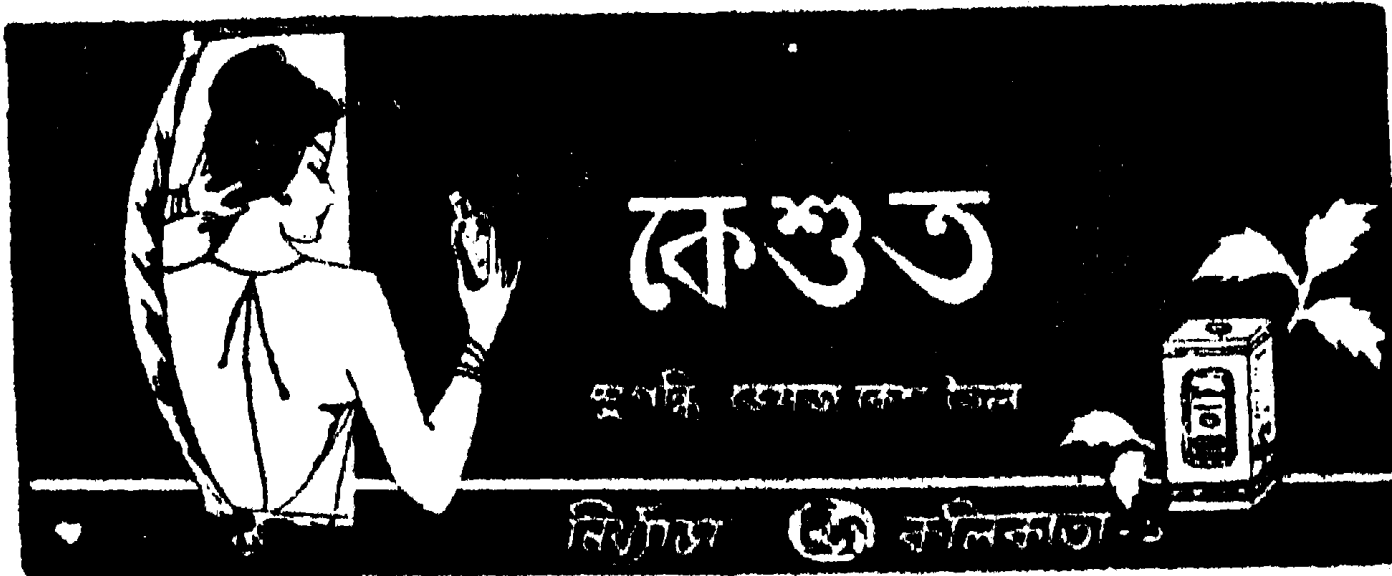
ামী ছাড়া মেয়েদের আর গরব করবার তা কিই-বা সম্পত্তি আছে। এবার বাগ্না। ার আগে সাদা ঘোড়া, তার পেছনে ল-পালকি। ওদের সংগে তাল রেখে চলা চ্ছে না। ক্লান্তিতে ঘর্মাক্ত কলেবর। আর ছুতে গিয়ে হাতের শাঁখার সিঁদুরের গ লেগে গেছে; রুদ্দুরের আঁচে আর মলে আলোয় গলার গজমোতি রক্তবর্ণ য় উঠেছে।

এসব ছড়ায় তবু অর্থ খুঁজে ওয়া যায়। প্রসংগ থেকে প্রসংগান্তরে ওয়ার গতিটি যথেষ্ট শ্লথ। অথচ ছড়ার লধর্ম'ই হল সংহতি এবং সংগতির বেড়া ঙে চকিত চরণে প্রসংগ থেকে প্রসংগা- রে, অর্থ থেকে নিরর্থে পরিক্রমণ। শ্চর্য চমক, অলৌকিকতা, অর্থহীনতা, ন্দের ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দের হল্কা দোলা এবং ধ্বনির গম্ভীর হার্দ্যিক র ছড়াকে অন্যান্য ছন্দোবন্ধ সাহিত্যকর্ম কে একটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা দিতে ক্ষম হয়েছে। ধলভূমের ছড়াতে-ও এই ৷ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই সংগে রবীন্দ্রনাথের কথা পুনশ্চ স্মরণ রা যেতে পারে; 'আমি ছড়াকে মেঘের হত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরি- র্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে চ্ছো ভাসমান। — দেখিয়া মনে হয় রর্থক।'

প্রসংগ থেকে প্রসংগান্তরে দ্রুত সঞ্চরণ- লতা দেখে মনে হবে এই সব ছড়া ুষ্যরচিত নয়, যেন 'ইহারা আপনি ন্মিয়াছে' ঃ অন্য কথায় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাসদৃশ। ানুষের চিন্তা এত দ্রুত শব্দ থেকে ব্দান্তরে, এক বিষয়বস্তু থেকে অন্য ষয়বস্তুতে সংগতিহীন অবস্থায় পরিক্রমা রতে পারে ভাবা যায় না। যেহেতু মানুষ ন্তাশীল, তাই সে যুক্তিতর্কের অবতারণা । করে এমন সাবলীল পরিক্রমা টানতে ায়ে পদে-পদে বিব্রত বোধ করে। কিন্তু ড়ার জগত সম্পূর্ণ আলাদা জগত, সেখানে ম আপনাতে আপনি বিকশি ওঠে। জিককে দুয়ো দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়।

তালতলা দিয়ে জল যায় মা ভিজে
মরি গো,
পেড়ীর কাপড় বার করাই দে দক্ষিণ
যাব গো।
দক্ষিণেতে সরস্বতী নাইতে নামেছে,
দু'ধারে দু' কই মাছ ভাসো উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুগোসাঁই, একটি
নিলেন টিয়া
টিয়ার মায়ের বিজা হচ্ছে লাল গামছা
দিয়া।

প্রসংগ থেকে প্রসংগান্তরে পরিক্রমণ খানে বেশ দ্রুত। একটি ঘটনার সংগে ন্যটির সামঞ্জস্য রাখবার বিন্দুমাত্র গরজ-ও ান নেই। তালতলা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে, তাতে ভিজে চুপসে যাবার কোন কারণ নেই, যদি না পা হড়কে জলে পড়ে গিয়ে থাকে! ভিজেই যদি থাকে, তবে সযত্নে জোগানো পেটিকার কাপড় বের করে দেবার জন্য মায়ের কাছে আবদারই বা কেন কিংবা কাপড় পেলে দক্ষিণে যাবার দরকারটাই বা কি? আসল ব্যাপার হল, ছড়ার কবিরা লজিক নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় নি। একটি সূত্র পেলেই হল। একটু গতি সৃষ্টি করতে পারলে তখন আর সূত্রান্তরে যাবার কোন অসুবিধে নেই। জলের প্রসংগ এল; জলের ধর্ম কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দেওয়া; ভেজা কাপড় বদলে শুকনো কাপড় পরাই রীতি; কাপড় পরে সাজগোজ করলেই বাইরে বেরুনোর কথা মনে আসে। অসংলগ্ন মনে হতে পারে, কিন্তু এখেন চলমান চিত্রের মিছিল। রীলের পর রীল দ্রুত সঞ্চরমান চিত্র আমাদের চোখে এবং মনে আভাসিত হয়েই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি ছড়ার মধ্যে একটি আভ্যন্তরীন গতি আছে যা বিভিন্ন ভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে একটা মোমেন্টাম দেবার ক্ষমতা রাখে, ফলে অজস্র অসামঞ্জ- স্যের মধ্যে-ও সাবলীল প্রবহমানতা সম্ভব হয়। শেষতক এই সব বিচিত্র চিত্রময় অসামঞ্জস্যের মধ্যে-ও সামঞ্জস্য আভাসিত হয় এবং তা শিশুমনের ওপর তীব্র কৌতু- হল এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এমনি ধরণের আরো দু'একটি ছড়া নিচে দেওয়া হল—

(১) শালুক মালুক বন শালুকের পাতা,
হরিণ বল্লে বিঁধে দিল
জঠঠাকুরের মাথা।
জঠ ঠাকুরের জামা জোড়া
রঘুনাথকে সাজে,
রঘুনাথের ঘাড় কাটা টিপতলার ঘাটে।
গাই খায় গঙ্গার পানী,
বাছুর খায় ফেণী।

(২) অড় গাছ বড় গাছ
তার তলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
সুরু চাউল কাঁড়ি।
কাইচতে কাইচতে হল্য ভাত
উঠ বুঢ়া জগন্নাথ।

(৩) একটা চাঁদ দু'টা চাঁদ
টানেটুনে কাপড় বাঁধ।
চল নানী জলকে যাব।
জলের ভিতর ফুল ফুটেছে
ফুলের বড় কলি,
শাগ লো জ্বাল্যা লো কর্মের ডালি।

ওপরে উদ্ধৃত সব কটি ছড়াতেই অর্থ যেমন আছে, তেমনি আছে শব্দের ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দের এবং ধ্বনির অলৌকিক মেলবন্ধন। ছড়ার এই সব সাধারণ ধর্মের সংগে কখনো-কখনো অর্থহীনতা এমন নিবিড় ভাব জমায় যে, তখন তার অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। শব্দ, ছন্দ এবং ধ্বনি যৌথবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সংগীতময় পরিবেশ রচনা করে যেখানে উদ্ভট কথার সংগে অর্থহীনতা একই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত পাশাপাশি বাস করবার সুযোগ পায়। এই প্রসংগে নীচের ছড়া দুটো বিচার করে দেখা যেতে পারে—

(১) উড়কুল তুড়কুল নলের বাঁশি,
নল করেছে একাদশী।
হলদ মানে তলদ ফুল,
টাকা মানে টগর ফুল।

(২) আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে,
ঝাঁঝ ঝটপট মুগুর বাজে।
মুগুর শাল পণ্ডমাল
কে কে যাবে কামারশাল।
কামারশালের বাঁর পুয়াতি
বনের লে বাহরাল্য কপ্তি।

চিত্রধর্মিতা ছড়ার অন্য একটি সাধারণ ধর্ম হলে-ও এখানে খানিকটা ধর্মচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে হয়। চিত্রের যেমন ভাষা আছে তেমনি অর্থ-ও আছে। ননসেন্স ভার্স তাই কোন সুস্পষ্ট চিত্রের সম্ভাবনা তুলে ধরতে পারে না। ওপরের ছড়া দুটোতে-ও কোন সুস্পষ্ট চিত্রের আভাস খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সংকলিত অন্যান্য ছড়াগুলো থেকে কখনো কখনো অসংলগ্ন মনে হলেও সুস্পষ্ট চিত্রমূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

ধলভূমের এই সব ছড়ার অনেকগুলিই বাংলাদেশের শিশুদের জানা। ছড়ার পাঠান্তর একটা স্বাভাবিক ঘটনা। লোক- মুখে প্রচারিত হতে-হতে পরবর্তীকালে একটি ছড়াই কয়েকটি রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। স্মৃতি প্রায়শঃই বিশ্বাসহন্ত্রী হয়ে থাকে, স্বভাবতঃই কোন শব্দ ভুলে গেলে অন্য শব্দ জুড়ে দেওয়া কিম্বা একই শব্দকে উচ্চারণবিকৃতিবশতঃ নবতর রূপ দান করা নেহাতই সাধারণ ব্যাপার। এ ছাড়াও স্মৃতি- নির্ভর আবৃত্তির ফলে একটি ছড়ার অংশ- বিশেষ অন্য ছড়ার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত এবং মিশ্রিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সংকলিত ছড়াগুলোর সংগে বাংলাদেশের ছড়ার তুলনামূলক বিচার করলেই এটা ধরা পড়বে। এই প্রক্রিয়াটি এত গভীরে এবং নিঃশব্দে ঘটেছে যে আজ আর এই সব ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কোন্ ছড়ার মধ্যে কোন্ অংশটা প্রক্ষিপ্ত তা সঠিকভাবে বলা একে- বারে অসম্ভব। এবং এ প্রয়াস শুধু বুদ্ধি- হীনতারই পরিচায়ক হবে না, এ প্রয়াস একান্তই অপ্রয়োজনীয়।*

* প্রসঙ্গে সংকলিত ছড়া-সংগ্রহের জন্য আমার সহোদরা শ্রীমতী মিনতি মাহাতর নিকট আমি ঋণী।

"তবে কি আপনি মনে করেন, সত্যিই উনি উন্মাদ," প্রশ্ন করলাম।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আরও কিছু দিন লক্ষ্য করা দরকার। হতে পারে সবটাই একটা নির্জলা ভাঁওতা। আবার এও হতে পারে সবই হয়েছে পাগলামীর খেয়ালে।' উত্তর দিলেন ডকটর গ্রান্ট, ভারতবিশ্রুত এক বিখ্যাত মনোস্তাত্ত্বিক।

'কিন্তু কি করে তা হয়?' প্রশ্ন করলাম। 'উনি যখন অপরাধ করেন তখন তো সেখানে ভুলচুক হয় না? সেখানে তো কোন গাফিলতি নেই? সেখানে তো নেই দিন-মাস-কালের ঠিকে ভুল? প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্তের জাগ্রত কড়া হিসেবের কোথাও তো ভ্রম বা ভ্রান্তির কোন চিহ্ন নেই? যেখানেই যাদের ঠকিয়েছেন সেখানে চুক্তিপত্র এমনভাবে খসড়া করা হয়েছে যাতে আসামীর অনেক সুবিধা হতে পারে। এমনভাবে অঙ্গীকার পত্র দিয়েছেন যার উত্তর হ্যাঁও হতে পারে বা নাও হতে পারে। যা কিছু সই করেছেন সেও তো নির্ভুল? স্বপক্ষে এবং প্রতি পদে পদে অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি যে জাল ছড়িয়েছেন, অসংশয়ী মানুষকে তাঁর টোপ গেলবার জন্যে, সেখানে তো এতটুকুও ফাঁক নেই? টাকাকড়ির হিসেবে তিনি তো এক পাকা হিসাব-নবিশের মত কাজ করেছেন? কি ভাবে, কাকে ধরতে হবে সেখানে তো তিনি দু-মনা নন? তবে?...'

'হতে পারে তা,' ডকটর গ্রান্ট জড়িত-কণ্ঠে বললেন। কিন্তু সেটা যে উন্মাদ বা অজ্ঞান অবস্থায় সময়ে সময়ে যে চৈতন্য হয়, সেই সময়েই যে হচ্ছে না, তা কি করে জানা যাচ্ছে?

যখন এই কথোপকথন হচ্ছিল তখন আমি আর ডঃ গ্রান্ট সেই আসামীকে ঘরের ছিদ্র দিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম তিনি মাথা খুঁড়ছেন, দেখলাম তাঁর মাথার চুল দৃঢ়-বন্ধনীতে তুলে ধরেছেন। অস্বাভাবিক কথা-বার্তা অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি। মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছেন ঘরের কোণের দিকে, বিড় বিড় করে কি যে বলছেন তা বোঝা যায় না। চক্ষু রক্তবর্ণ। গাঢ় রক্তবর্ণ। কিন্তু সে অকৃত্রিম কি কৃত্রিম আমি জানিনে। তবুও,

বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অনসূয়ার প্রেম

শাচিক চীৎকার করে উঠছেন ক্ষণে ক্ষণে, ত স্বরে, যেন জনহীন শ্মশানে ঊর্ধ্বমুখ পা কুকুরের একটানা চীৎকারের মত। ন হোল সেই বীভৎস ডাকে তাঁর ছিন্নগর্ভ মনা আর বাসনার কিছু অংশ হয়ত বা গশ করে চলেছে।

আমি দেখলাম, সন্দিগ্ধ ব্যক্তি চুল ড়ছেন, কণ্ঠশিরা ছিন্নভিন্ন করে যেন া বলতে চাইছেন। কিন্তু যে কথা তিনি ছেন সে কথার অর্থ হয় না, সংজ্ঞা হয় প্রকাশ করা যায় না, ব্যক্ত করা চলে না যে কথা শুধু বীভৎস শব্দসম্ভারের শৃঙ্খল শোভাযাত্রা। শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর ; তিনি ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ফিরে ঘরের াণে এসে বসছেন। কি অসংযত দৃষ্টি? গ্রাণ্টকে প্রশ্ন করলাম, 'ইনি কি সত্যিই গল? ইনি কি সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ?' ফুট স্বরে বললেন তিনি, 'চারদিন! রও চারদিন দেখতে হবে।'

আর উপায়ও ছিল না। নিম্নকোর্টে সামীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, র স্বজনবন্ধু হাই-কোর্টের দ্বারস্থ লন। হাইকোর্ট আপীল অনুমোদন লেন। আসামীর স্বপক্ষে বহু বিখ্যাত নাস্তাত্ত্বিকের আবির্ভাব হোল। সেই সাক্ষীরা অপরাধের বিশদ ব্যাখ্যা রলেন। তারা ব্যাখ্যা করলেন আসামীর পরাধ তাঁর কীটদষ্ট মস্তিষ্কের বিভ্রান্ত ন্তা, অসংলগ্ন চিন্তার বিক্ষুব্ধ তীর্যক কাশ, অসঙ্গত ভাব ও অবোধ্য আচরণ— আচরণের সঙ্গে মনের নেই কোন গতি। তাঁদের অভিমতে, আসামী উন্মাদ, প্রকৃতিস্থ, বিচারবোধশূন্য। যদি কিছু র থাকেন অপরাধ, তবে সেটা সম্পূর্ণ জ্ঞানবশতঃ, সম্পূর্ণ জ্ঞানহীনতায়। হাই-োর্ট মামলা মুলতুবী করল অনির্দিষ্ট লের জন্যে, যেহেতু আসামী উন্মাদ, কি রেছেন তা নিজেই জানেন না। মামলা লতুবী রইলো যতদিন আসামী ভালো হয়।

বিবিধ স্থান থেকে, বিবিধ দেশ থেকে ন সবশুদ্ধ একুশটি মামলা। কিন্তু সব ত্রেই আসামীকে উন্মাদ বিবেচনা করে, ব মামলাই হোল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে লতুবী। আসামী অন্যায় করেছেন, লাখে খে টাকা ঠকিয়েছেন সব ঠিক, কিন্তু সে া নিছক উন্মত্ততার প্রভাবে? যে উন্মত্ত-র প্রভাবে অপরাধী অপরাধ করে, তাকে সাজা দেওয়া যায়, জেনেশুনে যে সে মাদ, তবে তো বলতে হবে দেশে আইন ই? তাহলে তো যত সব অর্ধ উলঙ্গ মাদ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে বিসর্জন দিতে হয় অন্ধকার কারাগারে? অমানবিক, এ অমানুষিক বিধান হাই-োর্ট তো দিতে পারেন না?

ডঃ গ্রাণ্ট কিন্তু অপরের মতে সায় লেন না—তাঁর অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। র মতে, আসামীর অভিনয় অপূর্ব। ন্তু তার অভিনয়ে ছেদ থেকে যাচ্ছে। তার রণও আছে। [illegible] খাবার সময়ে, খাবার চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে দিলেও ঠিক আবার গুছিয়ে গুছিয়ে খান। যথাসময়ে জলপান করেন, মাঝে মাঝে জানলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন শুধু লক্ষ্য করতে তার উপরে কেউ কড়া নজর রাখছে কিনা। সেই সময়ে তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অনেক সময়ে দরজার ছিদ্রের দিকে চেয়ে থাকেন শুধু দেখতে কারোর দৃষ্টি এই ছিদ্রের দিকে ন্যস্ত কিনা? এইগুলিই উন্মাদ অভিনয়ের ভুল পদক্ষেপ। ডঃ গ্রাণ্টের অভিমতে, আসামীর এই উন্মত্ততা নিছকই কৃত্রিম, নিছকই অভিনয়, এর মধ্যে এতটুকুও বাস্তবতার স্বাক্ষর নেই।

আসামী জামিনে কিন্তু ছাড়া পান। কিছুদিন নীরবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন। চিকিৎসা চলতে থাকে। তারপর যথাসময়ে অপরাধ করেন। যখন ধরা পড়েন তখন আবার সেই পাগলামী—আবার সেই অসংযত প্রলাপ, অদ্ভুত আচরণ, আবার মনো-বিজ্ঞানীদের তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাদের অভিমতে আবার মামলা মুলতুবী। এই একইভাবে চলে আসছে অপরাধের অনুষ্ঠান চক্রবৎ।

কিন্তু যারা ঠকেছেন তারা দোষারোপ করছেন পুলিশকে, গোয়েন্দাকে। তাদের অভিমতে লোকটা ঠকিয়ে গেল, একটার পর একটা, পাগল সাজল, আর পুলিশ মেনে নিল। রেহাই কোথায়? অপরাধ করে যাচ্ছে একজন, আর পুলিশ তাকে সাহায্য করছে। কোথায় বিচার? কোথায় এর প্রতিকার?

পুলিশের বিরুদ্ধে, গোয়েন্দার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, এই আক্রমণ, কিছু নতুন নয়। আদিমকাল থেকে এটা চলে আসছে। যখন কাউকে দোষারোপ করার স্থান নেই, তখন একমাত্র ভরসা আছে পুলিশ। চাপাও সব দোষারোপ তার ঘাড়ে। কেউ বাধা দেবে

না, দোষ দেবে না, ত্রুটি নেবে না। বলো পুলিশ ব্যর্থ, বলো অযোগ্য, বলো চীৎকার করে, যে তারা উৎকোচ আদায়ের জন্যেই চিরব্যস্ত, এরা অসাধু, অপকৃষ্ট, দুর্বৃত্ত। এরা যেন অন্য জগতের জীব যাদের সংস্পর্শে মহামড়কের সৃষ্টি করে, যারা মহাবন্যাতার মহাধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসে। এরা মানুষ নয়, মানুষ নয়, এরা জন্তু। কিন্তু এ সামাজিক আবর্তে পুলিশ মাথা পেতে নিয়েছে সমাজের এ প্রিয়নাম—তারা মেনে নিয়েছে তারা জীবও নয়, লোষ্ট্রের মত, কাষ্ঠের মত, পাথরের মত, পথমধ্যে পড়ে রয়েছে অপরের ব্যবহারের জন্যে। পুলিশ হয়ে যায় দারুময় জগন্নাথ। পৃথিবীর পাপে ও অত্যাচারে জগন্নাথ দেবও তো দারুময় হয়েছিলেন—পুলিশের দোষ কোথায়? তবু সে পড়ে গেলেও দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার চলতে সুরু করে, অনন্তকালের পথিক সে—সে তো সহজ পথিক নয়!

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠছে কিভাবে আসামী তার অপকর্ম সাধিত করতেন? কিসের সাহায্যে তিনি পাপের পথে বীরের মত সদর্পে এগিয়ে যেতেন? তদন্তে দেখা যায়, তাকে এ অপরাধের পথে প্রথম সাহায্য করেছে তার সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ, তার সুদর্শন আকৃতি। বয়স তখন তার হবে আঠাশের কাছাকাছি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল বলিষ্ঠ ক্রীড়াবিদের মত। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ, ঋজু দীর্ঘাকৃতি, উন্নতদীর্ঘ নাসিকা। মাথায় ছিল রাশিকৃত কৃষ্ণকুঞ্চিত তরঙ্গায়িত কেশদাম, ললাট প্রশস্ত, দৃষ্টি ধীর স্থির নিস্তরঙ্গ, যেখানে আবিলতার কোন চিহ্নই ছিল না—শুধু ছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তার অনির্বাণ দীপ্তি।

আর ব্যবহার? সে ছিল অপূর্ব। সে-ব্যবহারে ছিল বহুকালের আভিজাত্যের সুস্পষ্ট মসৃণতা, বিনীত শিষ্টাচারের মার্জিত উজ্জ্বলতা। সহজাবস্থায় কোনদিন কেউ তাকে উচ্চগ্রামে কথা বলতে শোনেনি। ধীরে ধীরে কথা বলতেন—সে কথায় ওর ছিল আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন সে কথায় যেন ছিল নাম-না-জানা বশীকরণের মন্ত্র, অনাদি-কালের তীব্র জাদু, অব্যর্থ সম্মোহনের অনিবার্য ইঙ্গিত।

যারা প্রতারিত হয়েছেন, যারা তার প্রখর চাতুর্যের বলি হয়েছেন, তারা সবাই আমাকে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে আসামীর ব্যবহার এতই মধুর, তার কথা-বার্তা, ধরণ-ধারণ এতই হৃদয়গ্রাহী যে, প্রথম দর্শনেই তারা বশীভূত হয়েছেন, সম্মোহিত হয়েছেন। তারা এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারেন নি যে, সবটাই আসামীর ছলনা, কপটতা সবটাই সত্যের মিথ্যা আবরণীতে, শঠতা ও চাতুরীর দুর্ভেদ্য জাল পাতা।

দ্বিতীয়তঃ, তদন্তে দেখা গেল, প্রতারিতদের যা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তা আসামীর পাশ্চাত্য শিক্ষা। সে শিক্ষাকেই প্রতারিতরা অবিবেচকের মত স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন। সেই জন্যেই তাদের দুর্ভোগ। কেন দিনই বুঝতে পারেন নি যে, আসামী যে পরিচয় দিচ্ছেন, সে সর্বৈব মিথ্যা। তার বাইরের চাকচিক্য হতভাগ্য প্রতারিতদের ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

এইখানে আর একটি প্রশ্ন ওঠে। কি ভাবে তিনি অপরাধের অনুষ্ঠান করতেন? উত্তর জটিল নয়, সহজ। কোনখানে হয়তো ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অফিসার বলে পরিচিত হতেন। তারপর বিখ্যাত মোটর-গাড়ীর বিক্রেতার কাছে নানা গল্প ফেঁদে তাঁকে বিশ্বাস করাতেন তিনি মোটরগাড়ী ক্রয়ের জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র। সামান্য কিছু দাদন দিতেন। নতুন মোটরগাড়ী হস্তগত করতেন পরীক্ষার জন্যে, তারপরই অদৃশ্য। তদন্তে জানা গেল যে, সে গাড়ী যা তিনি নিয়েছিলেন স্বল্পকালের মেয়াদে, পরীক্ষার জন্যে, সেটা তিনি বিক্রয় করে দিয়েছেন কোন ব্যক্তিবিশেষকে জাল-জুয়াচুরির মাধ্যমে।

শুধু তাই নয়। কখনো সাজতেন বিখ্যাত বিচারপতি বা জজ অথবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মীয়—সেই পরিচয়ে প্রতারিতদের কাছ থেকে বহু অর্থ আত্মসাৎ করে নিয়েছেন শুধু নিছক আকস্মিক বিপর্যয়ের গল্প ছড়িয়ে এবং দুদিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। শুধু কি মোটরগাড়ী? না। না। তা নয়। যাবতীয় বস্তু। যেমন রেফ্রিজারেটার, গ্রাণ্ড পিয়ানো। আরও কত কী!

আসামীর দ্বারা নানাবিধ অপরাধ ভারতের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হোল। আজ এক ঝাঁক অপরাধ করছেন কলকাতায়, কাল চলে যাচ্ছেন মুসৌরি পাহাড়ে সেই পাপার্জিত অর্থে, সেখানে বিখ্যাত হোটেলে উঠলেন, কয়েকদিন থাকলেন, অভিজাত মহলে ভিড়ে গেলেন, ভিড়ে গেলেন নাচের আসরে, ককটেল পার্টিতে। তারপর বেশ কয়েক-জনকে প্রতারণা করে সেখান থেকে উধাও। তার খোঁজ পাওয়া গেল মাদ্রাজে যখন এই একই অপরাধ পদ্ধতিতে বেশ কয়েকজনকে ঠকিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন। তার আবির্ভাব হোল বম্বেতে, তারপর পুণা, কানপুর, পাটনা এবং ভারতের বিভিন্ন সহরে। সর্বদাই তিনি বহু প্রতারণা করে উধাও হলেন। এ যেন ডুব সাঁতারে চোর চোর খেলা। এক জায়গায় ডুবছেন, অন্য জায়গায় উঠছেন, আবার সেখানে ডুবছেন অন্য ঘাটে উঠছেন।

এটা ঠিক নয় যে তিনি কোথাও ধরা পড়েন নি। বহুবারই পুলিশ তাকে ধরেছে, ভারতীয় অপরাধ বিধির নানা ধারায় তাকে অভিযুক্ত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই তিনি উন্মাদের অভিনয় করেছেন এবং তাকে উন্মাদ বলেই সবাই ধরে নিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে মামলা মুলতুবী হয়ে গেছে।

মনে আছে একবার মধ্যপ্রদেশের কোন জেলার এক পুলিশ সুপার আমার কাছে পত্র মারফৎ জানতে চাইলেন যে এমন কোন অপরাধীর বিষয় জানি কিনা যার অপরাধ অনুষ্ঠান উন্মাদনার রক্ষা-কবচে সুরক্ষিত। তাঁর চিঠির একটু অংশ তুলে দিচ্ছি।

> 'We have a Strong Case, stronger than all the fictions. A crook goes hysteric and then widly erratic and mad. When caught after his operation, and nothing can be done about it. Do you know anybody whose modus operandi is fitted with the safety Value of insamity?......'

বুঝলাম এই সেই শ্রীমান যিনি এখানেও ধোঁকা দিয়েছেন। যা জানাবার তা জানিয়ে দিলাম।

কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে না কি তার সত্যকার পরিচয়, তার বিগত জীবন? নাম বিপ্লব মজুমদার। জন্ম বরিশাল জেলার এক গ্রামে, বর্ধিষ্ণু পরিবারে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ ইংরেজী পরীক্ষা পাশ করে তিনি চলে যান লণ্ডনে আই-সি-এস পরীক্ষার মোকাবেলা করতে। তার অভিভাবকেরা স্থির করেছিলেন যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্যে তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্যারিস্টারী পড়ার জন্যে প্রস্তুত হবেন। দুটি বছর গড়িয়ে গেল। অভিভাবকদের আশা-ভরসা ধূলিসাৎ হোল যখন তারা জানতে পারলেন যে, আই-সি-এস পাশ করার পরিবর্তে তিনি মেরীয়ান নাম্নী বিশ বছরের এক বিদেশিনী রূপ-পসারিণীর বাহুপাশকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। শুধু তাই নয়, তার মাসিক মাসোহারা শ্রীমতীর গর্ভে যাচ্ছে। বন্ধ হয় মাসোহারা, শাস্তির উদ্দেশে। কিন্তু তাতে কোন ফল হোল না। তিন বৎসর গড়িয়ে গেল। তাকে অনেক বুঝিয়ে, অনুনয় বিনয় করে অনুরোধ করে বলা হোল দেশে ফিরে আসতে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? তিনি দেশে ফিরলেন না। পিতামাতার চোখের জল রূপসীর কাছ থেকে তার মন টলাতে পারল না। সুরু হোল অর্থাভাব বিলাসিনী মেরীয়ানের চাপে। শেষ পর্যন্ত এই অর্থাভাবকে মেটাতে গিয়ে তাকে অপরাধের সুড়ঙ্গপথে আশ্রয় নিতে হোল। শেষ পরিণতি হোল যখন মেরিলবোন পুলিশ কোর্ট লণ্ডনে তার প্রথম সাজা হোল ঠকবাজির জন্যে। ছয় মাসের জেলবাস। তার প্রণয়িনী ইতিমধ্যে তাকে সম্পূর্ণ বর্জন...

ছন—তার উপর সব প্রেম কোথায় যেন রিয়ে ফেলেছেন। মুক্তির পর, মিলনা-ঙ্ক্ষায় অধীর, শ্রীমান বিপ্লব যখন তার য়সীর কাছে হাজির হলেন, তিনি তাঁকে জা দরজা দেখিয়ে দিলেন।

ব্যর্থ, অপাংক্তেয় বিপ্লবের তখন আর রার পথ নেই। তিনি কয়েকজন ঠকবাজ দুষ্কৃতকারীদের দলে যোগ দিলেন এবং দের কাছেই তার প্রথম শিক্ষা—কেমন র ধরা পড়লে উন্মাদের অভিনয় করতে । শিক্ষানবিশি থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ঃ দক্ষ কারিগর হয়ে উঠলেন।

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি যে সাফল্য ভ করেন নি তা নয়—বেশ কিছু অর্থ হরণ করলেন দুর্নীতির পথে। কিন্তু ার আর ভুলচুক নয়। এবার সেই অর্থে শ পাড়ি দিলেন।

কিন্তু দেশে এসেও তার যে বিশেষ চু সুবিধা হোল তা নয়। তিনি তার জে রইলেন অপাংক্তেয়। আত্মীয়স্বজন, বান্ধব যারা তার ইতিবৃত্ত ইতিমধ্যে নেছিলেন, তারা তার সঙ্গে ল সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তু বাঁচবার জন্যে তো অর্থের য়োজন। সৎ জীবন যাপনের চিন্তা ছিল স্বপ্নের অতীত। তাই দেশে আসার কোল পরেই শুরু করলেন তার অভিনব রাধ ধারা। প্রথম শুরু হোল এর টুপি মাথায় বসিয়ে, তার পরেই জাঁকিয়ে লেন পথে তার ঠকবাজির পসরা। সেই রে হাটেই তার সঙ্গে আমার দেখা।

মানুষের মন যখন দেউলে হয়ে যায়, সময় সে বোঝে না বলে নয়। বোঝে কারই কিন্তু দেউলে হবার মরণটান সে করতে পারে না। শ্রীমান বিপ্লবের তাই অবস্থা। তিনি বুঝেছেন যে, তার য় হচ্ছে তবু প্রতারণা, শঠতা, রীর ঝঞ্ঝাসংকুল কালস্রোতে তিনি স্বেচ্ছায় সরাসরি ঝাঁপ দিলেন, তারপর মরণ নেশার টানে, তাকে কোথায় যে নিয়ে গেল, কে জানে?

ঠিক এই সময়ের কিছু আগে ঘটে গেল অভিনব ব্যাপার। জীবন নিয়ে, মন কাড়াকাড়ি। শ্রীমান বিপ্লবের অপ-র পরিক্রমার পথে একবার এলেন জে। সেখানে যখন তার স্বল্প অবস্থান, সময় শ্রীমতী অনসূয়া নাম্নী এক শজাতা, অভিজাত বংশের উচ্চশিক্ষিতা রীর সংস্পর্শে এলেন। প্রথম দর্শনেই —মন দেওয়া-নেওয়ার হোল শেষ—তার অশুভ বিবাহ। শ্রীমতী বুঝলেন না জীবনের এই প্রথম বসন্ত শুধু হবে -ভরা। বুঝলেন না তার প্রেম, মায়া-স্নেহ, প্রীতি, আত্মত্যাগের কেউ দাম না—তার স্বামী তো নয়ই। সমস্ত টাই যেন ঘটে গেল এক নিমেষে। গেল যখন একটা দুর্জয় বাসনার তুর লেলিহান জিহ্বা [illegible] বিরাট উদ্দীপ্ত করল, সে প্রচণ্ড দুর্নিবারতে

শ্রীমতীর অভিভাবকদের বাধা, আপত্তি, অনুনয়, অনুরোধ গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল। ঝড় যখন থামলো তখন শ্রীমতী হৃদয়ঙ্গম করলেন তিনি সম্পূর্ণ প্রতারিত হয়েছেন—কোথায় তার স্বপ্ন আর কোথায় এই নগ্ন বাস্তব। বুঝলেন তিনি সম্পূর্ণ একাকিনী, তার সংসার গড়ার সাধ সব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য স্ত্রীচরিত্র। অন্য কেউ হলে যেখানে করতেন বিদ্রোহ, যেখানে করতেন মামলা, মকদ্দমা, যেখানে মান-সম্ভ্রমের জন্য স্বামীত্যাগ করতে এতটুকুও দ্বিধা করতেন না, শ্রীমতী কিন্তু কিছুই করলেন না। মেনে নিলেন বিধাতার বিধি-লিপি। তার ভাগ্য মিশিয়ে দিলেন স্বামীর ভাগ্যের সঙ্গে। শঠ প্রবঞ্চক জেনেও তিনি এই স্বামীকে আরাধ্য দেবতা জ্ঞান করে নিলেন। আশ্চর্য!

শ্রীমতী যে তার স্বামীর শঠতার, প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নি তা

নয়। কিন্তু সে প্রতিবাদ ছিল প্রতিবাদ-হীনতারই নামান্তর। সে প্রতিবাদে ছিল জল, ছিল না আগুন। সে প্রতিবাদ ছিল মেরুদন্ডহীন, হাড়মজ্জাহীন, মৃদুভর্ৎসনা—সে প্রতিবাদের অশ্রুধারার বুকে কোনদিনই জ্বলেনি আগুন।

অনসুয়াকে পেয়ে শ্রীমানের সুবিধাই হোল। অনন্ত শঠতার জীবন সব সময়েই জ্বালার জলদর্চ দিয়ে থাকে ঘেরা। প্রতি পদেই বিপদ, প্রতি পদেই অশান্তি, প্রতি পদেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্রতিপদেই অপমানিত হবার আশঙ্কা, প্রতি নিঃশ্বাসেই ধরা পড়ার ভয়। অনসুয়ার আত্মীয়স্বজন ছিলেন শক্তিধর রাজন্যবর্গ। যখনই শ্রীমান বিপ্লব বিপদে পড়তেন তখনই কোর্ট-কাছারীতে তাকে জামিনে মুক্ত করা এবং বিচারে খালাস করা, তাদেরই সাহায্যে সম্ভব হোত। তারা অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে অনসুয়াকে সাহায্য করতেন। অনসুয়ার মুখের দিকে চেয়ে বিপ্লবের ঘৃণ্য জীবন তারা মেনে নিয়েছিলেন যতই তারা বিপ্লবকে না চান। অনসুয়ার রোদন কোনদিনই অরণ্যে রোদন হয়নি।

হ্যাঁ। তাকে দেখেছিলাম, ১৯৪২ খৃঃ আগস্ট মাসে। 'ভারত-ছাড়' অভিযানের কোন এক পর্যায়ে। ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি, আমরণ চেষ্টা চলছে স্বাধীনতার জন্যে। কিন্তু যারা তস্কর, দস্যু, যারা প্রচন্ড নিম্ন অসামাজিক জীব, তাদের কাছে কি এসে যায় দেশ স্বাধীন হোল আর না হোল। যখন দেশ স্বাধীনতার প্লাবনে জেগে উঠেছে, যখন সারা দেশকে দোলা দিয়ে উঠেছে মুক্তির অসম্ভব আকর্ষণ, সেই এক সন্ধ্যায়, এসপ্লানেডের মোড়ে তার সঙ্গে দেখা হোল সম্পূর্ণ আকস্মিক। কে জানেন? অনসুয়া, যিনি ছিলেন ভীরু, দুর্বল, শত কোটি ভারতের নরনারীর মত যাদের শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে প্রায় লুপ্ত অতীতের নেপথ্য পরিবেশে, যা শিখিয়েছে শুধু ধরে থাকতে, আঁকড়ে থাকতে, ঘিরে থাকতে, জড়িয়ে থাকতে, যত কিছু অতীতের সুনিদর্শন, অতীতের ইঙ্গিত, অতীতের সম্পদ। আমি তখন ডিউটি দিচ্ছি সাদা পোশাকে এসপ্লানেডের মোড়ে। সেদিনকার মত যখন তাদের অভিযান শেষ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে যখন সে শোভাযাত্রা তরঙ্গায়িত হল ফিরে চলার পথে, তখন এক আলোক-স্তম্ভের নীচে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন একাকিনী। গ্যাস বাতি ও ইলেকট্রিক বাতির সমন্বয়ে তাকে দেখাচ্ছিল পুষ্পধনুর আড়ালে যেন মূর্তিমতী করুণা। দেখছেন জনতা কেমন করে শ্রেণী-বদ্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সবাই চলে গেল। কিন্তু তিনি গেলেন না। সবই লক্ষ্য করছি। কার জন্যে যে অপেক্ষা করছিলেন জানিনে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। অভিবাদন করে প্রশ্ন করলাম 'বিপ্লব কোথায় আছে? কেমন আছে? আপনি কেমন আছেন?'

উত্তর দিলেন না। ধীরে ধীরে জনতা প্রায় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অনসুয়া কিন্তু স্থির অচঞ্চল। যেন অপেক্ষা করছেন সবাই চলে যাবার।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কেন আমাকে বাধা দিলেন? আমি তো আপনাকে দেখব বলে আসিনি? কিন্তু যখন আপনাকে পেয়েছি তখন আমি সবই জানাব। কোনদিনই যাতে আমাকে ভুল না করেন।

আমি বিধবা। আমি তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাইনি। তিনি আমায় ত্যাগ করে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে অসহায় মনে হয়, কিন্তু তারপরই মনে হয়, তিনি তো আমার জীবনে দুঃখ দিতে কসুর করেন নি?'

প্রশ্ন করলাম, 'কিভাবে বিপ্লব চলে গেল।' উত্তর দিলেন,—'তখন আমরা পেশোয়ারে। কয়েকজনকে ঠকালেন তিনি, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মত হবে। কিন্তু পার পেতে পারলেন না। ধরা পড়লেন। ধরা পড়েই সেই পাগলামীর অভিনয়, যেটা দশ বছর ধরে করে আসছেন। আমি বারণ করতাম। তিনি কিন্তু কিছুতেই শুনতেন না।

এই ধরা পড়ার কিছু দিন আগে এক সন্ধ্যায় আমি চুপচাপ একাকিনী বসে রয়েছি বাড়ীতে। হঠাৎ তিনি এলেন উদ্‌ভ্রান্তের মত। আমার কাছ ঘেঁসে বসলেন, মাথায় হাত বুলোলেন। তারপর বললেন, 'অনসুয়া যদি সত্যি পাগলের অভিনয় করতে করতে পাগল হয়ে যাই? তবে তুমি কি করবে? যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছি তোমাকে। কিন্তু তবু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছ আমার কাছে। কিন্তু কেন? জানিনে। ভেবেছিলাম তুমি প্রথমেই আমায় বিদায় দেবে? কিন্তু আমি যে কী তা জেনে-শুনেও স্থান দিলে তোমার পায়ে। কোনদিন তোমার জন্যে কোন কিছু ভালো করি নি। তবু তুমি ভালবেসেছ—কেন জানিনে? এবার আমার অভিনয় করতেও কষ্ট হচ্ছে। আমি ক্লান্ত, আমি জর্জরিত। মনে হচ্ছে সত্যি উন্মাদ হয়ে যাবো—যা এতদিন অভিনয় করে এসেছি, সত্যিকারেরই তাই বোধহয় চলে যাবো। অনসুয়া, যদি আমি চলে যাই তবে তোমার জীবনের ব্যর্থ বসন্তের জন্যে আমি দায়ী। তুমি কিন্তু আবার বিয়ে কোরো এই অনুরোধ—মৃত্যুর পর হয়ত এই জন্যেই শান্তি পাব না। কিন্তু একটা কথা! এবার যাকে বিয়ে করবে তাকে দেখেশুনে নিও, বিশ্বাস কোর না যা আমার বেলায় করেছিলে। এক কথায় প্রেম নিবেদন কোর না যা আমাকে করেছিলে।

আমি যা আছি আমি তাই। কোনদিনই বদলাব না। তবে মনে হয় যাবার সময় হয়েছে।'

তারপর জানেন, পেশোয়ারের জেলে সেই আবার পাগলামির পুনরাভিনয় শুরু করলেন। কিন্তু এবারেই হার। আর পারলেন না। পৃথক আত্মার অভিনয় এইখানেই শেষ হল। অভিনয় করতে করতে হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠলেন। সমস্ত দেহের রক্ত যেন উৎক্ষিপ্ত হল তাঁর মুখে, বিকৃত হয়ে গেল গ্রীবাদেশ, দৃষ্টি স্থির, নিশ্চল হয়ে এলো যেন কত দূরে কাকে দেখছেন। তার-পর হঠাৎ কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের গায়ে তীব্রগতিতে ছুটে এসে প্রচন্ড আঘাত করলেন মস্তিষ্কের। মস্তক সে আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হল। রক্তধারায় প্লাবিত হোল দেহ। যারা তাকে দেখছিল, ছিদ্রের ফাঁকে, তারাই আমাকে বলেছে যে, তার সাহায্যে যাবার আগেই তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। চারিধার রক্তাপ্লুত। তার পকেটে ছিল ছোট্ট এক চার লাইনের চিঠি আমাকেই উদ্দেশ্য করে লেখা—

> 'Dasling Ansy, Enough of this show! Enough of the pose and acting! It's getting into my nerves that I protected so long. If I die, forgive me. Forgive my passions and prejudices, if you can.

তার মৃত্যুর পরে আমার আর কিছু মনে হয় নি। শুধু মনে হয়েছে অজস্র বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের মাঝে থাকলেও আমি আশ্রয়হীনা, অবলম্ব-হীনা। কে আমাকে দেখবে? তাছাড়া কটা দিনই বা আমার জীবন! যে কটা দিন পারি দেশের উপকারে আমি লেগে যাই। সেই থেকে সুরু করেছি দেশের কাজ। কবে শেষ হবে জানিনে? অনেক রাত হয়ে গেল, এবার কিন্তু যেতে হবে। তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি আপনাকে, যদি কোন ভবিষ্যৎ জীবনে আবার তাঁর সাক্ষাৎ মেলে সেদিন কিন্তু তাঁকে অন্য পথে যেতে দেব না—। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো যে পথে শুভ্রতা, সরলতা, সহজতা আর একান্ত জীবন।'

প্রশ্ন করলাম, 'পর জীবন সম্বন্ধে কিছু জানিনে। কিন্তু সত্যই যদি পরজীবন থাকে, এবং সত্যই যদি তিনি আবার আসেন আপনার জীবনে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবেন কি?'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' তিনি উত্তর দিলেন। 'ভুলে যাবেন না তাঁকে আমি ভালবেসেছিলাম। তিনি শঠ, প্রবঞ্চক—যত আপনারা কিছু বলুন না কেন, তাঁর যত অপরাধই থাকুক না কেন। আমি তাঁকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি—আমার ভালবাসায় কোন ফাঁক নেই, কোন জাল জুয়াচুরি নেই, কোন ছেদ নেই।'

অন্ধকার নেমে এল। স্বচ্ছ বাতির ছাটে বাতিগুলো অস্পষ্ট হয়ে এলো। অনসুয়া বললেন, 'এবার যাই।' উত্তর দিলাম, 'যাবেন কি করে একা, এ বর্ষা মুখর সন্ধ্যায়? আপনার একটা বাহনের ব্যবস্থা করে দিতে দিন?' অনসুয়া ধন্যবাদ জানালেন। অদূরে টিপু সুলতান মসজিদের কাছে অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ফিটন গাড়ী ভাড়ার প্রতীক্ষায়। সেই গাড়ী এল। অনসুয়া চড়লেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন অনসুয়া।

অধিকারে প্রতিষ্ঠিত

আমেরিকান নারী ভোটাধিকার অর্জন করেন ১৯২০ সালে। এই অর্জিত গৌরব অনায়াসলব্ধ নয়। এজন্য সুদীর্ঘ ৭২ বছর কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে আমেরিকার নারীসমাজকে। অবশেষে তাঁরা জয়ী, হয়েছেন। রাজনীতি এবং শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের পরিপূর্ণ অধিকারে তাঁরা এখন ভূষিত। বর্তমানে আমেরিকায় নারীভোটারের সংখ্যা পুরুষ-ভোটারের তুলনায় প্রায় ৫০ লক্ষ বেশি। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের প্রচারকার্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের শতকরা ৯৯ জন হলেন মহিলা। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে যে গৌরব অর্জিত হয়েছে সে সংগ্রাম কিন্তু কোনসময়েই এককেন্দ্রিক ছিল না। মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমেরিকান নারীসমাজ। যেটুকু অপূর্ণ ছিল রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পাশাপাশি জীবন ও জীবিকার সর্বস্তরে নিজেদের ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাও সক্রিয় ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯০ সালের এক সমীক্ষায়। শ্রম-বিভাগের এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কল-কারখানা মিলিয়ে আমেরিকান নারী-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৭ জন। এঁরা সবাই শিল্প শ্রমিক। দেখা যাচ্ছে যে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এদেশের নারীসমাজ শিল্পে পুরুষের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানতে শুরু করেছেন।

মধ্যবর্তী সময়ে এই সংখ্যার খুব একটা হেরফের ঘটেনি। তবে সূচনা থেকেই ক্রমে তা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। তারপর এলো যুদ্ধ। জাতির সংকটক্ষণে নারীসমাজও চুপ করে থাকলো না। দেশের স্বার্থ রক্ষায় পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা এগিয়ে এলেন। শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধির ডাকে সাড়া দিয়ে নারী-সমাজ শিল্পের সকল শাখায় নিজেদের বিস্তৃত করলেন। এসময় তাঁরা সংখ্যায় হলেন ৩৬-১ জন। দেশের সর্বত্র তখন এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা। এই উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীসমাজের এতো ব্যাপক-ভাবে শিল্পে অংশগ্রহণে সবাই উৎসাহিত বোধ করলেন। বিশেষত, ভোটাধিকার-লাভের পর এই উৎসাহ দেখে সবাই ভাবলেন যে এ বুঝি রাজনৈতিক স্বীকৃতির ফলশ্রুতি। তাঁদের ধারণা যে এবার আমেরিকার ইতিহাসে নারীসমাজ নতুন যুগ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না। যুদ্ধের পর এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেল। দেখতে দেখতে শিল্পে নারীশ্রমিকের সংখ্যা অনেক কমে গেল। এবং এই সংখ্যা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল যে আগের গর্ব এবার লজ্জায় পর্যবসিত হলো। কিন্তু সময় কখনো চুপ করে বসে থাকে না। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শিল্পে নারীশ্রমিক হ্রাস পাওয়ার কিছু কারণও আছে। যুদ্ধে অনেকেই পতি এবং পুত্রকে হারিয়েছেন। যুদ্ধ চলাকালে যে উৎসাহের বশবর্তী হয়ে তাঁরা শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু যুদ্ধশেষে হিসেব-নিকেশে' তাঁরা খুবই হতাশ হলেন। স্বামী-পুত্রহারা ঘরে যখন তাঁরা ফিরলেন তখন তাঁরা হতাশায় ভেঙে পড়লেন। কেউ কেউ আর কাজে ফিরলেন না। আবার কেউ কেউ যুদ্ধকালীন অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে কাজে ফেরার উৎসাহ অনুভব করলেন না। এমনিভাবে শিল্পে নারীশ্রমিকের সংখ্যা খুবই হ্রাস পেল। ইতিমধ্যে সময় এগিয়ে চলেছে। মানুষ নতুন জীবনস্পন্দনে মুখর হচ্ছে। এই অগ্রগামিতা আমেরিকার নারীসমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আবার নতুন-ভাবে শিল্পে নারীশ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করলো। এখন সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৬-৩ জনে অর্থাৎ যুদ্ধকালীন অবস্থা থেকে সামান্য মাত্র উন্নতি। ১৯৪৫ সালে নারীশ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি এবং বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় পৌণে তিন কোটি। সামগ্রিক উন্নতির বিচারে এই সংখ্যা বেশ সন্তোষজনক বলা চলে। এর পাশাপাশি আর একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৮৯০ সালে রুজিরোজগারে মেয়ে-দের হার ছিল ১৮-২ এবং বর্তমানে শতকরা ৪০-২ জন রুজিরোজগারে নিযুক্ত রয়েছেন।

১৮৯০ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সামগ্রিক অবস্থারও অনেক পরি-বর্তন ঘটেছে এবং সেজন্যে এই উন্নতিও সম্ভব হয়েছে। প্রথমাবস্থায় মেয়েদের কাজে যোগ দেবার সর্বোচ্চ বয়স ছিল ২৬ বছর। এর ফলে এক অদ্ভুত জিনিস দেখা যেতো। অর্ধেক কর্মী তরুণী এবং বাকী অর্ধেক বয়স্কা। বয়সের এই তারতম্যে কাজের পক্ষে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হতো। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমানে বয়সের সীমা বাড়ানো হয়েছে। ৪১ বছর বয়স পর্যন্ত মহিলারা শিল্পশ্রমিকের কাজে যোগদান করতে পারবেন। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে অনেক ক্ষেত্রে। নারীশ্রমিকের পক্ষে সেদিন বিয়ে করা ছিল এক বিরাট সমস্যা। চট করে কেউ বিয়ে করতে পারতেন না। এর ফলে দেখা যায় যে সেদিন মেয়েশ্রমিকদের বিবাহিতের হার খুবই কম। কিন্তু আজ সে চিত্রের পুরোপুরি বদল ঘটেছে। এখন অবিবাহিত মেয়েশ্রমিকের সংখ্যা অনুল্লেখ্য। বিয়ের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কেউ অযথা সময় নষ্ট করতে চান না এই সত্যি এখানে প্রমাণিত হয়। এখনকার নারীশ্রমিকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা দু-একবার বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত করেছেন। কেউ কেউ আবার নীরবে বৈধব্য-জীবনযাপন করছেন।

তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্য মাতৃত্বও আসছে তাড়াতাড়ি। নারীশ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশ প্রায় মাতৃত্বের মর্যাদায় মণ্ডিত। তাঁদের সন্তান স্কুলে বা কলেজে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভাল যে নারীশ্রমিকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা পরিবারের প্রধান হিসেবে কাজ করেন সংসার চালানোর জন্য। এবং একমাত্র এঁদের আয়ের উপর ভরসা করেই সংসার চলে এবং সন্তান-সন্ততি লেখাপড়া করে। তবে এরকম নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি যাঁরা স্বামী-স্ত্রী একত্রে রোজগার করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই এঁদের লক্ষ্য হলো জীবনে আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, আমেরিকার অর্ধেকের বেশি মহিলা বছরের কোন না কোন সময়ে কাজ করেন। এঁদের বয়স হলো ১৮ থেকে ৬৪ বছর। এঁদের প্রতি পাঁচজনের তিনজনই হলেন বিবাহিতা এবং সকলেই স্বামীর সঙ্গে বাস করেন। আর এতো খুবই সত্যি কথা যে স্ত্রীর আয়ের উপর পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি নির্ভর করে। সোজা কথায় বলা যায় যে স্ত্রীর রোজগার পরি-বারকে দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচায়। আবার কোথাও এই রোজগার পরিবারকে দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্তের মর্যাদা দান করে। এই সত্যি তো আমরা আরো মর্মান্তিক-

ভাবে অনুভব করি। একা স্বামীর আয়ে সংসার কিরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে সে অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। এক্ষেত্রে আমরা যদি স্বামীর আয়ের সহায়ক হতে পারি অর্থাৎ যৌথ রোজগার করতে পারি তবে সংসারের হাল যে ফেরে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য আমেরিকায় দরিদ্রের সংজ্ঞা যা তা আমাদের সংগে ঠিক মেলে না। এদেশের মধ্যবিত্ত আর সেদেশের মধ্যবিত্তে অনেক তফাৎ।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের মহিলা-সংস্থার মতে সাত হাজার ডলার বাৎসরিক আয় হলো চারজনের পরিবারের পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয়ে এই ভাণ্ডার পূর্ণ হবে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিবার আয়ের এই চিহ্নিত স্থানে পৌঁছুতে পেরেছেন। স্বামী-স্ত্রীর একত্রে রোজগারেই এটা সম্ভব হয়েছে। আবার কোন কোন পরিবার একার এই কোটা ছুঁতে পেরেছেন বটে কিন্তু আরো রোজগার বাড়ানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্ত্রী এসব ক্ষেত্রে রোজগারে অনুপস্থিত থেকেছেন। স্ত্রী রোজগার না করলে বছরে বড়রকমের ঘাটতি দেখা দেয় যার আর্থিক মূল্য কিনা প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার ডলার বছরে।

আমেরিকার নিগ্রো পরিবারের পক্ষেও এই যৌথ আয় জীবিকাসংস্থানের এক মস্ত সহায়। মহিলা সংস্থা-নির্দিষ্ট সাত হাজার ডলার বছরে আয় করেন এমন পরিবার হলো শতকরা একত্রিশ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ-কর্ম করেন। সংসার এঁদের বেশ ভালই চলে। কিন্তু মুশকিল হলো যে অনেক পরিবারে স্ত্রী রোজগার করেন না বা স্ত্রীকে রোজগার করতে দেওয়া হয় না। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এরকম পরিবারে আয় প্রায় দুই হাজার ডলার কম থেকে যায় আবার কোন কোন পরিবারের পক্ষে এই ক্ষতি মোট আয়ের শতকরা পনেরো ভাগ। অবশ্য তাঁরা এটাকে ঠিক ক্ষতি মনে করেন না। যদি তাই করতেন তাহলে তাঁদের স্ত্রীরা নিশ্চয়ই রোজগার করতে এগিয়ে আসতেন এবং নিজস্ব সামর্থ্যে পরিবারের হাল ফেরাতেন।

এতো গেল রোজগারের কথা। মেয়েরা যদি চান তো ভালই রোজগার করতে পারেন এবং পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু এই সংগে মেয়েদের কতগুলি ব্যক্তিগত সুখ-অসুখের কথাও মান রাখতে হবে। অনেক মেয়েরই কারখানার কাজের পরেও বাড়িতে কিছু কাজকর্ম করতে হয়। বিশেষ সাংসারিক খুঁটিনাটি ব্যাপারে গিন্নীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান দরকার। সন্তান লালনপালন করাও কারো কারো পক্ষে এক বিরাট সমস্যা। সন্তান হবার সময়ে বা কোন জরুরী প্রয়োজনে ছুটির দরকারও হয় কখনোসখনো। কিন্তু এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁদের এতো কথা ভাবলে আর চাকরি করা হয়ে ওঠে না। তাঁরা সব চিন্তা মাথায় রেখে কাজ করতে একরকম বাধ্য হন বলা চলে। অবশ্যই সাংসারিক প্রয়োজনে।

এসব অসুবিধার জন্য চাকরি যাঁদের না হলে চলে তাঁরা চাকরিতে আসতে চাইতেন না। সবচেয়ে অসুবিধা হতো গর্ভাবস্থায়। এসময় সবেতন ছুটি মঞ্জুর হতো না। এই ছুটির দায়িত্ব ছিল নিজের। অর্থাৎ এসময়টুকু বিনাবেতনের মধ্যে চলে যেত। তারপর সন্তানপ্রসব অন্তে ফিরে এলেও কর্তৃপক্ষের টালবাহনায় তাঁরা সরাসরি কাজে যোগদান করতে পারতেন না। এ যেন অনেকটা লে-অফের মতো। কিন্তু এখন এসব নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে। সন্তানপ্রসব অন্তে নারী-শ্রমিক ফিরে এলে তাঁকে সরাসরি কাজে বহাল করতে হয় এবং তৎসহ পুরো সময়ের বেতন। এই সংগে নারীশ্রমিকদের সংগে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হয়েছিল। শুধু মহিলা বলে কোন বৈষম্য করা চলবে না। সমান কাজের জন্য সমান মাইনে দিতে হবে এবং নারী-পুরুষের সিনিয়রিটি সমানভাবে গ্রাহ্য করা হবে। এবং মেয়েদের ট্রেনিং-এর সুব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাঁরা ভাল কাজের সুযোগ পান। এসব অধিকার বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ আজকের দিনে ক্রমেই অচল হয়ে আসছে। কারণ, আমেরিকান নারী সমাজজীবন ও জীবিকার প্রতি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন দিনে দিনে। অধ্যাপনা, শিক্ষকতা এবং স্বাস্থ্যবিভাগে তাঁদের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন দেশে এই কয়েকটি জীবিকার প্রধান অংশে রয়েছে নারীসমাজ। আমেরিকায় ততটা সম্ভব না হলেও বর্তমানে অগ্রগতি বেশ প্রশংসনীয়। সবদেশের মতো এদেশেও নার্সের অভাব খুবই গুরুতর। সেজন্য প্রয়োজনবোধে ৮০০ ডলার পর্যন্ত স্কলারশিপ মঞ্জুর করা হয় নার্সিং শিক্ষার জন্য। এসব সত্ত্বেও কিন্তু নারী-সমাজের মধ্যে বেকার থেকে যাচ্ছে। যদিও এই সংখ্যা খুবই সামান্য তবুও পুরুষের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন।

আমেরিকার মহাকাশ অভিযানে মহিলাদের অবদান খুব কম নয়। মহাকাশ সংস্থার অ্যাস্ট্রোনমি বিভাগের প্রধান ডকটর নান্সি গ্রেস রোমান মহাকাশ অভিযানে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। এজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন। এমনি রয়েছেন আরো কয়েকজন। এঁদের সকলেই মহাকাশ অভিযানে আমেরিকার সাফল্যের দাবীদার। এসকল দিক বিবেচনা করে শিল্পে নারীশ্রমিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। এবং এখন অনেকেই নারীশ্রমিকদের বেশ সুযোগসুবিধা দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁদের আশা যে এর ফলে শিল্পের আরো উন্নতি সম্ভব। এই ধারণা থেকে অংশতঃ এবং সমানাধিকারের আন্দোলনের ফলে মূলতঃ শিল্পক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ ক্রমেই বেড়ে চলছে। হয়তো একদিন দেখা যাবে যে আমেরিকান মেয়েরা শিল্পে পুরুষকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন।

কিন্তু রাজনৈতিক সমানাধিকারের ক্ষেত্রে আমেরিকান নারীসমাজের কৃতিত্ব এখানে তেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কংগ্রেসে নারীপ্রতিনিধির সংখ্যা বরাবরই কম। একবার কিছুটা ব্যতিক্রম নজরে পড়েছিল। ৮৭তম কংগ্রেসে নারীপ্রতিনিধি ছিলেন ১৯ জন। সেটাই এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। অবশ্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নারীর গুরুত্ব বেড়েছে এবং অনেক মর্যাদাসম্পন্ন পদও তাঁরা পাচ্ছেন। রাষ্ট্রসংঘে রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদায়ও তাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু হোয়াইট হাউস অভিমুখে এখনো নারীর পদ সঞ্চারণ অশ্রুত রয়ে গেছে। জীবন ও জীবিকার সর্বত্র নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তারপর তাঁরা এদিকে পা বাড়াবেন। এই সংকল্পেই হয়তো আমেরিকান নারীসমাজ দিনের প্রতীক্ষা করছেন।

—প্রমীলা

শাড়িতে ফুল, লতা-পাতা

ফেবরিকের ঐশ্বর্য
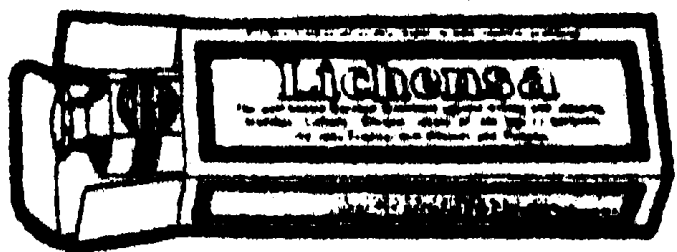
ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কলকাতা নগরী
কিছুদিন আগে থেকে ফেবরিক রং-এ
তে আরম্ভ করেছে, আজও ভাসছে।
া বলাটা একটুও অতিশয়োক্তি নয়,
যেদিকে তাকানো যায় অন্তত প্রতি
নের প্রায় একজনের শাড়ীতে ফেবরিক
র নানাবিধ কাজ করা। তাছাড়া
নার চাদর, গায়ের চাদর, পর্দা, সোফা-
। স্কার্টের নিচে সর্বত্রই ফেবরিক রং-
একচ্ছত্র অধিকার।

জনৈক মহিলা কয়েকদিন আগে বলে-
ছেন, 'বালিগঞ্জে একটি প্রদর্শনী
লাম—সেখানকার ফেবরিকের কাজ
কেও হার মানায়। প্রতিটি কাজই
ন্ত আর্টিস্টিক।'

অপর আর একজন মহিলা একদিন বলেছিলেন, 'দেখুন তো আমার ঘরের পর্দাগুলো। বলুন তো আমি কি কাপড় দিয়ে পর্দা তৈরী করেছি?' আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি গোটা তিনেক মাঝারি ধরণের লুঙ্গি কিনেছি। সেই লুঙ্গি-গুলোকে পর্দার সাইজ মত কেটে ফেবরিক রং দিয়ে ডিজাইন করেছি। দেখুন তো লুঙ্গি কিনে তাতে ফেবরিক রং দিয়ে কত অল্প খরচে ঘরের পর্দা বানিয়েছি—আপনার কি ভালো লাগছে না?'

আসলে আমার খুব ভালই লাগছিল। ফেবরিক রং দিয়ে এত সহজে অল্প দামের কাপড়ে কাজ করা যায় সেটা অনেকেই জানে না।
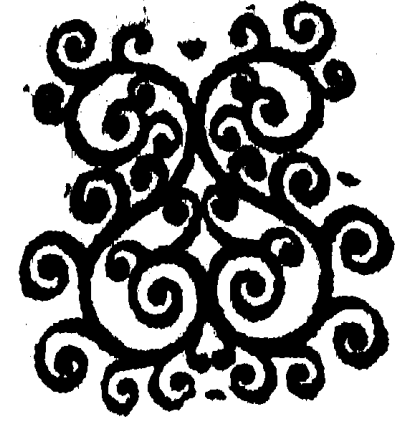
আর একদিন তো এক ভদ্রমহিলা গোটা কয়েক শাড়ি আমার সামনে রেখে দিয়ে বললেন, 'এই শাড়িগুলো আপনার কেমন লাগছে?'

'চমৎকার' বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্র-মহিলা প্রায় এক দৌড়ে একটা ছাতা, এক-জোড়া জুতো এনে হাজির করলেন আমার সামনে। অতি সূক্ষ্ম তুলিতে মাত্র দুটি রং দিয়ে গোটা ছাতার কাপড়টা ভরাট করেছেন। জুতো জোড়ার ওপরও কয়েকটি রং দিয়ে সুন্দর ডিজাইন করেছেন।

আমি ভাল করে দেখে অবশ্য মন্তব্য করেছিলাম 'ছাতার কাজটা এত সূক্ষ্ম না করাই ভাল ছিল। ছাতা থাকবে মাথার ওপর। পথচারীর নজর অত সূক্ষ্ম কাজ পর্যন্ত না যাবার সম্ভাবনাই বেশী।'

ভদ্রমহিলার রং চটে যাওয়া শাড়িতে ফেবরিক রং প্রয়োগ করায় ফলে শাড়ির ঔজ্জ্বল্য বহুলে পরিমাণে আবার ফিরে এসেছে। অতি সহজে, অবসর সময়ে বসে ফেবরিক রং দিয়ে নানাভাবে ঘরদোর আসবাবপত্র এমন কি নিজের সৌন্দর্যও বহুল পরিমাণে বাড়ানো যায়। দরকার মত শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে একখানা বটুয়া তৈরী করলেও বেশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাটিকের মত অত ব্যয় এবং অত সময়সাপেক্ষ কাজ যদিও ফেবরিক নয়, তবুও ফেবরিকের সৌন্দর্য অনস্বীকার্য। অবশ্য ফেবরিকের সব কাজই অতুলনীয় নয় অথবা সকলেই যে কাজ করছেন তা অপূর্ব সেকথা কোনমতেই ঠিক নয়, তবুও কোন স্থানে কোন জিনিসে, কিভাবে, কোন রং, কি ধরণের ডিজাইন দিতে হবে, সেগুলো সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে ফেবরিক রং প্রয়োগ করা দাকার। নয়

ব্লাউজের পিঠে ফেব্রিকের কাজ
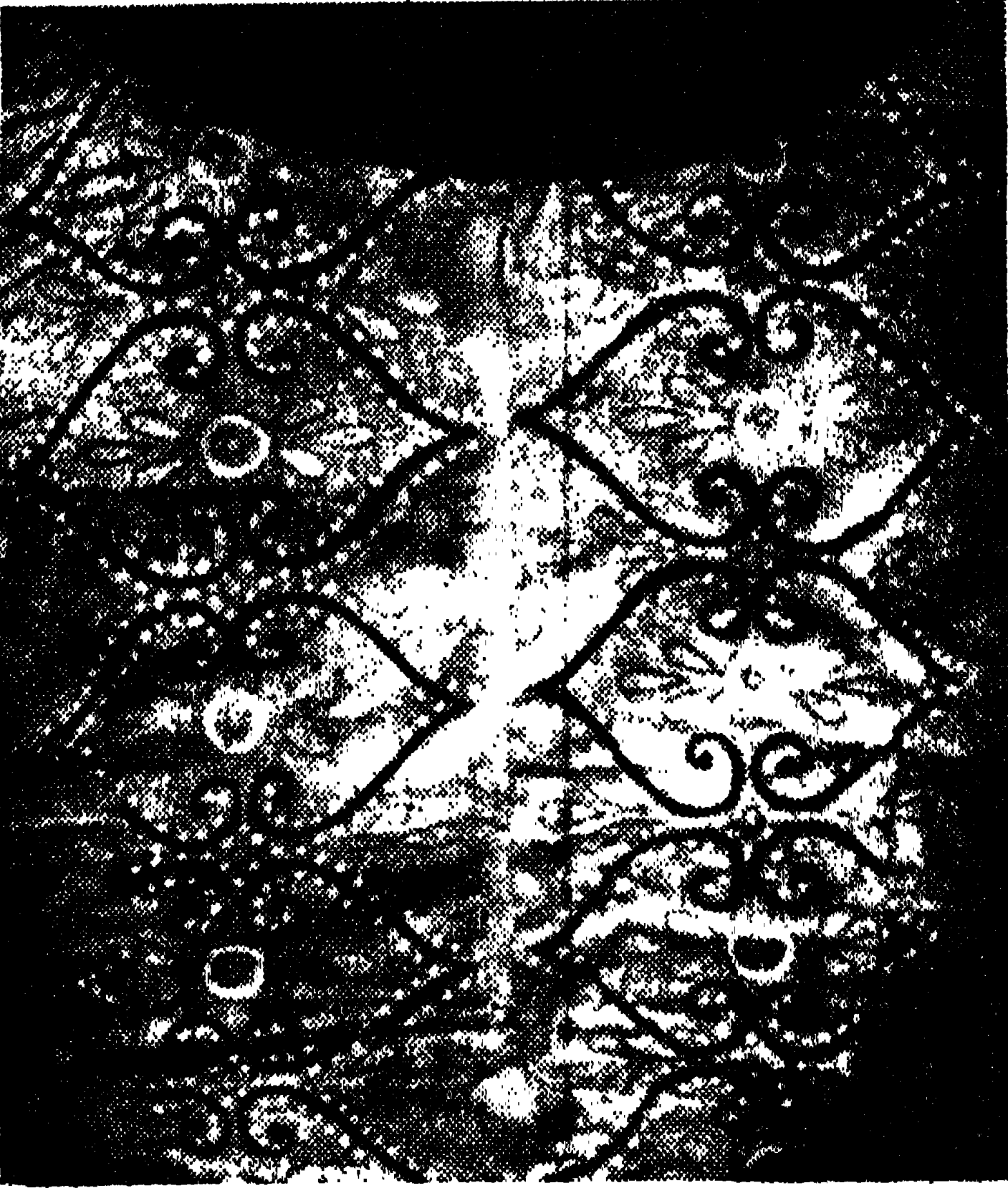
তো যে উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তার সঠিক সৌন্দর্য খোলে না।

সাধারণত পর্দা, সোফার ঢাকা, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, ছাতা এগুলোতে বড় বড় ডিজাইন করাই সবচেয়ে ভাল। এক ঝাঁক ফুল, বড় কলকা, বাঁকুড়ার ঢঙে ঘোড়া, হাতি, পায়রা, হাঁসের কোন ডিজাইন করলে দেখতে ভাল লাগবে। শাড়ির পাড়ে (অল্প বয়স্কদের জন্য) ভাল ফুল-লতা-পাতার ডিজাইন (সামান্য বড় ক'রে), হিউম্যান ফিগার (রাজপুত স্টাইলে), ডেকোরেটিভ কোন ডিজাইন টানা অথবা ছাড়া ছাড়া করলেও ভাল হয়। বয়স্ক মহিলাদের জন্য সাধারণত টানা পাড়ে ডেকরেটিভ ডিজাইন অথবা ওরিয়েন্টাল ডিজাইন করাই বাঞ্ছনীয়। ব্লাউজের পিঠের (সারা পিঠ জুড়ে অথবা কোমরের কাছে) ডিজাইনে উগ্র কোন রং ও জমকালো কোন ডিজাইন পছন্দ করা কোন মতেই উচিত নয়। ব্লাউজে প্রধানত সূক্ষ্ম কোন ডিজাইন দু'রং-এর সেড দিয়ে করলে বেশী ভাল লাগবে। সাধারণত একটি রং দিয়ে পুরো ডিজাইনটা ভরাট করে তারপর সেই রং-এর সঙ্গে আন্দাজ মত সাদা রং গুলে দিতে হবে। এবং রংটা অনেক হালকা করতে হবে। এখন সেই হালকা রং পূর্বে করা ডিজাইনের স্থানে স্থানে বুলিয়ে দিতে হবে। তাতে এক রং-এর একঘেয়েমি কমে যাবে ও একই রং-এর আলোছায়ায় ডিজাইনটি আরও মনোরম হবে। হালকা রং দেওয়া শেষ হলে স্থানে স্থানে সরু তুলি দিয়ে সাধ্যমত নিখুঁত-ভাবে ডিজাইনের পাশে পাশে কালো রং দিয়ে রেখা (আউটলাইন) দিতে হবে। এবার এই ব্লাউজটি যিনিই পরবেন তার শ্রী আরও সজীব হবে।

চীনামাটির ফুলদানি, বিয়ের পিঁড়ি এ-সবেতেই আপনি ফেব্রিক রং ব্যবহার করতে পারেন। ফেব্রিক রং-এর পর বার্ণিশ দেবার দরকার হয় না।

বড় বড় কোন ডিজাইন করার সময় প্রয়োজনমত তেল রং-এর তুলি তেল রং-এর পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে যতদূর সম্ভব রং কোন পাত্রে না ঢেলে শিশিতেই আন্দাজ মত মিডিয়াম ঢেলে তরল করে তেল রং-এর তুলি দিয়ে টানতে হবে। তাতে রং-এর অপব্যবহার কমে কারণ ফেব্রিক রং কোন পাত্রে ঢাললে অল্পক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। বড় কোন ডিজাইন চ্যাপ্টা একটা রং-এর ডেলা বানালে দেখতে খারাপ লাগবে। তাই বড় ডিজাইনে সাধ্যমত সেড ব্যবহার করা উচিত যাঁরা সেড দিতে জানেন না, তারা সোজা সুজি শিশি থেকে রং তুলে কাপড়ে লাগাবেন ও সেই রং ভিজে থাকতে থাকতে সাদা অথবা অন্য কোন মানানসই রং অল্প করে লাগাবেন। তাতে আপনার পূর্বে ব্যবহৃত রং-এর একটা সেড বোঝা যাবে সরু তুলি সূক্ষ্ম বা ছোট কাজের জন্য ব্যবহার করা একান্ত দরকার। মনে রাখা দরকার রং বেশী তরল হলে সে রং-এর প্রাখর্য কমে যায়। শিশিতে অবশিষ্ট রং থাকলে তা মাঝে মাঝে সামান্য মিডিয়াম ঢেলে নেড়ে-চেড়ে রাখতে হয়।

ভারী করে রং ব্যবহার করলে অনেক সময়েই খসে পড়ে যায়। যতদূর সম্ভব কম পরিমাণ রং ব্যবহার করলে আর খসে পরার ভয় থাকে না। সাদা কাপড় ধোয়ার সময় ঈষৎ গরম জল ব্যবহার করলে ভয়ের কিছু নেই। কাজটি সম্পন্ন হলে অল্প গরম ইস্ত্রি বা রৌদ্রে একটু মেলে দিলে কোন রকমে রং উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। গরম ইস্ত্রি কোনসময়ই সরাসরি ডিজাইনের ওপর চালানো চলবে না।

নিজের সাজ-সজ্জার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের প্রতিটি জিনিসও যাতে সুন্দর, গোছানো (বেশী খরচ না ক'রে) হয় সেদিকে নজর দেওয়া সব রুচিশীল মহিলারই অবশ্য কর্তব্য। একটু ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে অতি অল্প খরচেই আমরা সকলে ঘর সাজাতে পারি—এটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। অবসর সময়ে আপনি ইচ্ছে করলে উপরি কিছু আয়ও এথেকে করতে পারেন।

—জয়ন্তি ঘো

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন বাড়ীতে গণ্ডীপণ্ডে নবান্ন করেও কিছু হয় নি যতীনের।

চুপ করে পশ্চিম আকাশের দিকে চাইলেন স্মৃতিরত্নমশায়।

হেসে বললুম—রঙ ধরে নি, ফল এখনও পাকে নি, দাদু।

—ওরে শালা আমায় হনুমান বললে? —পিঠে মৃদু চাপড় কষিয়ে বললেন রত্নদাদু।

—তাই বৈ কি—চটপট উত্তর দিলুম—ফলাহার বুঝি হনুমানেরই একচেটে, ব্রাহ্মণেরা করেন না ফলাহার? তবে 'ফলারে-বামুন' খেতাবটা পেলেন কোত্থেকে?

—তা বলে এই বিশেষ রাঙা ফলটি নয় মশায়, ওটি বিশেষ একজনেরই একচেটে। —বললেন স্মৃতিরত্নমশায়।

বললুম—হলেই বা। শ্রীরামচন্দ্রের সেবকও দ্বিজোত্তম। এখনও বেলা আছে ঢের, আরও কিছু বলুন, দাদু।

—অর্থাৎ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমির অবসান —এই চাও তো? আচ্ছা, তাই হোক। স্মৃতিরত্নমশায় আরম্ভ করলেন—

যত দুরন্ত দজ্জাল দস্যি গুণ্ডাই হোক না, বেশ ছোটবেলা থেকেই যতীনের মধ্যে ছিল দুটো জিনিস, যা অনুকরণ করবার মত—সত্যনিষ্ঠা আর মাতৃভক্তি। ও ছিল মিথ্যের ওপর খড়্গহস্ত। মিথ্যে কইতে বা সইতে পারত না কখনও। সাধারণ লোকমত বা জনশ্রুতিকে আমলই দিত না সে। নিজে যাচাই করে পরখ করে দেখা চাই— কি সত্যি কি মিথ্যে। মানে—প্রত্যক্ষ বিচারে সত্যাসত্য প্রমাণিত হলে তবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা। কি রকম শোন—

ছেলের রকম সকম দেখে কালিদা তো ভাবনায় অস্থির। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রাণ, বিদ্যাচর্চার স্থান। জ্ঞাতি গুষ্ঠি আত্মীয়-স্বজন সবাই করে বিদ্যা আলোচনা, আর ওই থাকবে বামুনের ঘরে গরু হয়ে? আকাট মুখ্যু হয়ে গুণ্ডামি করে বেড়াবে? সবে ধন নীলমণি একমাত্র ছেলে কালিদার। যতীনের কোলে একটি খোকা হয়ে মারা গেছে শৈশবেই। আর মাত্র দুটি মেয়ে—সুশীলা আর রানি। এ হেন ছেলেটি কুল-প্রদীপ না হয়ে হবে কুলাঙ্গার? কি করা যায়? ভাবনায় ভাবনায় মনমরা হয়ে আছেন কালিদা। এই সময়ে মহানগরে ছিলেন এক সিদ্ধ সাধক যোগী মহাপুরুষ। তিনি এমনই যোগসিদ্ধ যে তাঁর শরীর বন্দুকের গুলীতেও বিদ্ধ হয় না। আঁধারে আলো দেখলেন কালিদা, ভাবলেন—নিয়ে যাই ছেলেটাকে এই মহাপুরুষের কাছে। মহা-পুরুষের সংসর্গে আর উপদেশে যদি মতি-গতি বদলায়। সব শুনে ছেলেও রাজি। যাবার দিন ঠিক হল। দূরে তো বেশি নয়—এই কাছেই মাহীনগর।

নির্দিষ্ট দিনে বাপবেটায় গেছেন সাধুর কাছে। আগে থেকেই কালিদা সাধুকে জানিয়ে রেখেছিলেন আপন মর্মবেদনার কথা।

সাধু দর্শনেচ্ছু জনতার ভিড় কমলে পিতাপুত্রে প্রণাম করে বসলেন সাধু-মহারাজের কাছে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখলেন সাধু। ছেলে কী—যেমন সুদর্শন, তেমনই বলিষ্ঠ তেজোদৃপ্ত সমস্ত বপু—সর্বাঙ্গ থেকে যেন একটা তেজ ফুটে বেরুচ্ছে। বড় ভাল লাগল সাধুর। আদর করে কাছে বসিয়ে বললেন কত ভাল কথা—কত হিত-উপদেশ। আর উপদেশ-ভবী যে ভোলবার নয়। মিষ্টিকথায় আসল কথা ভোলবার ছেলে কি যতীন? কথার মাঝখানেই সরাসরি মুখের ওপর জিজ্ঞেস করে বসল সাধু-মহারাজকে—লোকে লোকে যা শুনেছি, তা কি সত্যি, মহারাজ? যোগসাধনায় আপনি নাকি এমনই সিদ্ধ যে আপনি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, বন্দুকের গুলিও নাকি বিঁধতে পারে না আপনাকে?

একটু হেসে ঘাড় নেড়ে সাধু বললেন—সত্যি বলে সত্যি। চিরসত্যি কথাই শুনেছ তুমি।

—তাহলে পরখ করি,—বলেই পকেট থেকে পিস্তল বের করে যতীন উঁচিয়ে ধরল সাধুর বুক লক্ষ্য করে।

সর্বনাশ—হাঁ হাঁ করে উঠলেন কালিদা। তিনি ছিলেন পেস্কার,—সরকার থেকে পেয়েছিলেন একটি পিস্তল। তিনি জানতেন না যে আসার সময় ছেলে লুকিয়ে এনেছে সেটি। সাধুরও চক্ষু চড়কগাছ,—হকচকিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু মুহূর্তকাল। শেষে বুঝিয়ে বললেন যতীনকে—শোন, শোন, আমি কে? এই শরীরটা? এটা তো খোলশ মাত্র। এর জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় আছে, লয় আছে। সবাই বলি—আমার শরীর। সুতরাং শরীরটা যে 'আমি' নই তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে? দেখ, আমি বলছি 'আমি', তুমি বলছ 'আমি', এ বলছে 'আমি', ও বলছে 'আমি', সে বলছে—'আমি'। এই যে এ, ও, সে, তুমি, আমি সবাই বলছি 'আমি', এই সর্বভূতেস্থিত 'আমি'ই হচ্ছে সত্যিকার আমি। এই 'আমি'র জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, ক্ষয় নেই, লয় নেই। এ দেহ, মন, প্রাণ সবেরই আধার—সর্বাধার 'আত্মা'। এই হচ্ছে আসল 'আমি', পাকা 'আমি'—পরমাত্মা।

ভক্তিবাদীরা এইটিকেই সহজ করে নিয়ে বলেন—যস্মিন্ সর্বে যত সর্বে যঃ সর্বে, সর্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্বময়ো দেবো তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ।

তাঁদের দুই ভাব—দ্বৈতবাদ, তিনি আর আমি—সঃ আর অহং। কিন্তু, জ্ঞানমার্গে সমাহিত হয়ে সবের মধ্যে 'আমি'কে আর

'আমি'র মধ্যে সবকে যখন দেখবে তখনই তুরীয় অবস্থায় গণিতের একে একে দুই না হয়ে হবে একে একে এক—সঃ আর অহং—সোহম্।

তোমার বন্দুক পিস্তল দূরের কথা, আগুনের সাধ্য নেই পোড়াতে, জলের সাধ্য নেই ভেজাতে, বাতাসের সাধ্য নেই শুকোতে বা ওড়াতে এই পাকা 'আমিকে'

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তি মারুতঃ।।

কোন অস্ত্রই পারে না একে ছিন্ন করতে, সর্বধ্বংসী কালও পারে না একে ধ্বংস করতে—এ অজর, অমর, অক্ষয়।

সাধু থামলেন। তারপর পরম স্নেহে যতীনের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—ছেলেমানুষ, এসব এখন বুঝতে পারবে না, যতীন। আর একটু বড় হও। খুব ভাল করে পড়াশুনো কর। অনেক অনেক বই পড়ে ফেল, অনেক শোন। তারপর মনন করতে করতে যখন তন্ময় হয়ে যাবে, সমাহিত হবে—তখনই জানবে—'আমিকে'। আর জানতে পারবে তুমি—তোমার শক্তি আছে, বল আছে। এ জানা দুর্বলের কাজ নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

এখন যাও, খুব ভাল করে পড়াশোনা করগিয়ে। জানবার শেখবার অনেক আছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—যতীনের চোখ ঝলসে উঠল, বাজখাই গলায় বললে—যতসব বুজরুকি, ভণ্ডামি করবার আর জায়গা পেলেন না?

হো হো করে হেসে উঠলেন সাধু।
বাপের আশা—সাধুসঙ্গের সুফল—সব অতল জলে! যথা পূর্বম্ তথা পরম্—যা-কে তাই, দজ্জালকে দজ্জাল ছেলে নিয়েই ফিরলেন কালিদা।

সব শুনে মা আঁচলে চোখ মুছলেন।
বিকেলে নিরিবিলিতে ছলছল চোখে কালিদা বললেন সাধুদর্শনের সব খুঁটি-নাটি। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস, কোঁচার খুঁটে চোখও মুছলেন দু-চারবার। এই চোখ দুটোও শুকনো রইল না। কী বলে সান্ত্বনা দিই? হায়রে আশাহত পিতৃহৃদয়! ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও সংস্কৃতের চর্চা করতেন কালিদা। বেদান্ত উপনিষদ দর্শন তাঁর পড়া ছিল, মর্ম বুঝতেন, তা বলে সংস্কার ছাড়েন নাই। তিনি ছিলেন ভক্তি-মার্গের লোক। সব শেষে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন—ভগবান, যতীনকে মানুষ করো। ভগবান শুনেছিলেন তাঁর কথা।

কঠিন পাষাণে ঘা মারতে কুড়ুল ভেঙ্গে গেল, কিন্তু স্নেহময়ী মায়ের স্নেহরস সিঞ্চনে মাতৃভক্ত যতীনের দুরন্তপনা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বিদ্যা-জিজ্ঞাসা। সাধুদর্শন যে একেবারে নিষ্ফল হয়েছিল তা বলা যায় না। গ্রামে টোল ছিল। টোলে বেদান্ততীর্থ পণ্ডিতও ছিলেন ক'জন। যতীন সাধুর কথা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে হাসাহাসি করতে গেলে তাঁরা সমর্থন করতেন সাধুর কথার। অবিশ্বাসের সুরে যতীন জিজ্ঞেস করত—এসব কথার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে আছে? তাঁরা বলতেন গীতা উপনিষদ বেদান্তের কথা।

সেগুলো পড়ে দেখতে হবে—এ ইচ্ছেটা যে যতীনের হত না, তা কে বলবে? বাইরে প্রকাশ না থাকলেও অন্তরে অন্তরে একটু তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছিল বৈ কি তখন থেকেই। বীররস সিঞ্চিত ক্ষেত্র তৈরীই ছিল, আত্মানুসন্ধানের বীজ বপন তখনই হয়েছে—এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

হাত পা টানটান করে ছড়িয়ে আলিস ভেঙ্গে স্মৃতিরত্নমশায় একবার আড়চোখে দেখে নিলেন পশ্চিম দিগন্তটা।

বললুম—এখনও ডাঁশা, পাকেনি তেমন।

—আবার? সহাস্য ধমক। বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোন যুক্তি দিয়ে জনমত বা লৌকিক প্রবাদ খণ্ডনের কথাটা।

—এগারো বছরের ছেলে ভূত ধরতে যাবে ভূত-বাগানে, কথা উঠল সঙ্গে যাবে কে কে। সঙ্গে যাবার কথায় সঙ্গীদের অনেকেই তো ভয়ে কুঁকড়ে আধমরা। দু-একজন ডাকাবুকো হোঁৎকা ছেলে বুকে হাত দিয়ে বীরদাপে বললে—আমি যাব, আমি যাব—

ভূত আমার পুত
শাঁকচুন্নী ঝি
বুকে আছেন রামলক্ষ্মণ
করবে আমার কি?

যতীন ঝাঁঝিয়ে বলল—যা, যা, যেতে হবে না তোদের। কী আমার বীরপুরুষ রে? রামলক্ষ্মণের ভরসাতে যাবি ভূত ধরতে। আরে তোদের রামলক্ষ্মণই তো কোন্‌কালে সরযূর জলে ডুবে মরে ভূত হয়েছে। তার চেয়ে যদি বলতিস্—
বুকের মধ্যে আমি আছি
দেখি করিস কি?

তাহলে নিয়ে যেতুম তোদের। যা, যা,—যত সব ভীরু কাপুরুষ। ভূতের ভয়েই ভূত হয়ে গেছিস সব।

একা একা ভূতবাগানে সারারাত কাটিয়ে সকালবেলা এসে যতীন সঙ্গীদের কি বললে জান, ভায়া? বললে—ভূত-টুত কিচ্ছু নেই, যতসব বাজে কথা। পঁই পঁই করে খুঁজলুম, তা—গেছো, হামদো, মামদো, একঠেঙ্গা—কোন ভূতের ভাঁটিরও দেখা পেলুম না। থাকলে এক বেটাকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসতুম, নয়তো ওরা সবাই মিলে আমারই ঘাড় মটকাতো। ভূত কক্ষনো নাই, কক্ষনো নাই, থাকলে নিশ্চয়ই এস্পার নয় ওস্পার যা হোক একটা হয়ে যেত। তোরা কি বোকা রে—ভূত ভূত করে ভয়েই মরিস। ভূত কি কখনো থাকতে পারে? ভূত কথাটার মানে জানলেই তো ঘরে বসে ভূত ধরা পড়ে?

ব্যাকরণে পড়িস নাই—ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—ক্রিয়ার তিনটে কাল? ভূত মানে—অতীত, যা হয়ে গেছে, মরে গেছে, আপদ চুকে গেছে—'ছিল'। বর্তমান—'আছে' আর ভবিষ্যৎ—'হবে'। তাহলেই বোঝ—মরে ভূত হয়েছে মানে অতীত বা গত হয়ে গেছে, ছিল আর নেই। যেটা গত হয়ে গেছে আর নেই—সেটা আবার আছে কি করে রে? ভূত আছে বলা মানে তো তাই। ভূত নাই নাই, —থাকতে পারে না। অতীত কখনো বর্তমান থাকতে পারে না।

এতটুকু ছেলে যতীন কেমন কড়া সিদ্ধান্তবাগীশ, দুঁদে যুক্তি-সিদ্ধান্ত ছিল বুঝলে তো?

পশ্চিমের টুকটুকে পাকা ফলটি রাঙা-বস ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে খসে পড়ল অস্তাচলের বুকে। পূবের দিগ্‌বধূ ধূপ-ছায়া শাড়ীর আঁচলে ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে পা বাড়াচ্ছেন মাটির মায়ের দিকে।

কমলাকান্তের আসনে আর বিশালাক্ষী মন্দিরে প্রণাম করে দুজনে বেরিয়ে পড়লুম পথে। একটু তাড়াতাড়িই পা চালাতে হল বৈকি ঠিক সময়ে আশ্রমে পৌঁছুতে।

সন্ধ্যার পর যথাস্থানে নির্দিষ্ট আসনে। ভ্রমণকাহিনী বলতে হল। বললুম অবশ্য—কাহিনীটুকু বাদ দিয়ে।

—দুপুরে খাওয়ার পর কি কর, ঘুমোও? —জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী।

—দুপুরে তো স্কুলে পড়াশুনো করতুম। অভ্যাস নাই, তাই ঘুম হয় না।

—কি কর তবে সারা দুপুরটা?

বললুম—খানিকক্ষণ শুয়ে থাকি তারপর উঠে এটা সেটা খুটখাট করি। উষা পিসিমা কাজকর্ম সেরে আঁচল পেতে শুয়ে থাকেন দাওয়ায়। কখনো কখনো গল্প করি তাঁর সঙ্গে।

—পড়ার অভ্যাসটা রাখাই ভাল। ওই তো কিছু বই রয়েছে আলমারিতে। এক-একখানা করে নেবে, পড়ে আবার রেখে দেবে। একসঙ্গে দুখানা বের করবে না। তাতে পড়া ঠিক হয় না।

বেঁচে গেলুম। লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতুম আলমারির দিকে, সাহস করে বলতে পারি নি। দুপুরটা কাটাবার আর ভাবনা কি? বই তো কম নয় আলমারি ভর্তি। সাড়ে নয়টার পর খাওয়া শেষ। স্বামিজী পায়চারী করতে লাগলেন উঠোনে। চললুম নিজের ডেরায়—পান্থশালার দিকে।

সাত

যখনকার যা—তখনকার তা—চলতে হবে সময়ের তালে তালে। সময়ানুবর্তী হওয়া চাই। ভোরবেলায় উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে প্রাতর্ভ্রমণের পালা।

যাই কোন দিকে? বনগাঁস থেকে মাহীনগর গেছি ক'বার মকরসংক্রান্তিতে খাড়ির মেলা দেখতে। কাছে হলেও এখান থেকে পথ চিনি না। শুনেছি দুটো পথ—নতুন গাঁ থেকে গরুর গাড়ীর রাস্তায় মাইল খানেক দূরে মাহীনগর গ্রাম, আর খাড়ির ধারে ধারে গেলে মাহীনগর আশ্রম। ধরলুম খাড়ির ধারের পথ।

খাড়ি তো আর সোজা নয়—সুবঙ্ক-গামিনী। এঁকে-বেঁকে চলতে চলতে কতক্ষণে পেলুম শ্মশানের পাশেই বড় আমবাগানের মধ্যে এক আশ্রম—নদীর ঠিক উত্তরপাড়েই। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য। আম কাঁঠাল বেল পেয়ারা বট অশ্বত্থের রাসমণ্ডল। মাঝে মাঝে ফুলে ভরা টগর, করবী, চাঁপা, জবা, অশোক, সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়ার রংবাহারী হোলিখেলা। মাঝখানে দক্ষিণদ্বারী খড়ের দোচালা মেটে ঘরে উঁচু বেদিতে মানুষ প্রমাণ অতি সুন্দর মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমা। সামনে পূর্ণঘট ও সিঁদুরচর্চিত ত্রিশূল। পাশে শাঁখ, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, ধুনুচি, ধূপ-দান, আর কতকগুলি মাজাধোয়া ঝকঝকে তকতকে রেকাব, গেলাস, বাটি, কোষাকোষি, তাম্রটাট মেঝের ওপর উপুড় করে রাখা। আশ্রমের মন্দির এটি। মন্দিরের সামনে আঙিনায় বেলতলায় অনেকগুলি মড়ার মাথার বেদির ওপর পাথরের শিবলিঙ্গ।

মন্দিরের পশ্চিমে একটু তফাতে পূর্ব-দ্বারী চৌচালা কুটীরের দাওয়ায় চর্মাসনে বসে স্বাস্থ্যসুন্দর নধরকান্তি ভস্মবিভূষিত অঙ্গ, জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী ডান হাতের চিমটেয় ধুনির আগুন তুলে দিচ্ছেন বাঁ হাতের ছোট কলকেয়।

প্রণাম করে দাঁড়ালুম দাওয়ার নিচে। —বস বাবা, বস,—বলে সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন পাশে বিছানো কম্বল। তারপর কলকের নিচের অংশ একটুকরো কাপড় জড়িয়ে দু'হাতের পাতার মধ্যে কৌশলে ধরে 'হর-হর বোম বোম' বলে কপালে ঠেকিয়ে সন্ন্যাসী টান দিলেন। প্রথমে আস্তে আস্তে কটি টান, তারপরেই খুব জোরে দুটি টান দিয়ে কলকেটি উপুড় করে দাওয়ায় রেখে পূর্ব-মুখে স্থির হয়ে আসন করে বসলেন সন্ন্যাসী।

ভস্মবিভূষিত স্বাস্থ্যসুন্দর সুগঠিত দেহ, গলা বাহু ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, জোড়া ভ্রুর মাঝে সিন্দুরের ফোঁটা, পিঠে এলায়িত সদ্যস্নাত জলসিক্ত জটাজাল, আয়তোজ্জ্বল ঢুলু ঢুলু রাঙা চোখ দুটি—যেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী রচিত গঙ্গাধর মূর্তি।

মিনিট কয়েক চুপচাপ। তারপর মুখ-পানে চেয়ে মৃদু মধুর হেসে সন্ন্যাসী বললেন—এত সকালে কোত্থেকে আসা হচ্ছে, বাপধন?

—চাম্রা থেকে, মহারাজ।

—যাবে কোথায়?

—আর কোথাও না। আশ্রমের কথা শুনে এসেছি দেখতে। এখান থেকেই ফিরব চাম্রায়। কতদিন আছেন এখানে? আপনিই কি প্রতিষ্ঠা করেছেন এ আশ্রম?

—দশ বছর আছি এখানে। তবে এ আশ্রম আমার নয়, আমার শেষ গুরুদেব সিদ্ধ বাবার। দু হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে সন্ন্যাসী সুস্পষ্ট স্বরে বললেন—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
ওঁ শ্রীগুরু ওঁ শ্রীগুরু ওঁ শ্রীগুরু

একটু পরে চোখ চেয়ে বললেন—সিদ্ধবাবার আশ্রম এটি। অনেক দিন ছিলেন এখানে—তা প্রায় বছর পঁচিশ হবে। তাঁর সাধনার স্থান এটি। প্রথমে ছিলেন তান্ত্রিক সাধক, যোগ অভ্যাস করতেন। সিদ্ধি লাভও করেছিলেন, কিন্তু তৃপ্ত হতে পারেন নাই। সিদ্ধাই টিদ্ধাই মেকী, ওসবও মায়ার বাঁধন বলে মনে হয়েছিল তাঁর। বীরাচার, তন্ত্রাচার—সব ছেড়ে ধরলেন জ্ঞান মার্গ—বেদান্ত উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান, আত্ম-দর্শন। আরম্ভ হল নতুন পথের সাধনা—আত্মানুসন্ধান, ব্রহ্মদর্শনের পথযাত্রা। সে কঠোর সাধনায় অবিচল থেকে সমাধির তুরীয়ানন্দ ভোগ করে ঋষিকল্প আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী হয়েছিলেন তিনি। আশ-পাশ কাছে পিঠে তো বটেই, বহু দূর-দূরান্তেও নাম ছড়িয়েছিল—'সিদ্ধবাবা'। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এ অধমের সৌভাগ্য হয়েছিল মহাপুরুষ দর্শনের। কিন্তু অল্পকাল মাত্র। বছর খানেকের মধ্যেই সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় আত্মসমাহিত হয়ে মহানির্বাণ লাভ করলেন। ঐ বেলতলায় শিবলিঙ্গের পাশেই রয়েছে তাঁর সমাধি।

যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, জ্ঞান-গর্ভ কথাবার্তা আর মধুর আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। এ অধম অধিকার পেয়েছিল তাঁর শেষ সেবার। তাঁর তিরোধানের পর থেকেই আছি এখানে। তবে তাঁর মত উচ্চতম জ্ঞানমার্গে অধিকার হয় নাই। 'দুই' 'দুই' যায় নাই এখনও। তাই বিশ্বাত্মাকে 'মা' বলে ডাকি তাঁরই শেখানো মন্ত্রে—

সর্ব রূপময়ী দেবী
সর্বং দেবীময়ম্ জগৎ
অতোহয়ম্ বিশ্বরূপাং
ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীম্।।

'দুই' যখন কাবেই না থাক তখন 'মা' আর 'ছেলে' হয়ে। দেখি ও বেটি দুই ঘুচিয়ে 'এক' করে নেয় কতদিনে।

সুমধুর সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গী—অকপট আন্তরিকতার পূর্ণ প্রকাশ। শরীর রোমাঞ্চিত হল, চোখ দুটিও শুকনো রইল না, মনের ভেতরের মন যেন হেসে বললে—আর দেরী নয় ঠাকুর, শীগগিরই মাতৃহীন হবে তুমি।

সাজি হাতে সন্ন্যাসী উঠলেন ফুল তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। অঞ্জলি ভরে ফুল তুলে নিয়ে দিলুম সিদ্ধবাবার সমাধিতে।

নিঃসংশয়ে বুঝলুম—এই সেই মাহী-নগর আশ্রম, সমাহিত এই সেই সিদ্ধ সাধু—যাঁর বুক লক্ষ্য করে পিস্তল উঁচিয়ে-ছিলেন চাম্নার দুরন্ত ছেলে—যতীন্দ্রনাথ।

সন্ন্যাসী ফুল তুলতে থাকলেন গাছ থেকে গাছে। আশ্রমের বাইরেটা দেখে নিলুম এই ফাঁকে। মনোরম দৃশ্য। ঝিরিঝিরি নূপুর বাজিয়ে নৃত্য ভঙ্গীতে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে খড়ি। এপাড়ে ওপাড়ে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো মখমলি সবুজ মাঠ। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে রক্তরাঙ্গা ফুলে ভরা শিমুল পলাশ। কোথাও কোথাও হলুদ মাখা বাবলা সোঁদাল। দূরে মাটি ছোঁওয়া নীল আকাশে মাথা ঠেকিয়ে ঘনশ্যাম তরু-শ্রেণীর ছায়াতলে ছোট ছোট পল্লী কুটির-গুলি নতুন সূর্যের নতুন আলোয় ঝকঝক করছে। অপরূপ সুন্দর — নয়ন সার্থক, সৌন্দর্যের আবেশে মন-প্রাণ মুগ্ধ। দু চোখ ভরে দেখছি তন্ময় হয়ে, ফুল বেল-পাতাভরা সাজি হাতে সন্ন্যাসী এসে হেসে বললেন—এখনই বাড়ী যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ, তা যাবার সময় হল বৈ কি।

—তবে এস আশ্রমে। সন্ন্যাসী হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন কম্বলে। তারপর ফুলের সাজি মন্দিরের দাওয়ায় রেখে এসে কুটিরের ভেতর থেকে পাথরের থালায় চিঁড়ে মুড়কী দই কলা গুড় এনে সামনে দিয়ে বললেন—খেয়ে নাও। দেখছ তো মায়ের রূপ—এক হাতে ওর খড়গ ঝোলে, এক হাত করে শঙ্কাহরণ। এক রূপে করালী কালী, আর এক রূপে অন্নপূর্ণা। তা মায়ের কাছে এসে কি এমনি যেতে আছে? খেয়ে নাও।

—সে কি? পূজো হয় নি এখনও, খাই কি করে?

—এই তো বোকা ছেলে। ছেলেকে না খাইয়ে মা কি আগে খান? কিছু দোষ নাই এতে, খেয়ে নাও—কাছে বসে হেসে বললেন সন্ন্যাসী।

—কিন্তু আপনি তো খান না পূজোর আগে?

—না, তা খাই না। সেটা কি জান? অন্য সময় ছেলে হলেও পূজোর সময় বাবা হয়ে খেতে বলি মেয়েকে। খায় কি না ওই জানে। ওর আবার খাওয়া শোওয়া? ও তো নিজেই খিদে, নিজেই খাবার। জান তো—যা দেবী সর্বভূতেষু

ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।

—তা খিদের আবার খিদে কি? নিজেরা যা খাই, যা ভালবাসি তাই নিবেদন করি মায়ের নামে—বিশ্বাত্মার উদ্দেশে—'তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট' বলে। পূজোর আগে খাওয়ার কোন দোষ নাই, খাও তো তুমি। যা দোষ হয় আমার হবে।

শিশুকাল থেকে শুনে এসেছি পূজোর আগে খেতে নাই, আর এ সন্ন্যাসী বলেন কি? যুক্তিটাও যে অকাট্য, তাই কথা না বাড়িয়ে মন দেওয়া গেল কাজে।

খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে মন্দিরে, সিদ্ধ-বাবার সমাধিতে আর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে ছুটলুম আশ্রমের পথে।

সন্ন্যাসী হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন—আস্তে যাও, উঁচু নিচু রাস্তা, পড়ে যাবে—আর আস্তে যাও—ঠিক সময়ে পোঁছতে হবে তো।

দেরী একটু হয়েই গেছে। ভয়ে ভয়ে ঢুকছি নদীর ধারে ধারে চাম্না আশ্রমের পেছন দিয়ে। আশ্রমের বাইরে ছইওয়ালা গরুর গাড়ী নামানো, ছোকরা গাড়োয়ান বলদ দুটিকে ঘাস খাওয়াচ্ছে মাঠে। দক্ষিণের বারান্দায় স্বামিজীর কাছে বসে আছেন ভিন্ন আকৃতির দুজন ভদ্রলোক। একজন—পেশীবহুল বলিষ্ঠ সুন্দর দীর্ঘ-দেহী, ছোট ছোট আরক্ত চোখে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টি, বয়স যৌবনের প্রান্তসীমায়। অন্যজন সম্পূর্ণ বিপরীত—শিরাবহুল শীর্ণদেহ সূক্ষ্মাগ্র নাসা, কোটরাগত চোখে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, প্রৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে বার্ধক্যের কোঠায়। সাটীনন্দী গ্রামের বিশিষ্ট বিত্তবান চাষী রায়পরিবারের সন্তান দু ভাই এঁরা—দুর্গাদাস ও সত্যদাস রায়। একটু দূরে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ষণ্ডামার্কা প্যালোয়ান নামকরা লাঠিয়াল শশধর।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম—আস্তে আস্তে গিয়ে বসলুম পশ্চিমের বারান্দায় স্বামিজীর দৃষ্টির আড়ালে।

স্বামিজী দৃপ্তকণ্ঠে বলছেন—অনেকদিন থেকেই তো আসছ এখানে। উদ্দেশ্যটা কি? আত্ম-সংস্কৃতি—মানসিক উন্নতি—তাই না? তা হচ্ছে কই? যা শোন তা যদি নিজস্ব করে নিয়ে ব্যবহারিক জগতে কাজে ফলাতে না পার তা হলে আশ্রমে এসে লাভ? কত-বারই শুনেছ তো—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'। পড়ে পড়ে তো মুখস্তই হয়ে গেছে। তা ঐ পর্যন্তই—ধাতস্থ হয় নি। শুকবৃত্তি আর কি—দাঁড়ে বসে রাধাকৃষ্ণ বুলি বলছে, বিড়াল ধরলেই —ক্যাঁ ক্যাঁ। তোমাদেরও তাই।

জমির দখল নিয়ে কথা—সামান্য স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত। খুনোখুনি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। গ্রামের গণ্যমাণ্য পাঁচজন ভদ্র-লোকের কাছে দুপক্ষের দলিলপত্র দেখিয়ে আপোশেই কাজ মিটিয়ে নিতে পারতে। একপক্ষে একটু স্বার্থত্যাগ করলেও মিটে যেত। হয় তোমরা কিছু জমির অংশ ছাড়তে, নয় পাঁজারা ছাড়তো কিছু। কারুরই বিশেষ কিছু লোকসান হত না। তা না করে—লাঠালাঠি, খুনোখুনি। আর খুন হল কে? —একটা নিরপরাধ। সে হয়তো একটা বড় সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল কর্তা। ভাব তো—তার সংসারের অবস্থাটা। কত-গুলি প্রাণীর অন্নবস্ত্রের হন্তারক হলে তোমরা।

এই যে শশধর—টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে নামালে লাঠিবাজিতে। লাভটা কি হল? গরীব মানুষ, শক্তি আছে, পেটের দায়েই রাজি হল অমন গর্হিত কাজে। মালিকানার স্বার্থ ছিল না ওর। কুপ্ররোচনা দিয়ে লোভ দেখালে। লাভটা কি হল ওর? মাথা ফাটল। যে টাকাটা পেল চিকিৎসার খরচই কুললো না, তা খাবে কি? জাতও গেল, পেটও ভরল না।

যে কেউ একপক্ষ জবরদস্ত দখল না করে আদালতের আশ্রয় নিতে পারত। তাও হত মন্দের ভাল। দলিলপত্রের প্রমাণের বলে ন্যায়-বিচারের আশা থাকত। তা নয়—একে-বারে খুনখারাবি। এ কখনও সমর্থন করা যায় না। এ অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিফল পেতেই হবে—শারীরিক, মানসিক, আর্থিক —সব দিক দিয়েই। কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতেই হবে।

রায় ভাইদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। অনেক কাকুতি মিনতি করতে থাকলেন উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধারের সদুপায় বাতলাবার জন্যে।

স্বামিজী অনড়—এর আর উপায় কি? বিপক্ষ মামলা দায়ের করেছে, যাও এখন কোর্ট কাছারি কর—যতদিন মামলা চলে। যেমন কর্ম তেমনি ফল ভোগ কর। নিজেরা খেতে পাও, না পাও উকীল মোক্তারের গাঁট পয়সাকড়ি ঢাল। হেঁটমুখ ছলছল চোখে বসে রইলেন দু ভাই।

এইবার শশধরের পালা।

স্বামিজী বললেন—শশধর তোমার শক্তি আছে—যাকে বলে অমিত শক্তি। কিন্তু শক্তির সার্থকতা কিসে জান? শক্তির সার্থকতা— বিপন্নের উদ্ধারে, দেশরক্ষায়, সৎ উপায়ে নিজের খাওয়া পরা চালানো—সংসার চালানোর জন্যে যথাশক্তি চেষ্টায় আর সকলকার উপকারে। কিন্তু, এ তুমি করেছ কি? মালিকদের স্বার্থ নিয়ে অন্যায় ঝগড়া, এতে তুমি মাথা গলাতে গেলে কেন? ফলটা কি হল? কজনের মাথা ফাটালে, নিজেরও

মাথা ফাটল। এ শক্তির অপচয়, অপব্যবহার, শক্তির অপমান। বুঝে শুঝে শক্তির ব্যবহার না করলে দুর্ভোগ ভুগতেই হয়। লাঠি ছাড়।

স্বামিজী শশধরের ব্যাণ্ডেজ খুলতে বললেন আমায়। মাথার বাঁ দিকে পাঁচ আঙুল লম্বা গভীর ক্ষত। গা শিউরে উঠল। গরম জলে তুলো ডুবিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে নতুন ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হল।

বেলা এগারোটা। স্বামিজীকে প্রণাম করে বিষণ্নমুখে উঠে গিয়ে রায়মশায়রা বসলেন গাড়ীতে। শশধর হাঁটাপথে চলে গেল মাহীনগর। ওখানেই থাকে সে।

আট

দুপুরে খাওয়ার পর আলমারি থেকে ঈশানচন্দ্র ঘোষের 'জাতক' বইখানি নিয়ে গেলুম পান্থশালায়। বেশ কাটল দুপুরটা। সাড়ে চারটে বাজতেই বিশালাক্ষী মন্দিরে।

শনিবার। স্মৃতিরত্ন মশায় আগে থেকেই এসে আসন করে চোখ বুজে বসে আছেন কমলাকান্তের আসনের সামনে। নিঃশব্দে গিয়ে বসলুম কাছে। কোন খেয়ালই নেই, নিশ্বাস পড়ছে না, বোঝা যায় না,—নিথর নিষ্পন্দ পাথরের মূর্তির মত ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে স্মৃতিদাদুকে।

প্রায় আধঘন্টা পরে চোখ খুলে দেখতে পেয়ে বললেন—এই যে মূর্তিমান, কতক্ষণ আসা হয়েছে?

—তা প্রায় আধঘন্টা। ঘোড়া ঘুমোয় দাঁড়িয়ে, পাখি ঘুমোয় বসে, মানুষ ঘুমোয় শুয়ে। তা মানুষ যে আবার বসে ঘুমোয় কেমন করে তাই দেখে শেখবার চেষ্টা করছিলুম আর কি।

—তাই নাকি? শিখলে? একগাল হেসে বললেন স্মৃতিরত্ন মশায়।—না হে বন্ধু, না, তার এখনও ঢের দেরী। এ কি ঘুম? এ হচ্ছে নিদ্রা। মহানিদ্রার আগমনী নূপুর বেজে উঠেছে কি না—তারই অভ্যর্থনার একটু প্রস্তুতি আর কি।

—সে নূপুর ধ্বনি আবার শোনা যায় না কি দাদু?

—যায় না? নিশ্চয়ই যায়, কান থাকলেই শোনা যায়, শুধু কি শোনা, চোখে দেখাও যায় তার পায়ের ছাপ। এই দেখ না তার নাচের ছন্দে ছন্দে কালচুল শাদা হল, শাদা দাঁত নড়ে নড়ে পড়ে গেল, গায়ের চামড়া টোল খেয়ে লোল হল। এ যে তারই আগমনীর পদচিহ্ন ভায়া—হেসে হেসে কথা বললেন স্মৃতিরত্ন মশায়।

বুড়োকে কথায় পেরে ওঠবার যো কি? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—আচ্ছা দাদু, সে নূপুরের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করবেন পরে। কন্ট্রাক্টটা শোধ করুন তো আগে।

মনে করিয়ে দেয় মহাতপস্বিনী অপর্ণার কথা

আজ আর দুষ্টুমির কথা নয়, আপনাদের স্বামিজী কতদূর পড়াশুনো করলেন তাই বলুন।

—আমাদের স্বামিজী? স্বামিজী আমাদের নয় — তোমাদের। আমাদের যতীন।

যতীন বর্ধমান রাজস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসে খুব হৈ-হুল্লোড়ে আনন্দে কাটালে কদিন। পরীক্ষার ফল বের হতে অনেক দেরী। যতীন যাবে যশোহরে বাবার সঙ্গে দেখা করতে। যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেটের পেস্কার কালিদা থাকতেন সেখানে।

যতীন যাচ্ছে যশোহরে। পথে সে এক কান্ড। আর ঐ কান্ডটাই জ্বালিয়ে দিল তার ভবিষ্যৎ কর্মপথের আলোর বাতি।

উৎসুক হয়ে বললুম—কান্ডটা কি বলুন না দাদু।

—কান্ডটা সামান্যই। কিন্তু শান্ত শীতল মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি হলে আগুন জ্বলে জানতো? তাই আর কি। হাওড়ায় নেমে যতীন গেছে শেয়ালদা ষ্টেশনে যশোহরের ট্রেন ধরতে। ভীষণ ভীড়। প্ল্যাটফরম লোকে গিস্ গিস্ করছে। গাড়ীতে তিল ধরবার ঠাঁই নাই। থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে যতীন কামরার পর কামরা দেখে বেড়াচ্ছে—তা কোথাও যদি একটুকু বসবার জায়গা মেলে! দেখতে দেখতে যতীন দেখল বাইরে 'থার্ড ক্লাস' লেখা একখানা কামরা—ভেতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গদীআঁটা বেঞ্চ—একদম খালি। আর কথা কি—যতীন আরাম করে বসল গিয়ে সেই কামরায়।

গাড়ী ছাড়বার মিনিট দুয়েক আগে ধোপদুরুস্ত কোট-প্যান্ট হ্যাট-বুট পরা এক ফিরিঙ্গি সাহেব সেই কামরায় উঠে দেখে কি না—আসর জাঁকিয়ে বসে আছে এক কালাআদমি—নেটিভ। দেখেই তো সাহেবের মাথা গরম। চোখ লাল করে কর্কশ কণ্ঠে ইংরেজীতে বলতে লাগল—এটা ইউরোপীয়ানদের গাড়ী, নেটিভদের জন্যে নয়। এক্ষুণি নেমে যাও এখান থেকে, নইলে আই উইল কিক্ ইউ আউট (তোমাকে লাথি মেরে বের করে দেব)।

আর যায় কোথায়—তপ্ত খোলায় জলের ছিটে। সুপ্ত সিংহ গর্জে উঠল। তখনকার দিনে 'লাল মুখের সর্বত্র জয়, লালমুখকে সকলের ভয়' হলেও যতীন সে দরের মানুষ নয় মোটেই। 'কিক্ আউট' শুনেই তার শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল, ভ্রুকুটি কুটিল মুখ হয়ে উঠল রক্তরাঙা, দু' চোখে ছুটল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। জ্যা মুক্ত তীরের মত লাফিয়ে উঠে আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে যতীন তাগ করল সাহেবের মুখে।—কী এত বড় আস্পর্ধা, কোথাকার কে—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের যবন বেনে উড়ে এসে জুড়ে বসে আমাদের খেয়ে আমাদের নিয়ে আমাদেরই বুকে বসে দাড়ি ছিঁড়বে? এ অত্যাচারের চরম।

সে মহারুদ্র মূর্তি দেখে সাহেব তো থরহরি কম্পমান। নেটিভ বিশেষ করে ভেতো বাঙালীর এ মূর্তি তার কল্পনার অতীত। যায় বুঝি টিকলো নাকটা ভোঁতা হয়ে। সাহেব দু পা পিছিয়ে গিয়ে কেঁউ-কেঁউ করে ডাকতে লাগল—পুলিশ পুলিশ।

আর পুলিশ—গাড়ী তখন হুইসল দিয়ে হুস্ হুস্ ধোঁয়া ছেড়ে ছুটে চলেছে। ব্যাপারটা আর গড়ায় নি বেশি দূর। উচ্চ-বাচ্য না করে লেজ গুটিয়ে সাহেব বাছাধন ধসে পড়ল এককোণে।

যতীন সেই গাড়ীতেই বরাবর গেল যশোহরে।

কথা শেষ করে ভ্রূর ওপর হাতের পাতা মেলে আকাশ পানে চেয়ে দেখতে লাগলেন স্মৃতিরত্নমশায়। পশ্চিম আকাশে কালবোশেখির একখানা কালোমেঘ সূর্যের মুখ ঢেকে ফেলেছে। তাই বোধ হয় সময়ের আন্দাজ করছিলেন।

বললুম—জয়দ্রথ বধের দিনটা মনে করুন, দাদু, এখনও ঢের বেলা। অমন ছেলে বাইরে থাকলে পাড়া অন্ধকার হয়ে থাকবে যে। ফিরিয়ে আনুন তাকে।

—যা বলেছ, ভাই। অন্ধকার কালো অন্ধকার। প্রাণ প্রাচুর্যেভরা যতীন গাঁয়ের প্রাণকেন্দ্র। ও না থাকলে ওর সঙ্গীসাথী সম-

বয়স্কীরা তো বটেই, গাঁয়ের ছোট বড় ছেলে-পিলে, জোয়ানমদ্দরাও কেমন যেন মিইয়ে যেত। খেলাধুলোয়, লোকের দায় বিপদে, বিয়ে পৈতে আনন্দ উৎসবে দলবল নিয়ে মহাস্ফূর্তিতে নানান দায়দায়িত্বের কাজ সেরে গোটা গাঁখানাকে তাতিয়ে মাতিয়ে সরগরম করে রাখত যতীন। ও না হলে হৈ-হুল্লোড় আনন্দ উল্লাস যেন জমত না কারুর।

যতীন গেছে যশোহরে। কতদিন পরে পিতাপুত্রে মিলন। আনন্দের রুদ্ধ আবেগ কালিদার মনে-প্রাণে। বাইরে প্রকাশ হতে দিলেন না কিছু। নাওয়া খাওয়া বিশ্রামের পর বাপ জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে—পরীক্ষা দিলে কেমন?

—মন্দ হয় নি। উত্তীর্ণ হবার আশা করতে পারি নিশ্চয়ই।

—উত্তীর্ণ? কোন বিভাগে? জলপানির আশা করা যায়? —জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের মুখপানে চেয়ে রইলেন বাবা।

—ঠিক বলা যায় না। তবে লেখার অনুপাতে প্রথম বিভাগে নিশ্চয়ই থাকা উচিত—মুখ নীচু করে বললে যতীন—জলপানি পাবে না সে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। পাঠবিমুখ ছেলে পড়ায় মন দিয়েছে—এতে মা-বাপের চেয়ে বেশি আনন্দিত, বেশি সুখী আর কে? কিন্তু বাপের আশা যে আরও একধাপ উঁচু। পড়াশুনোয় মন যখন বসেছে—তীক্ষ্ণধী ছেলে, প্রথম, দ্বিতীয়—যাই হোক হবে—এইটাই ছিল বাপের অন্তরের আশা। কিন্তু বেপরোয়া যতীন বারবার আশাভঙ্গ করেছে তাঁর। ক্লাস থেকে ক্লাসে বরাবরই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে সে, কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় হয় নি কোনবারই।

বেশ কিছুদিন যশোহরে রইল যতীন। কারিৎকর্মা বুদ্ধিমান ছেলে। দেখেশুনে ক'দিনের মধ্যেই বাপের কাজ রপ্ত করে নিয়ে বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই সাহায্য করতে লাগল তাঁকে। বাপ তো অবাক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও খুব খুশি। হলে হবে কি—জেলা-শাসকের শাসনপদ্ধতিটাও বেশ ভালভাবেই জেনে নিল যতীন। বিদেশীর স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র মানে অপ্রতিহত গতি শোষণযন্ত্রটা গভীর রেখাপাত করল স্বাধীনচেতা যতীনের তরুণ মনে। সে কি আর রেখাপাত—বিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত। তীব্র দাহ—তীব্র জ্বালা—তপ্ত লাভা স্রোতে যায় বুঝি সব পুড়ে ছাই হয়ে। ট্রেন সাহেবের অভদ্র ব্যবহার জ্বলজ্বল করছে তার মনে, তাতে ইন্ধন যোগাল বিদেশীদের শাসনপদ্ধতির নামে শোষণ-নীতি। চঞ্চল যতীন হয়ে উঠল আরও চঞ্চল, আরও উদ্দাম, আরও দুর্দম।

—কী আমরা—মানুষ না মেষ? ঐ স্বেচ্ছাচারী বিদেশী আঙুল নাড়লেই সাত কোটী বাঙালী আমরা উঠব বসব? আমরা কি মেষের দল—গড্ডলিকা প্রবাহ? কেন ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করব আমরা? কেন নিজের দেশে বিদেশীর অধীন হয়ে পরাধীন হয়ে থাকব আমরা? কোন প্রতিকার কি নেই এর?—অন্তরে চিন্তার জ্বালামুখী।

যতীন ভাবে আর ভাবে—অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। বুকে তীব্র দহন। বাপ সরকারী চাকুরে, বলতেও পারে না বিশেষ কিছু। কিন্তু বুকের জ্বালা কদিন আর চেপে রাখতে পারে? একদিন মুখ ফুটে বলল বাপকে,—বাবা, এ বৈষম্য কেন? ট্রেনে থার্ড ক্লাস টিকিটের ভাড়া দেশীলোক যা দেয়, বিদেশীরাও দেয় তাই-ই। তবু তাদের সুখ আরামের বিশেষ ব্যবস্থা কেন?

ট্রেনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা যতীন আনুপূর্বিক বলল বাবাকে।

গুরু গুরু কেঁপে উঠল বাপের বুক। কী সর্বনাশ, ঘুঁষি বাগিয়ে সাহেবকে মারতে ওঠা? এ যে কল্পনার অতীত—অশ্রুতপূর্ব — অদৃষ্টপূর্ব — অচিন্ত্যপূর্ব। দুঃসাহসিক ব্যাপার। ছেলেকে তো ভাল-ভাবেই জানতেন তিনি। তাই আর বেশি না ঘাঁটিয়ে নিচুগলায় বললেন—এখন দেশের রাজা বিদেশী রাজার জাত ও'রা, কাজেই একটু সুখ-আরামের সুবিধাটা পান আর কি।

দেশের রাজা? গর্জে উঠল যতীন। সামনা সামনি ন্যায়যুদ্ধে জয় করে পররাজ্য দখল করা রাজনীতিসম্মত। তাই কি করেছে ওই বিদেশী বেনে জাতটা? গুপ্ত ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার মুখে অন্যায়ভাবে বাংলার গুণবান তরুণ নবাব সিরাজের পতন ঘটিয়ে জবরদস্তি দখল করেছে বৈ তো নয়। ঐ শঠ তস্কর বেনে দস্যুদের রাজা বলে মেনে নেবে কেন দেশের লোক? দেশের লোক কি এতই শক্তিহীন, পঙ্গু—এমনিই অপদার্থ? কোন বীরপুরুষ কি জন্মান নি এখানে? কোন ইতিহাস কি নেই এদেশের? দেশমাতার কোটী কোটী সন্তান কি শুধু পরপদানত হয়ে থাকতেই জন্মেছে? এইটাই কি তাদের জন্মগত অধিকার?

—চুপ, চুপ। ইচ্ছে হল চেপে ধরেন ছেলের মুখ। তাড়াতাড়ি কলম ফেলে ছেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন কালিদা—চুপ কর যতীন, এরা শুনলে চাকরীটা যাবে যে। এখনও উপায় করতে শেখ নি, খাবে কি? সংসার চলবে কিসে? ভাগ্যি ভাল সাহেব বাংলা বোঝেন না, নইলে এতক্ষণ কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। তবে সাহেবের কানে উঠতেই বা কতক্ষণ? কোন বাঙালী সহকর্মীর কানে গেলেই সাহেবের কানে উঠবে।

ছেলে চুপ করল বটে কিন্তু আগুন নিভল না। শাসনতন্ত্রের চোতা খাতাপত্র আর ভাল লাগে না। অনেক সময় অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় বাপের বন্ধু-বান্ধব পরিচিতদের কাছে বই-এর সন্ধানে। ইতিহাস—দেশের ইতিহাস, দশের ইতিহাস, দেশবাসী কর্ম-বীর, বীরপুরুষদের জীবন-ইতিহাস।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী—যে যা চায়, সে তা পায়—অবশ্য চাওয়াটা যদি হয় আন্তরিক। বই মিলল—যশোহরের কথা, যশোরেশ্বরীর ইতিহাস, বারো ভূঁইয়ার কথা, মহাবীর প্রতাপাদিত্য, কর্মবীর রাজা সীতারাম রায়ের জীবনী, মহা-রাষ্ট্রবীর শিবাজী ও ক্ষত্রবীর রাণাপ্রতাপের কাহিনী। আর মিলল সরকারী রেকর্ড বই থেকে সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—তাঁতিয়া টোপীর অদ্ভুত রণ-কৌশলের কথা। যেমন খিদে, তেমনি খোরাক—মনের খোরাক মিলল যতীনের।

পড়ার কথা উঠল যখন—বর্ধমানের মহাতাবচাঁদ ছিলেন যেমন বিদ্বান তেমনি বিদ্যোৎসাহী। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের বিরাট সংগ্রহ ছিল তাঁর গ্রন্থাগারে। কত গুণী-জ্ঞানী বিদ্বান বৃত্তি-ভোগী সভাপণ্ডিত ছিলেন তাঁর সভায়। মহারাজের নির্দেশে মূল সংস্কৃত মহাভারত ও আরও অনেক সংস্কৃতগ্রন্থের বাংলা অনু-বাদ করেছিলেন তাঁরা। রাজস্কুলে ফোর্থ-ক্লাসে সংস্কৃত আরম্ভ করে ভাষাটা একটু আয়ত্ত হতেই যতীন পড়ে ফেলেছিল চণ্ডী, গীতা, উপনিষদ মায় বেদান্ত পর্যন্ত। ও বলত—কিছু বুঝে কিছু না বুঝেই পড়ে ফেলেছি সব। দেখতে হবে তো সিদ্ধসাধুর কথাটা যাচাই করে।

গ্রীষ্মের ছুটী ও পুজার ছুটীতে বাড়ী এসে টোলের বেদান্ততীর্থ পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় কিন্তু 'না বোঝার' বদলে টীকা-টিপ্পনী সমেত অতি স্পষ্ট বোঝার লক্ষণই প্রকাশ পেত ওর কথায়। যতীন বলত—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতের মধ্যে জগৎ বলে যা কিছু সবই যখন ঈশ্বরে আর ঈশ্বরই যখন সব, তখন কেষ্ট বিষ্টু কালী দুর্গা মূর্তি করে ষোড়শোপচারে পুজো করার মানে কি? শুধু পড়াই নয়, তার ভালোলাগা শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থও করে ফেলেছিল যতীন। সেগুলির ভাব নিজের আচার আচরণে কাজে ফলাতেও চেষ্টা করত। ওর সব চেয়ে প্রিয় ছিল—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আত্মাবারে শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিধিধ্যাসিতব্যঃ যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্যাম আর অথ্যৈ-বেদং সর্বং—এই সব।

'আমার মতই সব' এই ধারণাতেই আর্ত আতুর দীন দুঃখীর দুঃখ-কষ্টকে নিজেরই দুঃখকষ্ট মনে করেই ছুটে যেত অভয় হস্ত বাড়িয়ে।

চোখেমুখে হাসির ঝিলিক, স্মৃতিরত্ন মশায় বললেন— দেখ তো দাদু জয়দ্রথ বধ পর্বটা হয়ে গেল নাকি।

হেসে বললুম—কি জানি কে বধ হল, মাথাটা তো দেখতে পাচ্ছি না।

—তবেই হয়েছে ভায়া, সেটা গেছে বাণের বাণে উড়ে। চল, ওঠা যাক।

চিন্ময়ী মায়ের সমাধির সামনে

বিশালাক্ষীতলা থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় আসতেই একটা ধুলো-ওড়ানো দমকা ঝড়ের মুখে দুজনে ছিটকে পড়লুম দুদিকে। দাদু চামার আর আমি আশ্রমের পথে।

ঝড় থেমেছে। গা মাথা ধুলোয় ভর্তি। খিড়কিতে নেয়ে পরিষ্কার হয়ে রায়মশায়দের আনা আম সন্দেশ খেয়ে বসলুম আঙিনায় যথানির্দিষ্ট আসনে খাটিয়ার পাশে।

—এবেলা কোন দিকে?

—সাধক কমলাকান্তের আসনের কাছে শিমুলতলায় বসে শুনছিলুম স্মৃতিরত্ন মশায়ের গল্প—বলেই শেষ করলুম ভ্রমণ-কাহিনী।

পূর্ণিমার সন্ধ্যা। পাশের নদী, কাছের দূরের গাছপালা, মাঠময়দান, সাঁওতাল পাড়ার জ্যোৎস্না-স্নাত শুচি-শুভ্র অপরূপ রূপ। বিভোর হয়ে দেখছি, চমক ভাঙলো স্বামিজীর কথায়। গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে স্বামিজী বললেন —বেশ কিছুদিন হল এসেছ এখানে। দু-বেলা নিয়মিত বেড়াচ্ছ। ঊষা আর রেণুর সঙ্গে গেরস্থালীর কাজও বেশ কর দেখতে পাই। মানে স্ফূর্তিরও অভাব নাই—বেশ আনন্দেই আছ। অথচ শরীর যতখানি ভাল হওয়ার কথা এই পরিবেশের মধ্যে, তা হচ্ছে না কেন? খাওয়া-দাওয়া কি রকম হচ্ছে? পেট ভরে খাচ্ছ তো?

—নিশ্চয়ই। কম খাব কেন? আধপেটা খেয়ে কি থাকা যায় স্বামিজী?

গড়গড়া নিতে এসে রেণুদা ডান হাতের আঙুলগুলি আধাফোটা পদ্মের মত মেলে হেসে বললে—খোকা এই কটি করে খায়, বাবাজী।

গম্ভীরভাবে 'হুঁ' বলে স্বামিজী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—আচ্ছা, 'খাওয়া'র সাধুভাষা কি?

—আহার করা, ভক্ষণ করা।

—ভাল। এই আহার একটি বিশেষ দরকারী জিনিস। দেহ-মন প্রাণ সবেরই। কত দরকারী? সংস্কৃত তোমার ভাল লাগে, বুঝতেও পার। শোন—

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ: সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, ধ্রুবাস্মৃতৌ বিপ্রমোক্ষঃ।

আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধিতে ধ্রুবাস্মৃতি হয় আর ধ্রুবাস্মৃতি হলে বিপ্রমোক্ষ হয়। বিপ্রমোক্ষ কি?—বিশেষ রূপেন প্রকৃষ্ট রূপেন মোক্ষ—একেবারে মুক্তি, পূর্ণমুক্তি। কাদের একেবারে মুক্তি হয়? সমস্ত গ্রন্থির বা বন্ধনের। কেমন করে? স্মৃতির দ্বারা। কি রকম স্মৃতি? ধ্রুবা অর্থাৎ স্থির বা সত্যস্মৃতির দ্বারা। সে স্মৃতিটা আসে কেমন করে? সত্ত্বশুদ্ধি হলে পর। সত্ত্বশুদ্ধি আবার কাকে বলে? সত্ত্ব মানে অস্তিত্ব—যা আছে তাই—তাদেরই শুদ্ধি। অর্থাৎ দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সমস্ত—যাদেরকে আমি আছে ভাবছি। সে-গুলোর আবার শুদ্ধি কি? তারা তো সব অপবিত্র নোংরা জিনিস দিয়ে তৈরী। তাদের সম্পূর্ণ সুস্থতাই হচ্ছে তাদের শুদ্ধি। প্রথমে ধর দেহ আর ইন্দ্রিয়গুলোকে—এরা স্থূল জিনিস। এরা সুস্থ না থাকলে সূক্ষ্ম জিনিস মনটাও সুস্থ থাকবে না, মনঃশুদ্ধি হবে না— কাজেই কোন কাজই হবে না। সুস্থতা কাকে বলে? যে অবস্থাটায় তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞানই থাকে না সেই অবস্থাটাই সুস্থতা। যেমন—চোখে একটু বালি পড়লে বা চোখের কোন অসুখ করলে বুঝতে পার চোখটা আছে; কিন্তু যখন চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ অর্থাৎ ভাল থাকে তখন সেটা আছে কি নেই তার কোন খেয়ালই থাকে না। তাহলে—যেটা তোমাকে

সমস্ত অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেয় সেটাই ঠিক সুক্ষ্ম বা সং। সমস্ত বিষয়েই 'সু' দিকটা এই। আর যেটা অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়, সেটাই হচ্ছে 'কু'। এই অবসরে একটা কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে—সং কাকে বলবে—না, যে চিন্তাটা তোমাকে জগতের সমস্ত এমন কি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ শেষে মনেরও পর্যন্ত অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেয়—সেই-টাই হচ্ছে 'সংচিন্তা', আর তার বিপরীতটাই হল 'অসং'। আচ্ছা, তাহলে সত্ত্বশুদ্ধি হল—দেহেন্দ্রিয়গুলোকে এমনভাবে রাখা যাতে তাদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন চিন্তাই করতে না হয়। সেটা হয় কিসে? আহারশুদ্ধি হলে।

এখন যত মজা 'আহার' শব্দটি নিয়ে। আহার বললেই বোঝ খাওয়া। কিন্তু তাইতো শুধুই নয়। 'আহার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বলতে পার?

বললুম—হ্যাঁ, আ—হৃ+ঘঞ্।

—আচ্ছা, আ—হৃ ধাতুর মানে কি?

—আহরণ করা, যোগাড় করা, সংগ্রহ করা।

—ঠিক, ঠিক। তাহলেই দেখ 'আহার' মানে শুধু খাওয়া নয়, জুটিয়ে পাটিয়ে আনা, সংগ্রহ করা। এখন আহার কর কি দিয়ে? শুধু মুখ দিয়ে? না তা নয়, আহার কর ঊনিশটা ইন্দ্রিয় দিয়ে — পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর অহঙ্কার।

প্রথমে স্থূল দেহটার আহারশুদ্ধি করতে হয়। কি করে করবে? দেহটা তো ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিন ভাল রাখতে হলে কি করতে হয়—(১) জল কয়লা ভাল দিতে হয়। (২) ঠিক পরিমাণ মত দিতে হয়, যেন কম না হয় আবার বেশীও না হয়—ঠিক সমান সমান। (৩) সমস্ত কল-কব্জায় তেল দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে মরচে না পড়ে। (৪) আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হয়, দিন-রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে চালাতে নাই—এই তো? শরীর সম্বন্ধেও তাই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যা চায়, সেটা ভাল দিতে হয়, ঠিক পরিমাণ মত দিতে হয়, ইন্দ্রিয়টাকে পরিষ্কার রাখতে হয়, আর বিশ্রাম দিতে হয়। এই কটি সব দিকে খাটালেই হয়ে গেল। এমনি করে শরীরটা ভাল থাকলেই প্রাণাদি বায়ুর কাজও ভাল হবে। যদি একটার কাজ ভাল না হয় বুঝতে হবে আগেরটায় কিছু গোল বেধেছে। দেহ ও প্রাণশক্তি ভাল থাকলেই মনও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তখন সং চিন্তায় যথেষ্ট অবসর পাবে।

এবার সূক্ষ্ম শরীরের দিকটা। আচ্ছা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার—এদের মধ্যে সব-চেয়ে বলবান কোনটা?—মন সঙ্কল্প আনে, বুদ্ধি স্থির নিশ্চয় করে, অহঙ্কার 'আমি' 'আমি' করে অহঙ্কার করে, একটা কিছু করছ বা ভাবছ এমন সময়ে বোঝার ওপর বোঝার মত আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেয় চিত্তটা। এইটিই যত নষ্টের গোড়া—সব তাতে বিচলিত করবার রাজা। যত বিপদের মূল—এই চিত্ত, মনের একাগ্রতা নষ্ট করে একটা পথে চলতে চলতে পথ হারিয়ে দেয়। একে ঠিক না করলে উপায় নেই। এহেন চিত্তকে সায়েস্তা করা যায় কি করে? ওর পেছনে দিন-রাত লেগে থাকতে হয়, কোন সময়ে কি ভাব আনে দেখতে হয়, তার ভালমন্দ 'সু' 'কু' বিচার করতে হয়।

সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে—এক জায়গায় নির্জনে বসে সমস্ত বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে ফেলা। সময়টি সবচেয়ে ভাল হয় প্রকৃতি যখন শান্ত নিস্তব্ধ থাকে—শেষ রাতে বা সন্ধ্যায়। ধর সমস্ত বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নিলে, কিন্তু চিত্ত তো সোজা নয়,—সে এমন কত বিষয় এনে ব্যস্ত করবে তোমায়। সেই সময়ে লক্ষ্য করতে হবে—কি বিষয় আনল সে। বিচার করতে হবে তার ঐ বয়ে আনা বিষয়ের সুখের নিত্যতা সম্বন্ধে। সেটা কতক্ষণের জন্যে স্থায়ী, প্রকৃতই তাতে সুখ আছে কি না—সেটা সং কি না। এখানেও সং মানে—যা তোমাকে অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেয়—সেইটি ধরলে তবে তোমার চোখ খুলবে। এখন ঐ চিত্তের সঙ্গে লাগো, নইলে উপায় নাই। এগিয়ে চল। চিত্তকে বশ করাই হল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

রাত সাড়ে নটা। খাওয়ার পর চললুম পান্থশালার বারান্দায়।

।। নয় ।।

সূর্যের তেজ বাড়ছে দিন দিন। তাই খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বেড়াতে বের হয়েছি সূর্য ওঠবার অনেক আগেই। পূব, পশ্চিম, দক্ষিণ — আশ্রমের তিন দিকে কাছে কোন জায়গা আর নতুন নাই। উত্তরে খাঁড় পেরিয়ে যাই নি কোন দিন। খাঁড়ির ধারে ধারে খানিকটা বেড়িয়ে এসে বসলুম দক্ষিণের বারান্দায় স্বামিজীর কাছে।

আঙিনা ভর্তি রোগী আর তাদের আপনজন। গরম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অসুখের হিড়িক—পেটের অসুখ, অম্বল, অজীর্ণ, জেরবমি। স্বামিজীর নির্দেশমত ওষুধ দেওয়া হল একে একে সকলকে। কেউ কেউ বার্লি পাতিলেবু কেনবার পয়সাও পেল। স্বামিজী নিজের হাতে ওষুধ খাইয়ে দিলেন কজনকে। রোগের গতি-প্রকৃতি অনুসারে প্রথম দাগ ওষুধ খাওয়ার দু ঘন্টা পরে খবর দিতে বললেন। ওষুধ নিয়ে চলে গেল সবাই।

আঙিনা খালি। কিন্তু খালি থাকবার যো কি? মিনিট দুয়েক পরেই পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বনপাসের ঝণ্টুর হল হাজির। পেছনে তিনজন বন্ধুসহ ওস্তাদ। রান্না-ঘরের দাওয়ায় পোঁটলা-পুঁটলি, তেল ঘি-এর টিন, দই সন্দেশের হাঁড়ি নামিয়ে স্বামিজীকে প্রণাম করে ঝণ্টুর দল বসল আঙিনায়। ওস্তাদ আর তিন বন্ধু গোপী মিস্ত্রী, গোপাল খাঁ আর জ্ঞানদাস বসলেন স্বামিজীর কাছে বারান্দায়।

দলটি নেহাৎ ছোট নয়—ছোকরা জোয়ান—সবে মিলে ষোলজন। বসল বটে কিন্তু কতক্ষণই বা, একটু পরেই এ ওর মুখপানে চেয়ে উঠে গিয়ে মাথায় এক এক খাবলা তেল দিয়ে গামছা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। তারপর ঝাঁপাই জুড়ে তল মাটি ওপর। তাও কি বেশীক্ষণ? তাড়াতাড়ি উঠে এসে ভিজে কাপড় মাঠে শুকোতে দিয়ে শুকনো কাপড় পরে সবাই এল রান্নাঘরে।

তারপর হৈ-হুল্লোড় এলাহি কাণ্ড। কেউ কুটনো কোটে, কেউ বাটনা বাটে, কজন যায় সাঁওতাল পাড়ায় মাংসের সন্ধানে, কোদাল হাতে দুজন যায় রান্নাঘরের উত্তর দিকে কিষণভোগ আমতলাটায় মাটি রাঁধবার বড় উনুন তৈরী করতে। ততক্ষণে দুজন দুটো উনুন জেলে তরকারী রাঁধে।

উমা পিসির ছুটি—ভাঁড়ারের ভার আমার হাতে দিয়ে পান্থশালায় যান বিশ্রাম নিতে।

সদাশিব ওস্তাদের নানা আলোচনা চলে স্বামিজীর সঙ্গে। ইচ্ছে থাকলেও শোনবার যো কি!

সংযত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও কি আনন্দ কোলাহল চেপে রাখতে পারে ঝণ্টুর দল? মাঝে মাঝে উঠে এসে হেসে হেসে উৎসাহ দিচ্ছেন স্বামিজী নিজে। আর তাদের পায় কে—একেবারে পোয়া বারো। আর কি আশ্রমের শান্তিভঙ্গের তোয়াক্কা রাখে ওরা?

কাজ বিভাগ হতেই দল পাতলা হল। আলোচনার কিছু অংশ কানে এল। ওস্তাদ বলছেন—মনে করি ঠিক পথেই চলব—বিচারের সঙ্গেই ভোগ করব। কিন্তু কাজের বেলায় কোন ফুসমন্তরে সব যে ভেস্তে যায়, বাবা। সংসার সংসারই থেকে যায়—ভোগাসক্তি কমে কৈ?

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওস্তাদের আপাদ-মস্তক এক লহমা দেখে নিয়ে স্বামিজী বলেন—অত সোজা নয়। বাঁধ দেবে কোন দিকে? বাঁধনের মত বাঁধন না হলে ফসকাবে। একদিক বাঁধবে, হাজার দিক খুলবে। সংসার কি একটা কিছু? এর হাজার হাজার অঙ্কুর, হাজার হাজার শাখা-প্রশাখা। মূল কিন্তু একটাই। মূলোচ্ছেদ করতে না পারলে কোন আশা নেই।

—অঙ্কুর, শাখা, প্রশাখা বুঝি কিছুটা, কিন্তু মূলটা কি, আর মূলোচ্ছেদ করাই বা যায় কি করে, বাবা?

—নিজের দিকে চাইলেই বুঝবে 'মূল' কি—

সহস্রাঙ্কুর শাখা স্বক ফল পল্লবশালিনঃ
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনোমূলমিদং
স্থিতম্।

সংসারের মূল 'মন' আর মূলোচ্ছেদ হচ্ছে এই মনের ক্ষয়। মনের ক্ষয়ই মোক্ষ বা মুক্তি। এ কি সহজে হয়? কেউ কেউ অল্প দিনে পারলেও বেশির ভাগই সারা জন্ম, এমনকি জন্মজন্মান্তর ধরেও এই মূলোচ্ছেদ করতে পারে না।

মনে কর—সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বিজন অরণ্যবাসী কেউ ভাবছেন তাঁর ছেড়ে আসা স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, ভোগ-সুখ-ঐশ্বর্যের কথা। বাইরে সংসার ছাড়লেও সংসার কি তাকে ছাড়ল? তার সংসার-ভোগ বহাল তবিয়তেই রয়ে গেল। এ মর্কট-বৈরাগ্যের সার্থকতা কি?

আবার দেখ রাজা জনক, রাজভোগে আছেন, রাজ্যশাসন করছেন, সংসারধর্ম পালন করছেন, কর্তব্যের অনুরোধেই কর্তব্য করছেন—কিন্তু বাঁধন নেই, আসক্তি নেই—মুক্ত, অনাসক্ত, ত্যাগী ঋষি। তাই জনক শুধু 'রাজা' নন—মহর্ষি। এঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলে তবে সংসারে থেকেও সংসার থাকে না—তার মূলোচ্ছেদ, মনের ক্ষয় বা মুক্তি হয়। মুমুক্ষুকে কঠোর নির্মম হতে হয়।

বেলা এগারোটা। স্বামিজী ও চার বন্ধু নদীতে স্নান সেরে এসে বসলেন। সবাই খাবেন একসঙ্গে। একটু দেরিই হল। স্বামিজীর জায়গা ঘরের ভেতর, ওস্তাদবন্ধু ও সাকরেদদের জায়গা বারান্দায়। উর্ধাপিসির নিরামিষ খাবার গেল পান্থ-শালায়। মহানন্দে খাওয়া শেষ। হাত-মুখ ধুয়ে ঢেকুর তুলে সবাই শুয়ে পড়ল যার যেখানে খুশি।

বিশ্রামটা লেখা ছিল না। পাকাপোক্ত হিসেবী রাঁধুনীদের হাতে খাবার বেঁচে-ছিল অনেক। গোছগাছ করে ঢেকেঢুকে ভাঁড়ারে তুলে রেখে গা ধুয়ে আসতেই বেলা চারটে। ছাতা মাথায় তাড়াতাড়ি ছুটলুম চান্নার পথে।

সবে দিবানিদ্রাটা সেরে বৈঠকখানায় শতরঞ্চে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক গুড়ুক টানছেন স্মৃতিরত্নমশায়। ছাতা বন্ধ করে দাওয়ায় উঠতেই মুখ বাড়িয়ে দেখে বললেন—

—এত রোদ্দুরেই? বস বস।

—রোদ্দুর লাগেনি, মামু, ছাতা রয়েছে।

—তা তো ঘামে নেয়ে উঠেছ দেখেই বুঝতে পারছি। তালপাতার পাখাটা হাতে দিলেন স্মৃতিরত্নমশায়।

হাওয়া খেতে খেতে অপেক্ষা করলুম হুঁকোর শেষ টানটি পর্যন্ত।

শেষ টান দিয়ে হুঁকোটি দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে বুড়ো হেসে বললেন—তারপর ভায়া?

হাসির উত্তরে হেসে বললুম—তারপর তো বলবার পালা আপনারই। আপনাদের গাঁয়ের ছেলে—'আলাদা মানুষ' গাঁয়ে ফিরে করলেন কি? খালি ইতিহাস উপন্যাসেই ডুবে রইলেন?

—ডুব বলে ডুব—একেবারে অতলে তলিয়ে যাওয়া। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, রাণা প্রতাপ, শিবাজী— কত সব দুর্ধর্ষ বীর জীবনী আর পলাশী যুদ্ধ, সিপাহী যুদ্ধের সব খুঁটিনাটি তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করে বেশ জোরের সঙ্গেই বলত যতীন—এদের অসাফল্যের একমাত্র কারণ দেশের লোকে ঐক্যহীনতা। দেশের আপামর জন-সাধারণ যদি এক জোট হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করত, কারুর সাধ্য কি এদের জয় করে। কি মোগল, পাঠান, কি খৃস্টান—কেউ কি এদের জয় করতে পেরেছে—দৈহিক শক্তিতে, শস্ত্রবলে বা রণকৌশলে? ওরা জয় করেছে মাত্র ভেদনীতির কূট-কৌশলে—চরম বিশ্বাসঘাতকতার পাশ-জালে।

মহিষাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভের মত ত্রৈলোক্য বিজয়ী অসুরকে কি ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ—কোন একক দেবশক্তি পেরেছে জব্দ করতে? নিজেরাই জব্দ হয়ে ফিরেছে বারে বারে। শেষে যখন সব দেবতার তেজ একীভূত হয়ে আবির্ভূতা হল একতারূপিণী দুর্গার, তখনই দুর্গতি দূর হল দেবতাদের। একতাহীন দেশ কি আবার একটা দেশ? চক্রান্ত যন্ত্রে ছিন্নভিন্ন সতীদেহের একান্ন খণ্ড। এ চলবে না। দীক্ষা চাই, দীক্ষা চাই—একতা মন্ত্রে দীক্ষা চাই। এছাড়া কোন উপায় নাই।

দেশের লোক—তাই বা কেমন? কেউ বলে—আমি 'বাঙালী', কেউ বলে 'বেহারী', কেউ রাজস্থানী, কেউ মাড়োয়ারী, কেউ পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী আবার কেউ উড়িয়া, মারাঠী, মাদ্রাজী। একজনও কি বলে আমি ভারতীয়? কেন রে বাপু? বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, মাড়ওয়ার, পাঞ্জাব, কাশ্মীর কি এক-একটা দেশ? দেশের অংশ—প্রদেশ মাত্র। দেশ তো একটাই—ভারতবর্ষ। একই দেশমাতৃকা ভারতমাতার সন্তান সবাই। তবে এ ভেদ কেন? নাঃ—এ চলবে না, চলবে না, চলতে পারে না। চাই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা, চাই একতার দীক্ষা। জনসাধারণের প্রত্যেককে হতে হবে দেশ-মাতৃকার সুযোগ্য সন্তান, যারা রক্তজবার অঞ্জলি দিয়ে মোচন করবে মায়ের পায়ের শৃঙ্খল।

বলতে বলতে যতীনের মুখ হয়ে উঠত সিঁদুর, সারাদেহে ছুটত বিদ্যুৎ-প্রবাহ, চোখে জ্বলত বজ্রের আগুন। আবার কখনও কখনও সুরধুনীধারা ছুটত দুচোখে। সে যে কী মূর্তি, যে না দেখেছে তাকে বোঝানো যায় না। সতীদেহ হারা মহারুদ্র মহাকাল আর কি!

এই ভাবনা নিয়েই থাকে যতীন। তবে সব সময়ে কি? খেলাধুলো হৈ-হুল্লোড়ও আছে, নতুন হয়েছে কুস্তি-কসরৎ—ডন, বৈঠক, ডম্বল। নিজে নিজে লাঠিও খেলে রায়বেঁশেদের মত। এমনি করে ওর শরীরটা হয়ে উঠল লোহার মত শক্ত, মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত দীপ্ত।

এই সময়ে খবর এল যতীন প্রবেশিকা পাশ করেছে। বাপের আশানুরূপ হয়নি বটে, জলপানি না পেলেও পাশ করেছে প্রথম বিভাগে সব বিষয়েই ভাল নম্বর রেখে। মনের আনন্দে বৌদি—যতীনের মা গৃহদেবতার পূজো দিয়ে নিজের হাতে কত কি রান্না করে লুচি সন্দেশ মিঠাইমণ্ডা খাওয়ালেন যতীনের সঙ্গীসাথী বন্ধু-বান্ধবদের।

এখন যতীন করবে কি? গ্রামবৃদ্ধদের কেউ কেউ বললেন—কি আবার করবে—বামুনের ছেলে, ইংরিজি শিখেছে, বাপেরও বয়স হয়েছে, বাপের চাকরিটাই বজায় করবে। আবার কেউ কেউ ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন—কী আবার করবে—লেঠেল হবে। কেউ বললেন—গুণ্ডা হবে, আবার কেউ বললেন—রায়বেঁশে হয়ে লাঠি খেলা দেখাবে।

যতীন হাসে আর বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই হব।

সব শুনে মায়ের মন কেমন করে। যতীনকে শুধোন—এবার কি করবি, যতীন?

যতীন বলে—আরও একটু পড়ব, মা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছেলের মাথাটি বুকে চেপে ধরে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—

—তাই পড়, বাবা। ইস্কুলে পড়লি, এবার গাঁয়ের টোলে পড় কিছুদিন। আমাদের শাস্ত্রগুলোও তো শেখা চাই।

(ক্রমশঃ)

বীর বিপ্লবী ভগৎ সিংএর ফাঁসী

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৯৩০ সালের ৭ অকটোবর তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ফল বার হয়। স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে ফাঁসির হুকুম হয় সুখদেব, রাজগুরু ও ভগৎ সিং-এর।

ভগৎ সিং তখন এক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মাত্র নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের বিপ্লব চেতনার এক অগ্নিময় প্রতীক। ব্রিটিশ শাসনের নির্লজ্জ বর্বরতার সামনে নির্ভীক জ্বলন্ত এক প্রতিবাদ। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মির পক্ষ থেকে তরুণ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও চন্দ্রশেখর আজাদের সহায়তায় কুখ্যাত পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে। যে স্যান্ডার্স পাঞ্জাবের রাজপথে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ নেতা লালা লাজপত রায়কে লাঠির আঘাতে খুন করেছিল, সেই স্যান্ডার্সকে লাহোরের প্রকাশ্য রাজপথেই গুলি করে যারা মেরেছিল, দেশবাসী নিঃশব্দ ও গোপন প্রশস্তি দিয়ে তাদের কল্যাণ কামনা করেছিল।

সেদিন কিন্তু এই তিনজন বিপ্লবী যুবকের সন্ধান পুলিশ পায়নি। ভগৎ সিংকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গা দেবী (ভগবতীচরণ ভোরার স্ত্রী) কলকাতায় চলে এলেন। কলকাতায় তাঁর প্রয়োজন ছিল। ভগৎ সিং খোঁজ করছিলেন যতীন্দ্রনাথ দাসের। যতীন্দ্রনাথ পার্টির জন্যে বোমা তৈরী করলেন।

ভগৎ সিং-এর মনের মধ্যে ছিল স্বাধীনতার প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা। পাঞ্জাবের কর্তার সিং সরোবার নির্ভীক আত্মদান তাঁর হৃদয়ে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বাইশ বছরের রূপবান যুবক। ভগৎ শুধু পাঞ্জাব নয়, বাংলাদেশের হৃদয়ও জয় করে নিয়েছিল। তাই বাংলাদেশ আজও মহান বিপ্লবী বীর ভগৎকে বেদনার অশ্রু দিয়েই স্মরণ করে।

স্যান্ডার্স হত্যার পরবর্তী ঘটনা দিল্লীর সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বলি হলে ঘটেছিল। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল। ব্যবস্থাপক সভায় নিরাপত্তা বিল নিয়ে আলোচনা। সভার মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন স্যর জন সাইমন। হঠাৎ সভার মধ্যেই বোমা ফাটলো, পর পর দুবার। তারপরেই রিভলভারের দুটি শব্দ।

চারিদিকে তীব্র উত্তেজনা। সভ্যরা আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপছেন। কিন্তু হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্ভয় দুই যুবক। হাতের রিভলভার ফেলে দিয়ে তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

না, কাউকে হত্যা করতে আসেননি তাঁরা। বোমা ছুঁড়ে পালাবার চেষ্টাও করেননি। তাঁরা এসেছিলেন দেশের প্রতিবাদের ভাষাকে মূর্ত করে তুলে ধরতে। ভগৎ সিং-এর ভাষাতেই বলি—

> "The attack was not directed towards any individual, but against an institution itself."

তাই কাজ শেষ হতেই তাঁরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ত্রস্ত পুলিশ সার্জেণ্ট যতক্ষণ না তাঁদের হাতে হাতকড়া পরায়। সেই দুই যুবক—ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

তাঁদের উদ্দেশ্য কিছুটা সার্থক হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসক চোখের সামনে যেন বিভীষিকা দেখলো। পুলিশ উন্মত্ত হয়ে অত্যাচারের তাণ্ডব বইয়ে দিল চারিদিকে। সাত দিনের মধ্যেই লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিংয়ে একটি বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কৃত হল। সেখানে ধরা পড়লো সুখদেব। চারিদিকে অজস্র যুবককে গ্রেপ্তার করা হল। কলকাতা থেকে লাহোরে ধরে আনা হল আর একটি তরুণ বিপ্লবীকে—যতীন্দ্রনাথ দাসকে।

লাহোর জেলে বিচারাধীন এই বন্দীদের ওপরে চললো বর্বর অত্যাচার যার প্রতিবাদে ১৫ জুন তারিখে জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয়কুমার সিংহ ও আরও অনেকে। ১৩ জুলাই তারিখে যতীন্দ্রনাথ দাস সহ আরও অনেকে অনশন শুরু করলেন। ৬৩ দিন অনশনে থেকে অবশেষে মৃত্যুর অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন যতীন্দ্রনাথ দাস।

১৯২৯ সালের ১০ জুলাই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সূচনা।

জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীজী তখন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস-এর স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু কংগ্রেস-এর মধ্যে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র বসু—আর একজন তরুণ যুবক। সুভাষের পেছনে বাংলার বিপ্লবী দল। লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতে আমরা সন্তুষ্ট হব না। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজীর দাণ্ডি অভিযান শুরু হল। কিন্তু ইংরাজের কাছে দুঃস্বপ্নের মত যে ঘটনা এসে দাঁড়ালো, তাহল এপ্রিল মাসেই সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদের যুদ্ধ। আর অকটোবরের ৭ তারিখে ভগৎ সিং প্রমুখের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হল।

বিদ্রোহের আগুন তখন চারদিকে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে। গান্ধীজীর অনুরোধে বিপ্লবীরা কান দিলো না। তাদের চোখের সামনে ভাসছে ১৯২২-এ গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারের ইতিহাস। তারা দেখছে রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী, রোশন সিং ও আসফাক উল্লার ফাঁসিতে ঝোলানো মৃতদেহ। তাদের হৃদয় জুড়ে রয়েছে যতীন দাসের আত্মাহুতির ছবি। পাঞ্জাবে চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিপ্লবীরা। ষড়-

লাটের ট্রেনের ওপরেও বোমা পড়লো, যদিও বেঁচে গেলেন লর্ড আরুইন—পরবর্তী কালের আর্ল অব হ্যালিফ্যাকস।

১৯৩১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজী এলেন বড়লাট আরুইনের সঙ্গে আলোচনা করতে। আন্দোলন আবার প্রত্যাহার করে সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই এগিয়ে এলেন গান্ধীজী। তিনি চাননি যে, দেশে সহিংস বিপ্লবের প্রসার হোক। তাই তিনি ব্যস্ত হননি ভগৎ সিং-এর প্রসঙ্গ তুলে বড়লাটের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ধারাকে ব্যাহত করতে।

কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ এমন প্রত্যাশাই করছিলো।

১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ রাত্রি। লাহোর জেলের গোপন ফাঁসিমঞ্চে অত্যন্ত গোপন নিঃশব্দতার মধ্যে তিনটি দেশপ্রেমিক নির্ভীক যুবককে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। দেশের লোক তখনও আশা করছে যে গান্ধীজী বড়লাট আরুইনের সঙ্গে যে আলোচনা করছেন (গান্ধী-আরুইন চুক্তি) তারই ফলস্বরূপ মুক্তি দেওয়া হবে তাদের। ২৪ মার্চ করাচীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। সেই অধিবেশনে যোগ দিতে যাঁরা আসছিলেন, তাঁরাও কেউ জানতেন না যে অধিবেশনের সূচনাতেই শুনতে হবে এমন এক নিষ্ঠুর সংবাদের প্রকাশ।

কিন্তু কেউই জানতেন না—একথা কি ঠিক? গান্ধীজী বলেছেন—ভগৎ সিং-এর জীবনরক্ষার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন; তিনিও জানতেন না? বড়লাট আরুইনের সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তিনি ৫ মার্চ তারিখে। চুক্তির সর্তরূপে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদের মুক্তির দাবী তিনি রাখেননি তাতে দেখাই গেছে। আলোচনা চলার সময়েও তিনি এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেননি। অথচ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বোম্বাইতে এসে কাতর অনুরোধ রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু নিজে। আর গান্ধীজি চুক্তিপত্রে সই করবার পরের দিন একটি চিঠিতে বড়লাটকে শুধু তাঁর ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন যে ভগৎ সিং প্রমুখ বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড মকুব করলে তিনি খুসী হবেন। কিন্তু গুরুত্ব দেওয়ার মত জোর তাঁর চিঠিতে ছিল না, একথা সুস্পষ্ট। থাকলে পক্ষকালের মধ্যেই তিন বিপ্লবীর ফাঁসিকে কার্যকারী করা হত না।

"It has been suggested that Gandhi put forward the request for clemency in a half-hearted way and this may well have been true, for his hatred of violence was so acute that it inhabited him from pressing the case of Bhagat Singh with any great enthusiasm".
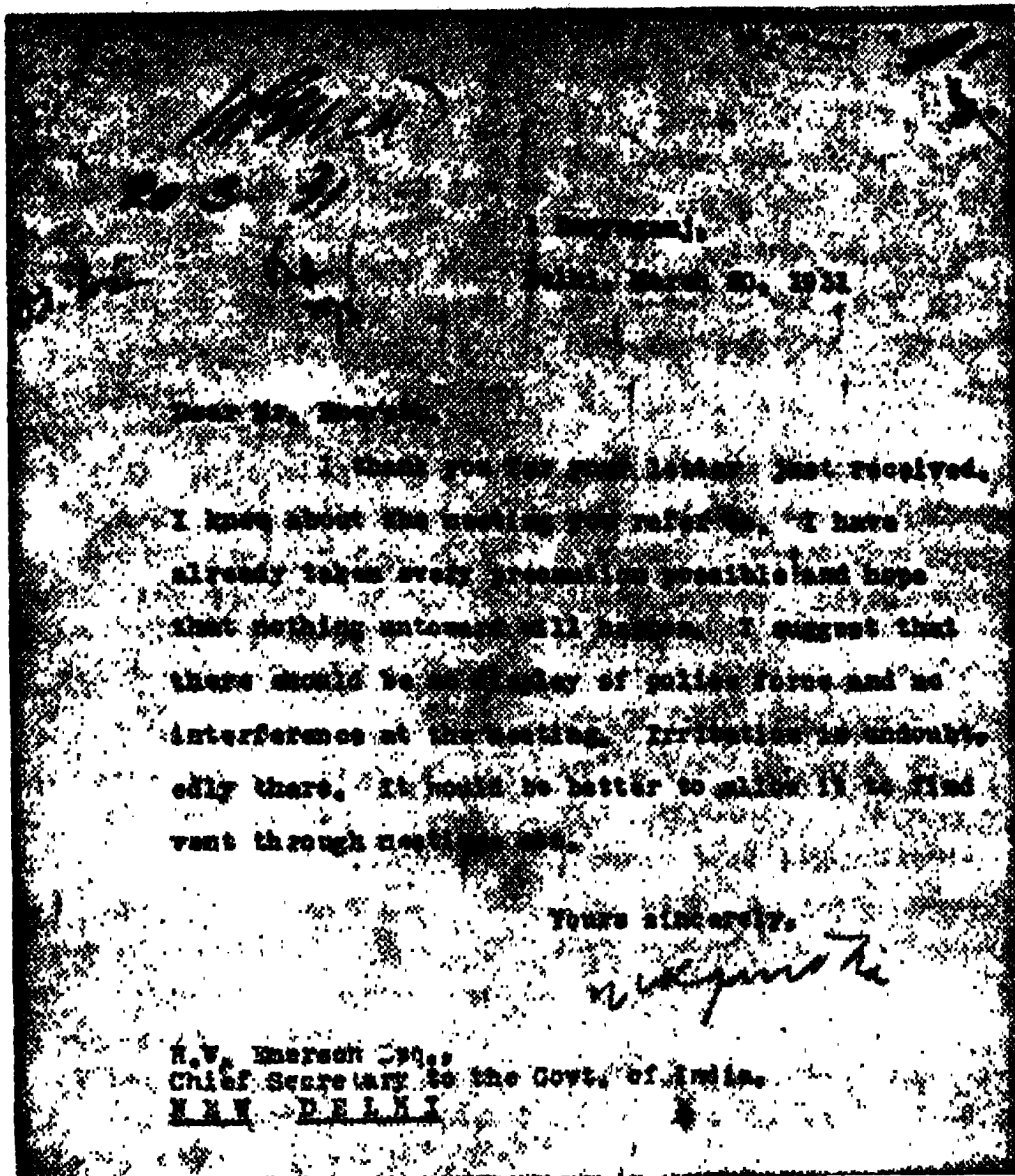
(Michael Edward — Last years of the British Empire).

সভার পূর্বাহ্নে চীফ সেক্রেটারিকে লিখিত গান্ধীজীর পত্র

Daryaganj,
Delhi, March 20, 1931

Dear Mr. Emerson,

I thank you for your letter just received. I know about the meeting you refer to. I have already taken every precaution possible and hope that nothing untoward will happen. I suggest that there should be no display of police force and no interference at the meeting. Irritation is undoubtedly there. It would be better to allow it to find vent through meetings etc.

Yours sincerely,
M. K. Gandhi

H. W. Emerson Esq.,
Chief Secretary to the Govt. of India.
NEW DELHI

গান্ধীজির নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করি—

"I might have made the commutation a term of the settlement. It could not be made so ......The Working Committee had agreed with me in not making commutation a condition precedent to truce. I could therefore only mention it."

অর্থাৎ আলোচনার শর্ত হিসেবে ফাঁসি মকুবের প্রস্তাব আমি তুলতে পারতাম; কিন্তু তা করা যায়নি...চুক্তির পূর্ব শর্ত হিসাবে ফাঁসি মকুবের প্রস্তাব না দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমার সঙ্গে একমত হন (?) আমি তাই এ ব্যাপারটিকে উল্লেখ করতে মাত্র পেরেছিলাম।

লর্ড আরুইন (পরবর্তীকালে আর্ল অব হ্যালিফ্যাক্স) তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। আরুইন লিখেছেন "আমাদের তথাকথিত আরুইন-গান্ধী চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরের দিন তিনি (গান্ধীজি) এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললেন যে, তিনি অন্য একটি প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। করাচী কংগ্রেসে এই চুক্তি অনুমোদিত হবে এবং তিনি তার জন্যে—করাচীর পথে রওনা হচ্ছেন। তার আগে তিনি এসেছেন ভগৎ সিং নামের সেই যুবক বিভিন্ন হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, সেই যুবকের প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন জানাতে।...গান্ধী বললেন, এই যুবককে ফাঁসি দিলে তিনি জাতীয় বীরের মর্যাদা পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের আবহাওয়া ব্রিটিশ শাসন ও কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে।

মিঃ গান্ধী বললেন—তিনি শঙ্কিত হচ্ছেন এই ভেবে—যে কিছু করতে না পারলে এই চুক্তিও বানচাল হয়ে যেতে পারে। আমি বললাম, তাহলে আমিও কম দুঃখিত হব না। কিন্তু আমার সামনে তিনটি মাত্র পথ—প্রথম—কিছুই না করে মৃত্যুদণ্ডকে কার্যকরী হতে দেওয়া,

দ্বিতীয়—নির্দেশ বদলে দিয়ে দণ্ডদান স্থগিত রাখা এবং তৃতীয়—কংগ্রেসের অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া। তিনি (গান্ধী) নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আমার দিক থেকে দণ্ডদান স্থগিত রাখা সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলে লোকে বলবে—ফাঁসি মকুব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি সেটাকে সরল পথ বলে মনে করি না। কাজেই যত অসুবিধাই থাক প্রথম পথই শ্রেয়।

মিঃ গান্ধী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—আমি এই যুবকের প্রাণরক্ষার জন্যে চেষ্টা করেছি, একথা যদি সকলকে বলি, তাহলে আপনার আপত্তি আছে?"

"আমি বললাম, না। তবে আপনি আরও একটু বলবেন যে, আমার দিক থেকেও আর কিছু করার আছে বলে আপনি মনে করেননি। তিনি (গান্ধী) আবার ভাবলেন, তারপর রাজী হলেন। এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়েই করাচীর পথে রওনা হলেন।"

(The Earl of Halifax in 'Fullness of Days', PP 149).

আসলে নীতি হিসেবে অহিংসার প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে গান্ধীজি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশে সন্ত্রাসবাদের প্রসারে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন একথাও বলা যায়। ইংরাজ সরকারের সঙ্গে কোনরকম একটা রফা করতে তাই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। আরুইনের সঙ্গে চুক্তিতে তিনি পাননি কিছু; বরং কংগ্রেসের আদর্শকে অনেকখানি খর্ব করতে হয়েছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কর্মসূচী সম্বন্ধে যে নোটগুলি তিনি দেন, তাতে এ কথাই সুস্পষ্ট যে আদর্শের চাইতে আপোসই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল।

বড়লাট আরুইন ১৯।৩।৩১ তারিখের এক নোটে লিখলেন—'আমাদের আলোচনা সমাপ্ত হলে তিনি বললেন যে, করাচীতে তিনি (গান্ধীজি) কোন বাধা পাবেন বলে মনে করছেন না। তাঁর ব্যবহার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। শান্তির পথে চলার জন্য তাঁর আগ্রহ আগের মতই আন্তরিক বলে মনে হল। যাওয়ার আগে তিনি হঠাৎ বললেন—খবর শুনলাম ভগৎ সিংদের ২৪ তারিখে ফাঁসি দেওয়া হবে। ওই দিনটা অসুবিধাজনক। কারণ ২৪ তারিখেই কংগ্রেস সভাপতি করাচী পেঁছোচ্ছেন। ফাঁসির ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা হবে। আমি (বড়লাট) তাঁকে (গান্ধীজিকে) বললাম, যে কথাটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু দণ্ড মকুব করার বা পেছিয়ে দেওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই।......তিনি (গান্ধীজি) আমার যুক্তির মর্ম বুঝে চুপ করে রইলেন।

২০।৩।'৩১ তারিখে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ইমার্সন গান্ধীকে একটি চিঠিতে লিখলেন—

'ভগৎ সিংকে ফাঁসি দেওয়া হলে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্পর্কে আপনার আমার মধ্যে গত রাত্রে যে আলোচনা হয়েছে—সেই প্রসঙ্গে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। চীফ কমিশনার আমাকে জানিয়েছেন যে, শহরে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে—সুভাষচন্দ্র বসু সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় একটি প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করবেন। এ ব্যাপারে আপনার অসুবিধা আমি বুঝতে পারছি। এবং আপনিও নিশ্চয়ই সরকার পক্ষের কি অসুবিধা তা বুঝতে পারছেন। এই মুহূর্তে সরকার কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান না। তবে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হলে তাঁরা বাধ্য হবেন। আজকের প্রতিবাদ সভায় যদি গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হয়, তবে উত্তেজনার সৃষ্টি হবেই। আপনি যদি আমাদের সহায়তা দিতে চান, যদি এই অসুবিধাকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নির্ধারণ করতে পারেন তাহলে গভর্ণমেন্ট খুসী হবেন।

এ চিঠির উত্তরে গান্ধীজি লিখলেন—

Dear Mr. Emerson,

I thank you for your letter just received. I knew about the meeting you refer to. I have already taken every precaution possible and hope that nothing untoward will happen. I suggest that there should be no display of police force and not interference at the meeting. Irritation is undoubtedly there. It would be better to allow it to find vent through meetings etc.

Yours Sincerely
M. K. Gandhi.

প্রিয় মিঃ ইমার্সন,

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। ধন্যবাদ। যে সভার কথা উল্লেখ করেছেন, তার খবর আমিও জানি। আমি সম্ভবমত সতর্কতা গ্রহণ করেছি। আশা করছি, কোন গোলমাল ঘটবে না। আমি মনে করি সভায় বাধা দেওয়া বা পুলিশ মোতায়েন করা উচিত হবে না। উত্তেজনা নিশ্চয়ই আছে। সভা-সমিতির মধ্যে দিয়ে সেই উত্তেজনাকে প্রশমিত হতে দেওয়াই ভাল, বলে মনে করি।

ভবদীয়
এম কে গান্ধী।

এ্যালেন ক্যাম্পবেল জনসন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—'স্যর হার্বার্ট ইমার্সন গান্ধী-আরুইন আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইমার্সন বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা শুনেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন। ভগৎ সিংকে ফাঁসি দেওয়া হবে—এই সিদ্ধান্তে পেঁছনোর পর দুজনে (গান্ধী ও আরুইন) দীর্ঘ কথোপকথনে মগ্ন হলেন। তখন আর তাঁরা রাজনীতিক নেতা নন, যেন মানুষের জীবনের পবিত্রতা রক্ষা সম্পর্কিত কর্তব্যে আবদ্ধ দুই মহাপুরুষ।'

এত ঘটনার পর করাচী রওনা হওয়ার মুহূর্তে গান্ধীজি এক প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ভগৎ সিং-এর মুক্তি কামনা জানালেন। তিনি করাচীতে পেঁছোলেন, তখন তিন বিপ্লবী—ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু—ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

কাল আজ আউর কাল/
রনধীর কাপুর ও ববিতা
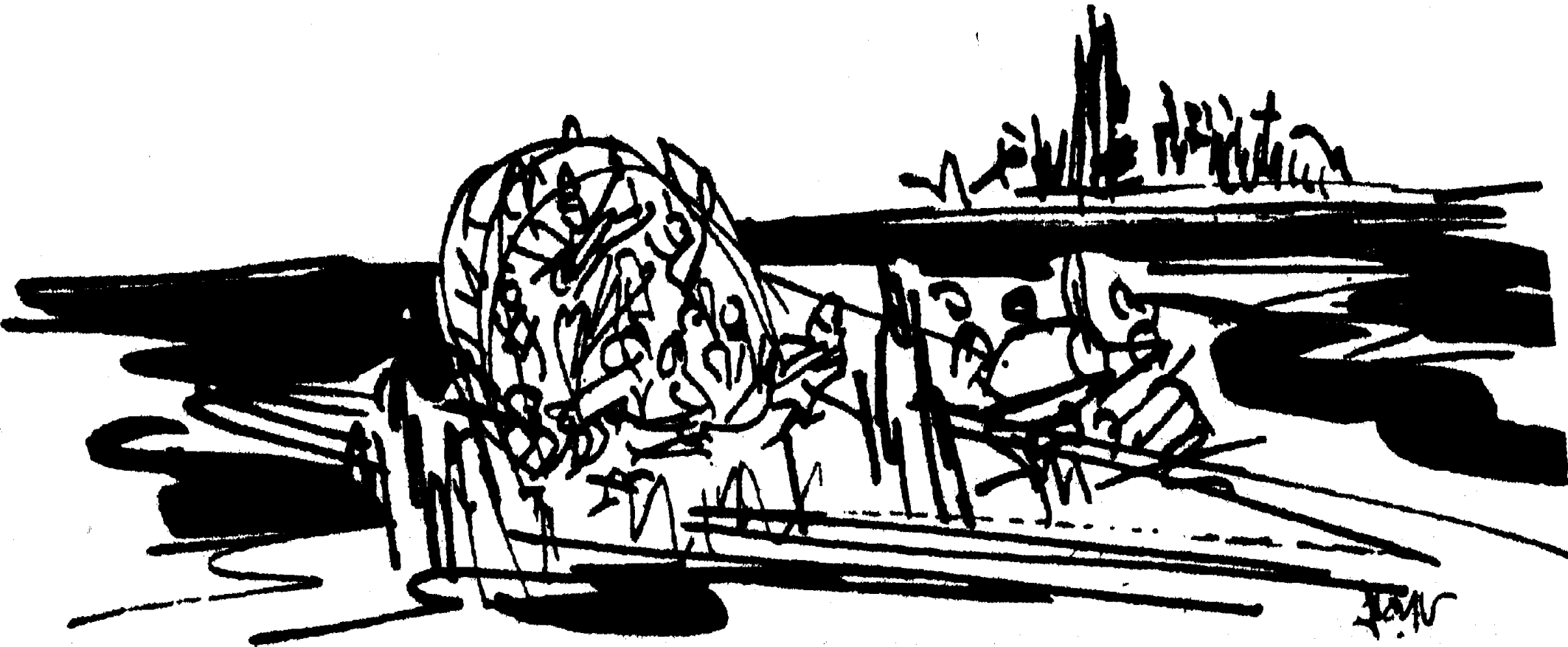
প্রেক্ষাগৃহ

চ্যাপলিন সংবাদ

পৃথিবীর চলচ্চিত্রজগতে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? — এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে — **চার্লি চ্যাপলিন**। আমরা জানি যে, ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক পি-এইচ-ডি উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বর্তমান ১৯৭২ সালের ১২ মে তারিখে, ২৫তম কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের উদ্বোধন দিবসে তাঁকে ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান 'কম্যাণ্ডার অব দি লীজন অব অনার' খেতাব দেওয়া হয়। সাধারণ ছবির দর্শকের কাছে তিনি একজন হাস্যরসের অভিনেতা মাত্র, একজন অসামান্য ভাঁড় মাত্র। কিন্তু গুণীজন তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে স্বীকার করেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক রেণি ক্লেয়ার বলেছেন, 'তাঁর (চ্যাপলিনের) বিশেষ ধরনের সাজগোজ এবং ভাঁড় ও মূকাভিনেতারূপে তাঁর দক্ষতা চ্যাপলিনের প্রকৃত ব্যক্তিত্বকে আমাদের কাছ থেকে বহু দিন পর্যন্ত লুক্কায়িত রেখেছিল। তিনি যে শুধু একজন শ্রেষ্ঠতম কৌতুকাভিনেতা, তাই নয়, চলচ্চিত্রকাররূপে তিনি এক বিরাট প্রতিভা। তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, হলিউডে যখন অরাজকতা বিরাজ করছিল, তখনও তাঁর প্রতিভা বিনা বাধায় স্ফুরিত হতে পেরেছিল। চ্যাপলিন যদি না থাকতেন, তাহলেও চলচ্চিত্রজগতের কাহিনী একই থাকত—একটি দৈত্যের মত বিরাট ব্যবসায়, যার ভিতর বয়ে চলেছে টাকার প্রস্রবণ, কৃত্রিমভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা নায়কের দল এবং এমন একটি মতবাদ, যা মূর্খতারই নামান্তর। কিন্তু আমরা একজন বন্ধুকে পেতুম না, তাঁর সঙ্গে আমাদের কথাও হত না—তাঁর যে-কথা হাজার হাজার লোক বুঝতে পারে।'

সিনেমাথেক ফ্রাঁসোয়ার স্রষ্টা হেনরী লাংলে বলেছেন, 'চ্যাপলিন হচ্ছেন জনসাধারণের আপনজন; তিনি জনসাধারণের ভিতর দিয়ে সারা পৃথিবীকে দেখেন। এবং সেই কারণেই চলচ্চিত্র আবার যে-রকম আমাদের কাছাকাছি হতে চলেছে, চ্যাপলিন সেই রকমই আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি।'

রেণি ক্লেয়ার ও হেনরী ল্যাংলো বিরাশী বছর বয়স্ক চার্লি চ্যাপলিনের নভেম্বরের গোড়াতে প্যারিস শহরে আগমন উপলক্ষ্যে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন, ওপরের উদ্ধৃতি তারই অংশবিশেষ। অবশ্য চ্যাপলিন প্যারিসে গেছেন ব্যবসায়িক কারণে। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ দশখানি ছবিকে 'চ্যাপলিন উৎসব' নাম দিয়ে আজকের জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করছেন এবং প্যারিস থেকেই তার শুরু।

৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় শার্লট—চার্লিকে ফরাসীরা ঐ আদরের নাম ধরেই ডাকে—যখন তাঁর স্ত্রী ও ছটি ছেলেমেয়েকে সংগে নিয়ে দুজন ফরাসী ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও দর্শকরূপে আমন্ত্রিত বর্ণাঢ্য অতিথিবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর 'মডার্ণ টাইমস' ছবির পুনর্মুক্তি দেখবার জন্যে আগমন করেন, তখন তার দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। পর দিন তিনি হোটেল দ্য ভিলাতে উপস্থিত হয়ে প্যারিস মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের প্রধানের হাত থেকে 'মেডাল অব দি সিটি অব প্যারিস' (প্যারিস নগরের পদক) গ্রহণ করেন। বলা চলে, একমাত্র শিল্পী পিকাসো (অবশ্য তিনি এত দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সে বসবাস করছেন যে, ফরাসীরা ভুলেই গেছে যে, তিনি একজন বিদেশী, স্পেনীয়) ছাড়া আর কোন বিদেশী শার্লটের মত ফরাসীদের অনুরাগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নি। চার্লিও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসেন ফ্রান্সকে। একবার তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'এত দেশ থাকতে আপনি আপনার পুরোনো ছবিগুলির পুনর্মুক্তির জন্য ফ্রান্সকেই বেছে নিলেন কেন,' তখন তিনি বিনাদ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'ফরাসীরা আমাকে বেশী বোঝে এবং অন্য কোন জাতি থেকে আমার অভিনয়ের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ব্যথা থাকে, তা বেশী করে উপলব্ধি করতে পারে।' জানি না, চার্লি বাঙালী-জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত কিনা এবং তাঁর ছবি ও তিনি বাঙালী দর্শকদের কাছে কত বেশী প্রিয়, তাও জানেন কিনা। যদি জানতেন, যদি বাঙালী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকত, তাহলে তিনি অন্তত ফরাসীদের সংগে বাঙালীদের নামটাও এক নিশ্বাসেই উচ্চারণ করতেন।

ঘন পক্ক কেশের নীচে যে-সুন্দর রক্তাভ মুখমণ্ডলটি দেখা যায়, তার উজ্জ্বল চোখ দুটি এখনও অতিমাত্রায় জীবন্ত, তাঁর চোখ জোড়া আজও উত্তেজনায় যেমন নেচে ওঠে, মুখেরও তেমনই ভাব-পরিবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে—এই যেন প্রশান্তিতে ভরা, পরক্ষণেই যেন রহস্যে কুঞ্চিত, আবার কখনওবা বেদনাকাতর আবার কখনও বিরক্তিতে অপ্রসন্ন।

বিরাশী বর্ষীয় চ্যাপলিনের আজও আছে যৌবনের উৎসাহ, উদ্দীপনা। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন 'অনেকে মনে করেন, আমি অবসর গ্রহণ করেছি, কিন্তু তা সত্যি নয়। আমার তো মনে হয় আমি জীবনে কখনও অবসর গ্রহণ করব না।

কয়েক দিন আগে এক রাত্রিবেলা একটা গল্পের খেই (সূত্র) এল মাথায়—তার থেকে একটা নতুন ধরনের ছবি করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়েছি ওটার রূপ দেবার জন্যে। ব্যাপারটা হচ্ছে ফাঁসি নিয়ে—অর্থাৎ একটা লোকের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তার মনে ঐ দণ্ড সম্বন্ধে যে-ভীতি, তাই নিয়ে। কানসাস জেলের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকটি দিন গুনছে, এই নিয়ে গল্পের আরম্ভ। একটি আমেরিকান ট্রাজিডি, না ভুল বললুম, আমেরিকান কমেডি—আজকাল ওরা যাকে ব্ল্যাক কমেডি বলে, সেই জাতের কমেডি আর কি! এতে আমার কোন ভূমিকা থাকবে না, তবে আমার ছেলে সিডনী এতে নামতে পারে।

আমি আরও একটা চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছি—দি ফ্রীক। আমার দুই মেয়ে—ভিকি ও জোসির জন্যে। ওটা একেবারে পুরোপুরি লেখা হয়ে গেছে। ছবি দুখানি আমার নিজেরই পরিচালনা করবার ইচ্ছে আছে। লক্ষ করছি, যখন হলিউডে আমার নিজস্ব স্টুডিও ছিল, তখন যে-ভাবে কাজ করতুম, এখন তার থেকে ঢের বেশী আট-ঘাট বেঁধে নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসারে সময়সূচী রক্ষা করে কাজ করতে হয়। বর্তমানে 'কিড' ছবিখানির পুনর্মুক্তির আগে ওর আবহ-সঙ্গীত রচনা করতে হচ্ছে (পাঠকদের মনে রাখা প্রয়োজন, ছবিখানি নির্বাক যুগের, বর্তমানের দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করবার জন্যে চ্যাপলিন ওতে শব্দ যোজনা করছেন)। মনে হচ্ছে কি, আমি যদি নিজেকে এখনও একজন সক্রিয় পেশাদারী বলে অভিহিত করি, সেটা বৃথাই বাকচাতুর্য ?

যে-সব চলচ্চিত্রকে আজকাল 'পারমিসিভ' সিনেমা বলে বাজারে ছাড়া হচ্ছে, যাতে অন্যায় বা পাপকেই বড় করে দেখান হয়, জনসাধারণের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেবার উদ্দেশ্যে যাতে যৌন-ব্যাপারের বা মাদক ব্যবহারের ছড়াছড়ি, আমার ধারণায় তাদের মধ্যে ধোঁকাবাজীটাই বেশী। মাদক জিনিসটা (যার ব্যবহারে মানুষ চেতনা হারায় বা ঘুমিয়ে পড়ে) আমার কাছে নিরুত্তাপ লাগে। একমাত্র মাদক, যা আমি কখনও-সখন ব্যবহার করেছি, সে হচ্ছে ঘুমের বড়ি (স্লিপিং পিল)। একথা মানতেই হবে যে, যৌন ব্যাপারটা এখন আর আমাকে তেমন আকৃষ্ট করে না। আমার বয়েস এখন বিরাশী বছর। কিন্তু আজ যাকে 'প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্যে ছবি' বলা হয়, আমি সে-ছবি তৈরী করেছি ১৯২৩ সালে—এ উওম্যান অব প্যারিস। আমার মনে হয়, এই যে-সব নানা রকমে চমক লাগাবার বা উত্তেজনা সৃষ্টি করবার চেষ্টা, এটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। তবে বাস্তবধর্মিতার প্রতি আমার আনুগত্য আছে। আমি যা বলি, সোজাসুজিই বলি—ঘুরিয়ে নাক দেখাতে আমি অভ্যস্ত নই। আর আমি বুদ্ধিজীবিতাতেও বা মস্তিষ্কধর্মিতাতেও (ইনটেলেকচুয়ালিজম) বিশ্বাসী নই। চিন্তাশীলতার আমি ধার ধারি না, কারণ সব সময়েই আমার উচ্চাশা হচ্ছে শিল্পী হবার, বুদ্ধিজীবী হবার নয়। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমি সবসময়েই চেয়েছি মানুষের মনোরঞ্জন করতে, আজও তাই চাই।'

বিরাশী বছর বয়সেও চার্লি চ্যাপলিন কি আশ্চর্য প্রাণচঞ্চল! আজও তিনি নতুন নতুন কাহিনীকে ছবির রূপ দেবার কথা চিন্তা করছেন আজকের দিনের দর্শকের কথা মনে রেখে। আপন বিশ্বাসে বলীয়ান চার্লির প্রত্যয় আছে, তিনি যা দেবেন, আজকের দর্শক তাতেই মাতোয়ারা হবে। বয়েসের হিসেব তাঁর চিরসবুজ প্রাণকে অণুমাত্রও হলুদ করে তুলতে পারে নি—তিনি চিরযুবক। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা চার্লি চাপলিন এমনই সবুজ প্রাণ নিয়ে শতায়ু হোন।

—নান্দীকর

বসন্ত বিলাপ/সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শিবাণী বসু ও অপর্ণা সেন। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

অপর্ণা/পরিচালনা : সলিল সেন। সেটে [illegible] চক্রবর্তী এবং অন্যরা।
ফটো অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

কার প্রশংসা আগে করবো? লেখক, পরিচালক না শিল্পীদের? কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'ছদ্মবেশী' উপন্যাসে এমন সরসভাবে কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে তার অন্তর্নিহিত শ্লেষটুকুও বেশ মধুর হয়ে পাঠকের ঠোঁটের কোণে হাসির ফুল ফোটায়। পরিচালক অগ্রদূত-গোষ্ঠীর কৃতিত্ব তাঁরা সেই ফুলগুলি চয়ন করে যথাযথভাবেই সেলুলয়েডের ফিতেয় তাকে বন্দী করেছেন—আর শিল্পীরা লেখকের চরিত্রে জীবন এনে পরিচালকের কল্পনাকে সার্থকভাবে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আর সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র ভারতীর 'ছদ্মবেশী' এমন একটি নিটোল হাসির ছবি হয়ে উঠতে পেরেছে যা বহুদিন দর্শকদের স্মৃতিকে আলোড়িত করবে। অতীতেও 'ছদ্মবেশী' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল এবং সেকালের দর্শক আজও সে ছবিকে ভুলতে পারেন নি। তাই সংশয় ছিল, সেকালের সেই হিট ছবির পুনঃচিত্রগ্রহণ কেমন হবে? ছবি দেখে বলা যায়, সে-বিচারে দর্শকরা হতাশ হবেন না। আজকের এ ছবি সম্পর্কে একটিই কথা বলা যায়, বুদ্ধিজীবীরাও 'ছদ্মবেশী' দেখে নির্মল আনন্দ পাবেন।

কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার কাহিনী এটা নয়। শালী-ভগ্নিপতির মধ্যে যে মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক তারই ওপর ভিত্তি করে রচিত 'ছদ্মবেশী'র কাহিনীর সার সংক্ষেপ হলো হরিপদবাবুর ছোট বোন সুলেখার সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট অবনীশের বিয়েতে এলাহাবাদ প্রবাসী সুলেখার দিদি লাবণ্য আর জামাইবাবু প্রশান্ত নেহাতই কাজের চাপে আসতে পারেন নি। তাই আক্ষেপের জ্বালা মেটাতে তাঁরা অবনীশ-সুলেখাকে এলাহাবাদে আমন্ত্রণ জানায় মধুযামিনী কাটাবার জন্য। ওরা আমন্ত্রণ গ্রহণ করে যাত্রার কথা ভাবছে, এমন সময় কথায় কথায় হরিপদবাবু ওদের বলেন, প্রশান্ত এমন একজন বাঙ্গালী ড্রাইভার পাঠাতে বলেছে যে ভালো বাংলা জানে, ইংরাজীতে দখল আছে এবং বেশ ভদ্র। খবর শুনে অবনীশের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপে। হরিপদর সুপারিশ নিয়ে অবনীশ নিজে ড্রাইভার সেজে এলাহাবাদ যায়—নাম নেয় গৌরহরি। গৌরহরির জ্ঞান পরীক্ষা করতে গিয়ে উল্টে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুধু প্রশান্ত লাবণ্যই নয়, দর্শকরাও হিমসিম খাবেন। যাই হোক, যথাসময়ে সুলেখাও এলাহাবাদ গিয়ে হাজির হয় এবং জানায়, অবনীশ দিল্লীর কাজ সেরে এখানে আসবে। সুলেখা আর গৌরহরির ব্যবহারে কিন্তু ওদের সন্দেহ জাগে। মোটরে গৌরহরির পাশে বসে যাওয়া, সুলেখার জন্যে সিগারেট, জানলায় সুতো বাঁধা ইত্যাদি নিয়ে লাবণ্য সুলেখাকে কয়েকটা কথাও শোনায়। ফলে অবনীশের আসার আগের দিন সুলেখা আর গৌরহরি নিরুদ্দেশ হলো। যথাসময়ে হরিপদর সঙ্গে অবনীশের বন্ধু পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট

সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়/
বনপলাশীর পদাবলী। ফটো : অমৃত

সুবিমল অবনীশ সেজে হাজির হয়। স্টেশনেই ছদ্ম রাগ দেখিয়ে সুবিমল অবনীশের বন্ধু বিনয়ের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। সেখানে তার মামাতো বোন বসুধার সঙ্গে এক মজার ব্যাপারের মধ্য দিয়েই সুবিমল প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেই নিয়ে বিনয়ের স্ত্রী আবার সৃষ্টি করে আরেক নাটকীয় পরিবেশের। সব মিলিয়ে অবস্থা যখন চরমে ওঠে তখন অবনীশ ও সুলেখা এসে সব ব্যাপারটা ফাঁস করে এবং এক মিষ্টি আমেজে ছবিটি শেষ হয়।

ছবিটির অভিনয় আর মিষ্টি সংলাপ দর্শকদের কতটা মাতিয়েছে প্রেক্ষাগৃহে তাঁদের মুহুর্মুহু হর্ষোৎফুল্ল চীৎকারেই তা বোঝা যায়। মূলত অবনীশ ওরফে গৌর-হরির চরিত্র অভিনয়ে উত্তমকুমার আবার প্রমাণ করলেন এ-জাতীয় চরিত্রাভিনয়ে বাংলাদেশে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর বাক্যভঙ্গিমা সত্যিই সুন্দর। মাধবী চক্রবর্তীর সুলেখা, বিকাশ রায়ের প্রশান্ত, অনুভা গুপ্তের লাবণ্য, তরুণকুমারের বিনয় দর্শকদের মনে ছাপ ফেলবে। ভালো লাগবে জহর রায়ের মোসাহেবকেও।

সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত এ-ছবির সঙ্গীতাংশের বেশ মনের কোনায় অনেকদিন আনাগোনা করবে। আশা ভোঁসলে, মান্না দে ও অনুপ ঘোষালের গাওয়া গানগুলি অনেকের মুখে মুখেই ফিরবে বলে মনে হয়।

চিত্রগ্রহণে মুন্সীয়ানার ছাপ রেখেছেন বিভূতি লাহা ও বৈদ্যনাথ বসাক। বেশ গতি-সম্পন্ন পরিচ্ছন্ন একটি ছবি উপহার দেবার জন্য অগ্রদূতগোষ্ঠী নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবেন।

মঞ্চাভিনয়

অনুভবের 'সওয়াল' : বক্তব্যের দিক থেকে খুব নতুনতর একটা আভাস না দিলেও, শুধু শিল্পসম্মত শৈল্পিক অভিনবত্বে একটি নাট্যপ্রযোজনা যে অনেক সম্ভাবনায় দীপ্ত ও বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হোতে পারে, তার একটি নজীর কয়েকদিন আগে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল 'রঙ্গনা'য়। নাটকের নাম 'সওয়াল', পরিবেশন করে-ছিলেন 'অনুভবে'র শিল্পীরা। সুপ্রযুক্ত নাটক দেখে মনটা যেভাবে ভরে ওঠে, 'অনুভবে'র 'সওয়াল' আমাদের সেই উদ্দীপ্ত আবেগকেই দোলা দিয়েছে চেনা আর অচেনার আলোয়।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বন করে 'সওয়াল' নাটকটি লিখেছেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। রিক্সাচালক লখাই দাসের আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নাটকটির মুখরতা ভাষা পেয়েছে। নাটকের যাত্রা শুরুতে লখাই দাসের মৃতদেহ নিয়ে মিছিলে ধ্বনিত হয়েছে, 'লখাই দাস, জিন্দাবাদ, লখাই দাস জিন্দাবাদ'। বৃদ্ধ পিতা গুরুপদর কিন্তু বিশ্বাস হোচ্ছে না তার ছেলে এপারের সব স্নেহ আর ভালো-বাসার বন্ধন কাটিয়ে চিরদিনের মতো চলে গিয়েছে। কিন্তু লখাইয়ের স্ত্রী রাধার যন্ত্রণা হয়েছে নিঃসীম, কারণ সে মর্মান্তিক আর নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। লখাইয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রিক্সাচালক দলের নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হোল। শেষপর্যন্ত অনেক সংকটের সত্যের সামনে এসে গুরুপদ বুঝতে পারলো লখাইয়ের বুকে বিঁধেছে পেট-ওয়ালা মানুষের গুলী। চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়ার আগে তাই সবার সাথে সুর মিলিয়ে নতুন করে বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে দিলো গুরুপদ। দৃঢ়তার সঙ্গে সে উপলব্ধি করতে পারলো লখাইয়ের মৃত্যু এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রামের সম্ভাবনাকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে।

লখাইয়ের সঙ্গে রাধার কয়েকটি প্রাণোচ্ছ্বাসে-ভরা মুহূর্ত ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে নাটকে। আলোর স্বতন্ত্র দু-একটি 'জোন' সৃষ্টি করে ঘটনাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

ফেলে-আসা দিনের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মুহূর্তের অতলে। খুব স্বাভাবিকভাবে এবং অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় এই ফ্ল্যাশ-ব্যাক এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মনে হয়েছে বর্তমান আর অতীতের সেতুবন্ধন মঞ্চের আলোয় আশ্চর্যসুন্দর হয়ে উঠতে পারে। এ-ব্যাপারে প্রয়োগ-প্রধান দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের সুগভীর শিল্পবোধই সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে। একটি মুহূর্তের পরিকল্পনা সত্যি ভোলা যায় না। ঘরের দাওয়ায় গুরুপদ মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হোচ্ছে, আর মঞ্চের বিভিন্ন কোণ থেকে ইউনিয়নের লোক, পুলিশ অফিসার যে-যার নিজেদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইছে গুরুপদকে। বিভিন্ন আলোর বৃত্তে ভিন্ন ভিন্ন অনুভবের মুখরতা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুর্বার হয়ে উঠেছে। শেষে একটি কথা, মঞ্চের মাঝখানে লখাইয়ের মৃতদেহটি না আনলেই বোধহয় ভালো হোত।

দু'-একজন ছাড়া 'সওয়ালে'র প্রায় প্রতিটি চরিত্রাভিনেতাই সপ্রতিভ অভিনয়ের নজীর রেখেছেন। প্রথমেই যাঁর অভিনয় আমাদের মনকে আপ্লুত করেছে, তিনি হোলেন 'গুরুপদ' চরিত্রের রূপকার দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। মানসিক যন্ত্রণার নিঃসীমতা, আর দৃঢ়তার মুহূর্তে আত্ম-প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা তাঁর চরিত্রচিত্রণে নিখুঁত-ভাবে রূপলাভ করেছে। তাপস দত্তগুপ্তের 'লখাই'ও হয়েছে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। 'রাধা' চরিত্রের প্রাণময়তা মঞ্জুশ্রী বসুর অভিনয়ে ধরা পড়েছে। অসীম ভাদুড়ীর 'সাহেশ' আরো অনেক ব্যক্তিত্বদীপ্ত হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অনুপ ভাদুড়ী, অনিন্দ্য নন্দী, অজয় বসু, চিত্ত ভাদুড়ী, পঙ্কজ দাসমজুমদার, শান্তিজিৎ সেনগুপ্ত।

মঞ্চপরিকল্পনায় নিতাই ঘোষের পরিচ্ছন্ন শৈল্পিক বোধ প্রশংসার দাবী রাখে।

বিশ্বরূপায় 'ফাঁস'

৭ই ডিসেম্বর 'বিশ্বরূপা'য় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের 'সাংস্কৃতিক শাখার সম্ভাবৃন্দ 'ফাঁস' নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন শিশির চক্রবর্তীর পরিচালনায়।

সংগঠনীর আগামী প্রয়াস : বারাসতের সুপরিচিত সংস্থা 'সংগঠনী'র শিল্পীরা এবারে যে যাত্রাভিনয় পরিবেশনের আয়োজন করছেন তার নাম হোল 'লালবাঈ'। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন বরুণ চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ দে, সমরজিৎ দে, রামপদ মুখোপাধ্যায়, কিরণ চ্যাটার্জি, বন্দনা বিশ্বাস ও অঞ্জলি ভট্টাচার্য। নাট্যনির্দেশনা আর সংগীত-পরিচালনায় আছেন বরুণ চ্যাটার্জি ও [illegible]

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার : অমৃত-বাজার-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর, বিশ্বরূপায় সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ-এ প্রমথ বিশীর 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে'র নাট্যরূপ পরিবেশিত হবে। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীজয়দেব বসু এবং নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীসুধীর মুস্তাফী। আলোকসম্পাত আর মঞ্চ-পরিকল্পনায় রয়েছেন শ্রীবিভাস মুখার্জি।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাব
(বহুবাজার শাখা)

'কত কথা পাই, কত দশ্ব ছই—জীবনে যত অন্ধকারই নামুক, সকালের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।' ঘোর তমসার মধ্যে আলোর জন্যে মানুষের চিরন্তন আকৃতি, চিরকালের পথ চাওয়া। রতন ঘোষের 'সকালের জন্য' নাটকটি গেল ২৩ নভেম্বর 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, বহুবাজার

রাণ্ড এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। দলগত অভিনয়ের গুণে নাটকটি সার্থক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দিলীপকুমার বসু (নীলাব্জ), সমরদেব চ্যাটার্জি (বিজন), দিলীপকুমার চ্যাটার্জি (উত্তম), মিলন মুখার্জি (ফটকে), কানুময় পাল (অরুণ), কানাই ব্যানার্জি (অমর মাস্টার), অরুণ দত্ত (মহেশবাবু), তিলক চক্রবর্তী (শঙ্কর) ও অসিত মুখার্জি (বাজোরিয়া) স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন। প্রদীপ সুর, দেবব্রত দাস, দুলাল কর, অরুণ সেনের অভিনয় সাধারণ স্তরের। জমিয়ে অভিনয় করেছেন একটি ছোট ভূমিকায় গৌর চ্যাটার্জি (সাংবাদিক সত্যপ্রকাশ)। ইরা মিত্রের বনলতাও সুঅভিনীত। নাটক পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বিশু চট্টোপাধ্যায়ের ওপর।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে আলোকচিত্রকর-পরিচালক যতীন দাস

সর্বভারতীয় ছায়াচিত্র-জগতের সুপরিচি[illegible] চিত্রধর ও পরিচালক যতীন দাস গেল ১৬ নভেম্বর তাঁর কলকাতার বাসভবনে (টালা) পরিণত বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে সবাক যুগের পঞ্চদশকের প্রান্তলগ্ন পর্যন্ত ছায়াছবির বিবিধ পর্বে তিনি সার্থক চিত্রধর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯২২ সালে নির্বাক ছবি 'গিরিবালা' দিয়ে। শেষ ছবি 'ফল্গু'। গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পরই ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দেন। কিন্তু কলকাতায় তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকেননি—সর্বভারতীয় ছায়াচিত্রের বিভিন্ন ভাষার চিত্রকাহিনীকে তিনি রূপালী পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এজন্যে ভারতীয় ছায়াচিত্র-জগতের 'মক্কা' বোম্বাইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। যেখানেই যান না কেন ফিরে ফিরে এসেছেন এই কলকাতায়—জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সম্পর্ক।

নির্বাক যুগের বহু ছবির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল : কাল পরিণয়, জানিয়া, নৌকাডুবি, কপালকুণ্ডলা। সবাক যুগে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন বহু ছবিতে—বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে নিম্নলিখিতগুলির, প্রহ্লাদ, দেবী-চৌধুরানী, যমুনা পুলিনে, নরনারায়ণ, সীতা, প্রভাসমিলন, কৃষ্ণসুদামা, রাতকানা, রাজনর্তকী (বাংলা, হিন্দী, ইংরেজি), মহব্বত, কাদম্বরী, হালচাল, কেদারগৌরী (উড়িয়া ছবি), ভক্ত নন্দনার (তামিল), কাজরী, শুভদা, পল্লীসমাজ, হরিলক্ষ্মী প্রভৃতি। পরিচালনাও করেছেন একাধিক বাংলা ছবি—জিপসী মেয়ে, অপবাদ, অনুরাগ, মর্যাদা, পরপারে প্রভৃতি।

নির্বাক ও সবাক যুগের প্রথিতযশা আলোকচিত্রী-পরিচালক যতীন দাসের পরলোকগমনে আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে তাঁর বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

রূপনায় 'চেনা অচেনা'

উত্তর কোলকাতার 'চেনা অচেনা' শিল্পীগোষ্ঠী তাঁদের সম্প্রতি অভিনীত নাটক অথ শিব-পার্বতী কথা ও ঝরা ফুলের মালা সহ অভিজিতের লেখা রঙ-বেরঙ নাটকটি আসছে ৪ঠা ডিসেম্বর '৭১ সন্ধ্যে ৬-৩০টায় রূপানায় পরিবেশন করছেন। প্রয়োগপ্রধান অসীম গুহের নেতৃত্বে সংস্থার শিল্পীরা এতে অংশ নিচ্ছেন।

[illegible] কবরী চৌধুরী এবং অন্যান্য শিল্পী

সুরথ স্মৃতি ক্লাবের 'চুপ'

গত ১৭ই নভেম্বর সুরথ স্মৃতি ক্লাবের সভ্যবৃন্দ রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে ক্লাব প্রাঙ্গনে শ্রীসমর মুখার্জির বহু-অভিনীত নাটক 'চুপ' অভিনয় করলেন সাফল্যের সঙ্গে অভিনেতা শ্রীগোবিন্দ দে-র পরিচালনায়। দলগত অভিনয়ই নাটকটিকে সাফল্যের শীর্ষসীমায় উন্নীত করেছিল। তবু কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন—ডাঃ মাখনচোরা, অবজ্ঞাকান্ত, চটপটে, বোমভোলা, হতভাগা ও দোলা দে চরিত্রে যথাক্রমে অলোক দত্ত, দিলীপ লাহা, নৃপেন মল্লিক, রবি মল্লিক, গোবিন্দ দে ও রমা গুহের অভিনয় অনবদ্য। সংগীত-পরিচালক সুরসুধাকর উমাপতি শীলের আবহসংগীত নাটকটির সাফল্যের অন্যতম শরিক। শ্রীশীলের গাওয়া 'রামকৃষ্ণ' বন্দনাগীতি ভক্তি-বিহ্বলতার পরি-মণ্ডল সৃষ্টি করে দর্শকমনে মাধুর্যের ছাপ রাখে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীঅনন্ত দত্ত ও নাট্যকার হরিপদ বসু। শ্রীবসু তাঁর ভাষণে বলেন, এই জোড়াসাঁকোই হচ্ছে বর্তমান পেশাদার থিয়েটারের জন্মভূমি। এখানে মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতেই বাগবাজারের গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হয় ১৮৬৯ সালে। শ্রী[illegible] [illegible]

জলসা

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

এক ঝলক অতীত

এ মাসের প্রথমে রবীন্দ্র - সদন আয়োজিত তিন দিনের সঙ্গীতাসর রবীন্দ্র-সদন কর্তৃপক্ষের এক উজ্জ্বল নিবেদন। এর আগে এ ধরণের আসরের আয়োজন রবীন্দ্র-সদনের পক্ষ হতে হয়নি। প্রথম দিন ছিল 'পুরানো বাংলা গানের আসর'—শেষ দুদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, যন্ত্র ও কন্ঠে।

বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রশাসন অধিকারিকা শ্রীমতী তপতী রায়ের। পুরানো বাংলা গান ও ধ্রুপদী সঙ্গীতের সঙ্গে সংগতি রেখে সোনার সুনিপুণ শিল্প-রচনায় মঞ্চসজ্জা, পশ্চাৎপটে শুভ্র বৃক্ষ যেন চিরন্তন ঊর্ধ্বমুখী আকৃতির দ্যোতনা। তারই পিছনে ঘন-নীল, কখনও বা লাল আলোর ইসারায় যেন বিভিন্ন যুগের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিভাস।

এই স্বপ্নীল পরিবেশে আঙ্গুরবালার 'ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধবনা ক'। আশ্চর্যমধুর ও হার্দ্য হয়ে উঠেছিল।

আজকের মানুষের কাছে একদা প্রখ্যাতদের উপস্থিত করে, উদ্যোক্তৃবৃন্দ যেন মেলে ধরেছিলেন বাংলা সঙ্গীতের অতীতের কয়েকটি পৃষ্ঠা যার মধ্যে রয়েছে পূর্বসূরীদের একাগ্রতা ও সাধনার ছবি।

আঙ্গুরবালা এরপর গাইলেন 'ঐ নাম বড় ভালবাসি', 'গোধূলির রং ছড়ালে কেগো আমার সাঁঝগগনে'—আরও কিছু নানান রসের ও বিচিত্র স্বাদের গান যা ভক্তি-বিহ্বলতায় ভাবের আবেগে প্রেক্ষাগৃহে সমগ্র পরিমন্ডল যেন ভরিয়ে দিয়েছিল। ভাবছিলাম সঙ্গীতের ওপর কতখানি অনুরাগ থাকলে তবে এই বয়সে রোগজীর্ণতাকে উপেক্ষা করেও এমন কন্ঠের অধিকারী হওয়া যায় যার মধ্যে আছে সুস্পষ্টভাবে আপন বক্তব্যকে পেশ করবার স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ শক্তি।

শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে টপ্পার ভঙ্গীটি ভাল লাগল, কন্ঠের জৌলুষ হয়ত ম্লান, কিন্তু গাইবার আগ্রহের আন্তরিকতায় সব ত্রুটি ঢেকে গেছে। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত টপ্পা ও আগমনী মনকে স্পর্শ করে।

গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের গান সু-গীত। কালীপদ পাঠকের শিষ্য দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের গানে শ্রীপাঠকের গায়কীর আভাস আমাদের অনেক সম্ভাবনার আশ্বাস দিয়েছে।

উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে সরোদ বাজিয়ে শোনালেন শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। ইমন-কল্যাণ রূপায়ণে প্রবীণ শিল্পীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ মুদ্রিত।

শ্রীমতী কল্যাণী রায় সেতার বাজান 'সূর্যমুখী' রাগে। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সৃষ্ট এই রাগ এই প্রথম শোনা গেল সাধারণ সঙ্গীতাসরে। অনেক পর্দা, বিশেষ শ্রুতিতে কোমল স্বর স্পর্শণে আলাপ বাজানো হয়ত কঠিন নয় যন্ত্র-দক্ষর পক্ষে। কিন্তু তান বাজানোর দুরূহতার খবর (বিশেষ করে সেতারে) যন্ত্রীমাত্রেরই জানা। কিন্তু এই সু-কঠিন প্রয়াসে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীমতী রায় তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার দীপ্ত পরিচয়ের নিদর্শন রেখে গেলেন। তবলা-সঙ্গতে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। এটা যে একটা বিশেষ আকর্ষণ সেকথা বলাই বাহুল্য।

বেহালায় ছিলেন শিশিরকণা ধর-চৌধুরী। এঁর পরিবেশিত হিন্দোল রাগের আলাপে ধ্যান-গাম্ভীর্য ত ছিলই এর ওপর ছিল শিল্পীর আনন্দভরা মেজাজ। পাণ্ডিত্য ও শিল্পকুশলতায় এ বাজনা জমে উঠেছে প্রথম থেকেই। সাথে সঙ্গতে ছিলেন কানাই দত্ত।
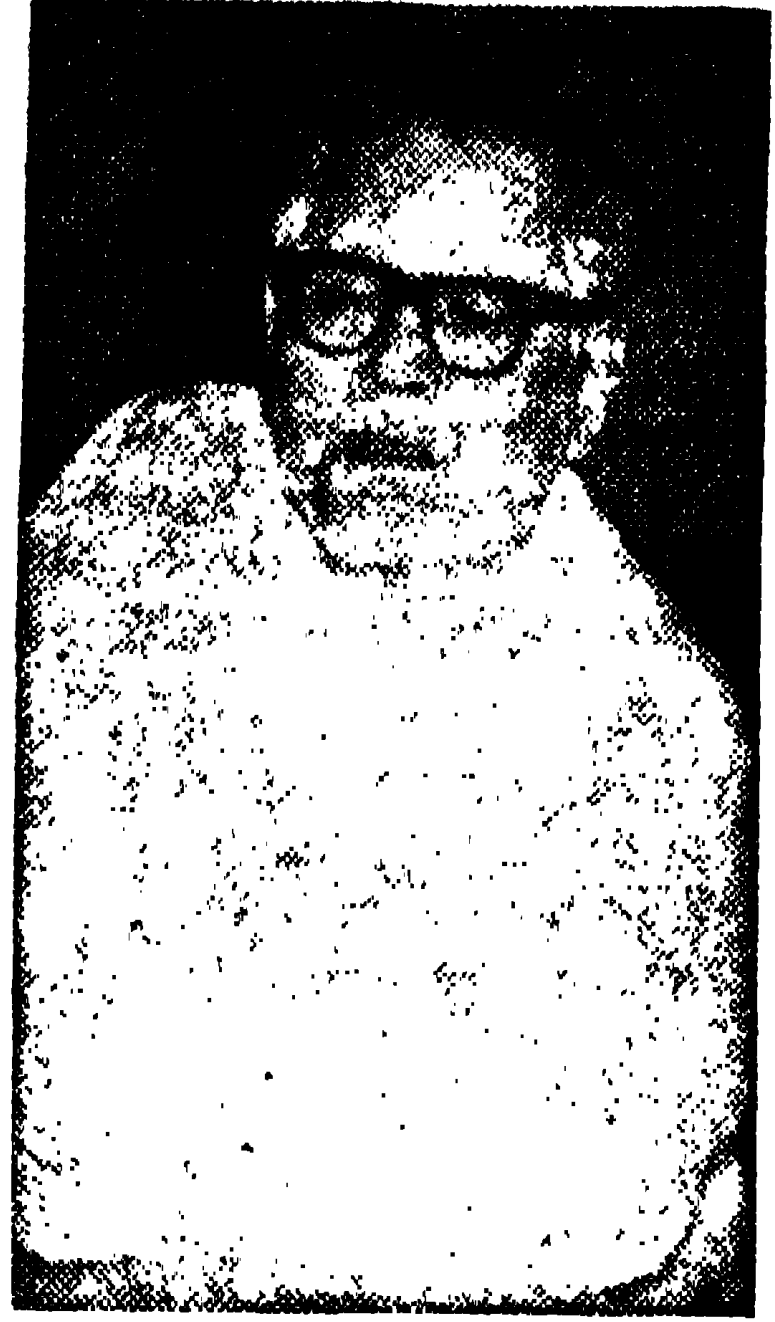
কন্ঠসঙ্গীতের আসরের উজ্জ্বল সূচনা ঘটালেন মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সু-বিস্তারিত ইমন-কল্যাণ দিয়ে। একই ঘরানার শিল্পী ও সতীর্থ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন কৌষিকী কানাড়া। উভয়ের গানেই পাতিয়ালা ঘরানার মেজাজটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

চিন্ময় লাহিড়ীর রজনী-কল্যাণে শিল্পীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতায় হৃদয়গ্রাহী। গায়ন-শিল্প ত আছেই।

এরপর আসরে এলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। 'বসন্ত' রাগাবলম্বী এক সুর-বিস্তারে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল কাছাকাছি

কল্যাণী রায়
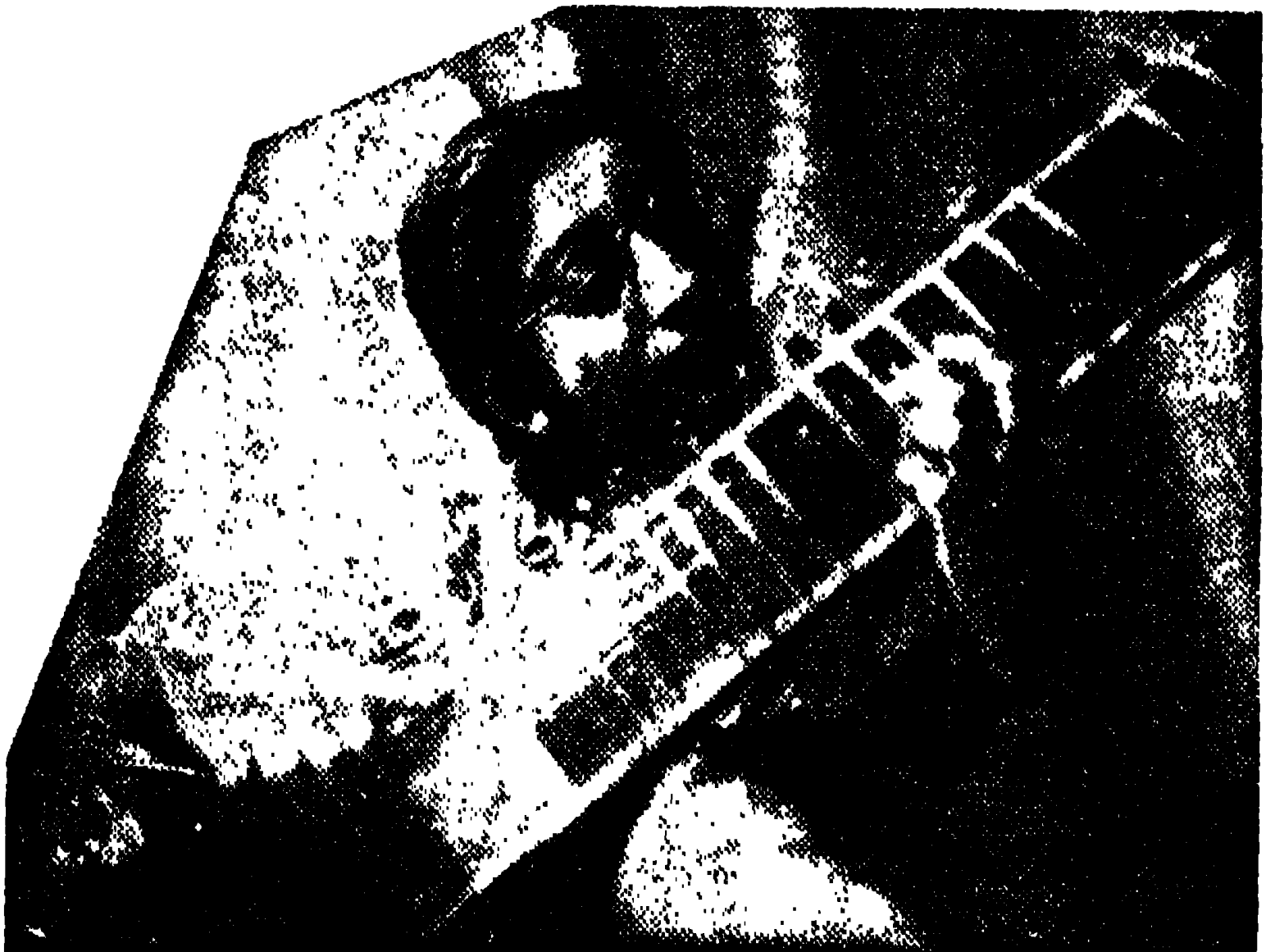
নানান রাগের রূপরেখা যার মধ্যে শিল্পীর স্বপ্নদৃষ্টির রঙিন ও আকর্ষণীয় ছবিটি ফুটে উঠল। তানে তিনি কতখানি কসরৎ দেখিয়েছেন অথবা সরগমের চকীবাজীতে কতটা কৃতিত্ব সে আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর। শ্রোতারা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের চিরশ্রদ্ধেয় ভীষ্মদেবকে। তাঁকে পাওয়া গেল। বিশেষ করে 'যদি মনে পড়ে' গানটিতে। সত্যিই মনে পড়িয়ে দিয়েছে অতীতের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি যে দিনে ভীষ্মদেবের উপস্থিতি যে কোন আসরের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিত।

আসরকে পূর্ণাঙ্গ করে তুললেন সর্বশিল্পী সঙ্গীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক। ভীষ্মদেবের অমন গানের পর আসর জমানো বুঝি এ'র মত শক্তিসম্পন্না শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। রাগ রাইসা-কানাড়া। অসামান্য কন্ঠসম্পদ, ত্রি-সপ্তক বিহারের অসাধারণ ক্ষমতা নানা তানের বৈচিত্র ত ছিলই। সবার ওপর ছিল শিল্পীর আপনহারা ভক্তির আবেগ যার অবশ্যম্ভাবী আবেদন সারা প্রেক্ষাগৃহকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। সুনন্দার তারাণা ও ভজনের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কৃতিত্বের একটা বড় অংশের দাবীদার ওস্তাদ কেরামৎ খান (তবলা) ও মহম্মদ সগীরুদ্দিন (সারেঙ্গী)।

একক সংগীত ও আবৃত্তির আসর

সম্প্রতি সুরমল্লার আয়োজিত একটি আসরে স্বপন গুপ্তের গান ছাড়াও মনে রাখার মত অনুষ্ঠান ছিল প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তি। স্থান—রবীন্দ্রসদন।

প্রায় এক ঘন্টার অনুষ্ঠানে পর পর পনেরোটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন প্রদীপ ঘোষ। বিভিন্ন ভাবের ও ছন্দের কবিতাগুলি যেন বিচিত্র রাগাশ্রয়ী সংগীতের মতই মাধুর্যবাহী হয়ে উঠেছিল। আবৃত্তিকারের সুললিত পরিবেশনে ও ভাবগ্রাহিতার প্রসাদে। কন্ঠের স্বরক্ষেপনা. কখনও অতি নিম্নে ঠিক যেন স্বগতোক্তির মতই নিজের সঙ্গে কথা বলেছে, পরমুহূর্তেই উচ্চগ্রামে পৌঁছে কবিগুরুর আকাশচারী কল্পনাকে স্পর্শ করার ব্যাকুলতায় অস্থির চঞ্চল। বিষয় বিশেষে কবিতার নাট্যধর্মিতার প্রতি যথাযোগ্য আলোকপাত প্রদীপবাবুর বৈদগ্ধ ও মননশীলতারই ফলশ্রুতি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—'দেবতার গ্রাস' কবিতাটির আবৃত্তি। মৈত্রমহাশয়, মোক্ষদা, মাসী, রাখাল, বজরার ক্ষিপ্ত জনতা—এতগুলি চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল শ্রীঘোষের স্বরব্যঞ্জনায়, চরিত্র-চিত্রনের নিপুণতায়।

কিন্তু সাদামাঠা কবিতা 'কথা' ভাবসম্পত্তির অভাবে ম্রিয়মাণ কিন্তু এই ঘাটতি তিনি পুরিয়ে দিয়েছিলেন বীরপুরুষ, 'শাস্ত্র', 'ঝুলন', 'রঙ্গ', 'হঠাৎ দেখা' ও 'পৃথিবী' আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল শ্রীঘোষের কন্ঠনৈপুণ্যে। দ্বৈত আবৃত্তি 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'-এ কুন্তীর ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন সুচিত্রা মিত্র।

স্বপন গুপ্তের কন্ঠের পনেরোখানি গান বলিষ্ঠ স্বরপ্রয়োগ এবং গাইবার আন্তরিকতায় স্নিগ্ধসুন্দর। গায়নভঙ্গীতে, পরীশীলিত স্বরশ্রুতি-উচ্চারণ ও প্রকাশশৈলীতে গুরু দেবব্রত বিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু শিল্পীজনোচিত শক্তির অধিকারী হয়েও কেন তিনি শুধুমাত্র দেবব্রত বিশ্বাসের ছায়ামাত্রই হয়ে উঠছেন?

সুরসঞ্চয়ন নিবেদিত : দেবব্রত-হেমন্ত

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রসদনে বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ব্যবস্থাপনায় শুনেছিলাম হেমন্ত ও কণিকা-কে। এবার শুনলাম দেবব্রত-হেমন্ত। শিল্প-ধর্মে উভয়েই স্বতন্ত্র আবার উভয়েই অনন্য। দেবব্রত, বিশ্বাস, আপন প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বলে এমন এক বিরাট শ্রোতৃগোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন যাঁরা তাঁরই ভাবের ভাবুক। কোনো কোড, ডগমা অথবা কনভেনসনের বন্দী তিনি নন।

শ্রীবিশ্বাস রবীন্দ্র-ভাবানুসারী, জীবনরস-রসিক। তাই তাঁর অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় অন্তর্লীন ভাবনার ক্রম পরিণতি এমন নাট্যরস সৃষ্টি করতে পারে। রাবীন্দ্রিক না হয়েও তিনি রবীন্দ্রময়।

আর হেমন্ত? তাঁর বিপুল সঙ্গীত-সম্ভারের একাংশ হোলো রবীন্দ্রসঙ্গীত। সবটা নয়। তবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তাস্রষ্টাদের মধ্যে এ'রও একটি বিশেষ স্থান ও অবদানও আছে। প্রথার বন্ধন এ'র নেই। আছে শুদ্ধ গাইবার আনন্দ, আর শ্রোতাদের হৃদয়ে অনুরণণ তোলার আন্তরিক নিষ্ঠা। কোনো বিশেষ দর্শনে ভারাক্রান্ত নয় এ'র গান। এই নিরাশ্রয় স্বচ্ছতাই তাঁর গানের চিত্তগ্রাহীতার কারণ। সেদিন ইনি গেয়েছিলেন 'এবার নীরব করে দাও হে' 'আমার গোধূলি-লগন' 'সেদিন দুজনে' 'প্রাঙ্গণে মোর' 'হে নিরুপমা' 'আমি কান পেতে রই'—ইত্যাদি গান. শেষ করলেন 'দিনের শেষে' দিয়ে। যে-গান পংকজ মল্লিকের কণ্ঠে অনুরণিত হয়ে এক যুগ-চিহ্নিত শ্রেষ্ঠত্বের আসনে তাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছে. সেই গানই তাঁরই সুরে হেমন্তবাবু গাইলেন। লোকে শুনল নিবিড় আগ্রহে. ব্যাকুল শিহরণে, হৃদয়ভরা আনন্দে।

উপরি পাওনা হিসেবে পেলাম হেমন্ত-দেবব্রতর দ্বৈত অনুষ্ঠান 'ও মণিহার' 'তোমার হোলো শুরু'। হেমন্ত গাইলেন বাংলায়, দেবব্রত ইংরাজীতে। উভয়ের মিলন সুন্দর, স্মরণীয়।

এলাহাবাদে সারস্বত সম্মেলন

কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে এলাহাবাদে আয়োজিত এক সঙ্গীত-সম্মেলনে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই উৎসবে কণ্ঠসঙ্গীতে সামগান গেয়ে শোনান এবং সুরশৃঙ্গারে ধ্রুপদী অঙ্গে রাগ বিস্তার পেশ করেন। পণ্ডিত কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য স্বস্তিবাচন পাঠান্তে রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এ'দের দুজনকে এবং সমাগত গুণীমন্ডলীকে মানপত্র প্রদান করেন।

রবীন্দ্রসদনে দেবযানী চালিহার নৃত্য

আগামী ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০টায় মৈত্তৈ জাগোইর পক্ষ হতে দেবযানী চালিহার একক মণিপুরী নৃত্য মঞ্চস্থ হবে।

—চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত সঙ্গীতোৎসবে সুনন্দা পট্টনায়ক ও সরস্বতীবাঈ

খেলাধুলা

দর্শক

ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের ডি-সি-এম ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে তেহেরানের তাজ ক্লাব ১-০ গোলে জলন্ধরের লিডার্স ক্লাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার ডি সি এম ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। তাজ ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই ট্রফি জয়ী হয়েছিল। এবছরের প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে তাজ ক্লাব ১-০ গোলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে এবং লিডার্স ক্লাব ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

এখানে উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতার দীর্ঘ বছরের ইতিহাসে একমাত্র তাজ ক্লাবই পরপর তিন বছর ট্রফি জয় করেছে।

বিশ্ব পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতা

প্রথম বিশ্ব পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে কেন রোজওয়াল অস্ট্রেলিয়া স্বদেশের বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় রড লেভারকে ৬-৪, ১-৬, ৭-৬ ও ৭-৬ গেমে পরাজিত করে সোনার কাপ এবং নগদ ৫০,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেছেন। সেমিফাইনালে কেন রোজওয়াল ডেনমার্কের টম ওক্কারকে এবং রড লেভার আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতারই ফাইনালে জয়লাভ করে নামী খেলোয়াড় রড লেভার বিশ্বের পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বপ্রথম, তাঁর পেশাদার টেনিস খেলার সূত্রে মোট এক মিলিয়ন ডলার উপার্জনের গৌরব লাভ করেন।

কেন রোজওয়ালের গত ২৫ বছরের পেশাদার খেলোয়াড়-জীবনে এই বিশ্বকাপ এবং নগদ ৫০,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ বড় কৃতিত্বের পরিচয়। বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় রড লেভারের বিপক্ষে আলোচ্য প্রতিযোগিতার ফাইনালে কেন রোজওয়ালের জয়লাভ বেশ অপ্রত্যাশিত ফলাফল। কারণ গত তিন বছরে রড লেভারের বিপক্ষে ১৩টি ম্যাচ খেলে কেন রোজওয়াল একটি খেলায় জিতেছিলেন।

রোভার্স কাপ

বোম্বাইয়ে ১৯৭১ সালের প্রখ্যাত রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়েছে। এ বছরের প্রতিযোগিতার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। মোট ৪১টি দল [illegible] প্রতিযোগিতার ৬ষ্ঠ রাউণ্ডে সরাসরি খেলবার গৌরব লাভ করেছে এই ৮টি দল: কলকাতার তিনটি দল—মোহনবাগান (গত বছরের বিজয়ী), ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং, বোম্বাইয়ের মহীন্দ্র অ্যাণ্ড মহীন্দ্র (গত বছরের রানার্স-আপ), সালগাওকার (গোয়া), ভাস্কো (গোয়া), লিডার্স (জলন্ধর) এবং আর এ সি (বিকানীর)। মোহনবাগান এবং সালগাওকার প্রথম কোয়ার্টারে, লিডার্স এবং মহমেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় কোয়ার্টারে, ইস্টবেঙ্গল এবং আর এ সি তৃতীয় কোয়ার্টারে, ভাস্কো এবং মহীন্দ্র অ্যাণ্ড মহীন্দ্র চতুর্থ কোয়ার্টারের ৬ষ্ঠ রাউণ্ডে প্রথম খেলতে নামবে।

পশ্চিম জার্মাণীর লিভারকুসনে আয়োজিত দশ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এশিয়া মহাদেশের ভারতবর্ষসহ ৯টি দেশের যে ১৪জন অ্যাথলীট অংশ গ্রহণ করেন তার একটি চিত্র। হার্ডলসে তালিম দিচ্ছেন জার্মান কোচ। তাঁর তালিম পরম আগ্রহে লক্ষ্য করছেন ভারতবর্ষের সুচা সিং এবং কুমারী কমলজিৎ সাধু (ছবির বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ)।

পশ্চিম জার্মানীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভারতবর্ষের সুচা সিং দৌড়ের তালিম নিচ্ছেন।

এখানে উল্লেখ্য ১৯২৩ সালের আগে বোম্বাইয়ের ওয়াই এম সি এ ছাড়া অপর কোন অসামরিক দলের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল না। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার সূচনা ১৮৯১-৯২ সালে। এই প্রতিযোগিতাটি সামরিক দলের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৯২৩ সালে বিশেষ আমন্ত্রণে দ্বিতীয় ভারতীয় অসামরিক দল হিসাবে মোহনবাগান ক্লাব রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করে এবং ফাইনালে ৪-১ গোলে সেই সময়ের দুর্ধর্ষ ডারহামস এল আই দলের কাছে হেরে যায়। উপর্যুপরি পাঁচবার রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে একমাত্র হায়দরাবাদ পুলিশ দল (১৯৫০-৫৪)। উপর্যুপরি তিনবার করে রোভার্স কাপ পেয়েছে ওয়ারউইকশায়ার রেজিমেণ্ট এবং চেশায়ার রেজিমেণ্ট।

জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতা

বিকানীরে অনুষ্ঠিত ১ম জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায় ম্যানুয়েল অ্যারোন প্রথম এবং মহম্মদ হোসেন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য অ্যারোন এই নিয়ে চারবার জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ান হলেন। ইতিপূর্বে তিনি ১৯৫৯, ১৯৬১ ও ১৯৬৯ সালে চ্যাম্পিয়ান হন এবং ১৯৫৭, ১৯৬৩ ও ১৯৬৭ সালে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

আগামী এশিয়ান জোন দাবা প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বে ভারতবর্ষের পক্ষে

প্রতিনিধিত্ব করবেন অ্যারোন এবং হোসেন। ভারতবর্ষের দাবা ফেডারেশন আগামী বছর বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দাবাদল পাঠাবার তোড়জোড় করছেন। এখানে উল্লেখ্য বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ শেষ যোগদান করেছে ১৯৬৪ সালে।

হকি টেস্ট

হকি টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ৪-০ খেলায় ভারত সফররত বৃটিশ হকি দলকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। কিন্তু এই টেস্ট সিরিজের কোন খেলাতেই বিরাট ব্যবধানে ভারতবর্ষ জয়ী হয়নি। চারটি খেলায় ভারতবর্ষ ৬টি গোল দিয়ে একটি গোল খেয়েছে।

খেলার ফলাফল

১ম টেস্ট (কোটা): ভারতবর্ষ ১-০ গোলে জয়ী, ২য় টেস্ট (কার্নাল): ভারতবর্ষ ১-০ গোলে জয়ী, ৩য় টেস্ট (লুধিয়ানা): ভারতবর্ষ ২-১ গোলে জয়ী, ৪র্থ টেস্ট (সাংরুর): ভারতবর্ষ ২-০ গোলে জয়ী।

মেয়েদের ফুটবল

ফুটবলের মত শ্রমসাধ্য খেলায় মেয়েদের অংশগ্রহণ পুরুষরা সমর্থন করে না। তাদের যুক্তি—ফুটবল খেলার ধকল মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং রূপ-লাবণ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া এ-খেলায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও অনেক। মেয়েরা কিন্তু ফুটবল খেলার মাঠে নিছক দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতে রাজী নয়। পুরুষদের মত ফুটবল খেলায় অংশ নিয়ে তারা আরও বেশী আনন্দ, উত্তেজনা এবং শিহরণ উপভোগ করতে বদ্ধপরিকর। দেশ-বিদেশের পৌরাণিক কাহিনী এবং ইতিহাসে যেখানে বীরাঙ্গনার ছড়াছড়ি, সেখানে পরিশ্রম এবং বিপদের দোহাই দিয়ে ফুটবল খেলায় যোগদান থেকে মেয়েদের নিরস্ত করা যে সম্ভব নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। মেয়েদের

কেন রোজওয়াল

এই জেদের কাছে পুরুষরা আগের অভিমত বদলাচ্ছেন।

'সারা দুনিয়া জুড়ে ফুটবল খেলা নিয়ন্ত্রণের কর্ম-পরিষদে পুরুষরা জাঁকিয়ে বসে আছে বলেই মেয়েদের ফুটবল খেলা উপেক্ষিত'—মেয়েদের এই অভিযোগের আজ অবসান হতে চলেছে। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'ফিফা' সম্প্রতি তার অনুমোদিত ১৩৫টি জাতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে মেয়েদের ফুটবল খেলা সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চেয়েছে। এই চিঠির উত্তরে সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, আলজেরিয়া প্রভৃতি পাঁচটি দেশ জানিয়েছে তারা নিজেদের দেশে মেয়েদের ফুটবল খেলাকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকারীভাবে স্বীকৃতি না পেলেও জাপান, কেনিয়া, ইংল্যান্ড, ইতালী, হল্যান্ড, আর্জেণ্টিনা, ব্রেজিল, নিউজিল্যান্ড এবং আমেরিকার মেয়েদের মধ্যে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করছে। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ইউরোপের ২২টি দেশে পরম উৎসাহের সঙ্গে মেয়েরা ফুটবল খেলে থাকে। সুইডেনে মেয়ে ফুটবল খেলোয়াড়ের সংখ্যা ১০,০০০ হাজার। পশ্চিম জার্মানীতে মেয়ে ফুটবল টীমের সংখ্যা ৬০০। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে মেয়েদের ১০০ ফুটবল টীম আছে। অস্ট্রিয়াতে মেয়েরা গত ৩৫ বছর ধরে ফুটবল খেলছে। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেসরকারীভাবে মেয়েদের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর এপর্যন্ত দুবার বসেছে—ইতালী এবং মেক্সিকোতে। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'ফিফা' তার সদস্য দেশগুলিকে মেয়েদের ফুটবল খেলার উৎসাহ এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

আজ যেখানে পুরুষদের ফুটবল খেলা উত্তেজনা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার কবলে পড়ে শান্তিপ্রিয় ক্রীড়ামোদীরা হিমসিম খাচ্ছেন সেখানে মেয়েদের ফুটবল খেলায় পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তা ভেবে তাঁরা খুবই শঙ্কিত।

বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতা

মালটায় বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন ইংল্যান্ডের নরম্যান ডাগলে এবং দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যানুয়েল-ফ্রান্সিসকো।

মালটায় অপেশাদার বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতার আসরে যে ১০ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের এই দুজন খেলোয়াড় ছিলেন—বর্তমান সময়ের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান সতীশমোহন এবং ২নং খেলোয়াড় মাইকেল ফেরেরা। গত ১৯৬৯ সালের অপেশাদার বিশ্ব বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতায় মাইকেল ফেরেরা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর ৬২৯ ব্রেক সর্বাধিক ব্রেক হিসাবে আজও বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে। ১৯৭১ সালের এই প্রতিযোগিতা দুটি গ্রুপে খেলানো হয়। ভারতবর্ষের মোহন এবং ফেরেরার খেলা পড়েছিল 'বি' গ্রুপে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।
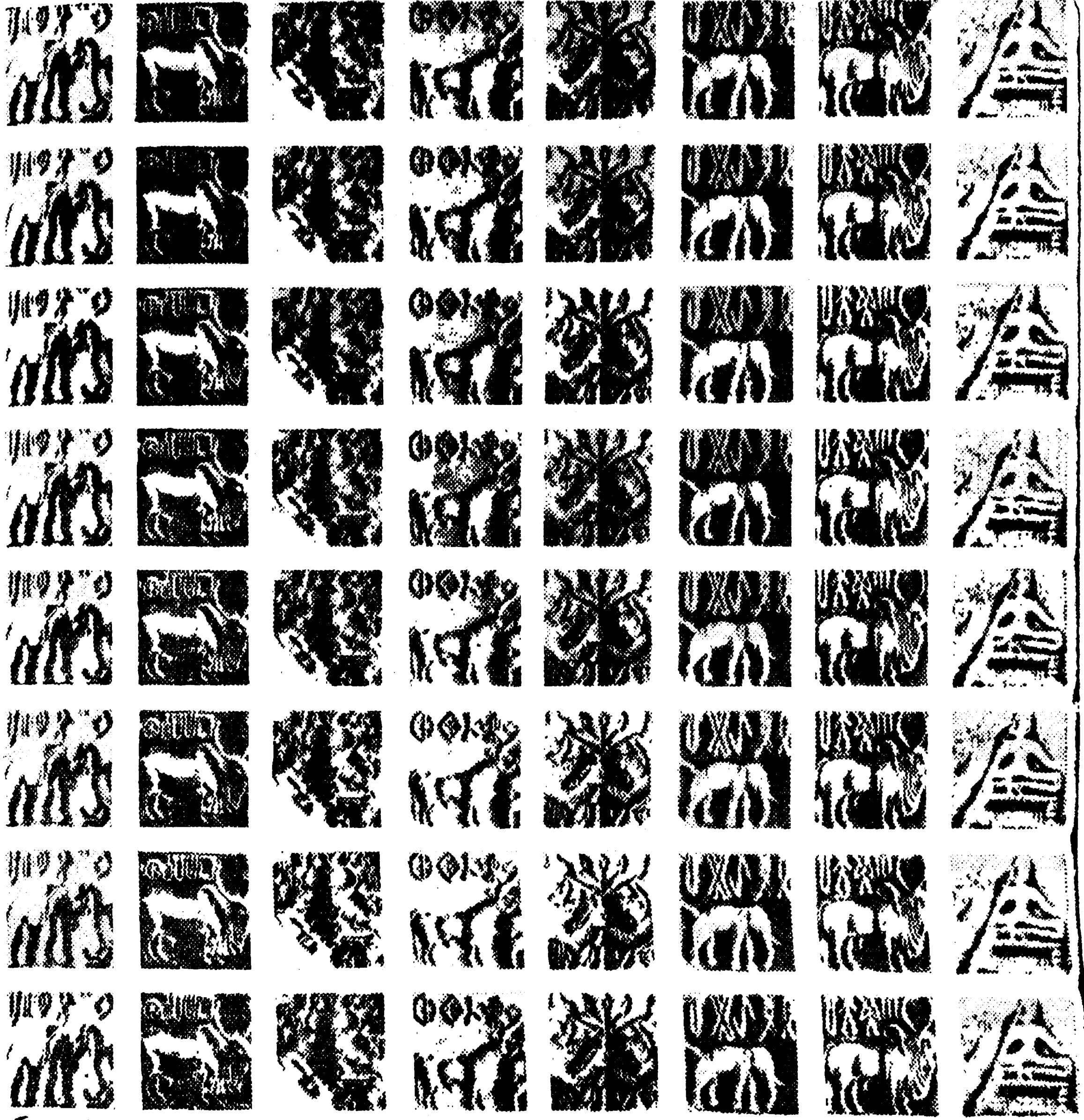
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও ভাষার বিকাশ

ভাষা বিকাশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এর মূল নীল নদী থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রমাণ পাওয়া যায়, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও মহেঞ্জোদাড়োবাসীরা লেখা পড়া জানত।

মাটির তৈরী এই সব শীলমোহর কে অক্ষরের মত ব্যবহার করা হত। আট আটটি করে এক একটি পঙক্তি সাজিয়ে এই চৌষট্টিটি শীলমোহর দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে এ-ও একটি।

কিন্তু মানুষ সব সময়ই নতুনের খোঁজ করে। যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভাব বিনিময়ের পদ্ধতির উন্নতি ঘটে।

আজ অভিনব কৌশলে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষ তার বাণী অবলীলাক্রমে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে।

অসীম শূন্যতার মাঝ থেকে আজ সে পৃথিবীর সংগে যোগাযোগ করছে। কিছুদিন আগেও ছিল এসব অচিন্তনীয়।

মানব প্রকৃতির এই জয়যাত্রায় যোগ দিয়েছে কম্প্যুটার। আই বী এম দ্বারা ভারতে প্রস্তুত এই কম্প্যুটার কৃষি বাণিজ্য, শিল্প, ব্যাংক, রেলওয়ে, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করছে।

মানবশক্তিকে আরও কাজে লাগাবার জন্যে মানুষ আজ প্রগতির সর্বক্ষেত্রে কম্প্যুটার ব্যবহার করছে।

IBM

mcm/ibm/118

মাথায় খুস্কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

Clinic
SHAMPOO
Contains: 0.15% 3.4.4' Trichlorocarbanilide
Clears dandruff from hair and scalp

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে কাজ করে।

ফেনা
চুল
মাথার খুলি
চুলের গোড়া

প্রতিষেধক এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 3130

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং স সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষান্মাষিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩১ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক- ২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 10th December, 1971 শুক্রবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ 52 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমৃন্ময় দাশগুপ্ত

‘এক নজরে’

অর্ধ-শত কোটি অলস মস্তিষ্ক : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আই-এল-ও’র এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, এশিয়ায় যে-হারে মানুষ বেড়ে চলেছে এবং যে-গতিতে শিল্প সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে ১৯৮০ সালে, অর্থাৎ আর মাত্র বছর-আষ্টেকের মধ্যে এই মহাদেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা অর্ধ-শত কোটি অতিক্রম করবে। অর্থাৎ গোটা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় যত লোকের বাস (যাদের সকলেই কর্মলিপ্ত), তত লোক কর্মহীন অবস্থায় বাস করবে এই মহাদেশে। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে একুশ বছরের কমবয়সী ছাত্রছাত্রীদের, অবসরভোগী ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এবং কর্মে অনাগ্রহী গৃহস্থবধূদের ধরা হয়নি। কাজ চেয়েও পাবে না শুধু এমন লোকের সংখ্যাই হবে পঞ্চাশ কোটি। আই-এল-ও’র ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীউইলিয়ম পেন্কস সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণকালে বলেছেন, সমস্যাটি বিশেষ গুরুতর হবে এই কারণে যে, ঐ বেকারদের বেশির ভাগই হবে ২৫ বছর বয়সের কম ছেলেমেয়ে, যারা হবে ১৯৮০ সালের এশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় ৫৮ শতাংশ। অর্থাৎ, পঞ্চাশ কোটি বেকার মানুষের মধ্যে প্রায় ত্রিশ কোটি হবে পঁচিশ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে। তারা যে নিজেদের সেই অবস্থাটাকে অনপনেয় দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেবে না, সেটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। সুতরাং আজকের ছাত্র-বিক্ষোভ বা যুব অশান্তি, যার মূল কারণ অনুসন্ধানে নানা ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার অবতারণা করা হচ্ছে, তা যে প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক কারণোদ্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই কারণেই এ-অশান্তি হ্রাস না পেয়ে দিনে দিনেই বৃদ্ধি পাবে এবং তার প্রতিক্রিয়া এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

এই অবস্থার প্রতিকারে বিশেষজ্ঞরা দুটি উপায়ের কথা বলছেন। প্রথমটি জন্মনিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়টি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ দুটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখা যাচ্ছে। এশিয়ার শতাধিক কোটি নিরক্ষর মানুষ সম্পূর্ণরূপে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং উন্নত দেশ-গুলির ঔদাসিকতায় অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতি বদ্ধ জলার মতো গতীহীন হয়ে রয়েছে।

নারী স্বল্পায়ু : আমাদের দেশে নারীদেরই আয়ুষ্মতী হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। পুরুষদের আয়ুষ্মান হতে বলতে বড় শোনা যায় না। চোখের সম্মুখেও আমরা বিগতদারের চেয়ে বিধবাদেরই অধিক সংখ্যায় দেখে থাকি। সেটা হয়ত ঐ আশীর্বাদেরই ফল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের জনতত্ত্ব বিভাগ সম্প্রতি যেসব হিসাব প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতসহ পৃথিবীর ছয়টি দেশে পুরুষ নারীর চেয়ে দীর্ঘজীবী। এ-ব্যাপারে ভারতের সঙ্গী হল আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও আপার ভোল্টা ও এশিয়ার জর্ডন, পাকিস্তান, সিংহল ও কম্বোডিয়া। বলা বাহুল্য, উল্লেখিত সবকটি দেশেই জন্মহার অত্যন্ত বেশি, এবং সেই কারণেই প্রসূতির মৃত্যু বেশি হয় বলে গড় হিসাবে নারীর আয়ু পুরুষের চেয়ে কম। অর্থাৎ, অশিক্ষা, অনগ্রসরতা ও জনস্বাস্থ্যের অনুন্নত অবস্থা এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে নারীর অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ।

বাইবেলে যে মানুষের আদর্শ আয়ু তিন-কুড়ি-দশ ধার্য আছে তা ইউরোপের মাত্র পাঁচটি দেশে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে পৃথিবীর একচল্লিশটি দেশে এখন নারীরা গড় হিসাবে হেসেখেলে সত্তর অতিক্রম করেন। তার প্রধান কারণ, সন্তান প্রসবকালে নারীর মৃত্যুর আশঙ্কা উন্নত দেশগুলিতে এখন নেই বললেই হয়। তাছাড়া নারীরা অন্দরমহলেই বেশি থাকেন বলে তাঁদের অকস্মাৎ ও অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কাও পুরুষদের তুলনায় অনেক কম।

রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষায় প্রকাশ, বর্তমানে সুইডেনের নারীরাই সর্বাধিক দীর্ঘজীবী। সে-দেশে একটি নারীশিশু ভূমিষ্ঠ হলে সে সাড়ে ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবে বলে আশা করা যায়। তারপরেই স্থান হল্যাণ্ডের মেয়েদের। তারাও অবলীলাক্রমে ছিয়াত্তর অতিক্রম করে যায়। দেখা যাচ্ছে যে, বাঁচার সমান সুযোগ পেলে নারীরা সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদের অতিক্রম করে যায়।

নৈতিক আপত্তি : একটি গুরুতর নৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন ধাত্রীদের সর্বভারতীয় সংস্থা—‘দি ট্রেনড নার্সেস এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া’। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন জীবন রক্ষার, জীবন হননের নয়। সুতরাং, সরকারের বর্তমান আইন অনুসারে কোন ধাত্রী যদি গর্ভপাতের কাজে সহযোগিতা করতে না চান, তবে যেন তাঁকে সে-কাজে বাধ্য না করা হয়। নার্স এসোসিয়েশনের মুখপাত্র বলেছেন, যেটা বিবেকের প্রশ্ন তাতে স্বাধীনতা অবশ্যই থাকা উচিত। গর্ভপাত মানে ত প্রাণীহত্যা, সেটা নৈতিক কারণে, ধর্মীয় কারণে, কিংবা ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম অনুসারে কোন কোন ধাত্রীর কাছে অসমর্থনীয় কাজ বলে মনে হতে পারে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় সরকারি হাসপাতালের বেতনভুক ধাত্রীর পক্ষে সরকারি আইন লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়, এবং সে-কারণে কোন ধাত্রী সহযোগিতা করতে না চাইলে তার চাকরি যাওয়ারই কথা। এটা এসোসিয়েশনের মতে, ধাত্রীদের পক্ষে একটা বড় রকমের উভয় সংকট। একদিকে বিবেকের তাড়না, অপর-দিকে চাকরির নিয়ম মেনে চলার বাধ্যবাধকতা। তাই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, তাঁদের যেন বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য না করা হয়।

লিপি উদ্ধার : হল্যাণ্ডের প্রখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ ইয়ান বেস্ট প্রায় এক দশক ধরে আমস্টার্ডম বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পর প্রাচ্যের প্রায় চার হাজার বছর পূর্বের একটি অজ্ঞাত বর্ণলিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হয়েছেন বলে দাবি জানিয়েছেন। ঐ বর্ণলিপি ইয়োক্‌স্ জাতির, যারা খৃষ্টজন্মের দু’ হাজার বছর আগে ককেসাস পার্বত্য অঞ্চল থেকে, আর্যদের ভারতে আসার সমকালে, এশিয়া মাইনর ও প্যালেস্টাইন হয়ে মিশরে গিয়েছিল এবং সেখানে প্রচলিত করেছিল ঐ লিপি ও সেই সঙ্গে নতুন সভ্যতা। উদ্ধৃত লিপি যে সেই চার সহস্রাব্দ পূর্বের সভ্যতার বহু রহস্য জাল উত্তোলনে সমর্থ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

দশ দিন পরে

নরমাংসক্ষুধিত শকুনি নাদির শাহের বংশধর ইয়াহিয়া খান আজ থেকে দশদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন, আর দশদিন, তারপর আর আমি পিণ্ডিতে থাকব না। যাব সমরক্ষেত্রে, ভারতের সংগে একহাত লড়তে হবে। তিনি কথা রেখেছেন। গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ঝাঁকে ঝাঁকে পাক বোমারু বিমান পাঠানকোট, অমৃতসর, শ্রীনগর, অবন্তীনগর, পুণ্ছ, উত্তর লাই, সাকার, আগ্রা, আম্বালা, ফরিদকোট প্রভৃতি পশ্চিম সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিমানঘাটি লক্ষ্য করে নগ্ন বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে যথেচ্ছভাবে বোমাবর্ষণ করে। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ যখন প্রকাশিত হবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই আরো অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে যাবে। কারণ পাকিস্তান পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থানুসারে এইবার পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করল। রেডিও পাকিস্তান এবং প্রায় ঐ একই সময়ে পিকিং রেডিও ঘোষণা করেছে যে, পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী পাকিস্তানী অগ্রবর্তী ঘাটিগুলির ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। ভারত ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বোমাবাজি করার ব্যাপারটি ঢাকা দেওয়ার জন্যই এই মনগড়া ও মিথ্যা প্রচার করা ছাড়া পাকিস্তান আর কি করতে পারে। যে রাষ্ট্রের অগ্রবর্তী ঘাটি এমনই বিপদের মুখে তারা কোন সাহসে একই সংগে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করতে সাহসী হয়—এই প্রশ্ন শিশুর মনেও জাগবে, অবশ্য যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগানো কঠিন। পাকিস্তান এই যে কৌশল প্রয়োগ করেছে রণনীতির দিক থেকেও তা অভিনব। আমরা পূর্বে যেমন অনুমান করেছিলাম ঠিক সেইরকম ঘটনাই ঘটছে। পাকিস্তান পায়ে পা বাধিয়ে একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যার দ্বারা তার মুরুব্বি রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ভারতকে নিন্দা করার সুবিধা হয়। সেই সুবিধাই পাকিস্তান করে দিয়েছে। তার মুরুব্বি বিদেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতের প্রতি রুষ্ট হয়েছে। কোনো কোনো প্রভাবশালী বিদেশী সংবাদপত্র ভারতের নিন্দা শুরু করে দিয়েছে। মার্কিন সরকার ত অস্ত্র সরবরাহের লাইসেন্স বাতিল করেছে এবং অনুন্নত দেশ হিসাবে সাহায্যস্বরূপ ভারতকে যে-ঋণ বা দান দেওয়া হয় তা বন্ধ করার হুমকী দিয়েছে। অবশ্য মার্কিন সরকারের মুখপাত্র চার্লস ব্রে বলেছেন, যা ঘটেছে তার জন্য ভারতকে ঠিক আগ্রাসী রাষ্ট্র বলা যায় না। ভারতকে কেউ কেউ অবশ্য এই জাতীয় সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন, কিন্তু এই জাতীয় সার্টিফিকেটের মূল্য কি!

বয়রা-সীমান্তে যখন তিনখানি পাকিস্তানী বিমান এবং তেরখানি ট্যাংক ধ্বংস হয়, তখনই পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরা একটা বড় রকমের ধাক্কা দেওয়ার মতলব ভাঁজছিল। পূর্ব বাংলায় বিশেষ সুবিধা হবে না এটা বোঝার মত বুদ্ধি তাদের আছে, বিশেষতঃ যখন মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ ক্রমশঃই জোরদার হয়ে উঠছে, তখন পূব-বাংলার মাটিতে ভারতকে না টেনে আনাই শ্রেয়। এই জাতীয় একটা ধারণা নিয়ে এইবার তারা পশ্চিম সীমান্তে লড়াইটা ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা ইতিমধ্যে আর এক কৌশলও ছেড়েছিল, পাকিস্তানে নবনিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অটলের মারফৎ তিনটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল যা আপাতঃদৃষ্টিতে মন্দের ভালো মনে হতে পারে। এই প্রস্তাব পাঠানোর পিছনে কিছু কালহরণের কুমতলব ছিল না এ-কথা কে বলতে পারে। সেই ফাঁকে হয়ত আরো একটু প্রস্তুত হওয়া যেত। এই ধরনের কৌশলেই মুজিবের সংগে দিনের পর দিন আলোচনা জীইয়ে রেখে পশ্চিম প্রান্ত থেকে রণসম্ভার আনা হয়েছিল পূব-বাংলায় ২৫শে মার্চের মধ্যে। ভারত যে এই ফাঁদে পা দেয়নি তার মধ্যে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের এক ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণদান করে রাজভবনে উপস্থিত হয়েই জানলেন পশ্চিম সীমান্তে পাক-আক্রমণের নৃশংসতার কথা। গভীর রাত্রিতে দিল্লী থেকে বেতার মারফৎ প্রধানমন্ত্রীর ভাবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'যুদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ। বাংলাদেশের—আমাদের। হে ভারতবাসী, দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য প্রস্তুত হন। সারা বিশ্বকে অনুরোধ করছি একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উৎসাদন রোধ করতে। আমরা এই আগ্রাসনের জবাব দেব। এর জবাব হবে সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য।'

এখন প্রতিটি ভারতবাসীর ধ্যানজ্ঞান হোক এক জাতি, এক প্রাণ, একতা। আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন। আমাদের মর্যাদা আজ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। এই নিদারুণ সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় স্বার্থে সকলকে সতর্ক হয়ে শত্রুকে রুখতে হবে। আগামী কালের মানুষ আমাদের ক্ষমা করবে না যদি আমরা দেহমনপ্রাণ মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্পণ না করি। জয় আমাদের অনিবার্য। কারণ আমরা শান্তি চাই। তবে স্বাধীনতা ছাড়া শান্তি কোথায়? প্রতিটি ভারতীয় আজ স্বাধীনতা ও শান্তির সৈনিক। এই বর্বর আগ্রাসনের উপযুক্ত জবাব ভারতবর্ষ দেবে। ৪-১২-৭১

পটভূমি

বর্ধমান পৌরসভার নির্বাচনে বিরাট সাফল্য যে এই রাজ্যে নতুন করে কংগ্রেসের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নানাদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফলে রাজ্যব্যাপী নির্বাচনের হদিস হয়ত পুরোপুরি পাওয়া যায় না, কিন্তু একটি পৌর নির্বাচনে ২৫টি আসনের মধ্যে ২১টিই যদি শাসক কংগ্রেস-প্রভাবিত ফ্রন্টের দখলে গিয়ে থাকে, তবে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে সেই ফলাফলের প্রভাব না-পড়ে পারে না।

বর্ধমানের সাফল্যকে কংগ্রেস এখন অনায়াসেই ভবিষ্যতের লড়াইয়ে রাজনৈতিক মূলধন হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। গত মার্চের নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য যে নিতান্তই আকস্মিক ছিল না এবং রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে যে দলের জনপ্রিয়তা কমেনি, এ-কথা এখন বেশ জোর গলায় বলতে পারে কংগ্রেস। ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'আধা-ফ্যাসিস্ত' শাসনের অভিযোগ ভোটদাতারা অগ্রাহ্য করেছেন, এ-দাবিও করা যেতে পারে। কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে বলেই ফেব্রুয়ারীতে বিধানসভার নির্বাচন করতে চাইছে না বলে সি পি এম যে-ধুয়ো তুলেছে, তার জবাব দেওয়ারও সুযোগ এনে দিয়েছে বর্ধমান। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিজে এই পৌর নির্বাচনে সাফল্যের জন্যে রাজ্য কংগ্রেসকে যে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তার উদ্দেশ্যও হল-কংগ্রেসকর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করা এবং এই সাফল্যকে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে কাজে লাগানোর জন্যে উৎসাহ দেওয়া। এই সাফল্যকে যে কংগ্রেস খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার কলকাতায় জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বর্ধমানের ফলাফলের উল্লেখ করেন কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সূচনা হিসেবে।

অন্য যে-কোনো পৌরসভার নির্বাচনে সাফল্যলাভের পরও অবশ্য কংগ্রেস এই সব দাবি করতে পারত। কিন্তু জায়গাটা যেহেতু বর্ধমান, তাই কংগ্রেসের সাফল্যটা সবাইকে এত অবাক করেছে, কংগ্রেসকর্মীদের এত উল্লসিত করেছে এবং সি পি এম নেতাদের এত ভাবিত করেছে। বর্ধমান পৌর এলাকাকে নিশ্চয়ই গোটা জেলার প্রতিভূ হিসেবে ধরা যেতে পারে না, কিন্তু সেটা জেলার প্রাণকেন্দ্র তো বটে আর সেই জেলারই প্রাণকেন্দ্র যে-জেলা সি পি এ'মর অন্যতম শক্ত ঘাঁটি। ঐ ধরনের শক্ত ঘাঁটি যে সি পি এমের আর নেই তা নয়, কিন্তু অনেকের মতে বর্ধমানকে সি পি এম একটা 'বেস এরিয়া' হিসেব গড়ে তোলারও চেণ্টা করেছিল।

পশ্চিমবাংলায় সি পি এম প্রভাবিত পাঁচটি প্রধান এলাকা হল কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী। পার্টির সক্রিয় সদস্য-সংখ্যার দিক থেকে বর্ধমানের স্থান ২৪ পরগণা ও কলকাতার পরেই। ১৯৭০ সালের গোড়াতেই বর্ধমানে সি পি এম সদস্য-সংখ্যা ছিল দু' হাজারের বেশি। তারপর ঐ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সি পি এমের কাছে বর্ধমান জেলার গুরুত্ব শুধু সদস্যসংখ্যা দিয়েই বোঝা যাবে না। এমনকি, মার্চে বিধানসভার নির্বাচনে সি পি এম যে একটি বাদে সবক'টি আসন এবং লোকসভার নির্বাচনে চারটির মধ্যে চারটি আসনই দখল করেছিল, তা থেকেও বর্ধমানে পার্টির শিকড় কতোদূর পর্যন্ত পৌঁচেছিল তা পুরোপুরি বোঝা যাবে না। সি পি এম নিশ্চয়ই সরকারীভাবে স্বীকার করতে চাইবে না, কিন্তু বর্ধমানে পার্টির লক্ষ্য ছিল একটি 'বেস এরিয়া' গড়ে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে পার্টি বহুসংখ্যক সারাক্ষণের কর্মীকে নিযুক্ত করেছিল। ঐ কর্মীদের কাজ হল চাষীদের সংগঠিত করা। কেউ কেউ বলেছেন, বর্ধমানে যে উদ্বৃত্ত চাষের জমি বিশেষ ছিল না, তাতে পার্টির কাজের বেশ কিছুটা সুবিধে হয়ে যায়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে যে-জমি দখল আন্দোলন শুরু হয় তার আঁচ বর্ধমানের গায়ে বিশেষ লাগেনি। তার কারণ ঐ উদ্বৃত্ত জমির অভাব। ঐ আন্দোলন যেমন অনেক চাষীকে উদ্বৃত্ত জমি দখল করতে সাহায্য করেছে, তেমনই ছোট-বড় চাষীদের মধ্যে তো বটেই, ছোট-মাঝারি চাষীদের মধ্যেও অনেক তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল। বর্ধমানে তা ঘটবার সুযোগ হয়নি। তাই পার্টির পক্ষে ভূমিহীন, গরীব ও মাঝারি চাষীদের একত্রে সংগঠিত করার সুবিধে হয়ে যায়।

সি পি এম অবশ্য বর্ধমানে কোনো বিপ্লবাত্মক সংগঠনের কাজে হাত দেয়নি। বরং চাষীরা বর্তমান আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকেও কীভাবে নিজেদের অধিকার নিয়ে লড়তে পারে, সে-কাজেই পার্টির কর্মীরা হাত দেন। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই সব কর্মীরা চাষীদের ভারতীয় দন্ডবিধির বিভিন্ন ধারা-উপধারার গুরুত্ব বোঝাবার কাজ শুরু করেন। কোনো গোলযোগ হলে আদালত থেকে কীভাবে তার প্রতিকার পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে চাষীদের অবহিত করাই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

কিষাণ ফ্রন্টে এই ধরনের সংগঠনের কাজ যেমন এগোতে থাকে, বর্ধমান জেলার শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজও তেমনই চলতে থাকে। দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকা যে সি পি এমের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটুর একটা বড় ঘাঁটি তা সকলেই জানেন। গত সেপ্টেম্বরে সিটুর যে প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তাও হল আসানসোলে।

তবু অনেকে এটা লক্ষ্য করেছেন যে, কিষাণ ও শ্রমিক, এই দুই ফ্রন্টেই সংগঠনের কাজ এগোতে থাকলেও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির দিক দিয়ে কিষাণ ফ্রন্টেই সি পি এমের সম্ভবতঃ বেশি সাফল্যলাভ ঘটেছে। এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে দুর্গাপুরে সি পি এমের আহ্বানে যে ধর্মঘট হয়েছিল তার ব্যর্থতার কথা। শ্রমিকদের আর্থিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ঐ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়নি, হয়েছিল রাজনৈতিক শ্লোগানের ভিত্তিতে ('সি আর পি হঠাও', 'এখনই নির্বাচন চাই' ইত্যাদি)। কিন্তু সেই ধর্মঘট যে শেষ-পর্যন্ত সি পি এম-কে ঐসব দাবি পূরণ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, শুধু রাজনৈতিক শ্লোগানের ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার মতো রাজনৈতিক চেতনা দুর্গাপুরের শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয়নি।

এরই একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখিত হয়ে থাকে আহ্লাদীপুর গ্রামের ঘটনার কথা। গত জুন মাসে বর্ধমানের ঐ
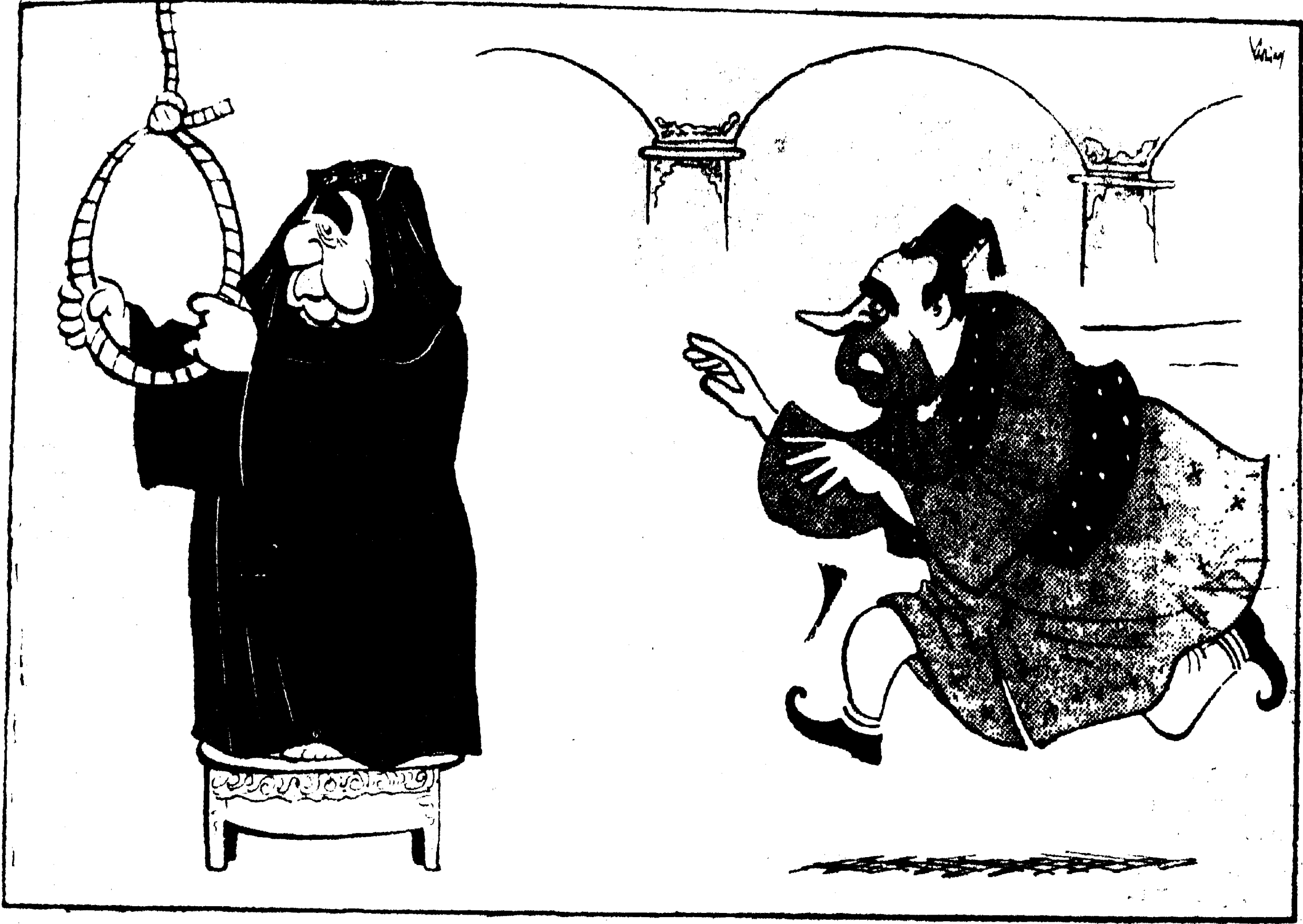
গ্রামে দু' দলের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সি পি এমের অভিযোগ, কংগ্রেসের লোক ঐ গ্রামের মানুষকে আক্রমণ করে। তার কারণ, ঐ গ্রামে সি পি এমের একজন সমর্থক আশ্রয় নিয়েছিল। আক্রান্ত হয়ে শুধু একজন সি পি এম সমর্থককে বাঁচাবার জন্যে ঐ গ্রামের মানুষ যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার তাৎপর্য এই যে, ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরিই রাজনৈতিক প্রতিরোধ, এর সঙ্গে গ্রামবাসীদের আর্থিক লাভের কোনো প্রশ্ন জড়িত ছিল না। আর এই প্রতিরোধকে সি পি এমের সফল সংগঠনের প্রমাণ হিসেবেই অনেকে মনে করতে চেয়েছেন।

•

বর্ধমান পৌর এলাকা পুরোপুরি শ্রমিক এলাকাও নয়, গ্রাম এলাকাও নয়। দুইয়েরই কিছু মিশ্রণ আছে এখানে, তার সঙ্গে আছেন অনেক মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। তাই পৌর নির্বাচনে কারা কোন্ দিকে গেছেন, তা এখনই বোঝা যায়নি। তবে শুধু 'কংগ্রেসী-গুন্ডাদের ভীতি প্রদর্শনের' ফলেই সি পি এমের বিপর্যয় ঘটেছে, এ-কথা প্রকাশ্যে বলা হলেও পার্টির নেতারাও তা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। তা যদি করতেন, তবে বর্ধমানের বিপর্যয়ের কারণ খুঁজে বার করার জন্যে পার্টির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার ওপর ভার দিতেন না। স্পষ্টতঃই পার্টি এই বিপর্যয়ের গভীরতর কারণগুলি খুঁজে বার করতে চায়। বর্ধমান পৌর এলাকার ফলাফলের ঢেউ রাজ্যের অন্যত্র গিয়ে আছড়ে পড়তে দেরি হলেও জেলার অন্যত্র পৌঁছে যেতে পারে সহজেই। তা যদি যায়, তবে সি পি এমের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ থাকবে যথেষ্টই, কারণ এতদিন ধরে পার্টি-কর্মীরা নীরবে যে-কাজ করে এসেছেন তা বানচাল হয়ে যাবে।

অবশ্য শুধু সি পি এমের ত্রুটিতেই বর্ধমানে এই অভাবনীয় ফলাফল হয়েছে, এ-কথা যে সত্যি নয় তা বোধহয় বলার দরকার নেই। কংগ্রেসের নতুন সাংগঠনিক উদ্যোগই এর প্রধান কারণ। বর্ধমানে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস রীতিমতো সক্রিয়। কংগ্রেসের তরফ থেকে যেটা বিশেষ উল্লাসের কারণ তা হল, ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের কর্মীরা সি পি এমের দুর্গে হানা দিয়েছেন এবং সি পি এমের দুর্গের মধ্যে লড়াই চালিয়ে জয়লাভ করেছেন।

বর্ধমানের লড়াই আরো একটা কারণে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু হবে কিনা সন্দেহ। জোট বাঁধার ছকের কথাই বলছি। বর্ধমানে দুই শিবিরে যে-সব দল একত্র হয়েছিল, তারা সাধারণ নির্বাচনেও একই পথে চলবে কিনা বলা মুশকিল। কারণ, পৌর নির্বাচনে স্থানীয় অনেক চাপ থাকে। যেমন ধরা যাক, ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা। এই দল বর্ধমানের নির্বাচনে ছিল সি পি এমের শিবিরে, অথচ ইদানিং ফরওয়ার্ড ব্লকের ঘোষিত নীতি হল, এই দল কংগ্রেস বা সি পি এম, কোনো জোটেই যাবে না। সুতরাং, সাধারণ নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক কী করবে, বর্ধমানের নক্সা থেকে তার হদিস পাওয়া ভার। আবার আর এস পি সম্বন্ধেও সঠিক করে কিছু বলা চলে না, কারণ আর এস পি-র পক্ষ থেকেও রাজ্য স্তরে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ ইতিমধ্যে হয়েছে।

তবে কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-এর গাঁটছড়া বোধহয় একরকম পাকা। এটা অবশ্য সি পি আই-এর দেশব্যাপী নীতি। সুতরাং বর্ধমানের পরীক্ষার সাফল্যের পর বিধানসভার নির্বাচনেও হয়ত সেই পরীক্ষিত ফর্মুলা প্রয়োগ করা হবে। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। বর্ধমানে সি পি এমের শোচনীয় পরাজয়ের পরও কিন্তু সি পি আই তা নিয়ে খুব একটা হৈ-চৈ করছে না। তার কারণ, বর্ধমানের জোটে সি পি আই ছিল নিতান্তই ছোট শরিক। সি পি আই প্রার্থী ছিলেন মোটে একজন। তিনিও জিততে পারেন নি।

৪-১২-৭১ —দৈবদত্ত

আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি

দেশে বিদেশে

এক সপ্তাহের ঘটনায় ভারত ও পাকিস্তানে একটা যুগান্তরের ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ইতিহাসের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবার সেটা নূতন আর একটা পথের বাঁকে এসে দাঁড়াল। সেদিনকার পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছিল আট মাস আগেই ২৫ মার্চ তারিখে। অনেক দ্বিধা-সংশয় ও সতর্ক বিবেচনার পর ভারত সেই মৃত্যুকে এবং পূর্ব দিগন্তে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নব-সূর্যোদয়কে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিল।

ভারতবর্ষের বুকের উপর ইয়াহিয়া বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, পাকিস্তানের যুদ্ধঘোষণা, ভারতের পাল্টা আঘাত, সোভিয়েট রাশিয়ার ভিটোতে।

আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বানচাল, বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের স্বীকৃতি দান, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ, এইসব ঘটনা নাটকীয় দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেল।

*

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর কথা রেখেছেন। চীনা মন্ত্রী লিউ সুই-চিংকে সাক্ষী রেখে তিনি বলেছিলেন, দশদিনের মধ্যে তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবেন। একথা তিনি বলেছিলেন ২৫ নভেম্বর তারিখে। এক সপ্তাহ পার হতেই ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিমান একযোগে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের অনেকগুলি বিমান ক্ষেত্রে হামলা চালিয়ে ভারতের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

পাকিস্তানের তরফ থেকে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা এল অবশ্য কয়েক ঘন্টা পরে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায়, এইভাবে পাকিস্তান "বাংলাদেশের যুদ্ধকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত" করল।

অথচ ভারত যতদিন পেরেছে এই পরিণামই এড়াবার চেষ্টা করেছে। আট মাস সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। সে আশা করেছে, ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকরা বাংলাদেশের প্রশ্নটিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে রাজনৈতিক মীমাংসার উপায় সন্ধান করবেন, আশা করেছে, বিশ্বের অভিভাবক রাষ্ট্রগুলি ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই ধরনের একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য ইসলামাবাদের উপর চাপ দেবে, আশা করেছে, এক কোটি আশ্রয়প্রার্থীর নিজের নিজের ঘরদুয়ারে ফিরে যাওয়ার অনুকূলে পরিস্থিতি তৈরি করা হবে। তার সব আশা ব্যর্থ হয়েছে। ভারত তার সেই হতাশার কথা ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর কন্ঠে জানিয়েছে। তবু ভারত একটা সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চায় নি। বরং সীমান্তে হানা দিতে এসে পাকিস্তান যখন তার তিনটে বিমান

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

গোয়াল. ঐ সীমান্তে ১৩টি পাকিস্তানী ট্যাংক যখন ঘায়েল হল, বালুরঘাট, হিলি, আগরতলায় যখন পাকিস্তানী কামানের গোলা এসে পড়তে থাকল তখনও কিন্তু ভারত এইসব ঘটনার মধ্যে "যুদ্ধ" দেখে নি, শুধু "স্থানীয় সংঘর্ষই" দেখেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ যখন নিজের দেশে "জরুরী অবস্থা" ঘোষণা করলেন তখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বললেন, পাকিস্তানের কাজে বাধ্য না হলে ভারত "জরুরী অবস্থা" ঘোষণা করবে না।

কিন্তু ভারত যে যুদ্ধ চায় নি সেই যুদ্ধই ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া হয়তো পাকিস্তানের মিলিটারি শাসকদের অন্য উপায় ছিল না। পূর্ব দিকে ইসলামাবাদের দখলদার ফৌজের পা রাখারই জায়গা নেই। সেখানে তাদের ভিতরে শত্রু, বাইরে শত্রু। মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের ৫৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল পাকিস্তানের অধিকার থেকে মুক্ত করেছেন। এর মধ্যে ২৩২০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীহট্ট, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, রাজশাহী ও যশোহর জেলার ৬২টি থানা এবং নোয়াখালি জেলার সমস্ত চর এলাকা জুড়ে আজ বাংলাদেশ সরকারের আধিপত্য। অন্যদিকে, ভারতীয় বাহিনী প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে হামলাকারীদের শায়েস্তা করে আসার নীতি গ্রহণ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে, অনুমান করা কঠিন ছিল না, ইসলামাবাদের মাথামোটা শাসকরা বাংলাদেশের লড়াইকে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ে পরিণত করার এবং নিজেদের দেশের মানুষের মনোবল ঠিক রাখার মরিয়া প্রয়াসে পশ্চিমে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলবে।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান

আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি

কিন্তু সেই প্রত্যাশিত পাকিস্তানী আক্রমণ যে এমন বিনা প্ররোচনায় এত দ্রুত, এত বিরাট এলাকা জুড়ে, এমন সুপরিকল্পিত ও অতর্কিত বিমান হানার আকার নেবে তা সম্ভবত ভারতও অনুমান করতে পারে নি। বাধ্য হয়েই বিমান সেনাপতি এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার তাঁর বাহিনীকে পাকিস্তানের "দুষ্ট সমরযন্ত্র" ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, রাত্রিতেই প্রেসিডেন্ট গিরি "জরুরী অবস্থা"র ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং কলকাতা থেকে তাড়াতাড়ি বিমানে দিল্লীতে গিয়ে মধ্য রাত্রির পর বেতারে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জানিয়েছেন, "৩ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে পাঁচটার কিছু পরে পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর আক্রমণ শুরু করেছে। দেশকে যুদ্ধের ভিত্তিতে দাঁড় করান ছাড়া এখন আমাদের অন্য উপায় নেই।"

৩ ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান যখন শ্রীনগর, পাঠানকোট, অমৃতসর, অবন্তীপুর, উত্তরলাই, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে এই অতর্কিত হামলা চালাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন কলকাতায় ছিলেন। স্থলবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মানেকশ টেলিফোনে পূর্বাঞ্চলের সেনানায়ক লেঃ জেনারেল অরোরাকে এই হামলার খবর দিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে এই খবর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে খবর পাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী রাজধানী অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁর অন্য প্রোগ্রাম বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গেলেন। বোম্বাই থেকে খবর পেয়ে দিল্লীতে ছুটে এলেন অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি চাবন। ঐ রাত্রেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে ও বিরোধী দলগুলির নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। সেই আলোচনার শেষেই তৈরি হল "জরুরী অবস্থার" ঘোষণা এবং ভারত রক্ষা বিলের খসড়া।

এই জরুরী অবস্থার ঘোষণা যখন শনিবার লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশনে পেশ করা হল তখন উভয় সভারই সদস্যরা বিনা আলোচনায় ও সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণাটি অনুমোদন করলেন।

এই উপলক্ষে সংসদের উভয় কক্ষে পাকিস্তানের আক্রমণের মোকাবেলায় যে ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের মনোভাব প্রকাশ পেল সেটা এক কথায় অভূতপূর্ব। সংগঠন কংগ্রেস, সি-পি-এম, সি-পি-আই, ডি-এম-কে, মুসলিম লীগ, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতি দলের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানী হামলা রুখবার সংকল্প ঘোষণা করলেন এবং এই হামলার জবাব দেওয়ার জন্য সরকারের সমস্ত ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানালেন। এর আগে ভারত ১৯৬২ সালে চীনের দ্বারা এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু সেসময়ে ভারত সরকার বিরোধী দলগুলির সকলের কাছ থেকে এমন একযোগে সমর্থন লাভ করেন নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আশা প্রকাশ করেছেন যে সংসদে যে সংহতি প্রকাশ পেল তা আমাদের এরপর সামনের কঠিন দিনগুলিতেও অটুট থাকবে।

জাতির এই অকুণ্ঠ সমর্থনে বলীয়ান হয়ে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের দুঃসাহসের উপযুক্ত জবাব দিতে আরম্ভ করেছে। ভারতীয় বিমান পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি বিমানঘাঁটিতে গিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীকে শিক্ষা দিয়ে

এসেছে। কলকাতায় পূর্বাঞ্চলের সেনাপতি ঘোষণা করেছেন, তাঁর উপর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পূর্ববঙ্গে তাঁর বাহিনীকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই বাহিনী পূর্ববঙ্গ থেকে খান সেনাদের হঠিয়ে দিয়ে সেখানে লোকায়ত্ত সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে সাহায্য করবে। তিনি আরও বলেছেন যে, এখন থেকে ভারতীয় বাহিনী পূর্ববঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ চালাবে।

এইভাবেই বাংলাদেশের আগুনকে গোটা উপমহাদেশে ছড়িয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি-সংগ্রামকে ৫৫ কোটি ভারতবাসীর জাতীয় নিরাপত্তার সংগ্রামের সঙ্গে একাকার করে দিলেন।

এই "এস্কেলেশন"-এর শেষ ধাপ যদি তৈরি করে থাকেন জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর অনুচররা তাহলে এর আগের কয়েকটা ধাপ তৈরির কৃতিত্ব প্রাপ্য বিশ্বের কয়েকটি মুরুব্বি দেশের এবং রাষ্ট্রসংঘের। সমস্যার মূলে গিয়ে এ'রা ইসলামাবাদের খুনীদের রক্তাক্ত হাত চেপে ধরবেন, এই আশায় ভারত অপেক্ষা করে ছিল। যে ধৈর্যের সঙ্গে ভারত আশ্রয়প্রার্থীদের ভার বহন করে চলেছে তার জন্য সে অবশ্য বিশ্বসমাজের প্রশংসা লাভ করল; কিন্তু একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া আর কাউকেই ইসলামাবাদের হত্যাকারীদের সংযত করতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ভারতের (এবং "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" সোভিয়েট রাশিয়ার) অভিসন্ধি আবিষ্কার করে চীন ইসলামাবাদের পিছনে এসে দাঁড়াল। মুসলমান-প্রধান দেশগুলিও তাই করল। পাকিস্তানের উপর প্রকাশ্যে অতিরিক্ত চাপ দিলে সে বিগড়ে যাবে, এই অছিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করে যেতেই থাকল। "পাকিস্তান আমাদের কথা শুনবে না" বলে বৃটেনও হাত গুটিয়ে রইল। বিদেশের সংবাদপত্রেই যখন পূর্ব বাংলায় টিক্কা-নিয়াজি বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের খবর বেরোতে থাকল তখনও সেসব দেশের সরকার মুখ খুললেন না; কিন্তু পাছে ভারত মাথা গরম করে বসে সেই উদ্বেগে এই মুরুব্বিরা বরাবরই বিচলিত। আমেরিকা হুমকি শুনিয়ে রাখল, ভারত পাকিস্তান লড়াইয়ের সঙ্গে চীন যদি জড়িয়ে যায় তাহলে কিন্তু আগের বারের মতো এবার আমেরিকা ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। আসল সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে জল ঘোলা করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক আমদানি করার চেষ্টা চলতে থাকল।

প্রধামমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা, বৃটেন, পশ্চিম জার্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সফর করে আসার পর এমন একটা ধারণা দেখা দিল যে, পূর্ববঙ্গে মিলিটারির হামলা বন্ধ করে আলোচনা আরম্ভ করার প্রয়োজনটা তিনি ঐসব দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বুঝিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এ'রা ভিতরে ভিতরে ইসলামাবাদের উপর চাপ দেবেন এমন একটা কথাও শোনা গিয়েছিল।

কিন্তু এইসব ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী যেসব রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তাঁদের কেউ ইয়াহিয়া খাঁকে বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য চাপ দিয়েছেন বলে খবর নেই। উপরন্তু ভারত পাল্টা মার শুরু করতে না করতেই তার উপর চাপ আসছে। আমেরিকা ঘোষণা করেছে, ভারতকে অস্ত্র সরবরাহের সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। এদিকে বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি ভারতের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে, এমনকি গার্ডিয়ানের মতো যেসব বৃটিশ সংবাদপত্র এতদিন পর্যন্ত তীব্র ভাষায় পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে ধিক্কার দিয়েছে তারাও সুর বদল করেছে এবং লন্ডন থেকে পি-টি-আইয়ের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, বৃটেন হয়ত শীঘ্রই ভারতকে "আক্রমণকারী" বলে ঘোষণা করতে পারে।

বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে যে ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে তার একটি নমুনা পাওয়া যায় "ইকনমিস্ট" পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায়। "নিউইয়র্ক টাইমস্"-এর সিডনি শ্যামবার্গের একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে "ইকনমিস্ট" লিখেছেন, শ্যামবার্গ নাকি বয়রাতে (ভারতীয় সেনা-বাহিনীর) ট্রাক ও ট্যাংকের কনভয়কে সীমান্ত অতিক্রম করে যেতে দেখেছেন, এগুলিতে শুধু যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শিখরা ছিল তা নয়, প্রিফ্যাব্রিকেটেড ব্রিজ এবং কম্যান্ড পোস্টের জন্য ফার্নিচারও ছিল। এই সময়ে ভারতীয় বাহিনীর আঘাত হানার কারণ কি হতে পারে, সেবিষয়ে ইকনমিস্ট পত্রিকা অনেক জল্পনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, বর্ষার শেষে এখন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি এলাকায় ট্যাংক চালাবার সুবিধা হয়েছে, এটা একটা কারণ হতে পারে। দ্বিতীয় একটা কারণ এই হতে পারে যে, ভুট্টো পিকিং থেকে হতাশ হয়ে ফেরায় এবং চীনারা ভারতের প্রতি কিছু বন্ধুত্বসূচক কথা বলায় ভারত এখন হয়তো বুঝেছে, পাকিস্তানের হয়ে চীন হস্তক্ষেপ করবে না। তৃতীয় আর একটি কারণ এই হতে পারে যে, সিংহল এতদিন পাকিস্তানী বিমানকে সেদেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের যে সুযোগ দিচ্ছিল সেটা বন্ধ করে দিতে ভারত সিংহলকে সম্প্রতি রাজী করাতে পেরেছে। এইসব জল্পনা-কল্পনার মধ্যে "ইকনমিস্ট" পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখক-দের একবারও মনে হয় নি যে, পাকিস্তানের মুরুব্বি দেশগুলি ইয়াহিয়াকে সংযত করে নি, বাংলাদেশ থেকে আশ্রয়-প্রার্থীদের আসা বন্ধ হয় নি এবং ইতিমধ্যে যারা এসেছে তাদের ফিরে যাওয়ার মতো পরিবেশ আদৌ তৈরি হয় নি। উপরন্তু ইকনমিস্ট পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছেন, পাশ্চাত্য দেশগুলির সরকার যখন শ্রীমতী গান্ধীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইয়াহিয়া খাঁর উপর চাপ দিচ্ছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যখন তাঁর রমজান বক্তৃতায় নরম সুরের কয়েকটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করে সেই চাপে সাড়া দিচ্ছিলেন তখনই ভারত কেন এই আঘাত হানল।

বিদেশ থেকে এই ধরনের চাপের সামনে প্রধানমন্ত্রী গত ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর দুটি অত্যন্ত জোরালো বক্তৃতা দিয়েছেন। দুটি বক্তৃতারই ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। প্রথম বক্তৃতাটি তিনি দেন রাজ্যসভায়। এতে তিনি একটি নূতন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় "মনরো ডকট্রিন", "ব্রেজনেভ ডকট্রিন" প্রভৃতি কথার সঙ্গে আমরা পরিচিত। এইসব তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতি তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিধি নির্দিষ্ট করে দেয়। অনুরূপভাবে এই 'ইন্দিরা ডকট্রিন' বা 'ইন্দিরা তত্ত্ব'-এর মধ্য দিয়ে একথা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আজকের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যের উপস্থিতিতেই ভারত তার নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর বলে গণ্য করবে। বাংলাদেশে গণহত্যা চলতে থাকবে, এটা ভারত নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু দেখে যেতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই বিবৃতির দ্বারা এই সর্বপ্রথম ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত করলেন। এতদিন এই সম্পর্কটা ছিল অনেকটা পরোক্ষ, শুধু আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার সূত্রে জড়িত।

প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় বক্তৃতায় পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ দেশগুলি ও রাষ্ট্র-সংঘ সম্পর্কে ভারতের হতাশা ও মোহ-ভঙ্গের ঘোষণা অত্যন্ত রূঢ় স্পষ্টতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। নিজের বাসভবনে কংগ্রেসকর্মীদের এই সভায় শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন "তিন কি চার হাজার মাইল দূরে থেকে কোন জাতি যখন তার বর্ণাধিপত্যের ভিত্তিতে তাদের অভিরুচিমাফিক কাজ করার নির্দেশ দিতে পারত সেসময় এখন পার হয়ে গেছে। ভারত বদলে গেছে এবং সে এখন আর নেটিভদের দেশ নয়।

ঐ বক্তৃতায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তানী বাহিনী পশ্চিম সীমান্তে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে মোতায়েন হওয়ার পর দশদিন পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীকে ঐ সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয় নি। "আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকদের কাছে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। খোঁজখবর নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকরা জানালেন, পাকিস্তানীরা সামরিক মহড়া দিচ্ছে, দশদিন বাদে তারা সরে যাবে। দশদিন কি এখনও শেষ হয় নি? এইসব ঘটনা যখন ঘটছে তখন আমরা তাঁদের উপর বিশ্বাস রাখি কি করে?"

ভারতবর্ষ যে পথ নিয়েছে সেই পথে চলতে গিয়ে এবার সে কোন আন্তর্জাতিক চাপের কাছেই নতিস্বীকার করবেন না, এই নোটিশ ভারত দিয়ে দিয়েছে।

৬-১২-৭১ —পুণ্ডরীক

কাঠের ঘোড়া

নিখিলচন্দ্র সরকার

মাঝে মাঝেই আমার এমন হয়, কেন হয় জানি না। আর মনের এই অবস্থাটা বোঝবার জন্যে চেষ্টা করেও বোঝাতে পারি না। কেন জানি হাতের কাছে মনের মতন কোন উপমা খুঁজে পাই না আমি। অথচ একটা কোন তুলনা না দিতে পারলে স্বস্তি বোধ করি না। খালি মনে হয় আমি যেন সকলের কাছেই দুর্বোধ্য, জ্যামিতির কোন জটিল একস্ট্রা, সহজে যার সমাধান সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত, তুলনা চলে এমন একটা বস্তু আমি পেয়েছি, যদিও আমার মনের মতন হয়নি। ধরা যাক স্রেফ গাড়ী, হ্যাঁ, যে কোন একটা গাড়ী। স্টার্ট দেওয়া হলো, গাড়ীটা চলতে শুরু করল, সামান্য চলতে না চলতেই কলকব্জায় গোলমাল, গতি থেমে গেল, ছন্দ থাকল না। আমি বলি, আমাদের জীবনটাও অনেকটা এরকম। ওই যে জন্মের সময় পা দুটো শূন্যে ঝুলিয়ে দম [illegible] দেওয়া হলো, আমি জানি, ঘড়ির কাঁটার মতন টিক টিক শব্দ করতে করতে ওটা একসময় নির্ঘাৎ থেমে যাবে; কলকব্জা সারাবার আর সুযোগ দেবে না। নাঃ, মনোমত হলো না তুলনাটা। তাছাড়া গাড়ীর সঙ্গে জীবনের মিলের চেয়ে অমিলটাই যে বেশী। তা হোক।

আমার কথাটথা শুনে বন্ধুরা কি ভাবে জানি না, জানলেও এ সময়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আত্মীয়-স্বজনেরা নানা উপদেশ দেয়; মা বলে, আমার স্বাস্থ্য ভীষণ ভেঙে পড়েছে, ভাল কোন ডাক্তার দেখানো উচিত, পাড়ার ধারকরা ডাক্তার-ওষুধে আর চলবে না, এমন তো নয় কোন পয়সা লাগে না, দেরীতে হলেও দিতে হয়। দাদার কথা হলো খাওয়া-দাওয়াটা একটু ভাল করা দরকার এক-আধ টুকরো টাটকা মাছ, পেয়াজটাক হলেও দুধ [illegible] চলবে। [illegible] চিঠি লেখে [illegible] ওখানে [illegible] কিছুদিন থাকতে, ওর গরুটা মাসখানেক হলো দুধ দিতে সুরু করেছে, শাক-সব্জি মাছটাছ খুব টাটকা ওখানে, কাছেই নদী, জেলেরা মাছ ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যায়। আসল কথা, আমার জন্যে সবাই একটু ভাবছে এখন। মনটাকে ফুর্তিতে রাখা, আরো নানান সব ফর্দ। আমি টের পাই, আমার জন্যে এ'দের কী গভীর উদ্বেগ, চাপা অশান্তি! হয়ত অন্যরকম কিছু ভাবছে। বেশ মজা লাগে।

এ সময় কেন যেন আমার ভোলানাথ-বাবুর কথা মনে পড়ে। ভোলানাথবাবু আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই ছিলেন। শুনেছি, এখন আর তিনি বেঁচে নেই। আমরা তখন টেন-ক্লাসে পড়ি, তিনি প্রায় সময়ই বলতেন, কেন বলতেন জানি না, আমাদের জীবনের চারপাশে নাকি শুধু [illegible] দেখছি, একটানা নেশা আর নেশা, [illegible] নেশা, এক এক বয়েসের এক [illegible] চাসতেন আবার বলতেন। নিজের গায়ের কোঁচকানো

চামড়াটা টেনে ধরে দেখাতেন: ওরে, এই যে ঢিলেঢালা চামড়া দেখছিস, এগুলো তোদের মতনই ভরাট আর কোমল ছিল একদিন। মজার ব্যাপার ভেবে আমরাও খুব হাসতাম। আসলে আমরা শুনেছিলাম, ভোলানাথবাবু একটু আধটু আফিং খান। অনেক সময় ক্লাসেও ঘুমোতেন, রীতিমতো ঘুম যাকে বলে। সেদিন এর অর্থটা বুঝিনি, আজো যে পুরোপুরি বুঝেছি, এমন কথা সাহস করে বলতে পারি না। কোঁচকানো চামড়া দেখিয়ে ভোলানাথবাবু কী বোঝাতে চাইতেন! এমন কি কিছু, জীবনটা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, অথচ কিছুই তো করা হলো না, কোন দুঃখ, অনুশোচনা বা আত্মগ্লানিটানি, কে জানে।

আমিও বন্ধুদের বলি, এই সাজানো নেশার পাত্রগুলোই জীবনের আসল রহস্য। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এই মুহূর্তে আমি অনেক চেষ্টা করেও তা মনে করতে পারব না। ভাবটা অনেকটা এই রকম, তোমার চারপাশে প্রকৃতির এত যে ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার ছড়ানো, এগুলো আর কিছুই নয়, তোমাদের মংগলের জন্যেই এবং প্রভুর কাছে যাওয়ার জন্যেই তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। এই গাছ-গাছালি, তরুলতা পাখি ফুল ফল নদী পাহাড় ঝর্ণা সমুদ্র আকাশ সব কিছুই তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে টানছে, নিয়ত শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যাবে। তিনি করুণাময়, এসবের ভেতর দিয়েই তাঁর করুণা অজস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে।

মাঝে মাঝে প্রান্তরে আঁধার নেমে এলে, সেই আঁধারে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে অনন্তবিস্তার নভোলোকের দিকে চেয়ে থেকেছি, রক্তের মধ্যে যেন কিসের উত্তাপ তখন। সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সব যেন ভুলে যেতাম, পাহাড়ে চড়ে গাছ-পালা পাখি দেখতে দেখতে মনে হতো, আমার এই আস্ফালনের কোন মানে হয় না। এগুলো আমার হয়। এও এক ধরনের নেশা।

ভোলানাথবাবু ঠিকই বলতেন, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন স্ত্রী-পুত্র সংসার এগুলো? এগুলোও নেশা, তবে এর রঙটা একটু ভিন্ন। সিঁড়ির মতন সব সাজানো। ধাপে ধাপে নেমে গেছে। প্রতিটি সিঁড়িতেই আমাদের পা রাখতে হয়। একেবারে শেষ সোপানে পা দিয়ে মনে হয়, সত্যি ভেলকিবাজির মতন সবই ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল, আর ফিরে পাওয়া যায় না!

মাঝে মাঝে এর নেশা কেটে যায়, যেমন আমার হয়। সিঁড়ির প্রায় মাঝামাঝি এসে আমার হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমি কিছুই এখনো করতে পারিনি। এতদিনে ভাল ভদ্র-গোছের একটা চাকরি আমার পাওয়া উচিত ছিল, আমি তা পারিনি, এমন কি, বিয়েও না। আমার হাত থেকে এই সময়টা টুক করে কখন পড়ে গেছে।

এই ঘোর ঘোর অবস্থায় আমার অনেক কিছুই মনে হয়। সব কিছু কেমন বাসি, আবর্জনায় সামিল। কোন কিছুতেই আর উৎসাহ বোধ করি না তখন। কিছুই ভাল লাগে না আমার। এই বেঁচে থাকা এবং এর সঙ্গে কারো একটা খেয়াল বলে মনে হয়। দুম করে অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিই আমি, রোজ রোজ ট্রামে-বাসে ঝুলেতে ঝুলতে, ধাক্কা, মারামারি করতে করতে কাজে যাওয়া একঘেয়েমি। এই একঘেয়েমি আমার ভীষণ অপছন্দ। যদিও বড়বাবু এতে ক্ষুন্ন হবে জানি, তবু, তবুও না। অথচ কোন কারণ নেই এর। মনে হয় আমার বুঝি দম ফুরিয়ে যাবে। কত হিজিবিজি ভাবনা। কেন এমন হয় আমার! এ বয়েসে তো এসব হওয়ার কথা নয়। চোখের সামনে আমি বাবাকে দেখেছি: একটা সময় কী দাপট নিয়েই না সংসার করেছেন আমার বাবা। রেগে গেলে বাবার সামনে দাঁড়াতে আমার বুক কী ঢিপঢিপই না করত। বাবার অন্যরূপও আমি দেখেছি। অথচ সেই বাবাকেই একদিন আমাদের চোখের সামনে অন্যরকম হতে দেখেছি। সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কেমন উদাসী পুরুষ হয়ে কাটিয়ে গেছেন শেষের কটা বছর। তিনি যে চলে যাবেন, এটা কি আগে থাকতেই টের পেয়েছিলেন? ভেবে দেখেছি, বয়েস হলে বোধ করি এমনটাই হয়। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপরও প্রবীণতার ভীরু ভীরু ছায়া নেমে আসে। হয়ত এই-ই জীবনের শর্ত, ধর্মও বলা যায়। বৈরাগ্যের সুরে মন-প্রাণ ভরে থাকে, কোন অসীম শক্তিমান জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে যেন নিবেদিত। এ সবই আমার অনুমান। মনের মধ্যে একটা কথা ভাঙা রেকর্ডের মতন কেবলই ঘুরপাক খায়। পৃথিবী, তাই বা কেন, নিজের রচিত বাস-ভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় সব মানুষেরই কি এমন হয়? একধরনের বৈরাগ্য, নিস্পৃহ নির্বিকার ভাব! হওয়াটাই হয়ত স্বাভাবিক, কেননা ভরা যৌবনও শেষ হয়ে আসে। রূপান্তর তো প্রতি মুহূর্তের।

আমার মনের এই ছবিটা স্পষ্ট হলো, বাবা যেবার মারা গেলেন। অবশ্য ছোট-খাটো কাজ অনেক আগে থাকতেই সুরু হয়েছিল। সেবার এই ঘোরভাব কাটতে আমার বেশ কদিন সময় লেগেছিল। আমার খালি মনে হতো, আমার সঙ্গে বাবার সম্বন্ধটা কি শেষ হয়ে গেল? অনেকেই অনেক কিছু বোঝাত, আমার শোক যাতে কমে। কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না। আমার শোক আরো বাড়তই এতে। আশ্চর্য, বাবার তৈরী সাজানো সংসারেই আমি হাঁটাচলা করে বড় হয়েছি। অথচ সেই বাবাই চলে গেলেন, কোথায় গেলেন আমি জানি না: শাস্ত্র যেভাবে বলে এতদূর আমি ভাবতেও পারি না, আসলে আমার অনুভূতি এতদূরে যায় না। বাবা কি সেই পরম কোন কাম্য ধামে গেছেন? আমিও কি ওখানেই যাবো,—মা, আমরা, ভাই-বোন সবাই?

আমার শুধু মনে হতো, চোখের সামনে একজন মানুষকে দিনরাত দেখেছি, এখন দেখছি না। অথচ তাঁর সব কিছু এখানে পড়ে থাকল, স্মৃতির মতন। জামা কাপড়, দাবা খেলার সরঞ্জাম, এমন কি বাবা বাড়িতে যে খড়মজোড়া পরতেন তাও রয়েছে, তাঁর ভালবাসার সবই তো পড়ে রইল। আমি এগুলো দেখি আর দেখি, বুকের ভেতরটা যে কী করে না তখন! আমার মা, মাও কি এভাবেই চলে যাবে? মার দিকে চাইতে আমার কী যে কষ্ট হয়?

আমার ঘরের কোণে বাবার আরো একটা জিনিস রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে। বহুকালের কাঠের একটা ঘোড়া। একটা পা ভেঙে গেছে, অকেজোর মত এককোণায় পড়ে থাকে। রথের মেলা থেকে বাবা আমার জন্যে কিনে এনেছিলেন। ছেলেবেলায় রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুরের গল্প শুনতে শুনতে আমি বায়না ধরে-ছিলাম, আমারও পঙ্খীরাজ চাই। রথের দিনে আশায় আশায় থেকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একসময়, বাবা আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনে পঙ্খীরাজের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই নে খোকা তোর পঙ্খীরাজ, এর পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকন্যেকে আন গে যা এবার।' মা খুব হাসছিল, আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিল।

মনে আছে সেদিন থেকেই এই কাঠের ঘোড়াটা আমার মস্ত বড় সঙ্গী হয়েছিল। ওর পিঠে চড়ে আমি 'হ্যাট-হ্যাট' করে বেত মারতাম, ভাবতাম ওটা আমাকে শেষ পর্যন্ত তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সেই রাজকন্যের কাছে নিয়ে যাবে, আরো কত কি। সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙোয়, পাহাড় টপকাবো, আহা রে কত স্বপ্ন! মাস যায়, বছর ঘুরে, আমার কাছে একদিন মনে হলো, এটা আসল পঙ্খীরাজ নয়। নেহাতই কাঠের একটা ঘোড়া! পা ভেঙে এখন ঘরের এককোণায় পড়ে আছে। ওর জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল একদিন। আমাকে কেমন ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছিল ঘোড়াটা। এসব মনে হলে আমার হাসিও পায় কখনো সখনো। আমার আর প্রয়োজন নেই এর। নেই, তবুও দেখছি আছে: যেমন ছেলেবেলার কিছু কিছু পুতুল এখনো মা কাচের সেলফে সাজিয়ে রেখেছে, এইরকম অনেকটা। আমি দেখেছি কোন কোন সময় মা ওগুলোর দিকে কেমন মমতার চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, কোন খেয়াল নেই। মা অনেক সময় আবেগের গলায় বলত, 'এই যে চীনামাটির পুতুল-গুলো দেখছিস না খোকা, ওগুলো তোর ঠাকুমার ছিল, বাউল আর পাল্কীটা আমার, তোর বাবার ওই ঢাউস লাটাই।' আমার, দাদার এবং দিদির খেলনাগুলোও মা এই-ভাবেই সাজিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে মার একটা তানপুরাও আছে, তার ছিঁড়ে গেছে। অনেক আগে মা তানপুরা বাজিয়ে গান গাইত। যন্ত্রটার গায়ে এখন পোকায় কাটার ফুটি ফুটি দাগ। পুরু হয়ে ধুলো জমছে। পুরনো কাপড়ে জড়ানো। আমার ধারণা

এজন্যে মার চাপা এক বেদনা আছে। এসব দেখেশুনে আমার মনে হতো, কোন যাদুঘরের মতন যেন আমাদের পারিবারের ছেলেবেলাগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এক একে সবাই এসে দেখবে। এগুলোই কি আমাদের পরিচয়পত্র? কখনো কখনো আমার কাছে মার এই ছোট্ট যাদুঘরটাই যেন আরো বড় হয়ে যায়, আমার তখন মনে হয়, আমরা আজ যেভাবে যাদুঘরের জিনিসগুলো দেখছি, আমাদেরও সেইভাবেই দেখবে। কিছুই আমরা লুকোতে পারি না, ফাঁক দিতে পারি না। একদিন না একদিন আমরা সবাই এই যাদুঘরের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবো। পরবর্তীকালের মানুষ এসে আমাদের সব কীর্তি অপকীর্তি দেখবে। কিছু নেবে, কিছু বা ফেলে দেবে, যেমন আমি আমার কাঠের ঘোড়াটা এখন ফেলে দিয়েছি।

এই বোবা জবুথবু ঘোড়াটার দিকে চেয়ে থাকলে, কেন জানি না, আমার সুধার কথা মনে পড়ে। সুধা আর আমি একই সঙ্গে কলেজে পড়েছি। আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের, ছ-সাত বছরের কম হবে না। সুধার চেহারাটা একটু গোলগাল, গায়ের রং ফরসা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁট দুটো সামান্য পুরু, একটু বেঁটে, চোখজোড়া টানা টানা, মুখের গড়নটা অনেকটা পানের মতন, ভারী সুন্দর দেখাতো ওকে, প্রতিমার মতন। শেষের দিকে ওকে দেখলে আমার কেন যেন দশমী দিনের প্রতিমার কথা মনে পড়েছে। সারা চোখ-মুখে কী এক দুঃখ যেন লুকোনো রয়েছে, সেটা কি আমি কোন সময়ই জানতে পারিনি। সুধাকে আমি ভালবাসলাম, সুধাও আমাকে। পড়া শেষ করে আমি তখন চাকরির চেষ্টা করছি। এমন সময় সুধা এসে একদিন আমায় জানাল,

'আমি আর পারছি না, কি করবে বল।'

'মানে?'

মানে খুব সোজা, বাড়ি থেকে আমার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে।'

'খুব ভাল কথা। আমাদের ব্যাপারটা দেখছি তোমাদের বাড়ির লোক এখনও জানে না কিছু।'

'এখনও বলিনি আমি।'

'আরো আগেই বলা উচিত ছিল তোমার।'

'বললে আর রক্ষে রাখবে না মশাই, এখন যাও বা একটু-আধটু দেখাদেখা হয়, পরে আর তাও হবে না।' সুধা আমার দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসছিল। আমিও হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'একদিন তো বলতেই হবে।'

'তাতো হবেই, কিন্তু—' সুধা আমার চোখে চোখে চেয়ে হাসল।

'কি?' হাসি হাসি চোখে আমি দেখছিলাম ওকে।

'কি আবার, তাড়াতাড়ি ভাল দেখে একটা চাকরিটাকরির যোগাড় কর তো।'

ওর কথাটা খট করে কানে লেগেছিল। সমস্ত সুরটাই যেন আচমকা কেটে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার চোখের ওপর থেকে হাসিটা মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একটু সময় চুপ করে থেকে আমি সামান্য নিস্পৃহ গলায় বলেছিলাম, 'হুঁঃ, ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া, পেলেই এখন বর্তে যাই।'

'তুমি না বলেছিলে, আই এ এস বা ডবলিউ বি-সি-এস পরীক্ষা দেবে?'

'না—, ওসব প্ল্যানটান এখন বাদ।'

'খুব ভুল করবে।' একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে ও বলেছিল, 'সংসার করতে হলে অনেক পয়সার দরকার, তাছাড়া বলার মতনও কিছু একটা চাই।'

আমিও জানি, সংসার করলে পয়সার দরকার এবং বলার মতন কিছু অহংকার বা গৌরব আমাদের সকলেরই থাকা উচিত, তা না হলে আমাদের বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। তবে সুধার ভাবনার সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখছি মিলছে না। আমি সুধাকে বোঝাতে চেয়েছি। বেশ বড় গোছের কোন চাকরি করলেই সংসারে সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না সুধা। সব সময় মর্যাদাও বাড়ে না এতে। বাইরেটাই সব নয়, ভেতরের মানুষটাকেই চিনে নিতে হয়। আমাদের চাওয়ার তো শেষ নেই, একটা থেকে আর একটা বেড়েই যায়। কোথাও না কোথাও তোমাকে থামতে হবে, এই থামতে জানাটাই তোমার শিক্ষা, মর্যাদা; এটাও তোমার অহংকার করার বিষয়। মনটাই আমাদের সবকিছু। বেঁচে থাকা মানেই তো এক ধরণের সংগ্রাম, মনের প্রস্তুতি সুধা। আসলে ও আমাকে বুঝতে পারেনি। অথচ এটা আমার আগে কখনো মনে হয়নি।

এরপর আমি একটা চাকরির যোগাড় করেছি। খুবই সাধারণ, বলার মত কিছু নয়। সেন্ট্রাল গবর্ণমেন্টের এল ডি ক্লার্ক। সুধা এজন্যে আমার ওপর খুশী নয়, কেমন যেন চুপসে গেছে। কথায় কথায় ও আমাকে একদিন বলেছিল, 'তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছো। আগের সেই উদাম, চটপটভাব আর নেই।'

আমি বলেছি, 'দেখলুম কোন লাভ নেই, ডব্লিউ বি সি এসটা দিয়েছিলুম, হলো না। এজন্যে অবশ্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমিও চাই না, এটাই আমার একমাত্র পরিচয় হয়।'

'একবার হয়নি দেখে কি হয়েছে, আবার দাও।'

'ধ্যাৎ—।'

'জান, আমার আরো একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলের অবস্থা ভাল, শুনেছি, স্টেট ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। আমার বাড়িও এটা হাতছাড়া করতে চায় না।' ওর কথা শুনতে শুনতে আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, সুধা যেন আমার অচেনা, মেয়েটা বড় লোভী।

কেন জানি, আমার কাছে আসা কমিয়ে দিয়েছিল সুধা। আমি বুঝতে পারছিলাম, ও আমার কাছ থেকে ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে। শেষ যেদিন এসেছিল, আমি বলেছিলাম, 'আমি নিজেই এবার তোমার বাবা-মা-র কাছে যাবো। সব ব্যাপারটা ওদের বলবো।'

'কি বলবে?' সুধার গলা কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছিল।

'তোমার আমার কথাগুলো বলবো।'

'সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোমায় পাল্টা প্রশ্ন করবে, তুমি কোথায় কোন ধরনের চাকরি কর, কত মাইনে পাও, নিজের বাড়ি-ঘরদোর আছে কিনা, তোমার সংসারে কে কে আছে, ইত্যাদি, তুমি জবাব দিতে পারবে এসবের?

'কেন পারবো না, নিশ্চয়ই পারবো। আমি তো কিছু লুকোতে চাই না, লুকোবো কেন? হয়ত আমার উত্তরগুলো ওদের মনের মতন হলো না, তাতে কি; তাই বলে আমার ভালবাসাটা তো মিথ্যে নয়, জাল নয়।'

'ছেলেমানুষি করো না; তারচেয়ে আরো ভাল একটা চাকরির চেষ্টা কর।'

এরপর সুধা আর আসেনি। আমিও আর যাইনি ওদের ওখানে। সুধাকে আমার বড় স্বার্থপর বলে মনে হয়েছে। শুনেছি, সুধার বিয়ে হয়েছে, পাত্র স্টেট ব্যাংকের ওই ছেলেটি। এরপর সুধা সম্পর্কে আমার একটা কথা কেন যেন বারবার মনে হয়েছে, সুধার লোভ কি ওখানেই থেমে থাকবে? ওর মনের এই রোগ বড় মারাত্মক। ওর জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে। আমার ভালবাসার কোন ভেজাল ছিল না। বাইরেটাই ওর সব হলো! আমার মন, আন্তরিকতা?

এই চিন্তাগুলোই আমাকে বেশ কিছুদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভাবতে খুব খারাপ লেগেছিল, অতি সাধারণ লোভী একটা মেয়েকেই আমি রূপকথার সেই রাজকন্যে বলে ভুল করেছিলাম। সুধা কি সুখী হয়েছে? আজকাল কেন যেন ওকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। ইদানীং দেখছি, আমার এই কাঠের ঘোড়াটার সঙ্গে আমারও কোথায় একটা মিল আছে। সুধা কি এখন যাদুঘরের কোন সামগ্রী?

এ সময়টা আমার কাছে অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতন, কিছু মনে করতে পারি, কিছু পারি না। আমি সবাইকেই খুব ভাবিয়ে তুলেছিলাম। বাবা মারা যাবার সময়ও নাকি আমার এমন হয়নি; কদিনেই সামলে উঠেছিলাম। সুধা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। ঘোর-ভাবটা কাটবার পরও মাঝে মাঝে আমি ভেবেছি, ওর সঙ্গে আবার যদি কখনো দেখা হয়, জিজ্ঞেস করবো, 'আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম সুধা, কি করেছিলাম? তুমি কি আমাকে চিনতে না, বুঝতে পার নি? এতগুলো বছর তোমার কাছে এমনই মিথ্যে হয়ে গেল!' হয়ত আরো, আরো কিছু ভেবেছি, এখন আর সব মনে নেই। এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি, আমাদের প্রিয় কোন কোন বস্তুর বিনিময়েই, বড় কোন অনুভবকে পাই। কি সেই অনুভব? আমিও কি তা পেয়েছি? সুধা আমাকে দুঃখকে বরণ করার মন্ত্র শিখিয়ে গেছে। তবু, তবু কি আমি সবটা পেরেছি? অন্ধকারে এখনো যে আমার ভয়!

এখন আবার মনে হচ্ছে, আমার দম ফুরিয়ে যাবে, এই ক্রমাগত ছুটে চলা অর্থহীন। কিছুই ভাল লাগছে না আর. দাদার চোখেমুখে আবার পুরনো সেই ভাজ ফুটে উঠেছে, মা, আমার বুড়ী মা, এবার যেন কেমন ভেঙে পড়ছে। আমিও যে ওদেরকে আমার কষ্ট বোঝাতে পারি না। এই সমুদ্র আকাশ গাছপালা পাখি আমাকে নিয়ত টানছে, টানছে শূন্যতার দিকে নিয়ে যাবে বলে। এক ধরনের বৈরাগ্য যেন পেয়ে বসেছে আমায়। আমি বুঝতে পারছি, আমার চারপাশে কালো কালো টুকরো মেঘ জমেছে, অন্ধকারের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। আমাদের সমস্ত সাধনা ব্যর্থ, অহংকার করার মতন কি থাকল আজ? ওই অমিয়ই এসব চিন্তাভাবনার মধ্যে আমায় ফেলে দিয়েছে। কেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে সব। আমি কি এর ভেতর থেকে বেরোতে পারবো আর? বাঃ, বারে অমিয়!

অমিয় আর আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু। একই অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করি। কতদিন অমিয় আমাকে টানতে টানতে ওর বাড়ি নিয়ে গেছে। ছোট ছোট পাঁচটি ভাইবোন ওর। মা আর বাবা। ওর বাবা অনেক দিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছেন। অমিয় আমাদের অফিস ইউনিয়নের সেক্রেটারী। তারপর থেকেই দেখেছি ও বদলাতে শুরু করেছে। ওর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমার বিরোধও।

এমনিতেই আমি কারো সঙ্গে বড় একটা মিশি না, কেন যেন ভাল লাগে না আমার। সেজন্যেই অমিয় ছাড়া আর কোন বন্ধু নেই আমার. পরিচিত কিছু মুখ অবশ্য বিভিন্ন সময়ে আমি মনে করতে পারি। শুধু অফিসেই নয়, পাড়ায়ও তাই। নিরিবিলি থাকতে আমার ভাল লাগে। প্রাণখুলে মিশতে আমার ভয় হয়। সবাই বলে একটু অসামাজিক আমি। কি কথা বলবো? আমি তো জানি, অফিসে, দিনের পর দিন কথাগুলো বাসি হয়ে গেছে। আমি কোন উৎসাহ বোধ করি না।

অমিয় আমাকে সুযোগ পেলেই বোঝাবার চেষ্টা করে. 'দেখ শৈলেন, এভাবে প্যাসিভ বাঁচা যায় না, বি অ্যাকটিভ।' আমি দেখেছি কথা বলার সময় ও বেশ আবেগ বোধ করে! ওর অ্যাকটিভ কথার অর্থ আমি বুঝি। ও চায় আমিও যেন ওর মতন জড়িয়ে পড়ি। অফিস, মিটিং, মিছিল, শ্লোগান মোটকথা ও চায় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আমিও যেন একজন সক্রিয় নট হয়ে চিহ্নিত হই। এসবই এখন অমিয়র ধ্যান জ্ঞান। তা হোক, কিছু বলার নেই। অনেকেরই অনেক রকম নেশা থাকে।

আমার কেন যেন হাসি পায় ওর কথাগুলো শুনে। আমি বলি, 'রাগ করিস না ভাই, তুই যে বাঁচার কথা বলছিস, আমার কাছে ওটা বড় ছোট. আমি কিন্তু আরো ভালভাবে বাঁচতে চাই.।'

'তোর এই হেঁয়ালির কথা আমার ভাল লাগে না। এসব ভাবের কথা ছেড়েছুড়ে এবার একটু কাজেটাজে নাম।'

'কাজ মানে তো তোর ওই মিছিল আর বড় বড় গালভরা সব কথা।'

'গালভরা কিরে, দাবী-দাওয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ।'

আমি হাসতে হাসতে বলেছি, 'তার মানে আরো অন্যায় করতে বলছিস?'

'তোর মাথাটা দেখছি একেবারেই গেছে।'

জবাবে বলেছিলাম, 'ঠিক বলেছিস। তাহলেই বোঝ, এই আন্দোলনে আমার মতন ভোঁতা দু-একটা মাথা বাদ গেলেও কোন ক্ষতি হবে না।'

'এমনও হতে পারে, মাথাটা তোর দামী. তাই এত লোভ।' অমিয় ঠাট্টা করেছিল. হয়ত খোঁচাও ছিল। এসব আগে ছিল না। ইদানীং দেখছি, এই ধরনের একটা মন ওকে আরো যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

অমিয় আবার বলেছিল, একটু শ্লেষও ছিল বলার মধ্যে, 'তোর ভালভাবে বাঁচাটা শুনি এবার।' ও হাসছিল কেন যেন।

'বাঁচা বলতে তোর ধারণাটা আগে শুনি একবার।'

'কেন, মোটামুটি খেয়ে-পরে মানুষ টিঁকে থাকবে, অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসা হবে, অভাবে অবহেলায় মরবে না। এই জন্যেই আমাদের আন্দোলন, সংগ্রাম।'

'ব্যাস, এতেই বাঁচা হয়ে গেল!'

'তবে আর কি!'

'আগে একটা কথার জবাব দে তো. আমার এই বেঁচে থাকার দরকারটা কেন. আমি মরে গেলেই বা কি ক্ষতি?'

'আচ্ছা ঝামেলা তো মরবোটা কেন আমি?'

'সবাইকেই মরতে হবে, ওটা কোন কথা নয়। আসল কথা, যা আমি বলতে চাইছি, নিছক দেহটাকে খাইয়ে পরিয়ে টিঁকিয়ে রাখলেই বাঁচা হলো না. এর একটা উদ্দেশ্য আছে, অর্থ আছে।'

'সেটা আবার কি বস্তু?'

'আমার জিজ্ঞাসাও তো এই। শুধু এটুকু মনে হয়েছে, কোন রকমে প্রাণধারণটাই বাঁচা নয়, এ কখনো বাঁচা হতে পারে না। প্রত্যেকের কাছেই এর একটা অর্থ থাকা চাই।'

'অর্থ আছে. নিশ্চয়ই আছে। তবে তোর সাথে মিলবে না।'

'মিলতো, যদি দৃষ্টিটা তোর আর একটু খোলা হতো।'

এসব অনেক ব্যাপারেই আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে। আমরা কেউ কাউকে নিজের জায়গা থেকে সরাতে পারি নি। তাছাড়া আমার এমন কোন আগ্রহও ছিল না যে ওকে দিনের পর দিন নাছোড়বান্দার মতন চেষ্টা করে আমার মতে বশ করবো; কিন্তু ও আমাকে সেই চেষ্টা ছিল।

অমিয় আমায় কতরকম করে বোঝাত. বাঁচতে গেলে লড়াই করা ছাড়া কোন উপায় নেই, লড়াই করেই বাঁচতে হবে। আজ হোক, কাল হোক, প্রত্যেককেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সামিল হতে হবে। দিন বদলের পালা এলো বলে ইত্যাদি আরো কত কি।

আমার কথা হলো, সবাই যদি দেশের এবং দশের মঙ্গলের কথা ভাবছে তবে আর নিজেদের মধ্যে এত রক্তারক্তি কেন? বিরোধটা তাহলে কোথায়? এত প্রাণ বলি হলো কেন? এই নৃশংসতার কি কোন পরিমাপ করা যায়? অমিয় এসবের কোন জবাব দিতে পারে নি। মানুষের দীর্ঘদিনের এই সাধনা মুহূর্তে এমন তুচ্ছ, আবর্জনার মতন হয়ে গেল কি করে?

একদিন অমিয় এসে আমায় বলল, 'পাড়াতে থাকা যাবে না, গণ্ডগোল। আমাদেরই দলের একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ছুরি মেরেছে, পরে গলার নলিটা কেটে ফেলে চলে গেছে, দিন-দুপুরে, অনেকেই দেখেছে।'

আমার খারাপ লাগছিল শুনে। এত অসহায় আমরা? তবে আর বাঁচার কি মূল্য? যে কোন মানুষ যে কোন লোককে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে? এ কোন বীভৎস নির্মম ছবি দেখছি আজ? আমার মনে হতো, যারা মরেছে তারা তো আমাদেরই স্বজন আত্মীয়, যারা থাকল, তারা কি নিয়ে বাঁচবে? আমার উৎকণ্ঠা বেড়ে গিয়েছিল। কাগজ খুললেই খুন আর খুন। এত অস্থিরতা অসহায় ভাব আর কখনো তো দেখি নি আমি। মনের মধ্যে সারাক্ষণ এক অস্বস্তি, যন্ত্রণা; বিশ্রী রকমের গা গুলোনো অনুভূতি। ভালভাবে খেতেটেতেও পারতাম না। আকাশে শকুন উড়তে দেখলে আমার খারাপ লাগত। অমিয়র কথা শুনে আঁতকে উঠেছিলাম। ওকে মারবার চেষ্টা করেছিল, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। আমার বুক কাঁপত এসব ভাবলে। অমিয়কেও পাড়া ছেড়ে দিতে বলেছি. 'একটু সাবধানে থাকিস টাকিস।' সর্বত্র একই ভয়, বর্বরতা। এরা কি কখনো রক্তের স্বাদ বদলাতে পারবে?

কাল অফিসে গিয়ে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। অমিয় আর নেই। অমিয়কে মেরে ফেলেছে। আমার গা-হাত-পা শুনতে শুনতে অবশ হয়ে গিয়েছিল। আমি রীতিমতন কাঁপছিলাম, ভয়ে আতঙ্কে। কত রকমের কানাঘুষো। ওর বাবার অবস্থা খুব খারাপ শুনে দেখতে গিয়েছিল। আবার কেউ বলল, বাস থেকে টেনে নামিয়ে গুলি করেছে।

অমিয় চলে গেল. কিন্তু যারা বেঁচে থাকল, এখন তাদের কি হবে? ওর বাবা-মা, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর কি হবে? আমার ওকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, দেখে যা অমিয়, একবার চোখ মেলে দেখে যা, তুই এদের কী করে গেছিস; কেউ আসে নি তোর মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিতে, একটু সাহায্য করতে। লড়াই করে না বাঁচতে হবে! আমার চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

আমি এখন আর অফিস যাবো না ক'দিন। কিছুই ভাল লাগছে না। জীবনের অর্থটা কি? সব কেমন অর্থহীন, উপন্যাসের মতন লাগছে। নিছক কারো একটা খেয়াল মাত্র। আমার মার বাদ্যযন্ত্রের কথা মনে পড়ছে কেন? বাবার মুখটা ভাসছে। বাবা আমার জন্যে রথের মেলা থেকে একটা কাঠের পক্ষীরাজ এনে দিয়েছিলেন। আমার ঘোড়াটা গেছে, আহা রে পক্ষীরাজ, একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে, আমি, আমি যে তেপান্তরের মাঠ পেরোতে চেয়েছিলাম। রাজকন্যে আনবো বলে সমুদ্র ডিঙোতে চেয়েছি! সুধা, এ তুমি কি করলে বল না!' তোমার স্বামী বড় চাকরি করে না? আমাকেও আই-এ-এস পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে বলেছিলে না? আমার মায়ের মুখটা বড় করুণ, দুঃখীর মতন দেখাচ্ছে! রাঙাদিও না জানি কত কি ভাবছে আমার জন্যে! কালো কালো মেঘগুলো ছুটে আসছে। হায়রে, কতগুলো সময় এভাবে আমার চলে গেল! এসব কেন আমার মনে আসছে। এই কি আমাদের শূন্যতার দিকে যাত্রা? অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার প্রস্তুতি? আমি তো তিরিশ বছরের একজন যুবক! আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে, ঘুরছে! কাঠের ঘোড়াটা ... তানপুরা, তানপুরাটা ... মা-র বাদ্যযন্ত্র...বাবার লাটাই...সুধা...আমির মিছিল ... শকুন...খুন...তিরিশটা ... বছর... গাছপালা আকাশ সমুদ্র...শূন্যতা...বাঁচার উদ্দেশ্য?

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী / কবি ও মানুষ

(১৮৭২-১৯৪৯)

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে কবি-নাট্যকার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর দান সামান্য বা উপেক্ষনীয় তো নয়ই, বরং বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশেষত, অজস্র গীতি-কবিতা রচনা করে তিনি এককালে কবি-যশ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা তাঁকে প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। নতুবা আগামী ইংরেজিবর্ষে, তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বাঙ্গালী তাঁর মহান কর্তব্য পালনের কোনো আয়োজন করছে না কেন?

অথচ, একদিন বহু বিদ্যালয়পাঠ্য কাব্য-সংকলন গ্রন্থেও প্রমথনাথের কবিতা, স্থান লাভ করেছে। বিশেষত, তাঁর 'বেলা যায়' কবিতাটির সঙ্গে ('পদ্মা' নামক কাব্যগ্রন্থ) সে কালের কিশোরদেরও পরিচয় ছিল। কবিতাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। লক্ষ্মীর বরপুত্র লালাবাবু অপরাহ্নে শিবিকারোহণে স্ব কর্মস্থান থেকে গৃহে ফিরছেন, সহসা তাঁর কর্ণে দুটি কথা প্রবেশ করল—'বেলা যায়'। কোনো এক রজক-গৃহে কন্যা নিদ্রিত পিতাকে ডাকছেন —'ওঠো বাবা, বেলা যায়।' এই কথা শুনে সহসা লালাবাবুর চৈতন্যের উদয় হোলো, তিনি বহুমূল্য বেশভূষা ত্যাগ করে কোন্ অজানার আকর্ষণে ছুটে চল্লেন। তিনি—

'বক্ষে তুলি
লইলেন জীবনের কুজ্ঝটিকা
হতে প্রজ্ঞার আলোক'।

*

'হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক ভরা
কেবল বিদায় যাত্রা, মুক্ত, মায়াহরা
ত্যাগের ঘোষণা!
ছুটিলা তৃষিত মনে,
কার ছদ্ম করুণার শুভ আকর্ষণে!
লক্ষ-কোটি নভ-আঁখি সাক্ষী হ'ল তার,
নীরবে দেখাল পথ নাশি অন্ধকার'।

সবাই জানেন, বাংলার আধুনিক গীতি-কবিতার ধারা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আধুনিক গীতি-কবিতায় কবির ক্ষণকালের সুখ-দুঃখ বা আনন্দ-বেদনার অনুভূতি একটা শাশ্বত বা চিরন্তন রূপ লাভ করে বলেই তাঁর হৃদয়াবেগ সহজেই রসিক পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। শ্রীমধুসূদন কয়েকটি খাঁটি গীতি-কবিতা রচনা করলেও (যেমন 'আশার ছলনা', 'জন্মভূমির প্রতি' প্রভৃতি) বিহারীলালকেই আধুনিক গীতি-কবিতার প্রবর্তক বলা হয়। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, কামিনী রায় ও প্রিয়ংবদা দেবী প্রভৃতি অসংখ্য কবি এই গীতি-কবিতার ধারাকে বহুমুখী ও বেগবতী করে তোলেন। প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রখ্যাত সাহিত্যিক জলধর সেনের সম্পাদনায় তিন ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'রচনাবলীর' প্রথম ভাগে মুদ্রিত হয়েছিল সাতখানি কাব্যগ্রন্থ যথা—(১) পদ্মা, (২) যমুনা, (৩) গীতি, (৪) গীতিকা, (৫) দীপিত, (৬) দীপালী, ও (৭) আরতি। দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হয়েছিল পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ যথা—(১) গৌরাঙ্গ, (২) গল্প (৩) গাথা, (৪) আখ্যায়িকা, (৫) চিত্র ও চরিত্র। তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছিল ছ'খানা কাব্যগ্রন্থ যথা—(১) কবিতা, (২) পাথেয়, (৩) পাষাণ, (৪) পাথার (৫) গৈরিক, (৬) গান।

প্রমথনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু জলধর সেন বলেছেন—কবির ভেতর যখন ভাবের জোয়ার আসতো, তখন তিনি আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হয়ে অবিশ্রান্ত শুধু লিখে চলতেন, তিনি এত দ্রুত রচনা করতেন যে না দেখলে কেউ তা বিশ্বাস করতেন না। আমাদের মনে হয়, এই দ্রুত লিখনের ফলেই তাঁর সকল কবিতা উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সমগ্র কাব্য রচনাবলীর মধ্যে মানুষ প্রমথনাথের যে পরিচয় আছে, তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা অর্পণ না করে পারি না। প্রমথনাথের কবিতার প্রধান গুণ আন্তরিকতা। এই জন্যেই কবি প্রমথনাথ ও মানুষ প্রমথনাথে কোনো বিরোধ নেই।

মনস্বী জলধর সেন বলেছেন—প্রমথনাথের কাব্যের মূল সুর—সাম্যবাদ, ও মানবতা-বাদ ও আশাবাদ। বাস্তবিক, যে মানবতার বাণী উচ্চারণ করেছেন মহাভারতকার মহর্ষি বেদব্যাস—

'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।'
মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই।

যে মানবতার বাণী উচ্চারণ করেছেন বাংলার সাধক-কবি চণ্ডীদাস—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই'।

মানুষের অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে সেই মানবতারই জয়গান করেছেন কবি প্রমথনাথ। তিনি বলেছেন, মানব-জীবন তখনই ধন্য হয়, যখন সে—

'অনন্ত-কল্যাণময় লোকহিত ব্রত
মহাগর্বে বহি চলে শিরে,
পদে পদে বাধা আসি করে পরাহত
আত্মবলে সে যে উঠে ফিরে'।
(গীতিকা : জীবনমাধুরী)

শুধু কি তাই?

'সুমেরু শিখরচূড়ে উঠিবারে চায়
মহোৎসাহে মর্ত্যের মানব'। (ঐ : ঐ)

মানুষে মানুষে সংঘাত, প্রবলের হস্তে দুর্বলের লাঞ্ছনা, ধর্মের নির্বাসন, বলদৃপ্ত অধার্মিকের বিজয়-উল্লাস কবির চিত্তকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত করে তুলেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথনাথও বিশ্বাস করেছেন যে মানবতার অপমান 'রচিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়'। তাই 'আকাশের উদ্দেশ্য' কবিতায় (গীতিকা) কবি বলছেন—

'এ কি রক্ততৃষাতুর হানাহানি মানবে মানবে,
দুর্বল হইছে চূর্ণ সবলের বিজয়-তান্ডবে!
ধর্ম নির্বাসিত হয়ে লুকায়েছে
লাজে তপোবনে,
অধর্ম বিজেতৃবেশে বসিয়াছে
রাজ-সিংহাসনে।

•

হবে কি দুঃখের শেষ, পতিতের
হবে কি উত্থান?
জ্ঞান ভক্তি সন্ধি করি করিবে কি
সত্যের সন্ধান?
থাকে যদি পরিণাম রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতন:
ঊর্ধ্ব হতে ভূমানন্দে কর কর
স্বস্তি উচ্চারণ'।

বাস্তবিক, প্রমথনাথ দেব-মহিমায় নয়, মানব-মহিমায় এবং মানবের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাসী। তাই যেখানে সদ্যঃস্নাতা শুভ্রবাস পরিহিতা ষোড়শী বিধবা পরম শ্রদ্ধাভরে পতির কাষ্ঠ-পাদুকায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন, সেখানে তিনি দেবতাকে দর্শন করেছেন। আবার যখন কোনো সদ্য-বিধবা শিশুপুত্রের মধ্যে জাতির মুখচ্ছবির দর্শন করে বিধাতার অমোঘ নির্দেশে সহমরণের সংকল্প ত্যাগ করেছে, কবি তখন সেখানে সেই নারীর মধ্যে যথার্থ সতীত্বের মহিমা আবিষ্কার করেছেন। কবির চোখে সাভরণা অহংকার-দৃপ্তা হৃদয়হীনা ধনী-বধূর কল্পিত মহিমা নিরাভরণা পরদুঃখ-কাতরা ভিখারিণীর সত্যিকার মহিমার নিকট একেবারেই ম্লান হয়ে গিয়েছে। ঐশ্বর্যে লালিত হয়েও কবি আর্ত ও লাঞ্ছিতের বেদনা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। শুধু মানুষের দুঃখেই কবি কাতর হননি, তাঁর বেদনাবোধ নিখিল প্রাণিজগতে প্রসারিত হয়েছে। কবির রচিত 'শিকার-স্মৃতি' কবিতাটি (গীতিকা) আমাদিগকে বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিষ্ঠুর ব্যাধের শরে নিহত ক্রৌঞ্চকে দর্শন ও ক্রৌঞ্চীর বিলাপ শ্রবণ করে একদিন মহর্ষির শোক শ্লোকরূপে উৎসারিত হয়েছিল। কবি প্রমথনাথও একদিন নিষাদ বৃত্তি অবলম্বন করে নদীতীরে একটি চক্রবাকের প্রাণ-সংহার করেছিলেন কিন্তু চক্রবাকের মৃত্যু-যন্ত্রণা দর্শন ও চক্রবাকীর বিলাপ-শ্রবণে তিনি এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে, চিরকালের জন্যে হিংসাবৃত্তি পরিহার করেছিলেন।

প্রমথনাথ আদর্শবাদী কবি। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের জীবনে বিঘ্ন-বিপত্তির, আঘাত-সংঘাতের প্রয়োজন আছে, যিনি দুঃখ-দৈন্যকে সহজে প্রসন্ন মনে বরণ করে নিতে পারেন, যিনি প্রতিকূল অবস্থার সংগে নিয়ত সংগ্রাম করতে পারেন, তিনিই মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।'

'কখনো পড়েনি যারা, পায় নি আঘাত,
শত বিঘ্ন-বিপত্তির উল্কা, বজ্রপাত
হাসিমুখে মাথা পাতি করে নি গ্রহণ,
মানুষ হয়নি তারা, পায়নি জীবন'।
(নবগান, গীতি)

প্রমথনাথের কাব্য-সমালোচক জলধর সেন লিখেছেন—প্রমথনাথের কবিতায় একটা মানসিক সুস্থতাসূচক আনন্দ-কলরব শোনা যায়। তিনি দুঃখের মধ্যেও জীবন-দ্বন্দ্বের শুভ পরিণাম দেখিতে পান। প্রমথনাথ জগতের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাসবান আশার কবি। মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া তিনি জীবনের জয়গান করিয়াছেন'।

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) দেবেন্দ্র সেন, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিদের মতো প্রমথনাথ রায় চৌধুরীও বহু চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি পেত্রার্কা বা সেক্সপীয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের গঠন-রীতির অনুসরণ করেন নি। তিনি নানা স্বাদের বহু প্রেমের কবিতাও রচনা করেছেন। মহাভারতের রুরু-প্রমদ্বরার উপাখ্যান অবলম্বনে তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন, তাতে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের জয়গান করেছেন। তাঁর বহু কবিতায় স্বদেশ-প্রেম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বোধের নিদর্শন আছে। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন। পল্লী-প্রকৃতির সংগে কবির পরিচয় অতি নিবিড়, নিপুণ চিত্রকরের মতো তিনি প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের আলেখ্য অংকন করেছেন।

প্রমথনাথ শুধু কবি নন, নাট্য-সাহিত্যেও তাঁর দান স্মরণীয়।

প্রমথনাথ তিনখানি ঐতিহাসিক পঞ্চাংক নাটক (ভাগ্যচক্র, হাম্মির ও হুমায়ুন), একখানি সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক (অন্নচিন্তা) ও একখানি প্রহসন (আক্কেল সেলামী) রচনা করেন। তাঁর 'ভাগ্যচক্র' মিনার্ভা থিয়েটারে ও 'হাম্মির' ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিছক রস-সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি নাটক রচনা করেন নি, তাঁর নাটক-রচনার উৎস হচ্ছে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতির কল্যাণ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে নাট্যকার প্রমথনাথ সম্পর্কে কোনো আলোচনা কোরবো না। কবির কাব্য-রচনাবলীর সম্পর্কে আমরা সামান্য দিগদর্শন করলাম মাত্র। আশা করি, সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী সমাজ, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক কবি-নাট্যকার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নতুন করে তাঁর রচনাবলীর মূল্য নির্ধারণ করবেন। যদি আমরা এই সাহিত্য-সাধকের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন না করি, তা হলে দিব্যধামবাসী কবির কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, আমরাই কর্তব্য লংঘনের অপরাধে অপরাধী হবো। এ সম্পর্কে মহাকবি কালিদাসের উক্তি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—

'প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজা
ব্যতিক্রমঃ'

যেখানে পূজনীয় ব্যক্তির পূজা হয় না, সেখানে মানুষের কল্যাণ ব্যাহত হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সমসাময়িক ইতিহাস

লর্ড বাটলার ইংলণ্ডের জনজীবনে দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন, অনেকগুলি ক্যাবিনেট পোস্টে দায়িত্বপূর্ণ অধিষ্ঠিত থেকে লর্ড বাটলার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পীয়রত্বে উন্নীত হওয়ার পূর্বে তিনি সুদীর্ঘ ৩৬ বছর কাল অবিচ্ছেদ্যভাবে হাউস অব কমন্সের সদস্য ছিলেন এবং সাতজন প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় তিনি কাজ করেছেন। ভারতসম্পর্কিত দপ্তরের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অব লেবারের আন্ডার সেক্রেটারি, মিনিস্টার অব এডুকেশন, চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার, লর্ড প্রিভি সীল, মিনিস্টার ফর হোম এফেয়ার্স প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করা ছাড়া অল্পকালের জন্য সেন্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। এবং ফরেন মিনিস্টারও হয়েছিলেন। তবে লর্ড বাটলারের অদৃষ্ট খুব ভালো বলা যায় না অতি অল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদটি তাঁর হাত ফসকে যায়। তাঁর পরিবর্তে ইডেন এবং পরে ম্যাকমিলান প্রধানমন্ত্রী হলে লর্ড বাটলার অবশ্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে বিরত থাকেননি। এই কারণে লর্ড বাটলারের মত উল্লেখযোগ্য কর্মজীবন খুব কম মানুষেরই আছে।

একটি পদের প্রতি লর্ড বাটলারের কিন্তু লোভ ছিল এবং সেই পদটির নাম 'ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া।' একবার মনে হয়েছিল এই পদের জন্য তাঁকে নির্বাচিত করা হবে। তখন চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত, তিনি স্থির করলেন একজন সৈনিককে এই পদের জন্য নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত। তাই লর্ড ওয়াভেলকে যুদ্ধের সেই চরম অবস্থায় ভারতের বড়লাটপদে বসানো হল। চার্চিলের দক্ষ কূটনৈতিক বিবেচনায় সেই সংকটকালে রাজনৈতিক নেতার চেয়ে দক্ষ সমরনায়ককে ভারতের শাসনকর্তা করে পাঠানো সমীচীন মনে হয়েছিল।

লর্ড বাটলার আজো সক্রিয় কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের তিনি মাস্টার। এই সব কারণে লর্ড বাটলারের স্মৃতিকথা অনেক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন ইতিহাস। অজস্র তথ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীতে লর্ড বাটলারের স্মৃতিকথা 'দি আর্ট অব দি পসিবল' পরিপূর্ণ।

ভারতীয় পাঠকের কাছে বাটলারের গ্রন্থটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সর্বপ্রধান কারণ শৈশব থেকে শুরু করে সুদীর্ঘকাল তিনি নানাভাবে ভারতের সঙ্গে বিজড়িত। বাটলারের পিতৃদেব এবং তাঁর জ্যেষ্ঠতাত দুজনেই যথাক্রমে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের লাটসাহেব ছিলেন এবং তার পূর্বে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের পদে কাজ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে বাটলার ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন পদাধিকার বলে। অনেক আলাপ-আলোচনা ও রাজনৈতিক জল্পনায় তিনি শরিক ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের এই বিভিন্ন ভূমিকা প্রসঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই তাঁর বক্তব্য অনেক আর সেইসব বক্তব্য অতিশয় চিত্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টে যখন ইন্ডিয়া বিল উত্থাপিত হয় তখন চার্চিল তার বিরোধিতা করেছিলেন অথচ এই বিলে পরিকল্পিত সুযোগসুবিধা ভারতবাসীদের প্রত্যাশা পূরণের কাছাকাছি পৌঁছয়নি। চার্চিল এই আইনের তীব্র নিন্দা করে বলেন—

'a gigantic quilt of jumbled crochet work a monstrous monument of shame built by pigmies'.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শেষাশেষি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মিশন যখন অসফল হল তখন চার্চিল তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বাটলারকে বলেন ব্রিটেন তার সেনাদল ভারত থেকে সরিয়ে এনে দেশটাকে এক বিরাট গৃহযুদ্ধের ভিতর ঠেলে দিচ্ছে। বাটলার তখন শিক্ষামন্ত্রী। মিসেস চার্চিল সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি চার্চিলের এই উত্তেজনায় বিস্ময় প্রকাশ করার পর চার্চিল শান্ত হয়ে বললেনঃ

'We might sit on the top of a tripos Pakistan, Princely India and the Hindus.

এই ত্রিদণ্ডের ওপর বসে থাকার আইডিয়াটা অন্ততঃ কিছুকাল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু নয়া তরঙ্গের চাপে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্রিটেন বাধ্য হয়ে শেষপর্যন্ত দেশবিভাগ ব্যবস্থা পাকা করে ভারতের মাটি ছেড়ে চ'লে যায়।

বাটলার বলেছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যদি কিঞ্চিৎ উদার মনোভাব প্রদর্শন করে মুস্লিম লীগের কিছু আবদার মেনে নিতেন তাহলে দেশবিভাগ হয়ত অপরিহার্য হত না। কিন্তু এই কথাগুলি লেখার কিছু পূর্বে তিনি লিখেছেন—

'Jinnah with few graces and one extreme determination of character looked upon himself as destined to create the independent Muslim State'

দেশবিভাগের সূচনা কিন্তু অনেক পূর্বেই হয়েছিল এবং সেই ভাবনার শিকড় ইতিমধ্যেই বেশ গভীরে প্রবেশ করে ছিল. অনেকের অলক্ষ্যে সেই শিকড় বর্ধিত এবং পরিপুষ্ট হয়েছে। পরে এনক পাওয়েল এক মন্তব্য করেন—

'Britain might re-conquer India with ten divisions'

কথাটা চার্চিলের কানে গেল। চার্চিলের বাস্তব বোধ অনেক সুতীব্র তাই তিনি বললেন—

'it is too late for that and in any case ten divisions are not enough'

চার্চিলের চিন্তাধারা তখন অন্যদিকে প্রবাহিত। য়ুরোপে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করায় চার্চিল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

বাটলার তাঁর শিক্ষামন্ত্রী পদে থাকাকালীন নতুন এডুকেশন এ্যাক্ট উত্থাপনের কথা সদম্ভে বর্ণনা করেছেন। অবশেষে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন এ্যাক্টকে তিনি বিধিবদ্ধ করতে সমর্থ হলেন, তাঁর নিজের দলেরই অনেকে বাধা দিয়েছেন। জীবনের মহৎ কর্মতালিকার মধ্যে এই এডুকেশন এ্যাক্ট পাশ করানোর ব্যাপারটিকে বিশেষ করে স্থান দিয়েছেন বাটলার। কারণ এই আইনবলে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যুদ্ধের সংকটকালেও উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাতে সমর্থ হয়েছে।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মাঝে মাঝে বাটলার রাজনৈতিক দাবাখেলার অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশন করেছেন। বাটলার অনেকগুলি বিদেশী ভাষায় পারদর্শী। ব্রিটেনের ফরেন সার্ভিসের জুনিয়র অফিসারদের চাকরীতে প্রবেশ করা পূর্বেই অন্ততঃ দুটি বিদেশী ভাষায় পারদর্শী হতে হয়। বাটলার বলেছেন যে তাঁর পিতৃদেব অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা জানতেন। বাটলার নিজে ৫৫ বছর বয়সে যখন পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হলেন তখন রুশভাষা শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার এই মন্ত্রীত্বের কাল স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় অবশ্য এই সাধ পূর্ণ হয়নি। তবে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। যে তিনটি ঘটনা ইদানীংকালে গুরুত্বলাভ করেছে যথা মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮), সুয়েজ অভিযান (১৯৫৬) এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন ও রোডেশিয়ার মধ্যে বিরোধ লর্ড বাটলারের গ্রন্থে তা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এই তিনটি ঘটনার সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বাটলারের বর্ণনা অনেক তথ্যপূর্ণ কিন্তু মিউনিক চুক্তি সম্পর্কিত তাঁর উক্তি বিতর্কমূলক।

চেকোশ্লাভাকিয়ার ঘটনার সময় ব্রিটেন সামরিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল না এবং হিটলারের বিরোধিতা করার সামর্থ ছিল না। ফ্রেঞ্চ-চেকোশ্লাভাকিয়া চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স চেকোশ্লাভাকিয়াকে সাহায্য করতে পারেনি। এছাড়া তাঁর সন্দেহ আছে যে মুনিক চুক্তির কালে জার্মানীর ন্যাশনালিস্ট সোসলিস্ট বাহিনীর মোকাবিলা করার শক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল না। 'রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা' নামক ব্রিটিশ পলিসির স্বপক্ষে তিনি বলেছেন—

'Diplomacy to be effective must be based on strength. Threats as an instrument of policy are not only useless but positively harmful unless backed by the determination and ability to give effect to them".

বাটলারের এই গ্রন্থটি আকারে সুবৃহৎ নয়, মাত্র ২৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

'not too heavy for anyone to hold up and doze over in bed".

রাজনৈতিক নেতার এই পারিমিতিবোধ প্রশংসনীয়।

বাটলার—মেভেল চেম্বারলেনের অতিমাত্রায় সতর্কতার নিন্দা করেছেন এবং মুসোলিনী সম্পর্কিত চেম্বারলেনের প্রত্যাশা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পক্ষে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, এই তাঁর ধারণা। সুয়েজ অভিযান সম্পর্কে তিনি বলেছেন ইডেন নাসেরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চালাতে গিয়ে যতদূর যাওয়া প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু বেশী গিয়ে পড়েছিলেন। ইডেনের প্রতি বাটলারের আনুগত্য কিন্তু অসীম।

বাটলারের স্মৃতিচারণ অনেক মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ হলেও অল্প কথায় বিধৃত। অথচ এই জাতীয় গ্রন্থ ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সুবৃহৎ করা কঠিন ছিল না।

—অভয়ংকর

THE ART OF THE POSSIBLE: By Lord BUTLER. Published by messrs. HAMISH HAMILTON: LONDON. Price: £ 3.75 shillings only.

নতুন বই

উপন্যাস প্রসঙ্গে (আলোচনা) —রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। তুলি-কলম, ১, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। আট টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় বাংলা উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও প্রতিটি আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ তথাপি প্রত্যেকের মধ্যে একটা অখণ্ড যোগসূত্র বর্তমান থাকায় সম্প্রতি সেইভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে উপন্যাসের সাধারণ সমস্যা আলোচিত হয়েছে। উপন্যাসে বক্তব্য, জীবন-বিন্যাস, চেতনাপ্রবাহ, বাস্তবতা ও রোমান্স, উপন্যাস-বিচার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে লেখক যে আলোচনা করেছেন তা সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ। দ্বিতীয় অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পর হঠাৎ শুধুমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা কিঞ্চিৎ খাপছাড়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা একত্রে করা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর যে বহু বাঙালী উপন্যাসকার জন্মেছেন। যাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসকারও একজন। তাঁদের উহ্য রেখে একেবারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি নায়কের আলোচনা ধারাবাহিকত্বের দিক থেকেও ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথমাংশ সুলিখিত এবং উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

The Goddess Bargabhima — A Study: Pradyot Kumar Maity, Indian Publications, 3 British Indian St. Calcutta-1. Price Rs. 7.50.

তমলুকের বহু আরাধ্যাদেবী বর্গভীমামন্দিরের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। কোন সময়ে কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দির তা নিয়ে আজও চলেছে অন্তহীন বিতর্ক। দেবীবর্গভীমা কি আচার্যদেব পরমারাধ্য অসীম ক্ষমতাময়ী কোন মাতৃমূর্তি? কয়েকজন পুরাতাত্ত্বিক বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন এই সুপ্রাচীন জনপদের দেবীমূর্তির আরধনার অন্তরালে। কোন বহু প্রচলিত পুরাণ বা সংস্কৃত গ্রন্থে এই দেবী-বিষয়ক কোন উল্লেখ নেই। দেবী বর্গভীমা নামের নিহিতার্থ আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাম্রলিপ্ত এককালে বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র ছিল, তখন ধনী ব্যবসায়ীরা দেবী বর্গভীমাকে অর্ঘ্য প্রদান করতেন। দেবীবর্গভীমা আজও নানা প্রয়োজনে মানুষের উপাস্য। বছরের কয়েকটি দিনে পুণ্যার্থী মানুষের সমাগম ঘটে এখানে। রোগমুক্তি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ব্যবসায় উন্নতি, চাকরি প্রাপ্তি, পরিবারের মঙ্গল ইত্যাদি নানান কামনা নিয়ে আসে বহু পুণ্যার্থী। শেষ সংক্রান্তির পূজো সব থেকে উল্লেখযোগ্য। এইদিন মেলাও বসে।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস-অধ্যাপক প্রদ্যোতকুমার মাইতি দেবীবর্গভীমা এবং তমলুক শহরের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই সমস্ত উপাদান বিস্তৃত গবেষণার সহায়ক হবে। তমলুকের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে শ্রীমাইতি আলোকপাত করেছেন। শ্রীমাইতি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে দেবীবর্গভীমা ছিলেন প্রাচীন বাংলার অনভিজাত মানুষদের আরাধ্য। পরে এই দেবী হিন্দু সমাজে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে উচ্চাসন পান। তাছাড়া তিনি দেখিয়েছেন এই দেবী আরাধনা শুরু হয়েছিল একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে। যে মন্ত্রপাঠে দেবীর আরাধনা হয়, কোন সংস্কৃত গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার রেখ শিল্পরীতির বিরল নিদর্শন, দেবীবর্গভীমা মন্দিরের স্থাপত্যে জীবন্ত হোয়ে আছে আজও।

অধ্যাপক মাইতির বর্তমান গ্রন্থটি খুবই ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বে বইটির মূল্য অসাধারণ। যাঁরা বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা বইটি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও এই ধরনের অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে আছে। সব মন্দিরেই যে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঘটেছে এমন নয়। তরুণ গবেষকরা এদিকে দৃষ্টিপাত করলে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির উপকার হবে।

জীবন নিয়ে খেলা (উপন্যাস)—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি প্রকাশনী, ৪৪।১, কাশীপুর রোড, কলকাতা—৩৬। পাঁচ টাকা।

মানুষের মনের গভীরে বাসা বেঁধে আছে যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। সভ্যতা শিক্ষা সংস্কারমুক্তির আলো সে অন্ধকার দূর করতে পারেনি আজও। মানুষের অন্ধ গোঁড়ামির যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে আজও হিন্দু মেয়েরা—আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে ভিন্নধর্মে, বিপথে অনালোকিত জীবনে। সমাজের সামনে নির্যাতিত তিনটি মেয়ের জীবনকাহিনীর মধ্যে দিয়ে মৌল সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলার প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছে লেখক।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অব্যয় (সাহিত্য পত্রিকা) সম্পাদক: অতীন্দ্রিয় পাঠক, তপনলাল ধর। অব্যয়, ৪২, গড়পার রোড, কলকাতা-৯। এক টাকা।

আলোচ্য সাহিত্য পত্রিকাটি চলতি সাময়িক পত্রগুলির এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। বিজ্ঞাপনহীন তবু এর সর্ব অবয়বে তারুণ্যের মাধুর্য ও দীপ্তি। লেখায় রেখায় মুদ্রণে এত অত্যুজ্জ্বল যে সহজেই পাঠকদের নজর টানে। রচনাগুলির রচনারীতিতেও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ। এ সংখ্যায় পরীক্ষামূলক চারটি গল্প লিখেছেন শেখর বসু, দিলীপ নন্দী, দেবাশীষ চৌধুরী ও অতীন্দ্রিয় পাঠক। কবিতা লিখেছেন বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তপনলাল ধর [illegible] রুদ্র [illegible]

বিশ্ব শেকস্পীয়র কংগ্রেস

জগন্নাথ চক্রবর্তী

টোটেম পার্ক। এখানেই আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। নিচের তলায় অফিস, ডেলিগেটরা ব্যাজ নিচ্ছেন, কুপন নিচ্ছেন, কেউ বা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। ইনফরমেশন কাউন্টারে দুজন তরুণী—বৃটিশ কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী—দ্রুত জবাব দিচ্ছে, নাম-ঠিকানা লিখছে, বলে দিচ্ছে কোথায় চেক ভাঙাতে হবে, কোথায় ডাকটিকিট পাওয়া যাবে, কোথায় পেপার-রীডিং, কোথায় ফিল্মশো, কোথায় বক্তৃতা এবং কোথায় মধ্যাহ্ন ও নৈশ ভোজের নির্দিষ্ট জায়গা। আমি টোকিও থেকে বিকেল বেলা রওনা হয়ে ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক এয়ার লাইনসের বিমানে যখন ঐ একই দিন সকালেই—আন্তর্জাতিক তারিখরেখার ভেল্কিবাজিতে—ভ্যাঙ্কুভার বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালাম তখন সেখানে অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি ছিল না। এয়ারপোর্টের মাইকেই 'ওয়ার্ল্ড শেকস্পিয়র কংগ্রেস'-এর স্বেচ্ছাসেবিকাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছিল আগন্তুক ডেলিগেটরা কোন্ গেট দিয়ে বেরোচ্ছেন ইত্যাদি।

বিশ্ব শেকস্পিয়র কংগ্রেস! একটা বিরাট ব্যাপার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে—অন্তত সব মহাদেশ থেকেই—পাঁচশো প্রতিনিধি এসেছেন; সকলেই শেকস্পিয়র-বিশেষজ্ঞ। নয় দিন ধরে চলবে এই কংগ্রেস। এর প্রধান উদ্যোক্তা কানাডার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়—বৃটিশ কলম্বিয়া ও সাইমন ফ্রেজার—এবং একটি বর্ণাঢ্য প্রতিষ্ঠান যার নাম কানাডা কাউন্সিল। এর কৃতিত্ব বিশেষ করে আরো একজনের—যিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান—তিনি সাইমন ফ্রেজারের অধ্যাপক রুডলফ হ্যাবেনিশট—ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় 'রুডি'—যাকে আমি এযাবৎকাল শুধু বিখ্যাত 'শেকস্পিয়র কোয়ার্টালি'র বাৎসরিক গ্রন্থপঞ্জী বা বিবলিওগ্রাফির সংকলক বলেই জানতাম। শেকস্পিয়র নিয়ে এরকম একটা মহাসম্মেলনের স্বপ্ন—বলা যায় 'মিডসামার-নাইটস ড্রিম'—প্রথম তাঁর মাথাতেই আসে, এবং তিনিই কানাডা কাউন্সিলের কর্তাদের কঠিন হিসেবী হৃদয় দ্রবীভূত করেন।

টোটেম পার্কের পাঁচতলায় যে একক ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট তার একেবারে পাশের ঘরটিতেই রয়েছেন গ্রিগরি কোজিনৎসেভ, লেনিনগ্রাদ থেকে আসছেন এবং আমারই মতো সদ্য কানাডায় এসে পৌঁছেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'প্রশান্ত-মহাসাগরের ওপর এই সুন্দর শহরটি আমার খুব ভাল লেগেছে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'কাস্টমসের ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল খুব।' কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আসছেন বিশ্ব শেকস্পিয়র কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে, আপনার আবার কাস্টমসের ঝামেলা কেন?' তাঁর জবাব থেকেই জানলাম যে এই শেকস্পিয়র মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি একটি রুশ শেকস্পিয়র-ফিল্ম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, ডেলিগেটদের দেখাবেন; ঝামেলা সেটিকে নিয়েই। বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না যে এটি সত্যিই শেকস্পিয়র-ফিল্ম এবং বিশেষ করে কনফারেন্সের জন্যই আনা। আমি খুব বিজ্ঞের মতো বললাম, 'আমি কিন্তু আপনার এই ছায়াছবিটি বেশ কয়েক বছর আগেই কলকাতায় দেখেছি।' তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'অসম্ভব! এ ফিল্ম আপনি দেখতেই পারেন না। আপনি বোধকরি আমার আগের শেকস্পিয়র ফিল্ম 'হ্যামলেট' দেখেছেন। কিন্তু যেটি আমি সঙ্গে করে এনেছি সেটি নতুন তোলা, 'কিং লীয়র'; সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে এর আগে কখনই দেখানো হয়নি।' আমি স্বীকার করলাম যে কলকাতায় যে ফিল্মটি দেখেছি সেটি তাঁর তোলা 'হ্যামলেট'। মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম যে, এখানে এসে এমন একটা ফিল্ম প্রথমেই দেখবো যা ভারতবর্ষ কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে পৃথিবীতে অন্য কোথাও কেউ দেখেনি। কোজিনৎসেভ খুব মৃদুভাষী এবং মৃদু হাসাময়। এর পর সিঁড়িতে বারান্দায় যখনই দেখা হত, তিনি বলতেন, 'আপনি তো আমার প্রতিবেশী'—এইটুকু আর মাইনর'; আমি জবাব দিতাম, 'হ্যাঁ, এখানেও এবং ওখানেও।' ওখানেও অর্থাৎ ভারতবর্ষে এবং রাশিয়া ও ভারতবর্ষ দুটি পাশাপাশি দেশ; আবার টোটেম পার্কে আমি ও কোজিনৎসেভ রয়েছি পাশাপাশি ঘরে। দুই অর্থেই আমরা প্রতিবেশী।

যেদিন কোজিনৎসেভের 'কিং লীয়র' ফিল্মটি দেখানো হবে সেদিনটির জন্য উৎসুক হয়ে ছিলাম। দেখে মুগ্ধ হলাম। নিঃসন্দেহে, কোজিনৎসেভ একজন অত্যন্ত সজাগ ও মেধাবী শিল্পী। ফিল্মের ছবিটি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ফুটে না ওঠা পর্যন্ত তিনি তাকে রূপায়িত করেন না। তাঁর 'লীয়র' চলচ্চিত্রটির আরম্ভে ও সমাপ্তিতে আছে ল্যান্ডস্কেপ। প্রথম দৃশ্যটি সম্পূর্ণ নির্বাক। এই নীরবতা এমন তীব্র যে দর্শক অভিভূত না হয়ে পারেন না। দীর্ঘ উষর পথ বেয়ে কাতারে কাতারে দরিদ্র, খঞ্জ,

অশক্ত প্রজারা চলেছে লীয়রের রাজপ্রাসাদের দিকে, রাজার ঘোষণা শুনতে। রাজ্যবণ্টনের ফলাফল যে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকেও বিপর্যস্ত, বিড়ম্বিত করতে পারে পরিচালক সেটিই ফুটিয়ে তুলতে চান। প্রাসাদরক্ষীদের ভ্রূকুটি এবং গরীব প্রজাদের উদ্বেগ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অশুভ, অস্বাভাবিক, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। শেষ দৃশ্যেও কোজিনৎসেভ আবার জনসাধারণকে নিয়ে এসেছেন ক্যামেরার সামনে। এবার তারা একটু পরিবর্তিত মানুষ। যুদ্ধবিগ্রহের ঝড় বয়ে গেছে তাদের ওপর দিয়েঃ এখনও তারা গম্ভীর ও নীরব, কিন্তু শক্ত হাতে বিধ্বস্ত দেশ পুনর্নির্মাণের কাজে রত। ফিল্মটি দেখবার পর অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, 'এটা কি শেকস্‌পীয়রের লীয়র হয়েছে?' আমি বলেছি, 'নিশ্চয়ই। তবে মঞ্চের লীয়র নয়, ফিল্মের লীয়র, এই যা। ফিল্মের কাজ শেকস্‌পীয়রের কথা হুবহু রক্ষা করা নয়, 'মেটাফর' রক্ষা করা।' কোজিনৎসেভ নিজেও হয়তো এই উত্তরই দিতেন। লীয়র যখন ক্রমশ উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন, তখন সেই পরিবর্তন চলচ্চিত্রে খুবই বাস্তব হয় উঠেছে। টেকনিকের সঙ্গে শিল্পীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী খুব চমৎকার সমন্বিত হয়ছে। সর্বাধিনায়ক লীয়র যখন তাঁর একশত রক্ষী নিয়ে রাজকীয় মর্যাদা ও গৌরবে এসে দাঁড়ান, তখন ক্যামেরা এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে, দর্শকরা রাজা লীয়রের হাঁটুর নিচে পড়ে থাকেন, ঘাড় উঁচু করে তাঁকে দেখতে হয়। আমরা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত 'রাজবদ্‌উন্নত-ধ্বনি'র আভাস পাই। তারপর গনেরিলের প্রাসাদ থেকে কন্যা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তিনি যখন বেরিয়ে আসেন, তখন দেখি তিনি সাধারণ মানুষের দৈর্ঘ্যে নেমে এসেছেন এবং দর্শকরা ঠিক তাঁদের লেভেলেই লীয়রকে ক্যামেরার সামনে দেখতে পান। কিন্তু পরে যখন লীয়র একেবারে উন্মাদ, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন, তখন ক্যামেরা তুলে ধরা হয়েছে আকাশে, যেন ঈশ্বরের চোখ দিয়ে তাকে দেখা হচ্ছে—বহু নিচে লীয়র যেন একটি ক্ষুদ্র নগণ্য বিন্দু—অসহায়, অশক্ত, অপমানিত, বৃদ্ধ। কোজিনৎসেভের ফিল্মের স্টাইল ক্লাসিক্যাল, এর মধ্যে কোনো অতি-আধুনিক কারসাজি তিনি ব্যবহার করেননি, সম্ভবত ইচ্ছে করেই। ঝাপসা হয়ে আসা দৃশ্য, ডাবল বা ট্রেবল প্রিন্টিং, ফ্ল্যাশ ব্যাক ইত্যাদি কিছুই তিনি আমদানি করেননি। কোনো রঙের ব্যবহারও নেই, সম্পূর্ণ চিত্রটি তোলা হয়েছে শাদা-কালোয়। সাধারণ মানুষের মুখগুলির মধ্যে তিনি এমন এক গ্রামীণ রুক্ষতা ও সারল্য সৃষ্টি করেছেন যা মনে থাকে। লীয়রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এস্তোনীয় অভিনেতা ইউরি ইয়ারভেৎ এবং আবহসঙ্গীত রচনা করেছেন বিখ্যাত সুরকার শস্তাকোভিচ।

আমার প্রবন্ধ কবে পড়া হবে সে সম্বন্ধে কোজিনৎসেভ আগ্রহসহকারে প্রশ্ন করতেন। আমিও যেদিন কোজিনৎসেভ তাঁর নিজের প্রবন্ধ পাঠ করলেন, সেদিন উৎসুক হয়ে আগের সারিতে গিয়ে বসেছিলাম। আমার ঔৎসুক্য বৃথা হয়নি। শিল্পী কোজিনৎসেভ নিজেই তাঁর শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পকর্ম ব্যাখ্যা করবেন, এটি সামনে বসে শোনার সৌভাগ্য সচরাচর ঘটে না। প্ল্যাটফর্মের ওপর তিনি একটি নীলচেরঙা স্যুট পরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে আরো বেশ কয়েকদিন তাঁকে এই পোশাকেই দেখেছি, সম্ভবত নীল রঙ তাঁর বিশেষ প্রিয়। কোজিনৎসেভের প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'হ্যামলেট ও কিং লীয়রঃ রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র।' তাঁর কাছ থেকে এর চেয়ে উপযুক্ত কোনো বিষয় আশাই করা যায় না, কারণ তিনি 'হ্যামলেট' ও 'লীয়র' দুটিরই ফিল্মরূপ দিয়েছেন এবং দিতে গিয়ে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বিষয়ে একাধিক সমস্যা অবশ্যই সমাধান করেছেন।

দীর্ঘাঙ্গী, কথা বলতে বলতে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েন, কখনো পকেটে হাত রাখেন। ভয়ানক লাজুক প্রকৃতির মানুষটি, কথা বলার সময় স্বরগ্রাম একটুও চড়ান না, কিছুটা যেন নিজের মনেই নিজের উক্তি ব্যাখ্যা করেন এবং বলার ভঙ্গী একেবারে কথোপকথনের মতো। সরাসরি প্রশ্নোত্তর একেবারেই ভালবাসেন না, মামুলি প্রশ্ন করা হলে হয় এড়িয়ে যান নয় সরাসরি ঘাড় নেড়ে বলেন, এ সম্বন্ধে তাঁর কিছুই বলার নেই। তিনি বললেন, চলচ্চিত্র এবং থিয়েটার দুটি আলাদা মিডিয়াম। চলচ্চিত্র শুধু যে দৃশ্যপ্রধান তাই নয় এবং দৃশ্যনির্মাণের কলাকৌশলও আলাদা। শেকস্‌পীয়রের কথা বলতে গিয়ে তিনি খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন যে, শিল্পী হিসাবে শেকস্‌পীয়রের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তাঁর কাব্যিক বাস্তবতা (পোয়েটিক রিয়্যালিজম) স্থান ও কালজয়ী। কোজিনৎসেভের মতে, চলচ্চিত্রে এবং নাটকে ঠিক একই জায়গায় জোর পড়ে না, না পড়াই বাঞ্ছনীয়। চলচ্চিত্রে নাটকের চাপ বা 'স্ট্রেস' বদলে যায়। কথা ও কাব্যের বদলে চলচ্চিত্রে জোর পড়ে দৃশ্যের ওপর। বলা বাহুল্য, থিয়েটারের কাঠামোটি ভেঙে ফেলে তাকে ফিল্মের কাঠামোয় রূপান্তরিত করে নিতে না পারলে এবং জোরের জায়গাগুলির পরিবর্তন না ঘটিয়ে চলচ্চিত্রকার কখনই সার্থক ফিল্ম সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি খুব সুন্দরভাবে বললেন যে, চলচ্চিত্রে চরিত্রগুলিকে ল্যান্ড-

স্কেপের মধ্যেই বসতে হয়। ফলে নাটকের কাব্যিক বোঝার অনেকটাই ফিল্মের মধ্যে বহন করে এই ল্যান্ডস্কেপ বা দৃশ্যপট। ফিল্মে দৃশ্যপট বলতে শুধু একটি স্থান বা ঘটনাস্থল বুঝায় না, ঘটনার সূত্রও এর সংগে অংগাংগী হয়ে থাকে।

নাটকের বদলে তিনি রুশ উপন্যাস থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। যেমন ধরুন দস্তয়েভস্কির বিখ্যাত উপন্যাস "ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেণ্ট'। খুনী র‍্যাশকলনিকফের চরিত্রটি নিদাঘদগ্ধ, ক্রিস্ট সেণ্ট পিটার্সবুর্গ নগরীর ইমেজের সংগে অভিন্ন। কোজিনৎসেভের মতে, উপন্যাসের মূল আইডিয়াটি দস্তয়েভস্কি-বর্ণিত পীড়িত তাপদগ্ধ নগরীর মধ্যেই রূপ পেয়েছে, অর্থাৎ ক্লিস্ট আত্মার অদৃশ্য নরকযন্ত্রণা এই ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। দস্তয়েভস্কি ও শেকস্পীয়র উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে খুব মিল দেখা যায়—দুজনের রচনাতেই স্থান ও কালের অনুভূতি পরস্পরের অংগাংগী এবং দুজনের ক্ষেত্রেই শিল্পীর ধ্যান বা ধারণা তার রূপায়ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা বা বিচার করা যায় না। রুশ পরিচালক বল্লেন, এইজন্যই শেকস্পীয়র-ফিল্ম নির্মাণের বেলায় স্থান বা ঘটনাস্থল বাছাই করার সময়ই কালের সমস্যাটিও তিনি সমাধান করে নেন।

তিনি এমন ভাবে অতীতের দৃশ্য পট ব্যবহার করেন যাতে তা অনায়াসেই ভবিষ্যতের দৃশ্য পটও হতে পারে। এইভাবে যে বাস্তব তৈরী হয় তা অতীতও নয়, ভবিষ্যৎ ও নয়, চির-বর্তমান বা চিরন্তন। তাঁর মতে, নতুন করে শেক্সপিয়র-অন্বেষণ কোনোদিনই শেষ হবে না। শেক্সপিয়র যেন এক অন্তহীন গোলক ধাঁধা যার বিভিন্ন অংশের সুযোগসূত্র খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় এবং প্রত্যেক যুগই শেক্সপিয়রের মধ্যে তার নিজস্ব সংযোগসূত্রটি আবিষ্কার করে নেয়। 'আমার নিজের যুগের আলোয় শেকস্পীয়রকে পড়তে চেষ্টা করেছি, প্রত্যেক যুগকেই তা করতে হবে।' এই বলে প্রবন্ধকার থামলেন।

কোজিনৎসেভের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে দীর্ঘ করতালিতে সভাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো। সভাপতি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রায়ান পার্কার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বল্লেন, 'এই হৃদয়স্পর্শী আলোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' প্রবন্ধের পর যখন আলোচনা শুরু হল তখন অবশ্য প্রবন্ধের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে বেশ কয়েকজন তাঁদের বিদগ্ধ সংশয় প্রকাশ করলেন। সম্মেলনের অন্যান্য দিনও দেখেছি অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সবচেয়ে শান্ত কোমল তন্বী ডেলিগেটরাই সবচেয়ে তীব্র আক্রমক শর মঞ্চের দিকে নিক্ষেপ করেছেন। এদিনও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আগতা রিয়োদিজানেয়োর 'এস্কোলা দে তেয়াত্রো'র অধ্যাপিকা শ্রীমতী বারবারা দে মেন্দোনচা অভিযোগ করলেন যে, কোজিনৎসেভের 'হ্যামলেট' ঠিক শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' হয়নি; শেকসপিয়রের বক্তব্য সম্পূর্ণ গ্রহণ না করে ইচ্ছেমতো বাছাই ও ছাঁটাই করতে গিয়ে তিনি মূল নাটকের রাজনৈতিক মন্তব্যই বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

আমি জানতাম কোজিনৎসেভ এইসব বাদানুবাদের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইবেন না, কারণ আমার প্রতিবেশীর লাজুক ভাবটি আমার চেয়ে কে আর বেশি বোঝে। কোজিনৎসেভের পক্ষ নিয়ে আমিই বল্লাম, 'আমার মনে হচ্ছে শ্রীমতী মেন্দোনচা এই প্রশ্ন বা অভিযোগ শুধু কোজিনৎসেভ নয় টোনি রিচার্ডসন ('হ্যামলেট' ব্রিটেন ১৯৬৯), বা লরেন্স অলিভিয়ারের ('হ্যামলেট' বৃটেন ১৯৪৮), প্রতিও ছুঁড়ে দিতে পারতেন। কারণ ডেনমার্কের রাজসভার দৃশ্যটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রকারেরই নতুন করে মনগড়া। এই মন-গড়ার কাজ তো চিরকালই শিল্পীর নিরঙ্কুশ অধিকার। এই অধিকার থেকে কোনো সৎ শিল্পীই স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হতে পারেন না, গ্রিগরি কোজিনৎসেভও না।' আমি কোজিনৎসেভের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাই না?' আমার রুশ প্রতিবেশী বন্ধু ডেলিগেট মৃদু হেসে ধন্যবাদসূচক ঘাড় নাড়লেন। কেউ কেউ তবু সভাগৃহ থেকে প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ কোজিনৎসেভ, আপনি নিজে কি কিছু বলবেন?' কোজিনৎসেভ জবাব দিলেন 'না। উনিই বলে দিয়েছেন।' এইভাবে লেনিনগ্রাদ ও কলকাতা থেকে আগত দুজন প্রতিনিধি বিশ্ব শেকসপিয়র কংগ্রেসের অধিবেশনে রুশ-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতার একটি সহজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শেষে যেন লজ্জা পেয়ে পূর্ণবাবুকেই চোখ নামাতে হল। কিন্তু হেমন্ত তেমনি বিচিত্র দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকেই প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আমার ছেলে?'

কিন্তু এই সামান্য প্রশ্রয়ের আড়ালেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বরং পূর্ণবাবুরই।

তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। তাকে বড় ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো, হোস্টেলে রাখব। ছেলে যখন ছুটিতে বাড়ী আসবে, আমি তখন থাকব না—কথা দিচ্ছি ছেলে কিছু টের পাবে না। তোমাকে যাতে অন্য কারও কাছেও না লজ্জিত হতে হয়, সে ব্যবস্থাও আমি করব। আমি লুকিয়ে আসব রাত্রে থাকব না। নটা-সাড়ে নটার সময়ই চলে যাব।... বালিগঞ্জে আমার বাগান বাড়ি আছে—নির্জন যায়গা তার আশে-পাশে কোন ভদ্র বসতি নেই, তোমার আমার চেনা লোক কেউ বেরোবে না। দরকার হয় ভাড়াটে গাড়ি পাঠিয়ে 'কল' দেবার নাম করে সেখানে নিয়ে যাব, ভোরে ফিরে আসবে। তোমার ঝি চাকর রাঁধুনীরাও টের পাবে না।...আমি বলছি, তোমাকে কথা দিচ্ছি—বিশ্বাস করে দ্যাখো। যা বলবে, যে শর্তে বলবে আমি তাতেই রাজী। একটুখানি দয়া করো আমাকে—আমি আর পারছি না। আমি বলছি, শুধু একবার রাজী হও, তোমার কোনদিকে কোন ভাবনা থাকবে না।'

বলতে বলতেই আবেগে, উত্তেজনায়—প্রেমের প্রবলতায় যেন স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যান পূর্ণবাবু, আরও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হেমন্তর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরেন, উন্মত্তের মতো প্রবৃত্তি-বিহ্বল কণ্ঠে অর্ধস্ফুট স্বরে বলেন, 'বলো বলো হেমন্ত, দয়া করবে আমাকে।'

হেমন্ত বাধা দেয় না, হাত দুটো ছাড়াবারও চেষ্টা করে না।

জায়ের কথাটাই মনে পড়ে তার, সেই অদ্ভুত মনোভাবটা।

ডুবে গেলেই বা ক্ষতি কি?

কি লাভ এত হাঙ্গামায়, এত কষ্টে—বাঁচবার চেষ্টা করার দরকারই বা কী এমন?

।। ১৪ ।।

পূর্ণবাবু বলেছিলেন, 'একবার রাজী হও, একটু দয়া করো, তোমার কোন দিকে কোন ভাবনা থাকবে না।'

সত্যিই কোন ভাবনা থাকে না।

অর্থের ভাবনা তো নয়ই।

যেন ভোজবাজীর খেলা দেখে সে বসে বসে। ইন্দ্রজালের ভেলকী।

যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়!

আলিবাবার গল্পে পড়া — 'সিসেম খোল' সংকেত মন্ত্রের মতো।

'কল'-এর পর 'কল' আসতে থাকে: শেষে এমন অবস্থা হয় দিনে-রাতে বিশ্রামের অবসর থাকে না একটু, এক এক সময় চান খাওয়ারও ফুরসৎ মেলে না। হেমন্ত অবাক হয়ে যায়—কোথায় ছিল এরা, এতকাল কি তার সাইনবোর্ডটা কারও চোখে পড়ে নি? এই তো এ পাড়ারও অনেকে ডাকছে এখন, আগে কেউ ডাকেনি কেন? এ কি তার সঙ্গে ভগবানের শত্রুতা, তাকে ডুবিয়ে মারবেন বলেই এমনভাবে চারি দিকের সব কূল, সব পথ বন্ধ করে রেখেছিলেন?

কেন অকস্মাৎ এই জনপ্রীতি—তা প্রশ্ন করার দরকার হয় না অবশ্য।

এ সবই পূর্ণবাবুর অনুগ্রহ, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা। তাঁরই ইঙ্গিতে, সুপারিশে—কাজ ভাল হবে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে এই আশায়—কোথা কোথা থেকে এসে খুঁজে বার করে হেমন্তবালাকে, পটল-ডাঙ্গার সুঁড়ি রাস্তার এই সামান্য বাড়িতে। অনেকে এসে ধরে বিপদের সময় পূর্ণবাবুকে পাওয়া যাবে বলে। নইলে তিনি আসবেন না। সোজা বলে দিয়েছেন নাকি তাঁর বাঁধা মক্কেলদের, অন্য কোন দাইকে ডাকলে তিনি সে প্রসূতির কোন দায়িত্ব নিতে পারবেন না।...এইটুকু বলাই তো যথেষ্ট।

অনেক ভাবনা থেকেই নিশ্চিন্ত হয়।

ছেলে ভর্তি হয় সরকারী ইস্কুলে। কলকাতারই ইস্কুল—কিন্তু এখানে কে দেখবে, এই অজুহাতই যথেষ্ট, হোস্টেলে রাখার। হোস্টেলও ভাল, বড়লোকের ছেলেরা থাকে অনেকে। নিয়ম-কানুনও নাকি খুব কড়া—ছেলে বকে যাবার সম্ভাবনা নেই।

হেমন্ত মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখে আসে, পূর্ণবাবুও যান। ফি শনিবার আনা যায় না, আজকাল কাজের জন্যে নিয়ম করে বাড়ি থাকা সম্ভব হয় না, জরুরী ডাক পড়লে তখনই ছুটতে হয়। কোন রবিবার হাতে কাজ না থাকলে হেমন্ত সকালে গিয়ে নিয়ে আসে আবার সন্ধ্যার আগে পৌঁছে দেয়।...পূর্ণবাবুই সব খরচ দিতেন প্রথম প্রথম, মায় ওখানে প্রাইভেট পড়াবারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন একটা, সে খরচও দিতেন—বছর খানেক পরে আর প্রয়োজন রইল না, হেমন্তরই যথেষ্ট উপার্জন হতে লাগল।

গোপালীর ভরসায় যে থাকে নি—তাতে ভালই হয়েছে। সেই জ্বরটার পরেই তার শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ল, কিছুতেই সুস্থ হতে পারে না আর। প্রায়ই জ্বর হয়, আহারে রুচি থাকে না, দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষে প্রায় শয্যাশায়ী হবার উপক্রম হতে ধনুবাবু ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে মুসৌরী পাহাড়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন। একেবারে বছরের মতো বাড়ি ভাড়া করে সঙ্গে অনেক লোকজন দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

যত দূর পর্যন্ত ট্রেন যায় যাবে—তার পর ডাণ্ডি করে নিয়ে যাওয়া হবে। খুব নাকি ভাল জায়গা, টানের জায়গা। সাহেবরা থাকে সেখানে, তারাই পাহাড়ের ওপর শহর গড়েছে, জল-হাওয়া আর দৃশ্য খুব ভাল বলে। ধম্মবাবু যেতে পারবেন না বলে গোলাপী খুঁৎ খুঁৎ করছিল—হেমন্তই বুঝিয়ে রাজী করাল, বলল, 'চলে যাও দিদি, নইলে একেবারেই যদি ছেড়ে যেতে হয় দাদাবাবুকে—তখন?...তারচেয়ে সেরে-সুরে আগের মানুষ হয়ে এসো, সেই তো ভাল। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

ধম্মবাবুও অবশ্য শেষ পর্যন্ত কথা দিলেন—অন্তত দু'তিন মাস অন্তর তিনি একবার করে যাবেন—তা তাঁর কাজের যত ক্ষতি হোক। বেশী দিন থাকা যাবে না—যেতে আসতেই তো আটদিন কেটে যাবে—তবু চোখের দেখাটা তো একবার হবে! আগে হেমন্তকেও সঙ্গে যাবার জন্যে খুব চেপে ধরেছিল গোপালী কিন্তু তারপর নিজেই পেছিয়ে গেল, বললে 'না, তোর এই নতুন পসারের সময়টা অতদিন বাইরে থাকা ঠিক হবে না। গেলে ক্ষতি হবে।'

যাওয়ার আগে এই হঠাৎ সৌভাগ্যের স্বর্গদ্বার খোলার (হেমন্তর নিজের মনে হয় দুর্ভাগ্যেরই স্বর্গদ্বার ওটা) খবর পেয়ে গেছে বৈকি গোপালী। তার কাছে কিছুই গোপন করে লাভ নেই, তার মতো উপকারী বন্ধু জীবনে আজ পর্যন্ত পায়নি, বাপ ভাইয়ের থেকে ঢের বেশী আপন—তাছাড়া টাকার প্রশ্নও উঠল, যাওয়ার আগে বেশী করে থোক টাকা দিয়ে যেতে চেয়েছিল গোপালী—কেন আর সে টাকা নিতে হবে না হেমন্তর, হয়ত আর কখনই হবে না—সেটা বলা দরকার।

সুতরাং সবই বলতে হ'ল। গোপালী কিছুই বলল না ধিক্কার দিল না, তিরস্কার করল না। হেমন্তর সেই প্রথম-দিককার তেজদর্প স্মরণ করিয়ে শোধ নেবার চেষ্টা করল না। ক্লান্তভাবে হাসল শুধু একবার, বোধহয় অস্বাস্থ্যের জন্যেই ইদানীং বেশী কথা বলতে পারত না। খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'কী করবি বল, সবই অদৃষ্ট। তোর ভাগ্য তোকে এই পথে আনবে বলেই সব রকমে বঞ্চিত করেছিল। পূর্ব্ব জন্মের পাপ। নইলে কার আর এমনভাবে সব কুল ঘোচে বল!... যাক গে, তুই মন খারাপ করিসনি, ছেলেটা যদি মানুষ হয়—আবার সব হবে। ভগবান অন্তর্যামী—তিনি সবই জানছেন, তিনি তোকে মাপ করবেন। এও একরকম কষ্ট করাই, ছেলেমেয়ের জন্যে কোন কষ্ট করাতেই পিছপা হলে চলে না, এইটেই মনে কর, মনে কর তার জন্যেই তপিস্যে করছিস!'

সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল হেমন্তর, হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেয় এই পতিতা মেয়েটার। এই যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার বাবার থেকে ঢের বড় সদব্রাহ্মণ ছিলেন এর বাবা, সত্যিকারের মহাপ্রাণ ব্যক্তি!

পূর্ণবাবু শিগগিরই বড় রাস্তার ওপর একটা বাড়ি ঠিক করলেন। এর চেয়ে অনেক বড়। নিচে খান চারেক, ওপরে তিনখানা ঘর। হেমন্ত আপত্তি করেছিল, 'কী হবে আমার এত বড় বাড়ি নিয়ে? আমি একা মানুষ, বড় বাড়ি খাঁ-খাঁ করে গিলতে আসবে—নয়ত একগাদা ঝি-চাকর রাখতে হবে।' পূর্ণবাবু সে আপত্তি শোনেননি। বলেছেন, 'কারবার করতে গেলে একটু ঠাট দরকার গো লক্ষ্মী, ভেখ নইলে ভিক্ষে মেলে না। মানুষের নিয়মই এই—বড়লোককেই পয়সা দিতে চায়, তেলামাথায় তেল ঢালে। তোমার অবস্থা ভাল হচ্ছে, সেটা লোককে জানাতে হবে। তবে তারা বুঝবে তুমি ভাল কাজের লোক, সেইজন্যেই তোমাকে বেশী লোক ডাকে। যাকে অনেকে ডাকে পসার বেশী—তাকেই ডাকতে চায় সবাই। ডাক্তার বলো, উকীল বলো—সকলের পক্ষেই একথা খাটে!

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'আর কি জানো, বড় রাস্তায় অনেক লোকজন, সেখানে কার বাড়ি, কে আসছে এখন অত কেউ খবর রাখে না। হল গাড়িটা একটু দূরে কোথাও দাঁড় করিয়ে রাখতে বললুম—অমুক সময় নিয়ে এসো বললে কোচোয়ান সেই সময়ে আবার নিয়ে আসবে। এ এই একরত্তি রাস্তায় প্রায় প্রত্যহই আমার গাড়ি আসে—তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে—সকলেরই চোখে পড়ে, নিশ্চয় এ নিয়ে আলোচনাও হয়। তোমারও একটা লজ্জা তো—'

কানের মধ্যে দিয়ে শব্দগুলো যেন জ্বলতে জ্বলতে ভেতরে ঢোকে। সে জ্বালা সমস্ত রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই সেদিনই কি একটা বইতে পড়ছিল 'অগ্নি-শলাকার মতো কানের মধ্য দিয়া মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল আজ কথাটার অর্থ বুঝতে পারল সে। প্রতিনিয়ত এই অপমান, এই লজ্জা এই অশুচিবোধ সে ভুলে থাকবারই চেষ্টা করে প্রাণপণে—কিন্তু আজ ও যখনই নিজের অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে তখনই যেন বিছের কামড়ের মতো জ্বলতে থাকে সারা দেহ। মনে হয় ছুটে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—তাতে মৃত্যুহিম সমাপ্তিতে ডুবে যদি এ দাহ কিছু কমে।

বড় বাড়িতে এসে একটা দারোয়ান রেখে দিলেন পূর্ণবাবু। বৃদ্ধ গোছের ভোজপুরী দারোয়ান। আগে অতটা কিছু ভাবেনি, পরে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে জানল, এর আগে সে এক বিখ্যাত বাইজীর বাড়ি ছিল, এক নাগাড়ে তেইশ বছর কাজ করেছে। তিনি এখন পেশা ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবন চলে গেছেন বলেই ওকে পাওয়া গেছে।

লোকটা কথা কম বলে, বিশ্বাসী তো বটেই—নইলে এতদিন এক নাগাড়ে এক জায়গায় থাকতে পারত না—এই জন্যেই সম্ভবত বেছে বেছে ওকে এনেছেন পূর্ণ-বাবু—কিন্তু এর মধ্যেও যে ইঙ্গিতটা আছে, হেমন্তর নিজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে—সেটা ভাল লাগে না। সেই ভাল-না-লাগার ঝাঁঝ বাইরেও প্রকাশ পায় পূর্ণবাবু এলে। পূর্ণবাবু কিন্তু রাগ করেন না, একটু হাসেন শুধু। বহুদর্শী চিকিৎসক তিনি, মানব মনের এই সব বিবর্তনের হিসেব তাঁর জানা আছে। সময়ে সব সয়ে যাবে, একদা হয়ত তাঁর মনোযোগের অভাব হলেই এই মেয়েটি ঝগড়া করবে তাও তিনি জানেন।

সত্যিই, সময়ে সয়ে যায়ও।

আরও বছর দুই পরে আর তেমন জ্বালা অনুভব করে না অপমানের! তত অসহ অস্বাভাবিকও মনে হয় না পূর্ণবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা। বরং আজকাল যেন পূর্ণ-বাবুর আসার সময়টা একটু উৎসুকভাবেই অপেক্ষা করে, না এলে বা অসুখ করলে উৎকণ্ঠাও বোধ করে।

পরিবর্তন সব দিকেই।

এই অকল্পিত বড়মানুষীতে কেমন ভাবে একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা ভেবে আজও মাঝে মাঝে অবাক লাগে বটে—তবু এখন স্বাচ্ছন্দ্যের আরামের অভাব ঘটলে যে বিরক্তি বোধহয় অসুবিধা লাগে সেটাও অস্বীকার করা যায় না। বিলাসের আয়োজনও ঢের। একটা দারোয়ান, একটা দিনরাতের ঝি, একটা ঠাকুর। এ ছাড়াও একটা ঝি রাখা হয়েছে। ওরই মধ্যে ভদ্রগোছের—'কল'এ যাবার সময় ব্যাগ বয়ে সঙ্গে যায়। অর্থাৎ একজনের সেবার জন্য চারজন দাস-দাসী।

ফলে দুরকম রান্নার ব্যবস্থা। একটা তার নিজের, ছেলে এলে ছেলেরও। আর বাকী একপ্রস্থ ঠাকুর চাকরের। হেমন্ত এখনও মাছ-মাংস খায় না। পূর্ণবাবু অনেক অনুরোধ করেছেন—কিন্তু কোথায় যেন একটা বাধে অতীত সংস্কারে। খেতে পারে না। কেবল একাদশীতে নির্জলা উপোসটা ছেড়ে দিয়েছে, দুধ ফল সন্দেশ খায়। ছেলেও যে এক-আধদিন বাড়িতে আসে মাছ মাংস খেতে চায় না, বলে 'আমি তোমার হেঁসেলে খাব মা। ওখানে তো দুবেলা ওসব বাঁধা—হয় মাছ, নয় মাংস নয় ডিম—খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। তোমার হেঁসেলের সুক্তো শাকের ঘন্ট তো পাইনে সেখানে—এখানে ঐ সবই খাব।'

কে জানে, হয়ত মার চোখের সামনে বসে মাছ খেতে তার লজ্জাই করে আজ-কাল, হয়ত মায়ের জন্যে কষ্টই হয়।...

এর মধ্যে হঠাৎ একেবারেই আকস্মিক ভাবে একটা বাড়ি কেনা হয়ে গেল।

একদিন উল্টোডাঙ্গায় কল্ সেরে বেলা চারটে নাগাদ পালকী থেকে এসে নামছে, একটি বুড়ো গোছের লোক এসে নমস্কার করে প্রশ্ন করল, 'মা বাড়ি কিনবেন একটা? খুব সস্তায় একটা বাড়ি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে।'

বাড়ি কেনার কথা কখনও ভাবেনি, স্বপ্নেও চিন্তা করেনি—বাড়ি কেনার মতো অবস্থা তার হয়েছে কিনা এ হিসাব করার কথাও মনে ওঠেনি কখনও এতকাল যাকে প্রাণপণে শুধু প্রাণ ধারণের কথাই চিন্তা করতে হয়েছে—সে একথা কল্পনা করবেই

বা কেন, তবু আপনা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কোথায়? কত বড় বাড়ি? দাম কত?'

'খুব সস্তা মা। এই পাড়াতেই, আমহাউস ইস্ট্রীটের ওপরেই। দোতলা বাড়ি। মোটে সাত হাজার টাকা দাম।...যদি একটু কষ্ট করেন—এই কাছেই তো—এখনই দেখিয়ে দিতে পারি—'

'আপনার বাড়ি?' প্রশ্ন করেন হেমন্ত।

'না মা এতখানি জিভ কেটে—যেন কথাটা খুবই লজ্জার—সে লোকটি উত্তর দিল, 'আমি কোথায় পাব মা, বলে সংসারই চলে না, আমি দালালী করি। সত্যি কথাই বলছি, বাড়িটা বিক্রী হলে হাজারকরা দশটা টাকা পাবো। বড় কষ্টে পড়েছি মা, আজ তিন মাস এক পয়সাও পাইনি। সাত-সাতটি প্রাণী ঘরে—

'চলুন দেখে আসি।' হেমন্ত আবার পালকীতে উঠে বসল। চেনা পালকী-বেহারা—বিবেচনা করে আর দু-গণ্ডা কি তিন গণ্ডা পয়সা ধরে দিলেই হবে।

খুবই ছোট বাড়ি, যেমন বাড়িতে ওরা ছিল পটলডাঙ্গায়। নিচে দুখানা ওপরে দুখানা খুপরি খুপরি ঘর, উপরন্তু তেতলায় একখানা ছোট্ট ঘর আছে। পুরনো বাড়ি, মনে হয়। এখনকার এই এগারো ইঞ্চি ইট বেরোবার অনেক আগের তৈরী।

মাটির গাথুনি—তবে চওড়া দেওয়াল। এমনি খুব মজবুত আছে এখনও। কিন্তু আর দুশো আড়াই শো টাকা খরচ করে ঝেড়ে মেরামত করে নিতে পারলে অনেকদিন চলবে।

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির করে ফেলল হেমন্ত।

হাজার পাঁচেক টাকা হাতে জমেছে—সেদিনই সেদিনই বলছিল পূর্ণবাবুকে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়ে দেবার কথা। তাহ'লে আরও দু হাজার টাকা তিনিই দেবেন। বাড়ি ভাড়া, চাকরদের মাইনে সবই তিনি দিচ্ছেন। আগে দৈনিক বাজার খরচের—উনোনের টাকাও দিতেন, হেমন্তই বারণ করেছে। দিতে দেয় না। এইসব খুচরো খরচের টাকাও হাতে পেতে নিতে এখনও পর্যন্ত লজ্জা করে তার। মনে হয় বাজারের বাঁধা মেয়েমানুষে হয়ে গেছে সে।

সে দালালকে বলল, 'ছ হাজার দিতে পারি, দেখুন, যদি ওঁদের মত হয় তো জানাবেন।'

লোকটি সন্ধ্যাবেলাই এল আবার। কাকুতি মিনতি করে সাড়ে ছ' হাজারে দাঁড় করাল। বলল, 'আমি বলছি মা, বিশ্বাস করুন বুড়ো মানুষের কথাটা—সাত হাজার দিলেও সস্তা পড়ে বাড়িটা। এরা খুব নাচার হয়ে পড়েছে তাই—নইলে কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারলে আট ন' হাজার দর পেত অক্লেশে।'

পূর্ণবাবু শুনে অবাক হয়ে গেলেন। 'বাড়ি দেখে দর-দস্তুর ক'রে এ'কেবারে সব ঠিকঠাক। কী সর্বনাশ। তোমার ভেতর এত আছে।...তা বেশ! আমি আমার অ্যাটর্ণীকে বলে দিতে পারি। ধর্মবাবুও দেখে দিতে পারেন অবিশ্যি কাগজপত্তরগুলো। সার্চ করিয়ে দেওয়া, বায়না দেওয়ার পর—সেও ও'র মুহুরী করতে পারবে। তাতে খরচা কিছু কমই পড়বে বরং—। কিনবেই যদি, তোমার সে পুরনো বাড়িটাও বিক্রী আছে কিন্তু!'

'না, না, ও বাড়ি আমি কিনব না। অপয়া বাড়ী!' গলায় অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলে হেমন্ত।

'অপয়া বাড়ি!' পূর্ণবাবু অবাক হয়ে যান প্রথমটা, 'সে কি! ঐখান থেকেই তো তোমার উন্নতি শুরু। এত বড় বাড়িতে এলে বোলবোলাও বাড়ল—।

বলতে বলতেই বোধহয় মাথায় যায় হেমন্তর এই ঝাঁঝের গূঢ়ার্থটা, কথাটা অসমাপ্ত রেখেই থেমে যান। মুখ লাল হয়ে ওঠে তাঁরও।

উনি বুঝেছেন বুঝেই হেমন্তও আর ব্যাখ্যা করে না।

বুদ্ধিমান পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়েন। বলেন, 'কেনো, তবে ও বাড়িতে তোমার যাওয়া হবে না। অতটুকু বাড়ি! তুমি ভাড়া বাড়িতে ছিলে এতকাল এখন নিজের বাড়িতে যাচ্ছ—এ কেউ তোমার দলিল হাটিকে দেখতে যাবে না, বড় বাড়ি থেকে ছোট বাড়িতে উঠে যাচ্ছ এইটেই সবাই জানবে। ওতে ইজ্জৎ থাকবে না। ও বাড়ি মেরামত করিয়ে ভাড়া দিয়ে দাও! ভালই তো একটা বাঁধা আয় হ'য় থাকল!'

বাড়ি কেনা হ'লে চেনা মিস্ত্রী ডেকে পূর্ণবাবুই মেরামত করিয়ে দেন। পাঁচিশ টাকায় ভাড়াও হয়ে যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তার আগে একদিন গৃহপ্রবেশের মতো একটা অনুষ্ঠান করে এল শুধু, একটু হোম, নারায়ণকে একশো আট তুলসী দেওয়া। হেমন্ত কিছুই করতে চায়নি, তার যেন কেমন একটা ভেতরে ভেতরে বদ্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে এসব পূজা-আচ্চা কল্যাণকর্মে তার আর কোন অধিকার নেই। —সে পতিত হয়ে গেছে। পূর্ণবাবু বলতেন 'ফিক্সেশন'—এও একরকম মনের অসুখ।

গোপালই ধমক-ধামক দিয়ে ভয় দেখিয়ে নিজের পুরুত ডেকে আয়োজন করাল।

বললে, 'তুই কি ঐসব ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবি নাকি? রাখ দিকি তোর পাণ্ডিত্য! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন এতদিনে। একটু মাথা গোঁজার মতো জায়গা হল, আপনার—নিজস্ব রোজগারে—ভগবানকে একটু পুজো দিবিনে? ষেটের তারক বেঁচে থাক, মানুষ হোক—অমিশাই আরও হবে, তাই বলে এ-ই প্রথম, একটু হোম, কি একটু তুলসী না দিলে ঐ গুঁড়োটুকুর অকল্যেণ হবে যে!...দ্যাখ পুরনো বাড়ি কেনা মানেই একজনের মন্দ কপালের ধন ঘরে তোলা। অপরের দুঃসময় তাকে অভাবে পড়ে, দুঃখে পড়েই বেচতে হচ্ছে। তাদের নিঃশ্বাসের জিনিস—একবার নারায়ণকে না নিয়ে এ'ল চলে?'

'গুঁড়োটুকুর অকল্যেণ হ'তে পারে'—একথা শোনার পর আর কিছু বলেনি হেমন্ত, নিজেই সব যোগাড় করেছে।

ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন বলে হেমন্তরও বিশ্বাস হ'তে আরম্ভ হয়েছে, তখনই আর একবার এক বিপর্যয় ঘটল তার জীবনে।

মনে মনে শেষ যে অহঙ্কারটুকু ছিল—সংস্কারের, বিবেক বোধের; মন্দকে মন্দ বলে ঘৃণা করার যে শেষ আশ্রয়টুকু ছিল মানবিকতার—সেটুকুও ঘুচিয়ে দিলেন ভগবান।

তাঁর সেই চরম মার এলও অভাবিত পথ ধরে—সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে।

পূর্ণবাবুর স্ত্রীর শরীর খারাপ, হাওয়া বদল করতে যাবেন—অনেকদিন ধরেই কথা চলছিল। যাওয়া হয়নি তাঁরই জেদের জন্যে। পূর্ণবাবু সঙ্গে না গেলে তিনি যাবেন না—তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা, তাতে শরীর থাকে আর যায়।

স্বামী যে একটা দাইয়ের পিছনে রাশি রাশি টাকা ঢালছেন, তাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার মতো—একথা তাঁর কানে না ওঠার কোন কারণ ছিল না। যেখানে বাড়ির কোচমান সহিস যায়, বাড়ির চাকর যেখানে বাজার পৌঁছে দেয়—সেখানকার খবর কানে না আসাই বরং আশ্চর্য। এরা ছাড়াও বহু হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন সাড়ম্বরে সালংকারে জানিয়ে দিয়ে গেছে সংবাদটা। যেসব পরিচিত লোক দু' বছরের মধ্যে এ বাড়ি মাড়াবনি—তারাও নিজেরা খবর পাওয়া মাত্র, পুলকিত চিত্তে গাড়ি পাল্কি ভাড়া করে এসে সুসংবাদ শুনিয়ে যাচ্ছে। 'তোমার জীবনের সোনালি দিন ফুরিয়ে এসেছে, সৌভাগ্যের রবি-রশ্মি মেঘে ঢাকছে'—পরিচিত ভাগ্যবতী কোন রমণীকে এ সংবাদ শোনাবার মতো আনন্দ আর কিসে আছে বলুন?

অবশ্য পূর্ণবাবুও খুব একটা গোপন রাখার চেষ্টা করেননি। করলে এতটা জানাজানি হ'ত না। তিনি ভেবেছিলেন, যাকে অনেক দিয়েছি, গরিবের মেয়েকে রাজরাণী করেছি, শেষ বয়সে আমাকে এটুকু আনন্দ এটুকু শান্তি দিতে সে কার্পণ্য করবে কেন? তার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না এতে। সে যে সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে বসে আছে, ছেলেমেয়ে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, স্বামীর পরিচয়, প্রতিপত্তি—সেখানে তো ঐ অভাগিনী কোনদিনই পৌঁছতে পারবে না—তবে আর তাকে ঈর্ষা করবে কেন? তাছাড়া স্ত্রীলোক ঘটিত দুর্বলতাও পূর্ণবাবুর এই নতুন নয়—প্রথম তো নয়ই, এতদিনে এলোকেশীর এটা গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, ভেবে নিয়েছিলেন।

কিন্তু আগের নেশাগুলোর কোনটাই এর মতো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, এত প্রকাশ্যও ঘটেনি সেগুলো। এত উন্মত্ততাও প্রকাশ পায়নি এর আগে। বোধকরি সেইজন্যই এলোকেশী এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটি মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, উপোস করে থাকা—সবই হয়ে গেছে; এবার

বোধকরি এই শেষ অবলম্বন · বেই—অসহযোগ ধরেছেন। 'তুমি না গেলে আমি কোথাই যাবো না, মরি সে ঢের ভাল'—পরিষ্কার বলে দিয়েছেন পূর্ণবাবুকে।

অগত্যা এবার যেতেই হয় পূর্ণবাবুকে। রোজগারের দোহাই দিয়েও আর অব্যাহতি পান না। স্ত্রীর যা অবস্থা, মাস-দুই কোন ভাল জায়গায় না রাখলে চলবে না। ডাক্তার বলে দিয়েছেন বারবার। বৈদ্যনাথে এক মক্কেলের বাড়ি পাওয়া গিয়েছে, পূর্ণবাবু স্ত্রীকে বলছেন, 'যদি তোমার ভাল লাগে, শরীর ভাল থাকে—ওখানে একখানা বাড়ি কিনেই দেব তোমাকে।' যার উত্তরে এলোকেশী বলছেন, 'হ্যাঁ তা-তো দেবেই, আপদ বালাই দূর হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত, ছুকরি মেয়েমানুষকে এনে বাড়িতে পুরবে তারা!'

আপাতত মাস-দুইয়ের জন্য যাচ্ছেন, দরকার হলে আরও একমাস থাকবেন—তাঁদের বলাই আছে। পূর্ণবাবু অবশ্য অতদিন থাকতে পারবেন না, সঙ্গে গিয়ে দিন পনেরো থেকে চলে আসবেন, আবার শেষের দিকে কটা দিন গিয়ে থাকবেন। এই কথা আছে। ডাক্তারের পক্ষে বিশেষ ওঁর মতো নামকরা ডাক্তার—বেশীদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়—এটুকু এলোকেশীও বোঝেন। এই পনেরো দিন নিয়ে যাওয়াটাই তাঁর যথেষ্ট বিজয় লাভ হ'ল বলে মনে করেন।

যাওয়ার আগে হেমন্তকে বলে গেলেন পূর্ণবাবু, 'টাকা-কড়ির দরকার নেই তা জানি—যদি অসুখবিসুখ করে কি আর কিছু দরকার হয়—আমি আমার এক ছাত্রকে বলে যাচ্ছি, রোজ কি একদিন অন্তর এসে একটু খোঁজ-খবর নেবে। ছাত্র মানে সেও ডাক্তার, এককালে ছাত্র ছিল—এখন আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে। ছেলেটাকে তো কিছুতেই এদিকে আনতে পারলুম না, তার মাথায় ব্যবসা ঢুকেছে—বলে ডাক্তারীতে আমার অভক্তি হয়ে গেছে আপনাকে দেখে, এমন পরাধীন কাজ আর নেই—তা সেইজন্যেই এই ছেলেটাকে তৈরী করছি, যাতে আমার প্র্যাকটিশটা বুঝে নিতে পারে। এতবড় প্র্যাকটিশ—। তা ছেলেটা ভাল, এদিকে বেশ ন্যাকও আছে। এরই মধ্যে বেশ পসার জমিয়ে নিয়েছে।'

হেমন্ত ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'কী দরকার আবার একজনকে ব্যস্ত করার। কদিনে আর কি রাজত্ব উলটে যাবে আমার? অসুখ-বিসুখ করে ডাক্তার ডাকতে পারব। দিদি আছে—খবর পেলেই ছুটে আসবে। মিছিমিছি আর ওসব হাঙ্গামা করো না।'

'না, না। তুমি বোঝ না। দিনকাল খারাপ। একলা একটা মেয়েছেলে ঝি-চাকরদের জিম্মায় থাকে, কথাটা ভাল না। চোর-ছ্যাঁচোড়েরাও আস্পদ্দা পেয়ে যায়। একজন কেউ দেখবার লোক আছে মাথার ওপর জানলে তারাও একটু হুঁশিয়ার থাকে।'

'হ্যাঁ! পনেরো দিনের তো ব্যাপার! তার মধ্যে কি করবে চাকররা, খুন করে ফেলবে? এটুকু হিম্মৎ রাখি—একটা দুটো লোক আমার কিছু করতে পারবে না।'

পূর্ণবাবু হেসে চোখ টিপে বললেন, 'বলি আমারও একটা পাহারা রাখা দরকার তো গো! কার সঙ্গে কী করে বসবে তার ঠিক কি। যদি আমার কপালে তেঁতুল গোলা শেষ পর্যন্ত?'

'মুখে আগুন তোমার! এখনও ঐ চিন্তে! বয়েস যে তিন-কুড়ি পেরিয়ে গেল।'

'সেই জন্যেই তো আরও ভয়!' হেসে বলেন পূর্ণবাবু। এত কষ্টে অনেক সাধ্য-সাধনায় যা জুটেছে একটা—গেলে কি আর পাব, এই বয়েসে?'

।। ১৫ ।।

যাওয়ার দিন সকাল বেলাই কমলাক্ষকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবে নিজে আর বলতে পারলেন না; হেমন্তকে বারবার সাবধানে থাকার নির্দেশ দিয়ে, কমলাক্ষকে সম্ভবমতো রোজই একবার খবর নিতে বলে, ব্যস্তভাবে তখনই চলে গেলেন।

কমলাক্ষকে বলে গেলেন, 'তুমি বসে দিদির সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করে যাও। আমার আজই যাওয়া—বুঝতে পারছ তো অনেক কাজ, এর মধ্যে দু-তিনটে রুগীও দেখে যেতে হবে—সন্ধ্যেয় গাড়ি শীতের দিনে দেখতে দেখতে বেলা চলে যাবে।'

কমলাক্ষকে দেখে অবাক হয়ে গেল হেমন্ত।

ডাক্তারী পাস করেছে, বিয়ে-থাও হয়ে গেছে—বয়স যা হিসেব পেয়েছে কাল পূর্ণবাবুর কাছ থেকে কম করে হলেও হেমন্তর সমবয়সী, এক-আধ বছরের বড়ও হতে পারে, কিন্তু ওকে দেখে মনে হ'ল ওর কুড়িও পেরোয়নি, মুখখানা এত কাঁচ ঢলঢল করছে। একেবারেই ছেলেমানুষের মতো। এ-কি দেখবে ওকে, খোঁজ-খবর করবে—এইটুকু বাচ্চা ছেলে। পূর্ণবাবু যে 'দিদি' বলে গেছেন তা কিছুমাত্র বেমানান মনে হচ্ছে না। এই শুধুমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, তাতেই কনে-বৌয়ের মতো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে মুখখানা, ঠান্ডার দিনেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, গলার খাঁজও চিক-চিক করতে শুরু হয়েছে।

হেমন্তর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল ওকে দেখে।

ব্যথা আর 'আপনি-আজ্ঞে' না করে সোজাসুজিই 'তুমি' বলে সম্বোধন করল। বলল, 'ও কি, বোস—দাঁড়িয়ে রইলে কেন। মনে হচ্ছে যেন ছুটে পালাতে পারলে বাঁচো — এমনি ধারা ভাব?...এত লজ্জা, ডাক্তারী করো কি করে? তার ওপর তোমাদের ডাক্তারী তো মেয়ে-ছেলেদেরই নিয়ে! তবে?'

আরও লজ্জা পেল কমলাক্ষ। কোনমতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'না—তা নয়, মানে—'

'মানে বুঝেছি।' খিলখিল করে হেসে উঠল হেমন্ত, 'তুমি আমার গার্জেনগিরি করবে—না আমাকেই তোমার গার্জেন করে রেখে গেলেন ডাক্তারবাবু, নাবালক ছাত্রটির সেইটেই বুঝতে পারছি না। আসলে তো দেখছি তোমারই একজন অভিভাবক দরকার।'

'না—আজকে—' কমলাক্ষ আরও যেন তোৎলা হয়ে যায়, 'আজ মানে—শরীরটাও খারাপ হয়েছিল সকালবেলা—'

এতক্ষণে একটা লাগসই কৈফিয়ৎ খুঁজে পেয়ে যেন বেঁচে যায় সে।

হেমন্ত মানুষ চিনে নিয়েছে ততক্ষণে। এর যা অবস্থা, এভাবে কথাবার্তা চালালে হয়ত এক্ষুনি ভির্মি হয়ে পড়বে লজ্জায়। এমনিতেই দুটো কথা বলতেই এই শেষ-অঘ্রাণেও কামিজের শক্ত কলার ভিজে ন্যাতা হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।...সে অন্য পথ ধরল এবার। একে একে নাম-ধাম কটা ভাই-বোন, দেশ কোথায় ইত্যাদি পর পর প্রশ্ন করতে শুরু করল। সাধারণ স্বাভাবিক প্রশ্ন—উত্তর দেওয়া সহজ। কমলাক্ষ তাতেই যেন সুস্থ বোধ করল খানিকটা, সহজভাবেই উত্তর দিতে লাগল।

দেখা গেল ওরাও ব্রাহ্মণ, কমলাক্ষ লাহিড়ী নাম, পাবনার দিকে দেশ—কিন্তু এখানেও তিন পুরুষের বাড়ি ঠাকুর্দা করে গেছেন। বাবাই দেশে যেতেন মধ্যে মধ্যে, সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন, আর কারও দেশে যাওয়া ঘটে ওঠে না। বছর চারেক হল বিয়ে হয়েছে—ডাক্তারী পড়তে পড়তেই—এই সবে সন্তানসম্ভবা, হয়েছে তার বৌ। সেও ছেলেমানুষ, এখনই মাত্র পনেরো বছর তার বয়স।

কথা বলতে বলতে ভাল করে তাকিয়ে দেখল হেমন্ত।

রূপবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমলাক্ষ নাম সার্থক। তবে হেমন্তর খুব পছন্দসই নয় পুরুষের এ ধরনের রূপ। বড্ডই মেয়েলি মেয়েলি। যাত্রার দলে রাজকন্যা সাজবার মতো। আজকাল তো থিয়েটারও হয়েছে। সবাই স্বরূপে নেবে এ যদি মেয়ে সাজে।...রঙটা গোলাপী ধরনের নয়—হলদের ওপর চড়া। এইটেই ভাল, বিশেষ পুরুষ মানুষের। এমনিতেও গোলাপী রঙ ভাল নয়। শিগগির নষ্ট হয়ে যায়, মেচেতা ধরে। মাকে তো দেখেছে, ওর বড় জাকেও। অমন রঙ সব, কত অল্প বয়সেই পুড়ে গেছে। ওর যে যায় নি, এইটেই আশ্চর্য।

এর শুধু রঙ নয়—আলাদা আলাদা করে ধরলে চেহারাটা খুবই ভাল। বড় বড় চোখ, একটু টানা—চোখের ভাবটিও বড় সুন্দর, লাজুক লাজুক কিন্তু তারা দুটো খুব কালো নয় বলেই একটু বাদামী রঙের হওয়াতে দৃষ্টিটা খুব গভীর মনে হয়, মনে হয় সমবেদনাপরিপূর্ণ বিশাল হৃদয়েরই দ্যোতক। চুল খুব কোঁকড়া নয়, ঢেউ খেলানো—ঈষৎ সোনালী বাদামী আভায় গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। বেশ লম্বা-চওড়াও, মুখ বা

হাত পা মেয়েলি গড়নের হলেও দেহের গঠন পুরুষের মতোই, বলিষ্ঠ।

আগে, প্রথম দেখতে যতটা খারাপ লেগেছিল — বয়সের তুলনায় ছেলে-মানুষের মতো দেখতে বলেই — আর মেয়েলি লজ্জার জন্যেও খানিকটা—ভাল করে দেখার পর আর অতটা মনে হল না। বরং আর একটু দেখার পর ভালই লাগল ক্রমশ। এক শ্রেণীর সান্নিধ্য আছে যা মনে আপনিই আনন্দ জাগায়, অকারণ প্রীতি ও স্নেহের সঞ্চার করে, মানুষটাকে কাছে বসিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে—কমলাক্ষর উপস্থিতির মধ্যে সেই ধরনেরই একটা অজ্ঞাত মাধুর্য, আকর্ষণী শক্তি আছে।

কমলাক্ষরও—বাড়ির কথা, লেখাপড়ার কথা, প্র্যাকটিশের কথা—পূর্ণবাবুর কৃপায় এখনই দিনে আট টাকা—বারো টাকা পর্যন্ত রোজগার হয়—বলতে বলতে লজ্জাটা কেটে গিয়েছিল। শেষের দিকে আর প্রশ্ন করারও প্রয়োজন হচ্ছিল না, হেমন্তর সামান্য সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাবেই উৎসাহিত বোধ করে নিজেই গল গল করে বলে যাচ্ছিল। এর মধ্যে গোড়ার দিকে, একটু বসেই যে বলেছিল, 'অনেক কাজ আছে, উঠতে হবে এবার, আজ তো তেমন কোন কাজ নেই—' সে কথাও মনে রইল না।

কেবল হেমন্ত যখন জলখাবারের রেকাবি নিয়ে এসে ঢুকল, তখনই যেন সমস্ত পুরনো লজ্জা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল, মুখখানা অরুণ বর্ণ ধারণ করল, একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কত কি বলে উঠল। লজ্জার প্রাবল্যে কথাবার্তা যে অসংলগ্ন শোনাচ্ছে তাও অত বুঝতে পারল না।

'না, না মাপ করবেন, এই সকালেই এক পেট খেয়েছি, আসবার পথে এক জায়গায় গিছলুম কিনা, মানে এই মাস্টার মশাইয়ের বাড়িই—এই তো এখনই বলতে গেলে—লুচিটুচি, সে একগাদা—' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হেমন্ত বার দুই যুক্তি প্রয়োগের বৃথা চেষ্টা করে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ওর একটা হাত ধরে জোর করে চেয়ারে আবার বসিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাল ছেলের মতো খেয়ে নাও দিকি, সুড় সুড় করে। নইলে খোকাদের মতো ঘাড় ধরে খাইয়ে দোব।... দিদি বলেছি, প্রথম দিন এলে, এতক্ষণ ধরে বকালুম—অমনি শুকনো মুখে ছেড়ে দোব।...আর রোজই যখন আসতে হবে, এত লজ্জা করলে চলবে কেন?'

ঝোঁকটা হঠাৎই এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গেল সেটা। একটু লজ্জা পেয়েই হাতটা ছেড়ে দিল হেমন্ত।...এতই ছেলেমানুষের মতো দেখতে, কথাবার্তায়ও এত সরল যে, সে যে নিতান্ত স্বল্প-পরিচিত বা সদ্যপরিচিত একটা পর-পুরুষের গায়ে হাত দিচ্ছে তা একবারও মনে হয় নি হেমন্তর; বরং এই মাত্র এক ঘন্টার পরিচয়েই মনের মধ্যে এই কিশোরের মতো ছেলেটি সম্বন্ধে এমন একটা স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে যে, সে মুহূর্তে এই আচরণটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। স্বাভাবিক বলেই—এতে কোন অশোভনত্ব প্রকাশ পেল কিনা তা ভাবার কথাও মনে আসে নি।

শেষের এই লজ্জাবোধটুকু—এ সঙ্কোচ কমলাক্ষ লক্ষ্য করে নি। সে অভিভূত হয়ে গেল। এর পর আর 'খাবার খাবো না' বলতে পারল না, বলার ইচ্ছাও রইল না। মাথা হেঁট করে বসে সবই খেয়ে নিল প্রায়। কিন্তু এইটুকু আন্তরিকতাতেই সে যে কতটা বিচলিত হয়েছে, কতটা কৃতজ্ঞ—তা বিদায় নেবার সময় তার ছলছল চোখের গভীর দৃষ্টিতেই বুঝতে পারল হেমন্ত। মুখে কিছু বলতে পারল না ছেলেটা—কিন্তু বলার প্রয়োজনও ছিল না, অন্তত হেমন্তর কাছে।

'সম্ভব হলে রোজ নয় তো একদিন অন্তর' খবর নেবার কথা বলে গিয়েছিলেন পূর্ণ ঘোষ, কিন্তু দিন সাতেক কাটার পর দেখা গেল রোজ তো বটেই—কমলাক্ষ দু বেলাই আসছে খবর নিতে। সহস্র কাজ ফেলেই আসছে সে, সহস্র কাজ সেরেও। এক একদিন রাত সাড়ে দশটা-এগারোটাতেও এসে হাজির হয়। অধিকাংশ দিনই—'কল'-এ বাইরে যেতে না হলে—এ সময় শুয়ে পড়ে হেমন্ত, একা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকার কোন কারণ নেই। ফলে এমনও হয়েছে —গোটা বাড়ির আলো নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়ার পর কমলাক্ষ এসে ডেকেছে—তখন আবার নতুন করে আলো জেলে দরজা খুলে দিয়েছে দারোয়ান।

সে সব দিনে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না, অপ্রতিভভাবে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে বিদায় নেয়।... লজ্জা পায়—অথচ না এসেও থাকতে পারে না।

এই রকম ঘটনা যেদিন প্রথম ঘটল সেদিন হেমন্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'তা দেখছই তো আলো নিভে গেছে, আমরা শুয়ে পড়েছি—তাহলে আর বাড়ি-সুদ্ধ সকলের ঘুম ভাঙিয়ে তুললেই বা কেন, বসবে না যদি?'

'না না। বসব আর কেন। এখন কি আর বসে গল্প করার সময়?...এমনিই, জাস্ট কেমন আছেন, কিছু দরকার আছে কিনা—খবর নেওয়া। একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মাস্টার মশাই—'

বলতে বলতেই বেরিয়ে গিয়েছিল, যেন হেমন্তর সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

ওর অবসর কম তা হেমন্তও বোঝে। পূর্ণবাবুর বিরাট প্র্যাকটিশ, বাঁধা ঘরই অনেক—সবই কমলাক্ষকে সামলাতে হচ্ছে। এতগুলো পরিবারের মধ্যে কয়েকটা বাড়িতে কিছু না কিছু ঝঞ্ঝাট লেগে থাকবেই—আর এসব 'কেস' একবার গিয়ে দেখেই পাঁচ মিনিটে চলে আসা যায় না। সুতরাং সারতে সারতে রাত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

শুধু বোঝা যায় না—এত রাত্রে আসার কারণটাই। ছেলেটা কি পাগল? মধ্যে মধ্যে খবর নেবার কথা—প্রত্যহ দু বেলা খবর নিতে হবে এমন কথা পূর্ণবাবু বলে যান নি নিশ্চয়ই,—হেমন্তর সামনেই বলে গেছেন রোজ না পারলে একদিন অন্তর যেন খবর নেয়—তবে ওর এ কি পাগলামি! তার ওপর আরও একটা ব্যাপার—দোষই এটা—কিছুতেই শোধরাতে পারা যায় না, বকাঝকা, অনুরোধ অনুনয় কিছুতেই কিছু হয় না, আসবে অধিকাংশ দিনই কিছু না কিছু নিয়ে। কোন দিন বলে 'এই সিমলেয় গিয়ে পড়েছিলুম, ওখানকার বাঁধা বটতলার হিঙের কচুরি—গরম গরম ভাজছে দেখে দুখানা নিয়ে এলুম'। কোনদিন বা বলে, 'তিনকড়ি ময়রার দোকানের সামনে দিয়েই আসছিলুম কিনা—নতুন গুড়ের আদাছানার মোণ্ডা ওদের বিখ্যাত, আপনার কথা মনে পড়ল।...একটু খেয়ে দেখুন না।' কিম্বা, 'বকতে পারবেন না কিন্তু খবরদার—হাতি ঘোড়া কিছু নয়, কাঁসারীপাড়ার সরের দই, আমি বাজি রেখে বলতে পারি কখনও খান নি!'

বেশী কিছু বললে করুণ মুখ করে বলে, 'বড্ড যে আপনার কথা মনে পড়ে যায়, সত্যি। ভাবি কে-ই বা আছে আপনার, এসব খোঁজ করে এনে খাওয়াবে। ...তা আপনি অত রাগ করছেন কেন, এতে কিন্তু হবার কি আছে। ভারি তো ছ গণ্ডা চার গণ্ডা পয়সার জিনিস।'

সবচেয়ে একদিন এমনি রাত এগারোটার সময় কোথা থেকে কার যেন বিখ্যাত দেদো-মোণ্ডা এনে বলে, 'এখনই দুটো খেতে হবে, গরম গরম, এনেছি,—কাল সকালে

খেলে অর্ধেক স্বাদ চলে যাবে!' হেমন্ত যত বলে রাত্রের খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়েছে, বিধবা মানুষ রাত্রে বার বার খেতে নেই—বিছানার কাপড়ে তো নয়ই—তার ওপর মুখে পান রয়েছে (ইদানীং পসার বাড়তে পান ধরেছিল, নইলে নাকি নানা রকম বদ গন্ধ গলায় লেগে থাকে—বাড়ি এসে খাওয়া যায় না কিছু, পান মুখে দিয়ে তবে কেস করতে যায়), ততই হাত জোড় করে কমলাক্ষ, কাকুতি মিনতি করে। বলে, পানটা ফেলে দিয়ে একটা কুলকুচো করে নিন, কিচ্ছু হবে না, লক্ষ্মীটি আমি কত আশা করে আনলুম, এখনও গরম—'

ছেলেটার কাঁচ সুন্দর মুখখানা এমন ম্লান হয়ে আউতে পড়ে। চোখ দুটো এমন ছলছল করে যে শেষ পর্যন্ত আর 'না' বলা সম্ভব হয় না— মুখের পান ফেলে দিতে হয়।

মাথার দিব্যি দিয়েও দেখেছে হেমন্ত, এ রোগ শোধরাতে পারেনি। বলেছে, 'দিন গে দিব্যি, আমি দাদুর মুখে শুনেছি, খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন ঈশ্বর বাগচি—দিব্যিটা বেলপাতায় লিখে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে আর সে দিব্যি লাগে না। আমি কাল ভোরবেলাই গঙ্গায় চলে যাব!'

পূর্ণবাবু পনেরো দিন বলে গিয়েছিলেন, ঠিক ষোল দিনের দিন সকালেই ফিরে এলেন।

এর পর আর কমলাক্ষর আসবার কোন কারণ নেই, যার দায়িত্ব সে-ই তো স্বয়ং এসে গেছে। আসবে না আর হেমন্তও তাই ভেবেছিল। সেইজন্যেই—যেদিন পূর্ণবাবু এসে পৌঁছেই দেখা করে গেলেন—সেদিন পরে কমলাক্ষ এলে তাকে সে খবরটা দিয়ে—কতকটা সৌজন্যবশতই বলে দিয়েছিল, 'তাই বলে তুমি যেন একেবারে ভুলে যেয়ো না, সুবিধেমতো মধ্যে মধ্যে এসো অবিশ্যি অবিশ্যি।'

কমলাক্ষ একটু অবাকই হয়ে গেল যেন একথায়। কিছুক্ষণ সময় লাগল তার হেমন্তর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কথাটা বুঝতে। অর্থাৎ তার যে না আসাও সম্ভব—এ-কথাটা হেমন্তর মাথায় গেল কি করে।

সে বিস্মিত দৃষ্টির অর্থ প্রথমটা হেমন্ত বুঝতে পারেনি। বুঝল ওর পরবর্তী কথায়, 'আমি আসব না, খবর নেব না—একথা আপনার মাথায় ঢুকলই বা কেন? বা রে, আমি বুঝি শুধু মাস্টারমশাইয়ের হুকুম তামিল করতেই আসছিলুম?'

হেমন্ত মুখ টিপে হেসে বলল, 'কী জানি ভাই, তাই তো শুনেছিলুম। তিনি থাকবেন না বলেই তো তোমাকে খবর নিতে বলেছিলেন। আমি ভাবছিলুম সেই দায়িত্বর জন্যেই এসো তুমি—কৈ, আগে তো কোনদিন আসোনি!'

'বারে! আগে পরিচয়ই ছিল না যে, তা আসব কি!'

বলতে বলতেই হেমন্তর কৌতুকচপল চোখের দিকে চেয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতাটা বুঝতে পারল বোধহয়।. নিমেষের মধ্যে সুগৌর সমস্ত মুখখানায় মায় যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত কে যেন মনে হল আলতা ঢেলে দিলে, আর—এটা কমলাক্ষ ছাড়া আর কারও এমন হতে দেখেনি হেমন্ত, আগেও না পরেও না—দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কপাল ভিজে উঠল ঘামে। অপ্রতিভভাবে হেসে মাথা নামিয়ে বলে 'আপনি এমন করেন না—বস্ত ইয়ে করে দেন লোককে।'

এর পর একটা দিন বোধহয় কোনমতে ধৈর্য ধরেছিল কমলাক্ষ। বিসদৃশ না দেখায়। কেউ না কিছু ভাবে—বিশেষ হেমন্ত নিজে, এইজন্যেই আসেনি। কিন্তু তারপর দিনই সকালে হাসপাতাল যাবার আগে একবার এসে দেখা করে গেল। তারপর প্রত্যহই। কখনও সকালে, কখনও বিকেলে। রোজ যে দেখা হয় তা নয়—কারণ আজকাল এক-একদিনে দু-তিনটে করে কেস থাকে হেমন্তর, সেসব দিনে খাওয়ারই সময় পায় না—এমনি সব দিনে দু-তিনবারও এসে ঘুরে যায়। তার সবই দিনের বেলায়, সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পর কোনদিন আসে না। সেটা যে ইচ্ছে করে আসে না—পূর্ণবাবুর থাকবার সময় বলে—তা অত আগে বুঝতেও পারেনি হেমন্ত, লক্ষ্যও করেনি।

কিন্তু একবার পর পর দুদিন এমনি দেখা হল না। এই দ্বিতীয় দিনে আর বোধহয় ধৈর্য মানল না কমলাক্ষর, আবারও একবার এল, অনেক রাত্রে।

রাত এগারোটা তখন, এরা সবাই শুয়ে পড়েছে, বিশেষ হেমন্ত সেদিন খুবই ক্লান্ত। ভোর ছ'টায় বেরিয়ে রাত ন'টায় ফিরেছে। সারাদিনে একটু জল পর্যন্ত মুখে পড়েনি, পূর্ণবাবুর সঙ্গেও দেখা হয়নি, তিনি ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে চলে গেছেন। এই অবস্থায় কাঁচা ঘুম ভাঙ্গায় একটু বিরক্তই হল, ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী ব্যাপার আবার, কোন জরুরী খবর আছে নাকি?'

কমলাক্ষ সে-বিরক্তিটা বুঝতে পারল বলে মনে হল না। বললে, 'না, জরুরী খবর আর কি থাকবে। মাস্টারমশাই তো এসেই ছিলেন নিশ্চয়।...এমনিই। দুদিন দেখা হয়নি তাই—। সকাল থেকে দুবার ঘুরে গেছি—'

'তা না-ই বা হল। এখন আর এত রোজ রোজ দেখা করার দরকারই বা কি? যার জন্যে খবর নেওয়া সে তো নিজেই আছে এখানে!'

হেমন্তর কণ্ঠস্বর নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝিবা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

এবার আর তার মনোভাব না বোঝার কোন কারণ থাকে না। লজ্জিত হয় কমলাক্ষ, বোধহয় একটু ভয়ও পায়। বলে, 'অতটা বুঝতে পারিনি, মাপ করবেন আমাকে। সত্যিই—খেটেখুটে এসে শুয়েছেন। এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে—! ইস—অনেক রাত হয়ে গেছে।—পকেট থেকে চেনে বাঁধা ঘড়িটা বার করে দেখে, 'আমি একটা গাধা। এবারের মতো মাপ করুন—এই বারটি, আর কখনও এমন আসব না।... মানে, কী জানেন, দুদিন দেখিনি বলেই কেমন যেন মনে হতে লাগল, কত কী—আর ঠিক থাকতে পারলুম না।'

এ-কথাগুলো বলে ফেলে বোধ করি আরও লজ্জিত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই বড় বড় ফোঁটায় ঘাম গড়িয়ে পড়তে শুরু হয়েছে কপাল বেয়ে, মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—এখন অধিকতর লজ্জা ও অনুতাপে বিবর্ণ হয়ে গেছে, লণ্ঠনের আলোতেই লক্ষ্য করল হেমন্ত—এমন অপ্রতিভ বোধহয় জীবনে আর হয়নি কমলাক্ষ সে আর দাঁড়াল না। ঘামের নোনা জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে বোধহয়—অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে গেল। বোধহয় ভাড়া গাড়িতে এসেছিল, একটু পরেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল রাস্তায়—লোহাবাঁধানো চাকা গড়িয়ে যাওয়ারও—

হাসি পাবারই কথা ছেলেটার রকমসকমে, হাসিই পেয়েছিল। সেইজন্যেই কথাটা মনে ছিল। হাসতে হাসতেই গল্প করল হেমন্ত পূর্ণবাবুর কাছে। শুনেছ তোমার ছাত্রর কীর্তি?—'

কিন্তু পূর্ণবাবু যেন চমকে উঠলেন, 'ও এখনও রোজ আসে নাকি? কৈ, বলোনি তো এর মধ্যে—কোন দিন?'

'ওমা, এ আবার কি বলব? বলার মতো কথা তাই তো জানি না।...এত দিন রোজ আসত, এখন যদি হঠাৎ আসা বন্ধ করে দেয় আমি কি ভাবব—হয়ত সেইজন্যেই আসে। এতে আর বলার বা খবর দেওয়ার কি আছে? তাছাড়া তুমি যে জান না তাই বা আমি কেমন করে জানব?'

'না, কৈ বলোনি তো' একটু চুপ করে থেকে বললেন পূর্ণবাবু।

'তা কি জানি। হয়ত বলা দরকার তা মনে করিনি।'...এবার হেমন্তও যেন একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে। এ আর এত বলাবলির মতো কী-ই বা কথা। এমন আর একটা কী কাণ্ড! চেনা-পরিচয় হয়েছে—আসবে না-ই বা কেন।...নেহাৎ কাল ঐরকম কাণ্ড করল বলেই আজ মনে পড়ল।...বড্ড বোকা বাপু, যাই বলো। কী করে ডাক্তারী পাস করেছিল তাই ভাবি।...পাস করেছিল, না ঐ খোকা খোকা চেহারা দেখে তোমরা পাস করিয়ে দিয়েছ?'

'না না', পূর্ণবাবু গলায় জোর দিয়ে বলেন, এমনি বোকা বোকা দেখতে, খুব ভাল ছাত্র ছিল। ডাক্তারীটা ভালই জানে। কালে আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে।...আসলে তোমার কাছে এলে সবাই বোকা হয়ে যায়—আমাকে দিয়েই দেখছ না?'

বলে হাসতে থাকেন পূর্ণবাবু।

হেমন্তও হাসে, বলে, 'হ্যাঁ, তুমি বোকা না। তোমাকে যে বোকা বলবে, তার চোদ্দ গুষ্টি বোকা। কী করে আমাকে পাড়ে ফেললে। কম শয়তানী তোমার। আমি তো তাই বলি, তোমার মাথায়

পেরেক সেঁধুলে ইসকুরুপ হয়ে বেরিয়ে আসবে।'

অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় দুজনে। অন্য খুচরো আলোচনা। পূর্ণবাবুর সংসারের কথা, অশান্তির কথা। হেমন্তরও নানা প্রসঙ্গ। কমলাক্ষর কথা আর কারও মনে থাকে না।

এর পর দু'দিন আর এল না কমলাক্ষ।

পথম দিন অত খেয়াল করেনি। দ্বিতীয় দিনও না আসাতে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল হেমন্ত। প্রথমেই মনে হল—ছেলেটার অসুখবিসুখ করল না তো?

আর খানিক পরে নিজের উদ্বেগটা দেখে নিজেরই একটু অবাক লাগল। এতদিন জানত যে, কমলাক্ষ আসে নিজের গরজেই. সে-গরজ কি তা নিয়েও মাথা ঘামায়নি কখনও—কিন্তু আজ বুঝল তার আসাটা ওর ভালই লাগে, বোধ করি প্রত্যাশাও করে।

পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করল রাত্রে, 'তোমার ছাত্রের কী হল গো, আর তো আসছে না। অসুখবিসুখ করেনি তো?'

কতকটা অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিলেন তিনি 'না, অসুখ করবে কেন? আজও তো আমার সঙ্গে ঘুরেছে তিন-চার ঘণ্টা। ভালই তো আছে। বোধহয় কাজের চাপ বেশী পড়েছে বলেই সময় পায়নি'

আর কিছু বলল না হেমন্ত। তাই হবে। কাজের চাপ বেশী পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। পড়ুক, উন্নতিই হোক দিন দিন—এই তো কাম্য।

কিন্তু পূর্ণবাবু চলে যাবার পর মনটা ঘুরে তার সেই চিন্তাতেই চলে এল আবার। বহু রাত পর্যন্ত ঘুম এল না ওর।

তবে কি রাগ করেছে কমলাক্ষ? দুঃখ পেয়েছে কোন কারণে, হেমন্তের কোন আচরণে?

অভিমান বোধ হয়েছে—সেদিন একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল বলে? না কি লজ্জাই?

আবার মনে হল। 'না—তার পরের দিনও তো বেলা তিনটের সময় এসে দেখা করে গেছে!'

তবে?

হতে পারে সত্যিই খাটুনিটাই খুব বেড়েছে। রাত্রের আগে সময় হয়ে ওঠে না। আর রাত বেশী হয়ে যায় বলেই আর আসতে সাহস হয় না।

নিশ্চয়ই তাই। মনে মনে জোর দিয়ে বলল। পূর্ণবাবুই ঠিক ধরেছেন।

এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে ঘুমিয়ে পড়ল।...

কিন্তু পরের দিন সকালেও যখন কমলাক্ষ এল না—তখন আর অনিশ্চিত কারণের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করে থাকতে পারল না। কোথায় একটা কি গোলমাল হয়েছে, আর সে গোলমালের কারণও—ওর মনে মনে যেন কে বলল—পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক জানা যাবে না। অথচ সেটা না জানা পর্যন্ত হেমন্তও স্থির হতে পারবে না।

আর এই সঙ্গে পরিষ্কার বুঝল—কোনদিনই আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা করে না সে-ছেলেটার ওপর তার মায়াই পড়ে গেছে। টানটা এখন আর একতরফা নেই। নিজের এই মরুভূমিবৎ জীবনে এই ছেলেটি যে স্নেহ-প্রীতি মুগ্ধতা নিয়ে এসেছে—এ-পাওনা তার জীবনে একেবারেই অভিনব। অননুভূত কল্পনাতীত অভিজ্ঞতা একটা। মরূদ্যানের সঙ্গে তুলনা করলেও ঠিক বলা যায় না, বোঝানো যায় না। একটা তরুণ ছেলের আবেগময় স্নেহ—হয়ত বা শ্রদ্ধাও—তার উজ্জ্বল প্রদীপ্ত উপস্থিতি যে কী এক অকল্পিত আশা ও আশ্বাস নিয়ে আসে, যে বস্তু জীবনে কখনও পায়নি, আর হয়ত কখনও পাবে না, তারই আভাস ও প্রতিশ্রুতি পায় যেন তার সুন্ধমাত্র হাসি হাসি মুখে এসে দাঁড়ানোতেই। এ বর্ণনা করা যায় না, নিজের মনেও বিশ্লেষণ করা যায় না. নিজের আবেগে শুধু এর প্রতিধ্বনি জাগে, অন্তরের তারে তার রেশটা ধরা পড়ে।...

বেলা দুটো তিনটে পর্যন্ত ছটফট করে এবং নিজের বিবেচনা বোধের সঙ্গে বহু তর্ক-বিতর্ক করে—যুক্তি-প্রতিযুক্তি প্রয়োগের পর—শেষে এক সময় মন স্থির করে ফেলল। ঠিকানা লেখাই ছিল কমলাক্ষর বাড়ির। পূর্ণবাবু বৈদ্যনাথ যাওয়ার আগে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন—যদি দরকার পড়ে, কিছু বিপদআপদ ঘটে তো খবর দেওয়ার জন্যে, সেই কাগজটা দিয়ে দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিল। বলে দিল শুধু খবর নিয়ে চলে আসতে—ডাক্তারবাবু কেমন আছেন। আর যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়—ঐ যে ছোট ডাক্তারবাবু আসেন প্রায়ই, শিউপূজন তো দেখেছে তাঁকে—যেন বলে মাইজী বলে দিয়েছেন অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করতে। যদি রাত্রে আসার সুবিধে হয় তাই যেন আসেন, যত রাতই হোক, মাইজী জেগে থাকবেন।

শিউপূজন ফিরে এসে খবর দেবার আগেই কমলাক্ষ পৌঁছে গেল। কারণ সে হেঁটে আসবে, নতুনবাজার কোম্পানীর বাগানের কাছ থেকে—কমলাক্ষ এসেছে নিজের গাড়িতে। পূর্ণবাবুরই পুরনো ব্রুহাম এটা, মাস-তিনেক হল কমলাক্ষ কিনেছে। গাড়ি-ঘোড়া সবই তাঁর। পূর্ণবাবু কোথাকার নীলামে এক সাহেবের বিরাট ভিক্টোরিয়া গাড়ি কিনেছেন, তার সঙ্গে মানিয়ে ওয়েলার ঘোড়া—এটার আর দরকার নেই বলে তিনিই একরকম জোর করে কমলাক্ষকে দিয়ে কিনিয়েছেন। বলেছেন, 'গাড়ি পোষার মতো আয় তো করেই দিয়েছি, মিছিমিছি কতকাল আর ভাড়াটে ছ্যাকড়া গাড়িতে ঘুরবে। নিজের গাড়ি হলে দেখবে আরও বাড়বে, আর এ আমার পয়মন্ত গাড়ি।'

কমলাক্ষকে দেখে কিন্তু হেমন্ত শিউরে উঠল।

এই মাত্র দুদিন আগে দেখেছে—এর মধ্যে একী হাল হয়েছে ওর!

আশ্চর্য, অমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুগৌর মুখে কেমন কালি মেড়ে দিয়েছে। মুখখানা শুকিয়ে লম্বা হয়ে গেছে, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। বহুদিন অসুখে ভোগার মতো শীর্ণ শ্রীহীন দেখাচ্ছে।

'ওমা, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! তাই তো ভাবছি—নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে। আমি ঠিক ধরেছি, মন অন্তর্যামী, কেবলই মনে হচ্ছে কোন অসুখবিসুখ করেছে—। কী হয়েছে তোমার বলো তো? জ্বর? না অন্য কিছু—আমাশাটামাশা? যেন মনে হয়েছে দেহের আদ্ধেক রক্ত শুষে নিয়েছে কিসে, ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো? জ্বরই হয়নি তো—নতুন হিমের সময়, ঘরে ঘরেই শুনছি জ্বর।...কৈ দেখি—'

বলতে বলতেই উদ্বেগের ব্যাকুলতায় কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই এগিয়ে গিয়ে হাতের উলটো পিঠে ওর কপাল ও গালের তাপ অনুভব করল, 'না, জ্বর তো নয়, গা তো ঠাণ্ডা, তবে?'

এটা অভাবনীয় শুধু নয়, একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত, এক মুহূর্তের আবেগ-বিহ্বলতা। অতর্কিত অসতর্কতা।

সেই প্রথম দিন যেমন—আজও তেমনি, কমলাক্ষর গায়ে হাত দেবার এক লহমা আগেও কল্পনায় পর্যন্ত ছিল না, চিন্তাটা। এমন যে করতে পারবে সে, নিজে ভাবতেও পারেনি। কিন্তু প্রথম সেদিন থেকে আজ অনেক তফাৎ। অনেক বেশী উদ্বেগ ও আবেগ আজ তাকে দিয়ে এ-কাজ করিয়েছে। সেদিনের সে আচরণে শিশুর প্রতি অভিভাবকস্থানীয়ার কর্তৃত্ব মাত্র ছিল। আজ সে মনোভাবের যেন অনেক বেশী পরিবর্তন ঘটেছে।

আবারও নিজের মনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল হেমন্ত—যেন কেমন ভয় ভয়ও করতে লাগল।

কিন্তু নিজের দিকে তাকাবার মনের ভাবটা ওজন করে দেখবার মতো বেশী সময়ও মিলল না।

তার আগেই আর একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

এই সস্নেহ স্পর্শে, আন্তরিক উৎকণ্ঠা ভরা কণ্ঠস্বরে, উদ্বেগাকুল প্রশ্ন-সর্বোপরি হেমন্তের আচরণের অপ্রত্যাশিততায় কমলাক্ষর মাথার মধ্যে যেন এক বিপর্যয় ঘটে গেল। অতবড় ছেলেটার, পাশকরা-প্রায় প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল।

'আরে, আরে-এ কি! কী হল কি-দ্যাখো পাগলার কাণ্ড! তুমি না ডাক্তার, তোমার না সংসার হয়েছে। বিয়ে করেছ, দু'দিন বাদে ছেলের বাপ হবে, তোমার চোখে জল!...এ অবস্থায় কেউ দেখে ফেললে কি বলবে বলতো!'

কিন্তু এ অনুযোগে ফল হল বিপরীত, এবার যেন যেটুকু আত্মসংযম তখনও ছিল তার বাঁধ ভাঙল, বুকের জামা ভিজে উঠল সাবালক পুরুষ মানুষের চোখের জলে।

ঝোঁকের মাথায় গায়ে হাত দিয়ে ফেলে লজ্জিত হয়েছিল ঠিকই, অনুতপ্ত

এবং শঙ্কিতও কিছুটা, কিন্তু সে লজ্জা ও অশোভনতা প্রকাশের আশঙ্কায় স্থির হয়েও থাকতে পারল না। এই ছেলেটার নিরতিশয় শুষ্ক ম্লান মুখ দেখে প্রথম থেকে বিচলিত বোধ করছিল—এখন তার ওপর এই চোখের তার মনের মধ্যেও যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল—সমস্ত দ্বিধা গেল ঘুচে, এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'চুপ করো, চুপ করো লক্ষ্মীটি। ছিঃ! পুরুষ মানুষের অমন করে চোখের জল ফেলতে আছে!...এত বড় একটা পুরুষ মানুষ! কাঁদে মেয়েছেলে আর কাঁচছেলে। ..কী হয়েছে বলো তো ভাই ঠিক করে—আমার কোন কথায় দুঃখ পেয়েছ?...না কি —আমি তো নিজেরটাই সাতকাহন ভাবছি —অন্য কোন খারাপ খবরটবর পেয়েছ কোথাও থেকে? মা বাবা বৌ—সবাই ভাল আছে তো?'

আস্তে আস্তে শান্ত হল কমলাক্ষ। প্রাণপণ চেষ্টা করতে হল উদ্গত চোখের জল সামলে নিতে। একটু সময় নিয়ে মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, বিরক্ত হয়েছেন—শুনে পর্যন্ত কী যে কষ্ট হচ্ছে আমার, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। কতবার—কতবার মনে হয়েছে, আত্মহত্যা করি—তাতে যদি আপনি আমার ওপর দয়া করেন—দয়া করে ক্ষমা করেন!'

হেমন্ত প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর বলে উঠল, 'এই দ্যাখো, পাগলাকে কে ঘাঁটিয়েছে! আমি রাগ করেছি, বিরক্ত হয়েছি—এসব আজগুবি কথা কে বললে তোমাকে? এই সব ভেবে বাড়িতে বসে আছ তুমি। আর আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি কেন আসছ না বলে! কত ভাবছি—অসুখ করেছে কিম্বা আর কোন বিপদআপদ হয়েছে—কি আমার ওপরই রাগ করে আসছ না!'

এবার ভাল করে চোখ মুছে তাকাল কমলাক্ষ ওর চোখের দিকে। তার দৃষ্টিতে একই সঙ্গে আশা ও অবিশ্বাস। আশার অতীত সৌভাগ্য—বিশ্বাস করতে পারছে না, ভুল শুনছে কিনা অথবা হেমন্ত তামাশা করছে—এই আশঙ্কা।

উৎসুক ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রশ্ন করল—ঠিক প্রশ্নও নয়, যেন কোন তথ্যের পুনরাবৃত্তি—'আপনি সেদিন অত রাত করে এসে ঘুম ভাঙানোর জন্যে আমার ওপর খুব রাগ করেছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন, না?... মাস্টারমশাই সেজন্যে পরশু সকালে খুব বকলেন আমাকে। আপনি নাকি ওঁকেও যাচ্ছেতাই তিরস্কার করেছেন—উনি আপনার পেছনে একটা পাগল লেলিয়ে দিয়েছেন বলে!...সত্যিই, আপনি যা বলেছেন তাও তো মিথ্যে নয়, খুবই অন্যায় হয়েছে কাজটা, আমিও পরে ভেবে দেখেছি, একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো হয়ে গেছে। ...সত্যিই তো, পাড়ার লোক তো দুষো ভাবতেই পারে. চাকরবাকররাও এ নিয়ে কত কি বলবে হয়ত! স্যার বললেন তাই, 'তুমি এত বড় ছেলে, এতখানি বয়স হয়ে গেল—এসবগুলো তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল নাকি? মাঝখান থেকে আমাকে সুদ্ধ অপ্রস্তুতে ফেললে। কতকগুলো কথা শুনতে হল তোমার জন্যে।...আপনার কথা বললেন, উনি খুব রেগে গেছেন, খুবই বিরক্ত হয়েছেন তোমার ব্যবহারে, বারবার বলে দিয়েছেন আর যেন কখনও না আসে আমাকে বারণ করে দিতে বলেছেন।'

বলতে বলতেই চোখদুটো আবার ছলছলিয়ে এল।

বললে, 'সেই থেকে যে কী আমার মনের ভেতরে—তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছে যদি কোনমতে জীবন থেকে ঐ দিনটা বাদ দিতে পারতুম! ...কেবলই মনে হচ্ছে তার আগে মরে গেলুম না কেন। তাহলে হয়ত সে-খবর পেলে আপনার মন নরম হত, হয়ত একটু দুঃখ করতেন, দুটো মিষ্টি কথাও বলতেন।...এখনও এই একটু আগে মনে হচ্ছিল বিষ খেয়ে মরে যাই, তাতে যদি আপনার রাগ যায় আমার ওপর থেকে—'

হেমন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল বলেই এতক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি। এবার ইন্দিলক্ষি কমলাক্ষর কথায় বাধা দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'উনি কি বলেছেন, তোমার মাস্টারমশাই— যে, আমি সেদিন অত রাত করে আসার জন্যে রাগ করেছি, তাকে গালাগাল দিয়েছি—আর আসতে বারণ করেছি তোমাকে? বলেছেন এই কথা উনি?'

'হ্যাঁ—। আরও বললেন—' বলতে গিয়েও হঠাৎ একটু থেমে গেল কমলাক্ষ। এতক্ষণে যেন একটা কি সংশয় দেখা দিয়েছে মনে, তারপর বললে, 'কেন, আপনি বলেননি ওঁকে কিছু?'

আরও খানিকটা চুপ করে রইল হেমন্ত, তারপর বললে, 'না, ঠিক এভাবে বলিনি, তোমার পাগলামি নিয়ে হাসাহাসি করেছি এই মাত্র। রাগ একটুও করিনি—এটা তুমি বিশ্বাস করো। অকারণে শুধু চক্ষুলজ্জার জন্যে কখনও মিথ্যে বলব না আমি।'

'তবে—উনি কেন বললেন?' অবাক হয়ে যায় কমলাক্ষ, এ-ব্যাপারের যেন কোন তল পায় না এখনও, পূর্ণবাবুর আচরণ ওর কাছে দুর্জ্ঞেয় মনে হয়, সত্যিই উনি সব বানিয়ে বলেছেন?—সঙ্গে সঙ্গে, গত দুদিন যে অকথ্য অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছে, সে-কথা মনে পড়ে একটা প্রচণ্ড উষ্মাও মাথা তোলে ভেতরে ভেতরে। চোখের সামনে সব লাল হয়ে আসে যেন—'উনি মিছে কথা বলবেন আমাকে? কিন্তু কেন, এর মানে কি?'

'ছিঃ!' হেমন্ত তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দেয়, উনি তোমার শিক্ষক, গুরুজন, তোমাকে ছেলের মতো ভালবাসেন, হিতাকাঙ্ক্ষী। ওঁর সম্বন্ধে এসব কথা চিন্তা করতে নেই। হয়ত উনি ভুল বুঝেছেন, তাও হতে পারে তো!...পাড়ার লোক কি ভাববে—কি চাকরবাকর কি মনে করবে—এসবও হয়ত উনিই ভেবেছেন, বলার সময় কীভাবে বলেছেন, তুমি ভেবেছ আমার জবানীতেই বলছেন।...তুমি এসব কথা ভুলে যাও। মিছিমিছি এ নিয়ে মাথা ঘামিও না, মন খারাপ করো না।...... তুমি যখন খুশি এসো, সময় না পাও রাত্রেই এসো—অনায়াসে স্বচ্ছন্দে। কারও কথা তোমার ভাববার দরকার নেই। মাস্টারমশাই বারণ করলে—যদি কোনদিন করেন—শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছে, তবে আমার হয়ে তাঁর কিছু বলার অধিকার নেই। আমি তাঁর কেনা চাকরানী নই, আমার সংসার—আমি নিজের রোজগারে খাই, তিনি যেটুকু সাহায্য করেছিলেন তার সুদশুদ্ধ উশুল হয়ে গেছে—আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই তাঁর সঙ্গে—এ-বাড়িতে কেউ আসবে কি আসবে না—এ-কথা বলার এক্তার শুধু আমারই। তুমি এসো—নিশ্চয়ই আসবে। না এলে ভাবব আমার ওপর রাগ করেছ!'

এতটা না বললেও হত বোধহয়। কিন্তু কথাগুলো বেরিয়ে যাবার আগে সে-সত্যটা ভাবার সময় হল না হেমন্তর। মানসিক আবেগের ধর্মই এই. বান ডাকলে কতদূর উঠবে, কোথায় গিয়ে থামবে তা কেউ বলতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

বিলুপ্ত রাজধানী

উৎপল চক্রবর্তী

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর মুখ খুঁজিতে যাই না আর...

কতদিন, কতজন, কখনো পরম বিজ্ঞতায়, কখনো আন্তরিক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন,—কেন মশাই এত পয়সা খরচ করে এই পোড়া বাংলাদেশের মাঠঘাট বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান? ইতিহাসের নমুনা দেখতে চান, সংগ্রহ করতে চান তো বাংলার বাইরে যান। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি, নালন্দা রাজগীর কত নাম করব। সেসব ছেড়ে এই বাংলাদেশে কেউ বেড়ায়, না বেড়াবার মতো জায়গা আছে?

কোন উত্তর দিইনি। আমি জানি, এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। যাঁরা প্রশ্নকর্তা, তাঁরা কেউ ইতিহাসবেত্তা নন, ঘুরে বেড়াবার যে আগ্রহ তাও তাঁদের অনান্তরিক। এবং জানি, আন্তরিক যদি বা হন, তবু দেখার চোখ নেই তাঁদের। আর, সম্ভবত সেই কারণেই 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা' এবং মনে করেন 'পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া!'

কতটুকু দেখেছেন তাঁরা এই পোড়া দেশের? কতটুকু খোঁজ রাখেন তাঁরা এই বাংলা দেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসের? বহু শিক্ষিত জনকেই জিজ্ঞাসা করেছি,

—বলুন তো, এখন পশ্চিম বাংলার রাজধানী যেমন কলকাতা, পূর্ব বাংলার ছিল ঢাকা—সেরকম কোন কোন জায়গা প্রাচীনকালে বাংলাদেশের রাজধানী ছিল?

যদি বা কেউ গৌড় বা মুর্শিদাবাদের নাম করেন, কিন্তু কোনটির পর কোনটি অনেকেই বলতে অপারগ। আর শুধু গৌড় বা মুর্শিদাবাদই তো প্রাচীন রাজধানী নয় —এ-দেশের ইতিহাস আরো প্রাচীন। হাজার বছর আগে কোন জায়গা ছিল এদেশের রাজধানী?

বলতে পারেন না তাঁরা। প্রশ্নের অনাবশ্যকতা নিয়ে বিতর্ক তোলেন। আমাকে আবার নীরবতা পালন করতে হয়। আমি জানি, ঐ অজ্ঞতায় তাঁরা স্বেচ্ছাবন্দী।

পরিত্রাণের পথ তাঁদের নিজেদেরই আগ্রহে বের করতে হবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও কিছু হবার নয়।

যাঁরা 'ইতিহাস' বিষয়েও বিশেষভাবে সচেতন, তাঁদেরও অধিকাংশেরই আগ্রহের কেন্দ্র বাংলাদেশ নয়। বৃহত্তর ভারতের দৃশ্যমান ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষক, বারংবার তাঁরা তাই ছুটে যান দিল্লী, আগ্রা, কোনারক, খাজুরাহো...... অথচ এই বাংলাদেশের কত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একান্তে পড়ে আছে পাথরে গড়া এক-একটি আশ্চর্য মূর্তি, অরণ্যের নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে আছে এক-একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ, কত রাজপ্রাসাদের শেষ চিহ্ন, কত মন্দির, মসজিদ মিনার, গড়ের পাথরে ইঁটে কারুকার্যে লিপিতে ক্ষোদিত আছে এই দেশের ইতিহাস—কয়জন এসবের টানে ছুটে যান সেই সব অমূল্য প্রত্নসম্পদ আবিষ্কার পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ বা অনুসন্ধানের জন্য!

বিশ্বাস করা কঠিন, তবু সত্য, সারা ভারতবর্ষে যত পাথরের মূর্তি, বা পোড়ামাটির কাজ বা মন্দির মসজিদ অথবা মুদ্রা শিলালেখর অস্তিত্ব আছে, পরিমাণে বা সৌন্দর্যে বাংলাদেশে যা আছে তাও কিছু কম উল্লেখযোগ্য নয়। এখনো বাংলার মাটির গভীরে গোপনে সমাহিত আছে কত অসংখ্য ঐতিহাসিক সম্পদ। অকস্মাৎ কখনো কৃষকের লাঙলের ফালে বা শ্রমিকের কোদালের ডগায় উঠে আসে বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের এক-একটি অধ্যায়ের নীরব সাক্ষ্য, পণ্ডিতজন ছুটে যান সেখানে—লিখিত হয় বাংলার ইতিহাসের এক-একটি ছিন্ন অধ্যায়—

কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে, গভীর একনিষ্ঠতায়, এই দৈবের দান ছাড়াও, এসব আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এদেশে আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। যা কিছু হয় তাও যথেষ্ট নয়, আর যা আবিষ্কার হয়ে গেছে —তার সংরক্ষণের ব্যবস্থাও যথাযথ নয়। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উপযুক্ত ভাবে সক্রিয় নন, ঐতিহাসিকেরা যথেষ্ট আগ্রহী নন, আর সাধারণ মানুষ?

ইতিহাস যা শিখেছেন তাঁরা বই পড়ে কি লেখা আছে তাতে?

প্রায় হাজার বছর আগে পাল রাজাদের রাজধানী বাণগড় লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী বা তারো আগে কুষাণ, সুঙ্গ, গুপ্ত যুগের 'গঙ্গে' বন্দর সম্বন্ধে কতটুকু লেখা আছে সে সব বইতে?

ঘরের পাশে বেড়াচাঁপা, কিছু দূরের সপ্তগ্রাম ঐ সিঙ্গুর, মহানাদ, আর পুষ্করণা বিষ্ণুপুর, বাণগড় দেবীকোট, পাণ্ডুয়া গৌড় কর্ণসুবর্ণ বা তাম্রা

গৌড়নগরী / কদমরসুল

কোথায়—এই বাংলার বর্তমান রাজধানী কলকাতা থেকে কতদূরে—কে তার খবর রাখে—অথচ ঐ জায়গাগুলি প্রত্যেকটিই এক সময় ছিল বাংলার রাজধানী।

কিভাবে সেগুলো গড়ে উঠেছিল কেনই বা তার পতন হলো—কোন বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় সে-সব? বাংলার মানুষ বাংলার ইতিহাস শিখবেন কোথা থেকে?

তাই জানি, বিজ্ঞজনের সেই প্রশ্নটির কোন উত্তর দিতে নেই। দিলীপকুমার রায়ের একটি গানের কলি মনে পড়ে, 'ওরা জানে না তাই হাসে', আমিও হাসি। আর ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়ি সেই বিলুপ্ত রাজধানীগুলির ডাকে। ম্লান, বিবর্ণ এক-একটি ঐশ্বর্যের শ্মশানভূমি, বিপুল সম্পদ বুকে আঁকড়ে ধরে যেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আশংকাজর্জর অপরাধীর মতো নীরবে প্রতীক্ষমান—কালের অনিবার্য প্রহার নেমে আসছে যুগের পর যুগ ধরে।

অবলুপ্তির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছে তারা ঐতিহাসিক চিহ্নগুলো যেন লুপ্ত হয়ে না যায়।

আর অসহায় সেই হাহাকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বারবার মনে হয়েছে, এখনো সময় আছে। এই চিহ্নগুলো, এই বিপুল ঐশ্বর্য যদি এখনো যথোচিত যত্ন নিয়ে সংরক্ষণ না করা যায় তবে কিছুদিনের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে যাবে প্রাচীন বাংলার এই হৃদপিণ্ডগুলি—যেমন চিরকালের মতো নীরব হয়ে গেছে 'গঙ্গে' বন্দর, রামাবতী, কর্ণসুবর্ণ, তাণ্ডা!

কত প্রাচীন এই বাংলা দেশ?

ইতিহাস নীরব। শুধু পুরাণ উপকথায় ছড়িয়ে আছে বঙ্গ-প্রসঙ্গ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে সবই এই পোড়া দেশের বিপক্ষে। ঋগ্বেদে কোন উল্লেখই নেই, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বটে, কিন্তু 'দস্যু' 'অসুর' বিশেষণে বঙ্গবাসী চিহ্নিত। এদেশের ভাষা নাকি পাখীর ভাষা—কেউ বুঝতেই পারে না। মহাভারতের ভীম বলেছেন, 'ম্লেচ্ছ', ভাগবত পুরাণে 'পাপ', বৌধায়ন ধর্মসূত্রে 'আর্যসংস্কার বহির্ভূত'। এদেশে এসে ঘুরে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো অন্য প্রদেশের মানুষকে।

মহাভারতের আদি পর্বে এ দেশ উদ্ভবের এক বিচিত্র কাহিনীও উল্লেখিত হয়েছে। বৃহস্পতির শাপে অন্ধ দীর্ঘতামস ঋষিকে তাঁর স্ত্রী প্রদ্বেষী বড়ই অযত্ন করতেন। এতে দীর্ঘতামস ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে অভিশাপ দেন। স্ত্রীও কিছু কম যান না। ছেলেদের সহায়তায় স্বামীর হাত-পা বেঁধে তাঁকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। বদ্ধ অন্ধ দীর্ঘতামস ভাসতে ভাসতে বলী রাজার ঘাটে গিয়ে লাগেন। অপুত্রক বলী রাজা দীর্ঘতামসকে মুক্ত করেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। রাণী সুদেষ্ণাকে অনুরোধ করেন ঋষির ঔরসে পুত্রবতী হতে। রাণী গররাজী যেহেতু ঋষি অন্ধ। ছল করে শূদ্রাণী দাসীকে পাঠালেন তিনি দীর্ঘতামসের শয্যায়। এই শূদ্রাণীর ছেলেদের পরিচয় ক্রমে বলী রাজা জানতে পেয়ে রাণী সুদেষ্ণাকে এবার আদেশ দিলেন পুত্রবতী হতে। দীর্ঘতামসের ঔরসে রাণী সুদেষ্ণার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ।

কাশীরাম দাস লিখছেন,—

'অঙ্গদেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ
কলিঙ্গ কলিঙ্গ দেশে, বঙ্গ দেশে বঙ্গ।।'

কিন্তু পৌরাণিক এই বঙ্গদেশের সঠিক অবস্থান আজ আর জানার উপায় নেই। কোথায় বা ছিল তার রাজধানী—তা'ও নয়। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বলা হয়েছে 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ'—বঙ্গ ও মগধ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আর পরবর্তীকালের ইতিহাসের যা সাক্ষ্য—তাতে মোটামুটি বোঝা যায় বঙ্গ-উপবঙ্গ-প্রবঙ্গ মিলিয়ে যে অঞ্চল তা এখনকার পূর্ববঙ্গ অঞ্চল। অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশের একপ্রান্ত মাত্র। আর সে বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁ, না কোটালীপাড়া কে তা জানাবেন?

বস্তুত সারা বাংলা তখন বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় সমতট ইত্যাদি ভিন্ন নামে চিহ্নিত ছিল। রাজধানীও ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

বঙ্গ যদি পূর্ববাংলা হয়—তবে পুণ্ড্র ও গৌড় সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। পানিনি, কৌটিল্য, বাৎস্যায়নের লেখাতে গৌড়ের উল্লেখ থাকলেও ঠিক কোন জায়গাটি গৌড় তা বলা নেই। পরবর্তী ইতিহাস বলে, প্রাচীন মুর্শিদাবাদ বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানই হলো প্রাচীন গৌড়—আর তার রাজধানী হলো চম্পা। এ কোন চম্পা? ভাগলপুরে এর অবস্থিতি না বর্ধমান শহরের উত্তর-পশ্চিমে দামোদরের বাম তীরে চম্পানগরী-ই সেই চম্পা? কে জানে! শুধু, আরো পরবর্তীকালে মালদহের গৌড় লক্ষ্মণাবতী-ই আজো গৌড়ের শেষ সাক্ষী হিসাবে অপেক্ষমান!

আর রাঢ় সম্ভবত বর্তমান পশ্চিম বাংলারই পূর্ব নাম। কিন্তু এর রাজধানী কোথায় ছিল? প্রাচীন জৈন গ্রন্থ আয়ারাঙ্গ বা আচারাঙ্গ সূত্র বলে দিনাজপুরের কোটীবর্ষ এর রাজধানী। সেই কোটীবর্ষই কি বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় অঞ্চল? কিন্তু রাঢ় তো দ্বিধাবিভক্ত ছিল। উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। আর দক্ষিণ বর্ধমান হুগলী হাওড়া পশ্চিম মুর্শিদাবাদ এর অন্তর্গত ছিল। তাহলে পরবর্তীকালের রাজধানীর নাম কি?

মধ্য বাংলার যে অংশ ছিল সমতট নামে পরিচিত তার রাজধানী কি হরিকেল না চন্দ্রদ্বীপ?

এত জিজ্ঞাসার কোন সঠিক উত্তর আজ অবধি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। শুধু প্রকৃতি যদি হঠাৎ প্রসন্না হয়ে হারা'না ইতিহাসের একটি লুপ্ত অধ্যায়ের স্মারকচিহ্ন মানুষের হাতে তুলে দেন, তবে নিশ্চিত বিশ্বাসে সেকথা লিপিবদ্ধ করেন ইতিহাসবেত্তাগণ!

কিন্তু আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি—এ কি শুধু গানের বাণী?

সুপ্রাচীন এই বাংলার প্রাচীনতম হৃদকেন্দ্রটি কোথায় ছিল, কিভাবে বাঙলার বিভিন্ন বিভাগগুলি প্রথমে 'গৌড়' নামের ছত্রছায়ায় পরে 'বঙ্গ' নামের ব্যাপ্তিতে আত্মগোপন করল—সেই রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তের বিবরণ ছড়িয়ে আছে ঐ বিলুপ্ত রাজধানীগুলিরই প্রতিটি অণুতে অণুতে! এই ইতিবৃত্তের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়? শুধু গান করলেই দায়িত্ব শেষ?

মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, হিউ-এন-সাঙ, ইবন বতুতা, ওয়াংতো ইউয়ান, মা-হোয়ান, ফেই-শিন, নিকলো কন্তি, ভারথেমা, বারবোসা ডো-আঁ-দে-বারোস—নামী অনামী কত পর্যটক বিভিন্ন যুগে এই রাজধানীগুলিতে এসেছেন সুদূর গ্রীস, চীন, পর্তুগাল থেকে তাঁদের জাহাজ এসে ভিড়েছে তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, গঙ্গে, চট্টগ্রাম বন্দরে—

সুজলা সুফলা এদেশের রাজধানীগুলির ঐশ্বর্য সৌন্দর্য বিশালতা থেকে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা। বাঙলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে আবার ফিরে আসার বাসনা নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের দু-চোখ ভরে দেখার ইতিবৃত্ত।—

কত যুগ পার হয়ে গেছে তারপর, কত ভাঙাগড়ার অনিবার্য আন্দোলনে বাংলাদেশের ইতিহাস বিবর্তিত হয়ে চলেছে। রাজধানীগুলি গৌরবের আলো, ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেছে—

একদা সমৃদ্ধ জনপদ মরুভূমির শূন্যতা বুকে নিয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছে গভীর অরণ্যের আড়ালে, কোথায় নিঃশব্দে নিজেকে সমাহিত করেছে মাটির গভীর গোপনে।

বিশ্বাস হয় না, ভাবতে গেলে বিষণ্ণতায় ঢেকে যায় কল্পনা—এইসব রাজধানীগুলিও একসময় আজকের কলকাতার মতো এমন কল্লোলিনী তিলোত্তমা ছিল। ধনে জনে প্রাণস্পন্দনে মুগ্ধ মানুষকে আহবান করেছে সাদরে—সুরম্য অট্টালিকা, সুসজ্জিত বিপনী শ্রেণী, প্রশস্ত রাজপথ, উৎসব কোলাহলমুখর জনজবীন যেন মন্ত্রবলে এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আজ সেই অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে নিশ্চিত ধ্বংসের নখ বসায় বট-অশ্বত্থের চারা, বিপণীশ্রেণীর দ্রব্যসম্ভারের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও, প্রশস্ত রাজপথের কঙ্কালে নির্ভয়ে পদচারণা করে সরীসৃপ আর হিংস্র শ্বাপদ, জনজীবনের কোলাহলের পরিবর্তে গভীর রাতে মুখর হয়ে ওঠে ফেরুপাল আর শেয়ালের আর্তস্বর!

কলকাতার পথ হাঁটি! আচমকা এক-এক সময় মনে হয়, হয়তো হাজার হাজার বছর পর, আমারই মতো কোন পর্যটক,

কলকাতায় ধ্বংসস্তূপে অন্বেষী পদচারণা করবেন—খুঁজে বেড়াবেন বিলুপ্ত এই রাজধানীর ইতিবৃত্ত—হয়তো আজকের এই প্রাণচঞ্চল মহানগরী ঢেকে যাবে গভীর অরণ্যে বা প্রোথিত হয়ে যাবে মাটির আড়ালে—! হয়তো...। আবার মনে হয়,

হয়তো তা হবে না। আধুনিক বিজ্ঞান নগর রক্ষার জন্য উপযুক্ত ভাবেই প্রস্তুত। এবং এই প্রস্তুতির অভাবের জন্যই প্রাচীন রাজধানীগুলি হারিয়ে গেছে এমন করে।

আর তাই, বারংবার পর্যটকমন সেইসব পর্যটকদের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে—যাঁরা এক সময় বিলুপ্ত রাজধানীগুলির রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সর্বত্র পৌঁছবার রাস্তা আজ আর খোলা নেই। আজ যেতে পারি না পৌণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল মহাস্থানগড়ে যা এখন বাংলাদেশের বগুড়া জেলার নিভৃতে অপেক্ষমান, যেতে পারি না খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের সমাচার দেব গোপচন্দ্রের মুদ্রা যেখানে পাওয়া গেছে সেই ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় যাওয়া যায় না ঢাকার সোনারগাঁ বা বিক্রমপুরে!

একসময় ঐ 'বঙ্গ' ছিল ব্রাত্য, পান্ডববর্জিত দেশ। 'বাঙগাল'রা ছিলেন উপহাসের পাত্র। ইতিহাসের চাকা আবর্তিত হয়ে চলেছে। গৌড়-বঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব-পাকিস্থান, পূর্ববঙ্গ বাঙলা দেশ—কে জানে ইতিহাস কোন অমোঘ নির্দেশে এগিয়ে চলেছে। আজ আর 'বঙ্গ' ব্রাত্য নয়—ব্রতী। সারা বাংলাদেশের উদ্দীপনায় উজ্জীবনের একটি মন্ত্রপূত নাম।

তাই ইচ্ছে করে বারবার প্রাচীন ইতিহাসের ঐ আদিম ভূমিকে স্পর্শ করি,—প্রণাম করি বর্তমান ইতিহাসের নায়কভূমিকে। কিন্তু পারি না। শুধু এ বাংলারই সেই সব বিলুপ্ত রাজধানীতেই তাই পা রাখি—সম্পূর্ণতার স্বাদ অপূর্ণতায় আরোও তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। একদা সমগ্র বাংলাদেশের যেগুলি রাজধানী ছিল সেগুলোর কাছে গিয়ে তাই তৃষ্ণা মেটাতে হয়।

গঙ্গে-কর্ণসুবর্ণ-বাণগড়, পান্ডুয়া, গৌড়, তান্ডা মুর্শিদাবাদ—প্রাচীন বাংলার এইসব বিলুপ্ত রাজধানীগুলির কাছে গিয়ে শুনে নেবার চেষ্টা করি পুরাবৃত্ত, দেখে নেবার চেষ্টা করি আমাদের লুপ্তপ্রায় সম্পদগুলি, অনুভব করবার চেষ্টা করি আমাদের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিকে; আর মনে হয়, বাঙলার সকল মানুষ যদি গভীর মমতা নিয়ে এই স্মৃতিচিহ্নগুলি বাঁচিয়ে রাখেন, যদি সে কারণে একবারও আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে এঁদের সম্মুখে একবারও দাঁড়ান, তবে তিনিও কবির মতো গভীর বিশ্বাসে বলবেন—বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি—তাই আমি পৃথিবীর মুখ খুঁজিতে যাই না আর।—

বিজ্ঞানের কথা

মেরিণার-৯ ও মঙ্গলগ্রহ

ইতিপূর্বে উপগ্রহের (চাঁদের) কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি হয়েছে, অন্য গ্রহের (শুক্র) পাশ কাটিয়ে পর্যবেক্ষণকারী ব্যোমযান (মার্কিন) চলে গিয়েছে, অন্য গ্রহের (শুক্র) মাটিতে ব্যোমযান (সোভিয়েত) নেমেছে, কিন্তু অন্য একটি গ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের হাতে তৈরি হল এই প্রথম। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার-৯ গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ হতে পেরেছে এবং মঙ্গলগ্রহের দুটি স্বাভাবিক উপগ্রহের মতোই মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে পাক খেয়ে চলেছে। আগামী তিনমাস ধরে চলবে। একই সময়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দুই ও তিন নম্বর মার্স'ও মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি। এই ব্যোমযান দু'টিরও মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নামার কথা। অবতরণ যদি সফল হয় তাহলে মঙ্গলগ্রহের তিনটি কেন্দ্র থেকে একই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ এবং প্রায় চোখের সামনে দেখার মতো করে আঁতিপাঁতি অনুসন্ধান চলবে। আশা করা চলে, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে যতো রহস্য এতোদিন ধরে জমা হয়েছে তার অনেকখানি পরিষ্কার করে তোলার সূত্রও এ থেকে পাওয়া যাবে।

মেরিনার-৯ যে বিশেষ কক্ষে মঙ্গলগ্রহকে পাক খাচ্ছে (ছবিতে অপেক্ষাকৃত মোটা দাগে চিহ্নিত), গ্রহের উপরিতল থেকে তার সর্বাধিক দূরত্ব ১৭,৭০০ কিলোমিটার, সর্বনিম্ন দূরত্ব ১,৩৫০ কিলোমিটার। এই কক্ষে পাক খেতে খেতে মেরিনার-৯ আগামী তিন মাসের মধ্যে দুটি উপগ্রহ সমেত মঙ্গলগ্রহের ৫,০০০ ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠাবে। এই ফটোগুলোতে ধরা পড়বে মঙ্গলগ্রহের উপরিতলের ৭০ শতাংশ এলাকা। ফটো তোলার জন্যে মেরিনার-৯ দু-রকমের ক্যামেরা ব্যবহার করবে—একটি বৃহৎ এলাকা গোটাভাবে ধরবার জন্যে, অপরটি ক্ষুদ্র এলাকা বিস্তারিতভাবে ধরবার জন্যে। শেষোক্ত ক্যামেরার টেলিফটো লেন্সে মঙ্গলগ্রহের উপরিতলের একটি ফুটবল খেলার মাঠের মতো আকারের বস্তুও স্পষ্টভাবে ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

শুধু এই দুটি ক্যামেরাই নয়, মেরিনার-৯-এ আরো আছে ইনফ্রা-রেড সেন্সর ও স্পেকট্রোমিটার। এই যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের পাতলা বায়ুমন্ডলের উপাদান, উপরিতলের তাপমাত্রা ও গড়নের মাপ নেওয়া যাবে। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা প্রথম স্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারবেন মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী কিনা।

মেরিনার-৯ মঙ্গলের উপগ্রহ হয়েছে ১৩ই নভেম্বর তারিখে, কিন্তু মঙ্গলের ছবি পাঠাতে শুরু করেছে তার দু-দিন আগে থেকেই।

প্রথম ছবিটি তোলা হয়েছে ১১ই নভেম্বর তারিখে গ্রীনউইচ সময় রাত ১১-১৬ মিনিটে (ভারতীয় সময় ১২ই নভেম্বর ভোর ৪-৪৬ মিনিটে)। মেরিনার-৯ মঙ্গলগ্রহ থেকে তখন ৮,৬১,০০০ কিলোমিটার দূরে। তারপরে পুরো ২৪ ঘন্টা সময় নিয়ে (মঙ্গলের একটি দিন পৃথিবীর একটি দিনের চেয়ে কয়েক মিনিট বড়ো) পর-পর ৩১টি ছবি তোলার পরে প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে মঙ্গল থেকে মেরিনার-৯ যখন ৫,৭১,০০০ কিলোমিটার দূরে।

ছবিগুলো প্রথমে ধরে রাখা হয়েছিল মেরিনার-৯-এর মধ্যে একটি ফিতেয়, পরে রেডিও মারফৎ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। ১১ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব পার হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছুতে সময় নিয়েছে ৬ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড।

দুটি ছবি ছিল মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ ডাইমোসের। ছবিতে তার আকার যদিও একটি আলোকবিন্দুর চেয়ে বড়ো নয়, কিন্তু ছ'টি অবস্থানের ছ'টি ছবি। পরে কক্ষপথ থেকে মেরিনার-৯ মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহের আরো স্পষ্ট ছবি যাতে নিতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। শুধু অবস্থান-গত ছবি থেকেও ডাইমোসের কক্ষপথটি নির্ভুলভাবে নির্ধারিত হতে পারবে।

মঙ্গলগ্রহের প্রথম যে ৩১টি ছবি মেরিনার-৯ থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে তা খুব স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতা কোনো প্রয়োগগত ত্রুটির জন্যে নয়, মঙ্গলগ্রহে প্রচণ্ড একটা ধুলোর ঝড় চলার জন্যে। বিগত পনেরো বছরের মধ্যে মঙ্গলগ্রহে এমন প্রচণ্ড ধুলোর ঝড় আর কখনো দেখা যায় নি। ফলে ছবিতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়—মেরুর সাদা টুপি বা এমনি আরো কিছু বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়া।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে এই ঝড় শুরু হয়েছে। চলবে আরো কিছু-দিন। এই ঝড় থামলে ছবিও আসবে স্পষ্ট—পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে চাঁদের উপরিতলকে যতোখানি স্পষ্ট দেখা যায় ততোখানি। মঙ্গলগ্রহকে এতটা স্পষ্ট করে মানুষ আজ পর্যন্ত দেখে নি।

মহাকাশ-গবেষণায় মেরিনার-৯ থেকে এক নতুন যুগের শুরু বলা চলে, খুব কাছের থেকে এক-একটি গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করার যুগ। মঙ্গলগ্রহ শুধু নয়, মঙ্গলের পরে বৃহস্পতি, তারপরে আরো দূরের গ্রহগুলি। সত্তরের দশকটি আমেরিকান বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে এমনি কয়েকটি ঐতিহাসিক অভিযানের দ্বারা চিহ্নিত হতে চলেছে। মেরিনার-৯ তারই সাফল্য-মণ্ডিত উজ্জ্বল সূচনা।

কাছের থেকে গ্রহ পর্যবেক্ষণ

আগামী দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে সৌরমন্ডলের সবক'টি গ্রহকে কাছের থেকে দেখার পরিকল্পনা করেছেন আমেরিকান বিজ্ঞানীরা। দেখার কাজটি সম্পন্ন হবে উন্নত ধরনের ক্যামেরা ও দূর-অবলোকনের নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

মেরিনার-৯ সফল হওয়াতে বোঝা যাচ্ছে, এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ-দানের কৃৎকৌশল এখন বিজ্ঞানীদের আয়ত্তের মধ্যে। মেরিনার-৯ যে-ভাবে মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণ করছে তেমনিভাবে সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের এলাকা ছড়িয়ে দেবার বিরাট একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলো বিজ্ঞানীদের হাতে এসে যখন পৌঁছুবে তা থেকে, এই পৃথিবী ও এই পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে তৎকালীন জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করে, প্রাণের রহস্যের একটা সমাধান হাতে আসবে। ধারণা করা যাবে—যে-তারাটিকে বলা হয় আমাদের সূর্য তাকে ঘিরে কেমনভাবে প্রাণের উদ্ভব, বিকাশ, রূপায়ণ ও বিস্তার।

সৌরমণ্ডলে প্রাণের অস্তিত্বের ছবিটি যদি এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে সৌরমণ্ডলের বাইরে আরো যে কোটি কোটি তারা আছে তাদের সম্ভাব্য গ্রহমণ্ডলের প্রাণের অস্তিত্বের ছবিটিও অনুজ্জ্বল থাকে না। সমগ্র পর্যবেক্ষণের মোট ফল হিসেবে এইটেই সবচেয়ে বড়ো লাভ। কথাটা আরেকটু স্পষ্ট করা যাক। বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্যের গ্রহমণ্ডলের মতো এই বিশ্বের আরো কোটি কোটি তারার গ্রহমণ্ডল থাকাটা খুবই সম্ভব। অতএব, যে-যে কারণে এই সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, সেই সেই কারণগুলো অন্য একটি তারার অন্য একটি গ্রহে বর্তমান থাকলেও থাকতে পারে। এই উক্তিতে অনিশ্চয়তার হেতু, এখনো পর্যন্ত সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কারণগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্যের আকারে আমরা পাই নি। যদি পাওয়া যায়, ছবিটি সমগ্রতা লাভ করে। তখন ধরে নেওয়া চলে, অন্য একটি গ্রহমণ্ডলের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা আর অনুমান নয়, সদৃশ সিদ্ধান্ত। এক জায়গায় যা হয়েছে, অনুরূপ অবস্থায় অন্য জায়গাতেও তাই হওয়া উচিত।

আমেরিকান বিজ্ঞানীদের কর্মসূচীতে এই দশকের মধ্যে সৌরমণ্ডলের প্রত্যেকটি গ্রহে এবং সূর্যেও, অনুসন্ধানী ব্যোমযান পাঠাবার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও ইতিমধ্যে শুক্রগ্রহে ব্যোমযান নামিয়েছেন, মঙ্গলগ্রহে নামাতে চলেছেন, সম্ভবত তাঁরাও অনুরূপ একটি কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হবার পথে। সত্তরের দশকটি যে মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই (কোন দশকই বা নয়!)। তবে লক্ষ করবার বিষয়, সত্তরের দশকে শুরু হলেও গবেষণার ফলাফলের জন্যে আশি দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকবে। পৃথিবী থেকে সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকের গ্রহ নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্ব এতই বেশি যে পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে একটি ব্যোমযানের নেপচুন বা প্লুটো গ্রহে পৌঁছতে (রকেট-বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায়) সময় লাগার কথা দশ বছর।

বলা বাহুল্য, এই অভিযানের জন্যে খরচের বহরও সামান্য নয়। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা তাঁদের কর্মসূচীতে মোট খরচের একটা হিসেবও রেখেছেন। তা হচ্ছে ১,৮৯৫ মিলিয়ন ডলার (১,৪২১ কোটি টাকার কিছু বেশি)। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের চন্দ্র-অভিযানের অ্যাপোলো কর্মসূচীতে মোট খরচ হয়েছে ২৪,০০০ মিলিয়ন ডলার। দেখা যাচ্ছে, দশ বছর ধরে গ্রহ পর্যবেক্ষণের খরচ তার চেয়ে বেশ কম।

গ্রহ পর্যবেক্ষণের কর্মসূচীতে মেরিনার-৯ ছাড়া আরো আছে : একটি মেরিনার ব্যোমযান—যেটি ১৯৭৩ সালে শুক্রগ্রহের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের ফটো তুলবে। পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চাঁদ দেখার মতো স্পষ্ট হবে এই ছবিও।
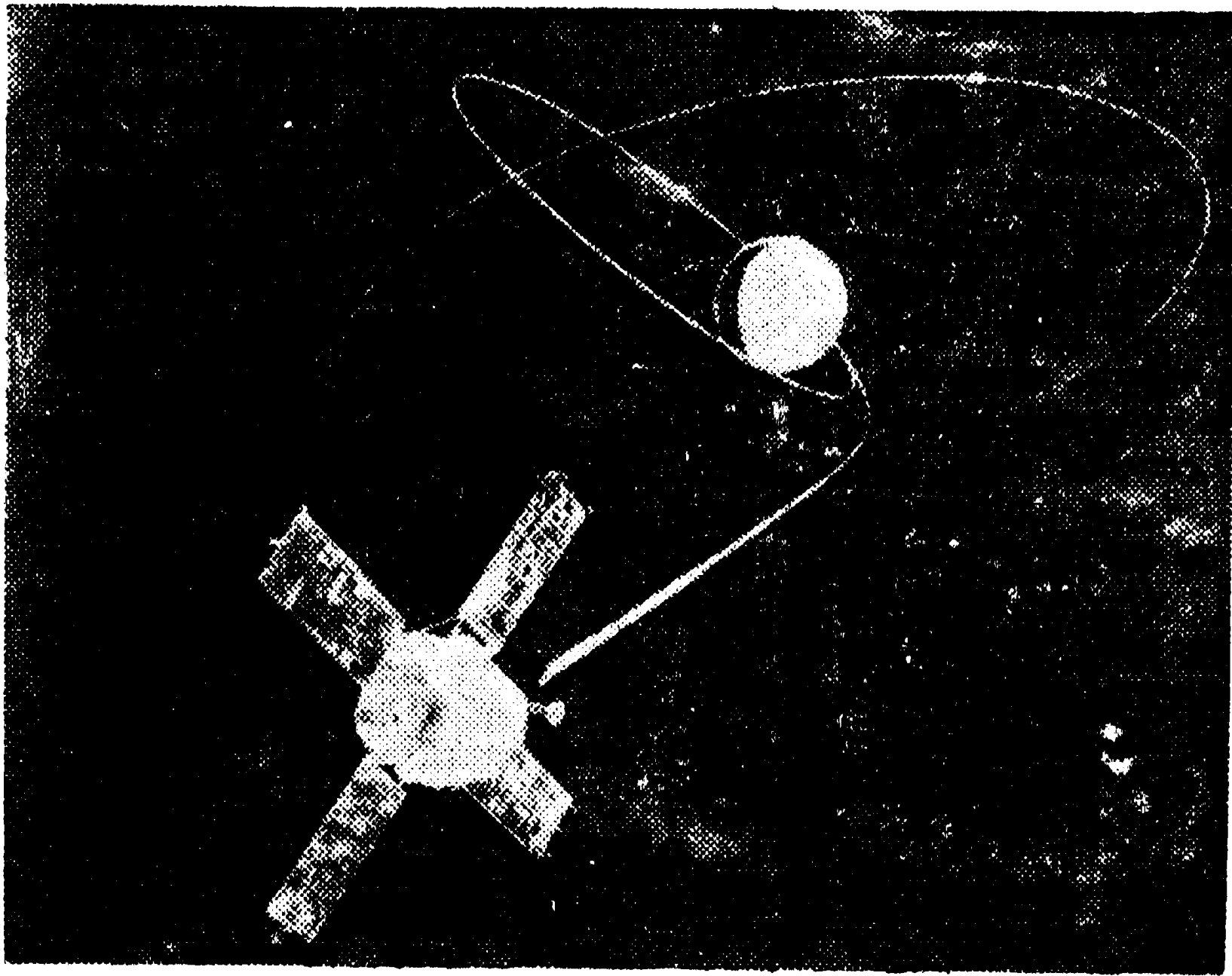
মেরিনার-৯ মঙ্গলগ্রহের দিকে অগ্রসর হচ্ছে (আঁকা ছবি)। মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে অন্য একটি গ্রহের কক্ষে মানুষের তৈরী উপগ্রহ স্থাপন এই প্রথম। মেরিনার-৯ থেকে মংগলের উপরিতলের ৭০ শতাংশেরও অধিক এলাকার টেলিভিশন চিত্র নেওয়া হবে, মঙ্গলের তাপমাত্রা এবং মংগলের বায়ুমণ্ডলের চাপ ও উপাদানগত গঠনের খবর সংগ্রহ করা হবে। ছবিতে মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহের কক্ষপথও দেখানো হয়েছে—বড়োটি ডাইমোস-এর, ছোটটি ফোবোস-এর। মেরিনার-৯ ১৯৭১ সালের ৩০শে মে তারিখে কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে মঙ্গলের কক্ষে স্থাপিত হয়েছে। মেরিনার-৯ পৃথিবী থেকে মঙ্গলে গিয়েছে সরাসরি নয়, সূর্যকে ঘুরে, ৪০০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে।

দুটি সাত-টনী ভাইকিং ব্যোমযান—১৯৭৫ সালে পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে ১৯৭৬ সালে মংগলগ্রহে পৌঁছবে। একটি মংগলের মাটিতে নামবে, অপরটি মংগলকে কক্ষপথে পাক দিতে থাকবে। মাটির ব্যোমযানটিতে থাকবে নানাবিধ অনুসন্ধানী যন্ত্র যার সাহায্যে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তার নির্ভুল হদিশ পাওয়া যাবে। মাটির ব্যোমযান থেকে মংগলের খবর পৌঁছবে কক্ষের ব্যোমযানে সেখান থেকে পৃথিবীতে।

দুটি সিকি-টনী অনুসন্ধানী ব্যোমযান—পায়োনিয়র-১০ ও পায়োনিয়র-১১। দুটিই যাবে বৃহস্পতির দিকে, বৃহস্পতির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে। প্রথমটি ১৯৭২ সালে রওনা হলে ১৯৭৩ সালে পৌঁছবে, দ্বিতীয়টি ১৯৭৩ সালে রওনা হয়ে ১৯৭৪ সালে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে গ্রহাণুর বলয়। পায়োনিয়র-১০ ও পায়োনিয়র-১১ ব্যোমযানকে এই বলয় অতিক্রম করতে হবে। বৃহস্পতি গ্রহের রয়েছে অতি তীব্র তেজস্ক্রিয় বলয়। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রথম অনুসন্ধানী ব্যোমযানের সাহায্যে এই বলয় পর্যবেক্ষণ করা হবে।

বহু গ্রহ-বিজ্ঞানী মনে করেন, গ্রহ হিসেবে বৃহস্পতি হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। আকারে এই গ্রহটি পৃথিবীর দশগুণ। এই গ্রহের চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের কুড়িগুণ অধিক শক্তিশালী। সূর্য থেকে যে-পরিমাণ তেজ এই গ্রহটি পায়, তার চেয়ে তিনগুণ অধিক এই গ্রহটি থেকে বিকীরিত হয়। এ-ব্যাপারটা লক্ষ করে কোনো কোনো বিজ্ঞানী অনুমান করেন, বৃহস্পতি সম্ভবত একটা নিভে-যাওয়া তারা—ক্রমেই একটি গ্রহ হয়ে উঠছে।

আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গ্রহ-পর্যবেক্ষণ কর্মসূচীর সবচেয়ে বড়ো স্থান নিয়ে আছে বাইরের দিকের গ্রহগুলোকে চক্কর দিয়ে আসার মস্ত একটি পরিকল্পনা। বাইরের দিকের গ্রহ বলতে বৃহস্পতি থেকে প্লুটো পর্যন্ত সবক'টি—অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। অনুসন্ধানী ব্যোমযান এই সমস্ত গ্রহের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ফটো তুলবে ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবে। বৃহস্পতির বিপুল মাধ্যাকর্ষণের

টানকে এই সমস্ত ব্যোমযানের ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্যবহার করা হবে যেন বাইরের দিকের গ্রহগুলোতে (অর্থাৎ শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোতে) যাবার পথে একটা ঠেলা তৈরি হতে পারে।

সেজন্যে এই গ্রহগুলোর একটি বিশেষ অবস্থান চাই। সত্তর দশকের শেষদিকে একবার এই বিশেষ অবস্থানটি পাওয়া যাচ্ছে, তারপরে আবার ১৭৯ বছর পরে। এই বিশেষ অবস্থানে যখন গ্রহগুলো থাকে তখন বৃহস্পতির পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে ব্যোমযান বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণের সহায়তা পায় এবং আরো কম সময়ে ও কম শক্তির ব্যবস্থায় বাইরের গ্রহগুলোতে পৌঁছতে পারে। পৃথিবী থেকে রকেটের এক ঠেলায় ব্যোমযানকে বৃহস্পতি ছাড়িয়ে বাইরের গ্রহে পাঠাতে হলে সময় লাগে আরো বেশি, শক্তির যোগান দরকার আরো বেশি।

বাইরের গ্রহগুলোর উদ্দেশে দুটি অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি অভিযানে পৃথিবী থেকে রওনা করানো হবে ১৯৭৭ সালে, বৃহস্পতির পাশ কাটানো ১৯৭৯ সালে, শনির ১৯৮০ সালে এবং প্লুটোতে পৌঁছনো ১৯৮৫ সালে। অপর অভিযানে পৃথিবী থেকে রওনা ১৯৭৯ সালে, বৃহস্পতির পাশ কাটানো ১৯৮১ সালে, ইউরেনাসের ১৯৮৫ সালে, নেপচুনের ১৯৮৮ সালে।

শুধু গ্রহ নয়, মার্কিন বিজ্ঞানীরা সূর্যকেও আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের কর্মসূচী নিয়েছেন।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে

মেরিনার-৯ এবং মার্স-২ ও মার্স-৩ আগামী কয়েক সপ্তাহে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে অনেক খবর পাঠাবে। এই সমস্ত খবরের গুরুত্ব বুঝতে হলে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে পুরোনো খবরগুলো কিছুটা জেনে রাখা দরকার। বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের অবহিত করার জন্যে সংক্ষেপে তা উপস্থিত করছি।

আকারে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫৭ কিলোমিটার, মঙ্গলের ৬,৬০০। মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলে পাঁচভাগের তিনভাগ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরুতেই সাদা টুপি চোখে পড়ে। ঋতুবিশেষে এই টুপি বাড়ে-কমে। অনুমান করা হয় এই টুপি আসলে বরফ ছাড়া কিছু নয়।

১৮৭৭ সালে একজন ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করেন যে মঙ্গলগ্রহের জমির ওপরে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম কালো দাগ রয়েছে। এগুলোর নাম দেওয়া হল 'কানালি' বা খাল। বলা হল যে খালগুলোর স্পষ্ট একটা জ্যামিতিক বিন্যাস আছে এবং বিভিন্ন সমুদ্রকে যুক্ত করছে। অতএব খালগুলো নিশ্চয়ই কৃত্রিম, অতএব একদল বুদ্ধিমান জীবের তৈরী।

১৮৯৭ সালে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, মঙ্গলের জমিতে সমুদ্র বলে কিছু নেই, মঙ্গলের কালো ছোপগুলো আসলে উদ্ভিদে ঢাকা জমি আর খালগুলোর স্পষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাস আছে এবং সম্ভবত মেরু-অঞ্চলের বরফ-গলা জল সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্যে খালগুলো কাটা হয়েছে। এইভাবে মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব এই বিজ্ঞানীও স্বীকার করে নিলেন।

হালের বিজ্ঞানীদের মতে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে মঙ্গলগ্রহের জমিতে যে-সব কালো দাগ দেখা যায় তা খাল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না, তার জ্যামিতিক বিন্যাস আছে কিনা তাও নয়। খুব সম্ভবত এই কালো দাগগুলো একটানা কালো দাগ নয়, ছাড়া ছাড়া বিন্দু মাত্র। এদের রঙও পালটায়। এই কালো ছোপের এলাকায় শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ থাকাটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

মঙ্গলগ্রহে পাহাড়-পর্বত নেই, মাটি একেবারেই সমতল। বায়ুমণ্ডল আছে তবে সেই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন না থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি। সম্ভবত বায়ুমণ্ডলের শতকরা আটানব্বুই ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন।
মঙ্গলগ্রহের বাতাসে জলীয় বাষ্প প্রায় না-থাকার মতো, বৃষ্টি নেই। তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় গড়পড়তা ৩০ ডিগ্রী থেকে ৪০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত কম। রাত্রিবেলা এই তাপমাত্রা অনেক কমে যায়।

মঙ্গলগ্রহে পুকুর-নালা খাল-বিল বা নদী-সমুদ্র ধরনের কোনো জলাধার নেই। সাদা চোখে দেখা যেতে পারে এমনি একটি ফোঁটা তরল জল কোথাও পাওয়া যাবে না।

পৃথিবীতে যদি দশ-বারো মাইল উঁচু একটি পর্বতের চূড়ো পাওয়া যেত যেখানে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে চল্লিশ ডিগ্রী কম, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প না-থাকার মতো, তাহলে যে অবস্থাটি পাওয়া যায় গোটা মঙ্গলগ্রহের অবস্থা তাই।

এই অবস্থায় প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব কি? হালের বিজ্ঞানীরা মোটামুটি এ-বিষয়ে একমত যে মঙ্গলগ্রহে কোনো প্রাণিজগৎ নেই। খুব প্রাথমিক ধরনের উদ্ভিদ-জগৎ আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন, মঙ্গলে এখনো অনেকগুলো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। এই আগ্নেয়গিরির ছাই যে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাই হচ্ছে পৃথিবী থেকে দেখা কালো ছোপের এলাকা।

সব মিলিয়ে মঙ্গল সম্পর্কে মোট খবর এই : মঙ্গলের কালো ছোপের এলাকাটি সমুদ্র নয় বা উদ্ভিদে ঢাকা জমিও নয়। মঙ্গলে প্রাণিজগতের অস্তিত্ব নেই, অতীতেও কোনো কালে ছিল না। বড়ো জোর প্রাথমিক ধরনের শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ থাকতে পারে।

এই মত সব বিজ্ঞানীর নয়। মঙ্গল সম্পর্কে অন্য ধরনের কথা বলেন এমন বিজ্ঞানীর সংখ্যাও এখনো কম নয়।

মেরিনার-৯ এবং মার্স-২ ও মার্স-৩ গত একশো বছরের বিতর্কিত এই গ্রহটির ওপরেই চূড়ান্ত আলো ফেলতে চলেছে। আশা করা চলে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে অনেক বিতর্কেরই মীমাংসা হয়ে যাবে।

—[illegible]

সুবনশিরি
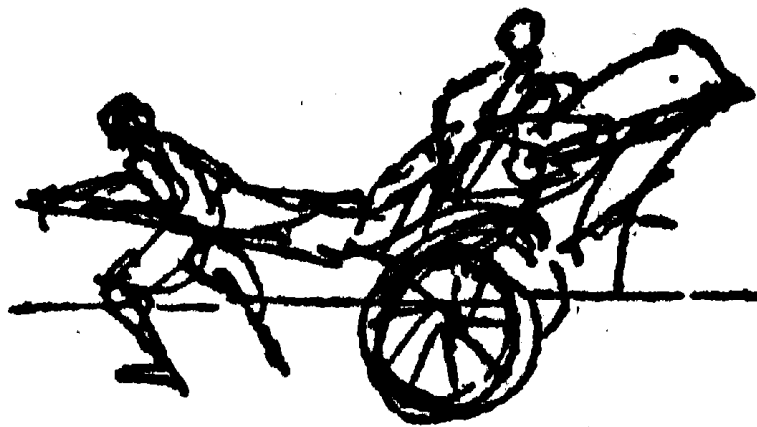
অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। তেইশ ।।

সকল উৎসবে যে ঘরে উদয়াস্তের বেশীর ভাগ সময় ঢেঁকি চলে, সেই লাইনে এমন মেয়ে থাকে না যে সেই ঢেঁকির পিঠে দিনান্তে একবার পা ঠেকিয়ে না আসে, সে ঘরে এবার যেন ঢেঁকির শব্দই শোনা যায় না। একই পাকের গুড় সব ঘরে মিষ্টত্বের সমতা বজায় রাখে, কিন্তু সেই ঘরে গিয়ে মিষ্টত্ব হারিয়ে ফেলে। নারকেলের পুর-গুলো মিষ্টি হয় না, লাড়ুগুলো তেমন জমাট বাঁধে না। ঘরের মেয়েটাও উৎসবে যোগ দেবে না। শর্মিষ্ঠা ফিরিয়ে দিয়েছে সখীদের—যাবে না সে বিহুর দিন তাদের সঙ্গে নাচগান করতে। —তার মাও জানে ও-ঘরের সকল কথা, কার সঙ্গে এবার পাঠাবে মেয়েটাকে।

উৎসবের ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে শান্তি পতন হয়েছে একটি ঘরের আঙিনায়। সকল ঘরে যেন দেওয়ালির প্রদীপ জ্বলছে, একটিতে অন্ধকার। সমস্ত তরুণ-তরুণীর হাসি ম্লান হয়ে যায় একটি মুখের পানে তাকিয়ে। একটি মুখ নিষ্প্রভ, একটি মুখের ওপর বারবার ভেসে ওঠে বিষাদের বুদ্বুদ।

শর্মিষ্ঠার কিছুই ভাল লাগে না! থাকতে চায় সে সকলের চোখের আড়ালে। দুঃখভরা দেহটা মাঝে মাঝে বয়ে নিয়ে যায় তাদের বস্তির পিছনের বাগানটায়। যেখানে প্রতিটি ঢিপিতে, গাছের ডালে ডালে তার জীবনের কত স্মৃতি জড়ানো—কত খেলা-ধুলো, সুখদুঃখ, মান অভিমানের। কত দুখ-দুঃখের লয়-প্রলয় হয়েছে যেখানে। আজও সেখানে গিয়ে বসল শর্মিষ্ঠা। তার চোখের সামনে একখানা ধূসর পর্দা। সেই পর্দার ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে রইল অতীতের পানে। স্মৃতির সমুদ্র মথিত করে ভেসে উঠল কত দৃশ্য, আবার তলিয়ে গেল, একটা ঢাকা পড়ে গেল আর-একটায়। বিগত রঙালী-বিহু, কঙালী-বিহু, ভোগালী-বিহু, আরো আগে—আরো। চলে গেল সে বাল্য আর কৈশোরের মাঝামাঝি একদিন—সুখদুঃখের কথা বেয়ে বেয়ে সুখের স্বপ্নে।

সামনের বারোমেসে পেয়ারা গাছটার ডালে বসে একদিন গান ধরেছিল শর্মিষ্ঠা। তার ললিত কণ্ঠের সুর রুদ্র বৈশাখের রৌদ্রের সোনালী কণায় ছিটিয়ে দেয় ময়ূর-কণ্ঠী রঙের আভা :

গ-রখীয়া হের গ-রখীয়া
কি সুর বজালি দিপারিয়া!

কোন রাখাল গরু চরাতে যায়নি সেখানে, কোন সুরও বেজে ওঠেনি শর্মিষ্ঠার কণ্ঠে সুর বেজে ওঠার আগে। কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে সচকিত করে রুক্ষ রৌদ্র সরস হয়ে ওঠে। রুদ্রের রোদে শুখনো বাতাস সুরসিক্ত হয়ে দূর থেকে ভাসিয়ে আনে অতি পরিচিত বাঁশীর সুর। বাঁশীর অনুসরণ করে কণ্ঠ :

পথারর মাঝতে আহঁতর (অশ্বত্থের)
তলতে
ম'হর (মহিষের) শিঙর
পেপাতি (সিঙা) বা।

অনির্বচনীয় আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে শর্মিষ্ঠার অন্তর। সে ঠিক পায় না, কোন দিক থেকে সুর ভেসে আসে। এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়ায় তার চোখ জোড়া সুরের রেশ বেয়ে। শুরু হয় দুজনের সুরের লুকোচুরি খেলা—মেঘু আর শর্মিষ্ঠা। সুর লুকিয়ে রূপ দেয় ধরা, রূপ লুকিয়ে সুর।

হঠাৎ ঝড় উঠল। ব্রহ্মপুত্রের বালুচরের বালি ধুলি-পটলের মতো আকাশে উড়ে মেঘের সঙ্গে কোলাকুলি করে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। ধূসর ঘুমে আচ্ছন্ন হল দিক-দিগন্ত। শুরু হল মেঘের গর্জন, তার সঙ্গে শিলাবৃষ্টি।

ছুটে এসে দুজন আশ্রয় নিল পেয়ারা গাছটার নীচে। বৃষ্টি বেড়ে উঠল, গাছের ঝোপে আর সানায় না। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে সেই গাছটার নীচে তারা আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু যখন দেখল তারা বেশ ভিজেই গেছে তখন ব্যস্ত হল শিলা কুড়িয়ে খেতে।

অমন সুখের স্বপ্নটা মিষ্টুকের মতো ভেঙে দিল তারই অতি অন্তরঙ্গ সখী। পিছন থেকে শর্মিষ্ঠার পিঠে এক ঝাঁকানি দিয়ে কতী বললে—এখানে বসে কি করছিস রে?

সন্তপ্ত সবিস্ময়ে শর্মিষ্ঠা ফিরে চাইল। কতীকে পেয়ে, তার সঙ্গে অন্য সখীদের পেয়ে সে যেমন খুশী হল, তেমন অখুশীও হল অমন স্বপ্নটা তার মন থেকে খসে পড়তে।

—আমরা তোকে দুনিয়া ভরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই এখানে লুকিয়ে—

—কার জন্য লুকিয়ে বসে রে, কার কথা ভাবছিস?

শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর এক ঝলক হাসি উচ্ছলিত হল। সে কৌতুর জবাব দিয়ে বললে—তোর জন্য, তোর কথা।

—তা হলে এখানে বসে থাকবি কেন?

খেদী এপাশ ওপাশ উঁকিঝুঁকি মেরে বললে—হ্যাঁ-রে, এই ফাঁকাটা দিয়ে কল-ঘরটা বেশ দেখা যায়!

—তাই নাকি!

একে একে সবাই যাচাই করে দেখে নিল খেদীর আবিষ্কারটা।

—ওলো আমার সোহাগী!

—ধোৎ, তোর সোহাগী হতে যাবে কেন? যার জন্য বসে আছে তার—

কটিবন্ধের উপরার্ধ হেলিয়ে দাঁড়াল কৌতি, বললে—মেঘু যে 'ইনজিনার' হোই গেলো রে!

—বহুৎ পড়া-লিখা শিখি গেলো যে রে!

খেদী চোখ ঠারা দিয়ে বললে—একবার যাই দেখি ল না, তুঁর নামটো এখন ভালু করি কোহিতে শিখিছে না নাই।

শর্মিষ্ঠা বুঝল—ওরা মেঘুর কথা তুলে তাকে মধুচক্রে ঠেলে ফেলে দিতে চায়। মৌমাছির গুঞ্জরণটায় রস আছে, কিন্তু দংশনটা! সে চুপ করে থাকে।

খোঁচা দিয়ে মধু ঝরানো গেল না। তাই সখীরা শর্মিষ্ঠাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় নাম-ঘরটার সামনে। নাম-কীর্তন নয়, তখন সেখানে নাচের মহলা চলেছে। গুণারামের উপদেশ, আদেশ রূপায়িত করে তোলবার আগ্রহ ও চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি কারো। তবু তাকে খুশী করা যায় না। তার অতৃপ্ত মন ঘুরে বেড়ায় দুটি দেহ-সৌষ্ঠবের রেখায় রেখায়। বিশ্বকর্মা যেন তাদের সৃষ্টি করেছিলেন নাচেরই জন্য

—শর্মিষ্ঠা আর মেঘনাদ। সে কথায় দ্বিমত নেই, কিন্তু গুণারাম জেনেছে, তা হবার নয় এখন, অসম্ভব।

গুণারামের মুখ ছিল ঘরটার দরজা-পথে। শর্মিষ্ঠাকে সামনে দেখে তার চোখ দুটো নেচে উঠল। শিষ্যদের আবার বলতে শুরু করল—ঐ হল নাচের শরীর। ওই দেহের প্রতিটি ভঙ্গি নাচের। অমন পেলে আমি ইন্দ্রের সভায় যেতে পারি, এই শীতের পাতাশূন্য গাছের ডালে ডালে ফুল ফোটাতে পারি।

শর্মিষ্ঠাকে দেখার পূর্ব মুহূর্তে, গুণারাম কথা বলছিল অন্য বিষয়ে, সেটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। উপস্থিত ছেলে-মেয়েরা বা শ্রোতারা তার কথার কোন খেই খুঁজে পায় না, তারা হাঁ-করে চেয়ে থাকে। গুণারাম বললে—দেখনা, আর একবার বলে দেখ না। ওই তো এসেছে—

কে এসেছে? গুণারামের দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই একসঙ্গে পিছন ফিরে চাইল। শর্মি!

সমবেত সকলে হাসির ঝলকে খাতির করে ডাকল শর্মিষ্ঠাকে।

ওঃ, এই জন্য এখানে ধরে এনেছে!

কারো কোন জবাব না দিয়ে শর্মিষ্ঠা ছুটে পালাল সেখান থেকে। গুণারামের দেখাদেখি সকলেই বেশ একটু মুষড়ে পড়ল।

অনেক রাত পর্যন্ত শিষ্যদের নিয়ে নাচগানের মহলা দিয়ে, গুণারাম বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারপর তার ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে পড়ে বিছানায়। নিজের কর্মসাফল্যের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে। গুণারামের দেহমন ভেসে যায় ঘুমের প্রবল বন্যায়। ফটিকার প্রভাব মনের মধ্যে সৃষ্টি করে ইন্দ্রজাল।

সুবর্ণশ্রীর ঢেউ ভেঙে বেয়ে চলে চাঁদ, আকাশে দুধ-সাগরের ঢেউ, জ্যোৎস্নার কোল জুড়ে শ্বেত-দুম্বার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সোপান, তারই দুগ্ধশ্বেত প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে সুবর্ণশ্রীর সরিৎ তট চুমিচুমি তড়িতবত ধেয়ে চলে ব্রহ্মপুত্রের কোলে। চলমান শ্বেত সোপানের মতো মেঘপুঞ্জ উড়ে চলে দূরদিগন্তে নীলাভ পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে রজত-শুভ্র কৈলাস পর্বত শিখরে বিলীন হতে। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে বসন্তের অভিসার। দিকদিগন্ত জুড়ে ঝরে পড়ে যুঁই চামেলীর পাপড়ি। চারপাশে সবুজ বীথিকার ডালে ডালে ফুটে ওঠে মণিমুক্তার ফুল।

তারই মাঝে, নদীর অনতিদূরে বৃহন্নলা। সদ্যস্নাতা উত্তরা সোপান বেয়ে উঠে আসে নদীর তীরে—পট্ট-মেখলাবৃত নিম্নার্ধ, উপরার্ধে ফিনফিনে বাসন্তী রঙের উত্তরীয় জড়ানো, তারই নীচে রক্ত-রেশমের কঞ্চুলী ঢাকা বুকের তপ্ত উল্লাস।

মৃদু সমীরণ জাগিয়ে তোলে শিহরণ বনবীথিকার শিখরে শিখরে, ঘন পল্লবের বক্ষে।

বৃহন্নলার পাদমূলে মাথা রেখে উত্তরা বলে—গুরুদেব, আমি এসেছি।

—এসেছ মা, আমার অভিমন্যু কোথায়?

—তাকেও এনেছি সঙ্গে। বলে, উত্তরা পিছন ফিরে তাকায়। তার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে বৃহন্নলা চেয়ে থাকে।

পাষাণের সোপান পৃষ্ঠে দেখা দেয় অভিমন্যু!

আনন্দে আপ্লুত গুণারাম চোখ খুলে চায়—তার সামনে দাঁড়িয়ে শর্মিষ্ঠা আর মেঘনাদ!

বায়ু প্রবাহে দক্ষিণ সাগরের দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, বনানীর শিরা-উপশিরায়। শুরু হয় বসন্তের কম্পন স্পন্দন, পাতায় পাতায় ওঠে মর্মর ধ্বনি। সবুজের স্নেহপুষ্ট মণিমুক্তার ফুল ওঠে নেচে। শর্মিষ্ঠা ও মেঘুকে নিয়ে গুণারাম এগিয়ে চলে নৃত্যগীতমুখরিত পথে, মেঘের সোপান বেয়ে স্বর্গের পথে। দেবরাজের রথও নেমে আসে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। দেবেন্দ্রের সঙ্গে নৃত্যরত কিন্নর-কিন্নরী অলৌকিক বসন-ভূষণ সাজ-সজ্জা।

স্বর্গ ও মর্তের মিলন, তারই উৎসবে মুখরিত সেই সন্ধিস্থল। দুয়ের মাঝে রূপ-রস, ছন্দ-গন্ধের লয়, প্রলয়, মহাপ্রলয়।

তবুও গুণারামের ঘুম ভাঙে না!

।। চব্বিশ ।।

যে উৎসবের আগমনীর গানে চারিদিক মুখরিত, যে আনন্দ রূপায়িত করে তুলতে চিরদিন মেঘু এগিয়ে গেছে অদম্য উৎসাহে, আজ তার কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। অমন সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়েছে সে। তার সমস্ত শক্তি সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করেছে বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতে। মূল্যবান দিনের মূল্যবান মুহূর্ত আর তা নষ্ট করা যায় না। হেলায় ফেলে আসা অতীতের দিনগুলো সে কুড়িয়ে নেবে, উসুল করে নেবে বর্তমানের কোল থেকে: তাই সে মহাব্যস্ত। দেহের সমস্ত তেজ নিয়ে সে কর্মের নব-প্রেরণার রসে সিক্ত করে তার সমস্ত সত্তা রুখে দাঁড়িয়েছে জীবনের মুখো-মুখি হয়ে। তাই এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি কাজ সে করতে পেরেছে।

মেঘুর বয়সের দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে তাকে প্রশংসা করবার মতো বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু তার অতীত জীবন ধারার সঙ্গে বর্তমান দিনের কাজ এবং সফলতা তুলনা করে দেখলে, তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। সবাই তার বিষয়ে আলোচনা করে এবং বলে—এই তো সেদিন মেঘু কাজে ঢুকল, বই নিয়ে বসল—গত ফাল্গুনের আগের ফাল্গুনে, তার আগে তো শুধু বনে-জঙ্গলে ঘোরা-ঘুরি ক'রে বেড়াত, যাত্রাগান করত। আর এখন! শুধু পড়া আর কাজ, একটু নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেয় না। অত যে ভালবাসত শর্মিকে, তার কথা মুখেও আনে না! অবাক কাণ্ড!

আজীবন অভ্যাসে রাবণ যা পারেনি, মেঘু তা পারে। অবাক হয়েছে সে, বলেছে—বাঃ! এর মধ্যে এমন সুন্দর রামায়ণ-মহা-ভারত পড়তে শিখে গেছে মেঘু!

পড়াতে পড়াতে বিলি বলে—এত বই একসঙ্গে পড়াব না মেঘু—কিছুই মনে থাকবে না, সব গুলিয়ে যাবে।

একটা একটা করে বই মায়ের হাতে তুলে ধরেছে মেঘু—জবাব দিয়েছে বিলির সকল প্রশ্নের। কত খুশী হয়েছে সে ছেলের কৃতিত্বে। গর্বে ভরে উঠেছে তার বুক।

গটফ্রিড্ বলেছেন—মেঘু, শুনতে পাই তুমি বেশ ইংরেজী বলতে শিখে গেছ, তবে আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বল না কেন?

মেঘু তার মুখটা নীচু করে মাথার ওপর হাতটা বুলিয়ে গেছে, কোন কথা বলতে পারেনি।

—না-না, অত লজ্জা করলে চলবে না। এখন থেকে আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলবে। যখন ইংরেজী শিখতে চেয়েছিলে তখন কি বলেছিলে মনে আছে?

মেঘুর মুখে ফুটে উঠেছে একটু সলজ্জ হাসি, বলেছে—ইংরেজী শিখব বলে-ছিলাম, আপনার সঙ্গে কথা বলব, তা তো বলিনি।

—বল নি? —বড় চালাক তুমি! না-না, বলবে—নইলে শিখবে কি করে?

তবুও মেঘুর ভাবের বদল হয় না, সে বলে—আচ্ছা, আপনি বলবেন—আমি যেমন কথা বলি তেমন করেই জবাব দেব।

লোক বিশেষে তেমন কথা বলায় লজ্জা পাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু মেঘুর ভাবে গটফ্রিড্ খুঁজে পেলেন আর একটি তত্ত্ব—দুটি রক্তের জোয়ার-ভাটায় ভাসছে তার মন। তিনি জানেন যে বিলির ইংরেজী সাধারণ শিক্ষিত ইংরেজের সমকক্ষ। তাতেই কাজ দেবে। তবুও তিনি হাসতে হাসতে বলেন—নাঃ! তবে, তোমায় সাহেব করা যাবে না দেখছি।

গটফ্রিডের অমন কথায় মেঘু আরো লজ্জা পায়। সে মাথা হেঁট করে থাকে, তার

মনের গভীরে জেগে ওঠে এক প্রশ্ন—সত্যিই কি সে সাহেব হতে চেয়েছিল?

গট্‌ফ্রিড্ বড় ভালবেসে ফেলেছেন ছেলেটাকে। তার অমন ভাব দেখে তাঁর হাসি পায়, কষ্টও হয়। তাই মেঘুকে প্রেরণা দিতে তিনি এমন এক প্রসঙ্গের অবতারণা করেন যা তার পক্ষে অবোধ্য, আবার বোধ্যও বটে। তিনি বলেন—ও সবের জন্য ভেব না, তোমার মায়ের কাছে যা শিখছ তাতেই হবে। তার ওপর আর একটা কথা বলি। নিজের দেশে থাকাকালে আমি সেখানকার ছেলেমেয়েদের উপদেশ দিতাম—যদি গ্রীক সাহিত্য ও শাস্ত্র পড়বার ধৈর্য না থাকে তবে অন্ততঃ হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি পড়ে নিও। ও-সব তোমার জানবার সময় এখনো হয়নি, তাতে যায় আসে না। এখানকার রামায়ণ মহাভারতও কম যায় না, সত্য বলতে গেলে ও-সবের চাইতেও অনেক গভীর। তোমাদের জন্য আমার উপদেশ—যদি এখানকার বেদ-বেদান্ত উপনিষদ পড়াশোনা করবার ধৈর্য না থাকে, তবে অন্ততঃ ঐ দুখানা বই পড়ে নেবে, বুঝতে চেষ্টা করবে—যদি জাতকে, দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও। আমি জানি ঐ দুখানা বই তোমার প্রায় কণ্ঠস্থ। ঐ দুখানা মহাকাব্যের মর্মার্থ গ্রহণ করার ওপর তোমার শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি নির্ভর করে, সেই গ্রহণের ওপর শিক্ষার বনিয়াদ প্রস্তুত হবে। তার পর তুমি যা খুশী পড়, যা খুশী ভাব। তখন দেখবে—তোমার বিচার শক্তি কত প্রখর ও প্রস্থিত। বর্তমান যুগে বিশেষ কার্যকর ইংরেজী ভাষা, এটা জানলে পৃথিবীর সর্বত্র গতিবিধি সুগম হবে, তা শিখবে নিশ্চয়ই। তার জন্য তোমার মা-ই যথেষ্ট এখন। পরে নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে পারবে। তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

এমন কথা মেঘু তার জীবনে শোনে নি। এত বড় একজন লোক তার মতো একটা নগণ্য ছেলের সঙ্গে এমন করে কথা বললেন! সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। হোমার কি বা কে সেটা অবশ্য বুঝল না, কিন্তু গট্‌ফ্রিড্‌কে বুঝতে তার কোন কষ্ট বা কোন ভ্রান্তি হল না।

ডেভিড বলে—নিধিরাম! তোমার মেঘু তো সব শিখে গেল হে, মায় ড্রইং দেখা।

—আপনার দয়া স্যার।

—হবে না! তুমি যে ওকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছ।

—স্যার, আসলটাই তো বাকী আছে—

—হাঁ, এবার হবে না—আসছে বছর ড্রাইং-মেসিন খুলব, তখন হবে।—কি হে, তা হলে হবে তো মেঘু?

—হাঁ স্যার, যা ভাল বোঝেন আপনি।

—তারপরই দেখবে, আমার চাকরিটা বড়সাহেব তোমাকেই দেবেন।

নিজের রসিকতায় রস সঞ্চার করতে ডেভিড খিক্‌খিক্ করে হেসে ওঠে। স্মিত হাস্যে নিধিরাম তাতে একটু যোগান দেয় বা তার অংশ গ্রহণ করে। মেঘুর মাথাটা নুয়ে থাকে।

মেঘুর দৈনন্দিন কাজের তালিকা ঠাসাঠাসি। দিনটা যদি ছত্রিশ ঘণ্টার হত তবে তার কাজগুলো শেষ হতে পারত কোনমতে। এমন অবস্থায় মাঘ বিহু, বা ভোগালী বিহু ভোগ করবার, বা তার দিকে ফিরে তাকাবার সময় তার কোথা? প্রেরণাই বা কোথা? প্রয়োজন বা কি? যে সময় নষ্ট করে এসেছে তার জন্য সে অনুতপ্ত। সেই ব্যর্থ দিনগুলোর কথা সে ভুলে যেতে চায়।

শৈশবে মেঘু রাবণের আশানুরূপ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু সবাই দেখেছে, বুঝেছে,—শত আক্ষেপ এবং উপেক্ষার মধ্যে সে পেয়েছে দুটি অমূল্য সম্পদ—সুস্থ সবল শরীর ও মনুষ্যত্ব, দারিদ্রের মনুষ্যত্ব, শ্রমজীবীর মনুষ্যত্ব, জাতীয় এবং সর্বজাতীয় মনুষ্যত্ব। তাই ভারতবর্ষের মহাকাব্যে বর্ণিত মহামানবের কীর্তি স্মরণে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে তার মন—সে বিদ্যার স্বাদ পায়। সেই আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মন। তার ঈর্ষাশূন্য মন স্বজন প্রীতির রসে ভরে ওঠে—সে কাজ করতে যায় তাদেরই একজন হয়ে। কাজ করতে গিয়ে মেঘুর চোখে পড়ে দুটো জিনিস—একদিকে তাদের দারিদ্র্য নিষ্পেষিত সমাজ, অপর দিকে মানুষের কর্মবিমুখ মন। কামাই বাড়াবার দিকে তার জাতভাইদের সযত্ন উপেক্ষা। এই দুটির উপকরণে তাদের সমাজে যে আবরণ, যে আচ্ছাদন তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে বেশ পড়ে আছে মানুষগুলো। যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন অবসাদ তারা। সমবেদনায় ভরে ওঠে তার মন—স্বজাতির কল্যাণ-কামনামুখি মন।

রাবণ সন্ধ্যাসরে বসে যা সুর করে পড়ে গেছে তা শুনতে শুনতে মেঘুর সেসব মুখস্থ হয়েছে। তাতেই তার প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ে তা উৎকর্ষের পথে এগিয়ে চলে। তার বাক্য রচনা, পালাগীতি প্রযোজন, এবং বাল্যসহচরদের পালাগীতি শিক্ষা দানের মধ্যে তার উন্মেষণী শক্তির প্রমাণ দেয়।

এইসব গুণের জন্য মেঘু আশৈশব নেতৃত্ব পেয়ে এসেছে—বাল্যে বালকবালিকার, যৌবনে প্রৌঢ়দের। কর্তৃপক্ষেরও বিশ্বাসভাজন হয়েছে তার শ্রমশীলতা ও কর্মনিষ্ঠার জন্য। সকলের স্নেহভাজন হয়েছে তার বিনয় নম্র ব্যবহারের জন্য, সকলকে মেনে চলার জন্য।

মাত্র একটি দিনের জন্য মেঘুর সংযমের সকল বাঁধন ভেঙে ছিঁড়ে পড়ে। তার ইন্দ্রিয় বোধ প্রকট হয়ে জেগে ওঠে। প্রকাশ্য রাস্তার মাঝেই মেতে ওঠে সে অশিষ্ট আচরণে। সেটা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের রচনা, তার অবচেতন মনের ওপর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অনিবার্য প্রভাব। যে পরিবেশের মানুষ যৌবনে পা দিয়ে মাইকী গ্রহণের বেশী আর কিছু ভাবতে শেখে না, পারেও না। যে পরিবেশের মানুষের জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে শুধু স্ত্রী-গ্রহণের ওপর। তাই অপরাপর সঙ্গীদের মতো সেও বিচলিত হয়ে পড়েছিল। মনের বাচালতা উলঙ্গভাবে প্রকাশ হয়েছিল। তার জন্য সে বিশেষ লজ্জিত, অনুতপ্ত, মর্মান্তিক বেদনাহত। সেদিনের মনের সেই অবস্থা থেকে সে চলে এসেছে বহু দূরে। এত দূরে যে, কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও কোন দিন তামাশাচ্ছলে সেসব কথা তুলতে পারে নি তার সামনে। সেই দেহটা আছে বটে, কিন্তু ভিতরটা এমনকি তার মুখের ভাবটাও বদলে গেছে। তার বয়সটা যেন হঠাৎ দশ-বিশ বছর বেড়ে গেছে। সে যেন একটা মত্যপার হয়ে এসেছে। তাই মেঘুর কোন কাজ, কোন ব্যবহার বা আচরণের মধ্যে পূর্বের সেই মেঘুকে এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে—মেঘুকে আর চেনা যায় না।

বয়সের সঙ্গে, শিক্ষার প্রভাবে বা অবস্থার হেরফেরে মানুষের গতানুগতিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু মেঘুর যা হল তা এক অদ্ভুত ব্যাপার। বাবুদের কুলিদের চোখে মেঘুর ঐ একটি দিনের উচ্ছৃঙ্খলতা উপেক্ষণীয়। কারণ, অমন ঘটনা এখানে দৈনন্দিন ব্যাপার। সেটার উপলক্ষ্যে, বা সেটাকে অবলম্বন করে যা অনুক্রমণ করল, সেটাই আশ্চর্য ও অভাবনীয়। তাই সকলেই বলে—মেঘুকে আর চেনা যায় না।

চেনা যাক বা না যাক, তার রুচি ও আচরণের জন্য সে সর্বজনপ্রিয়। এটা সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান যে, যে সংস্কারের উত্তরাধিকার নিয়ে মেঘু জন্মেছে তা পিছনে টানতে জানে না—ঠেলে দেয় শুধু সামনের দিকে। তাই সে এগিয়ে চলেছে সামনে। তাই তার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তাকে অসামান্য কর্তব্যপরায়ণ করে তুলেছে।

মেঘুর কর্তব্য এক, আর তাদের সংসারের কর্তব্য অন্য। তাই যে জিনিস থেকে মেঘু চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারে লছ্‌মী তা পারে না, রাবণ না, বিলিও না। বিশেষ করে এতকাল পর এটা তাদের সচ্ছলতার প্রথম বছর। ঠিক প্রথম নয়, দ্বিতীয়। প্রথমটা নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে, কোথা দিয়ে কেমনভাবে পার হয়ে গেছে, তা মন দিয়ে উপলব্ধি করবার অবসর তারা পায়নি। তাই এটাই যেন প্রথম। অতীতের যত কিছু দুঃখের কথা ভুলিয়ে দিতে, দুঃখের ওপর সুখের প্রলেপ বুলিয়ে দিতে এই নবান্ন উৎসবটি তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। দুজোড়া সুখী হাত একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে সংসারের যত কাজে, দুটি শুচি মন এক হয়ে ওঠে গৃহের কল্যাণ কামনায়, ঘরের শ্রীবৃদ্ধি করতে, পরবের দিনে পড়শীদের ও গাঁয়ের মানুষদের আপ্যায়িত করতে, অভ্যাগতদের সামনে তুলে ধরতে সযত্ন শুচিতা—অতিথি পরায়ণতা।

বিহুর দিন সকাল থেকে সকল ঘরে কত মানুষের সমাগম। তার জন্য সবাই যে যার সাধ্য মতো প্রস্তুত। ছেলেমেয়ের দল ঘুরে বেড়ায় গান গেয়ে গেয়ে, নেচে নেচে। ঝুমুর নাচ, আরো কত নাচ। নাচতে নাচতে হাসে, হাসতে হাসতে নাচে। কেউ সে-সব দেখতে দেখতে হাসে, কেউ বা হাসতে হাসতে দেখে।

পোশাক! মেয়েদের মন্দ নয়। নকসা তোলা রঙ-বেরঙের শাড়ী, সায়া-ব্লাউজও থাকে। কারো কাচের চুড়ি, কারো হাড়ের। নাকছাবিও শোভে, দুল-ঝুমকোও দোলে। গহনায় আগে ছিল রূপোর কেতা, এখন চলছে পিতলের ওপর সোনার জলের প্রলেপ। পুরুষের এক টুকরো থান, কোমরে বেড় দিয়ে একটা কাছার উপযোগী—কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর একখানা মাথায় জড়ানো। এটার অনেক কাজ—রোদ-বৃষ্টিতে থাকে মাথায়, বৈঠকে গলায় ঝোলায়, শীতে গায়ে দেয়, স্নান সেরে লাগায় গা মোছার কাজে, আর ঘুমের সময় থাকে গায়ের ওপর নয়তো পিঠের নীচে। আরো আছে—বাজারের থলি, বাচ্চাদের হাত-পা বেঁধে শাসন—এমন কত কাজে লাগে ওটা। ওটা প্রৌঢ়দের অভাব, নয়তো স্বভাব। স্বভাবটা মন্দ নয়—মোটা ভাত মোটা কাপড়। ভারতবর্ষের কোটি কোটি জাতীয় পোশাকও বটে। কিন্তু অভাব হলে অন্য কথাও আসে। অভাবটা যেতে পারে যদি স্বভাবটার বদল হয়। তাতেও একটা মস্ত বড় কিন্তু আছে, নেশা ছাড়লে বাঁচে কি করে? অতএব মরবার জন্য কে আর অমন স্বভাবটা ছেড়ে দিতে চায়।

ছোকরাদের! ধুতি-শার্ট, কোট-প্যান্ট সবই চলে। যত রাজ্যের ফ্যাশানি জিনিসের জগা-খিচুড়ি। অমন করে কেউ বা সাজে সঙ, শুধু হাঁক দেয় না—'ঝক মেরেছে কুমা-খাজা।'

এমনই কত পোশাক পরিচ্ছদে সেজে-গুজে বেরিয়েছে সবাই। সায়া-সেমিজের ওপর শাড়ীর আঁটসাট বাঁধুনি সত্ত্বেও মেয়েদের দেহের প্রতিটি রেখা যেন ঠেলে-ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় সকল আবরণ ভেদ করে। খাটা-খাটুনির ধকলে অনেকের পাছাই যেন সিঁটিয়ে থাকে। কোন কারিগরি খাটে না তার ওপর। যৌবন গুণবাচক, প্রচলিত প্রবাদের কোন খাতির রাখে না চা-বাগানের কুলি-কামিনদের পাছাগুলো। তারই মধ্যে যার কিছু আছে তার তো কোন সমস্যাই থাকে না, যার নেই সেও যেন একখানা উৎকীর্ণ করে তুলেছে মোটা কাপড়ে সায়ার ওপর শাড়ী জড়িয়ে। তবে বুকের বহরে পুষিয়ে দিয়েছে সবাই।

পুরুষের গলায় ঝোলে মাদল, হাতে করতাল, মুখে সানাই, শিঙা প্রভৃতি আরো কত বাদ্যযন্ত্র। নানা ভঙ্গিতে তারা নাচতে নাচতে বাজায়। মেয়েরা করে গান, নাচেও বাজনার তালে তালে ছন্দেছন্দে।

পুরানো দিনের ঘটনার ওপর বাঁধা একটা গান গেয়ে একদল ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে ডাকতে শুরু করে দিল :

> ছুকরিগুলা ওলাই (বেরিয়ে) আয়
> বিহু ঘরে ঘরে,
> গুন্ধবিরা মাটি পালো
> পাহাড়-তালির ধারে।

অর্থাৎ পাহাড়-তলি ডিভিশনের সাহেব মরে গেছে, আর কোন ভয় নেই। এবার সব মেয়েরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে।

মুহুরীবাবুর উঠানে গিয়ে গায় এক কৌতুকের গান—

> টিল্লাবাবু লাঠি হাতে
> মাঠে-বাটে ফিরে,
> কান ধইরে বিবির পাশে
> কাইন্দে মরে কি রে?

বাগানে গিয়ে বাবুটা তাদের সকলকে কত দাপট দেখায়, ঠেঙায়, অথচ ঘরে সামান্য একটা মেয়ের হাতে তার এই দশা! বাবু এখন বিবিকেও ধরে ঠেঙানি দিক, তবে তো বেশ মজা দেখতে পারে তারা।

জমাদার বাবুর ঘরে গিয়ে গাইল—

> ইমান টকা দরমা' (দরমাহা) পায়
> ঠাং ভাঙ্গে কিসে?
> যোয়ান বিবি ঘরে আছে
> কুলির লগে মিশে।

কবে যেন বাবুর পায়ে চোট লেগেছিল, তারই ওপর রচনা হয় গানটা। বাবুটা বড় কড়া। বিবিকে জানিয়ে দিল—মাইনের টাকাগুলো সব কুলির ঘরে খরচ করে আসে। বিবি যেন তাকে ঘরে আটকে রাখে, তবেই তাদের পোয়াবারো।

আর এক বাবুর ঘরে গিয়ে, তাদের লজ্জা দেবার জন্য গাইল—

> কুলি ধরি মারে বাবু
> লাজ নাই আছে,
> খুড়ার মায়ের মাইর খাইয়ে
> হাবা হইয়ে নাচে!

বড়বাবুর ঘরে গিয়ে খুব সংযত হয়ে, সহানুভূতি দেখিয়ে গাইল—

> গা-গতর ভাইঙ্গে গেল
> তভি বাঁইচে আছি,
> (বাবুর) ঘরে বাইরে কিবা দশা,
> নাক ভরা মাছি।

ভাবটা—আমরা গা-গতর খাটাই, মারধোর খাই, তবুও বেঁচে আছি। কিন্তু বাবুর দশা কি শোচনীয়! অফিসে সাহেবের হাতে, আর ঘরে ফিরে বাবুয়ানীর অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর হাতে তাকে কি পীড়নই না ভোগ করতে হয়! ফিট হয়ে পড়ে থাকলেও নাকের মাছিটা পর্যন্ত তাড়িয়ে দেবার লোক নেই।

মেমসাহেবের কাছে গিয়ে চুকলি করল সাহেবের নামে—

> চুপিচুপি কহি মেম,
> সাহেব শুনে পিছে!
> ইয়ার মোত টেমনা নাই
> (তুমার) বাঁইচে থাকা মিছে।

তুমি এখন তাকে শাসন কর, মারো! সাহেব ঘরে বসে দিন কতক কান্নাকাটি করুক, আমাদের হাড় জুড়োক।

এক সাহেবের কানে লাগাল মেম-সাহেবের কথা—

> মেম বুঝি ঘরে নাই?
> শুনে মন দিয়া—
> তুমি যখন বাটে ফুর (ঘোরাঘুরি কর)
> মেম করে বিয়া!

অতএব সাহেব কাজকর্ম ছেড়ে ঘরে বসে থাক মেমকে আগলে রাখতে। তারা তখন যেমন খুশী কাজ করে যেতে পারে।

বড় বাংলোর সামনে গিয়ে শুরু করল গর্টফ্রিডের প্রশস্তি—

> তুমার রোকম হাকিম নাই!
> বাটে পড়ে গিয়া,
> বিলাত অফিস চিঠি দিছে
> লক্ষ টকা দিয়া।

শুধু আমরা নয়! দুনিয়ার লোক জানে তুমি কত ভাল, কত সৎ লোক। এখন বিলেতের চিঠি মতে লক্ষ টাকার পার্বণীটা আমাদের ভাগাভাগি করে দেও। খবরটা সবাই জানে কিন্তু, মেরে দেবার চেষ্টা কোর না যেন!

বড়সাহেবের কাছ থেকে মোটা বকশিশ আদায় হল বটে, কিন্তু লক্ষ টাকার ভাগটা তো পড়ে রইল। সেটা আদায় করতে চলল বড়সাহেবের গলফ খেলার ওপর বিদ্রূপ, বিয়েটার কেচ্ছা :

> বোড় হাকিম লাজ নাই
> দেখ মাঠে গিয়া,
> লাঠি কান্ধে নাইচে বেড়ায়
> ঘরের মাইকী নিয়া!

কি ঘেন্না! এসব তো লোকে বাইরের মেয়ে নিয়ে করে!

> বোড় হাকিম লাজ নাই
> মাঠে দেখ গিয়া,
> বুড়ী লইয়ে নাইচে বেড়ায়
> ইটা কিমোন বিয়া!

তবে নিশ্চয়ই এটা বিয়ে-করা বৌ নয়।

এমন আরো কয়েকটা ছড়া গানের পর, শেষপর্যন্ত আর এক দফা বকশিস, অর্থাৎ লক্ষ টাকার অনুপাত অংশ এল। তারাও বড়সাহেবের গুণ গাইতে গাইতে সেখান থেকে বিদায় নিল।

তাদের জানা আছে কার কাছ থেকে কেমন করে কত আদায় করা যেতে পারে। অতি কৃপণেরও রক্ষা নেই। সেখানে গাইবে—

> কিপটা বাবু, সিঁপটা বিবি,
> পিঁপড়া ধরি খায়,
> টকার ঝুলি বোঝাই করে—
> বিবির গতর যায়।

এমন ক্ষেত্রে কর্তা-গিন্নীর কেউ ভাল হবে না, যতক্ষণ না আশানুরূপ পার্বণী মেলে।

সব গানেরই শেষে গাইবে—

> মাদল বাজে ক্রাং,
> ধিনতা দি ধিন্ তাং।

তাদের গানের কথায় নিন্দা, কেচ্ছা বা স্তুতি যাই থাকুক না কেন সবাই তা হাসি-মুখে শোনে, তার রস উপভোগ করে, এবং যে যার পদমর্যাদা অনুযায়ী পার্বণীও দেয়। সাহেবরা ধনী, উদার, তাদের কাছ থেকে পায় নোট, আর বাবুদের কাছে পায় ভাঙা মুদ্রা। রসজ্ঞ শ্রোতারা যত হাসাহাসি করে তত গম্ভীর হয় ওদের মুখ। যেন কিছুই জানে না, বোঝে না—গানের কথার অর্থটাও না।
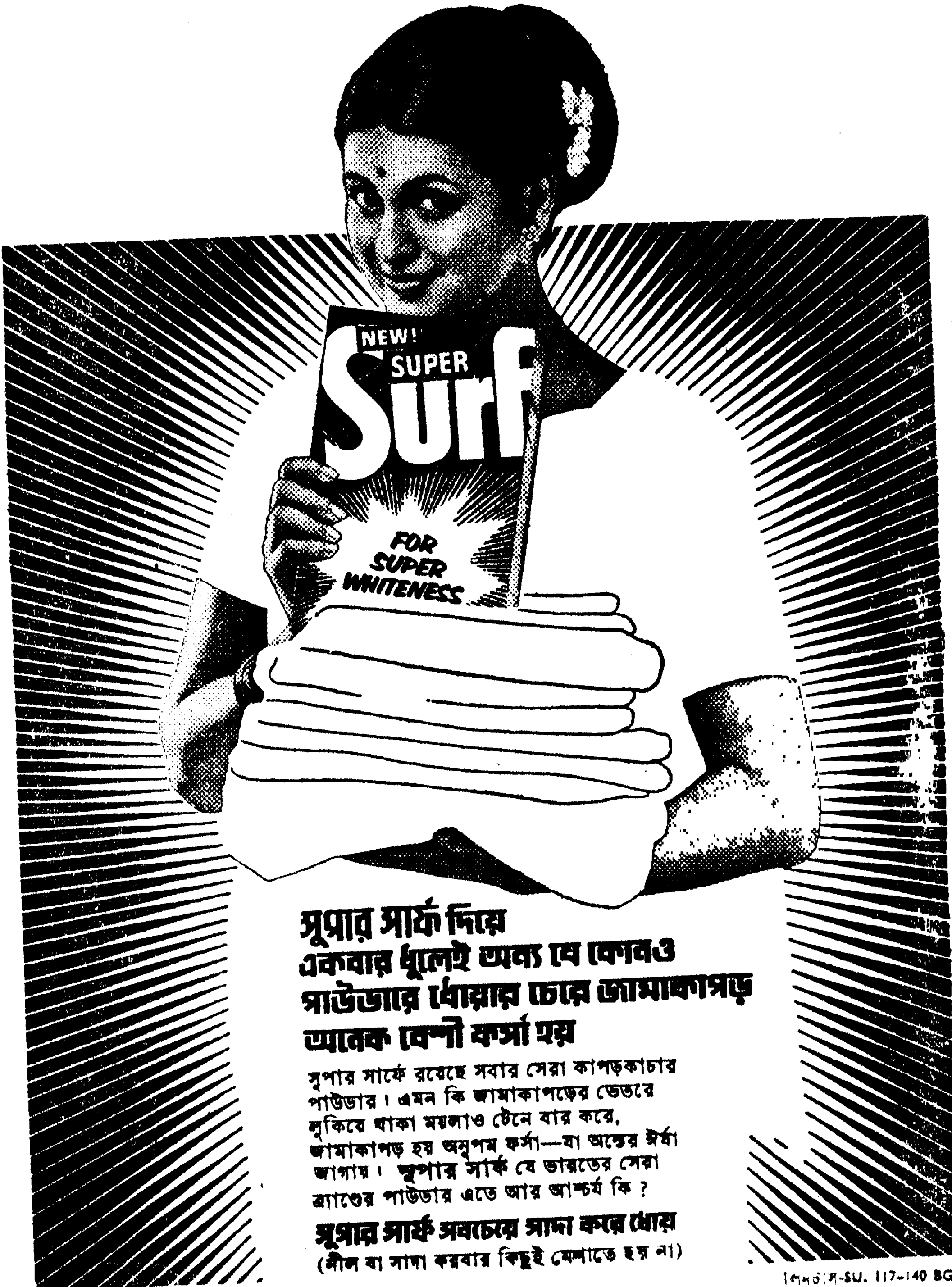
দলে দলে গান করে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়—সাহেবদের, বাবুদের এমনকি কুলিদের ঘরের সামনেও যায়। এমনিভাবে পার্বণী সংগ্রহ করে সকলের কাছ থেকে।

বাবুদের আর সাহেবদের ঘর থেকে আসে টাকা-পয়সা। কুলিদের মধ্যে সকলের তেমন সামর্থ নেই, তা থাকলেও নগদ পয়সাটা দিতে তাদের বড় গায়ে লাগে। সেখান থেকে পায় চাল-ডাল, তরি-তরকারি। যেখানে যা পায় সবই নেয়, সবই কাজে লাগে। সেসব দিয়ে হয় খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে যেখানে আরো কিছু পায়। একটু লাল চা, আর হাতের তালুতে একটু মিঠাই—একো গুড়, নয়তো চিনি। তার ওপর কিছু জলপান হলে তো কথাই থাকে না। মরুভূমিতে জল পাওয়ার শামিল সেটা। তেমন পাওনা যে-কোন ঘর থেকে হতে পারে, ওদের ক্লান্তি দেখে যারা কাতর, তাদের কাছ থেকে,—যারা অমন কেচ্ছা শুনে বেশ আনন্দ পায়, তাদের কাছ থেকে।

তিন নম্বর ও চার নম্বর লাইনের ছেলে-মেয়েরা জোট বেঁধে খুব সকাল থেকে নেচেগেয়ে বেড়াচ্ছে। সাহেবদের ও বাবু-দের ঘর শেষ করে এল গাঁয়ের পথে পথে—কুলি-বস্তির ঘরে ঘরে। শর্মিষ্ঠাকেও যোগ দিতে হয়েছে সকলের সঙ্গে। এটা তাদের সামাজিক প্রথা। এটা এড়ানো বড় কঠিন। কিন্তু এটা বজায় রাখতে গিয়ে যে কতখানি মুশকিলে পড়বে, তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। ভেবেছিল, কাউকে কিছু না বলে, মাঝপথ থেকে সে পালিয়ে যাবে। তা হল না, হতে দিল না তার সখীরা।

তারা সব সময় আগলে রেখেছে শর্মিষ্ঠাকে।

ঘুরতে ঘুরতে তারা এল রাবণদের ঘরের সামনে। তাদের উঠানে পা দিয়ে শর্মিষ্ঠার পা-দুটো যেন অবশ হয়ে পড়ল, সে আর নাচতে পারল না। কণ্ঠ রোধ হল, সে গাইতে পারল না। সেখানে এসে একটি-বার মাত্র সে বিলির চোখাচোখি হয়েছিল। বিলির উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দুটি চোখের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গেল তার দৃষ্টি। সে কোন-মতে স্থির রাখতে পারল না তার দুটি চোখ, বিলির অমন মিষ্টি চোখের সামনে। বিলির দুটি কৃতজ্ঞ চোখের সামনে।

কৃতজ্ঞ? না শ্লেষ, না অহঙ্কার? না-না, স্পষ্ট দেখতে পেল—কৃতজ্ঞতা। কিন্তু কিসের জন্য? কিছুই ভেবে খুঁজে পেল না শর্মিষ্ঠা।

মেঘুকে অপমান করবার পর, কোন্ মুখ নিয়ে শর্মিষ্ঠা আবার তাদের ঘরে আসতে পারে! তাই সেদিন থেকে ওদের দু-ঘরের মেলামেশা একেবারে বন্ধ। এমনই ভাবে তাদের পরস্পরের দরজা বন্ধ হয়েছে যে, তা খোলবার কোন উপায় ছিল না। তা খোলবার চেষ্টা করা তো বহু দূরের কথা, দু-পক্ষের কোন পক্ষ তা মনের মধ্যে ভেবে দেখবারও কোন পথ পায়নি। বরং বন্ধ দরজা আরো শক্ত করে বন্ধ রাখার পথটাই স্বাভাবিক ও সহজ। তাই, এর মধ্যে আর দেখাশোনা হয়নি এদের। যা হয়েছে তা চলতে-ফিরতে দূরে থেকে। অথবা দু-ঘরের কেউ কাউকে দূরে থেকে দেখে, আরো দূরে সরে যাচ্ছে। তেমন দেখা, না দেখারই শামিল।

যতটুকু লেখাপড়ার জন্য বাগানের ইস্কুল হয়েছে, তার চাইতে ঢের বেশী হয়ে গেছে শর্মিষ্ঠার। তবু সে ইস্কুলে যেত অনেক উঁচু ক্লাশের বই নিয়ে, পড়া-শোনা ভাল লাগে তার। বিলিও সাগ্রহে পড়াত তাকে। কিন্তু সেই ঘটনার পর, এ-মুখ সে বিলিকে দেখায় কি করে? তাই সে সায় দিতে বাধ্য হয় শুক্রীর মতে, ইস্কুলে যাওয়া ছাড়ে। তখন থেকে শর্মিষ্ঠা ঘরেই পড়ে। তাই এতদিন পর এমন অকস্মাৎ, ও অপরিহার্যভাবে এদের সামনা-সামনি হল সে, বিলির সামনা-সামনি হল।

কিন্তু একি অদ্ভুত ভাব তার চাহনিতে! যে শর্মিষ্ঠা মেঘুকে এত অপমান করল, বিলির নামে প্রকাশ্যে অত-বড় কলঙ্কের কথা বলল, তাদের সকলকে অতখানি অপমান করল, তাদের কাছ থেকে একি ব্যবহার পাচ্ছে শর্মিষ্ঠা!

এদের ঘরে এসে সবাই পেল দুধ-চিনি মেশানো চা, সঙ্গে জলপানও! গণ্ডাকয়েক চীনামাটির কাপ-ডিস সকলের হাতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। খাওয়া হয় একজনের, আর লছমী তা ধুয়ে ধুয়ে মুছে দেয় আর একজনের হাতে—নতুন কেটলি থেকে বিলি ঢেলে দেয় চা—কি সুন্দর চা! চমৎকার জলকরা, পিঠাও কত। আবার জানতে চায়—আরো দেবে কিনা? শর্মিষ্ঠাকেও জিজ্ঞাসা করে, যেন শুধু শর্মিষ্ঠাকেই। বিলি আর লছমী, দুজনই। সকলকে জিজ্ঞাসা করার মাঝে—নয়তো সকলকে শেষ করে, শেষে। নয়তো, শুধু শর্মিষ্ঠাকে খাওয়ানোর জনাই এত ঘটা।

বেচারা সকলের মাঝে, সকলের চোখের সামনে সকলের চোখ থেকে আড়াল হয়ে লুকিয়ে বসে আছে। যেন চোখ বুজে দুনিয়াটা অন্ধকার করে রেখেছে। প্রথমবারের পরিবেশিত জিনিস-টুকু নিয়েই সে বিব্রত। তবু তার নিস্তার নেই। ওদের প্রশ্নেই সে বোবা হয়ে গেছে। লজ্জায় সঙ্কোচে ধনুকের আকারে নুয়ে আছে তার দেহটা। তার ওপর সখীদের তাগিদ-টিপ্পনী। কানের পাশে মুখ এনে একে-একে তারা বলে যায় কত কথা। কথাগুলো কি তীক্ষ্ণ, কি জমাটে ঠাণ্ডা। শুনতে শুনতে শর্মিষ্ঠার দেহটা কন-কন করে ওঠে। ওদের কথার ধাক্কা লেগে তার আঙুল ক'টা সচল হয়, খুঁটে খুঁটে ডিসের খাবারগুলো করে টুকরো টুকরো, হাত আর মুখের কাছে আসতে চায় না—কাপের চা হয় ঠাণ্ডা।

তার ওপর ওদের তাগিদ—খাচ্ছিস না? খা-খা, এই নে—ওগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, সরিয়ে রাখ। এই গুলো খা।

আবার দিয়ে যায় ওপর ওপর! যত তৎপর হবার তাগিদ আসে, তত অলস অবশ হয় শর্মিষ্ঠার হাত, তার সমস্ত বোধশক্তি।

কথা তো নয়—যেন এক-একটা চাবুক পড়ছে শর্মিষ্ঠার কানে-পিঠে, গায়ে-মাথায়, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। স্নেহ-মাখানো সে চাবুক। স্নেহ? নিশ্চয়ই স্নেহ। তাছাড়া আর কি?—স্নেহ তো সুখই দিয়ে থাকে। কিন্তু তা যে এত কষ্টও দিতে পারে শর্মিষ্ঠা সেদিনই তা জানতে পারে। এই সূক্ষ্ম বস্তুটি সময়-বিশেষে মানুষের স্থূল দেহকে কতখানি যন্ত্রণা দিতে পারে, তা মর্মে মর্মে অনুভব করে সে।—খাবার দিতে এসে কত কথা বলে তারা, কিন্তু শর্মিষ্ঠার মুখে কথা নেই, একটু মাথা হেলিয়ে ইসারা ইঙ্গিত করেও কিছু জানাতে পারে না। একটা অবর্ণনীয় অসহ্য যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চায় তার বুক, ভেসে যেতে চায় চোখ। শুধু লজ্জার বাঁধনে বুঝি কোনমতে আটকে আছে সে-সব। এতগুলো লোকের সামনে সে কি করবে! পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পাবারও উপায় নেই।

ঘরের দাওয়াতে বিছানো মাদুর। তার এক পাশে ছেলেরা অপর পাশে বসেছে মেয়েরা। এ-বাড়ীতে কুঠরিটা নতুন উঠেছে, মেঘুর জন্য। বাঁশের জাফরি-দেওয়া জানালা—চারপাশে ছিটে বেড়ায় মাটি ধরানো, তার ওপর চুনকাম করা—খড়ের চালা। অনেকেই সেটা দেখেনি আগে। শর্মিষ্ঠাও না, যদিও খবরটা জানা ছিল। তার ইচ্ছা হল—একবার দেখে আসে ভিতরটা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, যাওয়া আর হল না।

পানাহার শেষ হয় সকলের। লছমী আর বিলি সকলের সামনে পান-তাম্বুলের বটা (বাটা) নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পানের সঙ্গে গুয়া আর চুন। এ-রাজ্যে খয়েরের পাট নেই। তাছাড়াই টকটকে লাল হয়ে যায় ঠোঁট। এমনই খায় সবাই, দেয়ও—দিতেই হবে তা অতিথি-অভ্যাগতদের। এটা প্রথম ও শেষ পর্ব—দুটোই হতে পারে। অর্থাৎ অভ্যর্থনা ও বিদায়।

অতএব এবার সকলের মুখেই উঠি-উঠি যাই-যাই ভাব।

এমন সময় লছমী বললে—মেঘুর কুঠরিটা দেখবে না?

যেন এরই জন্য সকলে অপেক্ষা করছিল। উঠি-উঠি করেও ওঠেনি, যাই-যাই করেও যাবার গরজ দেখায়নি।—লছমীর বলা মাত্র এক-একটা দল হুড়-হুড় করে ঘরটায় ঢোকে, আর বেরিয়ে আসে চোখেমুখে বিস্মিত ভাব নিয়ে!

দুটি অংশে ভাগ করা ঘরখানা মাঝে একটা বেড়া দিয়ে। সামনেরটায় বাঁশের পায়ার ওপর কাঠের পাটাতনটা টেবিলের মতো উঁচু, রঙিন কাপড়ে ঢাকা। তার ওপর খানকতক বই, খাতা, দোয়াত-কলম। পাশেই দুটো কাঠের টুল। ভিতরে আর একটা পাটাতন—তাতে ধবধবে বিছানা-বালিশ, মশারিও। বেড়ার গায়ে বেশ কয়েকটা ছবিও ঝুলছে—ফ্রেমে বাঁধানো, কাঁচে ঢাকা নয়। শুধু ছবি পিজ্-বোর্ডে আঁটা। কোন্ ঠাকুরের ছবি? চেনাজানা ঠাকুর তো নয়। রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা বা তাদের যে-কোন মূর্তি তারা চট করে চিনে ফেলতো। এমনকি রামসীতা, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জুন ও দ্রৌপদী হলেও চিনতে কোন কষ্ট হত না। এসব নাম নিয়ে তারা জন্মেছে, এসব নামের ছবি তাদের মনের মধ্যে আঁকা। রবিঠাকুরের নাম জানা নেই। জানলেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হত না। বাকী ক'টাও তো না-জানাই থেকে যেত। রঙচঙে ছবির বাইরেও ঠাকুর দেখেছে তারা। বাগানের দুর্গাপূজার সময় আসে পুরুত ঠাকুর, তার সাঙ্গ-পাঙ্গ আরো কত ঠাকুর। কোন কোন বাবুর রান্নাঘরেও ঠাকুর দেখে। এতো সেসব লোকের ছবি নয়! সামনে বাঘ-ভাল্লুক পড়ে থাকলেও না হয় বোঝা যেত কোন শিকারীর ফটো। হবে কোন বড় মানুষের ফটো! জানে শুধু গান্ধী মহারাজের নামটাই, চাক্ষুস কেউ দেখেনি। কিন্তু তাঁর ছবি কেউ দেখেছে, কেউ বা দেখেনি। না দেখলেও ছবিটা মনে আঁকা হয়ে আছে। তেমন একটা চিনল সবাই। নেতাজী ও নেহরুর নামও শুনেছে, কিন্তু ছবি বোধ-হয় দেখেনি। দেশবন্ধু নামটা বুড়ো-বুড়ীদের বেশ জানা, কোন কোন অতি আধুনিক যুবাও জানে। কিন্তু শঙ্কর, নানক, তিলক, গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথের নাম এদের কারো জানবার কথা নয়।

বাগানের পাঠাগার থেকে অনেক বই এনে মেঘু পড়েছে। তাই অমন বহু নাম সে জানে, তাদের কীর্তিকলাপও জানে। নানা পত্রিকা থেকে কেটে ছেঁটে অমন অনেক ছবি সংগ্রহ করে নিজের ঘরে ভর্তি ভরে সাজিয়ে রেখেছে। সেসব সে একান্ত মনে দেখে আর ভাবে, ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতো তেজ ও প্রেরণায় ভরিয়ে নেয় তার মনটাকে ঐ সব লোকের আদর্শে।

কুলি মজুরের ছেলেদের পক্ষে, বিশেষ করে চা-বাগানের কুলিদের পক্ষে অত শত জানার বা বোঝার কথা নয়। জানলে হয়তো আরো ভাল করে দেখতো। কিন্তু না জানা না বোঝার মধ্যেও কিছু অস্বস্তি থাকে। কারো মনে কৌতূহল জাগল, পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেবে—ও সব কি!

তখনকার মতো সে-সব দেখে যে যার চোখ নামিয়ে ফিরে আসে। সবাই ওঠে কিন্তু শর্মিষ্ঠা ওঠে না। সবাই যায়-আসে শর্মিষ্ঠা যায় না। স্থির হয়ে বসে আছে সে কখন সবাই ফিরে যাবে, তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

বতী আর কেতি ছুটে এসে দাঁড়াল শর্মিষ্ঠার দু-পাশে। হিড়হিড় করে টানতে টানতে হাসতে হাসতে তাকে নিয়ে গেল ঘরের ভিতরে।

মাথায় বাজ পড়লে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তা নিশ্চয় পড়েনি শর্মিষ্ঠার মাথায়। কিন্তু একজোড়া সুডোল চোখের চাহনি পড়েছিল তার চোখের ওপর। তাতেই যেন কেমন হয়ে গেল শর্মিষ্ঠা। একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টির স্পর্শে তার চোখ-দুটো একবার মাত্র বিস্ফারিত হয়ে উঠে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। তার হৃৎপিণ্ড একটা অসম্ভব আয়তন নিয়ে ওঠানামা করতে থাকল। তার মনের সেই অবস্থায়, উপায় থাকলে বাজ পড়াটাই সে হয়তো বেছে নিতো।

বই-এর পাতায় দৃষ্টি রেখে মেঘু বসেছিল বিছানার ওপর। হঠাৎ হাসির রোলে মুখ তুলে চাইল। তার স্নিগ্ধ চোখের সামনে শর্মিষ্ঠার বিহ্বল দুটি চোখ এক নিমেষের তরে প্রসারিত হল, পরক্ষণেই তা সঙ্কুচিত হল, নিষ্প্রভ হল। কিন্তু মেঘুর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। যেমন সহজভাবে চোখ টান করে তাকিয়েছিল, প্রায় তেমনিভাবেই ফিরিয়ে নিল তা। না বিহ্বলতার, না সংকোচের লেশ ছিল সে-চাহনিতে। কি যেন একটা ছিল সে চাহনিতে, কিন্তু তা বোঝা যেমন শক্ত, তেমনই শক্ত তার ব্যাখ্যা করা।

মেঘুর চোখে চোখ মিলিয়ে এমনই একটা অবস্থা হল শর্মিষ্ঠার। তার হাত-দুটো বতী আর কেতির বাহুবেষ্টিত না থাকলে, হয়তো সে মূর্ছিত হয়ে পড়ত। নয়তো শর্মিষ্ঠার মূর্ছিত দেহটা তাদের বাহুবেষ্টনের মধ্যেই পড়ে আছে। অথবা অমনই একটা কিছু হয়ে থাকবে।

পাশেই ছিল বিলি ও লছমী। তারা বুঝল মেয়েটার অবস্থা। তারা এগিয়ে এসে টুলের ওপর তাকে বসিয়ে দিলে। শর্মিষ্ঠার মাথাটা এক হাতে বিলি চেপে ধরল নিজের বুকের মাঝে, অপর হাতটা বুলিয়ে দিতে থাকল তার মাথার ওপর। কত আদর করল ওরা দুজনে মিলে, কত অনুযোগ-অভিযোগের কথাও বলল। বিলি বললে—কেন সে ইস্কুলে যায় না? লছমী বললে—মেয়েটা কত শুকিয়ে গেছে। কেন সে তাদের ঘরে আসে না? এমন কত কি।

কথাগুলো শর্মিষ্ঠা শুনেও শুনল না—মন দিয়ে শুনলেও কান দিয়ে শুনল না, কান দিয়ে শুনলেও মনে দিয়ে শুনলে না: এমন কথা শোনবার অযোগ্য, অপাত্রী সে। অধম সে, নরকই তার উপযুক্ত স্থান। এমন বুক তার জন্য নয়। তার বুকের ভিতরটা গুমরে কেঁদে উঠল।

অভাগিনী অভিমানিনী মেয়েটার প্রতিটি নিঃশ্বাসের তাৎপর্য বিলি তার হৃদয় দিয়ে অনুভব করল। সেই অনুভূতি অনুযায়ী সে কাজও করে গেল, শর্মিষ্ঠার অভিমানপ্রসূত দুঃখে সান্ত্বনা দিতে, তার বেদনা নিবৃত্ত করতে। তার প্রতিটি নিঃশ্বাস, সেই নিঃশ্বাস উদ্ভূত বাথার প্রতিটি বুদ্‌বুদ, প্রতিটি ঢেউ বিলি ভেঙ্গে দিতে থাকল তার সুচারু হস্ত-চালনে, হৃদয়ের তপ্ত আবর্তনে। তার ফলাফল সে হাতে-হাতে উপলব্ধি করেছে। সেই বেদনা বিলুপ্তির সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সকল সত্তা বিলীন হল বিলির আবক্ষ বাহুবন্ধনে। এমন মায়া-মমতা সংসারে আর কোথাও নেই, এমনটি আর কোথাও সে পায়নি জীবনে। তার মা-বাবার কাছেও নয়। এদের মতো আর কেউ তার মনটাকে চিনতে পারেনি, বুঝতে পারেনি—তার নিজের ঘরেও না। এই জিনিসেরই অভাবে শর্মিষ্ঠার দেহের ওপর মালিন্যের প্রলেপ পড়েছে। এরই বিহনে তার অন্তর তুষাগ্নির তুল্য দগ্ধ হয়ে চলেছে।—কিন্তু এদের কথার কি জবাব দেবে সে, জবাব দেবার মতো কি আছে তার? সে জানে, সে কত অপরাধী। ওরা যত কথা বলে, তত নুয়ে পড়ে শর্মিষ্ঠার মাথাটা। স্পন্দন-হীন বুকখানা স্পন্দিত হয়ে ওঠে, স্পন্দিত বুক হয় নিস্পন্দ। তরঙ্গায়িত বুকের ভিতরটা হয় নিস্তরঙ্গ। হিমকণার স্তরে স্তরে ঢাকা পড়ে যায় তার সমস্ত দেহমন।

এদের সব কিছুই অদ্ভুত। এদের কার্যকলাপ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, জীবন-যাপনের ভাবধারা এসব খতিয়ে সবাই তা এক বাক্যে স্বীকার করে—এরা এক সৃষ্টিছাড়া জীব। তা নইলে তাকে নিয়ে এমন করতে পারে! শর্মিষ্ঠা যা করেছে, তার চাইতে কত ছোটখাটো ঘটনায় কত বড় ঝগড়া লেগে যায়, কত কাণ্ড হয়! একদিন দু-দলের কত আয়োজনের আশঙ্কায় শর্মিষ্ঠার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করে কেঁপে উঠেছিল, সন্ত্রস্ত শশকের মতো, ডাক্তারের হাতে সূচীবিদ্ধ শশকের মতো, শিকারী ধাবিত পলায়মান ভীত শৃগালের মতো। কিন্তু, কিছুই হল না। মেঘুই নিজের চেষ্টায় সব কিছুর শেষ করে দিয়ে এল।—কোন্ জগতের জীব এরা কোন্ জগতে এসে পড়েছে! তা নইলে এত আদর, এত স্নেহ দেখাবার কথা তার মতো একটা ঘৃণ্য মেয়েকে?—অসহ্য! বিলি ও লছমীর স্নেহের প্রলেপ তাকে এক যন্ত্রণা থেকে তুলে এনে ফেলে দিল আর এক যন্ত্রণার মধ্যে।

অসহ্য! এর চাইতে একটা ঝগড়া ভাল। দিনের পর দিন ঝগড়া, তাও ভাল ছিল। দু-পক্ষের দাঙ্গা-মারামারি হয়ে দু-চারটে খুন-জখমও ভাল ছিল। রাবণের দল শর্মিষ্ঠাকে জোর করে ছিনিয়ে আনবার সময় একটা ঘোরতর দাঙ্গা—কয়েকটা জখম, খুন! সেই সঙ্গে শর্মিষ্ঠার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়াও ভাল ছিল। অন্ততঃ আজও একটা কিছু—বাঁকাটেরা চাহনি, দুটো গালমন্দের কথা, মেঘুর দুটো রক্তলাল চোখ দেখাও ভাল ছিল। তার নাম ধরে, তার গুষ্টির নাম ধরে উঠানের ওপর খেংরার ঘা—দু-চার ঘা তারও পিঠে পড়লে আরো ভাল হত।

আবার দু-পক্ষ জমা হত পুরানো দিনের আপসোসটা মিটিয়ে নিতে। এই বিহুর দিন কোন কিছুরই অভাব ছিল না। এমন দিনে সবাই তৈরি থাকে যে-কোন পরিবেশ রচনা করবার জন্য, এমন একটা ঘটনার মধ্যে বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। কি চমৎকার কাটত তাহলে এই উৎসবের দিনটা!

হতে পারে এদের মন ভাল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। যত কাজই করুক না কেন, আসলে এরা অকর্মণ্য। এদের রক্তে তেজ নেই, রক্ত নেই এদের শরীরে, মানুষের মতো রাগ নেই এদের কারো। রামায়ণ পড়েশুনে এরা যেন কেমন হয়ে গেছে। তাই জানে না, শেখেনি দোষীকে সাজা দিতে।

ভীরু এরা, এদের সাহস কোথায়? এ-সংসারে বাস করবার শিক্ষা নেই, অধিকারও নেই। এদের হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে। ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন।

না-না, এরা খুব ভাল। ভগবান তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তার কর্মদোষে তাকে অভিসম্পাত করেছেন। এদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন তার সকল সম্বন্ধ।

এতখানি দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়েও শর্মিষ্ঠা খাড়া হয়ে রইল। ব্যথা-বেদনার বিভিন্ন স্তরে নিষ্পেষিত হয়ে সে কত কথা ভাবল। কিন্তু এইটুকু বুঝল না, একবার মনেও এল না যে কার জন্য বিলি আজ [illegible] পুত্রের জননী হতে পারেনি, [illegible] জন্য মেঘুর জীবনের গতি ফিরে গেছে, সে নবজীবন লাভ করেছে?

(ক্রমশঃ)

সাধারণ রঙ্গালয় ও
মহাত্মা শিশিরকুমার

শিশির বসু

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে (১৮৭২) যাঁদের নৈতিক সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতায় ফলে বাংলা দেশের সাধারণ রংগালয় গড়ে উঠেছিল মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁদের অন্যতম। বস্তুতঃ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ সেকালের সংস্কারমুক্ত মনীষীরা আন্তরিকতার সংগে এগিয়ে না এলে সহায়সম্বলহীন বাগ-বাজারের তরুণ দলের পক্ষে সীমিত শক্তি ও সাধ্য নিয়ে পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর প্রমুখের দ্বারা ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীর অস্থায়ী মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ রংগালয়ের যে অভিযান সুরু হয়, তার মূলে ছিল বাংলা দেশের তিনজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা), নবগোপাল মিত্র (ন্যাশনাল পেপার) ও মনোমোহন বসু (মধ্যস্থ)-র প্রেরণা। এঁদের মধ্যে শিশিরকুমারের ভূমিকা ছিল ব্যাপকতর। তিনি যে কেবলমাত্র সমকালীন নাট্যচর্চাকে সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর গোচরে এনে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন বা গঠনমূলক সমালোচনা প্রকাশের দ্বারা অভিনয়ের মানোন্নয়নে সহায়তা করেছিলেন তাই নয়, দলাদলির ফলে এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সদ্যভূমিষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল থিয়েটার যখন অঙ্কুরেই বিনাশোন্মুখ (জানুয়ারী—১৮৭৩) সেই দুর্দিনে সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধারের দায়িত্ব গ্রহণ করে অসীম মমতা ও বিচক্ষণ পরিচর্যায় সেই নবজাত শিশুটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। শিশিরকুমারের সেই কৃতিত্ব নাট্যশালার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ১৮৭৩, ২১-এ ফেব্রুয়ারী 'ইন্ডিয়ান মিরার' লিখেছিলঃ—

> "......Now the rupture among the members of the National Theatrical Society has, happily, come to a close. Selfishness, distrust, dictatorial tone and unwillingness to cringe are some of the causes which gave rise to it. This collision would have proved destructive of National entertainments, had not the well-known Editor of the Amrita Bazar Patrika intervened between the contesting parties. His good advices and solicitations gradually conquered the obstinacy and party feeling of each party and at last brought the matter to a happy end .... The three directors of the Theatre now are the Editor of the Amrita Bazar Patrica. Babu G. C. Ghose, and another Native Gentleman.
>
> We wish prosperous career to the National Theatre. The members of N. T. Society must feel grateful: that the Editor of the Amrita Bazar has meddled in its affairs and when he is there we doubt not the matters will be managed smoothly......"

স্বদেশ হিতৈষণার মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ন্যাশনাল থিয়েটারের সংগে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এই সম্পর্কে পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু বলেছেনঃ—"এই যে নূতন থিয়েটর খোলা হইল, যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম ন্যাশনাল থিয়েটার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবিলেন, ইহার ভিতর দিয়া কি বাঙালী জাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না? এই যে democratic স্টেজ, ইহা ত আর ধনী গৃহস্থের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না; বাঙালীর সর্বাংগীন ভাবপুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন? ইহারা ত সাহস করিয়া 'নীলদর্পণ' লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। দেশের মর্মস্থান হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যাহার সহিত সমবেদনার জন্য লং সাহেবের কারাবাস হইল, সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাজিয়াছে। ইহারা যদি সদবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কার্য করে, তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অনেক আশা করিতে পারে। শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটরের একজন ডাইরেকটর হইলেন।" (পুরাতন প্রসঙ্গ)

সাধারণ রঙ্গালয়ের উদয়লগ্নে সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েই শিশিরপ্রতিভা ক্ষান্ত হয়নি, উপযুক্ত নাটকের অভাব পাবলিক থিয়েটারে যখন বিশেষভাবে অনুভূত, 'নয়শো রুপেয়া' ও 'বাজারের লড়াই' নামক সমকালীন সমস্যাভিত্তিক দু'খানি প্রহসন রচনার দ্বারা বঙ্গীয় নাট্যশালা এবং সাহিত্যকে তিনি উপকৃত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। নাটক দু'খানি যথাক্রমে ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ এবং ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ ন্যাশনালে অভিনীত হয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'নয়শো রুপেয়া' প্রহসনে অর্ধেন্দুশেখরের অসাধারণ অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। গিরিশচন্দ্র লিখে গেছেনঃ—"ন্যাশানাল থিয়েটারে 'নয়শো রোপেয়া' অভিনয় হইল। যাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে

অর্ধেন্দুশেখর

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অমৃতলাল বসু

অর্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন যে নয়শো রোপেয়ায় 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটির অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।" (নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী)।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত দেশপ্রেমমূলক প্রথম রূপকনাট্য (Mask) 'ভারতমাতা' শিশিরকুমারের অনুপ্রেরণাতেই রচিত। এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখে:—"ন্যাশন্যাল থিয়েটার। গত শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটরে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের পর 'ভারত-মাতার একটী দৃশ্য' প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিটকাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে ২ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সেদিন ন্যাশন্যাল থিয়েটরে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন ও এমন একটি শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিনকালে বিনষ্ট হইবে না। রঙ্গভূমি যেরূপ সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ আবার উহা সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, ন্যাশন্যাল থিয়েটর এই দুইটি মহৎ কার্য সাধনে সক্ষম হইবে।" (২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক এবং সামাজিক গুরুদায়িত্ব পালনে, সাংবাদিকতায় ও ভগবৎ আরাধনায় নিরন্তর মগ্ন থাকায় শিশিরকুমারের পক্ষে সক্রিয়ভাবে রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব না হলেও, প্রয়োজনকালে দেশের নাট্যশালা তাঁর পরামর্শ-সহানুভূতি থেকে কখনও বঞ্চিত হয় নি। অধুনাবিলুপ্ত বিডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত ভক্তিরসাশ্রিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ের সময় (১৮৮৩) বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা শিশিরকুমারের ঐকান্তিক আশীর্বাদ শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তরে অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনকথা ও হরিনাম সংকীর্তন অভিনয়ের মাধ্যমে অগণিত দেশবাসীর মধ্যে প্রচারিত হয়ে তাদের পারত্রিক মুক্তিলাভের পথ সুগম করবে—এই জ্বলন্ত বিশ্বাসে উদ্দীপিত 'শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস' শিশিরকুমার 'চৈতন্যলীলা' মহড়ার কালে স্টার কর্তৃপক্ষকে সর্বপ্রকারে অকুণ্ঠ সহায়তা করেছিলেন। পরম ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত তিনিও সেকালের নট-নটীদের অস্পৃশ্য এবং অপাংক্তেয় জ্ঞানে দূরে ঠেলে দেন নি এবং তদানীন্তন কালের অনন্যা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী পরমহংসদেব ব্যতীত মহাত্মা শিশিরকুমারেরও আশীর্বাদধন্যা হয়েছিলেন। ঐ নাটকের নামভূমিকার শিল্পী বিনোদিনী দাসী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন:—"...'চৈতন্যলীলা'র রিহারসালের সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকার' এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বারবার বলিতেন যে, "আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত জয় জয় মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম।..." (আমার কথা)

বস্তুতঃ উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান মহাত্মা শিশিরকুমার স্বয়ং একজন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবভক্ত হয়ে সেকালে যখন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি তথাকথিত অনাচার ও নীতিহীনতার কারণে পাবলিক থিয়েটারের প্রতি কেবলমাত্র বিমুখই নয়, খড়্গহস্ত—সেই সময় সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে ও উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ ও সংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন, তা স্বতই আমাদের হৃদয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি এই পবিত্রমনা ও উন্নতচেতা মহাপুরুষকে যাঁর নির্ভীক এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা সেকালের নাট্যশালাকে বর্তমানের উন্নততম পর্যায়ে উন্নীত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।*

---

* রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে:—

Life of Shishir Kumar Ghosh by wayfarer. The Indian Stage (Vol. II) —Dr. H. N Dasgupta.

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫—১৮৭৬)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত

সাহিত্যসাধক চরিতমালা (অষ্টম খণ্ড) —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত

আমার কথা—বিনোদিনী দাসী

বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

তুমিই আমার ॥ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ছিল না বিশ্বের মুক্তি প্রার্থিত, নিজস্ব বেদনায়
চেনা ছিল শুধু রূপ-নাম,
সে-ব্যথা বোধির মুক্তি পেল দীপ্ত সত্তায়, যেদিন
শারীরিক তোমাকে পেলাম।

আমার ধর্মের চক্র-বর্তনে অনন্য তুমি নাও
অমৃত সুখের পুণ্য ফল,
আমার অস্তিত্বে তুমি সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয়,
সাহারাতে বৃষ্টি অবিরল!

আমার জীবনে তুমি অনিঃশেষ বৈশাখী পূর্ণিমা
কৃতার্থ জ্যোৎস্নার সুখী গান,
তুমিই আমার ত্রয়ী—আবির্ভাব, সম্বোধি এবং
কোটি জন্ম-প্রার্থিত নির্বাণ।।

আলোছায়া ॥ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সূর্য উঠলো সাগরের এক পারে।
আরপারে নামে সন্ধ্যার ছায়া ঝাউয়ের পাশে।
এর আলো ওর ছায়াটিকে শতধারে
কখন ফিরবে—কে জানে সে কোন্ বন্দর বা সে দ্বীপ!
তালিদেওয়া শাড়ি তাঁবুর সজ্জা দমাস্কাসে :
চলেছে অকূলে এক মেয়েসহ বারো জোয়ানের ছিপ!

উড়িয়েছি নিশান ॥ নন্দন রায়

উড়িয়েছি নতুন নিশান
ঝরে গেছে অবিচারের পাখা—
তা এখন কর্দমাক্ত তা এখন
মাড়িয়ে যাওয়া ছিন্ন ভিন্ন জঞ্জাল।
নবীন প্রাণ হবে উদ্বেলিত
নতুন আশা হবে হিল্লোলিত
সফল হবে সমস্ত স্বপ্ন।
ঝরে যাওয়া পাতাগুলো
ভেসে গেছে কর্মের সাগরে
ভেসে গেছে উচ্ছলিত প্রাণের স্রোতে।
ছেঁড়া ছেঁড়া অংশগুলো পড়ে আছে
কোন এক পরিত্যক্ত অজানা দ্বীপে।

উঠেছে সূর্য, ঝর্ণাঝরা কিরণে
হারিয়ে গেছে অন্ধকার
তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না
তাকে আর খুঁজে বেড়াতে হবে না।

বৃষ্টি এলো

নির্মলেন্দু রক্ষিত

চোখেমুখে রোদ এসে পড়েছে।

শোভন চারদিকে তাকিয়েই আবার চোখ বুজল। টানটান হয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বেলা হয়েছে। ঠুংঠাং শব্দ হচ্ছে রান্নাঘরে। বারান্দায় তোতার গলা শোনা যাচ্ছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না শোভনের। এইরে, ও-বাড়ির মেয়েটা গলা সাধা শুরু করেছে। ওই চেহারায় এই গলা কি করে যে বেরোয়, কে জানে। নাঃ, আর শোওয়া গেল না।

দাদার ব্যস্তসমস্ত গলা শোনা গেল—ভদ্রলোক যেতে পারে না বাজারে। দিনদিন জিনিসপত্রের যা দাম—

বাকিটা শোনা গেল না। চোখ বুজেই শোভন যেন দেখতে পাচ্ছে দাদা বাথরুমে গেল দাড়ি কামাতে। এরপর চান। তারপর কোনরকমে দুটো মুখে দিয়ে ছুটবে স্টেশনের দিকে। তারপর সারাদিন মোটা মোটা খাতায় জমাখরচের হিসেব। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে বিধ্বস্ত সৈন্যের মতো। আর জানে না শোভন। ও যখন বাড়ি ফেরে, তখন সারা পাড়া নিঝুম। দু-একদিন বৌদি এসে দরজা খুলে দেয়। আগে এমনি অবস্থায় শোভন লজ্জালজ্জা গলায় বলত—একটু দেরী হয়ে গেল।

বৌদি নিরুত্তাপ গলায় বলত—তোমার ঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

তোমার ঘর মানে ও আর বাবা থাকেন যেখানে। বাবার কথা মনে হতেই একটা জীর্ণ হতাশ ছবি ভেসে ওঠে শোভনের মনে। বাবাও এক একদিন রাতে ওকে দরজা খুলে দিয়েছেন। শোভন এক ঝলকে দেখে নিয়েছে বাবার বিষণ্ণ মুখটা।

মোলায়েম করে শোভন বলেছে—তুমি এখনো ঘুমোও নি?

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন একটা। বলেছেন—কী যে করিস এত রাত পর্যন্ত? জানিস তো ওরা রাগ করে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে শোভন। টেবিলের ওপর ঢাকা-দেওয়া থালায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে একবার। দুটো ঠান্ডা ভাত আর একটু তরকারি। কোনদিন বাড়তির মধ্যে একটু ডাল। খেতে খেতে রোজ শোভন ভেবেছে এই বা মন্দ কি। তবু তো

জুটেছে এই বাজারে। দাদা-বৌদির অসীম করুণা। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর তিন বছরে ওর পক্ষে এটুকু পাওয়াই তো অনেক বেশী।

দাদার সঙ্গে এখন আর সম্পর্কই কতটুকু। কতদিন মুখোমুখি হয় না শোভন।

একদিন শুধু দাদা বলেছিল—কিরে, দেখছিস কোথায়ও?

শোভন কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হয়তো বলত সামনের সতেরো তারিখে একটা ইন্টারভিউ আছে কর্পোরেশনে। বাবলুর বাবা বলেছিলেন উনি চেষ্টা করছেন। ও পিসেমশায়ের কাছেও একদিন গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক মুহূর্তেই শোভনের কোন কথাই মনে এল না। দুবার মাথা চুলকোল শুধু।

দাদা বলল—বুঝতেই তো পারছিস আমার অবস্থা। বাবার ওষুধ, রেশন, বাজার, তোতার স্কুল—

সব বোঝে শোভন। সব জানে। সে তো চেষ্টা করছে তিন বছর ধরেই। বনমালীর দোকানে ঘুম থেকে উঠে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ে কর্মখালি বিজ্ঞাপনের ওপর। বাবার পেন্সনের টাকাটা থেকে দু-একটা টাকা যা ও পায়, সে তো এপ্লিকেশন পাঠাতেই খরচ।

দাদার চুল পেকে গেছে অনেকগুলো। সামনের দিকটায় টাক পড়েছে। ও সেদিন লুকিয়ে দাদাকে দেখছিল। যেন একটা অচেনা মানুষ। অথচ এই সেদিনের কথা। খেলা দেখতে যেত দুজনে। রাজনীতি আলোচনা করত, ক্যারাম খেলত। দাদার বিয়ের আগে মেয়ে দেখতে যেত ওরা। দাদা তখন কী লাজুক, ভীরু চোখে ওর দিকে চাইত। ও মৃদু হেসে অভয় দিত দাদাকে।

সে সব যেন কবেকার কথা।

বাথরুম থেকে দাদার গলা শোনা গেল—তোতা, তোর কাকুর ভোর হয়নি এখনো?

শোভন উঠল। হাই তুলল একটা। ধ্যুস, ভাল লাগে না আর।

বাবা ডাকলেন—শোভন, এই শোভন।

বৌদির অপ্রসন্ন গলা শোনা গেল—ঠাকুরপো।

শোভন উত্তর দিল না।

টুথপেস্ট নিয়ে ও গালে হাত দিয়ে বসে রইল। দাদা রান্নাঘরে গেলে ও এই ফাঁকে বাথরুমে ঢুকে যাবে। দরকার কি বাবা ঝামেলায়।

মাধবী ঢুকল। হাতে চায়ের কাপ।

শোভন আদুরে গলায় বলল—বৌদি, একটু হাসো না।

টেবিলে ডিসটা রেখে মাধবী ছুটল। অর্থাৎ, আমার এখন অফিসের ভাত দিতে হবে।

ওদিকেই আমি কুল পাচ্ছি না।

শোভন ভাবল বৌদিটা দেখতে মন্দ না সত্যি। দাদার লাকটা ভাল। এই মুহূর্তে ওর মনে হল আসলে বৌ জিনিসটা যদি মনের মতো হয়, বেশ মিষ্টি গোছের, মন্দ হয় না কিন্তু। হাসলে বৌদির গালে টোল পড়ে। ওকে হাসিয়ে শোভন আগে কত বৌদির গালের টোলে হাত বুলিয়েছে, বৌদির ঠোঁট টিপে আদর করেছে। আসলে কি যেন আছে এদের শরীরে। মাঝে মাঝে শোভনের মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। কি যেন গানটা—দিল তড়প তড়প—

কতদিন ও বৌদিকে হাসতে দেখে নি। গল্প করে নি একটুও।

শোভন জামাটা গায়ে দিল।

বাবা এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলি? ওঁদের অফিসে নাকি—

শোভন বলল—বলেছিলাম। ওঁর হাত নেই।

—একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস। জানিস তো বৌমা—

বারান্দার দিকে চেয়ে বাবা থেমে যান।

ঘেয়ো কুকুরটা পেছনে আসছিল।

শোভন ধমক দিল—এই শুয়োর, আসবি না। নন্দীদের এলসেসিয়ানটা খেয়ে ফেলবে তোকে।

বনমালীর চায়ের দোকানটায় এখন বেশ ভীড়। অবশ্য ওদের দলের কেউ এখনো আসে নি। শোভন বেঞ্চের একটা কোণে বসল। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দিকে। কিন্তু কোন উপায় নেই। এগারো নম্বর বাড়ীর বুড়োটা ওটাকে দখল করেছে বোধহয় সারা সকালের জন্য। শোভন মনে মনে বলল—আর কেন বাবা। অনেক তো হল।

শোভন ভাবল নিতাইকে একটা হাঁক দেবে চায়ের জন্য।

বনমালী উঠে এল। বলল—শোভনবাবু, দুটাকার ওপর হয়ে গেছে।

—ও। দাঁড়ান। পরশু বাবা পেন্সন পাবেন। ও গম্ভীরভাবে বলল।

শোভন বেরিয়ে আসে। যাঃ শালা, সকালবেলাতেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। বনমালীটা একটা বাস্তুঘুঘু। ঠিক বুঝেছে শোভন একবার চা চাইবে। তার আগেই ল্যাং। এইসা দিন নেহি রহেগা, দাঁড়াও. শোভন বিড়বিড় করল।

নাঃ, টিউশনি ছেড়েই ও ভুল করেছে। ঋতুকে পড়িয়ে অবশ্য টাকা নেওয়া যায় না। তাই ছলছুতো করে ও ছেড়ে দিয়েছে। আর সুধীরবাবুর বাড়ি? অফিসে ঢুকিয়ে দেবেন বলে পনেরো টাকায় দুটো ছেলেকে পড়িয়ে নিয়েছেন একমাস। তারপর একদিন একটা পুঁচকে মেয়েও ধারাপাত নিয়ে এসে বসল।

ওদের মা বলল—মাস্টারমশাই একেও একটু দেখাবেন।

আর যায় নি শোভন।

সিগারেটটা ধরিয়ে শোভন ভাবল—না ছাড়লেই হ'ত টিউশনিটা। পনেরোটা টাকা তো পাওয়া যেত। বাবার জন্য একটু দুধ রাখা যেত। তোতার জন্য কেনা যেত দু-একটা খেলনা। মা যদি থাকত। একবার মায়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল শোভন। নাঃ মনে নেই। এইই ভাল হয়েছে। মা থাকলে শুধু শুধু কষ্ট পেত। হয়ত বাতে ভুগত। দুবেলা পুঁই চচ্চড়ি আর আলুসেদ্ধ খেতে হত। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। কথাটা মনে ধরল শোভনের।

ভগবানের কথা মনে হতেই রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা ভেসে উঠল। আর তখনই মনে পড়ল ইন্দ্রাণীর কথা।

কলেজে পড়ত একসঙ্গে। তীক্ষ্ম নাক, দীর্ঘ চোখ। শ্যাম্পুকরা চুল। এক একদিন ও ক্যান্টিনে বসে সিগারেট খেত। হেসে উঠত কারণে-অকারণে। ছেলেদের ভিড় জমত ওর চারদিকে। শোভন প্রয়োজন ছাড়া কোনদিন কথা বলে নি ওর সঙ্গে।

সেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা।

কপালে সামান্য সিঁদুর। আরো উজ্জ্বল হয়েছে দেখতে এখন।

শোভনকে দেখেই হৈহৈ করে উঠল।

—এই যে, কি খবর, কেমন আছেন?

শোভন বলল—ভালোই, আপনি?

—আমি কোনদিন খারাপ থাকি না। তারপর, কোথায় আছেন এখন?

—কেন? কলকাতাতেই।

—ধ্যেৎ। ইন্দ্রাণী শ্রাগ করল। আমি বলছি চাকরীর কথা।

শোভনের বুকপকেটের কাছটা একটু ছেঁড়া। শোভন বুকে হাতদুটো আড়াআড়ি রেখে দাঁড়াল। সপ্রতিভভাবে বলল—ম্যাকলীনস বেরিয়েছে। সেলস-এ।

—বাঃ। ইন্দ্রাণী খুশী হল। আপনি তাহলে লাকি। জানেন, মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অনেকেই কনফার্মড বেকার। অবশ্য সামনে কেউ বা স্বীকার করে বলুন। শুধু দীপক কনফেস করেছিল—মনে আছে তো, সেই যে লম্বা মতো। আমি ওঁকে বলে জেসপে ঢুকিয়ে দিয়েছি। যাকগে, জোড় বেঁধেছেন? নাকি এখনো সেই গুডি গুডি বয়?

শোভন একটু হাসল।

—বুঝলাম। আসুন না একদিন। গল্প করা যাবে। ও হ্যাঁ ভাল কথা—দুটো টাকা বের করুন তো। আমরা 'শাপমোচন' করছি সাত তারিখে। কই, দিন।

শোভন বলল—ওই যা। আর দিন পেলেন না? আমি কালই পাটনা যাচ্ছি অফিসের কাজে।

ঠোঁট বেঁকাল ইন্দ্রাণী। সেই মিডল ক্লাস সেন্টিমেণ্ট। আপনি যেতে পারবেন কিনা সেটা বড় কথা নয়। কালচারাল পারফরমেন্সে কন্ট্রিবিউট করুন।

শোভন এরপর ঘাবড়ে গেছিল। বলেছিল—মানে, আমি তো ঠিক পার্স নিয়ে বেরোই নি—মানে, ভাইঝিকে স্কুল থেকে আনতে—মানে—

—ঠিক আছে। টিকিট রাখুন। আমাদের ছেলেরা গিয়ে আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে।

চলতে চলতে শোভন আবার ভাবল বেশ আছে এরা। জীবনকে সবদিক থেকে উপভোগ করেছে। টেস্ট পর্যন্ত অনায়াসে প্রচুর নম্বর পেত প্রফেসারদের পটিয়ে। ফাইনালে একেবারে ধরাশায়ী। আর যে ছেলেগুলো চারদিকে মৌমাছির মতো ঘুরত, তাদের মধ্যে সবগুলোর কেরিয়ার শেষ। পঙ্কাশ পরীক্ষাই দিল না। দিব্যেন্দু

কোথায় যেন চলে গেল। আর বিজন করল সুইসাইড।

শোভন ভাবল মেয়েটার কিন্তু এলেম আছে। দীপককে চাকরী দিয়েছে জেসপে। একবার বলে দেখলে হত। ধ্যুস শালা, এই ভাল হয়েছে। ডাঁটের মাথায় বলে দিয়েছে ভালই আছে। ভালোই তো। ভালোই আছি। আস্তে আস্তে ও উচ্চারণ করল। ম্যাকলীনস-এর সেলস এসিস্টেন্ট। ভাগ্যিস ও ওদের ওখানে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিল। ঝট করে মুখে এসে গেল।

দু-টাকার কথাটা নতুন করে মনে এল শোভনের। গুলের খেসারত। কালচারাল পারফরমেন্স। কড়া নামটা। তাসের দেশ। মানে রবীন্দ্রনাথ? ডঃ ভাদুড়ী ওদের রবীন্দ্রনাথ পড়াতেন। আঃ কি সুন্দর আইডিয়াগুলো—জীবনদেবতা, ভূমা, অরূপ। কি দিন গেছে, হায়রে। শেলী বাইরন, কীট্‌স্‌, বুদ্ধদেব, অশোক, প্রতাপ—

আর... ম্যাকলীন্‌স্‌-এর ওই বেঁটে লোকটা জিজ্ঞেস করেছিল—পেরুর জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট ক্রিশ্চান? বাঃ বাবা!

নাঃ, কালচারের দরকার নেই। তাসের দেশের নিকুচি করেছে। ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ল আবার। তার একটা একসিডেন্ট হয় না? যাক্‌ পাঠায় যেন বাড়িতে টাকার জন্য। আমায় বাড়িতে কে কবে পেয়েছে। সামনে তো পড়বে আমার পিতৃদেব—অর্থাৎ হাঁপানীর রুগী শ্রীধর সেনগুপ্ত। ওঁর খিচুনী তো দেখে নি। কি? দু টাকার তাসের দেশ? গেট আউট।

সামনে ঋতুদের বাড়ি।

ঢুকতেই পড়ল বাচ্চু। শোভনদা চকোলেট এনেছেন?

লজ্জা পেল শোভন। বলল—ভুলে গেছি রে। কাল দেব অনেকগুলো।

কে, শোভন নাকি। ঋতুর মা বেরিয়ে এলেন। কেমন আছো?

—এই তো মাসীমা। আপনারা কেমন?

—চলে যাচ্ছে। ওপরে যাও। চা খাবে তো?

ওকে দেখে ঋতু অবাক হল।

চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল—কি ব্যাপার। একেবারে সকালে? বনমালী বন্ধ?

ধুপ করে শোভন বসে পড়ল। সামনে একটা বই। এ সিলেক্‌শন অফ—। ধ্যুস। গুটিয়ে একদিকে তুলে রাখল।

—মুখটা শুকনো কেন? সকালেই বৌদির ধাতানি খেয়েছো, না? ঋতু মজা করে বললে।

শোভন উত্তর দিল না। চোখ বুজে রইল।

চা এনে ঋতু বললে—কার ধ্যান করছ তখন থেকে?

—তোমার। এতক্ষণে শোভনের মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল।

কাছে উঠে এল ঋতু।

কি মিষ্টি একটা গন্ধ। চুলে ও কি তেল দেয় কোনদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। ও কাছে এলে ভীষণ ভাল লাগে। মনে হয় দূরে কোথায় যেন বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিকে একটা অদ্ভুত শান্তি। একটা হিমেল ছায়া। শোভনের ইচ্ছে হয় ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওর এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে ঋতু বললে—দুপুরে চল সিনেমায় যাই।

শোভন বললে—না।

—বুঝেছি। আমি ধার দিচ্ছি। তুমি এখনও পর ভাবো আমায়?

শোভন রূঢ়ভাবে বললে—বলেছি তো সুযোগ হলে আমিই দেখাব। অন্য কিছু বল ঋতু। তুমি জান না আমি কত কষ্ট নিয়ে তোমার কাছে—

ও থেমে গেল। তারপর জানালার দিকে চেয়ে রইল।

ঋতু বইগুলো নাড়াচাড়া করল একটু। উঠে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটা ঠিক করতে লাগলে। শোভন চোখ ফেরাল। ঋতুর আঁচলটা সরে গেছে। পেটের অনেকটা বেরিয়ে রয়েছে। ঋতু বুঝল শোভন দেখছে ওকে। ও আঁচলটা টানলে। তাতে আরো সরে গেল আবরণ। নাভিটা দেখতে পেল শোভন।

ও শিউরে উঠে চোখ বুজলে। ভীষণ কষ্ট হল ওর। ঋতু, ঋতু, আমার সোনা। তোমায় যে আমি কোথায় স্থান দিয়েছি, তা তুমিও জান না। তোমাকে আমি ভীষণ পবিত্র হিসেবে দেখতে চাই। তুমি সাধারণ হবে না। তুমি মেয়ে না, তুমি শরীর না। তুমি যে আমার ভালবাসা।

এবার শোভনের বেশ ভাল লাগল।

ঋতু নীচু হয়ে শোভনের হাত ধরল। চোখাচোখি হল।

ঋতু নীচু হয়ে শোভনের বুকের কাছে সরে এল।

ছিটকে দূরে সরে গেল শোভন। বলল—না, ঋতু।

একটু চুপ থেকে বলল—আমারও ইচ্ছে করে। ভীষণ, ভীষণ ইচ্ছে করে। কিন্তু, কিন্তু—

ঋতু জানালার কাছে গিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

পেছনে দাঁড়িয়ে শোভন আদরে গলায় বলল—এই, তোমার ঠিক এ-সপ্তাহে সিনেমায় নিয়ে যাব, দেখো। বাবা পরশু পেনসন পাবেন। ফেরো, তাকাও এবার। যাবে তো?

ঋতু ফিরল। সুন্দর করে হাসল এবার। বলল—ঠিক?

ওর ঠোঁট একটু ছুঁয়ে শোভন বলল—ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। আজ যাই, কেমন?

অপলকে চেয়ে রইল ঋতু।

রাস্তায় নেমে পকেটে হাত দিল শোভন। একটা সিগারেট আছে। নাঃ, এখন খেলে সারাদিন চলবে না। কষ্ট হয় ঋতুর জন্য। এত ভাল মেয়েটা। যদি একটা চাকরী থাকত। বাবাকে বলা যেত। বৌদি অবশ্য বাগড়া দেবে, কারণ ঋতু বৌদির চাইতেও সুন্দর। তাছাড়া এসব কেসে দাবি করা যাবে না বিশেষ। বয়ে গেল, হ্যাং ইয়োর বৌদি। ঘস্‌তো সব—ক্যাঁচ্‌ করে গাড়িটা থেমে গেল। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি!

টাকমাথা লোকটা বলল—দেখে চলতে পারো না। উজবুক—

শাট আপ, ইডিয়াট। শোভন হুংকার ছাড়ল।

লোকটা গাড়ি নিয়ে পালাল। বাঃ বেশ হয়েছে। আরাম লাগল শোভনের। ও এত যে চেঁচাতে পারে, নিজেই জানত না। পরক্ষণেই ও থমকে দাঁড়ায়। হয়তো একদিন কোন অফিসে গিয়ে দেখবে ইন্টারভিউ নেবে এই হারামজাদাই। ব্যাস, কেঁচে যাবে কেসটা। আবার ও পকেটে হাত দিল। না, সিগারেট এখন—

না ঋতু, আমায় ভুলে যাও। কি হবে শুধু শুধু। আমার দ্বারা ওসব হবে না। তার চাইতে মা-বাবার পছন্দ করা কারো সাথে ঝুলে পড়। আমার বঁধুরো আন বাড়ি যায়—কার লেখা কে জানে। ডঃ ভাদুড়ী—

এই যে শোভনদা। ইস্, চিনতেই পার না আমাদের।

চমকে ওঠে শোভন। আরে, শ্যামা। তুই কত বড় হয়ে গেছিস।

—থাক। ঢাকুরিয়ায় চলে আসার পর কোনদিন খোঁজ করতে গেলে না। মা কত বলে। শোভন একটু তাকার চেষ্টা করে। কত ছোট দেখেছে শ্যামাকে। কত শাসন করেছে, আদর দিয়েছে। অথচ সেই মেয়ে-টাই জঘন্য একটা সাজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আজ। দেখলেই ধারণা খারাপ হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, কি বলছিলে? বড় হয়ে গেছি? কি করে বুঝলে, শোভনদা?

আহা নেকু। শোভন ভাবল। বলল—লম্বা হয়েছিস কত। যাক গে, সবাই ভাল?

—বলবে না। আগে চল আমাদের বাড়ি। যাবে এখন? চল না, কত শাড়ি কিনেছি দেখাব। রেকর্ড শুনবে কাম সেপ্টেম্বরের? আমি ড্যান্স্‌ শিখছি, জান? চল, কোন কথা শুনবে না।

আড়চোখে শোভন একবার দেখে নিল। স্বল্প বেশ। তীব্র প্রসাধনের প্রলেপ। এরও পেট বেরিয়ে আছে। উদ্ধত বুক। চোখের কোণে মদির আমন্ত্রণ।

শ্যামা আবার বলল—চল না। বেশ মজা হবে। বাড়িতে কেউ নেই, জান? ছোড়দা অফিসে, আর বাড়ির সবাই শ্যামনগরে গেছে নেমন্তন্ন খেতে।

—তুই গেলি না?

—বারে, আমার পরশু টেস্ট। নাও, চল। আমার রোদ লাগছে।

শোভন হাসল। বলল—শ্যামা, তুই আর কাউকে জোগাড় করে নে। আমার কাজ আছে।

হনহন করে ও হাঁটতে লাগল। ওর আবার ঋতুর কথা মনে পড়ল। কোথায় যেন আজ একটা মিল খুঁজে পেয়েছে। ধ্যুস, এ জাতটাই কি এই! এর জন্য এত?

ও থমকে দাঁড়াল। তারপর ভাবল—নাঃ আমি একটা রাস্কেল। ঋতুকে কেন আমি এরকম ভাবছি। ও সহজ হয় শুধু আমার কাছে। ও আমার, তাই। ঋতু ঋতু—তুমি একটা ইনোসেন্ট মেয়ে। কি মিষ্টি। আহারে, তোমায় ঠিক পরশু সিনেমায় নিয়ে যাবো।

সামনে বনমালীর দোকান। আড্ডা জমেছে এতক্ষণে।

এই যে গুরু। এস, এস।

শোভন বসল।

সুজিত বলল—নে, গুরু ছাড় একখানা।

শোভন পকেট থেকে সিগারেট দিয়ে বলল—শালা, জক্ দিলি তো? ভেবেছিলাম বিকেল পর্যন্ত চালাব।

ধোঁয়া ছেড়ে সুজিত বলল—নে, থাম। বিকেলেরটা বিকেলে। তারপর? খুব যে খুশী খুশী লাগছে। ঋতুর কাছে গেছিলি? খুচরো আদর ফাদর সেরে এলি, বল।

শোভন লাফ দিয়ে খিস্তি করে উঠল—

কি বললি? সিগারেট ফেলে সুজিতও তেড়ে এল। সবাই মাঝখানে পড়ে ঠেকাল ওদের।

শোভন হনহন করে হাঁটতে লাগল। যাঃ, হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়াটা ভাল হয়নি। বিশেষ করে বাপ তুলে বলা। কি যে হয় মাঝে মাঝে।

ও ফিরল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ডাকল সুজিতকে।

আস্তে আস্তে বলল—দ্যাখ, কিছু মনে করিস না, সুজিত। হঠাৎ কেমন হয়ে গেল মেজাজটা—

সুজিত ওর হাত ধরল। ডোন্ট মাইন্ড। এ হয় রে। তোর দোষ নেই। ফরগেট ইট। আয়, বোস।

শোভন বলল—আসছি রে। পাঁচ মিনিট।

এবার বেশ ভাল লাগছে শোভনের। সত্যি, ওদের কারো দোষ নেই। এরকম সবাইরই হবে। এ হতে বাধ্য।

বাড়ি ঢুকতেই কুকুরটা ছুটে এল।

শোভন বলল—সর ব্যাটা। বলেছি তো চাকরী পেলে তোকে ভেটেরেনারিতে নিয়ে যাব।

ওর গলা শুনে তোতা বেরিয়ে এল।

কাকু, লজেন্স?

বৌদি ডাকল এমন সময়। এই রে সেরেছে। নিশ্চয় পাঁচফোড়ন বা পেঁয়াজ জাতীয় কিছু আনতে হবে। অর্থাৎ কদিন সিগারেট কেনা বন্ধ।

—শোন ঠাকুরপো।

বৌদি কাছে এসে দাঁড়াল।

সেই মিষ্টি গন্ধটা। ঋতু কাছে এলে যেমন হয়। এই মুহূর্তে খুব ভাল লাগছে শোভনের। বৌদি, তুমি একটা গ্রেট—

—শোন তোমার দাদা ফিরে এসেছেন। কয়েকদিন ধরেই অফিসে গোলমাল চলছিল। ওরা বন্ধ করে দিয়েছে অফিস।

ফ্যালফ্যাল করে শোভন চেয়ে রইল বৌদির দিকে। ঠিক যেন ঋতুর চোখ। সেই শান্তি, সেই ছায়া। অথচ সেই অসহায়তা।

বৌদি বলল— আমাদের জন্য ভাবি না। বাবা বুড়ো মানুষ, তোতা আর তুমি—তোমায় মা আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছিলেন—

শোভন বৌদির দিকে চেয়ে রইল। ঠিক সেই আগেকার মতো।

বৌদি ওর হাতটা ধরল।

শোভন সেই নরম মুঠোটা শক্ত করে ধরে বলল—এত ভাবছ কেন, বৌদি। আমরা সবাই তো আছি। যা হবার হবে। তুমি একটুও চিন্তা করো না।

ঘরে ঢুকে শোভন থমকে দাঁড়াল। আয়নায় নিজেকে একবার দেখল। আজ কিন্তু তার একটুও ভয় করছে না। এবার বোধহয় দাদার সামনেও দাঁড়ানো যায়। বোধহয় বাবাকেও জানানো যায় খবরটা।

কিন্তু ঋতুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। বলতে হবে যে পরশু হবে না। কবে হবে কে জানে। হয়তো আর কোনদিনই না।

শোভন এতদিন পরে মায়ের ফটোটার নীচে এসে দাঁড়াল।

অঙ্গনা

ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দিন
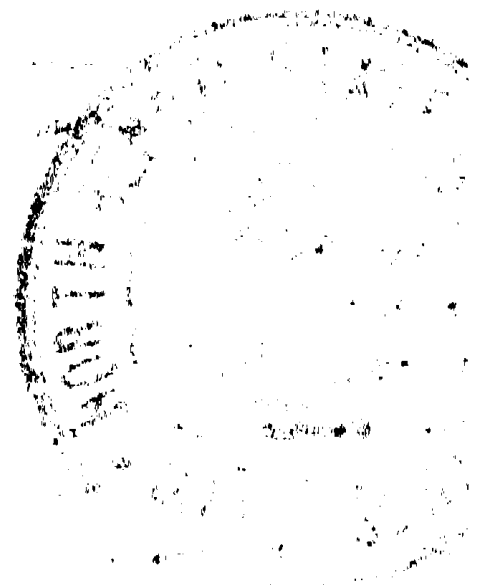
ডিসেম্বর মাস পরীক্ষার মরশুম। ন সময়ে শোনা সেই কথাটা হঠাৎ মনে ড় গেল। আমার এক বন্ধু শিক্ষকতা ন। পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে গিয়ে । মনের উপর দিয়ে ভাবনার তুফান । যায়। মনের ভার হালকা করার জন্য দিন কথাটা পাড়লেন আমার কাছে। ; বছর আপার প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় ন গার্ড দেন। খাতা আর প্রশ্নপত্র ার পর আর সব ভুলে তিনি তাকিয়ে কন মেয়েদের দিকে। কচি কচি সব য়। চুল আঁচড়ানো, মাথায় ফিতে, পায়ে তো। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ন তন্ময় হয়ে যান। হঠাৎ তাঁর মনটা য় ভরে ওঠে। ওদের ঠোঁটের কোণগুলি ন ফ্যাকাশে। ভিটামিনের অপ্রতুলতায়ই টা হয়েছে। মুহূর্তে তাঁর মনটা ভারী । ওঠে। সব অভিযোগ গিয়ে জমা হয় র মা-বাবার বিরুদ্ধে। বাচ্চাদের দিকে বাবারা নজর দেন না নাকি অভাবে কম হচ্ছে? এই কথাটাই তিনি জানতে তেন আমার কাছে। এই প্রশ্নের সরি কোন জবাব দেওয়া খুব সহজ —আজো এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে াছি আর পাশাপাশি কতকগুলি জবাব কে ভীষণ তোলপাড় করে।

অভাব তো আমাদের দেশে নির্মম য়। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের কিছু ও অনস্বীকার্য। ছেলেমেয়ে স্কুল যেতে ু করলে মা-বাব অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। ন থেকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য র পেছনে সবসময় লেগে থাকতে হবে । টিকটিক করতে হবে না এবং কথা না নার জন্য বিরক্ত হতে হবে না—এসবই র মধ্যে গুনগুনিয়ে ফেরে। কিন্তু লে ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে শুরু করলে বাবার দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এসময় বাবার নজর রাখতে হবে ছেলেমেয়ে সময়ে ঘুম থেকে উঠছে কিনা, সময়মত তে বসাতে হবে, ঘড়ি ধরে স্কুলে যাবার ী তৈরি করে দিতে হবে, স্কুলে পেঁৗছে দিতে হবে ও নিয়ে আসতে হবে, স্কুল থেকে আসার পর খাবারের দিকে নজর রাখতে হবে। এর পরও কিন্তু কাজ আরো থেকে যায়। বিকেলবেলা খেলাধুলার পর হাত-পা ধুইয়ে পড়াতে বসাতে হবে, নজর রাখতে হবে যাতে হোম-ওয়ার্ক ঠিক মতো করে। তারপর খাইয়ে দাইয়ে শুতে পাঠাতে হবে।

এইসব দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা অনেকে ঠিকমতো ওয়াকিবহাল থাকি না। প্রায়ই দেখা যায় ছেলেমেয়েরা ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে খুব একটা নিয়মানুবর্তী নয়। আবদার করে বা বায়না ধরে একটু বেশি সময় বিছানায় থাকতে চায়। এটা মা-বাবার প্রশ্রয়েই হয়। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে যাদের সকালে স্কুল তারা স্কুলে যায় আর যাদের তা নয় তারা পড়তে বসে। আর এখানেই মা-বাবার সবচেয়ে বড় ত্রুটি নিজেদের অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করে। ছেলেমেয়েকে বইপত্তর নিয়ে বসিয়ে দিয়েই অনেকে দায়িত্ব সারেন। তারপর ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো পড়ছে কিনা সেদিকে আর নজর রাখেন না। কারণ হিসেবে তাঁরা বলবেন, শুধু ছেলেমেয়ের দিকে নজর দিলেই তো চলবে না তাহলে যে সংসার অচল হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়ের প্রতি দায়িত্বকে তাঁরা গৌণ করে সংসারকে মুখ্য করে তোলেন। ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ফিরে আসার পর তারা খেলো কি না খেলো অনেক মায়ের অতটা নজর দেবার সময় নেই। এ সম্বন্ধে অধিকাংশ বাড়িতেই খাবার তোলা থাকে এবং ছেলেমেয়েরা নিজের খুশিমতো খায়। এ সম্বন্ধে মা-বাবার জানা দরকার যে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার মতই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চায়। কারণ, খেলাধুলার দিকে এসময় ঝোঁক থাকে বেশি। ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফেরে তখন অনেক মা-ই হয়তো একটু বিশ্রামে ব্যস্ত থাকেন। সারাদিন খাটাখাটুনির পর এই বিশ্রামটুকু তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু নিজেদের প্রাপ্য ষোলআনা বুঝে নিতে গিয়ে সন্তানের প্রতি যে ঘোরতর অবিচার হচ্ছে সেটা তাঁদের প্রায়ই খেয়াল থাকে না।

সন্ধ্যেবেলা ছেলেমেয়েরা পড়তে বসে। এসময় বাবা অফিস থেকে ফেরেন। কিন্তু তিনি ক্লান্ত। ছেলেমেয়ের দিকে নজর দেবার অবসর তাঁর নেই। আর মা রান্নাঘরে রাতের খাবারের জোগাড়ে ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা কেমন পড়াশোনা করছে সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর দেবার দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা কেউ ক্লান্ত এবং কেউ ব্যস্ত। সুতরাং ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করলো নিজের খুশিমত। অনেকদিন ধরেই একটা রেওয়াজ আমাদের দেশে চলে আসছে। ছেলেমেয়েরা স্কুল যেতে শুরু করলেই প্রাইভেট টিউটরের উপর মা-বাবারা তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন এবং মনে করেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁদের আর খোঁজখবর নেবার কোন প্রয়োজন নেই। সামর্থ্যে কুলোক আর না কুলোক প্রাইভেট টিউটরের দিকে এখন সকলের ঝোঁক। প্রাইভেট টিউটর রাখা হোক ক্ষতি নেই কিন্তু এরপরও ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে মা-বাবার অনেক কিছু করণীয় থাকে। সে সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর বা ছেলেমেয়ের পেছনে সেটুকু সময় ব্যয় করার অনেক অসুবিধা থাকে মা-বাবার। এর ফল হয় উল্টো। প্রাইভেট টিউটরের কাছে ছেলেমেয়েরা যেটুকু পড়ার পড়ে। তারপর আর নয়। এতদিনে ওরা জেনে যায় যে, বাড়ির মাস্টারমশাই ছাড়া পড়াশোনার খোঁজ নেবার আর কেউ নেই।

মা-বাবার এতটুকু সময় নেই ছেলে-মেয়ের দিকে নজর দেবার। এই অজুহাতের বুঝি কোন সদুত্তর নেই। অবিবাহিতদের বলতে শোনা যায় যে সময় কাটছে না। আর বিয়ে হলেই সময়ের বড় অভাব ঘটে। শুধু ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই নয়—এই অজুহাত দাঁড়

কারিরে অনেক দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়ার একটা প্রবণতা দিনে দিনে আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক বন্ধু আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেও আমরা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে একদম সময় পাই না। সংসারের কাজ হোল 'হোলটাইম জব'। একথা মনে রেখে সময়টাকে সুষ্ঠুভাবে ভাগ করে নিতে হবে। কেউ কেউ এমন করেন যে সকালবেলা চা খেয়ে একবার কাগজটা না নিয়ে বসলে চলে না। সংসারের সব কাজ গুছিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে এবং স্বামীকে অফিস পাঠিয়ে তারপর খবরের কাগজ নিয়ে বসা চলতে পারে। তখন মোটামুটি অবসরও থাকে। কিন্তু তা না করে সাতসকালে খবরের কাগজ নিয়ে বসলে সারাদিন কাজ করেও আর অবসর পাওয়া যায় না। সকালে উঠে সংসারের কাজ শুরু হয় আর রাত্তিরে ঘুমানো পর্যন্ত সেই কাজ চলে। প্রায় সারাদিনই কোন না কোন কাজ থাকে। কিন্তু কোন সময়ই সংসারের কাজকে ভারস্বরূপ মনে করলে চলবে না। জানতে হবে যে এরই মধ্যে সবদিকে নজর দিতে হবে। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেওয়া পর্যন্ত এর কোনটাকেই লঘু করে দেখলে চলবে না। কেউ যদি সারাদিন রান্নাঘরে কাটিয়ে দেন আর ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেবার ফুরসত না পান তো সে দোষ তাঁর নিজের। কোন অজুহাতে সে দোষ কাটানো যায় না। ছেলেমেয়েদের খাবারের দিকে নজর রাখতে হবে এবং তাদের পড়াশোনার দিকেও।

প্রাইভেট টিউটর পড়িয়ে যাওয়ার পরও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ একঘণ্টা বা দেড়ঘণ্টা পড়াই যথেষ্ট নয়। হোম-টাস্ক ছেলেমেয়েরা ঠিকমত করছে কিনা সেটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মা-বাবার সহযোগিতা প্রয়োজন। তার অর্থ এই নয় যে মা-বাবা নিজে হোম-টাস্ক করে দেবেন। দায়িত্ব সংক্ষেপ করার জন্য কেউ কেউ তাও করেন। কিন্তু এতে ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বরং মা-বাবাকে নজর রাখতে হবে যাতে ছেলে-মেয়েরা নিজেরা মাথা খাটিয়ে নিজেদের কাজ করতে পারে। সেজন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। কোন কোন বাড়িতে দেখা যায় যে ছেলেমেয়ে পড়তে বসেছে আর মা-বাবা গল্প করছেন। রেডিও বাজছে। মার হাতে উলের কাঁটা ঘুরছে, রেডিও চলছে আর সেই সঙ্গে গল্পও। আর ওঁরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে ছেলে-মেয়ে ওঁদের সামনে বসেই পড়াশোনা করছে। কিন্তু একটু নজর চালিয়ে দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে ছেলেমেয়ে চুপচাপ মা-বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁদের কথা হাঁ করে গিলছে। মা-বাবার মনে রাখা প্রয়োজন যে এই পরিবেশে পড়াশোনা হয় না। ছেলেমেয়ের সামনে গল্প হলে ওরা কিছুতেই পড়াশোনায় মন দিতে পারে না। তায় যদি আবার রেডিও চলে তাহলে তো কথাই নেই। ছেলেমেয়ে-দের পড়াতে বসিয়ে পুরোপুরি মনোযোগ সেদিকেই রাখতে হবে। না হলে গল্প করা, উল বোনা আর রেডিও শোনাই হবে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা হবে না। আর যদি হয়ও তবে তা শুদ্ধ হবে না। এজন্য অনেক সময় ছেলেমেয়ের উপর অযথা লাঞ্ছনা করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে আগে নিজেদের দোষ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

এ সম্বন্ধে আরো একটা অজুহাত হাতের কাছেই হাজির। বাড়িতে স্থানাভাব। শোবার, পড়বার এবং বসবার ঘর একটাই। বাড়ির লোক তাহলে বসবে কোথায়? আর দুজন একসঙ্গে বসলে তো একটু কথা-বার্তা হবেই। স্থানাভাবের কথাটা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু তা বলে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার সময়টুকু তো দিতে হবে। এসময় মা-বাবা এবং অন্য কেউ যদি চুপচাপ বসতে না পারেন তো তাঁরাও বই পড়তে পারেন। আসল কথা হলো যে, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সময়ে কোন গোলমাল করা চলবে না। এ সম্বন্ধে মা-বাবা নিজেদের ছেলেবেলার কথা মনে করলে সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পড়তে বসার জন্য দেশী ব্যবস্থা অর্থাৎ মেঝে বা চৌকিতে বসে পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করতে পারলে সর্বোত্তম এবং সাধ্যানুযায়ী চেয়ার-টেবিলের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু বিছানায় বসে পড়তে দেওয়া চলতে পারে না। বিছানায় বসলেই পড়ার চেয়ে শোয়ার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে ছেলেমেয়েরা বিছানায় বসেই পড়াশোনা করে। তারা শোয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেমেয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ছে। মা-বাবার কিছুটা প্রভাব এখানেও আছে। তাঁরাও প্রায়ই বিছানায় কাত হয়ে গল্পের বইটাই পড়েন। অন্য সময় যাহোক ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সময় এটা না হলেই ভালো। ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসিয়ে নিজেদেরও বসে থাকতে হবে। এর ফলে ছেলেমেয়েরা সহবতেও অভ্যস্ত হবে।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ের খাবারের দিকেও নজর রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে নানান কথা ওঠে। জিনিসপত্রের যা দাম, ছেলেমেয়েদের আর কি খাওয়াব। কিন্তু নিত্য আহার্যের তালিকায় এমনসব জিনিস রাখতে হবে যা প্রোটিন এবং ভিটামিন দুইই আছে। এমন খাবারদাবার কিছু নিশ্চয়ই আছে যা আয়ত্তের মধ্যে এবং বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। এজন্য শাকসব্জী এবং সহজলভ্য ফলমূলের দিকেই নজর দিতে হবে। খাবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছেলেমেয়ে ঠিক সময়ে ঘুমতে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। পাশাপাশি আর একটা কথাও মা-বাবাকে মনে রাখতে হবে যে পড়াশোনা এবং খাওয়াদাওয়ার দিকে যেমন নজর তেমনি নজর থাকবে ছেলেমেয়ের মনোরঞ্জনে। আনন্দ হাসিখুশী গান গল্পই ছোটদের মানসিক গঠন সুসম্পূর্ণ হতে সহায়তা দেয়। আবার সতর্কও থাকতে হবে। যা ওদের মনের উপর কুপ্রভাব ফেলবে তা থেকে ওদের দূরে রাখতে হবে।

ছেলেমেয়ের প্রতি মা-বাবার অনুশাসন যত কঠোর হবে তেমনি তাঁদের ধৈর্যশীল হতে হবে। কথায় কথায় বিরক্ত হওয়া বা মারধর এবং তিরস্কার করা কখনো সমীচীন নয়। এতে হয়তো ওদের ধারণা হবে যে, মা-বাবা ওদের তেমন ভালবাসে না এবং মা-বাবাকে ভয় করে দূরে থাকতে চাইবে। কিন্তু তাতো ঠিক নয়। মা-বাবা ছেলেমেয়েকে না ভালবেসে পারেন না। ছেলেমেয়েদের দিকে নজর রাখতে গিয়ে তাই নিজেদের সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। তবেই ছেলেমেয়েদের সমুচিত বিকাশ ঘটবে।

মহিলা আইন কলেজ

সবাই শামলা মাথায় আদালতে দৌড়বে এমন কোন কথা নেই কিন্তু আইনের শিক্ষা ও পাঠ বুদ্ধিবৃত্তিকে যে অনেক শাণিত, মার্জিত ও প্রাখর্যমণ্ডিত করে এ নিঃসন্দেহ, উপরন্তু বিধি, রীতি ও নীতির সঙ্গে সমাজজীবনের ব্যবহারে যেখানে সংঘাত বা বিসম্বাদের সূচনা হবে সেখানেই সুষ্ঠু সমাধানের পথ দেখিয়ে দেবে।

সাধারণ মেয়েদের বেলা ত বটেই এমনকি অন্যদিকে সুশিক্ষিতা মেয়েদেরও আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে ওয়াকিবহাল না হওয়ার সুযোগ নিয়ে সম্পত্তি বা অন্যান্য ব্যাপারে অনেকে প্রতারণা করে। আইন না-জানার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার থাকে না—অথবা, অকারণ মামলায় জড়িয়ে অর্থ-নষ্ট, মনে কষ্ট ও ভোগান্তির শেষ থাকে না।

শুধু এই দিকই নয়—শান্তসুন্দর পরিবেশে পাঠগ্রহণ করার ব্যাপারটা একেবারে তুচ্ছ করার নয়। তাছাড়া জীবিকা হিসেবে আইনে তো মেয়েদের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। শিক্ষিত মেয়েরা এদিকে ঝুঁকছে ক্রমশই। এইসব দিক বিচার করেই দক্ষিণ কলকাতায় (৬।১ সুইনহো স্ট্রীট) মহিলা আইন কলেজ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আওতায় আজ এক বছরের ওপর শুরু হয়েছে। যাঁরা অফিসে চাকরী করেন বা সারাদিন সংসারের নানান কাজে যাঁদের দিনের বেলায় সময় নেই, সন্ধ্যাবেলা ছটা থেকে সাড়ে সাতটা তাঁদের প্রাত্যহিক ক্লাশ করার সুবিধা এখানে করা হয়েছে।

মেয়েদের দিক থেকে এমনি ধরনের কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যে আইন কলেজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

—প্রমীলা

শীতের ফুল

অল্প অল্প শীত পড়েছে। এখন হাল্কা কিছু গায়ে দিলে আরামবোধ হয়। সকালের কাঁচা রোদ, দুপুরের নীল আকাশ আর রাতের তারা-ভরা অন্ধকার বেশ আমেজ এনে দেয়। বাইরের এই সুন্দর মোলায়েম পরিবেশকে যদি ঘরে আনা যায় ঘরও হ'য়ে ওঠে মোহনীয়।

ভোরবেলায় চোখ খুলতেই যদি এক-গুচ্ছ রজনীগন্ধা কিংবা গোলাপের গন্ধে ঘরটা ভরপুর হয়ে থাকে তবে কার মনটাই না খুশী-খুশী, কাব্যিক, রোমান্টিক হয়ে ওঠে? অথচ আমরা ইচ্ছে করলে অল্পায়াসেই এরকম রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারি। শীতকাল তো ফুলেরও কাল। অন্য সময়ের দুর্মূল্য ফুল দিয়ে আমরা ইচ্ছে থাকলেও ঘর সাজাতে পারি না। মনের সেই খেদটা আমরা স্বচ্ছন্দে এখন মিটিয়ে নিতে পারি।

দেখুন আপনার বাগানে কিংবা টবের গাছে কত মরশুমী ফুল ফুটে আছে। নয়তো আপনার পাশের বাড়ীর বাগান থেকে কয়েকটা ফুল চেয়ে নিন। তারপর সেগুলোকে যত্ন করে একটা পাত্রে জল ঢেলে তাতে রেখে দিন, পরে অবসর মত আপনি মনোযোগ দিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে

একজন জাপানী মহিলা ফুল সাজাচ্ছেন

ইকেবানা

দিন। লম্বা, চওড়া নানা ধরনের ফুলদানিতে ফুল রাখুন। ফুলের মাঝে মাঝে পাতা দিয়ে ফুল সাজাবেন তাতে ফুলের সৌন্দর্য বাড়বে বই কমবে না। একই আকারের ফুল না কেটে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের ফুলের ডাঁটা-গুলো কেটে ফুলগুলিকে সামনে-পিছনে এপাশে-ওপাশে হেলে সাজাতে হবে যাতে সব ফুলগুলিই একপাশে না ভিড় করে। তাতে ফুলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়। বড় বড় ফুলের সংগে ছোট ছোট কয়েকটি ফুল বেশ আকর্ষণীয় হয়। ছোট ছোট নানা রং-এর ফুলের একত্র সমাবেশও দেখতে বেশ প্রীতিপ্রদ হয়। সাদা ছোট কোন ফুলের সংগে হালকা (যেমন পিঙ্ক গোলাপী হলুদ) অন্য রং-এর ফুল মোটেই বেমানান নয়। যথেষ্ট সতর্ক হয়ে ফুল সাজাতে হয় নয় তা ফুলের স্বগীয় সৌন্দর্য কোনরকমেই বিঘ্নিত হয় সেটা কারুরই কাম্য নয়।

একদল লোক আছেন যাঁরা ভাবেন গন্ধ না থাকলে ফুল সাজিয়ে লাভ কি? ঘর যদি মিষ্টি গন্ধে ভরপুর না থাকে তবে শুধু চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু ভাল কোন জিনিস দেখলে চোখের সংগে সংগে মনটাও আনন্দে ভরে ওঠে। ভাল কোন কথায় নিশ্চয়ই কোন ঘ্রাণ থাকে না, তবুও তাতে আমাদের আনন্দই হয়।

গন্ধ ছাড়া রঙদার ফুল দিয়েও যেমন সুন্দরভাবে ঘর সাজানো যায়, তেমনি গাছের পাতা ঠিক ঠিক আকারের কেটে নিয়েও ঘর সাজালে চোখ বেশ আরাম পায়। স্বাভাবিক গাছপালা, উদার আকাশ, এক কথায় প্রকৃতির মধ্যে আমরা স্বাধীনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে পারি ও গ্রহণ করতে পারি।

কসমস, এ্যাস্টর, সান ফ্লাওয়ার, ডায়ান্‌থাস, জিনিয়া, ক্লার্কিয়া, ডালিয়া, মেরিগোল্ড, সুইট সুলতান, সুইট পিস, স্যালভিয়া, হলিহক, কারনেসান, ক্যানডিটাফট, নাইজেলা, কর্নফ্লাওয়ার, ক্যালেনডুলা, ন্যাসটারসিয়াম, ডেইজী, স্যাপোনারিয়া, রোজ, সুইট উইলিয়াম, ফরগেট মি নট, পপি, লার্কস্‌পার, এ্যান্টিরিনাম, প্যানজী ইত্যাদি নানারকম ফুল শীতকালেই ফুটে থাকে। এইসব ফুলের মধ্যে ধরুন সুইট উইলিয়াম ফুল খুব সহজেই ফোটানো যায়। সুইট উইলিয়ামের বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। গোবর, রেড়ির ক্যাস্টর কেক সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। বীজ থেকে গাছ হয়ে ফুল ফুটতে একমাস থেকে দেড় মাস সময় লাগবে। এই ফুলে সাদা, লাল, পিংক এই তিন রং-এরই হয়ে থাকে। সুইট উইলিয়াম মাটিতে কিংবা টবে লাগালেই ফুল ফুটবে।

এবারের শীতে অনেকেই ইতিমধ্যে বেশ যত্ন করে টব, বাগানে বীজ ফেলে চারা লাগিয়ে ফুল ফুটিয়ে ফেলেছেন। কারো কারো বীজ হয়তো চারাতে পরিণত হচ্ছে। মেয়েরা অনেকেই সারাদিন বাড়ীতে থাকেন। তাঁরা তাঁদের কাজের ফাঁকে টবে গাছে ফুল ফোটাতে পারেন। সারাদিন খাটাখাটুনির পরে যে কোন মহিলাকে ফুলদানিতে সাজানো একগুচ্ছ ফুল শান্তি দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জাপান গিয়ে জাপানি ফুল সাজানোর অপূর্ব দেখে মুগ্ধ হবার কথাই মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন, "কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে আমাকে এদেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত চিন্তা, কত আয়োজন, কত নৈপুণ্য আছে তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ ও সংগীত যে এদের কাছে এত প্রবলভাবে সুগোচর কাল আমি ওই দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

...কোবেতে একজন শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এত অভিনিবেশের সংগে এই যে ফুল সাজানো তোমরা সম্পন্ন কর এর সম্বন্ধে তোমাদের এত বেশী যে সতর্কতা এর অর্থটা কী? তিনি আমাকে বললেন ইতিহাসবিখ্যাত একজন যোদ্ধা একদা বলেছিলেন যে, এই ফুল সাজানোর অনুষ্ঠান তাঁর যুদ্ধ ব্যাপারে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পারবে, জাপানি নিজের এই সৌন্দর্য অনুভূতিকে শৌখিন জিনিস বলে মনে করে না। ওরা জানে গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির কারণটা হচ্ছে শান্তি; যে সৌন্দর্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে এবং যে-উত্তেজনা প্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে এই সৌন্দর্যবোধ তাকে পরিশান্ত করে।"

অঞ্জলি চৌধুরী

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—টোলে পড়ে টুলো পণ্ডিত হতে চাই না, মা। ইংরেজটাই শিখতে হবে আর একটু বেশী করে। কলেজে পড়ব আমি।

মনে মনে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন মা। বয়স হয়েছে, কর্তার চাকরীও শেষ হবার সময় হয়ে এল। শরীরটাও তাঁর ভাল যাচ্ছে না কিছুদিন থেকে। জমিজমাও এমন কিছু বেশী নেই যে সংসার-খরচ চালিয়ে শহরে কলেজে পড়ার খরচ সংকুলান হবে। বর্ধমানে কলেজ নেই—তাও সেই দূর কলকাতায় বা অন্য কোন শহরে। খরচাও তো কম নয়।

সাত-পাঁচ ভেবে মা বললেন—কলেজে পড়ে করবি কি? চাকরী?

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যতীন বলে—ও আশীর্বাদ কর না, মা। দেশের ব্যবস্থাই এখন ইংরেজদের হাতে। শিক্ষা ব্যবস্থাও। ওরা আমাদের দেশী লোককে ইংরেজী শেখায় চাকর করে ওদের শোষণ যন্ত্রটা চালু রাখবার কাজে সাহায্য পেতে। দেশের লোক উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে আধপেটা খেয়ে না খেয়ে অকালে মরছে। আর এদেরই পরিশ্রমের পয়সা লুটে-পুটে নিয়ে ওরা সবাই রাজা ওদের দেশ রাজার দেশ। স্কুল কলেজে ওদের ভাষা আমাদের শেখায় নিজেদের স্বার্থে। আমাদের ভাষা ওরা শেখে না। ভাবে—এদেশের সবাই অন্ধ বধির স্থবির, দেখে না কিছু, শোনে না কিছু, বোঝে না কিছু—দুর্বল, অক্ষম, শক্তিহীন। আমাদেরও চোখ-কান আছে, শক্তি-বুদ্ধি আছে। ওদের ফাঁকিটা, ওদের দস্যুতা, চৌর্যবৃত্তিটা যে আমাদের জ্ঞানের বাইরে নয়—সেটাই সোচ্চারে জানিয়ে দিতে হবে ব্যাটাদের ওদেরই ভাষায়, আমাদের ভাষা বুঝবে না যখন। তাই আর একটু ইংরেজী শেখার দরকার, মা।

মা শিউরে উঠলেন। হাওয়ার মুখে নব-কিশলয়ের মত থর থর কাঁপতে লাগল তাঁর ওষ্ঠাধর। বললেন—বলিস কি রে? ওরা আর তোরা? ওদের বাহুবল, অস্ত্রবল, ধন-বল জনবলের কাছে কতটুকু তোরা? ওদের পেছনে লাগবি?

—পেছনে নয় মা, একেবারে সামনা-সামনি—চটপট উত্তর দেয় যতীন, সর্ববলে বলীয়ান ওরা, আমরাই বা কম কিসে? তোমাদের মত আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রীর

পরদিনই রামানন্দবাবু নিজের কলেজে নিলেন এফ-এ ক্লাসে ভর্তি করে

সন্তান আমরা। তোমাদের আশীর্বাদই বাহুতে বল, হৃদয়ে শক্তি যোগাবে। তখন আমাদের পায় কে?

হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যতীন চাইল মায়ের মুখপানে, দেখল ঈষৎ শঙ্কাকুল, ললাটে চিন্তা রেখা।

ছেলের মাথায় ডান হাতখানি রেখে মা বললেন—কিছু অন্যায় করবি না, বল।

—আমার চেয়ে তোমার ছেলের কথা তুমিই বেশী জান, মা। বেশী কিছু তো চাই না আমরা। শুধু দেশের লোক নিজেদের পরিশ্রমে দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খাবে, পরবে, রোগে ওষুধ-পাথ্য পাবে, সুখে থাকবে। পারে তো তার ব্যবস্থা করুক, নইলে সে ভার নিতে হবে আমাদেরই।

সহজ সুরে মা বললেন—যা করবি তাতে দেশের গরীবগুর্বো সবাই পেটভরে খেয়ে-পরে অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র পেয়ে সুখে আনন্দে বেঁচে থাকতে পারবে তো, বাবা?

—তারই চেষ্টা করতে হবে, মা। শুধু আমিই নয়, সে চেষ্টা করতে হবে দেশের সব সন্তান মিলে একযোগে।

চিন্তারেখা মুছে গেল। স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ছেলের চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে মা বললেন—তবে তাই কর, বাবা। ইংরিজীই পড়, যদি ও কাজটা করতে পারিস। ওর চেয়ে ভাল কাজ আর নাই। দেখি ওঁকে বলে কলেজের ব্যবস্থাটা কোথায় করতে পারা যায়।

ছোট ছেলের মত দু হাতে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ রাখল যতীন। তারপর এক লাফে উঠোন পেরিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল আনন্দ সংবাদটা সঙ্গী-সাথীদের পরিবেশন করতে।

কলেজে ভর্তি হবার আর বেশী দেরী নেই। যথাকর্তব্য নির্দেশ দিয়ে কালিদার চিঠি এল। মহাউৎসাহে বাকস-বিছানা গুছিয়ে মাকে প্রণাম করে ছেলে বিদায় চাইল। সজল চোখে মা বিদায় দিলেন একমাত্র পুত্রকে। যতীন দেখল—মায়ের চোখে জল। সে কি শুধু তারই মায়ের? বাঙলার তথা ভারতের ঘরে ঘরে সব মায়েরই চোখে জল—ক্রন্দসী ভারতজননী। বিচলিত যতীন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল বুঝি—চোখের জল মুছিয়ে দেশমাতৃকার মুখে হাসি ফোটাবে সে।

গরুর গাড়ীতে খানা জংশন স্টেশনে গিয়ে পশ্চিমের ট্রেন ধরল যতীন। এলাহাবাদে তার মামার কাছে যাচ্ছে সে। যতীনের মামার বাড়ী এই তো মাইল তিনেক দূরে

সারুল গ্রামে। তার মামা এলাহাবাদে রেলওয়ের কাজ করেন। থাকেন রেলওয়ের ছোট কোয়ার্টারে। ছা-পোষা মানুষ। তিনিও যে যতীনের পড়ার খরচ চালাতে পারবেন তা নয়, তবে কালিদাকে আশা দিয়ে চিঠি লিখেছেন যতীনকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিতে—যাই হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

দশ

যথাসময়ে যতীন পৌঁছল এলাহাবাদে মামার বাসায়।

তখন এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার (কলেজ) অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসীর সম্পাদক) মশায়। তিনি যেমন সদাশয় ও দূরদর্শী, তেমনি সদালাপী ও পরোপকারী। প্রবাসী বাঙালী মাত্রেই যেতেন তাঁর কাছে নানা সৎ পরামর্শের জন্যে।

পরদিন সকালে মামা নিয়ে গেলেন ভাগ্নেকে রামানন্দবাবুর কাছে।

প্রথম দর্শনেই ছেলেটির বীরত্বব্যঞ্জক সুশ্রী চেহারা রামানন্দবাবুর মনে একটা বিশেষ ছাপ এঁকে দিল। তিনি জিজ্ঞেস করে জানলেন ছেলেটি এফ-এ পড়তে চায় কিন্তু কলেজে পড়ার খরচ চালাবার মত অবস্থা নয়।

রামানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন—পড়তে চাও কেন? সরকারী চাকুরী করবে?

—আজ্ঞে না সার, গোলামী করব না। যারা আমাদের গোলাম করে রাখতে চায়—তাদেরই গোলামী করাবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা পেতে চাই। ইংরেজ সরকারের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই তাদেরই অত্যাচারের চরম—শাসনের নামে শোষণ প্রণালীটা। তার জন্যে দরকার ইংরেজী ভাল করে আয়ত্ব করা। পড়তে চাই এই জন্যে।

রামানন্দবাবুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চমক, বললেন—পারবে তো?

—চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, সার? যত্নে কৃতে যদি না সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ—চেষ্টা করেও যদি না হয়, বুঝতে হবে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়েছে—উত্তর দিল যতীন।

—তুমিই পারবে। চমৎকৃত হলেন রামানন্দবাবু।

'আগে রূপ নেহারি, পরে গুণ বিচারি'—চেহারা তো মনে ছাপ মেরেছিল আগেই, এখন বুঝলেন—চৌকোশ ছেলে, যেমন রূপ তেমনি গুণ, যেমন চটপটে তেমনি চিন্তাশীল ভাবুক। ভাব কি—উন্নত হৃদয়প্রসূত পরিমার্জিত ভাবধারা। একটি উজ্জ্বল রত্ন।

আর কথা কি—গুণগ্রাহী বিচক্ষণ রামানন্দবাবু নিজের ছেলেমেয়ে—উমেশ, কেদার, সীতা আর শান্তার গৃহশিক্ষক করে যতীনকে রাখলেন নিজের বাড়ীতে আর পরদিনই 'কায়স্থ পাঠশালা' কলেজে নিলেন এফ-এ ক্লাসে ভর্তি করে।

'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে'—যোগ্যে যোগ্যে মিলন। সোনায় সোহাগা—যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। কলেজে পড়ানোর কথা তো বলতেই হয় না, বাড়ীতেও রামানন্দবাবু অতি যত্নে জোগাতে লাগলেন যতীনের মনের খোরাক। ভিত্তি তো তৈরীই ছিল, নিজের চেষ্টায়, স্বয়ং লব্ধ অভিজ্ঞতায় তাতে বজ্রলেপের গাঁথুনির সৌধ তুললেন গুরু রামানন্দবাবু। তিনি প্রথমেই পড়ালেন ভারতের ইংরাজ রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শাসন বনাম শোষণ নীতি। তার পরেই ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডীর জীবনী, ফরাসী বিপ্লব। আর ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। কি করে খণ্ড-বিখণ্ড ইটালী পরিণত হল এক অখণ্ড ইটালীতে—গুরু সবিস্তারে বোঝালেন শিষ্যকে। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সবিস্তার ইতিহাস ও তার নিষ্ফলতার কারণও সবিস্তারে আলোচিত হল। তাঁতিয়া টোপীর রণচাতুর্য, নানাসাহেব, প্রতাপাদিত্য, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর দৃঢ়তা, অনমনীয় মনোভাব, রাণা প্রতাপের কষ্ট সহিষ্ণুতা, বাদলের বীরত্ব, শিবাজীর রণকৌশল মুগ্ধ যতীনের বীর হৃদয়ে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। অপমানক্ষুব্ধ যতীনের নিজের চেষ্টায় যার প্রাথমিক আরম্ভ তা পূর্ণতা লাভ করল সুযোগ্য শিক্ষকের সুপরিচালনায়। দিশাহারার দিগদর্শন হল—ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পথনির্দেশ পেল যতীন।

ছোটখাট ছুটিতে রামানন্দবাবু যতীনকে পাঠাতেন আশে-পাশে দূরে কাছের গ্রামে বেড়াতে। উদ্দেশ্য—দেশের ঐ সব অংশের গ্রাম্যজীবনের পরিচিতি আর গ্রাম্য হিন্দীভাষা আয়ত্ব করা। যতীন যে বিশুদ্ধ হিন্দীতে অনর্গল কথা বলতে পারে তার শুরু এখানেই। বাংলার দরিদ্র গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তো ছিলই, এখানে দরিদ্রতম গ্রাম্যজীবনের জীবিকা সংস্থান, আচার-ব্যবহার, অশিক্ষা-কুশিক্ষার সম্যক পরিচয় পেয়ে অন্তরাত্মা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল যতীনের।

—এর নাম বেঁচে থাকা, এই তার দেশ? প্রতিবিধান চাই-ই, আর যেন সবুর সয় না। মনে মনে এক খসড়াও তৈরী করে নিল যতীন। দৈনিক রুটিন মত পড়াশুনোর পর রাতের নিরিবিলিতে এ নিয়ে আলোচনা হত শিক্ষকের সঙ্গে।

বছর দুই পরে রামানন্দবাবুর আশীর্বাদ-পূত যতীন এফ-এ পাশ করে ফিরল চান্নায়। শুধু কি কলেজের বাঁধা-ধরা কেতাবী বিদ্যায় পাশ করা—ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি, শোষণনীতি, শাসননীতি — বিভিন্ন নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা লাভ করে ফিরল সে। মনে এই, আর দেহে রূপ কি! একে তো স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ, তার ওপর পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়া, বয়সটাও বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে পূর্ণযৌবন—রূপ ফেটে পড়ছে। বৃষস্কন্ধ বৃঢ়োরস্ক, দীর্ঘবাহু, সিংহবিক্রান্তগতি, আয়তোজ্জ্বল চোখ, প্রফুল্ল মুখ,—সকলের মনে সম্ভ্রম জাগানো চেহারা।

মুখে হাসিটি লেগে আছে, কিন্তু হৈ-হুল্লোড় ফুরিয়ে গেছে। তবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা, আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি নেই। অল্প একটু গাম্ভীর্য এলেও গল্পগুজব, তর্ক আলোচনার কমতি নেই এতটুকু। নিজের মত আর পথ পরিষ্কার বুঝিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে সহজেই।

যতীন থাকে গ্রামে। ছোট গ্রাম—কটাই বা মন্দির, শিব, শালগ্রাম আর বিশালাক্ষী। বৌদি মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেন, বাড়ীতে সত্যনারায়ণ দেন ছেলের কল্যাণে। খাওয়া-দাওয়া ঘরগেরস্থালীর কাজ সেরে মেয়েদের মজলিস বসে অন্দরে। যতীনের বিয়ের জল্পনা-কল্পনা হয়। কার দেখা কোনখানে কাদের ডাগর-ডোগর মেয়েটি কত সুন্দরী, কত কাজের—তার ফিরিস্তি দেন অনেকেই। উৎসুক বৌদিও প্রশ্ন করেন, কত কি—জানতে চান কত খুঁটিনাটি।

যতীনের কানে ওঠে—সরাসরি মাকে বলে—ও কথা তুলো না মা, বিয়ে করব না।

মা বলেন—শোন কথা বিয়ে করবি না কি? আমরা কি চিরকালের? তোকে দেখাশোনা, সেবাযত্ন করবে কে?

—সে যাই হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—সে ব্যবস্থা নয়, অব্যবস্থা। আর তাই যখন করতেই হবে, তখন এ ব্যবস্থাটায় আপত্তি কিসের? তুই থাকবি কাজকর্মে বাইরে বাইরে, আমরা পড়ে থাকব এখানে। তিন কাল গিয়ে চারকালে ঠেকেছে, কত দিন আর সংসারের ঘানি ঘোরাতে পারব? শুধু কি তোরই সেবা-যত্নের দরকার হবে না আমাদের? ঘরের মেয়ে বউ ছাড়া আর কেউ পারে না—বেশ শক্ত হয়েই বললেন মা।

মায়ের মুখপানে চেয়ে চোখ নামালো যতীন।

মা বলতে থাকলেন — সংসারে থেকে বিয়ে না করা পাপ। যারা বিয়ে করে না তাদের বেশীর ভাগই পাপ করে। সেই পাপের পথটা নিজেদের হাতে খোলা রেখে যাব ভেবেছিস তোর জন্যে? বলবি হয়তো—স্ত্রী কাজের বাধা। ভুল ধারণা—তা কখনো নয়। স্ত্রী সহধর্মিণী, সহকর্মিণী—কর্মশক্তি আর প্রেরণা যোগাবার উৎস। সেটা জানিস না বলেই তোদের ঐ ভুল ধারণা।

তোকে কিছু ভাবতে হবে না। মেয়ে দেখবার ভার আমার। দেখে-শুনে মা-লক্ষ্মীকেই বরণ করে ঘরে তুলব, দেখিস। পরে বুঝবি।

তর্কবাগীশ যতীনের যে তেজের স্ফুলিঙ্গ মাত্র সেই তেজোময়ী মায়ের কাছে সমস্ত যুক্তি সিদ্ধান্ত উবে গেল তার।

—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, মা, বলে দুঃসাহসী যতীন একটা অজানা আশঙ্কায় কম্পিত পায়ে বেরিয়ে গেল মায়ের সুমুখ থেকে।

কিছুদিন পরে বৌদির পছন্দসই বেঁচি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে মহাধুমধামে বিয়ে

হল যতীনের। তা বৌদির পছন্দ বটে, ভায়া, হিরন্ময়ী তা হিরন্ময়ীই বটে—সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা। আর গুণে? শুধু সরস্বতীই বা বলি কি করে? বারে বারে যা দেখেছি—সরস্বতী, শকুন্তলা, দময়ন্তী একাধারে। ঐ যাঃ, মায়ের রূপ-গুণের বর্ণনা করতে নেই, সুতরাং—

—তাই নাকি দাদু? মায়ের রূপ বর্ণনা করতে নেই? তাহলে আপনাদের নিত্য পূজার ধ্যানমন্ত্র — 'জটাজুট সমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাং' গুলো কি?

—ওরে শালা, বিচ্ছু কম নয় তো—পিঠে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে স্মৃতিদাদু বললেন—হবে নাই বা কেন? 'সংসর্গজা দোষ গুণাঃ ভবন্তি' যেমন কালভৈরব তেমনি জোটে তার চেলাচামুণ্ডাগুলো। ফাঁকি দিয়েছ কি মরেছ। শাস্ত্রাচারে না হলেও দেশাচারে বলে—বুঝলে ভায়া। সুতরাং ক্ষান্ত হলাম।

হিরণ্ময়ীর কথা শুনতে চাও তো শুনো মেয়েদের কাছে—যারা তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। এই রাণী রয়েছে, দু-চারজন বিদুষী সন্ন্যাসিনীও আশ্রমে আসেন মাঝে মাঝে। আমার চেয়ে অনেক ভাল করে জানেন তাঁরা হিরণ্ময়ীকে।

—আমার কথাটি ফুরুলো—বলে চুপ করলেন স্মৃতিদাদু।

—তা বলে নটেগাছটি মুড়ুলো না দাদু। তার কত ডালপালা, ফুল ফল, ডালে ডালে কত পাখপাখালির কলকাকলী, জানেন তো?

—ইস, তা আর জানি না? দেখেছ নটে গাছ? বল দেখি কেমন?

—কেন উঠোনের ঐ সজনে গাছটার মতই আশ্রমের নটে গাছ। এত সহজে মুড়োয় কি? বলে চাইলুম দাদুর মুখপানে।

—তা বটে, তা বটে, উদ্ভিদবিজ্ঞানী মশায়, ওরই মত রেকারিং হারে ডালপালা গজালে কি মুড়োয় সহজে? কুড়ুল দিয়ে মুড়তে হয়—বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন বুড়ো।

ছোট মেয়েটি দু কাপ চা নিয়ে এসে রাখল দুজনের সামনে।

—দাদু, ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস—দু হাত যোড় করে বললুম।

—ঐ দেখ, ভায়া, বয়সের দোষে ভুলেই গেছি নেশা করবার বয়স এখনও হয় নি তোমার। বুড়োর ইঙ্গিতে একটি চায়ের কাপ নিয়ে গিয়ে মেয়েটি এনে রাখল এক বাটি গরম দুধ। খেতেই হবে কিছু। দুধটুকু খেয়ে নিয়ে স্মৃতিরত্ন মশায়কে প্রণাম করেই ছুট দিলুম আশ্রমের পথে।

অনেকটা বেলা আছে তখনও। বাড়তি খাবারগুলোর সদগতি করবার জন্যে প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি খিচুড়ী রান্না করে কলাপাতা কেটে ধুয়ে রেণুদা গেছে মেটেপাড়ায় লোক ডাকতে। সাঁওতালপাড়া থেকে ডেকে আনলুম—মংলা, কালো, সুপল, ঝুমরু, মংরু, ঝাল্লু, মাল্লু, আরও কজন সুস্থ সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের।

আঙিনায় সারি সারি বসিয়ে পরিবেশন করে খাওয়ানো শেষ হতে রাত আটটা।

দিনে অনেক বেলায় খাওয়া হয়েছে, স্বামীজী শুয়ে পড়লেন সকাল সকাল। আমরাও গেলুম যে যার বিছানায়।

এগারো

আজকাল সকালের সব কাজেই তাড়াহুড়ো। সংক্ষেপে প্রাতঃ ভ্রমণটা সেরে তাড়াতাড়ি ফিরেছি আশ্রমে। উষা পিসি সেই যে দুদিনের জন্যে বাড়ী গেছেন—দশ দিন হল ফেরবার নামটি নেই, হয়তো আর ফিরবেন না—কদিন বড় নির্যাতন সহ্য

সরাসরি গেলেন মহারাজার খাস সচিব অরবিন্দ ঘোষের কাছে

করতে হয়েছিল তাঁকে। কাজেই রান্নাঘরের ভার পড়েছে দুখানা ছোট অপটু হাতে। সহকারী রেণুদা—সেই যা ভরসা।

প্রথম দিন খেতে দিয়ে শঙ্কায় সংকোচে বসেছি আড়ষ্ট হয়ে। খেতে খেতে স্বামীজী খুশি মনেই জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেমানুষ অভ্যাস নেই—রান্না শিখলে কোথায়? জীবন ভোর দুবেলা বেঁধেও তো উষার হয় না এমনটি।

কোলের ছেলে, তাই মায়ের কাছে কাছে থেকে দেখে শেখা ছিল কিছুটা। বোলপুরে বাৎসল্য বৌদি স্নেহ করে ছেড়ে দিতেন সব কাজ। হাতে-কলমে শিক্ষাটা তাঁরই কাছে।

হাত-পা ধুয়ে মহাউৎসাহে বসে গেছি জলখাবার তৈরী করতে। আশ্রমের বাইরে চমৎকার রংচংয়ে ছইওয়ালা গরুর গাড়ী থেকে দুজন ভদ্রলোক নেমে এসে প্রণাম করে বসলেন স্বামীজীর কাছে। একজন কনককান্তি অতিসুপুরুষ, পাতলা গড়ন, বয়স বছর চল্লিশ, পরণে ধোপদুরস্ত জড়িপাড় কোঁচানো ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে মোজা, চোখে সোনার ফ্রেমে চশমা, আঙুলে হীরের আংটি—সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ, অন্যজন উজ্জ্বল শ্যামতনু, স্বাস্থ্যসুন্দর, বলিষ্ঠ বপু, গম্ভীর প্রকৃতি, হাতে কালো চামড়ার ডাক্তারী ব্যাগ।

প্রথমজন জগদাবাদ গ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ রেশম বস্ত্র ব্যবসায়ী বিখ্যাত ধনী শশীভূষণ হালদার মশায়ের বড় ছেলে শ্রীকালীপদ হালদার, সঙ্গী তাঁরই গৃহচিকিৎসক।

কুশলাদি বিনিময়ের পর একটু চুপ হতেই স্বামীজীর সঙ্গে ও'দের দুজনকে দিলুম জলখাবার। রেণুদা দিয়ে এল গাড়োয়ানকে।

জল খাওয়া শেষ হলে হালদার মশায় বসলেন স্বামীজীর কাছে কিছু আলোচনার জন্যে, পাশে ডাক্তারবাবু। সামনেই রান্নাঘরের দাওয়ায় বসেছি বঁটি আর তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে।

হালদার মশায়ের কথা যেমন স্পষ্ট তেমনি মিষ্টি। বললেন—বড় কষ্ট পাচ্ছি, স্বামীজী, রোগজীর্ণ শরীরটা নিয়ে। একটু ঠাণ্ডা পড়লেই হাঁপানিটা বাড়ে খুব। সে যে কী কষ্ট — নিঃশ্বাস নিতে পারি না। মনে হয় গেল বুঝি দম বন্ধ হয়ে। এই চলে দিনের পর দিন কতদিন। কোন কাজ তো দূরের কথা—সৎ-অসৎ কোন রকম চিন্তা করবারও প্রবৃত্তি বা শক্তি কিছুই থাকে না যেন।

অভিজ্ঞ প্রাচীন কেউ কেউ বলছেন সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে। ইষ্টমন্ত্র জপ করলে কাজ হবে। সত্যিই কি এতে কিছু ফল হয় স্বামীজী?

করুণা-কোমল স্নেহভরা দৃষ্টিতে হালদার মশায়ের মুখপানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন স্বামীজী। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মৃদু হেসে বললেন—তা মন্দ বলে নি। মনকে ডাইভার্ট করবার যত রকম উপায় আছে, এটিও তার মধ্যে একটি। তবে দীক্ষা নেবার আগে কিছু প্রস্তুতি আছে। জানের দরকার—জানতে হয় কিছু এ সম্বন্ধে।

—কী, স্বামীজী, কী জানতে হয় দীক্ষা সম্বন্ধে—আগ্রহভরা আকুলতায় প্রশ্ন করলেন হালদার মশায়।

—বিশেষ কিছু নয়, গুরু, দীক্ষা আর মন্ত্র—এই তিনটিকেই জানতে হয় যথাযথভাবে। মনে কর 'গুরু'। গুরু কে? কী কাজ তাঁর?—প্রশ্নভরা চোখে চাইলেন স্বামীজী।

হালদার মশায় বললেন—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ
শ্রীগুরবে নমঃ।।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচরম,
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ
শ্রীগুরবে নমঃ।।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—অর্থাৎ মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন স্বামীজী।

—মানে—যিনি জ্ঞানের কাজল শলাকা দিয়ে অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধজনের চোখ ফুটিয়ে দেন, সেই গুরুকে প্রণাম। আর অখণ্ডমণ্ডলাকারে যিনি সমস্ত বিশ্ব

চরাচরকে ব্যাপ্ত করে আছেন সেই ব্রহ্মপদ যিনি দেখিয়ে দেন সেই গুরুকে প্রণাম— বলে স্বামীজীর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন হালদার মশায়।

—ঠিক, ঠিক, গুরু কি জান। এখন দেখা যাক বর্তমান সমাজে কুলগুরুদের কাজ কি। কি করেন তাঁরা শিষ্যদের জন্যে? একটা প্রশান্ত শুভ দিন দেখে কানে মন্ত্র দিয়ে যথেষ্ট দান-দক্ষিণা নিয়ে যান, এই তো? তারপর গুরু-শিষ্যে দেখা বৎসরান্তে বার্ষিকী পার্বনী আদায়ের সময়। তাই না?

দু বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। ডাক্তারবাবু বলেন—ঠিক তাই, স্বামীজী। এ ছাড়া আর কি? গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ এই-টুকুই—সেবা আর পার্বনী আদায়। এতেই গুরুর গৌরব। শিষ্যরাও তেমনি। কানে একটু মন্ত্র পেলে তো সব পাপ-তাপ দূর হয়ে ব্রহ্মপদ পেয়ে গেল আর কি।

—এই ভাব। অঙ্গারেরও দোষ, কামারেরও দোষ, আগুনও জ্বলে না, লোহাও গলে না।

—ঠিক ধরেছেন, ডাক্তারবাবু, খাঁটি কথা। এঁরা সব গুরু নন মোটেই, গুরু-গিরি ব্যবসা এঁদের।

কান ফুঁকা গুরু হদ্‌কা,
বেহদকা গুরু আউর।
বহু বেহদকা গুরু মিলে
তো লেও ঠিকানা ঠউর।।

আবার—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ
দুর্লভস্তু গুরু দেবিঃ
শিষ্যহৃত্তাপাপহারকাঃ।।

—এই এঁরা হলেন কানফুঁকা গুরু, শিষ্যের বিত্ত-অপহারক। গুরুর মত গুরু সংসারে খুঁজে বের করতে হয়। সে বড় দুর্লভ। বুঝলে তো? এখন আসা যাক 'দীক্ষা' কথাটায়। বলত দীক্ষা কি?

কুঞ্চিত ললাটে চিন্তারেখা। দু বন্ধু চুপ করে থাকলেন মিনিট কয়েক। তারপর হালদার মশায় বললেন—

—শিক্ষা বলতে বুঝি লেখাপড়া বা কোন কাজ শেখা। আর দীক্ষা—ইষ্টমন্ত্র কানে নেওয়া। এ ছাড়া তো দীক্ষার আর কোন অর্থ জানি না, স্বামীজী।

একটু মাথা দুলিয়ে স্বামীজী বললেন—হুঁ, তবেই দেখ 'দীক্ষা, 'দীক্ষা' করে ব্যস্ত হচ্ছ, অথচ দীক্ষা কি তাই জান না। দীক্ষা হচ্ছে—

দীয়তে জ্ঞানমত্যান্তম্ ক্ষীয়তে কর্মবাসনা
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।।

মানে — যা কর্মবাসনাকে ক্ষয় করে অত্যন্ত জ্ঞান অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞান—পরাজ্ঞান শ্রেষ্ঠজ্ঞান দেয়, মুনি ঋষি তত্ত্বজ্ঞানীরা তাকেই 'দীক্ষা' বলেন। তবেই বোঝ—ঐ সব গুরু যা দেন, তাতে কি কর্মবাসনা ক্ষয় হয়ে শ্রেষ্ঠজ্ঞান বা পরামুক্তি লাভ করতে পার? পার না। তা হলে ও রকম দীক্ষার সার্থকতা কোথায়? ওটা দীক্ষাই নয়।

এইবারে বল—'মন্ত্র' কাকে বলে।

হালদার মশায় চুপ। উত্তর দিলেন মন্ত্র-দীক্ষিত ডাক্তারবাবু।

—সাধারণ মানুষ মূর্তি-উপাসক। দেব-দেবীর রূপ-গুণের বর্ণনাকে বলে 'ধ্যান' মন্ত্র। প্রত্যেক দেবতার পৃথক পৃথক বীজ অক্ষর আছে। বীজ অক্ষরের সঙ্গে সেই দেবতাকে নতি জানানই হল 'বীজ মন্ত্র'। তাই না স্বামীজী?

একটু জোরে হেসে স্বামীজী বললেন—তাই বটে, মন্ত্র বলতে যা বোঝ ওটা তাই-ই। কিন্তু 'মন্ত্র' কথাটির অর্থ কি বল। অর্থ ওই শব্দটির মধ্যেই আছে।

—ওই শব্দটির মধ্যেই আছে? চোখ বুঁজে গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলেন ডাক্তারবাবু। তারপর মাথা নেড়ে বললেন—নাঃ হল না স্বামীজী। ঐ শব্দটির মধ্যেই কি অর্থ লুকিয়ে আছে তার হদিশ পেলুম না, বাবা।

—আচ্ছা, কথাটা কি? 'মন্ত্র' ওর মধ্যে দুটো শব্দ—'মন' আর 'ত্র'। এখন এই দুটি শব্দের মানে জানলেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ও দুটোর মানে হচ্ছে—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ
যতঃ করোতি সংসিদ্ধৈ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ।।

যা সংসার-বন্ধন থেকে ত্রাণ করে বিশ্বের বিশেষ জ্ঞান মানে—পরাজ্ঞান এনে দেয় তাই 'মন্ত্র'। কানে তিনবার 'হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ' বলে দিলেই কি মন্ত্রের কাজ হয়ে গেল, না আজীবন রোজ চোখ বুঁজে লক্ষবার ঐ কথাকটা উচ্চারণ করলেই মন্ত্রের ফল পাওয়া গেল? তা হয় না।

দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন—কী করে হয়, স্বামীজী? মন্ত্র লাভ কি উপায়ে হতে পারে?

—আছে বৈ কি, উপায় আছে। কোন আদিমকাল থেকে মানুষ যা চেয়েছে তা পাওয়ার একটা না একটা উপায় বের করেছেই, অনেক ভেবে-চিন্তে খেটেখুটে। তা না হলে আজও উলঙ্গ হয়ে গুহায় বাস করতে হত মানুষকে। মন্ত্রলাভের উপায় হচ্ছে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরি প্রশ্নেন সেবয়া

সেবা, প্রণিপাত আর পরিপ্রশ্ন দিয়ে তা জানো। পরিপ্রশ্ন—জিজ্ঞাসা। তা সেবা প্রণিপাত আর পরিপ্রশ্ন করবে কাকে? জ্ঞানী আর তত্ত্বদর্শীদের। তাঁরাই জ্ঞান উপদেশ দেবেন তোমাদের—

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং
জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ

তোমার মনে যত প্রশ্ন আছে সমস্তই জানাবে তাঁদের। উত্তর পাবে সবেরই। সমস্ত সংশয় সমস্ত সন্দেহের নিরসন হবে। শেষ—'অথাতো আত্মজিজ্ঞাসা'। তবেই দেখছ—একমাত্র জ্ঞানী আর তত্ত্বদর্শীরাই উপদেশ দেবেন তোমাদের। এই দীক্ষা, এই মন্ত্র আর এই গুরু।

ব্যথিত সুরে হালদার মশায় বললেন—মানুষ কী ভুলটাই করছে, স্বামীজী, কত কাল ধরে বংশপরম্পরায়। গুরু শিষ্য নয়—প্রবঞ্চক আর প্রবঞ্চিতের দল। এ কুলগুরু প্রথা একেবারে তুলে দেওয়া উচিত বাবা।

—তা তো উচিত। কিন্তু তুলবে কে? পারবে তুমি সমাজে 'দীক্ষা' আর 'মন্ত্র' শব্দ দুটোর মানে বোঝাতে? পারবে তাদের চিরাচরিত অন্ধ কুসংস্কার প্রথা রহিত করতে? ভুল-ভ্রান্তি বা মায়া। মায়া গর্তে পড়ে আছে যারা তাদের টেনে তোলা কি সহজ কথা? মায়া কি যা তা? অনন্ত শক্তিশালিনী দুরত্যয়া।

—বেলা হয়ে গেছে, রান্নাও শেষ। রেণুদা তেল গামছা রেখে এল ওঁদের কাছে।

নাওয়া খাওয়া শেষ হলে হালদার-মশায় ও ডাক্তারবাবু গেলেন পান্থশালায়। দুদিন থাকবেন আশ্রমে।

মঙ্গলবার। সাড়ে চারটে বাজতেই গেলুম বিশালাক্ষীতলায়। প্রতি শনি মঙ্গলবারেই স্মৃতিরত্ন মশায় আসেন ওখানে। পেলুম তাঁকে কমলাকান্তের আসনের সামনে বসে বসে ঘুমন্ত অবস্থায়। ঘুম ভাঙ্গবার প্রতীক্ষায় বসে রইলুম ঘাসের ওপর।

কতক্ষণ পরে দু হাতে চোখ রগড়ে চেয়ে স্মৃতিরত্ন মশাই বললেন—এই যে, এসে বসে আছ—তা কতক্ষণ?

—প্রায় আধঘন্টা, টের পান নি?

—চোরের মত চুপি চুপি এলে কি টের পাওয়া যায়? তার ওপরে তন্দ্রাও নয় স্বপ্নও নয়, একেবারে গভীর নিদ্রা, মহা-নিদ্রারই সহোদরা, টের পেতে দেয় কি—হেসে হেসে বললেন স্মৃতিদাদু।

—নিদ্রা মহানিদ্রা চুলোয় যাক, এখন তো জাগরণ। এবার শুরু হোক—মহা জাগরণের পালাটা। এফ, এ পাশ করে কি করলেন আপনাদের স্বামীজী, না, না—যতীন?

যা বলেছ, ভায়া। মহাজাগরণই বটে। মনে পড়লেও গায়ে কাঁটা দেয়—বেশ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গম্ভীর হয়ে বললেন স্মৃতিদাদু। এফ, এ পাশ করে আর পড়বে কিনা? যতীন বলে—খুব হয়েছে, আর না। ওদের শিক্ষা ব্যবস্থার আট ঘাট অন্ধি-সন্ধি সবই দেখা হয়েছে, ক'বছর ধরে। মাতৃভাষা ভুলে ওদের ভাষায় কথা বল, নিজের ধর্ম ছেড়ে ওদের ধর্ম নাও, জাতীয় সংস্কৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ওদের অনুকরণ কর, ওদের অন্যায় অত্যাচারে ডান-হাত হও, ওদের শোষণ যন্ত্রটায় খুব করে ঘুর পাক দাও—এই তো ওদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মস্তমন্ত্র। শিক্ষায়তনগুলো স্বার্থ-সিদ্ধির গোলাম তৈরীর কারখানা। ওদের দরকার মত শেখায় ওরা, আমার দরকার মত শিখেছি আমি। আর ও যাঁতা-কলে নয়। এবার যা শেখবার তা শিখব ঘরে বসেই।

—কি কাজ শিখবে সে? চাবুক মারার কাজ—দু হাতে চাবুক মারার কাজ। মারা কাদের? দেশী বিদেশী—যারা অন্যায় করে আর যারা অন্যায় সহ্য করে তাদের। তাই চাই দু হাতে চাবুক মারার শিক্ষা। সব্যসাচী হবে সে। সে শিখবে—ধনুর্বিদ্যা, সে হবে সৈনিক।

সবাই অবাক। বলে কি?

কিন্তু বললেই তো সৈনিক হওয়া যায় না—সে পথে কাঁটা। ভেতো বাঙালী, ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ, অসামরিক জাতি—বাঙালীকে সেনা দলে ভর্তি করা ইংরেজ সরকারের নিষেধ।

ভেতো বাঙালী? একেবারে হাঁড়ি ধরে নাড়ী ধরে টান? রেগে আগুন যতীন বলে—বেইমান জাত, রাজত্ব পেলে কি করে? বাঙালীর শৌর্য, বীর্য, রণকৌশলে কত যুদ্ধ জয় করল। বাঙালীর সাহায্য না পেলে বেনের দাঁড়ি-পাল্লা মানদণ্ডই থেকে যেত, রাজদণ্ড হত না। আবার বলে কি না—ভেতো বাঙালী? আসলে ওরা ভয় করে বাঙালীর বুদ্ধি, কৌশল আর বীরত্বকে। তাই বুড়ো আঙুল কেটে—তাঁতিদের অক্ষম করে সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন শিল্প নষ্ট করার মতই জড়তা এনে বাঙালীর শৌর্য বীর্য বুদ্ধিকে দিতে চায় পঙ্গু করে। ও চালাকি চলবে না। যেমন করে হোক সৈনিক হয়ে দেখিয়ে দেব এক হাত—বাঙালী ভেতো নয় মেসো।

দেখ দেখি কাণ্ড! যতই জেদী তেজী একগুঁয়ে হোক না, সরকারের হুকুম রদ করবে কি করে? অনেক চেষ্টা করল যতীন সেনা দলে ঢুকতে। ইংরেজ শাসিত অঞ্চলে মিলল না কোথাও। দেশী রাজ্যেও চেষ্টা করতে কসুর করল না। ঘর ছেড়ে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল দেশীয় রাজ্যে রাজ্যে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি তো আর পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য নয়, কোনটি ইংরেজের মিত্র রাজ্য কোনটি বা করদ রাজ্য। প্রবল প্রতাপ ইংরেজের সঙ্গে মনোমালিন্যের ভয়ে কেউই বাঙালীকে নিতে চায় না সেনাদলে। দেশীয় রাজ্যগুলিও বন্ধ করেছে বাঙালী ফৌজ রাখা। তোষণ নীতি আর কি।

এ রাজ্য সে রাজ্য সাত রাজ্য ঘুরে যতীন এসে পড়েছে ভরতপুর রাজ্যে। এক বাঙালী মহান্তর মঠ ওখানে। রাজবংশে দীক্ষা দিয়ে বাঙালী সাধু পেয়েছিলেন কিছু ভূসম্পত্তি আর টাকাকড়ি। তাতেই মঠ করে মঠাধ্যক্ষ মহান্ত হয়ে থাকেন তিনি। সবাই বলে — বাঙালী মঠ, বাঙালী মহান্ত। যতীন আশ্রয় নিল মহান্ত মহারাজের কাছে বাঙালী মঠে। এখান থেকেই যোগাযোগ করতে থাকল ভরতপুর রাজ সরকারের সঙ্গে। ফল—যথাপূর্বম। ঠাঁই হল না সেনাদলে, কারণ একই—বাঙালী।

ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। চির-উৎসাহী সদাপ্রফুল্ল যতীন মঠে ঢুকল মুখ কালো করে। মহান্ত মহারাজের স্নেহ-দৃষ্টি এড়াল না। বিষাদের কারণ শুনে মহান্ত মহারাজ সস্নেহে বললেন—মুষড়ে পড়ো না, ধৈর্য ধর। সাহস করে চলে যাও বরদায়। বরোদার মহারাজার খাস সচিব এক উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী। শুধু সচিবই নন—বন্ধু, মিত্র, সুহৃদ, অন্তরঙ্গ, আত্মীয় —সবই। তাঁর কথা ঠেলতে পারেন না মহারাজা। ঠেলবেন কি করে? তেইশ বছর বয়সে মহারাজা যখন ইংলণ্ডে যান অকসফোর্ডে বি-এ পরীক্ষা দিতে তখন মাত্র উনিশ বছর বয়সেই ঐ বাঙালী যুবক বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপোসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। রতনে রতন চেনে—গুণীর মর্যাদা গুণীই জানে। সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মহারাজা অনুরক্ত হয়ে পড়লেন ঐ বাঙালীর। তারপর আলাপ-পরিচয়, শেষে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব—গভীর সখ্যতা। লেখাপড়ায় অনেক কিছু সাহায্যও পেলেন মহারাজা ঐ বাঙালী যুবকের কাছ থেকে। পড়ার শেষে মহারাজা ঐখানেই ওঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারী করে নিয়ে ফিরলেন ভারতে ১৮৯১ সালে। খাস সচিব থাকতে থাকতেই উনি আবার বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। বিদেশ থেকেই দুজনে অভিন্নহৃদয়, কাজেই মহারাজা ঠেলতে পারেন না খাস সচিবের কথা। ঐ বাঙালী খাস সচিব যেমন উচ্চ শিক্ষিত তেমনি উদার হৃদয়। তুমিও বাঙালী, ধর তাঁকে। তিনি বললেই হয়ে যাবে।

আর শোন—মহান্ত মহারাজ বললেন একটু খাটো গলায়, জান তো—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। সেনা দলে ভর্তি হওয়াই যখন তোমার স্থিরসংকল্প, তখন যেন তেন প্রকারেণ তা করা উচিত। দরকার হলে একটু-আধটু ছল-কৌশলের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করো না। চোস্ত হিন্দী বলতে পার, চেহারাখানাও বেশ মানানসই-মাফিক। আটকাবে না কিছুই। বাঙালীর বদলে হিন্দুস্থানী ফৌজে পাঞ্জাবী ফৌজেও চলে যেতে পার অক্লেশে। ধরতে পারে কার সাধ্যি!

চলে যাও বরোদায়। তোমার প্রাণের আকুলতা সার্থক হোক।

মহান্ত মহারাজের পদধূলি নিয়ে পর দিনই যতীন যাত্রা করল বরোদায়।

বারো

বরোদায় পৌঁছল যতীন। বিদেশ, বিভুঁই, চেনা, অচেনা, আপন পর—নেই তো ওর। খুঁজে-পেতে সরাসরি হাজির মহারাজার খাস সচিব শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মশায়ের কাছে। প্রথম দর্শনেই একে আকৃষ্ট হলেন অন্যের প্রতি। তারপর আলাপ। দুজনেই মুগ্ধ হলেন প্রথম আলাপেই।

অরবিন্দের কাছে যতীন প্রকাশ করল প্রাণের আকূতি। রাজ্যে রাজ্যে ঘোরার কথাও বলল। বাঙালীর ওপর নিষেধাজ্ঞা যে বাঙালী জাতিকে মস্ত বড় অপমান—সে কথা বলতেও ভুলল না যতীন। অরবিন্দ আশ্বাস দিলেন।

খাস সচিবের বন্ধু কালেকটর খাসীরাও যাদব, লেফটেন্যান্ট মাধবরাও যাদব, দেশপাণ্ডে—এঁরা সব। একান্তে আলোচনা চলল বন্ধুদের সঙ্গে। এক যুবককে সেনা দলে ভর্তি করে নেবার সানুরোধ প্রস্তাব করলেন অরবিন্দ।

করদ মিত্র রাজ্য বরোদা। এখানেও সেই ভূতের ভয়।

—বাঙলা ছাড়া যে কোন প্রদেশের যুবককে যে কোন মুহূর্তে ভর্তি করা চলে সৈন্য দলে। তবে আগে চাই শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা—বললেন বন্ধুবর্গ।

—নিশ্চয়ই — সানন্দে সম্মতি দিলেন অরবিন্দ। পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হল পরদিন।

সন্ধ্যার পর গোপন বৈঠক হল অরবিন্দ ও যতীনের। কাজে লাগল ভরতপুরের মহান্ত মহারাজের উপদেশ। ভোল বদলাল।

পরদিন শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষায় সহজেই প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করল অবাঙালী 'যতীন্দর উপাধ্যায়'। পরীক্ষকমণ্ডলী খুশি হয়ে সাধারণ সৈনিকের আরও উচ্চপদ দিতে চাইলেন তাঁকে। উপাধ্যায় মশায় প্রত্যাখ্যান করলেন যে কোন উচ্চপদ। যুদ্ধবিদ্যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদ্যন্ত শিখতে হবে যে তাঁকে। পদের মর্যাদা, অর্থের প্রলোভন সহজেই ত্যাগ করল রণচণ্ডীর একান্ত ভক্ত শিক্ষার্থী যতীন। সাধারণ সৈন্যদলেই ভর্তি হল যতীন্দর উপাধ্যায়।

তারপরে ঠেকায় কে? অতি দ্রুত তালে সব রকম রণকৌশল একটার পর একটা আয়ত্ব হতে লাগল করতলগত আমলকের মত। পদোন্নতিও হতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। অবশেষে দু হাজারী অশ্বারোহী মনসবদার থেকে মহারাজার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী হল যতীন।

অরবিন্দ গৌরব বোধ করলেন। যতীনের ওপর স্নেহ ভালবাসা প্রগাঢ় হয়ে উঠল। যতীন বয়সে পাঁচ বছরের ছোট হলেও অরবিন্দ আদর করে দাদা বলে ডাকতেন তাঁকে। যতীনও সহোদর দাদার মতই শ্রদ্ধা করে অরবিন্দকে। ধর্ম আর কর্ম সম্বন্ধে কত জটিল গুহ্য বিষয়ের আলোচনা হয় দুজনের।

দু-এক মাইল নয় দূরের দেশ, দু-এক মাসও নয় বছরের পর বছর, ছেলেও নয় না-জোয়ান—কাজেই গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ে ফিরিয়ে আনতে বলো না, ভাই। তার চেয়ে চলো বাড়ী যাই, বছর কতক বরোদায় থাকুক যতীন—বলে মিটি মিটি হেসে উঠে পড়লেন স্মৃতিরত্ন মশায়।

—ঠিক কথা দাদু, কাজকর্ম করতে হবে, সংসার চালাতে হবে তো, থাকুন এখন সেখানে। আমরা যাই—সেই ভাল।

দুজনে ফিরে এলুম আপন আপন ডেরায়।

আশ্রমে অতিথি নারায়ণ। কাজেই আঙিনায় নির্দিষ্ট আসনে বসা হল না।

রাত নটায় সকলকে খাইয়ে নিজে খেয়ে গেলুম পান্থশালার বারান্দায়।

তেরো

সকালের বেড়ানো সকাল সকাল শেষ। রেণুদা গেছে সাঁওতাল পাড়ার গোয়ালে

গাই দোহাতে। হালদার মশায় আর ডাক্তারবাবু বসে আছেন পান্থশালার দাওয়ায়। স্বামীজী বেড়িয়ে ফেরেন নি তখনও।

জলখাবার তৈরীর তাড়া নেই। হালদার মশায়ের আনা আপেল, নাশপাতি, কলা, কমলা, আঙুর, সন্দেশ—সবই মজুত। কিন্তু আসলেই যে ফাঁক—জলখাবার জলই বাড়ন্ত। শূন্য কলসী বসে আছে বিড়ের ওপর। তাড়াতাড়ি কলসী নিয়ে চললুম জল আনতে।

আশপাশের গ্রামীণ লোক সবাই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে খড়ির জল। আশ্রম তার ব্যতিক্রম। খড়ির ঘাটে নামবার পথের ডান দিকে মস্ত বড় গামলার আকারের বড় গর্ত নদীর জলসীমার হাত দুই ওপরে। ভূগর্ভের পরিশ্রুত বিশুদ্ধ জলস্রোত কটি সরু সুতোর আকারে ঝরে ঝরে জমা হয় এই গর্তে। জল কী—হীরের ধার, যেমন স্বচ্ছ তেমনি নির্মল। নীচের বালি সব দেখা যায়, জল আছে কি না বোঝাই যায় না—যেন একখানি কাঁচের স্বচ্ছ আবরণ গর্তের ওপরে। স্বামীজী বলেন — এই জলের উপকারিতাও খুব। ভুক্ত জিনিষ সহজে জীর্ণ করে খিদে বাড়ায়।

ধীরে ধীরে বাটি ডুবিয়ে জল তুলে কলসী ভর্তি করতে হল।

জল আনতে আনতেই দেখি স্বামীজী ফিরে এসে বসেছেন দক্ষিণের বারান্দায়। হালদার মশায় ও ডাক্তারবাবু বসেছেন কাছে। আঙিনা ভর্তি লোক—ওষুধ, পথ্য, টাকা-পয়সা—যা যা দরকার একে একে নিয়ে যাচ্ছে স্বামীজীর কাছ থেকে।

এরই মধ্যে হালদার মশায় উঠে এসে আস্তে আস্তে বললেন—ছ-সাতটা শিউলী পাতা তুলে একটু রস করে দিতে পার, খোকা? খালি পেটে খেতে হবে।

মিনিট কয়েক পরে কাঁচের গেলাসে শিউলী পাতার রস দিলুম হালদার মশায়ের হাতে।

রসটুকু খেয়ে হালদার মশায় জিজ্ঞেস করলেন—কোন গাছে কটি পাতা তুলেছ ভাই?

—সাতটি বলে দেখিয়ে দিলুম গাছটি।

—তা পাতা তুললে ডাল ভাঙলে গাছের কত কষ্ট হয় জান তো?

আগে কিছু দিয়ে তবে নিতে হয়। যাও, সাত ঘটি জল ঢেলে দিয়ে এস গাছটির গোড়ায়। ভিজে মাটি থেকে সহজেই রস টেনে নিয়ে জীবনীশক্তি পাবে গাছটি। যাও লক্ষ্মীটি, দেরী করো না।

সাত ঘটি জল ঢালা হল শিউলী গাছের গোড়ায়।

ততক্ষণে আঙিনা খালি। জলযোগ শেষ হতেই আরম্ভ হল আলোচনা পর্ব।

পূর্ব আলোচনার জের টেনে হালদার মশায় বললেন — ইংরেজীতে বলে—

To err is human

আর আমরা বলি — সবই মায়ার অধীন। এই মায়া বা ভ্রান্তির স্বরূপ কি? এটা আসে কোত্থেকে, স্বামীজী?

হালদার মশায়ের মুখ পানে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামীজী বললেন—কোথাও থেকে আসে না, কোথাও যায়ও না—অনাদি অন্তবতী জগৎপ্রসূতি এই মায়া। একে জানতে পারলেই আর থাকে না, না জানলেই থাকে, মানে—জ্ঞানীর থাকে না, অজ্ঞানের থাকে। এ 'আছে'ও বটে, 'নাই'ও বটে, আবার 'আছে নাই' তাও বটে। 'এই আছে এই নাই, হাত বাড়ালে পাই নাই'—আর কি। এ ব্যষ্টিরূপে—এককরূপে 'মন' আর সমষ্টির রূপে 'মায়া'। গভীর রহস্যাবৃত রূপ-প্রকৃতি — অনাদি অন্তবতী প্রমাণা-প্রমাণ-সাধারণা ন সতী না সতী ন সদসতী স্বয়মবিকারা বিকারয়েতো, নিরূপ্যমানে-অসতী অনিরূপ্যমানে সতী লক্ষণাশূন্যা সা মায়েত্যুচ্যতে।

প্রকৃতি—মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে অনয়া পদার্থা ইতি মায়া। এই মায়াই দেখায় রূপভেদ, অসীমকে করে সসীম, বিরাটকে দেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড করে। নির্মলকে দেখায় মলিন করে।

এরই আবার দুটি রূপ। দেখেছো তো দুর্গা প্রতিমার ডান দিকে রূপ যৌবন-সম্পন্না সর্বালঙ্কার ভূষিতা ধনদায়িনী লক্ষ্মী মূর্তি আর বাঁদিকে নিষ্কলুষ নির্মল কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী মূর্তি? মায়ার এই দুই রূপ—বিদ্যা আর অবিদ্যা। অবিদ্যারূপে সংসার বন্ধনের কারণ আর বিদ্যারূপে—বন্ধন মুক্তির কারণ।

সা বিদ্যা পরমমুক্তেহেতু ভূতা সনাতনী
সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।

সুতরাং বুঝলে মায়ার হাত থেকে নিস্তার নেই। শুধু ওর ভোল বদলে দিতে হয় প্রজ্ঞা বলে। শেষে মনের ক্ষয় হলেই মায়ার ক্ষয়, পরামুক্তি বা মহানির্বাণ।

বেলা হয়েছে। গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে স্বামীজী উঠলেন স্নান করতে।

স্নানাহার সারা হলে সবাই গেলেন আপন আপন বিশ্রামের জায়গায়।

আশ্রমে অতিথি—বেশী সময় পাওয়া যাবে না। তিনটে বাজতেই চাম্না গ্রামে গিয়ে খেলুম এক বিরাট ধমক—এত রোদে তেতে পুড়ে আসা?

বাইরে তাত, ভেতরে যে মৌতাত ধরিয়ে দিয়েছেন সেটা তো আর বুঝছেন না স্মৃতিদাদু। হাসি মুখেই ধমকটা হজম করে ফেললুম।

ঘাম মুছতে এক হাতে তোয়ালে আর এক হাতে পাখা দিয়ে স্মৃতিদাদু বললেন—হাওয়া নয়, যেন আগুনের হল্কা, দরজাটা ভেজিয়ে চুপচাপ বসে একটু ঠাণ্ডা হও।

যথা আজ্ঞা—দরজা ভেজিয়ে বসে পাখার হাওয়া খেতে লাগলুম। একটু পরে খুকী রেখে গেল দু গ্লাস সরবত।

—নাও, সরবত খাও। পোড়া আমের সরবত, শরীর স্নিগ্ধ রাখে এমন দিনে।

সরবত খেয়ে সত্যিই শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

বললুম—কথক ঠাকুর মশায়, অথাতো বরদায়াং যতীন্দ্র অরবিন্দ সম্বাদ কথনম্। মঙ্গলাচরণটা করে দিই—

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব
ততো জয়মুদীরয়েৎ।
জয়ন্থং দেবী চামুণ্ডে চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী
রূপং দেহি জয়ং দেহি
যশো দেহি দ্বিষো জহি।

—বাহবা বাহবা, সুযোগ্য মঙ্গলাচরণ। তৈরী মাল—স্থান কাল পাত্রের বিচারবোধ আছে। তবে দেহি দেহি ভাবটা ছিল না যতীনের। যাদের ছিল তাদের মত আর পথের সঙ্গে মিল ছিল না মোটেই।

—তা কাদের ছিল দাদু?

সে সময়ে তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। আসলে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-রক্ষার জন্যেই ১৮৮৫ সালে এক ইংরেজ সিভিলিয়ানের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এটি। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—কোন রকম সশস্ত্র বিরোধ-বিক্ষোভের প্রতিবাদকারী দেশীয় উচ্চশিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের দল আর কি। এদের কাজ ছিল তোষণনীতি মূলে আবেদন-নিবেদন। যতীন এর ঘোর বিরোধী। তার পাঞ্চজন্য ধ্বনিত হত—

তস্মাৎ ত্বম উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূণ ভুঙক্ষ্ব রাজ্য সমৃদ্ধম্।।

ভারতীয় কংগ্রেসের গতি-প্রকৃতি বুঝে যতীন সব বলে অরবিন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করল। বয়সে ছোট হলে কি হবে, আসলে সক্রিয় রাজনীতিতে অরবিন্দকে টেনে আনে যতীনই।

অরবিন্দের মর্মে আঘাত লাগল। কংগ্রেসের রীতিনীতির তীব্র সমালোচনা করে এক প্রবন্ধ বের হল ১৮৯৩ সালে বোম্বাইয়ে ইন্দুভূষণ পত্রিকায়। অরবিন্দ লিখলেন—

—কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন কতকগুলি শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির জন্যে। এতে দেশের কোটি কোটি দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণের কোন উপকার হবে না। এখনই এমন আন্দোলন করা দরকার যাতে দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণের মঙ্গল হয়, ইংরেজ প্রভুদেরও চৈতন্য হয়।

যোগাযোগটা কেমন দেখ—ঠিক এই সময়েই দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর প্রচার করছেন সর্বধর্ম সমন্বয় আর তাঁর নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাণ সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে গেছে আমেরিকায়। নরেন্দ্র বিবেকানন্দ বিশ্ব-ধর্মমহাসভায় উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করছেন ভারতীয় বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। আমেরিকার শিক্ষিত বিবেকী বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ নতমস্তকে স্বীকার করে নিচ্ছেন তাঁর অভ্রান্ত যুক্তি। অরবিন্দের বাণী প্রকাশিত হবার কিছু পরেই বিবেকানন্দ ভারতীয়দের জানালেন—শক্তিমান হও, পৌরুষ লাভ কর, দরিদ্র জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধ কর।

বিবেকানন্দ বললেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গম। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী,

চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার কল্যাণ। আর বল দিন-রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার দুর্বলতা, আমার কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

তারপর আর কি—বোঝার ওপর শাকের আঁটি না শাকের আঁটির ওপর ভূতের বোঝা—আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্র দল।

ছাত্রদল বিরোধিতা করতে লাগল কংগ্রেসের।

তা কত দিন আর চোখে ধুলো দিতে পারা যায়? যতই হোক বাঙালীরা তো আর বুদ্ধিহীন নয়। সূত্রপাত থেকেই ইংরেজদের কাছে আবেদন-নিবেদন করতেই ব্যস্ত ছিল কংগ্রেস। এর অধিবেশনও ছিল যেন বিলাতের শিক্ষিত বেনে যুবকদের একটা বিলাস ব্যসন, বড়দিনের ছুটি কাটাবার উপায়। ফি বছর বড়দিনের ছুটিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হত। প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাইতে হিউম সাহেবের নেতৃত্বে। সভাপতি করেন বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ছিল আগেকার কংগ্রেসের রূপ। তা এর বিরোধিতা করবে না দেশের ছেলেরা?

দেশের অবস্থা যখন এই তখন [illegible] ঋষি অরবিন্দের।

—সেইটাই তো আসল কথা, বললেন না দাদু।

—তা তুমি জিজ্ঞেস করো যতীনকে। [illegible] পারে।

—ওরে বাবা, জিজ্ঞেস করব স্বামীজীকে?

—হ্যাঁ জিজ্ঞেস করো তোমাদের স্বামীজীকে।

—ভয় করে যে—।

—ভয়? যতীন কি ভীষণ একটা কিছু? ওকে ভয় করবার দল আলাদা। সে দলের জন্যে দু হাতে চাবুক চালাতে শিখেছিল ও। তাদের দলে নও তুমি। মাস দেড় দুই কাছে রয়েছ, পাকাপোক্ত জ্ঞানী হলে, এত দিনেও চিনতে পারলে না যতীনকে? কঠোরে কোমলে মানুষ যতীন, যাকে বলে বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি। মনে আছে তো—ছোট থেকেই যতীন ছিল পরম মাতৃভক্ত আর একান্ত সত্যনিষ্ঠ। এই দুটি গুণেই ওকে করেছে কোমলে কঠোরে। মাতৃভক্তির জন্যেই ওর বুকে বাসা বেঁধেছে মাতৃহৃদয়ের কোমলতা—স্নেহ, দয়া, মায়া, বাৎসল্য, পরদুঃখকাতরতা। তার নিদর্শন তো প্রতিদিন দেখতে পাও আঙিনা ভর্তি দীন, দুঃখী, কাঙাল, গরীব। শুধু মানুষের জন্যেই নয়, জীবজন্তু পশুপাখী মায় গাছপালাতে পর্যন্ত ওর সমান প্রীতি। এই তো সেবার বঙ্কু চাষী যাচ্ছিল ধান বোঝাই গাড়ী নিয়ে সাঁওতালপাড়ার ডাঙ্গা দিয়ে। হঠাৎ গাড়ীর একটা চাকা গেল গর্তে পড়ে। একে দারুণ বোঝা তাতে আবার গর্তের মধ্যে চাকা, গরু দুটি প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করেও গাড়ী তুলতে পারছে না কিছুতেই। বঙ্কু করছে কি—হাতের পাচন দিয়ে বেদম মারছে গর্তের দিকের গরুটিকে। বেড়াতে বেড়াতে আগাগোড়া সব দেখেছে যতীন। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে বঙ্কুর হাতের পাচন কেড়ে নিয়ে গরুটিকে জোয়াল থেকে খুলে সরিয়ে দিয়ে বঙ্কুকে বললে—ধর জোয়াল, টেনে তোল গাড়ী, না পারলে এই পাচন বাড়ি। বুঝবি পাচনের স্বাদটা। বঙ্কু জোয়াল ধরল—কিন্তু সাধ্য কি যে টেনে তোলে। শেষে একদিকে গরু আর একদিকে বঙ্কুর সঙ্গে যতীন জোয়াল ধরে টেনে-টুনে অনেক কষ্টে গাড়ী তুলল। কপালের ঘাম মুছে বঙ্কুর মুখের কাছে পাচন উঁচিয়ে যতীন বলল—মনে থাকে যেন, যা খাওয়াবে তাই খেতে হবে। সেই থেকে এ তল্লাটে কেউ গরুকে মারে না — অন্ততঃ ওর সামনে। গাছের পাতা ছিঁড়ে দেখ—গাছের গোড়ায় জল দেওয়াবে।

আর একান্ত সত্যনিষ্ঠার জন্যেই ও হয়ে উঠেছে অসত্যের ওপর অন্যায় অত্যাচারের ওপর কঠোর, কঠিন, নির্মম।

দু মিনিট চুপ করে থেকে দাদু আবার বলতে শুরু করলেন—দেখে-শুনে বুঝেছ যতীন তোমাকে স্নেহ করে খুবই। ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীই হোন আর যাই হোন মার্গে সমাধির তুরীয় অবস্থায় সব সময়েই থাকতে পারেন না কেউ। অবতরণ করতে হয়। তখন সাধারণ স্নেহগুণসম্পন্ন মানুষ। মানুষ যতীনের অতৃপ্ত পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহধারা ঝরে পড়েছে তোমার ওপর। তোমার আবার ভয় কিসের? জিজ্ঞেস করো যতীনকে।

কী ফ্যাসাদেই ফেললেন বুড়ো! চিন্তিত মুখে বললুম—তা কথাটা তুলি কি সূত্রে, দাদু?

—খেই ধরিয়ে দিতে হবে বুঝি? রেণুদার মন্ত্রী! তা মন্ত্রীর নজরানাটা দেবে বল, সূত্রের খেই ধরিয়ে দিচ্ছি—ঘাড় নেড়ে চোখ পিটপিট করে বললেন স্মিত-দাদু।।

—দিতেই যদি হয় তো দেব নজরানা, বলুন সূত্রটা কি?

—ব্রহ্মসূত্রতো না পার তো যজ্ঞসূত্রটা ধরো। ঐ যাঃ, সেটাও তো নাই। ও যে সন্ন্যাসী ফেলে দিয়েছে। তা হলে? তা হলে দেহসূত্রটা ধর। দেখেছ তো তোমাদের স্বামীজীর বাঁ হাতখানা? একটু ভাঙ্গা মত না? কারণ জিজ্ঞেস করো—তা হলেই উঠবে গরোদার কথা। তার পরে কথার পিঠে কথা তুলে জিজ্ঞেস করে নেবে একে একে।

ধারে কারবার নেই—ফেল মন্ত্রীর নজরানাটা।

দু হাতে গলা জড়িয়ে পিঠে ভর দিয়ে বললুম—বয়ে নিয়ে যান নজরানাটা।

—ছাড়, ছাড়, শালা, রসিদ দিচ্ছি নজরানা পেয়েছি। যা, যা পালা — বলে চটাস করে গালে এক চড় কসিয়ে দিলেন দাদু।

তখন রাঙা মুখে রাঙা হাসিটি ছড়িয়ে সূর্যদেব চলে পড়েছেন পশ্চিম দিগন্তের অন্তরালে।

আশ্রমে অতিথি। তাড়াতাড়ি ছুটলুম আশ্রমের পথে।

সন্ধ্যের পর বসা হল না স্বামীজীর কাছে।

চোদ্দ

সকালের কাজ যথারীতি শেষ। স্বামীজী বসেছেন দক্ষিণের বারান্দায়। পাশে হালদার মশায় ও ডাক্তারবাবু।

ওষুধ পথ্য নিয়ে রোগীর দল বিদায় নিতেই আঙিনা ভর্তি হল একদল ভিখারী ভিখারিণীতে। বুড়ো-বুড়ী, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা-শিশু। অপর্যাপ্ত ময়লা চিরকুট ছেঁড়া টেনা পরা চলমান কঙ্কাল। ক্ষুধাকাতর মুখ, কোটরগত চোখ, হাড়-জিরজিরে বুক, শীর্ণ কাঠি-কাঠি হাত-পা, পেটের চামড়া ঠেকেছে পিঠে। শীর্ণ ডান হাতগুলি বাড়িয়ে আর্তনাদের মত চিঁ-চিঁ স্বরে সবাই বলছে—প্যাট ভরে দুটো খেতে দ্যান, বাবাজী। কদিন আধপেটা সিকি-পেটা জুটেছিল, আজ তিনদিন তাও জোটে নাই। পদ্মপুকুরের মলাম (মৃণাল) আর পাঁক খেইছি, আর লারচি। খিদেই মরি, বাঁচান আমাদিগে বাবা, বাঁচান। দুটো দ্যান প্যাট ভরে।

গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে স্বামীজী উদাস দৃষ্টিতে চাইলেন চিন্ময়ীমায়ের সমাধি পানে। একটু পরে ধীর গলায় ডাকলেন—খোকা!

হাতের কাজ ফেলে ছুটে গিয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়ালুম স্বামীজীর সুমুখে।

—তোমার আপ্তবন্ধু, ভাই-বোন আপনজন—দেশের মানুষ, সামলাও এদের। স্বামীজীর স্বর গম্ভীর।

অধরোষ্ঠ চেপে হেঁটমুখে গেলুম রান্নাঘরে। রেণুদা গাই দুয়ে এসে কপালের ঘাম মুছে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে।

চুপি চুপি বললুম—আর খানিকটা ঘাম বের করে এস দাদা, পাখার বাতাস দিয়ে শুকিয়ে দেব। লক্ষ্মী দাদা, এক ছুটে চলে যাও কামারপাড়া, বাজারে। কিছু আনাজ-পাতি আর মাছ নিয়ে এস।

—কাজে কাজেই। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম যখন—'না' করবার জো কি—চোখ মুখে হাসি ফুটিয়ে থলে আর টাকা নিয়ে রেণুদা ছুটল কামারপাড়ার পথে।

ছোটবড় সবশুদ্ধ তিরিশজন। কাঁঠালতলায় সারি দিয়ে বসিয়ে শালপাতার ঠোঙা ভর্তি মুড়ি আর নারকেল নাড়ু দিলুম আপ্তবন্ধু ভাইবোনদের প্রত্যেকের হাতে। শুকনো মুখগুলি ঝলসে উঠল। অতৃপ্তনয়নে দেখলুম ক্ষুধাতুরদের জলপান।

তারপর স্বামীজী ও অতিথিদের পালা।

তাঁদেরও জলখাবার মুড়ি নাড়ু আর দুধ।

দুটো বড় বড় হাঁড়ি চড়ানো হল দুটো উনুনে জেবলে।

রেণুদার আসতে দেরী আছে—জলখাবারের বাসনগুলি নিয়ে ধুতে গেছি খিড়ের ঘাটে।

হালদারমশায় ও ডাক্তারবাবু তেল মেখে গামছা হাতে ঘাটে নামলেন স্নান করতে। খাওয়ার পর বিকেলে বাড়ী ফিরবেন তাঁরা।

জলে নেমে গামছা দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিত মুখে হালদারমশায় বললেন—কী বলুন তো ডাক্তারবাবু প্রথম কথা দুটি। কিছুতেই মনে পড়ছে না যে। আঃ, কী যেন বেশ ঐ ন সতী না সতী শ্লোকটির গোড়ার কথাদুটি।

ডাক্তারবাবুরও ভ্রূ কুঁচকে গেল, হাতের গামছা থেমে গেল, স্মৃতিমন্দিরের দুয়ারে কিছুক্ষণ ধর্ণা দিয়ে বললেন—নাঃ হল না, আমারও মনে পড়ছে না যে—

দুজনেই এটা নয় ওটা, ওটা নয় সেটা করে বার কয়েক চেষ্টা করলেন মনে করতে। কিন্তু কিছুতেই আর হয় না।

—তাইতো কী হল? কালকের কথা আজই ভুলে গেলুম। আর তো জিজ্ঞেস করতে পারি না স্বামীজীকে! ছিঃ ছিঃ—দুঃখু করতে লাগলেন হালদার মশায়।

নোট করে রেখেছিলুম, পড়াও ছিল বারকয়েক। বাসন মাজতে মাজতে বললুম অনাদি অন্তর্বর্ত্তী প্রমানাপ্রমানসাধারণী!...

—বাঃ, বেশ মনে আছে তো! তুমি সংস্কৃত জান, খোকা?—হালদার মশায়ের চোখেমুখে বিস্ময়।

তাড়াতাড়ি বাসনগুলি ধুয়ে নিয়ে চলে এলুম রান্নাঘরে। কিছু পরেই স্নান সেরে কাপড় ছেড়ে দুবন্ধু বসেছেন স্বামীজীর কাছে।

—রাঁধুনী ছোকরাটি তো সংস্কৃত জানে মনে হয়, স্বামিজী—বললেন হালদার মশায়।

—রাঁধুনী ছোকরা?—স্বামিজী চাইলেন হালদার মশায়ের মুখপানে।

—শুধু রাঁধুনীই বা কেন, সব কাজই তো করে দেখছি—যাকে বলে হেল্‌পিং হ্যান্ড ঐ ছেলেটি।

—ওঃ, খোকার কথা বলছ? রাঁধুনী হেল্‌পিং হ্যান্ড—কিছুই নয় ও। বনপাসের দুলালকে তো জান, তারই ভাই। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছে বেড়াতে। ব্রিলিয়েন্ট বয়। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে চারটে লেটার নিয়ে—ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা আর ইতিহাস। দু নম্বরের জন্যে 'ষ্টার' মার্ক গেছে। অঙ্কে পেয়েছে আটাত্তর। সে ওর কি দুঃখু। লেখাপড়ায় খুব ঝোঁক। ও চায় পড়তে, ওর দাদা চায় ওকে স্বর্ণশিল্পী করতে। এক সমস্যা। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

—পরিচয় পেয়ে খুবই লজ্জিত হ'লেন হালদার মশায়। ভুল বোঝবার জন্যে বার বার দুঃখু করতে লাগলেন স্বামিজীর কাছে।

তারপরে কি আদর—দাদা, ভাই, ছাড়া কথা নাই। পেয়ে গেলুম দু দুটো দাদা। পাব নাই বা কেন? আশ্রমে যিনি আসেন তিনিই আপন—দাদা, কাকা, মাসি, পিসী।

বাজারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে রেণুদা এসে হাজির।

আর ভাবনা কি? দুজনে মিলে চার হাতে কাজ—ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই রান্না শেষ।

স্বামিজী, হালদার মশায় ও ডাক্তারবাবু খেতে বসেছেন। তাঁদের খাওয়া হতে হতেই সারি সারি কলাপাতা পড়ে গেছে কাঁঠালতলায়। পরিবেশক রেণুদা ও আমি। খাওয়া হতেই মুখ-হাত ধুয়ে স্বামিজী এসে বসেছেন চেয়ারে অনাহূত অতিথিদের সামনে।

দেখলুম খাওয়া। একের পর এক গ্রাস উঠছে টপ্‌টপ্‌, মুখে ফুটে উঠছে তৃপ্তির বিমল আনন্দ। দু চোখ ভরে দেখলুম—তা দেখতে আর পেলুম কি? বাধা হল চোখের জল। মনে হল—ডাল ভাতে এমন অমৃতের স্বাদ ত্রিভুবনেশ্বর ভাগ্যে মেলে না কোন দিন। আর মনে হল, যদি বলতে পারতম—নগরীর অন্ন বিলাবার, আমি আজি লইলাম ভার—জীবন সার্থক হতো।

খাওয়া শেষ।

—কি রে, পেট ভরেছে তো সব?—জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী।

—হিঁ, বাবাজী, খুব খেইচি। দ্যাখ ক্যানে প্যাট ফুলে জয়ঢাক হইচ। 'জয় গুরু, জয় গুরু' — আপন আপন এ'টো পাতা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল সবাই।

—হাত ধুয়ে এসে জায়গাটা পরিষ্কার করে এখানেই শুয়ে বসে থাক্ সব। এক্ষুনি যাস্ না যেন এই রোদ্দুরে। যাবি পড়ন্ত বেলায় রোদ কমলে—স্বামিজী বললেন উঠে যেতে যেতে।

কথা মতই কাজ হল।

সবাই গেলেন আপন আপন নির্দিষ্ট জায়গায় বিশ্রামের জন্যে।

বেলা পাঁচটা। জগদাবাদের গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল ফটকের বাইরে। স্বামিজীকে বিদায় নিয়ে বিষণ্ণমুখে বিদায় নিলেন দুবন্ধু। গাড়ীতে ওঠবার আগে প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরে হালদার দাদা বললেন—কত কষ্ট দিয়ে গেলুম ভাই, কিছু মনে করো না। অবিচারও করেছি, তুমি যে একটি ভাই—তা না জেনে।

—কষ্ট আবার দিলেন কোথায়? আনন্দ বলুন। আবার আসবেন।

—নিশ্চয়ই। একদিন জগদাবাদে নিয়ে যাব তোমায়। পেস্তা, বাদাম, কিসমিস আখরোটে দুহাত ভর্তি করে দিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন দুজনে। গাড়ী ছাড়ল। স্বামিজীকে প্রণাম করে ভিখারীর দলও উধাও হয়েছে ততক্ষণে। সান্ধ্য ভ্রমণের পর এসে খাটিয়ায় বসলেন স্বামিজী।

কদিন পরে কাছে বসলুম চৌকীতে।

প্রথমে পায়ে তারপর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—বাঁ হাতটি একটু বাঁকা। ফোড়া হয়েছিল, না ভেঙে গিয়েছিল, বাবা?

অল্প হেসে স্বামিজী বললেন—হাঁ, ভেঙেই গিয়েছিল। বেড়াতে গেছি মধ্যপ্রদেশে ভূপাল রাজ্যে। দক্ষিণ সীমার পার্বত্য অঞ্চলে। বিন্ধ্যপর্বতেরই কটি শাখাপ্রশাখা এসে ঢুকেছে বোধ হয়। ঐ সব পাহাড় অঞ্চলে ভীল আর মাওয়ালী জাতির বাস। কদিন আগেই হয়ে গেছে ভীলবিদ্রোহ। থেমে গেলেও তখনও ঝাঁজটা আছে বোধ হয় একটু একটু। পাহাড়ের মাঝ বরাবর উঠে বেড়াচ্ছি আপন মনে। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। হঠাৎ একটা বর্শা এসে লাগল পিঠের নিচে কোমরে। আকস্মিক আঘাত—পড়ে গেলুম পাথরের ওপর বাঁ পাশ চেপে বাঁ হাত মচকে। দারুণ যন্ত্রণা। তার ওপর বড় বড় পাথর এসে পড়ছে অবিরল ধারায়। আরও কিছু ওপর থেকে একদল পাহাড়ীর কান্ড—একেবারে অতর্কিতে আক্রমণ। জখম হয়েছি খুব, বাঁ হাতটা গেছে ভেঙে। সে কী যন্ত্রণা! হঠাৎ এক বুড়ো ভীল সর্দার বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বললে—ডান হাত উঁচু করে নেড়ে—রে বুড়বাক্ লোগ, মৎ মার ডালো, মৎ মার ডালো, বাম্ভন্ হ্যায়, বাম্ভন্ হ্যায়।

গলায় পৈতেটা ছিল তখন।

ভীলের দল অদৃশ্য হল। যন্ত্রণায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতে হল সারারাত। অনেক রাত অবধি না ফিরতে দেখে খুঁজতে বেরিয়ে সংগী-সাথীর দল ভোর বেলায় দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে আসে বাসায়। তারপর সেবা শুশ্রূষা ওষুধ পত্র, ব্যান্ডেজ। বেশ কিছুদিন ভুগিয়েছিল। তারই ফল এই।

হায়রে—কোথায় বরোদা আর কোথায় ভূপাল!

যাই হোক সংকোচ কেটে সাহস এল। সুযোগ মত জেনে নেওয়া যাবে সব।

(ক্রমশঃ)

শরতের মেঘ

শান্তি পাল

জামরুল গাছের নিবিড় ডালে একটা বিচিত্র রঙিন পাখী। খাটের ওপর থেকে শুয়ে শুয়ে গাছটা দেখা যায়। জানলার বাইরে নরম রোদ, ঘন ডালে পাতায় ঝিলমিল করছে। সুব্রত সদ্য ঘুমভাঙা চোখে চেয়ে চেয়ে সাদা ছেঁড়া মেঘ, প্রথম সকালের আলো এবং ছটফটে রঙিন পাখি এইসব দেখছিল। ও-ঘরে প্রাণকৃষ্ণের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ মার সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা হচ্ছে। সময়টা শরতের মাঝামাঝি। সকালের দিকে শরীরে একটা ঠাণ্ডার আমেজ, ঘুম ভাঙলে মনটা খুব তাজা লাগে।

ছটফটে পাখিটা উড়ে উড়ে বসছে এ-ডালে ও-ডালে। কাকেদের সঙ্গে জায়গা নিয়ে বচসা করছে। পাখিটার অমন স্ফূর্তির প্রাণ দেখে দেখে হঠাৎই সুব্রতর ব্যাধের কথা মনে এল। সুব্রত যদি একটা ব্যাধ হত, তাহলে এই মুহূর্তে কি করতে পারত ভাবতে গিয়ে ঝট করে উঠে বসল, পাখিটার দিকে তাকাতে সাহস করল না আর।

পাশের ঘর থেকে প্রাণকৃষ্ণের আওয়াজ কেমন যেন চড়া সুরে ভেসে আসছে। অবশ্য প্রাণকৃষ্ণের স্বাভাবিক গলাটাই একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা, যে-কারণে সুব্রত সহসা বড় একটা বাপের কাছাকাছি ঘেঁষে না। তার উদ্দেশ্যে বলা চড়া সুরের কথা আর পাঁচজনের কানে ঢুকুক এটা সুব্রত পছন্দ করে না। আড়ামোড়া ভেঙে উঠে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কলতলায় চলে গেল সুব্রত। মুখে হাতে জল দিয়ে তোয়ালে খুঁজল একটা। বস্তুতঃ এখানে তার সবকিছুতেই একটু নতুন নতুন লাগে। এতদিন হোস্টেলে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে থেকে এখানকার ছড়ানো-ছিটানো ব্যবস্থায় তার অস্বস্তি হয়। অবশ্য দুদিন থাকতে থাকতেই সয়ে যাবে সব, ভাবল সুব্রত। আগে তবু ছুটি-ছাটায় কদিনের জন্যে আসত। এখন তো পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলের পাটও চুকল। এখন থেকে এই ঘরদোর, এই জিনিসপত্র এবং এই মানুষগুলিও অঙ্গাঙ্গীভাবে তার সঙ্গে জড়িত।

নাঃ, ও-ঘরে আপাততঃ নিশ্চয় কোন অঘটনের ব্যাপার চলছে, নচেৎ প্রাণকৃষ্ণের কণ্ঠে এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনা ও বিদ্বেষ খেলত না। সুব্রত আস্তে আস্তে পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল এবার। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় নামানো পেশল পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে প্রাণকৃষ্ণ। জানলার নীচেটায় হেলান দিয়ে। জানলা-টার দিকে চোখ তুলে একবার তাকাল সুব্রত। এখান দিয়েও ঝাঁকড়া মাথা জামরুল গাছটা দেখা যায়। সেই রঙিন

পাখিটা আর নজরে আসছে না, শুধু খানিক সোনালী রঙের রোদ সবুজ পাতাগুলোয় নেচে নেচে খেলা করছে। প্রাণকৃষ্ণর হাতে বিড়ি, পাশে খালি চায়ের কাপ, তার মধ্যে ছাই ঝাড়ছে। চোয়াল কঠিন, চোখের দৃষ্টি বদমেজাজী। খাটের ওপর মা বসে আছে। চোখ বাইরে, ভাবহীন, হাতের চুরিগুলো অনর্থক নাড়াচাড়া করছে। প্রসঙ্গটি কি বোঝবার জন্যে সুব্রত ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল। ঠিক সে সময় প্রাণকৃষ্ণ বলে উঠল,

আজ সকালের কাগজ দেখলি? চাকরী-টাকরির খবর আছে নাকি কিছু? প্রাণকৃষ্ণর মাথার ওপর দেয়াল-ঘড়ি। সুব্রত তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছ'টা। ও যে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠছে, সে-কথা আর উল্লেখ করল না, শুধু কোনমতে অস্ফুটে বলল,

—দেখব।

ওকে দেখে মা খাটের ওপর থেকে নেমে এল তাড়াতাড়ি।

—চা খাবি চল, ওর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলল মা। মায়ের গলাটা শান্ত হলেও ভার মনে হচ্ছে, মুখ থমথমে।

—ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, প্রাণকৃষ্ণ ঈষৎ কঠিন গলাতেই বলল, রীতিমত চেষ্টা করতে হবে, হেসে-খেলে বেড়াবার দিন চলে গেছে এখন।

—আয়, মা ঘরের বাইরে থেকে তাড়া দিল, ডাকছি যে।

সুব্রত আবার পর্দা সরিয়ে বাইরে চলে এল, একেবারে নিজের ঘরে। জানালার গা ঘেঁষে ওর ছোট টেবিল চেয়ার। হাতের ওপর চিবুক রেখে বসল সুব্রত। খানিক বাদে চা এনে মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। চায়ে চুমুক দিয়ে সুব্রত মায়ের দিকে তাকাল। [illegible] কপালে টকটকে সিঁদুর টিপ। মাথায় এখন ঘোমটা নেই। [illegible] এখন কেমন ফ্যাকাশে লাগল সুব্রতর কাছে।

—কি হল সকাল বেলায়? সুব্রত ঠাণ্ডা গলায় বলল।

—তুই এ-সময় গেলি কেন ও-ঘরে? মন খারাপের গলায় বলল মা।

—তাতে [illegible] কিছু না। আসল ব্যাপারটা কি বলত?

—তোর ঝর্ণাপিসীকে জানিস তো। তাকে নিয়েই ব্যাপার।

সুব্রত চোখ বুজে একবার ঝর্ণাপিসীকে মনে করল, বাবার দূর সম্পর্কের বোন, স্বামীর অসুখ, তিন-চারটি সন্তান। ছিপছিপে চেহারা, উজ্জ্বল চোখ, রঙ-[illegible]। এক নজরে ঝর্ণাপিসীর পুরো ছবিটা ভাসল সুব্রতর সামনে।

—কি হয়েছে মা ঝর্ণাপিসীর।

মা নিঃশ্বাস ফেলল একটা বড় করে।

—ছেলেরা অবস্থার গতিকে ভেসে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে আসে এখানে কিছু সাহায্যের আশায়, তাই নিয়েই রাগ।

—তা, তোমার উপর রাগ না করে ঝর্ণাপিসীকে বাবা সাফ কথা বলে দিলেই তো পারেন।

—হয়তো সেইটাই ঘটবে এবার, অপমান করে ফিরিয়ে দেবেন কোনদিন। ও'রই তো বোন, তবু আমি কত সামলাই বলত। ইস্ কি বিশ্রী ব্যাপারই যে হবে।

আপন মনে বলতে বলতে মা ঘরের বাইরে চলে গেল। শূন্য চায়ের কাপের সামনে সুব্রত বসে রইল খানিকক্ষণ চুপচাপ। জানালার বাইরে রোদ ঘন হচ্ছে। হাত-কয়েকের মধ্যে একটা পুকুর। দু-তিনটে খয়েরী সাদা হাঁস জোট বেঁধে নির্বিকার ভেসে বেড়াচ্ছে। হাওয়ায় কেমন একটা হাল্কা হাল্কা ভাব। ওপাশে একটা ছোট মণিহারী দোকান, তার সামনে নিতান্ত বেমানান হয়ে উঠেছে কৃষ্ণচূড়া গাছটা। পুকুরের অপর পারে খানিক মাঠের মতন উঁচু জমি, ঘাসে ছাওয়া। সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো বাচ্চা ছেলে ঘুড়ি ওড়াতে ব্যস্ত। শুধু হাফ-প্যান্ট-সর্বস্ব শরীরের লিকলিকে হাতে সুতোর টান দেখে দু' মিনিট তাকিয়ে রইল সেদিকে সুব্রত। ওর জানলার নীচে নিজেদের ছোট্ট মাঠটুকু থেকে শিউলীর গন্ধ আসছে। সকালের রোদে হাওয়ায় মাখামাখি গন্ধটা ভারী সুন্দর লাগে। বস্তুতঃ এখানে এই খোলা-মেলা প্রকৃতিটুকুর জন্যেই সুব্রতর মন টিকে যায়, তাছাড়া এই বাড়ী এই পরিবেশ তার কাছে অসহ্য লাগে, বিশেষ করে তার সেই হোস্টেলের একক স্বাধীন জীবনের তুলনায়।

এসব ভাবতে ভাবতে সুব্রতর ঝর্ণাপিসীর কথা মনে হল আবার। দুস্থা হলেও ঝর্ণাপিসীর চেহারাটা কোনদিনও যেন তেমন মলিন বিষণ্ণ লাগেনি তার কাছে, বরং বড় বড় উজ্জ্বল চোখে একটা সতেজ দীপ্তি লক্ষ্য করেছে ও বরাবর। পাতলা ঠোঁটে সবকিছুকে তুচ্ছ করার ঈষৎ অহঙ্কারী দৃষ্টি। আসলে ঝর্ণাপিসীর বয়স তেমন বেশী নয়, বাপের বাড়ী চিরকাল আদরে লালিত ছিল, কপালগুণে বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে বাপ-মাকেও হারালো এবং তৎসহ স্বামীরও অসুস্থতার দরুণ অবস্থা বিপর্যয় ঘটল। এখন তার আত্মীয়ের মধ্যে কেবল প্রাণকৃষ্ণ ও তার পরিবার। সেই সূত্রেই মাঝে-মধ্যে এখানে আসে, আত্মীয়তার সহজ অধিকারে প্রাণকৃষ্ণর কাছে কিছু উপকার দাবী করে। আর প্রাণকৃষ্ণ তাকে এখন...।

মাথা নেড়ে নিজের মন থেকে চিন্তাটাকে তাড়াতে চাইল সুব্রত। বস্তুতঃ এমন নির্মল সকালে সুব্রত কোন বিষাদ চিন্তায় নিজের মনকে সম্পৃক্ত করতে চাইছিল না। এমনকি তার নিজের উদ্দেশ্যে বলা বাবার রূঢ় বাক্যগুলিকেও আপাততঃ নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। তবু মার কথা ভেবে কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে মনটা। বাবার রূক্ষ মেজাজের হাত থেকে নিজেকে ও সংসারের আর সবকিছুকেই রক্ষা করতে করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারী। একটা নিঃশ্বাস ফেলে জোর করে ওসব চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত করল সুব্রত, দু'হাত ছড়িয়ে আলস্য ছাড়াল শরীরের। চাকরী একটা খুঁজে পেতে হবে তাড়াতাড়ি, সুব্রত ভাবল। তারপর সদ্যো জানালা গলে আসা মোড়া খবরের কাগজটা টেনে নিল হাত বাড়িয়ে।

এ সময়টা দিন সামান্য তাড়াতাড়ি শেষ হয়। পড়ন্ত বেলায় জলের বুকে কিরকম নির্জন ছলছল শব্দ ওঠে। আসন্ন সন্ধ্যার ইঙ্গিতে ছুট-ফটিয়ে যে যার বাসায় ফেরে পাখির ঝাঁক। এ সময় গঙ্গার পাড়ে রুমাল পেতে গুছিয়ে বসতে গিয়েও খুঁত খুঁত করে উঠল অর্চনা।

—এখন এখানে বসলে কিন্তু দেরি হয়ে যাবে খুব।

—হোক না, ক্ষতি কি তাতে, সুব্রত অবহেলায় বলল।

—তোমাকে তো আবার ফিরতে হবে। দিনকাল ভালো নয় ভয় করে ভীষণ। অর্চনার মুখে ছায়া ঘনাল।

—ওরকম গিন্নীর মত কথা বলো না তো! সুব্রত সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে অর্চনার শংকাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিল।

—এমন কথা বল না! অর্চনা হঠাৎ লজ্জায় মুখ নামিয়ে কটাক্ষে তাকাল সুব্রতর দিকে।

দেখে মনে হাসল সুব্রত। গিন্নী হবার দিকে সব মেয়েরই প্রবণতা। মনের মত মানুষকে ঘিরেই কল্পনার জাল বোনে দিনরাত।

—পরীক্ষার পড়া কেমন তৈরী হচ্ছে এখন, সুব্রত জলের দিকে তাকিয়ে বলল।

—ধুৎ, খালি কাঠের মত রসকষহীন প্রশ্ন। পড়ছি না, বুঝলে? সুব্রত এবার শব্দ করে হাসল। আধপোড়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল দূরে।

—তাহলে বলি, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

—বারে কথা। একথা বলার কোন অর্থ হয় না।

—এ-ও বাজে? তার মানে?

—আমার থেকে কত সুন্দরী মেয়ে রয়েছে, তাদের দেখলে তোমার আরো ভাল লাগবে। ওরকম সার্বজনীন ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট নেই।

—তবে তো তোমাকে খুশি করা মুস্কিল। সুব্রত কৃত্রিম দুর্ভাবনার মুখ-ভঙ্গী করল।

ক্রমশঃ চারিদিকে সন্ধ্যার আবছায়া নিবিড় হয়ে আসছিল। সামনে জলের রঙ খুব ধূসর গাঢ় ও গভীর নীল হচ্ছিল। ওদের মাথার ওপর ঝাঁকড়া মাথা পত্রবহুল গাছ একটা, তার ডালে পাতায় থোকা থোকা অন্ধকারে দু'একটা জোনাকি জ্বলছে। পায়ের কাছে একটা লম্বা ঘাসের ডাঁটি অন্যমনে ছিঁড়ছিল অর্চনা। খুব ধীর মৃদু কণ্ঠে প্রায় আত্মগতভাবে বলল,

—আমাকে খুশি করার মতন কোন কথাই কি তোমার বলার নেই?

সুব্রত দেখে দেখে ভাবল অর্চনার অস্ফুট গলা, ঘনায়মান ছায়ান্ধকারে হাটতে

খুঁতোন রাখা ওর মুখ, দূরাশ্রয়ী দৃষ্টি, সমস্তই এই উদাস পরিবেশের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলেমিশে গেছে। সুব্রত বুঝল অর্চনা ওর সমগ্র সত্তাকে আপাততঃ একটিমাত্র প্রশ্নবোধক চিহ্নে সূচীমুখ করে সুব্রতর জবাবের অপেক্ষা করছে। ওর তীব্র অথচ নীরব প্রতীক্ষা সুব্রতর মুখ থেকে সেই চরম আশার বাণীটি শোনবার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে ক্রমশঃ আশ্চর্য আদ্র তার চল উপলব্ধি করছিল সুব্রত। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল এই মুহূর্তে অর্চনার সমস্ত উদ্বেগ, আশঙ্কা ও প্রতীক্ষাকে মুক্ত করে দেবার মত কিছু উচ্চারণ করে ফেলে, ওর জীবনকে পূর্ণ করে তোলার প্রতিশ্রুতি রাখে সামনে। কিন্তু কার্যত সেসব কিছুই বলল না সুব্রত। শুধু পরিস্থিতিটা হাল্কা করার জন্য অকারণ হেসে ফেলল খানিকটা। তারপর প্রায় কলরব করে বলে উঠল,

—আচ্ছা, আপাততঃ তুমিতো আমাকে খুশী করতে পার খানিকটা!

—কি রকম? চোখের কোণে তাকাল অর্চনা। তার ঠোঁটের প্রান্তে তখনও গাম্ভীর্য ঝুলছে সূক্ষ্ম রেখায়।

—শুধু শুধু বসে আছি। বাদাম কিনে এনেও তো খাওয়াতে পার।

—বয়ে গেছে। মুখ গম্ভীর রাখলেও অর্চনার চিবুকে কৌতুকের ভাঁজ পড়ল।

—লক্ষ্মীটি, তোমার পয়সায় বাদাম খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে আজ। সুব্রত কৃত্রিম মিনতি চোখে মুখে মাখিয়ে ফেলল।

—আমার পয়সা নেই, যাও।

—দেখি তোমার ব্যাগ, সুব্রত ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিতে গেল, হৈ হৈ করে ধমকে উঠল অর্চনা।

—এই, খবরদার আমার ব্যাগ টানাটানি করবে না বলছি, ভাল হবে না। অর্চনা চোখ গোল করে ঝগড়ার ভঙ্গি করল।

—ওঃ, ভারী মূল্যবান জিনিস আছে যেন, সুব্রত টিপ্পনী কাটল। মেয়েদের ভ্যানিটিতে যে কি থাকে সব জানি আমি। কি কি আছে বলব, ছোট্ট গোল আয়না, লিপস্টিক মিনি চিরুনী আর অজ্ঞাত কোন যুবকের দু একখানি প্রেমপত্র।

—বেশ তাই। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল অর্চনা, কাঁধের আঁচল সামলে সটান গটগট করে চলে গেল দূরে দাঁড়ানো বাদামওলার কাছে।

সুব্রত চেয়ে দেখলো ওর গমনভঙ্গি। স্বেচ্ছায় বাদাম খেতে চাওয়ায় অর্চনা দারুণ খুশী হয়েছে নিশ্চয়ই। ওকে খুশী করা কত সহজ, ভাবল সুব্রত, অর্চনার সারল্যের সুযোগ সুব্রত সর্বদাই গ্রহণ করছে। স্বাচ্ছন্দ নির্ভরতায় অর্চনা ওকে মেলে ধরছে ওর কাছে, প্রতিদানে ও কি দিতে পারে সেকথা ভাল করে না ভেবেই। আমি কি ওর অনাঘ্রাত বিশ্বাসকে ঠকাচ্ছি? ভাবল সুব্রত, ভাবতে গিয়ে বুকের মধ্যে কি রকম কষ্ট অনুভব করল। আমি কি ওকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারব? সুব্রত নিজের মনের ভিত পর্যন্ত খুঁড়ে দেখতে চাইল, হয়ত পারব, কিংবা হয়তো নয়, কিছুই বলা যায় না, আজকের এই আমি শ্রীসুব্রত মজুমদার এখনো জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত। অন্যের ওপর নির্ভরশীল, রোজ সকালে পিতা শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মজুমদারের কাছে চাকরী খোঁজার জন্যে গুঁতো খায় আর নীরবে মায়ের আঁচলে মুখ মোছে। কিন্তু জমানা সব সময় এক থাকে না, পাল্টে যায়। একদা এই সুব্রত মজুমদারই হয়ত কেউকেটা হয়ে উঠে বিশ্বসুদ্ধ লোককে হেঁকে উঠবে—তুমি কে হে?

হাওয়ায় এলোমেলো হওয়া চুলে একবার আঙুল চালিয়ে নিল সুব্রত। দূরে বাদাম-ওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে অর্চনা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হওয়ার আগেই ইতস্তত ইলেকট্রিক বাতিগুলি জ্বলে উঠেছে। সে আলোয় অর্চনার মুখ চেহারা শাড়ীর রঙ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুব্রত। অর্চনা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। বাদামওয়ালার কাছে বেশ ছোটখাট একটি ভীড়, সেজন্যেই অর্চনার দেরী হচ্ছে। অর্চনার ঝকঝকে দাঁতের হাসি দেখতে দেখতে গঙ্গার দিকে মুখ ফেরাল সুব্রত, সেখানে অস্পষ্ট ধূসর অন্ধকার বিছিয়ে আছে। দু একটি নৌকার মিটমিটে আলো জলের বুকে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। পাড়ের কাছে ছলাৎ ছলাৎ করা সেই অদ্ভুত শান্ত নির্জন শব্দটা হাওয়ায় পাক খেয়ে ক্রমশঃ দূরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক সময় মুখ ফিরিয়ে সুব্রত অর্চনার সুচ্ছন্দ হেঁটে আসা দেখল।

—এই নাও।

—এত? ঝুড়িসুদ্ধ তুলে এনেছ নাকি?

—তুমি খাও না।

—আমি কি রাক্ষস?

—মনে হয়।

এই সব টুকরো পরিহাসের মধ্যে সুব্রত অর্চনাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল, ঠিক দেখার জন্য নয়, ওর মনে এই মুহূর্তে কিছু কিছু অদ্ভুত চিন্তার ঢেউ ওঠাপড়া করছিল। অর্চনার মুখ হাসি কথা বলার ভঙ্গি ক্রমশঃ ওর সামনে ওর মায়ের আকৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল এবং নিজেকে এই মুহূর্তে প্রাণকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ও ভাবতে পারছিল না। সুব্রতর মা যেমন রুক্ষ প্রকৃতির প্রাণকৃষ্ণর কবলিত একজন নীরব, নির্বিরোধ প্রাণী মাত্র, একদিন হয়ত অর্চনারও সেই পরিণতি হবে। প্রাণকৃষ্ণর রক্ত সুব্রতকে সম্ভবত সুললিত জীবনে বাঁচতে দেবে না কোনদিনই।

—কি ভাবছ? প্রশ্ন করে উঠল অর্চনা।

—কিছু না। মন থেকে অন্যসব ছবি ঝেড়ে ফেলে সহজ হতে চাইল সুব্রত। তবু একটা বিমর্ষভাব যেন ওর সমস্ত সত্তায় ছেয়ে গেল। কোনদিন কোন সুন্দর দৃশ্য বা পরিবেশ সুব্রত একটানা উপভোগ করতে পারে না। তার মধ্যে একটা না একটা বীভৎস অথবা বিষাদ চিন্তা এসে জুড়ে বসবেই। যেমন গাছে সুন্দর পাখির খেলা দেখে তার ব্যাধের কথা মনে আসে।

—চল অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমাকে আবার ট্রেন ধরতে হবে। সুব্রত হাতঘড়ি দেখল।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুব্রত বলে উঠল,

—আবার কবে দেখা হবে বলত?

—আর কোনদিন নয়, অর্চনা মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বলতে চাইল।

—দেখা যাবে, সুব্রত ওর বাহুমূলে আলতো টোকা দিল।

—দেখো।

অর্চনা একটু জোরে হাঁটছিল। শুধু দেখা করে আর চা খেয়ে ও যে সময়টাকে আর প্রলম্বিত করতে চায় না, একথা বোঝাবার জন্যেই হয়ত। সুব্রত ইচ্ছে হলে এখনি ওকে কিছু বলে দিতে পারে। হয়ত এমন কথা, যে কথার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হবার কোন প্রয়োজন থাকবে না। আশ্চর্য, সুব্রতর একবার ইচ্ছে হল এধরনের কথাটা বলে দিতে। পরক্ষণেই কোন অজ্ঞাত কারণে ওর ঝর্ণা পিসীর কথা মনে পড়ে গেল প্রাণকৃষ্ণর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত সেই অসহায় মুখ। চিন্তাটাকে তাড়াবার জন্যে একটা নিঃশ্বাস চেপে দ্রুত পা চালাল সুব্রত।

বিকেলের দিকে শরতের ছেঁড়া মেঘেই বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঠো রাস্তা এখনো জায়গায় জায়গায় জল কাদায় একাকার। যথাসম্ভব জুতো বাঁচিয়ে চলতে তবু ভাল লাগছিল বেশ। আলের দুধারে সবুজ ক্ষেত, শালুক ফোটা স্বচ্ছ পুকুর। ইতস্তত পানের বোরোজ, আম, জামরুল, কলা ও সুপুরির গাছ। এইসব মাঠঘাট জল গাছ সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাক খেয়ে আসা বাতাসে যেন অদ্ভুত সুন্দর কিছুর ঘ্রাণ, শরীরের চারিপাশে যেন ঝনঝনিয়ে পুজোর বাজনা বেজে ওঠে। জনাকীর্ণ শহরে হোস্টেলে থাকতে এমন করে পুজোর গন্ধ এসে গায়ে জড়ায় না। বাড়ী এসে অন্তত প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়টা হয়েছে তার, ভেবে সুব্রত আর একবার বুক ভরে খোলা হাওয়াটা টেনে নিল। চারিদিকে তাকিয়ে শালুক ফোটা পুকুর ও বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত দেখল। এরই মধ্যে প্রাণকৃষ্ণরও অনেক জমি আছে ছড়ানো ছিটনো। বস্তুত এই ছোটখাট গ্রামের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ বেশ সম্পন্ন লোক, তার নিজস্ব কোঠাবাড়ি, বাগান, ক্ষেত, ট্রানজিস্টর ইলেকট্রিক আলো এবং স্টেশনারি দোকান সমেত।

স্টেশন থেকে ট্যাক্সি গেছে গাঁয়ের দিকে, হয়ত খানিকক্ষণ আগে, ভিজে রাস্তায় গভীর চাকার দাগ, মাঝে মাঝে গর্তে বৃষ্টির জল জমা। পা পিছলোতে গিয়েও সামলে নিল সুব্রত। আকাশের এক কোণে লাল রঙ বেশ কিছু সময় থেকে ক্রমশঃ ধূসর হয়ে এসেছে। বিকেলে মরা আলোয় চারিদিকে কি রকম নির্জন নিঃসঙ্গ মনে হয়। স্টেশন থেকে বাড়ি মিনিট কুড়ির পথ। হাঁটতে হাঁটতে এই রাস্তাটুকুর মধ্যেই মাথাটা অসম্ভব ভারী

লাগছে সুব্রতর। কানের দু'পাশ উষ্ণ, পদক্ষেপ শিথিল মনে হচ্ছে। এরকম অস্থির শারীরিক অবস্থায়ও অর্চনার কথা মনে হচ্ছিল সুব্রতর। আজকে অর্চনার সঙ্গে দেখা হল না। পার্কস্ট্রীটের অফিসে ইণ্টারভিউ সেরে ধর্মতলায় রেস্তোঁরার সামনে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে সুব্রত। ঘাড় কোমর অজ্ঞাত কারণে অসম্ভব টনটনিয়ে উঠেছে, চোখের সামনে জনস্রোত ফেরিওলা গাড়ীর মিছিল সব কিছু বৃষ্টির আকাশের মত বর্ণহীন মনে হয়েছে। তবু অর্চনাকে কথা দেওয়া আছে বলে সুব্রত চলে আসতে পারেনি। বাস ট্যাক্সি পথের দিকে চেয়ে থেকেছে, তবু আসেনি অর্চনা। দূরে মাঠের প্রান্তে গাছের সারিতে জমে ওঠা আবছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হল অর্চনা কি নিষ্ঠুর। একমাত্র নিরাপত্তার মূল্যেই সে নিজেকে ধরে দিতে পারে সুব্রতর কাছে, আর কিছুতে নয়। ভালবাসা, ভালবাসা, সুব্রতর মাথায় অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যে শব্দটাকে দুবার উচ্চারণ করল। কে জানে হয়ত প্রেম ভালবাসাগুলি মান অভিমান বিবেচনা ও নিরাপত্তাবোধের থেকে বড় কিছু নয়। বস্তুত এখন সুব্রত ভালবাসা বস্তুটিকে বুকের মধ্যে তেমন করে অনুভব করতে পারছে না। অর্চনাও এসব সেন্টিমেণ্টকে খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না সম্ভবত, না হলে সুব্রতর প্রতি হঠাৎ এরকম মৌন অনাস্থা জ্ঞাপন করল কেন।

এলোমেলো পদক্ষেপে চলতে অদ্ভুত আচ্ছন্নতা সমস্ত শরীরে ছেয়ে আসছিল ওর। দুপলক চোখ বন্ধ করে ও অর্চনাকে দেখল, চলমান মোটরের মিছিলে একটি ঝকঝকে বিশিষ্ট গাড়ী, তার মধ্যে চকমকে রঙিন কাঁচের অর্চনা, পাশে সুবেশী সুপুরুষ যুবক। অফুরন্ত আবেগে দেদার হাসছে অর্চনা। লাল ঠোঁট সাদা দাঁতে কামড়ে ধরছে বারবার। চোখ খুলতেই ছবিটা সরে গেল এবং এতক্ষণে নিজের বাড়ীর দরজার সামনে পৌঁছে গেল সুব্রত।

বসার ঘরে পুরনো আমলের কাঠের চেয়ারে এক হাঁটু উঁচু করে প্রাণকৃষ্ণ বসে। সামনে কালো রঙের ভারী বিরাট কাঠের টেবিল। প্রাণকৃষ্ণ কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ে হিসেব করছে। ওপাশে চাদর পাতা তক্তপোষে একজন মলিন চেহারার যুবক। প্রাণকৃষ্ণর কর্মচারী। স্টেশনারী দোকানের জন্য সম্প্রতি যেসব মালপত্র কলকাতা থেকে আনানো হয়েছে তার হিসেব দিচ্ছে। প্রাণকৃষ্ণ নিজে বসে দোকানদারী করে না। এইসব কর্মচারীদের দিয়েই কাজ চালায়। তার পুংখানুপুংখ জেরার মুখে খুঁটিনাটি হিসেব দাখিল করতে গিয়ে যুবকটির মুখে বিপর্যস্ত ভাব। দু' মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখছিল সুব্রত। এসময় প্রাণকৃষ্ণ ওর দিকে তাকাল। প্রাণকৃষ্ণর কালো নাকের ওপর সোনারঙের চশমা, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

—কি রে কিছু খবর আছে?

—না। সুব্রত প্রায় অস্ফুটে বলল, আস্তে আস্তে চলে এল সেখান থেকে। এসময় সুব্রতর আবার অর্চনার কথা মনে হল। ভালই করেছে অর্চনা, ও ভাবল, সুব্রতর কাছ থেকে এরকম করে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই তার উচিত। কেননা, অদূর ভবিষ্যতে এই প্রাণকৃষ্ণর সামনে, তার পুরনো টেবিল চেয়ার দোকান, পুরনো শাসন ধমক বিধিনিষেধের কড়াকড়ি এইসবের মধ্যিখানে ছিপছিপে নরম অর্চনা হয়ত রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠত। তার সেই মৃত্যু, প্রাণকৃষ্ণর চড়া মেজাজের আওতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু সুব্রত সহ্য করতে পারত না।

দোতলায় উঠে সিঁড়ির মুখ থেকেই মাকে দেখতে পেল সুব্রত। সদ্য পুজোর ঘর থেকে বেরোন। লালপাড় গরদ শাড়ী। এক হাতে জ্বলন্ত ধূপ আরেক হাতে প্রসাদী ফুল। ধূপের মৃদু মিষ্টি গন্ধ অলক্ষ্যে বারান্দাটুকুর বাতাস জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এ সময় সুব্রত মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকল,

—মা।

—এসেছিস? মা ফিরে তাকাল, তার শান্ত চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—তুমি আমার কথা ভাবছিলে? সুব্রত অকারণে প্রশ্ন করল।

—ভাবব না? তুই রাস্তায় থাকলে আমার ভাবনা হয়।

—এতক্ষণ তুমি পুজোর ঘরে বসে কি প্রার্থনা করলে বলত? ঠোঁটের কোণে অর্থহীন হেসে বলল সুব্রত।

—যাঃ, অত বকবক করতে হবে না, ঘরে আয় তো এখন, মা সস্নেহ হেসে ওর অবুঝ প্রশ্নকে পাশ কাটাতে চাইল।

—বল না, সুব্রত জেদ করল, কি প্রার্থনা করলে।

—কেন, তোর মঙ্গলের জন্য, তোর বাবার জন্যেও। কদিন ধরে ওঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না রে খোকা। শক্ত মানুষ প্রকাশ করেন না, তবু রাত্রে শুয়ে শুয়ে এক একদিন বলে ফেলেন, মাঝে মাঝে ওঁর খুব বুক ধড়ফড় করে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বলতে বলতে মায়ের গলা সামান্য কেঁপে গেল। উদ্বেগের ছায়া ঘনাল দুচোখে।

সুব্রত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল মায়ের দিকে, মায়ের চিন্তিত চোখ দুটির দিকে, এ সময় মা বলে উঠল,

—অমন করে কি দেখছিস, খোকা, তোর মুখ চোখ কেমন যেন লাগছে। দেখি—

পুজোর কাপড়েই সুব্রতর কপাল ছুঁয়ে দেখল মা।

—ইস, একি, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। কিছুই বলিসনি তো এতক্ষণ, ব্যাকুল হয়ে উঠল মা, সুব্রতকে ধরে এনে শুয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

—ব্যস্ত হয়ো না মা, এমন কিছু নয়, সুব্রত ক্লান্ত গলায় বলল।

—তুই শুয়ে থাক খোকা, নড়াচড়া করিসনি, আমি এখুনি আসছি।

মা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলে সুব্রত জানালার দিকে তাকাল। আকাশের গায়ে অবশিষ্ট আলোর আভাসটুকু মুছে গেছে। চারিদিকে কেমন একটা অবয়বহীন বিষণ্ণতা। জামরুল গাছের থোকা থোকা পাতাগুলি এখন শুধু ছোপছোপ কালচে অস্তিত্ব। ঘরের ভিতরের আলো ম্লান, মাথাটা অসম্ভব হালকা লাগছে এখন সুব্রতর। প্রকৃতপক্ষে সারা শরীরটাই যেন ভারহীন বোধ হচ্ছে। দুচোখ বুজে আসছে ক্লান্তি ও ঘুমে। সুব্রত চেষ্টা করেও চোখ খুলে রাখতে পারছিল না। অত্যন্ত তৃষ্ণা অনুভব করেও কাউকে ডেকে জল চাওয়ার ক্ষমতা হচ্ছিল না ওর। এ সময়, সম্ভবত অনেকক্ষণ পরে কানের কাছে প্রাণকৃষ্ণর গলা শুনল ও।

—এত শরীর খারাপ নিয়ে আজ ইণ্টারভিউ দিতে যাবার কি দরকার ছিল? তুমিই তো খালি খালি খিটখিট কর, বলতে ইচ্ছে হল সুব্রতর, কিন্তু সাড়া দিতে পারল না, পড়ে রইল চুপচাপ।

মাথায় জলীয় ঠাণ্ডা কোন কিছু অনুভব করতে পারছে, তার সঙ্গে কার হাতের আঙুল বোলানো। মায়ের, না, মায়ের হাত খুব নরম। সম্ভবত এটা প্রাণকৃষ্ণর হাত। প্রাণকৃষ্ণ বেশ নিচু গলায় আক্ষেপের সুরে একটানা বলে চলছিল।

—গেল তো শরীরটা জখম হয়ে? কেন ভাতের কি এতই অভাব, যে এরকম হন্যে হয়ে চাকরী খুঁজতে হবে? আমি কি মরে গেছি?

সুব্রতর হঠাৎ কি রকম ভাল লাগছিল, বুকের মধ্যে একটা অনাঘ্রাত কোমলতার ঢল নামছিল। প্রাণকৃষ্ণর কোলের ওপর শিথিল হাতখানা তুলে দিতে ইচ্ছে করছিল তার।

—এই সব পুতুলের মত শরীর, প্রাণকৃষ্ণর দুঃখিত গলা শোনা যাচ্ছিল, সম্ভবত মায়ের উদ্দেশ্যে, ঠিক তোমার ধাত পেয়েছে, ফর্সা রোগা রোগা, আমাদের মত শক্ত সমর্থ তো নয়। ওকে এবার থেকে একটু দেখেশুনে জোর করে খাওয়াবে, বুঝলে।

সারা শরীরে দারুণ আচ্ছন্নতা, তবু বুকের মধ্যে আশ্চর্য ভালবাসা। কাল সকালে হয়ত এই প্রাণকৃষ্ণ থাকবে না, এই সুব্রত থাকবে না। তবু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বাবার মুখের এইরকম সব মমতার কথা শোনবার জন্যে সারাজীবন এমনি চোখ বুঁজে পড়ে থাকতে পারে সুব্রত।

এবং এমত চিন্তার মাঝখানে আবার অর্চনার কথা মনে হল তার। সে ভাবল এই মুহূর্তে অর্চনা খুব বিনম্র ভঙ্গীতে তার পায়ের দিকে খাট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, তার কপালে উজ্জ্বল সিঁদুর, চোখ প্রার্থনায় উদ্দীপ্ত। এরকম ভাবনার মাঝখানে মায়ের উৎকণ্ঠিত গলা শুনল সুব্রত।

—এই গরম দুধটুকু খেয়ে নে তো খোকা। অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মত বিনম্র-ভাবে হাঁ করে তৃষ্ণা মেটাল সুব্রত।

জলসা

একটি ওড়িষী প্রতিষ্ঠানের রজত-জয়ন্তী উৎসব

কয়েকদিন আগে খিদিরপুর উড়িয়া হাই স্কুলের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মহাজাতিসদনে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লায়নস্ ক্লাবের সভাপতি। পৌরোহিত্য-কালে শ্রী আর বি পট্টনায়ক এই ওড়িষী প্রতিষ্ঠানটির ধাপে ধাপে এগিয়ে বর্তমান গৌরবোজ্জ্বল পরিণতিতে পেঁৗছনয় যেসব শুভানুধ্যায়ীর নীরব সাহায্যের অবদান আছে, তাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রী (ছ' বছর) সুস্মিতি পট্টনায়কের ওড়িষী নৃত্য তারিফ করবার মত। উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলন থাকলে এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা সত্যিকারের প্রতিভা হয়ে উঠতে পারবে। অক্ষয়কুমার মোহান্তি বেশ কয়েকটি আধুনিক গান দিয়ে আসর জমিয়ে তোলেন। রঘুনাথ পাণিগ্রাহীর একক সংগীতও শোনবার মতই।

এ-আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন নৃত্যপ্রবীণা সংযুক্তা পাণিগ্রাহী ও সঙ্গীতালংকার শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক। শ্রীমতী পাণিগ্রাহীর ওড়িষী নৃত্যে ভক্তি-উজ্জ্বল ছন্দ ভাবে, মুদ্রায় ও গতিভঙ্গীর সাবলীল ভঙ্গীতে পুরীর মন্দিরের দেব-দাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মঞ্চের পার্শ্বস্থিত শ্রীশ্রীজগন্নাথজীর মূর্তি এই ভাববিস্তারের প্রেরণাস্বরূপ। নৃত্যের অনান্য সংগীতের সঙ্গে এঁরই স্বামী শ্রীরঘুনাথ পাণিগ্রাহীর কণ্ঠসংগীত অনু-ষ্ঠানের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠানে 'যোগকোষ' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনালেন সংগীতালংকার সুনন্দা পট্টনায়ক। জনাব সগীরুদ্দিন ও ওস্তাদ কেরামতুল্লার সারেঙ্গী ও তবলা-সঙ্গতে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে এঁর দেরী হয়নি। কণ্ঠের অতুলনীয় লাবণ্য ও দাপটের বিরল সমন্বয় ও আবেগে রসোত্তীর্ণ এঁর অনুষ্ঠান—এক আশ্চর্য পরিমণ্ডল রচনা করেছে। কখনও বিস্তারের তন্ময়ী যাদুতে, কখনও চমকপ্রদ তানের ফুলঝুরীতে ইনি যে শিল্পকৃতি প্রদর্শন করেছেন তা রীতিমত সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে।

শুধুমাত্র উড়িষ্যার শিল্পীসমাবেশে এমন জমজমাট একটি অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ।

নিউ দিল্লীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

সম্প্রতি নিউদিল্লীতে এক সঙ্গীতোৎসব হয়ে গেল বঙ্গসংস্কৃতি উৎসব আয়োজিত নিউদিল্লী সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। এই উৎসবে যোগদানকারী বহু শিল্পীর মধ্যে জপমালা ঘোষ, দিলীপ শর্মা ও পরিতোষ রায় ছিলেন। আটদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ছড়াগান, পল্লীগীতি, অতুল-প্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুলগীতি ও শ্যামাসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন শ্রীমতী জপমালা ঘোষ।

সংগীতে বাংলা গানের ইতিহাস

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে অরূপ নিবেদিত হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর একক সংগীতের আসর এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। স্মরণীয় শুধু সু-পরিবেশনার কারণেই নয়। প্রাচীন বাঙ্গালী গীতিকার শ্রীধর কথক, গোপাল উড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নিধুবাবু, দাশরথি রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র-লাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের গানে বাংলা গানের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাকে অনু-

ছড়াগান গাইছেন জপমালা ঘোষ

রবীন্দ্রসদনে রুবী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

ধাবন করার এমন একটা মহৎ এবং দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বিদগ্ধ সমাজের অভি-নন্দনের দাবীদার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অনুষ্ঠানের ভাষ্যকার শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি 'বাঁধা সড়কে না চলে মানুষ যখন পায়ে-চলা পথে চলে তখন আমার মন তাতে সাড়া দেয়, আমি সেই পথিকের পাশে এসে দাঁড়াতে আনন্দ পাই।'

সত্যিই দাঁড়িয়েছেন। সানন্দে, সাগ্রহে ও অনলস ছন্দে। হিমঘ্নবাবুর গাওয়া প্রতিটি গানের আগে গান, সুর ও তালের ব্যাখ্যা রসোপভোগের সহায়ক ত হয়েইছে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছে অতীতের পট-ভূমিকা যার মধ্যে গীতিকারদের জীবন-প্রবাহে গড়ে উঠেছে তাঁদের মানসপ্রকৃতি ও রচনাশৈলীর ধারা।

উদ্বোধন সঙ্গীতে ছিল 'মোদের গরব মোদের আশা'।—এসব সমবেত গানে কোনো বিশেষ শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবকাশ খুবই কম। তবু পরিচালিকা রুণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ আমাদের আকৃষ্ট করে-ছিল, নির্ভুল সুরক্ষেপণ ও মাধুর্যের কারণে।

হিমঘ্নবাবু গান শুরু করলেন রবীন্দ্র-নাথ থেকেই। 'দেশ'-এর আভাষে 'মহানন্দে হের গো সবে'-র গাম্ভীর্য। তারপরই 'মল্লার'—'আজ বুঝি আইল প্রিয়তম'-তে সুরগত সাদৃশ্য আনন্দদায়ক। তারপর গিরিশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নিধুবাবু ও রবীন্দ্র-নাথের যথাক্রমে বেহাগ ও জৌনপুরী

রাগাভাষে রচিত গানগুলিতে একই রাগে উভয়ের প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য শ্রোতাদের মর্মগোচর করা হয়। এর পর একই ভাবের ওপর দুই যুগের কখনও একই যুগের গীতিকার দাশরথী রায়, শ্রীধর কথক ও নিধুবাবু, গোপাল উড়ে ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, নিধুবাবু ও অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি। নতুনত্ব হোলো বঙ্কিমচন্দ্রের একটি গান 'সাধের তরণী আমার কে দিল' ভৈরবী সুরে। এ-গান আগে কোথাও শুনিনি।

গান-সংকলনের গুরুদায়িত্বে হিমঘ্নবাবুর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও অন্তর্দৃষ্টি শ্রদ্ধেয়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে আমরাও বিশ্বাসী। গানগুলির মধ্যে ভাষাগত অথবা ভাবগত মিল যদি নাও থাকে, তাদের অমিলটা শ্রোতাদের বোধগম্য করানোও কম কথা নয়। কারণ রসের ক্ষেত্রে সৃষ্টির প্রকৃত তারতম্য বোঝাটাই রসিকের কাজ। এ-কাজে হিমঘ্নবাবুর সুষ্ঠু সুন্দর ও সুরেলা পরিবেশনা রসবোদ্ধাদের রসোপভোগের সহায়ক হয়েছে। ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ-র তবলাসঙ্গত অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিকারক।

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্ট সেণ্টারের বার্ষিক অধিবেশন

গত সপ্তাহে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্ট সেণ্টারের বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন-সঙ্গীত দিয়ে শুরু করেন সংস্থার শিক্ষার্থী-বৃন্দ। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত।

কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীনিত্যপ্রসাদ ঘোষদস্তিদারের শিষ্যা নীতা সাহা। শ্রীমতী সাহা পরিবেশিত খেয়ালে শিক্ষা ও রেওয়াজের অভাব নেই। তবে তানের অঙ্গ আরো পরীশীলিত হওয়া দরকার।

কথক নৃত্য পরিবেশিত করেন প্রতিষ্ঠানশিক্ষিকা শ্রীমতী মানু পালে। শ্রীমতী পালের নৃত্য আগেও আমরা দেখেছি। এবারের পরিবেশনায় তাঁর অগ্রগতির স্বাক্ষর আনন্দদায়ক। লয়ের কাজ সুমার্জিত, ভাও-ও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। তোড়া, চক্রধার, তকোর ইত্যাদি বিভিন্ন অংগ মধ্যালয়ে প্রদর্শিত, নির্ভুল ও শ্রীসম্পন্ন। দর্শকবৃন্দের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে এঁর তোকর। তবলার প্রতি বোলের জবাব ও সাথসঙ্গতে সত্যিকারের রসসৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। তবলাসঙ্গতে শান্তাপ্রসাদের পুত্র কুমারলাল মিশ্র, গানে পন্ডিত রামগোপাল মিশ্র, হারমোনিয়াম ও তবলায় রমেশ ও কেদার মিশ্র।

পরিশেষে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার পরিবেশিত ভারতের বিভিন্ন দেশের লোক-সঙ্গীত এক আনন্দমুখর পরিবেশ রচনা করে।

রবীন্দ্রসদনে 'দিবস-রজনী'

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২১শে নভেম্বর রবীন্দ্রসদন মঞ্চে দেখলাম 'দিবস-রজনী'র রূপ, সঙ্গীতে ও নৃত্যে। রূপায়ণে ছিলেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুবী দত্ত।

মঞ্চে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য উপস্থাপনা বর্তমান সংস্কৃতি-লোকের এক অপরিহার্য অঙ্গ। আবার মূল নৃত্যনাট্যর বহুল প্রচলনতা এড়াবার জন্য নতুনত্ব প্রয়াসী কিছু প্রতিষ্ঠান কবিগুরুর অন্তহীন সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে বিষয়ানুযায়ী গান নির্বাচন করে নাটকীয় ভাবপ্রসারী রীতিতে সাজিয়ে নৃত্যনাট্য অথবা গীতিনাট্য রচনা করে নিচ্ছেন।

মহাস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ মহাদ্রষ্টাও। তাই নানান ব্যঞ্জনা দ্বারা উত্তরসূরীদের সৃজন-প্রয়াস উদ্দীপ্ত করেই ক্ষান্ত থাকেননি। এই উদ্যমকে সার্থক পরিণতিতে পেঁছে দেবার পথ-সৃষ্টিও করে গেছেন। ছোট, বড়, সোজা, বাঁকা অনেক পথ। আপন স্বধর্মানুযায়ী পথরেখা ধরে চলার সুবিস্তৃত অবকাশ আছে এ যুগের সন্ধানীদের। তাঁরা তা করছেনও।

এই কথাটাই বারবার মনে পড়ছিল 'দিবস-রজনী' দেখবার সময়। 'স্বপন যদি ভাঙেরে রজনী প্রভাতে', রাতের অন্ধকারের ফাঁকে অস্ফুট ঊষালোকের উঁকিঝুঁকি, এরই মধ্যে ঘুমের মধুর আবেশ ও জাগবার তাগিদ—'রামকেলী' রাগাশ্রিত কড়ি-মধ্যমের ইসারায় যেন মূর্ত হয়ে উঠল অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবগভীর উদাত্ত কণ্ঠে। তার সঙ্গে ছিল রুবী দত্তর নৃত্যের ব্যঞ্জনা। এইভাবে সুর ও ছন্দের পথ বেয়ে পেঁাছলাম মধ্যাদিনের তপ্ত নিঃশ্বাস, যখন পাখীরা গান বন্ধ করে। রাখাল বাঁশী বাজায় আর সেই বাঁশী শোনেন স্বয়ং রুদ্র। ভাবকল্পনার এমন অপরূপ উদ্ভাস, এমন উত্তরণ অন্য কোনো দেশের কোনো কবির কাব্যলোক আলোকিত করেছে কি?

এইভাবে বিকেল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোলো। এল গভীর নিশা—রহস্যে বেদনায়, ভাবঘন ইসারায়। তারপরই ভোরের আভাস, যখন বিচ্ছেদশঙ্কিতা নায়িকা মিনতি জানাচ্ছে 'তুমি যেওনা এখুনি'।

সঙ্গীত নির্বাচন ও তার যথাযথ পরিবেশনার কাজকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন অশোকতরু।

নৃত্যের অঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবী রাখেন শ্রীমতী রুবী দত্ত। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা ও রাতের নানান রূপ ও রস ইনি কখনও অভিনয়ে, কখনও নৃত্যভঙ্গিতে কখনও ভারতনাট্যমের লীলায়িত ভঙ্গিমায় কখনও কথকের উচ্চকিত বোলে মুখর করে তোলেন। গান ও নাচের ফাঁকটুকু কবিরই কাব্যসুন্দর মন্তব্যে ভরে দিয়েছেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহজ হৃদ্যতায়। পশ্চাৎপটে অনুষ্ঠান সার্থকতার সহায়ক ছিলেন তাপস সেন (আলোকসম্পাত), মঞ্চসজ্জায় সুরেশ দত্ত, যন্ত্রসঙ্গীতে দীনেশ চন্দ। অন্যান্য যন্ত্রীরা হলেন রমেশ চন্দ্র, বিপ্লব মণ্ডল, জহর দে ও কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ।

নৃত্যনাট্যের আগে একক সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন শ্রীমতী সুমিত্রা সেন ও সুচিত্রা মিত্র, নৃত্যনাট্যের পরে স্বপন গুপ্ত। সুমিত্রার আন্তরিকতা ও সুচিত্রার দৃপ্ততা তাঁদের পরিবেশনায় সু-মুদ্রিত ছিল। স্বপন গুপ্তও ভালই গেয়েছেন তবে অনুষ্ঠানকে দীর্ঘ প্রলম্বিত না করলে আরো উপভোগ্য হোতো তাঁর গান। শম্ভু মিত্রের 'মধুবংশীর গলি' ভোলা যায় না। ক্লিষ্ট জীবনের দীনতা একঘেঁয়েমো, নিম্নগামী পর্দায় সুপরিচিত গানের কলির মতই ধ্বনিত হোলো আবার সব্যসাচীর আবির্ভাব-সম্ভাবনা চড়া নিখাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনের প্রতি পরতে যেন গাঁথা হয়ে গেল। এ ত আবৃত্তি নয় যেন গান। বর্তমান জীবনবেদে ধ্বনিত চিরন্তন আকুতির ধ্রুপদী সুর।　　—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

শেষ পর্ব / মিঠু মুখার্জি

বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর চিৎপুর রোডের উপর জোড়াসাঁকো সান্যাল ভবনে বাঙলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় প্রধানত উত্তর কলিকাতার কয়েকজন নাটক-পাগল যুবকের সম্মিলিত উৎসাহে। ঐ যে সেদিন নাট্যপিপাসু জনসাধারণ আট আনা, এক টাকা বা দু' টাকা খরচ করে টিকিট কেটে মধুসূদন সান্যালের সামিয়ানা-ঢাকা উঠানের ওপর সারি দিয়ে সাজানো চেয়ার, বেঞ্চি ও শেষের দিকের শান-বাঁধানো [illegible] ভরে তুলেছিলেন, তারপর থেকে যে টিকিট কিনে থিয়েটার দেখার প্রথাটি [illegible] জন্যে চালু হয়ে গিয়ে বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে একটি স্থায়ী ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান করে তুলবে, একথা বোধ করি ঐ ৭ ডিসেম্বর রাত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের উদ্যোক্তারা কিংবা দর্শকরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

কিন্তু বেণীমাধব মিত্রকে সভাপতিরূপে নিয়ে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, মতিলাল সুর, মহেন্দ্র বসু, অমৃতলাল বসু, অবিনাশচন্দ্র কর, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নাটুকে যুবক যে ন্যাশনাল থিয়েটার দলটি সেদিন গড়ে তুলেছিলেন, বাঙলা সাধারণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় তাদেরই নাম চিরকালের জন্যে লেখা হয়ে রইল। অত্যন্ত ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, যিনি এই দলের শিরোমণি এবং প্রধানত যাঁর শিক্ষায় এঁরা শিক্ষিত, সেই নটকুলচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সময়ে এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ন্যাশনাল থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর মনে যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার তুলনায় ন্যাশনাল থিয়েটারকে অত্যন্ত দীন, সৌষ্ঠবহীন মনে হওয়ায় তিনি ঐ থিয়েটার দেখবার জন্যে সর্বসাধারণে টিকিট বিক্রী করা সম্পর্কে প্রতিকূল মত পোষণ করায় শেষ পর্যন্ত দলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শুধু তাই নয়, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সুখ্যাতিতে দর্শকরা, এমন কি বহু সংবাদপত্র যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই সময়ে তিনি ছদ্মনামে এই ন্যাশনালের ও তার অভিনয়ের নিন্দা করে 'লুপ্ত বেণী বইছে তেরোধার' নামক বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অবশ্য কিছুকাল পরেই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অর্থাদি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জানুয়ারী মাসের (১৮৭৩) মাঝামাঝি সময় থেকেই দুই বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং এঁদের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্যে সকলের সম্মতিক্রমেই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবং গিরিশচন্দ্র ফেব্রুয়ারী মাসে ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেকটার মনোনীত হন। এই যে বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার দু'মাসের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র এগিয়ে এসে তার হালটি শক্ত করে ধরলেন, সেই হালটি তিনি বরাবরই [illegible] আঁকড়ে থেকে বাঙলার সাধারণ নাট্যশালাকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে

নায়িকার ভূমিকায়/অপর্ণা সেন ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

গিয়ে একটি জাতীয় গর্বের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। গিরিশচন্দ্র একাধারে নট নাট্যশিক্ষক, নাট্যপরিচালক ও নাট্যকাররূপে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার যুগে এর মধ্যমণিরূপে বিরাজ করেছেন। ১৯০৫ সাল থেকেই মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লেও ১৯১২-র ৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রই ছিলেন বঙ্গ নাট্যলক্ষ্মীর প্রধান হোতা।

গিরিশ যুগের পরে প্রায় বছর বারো ধরে বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের চলেছিল এক অন্ধকারময় অধ্যায়, যে-সময়ে শিব-রাত্রির সলতের মতো আলোক বিকীরণ করছিলেন মাত্র দুজন: এক, গিরিশপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে দানীবাবু এবং দুই, গিরিশশিষ্যা তারাসুন্দরী। অবশ্য ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট জনপ্রিয় নট অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু সলতের আলো ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল এবং নাট্যপ্রিয় দর্শকরাও ক্রমে মঞ্চের ফুটলাইটের আলো থেকে সিনেমার রুপালী পর্দাকে বেশী করে পছন্দ করছিলেন।

এমন সময়ে কলকাতার শিক্ষিত ধনী-সমাজ থেকে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গদাধর মল্লিক ও সতীশচন্দ্র সেনকে ডাইরেকটার করে একটি নাট্যরসিক-গোষ্ঠী আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড নামে স্টার থিয়েটারের পরিচালনাভার গ্রহণ করলেন এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নূতন রক্ত আমদানী করার প্রয়োজন বুঝে সৌখীন থিয়েটার ও যাত্রাদল থেকে তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে এলেন এবং ওরই সঙ্গে বেছে বেছে পুরাতন কিছু শিল্পীকে রাখলেন। অবশ্য এর আগেই ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত বাঙলা নাট্যসম্প্রদায় বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শ্রীভাদুড়ী ইতিপূর্বে কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ইংরাজী, বাঙলা বহু নাটকে নিজের নাট্যপ্রতিভা প্রদর্শন করে বিদগ্ধ মহলে যশস্বী হন। বলা যেতে পারে, নতুন করে শিক্ষিতদের সাধারণ রঙ্গালয় অভিযান এই শিশিরকুমার থেকেই শুরু হয় এবং এঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসেন নরেশচন্দ্র মিত্র, রাধিকানন্দ মুখো-পাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রমোহন রায়, আর্ট থিয়েটারের নতুন অভিনেতারা, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ললিতমোহন লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী এবং আরও পরবর্তী যুগে ভূমেন রায়, রতীন বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি শক্তিশালী, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সমাজের অভিনেতা। এবং একমাত্র এই কারণেই ১৯২১ থেকে বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে যুগের সূচনা হয়, তাকে 'শিশির যুগ' নামে অভিহিত করা হয়।

আর্ট থিয়েটার তাঁদের নাটক 'কর্ণার্জুন'-এর মঞ্চোপস্থাপনায় পার্শী আলফ্রেড বা কোরিন্থিয়ানের রীতি অনুসরণ করেন। উজ্জ্বল ফুটলাইটের পিছনে কাটা (কাট আউট) দৃশ্যপট এবং উইংস। কিন্তু মঞ্চস্থাপত্যে যুগান্তর আনেন শিশিরকুমার ১৯২৪ সালের ৬ আগস্ট তারিখে প্রথম অভিনীত ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'সীতা' নাটকে। মঞ্চালোক ব্যবস্থায় ফুটলাইট বাতিল হয়ে স্পটলাইটের ব্যবহার শুরু হয়: মঞ্চের ওপর ত্রিমাত্রিক দৃশ্যসজ্জার প্রথম প্রবর্তন হয়। গানের সুরে ও নৃত্যের রচনায় অনুসৃত হয় রবীন্দ্রপদ্ধতি। নাট্যাভিনয়ে প্রথম ব্যবহৃত হয় আবহসঙ্গীত। সার্থক-ভাবেই শিশিরকুমার যুগপ্রবর্তকরূপে আখ্যাত হন। এতদিন ছিল মোশান মাস্টার বা অভিনয়-শিক্ষক। এখন থেকে নতুন অভিধা সৃষ্টি হল—নাট্যপ্রয়োগকর্তা বা নির্দেশক।

এই শিশির-যুগের মাঝেই দর্শকদের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করে নাট্যরসিক

অব্যাহত রাখবার চেষ্টায় আমেরিকা থেকে সদ্যপ্রত্যাগত সতু সেন ঘূর্ণন-মঞ্চের (রিভলভিং স্টেজ) প্রথম প্রবর্তন করেন রঙমহল মঞ্চে ১৯৩৩-এর ১৭ এপ্রিলে প্রথম অভিনীত 'মহানিশা' নাটকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ আমাদের জীবনযাত্রাকে শুধুই যে চরম আঘাত হানে, তাই নয়, আমাদের চিন্তা ও ব্যবহারিক জগতে আনে অভাবনীয় পরিবর্তন। সংসারে, সমাজে, ভাবনায় চিরাচরিত প্রথাবর্জিত হয়ে নব-মূল্যায়ন শুরু হয়ে যায়। যার ফলে নাট্য-জগতেও আসে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। ভারতীয় লোকনাট্য সংস্থা (ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার)-র বাঙলা শাখা যেদিন বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন' নাটককে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করেন, সেদিন নাট্যোৎসাহী দর্শকদের চোখের সামনে যেন একটি নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। বাস্তবধর্মী নাটকের বাস্তব ভঙ্গীর অভিনয় সম্পর্কে তাঁদের চিন্তে যেন একটি নববোধ জাগ্রত হয়ে উঠল। এবং সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে নাটক এবং নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা আজও চলেছে অপ্রতিহত-গতিতে নব নব দিগন্তের সন্ধানে। বলা বাহুল্য, এই নূতনত্বের সন্ধান করছেন বহু নাট্যসম্প্রদায় এবং সাধারণ নাট্যশালা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে বাধ্য হচ্ছেন।

এইভাবেই বাঙলার সাধারণ নাট্যশালা নিরানব্বই বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ জীবন অতিক্রম করে গেল ৭ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার শতবর্ষে পদার্পণ করল। জাতির রঙ্গালয় তার ঐতিহ্যের বাহক। আমাদের রঙ্গালয়ের শতবর্ষ বয়ঃক্রম আমাদের প্রকৃষ্ট গর্বের বস্তু। এই শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিরাট উৎসবসূচী গ্রহণের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু সে উৎসবসূচী গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আমাদের জাতীয় সঙ্কট। পাকিস্তানের জঙ্গীশাসকবর্গ আমাদের দেশকে করেছে আক্রমণ। এই অবস্থায় দেশের অখণ্ডতা, সম্মান ও শান্তিকে অটুট রাখবার জন্যে আমাদের মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে আগ্রাসী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। দেশে যতদিন না আবার সুনিশ্চিতভাবে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসছে, ততদিন পর্যন্ত সবরকম উৎসব বাতিল। কাজেই আমাদের নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তির কথা শুধুমাত্র স্মরণ করেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে বর্তমানে—উৎসবের কথা পরে।

—নান্দীকর

যাত্রা আলোচনা

জয়বাংলা

ঐকতান শেষে পালা কাহিনীর গ্রন্থি উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকরা যেন আসরে বসেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সামিল হয়ে উত্তেজনার আগুন পোহাতে থাকেন। মূলত লোকনাট্যের 'জয় বাংলা' পালায় পাক জঙ্গীশাহীর জঘন্য বর্বর রূপটি যেমন উদ্ঘাটিত, তেমনি মুক্তি-সেনানীদের আত্মত্যাগ, স্বদেশ প্রেম ও বীরত্বের ছবিটিও মূর্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্যই কাহিনীর শেষে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, সমাপ্তির রেশ শ্রোতাদের মনে বেদনার কারণ হয়েই থাকে। প্রতিটি বাঙালী যখন স্বাধীনতার উদগ্র কামনায় উদ্বেল সে সময় এজাতীয় হতাশ মনোভাব তাঁদের সমর্থন পায় কোথা থেকে? তবে উৎপল দত্ত রচিত ও পরি-চালিত এ পালাটিতে নাটকীয়তার যে রসঘন রূপ প্রতিভাত হয়েছে তা সমকালীন যাত্রাপালার ইতিহাসে লোকনাট্যের বিশিষ্ট স্থানটিকে সুদৃঢ়ভাবে চিহ্নিত করে। বাংলা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে শ্রীদত্ত প্রায় নিজস্ব যে ধারার সৃষ্টি করেছেন, যা বর্তমান যাত্রা-পালাতেও পুরোপুরি উপস্থিত। অর্থাৎ এ পালায় যেমন একদিকে রয়েছে অসম্ভব নাট্যকৌতুহল-দ্রুতগতি-সরস তীক্ষ্ম সংলাপ তেমনি মিশ্রণ ঘটেছে কিছু ইতরভাষার, মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিজের আদর্শ বা মতবাদকে। তবে এক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব সেই আদর্শ বা মতবাদকে তিনি পালার অঙ্গীকৃত করতে পেরেছেন। আর তাই এ পালার পরিণতি মনকে যেমন পীড়া দেয় তেমনি নিটোল সৃষ্টি উপভোগের পরিতৃপ্তিও এনে দেয়।

কাহিনীর ব্যাপ্তিকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর জঙ্গীবাহিনীর হাতে বন্দী হবার পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই মুজিব আসরে প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামের কথা ও ছবি এ পালার অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে। পালার শুরুতে দেখি দুটি তরুণ-তরুণী নাজ আর বাঙালী সৈনিক ওয়াহেদের মিলনের আয়োজন হচ্ছে মাহমুদপুরে এক আনন্দঘন হাল্কা পরিবেশের মধ্যে। এমনি সময় এলো দুঃসংবাদ। ইয়াহিয়ার জহ্লাদ বাহিনী হাঙরের মত কামড় বসিয়ে রক্তাক্ত করে তুলেছে ঢাকা-কুমিল্লা-ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায়। মিলনের ক্ষণে বাজল বিদায়ের বাঁশি। ওয়াহেদ ফিরে গেল মুক্তি সংগ্রামে। ক্লান্ত, অবসন্ন আকাংখী বড় মিঞা গেছেন খেয়ালীর চরে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু সেখানেও তাঁকে তুলে নিতে হয়েছে দু হাতে বন্দুক—লড়ছেন মৃত্যু পর্যন্ত বাঁঝলা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাটিকে।

এ পালায় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য তো দেখান হয়নি-ই; বরঞ্চ প্রকাশ করা হয়েছে সংশয়। তবুও 'জয় বাংলা' শ্রোতাদের ক্ষণে ক্ষণে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত করেছে। পালার সাফল্য এইখানেই। ঘটনা ও চরিত্রের অনেকাংশই কল্পিত, কিন্তু উপস্থাপনার গুণে সমস্তটাই অতি বাস্তব রূপে দেখা দিয়েছে। পালার ঘটনাবলী এগিয়েছে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পথে। আগেই সংলাপ-এর কথা উল্লেখ করেছি, আবার বলছি সংলাপ এ পালার প্রাণ। তা এমন তীক্ষ্ম, এমন সরস যে পালাকারের তারিফ না করে পারা যায় না। তেমনি বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট অভিনয়ধারার জন্য পরিচালক শ্রীদত্তও সাধুবাদ পাবেন। এর প্রতিটি মুহূর্তে কল্পনায় তিনি বিশিষ্টতার ছাপ রেখেছেন। যাত্রা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুনের সূচনা করেছেন। আসরে বক্সিং-এর রিং, একটা গোটা জীপকে তুলে দেওয়া বা আকাশপথে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের দৃশ্য পরিকল্পনা এর আগে যাত্রায় হয়েছে বলে শোনা যায় নি। সেদিক থেকে 'জয় বাংলা' এক বিরল প্রযোজনা। এ পালায় ত্রুটিও বেশ কিছু আছে। বড়মিঞার মুখ দিয়ে যেসব সংলাপ বলান হয়েছে তাতে মনে হয় পাকিস্থানের জন্মের আগে থাকতেই তার মুক্তির জন্য তিনি গেরিলা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া পালায় মুজিবের প্রতিই কি ঠিক শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে? তাছাড়া ইতিহাসের স্বাভাবিকতা ও তথ্যকে বিকৃত করার প্রবণতা পালাকারের মধ্যে আগেও দেখা গেছে এবং এক্ষেত্রে তা যেন একটু বেশী প্রকট। আর তাই মাঝে মাঝে সঙ্গীত ও সংলাপের মধ্য দিয়ে যে ছবি ফুটিয়ে তুলতে

তিনি চেয়েছেন তাকে সত্য বলে স্বীকার করা যায় না।

তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ সমস্তই ভেসে গেছে জোরালো অভিনয়ের স্রোতে। ব্যক্তির দক্ষতা এখানে সমষ্টির সঙ্গে মিশে যেন এক শতদলের সৌন্দর্য বিকীরণ করেছে। বিজন মুখার্জির বড়মিঞা বেশ সংযত ও সুন্দর। ভোলা পালের সুদখোর খলচরিত্র দুর্বিরুল চরিত্রানুগ। বাবলু ভট্টাচার্যের ওয়াহেদ আবেগ ভরা। এর মধ্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি শিবদাস মুখার্জির ইফতিকার। যেরকম বলিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি অভিনয় করে গেছেন তাতে অনেক সময় ভুল হয় পরিচালক শ্রীদত্তই বুঝি অভিনয় করছেন। সুদেশকুমার-এর মৌলভী প্রশংসনীয়। রাখাল সিংহ অজস্র সাধুবাদ পাবেন কেবল চরিত্রায়নের জন্য। গানে ও অভিনয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠে শর্মিলার ফিরোজা। সোনালী গোস্বামীর মরিয়ম এক বলিষ্ঠ সৃষ্টি। রীতা দেবীর নাজ যথাযথ। প্রশান্ত ভট্টাচার্যের সুরে গাওয়া খলিফরূপী বঙ্কিম মুখার্জির গানগুলি সুগীত।

মহেঞ্জোদড়ো

পালাগান পরিবেশনার ক্ষেত্রে তরুণ অপেরার একটা নিজস্ব ধারা রয়েছে। তাঁরা ধারণত পথিকৃতের ভূমিকা নিতে দ্বিধাহীন। জীবনী নাটক বিশেষ করে আধুনিক ইতিহাসের নায়ককে আসরে প্রথম আনার দাবী তাঁরা করতে পারেন। শুধু প্রথম আনাই নয় তাঁদের 'হিটলার' বিনীপালা অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে শিল্পের সূচনা করে তারই পরিণতি দেখি তাঁদের 'লেনিন' পালাটিতে—যা রাশিয়ার সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার আনতে সক্ষম হয়েছে। এটাও বোধহয় যাত্রার ইতিহাসে প্রথম। সেই অগ্রপথিকের পথ ধরেই তাঁরা এবার এনেছেন তাঁদের নবতম অবদান প্রাগৈতিহাসিক পালা 'মহেঞ্জোদড়ো'—যেটিকে তাঁরা যাত্রায় প্রথম প্রাগৈতিহাসিক নাটক বলে দাবী করেছেন। এ দাবীর যৌক্তিকতার বিচার না করেও বলা যায় যাত্রার আসরে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক উত্তেজক নাটক ইতিপূর্বে হয়েছে বলে জানা নেই। মূলত পরকীয়া প্রেম, হত্যা, বীভৎসতা, নৃত্যসঙ্গীত ও শারীরিক ভালবাসার এত শিল্পসম্মত প্রকাশের নজীর বড় বেশী একটা পাওয়া যায় না।

পালাকার শ্রীশম্ভু বাগ পালাটিতে নাট্যসংঘাত ও কৌতূহল সৃষ্টিতে যেমন সফল হয়েছেন তেমনি পরিচালক অমর ঘোষ সুকৌশলে পালাটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। পালাটিতে শৃঙ্গার রসের আধিক্য আছে একথা সত্যি, কিন্তু নাট্যগুণের গুণে তা পালাটির নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে।

নয়া মিছিল/শাওলি মিত্র। পরিচালনাঃ পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটোঃ অমৃত

সিন্ধু উপত্যকায় সেই মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার কালে নান্দুর জনপদের পটভূমিকায় এপালা রচিত। রাজশক্তি ও পুরোহিত তথা যাদুকরের শক্তির মধ্যে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব ও বহিরাগত আর্যদের আক্রমণ, তাদের বীভৎস হত্যালীলা এবং শুধু তাই নয় সিন্ধুনদের বাঁধ কেটে এই সমৃদ্ধ জনপদকে জলের নীচে ডুবিয়ে দেবার যে কাহিনী বিধৃত হয়েছে তার সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক কূট প্রশ্নের বিস্তার না করেও বলা যায়, কাহিনীর পরিণতি আমাদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। অন্যদিকে রাণী অর্জাঝিতার অন্যের প্রতি আসক্তি, রূপোপজীবিনী কুন্দবীর হাস্য, লাস্য, নৃত্য ইত্যাদি, যাদুকর আককনেয়ার কূট কৌশল আর্যদের জনপদ বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে যে নাট্য-কৌতূহল গড়ে উঠেছে তা তরুণ অপেরার 'মহেঞ্জোদড়ো'কে এক বিশিষ্ট প্রযোজনা বলে চিহ্নিত করবে।

অভিনয়ে তরুণ অপেরার যে স্বাভাবিক সুনাম রয়েছে বর্তমান বইটিতেও তার স্বাক্ষর রয়েছে। রাখাল দাস ও নান্দুররাজ শম্বরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শান্তি-গোপাল। প্রথম চরিত্রটিতে তাঁর কিছু করার ছিল না এবং সেটিকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে উপস্থিত করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু শম্বরের ভূমিকায় তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটি

আলোর ফেরা/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা: অজিত গাঙ্গুলী।

বিষণ্ময় হয়ে ওঠে। নৃত্যে সঙ্গীতে ও লাস্যে সুন্দরী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলেন বর্ণালী ব্যানার্জি। তাঁর দুটি গান ভোলা যায় না।

যাদুকরের ভূমিকায় অজিত দত্ত যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। পুংকল চরিত্রে শিব ভট্টাচার্য হাস্যরস বিতরণে তাঁর সহজাত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন। রাণী অজাশিকার অনোর প্রতি আসক্তি এবং রাজার কঠিন শাসন ও শাস্তির মুখে হৃদয়স্পন্দনটি ফুটিয়ে তোলেন লিলি মণ্ডল। আনন্দের ভূমিকায় বাবলু চৌধুরী তাঁর পূর্ব সুনাম বজায় রেখেছেন। কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পুরুষেপ ও পুরুধান চরিত্রে বিশ্বনাথ দত্ত ও অতীন সরকার। সৌবীর চরিত্রে সুঅভিনয় করেন অনুপ-কুমার। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুণসিন্ধু মণ্ডল, নরেন দে, ব্রজগোপাল দে, পুতুল দত্ত প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ করার মত।

দুর্গা সেন সুর সংযোজিত এ পালার সঙ্গীতাংশ সবাইকে মুগ্ধ করবে।

—নন্দ ভট্ট

মঞ্চাভিনয়

রংগনাট্যমে'র 'সাজাহানের মৃত্যু': ভারত সম্রাট সাজাহানের জীবনের কোন ঘটনা বা জীবনযন্ত্রণা কেন্দ্র করে এ নাটক গড়ে ওঠেনি। এ নাটকটির সংঘর্ষ এবং আবর্ত সৃষ্টি করেছে 'সাজাহান' চরিত্রের এক সুবিখ্যাত রূপকার। নাম তার মহীদাস। সাজাহান সম্পর্কে একটি আন্তর মায়া ও মদির মোহ যা মহীদাসের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল তার ভেঙে যাওয়ার বেদনাই এ নাটকের বিভিন্ন মুহূর্ত আর সংলাপ তৈরী করেছে। সম্প্রতি 'রংগনাট্যমে'র শিল্পীরা 'রঙমহলে' এ নাটকের একটি সার্থক প্রযোজনা পরিবেশন করেছেন। নাটকটির প্রয়োগ পরিকল্পনায় গভীরতর শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন ঠাকুরদাস মিত্র।

কয়েকটি ভূমিকায় বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখেন ঠাকুরদাস মিত্র, ছন্দা দেবী, প্রেমাংশু বসু, সুখেন দাস, তুলসীসাধন দত্ত, অজিত ব্যানার্জি, প্রকাশ গাঙ্গুলী, মানিক বসু ও রেখা সেনগুপ্তা। আলোকসম্পাত মোটামুটি ভাবে নাটকটির গতিকে অব্যাহত রেখেছিল।

শেষরক্ষা: সম্প্রতি শিশির-স্মরণ সমিতির উদ্যোগে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অভিনীত হোল রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্মদিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে এই অভিনয়-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মণি লাহিড়ীর পরিচালনায় এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন অশোক চক্রবর্তী, মণি লাহিড়ী, চিরকিশোর ভাদুড়ী, মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়, আশু গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ, স্বপন মন্ডল, বিভা গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি ঘোষ, কেকা চৌধুরী ও রেবা দেবী।

ইউরেকা'র 'মিলনমধুর': প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী ইউরেকা'র শিল্পীরা তরুণ ঘোষের 'মিলনমধুর' নাটকটির নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হবে বরানগর রবীন্দ্রভবনে। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

রূপশ্রীর 'যুগসূর্য'র ধারাবাহিক অভিনয়—বরাহনগরের প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা রূপশ্রী মধ্য ডিসেম্বর ও ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে তাদের চিরনূতন ভক্তি-অর্ঘ্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত নিয়ে লেখা নাট্যকার শ্রীহরিপদ বসু রচিত 'যুগসূর্য' নাটকটির মঞ্চাভিনয় উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে করবেন বলে স্থির করেছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন বিখ্যাত সুরকার অনিল বাগচী। নেপথ্যকণ্ঠ দান করবেন প্রতাপ (রেডিও), সংগীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা, লিলি চক্রবর্তী প্রমুখ গুণী শিল্পী। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন, নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা, রবি ঘোষ (ফিল্ম) সন্তোষ সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী, মুরারি দাস, লিলি চক্রবর্তী (ফিল্ম) এবং নাট্য পরিচালনা ও গিরিশ ঘোষ চরিত্রে রূপ দান করবেন: শ্রীমণি দে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে, নাট্যকার হরিপদ বসুর 'যুগসূর্য'ই প্রথম ধর্মমূলক নাটক। ১৯... সালের ১৩ই এপ্রিল এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিবেকানন্দ মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার শুভ জন্মতিথি উৎসবে। স্বর্গত সুধাকণ্ঠ শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের শ্যামাসংগীতই নাটকের বিশেষ আকর্ষণ হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রাভিনয় করেছিলেন রসরাজ অমৃত বসুর দৌহিত্র ম্যাকাই বসু। দুঃখের বিষয় এই দুজন শিল্পীই বর্তমানে ইহলোক ছেড়ে রামকৃষ্ণ চরণে ঠাঁই পেয়েছেন।

কবরী চৌধুরী

হেমা মালিনী
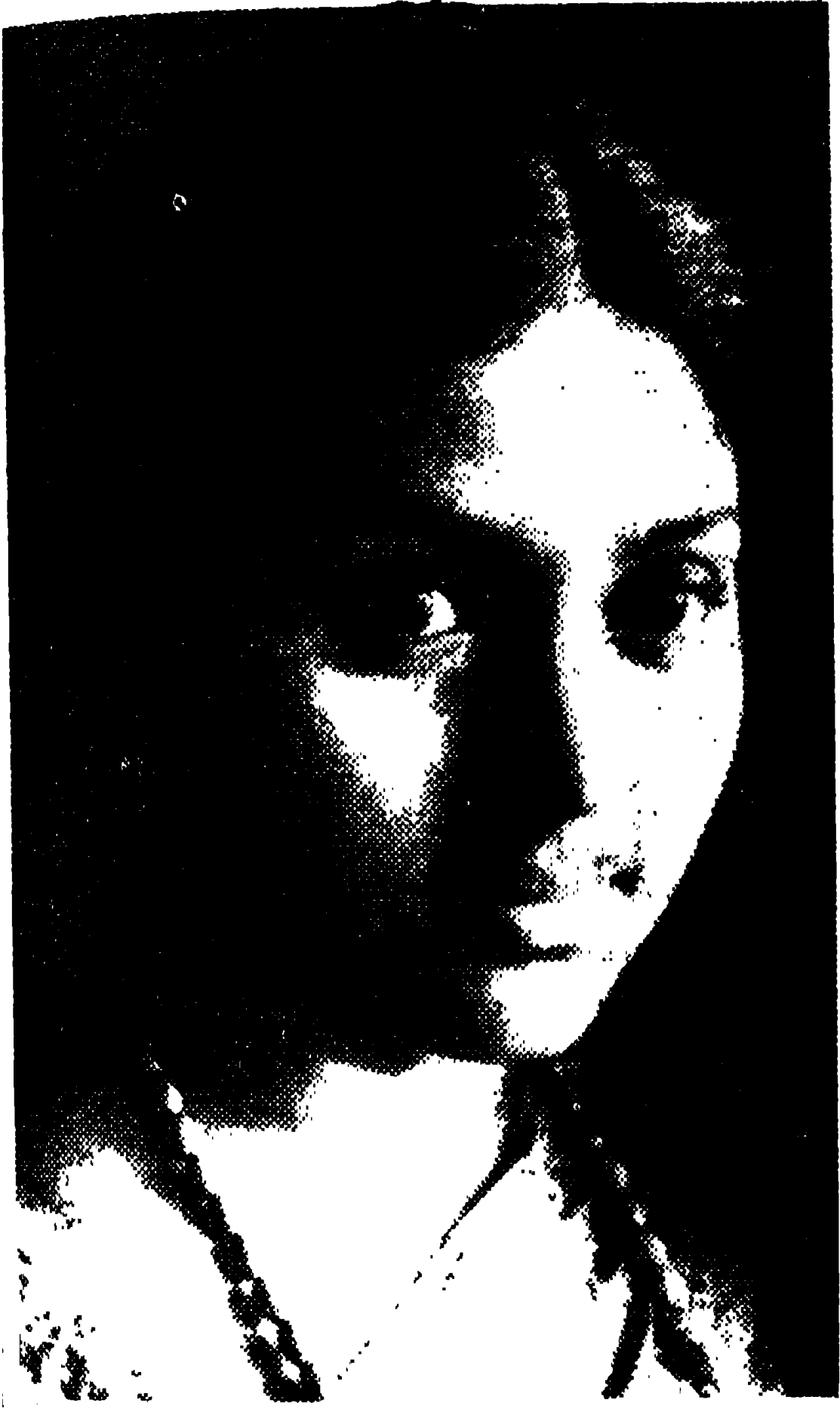
...চার্বহারে 'সূর্যের প্রার্থনা'—সম্প্রতি ...সরকারী জেনকিনস্ স্কুলের ...শ্রীশাহারিয়ার কবির বিরচিত ...র্থনা' নাটকটি বিশেষ সাফল্যের ...নয় করেন শহরতলী পূর্ণাবি-...াংগন মঞ্চে। ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক বঙ্গদেশবাসীর স্বাধীনতা-...বলম্বন করে রচিত হয়েছে এ ...হিনী।

...র পরিচালনা এবং নেপথ্য ...বিনয় সেন মুন্সীয়ানার ছাপ ...ব এ নাটকে আবাহসংগীত সব ...যুক্ত হয়নি। নাটকের সাতখানি ...ঠদান করেন সহিদুল ইসলাম ...ল গাইলেনও সেদিন চমৎকার। ...লগত অভিনয় ছিল প্রচণ্ড সম্পন্ন। তবু একক অভিনয়ে নাম করতে হয় 'বন্ধ চাষী'র ...শান্ত গোস্বামীর। মুক্তিযোদ্ধা-...সেনের অভিনয়ও মনে রাখবার ...ছাড়াও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন রামপ্রসাদ নায়েক, নীরেন ঘোষ, শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী, অর্চনা দেবী শংকর-দেব চক্রবর্তী, দিলীপ দত্ত, রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা, তপন মুখার্জি ও রবীন্দ্র কর্মকার।

শিশির একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

'সুভাষ মঞ্চে'র পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীনাট্যম পরিচালিত শিশির একাংক নাট্য প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের শেষ তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭১। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক ফিল্ম এ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস অফ ইণ্ডিয়া, ৮১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪। অবলা স্টোর্স, ৭০ বারাসত রোড, মোনা-চন্দনপুকুর, ২৪ পরগণা।

সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা

বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাবের পরি-চালনায় আগামী পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—নাট্য-সম্পাদক, বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব, পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

হলদিয়া ডক প্রজেক্ট কণ্ট্রোল অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠান :
গত ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার হলদিয়া ডক প্রজেক্ট কণ্ট্রোল অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা রবীন্দ্রসদন মঞ্চে নীহার-রঞ্জন গুপ্তের 'বহ্নিশিখা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

সুষ্ঠু একক ও দলগত অভিনয়ে নাটকটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়।

দৈনন্দিন জীবনের কর্ম অবসরে যে সব অফিস সংস্থা অভিনয় করেন, সেখানে হয়তো আন্তরিক নিষ্ঠা থাকে, অভাব হয়তো অভিনয় দক্ষতার। আবার হয়তো, অভিনয় দক্ষতা আছে, অভাব হয়ে ওঠে অনুশীলনের। তাই সার্থক নাট্যানুষ্ঠান সচরাচর নজরে আসে না। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই হলদিয়া ডক প্রজেক্ট কণ্ট্রোল অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব আন্তরিক নিষ্ঠা ও অভিনয়চাতুর্য কোন কিছুরই অভাব রাখেননি। তাই 'বহ্নিশিখা' একটি

সংসার/সন্ধ্যারাণী. সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং হরিধন
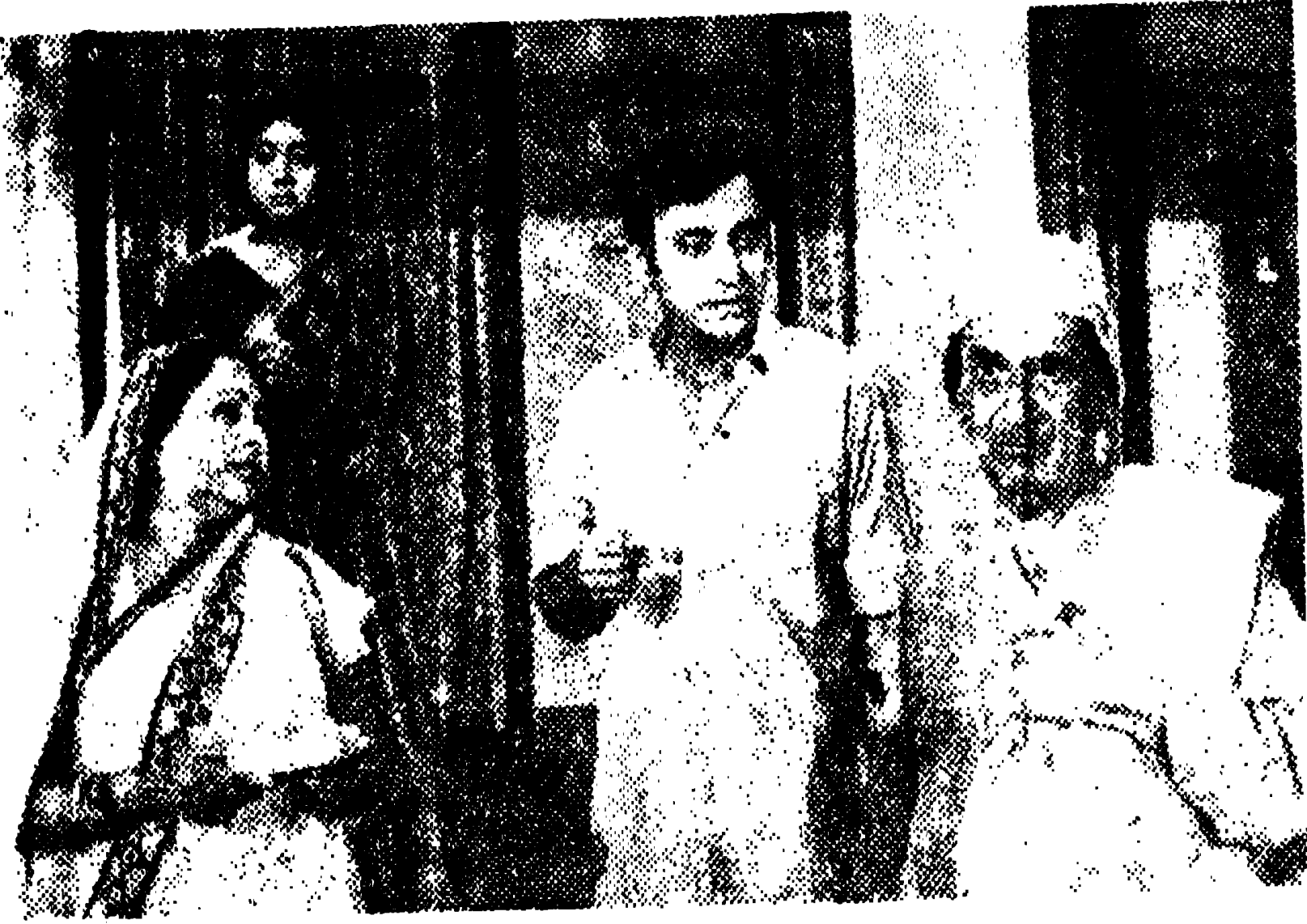
সার্থক নাট্যানুষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হবে না।

অভিনয়ে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় শ্রীদিলীপ দে (সিনহা)। সুন্দরভাবে তিনি চরিত্রটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। অভিব্যক্তি, বাচনভঙ্গি ও স্বাভাবিক অভিনয়ে 'সিনহা' সজীব।

অন্যান্য চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন সর্বশ্রী তপন ভট্টাচার্য (জয়ন্ত সেন), দীপেন ভট্টাচার্য (আহম্মদ দুরানী), রত্নেশ্বর চৌধুরী (প্রদ্যুৎ বোস), প্রশান্ত মিত্র (নিরোন্দু ঘোষাল)। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, চন্দ্রনাথ দে, তৃপ্তি ভট্টাচার্য, রাধাশ্যাম সোম, নিমাই গুহ খাসনবীশ, অজিত দে, প্রফুল্ল মণ্ডল, যতীন দাস, তারকচন্দ্র দাস, তুলসী জানা, ক্ষীরোদ দেবনাথ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, সহদেব সাহা ও সুনীল দাস। স্ত্রী চরিত্র শ্রীমতী শাশ্বতী রায় (লতিকা) অনবদ্য। কন্যা-হারা পাগলিনী মায়ের ব্যথাবেদনা শ্রীমতী রায়ের অভিনয়ে মূর্ত। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন ডলি মুখার্জি (কল্যাণী), আরতি ঘোষ (শিপ্রা), বেলা রায় (অঞ্জলী) ও যূথিকা ভট্টাচার্য (বকুল)। সুষ্ঠু পরি-চালনা ও পরিকল্পনার জন্য পরিচালক শ্রীঅমিয়কান্তি অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। আলো ও আবহসঙ্গীতের কাজ বিশেষ-ভাবে প্রশংসনীয়, সে তুলনায় মঞ্চ ব্যর্থ।

'রূপকথা'র 'ভলপোন' :

বেন জনসনের 'ভলপোন' নাটকের কাহিনী ভলপোনের অদ্ভুত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এবং সবশেষে ভল-পোনের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এরই মধ্যে নাটকটির বিচিত্র ব্যাপ্তি। অভিনয়ের ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই দক্ষতার নজীর রেখেছেন এবং তাই সংঘ-বদ্ধ অভিনয়ের গতি কোথাও শিথিল হয়ে পড়েনি। এ-ব্যাপারে নির্দেশক সুশীল সেনের শৈল্পিক বোধই কাজ করেছে। কারণ এ-ধরনের নাটককে মঞ্চে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে পরিবেশন করতে হোলে টিম-ওয়ার্কের যে নিখুঁত বাঁধুনি দরকার, সেদিকেই শ্রীসেনের দৃষ্টি প্রথম থেকেই নিবদ্ধ ছিল, অন্তত এর প্রযোজনাটিই তার প্রমাণ দেয়।
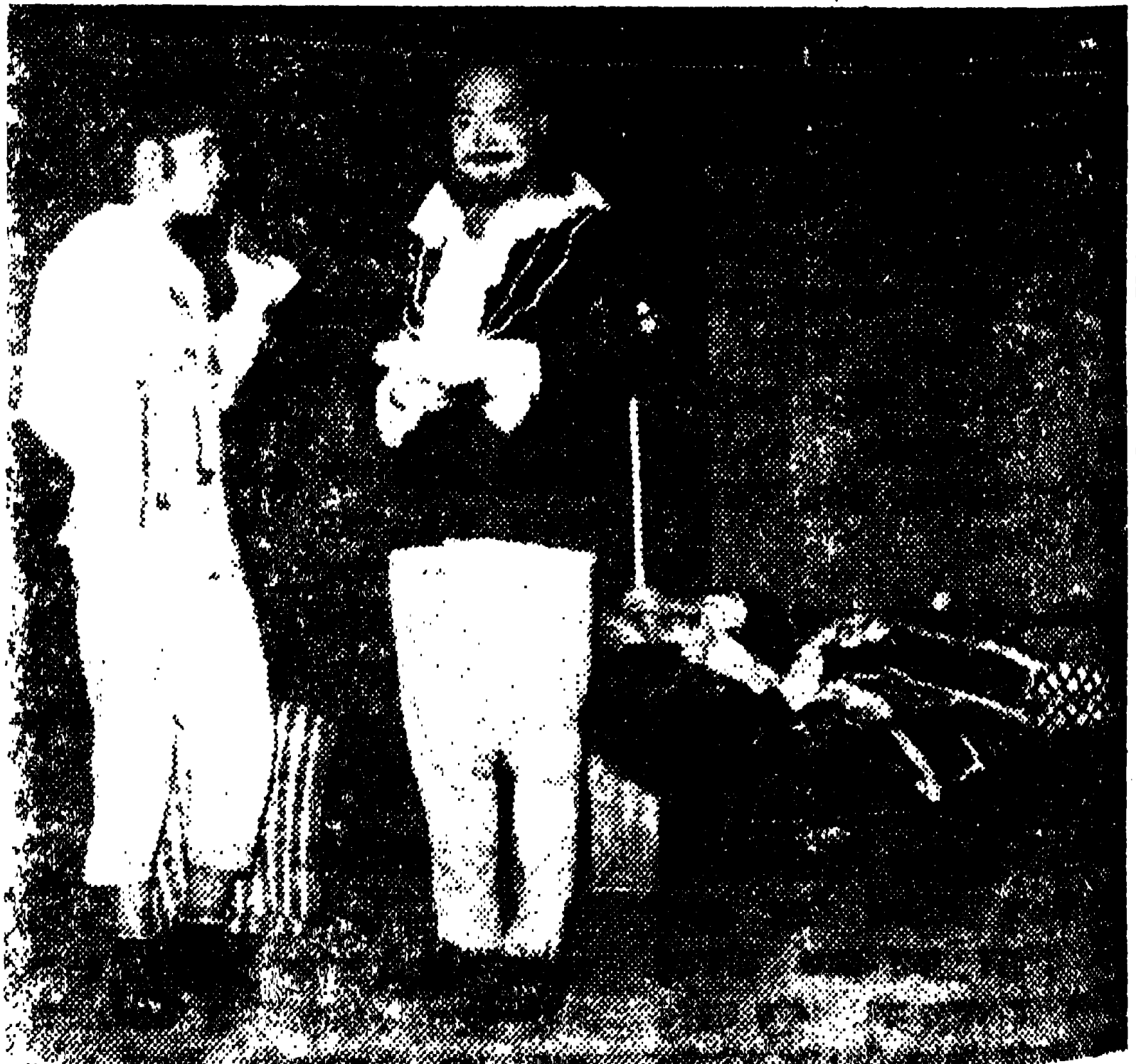
রূপকথা প্রযোজিত ভলপোন নাটকের একটি দৃশ্যে বিশু বন্দ্যোপাধ্যায় (মসকা) ও সোমনাথ মজুমদার (ভলটোর)

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর চরিত্রচিত্রণ আমাদের বিস্মিত করেছে, তিনি হোলেন 'মসকা' চরিত্রের রূপকার বিশু বন্দ্যো-পাধ্যায়। ভলপোনের সহকারীর এই চরিত্রটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে অসা-ধারণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি আমাদের অবাক করেছে। 'ভলপোন' চরিত্রেও সুকুমার চৌধুরী প্রত্যাশিত আবেগ আনতে পেরেছেন। আর দুটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ হোল সোমনাথ মজুমদারের 'ভলটো'র আর প্রবীর গুপ্তের 'করভিনো'। 'লেডী পলি-টিক উড বি'-র ভূমিকায় যূথিকা ভট্টাচার্য 'স্টাইলাইজড' যে অভিনয় করেছেন, তা বাঞ্ছনীয়ই হয়েছে। মীনা হালদারের 'সিলিয়া' মোটামুটি স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু শিল্পীর উচ্চারণে মাঝে মাঝে জড়তা এসেছে। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে প্রাণ-ঢালা অভিনয় করেন বলাই দাস, সমীর চক্রবর্তী, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন গুপ্ত, প্রদীপ রায়, দিলীপ ভট্টাচার্য, দেবাশীষ মিত্র, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন দে হাজরা, অজিত মণ্ডল, বিজয় ভট্টাচার্য, বিজয় রায়, জয়ন্ত মিত্র।

নাট্যপ্রযোজনাটির মধ্যে সুরেল গান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এ-ব্যাপারে সঙ্গীতপরিচালক সৌরেন গুপ্তের আন্তরিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। মঞ্চপরিকল্পনায় সুকুমার চৌধুরীও যথেষ্ট শৈল্পিক সংযম আর নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন।

'রূপকথা'র শিল্পীরা 'জলপোন' নাটকটিকে প্রথম মঞ্চস্থ করেন 'মুক্তাঙ্গনে'। তারপর সালকিয়া (হাওড়া) 'শীসমহল' থিয়েটারে বেশ কিছুদিন নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যান। তাঁদের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। শীসমহল থিয়েটারের কর্ণধার শ্রীনন্দলাল জয়সওয়ালের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় 'রূপকথা' এই নাটকটির নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যাবার প্রচণ্ড উদ্দীপনা পান। আমরা কলকাতার সর্বত্রই 'জলপোন' নাটকের ব্যাপক অভিনয় আশা করি।

লালপাঞ্জা : পশ্চিমবঙ্গ আয়কর বিভাগীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র ঐতিহাসিক নাটক 'লালপাঞ্জা' সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন বিশ্বরূপার মঞ্চে। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সামগ্রিকভাবে নাট্যপ্রযোজনাটি মোটামুটিভাবে প্রাণবন্তই হয়ে ওঠে।

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা প্রথমেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হোলেন অমর রায় (দাউদ খাঁ), কনকরঞ্জন পাল (নাসির খাঁ), শ্যামল বসাক (মোবারক), অভিমন্যু ভৌমিক (সত্যপীর), হরিপদ চক্রবর্তী (আলি মনসুর), বিমল ব্যানার্জি (মুনীম খাঁ), কল্পনা বিশ্বাস (আসমান), মুক্তলেখা মিত্র (ছবি)। এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন চন্দনা বিশ্বাস, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সুধীর নন্দী, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, নিখিল দে পোদ্দার, সরোজ দত্ত, সুশীল সান্যাল, অনিল সরকার, অনিমা দাশগুপ্তা, মালবিকা মুখার্জি।

'সংক্রান্তি' ও 'লবণাক্ত'

বেহালার বনমালী নস্কর রোডস্থ 'বীণাপাণি সংগীত সমাজ' একটি অভিজাত নাট্যসংস্থা। গত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর প্রমথতিসদন প্রাঙ্গণে দুটি বিভিন্নস্বাদের নাটক পরিবেশন করে স্থানীয় নাট্যানুরাগীদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। নাটক-দুটি হল বীরু মুখোপাধ্যায়ের মঞ্চসফল নাটক 'সংক্রান্তি' ও পার্থিব্রশ সরকারের 'লবণাক্ত'। নির্দেশক সুপ্রকাশ ব্যানার্জির নিষ্ঠ পরিচালনায় নাটকের বক্তব্য সোচ্চার ও স্বচ্ছগতি লাভ করে। বিশিষ্ট চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁরা প্রায় সবাই তাঁদের স্ব স্ব চরিত্রের অতলে ডুবে যেতে পেরেছিলেন। দলগত সংহতি মনে রাখার মতো। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন—সুপ্রকাশ ব্যানার্জি, সুশীল ভট্টাচার্য, মানিক গাঙ্গুলী, প্রভাত ব্যানার্জি, প্রকাশ চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ পাল, অতুল চক্রবর্তী, সুধীর দাস, অরবিন্দ ব্যানার্জি, প্রবোধ ব্যানার্জি, কুমার ভট্টাচার্য, দেবনাথ চ্যাটার্জি, সরোজ পালিত, উদয় মুখার্জি, হারাধন চ্যাটার্জি, প্রদীপ চ্যাটার্জি, শাশ্বতী রায়, অর্পিতা ঘোষ এবং পাপিয়া চ্যাটার্জি।

সোনালী গুপ্ত

বিবিধ সংবাদ

বারাণসীতে ক'দিনের আনন্দ-অনুষ্ঠান

বাংলার বাইরে প্রবাসে যেখানেই বাঙালীর বাস, সেখানে আর কিছু নাই-ই থাক, নাট্যাভিনয়ের আয়োজন আছেই। বিশেষ করে বাঙালীপ্রধান স্থানগুলিতে। প্রবাসের বাঙালীপ্রধান স্থানগুলির মধ্যে কাশী (বারাণসী) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রবাসী বাঙালীদের অনেকগুলো নাট্যসংস্থা আছে যারা পালে-পার্বণে আনন্দ-উৎসবের উপকরণ হিসাবে নানান রসের নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে।

দুর্গাপুজোকেই উপলক্ষ্য করেই যেন আনন্দ-উৎসব দানা বেঁধে ওঠে। শারদোৎসবে এবার ছিল মোট ছ'দিনের অনুষ্ঠান। প্রথম তিনদিন নাটকাভিনয়। তিনদিনে মোট ছ'টি নাটক মঞ্চস্থ হল। ছ'টি নাট্যসংস্থা ছ'টি নাটক অভিনয় করে। নাট্যসংস্থাগুলি বারাণসীতে সুপরিচিত। প্রথম তিনদিনের নাট্যসূচী ছিল এইরকম : কল্লোল মঞ্চস্থ করল 'ক্যাম্প থ্রী' মধুচক্র করল 'কালের মৈনাক' নাটক, গণনাট্য অভিনয় করল একটি সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী, হরিহর সমিতি 'নিকটেই ফাঁদ', রবীন্দ্র সদন-এর অভিনেয় নাটক হল 'অনাহুত পথিক' ও ললিত চক্র মঞ্চস্থ করল 'পাষাণকারা'। বাকি তিনদিনের আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বসেছিল সঙ্গীতানুষ্ঠানের আসর। কলকাতার নামী শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বিসমিল্লা খান, পারভিন সুলতানা, মণিলাল নাগ, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

"বিরাজ বৌ"—উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলায় : সুনীল রায় নিবেদিত কে সি দাস প্রোডাকসন্সের প্রচুর অর্থ ব্যয়ে গৃহীত শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ" চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ করে জীবন জিজ্ঞাসার পর উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অন্যত্র মিলি পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তির দিন গুণছে। উত্তমকুমার (নীলাম্বর) ও মাধবী মুখোপাধ্যায় (বিরাজ) ছবির প্রধান চরিত্র দুটিতে রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রলিপিতে আছেন : সুব্রতা চ্যাটার্জি, অনুপকুমার,

দিলীপ রায়, নীলিমা দাস, বিকাশ রায়, শিবানী বসু, কমল মিত্র, তরুণকুমার, জীবেন বসু, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল, ধীরাজ দাস, বীরেন চ্যাটার্জি, আনন্দ মুখার্জি, গৌর সী, রাজলক্ষ্মী (ছোট), শর্মিলা প্রভৃতি। সলিল সেন রচিত চিত্রনাট্যের চিত্র-পরিচালনা করেছেন পরিচালক মানু সেন। সুর দিয়েছেন : কালীপদ সেন। নেপথ্য-কণ্ঠে আছেন : সন্ধ্যা মুখার্জি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র ও অনুপ ঘোষাল।

মুক্তি প্রতীক্ষায় : অপর্ণা : দিলীপ সরকার প্রযোজিত সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত জরাসন্ধের "অপর্ণা" সেন্সার ছাড়পত্র নিয়ে মুক্তি লাভের জন্য শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ-এর পরিবেশনাধীনে অপেক্ষা করছে। সলিল সেন ছবিটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন। প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গানে সুর দিয়েছেন—রবীন চট্টোপাধ্যায়। নেপথ্য-কণ্ঠে আছেন : আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু, গীতা মুখার্জি, রবীন ব্যানার্জি ও চিন্তাপ্রিয় মুখার্জি। নৃত্যে : নৃত্যরাজ হীরালাল। চিত্রগ্রহণে : কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সম্পাদনা : সুবোধ রায়। প্রধান চরিত্র-লিপিতে আছেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, গীতা নাগ, গীতা দে, অমরনাথ, কল্যাণ চট্টো, অপর্ণা দেবী, জহর রায়, তরুণকুমার, তপতী ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, রেবা দেবী, সুচেতা বন্দ্যো, বিজন ভট্টা, বীরেন চট্টো, মাঃ তপন, অরিন্দম কুমারী শর্মিলা প্রভৃতি।

আলোয় ফেরা : রাখালচন্দ্র সাহার প্রযোজনায় বাদল পিকচার্সের ৮ম নিবেদন অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত "আলোয় ফেরা"র চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় এক-চতুর্থাংশ শেষ হয়ে গেছে। মানুষকে সৎপথে বাঁচার লড়াই করতে হবে, কাজকে ছোট ভাবা অন্যায়—এরই ওপর ছবির মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে। নচিকেতা ঘোষের সুরে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন—মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জি, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে : অনিল গুপ্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, হাসু ব্যানার্জি, বিদ্যা রাও, প্রমোদ গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে এখন পর্যন্ত চিত্রগ্রহণে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। জি আর পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

১৭ ডিসেম্বর 'সংসার' : হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত নর্মদা পিকচার্সের প্রথম ছবি সলিল সেন রচিত ও পরিচালিত "সংসার" আগামী ১৭ ডিসেম্বর নর্মদা চিত্রর পরিবেশনায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র মুক্তিলাভ করবে। মঞ্চ-খ্যাত নাটক স্বীকৃতির চিত্ররূপ 'সংসার'। একটি সুখের সংসারের উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতময় কাহিনী ছবির মূল বিষয়বস্তু। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, বসন্ত চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, নির্মলকুমার, হরিধন, অমরনাথ, মৃণাল, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, মাঃ অরিন্দম, নন্দিনী মালিয়া প্রভৃতি। সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে : কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সম্পাদনায় : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি

গেল মঙ্গলবার, ৭ ডিসেম্বর বাঙলার সাধারণ নাট্যশালা শততম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি ঐ তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে একটি স্মারক সভা আহ্বান করেছিলেন। সভাশেষে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "কুলীনকুল-সর্বস্ব" (বাংলা ১২৬১ এবং ইংরাজী ১৮৫৪ সালে রচিত) নাটকটি অভিনীত হয়। বঙ্গনাট্য সংস্থা, নাট্যামোদী, শিল্পী সাহিত্যিক নিয়ে গঠিত এই উৎসব সমিতি ১৯৭১-এর ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে কলকাতা শহরে একমাসব্যাপী ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বর্ষব্যাপী এক বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

বাওয়ালীতে শিক্ষাশিবির

২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় ৭ম বার্ষিক শিক্ষা-শিবির আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর, চারদিন বাওয়ালী হাইস্কুল ও শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

সবল, সুস্থ, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সৎ নাগরিকরূপে দেশের প্রত্যেক তরুণ-তরুণীকে গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই এই শিবির। জেলার বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই শিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিবিরের শিক্ষণীয় বিষয় হল : নিয়মশৃঙ্খলা, সমষ্টি ব্যায়াম, নানান ধরনের ড্রিল, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত, লোকনৃত্য, জাতীয় খেলাধুলো, ব্রতচারী, যোগব্যায়াম ইত্যাদি।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার প্রাক-শতবর্ষপূর্তি উৎসব

বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্ণ হবে আগামী ১৯৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর এই দিনটি জাতীয় উৎসবের একটি স্মরণীয় দিন। শতবর্ষপূর্তি উৎসবকে সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এবং নানান কর্মসূচী রচনা করা হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বনামধন্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে উৎসব কমিটি, পুরোধায় আছেন সর্বশ্রী শচীন্দ্র চৌধুরী, মন্মথ রায়, তুষারকান্তি ঘোষ, অশোককুমার সরকার প্রমুখ।

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে গেল শুক্রবার, ৩ ডিসেম্বর বিকাল ৫টা নাগাদ। ফলে ভারতকেও পাল্টা আঘাত হানবার জন্য সব শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। সমগ্র ভারতে আপৎকালীন অবস্থা। দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতিতে এখন চলছে অপ্রদীপ। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে শহরে নেমে আসে সূচীভেদ্য অন্ধকার। এই অবস্থায় ছবিঘরগুলির রাত্রির প্রদর্শনীতে দর্শকসংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছুতে বাধ্য। ফলে নতুন ছবির শুভ মুক্তির কথা ঘোষণা করেও অনেকে পিছিয়ে পড়েছেন। যেমন আর-কে ফিল্মস-এর "কাল আজ ঔর কাল" ছবিটির মুক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ রইল।

কে এল কাপুর ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত ও চিত্ত বসু পরিচালিত **শেষ পর্ব** ছবিটিও আপাততঃ মুক্তি পাচ্ছে না। রবীন্দ্র সদন আয়োজিত নাট্যোৎসব শুরু হওয়ার কথা ছিল ৭ ডিসেম্বর। সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে।

খেলাধুলা

দর্শক

গারফিল্ড সোবার্স
অধিনায়ক—বিশ্ব একাদশ

আয়ান চ্যাপেল
অধিনায়ক—অস্ট্রেলিয়া

বিশ্ব একাদশ বনাম অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

ব্রিসবেনে বিশ্ব একাদশ বনাম অস্ট্রে-লিয়ার পাঁচদিনব্যাপী বে-সরকারী প্রথম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। বৃষ্টিই এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী। পাঁচদিনে খেলার মোট ১১ ঘণ্টা সময় মাঠে মারা গেছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেল খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১৪৫ রান ও ১০৬ রান) করার দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন। তিনি ছাড়া সেঞ্চুরী করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কিথ স্ট্যাকপোল (১৩২ রান) এবং বিশ্ব একাদশ দলে দক্ষিণ আফ্রিকার হিলটন অ্যাকারম্যান (১১২ রান) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রোহন কানহাই (১০১ রান)।

বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স টসে জিতে ভিজে পিটিতে অস্ট্রেলিয়াকে খুবই বেকায়দায় ফেলতে পারবেন ভেবে ব্যাট করার প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়াকে ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি অস্ট্রেলিয়াকে ফাঁদে ফেলতে পারেন নি। নিজেই বেকুব হয়েছেন। বৃষ্টির ফলে প্রথম দিনের খেলা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হয়নি। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ২২ রান সংগ্রহ করেছিল। স্ট্যাকপোল সেঞ্চুরী করেন (১৩২ রান) এবং অধিনায়ক চ্যাপেল ৭১ রান করে খেলায় অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে স্ট্যাকপোল এবং চ্যাপেল ১৪৯ মিনিট খেলে দলের ১৬০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। স্ট্যাকপোলের ১৩২ রানে ছিল ১৭টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী। উইকেটে ছিলেন ১৯৫ মিনিট। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় স্ট্যাকপোল এই নিয়ে ১২টা সেঞ্চুরী করলেন।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া ৩৮৯ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। চ্যাপেল সেঞ্চুরী করেন (১৪৫ রান) এবং ওয়াল্টার্স ৭৫ রান করে অপরাজিত থেকে যান। এইদিনের বাকি সময়ের খেলায় বিশ্ব একাদশ দল তাদের প্রথম ইনিংসের ১টা উইকেট খুইয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে অ্যাকারম্যান (৭৩ রান) এবং কানহাই (৬৭ রান) ১২২ মিনিটে ১১৪ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন। তৃতীয় দিনে ২টো উইকেট পড়ে মোট ৩২৯ রান উঠেছিল—অস্ট্রেলিয়ার এক উইকেটে ১৬৭ রান এবং বিশ্ব একাদশ দলের এক উইকেটে ১৬২ রান।

চতুর্থ দিনে চা-পানের পর বিশ্ব একাদশ দল অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১০৪ রানের পিছনে থেকে ২৮৫ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার হিলটন আকারম্যান (১১২ রান) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রোহন কানহাই (১০১ রান) সেঞ্চুরী করেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে তাঁরা ২০০ মিনিট খেলে দলের ১৭৮ রান তুলেছিলেন। এই দিন বৃষ্টির জন্যে পুরো সময় খেলা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ২১ রানের (১ উইকেটে) মাথায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

রোহন কানহাই

বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা খারাপ থাকায় চতুর্থ দিনের সকাল দিকে ১১১ মিনিট দেরীতে খেলা আরম্ভ হয়েছিল।

পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২০ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অধিনায়ক চ্যাপেল দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরী (১০৬ রান) করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে চ্যাপেল এবং রেডপাথ দলের ১১৩ রান তুলেছিলেন। রেডপাথ ৫৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার এই দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার পর খেলা ভাঙতে মাত্র ১৫৩ মিনিট বাকি ছিল। এই সময়ে বিশ্ব একাদশ দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২৫ রান সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। বিশ্ব একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১০৮ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় পঞ্চম দিনের খেলা শেষ হলে প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড় প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন—ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, সুনীল গাভাস্কার এবং বিষেণ সিং বেদী। গাভাস্কার বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি —প্রথম ইনিংসে ২২ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ রান। বেদী ৫৩ রানে ১ এবং ৬৪ রানে ১ উইকেট পেয়েছিলেন। এক ইনিংসের খেলায় দুটো উইকেট পেয়ে-ছিলেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার লিলি (২য় ইনিংসে ৩৮ রানে ২)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩৮৯ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। স্ট্যাকপোল ১৩২, চ্যাপেল ১৪৫ এবং ওয়াল্টার্স নটআউট ৭৫ রান। সোবার্স ক্লেগ হাটন এবং বেদী একটা করে উইকেট)

ও ২২০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চ্যাপেল ১০৬ এবং রেডপাথ নটআউট

বার্নপুর স্টেডিয়ামে ইন্টার-স্টিল প্ল্যান্ট অ্যাথলেটিকের উদ্বোধন দৃশ্য
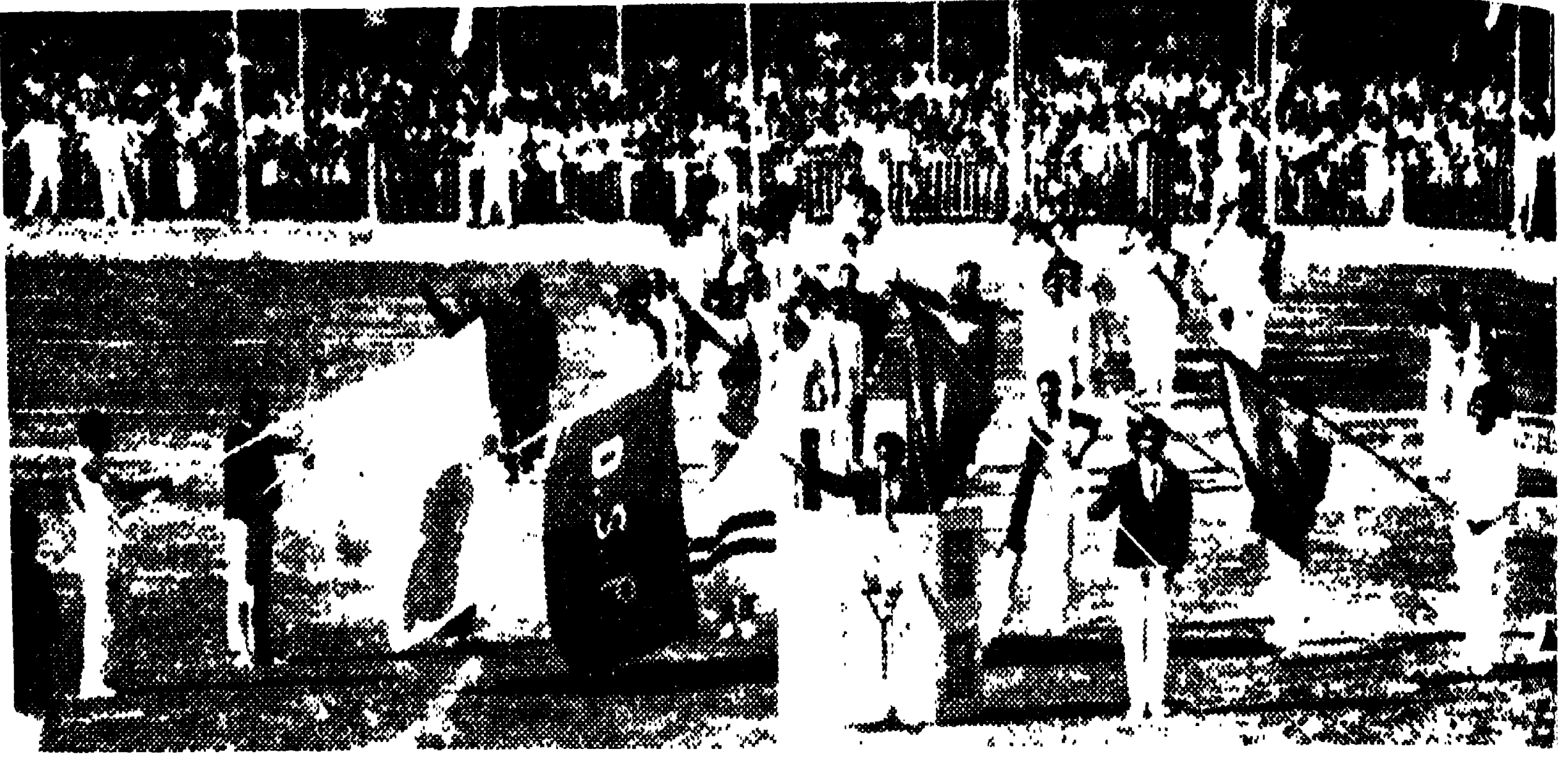
৫৬ রান। সোবার্স, হাটন এবং বেদী একটা করে উইকেট)

বিশ্ব একাদশ : ২৮৫ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। অ্যাকারম্যান ১১২ এবং কানহাই ১০১ রান। লিলি, ম্যাকেঞ্জী, ওকেফ এবং জিনার একটা করে উইকেট)

ও ১০৮ রান (৪ উইকেটে। আব্বাস ৩২ ও কানহাই ২০ রান—আহত হয়ে অবসর)

নেহরু হকি প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের নেহরু হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ২—০ গোলে শক্তিশালী গ্রেটব্রটেনকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার নেহরু হকি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দলের পক্ষে দুটি গোলই দিয়েছিলেন ইনসাইড-লেফট খেলোয়াড় ইনাম। ইতিপূর্বে এয়ারলাইন্স দল ১৯৬৮ সালে অল ইণ্ডিয়া পুলিস দলের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল এই ৮টি দল : ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, গ্রেট-ব্রটেন, ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, কোর অব সিগন্যালস, মহীশূর একাদশ, নর্দার্ন রেলওয়ে, অল ইণ্ডিয়া পুলিশ এবং মালয়েশিয়া। গত বছরের নেহরু হকি কাপ বিজয়ী অল ইণ্ডিয়া পুলিশ এবং রানার্স-আপ নর্দার্ন রেলওয়ে যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং কোর অব সিগন্যালস দলের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায়। সেমি-ফাইনালে গ্রেটব্রটেন ২—১ গোলে কোর অব সিগন্যালস এবং ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ৪—২ গোলে (টাইব্রেকার প্রথায়) ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ইন্টার স্টিল-প্ল্যান্ট অ্যাথলেটিক

বার্নপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী ইন্টার-স্টিল প্ল্যান্ট অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় টিসকো ৩৩৩ পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে উপর্যুপরি তিন বছর দলগত খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। টিসকোর প্রখ্যাত অ্যাথলীট এডওয়ার্ড সিকায়েরা ৪৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত খেতাব লাভ করেছেন।

ইউরোপীয়ন ফুটবল

দ্বিতীয় 'ইউরোপীয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ' প্রতিযোগিতা বর্তমানে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ১৯৭২ সালের এই ইউরোপীয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতা সরকারীভাবে দ্বিতীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ প্রতিযোগিতা কারণ আগে দুবার অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়ন নেশনস কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার নাম বদলে বর্তমান নামকরণ হয়েছে। বিজয়ী দলের পুরস্কার কিন্তু আগেরই মত আছে—হেনরী ডেলাউনে কাপ। আগের ইউরোপীয়ন নেশনস কাপ।

১৯৬০ সালে প্রথম ইউরোপীয়ন নেশনস ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাশিয়া ২—১ গোলে যুগোশলাভিয়াকে পরাজিত করে। প্রথম বছরের এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং চতুর্থ স্থান পায় ফ্রান্স। দ্বিতীয় ইউরোপীয়ন নেশনস কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইতালী ২—১ গোলে রাশিয়াকে পরাজিত করে। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান পায় যথাক্রমে হাঙ্গেরী এবং ডেনমার্ক। ১৯৬৮ সালে প্রথম ইউরোপীয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইতালী ১—১ ও ২—০ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে 'ইউরোপীয়ন চ্যাম্পিয়ান' খেতাব লাভ করে। তৃতীয় স্থান পায় ইংল্যাণ্ড এবং চতুর্থ স্থান রাশিয়া।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥

অখন্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ ৪৲ (যন্ত্রস্থ) ভাগবতীতন্ ১০৲ গৌরাঙ্গ পরিজন ১০৲ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ২৪৸ মৃগমদ ৮৸ চল চল কাঁচা ৬৸ ইন্দ্রাণী ৩৲

॥ অনুরূপা দেবী ॥

মা ৭৸ মন্ত্রশক্তি ৭৲ জ্যোতিহারা ৭৲

॥ অবধূত ॥

উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫৸ মরুতীর্থ হিংলাজ ৬৲ হিংলাজের পর ৫৸ দুর্গম পন্থা ৪৲ নীলকণ্ঠ হিমালয় ৯৲

॥ আবদুল জব্বার ॥

বাংলার চালচিত্র ১০৲ মুখের মেলা ৮৲

॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥

নয়ছয় ৫৸ প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৮৲ অগ্নিপরীক্ষা ৪৲ একাল সেকাল অন্যকাল ১৫৲ সোনার হরিণ ৫৲ রঙের তাস ৭৲ সুবর্ণলতা ১৩৲ বিজয়ী বসন্ত ৬৲ নিরালাপ্রহর ২৲

॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥

স্বয়ংবৃতা ৬৲ শিলাপটে লেখা ৮৲ নগর পারে রূপনগর ১৮৲ কাল তুমি আলেয়া ১২৸ চলাচল ৭৲ সাঁঝের মল্লিকা ৫৸ অলকাতিলক ৫৲ সাত পাকে বাঁধা ৫৲

॥ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥

হিমালয়ের পথে পথে ৭৲ গঙ্গাবতরণ ৫৲ মণিমহেশ ৬৸ কুমারী গিরিপথে ৫৸ ত্রিলোকনাথের পথে ৪৲

॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥

কলকাতার কাছেই ৮৲ উপকন্ঠে ১০৲ বহ্নিবন্যা ১০৲ আমি কান পেতে রই ১৪৲ একদা কী করিয়া ১৩৲ দহন ও দীপ্তি ৬৲ অবছায়া ৪৲ গল্পপঞ্চাশৎ ৯৲ নারী ও নিয়তি ৩৲ প্রভাতসূর্য ৪৲ রাত্রির তপস্যা ৮৲ মনে ছিল আশা ৪৸ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৸ এক প্রহরের খেলা ৫৲ নবজন্ম ৪৲ রমনীর মন ৫৲ পাওনাই পরিচয় ৫৲

॥ জরাসন্ধ ॥

লৌহকপাট একত্রে ২০৲ ঐ ৪র্থ ৭৲ ছবি ৪৲ ছায়াতীর ৫৲ পসারিণী ৪৲ পরশমণি ৫৲ জায়গা আছে ৪৲ বন্যা ৫৲

॥ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ॥

ইষ্ট বাঙলাান্ড রোড ৮৲
ঈশ্বরের আভাস ৬৲

॥ জয়ন্তকুমার ॥

অভিনেত্রী খুন ৪৲ নায়িকার প্রতিহিংসা ৪৲

॥ টলস্টয় ॥

আনাকারেনিনা ৩৸
ওঅর য়্যান্ড পীস ১৭৸

॥ তারাপদ মুখোপাধ্যায় ॥

আধুনিক বাংলাকাব্য ৮৲
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ৬৲

॥ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

১৯৭১ ৬৲ গন্নাবেগম ৯৲ সংকেত ৫৲ শুকসারীকথা ৮৸ অভিযান ৭৲ উত্তরায়ণ ৫৸ কবি ৬৲ না ৩৲ কালিন্দী ১০৲ রাধা ৮৲ যোগভ্রষ্ট ৭৲ সন্দীপন পাঠশালা ৫৸

তারাশংকর রচনাবলী

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে

॥ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ॥

ঠাকুমার ঝুলি ৫৲ ঠাকুর্দার ঝুলি ৪৸ দাদামশায়ের থলে ৫৲ কিশোর গ্রন্থাবলী ৪৸

॥ দ্বারেশ শর্মাচার্য ॥

ছায়ামিছিল ৬৲ ভৃগুজাতক ৫৸

॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥

যাত্রাপথ ৪৸ দ্বৈত সংগীত ৩৸
মিশ্ররাগ ৪৲ সুরের বাঁধনে ২৲

॥ নকুল চট্টোপাধ্যায় ॥

তিনশতকের কলকাতা ৬৲
চিরকুমারী সভা ৪৲

॥ নলিনীকান্ত সরকার ॥

দাদাঠাকুর ৫৸ হাসির অন্তরালে ৬৲
শ্রদ্ধাস্পদেষু ৫৲

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥

কলধ্বনি ৪৸ নতুন তোরণ ৪৸

॥ নির্মলকুমারী মহলানবিশ ॥

বাইশে শ্রাবণ ৬৲ কবির সঙ্গে য়ুরোপে ১২৲
কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ৫৸

॥ নিরুপমা দেবী ॥

অন্নপূর্ণার মন্দির ৪৸ শ্যামলী ৫৲

॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥

কিরিটী রায় ১১৲ স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯৲ তালপাতার পুঁথি ১৫৲ ঝড় ১০৲ অপারেশন ৭৸ অরণ্য ৬৸ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭৸ ধূসর গোধূলি ৫৲ উত্তর ফাল্গুনী ৭৲ ছিন্নপত্র ৫৲ বহ্নিশিখা ৮৲ মল্লার ৪৲ কালোহাত ৬৸ ঘুম নেই ৫৸ নূপুর ৪৲ বেলাভূমি ৮৸ মুখোশ ৬৲ সেই মরুপ্রান্তে ১১৲ সূর্যতপস্যা ১০৲ রাতের রজনীগন্ধা ৫৲ লালুভুলু ৪৸ হাসপাতাল ৮৸ হীরা চুনি পান্না ৫৸

॥ প্রফুল্ল রায় ॥

বাতাসে প্রতিধ্বনি ৭৸ মুক্তো ৫৲ তটিনী তরঙ্গ ৬৲ নাগমতী ৫৲ প্রথম তারার আলো ১০৲ কিন্নরী ৪৸

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥

কাঁচ কাটা হীরে ৪৲ আঁকাবাঁকা ৫৸ উত্তরকাল ৫৲ আগ্নেয়গিরি ২৸ জলকল্লোল ৫৸ তুচ্ছ ৪৸ অগ্নিকন্যা ৪৲ মনে রেখো ৮৲ এক চামচ গঙ্গা ৪৲ নগরে অনেক রাত ৪৸

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

পূর্ণাবতার ১০৲ লালকেল্লা ১৮৲ কেরী সাহেবের মুন্সী ১০৲ নিকৃষ্ট গল্প ৫৲ সিন্ধুদেশের প্রহরী ৩৸ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ ১০৲ রবীন্দ্র সরণী ১০৲ চিত্র ও চরিত্র ৬৲ মাইকেল মধুসূদন ৪৸

॥ প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় ॥

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৮৲ ২য় ৮৲ অবধূত ও যোগীসঙ্গ ৯৲ যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ৫৲

॥ প্রশান্ত চৌধুরী ॥

আলোকের বন্দরে ৪৸ কান পেতে শুনি ৫৲ নদী থেকে সাগরে ৮৲ ঘন্টাফটক ৪৲

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

পাকা ডালেই রাস্তা ৫৸ স্বপ্নতনু ৪৸

॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥

দোলগোবিন্দের কড়চা ৬৲ নয়ান বৌ ৬৲ মিলনান্তক ৪৸ স্বর্গাদপি গরিয়সী ১৭৸

॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পথের পাঁচালী ৬৸ অপরাজিত ১০৲ আরণ্যক ৬৸ দেবযান ৬৲ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৬৲ ইছামতী ৯৲ দৃষ্টি প্রদীপ ৭৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৬৸

॥ বিমল কর ॥

সীমারেখা ৪৸ পান্থশালা ৩৸
জীবনায়ন ৫৲ সঙ্গিনী ৪৲

॥ বিমল মিত্র ॥

কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩৪৲ একক দশক শতক ১৪৲ স্ত্রী (যন্ত্রস্থ) আমি (যন্ত্রস্থ)

॥ মনোজ বসু ॥

সাজবদল ৫৸ বন কেটে বসত ১০৲

॥ মহাশ্বেতা দেবী ॥

আঁধারমানিক ১২৸ বায়স্কোপের বাক্স ৬৲
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৸

॥ লীলা মজুমদার ॥

পাখী ৫৸ আর কোনখানে ৫৸
সুকুমার রায় ৪৸

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩২ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 17th December 1971, শুক্রবার, ১লা পৌষ, ১৩৭৮ 52 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅর্ধেন্দু রায়

'এক নজরে'

পৃথিবীর অষ্টম রাষ্ট্র : গণতন্ত্রী ভারতের সক্রিয় সমর্থনে এই উপমহাদেশে 'গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে যে নতুন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হল, তার গুরুত্ব বোধহয় পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতিকরা এখনও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, জন-সংখ্যার দিক থেকে, পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশই যে আজ সে রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুর হিংস্রতা ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা অর্জন করল এ-কথা বৃটেন-আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলিরও যে জানা নেই তা বোঝা যায় তাদের বিভিন্ন নিবন্ধ ও মন্তব্যে 'বেঙ্গলি মাইনরিটি ইন পাকিস্তান' কথাটির উল্লেখে।

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত যে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি জানাল, তার বর্তমান অনুমিত লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি, '৬১ সালে আদমসুমারির রিপোর্ট অনুসারে সেখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮০ লক্ষ। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৯৯ বর্গ কিলোমিটার, অর্থাৎ ৫৫ হাজার ১০৪ বর্গমাইল।

বাংলাদেশ আয়তনে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দেড়গুণের কিছু বেশি (পঃ বঙ্গের আয়তন ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল), কিন্তু লোকসংখ্যায় প্রায় দুগুণ। আর রাষ্ট্র-তালিকায় জনসংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশের স্থান হবে অষ্টম—চীন, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও ব্রেজিলের পরে। বৃহৎ শক্তিরূপে বিবেচিত বৃটেন ও ফ্রান্স, শক্তিশালী পশ্চিম জার্মানী, আফ্রিকার সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র মিশর, এমনকি মাতৃত্বের দাবিদার পাকিস্তানও জনসংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশের চেয়ে ছোট রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হবে।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, ভারত উপ-মহাদেশের মুশ্লিমদের স্বাধীন রাজ্য গড়ার দাবিতে কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না সৃষ্টি করেছিলেন যে-পাকিস্তান, বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার জনসংখ্যা ভারতে বসবাসকারী মুশ্লিমদের চেয়েও কম হয়ে যাবে। ভারতে মুশ্লিম নাগরিকের সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ, আর পাকিস্তানের লোকসংখ্যা হবে ৫ কোটি ২০ লক্ষ।

বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ, তার শতকরা বিরাশি-জন মানুষ কৃষিজীবী আর শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ জমিতে হয় চাষ-আবাদ। কিন্তু তাহলেও সে-দেশের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা যে বিপুল তা তার গত বছরের রাজস্বের হিসাব থেকেই বোঝা যায়। ১৯৭০ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে রাজস্ব আদায় হয় ১৫৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ব্যয় হয় ১৫২ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাজস্বের হিসাবে সে-দেশ এখনও উদ্বৃত্ত। তাছাড়া সারা বিশ্বের পাট উৎপাদনের শতকরা আশি ভাগ উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে। তার উৎপাদনও এক কোটি টনের বেশি, যে-কারণে খাদ্যের ব্যাপারেও তাকে কারও 'পরে নির্ভরশীল হতে হবে না। তাছাড়া সুন্দরবনে ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে তার যে অরণ্যসম্পদ আছে, তা নানা শিল্পের, বিশেষ করে কাগজশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এখনই তার কর্ণফুলির কাগজ-কল ও খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানা দুটি বৃহৎ শিল্পরূপে পরিগণিত। এছাড়া কাপড়কল, চিনিকল, কাঁচ, দেশলাই, এলুমিনিয়ম, সিমেন্ট ও সার কারখানা ছড়িয়ে আছে সারা বাংলাদেশে এবং সেসব শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারেরও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তার উপকূল অঞ্চলে তেল পাওয়ারও বিশেষ আশা রাখেন খনিজতত্ত্ববিদরা। সুতরাং বাংলাদেশ যে স্বয়ংশাসিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে অনতিবিলম্বে একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন শিল্পে প্রাণের জোয়ার : বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এ-দেশের সংবাদপত্রগুলিতে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেয় একটি বিড়ি কোম্পানী। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বাংলা-দেশের সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় ঐ সেব্য বস্তুটি এতদিন রাষ্ট্রীয় ব্যবধানের জন্য সে-দেশে অমৃতের মতোই দুষ্প্রাপ্য ছিল। এবার এই স্বদেশী শিল্পটি নিশ্চয়ই ব্যাপক প্রসারের সুযোগ পাবে এবং তা উভয় বাংলার অগণিত মানুষকে নতুন করে কাজের সন্ধান দেবে। একইভাবে প্রসারিত হবে উভয় বাংলার চলচ্চিত্র-ব্যবসায়, গ্রন্থ ও সংবাদপত্রের বাজার। পশ্চিমবঙ্গবাসীদের রসনা নতুন করে পরিতৃপ্ত হবে যশোরের কৈ আর পদ্মার ইলিশে এবং তা নতুন করে সৌভাগ্যের সুযোগ এনে দেবে বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের।

এছাড়া পর্যটন ব্যবসায়ও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে। বার্লিন যেমন উভয় জার্মানীর কাছে, কলকাতা তেমনই উভয় বাংলার কাছে প্রাণের বস্তু। আবার একইভাবে উভয় বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাদের ছেড়ে-আসা গ্রাম-গুলি, আর সেই সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর, কপোতাক্ষ-তীরের কবিতীর্থ সাগরদাঁড়ি, চট্টগ্রামের পুণ্যতীর্থ চন্দ্রনাথ। আর এই যাওয়া-আসা ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে একটি নতুন অর্থনীতি ও সেইসঙ্গে একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনা।

বাংলাভাষা : সারা এশিয়ার অগণিত ভাষার মধ্যে যে-ভাষার রচনা প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করে, যে-ভাষায় কথা বলে, পৃথিবীর প্রায় বারো কোটি লোক সেই বাংলাভাষা সুন্দর, শ্রুতিমধুর ও সমৃদ্ধ বলে বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি লাভ করলেও, তার নিঃসপত্ন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বাংলায় লেখা গান ভারতের জাতীয় সংগীত, বাংলা ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা, পূর্বনঙ্গবাসীদের জন্য বাংলা পাঠ্যবিষয় হয়েছে সুদূর করাচী, লাহোর, পেশোয়ারের বিদ্যালয়গুলিতে, নানা রাজনৈতিক কারণে বাংলাভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন, ইতালী, মিশর, জাপান প্রভৃতি দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে, বিপুল বাংলা গ্রন্থসম্ভার সমৃদ্ধ করছে ইউরোপ আমেরিকার বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলিকে, বাংলা পড়ানো হচ্ছে দেশবিদেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং সে-ভাষার ছাত্রের সংখ্যাও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সামান্য নয়—এসব জেনেও কোন বাঙালীর মন ভরত না, বাংলা কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষা নয় বলে। এতদিনে বাঙালীর সে-সাধ পূর্ণ হল। বাংলা এখন পৃথিবীর প্রথম দশটি রাষ্ট্রের একটির অন্যতম জাতীয় ভাষা এবং অপর একটির একক রাষ্ট্রীয় ভাষা। এক কথায় বাংলা এখন আন্তর্জাতিক ভাষা। সুতরাং এখন থেকে সারা পৃথিবীর সব দেশে, বাংলাদেশের সঙ্গে যারা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, তাদের সকলকে, স্বদেশে বাংলা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাও বহু বাংলাভাষা শিক্ষকের সম্মুখে দেশে-দেশে কর্মের সুযোগ এনে দেবে। বাঙালীর কাছে 'জয় বাংলা' ধ্বনির এইখানেই সার্থকতা।

৯।১২।৭১

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

বিচিত্র শয্যাসঙ্গী

সংবাদ শুভ। হোয়াইট হাউসের একজন 'মুখহীন' (ফেসলেশ) মুখপাত্র বলেছেন নিকসন সাহেব ভারতবিদ্বেষী বা এ্যাণ্টি-ইণ্ডিয়ান নন, তিনি শুধু 'এ্যানয়েড' অর্থাৎ চটেছেন। বাংলাদেশের ব্যাপারটি নিয়ে ওয়াশিংটন আর পিকিং দুই পক্ষই ভীষণ চটেছে। নিকসনের সঙ্গী এবং পরামর্শদাতা ইহুদী কুলতিলক হেনরী কিসিংগার পাকিস্তানী দালালের মধ্যস্থতায় পিকিং-এর সঙ্গে একটা মধুর কোর্টসিপের ব্যবস্থা করেছেন। এশিয়ার ভবিষ্যৎটা এই দুই প্রবল শক্তি নির্ধারণ করে হিতোপদেশের গল্পের সেই বানরের মত পিষ্টক ভাগ করবে এই রকম একটা কথাবার্তা চলছে—আর কিছু দিন পরেই দুই বন্ধু (অর্থাৎ একজন সাম্রাজ্যবাদী ও অপরজন সমাজবাদী), গোল টেবিলের সামনে বসে পৃথিবীর বিশেষতঃ এশিয়া খণ্ডের ভবিষ্যৎটা স্থির করে ফেলবে এই রকম ব্যবস্থা প্রায় পাকা। 'মিঞা রাজী, বিবি রাজী, কেয়া করে গা কাজী—' এমনই একটা পরিবেশ সবেমাত্র গড়ে উঠেছে, এমন সময় একি 'সাম্রাজ্যবাদী সোস্যালিষ্ট' (চীনা বিশেষণ) সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ভারত কিনা নিকসনী নিকার ব্যবস্থাপক ইয়াহিয়ার পূর্ব পাকিস্তানে হামলা শুরু করে দিল! উভয়পক্ষ ভিন্নমতাবলম্বী সন্দেহ নেই, কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থে সকল রকম হ্যানডিক্যাপ হটিয়ে একটা অসবর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে দুজনেই বদ্ধপরিকর। এঁরা আবার বড় তরফ। ইচ্ছা করলে যখন খুসী যার তার ধোবা-নাপিত বন্ধ করে সমাজচ্যুত করতে পারেন। তবে এঁদের ধরণ-ধারণটা একটু সূক্ষ্ম। একেবারে খোলাখুলি কিছু করতে চক্ষুলজ্জায় বাধে। সবই স্থির, জীবনের পরম লগ্নে মার্কিন-চীন পিষ্টক ভাগাভাগির আলোচনা যখন শুরু হতে চলেছে ঠিক সেই সময় কিনা বাংলাদেশের এই উৎপাত। তাই ইয়াহিয়া যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ঠিক সেই দিনই ওয়াশিংটনের একজন 'হাই স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিসিয়াল' (অনেকের বিবেচনায় ইনিই স্বয়ং সেই কিসিংগার) বলে বসলেন—'আমরা বিশ্বাস করি এই সঙ্কটের শুরু থেকেই ভারতীয় নীতি একটা বাঁধাধরা ভঙ্গীতে সংকটের তীব্রতা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। বর্তমানে যে সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ চলেছে তার প্রধান দায়িত্ব বহন করতে হবে ভারতকে।'

চেয়ারম্যান মাও এবং প্রেসিডেন্ট নিকসন দুজনেই ভারতের নীতিতে বিরক্ত এবং বিব্রত। দুই পক্ষের মনেই যখন একটা লাভজনক প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে ঠিক সেই চরম মুহূর্তে এই পরমপ্রিয় ইয়াহিয়া খান কেন এশিয়া খণ্ডের যে কোনও রাম-শ্যামের সঙ্গে ভারতের বিরোধ ঘটলে এই দুই মাতব্বর ঠিক এমনই চটতেন। আদর্শ দু পক্ষের যতই পৃথক হোক না, আকাঙ্খা দুজনেরই এক। তাই আজ দরাজ গলায় 'মার্কিন-চীনী ভাই ভাই' ধ্বনি উচ্চারণ করতে কোন পক্ষের বাধছে না। একালের সবই বিচিত্র। এই ক'দিন আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসাবে চীন যখন অধিকাংশের ভোটের জোরে প্রবেশ করল তখন মার্কিন শাসকচক্রের একজন পদস্থ কর্তা বললেন—ইউএনোর জন্য বরাদ্দ অর্থসাহায্য বন্ধ করো। যুক্তরাষ্ট্রের মাটি থেকে তাঁবু তুলে ওরা অন্যত্র যাক—ইত্যাদি। কিন্তু স্বার্থের খাতিরে সবই ভুলে যেতে হয়।

যে কম্যুনিষ্ট চীন এতাবৎ নির্যাতিত স্বাধীনতাসংগ্রামীদের মুক্তির স্বপক্ষে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে এসেছে ও পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 'ফ্রি-ওয়ার্লড' নামক বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী, এক নিমজ্জমান জঙ্গী শাসকচক্রকে বাঁচানোর জন্য দুজনে নতুন শয্যাসঙ্গী হয়েছে। স্বার্থের কি বিচিত্র গতি।

১১-১২-৭১

পটভূমি

দেশের অন্যান্য প্রান্তের কথা ঠিক জানি না, তবে সোমবার ৬ ডিসেম্বর কলকাতার পথে পথে যে-দৃশ্য দেখা গেল তাতে আর একটি দিনের কথাই অনেকের মনে পড়ে যাচ্ছিল—সেই দিনটি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। দুটি দিনই যে সমান তাৎপর্যপূর্ণ সে-বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই, কারণ ইতিহাস রচিত হয়েছে ঐ দুটি দিনেই। বরং বলা চলে, ১৯৪৭ সালে ইতিহাস যে ভুল করেছিল, ১৯৭১ সালে যেন সংশোধিত হল সেই ভুল। ২৪ বছর আগে স্বাধীনতার জন্মলগ্ন ছিল বিষাদ-মধুর। স্বাধীনতার আনন্দের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল দেশভাগের বেদনা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানে কলকাতার মানুষের উল্লাসের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত সেই উল্লাস দুই বাংলার অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য এবং ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তাকে স্বীকৃতির (ভুটানও পরে তার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তা স্বীকার করেছে) দিনটি তাই পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে বিশেষ স্মরণীয়। সারা ভারত অবশ্যই বাংলাদেশের সংগ্রামে মানসিক দিক দিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলার মানুষ যতোখানি জড়িয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে দেশের অন্যান্য প্রান্তের মানুষের কোনো তুলনা হতে পারে না নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই। তাই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই রাজ্যের মানুষের উল্লাসও অন্যান্য রাজ্যের মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

বংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এই সাফল্যে পৌঁছতে যিনি সাহায্য করলেন, তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। গত আট মাসের চরম পরীক্ষার সময় আমাদের প্রধান-মন্ত্রী যে সংযম ও স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা করেছেন দেশ-বিদেশের অনেকেই। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামের জন্যে তিনি যা করেছেন তার পূর্ণ বিবরণ অনেকেরই অজানা। তা সত্ত্বেও একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন যে, ভারত-পাক উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিপ্লবী ভূমিকা হয়ে থাকবে চিরভাস্বর। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

না, তা গিয়ে পৌঁছেছে পশ্চিম পাকিস্থানেও, সেখানেও ক্রমে ধ্বসে পড়ছে ফৌজী শাসকদের স্বৈরাচারী জমানা, ভারত-পাক মহাদেশে জয়ী হচ্ছে গণতন্ত্রের আদর্শ।

শ্রীমতী গান্ধীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল। তবু এর ফলে কোথাও যদি তাঁর রাজনৈতিক 'স্টক' সবচেয়ে বেশি বেড়ে গিয়ে থাকে তবে সেটা অবশ্যই পশ্চিম বাংলা। তার কারণ, বাংলাদেশের সংকট সুরু হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বোধ হয় পশ্চিম বাংলাতেই। কেন মার্চ মাসে পাকিস্থানী তান্ডব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল না? কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এত দেরি করা হচ্ছে? এইসব প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি উঠেছিল পশ্চিম বাংলায়। তার কারণ ছিল দুটো। প্রথমতঃ, বাংলাদেশের সংগ্রামের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মানুষের নিবিড় মানসিক সংযোগ, এবং দ্বিতীয়তঃ এই রাজ্যের নানা প্রান্তে ৭৫ লাখ শরণার্থীর অবস্থান। এই সব প্রশ্নকে অনেকে আবার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজেও লাগাতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক দল তো বটেই, কোনো কোনো পত্র-পত্রিকাও চটকদার লেখা লিখে শরণার্থী সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে লজ্জা পায় নি। গত মার্চের পর প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকবারই কলকাতায় এসেছেন। একবার এসে তিনি শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলেন শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে। তার মাত্র দিন কয়েক পরেই আবার তাঁকে আসতে হল কলকাতায়। সেবার অবশ্য তাঁর আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করা। শরণার্থীদের দেখতে যাওয়ার কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু এ-কথা ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও সস্তায় কিস্তিমাৎ করার জন্যে কলকাতার একটি দৈনিকে রীতিমতো কটাক্ষ করে বলা হল, প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় বেড়াতে চলে গেলেন, শরণার্থীদের দেখতে গেলেন না!

আর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দেরী হচ্ছে দেখে অনেকেই অধৈর্যে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন। তাঁরা শুধু দাবি তুলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা সম্পর্কে। যে-সব দল এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের ক্রমাগত সমালোচনা করে এসেছে তাদের পুরোভাগে ছিল সি পি এম। গত সেপ্টেম্বরে বাঙ্গালোরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে সি পি এম অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। সি পি এমের মতে স্বীকৃতিদানে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের বিলম্বের কারণ একমাত্র নিজেদের বাছবিচার। সব দল স্বীকৃতি দানের দাবি জানাচ্ছে, তবু সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছেন না,

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান

শুধু সহানুভূতি আর আশার স্তোকবাক্য দিয়ে লোককে ভুলিয়ে রাখছেন।

কিন্তু আজ যখন সেই স্বীকৃতি দানের পরম লগ্ন এল তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, এটাই স্বীকৃতি দানের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই সময়ে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী প্রমাণ করলেন যে, তিনি নিতান্ত একজন রাজনীতিক নন, তিনি একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনেত্রী। তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে সব প্রশ্নও তাই আজ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ফলে সব হিসেবটাই এখন পাল্টে গেছে। এই পশ্চিম বাংলাতেই কয়েক মাস আগে আমরা এই আওয়াজ শুনেছি 'ইন্দিরা-ইয়াহিয়া এক হায়।' রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাপ্রসূত সেই শ্লোগানের উদ্দেশ্য ছিল কিছু নগদ মুনাফা লুঠে নেওয়া। ইয়াহিয়া
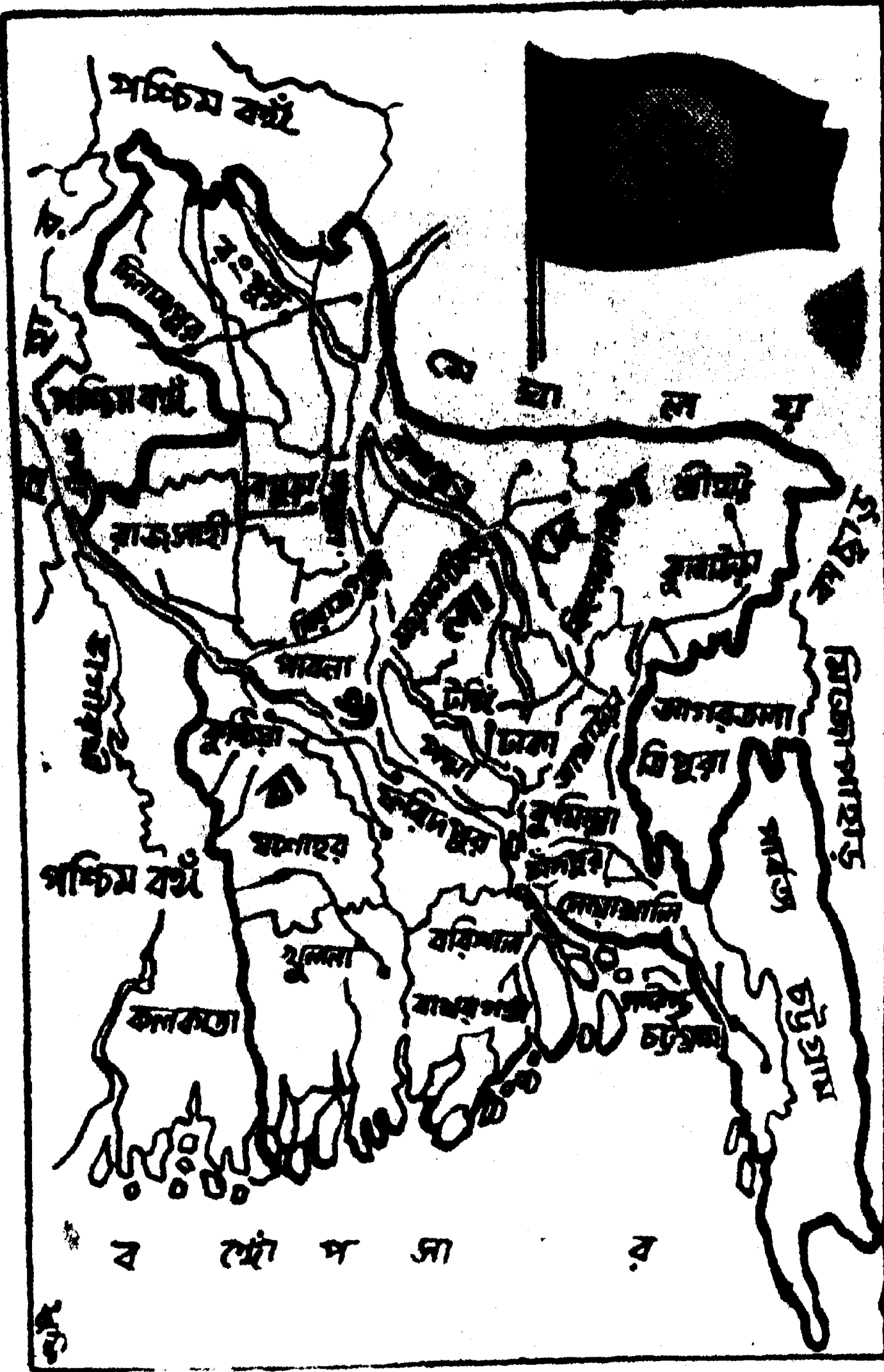
যেমন পূর্ব বাংলায় শোষণ চালিয়েছেন, ইন্দিরাও তেমনই শোষণ চালাচ্ছেন পশ্চিম বাংলায়—এই শ্লোগানের পিছনে ছিল ঐ কথাটা প্রমাণ করার একটা হীন উদ্দেশ্য। কিন্তু পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যারা বলেছিল 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হায়' তাদেরই মুখের ধ্বনি আজ 'ইয়াহিয়ার কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।' যে ইন্দিরা আর ইয়াহিয়া এক দিন ছিলেন সমগোত্রীয়, সেই ইন্দিরারই হাতকে শক্ত করার ডাক দিতে হচ্ছে আবার তাদেরকেই। অর্থাৎ, শ্রীমতী গান্ধীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা আজ অবিসম্বাদিত। পশ্চিমবাংলায় এই প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি এই কারণে যে, গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর 'গরীবী হটাও' শ্লোগান দেশের অন্যান্য প্রান্তে যে-সাড়া জাগিয়েছিল এই রাজ্যে ঠিক ততোটা পারে নি। এই রাজ্যে লোকসভার অধিকাংশ আসন চলে যায় বিরোধীদের হাতে। সেই সাফল্যের ফলেই সি পি এম লোকসভায় প্রধান বিরোধী দল হয়ে দাঁড়ায়। তাই, একথা বললে অন্যায় হয় না যে, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা বড় চ্যালেঞ্জ এসেছিল পশ্চিমবাংলা থেকে। সেই চ্যালেঞ্জের যোগ্য উত্তর যে প্রধানমন্ত্রী দিতে পেরেছেন, সে-বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সি পি আই তো বটেই, সি পি এম, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক সব দলই আজ প্রধানমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের এই অবিসম্বাদিত প্রতিষ্ঠার দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে দেশের সর্বত্র, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় হয়ত সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়বে সেই প্রতিক্রিয়া।

পাকিস্থানী আক্রমণের মোকাবিলা করতে সারা দেশ যখন এক হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে তখন যদি পশ্চিমবাংলায় আত্মঘাতী হানাহানি বজায় থাকত তবে তা অবশ্যই প্রতিরক্ষা প্রয়াসের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু ভারত আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই এই রাজ্যে শূন্যোত্থান একরকম বন্ধ। অবশ্য তার আগে কিছু দিন থেকেই অশান্তি বেশ কমতে সুরু করেছিল। ঠিক কী কারণে যে কমছিল তা আজ বলা মুস্কিল। তবে এটা ঠিক যে, কোনো একটি বিশেষ কারণের জন্যে অবস্থার উন্নতি ঘটে নি, ঘটেছে নানা কারণের মিলনে। সেদিন ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার মধ্যেও পশ্চিম বাংলার আইন-শৃংখলার অবস্থার উন্নতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাষায় এই দাবি করলেন যে, এই উন্নতি আপনা থেকে হয় নি, হয়েছে 'মেহনতীর' দ্বারা—প্রশাসনের মেহনতী কংগ্রেসের মেহনতী, ছাত্র পরিষদের মেহনতীর দ্বারা।

প্রশাসনের কঠোরতা, যেটা রাষ্ট্রপতির শাসন বলেই সম্ভব হয়েছে, একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই। কংগ্রেসের যুব ও ছাত্র শাখার মিলিত প্রয়াসও একটা বড় কারণ, সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে আরও কারণ অবশ্যই আছে। এই রাজ্যে হিংসার রাজনীতি যারা সুরু করেছিল সেই উগ্রপন্থীরা এখন ছত্রভঙ্গ। তাদের নেতৃত্ব বহু ভাগে বিভক্ত, হিংসার পথ সম্পর্কেই তাদের মনে নানা প্রশ্ন। এই জন্যেই প্রশাসনের কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে। তাছাড়া, গত কয়েক বছরের উদ্দেশ্যহীন হিংসার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনেও যে একটা প্রতিরোধের ভাব গড়ে ওঠে নি তা নয়। এইসব কারণ মিলিয়ে অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। কিন্তু তবু এত দিন তা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। অথচ যেই সীমান্তে পাকিস্থানী আক্রমণ সুরু হল, গোটা দেশ জেগে উঠল আক্রমণকারীকে ঠেকাবার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে যেন যাদুর মতো কাজ হল।

ভাবতেও ভয় করে যে, পাকিস্থানের সঙ্গে এই লড়াই যদি সত্যিই কয়েক মাস আগে সুরু হতো তবে পশ্চিমবাংলার অবস্থা কী দাঁড়াত। তখন সন্ধ্যার পরে তো বটেই, দিনের আলোতেও পথ চলতে অনেকেই ভয় পেতেন। সর্বদাই ত্রাস ও শঙ্কার একটা আবহাওয়া। সেই অবস্থায় যদি লড়াই লাগতো, নিষ্প্রদীপ হতো, তবে অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াত? আজ যে অবস্থার কতোটা উন্নতি হয়েছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও বেশ রাত পর্যন্ত লোকজন কলকাতায় চলাফেরা করছে নির্ভয়ে।

পাকিস্থানের সঙ্গে লড়াইটা যাদুর মতো যদি কাজ করে থাকে, তবে সেই যুদ্ধ মিটে গেলেই কি আবার অবস্থার অবনতি ঘটবে? বলা মুস্কিল। তবে একটা কথা বলা চলে। লড়াইটাই যাদুর মতো কাজ করেছে, এ-কথা না বলে যদি আমরা বলি, যাদুর মতো যা কাজ করেছে সেটা একটা জাতীয় উদ্দেশ্য? এর আগে ভারতকে আরো যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণ, ১৯৬৫ সালে পাকিস্থানের আক্রমণ খুব বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু চীনের আক্রমণের সময় তো বটেই, এমন কি পাকিস্থানের ১৯৬৫ সালের আক্রমণের সময়েও এবারের মতো ঐক্যবোধ দেখা দেয় নি।

এই ঐক্য সম্ভব হয়েছে একটা জাতীয় উদ্দেশ্যের জন্যেই। সে উদ্দেশ্য একদিকে যেমন পাকিস্থানের আক্রমণের মোকাবিলা অন্য দিকে তেমনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য দেওয়া। এই উদ্দেশ্যবোধকে একটা জাতীয় জাগরণ বললেও বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হয় না।

১০।১২।৭১ —দেবব্রত

বাংলাদেশের জীবননগরে অস্থায়ী সামরিক ব্রীজ

ইণ্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের যে সব বাঙ্গালী সৈনিক পশ্চিম পাকিস্থানে ভারতীর বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ কর বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করেছেন, তাঁরা বুধবার বাংলাদেশে এলে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল এম এ জি ওসমানী তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

শত্রুসন্ধানী ভারতীয় জওয়ান।

দেশে বিদেশে

বিশ্ব সমাজের ভরসায় থেকে ভারত ও বাংলাদেশ এতদিন যা পারেনি তাই এখন তারা সম্ভব করে তুলছে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে। বীর মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পূর্ববঙ্গে দখলদার ফৌজকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সমরযন্ত্রকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছে। অথচ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ এখনও সমস্যার মূলে না গিয়ে শুধু যুদ্ধবিরতি ও সৈন্যাপসারণ নিয়েই ব্যস্ত। অন্যদিকে, স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ দ্রুত একটা বাস্তব সত্য হয়ে উঠছে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে।

'পাপের মধ্য দিয়ে যার জন্ম হিংসার মধ্য দিয়ে তার মৃত্যু ঘটছে।' পাকিস্তান সম্পর্কে রাজ্য সভায় একথা বলেছেন মহম্মদ করিম চাগলা।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত পরাক্রম যখন দ্রুত এই মৃত্যু ও ধ্বংস ডেকে আনছে এবং সেই ধ্বংসের ভস্মরাশি থেকে যখন জন্ম নিচ্ছে বাংলাদেশ নামে একটা নূতন রাষ্ট্র তখন ইসলামাবাদের সামরিক চক্রের চীনা ও মার্কিণ বান্ধবরা মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান করছেন। ইয়াহিয়াশাহী নিজেদেরই কুকর্মের দ্বারা যে অনিবার্য পরিণাম ডেকে এনেছে তাকে তাঁরা ঠেকাবার চেষ্টা করছেন ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া ও নবজাত বাংলাদেশের অবিরাম কুৎসা গেয়ে।

কিন্তু নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের মুখপাত্ররা ও রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অন্যান্য বারের মতো এবারও পাকিস্তান যে আন্তর্জাতিক কূটনীতির সাহায্যে তার সামরিক পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবে ভারত তা হতে দেবে না। তার জন্য ভারতকে যদি রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অমান্য করতে হয় তাও সে করবে। ভারত তার এই অভিপ্রায়কে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ নূতন রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে।

তেসরা ডিসেম্বর ভারতের কয়েকটি বিমানঘাঁটির উপর অতর্কিতে একযোগে হামলা চালিয়ে পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে তার প্রতিফল সে এক সপ্তাহের মধ্যেই ভালভাবে পেয়েছে। পূর্ববঙ্গে তার দখলদার বাহিনী নিশ্চিত পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়েছে। তার সামনে হয় আত্মসমর্পণ নয় মৃত্যু, তৃতীয় কোন পথ নেই। সামরিক বিমান থেকে তার সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। কেননা, ভারত পূর্ববঙ্গের সমস্ত সামরিক বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে, সেখানকার আকাশে এখন ভারতীয় বিমানের একাধিপত্য। পূর্ববঙ্গ থেকে দখলদার ফৌজের পালাবার পথ নেই, কেননা জলপথ আগলাচ্ছে ভারতীয় নৌবহর। পশ্চিমে একমাত্র কাশ্মীরের ছাম্ব অঞ্চলে সাময়িকভাবে কিছুটা অগ্রসর হওয়া ছাড়া পাকিস্তান বাহিনী আর কোন সাফল্য দেখাতে পারে নি, সর্বত্রই তার ফৌজ ভারতীয় বাহিনীর হাতে মার খেয়েছে অথবা ভারতীয় অগ্রগতির সামনে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর এক-পঞ্চমাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আক্রমণ শুরু করার এক সপ্তাহ পর এখনও যদিও মধ্যে মধ্যে পাকিস্তানী বিমান ভারতের উপর হানা দিচ্ছে তাহলেও তার সংখ্যা কমে

অমৃতসরের কাছে ভেঙে-পড়া পাকিস্তানী বিমান দেখছেন উৎসুক স্থানীয় অধিবাসীরা
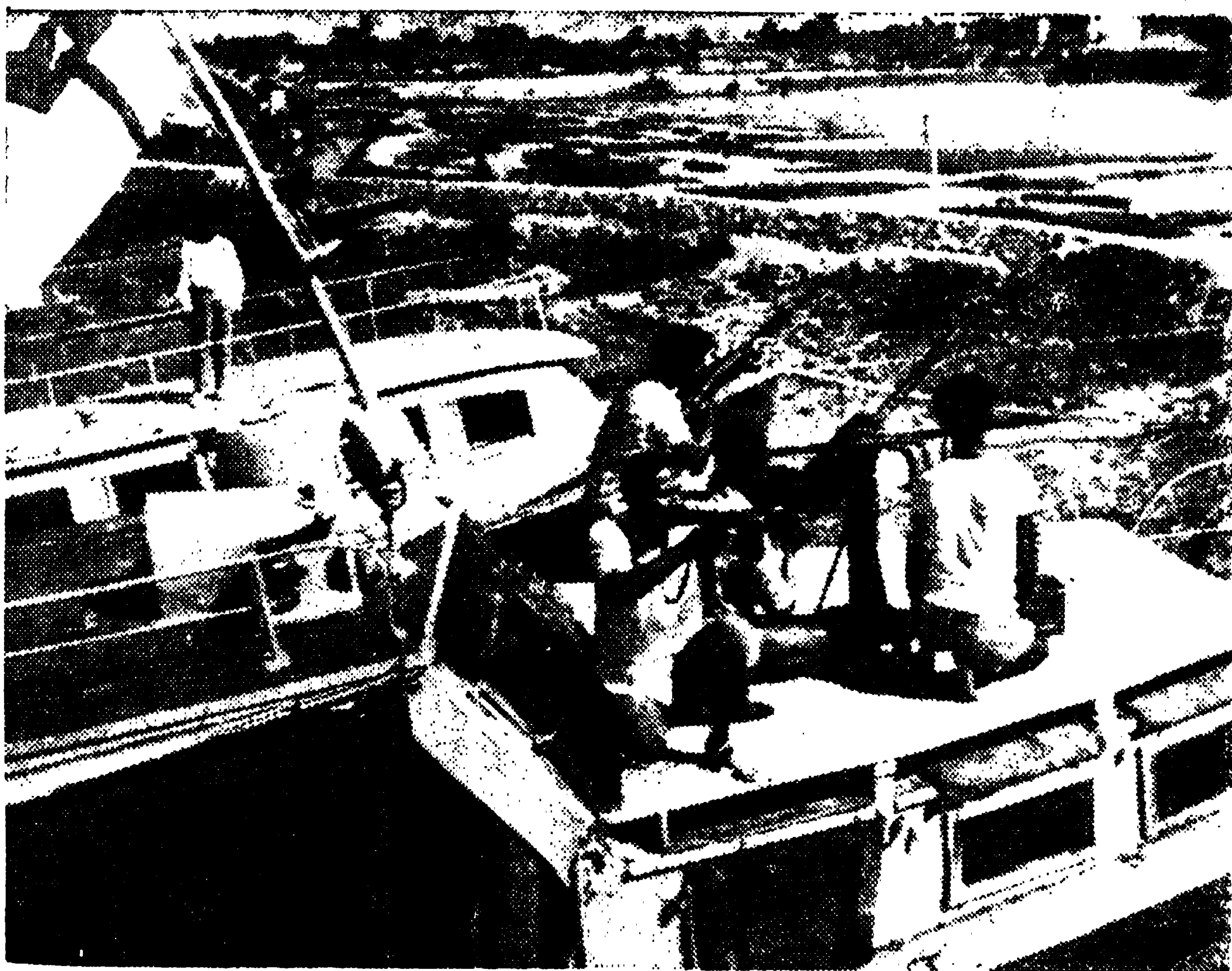
পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের কাছ থেকে অধিকৃত গানবোটের ওপর সক্রিয় মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা

বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম বন্দর

দিনে মাত্র বার দশেকে দাঁড়িয়েছে এবং তাতেও তারা ভারতের ক্ষতি বিশেষ কিছু করতে পারছে না। অন্য দিকে, ভারতীয় বিমানবাহিনী একমাত্র পশ্চিম খণ্ডেই প্রতিদিন প্রায় দশ-আড়াইশ বার পাকিস্তানের উপর গিয়ে হামলা করে আসছে।

•

এই যুদ্ধে সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনী। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখার মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে উপেক্ষিত এবং বাজেট বরাদ্দ, লোকসংখ্যা, ইত্যাদি দিক দিয়ে এই শাখার উপরই এযাবৎ সবচেয়ে কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কিন্তু, পাকিস্তান সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের এই বাহিনী পাকিস্থানের বৃহত্তম নৌঘাঁটি করাচীর কাছে এবং তার কামান ও বিমানের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পাকিস্তানের দুটি ডেস্ট্রয়ার 'খাইবার' ও 'শাহজাহান'কে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে এবং তার একমাত্র ক্রুইজারটিকেও সম্ভবত ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে। নৌযুদ্ধের ইতিহাসে এই ধরনের কৃতিত্বের নজীর খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই আক্রমণ চালাবার জন্য ভারতীয় রণতরীগুলিকে করাচীর মাত্র ২০ মাইলের মধ্যে যেতে হয়েছিল।

এই যুদ্ধের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, সম্প্রতি ভারত সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র-বাহী যে কয়েকটি 'কোমার' শ্রেণীর টহলদার জাহাজ পেয়েছে সেগুলি এইবার সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই জাহাজগুলিতে যেসব ক্ষেপণাস্ত্র থাকে সেগুলির পাল্লা ১৫ মাইল পর্যন্ত। এই ধরনের একটি রুশ জাহাজ ব্যবহার করেই মিশর ইজরায়েলের "এটলাথ" নামক জাহাজটি ডুবিয়ে দিয়েছিল।

তিন দিনের মধ্যে দ্বিতীয় আর একবার হানা দিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর পশ্চিম শাখা একই কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি করে। এবার শুধু করাচী নয়, তার পশ্চিমে সোরাভর ও জিওয়ানি বন্দরে হাজির হয়ে ভারতীয় রণতরীগুলি এই নৌযুদ্ধকে প্রায় ইরাণের সীমান্তে নিয়ে গেছে এবং চারটি পাকিস্তানী জাহাজকে "ডুবিয়েছে অথবা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।"

ভারতীয় নৌবাহিনীর পূর্ব শাখার কৃতিত্ব হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের নৌযুদ্ধে ভারতের একমাত্র বিমানবাহী জাহাজ (পাকিস্তানের কোন বিমানবাহী জাহাজ নেই) 'বিক্রান্ত'কে সাফল্যজনকভাবে নিয়োগ: এই বিক্রান্ত থেকে উড়ে এসে ভারতীয় নৌবাহিনীর 'সীহক' ও অন্যান্য বিমান পূর্ববঙ্গ থেকে পালাবার ও পূর্ববঙ্গে রসদ পৌঁছে দেওয়ার জলপথগুলি আগলাচ্ছে। 'বিক্রান্ত' থেকে উড়ে গিয়েই সাব-মেরিন-ধ্বংসী "এলিজে" বিমান বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানী সাবমেরিন ধরতে ও ধ্বংস করতে সাহায্য করেছে।

প্রাক্তন বৃটিশ জাহাজ 'হারকিউলিস'কে অদল-বদল করে 'বিক্রান্ত' নাম দিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীতে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় রণতরীগুলির মধ্যে 'বিক্রান্ত' এখন প্রধানতম, যাকে বলা হয় 'ফ্ল্যাগশিপ'। জাহাজটি এবং এই জাহাজে যেসব বিমান রাখা হয়েছে সেগুলি সেকেলে এবং প্রকৃত প্রয়োজনের সময় এর দ্বারা কোন কাজ হবে কিনা এসব বিষয়ে অতীতে কিছু কিছু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এবার বিক্রান্ত যে বাহাদুরী দেখিয়েছে তাতে এই সব সমালোচনা আর খাটবে না।

এই যুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনীর আর একটি চমকপ্রদ সাফল্য হল পাকিস্তানের সাবমেরিন 'গাজী'কে নষ্ট করা। টেঙ্গ শ্রেণীর এই সাবমেরিন পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে খয়রাত হিসাবে পেয়েছিল। ১৯৬৪ সালে আমেরিকা যখন পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য কর্মসূচী অনুযায়ী সাবমেরিনটি দেয় তখন বলা হয়েছিল যে, জাহাজটি শুধু তালিম দেওয়ার কাজেই ব্যবহার করা হবে, অন্য দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। এই ধরনের একটা সর্তও নাকি ছিল যে, আমেরিকা যে কোন সময়ে সাবমেরিনটি ফেরৎ নিতে পারবে, কিন্তু 'গাজী' কার্যত পাকিস্তানী নৌবাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাবমেরিনে এক সঙ্গে
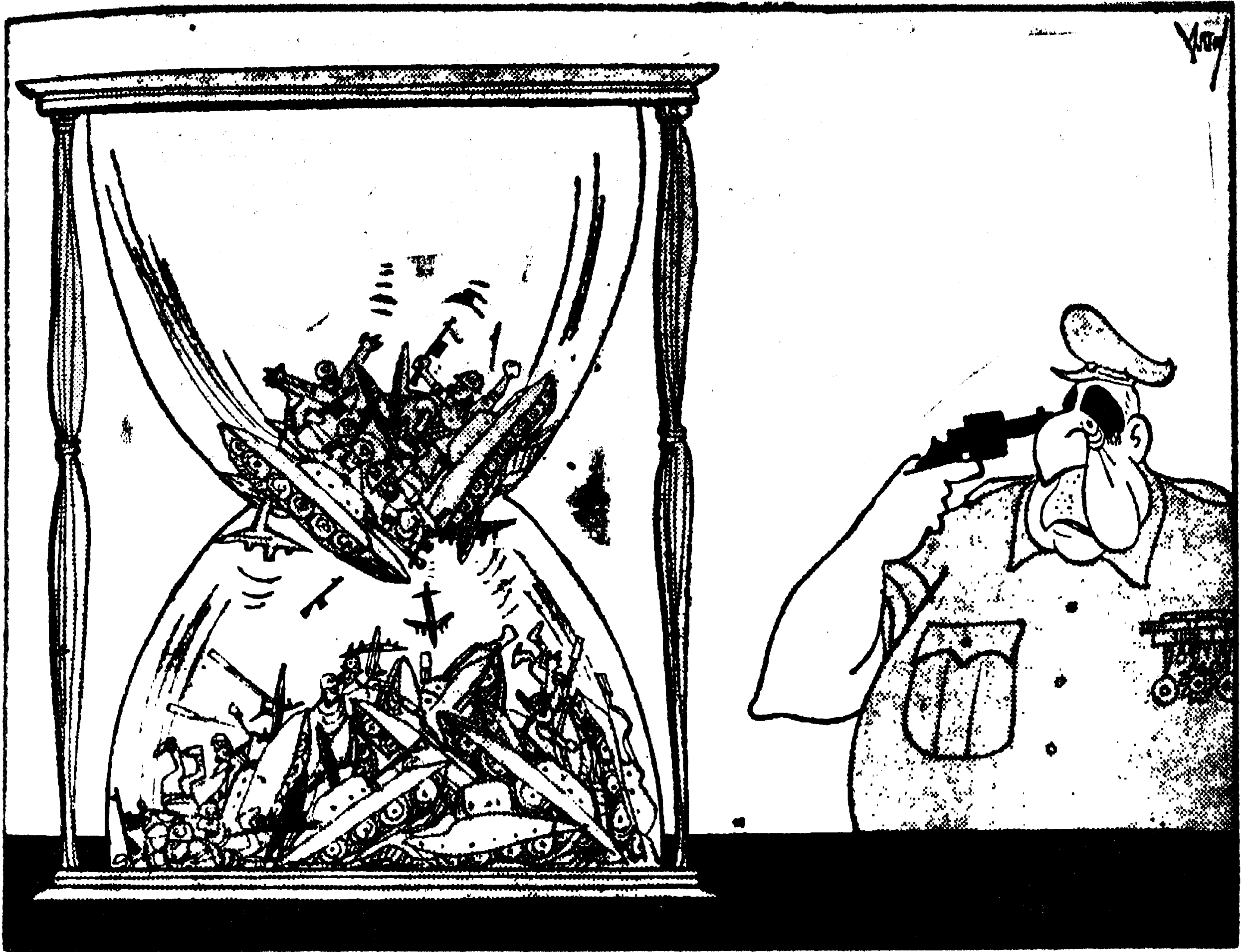
২২টি টর্পেডো বা মাইন বহন করা যায় এবং জাহাজটি একবারও ভেসে না উঠে জলের মধ্যে ডুবে থেকে এক নাগাড়ে ১৫ হাজার মাইল যেতে পারে।

গত তেসরা ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনম বন্দরের অদূরে ভারতীয় টহলদার জাহাজ ডেপথ চারজ ছুঁড়ে 'গাজী'কে ধ্বংস করেছে, যদিও এর পাকা খবরটা পাওয়া গেছে ছয় দিন পরে সাবমেরিনের কয়েকজন পাকিস্তানী নাবিকের লাশ জলের উপর ভেসে ওঠার পর। একজনের পকেট থেকে পাওয়া গেছে একটি চিরকুট। তাতে একটি উর্দু কবিতার দুই লাইন লেখা আছে, যার মর্মার্থ হচ্ছে, 'নিজেদের ঘর-দুয়ার থেকে আমরা রয়েছি অনেক দূরে, কবে আমরা আমাদের প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হব?' পৃথিবীর সব দেশের নৌসৈনিকদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই ঘরকাতুরে পাকিস্তানী নাবিকের মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরের জলে সমাধি দেওয়া হয়েছে।

●

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গার ও পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন সরকারী সেক্রেটারি, সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এই যুদ্ধে ভারতই আক্রমণকারী। রাষ্ট্রসঙ্ঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি জর্জ বুশও একই কথা বলেছিলেন।

সম্প্রতি কতকগুলি লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, এই কথা বলার পর নিক্সন সরকার এখন একটু বেকায়দায় পড়েছেন এবং কিছুটা সরে আসার চেষ্টা করছেন। মার্কিন সরকার ভারত-বিরোধী নীতি নেয় নি, তাঁরা শুধু এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারত পাকিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে ভাল করে নি, একথাটা বলার জন্য মার্কিন সরকারী মুখপাত্রদের মধ্যে যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। ৭ ডিসেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের একজন প্রধান সহকারী (পরে একজন মার্কিন সংবাদদাতা জানিয়েছেন, এই 'সহকারী' হচ্ছেন ডাঃ হেনরী কিসিঙ্গার) বলেছেন, 'হোয়াইট হাউস' (মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন) থেকে এই প্রসঙ্গে 'আক্রমণকারী' কথাটা কখনও ব্যবহার করা হয় নি। পর দিন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র রবার্ট ম্যাক-ক্লসিক বললেন, 'ভারত যা করেছে সে বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রকাশ করার জন্য 'আক্রমণ' কথাটি ব্যবহার করতে কাউকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি।' ১০ তারিখে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে আমতা-আমতা করে কৈফিয়ৎ দিলেন, যাই হয়ে থাকুক, ভারতের সৈন্য পাঠান ঠিক হয় নি, এটাই আমেরিকা বলতে চেয়েছে।

একতরফাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার পর এবং ভারতের অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার পর নিক্সন সরকার সুর বদলাচ্ছেন কেন? প্রশ্নটি নিয়ে কিছু জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। একটি অনুমান এই যে, আগামী ১৯৭২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন এমন অন্তত দুজন সিনেটর এডমণ্ড মাস্কি ও সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে মার্কিন সরকারের এভাবে এক পক্ষ অবলম্বন করার নিন্দা করেছেন। সিনেটর গোল্ড ওয়াটারের মত কট্টর রক্ষণশীল সদস্যও এ বিষয়ে নিক্সন সরকারের আচরণের সমালোচনা করেছেন। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকা এবং জোসেফ ক্রাফট প্রভৃতি কয়েকজন লেখকও এই আচরণের নিন্দা করেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে এবং তাতে নিক্সনের অসুবিধা হতে পারে, একথা মনে করেই হয়ত মার্কিন সরকার এখন ভারত-বিরোধিতার সুর নরম করতে চাইছেন।

১০-১২-৭১ —[illegible]

॥ তার নাম ॥

মযহারুল ইসলাম

আমি শুধু বসে বসে লিখি তার নাম
আমার চেতনা শুধু সেই এক নামের আবেশে
নিস্তব্ধ সত্তার মত জেগে থাকে জীবনের বালুকাবেলায়
লেখা হয়ে গেছে তার নাম সব প্রজ্ঞার এপিঠে ওপিঠে
রক্তের প্রবাহে অবিরাম।

তার নাম
দেখেছি শব্দের মত বৈশাখের ঝড়ে ভেসে আসে
সৌরভের মত হায় নরম বিনিদ্র নেত্রে নামে ঘাসে ঘাসে
তার নাম পরিচিত ছয়টি ঋতুর চোখে ঐশ্বর্যের কণা
ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়, আকাশে সুরের আলপনা
বিচিত্র রঙের স্পর্শে এঁকে রাখে
পুষ্পের কোরকে তার নাম যেন ঘ্রাণ হয়ে থাকে।

পদ্মা মেঘনার স্রোতে তরঙ্গিত তার নাম, ধলেশ্বরী বাঁকে
অযুত বর্ণের মত তার নাম লেখা হয় প্রচঞ্চল বলাকার ঝাঁকে
কিষানীর নিড়ানীতে কাস্তে কোদালে সেই নামের প্রতীক
দেখেছি অশ্রুর বানে দুঃখের মত হয়ে লেগে থাকে ঠিক।

ভাতের থালায় আর রুটিতে লিখি সে নাম ক্লান্তিবিহীন
আমার গলিত ঘর্মে বিরামবিহীন
হৃদয়ের নিগূঢ় প্রচ্ছায় আমি লিখি সেই নাম রাত্রিদিন
বিরামবিহীন
সেই নাম হাতে আসে দুর্দিনের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে
একখানি শাণিত সঙীন
বাঁধভাঙা মানুষের শপথের আলোকে রঙীন।

তারপর প্রতিশ্রুতি হয়ে আসে
সংঘবদ্ধ সুউত্তাল মিছিলের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
প্রতিশ্রুতি প্রতিরোধ প্রতিশোধ দুর্জয় সংগ্রাম
সম্মুখ সমরে মূর্ত যেন তার এক একটি নাম।

—সে আমার বাঙলা দেশ, দুইটি শব্দের সোনা ঝরে যার নামে
নাম তার লিখে রাখি অনুভূতি দিয়ে এই হৃদয়ের খামে,
তৃষ্ণায় শান্তির মত সে আমার বাঙলা দেশ, আমার স্বদেশ
আমার সত্তার মাঝে প্রভাতের সূর্য হয়ে জাগে অনিমেষ।

মাটিতে মাটিতে আর হৃদয়ে হৃদয়ে তাই লিখি সেই নাম
রক্তের আখরে অবিরাম।

জীবন যেমন ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু

নির্দিষ্ট আশ্রয় নয়, বহতা এ নদী
সারি সারি আকর্ষণ দুই তীর জুড়ে,
চাঁদের তারার স্বপ্ন পাহাড় চূড়ায়
এলোমেলো মেঘেদের বেশ জমে মেলা
ঝুলন্ত শূন্যের বুকে শিখরে শিখরে
যতদিন এদেহে উজান ভ্রামরী গুঞ্জন,
তারপর ক্রমে ক্রমে গোধূলি বিকেল;
উদ্যানে সন্ধ্যায় ঝরে স্মৃতির কুসুম
নানা-রঙ নানা-গন্ধ হাসি ও কান্নার।

উজানে ভাটায় আর আলোয় আঁধারে
এমনিই মনে হয় প্রতিটি জীবন
মূর্তি হয়ে গড়ে ওঠে ঈশ্বরের মতো;
ঈশ্বরও যেমন দৃশ্য করুণা ধারায়,
অন্ধকারে অধিকাংশ কাল উদ্‌যাপন,
সুখে-দুঃখে মানুষের জীবনও তেমনি
বহতা নদীরই মতো লক্ষ্যপথে ধায়।
সব শেষে একদিন সমস্ত পায়ের শব্দ
শুয়ে পড়ে অতীতের নিটোল শয্যায়,
জীবনেও যেন ঘটে বহমান ঋতু আবর্তন।
নির্দিষ্ট সরাই নয়, এ ঠিক বহতা নদী—
কোথা তার তরঙ্গেরা সমুদ্রে মিলায়,
তীরে তীরে রেখে যায় হৃদয় স্বাক্ষর।

এখন অন্যরকম

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল, তারপর সোজা বলল—কাকে চাই? জামাইবাবুকে তো? নেই। কেন নেই, কোথা গেছে, অত খবর আমি রাখিনে। সে পুরোপুরি আলোর মধ্যে রয়েছে—আর চন্দন রাস্তায়। ছোট রাস্তা—পিঠের দিকে টিমটিমে বালবটা জ্বলছে অনেক উঁচুতে—তাই চন্দনের মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। এত ঝিমঝিম নির্জনতা চারপাশে! ঝোপঝাড় গাছপালার ফাঁকে একতালা ঘরবাড়ি। অনেক খুঁজে পরেশদার বাড়িটা পাওয়া গেছে। রিকশোওলা খুব মেহনত করেছে বলতে হয়। তাকে বখশিস ও কৃতার্থতাসূচক বিদায় দিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছিল চন্দন। তারপর তো এই সম্ভাষণ!

মেয়েটিকে চেনাচেনা লাগছিল। পরমুহূর্তে চন্দন ফিক করে হেসে উঠল। ...রুমা না? আমি চন্দন—জিয়াগঞ্জ থেকে আসছি।

রুমা একটু ঝুঁকে ওকে দেখে নিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। চন্দনদা! কী অবাক! আমি ভাবলাম...কথাটা শেষ না করে সে মুখ ঘুরিয়ে অস্ফুট চেঁচাল, দিদি, দিদি! কে এসেছে দেখে যাও। জিয়াগঞ্জের চন্দনদা!

বাড়ির ভিতর চকিতে একটা দুদ্দাড় ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। অদ্ভুত সুর করে যে ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ পড়া মুখস্থ করছিল, বোঝা যায় ওরাই দৌড়ে আসছে। রুমার পিঠের কাছে চারটে মুণ্ডু দেখা গেল। তাদের ভিড় ঠেলে চন্দন রুমার পিছনে বাড়ি ঢুকতেই স্নেহধারা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বলল, কে, চন্দন? এস এস। ভালো আছো তো? বাড়ির খবর ভালো? আজই তোমাদের কথা ভাবছিলাম।...

স্নেহবউদির গলার স্বরটা কেমন নিস্তেজ মনে হল চন্দনের। বারান্দায় মোটামুটি উজ্জ্বল আলো। ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। চেহারাতেও কেমন যেন ময়লা জমেছে। একটু রোগা হয়ে গেছে না স্নেহবউদি! চন্দন কোনদিন তাকে প্রণাম করেছে কিনা মনে পড়ছিল না সে মুহূর্তে, তাহলেও টিপ করে একটা প্রণাম করে বসল। পরেশদার সঙ্গে চন্দনের বয়সের তফাৎ বড়জোর দু-তিন বছর। বিয়ে করলেই চন্দনেরও এমন একগুচ্ছের ছেলেমেয়ে হয়ে যেত নিঃসন্দেহে। পরেশদা হুট করে সাততাড়াতাড়ি কেন বিয়ে করে বসেছিল, আজও চন্দনের কাছে তা একটা রহস্য। সে বলল, হঠাৎ এসে পড়লাম—একটা টেলিগ্রাম পেয়ে।

স্নেহধারা বলল, টেলিগ্রাম! কিসের টেলিগ্রাম? কে করল?

চন্দন বারান্দার খালি তক্তাপোষে ফোলিও ব্যাগটা রেখে বলল, চাকরীর ইন্টারভিউ। অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এলাম। বাপস, অনেক অচেনা জায়গায় গেছি—এমন হয়রান কক্ষনো হইনি। কখন থেকে ঘুরছি, বাড়ির হদিস মেলে না। যাকেই জিগ্যেস করি, বলে—চিনিনে। ব্যাপার কি বউদি? পরেশদার মতো মার্কামারা লোক এখানে এখনও অচেনা! ভাবতে অবাক লাগে সত্যি!

স্নেহধারা কাকে ডেকে বলল, বালতি আর মগটা এই সিঁড়ির কাছে এনে দে। আর রুমা—থাক, লতুকেই পাঠাচ্ছি। লতু, শুনে যা।

বলে সে চন্দনের দিকে ঘুরল। চোখ এবং ঠোঁটের কোণে কী যেন ঝিলিক দিচ্ছিল, চন্দনের চোখ এড়াল না—তার অবাক লাগল একটু। স্নেহধারা বলল, হ্যাঁ—মার্কামারা লোক বলেই তো কেউ বাড়ি দেখাতে চায় না। ওঠ, হাতমুখ ধুয়ে ফেল। রুমা, বাইরের ঘরটা খুলে দে। চন্দন, তোমার কাপড় ছাড়ার দরকার হলে ওঘরে যাও।

রুমা বারান্দার শেষ প্রান্তে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, পরশু থেকে আলোটা জ্বলছে না। মোমবাতি চাই যে! লতুকে দুটো মোমবাতি আনতে বলো।

স্নেহধারা বলল, তোদের যত পেট ব্যথা—অসময়ে! কেন, কালই তোকে বললাম সুধীর ঠাকুরপোকে ডেকে নিয়ে আয়। লাইনটা দেখে দেবে—কোথায় কী হল।

রুমা অন্ধকার ঘরটার দরজা খুলে দিয়ে সরে আসছিল। বলল, দুদিন দুবেলা করে চারবার গেছি। সুধীরটুধীর কারো পাত্তা নেই। মোড়ে যে মিস্ত্রিটা ফ্যান সারায়, সে আসব বলেছিল—

স্নেহধারা বলল, থাক, অত খুঁটিয়ে কিছু শুনতে চাইনি। আরে! লতু, ইনতু! তোরা কাকুকে প্রণাম করলিনে! আয় এদিকে।

আট-ন বছরের দুটি ছেলেমেয়ে পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে এসে টিপ করে প্রণাম সেরেই ঘরে ঢুকছিল। স্নেহধারা ধমক দিল, কাজ আছে। এদিকে আয়। আর সনতু, মানতু! তোমরাও এস—এস। প্রণাম করো কাকুকে।

চার-ছয় বছরের আর দুটি ছেলেমেয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই দুটো পেন্সিল চিবোচ্ছে। তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল আগন্তুককে। স্নেহধারা ওদের হাত ধরে টেনে প্রণাম করিয়ে ছাড়ল। চন্দন হো-হো করে হেসে বলল, কী মুশকিল!

স্নেহধারা বলল, মানুষকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে যদি এখন থেকে না শেখাই, শিখবে কবে? যতদিন বেঁচে আছি, আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করব না। মলে তখন ওদের বাবার হাতে পড়বে—বাবা তখন নিজের পথে চালাতে চেষ্টা করবে নিশ্চয়। মানুষকে বলতে শেখাবে, গাছপাথর—যাক্‌ গে। হাতমুখ ধোও। এসেছ, এত মনে জোর পেলাম ভাই!

স্নেহধারা লতু-ইনতুর হাত ধরে রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল। চন্দন কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। একটা কিছু নেপথ্যে যেন রয়ে গেছে—আঁচ করতে পারছে না। পরেশদা একটু উদ্দাম স্বভাবের মানুষ ছিল, সেটা ঠিক। জিয়াগঞ্জ ছেড়েছে আজ আট নবছরেরও বেশি। এখানে কী একটা ব্যবসা করে অবস্থাও নাকি কিছুটা গুছিয়েছে। চিঠিপত্রে মধ্যে মাঝে এইসব খবর একটু আধটু থেকেছে। আজ এখানে এসে পড়ে ঘরবাড়ি ও ছেলেমেয়েদের পোষাক-আসাক দেখে আঁচ করা যায়, খবরটা বরং কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাবা যায় না, পরেশদার মতো লোকের এমন একখানা বাড়ি হয়েছে। তবু কোথায় একটা কিন্তু এসে দাঁড়াচ্ছে বারবার।

চন্দন ডাকল, রুমা, শোন।

রুমা কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল। সে এতক্ষণ স্থির তাকিয়ে চন্দনকে দেখ-ছিল।

চাপা গলায় চন্দন বলল, ব্যাপার কী রুমা? পরেশদা কোথায়?

রুমা ভুরু কুঁচকে অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, কে জানে! তিনদিন ধরে বাড়ি নেই।

চন্দন অবাক হয়ে বলল, বাড়ি নেই মানে? কোথায় গেছে?

রুমা মুখ নামিয়ে বলল, কিছু তো বলে যায় না জামাইবাবু। হুট করে যায়, আবার হুট করে আসে। সেও কোন সময়ের ঠিক নেই—হয়তো দুপুর রাত্তিরেই এসে হাজির হল।

চন্দন অগাধ জলে পড়ে গেল।...কেন? পলিটিকাল অ্যাবস্কন্ডার নাকি?

রুমা চাপা হেসে ফেলল। যাঃ! ও কিছু না। পরে শুনবে'খন। দিদি বলবার জন্যে ধড়ফড় করছে এতক্ষণ। ......চন্দনদা, বরং এক কাজ করো। এখানেই কাপড় ছেড়ে ফেলো না। আমি কাটছি।

চন্দন বলল, খুব—খুব যে মুখ খুলেছে এখানে এসে! এ্যাঁ?

রুমা আলোয়ভরা ঘরটায় ঢোকার মুখে ঘুরে আর একবার মৌন হেসে গেল। ব্যাগ খুলে লুঙ্গি বের করতে করতে চন্দন কিছু পুরনো কথা ভাবছিল। জিয়া-গঞ্জে থাকত যখন, তখন রুমার বয়স দশ থেকে বারো বড় জোর। অনাথা এই শালীটির দায়ভার পরেশদা হাসিমুখে নিয়েছিল মাথায়। অথচ তখন কী দুরবস্থা পরেশদার! এঁদো গলির স্যাঁতসেঁতে ঘরে সারাদিন বসে হারমোনিয়াম মেরামত করত। সাউ এ্যান্ড সনসের বাজনার দোকানের ঠিকে কাজের এক সামান্য মিস্ত্রী ছিল সে। দেখলে দুঃখ হত ভারি। আরো নানা-রকমের কাজকর্ম করেছে পরেশদা। বই বাঁধতে পারত। হ্যান্ডাগ স্টোভ গ্রামোফোন সারাতে জানত। এমন কি শেষঅব্দি কিছুদিন ছায়া সিনেমার অপারেটরের কাজও করেছিল। কী কথায় ম্যানেজারকে মেরে বসল। তার ফলে চাকরীটা গেল। অত মাথা গরম হলে গরীব মানুষের চলে না। অথচ পরেশদার রক্তে কী একটা ছিল।

চন্দনের সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্কই অবশ্য নেই। নেহাৎ পাড়ার ছেলে—মুখোমুখি আজন্ম বাস। তবে শুধু চন্দনের নয়, পরেশদা ছোট্ট শহরটার আরো অনেক ছেলেরই দাদার অধিকার কাড়তে পেরেছিল। ছেলেদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট লাগলে সেই ছিল চরম মধ্যস্থতা করার মতো যুবক। সবাই তাকে মানত। শ্রদ্ধা করত। জিয়াগঞ্জ ছেড়ে ভাগ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ার সময় তাকে দল বেঁধে সবাই ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, চিঠিপত্র দেব বরাবর, জবাব দিতে ভুলো না পরেশদা। কেউ বলেছিল, সব সময় গিয়ে জ্বালিয়ে আসব পরেশদা।

কেউ চিঠি লেখেনি। কেউ আসেনি রূপপুর চটিতে। কেবল চন্দন বাদে। চন্দনের মনে পরেশদা বাদেও আরো দুটো স্মৃতি দুর্মর ছিল—সে হচ্ছে স্নেহধারা বউদি আর তার হাসিখুসি চঞ্চল বোন, এই রুমা। ফুটবল খেলে এসে উপুড় হয়ে শুয়েছে চন্দন। জানালা দিয়ে ডেকেছে, রুমা এই রুমাকি! ব্যস, অমনি রুমা হাজির। একঘণ্টা পিঠে কোমরে পায়ে দাপাদাপি করে আরাম দিয়ে গেছে বালিকা রুমা। গঙ্গায় ওকে দুহাতে শূন্যে তুলে সাঁতার কেটেছে চন্দন। রাগ করলে সন্দেশ খাইয়েছে। রুমা কিশোরী হতে হতে জিয়াগঞ্জ ছেড়ে চলে গেল জামাইবাবুর সঙ্গে। তারপর কত-দিন শূন্য আর নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল চন্দনের জীবন। আসলে সবই অভ্যাস। একটা অভ্যাস ছেড়ে ফের নতুন একটা অভ্যাসে ধাতস্থ হলেই ফের সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। চন্দনের আর কোন কষ্ট হয়নি। কেবল স্মৃতি—স্মৃতি ভারি চক্রান্তকারী।

লতু-ইনতুরা হই হই করে এসে গেল, মোম এনেছি! মোম এনেছি!

রুমা বেরিয়ে এসে মোম দুটো হাতে নিয়ে বলল, একী-রে! এতটুকুন! এ দিয়ে কী হবে? যা— ফেরৎ দিয়ে বড়গুলো আন্।

চন্দন হাত মুখ ধুতে ধুতে বলল, থাক। ওই হবে। ইলেকট্রিরির হালহদিস এক-আধটু জানি। চলো, কী হয়েছে দেখছি।

একটু পরেই স্নেহধারা এল। হাতে প্লেট আর জলের গ্লাস। বলল, ও বেলা এলে ইলিশ খাওয়াতে পারতাম। খুব সস্তা এবার।

চন্দন বলল, ওই যাঃ! আসবার সময় একটা ইলিশ আনলেও পারতাম! ঘাট পেরোনর সময়—

রুমা জিভে জল টেনে বলল, ই-স্‌স্‌! জিয়াগঞ্জের গঙ্গার ইলিশ! ফেট্! তুমি করেছ কী!

স্নেহধারা বলল, তাইতো! জিয়াগঞ্জের কথা ভুলেই গেছি—কত বছর হয়ে গেল। আচ্ছা চন্দন, সেই সরলা-কমলার বিয়ে কোথায় হল? পিনাকীবাবুর মা বেঁচে আছে তো? আর—সেই যে ঘাটের ধারে বাড়ি, রিটায়ার্ড সাব-জজ ভদ্রলোক—সেই যে গো, মুসলমান ফ্যামিলি, মেয়েটার নাম কী যেন ছাই...

রুমা বলল, নাও—এখন সারা শহরের খবর দাও ওকে! দিদি, চন্দনদা লাইন সেরে দেবে বলছে।

যেন কথাটা চন্দনকেই মনে করিয়ে দেওয়া। চন্দন ঢকঢক করে জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল। ...হ্যাঁ, দিচ্ছি।

স্নেহধারা আঁতকে উঠে বলল, না না! কী হয়ে আছে কোথায়—এক্ষুনি বিপদ হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও। তুমি বরং আমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও ভাই। রুমা, ওকে নিয়ে যা।

চন্দন পা বাড়িয়ে বলল, ভেবো না। পরেশদার মতো...হঠাৎ হেসে উঠল সে। বউদি, তোমার মনে পড়েছে? সেবার পুজোর প্যান্ডেলে আলোর ভার নিয়েছিল পরেশদা—তারপর ধুন্ধুমার অগ্নিকাণ্ড! কী বিপদ!

স্নেহধারাও হাসল।...হ্যাঁ, গোঁয়ার লোকেরা তো অমনি করে পরের বিপদ ডেকে আনে—নিজেও বিপদে পড়ে যায়।

রান্নাঘরের দরজায় কে একজন ছোকরা মতো উঁকি মেরে বলল, জল ফুটছে বউঠান।

স্নেহধারার যেন নড়তে ইচ্ছে নেই। বলল, চা ফেলে নামিয়ে রাখ্। যাচ্ছি। আরে! সত্যি লাইন সারবে নাকি? বসো, বসো। অদ্দূর থেকে ক্লান্ত হয়ে এলে। রুমাটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। একটু হুজুগ পেলেই হল।...লতু, ইনতু! কী হল? পড়া শুনতে পাচ্ছিনে যে।

চন্দন দেশলাই বের করে রুমার হাতের সরু মোমটা জ্বালিয়ে দিল। সে সময় সে লক্ষ্য করল, রুমা তাকে দেখছে। কী দেখছে রুমা? শরীরের বা চেহারার রদ-বদল? মিলিয়ে নিচ্ছে আগের সেই চেনাটার সঙ্গে? হয়তো তাই। একটু চমক খেয়ে গেল চন্দনের মনে। রুমা এখন প্রায় যুবতী। বয়স কত হবে? আঠারো-উনিশ তো বটেই। রুমা তাকে কোন চিঠি লেখেনি কোনদিন। তবে তার খবর পরেশদার চিঠিতে থাকত।......

দরজার কাছে স্নেহধারা দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ঘরে সামান্য মোমের কাঁপন্ত আলোয় খুব ঘনিষ্ঠ দাঁড়িয়ে ওরা দুজনে বোর্ডটা দেখছে। স্নেহধারা বলল, আলোর শিস ঢুকছে নাকে—একটু তফাতে ধর না!

চন্দন বলল, ঠিক আছে। বউদি, স্ক্রু-ড্রাইভার আছে?

রুমা অস্ফুট হাসল। প্রাক্তন মিস্ত্রীর বাড়ি—থাকা উচিত ছিল নিশ্চয়। কিন্তু দুঃখিত—নেই। তবে ছুরি আছে। দেব?

হঠাৎ কেন কে জানে চন্দন চমকে

উঠল। স্নেহধারা ডাকল, গ্যাদা, রান্নাঘরের তাকে একটা ছুরি আছে দিয়ে যা।......

দোষটা সুইচেরই। একটা তার সবুজ হয়ে জ্বলে গেছে। স্নেহধারা চায়ের কাপ হাতে যখন ঢুকল, তখন ঘরে উজ্জ্বল আলো। রুমা জানালা খুলতে খুলতে বলল, খুলে তো দিচ্ছি। দারুণ মশা কিন্তু। জঙ্গল কেটে শহর বসছে, মশাদের পুনর্বাসন হচ্ছে না। চন্দনদা, কী চাকরী তা তো বলছ না? মসকুইটো রিহ্যাবিলিটেশনের নয় তো?

তিনজনেই হাসল। স্নেহধারা বলল, সেও একটু খুলে ফেলবে হয়তো। যা হচ্ছে। চন্দন, এবার তোমার চাকরীর খবরটা শুনি। বলো।

চন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, বড্ড অদ্ভুত ব্যাপার। লোকাল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, একজন চালাকচতুর সুশিক্ষিত ম্যানেজার দরকার—কমার্সে ডিগ্রী থাকলে ভালো হয়। তাছাড়া বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট কোর্স যারা শেষ করেছে, তারাই প্রেফারেন্স পাবে। মাইনে মোটামুটি ভালই। রুমা, এখানে অলফা ডিসট্রিবিউটারসটা কোথায় জানো?

রুমা ঘাড় নাড়ল।......নাঃ। দিনে দিনে কত সব ভুতুড়ে কনসার্ণ ব্যাঙের ছাতার মত গজাচ্ছে এখানে। অত খবর কে রাখে!

স্নেহধারা বলল, তোমার দাদা অবশ্য চেনে। আসুক—ভেবো না।

চন্দন বলল, বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল মাস আটেক আগে। তক্ষুণি দরখাস্তও করে বসলাম। একবার ভাবলাম, পরেশদাকে জানাই—পরে ঠিক করলাম, থাকগে। চাকরী তো হবেই না—যা চাইছে তেমন কোয়ালিফিকেশন তো আমার নেই-ই।...... হঠাৎ আজ সকালে জরুরী টেলিগ্রাম হাজির —এক্ষুণি চলে এস!

রুমা বলল, টেলিগ্রামটা কই?

ব্যাগে আছে। ব্যাগটা নিয়ে এস না লক্ষ্মীটি।...বলে চন্দন ঘরটার ভিতর এতক্ষণে চোখ বুলোলো। খুব বেশিদিনের বাড়ি নয়। দেয়ালগুলো ধবধবে শাদা, মসৃণ, সুদৃশ্য।

দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। আরে! কোথায় বসে আছে সে। আসলে তিয়াগঞ্জের পরেশদা ও তার ঘরের স্মৃতি এত চেপে বসেছিল চোখে, যে বর্তমানটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল না। সে গদীআঁটা সোফায় বসে রয়েছে। তার সামনে বসে আছে স্নেহ বউদি। রুমা এতক্ষণ বউদির পাশে হাতলে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো-বসার মাঝামাঝি ভঙ্গীতে অবস্থান করছিল। এমন চমৎকার বেতের সোফাসেট পরেশদার বাইরের ঘরে! শোকেসে পুতুলের জগৎ! কোনে কারুকার্যকরা বাদামী টুলের ওপর উড়ুক্কু বক। একদিকে ছোট্ট তক্তপোষটায় তোষক—চমৎকার চাদর বিছানো, তার ওপর দুটো তাকিয়া। অন্য কোনে উঁচু টুলের ওপর সুদৃশ্য ঢাকনা—ওপরে ফুলদানীতে প্ল্যাস্টিকের ফুল।

একটু অস্বস্তিতে ফের আচ্ছন্ন হল চন্দন। রুমা ব্যাগটা এনে টেবিলে রেখে বলল, থাক। আর দেখে কাজ নেই। সকালে আমাকে নিয়ে বেরোবে। খুব বড় জায়গা তো নয়—মোটে এক রত্তি। খুঁজে বের করা যাবে।

স্নেহধারা উঠে দাঁড়াল।...রাত্তিরে আটা না ভাত খাও তোমরা?

চন্দন বলল, কিচ্ছু ঠিক নেই। আর আমি তো সর্বভুক, তা জানো বউদি।

স্নেহধারা বলল, রুমা, আয় তো। ময়দা মাখতে দিয়েছি। আমি সেঁকব, তুই বেলে দিবি।

রুমা বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, উঁহু। আমার পড়া ডিসটার্ব হয়ে গেল তখন থেকে। আমি ও ঘরে চললাম। তুমি গ্যাদাকে নিয়ে লেগে যাও না!

সে সত্যি সত্যি কেটে পড়ল। স্নেহধারা হাসতে হাসতে চলে গেল। বলে গেল, শুয়ে হাত-পা ছড়াও ততক্ষণ। গরম গরম সেঁকে দিচ্ছি। ঘুমিয়ে পড়ো না কিন্তু।

ঘরে একা বসে রইল চন্দন। ঘরের ভিতরটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে নিল। পরেশদার এই সচ্ছলতার উৎস হাতড়াচ্ছিল হয়তো। কিন্তু একটু পরেই দেখল, ঘুরে-ফিরে কেবল রুমার কথাই তার মাথায় আসছে। রুমা—সেই রুমা! আজ চাঞ্চল্য জাগাতে পারছে তার মনে, এটাই আশ্চর্য। আর সেই সঙ্গে কোত্থেকে হুড় হুড় করে ঝড়ো হাওয়ার মতো অপরিচিত একটা আশা তাকে ঘিরে ধরছে। ঘুরপাক খাচ্ছে। না— রুমার সঙ্গে প্রেম ভালবাসার আশা নয়—

সেটা এক রকম ভাবাই যায় না। সেই একরত্তি মেয়েটি আজ এত বড় হয়েছে, তাকে পুরুষের চোখে দেখতে লজ্জা করছে তার। কিন্তু খাঁপ মনে হচ্ছে, চাকরীটা হবে। হবে। তারপর সেও পরেশদার মতো দিদি ভাই-বোন মা বাবা সবাইকে জিয়াগঞ্জের সেই ঘিঞ্জি গলি থেকে এখানে এনে তুলবে। তারও ভাগ্যে এসে যেতে পারে এমনি চমৎকার ঝকঝকে ঘর, মসৃন দেয়াল আর উজ্জ্বল সিলিং। সন্ধ্যা রাত্রি হলেও বাস থেকে দেখেছে, এখানে আকাশটা বিশাল। চারদিকে যথেষ্ট খোলামেলা। অনেক আলো আছে। বাতাস আছে। নতুন জীবনের স্পন্দন আছে। এখানে থাকতে থাকতে মায়ের হাঁপানিটা সেরে যেতেও পারে। বাবার খিটখিটে মেজাজও ভালো হতে পারে। রুমা নিশ্চয় এখন কলেজে পড়ে। স্কুল কলেজ আছে বোঝা যাচ্ছে। দিদির কি কোন চাকরী মিলবে না এখানে? দিদির ভাগ্য — ত্রিশ বছর বয়সের শিক্ষিকা, অযথা স্ক্যান্ডালে চাকরীটা গেল তো গেলই। দু বছর ধরে বসে আছে— নিষ্কর্মার ধাড়ী হয়ে গেছে একেবারে। প্রাইভেট টিউশানিও একটা জোটাতে পারে না। হয়তো পারত—ওই স্ক্যান্ডাল! যাকগে। এখন নিজের এটা জুটে গেলে মঙ্গল।

চন্দন মশার কামড় টের পাচ্ছিল। কী ঘোর স্তব্ধতা এখানটায়! সে উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল। গাছপালার ফাঁকে ইতিউতি আলো জ্বলছে। একটা ব্যাপক অন্ধকারের অংশে সামান্য কিছু কারুকার্য যেন। দূরে মোটরগাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওদিকে আকাশটা একটু উজ্জ্বল। ওখানেই তবে সেই চৌরাস্তা— যেখানে বাস থেকে নেমেছিল। রিকশোওলা বেশ অমায়িক লোক। বলছিল, দেখতে দেখতে কী সব হয়ে গেল বাবু। মাঠের মধ্যে উড়ে এসে বসল এক যাদুপুরী। ছিল একটা ছোট্ট চটি। মানসুন্দেদের আড্ডা। ছেলেবেলায় দেখেছি, একা কেউ সন্ধেবেলা চৌরাস্তা পেরিয়ে পারতপক্ষে হাঁটত না। যারা চটিতে রাত কাটাত, তারা থাকত দল বেঁধে। অস্ত্রশস্ত্র থাকত সঙ্গে। পরে অবশ্যি পুলিশ চৌকি বসল। তাও উপদ্রব।

...আর ওদিকের জঙ্গলটা দেখেননি বাস থেকে? দীঘির পাড়ে? দেখেছিল হয়তো। রিকশোওলা বলছিল, ঠাহর করলে দেখতে পেতেন, মধ্যিখানে গাছের ডগায় নিশান উড়ছে। ওই হল গোলাপ শা'র দরগা। সে অনেক কথা বাবু। গৌড়ের বাদশার গুরু তিনি। একা বাস করতেন দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। ভয়তরাস নেই। সাধকের মন সাধনা নিয়েই থাকে। একদিন হল কী...

কী হল, আর শোনা যায়নি। পরেশদার বাড়ি এ লোকটা জানত না। তবে ভাল চেনে তাকে। নাম শুনেই বলেছিল, কলোনীর ভিতর কোথায় থাকেন যেন। ওরে বাবা, তাঁর লোক আপনি! আসুন, নিয়ে যাই। বাবুকে বলবেন, মঙ্গল— মিঠিপুরের মঙ্গল বাউরির রিকশোয় এসেছি।......

স্নেহধারা ডাকছিল, চন্দন, ও চন্দন! এবার এস ভাই! রাত বেড়ে গেল।

বারান্দায় আসন পেতে দিয়েছে। খেতে খেতে চন্দন বলল, রুমা কই?

স্নেহধারা বলল, নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। যত ধিঙ্গি হচ্ছে, তত বদঅভ্যাস বাড়ছে মেয়ের। রুমা, ঘুমোল নাকি?

রুমার সাড়া এল না। চন্দন বলল, আর—ওরা সব, ওদের খাওয়া হয়েছে?

স্নেহধারা বলল, নাঃ। দিচ্ছি।

ঘুমিয়ে পড়েনি তো? ...চন্দন কান পেতে ওদের পড়াশোনার সেই আওয়াজ শোনার ভঙ্গী করল। ...কই, সব তো চুপ। বউদি, আমি খাচ্ছি। ওদের দ্যাখো।

স্নেহধারা উঠে দাঁড়াল। ...এক্ষুনি ঘুমোবে কী! মোটে তো আটটা। দেখছ কাণ্ড? এতটুকুন ফাঁক পেলেই স্বভাব সব ফেটে বেরোবে। রুমা! লতু! ইনতু!

কতক্ষণ পরে ঢুলুঢুলু চোখে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে প্রায় টলতে টলতে রুমা বেরিয়ে যাচ্ছে। চন্দনের একটা কথারও জবাব দ্যায়নি। হয়তো ঘুমের ঘোরেই এসব করে গেল। হাসতে হাসতে চন্দন যখন মশারি গুঁজে দিচ্ছে বিছানায়, স্নেহধারা বাইরে দাঁড়িয়ে বলে গেল, দরজা বন্ধ করে দাও ভাই। ভীষণ চোরের জায়গা।...

নতুন জায়গায় গিয়ে পড়লে চন্দনের একটুও ঘুম হয় না। তার ঘুম আসছিল না। সবে হেমন্ত শুরু হয়েছে। একটু একটু হিম পড়েছে। একবার ঘুমিয়ে পড়েছিল—স্বপ্নও দেখছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। বেশ শীতবোধ হচ্ছে। জানালাগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার। ক্লান্তির আলস্যে তার উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পায়ের দিকটায় রুমা কোন চাদর রেখে গেছে কিনা কে জানে। পা বাড়িয়ে টের পেল না সে। তখন উঠল। চারদিকে ঘোর স্তব্ধতা। কদাচিৎ চাপা গুরুগুরু আওয়াজ উঠে ফের মিলিয়ে যাচ্ছে। হাইওয়েতে গাড়ি যাচ্ছে হয়তো। মশারি থেকে বেরোনর মুহূর্তে কোথাও একটা শব্দ হল কিসের। চাপা কথাবার্তা শুনতে পেল। শব্দটা বাড়ির ভিতর থেকে আসছিল। হঠাৎ চন্দনের মনে পড়ল, কখন আরও একবার ওইরকম আওয়াজ যেন শুনেছিল। হয়তো ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যেই। দরজা খোলার শব্দ, কোন চেনা কণ্ঠস্বর। পরেশদা এসেছে নাকি?

সে মেঝেয় গিয়ে দাঁড়াল। সিগ্রেট খাবার ইচ্ছে করছিল। হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে সিগ্রেট দেশলাই নিল। তারপর টের পেল, হ্যাঁ—পরেশদারই গলা।

...আঃ, কী হচ্ছে! ছাড়ো, পা ছাড়ো বলছি!

...না, না। আমার গলা টিপে মারো, তারপর যেখানে খুশি যেও।

...বিনু, জুলুম করো না! আঃ, কী হচ্ছে! ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ওঘরে চন্দন রয়েছে—আঃ ছি ছি ছি!

...কেন তুমি এমনি করে রাতবিরেতে ঘুরে বেড়াবে? বলো—কী তোমার এমন কাজ যে ঘরসংসার ছেড়ে বাইরে রাত কাটাতে হয়?

...ঘরসংসার আমি দেখছি না তো কে দেখছে! বিনু, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

...দেখ, আমি সব বুঝি। সব জানি। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমার জিয়াগঞ্জের সেই এঁদো গলিই ভাল ছিল। কেন এখানে তোমার সঙ্গে এলাম গো!

বিনু—স্নেহধারা বউদির ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দ হল। তারপর রুমার গলা শোনা গেল, ...দিদি! ঘরে এসো বলছি। কেলেঙ্কারী করো না রাতদুপুরে। চলে এস এক্ষুণি।

কান্নার শব্দটা দরজা বন্ধ করার শব্দে চাপা পড়ল। একটুখানি নীরবতা। তারপর পরেশদার ভারি গলা—রুমা, চন্দনকে বলিস, কাল দুপুর নাগাদ আলফাতেই আমার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করার শব্দ। নীরবতা। দরজা বন্ধ করার শব্দ। এবং ফের নীরবতা। কার্তিকের শিশির হিম নক্ষত্র আর অন্ধকার, পোকামাকড়ের ডাক, রূপপুর চটি পেরিয়ে হাইওয়েতে দূরগামী ট্রাকের চলে যাওয়া— আর ঘুম এল না চন্দনের।

যখন এল, তখন নীলচে কুয়াসার গায়ে ভোরের আলতারঙ মৃদু আলো এসে লেগেছে।

দুই

জায়গাটা যত বড় ভেবেছিল, অল্প হেঁটেই বোঝা গেল তত বড় কিছু নয়। চারদিক থেকে চারটে রাস্তা একখানে এসে মিলেছে। সেখানটা কেন্দ্র করে চারদিকে ছড়ানো ছিটান বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও কোন সামঞ্জস্য নেই। নিঃসন্দেহে একটা টাউনসিপ—অথচ পিছনে কোন প্ল্যানিং ছিল বা আছে বলে মনে হয় না।

যতটুকু বোঝা গেল, আসলে এ ছিল একটা সর্বস্বত্ব বাঁজা ডাঙ্গা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন একটা পাহাড়কে যদি দুরমুষের ঘায়ে বসিয়ে দেওয়া যায়, এই রকম দেখাবে। চারদিকের চারটে রাস্তার প্রত্যেকটাই চৌমাথা থেকে যে-যার দিকে উৎরাইয়ের ঢালুতে নেমে গেছে। তাই ওখানে দাঁড়ালে মোটামুটি এলাকাটা নজরে পড়ে। অসমতল ধানের মাঠ—কোথাও সবুজ, কোথাও বা হলুদ হয়ে রয়েছে। দূরে-অদূরে কার্তিকের কুয়াসাঢাকা গ্রাম-গ্রামান্তর। কোথাও একলা কোথাও দল বেঁধে থাকা তালগাছ। সকালের রোদে চিকমিক করছে দূর বিলের জল, সরু নদী, বালির চড়া আর ব্রীজ। এই নিসর্গের মধ্যে অন্তত এখন—এ মুহূর্তে ভাল লাগার মতো অনেক কিছু আছে। তবে পরে কেমন লাগবে বলা যায় না। চন্দন সামনে কিছুটা দূরে জংগলটার দিকে তাকিয়েছিল, খুঁজছিল কোথায় সেই পীরের দরগার নিশান। রুমা বলল, ব্যস, এই তো সব ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো। আমাদের রূপপুর চটির খেল খতম। সুতরাং ফেরা যেতে পারে।

চন্দন অন্যমনস্ক ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, উঁ?

রুমা খিলখিল করে হেসে উঠল হঠাৎ। ...এই! কোথায় তোমার সেই অলফা-গামা বিটা?

চন্দন বলল, এগুলো তেজষ্ক্রিয় রশ্মির নাম—খালি চোখে দেখা যায় না। তবে বড্ড মারাত্মক রশ্মি সব। যাক গে, সে পরে দেখা যাবে। রুমা, এখানে রেস্তোরাঁ—মানে আমরা বসে চা খেতে পারি এমন চায়ের দোকান নেই?

রুমা পা নাড়িয়ে বলল, চায়ের দোকান চারপাশে অনেক আছে। ওই তো দেখতে পাচ্ছ!

চন্দন বলল, চলো না—ওই দোকানটায় গিয়ে বসি। ওরা আমার আলফা কোম্পানীর খোঁজ দিতে পারবে নিশ্চয়।

রুমা চোখ কপালে তুলে বলল, মাথা খারাপ! এসব দোকানে..ফেটু! যতসব আজে-বাজে লোকের আড্ডা। দেখছ না চেহারাগুলো?

চন্দন বলল, তোমরা—মানে মেয়েরা কোথায় আড্ডা দাও?

রুমা ওর অজ্ঞতায় না হেসে পারল না। ...তুমি কি সত্যিসত্যি এটা টাউনশিপ ভেবেছ নাকি?

সেইরকমই তো মনে হচ্ছে! এতসব দোকানপত্তর, লোকজন, বাস রিকশো লরী।

যাঃ, সব গেঁয়ো ভূতের আড্ডা। চার-পাশের গাঁ থেকে ব্যাপারী আর জোতদার আর চাষাভূষোরা এসে মাছির মতন ভনভন করছে। ...রুমা বিরক্ত মুখে বলল। ...ফাইনালটা শেষ হতে অপেক্ষা। আমি বাবা ফুড়ুৎ করে কাটব!

তোমাদের কলেজটা কোথায়? দেখালে না তো রুমা?

রুমা দাঁড়িয়ে বলল, এখানে কলেজ কী! কলেজ সেই আট মাইল দূরে—কান্দীতে। বাসে যাই, বাসে ফিরি। আর সে কী গাদাগাদি, ঘাম, দুর্গন্ধ!

চন্দন একটু হাসল। ...সে সবখানে। কলকাতায় গিয়ে দেখে এসো না!

রুমা বলল, সেখানে ভিড় আছে—কিন্তু এমন নোংরা লোকেদের গায়ে গা দিয়ে কেউ চলে না।

চন্দনের কেমন খারাপ লাগছিল রুমার মতামত। সে মনে মনে বলল, ভাগ্যিস পরেশদার মতো লোকের সংগে তোমার দিদির বিয়ে হয়েছিল। ...সে জিয়াগঞ্জের সেই বালিকা রুমার কথা ভাবছিল। তখন রুমা কত চমৎকার মেয়ে ছিল। পৃথিবী সম্পর্কে তখন তার ধারণা যাই থাক, কোন মতামত দিতে জানত না। সম্ভবত রুমার মনে এখন অপর্যাপ্ত লোভ জন্মে গেছে। সম্ভবত একটা সৌন্দর্য রুচি আর ঔচিত্যের বোধ অর্জন করেছে সে। এটা অবশ্য ভালো। এটা মানুষের মধ্যে না জন্মালে মনুষ্য সেই আদিম দশাতেই থেকে যেত।

রুমা বলল, চন্দনদা, কথা বলছ না যে?

কী বলব?

জায়গাটা কেমন লাগল?

মন্দ কী!

তোমার পুষিয়ে যাবে। তুমি তো জামাইবাবুর চেলা। আমার কথা যদি জিগ্যেস করো, বলব—হঠাৎ রুমা লাফিয়ে উঠল। ...এই! একদম ভুলে গেছি। সোর্স অফ ইনফরমেশন জানতে চেও না—জামাইবাবুর সংগে তোমার দেখা হবে দুপুরবেলা—আলফাবিটাগামাতে! ...সে হেসে উঠল ফের।

চন্দন অবাক হবার ভান করে বলল, তাই নাকি? ...কিন্তু সেটা কোথায় বের করা দরকার যে!

আছে কোথাও। ...রুমা বলল। ...সামনে ওই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীটা দেখছ, ওখানে এক ভদ্রলোক জামাইবাবুর বন্ধু। ওঁকে জিগ্যেস করতে পারো। যাবে?

চন্দন ব্যস্তভাবে বলল, যাবো না আবার?

দুজনে এগিয়ে গেল। রাস্তার পর কিছু ফাঁকা জমি—তারপর গেটমতো। তারকাঁটার বেড়ায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে কতকগুলো মস্তো ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা বাস ধোওয়া হচ্ছে। এদিকে-ওদিকে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বা বসে জটলা করছে। একটা শান্ত সকালের যে স্তব্ধতা, তা খুব একটা ক্ষুণ্ন হচ্ছে না এইসব কাজে ও আলাপচারিতায়। ওরা গেটে ঢুকতে ঢুকতে দেখল একটা ট্রাক ব্যাক করা হচ্ছে এবং তার পিছনে দাঁড়িয়ে হাত দেখাচ্ছেন এক মোটাসোটা ভদ্রলোক। পরনে ধুতি আর ফুলশার্ট। সোনার বোতামগুলো চিকচিক করছে। আঙুলে অনেকগুলো আংটি-লাল পাথর বসানো। ভদ্রলোকের গায়ের রং বেশ ফরসা। গোঁফটা পুরু—সুচলো। কতকটা রানাপ্রতাপের মতো। মাথায় টেড়ি করা পরিপাটি কাঁচাপাকা চুল। রুমা বলল, ইনিই।

চন্দন একটু কেশে বলল, নমস্কার।

ভদ্রলোক মাথাটা সামান্য দোলালেন। তাঁর মনোযোগ ট্রাকটার দিকে বেশি। গাড়িটা ঠিক জায়গায় না পৌঁছনো অব্দি এদের আমল দেবেন না সম্ভবত। চন্দন ও রুমা মুখ অকারণ অকাতরে করে একটু হেসে নিল।

রোগা সিড়িঙে চেহারার খাকি পাতলুন আর খয়েরী হাওয়াইশার্টপরা একটি লোক ওপাশে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, অফিসে গিয়ে বসুন। এক্ষুনি এসে পড়ছেন বাবু।

ট্রাকগুলোর ভিতর দিয়ে কাদা বাঁচিয়ে দুজনে গিয়ে বারান্দায় উঠল। পাশাপাশি দুটো ঘর। খোলা ঘরটায় আপিস সম্ভবত। দুদিকে দুটো টেবিলে খাতা আর ফাইল-পত্তর রয়েছে। পেপারওয়েট আছে। কলম-দানী আছে। র‍্যাকেও অনেক খাতা ফাইল। মেঝেয় কালো তেলতেলে কী সব যান্ত্রিক পার্টস এলোমেলো ছড়ানো। চেয়ারের পিছনে, দেয়ালের কোণে, কয়েকটা টায়ার। তেলের টিন। দেয়ালের ক্যালেন্ডারে মা-কালী ও রামকৃষ্ণর ছবি। বড় বড় হরফে ছাপা রয়েছে : কমলা ট্রান্সপোর্ট কোং, রূপপুর চটি, মুর্শিদাবাদ। স্থাপিত—১৯৫৭। প্রোঃ শ্রীশিশিরকুমার চন্দ্র, শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র।

নতুন জায়গায় গিয়ে কারো জন্যে অপেক্ষা করতে হলে সেখানের সবকিছু খুঁটিয়ে না দেখে উপায় থাকে না। চন্দন প্রায় মুখস্থ করে ফেলল আগাগোড়া। এমনকি টেবিলের নিচে একটা তেল জবজবে মস্তো বল্টুটাও তার পুরো মনে এঁকে গেল। বল্টুটা দেখে তার খারাপ লাগছিল। কেন খারাপ লাগছিল, সে জানে না। মনে হচ্ছিল, ওটা পাশের কৌটোয় তুলে রাখলেই পারত। ধুতির পাড়ে কিংবা পায়ে কালি লেগে যেতে পারে। সে বলল, রুমা, তোমাকে উনি চেনেন না?

রুমা ঘাড় নাড়ল। পিছন থেকে সেই রোগা লোকটি বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন না। ওই তো চেয়ার রয়েছে।

যেন এইটে বলার অপেক্ষা ছিল, দুজনে বসল। রুমা চাপা গলায় বলল, দেখছ? এরা জিগ্যেসও করছে না—কোত্থেকে আসছি, কেন আসছি। ফেট! আমার খারাপ লাগছে। একেই জিগ্যেস করো না, কোথায় তোমার সেই কোম্পানীটা?

চন্দন বলল, সেও ঠিক। ...সে চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে বাইরের দিকে লোকটাকে খুঁজল। লোকটা আছে। বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে একমনে সিগ্রেট খাচ্ছে আর ফিকফিক করে চাপা হাসছে। ব্যাপার কী? পাগল নয়তো?

না, চন্দন দেখল, তার সামনে নিচে ট্রাকের তলায় একজন গদী বিছিয়ে চিৎপাত শুয়ে এঞ্জিনের নিচটায় কী খুটখাট করছে। তারই সঙ্গে চাপা গলায় রসিকতা করছে লোকটা। চন্দন ডাকল, দাদা শুনুন? লোকটা এগিয়ে এসে বলল, বাবু এক্ষুনি আসছেন।

চন্দন বলল, একটা ব্যাপারে আমরা এসেছি। এখানে আলফা ডিসট্রিবিউটারসটা কোথায় বলতে পারেন?

লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল, আলফা ডিসট্রিবিউটারস! নাঃ, তেমন কিছু তো এখানে নেই!

চন্দন বলল, সে কী! আমি কাগজে-

লোকটি চতুর হাসল। ...আজকাল কাগজে অমন কত কী লেখে। সে অন্য রূপপুর হবে। এটা রূপপুর চটি। সাঁইথের দিকে কিন্তু একটা রূপপুর আছে—ভালো জায়গা। বড় জায়গা। তা আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

চন্দন বলল, জিয়াগঞ্জ।

লোকটা সিগ্রেটটা জুতোর তলায় নিভিয়ে বলল, আমাদের এখানে জিয়াগঞ্জের এক ভদ্রলোক থাকেন। চেনেন নাকি? পরেশ মজুমদার?

চন্দন বলল, খুব চিনি। আমি তো তাঁর বাড়িতেই উঠেছি। আর ইনি—পরেশদার ইয়ে।

লোকটা কেন যেন ঝেঁঝে উঠল। .. পরেশবাবু বলতে পারলেন না ঠিকানাটা?

চন্দন রুমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। রুমার মুখে বিরক্তি ফেটে পড়ছে।

লোকটা চলে যেতে যেতে বলল, তাহলে বসুন। বাবু জানলেও জানতে পারেন—নানান জায়গায় চেনাজানা আছে ওনার।

রুমা বলল, ধুৎ! চলো, কেটে পড়ি।

চন্দন চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, পরেশদা বলেছেন—ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। কখন নিশ্চয়ই সেটা আশেপাশে কোথাও আছে' দুপুরের আগে খুঁজে বের করতেই হবে।

রুমা ভ্রু কুঁচকে একটা পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করতে থাকল।

চন্দন কতকটা স্বগতোক্তি করল, কী হেঁয়ালি! এ যেন কারো জীবন নিয়ে রসিকতা! শা—

শালা বলতে গিয়ে সে রুমার প্রতি শালীনতাবশত থামল, বাঘের গরগরে আওয়াজে প্রশ্নটা এসেছে বারান্দা থেকে—বলুন, কী চাই!

সেই গুঁফো ভদ্রলোক এসে নিজের জায়গায় বসলেন। তারপর রুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে চেনাচেনা মনে হচ্ছে...

রুমা মুখ নামিয়ে বলল, পরেশবাবু আমার জামাইবাবু।

ওঃ হো! ঠিক ঠিক। ...ভদ্রলোক অমায়িক হাসলেন। ...বেশ, বেশ। ভালো। আর এঁকে তো চিনতে পারলাম না?

চন্দন বলল, পরেশবাবু আমার দাদা বলতে পারেন। আমি জিয়াগঞ্জে থাকি। দেখুন, এখানে আলফা ডিসট্রিবিউটারস বলে..

ভদ্রলোক হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নতুন একটা কারবার হচ্ছে। এখনও চালু হয়নি—হতে চলেছে। জায়গাটা একটা সেন্টার কি না—চারদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। এসব এলাকার ব্যবসায়ীরা সেই দূরে বহরমপুরে সাঁইথে থেকে, নয়তো কলকাতা থেকে দোকানের মালপত্র আনে। কাজেই বুঝতে পারছেন, এমন একটা কনসার্ন এখানে থাকলে তাদের আর কষ্ট করতে হয় না। অর্ডার দিলেই যা যা দরকার ঘরে পৌঁছে দেবে কোম্পানী। অবিশ্যি স্পেশাল দুচারটে মালের সোল ডিস্ট্রিবিউটর এরা তো থাকবেই। যাকগে, শুনুন—আপনিই তাহলে পরেশবাবুর লোক। ঠিক আছে। আপনার স্বাস্থ্য চেহারা তো বেশ ভালই। এ্যাদ্দিন কী করতেন?

চন্দন সরল মনে বলল, তেমন কিছু না। চাকরিবাকরি তো পাইনি। ধরার লোক ছিল না। মাঝে কিছুদিন সাবরেজেস্টরী অফিসে ডিড-রাইটারের কাজ করেছি। তারপর একটা কাপড়ের দোকানে সেলস-ম্যান ছিলাম। মাইনেতে পোষাল না—ছেড়ে দিলাম। তারপর কিছুকাল ইলেক-ট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং পড়লাম। কাজও করলাম কিছু জায়গায়। সবখানেই ব্যর্থতা। পিছনে বড় ফ্যামিলির দায়িত্ব আছে। বুঝতেই পারছেন।

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। ...পরেশ-বাবুর জুড়ি তাহলে!...সুধা, অরে সুধা! শুনে যা দিকি।

কালিঝুলিমাখা প্যান্ট গেঞ্জী পরে একটি বছর-দশেকের ছেলে এসে দাঁড়াল।

চা এনে দে। বিস্কুট-টিস্কুট আনবি।

রুমা হন্তদন্ত বলল, না, না। আমার জন্যে চা-কা না।

খাবেন না? ঠিক আছে। সুধা, একটা চা।...ভদ্রলোক চন্দনের দিকে ঘুরে বললেন, আপনি এক কাজ করুন। বারোটার মধ্যে চলে আসুন। কোথায় আসতে হবে বলে দিচ্ছি। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা পুবের রাস্তায়—তার মানে যেটা কান্দী যাচ্ছে, সেদিকে কিছু দূর এগিয়ে বাঁয়ে দরগাডাঙা—মানে পীরের আস্তানা, ডাইনে ইটখোলা। ইটখোলার পরেই দেখবেন বোন-মিল কো-অপারেটিভ—তার ঠিক উল্টো-দিকে, মানে আপনার...

চন্দন বলল, বাঁদিকে তো?

হ্যাঁ—বাঁদিকে। পেট্রোলপাম্প আর গ্যারেজ। গ্যারেজে সোজা গিয়ে জিগ্যেস করবেন, বেচুবাবু কোথায় বসেন। ব্যস!

আপনার নামটা জানিনে স্যার?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—আমি শিশিরকুমার চন্দ্র।...

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে রুমা ফেটে পড়ল।...ওই লোকটাকে তুমি স্যার বললে?

চন্দন বলল, কেন? ক্ষতি কী? মনে হচ্ছে, উনিও কোম্পানীর একজন লোক। একটু তোয়াজ না করলে চলে? ওরা চির-দিন তোয়াজ পেতে অভ্যস্ত, ড.বে—এটাই নিয়ম। তাই—

রুমা বলল, পায়ের ধুলো নিলেও পারতে।

চন্দন একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, রুমা—এখনও তুমি সেই কচি বালিকাই আছো। মানুষ আজকাল কীভাবে বেঁচে আছে, তা তো টের পাও না। এই একটা চাকরি পেলে একটা ফ্যামিলিতে কী অসম্ভব কান্ড ঘটে যায়, তুমি ভাবতেও পারবে না।

রুমা শান্তভাবে বলল, দারিদ্র্যের সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে না শুনলেও চলবে। আমি শুধু বলছি, ওকে স্যার না বললেও চলত।

কী জানি! মুখ দিয়ে শালা বেরিয়ে গেল।...চন্দন হো হো করে হেসে উঠল।

শালা বেরোলে তো তোমাকে প্রণাম করে বসতাম। স্যার বেরোল কিনা।

চন্দন একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। নতুন আসা উত্তরহাওয়া চওড়া রাস্তা ভরিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ। রুমার চুলগুলো উড়ছে। মুখের সেই সরল লালিত্য কোথায় হারিয়ে ফেলেছে রুমা? গঙ্গার জলে ভিজে মুখ নিয়ে করুণ চোখে তাকানো সেই বালিকা এখনও মনের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। চাপল্য ছিল তখনও—কিন্তু সবই যেন ভিজে-ভিজে লাগত। এখন প্রখর আলোয় বড় খসখসে দেখাচ্ছে। রুক্ষ উদ্ধত প্রগলভ। অবশ্য আজ এটা সাজে রুমার। জামাইবাবুর সচ্ছলতার মধ্যে বেঁচে থেকে ওর কমনীয়তা নমনীয়তা—সবকিছু খুবই টানটান হয়ে উঠেছে। হয়তো বিয়েও হবে

কোন সচ্ছল সংসারে। তারপর রুমা আরও অনেক বাবে।

রুমা একটু এগিয়ে পড়েছিল। চন্দন খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। রুমা পিছিয়ে বলল, চাকরী যে হওয়াই—সে তো বুঝে গেছি। মনে হচ্ছে জামাইবাবুরই হাত আছে পিছনে। টেলিগ্রামটাও। কাজেই তুমি এখন এখানের বাসিন্দা হয়ে গেলে। ইস্ ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে চন্দনদা!

চন্দন বলল, কিসের আনন্দ?

রুমা হালকাভাবে জবাব দিল, কিসের আবার? আগের মতো—সেই যে জিয়াগঞ্জে যখন থাকতাম।

শরীর ব্যথা করলে পিঠে নাচানাচি করতে পারবে তো?

হুঁ-উ। ভার সইতে পারবে কিনা দ্যাখ আগে।

কিন্তু এখানে তো গঙ্গা নেই।

নেই—সেই তো বাঁচোয়া। দুহাতে তুলে আর সাঁতার কাটার সুরোদ তো নেই। আমার ওজন এখন কত জানো?

তোমার সব মনে আছে দেখছি, রুমা।

আছে—ছেলেবেলার কথা কেউ ভোলে? ...তবে চন্দনদা, আগের মতো পিকনিক এখানে করা যায়। ওদিকে একটা নদী আছে—ভারি চমৎকার। বেশ গাছপালা জঙ্গলও আছে। গত শীতে আমরা সব পিকনিক করে এলাম। সে কী আনন্দ!

চন্দন সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে বলল, শুধু আনন্দ নিয়েই বাঁচতে নেই—মাঝে মাঝে দুঃখের স্বাদ পাওয়া ভালো। তবে না আনন্দটা টের পাওয়া যায়।

রুমা ঝাঁঝাল স্বরে বলল, ফিলসফি রাখো বাবা! ফিলসফি মানে তো বুঝি, স্রেফ গোঁয়োমি।

একটা বাস সশব্দে চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। তার ওপর-পাশ—সবখানে গাদা-গাদা লোক। এ্যাসিস্ট্যান্টটা চেঁচাচ্ছে—নগর ইন্দ্রাণী সাঁকোর ঘাট। নগর ইন্দ্রাণী সাঁকোর ঘাট! দুহাতে মুখ ঢেকে তফাতে সরে গিয়েছিল রুমা। কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, কী দেখছ? ওদিকে যাবে নাকি? নগর ইন্দ্রাণী সাঁকোর ঘাট?

চন্দন ঘুরে পা বাড়াল।...না। এমনি দেখলাম। চলো।

কিছুক্ষণ নীরবতা। বাঁদিকে ব্লক আপিস আর কোয়ার্টার। একখানে গেটের মাথার ওপর লেখা আছে—রূপপুর উন্নয়নী। অনেক কৃষ্ণচূড়া গুলমোহরের গাছ। সুদৃশ্য ফুলবাগিচা। লন। তার ওপাশে হাসপাতাল। তারপর স্কুল। রানী সর্বানী হায়ার সেকেন্ডারী এ্যান্ড মালটি-পারপাস স্কুল। বোর্ডিং। এদিকটা বেশ সাজানো-গোছানো। পাঁচিলের গায়ে ঝাকড়-ঝাকড় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপ। একটা ড্রেন। ড্রেনে কে একজন পেচ্ছাপ করছিল। কাজ শেষ করে সে রাস্তায় এল। চন্দন তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। মুখোমুখি হতেই সে বলে উঠল, রাজেনবাবু! কী ব্যাপার? আপনি এখানে কোথায়?

ভদ্রলোক চন্দনের বয়সী। পরনে পরিষ্কার সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী। এক লাফে এগিয়ে এল সে।...আরে, আরে! কী কাণ্ড!

চন্দন বলল, কাল সন্ধ্যায় এসেছি। একটু কাজ আছে। আপনি এখানে কী করছেন?

আর বলবেন না। সেই মাস্টরী। স্রেফ ছেলেঠ্যাঙানি—থুড়ি! জিভ কেটে রাজেন বলল, আজকাল আর ছেলেদের ঠ্যাঙানো যায় না। মাস্টারদেরই ওরা ঠ্যাঙায়। আর বলবেন না। আছেন কেমন?

একরকম।...চন্দন বলল।...পরিচয় করিয়ে দিই। জিয়াগঞ্জের পরেশবাবুকে চিনতেন?

রাজেন ঘাড় নাড়ল।

পরেশদা আমাদের দাদা। এখানেই আছেন অনেকদিন। তাঁর শ্যালিকা।

রাজেন ভ্রূ কুঁচকে রুমাকে দেখে নিয়ে নমস্কার করল। রুমাও। রাজেন বলল, এখানের পরেশবাবুকে অবশ্যই চিনি—মানে জানি। পরিচয় নেই। ওঁকে কে না চেনে এখানে! যাকগে মরুক গে! কদিন আছেন? ওবেলা আসুন। বোর্ডিং-এ। আড্ডা দেওয়া যাবে।

চলে আসতে আসতে রুমা বলল, ব্যস, তাহলে একজন পুরনো সঙ্গী জুটে গেল। তোমার লাক্, চন্দনদা।

চন্দন বলল, জিয়াগঞ্জে মাস্টারি করতেন ভদ্রলোক। মাস্টার হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে খুব পপুলার ছিলেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে বনল না।

রুমা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।...এই! এখানের স্কুল ম্যাগাজিনে ওঁর একটা লেখা পড়েছি মনে হচ্ছে। বেশ ভালো লেখেন ভদ্রলোক।

চন্দন বলল, তাই নাকি! পদ্যটদ্য?

উঁহু—গপ্পো। খুব ভালো লেগে-ছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতে হবে তো!

বেশ তো।...চন্দন দাঁড়াল।...রুমা, এবার লেফ্ট টার্ণ। তাই না?

রুমা পা বাড়িয়ে বলল, ছোট্ট জায়গা—চিনতে ভুল হবে কেন? আমি যখন এলাম, তখন তো আরো এটুখানি ছিল। দেখতে দেখতে বেশ বেড়ে গেল। কী হল? এস!

যাই, বলে চন্দন তাকে অনুসরণ করল। সে দূরে জঙ্গলভরা দীঘির পাড়ে দরগার নিশানটা দেখতে পেয়েছিল। রিকশোওলা কী গল্প বলছিল—শোনা হয়নি। গল্পটা শুনতে ইচ্ছে করছে।

সেই ছোট্ট রাস্তা। দুপাশে ঝোপঝাড় গাছপালার ফাঁকে অনেক ঘরবাড়ি। আলোর ব্যবস্থা আছে। একটা বাড়ির সামনের জমিতে একটি মেয়ে গাইগরুর খুঁটি পুঁতছে। গরুটা লাফালাফি করছে। দুরমুশ তুলে তেড়ে যাচ্ছে মেয়েটি। রুমা ডাকল, কল্পনা, আজ কলেজ গেলে না যে!

মেয়েটি এদের দেখে একটু সলজ্জ হেসে ক্ষান্ত হল।...গেলাম না। তুমি?

আমি এক্ষুনি বেরোব।...রুমা এগিয়ে কী সব কথা বলতে থাকল ওকে, চন্দন শুনতে পাচ্ছিল না।

সে পরিবেশটা খুঁটিয়ে দেখছিল। কোন কোন বাড়ির সামনে পিছনে সবজী-ক্ষেত ফুলগাছ। নারকোল গাছও রয়েছে—তবে শ্রীহীন। বোঝা যায় এ-মাটি তাদের অনুকূল নয়। ওদিকে প্রকাণ্ড একটা বট-গাছের মাথায় রাজ্যের বক বসে আছে। একটা বিধ্বস্ত সেকেলে বাড়িও আছে ওখানে—হয়তো মসজিদ বা মন্দির ছিল কোনসময়। কিছু মাটির বাড়িও দেখা যাচ্ছিল। হয়তো ছোট্ট গ্রামগ্রাম ছিল। এখনও সেটা নিজের অস্তিত্ব হারায়নি। চারপাশে কেমন স্তব্ধতা—পাখির ডাক, গাভীর হাম্বা, বাছুরের গলায় ঘণ্টার শব্দ, কে-কাকে ডাকল, অল্প আলাপের আভাস এবং মাঝে মাঝে দূরের ট্রাকের গুড়গুড় আওয়াজ। হেমন্তের নীলধূসর আকাশ পেরিয়ে চলে গেছে বিজলী তার—বিশাল ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো। সেকালের বুনি-য়াদের ওপর একাল এসে চেপে বসছে ক্রমাগত। তাই কোথাও কোন সুষম বিন্যাস নেই—একটা লণ্ডভণ্ড ভাব সবখানে। ছেঁড়া কাপড় জড়ানো কাঠি-কাঠি গড়নের গ্রাম্য যুবতী মেয়ের আশেপাশে রুমারাও হেঁটে বেড়াচ্ছে।

তারপরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসছে ওদিকে একটি বাচ্চা মেয়ে—খালি গা, পরনে হাফপ্যান্ট। গলায় সরু চেন। পিঠে হাত রেখে দৌড়চ্ছে। দরজা থেকে তার মা একটা চেলাকাঠ ছুঁড়ে মারল। কাঠটা চন্দনের সামান্য দূরে পড়ল। তবু সপ্রতিভ ভঙ্গীতে মেয়েটি গটগট করে এসে কাঠটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। রুমা বলল, কী হল সবিতাদি? রাণু কাঁদছে কেন?

সবিতাদি একমনে যেন চন্দনকে দেখল। ঘোমটা টেনে গজগজ করতে করতে বাড়ি ঢুকল। রুমা এসে বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাড়ি ঢোক না।

চন্দন হাসল।...তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রুমা দরজায় কড়া নেড়ে বলল, কয়েকটা খবর নিলাম ওর কাছে। বুঝলে? সে ভারি মজার স্ক্যান্ডাল! বলব'খন।

চন্দন বলল, মেয়েদের ব্যাপারে আমার উৎসাহ নেই।

আজ্ঞে না। ছেলেদেরই।...

দরজা খুলে দিল লতু। রুমা তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, তোর মা উঠেছে?

লতু বললে, উঁহু। শুয়ে আছে। কী জানি, জ্বর, না গা-ব্যথা। কথা বলছে না।

রুমা আঁতকে উঠে বলল, সে কী রে! রান্না হচ্ছে তো? ও—গ্যাঁদা রাঁধছে! তাহলেই আজ কলেজ গেছি!...সে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

চন্দন থমকে দাঁড়িয়েছিল। সকালে চা-জলখাবার রুমাই দিয়েছিল। স্নেহবউদির নাকি শরীর খারাপ। সে একবার খোঁজ নেবে ভাবল—পা বাড়াল। কিন্তু রাতের কথা মনে পড়ায় সোজা বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

(ক্রমশঃ)

হারাপ্পায় প্রাপ্ত নর-কংকাল কি বলে?

যতীন্দ্র মোহন দত্ত

ভারতবর্ষের সিন্ধু-সভ্যতা বহু প্রাচীন। খৃঃ পূঃ ৩০০০ থেকে খৃঃ পূঃ ১৪০০ সাল অবধি পশ্চিম ভারতে বর্তমান ছিল। এই বিশাল ও ব্যাপক প্রাচীন সভ্যতার যুগ্ম রাজধানী বা প্রধান সহর ছিল হারাপ্পা ও মহেনজোদাড়ো। হারাপ্পার জনসংখ্যা ৩৭,০০০ ছিল বলিয়া মনে করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। মহেনজোদাড়োয় অপেক্ষাকৃত কম লোক ছিল—জনসংখ্যা ৩৩,৫০০ জন। ইং ১৯২১ সাল হইতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ হারাপ্পার বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালাইয়া বিভিন্ন সময়ের মোটমাট ২৬০টি নর-কংকাল আবিষ্কার করিয়াছেন। এইগুলি কলিকাতার যাদুঘরে যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। কংকালগুলি সবই এক যুগের নহে, পুরাতত্ত্ববিদরা ইহাদের ৫টি ভাগ করিয়াছেন। এই বিভাগগুলির নাম ইংরাজীতেই দিলাম, অনুবাদে ভুল-ভ্রান্তি আসিতে পারে।

অনুবাদে কিরূপ হাস্যকর ভুল-ভ্রান্তি হয় তাহার একটি উদাহরণ ডবলু এফ অলব্রাইটের আর্কিওলজি অফ প্যালেস্টাইন হইতে দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

> "I remember seeing in two independent English translations of German books the curious statement that ancient Egyptian barbers spent much of their time making the rounds in order to search for news. This attribution of the functions of a modern journalist to the ancient barber is based solely on confusion of German, **Kunden**, 'customers' with the same word in the sense of "news!" (P. 200)

আমাদের নাতি শম্ভু বাংলা ম্যাপে 'রাশ্যা' খুঁজিয়া পায় নাই। পরে তাহাকে দেখাইয়া দিলে বলিল, 'ও তো রুশিয়া'। হারাপ্পায় পুরাতত্ত্ববিদরা যে বিভাগ করিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাহাদের (এ), (বি) ইত্যাদি বলিব। যথাঃ—

Cemetry H. Stratum I	(A)
" Stratum II	(B)
Mound Area	(C)
Area G 289	(D)
Cemetry R 37	(E)

যে সকল নর-কংকাল হারাপ্পায় পাওয়া গিয়াছে নৃতত্ত্ববিদরা তাহা পুরুষের কি স্ত্রীলোকের বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, আর কোন বয়সের লোকের তাহাও নির্ধারণ করিয়াছেন। সর্বক্ষেত্রেই যে তাঁহারা নির্ধারণ করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে—শতকরা ২০টি ক্ষেত্রে তাঁহারা নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। নিম্নে তাঁহাদের নির্ধারণ ও অ-নির্ধারিতদের হিসাব দিলাম। যথাঃ—

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	অ-নির্ধারিত
(এ)	১১	২১	১৩
(বি)	১১	৯	৪
(সি)	৬	৬	৫
(ডি)	৯	৪	৪
(ই)	৩৮	৫৫	১৫
	৭৫	৯৫	৪১

—২১১

সাধারণতঃ জনসমাজে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান সমান, কখনও স্ত্রীলোকের অনুপাত কিছু বেশী, কখনও পুরুষের অনুপাত বেশী। যতদূর জানা যায় বাংলায় ইং ১৭৯০ নাগাদই স্ত্রীলোকের অনুপাত খুব কম ছিল, তাহার পর বাড়িতে বাড়িতে প্রথম আদমসুমারীর সময় ইং ১৮৭২ সালে পুরুষদের ছাড়াইয়া যায়। তাহার পর আবার কমিতেছে। বর্তমান ভারতে দেখা যায় যে যাহারা গম যব ইত্যাদি দানাশষ্য খায় তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত কম, আর যাহারা ভাত খায় তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত উহাদের অপেক্ষা বেশী, কোন কোন জায়গায় তাহাদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়েও বেশী।

হারাপ্পার লোকে গম, যব খাইত। গমের খোসা, যবের খোসা পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধুনদে আমাদের বাংলাদেশের 'খোকা ইলিসের' ন্যায় মাছ পাওয়া যায়। হারাপ্পায় যে সব মাছের কাঁটা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সিন্ধুনদের 'খোকা ইলিশের' কাঁটা। হারাপ্পার লোকে যখন গম যব খাইত তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অনুপাত কম হইবার কথা। কিন্তু হারাপ্পায় বিভিন্ন স্তরে বা যুগে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত এইরূপঃ—

	প্রতি ১,০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা
(এ)	১৯০৯
(বি)	৮১৮
(সি)	১০০০
(ডি)	৪৪০
(ই)	১৪৫০

সর্বস্তরকে একত্রীভূত করিলে (যদিও এইরূপ একত্রীভূত করা সম্ভব হইবে না) আমরা পাই প্রতি ১০০০ পুরুষে ১২৬৬টি স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোকের অনুপাত কম না হইয়া এত বেশী হইবার কারণ শহরের বাহির হইতে অনেক কুলিকামিন আসিয়াছিল। হারাপ্পা শহরের শস্যাগারে পাশেই গম বা যব গুঁড়াইবার পাকা ইঁট দিয়া গাঁথা বেদী পাওয়া যায়। এই পাকা সান বাঁধান স্থানে মুষল দিয়া পিটাইয়া আটা বা ময়দা তৈয়ারী হইত। দানা শস্য গুঁড়াইবার পদ্ধতির এইরূপ ক্রমবিকাশ হইয়াছে। প্রথমে উদূখল ও মুষল পরে শিল-নোড়া বা জাঁতা। তাহার পর ঢেঁকি। এখনও আদিবাসীদের মধ্যে উদূখলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। হিন্দুদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ-কার্যে, বৃষোৎসর্গের সময় এবং অন্যান্য ধর্মকার্যে চরু পাকের সময় যব গুঁড়া করিবার জন্য ছোট খেলাঘরের মুষল ও উদূখল ব্যবহৃত হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় এই ছোট মুষল ও উদূখল দিয়া গোটা-কতক যব গুঁড়া করিয়া চরুগুলিতে পাক করিবার পূর্বে দেন।

হারাপ্পায় সান বাঁধান স্থানে কাহারা গম বা যব গুঁড়া করিত? স্ত্রীলোক না পুরুষ? আমাদের দেশে কি জাঁতায়, কি ঢেঁকিতে মেয়েরাই শস্য গুঁড়া করে ও ধান ভানে। এখনও বাংলাদেশে কি ধানকলে, কি গৃহস্থবাড়িতে মেয়েরাই ধান সিদ্ধ করে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়। 'এলো' দেওয়া থেকে কুলা ঝাড়া পর্যন্ত সব কাজই মেয়েরা করে। শস্য গুঁড়ানো মেয়েদের কাজ, যেমন লাঙ্গল দেওয়া, জমিতে মই দেওয়া, ধান কাটা প্রভৃতি পুরুষের কাজ।

গর্ডন চাইল্ডের সুবিখ্যাত পুস্তক হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন হিস্ট্রি পাঠে জানা যায় যে মানুষ, আদিম মানুষ যখন শস্য বপন আরম্ভ করিল তখন মেয়েরাই বাড়ীর সংলগ্ন বা কাছাকাছি জমিতে খন্তা বা কাঠের কোদাল দিয়া হো কালটিভেশন করিত, শস্য কাটিত ও ঘরে তুলিত। তিনি লিখিয়াছেন যে—

> 'The plough changed farming from plot cultivation to agriculture (the tillage of fields), and welded indissolubly cultivation and stock-breeding. It relieved

women of the most exacting **drudgery**, **but** deprived them of **their monopoly** over the cereal **crops, and** the social status that **conferred**. Among barbarian **where** women normally hoe Plots **it is men** who plough fields. **And in even** the oldest **Sumerian and** Egyptian documents **the ploughmen** are really males". (p.81)

পুরুষরা যখন চাষ-বাস করিতে **লাগিল, তখন** মেয়েরা ইকোনমিক্যালি আন্-**এমপ্লয়েড হইয়া** পড়িল। মেয়েরা ধান **সিদ্ধ, ধান ভানা**, ঢেঁকিতে পাড় দিতে ও **কুলা ঝাড়িতে** লাগিল। নিজের গৃহস্থালীর **কাজ কতটুকু?** বাকী সময় তাহারা কি **করিবে?** মেয়েরা গতরে পুরুষের চেয়ে **কম খাটিতে** পারে। মুলহল তাঁহার **ডিকসনারী অফ** স্ট্যাটিসটিকস-এ বলিয়াছেন **যে কাজ পুরুষে** করিতে পারে মেয়েরা **তাহার** দুই-তৃতীয়াংশ কাজ পারে। **এ হিসাবে** মেয়েদের মজুরি কম।

এজন্য হারাপ্পা সরকার বা কর্তৃপক্ষের **পক্ষে গম বা যব** গুঁড়াইবার জন্য মেয়েদের **নিযুক্ত করা** স্বাভাবিক অল্পতর ব্যয়সাধ্য। **শুধু গম, যব** ভাঙ্গানো নয়, অন্যান্য কাজেও সরকার **বা গৃহস্থরা পুরুষদের** অপেক্ষা মেয়েদের **নিযুক্ত করিবেন।** হারাপ্পার মেয়েদের যে সংখ্যাধিক্য দেখা যায় তাহা **শহরের বাহির হইতে** রোজখাটা মজুরনীর **জন্য হইয়াছে** বলিয়া মনে করি।

শস্যাগারের নিকট শ্রমিকদের বাসের জন্য যে ১৪টি ঘর দেখিতে পাওয়া গেছে তাহা ২ কামরাযুক্ত বাড়ি। ১৬ ফুট—৪৮ ফুট। **২০টি গম বা যব** গুঁড়া করিবার রোয়াক **আবিষ্কৃত হইয়াছে।** বড় বড় কাঠের বল্লা দিয়া পিটাইয়া শস্য গুঁড়া করা হইত। এই বল্লা চালাইবার জন্য অন্ততপক্ষে সকালে ৪ জন ও বৈকালে ৪ জন ধরিলে ১৬০ জন কুলির দরকার। এক এক বাড়িতে ১০।১২ জন করিয়া থাকিত। ইহা কুলি লাইনের অনুরূপ—স্বামী পুত্র।

হারাপ্পায় যে সব অস্থি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগ বয়স নির্ণয় করিয়াছেন। সব ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণ সম্ভব হয় নাই। শিশুদের বেলায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নির্ণয় **করা যায়** নাই। দেখা যায় ২৬০টির মধ্যে তিন বছর অবধি শিশুদের সংখ্যা এইরূপঃ—

এ—২০, বি—০, সি—২, ডি—০ ই—০ মোট ২২টি। **স্ত্রী-পুরুষ লইয়া** 'ঘর' **অনেক ক্ষেত্রেই** নাই। তিনটি যুগে কোন **শিশু নাই। ইহার কারণ** কুলি খাটিতে আসিলে শিশু কোলে কুলি খাটা যায় না। আমরা শীতকালে যে সাঁওতালদের পিঠে ছেলে বাঁধিয়া কাজ করিতে দেখি, তাহা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়, পরিবারযুক্ত হইয়া বাস করে বলিয়া।

(এ) যুগে সাবালিকা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৯জন, আর শিশুর সংখ্যা ২০টি—প্রত্যেকের গড়ে ১টি করিয়া ছেলে,

(বি) যুগে ৮টি সাবালিকার মধ্যে কোথাও শিশু নাই

(সি) যুগে ৬টি সাবালিকার মধ্যে ২টি শিশু, গড়ে ৩ জনের ভাগে একটি শিশু পড়ে

(ডি) যুগে ৪ জনের মধ্যে একটিও শিশু নাই।

(ই) যুগে ৫৫জনের মধ্যে একটিও শিশু নাই।

এজন্য বলা যায় যে বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেই কুলি-খাটিতে আসিয়াছিল।

স্বামী পুত্র লইয়া ঘর করিবার ব্যবস্থা নাই। Stuart Piggot তাঁহার Pre-Historic India পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—

> "The whole area in which these coolien lives stood is, in Wheelers' words marshalled like a military cantonment and bespeaks authority"

*

> It is inevitable that one should mention slave-labour when describing this piece of planned economy; the standardized little houses in dreary rows, the great State Granary, the municipal flour-mills".

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরিলে মাথার খুলিতে ও হাড়ে একরকম দাগ পড়ে। এই দাগ হারাপ্পায় প্রাপ্ত অস্থিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য মনে হয় সে যুগে হারাপ্পার ম্যালেরিয়া ছিল। এদেশে তাহা হইলে ম্যালেরিয়া অন্ততঃ প্রায় চার সাড়ে চার হাজার বছর আছে। প্রাচীন ভারতে যে ম্যালেরিয়া ছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুরাণাদি পাঠে জানা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ রাজার কন্যা উষাকে গোপনে বিবাহ করিলে বাণ রাজা অনিরুদ্ধকে আটকাইয়া রাখেন। নাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ অক্ষৌহিনী সেনা লইয়া বাণ রাজাকে আক্রমণ করেন। বাণ রাজার রাজধানী দিনাজপুর জেলায়। যাদব সৈন্যগণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আছে। দিনাজপুর জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশী। বাদসাহ আকবরের সময়েও জ্বরের উৎপাত খুব বেশী। পুরাণের গল্প সত্য হওয়া সম্ভব।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রেমের বেতন মৃত্যু

সুরসিক এবং উদারমতাবলম্বী বলে ফরাসী জাতির খ্যাতি আছে। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯-এর একটি বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনী ফরাসী জাতির ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির বিচিত্র নিদর্শন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কুখ্যাত 'ড্রেফাস স্ক্যাণ্ডালে'র মত।

এ-কাহিনী মার্সাই শহরের এক শান্তি-ময়ী অধ্যাপিকার বিস্ময়কর প্রেমকাহিনী। আনারকলির বেদনাদায়ক প্রেমকাহিনীর সঙ্গে মার্সাই-এর গ্যাব্রিয়েল রুসিয়ের অভূতপূর্ব আত্মাহুতি প্রায় সমপর্যায়ের।

গ্যাব্রিয়েলের বয়স ত্রিশ আর তাঁর ছাত্র ক্রিশ্চিয়ান রোসীর বয়স মাত্র ষোলো। ত্রিশ আর ষোলোর প্রেম গোঁড়া সমাজের চক্ষে এক কলঙ্কিত ব্যাপার। ফরাসী সমাজের কানাকানি ফিসফিসানির কেচ্ছাকাহিনী একটা কলঙ্কজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ফরাসী আইনে পনের বছর বয়সের মেয়ে তার পিতার অনুমতি নিয়ে বিবাহ করতে পারে কিন্তু আঠারো বছরের কম বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে ফরাসী রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্টের অনুমতি চাই। সুতরাং ভ্রুকুটিকুটিল রক্ষণশীল ফরাসী সমাজের ভ্রুকুটির ফলে গ্যাব্রিয়েলের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল।

গ্যাব্রিয়েলের ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনা নিয়ে ফরাসী সমাজ যেভাবে মেতে উঠেছিল, তার ফলে মনে হতে পারে যে, জনজীবনের যৌন বা ব্যক্তিগত রুচির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আদালতের এক্তিয়ারে ব্যক্তিজীবনের এমন এক সূক্ষ্ম দিক কিভাবে বিচার্য হতে পারে এমন প্রশ্নও উঠেছে। এই দিনগুলি গ্যাব্রিয়েলের জীবনের নিদারুণ দুঃস্বপ্নের। দায়িত্বজ্ঞানহীন কেচ্ছারটনার ফলে গ্যাব্রিয়েলকে মেনটাল হসপিটালে পাঠানো হল। দুবার ধরে তাঁর বিচার হল। গ্যাব্রিয়েল কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লেন। চরম দুর্দশার মধ্যে তাঁর জীবনের সকল কামনাবাসনার অবসান ঘটল।

আইনের কবলে পড়ে গ্যাব্রিয়েল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেন। বুদ্ধিমতী ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপিকা গ্যাব্রিয়েল একটি লাল রঙের সিত্রোঁ মোটরকার চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর গাড়ির কাঁচের গায়ে সাঁটা ছিল 'মেক লভ, নট ওয়ার'। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষকটি দিন কাটল রেফ্রিজারেটরের পাশে চুপচাপ বসে।

গ্যাব্রিয়েল জেল থেকে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিগুলি এবং রেমণ্ড জাঁ লিখিত ভূমিকা মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন থিসিয়ান ব্যুলেনজার এবং পরিচারিকা লিখেছেন ক্যানাডার মিস্ মেভিস গ্যালাণ্ট। 'দি এফেয়ার অফ্ গ্যাব্রিয়েল রুসিয়ের' এ-কালের এক চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ।

গ্যাব্রিয়েলের এই চিঠিগুলি পড়তে বসে বেদনায় সহৃদয় পাঠকের চিত্ত আকুল হয়ে উঠবে। ১৯৬৮-৬৯-র এই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি গ্যাব্রিয়েলের জীবনে নেমে এসেছিল অভিশাপের মতো। গ্যাব্রিয়েল প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন এবং শেষপর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে আত্মবলি দেন।

'লেটারস্ অব গ্যাব্রিয়েল' ফরাসী সমাজের এই রসাল কেচ্ছাকাহিনীর অন্তরালের বিচিত্ররূপিণী নারীর মনের গভীরে প্রবেশের একটা সুযোগ করে দিয়েছে। গ্রন্থশেষে উদ্ধৃত একখানি চিঠিতে গ্যাব্রিয়েল লিখেছেন—

'Only one tactic—to reduce the story to what it was, that is to say nothing. My story is getting the whole world excited. It must be cutdown to size, deglamourised'.

ছাত্র ক্রিশ্চিয়ান রোসীর সঙ্গে গ্যাব্রিয়েলের প্রেমের ব্যাপারটি নিয়ে ফরাসী সমাজ কুৎসা রটনা করেছে ১৯৬৯-এ গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যুর পর পর্যন্ত কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশী বলতে পারেনি।

গ্যাব্রিয়েলের মামলা নিয়ে ফরাসী সমাজে দুটি বিভিন্ন দল গড়ে উঠল। প্রতিটি পরিবারের মধ্যেই দুটো দল হয়ে গেল, বুড়োরা চায়—গ্যাব্রিয়েলের শাস্তি, আইনমাফিক শাস্তি হোক তার, যে একটা নাবালক ছেলেকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। আর তরুণ দল সবাই গ্যাব্রিয়েলের স্বপক্ষে।

এই সময় ফ্রান্সে একটা প্রচণ্ড ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ১৯৬৮-র এই ছাত্রআন্দোলনকে ফ্রান্সের প্রচলিত ধারা এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে তরুণের বিদ্রোহ বলা যায়। মেকী ফরাসীসংস্কৃতির ভণ্ডামির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা ছিল তরুণ বিদ্রোহীদের লক্ষ্য। মিস্ গ্যাব্রিয়েল রুসিয়ের এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনেকে মনে করেন সম্ভবতঃ তরুণদের অভিযানে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল মিস্ গ্যাব্রিয়েল রুসিয়েরের। গ্যাব্রিয়েলকে ধ্বংস করার চক্রান্ত হয়ত সেই কারণেই বেশ ভেবেচিন্তে করা হয়েছিল। মিস্ রুসিয়ের বিশেষ প্রভাবশালী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ রমণী। তাঁর চরিত্রের এই গুণটিও তার বিপক্ষে গেছে। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন সাধারণ মেয়ে হলে হয়ত তাঁকে উপেক্ষা করা হত। মামলা চলার সময়

সরকার পক্ষের সহকারী উকীল বলেছিলেন—

'If she had been a hairdresser or if she had slept with a young apprentice, it would have been different".

এই উক্তির দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বলেই গ্যাব্রিয়েলের অপরাধের গুরুত্বটা সরকারের চোখে এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। নইলে গ্যাব্রিয়েলের মত একজন 'AGREGEE' -কে এমনভাবে ধ্বংস করা হত না। ('এগ্রিগি'—পাঠক্রমের এক উচ্চ সম্মানসূচক অভিধা। পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে ছাত্রের সবরকম জ্ঞান থাকলে তাকে 'এগ্রিগি' বলা হয়।) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত স্নাতক হিসাবে গ্যাব্রিয়েলের খ্যাতি ছিল।

এই কারণে মিস গ্যালান্ট প্রশ্ন করেছেন—

'How could they arrest a University graduate, a professor, an AGREGEE and give her the same treatment as an illiterate and poor person?'

ফরাসী আইন অনেক দিক থেকে বিচিত্র। বিচারকালে বিচারাধীন আসামীকে নিবারণমূলক আটক রাখার ব্যবস্থা আছে। এই আইনবলে গ্যাব্রিয়েলকে দু মাস আটক রাখা হয়েছিল। এই সময় গ্যাব্রিয়েলের কিশোর-প্রেমিক বারবার বাড়ি থেকে পালিয়েছে; স্কুল থেকে পালিয়েছে, স্কুল থেকে উধাও হয়েছে এমনকি মনোবিজ্ঞানীর ক্লিনিকেও তাকে আটক রাখা যায় নি। মিস গ্যালান্ট বলেছেন যে মিস গ্যাব্রিয়েলকে প্রথমবার বিচারের কালে আটক রাখার এটিও হয়ত অন্যতম কারণ।

মিস গ্যালান্ট মনে করেন গ্যাব্রিয়েল যদি নারী না হয়ে পুরুষ হতেন তাহলে হয়ত কোনো মামলাই উঠতো না এবং হৈ-চৈ হত না এতটুও—

'It's doubtful if the case would have become a Cause Celebre. Miss Russier was charged with causing a minor to leave home. When a Dean of University faculty seduced a girl of 17 'diviating a minor' was never mentioned'.

এই গ্রন্থের তিনটি ভাগ তথ্য এবং চাঞ্চল্যকর নানাবিধ ঘটনার বিবরণে পরিপূর্ণ। সহজেই বোঝা যায় কেন ফরাসীরা ১৯৬৮-র গ্রীষ্মকালে যখন গ্যাব্রিয়েল আর ক্রিশ্চিয়ান রোসীর প্রেমলীলার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন থেকে ১৯৬৯-তে গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনো ঘটনা নিয়ে এত মাথা ঘামায় নি। ফরাসীসমাজে গ্যাব্রিয়েলের কলঙ্ককাহিনী একমাত্র মুখরোচক আলোচনা হয়ে উঠেছিল। সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি এবং প্রেমের মধুর ও পবিত্র দিকটির কথা কারো মনে হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে, এই ক্ষেত্রে অসম প্রেমের নিদারুণ অভিশাপ একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণোচ্ছল তরুণীর জীবনদীপ অকালে নিভিয়ে দিয়েছে। নিষ্ঠুর বিচারের প্রহসন মিস গ্যালান্টের তীক্ষ্ম মন্তব্য ও যুক্তিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যুসংবাদ যখন রক্ষণশীল প্রেসিডেন্ট পম্পিদ্যুর কাছে পৌঁছাল তখন তিনি কমন মার্কেট এবং ইস্রায়েল বিষয়ে একটি প্রেস কনফারেন্সে বসেছিলেন। সাংবাদিকরা তাঁকে এই মামলা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি আবেগভরে পল এলুয়ারের একটি কবিতার প্রথম লাইন আবৃত্তি করেন—

'My remorse, dead for having been loved'.

ফরাসী জাতির রাষ্ট্রপ্রধান কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

মিস গ্যালান্ট ফরাসী আইনকানুন এবং বিচারপদ্ধতির কয়েকটি বিচিত্র দিক উল্লেখ করেছেন। কোনো রমনী ত্রিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত জন্মনিরোধ বিষয়ে আইনতঃ কোনো উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন না। ফরাসী আইনে 'নট গিলটি' এই অজুহাতের কোনো অবকাশ নেই। যতক্ষণ না নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ আসামীকে একজন অপরাধী বলে ধরতে হবে।

এই মামলার সময় জর্জেস পম্পিদ্যু সবেমাত্র নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ফরাসী আইনানুসারে বারো মাসের চেয়ে কম দণ্ডপ্রাপ্ত সকল আসামীকে মুক্তি দিতে হয়। একদিন বিচারের পর গ্যাব্রিয়েলের এক বছর কারাদণ্ড হল এবং কিছু অর্থদণ্ড হল। এই সরকারী অব্যাহতি বা এমনেস্টির বলে গ্যাব্রিয়েলের মুক্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু ফরাসী জাতির রাষ্ট্রপ্রধান কবিতার উদ্ধৃতি অতি দ্রুতগতিতে অর্থাৎ দণ্ডাদেশ প্রদানের ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই সরকারী উকীল বললেন তিনি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেছেন। তিনি বলেন—আমি নির্দেশ পেয়েছি।

এই নির্দেশ কোথা থেকে এল—মিনিস্ট্রি অব ন্যাশনাল এডুকেশন গ্যাব্রিয়েলকে খতম করার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিল। সেদিনই গ্যাব্রিয়েল আত্মহত্যা করলেন।

এই গ্রন্থটির মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানের চরিত্রে বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি, তার কম্যুনিস্ট পিতা-মাতা (দুজনেই অধ্যাপনা করেন) যে বুর্জোয়া আইনযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে গ্যাব্রিয়েলকে খতম করেছেন তার জন্য মিস গ্যালান্ট তাঁদের নিন্দা করেছেন। গ্যাব্রিয়েল একটি চিঠিতে লিখেছেন—

'When I am in Jail Christian's parents will see how much I love him'.

বাইবেলের ভাষায় 'পাপের বেতন মৃত্যু'। একালের এই বিচিত্র প্রেমকাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয় প্রেমের বেতন মৃত্যু।

—অভয়ঙ্কর

THE AFFAIR OF GABRIELLE RUSSIER: Preface by Raymond Jean. Introduction By — Mavis Gallant: Translated from French By Ghisiaine Boulanger: Published By: A Knopf Price 5.95 Dollars,

নতুন বই

জীবনপথের দুধারে (স্মৃতিচারণ)—জ্ঞানেন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়। দুর্গারাণী মুখার্জি। ৮।৫৫ ফার্ণ রোড। কলিঃ—১৯। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থের লেখক দীর্ঘদিন বাংলার বাইরে কর্মসূত্রে বাস করেছেন। তাঁর কৈশোরের ও যৌবনের সোনালি দিনগুলির কথা তিনি নানাভাবে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, আর সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাংশকে তিনি পাঁচফুলের মালার মত একসূত্রে গেঁথেছেন। বাংলার এক বিদগ্ধ পরিবারে লেখকের জন্ম, তিনি অর্ধশতাব্দীর পরিবর্তনশীল বাংলাকে স্বচক্ষে দেখেছেন, দেখেছেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। ইংরেজ আমল, দেশীয় রাজন্যবর্গের বদান্যতা এবং বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্য সব কিছুই লেখকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এই পরিবর্তিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাঙালী সমাজ কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'জীবনপথের দুধারে' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থটিকে এক হিসাবে 'ডকুমেন্টারী' বলা যায়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

'It is interesting to find how, inspite of the changing pattern of society, the old values still obtain and they have a potency in guiding and motivating life".

গ্রন্থটি সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত। একজন বাঙালীর পারিবারিক আত্মজীবনীর সঙ্গে বাংলার সমাজজীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস একই সঙ্গে জড়িত, লেখকের রচনাকুশলতায় তা সার্থক হয়ে উঠেছে।

ছোটদের লেনিন, (জীবনী) — রত্নাকর। ডানপিটেদের আসর প্রকাশনী। জলপাইগুড়ি। পঁচাত্তর পয়সা।

জলপাইগুড়ির সুখ্যাত কিশোর সংস্থা 'ডানপিটেদের আসর'-সংগঠক-পরিচালক হিসেবে 'রত্নাকর' খ্যাতনামা লেখক হিসেবেও নেহাৎ কম যান না, তার প্রমাণ ছোটদের জন্যে গল্পচ্ছলে সুন্দর করে সহজ ভাষায় লেখা আলোচ্য বইটি। শিশুদের উপযোগী করে বড় হরফে লেখা বইটির ছাপাও সুন্দর। বিস্তর ছবি থাকায় বইটির আকর্ষণ আরো বেড়েছে।

প্রাপ্তিস্বীকার

মধুরম (পাক্ষিক)—সুভাশিস ত্রিপাঠি। শৈলজা ভবন, মুগবেড়িয়া, মেদিনীপুর। পঁচাত্তর পয়সা।

সপ্তর্ষি (সাহিত্য পত্রিকা)—সম্পাদক: দিলীপকান্তি লস্কর। শিলচর—১, আসাম। একটাকা।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ১৬ ॥

সেদিন কমলাক্ষ শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি ফিরল বটে কিন্তু হেমন্তর অশান্তি ও দুশ্চিন্তার সীমা রইল না।

এ-চিন্তা তার নিজেকে নিয়েই। নিজের ওপর যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সে। কী করে বসবে, কতদূর কি করতে পারে—সে-কথা আজ আর সে নিজের সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে বলতে পারে না।

আরও চিন্তা তার কমলাক্ষর জন্যও।

পূর্ণবাবুর এই মিথ্যা কথার পিছনে যে মনোভাব কাজ করছে তা পুরো স্বরূপটা এখনও প্রকাশ পায়নি—কতদূর যাবে তাও জানা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বেশ জানে হেমন্ত, কমলাক্ষ যদি এখানে আসা বন্ধ না করে—অন্তত না কমায়—তাহলে শিগগিরই ও'র প্রচণ্ড বিরূপতার সামনে পড়তে হবে. শত্রু হয়ে উঠবেন উনি।

ভালই হয়েছিল. পূর্ণবাবু হয়ত ভালই করেছিলেন—ওকে এখানে আসতে নিষেধ করে। দুঃখ পাচ্ছিল ঠিকই—কিন্তু অল্পবয়সের এ দুঃখ দুদিনেই ভুলে যেত—নিজের নিরাপদ জীবনবৃত্তে আবর্তিত হত আবার, নিজস্ব জগতে সুখে বাস করত। পূর্ণবাবুর প্রীতিভাজন হয়ে থাকলে আরও উন্নতি হত দিন দিন।

ভাল দুজনেরই হত। হেমন্তও নিজের মতো নিজের কাজ নিয়ে থাকত—কোন অশান্তি বা আশঙ্কা ভোগ করতে হত না। ...খুবই ভুল করল হয়ত কমলাক্ষর ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে। সবচেয়ে ভুল এই ভাবে ডেকে পাঠানোটাই। অকারণেই এসেছিল—পরের গরজে, গরজ ফুরোতে চলে যাবে—এইটেই সঙ্গত। দুদিনের পরিচয় দুদিনেই ভুলে যেত। মিছিমিছি সাধ করে এই অশান্তি ডেকে আনার কোন দরকার ছিল না।

ভাল হবে না, এতে ওর ভাল হবে না—তা ওর অন্তর্যামীই বলছেন। সাবধান করে দিচ্ছেন বারবার। অনেক দুঃখের পর, অনেক নৈরাশ্যের কুয়াশা কাটিয়ে ওর দিশাহারা নোঙর ছেঁড়া ভাগ্যের নৌকা এতদিনে একটু কূলের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে—আবার ইচ্ছে করে বুঝি অকূলের দিকে সে নৌকোর মুখ ফেরাল সে।

অনেক ভাবল। পূর্ণবাবু এসে ওর শুকনো মুখের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। বাজে ওজর দিয়ে কাটিয়ে দিল, শেষে বলল মাথা ধরেছে। পূর্ণবাবুকে বলা গেল না কমলাক্ষের কথাটা, কেন বলতে পারল না, সেও সারাক্ষণ একটা অশান্তি, বলবে কি বলবে না—মনে মনে এই চিন্তায় ক্ষত-বিক্ষত হওয়া; বললেও কীভাবে বলবে তাই নিয়ে তোলপাড়; তার মধ্যেই নিজেকে ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন— কেন গোপন করতে চাইছে, কেন বা সংবাদটায় মিথ্যের প্রলেপ দিয়ে সুসহ করে তুলতে চাইছে—তবে কি কোন অন্যায় আছে এর মধ্যে?—শেষ পর্যন্ত বলা হল না। 'সন্ধ্যাটা বৃথা গেল।' এইরকম একটা মনোভাব নিয়ে পূর্ণবাবু সকাল সকাল চলে গেলেন।

তারপরও দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে ভাবল।

এখনও হয়ত সময় আছে নিবৃত্ত হওয়ার। কিছুই না, এমন কোন বন্ধন নয়। ওর মনের দিক থেকে কোন খারাপ আকর্ষণ কিছু নয়—দোষের কোন কারণ দেখতে পাচ্ছে না। ছেলেমানুষ, ভাল লেগেছে—এমনিই একটা ঝোঁক এসেছে তাই ছুটে ছুটে আসে, আবার দুদিন পরেই হয়ত এ ঝোঁক কেটে যাবে। তার জন্যে মিছিমিছি—দুজনেরই উপকারী অভিভাবকস্থানীয় একটা লোককে ক্ষুব্ধ—হয়ত বা বিক্ষুব্ধও—করবার দরকার কি? এক কথাতেই এ অশান্তির শেষ করে দেওয়া যায়। ডেকে পাশে বসিয়ে মিষ্টি কথায় বললেই হল, আগে বলিনি, এখন বলছি—তোমার আমার ভালর জন্যেই বলছি— তুমি আর এসো না ভাই, লক্ষ্মীটি! যদি কখনও আসা দরকার মনে করো, কিম্বা আমারই কোন বিপদ-আপদ ঘটে—খবর দিই, সে আলাদা কথা—নইলে মিছিমিছি, তোমার মাস্টারমশাই যখন পছন্দ করছেন না, আর এসে দরকার নেই! লক্ষ্মীছেলে কিছু মনে করো না।'

বলা যায় বৈকি, এখনই বলা যায়। আর তাতে ওরই দুঃখটা অত দুঃসহ বোধ হবে না।

কিন্তু, হতাশভাবেই স্বীকার করল সে, নিজের মনের কাছে—একথা সে বলতে পারবে না। অর্থাৎ বলতে চায় না। ঐ ছেলেটার আসার গরজ তার যতখানি—ওর তা থেকে কিছুমাত্র কম নয়। তার ঐ উৎসাহপ্রদীপ্ত উপস্থিতি ওর অন্ধকার জীবনে—এতদিনের অপরিসীম দুঃখ ও ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মনে—যেন ক্ষণকালের জন্য আশা ও আনন্দের একটা আলো নিয়ে আসে, রুদ্ধ জীবনে আনে এক চপল সুগন্ধবহ দক্ষিণা বাতাস। শুধু এই—আর কিছু নয়, তবু সেটা এতই দুর্লভ ওর এতদিনের জীবনে যে এটুকুও হারাতে রাজী নয় সে। ঐ তরুণের মুগ্ধ চোখের চাহনিতে নেশা লেগেছে ওর, যে নেশার ঘোরে নিজের মূল্যের একটা অস্পষ্ট আভাস পায়—এখনও স্বপ্নের আমেজ লাগে কল্পনায়। এই কদিনে সে নেশা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ছাড়া হয়ত অসম্ভব নয়—ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কেনই বা ছাড়বে, এইটুকুতে আর কি ক্ষতি, এই কথাই মনে মনে প্রশ্ন করছে শুধু বারবার।

তবু—পূর্ণবাবুকে কমলাক্ষকে ডেকে পাঠানোর কথা বা তার আসবার কথা বলতে পারল না। সেদিনও না, পরের দিনও না।

নিজেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করত, কমলাক্ষর প্রসঙ্গ উঠলে সে কেমন সু-কৌশলে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। পাছে পূর্ণবাবু কোন দিন সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসেন, 'সে ছোকরা এখনও আসে নাকি এখানে?' প্রশ্ন করলে একেবারে খাড়া মিথ্যে কথাটা বলা যাবে না। বলা উচিত নয়। মিথ্যা বলতে হয় সত্যের একটা আড়াল রেখে। নির্ভেজাল মিথ্যে—বিপজ্জনক তো বটেই—অপমান-করও। ধরা না পড়লেও অপমান, নিজের আত্মসম্মানের কাছে।

কমলাক্ষ নিয়মিতভাবে আসতে শুরু করল আবার।

অবশ্য সব দিন যে দেখা হত তা নয়—কারণ তার অবসরের সঙ্গে ওর অবসর মিলত না সব সময়। দুজনেরই সময় এক রকম পরের কাছে বাঁধা। তেমন দিনে দুবার—কোনদিন বা তিনবারও আসত খোঁজ করতে। তবে যখনই আসুক, সন্ধ্যা-বেলায় কখনও আসত না। রাতে সাড়ে নটার আগে নয়। অর্থাৎ পূর্ণবাবুর থাকার সময়টা—সাধারণত সাড়ে ছটা সাতটা থেকে নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত থাকতেন তিনি, অবশ্য হেমন্ত বাড়ি থাকলে—পরিহার করে চলত। তেমনি রাত দশটার পরও আর কোন দিন আসে নি। হেমন্ত তা লক্ষ্য করে দু-একদিন বলেওছে, 'ছেলের রাগ এখনও যায় নি দেখছি। কী বলেছিলুম একটু—তাই আর কোন দিন বেশী রাতে এসো না—না?...অন্তত একদিন এসো অমনি দমকা—রাত এগারোটা-বারোটায়—তবে বুঝব যে তুমি কিছু মনে করো নি।'

কমলাক্ষ জিভ কেটে বলেছে, 'না না, ছিঃ! কী বলছেন! রাগ নয়।...এত দিনে একটু জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে তাই বলুন। সত্যিই ও রকম আসা উচিত নয়। মাস্টার-মশাই ঠিকই বলেছেন কিন্তু কথাটা—অমন অসময়ে এলে সকলের কাছেই দৃষ্টিকটু লাগবে। খুবই অন্যায় হয়েছিল।'

একটা কথা হেমন্ত লক্ষ্য করেছিল এর মধ্যেই—সে যে এইভাবে আসে—নিয়মিত প্রায়—তা কমলাক্ষও পূর্ণবাবুকে বলে নি। হেমন্ত জিজ্ঞাসা করে নি, তবে এটা ঠিক জানে যে, পূর্ণবাবু টের পেলে সে প্রসঙ্গ তুলতেন নিশ্চয়ই, বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। অন্য কোন পথ ধরতেন কমলাক্ষর এ বাড়িতে আসা বন্ধ করবার।...এটা খারাপও লাগে হেমন্তর, কেন লাগে তা সে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবে না কাউকে—মনে মনে কেমন যেন একটু শঙ্কাও বোধ করে—অজানা, অবর্ণনীয় একটা সামান্য আশঙ্কা। নিজের ভবিষ্যৎ, ঐ ছেলেটারও ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। অত সরল, অত উজ্জ্বল, নিষ্পাপ এক তরুণের এই আপাত-অকারণ মিথ্যাচরণটাই খারাপ লাগে। সে-ই কি এ জন্যে দায়ী—হেমন্তই? ওর মধ্যেই কি পাপ এক পাপ, সর্বনাশের বীজ আছে বাসা বেঁধে, ওর সংস্পর্শে যে আসবে তারই ছোঁয়া লাগবে সে পাপের? ওর শাশুড়ি ওকে ডাইনী বলতেন, পিশাচী বলতেন—ও-ই নাকি তাঁর ছেলেকে চুষে খেয়েছে; কে জানে তার কতটা সত্যি, কিছু সত্যি আছে কিনা!

পূর্ণবাবুর বাগানবাড়ি বহু দূরে। বালিগঞ্জ নাম—কিন্তু বালিগঞ্জ বলতে যা বোঝায় তার একেবারে এক প্রান্তে, মনোহর পুকুরের রাস্তা দিয়ে গিয়ে সেই এক রেল লাইনের ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নিবান্দা অর্থাৎ নির্বান্ধব পুরী যাকে বলে। আশে পাশে দূরে দূরে দু-একঘর লোকের বসতি, তার মধ্যে পাকা বাড়ি নেই বললেই হয়—ছাদে উঠলে বহুদূরে দূরে এক-আধখানা কোঠাবাড়ি নজরে পড়ে। তাও উত্তরপুর দিকে যা কয়েকটা—কাঁকুলিয়া না কি বলে গ্রাম একটা—সেখানেই যা দু-এক ঘর ভদ্রগৃহস্থের বাস। দক্ষিণে নতুন যে রেল লাইন পাতা হচ্ছে কালিঘাটের দিকে—তার ওপারেও নাকি ভদ্রলোকের বসতি আছে সব, ঢাকুরে, গড়ে—সব গ্রাম, কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় না, সেখানকার বাড়িঘরও দেখা যায় না এখান থেকে।

এত দূরে—এই বলতে গেলে গভীর অরণ্যের মধ্যে জমি কেনার মানে কি জিজ্ঞাসা করলে পূর্ণবাবু হাসেন। বলেন, 'হবে। দেখো এককালে এই দিকেই শহর সরে আসবে। তখন এই চার পাশে বড় বড় অট্টালিকা বাড়ি উঠবে—এই পাঁচ বিঘে জমি কিনেছি পাঁচ শ টাকায়—যদি বেঁচে থাকো এই জমির দাম একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠবে। ভাবছ গালগপ্প—আমি বলছি, তুমিই দেখে যাবে সে দাম।'

'কিন্তু এখন এখানে থাকো কি করে?' প্রশ্ন করেছিল হেমন্ত।

তার পাড়াগাঁয়েই শ্বশুরবাড়ি ছিল, কিন্তু সে এরকম বিজন বন নয়। আশেপাশে অনেকের বাড়ি, লোকজনের কথাবার্তা, এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে বসে কথা স্পষ্ট না শোনা যাক, গলার আওয়াজ একটা পাওয়া যেত, রাত্রেও একা পুকুর-ঘাটে যেতে ভয় করত না। এখানে দোতলাতেও ঘর থেকে বারান্দায়—বেরুনো যায় না, গা ছমছম করে। চারিদিকে—যাকে কেতাবে বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তার মধ্যে অসংখ্য জোনাকী জ্বলছে দপদপ করে—ছেলেবেলায় শোনা আলেয়াভূতের গল্প মনে পড়ে যায়। শব্দের মধ্যে সন্ধ্যের আগে থেকেই শিয়াল ডাকতে আরম্ভ করে, একসঙ্গে যে কতগুলো ডাকে, চারদিক থেকে—তার সীমাসংখ্যা নেই, এক-এক দিন তাদের এই বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে পর্যন্ত চলে আসে শিয়ালের পাল,—আর অবিরাম ঝিঁঝি পোকা ডাকার শব্দ। সবশুদ্ধ জড়িয়ে যেন ভূতুড়ে ব্যাপার মনে হয়। প্রথম যেদিন এখানে আসে—ভয়ে সিঁটিয়েছিল সারারাত—চোখে-পাতায় এক করতে পারে নি।

তবু পূর্ণবাবুর এখানে দুটো দারোয়ান আছে, একটা ভাঙ্গাচোরা বন্দুকও নাকি আছে তাদের, বাগানেরই এক পাশে একখানা ঘরে মালীরা থাকে সপরিবারে, মজুরেরাও থাকে কেউ কেউ। সেকথা বলেওছেন পূর্ণ-বাবু, 'সারারাত দুজনে পালা করে ঘুরছে দরোয়ানরা—বাড়ির চারদিকে, কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও'— তাতেও ঘুম আসে নি চোখে। ওর ভয়ের জন্যে তেলের লণ্ঠনের বদলে—হেমন্ত যেদিন আসে—ঝাড়বাতিদানে দশ-বারোটা করে মোম-বাতি জেবলে দিতে বলেন, ঘরে, দালানে—কিন্তু তাতে বাইরের অন্ধকারটা যেন আরও বেশী বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। ক'বছর কলকাতায় থেকেই বোধহয় অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে—পূর্ণবাবু ঠিকই বলেন। অথচ উপায় বা কি?

এই কারণেই হেমন্ত আসতে চায় না এখানে। নেহাৎ পূর্ণবাবুর অনুনয় অনুরোধ পীড়াপীড়িতে এক আধবার রাজী হতে হয়—তবে সেই আসার দিনটাকে যত দূরে সম্ভব নানা ওজরে টেনে নিয়ে যায়, বিলম্বিত করে। দু-মাস তিন মাস—সম্ভব হলে চার মাসের ব্যবধান করে আনে দুটো অবস্থিতির মধ্যে। এলেও 'কেস'এর অজুহাতে আসা, সেই অজুহাত দেখিয়েই এক রাত্রির বেশী থাকে না কখনও। বিকেলে আসে, সকালবেলাই গাড়ি ডাকিয়ে ফিরে যায়।

এবার চৈত্র মাসে কিন্তু পূর্ণবাবু চেপে ধরলেন, টানা তিন-চারটে দিন গিয়ে থাকতেই হবে। ও'র স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই দার্জিলিং যাচ্ছেন—একেবারেই ফাঁকা এখানকার সংসার, পূর্ণবাবুর আদৌ ভাল লাগছে না। হেমন্ত চলুক, এখানে রটনা করে দিলেই হবে যে বাইরের রাজবাড়ি

থেকে হেতমপুর, দীঘাপাতিয়া, পুঁটিয়া কিংবা আরও দূরের কোন রাজবাড়ির নাম করলেই হবে—ডাক এসেছে, যেতে আসতেই তো দু'দিন-আড়াই দিন। কাজেই চার দিন কাটিয়ে এলেও কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। চাই কি, আরও দু-এক দিন বেশিও থেকে আসতে পারে। বললেই হবে যে তারা মোটা টাকা দিতে চেয়েছে—ক'দিনের মতো ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

পূর্ণবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করে চোখ টিপে বললেন, 'সে টাকা—দুশো আড়াইশো যা বলো, আমিই তোমাকে দিয়ে দেব। খুব একটা মিছে কথাও বলা হবে না।'

তবু নানারকম টালবাহানা করে আরও কটা দিন কাটাল হেমন্ত।

শুধু ওখানে থাকতেই যে আপত্তি তা নয়, এখান থেকে যেতেও অনিচ্ছা। বরং এটাই বেশী। কেন অনিচ্ছা তা নিজেও ভাবতে সাহস করে না আজকাল। তবু মনের অবচেতনেই একটা হিম হতাশার সঙ্গে বোধ করে যে—সে কারণটাও ওর অজ্ঞাত নয়। এখানের আকর্ষণ কিসের তা জানে সে। সে যে আজকাল প্রতিদিনই প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমলাক্ষর আসবার সময়টির জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে, এবং তার আসার কোন নির্ধারিত সময় নেই বলেই অস্থির ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সারাটা ক্ষণ—এ আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তবু যেতেই হয়। না যাওয়ার কোন প্রবল যুক্তি দেখাতে পারে না। নতুন কী এক কলের গান বেরিয়েছে, সেই কল একটা কিনেছেন পূর্ণবাবু ওখানের জন্যে। সেই সঙ্গে গোল চওড়া বালার মতো কতকগুলো—তাকে নাকি রেকর্ড বলে, সেই বালাগুলো পরিয়ে কল চালিয়ে দিলে আপনিই গান হয়। তাতে সময় কেটে যাবে বেশ, সন্ধ্যেবেলা বসে কেবল শিয়াল আর ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে হবে না। এছাড়া একটি উড়ে বামুনকেও বলে রেখেছেন, ওঁদের সঙ্গে যাবে—যতে হেমন্তকে গিয়ে দু-বেলা রাঁধতে বসতে না হয়। তাতে লোকও একজন বাড়বে। এখান থেকে ওর বাইরের ঝিকেও চাইকি নিয়ে যেতে পারবে হেমন্ত কাজেই অতটা নির্জন আর মনে হবে না। দুপুরবেলা একবার করে পূর্ণবাবু কলকাতা আসবেন যা—তা তখন তো আর ভয়েরও কোন কারণ নেই, তিনি দ্রুত ওখানের কাজ সেরে বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন প্রত্যহ—সে প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

সুতরাং একসময়ে চৈত্রের শেষ সপ্তাহে চার দিনের জন্যে বাগানবাড়িতে যেতে হল।

এমনিই যথেষ্ট অনিচ্ছা ছিল, যাওয়ার আগের আর একটা ব্যাপারে আরও মন খারাপ হয়ে গেল হেমন্তর। কোথায় যাচ্ছে তা সঠিক কাউকেই বলা হল না—ভয় ছেলেকেই বেশী—সেই জন্যেই ঝি-চাকরদের কাছেও গোপন করা, ওর বাইরের ঝি, যে 'কেস' করতে যাবার সময় সঙ্গে যায়, খুব বিশ্বাসী আর স্বল্পভাষী, তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোবে না।

কেবল কমলাক্ষকে মিথ্যা কথা বলতে মন সরল না। বিশেষ তার কাছে আর গোপন করার দরকার কী? সে কি আর জানে না পূর্ণবাবুর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা। তাই সেদিন সকালে সে আসতে চুপিচুপি জানিয়ে দিল সে কোথায় যাচ্ছে এবং ক'দিন এখানে অনুপস্থিত থাকবে।

খবরটা শুনে তার মন খারাপ হবে, মুষড়ে পড়বে—এইটেই ভেবেছিল কিন্তু কমলাক্ষ অকস্মাৎ যেন একেবারে রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। দেখতে দেখতে মুখচোখ লাল হয়ে উঠল তার। অমন কোমল গভীর দৃষ্টি উগ্র হয়ে উঠল, এমনিই তো গরমের সময়, তার ওপর সামান্য উত্তেজনার কারণ ঘটলেই সে ঘেমে ওঠে—এখন আরও বেশী, মোটা ধারায় জল ঢালার মতো ঘাম গড়িয়ে পড়তে শুরু হল গাল বেয়ে, গলা বেয়ে কানের পাশ দিয়ে, আর একটা জিনিস হল—যা আগে কখনও দেখে নি হেমন্ত। কপালের শিরাগুলো নীল দড়ির মতো হয়ে ফুটে উঠল রগের দু-পাশে।

সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'না না, আপনি ওর বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকবেন কি!... ছিঃ ছিঃ! হতেই পারে না তা। একথা আপনি ভাবতে পারলেন কি করে? কক্‌খনও যাবেন না—কিছুতে না। দ্যাট ওল্ড স্কাউন্ড্রেল! ব্যাস্টার্ড! বুড়ো হয়ে মরতে চলল, এখনও এ সব বজ্জাতি গেল না। ...আপনি যেতে পারবেন না ওখানে বলে দিচ্ছি। যাক তো কেমন নিয়ে যেতে পারে!...আই'ল মার্ডার হিম! চাবুকপেটা করব, মাস্টার বলে মানব না! রাস্কেল কমনেকার!'

হেমন্ত তো অবাক। এরকম চেহারা কখনও দেখেনি কমলাক্ষর, কখনও কল্পনা করেনি দেখবে বলে। সে দস্তুরমতো থতমত খেয়ে গেল এই প্রচণ্ড উষ্মা দেখে। বাগানবাড়ি যে মধ্যে মধ্যে যায়, তা অবশ্য কখনও পরিষ্কার করে বলে নি ওকে—তবে এটা তো ধরে নেওয়াই উচিত। যখন এতটা নামতে পেরেছে তখন ওটাই বা পারবে না কেন? যে সম্পর্কটা এখানে আছে, তার বেশী আর ওখানে কি হতে পারবে—যার জন্যে এতটা বিচলিত জ্ঞানহারা হয়ে পড়ল কমলাক্ষ।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্‌কাটা সামলে নিতে একটু সময় লাগল, তারপরই ব্যাকুলভাবে ওর মুখের ওপর হাতচাপা দিল হেমন্ত, চুপ চুপ এই দেখ পাগল কোথাকার—চেঁচায়! পাড়াশুদ্ধ লোককে না জানালে চলছে না? এই জন্যে বুঝি তোমাকে বিশ্বাস করে বললুম!'

কমলাক্ষ যেন সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছিল সেদিন। সে হেমন্তর হাতখানা দু'হাতে ধরে সেই প্রথমটা মুখের ওপরই চেপে রাখল কিছুক্ষণ তারপর গালে কপালে চোখে বুলিয়ে চেপে চেপে ধরে—শেষে উন্মাদের মতো বিভ্রান্তর মতো সেই হাতের তালুতেই চুমো খেতে লাগল।

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত —এত দ্রুত ও অতর্কিতে ঘটল, তরুণ বলিষ্ঠ হাতের সবল স্পর্শেও সেই উন্মত্ত চুম্বনে এমনই বিহ্বল করে দিল কিছুক্ষণের জন্য যে—কী হচ্ছে সেটাই বেশ কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারল না হেমন্ত।

তারপরই এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এ আবার কী? একি অসভ্যতা। তোমার সাহস তো কম নয়!... এই জন্যে মাস্টারমশাই এত খারাপ!'

বেশ শাসনের সুরে, তিরস্কারের সুরেই বলার চেষ্টা করল কিন্তু সে নিজের কানেই কেমন দুর্বল ও মিথ্যা মনে হল—আত্মবিশ্বাস শূন্য। গলার আওয়াজে যে কিছুমাত্র তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পেল না, বরং এক ধরনের উত্তেজনায় ও উৎসুক প্রত্যাশায় কেঁপেই গেল বলার সময়, তাও বুঝতে পারল।

কমলাক্ষর কিন্তু এত লজ্জা করার অবস্থা নয়। সত্যি সত্যিই ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল সে, 'কেন, কেন আপনি ও কথাটা শোনালেন আমাকে!...সামান্য কটা টাকার জন্যে আপনি—আপনার মতো—ওঃ, আমি যে ভাবতেই পারি না। এর চেয়ে, এর চেয়ে—'

কথা শেষ করতে পারল না। আবেগে কান্নায় গলা চেপে এল, কী বলবে কি বলতে চায় তাও হয়ত ঠিক মাথার মধ্যে স্পষ্ট নয়, তখন—চিন্তা-ভাবনা সব গোলমাল হয়ে গেছে, মনোভাব প্রকাশের মতো শব্দ বা ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না। সে যেমন অকস্মাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, অকস্মাৎ সম্বিৎ শোভনতা ও হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিল, তেমনই অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল।

কমলাক্ষকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে ঝি ছুটে ওপরে এসেছিল, এখন ঐভাবে ঝড়ের মতো বেরিয়ে যেতে দেখে সে বললে, 'কী হয়েছে গা দিদিমণি, ঐ দাদা অমন করে বেইরে গেল?'

হেমন্তরও যেন সেই মুহূর্তে কথা যোগাচ্ছে না মুখে, উপস্থিত বুদ্ধি এক প্রবল দুর্যোগে যেন ঘুলিয়ে উঠেছে, মিথ্যা কথা একটা খুঁজে পাচ্ছে না। কোনমতে ঢোক গিলে গিলে বললে,—বলতে বলতেই সামলে নিতে হচ্ছে নিজেকে, গলাটা স্বাভাবিক করতে হচ্ছে—'ও কিছু না, মানে—ইয়ে বাড়িতে অযথা রাগারাগি করেছে বোয়ের সঙ্গে, সেই জন্যে—ইয়ে—আমার কাছেও বকুনি খেয়েছে—তাই!'

'ওমা, তাই বলে অতবড় বেটাছেলেটার চোখে জল! ও আবার কেমনতারা পুরুষ মানুষ!'

(ক্রমশঃ)

ওস্তাদ আসগর

শ্রেণী সেন

সার্বজনীন পূজার সংখ্যা বাইরের অলিগলিতে বছরের পর বছর জেঁকে বসছে। চাঁদার অঙ্কের জোরে পূজামণ্ডপের সাজ-সজ্জায়, প্রতিমার শিল্পচাতুর্যে পাড়ায় পাড়ায় রেশারেশি চলে। অন্তঃসারশূন্য পূজার অঙ্গ মাইকের বাজনায়, আলোক-সম্পাতের চাকচিক্যে, বিসর্জনের মিছিলের আড়ম্বরে পর্যবসিত। শাক্ত পূজায় ভক্তির অভাব বড় বেশী চোখে পড়ে। বাজারের অগ্নিমূল্য, জমকালো পোষাকআশাকের চাহিদা মধ্যবিত্তের জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ।

পূজোর ছুটিতে শহর থেকে অনেক-দূরে দেশের শান্ত পরিবেশে এসেছি হৈ-হুল্লোড় এড়াতে। পৈতৃক বসতবাড়ী, বাগান-বাগিচা আমার ছেলেবেলাকার নির্ভর খেলাঘর ছিল একদিন। আজ আমি সেখানে কদিনের অতিথি। চাকরীর খাতিরে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর সময়, মনে মনে দেশের বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতাম আমি। সেদিনের গোয়াল ভর্তি দোয়াল গাই, পুকুরভর্তি মাছ। ফলফুলেভরা বাগিচা, আজ আমার কল্পনার খোরাক মাত্র।

বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে কংসাবতী নদী, ডাইনে বাঁয়ে শ্যামল ধানের খেত, কংসাবতীর, উপর ব্যারেজ তৈরী হওয়ার পর থেকে নদী মজে আসছে। বর্ষার সময়টুকু ছাড়া নদীর ক্ষীণস্রোত বালুচরে আটকা পড়ে থাকে। সেচব্যবস্থার উন্নতি করতে জলাধার তৈরী করলেও, বছর বছর বর্ষার সময় ব্যারেজের জল ছাড়া পেয়ে দুর্দাম আবেগে দু তীরের গ্রাম ভাসিয়ে দেয়। নদীতীরের গ্রামের মানুষদের জীবনে বন্যা এখন নতুন উপদ্রব সৃষ্টি কচ্ছে। কিষানদের ফি বছর দুর্ভোগ পোয়াতে হয় সে জন্যে।

নীল আকাশের বুক চিরে চড়া রোদ আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে মাটির বুকে। শরতের আকাশপথ বেয়ে সাদা মেঘ ভেসে চলেছে দূর দেশের পাহাড়উপত্যকায়। গাছ-পালার সবুজ পাতা রোদের ঝলকে নুয়ে পড়ছে ডালে ডালে ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গীতে। কা কা রব করে কর্কশ চিৎকারে ডাঙ্গরা কাক দুটো ছাতিফাটা তেষ্টায় চেঁচাচ্ছিল এতক্ষণ বাঁশঝাড়ের আড়ালে। তারাও চুপ করে গেছে। বানে ডোবা ফাঁকা মাঠগুলো খাঁ খাঁ কচ্ছে। কংসাবতীর বন্যা কৃষকের সারা বছরের আশাভরসা আমন ধানের বাড়ন্ত চারাগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর, বিছানায় হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। গরু-ছাগলের কবল থেকে কলমের গাছগুলোকে রক্ষা করতে মালী গেটে তালা বন্ধ করে রেখেছিল। পাঁচিলের ধারে অশথতলার সান বাঁধানো চাতালে বসে কে একজন ফকির সুর করে পাঁচালি গাইছিল—'মুশকিল আসান কর সাহেব সত্যপীর'। দেশ-পাড়াগাঁয়ে বাউল ফকিরের দল গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী। শুয়ে শুয়ে ছেলেবেলাকার কথা একমনে চিন্তা কচ্ছিলাম। ফকিরের চিৎকারে চিন্তায় বাধা পড়াতে উঠে বসলাম। বারান্দায় এসে মালীকে ডেকে বললাম—'ওকে ভিক্ষে দেওয়া হয়েছে'?

'কখন ও ভিক্ষে নিয়ে গেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অশথতলায় বসে পুঁথি আওড়াচ্ছে' মালী জানাল আমাকে।

জিজ্ঞেস করলাম—'ওর বাড়ী কোথায়? কেন ও দেখা করতে চায় আমার সংগে'?

'সোনাডুঁয়ের আসগর ফকির। আপনি দেশে এসেছেন জেনে, আপনাকে সালাম জানাতে এসেছে'।

লোকটাকে ঠিক ঠিক চিনতে না পেরে বললাম—'কোন আসগর?'

'লাঠিয়াল আসগর,, খুনের দায়ে যার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল।—আসগর ফকিরের পরিচয় জানাল মালী। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলল—'আসগর এখন পীরের ফকির। সত্যপীরের পাঁচালি গেয়ে বেড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে।'

আসগরকে এবার আমার মনে পড়ল। মহরমের সময় দুপুরে মাতঙের দিনে সাতফিট লম্বা জোয়ান আসগর একাই একটা ঢেঁকি ঘুরিয়ে ছেলেবুড়ো সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। লাঠি ঘুরিয়ে ইঁট-পাটকেল আটকে ফেলতে পারত সে। বিরোধী জমির মালিকানার মুকাবিলা করতে তার ডাক পড়ত গাঁ বেগাঁয়ে। যে পক্ষে সে লাঠি ধরত, তার বিরুদ্ধ পক্ষের লাঠিয়ালরা মাঠ ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে পথ পেত না।

ডাকসাইটে খুনী লোকটার ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত চোর ডাকাত, তার হাতে পড়লে রক্ষে থাকত না। তাদের থাপ্পড় মেরে চোরকে মাংসপিণ্ড বানিয়ে ফেলত। মারতে মারতে আধমারা করে ফেলে মুখে থুথু দিয়ে বলত—'আর চুরি করবি? বুকের পাটা থাকেত' লাঠিয়ালি কর।' মারের চোটে চোরের নাম ভুলিয়ে দিত সে। বদমায়েস লোক তার পায়ে ধরে বলত—'দোহাই ধর্মের বাপ, এবারের মত মাফ কর। জীবন থাকতে অন্যায় করব না আর'।

মুলুকের নামজাদা লাঠিয়াল আসগর আলি ফকির হয়েছে শুনে, তাকে দেখতে, তার কথা শুনতে আমার ইচ্ছে করল। নীচে নেমে মালীকে বললাম—'আসগরকে ডাক।'

আসগর ফটক পার হয়ে বাগানের পথ ধরে আসতে লাগল। আমার নজরে পড়ল কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, হাতে আশাবাড়ি নিয়ে, খড়ম পায়ে খট্ খট্ করে হেঁটে আসছে পীরের ফকির। কাছে এসে দীর্ঘ সেলাম জানিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—'আমাকে চিনতে পার খোকাবাবু।'

বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে আসগর, ফকিরের আলখাল্লার মাঝে সেদিনের চওড়া বুকের পাটা লাঠিয়াল আসগর যেন হারিয়ে গেছে। যে হাতে সে লাঠি ধরত, সে হাত অস্থিচর্মসার, চোখদুটো কোটরে বসা।

আসগরকে দেখে আমি অতীতে ফিরে গেলাম। জোতজমা মীমাংসা করতে কতবার তার ডাক পড়েছে আমাদের বাড়ীতে। পুজো-পার্বনে সে তার দলবল নিয়ে খেতে আসত আমাদের পুজোমন্ডপে। হিন্দুর ঠাকুর-দেবতার উপর তার শ্রদ্ধাভক্তি ছিল দেখেছি।

অতীতের আসগরকে চিনতে আমার ভুল হয়নি, যাকে একদিন চিনতাম সে যেন এ নয়। মুখে হাসি টেনে বললাম, 'চিনব না কেন?'

'ভাবলাম তোমরা এখন শহরের বাবু-সাহেব, আমার ছোটবাবু কি আর বুড়ো ফকিরকে চিনতে পারবে, তাই বুঝি।'

'সবাই কি আর বদলে যায় আসগর, কাজের খাতিরে শহরে থাকতে হলেও পাড়াগাঁকে আমি ভুলিনি। দেশকে আমি ভালবাসি।'

'আমার মা-লক্ষ্মী, দাদা-দিদিরা সব ভাল আছে? তাদের আনলে না কেন?'

'হ্যাঁ, ভাল আছে। তারাও আসত, শহরের পুজো দেখতে থেকে গেছে।'

'তা বেশ, তা বেশ, বছরে একবার করে দাদা-দিদিদের ঘুরিয়ে নিয়ে যেও ছোটবাবু, জন্মভূমি বলে কথা, আমরা কত খুশী হই তোমাদের দেখলে,' আসগর মনের আনন্দে আমার খোঁজখবর করে চলল।

তার কথা জানতে বললাম—'তুমি ফকির হলে কবে থেকে।'

আমার কথায় অতীতে ফিরে গিয়ে আমতা আমতা করে আসগর বললে—'দোলুইদের বাড়ীতে ডাকাতির কথা তোমার মনে পড়ে খোকাবাবু।'

'সব কথা মনে নেই, কিছু কিছু মনে আছে এখনও। তখন আমি স্কুলে পড়তাম।'

চব্বিশ পরগনার মুড়াগেছে থেকে নদী-পথে নৌকো করে জনা-পনের ডাকাত এসে-ছিল দলুইদের গদীতে ডাকাতি করতে। গদীর গায়ে লাগোয়া তাদের বসতবাড়ী নদীর কোল ঘেঁষে। গাঁয়ের লোকের হাঁক-ডাকে ডাকাত পড়ার খবর পেয়ে আমার সাকরেদ দুজন লাঠিয়ালকে সংগে করে দৌড়ে গেছলাম ডাকাতদের মুলাকাত করতে, আমার বড় ছেলে ইয়ার আলি কখন আমাদের পিছু পিছু গিয়েছিল জানতাম না।

চওড়া গালপাট্টা, নকল দাড়িগোঁফ, ঝাঁকড়া চুল বেঁধে মশাল জেলে ডাকাতের দল ভরসন্ধ্যেবেলা নৌকো থেকে নেমে এসেছিল। মশালের ছেঁকা দিয়ে বাড়ীর কর্তাগিন্নিকে শায়েস্তা করছিল তারা লুকানো সোনাদানার খোঁজ পেতে, মেয়ে-দেরও বেইজ্জত করতে ছাড়ে নি তারা।

ভয়ার্ত মানুষগুলোর চিৎকার শুনে পাঁচিল টপকে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম বাগানের ভেতর। খিড়কির পথ আগলে যে দুজন ডাকাত লাঠি ঘোরাচ্ছিল ভয় দেখাতে, লাঠির এক ঘায়ে দুজনকে শেষ করে এগিয়ে গেলাম সদর দরজায়, দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে ডাকাতদের সর্দার থালাবাসন ভেঙে টুকরো করে ছুঁড়ে মারতে লাগল আমাদের দিকে। লাঠি ঘুরিয়ে ভাঙা বাসনের টুকরো আটকাতে আটকাতে ছুটলাম সর্দারের দিকে।

বেগতিক বুঝে আমাকে লক্ষ্য করে সর্দার বল্লম ছুঁড়ে মারল, পাশ কাটিয়ে, লাঠির বাড়ীতে সর্দারের মাথা দু ফাঁক করে ফেললাম, আমার বড় ছেলে ইয়ার আলির আর্তনাদ ভেসে এল আমার কানে। দোতলার বারান্দা থেকে ডাকাতরা বল্লম ছুঁড়ে মেরেছে তাকে। দোতলায় উঠে চারজনকে একাই সাবাড় করে ফেললাম লাঠির ঘায়ে। বাকীরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে পালাল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ইয়ার আলির কাছে ফিরে এসে দেখলাম বল্লম তার পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে গেছে। ইয়ারের তাজা খুনে ভেসে গেছে জমিনের মাটি। ইয়ারের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসে পড়লাম। ইয়ার মৃদুস্বরে বলল—'আমাকে তুই বাঁচা আব্বাজান।' ইয়ারের মাথা ঢলে পড়ল আমার কোলে।

ছেলের তাজা খুন দেখে মাথায় খুন চেপে বসল, আমার বুকে মাতাল হাতীর বল এসে গেল। আহত ডাকাতগুলোকে টেনেহিঁচড়ে ইয়ারের পাশে এনে ধড় শির দু ফাঁক করে দিলাম। আমার বাজান আমাকে ছেড়ে চলে গেল দেখে, মমতাহীন লাঠিয়ালের চোখ বেয়ে আঁশু ঝরে পড়ল। বাড়ীর দু দিকের রাস্তা লোকে লোকারণ্য। আমার শোকে সান্ত্বনা দিতে কেউ এগিয়ে এল না। ইয়ারের প্রাণহীন দেহ কাঁধে তুলে ভিড়ের ভেতর দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরলাম। বাগানে ফেলে এলাম ডাকাতদের গর্দানহীন ধড়।

ইংরেজদের বিচারের মহিমা বুঝলাম না। ডাকাতদের শায়েস্তা করার অপরাধে খুনের দায়ে আমার দ্বীপান্তর হয়ে গেল। আমিনা বিবির ছোট বাজান আবুকে ছেড়ে আমাকে যেতে হল কালাপানির পারে, অসহায় বিবি-বাচ্চার ভার দিয়ে এলাম খোদার উপর।'

আসগরের দুগাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল, সহায় সম্বলহীন স্ত্রী ছেলের কথা ভেবে তার শোক উথলে উঠছে বুঝতে পেরে তাকে বললাম—'অত কথা জানতাম না, তোমার দ্বীপান্তর হয়েছে শুনেছিলাম।'

'লোকে জানে খুনের আসামী আমি। নির্দোষ মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে দোষীকে সাজা দিয়েছি তা বেশীরভাগ লোকে বোঝে নি, হাকিমরাও না।'

কথার মোড় ফেরাতে বললাম—'কবে ছাড়া পেলে?'

'দেশ স্বাধীন হবার জন্য আমার নথি-পত্র বিচার করে কয়েদবাস মকুব করা হয়। দেশে ফিরে দেখলাম, যে দেশ ছেড়ে গেছলাম, সে দেশে আর ফিরতে পারলাম না, সময়ের সংগে দেশ বদলে গেছে বিলকুল।'

আসগরের কথায় সায় দিয়ে বললাম—'খুব সত্যি। সুজলাসুফলা বাংলাদেশ দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে, বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারী এখন দেশের সংগী-সাথী।'

শুধু কি তাই, নিজের দেশে আমরা এখন পরবাসীর মত। হিন্দু মুসলমানের ভেতর সম্প্রীতিও কমে গেছে।'

'দেশবিভাগ, দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলেই তা কতকটা হয়েছে, তবে সময়ে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তা কি হয় ছোটবাবু, যা ভাঙ্গে, তা আর জোড়া লাগে না।'

আসগরের মুখে নিরাশার বেদনা, তার ঘর সংসারের খবর নিতে জিজ্ঞেস করলাম—'তোমাদের খবর সব ভাল ত?'

'আন্দামান দ্বীপ থেকে ঘরে ফিরে দেখলাম ভিটেমাটি পড়ে আছে, ঘরের মানুষ নেই, তেতাল্লিশের ঝড়ে কাঁসারের ঘানে আবু ভেসে গেছে, মন্বন্তরে আমিনা বিবি অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে গাছের শুকনো পাতার মত ঝরে গেছে, ঘরছাড়া আসগরকে ঘরে আটকে রাখার কেউ আর নেই, তাই পথকেই ঘর করলাম, সোনাভুঁয়ের পোড়ো ভিটে শূন্যই পড়ে রইল।

পাকা সড়কের ধারে মসজিদের পাশে কুঁড়ে বাঁধলাম। পেটের জ্বালা মেটাতে নদীচরের কাশের ঝাড় তুলে চাষের কাজে মন দিলাম। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বন-বাদাড় সাফ করে পাঁচবিঘে জংলা জমি আবাদী করে তুললাম। বানের পলি জমে আচট মাটিতে সোনার ফসল ফলল, সরকারী অনাবাদী জমি ভোগ-দখল করছি জানিয়ে সরকারের আমিন ফসলের ভাগ দাবী করল।

সারাদিন খেটেখুটে এসে শূন্য ঘরে প্রাণ আইঢাই করত, একমুঠো ভাত রেঁধে দেবার জন্য পড়শী ময়নাবিবির আশায় পথ চেয়ে থাকতে হত। আমাকে দুবেলা দু মুঠো রেঁধে দিয়ে যেত। একমানুষের পেট-ভরা খাওয়াও নিয়ে যেত বাড়ীতে তার জন্যে।

ও গাঁয়ের মেয়ে ময়না ফকির রিয়াসতের বিবি, ওলাবিবির আস্তানায় ফকির ছিল রিয়াসত মিঞা, বিবির আস্তানার থালিয়ানা আর সিন্নি থেকে সংসার চলত তাদের। মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে পেটের খোরাকের টান পড়তে ভক্তিছেদ্দা কমে গেল মানুষের। বিবির আস্তানায় সিন্নিচড়ানো একরকম বন্ধ হয়ে গেল, কালেভদ্রে উরসের সময় ছাড়া বিবির অতবড় আস্তানা খাঁ খাঁ করত।

ফকির রিয়াসত ফকিরি করে পেটের দানা জোগাড় করত। ওলাবিবির দোয়ার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে কবরের হিমশীতল ঘরে আস্তানা গাড়ল সে। অসহায় ময়না-বিবি ওলাবিবির নাম করে মাঙন মেঙে বেড়াত সেই থেকে, কিন্তু কে কাকে ভিক্ষে দেবে? দেশজোড়া ভিখিরীর আস্তানা—কেউ অভাবের দায়ে, কেউ স্বভাবের তাগিদে।

শেষটায় পেটের খোরাক জোগাড় করতে ময়নাবিবি আমার গেরস্থালির ভার নিয়ে-ছিল, পানি-বসন্তে ছেলে মারা যাওয়ার পর সে আমার ঘরেই থেকে গেল।

মোল্লাসাহেব একদিন আমাদের ডেকে বললেন—তোমাদের দুজনের ঝাড়া হাত-পা, একসঙ্গে ঘরকন্নার বাধা নেই তোমাদের, নিকা না করে মেয়ে পুরুষের একসঙ্গে থাকা কোরানে মানা আছে। মোল্লার কথা শুনে অধর্মের কথা ভেবে ময়না আমাকে নিকায় রাজী করাতে উঠে পড়ে লাগল। দ্বিতীয়বার সংসার করতে আমার মন উঠল না, ময়নার চোখের জল, জাহান্নমের ভয়—দুয়ে মিলে একরকম জোর জবরদস্তি করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

কোরানের বুলি আউড়ে মোল্লাসাহেব নিকা দিয়ে আমাদের মিয়াবিবি বলে ঘোষণা করলেন। আমাকে নিয়ে ময়নার ভয়ডর ছিল খুব বেশী, চোখের আড়াল হতে দিত না সে, মাঝে মাঝে বলত—'দেখো মিঞা, ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়াতে যেও না কেন, কাউকে ভাল কথা বলতে গেলেও সে তোমাকে মন্দ বলবে। দিনকাল বদলে গেছে। পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের ঘাড়ে দোষ চাপিও না আর।'

তার মনে সাহস জোগাতে বলতাম—'সে আর বলতে, বয়েস আমার পঞ্চাশের কোঠায় হতে চলল, নিজের ভালমন্দ বুঝি না? পরের বিপদেআপদে তার পাশে দাঁড়াবার দিন চলে গেছে।'

ময়নাবিবিকে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছিলাম ক'বছর। সংসারের বাড়বাড়ন্তর সঙ্গে দুটো চাঁদের পারা ছেলেমেয়ে জন্মে-ছিল আমাদের। ভাগ্যে সুখ লেখা নেই, সইবে কেন? পাঁচ বছর আগে দৈবের লেখা এক কালরাত্রি সব ধুয়ে মুছে একাকার করে মহাকালের রূপ ধরে গ্রাস করতে এগিয়ে এল আমাদের। আমার সুখের ঘর ভেঙে গেল খোকাবাবু।'

কখন আসগরের ব্যথায় সমব্যথী হয়ে গেছি আমি, তার কথা শুনতে শুনতে। অসহায় মানুষটির চরম দুর্দশার কাহিনী শোনার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'কি করে তোমার কপাল পুড়ল?'

সে বছর বৈশাখের শুরু থেকেই অল্পসল্প বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। গরমের তাপ মোটেই লাগে নি মাটির বুকে। আমাদের কাজ ধীরেসুস্থে ভালভাবেই চলছিল, আষাঢ়ের গোড়াতেই চাষের কাজ শেষ, সবুজ ধানখেতের বুকের উপর দিয়ে বাউল বাতাস বয়ে গিয়ে, মেঘে ঢাকা রোদে ঝলমল ধান-গাছগুলো কিষাণদের মনে তুলেছিল আনন্দের ঢেউ।

শ্রাবণে নদী কুলে কুলে ভরে উঠল বর্ষার উদ্দাম আবেগে, গাঁয়ের মানুষ নদী থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ ধরতে লাগল। স্বচ্ছন্দে তাদের সংসার চলতে লাগল। বর্ষার বিরাম নেই, রাতদিন আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল ডাগর ডাগর পানির ফোঁটা, শ্রাবণের শেষে ধান ক্ষেতে কোমরভর্তি পানি দাঁড়াল। গাঁয়ের পথঘাট ডুবতে বসল। পুকুরের নীচু পাড় ডুবে পানি ভরে উঠল, মজা গাঙ সাগরের মত ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগল দিনে দিনে।

গাঁয়ের লোকে বানের আশঙ্কায় ভয় পেল। সকলের মুখে এক কথা—কি হয়, কি হয়, পালা করে বস্তীর ছেলেবুড়ো রাতদিন পাহারা বসাল গাঁয়ের সীমা বেঁধে। গাঙের পানি তখনও বিপদসীমার নীচে, সরকারী লোকলস্কর নদীর বাঁধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগল, ঝোড়ো কোদাল জড় করে গাঙড়ে বাঁধের উপর চৌকি ফেলা হল, বানের মুকাবিলা করতে সব গাঁয়ের মানুষ তৈরী হল।

ক'দিন ধরে বৃষ্টির কামাই নাই, বর্ষার দাপটে ঘরের বাইরে পা বাড়ানো দায়, মাঠের ধানগাছ পানির তলায় ডুবে গেল, নদীচরের খেতের চিহ্নমাত্র নেই, নদীর পানি বিপদ সীমা ছাপিয়ে সাপের ঘোট দিয়ে ডুবা মাঠে পানি ঢুকতে লাগল। সন্ধ্যার আগে গাঁয়ের চৌকিদার সবাইকে বানের হুঁশিয়ারী করে গেল, ছেলেছোকরারা পানিতে ভিজতে ভিজতে নদীর বাঁধে মাটি ফেলে চলল।

সোনাগাঁয়ের দিক থেকে শঙ্খধ্বনি শুনে আমরা বুঝলাম ওখানে নদীর বাঁধ ভেঙেছে, দুগাঁয়ের মাঝে উঁচু সরকারী সড়ক, বানের জল বাঁধ ছাপিয়ে উঠতে রাত পোয়াবে না বুঝে ঘরের বার হতে যাচ্ছিলাম, ক'দিন আমার অল্পবিস্তর জ্বর হচ্ছিল, আমাকে বাইরে যেতে দেখে ময়নাবিবি বাধা দিয়ে বলল—'তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমাদের সব জমি নদীর পানির তলায় কবে ডুবে গেছে। ধানের চারা পচেমজে শেষ হয়ে গেছে, মনে তোমার শান্তি নেই, তার উপর জ্বর গায়ে বৃষ্টিতে ভিজে নিউমোনিয়াতে ভুগবে আর কি?

ময়নার কথায় থমকে দাঁড়ালাম, আমার সোনাজমির ফসল কবে হেজে গেছে। সারা বছরের খোরাক আমার বাড়ন্ত। কি হবে আমার বাঁধ আগলাতে গিয়ে, দাওয়ায় বসে দেখলাম নদীর উপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে, গাঁয়ের বেশীরভাগ লোক নদীর বাঁধে চেঁচামেচি করে কোদাল চালাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দুচার হাতের বাইরে কিছুই নজরে পড়ে না। মজিদ গোড়ার পাড় ছাপিয়ে ঘোলা পানি ঢুকে পড়ল মিঠা-পুকুরে, পুকুর ভরে পানি উঠতে লাগল

উঠোনে। উঠোন ভরে গেল দেখতে দেখতে, এবার ঘরের দাওয়ায় উঠতে লাগল পানি।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দে মাটির ঘর বানে ভেঙে পড়ার শব্দ কানে এল। মানুষের বুকফাটা কান্না ঝড়ের বেগে তলিয়ে গেল। হাজার হাজার সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ করে পানি ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

ছেলেমেয়ে দুটোকে চৌকির উপর বসিয়ে মটকার সঙ্গে রসির একদিক বেঁধে, অন্যদিকে চৌকির চারধারে পেঁচিয়ে বেঁধে দিলাম, অপর একটা রসি দিয়ে সকলের কোমরে বেঁধে মটকায় বেঁধে ফেললাম। কোমর জলে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম পেছনের দেওয়াল ধসে পড়ছে। চালা ফুটো করে আমরা উঠে বসলাম তার উপর, সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের টানে ঘুরপাক খেয়ে চালা ভেসে চলল। চৌকি ভেসে গেল, পুরাতন রসি ভার সইতে না পেরে দু টুকরো হয়ে কেটে গেল। একদিকে আমি, অপরদিকে ময়না আর বাচ্চা দুটো।

চালার উপর বসে ঝড়বাদল মাথায় করে ভেসে চললাম আমরা, কোন দিকে চলেছি অন্ধকারে ঠাহর করতে পারছি না, যে দিকেই চোখ ফেরাই, চোখে ভাসে অথৈ বানের পানি। স্রোতের মুখে বড় বড় গাছ উপড়ে ভেসে যাচ্ছে। গোখরো, বড়া, জল ভেঙে চালায় উঠে আসছে।

কত রাত, কত দূরে ভাসছি কিছু জানতে পারলাম না, আচমকা ডুবা গাছের ধাক্কায় চালার রসি কেটে দু ফাঁক হয়ে গেল চালা। ভয় পেয়ে ময়না চিৎকার করে উঠল—'চালা যে খসে যাচ্ছে।' চোখের পলকে ময়নার চালা দূরে ছিটকে পড়ল আমার থেকে, বাঁধ থেকে ময়নার চালা ভেসে গেল দয়ের ঘূর্ণি জলে, দূর থেকে ময়নার কন্ঠস্বর ভেসে এল—'ছোট মিঞা, আমাদের তুমি বাঁচাও।'

'কে কাকে বাঁচাবে? খোদার নাম করে রসি ধরে থাক'—বাতাসে আমার কথা ভেসে গেল দূরে। নদীতীরের কাঁটা বাঁশের ঝাড়ে আটকা পড়ল আমার দিককার চালার অংশ, ক্ষীণ হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল ময়নার আর্তস্বর, আমার কানে ভাসতে লাগল তার ডাক—'আমাদের তুমি বাঁচাও ছোট মিঞা।'

ছোটমিঞা কাউকে বাঁচাতে পারল না—কাঁটা বাঁশে বিঁধে বেঁচে রইল সে, চালা খান খান হয়ে ভেসে গেল বানের তোড়ে, দু-দিন দু-রাত কেটে গেল একই ভাবে। খিদেতেষ্টায় মরার মত হয়ে পড়লাম আমি, বরাত জোরে মিলিটারি বোটের নজরে পড়ল আমার রঙীন গামছা, বাঁশঝাড়ের মাথায় পতাকার মত উড়তে ছিল গামছাখানা, সেই দেখে ঝাড় কেটে আমাকে বের করল মিলিটারি জোয়ানরা।

সরকারী লঙ্গরখানায় একমাস কাটিয়ে ফিরে এলাম গাঁয়ে। আশপাশের গাঁ জনশূন্য, সোনাভূঁয়ের চল্লিশজন বাসিন্দার কনা দশেক টিঁকে ছিল সে যাত্রা, দু দুবার বিবিজান, পোলাপানদের হারিয়ে বুঝলাম, খোদার উপর খোদকারী করতে পারে না মানুষ।

সংসার ছেড়ে খোদার খিদমদগারী করতে মসজিদে এসে দরবেশ বনে গেলাম। খোদার নাম করে বেড়াই আজকাল, এক-যুগের দুর্দান্ত লাঠিয়াল আসগরের রক্তে মানুষ সেবার যে বাসনা একদিন দানা বেঁধেছিল, সে আজ মানুষকে সত্যের পথ দেখাতে খোদার মহিমা গেয়ে শোনায়।'

তার কথা শেষ করে আসগর বসে পড়ল বারান্দায়, দুর্ভাগা মানুষটির মুখের দিকে চেয়ে বললাম—'তোমার খাওয়া হয়েছে আসগর?' তার শুকনো মুখ দেখে আমার মনে হল খাওয়া জোটেনি তার।

'রাতের বাসি রুটি দুখানা খেয়ে বেরিয়েছি সকালে, ফিরে গিয়ে রাতে যা হোক কিছু রান্না করে খাব, খিদেতেষ্টা আমি ভুলে গেছি ছোটবাবু।'

থালি ভরে গুড়মুড়ি খেতে দিলাম তাকে, ওজু করে ঘাটের উপর নামাজ পড়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম করে খেয়ে ফেলল সব মুড়ি। শান্তভাবে বসে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল—'শহরের মানুষরা কি আমাদের মত গাঁয়ের লোকদের কথা ভাবে? আমাদের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর রাখে?' তাকে বললাম—'ভাবে বৈকি? স্বাধীন দেশে সব মানুষের সমান অধিকার, গ্রামের উপর বনেদ করে শহর টিঁকে থাকে, সেখানকার মানুষরা গ্রামের উপর অনেকটা নির্ভরশীল, তাদের ভালমন্দ না ভাবলে চলবে কেন-'

'শহর যে অনুপাতে ফেঁপে উঠছে, গ্রাম সে তুলনায় অনেক পেছিয়ে পড়ছে না কি? গাঁয়ের মানুষের কথা ভাবলে কি এমনটা হত।'

গাঁয়ের মানুষের উন্নতির জন্য স্কুল কলেজ হাসপাতাল তৈরী হয়েছে, পিচঢালা রাস্তা তৈরী হচ্চে, চাষবাসের ফলন বাড়াতে ডিপ-টিউবওয়েল বসছে, সার সরবরাহ করা হচ্চে, উন্নত ধরনের হাঁস-মুরগীর বাচ্চা জোগান আসছে। গ্রামীণ শিল্প প্রসারে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্চে। সেসব ত' তোমাদেরই জন্যে।'

'সবই বুঝলাম ছোটবাবু। ভেবে দেখুন ত দিনের পর দিন জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে গাঁয়ের মানুষদের জীবন বিষিয়ে দিচ্ছে কারা? খয়রাতির চাল-গম রাতের অন্ধকারে কালোবাজারে পাচার কচ্চে কারা? লেখাপড়াশেখা মানুষ প্রতারণা বেইমানিই বা কচ্চে কেন?'

'মানুষের নৈতিক জীবনে ভাটার টান পড়েছে। স্বার্থসর্বস্ব মানুষ অন্যায়কে অন্যায় বলে ভাবছে না। গায়ের জোরে অবিচার সমাজের বুকে দানা বেঁধে বসেছে। পুঁজিবাদী সমাজকাঠামো এ-সকলের জন্যে দায়ী।'

'পয়সার মোহই কি মানুষকে অন্যায় করতে শেখাচ্চে? কবরের তলাতেও কি মানুষ টাকাপয়সা সোনাদানা সঙ্গে নিয়ে যাবে? খোদার কাছে অন্যায়ের জবাবদিহি করতে হবে না তাকে?

'অর্থের লালসায় মানুষ অন্ধ হয়ে, ধর্ম-অধর্মের কথা ভাবছে না। পরকালের কথা ত নয়ই। গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ভোটের জোরে মুনাফাবাজ লোকেরা সমাজের বুকে পরগাছার মত চেপে বসেছে।'

'ঠিক বলেছ খোকাবাবু, বাবুরা ভোটের সময় বাড়ী বাড়ী ধর্ণা দিয়ে সেবার অধিকার চেয়ে, ভোট ভিক্ষে করে বেড়ায়। ভোটের পর আমাদের চিনতেও পারে না তারা, পাঁচ বছরের মত নিশ্চিন্ত আরামে গদী আঁকড়ে শহরেই থেকে যায়, গ্রামকে তখন মনেও পড়ে না তাদের।'

'ধোঁকা দিয়ে মানুষকে বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যায় না আসগর। দেশের মানুষ দিন দিন জাগছে। জোর করে তাদের অধিকার তারা একদিন আদায় করে নেবে দেখো, ইতিহাস তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, জগতের সমস্ত সম্পদের চেয়ে একজন মানুষের মূল্য অনেক বেশী।'

'তার আগে আমরা শেষ হয়ে যাব বাবু, বন্যা দুর্ভিক্ষ মড়কের সঙ্গে লড়াই করে আমরা টিঁকে থাকব না সেদিন। অভাব অনটন, রোগ ব্যাধি আমাদের নিত্য সহচর। চোর-ডাকাত দল বেঁধে দেশের অনর্থ ডেকে আনছে, এর শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পার।'

'শেষ পরিণতি শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম। যে-সংগ্রামের সৈনিক গড়ে তুলবে তোমরা—আউল বাউল, ফকির দরবেশ, লেখক কবিয়ালের দল। খোদা-তালার নাম গেয়ে বেড়িয়ে তোমরা মানুষকে শেখাবে ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়।'

বিকেলের রোদ পড়ে এলে সালাম জানিয়ে আসগর তার পথ ধরল। তার কথা ভাবতে ভাবতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম কংসাবতীর শীর্ণ জলরেখা বালুচরে ঝিকমিক করে বয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, মানুষের ঘর ভেঙেই নদী মানুষ গড়ছে। লাঠিয়ালকে করেছে ফকির, ডাকাতকে বানিয়েছে সমাজসেবী, ঘরছাড়া মানুষকে ফিরিয়ে এনেছে ঘরে, ঘরের মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে দূরে, নদীর দুকূলে ভাঙাগড়ার মত দেশও নিত্য ভাঙছে গড়ছে। পুরাতনকে ভেঙেচুরে, নতুন করে গড়ে তোলাই বন্যার খেলা।

দূরে গাঁয়ের পথ থেকে আমার কানে ভেসে এল আসগরের পাঁচালির সুর—'মুশকিল আসান কর সাহেব সত্যপীর।' মনে হল মানুষের ভগবানকে সে যেন মনপ্রাণ ঢেলে ডেকে বলছে—মানুষকে মানুষের মত করে গড়ে তোল খোদা, দেশের সুদিন ফিরিয়ে দাও, মানুষের মনে জাগিয়ে তোল দেশাত্মবোধ। আজানের ডাক ভেসে এল মসজিদের মিনার থেকে। ফকিরের গানের সুর মিশে গেল আজানের সঙ্গে। আসগরের জীবনের টানাপোড়েনের একটা রেশ জেগে রইল আমার মনে। অন্ধকারের ভেতর জলস্থল এক হয়ে মিশে গেল ধ্যানগম্ভীর নিস্তব্ধতায়।

প্রদর্শনী

বসন্ত পণ্ডিত সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীটের কেমোল্ড গ্যালারিতে তাঁর ছেচল্লিশখানি জলরঙের ছবির প্রদর্শনী করলেন। তিনি কোন শিল্পবিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা করেননি। শিল্প রচনা তাঁর জীবিকাও নয়। তবে পেশার চাইতে নেশার টান বেশী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। প্রায় প্রতি বছরই মধ্যপ্রদেশের অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে কোন একটি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হিসেবে তাঁকে যেতে হয়। সেজন্য বন্যপ্রকৃতির প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ এসে গিয়েছে। সারা প্রদর্শনীর সবকয়টি ছবিই এইসব জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে আঁকা।

নিজে ছবি আঁকা শিখেছেন বলে কোন বাঁধাধরা টেকনিকে তিনি কাজ করেন না। তবে টেকসচারের দিকে তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ আছে বলে মনে হল। এদিকে তাঁর কাজের মধ্যে বেশ একটা বৈচিত্র্যের লক্ষণ দেখা যায়। সন্ধ্যা বা প্রভাতের আলোর প্রতিফলনের কাজেও তাঁর দক্ষতার অনেকগুলি পরিচয় প্রদর্শনীতে পাওয়া গেল। অরণ্যের স্তব্ধতা ও নির্জনতার যে রূপ কয়েকটি ছবির মধ্যে ফোটানো হয়েছে তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কবি মনের ছাপ দেখা যায়। রুক্ষ ধ্বংসস্তূপের ওপর সন্ধ্যার আলোর সোনালি ছোঁয়া, উপত্যকার ওপর থেকে দেখা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ ও অরণ্যের রূপ, পাহাড়ের ঢালু জমির গায়ে কুটির শ্রেণীর শান্ত অবস্থান, পার্বত্য দৃশ্যের ছবির টেকসচারের বৈচিত্র্য বা পেছন থেকে আলোকিত অরণ্যের বিচিত্র রূপের মধ্যে নিস্তব্ধ প্রকৃতির নানা মেজাজের রূপের পরিচয় পাওয়া গেল। শুধু অরণ্য ও পর্বতের দৃশ্যের মধ্যে একটি প্রদর্শনীতে রঙ রেখা টেকসচার ও মেজাজের বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্যের সন্ধান কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ উপরে উল্লিখিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতার চিকিৎসার জন্যে ব্যয় করা হবে।

●

শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরারের পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জার্মান ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিকের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী গৃহে শিল্পীর নব্বইখানি শিল্পসৃষ্টির প্রতিলিপির প্রদর্শনী হয়ে গেল। এতগুলি ছবির মধ্যে তাঁর পেণ্টিং, কাঠ খোদাই, ড্রয়িং, জলরঙ ও এনগ্রেভিং-এর যেসব মমুনা ছিল তার সাহায্যে ড্যুরারের বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভার বেশ একটা পরিচয় পাওয়া যায়—যদিও

অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ : ড্যুরার

তাঁর বহুবর্ণ চিত্রগুলির প্রতিলিপির মান যথেষ্ট উন্নত বলে মনে হল না। তবে ড্রাফটসম্যান ও গ্রাফিক শিল্পী হিসেবে তাঁর পরিচয় বেশ ভালভাবেই পাওয়া যায় এবং তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কাষ্ঠখোদাইএর বর্ধিতাকার প্রতিলিপির মধ্যে শিল্পীর কাজের সূক্ষ্মতার পরিচয় নতুন করে পাওয়া গেল। সাধারণ মানুষের সরল জীবনযাত্রার কতকগুলি ড্রয়িং এবং বিশেষ করে চাষীদের জীবন নিয়ে করা ছবিগুলির মধ্যে গথিক রিয়্যালিজমের সঙ্গে রেনেসাঁস ডিজাইনের অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। তাঁর যুগের বিরাট ট্র্যাজেডি কৃষক বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভের যে নকসা তিনি করেন তাতে তাঁর সমাজ চেতনার একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। চাষবাস সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি পশু ইত্যাদির ডিজাইনের সাহায্যে করা একটি স্তম্ভের ওপর হেঁটমুণ্ডে এক চাষী উপবিষ্ট তার পিঠে বেঁধা এক তলোয়ার। এতেই কৃষক বিদ্রোহের দমনের স্বরূপটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে করা কাঠখোদাই ও এনগ্রেভিংগুলি তাঁর মুন্সীয়ানা ও ধর্মপ্রাণ চরিত্রের ছাপ বহন করে। বিখ্যাত অ্যাপোক্যালিপস সিরিজের উডকাট এবং সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়নের প্রার্থনা পুস্তকের মার্জিনের ড্রয়িংগুলি তাঁর কাজের সূক্ষ্মতা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় বহন করে। তাঁর শেষ জীবনের করা প্রতিরক্ষা বিষয়ক কয়েকটি উডকাট ও এনগ্রেভিংএর মধ্যে তাঁর প্রতিভার অন্য একদিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ড্যুরার যে একজন অত্যন্ত সমাজ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে একজন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন তার অনেক নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও সেদিকে যথোপযুক্ত জোর দেওয়া হয়নি। লুথারের রিফর্মেশনের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ক্যাথলিক চার্চ ছাড়েননি তারও কোন হদিশ প্রদর্শনীতে বিবৃত শিল্পী পরিচিতিতে পাওয়া গেল না। প্রদর্শনীর সজ্জা ও উপস্থাপনা প্রশংসনীয়।

চাষীর নৃত্য : ড্যুরার

—চিত্ররসিক

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥২৫॥

মেঘুই অপমানিত হয়েছে। তা সত্ত্বে সেই মেঘুই রাঘবের চাকরি রক্ষা করেছে, এতগুলো লোকের নির্বাসন রদ করিয়েছে। তবুও শুক্রীর রাগ যায় না, গায়ের জ্বালাও মেটে না। কোন দিক দিয়ে কি করবে, ভেবে পায় না। মেয়েটাকে ইস্কুল ছাড়াল—বিলির কাছে পড়তে দেবে না। তাতেই কি নিস্তার আছে। পড়শীরা তাকে জ্বালিয়ে তোলে। তাদের মারফৎ নানা খবর আসে—মেঘুর লেখাপড়ার কথা, মেঘুর কাজকর্মের কথা। মেঘু এই করেছে ওই করেছে। শুক্রী আরো জ্বলে ওঠে। তার জেদ চাপে, শর্মিষ্ঠার ওপর কিছুতেই সে উঠতে দেবে না মেঘুকে। কি করে তা করা যায়? কলঘরের কাজ তো আর মেয়ের দ্বারা হবে না। একটা রাস্তা আছে—লেখাপড়া। অনেক ভেবেচিন্তে একটা পথ ঠিক করে। তাই নিয়ে রাঘবের সঙ্গে পরামর্শে বসল শুক্রী। ঠিক পরামর্শ নয়—নিজের ইচ্ছাটা রাঘবকে জানিয়ে দেওয়া। ছেলে তার নেই। একটা মেয়ে, তাকে মানুষ করতে হবে ছেলেরই মতো। টাকা পয়সা কার জন্য? কি হবে? যদি মেয়েটাকেই মানুষ করতে না পারে, তাদের মরাই ভাল। এমনই ধরনের কথায় তার ভূমিকা শেষ হ'ল।

রাঘব ঘাড় নাড়ল—তা তো বটেই। তুর বোধি আছে, তুই ঠিক কহেছিস।

শুক্রী এক ঝাঁজ দিয়ে বলে—ঠিক কহিছি তো হামার বাত্ নাই মান্ছিস্ কেনে?

রাঘবের কানের পাশে এমন বোমা-পটকা প্রায়ই বাজে শুক্রীর প্রস্তাব মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত। তখনও শুক্রীর মুখ থেকে আসল কথা বের হয়নি, শুধু ভূমিকা চলছে। তাতেই রাঘব সায় দিয়ে বললে—মানেছি তো তুর বাত্টা।

স্বভাব অনুযায়ী একটা মনগড়া দায় চাপিয়ে শুক্রী বললে—মান্ছিস্ তো পাঠাইছিস্ না কেনে মাইয়েটাকে?

রাঘব হতবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—কুথায় পাঠাবি?

—ইস্কুলে।

—ইস্কুল তো বন্ধ করি দিলি।

—ঐ ইস্কুল কেনে! ভাল্ ইস্কুল—শহরে।

কুলির ঘরের মেয়ে হয়েও শুক্রী আকাশকুসুম ভাবতে পারে, বিশেষ করে তার যখন পয়সা, ক্ষমতা দুই-ই আছে। হাজার হোক রাঘব পুরুষ মানুষ, সে বোঝে তার সীমা। শুধু পয়সায় ও তার মতো ক্ষমতায় সব হয় না। তার বাচ্চার দৌড় আর কত হ'তে পারে। দু'চোখ বিস্ফারিত করে রাঘব বললে—তু' পগ্লা হোইলি নাকি রে! উ তো ভাগ্গর মানুষ কাম, বহুত্ খরচ!

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে শুক্রী মেঝের ওপর হাত ঠুকল। বললে—তোরে দু'ই টাকা লই থাক। হামি ভাইদের ঠেনে টাকা লই যাই। বলি—উর বাপের টকা নাই আছে। মাইগো! দশটা নাই, পাঁচটা নাই, একটা মাইরে। বলে, কান্না শুরু করে দিল শুক্রী।

শুক্রীর কান্না দেখে রাঘবের দ্বিধা সংকোচ উবে গেল। সে ধরে নিল তার কিছু অর্থ ধ্বংস অনিবার্য; আর মেয়েটার কপালেও দুর্ভোগ আছে। গাধা ঠেঙিয়ে ঘোড়া করবার বৃথা চেষ্টায় রাজী হতেই হবে। সে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—খং (রাগ) করিস কেনে, কান্দ্ছিস কেনে। হামি কি নাই কহেছি নাকি? পাঠাই দিনা। হামি ভাবেছি—কুলি-বাচ্চা কেত্না দূর যাবে?

কান্না থমকে হাসি ভেসে উঠল শুক্রীর মুখেচোখে। রাঘবের শেষের কথাটা তার কানেই গেল না। তখন ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করার ভাব দেখিয়ে সে উঠে গেল সেখান থেকে।

অমন জিতে এসেও শেষ পর্যন্ত শুক্রীর হার হল। রাঘব রাজী হলেও, শর্মিষ্ঠাকে রাজী করান যায় না। তার মনে যাই থাকুক, মুখে সে বলে—বাগান ছেড়ে সে যাবে না, মা-বাবা ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

যতই জেদাজেদি করুক সে, একমাত্র সন্তানের ওপর মায়ের যতটুকু মায়া মমতা স্বাভাবিক, তার চাইতে কোন অংশে কম মায়া মমতা নেই শুক্রীর [illegible] ওপর। অমন কথা সেই [illegible] শুনে, কোন পাষাণী মা তার মেয়েকে দূরে ডিব্রুগড়ে নির্বাসন দিতে পারে!

অগত্যা ঘরেই পড়ার ব্যবস্থা হয়। ইস্কুলের এক মাস্টার আসে পড়াতে। শুক্রী কাজকর্মের অবসরে পড়াশোনার তদারক করে যায়। মাঝে মধ্যে পাশে বসে যায় তার পড়া শুনতে। কিছু না-বোঝার আনন্দ ও গর্বও বেশ অনুভব করে। ইংরেজিটা ভাল করে শেখাতেই হবে, আর কিছু হোক বা না হোক। এই কথাটা বিশেষ করে মাস্টারকে বুঝিয়ে দেয়।

পড়াশোনা ভালই চলছিল এতদিন। কিন্তু বিহুর দিনের ঘটনাটা সব তোলপাড় করে দেয়। লাইনের ছেলেমেয়েদের মুখে শুক্রী শুনল সব কথা—বিলিদের ঘরে খাওয়ানোর কথা, আদর-যত্নের কথা। শুক্রীর অবস্থায় পড়ে, শুক্রীর মন নিয়ে এটা সহজভাবে নেওয়া, বা এটার মধ্যে ভাল কিছু খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। একদিকে পরপর যত ঘটনার স্মৃতি যা তার সংসারটা ছারখার করে দিল, অপরদিকে পড়শীদের হাড় জ্বালানো কথা, এই দুটির মধ্যে শুক্রী অস্থিরভাবে দিন কাটায়। সে সবের যখন যেমন প্রতিক্রিয়া হয় তার মনে, তেমনই চলতে হয় তাকে। তাই শুক্রীর মাথাটা আবার নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল মেঘুর ভবিষ্যতের ভাবনায়। ডাইনীদের হাত থেকে কি করে মেয়েটাকে রক্ষা করা যায়!

শহরের ইস্কুলে পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার। আবার শুক্রী কোমর বেঁধে লাগল মেয়েকে ডিব্রুগড়ের ইস্কুলে পাঠাবার আয়োজন করতে। কিন্তু কোন ফল হল না। শর্মিষ্ঠা সে কথায় কিছুতেই মাথা পাতে না।

শুক্রীর ওপর যেমন রাঘবের কথা চলে না, তেমন শর্মিষ্ঠার মতের বিরুদ্ধে শুক্রীর কোন কথা টিকতে পারে না। বিশেষ করে সে তার লেখাপড়া জানা মেয়ে এবং ঘরেও তার পড়াশোনা ভালই হচ্ছে। মাস্টার বলে—মেয়েটার মাথা আছে, পড়াশোনায় খুব চাড়। চোখের সামনে দেখেও, দিনরাত [illegible] নিয়ে বসে থাকে নিজের পড়বার ঘরটিতে। নিজের খরচে একখানা ঘর তুলে দিয়েছে তার জন্য। হাজার সাধাসাধি করেও বই ছাড়িয়ে ওঠাতে পারে

না, কারো সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করতেও পাঠাতে পারে না। এ আবার আর এক মুশকিল। মাস্টার বলে—এত পড়া ভাল নয়, একটু-আধটু ঘুরে বেড়ানোও চাই।

।।২৬।।

কারখখানার স্টাফ দুটো অংশে ভাগ করা—একটা চা-তৈরি করবার, অপরটি মেকানিক্যাল। কলঘর বলতে যেখানে চা-তৈরি হয় সাধারণতঃ সেটাকেই বোঝায়। কিন্তু, তা ছাড়া মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপও আছে। এই ওয়ার্কশপের ইঞ্জিনীয়ার ডেভিড। তারই হাতে কলঘরের মেসিন-গুলো রক্ষণাবেক্ষণের ও চালু রাখার ভার। প্যাওয়ার-হাউস থেকে বাগানের যেখানে যত মেসিন, লরী, গাড়ি, ট্রলি, স্টিম ইঞ্জিন সবই তার হাতে। ডেভিডের একটা স্টাফ কলঘরে দেখে বেড়ায় মেসিনগুলো ঠিক চলছে কিনা। আর কাঁচাপাতা, প্রডাকসন, তার হিসাব সংরক্ষণ, চালান দেওয়া প্রভৃতি যাবতীয় চায়ের কাজ ফ্যাকটরি-ম্যানেজার এডওয়ার্ড-এর হাতে। ইংলন্ডে এমন নামের সংক্ষেপে বলা হয়—টেড্, কিন্তু এখানে তার তারতম্য হয়েছে। সবাই তাকে সংক্ষেপে ডাকে—এডি। বয়স প্রায় তিরিশ, লম্বা-চওড়া চেহারা, খাড়া নাকের দুপাশে কোটরাগত চোখ। মেঘুর কাজ নিধিরামের সঙ্গে, ডেভিডের ডিপার্টমেন্টে। এডওয়ার্ডের সঙ্গে তার সরাসরি কোন সংস্রব নেই।

দেখতে দেখতে সময় চলে গেল। পরের বছর ম্যানুফ্যাকচারিং সীজন শুরু হবার পর মেঘু এক ধাপ উঠেছে। এখন সেও একজন ভাল মিস্ত্রী। সর্বত্র তার অবাধ গতি। মেঘুর কৌতুহলের শেষ নেই। সব কিছু জানবার আগ্রহে উজিয়ে চলে তার মন, চোখ দুটো অনাবিল ঘুরে বেড়ায় একটার পর আর একটার ওপর। তাই প্রডাকশন বিভাগের কাজগুলো উপরি হিসাবে তার আয়ত্ত হয়েছে। এমনকি মালপত্র চালান দেবার পদ্ধতিও তার অজানা নেই।

একদিন মেঘুর কাজ শেষ হয় দুপুরে। কিন্তু বিশেষ কারণে নিধিরামের নির্দেশে সে সন্ধ্যায়ও কাজে আসে। তখন কতগুলো চায়ের পেটি লরীতে বোঝাই হচ্ছে। মেঘুর নজর পড়ল পেটিগুলোর চালান নম্বরের ওপর। যেসব নম্বরের পেটি সকালে ট্রলিতে বোঝাই হয়ে সুবর্নাশিরি ঘাটে গেছে, লরীর বাকসগলোর গায়েও সেই নম্বর। অথচ তার পরের ইনভয়েস নম্বর দিয়ে প্যাক করা মালও সে দেখে গেছে দুপুরে। তবে এগুলো কি? টি-হাউসের বড়বাবু তখন কারখানায় নেই। দু-একজন বাবুকে জিজ্ঞাসা করে যা শুনল তাতে সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। নিধিরামবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে, সে বলে দিলে—ওসবে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুই তোর কাজ করে যা।

মেঘু পারে না সেটা উপেক্ষা করে শুধু নিজের কাজ নিয়ে থাকতে। কলঘরে কাজ শুরু করার আগেও এমন অনেক কানাকানি কথা সে শুনেছে। হাতের সামনে এমন একটা কাজ পেয়ে চুপ করে থাকার পাত্র মেঘু নয়। সে জানে কেন্দ্রীয় আবগারী অফিসারের ছাড়পত্র সই না হলে এক ছটাক চা-ও গুদাম থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। কাঁচাপাতা ঢোকেই শুরু হয় আবগারী বিভাগের হিসাবের হিড়িক। তারপর মিল-চা, কাটা-চালা, প্যাকিং। বাকি থাকে টি-ওয়েস্ট—ফ্যাপিংস আর সুইপিংস। সবই হিসেবের মধ্যে থাকে যতক্ষণ না আবগারী কর দিয়ে, ছাড়পত্র নিয়ে মাল চালান হয়ে যায়। চায়ের ঝাড়া কুঁড়োরও রেহাই নেই। তাও বিক্রি হয়ে যায় রঙ তৈরির কাজে; নয়তো জ্বালিয়ে ফেলতে হবে সরকারী অফিসারের সামনে। এত কড়াকড়ি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও পেটি ভর্তি মাল সাফ্!

ডেভিড তার ওপরওয়ালা, তাকে জানানো উচিত। কিন্তু মেঘু জানে, সে তখন ক্লাবে। এখন সে কি করে? এডি সাহেব! তাকেই জানাবে। মেঘুকে সে হয়তো চেনে, নয়তো চেনে না! নাই বা চিনল, মেঘু তো তাকে চেনে। উচিত হবে কি ঘোড়া ডিঙিয়ে—? মেঘু জানে ঘোড়ার তখন কি অবস্থা। ঘোড়া তো তখন 'রমএর' নেশায় বুঁদ। হয়তো শুনবে নয়তো শুনবেই না—নয়তো কি করে বসবে তার ঠিক নেই।

এমন ভাবতে ভাবতে মেঘু এ-ডি সাহেবের বাংলোর দিকেই চলল। সে-ও ঘরে নেই ক্লাবে। ফিরতে হল তাকে। তার তুল্য একটা তুচ্ছের পক্ষে কি সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলা উচিৎ, না সেখানে গিয়ে তাদের রসভঙ্গ করাই উচিৎ? ফিটারবাবুই মাথা পাতেন না।

এটা মেঘু বোঝেনা—মাথাটা কলাগাছ নয়, যে কেটে দিলেও গজাবে। সাহেবরা হাজির থাকলেও নিধিরাম এসব নিয়ে মাথা ঘামাতো না। সে অভিজ্ঞ লোক। এসব বড় মানুষের বড় ব্যাপার। এদিকে চোখ দেবার পরিণাম তার জানা। তাই সে চাচার মতো নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে চলে। কিন্তু মেঘু অমন প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে জানে না, শেখেনি। জানত—যদি সে কুলি হত, শিখত—যদি বাবু হত। কিন্তু কুলি ছাড়া সে আর কি? আর কোন চোখে এই বাগানের মানুষ তাকে দেখতে পারে: এ-সংসারের মানুষ তাকে আর কোন ভাবে গ্রহণ করতে পারে! তবুও সে কুলি নয় বাবুও নয়। মেঘু কুলি হয়েও কুলি নয়, বাবু হয়েও বাবু নয়। এখানকার মানুষ যা, তা সে নয় যা ভাবে তাও সে নয়। এটা যদি মানুষের রাজ্য হয়ে থাকে তবে সে মানুষও নয়। অমানুষের রাজ্য হলে সে কি! কিছুই ভেবে পায়না।

রাত্রির অন্ধকারে গৃহস্থের ঘরে মেঘু যেন আগন্তুক দেখেছে। তাই বড় চঞ্চল সে। গৃহস্থকে সজাগ না দেখলে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কিন্তু এখন সে কি করবে! বড় সাহেব বড় বাড়াবাড়ি হবে সেটা। তিনিও বোধহয় ক্লাবে। তবে! এত টাকার মাল এমনি ভাবে চলে যাবে—সে শুধু দেখে যাবে তা। যা থাকে তার কপালে।

—মেঘু, কাম্ অন্।

চকিত ভাবে মেঘু ফিরে দাঁড়াল। তার ডানপাশে এ-ডি সাহেবের গাড়িখানা হঠাৎ ব্রেক্ কষেছে।

এ-ডি সাহেব তবে তাকে চেনেন। তার নামও জানেন! মেঘু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। যাকে সে এত খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাকে সামনে পেয়েও কিছু বলতে পারে না। বলতেও হয় না। তার আগেই এ-ডি প্রশ্ন করে—আর ইউ লুকিং ফর্ মি?

সে বাগানের কুলি, কলঘরে একটা নগণ্য কাজ করে। তার সঙ্গে সাহেব ইংরেজীতে কথা বলছেন! সে যে ইংরেজী শিখছে তাও সাহেবের জানা। সাহেবরা সব খবর রাখেন! বড় আশ্চর্য লাগে তার।

এ-ডি বোঝে ছেলেটা ঘাবড়ে গেছে। তাকে অভয় দিয়ে বলে—ডোণ্ট বি এ্যাফ্রেড্। আই হ্যাভ্ হার্ড্ এভরিথিং, থ্যাংক্ ইউ ফদ্যাট্। গেট্ ইন্ প্লিজ!

এ-ডি নিজেই গাড়িটার চালক—হাত বাড়িয়ে বাঁ-পাশের দরজাটা খুলে মেঘুকে গাড়িতে ওঠার ইঙ্গিত করে।

সব শুনেছে! মেঘু ভাবে—কে বললে? আবার প্লিজ্ বলেন! সাহেব তো বড় ভাল।

সত্যই ভাল। কথাবার্তায় সাহেবরা বড় বিনয়ী। কিন্তু মেঘু জানে না, ওটা সাহেবদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, যে 'দূর হ' বলতেও ওই কথাটা জুড়ে দেবে।

ভয় সে মোটেই পায়নি। তবে কি যে তাকে পেয়েছে তাও বুঝতে পারে না। দরজায় হাত দিয়ে মেঘু অনুনয় করে—না স্যার, আপনি এগোন, আমি হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি।

—কাম্ অন্, মাই বয়! কথার সঙ্গে সঙ্গে এডির বাঁ-হাতটা ঘুরে আসে মেঘুর দিক থেকে নিজের বুকে—হাওয়ার ওপর অর্ধচন্দ্রের রেখা টেনে।

অনুরোধের মতো হুকুম, হুকুমের মতো অনুরোধ। কি সুন্দর সাহেবের হুকুম! অগত্যা গাড়িতে ওঠা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না মেঘুর।

সকালের সিফ্ট্ শেষ হতে এবেলার কাজে কুলি, বাবু, সব বদল হয়েছে। ওবেলা যে ইনভয়েসের মাল ট্রলিতে চালান হয়ে গেছে তারই আর এক সেট প্রতিলিপি বাবুর টেবিলের ওপর পড়ে আছে। সেগুলো দেখায় প্রথম লিপির মতো। এবেলায় বাবুরা জানে না, বোঝে না যে ওবেলা মাল চালান হয়েছে। এমন কাগজ দেখেই তো তারা কাজ করে, যদি বিশেষ করে নির্দেশ মতো কেউ হাজির না থাকে কারখানায়। সাহেব নেই, টি-হাউসবাবুও নেই। সময় বিশেষে এমন হয়ে থাকে। ডিউটি বদলের পর বড়বাবু একটু ঘুরে আসে। তা ছাড়াও যায়, যখন এমন ধরনের কাজ হয়। সেটা খুব কম লোকই জানে। চা-পাতা প্যাক করা পেটিগুলোর গায়ে স্টেনসিল্ মার্কিং আগেই হয়ে থাকে।

বাকি শুধু ইনভয়েস, নম্বর বসানো। সেটা হয় মাল বোঝাই হবার একটু আগে। এদিকে লরীও দাঁড়িয়ে থাকে। অতএব সকলের রুটিন কাজ চলে। তারা মেঘুর প্রশ্নের কি জবাব দেবে? মেঘুর চাঞ্চল্যে সবাই চিন্তিত হয়ে ওঠে. টি-হাউস বাবুর কাছে খবর যায়। সে ছুটে আসে কারখানায়, এডি সাহেবকে ফোন করে। সাহেবের নেশা ছুটে যায়, বেরিয়ে পড়ে ক্লাব থেকে। পথে মেঘুর সঙ্গে দেখা তাকে তুলে নিয়ে আসে কারখানায়। সবাই ভেবে নেয় মেঘুই সঙ্গে করে এনেছে তাকে।

ব্যাপারটা এমনভাবে সাজানো থাকে, যাতে দলের কাউকে ছোঁয়া না যায়, যাতে সমস্ত দোষ ফেলে দেওয়া যায় নিরীহ একজনের ওপর—ইভনিং সিফটের বাবুর ওপর। দল খুব ছোট, কয়েকটি বিশ্বস্ত কুলি, লরী-ড্রাইভার, টি-হাউসের বাবু আর সাহেব। এডি সাহেবের বাড়তি খরচের টাকা তুলে না দিতে পারলে এখানকার বড়বাবু হওয়া যায় না। যারা তার সহচর কোন ভয় নেই তাদের। আগেই মতলব ভাঁজা আছে। কুলিরা বাবুর হুকুম ছাড়া এতবড় কাজে হাত দিতে পারে না। লরীর জন্য অন্য একটা কাজও থাকে। টি-হাউস বাবু তখন অনুপস্থিত, আর সাহেব তো রাত্তিরে কারখানায় বড় একটা থাকে না—শুধু ক্লাব থেকে ফেরবার পথে একটু ঢু-মেরে যায় রোজই। লিখিত কোন হুকুম থাকে না বটে, কিন্তু সাহেবের সই করা কাগজগুলোই তো হুকুমের শামিল। ঐখানেই যত রহস্য। সেসব রবার স্ট্যাম্প এবং তা বোঝার মতো লোক চা-বাগানে নেই। বোঝবার লোক থাকলেও সাহসের অভাব।

মতলবটা মনের খাপে ঢাকা ছিল এতকাল। কাজে লাগাবার দরকার হয়নি কখনো। পেটিগুলো নির্বিবাদে লরীতে তুলে নিয়ে ড্রাইভার নির্দিষ্ট স্থানে খালাস করে এসেছে এতদিন। মহাজন আগেই আসে বড়বাবুর ক্যোয়টারে, ফিসফিস করে কথা কয়—রফা হয় পাউন্ড প্রতি কয়েক আনা কমে। আগাম টাকা দিয়ে যায় বড়বাবুর হাতে। সাহেব ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকে না। সে বড়বাবুর হাতে তামাক টানে। আর সবাই প্রসাদও পায়।

—কার হুকুমে একাজ হয়েছে? এডি গর্জন করে ওঠে কারখানায় ঢুকে। কথার সঙ্গে চোখ দুটো তার ঘুরে আসে সকলের মুখের ওপর দিয়ে—থমকে দাঁড়ায় নাইট-সিফটের বাবুর ওপর। বুঝিয়ে দেয়, কার কাছ থেকে সে জবাব চায়। সে দায়িত্ব যে শেষের লোকটির, তা বুঝিয়ে দেয়।

হতবুদ্ধি বাবুটি কৈফিয়ং দিয়ে বলে—স্যার, আমার টেবিলের ওপর এই মাল চালান দেবার গেট-পাশ আর ইনভয়েস ছিল। আমি সেই নির্দেশেই কাজ করেছি।

—কই দেখি। বলে, এডি হাত বাড়ায় ডকুমেণ্ট দেখার জন্য।

—খুঁজে পাচ্ছি না স্যার কাগজ-গুলো—। তার কথার শেষাংশ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

—হাউ সিলি।

খুঁজে পাচ্ছে না! সময় মতো অমন হয়। অমন কৈফিয়ং সবাই দেয় হালে পানি না পেয়ে। যেমন দৃঢ় তেমন সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় এডি।

—তোমায় বিদায় নিতে হবে এখান থেকে।

—স্যার, আমার কোন দোষ নেই—

—তবে অর্ডার দেখাও।

—সত্যি বলছি স্যার! কে যেন কাগজ-গুলো—

—কোন কথা শুনতে চাই না। যদি ভাল চাও তো রিজাইন কর—সার্টিফিকেট পাবে। আর যদি কথা দাও যে ভালভাবে কাজ করবে, তবে একটা চিঠিও দিতে পারি—অন্য জায়গায় কাজ পাবে। এখানে আর রাখতে পারব না।

দৃঢ়তার ফাঁক দিয়ে এডির করুণাও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। হতে পারে মোটেই তা নয়—ঘটনাটার শেষ করতে বাবুটিকে আর একটা চাকরি দিয়ে হাতে রাখার প্রচেষ্টা। এডওয়ার্ড তো জানে, সে দোষী নয়।

নিরপরাধীর চাকরি যায়। মেঘুর সাহস ও কীর্তিকথা ছড়িয়ে পড়ে সারা বাগানে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় অসত্যের নামও।

॥ ২৭ ॥

এ্যাসিষ্ট মেরিডিয়ম শেষ হতে কিছু বাকী আছে। গটফ্রিড সাহেবের বাংলোর সামনে পোর্টিকো, সেখানে তিনজনই উপবিষ্ট—গটফ্রিড আর তাঁর সামনে টেবিলের অপর পাশে ডেভিড ও এডওয়ার্ড। ফ্যাকটরির নানান কাজকর্ম সম্বন্ধে জরুরী আলোচনা হচ্ছিল। সেসব শেষ হতে এডি বললে—যদিও আমার ডিপার্টমেণ্টের কথা নয়, তবু বাগানের ইণ্টারেস্টে একটা কথা বলার ছিল। যদি অনুমতি হয় তবে—

এডির মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গটফ্রিড বললেন—ইয়েস, বাই অল মিনস, ক্যারি অন।

ডেভিডের পানে তাকিয়ে এডি বলে—কথাটা অবশ্য ডেভিডের বলবার। তবে প্রস্তাবটা তার ডিপার্টমেণ্টের বাইরে চলে যায়, তাই সেও বলতে পারে না। তাই নিছক বাগানের ইণ্টারেস্টে একটা প্রস্তাব করতে চাই। আর—

—কি হে ডেভি! বলে, গটফ্রিড তাকান ডেভিডের পানে।

—আমি তো কিছুই বুঝছি না, এডওয়ার্ড কি বলতে চায়। একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে ডেভিড। সে ভাবে, তার নিজের কোন একটা ত্রুটির কথা এডি বলে বসে বুঝি!

এডি বোঝে সেটা, তাই একটু লজ্জা পায়। সে তৎপর বলে—না-না, ডেভিড কিছুই জানে না, এটা আমার মনের কথা। বলছিলাম কি—মেঘু ছেলেটা বড় বুদ্ধিমান, বড় কাজের।

এডির কথায় ডেভিড আশ্বস্ত হয়। দ্বিধাশূন্য মনে তৎপর জবাব দেয়—হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আমি তো সে কথা জিঃ এমঃ-কে (জেনারেল ম্যানেজারকে) বলেছি বহুবার। তাঁর হুকুমে সে এখন মিস্ত্রী, মাইনেও পায় ভাল। তবে একটা কথা আছে, তার কোয়ার্টারের বিষয়। তার মায়ের একটা কোয়ার্টার প্রাপ্য—সেখানে তো ওরা গেল না। এখন ওরও একটা ঘর পাবার কথা। কিন্তু ওর ধর্ম-বাপকে ছেড়ে ভাল ঘরে থাকতে যেতে চায় না।

গটফ্রিড বললেন—তবে রাবণকে একটা ভাল কাজ দিয়ে ওদের একটা বড় কোয়ার্টার দেও, যাতে সবাই একসঙ্গে ভালভাবে থাকতে পারে।

একা মেঘুতেই অস্থির, তার ওপর আবার রাবণ! কথাটা এডি টেনে নিয়ে বললে—রাবণের উপযুক্ত কাজ ডেভিড বা আমার হাতে নেই বলেই মনে হয়, থাকলে খুশী হতাম তাকে নিয়ে। সে বাগানের কাজ খুব ভাল জানে, মেঘুও জানে। এদের দুজনের কাজই বাগানের পক্ষে বেশী হিতকর হবে।
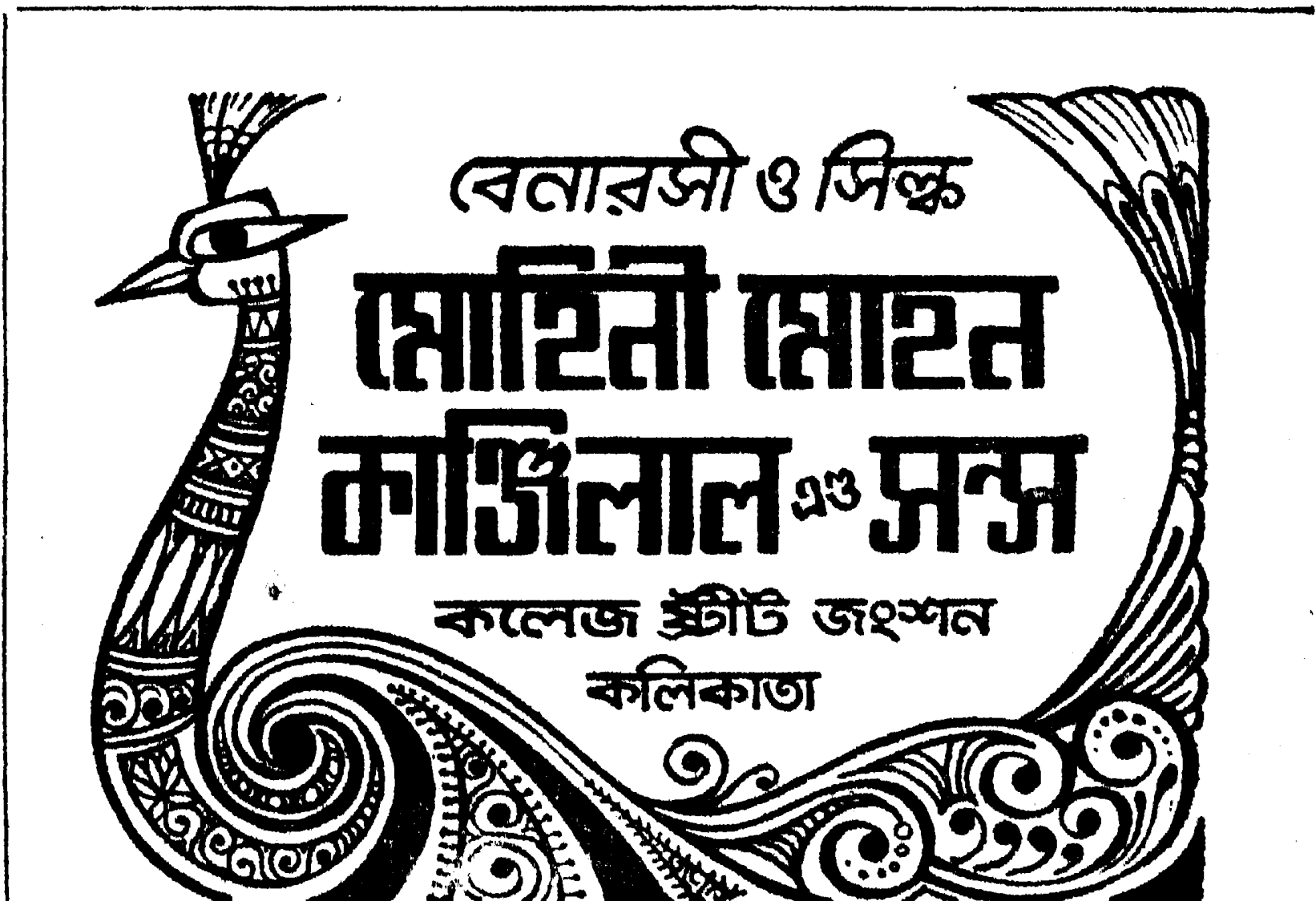
ডেভিড তৎপর বলে—মেঘু তো ভালই কাজ করছে আমার কাছে।

ডেভিডের সঙ্গে রফা করতে এডি বলে—অস্বীকার করছি না সে কথা। আমিও তা খুব ভাল রকম জানি। কারণ ওর কাজ কোন ডিপার্টমেন্টে সীমাবদ্ধ নয়। সেই জন্যই তো আমি চাই ও যাতে উপযুক্ত পুরস্কার পায়। এখানকার কাজের উন্নতি বাগানের কাজেই। তাই জিঃ এমঃকে বলতে চাই—ছেলেটো যখন এত কাজের তখন ওকে বাগানে রাখলে সেখানকার কাজ ভাল হয়, ছেলেটোরও উন্নতি হয়। এই পুরস্কারটা তার।

ডেভিড অনুমান করে, সেই চুরি ধরার সম্পর্কে মেঘুর তারিফে এডি হয়তো কথাটা বাড়াতে চায়। কিন্তু সে কথায় থাকলে তা কোথা দিয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। তাই তাতে কান না দিয়ে ডেভিড নিজের সীমার মধ্যে থাকাটাই উচিত মনে করল। সে বললে—কেন, মেকানিক্যাল লাইনে কি উন্নতি হতে পারে না?

এডি বোঝে ডেভিড নিজের গণ্ডির বাইরে যেতে চায় না। সে তার আসল বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বলে—মাফ কর, তা বলছি না ডেভিড। আমি দেখাতে চাই চা-বাগানে আউটডোর কাজের ইম্পর্টেন্স। তাছাড়া মেকানিক্যাল কাজের উন্নতি নির্ভর করে কতগুলো ফ্যাক্টরের ওপর। প্রথম, বেসিক এডুকেশন—বিশেষ করে অঙ্ক আর কাজ শেখার সুযোগ।

—পড়াশোনা তো ভালই হচ্ছে। আমার মেয়ের ইংলণ্ডের ইতিহাসখানা নিয়ে পোনেরো দিনে শেষ করে ফেলেছে।

দুজনের কথা কাটাকাটির মধ্যে চুপ করে গর্টফ্রিড বোধহয় মেঘুর চরিত্রটা ব্যবচ্ছেদ করে দেখছিলেন। লেখাপড়ার কথায় তাঁর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—আমিও ওকে আসামের ইতিহাস সমেত খান কতক বই পড়তে দিয়েছিলাম, শুনলাম সে সবও শেষ করেছে। আশ্চর্য! এত পড়ে কখন?

বড়সাহেবও তার দিকে! ডেভিড সাগ্রহে বা জয়োল্লাসে বললে—তবে? ছেলেটোর অসম্ভব চাড়—যখন যা বলি, তাই করে ফেলে। এখন নক্‌সা দেখেও কাজ করে। অঙ্ক? ও দুদিনে হয়ে যাবে। দরকার হয়নি তাই বলিনি।

এখানেই শেষ না করে প্রসঙ্গটা টেনে নিয়ে চলল ব্যক্তিগত কথায়। মেঘুর কথা ছেড়ে দিয়ে গেল নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে। বড় বেমানান লাগল সেটা। সে বললে—আর ধরুন, আমিই বা কত লেখাপড়া জানা ছেলে ছিলাম। ছোটবেলায় হ্যাণ্ড-ম্যানের কাজ করে বেড়িয়েছি। তারপর সুযোগ পেয়েছি। তখন কয়েকটা বড় বড় কারখানার কাজ শিখে বেড়িয়েছি বৈ তো নয়। আমিও তো এখানে ভালই মাইনে পাই। আশা করি জিঃ এমঃকে সেজন্য অনুতাপ করতে হয় না। এডওয়ার্ড, সবই নির্ভর করে নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর।

পলকের জন্য গর্টফ্রিডের সঙ্গে এডির একটা দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। এতক্ষণ বেশ বলছিল ডেভিড। হঠাৎ তার নিজের মাইনের কথাটা বেখাপ্পা লাগে। এডির ওপর কটাক্ষপাত বলেই মনে হয় সেটা। এডির মাইনে ডেভিডের চাইতে কিছু কম, তার বয়সও কম। এডির সামনে সারাজীবন পড়ে আছে কিন্তু ডেভিড বুড়ো। তাতেই খোঁচা মেরে কথা! যেন কতই না মাতব্বর। এটা বোঝে না—ওই বয়সে তার কত কামাই হবে। মাইনে, শালিয়ানা বোনাস। ওর চাকরি গর্টফ্রিডের হাতে, তার হোম অফিসের।

অর্ধশ্বেতাঙ্গ ডেভিডের কথার ধরনটা বিশেষ অপছন্দ করে পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ এডওয়ার্ড। তবুও ইংরেজের সহজাত শালীনতা বজায় রেখে সে বললে—মিঃ ডেভিড, তোমার মতো ট্যালেণ্ট সকলের মধ্যে আশা করা যায় না। এবং তা করলে হতাশ হবার সম্ভাবনাই বেশী। ইংরেজী সে শিখছে, আরো শিখবে, কিন্তু অঙ্কে হয়তো আটকে যেতে পারে। টি-হাউসের কাজে তার দরকারও নেই। মেসিন-সপে গেলেই তা লাগবে। হয়তো আর কিছুদূর এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াবে।

এডির কথায় ডেভিড খুব খুশী হল, কিন্তু মেঘুর ব্যাপারে সে নাছোড়বান্দা। সে বললে—বেশ তো, দেখাই যাক না কি হয়। তার প্রতি সকলের সহানুভূতি থাকলে বদলে দিতে কতক্ষণ লাগবে!

দু-হাতের তালু একসঙ্গে চেপে ধরে এডি বললে—দ্যাটস মাই পয়েণ্ট। সহানুভূতি সব সময় থাকতে পারে, কিন্তু সুযোগ নাও থাকতে পারে।

কথার শেষে এডি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল গর্টফ্রিডের পানে তাঁর সমর্থন লাভের আশায়।

এডির কথায় সায় দিয়ে গর্টফ্রিড বললেন—তা ঠিক বলেছ।

তার কাজ হয়ে গেছে। বড়সাহেবের কথার পিঠেই এডি বললে—এখন সুপারভাইজিং স্টাফ নেওয়া হবে, এই সুযোগ সে কাজে মেঘুকে নেবার। আমি জানি, ওদিকেও ছেলেটোর যথেষ্ট ট্যালেণ্ট আছে। লেগে থাকলে যে কোন ছোটখাটো বাগানে ম্যানেজারও হতে পারবে। অবশ্য এখানেও অনেক উন্নতি হতে পারে তার ক্ষমতা অনুযায়ী। কিন্তু ওখানে, অর্থাৎ কারখানার কাজে এতটা উন্নতির আশা দিতে পারা যাবে?

ডেভিড কল-কব্জা নাড়াচাড়া করে, বাগানের অত খবর সে রাখে না। সেখানে যে কি দিয়ে কি হতে পারে, তার মোটামুটি জ্ঞান থাকলেও অত খতিয়ে দেখার প্রয়োজন কখনো হয়নি। তাই সেখানকার কাজকর্মের সঙ্গে তুলনা করে মেসিন-সপে কতখানি উন্নতি হতে পারে তাও বলতে পারে না। তবুও একটু হেলেদুলে সে বলে—সুপারভাইজিং কাজ!

ডেভিড ঠিক পায় না কোন কাজের কথা এডি বলতে চায়।

এডি বুঝল—গর্টফ্রিডের মন সায় দিয়েছে তার কথায়, ডেভিড পড়েছে ভাবনায়। সেই সক্রিয় মুহূর্তের নিষ্ক্রিয় ভাবের সুযোগটা সে অপব্যবহার করল না। সে বললে—ডেভিড, তুমি আর আপত্তি কোর না। আমি ছেলেটোর ভালর জন্যই জিঃ এমঃ আর তোমার সামনেই কথাটা তুলেছি। আমার প্রস্তাব তাঁর অপছন্দ হলে তিনিই তাতে রাজী হতেন না। এই অভাগা ছেলেটোকে আমাদের চাইতে অনেক বেশী ভালবাসেন তিনি।

এডির কথা শেষ হতেই গর্টফ্রিড একটু হেসে বললেন—তা ঠিক, তবুও ঠিক নয়। আমি তো দেখছি তোমরা দু-জনও মেঘুকে কম ভালবাস না। —বুঝলে ডেভি, এডির কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। বাগানের কাজে ওর উন্নতি হবে দ্রুত। আমরাও ভাল কাজ পাব মেঘুর কাছে। সে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে চেয়েছিল, তাই সেখানে দিয়েছিলাম। এখন বাগানে দিতে হলে, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করা চাই তো।

সোৎসাহে এডি বললে—আপনি যদি তাই মনে করেন তবে সে নিশ্চয়ই তা করবে।

এক পলের জন্য চিন্তা না করে গর্টফ্রিড বললেন—আমি সে বিশ্বাস রাখি।

গর্টফ্রিড ভেবে দেখেন এখানে কত প্ল্যানটেশন, কত কাজ। সেই অনুপাতে লেবার-ফোর্স কম। মেঘু যখন বাগানে হাজিরা খেটেছে, তখন থেকে দলকে-দল ওর সঙ্গে দু-তিন হাজিরা কাজ করতে শুরু করেছে। কুলিদের ওপর অদ্ভুত প্রভাব মেঘুর। সে বাগানে কাজ করলে কুলি সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। ওর কাজও খুব পরিষ্কার।

খুশী হয়ে গর্টফ্রিড বললেন—তোমরাই বলে দিও—আমি ওকে জমাদারের পদ দিতে চাই। ওর বাবাকেও মুহুরীর কাজ দেব।

এক ধাপ টপকে জমাদার! আবার বাবাকে বাবুর কাজ! খুবই আশ্চর্য হল ডেভিড।

অপরাপর অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো চা-বাগানেও যেমন কাঁচা পয়সা লোটবার সুযোগ আছে, তেমনি ব্যবস্থাও কড়া। তবু চুরি হয়। যারা ফিকিরে থাকে, তারা পথ বের করে নেয়। সময় বিশেষে ধরা পড়ে নীচের ধাপের লোক। তাই তা প্রকাশ পায় নীচের স্তরের কার্যকলাপ হিসেবে। ওপরের লোক খুব হুঁশিয়ার। তাদের বোঝা শক্ত, জড়ানোও শক্ত, ধরা তো দূরের

কথা। কারই বা অত হিম্মত থাকে। সেই চুরির কথা শুনে ডেভিডের মনে হয়, ওটা বাবুরই কাজ। কিন্তু চতুর নিধিরাম সব বোঝে, সব জানে। কিন্তু মেঘু যে কোন ধাতুতে গড়া তা নিধিরামের জানা। তাই তাকে কিছু বলবার মতো সাহস তার ছিল না, শুধু নিজের কাজ নিয়ে থাকতে উপদেশ দেয়। তা সত্ত্বেও সে যখন অতটা করে বসল তখন মেঘুকে বাঁচাবার জন্য ডেভিডকে কথাটা না বলে পারল না নিধিরাম। ডেভিড তাতে খুবই বিস্মিত ও বিচলিত হয় বটে, কিন্তু নিধিরামকে সে অভয় দেয়।

তাই সেই ঘটনার পর ডেভিডের একটা আশঙ্কা ছিল। এডির কোপ থেকে রক্ষা করে মেঘুকে কলঘরে রাখা খুব শক্ত হবে। তাকে মেসিন-সপে নিলে, আবার নতুন করে সে-কাজ শেখার ঝামেলা। তাই প্রথম থেকেই সে নানা ওজর আপত্তি করছিল। কিন্তু গার্টফ্রিডের কথায় সে নিশ্চিন্ত হল, খুশী হল। মনে মনে ডেভিড অসংখ্য ধন্যবাদ দিল এডিকে। কিস্তিমাতের চালটা ডেভিডের সাদাসিধে মাথায় কোনমতে ঢুকল না। সে ধরে নিল নিধিরাম সরল ও সামান্য বুদ্ধির মানুষ, নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছে। মেঘুকে অপছন্দ করলে এডি বড়সাহেবের সামনে অমন তর্কাতর্কি করতে যাবে কেন তাকে অত ভাল কাজ দেবার জন্য!

এডওয়ার্ড হাসতে হাসতে বললে—কি ডেভিড! এবার খুশী তো?

ডেভিড লজ্জায়, সংকোচে, কৃতজ্ঞতায় একেবারে মিইয়ে পড়ল। মুখে একটু হাসি টেনে বলল—নিশ্চয়ই! মাফ্ কোর এডি, আমরা মিস্ত্রী-মজুর লোক, মাথায় শুধু লোহা-লক্কর ঘোরাফেরা করে। বাগানের কথা কিছুই বুঝি না। তাই তোমার সঙ্গে তর্ক করেছি।

গার্টফ্রিড হোঃ হোঃ করে হেসে যেন সকল তর্কের মীমাংসা করলেন। বললেন—আই অ্যাপ্রিসিয়েট। বাগানের কিছু বোঝবার জন্য মাথা দেওনি বলেই আমার কারখানাটা ঠিকমতো চলছে। তুমি যেন বাগানের কিছু বুঝতে যেও না। তবে আমার কারখানা অচল হবে।

গার্টফ্রিডের হাসি ও ঠাট্টায় ডেভিড সহজ হল, প্রেরণাও পেল। সেও পাল্টা রসিকতা করে বললে—আজ্ঞে স্যার, বাগানের কাজও কম জানি না আমি—লাইট-প্রুনিং, মিডিয়ম-প্রুনিং, ডীপ-প্রুনিং আর কলার-প্রুনিং (গোড়া-কাটা)। কিন্তু হাতে ছুরি দিলে কলার-প্রুনিং করে দিয়ে বলব—এই পাত্-কলম।

চা-গাছে কলম কাটার পক্ষে, নীচে বা ওপরে দু-দিকেই ওই দু'টো চূড়ান্ত। তাই তুলনাটা বেশ লাগল। হো হোঃ করে হেসে উঠল সবাই।

।। ২৮ ।।

কথাটা শোনামাত্র গেনী ছুটে এল শর্মিষ্ঠার ঘরে। হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে জানাল মেঘুর নতুন পদোন্নতির খবরটা। তারপর তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিশেষ কিছু একটা শোনবার আগ্রহে। কিন্তু তার কিছুই হল না। এমন কি অন্য সময় যেমন স্বাভাবিক ব্যবহার করে তেমনও করল না।

শর্মিষ্ঠার চোখ দুটো যেন হেসে উঠে এক পলকের জন্য গেনীর মুখের ওপর পড়ল। পরক্ষণেই গেনীকে অবাক করে শর্মিষ্ঠার চোখ ফিরে গেল বই-এর পাতার ওপর। পড়তে নয়, ভাবতে বা অমনই কিছু একটা করতে।

এতবড় একটা খবর, তা মেয়েটার মনেই ধরল না! শর্মিষ্ঠার ভাব দেখে গেনী বেশ হতাশ হল, নয়তো রেগে উঠল। তার গায়ে এক ধাক্কা দিয়ে গেনী বললে—ওদিকে কি এমন মধু আছে শুনি! শোন না আমার কথা।

তাচ্ছিল্য করে শর্মিষ্ঠা বলে—বল না, শুনব তো কান দিয়ে।

আবদারের সুরে গেনী বলে—মুখ না দেখলে কি কথা বলা যায়!

শর্মিষ্ঠা ফিরে তাকাল। বললে—বল।

শর্মিষ্ঠার মাথাটা টেনে তার কানের পাশে মুখ নিয়ে গেনী চুপিচুপি বললে—আমাদের সঙ্গে পাতা তুলতে যাবি?

গেনীকে ঠেলে দিয়ে শর্মিষ্ঠা তৎপর জবাব দিলে—না-না, আমার সময় নেই।

চোখেমুখে লোভ দেখানোর ভাব খেলিয়ে গেনী বললে—চল না দেখবি কেমন মজা করব।

যেন মন্ত্রের মধ্য থেকে কথাটা বেরিয়ে এল—কি মজা?

চোখ দুটো রকমারি করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেনী বললে—দেখবি কেমন খেপাব মেঘুকে।

আবার মুখ ফেরায় শর্মিষ্ঠা, বলে—না-না, আমি ওসব পারব না।

তাকে অভয় দিয়ে গেনী বলে—তোকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমরাই করব, তুই শুধু দেখবি।

শর্মিষ্ঠার মনের কথা ফুটে ওঠে মুখে—হাঁ, সেই মেঘু আছে কিনা!

গেনী আত্মবিশ্বাস হারায় নি। দেহটা টান করে খাড়া হয়ে সে বললে—ইস্, আমাদের সঙ্গে রাশ টেনে চলবে! তেমন ক্ষমতা ওর হবে নাকি কখনো? যত বড়ই হোক না কেন!

গেনীর হাত থেকে এড়াবার জন্য শর্মিষ্ঠা বলে—না ভাই, তোরা কর্ গে-যা যা খুশী। আমায় যেতে দেবে না মা।

এমন সময় হঠাৎ শুক্রী এল শর্মিষ্ঠার ঘরে। বললে—ও গেনী এসেছিস। আমি ভাবি কার সঙ্গে কথা কইছে শুর্মি! বোস মা বোস, আমি তোর জন্য চা করে আনছি।

শুক্রী খুশী হয়েছে গেনীকে সেখানে দেখে। শর্মিষ্ঠা তো যায় না কোথাও। তবু ওরা আসে, দু-দণ্ড কথা বলে যায়!

গেনীর মাথায় একটা ফন্দি এল। শঙ্করীর সাহায্য পাবার জন্য শর্মিষ্ঠার ওপর দোষ চাপিয়ে বললে—দেখ্ না জেঠী, ও কিছুতেই আমাদের সংগে যেতে রাজী হচ্ছে না।

গেনীর কথায় সায় দিয়ে শঙ্করী বললে—হাঁ মা, ওই তো ওর দোষ। কত বলি যা যা, একটু ঘুরে আয় মাথায় হাওয়া লাগিয়ে। তা নয়, শুধু বই আর বই। বাবাঃ, এমন মেয়ে দেখিনি।

শর্মিষ্ঠা তার মায়ের মন জানে। সে গেনীকে জব্দ করবার জন্য বললে—হুঁ, তোদের সংগে মা যেতে দেবে কিনা!

শর্মিষ্ঠাকে কোণঠাসা করবার জন্য গেনী বললে—হাঁ জেঠী, আমাদের সংগে শর্মিকে যেতে দিবি না?

শঙ্করী অবাক! নিজেকে দায়মুক্ত করতে বলে—ওমা, সে কি কথা! কেন যেতে দেব না? দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকে। কত বলি—যা, যা ওদের কাছে—দু-দণ্ড হাসি-ঠাট্টা করে দেহমনটা হাল্কা করে আয়। তা নয়—

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বললে—বল্-বল্, কোথায় নিয়ে যেতে চাস তোরা।

শঙ্করীর আড়ালে, শর্মিষ্ঠাকে তর্জনী দেখিয়ে গেনী শাসন করল—সে যেন চুপ থাকে। বললে—যেখানেই নিয়ে যাই না, জেঠী আমাদের সংগে তোকে যেতে দেবে কিনা সেটাই আসল কথা।

গেনীর চিবুক ধরে শঙ্করী স্নেহ চুম্বন করে বললে—তোরা আমার মেয়ের সমান, শর্মি কি বলছে পাগলীর—

গেনীর ইংগিতটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল শর্মিষ্ঠা। চোখ কুঁচকে, মুচকি হেসে গেনীকে জব্দ করতে গেল। সে বললে—হাঁ পাগলীর মতো! ওরা পাতা তুলতে নিয়ে যেতে চায় মা।

দিলে শর্মি তার মতলবটা ভণ্ডুল করে! কিন্তু গেনীও কম ধূর্ত নয়। সে তৎপর বললে—পাতা তোলা কি খারাপ কাজ জেঠী? আমাদের গুষ্ঠি পাতা তোলে। তুইও তো জেঠী কত পাত্ তুলেছিস—তোর কত নাম ছিল পাত্ তোলায়, শুনি তো এখনো।

শঙ্করীর জাত গুষ্ঠির সব মেয়েরাই বাগানের সব কাজ করে, পাতা তো তোলেই। যে ভাল পাতা তুলতে পারে, তারই সংসার হয় সচ্ছল। যেই সচ্ছলতার জোরে বাগানের কাজ থেকে সে বিদায় নিতে পেরেছে, সেই গর্বে সজাগ তার মন। যদিও রাঘবের পদোন্নতির সংগে সেই গর্বটা উঠে গেছে খানদানীর পর্যায়। কিন্তু গেনীর কথায় শঙ্করীর মন একেবারে গলে গেল। মুহূর্তে উবে যায় তার মান-মর্যাদা, যত গর্ব। কৈশোর ও যৌবনের পাতা তোলার স্মৃতি মধুময় হয়ে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। যে কাজ সে নিজে করেছে তা কি ছোট কাজ হতে পারে?

আর কিছু ভেবে দেখার সময় শঙ্করী পেল না, অথবা তার মন তাকে ভাবতে সুযোগ দিল না। সে বললে—হাঁ, পাত্ তোলা খারাপ কাজ! কে বললে? আমার ঠানদিদির ঠানদিদি, আমার শ্বশুর ঘরের চোদ্দ পুরুষ পাত্ তুলেছে। আজ শর্মির কাছে পাতা তোলা হল খারাপ কাজ! এই পাতা তোলার পয়সা খেয়ে ওর দেহটা অত বড় হয়েছে। বুড়ো আর ক'টা টাকা দরমাহা পেত? আমার পাতা তোলার পয়সা দিয়েই তো সব হয়েছে এককালে। সেই পাতা তোলা—

মাকে থামিয়ে দিতে, শর্মিষ্ঠা নিজেকে দোষমুক্ত করতে বৃথা চেষ্টা করল। শঙ্করীর এক ধমকানিতে চুপ করতে হল তাকে। সুযোগ পেয়েছে, যেটুকু বলবার তা না বলে সে থামবে না।

শঙ্করী বলে চলল—থাম! আর তর্ক করতে হবে না। এখন তো ও-সব বলবেই। ও-ই একটা সর্দারের মেয়ে, আমাদের বাপ-চোদ্দ পুরুষ ধাঙ্গাড় ছিল লো। আমার দুটো ভাই চোখের সামনে, কি কাজ করে তোরা দেখছিস না?

শর্মিষ্ঠা বুঝল, ওর সংগে বাক যুদ্ধে তার হার অবধারিত। তাই আবার মাকে ঠাণ্ডা করতে গেল। সে বললে—মা, শুধু শুধু রাগ করছিস কেন? আমি কি পাতা তোলা ছোট কাজ বলেছি নাকি?

শর্মিষ্ঠার কাছে সকল সময় শঙ্করীকে হার মানতে হয়। সেটা তার গৌরবের বিষয়। সে লেখাপড়া জানা মেয়ে, অতএব তার বুদ্ধি বেশী। তবুও অমন মেয়ের কাছে এক-আধবার জিতে আসার ইচ্ছাটা তার প্রকট হয়ে ওঠে। অন্ততঃ রাঘবের কাছে মানটা বাড়িয়ে নিতে। কিন্তু তা আর হয় না। তাই তখন সুযোগ বুঝে, গেনীর আড়ালে থেকে, শঙ্করী নিজের স্বাভাবিক মূর্তি মেয়ের সামনেও তুলে ধরেছে।

সে গলা চড়িয়ে বললে—আলবাৎ বলেছিস! এই তো গেনীও শুনেছে। না রে গেনী?

গেনীর কাজ হয়ে গেছে। সে সায় দিয়ে বললে—হাঁ জেঠী, বলেছে বৈ কি। তবে কাল থেকে ওকে পাতা তুলতে নিয়ে যাব—ওর ভিরকুটি ভাঙব।

শর্মিষ্ঠা জিতে আসতে পারে এখান থেকে। কিন্তু তাতে গেনীর ক্ষতি হবে। তার ওপর শঙ্করী বড় রেগে থাকবে। তাই সে চুপ করে রইল গেনীর পরিণাম ভেবে।

মেয়েকে পাতা তুলতে পাঠাবার প্রস্তাবে শঙ্করীর বুকের ভিতরটায় বেশ ধাক্কা লাগে। কিন্তু সে চলে গেছে অনেক দূরে। সেখান থেকে ফিরলে তো তার হার হয়ে যায়। সে প্রশ্ন আর কোন মতে আসতে পারে না। তাই অসুস্থ অবস্থারও শঙ্করী যা করতে পারত না, সুস্থ অবস্থায় তা করে বসল।

শঙ্করী অম্লানে বলে দিলে—হাঁ মা, কাল থেকে ওকে নিয়ে যাবি। মাথায় একটু হাওয়া লাগুক। দিনরাত পড়া আর পড়া। যদি না যায় তো দেখবে মজা?—এই দেখ, তোকে চা খাওয়াবার কথা ভুলেই গেছি। তুই একটু বোস মা। আমি জলপান নিয়ে আসছি।

বিজয় গর্বে শঙ্করী চলে গেল ঘরের বাইরে। কাজ যখন হয়ে গেছে তখন ওখানে থেকে আর লাভ কি। ওখানে থাকলেই বরং মেয়েটা ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে। একবারও শঙ্করীর মনে হল না যে গেনীর সামনে মান সম্মান রক্ষা করতে যা করে বসল, তাতেই তার মান সম্মান নষ্ট হল।

শঙ্করী চলে যেতে শর্মিষ্ঠা গেনীকে বললে—কি মেয়ে বাবা! আমাকে গালমন্দ খাওয়ালি তো!

বিজয় গর্বে অথবা আদর করে শর্মিষ্ঠাকে জড়িয়ে ধরে গেনী বললে—তা নইলে কি জেঠী অত সহজে রাজী হত? দেখি কাল সকাল পর্যন্ত মতটা থাকে কিনা!

—তা থাকবে।

—কি করে বুঝলি?

—খুব সোজা কথা। বাবা এসে শুনলেই আপত্তি করবে। একটা রাগারাগি হবে—মায়েরও জেদ বাড়বে। তারপর কি হবে, তা তো জানিস।

শর্মিষ্ঠার সমীক্ষণের প্রশংসা করে গেনী বললে—ঠিক আছে। তুই কিন্তু জেঠার পক্ষে যোগ দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিবি না যেন। বল, কথা দে।

শর্মিষ্ঠার ভাবনাটা বুঝতে দিল না গেনীকে। এমনকি তার কথা দেবার কথাটাও এড়িয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিল—আমার কিন্তু ভাই ভাল মনে হচ্ছে না।

কাজ হাসিল করতে সহজভাবে গেনী বললে—চল না, ভাল না লাগে আর যাবি না।

—হাঁ, পাত্ তোলার কিছু জানি না—একদিনের জন্য গিয়ে নাম খারাপ করি, লোক হাসাই।

শর্মিষ্ঠার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে, তাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করে গেনী বললে—ওগো ঠাকরুণ, নাম খারাপ না করলে মেঘুর কাছে নাম হবে না, লোক হাসানো কাজ না করলে মেঘুর হাসি দেখতে পাবে না।

একটু লজ্জা, একটু তাচ্ছিল্যতা মিশিয়ে শর্মিষ্ঠা বললে—যাঃ! চাই না আমার নাম, চাই না কারো হাসি।

চোখ টান করে, দু-পা পিছু হটে, তর্জনী তুলে গেনী শাসিয়ে উঠল—চাই না তো? ঠিক!

মুখ ফিরিয়ে, চাপা গলায় শর্মিষ্ঠা বলল—চুপ! ঐ মা আসছে।

(ক্রমশঃ)

নদীতে নীলকমল

শংকর দাশগুপ্ত

পারাপারের নদীতে রাত তখন গভীর হয়ে নামছে।

'আইজ আর বুধহয় আসবে না কেউ, রাত প্রায় বারোটা হতি চললো', নতুন করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নদীর বুকে নেমে আসা রাত দেখতে দেখতে ভাবলো নীলকমল।

প্রথম শীত এখন। হালকা কুয়াশায় জ্যোৎস্না মোটামুটি স্পষ্ট। নতুন জ্বালানো বিড়িটায় প্রথম টান দিতে দিতে একনজরে জনশূন্য নদীর ঘাট, দূরে চলে যাওয়া পথ, পথ জুড়ে জ্যোৎস্নায় ভেসে থাকা হালকা কুয়াশা দেখে নিচ্ছিল নীলকমল।

চারপাশ থমথমে। নদীর জলে ম্লান ছলাৎছল ঢেউ। ঢেউএর মুকুটে জ্যোৎস্না খেলা করছে। আকাশে ওলটানো একবাটি দুধের মত চাঁদ। দেখতে দেখতে নীলকমল অনুভব করছিল এইসব মায়াবী জ্যোৎস্না। এ রাত তাকে বড় একা করে দেয়। এপার ময়নাডিঙি, ওপার বাবুইহাট। সারাদিন খেয়া পারাপার। নীলকমল ছাড়া অন্য মাঝিরা বড় সুখ-বিলাসী। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে যায়। নীলকমল ফেরে না। রাতের যাত্রী ধরার জন্য বসে থাকে একা। আসলে টাকার লোভ নয়, ঘরের টান নেই নীলকমলের। এই রাত, এই নদী তার বড় আপন, স্বজনবন্ধুর মত হয়ে গেছে।

বিড়ি টানতে টানতে নদীর ধারের ঢালু পথটার দিকে তাকায় নীলকমল। মধ্যেখানে ঝুরিনামা মস্ত এক বটগাছ। যাত্রীদের দিনের বেলার ছায়া-আশ্রয়। পান সিগারেটের দোকান খোলে অনন্ত। এখন ফাঁকা। শুধু বটগাছের ফাঁক ফোকড় দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শূন্য জায়গাটাতে। দেখতে দেখতে নীলকমলের চোখে পড়ে যেন মানুষজন। জ্যোৎস্নায় দেখার বড় ভুল হয়। ভালো করে দেখে নীলকমল, 'হ্যাঁ জনমানিষ্যিই, নিশ্চয়।' ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে দুজন ঝুরিনামা বটগাছের তল দিয়ে। তারা আরো এগিয়ে এলে নীলকমল বোঝে, জ্যোৎস্নায় প্রায় স্পষ্ট দেখতে পায় এক মিঞাসাহেব আর সঙ্গে তার বিবিজান। ঢালু নদীর পারের পথ ধরে এগিয়ে আসছে তারা।

'ও মাঝি, যাবা নাকি?' হাঁক পাড়ে মিঞাসাহেব তীরে দাঁড়িয়ে।

'কনে বাবু?' উঠে দাঁড়ায় নীলকমল।

একটু এগিয়ে আসে মিঞাসাহেব। বিবিজান দূরেই দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে টিনের সুটকেশ মিঞাসাহেবের।

'সাহেবগঞ্জ', উত্তর দেয় মিঞাসাহেব, পীর্টারনটা ফ্যাল করে ব্যাবাক পথ হাঁটতি হাঁটতি অ্যালাম যদি লাও পাই। পাতক্কালের মধ্যে পৌঁছানো বড় জরুরী। বাবা নাকি মাঝি?'

'তা যাতি পারি', জরুরী শুনে মনে মনে চড়া দর ঠিক করে ফেলে নীলকমল। পাটাতনের কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'তা কত দিবেন?'

'পুরোই দেবো আনে, পাঁচ, পাঁচ ট্যাকা!'

'সাত করেন কত্তা, পাঁচ তো এমনিতেই রেট। এত রাত, শীতও', অপেক্ষা করে নীলকমল উত্তরের।

'এট্টু বেশী হইল না?' ভাবে মিঞাসাহেব, 'আইচ্ছা তাই সই', রাজী হয়, 'অ্যাসো বিবিজান, অ্যাসো, অ্যাসো!'

গোড়ালী-জলে নেমে দাঁড়ায় নীলকমল। বোরখাপরা ছোট্টখাট্টো বিবিজান নড়ে ওঠে। হাত ধরে বিবিজানকে নৌকায় তুলে দেয় মিঞাসাহেব। পাশে দাঁড়িয়ে নীলকমল দেখে মিঞাসাহেবের দাঁড়িতে মেহেন্দী, চোখে সুর্মা, বাহারী নাগরা জুতো পায়, শরীরে আতরের গন্ধ। দাঁড় খুলতে খুলতে নীলকমল ভাবে দামটা পুরো দশ হাঁকলেই ভালো হতো। মিঞাসাহেব পয়সা-বালা লোক।

লগি হাতে তুলে নেয় নীলকমল। লণ্ঠনটা আগে থেকেই জ্বলছিল ছইএর মধ্যে। পাতলা জ্যালজেলে পর্দা হাওয়ায় একটুআধটু দোলে। হাতের জোরে লগি ঠেলে নীলকমল। ক্রমে মাঝনদীর দিকে এগিয়ে যায় নৌকা।

অন্যমনস্কভাবে রাত, নদী, নদীর ছোট ছোট ঢেউএ জ্যোৎস্নার খেলা দেখছিল নীলকমল। হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে ছইএর দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। রাঙি না! বুকের ভিতরটা ভীষণ কেঁপে উঠল নীলকমলের। আজই ছইএর লণ্ঠনে নতুন কেরোসিন ভরেছে, জ্বলজ্বলিয়ে জ্বলছে লণ্ঠন। স্পষ্ট আলো এসে পড়েছে বিবিজানের মুখে। মুখ থেকে বোরখার আড়াল খসে গেছে বিবিজানের। কি এক মজার কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে বিবিজান মিঞাসাহেবের বুকে। চোখ কুঁচকে ভালো করে আবার দেখলো নীলকমল। বুক জুড়ে বেজে উঠছে নীলকমলের চড়কপুজোর বাদ্যি। চোখের সামনে বনবনিয়ে ঘুরছে নাগরদোলা। লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট জ্বলছে বিবিজানের মুখ। সেই চোখ, সেই বাদামী চোখের তারা, সেই হাসলে পরে বাঁ গালে টোল। চিনতে এতটুকু কষ্ট হয় না, ভুল হয় না নীলকমলের। রাঙি! হ্যাঁ রাঙিই!...

বুড়ী পিসিমাই জোর করে বিয়ে দিয়েছিল। পাশের গায়ের পরানমাঝির মেয়ে রাঙি। ষোল বছরের ডগ[illegible] মেয়ে। দেখতে পর্যন্ত দেয়নি পিসি নীলকমলকে নিজেই পাকা কথা দিয়ে এসেছিল। আর নীলকমল? নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে ভাবতো, কেমন সে মেয়ে? চোখ দুটো তার ডাগর তো? গায়ের রং? শরীল? জোয়ারের শব্দ শুনতে পেতো নীলকমল তার শিরায় শিরায়। ছলাৎ-ছল রক্তের ভিতর।

সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় বিয়ে। শুভদৃষ্টির সময় কনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর পলক পড়েনি নীলকমলের। ভোমরার মত চোখ। তা আবার কালো নয়, বাদামী ভোমরা। দুধে আলতা গায়ের রং। মনে মনে পিসির পছন্দের সুখ্যাতি করেছিল নীলকমল।

নতুন বউ ঘরে এনে সেই আশ্বিনেই পিসি চলে গেল ঘর ছেড়ে। নদীর বুকে বৈঠা মারতে মারতে পিসির জন্য কান্না পেতো নীলকমলের।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসতো তখন। উনোনে ভাত ফুটতো। আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করতো রাঙির ফর্সা মুখ। নীলকমলের রক্তে তখন জোনাকির খেলা। নেশা ধরতো নীলকমলের। পেছন থেকে চুপি চুপি গিয়ে দুহাতে কোলে তুলে নিতো রাঙিকে। অসহায় রাঙি হাত-পা ছুঁড়তো। হাজার দানার শক্তি তখন নীলকমলের শরীরে। সোজা শোবার ঘরে এসে বিছানায় ফেলতো রাঙিকে। খিল দিতে ভুল হয়ে যেতো দরজার।...

রাতে পোড়া ভাত খেতে হতো সেদিন নীলকমলকে। ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি নিয়ে চেয়ে থাকতো রাঙি। হাসি মুখে পোড়া ভাতই সাপটে খেতো নীলকমল। ঠোঁটের কোণে হাসি আর চোখের বাদামী তারায় মিথ্যে 'আহারে, আহারে' ভাব করতো রাঙি।

খুব ভোরে উঠতে হতো নীলকমলকে। তার নৌকায় শহরের অফিস কাচারীতে যান বাবুরা। রোজকার বাঁধা প্যাসেঞ্জার। বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে বুঝতো নীলকমল রাঙির একটা হাত তার বুক জড়িয়ে আছে। আলতো করে হাতটা সরাতে গেলেই, ঘুম-জড়ানো গলায় আব্দার করতো রাঙি, 'না।'

'কি না?' জিজ্ঞেস করতো নীলকমল।
'রোজ রোজ এত ভোরে যাবানা তুমি।' রাঙি আরো ঘন করে জড়িয়ে ধরতো নীলকমলকে।

'আজ বাবুইহাট থিকে রঙিন কাঁচের চুড়ি আনবো তর জন্য রাঙি, যদি পাই জলডুরে শাড়ীও একখান। দেখিস, ঠিক আনবো।' আদর করতে করতে বলতো নীলকমল।

'আট্টু পরে যাইও', আবদার করতো রাঙি, 'আট্টু সকাল হোক। আর এট্টু সময় থাকো না।'

নীলকমল শুয়ে শুয়েই দেখতো জানালার বাইরে ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ, গাছে গাছে পাখপাখালীর কিচিরমিচির। সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে বনবাদার থেকে। তার চাইতেও কাছে রাঙির চুলে কুন্তল তেলের মিষ্টি গন্ধ, গত হাট থেকে এনে দিয়েছে নীলকমল।

'এট্টু ধীরে ফস্যা হওগো আকাশ,' ভোর হয়ে আসা আকাশের দিকে চেয়ে বলতো নীলকমল, 'দোহাই তোমার সুয্যিঠাকুর।' পাশ ফিরে দেখতো ঘুমন্ত রাঙির বাঁ গালে বাদামী রঙের জরুল, যার রং ঠোঁট দিয়ে বারবার ছুঁয়েও একটু ফিকে করতে পারেনি নীলকমল, 'এ কন্যে আমারে বড় ভালোবাসে।' ঠোঁট দিয়ে বাদামী জরুল ছুঁতো নীলকমল, মনে মনে বলতো, 'দোহাই সুয্যিঠাকুর, এট্টু ধীরে চোখ ম্যালো তুমি, এ কন্যের ভালোবাসার দোহাই।' ভালোবাসায়, সোহাগে, উষ্ণতায় বুকের ভিতর রাঙিকে নিয়ে চোখ বুজতো নীলকমল।...

আবার হাসির শব্দ। চমকে ওঠে নীলকমল। লণ্ঠনের আলোয় কি এক বই যেন পড়ে শোনাচ্ছে মিঞাসাহেব, আর নদীর কলকলানির মত হেসে গড়িয়ে পড়ছে রাঙি মিঞাসাহেবের বুকে।

'নারীগণ বড় মোহিনী জানে হে', ভুবনকাকার কথাটা মনে পড়ে নীলকমলের। বুড়ো মাঝি ভুবনকাকা নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে বলতো, 'নারীগণ সব গিরগিটির মতন, তেনাদের মনের রং বড় দ্রুত বদলায়।' নদীর বুকে গান ধরতো ভুবনকাকা, 'কন্যে তোর গহীন মনের অন্ত পাইলাম না। তোর ভালোবাসা, বিষের জ্বালা, ও কন্যে ফিরায়ে লয়ে যা।' শুনতে শুনতে গানটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল নীলকমলের।

সে সকালের কথা আজো ভুলতে পারেনি নীলকমল। তাদের নমপাড়া আর পাশের বাগদীপাড়ার বিবাদ ছিল অনেক দিনের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গিয়েছিল বাগদীরা। ভিনগাঁয়ে যাত্রী পৌঁছে দিয়ে, সারারাতের শেষে ভোর ভোর বাড়ী ফিরছিল নীলকমল। কিন্তু বেশীদূর এগোতে হলো না। দূর থেকেই দেখতে পেলো, তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে নমপাড়ার অনেক বাড়ীর চাল থেকে। অনেক ভিটে পুড়ে ছাই। চারপাশে চীৎকার, কান্না। ধ্বসেপড়া ভিটে, ছারখার বাড়ীঘর, সর্বস্বান্ত অসহায় মানুষদের কান্নার মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে নীলকমল দেখেছিল, তার ঘরের চালের তখনো আগুন নেভেনি। সেই জ্বলন্ত ঘরের কোথাও খুঁজে পেলো না নীলকমল রাঙিকে। জনে জনে জিজ্ঞেস করলো, 'রাঙিরে দেখছো কেউ তোমরা? আমার রাঙি? রাঙিরে দেখছো কেউ?' কেউ কোন উত্তর দিতে পারেনি। নমপাড়ার অনেক মেয়ে বৌএর সঙ্গে রাঙিও হারিয়ে গেছে সে রাতে।

নতুন করে ধ্বসেপড়া ঘর আবার বানিয়েছে নীলকমল। কিন্তু বুকের ভিতর

সেই জ্বলন্ত সকাল আজো বেঁচে আছে তার। নমঃপাড়ার সকলে অবাক হয়ে দেখেছে, দিন দিন কেমন পাল্টে গেছে নীলকমল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়িয়ে, বাতাস কাঁপিয়ে আর হাসে না, কথাও বলে না। রাতদিন নদীর বুকেই কাটিয়ে দেয় নীলকমল। দূরে থেকে পথ-চলতি লোক শুনতে পায় মাঝনদীতে নৌকা ভাসিয়ে কে যেন গাইছে 'কন্যেরে তোর গহীন মনের অন্ত পাইলাম না'। মাঝনদীর শেষ-পান কান্নার মত ভেসে আসছে তীরের দিকে 'তোর ভালোবাসা, বিষের জ্বালা ও কন্যে ফিরায়ে লয়ে যা'। না, খুড়োমাঝি ভুলকাকা নয়। নদীর বুকে উদাস গলায় গান ধরেছে সাজোয়ান নীলকমল।...
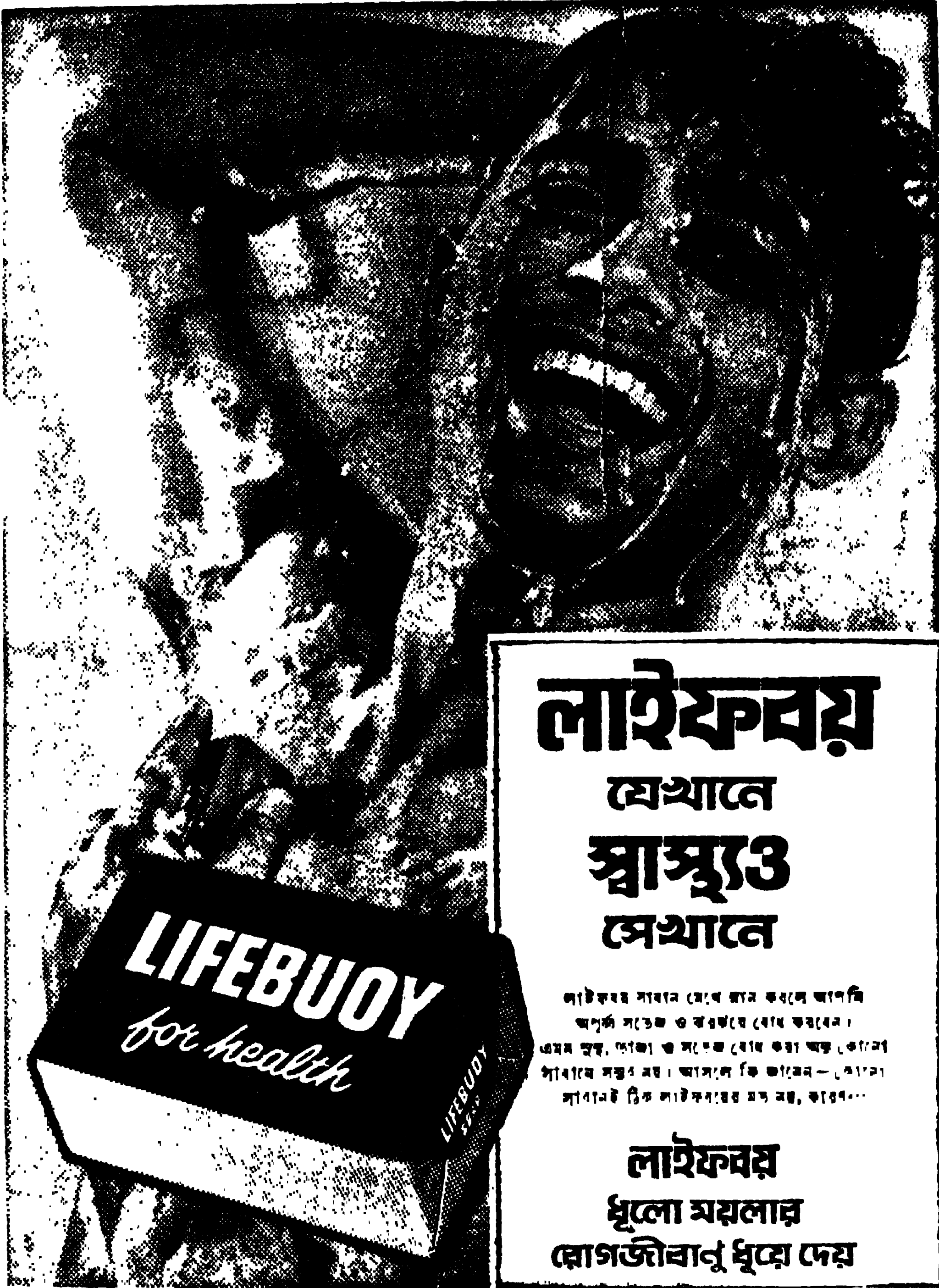
হঠাৎ-ঝড়ে বৈঠা পড়েছে রাতের নদীর বুকে। নীলকমলের বুকেও। এদিকটায় জ্যোৎস্না আরো স্পষ্ট। একঝাঁক রুপালী মাছের মত নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্না। রাতও আর বেশী নেই। পার হয়ে যাচ্ছে নদীর ধারের নিঝুম, ঘুমন্ত গ্রামগঞ্জ। মায়ার মত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে আকাশে।

নীলকমল একবার চাইলো ছইএর দিকে। হাসির শব্দ আর ভেসে আসছে না। কখন যেন লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়েছে মিঞাসাহেব। ঘুমিয়ে পড়েছে ছইএ হেলান দিয়ে। বুকে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে মাজু।

বুকের ভিতরটা জ্বলে যায় নীলকমলের। রাগ হয়, দুঃখ, ঘেন্না। মনে হয়,

একটানে ছইএর পর্দা ছিঁড়ে ভেতরে ঢোকে নীলকমল, তারপর মিঞাসাহেবের বুকে থেকে ছিনিয়ে নেয় তার রাঙিকে। তারপর আবার ভাবে, 'সুখেই তো আছে রাঙি, মনে সুখ না থাকলে মানুষ কি ওরম হাসতি পারে? ঘুমাতি পারে নিশ্চিন্তে। সুখেই আছে রাঙি।' জ্বলে যাওয়া বুকে নীলকমল ভাবে 'কত ট্যাকা মিঞাসাহেবের, আমি তো কিছুই দিতি পারিনি রাঙিরে। ডুরেশাড়ী রঙীন কাঁচের চুড়িতে আর কি সুখ?' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস লুকিয়ে থাকার আড়াল খুঁজে পায় না নীলকমলের বুকে। আর ঠিক তখনি, এক আকাশ মায়াময় জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে, মনে পড়ে নীলকমলের, রাঙি একবার তার সঙ্গে সারারাত নৌকায় চড়ার আবদার করেছিল। 'সারারাত্তির তোমার সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় থাকবো আমি।' বলেছিল রাঙি একরাতে তার পাশে শুয়ে; 'পুন্নিমে রাত্তির, বেশ চমচমে জোছ্না থাকবে আকাশে, তোমার কোলে মাথা র‍্যাখে রাত জাগবো আমি, তুমি নৌকা চালাবে। আর কেউ কোত্থাও থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি।'

কথা দিয়েছিল নীলকমল, আসছে পুর্ণিমায় রাতে নদীর বুকে নৌকায় থাকবে সে আর রাঙি, সারারাত। কিন্তু তার আগের দিন সকালেই।...

'রাঙি মিঞাসাহেবের বুকে মাথা র‍্যাখে ঘুমাচ্ছিস এখন তুই।' মনে মনে বললো নীলকমল, 'আমি তরে কথা দিছিলাম, নৌকা চড়াবো পুন্নিমে রাতে। আজ কি পুন্নিমে? আমি জানি নারে রাঙি, তবে আজ সারা-রাত্তির বড় আলো ছিল আকাশে। সারা-রাত্তির তুই আমার নৌকায়। আট্টু পর থিকে ফস্যা হবে আকাশ। সাহেবগঞ্জে পৌঁছে ঘুম ভাঙবে তর। তুই জানতে পারবি না নীলকমল তার রাঙিরে দেয়া কথা রাখলো শ্যাষ পর্যন্ত। তুই জানতেও পারবি না রাঙি, মিঞাসাহেবের বুকে মাথা র‍্যাখে, হায়, কার নৌকায় তুই এক পুন্নিমে রাত কাটালি!'

দুঃখ আর সুখের দুই অনুভব পাশাপাশি জেগে উঠেছিল নীলকমলের বুকে। দুঃখের অনুভবে সে ভাবছিল, কার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে তার রাঙি? সুখের অনুভবে সে ভাবছিল, রাঙিকে দেয়া কথা সে রেখেছে শেষ পর্যন্ত। বড় দুঃখ ছিল তার, কোনদিন রাঙির সাধ আর পূরণ করতে পারবে না সে। এখন এই ভোর হয়ে আসা নদীর বুকে নীলকমল তার রাঙিকে দেয়া কথা রাখতে পেরে মনে মনে আশ্চর্য এক উজ্জ্বল সুখ অনুভব করলো।

সাহেবগঞ্জ পৌঁছতে প্রায় ভোর। আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। পারের দিকে নৌকা নিয়ে যেতে লাগলো লগি ঠেলে। লগি পুঁতে নৌকা বাঁধলো। পা-ডোবা জলের ওপর দাঁড়িয়ে, ছইএর পাশ থেকে নীচু গলায় ডাকল মিঞাসাহেবকে।

পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে দুহাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো মিঞাসাহেব। দাড়িতে মেহেন্দী, আর চোখে সুর্মা, আরো স্পষ্ট দেখতে পেলো নীলকমল। পাঞ্জাবির ডানদিকটা কুঁচকে আছে মিঞাসাহেবের। সারারাত রাঙি মিঞাসাহেবের শরীরের খুব কাছে কাছেই ছিল।

টিনের সুটকেশ হাতে পাটাতনের ওপর এসে দাঁড়ালো রাঙি। বোরখার পর্দা নেমে গেছে আবার, মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। নীলকমলও মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'বড় মনোরম দৃশ্য', ঘুমভাঙা ভরাট গলায় বললো মিঞাসাহেব, 'এই নদীর পারের শোভা দ্যাখছোনি বিবিজান। আরে, এহানে আবার লজ্জা কিসির? কে দ্যাখতেছে তোমার সোন্দর মুখখান? দ্যাখো, দ্যাখো, বড় মনোরম দিশ্য এই পাতক্কালের!'

বোরখার পর্দা আলতো হাতে তুলে দিল বিবিজান। বুকের ভিতর সেই হরি-সংকীর্তনতলার খোলকর্তাল বেজে উঠেছিল মৃদু লয়ে নীলকমলের। শেষ একবার রাঙির মুখ এই ভোরের আলোয় দেখে নেয়ার ইচ্ছে মাথা কুটছিল নীলকমলের বুকে। ওদের চোখ লুকিয়ে তাকালো নীলকমল।

আর তাকিয়েই নতুন করে চমকে উঠলো। বাদামী চোখের তারা, ফর্সা রং, বাঁ গালে টোল সবই ঠিক হুবহু রাঙির মত, কিন্তু রাঙি না! বাঁ গালে রাঙি সেই ছোট্ট বাদামী রঙের জরুল, ঠোঁট দিয়ে বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়েও যার রং এতটুকু ফিকে করতে পারেনি নীলকমল, কৈ বিবিজানের বাঁ গালে সেই জরুলটা নেইতো? লণ্ঠনের আলোয় দেখা রাতের ভুল, দিনের প্রথম আলোয় সুধরে যাচ্ছিল নীলকমলের চোখের সামনে। সব কিছু রাঙির মত, হুবহু রাঙি, কিন্তু রাঙি না। বিবিজান, বিবিজানই।

বিবিজানের হাত থেকে টিনের সুটকেশটা পারে রাখলো মিঞাসাহেব। তারপর কোলে করে নৌকা থেকে নামালো বিবিজানকে। গুনে গুনে সাতটা টাকা নীলকমলের হাতে দিয়ে, দুজনে হেঁটে চললো ঢালু পার বেয়ে।

লগি হাতে তুলে নিলো নীলকমল। চেয়ে দেখলো, দূরে পারে দাঁড়িয়ে বিবি-জানের হাত থেকে টিনের সুটকেশটা নিজের হাতে নিচ্ছে মিঞাসাহেব।

রাঙি তার বিবিজান হয়ে যায়নি, এই সুখ বুকের ভিতর অনুভব করতে গিয়েই কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে নীলকমলের বুকের ভিতরটা। কোথায় তবে এখন তার রাঙি? লগি ঠেলতে ঠেলতে ভাবে নীল-কমল। এখনো কি বেঁচে আছে? কেমন সে বেঁচে থাকা? হাটবাজারের খোলার ঘরের দরজায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে, মুখে রং, ঠোঁটে আলতা, ডানহাত উঁচু করে, বাঁ হাত কোমরে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে, শেয়াল কুকুরের মত মানুষের চোখে চোখে ইশারা করে বেঁচে থাকা? দাঙ্গায় লুঠ হয়ে যাওয়া মেয়ে-বৌদের এই তো বেঁচে থাকার জীবন।

সমস্ত সুখ বুকের ভিতর থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল নীলকমলের। তবে তো সে তার রাঙিকে দেয়া কথা রাখতে পারবে না কোনদিন। পুন্নিমে রাতে রাঙিকে পাশে নিয়ে রাতভোর নৌকা চালানোর যে কথা সে দিয়েছিল রাঙিকে, তা যেন এই সকালে বড় কাঙাল হাত বাড়াচ্ছিল নীলকমলের দিকে।

নদী এখানে অনেক চওড়া। মাঝনদীতে এসে পড়েছে তখন নীলকমলের নৌকা।

সাহেবগঞ্জ থেকে আবার ময়নাডিঙি। বৈঠা মারতে গিয়ে কেমন যেন ভুল হয়ে যায় নীলকমলের। ময়নাডিঙির দিকে আর যাওয়া হয় না। সাহেবগঞ্জ, তারপর নীল-বাজার, হাতিমপুর, রূপডিঙা একে একে চেনা অচেনা দু'ধারের গ্রামগঞ্জ পার হয়ে, ভোরের আলোয় দুঃখী এক নদীর মাঝখান দিয়ে নৌকা বেয়ে, কোন এক অজানা ভিনগাঁয়ের দিকে চলে যায় উদাসী নীলকমল।
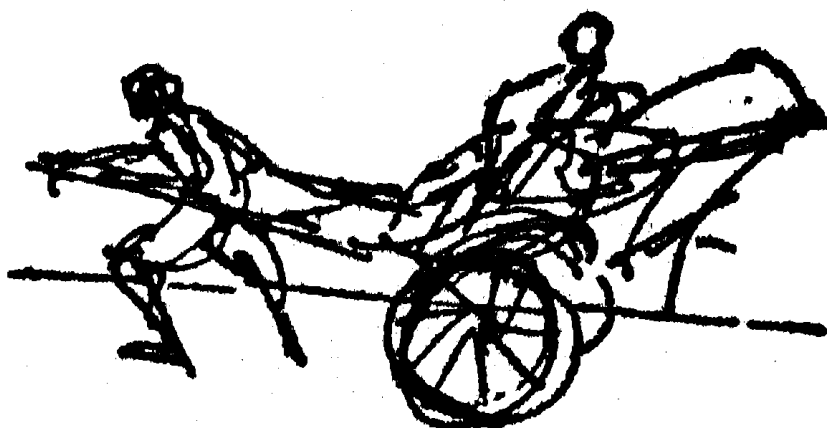
কণ্ডু ও প্রম্লোচা

সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ

গোমতী তীরের তপোবনে তখন বসন্ত এসেছে। মঞ্জুল-মঞ্জরী আম্রকুঞ্জে আদীপ্তবহ্নিসদৃশ কিংশুক বনে সপদ্মসলিল দীর্ঘিকার বর্ণগন্ধময় এক বিপুল সুষমায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে ঋতুরাজ বসন্ত। শিশিরাশ্রুবর্ষণের আর কোন যাতনা নেই স্বচ্ছনীল আকাশের বুকে, সূর্যকিরণজালে কোন শৈত্যনিবিড় জড়তা নেই, হিমকণার কোন কুলিশ স্পর্শ নেই বাতাসে। আজ এক মদমত্ত চঞ্চলতার ঢেউ খেলে যাচ্ছে যেন আকাশে বাতাসে আর সূর্যরশ্মির অম্লান স্বর্ণরেণুপুঞ্জে।

তাম্রাভ পল্লবগুচ্ছমণ্ডিত দ্রুমদলের পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্র শাখাগুলি মলয়ানিলের মধুর আঘাতে থেকে থেকে মৃদু চঞ্চলিত হয়ে উঠেছে কেমন যেন। দেখে মনে হয়, যেন নবযৌবনভারাবনতা প্রণয়লালসাপূর্ণা একদল অঙ্গনা বসন্ত সমাগমে আপন আপন নায়কের অত্যুগ্র মদির আলিঙ্গনে বিহ্বল ও বিকম্পিত হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। প্রবলসুরতকোলাহলপূর্ণ কূজনের মদকাকলী দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে কোকিলের কুহুনাদে আর কুসুমাভিসারী অলিকুলের অবিশ্রান্ত গুঞ্জনে।

কিন্তু নদীতটসেবিত এই বনভূমির মনোরম কোন শব্দ দৃশ্য বিন্দুমাত্র কখনো বিচলিত করতে পারে না মহর্ষি কণ্ডুর তপস্যানিরত চিত্তকে। চারিপার্শ্বস্থ দৃশ্যের কোন মায়া, শব্দের কোন আবেশ, গন্ধের কোন মাদকতা কোনদিন হৃদয়কক্ষেও প্রবেশ করতে পারে না তাঁর দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়ের কোন রন্ধ্রপথে।

মহর্ষি কণ্ডু মনে করেন সবচেয়ে উত্তম তপস্যা হলো কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শোধন। কঠোর তপস্যার যে অনল তিনি আপন হাতে প্রজ্বলিত করেছেন অন্তরে, পূর্ণসিদ্ধি লাভ না করা পর্যন্ত সে অনল নির্বাপিত হবে না কোনদিন। এই পূর্ণসিদ্ধির অর্থ হলো অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার মধ্য দিয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধন। অষ্টাঙ্গ যোগপদ্ধতির শেষ স্তর সমাধি ছাড়া আর সব কটি পদ্ধতিতেই কৃতবিদ্য হয়ে উঠেছেন কণ্ডু। ধ্যানের দ্বারা

জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংস্থাপিত করাই হলো সমাধি আর এই সমাধিতে সিদ্ধিলাভ করার সংগে সংগে কণ্ডু দেখতে চান হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা অপাহিত সেই পরম সত্যের মুখ। তিনি লাভ করবেন দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব। তপস্বীদের একান্তকাম্য সুদুর্লভ দেবলোকে দেবগণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর অবাধ অধিকার আর অক্ষয় আসন। তাই ভীত হয়ে উঠেছেন দেবগণ।

মহর্ষি কণ্ডু কিন্তু একথা একবারও ভাবেননি। তিনি জানতেই পারেননি, তাঁর যজ্ঞকুণ্ড হতে উত্থিত এক জটিল ধূম্রজাল কখন ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে কৃষ্ণকুটিল এক বিশাল ছায়া বিস্তার করেছে সারা স্বর্গলোক জুড়ে, তাঁর তপোশক্তি বিচ্ছুরিত একটি উচ্ছ্বসিত উত্তাপ সুদূর স্বর্গের নন্দনকাননের চিরসবুজ প্রশান্তিকে দগ্ধ করে দিতে শুরু করেছে কখন।

কণ্ডুমুনির পিতা মহর্ষি কন্ব সংসারাশ্রমে থেকেই পরমার্থতত্ত্ব লাভ করেছিলেন। সংসারে থেকেই তিনি সমস্ত কামনা ও সঙ্কল্প ত্যাগ করে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধে বিধিবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস করে যেতেন নিয়মিত। কিন্তু কণ্ডুমুনির কাছে সারা জীবনটাই হলো তপস্যা। বস্তুতঃ তাঁর আত্মাই যেন চিরস্থায়ী আর চিরপবিত্র এক যজ্ঞবেদী; আপন দেহমধ্যস্থিত অগ্নিকে অগ্নিহোত্রাগ্নি ও চিত্তকে ঘৃতরূপে জ্ঞান করে প্রতিদিন নিজের জীবনটাকেই যেন তিলে তিলে আহুতি দিয়ে চলেছেন কণ্ডু। তাঁর একমাত্র আহার্য ও পানীয় হচ্ছে তপোবনজাত ফলমূল ও স্বচ্ছসলিলা গোমতির জল।

অন্যদিনকার মত সেদিনও সন্ধ্যা-বন্দনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন মহর্ষি কণ্ডু। এই পরম ক্ষণটিতে প্রতিদিন উপাংশু জপ করেন তিনি। অতঃপর তিনবার প্রাণায়ামের পর প্রণবরূপে একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কার্যরূপ জীবাত্মা সর্বকারণরূপ পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায় ধীরে ধীরে। সহসা মূর্ধস্থানে ভ্রূযুগল মধ্যে স্থাণুর মত নিশ্চলভাবে দীপ্ত পেতে থাকে এক দিব্যজ্যোতি। সেই জ্যোতির অগ্রপ্রসারী আভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দ্যুলোক ও ভূলোক; সমাগত সন্ধ্যার ঘনায়মান তমোরাশি সভয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়।

কিন্তু সেদিন আর শেষ হলো না মহর্ষি কণ্ডুর সন্ধ্যাবন্দনা। শেষ না হতেই এক উগ্র গন্ধগন্ধের দুঃসহ নিঃস্রাবে ধ্যানভঙ্গ হয়ে গেল মাঝপথে। রোষ-কষায়িত লোচনের অগ্নিস্রাবী দৃষ্টি উর্ধ্বে সমুত্থিত করে কণ্ডু দেখলেন, সুদূর স্বর্গ-লোক হতে এক অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরা আকাশপথে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। কী আশ্চর্য! বিস্ময়বিস্ফারিত ক্রোধতপ্ত অক্ষিপক্ষ্মগুলি শত চেষ্টাতেও আর ধ্যানে নিমীলিত করতে পারলেন না কণ্ডু পূর্বের মত।

ক্ষণকালের মধ্যে নূপুরে শিঞ্জার মধুর ঝঙ্কারে সন্ধ্যার শান্ত বনপ্রকৃতিকে উচ্চকিত করে কাছে এসে মহর্ষিকে প্রণাম করল সেই অপ্সরা। মুহূর্তে তাঁর সতত সজাগ যোগনেত্র সহযোগে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হলেও কণ্ডু রোষভরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি যুবতী?

আমি অপ্সরা প্রম্লোচা।

মদিরেক্ষণা প্রম্লোচার প্রতিটি কথার সংগে সংগে ঝরে পড়ে এক মদস্রাবী হাসির ফোয়ারা। তার অনঙ্গাতুরা দেহলতার তরঙ্গায়িত ভঙ্গিমা দেখে কণ্ডুর মনে হয়, বসন্তের দুঃসহ মদনতাপ সহ্য করতে না পেরে প্রিয়সন্নিধানে এসেছে রতিসুখাভিলাষিণী কোন এক নারী।

মহর্ষি কণ্ডু আবার বজ্রনির্ঘোষে প্রশ্ন করলেন, কি হেতু আগমন তোমার এখানে?

কিন্তু এবার কোন উত্তর দিল না প্রম্লোচা। নীরবে শুধু একটু হাসল। মহর্ষির কোপ দেখে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত বা বিচলিত হলো না সে। আগের মতই এক কুটিল মদিরতা ঝরতে লাগল তার ঈক্ষনে। এক তরল রতিলালসার তীব্র ছটা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তার হাসি হতে। প্রম্লোচার আপাদমস্তক সর্বদেহে ও বেশভূষায় প্রকট হয়ে উঠেছে দর্পিত মদনের বিচিত্র বিলাস। তার কর্ণপাশে নব-কর্ণিকার কুসুম ও ঘনকৃষ্ণ চঞ্চল অলকদামে রক্তাশোকের স্তবক। কুসুম্ভকুসুমরাগে অরুনিত মনোহর বসনে বিম্বিত হয়ে উঠেছে তার নিতম্বদ্বয়। এক রক্তিমাভ সৌন্দর্যে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে তার প্রিয়ঙ্গুপরাগ ও কুঙ্কুমরাগচর্চিত স্তন-মণ্ডল। প্রম্লোচার পীনপয়োধশোভী উরঃস্থলোপরি শ্বেতচন্দলিপ্ত হার, বলয় ও কেয়ূরশোভিত বাহুলতা ও মেখলাদাম পরিহিত স্থূল জঘনদেশ দেখে জিতেন্দ্রিয় কণ্ডুর অচঞ্চল চিত্তও সুরতোৎসুক হয়ে উঠল সহসা।

কণ্ডু বললেন, যৌবনবিলাসিনী, জান তোমার কৃতকর্মের পরিণাম? জান, আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত দৃষ্টি মুহূর্তে ভস্মীভূত করে দিতে পারে পর্যাপ্ত-যৌবনপূর্ণ তোমার এই দেহকে?

কথাটা বললেন বটে কণ্ডু, কিন্তু কণ্ঠে তাঁর আর সে কাঠিন্য নেই, দৃষ্টিতে কোন রোষ নেই।

এদিকে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে যেন প্রম্লোচার স্পর্ধা। কলকণ্ঠ নিনাদে হাস্যোচ্ছ্বল মুখে প্রম্লোচা বলল, জানি ঋষিবর! কিন্তু আপনিও স্মরণ রাখবেন, মদনকে ভস্মীভূত করেও পরিত্রাণ পাননি দেবাদিদেব মহাদেব। ভস্মীভূত অনঙ্গের অমর আত্মার অদেয় প্রভাবে কামার্ত হয়ে উঠেছিল মহাযোগীর চিত্ত। আপনি ক্রোধভরে আমাকে ভস্মীভূত করুন অথবা কামার্ত হৃদয়ে রতিবিলাস মানসে আমায় গ্রহণ করুন,—আপনার তপস্যার ফল তাতে বিনষ্ট হবেই। দেবতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই।

অবশেষে কাম এবং ক্রোধ এই দুইটি পথের কোনটিকে গ্রহণ না করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলেন কণ্ডু। বললেন, আমি যদি এই দুইটির কোনটিই না করি, যদি এক হিমশীতল ঔদাসীন্য আর সহজ অবহেলায় তোমার উদ্ধত যৌবনের সমস্ত উত্তাপ ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করে চলি?

প্রম্লোচাও তার উদ্দেশ্য সাধনে অটল এবং কৃতসঙ্কল্প। কোনরূপ বিচলিত না হয়ে সহজভাবে বলল, তা আর আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না মুনিবর। ভোগের উপকরণ প্রলোভনের বস্তু থেকে দূরে এই জনমানববর্জিত তপোবনে বাস করেন বলেই এতখানি ইন্দ্রিয়সংযম সম্ভব হয়েছে আপনার পক্ষে। কিন্তু একদ্র হতে তা আর সম্ভব হবে না। কারণ কামকলা পটিয়সী এক অপ্সরার রাগোদ্ধত হৃদয়ের রসোচ্ছ্বাস, তার যৌবনোদ্ধত দেহগাত্রের পদ্মগন্ধ ও তার নৃত্যগীতের অবিরাম সুরঝঙ্কার অনুক্ষণ আঘাতে আঘাতে শিথিল করে তুলবে আপনার ইন্দ্রিয়দ্বার।

প্রম্লোচার কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে ধ্যানে বসলেন মহর্ষি কণ্ডু। এদিকে প্রম্লোচাও সুরু করে দিল তার নৃত্য-গীতের বিরামহীন অনুষ্ঠান।

সহসা আশ্চর্য হয়ে উঠলেন মহর্ষি কণ্ডু। যতবারই তিনি ধ্যানে সমাধিস্থ হবার চেষ্টা করেন ততবারই প্রবলভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে তাঁর পদ্মাসন তলস্থিত ভূমি। আর মনে হতে থাকে প্রম্লোচার নৃত্যগীতের অপরিসীম মাদকতায় মত্ত হয়ে উঠেছে যেন সমগ্র বিশ্বচরাচর। নক্ষত্রখচিত নৈশ আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারসমন্বিত নিশ্চল দ্রুমদল, তমসাবৃত প্রশান্তগম্ভীর বসুন্ধরা সেই মধুক্ষুবী সুরঝঙ্কার আকণ্ঠ পান করেও এক অলৌকিক অতৃপ্তিতে মত্তচঞ্চল হয়ে উঠেছে আশ্চর্যভাবে। সে চঞ্চলতার যেন শেষ নেই সীমা নেই।

ধ্যানাসন ছেড়ে গোমতীর তীর ধরে এগিয়ে চলতে লাগলেন কণ্ডু। কিন্তু যেখানে যতদূরেই যেতে থাকেন তিনি, সেখানেই উতল বাতাস বয়ে নিয়ে আসে প্রম্লোচার দেহগাত্রের সেই রহস্যময় পদ্মগন্ধ। গোমতীর কলতানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে তার সেই অবিশ্রান্ত নৃত্যগীতের মাদকতাময় সুরঝঙ্কার। অন্ধকার আকাশ-পটে নক্ষত্রালোকের ক্ষীণ রেখায় বিচিত্রিত হয়ে ওঠে প্রম্লোচার এক বিশাল ছবি।

অবশেষে এক নিবিড় ক্লান্তি ও বিরক্তি বুকে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে তপোবনে প্রত্যাবর্তন করলেন যখন কণ্ডু, তখন প্রভাতকাল সমাগত। সহসা চমকিত হয়ে দেখলেন, কুটিরদ্বারপ্রান্তে ক্লান্ত ও অবসন্ন

দেহে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে প্রম্লোচা। কণ্ডু ভাবতে লাগলেন, তবে কি হার মেনেছে প্রম্লোচা? যৌবনপ্রমত্তা প্রগলভা প্রম্লোচার এই ক্লান্তিনিবিড় নিদ্রা কি তার সেই পরাজয়ের অভ্রান্ত অভিজ্ঞান নয়?

তা হোক, তবু বড় সুন্দর দেখাচ্ছে প্রম্লোচাকে। তার হেমারবিন্দপ্রতিম পত্ররচনাবিশিষ্ট মুখমণ্ডলে উদগত স্বেদবিন্দুগুলিকে রত্নজালমধ্যে খচিত মুক্তার মত মনে হচ্ছে। নিদ্রাভিভূতা প্রম্লোচাকে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে কামবিমোহিত হয়ে পড়লেন কণ্ডু। তিনি ভাবলেন, পরাজয়ের মাঝেই এক অভিনব জয় লাভ করেছে প্রম্লোচা। তার নৃত্যগীত বাইরের জগতে থেমে গেলেও তাঁর নিজের অন্তরজগতে সূক্ষ্ম ও অভিনবরূপে তা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এখনো অব্যাহতভাবে। সুরতোদ্দীপক এক গীতিরসসুধার স্রোত বয়ে চলেছে যেন তাঁর প্রতিটি ধমনীতে। এক উতল কামনায় নৃত্যচঞ্চল হয়ে উঠেছে তাঁর দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু।

নতজানু হয়ে প্রম্লোচাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করলেন কণ্ডু। তাঁর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষঃস্থল বিমর্দিত ও অজস্র চুম্বনপুঞ্জে ওষ্ঠাধর পীড়িত হতেই ধীরে ধীরে আঁখিপল্লব উন্মীলিত করল প্রম্লোচা।

কণ্ডু বললেন, সুস্মিতমুখি, ওঠ আর শুয়ে থেকো না। উঠে দেখ, বসন্তের প্রভাতকাল কত সুন্দর। পূর্বাচলে তপনদেব উষাকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করছেন। চূতমঞ্জরীর মকরন্দরূপ মধু পান করে কোকিলকুল কেমন অনুরাগান্ধ হৃদয়ে তাদের প্রিয়তমাকে প্রগাঢ়ভাবে চুম্বন করছে। ওদিকে পদ্মদলনিমগ্ন ভ্রমরগণ মৃদু গুঞ্জরণচ্ছলে মধুর প্রিয়চাটুবচন দ্বারা প্রিয়তমা ভ্রমরীর হৃদয় বিগলিত করছে। পুষ্পগন্ধবহ পবনের মৃদু হিল্লোলস্পর্শে ব্রীড়াকুঞ্চিত নববধূর মত ঈষদানত হয়ে পড়ছে অচিরোদ্গত আরক্ত পল্লবগুচ্ছ।

কণ্ডু আরও বললেন কুরঙ্গনয়না, তোমার কটাক্ষবাননিকরে আমার হৃদয় জর্জরিত। জ্বলন্ত বহ্নিবৎ তোমার স্তনমণ্ডলদর্শনে দুঃসহ মদনানলতাপে আমার দেহমন দগ্ধপ্রায়। সুন্দরি, তোমার স্তনমণ্ডলের বহ্নি সত্যিই বড় অদ্ভুতরকমের, দূর হতে দেখলে দেহমন দগ্ধ হয়। কিন্তু বক্ষোসংলগ্ন হলেই দগ্ধপ্রায় দেহমন শীতল হয়ে যায়।

অন্তরে আনন্দাতিশয্যে অধীর ও উল্লসিত হয়ে উঠলেও কোন কথা বলল না প্রম্লোচা। একান্তপ্রার্থিত কণ্ডুর চুম্বন ও আলিঙ্গনে অলস নিমীলিতলোচনা পুলকাবলি-ললিতকপোলা বিস্রস্তবসনা প্রম্লোচা কণ্ডুর বাহুবন্ধন হতে কোনরকমে নিজেকে মুক্ত করে উঠে গেলেন। গোমতী জলে স্নান করে এসে তপোবনসংলগ্ন কুসুমোদ্যানে চলে গেলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন রকমের পুষ্পপল্লব চয়ন করে নিয়ে এসে পুষ্পসার দিয়ে এক অতি-উপাদেয় মদ্য প্রস্তুত করে দুজনে পান করলেন। তারপর নিরতিশয় কামোদ্দীপক নবপুষ্পিত অশোকলতিকার পল্লবগুচ্ছ দিয়ে কুটির মধ্যে এক সুকোমল কুসুমশয্যা রচনা করলেন প্রম্লোচা। কণ্ডু দেখলেন, রুদ্ধদ্বার প্রায়ান্ধকার ক্ষুদ্র কক্ষখানি প্রম্লোচার অঙ্গলাবণ্যে এক উজ্জ্বল রতিমন্দিরে পরিণত হয়েছে।

সুগন্ধি অগুরু ধূপবাসিত ও বিস্রস্ত কুসুমদামসজ্জিত সেই রতিমন্দির হতে যখন বেরিয়ে এল প্রম্লোচা, তখন সায়ংকাল উপস্থিত। সান্দ্রতম রতিসুখসারে একই সঙ্গে পুলকিত ও শ্রান্ত হয়েছে প্রম্লোচা। বিপুলযৌবনা প্রম্লোচার সমস্ত যৌবনসুধা সারাদিন ধরে নিঃশেষে পান করে তার উদ্ধত যৌবনের সমস্ত অহঙ্কারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন যেন কণ্ডু। প্রম্লোচার নিপীতসর্বস্ব ব্রণবিধুর বিম্বাধরে দশনচিহ্ন, নির্মম নখাঘাতে আকুঞ্চিত হয়ে আছে তার পীনোন্নত স্তনাগ্রভাগ, কবরীবন্ধনবিযুক্ত তার কুঞ্চিত অলকলতা আলুলায়িতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার অংসদেশে। প্রম্লোচাকে দেখে মনে হয়, কোন এক নিষ্ঠুর ভ্রমরের দ্বারা নির্দয়ভাবে উপভুক্তা একটি ফুল্লকুসুম এক অন্তঃসারশূন্য বিহ্বলতায় হৃতোদ্যম হয়ে আছে। বর্ণে তার কোন উজ্জ্বলতা নেই অন্তরে কোন। রসের উচ্ছ্বাস নেই, গন্ধে কোন মাদকতা নেই; শুধু শৃঙ্গারসর্বস্ব নায়কের নিবিড় প্রেমগর্বের এক গোপন আবেগ কোনরকমে স্ফীতিসিক্ত করে রেখেছে তার শূন্যশুষ্ক বক্ষটিকে।

নির্দয়োপভুক্তা প্রম্লোচাও এমনি এক প্রেমগর্বে ও গৌরবে গৌরবান্বিতা হয়ে উঠেছে আজ। একটি দিনের জন্য হলেও মহামুনি কণ্ডুর অঙ্কশায়িনী ও বক্ষোলগ্না হতে পেরেছে সে। তাঁর নিবিড়তম আলিঙ্গন ও চুম্বনে অভিসিক্ত হয়েছে তার দেহ। তাঁর আবেগোচ্ছ্বলিত প্রেম সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছে তার নারীমন। স্বর্গের দেবকুলের মনোরঞ্জন করে তাঁদের কাছ থেকে এতদিন যে প্রেমাদর পেয়ে এসেছে কলাপটিয়সী রূপোপজীবিনী অপ্সরা প্রম্লোচা, সে প্রেমাদর একদিকে যেমন কৃত্রিমতায় প্রাণহীন, অন্যদিকে তেমনি আন্তরিকতাহীনতায় অবহিতও।

একথা আজ প্রথম মনে হলো প্রম্লোচার, অপ্সরা হলেও সে নারী। সে শুধু অপ্সরা, শুধু তরলতা দিয়ে সৃষ্ট তার সত্তা, একথা আজ আর বিশ্বাস করে না প্রম্লোচা। আর সব নারীর মত তারও সত্তার মধ্যে আছে মৃত্তিকার গুরুত্ব, অগ্নির উত্তাপ আর অভিমান। আছে বায়ুর সেবাপ্রবৃত্তিমূলক উদারস্নিগ্ধ এক ব্যাপ্তিবোধ—একথা আজ সে প্রথম অনুভব করল। মর্তমানবীর মত সেও চায়, কোন এক বিশিষ্ট পুরুষপ্রচারের হৃদয়বিমথিত স্বতোৎসারিত এক প্রেমাবেগ। সহকারসংজড়িত ব্রততীর মতই এক নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সে প্রেমকে অবলম্বন করে নিজেকে ঊর্ধ্বে বিস্তার করে দিতে চায় প্রম্লোচা।

প্রম্লোচা আজ সব দিক দিয়ে সফলকামা। যে উদ্দেশ্যে দেবকুল দ্বারা সে প্রেরিত হয়েছে এখানে, সে উদ্দেশ্য এখন তার সিদ্ধ। তাছাড়া তার শাশ্বত নারীমনের গভীর গোপন মৃদুসুবাসিত একটি পিপাসা অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও তৃপ্ত হয়েছে। আজ সে পূর্ণচন্দ্রাবিম্বিত সমুদ্রবক্ষের মত সূর্যকিরণস্নাত পদ্মকোরকের মত মেঘাম্বুধন্য চাতকের মত তৃপ্ত ও সার্থক।

শিশিরকালে তেমনি সুরঞ্জিত কৌষেয়বসনে তপোবনকুটির হতে সান্ধ্যছায়াঘন গোমতীর তীরে এসে দাঁড়ায় প্রম্লোচা। তার মনে হয়, তার আজীবনপুঞ্জিত তৃষ্ণার শান্তি ও তৃপ্তির এক তরলিত ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে যেন বিপুলসলিলা গোমতীর তরঙ্গায়িত বুকে।

এদিকে কণ্ডুও কখন যে নীরবে নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা বুঝতে পারে নি প্রম্লোচা। দেখে আশ্চর্য ও বাধিত না হয়ে পারল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়; তবু সন্ধ্যাবন্দনার কোন চেষ্টা করছেন না কণ্ডু। আশ্রম প্রাঙ্গণে যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিতপ্রায়, তবু সমিধ বা আহুতি প্রদানের দ্বারা সে অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত রাখবার কোন ব্যবস্থা করছেন না। আজ এতদিনের তপস্যালব্ধ সমস্ত তেজ হারিয়ে একেবারে নিস্তেজ ও নির্বীর্য হয়ে পড়েছেন মহামুনি কণ্ডু। তপস্বীরা কেবলমাত্র বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গেই ঋতুকালে পুত্রেসৃষ্টিমানসে সঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু অবৈধ প্রেমপরবশ হয়ে কামার্ত হৃদয়ে অন্য নারীতে উপগত হয়ে বেদবিরুদ্ধ কর্ম করেছেন কণ্ডু।

মহর্ষি কণ্ডু ডাকলেন, প্রম্লোচা!

ছোট্ট একটি কণ্ঠস্বর। কিন্তু অনুতাপের বেদনা আর অনুরাগের বিহ্বলতা একই সঙ্গে ফুটে ওঠে যেন সে কণ্ঠস্বরে।

কণ্ডুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনম্র কণ্ঠে উত্তর করল প্রম্লোচা, আজ্ঞা করুন ঋষিবর!

তোমার কার্য ত সিদ্ধ হয়েছে, তবে স্বর্গ প্রত্যাগমনে বিলম্ব কেন সুন্দরি?

স্তব্ধ বিজন বনভূমিতে সাথীহারা কোন কপোত অথবা চক্রবাকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠা এক কাতরতা সে কণ্ঠে। অন্ধকারে ভাল দেখা না গেলেও প্রম্লোচার বুঝতে বাকি রইল না, শঙ্কাবিহ্বল এক ভীরু তৃষ্ণায় অকথিত আবেদনের একটি অবদমিত উচ্ছ্বাস মূর্ত হয়ে উঠেছে কণ্ডুর কণ্ঠের কাতরতায় ও দৃষ্টির বিষণ্ণতায়।

কোন উত্তর না পেয়ে কণ্ডু আবার বললেন, কই, উত্তর দাও প্রম্লোচা!

তবু কোন উত্তর দিতে পারে না প্রম্লোচা। আজ কণ্ডুর সারা দেহমন জুড়ে কন্দর্পদর্পের যে একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে আধিপত্য প্রম্লোচারই বিজয়-গৌরবের এক অভ্রান্ত ইঙ্গিত বহন করছে। তবু সেই জয়ের গৌরবের মধ্যে পরাজয়ের এক দুঃসহ গ্লানি অনুভব করছে সে। এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। লজ্জায় ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারছে না প্রম্লোচা, কণ্ডুর কণ্ঠে যে বিষাদের সুর ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে সমানভাবে ধ্বনিত হয়েছে তার তৃষিত অন্তরের শূন্যতা।

এবার আর কোন স্পন্দন নয়। কোন কুণ্ঠা নয়। প্রম্লোচার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দুর্যোগঘন নিশাবসানে প্রশান্তোজ্জ্বল স্বর্ণপ্রভাতের মত একটি স্বচ্ছ নির্মল সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে এবার। মনের কথা স্পষ্ট করে বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে প্রম্লোচা। বলে, আর আমি স্বর্গ-গমনে প্রত্যাশী নই ঋষিবর। আপনি যদি কৃপা করে আমায় গ্রহণ করেন তাহলে আপনার দাসীরূপেই আমি আমার নারী-জীবনের সমস্ত সার্থকতাকে খুঁজে পেতে চাই।

প্রম্লোচার মুখ থেকে এই মধুর আত্ম-সমর্পণের কথাটি শোনবার জন্য কণ্ডুও যেন এক উষ্ণনিবিড় প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়েছিলেন। এবার দুজনেই বুঝতে পারলেন, নিদাঘতপ্ত নিরুদক সরোবরসদৃশ দুটি অন্তর হতে দুটি তৃষ্ণার জ্বালা বাষ্পীভূত কামনার দুটি হাহাকার হৃদয়ের সব রস শোষণ করে দুজনেরই অন্তরাকাশে গিয়ে অনুরাগের দুটি বিশাল মেঘ রচনা করেছে। বর্ষণোন্মুখ সেই দুটি মেঘ এক তরল আবেগে স্তব্ধঘন হয়ে আছে।

তবু শেষবারের মত প্রম্লোচাকে পরীক্ষা করবার জন্য কণ্ডু বললেন, আমি এক দরিদ্র তপোবনবাসী, কী পাবে তুমি আমার কাছে? কেন স্বেচ্ছায় স্বর্গসুখ ত্যাগ করতে চাও তুমি অপ্সরা?

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করল প্রম্লোচা, আমায় আর অপ্সরা বলে লজ্জা দেবেন না ঋষিবর! আমি একজন সাধারণ নারী, এটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। প্রেমধর্ম ও সংসারধর্মই নারীর ধর্ম। আমি সেই ধর্মে সিদ্ধি লাভ করতে চাই। স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ামণ্ডিত তপোবন কুটিরে একটি ক্ষুদ্রনিবিড় সংসার রচনা করে তারই মধ্যে আমি নারীজীবনকে সার্থক করে তুলতে চাই। স্বর্গসুখ আর আমার কাম্য নয় প্রাণেশ্বর। অশোক লতিকার মেদুরারক্ত পল্লব সহকারতরুর কাছে যা চায় আমিও ঠিক আপনার কাছে তাই চাই, তার বেশী কিছু নয়।

ক্রমে দিন যায়। মাস যায়। বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়। প্রম্লোচার মত কণ্ডুও জপতপ সাধনভজন সব কিছু ভুলে গিয়ে প্রেমকেই পরমার্থ বলে জ্ঞান করেন। প্রণয়মগ্ন এক নিবিড় সংসারসুখের মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতাকে খুঁজে পান।

ঋতুতে ঋতুতে আশ্রমসংলগ্ন বন্য-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নব সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে প্রম্লোচা। বসন্তে ও গ্রীষ্মে যেমন সে লাক্ষারসরঞ্জিত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে, আবৃত করে তার যৌবনান্বিত দেহভার। কাঞ্চীদামে স্তনযুগল ও মেখলাদামে গুরু নিতম্ব পীড়িত হয়। চন্দনরসে অঙ্গরাগ করে তপোবনসরোবরে স্নান করতে গেলে গন্ধবহ বাতাস কৌতুকচ্ছলে কখন কেতকী পরাগ আবার কখনও বা স্বর্ণকমলপরাগে অনুলিপ্ত করে দেয় প্রম্লোচার মুখমণ্ডল।

একদিন সহসা পরাগভারাবনতা শান্ত-বিহ্বল একটি কুসুমস্তবক দেখে সন্তান-কামনা জাগে প্রম্লোচার মনে। অবশেষে প্রস্ফুটিত কুসুমকোরকের সফল স্বপ্নের মত প্রম্লোচার মন-কোকনদের সেই সুবাসিত বাসনাটি পূর্ণতা লাভ করতে থাকে ধীরে ধীরে।

প্রথম প্রথম গর্ভসঞ্চারের অবসাদে কিছুটা খিন্ন হয় প্রম্লোচা। পরে বসন্ত-সমাগমে নবকিশলয়মঞ্জরিত বৃক্ষশাখার মত এক তরল অঙ্গলাবণ্যে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল তার দেহ। স্থূলতর পীনপয়োধরযুগলের অগ্রভাগ ঈষৎ সুনীল আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠল। অগ্নিগর্ভা শমীলতার ন্যায় গৌরব-ময়ী হয়ে উঠল প্রম্লোচা।

অবশেষে নববর্ষাগমে জলদভারনত আকাশের মত প্রম্লোচাকে প্রসবোন্মুখী দেখে কণ্ডু একদিন তাকে বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন কঠিনভাবে। এদিকে বিদায়ের মুহূর্তে যত দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকেন কণ্ডু, ততই এক সকরুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রম্লোচা, যেন সদ্যছিন্ন এক ব্রততী রসক্ষরণচ্ছলে অশ্রুবর্ষণ করছে নিষ্ফল অভিমানে।

কণ্ডু সান্ত্বনা দেন প্রম্লোচাকে, হৃদয়-রঞ্জিনি, আমরা দুজনে দীর্ঘকাল যাবৎ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করেছি। এবার হতে আমি আবার তপস্বীজীবনে ফিরে যেতে চাই। মনে রাখবে, সম্ভোগ প্রেমকে পরি-পূর্ণতা দান করলেও প্রেমের চরম সার্থকতা কখনো চিরদিন আবদ্ধ থাকতে পারে না তার মধ্যে। দেহহীন দ্বৈত আত্মার মিলনোৎসবে ভোগহীন ত্যাগের সূক্ষ্মনিরস সুষমায় মণ্ডিত হয়েই প্রেম একমাত্র চরম ও পরম সার্থকতা লাভ করতে পারে। সন্তানস্নেহ সংসারে যে মায়াজাল সৃষ্টি করে, সে মায়া-জাল ধর্মসাধনার পথে একান্ত অন্তরায় হয়ে ওঠে। এই জন্যই আমি তাকে পরিহার করতে চাই। এই সন্তান তুমি অন্যত্র প্রসব ও পালন করে পরে এসে তুমি আমার প্রকৃত সহধর্মিণীরূপে এই সাধনায় যোগদান করতে পার।

আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে গজেন্দ্র-গামিনী পৃথুলদেহী প্রম্লোচা দূর হতে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়ে যান। কণ্ডুও সেদিকে আর না তাকিয়ে সমিধ আহরণ করে এনে ও গোমতী সলিলে স্নান সমাপন করে তপোবন প্রাঙ্গণে এক নূতন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন।

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)
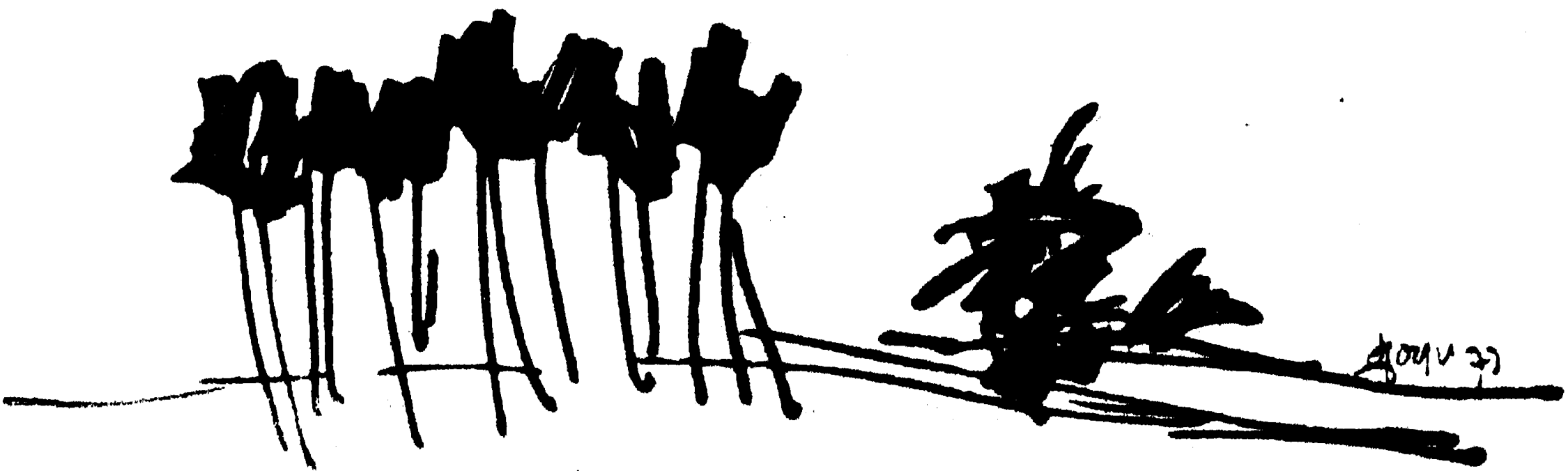
ত্রিভঙ্গ রায়

।। পনেরো ।।

সকালের সব কাজ শেষ, মায় জলখাবার পর্যন্ত। নতুন জলখাবার—খাসখানি আতপের লপ্সী। স্বামিজীর নির্দেশ।

যথারীতি দক্ষিণের বারান্দায় স্বামিজী। শুরু হয়েছে লোকজনের আনাগোনা। খানা জংশনে দুর্গাদাস রায় মশায়ের দোকান থেকে লোক এল চটের থলেয় কটি বড় বড় মোটা বোতল নিয়ে। চাই ঝরণার জল, পাঠাতে হবে কলকাতায়।

সকালে বাঁধাধরা কাজের তালিকায় বাড়ল একটি। তবে দৈনিক নয়—সাপ্তাহিক। কলকাতার প্রসিদ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বসাক-ফ্যাক্টরীর মালিক শ্রীযুক্ত বিজয়বসন্ত বসাক মশায়ের প্রথম শিশু-পুত্রের সাংঘাতিক অসুখ। নামকরা ডাক্তাররা হিমসিম খেয়েছেন সামলাতে। স্বামিজী ছিলেন তখন নন্দমল্লিক লেনে বিনয়বাবুর বাড়ীতে। দেখে-শুনে ব্যবস্থা করেন কতকগুলি দেশীয় ভেষজ সিদ্ধ পাচন, আর নিষিদ্ধ করেন কলের জল ব্যবহার। দু-চার দিনেই রোগের গতি ফেরে আরোগ্যের পথে। সেই শিশুর জন্যেই যাবে ঝরণার জল। একবারে সাত দিনের জল।

বোতল ভরে দেওয়া হল ঝরণার জল। ভাল করে ছিপি এঁটে বোতলগুলি থলেয় পুরে স্বামিজীকে প্রণাম করে লোকটি হন্-হন্ করে অদৃশ্য হল খানা-জংশনের পথে। পরের ট্রেন ধরতেই হবে তাকে।

কাঁদাল তলার পথ দিয়ে সিংহবিক্রান্ত ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে ঢুকলেন কবাটবক্ষ, সিংহকটি, পেশীবহুল লৌহদণ্ডবাহু, উজ্জ্বলচক্ষু, দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক। মোহনপুর উগ্রক্ষত্রিয় বংশজ শ্রীভোলানাথ খাঁ। বছর কয়েক আগে ফিরেছেন জেলখানা থেকে। দেশের জন্যে দশের জন্যে নয়, জেল তুচ্ছ বৈষয়িক কলহে—খুনের দায়ে।

ততক্ষণে লোকজনের ভিড় কমেছে। স্বামিজীকে প্রণাম করে কাছে বসলেন ভোলানাথ খাঁ। তারপর মৃদু মৃদু মিষ্টি ভাষায় সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা নিবেদন করলেন অনেক—মাঝে কাঁদুনি গাইলেন বিস্তর।

দুই ভুরু কুঁচকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন স্বামিজী—'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' তোমাদের। কেন আস আশ্রমে বলতে পার? কী পাও এখানে? কী সংস্কৃতি হচ্ছে তোমাদের? মনের অবস্থা তো যে তিমিরে সেই তিমিরে—সেই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শম, দম, তিতিক্ষার বিন্দু বিসর্গ আছে তোমাদের? এখানে যা জেনে যাও তার কণামাত্র মেনে চলতে পার না নিজস্ব করে নিয়ে কাজে ফলাতে পার না। ধৈর্য, শক্তি, সাহস, সংযমের লেশ মাত্র নেই। বেশি কিছু না—সত্যদর্শী কবির স্বতঃস্ফূর্ত পংক্তি কটা মনে রাখলেও তো পার—

> সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
> প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ।
> দিবানিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
> ক্রন্দনের নাহি অবসান।।

তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণব মহাজনরাও বলেছেন চিরন্তন সত্যটা—

> সুখ দুখ দুটি ভাই।
> সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি—
> দুখ যায় তার ঠাঁই।।

এ বোধ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আসা উচিত, অন্যের কাছে পাবার জিনিষ নয়। দুঃখের কষ্টিপাথরেই মনুষ্যত্বের যাচাই হয়। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে নিস্পৃহ, কর্তব্যে অটল—এই মানুষের মত মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

'আশ্রমে যাই, সাধু সঙ্গ করি'—এ শুধু তোমাদের অহংকার মাত্র। বৃষ্টির জল ঊর্ধ্ব-মুখ পাত্রেই জমে, অধোমুখ পাত্র খালিই থাকে। আগে 'আত্মদেবো ভব' নিজের প্রভু নিজে হও, মনকে বশ করতে শেখ, তারপর অন্য কথা।

কথা শেষ। স্তব্ধ রইল আকাশ বাতাস। স্বামিজীকে প্রণাম করে ছল ছল চোখে বিষণ্ণ মুখে বিদায় নিলেন ভোলা খাঁ।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই স্বামিজীর খাওয়া-দাওয়া শেষ।

সব কাজ সেরে পান্থশালায় গিয়ে বিশ্রাম কি আর হয়—উশ্খুশ্ করে কাটে। কতক্ষণে তিনটে বাজে—ঘড়ি দেখছি বার-বার। তারপর এক সময় তিনটের ঘরে কাঁটা এসেছে কি না এসেছে এক ছুটে চাদ্দা গাঁয়ে।

জ্যৈষ্ঠের সাত আষাঢ়ের সাত, তবে জানবে মৃগের বাত'—কদিন থেকে আকাশে মেঘঘটার আগমনী সুর বেজে উঠেছে। আতপতাপিত পৃথিবীর বুকে ঝরেছে দু-এক পশলা বৃষ্টিধারা, কখনও ঝম্ঝম্ কখনও বা রিম্ ঝিম্। গ্রীষ্মের ধূলি-ধূসরিত গাছপালা নববর্ষাস্নাত হয়ে উজ্জ্বল সবুজ শোভায় নয়নরঞ্জন করছে। রোদের তাপ গেছে অনেকখানি কমে।

দিবানিদ্রাদি সদ্য সেরে দাওয়ায় বসে চোখেমুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে ঘুমটা ভাল করে ভাঙাচ্ছেন তখন স্মৃতিদাদু। গামছায় হাতমুখ মুছে হেসে বললেন—আরে এস এস, কদিন যে একেবারে ডুমুর ফুলটি, ব্যাপার কি?

—আর ব্যাপার কি—মুন্ধং দেহি। মন্ত্রী মশায়ের মস্তিষ্কের নজরানাটা ফিরিয়ে নিতে এসেছি। কী মস্তিষ্কটাই করলেন আর কি। যাব বরোদা, টিকিট কেটে দিলেন ভূপালের। কোথায় আর কোথায়? দিন ফিরিয়ে নজরানাটা।

ফোকলা মাড়ি বিকসিত করে হো হো হেসে বুড়ো বললেন—এই কথা? এক্ষুনি নাও, এক্ষুনি নাও তোমার নজরানা ফিরিয়ে। ওইটুকু তো কাঁধ, পারবে এই বপুটিকে বয়ে নিয়ে যেতে? নাবিক সিন্ধবাদের দশা হবে যে!

আবার হো হো হাসি। অপ্রস্তুত হয়েও হাসিতে যোগ দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

—আরে ভায়া, বরোদা টরোদা নেপাল ভূপাল—যাই হোক না, উত্তর তো পেয়েছ। যতীন যে ভীষণ নয় তা তো বুঝলে। এখন শনৈঃ পন্থা। পথ কাটা হল এগিয়ে যেতে

আর বাধবে ... কিছু জানা থাকলেও যা জানি তা ... ভাসা। ওগুলো ওদের মন্ত্রগুপ্তি। দলের লোক ছাড়া জানতে পারত না কেউ, 'মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ' আর কি। সিঁধের আশঙ্কা তো বটেই, তার ওপরে টিকটিকির ভয়। পুলিশ ব্যাটারা কি কম জ্বালাতন করেছে? আশ্রমেও হানা দিতে ছাড়ে নি। জবাবদিহি করতে হয়েছে গাঁয়ের অনেককেই। একেবারে নির্দোষ সংস্পর্শলেশশূন্য সাঁওতালগুলোও কি বাদ গেছে? তাই বলছি যতীন্দ্র অরবিন্দ সম্বাদটা জেনে নিও ওর কাছেই। আসল জিনিসটিই পাবে। যতটুকু বলবার ও ঠিক বলবে।

—তাই তো দাদু, ভয় করে যে—বললুম চুপি চুপি।

—এই তো ভায়া ভুল করছ। জ্ঞানের পথে চলতে হলে মানে—কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে—'লজ্জা তন্দ্রা ভয় তিন থাকতে নয়'—লজ্জা, আলস্য আর ভয় ছাড়তে হবে। তবে কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। মানুষ তো—তোমায় খেয়েও ফেলবে না, মেরেও ফেলবে না। বড় জোর দু একটা ধমক। তাতে এত ভয় কিসের? জিজ্ঞেস করেই দেখ না।

জোর গলায় বলে উঠলুম—নিশ্চয় জিজ্ঞেস করব, দাদু। যা হয় হবে।

——হ্যাঁ, এই তো চাই। সাহস কর, ভয় কিসের?

এর পর দুধের বাটি খালি করে একটু বেলা থাকতেই ফিরলুম আশ্রমে।

রাত্রে রান্নার ঝামেলা নাই। সন্ধ্যে হতেই বসলুম স্বামীজীর কাছে।

অম্বুরী তামাকের কলকেয় আগুন ধরিয়ে গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে নলটি হাতে দিয়ে গেল রেণুদা।

জিজ্ঞেস করতে হবে—কী জিজ্ঞেস করি? বরোদার কথা উঠবে কিসে? যুদ্ধের কথা? বললুম—হ্যাঁ বাবা, সন্ন্যাসীরা কি যুদ্ধ করেন? যুদ্ধ করেন তো সৈনিকরা।

—নিশ্চয়ই, সন্ন্যাসীরাও যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ জয় না করলে কি সন্ন্যাসী হয়? তবে এঁদের যুদ্ধ দেখা যায় না, সৈনিকের যুদ্ধ দেখা যায়।

—সন্ন্যাসীদের আবার কার সঙ্গে যুদ্ধ, স্বামীজী?

—অসুরদের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে। চণ্ডী পড়েছ, চণ্ডীর ছ'-ছ'টা অসুর থাকে মনোরাজ্য দখল করে। তাই আত্মশক্তিকে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, দুর্গারূপে জাগিয়ে যুদ্ধ করতে হয় ঐসব দুর্ধর্ষ অসুরদের সঙ্গে। জয় করলে তো ভাল, আত্মরাজ্য দখল করবে—সন্ন্যাসী হতে পারলে। নয়তো খতম। প্রকৃত বীর সৈনিক যারা তারাও তো সন্ন্যাসী। দুটোর লক্ষ্য এক, কর্ম এক, দুজনেই সংসারত্যাগী।

—বুঝলুম না বাবা। মারামারি কাটাকাটি করা সৈনিকরা আবার ত্যাগী সন্ন্যাসী হয় কেমন করে?

—এরা কি করে? দুজনেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সংসার ত্যাগ করে। সন্ন্যাসী যায় বনে, সৈনিক যায় ব্যারাকে। দুয়েরই লক্ষ্য মুক্তি, দুয়েরই কর্ম যুদ্ধ। সন্ন্যাসী চান নিজের মুক্তি, তাই—নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ, আর সৈনিক চায় দেশের মুক্তি, দশের মুক্তি, জনসাধারণের মুক্তি—বিপদ থেকে, পরাধীনতা থেকে। তাই তাদের যুদ্ধ দেশের শত্রু, দশের শত্রুর সঙ্গে। তাহলেই দেখ—সন্ন্যাসীর যুদ্ধ স্বার্থে, সৈনিকের যুদ্ধ পরার্থে।

অধরোষ্ঠে তর্জনী ঠেকিয়ে চুপ করে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। পট পরিবর্তন হল। যেন একটা কালো যবনিকা সরে গেল মানসপটের ওপর থেকে। ঈশ্বর অনুগৃহীত জ্ঞানী বলে সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আর খুনে-ডাকাত বলে সৈনিকদের ওপর ঘৃণা পোষণ করে এসেছি ছোট থেকেই। এখন যে সব ওলটপালট।

নীরবতা ভেঙে সাহস করে বললুম—তাহলে কি বলতে হবে স্বামীজী, সন্ন্যাসীরা স্বার্থপর?

হাসতে হাসতে স্বামীজী বললেন—প্রথমটা তাই বৈ কি। তবে এই স্বার্থপরতা পরিণত হতে পারে পরার্থপরতায়—সর্বসাধারণের মধ্যে নিজের উপলব্ধ সত্যজ্ঞানের প্রচারে। যেমন কত দুর্দান্ত চণ্ডাশোককে—দেশ-কল্যাণ ধর্মাশোকে রূপায়িত করেছিল বুদ্ধদেবের উপলব্ধ সত্যধর্মের প্রচার। নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলীমাল হয়েছিল মাতৃ-ভক্ত সন্তান। শাক্য কোলিয় রাজের বংশানুক্রমিক শত্রুতা পরিণত হয়েছিল অকপট মিত্রতায়। সৈনিকের চেয়ে সন্ন্যাসীর কৃতিত্ব এইখানে, সৈনিকের কর্মে—লোকক্ষয়, সন্ন্যাসীর কর্মে—লোক অক্ষয়।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল—সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ।

পরের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে খটকা লাগল। পূর্বাশ্রমের কথা যে জিজ্ঞেস করতে নেই সন্ন্যাসীদের। কিন্তু এঁদের থাক তো আলাদা—কুসংস্কারমুক্ত জ্ঞান-মার্গী এঁরা। কিছু মনে করবেন কি? দেখাই যাক না জিজ্ঞেস করে।

খানিক ইতস্ততঃ করে চোখ বুজে ঢোক গিলে বলে ফেললুম—আচ্ছা বাবা, শোনা যায়—বরোদা রাজ্যে সেনা বিভাগে ভর্তি হয়ে যুদ্ধের সব খুঁটিনাটি কলা-কৌশল শিখেছিলেন। তারপর পদোন্নতি হতে হতে শেষপর্যন্ত হয়েছিলেন রাজার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। এ কি সত্যি? যুদ্ধ শেখবার ইচ্ছেই বা হয়েছিল কেন, স্বামীজী?

এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে গাল ফুলিয়ে তীক্ষ্ম উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চোখে চোখে চেয়ে রইলেন স্বামীজী। ... ... চোখ নত করলুম।

ফুস্ করে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে অল্প ঘাড় নেড়ে স্বামীজী বললেন—যা শুনেছ তা সত্যি। 'যুদ্ধ' শেখবার ইচ্ছা হয়েছিল কেন তা কথা নয়, কথা হচ্ছে—দেশের প্রত্যেকেরই যুদ্ধ শেখবার ইচ্ছাটা হয় না কেন?

গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে কোলে তাকিয়া নিয়ে সোজা হয়ে বসে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন স্বামীজী—বলতো দেখি,—সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুনো, বর্বর সবদেশের সাধারণ লোক যুগে যুগে চায় কি?

ঠ্যালা সামলাও। প্রশ্ন করেছিলুম উত্তর চেয়ে। প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন, বলি কী? হকচকিয়ে তাকাচ্ছি এদিকে ওদিকে।

আষাঢ়ে নবমী। সকাল থেকে রিম্‌ঝিম্ ঝ'পঝলা বৃষ্টির পর সন্ধেয় মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে উঠেছে শুক্লা নবমীর চাঁদ। চাঁদের হাসিতে ভেসে যাচ্ছে চারিদিকের গাছপালা, মাঠ-ময়দান, নদী, নদীতীর—সব। খড়ির উত্তরে মাইলখানেক দূরে কয়রাপুর গ্রামে ত্রৈলোক্যতারিণী দেবীর জ্যোৎস্না-স্নাত সুধা-ধবলিত সুউচ্চ মন্দির। হঠাৎ মনে হল মন্দির-শিখরের গায়ে চিতোরেশ্বরী উবর দেবীর সর্বালঙ্কারভূষিতা অপরূপ রূপময়ী মূর্তি—শীর্ণা, কঙ্কালসারা বুভুক্ষিতা—বাঁ হাতে শূন্য খর্পর, ডান হাত প্রসারিত করে বলছেন—ম্যাঁয় ভূখা হুঁ। বিস্ময়ে আতঙ্কে চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলুম।

সামনে নববর্ষায় দুকুল প্লাবিতা খড়ির পারঘাট। ঘাটে বাঁধা খেয়া নৌকা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। মনে পড়ে গেল অন্নদামঙ্গলের কথা। এই দুর্যোগ সন্ধ্যায় নির্জন পারঘাটে টলোমলো নৌকায় যেন একাকিনী বঙ্গবধূ আর হৃষ্টপুষ্ট একজন মাত্র নাবিক—ঈশ্বরী পাটনী। বাঁ হাতে লগি ডান হাতে সোনার ঝকঝকে সেঁউতি, ঈশ্বরী পাটনী চাইছে বঙ্গবধূ ঈশ্বরীর কাছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।

এই তো সব দেশের সব মানুষের চিরন্তনী চাওয়া।

—কী চুপ করে রইলে যে? হাঁ করে দেখছ কি? উত্তর দাও—স্বামীজীর স্বর জলদগম্ভীর।

—ইচ্ছেমত খেয়ে পরে সুখেশান্তিতে আনন্দে জীবনটা কাটিয়ে দেবে—সব দেশের সব কালের মানুষ এইটাই চায়, স্বামীজী। কবিবরের—প্রতি সংসারের কর্তা চান—

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

কবিগুরুর কথায়—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
যাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল
পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট;

—খাঁটি কথা। সঠিক জবাব। এগুলি চাওয়া মানেই স্বাধীনতা চাওয়া। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষেই পুরোপুরি পেতে পারে এগুলি। আষ্টেপৃষ্ঠে দাসত্ব শিকলে বাঁধা তোমাদের ভারত। তোমরা এসব পাবে কি করে? পড়েছ নিশ্চয়ই—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়ে রে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়?

এই স্বাধীনতার জন্যে যুগে যুগে মানুষ কি করেছে একটু তলিয়ে দেখা যাক ইতিহাসের পাতায়।

দুলাল বলে—কথক ঠাকুর। মায়েদের বৈকালিক আসরে রোজই নাকি পড়ে শোনাও—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, উপপুরাণ, মঙ্গলকাব্য। খুব ভাল। স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষার চেয়ে ঢের বেশি শেখা যায় এতে। তবে খুদ কুঁড়ো তুষ—সবই থাকে, ঝেড়ে নিতে হয়। দেখেছো তো চাষীরাও কুলোয় ঝেড়ে খুদ-কুঁড়ো তুষ বাদ দিয়ে চালগুলি বেছে নেয়। শিক্ষার বেলাতেও এমনি—শোনানো, মনুনো, জানা, হোনা। প্রথমে শুনতে হয়, তারপর ভাবতে হয়—বিচার করতে হয়, তবে জানা হয় অর্থাৎ জ্ঞান হয়। আর জানাটা ঠিক হয়—সেই রকম হতে পারলে। এই হোনা। কি রকম? মনে কর শুনলে জানলে—ভরত-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি। বিচার করে দেখলে—আদর্শ। নিজেকে তৈরী করলে সেই আদর্শে। তবে হোল অধিগত বিদ্যা। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা আবার বিদ্যা নাকি? সে-পুঁথিতেই থাকল, চোরে চুরি করলে, উই-ইঁদুরে কেটে নষ্ট করলে, তোমার নিজস্ব হল না কিছুই।

পুরাণের যুগ অনুসারেই দেখা যাক তোমাদের দেশের লোক কি করেছে শিক্ষা, সংস্কৃতি আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে। পুরাণ অনুসারে যুগ ক'টা?

—চারটে, —সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।

—বেশ, আরম্ভ করা যাক—সত্য বা আদিম যুগ থেকে। আদিম যুগ—গুহা-মানবের যুগ, প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, —প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ছেড়েও দাও এ-সময়ের কথা। কিছু পরের কথাই ধর। আর্য অনার্য দু' শ্রেণীর লোকের বাস তোমাদের দেশে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বড়—আর্যরা। দেশ বনজঙ্গলে ভরা। বনে বনে পশু, গাছে গাছে ফল। খাবার অভাব নেই। লোকজন কম। পাঞ্জাব প্রদেশে সরস্বতী দৃষদ্বতী নদীতীরে উর্বরা ভূমিতে আর্যদের বাস। কাজ কি? সহজ লভ্য বন্য ফলমূল, পশুমাংস আহার আর প্রকৃতির অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা—গবেষণা। রচিত হল বেদ-উপনিষদ। বৈদিক যুগ। লেখার কৌশল জানা হয়নি তখনও। মুখে মুখে রচনা—মুখে মুখে শেখা। শ্রুতি-স্মৃতি আর কি। ঋষি-জীবন—সবাই ঋষি। কিন্তু অনার্যদের সঙ্গে লড়াইও করতে হয় মাঝে মাঝে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দখলী জায়গার অধিকার রক্ষা নিয়ে।

বিদেশী ধারায় ইতিহাস রচনা-পদ্ধতি না থাকলেও তখনকার ধর্মনীতি, সমাজ-নীতি, গার্হস্থ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রণনীতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায় এই বেদ উপনিষদ থেকে। পরিষ্কার জানা যায়—স্ত্রী, পুরুষ—সবাই শিক্ষিত, সবাই উচ্চমনা—গভীর চিন্তাশীল। এ'রা গভীর চিন্তা করেছেন—অধিভূত অর্থাৎ জড়পদার্থ, অধি-দৈব অর্থাৎ—আকাশ, চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্রাদি নৈসর্গিক পদার্থ, অধিপ্রজন অর্থাৎ সৃষ্টি-তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম অর্থাৎ অণু, পরমাণু আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিচারে—গবেষণায়। এ সত্ত্বেও তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে নিজে-দের সংস্কৃতির অধিকার—স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে।

এর পর ত্রেতা যুগ। সত্যযুগেই মানুষ শিখেছে দলবদ্ধ, সমাজবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে। তৈরী হয়েছে গ্রাম, গ্রামনী, নির্বাচিত হয়েছে গ্রামের মাণ্ডলিক বা মোড়ল। পরে—নগর, জনপদ, রাজ্য, নির্বাচিত রাজা, রাজবংশ—এই সব। কাজের সুবিধার জন্যে কর্মবিভাগ অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চার বর্ণ। সভ্যতার অগ্রগতি আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোট-বড় রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন যুদ্ধ করতে হত বাইরের শত্রু আর অনার্যদের সঙ্গে, এখন আরম্ভ হয়েছে প্রতিবেশী রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজ্য ঐশ্বর্য দখল নিয়ে। এই সময়ে প্রবল হয়ে ওঠেন সূর্য-বংশের রাজারা। ইতিহাস পাওয়া যায় মহর্ষি বাল্মিকী রচিত রামায়ণে। আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা রামের জীবনী নিয়ে রচিত হলেও এ-সময়ের রাষ্ট্রনীতি, রণনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, আর্য-অনার্য মিলন, সাধারণ মানুষের মনোবিজ্ঞান বিষয়ক বহু চরিত্রচিত্রণ আছে এই

জনসাধারণে। তখনও স্বাধিকার অর্থাৎ স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জনসাধারণের কি অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

এল দ্বাপর যুগে। মহর্ষি বেদব্যাস রচনা করলেন বিশ্বের বিস্ময়—মহাকাব্য মহাভারত। এই মহাভারতে নাই কি? লোকে বলে—যা নাই ভারতে (মহাভারতে) তা নাই ভূ-ভারতে। যোগে মহাযোগী, ভোগে ভোগী, ত্যাগে মহাত্যাগী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চেষ্টা করলেন অন্যায় অধর্ম দূর করে এক অখন্ড ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে। যেখানে অন্যায় সেখানেই শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিধান। তখন শক্তিশালী চন্দ্রবংশীয় রাজারা। নাম যদিও দুটো একই রাজবংশে সংঘাত—ভাই-এ ভাই-এ গৃহবিবাদ আর কি। পান্ডব আর কৌরব। ন্যায় আর অন্যায়। পান্ডবপতি রাজ্যহারা যুধিষ্ঠির আর কৌরবপতি মহারাজা দুর্যোধন। দুজনেই চান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য। পক্ষপাতহীন সমদর্শী শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব—একপক্ষে থাকবেন নিরস্ত্র তিনি, আর একপক্ষে তাঁর অক্ষৌহিণী দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা। কে কি চান? লটারী হল। দুষ্কৃত দুর্যোধন অক্ষৌহিনী নারায়ণী সেনা নিয়ে মহাউল্লাসে যুদ্ধের উদযোগ করল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের সারথি ও মন্ত্রণাদাতা হয়ে নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের সাহায্য করলেন ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে। অন্যায়ের দমন হল। দেশের একচ্ছত্র সম্রাট হলেন ধার্মিক রাজা যুধিষ্ঠির। এখানেও দেখ—দেশের শান্তি, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জনসাধারণের কত আগ্রহ। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রণনীতি তো বটেই মানব প্রকৃতির সবরকমের ন্যায়-অন্যায় পাপ পুণ্যময় ছোটখাট চরিত্র-চিত্রণও এত পূর্ণাঙ্গ এই মহাভারতে যে মানবজাতির এমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস পৃথিবীতে আর রচিত হয়নি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এস বর্তমান যুগে—মানে কলিযুগে। দ্বাপরের শেষদিকে আবার বহু খন্ড খন্ড স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, যাগ, যজ্ঞ, পশুবধ—নৃশংসতা নির্মমতা ব্যাভিচারে ভর্তি হল দেশ। সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র সব লোপ পেল। স্বৈরাচারী রাজাদের খেয়াল-খুশি মত হতে লাগল রাজ্যপরিচালনা। ভারতের অন্তর্বিপ্লবের কথা—গৃহবিবাদের কথা— ছড়িয়ে পড়ল সারা এশিয়া আর ইউরোপে। সুযোগ বুঝে ম্যাসিদনের রাজা সেকন্দার দরায়ুস ভারত আক্রমণ করে ৫১৮ খৃঃ পূর্বাব্দে পাঞ্জাবের কিছু অংশ নিলেন জয় করে।

জন্ম নিলেন বুদ্ধ। শান্তিদাতা বুদ্ধের অহিংসার প্রেমমন্ত্রে শান্তির হিল্লোল বইল দেশে। কিন্তু শতাব্দী দুই পরে লাগল ধর্মে ধর্মে সংঘাত। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে। ব্রাহ্মণরা অনেক অত্যাচার করল বৌদ্ধদের ওপর। দুপক্ষের হয়ে রাজায় রাজায় শুরু হল গৃহযুদ্ধ। বিদেশীরা সুযোগ পেল। দিগ্বীজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্ডার পাঞ্জাবরাজ বীর কেশরী পুরুকে পরাজিত ও বন্দী করেও তাঁর অসাধারণ বীরত্ব ও তেজে মুগ্ধ হয়ে বিজিত রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন দেশে।

এরপর ভারতে এক অখন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেও সফল হননি মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর পৌত্র চন্ডাশোক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হলেন ধর্মাশোক, প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতে এক অখন্ড ধর্মরাজ্য। দেশে শান্তি এল, সুখী হল রাজর্ষি অশোকের প্রজারা। প্রায় সমগ্র এশিয়া শান্তিদাতা বুদ্ধের চরণতলে প্রণতি জানিয়ে গাইল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

রাজর্ষি অশোকের পর প্রায় হাজার বছর দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রেম ও মৈত্রীবন্ধনে একতাবদ্ধ ছিলেন। তাই এই সময়টায় কোন বিদেশী আক্রমণ রাষ্ট্রের বা দেশের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

এরপর আবার যা কে তাই। আবার জ্বলল আত্মঘাতী আগুন। সেই সুযোগে সবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করে জয় করলেন কটা দুর্গ ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে। তারপরেই কনৌজের রাজা জয়চাঁদ আর চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের বিবাদের সুযোগ নিয়ে বিদেশীরা ভারতের বহু জায়গা নিল দখল করে।

মোগল পাঠানের যুগ। ভারতের ভাগ্যে দুর্যোগ। এর মধ্যে নামকরা বাদ সম্রাট আকবরের। ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না তাঁর। হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতার গুণে তিনি একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হলেও মেবারের রাণা প্রতাপ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেননি। চরম দুর্গতিকে বরণ করেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন তিনি। এই সময় রাজপুত জাতির বীরত্ব আর রাজপুত রমণীর সতীত্ব ও তেজের কথা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনল সারা জগতের লোক। ঠিক এই সময়েই বাংলার বীর প্রতাপাদিত্যও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রভূত দুঃখ-কষ্ট বরণ করেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা পদ্ধতিতে আকবর সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহকে পাঠিয়ে প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার পথে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়।

এরপর অলোকসামান্য রূপসী বেগম নুরজাহানের হাতের পুতুল বিলাসী আড়ম্বরপ্রিয় বাদশাহ জাহাঙ্গীর।

জাহাঙ্গীরের পর শিল্পদরদী প্রজারঞ্জক আড়ম্বরপ্রিয় শৌখিন বাদশাহ সাজাহান। আগ্রা দুর্গ, দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম, মতি মসজিদ, জুম্মা-মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন ও একমাত্র বেগম মমতাজের স্মৃতিসৌধ বিশ্বের বিস্ময় তাজমহল-এর শিল্প রুচির ও আড়ম্বরপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আলোর নিচে অন্ধকারের মতই এঁর ছেলে ঔরঙজীব ভাইদের হত্যা করে বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে বন্দী করে দখল করে বসলেন ভারতের সিংহাসন। ইনি ছিলেন যেমন গোঁড়া মুসলমান তেমনি ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী। অনেকগুলি ছোট ছোট হিন্দু রাজ্য দখল করেন ইনি। কিন্তু মহারাষ্ট্রের মহাবীর ছত্রপতি শিবাজী বশ্যতা না মেনে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজীবন যুদ্ধ করেন, এই প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতসম্রাটের বিরুদ্ধে। একবার ঔরঙজীব সুকৌশলে শিবাজীকে বন্দী করল সুচতুর শিবাজী 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতি অনুসারে সশস্ত্র রক্ষীদের চোখে ধূলি দিয়ে বন্দীশালা থেকে মুক্ত হন। তারপর সারাজীবন চলে তাঁর স্বাধীনতার যুদ্ধ। মেবারের রাণা প্রতাপ, বাংলার প্রতাপাদিত্য, মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর অপূর্ব বীরত্বগাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ভারতের ইতিহাসে।

এমনি করে ভারত পরাধীন হয়ে থাকল প্রায় সাড়ে সাতশ' আটশ বছর। একটু সুরাহা এই যে মোগল সম্রাটরা ভুলেছিলেন তাঁদের নিজেদের দেশকে। এখানে এসে পুরুষানুক্রমে এখানকারই আদিবাসী যে ভারতকেই নিজেদের দেশ বলে ধরে নিয়েছিলেন তাঁরা। তাই প্রথমদিকের কটা বর্বর আক্রমণের কথা বাদ দিলে এখানকার ধনসম্পদ বিত্ত ঐশ্চর্য এখানেই ছিল, লুন্ঠিত হয়ে শোষিত হয়ে চলে যায়নি বাইরে। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোটাও ভেঙে পড়েনি তখন। মুসলমান নবাবদের সবাই যে আকবর সাজাহানের মত ছিলেন তা নয়, বেশীরভাগই ছিলেন যেমন গোঁড়া তেমনি হিন্দু-বিদ্বেষী। মান ইজ্জত ধন-প্রাণের ভয়ে অনেক হিন্দুই ইসলাম ধর্ম নিতে বাধ্য হত।

শেষদিকে এলেন চৈতন্যদেব। তাঁর উদার বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে হিন্দুসমাজ রক্ষা পেয়েছিল অনেকখানি। সনাতন হিন্দু ধর্ম রক্ষা তো পেয়েছিলই অনেক মুসলমানও চৈতন্য দেবের ধর্ম গ্রহণ করে তার প্রসার ঘটিয়েছিল।

এই তো গেল মুসলমান রাজত্বের কথা। তারপরে? পরের কথা পরেই হবে। আজ থাক রাত হয়েছে।

রাত সাড়ে নটা। এবার খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পালা।

অঙ্গনা

আমাদের পথ

এই পৃথিবীতে ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়দের দিন বহু আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—লোকসভায় সদস্যদের প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির মধ্যে একথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ঐতিহাসিক এই ঘোষণার সূত্র হচ্ছে জনৈক সদস্যের একটি উক্তি। সেই সদস্য মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী একজন ভদ্রমহিলা বলেই তিনি তাঁর কোন কোন বিবৃতির ভুল সংশোধন করতে চান না। এর উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, আমি নিজেকে একজন ভদ্রমহিলা বলে বিবেচনা করি না। এজন্য কোন বিশেষ সুযোগও চাই না। আর আমরা এখানে কেউ ভদ্রমহিলা বা ভদ্রমহোদয় বলে আসিনি। সমগ্র মানবজাতির অংশ বলেই আমরা এখানে রয়েছি। সারা মানব-সমাজে আজ যেখানে যা ঘটছে তার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র গ্রথিত এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরাও সমান অংশীদার।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগে চোখে দেখা এবং কানে শোনা একটা ঘটনার কথা। বিদেশ থেকে একজন মহিলা সাহিত্যিক এসেছেন। একটা ঘরোয়া আসরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আমাদের কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক। দু দেশের সাহিত্য নিয়ে আলাপ আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ একজন জানতে চাইলেন যে, ও দেশে মহিলা সাহিত্যিকদের স্থান কোথায়। প্রশ্নটা নেহাৎই কৌতূহলবশতঃ এবং আমাদের দেশের বিচারে একান্তই যুক্তিসংগত। কিন্তু সেই মহিলা সাহিত্যিক তাঁকে এবং প্রকৃতপক্ষে সকলকে হতাশ করে জবাব দিলেন যে, ওঁদের দেশে এরকমভাবে কোন বিচার হয় না। সামগ্রিক অবদানে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় আর সাহিত্যের মূল্যায়নও হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই। তাই পুরুষ এবং মহিলা সাহিত্যিকের পৃথক পৃথক অবদান কতখানি সে প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ।

ওঁদের দেশে যা সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশে তা হয়নি। শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনেও নারী-পুরুষের পার্থক্য আজ আর প্রায় কোন কিছুতেই করা হচ্ছে না সে দেশে। বরং দিনে দিনে বৈষম্যের প্রাচীর আরো উঁচু হচ্ছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সে চিত্রই অত্যন্ত প্রকট। কলকাতার রাস্তা-ঘাটের অবস্থা নতুন করে বিশদ বলার প্রয়োজন নেই। বাস-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এমনি একটি বাস বা ট্রাম কোন স্টপে এসে দাঁড়ানো মাত্রই নামা-ওঠার জন্য এক তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। একজন অপরকে পিছে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। এই ভিড়ে যদি কোন মহিলা থাকে তবে তো কথাই নেই। সবাই তাঁকে এই ওঠা-নামার প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন। কেউ কেউ বলেই ফেলেন, এই ভিড়ে আমরাই উঠতে পারছি না, আপনি আবার কেন? কেউ কেউ আবার বলেন, পরের বাস দেখুন। কিন্তু আসল কথাটা কেউ তলিয়ে দেখতে চান না। তাঁদের যেমন যাওয়ার তাড়া, তেমনি একই তাড়া সেই মহিলারও। এমনিতে হাওয়া খাওয়ার জন্য কেউ বাসে-ট্রামে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি করে না। ইদানিং অবশ্য অফিস আওয়ার্সে লেডিস স্পেশাল বাস-ট্রাম চালানো হচ্ছে। কিন্তু তাতে তো সেই ফারাকই থেকে যাচ্ছে। সকলেরই যে বাসে-ট্রামে ওঠার সমান দরকার একথা আমাদের হৃদয়ংগম হতে আরো কতদিন লাগবে কে জানে।

একই অভিজ্ঞতা কর্মস্থলেও। সেখানে পুরুষ সহকর্মীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, আপনাদের চাকরি করার আর কি দরকার। শুধু শুধু সিটখানা আঁকড়ে রেখে একটি ছেলেকে বঞ্চিত করে চলেছেন। একটি ছেলের কথা তাঁরা ভাবলেন কিন্তু একটি মেয়ের জন্য কোন ভাবনা তাঁদের নেই। এমনও কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, মেয়েদের চাকরি করা মানেই আরো গয়না-শাড়ি এবং কসমেটিক। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে একদিন বলতে শুনেছিলাম, মেয়েদের রোজগারের একটা বড় অংশ নিউ মার্কেটে খরচ হয়। অথচ এই ব্যক্তিটির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বার্থ রক্ষা করার কথা। অন্তত সেই দায়িত্বের কথাই তিনি সকলকে বলে বেড়ান। অথচ সুযোগ পেলে এক নিমেষে মন হালকা করে সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেন। সবচেয়ে নির্মম সত্যকে ওঁরা এমনিভাবে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান। আজকের দিনে প্রয়োজন ছাড়া কেউ চাকরি করতে আসেন না। শখ করে চাকরি করার দিন কবে ফুরিয়ে গেছে। এমন একদিন ছিল যে, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন কোন মেয়ে চাকরি করতেন। তারপর বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিতেন। সেদিন চাকরিতে মহিলার সংখ্যাই ছিল কম। আর যাঁরা চাকরি করতে আসতেন তাঁরাও যাবতীয় সংস্কারমুক্ত পরিবারের মেয়ে। কারণ, এই কিছুদিন আগেও নেহাত সংস্কার বশেই অনেকে মেয়েদের চাকরি করতে দিতে চাইতেন না। এখন অবশ্য সে সংস্কার আর ধোপে টিকছে না। চাকরি আজ আর বিলাস নয়, প্রয়োজন। একথার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে দেখা যায় যে, এখন আর বিয়ের পর কেউ চাকরি ছাড়ছেন না বরং চেষ্টা করেন চাকরি পাওয়ার, আরও উন্নতি করার।

এই তো কিছুদিন আগে বাজারে একটা কথা জোর চালু হয়েছিল যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনের চাকরি করা চলবে না। এই পরিকল্পনাটা কার বা কাদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত তা আমার জানা নেই কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যে শুধু এই কথাটাই নিবেদন করবো যে, তাঁরা কোন যুগে বাস করছেন? স্মৃতি-শিরোমণি শাসিত যুগে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল এবং আঁতুর ঘর আর রন্ধনশালার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা কি আবার সে যুগ ফিরিয়ে আনতে চান? নাহলে, এ-ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত পরিকল্পনা বা মনোভাবের অর্থ হৃদয়ংগম করা শক্ত হয়ে পড়ে। স্বামী তো চাকরি করবেনই কিন্তু স্ত্রীর কি দোষ? কেউ কেউ অজুহাত হিসেবে বলেন যে, স্বামীর যা রোজগার তাতে স্ত্রীর চাকরি না করলেও চলে। এ যুক্তি নেহাতই শিশুসুলভ। এরপরও তাঁরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, আমাদের দেশে চাকরির যা হাল, তাতে স্বামী-স্ত্রী সমানে চাকরি করলে অনেক ছেলেকে বেকার থাকতে হয়। কথাটা সত্যি, কিন্তু সে দোষ তো মেয়েদের নয়। লেখাপড়া শেখার পর তাঁরা রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চাকরিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। অনেকে কিন্তু স্বামীর বিরাট আয়ের পাশে স্ত্রীর চাকরি করাকে অযৌক্তিক মনে করেন। স্বামীর স্বল্প আয়ে স্ত্রীর রোজগার যে বিরাট সাপোর্ট, এই সত্যটা ভুলে গেলে চলবে কেন। এই দোষটা পুরোপুরি তাঁদের নয়। কোন একজন নেতা একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, সব চাকরিতে মেয়েদের সুযোগ দেওয়া উচিত নয় এবং তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি কোনমতেই মেয়েদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে দিতেন না। তখন এই কথা নিয়ে তুমুল আলোড়ন হয়েছিল এবং এই বিবাদের তখনই ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল যে, মেয়েদের আজকের অধিকার কারো দয়ার দান নয় এবং তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠার অধিকার আদায় করে নিয়েছেন। এমন অর্বাচীন মন্তব্য আরো কেউ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ সফল হতে পারেন নি। তাই এই নতুন পরিকল্পনার উদগাতাদেরও একই রকমভাবে ব্যর্থতা বরণ করে নিতে হবে। তাঁদের জানতে হবে যে, শুধু চাকরি-বাকরি নয়, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে আজ যে মেয়েটি সেলস গার্লের চাকরি নিয়ে ঘরকে পর করে দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সে শখ তাঁর শখ নয়। নিতান্ত বাধ্য না হলে তিনি কখনো

এতখানি ঝুঁকি নিতেন না। আর এই ঝুঁকি থেকেই শুরু হয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

কোন সংগ্রামেই আমরা পেছপা নই। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে নানা সংকটে আমাদের দেশ ভুগছে। এর মধ্যে আছে দু' দুবার আমাদের দেশের অখন্ডতার উপর আঘাত হানবার প্রয়াস। দেশের প্রতিরক্ষায় এ-সময় আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। জোয়ানদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজনে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বিগত পাক-ভারত সীমান্ত যুদ্ধে পাঞ্জাবের মেয়েরা খাবার তৈরী করে নিজেরাই পৌঁছে দিয়েছেন সীমান্তে সংগ্রামরত তাঁদের ভাই-দের। এ-সময় একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, তোমরা যে এভাবে সীমান্তে খাবার নিয়ে যাও তোমাদের ভয় করে না। উত্তরে ও'রা জানিয়েছেন, ভয় করবে কেন? ভায়ের কাছে বোন যাবে এতে ভয়ের কিছু নেই। আর শত্রুর আক্রমণে যদি মারা যাই তবে তা হবে আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরব। আমাদের জওয়ানদের পাশাপাশি দেশের জন্য আমরাও আত্মদান করবো।

সারা দেশ জুড়ে মেয়েদের মধ্যে তখন এক অদ্ভুত উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়ে-ছিল। চীন-ভারত সীমান্ত লড়াইয়ে এমনি-ভাবে সামিল হয়েছিল সারা দেশের মেয়েরা। মেয়েরা দিনরাত সোয়েটার বুনেছেন, উলের জামা তৈরি করেছেন জওয়ানদের শীতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। প্রদ-র্শনী এবং নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। সেই অর্থ পাঠিয়ে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার কাজে সাহায্য করেছেন। সকলের সঙ্গে লাইন দিয়ে রক্তদান করেছেন। কোন ডাকেই তাঁরা পিছিয়ে থাকেননি।

এবার আবার এমনি সংকট। এই সংকট বিগত দিনের তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কর্তব্যও তাই খুবই কঠিন। কিন্তু এবারও আমরা পিছিয়ে নেই। বরং সেই দু'বারের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে রয়েছি। পাড়ায় পাড়ায় শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব এবার অংশত আমা-দের। এতদিন এই দায়িত্ব একা পুরুষরাই পালন করেছেন। কিন্তু অনেক কিছুর মত এক্ষেত্রেও সেই একচ্ছত্র কর্তৃত্বের দিনের অবসান ঘটেছে। সিভিল ডিফেন্সের ওয়া-র্ডেন হিসেবে এবার মেয়েরা সেই কর্তৃত্বের ভাগ নিচ্ছেন। এই তো সেদিন ময়দানে মহিলা ওয়ার্ডেনদের মার্চ পাস্ট হলো। তাঁদের কাজে সবাই সন্তোষ প্রকাশ কর-লেন। দায়িত্ব নতুন কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন। ভারতীয় নারী-সমাজের পক্ষে এটাই আমাদের গর্ব।

বহুদিন আগে বিবেকানন্দ বলে-ছিলেন যে, একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। উন্মুক্ত আকাশে অবাধ বিহার করতে হলে পাখির দুই ডানা যেমন সমান শক্তি-শালী হওয়া দরকার তেমনি আমাদের দেশের জাগরণ সম্পূর্ণ করতে হলে নারী জাতিকেও জীবনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আঁতুড়ঘর আর রান্নাঘরে তাঁদের পচিয়ে মারলে সারাদেশও পচে মরবে। এতদিন আমরা যে ভুল করেছি আমাদের অগ্রবর্তী রথের রশি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাসহ পৃথি-বীর নানা দেশ ঘুরে সেদেশে নারী-জাতির স্বাধীনতা দেখে বিস্মিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে যে চিন্তার উদয় হয় তা হলো যে, আমাদের দেশে নারী-জাতির দুর্দশাই আমাদের অধোগতির মূলে কারণ। এই দুর্দশার পঙ্ক থেকে তাঁদের আবার উদ্ধার করতে পারলেই সারা দেশ ঋজু হয়ে চলার শক্তি পাবে। স্বামী বিবেকানন্দের এই স্বপ্ন আজ অনেকাংশে সার্থক হতে চলেছে। জীবন ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি আজকের এক বিরাট বিস্ময়। পৃথিবীর তিনটি দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চে রয়েছেন মহিলা। আমাদের দেশ এদের মধ্যে সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এক অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে সুদক্ষ কর্ণ-ধারের মতো রাষ্ট্র-তরণী পরিচালনা করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর এই কৃতিত্বকে মেনে নিয়ে তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মহিলা বলে অভিহিত করেছে লন্ডনের বহু প্রচারিত ডেইলি মিরর পত্রিকা।

শ্রীমতী গান্ধী নারী-পুরুষের ক্ষুদ্র বাদানুবাদের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনি নিজেকে অভিহিত করে-ছেন মানবজাতির অংশ হিসেবে। এ এক দুরূহ প্রয়াস। তবে অসম সাহসিকতায় এই প্রয়াসে তিনি সফল হবেন। সেইসঙ্গে এক গুরু দায়িত্ব আমাদের সকলের। শ্রীমতী গান্ধীর সাফল্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের সমবেত অগ্রগতি। তাই আমাদের অগ্রগতিকে আরো জোরদার করে সারা দেশ জুড়ে সৃষ্টি করতে হবে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা। একথা আমাদের জানা যে, সংস্কার নামক অহিফেন-এর ঘোর খুব সহজে কাটে না। এখনো যে কাটেনি তার স্পষ্ট প্রমাণ তো প্রতি পদে পদে পাওয়া যাচ্ছে। এর এক-মাত্র উপায় হচ্ছে আরো অগ্রগতির। একমাত্র অগ্রগতির রথ চালিয়েই এই সংস্কারের দুর্গকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা সম্ভব। সেদিন নারী-পুরুষ ভেদে বিচার ব্যবস্থা লুপ্ত হবে আমাদের দেশেও—কথায় কথায় আর নজির টানতে হবে না বিদেশের।

—প্রমীলা

নেপালী লৌকিক কাব্য

হরেন ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য ভূখন্ড শৈলপুরী দার্জিলিং। নগাধিরাজ হিমালয় তার অনন্ত ঐশ্বর্য বিস্তার করে দিয়েছে এই অঞ্চলে। বিভিন্ন বৃক্ষলতাগুল্ম, বনজ-কুসুম, কল্লোলিনী রজতশুভ্র ঝর্ণা-ধারার অবিশ্রান্ত সঙ্গীত, ঝাউ-পাইনের মর্মর, রঙিন ফুলে ফুলে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমর-গুঞ্জন, চপল প্রজাপতির বর্ণালী পাখার শিহরণ—সব নিয়ে মনোমুগ্ধকর পার্বত্য পরিবেশ।

দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নেপালী, ভুটানী, তিব্বতী, সিকিমী ইত্যাদি পার্বত্য জাতির সঙ্গে একত্রে বসবাস করে বাঙালী, বিহারী, রাজস্থানী এবং ভারতের নানা প্রান্তের অধিবাসী। এই অঞ্চলে নেপালী ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ। ধর্মের ক্ষেত্রেও সমন্বয় ও সহিষ্ণুতা লক্ষণীয়। নেপালীরা প্রধানত হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ বা খৃষ্টধর্মাবলম্বী।

বাংলা ও নেপালী উভয় ভাষার জননী সংস্কৃত। তাই যে-কোন বাংলা ভাষী একটু চেষ্টা করলেই নেপালী ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। নেপালী ভাষা শ্রুতিসুখকর মধুর। নেপালী লৌকিক কাব্য আমাদের কানে ঝংকার তোলে, মন মাতায়।

সরল সাধারণ গ্রামের অধিবাসী, যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেনি, আধুনিক জীবনের রং জৌলুষ যাদের মন আচ্ছন্ন করেনি, তারা মনের ভাব প্রকাশ করে কবিতায়—যে কবিতায় ছন্দচাতুর্য নেই অলংকারবাহুল্যো নেই—সহজ সরল ভাষায় হৃদয়ের উত্তাপ আছে, আছে আন্তরিকতা। একেই বলে লৌকিক কবিতা। স্থান কালের সীমা ছাড়িয়ে লৌকিক কাব্য সর্বত্র নিজের আসন বিস্তার করে নেয়। এ তো শুধু একজনের মনের কথা নয়, সবারই মনের কথা। নেপালী লৌকিক কাব্যে প্রকৃতির প্রভাব বেশি। ধ্যানমৌনী হিমালয়, পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই, ঝর্ণাধারার কলপ্রবাহ, পাথরের স্তব্ধ শীতলতা অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ নেই এখানে, আছে অপূর্ব সখ্য, নৈকট্য। এই কবিতায় তাই পাওয়া যায় মাটির ঘ্রাণ, মাটির মানুষের মনের কথা।

নেপালীরা সঙ্গীতপ্রিয় জাতি এবং সঙ্গীতের নানা শাখায় পারদর্শী। স্বভাবতই অধিকাংশ কবিতাই সুরসহযোগে গীত হবার উপযোগী করেই রচিত। লৌকিক কাব্যের নানা স্তর রয়েছে। কখনো পৌরাণিক কাহিনী ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু, কখনো নর-নারীর চিরন্তন প্রণয়, কখনো সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, সামাজিক অসংগতি, কখনো প্রকৃতির মনোরম রূপ, কখনো বা রুক্ষ ধূসর নির্মম প্রকৃতির রুদ্র ভয়াল তান্ডব। এখানে কবির নাম কেউ মনে রাখে না, জানবার প্রয়োজনবোধ করে না, কাব্য নিয়েই সকলে মুগ্ধ। তাই লৌকিক কাব্য সর্বজনীন।

আমরা কিছু কিছু কবিতার মূল রূপ তুলে দিচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তার ভাবানুবাদ ও প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি। নেপালী লৌকিক কাব্যের মূল সুর তাহলে ধরতে পারব আমরা।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বাবা অনেক দূর দেশে। এত দূরের পথ, যেতে ছ' মাস, আসতে ছ'মাস সময় লাগে। ইচ্ছে হলেই যাতায়াত করা যায় না। কেই বা নিয়ে আসবে! বিশেষ করে 'তীজ' উৎসবের সময় যখন সব মেয়েই বাপের বাড়ি আসে তখন কে তাকে আনতে যাবে। এটি একটি পরিচিত জনপ্রিয় কবিতা। এখানে কন্যার বিলাপ দিয়ে আরম্ভ।

'হামরো জেঠা বাবা সাতই বহিন ছোরি
সল্যোনি ডাঁড়ামা ঢলকে কি
হামরা বাবাকি ম এউটি ছোরি
পুরায়ো বরই নেপাল।
ছএ মহিনা যান, ছএ মহিনা আউন
বর্ষ দিনকো বাটো কটে বাঁরলৈ
বর্ষ দিনকো বাটো দিয়েও মেরা বাবই
তীজমা লিন মোলাই কো জালা।

বাবা সান্ত্বনা দিচ্ছেন—

'ঢলকৈ দিউলা কোটে সাঁভো
লরকৈ দিউলা ডুঙ্গিয়া
তীজমা জেঠা দাইলায় লিন পাঠাউলা।'

কোন চিন্তা নেই তোমার, তোমার জন্যে ডুঙ্গি বা নৌকার ব্যবস্থা করে দেব এবং তীজ উৎসবে আনবার জন্যে তোমার বড়দাকে পাঠাব।

মেয়ের মন মানে না, ভয় কাটে না।

'পহিলে পরথম জেঠা দাইলে
জাম কি ন জাম ভনন
জেঠি ভাউজুলে জানৈ দেউইনন।'

বাবার কথায় হয়ত বড়দা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে রাজি হবেন কিন্তু বড়বৌদি তাকে যেতে দেবে না। তখন উপায়?

কবিতাটি দীর্ঘ। এরপর বাবা বলবেন তাহলে মেজদাকে পাঠাবেন। সেখানেও মেয়ের একককথা—মেজবৌদি আপত্তি জানাবেন। এইভাবে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সব ভাই-ই স্ত্রীর বশীভূত এবং তাদের নিষেধেই কেউ যেতে পারবে না। অবশেষে বাবা জানান তোমার ছোট ভাই, তারই শুধু বিয়ে হয়নি, সেই যাবে আনতে। তখন মেয়ে চোখের জল মোছে, সান্ত্বনা পায়, ভয় কাটে তার। ছোট ভাই-ই তার একমাত্র ভরসা। এই কবিতাটি পড়লে অজান্তেই আমাদের আগমনী গানের কথা মনে পড়ে যায়।

নেপালীরা যোদ্ধা জাতি। অনেকেই ঘরের মায়া কাটিয়ে দেশান্তরে জীবন কাটায়। তাদের সৈনিক জীবনে কত ব্যথা, কত দুশ্চিন্তা। এই জীবন নিয়েও নানা কবিতা আছে।

'হিমালৈ চুলি পারী বাট
বাস্যো হৈ কুখুরা
হের কৌজকো বিরলৈলে দেশই কাটো
জালৈ লাগেও জানৈ লাগেও
দুই দিনকো লাহুরে যৌবন জানৈ লাগেয়
কানছিলে দিয়েকো কইচিমার সিগরেট
অলৈ ছ টুকুরা।'

হিমালয় শিখরের অপরপারে ভোরে মোরগ ডাকলো। আমাদের বীর সৈনিকরা সেই বন্ধুর পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে—তাদের ক্ষণস্থায়ী যৌবন এইভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে। তবু ঘরের স্মৃতি কি তারা ভুলতে পারে। প্রেয়সীর দেওয়া সিগারেটের টুকরো এখনো পকেটে রয়েছে। এই স্মৃতিটুকুই সম্বল।

মেষ পালন, গোপালন এদের এক শ্রেণীর জীবিকা। এরা গোঠালা নামে পরিচিত। সঙ্গে শিকারী কুকুর নিয়ে কাকভোরে এরা বেরিয়ে যায়। অনেকে আবার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘোরে জীবিকার সন্ধানে।

'রাণীলাই চরী
উড়িমা গয়ো
বস্যো নি বারৈমা—
গোঠে গোঠ ঘুমনে
গোঠালা ভাইহো
নাচন নাচ টুংনা কো পারই মা।'

রাণীপাখি উড়ে গিয়ে বাগানের বেড়ায় বসেছে, গোঠে গোঠে ঘোরা গোঠালা ভাইরা সব, এখন মনের আনন্দে টুংনা বাজিয়ে তার সুরে সুরে নাচ। কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পরে নাচ-গানে মন ভরায় ওরা। তারপর ভোর হয়। যখন বলে—

'খোলাকো পানী খোলাইমা রয়ো
যাঁউ কতা প'ধেরা—
উঠন আমৈ
ফুকন আগো
ভই গয়ো সবেরা।'

ঝর্ণার জল ঝর্ণায় রয়ে গেছে, কোথায় গিয়ে আমরা স্রোতধারা পাব? মা এবার ঘুম থেকে ওঠো, চুলোয় আগুন দাও ভোর হয়ে গেছে।

'ধুরীমা লাগেও
ধরীকো ধোঁয়াশো
মধেরী লাগ্যো দেউ।
কেটোলাই মকাই
বুড়ালাই চামল
হৈ মেরী আমৈ
কুকুরলাই পিঠো দেউ।'

ঘরের চাল ধোঁয়ায় কালো হয়েছে, ঝুল জমেছে, উঠোনে শ্যাওলা জমেছে—ওসব ধোয়া মোছা, পরিষ্কার করতে হবে। মা আমার আমাদের সঙ্গে যারা গোচারণে যাবে, সেই সব ছেলেদের জন্যে ভুট্টা, বড়দের জন্যে চাল, আর কুকুরের জন্যে খাবার দিয়ে দাও। এই সব গুছিয়ে নিয়ে ওরা রওনা হয়ে যায়।

লৌকিক কাব্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে প্রেম-কবিতা। টুকরো টুকরো কবিতায় মনের ভাব প্রকাশ করা হয়।

'মৈলে পালে মইনা চরী
বোলাও'দা বোলদৈন
বোলি দেউন মৈনা চরী
হবেলীমা হাঁসি খেলি যাঁউ।'

একটি ময়না পুষেছি আমি, আমি কথা বললেও সে কথা বলে না—দয়া করে একবার তুমি কথা বল, আমি একটু হেসে খেলে ঘরে ঢুকি।

পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব। দূরদূরান্ত ঝর্ণা থেকে জল আনতে হয় তাই জল আনতে যাবার জন্যে ডাক দেয় সঙ্গীরা।

'ভারা ঘরাক শাইলি মাইলি
পানি ভরন যানছন কি?
সোধি দেউন।'

নিচের বাড়ির মেজমেয়ে সেজমেয়ে জল আনতে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করে দাও।

'সাত থৈলা পানি ছ
কাখে মা নানি ছ
যাছৈ ন ভনি দেউন।'

জবাব দেয় ওদের একজন—সাতঘড়া জল ভরা আছে, কোলে আছে ছেলে, আজ আর জল ভরতে যাব না।

কয়েকটি মাত্র লৌকিক কাব্যের পরিচয় দিয়েই বর্তমান প্রসঙ্গের যবনিকা টানতে হল। দুঃখ-দৈন্য ভরা কর্মব্যস্ত জীবনে অজস্র ব্যথা, যন্ত্রণা, চিন্তা, কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য সাময়িকভাবে সেই ব্যথা ভুলিয়ে দেয়—মনকে নিয়ে যায় অরূপলোকে। লৌকিক কাব্যের সহজ সরল ভাষা, অলংকারহীন আটপৌরে শব্দ মনের গুরুভার লাঘব করে মনকে নিয়ে যায় অপূর্ব সৌন্দর্যের দুর্লভ জগতের প্রান্তসীমায়।

জীবনের জন্য

অর্চনা চৌধুরী

ছোট খাটো একটা যুদ্ধ করে, ঐ বিশাল পাইপগুলোর একটাতে দখল নেওয়ার জন্য ভেতরে ঢুকে সোজা উপুর করে দিলে সাত-দিনের প্রায় উপোসী শরীরটাকে নজরআলী। চারদিক থেকে ঢিল এসে পড়লো কটা ঐ পাইপের ওপর। একটা পায়েও লাগলো। নজরের ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। প্রাণ গেলেও নজর এই পাইপ ছাড়বে না। অন্যথায় এই বিশাল আকাশের নীচে খোলা মাঠে এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে কাটাবে কেমন করে?

"আল্লাও গোসা করছে আমাগো উপর। নাইলে এত বৃষ্টি হয়?" নজর ভাবে।

নজর মাথা উঁচু করে দেখে ওর ছেলে-মেয়ে বৌ ওর পাইপ দখল করা দেখছে কি না? নজরের বৌ, ছেলেরা দূর থেকে দেখছে ওদের আস্তানাটা। কতলোক আকাশের নীচে আছে। ওরা তবু মাথা গোজার একটা ঠাঁই পেল। ঠাঁইই বটে। কলকাতার জল-নিকাশী পাইপ। বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে না। নজরের বৌ-এর মনটা খুসিতে ডগমগ ক'রে ওঠে। বড় ছেলেকে তাড়া দেয় —"অ মোতি, গাটঠিটা মাথায় ল। চল সকাল সকাল তোর আব্বায় জায়গা পাইছে।'

সবচেয়ে ছোট ছেলেটাকে কাঁখে তুলে নেয়। বাঁ হাতে মাথার পোটলাটা ধরে পাইপের দিকে এগোতে থাকে। পেছনে ওর পাঁচটা বাচ্চা নিজ নিজ পোটলা নিয়ে লাইন ধরে এগোতে থাকে।... ... ক্ষুধার্ত নিপীড়িত, মানবসভ্যতার কলঙ্ক, একপাল নিরন্ন ঘরছাড়া দিক্‌হারা মানুষ। খান শাসনের বর্বর আক্রমণে ভিটেমাটি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে। জীবনে কখনো আপন গ্রামের বাইরে যায় নি এমন সব মানুষ। ঘরই যাদের ছিল বিশ্ব এমন সব মানুষ। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে খানসেনারা।

আর্ত মানুষে প্রাণের দায়ে ছুটে এসেছে ভারতের দিকে।

নজর আলীও চলে এসেছে।...

গ্রামের বাইরে কখনও পা দেয় নি নজর আলী। বিয়ে করেছে গ্রামেই। বাপের আমলের জমিতে চাষ করে সারা বছরের খাবার জুটতো না। অন্যের জমিতে মুনীষ খেটে পেট চালাত। মালিক যা দিত তাই নিয়ে ঘরে ফিরত। প্রতিবাদ কখনো করতো না। অভাবের অনটনের জীবন। ক্ষিধেটাকে আই দুঃখ বলে মনে হয় নি। ওকে ওর পারিশ্রমিক ঠিক দেয় নি, এমন কথা মনে করিয়ে দিলেও নজর গা করেনি। বলেছে, "দেউক, দুই কুনকী ধান কম দিয়া ও বড়লোক হয়, হউক। আল্লা ওরে গুণা দিব"।

...নজর চাষের সময় বাদ দিয়ে অবসর সময়ে মাটির পুতুল বানাতো। ঐ এক নেশা ছিল ওর। ছোটবেলায় পটুয়াদের কাছে বসে হিন্দুদের প্রতিমা তৈরী দেখতো। শিখতো। রং তুলির বালাই ছিল না। শুধু মাটির মূর্তি গড়তো। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের কাছে খুব প্রিয় ছিল নজর। ছোট-দের সব পুতুল তৈরী করে দিত। বেশীর ভাগ দেবী মূর্তি। ওর জাতভাইরা সব সময় রাগ করতো। তা করুক। নজরের ঐ ছিল এক নেশা। ......

দিন শেষ হয়। রাত আসে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। একে একে আসে চলে যায়। কেন যায় নজর জানে না। জানতে চায়ও নি। গ্রামটুকুই ওর পৃথিবী। ঘরে চাল না থাকলে, মূর্তি গড়তে গড়তে বৌকে বলতো—"অ মোতির মা, দাসগো পুকুরে না, এই পুরুষ্ট কলমী হইছে। আর শোলের পোনায় গিজ্‌গিজ্‌ করতেছে। মোতিরে লইয়া কিছু ধইরা আন। দুফরে খাওন যাইবো। কলমী শাক পোলাপানে ভাল খাইবো।

মোতির মা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে।

—"হ, বুঝছি। আর কওন লাগবো না। তুমি তোমার খেলা লইয়া থাকো। মাটির বৌ তোমারে ভাত দিব। কাম কাজ করণের নাম নাই। বইয়া বইয়া ক্যাবল পুতুল বানাও।"

নজরআলী জানে যত জোরে জোরে পা ফেলে ঘরে ঢুকুক না মোতির মা এখুনি বেড়িয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে কারও ঘর উঠোন লেপে চাল নিয়ে আসবে ঠিক।

কি হোল, কেন হোল নজর জানে না। খানসেনারা এসে গ্রাম নষ্ট করছে। মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের দাঁড় করিয়ে গুলি করছে।

নজর ঘরবাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। ওদের গ্রামের সুধীরবাবুই বললো—"আমগো লগে ভারতে চল নজর। ঘর বাড়ী সব জ্বালাইয়া দিছে। থাকনের তো জায়গা নাই।"

নজরের কষ্ট হয়েছে। ভয় করেছে। তবু গ্রামের অনেকের সঙ্গে ভারতে চলে এসেছে।

দিনের পর দিন হেঁটেছে। উপোস করেছে। ভারতে ঢুকে কতদিন পর খেয়েছিল পেট ভরে। সেও সাতদিন হয়ে গেল। এর মধ্যে যা পেয়েছে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে নিজেরা যা খেয়েছে তা না খাওয়ারই মত।

ছেলেমেয়েরা তাদের গাটটি বোঁচকা ওর চারপাশে ফেলে বসে পড়ে। ছোট বাচ্চাটা মাকে প্রশ্ন করে—'ও আম্মু, এইডা ক্যামন ঘর? এইডারে কি কয়?

—কে জানে সোনা, কি কয়? থাকনের লাগবো থাকো। উইঠ্যা বও। সব গুছাই লই।

নজরআলী উঠে বসে।

"আজ সাতদিন হলো জ্বর। সর্দি-কাঁসিও হয়েছে খুব। বুকে ব্যথা। গ্রামে থাকলে অনন্ত কবিরাজের কাছে গিয়ে দেখিয়ে আসতো। বৌকে বলে, "হাত চালা মোতির মা। মাথা ঘুরে। বইতে পারুম না।"......

মোতির মা গায়ে হাত দিয়ে দেখে উত্তাপটা। গ্রামের বৌ। গ্রামের মেয়ে। গ্রাম ছেড়েছে। একমাত্র অবলম্বন স্বামী। ওর ফর্সা মুখটা ভয়ে কালো হয়ে যায়।

"অয়, তোমার শরীরের উত্তাপ বাড়ছে। হায় আল্লা, আই কি করি?"

"ভাবিস না। ভাল হইয়া যামু। অখন শোওনের দে।"

মাদুরের ওপরে ভারি কাঁথাটা হাত চালিয়ে পেতে ফেলে। মাথায় কিছু দেওয়ার দরকারও নেই। ঐ পাইপের ভেতরে টান হয়ে একজনই শুতে পারে। একপাশে গুটি-শুটি মেরে শুয়ে পড়ে নজরআলী। ভয়ার্ত মোতির মা আর একটা কাঁথা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেয়। ......

বনগাঁ সীমান্ত পর্যন্ত সুধীরবাবুদের সঙ্গেই এসেছে ওরা। সুধীরবাবুর শ্বশুর পাকিস্থান হওয়ার সময়ই চলে এসেছিলেন। ওরা ওখানেই যাবে। শরণার্থী শিবিরে ওরা থাকবে না। সুধীরবাবুর শালা এসেছে নিতে। সুধীরবাবুর স্ত্রী কিছু টাকা দিয়ে মোতির মাকে বলেছিল, "এই টাকা কয়টা রাখ মোতির মা। পোলাপানেরে কিছু কিন্যা দিস।" ...

শাড়ীর আঁচলের গিট খুলে টাকা কটা বার করে মোতির মা। ভারতীয় টাকা ও চেনেও না। পড়তেও পারে না। নজর-আলীর গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দেয়, "এইটা কি ট্যাহা, দেখসে।"......

নজরআলী চেয়ে দেখে।

"এই ট্যাহা কে দিল তোরে?"

"সুধীরবাবুর বৌ দিছিল। মোতিরে দি চিড়া আনাই। চাউল কখন দিব, ঠিক কি?"

নজরআলী একটা টাকা নিয়ে মোতির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। "এক ট্যাহা। দেইখ্যা যাইস। হারাইস্‌ না।"

মোতি টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পনের বছরের ছেলে মোতি। এখানে আসা পথে দোকান দেখে এসেছে ঠিক। রাস্তার পাশে দোকান আছে।

চওড়া রাস্তা। ভি-আই-পি রোড। মোতি শুনেছে জায়গাটার নাম লবণ হ্রদ। কলকাতার নতুন উপনগরী। তৈরীর পথে। বাড়ী, ঘর, রাস্তা—জনবসতি তৈরী হচ্ছে। ড্রেন তৈরীর জন্য বড় বড় পাইপ রাখা হয়েছে। মোতিরা একদল আজ এই পাইপে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁবুতে ওদের জায়গা হয় নি। যা তাঁবু ফেলা হয়েছিল সব ভর্তি হয়ে গেছে। ওদের জন্যেও নাকি তাঁবু পড়বে।

মোতি দেখতে দেখতে চলে পাছে রাস্তা ভুল হয়।

দোকানে চিড়া কিনতে গিয়ে মোতি অবাক। "এক স্যার চিড়া তিন ট্যাহা! কও কি?

দোকানী জিজ্ঞাসা করে—"বাংলাদেশ থেকে এসেছো?"

মোতি মাথা নাড়ে। দোকানী এক সেরের মত চিড়ে দিয়ে টাকাটা রাখে।

মোতি বলে, "আম্মা গুড় নিবার কইছে। চিড়া একটু কম দিয়া গুড় দাও।"

দোকানী খানিকটা ভেলিগুড় দিয়ে বলে "নিয়ে যাও। পয়সা লাগবে না।"

মোতি খুশি হয়। দোকানের পেছনে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। খুব যেতে ইচ্ছে করে ওর। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে, "এখানটার নাম কি লবণ হ্রদ?"

"না, ওখানের নাম লেক টাউন। এই দিকটা লবণ হ্রদ।"

মোতি ফিরে এসে মাকে সব বর্ণনা দিয়ে ফেলে। ওর কাছে সব আশ্চর্য লাগছে। মাকে চিড়ে গুড়ের ঠোংগা দুটো দিয়ে বলে, "ওরে বাইস্‌রে, আম্মু সব ডাকাইত। কয় চিড়ার স্যার তিন ট্যাহা। গুড়ের পয়সা লয় নাই দোকানী। এমনি দিছে।"

জ্বর বাড়ছে নজরআলীর। বুকের ব্যথাও। যতক্ষণ চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল বুঝতে পারে নি। এখন মনে হচ্ছে ওঠার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। মোতির মা এরই মধ্যে সংসার গোছাচ্ছে। ছেলেমেয়ে-দের খেতে দিচ্ছে। চার বছরের ছোট ছেলেটা বাপ নেওটা। কাছে বসে নজরআলীকে দেখছে। "অ, আব্বু, পুতুল বানাইবা না? ঐ দেখ কত কাঁদা? আমারে একটা কালী বানাই দিবা।"

"দিমুরে বাপ, দিমু।"...

নজরের জ্বর বেড়ে চলেছে। নাম লিখিয়েছে কিন্তু—এখনও কোন ক্যাম্প হয়নি ওদের। কিছু স্বেচ্ছাসেবক খাবারটা দিচ্ছে কোনরকমে। ডাক্তার ওষুধ এখন কোথায়? তাছাড়া মোতির মা পরপুরুষের সঙ্গে কথা

বলে নি কখনও। কাকে বলবে? ছেলেরা তো সব ছোট। তিন দিনে অসার হয়ে গেছে নজরআলী। শুধু কাত হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে ওদের নতুন জীবনযাত্রা। মাঝে মাঝে সবুজের ছায়া নেমে আসে চোখে। চলন্ত মাঠগুলি সিনেমার ছবির মত সরে সরে যায়। নজরআলী ভুলে যায় কোথায় আছে। মোতির মাকে ডেকে বলে—"অ মোতির মা, একবার কবিরাজেরে খবরটা দে। আই শুই থাকলি, ধান পুতবা কে? জালি বড় হইছে না? পুতন লাগবো তো।"

মোতির মা অস্থির হয়ে পড়ে। কপাল চাপড়ে চীৎকার করে ওঠে—"হায় আল্লা, আই অহন কি করি? হায় আল্লা, আমারে দোয়া কর।"

মোতির মার চীৎকারে নজরের ঘোর কেটে যায়। বুঝতে পারে অবস্থাটা। তাড়াতাড়ি ডাকে—"অ মোতির মা, কান্দরে ক্যান? অই তো ভাল আছি। তুই ভাবিস না।" স্বামীর স্বাভাবিক স্বর শুনে সান্ত্বনা পায় মোতির মা।

নজর চেয়ে দেখে ছেলেরা খেলছে।

চারিদিকে জলে কাদায় ভরা। বৃষ্টির যেন শেষ নেই। প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। জল কাদায় এক বিশ্রী অবস্থা। ওরই মধ্যে একটা গাড়ী এসে থামলো।

পাইপটার গায়ে হেলান দিয়ে খানিকটা সোজা হয়ে বসলো নজরআলী। গাড়ী থেকে লোক নামলো। ওদের দেখ্‌ত এসেছে বুঝতে পারে নজর। ক'দিন ধরে এমন অনেক আসছে। কিন্তু ঐটা কে? অসুস্থ শরীরেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মোতিকে ডাকে—"অ মোতি দ্যাখতো, ঐডা কন? হাসান মুর্শেদ সাহেব না?"

"হ আব্বু, ঐতো হাসানসাহেব।"......

মোতি প্রায় ছুটে যায়। ওদের গ্রামের লোক। ঢাকায় থাকে। জমিজমা দেখতে আসে। ওদের জমিতেও অনেক কাজ করেছে নজর। মোতিকে দেখতে পেয়ে ওর সঙ্গে এগিয়ে আসে। নজর সালাম জানায়।

"আপনে এহানে কবে আইলেন?" নজর জিজ্ঞাসা করে।

"এই তো কয়েকদিন। তোমার অসুখ নাকি?"

"হ। জ্বরটা আর সারে না। আপনি আইলেন, যুদ্ধ করে কে?"

হেসে ফেলেন হাসানসাহেব। বলেন—"আমি যুদ্ধ করবো কি রে? যুদ্ধ করছে আমার দেশের সোনার ছেলেরা আর তোরা।"

লাজুক হাসিতে মুখ ভরে যায়।

"কি যে কন কত্তা, আমরা মুখ্যু মানুষ যুদ্ধের কি জানি? যুদ্ধতো আপনাগো। আমাগো মত আপনি পলাই আইলেন?"

বিরক্ত বোধ করে হাসান সাহেব। "কথা ঘুরিয়ে নেয়।" তোমরা ভালো আছো তো? শিগ্‌গির ক্যাম্পে নিয়ে যাবে তোমাদের।"

মোতির মা পাইপের আড়ালে দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছিল। বলবে ভেবেছিল নজরের অসুখের কথা, ডাক্তার দেখানোর কথা। বলা আর হোল না। চলে গেলে নজরের কাছে এসে রাগে ফেটে পড়লো—"তুমি অসুখের কথা কইলা না ক্যান? হাসান সাহেব ডাক্তার আইন্যা দেখাইত।"

নজর উত্তর দেয় না। হাসান সাহেবের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। হাসান সাহেব তো ওদের ওখানকার এম-এল-এ। ভোটের আগে ওদের কথা বলেছে—"বুঝেছ, মিয়া শুধু নৌকা চিহ্নে ভোট দিবা। তোমাগো কিছু ভাববার লাগবো না। এই খানগো না মাইরা তাড়ামু। তোমাগো আর খাওনের কষ্ট থাকবো না।"

কি যে হোল নজর কিছুই জানে না। এই বাবুরা যুদ্ধ না করে এই দেশে চলে এলো। খানেরা উল্টে ওদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিল। অনেকক্ষণ বসে থেকে নজর চোখে অন্ধকার দেখছে। সব যেন আঁধার হয়ে আসছে। কাত হয়ে পড়ে যায় নজর। ছোট ছেলে খতু বসে থাকে সব সময় বাপের কাছে। ওর আব্বুকে দুবার ঠেলে ঠেলে দেখে। ঘুমিয়েছে ভেবে আর ডাকে না।... মা ব্যস্ত রাতের খাবার করতে। নুন আর জল দিয়ে আটাটা ঘন করে জাল দিয়ে নিচ্ছে। রুটি করতে জানে না মোতির মা।

অন্ধকার নেমে আসার আগে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো চাই। আলো নেই যে বসে খাওয়াবে। সব কাজ সেরে পাইপের মধ্যে যখন এলো মোতির মা তখন অন্ধকার। এক বাটি আটা সেদ্ধ রেখেছে যদি স্বামীকে খাওয়াতে পারে। কুঁকড়ে আছে দেখে নজরকে ঠিক করে টেনে শুইয়ে দেয় মোতির মা। ও অবাক হয়ে যায় নজরের দিকে তাকিয়ে। ঐ যোয়ান মদ্দ মানুষটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল কি করে? মোতির মা অনায়াসে ওকে নাড়াচাড়া করতে পারে।

দুবার ডেকে সাড়া না পেয়ে আর বিরক্ত করে না। নিজের ক্লান্ত দেহটাকে ছেলেমেয়েদের পাশে সঁপে দেয়।

খতু বাপের পাশেই শোয়। সকালে উঠে আগে বাপের সনে কিছুক্ষণ কথা বলে। তারপর অন্য কাজ। আজকাল অসুস্থ বলে বাপকে বেশী বকায় না। নিজেই বকবক করে যায়। বাপের পিঠের সংগে লেগে শুয়ে পা-টা গায়ের উপরে তুলে দেয়। বলে—"জানো আব্বু কাইল না একটা স্বপন দেখছি। তোমারে লইয়া আই গাঁয়ে গেছি।"

উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঠে বসে। বাপের মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে অবাক হয়ে যায়। কতগুলি লাল পিঁপড়ে ওর বাবার চোখেমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি পিঁপড়ে তাড়াতে থাকে—"ও আব্বু উঠ। তোরে পিঁপড়ায় ধরছে।"

খতুর চীৎকারে মোতির মা, মোতি কাজ ফেলে ছুটে আসে। তড়িতাহতের মত স্থির হয়ে বসে থাকে মোতির মা। বিশ্বাস করতে পারে না মৃত দেহটার গায়ে সকালেও কাঁথাটা ভাল করে জড়িয়ে দিয়েছে।......

মরে শক্ত কাঠ হয়ে আছে নজর। ডুকরে কেঁদে ওঠে মোতির মা। "হায় আল্লা, আমাগো কি হইবো? ও মোতি তোর আব্বুর কি হইল?"

মোতির মায়ের চীৎকারে চারদিক থেকে সব এসে ভীড় করে। ভয়ে, চিন্তায় মূক হয়ে গেছে মানুষগুলি নিজেদের এই একই পরিণামের কথা ভেবে।

স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে মোতি কিছু-দূরে ওদের বাপকে কবর দিয়ে আসে। খতু শুধু অবাক হয়ে দেখে। একবার শুধু মোতিকে বলে—ভাইজান, আব্বুরে কবর দিলি ক্যান? আব্বু ঘুমাইছিল। পিঁপড়ায় কাটছে। আব্বুরে লইয়া আয়।

ভাইকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে মোতি।

"নারে ভাই। আব্বু আমাগো ছাইড়া বেহেস্তে গেছে।"

খতু কাঁদে না। চুপ করে থাকে।

সন্ধ্যার পর থেকে খতুকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সদ্য বিধবার সন্তান হারাবার জন্য আর্ত চীৎকারে পরিণত হয়। সমস্ত লবণ হ্রদ ওর আর্ত চীৎকারে কেঁপে ওঠে। অন্য মায়েরা তাদের শিশু-সন্তানদের বুকে চেপে ধরে।......

সবাই মিলে খতুকে খুঁজে বেড়ায়। অতটুকু ছেলে কোথায় যাবে? মোতিরই মনে হলো—আব্বুর কবরে যায় নাইতো?

অতদূরে একা যাওয়া খতুর পক্ষে সম্ভব নয় জেনেও আলো নিয়ে সবাই রওনা হোল।

আবছা জ্যোৎস্নায় নজর মিঞার কবরের ওপরে কিছু একটা নড়ছে বলে মনে হলো। মোতি প্রায় ছুটে এগিয়ে গেল।...খতু! হ্যাঁ খতু একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কবরের কাঁচা মাটি খুঁড়ে চলেছে। ওর ছোট ছোট হাতের মুঠো মুঠো মাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এতগুলি লোক এসেছে ভ্রূক্ষেপ নেই খতুর। শুধু একবার মোতির দিকে তাকিয়ে বলে—ভাইজান হাত লাগা। আব্বুর শ্বাস বন্ধ হইয়া মইরবো। আব্বু মরলে আল্লায় গুণা দিব।"

এতগুলি লোক নীরবে এই শিশুর পাগলামি দেখে বেদনায় নিথর হয়ে যায়।

প্রাচীন কবি অকিঞ্চনের হস্তলিপি ও নথিপত্র

প্রণব রায়

নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আবর্জনা স্তূপ বলে যাকে অবহেলায় দূরে ফেলে দেওয়া যায় তার ভেতর থেকে কোন কোন সময় বেরিয়ে পড়ে অনেক মূল্যবান জিনিস। জীর্ণ ধূলিসমাচ্ছন্ন প্রাচীন পুঁথি দীর্ঘকাল ধরে কীটদষ্ট হয়ে অবহেলার সামগ্রী হয়ে পড়ে। বর্তমান যুগে আজ তার আর কোন প্রয়োজন নেই, হোক না সে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় কোন কবিকৃতি। কিন্তু পুরানো পুঁথির সন্ধানে যারা জাগল, প্রাচীন সাহিত্যের সেই গবেষকরা জীর্ণ পুঁথির ধূলি-ধূসরিত অংশের মধ্যে গন্ধ পান অতীতের। বিচ্ছিন্ন পত্ররাশির মধ্যে থেকে টেনে বের করেন তাঁরা বিস্মৃতপ্রায় কোন কবিকে। পত্ররাশির ধূলিজালের অন্ধকার থেকে কবি আবার আবির্ভূত হন সাহিত্যপ্রেমীর মানসলোকে।

গত ২৫শ সংখ্যায় (১৯ই কার্তিক, ১৩৭৮) 'অমৃতে' অষ্টাদশ শতকের পুরানো কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু বিস্তৃতির ভয়ে সব কথা বলা হয়নি। অকিঞ্চনের পুঁথির সঙ্গে এমন অনেক বিচ্ছিন্ন প্রাচীন নথিপত্র আছে যা থেকে কবি সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে (১)। প্রাচীন কয়েকটি দলিল, কবির নিজ হাতে লেখা টুকরো হিসাবের কাগজ ও তাঁর বংশাবলীর অনেক তথ্য জীর্ণ পত্ররাশির ভেতর থেকে উদ্ধার করলে কবি সম্পর্কে আরও অনেক নতুন কথা জানা যাবে। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী এক শক্তিশালী কবি হিসাবে অকিঞ্চন তাঁর কাব্যে কবিত্বের যে ছাপ রেখে গেছেন সে বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে দুষ্প্রাপ্য ও জীর্ণ পুঁথিপত্রের ভেতর থেকে কবি ও তাঁর বংশাবলীর যে ইতিবৃত্ত জানা গেছে পাঠকসাধারণের জন্যে তা উপস্থিত করা প্রয়োজন। এই দুষ্প্রাপ্য পত্রগুলি কালকবলিত হলে কবিসংক্রান্ত অনেক আকর্ষণীয় তথ্য চিরতরে অন্ধকারাবৃত হয়ে থাকবে।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অধীন বরদা পরগণায় কবি অকিঞ্চনের জন্ম। বরদা পরগণার আটঘরা গ্রামে ছিল কবির পৈত্রিক বাসভূমি। পরবর্তীকালে কাব্যসরস্বতীর আরাধনা করে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে যখন তিনি আরোহণ করেছেন তখন কোন কারণে পৈত্রিক বাসভূমি ছেড়ে কবি কাছাকাছি বেণ্গারালি গ্রামে এসে বাস করেন। নিজের বাসভূমি সম্পর্কে কবি কিন্তু নীরব থেকে গেছেন। চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির একস্থানে 'বসতি বরদা' বলে উল্লেখ করলেও বরদা গ্রামে যে তাঁর বাস ছিল না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ; 'বসতি বরদা' বলতে তিনি বরদা পরগণাকেই বুঝিয়েছেন। শীতলামঙ্গল পুঁথির একস্থানে চারনানগরে সাকলরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের পোষ্যরূপে কবির বাস করার কথা পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। তবে বাংলা ১১৮৪ সালে কবি যে স্থায়িভাবে বেণ্গারালি গ্রামে বাস করেছিলেন কবির নিজের লেখা হিসাবের একটুকরো কাগজ থেকে তা অনুমান করা যায়। ১১৫৫ সাল থেকে ১১৮৪ সাল পর্যন্ত এ ধরণের অনেকগুলি জমা-খরচের কাগজে যে ঠিকানার উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে তাঁর বাসস্থানের ব্যাপারে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। ১১৫৫ সাল থেকে ১১৫৮ সালের জমা-খরচের যে কয়েকটি কাগজ পাওয়া গেছে তাতে ঠিকানায় উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীরামপুরে গ্রামের। শ্রীরামপুর গ্রাম কবির পৌকে বসতি আটঘরা গ্রামেরই পশ্চিম অংশ ছিল। তাই ১১৫৮ সাল পর্যন্ত কবি যে তাঁর পৈত্রিক বাসভূমিতেই ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত। ১১৫৮ সালের হিসাবের একটি কাগজে কবির স্বাক্ষরের সংগে ঠিকানা পাওয়া যায় সিরিষগড়্যার। এটি হল একটি জিনিস তালিকার হিসাব। কবির স্বাক্ষরিত এই টুকরো কাগজটি হল কবি সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল। (এর একটি আলোকচিত্রও দেওয়া হল) কবির হস্তাক্ষর ছিল খুব সুন্দর ও স্পষ্ট, কালীও উজ্জ্বল। ২২০ বছর আগে কবির হাতের লেখা ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজও অক্ষয় হয়ে আছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তালিকাটিতে কবি তাঁর ব্যক্তিগত কয়েকটি জিনিস ও পুজোর সাজ-সরঞ্জাম সিরিষগড়্যায় রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। এই হিসাব তালিকার বিকাশ থেকে মনে হয় এসময় কবি কোন কারণে পৈত্রিক বাসভূমি ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় বাস করার উদ্যোগ করছিলেন। এই তালিকায় কয়টি পুঁথিরও উল্লেখ আছে। জমা-খরচের ১১৬৮ সালের আরেকটি হিসাবে বিভিন্ন গ্রামের আদায় জমাকে কবি তাঁর আয় দেখিয়েছেন। এর মধ্যে সেকালের অধ্যাপক বিদায়ও আছে। হিসাবের কাগজগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় জমিজমার খাজনা ও কিছু কিছু কর্জদাদন থেকে কবির যা আয় হত তাতে অল্প
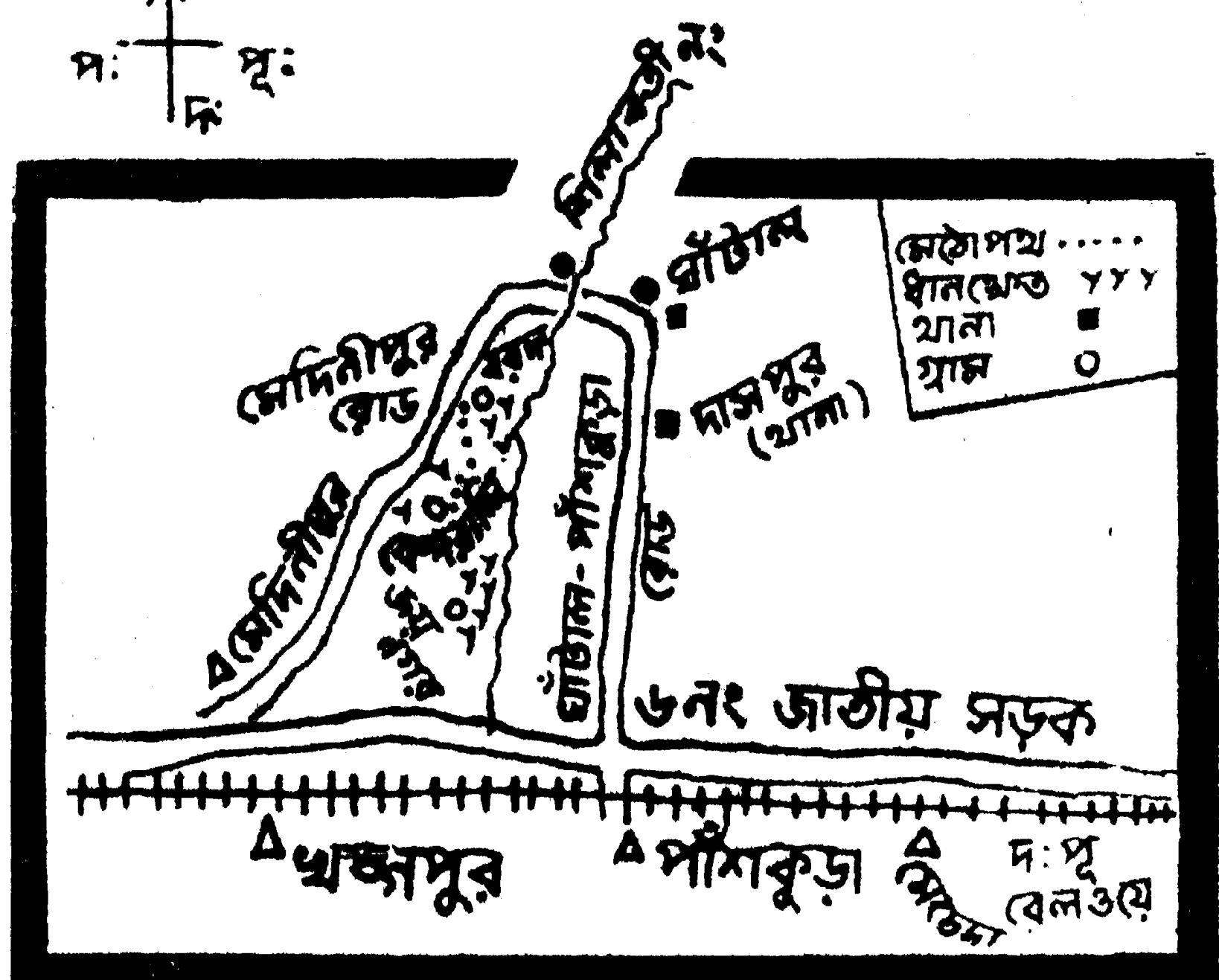
আঠারো শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তীর বাস্তুভিটা ঘাটাল থানার বেণ্গারালি গ্রাম।

কবি অকিঞ্চনের স্বাক্ষরিত বাঙলা ১১৫৮ সালের জিনিস-পত্রের তালিকা

কবির জমাখরচ হিসাবের কাগজ
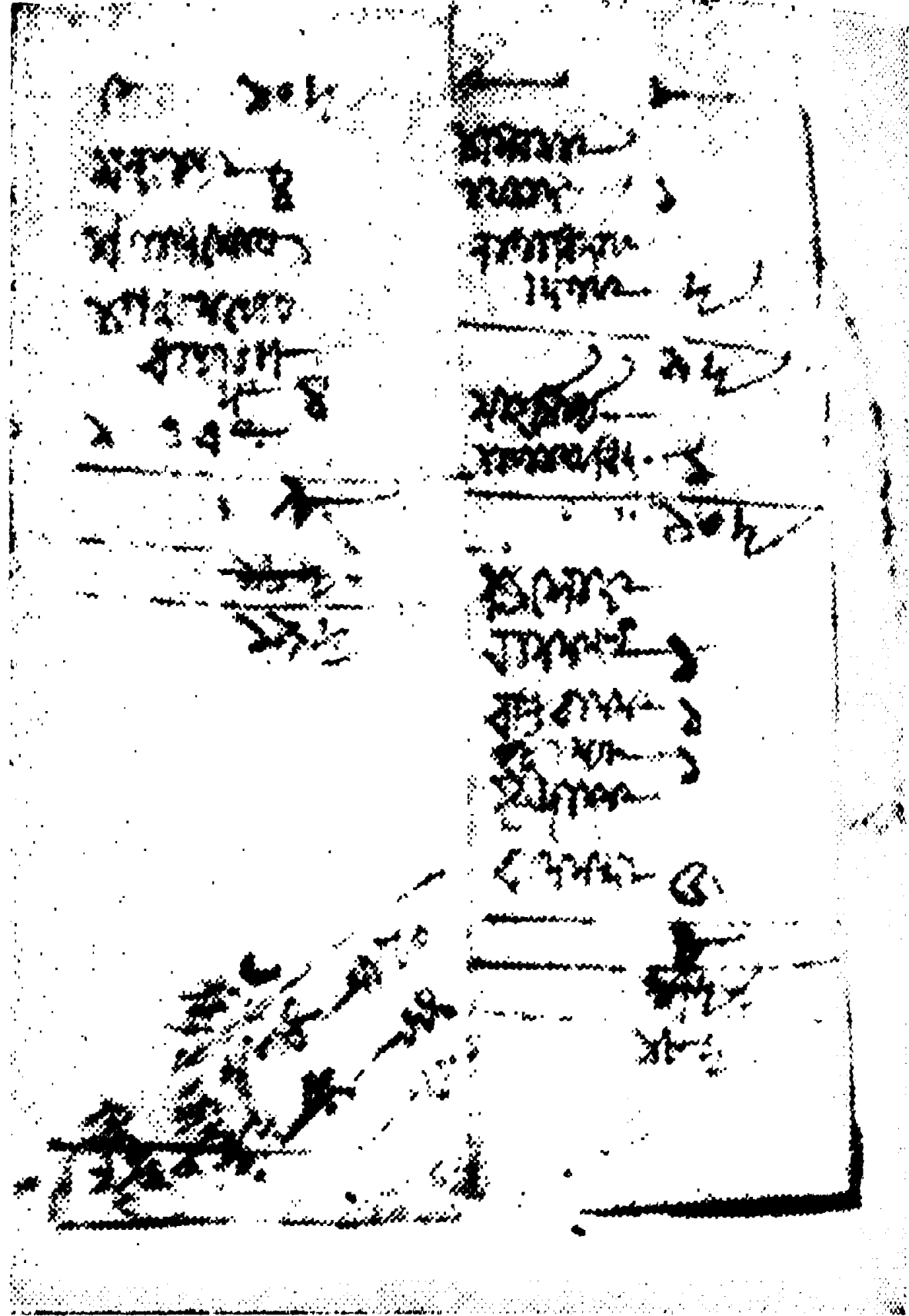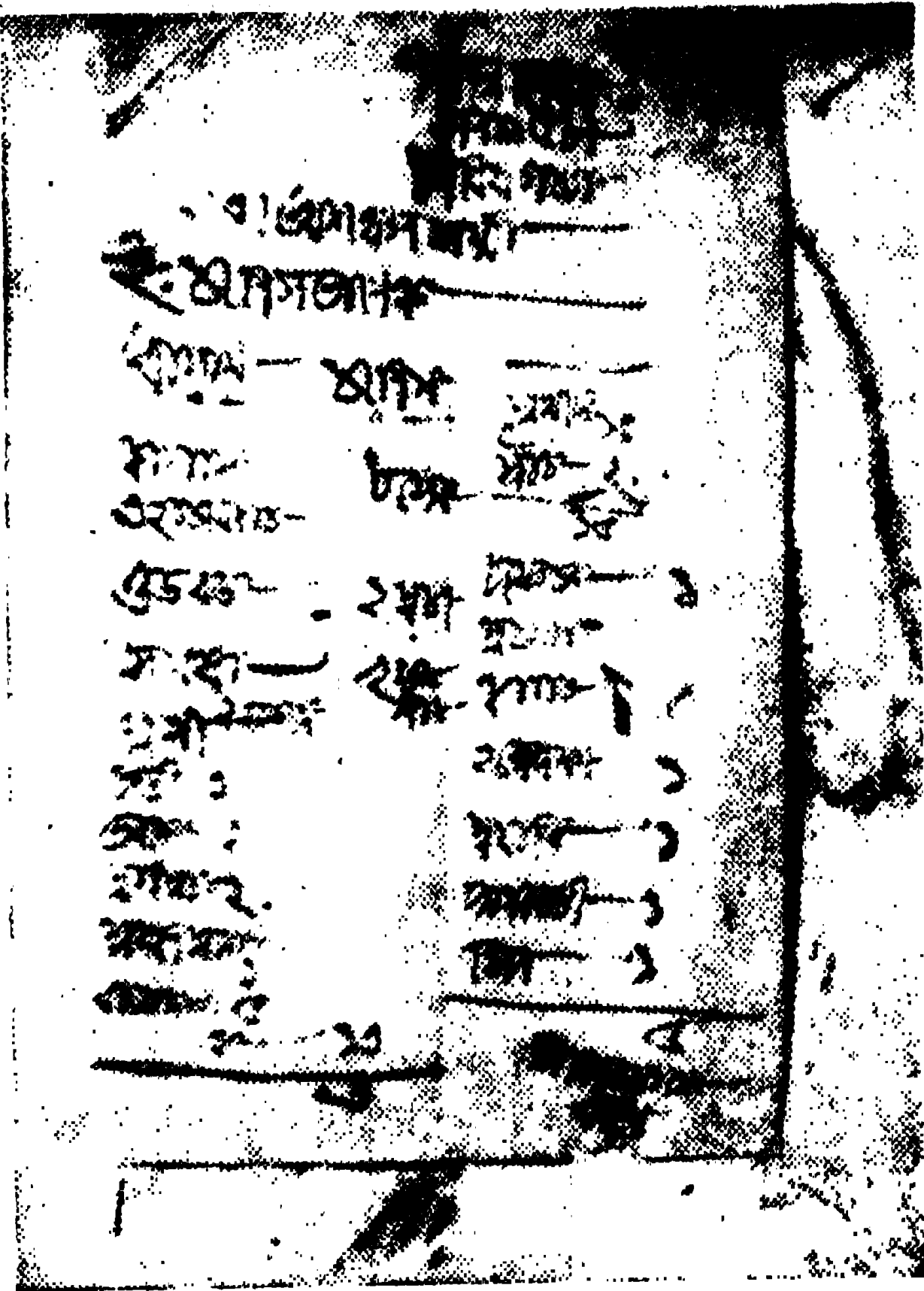
কিছু উদ্বৃত্তও হত। সে উদ্বৃত্ত অতি সামান্য। আয়-ব্যয়ের এই হিসাবনামায় সেকেলের পল্লীসমাজের মিতব্যয়িতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার এক নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে। অল্প সুদে টাকা খাটিয়ে যা আয় হত তাতে একরকম চলে যেত কবির জীবনযাত্রা। শুনতে হয়তো খারাপ লাগছে কবি সুদে টাকা খাটাতেন জেনে। কিন্তু ঠিকভাবে চিন্তা করলে মনে হয় ব্রাহ্মণ পন্ডিতের গতানুগতিক, যজন-যাজন বৃত্তির থেকে এ ধরণের আয়ে জনকল্যাণ-বোধ কবিকে এ কাজে হয়তো প্রবৃত্ত করেছিল। নামমাত্র সুদ ও অনেক সময় বকেয়া টাকা অনাদায় কাগজপত্রের মধ্যে কবি উল্লেখ করেছেন। স্বাধীন জীবনের কবির আগ্রহ এর থেকে অনুমান করা পারা যায়।

বাংলা ১১৮৪ সালের হিসাবের কাগজে বেণ্ডরালী গ্রামের ঠিকানা দেখে মনে হয় কবি ঐ সময় ঐ গ্রামের বাসিন্দা হয়েছিলেন. অবশ্য ১১৭৩ সালের একটি ছোট ফর্দেও বেণ্ডরালী নাম আছে। ১১৮৪ সালের পর এ ধরনের জমা-খরচের হিসাবের টুকরো টুকরো কাগজ আর পাওয়া যায়নি। কবির বংশধরেরা যেভাবে তাঁদের বংশের পুরোনো পাঁথিপত্র রক্ষা করে এসেছেন তাতে মনে হয় এটিই কবির জমা-খরচের শেষ কাগজ। এর এক বছর আগেই কবি তাঁর গঙ্গা-মঙ্গল পুঁথি শেষ করেছিলেন। 'ভাবি গঙ্গা মংগল তিরাশি সালে সারা'—গঙ্গামঙ্গল। গঙ্গামঙ্গল তাঁর শেষ জীবনের রচনা—একথা আগের প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। তাই অনুমান হয় ১১৮৪ সালই কবির জীবনের শেষ বৎসর।

অকিঞ্চন 'গঙ্গামঙ্গল' পুঁথিতে তাঁর তিন পুত্র রামদুলাল, রামচন্দ্র ও শিবানন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। রামদুলাল ও শিবানন্দের লেখা কয়েকটি চিঠি থেকে কবিপুত্রদের সম্পর্কেও অনেক কথা জানা যায়। ১২১৫ সালে জনৈক অনুপচন্দ্র দাস

শিবানন্দকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন সেটি এখানে অবিকল উদ্ধৃত করছি ঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সন ১২১৫

পরম পূজনীয় শ্রীজুত সিবানন্দ সার্বভূম ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীচরণেষু শ্রীঅনুপচন্দ্র দাসের প্রণাম জানিবেন শ্রীজুত চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মত্তর জমি আপনি জোত করিবেন এহাতে কোন ওজর আপত্তি করিবেন নাই এহাতে জা জা দায় আছে আমি আছি.....এ জমি আপনি নিজ জোত করিবেন ইহা নিবেদন করিলাম ইতি তারিখ—২২ ফাল্গুন নিবেদনপত্র অবধান করিবেন। কবির কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ 'সার্বভৌম ভট্টাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এসময় তিনি বেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বোঝা যায়। তাঁর এক ছেলে রাজচন্দ্রও যে এসময় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন রামদুলালকে লেখা শিবানন্দের একটি চিঠিই তার প্রমাণ। উদ্ধৃত পত্রে উল্লিখিত শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের এই ব্রহ্মত্তর জমি জোত করে কবিপুত্রদের এক জটিল মোকর্দমায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। বরদা পরগণায় ঐ অঞ্চলের সে সময়ের তালুকদার ছিলেন নিত্যানন্দ ঘোষ। বেগরাজী গ্রাম ছিল ঘোষেদের তালুক। ঐ গ্রামে গুরু-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কিছু জমি পূর্বে পত্তনী-মহলী শিবানন্দ জোত করায় মোকর্দমা

১১৬৮ সালে কবির জমাখরচের হিসাব। পত্রটি ২১০ বছরের পুরোন। ২২ চৈত্র ও ৫ বৈশাখ তারিখ দেওয়া আছে
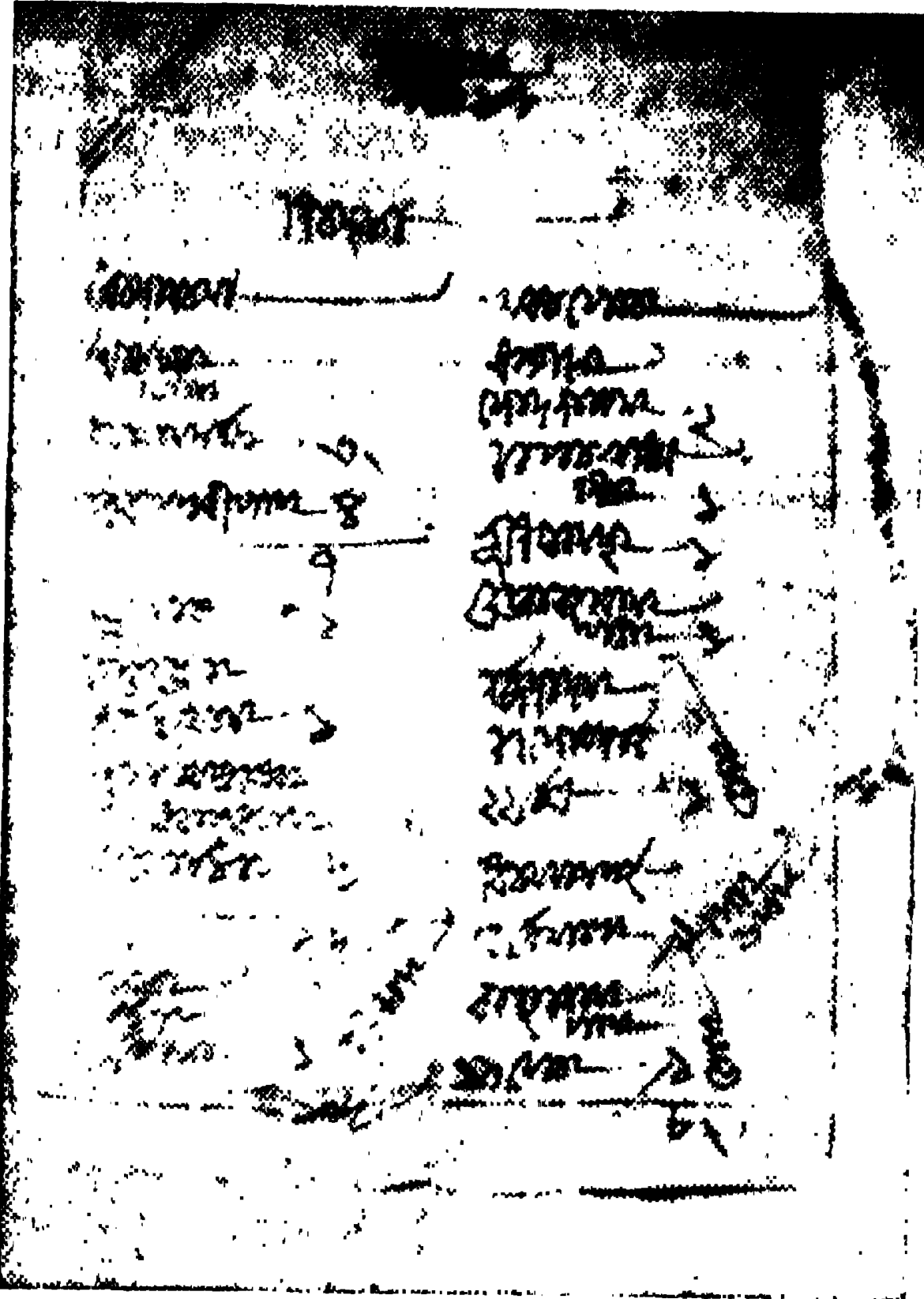
উপস্থিত হয়েছিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সম্ভবত চট্টোপাধ্যায়ের ওপর তালুকদার ঘোষের ছিল সমর্থন। তাই মামলা যখন সদর আদালতে উঠল তখন মামলা তদারকি করতেন শিবানন্দ। সালবিহীন ২৫শে চৈত্র তারিখে রামদুলালকে লেখা শিবানন্দের একটি দীর্ঘ চিঠিতে এ বিষয় জানা যায়। চিঠিটি সম্ভবত ১২১৫ সালের পর লেখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত টাকার জোরে দোর্দণ্ড প্রতাপ তালুকদার ও তার প্রিয়ভাজন চট্টোপাধ্যায়ই বোধ হয় জয়ী হয়েছিলেন। তাই কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদুলালকে সন ১২২২ সালের আশ্বিন মাসে তালুকদার নিত্যানন্দ ও গঙ্গানারায়ন ঘোষকে জমির ফসলের ভাগ দেওয়ার সর্তে এক বার পত্র লিখে দিতে হয়েছিল। যার পত্রটির অংশ বিশেষ এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাচ্ছে:

মহামহিম শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীরামদুলাল চক্রবর্তী কস্য এক বাবপত্র মিদং কার্জনঞ্চ আগে তুপে বরদা মোজে বেঙ্গারালি গ্রাম আপনাকারদের তালুক গ্রাম মজকুরে শ্রীগুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাবুদি কালা জমি ১।১ এক বিঘা ছয় কাঠা সালে দ৩ আঠার কাঠা জমি আমি জোত করি...এ জমি মালের বলিয়া তলব করা হইয়াছিল (?) এ জমির সকল আমার জিমা রহিল চট্টোপাধ্যায়দিকে মাহ মাহে হাজির করিয়া দিব...তবে তোমরা জেখন কষুর তলব করিবেন জমিতে জে ফল হইয়াছে তাহার উরাজিব ভাগ দিব এই কথা রফা(?) করিব...জিমা করিয়া এ বাবপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২২২ সাল...আশ্বিন-এর থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গ্রামীণ তালুকদারের অত্যাচারের এক দৃষ্টান্ত মেলে। কবিপুত্রদের যে কিরূপ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল তার ইতিহাস এই পত্রগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। ১২২২ সালের (১৮১৫ খৃঃ) এ পত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদুলাল তখনও জীবিত। সম্ভবতঃ তাঁর সে সময় বৃদ্ধাবস্থা। বাড়ীর কর্তা হিসাবে তাঁকে মান্য করে চলতেন শিবানন্দ।

কবিবংশে রক্ষিত বংশলতা থেকে জানা যায় রামচন্দ্রের (কবির দ্বিতীয় পুত্র) পুত্র শিরোমণি তস্য পুত্র রামধন তস্য পুত্র রামজীবন তস্য পুত্র বেণীমাধব ও নীলমাধব, বেণীমাধবপুত্র মাখন তস্য পুত্র প্রহ্লাদ ও তারাপদের পুত্রগণও বয়ঃপ্রাপ্ত। প্রহ্লাদ ও তারাপদের পুত্রগণষ বয়ঃপ্রাপ্ত। কবির প্রপৌত্র রামধন যে এক বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির মালিক ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ কয়েকটি ছিন্ন দলিলের অংশ বিশেষ থেকে জানা যায়। তিনি সম্ভবতঃ সন ১২৭৯ বা তার কিছুকাল পরও জীবিত ছিলেন। ১২৭৯ সালের লেখা একটি ছিন্ন দলিলে তাঁকে 'মহামহিম শ্রীযুত রামধন চক্রবর্তী মহাশয় বরাবরেষু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে তিনি বেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর পৌত্র রামজীবনের পুত্র নীলমাধবের নাম ১২৭৬ সালের এক ক্ষুদ্র পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়। পুঁথিটি নীলমাধবের লেখা। মাধবলতা নামে এক মহিলা কার 'সুবচণীর পাঁচালী' নামক এ পুঁথির লেখিকা। রামধনের জমি শুধু বরদায় নয়, সুদূর জাহানাবাদ পরগণা (বর্তমান আরামবাগ), ব্রাহ্মণভূম, চেতুয়া, চন্দ্রকোণা ও মেদিনীপুরেও বিস্তীর্ণ ছিল। খরিদা জমির দলিলসমূহের ছিন্নাংশে যে সব তারিখ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় ১২৫৯ সাল থেকে ১২৭০ সালের মধ্যে রামধন এসব জমি ক্রয় করেছিলেন। কোন স্থানে তাঁর কত পরিমাণ জমি ছিল তারও একটি হিসাব পাওয়া গেছে। তা থেকে জানা যায় কবি অকিঞ্চনের পৈত্রিক বাসভূমি আটঘরা শ্রীরামপুর গ্রামে রামধনেরও পৈত্রিক বাস্তু ও কালা জমির অংশ ছিল। রামধন বরদা অঞ্চলে এক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও বদান্য ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। জনৈক গুরুপ্রসাদ দেবশর্মা তাঁকে 'পরম পোষ্টাবর শ্রীজুত রামধন চক্রবর্তী বাবাজি পোষ্টাবরেষু' বলে উল্লেখ করেছেন। এই গুরুপ্রসাদের সঙ্গেই তাঁর জ্যেষ্ঠ ও খুল্ল পিতামহের একখণ্ড জমি নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল মনে হয়। রামধনের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হলে সেই গুরুপ্রসাদই তাঁকে 'পোষ্টাবর' ও 'বাবাজি' বলে সম্বোধন করেছিলেন। সম্ভবত কবিপুত্র রামদুলাল ও শিবানন্দের জীবদ্দশাতেই রামধনের জন্ম হয়েছিল।

কবীন্দ্র অকিঞ্চনের বংশধারা মেদিনীপুর জেলার সেই ক্ষুদ্র গ্রামে আজও অনির্বাণ হয়ে রয়েছে। ঘাটাল থানার অধীন সেই প্রাচীন বেঙ্গরাল গ্রামটির এক নিভৃত ছায়া সুনিবিড় কুঞ্জে একদা যে পল্লীকবি কাব্যসাধনা করেছিলেন নিরলসভাবে আজ সে গ্রামটির প্রাচীন রূপ হয়তো আর নেই। বর্ষায় দুর্গম ও চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ধানখেতের মধ্যে মনে হয় হঠাৎ জেগে ওঠা চক্রবর্তী বাড়ীর উঁচু বাস্তুটিকে দেখলে বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এক ছোট্ট দ্বীপের কথা মনে হতে পারে। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় নানা পরিবর্তনের মধ্যেও আড়াই শ বছরেরও অধিক অকিঞ্চনের কাব্যের পুঁথিগুলি আজও অক্ষত ও অম্লান রয়ে গেছে—সেগুলো হয়তো কবির স্বহস্তের মসীরেখায় অলংকৃত হয়েছিল এককালে—আর অবশিষ্ট আছে কবিবংশের কয়েকটি পুরোনো নথিপত্র অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে।

---

(১) অকিঞ্চনের পুঁথি, হস্তলিপি ও অন্যান্য নথিপত্র বরদা পরগণার বেঙ্গরাল গ্রামের অধিবাসী কবির বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে পাওয়া গেছে।

মন নিয়ে খেলা

সুধীরচন্দ্র দাঁ

কে ভাবতে পেরেছিল, মঞ্জুবৌদির এই পরিণতির কথা! সে কি আত্মহত্যা, না মরীচিকার পিছনে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটি জীবন! আজও নির্জনে বসে যখন ভাবি, তখন মঞ্জুবৌদির এই বিচিত্র পরিণতির কোন হদিসই পাই না। সুঠাম দেহবল্লরী, নিটোল মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রঙ—যথা কাঁচের জলে ভেজা অমসৃণতলে ঠিকরে পড়া আলোর ছটা। শাড়ী আর ব্লাউজের তলে লুকিয়ে থাকা দেহলতাটি কার না লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতো!

ডিলাক্স বাসের গদীমোড়া সিটে বসে থাকা মঞ্জুবৌদিকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে স্ট্যাণ্ডে বাসটা দাঁড়াতেই চীৎকার করে উঠেছিলাম: মঞ্জুবৌদি—একবার মাত্র আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল মঞ্জুবৌদি। তারপর সংযত হয়ে চোখ দুটো বুজে নিজের দিকে নামিয়ে নিয়েছিল। কেমন যেন অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে। এটাচি, স্যুটকেশ ও ছুপড়িটাকে রিক্সায় তুলে দিয়ে বলেছিলাম, ওঠো—

একটি কথাও বলেনি মঞ্জুবৌদি। রিক্সায় পাশাপাশি বসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, যেন কত বিরাট ব্যবধান দুজনের। আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল। একবার আড়চোখে মঞ্জুবৌদির দিকে তাকালাম। পরনে সাদা জরিপাড় শাড়ী। সিল্কের। গায়ে চাঁপা রঙের আঁটসাঁট ব্লাউজ। দেহের খাঁজে খাঁজে দুকূল ছাপিয়ে যৌবনের ঢল নেমেছে। চোখের পাতা দুটো জলে ভেজা পাখীর ডানার মত ভারী। নরম পাতার গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে বেদনার বিন্দু। আমার বুকের ভিতর টন্-টন্ করে উঠলো।

: এই যৌবন...এই দেহ... এই বয়স! ভগবানের কি নিদারুণ অভিশাপ।

মঞ্জুবৌদির ব্যথার ছুরিটা যেন আমার শিরা উপশিরাগুলো কেটে তছনছ করে চলেছে। কি করে সময় কাটবে মঞ্জুবৌদির! শুনেছিলাম, আসানসোল থেকে মঞ্জুবৌদি আর আসবে না। সেখানেই একটা স্কুলে চাকরী নেবে। কোম্পানীও অবশ্য একটা চাকরী দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু না। যে কোম্পানীর কাজ করতে করতেই জীবন দিল অশোকদা, সেই কোম্পানীর ছায়াও যেন মঞ্জুবৌদির কাছে বিষ।

অবশ্য বাবা আসানসোল থেকে ফেরার সময় অনুনয় করেছিলেন: তুমি চলে এস

বৌমা? আমাদের কাছে। আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকবো মা!

আমার মা বড়ছেলের শোক সহজে ভুলতে পারেননি। বিছানা নিয়েছিলেন বেশ ক-দিন।

ঘরে আমরা ঢুকতেই মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বাবা খুক খুক করে কাসতে কাসতে লাঠি ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মঞ্জুবৌদি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বাবাও ছোটছেলের মত নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য মঞ্জু-বৌদি! একটুও কাঁদলো না, একটুও উত্তেজনা প্রকাশ করলো না। যেন একটা প্রবল বন্যাকে মনের শক্ত বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছে; কিন্তু বিপদের মেঘ কাটেনি। আষাঢের জলভরা ঘন মেঘের মতই চোখ দুটো ভারী, যে-কোন মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি নামলে বন্যার বাঁধ ভেসে যেতে পারে।

স্যুটকেশ থেকে একগোছা নোটের তাড়া আমার হাতে তুলে দিল মঞ্জুবৌদি। এই প্রথম কথা বলল: বাবাকে দাও, কোম্পানী তোমার দাদার জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

বাবা সে টাকা নিলেন না। বললেন: নেমকহারাম, আমার ছেলেকে খেয়েছে আবার টাকা দিয়ে তার দেনা শোধ করতে চায়। এ দেনা পরিশোধ করা যায় না।

হাউ হাউ করে অসহায় শিশুর মত কেঁদে উঠলেন বাবা। কিন্তু ধন্যি মঞ্জুবৌদি। একদিনের মধ্যেই যেন সে আমাদের সকলের মনের পাঠ পড়ে নিল। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো যেন আমাদের বিবর্ণ বাড়ীটা। মঞ্জুবৌদিই তাকে ক্ষিপ্রহাতে তুলে যেন স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে হাল ধরলো। অশোকদার বিচ্ছেদের শোক কেবল দোতলার মঞ্জুবৌদির ঘরে টেবিলে রাখা ফটোটার মধ্যে কোন এক বিশেষ সময়ের জন্য বাঁধা রইলো। আমাকে একদিন বললো:

—সমীর, আমাকে বাজারে নিয়ে চলো।

—কেন?

ধমক দিয়ে উঠলো মঞ্জুবৌদি: পাকামো করো না। যা বলবো তাই শুনবে।

সেদিন থেকে আমিই মঞ্জুবৌদির এক-মাত্র সাথী হলাম। বাজার থেকে খাট, পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, মীটসেফ, চেয়ার, টেবিলে ঘর ভর্তি হতে লাগলো, আমাদের পুরানো বিছানাপত্র বদলে নতুন গদীমোড়া নরম তোষক, বালিশ এলো। কাঠের ও স্টীলের রকমারি আলমায়রা...

মা ও বাবা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

—কি করছো বৌমা?

বাবা ও মাকেও মঞ্জুবৌদি ধমক দিল:

—আপনারা চুপ করুন। সারাজীবন কষ্ট করেছেন, বুড়ো বয়সেও এই ভাঙা-নড়বড়ে তক্তাপোষে শুয়ে কষ্ট পেতে হবে?

—কিন্তু এত টাকা?

মা অনুযোগ করতে গিয়ে আটকে যান।

—আপনার ছেলের টাকা। কোম্পানী দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, আর মাসে পাঁচশো টাকা করে দেবে। আপনার ছেলে বেঁচে নেই কে বলেছে?

মঞ্জুবৌদির গলাটা ধরে এলো। কিন্তু সে এক মুহূর্ত মাত্র। তারপর হৈ-হৈ করে আমার হাত ধরে টেনে হিচড়ে নিয়ে চললো ওপরে দোতলায়।

—এই সমীর, চলো, হাত লাগাও, এই ঘর দুটোকে সাজিয়ে ফেল দেখি।

দুদিন কলেজ বন্ধ করে আমিও ঘর সাজাতে লাগলাম। ঘরের চেহারা বদলে গেল। যেন ঘরের আনন্দে হাল্কা হাওয়ায় দেহের জলুস নিয়ে তরতর করে নেচে চলেছে আমাদের বাড়ীটা। মাকে রান্নাবান্নার কাজ থেকে ছুটি দিল।

রাঁধুনী এল, চব্বিশ ঘন্টা কাজ করার ঝি আর বাগানে ফুলের কেয়ারি করবার জন্য এল মালী। আমি আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলুম:

—মঞ্জুবৌদি, কি মনে করেছ তুমি? আমাদের কি পথে বসিয়ে ছাড়বে?

মঞ্জুবৌদি অবাক হয়ে বললেন: কেন?

—এত খরচ করার কি দরকার?

মঞ্জুবৌদি হো-হো করে হেসে উঠে আমার গালে একটা টোকা দিয়ে বললো, ও, তাই বলো। আমি মনে করি, কি-না-কি? তা খরচ করছি তো আমার টাকা। বাবার পেনসনের টাকাটা না হয় সেভিংসে জমা রেখো।

আমি কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ভার মুখে দাঁড়িয়ে আছি দেখে মঞ্জুবৌদি আবার আমার মাথাটা বুকে চেয়ে ধরে বললো: সমীর ভাই, তোমার যখন বৌ আসবে তখন যদি তার ঘর পছন্দ না হয়...

আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। জোর করে মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম: ধেৎ যতো সব ইয়ে— আমি আর একমুহূর্ত দাঁড়াইনি। আমার চোখমুখ, কান, নাক, মাথা যেন আগুনের আঁচে পুড়ে যাচ্ছে। বৌদির নরম বুকটা যেন আগুনের তুলোর মত, ফুলকি দেওয়া আঁশগুলো যেন এখনো আমায় বিঁধে মারছে। আমি ছুটে পালিয়ে আসছি দেখে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো মঞ্জুবৌদি।

—সমীর, যেও না শোন...শোন...

কিন্তু আমি শুনিনি। থামিওনি। আমার কানের পর্দায় মঞ্জুবৌদির হৃৎস্পন্দন তখনও বাজছে। আমি দম বন্ধ করে দোতলা থেকে নেমে একতলায় এসে হাঁফ ছাড়ি।

মঞ্জুবৌদি রান্নারও তদারক করতো। রাত্রে আমি আর বাবা একসঙ্গে খেতে বসলে টেবিল ক্যাসটা এসে প্লাসটার দাঁড়িয়ে দিত। কাছে বসে ঠাকুরকে ফাইফরমাস করতো।

—এটা দাও, আর একখানা পরোটা, বাবাকে আর একটু তরকারী...

মঞ্জুবৌদির নিপুণ তদারকিতে বাবা ও মায়ের শরীর আবার ডরাট হয়ে উঠলো। বিকাল হলেই বেড়াতে যাবার আগে বাবার হাতের মুঠিতে ছড়িটা, চাদরটা জুগিয়ে দেওয়া, চাকরকে বলে চটিটা পালিশ করিয়ে দেওয়া, মায়ের পুজো-আর্চার জোগাড় করানো, বার ব্রতের দিনে ফল-ফুলের ব্যবস্থা করা। এক কথায় মঞ্জুবৌদির হাতের ছোঁয়া পেয়ে যেন আমাদের পুরানো বাড়ীটা হাসি-খুশির রোশনাই-এ ঝলমল করে উঠলো।

যেন অশোক বলে বাড়ীর কোন বড়-ছেলে আসানসোলের নামকরা কোম্পানীর সম্ভাবনাময় চাকুরে ছিল না। ফ্যাক্টরীর হুইল ভেঙে যেন কোন অঘটনই ঘটেনি এবং অশোক নামে কোন এক সুদর্শন তরুণ কোনদিনই সেই অঘটনের বলি হয়নি। যেন সব ঠিক ছিল, ছিল যা তাই হলো। মাঝ-খানের কটা দিন একটু যেন ধাক্কা লেগে ছিল বাবা, মা ও সুন্দরী মঞ্জুবৌদির বুকে।

আসানসোলের ছোট বাংলোতে যেদিন চেলী-পরা মঞ্জুবৌদি এলো, সেদিন প্রথম মঞ্জুবৌদিকে এত ভালো লেগেছিল কি বলবো। রাঁচীর কোন এক মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা কনভেন্ট-পড়া মঞ্জুবৌদির সঙ্গে নামকরা কোম্পানীর নতুন ম্যানেজার অশোকদার কি করে আলাপ, কোথায় আলাপ এবং কেমন করে সে আলাপ প্রেমে পরিণত হয়েছিল, তা সবই মঞ্জুবৌদির কাছে বার বার শুনেছি।

বিয়ের পর কদিনই বা কেটেছে। বছর অনেক বইত নয়। একটি দিনের জন্য অশোকদা মঞ্জুবৌদিকে কাছ-ছাড়া করেনি। হয়ত সমস্ত সুখ-আহ্লাদ ভাগ্যের পরিহাসে কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল।

বৌদি বয়সে আমার চেয়ে দু-এক বছরের বড় হয়ত। কিন্তু অশোকদার বাড়ীতে যখন গেছি, মনে হয়েছে একজন যেন খেলার সাথী আমার অপেক্ষায় বসে আছে। ফিকে চাঁপা রঙের শাড়ী, পাড় মিলিয়ে ব্লাউজ, কপালে সোনালী চন্দনের টিপ, গলায় হীরে বসানো পেন্ডেন্ট হার, ছিমছাম পোষাকে যেন একটা গোলাপ ফুল। কি ভালোই যে লাগতো মঞ্জুবৌদিকে।

মঞ্জুবৌদির বাবা খুব বড়লোক। কলকাতায় বিরাট বাড়ী। মাঝে মাঝে বর্ধমান এসে মেয়েকে দেখে যেতেন। একবার নিয়েও গেলেন কলকাতায়। কিন্তু কলকাতা থেকে ফিরে মঞ্জুবৌদি কেমন যেন হয়ে গেল। নিজের ঘরটিতে চুপ-চাপ বসে থাকতো। কেবল বাবা ও মার কোন কাজের সময় তাড়াতাড়ি নেমে আসতো ওপরতলা থেকে। এটা সেটা হাতের কাছে জুগিয়ে দিত। একটি কথাও বলতো না। বাবা সেটা লক্ষ্য
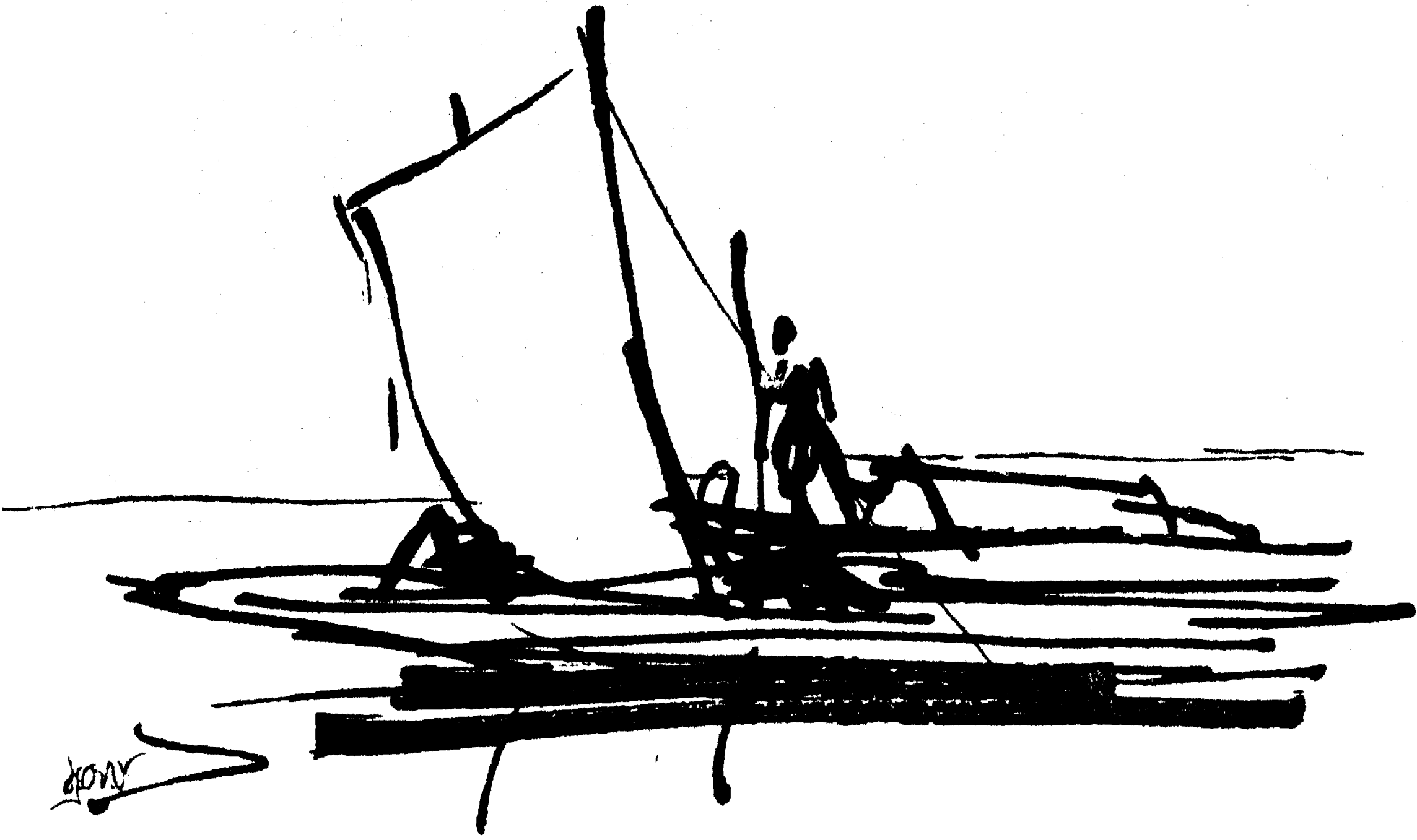
বলে বলতেন : কি গো, মায়ের আমার শরীর খারাপ নাকি? মা হয়তো অন্তরের ব্যথা বুঝতেন। কিছু না বলে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। আমার সঙ্গেও বড় একটা কথা বলতো না। আমি বুঝতে পারতাম, আমাকে এড়িয়ে চলছে, মঞ্জুবৌদি। একদিন দোতলায় অশোকদার ঘরটা উঁকি দিয়ে দেখি, মঞ্জু-বৌদি টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে আছে। চুলের খোঁপা খুলে বিনুনীর বাঁধনে দেহটা পিঠের ওপর এঁকে-বেঁকে নেমে এসেছে। সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকলাম।

বৌদি লাল চোখে তাকালো একবার। বললো : আমায় বিরক্ত ক'রো না সমীর। নিজের কাজ দেখ।

আবার সব যেন ঠিক হয়ে গেল। মঞ্জুবৌদি আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

একদিন সন্ধ্যায় ওর ঘরে হাত ধরে টেনে নিয়ে বসালো। বললো : সেদিন আমার উপর রাগ করেছিলে ভাই?

—না, তোমার মন খারাপ দেখে...

—মন খারাপ! মুচকি হাসলো বৌদি। মনই যে নেই, তার খারাপ কি ভাই? আর তাছাড়া সব সময় কি হাসতে হবে?

শেষের কথাগুলো বলার সময় গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বৌদির ঘরে জানলার খোলা কপাট ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। বৌদি খাটে। বুঝতে পারলাম, চোখ মুছছে।

মঞ্জুবৌদির জন্য আমার মনটা গুমরে কাঁদতে লাগলো। যদি হাসি-খুশিতে উজ্জ্বল মঞ্জুবৌদির জন্য কিছু করতে পারতাম!

তারপর বৌদি কয়েকবারই কলকাতায় গেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই সেই এক ঘটনা। কলকাতা থেকে ফিরে মঞ্জুবৌদি যেন কেমন হয়ে যেত। কোথায় যেন তলিয়ে যেত। আমি তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারতাম না।

একবার আমিও মঞ্জুবৌদির সঙ্গে কলকাতা গেলাম। বৌদির অনুরোধেই। তার মুচিমত, তার ভাই-এরই স্যুট প'ড়ে। মঞ্জু-বৌদির বাবার বিরাট বাড়ী। গাড়ী আছে। বৌদিই বাড়ীর বড় মেয়ে, আরও বোন আছে। দু দাদা। কোথায় যেন বিরাট কারখানা আছে। বাবা খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। মা কিন্তু ঠিক বিপরীত। অত্যন্ত নরম ভাবপ্রবণ মহিলা। যেন কঠিন শিলা-স্তরের উপর নরম পলির আস্তরণ। বড়-মেয়ে যেতেই উনি কেঁদে ফেললেন।

—ভালো ছিলি? কি দরকার বর্ধমানে থাকবার! আর যেতে হবে না, আমার কাছেই থাক না মা।

মঞ্জুবৌদি বিরক্তি প্রকাশ করে ঠোঁট উল্টে বললো : তোমাদের এখানে থাকতে না পারলে?

বিকালে বেড়াতে বেরুলাম। গাড়ীতে। মঞ্জুবৌদি ও আমি। মঞ্জুবৌদির কত বন্ধু! এখান সেখান ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে হয়ে এল। বৌদি বললো : চলো কিছু খাওয়া যাক।

একটা রেস্টুরেন্টে এলাম।

সেখানে রং-বেরঙের পোষাকে ঝলমল মেয়ে-পুরুষের মেলা। অনেকেই মঞ্জু-বৌদিকে চেনে। দু-একজন পুরুষ বন্ধু তো মঞ্জুবৌদি যাওয়া মাত্র হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। আমি একটা চেয়ারে বসে রইলাম।

বুঝলাম, মঞ্জুবৌদিকে নিয়ে ওরা খুব হৈ-চৈ করছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘণ্টা বেজে উঠতেই পাশে দাঁড়ানো অর্কেস্ট্রা পার্টির লোকজন খুব তীক্ষ্ণস্বরে মিউজিক বাজাতে লাগলো।

ওদিকে মেয়েপুরুষ জোড়ায় জোড়ায় নাচ সুরু করেছে। মঞ্জুবৌদিকে একজন সুদর্শন পুরুষ ইশারা করে কি যেন বলছে। আমি অপ্রস্তুত। এমনি উদ্দাম উচ্ছল জীবনের সঙ্গে কখনো মুখোমুখি হইনি। চলে আসবো কিনা ভাবছি। বললাম : বৌদি, আমি একটু ঘুরে আসি।

মঞ্জুবৌদি খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললো :

—কোথা যাচ্ছ? দাঁড়াও আমিও যাবো...

তারপর শাড়ীর আঁচলটা শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে মঞ্জুবৌদি জোড়হাতে বন্ধুদের নমস্কার করে পিছন ফিরতেই প্রচণ্ড হাসির রোল উঠলো।

হাসির ঢেউটা যেন বৌদিকে হঠাৎ এসে সজোরে আঘাত করলো। এক ঝটকায় ফিরে তাকাল মঞ্জুবৌদি। দু'চোখে বিদ্যুৎ-ঝলক যেন। তারপর দৌড়েই হোটেলের বাইরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে ডাক দিল। সিংজী...

সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের মধ্যে কান্নার রেশ যেন ঝংকৃত হয়ে উঠল।

ড্রাইভার এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। আমি শুধু টিউবলাইটের স্বচ্ছ আলোয় লক্ষ্য করছি বিচিত্র মঞ্জুবৌদিকে...

নরম গদী-আঁটা সীটে দুজনেই চুপচাপ আছি। একসময় যেন নিজেকে এগিয়ে দিল মঞ্জুবৌদি। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ একটা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : চলো এখান থেকে চলে যাই...

মঞ্জুবৌদি তীর বেগে উঠে পড়ে আমার দিকে একটা অপরিচিত চাহনি নিয়ে তাকালো : কোথায় ?

—বর্ধমানে ?

মঞ্জুবৌদি যেন হতাশ হয়ে চোখ বুজলো। আকাশে তখন পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

সেদিনই রাতে মঞ্জুবৌদিকে কাঁদতে দেখলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে উপরে আসছি। বৌদির মা আড়ালে ডেকে বললেন : মঞ্জু তো খাবে না বলেছে, ঘরে কাউকে ঢুকতেও দিচ্ছে না। বিরক্ত হচ্ছে। তুমি একবার বলে দেখবে বাবা ?

বুঝলাম, মঞ্জুবৌদির মাও কাঁদছেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম মঞ্জুবৌদির ঘর অন্ধকার। শুধু ফুঁপিয়ে চাপা কান্নার শব্দ। ডাকলাম : বৌদি...। কোন সাড়া নেই, কোন ভাবান্তর নেই। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সংসারে যারা নিজেকে বঞ্চনা করে সবার সুখ, দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নেয়, নিজের অন্তরের ব্যথা কাউকে জানতে দেয় না অথচ তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যায়—তাদের ওপর আমার খুব রাগ হলো। রাগ হলো মঞ্জুবৌদির উপরও...

খুব ভোরেই মঞ্জুবৌদি কাতুকুতু দিয়ে ঠেলা মেরে তুলে দিল আমাকে।

—ওঠো...ওঠো...রেডি হয়ে নাও। বর্ধমানের গাড়ী ধরতে হবে। গাড়ী রেডি—

আমি কি দেখছি, তাই ভাবতে লাগলাম। বুদ্ধিমতী মঞ্জুবৌদি যেন এক নিমেষেই আমার মনের পাঠ পড়ে নিল। বললো : কি ? ভাবছো...মঞ্জুবৌদির সেই গোমড়া ফুঁপিয়ে কান্নার মুডটা গেল কোথায় ?

মঞ্জুবৌদি এবার সত্যিই আমার মুখের কাছে নিজের মুখটা নামিয়ে এনে বললো : দেখ...দেখ কোথাও কোন চোখের জল আছে কি না ? আমার গালে মঞ্জুবৌদির গালটা ঠেকতেই যেন একটা হিম-পিণ্ডের ছোঁয়াচ লাগলো বলে মনে হল।

তখনও রাত্রির কালো বোরখাখানা সরে যায়নি। ফুলের বাগানের ঝোপে ঝোপে অন্ধকার তখনও গাঢ়। মঞ্জুবৌদির মা শুধু গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। মঞ্জুবৌদিদের বিরাট বাড়ীখানা পিছনে রেখে বাড়ীর গাড়ীখানা ছুটে চললো।

মঞ্জুবৌদি কিন্তু আর সহজ হতে পারলো না। অবশ্য বর্ধমানে এসে আবার সে তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নিয়ে মেতে থাকবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না। আমি বুঝতে পারলাম, একটা জটীল আবর্তে পড়ে ও সংগ্রাম করে চলেছে।

চেষ্টা করলো সব কিছু ভুলে থাকবার। বাবা, মার যত্ন করা। রান্নার তদারক করা। হাট-বাজারের ফর্দ, জিনিস কেনা-কাটা। আর আমাকে এড়িয়ে চলা। কোনটাই বাদ গেল না। কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়ে গেছে। ফলে গমক, মীড়, লয়, মূর্ছনা সব টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। একদিন সাহস করে বলি : মঞ্জুবৌদি, তোমার কি হয়েছে বলো ত ?

হো হো করে হেসে আমাকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করে তুললো মঞ্জুবৌদি।

বললো : আমার ওপর অত নজর কেন ? এই কটা দিন সবুর করো, তোমার একটা সঙ্গী এনে দিচ্ছি।

আমি লজ্জায় অবাক হয়ে তাকাই ! কি বলছ ?

—ঠিকই বলছি। ও তোমার মনের পাঠ অনেক আগেই পড়েছি।

কিন্তু এ খুশি-খুশি ভাবটাই মঞ্জুবৌদির মনে ফাঁকি বলে ধরা পড়লো। কারণ শত চেষ্টা করেও মঞ্জুবৌদি আর সহজ হতে পারলো না। পদে পদে প্রতিদিনের পরিচিত কাজে ভুল হতে লাগল। অশোকদার ফটোতে চন্দনের ফোঁটা কবে যে শুকিয়ে গেছে। ফ্লাওয়ার ভাসে রজনীগন্ধার শুকনো স্তবক। ড্রেসিং টেবিলে ধুলো জমেছে মোটা হয়ে, বিছানার চাদর ময়লা, আলু-থালু, নিজের বেশবাসেও যেন ছিরি-ছাঁদ নেই, উদাস আনমনা। আমাদের ছোট্ট বাড়ীটা যেন ছেঁড়া পালের হাওয়ায় ধুঁকতে ধুঁকতে কোনরকমে এগিয়ে চলেছে।

সেবার আষাঢ়ে ভালো বর্ষা হয়নি। শ্রাবণের শেষ। কদিন ধরে প্রবল বর্ষণ শুরু। বর্ধমানের নীচের মহল্লা জলে ডুবু ডুবু। আমাদের বাড়ীটা দামোদরের তীরে হলেও বেশ উঁচু জায়গাতে। সেখানেও জল উঠতে শুরু করলো। মঞ্জুবৌদি এত জল কখনও দেখেনি। কেবল জানলার ধারে বসে দামোদরের জলস্রোত দেখতো। একদিন মঞ্জুবৌদি বলল : সমীর চলো না, আমরা একটা ডিঙি নিয়ে ঘুরে আসি।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? যা স্রোত !

--বেশ ভালো হতো কিন্তু...

রাতে শুতে যাবার আগে দেখিনি। মাঝরাতে জলের কল কল শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে দেখি জলের সেকি মত্ততা, আমাদের বাড়ীর বাগান, উঠোন, সব—সব ডুবে গেছে। আমি মঞ্জুবৌদিকে ঘুম থেকে টেনে তুললাম। মঞ্জুবৌদি বললো : বাবা, মা নীচেয় আছেন। চলো চলো...তুলে আনি।

নীচেয় নেমে এসে দেখি, মেঝেতে জল জমতে শুরু করেছে। ঘরের লাইট সব অফ হয়ে গেছে। অন্ধকারে বাবা ও মাকে ওপারে তুলে নিয়ে এলাম। মা বললো : ওরে বৌমা কোথায় ?

আমি দ্রুত নেমে এলাম নীচে। ততক্ষণে মেঝেতে হাঁটুজল। ডাকতে লাগলাম : বৌদি...বৌদি...পাশেই একতলা টালির ছাউনী দেওয়া রান্নাঘর। সেখানে ঢুকে শব্দ পেলাম, বৌদি মাচায় উঠে ঘর-গেরস্থালির জিনিস সামলাচ্ছে। মই বেয়ে ওপরে উঠেও কিছু দেখতে পেলাম না, সব অন্ধকার। কেবল ছোট্ট একটি জানলার অল্প আলোয় বৌদিকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে।

বললাম : বৌদি, বৌদি—নেমে এসো, জল বাড়ছে। একটা বিদ্যুৎ চমকালো, সেই আলোয় দেখলাম বৌদি উপুড় হয়ে শুয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

বৌদি বললে : দেখবে এস জলের খেলা। কেমন উন্মাদের মত জল নেচে বেড়াচ্ছে।

মই থেকে মাচায় উঠে বৌদির কাছে এলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম, যেন একটা বিরাট অজগর হাঁ করে ছুটে আসছে। আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে কি ভীষণ! কি ভয়াবহ !!

বৌদির একটা হাত ধরে টানতে লাগলাম : চলো, চলো, নেমে চলো...জল বাড়ছে যে...

একরকম টেনে হিঁচড়ে মঞ্জুবৌদিকে মই-এর কাছে নিয়ে এলাম। বৌদি কিন্তু নীচে রান্নার ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলো : সমীর, যেও না, রান্নাঘরের মেঝেয় মানুষভোর জল। আমাদের হুটোপুটিতে মইটাও খসে জলে পড়ে গেল। আমি তখন একটা পা মইএ দিয়েছিলাম, তাই ঝুলে পড়েছি।

বৌদি আমার পতনোম্মুখ দেহটাকে দু-হাতে ধরে চীৎকার করে উঠলো : সমীর ওপরে উঠে এসো, আমি দু হাত দিয়ে মাচার পাটাতন ধরে ঝুলছি। বৌদি আমাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। একসময় আমাকে নিয়ে মঞ্জুবৌদি ছিটকে পড়লো।

এমন সময় মনে হল, জগদ্দল পাথরের মত টালির ছাউনীটা ভেঙে আমাদের ওপর পড়লো।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, রিলিফ ক্যাম্পের হাসপাতালে শুয়ে রয়েছি। আমি চোখ মেলতেই মা কাছে এগিয়ে এলেন, ঝুঁকে পড়ে কি যেন বললেন। আমি ঠোঁট নেড়ে বলতে চেষ্টা করলুম : বৌদি—

আমার মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না। আমার অস্ফুট কথা কেউ বুঝতে পারল না। না বাবা। না মা। কেউই না।

মঞ্জুবৌদি উদ্দাম যৌবন আর প্রাণোচ্ছল জীবন নিয়ে আলো-হাওয়ায় দোল খেয়ে ফিরছিল। আলোকিত উজ্জ্বল কলকাতা তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল—ডাক পাঠাচ্ছিল বর্ধমানের আনন্দহীন গৃহী জীবন।

বৌদির ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের মন নিয়ে খেলা, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। পাশে চোখ পড়তেই দেখলাম, বাবা। মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছেন।

ছিন্নপত্র/উত্তমকুমার তিন মুহূর্তে। পরিচালনা : দিলীপ মুখার্জি। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

একটি দেশের জীবনযন্ত্রণা নিয়ে ছেলেখেলা

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট তারিখে বিদায়ী ইংরাজ শাসকের ভেদনীতি এবং আমাদের নেতৃবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের ফলে নবসৃষ্ট পাকিস্তানের অংশস্বরূপ যে পূর্ব পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হয়, বছর দশেক যেতে না যেতেই সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বুঝতে পারে যে, ধর্মান্ধতার ঠুলি তাদের চোখে সেঁটে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক-সম্প্রদায় তাদের ওপর তাদের শোষণনীতি চালাচ্ছে বেপরোয়াভাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় বাঙলা ভাষা আন্দোলন। কঠোর দমন-নীতিকে ব্যর্থ করে আন্দোলন সার্বিক সাফল্যলাভ করে। এবং এই বাঙলা ভাষাই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের এমন আশ্চর্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে যে, দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বাঙলা ভাষা আন্দোলনের বৃহত্তম শরিক আওয়ামী লীগ সম্প্রদায় শতকরা ছিয়ানব্বইটি আসন অধিকার করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কেন্দ্রীয় বিধানসভায় জনপ্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ লাভ করে। এটা হচ্ছে ১৯৭০-এর ২৭ নভেম্বরের কথা। এর পরেই পাকিস্তানের জঙ্গীশাসক জেনারাল ইয়াহিয়া খাঁ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন জুলফিকার আলি ভুট্টোর পরামর্শে নানারকম টালবাহানা শুরু করেন এবং আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে আলাপ-আলোচনা চালাবার অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য আমদানী করতে থাকেন ও ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ আলোচনা ভেঙে দিয়ে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তান রওনা হয়ে যাবার পরেই ঐ রাত্রেই সৈন্যদের অসামরিক, অপ্রস্তুত জনসাধারণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে হত্যালীলা চালাবার নির্দেশ দেন। এর পরের ঘটনাগুলি চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো দ্রুত সংঘটিত। অসামরিক নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে জঘন্যতম অত্যাচার ও ধ্বংসলীলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দলে দলে শরণার্থীদের ভারতভূমিতে প্রবেশ, মুজিবর রহমানের বন্দী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা ও বিচারের প্রহসন, নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমেদকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন, মুক্তিযোদ্ধবাহিনী গঠন ও তাদের তৎপরতা, প্রায় এক কোটি শরণার্থীর চাপে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নিদারুণ চাপ সৃষ্টি, বাংলাদেশ সম্পর্কে রাজনৈতিক সমাধান ত্বরান্বিত করবার জন্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন, ইয়াহিয়ার রণহুঙ্কার এবং ৩ ডিসেম্বরে আচম্বিতে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী বিভিন্ন শহরে যথেচ্ছ বোমাবর্ষণ করে যুদ্ধের সূচনা ও ভারতকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা প্রভৃতি ঘটনা আজ আমাদের নখদর্পণে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার তৃতীয় দিনেই ভারত সরকার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন এবং তারপর থেকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একযোগে আমাদের সৈন্যরা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হয়েছে।

উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলি কোনো দূর অতীতের ব্যাপার নয়; ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট থেকে মাত্র ২৪ বছরের কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। এবং এই বছরেরই ২৫ মার্চ রাত্রি থেকে গেল ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগে পর্যন্ত ৮ মাস ১০ দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা বঙ্গভূমিকে শ্মশানে পরিণত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়ায় যে সঙ্ঘবদ্ধ মুক্তি আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, তাকে উপজীব্য করে যদি কোনো কাহিনী-চিত্র নির্মাণ করতে হয়, তাহলে কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজককে সমগ্র ঘটনার গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে হবে; অমানুষিক অত্যাচার কি করে প্রতিরোধের জন্ম দেয়, সে সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং মুক্তিবাহিনী কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করে অত্যাচারী সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে ও গেরিলা-প্রথার যুদ্ধ শিক্ষা ও পরিচালনার পর্যায়গুলি কি কি, তাও রীতিমতভাবে জানতে হবে। এ সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবাত্মক ছবিগুলি স্মরণীয়।

কিন্তু শঙ্কর বি-সি ও ডি-লাক্স প্রোডাকসান্স নিবেদিত এবং আই-এস জোহর রচিত, প্রযোজিত ও পরিচালিত রঙীন ছবি **'জয় বাংলাদেশ'** ছবিটি নির্মাণের ব্যাপারে এ-সব কিছুই করা হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বাস্তব রূপটি তুলে ধরবার অণুমাত্রও চেষ্টা এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কাহিনীর মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্যদের নৃশংসতা, মুক্তিবাহিনীর গেরিলা-যুদ্ধ, রুকসানা নামে নায়িকার সর্বস্বপণ করে পাকিস্তানী অত্যাচারী ক্যাপ্টেন খোটুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং মাইন বুকে বেঁধে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া, নায়ক ডাক্তার হোসেনের বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও ছবির সামগ্রিক সুরটি যেন [illegible]। এক হৃদয়হীন কর্নেল সালাউদ্দীন এবং [illegible] কর্নেল মহীউদ্দীন

যে-রকম অবলীলাক্রমে সেতারের আচ্ছাদনে রেখে মেশিন-গান দ্বারা শত্রু নিধন করেছে, তাতে মনে হয়, শত্রুনিধন ব্যাপারটা কিছুই নয়। বহু হাস্যকর, অবাস্তব পরিস্থিতি-সংবলিত 'জয় বাংলাদেশ' ছবি একটি নিপীড়িতজাতির জীবন সংগ্রামকে—যে জ্বলন্ত জীবন সংগ্রাম আজ শেষ পর্যায়ে উপনীত—যেন ব্যঙ্গই করেছে। অথচ দেখে আশ্চর্য হচ্ছি, কয়েকটি রাজ্য সরকার এই অকিঞ্চিৎকর ছবিটিকে প্রমোদকরমুক্ত করে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির নায়িকা ও নায়করূপে যথাক্রমে অম্বিকা জোহর ও রাজীব জোহর কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব ও চরিত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েই যথাসম্ভব বাস্তব অভিনয় করেছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনাম্নী নায়িকা কবরী চৌধুরীকে একটি নগণ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে শুধু লাঞ্ছনার দৃশ্যটিই দেখানো হয়েছে নিতান্তই অপ্রয়োজনে। ক্যাপ্টেন খোটুর চরিত্রটি সুঅভিনীত। যে পাঞ্জাবী মেয়েটির সঙ্গে ডাঃ হোসেনের ভুলক্রমে বিবাহ হয়েছিল, সে চরিত্রটিও যথেষ্ট দরদের সঙ্গে অভিনীত। এবং গায়িকা বারবনিতার ভূমিকাটিও সুন্দর ভঙ্গীসহকারে চিত্রিত।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ইন্দিবর রচিত গীত-গুলিতে কল্যাণজী আনন্দজী উপযোগী সুরযোজনা করে দর্শকচিত্তে উত্তেজনা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনোহারী করেও তুলেছেন। ফারুক কাইজার রচিত 'নটী-সঙ্গীত'টিও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ও শ্রুতিসুখকর।

ক্লড লেলুচ কৃত 'লিভ ফর লাইফ'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক টেলিভিসনের প্রযোজক—জগতের সর্বত্র তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয় চলমান জীবনের ছবি তোলবার জন্যে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম—কিছুই বাদ যায় না।

পরের ব্যাপারে আমেরিকার নাক গলানো তাঁর পছন্দ হয় না। একই জাতির বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় জাতির প্রতি কর্তব্য ভুলে কি করে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে ব্যস্ত থাকে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। ভদ্রলোক বিবাহিত; কিন্তু আর একটি মেয়ে তাঁকে ভালোবাসে এবং তিনিও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছেন। স্ত্রীর ভালোবাসা তাঁকে আর তেমন আবিষ্ট করতে পারে না। অথচ ব্যাপারটার একটা সুষ্ঠু নিষ্পত্তি যাতে হয়, সেই ডাই-ভোর্সের কথা তিনি স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করতে পারছেন না, সেই সাহসটা সঞ্চয় করতে পারছেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেদিন তিনি শয্যায় শুয়েই স্ত্রীর কাছে কথাটা বলে ফেললেন, সেদিন দেখলেন স্ত্রী অত্যন্ত সহজভাবেই অবস্থাটা মেনে নিলেন। যদিও দর্শক দেখল, স্ত্রী রীতিমত মানসিক আঘাত পেয়েছেন। ভদ্রলোক প্রেমিকার কাছে সোৎসাহে কথাটা ব্যক্ত করতে প্রেমিকা কিন্তু খুশী হল না; সে বললে, সে তাঁর স্ত্রীকে দেখেছে, তার সঙ্গে কথা কয়েছে এবং যে ব্যক্তি অমন ভদ্র-মহিলাকে ত্যাগ করতে পারে, তার ওপর কোনো স্ত্রীলোকই নির্ভর করতে পারে না। অতএব ওঁদের কোনো সুখী মিলন সম্ভবপর নয়। ভদ্রলোক এ অবস্থায় করেন কি? অগত্যাই তিনি গেলেন স্ত্রীর কাছে ফিরে—কিন্তু সেও ততক্ষণে অন্য জীবন-সঙ্গী বেছে নিয়েছে। কাজেই ভদ্রলোক বিচলিত কিছুক্ষণের জন্যে। পরে মনকে ঠিক করে নিয়ে যে মেয়ে তাঁর কাছে এসে প্রেমের দৃষ্টি ফেলল তাঁর চোখে, তাকেই বোধকরি গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

ক্লড লেলুচ এই অতি-বাস্তব কাহিনী-টিকে বিচিত্র ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন সেলুলয়েডের মাধ্যমে। ভদ্রলোকের চিন্তা-ভাবনাগুলি একরঙা (নীল) এবং বাকী অংশ ডি-লুক্স কলারে রঞ্জিত।

আলেকজান্ডার মুচকিন ও জর্জেস ড্যান্সিজার প্রযোজিত এবং ইউনাইটেড আর্টিস্ট নিবেদিত এই ছবিটিতে নায়ক, স্ত্রী ও প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যথাক্রমে ইয়েভস মণ্টাণ্ড, অ্যানি গিরার্ডো এবং ক্যান্ডিস বার্গেন।

অনন্তর স্বপ্ন : শ্রীবিভূতি রায় আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র উপহার দিয়েছেন। এই চিত্রের নায়ক হচ্ছেন বিখ্যাত শোলা শিল্পী অনন্ত মালাকার এবং উপজীব্য বিষয় হচ্ছে তাঁর জীবন ও সাধনা। কিন্তু এটি কেবল একজন গ্রাম্য হস্ত-শিল্পীর জীবনের চিত্রায়ণ নয়, এটি একটি শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতাও। যদি প্রচেষ্টা থাকে, কর্তব্যে নিষ্ঠা থাকে এবং মনে উচ্চাশা থাকে, তাহলে একজন সাধারণ শিল্পীও কিভাবে গৌরবান্বিত সাফল্য অর্জন করতে পারে, ছবির মধ্যে দিয়ে শ্রীরায় সে কথাই বলতে চেয়েছেন। অনন্ত মালাকার এই ক'টি গুণকে আশ্রয় করেই নিজের সাফল্যে উপনীত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও লাভ করেছেন। এই সাফল্যের পেছনের কাহিনীটুকু নিয়েই শ্রীরায় সহজ কিন্তু অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁর চিত্র গড়ে তুলেছেন। আর সেই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন অনন্তর স্বপ্ন-সাধনার কথা। সে স্বপ্ন সম্পূর্ণ শোলায় একটি পূর্ণাঙ্গ দুর্গা প্রতিমা গড়ার স্বপ্ন। কিভাবে তিল তিল করে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছিল অনন্ত তা-ই বিবৃত হয়েছে ছবির শেষ ভাগে। এই পর্যায়ের কাজ, এবং বিষয়ের উপযোগী আবহসঙ্গীত (ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ) সত্যিই উঁচু স্তরের। শ্রীরমেশ যোশীর সম্পাদনার গুণে (সহকারী শ্রীঅমরেশ শিকদার) ছবিটি সুন্দর স্বচ্ছ গতিতে প্রবাহিত, কোথাও ক্লান্তিকর মনে হয় না। শ্রীঅঞ্জন গুপ্তর ক্যামেরার কাজ উৎকৃষ্ট এবং ধারাবিবরণীর গুণে ছবিটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এক কথায়, এই তথ্যচিত্র আর পাঁচটা তথ্যচিত্রের মতো নয় এবং এর বহুল প্রচার কাম্য।

স্টুডিও থেকে

শপথ নিলাম : কৃষ্ণা মল্লিক প্রযোজিত ও শৈলেশ দে রচিত 'শপথ নিলাম' ছবি সেন্সার সার্টিফিকেট পেল। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায়। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন শমিত ভঞ্জ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চৌধুরী, দিলীপ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, শিপ্রা বসু, সুনন্দা দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে। ছবিটির পরিচালনা, সুররচনা ও গীতরচনা করেছেন যথাক্রমে শচীন্দ্র অধিকারী, সুকুমার মিত্র এবং অমিতাভ নাহা।

সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে 'নয়া মিছিল'-এর শুভ সূচনা : সুখেন দাস নিবেদিত মনমুন ফিল্মস-এর প্রথম প্রয়াস সুখেন দাস রচিত ও চিত্রনাট্যায়িত 'নয়া মিছিল'-এর শুভসূচনা গেল ৬ ডিসেম্বর ইন্দ্রপুরী ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে।

অজয় দাসের সুরারোপে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—শ্যামল মিত্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও মীনা মুখোপাধ্যায়।

পীযূষ গাঙ্গুলী পরিচালিত ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অনুপকুমার, সুখেন দাস, নবাগতা শাঁওলী মিত্র, চন্দ্রাবতী দেবী, শমিতা বিশ্বাস, শ্যামল ঘোষাল ও মোম মুখার্জি। গেল ৯ ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে এবং চলবে একটানা ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

'বহুরূপী'র সঙ্গীতগ্রহণ : 'পান্না হীরে চুনী' ও 'সোনা বৌদি' ছবির সফল প্রযোজক দীনেশ দে তাঁর পরবর্তী চিত্রোপহার 'বহুরূপী'-র শুভসূচনা টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গেল ১ ডিসেম্বর সঙ্গীতগ্রহণের মাধ্যমে শুরু করেছেন। অজয় দাসের সুরারোপে তিনটি গান

রেকর্ড করা হয়েছে এবং কণ্ঠদান করেছেন—মৃণাল চক্রবর্তী, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও নবাগতা মীনা মুখোপাধ্যায়।

প্রণব রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করবেন 'নবজাতক' ছদ্ম-নামধারী একদল কলাকুশলী।

দীনেশ চিত্রম নিবেদিত ও পরিবেশিত এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে এ পর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং নবাগতা মণিকা মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

গেল ৮ ডিসেম্বর প্রযোজক শ্রীদে বম্বে রওয়ানা হয়ে গেছেন নায়িকা চরিত্রে সর্ব-ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন জনৈক শিল্পীকে চুক্তিবদ্ধ করতে।

মঞ্চাভিনয়

প্রথম পুরুষ উত্তম পুরুষ : আজকের জটিল সমাজজীবনে উদ্দীপিত তরুণেরা মাঝে মাঝে অবিশ্বাস, সংশয় আর শূন্যতার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়ার বিষণ্ণতাই একমাত্র সত্য নয়, তমিস্রার আবর্ত থেকেই নতুন এক ভোরের আলোর সন্ধানে এগিয়ে যেতে তারা আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করে। একটি উপলব্ধিই সেই মুহূর্তে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা বেঁচে থাকা যাবে না, সংঘবদ্ধভাবে বাঁচবার চেষ্টা করলেই এগিয়ে যাবার সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। অসিত পালের 'প্রথম পুরুষ উত্তম পুরুষ' নাটকটি বোধহয় এই গভীরতর সত্যকেই সংলাপে আর সংঘাতে ভাষা দিয়েছে।

কলকাতা মিউনিসিপাল কনট্রাকটরস অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে নাটকটি সম্প্রতি পরি-বেশিত হোল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। বক্তব্যের দিক থেকে নাটকটি বলিষ্ঠ হলেও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বহুতর ত্রুটি থাকায় প্রযোজনাটি খুব বেশী সপ্রতিভ হয়ে উঠতে পারেনি। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে মনোজিৎ দে (ডালিম) ও বেবী মুখার্জি (রত্না)ই দর্শকদের মনে রেখাপাত করতে পেরেছেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে রূপ দিয়েছেন কার্তিক পাল, বেচু ঘোষ, সুপ্রভাত দাস, সুবীর সেন, মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, রাখাল সেন, অনিল সেন, অশোক দাস বিশ্বাস, ও জি-আর রমন।

ফাঁস : ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতির (শ্যামবাজার শাখা) শিল্পীরা সম্প্রতি প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'ফাঁস' নাটকটি পরিবেশন করলেন 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে। শ্রীশিশির চক্রবর্তীর সূক্ষ্ম নির্দেশনার ছোঁয়ায় আর শিল্পীদের দলগত অভিনয়ের অটুট বাঁধুনীতে সামগ্রিকভাবে প্রযোজনাটি প্রাণবন্তই হয়ে ওঠে। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা বৈশিষ্ট্যের নজীর রাখেন তাঁরা হোলেন মানিক চক্রবর্তী (ডেপুটি), প্রশান্ত রায় (সোমনাথ), নীহার চক্রবর্তী (বিমান), শঙ্কর ব্যানার্জি (সুভাষ), ব্রতী দত্ত (তরলা)। 'নবীনকুমার' ও 'তরলা'র ভূমিকায় মহাদেব ব্যানার্জি ও অঞ্জলি ভট্টাচার্য প্রত্যাশিত ছবি তুলে ধরতে পারেননি। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অমলেন্দু ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী সেন, চন্দন মল্লিক, দিলীপ চন্দ্র, অসীম পাল, রঞ্জিত মিত্র, ইন্দ্রজিত দেবরায়। আবহসংগীত পরিকল্পনায় অরুণ দাস ও সম্প্রদায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

'সত্যদা আসছে' : আজকে সমাজে যা কিছু দুঃসহ অন্ধকার, যা কিছু যন্ত্রণা আর বিপর্যয়ের নিঃসীমতা তাকে মুছে দিয়ে প্রসন্ন এক সূর্যোদয়কে উদ্ভাসিত করতে গেলে সন্ত্রাস আর হিংসার পথে এগোলে চলবে না। আপন ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাবান থেকে, একতার বন্ধনে সবাইকে বেঁধে সংঘবদ্ধ-ভাবে পরিবর্তন আর রূপান্তরের কাজ শুরু করতে হবে। দেশের যুবশক্তিকেই নিতে হবে এই দুরূহ কাজের দায়িত্ব। আজকের সমাজজীবনের এই সত্যকেই অসাধারণ এক ব্যঞ্জনায় রূপ দেওয়া হয়েছে শক্তিশেখর দাসের 'সত্যদা আসছে' নাটকে। 'রক্তকরবী নাট্যগোষ্ঠী'র শিল্পীরা এই নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের (প্রতি বুধবার) শুরু করেছেন 'থিয়েটার সেন্টার' মঞ্চে। বাস্তবভিত্তিক নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনায়ও নাট্যকার গভীরতম শিল্প-বোধের পরিচয় রাখেন। প্রাণঢালা অভিনয়ে যাঁরা সবাইকে আকৃষ্ট করেন তাঁরা হোলেন সঞ্জীব চক্রবর্তী, পাঁচুগোপাল দে, দিলীপ ব্যানার্জি, দীপক ব্যানার্জি, শক্তিশেখর দাস, মাঃ সোমাংশু, স্বপ্না দাস।

ঝিন্দের বন্দী : কয়েকদিন আগে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হোল 'ঝিন্দের বন্দী' নাটকটি। অভিনয় অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বেঙ্গল স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। সামগ্রিকভাবে প্রযোজনাটি কোন ছাপ রাখতে পারেনি। এর জন্য নাট্যনির্দেশকের শিথিল প্রয়োগ-পরিকল্পনা আর শিল্পীদের অগভীর চরিত্রচিত্রণই দায়ী। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন পণ্টু ঘোষ, সমীর চৌধুরী, অজিত ব্যানার্জি, অজিত ঘোষ, কার্তিক সমাজদার, শিশির সরকার, পরেশ সরকার, পি-এন-চন্দ্র, নিশিকান্ত হালদার, বঙ্কিম চন্দ্র, দুর্গা মিত্র, এ্যান্টনী গোমেশ, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমানী গঙ্গো-পাধ্যায় ও শিখা ভট্টাচার্য। নৃত্যাংশে ছিলেন জয়শ্রী সরকার।

তুলসী লাহিড়ীর নাটক অভিনয় : বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে 'কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার' আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। এই আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শরিক শ্রীতুলসী লাহিড়ীর নাটক-গুলোকে পর্যায়ক্রমে অভিনয় করবার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলার নাট্য আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকেই স্পষ্টতার ভাষা দিয়েছেন। নাট্যরসিকদের কাছে এটা অবিদিত নেই যে শ্রীলাহিড়ীর নাটকগুলো কিভাবে, কোন্ সুর ও ছন্দে বাংলা থিয়েটারের পালা বদলের জোয়ারকে শতধারায় উৎসারিত করেছিল। আগামী জানুয়ারী (৭২) মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে তুলসী লাহিড়ীর 'গণনায়ক', 'মণিকাঞ্চন', 'চৌর্যানন্দ', 'ছেঁড়া তার', 'বাঙলার মাটি' ও অন্যান্য সব নাটকগুলো অভিনীত হবে প্রতি শনিবার সেন্ট টমাস মঞ্চে (৯ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট)। এক বৎসরব্যাপী এই নাটকগুলো পরিবেশিত হবে।

লোকায়নের আগামী নাটক : লোকায়নের শিল্পীরা আগামী ১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূত-পেত্নীর যাত্রা' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন 'অবন মহলে'। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অরুণ রায়। মঞ্চ, সংগীত আর নৃত্য-পরিচালনায় রয়েছেন রঘুনাথ গোস্বামী, ব্রজসুন্দর দাস আর শক্তি নাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ : দেশের বর্তমান পরি-স্থিতির জন্য সুরথ স্মৃতি ক্লাব হরিপদ বসু রচিত তাঁদের আগামী 'শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাভিনয়গুলি পুনঃ ঘোষণা পর্যন্ত বন্ধ রাখছেন। তবে আগামী ২রা জানুয়ারী, ৭২ রবিবার ৩টায় দক্ষিণেশ্বর নাটমণ্ডপে অভিনয় হবে।

আর এই নাটকের নটি বিনোদিনী চরিত্রে স্থায়ীভাবে রূপদান করবেন প্রতিভা-ময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী অলকা গাঙ্গুলী। সুরসৃষ্টি ও রামকৃষ্ণ বন্দনা : সংগীত-সুধাকর শ্রীউমাপতি শীল।

রং ও রূপ-এর 'পলাশী' : কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাকটরীর সাংস্কৃতিক নাট্যসংস্থা 'রং ও রূপ' সম্প্রতি রঙমহল মঞ্চে পরিবেশন করলেন হরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়ের 'পলাশী' নাটক। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ছবিই যেন ভেসে

উঠেছে এই নাটকের সংঘাতে। এইদিক থেকে একটি সময়োপযোগী নাটক পরিবেশন করার জন্য 'রং ও রূপে'র শিল্পীরা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখেন। শ্রীঅবনী মুখোপাধ্যায়ের সার্থক নির্দেশনায় সামগ্রিক নাট্যানুষ্ঠানটি বৈশিষ্ট্যে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন বলরাম মুখার্জি, সুকুমার চ্যাটার্জি, কালিদাস ঘোষ, সুখরঞ্জন দাস, নারায়ণ চৌধুরী, সত্যরঞ্জন দাস, দেবী রায়, মোহন চক্রবর্তী, দীপক হোড়, রঞ্জন দাস, রবীন দাস, বিজয় মুখার্জি, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সান্ত্বনা ঘোষ, নীলিমা চক্রবর্তী, সবিতা ব্যানার্জি ও ঝর্ণা মুখার্জি।

পতিব্রতা : পুরনো দিনের পটভূমিতে রচিত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'পতিব্রতা' নাটকটি সম্প্রতি বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ হোল। এই নাটকের একটি সার্থক প্রযোজনা সেদিন পরিবেশন করেছিলেন স্টাফেকন (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফেডারেশন) রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। নাট্যনির্দেশনায় শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন। বিশেষ করে 'রাজেশ্বরে'র ভূমিকায় মনীশ মুখার্জির অভিনয় সত্যি মর্মস্পর্শী। স্বপন সরকারের 'তারক' ও প্রাণতোষ ঘোষের 'গপে গুন্ডা' যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত হয়েছে। এ ছাড়া আর অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন দিবাকর দাস, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, মাঃ সুকান্ত, সুধীর চক্রবর্তী, ইরা মিত্র, অজন্তা চৌধুরী, রঞ্জিত ব্যানার্জি, ক্ষিতীশ ভৌমিক, বেবী সেনগুপ্তা। আবহসংগীত আর আলোকসম্পাত মোটামুটিভাবে নাটকটির সামগ্রিক অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে।

বিবিধ সংবাদ

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

এ-বছরে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে-সব ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্যে বিবেচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র রূপে গণ্য হয়েছে কানাড়ী চিত্র 'সংস্কার'। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে স্বীকৃত হয়েছেন সত্যজিৎ রায়। অন্যান্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছেন (১) অভিনেতা—সঞ্জীবকুমার (দস্তাক), (২) অভিনেত্রী—রেহানা সুলতান (দস্তাক), (৩) শিশু-অভিনেতা—ঋষি রাজকাপুর (মেরা নাম জোকার), (৪) সঙ্গীত-পরিচালক—মদনমোহন (দস্তাক), (৫) ফোটোগ্রাফার (রঙীন)—রাধু কর্মকার (মেরা নাম জোকার), (সাদা-কালো)—কে-কে মহাজন (উস্‌কি কাহানী), (৬) নেপথ্য গায়ক—মান্না দে (নিশিপদ্ম), (৭) নেপথ্য গায়িকা—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (নিশিপদ্ম ও জয়জয়ন্তী)। শ্রেষ্ঠ সামাজিক তথ্যচিত্ররূপে নির্বাচিত হয়েছে লেটেন্ট।

প্রেসিডেন্টস স্কাউট র‍্যালি

ভারত স্কাউটস এণ্ড গাইডস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে ৪৫ জন কৃতী স্কাউট সভ্য স্কাউটার রবীন্দ্রকুমার সুর-এর নেতৃত্বে গত ১৯শে থেকে ২৩শে নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্টস স্কাউট র‍্যালিতে যোগদান করে। ২২শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে মাননীয় রাষ্ট্রপতি কৃতী স্কাউটদের স্বাক্ষরস্বরূপ কৃতিত্বের জন্য সার্টিফিকেট দেন। ২৫শে নভেম্বর সভ্যরা রাজধানী থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে।

ছয়দিনব্যাপী লোক উৎসব

ডায়মণ্ডহারবারের 'আশুরালী গঙ্গাপুজো উৎসব কমিটি' আগামী ১৬ জানুয়ারী থেকে ছয়দিনব্যাপী লোক-উৎসবের আয়োজন করছেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে পুতুল নাচের পালা, কৃষ্ণযাত্রা, বিভিন্ন সৌখীন দলের যাত্রাপালা এবং গুণীজন সম্বর্ধনা।

পরলোকে চলচ্চিত্র প্রযোজক ডাঃ দেবনাথ রায়

মানুষ যখন লোকান্তরিত হয়, তখন সেই শোকের মধ্যেও তার আত্মার উদ্দেশে জানাতে হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি। কল্যাণ কামনার সঙ্গে তর্পণ করতে হয় হৃদয়ের নানা ভক্তির অর্ঘ কিংবা প্রীতির স্নেহ-ভালবাসা।

একজন লোকান্তরিত মানুষকে আজ তেমনিভাবে স্মরণ করছি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, যার আকস্মিক বিয়োগে স্বজনবান্ধব সকলেই বেদনাবিধুর। বিশেষ করে এই বিয়োগটি নিদারুণ মর্মান্তিক এই কারণে যে, প্রকৃতই অপরিণত বয়সে আপন প্রতিষ্ঠার ঠিক উষালগ্নেই তাকে হঠাৎ চলে যেতে হলো; চলে যেতে হলো বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী, শিশুপুত্র-কন্যা আরো কত অগণিত স্বজনবান্ধবকে চরম নিঃসঙ্গ, রিক্ত করে দিয়ে। কারো বা তারই জন্যে কর্মজীবনের ভিত্তিভূমি গেল ভেঙে।

যার কথা বলছি, তার নাম ডাঃ দেবনাথ রায়। গত মঙ্গলবার তিরিশে নভেম্বর অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দেবনাথ পরলোকগমন করেছে। উত্তর কলকাতার দুটি নার্সিং হোমের স্বত্বাধিকারী সুচিকিৎসক দেবনাথ রায় শুধু চিকিৎসা জগতের মধ্যেই নিজেকে নিবিষ্ট রাখেনি, অভিনয় জগত এবং চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রেও স্বল্পসময়ের মধ্যে তার সজীব প্রতিভার স্পর্শ রেখে গেছে।

সলিল দত্ত পরিচালিত সুখ্যাত 'অপরিচিত' প্রযোজনার মাধ্যমে দেবনাথ রায় চিত্রজগতের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই আপন সুমিষ্ট ব্যবহারের গুণে চিত্রজগতের অনেকেরই সে প্রিয় হয়ে ওঠে। সম্প্রতি প্রদর্শিত জনঅভিনন্দিত 'ফরিয়াদ' চিত্রটি দেবনাথের দ্বিতীয় প্রযোজনা।

আর, জি, কর কলেজ থেকে সদ্য ডাক্তারী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে আসা দেবনাথ রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে অনেক বছর আগে, একটি নাট্যসংস্থার মাধ্যমে, নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। তারপরে দেবনাথের সঙ্গে বেশ কয়েকটি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছি। আর সেই অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ চিকিৎসকের হৃদয়ের কাছাকাছি কখন আমি চলে গেছি, তা বুঝতেই পারিনি। বোধকরি, এই কারণেই অনুজপ্রতিম বন্ধুস্থানীয় দেবনাথের বিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়েছি, পেয়েছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের প্রাসাদোপম 'সুপ্রভাত' অট্টালিকাটির গৃহপ্রবেশের উৎসবের নিমন্ত্রণ।

এই উৎসব অনুষ্ঠানে দেখেছি তার সৌজন্যবোধ। দেখে বিস্মিত হয়েছি তার কর্তব্যবোধ, চারিত্রিক নিষ্ঠা। সংসারে সর্বদিকে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। সে দৃষ্টি যেমন প্রখর, তেমনি পরিশীলিত, শিল্পমার্জিত। চিত্রজগতেও তার সততার কথা সংশ্লিষ্টদের কাছে শুনেছি। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল নিরলস চেষ্টা এবং প্রশংসনীয় উদ্যম।

সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতনামা লেখকের রচনার ব্যাপারে যেমন তার মধ্যে উৎসুক্য দেখেছি, তেমনি আমার মত সাধারণ একজন অখ্যাত লেখকের রচনার ব্যাপারেও কখনো তার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিনি। কোনো গল্প সম্বন্ধে যখনি আলোচনা করেছি, আগ্রহভরে তখনি নিজের মতামত জানাতে কখনও দ্বিধা করেনি। আমাদের মত নিছক ভাবপ্রবণ মানুষ না হলেও ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সহজে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো না।

উচ্ছাস নেই, আবেগের আধিক্য সেখানে নেই, কিন্তু শিল্পী-মনের প্রকাশ ছিল সুসংবদ্ধ, যথাযথ। স্বল্পবাক, সংযমী মন, বাস্তববাদী দেবনাথ রায়ের অন্তরের খোঁজ পাওয়া তাই ছিল দুর্লভ। নিতান্ত কাছের মানুষও তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দেবনাথের আরো দুটি কাহিনীর চলচ্চিত্রায়নের পরিকল্পনা ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'। সন্ধানীর দৃষ্টিতে দেখা সেই অমৃতকুম্ভের কাজটি অসমাপ্ত রেখে জীবনের আর সব পরিকল্পনাগুলোকে আকস্মিকভাবে স্তব্ধ করে দিয়ে দেবনাথ পাড়ি দিল অমৃতলোকের উৎস সন্ধানে। মাত্র চৌদ্দ পনেরো বছরের সামাজিক কর্মজীবনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে জীবনের সাঁয়ত্রিশটি বছর পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তানের অনাবিল স্নেহচ্ছায়ায় লালিতপালিত হয়ে হঠাৎ চলে গেল দেবনাথ আনন্দলোকের সেই অনন্তধামে।

তার এই আকস্মিক বিয়োগে শোক প্রকাশ করবো না। শুধু প্রার্থনা করি পরম মঙ্গলময়ের কাছে যেন তার আত্মার অক্ষয় শান্তিলাভ হয়। এবং তার পিতামাতা প্রিয়পরিজনদের এই দুঃসহ শোক সহ্য করবার তিনি শক্তি দেন। —রণজিৎ চক্রবর্তী

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব

বয়েসের বিচারে আধুনিক পোলিশ চলচ্চিত্রের বয়স মাত্র ২৫ বছর। ১৯৪৭ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পোল্যান্ডে চলচ্চিত্র শিল্প পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলে প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায়। আজ অবাক বিস্ময়ে দেখতে হয় পোলিশ চলচ্চিত্র শুধু দ্রুত উন্নতই হয় নি, সংগে সংগে তার সর্ববিভাগেই একটি বিশেষ মানে পেণছেছে। যুদ্ধের যে বিভীষিকা দেশটির ওপর বয়ে গেছে তার বেদনাদায়ক স্মৃতি পোলিশ চলচ্চিত্রের কাহিনীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্ভাসিত। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বাস্তব ঘেঁষা বেশ এক স্বচ্ছন্দ ও বলিষ্ঠ ভাব উপস্থিত। সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে এর চিত্রগ্রহণের কাজ। বস্তুত প্রায় প্রতিটি পোলিশ চলচ্চিত্রেই রীতিমত উন্নত মানের এক ফটোগ্রাফি দেখা যায়। আনুষংগিক অন্যান্য বিভাগেও এই স্বল্প সময়ে পোলিশ চলচ্চিত্রের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়।

পোলিশ চলচ্চিত্রের এই সামগ্রিক রূপটি আবার প্রতিভাত হলো কলকাতার সাম্প্রতিক সাত-দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবে। আগেই বলা হয়েছে যুদ্ধের যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা পোলিশদের রয়েছে তার ছাপ অহরহই তাঁদের বিভিন্ন চিত্রে দেখা যায়। এবারের উৎসবে প্রদর্শিত সাতটি ছবির মধ্যে তিনটিই যুদ্ধের পটভূমিকায় চিত্রায়িত। বাকী কটিতে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে জীবনের নানা বিচিত্র ও কাব্যিক রূপ। উৎসবে আধুনিক পোলিশ চলচ্চিত্রের অন্যতম রূপকার আন্দ্রেজ ওয়াজদা'র 'এভরিথিং ফর সেল' ও 'অ্যাসেজ এন্ড ডায়মন্ড' ছবি দুটিও দেখান হয়েছে।

উপস্থাপনা ও বিন্যাসের গুণে 'এভরিথিং ফর সেল' ছবিটিকে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করা যায়। ছবির শুরুতে দেখা যায় দ্রুত ধাবমান একটি ট্রেনের সংগে ছুটতে ছুটতে অবশেষে লোকটি ওই ট্রেনেরই চাকার তলায় চলে যায়। নায়কের অনুপস্থিতিতে পরিচালক নিজেকে দিয়েই দৃশ্যটি নেন। পরিচালক নায়কের স্ত্রী ও তার প্রাক্তন প্রেমিকা ও বর্তমানে তার স্ত্রীকে তাঁদের স্ব স্ব ভূমিকায় নির্বাচিত করেন যাঁরা নায়কের খোঁজে বেরিয়েছিল। বেতারে শোনা যায় নায়কের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। পরিচালক কিন্তু চিত্রগ্রহণ বন্ধ রাখেন নি। দ্বিতীয় একজন অভিনেতাকে দিয়েই ছবিটি তোলার ব্যবস্থা করেন। শিল্পীটির আপত্তি সত্ত্বেও পরিচালক তাকে দিয়েই অভিনয় করাবেন বলে ঠিক করেন। সেই ট্রেন দুর্ঘটনার দৃশ্যটির সব ব্যবস্থা করে পরিচালক দৃশ্য গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার পরই দেখা যায়, পাশের খামার থেকে ধাবমান একদল ঘোড়ার সংগে সংগে এই অভিনেতাটিও ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে—[illegible] পরিচালক ওই [illegible] গ্রহণ করেন—বোঝেন একজন কখনও অন্যের 'ডুপ্লিকেট' হতে পারে না। ছবিটিতে বিখ্যাত পোলিশ অভিনেতা সিবুলস্কির নাম একবারও উচ্চারিত না হলেও এটি ওয়াজদার বন্ধু অভিনেতার স্মৃতিতর্পণ বলেই ধরা হয়। ছবিটিতে বাস্তব ঘটনা ও কাহিনীর এক অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়। ছিমছাম ছবিটির চিত্রগ্রহণ এক কথায় অপূর্ব। দ্বিতীয় ছবিটি যুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা। বিভিন্ন বিভাগের উন্নত কাজের জন্য এটিও মনে দাগ কাটে।

একই কথা বলা যায় যুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা জে. মর্গেনসটার্ন-এর 'অ্যান্ড অল উইল বি কোয়াইট' এবং এ, ফোর্ডের 'দি ফার্স্ট ডে অব ফ্রিডম' সম্পর্কেও। জাতীয় সংহতি ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ওপর তোলা এ ছবি দুটিতে নিখুঁত ফটোগ্রাফির স্বাক্ষর।

স্টানিসলা লেনারটোউইচ-এর 'রেড এন্ড গোল্ড' ছবিটি বেশ সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনবোধে উজ্জ্বল। ছবিটিতে প্রৌঢ় জীবনের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যও যে প্রৌঢ় সাথীর প্রয়োজন আছে তা এতে বলা হয়েছে। ছবিটির মূল সুরের সংগে বাংলা ছবি 'অনুষ্টুপ ছন্দ'র এক ভাবগত ঐক্য রয়েছে।

প্রেম ও বিদ্বেষের পটভূমিকায় তোলা জে, মর্গেনস্টানের দ্বিতীয় ছবি 'ইয়োভিটা' বেশ পরিচ্ছন্ন ছবি।

পুরনো হলেও যে ছবির কাব্যিক জীবনবোধ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, উন্নতমানে চিত্রগ্রহণ ও সংগীত মনকে এক শান্ত ও করুণ রসে মথিত করে সেটি হলো উইটোল্ড লেসংচিনস্কি'র 'দি ডেজ অব ম্যাথিউ'। ছবির নায়ক ম্যাটিস-এর কাছে প্রকৃতির সব কিছুতেই অপার বিস্ময়—সবকিছুর প্রতিই তার ভালবাসা বারবার মনকে নাড়া দেয়। সেই গুলীবিদ্ধ পাখীটিকে বুকে তুলে নেওয়া (সে সময় সিদ্ধার্থর শরাহত বকটিকে বুকে তুলে নেওয়ার কথা মনে পড়ে), ঝড়ের রাতে গাছ ভেঙে যাওয়ায় কোনা, লেকের বুকে ফেরী পারাবার, বোন ওলগা ও জ্যান-এর প্রেমের কথা বুঝতে পেরে ও বাস্তবতার আঘাতে আহত ম্যাটিস-এর সেই করুণ চাহনি—আত্মহননের মুহূর্তগুলি ভোলা যায় না। ফ্রানসিজেক পিচকা চরিত্রটি রূপায়ণেও অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

সবশেষে বলতে হয় পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিটি ছবিরই উন্নত মানের চিত্র-গ্রহণ সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করেছে।

—ন-লা-ভ

জলসা

দেবযানী চালিহা

মণিপুরী নৃত্যে দেবযানী চালিহা : মিতেই জাগোই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত শনিবার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে দু ঘন্টাব্যাপী এক মণিপুরী নৃত্যের অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। প্রধানা শিল্পী দেবযানী চালিহা। গতবছরেও এঁর নাচ দেখেছি কলামন্দিরে। সত্যিই ভাল লেগেছিল। এবারে দেখলাম শ্রীমতী চালিহা আরো অনুশীলিতা, আরো সাবলীল ও স্বচ্ছপ্রবাহী।

ইনি অসমীয়া, কিন্তু মণিপুরী নাচের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই এঁকে অনুপ্রাণিত করেছে মণিপুরে যেয়ে মণিপুরী প্রথায় ভোজ্য গ্রহণ করে, মণিপুরী বেশভূষা ও জীবনযাপন করে যথার্থভাবে মণিপুরী সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নৃত্যে প্রকাশ করতে।

সেদিন আমরা দেখলাম এঁর কৃষ্ণ অভিসার, লাস্যভঙ্গিতা, বসন্তরাস, থাম্বা থইবি, খুবক চোলম, শ্রীকৃষ্ণবন্দনা, মন্দিলা চোলম, লাইজারোবা, পুংচোলম, তবল ছোংবী তা খোকসভা, কিতলম ও রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে মণিপুরী আঙ্গিকে রচিত শ্রীমতী চালিহার দুটি নৃত্য।

পাহাড়ঘেরা মণিপুরের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবন এঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাটি সযত্নে রক্ষা করেছে। মণিপুরের রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহে এমনভাবে লিপ্ত থাকতে হোতো যে, শিল্পকলার প্রতি মনোযোগ দেবার এঁদের সময়ই ছিল না। তবু মিতে (মণিপুরবাসী)দের কাছে এ নৃত্য সমাদরে গৃহীত হয়েছে কারণ এ নৃত্য এদের ধর্মের অঙ্গীভূত। তাছাড়া এ নৃত্য লোকনৃত্যও বটে। তাই লোকনৃত্যের আনন্দ ও মন্দিরের ভক্তিভাবের সমন্বয়ী এ নৃত্যের একটা স্বতন্ত্র স্বাদ আছে।

এই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় রেখেছেন দেবযানী চালিহা। মণিপুরী নৃত্যে শিবধর্ম, তারপর মঙ্গোলিয়ান প্রভাব এবং সবশেষে বৈষ্ণব ভাবই প্রবল হয়ে ওঠে।

বসন্তরাসের একটি প্রধান অংশ 'চালি'। পদ্মশেষ, অর্ধচন্দ্র ও হংসাস্য—এই তিনটি মুদ্রা বিভিন্ন পদবিক্ষেপের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে থাকে। এই আঙ্গিকের পরিশুদ্ধতা ত চালিহার নৃত্যে ছিলই এছাড়া ছিল নিস্পৃহ প্রেমের বৈর্যক্তিক ভাবকল্পনার অভিব্যক্তি। এ নৃত্যে প্রেম আছে, ভালবাসা আছে মিলনের আনন্দ ও বিরহের বেদনাও আছে—কিন্তু সবই শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত উৎসারিত।

এই আত্মনিবেদনের রূপটি যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলেই শ্রীমতী চালিহার নৃত্য চিত্তস্পর্শ করেছে।

আর এক উল্লেখযোগ্য গুরু নদীয়াচাঁদ সিং-এর পুংচোলম নৃত্য। একাধারে মৃদঙ্গ-বাদক ও নর্তকের যুগ্ম-ভূমিকায় ছন্দ ও ভঙ্গীর মিলনের ছবিটি মুগ্ধ না করে পারে না।

মণিপুরী নৃত্যকে বিশ্বসভায় উপস্থিত করেন কবিগুরু স্বয়ং। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর রচিত দুটি নৃত্যে তাঁর প্রতি যথা-যোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন দেবযানী। তবে নৃত্যরচনা আরো সুন্দর হওয়া উচিত ছিল। অন্তত তাঁর মত প্রতিভাসম্পন্নার কাছে আমরা আরো কিছু আশা করেছিলাম?

সুষ্ঠু সঙ্গীত পরিচালনার কৃতিত্ব প্রাপ্য শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের, সম্মিলিত নৃত্যে রোহিণী দেবী, তিলোত্তমা দেবী, বিমলা দেবী ও বিলাসিনী দেবীর মণিপুরী ঢঙে গানগুলি সুন্দর গেয়েছেন কৃষ্ণা মুখো-পাধ্যায়, প্রীতিকণা ভট্টাচার্য, মণিসনা দেবী, শান্তা দেবী, নাগনবী দেবী।

সর্বসাধারণে উন্মুক্ত রবীন্দ্র ভারতীর উৎসব : প্রতিবারের মত এবারও জনতার উচ্ছ্বাসে দুলে উঠেছিল রবীন্দ্র সদনের বিরাট প্রেক্ষাগৃহ। সমাজের ওপর মহল থেকে সুরু করে জনসাধারণ এ আনন্দ সভায় প্রবেশের অধিকারী ছিলেন বিনা-প্রবেশপত্রে, বিনা দক্ষিণায়। উপলক্ষ্য রবীন্দ্র ভারতীর বার্ষিক উৎসব—আহ্বায়িকা ডঃ রমা চৌধুরী।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে এ উৎসব প্রযোজনায় বাইরের কোনো শিল্পী আহূত হন নি কারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দের ডালি সাজিয়েছেন রবীন্দ্র ভারতীর বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুচিত্রা মিত্র ও সুমিত্রা সেন, উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীতে তিমিরবরণ, শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ও শিশিরকণা, আবৃত্তিতে শম্ভু মিত্র, নৃত্যে অসিত ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দম কুট্টি। এছাড়া লোকসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং অন্যান্য

ম্যাক্সমুলার ভবনে উমরশঙ্কর কালচারাল সেন্টার আয়োজিত অনুষ্ঠানে মিঃ এবং মিসেস ভায়ান, সুকোমলকান্তি ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ এবং অন্যান্য কয়েকজন।

নাল বিষয়ের নামী শিল্পী শিক্ষক ও শিক্ষিকা।

মধুরেণ সমাপয়েৎ হোলো নাট্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকের স্বর্গ' নাটক দিয়ে। 'ক্ষণিকের স্বর্গ' অনার্য উপ-দেবদেবীদের স্বর্গগমন ও আকস্মিক প্রাপ্ত স্বর্গোপভোগের কাহিনী। স্বর্গবাসী দেবগণের মধুর ভাষণ, আচার-ব্যবহারের বিনীত শ্রী ও অভিজাত্যের বিপরীতে মর্ত্যের অনার্য দেবদেবীদের অমার্জিত চালচলন অশালীন পরিহাস ও অধিকার বোধের কৌতুকময় চিত্র সারা প্রেক্ষাগৃহে নির্মল আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত করেছিল।

গুরুদেবের এই অতুলনীয় ভাব-কল্পনার এমন রসোত্তীর্ণ রূপসৃষ্টির জন্য অভিনন্দনীয় কলাকুশলীবৃন্দ ও নাট্য পরি-চালক ডঃ রমা চৌধুরী।

মঞ্জীর-প্রযোজিত ত্রয়ীর আসর : কলামন্দিরে 'মঞ্জীরের' নিবেদন ত্রয়ীর রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর গত পক্ষকালের এক উল্লেখযোগ্য সাঙ্গীতিক ঘটনা। শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শিল্পীত্রয় সম্বন্ধে কিছু বলার নেই, আপনাপন ক্ষেত্রে সকলেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আসর সুরু হয় অশোকতরুর গান দিয়ে। ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে নির্বাচিত 'হে মহাপ্রবল বলী'র দিয়ে সঙ্গীতারতির আরম্ভ, তারপর 'দেশ' রাগাশ্রিত ব্যাকুল দ্যোতনার একটি গান। তৃতীয় গান—'মরি গো মরি'—স্বামী বিবেকানন্দর প্রিয় গানটিতে ফুটে উঠল স্বামীজির হৃদয়ার্তি।

কিন্তু সুর ও ভাবের মিলন প্রগাঢ় মাধুর্যে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়' যে মোহানায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি পথরেখা টপ্পা ও বাউলাঙ্গ যেন হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়ালো—অন্তরার 'যেজন দেয় না দেখা ভালবাসে 'আড়াল থেকে'—চরণটিতে। 'বুঝি বেলা বয়ে যায়' মুলতানের রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস, মায়ার খেলার প্রণয়-রাঙিন খেলা (যেওনা চলে) কৌতুকের সরসতা মিলিয়ে গেল 'আঁধার রাতে একলা পাগল'এর খোঁজার আর্তিতে। সুচিত্রা মিত্রের দশখানি গানের মধ্যে 'কৃষ্ণকলি' ছাড়াও যে গানগুলি মনে দাগ কেটেছে সেগুলি হোলো 'একলা বসে এসে অন্য মনে' 'অবেলায় যদি এসেছ আমার মনে' 'সখী আমারই দুয়ারে'।

সর্বশেষ শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শ্রোতাদের প্রাপ্তির করপুট ছাপিয়ে দিয়ে-ছেন অকৃপণ গানের ধারায়। এঁর গাওয়া ১৫খানি গানের প্রত্যেকটিতে যেন অতি পরিচিত গানের জগতটি নূতনরূপে দুলে উঠল। সেদিনের প্রত্যেকটি গানে শিল্পীর অনুপ্রেরিত মনের দীপ্তি আভাসিত হয়েছে বলেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল পারমিতা চৌধুরীর ব্যাখ্যাপাঠ।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের ভাষ্যপাঠ করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারকেশ্বরে গানের জলসা : তারকেশ্বর চাউলপট্টী রক্ষীবাহিনী ১৫ ডিসে-ম্বর, বুধবার মহাদেব ঘোষের ব্যবস্থাপনায় তারকেশ্বর রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে সারারাতব্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এতে অংশ গ্রহণ করবেন সর্বশ্রী শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, জপমালা ঘোষ, সলিল মিত্র, নিলাদ্রি বসু, দিলীপ শর্মা, অশোক মুখার্জী ও আরও অনেকে।

'পুনশ্চ'-র দ্বৈত সঙ্গীতাসর : একা-ডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে গত রবিবার সকালে 'পুনশ্চ' সভাবৃন্দ রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নজরুল গীতির দুই বিচিত্র স্বাদের সঙ্গীতাসর উপহার দিলেন। আমরা শুনলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রীঅশোক-তরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ঠে, নজরুল গীতি গেয়ে শোনালেন অনুপ ঘোষাল।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থনায় অশোকতরু পরিবেশিত ১২খানি গান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অশোকবাবু আমাদের বহু আলোচিত শিল্পী। বিশেষ করে বলা দরকার অনুপ ঘোষালের সম্পর্কে। এই ধরনের একক সঙ্গীতের আসরে অনুপ ঘোষালের গান এই প্রথম শোনা গেল।

স্বল্পকালের মধ্যে শ্রীঘোষাল আপনাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তাঁর প্রাণবন্ত পরিবেশনার দক্ষতায়। রেকর্ডে অথবা প্লে-ব্যাক সঙ্গীতে হাল্কা রসের কৌতুক-গীতি দ্বারাই তিনি পরিচিত। কিন্তু ভাবগভীর রাগাভিত্তিক গানের অনুশীলনেও যে ইনি ব্রতী এবং এ গানকেও ইনি স্ব-নিষ্ঠায় রীতিমত উপভোগ্য করে তোলবার যোগ্যতার অধিকারী তারই পরিচয় পাওয়া গেল সেদিনের গানে। 'সাজিয়াছ যোগী'র ধ্রুপদী গাম্ভীর্য খেয়াল অঙ্গের 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে' তান-তরঙ্গগত রূপ ঠুংরী চালের 'ভোরের হাওয়া এলে' ও গজলে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই'-এর রঙের মাতন যেমন চিত্ততটে স্পর্শ করেছে, তেমনই

আগমনী ভাটিয়ালী ও ঝুমুরের সরস মাধুর্যে সিক্ত করেছে তাঁর 'আর মা উমা রাখব এবার', 'আমার সাম্পান যাত্রী ও ঝুমে, ঝুম ঝুমেরা নাচ'। এ শতরূপ প্রতিভাকে বিকশিত হবার ব্যাপক অবকাশ প্রদানের জন্য উদ্যোক্তাবৃন্দ ধন্যবাদার্হ।

ছুটির নিমন্ত্রণে : কোলকাতা শহরে ব্ল্যাক আউটের যবনিকা নেমেছে ঠিক আগের দিন রাতে। সকলের মন ত্রস্ত, চিন্তিত—যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। তবু আমরা সবাই গেলাম ম্যাকসমুলার ভবনের একটি কক্ষে শ্রীমতী অমলা শঙ্করের নিমন্ত্রণে। এ যেন ছুটির নিমন্ত্রণ। যে নিমন্ত্রণে জীবনের কয়েকটি পলাতক মুহূর্ত চুরি করে তারই মধ্যে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে বাস্তবের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে। সত্যিই ভুলে গেলাম, লড়াই—প্রতি মুহূর্তের উদ্‌গ্রীব কৌতূহল—কি হয় কি হয় ভাব। ভুলিয়ে দিলেন শ্রীমতী শঙ্কর আর তাঁরই হাতে গড়া ভাবী শিল্পীর দল শিশু থেকে সুরু করে কিশোরী অবধি যে দলের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ যেন ছিল শ্রীমতী শঙ্করের একটি নীরব চ্যালেঞ্জ—মুগ্ধকারী শক্তিতে সকলকে সম্মোহিত করবেন। কোনো আলোকোজ্জ্বল মঞ্চ নয়, চোখ-ঝলসানো সজ্জা নয়, অঙ্গরাগের বাহারও নেই শুধুমাত্র অন্তরের স্বতোৎসারিত নৃত্য দিয়ে নৃত্যরসিকের চিত্ত নাড়া দেওয়া। একমাত্র তিনিই পারলেন যিনি চির-বিপ্লবী স্রষ্টা উদয়শঙ্করের সচিব-গৃহিণী-সখী।

দর্শকসারিতে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রী ও শ্রীমতী ডায়াস ও তস্যা জননী, জার্মান ও আমেরিকার কনস্যুলেট জেনারেল, স্বামী স্বরূপানন্দ, শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ ও শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, ইন্দো-জার্মান ও ইন্দো-আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অধিকর্তা তথা রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জগতের দিকপালবৃন্দ।

এ নৃত্য কোনো সুপরিকল্পিত নৃত্যানুষ্ঠান নয়। যে সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও ছন্দচেতনা নিয়ে মানুষ জন্মায়—তারই সহজ সুন্দর প্রকাশ ঘটানো—কোনো ভয়ঙ্করী শাসনে নয়, ক্লান্তিকর জীর্ণপ্রথায় নয়, স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে, আপনাকে প্রকাশের তাগিদে। যেমন করে হাওয়ার আদরে ফুল দুলে ওঠে, বসন্ত সমাগমে পাখীর কণ্ঠে জাগে গান ঠিক তেমনি করে প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন মেতে উঠেছিল ছন্দ ও ভঙ্গীর লীলায়িত সুষমায়—শ্রীমতী শঙ্করের সেই সুবিখ্যাত মধুর হাসির ইসারায় কখনও বা উজ্জ্বল চোখের আশ্বাসে। প্রথমেই শ্রীমতী শঙ্কর জানালেন, 'প্রতিদিন শিক্ষার আগে আমি জানি না আমি কি শেখাবো, এরাও জানে না এরা কি শিখবে। কিন্তু হঠাৎ এক সময় দেখি নাচ সুরু হয়ে গেছে শুধু দেহে নয়, মনেও। আর সে নাচ বেরিয়ে আসছে এদেরই ভেতর থেকে এমন সহজ সাবলীল গতিতে যেন না বেরিয়ে কোনো উপায়ই ছিল না।' আমরাও দেখলাম এই জড় দেহে কেমন করে নেমে আসে ছন্দের চেতনা, যার প্রসাদে এই দেহই হয়ে ওঠে বিদ্যুৎধর্মী।

প্রথমে সামনে এসে দাঁড়ালো শিশুর দল। সঙ্গীতগুরুকে বলা হোলো মাঝে মাঝে তবলায় মাত্রাদ্যোতক টোকা দিতে। আর শিশুদের বললেন তোমরা যে যেমন খুসী নাচ, কোনো ভয় নেই, বাধা নেই—শুধু তবলার বোলের সঙ্গে লয় মিলিয়ে যেন পা পড়ে, আর কেউ কাউকে ছোঁবে না। যার যে মুহূর্তে এ দুটি নিয়মভঙ্গ হবে সে দূরে গিয়ে বসে পড়বে সঙ্গিনীদের নৃত্যে বাধার সৃষ্টি না করে।

দেখলাম শিশুদের হাসি, কাকলী ও খেলাও কেমন সুসংবদ্ধ নাচ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীমতী শঙ্কর দেখালেন শৃঙ্খলা কেমন করে শৃঙ্খলের মত পায়ের বেড়ী হয়ে না উঠে—আনন্দের নূপুর হয়ে বেজে উঠতে পারে।

এরপর এল বড়দের পালা। সংগীত পরিচালককে ৮ মাত্রার একটি সংগীত বাজাতে বলা হোলো। আর নৃত্যোৎসুক শিক্ষার্থীরা? তাঁদের বলা হোলো ঐ সুরেরই ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে ইচ্ছে মত নৃত্য সৃষ্টি করতে তালভঙ্গ না করে। প্রথমে একসঙ্গে। মনে হোলো, যেন গতির নানান ঢেউ, আঁকাবাঁকা, ছোটবড় আপন সীমাকে অতিক্রম করার প্রয়াসে ব্যাকুল, চঞ্চল।

তারপর এক-একজনকে ভিন্নভাবে নৃত্য-রচনা করতে বলা হোলো ঐ ভাবের সঙ্গেই ছন্দ মিলিয়ে। দেখা গেল নানা রং ও গন্ধের বিভিন্ন ফুলের মতই এক-একজন নৃত্যরতা এক-একটি ভঙ্গী ও ভাবে নৃত্য রচনা করলেন। প্রত্যেকটিই সুন্দর, সুষমায় মধুর। বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এ-নৃত্যে প্রতিফলিত। তাঁদের আত্মবিশ্বাসও। প্রত্যেকের নাচ পরের পর সাজানো গেলে নিঃসন্দেহে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নৃত্যকাহিনী হয়ে উঠত।

এই হোলো শঙ্করের নৃত্য এই তাঁর পদ্ধতি। আর এই পদ্ধতিকে সযত্নে লালন করে ভাবীকালের সত্যিকার নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলছেন স্বয়ং অমলাশঙ্কর।

এরপর দেখলাম গুরু রাঘবনের কথাকলি নৃত্যের দু-একটি টুকরো, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও গুরুজীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও মুদ্রায় আজন্মকালের সাধনার স্বাক্ষর মুদ্রিত।

মমতাশঙ্করের বর্ণম (ভারত নাট্যম) পলকহীন চোখে দেখার মতো।

পরিশেষে এবং সকলের বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী শঙ্কর দেখালেন 'কৃষ্ণনিবেদন' —ভারতনাট্যম অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ভক্তি বাৎসল্যে ও আত্মনিবেদনে অপরূপ সে উদ্ভাস।

—চিত্রাঙ্গদা
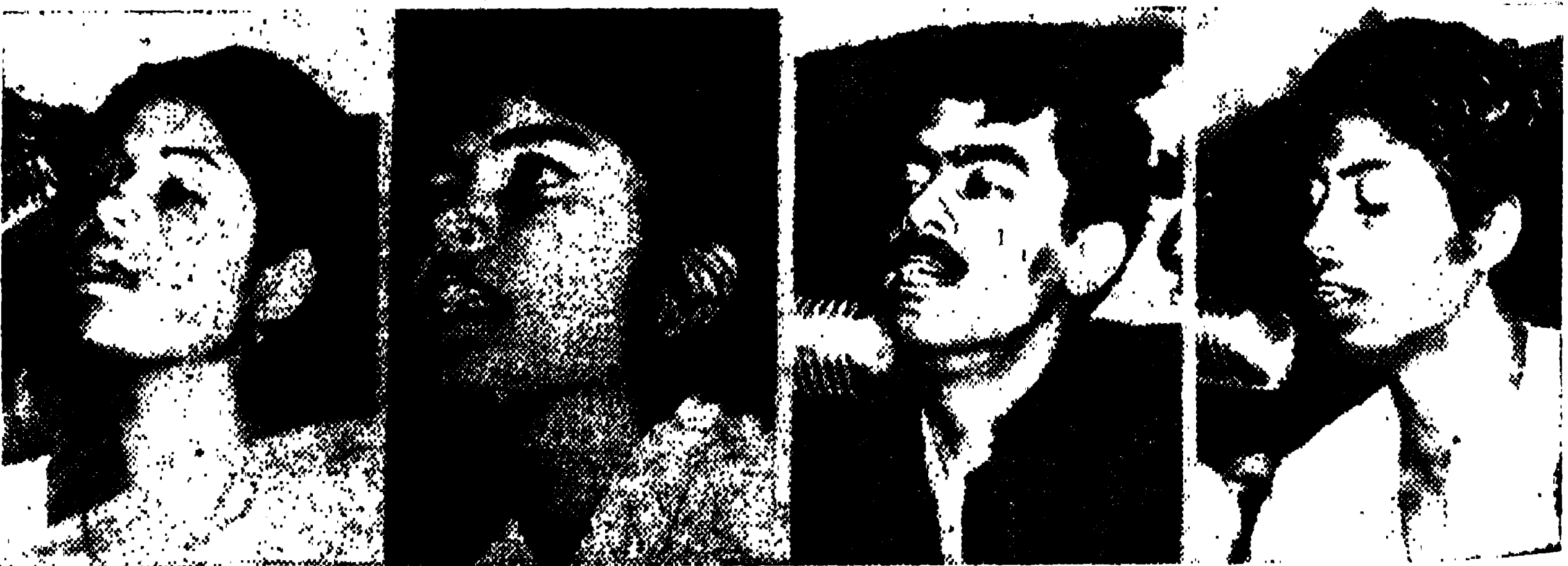
বাংলাদেশের শরণার্থিদের সাহায্যকল্পে প্রিয়া সিনেমার [illegible] উদ্যোগে বঙ্গবধূ শিল্পীগোষ্ঠীর নিবেদিত সংগীতানুষ্ঠানে রূপা খান, স্বপ্না রায়, অপেল মাহমুদ ও আব্দুল [illegible] —ফটো : অমৃত

রোহন কানহাই

অস্ট্রেলিয়া বনাম বিশ্ব একাদশ

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

পার্থে অস্ট্রেলিয়া বনাম বিশ্ব একাদশ দলের বে-সরকারী দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১ রানে জয়ী হয়েছে। এই দুই দলের প্রথম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিত ছিল। দ্বিতীয় টেস্টের বরাদ্দ পাঁচদিনের খেলাটি তৃতীয় দিনেই শেষ হয়ে যায় তাও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গড়ায়নি। হিসাবে দেখা গেল আড়াই দিনের খেলা মাঠে মারা গেছে। অস্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভের মূলে ছিল দুই ফাস্ট বোলার লিলি এবং ম্যাকেঞ্জির বোলিং। এঁরা দুজনে বিশ্ব একাদশের ২০টি উইকেটের মধ্যে ১৭টা উইকেট পেয়েছেন—লিলি ১২টা উইকেট ৯২ রানে এবং ম্যাকেঞ্জি ৫টা উইকেট ৭৮ রানে। ডেনিস লিলির মারাত্মক বোলিংয়ে বিশ্ব একাদশ দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৫৯ রানে শেষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আয়ান চ্যাপেল টস জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৪৯ রানের মাথায় শেষ হয়। ডগ ওয়াল্টার্স সেঞ্চুরী করেন। তাঁর ১২৫ রানে ছিল ১৩টা বাউন্ডারী। তিনি তাঁর ২০৯ মিনিটের খেলায় দুবার—৪৬ এবং ৫১ রানের মাথায় আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান। তাঁর পরই স্ট্যাকপোলের ৫৫ রান এবং অধিনায়ক চ্যাপেলের ৫৬ রান উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব একাদশ দলের ফিল্ডিংয়ের গলতিতেই অস্ট্রেলিয়ার এই ৩৪৯ রান উঠেছিল। সে নাহলে আরও কম রান হত।

দ্বিতীয় দিনে মাত্র ১৪-১ ওভারের খেলায় বিশ্ব একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৫৯ রানের মাথায় শেষ হয়। তাদের প্রথম ইনিংস মাত্র ৯০ মিনিট স্থায়ী ছিল।

খেলাধুলা

দর্শক

ডেনিস লিলি ২৯ রানে ৮টা উইকেট নিয়ে বিশ্ব একাদশ দলের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেন। এক সময় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল— কোন রান না দিয়ে ১৪টা বলে ৬টা উইকেট—কি মারাত্মক বোলিং!

বিশ্ব একাদশ দল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৪৯ রানের থেকে ২৯০ রানের পিছনে পড়ে ফলো-অন করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাও ভাল হয়নি, মাত্র ১ রানের মাথায় ১ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রোহন কানহাই পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে সেঞ্চুরী (১১৮ রান) করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বিশ্ব একাদশ দলের ২য় ইনিংসের ৫টা উইকেট পড়ে ২১৭ রান দাঁড়ায়। ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পেতে তখনও তাদের ৭৩ রানের প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয় দিনে বিশ্ব একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৯ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১ রানে জিতে যায়। এইদিন বিশ্ব একাদশ দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের বাকি ৫ উইকেটে পূর্ব দিনের ২১৭ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৬২ রান যোগ করেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার লিলি এবং ম্যাকেঞ্জী চারটে করে উইকেট পান—লিলি ৬৩ রানে ৪ উইকেট এবং ম্যাকেঞ্জী ৬৬ রানে ৪ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই দ্বিতীয় টেস্টে বিশ্ব একাদশের পক্ষে এই তিনজন ভারতীয় ক্রিকেটার খেলেছিলেন—গাভাস্কার, ইঞ্জিনীয়ার এবং বেদী। গাভাস্কার যথাক্রমে ০ ও ২১ রান করেছিলেন। ইঞ্জিনীয়ার করেছিলেন ১৩ ও ৮ রান। বেদী ২৫ রান দিয়ে ১টা উইকেট পেয়েছিলেন। উইকেট-কিপার ইঞ্জিনীয়ার ক্যাচ নিয়েছিলেন দুটো।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া: ৩৪৯ রান (স্ট্যাকপোল ৫৫, চ্যাপেল ৫৬ এবং ওয়াল্টার্স ১২৫ রান। গ্রেগ ৯৪ রানে ৪, কুনিস ৮৩ রানে ২ এবং সোবার্স ৬৯ রানে ২ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ: ৫৯ রান আব্বাস ১৪ এবং লয়েড ১৭ রান। লিলি ২৯ রানে ৮ উইকেট)

ও ২৭৯ রান (কানহাই ১১৮ এবং আব্বাস ৫১ রান। লিলি ৬৩ রানে ৪ এবং ম্যাকেঞ্জী ৬৬ রানে ৪ উইকেট)

ডগ ওয়াল্টার্স

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানশীপ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় চারটি 'চ্যাম্পিয়ানশিপ' খেতাবই জয় করেছে বিদ্যাসাগর কলেজ—ছাত্র ও ছাত্রীদের দলগত খেতাব এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের ব্যক্তিগত খেতাব।

প্রতিযোগিতায় যে ৮টি নতুন রেকর্ড হয়েছে তার সাতটি রেকর্ড করেছে বিদ্যাসাগর কলেজ। বিদ্যাসাগর কলেজ সান্ধ্য বিভাগের মনোরঞ্জন পোরেল ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর কলেজেরই ছাত্রী শ্রীরূপা চ্যাটার্জি ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে শীর্ষস্থান লাভ করেন এবং ১০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করেন। শেষ পর্যন্ত মনোরঞ্জন পোরেল ছাত্র বিভাগে এবং শ্রীরূপা চ্যাটার্জি ছাত্রী বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ পান।

চ্যাম্পিয়ানশিপ খেতাব

দলগত

ছাত্র বিভাগ: বিদ্যাসাগর (ইভনিং)—৬৬ পয়েন্ট

ছাত্রী বিভাগ: বিদ্যাসাগর—৫৩ পয়েন্ট

ব্যক্তিগত

ছাত্র বিভাগ: মনোরঞ্জন পোরেল (বিদ্যাসাগর) ১৫ পয়েন্ট

ছাত্রী বিভাগ: কুমারী শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর), ১৫ পয়েন্ট

নতুন রেকর্ড

ছাত্র বিভাগ

হাইজাম্প: তাপস পাল (বিদ্যাসাগর সান্ধ্য) উচ্চতা: ১-৮১ মিটার

জ্যাভেলিন: দেবীপ্রসাদ ঘোষ (বিদ্যাসাগর সান্ধ্য) দূরত্ব: ৫৯-৭০ মিটার

১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের আসর বসবে বিভিন্ন স্টেডিয়ামে। নীচের সুদৃশ্য স্টেডিয়ামে হবে সাইকেল প্রতিযোগিতা। স্টেডিয়ামের ছাদটি বিশেষ রাসায়নিক উপাদানে তৈরী—স্বচ্ছ এবং মজবুত।
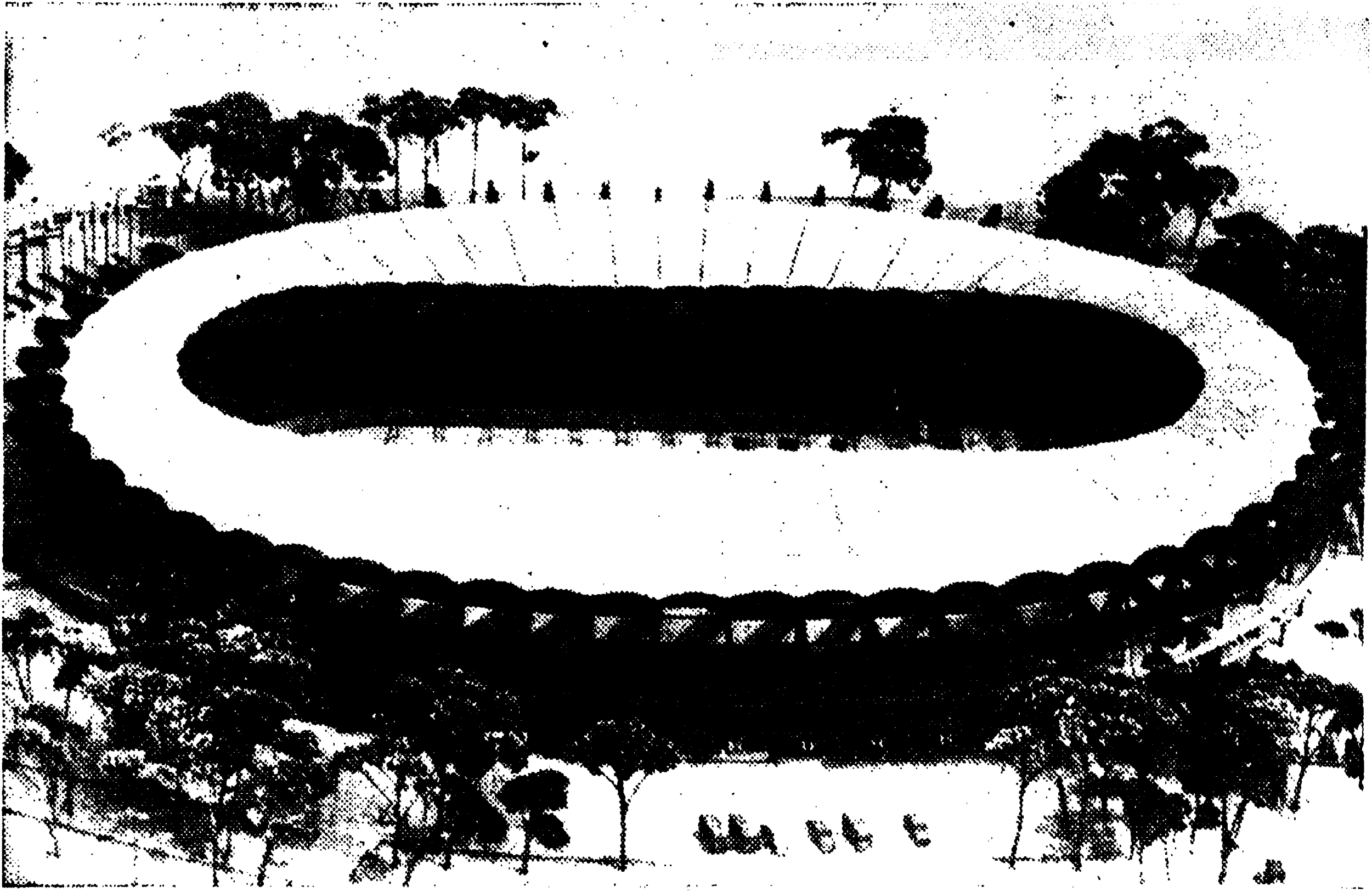
২০০ মিটার: মনোরঞ্জন পোরেল (বিদ্যাসাগর সান্ধ্য) সময়: ২২ সেকেন্ড

৪০০ মিটার: মনোরঞ্জন পোরেল (বিদ্যাসাগর সান্ধ্য) সময়: ৪৯-৩ সেকেন্ড

১,৫০০ **মিটার:** নির্মল সাঁতরা (গড়্ড়দাস) **সময়:** ৪ মি: ১১-৮ সে:

৪×১০০ **রীলে:** বিদ্যাসাগর ইভনিং **সময় : ৪৪-২ সে:**

ছাত্রী বিভাগ

হাইজাম্প : ছবি হাজরা (বিদ্যাসাগর) উচ্চতা: ১-৩৬ মিটার

১০০ মিটার: শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর) সময়: ১২-৬ সেকেন্ড

ডেভিস কাপ

১৯৭২ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস **কাপ** লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চল **খেলার তালিকা:**

'এ' বিভাগ : জাপান (বাই), তাইওয়ান বনাম দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া (বাই)।

'বি' বিভাগ: মালয়েশিয়া বনাম পাকিস্তান, ভারতবর্ষ বনাম সিংহল।

ক্রীড়ানুষ্ঠান স্থগিত

পাকিস্থানের ভারত আক্রমণের ফলে সারা ভারতে যে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ক্রীড়ানুষ্ঠানই স্থগিত রাখতে হয়েছে। যেমন ডুরান্ড কাপ এবং সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা, জাতীয় এবং আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন এবং টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা, অল ইন্ডিয়া ওপন অ্যাথলেটিকস, ইন্টার স্টেট অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা, ইস্ট ইন্ডিয়া গলফ চ্যাম্পিয়ানসীপ, জাতীয় কবাডি, প্রথম এশিয়ান অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসীপ ইত্যাদি।

সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড

অস্ট্রেলিয়ার স্কুল-ছাত্রী কুমারী সেন গোল্ড সম্প্রতি ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতার ১৭ মি: ০-৬ সেকেন্ডে শেষ করে মেয়েদের পক্ষে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে তিনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার এবং ৮০০ মিটার সাঁতারে যে বিশ্ব রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ১৫ বছরের কুমারী সেন গোল্ড আন্তর্জাতিক সাঁতারে আজ এক পরম বিস্ময়—ফ্রি স্টাইল সাঁতারের পাঁচটি বিষয়ে তিনি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১.০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday 24th December, 1971 শুক্রবার, ৮ই পৌষ, ১৩৭৮ 52 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাশ

এক নজরে

ছিল শাল, হ'ল মুল : বাংলাভাষায় যে একটি প্রবাদ আছে—'ছিল শাল, হ'ল মুল, দেখতে দেখতে নির্মূল', পাকিস্তান সম্বন্ধে তা মর্মান্তিকভাবে সত্য হ'তে চলেছে। ভারত উপ-মহাদেশের মুশ্লিম 'জাতি'র জন্য কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না যে স্বতন্ত্র মুশ্লিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের পরিকল্পনা করেন, তাতে পশ্চিমে কাশ্মীর, সম্পূর্ণ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এবং পূর্বে সম্পূর্ণ বাংলা এবং আসাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য অবশিষ্ট ভারতের উপর দিয়ে করিডরেরও দাবি জানিয়েছিলেন কায়েদে আজম। কিন্তু শেষপর্যন্ত, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের মধ্য-রাত্রে যে-পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল তাতে কাশ্মীর বাদ গেল, বাদ গেল পাঞ্জাব ও বাংলার অর্ধাংশ, আর করিডরের ত কোন প্রশ্নই রইল না। 'পোকায় খাওয়া' পাকিস্তান পেয়ে ক্রুদ্ধ দিশাহারা জিন্না গায়ের জোরে কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করলেন, আক্রান্ত কাশ্মীর তৎক্ষণাৎ ভারতে যোগ দিলে ভারতীয় জওয়ানদের বিক্রমে পাক-হানাদাররা পিছু হঠতে বাধ্য হ'ল। কাশ্মীরের কিছুটা পাক দখলে থেকে গেলেও শ্রীনগর ও কাশ্মীরের বৃহদংশ চিরকালের জন্য পাক-হানাদারদের দখলের বাইরে চলে গেল।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশরূপে নবজন্ম লাভের পর পাকিস্তানের যা অবশিষ্ট রইল তা বোধহয় পাকিস্তানের স্রষ্টারা কোনদিন দুঃস্বপ্নেও প্রত্যক্ষ করেননি। ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫২৯ বর্গমাইল আয়তন নিয়ে সৃষ্ট পাকিস্তানের আয়তন এখন পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল কমে গেল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, যে-পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের মুশ্লিমদের স্বতন্ত্র বাসভূমির ধুয়া তুলে, সেই পাকিস্তানের মুশ্লিম অধি-বাসীর সংখ্যা (৪ কোটি ২৮ লক্ষ) এখন ভারতের মুশ্লিম নাগরিকদের সংখ্যার (৫ কোটি ৩০ লক্ষ) চেয়ে কমে গেছে। অবশ্য পাকিস্তান এখন থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি মুশ্লিম রাষ্ট্র হবে। কারণ আগে যেখানে পাকিস্তানে মুশ্লিমের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ, বাংলাদেশ বেরিয়ে যাওয়ার পর ঐ আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৯৭ শতাংশ। অধিক শিক্ষা ও অগ্রগতির দাবিদার ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, যে কারণে সে-রাষ্ট্রের সব সরকারি পদের সিংহভাগ তারা দখলে রাখত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হওয়ার পর পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার প্রায় ১৬ শতাংশ থেকে কমে ১৩ শতাংশ হয়ে যাবে। আমদানি ৪৮৭ কোটি টাকা থেকে কমে ৩০৫ কোটি টাকার মতো হবে, কারণ আমদানি যা হ'ত তা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেদের ভোগের জনাই হ'ত। কিন্তু যার বিনিময়ে ঐ আমদানি সম্ভব হ'ত, সেই রপ্তানির পরিমাণ ৩৩১ কোটি থেকে হ্রাস পেয়ে ১৭৬ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। কারণ রপ্তানির প্রধান পণ্যগুলিই যোগাতো পূর্ববঙ্গ। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে এই বিপুল ব্যবধানের পরিণতি সহজেই অনুমেয়। স্বীয় দুষ্কৃতির ফলে পাকিস্তান শুধু খণ্ডিতই হ'ল না, দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতেও তার বিশেষ সময় লাগবে না।

মহার্ঘ গণতন্ত্র : বর্তমান অবমূল্যনের যুগে সবকিছুর মতো গণতন্ত্রের মূল্যও এমন দুর্নিবার গতিতে বেড়ে চলেছে যে, যাদের জন্য গণতান্ত্রিক শাসন, সেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সংযোগ রক্ষা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্রের মূল নীতি অনুসারে একজন অজ্ঞাত অখ্যাত দীনাতিদীন ব্যক্তি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকারী হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে বিত্তশালী ব্যক্তিরা বা তাদের কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবানরা ছাড়া আর কেউই জনপ্রতিনিধি হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারেন না। এই বছর মার্চ মাসে লোকসভার যে নির্বাচন হয়ে গেল, তার আয়োজন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৫ কোটি টাকা, যেটা চার বছর আগে অনুষ্ঠিত লোকসভার পূর্বের নির্বাচনে ব্যয়ের তুলনায় দু'গুণ। এ ত' শুধু সরকারের অর্থব্যয়, এর সঙ্গে প্রার্থীদের ব্যয়ের হিসাব ধরলে—যে হিসাব ঠিকমতো কোনদিনই জানা যাবে না—লোকসভার পঞ্চম নিবাচনে ব্যয়ের অঙ্ক ত্রিশ কোটি অতিক্রম করে যাবে। লোকসভার নির্বাচনে একজন প্রার্থী আগের আইনানুসারে সর্বাধিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় তার চেয়ে অনেক বেশি হ'ত বলে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে ঐ ব্যয়ের সর্বোচ্চ অঙ্ক বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার করা হয়। কিন্তু পঁয়ত্রিশ হাজারও যে প্রকৃত ব্যয়ের ভগ্নাংশ মাত্র, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই অজানা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে ১৯৬৮ সালে নিক্সন দু' কোটি নব্বুই লক্ষ ডলার, অর্থাৎ প্রায় বাইশ কোটি টাকা ব্যয় করেন। সামনের বছরের নির্বাচনে প্রচারের জন্য তিনি পাঁচ কোটি ডলার, অর্থাৎ সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা নিয়েছেন। ১৯৬৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হয় ৩০ কোটি ডলার, অর্থাৎ ২২৫ কোটি টাকা। সামনের নির্বাচনে এই ব্যয়ও যে প্রায় দ্বিগুণিত হবে তা বলই বাহুল্য।

গ্রহান্তরের সংবাদ : যুদ্ধের ডামাডোলে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠক মহলে বোধহয় বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। তা হ'ল মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর মানুষের অভিযান-সাফল্য। চাঁদে মানুষের পদচিহ্ন পড়া বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সাফল্য হলেও ঐ জলহীন বায়ুহীন মৃত গ্রহটি জনভারে পিষ্ট এই পৃথিবীর ভার লাঘবের কাজে কোনদিনই সহায়ক হবে না। শুধু ঐ আড়াই লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহটিতে মানুষের নিরাপদ অবতরণ ও প্রত্যাবর্তনে একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে যে, অন্যান্য গ্রহেও একইভাবে যাওয়া ও ফিরে আসা একদিন সম্ভব হবে। সেই সম্ভাবনার সুনিশ্চিত বার্তা বহন ক'রে এনেছে মার্কিন অভিযাত্রী উপগ্রহ ম্যারিনার—৯ এবং সোভিয়েট উপগ্রহ মার্স—২ ও মার্স—৩।

রহস্যময় রক্তিম মঙ্গল উপগ্রহ পৃথিবীর মতোই প্রাণের অনুকূল আবহাওয়ায় মণ্ডিত এমন একটা অনুমান গ্রহবিজ্ঞানীরা বরাবরই ক'রে এসেছেন তার গায়ে খালের মতো দীর্ঘ রেখা দেখে ও সূর্য থেকে তার দূরত্ব বিবেচনা ক'রে। ম্যারিনার ও মার্স উপগ্রহগুলি থেকে প্রেরিত আলোকচিত্রগুলি থেকে বিজ্ঞানীদের সেই অনুমানই সত্য ব'লে মনে হচ্ছে। ছয় মাসের পথ অতিক্রম করে ম্যারিনার—৯ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে পেঁছায় এবং ঐ গ্রহ বেষ্টন করে পরি-ক্রমার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ছবি পাঠাতে থাকে। তারপর সোভিয়েট উপগ্রহ মার্স—২ পেঁছায় ২৭শে নভেম্বর এবং মার্স—৩ তার এক সপ্তাহ পরে। তারাও একইভাবে পৃথিবীতে ছবি পাঠাতে আরম্ভ করেছে। সেই সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, মার্স—২ তার একটি অংশকে মঙ্গল গ্রহের বুকে ধীরে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে নামিয়ে দিতে সমর্থ হয়। চাঁদে ঐ ধীর অব-তরণ সফল হওয়ার পরেই চাঁদে মানুষ নামানোর বিষয়ে বিজ্ঞানীরা সুনিশ্চিত হ'তে পারেন।

সোভিয়েট ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা এখন মঙ্গল গ্রহ থেকে লব্ধ চিত্রাবলী ও অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, পৃথিবীর মতোই বালির পাহাড়, গুহা ও হিমপ্রপাতের মতো কিছুর সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। আর হিম-প্রপাত যদি থাকে সেখানে, তবে পৃথিবীর প্রাণীকুলের জীবন-ধারণের উপযোগী আবহাওয়াও সেখানে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

নতুন ইতিহাস

মাত্র চোদ্দটি দিন। এই চোদ্দদিনের যুদ্ধে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক নতুন নজীর সংযোজিত হল। ঢাকায় লেঃ জেনারেল নিয়াজী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করার কিছু পরেই ভারতবর্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে একতরফা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ঘোষণা করেছিল, তা যথাযথভাবে মেনে নেওয়ায় পশ্চিম সীমান্তের অস্ত্রের ঝনঝনিও স্তব্ধ হয়েছে। নতুন রাষ্ট্র 'বাংলা দেশ' স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হল। অনেক রক্ত অনেক অশ্রুর বিনিময়ে স্বাধীন বাংলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গৃহপ্রবেশ ঘটল। এ সবই নতুন ইতিহাস।

ইতিহাসে নজীর নেই মাত্র চব্বিশ বছরের আয়ুর মধ্যে পাকিস্তানের আকারের একটি রাষ্ট্রের এভাবে ভেঙে পড়ার। কোনো সাম্রাজ্যও এভাবে ভাঙেনি। এই সব ভাঙাগড়ার ব্যাপার অতি দ্রুততালে ঘটে গেল।

ভারত অনুন্নত দেশ, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার ভারে জর্জরিত, তাই তাকে চাপ দিয়ে যা খুসী করানো চলবে, বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ধারণার অবসান ঘটল। এই সর্বপ্রথম ভারত এক প্রবল শক্তির চোখরাঙানিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। বর্তমান সংকটের কালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে অতুলনীয় দৃঢ়তা ও আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। লোকসভার অধিবেশনে জনৈক সদস্য তাঁকে জোয়ান অব আর্কের সঙ্গে তুলনা করে বাহুল্য প্রকাশ করেননি। ভারতবর্ষের এই অবদান আত্মস্বার্থের প্রয়োজনে নয়, বাংলাদেশের উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত অসহায় মানুষগুলির সংকটত্রাণেই ভারতকে এই ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই সূত্রে প্রেসিডেন্ট নিকসনকে লিখিত শ্রীমতী গান্ধীর চিঠিখানির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এমন লিপিকুশলতা, বলিষ্ঠ বক্তব্যের এই জাতীয় সমাবেশ ইদানীং কালে দেখা যায়নি। আবেগহীন ও বাহুল্যবর্জিত ভাষায় লিখিত এই পত্রে শ্রীমতী গান্ধী ভারতের জনগণের মনোভংগী দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একদা রোগশয্যা থেকে শ্রীমতী রাথবোনকে যে পত্র লিখেছিলেন, এই চিঠিখানির সাহিত্যিক-মূল্য সেই পত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

শ্রীমতী গান্ধী এইবারকার যুদ্ধের ব্যাপারে যেসব ভাষণ ও বিবৃতি দিয়েছেন, তার মধ্যেও সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ যে অতঃপর এক নয়া পররাষ্ট্রনীতি অনুসারে চলবে তার আভাষ পাওয়া গেছে। সে নীতি 'আসিবে কি, ফিরিবে কি'-র দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ নয়। সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইঙ্গিত আছে ভারতের নতুন নীতিতে। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লীকে আরও অনেক নতুন নীতির কথা চিন্তা করতে হবে এবং আত্মতুষ্টির মনোভাবকে সর্বদা পরিহার করতে হবে। ভারতবর্ষের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এশিয়া খণ্ডে রয়েছে তাকে সার্থক করে তুলতে হবে। সীমান্তের যুদ্ধবিরতির পরও অতন্দ্র প্রহরীকে সদা সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্বজগৎ একটি কথা বিশেষভাবে জানতে পারল যে 'সেনটো, সিয়াটো'র সামরিক চুক্তি নিরর্থক। সুপার-পাওয়ার বা বৃহৎ শক্তি নানাভাবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি রাষ্ট্রগুলিকে আপন পক্ষপুটে রাখার চেষ্টা করে নিজের স্বার্থ পূরণের প্রয়োজনে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর কলাকৌশল, উষ্ণ লড়াই-এর চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম এবং মর্মভেদী, এইবারকার যুদ্ধে তাও সুস্পষ্ট হল। নিকসন মনে করেছিলেন, পিকিং-এর সঙ্গে আসন্ন আলাপ-আলোচনায় একটা বিরাট দাঁও কষতে পারবেন এবং ঘরে-বাইরে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েত রাশিয়া কিন্তু অতি সামান্য চেষ্টাতেই ৬৫ কোটি ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা অর্জন করলেন। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে দাঁড় করিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন শুভেচ্ছার জলাধারে যেটুকু শুভেচ্ছা সঞ্চিত ছিল তা নিঃশেষিত করে দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কারণ ইতিহাস সব রকম পরিবর্তনের বিনিময়ে যে মূল্য দাবী করে তার পরিমাণ কম নয়। এই চোদ্দদিনের যুদ্ধে প্রমাণিত হল ঔদ্ধত্য এবং পৈশাচিকতার উন্মাদ নীতি কখনই সফল হয় না। আজ তাই জঙ্গীশাহীর রথচক্র গ্রাসিল মেদিনী। আন্তর্জাতিক চক্রান্তও বিফল। জয় ভারতের, জয় নবজাতকের। নব অরুণোদয় জয় হোক।

১৮-১২-১৯৭১

পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের চোখের সামনে, পশ্চিম বাংলার একেবারে ঘরের পাশে যে ইতিহাস তৈরী হল তার দূরপ্রসারী প্রভাব আমাদের রাজনীতির ওপর পড়বেই। এত বড় একটা ঘটনা আমাদের এত কাছে ঘটে গেল বলেই হয়ত তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখনই আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারছি না, তবু কিছু কিছু আগাম আভাস পাওয়া একেবারেই অসম্ভব, এ-কথা বলি কী করে?

স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব আর কিছু না-পারুক, অন্ততঃ এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাকাপাকি কবর তৈরী করতে পারে, এ-দাবীকে মোটেই অতিরঞ্জিত বলা চলে না। ঐ দুষ্ট রাজনীতিকে কবর দিতে প্রভূত রক্তপাত হল ঠিকই, কিন্তু সেই রক্তপাত বৃথা গেল না। কে জানে, এই রক্তপাত হয়ত দরকারও ছিল। দুই বাংলাই দেশ ভাগের আগে ও পরে সেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সাক্ষী। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে আজ কতোটাই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল পাকিস্তানের (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান) চেয়ে বেশী। ভাবলে এখন নিশ্চয়ই হাসি পাবে যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে পৃথক একটি 'হোমল্যান্ড' দেওয়ার জন্যেই পাকিস্তান তৈরী হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের আশীর্বাদে। পূর্ব বাংলার মানুষ কঠিন মূল্য দিয়ে বুঝলেন যে, ধর্মের বাঁধন বড়ই ঠুনকো, অনেক বেশী জরুরী অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণের প্রশ্ন। তাই যা ছিল ঐশ্লামিক পূর্ব পাকিস্তান তার কবরের ওপর তৈরী হল ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের ভিত। আর এই বাংলাদেশের জন্মলগ্নে আরও একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ল। আমরা দেখলাম, মুক্তিবাহিনী যার অধিকাংশ সদস্যই মুসলমান এবং ভারতীয় বাহিনী, যাঁদের অধিকাংশই হিন্দু, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করলেন। এই উপমহাদেশের গত প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক হানাহানির কলঙ্কময় ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এই ঘটনার তাৎপর্যকে মোটেই কম করে দেখতে পারেন না। কারণ, এই ঘটনার পর এদেশে নিছক ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

এটা সকলেই জানেন যে, গত কিছুকালের মধ্যে এদেশে মুশ্লিম লীগ বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। যে-সব দল ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নামে শপথ করে তারাও নিতান্ত আশু রাজনৈতিক মুনাফার জন্যে মুশ্লিম লীগের সংগে আঁতাতবন্ধ পর্যন্ত হয়েছে। কেরলে এবং পশ্চিম বাংলায় মুশ্লিম লীগের প্রতিনিধিরা মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন। পশ্চিম বাংলায় এবং দেশের আরও কয়েকটি জায়গায় মুশ্লিম লীগের নামটির সংগে জড়িত অনেক তিক্ত স্মৃতি। সেই কারণেই বোধ হয় পশ্চিম বাংলায় 'প্রোগ্রেসিভ' মুশ্লিম লীগ নামে একটি দলের পত্তন হয়। কিন্তু সর্বভারতীয় মুশ্লিম লীগ যখন পক্ষ বিস্তার করতে শুরু করে তখন এই দল তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং 'প্রোগ্রেসিভ' বিশেষণটিও ত্যাগ করে। কিন্তু আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর এদেশেও শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের রক্তাক্ত উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ধর্মের বাঁধনের চেয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবীদাওয়ার ভিত্তিতেই অনেক স্থায়ী ঐক্য গড়ে ওঠে।

মুশ্লিম লীগের চারিত্রের এই পরিবর্তন হয়ত পশ্চিম বাংলাতেই সবচেয়ে আগে দেখা দেওয়া উচিত, কারণ বাংলাদেশের যে-কোন ঘটনার আঘাত প্রথমে পশ্চিম বাংলার ওপর পড়াই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তন পশ্চিম বাংলায় প্রথম ঘটার পক্ষে একটা সুবিধেও আছে। আগে বলেছি, মুশ্লিম লীগ নামটার সংগে এই রাজ্যের অনেক তিক্ত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তবু কিন্তু এই রাজ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কোন দিনই রাজনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধে করে উঠতে পারে নি। যে-রাজ্যে বার বার সাম্প্রদায়িক হানাহানি হয়ে গেছে, সে-রাজ্যের মানুষের পক্ষে এটা মোটেই কম কৃতিত্বের কথা নয়।

•

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এবং সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের নানা প্রতিক্রিয়ার আরও কয়েকটির কথা আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি। প্রধান ফল অবশ্যই এদেশের অবিসম্বাদিত নেত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর, ক্যালেন্ডার-এর হিসেবে মাত্র ছ' বছর। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বশক্তির বিকর্তনের বিচার শুধু দিন-মাস-বছরের হিসেবে সম্ভব নয়। আরও যেটা আশ্চর্য মনে হয়, দলনেত্রী এবং সরকারের প্রধান হিসেবে তিনি নিজেকে প্রথম 'অ্যাসার্ট' করতে শুরু করেন মাত্র ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে। তিনি দলের বৃদ্ধ নেতাদের হাতের পুতুল হতে অস্বীকার করেন বলেই কংগ্রেসের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তিনি যে ঠিক পথে চলেছিলেন তার জন্যে এই বছরের লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলের চেয়ে বড় প্রমাণ আর দরকার নেই। এই অভাবিত সাফল্যের পর কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীর আসন পাকা হয়ে যায়। কিন্তু তখনও তিনি প্রধানত একটি দলের নেত্রী ছিলেন, এ-কথা বললে অন্যায় হয় না। আর এখন, এই ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের পর তিনি যে গোটা জাতির নেত্রীর আসনে অভিষিক্ত হলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে-ভাবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে তিনি প্রতিটি পদে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে তাঁর স্টেটসম্যানশিপ সম্বন্ধে আজ আর কোন প্রশ্ন নেই। লোকসভায় তাঁর সম্বন্ধে বলা হল, 'দেশে এখন একটি মাত্র দল এবং দলের নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী।' পণ্ডিত নেহরুও তাঁর জীবদ্দশায় এত বড় স্তুতি বিপক্ষের নেতাদের কাছ থেকে পান নি।

শ্রীমতী গান্ধী যে-জন্যে আজ যথার্থ দলনেত্রী হয়ে উঠলেন তা হল, দেশবাসীকে তিনি একটা হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিলেন। ভারত কিছুই পারে না এবং সর্বত্রই মার খায়, এই ধরনের একটা মনোভাব এদেশে গড়ে উঠেছিল। সেই মনোভাব চরমে পৌঁছয় ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণের মুখে আমাদের বিপর্যয়ের পর। যদিও চীনের তুলনায় ভারত এমন কিছু ছোট দেশ নয়, তবু ভারতের ঐ সামরিক বিপর্যয় শুধু বাইরের দুনিয়ার কাছে নয়, দেশবাসীর মধ্যেও ভারতের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট হতাশার সৃষ্টি করে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানী আক্রমণের সময় ভারত অবশ্য তিন বছর আগের তুলনায় অনেক ভালভাবে লড়াই করে তবু ঐ লড়াই শেষ পর্যন্ত এক রকম অচলাবস্থাতেই শেষ হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের এই ১৪ দিনের লড়াই নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত করল জলে-স্থলে-আকাশে ভারতীয় বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই সংগে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা পাকিস্তান যে শুধু তার হঠকারিতার যোগ্য জবাব পেল তাই নয় এর দ্বারা এশিয়ায় একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও সুনিশ্চিত হল।

তা ছাড়া, এই লড়াইয়ের ফলে আরও দুটো বড় ব্যাপার ঘটে গেল। ভারতের তুলনায় আয়তন ও লোকসংখ্যায় পাকিস্তান (এমন কি, সংযুক্ত পাকিস্তানও) যদিও অনেক ছোট দেশ, তবু গত ২৪ বছরে কয়েকটি বিদেশী শক্তির মদৎ পেয়ে তার হম্বি-তম্বি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, দুটি দেশের গুরুত্ব যেন এক, এমন একটা ভুল ধারণা প্রশ্রয় পাচ্ছিল। কিন্তু এই লড়াইয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার পূর্ণ বিপর্যয় এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর ভারত তার নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারল। এর ফলে যে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্যটাই পাল্টে গেল, তার প্রভাব দূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

এই লড়াইয়ের সময় শ্রীমতী গান্ধী দ্বিতীয় যে-জিনিসটি সাধিত করলেন তা হল, তথাকথিত কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের ধাপ্পাকে তিনি দিনের আলোয় প্রকাশ করে দিলেন। সমাজতান্ত্রিক চীন এবং গণতান্ত্রিক আমেরিকার আদর্শের বুলি যে নিতান্তই ফাঁকা তা তো ধরা পড়ে গেলই। তার চেয়েও

স্বাধীন বাঙলাদেশ

[illegible] এই সব 'সুপার পাওয়ার' যে [illegible] কিছু না মুখোমুখি দিয়ে অপেক্ষাকৃত [illegible] দেশকে সব সময়েই কাবু করে ফেলতে পারে, এটাও যে নিছকই একটা ধাপ্পা সেটাও ধরা পড়ে গেল।

•

এ-যুদ্ধ [illegible] আমাদের দেশের পক্ষে বিরাট [illegible] কিছু একটা, তবে দেখলে বোঝা যাবে যে এর জন্যে আমাদের খুব কম মূল্য দিতে হল না। শুধু টাকার অঙ্কেই মূল্যটা কম দাঁড়ায় না। শরণার্থীদের ত্রাণের কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যায় যে, এ-পর্যন্ত সরকারকে এ-জন্যে ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। তাতেও পুরোপুরি খরচ কুলোবে বলে মনে হয় না, কারণ সব শরণার্থীর বাংলাদেশে ফিরে যেতে এখনও বেশ কিছু দিন সময় লাগবে। তা ছাড়া, লড়াইয়ের জন্যে প্রতিরক্ষা বাবদও বেশ কিছু বাড়তি টাকা খরচ করতে হবে। এই সব খরচের চেয়েও বড় কথা, এর ফলে আমাদের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হতে বাধ্য। সেটা সবচেয়ে আক্ষেপের কথা, ঠিক গত মার্চে যখন কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী সরকার স্থাপনের ফলে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটল, বৈষয়িক ক্ষেত্রে মন্দারও অবসান ঘটতে শুরু করল এবং উন্নয়নের কাজ জোর কদমে শুরু হবে সকলেই আশা করলেন, ঠিক তখনই জেনারেল ইয়াহিয়ার হঠকারিতার ফলে শরণার্থীর স্রোত এসে পড়ল ভারতে। যে ঘটনা পরম্পরায় ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল তার মূলে এই শরণার্থীর স্রোত।

যুদ্ধে জড়িয়ে না-পড়লেও যে খরচের দিক দিয়ে এমন কিছু সুবিধে হত তা নয়। ১৯৬৫ সালে বাইশ দিনের যুদ্ধে ভারতের খরচ হয়েছিল ৫০ কোটি টাকার মতো। এবারের ১৪ দিনের লড়াইয়ে ঠিক কতো খরচ হল, তা এখনও জানা যায় নি। ৫০ কোটি টাকার বেশী খরচ হওয়াও অসম্ভব নয়, কারণ এবার পূর্ব ও পশ্চিম দুই ফ্রন্টেই লড়াই হয়েছে। কিন্তু যদি এই খরচের অঙ্ক ১০০ কোটি টাকাও দাঁড়ায় তবু মনে রাখতে হবে যে, ঐ টাকাটা শরণার্থীদের ত্রাণের জন্যে মাস দেড়েকের খরচের চেয়ে বেশী নয়। শরণার্থীরা যদি এখন দেশে ফেরেন তবে এই খরচটা মোটেই অপব্যয় বলে মনে করা যাবে না।

অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে, শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরও তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করতে হবে এবং সেই সাহায্যের মধ্যে আর্থিক সাহায্যও পড়বে। কিন্তু এক কোটি (অথবা তারও বেশী) শরণার্থীকে আমাদের দেশের মধ্যে পুনর্বাসনের সুযোগ দিতে হলেও বিরাট খরচের বোঝা আমাদের বইতেই হত। আর সেই পুনর্বাসন সুষ্ঠুভাবে না-হলে এদেশে তার নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিত—এবং সবচেয়ে বেশী দেখা দিত পশ্চিম বাংলাতেই। তার তুলনায় স্বদেশে তাদের পুনর্বাসনের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং যুদ্ধ আমাদের ওপর কোন বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং এখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান, স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন পশ্চিম বাংলা তথা গোটা পূর্ব ভারতের রাজনীতিকেই অনেক সুস্থির করে তুলবে। এটা খুবই আশার কথা।

১৮।১২।৭১   —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

তিন প্রধান

মানেকশ

অ্যাডমিরাল নন্দ

এয়ার চীফ মার্শাল পি সি লাল

বৃহস্পতিবার ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় বিকাল ৪টা ৩১ মিনিট। স্থান ঢাকার রেস কোর্স ময়দান। এই সেই ময়দান যেখানে কিছুদিন আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক দিয়ে গেছেন, সেখানেই তখন নূতন ইতিহাস লেখা হচ্ছিল। একটা টেবিলে এসে বসেছেন ভারতীয় বাহিনীর ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল আবদুল্লা খাঁ নিয়াজি। দুই জেনারেল একদা একই সামরিক কলেজে শিক্ষার্থী ছিলেন। আজ তাঁদের একজন বিজয়ী নায়ক, আর একজন পরাভূত সেনাপতি। দুই জেনারেলের সামনে রাখা হল আত্মসমর্পণের দলিল, যাতে লেখা আছেঃ

"পাকিস্তানী ইস্টার্ন কম্যান্ড পূর্বখণ্ডে ভারতীয় জওয়ান ও বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সেনানায়ক লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে বাংলাদেশের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের সম্মতি জানাচ্ছেন।

"যাবতীয় পাকিস্তানী স্থল, আকাশ ও নৌসেনা এবং সমস্ত আধা-সামরিক ও অসামরিক সশস্ত্র বাহিনী এই আত্মসমর্পণের সর্তের অন্তর্ভুক্ত হবে।

"এই বাহিনীগুলি যে যেখানে আছে সেখানেই লেঃ জেনারেলের অধীনস্থ নিকটতম সৈন্যবাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ ও আত্মসমর্পণ করবে।

"আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী ইস্টার্ন কম্যান্ড লেঃ জেনারেল অরোরার হুকুম তামিল করে চলবে..."

বিজেতা ও পরাজিত দুই সেনাপতি ঐ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলেন। তারপর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের রীতি অনুযায়ী বিজয়ী সেনাপতি পরাজিত সেনাপতির ইউনিফর্মের কলার থেকে জেনারেলের ব্যাজ ছিঁড়ে ফেললেন। সারিবদ্ধ পাকিস্তানী সৈন্যদল অস্ত্র সমর্পণ করল।

ঢাকার ঐতিহাসিক রেস কোর্স ময়দানে তখন হাজার হাজার আনন্দ উদ্বেল মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

একটি ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক দিনের সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি বুড়িগঙ্গার জলে মিলিয়ে গেল আর সেই সঙ্গে দূর হল ২৪ বছরের পাপ। নাদিরশাহের যোগ্য বংশধর জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের সঙ্গে যে 'শেষ যুদ্ধ'-এর খোয়াব দেখেছিলেন, সেই যুদ্ধ পাকিস্তানের ৮৮৮৪ দিনের পরমায়ু শেষ করে দিল। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ২৬৫ দিনের অমিতবিক্রম মুক্তিযুদ্ধের শেষে, তাদের মিত্র ভারতীয় বাহিনীর ১৩ দিনের প্রচণ্ড আঘাতের পর, দশ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষ ও এক হাজার সশস্ত্র সৈনিকের মৃত্যু, হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রম এবং এক কোটি মানুষের নির্বাসনের মূল্যে এল সেই মুক্তি। ৩৬৩ বছরের পুরনো শহর ঢাকা, যে ঢাকা তার ইতিহাসে ইতিপূর্বে তিনবার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছে, সেই শহর এবার, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ভাষায়, 'স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী' হল।
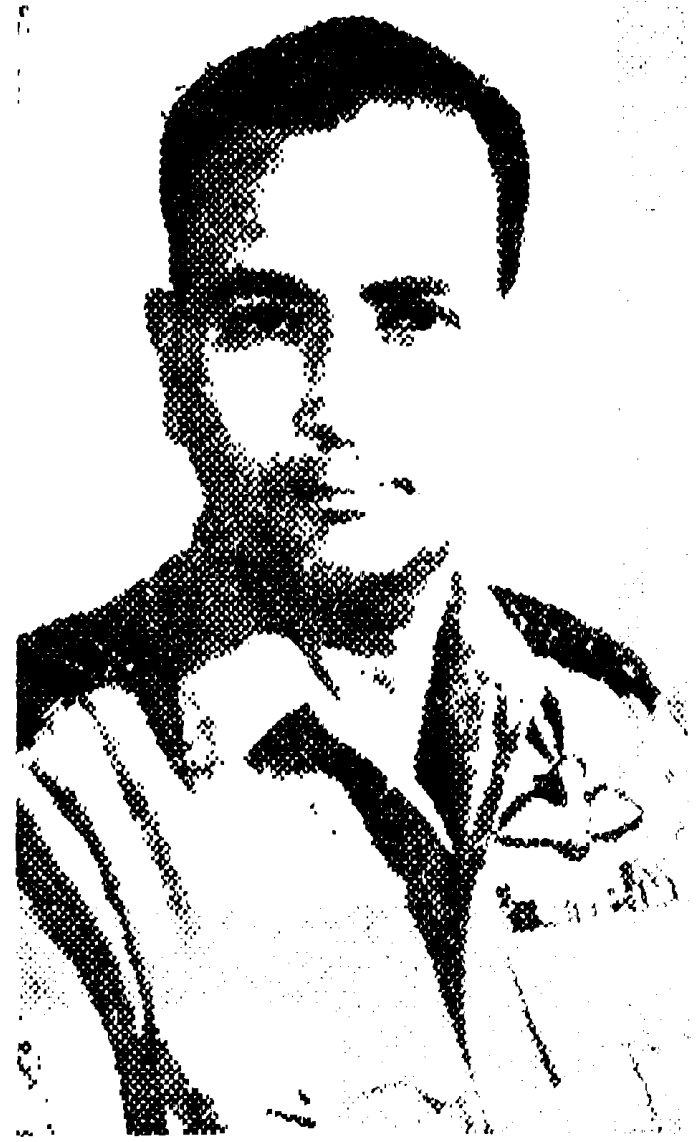
কিন্তু যেহেতু শেষ-লড়াই লড়নেওয়ালা জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব তখনও তাঁর দম্ভ ও ঔদ্ধত্য ছাড়তে রাজী নয় সেহেতু এই আত্মসমর্পণের ঘণ্টা তিনেক বাদে রেডিওর সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি হুংকার ছাড়লেন। চূড়ান্ত পরাজয়ের গ্লানি-ভরা এই আত্মসমর্পণের সংবাদ তাঁর দেশবাসীদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন করে তিনি বললেন, তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।

কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মিলিটারি ডিকটেটরের সেই শেষ দম্ভও শূন্যে মিলিয়ে গেল। ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তিনিও পশ্চিম খণ্ডে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন শুক্রবার ১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় সময়ের রাত আটটা থেকে। যুদ্ধ বন্ধ করার আগে তিনি শেষবারের মতো তাঁর হানাদার বিমানবাহিনীকে পাঠালেন পাঞ্জাবের অমৃতসর, ভাটিন্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করার জন্য।

এ-এফ-পি ইতিমধ্যে সংবাদ দিয়েছেন, পাকিস্তান রেডিও ও সংবাদপত্রের সংবাদ এখন আর পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষরা বিশ্বাস করতে চাইছেন না। সকলের মুখেই এখন প্রশ্ন—পশ্চিম পাকিস্তানে এখন কি

জেনারেল নিয়াজি বাংলাদেশে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন। তাঁর ডানদিকে লেঃ জেনারেল অরোরাকে দেখা যাচ্ছে। পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল কৃষ্ণান, এয়ার মার্শাল এইচ সি দেওয়ান, লেঃ জেঃ সগত সিং, মেজর জেনারেল জ্যাকব।
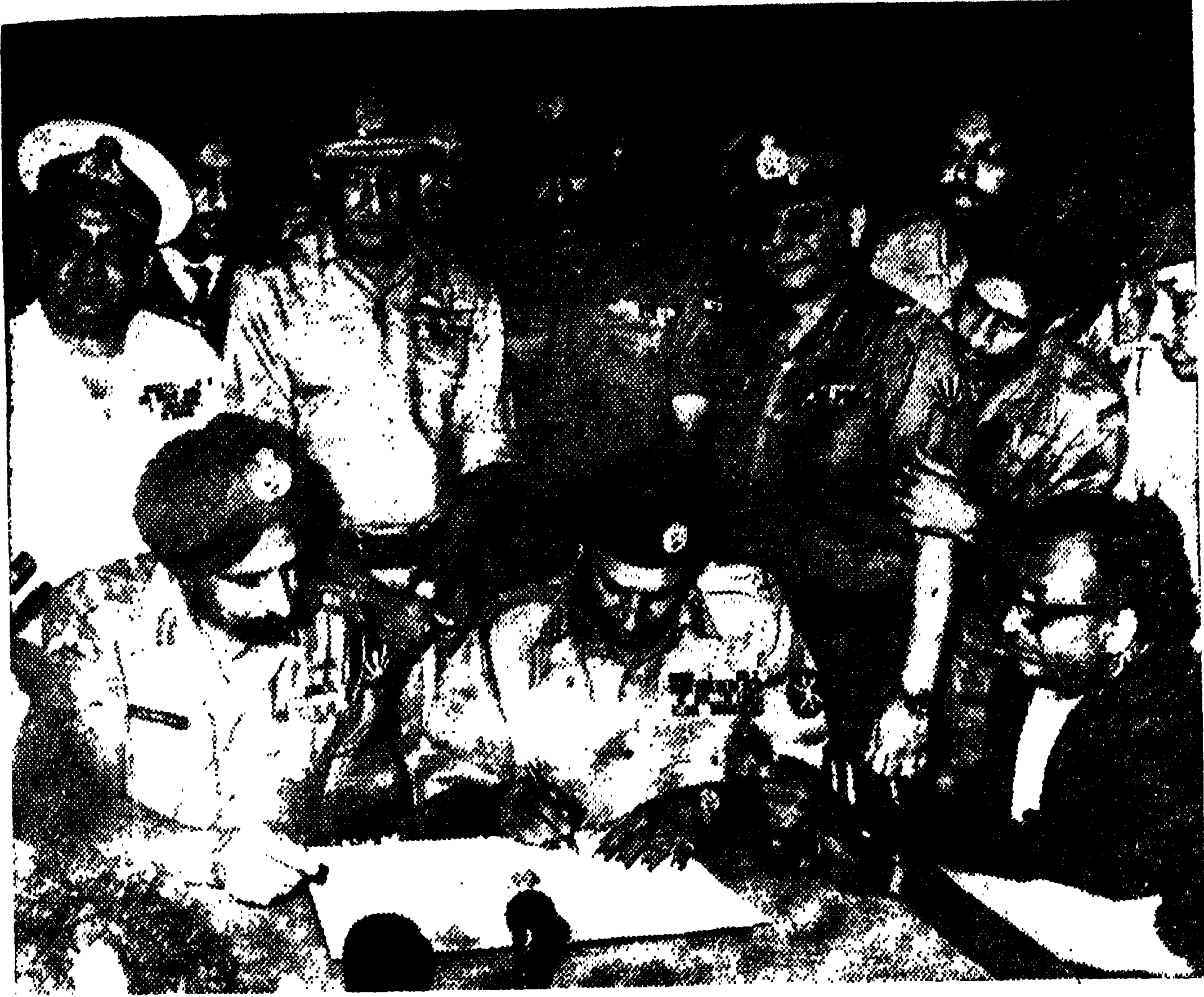
হবে? প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ এখন কি করবেন?

বাংলাদেশের জাতির জনক এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে এই গৌরবময় মুহূর্তে তাঁর দেশের মানুষের কাছ থেকে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার দূরে শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে রয়েছেন সেটা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ।

সংসদে শ্রীমতী গান্ধী এই আশাপ্রকাশ করেছেন যে, নূতন জাতির জনক নিজের দেশের জনগণের মধ্যে তাঁর ন্যায্য আসন গ্রহণ করে জাতিকে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ভারত সরকার এখন শেখ মুজিবুর রহমানকে ফিরিয়ে আনা তাঁদের বড় কাজ বলে গণ্য করবেন। সেদিনও হয়তো আর বেশী দূরে নয়, যেদিন বঙ্গবন্ধু মুক্ত দেশে মুক্ত মানুষ হিসাবে এসে উপস্থিত হবেন।

আমৃত্যু লড়বেন বলে সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন লেঃ জেনারেল নিয়াজি। তাঁর সেই সঙ্কল্প তিনি রক্ষা করেন নি। কিন্তু রণক্ষেত্র থেকে চম্পট দিয়ে আত্মসমর্পণের গ্লানি এড়াবার জন্য তিনি ও তাঁর বাহিনীর অন্যান্য সেনাপতিরা শেষ পর্যন্ত যে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন তার কাহিনী এখন জানা যাচ্ছে। ১১ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে সেখানকার স্থানীয় পুতুল সরকারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফারমান আলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে এই মর্মে জরুরী বার্তা পাঠালেন যে, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী ফৌজ সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সেক্রেটারি জেনারেল যেন সাহায্য করেন। একই দিনে ভারতীয় স্থল সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যাম হরমুসজী ফ্রামজী জমসেদজী মানেকশ মেজর জেনারেল রাও ফারমান আলির উদ্দেশে বললেন, 'আমি জানি, আপনারা গুপ্ত ক্রসিং দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং 'পাইলট ফর আর-কে ৬২৩' আপনাদের পার করে দেওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, আপনারা পালাবার চেষ্টা করবেন না।' 'গুপ্ত ক্রসিং' এবং 'পাইলট ফর আর-কে ৬২৩', এগুলি স্পষ্টতই সাঙ্কেতিক নাম। এগুলি কিসের সংকেত তা জানা নেই। তবে স্পষ্টতই ইসলামাবাদের গোপন পরিকল্পনার কথা ভারতীয় সৈনাবাহিনীর সদর দপ্তরের জানা ছিল।

দিন দুয়েকের মধ্যেই সেই গোপন পরিকল্পনার উপর থেকে যবনিকা ধীরে ধীরে উঠতে থাকল। খবর পাওয়া গেল যে, পৃথিবীর বৃহত্তম রণতরী বলে পরিচিত 'এণ্টারপ্রাইজ', হেলিকপ্টারবাহী ত্রিপোলি এবং ক্ষেপণাস্ত্রবাহী আরও কয়েকটি জাহাজ সহ মার্কিন সপ্তম নৌবহরের একটা অংশ বঙ্গোপসাগরের দিকে আসছে। বাংলাদেশের রণক্ষেত্রের কাছাকাছি মার্কিন সামরিক শক্তির এই উপস্থিতি ইন্দোচীনে আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনীর বোম্বেটেগিরির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। রাশিয়া এটাকে 'গানবোট ডিপ্লোম্যাসি' ও 'ব্ল্যাকমেইল' বলে অভিহিত করল। কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে এ-বিষয়ে কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করলেন।

অনুমান এই যে, মেজর জেনারেল রাও ফারমান আলি যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সম্মতি নিয়ে ঢাকাস্থিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিনিধির মারফৎ সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে তাঁর আবেদন পাঠান তখন সপ্তম নৌবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে ইসলামাবাদের কাছে পাকা খবর ছিল না। সেই খবর যখন পাওয়া গেল তখন ইসলামাবাদ তার ফৌজকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভের আশা করতে থাকল। সেই কারণেই ইসলামাবাদ থেকে ম্যানহাটানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে নির্দেশ গেল, জেনারেল ফারমান আলির আবেদন অনুমোদিত, সেটা [illegible]

১৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী যখন ঢাকার ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পৌঁছল এবং ভারতীয় মিগ বিমানের আক্রমণে ঢাকার গবর্নর ভবন যখন ভাঙতে থাকল তখন সেখানকার আশ্রয়স্থলে বসে কাঁপতে কাঁপতে পুতুল সরকারের গবর্নর ডাঃ এ এম মালিক এক টুকরো চোথা কাগজে তাঁর পদত্যাগপত্র লিখলেন। তাঁর 'মন্ত্রিসভার' মন্ত্রীরাও ইস্তফা দিলেন। তারপর সকলে মিলে রেডক্রস কর্তৃক নিরপেক্ষ এলাকা বলে চিহ্নিত ইণ্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এসে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন চীফ সেক্রেটারি, পুলিশের ইন্সপেকটর জেনারেল প্রভৃতি পদস্থ অফিসাররাও।

কিন্তু জেনারেল নিয়াজি তাঁর ধ্বংসাবশিষ্ট বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অক্ষতদেহে পশ্চিম প্যাকিস্তানে পলায়নের আশা তখনও ছাড়েন নি। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৫ ডিসেম্বর তারিখে মার্কিন দূতাবাসের মারফৎ দিল্লিতে প্রেরিত তাঁর বার্তায়। তাতে তিনি আত্মসমর্পণের কোনরকম কথা না বলে শুধু যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলেন। যুদ্ধবিরতি করে তাঁকে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে সমবেত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে সেই সব অঞ্চল থেকে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে পারেন। যেহেতু মার্কিন দূতাবাসের মারফৎ এই বার্তা পাঠান হয়েছিল সেই হেতু এই অনুমান স্বাভাবিক যে জেনারেল নিয়াজির এই প্রস্তাবের সঙ্গে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের জাহাজে খান সেনাদের পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠাবার পরিকল্পনার যোগ ছিল। কিন্তু কোন পরিকল্পনা, কোন কৌশলই টিকল না। জেনারেল মানেকশ চরমপত্র দিয়ে বললেন, শুধু যুদ্ধবিরতি নয়, আত্মসমর্পণ চাই। আরও বললেন, ঢাকার দখলদার বাহিনী মার্কিন দূতাবাসের মারফৎ নয়, সরাসরি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করুক। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে একটি রেডিও সংযোগও স্থাপন করলেন। মধ্যস্থ হিসাবে আমেরিকাকে সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়াজি-ফারমান আলির দল নতজানু হলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বাক্ষরিত হল আত্মসমর্পণের দলিল।

অত্যাচারী, দখলদার পাকিস্তানী ফৌজের চরম বিপর্যয়ের ক্ষণে মার্কিন নৌবাহিনীকে পাঠিয়ে এভাবেই নিকসন সরকার ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীকে চাঙা করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, এভাবেই তাঁরা ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ককে আরও বিষাক্ত করে তুলেছিলেন। এই নৌবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে কোনরকম সংবাদ দিতে অস্বীকার করে এবং তার গতিবিধি সম্পর্কে উল্টোপাল্টা সংবাদ প্রচারিত হতে দিয়ে তাঁরা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে খবর পাওয়া গেল যে, বাংলাদেশে যেসব আমেরিকান নাগরিক আছেন তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এই যুদ্ধ জাহাজগুলি যাচ্ছে। দিল্লিতে সরকারী মুখপাত্র এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, যে সামান্য কয়জন আমেরিকান আছেন তাঁদের নিয়ে আসার জন্য এত বিরাট নৌবহরের কি প্রয়োজন আছে? তাছাড়া, বেশ কিছু আমেরিকান সমেত বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা যখন বৃটিশ বিমানে করে চলে আসতে পারলেন তখন বাকী আমেরিকানদেরই বা চলে আসতে বাধা কোথায়?

একই সময়ে আমেরিকান সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিসনে প্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের বিহারী মুসলমানদের সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হতে থাকল এবং এই রকম ইঙ্গিত দেওয়া হতে থাকল যে, এই বিপন্ন মানুষদের নিরাপত্তার জন্য বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি প্রয়োজন। দিল্লিতে ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র এই প্রচার সম্পর্কে মন্তব্য করে বললেন, 'বাংলাদেশে পাকিস্তানী ফৌজ ১৫ থেকে ২০ লক্ষ মানুষকে জবাই করেছে, তাদের এখন ক্ষুদ্র ছাগশিশুর মতো করে আর আমাদের শয়তান নেকড়ের মতো করে চিত্রিত করা হচ্ছে। এই ক্ষুদ্র ছাগশিশুরা
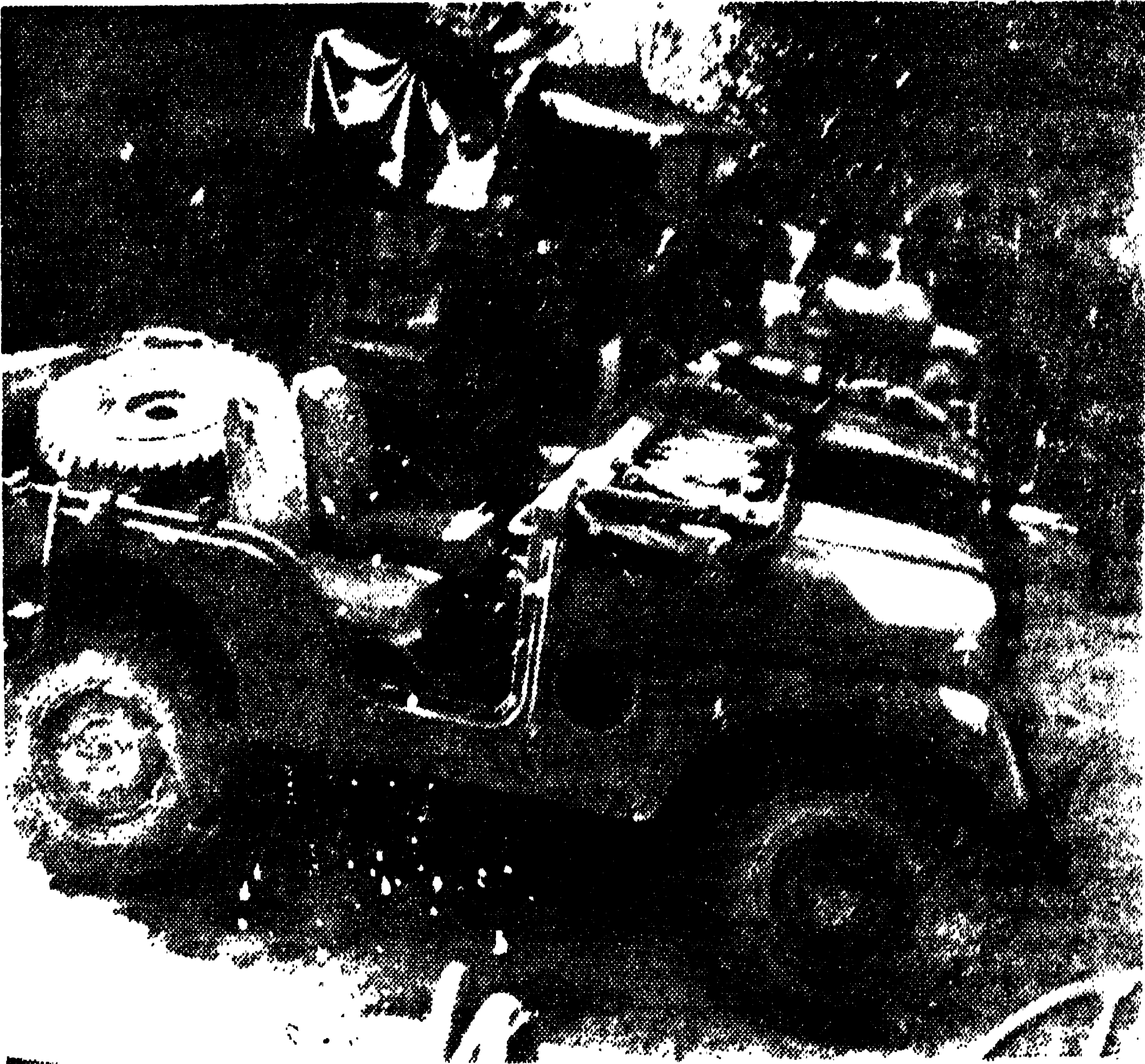
বগুড়া অঞ্চলে পাক সৈন্যরা যেসব জীপ ফেলে পালিয়ে গেছে, এখন সেগুলি ভারতীয় জওয়ানদের দখলে রয়েছে।

যশোর টাউনের উপকণ্ঠে খান সেনারা যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তার একটি দৃশ্য।

সর্বপ্রকারের আধুনিক অস্ত্র, বোমা, গোলা ও রকেট ব্যবহার করে গণহত্যা চালিয়েছে। তবু তারা ভাল মানুষ। তারা পরিকল্পিত আক্রমণ চালিয়েছে, এক কোটি মানুষকে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়েছে এবং কামানের গোলা ছুঁড়ে ভারতের উপর হামলা চালিয়েছে। তবু কিছু লোক বিহারী মুসলমানদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেই ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেদের উপর পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির দায়িত্ব আরোপ করছেন।'

ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব জোসেফ সিসকোর সঙ্গে দেখা করে বলে এলেন, তাঁদের কাছে বিশ্বস্তসূত্রের খবর আছে যে, মার্কিন সপ্তম নৌবহর বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলে একটি পারঘাটা স্থাপন করতে যাচ্ছে এবং তাদের উদ্দেশ্য শুধু আমেরিকানদের নয়, পাকিস্তানী অফিসার ও সৈন্যদেরও এবং অন্যান্য যারা বিপন্ন বোধ করছে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সিসকো এই সংবাদ সরাসরি অস্বীকার করলেন না। অগত্যা শ্রীঝা সাংবাদিকদের ডেকে বললেন, 'আমাদের মতে, আমেরিকা এই ধরনের একতরফা সামরিক গতিবিধি চালালে একটা জটিল পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ভারতের পক্ষে এটা গভীর উদ্বেগের বিষয় হবে এবং আশা করি, আমেরিকার পক্ষেও এটা উদ্বেগের বিষয় হবে।'

শ্রীঝা যে মিথ্যা হুমকি দিচ্ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন জাপান থেকে খবর পাওয়া গেল যে, মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পিছু পিছু ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ফ্রিগেট ও সাবমেরিন সমেত একটি রুশ নৌবহরও বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা করেছে।

ভারত সরকারের কাছে সর্বশেষ যে সংবাদ ছিল তাতে জানা যায়, মার্কিন সপ্তম নৌবহরের জাহাজগুলি বৃহস্পতিবার সকালে যেখানে ছিল সেখান থেকে শুক্রবার বিকাল ২টা নাগাদ তারা চট্টগ্রামের উপকূলে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু তার আগেই নৌবাহিত ভারতীয় সেনা কক্সবাজারের উপকূলে নেমে পারঘাটার দখল নিয়েছে।

যদিও ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা বদলে গেছে এবং এই মার্কিন উদ্ধারতরীগুলি বন্দী পাকিস্তানী সৈন্যদের আর কোন কাজেই আসবে না, তাহলেও আমেরিকা এখন পর্যন্ত তার এই সামরিক শক্তির প্রদর্শনী সরিয়ে নেওয়ার কোন ইঙ্গিত দেয় নি। সর্বশেষ যে সংবাদ আছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, 'যতদিন উপমহাদেশ থেকে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর না হচ্ছে এবং যতদিন মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মার্কিন নৌবহর বঙ্গোপসাগরে থাকবে।'

ইতিমধ্যে ম্যানিলা থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে। সেখানে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের অধিনায়ক অ্যাডমিরাল জর্জ ম্যাকেস ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট মারকোসকে নাকি বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানকে তাঁর নৌবহরের আওতার মধ্যে আনার উদ্দেশ্যে এই নৌবহরের কর্মক্ষেত্র ভারতের পশ্চিম দরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মার্কিন সরকার, বিশেষ করে সেখানকার প্রেসিডেন্ট নিকসন নিজে যে ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তানমুখী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তারই চূড়ান্ত পরিণতিতে এইভাবে মার্কিন নৌবহরকে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হল। প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টা ডাঃ হেনরি কিসিংগার নাকি বলেছেন যে, ভারতকে সিধে করার উদ্দেশ্যে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং 'প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর টেলিফোন তুলে আমাকে ধমক দিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছিলেন।'

ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের মতো পত্রিকা, গলব্রেথের মতো পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, সিনেটর হামফ্রি, কেনেডি প্রভৃতি নিকসন সরকারের এই নীতির ব্যর্থতা দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনকি আমেরিকার একজন কূটনৈতিক প্রতিনিধি এই ব্যাপারে পদত্যাগ করতেও উদ্যত হয়েছিলেন বলে খবর আছে। অথচ প্রেসিডেন্ট নিকসন সেই নীতিকেই আঁকড়ে ধরে এমনকি ভারতের বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে সর্বাত্মক বিরোধিতায় নামছেন

প্রস্তুত হয়েছেন। তার মানে হচ্ছে, পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা হ্রাস, ইয়োরোপের নিরাপত্তা, বার্লিন প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার যে সমঝোতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তাকে বিপন্ন করে তোলা। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট নিকসন শান্তিদূত হিসাবে নিজের যে ভাবমূর্তি দেশের মানুষের সামনে গড়ে তুলছিলেন, সেটিও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে আগামী বছর তাঁর নির্বাচনে অসুবিধা হতে পারে। তবু, ভারত-বিরোধিতার খাতিরে প্রেসিডেন্ট নিকসন এইসব ঝ‍ুঁকি নিয়েছেন।

এখন, বাংলাদেশে ইসলামাবাদের অপশাসনের চূড়ান্ত পশ্চাদপসরণের পর নিকসনী নীতির ব্যর্থতা আরও প্রকট। মার্কিন সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়েও সে-দেশের জন্য অর্থ-সাহায্য দেবেন বলে অবশ্য ঘোষণা করেছেন। এটা যদি নূতন চিন্তার সূচনা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। নাহলে বে অব বেঙ্গল নিকসনের 'বে অব পিগস' হবে।

উপমহাদেশে যখন আগুন জ্বলার উপক্রম হয়েছে তখন স্বস্তি সংসদ সপ্তাহের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন সেনিগল ও পর্তুগীজ গিনির মধ্যে একটা অস্পষ্ট সীমানা বিরোধ সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে। কিছু ছাড়া গরু নিয়ে এই বিরোধের উদ্ভব। একজন পুরানো মানুষ বললেন, 'ভারত-পাকিস্তান সমস্যাটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেটা রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাওয়ার উপযুক্ত নয়।'

এই খবর 'টাইম' পত্রিকার।

১৭।১২।৭১ —পুণ্ডরীক

কাদুয়া শহরের দিকে অগ্রসরমান ভারতীয়বাহিনীর একটি দল।

কাদুয়া দখলের পর [illegible] ঢাকার দিকে।

এ'রা মহাবীর চক্র পেলেন : উপরের সারিতে—লেঃ কর্নেল এইচ এইচ এস ভবানী সিং, মেজর দলজিৎ সিং নারাং (মরণোত্তর), ক্যাপ্টেন এম এন মল্লা (নিখোঁজ)।

নীচের সারিতে—উইং কমান্ডার ভি বি বশিষ্ঠ, স্কোয়াড্রন লীডার এম ব্যানার্জি।

১৯শে ডিসেম্বর এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এম এ ওয়াই ওসমান শনিবার শ্রীহট্ট রেল স্টেশনটি পরিদর্শন করছেন।

একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম

পুলকেশ দে সরকার

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান বর্তমান বাংলাদেশের অন্তস্তলী আলোড়নের দিকে তাকিয়ে ৮ই মার্চ বলতে পেরেছিলাম : 'পূর্বে সূর্যোদয় হচ্ছে। বলেছিলাম : রক্তের মধ্যেই নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে! আবির্ভাব ঘটছে পূর্ব বাংলায় এক নতুন বলিষ্ঠ বাঙালী জাতির।' (যুগান্তর, ৮ই মার্চ, ১৯৭১)

তারও আগে অবিস্মরণীয় 'একুশে ফেব্রুয়ারী' উপলক্ষ্য করেও বলতে পেরেছিলাম : 'অনেক তাৎপর্য ও সম্ভাবনার কিরণ রেখায় উজ্জ্বলতর হয়ে এই দিনটি ফিরে এল—কপালে ও সীমন্তে রক্ত-রাঙন অপরূপ তার রূপ। এ রূপ বাঙলা মায়ের, বাংলা ভাষার।' (যুগান্তর, ২১এ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)

বলতে পেরেছিলাম, তার কারণ, ১৯৭০এ সেখানকার অকস্মাৎ অতি-কৃপণ হাতে দেওয়া সাধারণ নির্বাচনে তার অবিসম্বাদিত প্রমাণ মিলেছে। সেখানে একটিমাত্র কথা ছিল : বাঙলা। 'মমতায় বিনম্র, শপথে-কঠিন শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে একথা বললেও যেন সামান্য করে বলা হয়, বলতে ইচ্ছে যায়, একমেবাদ্বিতীয়ম। এবং ঐ একটি কথা বাঙলা।

এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা শুধু 'পূর্ব পাকিস্থান'—এই নয়, সমগ্র পাকিস্থানেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐখানেই সঙ্ঘর্ষের বীজ নিহিত ছিল। সচেতন পাকিস্থানী শাসকমন্ডলী এই সাধারণ অংকটা জানতেন, জানতেন পূর্ব পাকিস্থান একক সংখ্যাগরিষ্ঠ, জনবলে এবং মৌলিক ধনবলেও। এতদিন ঐ সত্যটাকে চাপা দেবার জন্যই এবং পশ্চিম পাকিস্থানী শিল্পগোষ্ঠীদের শোষণস্বার্থে এক ইউনিটের পাকিস্থানে গণতন্ত্র বা নির্বাচন চলতে দেওয়া হয়নি; সৃষ্টিকালের কিছু পর অবধি যদিবা ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টের সীমিত নির্বাচন চলেছে, বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কখনও মঞ্জুর হয়নি। সেটিকে আরও অসম্ভব করে তুলতে পাকিস্থানের শাসন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক পথে না গিয়ে গেছে সামরিক অভ্যুত্থানের পথে—একনায়কতন্ত্রে। প্রথমে আয়ুব, পরে ইয়াহিয়া। নতুবা সমগ্র শাসনভার অমোঘ নিয়মে আসত পূর্ব পাকিস্থান বা পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের হাতে। এসেও ছিল, সেই নির্বাচন মঞ্জুর হল অমনি এই অনিবার্য ঘটনা ঘটল। পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সূচিত হল : শুধু তাই নয়, এমন এক সংখ্যাগরিষ্ঠতা যা নিশ্ছিদ্র। অর্থাৎ, একটি দলের এবং এমন দলের যা বাংলার দাবী নিয়ে দৃঢ়পণ। সেই দলই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের ভিত্তিই ছিল বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন। ইয়াহিয়াগোষ্ঠীর আশা ছিল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে না, বাংলাদেশের দলাদলি শাসকগোষ্ঠীর মসনদ সুনিশ্চিত করবে; কিন্তু আওয়ামী লীগ দুটি মাত্র আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে বাকী সব কব্জা করল। ইয়াহিয়াগোষ্ঠীর সাধ্য নেই এ নিরেট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চূর্ণ করতে পারে। পরিণাম—দীর্ঘকালীন পাঞ্জাবী সংখ্যালঘুর আধিপত্য শেষ। অর্থাৎ, গণতন্ত্রের পথে এছাড়া গত্যন্তর নেই। সুতরাং, ও পথ নয়, অন্য কোন পথ। চীন-মার্কিণ ষড়যন্ত্রের পুতুল ইয়াহিয়াকে তাই বিপরীত কোন পথ দেখতে হল এবং কোন ছলনা অজুহাতের সন্ধানে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে প্ররোচিত করতে লাগল।

এই দলের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে। মায়ের ভাষা, মাতৃভাষার দাবীতেই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ২১এ ফেব্রুয়ারী রক্ত-তর্পণ করতে হয়েছে। বাংলাভাষা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমেদ

মুস্তাক আহমেদ

পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। তবু সেখানে ছিল কার্পণ্য—পশ্চিমবঙ্গ বা পাকিস্থানের বাইরে যে অতীত ও বর্তমান বঙ্গসাহিত্য, তা পূর্ব পাকিস্থানে বাঙালী মুসলমানদের জন্য না-পাক। যদিবা মুসলিম নাম-মাহাত্ম্যে নজরুল মঞ্জুর হলেন, রবীন্দ্রনাথ সহসা নন, বিদ্যাসাগর ও আর সবাই নামঞ্জুর। কিন্তু বাংলাভাষা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে হয়? এই প্রশ্ন রইল অগ্নিগর্ভ হয়ে বাঙালীর চিত্তে।

মাতৃভাষা—বঙ্গভাষা

তারপর মাতৃভাষা বঙ্গভাষাকে নিয়ে আন্দোলনে অবতীর্ণ হতেই পশ্চিম পাকিস্থানীদের স্বার্থে পূর্ব-বাঙলার মুসলমান বাঙালীদের বঞ্চনাও ধরা পড়তে লাগল। সেই বৈষয়িক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই শেখ মুজিবের ছয়-দফা দাবীতে বাঙ্ময় ও প্রাণময় হয়ে উঠল। এবং এই দাবীতেই আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়ী হয়ে এল। এবার যে অনিবার্যকে ঠেকাবার জন্য পাকিস্থান এতকাল প্রয়াস পেয়েছে, তা বিরাটরূপে দেখা দিল। বঙ্গবন্ধু সেই বিরাট রূপের প্রতীক; কার্যতঃ পূর্ব পাকিস্থান তথা সমগ্র পাকিস্থানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক; শুধু আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তরের অপেক্ষা!

১৯৭১-এর ৩রা মার্চ পাকিস্থানের জাতীয় পরিষদ বা সংবিধান পরিষদ বসবার কথা। কিন্তু সেই প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিমুখ পাকিস্থানের মাইক্রোফোন লারকানার নবাব জুলফিকার আলি ভুট্টো যে আস্ফালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবর তার জবাবে মেঘমন্দ্রে বলেছিলেন : বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি - রোধের কোনরকম চেষ্টা হলে ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি হবে। কার্যত আওয়ামী লীগের করতলগত বাংলাদেশের রেডিও আর 'রেডিও পাকিস্থান—ঢাকা' নয়, তার নাম হয়েছিল ঢাকা বেতার কেন্দ্র এবং প্রোগ্রাম বাঙালী-নিয়ন্ত্রিত। ঢাকায় বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুত্থান সম্পর্কে সাতদিনব্যাপী প্রচারাভিযান উদ্বোধনকালে শেখ মুজিব বলেন, তাঁর দল যখন ক্ষমতায় আসীন হবে তখন বাংলাকে সরকারী ভাষা করা হবে।' তিনি ভাষা-শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তাঁদের আত্মদান ব্যর্থ হবে না।

এই নিয়েই বাংলাদেশের ধ্বনি : জয় বাংলা। জাতীয় সঙ্গীত : আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। আমরা ভুলতে পারি কিন্তু ও'রা ভুলতে পারেন না, ঐ সত্তরেরই মর্মান্তিক সামুদ্রিক ঝড়ের দোলা ও জলোচ্ছ্বাস। এ সম্পর্কে আগে-ভাগে খবর পাওয়া সত্ত্বেও নিষ্করুণ শাসকমণ্ডলী উপকূলবাসীদের সতর্ক না করে নিবার্য অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। ১৯৭০-এর ২৫এ নভেম্বরের 'ইত্তেফাক'-এ আবুল মনসুর সখেদে লিখেছিলেন :

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

'ক্ষমতাসীন যাদের উপেক্ষায় অবহেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহে-মনে-জীবনে এই দুর্দৈব নামিয়া আসিল তাদের পাপের শাস্তি কি কঠিন ভাষা প্রয়োগেই বিধান হইতে পারে? ধরা যাইতে পারে এই দুর্যোগে কম-বেশী পনের লাখ আদম সন্তান প্রাণ হারাইয়াছে। এদের মৃত্যুতে আর কত লাখ লোকের দেহে-মনে যাতনা ও জীবন-সংসারে দুর্দিন আসিয়াছে, তাও আমরা বুঝিতে ও অনুমান করিতে পারি। যাঁদের হাতে আমাদের ভাগ্য ন্যস্ত আছে. আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, যাঁরা আমাদের ভাগ্যের ভার নিজ হাতে নিয়াছেন তাঁদের ব্যবহারে এটাই কি বলা যায় না যে যারা মরিয়াছে তারাই বাঁচিয়াছে; আর যারা বাঁচিয়া আছে, আসলে তারাই মরিয়াছে?... ...ঘটনার এক দুই সপ্তাহের পরে যখন রিলিফ দ্রব্য ও ঔষধপত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়াছে, তখন রিলিফ গ্রহণ করিবার জন্য কেউ বাঁচিয়া নাই।

'দুর্যোগের পরে বিদেশী রিলিফ আসিবার আগে আমাদের সরকারী রিলিফ আসে নাই। গবর্নর আহসান বলিয়াছেন পূর্ববাংলা সরকারের একটিও হেলিকপ্টার নাই। তিনি কেন্দ্রের কাছে হেলিকপ্টার চাহিয়া পান নাই। আজ যখন তিন ডজন বিদেশী হেলিকপ্টার আসিয়া সেবা কাজে নিয়োজিত হইয়াছে, সেই সময় পাকিস্থান সরকারের দুইটি হেলিকপ্টার পূর্ববাংলায় আসিয়াছে। বিদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্থানের সাহায্য তৎপরতা সামান্য।'

২৬-এ নবেম্বর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেণ্ট শেখ মুজিবর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে শুধু খেদ প্রকাশ করলেন না, জ্বলেও উঠলেন :

'আমাদের রক্তে পরিপুষ্ট সেই বাইশ[illegible] (ধনী) পরিবারের কেউ ত্রাণকার্যে কোন[illegible] উল্লেখযোগ্য সাহায্য এখনো করেননি। পশ্চিম পাকিস্থানের যে কাপড়ের মিল[illegible] বাংলাদেশকে তাদের প্রধান বিক্র[illegible] হিসেবে শোষণ করছে তারা নগ্নদেহ মানুষ বা শবাবরণের জন্য এক গজ কাপড়ও দেয়নি। এইজনাই কি আমাদের ৭২ ভাগ সম্পদ গত দুই দশক ধরে আমাদের শোষণ করতে দিয়েছি? এইজন্যই কি প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের ৬০ শতাংশ বাজেট মঞ্জুর করেছি? এইজনাই কি বাংলাদেশের পাট-চাষীরা নিরন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করছে যে, করাচী আর লায়ালপুরের পুঁজিবাদীরা আমাদের শোষণ করে উন্নততর সোপান বেয়ে উঠবে?......

'রাওয়ালপিণ্ডি ও ইসলামাবাদই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। ইসলামাবাদের বিলাস-বহুল অট্টালিকা নির্মাণের জন্য

২০০ কোটি টাকার যোগাড় হইতে পারে, ঘূর্ণিবাত্যা থেকে স্থায়ী আত্মরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ২০ কোটি টাকার বেলাতেই অর্থাভাব।

'আজ আর কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতির ধ্বংসলীলার হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে ৬-দফা দাবী/১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা আমাদের হাতেই তুলে নিতে হবে।'

একেবারে মৌলিক সমস্যা

অর্থাৎ, পূর্ব পাকিস্থানে নির্বাচন-প্রাক্কালে যা ছিল, তা নিছক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন নয়, একেবারে মৌলিক জীবন-মরণ সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে স্বায়ত্তশাসন ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর চোখে পড়ছিল না পূর্ববঙ্গবাসীদের। এবং এ উপলব্ধি যে সর্বাত্মক ও সর্বজনীন তা প্রমাণিত হল নির্বাচনেই। বঙ্গবাসীরা আর কোন দল নয়, ধর্মের ডাকে টলল না, ইসলাম তমদ্দুন কওমের বৈশিষ্ট্যে গলল না, নিতান্ত বাঁচার দায়ে আওয়ামী লীগকেই সর্বতোভাবে সমর্থন করল।

নির্বাচনের পর পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একদিকে ১৪ই জানুয়ারী (১৯৭১) শেখ মুজিবকে পাকিস্থানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অন্যদিকে জল ঘোলা করে গণতন্ত্র থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রও করে বসলেন। বোম্বেটেরা ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ভুট্টো প্রমুখ ভারত-বিরোধী পাকিস্থানীরা সোল্লাসে বোম্বেটেদের সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং শেষ পর্যন্ত বিমানটি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। ভারত সরকার ভারতের আকাশ দিয়ে পাক-বিমান চলাচল বন্ধ করে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তাঁরাও পাক আকাশ এড়িয়ে চলবেন। পাকিস্থান জানায়, সে বোম্বেটেদের ভারতের হাতে অর্পণ করবে না। দিল্লী ইসলামাবাদকে এজন্য সাবধান করে দেয়। শেখ মুজিব বলেন, ভারতীয় বিমান উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। (১)

১৫ই ফেব্রুয়ারী ভুট্টো হুমকি দেন যে, ৩রা মার্চ যে জাতীয় পরিষদ বসবার কথা, তা তিনি বয়কট করবেন। এদিকে পাক জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতৃপদে মুজিবর নির্বাচিত হন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে থাকে। পাক-সংবিধান রচনা সংকটের পাঁকে পড়ে। ইয়াহিয়া ভুট্টো-মুজিবের মধ্যে আপোষ ঘটিয়ে দেবার একটা ছলনার পথ নেন। নয়াদিল্লীতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এ সংবাদ পাওয়া যায়। করাচী থেকে রয়টার জানায়, জাতীয় পরিষদে কোরাম স্থির হয়েছে ১০০। শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, তিনি ভুট্টোকে বাদ দিয়েই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে কৃতসংকল্প। ভুট্টোর কণ্ঠে একটু নরম সুর শোনা যায়। শেখ মুজিব আবারও জানান, তিনি তাঁদের কর্মসূচীতে অবিচল রয়েছেন। নয়াদিল্লীতে ২৫এ ফেব্রুয়ারী খবর এল, পাক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন নির্দিষ্ট সময়েই হবে।

জানা গেল, কিঞ্চিৎ নরম-সুর ভুট্টো ঘোষণা করেছেন, তিনি পাকিস্থানের অখণ্ডতা বজায় রেখে ছ' দফা কর্মসূচী যথাসম্ভব মেনে নেবেন। ২৭এ ফেব্রুয়ারী। ২৮এ ফেব্রুয়ারীতে করাচীর খবর, পাকিস্থান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো লাহোরে বলেছেন যে, তিনি দুটি শর্তে জাতীয় পরিষদে পাক সংবিধান রচনায় অংশ নেবেন। (ক) সংবিধান জাতীয় পরিষদেই প্রণয়ন করতে হবে, বাইরে থেকে রচনা করে পেশ করা চলবে না। (খ) ১২০ দিনের যে সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া আছে তা তুলে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, আওয়ামী লীগের এতে কোন আপত্তি ছিল না।

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, যদি তাঁর দল ক্ষমতা লাভ করতে পারে তবে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। নতুন সংবিধান অনুসারে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের বিষয়টি প্রাদেশিক ক্ষমতার অধীনে থাকবে। ২৩ বছর ধরে এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্থানকে শোষণ করে আসছে, কারণ, এ-সব বিষয় কেন্দ্র নিজের ক্ষমতার অধীনে রেখেছিল। ফলে পশ্চিম পাকিস্থানের বড় বড় শিল্পপতি পূর্ব পাকিস্থানের ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ঘাড় ভেঙে রাশি রাশি সম্পদের অধিকারী।

সুতরাং এ মৌলিক সংগ্রামটা কেবল আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির মধ্যে নয়, পশ্চিম পাকিস্থান ও পূর্ব পাকিস্থান বা বাংলাদেশের মধ্যেও। এ দুয়ের মিলন-ক্ষেত্র কোথায় হবে? এদ্দিন ধর্মের নামে, পৃথক কওম তমদ্দুনের নামে যে জোড়া-তালি ছিল তা ধরা পড়ে গেছে। ঝরঝরে করে পড়ে যাচ্ছে। জোড়াতালিটা রাখবার জন্য গণতন্ত্রের ছলনাটির এসে ইয়াহিয়াকে ভুট্টোকে ফিরতে হল সেই স্বৈরাচারী শোষণের জঙ্গীশাহীতেই। প্রেসিডেন্ট দুম্ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনই দিলেন বন্ধ করে।

কিন্তু বাংলাদেশের অন্তস্তল তখন আলোড়িত; এই আর এক নতুন বঞ্চনায় ফেটে পড়ল বাংলাদেশ। যুগান্তরের ৩রা মার্চের সংবাদ শিরোনামা :

'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে ঢাকায় পূর্ণ হরতাল : ব্যাপক লুঠ ও অগ্নিসংযোগ, কার্ফু,
দশ হাজার ছাত্রের প্রতিবাদ সভা,
জাতীয় পতাকার বহ্ন্যুৎসব'

বহুদিনের কামনা — গণতান্ত্রিক শাসনের প্রথম পদক্ষেপ নির্বাচনের রায় পাওয়ার পর—যে আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রদীপ্ত হয়েছিল তা একটিমাত্র লোক—কোন জন-প্রতিনিধি নয়—ফুৎকারে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার নৈরাশ্যে মানুষ দিশেহারা হয়ে গেল। জননেতা শেখ মুজিব কোটি কোটি

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান

---

(১) এ সংবাদ ঢাকার 'ইত্তেফাক'-এ বেরোয়। তখনও ইত্তেফাক নিষিদ্ধ হয়নি অথবা ইত্তেফাক-এর বাড়ীর মাথায় বোমা পড়েনি।

লোকের বিহ্বলতাকে ঢাকায় পূর্ণ হরতালের পথে চালিত করলেন। উত্তেজনা বিক্ষোভের মধ্যে সরকারী বেসরকারী অফিস স্কুল-কলেজ দোকানপাট বন্ধ, রাস্তাঘাট নির্জন। সমতালে সামরিক কর্তৃপক্ষও করলেন কার্ফ্যু জারী, সংবাদপত্রের ওপর সেন্সর। শহরে টহলদার সৈন্য; গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে মিলিটারী মোতায়েন।

সঙ্ঘর্ষ বাধল

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন : যদি ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও মনে করে থাকেন যে, তাঁরা তাঁদের ঔপনিবেশিক শাসন চিরস্থায়ী করে তুলবেন তবে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

ছাত্র, কারখানা-শ্রমিক, আইনজীবী ও সরকারী কর্মচারীরা ঢাকার রাজপথে শোভাযাত্রা বের করে। তাদের হাতের প্লাকার্ডে লেখা ছিল : 'স্বাধীন বাঙলা চাই।'

দমনের জন্য করাচী থেকে সৈন্য আসতে লাগল বিমানে।

গোলমালের সূত্র পূর্ব পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে। পশ্চিম পাকিস্থানীদের আশঙ্কা, যেহেতু পূর্ব পাকিস্থান প্রতিনিধি সংখ্যায় প্রবলতম সেইহেতু পশ্চিম পাকিস্থানীদের বক্তব্য খাটবে না। এই আশঙ্কায় ইয়াহিয়া অধিবেশন স্থগিত রাখায় ওরা স্বস্তি পেল: গণতন্ত্র চুলোয় যাক, জঙ্গীশাহী চিরস্থায়ী থাকে থাকুক, পশ্চিম পাকিস্থানের শোষণাধিপত্যের বদলে পূর্ব পাকিস্থানের বাঁচার আধিপত্য বরদাস্ত করা যাবে না। তাই ওরা পাকিস্থানী সংহতির নামে গণতন্ত্রের বদলে জঙ্গীশাহী শ্রেয়তর মনে করে। নির্বাচন অনুকূলে হলে কথা ছিল না, প্রতিকূলে হলে তা ফাঁকা আওয়াজ নয়। ইয়াহিয়ার হস্তক্ষেপে তাই তারা খুশী হল। জঙ্গীশাহীও আর এক পা এগিয়ে গিয়ে গবর্নরদের পদ বিলুপ্ত করে দিল ৫টি প্রদেশে সামরিক প্রশাসক স্থলাভিষিক্ত হল। পূর্ব পাকিস্থানের গবর্নর এডমিরাল আহসানকে পদচ্যুত করে সেখানে শাহেবজাদা ইয়াকুব খাঁকে বসানো হল। এডমিরাল আহসানের অপরাধ বিচ্ছিন্নতাকামী শেখ মুজিবের- তিনি নাকি ছিলেন বন্ধুস্থানীয় এবং এজন্য গণবিক্ষোভ দমনে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

করাচী থেকে এ-এফ-পি ৪ঠা মার্চ জানালো গত দুদিনে পাক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানীদের রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধে অন্তত একশ নিহত, কয়েকশ' আহত হয়েছে। সরকারী হিসেব। ঢাকার হাসপাতালগুলো থেকে রক্তদানের আহ্বান জানানো হয়। আহতদের মধ্যে আওয়ামী লীগের হুইপ এম এ মান্নান ছিলেন বলেও খবর আসে।

সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে শ্রীহট্ট, রংপুরে। সেখানেও কার্ফ্যু জারী হয়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ কার্ফ্যু না মেনেই বিক্ষোভ

কামরুজ্জমান

মনসুর আলি

প্রকাশ করতে থাকে। শেখ মুজিব ঘোষণা করেন : ৭ই মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। ইতিমধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্থান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানান। পূর্ব পাকিস্থানে অত্যাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে পাকিস্থান সরকারের ওপর চাপ দিতে তিনি মার্কিন সরকারকে অনুরোধ করেছেন বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয় শেখ মুজিব তা অস্বীকার করেন। (২) পাকিস্থান বেতারে বলা হয়েছিল যে, শেখ মুজিব ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা বখরা করতে রাজী আছেন। শেখ মুজিব এই সংবাদকে দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেন।

পাকিস্থানের খামখেয়ালী প্রেসিডেন্ট আবারও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সম্পর্কে একটা তারিখ ঘোষণা করেন। সে তারিখটা ২৫এ মার্চ। তিনি বলেন, সংবিধান সঙ্কট নিরসনের জন্য 'আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।' কথাটা যে তাঁর আদৌ আন্তরিক নয় তা ঐ ২৫ তারিখেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঐ ঘোষণার তারিখে আর একটি যে কথা বলেছিলেন তাই পূর্ব পাকিস্থানের বুকে সত্য হয়ে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। তিনি বলেছিলেন : সশস্ত্র ফৌজ পাকিস্থানের পূর্ণ নিরঙ্কুশ অখণ্ডতা বহাল রাখবে। আইনভঙ্গকারীদের লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি ন্যূনতম বলপ্রয়োগের আদেশ দিয়েছেন।

অর্থাৎ, আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তথা পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালী আধিপত্যের সম্ভাব্য চিত্রটি উদ্ঘাটিত হতেই ইয়াহিয়া যে গণতন্ত্রের পথ—জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ—পরিহারেরই যে পাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা সেই মুহূর্ত থেকে প্রকট হতে থাকে। তাঁর সেদিনকার ঐ তের মিনিটের নরম-গরম ভাষণের তাৎপর্য সকলে ধরতে পারেনি। সে তাৎপর্য—জঙ্গীশাহীর পুনরভ্যুত্থান এবং জনপ্রতিনিধিত্বের সমাধি।

ইয়াহিয়ার বেতার-ভাষণ

তবু ইতিহাসের পাতায় ইয়াহিয়া ২৫এ তারিখটি নির্দিষ্ট করে তিনি যে কৈফিয়ৎ তাঁর বিবৃতিতে রেখেছেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, ১লা মার্চ (অধিবেশন স্থগিত করে) তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য নির্বাচিত নেতাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় ১০ই মার্চ এক বৈঠক ডেকেছিলেন। 'আমার এই আহ্বানে যে সাড়া পেয়েছি, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা আমার এই চেষ্টাকে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তা খুবই নৈরাশ্যজনক। অথচ তিনিই আমার ঐ বেতার ঘোষণার আগে আমার মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যে, তিনি এমন একটি বৈঠকের পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করবেন না। এরূপ অবস্থায় আমার ঐ প্রস্তাবের সরাসরি প্রত্যাখ্যান আমাকে বিস্মিত করেছে। পাকিস্থান ডেমক্রাটিক পার্টির নেতা মিঃ নুরুল আমিনও প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদানে অসম্মতি জানিয়েছেন। অর্থাৎ, পূর্ব পাকিস্থানের কোন প্রতিনিধিই উপস্থিত থাকবেন না। আপনারা এইভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, আমি ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি গ্রহণ করলেও আমাদের কোন কোন নেতা তাতে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

এই বেতার ভাষণে সকল দোষ পূর্ব পাকিস্থানের ওরফে প্রধানত আওয়ামী লীগের ওপর দেবার এবং পশ্চিম পাকিস্থানীদের, বিশেষ করে, ভুট্টোর পিপলস পার্টিকে একটা গুড সার্টিফিকেট দেবার অপপ্রয়াস দেখা যায়। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কেবল ভৌগোলিক নয় মানসিক ফারাকটা যে দুস্তর এটাই পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

(২) এই জাতীয় মিথ্যা প্রচারে মার্কিন সরকার খুবই অভ্যস্ত। সম্প্রতি ভারত সম্পর্কেও অনেক মিথ্যা প্রচারণা তারা করেছেন।

রমনার মাঠে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

ইয়াহিয়া জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্থানের গবর্নর নিযুক্ত করলেন। ইয়াহিয়া তথা পশ্চিমাদের লক্ষ্য যে কি তা আর অন্তরালে রাখা যাচ্ছে না।

শেখ মুজিবের আলোচনায় আপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছয়দফা স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে সে আলোচনা হোক। পরিষদে তিনি সবার কথা শুনতে ও তদনুসারে সাধ্যমত মানিয়ে নেবার চেণ্টা করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমাদের এই ছয়দফাই ছিল এলার্জি। মিঃ জহুর বক্স অমৃতবাজার পত্রিকায় ৮ই মার্চ এক প্রবন্ধে লেখেন :

> 'Mr Rehman has regretted that some political leaders in the Western Wing had taken a different attitude with regard to the six points with some 'ulterior' motives'.

ভুট্টো ঘোষণা করেছিলেন তিনি কোন 'নির্দেশিত সংবিধান' গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তবে সব্বার মতের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি সংবিধান হয় তিনি ঢাকার জাতীয় অধিবেশনে বসতে রাজী। এবং ফেডারেল গবর্ণমেন্টকে তিনি এমনভাবে গড়তে চাইছিলেন যাতে আওয়ামী লীগের ছয় দফার স্বায়ত্তশাসন কার্যতঃ বাতিল হয়ে যায়। অথচ আওয়ামী লীগের অবস্থাটা ছিল সব রকমে নিরঙ্কুশ : পূর্ব পাকিস্থান ব্যবস্থা পরিষদে তার সদস্য সংখ্যা ২৮৮, জাতীয় পরিষদে ১৬০; অথাৎ, যে ৯০০ সদস্য নিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচকমন্ডলী গঠন করা হত তাতে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা ৪৪৮। সেখানেও ইয়াহিয়ার গদী টলমল। এমন দলকে এড়িয়ে কিছু 'মীমাংসা' করতে যাওয়ার অর্থ গণতন্ত্রের বা জন প্রতিনিধিকে এড়িয়ে যাওয়ার দুশ্চেণ্টা।

আওয়ামী লীগের খসড়া সংবিধান

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তাঁদের ছয়দফা দাবীর ভিত্তিতে যে সংবিধানের ৪১ দফা খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন তাতে ছিল ফেডারেল রিপাবলিক পাকিস্থানকে বলা হবে—পাকিস্থান যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্থান; স্টেটস বা রাজ্যগুলো হবে : বাংলাদেশ, সিন্ধু দেশ, পাঞ্জাব দেশ, পাখতুনিস্থান দেশ ও বেলুচিস্তান দেশ। কেন্দ্রে থাকবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় ও মুদ্রা। রাজ্যে ন্যস্ত থাকবে কৃষি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা, ইস্পাত কারখানা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। রেল, ডাক-তার, সামুদ্রিক ও আকাশ পরিবহন হবে সংবাদ ও যোগাযোগ বিভাগের অন্তর্গত। তিনটি সেনাবাহিনীর সদর কার্যালয় হবে তিনটি দেশে। নৌ—বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্থান), স্থলবাহিনী—পাঞ্জাব দেশ; বিমানবহর—সিন্ধু দেশ-এ। পুলিশ ও রাইফেল ফোর্স ছাড়া প্রত্যেক দেশ পৃথক মিলিশিয়া রাখতে পারবে। রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য অবশ্যই পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে হবে। মুদ্রা একটাই হবে, কিন্তু প্রতি দেশ-এর নিজস্ব রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে ঐ কারেন্সী নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে। কর ধার্যের অধিকার থাকবে প্রতি দেশ এর; তবে কর দুরকম হবে—এক, কেন্দ্রীয়, দুই দেশীয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাকিস্থানের পক্ষে এই সংবিধানই 'বৈপ্লবিক' বলা যায়। সুতরাং কায়েমী স্বার্থান্ধেরা এর সম্ভাব্যতায়ও অস্থির হয়ে উঠল। তাই সামরিক ও পশ্চিমা শিল্পগোষ্ঠীর নেতা ইয়াহিয়া ছিদ্রপথ রেখেই এগিয়েছিলেন। হাতে তুরুপের তাস ভুট্টোর আবদার তো আছেই, আর আছে ক্ষমতা হস্তান্তর থেকে সরে আসবার খিড়কিদুয়ার। অর্থাৎ, তিনি প্রস্তাবনাতেই গেয়ে রেখেছেন : যদি সংবিধান পাকিস্থানের অখন্ডতার পরিপন্থী হয় তবে তা তাঁর গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিষ্কার বুঝেছিলেন পূবের ঝোঁক পশ্চিমা নেতৃত্বের অবসান ঘটানো।

সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। রমনা রেস কোর্স ময়দানে লক্ষাধিক মানুষকে সম্বোধন করে শেখ মুজিবর এক ভাষণ দিলেন। **জঙ্গী আইন প্রত্যাহার ও জন-**

প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাবীতে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান সাত কোটি বঙ্গবাসীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানালেন :

'আমি ইসলামাবাদকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, বাঙালীরা প্রাণ দিতে জানে কিন্তু কারুর কাছে মাথা নত করতে জানে না, সে যত বড় শক্তিই হোক না কেন।'

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এই ভাষণটি পুনঃপ্রচারিত হবার কথা ছিল। অজ্ঞাত কারণে বেতার স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য বাজানো হয়। এই বক্তৃতায় তিনি পূর্ব পাকিস্থান কথা দুটি উচ্চারণ না করে বলেছেন, 'আমার বাংলা'—এবং ভাষণ শেষে 'জয় বাংলা'!

নতুন বাংলাদেশের ভ্রূণ আবিভাব এখানেই।

শেখ মুজিব বললেন : 'গত ২৩ বছর ধরে আমরা শোষিত হয়ে আসছি এবং জনগণের সরকারকে নির্বাচিত করার ন্যায্য ও মৌল অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের অনেক [illegible] অশ্রু ঝরাতে হয়েছে। আমার [illegible] জনগণকে তাদের অধিকার অর্জনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এবার আমরা জনগণের সরকার গঠনের জন্য জনগণের রায় পেয়েছি। কিন্তু জঙ্গীশাহী আমাদের সরকার গঠনে বাধা দিচ্ছে।'

শেখ মুজিব বললেন, সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের শ্রমে অর্জিত অর্থে কেনা অস্ত্র আমাদের নাগরিকদের হত্যা করার জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে। পৃথিবীর কোনোখানেই দেশের জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর এই নৃশংসতা দেখা যায় নি।

তিনি জঙ্গীশাহীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে জনগণকে বলেন, আর যদি একটা গুলী চলে, তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরও রক্ত দেব। দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

হ্যাঁ আরও রক্ত দিতে হয়েছে, হচ্ছে। বাংলাদেশের সম্পূর্ণ মুক্তির পথ আজ সুনিশ্চিত।

তখন অটল সংকল্প ছিল নিঃসংশয় কিন্তু ছবিটা স্পষ্ট হয় নি, বাঙলাদেশ তখনও নীহারিকা, আজকের মত এমন বাস্তবায়িত নয়।

'রক্তলাল—রক্তলাল'

কবাচীর খবর মতই ঢাকায় যখন ২০০০ লাস পড়ে তখন থেকে সেই ২৫-এ মার্চ থেকে ৬ই ডিসেম্বর অবধি ঘটনাপঞ্জী নির্লজ্জ কলঙ্ক কালিমায় কালো এবং রক্তমোক্ষণের লালে লাল। ৭ই মার্চ শেখ মুজিব বলেন, চারটি শর্ত পূরণেই কেবল তার পক্ষে জাতীয় পরিষদে যোগ দেওয়া সম্ভব। সামরিক আইন তুলে নিতে হবে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে অসামরিক শাসন প্রবর্তন করতে হবে, হতাহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৮ই মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্থান (বাঙলাদেশে) আইন অমান্য আরম্ভ হল, পাচক ও পরিচারকও গভর্নরকে ছেড়ে গেলেন। বিক্ষোভ হল লণ্ডনেও। ইস্ট-পাক রাইফেলসের বাঙালী সেনারা বন্দুক ঘুরিয়ে ধরল।

রেডিও পাকিস্তান ঘোষণা করল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আসছেন ঢাকায়, সামরিক জাল ফেলে দিয়েই। কিন্তু কবে কখন তা রেডিও পাকিস্তান ভাঙল না। উদ্দেশ্যটাও উহ্য থাকল।

কিন্তু অসহযোগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জজেরা পর্যন্ত লেঃ জেঃ টিক্কা খাঁর শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করলেন। চীনাপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-নেতা অশীতিপর মৌলানা ভাসানী শেখ মুজিবের আন্দোলনে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। পক্ষান্তরে সামরিক গোষ্ঠীও এই আন্দোলন দমনে কৃতসংকল্প হল এবং তাদের একটা পথই জানা ছিল, সে পথ নির্বিচার রক্তপাত। পূর্ব পাকিস্তানে দুই ডিভিসন সৈন্য ছিল। অতঃপর জাহাজ বোঝাই ও বিমান বোঝাই সৈন্য নামতে লাগল বাঙলাদেশের মাটিতে। সামরিক কর্তৃপক্ষ অবশ্য বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্য করল, স্টেভেডোররা মাল খালাস করতে অসম্মত। সারা পাকিস্তান কালো পতাকা উড়তে লাগল ঘৃণায় ও প্রতিবাদে। সরকারী ও বেসরকারী ভবনও। কোথাও কোথাও গাঢ় সবুজ পটভূমিকায় সোনালী রংয়ে বাঙলাদেশের মানচিত্র-খচিত পতাকাও উড়তে লাগল। পশ্চিম পাকিস্থানীদের নামাঙ্কিত রাস্তাগুলোর নতুন নামকরণ হল পূর্ব বাঙলার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নামে। সম্মানিত বিদেশী

পাকিস্থানী সৈন্যদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এরা ভিটেমাটি ছেড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের বুকে

ছাড়ার উদ্যোগ করতে লাগলেন। একটা অপ্রাকৃতিক ঝড় আসন্ন, ৯০ জন ইংরাজ মহিলা ও তাদের শিশু সন্তান ঢাকা ছাড়লেন, জার্মানীর ১১৩ জন ব্যাংকক রওনা হয়ে গেলেন, মার্কিনীরা যাবেন কি থাকবেন জানা গেল না, জাপানীরা ১৫০ জনকে নিয়ে একটা বিমান ছাড়বার কথা স্থির করলেন।

এই সময় থেকেই সংবাদ সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হল, পাকিস্তানের সরকারী সূত্রে সকল সংবাদ নিয়ন্ত্রিত, আলকাতরায় প্রলিপ্ত, বেসরকারী সূত্রের সংবাদ প্রায়শঃই অলীক ও অভিলাষাচ্ছন্ন হওয়ায় কোনটারই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য রইল না। ফলে অনেক সংবাদই পরে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে, আবার অনেক সত্য সংবাদ পথই পায় নি প্রকাশের।

১২ই মার্চ জানা গেল, ইয়াহিয়া খাঁ নাকি শেখ মুজিবর রহমানের কাছে একটি আপোষ প্রস্তাব পাঠিয়েছেন বিশেষ দূত এম খুরশিদের হাতে। সকল দলের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে শেখ মুজিব একটি জাতীয় সরকার গঠনে সম্মত হলে জাতীয় অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কে আওয়ামী লীগের চার দফা শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। খুরশিদের সঙ্গে নাকি মুজিবের আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সে কি, তা জানা যায় নি। অন্ততঃ মুজিব কোন মন্তব্য করেন নি।

১৩ই মার্চের খবর, সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রতিরক্ষা-কর্মীদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যদি অবিলম্বে কাজে যোগ না দেন তো কর্মচ্যুত হবেন। পালিয়ে থাকলে বা গেলে দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারবে। ঢাকা বেতারকেন্দ্রে এই সাবধানবাণী প্রচারিত হলেও আওয়ামী লীগের কোন মন্তব্য জানা গেল না, পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগ এই বলে প্রতিবাদ জানালেন যে, যে-গমবাহী মার্কিন জাহাজটি চট্টগ্রাম আসবার কথা ছিল তা করাচীতে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঐ গম ছিল ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত ব্যক্তিদের ক্ষুৎনিবারণের জন্য।

এদিকে লাহোরে ভুট্টো-ইয়াহিয়া মোলাকাৎ। নির্বাচনের পর থেকে এমন মোলাকাৎ ও সল্লা খুবই হচ্ছিল। বাঙলাদেশে অসামরিক প্রশাসন কার্যত তখন শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগের করায়ত্ত, তাঁদেরই নির্দেশে সব কাজ চলছে। কর্মচারীরা আর কারও কাছ থেকে আদেশ নেন না।

তারপর ১৫ই মার্চ : অমৃতবাজার পত্রিকার শিরোনামা :

'Bangladesh' on verge of Independence
Mujibar takes over civil control
Yahya Khan rushes to Dacca
Confrontation likely ahead

স্বাধীনতার প্রান্তে

'বাংলাদেশ' স্বাধীনতার প্রান্তে এসে পড়েছে, মুজিবরের হাতে অসামরিক প্রশাসন, ইয়াহিয়া ছুটেছেন ঢাকা, সম্মুখের আশংকা। ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার ছুটে এলেন কলকাতায়। আওয়ামী লীগ-নেতা অসামরিক প্রশাসন-ভার নেবার যে ঘোষণা করেছেন তা প্রতিরক্ষা কর্মীদের উদ্দেশে সামরিক কর্তৃপক্ষের সতর্কবাণীর পরে পরেই। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাবলেই সাড়ে সাত কোটি মানুষের অসামরিক প্রশাসনভার হাতে নিলেন। বাঙলাদেশের মুক্তির জনাই তিনি এ ভার নিলেন। বাঙলাদেশের মানুষেরা যেন সর্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তিনি এই সম্পর্কে ৩৫ দফা নির্দেশ জারী করেন।

এদিনই বিকেলে ইয়াহিয়া উড়ে এলেন ঢাকায়। রেডিও পাকিস্তান দিল এই খবর, তার আগে 'ঢাকা বেতারকেন্দ্র' শোনাল এক গুচ্ছ স্বদেশী সঙ্গীত।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকায় পেঁৗছোবার কিছু আগে অবাঙালী শরণার্থীরা শান্তিরক্ষী আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকসহ বাঙালী জনসমাবেশের ওপর গুলী চালায়। ঘটনাটি হয় ঢাকা বিমান ঘাঁটির কাছাকাছি। প্রেসিডেন্টের যাবার পথ রণসাজে সজ্জিত ছিল, সৈন্য মিলিসিয়া, প্রেসিডেন্ট-ভবনে মেসিনগান। পূর্ব পাকিস্থানে আরও সৈন্য আসছে।

ঢাকা, ১৬ই মার্চের খবর, ইয়াহিয়া-মুজিবর আলোচনা আরম্ভ হল। শেখ তাঁর সাথীদের বললেন, তিনি যদি তাঁদের মধ্যে না-ও থাকেন তবু যেন তাঁরা পার্টির নির্দেশগুলো মেনে চলেন।

লোকে অবশ্য ভাবতে লাগল, একটা আপোষ হয়তো হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া যে যথেষ্ট সৈন্যাবতরণের জন্য কালহরণ করছেন এ সন্দেহ কারও কারও হলেও আলোচনার মুখোসটা রইল ইয়াহিয়ার মুখে। এমন কি, এমনও গুজব রটল যে, গুলী চালনার তদন্ত হবে। অসমাপ্ত আলোচনার এক পর্যায়ে শেখ মুজিবকে বলতে হল, আমরা চিরকাল দাস হয়ে থাকতে পারিনে, শহীদদের রক্তদান বৃথা যেতে দিতে পারিনে, এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়, সংগ্রামে নামব। আল্লা আমাদের সহায়। বাঙলাদেশবাসীর ওপর খবরদারী করবার কোন অধিকার বিদেশী সৈন্যের নেই। ইয়াহিয়া যখন ফিরে যাবেন তখন যেন তিনি তাঁর সৈন্যদেরও নিয়ে যান।

না, ইয়াহিয়া সৈন্যদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন নি। ঢাকার ১৯এ মার্চের খবর, ঢাকার কাছে জয়দেবপুরে নিরস্ত্র জনতার ওপর সেনাবাহিনী গুলী চালায়, অন্তত ২০ জন নিহত, বহু আহত হয়। এই খবরে মুজিবর এমনই বিচলিত হন যে, পরবর্তী ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ভুট্টো সদলে ঢাকায় আসেন আলোচনার জন্য। ভুট্টোর আগমনের পর আলোচনা অবনতির দিকে যায়।

ঢাকার ২২এ তারিখের খবর : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আজ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী করে দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দেবার ধূম্রজাল সৃষ্টি করেই তিনি এই কপট ঘোষণাটি করেন। সম্ভবত শেখ মুজিবের সন্দিগ্ধ মনেও কিছু বিশ্বাস উদ্রেক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর যতটা সতর্ক হওয়া উচিত ইয়াহিয়া তাঁকে ততটা সতর্ক না হবার কৌশল করেছিলেন। ইয়াহিয়ার পেছনে জোড়া হাতে শানানো অস্ত্র ছিল। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা বা সংবাদপত্রও এজন্য কিছুটা দায়ী। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ বেরোল — পূর্ব পাকিস্তান— বাঙলাদেশ— স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেল। শুধু পূর্ব পাকিস্থান নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশেও পৃথক সরকার হবে। ইয়াহিয়া ঘোষণায় উন্মুখ।

আসল জবাব বন্দুকের মুখে

আসল খবরটা পাওয়া গেল, পাক সেনাবাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে। ছয় জাহাজ খান-সেনা নেমেছিল চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে। কমসেকম ৬০,০০০। আস্তানা গেড়েছিল ঢাকা, কুমিল্লা, যশোরে। সম্ভবত চীন-ব্রহ্ম হয়ে কিছু সৈন্য বিমানে ঢাকায় এল। তারপর আর এক সর্বাত্মক অপ্রাকৃতিক ঝড়ে সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে গেল। যে-তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল সেই ২৫এ মার্চই ইয়াহিয়া উড়লেন ইসলামাবাদের উদ্দেশ্য, একাই গেলেন এবং সেনাদের যথাবিধি করবার জন্য রেখে গেলেন, স্থানীয় সর্বকর্তৃত্ব রইল টিক্কা খানের ওপর। খবরের অন্ধকার ছাপিয়ে পড়বার আগে যে সামান্য সংবাদ ঝিলিক দিয়েছিল তাতে দেখা যায়, নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলী চালিয়ে খানসেনারা ৫৫টি মৃত ও ২০০টি আহত বাঙালীর ফসল তুলেছে। শেখ মুজিবের কণ্ঠ তখনও রুদ্ধ হয় নি। তিনি বললেন, বিনা জবাবে এই হত্যাকাণ্ডের উপসংহার হবে না। গোলমালের সূত্রপাত চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী নামানো নিয়ে। স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি বাঙলাদেশকে সার্বভৌম, স্বাধীন ও লোকতন্ত্রী বলে ঘোষণা করলেন। ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যাবার পরই তিনি এই ঘোষণা করেন। বললেন, আমরা বিড়াল কুকুরের মত মরব না, মরতে হয় বাঙলামায়ের সুযোগ্য সন্তান হিসাবেই প্রাণ বিসর্জন দেব।

ইয়াহিয়াও এক বেতার ভাষণ দিলেন এবং আওয়ামী লীগকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন ২৬-এ মার্চ। বললেন, শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু। কিন্তু এই দিনই প্রশ্ন উঠেছিল : মুজিব কোথায়? ঢাকা থেকে সর্বত্র পাক মিলিটারীর তাণ্ডবে বাঙালীর রক্ত ঝরছে। ১৬-দফা জঙ্গী-ফর্মাণ জারী হয়েছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, বরিশাল, রাজসাহী, যশোর — শহরে-শহরে কার্ফু। মুজিব কোথায়? রহস্যের কুয়াসায়।

দুর্ধর্ষ বাংলাদেশ গেরিলাবাহিনীর কয়েকজন

স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্রের সূচনাও এই দিন থেকে। বাঙালীদের প্রতিরোধের খবর আসতে লাগল—এখানে ওখানে সর্বত্র, সত্য থেকে মিথ্যা, মিথ্যা থেকে সত্য যাচাই করা কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু এই জঙ্গল থেকে একটা নির্মম সত্য প্রকাশ পেল, আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত হাজার হাজার সেনাবাহিনী নিরস্ত্রপ্রায় বাঙালী নিধনলীলায় মেতে গিয়েও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে লাগল। বাঙলাদেশের পক্ষে এই সময়ই রাষ্ট্রপুঞ্জ ও আফ্রো-এশিয়ান জাতিসমূহের কাছে নিষ্ফল আবেদন জানান হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা বাঙলার মাটিতে এক অদ্ভুত ফসল।

২৭এ তারিখেই শোনা গেল, এরই মধ্যে লাখখানেক মানুষের অপমৃত্যু ঘটেছে সেনাবাহিনীর আস্ফালনে। ভারতীয় লোকসভায় প্রবল উত্তেজনার মধ্যে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, ভারত যথাসময়ে তার ইতিকর্তব্য স্থির করবে।

প্রথম প্রথম, বহু জায়গায়, খানসেনারা না পৌঁছোনো পর্যন্ত, মুক্তিসেনাদের আধিপত্য ছিল।

ব্যাপক গণহত্যার খবর আসতে লাগল অন্য সূত্রে। প্যারিসের ২৮এ মার্চ তারিখের এক খবরে নির্মম কাহিনী প্রকাশ পায়। সেই সূত্রেই খবর পাওয়া যায়, সব বিদেশী সাংবাদিককে এক জায়গায় জড় করে সিংহলগামী বিমানে তুলে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ, পাকিস্তান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সংবাদের একমাত্র সূত্র রইল খানসেনাবাহিনী। তবু, ঐ সব বিদেশী সাংবাদিকের বয়ানেই বহু কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে।

সে কাহিনী দীর্ঘ ও বিস্তারিত। ২৫এ মার্চ থেকে ৬ই ডিসেম্বর। (বাঙলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দানের তারিখ) পর্যন্ত শুধু বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলোই এখন বলে যাব। একদিন যখন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হবে বাঙলাদেশের তখন ইতিহাসবিদ এসব যাচাই-বাছাই করে নেবেন। ২৮এ মার্চ স্বাধীন বাঙলা বেতার-কেন্দ্র থেকে অস্থায়ী বাঙলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা করা হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের [illegible] স্বীকৃতিদানের আবেদন জানান হয়। এই অস্থায়ী সরকারের প্রধান ছিলেন মেজর জিয়া খান।

১লা এপ্রিল ভারতীয় সংসদ বাঙলাদেশের প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা জ্ঞাপন করে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রস্তাবটি লোক ও রাজ্যসভায় উত্থাপন করেছিলেন।

এই দিনের আর একটি খবর পাক-নৌবহরের বাঙালী সেনারা বিদ্রোহ করেছেন চট্টগ্রামে।

অস্থায়ী বাঙলাদেশ সরকারের রাজধানী চুয়াডাঙায় খানসেনারা নাপাম বোমা ফেলে বলে খবর পাওয়া যায় ৩রা এপ্রিল। বাঙলাদেশের অবস্থায় রুশ নেতা কোসিগিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ভারত সরকার দরবারে বাঙলাদেশ প্রতিনিধি

৪ঠা এপ্রিল অস্থায়ী বাঙলাদেশ সরকারের চারজন প্রতিনিধি ও ভারত সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার এই নিশ্চয়তা দেন যে, ভারত চুপ করে বসে থাকবে না। পর দিন তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে এও বলেন যে, পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্যকালে সংযমের প্রয়োজন।

৫ই এপ্রিল রাজ্যসভায় আবার দাবী ওঠে বাঙলাদেশকে স্বীকার করবার। ৭ই এপ্রিল চীনের বিরূপ কণ্ঠ শোনা যায়, ভারত নাকি পাক-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

মুজিব সম্পর্কে নানা গুজব চলছিল। ১৩ই এপ্রিল টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ৪ পৃষ্ঠায় মুজিবের বন্দীদশার একটি ছবি বেরোয়। তবু লোকের মনের সন্দেহ ঘোচে না। রুশ নেতা কোসিগিন ভারত ও পাক দূতের সঙ্গে কথা বলেন। চৌ পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। বাঙলাদেশের যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা গঠিত

হয় : সৈয়দ নজরুল ইসলাম—উপরাষ্ট্রপতি, তাজুদ্দিন — প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী — মনসুর আলি, খোন্দকার মুস্তাক আলি, এ এইচ এম কামরুজ্জমান। বাঙলাদেশ সরকার আবার স্বীকৃতির আবেদন জানান। ভারত থেকে বলা হয়, আবেদন করলে বিবেচনা করা হবে। ১৪ই এপ্রিল বাঙলাদেশের বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনের জন্য বিশ্ব-বাসীকে আমন্ত্রণ জানান বাঙলাদেশ সরকার। হানাদারদের রুখতে অস্ত্রেরও প্রার্থনা জানান। ১৬ই তারিখ জানা যায় চুয়াডাঙ্গা থেকে পাক আক্রমণের ফলে বাঙলাদেশ অস্থায়ী সরকারের সদর কার্যালয় সরিয়ে নিতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রবল জলধারার মত বাঙলা-দেশের শরণার্থীরা মেঘালয়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে এসে পড়েছে, আরও আসছে হাজারে হাজারে। এমনি করে এ পর্যন্ত এক কোটিরও বেশী বাঙালী শরণার্থী এসেছে এপ্রান্তে।

ভারত সরকার পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেন ১৫ই এপ্রিল। খানসেনাদের কার্যক্রমের ফলে এপ্রান্তের ভারতীয় নাগ-রিকরাও হতাহত হচ্ছে, এর পরিণামের দায়িত্ব হবে পাকিস্তানেরই। ১৮ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের প্রকাশ্য অভ্যুদয় ঘটে। প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন দাবী করেন বাঙলাদেশের ৯০ শতাংশ অঞ্চলে এই সরকারের হুকুমনামা চলছে। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সাংবাদিকগণ ছাড়াও ৫০ জন বিদেশী সাংবাদিক ছিলেন।

পাক-কূটনীতিকদের আনুগত্য

১৮ই এপ্রিল, কলকাতায় পাকিস্থানের ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন আলি বাঙলাদেশের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে কমিশন-ভবন-শীর্ষে বাঙলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। তারপর থেকে পাকিস্থানে ভারতের ও ভারতে পাকিস্থানের কূট-নীতিকদের নিয়ে এক অকারণ জট পাকিয়ে ওঠে। কলকাতা কমিশনের সব বাঙালী কর্মীই বাঙলাদেশের প্রতি অনুগত।

২২এ এপ্রিল জানা যায়, বাঙলাদেশ সরকার রুশিয়া, আমেরিকা, ১৬টি রাষ্ট্রের রাজধানীতে দূত পাঠালেন স্বীকৃতির আবেদন জানাতে।

২৩-এ পাক সেনারা হিলির ওপর গোলাবর্ষণ করে। ২৪-এ বনগাঁয়, হরিদাস-পুর ঘাঁটিতে অবিশ্রাম গোলা চালায়। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, পাক হামলা বরদাস্ত করা হবে না। ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ করে দিতে হয়। দেশে দেশে বাঙালী কূটনীতিকেরা বাঙলাদেশের প্রতি আনুগত্য জানাতে থাকেন। ২৭এ এপ্রিল আবার ভারতীয় এলাকায় পাকিস্থানীরা গুলী চালায়, কয়েকজন ভারতীয় মারা যায়। ২৯-এ এপ্রিল আবার পাক সেনারা বয়রা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকতে চেষ্টা করে। ৩০-এ এপ্রিল আবারও এবং ভারতীয় সীমান্তে পাক সেনাদের জোর টহল চলে। ১লা মে একটি ছোট মেয়ে ওদের গোলায় মারা যায়। ২রা মে তারিখেও গোলাবর্ষণের পুনরাবৃত্তি করে পাক সেনারা। ৪ঠা মে নিউইয়র্কে বাঙলাদেশ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি গিরির কাছে স্বীকৃতির অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন নজরুল ইসলাম।

শরণার্থী ত্রাণের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাহায্য করবে বলে মিঃ মেস ঘোষণা করেন বলে জানা যায় ১০ই মে। ১১ই মে পাকিস্থানের গুলী এসে লাগে আগরতলায়—একজন মারা যায়। ১৫ই তারিখেও ভারতীয় এলাকায় গুলী। ঐ তারিখে ভারত পাকিস্থানকে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিতে বলে। ১৬ই প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের ওপর শরণার্থীর দুঃসহ ভার, পাকিস্থানের ওপর চাপ দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বশক্তির কাছে আবেদন জানান। সীমান্তের ওপর পাক গোলাবর্ষণ ও গোলায় ভারতীয়ের মৃত্যু চলছেই। (২১ মে) প্রচন্ড গোলাবর্ষণের পর সীমান্ত ঘাঁটি সুতার-কান্দিতে পাক সৈন্যের প্রবেশ (২৪ মে)। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাঙলা গণহত্যা বন্ধ করতে হবেই। মেঘালয়ে পাক গোলাবর্ষণে নয়জন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী ও ১৩ জন অসামরিক নাগরিক নিহত হয়। ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী আর একবার বিশ্ববাসীকে বাঙলাদেশে হস্তক্ষেপের আবেদন জানান।

২৭-এ মে ভারতের পক্ষে ঘোষণা করা হয় পাক হানাদার নিবৃত্ত করতে ভারত কোন প্রতিবন্ধক মানবে না। পাকিস্থানীরা এদিন ডলুতে গোলা ছোঁড়ে। ২৯এ নতুন নতুন এলাকায়, বসিরহাটে দুজন মারা যায়। সংবাদ—পাকিস্থানী কমান সীমান্তে সন্নিবেশ করা হয়। শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ (৩০ মে)।

চীন পাকিস্থানকে দুই ডিভিসন সৈনা সজ্জায় অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। পক্ষান্তরে, ভারত প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপনের জন্য দেশে দেশে দূত পাঠাবে স্থির করে। প্রেসিডেন্ট নিকসন ইয়াহিয়াকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত উদারক সুরু করেন (১লা জুন)। ৬ই জুন সর্দার স্বরণ সিং মস্কো পেঁাছোলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ গেলেন লন্ডন থেকে ওয়াশিংটনে। কি ভিত্তিতে তথাকথিত 'রাজনৈতিক মীমাংসা' হতে পারে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার একটি চার দফা শর্ত দেন। তার মধ্যে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি অন্যতম। ৯ই জুন জানা যায়, বাঙলাদেশে পাঁচ ডিভিসন খান সেনা ও তিব্বত সীমান্তে পঞ্চাশ হাজার চীনা সৈন্য আছে। ১১ই জুন মার্কিণ সেনেটে পাকিস্থানকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান বন্ধের জন্য এক যুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীমতী গান্ধী এই আশা ব্যক্ত করেন যে, বিশ্ব জনমতের চাপে পাকিস্থান শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মীমাংসা করতে পারে। স্তিন ১৭ই জুন বলেন, শরণার্থী-দের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ভারত সঙ্কল্পবদ্ধ। ১৮ই জুন পাকিস্থানীদের অবিরাম গোলাবর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আবার বাঙলাদেশ স্বীকৃতির দাবী জানান সংসদ সদস্যগণ। ২০-এ জুন প্রধানমন্ত্রী সবাইকে পাক আক্রমণ রুখতে প্রস্তুত হবার জন্য বলেন। জানা যায়, দুটি পাক জাহাজে মার্কিন সমরাস্ত্র আসছে (২৩ জুন)। ২৪ জুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেন, ভারত পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। ২৮এ জুন ইয়াহিয়া জানান, তিনি তাঁর নিজস্ব সংবিধান দেবেন পাকিস্থানকে। মার্কিণ পদস্থ ব্যক্তিরা জানান, আমেরিকার পাকিস্থানকে সাহায্য দান বন্ধ করা হবে না। ৯ই জুলাই জানা যায় সাড়ে তিন কোটি ডলার মূল্যের মার্কিণ অস্ত্রপাতি সরবরাহ পথে রয়েছে। জয়প্রকাশ বলেন, পেন্টাগনের সংগে পাকিস্থানের আঁতাত আছে। ভারতীয় লোকসভায় পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের দাবী তোলা হয়।

বিশ্বব্যাঙ্ক টিম পাকিস্থানকে সাহায্য দান স্থগিতের জন্য সুপারিশ করেন। কানাডিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পাকিস্থান বিভাগই একমাত্র সমাধান (১৪ জুলাই)।

ইয়াহিয়ার হুমকি

১৯এ জুন ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দেন, বলেন, পাকিস্থান একক নয়। ২০-এ জুনের খবরে প্রকাশ, আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষক বসাতে চাইছে দুই সীমান্তে. বাঙলাদেশ সরকার মুজিবকে রক্ষার আবেদন প্রচার করেন, বাঙলাদেশে চীনা সৈন্য রয়েছে। ভারত সরকার পাক-সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করলে পাক-বিমানকে গুলী করে নামানো হবে (২৪ জুলাই)। ভারত-পাক সীমান্তে উ থান্টের পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব ভারত অগ্রাহ্য করে (৩০-এ জুলাই)। ৬ই আগস্ট পাকিস্থান আবারও যুদ্ধের হুমকি দেয়। গ্রোমিকো ছুটে আসেন দিল্লীতে জরুরী আলোচনার জন্য। ভারত আমেরিকাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য বৈরী আচরণ বলে গণ্য হবে।

৯ই আগস্ট ভারত ও রুশিয়া ২০ বছরের মেয়াদে এক শান্তি ও সৌহার্দের চুক্তি স্বাক্ষর করে। তাতে এই এক শর্ত থাকে যে যে-কেউ আক্রান্ত হলে উভয়েই আক্রান্ত বলে গণ্য হবে, জরুরী অবস্থায় পারস্পরিক পরামর্শ হবে। কেনেডিকে পাকিস্থান যেতে দেওয়া হল না, গ্রোমিকোও গেলেন না। স্বরণ সিং লোকসভাকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভারত-রুশ চুক্তি কোন কিছুর প্রতিবন্ধক নয়।

১১ই তারিখের এক খবরে প্রকাশ পায়, মুজিবের বিচার নাকি আরম্ভ হয়েছে। ১২ আগস্ট দীর্ঘ লাঞ্ছনার পর ভারতীয় কূটনীতিবিদরা সপরিবারে দেশে ফিরলেন। মুজিবের কোন ক্ষতি হলে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ সৃষ্টি হবে বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সতর্ক করে দেন।

১৪ই আগস্ট পাক-নাশকেরা অসমে একটি মালগাড়ী উড়িয়ে দেয়। আগরতলা বিমানঘাঁটিতে ১৬ই আগস্ট পাক-গোলা এসে পড়ে। ২১-এ করিমগঞ্জে আর একটি ট্রেন উড়োবার পাক চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাঙলাদেশে টিক্কা খাঁর বদলে অসামরিক গবর্ণর হলেন ডাঃ মালিক। ২৮-এ আগস্ট চৌ ঘোষণা করেন, তিনি ভারতকেও বৃহৎ শক্তিদের হাত থেকে উদ্ধার করতে চান।

১লা সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া বিশ্ববাসীকে জানান : মুজিব জীবিত, জেলে। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের খবর, পাকিস্থান বিদেশে পাক-কূটনীতিকদের পাস-পোর্ট বাতিল করে দিয়েছেন। ইয়াহিয়া মুজিব ও তাঁর অনুগামীদের বাদে সবার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন বলে জানান (৫ই সেপ্টেম্বর)।

৯ই সেপ্টেম্বর বাঙলাদেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। করিমগঞ্জে সময়মত একটি বোমা নজরে পড়ায় ট্রেনটা বেঁচে যায়।

ইয়াহিয়া ইরাণের কাছে ধর্ণা দেন ১৪ই সেপ্টেম্বর। রুশ নেতা পোদগোর্নি বলেন, পূর্ববঙ্গের সমস্যা না মিটলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভয়ের কারণ আছে। ১৫ই আগস্ট পাথরকান্দি স্টেশনের পাঁচটি পেট্রোল বোমা পাক-নাশকদের আবার ট্রেন ওড়াবার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। কিন্তু করিমগঞ্জে ১৬ই তারিখ ট্রেন উড়ে যায়। ১৮ই সেপ্টেম্বর ২৪টি রাষ্ট্র সম্মেলনে শেখ মুজিবকে মুক্তির দাবী জানানো হয়।

২৬-এ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মস্কো রওনা হয়ে গেলেন। ২৮-এ সেপ্টেম্বর ক্রেমলিনের ভোজসভায় রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন পূর্ববঙ্গ সমস্যার দ্রুত রাজনৈতিক সমাধানের আবেদন জানান। সেখানে এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়, এই সমাধান পূর্ববঙ্গবাসীর অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করতে হবে। ১লা অক্টোবর জানা যায়, পোদগোর্নি দিল্লী আসছেন। ইরাণে একতে ইয়াহিয়া পোদগোর্নি ও টিটোর সঙ্গে দেখা করেন। ১৬ তারিখে একটা পাক-নাশকতা ব্যর্থ হলেও ১৮ তারিখে একটা মালগাড়ীর চারটি বগী উড়িয়ে দেয়। ইয়াহিয়া ১৯ই ভারত-পাক আলোচনার প্রস্তাব করলে ১৯-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন

> No shaking of hands with clenched fist. We won't relax defence steps.

তিনি আরও বলেন যে, সীমান্তের অবস্থা সংকটাপন্ন। ভারত সরকার সাফ বলে দেন যে, সীমান্ত থেকে তাঁরা সৈন্য সরাবেন না, মার্কিণী 'সংযম প্রস্তাব' তাঁরা মানেন না। শ্রীশুক্লা ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, সমরযন্ত্র প্রস্তুত, পাক-আক্রমণের মোকাবিলা ভারত করবে। পাক-সেনারা সীমান্তে আরও ঘেঁষে আসে। আগরতলায় পাক গোলা পড়লে চারজন মারা যায়।

১লা নভেম্বরের খবর : সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা গুলীতে পাক গোলন্দাজেরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

২রা নভেম্বর মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নিকসন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে মৌখিক জানালেন যে, তিনি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক মীমাংসা চান।

৫ই নবেম্বর ভারতের পশ্চিম সীমান্তে হানাদার পাক বিমান বিতাড়িত হল। ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত দূত হিসেবে ভুট্টো হঠাৎ পিকিংয়ে হলেন হাজির। নিকসন-ইন্দিরা বৈঠক শেষ হল। নিষ্ফল। নিকসন নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল (৬ই নবেম্বর)।

ইয়াহিয়া খান

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৭ই নবেম্বর ঘোষণা করলেন, ভারত একাই লড়াইয়ে প্রস্তুত। ১২ই নবেম্বর বার বার তিনবার পাক বিমান ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১৩ই নবেম্বর। ভারতের নিরাপত্তা-বাহিনী চার ব্যাটেলিয়ান নিয়ে পাক আক্রমণ প্রতিহত করল।

তারপর একদিন

ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রম করেই আক্রমণোদ্যত পাক ট্যাঙ্ক বহরকে নিরস্ত করতে হল বয়রা সীমান্তের কাছে। যশোর সীমান্তও বটে। ১৩টি পাক ট্যাঙ্ক ধ্বংস হল আর ধ্বংস হল তিনখানি ওদের স্যাবার জেট, দুজন পাক বৈমানিক বন্দী। ভারত সরকার বললেন, আত্মরক্ষায় শত্রুকে নিরস্ত করতে ভারতীয় বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করবে (২৪-এ নবেম্বর)। মুক্তি-বাহিনী যশোরের ওপর চাপ রেখে চলল। সীমান্ত থেকে সৈন্যাপসরণের মার্কিণ প্রস্তাব ভারত অগ্রাহ্য করল (২৫ নবেম্বর)। হিলির কাছে আর একটা পাক ট্যাঙ্ক ধ্বংস হল। ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

২৭-এ নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জে বেলজিয়াম এক শান্তি প্রস্তাব দিলেন। পাক সৈন্যেরা বালুরঘাটে গোলা ছুঁড়ল, তিনজন মারা গেল এ প্রান্তে। বেলজিয়ামের প্রস্তাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেই বললেন, এই জাতীয় প্রস্তাবের উদ্যোক্তারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু দেখে না। সোভিয়েট রুশিয়া বাধা দিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জকে এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে। ইয়াহিয়া-বন্ধু নিকসন চিঠি পাঠালেন কোসিগিন, ভারতের প্রধান-মন্ত্রী ও ইয়াহিয়াকে। অভিভাবকতার চাড়।

৩১-এ নবেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, কোন কথার আগে পাক বাহিনীকে বাঙলাদেশ ছেড়ে যেতে হবে। ভারতীয় বাহিনী বালুরঘাট-হিলি সীমান্তে পাক-আক্রমণ প্রতিহত করে।

২রা ডিসেম্বর বেলা সাড়ে বারোটায় তিনটি পাক স্যাবার জেট বিনা প্ররোচনায় আগরতলা বিমান বন্দরের আশেপাশে বোমাবর্ষণ করে। বহু অসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আবার স্পষ্ট করে বলেন, ভারত যখন আক্রমণ করছে না তখন যে যাই বলুক তাতে ভারতের কিছু যায় আসে না।

৩রা ডিসেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় যখন এক বিশাল জনসমাবেশ সম্বোধন করে বলছিলেন, ভারত প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত, তখনই পাকিস্থান পশ্চিম সীমান্তে বিমান ও ট্যাঙ্ক নিয়ে ভারত ভূখণ্ডের ওপর নগ্ন আক্রমণ চালায়। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের নানা জায়গায় বোমা ফেলে, বিমানঘাঁটিগুলোই ছিল তাদের লক্ষ্য। ভারতও পাল্টা আক্রমণের আদেশ দেয়, ভারতের রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে এ এক সর্বাত্মক লড়াই।

৪ঠা ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী বাংলা-দেশে মুক্তিবাহিনীর সহযোগে পাকিস্থানী রক্ষাব্যূহ দ্রুতগতি ভেদ করে যায়। একই সঙ্গে স্থল, জল ও বিমান বাহিনী এই আক্রমণ চালায়। পশ্চিমেও তুমুল যুদ্ধ চলে। পাকিস্থানের ৩৩টি বিমান খোয়া যায়। পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতের রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন, বাংলাদেশকে মুক্ত করাই ভারতের লক্ষ্য। ভারত সরকার পাক বন্দর-গুলো অবরুদ্ধ করার হুকুম দেন।

বাঙলাদেশে মুক্তিবাহিনীর সহযোগে ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধ সম্পূর্ণ বাঙলাদেশ ও ভারতের অনুকূলে যায়, যাচ্ছে এবং নিশ্চয়ই যাবে। এ আর কারো প্রত্যাহত করবার সাধ্য নেই। বাঙলাদেশ আজ বাস্তব। শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম খান-সেনাদের কবলমুক্ত হয়ে চলেছে আর বাঙলাদেশ সরকারের দখলে আসছে, সেখানে বাঙলাদেশ সরকারের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করেছে ভারতবর্ষই প্রথম এবং ঐ স্বীকৃতিপরোয়ানা নিয়ে কলকাতার সংবাদপত্রগুলো ৬ই অপরাহ্নে স্পেশ্যাল বের করেছে, কেননা, ৬ই ডিসেম্বরই বাঙলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির তারিখ। সংবাদ শিরোনামার নীচে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হল :

> New Delhi, Dec. 6. — The Government of India today has extended its recognition to the Government of Gana Prajatantri Bangladesh and this ceremonially proclaims birth of an independent sovereign democratic republic in this sub-continent.

সংসদ সদস্যগণ সোল্লাসে এই ঘোষণা গ্রহণ করলেন, দাঁড়িয়ে, টেবিল থাবড়ে, সোচ্চারে ধ্বনি দিলেন : 'জয় বাঙলাদেশ', ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ'।

এক নতুন রাষ্ট্রের—নবজাতকের ষষ্ঠী হল।

অমৃত

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

বহু আলোকচিত্র সমৃদ্ধ প্রত্যেকেরই সংগ্রহযোগ্য সুসজ্জিত এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে ৩১শে ডিসেম্বর।

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮

যাত্রা ॥ চলচ্চিত্র ॥ নাটক ॥ ফ্যাশন

তুষারকান্তি ঘোষ, পঙ্কু সেন, অমর ঘোষ, এন কে জি, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষতরু মুখোপাধ্যায়, অমলাশঙ্কর, সন্ধ্যা সেন, রঞ্জন মজুমদার, সুজাতা, গীতা সেনগুপ্ত, নন্দলাল ভট্টাচার্য।

* গল্প *

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
পরিমল গোস্বামী
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
বিশ্বনাথ বসু
কুমারেশ ঘোষ
বিশু মুখোপাধ্যায়
ভবানী মুখোপাধ্যায়

* কবিতা *

অন্নদাশঙ্কর রায়
বনফুল
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

* খেলাধুলা *

মতি নন্দী
শঙ্করবিজয় মিত্র
কমল ভট্টাচার্য
প্রশান্ত দাঁ
অমল দাশগুপ্ত
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
সুশান্তকুমার মিত্র
ক্ষেত্রনাথ রায়

দাম : ১·৫০, শুল্ক ২ পয়সা
মোট মূল্য : ১·৫২ পয়সা

নীলিমার জন্যে একদিন

সুবর্ণ ভট্টাচার্য

পরিচিত পাড়া। এক সময় নিয়মিত [illegible] ছিল। তারপর মধ্যে প্রায় দু-[illegible] বিরতি। এতদিন পর আসার [illegible] পাড়াটাকে নতুন লাগছিল। তাছাড়া [illegible] বিজন কলকাতা সম্বন্ধে এত কথা [illegible] ও পড়েছে যে যে-কোন পাড়াতে [illegible] অকারণেই গা ছম-ছম করে।

তাছাড়া সময়টা এখন দুপুর। রাস্তায় লোকজন বেশী নেই। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢোকার মুখেই একটা বাড়ীর রকে [illegible] ছেলেকে বসে থাকতে দেখে [illegible] যে ভয় ভয় করেনি তা নয়। তবে [illegible] সে ভয়টাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নীলিমাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

চার-পাঁচ মিনিট হাঁটবার পরই সে নীলিমাদের বাসায় পৌঁছে গেল। সদর দরজাটা খোলা ছিল। নিচে আর এক ঘর ভাড়াটে থাকে। নীলিমাদের বাসার একতলাটা এত অন্ধকার যে সিঁড়িটা খুঁজে বার করাই কঠিন। তাছাড়া রাস্তা ছেড়ে এ বাড়ীর একতলায় প্রথম ঢুকলে অন্ধকার আরও বেশী মনে হয়। সিঁড়িটা খুঁজে বার করতে বিজনের দু এক মিনিট দেরী হল। তারপর অন্ধকারটা চোখ সয়ে যাবার পর বিজন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। নীলিমারা দোতলাতেই থাকে।

বিজন দরজার কড়া নেড়ে প্রথমে ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পেল না। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়ার পর একজন ভদ্রমহিলার গলা পাওয়া গেল—কে?

বিজন বলল, আমি।

ভদ্রমহিলা ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোত্থেকে আসছেন? আপনার নাম কি?

বিজন একটু বিস্মিত না হয়ে পারল না। এতদিন সে এ-বাড়ীতে এসেছে কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম হল। তারপর ভাবল এখন কলকাতার যা অবস্থা তাতে চট্ করে একজন মানুষকে বিনা পরিচয়ে ঘরে ঢুকতে দিতে অনেকেই চাইবে না।

সে বলল, আমি বিজন। সিন্থী থেকে আসছি।

এবার দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ পাওয়া গেল। একজন বিধবা ভদ্রমহিলা দরজার একটা পাল্লা একটু খুলে বিজনকে

দেখে যেন নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর বললেন, এসো, ভিতরে এসো।

ভদ্রমহিলাকে বিজন চিনতে পারল। নীলিমার জ্যাঠাইমা।

বিজন ঘরে ঢুকতেই তিনি আবার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, তুমি কিছু মনে করনি তো? আজকাল যা দিনকাল পড়েছে তাতে চট করে কাউকে দরজা খুলে দিতে ভয় করে। যদি কেউ ঢুকে পড়ে। বাড়ীতে তো এখন কোন পুরুষ নেই।

না না, মনে করব কেন জ্যাঠাইমা। আমি কলকাতায় না থাকলেও কিছু কিছু খোঁজ-খবর তো রাখি। বিজন বলল।

নীলিমার জ্যাঠাইমা পাশের ঘরে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বললেন, ছোটবৌ, দেখ কে এসেছে।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বিজনকে দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি! কবে এলে সিন্ধ্রী থেকে?

—কাল রাতে।

বিজন নীলিমার মাকে প্রণাম করল। তারপর সৌজন্যের খাতিরে নীলিমার জ্যাঠাইমাকেও প্রণাম করল। যদিও সে এসব প্রণাম-টনাম করা পছন্দ করে না, তবুও সে জানে এখনও নীলিমার মা-জ্যাঠাইমার মত কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রণাম পেলে খুশী হন।

—থাক বাবা। বোসো, বোসো। নীলিমার মা বললেন।

বিজন একটা সোফার উপর বসে পড়ল। এটা বোধহয় নীলিমার বাবার বসবার ঘর। ভদ্রলোক ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে প্র্যাকটিস করেন। আলমারি ভর্তি আইনের বই। টেবিলের উপর ফোনটাও সে দেখতে পেল।

নীলিমার মায়ের চেহারা প্রায় এক রকমই আছে। শুধু মুখের উপর বয়সের ছাপ পড়েছে এই যা তফাৎ। তাছাড়া দু'বছর আগে তাঁর চোখে চশমা ছিল না। এখন চশমার ভিতর থেকে বিজনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে দেখে বিজনের মনে হল তিনি বোধ হয় শুয়েছিলেন। বিজন এসে তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাল।

—তুমি কত দিন পর এলে। নীলিমার মা বললেন।

—হ্যাঁ। প্রায় দু'বছর হল।

—তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?

—এখন ভালই আছেন। তবে মধ্যে বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না।

—তোমার বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে?

বিজন ভাবল নীলিমার মার তাদের বাড়ীর সব কথাই মনে আছে।

—এক বোনের বিয়ে হয়েছে আর একটি ক্লাশ টেনে পড়ে।

—তোমার ভাইটি কি করছে?

বিজন এইসব আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে চাইছিল না। যে প্রশ্নটা করবার জন্য সে ছটফট করছিল সেটা না করতে পারা পর্যন্ত সে খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু বাধ্য হয়েই নীলিমার মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেই হল : ও তো বি-এসসি পাশ করে বসে আছে।

—আর পড়ছে না?

—না, কোথাও চান্স পাচ্ছে না।

নীলিমার মা কি যেন ভাবছেন মনে হল। 'তোমরা কথা বল। আমি আসছি—' বলে নীলিমার জ্যাঠাইমা পাশের ঘরে চলে গেলেন। বিজন ভাবল নীলিমা নিশ্চয়ই বাড়ীতে নেই। যদি থাকত তাহলে এতক্ষণে এ-ঘরে নিশ্চয়ই আসত।

শেষ পর্যন্ত সে নীলিমার মাকে শুধোল, নীলিমা কোথায়?

—বুলবুলি? বুলবুলি তো বাড়ী নেই।

বিজন নীলিমার এই ডাক-নামটা অনেক দিন পর শুনতে পেল। নীলিমা সামনে থাকলে নিশ্চয়ই লজ্জা পেত।

—কোথায় গেছে? বিজন আবার শুধোল।

—ও তো সিনেমা দেখতে গেছে।

বিজন হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল তখন প্রায় তিনটে বাজে।

—কখন গেছে?

—এই তো তুমি আসার মিনিট দশ-পনেরো আগে।

বিজন ভাবল আর দশ-পনেরো মিনিট আগে এলেই হত। তাহলে সে নীলিমার দেখা পেত।

—কোন্ হলে গেছে? বিজন যেন শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়। যদি এখনও নীলিমাকে ধরা যায়।

—তা কি আমি জানি। এখানে তো কত সিনেমা হল আছে।

সেকথা ঠিক। কিন্তু বিজন এখন কী করে? তার পক্ষে নীলিমার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সন্ধ্যার আগেই সে এখান থেকে চলে যেতে চায়। কখন কি হয় বলা তো যায় না। কাল ভোরে তাকে সিন্ধ্রী ফিরে যেতে হবে। সুতরাং নীলিমার সঙ্গে তার দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ এবার সে আশা করেছিল যে নীলিমার সঙ্গে দেখা হবেই। নীলিমার মা বা জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তো আর সে সিন্ধ্রী থেকে ছুটে আসে নি। পরপর দুটো চিঠি দিয়েও সে নীলিমার কোন উত্তর কেন পায়নি সেটা তার জানা দরকার।

—তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন?

—হ্যাঁ।

—বাবা-মা কি দেশের বাড়ীতে থাকেন?

—না, আমার কাছে নিয়ে এসেছি। কোয়ার্টার পেয়েছি।

নীলিমার মা দু-এক মিনিট কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, এবার একটা বিয়ে-টিয়ে করো।

নীলিমার মায়ের মুখে বিজন যেন অল্প হাসি দেখতে পেল। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি যে বলেন কাকীমা।

—কেন, অন্যায়টা কী বললাম? তোমার বিয়ের বয়স হয় নি?

বিজন কী বলবে ভেবে পেল না। বিয়ে করার বয়স তার হয়েছে। কিন্তু সে কথা তো আর নীলিমার মাকে বলা যায় না। তাই অন্য কথা বলতে হল, এখনও এক বোনের বিয়ে দিতে হবে।

—বোনের বিয়ের জন্য তোমাকে এখন থেকে ভাবতে হবে না। সে তো সবে ক্লাশ টেনে পড়ে।

—তাছাড়া চাকরিতে ঢুকেছি মাত্র দু'বছর—

নীলিমার মা কিছুতেই দমবার পাত্রী নন। বললেন, তাতে কী হয়েছে? তোমার চাকরি না থাকলেও তোমাদের সংসার অচল হবে না। তাছাড়া তোমার মায়েরও বয়স হয়েছে। তার কষ্টটাও একটু দেখা দরকার—

বিজন খুব বিব্রত বোধ করছিল। তবু সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, তার জন্য তো বোনই আছে।

—বোন লেখাপড়া করবে না সংসারের কাজ করবে? তাছাড়া সে তো আর চিরকাল তোমাদের বাড়ী থাকবে না।

বিজন ভাবল তার বিয়ে করার পক্ষে নীলিমার মা যেসব যুক্তি খাড়া করছেন তার কোনটাই খণ্ডন করতে পারছে না। সুতরাং এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো। সে তাই আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল নীলিমা [illegible] করবে ঠিক করেছে?

—কী আর করবে। বলছে তো বি-টি পড়বে।

বি-টি? বিজন নীলিমার বি-টি [illegible] কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। সে [illegible] বি-টি কেন?

—কে জানে? বলছে বাড়ীতে [illegible] শুধু বসে থেকে কী করবে? [illegible] বি-টি পড়াই ভালো। পাশ করলে [illegible] মাস্টারি-টাস্টারি পাবে।

—কোন কাজ নেই বলেই বি-টি পড়তে হবে? তার চেয়ে এম-এ পড়লেই হত।

—সে চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হল না।

—বি-টি কলেজে ওর অ্যাডমিশন [illegible] সেখানেও তো খুব ভিড় শুনেছি।

—ওর বাবার সঙ্গে কোন বি-টি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের আলাপ [illegible] তিনিই ওর ভর্তির ব্যবস্থা করে দেবেন [illegible] কথা দিয়েছেন।

—তাহলে অবশ্য অন্য কথা। বিজন বলল। কিন্তু নীলিমা স্কুলের দিদিমণির মত বি-টি পড়তে যাবে এটা তার [illegible] ভালো লাগছে না। একটা উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে কি বি-টি পড়ে? সে ঠাট্টা করে বলল, নীলিমাকে বলবেন বি-টি পড়লে ওর বিয়ে হবে না। ওটা ডিসকোয়ালিফিকেশন।

নীলিমার মা বিজনের কথায় হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, সে কথা তুমি বুলবুলিকে বলো।

—আমার সঙ্গে তো আর দেখা হচ্ছে না।

—কেন? তুমি কলকাতায় ক'দিন আছ?

—আমি কাল সকালেই সিন্ধ্রী চলে যাচ্ছি।

—সে কি! দুটো দিনও থাকতে পারবে না?

—উপায় নেই কাকীমা। অফিসে এক-দম ছুটি নেই।

নীলিমার মা চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বললেন, তোমরা বুলবুলির জন্য একটা পাত্র-টাত্র দেখে দাও না। ওর বাবা বলেছেন যদি তিনি ভালো পাত্র পান তাহলে ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন।

মুহূর্তের মধ্যে বিজনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নীলিমার মার সামনে সে তার প্রকৃত মনোভাব গোপন করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নীলিমার মা যে তাকেই নীলিমার জন্য পাত্র দেখতে বলছেন এটা তার কাছে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলেই মনে হল।

নীলিমার মা তখনও বলে চলেছেন, আমি বাপু বেশী দূরে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না। কলকাতার মধ্যে হলেই ভালো হয়। তাহলে বুলবুলি যখন ইচ্ছে তখনই বাপের-বাড়ী চলে আসতে পারবে—

তারপর বিজনকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে নীলিমার মা-ও চুপ করে রইলেন। বিজন ভাবল, তার কিছু বলা দরকার। না হলে নীলিমার মা কিছু মনে করতে পারেন। সে অতি কষ্টে মুখে হাসি টেনে বলল, হ্যাঁ কাছাকাছি বিয়ে হওয়াই ভালো। যাতে আপনি ইচ্ছে করলেই ওকে নিয়ে আসতে পারেন।

নীলিমার মা বিজনের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বললেন, সেই কথাই তো বলছি। তা তোমরা তো ওর দাদার মত। দেখ না চেষ্টা করে ওর জন্য। ওর বাবা বলেছেন যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার পাত্র হলেই ভালো হয়। না হলে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হলেও চলবে।

—আচ্ছা দেখব। বিজন থেমে থেমে কথাটা বলল। তার আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। নীলিমার মার কথা শুনে তার বারবার মনে হচ্ছিল এর জন্যই কি সে সিন্ধ্রী থেকে ছুটে এসেছে? নীলিমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সে স্বেচ্ছায় অফিসের কাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছে। অফিসের কাজ তো উপলক্ষ। মূল লক্ষ্য নীলিমা। না হলে সে ইচ্ছে করলে এ দায়িত্বটা এড়াতে পারত। সাধ করে কে আর এখন কলকাতায় আসতে চায়? কে আর জেনে শুনে হাংগামার মধ্যে পড়তে চায়? তবু যে সে এত ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় এসেছে সে তো নীলিমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই। ভাগ্যিস সে তার পুরোনো মেসে সিট পেয়েছিল। নাহলে কলকাতায় কোথায় যে সে রাত কাটাবে তার কোন স্থিরতা ছিল না। কলেজে-ইউনি-ভার্সিটিতে পড়ার সময় সে ঐ মেসেই দীর্ঘ পাঁচ বছর কাটিয়েছে। মেসের ম্যানেজার তাকে খাতির করে একটা সিংগল সিটের রুমও দিয়েছে। কাল রাতে সে খুব ক্লান্ত ছিল বলে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ সকালে সে কোন রকমে দু-মুঠো ভাত নাকে গুঁজে অফিসের কাজে বেরিয়ে পড়েছে। নীলিমার সঙ্গে দেখা করতে হবে এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে ছিল বলে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অফিসের কাজ সেরেছে। দুটো-আড়াইটা নাগাদ তার অফিসের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই সে নীলিমাদের বাড়ীর দিকে রওনা দিয়েছে। কিন্তু তার এত পরিশ্রম বৃথাই গেল। নীলিমার সঙ্গে দেখা হল না। উপরন্তু নীলিমার মার কথাগুলো তার বুক ভেঙে দিয়েছে।

বিজন হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল চারটে বেজে গেছে। সে বলল, তাহলে উঠি।

—না না, এখনই উঠবে কি? নীলিমার মা বললেন, বুলবুলি আসুক। তার সঙ্গে দেখা করে যাবে। সে তোমাকে দেখলে কত খুশী হবে—

—দেখা করব বলেই তো এসেছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে তো সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকা সম্ভব নয়। বিজন কথাটা বলে দু-এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর আবার বলতে শুরু করল—আজকাল কলকাতার যা অবস্থা হয়েছে তাতে কখন যে কী হয় তাতো বলা যায় না। তাছাড়া আমি তো আর এখন কলকাতায় থাকি না। বাইরে থাকি। কোন্ পাড়ার অবস্থা কি রকম তাও জানি না—

নীলিমার মা বললেন, সেকথা অবশ্য ঠিক। আমরাও তো বাড়ী খুঁজছি। ভালো বাড়ী পেলেই এ পাড়া ছেড়ে দেব। একদিক দিয়ে তোমরা কলকাতার বাইরে আছো ভালোই আছো।

—তাহলেই বুঝতে পারছেন আমি কেন উঠতে চাইছি—

নীলিমার মা কিন্তু তখনই তাকে ছাড়তে রাজী হলেন না। বললেন, যাবে, যাবে। অত ব্যস্ত হবার কী আছে? এতদিন পর তুমি এলে। তোমাকে যদি এক কাপ চা ও না করে খাওয়াই তাহলে বুলবুলি শুনলে কি আমায় আস্ত রাখবে? ও থাকলে ও-ই তোমায় চা করে খাওয়াতো।

—না, না। চা-টা লাগবে না—।

—তা কি হয়! তুমি বসো। আমি চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে আসি।

নীলিমার মা ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

বিজনের আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু নীলিমার মার অনুরোধটা না রাখলে তিনি খুব দুঃখ পাবেন। কাছেই কোথাও পরপর কয়েকটা বোমা ফাটার আওয়াজ পাওয়া গেল। কাল রাতেও মেসের বিছানায় শুয়ে সে এরকম আওয়াজ পেয়েছে। কলকাতার লোকেদের বোধ হয় এ-সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু বিজনের মনে শব্দগুলো বেশ আতংক সৃষ্টি করছিল। সে ঠিক করল চা খেয়েই সে উঠে পড়বে। আর দেরি করা উচিত হবে না।

বিজনের দৃষ্টিটা এলোমেলোভাবে চেয়ার-টেবিল বইয়ের র‍্যাক ক্যালেন্ডারের উপর দিয়ে ঘুরে নীলিমার একটা ফটোতে এসে আটকে রইল। ফটোটার মধ্য থেকে নীলিমা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। নীলিমা যেন তাকে বলতে চাইছে, কি, কেমন ফাঁকি দিলাম?

নীলিমা দেখতে মন্দ নয়। তার মুখটা গোল ধরনের। কপালটা ছোট। চোখ দুটো বড়ো বড়ো। ঠোঁট দুটো খুব পাতলা। মাথায় খুব চুল আছে। হাসলে দাঁতগুলো খুব সুন্দর দেখায়। অনেক দিন আগে যখন বিজন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তখন সে আর নীলিমা একদিন একসঙ্গে একটা ফটো তুলেছিল। সেই ফটোর দুটো কপি দুজনে নিয়েছিল। সে কথা তারা দুজন ছাড়া আর কেউ জানত না।

চা-টা খেয়ে বিজন নীলিমাদের বাড়ী থেকে যখন বার হল তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গলিটা পার হয়ে বড়ো রাস্তায় পড়ল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাল। এতক্ষণ সে নীলিমার মা-জ্যাঠাইমার সামনে সিগারেট ধরাতে পারে নি। বাড়ীতে যদিও সে মায়ের সামনে সিগারেট খায় কিন্তু এ'দের সামনে

কি রকম লজ্জা করছিল। শত হলেও এ'রা ছোটবেলা থেকে তাকে দেখেছেন। এক সময় তারা পাশাপাশি থাকত। তারপর বিজনের বাবার বদলি চাকরির জন্য তাদের মফঃস্বলে চলে যেতে হয়। নীলিমারাও বাসা-বদল করেছে। তবে কলকাতা ছাড়ে নি। তারপর থেকে দু পরিবারের ছাড়াছাড়ি। কিন্তু যোগাযোগ ছিল। বিজন যখন কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করত তখন ঘন-ঘনই আসত। তারপর বিজন সিন্ধীতে চাকরি নেবার পর থেকে এই যোগাযোগটা ছিন্ন হয়ে যায়।

বড় রাস্তায় এসে বিজন একটা বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়াল। সে ভাবল এখন কী করবে? অবশ্য এখন মেসে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু তার এখনই মেসের সেই ছোট ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের দু-একজনের বাড়ী সে চেনে। কিন্তু কোন্ অচেনা জায়গায় গিয়ে কী বিপদে পড়বে কে জানে।

একটা বাস এসে দাঁড়াতেই বিজন উঠে পড়ল। এখন শীতের বিকেল। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়ে আসে। পাঁচটাও বাজে নি। অথচ এরই মধ্যে বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

নীলিমার সঙ্গে দেখা হলো না এই কথাটাই তার বারবার মনে হচ্ছিল। সে খুব আশা করেছিল যে নীলিমার সঙ্গে তার দেখা হবেই। এখন তার মনে হচ্ছে যে সে যদি আসবার আগে নীলিমাকে একটা চিঠি দিত তাহলে হয়তো সে থাকত। তাহলে হয়তো নীলিমা সিনেমা দেখতে যেত না। আবার ভাবল, সে চিঠি দিলেই যে নীলিমা বাড়ীতে থাকত তার নিশ্চয়তা কি? অবশ্য সে ইচ্ছে করলে নীলিমাকে চিঠি লিখে রেখে আসতে পারত। কিন্তু তাতে কী লাভ হত? নীলিমার সঙ্গে তো আর দেখা হত না।

বাসটা এসপ্ল্যানেডে পেঁছোতেই বিজনের চিন্তায় ছেদ পড়ল। আলোয় লোক-জনের ভীড়ে গাড়ীর মিছিলে এসপ্ল্যানেড যেন গমগম করছে। বিজন ভাবল সে একটা সিনেমা দেখবে। অনেক দিন সাহেবপাড়ায় ইংরেজী ছবি দেখা হয় না। সে বাস থেকে নেমে পড়ল।

কোন্ হলে কোন্ ছবি হচ্ছে তাও তার জানা নেই। যে কোন একটা ছবি হলেই হল। আড়াই ঘন্টা সময় কাটানোটাই বড়ো কথা। শেষ পর্যন্ত সে লাইটহাউসে বেশী দামের একটা টিকিট পেয়ে গেল। ছবিটা বোধ হয় ভালোই হবে। হলে খুব ভিড় হয়েছে।

ছবিটা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝেই বিজন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। সে বারবার ছবিটায় মন বসাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না। তার মনে পড়ছিল নীলিমা তার সঙ্গে কম সিনেমা দেখে নি। এই লাইটহাউসেই সে একাধিকবার নীলিমাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে এসেছে। অন্ধকার হলে নীলিমাকে পাশে বসিয়ে সিনেমা দেখার মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আনন্দ ছিল। নীলিমা কিন্তু তার সংগে সিনেমা দেখার কথা বাড়ীতে ঘুণাক্ষরেও জানাত না। সেজন্য বিজনও নীলিমাদের বাড়ীতে সব কথা গোপন করে যেত। এমন কি নীলিমা যে তার সঙ্গে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করত, বেড়াতে যেত, সেকথা নীলিমার মা-বাবা কখনও টের পেতেন না। এভাবেই কয়েক বছর বেশ চলছিল। কিন্তু বাবা রিটায়ার করার পর বিজনকে বাধ্য হয়েই এম-এসসি পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিয়ে সিন্ধীতে চলে যেতে হল। নীলিমার ব্যাপারটা মোটেই মনঃপূত হয়নি। সে চেয়েছিল বিজন এম-এস-সি পাশ করে এখানেই অধ্যাপনা করুক বা গবেষণা করুক। বিজনের কলকাতা ছাড়ায় নীলিমার মোটেই মত ছিল না। অথচ বিজনকে সংসারের কথা ভেবেই বাধ্য হয়ে নীলিমার অমতে কাজ করতে হয়েছিল।

সিনেমা দেখে বিজন যখন ফিরল তখন নটা বেজে গেছে। মেসের ম্যানেজার বিজনকে দেখে বলল, আপনার কথাই ভাব-ছিলুম। সেই কোন সকালে বেরিয়েছেন—। এখন তো আবার দেরি করে ফিরলেই চিন্তা হয়।

বিজনের কথাটা ভালো লাগল। এখানে তার জন্য কেই বা ভাববার আছে? বলল, অনেক কাজ ছিল। সারতে সারতে দেরি হয়ে গেল।

সিনেমা দেখার কথাটা ইচ্ছে করেই আর বলল না।

ম্যানেজারের টেবিলের উপর রাখা ফোনটার দিকে নজর পড়তেই বিজনের মনে একটা নতুন চিন্তা এল। আচ্ছা, নীলিমাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? ওদের বাড়ীতে তো ফোন আছে। দু'বছর আগেও বিজনের নীলিমাদের ফোন নাম্বার মুখস্থ ছিল। কিন্তু এখন আর মনে নেই।

ফোন-গাইডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বিজন ম্যানেজারকে বলল, একটু দিন তো।

একটা চেয়ারে বসে বিজন ফোন-গাইডের পাতাগুলো উল্টোতে লাগল। কয়েক মিনিট চেষ্টা করার পর নীলিমাদের ফোন নাম্বার পাওয়া গেল। রিং করতেই একজন ভদ্রলোক বললেন, হ্যালো।

গলার স্বর শুনে মনে হল নীলিমার বাবা। বিজন বলল, নীলিমাকে একটু ডেকে দেবেন।

—আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি বিজন। সিন্ধির বিজন।

—ওঃ তুমি! কোত্থেকে ফোন করছ?

—আমার মেস থেকে।

বিজন নীলিমার বাবার সঙ্গে কী কথা বলবে ভেবে পেল না। ভদ্রলোক এত গম্ভীর প্রকৃতির যে বিজন তাঁর সংগে কোনদিনই খুব বেশী কথা বলার সাহস পায় না। সে অকারণেই বলল, আমি আজ আপনাদের ওখানে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ শুনলাম।

দু-তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর নীলিমার বাবা বললেন, সমরদা কেমন আছেন?

সমরদা হচ্ছেন বিজনের বাবা। বয়সে বড়ো বলে নীলিমার বাবা তার বাবাকে দাদা বলে ডাকেন।

—এখন ভালোই আছেন। প্রেসারে মাঝে মাঝে কষ্ট পান।

—বৌদির শরীর কেমন আছে?

—মা ভালোই আছেন।

—কতদিন দেখা হয় না। নীলিমার বাবার গলায় যেন আক্ষেপের সুর ফুটে উঠল।

এবার বিজন ভদ্রলোককে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলে ফেলল, নীলিমাকে একটু ডেকে দেবেন?

—বুলবুলিকে? ও তো বোধহয় শুয়ে পড়েছে। আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি—

ভদ্রলোক যে কাউকে ডাকছেন সেটা স্পষ্ট শুনতে পেল। নীলিমা এত তাড়া-তাড়ি শুয়ে পড়ে নাকি? জানা ছিল না তো।

একটু পরে নীলিমার বাবা বললেন, হ্যালো—

—বলুন। বিজন এ-প্রান্ত থেকে বলল।

—শোনো। বুলবুলি আসছে। তুমি একটু ধরে থাকো।

—আচ্ছা।

প্রায় দু মিনিট বিজন ফোনটা ধরে বসে রইল। ভাবছিল নীলিমাকে সে কী বলবে?

—হ্যালো। কে বিজনদা? নীলিমার গলা শোনা গেল।

—হ্যাঁ। তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

—না ঘুমোইনি। শুয়েছিলাম।

—কেমন সিনেমা দেখলে বল।

—ভালো। নীলিমা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

—কার সঙ্গে গিয়েছিলে?

—আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে।

—বান্ধবী না বন্ধু?

—কেন আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিজন একথার সরাসরি উত্তর দিতে পারল না। সে বলল, আমি আজ তোমার সংগে দেখা করবার জন্যই তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম।

—কী করব বল? আমি তো জানতাম না যে তুমি কলকাতায় এসেছো—

—হ্যাঁ আমারই ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে আগে জানিয়ে আসা উচিত ছিল। অবশ্য—

—অবশ্য কি?

বিজন কথাটা বলবে কিনা ঠিক করতে পারল না। বলল, না থাক—

—থাক কেন? বলেই ফেল না।

—না ভাবছিলাম যে তোমাকে আগে থাকতে জানালেই কি তুমি থাকতে?

—জানালে থাকতাম না ভাবছ কেন?

—এর আগে দুটো চিঠি দিয়ে তার উত্তর পাইনি।

—দুটো চিঠি দিয়েছ? কই আমি পাইনি তো।

বিজন ভাবল এটা মেয়েদের স্বভাব-সিদ্ধ। যে চিঠি তারা চায় না সে চিঠি তারা পেলেও অস্বীকার করে। সে বলল,

চিঠি দুটো যে তুমি পাওনি তা আমার দুর্ভাগ্য।

—আমারও দুর্ভাগ্য। নীলিমা কথাটা বলল বটে কিন্তু তার গলার স্বরটা কিরকম নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে।

—তোমার দুর্ভাগ্য কেন হবে? দুর্ভাগ্য আমারই। না হলে কলকাতায় একটা চাকরি জোটাতে পারলাম না। সিন্ধ্রী চলে যেতে হল।

—এখন কলকাতায় না থাকাই ভালো।

বিজন ভাবল এই নীলিমাই একদিন তার কলকাতা ছেড়ে বাইরে চাকরি নিয়ে যাওয়া পছন্দ করেনি। এখন সেই তাকে কলকাতায় না থাকার পরামর্শ দিচ্ছে। সে বলল, তা ঠিক। তবে কলকাতার লোকেরা তো সব পালিয়ে যায়নি। তোমরাও তো আছো।

—কেমন আছি নিজের চোখেই তো দেখে গেলে।

—কেন, বেশ তো আছো।

—তাই নাকি? তোমার তাই মনে হচ্ছে?

বিজনের একবার বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল, তুমি খাচ্ছো-দাচ্ছো ঘুরে বেড়াচ্ছো, বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা দেখাও চলছে—তুমি খারাপটা আছো কোথায়? কিন্তু সে তা বলল না।

মেসের ম্যানেজার একটা গলা-খাঁকারি দিল। বিজন খুব লজ্জা পেল। অনেকক্ষণ ধরে সে ফোনটা আটকে রেখেছে। এবার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

—নীলিমা কাল ভোরে আমি চলে যাচ্ছি।

—তাই নাকি? কেন দু-একদিন থেকে যাওনা।

—না ছুটি নেই।

—কী এমন রাজকার্য কর, তুমি। দু-একদিন ছুটি নিতে পার না?

বিজনের কানে রাজকার্য কথাটা ব্যঙ্গের মত শোনাল। সে বলল, নীলিমা, আমার কাজটা ছোট বলেই সব সময় হারাবার ভয় থাকে।

—ও। নীলিমা যেন একটা হাই তুললো বলে মনে হল।

—তোমার ঘুম পাচ্ছে?

একটু একটু পাচ্ছে। দুপুরে ঘুমোইনি তো।

—আচ্ছা আমি আর বেশীক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না।

—না-না এতে বিরক্তির কী আছে! নীলিমা যেন লজ্জা পেল।

—তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হত।

—কেন বল তো? নীলিমা শুধোল।

—দু'বছরে তোমার কতখানি পরিবর্তন হয়েছে দেখবার ইচ্ছে ছিল।

—কোন পরিবর্তন হয়নি। দু'বছর আগে আমার চেহারা যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে।

—কিন্তু নীলিমা তোমার বাইরে কোন পরিবর্তন না হলেও তুমি ভিতরে ভিতরে অনেক বদলে গেছ।

—তাই নাকি? নীলিমার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটে উঠল।

দেয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দশটা বেজে গেল।

বিজন বলল, নীলিমা একটা কথা বলব।

—বল।

—আমরা দুজনে একসঙ্গে একটা ফটো তুলেছিলাম মনে আছে?

—কোন ফটোটা? নীলিমা দু-এক সেকেন্ড ভেবে বলল, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে।

—সেটা কি এখনও তোমার কাছে আছে?

—খুঁজে দেখিনি। তবে বোধহয় আছে। কেন বল তো?

—ওটা তুমি ছিঁড়ে ফেলো।

নীলিমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বিজন ফোনটা নামিয়ে রাখল।

কাল ভোরে উঠতে হবে। বিজন তাই তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তার ছোট ঘরে ফিরে গেল। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। অথচ তার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু ঘুমোতে চাইলেই কি ঘুম আসে? বারবার তার মনে হচ্ছিল তার যে উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় আসা তাই ব্যর্থ হল। বৃথাই সে কলকাতায় এসেছে। না এলে তার কোন ক্ষতি হত না। সে না আসতে চাইলে অফিস তাকে জোর করে পাঠাত না। কিন্তু সে কি তখন ভাবতে পেরেছিল যে তাকে এতখানি হতাশ হতে হবে? সে কি ভাবতে পেরেছিল যে এতদিনের পরিচিত নীলিমা হঠাৎ এতখানি দুর্লভ হয়ে উঠবে? মাত্র দু'বছরেই নীলিমা যে তার কাছ থেকে এতখানি দূরে সরে যাবে, তা কি সে ভাবতে পেরেছিল? তার চেতনা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হবার পূর্ব মুহূর্তে তার মনে হল, নীলিমা নামে যে মেয়েটিকে সে চিনত সে এখন অনেক দূরে চলে গেছে। এই নীলিমাকে সে চেনে না।

ফরাসী বিশ্বকোষ ও ফরাসী বিপ্লব

সুনীলকুমার নাগ

মানুষের সংস্কারমুক্তির উদ্দেশ্যে ইয়োরোপের চিন্তানায়কগণের কয়েক যুগ-ব্যাপী অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস যেমন, বিস্ময়কর, তেমনই চমকপ্রদ। এই সংস্কার-মুক্তির আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ হলো ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)। আর ফরাসী বিপ্লবের পেছনে যে চিন্তারাজি প্রতিমুহূর্তে মানুষকে নতুন সৃষ্টির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তার সমস্ত কর্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার প্রথম সুসংহত ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল 'ফরাসী বিশ্বকোষে।'

বৈশিষ্ট্য—আধুনিক চিন্তা, আধুনিক জীবন বা জগৎ, অর্থাৎ, এককথায়, যে আধুনিকতার জন্যে আমরা খুব ন্যায়সঙ্গত-ভাবেই গর্ববোধ করে থাকি, তার সূত্র অনেকের মতে ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংস-স্তূপের মধ্য থেকেই হয়েছিল। কাজেই এই বিশ্বকোষের সংকলকগণের নিকট মানুষের ঋণ যে সীমাহীন তা বলাই বাহুল্য। একটা কথা মনে রাখা দরকার। তা হলো এই যে, ফরাসী বিশ্বকোষের সংকলকগণ ঠিক অন্যান্য বিশ্বকোষের সংকলকগণের মতো নয়। ফরাসী বিশ্বকোষের পূর্বের ত বটেই, এমন কি তার পরেরও যে-কোন ভাষার বেশীর ভাগ বিশ্বকোষই সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র। অর্থাৎ, অন্যান্য প্রচলিত গ্রন্থের 'সার' সংগ্রহ করে একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। কাজেই, এই সমস্ত বিশ্বকোষের সংকলকগণকে সবাই পণ্ডিত বলে স্বীকার করলেও কেউই তাঁদের 'স্রষ্টার' মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। এমন কি আয়তন বা আলোচিত বিষয়বস্তুর বাহুল্যে বিস্ময়কর হলেও এযুগের 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটা-নিকা' বা 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা' সম্পর্কেও কথাটা সমানভাবে সত্য। এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় ফরাসী বিশ্ব-কোষের সংকলকগণের মধ্যে। তাঁরাও 'সংগ্রহ' অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব মৌলিক চিন্তারও প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের কীর্তির মধ্যে সে-সময় পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার তো পাওয়া যায়ই উপরন্তু পাওয়া যায় নানা বিষয়ে—শিল্প-সাহিত্য থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং রাজনীতি বা অঙ্কশাস্ত্র থেকে ধাতুবিদ্যা পর্যন্ত বহু গবেষণালব্ধ নতুন নতুন ধারণা।

ফরাসী বিশ্বকোষের রচনা তথা প্রকাশনার পেছনে রয়েছে দিদরো, রুশো, ভলতেয়ার, দা আলেমবেয়ার প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সমস্ত উল্লেখযোগ্য চিন্তানায়কগণের দীর্ঘ একুশ বৎসরব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রাম-বিজয়ে সম্ভবত দিদরোর অবদানই ছিল সর্বাধিক। কারণ একদিকে সরকার, পাদ্রী-সম্প্রদায় এবং প্রকাশক এবং অন্যদিকে সংকলকগণের মধ্যে পারস্পরিক মত পার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সুমহান জ্ঞান উদ্যোগকে তিনিই সার্থক করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিজের সাংসারিক অভাব-অনটন অর্ধাশন কিম্বা সরকারী নির্যাতন, পাদ্রীদের আক্রমণ বা প্রকাশকের অসাধুতা—কিছুই এই দৃঢ়চেতা মনীষীকে তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনিই ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বকোষের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনা-কার্য দুটি মূলে বিঘোষিত লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। তা হলো প্রথমত, সত্যের সাধনায় উপযোগী করে তুলবার জন্যে মানুষের চিন্তার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটানো; দ্বিতীয়, ঐ চিন্তাকে গ্রহণ করবার জন্যে মানুষের 'মানসিকতায়' আমূল ও বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো।

সূচনা—১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এপ্রাইম চেম্বারস নামে জনৈক ধনাঢ্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি কয়েকজন সংকলক ও পণ্ডিতের সহ-যোগিতায় বিখ্যাত 'সাইক্লোপিডিয়া' প্রকাশ করেন। এই বিশ্বকোষটি আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। সে-সময়কার ইয়োরোপে এই বিশ্বকোষটি রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আলোচিত বিষয়বস্তুর বহু ব্যাপকতায় তথা মূল্যবান চিত্রগুলির জন্য। এই ইংরেজী বিশ্বকোষখানা 'কপি' করবার জন্য ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে প্রকাশক মহলে প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জন মিলস নামে একজন ইংরেজ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সে-সময় ছিলেন প্যারিসে। তাঁর কিছুটা সাহিত্য-প্রীতিও ছিল। জি সেলিয়াস নামে তাঁর এক-জন জার্মাণ বন্ধু ছিল। ইনি ছিলেন সাত-আটটি ইয়োরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত একজন পেশাদার অনুবাদক। প্রধানত এঁর সহযোগিতায় মিলস চেম্বারস-এর সাইক্লো-পিডিয়ার একটি সংক্ষেপিত ফরাসী অনু-বাদের কপি তৈরী করলেন। তাঁরা দুজন এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে তদানীন্তন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক আঁদ্রে লে ব্রেটন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু ব্রেটন তাঁদের কপি দেখে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন না। কিন্তু পরিমার্জনের পর চার খণ্ডের এই বিশ্ব-কোষটি প্রকাশ করা যায় কিনা তিনি এই রকম চিন্তা করছিলেন। এমন সময় দেখা গেল মিলস ও সেলিয়াস এই বিশ্বকোষের ভবিষ্যৎ স্বত্ব সম্পর্কে একমত নন। ব্যাপারটা দেখে স্বভাবতই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের কপি ফিরিয়ে দিলেন।

ব্রেটন নিছক একজন পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশকই ছিলেন না। ফরাসী দেশ, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ফরাসী ভাষায় একখানা বিশ্বকোষ প্রকাশ করতেই হবে এবং তা নিছক চেম্বারস-এর বিশ্বকোষের 'কপি' হবে না—হবে একখানা যুগান্তকারী প্রকাশন। তিনি অবিলম্বে তাঁর জনৈক বন্ধু, একজন দর্শনের প্রবীণ অধ্যাপককে নিযুক্ত করলেন এই বিশ্বকোষ সম্পর্কে কাজ সুরু করবার জন্য। এই অধ্যাপক মহোদয় তাঁর বিষয় সম্পর্কে যথার্থই সুপণ্ডিত ছিলেন যদিও, কিন্তু একখানা বিশ্বকোষের মতো বহু বিচিত্র বিষয়ের পরিকল্পনা করার মতো যোগ্যতা তাঁর সত্যি ছিলো না। তাই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ব্রেটন এই অধ্যাপক মহোদয়কে

তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন। এটা ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

দিদরো কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ—এই সময়কার ইয়োরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে মৌল চিন্তার প্রবক্তা হিসেবে ইংরেজ মনীষীগণের খ্যাতিই ছিল সর্বাধিক। এঁদের মধ্যে বেকন (১৫৬১-১৬২৬); হবস্ (১৫৮৮—১৬৭৯); — লক্ (১৬৩২-১৭০৪); এবং হিউম (১৭১১—১৭৭৬) ছিলেন অগ্রগণ্য। স্বনামধন্য ভলতেয়ার (১৬৯৪—১৭৮৪) কেবল যে নিজস্ব মৌলিক রচনাই করতেন তাই নয়, ফ্রান্সে ত বটে এমন কি গোটা ইয়োরোপে ইংরেজ চিন্তাবিদগণের নানা ধারণার প্রচারেও সাহায্য করতেন। ফ্রান্সে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠী এই সময় সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী বলে গণ্য হতো, যুবক দিদরো ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও খ্যাতিসম্পন্ন। ইংরেজ দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদগণের চিন্তার সঙ্গে একমাত্র স্বয়ং ভলতেয়ার বাদে দিদরোর পরিচিতিই যে সর্বাধিক ছিল, এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল না। শুধু তাই নয়, দিদরো নিজেও মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তাই প্রকাশক ব্রেতনের নজর পড়লো দিদরোর উপর: তিনি যে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নানা প্রবন্ধের মাধ্যে এই ধরনের মতাদর্শই প্রচার করতেন তা গোটা ফ্রান্সের বিদগ্ধ সমাজের অবিদিত ছিল না। রুশোর 'কনট্রাকট সোশাল' প্রকাশিত হবার অন্ততঃ ১০ বৎসর পূর্বে রচিত একটি প্রবন্ধে দিদরো মন্তব্য করেছিলেন যে, "প্রকৃতি কোন ব্যক্তিবিশেষকেই অপর কোন মানুষের ওপর কর্তৃত্বের অধিকার দেয়নি।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, কিশোর বয়স থেকেই রুশোর ঝোঁক ছিল সঙ্গীতের দিকে, এবং একজন সার্থক সুরকার ও স্বরলিপিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধিলাভ করাই তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল। এ সম্পর্কে বারংবার চেষ্টার ফলেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে রুশো যখন চরম হতাশার সম্মুখীন, তখন দিদরোই তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন কলম ধরবার জন্যে অর্থাৎ লেখক হতে। যাই হোক, দিদরো যে এ সময়ে পাদ্রী-প্রভাবিত সরকারের বিষ নজরে ছিলেন, প্রকাশক ব্রেতন তা জানতেন কিন্তু তবু ফরাসী ভাষায় একখানা প্রথম শ্রেণীর বিশ্বকোষের প্রয়োজন মেটাবার অপরাজেয় আশায় তিনি সুযোগ্য দিদরোকেই সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে রইলেন দা আলেমবেয়ার অংকশাস্ত্র সম্পর্কে দিদরোকে পরামর্শ দেবার জন্য।

পরিকল্পনা—প্রকাশক ব্রেটন-এর নিকট থেকে দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দিদরো বুঝতে পারলেন যে নতুন ভাবধারার পক্ষে একটা দারুণ অভাবিত পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সাধা-[illegible] জানেন। [illegible] থেকেই তিনি রুটিন করে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রাচীন গ্রীসের প্লেটোভাগিনের স্পেউসিপ্পাস থেকে বেকন পর্যন্ত সমগ্র ইয়োরোপের মনীষীরা বিগত দু' হাজার বছর যাবৎ বিশ্বকোষ সম্পর্কে যা কিছু ভেবেছেন দিদরো সর্বাগ্রে সে-সবের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তারপরে গ্রীক, লাতিন, জর্মন ও ইংরেজী ভাষায় যে সমস্ত বিশ্বকোষ সে-সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল সে-সবগুলির সংকলন-পদ্ধতি, সন্নিবিষ্ট বিষয়বস্তুর ধারা এবং প্রত্যেকটির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করে দেখে নিজের বিশ্বকোষের পরিকল্পনা শুরু করলেন।

বলাই বাহুল্য, একদিকে যখন দিদরো নিজে এইভাবে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে তখন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞগণের একটি গোষ্ঠী তাঁরই নির্দেশে বিশ্বকোষের জন্য শত শত নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ঠিক এক বছর বাদে দিদরো ফরাসী বিশ্বকোষের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। এই পরিকল্পনা পাঠেই বিদগ্ধজন বুঝলেন যে ফরাসী ভাষায় প্রকৃতই যুগান্তকারী একটা কিছু রচনার কাজ চলছে।

এমন সময় প্রায় চার মাসের জন্যে দিদরো কারারুদ্ধ রইলেন। কিছুদিন পূর্বে ও'র একখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল 'লেটার অন দি ব্লাইন্ড', এই বইতে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে সরকারী মতে কিছু কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য ছিল—এ অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল বেনামে, কিন্তু দিদরোই যে তার প্রকৃত লেখক, সরকারী গোয়েন্দারা শেষপর্যন্ত তা জানতে পেরেছিল। প্রকাশক ব্রেটনের সরকারী মহলে, এমনকি স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গেও যথেষ্ট জানাশোনা ছিল। তিনিই সরকারকে বোঝালেন যে ফরাসী ভাষায় নেই এমন একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে দিদরো প্রকৃতই একজন অপরিহার্য ব্যক্তি। এই ধরনের তদ্বিরের পরে দিদরো মুক্তি পেলেন।

প্রথম দুই খন্ডের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা পাদ্রীদের ষড়যন্ত্র ও রাজরোষ—জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও আরো কিছুদিন দিদরোকে অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হলো। তবে এ অবস্থায় বিশ্বকোষ সংক্রান্ত কাজকর্ম যাতে তিনি করতে পারেন তার অনুমতি দেওয়া হলো। দিদরো এবার অক্লান্তভাবে এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর সম্পাদনা কার্য শুরু করলেন এবং আট মাসের চেষ্টায় প্রথম দু'খন্ডের মতো 'কপি' প্রস্তুত হলো। প্রকাশক সঙ্গে সঙ্গে ছাপানোর কাজ শুরু করলেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম খন্ড এবং পরের বছর জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হলো।

দা আলেমবেয়ার লিখিত এবং দিদরো পরিমার্জিত ভূমিকায় [illegible] হলো: "পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে মানুষের যে অর্জিত জ্ঞান বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, তাকে সুসংবদ্ধভাবে একত্র করাই বিশ্বকোষের যথার্থ উদ্দেশ্য। মানবজাতি অবশ্যই এক ও অভিন্ন, কাজেই জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের লব্ধ জ্ঞানকে সকলের উপযোগী করে পরিবেশন করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষের যে বিশেষ অবস্থা তার প্রকৃতির সম্যক ব্যাখ্যা করতে হবে। এ সমস্ত সার্থকভাবে করতে পারলেই বিগত শতাব্দীগুলির অভিজ্ঞতাকে আমরা উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারবো এবং এর ফলে আগামী শতাব্দীগুলিতে আমাদের অনাগত বংশধরগণের জীবন সুখময় হয়ে উঠবে।"

বর্ণানুক্রমিকভাবে পর পর চারটি নিবন্ধ নিয়ে গোটা ফ্রান্স তথা ইয়োরোপে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। Authority, Bible Church Certi-dute —এই চারটি নিবন্ধ পৃথক পুস্তিকা হিসেবেও মুদ্রিত হলো এবং সেসব হাজারে হাজারে দেশময় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। Authority অর্থাৎ সরকারের ক্ষমতা যদি জনগণের সমর্থনপুষ্ট না হয় তা যে নেহাৎ জবরদস্ত এবং তার পেছনে কোন নৈতিক শক্তি থাকে না, কাজেই তার হুকুম আমল না করলেও কিছুমাত্র অন্যায় হয় না—একথা বিশ্বকোষে দ্ব্যর্থহীনভাবেই ঘোষিত হলো। Bible সম্পর্কে বলা হল যে অন্যান্য হাজারখানা বইয়ের মতোই এখানাও একখানা বই মাত্র। যে-কোনো সাহিত্য এবং জীবনীর মতো এ-বইতেও অনেক সুখপাঠ্য এবং প্রয়োজনীয় কথা আছে, তবে এর বেশীর ভাগটাই হাস্যকর এবং অপ্রয়োজনীয়।

ফ্রান্সের পাদ্রী-সম্প্রদায় প্রমাদ গনলেন। তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে সম্রাটকে বোঝাতে লাগলেন যে বিশ্বকোষের এ খন্ডদুটি অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত হওয়া দরকার এবং ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও খন্ড প্রকাশিত না হয় তারও বন্দোবস্ত করা দরকার। কারণ, বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলি মারাত্মকভাবে মানুষকে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করছে: এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই দেশে সম্রাট তথা পাদ্রী-সম্প্রদায় উভয়েরই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বার আশংকা রয়েছে। সম্রাটের ওপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে পাদ্রীদের সঙ্গে সামন্ত শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিগণও যোগ দিলেন। সম্রাট এঁদের অভিমত মেনে নিলেন এবং বিশ্বকোষের প্রথম দুটি খন্ড বাজেয়াপ্ত করা হলো ও তার প্রকাশনার উদ্যোগটি বেআইনী ঘোষিত হলো। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সম্রাট পঞ্চদশ লুই তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন যখন তাঁর কানে এলো যে গোটা ইয়োরোপময় বিশ্বকোষের প্রথম দুটি খন্ড বিশেষ সমাদরলাভ করেছে, এমনকি কয়েকটি রাজধানীতে [illegible] তার অনুবাদও করছেন। [illegible] সম্রাটের পরামর্শদাতা ছিলেন সুপণ্ডিত ম্যালেশারবে। ইনি

সম্রাটকে বোঝালেন যে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হবার ফলে ফ্রান্সের জাতীয় সংস্কৃতির মান যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং সারা ইয়োরোপে আজ ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দ্বিমত নেই। কাজেই বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হলে সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতা বাড়বে ছাড়া কমবে না: সম্রাট এ যুক্তি মেনে নিয়ে বিশ্বকোষের ওপর থেকে যাবতীয় নিষেধাবিধি তুলে নিলেন। শুধু তাই নয়,এমনকি তিনি এরকম লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভবিষ্যতে আর তিনি এই প্রকাশনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না।

সম্রাট তাঁর এই শেষোক্ত প্রতিশ্রুতি কয়েক বছর রক্ষা করে চলেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গোপনে প্রকাশক রেটনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন রাজনৈতিক ধরনের নিবন্ধগুলি দিদরোর চূড়ান্ত সম্পাদনার পরেও সরকারী স্বার্থে 'কাটছাঁট' করা হয়। পরবর্তী সাত বৎসরের মধ্যে বিশ্বকোষের আরও ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হলো। ইতোমধ্যে রবার্ট-ফ্রাঁসোয়া ডামিয়েন নামে এক ধর্মান্ধ খৃষ্টান সম্রাটের প্রাণনাশের চেষ্টা করলো। দিদরো বিশ্বকোষের অষ্টম খণ্ডে এই ধরনের হীন প্রয়াসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে একটি নিবন্ধ লিখলেন। পাদ্রী-সম্প্রদায়ও আবার নতুনভাবে বিশ্বকোষের উদ্যোগের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো। আবার বিশ্বকোষ বেআইনী ঘোষিত হলো।

প্রকাশক রেটনের সমস্যাটা ছিল দুরকমের। প্রথমতঃ গোপন-সম্পাদনার ব্যাপারে সম্রাটের নির্দেশ মান্য করে চলা, দ্বিতীয়তঃ সরকারী নীতির অস্থিরতার জন্যে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে যে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে তার পথরোধ করা। বিশেষতঃ এই জন্যে বিশ্বকোষ প্রকাশনার দুটি দপ্তর ছিল, একটি প্রকাশ্য অন্যটি গোপন। দ্বিতীয়বার বেআইনী ঘোষিত হবার সময় প্রকাশ্যে বিশ্বকোষের আটটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল বটে কিন্তু গোপনে আরও চারটি খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুতগতিতে চলছিল। সম্রাটের বান্ধবী মাদাম পম্পাদ্যু প্রকাশক রেটনকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন বিশ্বকোষ সম্পর্কে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে। কিন্তু ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে এই বিদুষী মহিলার আকস্মিক পরলোকগমনের পরে সব কিছু জানাজানি হয়ে গেল। দিদরোসহ বিশ্বকোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত লেখকগণ আত্মগোপন করলেন। রেটনকে গ্রেপ্তার করা হলো। ভলতেয়ারের অনুরোধে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক দিদরো এবং অন্যান্যদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর দেশে গিয়ে বিশ্বকোষের বাকী খণ্ডগুলির কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে। এইসব দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ফরাসী সম্রাট আবার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন এবং প্রকাশক রেটনকেও মুক্তি দিলেন। পরবর্তী আট বৎসরে অপেক্ষাকৃত কম বাধাবিপত্তির মধ্যে বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হলো—সর্বসমেত ১২ খণ্ড লেখা এবং ১০ খণ্ড চিত্র।

দিদরো যথার্থই বলে গেছেন যে ফরাসী বিশ্বকোষের প্রকৃত রচয়িতা গোটা ফরাসী জাতি। কারণ সে সময়কার ফ্রান্সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন দিকে এমন কেউ ছিলেন না যিনি কোন না কোনভাবে বিশ্বকোষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দিদরো পরলোকগমন করেন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এর পাঁচ বৎসর বাদে মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রকাশস্বরূপ ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হলো। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত হলো।

বিপ্লবের পরের বৎসর এডমণ্ড বার্ক তাঁর Reflections on the Revolution in France-এ ফ্রান্সের সে সময়কার ঘটনাবলীর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন যে: লেখকগণ যখন সংঘবদ্ধভাবে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে তাঁদের লেখনী চালনা করতে থাকেন গণমানস তার দ্বারা প্রভাবিত হবেই।

(Writers, especially when they act in a body, and with one direction, have great influence on the public mind).

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি—সংক্ষেপতঃ মানবজাতির চিন্তারাজ্যকে সর্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্যে ফরাসী বিদগ্ধ সমাজের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল হল ফরাসী বিশ্বকোষ—ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে তারই প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অগ্নিগর্ভ পূর্ব-পাকিস্থান। পূর্ববঙ্গের মানুষ স্বাধীনতার প্রাক্কালে মুসলিম লীগ প্রভাবিত রাজনৈতিক চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পাকিস্তান চেয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর মহম্মদ আলি জিন্না এবং তার সঙ্গীরা সেই সময় পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণকে তোয়াজ করতেন নানাভাবে। ধর্মীয় উন্মাদনা পূর্ববঙ্গের মানুষকে সেদিন বিভ্রান্ত করেছিল। তারপর অতি অল্পকালের মধ্যেই নতুন উপলব্ধি জাগল। জনগণ দেখল শাদা শাসকের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের বাদামী বদমায়েসরা শাসনযন্ত্র হাতে পেয়ে কিভাবে শোষণ এবং শাসন সুরু করল। ১৯৪৮-এ জিন্না পূর্ববঙ্গে সফর করতে এসে বাঙালীর প্রতিরোধের আকৃতি দেখে গেলেন। বঞ্চিত ও শোষিত নর-নারী আল্লার দোহাই পাড়ে, অসহায় দৃষ্টিতে আসমানে তাকিয়ে থাকে, তার জমিনের ফসল পশ্চিম-পাকিস্তান গোলাজাত করে মুনাফা ওঠায়। ১৯৪৮-এর পর ১৯৫২, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম গণ-জাগরণের সূত্রপাত। ছাত্র-বুদ্ধিজীবীর দল রইলেন পুরোভাগে। পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরতার বিরুদ্ধে তাঁরা বুক পেতে দিলেন। সাম্প্রদায়িকতার যে আফিঙের প্রভাবে তাঁরা জড়চেতন হয়ে ছিলেন সেই আফিঙের ঘোর কেটে গেল। পূববাংলার সেই ভাষা আন্দোলন উত্তরকালে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। তারপর গত ২৫ মার্চ থেকে এই ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে পৌঁছেও পূববাংলার মানুষ যে দুঃসাহসিক সংগ্রাম করে চলেছেন তার জন্য তাঁরা জগৎসভায় এক মহান আসন লাভ করেছেন। অশেষ মর্যাদা ও সম্ভ্রমের অধিকারী এই নব জাগ্রত মানুষদের এপারের বাংলার আরও যেসব বাঙালী আছেন তাঁরা অন্তরের শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাচ্ছেন নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে।

পূববাংলার এই আত্মবিকাশের সংগ্রামের স্মারক হয়ে রইল এপার বাংলার সাহিত্যিকদের রচিত কয়েকখানি অভিনন্দন গ্রন্থ। অজস্র গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে এই তিনখানি সঙ্কলন গ্রন্থের বিস্তর আলোচনা করব। গঙ্গোত্রী সম্পাদক প্রতিভাবান তরুণ কবি শান্তনু দাসের প্রচেষ্টা অভিনব। তিনি গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ বা চটকদার আবেগভরা কবিতার সংকলন করেননি। 'বাংলার মুখ' নামক তাঁর সংকলন গ্রন্থটিতে বাংলা সাহিত্যের লোক-প্রিয় মাধ্যম লোকসাহিত্যের ছন্দোবদ্ধ কথার মালা গেঁথে বাংলাদেশের বর্তমান দুর্বিপাকের আসল আকৃতিটি প্রকাশের প্রয়াস করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে সম্পাদক শান্তনু দাস বলেছেন, 'মা সেই পুরনো ঘুমপাড়ানি সুরেই ছেলেকে আজও ঘুম পাড়ায়, হৃদয় দুলুনি ছন্দের মেঠো লয়ে—' এই ঘুমপাড়ানি ছড়ার মাধ্যমেই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে 'বাংলার মুখ' নামক গ্রন্থে অগণিত নবীন ও প্রবীণ কবির বজ্রকণ্ঠ। সম্পাদকের বিশ্বাস—'এই ছড়া আগামীকাল বাংলাদেশের লোকের মুখে মুখে ফিরবে'—তাঁর এই বিশ্বাস অহেতুক নয়। আগামীকালের মানুষ এদিনের জ্বালার পরিচয় পাবে এই ছড়ার অন্তরালে। এই কারণেই শান্তনু দাস 'সাদামাঠা ভাষায়' রচিত বাংলা ছড়া বেছে নিয়েছেন। তাঁর এই মৌলিকত্ব বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। শুধু তাই নয়, তরুণ সম্পাদক আর এক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এই সংকলনের লেখক নির্বাচনে। তিনি বলেছেন, 'মানোপালি কবিতা-লেখক ছাড়া ইদানীং সংকলন-গুলোতে কেউ ঠাঁই পাচ্ছেন না।' তাই যাঁদের নাম কেউ শোনেনি তাদের সঙ্গে বহুশ্রুত নামের নামাবলী রচনা করেছেন সম্পাদক। প্রতিটি ছড়ার সঙ্গে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন স্বনামখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। এই সূত্রে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সংকলনের সম্পাদক গ্রন্থের প্রথমাংশে অখণ্ড বাংলার অজ্ঞাত পরিচয় প্রাচীন কবিদের ছড়ার একটি বিভাগ রেখেছেন এবং গ্রন্থের শেষাংশে ইদানীংকার বাংলাদেশের (পূর্ব-বাংলায়) পাঁচজন কবির ছড়া সংযোজন করেছেন। পুরাতনকালের প্রচলিত রীতি অনুসারে সম্পাদক তাঁর নিজের ছড়াটি সর্বশেষে সংযোজন করে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন কমল সাহা। কমল সাহা অতি অল্পকালের মধ্যে প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে যে খ্যাতি অর্জন করেছেন এই প্রচ্ছদে সেই খ্যাতি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

'অন্যদিন' নামক কবিতা পত্রের সম্পাদক শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা' হল এপার বাংলা ওপার বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাতষট্টি-জন কবির রচনা সম্বলিত একটি সংকলন গ্রন্থ। সম্পাদক সূচনায় 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি' এই নামে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিখেছেন—

'সীমান্তের এপার আর ওপারে দাঁড়িয়ে যে নামেই ডাকি না কেন দেশটাকে; যে বিশেষণই নিজেদের কপালে সাঁটি না কেন; একটি সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধই থেকে যায়—দেশটা আমাদের, আসলে বাংলাদেশ আর জাতধর্ম নির্বিশেষে এই দেশের অধিবাসী সবাই আমরা বাঙালীই।'

সম্পাদক এই মনোভঙ্গী নিয়েই 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গার অন্তর্গত কবিতাগুলি সংকলিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর, বিষ্ণু দে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে অনেক নবীন কবির কবিতা সংযোজিত হয়েছে। সম্পাদক একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন নীতি অনুকরণ করায় পাঠকের পক্ষে সুবিধা হয়েছে প্রবীণ ও নবীন কবিদের সঙ্গে একযোগে পরিচিত হওয়ার। এছাড়া পূববাংলার ছজন প্রখ্যাত কবির কবিতা 'বাংলাদেশ থেকে' নামক অংশ সংযোজিত। সম্পাদক সবিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন 'ভারতীয় অন্য ভাষায়' নামক সর্বশেষ বিভাগটির জন্য। হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, ইংরাজী এই চারটি ভাষায় রচিত বাংলাদেশ বিষয়ক কবিতার ইংরাজী থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন সম্পাদক স্বয়ং। সম্পাদককৃত এই অনুবাদগুলি সার্থক হয়েছে। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত। আগের গ্রন্থটির মত এই গ্রন্থেরও শোভন প্রচ্ছদপট কমল সাহা অঙ্কিত।

'গ্রাম থেকে সংগ্রাম' অন্য জাতের সংকলন। এই সংকলন গ্রন্থটি [illegible]

করেছেন প্রখ্যাত কবি দুর্গাদাস সরকার ও সনাতন কবিয়াল। গ্রন্থটির ভূমিকাংশে সম্পাদকদ্বয় বলেছেন—এই সংকলনের কবিতাগুলির মধ্যে বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। 'বাঙলাদেশের কবিদের কতকগুলি কবিতা কাঁচি কাটা করে দায় সারা হয়নি। সেখানের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আন্দোলনের পেছনে কিভাবে কাজ করেছেন, কবিতাগুলি পর পর ভাবানুষঙ্গ অনুযায়ী পড়লে তা হৃদয়ঙ্গম হবে।' সম্পাদকদ্বয়ের এই উক্তি অনেকাংশে ঠিকই। সকল প্রকার গণসংগ্রামে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে, বর্তমান সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করেছে। পরোক্ষভাবে ইয়াহিয়ার দ্বারাও স্বীকৃতি মিলেছে, কারণ ইয়াহিয়ার ব্যাপক গণহত্যার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল। এই সংকলনের অন্তর্গত কবিতাগুলি মুখ্যত একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মরণে রচিত কিন্তু তাছাড়াও গণসংগ্রামের অন্য অনেকগুলি দিক এই সব কবিতায় প্রতিফলিত। জসীমউদ্দিন, আবুল ফজল, দিলওয়ার, সিকান্দার আবু জাফর, বেগম সুফিয়া কামাল, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শহীদুল্লা কায়সার আল মাহমুদ প্রভৃতি কবিদের নাম এদেশে সুপরিচিত, কিন্তু এ ছাড়া আরো অনেক শক্তিমান কবি যাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না সম্পাদকদ্বয় তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন। 'আঁধার হয়েছে ক্ষয় জয় বাংলা জয় জয় জয় জয়—' পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময়. জয় জয় জয় জয় জয় বাংলা।' এই গ্রামোফোন সংগীত দিয়ে গ্রন্থটির সূচনা এবং শেষ কবিতাটি এ্যাঙ্গোলার কবি এ্যাগোনোতিনো নেতো রচিত আফ্রিকার-দেশাত্মবোধক কবিতার বঙ্গানুবাদ, এ কবিতা জীবনের প্রত্যাশার গান। কবিতা নির্বাচনে সম্পাদকদ্বয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী কামরুল হাসান। পূববাংলার কবিদের কাব্য সম্ভারে সমৃদ্ধ 'গ্রাম থেকে সংগ্রাম' একটি মূল্যবান সংকলন গ্রন্থ।

—অভয়ঙ্কর

(১) **বাংলার মুখ** (ছড়া সংকলন)—শান্তনু দাস সম্পাদিত। অনির্বাণ প্রকাশনী, কলিকাতা-১১। পাঁচ টাকা।

(২) **গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা** (কবিতা সংকলন)—শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত। অন্যদিন। ৫৮।১২৮ লেক প্লেস। কলকাতা-৪৫। তিন টাকা।

(৩) **গ্রাম থেকে সংগ্রাম** (কবিতা সংকলন)—দুর্গাদাস সরকার ও সনাতন কবিয়াল সম্পাদিত। নবজাতক প্রকাশন। এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

নতুন বই

দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ? (সচিত্র বৈজ্ঞানিক আলোচনা)—মূল লেখক ডাঃ এরিক ফন দানিকেন। অনুবাদ: অজিত দত্ত। প্রকাশক: লোকায়ত প্রকাশনী ৫০, নীলকমল কুণ্ডু লেন, হাওড়া-২। মূল্য: বারো টাকা।

ডাঃ এরিক ফন দানিকেন রচিত 'চ্যারিয়টস অফ দি গডস' (ইংরাজীতে অনূদিত গ্রন্থের নাম) এ-কালের এক চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ। ডাঃ দানিকেন বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা দেবতা সংক্রান্ত মানবমনের ধারণা ও বিশ্বাসের মূলতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশের প্রয়াস করেছেন। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি জার্মানীতে প্রথম প্রকাশের পর পৃথিবীর উনিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শ্রীঅজিত দত্ত অসীম আগ্রহ নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এই মূল্যবান গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন, তজ্জন্য অভিনন্দনযোগ্য।

দেবগণের মর্তে আগমনের বিচিত্র কাহিনী পৃথিবীর সর্বত্রই কোনো না কোনো ভাবে প্রচলিত। তাঁরা অগ্নিগর্ভ রথে বিচরণ করেন এই কথা অনেক ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে দেবতাদের মহাকাশযানে যত্র-তত্র গমনের কথা বর্ণিত আছে। মহাকাশে ভ্রমণ কালে যে জাগতিক এবং মহা-জাগতিক ক্ষণমানের মধ্যে বিরাট তারতম্য ঘটে আইনস্টাইনের মতে যার নামে টাইম ডাইলেসন—তার সংবাদ মহাভারত রচনাকালে বেদব্যাস কিভাবে জানলেন—সুদীর্ঘ কালের এই জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর এতাবৎ পাওয়া যায়নি। ডাঃ এরিক ফন দানিকেন বর্তমান নভোচারণার কালে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে এই রহস্যময় প্রশ্নের সমাধান সন্ধান করেছেন। চন্দ্রযান 'এপোলো' থেকে তোলা পৃথিবীর ছবির সঙ্গে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত পীরি রাইখের মানচিত্রগুলির সাদৃশ্য বিস্ময়কর। সাহারার পর্বতগাত্রে আঁকা ছবির সঙ্গে আধুনিক নভশ্চরের চিত্রের আশ্চর্য মিল। এইসব কারণে মনে করা অসঙ্গত নয় গ্রহান্তরের মানুষ উন্নততর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অধিকারী এবং একদা তাঁদের এই মর্তভূমিতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

ডাঃ দানিকেন এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে 'মহাবিশ্বে কি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব আছে?' 'পুষ্পক যেদিন নামল—' 'অব্যাখ্যাত রহস্যপুঞ্জ', 'দেবতা না নভশ্চর' 'অগ্নিগর্ভ পুষ্পক' 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ'? 'আকাশের অভিজ্ঞতা', 'প্রত্যক্ষ সংযোগ সন্ধানে' প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা এমনই চিত্তাকর্ষক যে একটি জটিল গ্রন্থ পাঠের ক্লান্তি পাঠকের মনে জাগে না। সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে নজরে পড়েনি।

প্রচুর তথ্য এবং চিত্র সংযোগে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ছবি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তা কল্পনা-বিলাসী মনকে চঞ্চল করে তোলে। একথা বিশ্বাস করা যায় যে, মহা-জাগতিক সংসারে নানাপ্রকার বুদ্ধিমান এবং উন্নততর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী বিচরণ করেন, তবে প্রাচীনকালে এই পৃথিবীর সঙ্গে যে কোনো সংযোগই থাকুক না কেন ইদানীং তা বিরল হয়ে এসেছে। এই দিকটিও অনুসন্ধানের দাবী রাখে। মর্তের মানুষ যখন মহাকাশে যাতায়াতে এত আগ্রহী তখন মহাজগতের অধিবাসীরা মর্তভূমিতে পদক্ষেপ করতে এ-যুগে দ্বিধান্বিত কেন? হয়ত আগামী দিনে সে প্রশ্নেরও উত্তর মিলবে। মিশিং লিংকেরও হয়ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

অনুবাদক অজিত দত্ত এই গ্রন্থটি অনুবাদের দ্বারা বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্র এক নতুন ইতিহাস রচনা করলেন। বিজ্ঞান-ভিত্তিক এক দুরূহ গ্রন্থকে এমন সরল ও সুখপাঠ্য করে তোলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অনুবাদকের।

পরিশেষে গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্যের কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। নতুন ধরনের টাইপে গ্রন্থটি মুদ্রিত। ইতিপূর্বে এমন টাইপ দেখার সুযোগ হয়নি। প্রায় ষোলোখানি আর্ট প্লেট এই গ্রন্থের সম্পদ।

কবিতা : চিত্রিত ছায়া—বার্ণিক রায়—সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। মূল্য পনেরো টাকা।

কবি-ব্যবহৃত চিত্রকল্প প্রসঙ্গে সমালোচক মার্জোরি বুলটনের একটি মূল্যবান মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়—'কবিরা একান্তভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই রূপ দেওয়ার জন্যে তাঁদের কাব্যে এক বা একাধিক চিত্রকল্প রচনা করে চলেন এবং সেই সমস্ত চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা স্বভাবী পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।' মন্তব্যটির মধ্যে কবিতায় চিত্রকল্পের অসাধারণ গুরুত্ব স্বীকৃত। এই গুরুত্বের কথা চিন্তা করেই সাধারণভাবে বাংলা কাব্যে এবং সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্পের প্রয়োগ কিরকম—এর সুচিন্তিত ও দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন কবি-সমালোচক শ্রীবার্ণিক রায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত সুবৃহৎ গ্রন্থ 'কবিতাঃ চিত্রিত ছায়া'র মধ্যে। লেখক স্বয়ং একজন তরুণ কবি, তাঁর নিজ অনুভূতিলোকের সঙ্গে ও বিদেশী এবং বাংলা কাব্য সম্পর্কে মননের পরিচয় এ গ্রন্থে স্পষ্ট।

লেখক গ্রন্থের প্রথম চারটি প্রবন্ধে কবিতা, কবিতার চিত্রকল্প, শব্দ প্রয়োগ, কাব্যের দুর্বোধ্যতা ইত্যাদির আলোচনায় বিদেশী কবি, কাব্য ও কাব্য-সমালোচক এবং সেই নিরিখে বাংলা কবিতার অন্তঃপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক স্বয়ং কবি হওয়ার কারণেই আলোচনা আদৌ সহানুভূতিহীন ও নীরস হয়নি; বরং বহুস্থলে আলোচনার স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মর্যাদা পায়।

বার্ণিক রায়ের আলোচনার ধারা যেমন তুলনামূলক তেমনি বাংলা কবিতার আলোচনার ধারায় তা নতুন দিক-নির্দেশকও বটে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা শব্দ, চিত্র, ছন্দ, চরণের বিচিত্রতা, স্তবকবন্ধ, অন্ত্যমিল ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক-দর্শনের সঙ্গে বিশ শতকের সন্দেহ, বিরোধ, অনিশ্চয়তা নিয়ে জটিল। এই জটিলতা আলোচ্য লেখকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়েছে। তাঁর প্রয়াস সনিষ্ঠ ও আন্তরিক এবং যথেষ্ট মৌলিক ও প্রশংসনীয়।

লেখক তিন, চার, পাঁচ ও ছ'-এর দশকের বেশ কিছু কবির কাব্য ও কবি-কৃতির স্বতন্ত্র আলোচনা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। বিশ শতকের এই দশক-গুলির সমস্ত কবির এইভাবে আলোচনা করা আদৌ সম্ভব নয়, লেখক সেকথা স্বীকার করেই এবং গ্রন্থটি বাংলা কবিতার সংকলন না হওয়ায় কবি-ব্যক্তিত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে আমাদের কোন অভিযোগ নেই; কিন্তু যাঁদের আলোচনায় এনেছেন, তাঁদের সম্পর্কিত আলোচনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত হওয়ায় মনে হয় একটি সূত্রে ব্যক্তিত্বগুলি ধরা পড়েনি। লেখক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, মণীন্দ্র রায়, ইত্যাদি কয়েকজনের উপর আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত করেছেন, যা, স্বভাবী পাঠকের রসাস্বাদকে ব্যাহত করবে ও অতৃপ্ত রাখবে। যদিও দশক ধরে কবি-দের চিহ্নিত করার ব্যাপারটি নিরর্থক, হাস্যকর ও অবান্তর। তবু ছ-এর দশকের মাত্র চারজন কবির স্বতন্ত্র আলোচনা না করে সামগ্রিক আলোচনাই কি যথেষ্ট হয় না? কারণ, মনে হয়, ছ-এর দশকের কবি-দের কোন কবিরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ধরার মত পূর্ণ কবিমানস গঠিত হয়নি। আর একটি কথা 'তিরিশ', 'চল্লিশ', 'পঞ্চাশ', ষাট ইত্যাদির 'দশক' কথাগুলি কি শুদ্ধ? এগুলি কি তিন, চার, পাঁচ, ছয় অথবা তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ দশক হবে না? লেখক স্বয়ং 'আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা' শীর্ষক পরিচ্ছেদের প্রথমেই 'দ্বিতীয় দশকে' কথাটি বলেছেন, কিন্তু আগের মত এটিই বা কেন 'বিশের দশক' হবে না? মার্কিণী আলোচনার প্রভাবেই এই জাতীয় শব্দ বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণিকা — যামিনী রায় সংখ্যা। ২৫এ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট। মূল্য ১ টাকা।

জীবদ্দশায় আমাদের দেশের শিল্পীর মূল্যায়ন প্রচেষ্টা বড়-একটা হয় না। পত্রিকাটি এই মহৎ কাজে হাত দিয়েছে। শিল্পী যামিনী রায় সংখ্যাতে এগারোটি প্রবন্ধের সমাবেশ করা হয়েছে। এর অধিকাংশই অবশ্য সঞ্চয়ন। তবু রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অতুল বসু প্রমুখ শিল্পী ও সাহিত্যিকবর্গ এই শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিকে কিভাবে দেখেছেন তার একটা সংকলন হাতে এলে কৌতূহল জাগে বৈকি। অতুল বসু যখন বলেন যে, পশ্চিমের স্বীকৃতির পূর্বেই যামিনী রায় স্বদেশে সম্মান পেয়েছেন এবং যত কষ্টই হোক কেবলমাত্র ছবি এঁকেই একান্ত দুঃসময়েও সংসার প্রতিপালন করতে পেরেছেন তখন কিছুটা স্বস্তি বোধ হয় বৈকি। সুধীর নন্দী শিল্পীর শিল্পচর্চার একটা মোটামুটি ধারাবাহিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। বিদেশীদের চোখে যামিনী রায় কিভাবে প্রতিভাত হয়েছেন তারও কিছু বিবরণ আছে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় রচনা হয়েছে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুলিখিত পটুয়া শিল্প সম্পর্কে শিল্পী যামিনী রায়ের নিজস্ব বক্তব্যগুলি। বক্তব্যের সারল্য, যুক্তি এবং প্রাসঙ্গিকতা রচনাটিকে বিশেষ মূল্যবান করেছে।

ষড়ঙ্গ—শারদীয়া সংখ্যা　　টাকা।

এই শিল্প পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় শিল্পকলার নানা দিক সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা ও সমকালীন চিত্র সমালোচনা স্থান পেয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হিসেবে উইলিয়ম হজেসের উপর একটি প্রবন্ধ, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পালোচনা, বৌদ্ধ শিল্পের দিকদর্শন ও মন্মথনাথ চক্রবর্তীর রচিত পুরাতন রচনার পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। অনেকগুলি ছবি ও স্কেচ এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

প্রগতি (ঈদ সংকলন)—সম্পাদক মোহম্মদ আলি। আকড়া মাদ্রাসাবাজার, বাটানগর, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

নবম বর্ষের ঈদ সংখ্যাটি বৃহদাকারে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিষ্ঠনামা ও প্রতিশ্রুতিবান লেখকদের নানান স্বাদের রচনা নিয়ে। এই সংখ্যায় অন্নদাশংকর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী ও অম্লান দত্তের সময়োপযোগী মূল্যবান প্রবন্ধ, অগ্নিমিত্র, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, জি এম তালেব, বুলবুল ইসলামের গল্প এবং আরো কিছু রচনা এ সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ।

কোচবিহার সমাচার (বিশেষ রাস সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদক : যোগেশচন্দ্র রায়। রূপসী কলোনী। কোচবিহার। পঁচিশ পয়সা।

কোচবিহারের জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা সপ্তমবর্ষের ২৭শে সংখ্যাটি রাস সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। মদনমোহনের রাস উৎসব কোচবিহারের সর্ববৃহৎ উৎসব। এই সম্পর্কে নিরজা বিশ্বাস ও চারুচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ দুটি সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ। স্থানীয় সমস্যার ওপর তির্যক দৃষ্টিপাত : 'প্রাণেশ্বরের প্রাণায়াম' এবং সম্পাদকীয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

মনন (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র)—সম্পাদক : কুমারশংকর রায়শর্মা। বি ৯।১৭ নৌকা পার্ক, কল্যাণী, নদীয়া। তিরিশ পয়সা।

মেঘনা (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদনা : কান্তিময় ভট্টাচার্য, অশোক আচার্য। রামনগর রোড, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। তিরিশ পয়সা।

নবরাগ (নভেম্বর '৭১)—সম্পাদক : মেঘনাথ দাস। ২।২ নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী। কুড়ি পয়সা।

বারবেলা (নভেম্বর '৭১) — সম্পাদনা : অর্ধেন্দুশেখর দেব। বাণীপুর, চব্বিশ পরগণা। পঁচিশ পয়সা।

নীবাজনা (সাহিত্য ত্রৈমাসিক)— সম্পাদক : প্রিয়লাল মৌলিক। ৩৫সি, মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা—২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

মরক (মৌলিক পত্রিকা)—সম্পাদনা : তপনকুমার চক্রবর্তী। ৫ সাউথ এন্ড পার্ক, কলকাতা—২৯। কুড়ি পয়সা।

আমি যাচ্ছি ।। কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমি যাচ্ছি
তোমরা কে যাবে? চলো
সমস্বরে বলো—
'জয় আমাদের হবেই'।

সীমান্তে সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী
দেয় পাহারা
চক্ষে তাঁদের জয়ের নেশা
বক্ষে তাঁদের ভালবাসা
দেশের প্রতি।

ভারতমাতার জওয়ান ছেলে সব তৈরী
এগিয়ে যাবে সদলবলে
শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে
ভারতমাতার আশিস মাল্য
পড়বে তাঁদের গলে।

ভারতমাতার আশিস ব'য়ে
তাঁদের কাছে পোঁছে দেব।
আমি যাচ্ছি
তোমরা কে যাবে? চলো
সমস্বরে বলো —
'জয় আমাদের হবেই'।

মৃত্যুর মতন তুমি প্রেম ।।

বার্ণিক রায়

যখনই তাকাই, দেখি, মৃত্যুর মতন তুমি স্থির
হয়ে আছো কালো জলে।
অবগাহনে গভীর শান্তি,
এই ভেবে চুলের ভেতরে গন্ধের সাগরে ডুব দিই।
জীবনের সব আলো নেভে,
আলোহীন অন্ধকারে
তোমার রক্তের মধ্যে গভীরতম অসুখ গান
হয়ে কাঁদে অহরহ।
সব কিছু হারায় আমার—
শুধু চেতনায় লেলিহ আগুন জ্বলে দিনরাত্রি।।

জট ।। বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

বেশ তো ছিলে শান্ত-শিষ্ট-ভদ্র-মানুষ সেজে
সুতোটাতে জট পাকালে কেন?
জট ছাড়াতে জটটা শেষে
জড়িয়ে গেলো আরো।

ভুলে গেলে অফিস যাবার তাড়া:
ভুলে গেলে সন্ধ্যাবেলা আসবে বাড়ীওলা।
ভুললে বাড়ি, ভুললে বাড়িভাড়া।

বেশ তো ছিলে বৌ-এর স্বামী ছেলের পিতা সেজে
সুতোটাতে জট পাকালে কেন?
জটটা এতোই জটিল যদি
থাক-না জটাজটি।

এখন অফিস 'লেট' হয়-না যেন:
সামনে ছাঁটাই। জট-খাওয়া মন প্রশ্ন তোলে তবু:
'আচ্ছা, আমি কেন?'

এখন অন্ধকার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

তিন

অনেক মানুষের চেহারা স্থানকাল বিশেষেও বদলায় না। সেই একই পরেশদা! লম্বা চওড়া ছ ফুট মানুষ, উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রঙ, সেই উজোন চুল, সরু গোঁফ—সব একই। তবে বাইরে কিছু রদবদল ঘটেছে। চোখে চশমা নিয়েছে। আগের মতো প্যান্টশার্ট পরে না। হাতগুটোনো ধূসর তাঁতের পাঞ্জাবি আর ধুতি রয়েছে পরনে। পায়ে পাম্পসু। আজও চেহারার কঠিন সংহত সৌন্দর্যের ভাবটা ঘোচেনি। চিবুকে, ঠোঁটের ভাজ, খাড়া নাক—সবখানে চেনা অমায়িকতার চিহ্নগুলো অটুট। ভাবা যায় না, এই মানুষ রাগলে কী হয়ে ওঠে।

পরেশ বলল, সময় নেই হাতে। উঠি। রাত্তিরে খেয়েছি সাঁইথেতে, সকালে চা খেলাম কান্দিতে, দুপুরে খেয়ে এলাম বহরমপুরে নুটুদার হোটেলে। আজ রাত্তিরে আবার কোথায় খাব ঠিক নেই—যাচ্ছি তো কলকাতা। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোন। এই ঘরটায় তুমি থাকবে—এই খাটিয়া। আর টেবিলের সামনে বসলেই তোমার অফিস। অলরাইট?

চন্দন হেসে মাথা দোলাল।

পরেশ বলল, ভেবো না। কোম্পানী শিগগির তোমাকে ঘর দিচ্ছে। আলাদা অফিসও ভাল জায়গায় পাবে। তারপর যদি আমাদের কপাল ফেরে, চাই কি তোমার একটা কোয়ার্টারও হয়ে যেতে পারে। তখন ম্যাঠামশাইদের এনে রাখতে পারো। কী বলেন হক সায়েব?

মধ্য বয়সী [illegible] লোকটি [illegible] উঠলেন। হ্যাঁ। তবে সবই নিজের হিম্মতে করে নিতে হবে। কোম্পানী চালাবার ভার যখন হাতে নিলেন, তখন যা যা সব দরকার—নিজেই করে নেবেন বইকি।

পরেশ বলল, আপাতত তোমার কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দেবেন বেচুদা—শিশিরবাবুর ভাই। কোন অসুবিধে নেই। তবে ভাই, মাঝেমাঝে এক একবার ঘোরাঘুরি করতে হবে নানা জায়গায়। অরডার সাপ্লাইয়ের কাজ তো! তার জন্যে রাহাখরচ ইত্যাদি অবশ্যই পাবে। তোমার লোকজন থাকবে দরকার-মতো। ট্রাক পাচ্ছ একটা। নাও, সিগারেট খাও।

একটা দামী সিগারেট এগিয়ে দিল পরেশ। চন্দন সিগ্রেটটা ধরিয়ে নিয়ে বলল, তাহলে আজই ফিরে গিয়ে জিনিসপত্র আনব ভাবছি। কিছু তো আনিনি সঙ্গে।

পরেশ, ডাকল, হীরুবাবু, শুনুন! এই যে, হীরুবাবু!

চন্দনের দুপাশে কজন লোক বসে রয়েছে—বোঝা যাচ্ছিল এরাই কোম্পানীটা গড়েছে। হক সায়েব, শিশিরবাবু, বেচুবাবু, আর একজন অবাঙালী। পাণ্ডেজী বলে তাঁকে ডাকছে ওরা। লম্বাটে গড়নের মানুষ, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুল—টিকি আছে, হাফহাতা সাদা ফতুয়া গোছের জামা, ধুতি, পাম্পসু। নাকটা অসম্ভব লম্বা। পাতলা ঠোঁট। বয়সে এদের সবার চেয়ে বড়ো। পঞ্চাশ নির্ঘাৎ পেরিয়ে গেছে। এইসব লম্বানেকো লোকরা খুব বোকা হয় বলে চন্দনের ধারণা। কিন্তু একটু আগেই পরেশদা বলছিল যে, তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের আগের বছর রূপপুরের নির্জন মাটিতে এই সাহসী লোকটি খোল-ভূষির দোকান খোলেন নানান অঞ্চলের গরুর গাড়ি এখানে এসে বিশ্রাম নিত। বলদ-গুলোর খাবার যোগাতেন পাণ্ডেজী। তারপর দুর্ভিক্ষ লাগল। তখন বলদে খাবে কী, মানুষই সব খেয়ে শেষ করতে লাগল। পাণ্ডেজী এখন লাখপতি মানুষ।...এবং এইসব শুনে পাণ্ডেজী ভাঙা দাঁতে খুব হাসছিল।

হীরুবাবু পেট্রোল পাম্পের দিক থেকে এসে গেল। কুঁজো বকের মতন চেহারা লোকটির; তার ওপর ঢিলে প্যান্টশার্টে যা দেখাচ্ছে, হাসি পায়। পরেশ বলল, এক কাজ করুন। ক্যাশে শতখানেক টাকা হবে? দিন তো—জলদি।

হীরুবাবু টাকা এনে দিলে পরেশ টাকা-গুলো চন্দনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, যথা দরকার কিনে নেবে। না—সঙ্কোচ করো না। পরে মাইনে থেকে কেটে দেবে—ব্যস! আর ওঁদেরও তো কিছু দিয়ে আসা লাগবে। তাই না? বেচুদা, ওকে আরো একশো দিও। কেমন? চন্দন, ওঁর সঙ্গে একটু কষ্ট করে যাবে। তাহলে তুমি কাল থেকে লেগে যাচ্ছ। ঠিক আছে? আর কিছু বলবে?

চন্দন সলজ্জ হেসে মাথা দোলাল।

তুমি আমার সঙ্গেও যেতে পারো, চন্দন। ...পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল। ...আমি তো ট্রাকে যাচ্ছি। বহরমপুরে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। তুমি বাসে জিয়াগঞ্জ চলে যাবে।

চন্দন বলল, তাহলে তো একবার ওখানে যেতে হয়। ব্যাগটা আছে।

পরেশ বলল, ব্যাগের কী দরকার? রুমা রেখে দেবে—ভেবো না।

না......চন্দন একটু ভেবে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

পরেশ বেরিয়ে কাকে বলল, এই ফরিদ, আমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে আয় তো। জলদি। বলবি, জিয়াগঞ্জের যে বাবু রাত্রে

এসেছিলেন, তিনি জিয়াগঞ্জ গেছেন জরুরী কাজে। কাল ফিরবেন। বলতে পারবি তো?...

রাস্তায় একটা সবুজ রঙের ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা উঠে বসতেই স্টার্ট দিল। চন্দন ভাবছিল, বেচুবাবুকে আরও একশো টাকা দিতে বললেন পরেশদা—সেটার কী হবে? এখন টাকার কথা তোলা কি ঠিক হবে? টাকাটা পেলে এত ভালো হত! পরেশদার যা কাজের চাপ—বলার পরই ভুলে গেছেন। কিন্তু বেচুবাবুও কি ভুলে গেলেন? বা রে!

না—বেচুবাবু ভোলে নি। দৌড়ে এসে গেল।... আরে, ও পরেশ। সেই টাকাটা!

পরেশ কপালে করাঘাত করে জিভ কাটল।...দেখছ কান্ড? নৃপেন, রোখো, রোখো।

বেচুবাবু বলল, দু মিনিট। আমি রিকশায় যাচ্ছি। এসে পড়লাম এক্ষুনি এই মন্টু, রিকশো কই তোর?...

পরেশ একটু হেসে চন্দনের কানের কাছে মুখ আনল।...শালারা আমাকে যা ভয় পায়, ভাবতে পারবিনে চাঁদু। তোর দিব্যি। ভয় পায়—অথচ দারুণ বিশ্বাস করে। ভাবতে পারিস? এই সব লাখ-দু লাখের মালিকেরা আমাকে খুশি রাখতে পারলে সেইফ মনে করে—জিয়াগঞ্জের এই পরেশ মজুমদারকে। বিশ্বাস করে—কারণ, আমি কখনও ওদের সঙ্গে কোন তঞ্চকতা করি নি। করি নি—অথচ ওই বোকাগুলোর ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে দিব্যি খেয়ে এসেছি।... খিক খিক করে হেসে উঠল সে।

চন্দন বলল, যত বোকা ওদের ভাবছ, ওরা তত বোকা না হতেও পারে।

বুড়ো আঙুল নেড়ে পরেশ বলল, কিস্যু আসে-যায় না তাতে। ওদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছি যে, এই পরেশ মজুমদার ছাড়া ওদের কোন নিরাপত্তা নেই। ওরা রূপপুর চটিতে তাহলে কি অবস্থায় পড়বে জানিস? ভাগাড় দেখেছিস তো, ভাগাড়? এটা একটা ভাগাড়। চারদিকে ওৎ পেতে রয়েছে শেয়াল-শকুন। হাঃ হাঃ হাঃ।

হাসতে থাকল পরেশ। চন্দন বলল, তোমার অনেক কথা জানি না পরেশদা। জানতে ইচ্ছে করে।

পরেশ হাসি নামিয়ে একটু গম্ভীর হল। বলল, সে নিজমুখে কি বলব? ওরাই যেচে তোকে শুনিয়ে দেবে। এখানের লোকেরাও শোনাতে পিছপা হবে না। সবই করলাম জীবনে, পেলামও অনেক কিছু—কিন্তু চন্দন, মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয় কি জানিস ভাই? লোকের কাছে আমি ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠলাম। রূপপুর চটির লোকেরা সামনে-পিছনে ভয় যথেষ্ট করে—কিন্তু ঘেন্না কি কম করে? অথচ আমি কোন শালার পাকা ধানে মই দিই নি!

চন্দন অবাক হয়ে বলল, তাহলে কেন ঘেন্না করে বলছ?

করে—কারণ আমি এখানে এসে সামান্য ট্রাক ড্রাইভার হলাম—তারপর যে করে হোক নিজেই ট্রাক-মালিক হয়ে উঠলাম। ব্যবসা করে পয়সা কামালাম। বাড়ি করলাম। পেট্রোল পাম্প বসালাম। ওরা ভাবে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে কেন?

চন্দন হেসে বলল, সেই তো। কেন হল, তা আমিও বলছি।

পা সামনে তুলে একটু হেলান দিয়ে পরেশ বলল, সব কথা আমি নিজেও বুঝিনে—বলাও যায় না। শুধু বলব, যুগের ফসল আমি কাটতে পেরেছি। বেশী কৌতূহল দেখাস নে সব টের পাবি এক সময়।...ঘড়ি দেখল সে।...দেখছ, শালা বেচার কান্ড? নৃপেন, গলা বাড়িয়ে দ্যাখ তো ভাই—শালা আসছে নাকি!

ড্রাইভারটা মুখ বাড়িয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রিকশোয় এদিকে বেচুবাবু হাজির। হাত বাড়িয়ে একশো টাকার নোট দিয়ে বলল, পরেশ, জ্ঞানবাবুর গদীতে বড়বাবু এসে বসে আছে।

পরেশের ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, মুখার্জি?

হ্যাঁ। আমাকে ডাকছিল। রিকশো থেকে নামি নি—আসছি বলে এলাম।

আমার কথা জিগ্যেস করলে বোলো কলকাতা গেছি—ফিরতে দেরী হবে। চলো হে নৃপেন!

গাড়ি খুব জোরে চলছিল। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ। হাওয়া দিচ্ছিল উদ্দাম। পরেশ বলল, শীতের কাপড়-চোপড় সব এনো। যা যা নেই—সময়মত কিনে নিলেই চলবে।

চন্দন ডাকল, পরেশদা!

উঁ?

চন্দন চুপ করে গেল। ভাবল, কথাটা এক্ষুনি বলা ঠিক হবে কিনা। অথচ সেই রাতে আসা অব্দি যে অস্বস্তিটা জেগে উঠেছিল, এতক্ষণে সেটা বেড়ে গেছে অনেকখানি। একটা অন্ধকার কুয়াসায় জায়গার এক পাশে আলো পড়েছে—সেখানে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে কি বা কারা আছে, কি ঘটছে, সে জানতে পারছে না।

পরেশ বলল, কি?

কিছু না।

উঁহু। তোমার মুখ দেখে টের পাচ্ছি কি বলতে চাচ্ছ।

নাঃ। এমনি।

পরেশ ওর কাঁধে হাত রাখল।... একজন জানাশোনা বিশ্বাসী কাকেও খুঁজছিলাম। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম, চন্দন। যখন কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিই, তখন কোম্পানীর ব্যাপারটা ঠিক দানা বেঁধে ওঠে নি। তাই সময় লাগল। খুলে বলাই ভালো [illegible] আমি একাই করতাম। কিন্তু [illegible] হেভী লস খেয়ে একটু ঠেকে [illegible]

টাকা চাই। তখন ওই শালাদের ধরতে হল। দিনের পর দিন বুঝিয়ে-শুঝিয়ে রাজী করালাম। রেজিস্ট্রেশন হল। ব্যাঙ্কে টাকা পড়ল। এবার কাজ। কিন্তু ভাই চন্দন, বুঝতেই তো পারছ—যা দিনকাল পড়েছে, তাতে সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। আইন মেনে চললে তো ব্যবসার্কাড় ডকে উঠে যাবে। এখানেই যা একটুখানি ঘোরপ্যাঁচ। ধরো, হঠাৎ তোমাকে দুপুর রাত্রে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। বলা হল, কিছু মালপত্র এসেছে। তুমি যথারীতি ডেলিভারী নিলে। কাগজে সই করে দিলে। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক আছে। তারপর একটুখানি লুকোচুরির খেলা। কারণ, যে কোন সময়ে পুলিশ বা আই-বি'র লোক এসে হাজির হতে পারে। কই, মালগুলো দেখি।...তুমি তাদের কনসাইনমেন্ট চালান বা ভাউচার ইত্যাদি কাগজপত্র দেখালে। কেমন? এখানেই তোমার বুদ্ধিশুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। কারণ। ওই কাগজগুলো সব ফিকটিসাস কোম্পানীর নামে। সেই কোম্পানীকে খুঁজে বের করার আগেই ওদের সঙ্গে ম্যানেজ করে নিতে হবে। মনে রেখো—যথেষ্ট সময় তুমি পাচ্ছ। এই সময়ের সদ্ব্যবহার তোমাকে করতেই হবে।...

চন্দন গুম হয়ে গেল। সে বাইরে তাকাল। হেমন্তের বিকেল। দুধারে সবুজ ধানের রং হলুদে হয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। কুয়াসার টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে দূরের গাছপালা। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে সেদিকে। পাড়াগাঁয়ের পৃথিবীর সুন্দর প্রাকসন্ধ্যা শান্তি ও নির্জনতা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছে এই ধাবমান গর্জনকারী একটা শক্তি—ষড়যন্ত্র সংশয় আর শঠতার প্রতীক যেন সে। কোথায় চলে এল চন্দন? তার বুক কাঁপল। ভয়ার্ত চোখে সে পরেশকে একবার দেখে নিল।

পরেশ অস্ফুট চেঁচাল, আরে গেল, গেল! দুঃ ছাই!

চন্দন চমকে উঠেছিল। কিছু চাপা পড়ল নাকি?

পরেশ বলল, ব্যাঙ! রাত্তিরে বেশ মজা হয়। সাপগুলো এক নয়ানজুলি থেকে উঠে আরেক নয়ানজুলিতে যেতে চায়। কংক্রিট স্ল্যাবের ওপর আলো পড়ে। শালা, বুকের খাঁজে চাকার শব্দ লাগছে তখন—সে কি ধড়ফড়ি। কিন্তু পিছল জায়গায় ওরা তো ভারী কাবু। ফ্যাঁচ করে ভারী চাকা চলে যায়। ভাবা যায় না!

এই সব কথায় মাঝে মাঝে পুরনো পরেশদা ফিরে আসছে। সেই ভঙ্গী, হাসি, চোখ নাচানো—তাকানো। মুখ তুলে ঠিক সেভাবেই বাইরে তাকাচ্ছে—যে তাকানো তার কোন ভাবনা-চিন্তাকেই প্রকাশ করে না। শিশু যেমন করে বাইরের পৃথিবীটা দ্যাখে, এ চাউনি যেন ঠিক সেই রকম।

তোর বউদি যা শাপমন্যি করছে! বুঝলি রে?

চন্দন সাড়া দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই পরেশ বলল, বুঝলি নূপেন? বিয়ে করিস নি, ভালই আছিস ভাই। তোমার সম্পত্তি লাটে উঠুক, আর দুনিয়া জাহান্নামে যাক, দু রাত্তির পরে-পরে একটা রাত্তির অন্তত গলা ধরে শোওয়া চাই-ই। নৈলে কুরুক্ষেত্র।

চন্দন বলল, বউদির জ্বরটর হয়েছে মনে হল।

পরেশ বলল, তুই শুনলি নাকি? তোকে বলি নি। তোর গুরুজনের একটু খিটকেল করলাম রে, চন্দন।

চন্দন তার কথার পুনরাবৃত্তি করল, বউদির জ্বর হয়েছে। সারা দিন শুয়ে আছে দেখছিলাম।

ওর জ্বরজারি বারো মাস। ছেড়ে দে। নে, সিগারেট খা।...সিগারেট বের করে পরেশ বাইরে আঙুল তুলে বলল, ওই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে—ব্রীজের ওধারে, শিশিবদার গ্রাম।

হাওয়া বাঁচিয়ে দুজনে সিগারেট জ্বেলে নিল। চন্দন বলল, যাই হোক। তোমার এখন মাঝে মাঝে বাড়ি শোওয়া ভালো পরেশদা। ওরা একা মেয়েছেলে রাত কাটায়। জায়গার বদনাম আছে শুনেছিলাম।

পরেশ বলল, পাগল! পরেশ মজুমদারের বাড়ি পা বাড়াবে, এলাকায় তেমন কেউ নেই। তার দলবল নিতান্ত সামান্য নয়। আর রুমা—রুমাকে তো দেখলি। কী মনে হল?

কী মনে হবে? ...চন্দন খুব আস্তে বলল কথাটা।

কিছু মনে হল না? তোর হাতে গড়া মেয়ে। মনে হল না, শান দেওয়া তরোয়াল?

কী জানি!

কী জানি? ...পরেশ তার বিশাল হাতের থাবায় চন্দনের ঘাড়টা ধরল। ...স্পষ্ট কথা শোন চন্দন। আমি ভাই বরাবর ফ্র্যাংক কথাবার্তা বলি। ওই মাবাপমরা মেয়েটাকে এতটুকুন থেকে মানুষ করছি, লেখাপড়া শেখাচ্ছি। সে চাকরী করবে—সেজন্যে নয়।

তবে কী জন্যে?

ঘাড়টা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে সিধে হল পরেশ। বলল, মেয়েটা বাঘিনী হবে রে চন্দন, বুঝলি? আর পাঁচটা বাঙ্গালী মেয়ের মতো ন্যাকা-ন্যাকা ঢঙে চাকরী করতে ও জন্মায়নি।...হঠাৎ পরেশ গলাটা চাপা করল। ...তোকে সব বলা যায়। রুমার নামে আমার অনেক কিছু রয়েছে। ওই পাম্প, ট্রাক দুটো, আরো অনেক কিছু—ব্যাংক এ্যাকাউন্ট তো আছেই। এগুলো ওনলি ফর মাই সেফটি, বুঝলি? আর তোর বউদির নামে বাড়িটা আছে। আমার শালা কিস্যু নেই। নেই—কারণ বাধা আছে। বাধা ছিল। সে অনেক হিস্ট্রি। পরে একদিন তোকে সব বলব। এখন কথা হচ্ছে, রুমা—রুমা সামান্য মেয়ে নয়।

চন্দন হেসে উঠল।

পরেশ—একদিন জিয়াগঞ্জের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে কী কথায় ঠাট্টার ছলে যেমন বলেছিল, ঠিক তেমনি সুরে, এই গর্জমান শক্তিশালী ট্রাকটার ভিতর বসে বলে উঠল, হাসিস নে চাঁদু। তোর গলাতেই ঝুলিয়ে দেব শালীটাকে।

চন্দন আরো জোরে হেসে উঠল। কিন্তু নিজেই টের পেল—হাসিটা শুকনো, চেষ্টাকৃত, অকারণ। সামঞ্জস্যহীন এই হাসির নিচে বিকট একটা কিছু ওৎ পেতে রয়েছে। পরক্ষণে তার মাথার ভিতরটা শুকনো লাগল। চোখের সামনে সব কাঁপতে থাকল।

চাঁদু!

উঁ?

ওকে তোর পছন্দ হয়?

পরেশদা! ...চন্দন অস্ফুটকণ্ঠে বলল। ...কী যা তা বলছ? তুমি ড্রিংক করেছ নির্ঘাৎ!

করি—কিন্তু এখনও করিনি। ...পরেশ সহজভাবে বলল। ...তোকে বহরমপুরে নামিয়ে দিয়ে সাউবাবুর ওখানে যাবো—তখন। কিন্তু প্রস্তাবটা জানিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে?

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। পিছনে খোলের মধ্যে বসে ট্রাকের লোকগুলো গান গাইছে: আবছা শোনা যাচ্ছে। কী উদ্দাম বাতাস! অন্ধকার নামছে ক্রমশ। বড় বড় গাছ দুধারে। হেডলাইট জ্বলে উঠল। সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে দু-পাশে সব বিশাল ছায়া—মাঠের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। একটা গরুর গাড়ি আসছিল। বলদ দুটোর চোখ উজ্জ্বল নীল হয়ে উঠল। একটা চাকা নামিয়ে নৃপেন গাল দিল, এই শালা শুয়ারকা বাচ্চা! কানা নাকি? তীব্র হর্নের শব্দে আর কিছু শোনা গেল না। চন্দন টের পেল, তার মধ্যে একটা বিপুল অস্থিরতা জাগছে। একটা ঝড় বইছে হু-হু করে। কিছুক্ষণের জন্যে সে ভাবতে ভুলে গেল। স্বপ্নের মধ্যে তার এই যাত্রা—কেমন যেন অসহায়—কিছু বলা যায় না, করা যায় না। নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ আর নেই। সে চোখ বুজল। দেখল রুমাকে। গঙ্গাজলে স্নিগ্ধ ভিজে মুখ নিয়ে অপেক্ষমানা বালিকা রুমাকেই।

তারপর শ্যাওলাধরা নবাবী আমলের ক্ষুদে ইটের তৈরী জিয়াগঞ্জের বাড়িটা দাঁত ছরকুটে হেসে ওকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

সাড়া পেয়ে বাবা লণ্ঠন হাতে দৌড়ে এলেন। দরজা খুলেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন—হল? কী বলল ওরা?

চন্দন টলতে টলতে হাঁটছিল। শুধু অস্ফুট হুঁ বলে সে এগিয়ে গেল বারান্দায়। সতরঞ্চ বিছিয়ে ভাইবোনদের পড়াচ্ছিল দিদি পারুল। ওকে দেখে সবাই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল। সবার মুখে প্রশ্ন আঁকা। মা ভিতর থেকে বললেন, চাঁদু এলি? খবর ভাল, না খারাপ?

জবাব দিলেন বাবা। অভিজ্ঞ লোক। বললেন, হয়েছে। হবে না কেন? কমার্সে ডিগ্রি, তার ওপর ইলেকট্রিক এনজিনিয়ারিং—কই রে, তোরা দাদাকে হাতমুখ ধোবার জল দে।

পারুল বলল, তোর ব্যাগ কোথায়?

চন্দন মেঝের সতরঞ্চিতে বসে পড়েছিল।। বলল, আছে ওখানে। কাল সকালেই সব গুছিয়ে যেতে হবে। এক গ্লাস জল দে তো দিদি।

মিথ্যে বলে না চন্দন—তার মুখে মিথ্যে শুনে হয়তো নয়, আগের কথাটা পারুলকে চঞ্চল করে তুলেছে। সে প্রায় লাফাতে লাফাতে-ঘরে ঢুকল। 'ভাইবোনগুলো সেই মুহূর্তে' কলরব করে উঠল, চাকরী হয়েছে, দাদার চাকরী হয়েছে!

সারা বাড়িটা হা-হা করে হাসছে। মা বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে। বললেন। হ্যাঁ রে, তা মাইনে টাইনে কী রকম দেবে?

চন্দন বিকৃত মুখে ঘুরে বলল, চারশো। পরে আরও বাড়তে পারে।

ফের একটা চাপা গুঞ্জন এবং তারপর কলরব উঠল চারপাশে। বাবা হাসছেন। মা হাসছেন। পারুল হাসছে। সতু নাণ্টু, লিলি হাসছে! হাসছে নবাবী আমলের শরু ইটের বাড়িটা। তার দেয়ালে একদঙ্গল ছায়া নাচছে। উৎসবের এই নির্বোধ বেলুনটা এক ঘুঁষিতে ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল চন্দনের। ফিসফিস করে কণ্ঠগুলো উচ্চারণ করছিল, চারশো—চা-র-শো! এবং আঙুল-গুলো বারবার নড়ে উঠছিল—নিরুপমার হাসিখুশি নিরাপত্তাসূচক কঠিন কংক্রিট স্ফা-র-স্রোতে'। তক্ষুনি চন্দনের মনে হল—একটা কিছু করা দরকার।

অথচ কিছুই হয়ে উঠল না। সে নিঃসাড় হাতে খুচরো নোটগুলো বের করে বাবার হাতে দিল। বলল, এক্ষুণি আছে।

বাবার জিভ বেরিয়ে গেল।...আগাম দিলে? এ্যাডভান্স?

সবাই নিঃশব্দে টাকা দেখছে। একটা ভয়ংকর স্তব্ধতা করেক মুহূর্ত—তারপর বাবা একটু কাসলেন। বললেন, কাল সকালে আর বাজার করার পয়সা ছিল না। বীরুর কাছে যেতে বলেছিলি, একটু আগে পারু ফিরে এল। কলকাতা থেকে আসেই নি। কবে আসবে ঠিক নেই। দায়িত্বহীন, দায়িত্ব-হীন! একটা ফ্যামিলির জীবন নিয়ে ছেলে-খেলা!

বাবার গলাটা শেষ দিকে জড়িয়ে গেল। মা বললেন, তুমি পারুলকে নিয়ে বাজারে যাও। সকালে যাবে বলছে, দেরী করা ঠিক হবে না। ঘাটের দিকে ঘুরে এসো না। হরেনের নৌকোটা দেখে এসো। মাছটাছ পাও নাকি।

চন্দন বলল, একটা বড় দেখে ইলিশ এনো—যদি পাও। স্নেহবউদির বাড়িতে দেব। মা, কাল সকাল অব্দি মাছটা পচে যাবে না তো?

বাবা বললেন, কী দরকার? সক্কালে ঘাটে হয়ে যাবি—তখন ওর কাছেই নিবি। আমি বলে রাখছি। তবে এখন বড় আশা কম। ইলিশ আর নাকি ওঠে না জালে।

পারুল বলল, হ্যাঁ রে, ওরা সব কেমন আছে? সত্যি বাড়ি-ফাড়ি করেছে নাকি? আর তোর সেই রুমাকি কেমন আছে?

চন্দন ঘুরে তীব্র দৃষ্টে তাকাল।...কার রুমাকি?

হাসতে হাসতে সরে গেল পারুল।... মা থালে-টালে সব কই?...

অনেক রাত হল শুতে। পাশের ঘরে মা-বাবার কথাবার্তার গুনগুনানি কানে আসছে। ও-ঘরের মেঝেয় পারুল আর লিলি শোয়। তারা হয়তো শুনছে কথা-গুলো। ভবিষ্যতের জল্পনাকল্পনা। বাড়িটা আজ রংমহলের রূপ নিয়েছে। ওদের চোখে তার জেল্লা ঠিকরে পড়ছে। এ ঘরে একা চন্দন। তার ঘুম এল না গতরাতের মতোই। রাত যত বাড়ছিল, এ পুরনো শহরের সব শব্দ যত চাপা পড়ছিল স্তব্ধতার নিচে, দেয়ালের ফাটলে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছিল, চন্দন বুঝতে পারছিল— ক্রমশ তার চেতনা পরিষ্কার হয়ে আসছে। সে সব স্পষ্ট বুঝতে পারছে। পরেশদার কোম্পানীটা আসলে কী, কেন পরেশদাকে সবাই ভয়-ভক্তি করে, তার বেনামী সম্পত্তির উৎস কোথায়, আর বেচুবাবুর মুখে কোন বড়বাবু মুখার্জির কথা শুনে পরেশদার মুখের বিকৃতি, একটু করে—আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে। কুয়াশা সরে গিয়ে রোদে যেমন পৃথিবীটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তার বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা শ্বাস শিরশির করে মগজে গিয়ে ঢুকল। সিগারেটের পর সিগারেট খেল সে। পায়চারী করল মাঝে মাঝে। সে জিয়াগঞ্জে খুব সৎ ছেলে বলে পরিচিত। সবাই তাকে ভালবাসে। সাহায্য করতে চায়। তা না হলে কবে এই পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যেত। পথে আশ্রয় নিতে হত। আর এইবার সে অবিকল রূপপুরে চটির পরেশ মজুমদার হয়ে উঠবে।

না—এটা কোন ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম বিবেকের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা অন্যখানে। সে পারবে তো? জীবনে কখনও মিথ্যা বলে নি। চুরি করে নি। চন্দন, তুমি পারবে তো? এ তোমার সাহস ও শক্তির কাছে একটা সরল প্রশ্ন। এ একটা চ্যালেঞ্জ। এবং ভোরে যখন প্রথামত গেনুবাবু গলিপথে খঞ্জনী বাজিয়ে গঙ্গাস্নানে গেল, গাইতে গাইতে গেল—ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, সে চোখ খুলল। এইমাত্র সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। অতল কালো উত্তরঙ্গ গঙ্গার জলের ওপর দু-হাতে সে রুমাকে ধরে আছে— ভিজে স্নিগ্ধমুখ বালিকা রুমার, দু'চোখে করুণ ত্রাস—চন্দনদা, ডুবে যাইনে যেন।

(ক্রমশঃ)

ভুটান নতুন যুগের ভোরে

অঞ্জন রায়

১৯৪৯ সালের ভারত-ভুটান মৈত্রী-চুক্তির পর এ দুটি দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভুটানের সদস্যপদের জন্য ভারতের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদিত হয়েছিল আগেই। গত ২২শে সেপ্টেম্বর সাধারণ সভাতেও তা অনুমোদিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এ বছরের ১৭ই মে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত তাঁর পরিচয়পত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। দাশো শ্রীলিওনপো পেমা ওয়াংচুক ভুটান সরকারের প্রথম প্রতিনিধির কৃতিত্ব নিয়ে নয়াদিল্লীতে তাঁর দপ্তর খুলেছেন গত ১৭ মে, সোমবার ১৯৭১ সাল।

১৮ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে, প্রায় ১২ লক্ষ লোকের ছোট্ট দেশ ভুটান। পুনাখা থেকে রাজধানী উঠে এসেছে থিম্পুতে। এর উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে সিকিম আর দক্ষিণ-পূর্বে, উত্তরবঙ্গ ও আসামের সীমারেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ২০০ মাইল ব্যাপ্ত এর দক্ষিণ সীমান্ত।

দেশের পুনর্গঠনে ভারতের সহায়তার স্বীকৃতি ১৯৪৯ সালের ভারত-ভুটান চুক্তি। রাজতন্ত্রের দেশ হলেও মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে সভ্যতার আলোকে পৌঁছুতে রাজারও (রাজা শ্রীজিগমে দোর্জি ওয়াংচুক) সমান আগ্রহ। ১৯৫২ সালে রাজা দাসত্ব প্রথাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন এবং পাঁচ হাজার দাসকে মুক্ত করে তাদের জন্য জমি ও সরকারী অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় জাতীয় সভা, এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন। রাজকীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় ১৯৬৫-তে আর মন্ত্রী পরিষদ ১৯৬৮-তে। বিচার ব্যবস্থার

রাজধানী থিম্পুর বাজার এলাকা

থিম্পু শহর ও বাকু পরিহিতা মহিলা
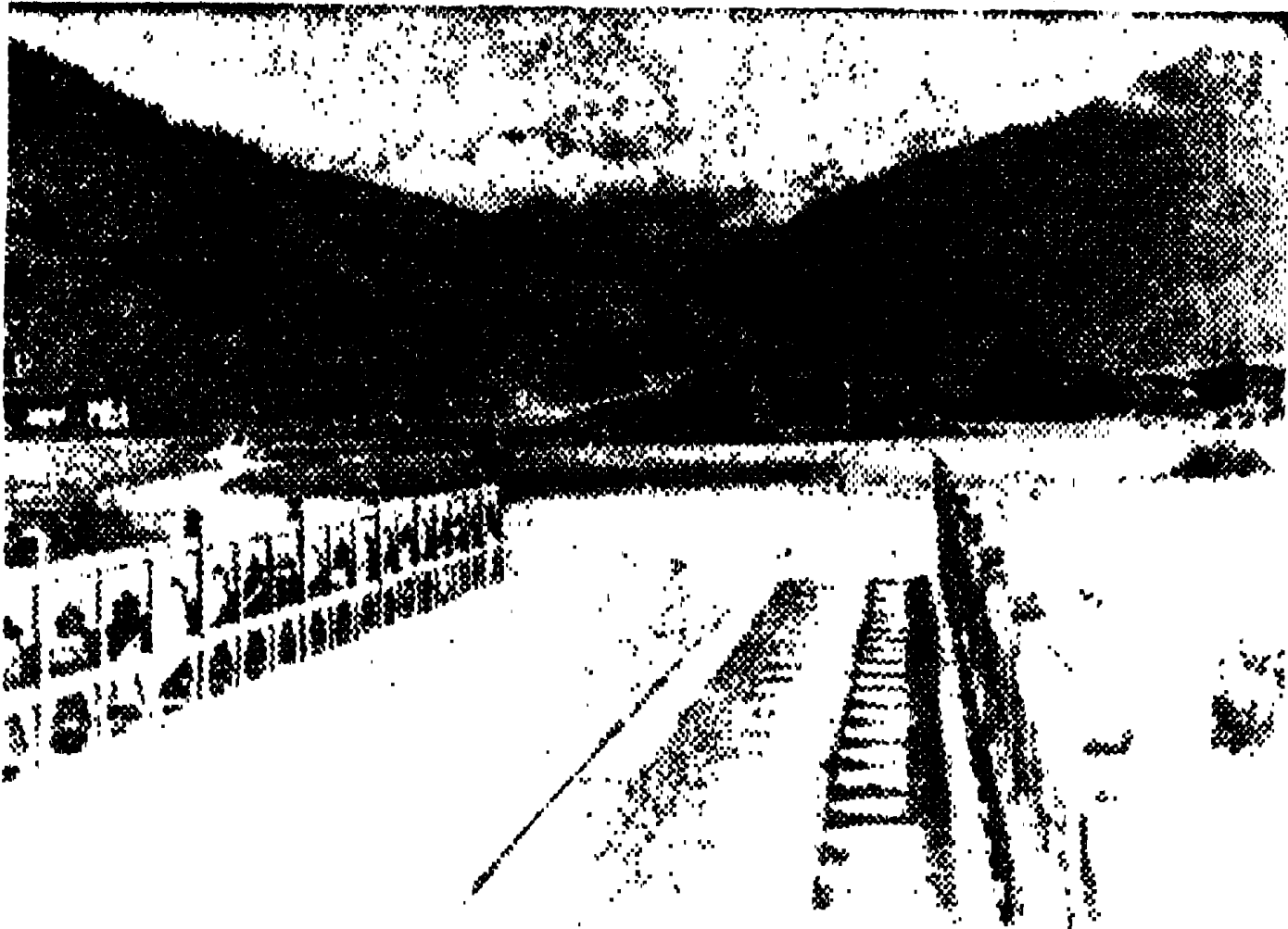
পারো শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য

পারো শহরে 'চোরতেন'—পবিত্র স্তূপ
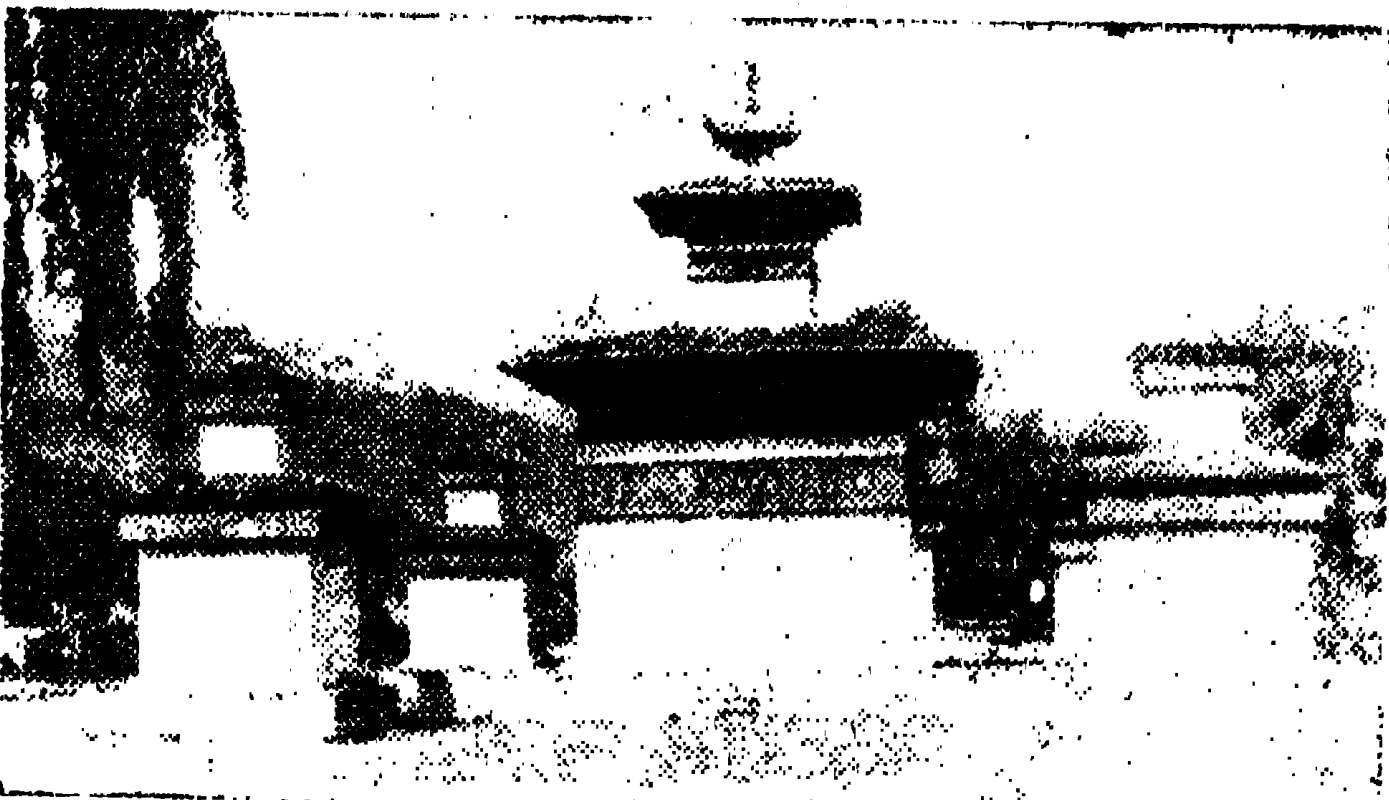
উন্নতির জন্য গঠিত হয় হাইকোর্ট ১৯৬৮-তেই। এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ মনযোগ দেওয়া হয়। দুটি ব্যাপক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১-১৯৬৬ ও ১৯৬৬-১৯৭১) ভুটানের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এনেছে আলোড়ন। ভারতের সহায়তায় ভুটান একটি কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত দেশ এবং সেই বাবদ বৈদেশিক সাহায্য মেলে ২০ কোটি টাকার।

ভারতের সাহায্যে স্থাপিত হয়েছে ভুটানের নিজস্ব টাকশাল। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ভালো রাস্তাঘাট, টেলিফোন টেলিগ্রাফ, স্কুল—বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক-বাজার সিনেমা আধুনিক জীবনের অনেক কিছু। ভারতের তত্ত্বাবধানে ভুটানের সেনাবাহিনীও ঢেলে সাজানো হয়েছে। ভারতের ভূতত্ত্ববিদদের সহায়তায় পাওয়া গিয়েছে তামা, চুনা পাথর, ডলোমাইট, জিপসাম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ। শুরু হয়েছে কাগজ, সিমেন্ট ও পটাশ উৎপাদন। আছে আকরিক লোহার অফুরন্ত ভাণ্ডার। পশু-পালন শিল্প হিসাবে জনপ্রিয় হচ্ছে। এছাড়া ফল ও আনাজও ফলে পর্যাপ্ত। ভুটানী মদ, বিশেষতঃ কমলার রসের হুইস্কি বিশ্ব-বাজার মাতানোর যোগ্য। ভারতের সীমান্তের সাপ্তাহিক হাটগুলিতে ভুটানী বণিক আসে তার সওদা নিয়ে। আনে কমলা, আদা, আলু, কোয়াশ, আনারস প্রভৃতি ফল ও আনাজ। আনে 'ভরসা' দুধের মাখন। আর আনে সৌখীন ভারতীয়দের জন্য সুন্দর সুন্দর কুকুর ছানা।

রাজতন্ত্রের দেশ হলেও রাজা স্বেচ্ছায় জাতীয় সভার হাতে অধিকতর ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন ধীরে ধীরে। কোন রাজাই শাসন চালিয়ে যেতে পারেন না যদি 'সংদু'র অর্থাৎ জাতীয় সভার দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা তা না চান। অর্থাৎ ঐ সংখ্যাধিক্যে রাজাকে অপসারণও করা চলবে।

পণ্ডিত নেহরু স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারত সীমান্তের ছোট দেশগুলি স্বয়ংনির্ভর এবং শক্তিশালী হলে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে তা অত্যন্ত কার্যকর হবে। তাই হতে চলেছে। কৈশোর ছেড়ে যৌবনে—শত-শতাব্দীর ঘুম ভেঙে ভুটান আজ নতুন যুগের ভোরে।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥১৭॥

আজ কর এই সকালটাই শুধু বিষিয়ে গেল না, শুধু আজকের দিনটাও না—এর-পর আসন্ন প্রমোদবাসের চিন্তাও অসহ্য বোধ হতে লাগল। মনটা ভারী অবসন্ন হয়ে উঠছে, কিছুই ভাল লাগছে না। নিজের সম্বন্ধেই সবচেয়ে বিতৃষ্ণা যেন। নিজের মনের যে রূপটা দেখতে পেয়েছে, তাতে মাথাকুটে মরতে চাওয়াই উচিত। এরপর সেই জনহীন পল্লীর নির্বান্ধব পুরীতে একমাত্র পূর্ণবাবুকে অবলম্বন করে একমাত্র তাঁর সাহচর্যেই চারদিন একান্তবাসের কথা কল্পনা করতেই যেন মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

অথচ যেতেই হবে। এতদিন টালবাহানা করে শেষ অবধি কথা দিয়েছে, এত আয়োজন পূর্ণবাবুর, আজ আর যাব না বলা যায় না। না যাওয়ায় কোন ভদ্রমতো কারণও দেখানো যাবে না। যেতে হবে, চারদিন থাকতেও হবে—সবচেয়ে বড় হাসতে হবে, হাসাতে হবে। আনন্দ করতেই নিয়ে যাচ্ছেন তিনি, অনেকদিনের সাধ তাঁর—কদিন নিরিবিলিতে হেমন্তকে নিয়ে সুখবাস করবেন, আনন্দ করবেন।...

দুপুরের দিকে গাড়ি আসবে, যেতেও ঘণ্টা দেড়েক লাগবে অন্তত—ভাড়াটে ছ্যাকরা গাড়ি—এইটুকু সময় হাতে আছে। প্রাণপণে সাধনার মতো করে চেষ্টা করতে লাগল হেমন্ত—এই সময়ের মধ্যে, মন যদি নাও হয় মুখভাবকে স্বাভাবিক করে তুলতে।

ওর বিশ্বাস, অপরাহ্নের দিকে যখন বাগানবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল, তখন সে সাধনায় ও সিদ্ধিলাভ করেছে, ওর সহজ স্বরূপে ফিরে এসেছে ও। কিন্তু পূর্ণবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। [illegible] সব [illegible] তিনি এক সময় অনুযোগ করলেন, [illegible] মুখভার করে আছ কেন? গোমড়া মুখ করে?...বর্ষার মুড়ির মতো মিইয়ে যাচ্ছ যে! এতই খারাপ লাগছে আমাকে?'

হেমন্ত ভ্রূকুটি করে জবাব দিল, 'তোমার সঙ্গে তো নিত্যই দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, ছেড়েও তো দিচ্ছ না কিছু। খারাপ লাগলে তো কবেই জানতে পারতে। ...এখানে আমার ভাল লাগে না—জানই তো। জেনেশুনেই তো এনেছ!'

'কেন যে ভাল লাগে না তা জানি না।' অপ্রসন্নমুখে বলেন পূর্ণবাবু, 'নির্জন, ভয় করে, একা একা থাকতে হয়—যত যুক্তি ছিল তোমার না-আসার সবই তো কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি, তবুও অত ব্যাজার মুখ কেন? তাহলেই বলতে হয় যে আমাকেই আসলে পছন্দ নয়।'

'তোমাকে যে খুব পছন্দ, এমন কথা কি কখনও বলেছি?' শাণিত হয়ে ওঠে হেমন্তর কণ্ঠ, বহুদিনের জ্বালা যেন গলা দিয়ে উপচে উঠতে চায়, 'না, সেটা জানার জন্যে অপেক্ষা করেছ? পছন্দ আছে জেনে তবে গায়ে হাত দিয়েছ? তোমার দরকার তুমি সেইটেই ভেবেছ, আমার মতামত ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা কখনও ভেবেছ কি?'

চুপ করে থাকেন পূর্ণবাবু। হেমন্তই আবার বলে, 'মানুষের মনের গতিক কি সর্বদিন সমান থাকে? তোমার যখন হাসবার ইচ্ছে হবে তখন আমার না-ও হতে পারে। তোমার মন যুগিয়ে চলতে হবে—এমন করার কখনও করেছি কি?'

এ কঠিন আঘাতও নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। শুধু মুখটা যে লাল হয়ে ওঠে, আর [illegible] কঠিন—তাইতেই বোঝা যায় আঘাত [illegible]স্থানে ঠিক মতোই বেজেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন পূর্ণবাবু, [illegible] বললেন, [illegible] আর আসে তোমার ওখানে?'

কঠিন প্রশ্ন। সুকঠিন উত্তর দেওয়াও। চুপ করে থাকা বিপজ্জনক।

বহুদিন এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল সে, তখন করেননি পূর্ণবাবু। আজ এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে ঠিক এই আলোচনার সূত্র টেনে প্রশ্নটা করাতে কয়েক মুহূর্ত ভাবতে হল বৈকি। কতদূরে কি ভাবছেন এ লোকটি, কিসের সঙ্গে কি মেলাচ্ছেন বলা শক্ত, এ উত্তরের ওপর হয়ত অনেকখানি নির্ভর করছে, বহুদূর প্রসারী বহুবিস্তৃত চিন্তার হয়ত এই শুরু। যা শুনবেন তার চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা করবেন।

তবু মিথ্যা কথাও বলা গেল না। বলা উচিত নয়।

বহুলোক যে কথা জানে সে কথা সরাসরি গোপন করতে যাওয়ার মতো মূর্খতা নেই। বাড়িতে আসে, ঠাকুর চাকর দারোয়ান সবাই জানে, এরপর যদি তাদের কারও কাছ থেকে শোনেন?

উদাসীনভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, 'মধ্যে মধ্যে আসে।'

'আসে! কৈ, বলোনি তো?'

পূর্ণবাবু চমকে সোজা হয়ে বসেন কি ওর মুখের দিকে চেয়ে মুখভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন, সে রকম কিছু নয়—তবু কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্নতা একেবারে গোপন করতে পারেন না।

হেমন্তর যে কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হল উত্তর দিতে—এর কোন বিশেষ অর্থ করার চেষ্টা করছেন কিনা, করলেন কিনা—কে জানে!

হেমন্ত উত্তর দিল, 'তুমি তো জিজ্ঞাসাও করোনি এর ভেতর কোনদিন। অত আমার মনেও ছিল না। তাছাড়া আমি ভেবেছি [illegible] থেকেই নিশ্চয় তুমি শোন—'

[illegible] একটু থেমে কথাটা আরও [illegible] করার জন্য বলে, 'বোধহয় তুমি খুব

বকেছিলে রাত করে আসবার জন্যে—সেই ভয়েই তোমাকে জানায়নি। অনেকদিন আসেনি তার পর, এখনও এক আধ দিন যা আসে সকাল ছাড়া আর আসে না, ঐ কলেজ যাবার আগে।...খুব ভয় করে তোমাকে!'

এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করলেন না পূর্ণবাবু। জোর করেই যেন অন্য কথা পাড়লেন।

হেমন্তও আর অকারণে নিজে থেকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল না। বরং সহজ ও স্বাভাবিক হবারই চেষ্টা করতে লাগল। কিছু পূর্বের মনোমালিন্যটা মিটিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর সে। হিসেব করে করে, পূর্ণবাবুর মন কোন্ কুটিল গলিপথে বিচরণ করে — এতদিনে যতটা জেনেছে—সেই পথেই অগ্রসর হতে লাগল, হাসি-খুশি রসিকতায়। ওঁর পছন্দ মতো আচরণে ওঁকে খুশি করারই চেষ্টা করতে লাগল।

তবু অস্বস্তি একটা থেকেই গেল মনের মধ্যে।

যদি এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতেন, যদি কোন বাঁকা মন্তব্য করতেন, — রাগ করতেন খানিকটা তো নিশ্চিন্ত হত হেমন্ত।

এই লোকটি অতিসামান্য অবস্থা থেকে অনেক বড় হয়েছে শুধু বিদ্যা বা প্রতিভায় নয়—বুদ্ধিকৌশলেই বেশী। এঁর মুখেই শুনেছে হেমন্ত দূর সম্পর্কের কে এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে পড়াশুনা করেছেন ছেলেবেলায়—সে বাড়ির অন্য ছেলেরা, তাদেরই আশ্রিত একটা ছেলে তাদের চেয়ে ভাল পড়াশুনো করছে এটাকে এক রকমের ধৃষ্টতা মনে করে—কি পরিমাণ ওঁকে অপদস্থ ও বিপন্ন করবার চেষ্টা করত দিন-রাত। শুধু নিজের কূট বুদ্ধিকে সদাসতর্ক ও সদাজাগ্রত রেখেই সেখানে বাস করতে পেরেছেন কটা বছর। চারিদিকে দৃষ্টি রাখতে হত, সকলের মনের গতি লক্ষ্য করতে হত—কে কোথা দিয়ে তাঁকে বিপন্ন কি অপদস্থ করার চেষ্টা করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করতে হত কোন কৌশলে সে আঘাত প্রতিহত করতে হবে ষড়যন্ত্র বানচাল করতে হবে।

এইভাবেই, পরবর্তী কালেও, পরভৃৎ পরান্নভোজীর জীবনযাপন করতে হয়েছে—এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে—সর্বত্রই এইভাবে লড়াই করে যেতে হয়েছে ঈর্ষা ও নীরবতার সঙ্গে। তার ফলে পূর্ণবাবুর মনের গতিটাও সর্বদা কুটিল পথে জটিল চিন্তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে। কোন জিনিসই সহজ সরল অর্থে গ্রহণ করতে অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রতিটি [illegible] [illegible] পিছনে কি [illegible] [illegible] দেখার ও ভাবার চেষ্টা করেন।

[illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] যদি এখন সংস্রব ত্যাগ করেন তো সে বেঁচে যায়।

যে পসার হয়েছে তা এখন আর সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না, নিজেকেও সেই সঙ্গে হেয় না করে। তার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না আর—এটা নিশ্চিত, অবশ্য ভগবান যদি না মারেন, দেহটা যদি ভেঙে না যায়।

কমলাক্ষর কিন্তু অনেক অনিষ্ট করতে পারেন, অনেক শত্রুতা।

এই উন্নতির মুখ এখন ওর।...

এখনও যদি সুবুদ্ধি হয়, যদি আসা বন্ধ করে তো ভাল।

সেই কথাই বলবে ও কমলাক্ষকে—মনে মনে বার বার সঙ্কল্প করে। আর না। ছেলে হয়েছে, সংসার সম্পূর্ণ ওর ওপরই নির্ভর করছে—নিজের আখেরটা দেখতে হবে তো।...

কী লাভই বা এভাবে এসে। শুধু শুধু দুটো লোকেরই মনে অশান্তি বাড়ানো — ভবিষ্যতের অনেক অশান্তির কারণ সৃষ্টি করা।

না, একার বন্ধ করতেই হবে এই দেখা-শুনো। ভাল নয় এটা, কারও পক্ষেই ভাল না।

বিশেষ সেদিন ওর মনের যে চেহারাটা, যে নগ্ন বুভুক্ষা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—তার পর আর কোনমতেই ওকে আসতে দেওয়া বা নিভৃতে দেখা করা উচিত নয়।

সেই কথা বুঝিয়ে বলে ওকে নিবৃত্ত করতে হবে।

দরকার হয় জোর করতে হবে।...

বার বার প্রতিজ্ঞা করে, বার বার নিজেকেই শাসায়—আর প্রাণপণে পূর্ণবাবুকে খুশী করার, ভোলাবার চেষ্টা করে। কেন যে এত বার বার সঙ্কল্প করতে হয় এত করে বলতে হয় নিজেকে—সেইটেই শুধু ভেবে দেখে না। ভাবতে সাহস হয় না বোধ হয়।

এখান থেকে পূর্ণবাবু রওনা দিল সকাল আটটা নাগাদ, ফেরেন অপরাহ্নে—চারটে সাড়ে চারটেয়। দুপুরে নিজের বাড়িতেই খাওয়া সারেন। একদিন অবশ্য বেলা একটাতেই ফিরে এসেছিলেন—বাকী সব দিনই, মধ্যের এই সময়টা হেমন্তর নিজস্ব। একটু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে, ভাবতে পারে নিজের কথা, নিজের ভবিষ্যৎ।

এই সময়টা আর মুখোশ পরে থাকতে হয় না—লক্ষ্য রাখতে হয় না তার মুখ দেখে পূর্ণবাবু কি অনুমান করার চেষ্টা করছেন। এইটুকুই তার অবসর—অবকাশও।

চার দিনের দিন, দুপুরের দিকে বাগানে বেরিয়ে পড়েছিল একটু। শেষ প্রভাত যাকে বলে—বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা।

পরের দিন সকালে চলে যাওয়ার কথা [illegible] [illegible] দীর্ঘ দিন আসা হবে না। এমন [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] না [illegible] রাত্রে রাত্রেই, বাগানটাও ভাল করে ঘুরে দেখা হয় নি। একদিন দুপুরে এসেছিলেন। এইখানে কাছাকাছি সাদি পার্কে একটা কেস ছিল—দুজনেরই কেস—সেরে, পূর্ণবাবু পীড়াপীড়ি করে নিজের গাড়িতে করে এনেছিলেন। কিন্তু সেও—তখন এত ক্লান্ত, ঘুরে ঘুরে বাগান দেখার অবস্থা ছিল না।

এই গত তিন দিন যা একটু-আধটু ঘুরেছে, সকালের দিকে। দুদিন পুকুরে স্নানও করেছে—ভরসা করে, পূর্ণবাবুর নিষেধ না শুনে। তাঁর কেবলই ভয় ডুবে যাবে হেমন্ত। ও যে সাঁতার জানে, সে তথ্যটা আসলে জানেন নি বিশেষ, বলেছেন, 'কত দিন সাঁতার কাটো নি, হয়ত ডুবে যাবে, পারবে না। এ পুকুরের জলটাও ভারী, ব্যবহার তো হয় না বিশেষ। অত গোঁয়ার্তুমি করতে যেয়ো না।'

প্রথম দিন সে জন্যে বাড়িতেই নেয়েছে, তোলা জলে। তারপর আর লোভ সামলাতে পারে নি। নেমেছে, সাঁতারও কেটেছে; একটু একটু করে ভয় ভাঙাতে, হাত পায়ের খিল ছাড়তে এপার ওপারও করেছে দু-তিনবার।

তবু বাগানটা পুরো দেখা হয় নি। বিরাট বাগান, পাঁচ বিঘের ওপর জমি, ছ বিঘের কাছাকাছি।...আম-জাম-কাঁঠাল-জামরুল-আমড়া-গোলাপ জাম— এদিকে নারকেল সুপুরি—সব রকম জানা গাছই আছে। এ ছাড়া দেশী-বিদেশী ফুল—চাঁপা বকুল কামিনী কাঁটালচাঁপা থেকে শুরু করে ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা পর্যন্ত। বড় বড় গাছই বেশী। ফলে বাগানটা কেমন যেন ঝুপসি ঝুপসি—ছায়াঘন অন্ধকার হয়ে থাকে বেশীর ভাগ সময়ই। সকালের দিকে —এই শেষ বসন্তের সকালেও গা ছমছম করে।

সেই জন্যেই আজ, এই দুপুরে বেরিয়ে পড়েছে, স্নান পুজো সেরে। অনেক বেলা করে খাবে—ঠাকুরকে বলে দিয়েছে। পূর্ণবাবু যদি আসেন দেড়টার মধ্যে এসে পড়বেন, সেই সময়টা পর্যন্ত দেখে খেতে বসবে।...ঘুরতে ঘুরতে, এই প্রথম আজ ভরসা করে পুকুরটা ঘুরে পূব-দক্ষিণ দিকে — নিবিড় ছায়ার মধ্যে ঢুকল সে।...বাঁদিকে, উত্তর-পূব দিকটায় কাকুলিয়া বলে গ্রাম এখানে কিছু বসতি আছে—ভদ্র বসতি নয়—সে অনেক দূরে দূরে। কিছু বস্তিও আছে। কিন্তু এই দক্ষিণ দিকটায় শুধুই বাঁশবন। বড় বড় তেঁতুল আর অশত্থ গাছ। রেল লাইনটুকু যা ফাঁকা। তার ওপারে এপারে ঠাসা জঙ্গল। ঘর নাকি আছে কিছু কিছু—গোলপাতায় ছাওয়া মাটির ঘর, ওদের ঝিয়ের ননদ নাকি এই দিকেই থাকে—কিন্ত সে সব ঘর এখান থেকে দেখা যায় না।...

চৈত্রের রৌদ্র-প্রখর মধ্যাহ্ন। মাঝে মাঝে [illegible] সব [illegible] [illegible] শাখা-প্রশাখা পত্রপল্লব [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] দক্ষিণা বাতাস বইছে; অনুকি মাছি যেন ডেলা

পাকিয়ে কতকগুলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে মুখের সামনে সামনে আধো-আলো-আধো-ছায়া জড়াজড়ি করা গাছের তলার এই শূন্য স্থানটুকুতে; কত কি নাম-না-জানা পাখি ডাকছে, জানার মধ্যে ঘুঘুই বেশী—দূরে কোন গাছ থেকে একটা কোকিল ডেকে যাচ্ছে একঘেয়েভাবে, অবিরাম; ভোরে এই দিক থেকে শ্যামা পাখি না দোয়েল—শিস দিচ্ছিল, এখন আর তার সাড়া নেই; আজ হাট বার—সকাল থেকে গোড়ের দিকে ক্যাচ-কোঁচ শব্দ করে গরুর গাড়ির দল চলেছে সবজী নিয়ে—তার একটানা শব্দটা অবশ্য বাড়ি থেকে যত স্পষ্ট এখান থেকে তত নয়, এখান থেকে বরং ভালই লাগছে; মধ্যে মধ্যে এক এক ঝলক বাতাস বইছে—মলয় বাতাসের সে মাধুর্য তাতে নেই। আতে উষ্ণ অনাদৃতা তাতে গরম বোধ হচ্ছে কিন্তু অসহ্য কিছু নয়; ঘাম নেই, এতক্ষণে কপালে চুলের কোলে কোলে ও ঘাড় ভিজে এলো চুলের আড়াল একটু খানি দেখা দিয়েছে মাত্র।...সব জড়িয়ে [illegible]—খুব মিষ্টি লাগছে, সমস্ত পরি-বেশটাই যেন স্বপ্ন মাখানো। ঝিলমিলে ছায়ায় রোদে আকাশের ধূসর প্রখরতায়, [illegible] মিশিয়ে সুবাসে—কোন [illegible], চাঁপার গন্ধটাই উগ্র—সব মিলেই এই স্বপ্নের আবহাওয়া।

বেশ লাগছে হেমন্তের। অনেক দিন পরে ভাল লাগছে।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় আবছা আবছা মনে হচ্ছে জীবনটা মন্দ নয়, শুধু বেঁচে থাকতেই আনন্দ আছে; সুখের সম্ভাবনাও হয়ত একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি ওর এই জীবন থেকে। কেন মনে হচ্ছে তা জানে না। যুক্তিতর্কের অবতারণা করলে আর স্বপ্ন থাকে না, বাস্তবে এসব সম্ভাবনার কোন স্থান নেই—কিন্তু আজ এই সামান্য সময়টুকু বাস্তব ভুলে থাকলে দোষ কি? আর একটু স্বপ্নই দেখতে চায় সে—বাস্তব যুক্তি, ওসব থাক না!...

স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে, চারিদিকের এই পরি-বেশ আবহাওয়া যেন স্পর্শ করতে করতে এগিয়ে চলে। সেইভাবেই গাছের ছায়ায় ছায়ায় কখন পাঁচিলের ধারে এসে পড়েছে তাও জানে না একেবারে চমক ভাঙল একটা কি খস করে কোথায় পড়বার শব্দে। ভয় পেয়ে চমকে উঠে দেখে পাঁচিলের ওপার জঙ্গলের দিক থেকে একটা কার [illegible] পড়ল!

[illegible] করেই উঠত—অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাত—কিন্তু সেই চকিতের মধ্যেই [illegible] হল, এই কামিজটা তার বিশেষ পরিচিত। মুখে হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে [illegible] ধমক সামলাল বটে—কিন্তু চোখকে [illegible] বিশ্বাস করতে পারল না। মনে হল [illegible] দেখছে এতক্ষণ নিজের অজ্ঞাত-সারেই [illegible] কথা [illegible] করে-ছিল — বোধহয় সেই কারণেই মনের ঐকান্তিক চিন্তারই ফলে, বইয়ে পড়া মরীচিকার মতো—কল্পনায় জামাটা দেখছে সে। চিন্তা কল্পনাটা এতই একাগ্র যে মনে হচ্ছে সত্যিই দেখছে।...নইলে এখান ও জামা আসবে কি করে? আর শুধু জামাটাই?

এর মধ্যেই এমনও মনে হল। আতঙ্কে হিম হয়ে গেল বুকের মধ্যেটা—মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই — ওদের মালী যা বলে—কোন 'অপ্দি দেবতা'র কাজ নয় তো?

মালী বার বারই বলে, 'এ বাগানে অপ্দি দেবতারা আছেন মা, আমি বলছি—বিশ্বাস করুন। মাঝে মাঝেই নানান রকম কাণ্ড করে যান তেনারা।'

এ সমস্ত সম্ভাবনা-ভাবনাই খেলে গেল কয়েক লহমার মধ্যে—বার কয়েক চোখের পলক পড়তে যতটুকু সময় লাগে। এই শেষের কথাটা ভেবে আবারও পালাতে যাবে— এর মধ্যে দেখতে পেল পাঁচিলের ওপর দুটি হাত—সুঠাম সুগৌর—তার একটা আঙুলে বিশেষ পরিচিত একটা চুনির আংটি।

আবারও সেই স্তম্ভিত অবস্থা, পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেছে যেন, পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে।

আবারও সেই নিজের দৃষ্টিকে অনুভূতিকে অবিশ্বাস।

এবার আরও বেশী, মনে হচ্ছে এত ভুল দেখছে যখন, মাথাই খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। অতিরিক্ত কমলাক্ষর চিন্তা থেকেই এই কাণ্ড হয়েছে নিশ্চয়।

তবে বেশীক্ষণ লাগল না। একটু পরেই মানুষটাকেও দেখা গেল। চোখের ভুল নয়, স্বপ্ন বা মরীচিকাও নয়—কমলাক্ষই। পাঁচিল ডিঙোবার সুবিধার জন্যে আগে কামিজটা ফেলে দিয়েছিল, শুধু ফতুয়াটাই গায়ে আছে, মালকোঁচা দেওয়া ধুতি—সেই অবস্থায় পাঁচিল ডিঙিয়ে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ল এপারে।

তারপর ভূত দেখার অবস্থা তারও। ভূত বা মরীচিকা মতিভ্রম? স্বপ্ন, চোখের ভুল?

যার জন্যে এত কাণ্ড, যাকে কেন্দ্র করেই গত তিন দিন সমস্ত চিন্তা, যাকে

দেখার উদগ্র বাসনায় এমন করে ছুটে এসেছে—লজ্জা মান ভয় ভবিষ্যৎ সব বিসর্জন দিয়ে—এত সহজে ঠিক সামনেই তার দেখা পাবে এ ভাবতেও পারে নি। ভাবা যায় না এমন যোগাযোগ, বিশ্বাস হয় না।

দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিস্ময়ের ধাক্কা দুজনকে জড়ী-ভূত অনড় করে দিয়েছে, শুধু স্নায়ুতে নয়, মনেও। ধারণা শক্তিটাই কাজ করছে না কারও।

তার মধ্যে দুজনেই দেখছে। অবিশ্বাসের মধ্যেও চোখ তার কাজ করে যাচ্ছে—কি দেখছে লিপিবদ্ধ করে রাখছে মাথায়। একজন দেখছে সদ্যস্নাতা, সিক্ত-আলুলিত-কুন্তলা দেবীমূর্তি; আরাধনাস্নিগ্ধ মুখ, চোখে স্বপ্নালস দৃষ্টি — ওর দিবা-রাত্রির কল্পনায় দেখা রূপ মূর্তিপরিগ্রহ করেছে যেন, ঈশ্বর যেন দয়া করেই এত-দিনে অনন্যমনা একাগ্র সাধনার পুরস্কার দিয়েছেন—সেই স্বপ্নের ধনকে মূর্ত করে পাঠিয়েছেন ওর সামনে।

আর একজন ব্যথিত নেত্রে দেখছে তার দুর্ভাগ্য আরও একজনকে কি অমোঘ সর্ব-নাশের আকর্ষণে টানছে নিদারুণ নিপাতের দিকে। কদিনই বোধহয় ঘুম হয় নি কমলাক্ষর, খায়ও নি ভাল করে। মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে; চোখের চাহনি উদ্‌ভ্রান্ত, লোহিতাভ। প্রখর রোদে আর পরিশ্রমে—বোধহয় অনেক দূর থেকেই হাঁটছে, হয়ত দু-তিন ঘন্টা ধরেই, কখন থেকে ঘুরছে হয়ত ঠিক স্থানটি খুঁজে নেওয়ার জন্য—সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে, ঘামে সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে সদ্যস্নান করে উঠে এসেছে কোথাও থেকে—ফতুয়া ধুতি গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে; চুল রুক্ষ উসকো-খুসকো, বোধহয় সকালে মাথা আঁচড়ানোর কথা মনেও পড়ে নি—তার কিছু কপালে জড়িয়ে গেছে, কোনটার বা প্রান্তে শিশির বিন্দুর মতো ঘাম জমে আছে—সব জড়িয়ে পাগলের মতোই অবস্থা ...

প্রথম সম্বিৎ ফিরল হেমন্তরই।

সে কঠিন কণ্ঠেই প্রশ্ন করতে গেল, 'এ—এসব কি? কী ব্যাপার এ সব তো বুঝছি না!' কিন্তু ঠিক উচ্চারণের সময় গলা কেঁপে গেল, ইচ্ছানুরূপ কাঠিন্য ফুটল না।

কথা বলল — বলতে পারল — এবার কমলাক্ষও, হেমন্তর কণ্ঠস্বরেই যেন পাথরে প্রাণ ফিরে এল. একটু এগিয়ে খানিকটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে আবেশ উদ্বেলিত কণ্ঠে বলল, 'তুমি—আমি—আমাকে মাপ করো—কদিন যে আমার কি কেটেছে তা তুমি কোনদিন ভাবতেও পারবে না—দিন-রাত ছটফট করেছি, যেন কাঁটার ওপর কাটিয়েছি সর্বক্ষণ, শুধু তোমার কথা ভেবেছি। কেবলই মনে হয়েছে তোমাকে বন্দী করে রেখেছে, জোর করে ধরে রেখেছে—তুমি ইচ্ছেসুখে আছ এ হতেই পারে না—কি যে হত, তখন যখন মনে হত এই দানবের পুরীতে তুমি একা—মাথায় যেন খুন চড়ে যেত, ইচ্ছে হত ঐ লোকটাকে খুন করে নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিই!...

হেমন্ত ওকে বাধা দিয়ে কি বলতে গেল, বোধহয় বলতে গেল, 'এই, এখন তুমি চলে যাও, কে দেখে ফেলবে কোথা থেকে। ডাক্তারবাবুর আসবার কথা আছে দুপুর-বেলা—যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন—যেমন এসেছ যেভাবে, সেইভাবেই চলে যাও লক্ষ্মীটি আর এইতো আজই শেষ দিন—কাল সকালেই তো—' বললও বুঝি, কিন্তু ওরও হয়ত গলা দিয়ে স্পষ্ট কথাগুলো বেরোল না, কথার সঙ্গে কথা জড়িয়ে গেল, উদ্বেগে, উত্তেজনায়—এবং হাঁ, আর অস্বীকার করার উপায় নেই—এই ছেলেটার প্রতি প্রেমেও; কমলাক্ষরও সে সব কথা শোনার ধৈর্য রইল না—সে আরও এক পা এগিয়ে এসে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে তেমনি পাগলের মতো বলে চলল 'কাল সারাদিন ঘুরেছি এখানে—কেউ দেখতে পেলে চোর ভাবত। পুলিশে দেখলে ধরে নিয়ে যেত,—তোমাকে দেখতে পাইনি, ভেতরে আসতেও সাহস হয়নি তোমার জন্যেই, শুধুই ঘুরেছি তাই। রাত্রে যখন ঐ ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে, মনে হয়েছে—যাক সে কথা—তখন নিজের গায়ের চামড়ায় চিমটি কেটেছি নিজেই—এই দ্যাখো সে দাগ। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে ছুটে চলে গেছি, অনেকদূর গিয়ে গাড়ি পেয়েছি—তারাও আমার অবস্থা দেখে নিতে চায় নি প্রথমটায়, পাগল ভেবেছে কিম্বা মাতাল—'

হেমন্তর এদিকে কান নেই। সে কত কি ভাবছে, দ্রুত ভাবছে, চেষ্টা করছে, প্রকৃতিস্থ হবার জন্যে বুদ্ধির দোরে মাথা খুঁড়ছে—কিন্তু সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তারও।...বুকে যেন কিসের দাপাদাপি, দেহের ভেতরে রক্তও যেন মাতাল পাগল হয়ে উঠেছে, এই আতপ্ত দক্ষিণা বাতাস, অনেক-রকম ফুলের মিলিত উগ্র সুবাস। এই লোকটির পরিচিত আকাঙ্ক্ষিত দেহগন্ধ—সব মিলিয়ে যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো তারও কাণ্ডজ্ঞান বিবেচনা সংস্কার সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—

কানে গেল, কমলাক্ষ তখনও আবোল-তাবোল কত কি বলে যাচ্ছে, কি বলছে সে-ই কি জানে?—'আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছি, কেউ জানে না, হাঁটতে হাঁটতে এসেছি—আজ দেখা করবই। দেখবই তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা, তুমি রাগ করো, তিরস্কার করো [illegible] সইব—তুমি আমাকে লাথি মারো কিছু বলব না—তোমাকে দেখেছি, এই আমার যথেষ্ট—'

হেমন্ত প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার, প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করে একবার দু হাতে ওর গালটা ধরে আদরের ভঙ্গীতেই বলতে যায়, 'দেখা তো হয়েছে লক্ষ্মীটি, আর বিপদ বাড়িও না, তুমি এবার যাও, কাল সকাল বেলাই আমি [illegible] যাবো, তখন যেয়ো ওখানে।...চলো। আমি তোমাকে রাস্তাটা এগিয়ে দিই [illegible] ওপারে—'

কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ফল [illegible] এতে। সেটুকু জ্ঞান তখনও ছিল কমলাক্ষর দয়িতার এই সস্নেহ স্পর্শে সেটুকুও [illegible] গেল, অকস্মাৎ সজোরে সবলে ওকে জড়িয়ে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে পাগলের [illegible] ওর মুখের ওপর নিজের মুখটা [illegible] বিকৃত অস্ফুট স্বরে অর্ধ উচ্চারিত [illegible] বলে, 'না, না, না, আর আমি পারছি না [illegible] না—কোথাও যাব না আমি তোমাকে ছেড়ে—কোথাও না—'

হেমন্তরও আর সাধ্য ছিল না নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার—ইচ্ছাও না। অনেকদিন যুঝেছে সে এই নিয়তির সঙ্গে, সেও আর পারছে না, পারবে না।

জীবনে এই প্রথম প্রেমের স্বাদ পেয়েছে সে, কোন পুরুষ যে কোন মেয়েকে এমন পুজো করার মতো ভালবাসতে পারে তা ওর ধারণার অতীত, সমস্ত অন্তর সমস্ত দেহ কাঁপছে সেই আস্বাদনে। মূর্ছাতুর [illegible] উঠেছে সমস্ত স্নায়ু, অনুভূতি [illegible] মূর্ছিতের মতোই সেই একান্ত ঈপ্সিত বক্ষের মধ্যে এলিয়ে পড়ল, বহুদিনের তৃষিত ওষ্ঠ দুটি প্রিয়তমের কঠিন উত্তপ্ত তৃকার্ত ওষ্ঠবন্ধনে সঁপে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হল।...

আর কিছু করার নেই তার, আর কিছু ভাববে না সে।

এই মুহূর্তেরই জয় হোক এই মুহূর্তে। তার ভাষা বাক্য, চিন্তা ইচ্ছা [illegible] কিছু একাকার স্তব্ধ জড় হয়ে গেছে—কিছু ভাবার, বাধা দেবার [illegible] ইচ্ছায় চালিত হওয়ার ক্ষমতা নেই আ[illegible]

ক্রমশঃ

বিজ্ঞানের কথা

মার্স-২ ও মার্স-৩

আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার-নয়ের পরে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ওই একই মঙ্গলগ্রহে প্রায় অবিশ্বাস্য একটি কান্ড ঘটিয়েছেন। মার্স-৩ থেকে একটি অবতরণ-যান প্যারাসুটের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নেমেছে এবং মার্স-২ ও মার্স-৩ ব্যোমযানদুটি মঙ্গলগ্রহের কক্ষে পাক খাচ্ছে। অবতরণ-যানটি নেমেছে মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধে. যেখানে নেমেছে তার অক্ষাংশ ৪৫ ডিগ্রী দক্ষিণ, দ্রাঘিমা ১৫৮ ডিগ্রী পশ্চিম। অবতরণ-যান থেকে পাঠানো সংকেত মার্স-৩ ব্যোমযানে ধরা পড়েছে, সেখান থেকে পৃথিবীতে এসেছে। ১৮৮ দিনে পথ পাড়ি দেবার পরে মার্স-৩ তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছল। মার্স-৩ পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করেছিল গত ২৮শে মে [illegible] মার্স ২ গত ১৯শে মে তারিখে। এই দুটি স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশনের [illegible] মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে আরো একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

[illegible] অবতরণের ব্যাপারটা মঙ্গলগ্রহে মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কেননা এই গ্রহের প্রকৃতিটা যে কেমন সে-সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত সামান্যই জানা গিয়েছে। শুক্রগ্রহের ঘন বায়ুমন্ডলে ছোট একটি প্যারাসুটের সাহায্যেই ব্যোমযানকে নামানো যায় কিন্তু মঙ্গলগ্রহের অতি পাতলা বায়ুমন্ডলে তা সম্ভব নয়। মঙ্গল-গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ১০০ ভাগের ৬০ ভাগ। এ-কারণে ব্যোম-যানকে মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নামানোর জন্যে বিশেষ রকমের প্যারাসুটের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ব্যোমযানটি মঙ্গলগ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করেছিল শব্দের গতিবেগের তিন-গুণ গতিবেগে। এই প্রচন্ড বেগ থাকায় [illegible] বায়ুর ঘর্ষণজনিত গতিহ্রাসের মাত্রাও ছিল অনেকখানি। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা 'সয়ুজ' ও 'জোন্দ' জাতীয় ব্যোমযান-গুলিকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনার সময়েও একই কায়দায় বায়ুর ঘর্ষণজনিত গতিহ্রাসের সুযোগ নিয়ে থাকেন।

তারপরে বিশেষ একটি ব্যবস্থা চালু করে ছোট একটি প্যারাসুট খুলে দেওয়া হয়েছিল। পরে প্রধান প্যারাসুটটি। এমনি-ভাবে দুটি [illegible] সাহায্যে ব্যোমযানটি [illegible] মাটিতে অবতরণ করে।

এই যানটি [illegible] দক্ষিণ গোলার্ধে এমন একটি এলাকায় অবতরণ করেছে যা ইতিপূর্বে কখনো পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে নি। গত কয়েক বছরে মঙ্গলের উপরিতলকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে পৃথিবী থেকে রেডারের সাহায্যে কিংবা পাশ দিয়ে চলে যাওয়া 'মেরিনা'র ধরনের ব্যোমযানের সাহায্যে। কিন্তু এই এলাকাটি সমস্ত পর্যবেক্ষণের বাইরে ছিল। এদিক থেকে এই এলাকায় একটি সোভিয়েত ব্যোমযানের অবতরণ বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মঙ্গলের বায়ুমন্ডলটি বড়োই অস্থির। সেকেন্ডে ১৩০ মিটার বেগের ঝড় মঙ্গলের বায়ুমন্ডলে খুব একটা বিরল ঘটনা নয়। পৃথিবীর ঝড়ে কখনো এমন প্রচন্ড বেগ হয় না। ব্যোমযানকে মঙ্গলের মাটিতে নামাবার সময়ে এই ঝড়ের কথাও মনে রাখতে হয়েছে। পৃথিবীতে একটি যাত্রী বাহী এরোপ্লেন যে-বেগে মাটিতে নামে মঙ্গলের মাটিতে গিয়ে ব্যোমযানও ঝড়ের মুখে এমনি বেগসম্পন্ন হতে পারে।

মঙ্গলের বায়ুমন্ডলে 'ওঠা-নামা' বড়ো বেশি। বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব ঋতুতে ঋতুতে বদলায়, এমনকি দিনে-রাতে। ব্যোমযানকে মঙ্গলের মাটিতে নামাবার সময়ে এ-ব্যাপারটিকেও খেয়ালে রাখতে হয়েছে। গত কয়েক বছরের পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে মঙ্গলের ঘোর-রঙের 'সমুদ্র' এলাকাতেই ব্যোমযান নামানো সবচেয়ে সুবিধের। অবশ্য এই একটি ব্যাপারই নয়, অবতরণের স্থান ঠিক করতে গিয়ে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছানোর বিশেষ অবস্থাও হিসেবে রাখতে হয়েছে. কেননা মঙ্গলগ্রহে অবতরণের পথটি কী হবে তা এই বিশেষ অবস্থার ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল।

এত বিভিন্ন দিকে নজর রেখে এত বিভিন্ন বিষয় হিসেবে রেখে তবেই সম্ভবপর হয়েছে সোভিয়েত ব্যোমযানের মঙ্গলের মাটিতে সফল আলতো অবতরণ। সব মিলিয়ে এই অভিযানটি [illegible] বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক সাফল্যের আসাধারণ একটি নিদর্শন।

আর যোগাযোগ বজায় রাখার জটিল ব্যাপারটি তো থাকছেই। এক্ষেত্রে আরো বেশি জটিল এ-কারণে যে বার্তাটি আসছে মঙ্গলের মাটিতে থাকা একটি ব্যোমযান থেকে। এমনিতে পৃথিবী থেকে রেডারের একটি ঝলক বৃহস্পতি গ্রহে পাঠানো এবং বৃহস্পতি থেকে ফিরে আসা ঝলকটি পৃথিবীতে আবার ধরতে পারা এখন আর শক্ত ব্যাপার নয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এ-ধরনের যোগাযোগ স্থাপনে সাফল্য অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরকম, তাই ব্যবস্থাও অন্যরকম। মাটির ব্যোমযানে শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্র নেই, মস্ত অ্যান্টেনাও নয়। এই ব্যোমযান থেকে বার্তা গিয়ে পৌঁছয় শুধু মঙ্গলের কক্ষে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহে, সেখানে তা জমা হয় ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কে। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ এই কৃত্রিম উপগ্রহের, মাঝখানের দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার।

অন্য একটি গ্রহের কক্ষে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ বজায় থাকার ফলে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ উপস্থিত হচ্ছে, বিশেষ করে সৌর-মণ্ডলের গবেষণায়। অতঃপর এই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকেই চলতে পারবে গ্রহের বায়ুমণ্ডলের পর্যবেক্ষণ, গ্রহের দিনের দিকে ও রাত্রির দিকে বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা নির্ধারণ এবং গ্রহের উচ্চতর স্তর সম্পর্কে ধারণালাভ। মেরিনার-৯ থেকে যেমন এ-কাজগুলো হতে পারবে, তেমনি মার্স-২ ও মার্স-৩ থেকেও। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে তাঁরা মঙ্গলের মাটিতেও ব্যোমযান নামিয়েছেন, ফলে পর্যবেক্ষণ হতে পারবে আরো অনেক ব্যাপক ক্ষেত্রে, আরো অনেক নতুন বিষয়ে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ঘোষণা থেকে আরও জানা যায়, সূর্যের বিকীরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণও মার্স-২ ও মার্স-৩ অভিযানের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

মহাশূন্য থেকে বায়ুমণ্ডলের মানচিত্র গ্রহণ

কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ থেকে সবচেয়ে উপকৃত হচ্ছে আবহবিজ্ঞান। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নেওয়া মেঘের ছবি আজকাল দৈনিক কাগজেও প্রকাশিত হয় এবং সকলেই তা দেখেছেন। এই ছবি থেকে মোটামুটি নির্ভুলভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ পাওয়া যেতে পারে। বোঝা যায় ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি শুরু হবার সম্ভাবনা কতখানি। কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে শুরু হয়ে সমুদ্রেই শেষ হয়ে যায়, আগে এগুলোর হদিশ রাখা হত জাহাজ থেকে বা দ্বীপ থেকে পর্যবেক্ষণ করে। তা ছিল খরচের ব্যাপার। এখন কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবির সাহায্যে অনেক কম খরচে অনেক বেশি নির্ভুল খবর রাখা যাচ্ছে।

শুধু মেঘের ছবিই নয়, আরো অনেক আবহগত খবর কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে। যেমন, বাতাসের ও মাটির তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাতাস ও ওজোন-এর বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি। খবরগুলো পাওয়া যায় কৃত্রিম উপগ্রহের নিচে থেকে আসা বিদ্যুৎচৌম্বিক বিকীরণের মাত্রা থেকে।

১৯৭০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে নিম্বাস-৪ নামে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আকাশে তুলেছেন তা এমনি একটি আবহ উপগ্রহ। এই উপগ্রহে এমন একটি যন্ত্র আছে যার সাহায্যে ছয়টি বিভিন্ন পর্দায় কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত লাল-উজানী রশ্মির বিকীরণের পরিমাণ মাপা হয়। এ থেকেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার একটি চিত্র বেরিয়ে আসে। তারপরে পর-পর চিত্রগুলো সাজিয়ে অনায়াসেই বায়ুমণ্ডলের একটি মানচিত্র এঁকে নেওয়া সম্ভব।

নিম্বাস-৪ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে প্রতি ১৬ সেকেন্ড পরে পরে দূরত্বের দিক থেকে ২০০ কিলোমিটার। সংকেতগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে একটি টেপ-রেকর্ডারে এবং এই টেপ-রেকর্ডার থেকে পরে পৃথিবীতে। উপগ্রহটি প্রতি ১০৭ মিনিটে একবার মেরু-বরাবর পৃথিবীকে পাক খেয়েছে। প্রতি পাকে পৃথিবীও তার অক্ষের চারদিকে ঘুরে গিয়েছে ২৭ ডিগ্রী পরিমাণ। তার মানে বিষুবের যে-কোনো বিন্দুর ৩০০০ কিলো-মিটারের মধ্যে দিয়ে উপগ্রহটি অতিক্রম করছে দিনে দুবার। যদি ৫০ অক্ষাংশের কোনো বিন্দু ধরা যায় তাহলে এ-ব্যাপারটি ঘটে ১৯০০ কিলোমিটারের মধ্যে।

কৃত্রিম উপগ্রহের যুগ শুরু হবার আগে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর এলাকায় তাপমাত্রা নেওয়া হত বেলুনের সাহায্যে। তাতে বড়ো জোর ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় পৌঁছনো যেত। রকেটের সাহায্য নিয়ে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত। কিন্তু প্রতি বারে রকেট ব্যবহার করাটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ব্যবহার করলেও চব্বিশঘণ্টাব্যাপী

টানা পর্যবেক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনই এক্ষেত্রে বাস্তব সমাধান।

১৯৭০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিমবাস-৪ থেকে ৪২ কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার যে-সব চিত্র পাওয়া গিয়েছে তা থেকে তৈরি করা একটি মানচিত্র এর সঙ্গে প্রকাশ করা হল। মানচিত্রটি দক্ষিণ গোলার্ধের, কালো ছোপগুলো দক্ষিণ গোলার্ধের স্থলভাগের। বিষুবরেখার গায়ে গায়ে দ্রাঘিমা দেখানো হয়েছে, কেন্দ্রের বৃত্তে অক্ষাংশ। কালো মোটা দাগে সমমাত্রার এলাকা চিহ্নিত, মাত্রাগুলো সেন্টিগ্রেডে। লক্ষ্য করবার বিষয়, উষ্ণতম তাপমাত্রার এলাকা কিন্তু বিষুবে নয়, ৬০ ডিগ্রী অক্ষাংশ ছাড়িয়ে আরও মেরুর দিকে।

নিমবাস-৪ পুরানো খবর। কিন্তু মানুষের তৈরী একটি উপগ্রহ তার গ্রহ সম্পর্কে কত-কি খবর জানাতে পারে সে-সম্পর্কে খানিকটা ধারণা এই পুরানো খবর থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এই সঙ্গে যদি মনে রাখা যায় যে মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে একটি নয়, দুটি নয়, তিন-তিনটি মানুষের তৈরী উপগ্রহ পাক খাচ্ছে তাহলে ধারণা করা শক্ত হয় না যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মঙ্গলগ্রহকেও আমরা মানচিত্র দেখে পৃথিবীকে চেনার মতো চিনতে পারব।

পৃথিবীকে চিনতে হলে
অন্য গ্রহ চেনা দরকার

বিজ্ঞানীরা বলেন, এই পৃথিবীকে চেনার জন্যেও অন্য গ্রহকে চেনা দরকার। ভূ-বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যতোটুকু পর্যবেক্ষণ করেছেন তা ভূত্বকের এলাকা মাত্র—এই গ্রহের ব্যাসার্ধের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অর্ধাংশ এখনো পর্যন্ত আমাদের প্রায় অজানা। আরো কথা আছে, পৃথিবীর সমুদ্রের নিচে পাওয়া যায় ব্যাসল্ট, স্থলভাগে গ্রানাইট। ভূত্বকের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে এই স্থলভাগের গ্রানাইটের উদ্ভব নিয়ে তর্কের মীমাংসা আজও হয় নি। অন্য কোনো গ্রহ সম্পর্কে বিস্তৃত খবর না পাওয়া পর্যন্ত হবেও না।

তাছাড়া, সবচেয়ে বড়ো যে প্রশ্নটি আছে, তার মীমাংসাও এখনো বাকি। প্রশ্নটি হচ্ছে—জীবনের উদ্ভব কি ভাবে? এখনো পর্যন্ত জীবনের একটিমাত্র নমুনাই আমাদের জানা—তা এই পৃথিবীর। কিন্তু এই একটিমাত্র নমুনা থেকে সাধারণ কোনো সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব নয়। অন্য কোনো গ্রহের নমুনাও এজন্যে জানা দরকার। মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কিনা, থাকলে কী ধরনের, না থাকলে কেন নেই—এসব প্রশ্নের নির্ভুল জবাব পাওয়া গেলে জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে সাধারণ জবাবটিও পাওয়া যাবে।

দিব্যধ্যানের সুফল

কলকাতার ইংরেজী দৈনিকে দিব্যধ্যান শেখার স্কুলের বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে। এক মাসের কোর্স। আমাদের দেশে কি-রকম সাড়া পাওয়া যাবে জানি না, কিন্তু আমেরিকায় এ-ব্যাপারটা এখন খুব চালু। দিব্যধ্যান নিয়ে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীর গবেষণার কিছু খবর 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংক্ষেপে উপস্থিত করছি।

দিব্যধ্যানের কায়দাকানুন শিখেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন মানুষের সংখ্যা সত্তর হাজারের কাছাকাছি। এঁদেরই একজন হচ্ছেন বোস্টন সিটি হাসপাতালের রবার্ট ওয়ালেস। মহার্ষি মহেশ যোগীর কাছে ইনি একাধিক কারণে কৃতজ্ঞ। দিব্যধ্যান থেকে তিনি যে শুধু আনন্দ পেয়েছেন তাই নয়, চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সুফল পেয়েছেন।

ছাত্র থাকাকালেই ওয়ালেস দিব্যধ্যানে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণা-নিবন্ধের বিষয় ছিল দিব্যধ্যানের শারীরিগত ক্রিয়া। তারপরে বোস্টনে এসে তিনি তাঁর এই গবেষণায় যাঁকে সহযোগী পেয়েছেন তিনি হাইপারটেনশন বিশেষজ্ঞ হারবার্ট বেনসন। এই শেষোক্ত জন কিছুকাল আগে গবেষণা করেছিলেন পরীক্ষামূলক একটি পদ্ধতি নিয়ে যার উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব চেষ্টায় রক্তচাপ কমানো। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর', অর্থাৎ চেষ্টা করে যাওয়া এবং ভুল শোধরাতে শোধরাতে নির্ভুল হওয়া—পদ্ধতিটি সেই রকম। তারপর থেকে তিনি 'মানসিক' কোনো উপায়ে শরীরের পরিবর্তন সাধন করা যায় কিনা এ-বিষয়টি নিয়ে ভাবিত ছিলেন। অনুসন্ধানের বিষয়ের এই মিল থাকার জন্যেই তিনি ওয়ালেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করেন।

আমেরিকায় দিব্যধ্যান নিয়ে গবেষণা করার একটা সুবিধে এই যে যাঁদের নিয়ে গবেষণা করা হবে সংখ্যায় তাঁরা প্রচুর। দিব্যধ্যানের কায়দাকানুনে তারা শিখছেন স্বয়ং মহার্ষির শিষ্যদের কাছ থেকে এবং তা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই রকম। ফলে অতি সহজেই এই দিব্যধ্যানীদের মধ্যে থেকে ৩৬ জনকে বেছে নিয়ে এই দুই গবেষকের কাজ শুরু হয়েছে।

তাঁরা দেখলেন, দিব্যধ্যান করার সময়ে অকসিজেন কমে যায় ১৭ শতাংশ, কার্বন ডাই-অকসাইডের নিষ্কাশন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হারও কমে। তাপমাত্রা ও রক্তচাপ মোটামুটি স্থির থাকে, হৃদস্পন্দন কমে, চর্মের প্রতিরোধ গোড়ার দিকে দারুণ বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের তরঙ্গ বদলে যায়। তার চেয়েও বড়ো কথা, রক্তের মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে যা উদ্বেগের হেতু প্রশমনের সহায়ক। দিব্যধ্যানীরা যে প্রশান্তির কথা বলে থাকেন তার জৈব-রাসায়নিক কারণটিও বর্তমান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

বেনসন ও তাঁর সহযোগীরা আরো একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ঘুমন্ত বা সম্মোহিত মানুষের শরীরের অবস্থা আর দিব্যধ্যানীর শরীরের অবস্থা এক নয়। দিব্যধ্যানীর শরীরের অবস্থার বিশেষ লক্ষণগুলো অন্যভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

তাঁরা আরও একটি ব্যাপারে লক্ষ করেছেন বাস্তব ক্ষেত্রে যার তাৎপর্য বিরাট। প্রায় ২০০০ দিব্যধ্যানীর কাছে খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জানতে পেরেছেন, এঁরা প্রায় সকলেই দিব্যধ্যান শুরু করার আগে কোনো না কোনো নেশায় আসক্ত ছিলেন, দিব্যধ্যান শুরু করার পরে তা ছেড়ে দিতে পেরেছেন। শুধু মদ খাওয়া ও ধূমপান করা নয়, তার চেয়ে অনেক কড়া নেশাও।

বেনসন ও তাঁর সহযোগীরা বলছেন, দিব্যধ্যানের সঙ্গে নেশা ছাড়ার সরাসরি সম্পর্ক হয়তো নেই, মূল কারণটি হয়তো দিব্যধ্যান করার পরে ভিন্নভাবে বিচার করার প্রবণতা। 'আত্ম-উন্নয়নের' যে ঝোঁক তখন আসে তারই ফল হয়তো এই নেশা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটি। যাই হোক না কেন, বেনসন ও তাঁর সহযোগীরা বলছেন, নেশা ছাড়াবার অন্য কোনো ফলপ্রসূ উপায়ের সন্ধান যেখানে জানা নেই সেখানে এই একটি সাধু উদ্দেশ্যেও দিব্যধ্যানের পদ্ধতিকে পরখ করে দেখতে ক্ষতি কি!

—অয়স্কান্ত

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(ষোল)

সকালে বেড়ানো সংক্ষিপ্ত হয়েছে উষা-পিসির চলে যাওয়ার পর থেকেই। বেড়িয়ে এসেই ব্যস্ত থাকতে হয় আশ্রমিক কাজে, তার ওপর দু'চার দিনের অতিথি থাকলে তো কথাই নেই। ভ্রমণ কাহিনীটা বলতে হয় না। আর বলবারই বা আছে কি—কাছাকাছি বা অল্পদূরের জায়গাগুলো সব নতুনত্ব হারিয়েছে। তা বলে বেড়ানো বন্ধ হবার যো নেই।

নিয়মিত কাজ সেরে চাবটের সময় চাঙ্গা গ্রামে গিয়ে স্মৃতিদাদুকে বললুম ভারতের চারযুগের ইতিহাস আলোচনার কথা।

এক গাল হেসে পিঠ চাপড়ে স্মৃতিদাদু বললেন—সাবাস ভায়া, এই তো হয়েছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। তেমনি করেই চলবে এখন। এই তার ভূমিকা। যতটুকু বলবার ঠিক বলবে যতীন। তবে ওদের কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিতব্য যা তা কিছু কিছু জানতে পার ঐ ঠাকুর্দার ঝুলিটা থেকে।

স্মৃতিদাদু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মানুষ-ভোর উঁচু তাকের ওপর ধুলোপড়া লালখেরোয় বাঁধা একটা দপ্তর।

—কি আছে দাদু ওর মধ্যে? পুঁথি-পত্তর নাকি?

—পুঁথিপত্তর নয়, তবে সমগোত্রীয় কিছু। ওদের কর্মযোগের সমসাময়িক কিছু পত্রপত্রিকার কাটিংস।

সাগ্রহে বললুম—দেখব দাদু? নামাব কেমন করে—যা উঁচু!

—তোমায় নামাতেও হবে না, দেখতেও হবে না। আগে শোনা, তারপর দেখা। দেখে আর পাবে কতটুকু—ঢের বেশি পাবে যতীনের কাছে। ওদের বহিরঙ্গ অনুশীলন সমিতি। অন্তরঙ্গ—গুপ্তসমিতি। অন্যে পরে কা কথা—স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও জানতে পারতেন না ওদের অন্তরঙ্গের কথা—এমনি ছিল রক্তগুপ্তির শপথ। তাইতো বলছি শোনো ওর কাছে। ও যা বলবে তেমনটি আর পাবে না কোথাও।

—সেই ভাল। যতখানি পারি স্বামীজীর কাছে শুনি তো আগে, তারপর ঝেড়েঝুড়ে দেখব কতখানি মেলে ঠাকুর্দার ঝুলিতে।

—সেই কথাই তো বলছি। ওদের সে কী কাজ—মহাযজ্ঞ। সে যজ্ঞের কুশ কোশ সমিধ হবি—সবই সংগ্রহ করেছিল যতীন। যতীনই জ্বালিয়েছিল সেই মহাযজ্ঞের আহিতাগ্নি—দেশের দশের পরম কল্যাণ কামনায়। বলতে গেলে সে যজ্ঞের হোতা, তাই বলছি মন্ত্রটা শুনো ওর মুখেই।

রূপকটা বুঝলুম। শুনেছি স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী বর্জনের জ্বলন্ত বক্তৃতা, অনেক নাম-করা লোকের মুখে। দেখেছি সরকারী স্কুল করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক মশায়দের দেশাত্ম-বোধক ভাবধারার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে মনে: তার ওপরে কঠোর জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী হয়েও দীনদুঃখী নিরন্ন দুর্গতদের দুঃখে বিচলিত হতে দেখাটা তো নিত্য-নৈমিত্তিক। তবে দেশব্যাপী এই যে স্বাধীনতা আন্দোলন এর মূলে কি—এই সন্ন্যাসী?

—আচ্ছা, স্বামীজীর এই পথের গুরু কে?

—তবেই তো ভাবালে, ভায়া। কথায় বলে—এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই। যতীনেরও তাই। স্বয়ংসিদ্ধের থাক ও। শুনেছ তো—যশোহর যাবার পথে ট্রেনে তিক্ত অভিজ্ঞতা, যশোহরে সরকারী খাতাপত্র শোষণনীতি আর রামানন্দবাবুর শিক্ষার কথা। শিক্ষা গুরু রামানন্দবাবু। আর একলব্যের মত ও যে ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রকেই বরণ করেছিল দীক্ষা গুরুরূপে ত বেশ বোঝা যায় যতীনের সে সময়কার কথাবার্তা, আকার, ইঙ্গিত ও ভাবভঙ্গিতে আঁধার রাতে আলোর মতই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'ও পেয়েছিল পথের নিশানা আনন্দমঠের সন্তানদের মতই জগদ্ধাত্রী কালী, দুর্গা ও বিষ্ণুঅঙ্ক স্থিতা ক্ষীণ অপরূপ রূপসী মাতৃমূর্তিতে যতী দেখেছিল জননী জন্মভূমির অতী বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূর্ত বিগ্রহ। বিশ্ব জননী, জননী ও জন্মভূমি এক হ

কুন্দী
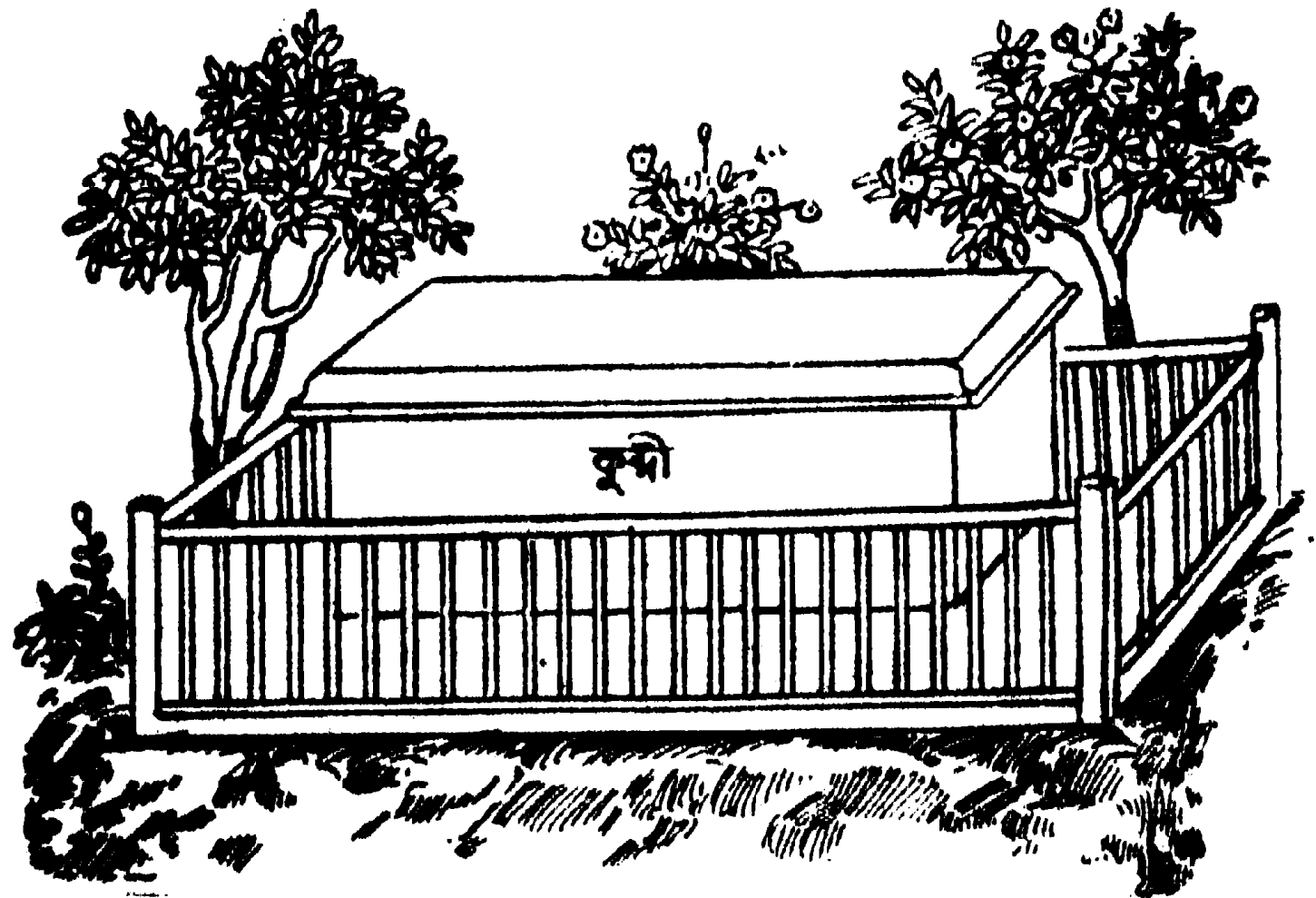
স্বামিজীর প্রিয় গাই কুন্দীর সমাধি

গয়েছিল ওর চোখে। ওর ইষ্টমন্ত্র হয়েছিল—

বন্দেমাতরম্,

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।

তাই ও আনন্দমঠের সন্তানদের মতই বলতে পেরেছিল—আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী আমাদের জননী জন্মভূমি। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বোন নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই। আমাদের আছে কেবল সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মা।

ন তাতো ন মাতা,
ন ভ্রাতা ন ভর্ত্তা,
ন পুত্র ন পুত্রী
ন বন্ধু ন দাতা
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।

দেশ মাতৃকাকে উদ্দেশ করে গাইল—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।।

এই তো ভায়া কথায় কথায় মর্মকথা পেয়ে গেলে কিছুটা। এইবার যতীনের কাছে।

বেলা ঝিকিমিকি। যথাসময়ে এল চা আর দুধ। যার যা পালা শেষ করে ফেলা গেল আশ্রমে।

সন্ধ্যার পরে স্বামিজীর কাছে।

কোলে তাকিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন—তারপর কি খবর?

—কলিযুগে ভারতের ভাগ্য আলোচনাটা শেষ হয় নি, বাবা।

—ও হ্যাঁ, মুসলমান আধিপত্যের কথা। অনেক আগে থেকেই ধনধান্যেভরা সুজলা-সুফলা মলয়জশীতলা ভারতের খ্যাতি রটেছিল পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সব দিকেই। সব দিকের লোকেরই লোলুপ দৃষ্টি ভারতের দিকে।

মুসলমান আক্রমণের পর থেকেই ইউ-রোপের বণিকরা আসে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করতে। প্রথমে তারা বন্দরে বন্দরে পৌঁছে সেখানকার শাসকদের কাছ থেকে আশ্রয়ভিক্ষা করে কুঠী তৈরী করে নিত। তারপর যখন ভারতে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল—মুসলমানে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দু-মুসলমানে হানাহানি আরম্ভ হল ক্ষমতা আর অধিকার নিয়ে তখন ঐসব কুঠিয়াল বেনেরা নিজেদের নিরাপত্তার

কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পী রচিত গঙ্গাধর মূর্তি

জন্যে কিছু কিছু গোরা সৈন্য এনে রাখল নিজেদের দেশ থেকে। তারপর মুসলমান সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে তখন বেশি সৈন্য আমদানী করে প্রতিটি কুঠীকে করে তুলল এক একটি দুর্গবিশেষ।

কথায় বলে—'বেনেবুদ্ধি'। সুচতুর বেনেরা বিবদমান হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কিছু টাকাকড়ি ভেট দিয়ে জমিজমা ইজারা নিতে আরম্ভ করল। এই সময়ে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা কর্নাটের নবাবকে হারিয়ে দিয়ে মাদ্রাজ অধিকার করল। এদিকে বাংলার সুযোগ্য তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার খিটি-মিটি আরম্ভ হল ইংরেজ বেনেদের। সেনা-পতি মীরজাফর আর আমাত্য উমিচাঁদ নবাবের ডানহাত—বাঁহাত। বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় ইংরেজ পেয়েছে—জেনেছে সম্মুখ যুদ্ধে বাঙালী সৈনিকদের পরাজিত করা সোজা নয়। কূটকৌশল জাল বিস্তার করলে সুচতুর ইংরেজ বেনে। গোপনে গোপনে প্রলোভন দিয়ে বশ করল নবাব সেনাপতি মীরজাফর আর আমাত্য উমি-চাঁদকে। ডান হাত বাঁ হাত—দু হাতই ভাঙ্গা হল নবাবের। তারপর ১৭৫৩ ২৩শে জুন নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হল পলাশীর প্রান্তরে। সে কী আর যুদ্ধ—যুদ্ধের অভিনয় মাত্র। মীরজাফর আর উমিচাঁদ—দুজনের বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বাস-ঘাতকতায় পরাজিত হলেন বাঙলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা। তবে এই যুদ্ধেও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন বাঙলার সন্তান মীরমদন আর মোহনলাল। কিন্তু ঐ কটি সৈন্য নিয়ে অগণিত ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে কতক্ষণ আর পারেন তাঁরা? প্রাণপণে যুদ্ধ করে বাঙালীর "যোদ্ধা' নাম অক্ষুণ্ণ রেখে দুই বীরকেশরী প্রাণ দিলেন পলাশীর প্রান্তরে। সিরাজদ্দৌলা হলেন বন্দী। তার-পর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের প্ররোচনায় সিরাজেরই আশ্রিত মহম্মদ-ই-বেগ প্রার্থনার অবসরটুকুও না দিয়ে হত্যা করল হতভাগ্য বন্দী নবাবকে।

ভারতের ভাগ্য পরিবর্তন হল—'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।'—বেনে হল রাজা। তারপর রাজ্যবিস্তার। হতভম্ব হয়ে গেলেন দেশীয় রাজারা। তাঁদের সব রাজনৈতিক চেষ্টা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। যুদ্ধ তো দূরের কথা—ইংরেজদের অন্যায় অবি-চারের বিরুদ্ধে একটি টুঁ শব্দ করতেও সাহস করলেন না কেউ।

ইংলন্ড থেকে আমদানী হতে লাগল 'গভর্নর' বা শাসনকর্তা। শুরু হল বৃটিশ শাসন। সে কী আর শাসন—অন্যায়, অত্যা-চার—রক্তশোষণ। দেশীয় রাজারা চুপচাপ—একটিও প্রতিবাদ নেই কারুর মুখে! জাগল বাঙলার সন্ন্যাসীরা। সন্ন্যাসী—স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ঘরবাড়ী—কিছুই তো নেই তাঁদের, কিন্তু—

একটিও যার নাইকো আলয়
সমস্ত জগত তাহার ঘর,
একটিও যার নাই সখা-সখী
কেহ তো তাহার নয়কো পর।

দেশের জনগণের দুঃখে কাঁদল সন্ন্যাসী-হৃদয়! দলে দলে সন্ন্যাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নানান জায়গায়—জেলায় জেলায়, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামান্তরে। ১৭৬৩ সাল থেকে আরম্ভ হয় সন্ন্যাসী সংগ্রাম। ওরা বলে—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। যা কিছু স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই ওদের বিদ্রোহ। ঢাকা, রাজ-সাহী, ময়মনসিং, দিনাজপুর, সেরপুর, ভাওয়াল, কলকাতা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর এমনকি বিহারের সারণ জেলাতেও সংগ্রাম করেন সন্ন্যাসীরা। প্রত্যেক জায়গাতেই জিততেন তাঁরা। স্থানীয় লোকেরা নানানরকমে সাহায্য করতেন তাঁদের। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে খুব জোর যুদ্ধ হয় সন্ন্যাসীদের। ক্যাপ্টেন টমাস মারা যায় এই যুদ্ধে। তারপর এঁরা আসেন বগুড়া আর দিনাজপুরে। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস নিহত হয় এখানে।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস বলেন—সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও গ্রামে এসে হাজির হয় যেন আকাশ থেকে পড়ে। অবিশ্বাস্যরকমের শক্ত, সাহসী ও উৎসাহী এরা।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বিদেশী ইংরেজদের তাড়াবার উদ্দেশ্যে বাঙলার এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সন্ন্যাসীরাই প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম করেন। তখন দেশীয় রাজন্যবর্গের সংহতি ও সাহসের অভাব। কোনরকম সাহায্য করলেন না তাঁরা এই সহায়সম্বলহীন দেহবলে ও মনোবলে বলীয়ান সন্ন্যাসীদের। তাই প্রত্যেক যুদ্ধে জয়লাভ করলেও শেষ-রক্ষা হল না।

পরে এই সন্ন্যাসী সংগ্রামের পট-ভূমিকাতেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী বের হয় 'আনন্দমঠ'। সন্ন্যাসী সংঘের মহৎ উদ্দেশ্য ও কর্মধারায় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে তাতে। দেশমাতাকে যে উপাস্য দেবীরূপে দেখাতেন [illegible] প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে।

১৭[illegible] হেষ্টিংসের স্বেচ্ছাচারী কূটনীতি। ভারতের সব জায়গা

থেকে ঘুষ নিয়ে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যে এক রাজার বদলে সিংহাসনে বসাতে লাগলেন অন্য রাজা। অন্যায়টা বুঝলেন সবাই। কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করলেন কি কেউ? সহ্য হল না বাঙলার যুবক নন্দকুমারের। এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইংরেজ রাজদরবারে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন তিনি। ইংরেজের ন্যায় বিচারে হল নন্দকুমারের ফাঁসি। হতচকিত দেশবাসী। অন্যায় অত্যাচারের মাত্রাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন সবাই, কিন্তু টুঁ শব্দটি করবার সাহস হল না কারুরই।

এরপর রাজ্য বিস্তারের পালা। বাছা বাছা বুদ্ধিমান লোকদের নিয়ে ইংরেজ সরকার গড়ে তুলল মীরজাফরের দল! বিশ্বাসঘাতকে পূর্ণ হল দেশ। তাদের সাহায্যে ইংরেজ সহজেই দখল করতে লাগল একটার পর একটা দেশীয় রাজ্য। একটা রাজ্য অধিকৃত হলেই প্রতিবেশী রাজা ভাবেন—এইবার বুঝি তাঁর পালা। কিন্তু প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন না কেউ। এমনি করে বছর কয়েকের মধ্যেই কটি রাজ্য ছাড়া সারা ভারতই পড়ল ইংরেজের করাল কবলে। বাকী রাজ্য ক'টিও কি পূর্ণ স্বাধীন রইল? ওরা থাকল ইংরেজের করদ মিত্র রাজ্য হয়ে।

এমনি করে বাঁধনের ওপর বাঁধন পড়ল তোমাদের সুজলা সুফলা ভারতমাতার আষ্টেপৃষ্ঠে। তার মুক্তিসংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টাও এই বাঙলায়।

রাত হয়ে গেছে। চুপ করলেন স্বামিজী।

(সতেরো)

সকালে স্বামিজী দক্ষিণের বারান্দায়, পাশে ওষুধের বাক্স আর বই। নতুন বর্ষায় ভিজে ম্যালেরিয়া আর ইনফ্লুয়েঞ্জা। রোগী ক'জন কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছে আঙিনায়। চাম্নার সামন্তবাড়ীর জোয়ানরা চাষআবাদের আলোচনা করছেন স্বামিজীর সঙ্গে। ওদিকে বসে কজন হৃষ্টপুষ্ট কৃষাণ আশ্রমের জমিতে কোথায় কত জল দাঁড়িয়েছে কোথায় দাঁড়ায় নাই—খবর দিতে এসেছে।

আপন আপন বক্তব্য পেশ করে কর্তব্যের নির্দেশ নিয়ে চলে গেল সব একে একে। একের পর এক রোগ বিবরণ বলে ওষুধ নিয়ে চলে গেল রোগীর দল।

ওষুধের বাক্স বই আলমারিতে রেখে আসতেই দেখি দক্ষিণের মাধবীলতার ফটকের বাইরে গরুর গাড়ী থেকে নেমে বাঁ হাতে জুতো আর ডানহাতে পরণের ধুতি হাঁটু পর্যন্ত তুলে আসছেন স্বাস্থ্যবান উজ্জ্বলবর্ণ মধ্যমাকৃতি এক ভদ্রলোক। একটু এগিয়ে আসতেই বললুম—স্বামিজী যাত্রাদলের অধিকারী আসছেন একজন।

সামনে চেয়ে স্বামিজী বললেন—চেন ওঁকে? শুনেছ ওঁর গান?

—হ্যাঁ স্বামিজী, মুকুন্দ দাস। শুনেছি ওঁর যাত্রাগান যোলপুরে কালী-বারোয়ারী তলায়। সে যেমন ভীড় তেমনি পুলিশের আমদানী। শুধু রাস্তায় নয়—ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—আসরের চারদিকেই তিন চারজন করে লাল-পাগড়ী। যাত্রা আরম্ভ হল—সবাই শুনছে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে কখনও চোখে জল, কখনও মুখে হাসি, কখনও দাঁত কড়মড়। যাত্রা—অভিনয় বলে মনেই হয় কারুর—যেন প্রত্যক্ষ ঘটনা।

আরম্ভের কিছু পরেই দরাজ গলায় মধুর সুরে যে গানটি গাইলেন অধিকারী মশায় নিজে, সবাই বললে—কবি কিনা, ব্যাপার দেখে সদ্য সদ্য রচনা করে গাইলেন ওটি।

—কি গান বলতে পার?

—অনেকদিনের কথা, সবটা মনে নেই। প্রথম লাইন—'শাসন-সংযত-কণ্ঠ গাইতে পারি না মা, গান।'

চোখে মুখে খুশি উছলে উঠল, স্বামিজী বললেন—হ্যাঁ, উনিই মুকুন্দ দাস।

ভিজে মাটিতে পা টিপে টিপে ততক্ষণে কাছে এসে বাঁ হাতের জুতো নামিয়ে ডান হাতের কাপড় ছেড়ে দিয়ে দু-হাত যোড় করে কপালে ঠেকিয়ে অধিকারী মশায় বললেন—ওঁ নমো নারায়ণায়।

কুন্দদন্ত বের করে একগাল হেসে স্বামিজী বললেন—আরে আসুন, আসুন বসুন। বহুকাল পরে যে! ভাল আছেন তো সদলবলে? গানটান হচ্ছে কেমন?

পায়ে কাদা, বসতে ইতস্ততঃ করছেন, গাড়ুগামছা হাতে দিয়ে কম্বল পেতে দেয়া স্বামিজীর পাশে।

পা হাত ধুয়েমুছে কম্বলে বসে হাসি হাসি মুখে অধিকারী মশায় বললেন—হ্যাঁ, স্বামিজী, গান হচ্ছে। চষে বেড়াচ্ছি সারা বাঙলা দেশ। এক জায়গায় বায়না পেলে সেখানে গান তো হয়ই আশপাশ দু-চারখানে গাঁয়ে না গেয়ে ফেরা যায় না। আজ যাচ্ছি বোলপুরে। দলের সবাই চলে গেছে লুপ ট্রেনে। দেরী করে বেরিয়ে মেন লাইনের গাড়ী চড়ে নামতে হল খানা জংশনে। লুপ ট্রেন সেই বিকেল চারটের। তাই বলি দেখে আসি আশ্রম। আশ্রমের সব কুশল তো?

স্বামিজীও হাসিমুখে বললেন—হ্যাঁ।

আম সন্দেশের ডিশ আর জলের গ্লাস রাখলুম অধিকারী মশায়ের সামনে।

স্বামিজীর দিকে চেয়ে বসে থাকতে দেখে বললুম—স্বামিজীর খাওয়া হয়ে গেছে, খান আপনি।

অল্প হেসে চুপি চুপি বললেন—আমায়ো চা দিচ্ছ না কি, খোকা?

—কিছু নিষিদ্ধ নয়। এতখানি রাস্তা এসেছেন গরুর গাড়ীতে, জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তো আগে। গরম চা পরে।

আশ্রমের কেউ চা না খেলেও সরঞ্জাম ছিল অতিথি অভ্যাগতদের জন্যেই।

চা পান শেষ হতেই কথাবার্তা। কতদিনের কত কথা। আলোচনা হল কতগুলি যাত্রা পালাগানের বিষয়বস্তু নিয়ে। কতগুলি নতুন পরিকল্পনার বিষয়ও বললেন অধিকারীমশায়।

স্বামিজীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সোৎসাহে বললেন—ঠিক, ঠিক—এমনি করেই করুন দেশের সেবা। একটা মস্তবড় কাজ। অচেতনকে চৈতন্য দেওয়া কি কম কথা? যাত্রা, গান, পাঁচালী কথকতা—এসবের মাধ্যমেই তো চলত লোকশিক্ষা। নৈতিক শিক্ষা, চরিত্রগঠন হত এ থেকেই। গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় এ সবের ব্যবস্থা ছিল। কত আড়াআড়ি—কে কত ভাল করতে পারে। গাইয়ে, বাজিয়ে, নট, কবি, কথকঠাকুরবাও ছিলেন তেমনি—ভাবের বন্যা বইয়ে দিতেন। সুনীতির গুণ দুর্নীতির দোষগুলো পাথরে খোদাই-এর মত দাগ কেটে বসে যেত শ্রোতাদের মনে। আঁধার পথে আলোর বাতি। এমনি করেই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের উপাখ্যানের রস ও নীতিশিক্ষার প্রচার হত সাধারণের মধ্যে। বড় ভাল কাজ—করে যান।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন অধিকারী-মশায়। বেলা সাড়ে দশটা। বললেন—আজ তাহলে উঠি, স্বামিজী। অনেকখানি যেতে হবে গরুর গাড়ীতে। ট্রেন ধরতে হবে তো সময় মতো।

—এক্ষুনি যাবেন? এখনও অনেক সময় —বললেন স্বামিজী।

তেলের বাটি আর গামছা দিয়ে বললুম—স্নান করে আসুন। রান্না শেষ খেয়ে বারোটায় বের হলেও ট্রেন পাবেন। কাদার রাস্তা—ঘন্টা তিনেক লাগবে। চারটের ট্রেন সহজেই পাবেন।

—একেবারে শুভঙ্করীর আর্যা ধরে অঙ্ক কষে রেখেছে যে—বলে হাসলেন অধিকারী মশায়।

—তবু অঙ্কে দু নম্বর কম পেয়ে স্টার মার্কটা গেছে ওর—বলে হাসলেন স্বামিজী। লজ্জায় পালিয়ে গেলুম রান্নাঘরে।

স্নান সেরে দুজনে খেতে বসলেন পাশাপাশি।

খাওয়া শেষ। তখনও বারটা বাজতে ঢের দেরী। স্বামিজী ভেতরে গেলেন না,—বাইরে বসেই গড়গড়ার নল টানতে টানতে হেসে বললেন—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙতে হয়—তা এক আধটা গান হবে না এখানে?

ঢেঁকিও হাসলেন। তা মায়ের গান শোনাই একখানা মায়ের মন্দিরে।

চিন্ময়ী মায়ের সমাধি মন্দিরের দাওয়ায় বসলেন অধিকারী মশায়।

—খোকা, গান শুনবে এস—স্বামীজীর ডাকে গিয়ে বসলুম এক কোণে।

—ওতে আসর জমে না বাবা, কাছে এস—হেসে হেসে বললেন অধিকারীমশায়। আসতেই হল। উপায় কি? গায়ক, আসর, শ্রোতা—সবই যখন একমেবাদ্বিতীয়ম।

আপন মনে একটু গুনগুন করে নিয়ে গাইলেন মুকুন্দদাস—

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং
ত্রিংশ কোটি নাচে যোগিনী সঙ্গে।।
দানবদলনী হলে উন্মাদিনী
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে।
সাজ'র সন্তান হিন্দু-মুসলমান
যায় যাক প্রাণ থাকে থাকুক প্রাণ
ধররে কৃপাণ হওরে আগুয়ান
নিতে হয় মুকুন্দের নাওরে সঙ্গে।।

যেমন গান, তেমনি গলা, তেমনি সুর। এ বলে 'আমাকে দ্যাখ', ও বলে 'আমাকে দ্যাখ'। সুসংগত সংগীত। শিরায় শিরায় রক্ত উদ্বেগিয়ে ছোটে। গান থামলেও সুরের রেশ যেন গাছের পাতায় পাতায় শিহরণ তুলছে। সামনে চেয়ে দেখি কাঁঠালতলায় কতকগুলি ছোট ছোট সাঁওতাল ছেলেমেয়ে—কেউ গামছা পরা, কেউ ঘুনসী পরা আবার কেউ-বা দিগম্বর, সামনা-সামনি দু দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে-পেছিয়ে পাচনবাড়ি ঠোকাঠুকি করে গানের তালে শুরু করেছে সাঁওতালী রণনৃত্য।

আস্তে আস্তে বললুম আর একখানা গান করুন, অধিকারী কাকা।

—আর একখানা? আচ্ছা, শোন—

হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
করিতে হবে সবে মায়েরি সাধনা।
দেখাতে হবে আজি জগতবাসী সবে
এখনও ভারতের যায় নি রে চেতনা।।
গভীর হুঙ্কারে হুঙ্কারী বেড়ে যাক
শিহরি উঠুক বিশ্ব মেদিনীটা ফেটে যাক
আমাদের জন্মভূমি দেবতার লীলাভূমি
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হোক কামনা।
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার,
ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী মা আমার
জগৎ লুটিবে পায়, ঘুচে যাবে যত দায়
মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাসনা।।

গান থামল। সুরের ঝঙ্কার রয়ে গেল গাছের পাতার শিহরণে, নদীর জলের কলতানে।

—আগে বাবু মশায় গো, বেলা দুপর বাজে যে। পথে কাদা যেতে সময় লাগবে এ্যানেকটুকুন। শ্যাষে এ্যাল গাড়ী ধরতে লাড়বে, আসুন গো এই বেলা—হাঁক দিলে গাড়োয়ান।

আর একবার জোড়হাতে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে চলে গেলেন অধিকারীমশায়। স্বামীজী উঠে গেলেন ঘরের ভেতর।

শিবলিঙ্গের বেদীর পাশেই তাঁর (সিদ্ধ বাবার) সমাধি

খাওয়া-দাওয়া গোছগাছ করতে দেরীই হল একটু।

বিকেলে আর কোথাও না—বাড়ির ধারে ধারে খানিকটা বেড়িয়ে দেখে এলুম কেমন ফুলে ফুলে দুলে দুলে দুকূল ছাপিয়ে আপনহারা পাগলপারা নদী তর্ তর্ করে ছুটে চলেছে কিসের টানে কে জানে।

(আটাশে)

ভাঁড়ার থৈ-থৈ — রান্নার তাগিদ নেই রাত্রে।

কাছে বসতেই স্বামীজী বললেন—দেখলে একজন মানুষের মত মানুষ? যেমন সুকবি তেমনি সুগায়ক। আবার অক্লান্ত-কর্মা। দেশের অজ্ঞ সাধারণকে আত্মসচেতন করবার ব্রত নিয়েছেন রসের মাধ্যমে। একনিষ্ঠ সাধক — দেশমাতার পূজারী।

দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললুম—আচ্ছা বাবা, দেশের এত রাজা-রাজড়া হোমড়া-চোমড়া থাকতে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা বাঙলায় হল কি করে?

—হ্যাঁ, তাই তো হল। ভেতো বাঙালীর কাণ্ড আর কি! শোন তবে।

আমদানী হল লর্ড ডালহাউসি। বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষিদে তার। আইন করল—কোন অপুত্রক রাজা দত্তক নিতে চাইলে গভর্নরের অনুমতি নিতে হবে রেসিডেন্টের মাধ্যমে। তা না হলে রাজ্য যাবে ইংরেজের কবলে। ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যের ইংরেজ প্রতিনিধিদের বলা হত 'রেসিডেন্ট'।

প্রথমেই রণজিৎ সিংহের পাঞ্জাব। খালসা সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হল। ছলে-বলে-কৌশলে নেয়া হল রণজিৎ সিংহের বহুমূল্য কোহিনুর।

তারপরেই শ্যেন দৃষ্টি পড়ল শিবাজীর সেতারা রাজ্যে। শিবাজীর বংশধর অপুত্রক প্রতাপসিংহকে রাতারাতি নির্বাসিত করা হল কাশীতে। [illegible] জনপদ সব গেল ইংরেজের জঠরে। সেতারার দুর্গচূড়ালে উড়ল বেনে পতাকা—ইউনিয়ন জ্যাক।

এর পর বুন্দেল খণ্ড। বুন্দেল খণ্ডের ছোট রাজ্য—ঝাঁসীর অপুত্রক রাজা গঙ্গাধর রাও মৃত্যুশয্যায় রেসিডেন্টের সম্মতি নিয়ে দত্তক নিলেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ডালহৌসি মানল না সে কথা, হাঁ করে গেল ঝাঁসী গ্রাস করতে। বালক দত্তকপুত্রকে বুকে জড়িয়ে বিধবা রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ বললেন—মেরি ঝাঁসী নেহি দেউঙ্গী—দেবো না আমার ঝাঁসী। বীরবেশে ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন তিনি।

এর পর নাগপুর রাজ্য। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক রাজা রঘুজী ভোঁসলে মারা গেলেন। বিধবা রাণী দত্তক নিলেন। লোভী ইংরেজ সরকার মানল না। নাগপুরের বিখ্যাত তুলা সে চাই ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলের জন্যে। নামমাত্র দামে তুলা নিয়ে কাপড় বুনে এদেশেই চড়া দামে বিক্রী করে কোটি কোটি টাকা পাঠানো যাবে বিলেতে। নাগপুর গেল রাহুগ্রাসে। রাজকোষের সোনাদানা হীরেজহরত মণি-মুক্তো কিছুই বাদ গেল না। অন্তঃপুরে রাণীদের বিছানার নীচে যে সোনাদানা ছিল তা পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হল।

এই অবিচারে বিক্ষোভের ঢেউ বয়ে গেল সারা দেশে। এখানে-ওখানে সর্বত্রই দেখা দিল অসন্তোষ। ডালহৌসি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। শনির দৃষ্টি পড়ল নিজাম রাজ্য হায়দরাবাদে।

নিজাম তো হতভম্ব। ক বছর আগে সন্ধিসূত্রে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এক দল ইংরেজ সৈন্যের খরচ যোগাতে রাজী হয়েছেন তিনি। এই খরচ যোগাতে এর মধ্যেই তাঁর দেনা হয়েছে চল্লিশ কোটি টাকা। এখন আবার বন্ধুত্ব ভেঙে চায় রাজ্য দখল করতে? বন্ধুত্বের কথা—সন্ধির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে নিজাম চাইলেন ন্যায়-বিচার। কিন্তু চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী। নিজাম রাজ্যের বেরার প্রদেশে যে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মায় অপর্যাপ্ত। ওটা না হলে চলে? ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এক রকম জোর করেই বেরার সমেত নিজাম রাজ্যের খানিকটা অংশ গ্রাস করলে ডালহৌসি। কিছুই করতে পারলেন না দুর্বল নিজাম।

এর পর তাঞ্জোর। তাঞ্জোরের রাজা শিবাজীর এক মেয়ে। শিবাজীর পর তারই রাজ্য পাবার কথা। ইংরেজ রেসিডেন্ট পর্যন্ত তা স্বীকার করে লিখলেন ডাল-হৌসিকে। বয়েই গেছে তাঁর সে কথা শুনতে। তাঞ্জোর গেল ডালহৌসির জঠরানলে।

বাজিরাও পেশোয়া ছিলেন অপুত্রক। নানাসাহেব নামে একটি ছেলেকে দত্তক নিলেন তিনি। দত্তক অনুমোদন করে তাকে 'পেশোয়া' উপাধি আর বার্ষিক বৃত্তি দেবার আবেদন করলেন ইংরেজ সরকারে। ইংরেজ

অগ্রাহ্য করল। এতটা আশা করেন নি বাজিরাও। ইংরেজের অনেক উপকার করেছিলেন তিনি। তাঁরই সাহায্যে কাবুলযুদ্ধে ও শিখযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ইংরেজরা। এত উপকার পেয়েও এই কাণ্ড? নিমকহারাম আর কাকে বলে?

এর পর রামরাজ্য অযোধ্যা। তখন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা—কোম্পানীর পরম বন্ধু। কিন্তু বেনে রাজার ভালবাসা—মিঞাজানের মুরগী পোষা—লোভীর নোলা সর্বদাই লক্ লক্—তা তো আর নবাব জানেন না তখন। সন্ধি হল পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য রাখতে পারবেন না নবাব। মস্ত বড় রাজ্য—কত দুর্গ, কত নগর, কত গ্রাম, কত জনসংখ্যা। হল বর্গীর হাঙ্গামা। বন্ধুত্ব জানিয়ে নবাবকে রক্ষা করবার অজুহাতে চুনার দুর্গ আর এলাহাবাদের ভার নিল ইংরেজ। নবাব মারা যাবার পর অযোধ্যার কিছু অংশ গ্রাস করল ইংরেজ কোম্পানী। অংশে-টংশে পেট ভরে না ডালহৌসির। গ্রাস করল গোটা অযোধ্যা রাজ্য। শেষ নবাব ওয়াজেদ আলির ধনসম্পদে কোম্পানীর কোষাগার থৈ-থৈ। অযোধ্যার জনসাধারণের মন ভরে উঠল অসন্তোষ আর বিদ্বেষ।

এমনি করে ছোট বড় রাজ্যগুলি গ্রাস করেই কি ক্ষান্ত হল ডালহৌসি? নানা অন্যায় উপায়ে রাজ্য বিস্তার করতে আর কোষাগার ভরিয়ে তুলতে লাগল সে। ভূমির বন্দোবস্ত, তালুকদারী স্বত্বলোপ, মুসলমান আমল থেকে সত্বদখলী লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সম্পত্তি ক্রোক, নীলাম—সব রকম ফন্দীফিকিরে বেপরোয়া ডালহৌসি। কত বিত্তবান দেশীয় লোক হল নিঃস্ব। বেড়ে চলল কোম্পানীর বিরুদ্ধে—অসন্তোষ আর উত্তেজনা।

সারা দেশে অসন্তোষ তো বটেই কোম্পানীর সিপাহীরাও বাদ গেল না। তার মাইনে পেত খুব কম। জান দিয়ে প্রাণ দিয়ে কোম্পানীর রাজ্য বাড়িয়ে দিত তারাই। কাজেই আশা করত উপযুক্ত বেতনের। রাওয়ালপিণ্ডির দু দল সেনার মধ্যে এক দল মাইনে নিতে রাজী হল না। তাদের চারজনকে দেয়া হল কঠিন শাস্তি। বিষম চঞ্চল হয়ে উঠল সিপাহীর দল। গোবিন্দগড়ের এক দল সিপাহী দুর্গের দরজা পর্যন্ত আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিরস্ত্র করে বহাল করা হল এক দল গুর্খা সৈন্য।

সিপাহীরা বুঝল জান দিয়ে প্রাণ দিয়ে বিদেশী বেনেদের রাজ্য ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়ে তাদের লাভ হয়েছে কি! হাড়ে হাড়ে বুঝল তারা মিঞাজানের মুরগী পোষার নীতিটা। অসন্তোষ আর প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল সব জায়গার সিপাহীদের মধ্যে। এই সময়ে বাধল ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ। সিপাহীদের উপর হুকুম হল যুদ্ধে যাবার।

—যাবো না সমুদ্র পাড়ে—বেশ জোরের সঙ্গেই বলে বসল দেশী সিপাহীরা।

ঠিক এই সময়েই গুজব রটল—কোম্পানী যে নতুন টোটা আমদানী করেছে তা গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরী। আর যায় কোথা—জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি। হিন্দু মুসলমান দু সম্প্রদায়ের সিপাহীরাই সমানে আপত্তি জানাল টোটা ব্যবহার করতে। তারা বলল—এই টোটার টুপি দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরলে তাদের জাত ধর্ম—সব যাবে।

সব জায়গায় ভারতীয় সিপাহীদের দৃঢ় বিশ্বাস হল—ইংরেজরা তাদের বিষম শত্রু। দেশ নিয়েছে, দেশের সম্পত্তি লুটেপুটে নিয়ে দেশের লোককে নিঃস্ব করছে, আবার জাত ধর্ম—তা ও নেবে? এ চলবে না, মারো ব্যাটাদের।

এই হল উদ্‌যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্বটা হবে কাল।

রাত সাড়ে নটা। খাওয়া দাওয়া সবই আপন আপন জায়গায়।

(উনিশ)

সকাল হতে দুপুর। সব কাজ শেষ মায় খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত। বিশ্রামের জন্যে ঘরের ভেতর স্বামীজী। নিজে পান্থশালার খড়িমুখো বারান্দায়। দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই, কাজ—কিছু পড়া আর লেখা। পড়া—কিছু বুঝে কিছু না বুঝে উপনিষদগুলি, আর বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের গ্রন্থগুলি। যা কবার পড়া থাকলেও পুরানো হয় নি কোনদিন। সব অবশ্য এক সঙ্গে নয়—একখানি শেষ করে আর একখানি। লেখা—রোজনামচা নয়, কাজ সারাদিন যার কাছে যা শুনেছি। সবশেষে বেড়ানো।

সন্ধ্যার পর স্বামীজীর কাছে নিজের আসনটিতে। ধূমপান শেষ হলে নল নামিয়ে রেখে স্বামীজী বললেন—তারপর?

—তারপর ভীমপর্ব, বাবা।

—ও, আচ্ছা। দেশ জুড়ে অসন্তোষ, উত্তেজনা আর বিক্ষোভ। শুধু কি সিপাহীদের—রাজারাজড়া ইতর ভদ্র সবারই। সবারই চোখ ফুটিয়ে দিল ডালহৌসি। মর্মে মর্মে বুঝলেন সবাই, ইংরেজ শাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে—এ দেশকে নির্মমভাবে শোষণ করা, এদেশের ধনদৌলত সাগরপারে চালান দিয়ে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করা। তাদের নির্মম শোষণের ফলে ভারতের ছোট-বড় সব শিল্প নষ্ট হচ্ছে। সাধারণের দারিদ্র্য বলবার নয়, দেখাবার নয়। দুবেলা দু মুঠো পেটের ভাত জোটাতে প্রাণান্ত হচ্ছে। দুর্ভিক্ষ তো নিত্যিকার ঘটনা। লক্ষ লক্ষ লোক পশুর মত মরে, যারা বাঁচে তারাও বাধ্য হয় পশুজীবন যাপন করতে।

সোনার ভারত রসাতলে যেতে বসেছে। এর প্রতিকার এইবেলা করা দরকার। অঙ্কুরে বিনষ্ট না করলে শিকড় গেড়ে মহীরুহ হয়ে পড়লে তোলা দুষ্কর।

এর আগে লম্ফঝম্প প্রতাপ দেখে সবারই ধারণা হয়েছিল—ইংরেজ ঈশ্বর নির্দিষ্ট অপরাজেয় রাজজাতি, কেউ পারবে না তাদের হঠাতে। ঠিক এই সময়েই বুয়র যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয়, আর জাপানের হাতে রুশোর পরাজয়—ভারতের জনসাধরণের ধারণা বদলে দিল। জনরব উঠল—১৮৫৭ সালেই হবে ইংরেজ রাজত্বের অবসান।

ভারতের রাজধানী দিল্লী। তার দশাটা কি? পলাশী যুদ্ধের পর দিল্লীর সম্রাট ছিলেন শাহ আলম। তাঁর দরবারে খালি পায়ে কুর্ণিশ করতে যেতে হত ইংরেজ রেসিডেন্টদের। শাহ আলমই কোম্পানীকে দিয়েছিলেন বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী। শুরু হল ইংরেজের অভ্যুত্থান, মোগল সাম্রাজ্যের পতন। শেষ জীবনে শাহ আলম দিন কাটাচ্ছিলেন ইংরেজ কোম্পানীর কাছে বছরে দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে আকবার শাহ বসলেন দিল্লীর সিংহাসনে। তাঁর সময়েও বাদশাহের হুকুম ছাড়া ইংরেজরা কোন নতুন সুবাহ অধিকার করতে পারত না। তখনও মুদ্রায় ছাপা হত বাদশাহের নাম। সময় আর সুযোগ বুঝে রাজসম্মান চিহ্নগুলো একে একে লোপ করতে লাগল ইংরেজ। পলাশী যুদ্ধের আশী বছর পর ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে দিল্লীশ্বর বঞ্চিত হলেন সব রাজলক্ষণ থেকে। সামান্য বন্দীর মতই রাজপ্রাসাদে থাকতে লাগলেন আকবর শাহ। যে টাকা বৃত্তি পান তাতে বাদশাহের না চলে দিন, না রাখা যায় বাদশাহী ঠাট। কত আবেদন নিবেদন করলেন কোম্পানীর দরবারে। ফল হল না কিছুই। কোম্পানীর আসল মালিকরা থাকেন লণ্ডনে। আকবর শাহ দূত পাঠালেন বাঙলার শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাবিদ্বান বাগ্মী রামমোহন রায়কে। বাদশাহ 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন তাঁকে। বিলাতে গিয়ে সম্রাটের জন্যে বিস্তর চেষ্টা করলেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। বিফল হল রামমোহন রায়ের সমস্ত চেষ্টা। আকবর শাহ মারা গেলেন। তাঁর ছেলে বাহাদুর শাহ হলেন সম্রাট। নামেই সম্রাট। বাহাদুর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে, প্রায় সমস্ত ভারত তখন ইংরাজ কবলে। বাহাদুর শাহ সম্রাট হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানী ঠিক করল দিল্লীর বাদশাহের উত্তরাধিকারীর চিরন্তন স্বত্ব লোপ পাবে, আর 'সম্রাট' উপাধি দেওয়া হবে না কাউকে। এই তো দিল্লী তথা সারা দেশের অবস্থা। এস বাঙলায়।

(ক্রমশঃ)

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(উনত্রিশ)

যেমন সর্বত্র পাওয়া যায়, তেমনি চা-বাগানের কর্মীরাও নানান মন মেজাজের, এবং তাই নিয়ে তারা কাজকর্ম করে থাকে। কেউ মুখ গুঁজে তৎপর কাজ করে যায়, কেউ বা ঢিলে, কেউ কাজে ও কথায় সমান, কেউ বিচক্ষণ অপরের ছিদ্রান্বেষণ বা তারিফ করতে এমন কত কি। সেদিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, যা আছে তা স্তর ও কাজ বিশেষের রকমফের। যেমন রাজমজুরের ছাদ পেটাবার, শালের খুঁটি পোঁতবার গানের কথা সকলেরই জানা। বাগানের পাতা তোলার মেয়েরাও তেমন গান গায়—কেউ সময় সময়, কেউ বা সব সময়। কিন্তু সেদিন কোন কারণে সকলকে উঁসকে তোলার আয়োজন হয়।

টিলার ও-পাশে পাতা তুলতে তুলতে যুবতীর দল প্রৌঢ়াদের খেপাবার জন্য গেয়ে উঠল—

সোনশিরির ধারে লো
মাইকীগুলা মরে
সব মটা (পুরুষ) আছে ...
আরো ঢাইরে ফিরে।

এ-পাশে প্রৌঢ়ার দল বুঝল আজ ওরা তাদের পিছনে লেগেছে তার জবাবে তারাও গাইল—

সোবনশিরির ধারে লো
ছুকরিগুলা মরে,
বুকভরা মধু আছে
ভোমরা নাহি পড়ে।

ও-পাশ থেকে তার পাল্টা জবাব হল—
বুড়ীগুলোর মুখ আছে,
পাছা বিনা ঠাট
ছাকরা লইয়ে বাট্ কুরে,
(বুক উহা)—বাইন্ধে আঁটসাঁট।

এরা কত নিপুণ ছড়া বাঁধতে, ছাড়বে কেন। এরাও গেয়ে উঠল—
ফুলের মইধে গন্ধ নাই,
ফুল দেইখে মরে,
কাক দেখা পাল্লে উরা
কোকিল বইলে ধরে।

ওরা গাইল—

কাঁচের চুড়ির জলুস দেখায়
আর আছে মুখ,
সারা জনম লুইটে খাইলো
হিংসা হোইলো সুখ।
এরা জবাব দিল—
বুড়ী উপর হিংসা করে
ইমন দেখি নাই,
বুকভরা রাইখে বলে—
মধু কুথা পাই।

ওরা গাইল—
মধু বিনা ঢেমনা ঢুঁড়ে,
ঝুলে কানপাশা:
ছুকরির উপর উইঠে বাড়—
ইমন করে আশা।
এবার এরা প্রৌঢ়ত্বের দাবী করে গাইল—
তিন জনম কইটে গেছে
(হামদের) এক জনম আছে,
তবু ছুকরির হিংসা করি'
ঢেমনা দেখে পিছে।

গুঞ্জরণটা হঠাৎ থমকে গেল। শুরু হল কল-কাকলি।

এক কোণ থেকে ইঙ্গিত—উঁ—!
আর এক পাশ থেকে প্রশ্ন করল—কুঁ—?
একজন চেঁচিয়ে উঠল—কী হোইল রে!
যার জন্য অপেক্ষা করছিল তার আগমন-বার্তা বতী ঘোষণা করল—আইছে রে—!
জানা কথা, তবু কেতি নেকামি করে বলে—কী—আহিল্ রে—?
নাম করবে না, গেনী শুধু বলে—আহিল আরু।
সকলকে ভয় দেখাতে কেতি একটা নাম দিলে—বেত আহিল্ রে—!
সন্ত্রাসের ভান করে সবাই এদিক-ওদিক চেয়ে বলে উঠল—কুন্ দিনে?
ঈদের চাঁদ যে বতীর দিকে দেখা দিয়েছে তার ইঙ্গিত দিল—দেখি যা না।
গেনী সকলকে বাঁচাবার এক উপায় বাতলে দিলে—বাঁনধি রাখিবি রে—!

এমন কত রকমারি সাংকেতিক কথার আদান-প্রদান হয়ে চলল পাতা তোলার মাইকীদের। টিলার এ পাশ ও পাশ থেকে আকাশে-বাতাসে সেসব শব্দ উঠে তা ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হতে থাকল পাহাড়ের গায়।

নীচে রাস্তার ধারে এসে মেঘু কথা কইছিল সর্দার আর মুহুরীবাবুর সঙ্গে। সে মুখ তুলে চাইল। যাদের কণ্ঠের কল-কাকলিতে বাতাস মেতে উঠেছে তাদের দেখা গেল না। ওদের কোন ধরণ-করণই মেঘুর অজানা নয়। সে বুঝল-তারা টিলাটার ওপর পিঠে গা-ঢাকা দিয়ে তাকে খাতির জানাচ্ছে। সামনে দেখল কয়েকজন প্রৌঢ়া—চা-পাতা ছিঁড়ছে দু-হাতে, মুঠো-মুঠো পাতা ফেলছে পিঠের টুকরিতে নয়তো কোমরে জড়ানো ধুকড়িতে। মেঘুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে তারাও চোখ বুলিয়ে আদর করল, আহ্বান জানাল। মেঘু হাসতে হাসতে উঠে গেল তাদের সামনে।

এক প্রৌঢ়া হেসে বললে—আহিলি! হামদের ছোলি (ছেলে বা মেয়ে, কিন্তু ভাবটা মাণিক) হামদের কাছে।

মেঘুও এক গাল হেসে জবাব দিলে—আহিলু।

ওপাশ থেকে শব্দ ভেসে এল—আইছে রে—

বতী সাবধান করল—হুঁশিয়ার!

কেতি সকলকে শাসন করল—ঠিক্-সে পাত্ তুলিবি।

গেনী হাত চালানো বন্ধ করে আবদারের সুরে বললে—এ-মেঘু, হামদের মিঠাই খোয়াবা লাগবো। তু' সাহেব হোইলি।

কেতি জিজ্ঞাসা করে—তু'কে কী কহি মাতিম রে—মেঘু সাহেব না, সাহেব?

গেনী তাকে শুধরে দিয়ে বললে—নাই, জমাদার সাহেব। নাই রে মেঘু?

দু-জনেরই মতামত উড়িয়ে দিয়ে মেঘু বললে—ওঃ, জমাদার আবার সাহেব নাকি! যা বলতি তাই বলবি, মেঘু।

বতী সায় দিয়ে বললে—হাঁ রে, উ' হামদের মেঘুই আছে রে।

ও-পাশ থেকে মেয়েরা কান খাড়া করে সব শুনল। কিন্তু আওড়ে গেল যে যার

পছন্দসই কথা। জোরগলায় তা শুনিয়ে দিলে এক মাথা থেকে অপর মাথা পর্যন্ত।

—সাহেব মাত্‌বা লাগ্‌বো রে—

—তোবে মিঠাই খাইলি রে—

—বুড়ীগুলো সোব মিঠাই খাই দিলো রে।

—হামদের শুধু বেত খাব দিছে।

কল-কণ্ঠের অদৃশ্য উৎসের পানে তাকিয়ে একটু হেসে নিল মেঘু। বুড়ীদের দিকে ফিরে সে বললে— দেখছিস, কি গোলমাল লগাই দিছে ছুকরিগুলো।

এপাশ থেকে এক প্রৌঢ়া ওপাশের মেয়েদের প্রতি উত্তর দিল—তুদের মিঠাই লই যা না উ পিনে (ওদিকে), হামদের কারণে বেতটা রাখি যা।

কে যেন ওপাশ থেকে মেঘুর উদ্দেশে বললে— দি-দি, বুড়ীগুলোক্ পাতি তুলা শিখাই দি।

—বুড়ীগুলো ভুলাই গিছে, সপাসপ্ বেত মারি শিখাই দি।

মেঘু বলে—উঃ! উ'রা হামকে কাম্ করতে নাই দিবে।

এক প্রৌঢ়া রসিকতা করল—যা-যা, ঘা-কতক পিটি আয়, তোবে টিট হইবে ছুক্‌রিগুলো।

—হাঁ, তাই করে আসি। বলে, ও-দিকে যাবার জন্য মেঘু পা বাড়াল।

ওদিকেও হট্টগোলের হাট বসে গেল। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—সাহেব আহিল্ রে, পালা রে—!

একজন বলে—পিঠে টুকরি বান্দি রে—

আর একজন বলে—খুকড়ি বান্দি রে—ছুট্ ছুট্।

ততক্ষণে মেঘু তাদের সামনে গিয়ে পড়েছে। অমনি সব চুপ্—যে যার পাতা তোলায় ব্যস্ত। যেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

হাসতে হাসতে মেঘুও হঠাৎ গম্ভীর হল। চোখমুখ টান করে শাসনের ভান দেখিয়ে বললে—কী! এতনো চিল্লাচিল্লি করছিলি কেনে?

সবাই চুপ, সবাই অবাক! যেন কিছুই হয় নি সেখানে। কিছুই জানে না তারা।

—কোউন চিল্লাচিল্লি করছিলি রে? বলে, একজন তাকায় আর একজনের পানে মুখ ফিরিয়ে।

—হামদের দিকে তো একো হওয়া নাই (কিছুই হয় নি)—তুদের দিকে হোইছে নাকি রে? বললে কৌতি আর একজনের পানে মুখ ফিরিয়ে।

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বাতাসী বলে—হামদের দিকে কেনে হবেক! কুন দিকে হোইছে কইতে ন'রছি। তুদের দিকে—?

কেউ দায় নিতে চায় না। সবাই একে-একে দায় কাটায়। বতী একটা উপায় বাতলে দিল। বললে—মানু' (লোক) যখন নাই পাছিস্ তখন মারি থাক হামদের। বুড়ীগুলা তো কহে' দিছে—

মুখ ভার করে কৌতি বললে—তু' সাহেব হোইলি, হামরা ভাবলি হামদের দুখ গেলো, আর তুঁ হামদের মারিব আহিলি।

মেঘু আবার চোখ দুটো টান করে বলে—আচ্ছা, ভালসে কাম্ করি যা, তবে নাই—

—নাই মারবো রে—! কে যেন মেঘুর কথাটা কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—ভাল্ করি কাম্ করি থাক।

আবার শুরু হল কল-কল্লোল খবরটা সকলকে পৌঁছে দিতে।

গেনী প্রসঙ্গটা বদলে দিয়ে বললে—বুড়ীগুলার লগ্ লাগি কী এতনা বক্-বকাইছিলি?

কৌতি বলে—পাত্ তুলা শিখাইছিল্ রে।

—দি, দি, হামদের ভি পাত্ তুলা দেখাই দি না।

মেঘুর চোখ কপালে ওঠে, বলে—হাম্রে কি পাত্ তুলবা জানে নাকি রে!

গেনী শাসায়—পাত্ তুলবা নাই জানছিলি তো কী কাম্ দেখ্‌বা আহিছিস্।

বতী ভয় দেখায়—হাম্‌রা ভুলসে পাত্ তুলি গাছগুলা খাই দিম্ তো কী করিবি?

মেঘু কাকুতি করে—হাম্‌কে আজি শিখাই দি, পিছে তুদের ভুল ধরিম্।

কৌতি হেসে ওঠে—হাইরে, বড়ি মজা পাইছে!

গেনী গম্ভীর হয়ে বললে—ঠিক আছে, উঁধারে এটা মাইকী আছে, উয়ার কাছে যা—উ খুব ভাল্ পাত্ তুলবা জানে। তোক্ ভাল্ করি শিখাই দিব।

—হিঁপিনে কোউন আছে?
—এটা নওতুন মাইকী, যাই দেখি লবি।

নতুন কারো আসার খবর তো সে জানে না! শিখতে না হোক শিখিয়ে দিতে, অন্তত কেমন কাজ করে সেটা দেখতেও তার যাওয়া দরকার। মেঘু এগিয়ে গেল সেদিকে। টিলার বাঁকটা ঘুরতেই সে বুঝল গেনীর হেঁয়ালী কথার তাৎপর্য। তার চোখ দুটো বড়ো হল। শর্মিষ্ঠা! শর্মিষ্ঠাকে পাতা তুলতে দেখে তার পা দুটো তৎপর হল। সংকোচের সকল বাঁধ ভেঙ্গে ছিঁড়ে দিয়ে মেঘু দাঁড়াল শর্মিষ্ঠার পাহির পাশে। (পাহি—চা-পাতা তোলার জন্য জনপ্রতি নির্দিষ্ট গাছের সারি)

শর্মিষ্ঠার একাগ্র চোখ দুটো গাছের ডগায় ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব ব্যঞ্জনা-ময় আঙ্গুল দিয়ে একটির পর আর একটি ডগা ধীরে ধীরে ছিঁড়ে চলেছে। কোন পরিহাস-প্রিয় সর্দার বা বাবু দেখলে মেয়েগুলো অমন চেঁচামেচি করে থাকে। তাতে শর্মিষ্ঠা যোগ দেয় না। তাই ওদের যত ইসারা-ইঙ্গিত তার রপ্ত হয় নি। ওদের মুখে মেঘুর নাম-টাও তার কান পর্যন্ত পৌঁছয় নি। সে বুঝতে পারে নি যে মেঘুই সেখানে এসেছে, তার এত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

মেঘুর চোখমুখ খুশীর প্রাচুর্যে ভরে গেল। এক দুর্দমনীয় কৌতূহল জেগে উঠল তার মনে। উৎসুক আগ্রহে সে এগিয়ে গেল শর্মিষ্ঠার পাশে। সে বলল—তুই পাত্ তুলব আহিলি, শর্মি'।

মেঘুর সব কটা কথা শর্মিষ্ঠা শুনতে পায় নি। শুধু তার নামটাই অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বরের মারফত তার কানে প্রবেশ করল। অবাক হয়ে শর্মিষ্ঠা মুখ তুলে চাইল। মেঘুর চোখে চোখ মিলিয়ে তার দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে রইল।

মেঘু আবার বললে—শর্মিষ্ঠা! তুই পাত্ তুলিব আহিলি?

তার এ নাম মেঘুর মুখে, অথবা আর কারো মুখে কখনো শোনে নি শর্মিষ্ঠা। আটপৌরে নামের তলায় ওটা তো চাপা পড়েই আছে। পোশাকী নামটা পোশাকের মতই তার কানে বাজে। তবু অত ভাবতে চায় না সে। শুধু মেঘু তাকে প্রশ্ন করছে? সে বিশ্বাস করতে পারে না নিজেকে, নিজের কান দুটোকে। যাচাই করে নিতে চায় ঐ স্বর। অমন কথা সে আবার শুনতে চায়, বারবার শুনতে চায়। কিন্তু কেমন করে তা শুনবে? সে যদি কিছু বলে, তবে তো মেঘু আরো কিছু বলবে। কেমন করে [illegible] কথার জবাব দেবে শর্মিষ্ঠা? দিতে পারলে তো দেবে। সে মুখ কি তার আছে?

—কিমান্ দিন তয় পাত্ তুলি আছ্?
(কতদিন তুই পাতা তুলছিস?)

ঐ তো মেঘু আবার কথা বললে! কিন্তু কই, সে তো কোন জবাব দিতে পারছে না!
—শর্মিষ্ঠা! পড়ালিখা এড়ি দিলা?
ঐ তো আবার। স্পষ্ট তার নাম, মেঘুরই মুখ থেকে। জানতে চাইছে সে লেখাপড়া ছেড়ে দিল কিনা। তবুও সে নির্বাক। নুয়ে আছে তার মাথা।

মেঘু বুঝল শর্মিষ্ঠার মনের ভাবটা। তাই কথাটা বদলে দিল। এল কাজের কথায়। চা-গাছের ওপর চোখ ফিরিয়ে সে বললে—চাঁও (দেখি) কেনেকুয়া (কেমন) পাত্ তুলিছা—

গাছের ডগায় চোখ পড়তেই মেঘুর মনের ভিতরে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। সমস্ত গাছগুলো মুড়িয়ে দিয়েছে! পাহিটার সর্বনাশ করে রেখেছে শর্মিষ্ঠা। কিন্তু ওর কি দোষ? সর্দারের দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, তারপরও সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। একজন প্লাকার তৈরি করা কি এতই সোজা? একবার দেখিয়ে দিলাম, তার এক পাশে বসে খইনি টিপতে শুরু করলাম। সর্দারের ওপর জ্বলে উঠল মেঘু। যদি বড়সাহেব দেখেন—কি মনে করবেন? সমস্ত দায় তো

তারই ওপর পড়বে। এত ভেবেও সে নিজেকে সামলে নিল। শর্মিষ্ঠাকে তার মনের ভাবটা বুঝতে দিল না।

কথায় কথায় শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে মেঘু গেল আর একটা গাছের সামনে। যে গাছটা থেকে তখনো সেই রাউণ্ডের পাতা ছেঁড়া হয় নি সেটা দেখিয়ে বললে—এই দেখ, গাছটা, এই সেকশনের সব গাছই তিন ফুটের মাথায় কলম কাটা। এই দেখ, ঠিক তার চুইঞ্চি ওপর নমুনো-পাত্তি ছেঁড়া হয়েছে। এখন এই দেখ, ঐ ছেঁড়া ডগার পরে আর একটা জনম্‌পাতি রেখে বাড়তি ডগাগুলো সব ছিঁড়া হয়েছে—বুঝলি তো।

শর্মিষ্ঠা অস্ফুট স্বরে জবাব দিল—হুঁ।

তখন মেয়েরা ওপাশের পাহি শেষ করে চলে এসেছে এ পাশের পাহির মুখে। তারাও শুনছে মেঘুর কথা। শর্মিষ্ঠাও নিবিষ্ট মনে শুনছে। সে অবাক হল—এ কাজ তো করে মেয়েরা। মেঘু বাগানে কাজ করত পুরুষের সাথে। এত কাজ সে শিখল কখন? মেঘুর ঘনিষ্ঠ ভাবের স্পর্শে শর্মিষ্ঠা বিস্মৃত হল তার পূর্ব অপরাধের যত গ্লানি। সে সহজ ভাব ফিরে পেল।

কতদিন পর শর্মিষ্ঠার কণ্ঠের ঐ একটুকু স্বর মেঘুর শ্রুতিগোচর হল। তা যেন মধু ঢেলে দিল তার কানে। সে বললে—এই দেখ, তারপর নীচে থেকে কত ফাঁকড়া ডালপালা উঠে এসেছে। এগুলোকে কি বলে জানিস?

এর আবার নাম আছে? শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে তাকাল মেঘুর পানে, বলে—না।

মেঘুর মুখে যত সমারোহই হতে থাক না কেন চোখ দুটো তার ছিল গাছের ডগার ওপর। সে একটার পর আর একটা ডালে হাত দিয়ে বলে যায়—এটাকে বলে কেরাসিন, এটা জেরাসিন। বুঝলি?

—হুঁ।

—আচ্ছা, এত কথা তুই এক দিনে মনে রাখতে পারবি না। তুই শুধু এইখানে লেবেল রেখে পাতা ছিঁড়ে যাবি। অর্থাৎ, এরপর যে কোন ডগাতে আড়াই খিলি পাতা (দুটো পাতার ডগায় একটা কুঁড়ি পাতা) পাবি সেটা তুলে নিবি। সাড়ে তিন খিলিও তুলে নিবি। এই দেখ, এটায় সাড়ে তিন খিলি গজিয়েছে। কিন্তু এমনি করে একটা ছিঁড়ে ফেলে দিবি—আড়াই পাত্তির ডগাটা ঝুড়িতে রেখে দিবি। বুঝলি?—তা নইলে খারাপ চা তৈরি হবে। লাল ডাঁটি, সাদা ডাঁটি মিশে যাবে কালো চায়ের সঙ্গে। বাজারে তার দাম কমে যাবে। আমার বদনাম হবে, তোদেরও নাম খারাপ হবে।

—হাঁ, আরো বড় ডগা পেলে কি করব? এই কথা বলে শর্মিষ্ঠা।

—বাঃ! বেশ কথা জিজ্ঞাসা করেছিস। এই তো বুঝে গেছিস। কোনটা অমন বেড়ে যায়, ওকে বলে পাগলা ডগা। ওটাও তুলে ফেলবি, কিন্তু রাখবি মাত্র দুই পাত্তি আর কুঁড়িটা। কুঁড়িটা ফুটে গেলে, এক আধটা কোমল পাতা যা পাবি রেখে দিবি।

মেঘু তার প্রশংসা করছে! শর্মিষ্ঠার উৎসাহ বেড়ে গেল। সে বললে—আর দেড় খিলি পেলে কি করব?

—হাঁ, সাবধান! ওটা রেখে দিবি। পরের রাউণ্ডে এসে দেখবি সেটা তৈরি হয়ে গেছে। সেটা তখন তোলা হবে। আর এই লেবেলের নীচে কোন পাতায় হাত দিবি না। তবে কিন্তু তাতে আর পাতা পাবি না।

কি যেন একটা ভেবে শর্মিষ্ঠা মেঘুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। বলবার মতো কিছু গুছিয়ে নিতে পারল না।

একটু হেসে মেঘু বললে—যেমন ওগুলোর হয়েছে, ওসব গাছে মাস দেড়েকের আগে আর পাতা পাওয়া যাবে না।

অপরাধিনীর মতো সে বললে—দেড় মাস পাতা পাওয়া যাবে না?

শর্মিষ্ঠা এত বড় দোষ করেছে। তবুও মেঘু তাকে ধমক দিচ্ছে না? হাসছে।

মেঘু আবার হাসল, বলল—হাঁ রে, দেড় মাসে হলে হয়, এমনই হয়েছে। তোর কি দোষ, সর্দার কেন সামনে ছিল না? অনেক বলেছি, এবার পাতা তুলতে থাক। নে, এখন হাত চালা আমার সঙ্গে।

মেঘু পটাপট পাতা ছিঁড়তে লেগে গেল। শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন পাতা তোলা মেঘু শিখল কবে?

—কি রে! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? নে ছেঁড়, এই দেখ, বাঞ্জি (বাজা) পাতা—এমন ডগা যেখানে দেখবি সব তুলে ফেলে দিবি। যদি সেটায় কোমল পাতা পাস তবে রেখে দিবি। গাছের কিনারে, পাতা তোলার লেবেলের নীচে বাঞ্জি পেলেও ছিঁড়বি না। নে নে, তোল।

দুজনে মিলে পাতা ছিঁড়তে থাকল, একটা শেষ করে যায় আর একটা গাছে। শর্মিষ্ঠার একটার সঙ্গে মেঘুর চার-ছটা পাতা ছেঁড়া হয়ে যায়—যেমন চকিত তার চাহনি তেমনি তৎপর হাত। হঠাৎ তার চোখে পড়ে শর্মিষ্ঠার আঙুল চালানোর ধরন। সেটা শুধরে দিতে বলে— ওঃ হো, তুই অমন করে পাতা ফুলিস! তাই তোর হাত চলে না।—এমনি করে দু-আঙুলের ফাঁকে ডগাটা চেপে ধরে টান মারবি। অমন করে তুললে আঙুলে দুঃখ পাবি, বেশীক্ষণ পাতি তুলতে পারবি না।

এক পাহি শেষ করে দুজন চলে গেল অপর পাহির মুখটায়। মেঘুর কথা শুনতে শুনতে, তার সঙ্গে কাজ করতে করতে, তার কথার জবাব দিতে দিতে সব ভুলে গেল শর্মিষ্ঠা। এত সুখ, এত আনন্দ সে জীবনে অনুভব করে নি। শর্মিষ্ঠার মনের যতকিছু গ্লানি, তার বিচ্ছিন্ন দিনগুলোর সঞ্চিত পুঞ্জীভূত যত অনুতাপ, যত ব্যথা সেসব কোথা দিয়ে কি ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল তার কিছুই সে বুঝল না, বোঝবার কোন অবকাশ পেল না। মেঘুর সহজ সরল সাবলীল কাজ ও কথার ছন্দে শর্মিষ্ঠার সারা দেহ যেন দুলতে থাকল, বায়ুপ্রবাহে বেতসপত্রের মতো। তার মন যেন ছন্দের তালে তালে হেলে-দুলে হেসে-ভেসে চলল মেঘুর মুখনিঃসৃত কথার সুরপ্রবাহে। তার মনের দুঃখ-সমুদ্রে হতে থাকল অমৃত মন্থন।

একপাশে শর্মিষ্ঠার আগের কাজ করে যাওয়া পাহি, অপর পাশে পরপর অন্য মেয়েদের পাহি। সে পাশ থেকে মেয়েরা হাত চালান বন্ধ রেখে মেঘুর হাতের দিকে চেয়ে আছে। পুরুষের তো দূরের কথা, মেয়েদেরও অমন হাত তারা দেখে নি। কাজ তারা ঠিকই করে বটে, কিন্তু অমন পাতা তোলার নিগূঢ় তথ্য জানে না। কেউ তাদের অমনভাবে বুঝিয়েও দেয় নি কখনো। নমুনো পাতা তোলে খুব ঝানু পুরুষ ও মেয়েরা, তারপর তারা শুধু লেবেল রেখে পাতা ছেঁড়ে। বাল্য সহচরের কৃতিত্বের কাছে নুয়ে পড়ল তাদের মাথা।

তবুও ঠাট্টা টিপ্পনির মওকা তো ছাড়া যায় না। কেতি হাঁক দিয়ে বলল—তুই বললি কাজ জানিস না। তাই আমরা তোকে ওর কাছে পাঠালাম কাম শিখতে, আর তুই ওকে কি শেখাতে শুরু করে দিলি রে।

—নাই-নাই, ও-ই আমায় শিখিয়ে দিচ্ছে।

মেঘুর পরিহাসে শর্মিষ্ঠার চোখ দুটো সলজ্জ-খুশীতে ভরে গেল, সে মুখ ফেরাল।

—শিখলি তো? এবার আমাদের কাছে আর কিছু শিখিয়ে দে।

মেঘু আর একটু থাকতে চায় শর্মিষ্ঠার কাছে। ওদের বললে—র, আজ ভাল করে শিখে নি—কাল তোদের শেখাব। নয়তো তোদের কাজ থেকেও খানিকটা শিখে নেব, তারপর যাব অন্য লাইনের মেয়েদের শেখাতে।

—নাই, আমাদের শিখিয়ে না দিলে আর পাতা তুলব না। বলে, বাতাসী আর হাসি মুখ গম্ভীর করল।

কেতি হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে—আয় শিগগির আমাদের কাছে। নাই তো গর্টফি সাহেবের কাছে নালিশ করব—তুমার জমাদার সাহেব হামদের কাম্ নাই শিখাছে, ওই একটা ছুকরির লই পড়ি আছে।

—নাই রে, হামার নোক্‌রিটা নাই খাবি। ই পাহিটা আদায় করি দেইকে তুঁদের কাছে যাছি। বলে, মেঘু ফিরে চাইল শর্মিষ্ঠার পানে। বলল—নে-নে, হাত চালা, দেখছিস না চিল্লাচিল্লি করছে। না গেলে আবার হামার নোক্‌রিটা খাই দিবে উঁরা।

শর্মিষ্ঠাও ছেড়ে দিতে চায় না মেঘুকে। সে আবদার করে বলে—তবে আমার হাত চলবে না।
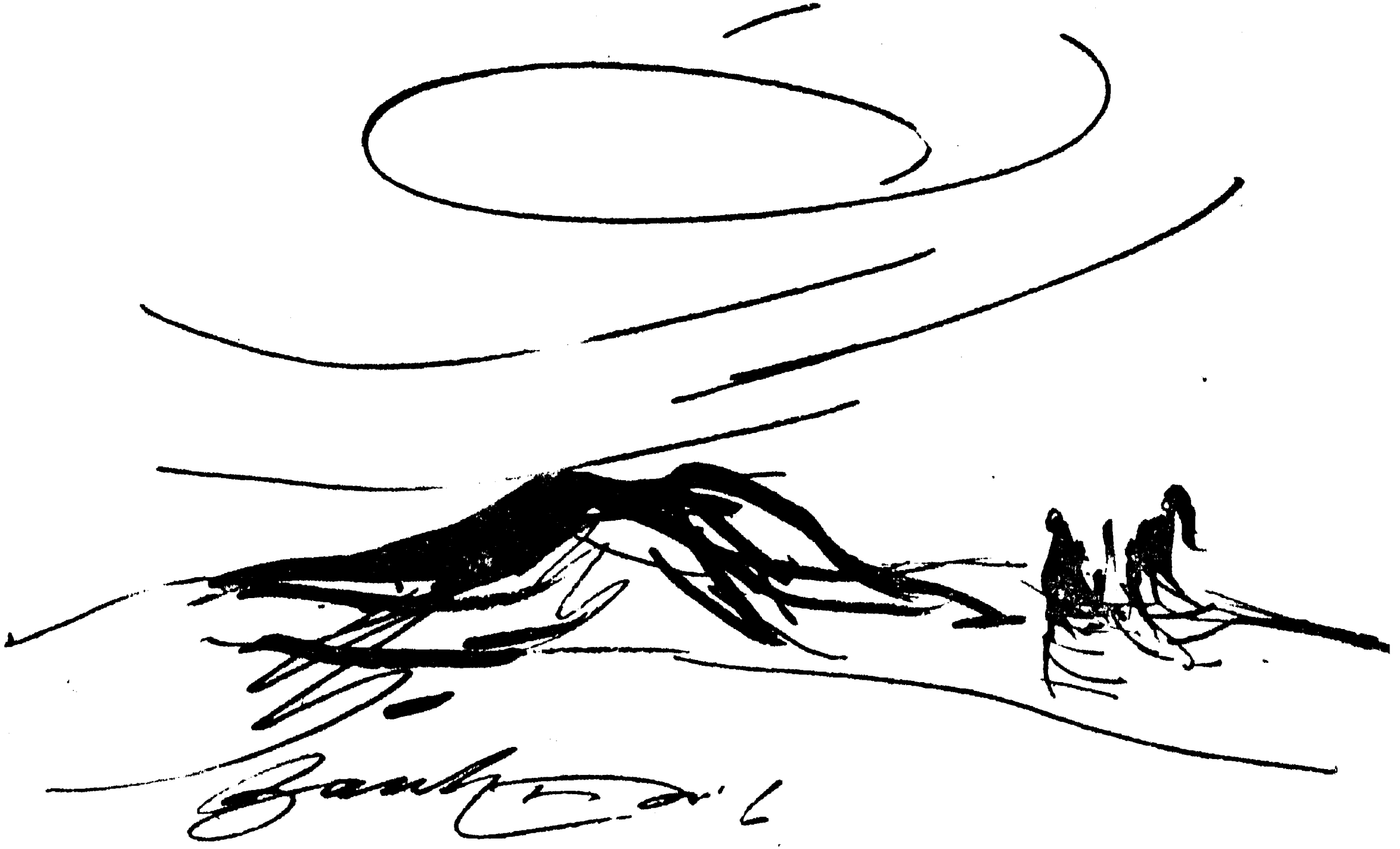
মেঘু কিছু বলার আগেই তাকে ভয় দেখিয়ে শর্মিষ্ঠা বলে—ওই তো গাছগুলো সব নষ্ট করেছি—আবার নষ্ট হবে। ওদের কাছে যেতে হবে না—ওরা তো পাতা তোলা জানে।

বাতাসী ঝাঁজি দিয়ে বলে—নাই, হামরা পাতি তুলা নাই জানি। কোউনে হামদের শিখাইছে? জমদার সাহেব কি তু'র একলার নাকি?

গেনীও সায় দিয়ে বলে—হাঁ, হামদের গট্‌ফি সাহাব মরম করি পাঠাই দিছে—পাত্ তুলা শিখাই দিব।

শর্মিষ্ঠাও পরিহাসের ঝগড়ায় মুখ খুলল। সে বললে—হাঁ, গট্‌ফি সাহেব পুরনা ধাড়িগুলোকে বেত মারিব পাঠাইছে—আর নয়াগুলোক মরম করি শিখাই দিব পাঠাইছে। —নাই রে জমদার সাহেব, নাই যাবি উঁদের কাছে।

—উঁরে আমার নয়া খুকি রে।

—একটা দোলনা আনি গাছে বান্ধি দে রে জমদার সাহেব।

—উঁকো যদি দোলনা দিবি তো হামদের বি—

শর্মিষ্ঠা এক ধমক দিল—মনে মনে (চুপ) থাক।

কেতি গালে হাত দিয়ে বললে—উঁ—বাবা! ছুকরির রকম দেখ। হামদের জমদারকে দংশাইছে আউর হামদের বি ধমকাইছে।

কেমন ক'রে শর্মিষ্ঠার মুখের সকল বাঁধ খুলে গেল। সে বললে—বেশ করাছি দংশাইছি, নাই তো তুদের দংশাবা দিম্ না কি? নাই জানছিলি নাকি?

কথাটা শেষ হ'তে শর্মিষ্ঠার মুখ চোখ রাঙা হ'য়ে উঠল। চেষ্টা করল তার সে মুখ মেঘুর চোখের আড়ালে রাখতে।

—তু'র সাথে হাই-কাইজা করতে নাই পারব। হামরা গট্‌ফি সাহেব ঠেনে আপত্তি জানাইব। জমদার হামদের—

জবাব দেবার উৎসাহে শর্মিষ্ঠা লজ্জার কথা ভুলে গেল। সে বললে—হামি বি সাহেবকে কহে দিম—নয়া জমদার খুব্ ভাল, হামকে খুব মরম করি—

ওর কথাটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে কেতি পাদ পুরণ করল—হাঁ, খুব মরম করি দংশাবা দিছে।

আবার শর্মিষ্ঠা রাঙা হ'য়ে ওঠে। ওদের বেহায়া-পনার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। নিঃসহায় হ'য়ে তাকায় মেঘুর দিকে। দেখে সে-ও হাসছে কৌতুক-ভরা চোখে, নির্লজ্জের মতো।

কয়েকবার ধুকড়িটা ভরে গেল—শর্মিষ্ঠা নেমে গিয়ে পাতাগুলো রেখে এল টুকরিতে। দু-পক্ষের কথার মধ্যে মেঘুর হাত যেমন কাজ ক'রে গেছে, কানও তেমনি সজাগ থেকেছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে এর-ওর পানে তাকিয়েছে। সর্দার আর মুহুরীবাবু এমনই একটা কিছুর আন্দাজ করে, তাই নিজেদের একটু আড়াল ক'রে রেখেছে।

হঠাৎ ওপাশে সর্দারের গলার শব্দ শুনে মেঘু হাঁক মারল। সে এল, তার সঙ্গে মুহুরীবাবুও এল।

সর্দারকে মেঘু বললে—ঐ পাহা (সারিটা) একবার দেখে আয়।

আর কোন কথা না বলে মেঘু হা চালাতে থাকল। সর্দার শর্মিষ্ঠার পাহা এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত ঘুরে এসে মেঘুর সামনে দাঁড়াল। ত সঙ্গে মুহুরীবাবুও ঘুরে এল

হাতের পাতা কটা শর্মিষ্ঠার ধুকড়িতে ফেলে দিয়ে মুখ তুলে চাইল মেঘু বললে—কি দেখলি?

অস্ফুট স্বরে—হুঁ, বলে সর্দা অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিনের মেঘু! তার কাছে এই হা বুড়ো সর্দারের—এতগুলো ছুকরি অ বুড়ীর সামনে। মুহুরীবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হ'ল। বিশ বছর সে এই কা করছে। আজ এই বাচ্চা ছেলেটার হা এমন অপদস্থ হ'তে হ'ল তাকে। বশে করে পেংটির সামনে। পাতা তোলা ছেড়ে ঠায় চেয়ে আছে এদিকে—ডেবডেব চো দিয়ে কথাগুলো গিলছে, হাসছেও মু টিপে। কত ফুট কাটবে তাকে আড়া পেলে।

—হুঁ কি? মেঘু জানতে চাইল।

—বেয়া (খারাপ) হোইছে পাহিগুলা।

—সাহেবদের চোখে পড়লে তোদের কিছু বলবেন না, বলবেন আমাকে। আ তখন কি জবাব দেব?

সর্দার নিরুত্তর। কি আর সে বলবে। সে আশা করেছিল, যে অতবড় বাপের মেয়ে, অমন নাম-করা পাতা-তুলিয়ে শুক্রীর মেয়ে, তাকে কি আর আনাড়ীর মতো হাত ধরে কাজ শেখাতে হবে! বড় জোর লেবেলটা ধরিয়ে দিলেই সড়সড়িয়ে তার হাত চলবে। কিন্তু লেখাপড়া ক'রে মেয়েটা যে এতখানি গোল্লায় যেতে পারে তা সে আগে বুঝল না। —কিন্তু এসব তো আর ত্রুটির কৈফিয়ৎ হ'তে পারে না।

মুহুরীবাবুরই বা জবাব দেবার কি আছে! দায় তো তারই। সে তো জানে, একটু লেখাপড়া শিখলেই কুলির ঘরের ছেলেমেয়েদের কি হয়। না পারে বাবুর কাজ, না শিখতে চায় কুলির কাজ। এত জেনেও সে সর্দারের কথায় ছেড়ে দিল মেয়েটাকে একলা কাজ করতে। দোষ তো তারই। যদিও তাকে পাশ কাটিয়ে মেঘু ধরেছে সর্দারকে—সে তো তারই ত্রুটির জন্য।

এমন ক্ষেত্রে অন্য জমাদ্দার ধমকায়, কত কি কান্ড ক'রে, কিন্তু মেঘু তার কিছুই বলে না। সে নরম সুরে বুঝিয়ে বললে—ও যখন নতুন, ওর সংগে দিনকতক কারো থাকা উচিত ছিল। তাহলে তো এমন হ'ত না। এই ক'দিনে কত গাছ অমন নষ্ট হয়েছে। কট ক'রে ছোট সাহেবের চোখে পড়লে আমার কি হবে তা জানিস তো? বড় সাহেবের কানে তুলে দেবেন সংগে সংগে। তখন আমার অবস্থা কি হবে। আমায় তো সত্যি কথা বলতে হবে—তাহলে তোর কি হবে? —বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—আপনাকেই বা কি মনে করবেন? ভেবে দেখেছেন?

এমন অবস্থায় পড়ে পদস্থ লোকের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার সকলে পেয়ে এসেছে তেমনটি হ'লে কারো ক্ষোভের কিছু থাকত না বোধহয়। কিন্তু এটা তেমন নয়। খানদানী জমাদার নয় তো মেঘু। ধমক দিয়ে শাসালে বনিয়াদীর আসনে চট ক'রে উঠে যেতে পারত। যেটায় ওরা ধাতস্থ, সেটার মর্যাদা দিতে সকলে জানে। যত অনুনয় বিনয় করেই কথা বলুক না কেন, সে মেঘু! একে মেঘু, তায় আবার নরম সুরের কথা। যেন তার নিজেরই একটা দোষ হয়ে গেছে। ওদের দু-জনের মনই অপরাধ স্বীকার ক'রে নিল বটে, তাই মুখে আর কথা ফুটল না। কিন্তু মনের অপর প্রান্তে বড় অপমান বোধ করল, তার আনুষংগিকভাবে এল দুঃখ, এল রাগ। শেষ পর্যন্ত অপরাধটা সুবিধার্থে অন্তর্হিত হল, অথবা ভুলেই গেল রাগটাই মুখ্য হ'য়ে রইল তাদের মনে। তাদের রাগ হ'ল মেঘুর ওপর। তবুও সব মিলিয়ে তাদের মনে যে জিনিসের সৃষ্টি হল তাতে চুপ করেই থাকতে হল। উপায় নেই তা না করে, সে কথাও জানা।

সকলকে নিশ্চিন্ত করতে মেঘু বললে—যা হয়ে গেছে তার জন্য ভয় নেই। আমি সাহেবকে ব'লে দেব।

দু'জনের মাথাই বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকল। সাহেবকে ব'লে দেবে, তবেই হয়েছে! আবার ভয় নেই বলে। তা কি করে হয়? —এমন কেতাটা বিলেতি। সেখানে ভুলের মাপ আছে, মাপ নেই অবহেলার। বড় সাহেবের কৃপায় মেঘুর তা রপ্ত হয়েছে। ওদের পক্ষে তো তা হবার কথা নয়। মেঘুর আশ্বাসটা হেঁয়ালির মতো, তাতে ভয়ই হ'ল।

মেঘু বুঝল না ওদের ভাবটা। সে বললে—কিন্তু এবার থেকে কেউ না কেউ যেন নতুন মাইকীর সংগে থাকে, যতদিন না কাজ শেখে। আমি তো রোজ এক জায়গায় আসতে পারব না। এবার যেদিন আসব সেদিন যেন দেখি সব ঠিক আছে।

কারো কোন জবাবের অপেক্ষা করল না মেঘু। চলে গেল সে অন্য মেয়েদের কাছে। হাসতে হাসতে বললে—তু'হতর লগ পাব আহিসু। (এলাম তোদের কাছে) দি অলপ্ কাম্ শিখাই দি।

—হুঁ, বাবু আর সর্দারটাকে ধমকাই আহিলি, হামুদের ভি ধমকাইবি তো?

—না-না, আমি জানি তোদের কিছু বলতে হবে না। ব'লে, মেঘু প্রত্যেকের ধুকড়িতে কয়েক মুঠো করে পাতা তুলে দিতে থাকে। একজনকে ছেড়ে চলে যায় আর একজনের কাছে। মাঝে মধ্যে দু'টো একটা ফুট কাটা কথাও বলে।

কিন্তু একটু আগে মেঘুর যে মুখ তারা দেখেছে, অন্ততঃ তার মুখ নিঃসৃত যে কথা শুনেছে, তাতে সকলের মনের ভিতরকার আনন্দের সকল উৎস শুকিয়ে গেছে। যদিও ও-সব ব্যাপারে তাদের মাথা পাতার কথা নয়—এবং যেমন হয়, যেমন দেখে সে তুলনায় তেমন কিছুই হয় নি, কিছুই দেখে নি—তবুও পরিস্থিতিটা তাদের মনেও আঘাত করল। বিশেষ করে তাদের এমন আয়োজনটা ভন্ডুল হয়ে গেল।

এই কঠিন কষ্টলব্ধ জীবনে পরিহাস-প্রিয়তাই তাদের সম্বল। গল্প, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে তারা হাত চালায় সারাটা দিন। রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, শীতে কনকন ক'রে কাঁপে—তবুও উদয়াস্ত বাগানে থাকে, থাকতে পারে। বর্ষাতি ঢাকা দেহ ওঠে ভেপ্সে, তবুও কাজ করে হাসি হাসি মুখে। তবেই না এরা কামাই করতে পারে মরদের চাইতে অনেক বেশী।

মেঘু সে সব জানে, তাই খুব চেষ্টা করল ওদের সহজ ভাব ফিরিয়ে আনতে। তারপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে যাবে অন্যত্র। এক জায়গায় তার এতক্ষণ আটকে থাকার উপায় নেই। কিন্তু এখানে এসে যেমন হাসিখুশী ভাবের মধ্যে মেঘু সবাইকে পেয়েছিল কিছুতেই পারল না তাদের সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। হয়তো মন ফিরে এসেছে। কোন জমাদার এমন করে কাজ শেখায় না, এমন নিজের হাতে পাতা তুলেও দেয় না। তবুও মুখ আর খুলতে চায় না।

যাক, আজ এর বেশী আর কিছু করবার উপায় নেই মেঘুর, অন্য দিন দেখা যাবে। অনেকটা সময় সে এখানে থেকেছে, তাকে থাকতে বাধ্য করেছে তার মন। কিন্তু আর না। হঠাৎ মেঘু হাত খালি করে দাঁড়াল। সর্দার এবং মুহুরীবাবুর উদ্দেশে বললে—আমার অন্য কাজ আছে, চললাম আজ। পরে দেখা হবে।

সর্দার কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই সে সকলকে শুনিয়ে বললে—বেরা না পাবি দেই।

অর্থাৎ মেঘুর কাজে বা কথায় কেউ যেন অসন্তুষ্ট না হয়। এটা এ-দেশীয় ভদ্রতা। চা-বাগানেও তার প্রচলন আছে।

শর্মিষ্ঠা হাঁ ক'রে চেয়ে রইল—মেঘুর মুখ থেকে একটা বিশেষ কিছু শোনবার আগ্রহে, নিছক তারই উদ্দেশে। কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হ'ল না। বাগান থেকে পথটায় নেমে মেঘু তার দিকে ফিরেও তাকাল না। হনহন ক'রে সে চলে গেল—টিলাটার গায়ে ঢাকা পড়ে গেল মেঘুর দেহটা। সেই সংগে শর্মিষ্ঠার মনটাকে কতখানি মুচড়ে ভেংগে দিয়ে গেল তার কিছুই মেঘু জানতে পারল না।

(ক্রমশঃ)

আবিষ্কারের পাওয়া

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
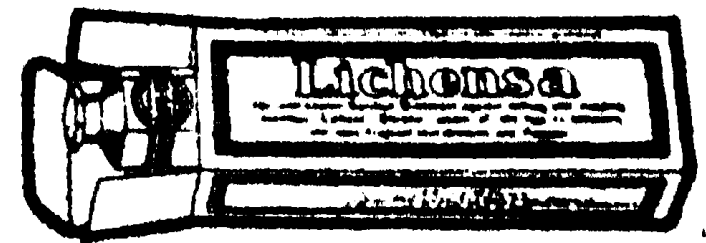
সুখ আর আনন্দের মধ্যে বড় রকমের যে একটা ফারাক আছে—তা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বুঝি না বটে, কিন্তু সাধারণ গন্ডীর বাইরে একটা কিছু ঘটলেই তা উপলব্ধি করি। সুখ অবশ্য আনন্দের ছোট সংস্করণ, মিনি সাইজের ডাইজেষ্ট কিম্বা পকেট বইয়ের মতো। ছোট পাওয়ার তৃপ্তিতেই সুখ মেলে, নিটোল ছোটগল্প পড়ার পরম পরিতৃপ্তি, আর আনন্দ বিরাট উপন্যাস পাঠের ব্যাপ্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে,—ওয়ার এন্ড পীস, গোরা বা পথের পাঁচালী পড়ার মতো।

এই আনন্দ যে কখন কোথা দিয়ে মনকে খুশির পূণ্য ধারায় পরিপ্লুত করে—বলা যায় না। আমরা যত চাই, তত পাই না, পাই না বলেই চাওয়ার মধ্যে যত উৎকন্ঠিত ব্যাকুলতা ও স্বপ্নরঙিন সুখ-কল্পনা।

সাধকেরা এই চাওয়ার পেছনে নিজেদের নিষ্ঠাকে নিয়োজিত করে রাখেন, ফলে চাওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁদের কাজ সুরু হয়, চাওয়ার শেষে পাওয়ার পর্যায় যখন আসে, তখন সেই পাওয়া যদি ধীরে ধীরে এগোয়, তাতে লাভের আনন্দ জাগে ঠিকই, কিন্তু চমক আসে না। আর অতর্কিতে হঠাৎ যদি আপসেট বাজী জেতা যায়—তাতে নাটকীয়তা যাই থাক না, পাওয়ার যে তৃপ্তি—তা আনন্দের আকারে দেখা দেয়।

সাধকেরা যে সাধনায় নিমগ্ন—সেই তপস্যায় যখন সিদ্ধি আসে—তখন স্বর্গীয় আনন্দে তাঁদের মন ভরে যায়। গায়কের গলা সাধায় যে কষ্ট—তা তিনি ভুলে যান—যখন সুর তাঁর কন্ঠে ফোটে। গায়কের কথা কি বলবো, আমি এক তবলচির কথা জানি, তিনি রোজ চোদ্দ পনেরো ঘন্টা ধরে বোল সাধতেন, তবুও তাঁর বাঁয়ার আওয়াজ গম্ গম্ করে বের হতো না। বছর কয়েক বাজাতে বাজাতে হঠাৎ এক সময় তাঁর বাঁয়া থেকে সুরসমন্বিত শব্দিত ঝংকার বের হলো। প্রথম দিন সেই শব্দ শুনে তবলচির সে কি আনন্দ! তার চোখে মুখে স্বর্গীয় দ্যুতির পূণ্য বিচ্ছুরণ দেখে সাধকের আনন্দ যে কি বস্তু—তা কিছুটা মালুম হয়েছে।

শুধু গায়ক বাদক কেন, বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও আবিষ্কারের বহু বাস্তব কাহিনী এবং ঘটনার কথা আমরা জানি। ইউরেকা বলে লাফিয়ে ওঠার মধ্যে যে গভীর আনন্দ—তা বুঝতে আমাদের বাধে না।

পর্বতারোহী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পর্বত চূড়ায় ওঠেন, ওপরে ওঠবার পর তাঁর মনে অবিস্মরণীয় আনন্দ জাগে, নামার বিপদ বেশী জেনেও সে আনন্দে একটুও ভাঁটা পড়ে না।

যিনি যে পথের সাধক, তিনি ভাবেন বোধহয় তাঁর সাধনার ফলশ্রুতিতেই আনন্দের সোনার খনি। এই আনন্দের সোনার খনির খোঁজেই মানুষ অ্যাডভেঞ্চারে মত্ত হয়েছে, কঠোর সাধনায় লিপ্ত হয়েছে, লক্ষ্যে পৌঁছুবার হাজার ঝুঁকি নিতে কুন্ঠিত হচ্ছে না। লক্ষ্যে যেতে হবে—অর্থাৎ গোল করা চাই।

গোল যে কখন হয়—তার কোনো স্থির নির্দেশ নেই, নাটকের আকস্মিক চমকের মতো সিদ্ধিলাভ হঠাৎ ঘটে যায়। হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া সিদ্ধিলাভ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আবিষ্কারের জগতেই ঘটতে দেখা যায়। কলম্বস যে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন—তাও হঠাৎ, তিনি তো বুঝতেই পারেন নি যে ঐ নবাবিষ্কৃত ভূখন্ড ভারতভূমি নয়, অন্য এক দেশ, পৃথিবীর অপর গোলার্ধ! কলম্বসের এই অভিযানে সঙ্গী হিসেবে ছিল স্পেনের দুর্ধর্ষ অপরাধীবৃন্দ, আজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তিদেরই পাঠানো হয়েছিল। যে সময় ওই দুর্ধর্ষ অপরাধীর দল বিদ্রোহ করেছিল, কলম্বসকে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দেশে ফিরতে বলেছিল, তা করা না হলে, কলম্বসকে জোর করে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে তারা স্পেনে প্রত্যাবর্তন করবে—ঠিক এই রকম এক উত্তেজনাময় মুহূর্তে আমেরিকা-ভূখন্ডের হদিস মেলে!

নৈরাশ্য এবং হতাশার শেষ সীমা বলে আবিষ্কারকের জীবনে কিছু নেই। সবাই যখন হাল ছেড়ে দেয়, নেতৃবর্গের তখনো আশা থাকে। পৃথিবীর সব আবিষ্কারের পেছনেই এই আশার কথা।

মধ্য এশিয়ায় তুর্কমেনিয়ার দক্ষিণে পুরাতত্ত্ববিদেরা সুপ্রাচীন কালের—বলতে গেলে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি গ্রাম আবিষ্কার করেছেন,—সেই আবিষ্কারের আনন্দেও এই রকম চমক আছে, নৈরাশ্যের পর হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত সাধক প্রত্নতত্ত্ববিদের সামনে ধরা পড়লো সুদূর অতীতের এক সন্ন্যাসিনীর সমাধি-মন্দির।

সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার কারাকুম মরুভূমির প্রান্তরে সেই সন্ন্যাসিনীর সমাধিস্তূপ আবিষ্কৃত হয়।
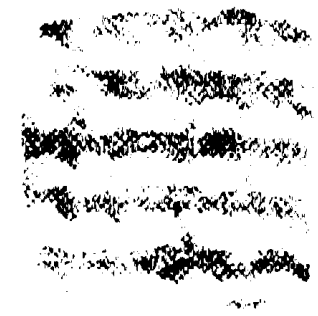
কারাকুম মরুর মধ্যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সন্ন্যাসিনীর সমাধি-মন্দির ও নামাজগা ডেপে ও অলটিন ডেপের ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত ধাতু নির্মিত নানাবিধ অলংকার।

প্রত্নতত্ত্ববিদ ভাদিম ম্যাসন

এই সমাধি স্তূপটির বয়স কম করে চার পাঁচ হাজার বছর হবে। যে সন্ন্যাসিনীর দেহ এই সমাধি-মন্দিরে সমাহিত করা আছে—তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি খুব বেশী জানা যায় নি, তবে সমাধিগৃহ দেখে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সন্ন্যাসিনীকে বিবিধ ঘটা করে সাড়ম্বরে কবরস্থ করা হয়। সোনার অংটি, মহামূল্যবান পাথর খোদাই করা গলার হার, সোনার পাতে ইন্দ্রনীল মণি (ল্যাপিস ল্যাজুলি) পাথর বসানো অলংকার—সব কিছুই সেই কবরে পাওয়া গেছে। শবাধারের পাশে একটি রূপোলি পাতে মোড়া ধূপদান আছে, বিচিত্র ধরনের তিন মাথার এক পশু মূর্তি আঁকা সেই রূপোর পাতে, আর পোড়ামাটির ওপর কারুকার্যখচিত ছোট্ট এক মূর্তি সন্ন্যাসিনীর হাতের ওপরে স্থাপিত দেখা গেছে।

১৯৬৬ সালের গরমকালে এই কবর হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। রুশ দেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কারাকুম মরুভূমি অঞ্চলে খনন কার্য চালাচ্ছিল। বেশ কিছুদিন উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ চললো। তারপর নৈরাশ্য এসে সকলের মনে শক্ত শিকড় গজিয়ে দিতে লাগলো। বিশেষ করে যখন বর্ষা আসার উপক্রম হলো, তখন সেখান থেকে ফিরে আসাই স্থির করা হলো। সে সময় দলের নেতৃত্ব করছিলেন ভাদিম ম্যাসন। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে তাঁকেও মত দিতে হলো—এখনকার মতো আপাততঃ কাজ স্থগিত থাক। কাজ বন্ধের হুকুম দিয়ে তিনি ফেরার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন, দলের নানা জিনিসপত্তর কেমনধারা বাঁধা-ছাদা হচ্ছে দেখতে গেলেন, কুলিদের একজনকে ডেকে বললেন—শুকনো ওই ঘাসের চাঙড়টা সরিয়ে ফেল, এখানটা যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের উঁচু মনে হচ্ছে।

মালপত্তর বাঁধা শেষ, এবার ফিরে আসার পালা। হঠাৎ সেই কুলিটা শুকনো ঘাসের চাঙড়টা সরাতেই দেখা গেল ঠিক তার ইঞ্চি পাঁচেক নীচেই এই সমাধি মন্দির! আশ্চর্য! আনন্দে ভাদিম ম্যাসন লাফিয়ে উঠলেন—ইউরেকা, ইউরেকা। কিন্তু ততক্ষণে বেশ জাঁকিয়ে বর্ষা সুরু হয়ে গেছে।

আবিষ্কার হাতের কাছে এলেও তাকে সেই মুহূর্তে ধরা গেল না। এ আর এক যন্ত্রণা! কিন্তু উপায় নেই, বর্ষার কটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে। আনন্দ-বিষাদ-মাখা মন নিয়ে ভাদিম তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে এলেন, পরের বছরের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতেই হলো।

পরের বছর খনন কার্য চললো পুরোদমে, দেখা গেল পাঁচ হাজার কি তার কিছু আগে এখানে সুপ্রাচীন তিনটি সহর—নামাজা ডেপে, উলুগ ডেপে, এবং অলটিন ডেপে ছিল।

আজ সেই সব প্রাচীন সহরের নামগন্ধ নেই, সভ্যতার ইতিহাসেও তাদের কোনো অবদানের কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য সুমেরীয়, ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ তখন ঘটেছে, এবং এই দুই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের কথা জানাও যায়, কিন্তু নামাজা, উলুগ এবং অলটিন ডেপের প্রাচীন সভ্যতার কোনো খবর আজকের জগতের মানুষের জানা নেই।

এই রুশ প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টাতেই অলটিন ডেপের উত্তরে এক শক্ত প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়, খৃষ্টপূর্ব তিরিশ হাজার বছর আগের তৈরী বলে জানা গেছে। অবশ্য প্রাচীরের সবটা খুঁজে পাওয়া যায় নি, একদিককার কিছু অংশ খুঁড়ে পাওয়া গেছে মাত্র।

সন্ন্যাসিনীর সমাধি-মন্দির, শবাধারে অলংকারাদি, চিত্রাঙ্কিত ধূপাধার—এ সবের আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে তদানীন্তন সমাজের সংস্কৃতি ও সভ্যতা খুব উচ্চ মার্গের ছিল।

উৎসাহিত প্রত্নতাত্ত্বিকের দল খুঁড়ে বার করলো কিছু কিছু বাসন-কোসন, মৃত জীবজন্তুর অস্থি, মাটির তৈরী কুঁড়ে ঘরের ভগ্নাবশেষ, কিছু কিছু ইঁটের গাঁথনি।

এই আবিষ্কারের ফলে সুমেরীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার একটা আঁচ পাওয়া গেছে। কারাকুমের মরুভূমির ধারে আর একটা পাঁচীল খুঁজে পাওয়া গেছে, আঠারো ফুট চওড়া আর দূরের পাহাড় থেকে নীচের সমতল ভূমি পর্যন্ত লম্বা, যে সময় ঐ সন্ন্যাসিনীর জীবনকাল, আবিষ্কারকদের ধারণা এই প্রাচীরও সেই সময় তৈরী। একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষও দেখা গেছে। সুমেরীয় সহরের মন্দিরের মতই এর গড়ন। পাহাড়ের উঁচু টিলার ধারেই মন্দিরটা আছে, মন্দির-চত্বরে ধুনী জ্বালাবার জায়গার চিহ্নও পাওয়া গেছে। নীচে রাখালিয়াদের, কামার কুমোরের ঘর-বাড়ী—এ-সবেরও নিদর্শন কিছু কিছু মিলেছে।

অলটিন ডেপের বাসন-কোসন যা পাওয়া গেছে—তাতে কিন্তু শিল্প-প্রতিভার ছাপ আছে। দেখতেই সেগুলি শুধু সুন্দর—তা নয়, ব্যবহারের দিক থেকেও সে-সব জিনিস অত্যন্ত সহজ, অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যায়।

কারাকুম মরুর দক্ষিণে কিন্তু মাটির তৈরী অনেক নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। সে-সব মূর্তির কানে বসানো দুলের মতো শস্যকণা লটকানো রয়েছে। কোনো কোনো চেহারা গাছের পাতার আদলে তৈরী করাও হয়েছে। কোনো মূর্তির ওপর আটমুখো এক তারকা-চিহ্ন ক্ষোদিত করা আছে, হয়তো এই তারকা সুমেরীয় কোনো দেবতার অভিধাসূচক। কোনো মূর্তি বা ত্রিভুজাকৃতি, কোনোটা আবার ইংরাজী বর্ণমালার 'কে' হরফের মতো।

পাঁচ হাজার বছর আগের সভ্য জগতের একটা নতুন হদিস এই আবিষ্কারের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে এসে পৌঁছল। সভ্যতার ইতিহাসে এর মূল্য অসীম। কিন্তু যাঁরা এই আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের মনের আনন্দের কি কোনো মূল্য আছে? বরং বলা যাক, কোনো মূল্য দিয়ে কি সেই আনন্দকে কেনা যায়? তাই বলছিলাম আবিষ্কারের আনন্দ বাস্তব জীবনে এক অমূল্য সম্পদ, সুখের মতো অতটা অনায়াসলভ্য নয়।

পোড়ামাটির নারীমূর্তি
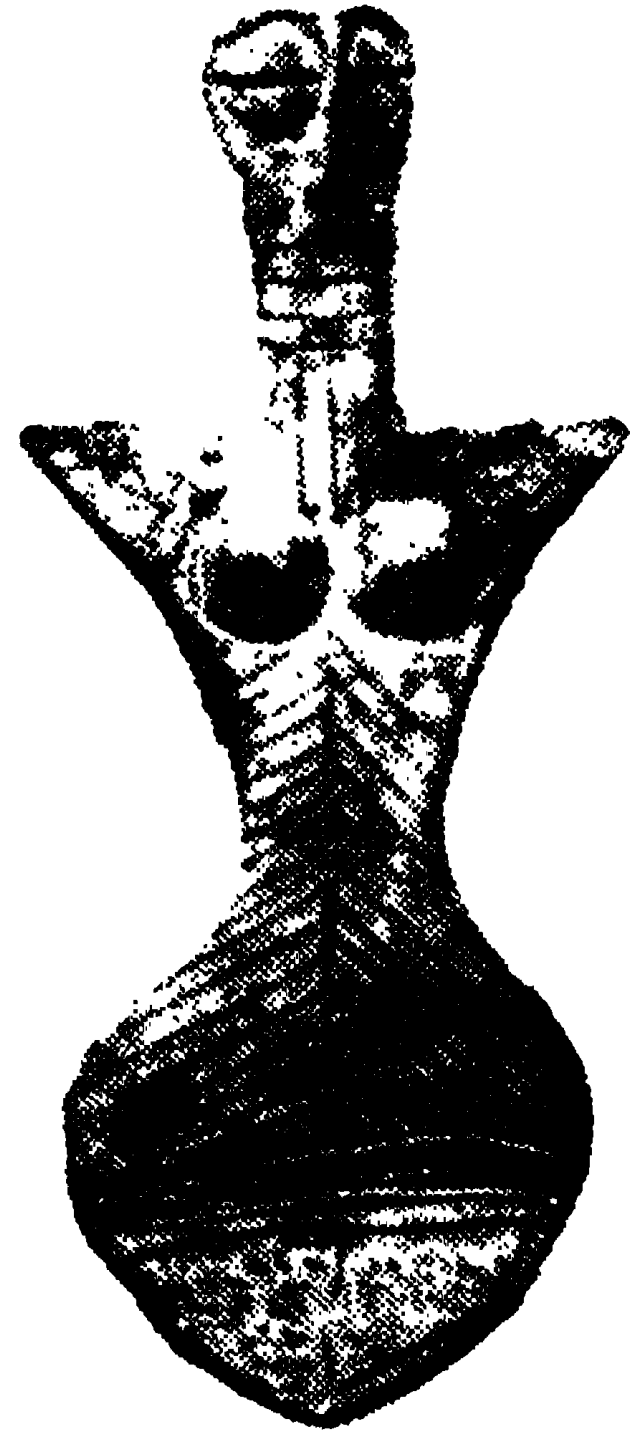
আবিষ্কৃত বিচিত্র জীবের মূর্তি

পোশাকে বিবর্তন

আজকের দিনে আমরা দেখছি জীবনের প্রতিটি ব্যবহার্য জিনিসই দ্রুত পরিবর্তনশীল। যেমন ধরুন পোশাক-পরিচ্ছদ, কালকের জিনিস আজকেই কেমন পুরনো হয়ে যায়। নতুন নতুন জিনিস ব্যবহার করার দিকে মানুষের একটা প্রবল ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। প্রাচীনকালের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেই বা তার সম্বন্ধে আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে সেগুলি পরিবর্তিত হতে কত সময় লেগেছিল।

এক সময় মানুষ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেছে তাদের লজ্জানিবারণের জন্য। প্রস্তর যুগের মানুষ হাড়ের তৈরী সূচের মত জিনিসে জন্তু-জানোয়ারের চামড়াকে পরস্পর সংলগ্ন করে মোটামুটি ব্যবহার-যোগ্য করে তুলতো। সেই থেকেই অনুমান করা যায় যে, মানুষ প্রথমে জন্তু-জানোয়ারের চামড়া ও পরে গাছ-গাছালির ও তৃণ-গুল্মের বাকল ও তন্তু পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করেছে।

মানুষের বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদ শুধুমাত্র লজ্জা নিবারণের জন্য নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস হিসাবেও ব্যবহৃত হতে লাগলো। এই সৌন্দর্য রক্ষার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা, জলবায়ুর তারতম্য বা আবহাওয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির দিকে নজর দিয়েও পোশাক-আশাক পরা হতে শুরু হল।

পূর্বে পোশাকের ধরন-ধারণ দেখে বলে দেওয়া যেত সে কোন্ দেশের লোক। ইতিহাসের যত পুরনো দিনের পাতা ওল্টানো যায় ততই বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে দীর্ঘ দিন সময় লাগতো। কিন্তু বর্তমানে কোন দেশের দূরত্ব আর দীর্ঘ বলে মনে হয় না। সুতরাং প্রাচীনকালে ভাবের আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদের আদান-প্রদান হতে সময় লাগতো।

মহিলাদের পোশাক-আশাকের জাঁকজমক অতি পুরনো দিন থেকে আমরা লক্ষ করে থাকি। শুধু আমাদের দেশে কেন রুশ মহিলারা পুরনোকালে মাটি-ছোঁওয়া লম্বা লম্বা শার্ট পরতো। এই শার্টের ওপর রেশমের ঢোলা পোশাক পরারও একটা রেওয়াজ ছিল। দুপর্দা কাপড়ের মধ্যে তুলো সেলাই করা মোটা কোট বা ফারের চাদর বাইরে যাবার জন্য ব্যবহার করতো। যারা কমবয়সী অর্থাৎ কিশোরী তারা লাল এমব্রয়ডারি করা লাল ব্যাণ্ড টুপিতে লাগিয়ে দিত। সেই টুপির পিছন থেকে ঝুলতো একটা রিবন। বিয়ের পর মেয়েরা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে মাথা ঢাকার জিনিস ব্যবহার করতো। এগুলি কিকা, কোকোশনিকস্ প্রভৃতি নামে পরিচিত, সেই সময় এই সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ রুশ মহিলারা ব্যবহার না করলে তাদের আভিজাত্য বজায় থাকতো না।

রুশ মহিলাদের মত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পোশাকের চলন ছিল, এখনও আছে। মহিলাদের পোশাকের মধ্যেই আঞ্চলিকতার প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। সেলাই করা পায়জামা বা সালোয়ার, ঘাগরা, লহঙ্গা, ব্লাউজ, কাঁচুলি, লম্বা একখণ্ড বা দুখণ্ড কাপড় পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীর, জম্মু ও হিমাচল প্রদেশে কামিজ ও ফেরন পরে। মেয়েদের অনেকে ঘোমটার মত ওড়না, লুগড়া, তরঙ্গা ও [illegible]

([illegible])

মেয়েরা মায়ের সহযোগী হোক

অঙ্গনা

এরকম একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, আজকালকার মেয়েরা একদম কাজ জানে না। কাজ বলতে অবশ্য এখানে ঘর-সংসারের কাজের কথাই বোঝাচ্ছে। মেয়েদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অংশত স্বীকার না করে উপায় নেই। অংশত বললাম এজন্য যে, শহরের মেয়েদের মধ্যেই এই প্রবণতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, গ্রামের মেয়েরা এখনো পুরোপুরি এর গ্রাসে পড়ে নি। তবে ফ্যাশান সচেতন আর বিলাস-বহুল সভ্যতা যেভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে চলেছে তাতে কত দিন যে এর প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে সে কথা বলা শক্ত। একথা সত্য যে, ফ্যাশান এবং বিলাস চিরকালই ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েরা ঘরের কাজ শিখতো। আজ আর তা হয় না। মেয়েকে ঘরের কাজ শেখানোর ব্যাপারে মায়ের উৎসাহ হলো আসল। কিন্তু অনেক বাড়িতেই দেখা যায় যে, মা এখন মেয়েকে এ ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দেন না। একটা ঠুনকো অজুহাতে একে ঘরসংসারের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। আর সেই অভিযোগটি হলো যে, এতে মেয়ের পড়াশোনার ক্ষতি হবে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। কথাটা সুস্পষ্ট। এর বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এখন চুল বাঁধায় মেয়েরা হয়তো কিছুটা পটুত্ব অর্জন করে কিন্তু রান্নার ব্যাপারে ওদের দক্ষতা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে, মেয়েরাও রান্নাঘরের সঙ্গে সম্পর্ক মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। কোন কোন মেয়ে অবলীলাক্রমে বলে ফেলেন যে, মান্ধাতার আমলের আলু-পটোলের সংসার আমি করবো না। দুবেলা হাঁড়ি ঠেলা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। টিপ-টপ থাকবো। খাবার-দাবারের ব্যাপারটা হোটেল থেকেই মিটিয়ে নেব। এই মনোভাব তারা প্রকাশ করে মা-বাবার সামনেই। মা-বাবা মেয়ের মুখে একথা শুনে নিরুত্তাপ আনন্দ উপভোগ করেন। মনে মনে মেয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে হয়তো তারিফও করেন

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পশম বা গজ ব্যবহার করে। দোপাট্টা নামক একরকম কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকার প্রচলন এখনও আছে। কোন কোন স্থানে অর্ধেক হাতাওয়ালা ছোট ব্লাউজ 'ক্যাবডা'রও যথেষ্ট চলন আছে।

উপরিউক্ত নানারকম আঞ্চলিক পোশাকের প্রচলন থাকলেও অনেকেই সেগুলো ব্যবহার করেন না বিশেষ কোন অনুষ্ঠানাদি ছাড়া। বয়স্ক মহিলারাই সাধারণতঃ নিজ নিজ আঞ্চলিক পোশাক আজকালও পরে থাকেন। কিন্তু মেয়েরা যারা স্কুলে-কলেজে পড়ে, অফিসে চাকুরী করে, তারা শাড়ী পরতেই বেশী ভালবাসে। পাঞ্জাবী মেয়েরা সহজেই সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে শাড়ী পরতে পারেন, তাদের সুঠাম দেহগঠনে শাড়ীর সৌন্দর্য অতি রমণীয় হয়ে প্রকাশ পায়। ইওরোপ বা আমেরিকা হতে আগত দু'একজন বিদেশী মহিলাদের অঙ্গে যখন শাড়ী শোভা পায় তখন তা একটুও বেমানান ঠেকে না। বিদেশী মহিলাদেরও শাড়ীর দিকে একটা বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ঢাকাই জামদানী, মুর্শিদাবাদ শাড়ী, তসর গরদ দিন দিন এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে বিদেশের বাজারে এদের একটা বিরাট চাহিদা।

নতুন নতুন যতই ফ্যাসন উঠুক না কেন আমরা কি সেই ঠাকুরমা-দিদিমাদের আমলের ফ্যাসনকে একেবারে ভুলে যেতে পেরেছি? ওদের আমলের প্রায় কনুইহাতা, গোল গলা ব্লাউজের সমাদর এখন আবার আমরা নতুন করে প্রত্যক্ষ করছি। সেই তিন পাড়ওয়ালা তাঁদের শাড়ীই এবার আমাদের পুজো-বাজারকে সরগরম করে রেখেছিল। দিদিমাদের আমলের ঢাকাই জামদানী এখন আর নেই বলে আমাদেরও আফসোসের শেষ নেই।

বর্তমানে বেল বটম, লুঙ্গি কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী শহরে মেয়েদের মধ্যে একটা প্লাবন সৃষ্টি করেছে। আমেরিকা থেকেই এই 'বেল-বটম' ভারতবর্ষে এসেছে। বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী নির্বিশেষে এই বেল-বটম্-এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছেন। অথচ অনেকেই বোধ হয় একবারও ভেবে দেখেন নি যে আমেরিকার মেয়েদের দেহের গঠনে যা মানায় আমাদের দেশের সকলের দেহেই তা শোভাবর্ধন করে কিনা! অন্ধ অনুকরণে যে সৌন্দর্য বাড়ানো যায় না তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। আবার হয়তো অনেককেই এই বেল-বটম্ পরলে যথার্থই রূপসী মনে হয়; সব সময়ই নিজের দেহ গঠন, বর্ণ, উচ্চতা এসব দিকে নজর দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে হয়।

একজন ছোটখাট মহিলা যদি একটি সুন্দর কারুকার্য করা চওড়া পাড়ওয়ালা শাড়ী পরেন, তবে শাড়ীটির পাড়ের সূক্ষ্ম কাজও যেমন চোখে পড়ে না তেমনি পরিধানকারিণীকে সমস্ত পাড়টি গ্রাস করে। অথচ লম্বা কোন মহিলা এই চওড়া পাড়ওয়ালা শাড়ীখানি পরলে তাকে কতই না সুন্দর ও সুশ্রী লাগবে।

জার্মান দেশে আজকাল স্লিম ফিগারের দিকে সব মহিলারই নজর। দরকার মত ঔষধ ব্যবহারে নিজেদের ক্ষুধা কমিয়ে ফিগার সুন্দর ও স্লিম রাখতে তাদের কোন ক্লেশ নেই। এই স্লিম ফিগার রক্ষা করা অবশ্য আজকাল প্রায় পৃথিবীর সব দেশের মেয়েদেরই কাম্য। সত্যি সত্যি সুন্দর লতানো ফিগারে পোশাক পরিচ্ছদের জলুস বহুগুণে বাড়ে।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারের ওপরে ব্যবহারকারিণীর রুচিবোধেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রুচিসম্পন্না মহিলাকে সব সময় দামী পোশাক-পরিচ্ছদই ব্যবহার করতে হয় না, উপরন্তু তিনি ক্ষমতানুযায়ী অল্প মূল্যেই নিজেকে সুন্দর ও সুশ্রী বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার দেখে কোন একজন লেখকের উক্তিটি মনে পড়ে—

"We saw some pretty dresses in our walk to-day. Well, if the clever work women had been a little more skilful, we should have heard, we saw, some pretty women in our walk to-day".

অঞ্জলি চৌধুরী

কিন্তু ঘরসংসার কি রকম হওয়া উচিত এবং সেখানে মেয়েদের দায়িত্ব কতটুকু তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টাও করেন না। বরং এই চিন্তায় মশগুল থাকেন যে, আমাদের দিন তো শেষ হয়ে এলো এবার ওদের যা হবার হোক।

কোন কোন মেয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলে যে, এক গ্লাস জলও গড়িয়ে খাই না। আপাতদৃষ্টিতে কথাটার মধ্যে দূষণীয় কিছু নেই। কারো কারো অবস্থা হয়তো এমন যে, বাড়িতে কোন কিছু না করলেও চলে। আগেকার দিনে সম্পন্ন বাড়ীতে এই রেওয়াজ চালু ছিল। ঝি-চাকরে সে-বাড়ি গমগম করতো আর সেখানে বাড়ির মেয়ের কাজ করার কোন প্রশ্নই আসতো না। সে রকম সম্পন্ন বাড়ি এখনো আছে এবং তাঁদের মেয়েদের একথা বলা সাজে। কিন্তু সব মেয়ের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। সকলেরই বাড়ির অবস্থা এমন নয় যে, সামান্য কাজও নিজের হাতে না করলে চলে। তবু এই গর্বটুকু আমাদের মেয়েরা বন্ধুমহলে বেশ উপভোগ করে। এর একটা কারণ যে, মা-বাবা নির্বিবাদে তাদের দাবি-দাওয়া মেটান এবং তাঁদের ইচ্ছে মতো চলার পথে খুব একটা বাধার প্রাচীর তোলেন না।

বাসন-কোসন মাজা, মশলা বাটা এবং জল তোলা এই কাজগুলি অনেক বাড়িতেই আজকাল কেউ নিজে হাতে করেন না। ক্ষমতায় কুলোক আর না কুলোক এজন্য লোক রাখা হয়। বাড়ির গিন্নির শরীরের দিকে তাকিয়েই নাকি এই ব্যবস্থা। মায়ের জন্য যখন এই ব্যবস্থা হয় তখন তিনি তাকান মেয়ের শরীরের দিকে এবং পাছে মেয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এজন্য তাকে কিছু করতে দেন না। মা বোঝেন না যে, এতে মেয়ের কোন মহৎ উপকার তিনি করছেন না বরং তার চলার পথের ভিৎ নড়বড়ে করে দিচ্ছেন। এমনিভাবে মায়ের প্রশ্রয়ে মেয়ে বলে বেড়ায় যে, বাড়িতে এক গ্লাস জলও সে গড়িয়ে খায় না। এমনি-ভাবেই আমাদের রান্নাঘরের দায়িত্ব গিয়ে বর্তাচ্ছে ঠাকুরের উপর। ঠাকুর মর্জিমাফিক রান্না করে আমাদের রসনা তৃপ্ত করে। এভাবে একদিন দেখা যাবে যে, ঘর-কন্নার সব কাজ থেকে আমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে এনেছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের মেয়েদের অবস্থা হবে আরো মর্মান্তিক। তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারেন যে, রান্নাবান্নার কাজ তো আগেও আমাদের কোন কোন পরিবারে বামুন বউ করতো তবে আজ আর ঠাকুরে দোষ কি? কথাটা সত্যি, কিন্তু সেদিন খুব কম পরিবারেই বামুনবউ হেঁসেলের দায়িত্ব পালন করতো, আর যেখানে করতোও সেখানে সবকিছু তত্ত্বাবধান করতেন গিন্নি স্বয়ং। এমন কি কি কি রান্না হবে সেসব তিনি নিয়মিত বাতলে দিতেন। শুধু তাই নয়, কর্তা থেকে

শুরু করে ছেলেমেয়ের খাওয়াদাওয়া তিনি নিজে দেখাশুনা করতেন। সোজা কথা হলো যে, সংসার চালনায় তাঁর অভিজ্ঞতার কোন অভাব ছিল না। প্রয়োজনে তিনি নিজেও খুন্তি ধরতে পারতেন।

যে স্বাস্থ্যের কারণে আমরা মেয়েদের কাজ করতে দিই না তাতে করে তাদের স্বাস্থ্যের আরো বেশি ক্ষতি করা হয়। আগেকার দিনে মেয়েরা সংসারের সব কাজ নিজে হাতে করতেন। বাসনকোসন মাজা, মশলাবাটা, জল তোলা আর রান্না তো নিত্য তিরিশ দিনের রুটিন। এরপরও কতো কাজ যে তাঁরা করতেন তার অন্ত নেই। ধান সেদ্ধ করা, ধান ভানা, চিঁড়ে কোটা এসব কাজও তাঁদের নিজের হাতে করতে হতো। এরপরও ছিল গরুর পরিচর্যা, বাড়িঘর নিকানো এবং ক্ষার কাচা। সব কাজ তাঁরা নিজের হাতে করতেন। এতে তাঁদের শরীর থাকতো সুস্থ ও সবল। সহসা কোন অসুখবিসুখ তাঁদের কাবু করতে পারতো না। বলতে গেলে রোগ-বালাই তাঁদের ধারকাছেও ঘেঁষতে পারতো না। কিন্তু আমাদের আজকের অভিজ্ঞতায় আর সেকথা বোঝার উপায় নেই। এখনকার মেয়েদের অসুখবিসুখ লেগেই আছে। এজন্য শীতকাল বা গ্রীষ্মকালের প্রয়োজন হয় না। সব সময়ই তাদের শরীর খারাপ! ডাক্তার এবং ওষুধ লেগেই আছে। এভাবে শারীরিক জটিলতা আরো বাড়ে। এর একমাত্র কারণ হলো যে, ছেলেবেলা থেকে কোন কাজ না করে করে শরীরের ভিৎ এমন নড়বড়ে হয়ে যায় যে, কোন কাজ না করেই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, সুখে থাকার প্রচেষ্টায় অসুখ বাদ সাধে। এর ফলে ঠাকুরচাকরের মতো ডাক্তারও বাড়ির পক্ষে সব সময়ের প্রয়োজন। সংসারের আর্থিক অবস্থার উপর চাপ পড়ে প্রচন্ড। আর যদি কোন দিন ঠাকুর-চাকরের কেউ গরহাজির হয় এবং সব কাজ নিজে হাতে করতে হয় তবে তো আর কথা নেই, অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণও এমন কিছু বিচিত্র নয়।

অথচ এই সত্যিটা যেমন আমরা নিজেরা বুঝি না তেমনি মেয়েদেরও বুঝতে দিতে চাই না। ঠাকুরচাকর রেখে নিজেরা একটু আয়েস করতে চাই এবং মেয়েদের আরো আয়েসী করে গড়ে তুলি। ঘর-সংসারের কাজে মেয়েদের লাগানো হয় না। অজুহাত দাঁড় করিয়ে বলি, ওদের অতো সময় নেই। এদিকে সাজগোজের কিন্তু ঘাটতি নেই। হাল ফ্যাশান নিয়ে বন্ধুবান্ধব তো বটেই এমন কি বাড়িও তারা সরগরম করে রাখে। কখন কোন ফ্যাশান বেরুল এবং কোন্ ফ্যাশান পুরোন হয়ে গেল সে হিসাবে তাদের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নেই। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে সাজানো চাই। শাড়ির বদলে লুঙ্গি এবং ম্যাক্সির পরিবর্তে মিনি স্কার্টের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান টনটনে কিন্তু ঘরসংসারের কাজের কথা উঠলেই তারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে পাশ কাটিয়ে যায়। সাজগোজ মেয়েরা নিশ্চয়ই করবে এবং এই অধিকার তাদের চিরন্তন কিন্তু ঘরসংসারের কাজে উপেক্ষা করলেও তারা নিজেরাই নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এভাবে দেখা যায় যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে কথাটা আর এখন খাটছে না। চুল বাঁধা অর্থাৎ সাজগোজ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে এবং নারীগুণের প্রধান অংশটির প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে। এর পেছনে অবশ্য রয়েছে মায়ের পরোক্ষ এবং কোথাও প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়।

প্রত্যেক মায়ের ভেবে দেখা উচিত তাঁর মা তাঁকে কিভাবে মানুষ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর ঠাকুমা-দিদিমা কিভাবে তাঁকে সংসারে চলার উপযোগী করে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। এজন্য তাঁকে গোড়া থেকেই অর্থাৎ শৈশব থেকেই সংসারের কাজে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর বয়সের পক্ষে যখন যেটা সম্ভব হতো সেভাবেই মায়ের সাহায্যে আসতেন। সংসারের কাজে সাহায্য করতে করতে একদিন তাঁর রান্নায় হাতেখড়ি হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, সংসারের সব কাজই তিনি বেশ রপ্ত করে ফেলেছেন। সেদিন এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে বরের ঘর করতে এসে প্রথমেই তাঁকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। বউমা যদি রান্নাবান্নায় দড় হয় তবে সে হতো শ্বাশুড়ির অনাদরের পাত্রী আর রান্নাবান্নায় মোটামুটি সক্ষমতা এবং আগ্রহ দেখাতে পারলে শ্বাশুড়ির আনন্দের সীমা থাকতো না। এবার তিনি লেগে থাকতেন কিভাবে বউমাকে রান্নায় পাকাপোক্ত করে তোলা যায়। নিজের সব গুণ তিনি নিঃশেষে উজাড় করে দিতেন। আর সংসারের কাজ তো আছেই। আর এর বিপরীত হলেই বউমার রেহাই মিলতো না। মা-বাবা শুদ্ধ টান পড়তো। শাশুড়ি সোজাসুজি শুনিয়ে দিতেন যে, কেমন মা-বাবা যে মেয়েকে কোন কাজ শেখায়নি?

সেদিন এটাই ছিল নিয়ম যে, মেয়েদের ঘরের কাজ জানতে হবে। কনে দেখতে গিয়ে বরপক্ষ একথা সেকথার পর আসল কথাটা পাড়তেন, সংসারের কাজকর্ম মেয়ে কেমন জানে। উত্তর প্রায় তৈরিই থাকতো। সংসারের কাজ মেয়ে ইতিমধ্যে কেমন আয়ত্ত করেছে তার সবিস্তার বর্ণনা আরম্ভ হয়ে যেতো। সেদিন এটাই ছিল মেয়ের আসল কোয়ালিফিকেশন। তবে একমাত্র কোয়ালিফিকেশন নয়। অন্য সবকিছুর সংগে এটি থাকা চাই। এটি না থাকলে সবকিছু প্রায় ব্যর্থ হয়ে যাবার দাখিল। তবে এমনও কোথাও কোথাও ঘটতো যে, বিয়ের পর শাশুড়ি বউমাকে নিজের হাতে গড়ে নিতেন। তখনকার দিনে সেটা সম্ভবও ছিল। অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হতো। ইচ্ছেমতো ছাঁদে ফেলে তাদের গড়ে নেওয়া চলতো। কিন্তু আজ তো আর তা সম্ভব নয়। খুব একটা অল্প বয়সে এখন কোন মেয়েরই বিয়ে হয় না এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আর সে জন্যই শেখার সুযোগটাও এখন অনেক বেশি। নিজের মায়ের কাছ থেকেই সবকিছু শিখে নেওয়া চলে এখন। অবশ্য যদি শেখার আগ্রহ থাকে। এই শেখার আগ্রহে মেয়েদের উজ্জীবিত করতে হবে মায়েদের। মায়েদের মনে রাখতে হবে কেমনভাবে তাঁদের মায়েরা হাতে ধরে তাঁদের সংসারের কাজ শিখিয়েছিলেন। এই উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে যাবেন তাঁর মেয়েকে। একথা মনে রেখে সংসারের হালে বসলেই আর কোন অসুবিধা হবে না।

সংসারের কাজে মায়ের সংগে মেয়ে যদি হাত লাগায় তবে সংসারের আর্থিক কাঠামোর উপর চাপও কম পড়ে। বাহুল্য অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। সকলেরই এমন কিছু অবস্থা নয় যে, সংসারের কাজের জন্য ঝি-চাকর রাখা চলতে পারে। মেয়ে যদি টুকটাক সংসারের কাজে সাহায্য করে তবে এদিকটা যেমন সামলানো যায় তেমনি আবও ঘর-সংসারের কাজটা আস্তে আস্তে রপ্ত হয়ে আসে। তখন আর এই অভিযোগ শুনতে হবে না যে, বাড়িতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে না খাওয়ার মধ্যে যে অহমিকা প্রচ্ছন্ন আছে তার চেয়ে অনেক বেশি গৌরব অনুভব করা যাবে ঘরসংসারের কাজ জানা থাকলে। রান্নাবান্নার গর্ব আমাদের কম [illegible] নয়, এ হলো আমাদের মহান ঐতিহ্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার এক বন্ধুর কথা। সেই বন্ধু একদিন বলেছিল, মেয়েকে মনের মতো করে রান্না শিখিয়েছি। বরপক্ষ দেখতে এলে বুক ঠুকে বলবো যে আমার মেয়ে আজকালকার নিয়মের ব্যতিক্রম। তবু আমার বন্ধুর আশংকা যে পাছে কেউ মেয়েকে রাঁধুনি বলে বসে।

এই হলো এখনকার আর এক [illegible]। এ দোষটা হলো ছেলেদের। কোন কোন ছেলের মতামত, বিয়ে করতে গিয়ে রান্নাবান্নার অতো খোঁজখবরের দরকার কি? তাহলে তো রাঁধুনি বিয়ে করলেই চলে।

কিন্তু এ অবস্থা তো চলতে পারে না। ঘরসংসারের কাজ মেয়েদের জানতেই হবে। সেদিনের তুলনায় এখন কাজ অনেক কম আর প্রক্রিয়াও সহজ হয়ে আসছে। কয়লার বদলে গ্যাস, ঘণ্টার পর ঘণ্টা উনুনের কাছে বসে না থেকেও সহজেই রান্না হয়ে যাচ্ছে প্রেসার কুকারে। সুতরাং এ দায়িত্বটুকু সহজেই হাতে নেওয়া চলে। তাছাড়া ঘরসংসারের কাজে শরীর এবং মন দুই-ই সুস্থ থাকে। এখনকার মেয়েদের শরীর খুবই ভঙ্গুর এই ঘটনা থেকেও অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যায় এভাবে। ফলে সংসারের যেমন মস্ত উপকার হয় তেমনি শরীর সুস্থ থাকলে ডাক্তারের খরচই শুধু বাঁচে না জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হয় আনন্দদায়ক। আর তা একমাত্র সম্ভব 'রাঁধে মেয়ে চুলও বাঁধে'—এই ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রবচনটির অনুসরণে। যে কোন একটা নয় এর দুটিই অর্থাৎ সার্বিক পূর্ণতাই জীবনের সর্বস্ব আনন্দ।

প্রমীলা

প্রেম

শৈলেন রায়

সুধাময় বলছিল, 'কথাটা হচ্ছে কী জানিস, আসলে আমরা যেমন ধর, তুই, কিম্বা অচিন্ত্য বা গণেশ, যে কেউ-ই, অর্থাৎ কিনা গোটা মনুষ্য সমাজটাই, কেউ আমরা জানি না, রিয়্যালি আমরা কী চাই। যখন খিদে পায়, মনে হয় খাওয়াতেই বুঝি পরম সুখ। খুব খাওয়া হল, পেট ভরে টাইটুম্বুর, একটা অস্বস্তি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে লাগল শরীরে, যে খাওয়াটা একান্ত কাম্য ছিল কিছুক্ষণ আগে, তাই বিষবৎ মনে হতে লাগল। প্রেমের ব্যাপারটাও অনেকটা সেই ধরনের। যতক্ষণ নেই, মনের মধ্যে আকুর পাকুর। যেমনি প্রেম এল, সেই এক অস্বস্তি, প্রাণ ওষ্ঠাগত, যাই যাই ভাব। আসলে প্রেম বস্তুটা যে কী, দেখতে কেমন, স্পর্শে সুখ, না দৃষ্টিতে, ভোগে না ত্যাগে, কিম্বা শুধুমাত্র একটা মনোবিকার—সেকথা আজ পর্যন্ত জানা হল না। অথচ এই না-জানার পিছনেই তো নিরন্তর ছুটোছুটি।' সুধাময় থামল। ওর পা দুটো সামনের টি-পয়ের ওপর তোলা ছিল, সেই পা ধীরে ধীরে নাড়াচ্ছিল ও। এটাই সুধাময়ের রীতি। ও যখন কথা বলে, গভীরভাবে তলিয়ে গিয়ে বলে, চোখ বুজে ধীরে ধীরে পা নাড়ায়, আর মুহুর্মুহুঃ সিগারেট খায়। খাওয়া ঠিক না, সিগারেটের গোড়ায় মৃদু টান দিয়ে ধোঁয়া ছড়ায়, মাঝে মাঝে রিং ভাসায়। কথা বলা যে একটা আর্ট সুধাময়কে না দেখলে জানা হতো না।

সুধাময় আমাদের বন্ধু। বন্ধুও বটে, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শকও সময় সময়। ওর অকালপক্ক ভাবটা আমরা সবাই মেনে নেওয়ায় সুধাময় খুশী। যথেচ্ছভাবে উপদেশ দেয়, গল্প বলে, উদাহরণ দেখায়। সুধাময়ের গল্প শুনতে আমরা ভালবাসি। সময় সময় অলীক সমস্যা তুলে ওর গল্প শুনি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্য ধরনের। সত্যি সত্যি প্রচণ্ড একটা সমস্যা নিয়ে আজ আমরা সুধাময়ের কাছে এসেছি। আমি, অচিন্ত্য আর গণেশ। সমস্যাটা অচিন্ত্যর ব্যক্তিগত। কিন্তু আমাদের চার বন্ধুর কোন সমস্যাই ব্যক্তিগত ব্যাপার না। সমষ্টিগতভাবে আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি।

সুধাময় যখন খুব নিরাসক্ত মুখে চোখ বুজে পা নাড়াচ্ছিল, অচিন্ত্য অধৈর্য

স্বরে বলে উঠল, 'নিকুচি করেছে প্রেমের. আমি মরছি নিজের জবালায়, আর তুই কিনা প্রেমতত্ত্ব নিয়ে পড়লি।'

সুধাময় হাতের ইশারায় অচিন্ত্যকে থামতে বলে সিগারেটে গোটা কয়েক টান মেরে অ্যাসট্রেতে টুকরোটা ঠেসে দিল। তারপর পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। কিছুক্ষণ অচিন্ত্যর দিকে তাকিয়ে থাকার পর সুধাময় বলল, 'তুই যে আগুনে জবলছিস অচিন্ত্য, সেটা কিন্তু প্রেমেরই আগুন।'

অচিন্ত্য জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, 'মোটেই না। প্রেমট্রেমের ধার আমি ধারি না। বাবা-মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিল, না হলে আজীবন ব্যাচিলার থাকতাম।

'মানুষ সবচেয়ে অসহায় বোধ করে কখন জানিস? যখন সে নিজেকে দেখতে পায় না। অচিন্ত্য তুই এখন একজন অসহায় মানুষ।'

অচিন্ত্য উত্তর দিল না। বিভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে রইল। সুধাময় বলল, 'কাল রাত্রে তোর বউ তোকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সামনের বারান্দায় তোকে সমস্ত রাত কাটাতে হয়েছে, ঠান্ডা লেগে তোর জবর হতে পারতো, কিম্বা নিমুনিয়া বা অন্য কিছু, মোট কথা তোর বউয়ের এই নিষ্ঠুর আচরণে তুই ভয়ানক আপসেট হয়ে পড়েছিস—এই তো ব্যাপারটা?'

অচিন্ত্য বিহ্বলভাবে ঘাড় দোলাল।

'অথচ অনেক কিছু করতে পারতিস তুই। চেঁচিয়ে তোর বাবা-মাকে ডাকতে পারতিস। তাঁদের সাহায্যে তোর বউকে শায়েস্তা করা তোর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না, বা দমাদ্দম দু-চারবার লাথি মারলেই দরজা যে খুলে যেতো সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না, তবু যে তুই সে ধরনের কোন কাজ করতে পারলি না, তার একটাই মাত্র কারণ।'

'কি?' অচিন্ত্যর মুখ দিয়ে যেন অন্য কেউ আওয়াজ করল।

'তুই তোর বউকে ভালবাসিস।'

'যাঃ।' সহসা অচিন্ত্যর মুখ লাল হয়ে উঠল।

সুধাময় একটা সিগারেট ধরালো, পা টি-পয়ের ওপর তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে লাগল। 'তোর বউও যে তোকে ভালবাসে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভাল না বাসলে মানুষ, বিশেষ করে মেয়েমানুষ, নিষ্ঠুর হতে পারে না। তাই বলছিলুম, প্রেম বস্তুটা যে কী, আজ পর্যন্ত জানা হলো না। জানা হলো না বলেই, সে চিরনতুন, চিরদিন নব নবরূপে স্ত্রী-পুরুষের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে চলেছে।' কথা বলতে বলতে সুধাময় চোখ বুজল. ওর গলার স্বর ভারী ভারী মতন শোনাচ্ছিল। ও যেন ক্রমশই এক অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। ওর এই ভাবটা আমাদের অ-চেনা নয়। সুধাময় যখন গল্প বলতে শুরু করে, এইভাবে সমাহিত হতে থাকে, সুধাময় হঠাৎ বলে উঠল, 'বহু দিন পর সদুপিসীর কথা খুব মনে পড়ছে, যদিও সদুপিসী বাবাদের আপন বোন ছিল না, কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ, আর বেজায় মধুর। আমাকে দারুণ ভালবাসতো. আমিও সদুপিসী বলতে অজ্ঞান ছিলুম সেই সময়। সেই সময় বলতে, আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।'

হাতের সিগারেট অ্যাসট্রেতে রাখল সুধাময়। চোখ খুলে আমাদের দেখে নিল একবার, তারপর বলতে শুরু করল, 'সদুপিসী খুব রূপসী ছিল। তেমন রূপ সচরাচর চোখে পড়তো না। যেমন রং, তেমন শরীরের গড়ন, তেমন মুখের লালিত্য, সদুপিসী যখন হাসতো, সেই যে বলে না, মুক্তো ঝরা হাসি। ঠিক সেই রকম, হাসতে হাসতে গাল এমন লাল হয়ে উঠতো, যে মনে হতো চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরে পড়বে বুঝি। পিসেমশাই ছিলেন ঠিক বিপরীত। বেঁটে, মোটা. থলথলে শরীর। এই লোকের সঙ্গে যে কী করে সদুপিসীর বিয়ে হয়েছিল, কথায় বলে না প্রজাপতির নির্বন্ধ, ঠিক তা-ই। আগেই বলেছি, সদুপিসী আমাকে খুব ভালবাসতো। ছেলে বলেই বাসতো। পিসীর পাঁচ মেয়ে, একটিও ছেলে ছিল না। পিসী ছেলে ছেলে করে মরছে, আর প্রতিবার একটি করে মেয়ে হচ্ছে। এত সব অবিশ্যি আমার জানার কথা না। কিন্তু কী অবস্থায় পড়ে জেনেছিলুম. কার কাছ থেকে জেনেছিলুম, পরে সবই বলবো।

পিসীর বাড়িতে খুব যাওয়া-আসা ছিল আমার। একদিন না গেলে ও বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। পিসী রাগ করে নানা কথা শোনাতো, বলতো, আমার দেমাক বাড়ছে. আমি নাকি দিনকে দিন যাচ্ছে-তাই হয়ে যাচ্ছি। ও বাড়িতে এত যেতুম, কিন্তু পিসীকে কোন দিন পিসেমশাইর সঙ্গে সোজাসুজি ভাবে কথা বলতে শুনি নি। যেটুকু কথা বলতো, কোন মেয়েকে মাঝখানে রেখে, আড়ে আড়ে বলতো। ব্যাপারটা বিষম অদ্ভুত লাগতো। আর একটা বিষয়ও আমাকে বিস্মিত করেছিল। পিসী মেয়েদের নিয়ে বড় ঘরে বিরাট এক পালঙ্কে শুতো, পিসেকে শুতে দেওয়া হয়েছিল ছোট একটা ঘরে। ব্যাপারটা আমার বিসদৃশ ঠেকতো. কারণ আমাদের বাড়ির বাবা-মা, কাকা-কাকীদের এক সঙ্গে শুতে দেখে এসেছি বরাবর, এবং এই দেখা থেকে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা শুতে নেই।

যত দিন যেতে লাগল, পিসীর আচরণ আমার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করে চলল। পিসেমশাইর মত নির্বিরোধ একজন মানুষের প্রতি এই ধরনের ঔদাসীন্য এবং অবহেলা, চরম নিষ্ঠুরতা বলে মনে হতো আমার। পিসের প্রতি এই মমতাবোধ থেকেই আমি যেন ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে লাগলুম। এমন একটা সময় শেষ পর্যন্ত এলো, যখন পিসের ছোট নির্জন ঘরে আমি আর উনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুইজন অসমান-বয়স্ক বন্ধুর মত গল্পে মেতে উঠতুম। পিসী যেন ক্রমশই দূরে সরে যেতে লাগল। অথচ আমাকে কাছে টেনে রাখার কী দুরন্ত চেষ্টা ছিল তাঁর।

আমাকে নিয়ে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঠান্ডা লড়াই চলছিল, সেই সময় সদুপিসী অসুখে পড়ল।

পুরো দেড় মাস ভুগলো পিসী। বহু ডাক্তার বদ্যি এলো, অজস্র টাকা ব্যয় হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দিনকে-দিন রোগ বেড়েই চললো। পিসের তখন কী অবস্থা! দিনের বেলায় অফিসে যাচ্ছেন, ফিরে এসে সেই যে রুগীর শিয়রে বসেন, সমস্ত রাত কেটে যায় একভাবে।

এক এক সময় আমার মনে হতো, উনি হয়তো রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ না, কোন যন্ত্রটন্ত্র, যার ক্লান্তি বলে কোন পদার্থ নেই। পিসীকেও সময় সময় খুব স্বার্থপর ভাবতুম। পিসের যা রোজগার, বিশাল এক কোম্পানীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তিনি, অনায়াসে রাত্রে নার্সের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পিসীর নাকি মাইনে করা লোকের শুশ্রূষা নেওয়া মনঃপূত না। এটাও এক ধরনের নিষ্ঠুরতা বলে মনে হতো। একজন মানুষ দিনে অফিস করবেন. আর রাত্রে মরণাপন্ন রুগী নিয়ে জেগে থাকবেন. সেই মানুষটির অসুখে পড়তে কতক্ষণ! পিসেকেও সময় সময়

মেরুদণ্ডহীন পুরুষ বলে মনে হতো। ইচ্ছে করলে পিসে অফিস থেকে ছুটি নিতে পারেন, কিম্বা একান্ত যদি নার্স রাখা না-ই যায়, মেয়েদের মধ্যে কেউ রাত জাগতে পারে। এত সব কথা নিজের মনে মনেই ভাবতুম, মুখ ফুটে কাউকে বলতুম না। বলবো কাকে? যাকে বলা যেতো, সেই মানুষটি তখন ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে। বেশীর ভাগ সময়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, যদি কখনও চোখ খুলে আমাকে দেখতে পায়, নিস্তেজ কণ্ঠে চেঁচামেচি শুরু করে—পিসেকে গালাগাল দেয় অক্ষম-পুরুষ বলে, এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে। বলে রুগীর ঘরে থাকতে নেই। কী জানি, এক একজন মানুষ যে কী মন নিয়ে জন্মায়! নিজের বেলায় কোন হিসেবের ধার ধারে না, কিন্তু পরের বেলায় কত সতর্ক ভাব, কত সাবধানতা। পিসীর ওপর অভিমান হতো খুব। মনে হতো, পিসী কোনমতেই আমাকে আপন করে নিতে পারলো না, পরের মত দূরে ঠেলে রেখে দিল।

পুরো দেড় মাস ভুগলো পিসী, তারপর একদিন শেষ রাত্রের দিকে মারা গেল। মানুষ তো মরবেই, একদিন-না-একদিন, সেটা বড় কথা না। কিন্তু সদুপিসীর মৃত্যু যে কী অপার্থিব, কী ভীষণ রকমের করুণ আর রোমান্টিক, যার তুলনা আজ পর্যন্ত পেলুম না।'

সুধাময় থামলো। ওর পা তখনও ধীরে ধীরে নড়ছে, চোখ বোজা। সমস্ত মুখে এক নিবিড় প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন সদুপিসীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করছে এই মুহূর্তে। আমরা একাগ্র দৃষ্টিতে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছি। কোন রকম শব্দ উচ্চারণ করে ওর স্তব্ধতা ভঙ্গ করার শক্তি আমরা যেন হারিয়ে ফেলেছি। এক সময় সুধাময়ের মৃদু কণ্ঠ কানে আসতে লাগল, 'একটা সুন্দর সংসার নষ্ট হয়ে গেল। দুরন্ত একটি ছেলে যেন সাজানো বাগানকে কাটারি দিয়ে কেটে তছনছ করে দিল।

ও বাড়িতে যেতে মন চায় না, তবু যেতে হয়। পিসেমশাই একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন, গল্পস্বল্পের মধ্য দিয়ে তাঁকে যদি আবার কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা যায়। কিন্তু উনি যেন ইচ্ছে করেই শক্ত একটা আবরণের আড়ালে নিজেকে গোপন করে ফেলেছেন। যে আবরণ ভেদ করে তাঁকে স্পর্শ করা সাধ্যাতীত। উনি যে কেবল নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন, তা-ই না, উনি ক্রমশই সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। মেয়েরা সমস্ত দিন কী করছে, কী খাচ্ছে না খাচ্ছে সে দিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই। সময় মত অফিসে যাচ্ছেন, দেরী করে ফিরছেন। ফিরে সেই সামনের বারান্দায় গিয়ে বসলেন, অনেক রাত পর্যন্ত একভাবেই বসে থাকতেন। [illegible] বিবাগী মানুষটিকে দেখে মনে হতো, সদুপিসীর বদলে উনি যদি মারা যেতেন, বেঁচে থাকার এই দুরূহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতেন উনি। পিসিকে ঘিরে আমার যন্ত্রণাও ক্রমশ বেড়ে চলছিল। আসছি, যাচ্ছি, তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি, স্বাভাবিক হতে সাহায্য, অথচ কিছুই করতে পারছি না, দিনে দিনে তিনি সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন—এ কী কম যন্ত্রণা আমার পক্ষে।

এই সময় ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল, ও বাড়ি যাওয়া বন্ধ হলো আমার। আমিও যেন এক অসহ্য পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলুম। বাঁচলুম।

মাস দুয়েক ওদিকে আর যাওয়া হয় নি। পড়াশুনোর জগতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলুম। পরীক্ষা শেষ হতে একদিন ও-বাড়ি গেলুম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চাকর দরজা খুলে দিল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। পিসীর ঘরে ঢুকলাম। কেউ নেই। শুধু গোটা কয়েক ধূপকাঠি পুড়ছে। সামনেই বারান্দা। অন্ধকার, রাস্তার সামান্য একটু আলো এসে পড়েছে সেখানে।

সেই আলোতে ছায়া ছায়া মতন একজন মানুষ নজরে পড়ল। ডেক চেয়ারে পিসে শুয়ে আছেন। কাছে যেতেই উনি নড়ে-চড়ে উঠলেন। পাশের খালি চেয়ারে বসে বললুম, 'ওদের কাউকে দেখছি না।'

'আমার ভাই এসে নিয়ে গেছে।'

'আপনি গেলেন না?'

'নাঃ।' মনে হলো অন্ধকারের মধ্যে উনি একটা হাই তুললেন।

কথা ফুরিয়ে গেল। অথচ আগে এই মানুষটির সঙ্গে কত গল্পই না করতুম। কী দুর্ধর্ষ গল্প বলতে পারতেন ভদ্রলোক। আর সেই মানুষের গল্পই কিনা ফুরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি, এভাবে বসে থাকা অস্বস্তিকর। অথচ উঠে আসাও কী রকম অপ্রীতিকর বলে মনে হচ্ছিল। সদুপিসী বেঁচে থাকলে আজ যে কী ভয়ানক রাগ করতো। চুপ করে বসে থাকা পিসী একেবারেই পছন্দ করতো না। যে মুহূর্তে পিসীর কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলুম, পিসে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এভাবে চুপ করে বসে থাকা সদু একেবারে পছন্দ করতো না।' একটুক্ষণ থেমে থেকে উনি যেন নিজেকেই শুনিয়ে আবার বললেন, 'কিন্তু কী বলবো, কাকে বলবো।'

সহসা নিজেকে খুব বড় একজন মানুষ বলে মনে হতে লাগলো আমার। মনে হলো, মুহূর্তে আমি যেন পিসের সমবয়সী কেউ হয়ে উঠেছি—তাঁর বন্ধু মতন কেউ। আমার মুখ দিয়ে অতর্কিতে বেরিয়ে গেল, 'একটু বেরোলেই পারেন। একা একা বসে থাকলে মন আরও খারাপ হয়।'

উনি উত্তর দিলেন না। একটা নিঃসঙ্গ আত্মা আমার খুব কাছাকাছি রয়েছে। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু মাঝখানে এক কঠিন আবরণ, যা ভেদ করে আমার হাত কিছুতেই সেখানে পৌঁছুচ্ছে না। পৌঁছতে পারে না। আরও কিছুক্ষণ একভাবেই কাটল। হঠাৎ দেশলাই জ্বলে উঠল, পিসে একটা সিগারেট ধরালেন।

বললুম, 'আগে তো সিগারেট খেতেন না।'

'আগে তো অনেক কিছুই করতুম না। সিগারেট খেতুম না, স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকা কী মারাত্মক কষ্টকর ছিল আমার পক্ষে। অথচ এখন বসেই থাকি। উঠতে ইচ্ছে করে না।' উনি একটা বড় নিঃশ্বাস যেন জোর করে চেপে নিলেন।

পিসেকে কথা বলাতে খুব ইচ্ছে করছিল তখন। মনে হচ্ছিল, কথা বলতে পারলে উনি কিছুটা হাল্কাবোধ করবেন। বললুম, 'পরীক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছু দিন আসতে পারিনি। আজ পরীক্ষা শেষ হলো।'

উনি যেন ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ জেগে উঠে প্রশ্ন করলেন, 'কী পরীক্ষা?'

'আপনি জানতেন না, যে এবার আই, এস, সি দেবার কথা।'

'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। অনেক কিছুই ভুলে যাই আজকাল। পরীক্ষা কেমন হলো?'

'হলো এক রকম।'

উনি আর প্রশ্ন করলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এক এক সময় কী মনে হয় জানো, এক এক সময় কেন, সারাক্ষণই মনে হয়, এই যে আমরা বেঁচে রয়েছি, কাজ করছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, আসলে আমরা একটা গণ্ডির মধ্যেই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি, শত চেষ্টা করেও সেই গণ্ডি পেরোতে পারছি না। কী বিস্ময়কর ব্যাপার বলতো।'

'এই তো সংসারের নিয়ম পিসেমশাই।' যদিও কথাগুলো নিজের মনেই কী রকম বেখাপ্পা শোনালো, তবু বলার মত কিছু পেয়ে আমি স্বস্তি পেলুম। এক অখণ্ড নৈঃশব্দ যেন ক্রমশই আমাকে গ্রাস করে ফেলছিল। সেই নিস্তব্ধ জগৎ ভেদ করে আমি যে আবার শব্দমুখর জগতের মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছি, অনুভব করতে পেরে ভাল লাগল।

'কি নিয়ম আর কি অনিয়ম বুঝতে পারি না। শুধু উপলব্ধি করতে পারি, মানুষ হয়ে জন্মেছি, অথচ এই যে একটা অসাড় পদার্থের মত পড়ে রয়েছি, এর সার্থকতা কোথায়। অথচ কী করতে পারি আমি, কী করার উপায় আছে আমার', ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলে না সুধাময়, 'কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি দিনকে দিন। অথচ শরীরে কোন উদ্বেগ নেই, শরীর ভালই আছে। সব কাজই কেমন নিরর্থক বলে মনে হয়। ভাবি, কার জন্য করবো, কাকে দেখাবো, আমার কথা শুনবে, আমাকে বুঝবে, বুঝবার চেষ্টা করবে। অথচ এক সময় কী অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সদু বলতো, ছোট ছোট টিলা তো অসংখ্য রয়েছে, কিন্তু হিমালয় এক। ওর কথায় নেশা ধরতো। প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছিলুম, যেন অশ্বমেধের ঘোড়া। আজ কত আনন্দের দিন হতে পারতো, এত-দিনের কঠোর পরিশ্রম, ওর অসুখের মধ্যেও ঘড়ি ধরে অফিসে গেছি, কেন না, আশা ছিল, সদু ভাল হয়ে উঠবে, ওকে বড় রকমের একটা সুসংবাদ দিতে পারবো। দেবার মত সংবাদ তৈরী হলো, কিন্তু কাকে দেবো, সে চলে গেল।'

উদ্যত আবেগ সংযত করতে কিছুক্ষণ লাগল। 'আজ আমি জেনারেল ম্যানেজার হয়েছি, সুধাময়।'

'আপনি ম্যানেজার হয়েছেন পিসে-মশাই!' আমি লাফিয়ে উঠলুম।

উনি যেন আমার কথা শুনতেই পেলেন না। বলতে লাগলেন, 'কিন্তু কী লাভ হলো, কিছু না।' চেয়ারে শুয়ে মাথার দু পাশ দিয়ে ওপরের দিকে হাত ছড়িয়ে দিলেন উনি। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকার পর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তুমি বড় হয়েছো সুধাময়, তাছাড়া তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, সদু তোমাকে খুব ভালও বাসতো, পুঞ্জ পুঞ্জ কথা বুকের মধ্যে নিয়ে কী বাঁচতে পারে মানুষ, বলো?'

'আপনার সব কথা বলুন পিসেমশাই, আমি শুনবো।'

'সদু যে তোমাকে এত ভালবাসতো, ঠিক নিজের ছেলের মত ভালবাসতো, কেন জানো? সদুর খুব ছেলের সখ ছিল। ঠিক সখ না, বলতে পার আকাঙ্খা। প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। অথচ পূরণ হলো না। এর জন্যে মনে মনে ও আমাকেই দায়ী করেছিল।' বলতে বলতে অতর্কিতে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা উনি রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। রাস্তায় লোকজন হাঁটছে, গাড়ি চলছে, হঠাৎ অবিবেচকের মত এই কাজটা যে উনি করে বসবেন ভাবতে পারি নি। ঝুঁকে পড়ে তখন রাস্তা দেখার চেষ্টা করছিলুম, পিসের কথা কানে এল। 'তোমাকে বলতে লজ্জা নেই সুধাময়, তুমি বড় হয়েছো, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, সদু তোমাকে ভালও বাসতো খুব। তাছাড়া মানুষ তো কারও না কারো কাছে গোপন কথা বলতে চায়-ই, ছোট মেয়েটি জন্মাবার পর থেকে, প্রায় দশ বছর আমরা এক সঙ্গে শুই নি। সদুই সেরকম ব্যবস্থা করেছিল। সেই জন্য ওর মনেও খুব কষ্ট ছিল। ও যে আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলতো না, রূঢ় আচরণ করতো, আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতুম, সদু ওর আচরণের মধ্য দিয়ে যতটা কষ্ট আমাকে দিচ্ছে, তার চতুর্গুণ নিজে পাচ্ছে। আমার অনুমান যে মিথ্যে না, তার প্রমাণ পেয়েছিলুম সেই রাত্রে, যে রাত্রে সদু মারা গেল।

সেদিন রাতটা ভারী সুন্দর ছিল। যথারীতি সদুর শিয়রে চেয়ার নিয়ে বসে রয়েছি, রাত তখন খুব গভীর। লোক-চলাচল, গাড়ির শব্দ সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল একটা শান্ত জগৎ যেন স্থির হয়ে রয়েছে। সেই জগতের বাসিন্দা একমাত্র আমি। শুধু আমি না, সদুও, যদিও নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে সদু, আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবী শুদ্ধ সব মানুষ তখন ঘুমোচ্ছে, তখন শুধুমাত্র আমরা দুজনেই জেগে রয়েছি, জানালা দিয়ে শীতের বাতাস সর সর করে ঘরে ঢুকছিল, আমার রোঁয়ায় কাঁপুনি ধরছিল, কিন্তু উঠে গিয়ে যে জানালা বন্ধ করে দেবো, সে শক্তি বা ইচ্ছা আমার ছিল না। জানালা দিয়ে আকাশের যে অংশ চোখে পড়ছিল সেখানে আমি একটা গোল চাঁদ দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁবা তাঁবা রংয়ের চাঁদ এর আগে আমি কখনও দেখি নি। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাঁদ দেখার মনের অবস্থা নয় তখন, তবু, বলতে লজ্জা নেই সুধাময় আমি সদুকে ভুলে তন্ময় হয়ে চাঁদটাকেই দেখছিলাম। কতক্ষণ ধরে ওকে দেখতুম জানি না, হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দে চেতনা ফিরে এল। সদুর দিকে তাকালুম। তাকিয়ে কী দেখলুম জানো, দেখলুম সদু, যে কিনা এতক্ষণ বিছানার এদিকটায় শুয়ে ছিল, হঠাৎ অপূর্ব কৌশলে ওদিকটায় সরে গেল। সদুর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী হয়েছে, কষ্ট হচ্ছে?' সদু কী বলল, বোঝা গেল না, শুধু একটা ঘড় ঘড় শব্দ কানে এল। তুমি বড় হয়েছো সুধাময়, তাছাড়া তোমাকে খুব আপনজন বলেই ভাবি, যদিও সেই মুহূর্তে সদুর কথা আমি শুনতে পাই নি, কিন্তু বলতে লজ্জা নেই আমি অনুভব করলুম, সদু বিছানার এদিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাকে শুতে আহবান জানাল। দশ বছর পরে আমি ওর পাশে শুলুম। এক নাগাড়ে দেড় মাস রাত জেগেছি, জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে আসছে, ঠিক যেন কেউ নরম হাতে আমার চুল স্পর্শ করছে, ঘুম পাড়ানির গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছে, ধীরে ধীরে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম জানি না। যখন জেগে উঠলুম', বলতে বলতে পিসেমশাই দু হাতের আড়ালে মুখ লুকোলেন। সেই ছায়াময় স্বল্প আলোকে আমি দেখতে পেলুম, এক অপরিসীম বেদনায় তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল।

সুধাময় থামলো। ও স্থির হয়ে বসে রয়েছে। ওর পা আর নড়ছে না। চোখ বোজা, আত্মসমাহিত ভাব। কিছুক্ষণ এই-ভাবে বসে থাকার পর ধীরে ধীরে বলল সুধাময়, 'তাই বলছিলুম অচিন্ত্য, প্রেম বস্তুটা যে কী, তার পরিণতি চরম নিষ্ঠুরতায়, না পরম ক্ষমায়, না কী শুধু-মাত্র একটা মনোবিকার — তা আজ পর্যন্ত জানা হল না।'

জলসা

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন দিক : বাংলা গানের এক জনপ্রিয় [illegible]কা প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রোতৃমহলে [illegible]ন আধুনিক সংগীত শিল্পীরূপেই পরিচিতা। কিন্তু রসিকমহলে অপরিজ্ঞাত এঁর [সং]গীত ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক আছে। [illegible]র সেইখানেই তার যথার্থ শিল্পী-পরিচয় [illegible]হিত। এ খবর জানা গেল সম্প্রতি হিন্দু[স্থা]ন পার্কে আয়োজিত শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যা[য়ে]র একটি একক সংগীতের আসরে। নিবে[দ]ক বাদল ধর চৌধুরী ও শিশিরকণা ধর[চৌ]ধুরী।

শ্রোতাদের অনুরোধে প্রথমে প্রতিমা [শো]নান লোকের মুখে মুখে ফেরা বেশ [ক]একটি হিট্ সং—প্রথম যুগ থেকে সুরু [ক]রে আজ অবধি—'বাঁশ বাগানের মাথার [উ]পর', 'আয় ঘুম আয়', 'আঁধার আমার ভাল [লা]গে', 'কে যেন নীলকন্ঠ পাখীর' তথা [আ]ধুনিক গান।

তারপর রবীন্দ্রসংগীত—প্রথমে বি এফ [জ]ে এ-র পুরস্কার পাওয়া 'তোমাদের এই [illegible]'।

একবার সুরু করতেই তাকে আর [থা]মতে দেওয়া হয়নি—আর লাজুক শিল্পীও [illegible] সহজাত বিনয়ে আত্মাবগুণ্ঠিতা [illegible] চলেনি। এ অবরণ সেদিন যেন খসে [প]ড়ে। কারণ রসপিপাসু গুণী ও সঙ্গী[ত]জ্ঞ সমন্বিত শিল্পীর আত্মপ্রকাশের অনু[ক]ূল লগন জীবনে কমই আসে। অনুষ্ঠান[সূ]চী সত্ত্বেও। সেদিন ছিল বুঝি এমনই [এ]ক দুর্লভ মুহূর্ত—যখন অন্তরের অতলে [illegible] শিল্পীসত্ত্বা তার খোলস বিদীর্ণ [ক]রে বেরিয়ে এল। কন্ঠের সূক্ষ্মকারুকীর্ত [ও] আবেগে হৃদয়ের রসাবেশে নিসৃত হোল [illegible] সজনী যেওনা যেওনা', 'যোগিয়া' [illegible] অভিমানিনী নায়িকার [illegible] আবেগ—বেদনা ও মাধুর্য যে রসোত্তীর্ণ [illegible] সৃষ্টি করেছিল, তাকে কি বলব? '[illegible]?' 'অপূর্ব'? না, প্রচলিত সকল বিশেষণ অচল হয়ে যায়—যখন এক [illegible] অনুভূতির তীরে সহৃদয় হৃদয়কে [illegible] পৌঁছে দেন।

[ঢে]উ-এর পর ঢেউএর মত রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে হাতধরাধরি করে এল নজরুল গীতির উচ্ছ্বাসমুখরতা—কখনও [illegible] নূপুর বাজিয়ে, কখনও ভুরু [illegible] বাঁকিয়ে, কখনও বা 'পথহারা পাখীর' আকুল কান্নায়।

তারপর? সবাইকে চমকে দিয়েই প্রতিমা [illegible] কাটে রজনী সজনী'—[illegible] সঙ্গে দ্বৈতকন্ঠে গীত ক্ষুধিত [illegible] সেই গান। সাপট তানের [illegible] বিদ্যুতালোকে বিরহবিধুরা [illegible]তে, কখনও বা বোলতানের বাহার।

পটদীপের উদাস বৈরাগ্য রণিত 'ত্রিবেণী তীর্থ পথে' স্মরণ করিয়ে দিল প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত জীবনের সেই গৌরবদীপ্ত অধ্যায় যখন তিনি আদরণীয় শিল্পীরূপে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেন বাংলাদেশের সংগীতজগতে।

এরপর যেন ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে ওঠে পবিত্র পুষ্পগুচ্ছের মতই রাগপ্রধান গানের স্তবক—কখনও দরবারী কানাড়ার নিগূঢ় নীরব বিষম আভাসে, কখনও জৌনপুরীর আছড়ে পড়া বেদনায়, কখনও বা আড়ানার নৃত্যোল্লাসে। বিস্মিত চিত্তে অনুভব করলাম ইনি সুরেলা কন্ঠের অধিকারী লঘুসংগীত গায়িকাই নন, উচ্চাঙ্গ সংগীতে রীতিমত সুশিক্ষিতা ও রেওয়াজী শিল্পী যাঁর শুদ্ধ স্বরক্ষেপণ সুরবিন্যাসে সংগীতের মর্মলোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আপন স্বরূপে।

শুনলাম ঠুংরী, গজল, চিতী, কাজরী। উচ্চারণ-শুদ্ধতা মীড় ও জমজমার সূক্ষ্ম কারুকাজে কি নিবিড়, আকুল সৌন্দর্যানুভূতি! ঠুংরীর সঙ্গে ভাবসংগীত রেখেই ইনি শোনান অতুলপ্রসাদের দুটি গান 'একা মোর গানের তরী' ও 'সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া'—একটি খাম্বাজের পাল তোলা একাকীত্বের দ্বীপে যাত্রা অন্যটি পরমাত্মার চরণে আত্মনিবেদন।

আত্মনিবেদনের ছন্দেই এল ভজনের দীপারতি। ভীষ্মদেব ও দিলীপ রায়ের সেই বিখ্যাত ভজন "বন্ধন কর—আয়ি" যশোদা'। এগান শুনেছি ভীষ্মদেবজীর মধুবর্ষী কন্ঠে, দিলীপ রায়ের উদাত্ত ভঙ্গিমাতেও। শরণাগতের সেই আকুতির সুরে নারীকন্ঠের লাবণ্য ও সবঢালা প্রণাম মন্দিরের পূজারিণীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। শিল্পী যেন স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ শক্তিতেই সেদিনের শ্রোতাদের বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন।

ভাবতে বেদনা জাগে এতবড় গুণীর সামগ্রিক সত্ত্বার একাংশ মাত্রই সংগীত মহলে পরিবেশিত হয়—গ্রামোফোন কোম্পানীর বছরে একখানি মাত্র প্রকাশিত পূজোডিস্কে, কখনও বা একটি দুটি প্লে-ব্যাক সংগীতে। অরুন্ধতী দেবীর সৌজন্যে 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল'—তবু নজরুল-গীতিতে এঁর নৈপুণ্যের সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের পরিচয় ঘটিয়েছে—তাঁর কন্ঠে রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান শোনা গেছে এই চিত্রগীতিরই দাক্ষিণ্যে। আমরা গুণগ্রাহী গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি অকর্ষণ করছি।

রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির দ্বৈত আসর : সম্প্রতি 'সঙ্গীতচক্র' নিবেদিত বসুশ্রী রঙ্গালয়ে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন বসুর রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির এক প্রভাতী আসর—আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

ভাষ্যকার সৌম্যেন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণের আলোয় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ঠে শোনা যায় 'প্রভাতে পুষ্পবনে'। ১৯৩১ খৃঃ রচিত কবির এই গানটিতে দাক্ষিণ সুরের প্রভাব লক্ষ করবার মত। এরপর রামকেলী রাগে 'তুমি নবনবরূপে এস' শুনিয়েই অশোকবাবু ধরেন পঁচিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ রচিত সেই গান 'নয়ন তোমারে পারে না দেখিতে'—যে গান শুনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেন।

'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি' 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' 'ওগান গাস নে' 'যেওনা যেওনা ফিরে' 'কে বলেছে তোমায়' 'তুমি আছ কোন পাড়া'—ইত্যাদি ভাবসংগীত দেশাত্মবোধক, প্রেমসংগীত ও কৌতুকগীতির গুচ্ছে নানাভাব ও রঙের বিন্যাসে রবীন্দ্রসংগীত মানসের বিভিন্ন অধ্যায়ে পরিক্রমন সাঙ্গ হয়। এরপর প্রদীপ ঘোষের ব্যাখ্যাসমেত নজরুল গীতিতে অংশ গ্রহণ করলেন ধীরেন বসু। গত দু বছরের মধ্যে নজরুলগীতিতে ইনি নিজেকে প্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নজরুলের সংগীত চিন্তা ইনি নিষ্ঠাভরেই অধ্যয়ন করেছেন তারই পরিচয় পাওয়া গেল—অনুষ্ঠানে পরিবেশিত নানান জাতের ও ভাবের নজরুলগীতিতে। গজলের ঢঙে ইনি পরিবেশন করেন 'মুসাফির' রাগাশ্রয়ী ও ঠুংরী চালের 'অরুণকান্তি'—কবির হতাশাক্লিষ্ট জীবন বেদনা বাণী 'মোর না মিটিতে সাধ' বিদেশী লোকসংগীত 'মোমের পুতুল' বর্ষাঋতুর গান, শ্যামসংগীত 'কালো-মেয়ের', মাঝিমাল্লার প্রতি প্রাণের টানে 'গহীন জলে', পুত্রবিরহে রচিত 'শূন্য এ বুকের পর শেষ হোলো 'ফুলের জলসায়'। প্রতিটি গানই দরদভরে গাওয়া বলেই মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে।

—চিত্রাঙ্গদা

বসন্ত বিলাপ : অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজল গুপ্তা পরিচালনা দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

বোম্বাইস্থিত কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক ফিল্ম সেন্সার বোর্ড

সম্প্রতি আই এস জোহর কৃত 'জয় বাঙলাদেশ' ছবিখানির সারা ভারতে সাধারণ্যে প্রদর্শনী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে। ছবিখানি যখন নভেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে মুক্তিলাভ করে, তখনই একটি চিত্রগৃহের সামনে ছবিটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। কলকাতায় ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রসমালোচকরা এক বাক্যে 'বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের মরণপণ অভিযান'কে উপজীব্য করে এমন একখানি লজ্জারজনক ছবি তৈরী করে নির্মাতা আই এস জোহরের যেন-তেন-প্রকারেণ মুনাফা লোটবার মনোবৃত্তির নিন্দা করেন।

কিন্তু আমরা অবাক হই, 'জয় বাঙলা-দেশ'-এর মতো এমন একখানি অবাস্তব ঘৃণ্য ছবিকে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের সদস্যরা ছাড়পত্র দিলেন কি করে? যে ক'জন সদস্য এই ছবিটির সেন্সার প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-ই কি বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমি সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন? তাঁরা কি আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবর রহমান, ইয়াহিয়া খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রভৃতির নাম শোনেন নি? তাঁরা কি জানেন না, কি কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অধি-বাসীরা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে তাঁদের দেশের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে 'বাঙলাদেশ রাখতে বাধ্য হয়েছেন? তাঁরা কি খবর রাখেন না, ১৯৭০-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা শতকরা ৯৬টি আসন লাভ করা সত্ত্বেও তাদের ওপর শাসনভার ছেড়ে না দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ বাঙলাদেশের জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন গেল ২৫ মার্চ রাত্রি থেকে? এবং তারপরে লাখে লাখে শরণার্থীদের ভারতে আগমন?

একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার, অন্য দিকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা—এবং এই উভয় ঘটনার অতীত ইতিহাস, যে ইতিহাসের শুরু পঞ্চাশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধের ভাষা-আন্দোলন—এই সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে 'জয় বাঙলাদেশ' ছবি নির্মিত হতে পারে না, এই সাধারণ জ্ঞান যে-সদস্য মহোদয়দের নেই, তাঁরা কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের সদস্যরূপে বৃত হবার যে যোগ্য নন, একথা অনস্বীকার্য। 'জয় বাঙলাদেশ' ছবিকে সেন্সরের ছাড়পত্র দেবার সুপারিশ করে তাঁরা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন।

কে বা কারা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সেন্সার বোর্ডের সদস্যদের মনোনীত করেন এবং কোন্ যোগ্যতার মাপকাঠিতে, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু সেন্সারকৃত ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষার ছবিগুলি গেল দশ বছর ধরে মাসের পর মাস, হপ্তার পর হপ্তা দেখবার পরে বলতে

পারি, কোন্ ছবিখানি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হওয়া উচিত এবং কোন্‌টি উচিত নয়. এ-সম্পর্কে বোধকরি একজন সদস্যেরও সম্যক্ জ্ঞান নেই। বহু অর্থ ব্যয় করে একটি ছবি নির্মিত হওয়ার পরে যদি ছবিটি সেন্সারের বিরূপতায় প্রদর্শিত হতে না পায়, তাহলে ছবির নির্মাতা বেচারী ধনেপ্রাণে মারা পড়বে, এই চিন্তা নাকি সদস্যদের 'ক্ষেমাঘেন্না'য় বাধ্য করে, এমন একটা কথা হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের শর্তগুলি যথাযথভাবে পালিত হয় নি, বা কাহিনীটি বিশ্বাস্যভাবে প্রদর্শিত হয়নি কিম্বা অবাস্তব দৃশ্য-সংবলিত বলে যদি দু' তিনটি ছবিকেও প্রদর্শনের অনুপযোগী বলে চিহ্নিত করা হত. তাহলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান আজ যে যথেষ্ট উন্নত হত, সে-সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের অন্য কথা মনে পড়ছে। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন, কোনো ব্যবসায়ীকে যদি খাদ্যে ভেজাল দিতে দেখা যায়, তাকে সবচেয়ে নিকটবর্তী ল্যাম্পপোস্ট থেকে আমি ঝুলিয়ে দেব। বলতে বাধা হচ্ছে, যদি তিনি একজনকেও এই শাস্তি দিতেন, তাহলে দেশ আজ ভেজালে ভরে যেত না। ছবির ব্যাপারেও ঐ একই কথা।

কারণ আজ আর মাত্র জনমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য না-হোক করে ছবি তৈরী করা আমাদের সাজে না। যে-কোনো কাহিনীকেই চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করি না কেন, কিম্বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে-কোনো কাহিনীই নিয়ে করি না কেন—সে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক হোক কিম্বা বিয়োগান্ত, মিলনান্ত অথবা কৌতুকপ্রদ হোক—প্রতিটি কাহিনীই নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস্যভাবে সেলুলয়েডের রূপ যাতে পায়, সেই দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি যেন থাকে। যীশু খৃষ্টের চরিত্র অবলম্বনে যেমন-তেমন করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কোনো ছবি তৈরী হতে দেখেছেন আজ পর্যন্ত? অথচ আমাদের শিব, সতী, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি চরিত্র অবলম্বন করে কত অশ্রদ্ধেয় ছবিই না তৈরী হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। আমরা কটি ঐতিহাসিক চিত্রে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হতে দেখেছি? আর সামাজিক নাম দিয়ে যে-সব হিন্দী ছবি সাধারণত দেখানো হয়, সেগুলির পাত্র-পাত্রীরা স্থানকাল অমান্য করে যে-সব উদ্ভট আচরণ করেন, তেমন আচরণ ভারতের কোথাও কোনোও নর বা নারী করে বা করেন বলে আমাদের জানা নেই। কাহিনী রচনায় এমন সব হাস্যকরভাবে অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়, যা স্বপ্নেও সম্ভব বলে বিবেচিত হয় না। বাঙলা কাহিনী চিত্রের মধ্যেও উদ্ভট অবাস্তব পরিস্থিতি বা ঘটনা বড়ো অল্প থাকে না। সামান্য মাত্র যুক্তি প্রয়োগ করলেই বহু পরিস্থিতিকে বা চারিত্রিক কার্যকলাপকে হাস্যকরভাবে অবাস্তব মনে হবে, এমন বাংলা ছবির সংখ্যা অগণিত। অথচ দেখছি, কিবা কেন্দ্রীয় এবং কিবা আঞ্চলিক—সকল সেন্সার বোর্ডের সদস্যই বিনা দ্বিধায়, প্রায় চোখ বুজেই সকল ছবিকেই অল্প-বিস্তর কাঁচি চালাবার পরে কিম্বা কাঁচি না চালিয়েই ছাড়পত্র দেবার সুপারিশ করে থাকেন। চলচ্চিত্র দর্শক মনকে কতখানি প্রভাবিত করতে সক্ষম, এ-সম্বন্ধে চলচ্চিত্র-নির্মাতারা যেমন উদাসীন, সেন্সার-বোর্ডের সদস্যরা, বোধ-করি, তার থেকেও বেশী উদাসীন। তাঁদের যে একটা গুরুতর সামাজিক দায়িত্ব আছে, এ-বোধ সম্ভবত সেন্সর বোর্ড-সদস্যদের আদৌ নেই, কিম্বা থেকেও নেই। চলচ্চিত্রে চুম্বন চলবে কিনা, কিম্বা নগ্নতা দেখানো হবে কিনা, এটা বড়ো কথা নয়, আসল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, চলচ্চিত্রায়ণে কাহিনীটির প্রতি শিল্পসম্মত সুবিচার করা হয়েছে কিনা, বিশ্বাস্য ও ন্যায়সঙ্গত-ভাবে কাহিনীটি রূপায়িত হয়েছে কিনা। এ-ব্যাপারে বোর্ডের সদস্যদের যেমন করণীয় আছে, তেমনই প্রয়োজন হচ্ছে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যুক্তিসম্মত নির্দেশ দেবার জন্যে ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের। কিন্তু ভারতের জনসাধারণকে যোগ্য নাগরিক করে তোলবার জন্যে, তাদের বিচার-বিবেচনা-কর্তব্যজ্ঞানকে জাগ্রত এবং উন্নত করবার জন্যে সরকারী বা বে-সরকারীভাবে ব্যাপক কোনো চেষ্টা যখন আজও অবধি করা হয়নি, তখন চলচ্চিত্রের দর্শক-সাধারণকে মানুষ করে তোলবার জন্যে চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন, একথা যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তার জবাবে আমরা কি বলব তা ঠিক করতে পারছি না।

চিত্র-সমালোচনা

গ্লোবে 'বুয়োনা সেরা, মিসেস ক্যাম্বেল'

চমৎকার উপভোগ্য এক কমেডি চিত্র 'বুয়োনা সেরা, মিসেস ক্যাম্বেল' মুক্তিলাভ করছে বৃহস্পতিবার, ২৩ ডিসেম্বরে স্থানীয় গ্লোব থিয়েটারে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ইতালীর একটি মেয়েকে বাধ্য হয়ে তিনজন আমেরিকানের সঙ্গ করতে হয়েছিল। ফলে যখন তার একটি মেয়ে হয়, সে বুঝতেই পারে না ওই তিনজনের মধ্যে কে মেয়েটির বাপ। কাজেই সে প্রত্যেককেই আলাদা করে জানালো সে তার মেয়ের বাপ। প্রত্যেকেই দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে মেয়েটিকে খরচ বাবদ চেকে টাকা পাঠাতে লাগল। তিনজনের সম্মিলিত টাকা দিয়ে ওই নারী মেয়ের শিক্ষার সুব্যবস্থা করল। সবই বেশ চলছিল। সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। শোনা গেল, আমেরিকানরা ইতালী পরিদর্শনে আসছে। তিন স্বামীই চিঠি লিখল—আসছি গো, আসছি। বিপদের মধ্যে বিপদ। মেয়েও

তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ী আসছে। ক্যাম্বেল প্রোডাক্টস্ থেকে ভদ্রমহিলা নিজের নাম নিয়েছিলেন মিসেস ক্যাম্বেল। এবং প্রচার করেছিলেন, তাঁর স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন এবং স্বামীর তিনজন বন্ধু তাঁকে জীবনযাপনে সাহায্য করছেন। এখন এই সমূহ বিপদের মধ্যে ভদ্রমহিলা কিভাবে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হলেন এবং মেয়ে মায়ের প্রকৃত তথ্যটি জানবার পরে মায়ের প্রতি প্রথমটা বিরূপ হয়েও শেষ পর্যন্ত কেমন করে মায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠল, তার একটি সুন্দর নাটকীয় চিত্র এই কমেডিটিকে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ করে তুলেছে।

ডেনিস নর্ডেন ও শেলডন কেলারের সহযোগিতায় প্রযোজক-পরিচালক মেলভিন ফ্র্যাঙ্ক যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, সেটি এমনই ঠাসবুনোন যে, দর্শক মুহূর্তের জন্যেও ছবিটি থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। তীব্র গতিসম্পন্ন এই কাহিনীটিতে যে হাসির ভিতর দিয়ে একজন নিরুপায় মহিলার নিজের মেয়ে ও প্রতিবেশীদের চোখে নিজের একটা অকলঙ্ক রূপ বজায় রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হচ্ছে, সেই কথার চিত্রটি অনায়াসেই ফুটে উঠেছে। নিঃসন্দেহে নায়িকার চরিত্রে গিনা লোলোব্রিগিডার আন্তরিক অভিনয় ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ। মিসেস ক্যাম্বেলের কুমারী কন্যারূপে জেনেট মার্গোলিন আকৃতি ও প্রকৃতিতে একটি বাস্তব মূর্তি প্রকাশিত করেছেন। নায়িকার তিন মার্কিণ স্বামী, তাঁদের তিন স্ত্রী এবং নায়িকার প্রতি সহানুভূতিশীল বর্তমান অভিভাবকের ভূমিকায় যথাক্রমে শেলী উইন্টার্স, ফিল সিলভার্স, পিটার লফোর্ড, মিস উইন্টার্স, মেরিয়ন মোজেস, লী গ্রান্ট ও টেলি সাভালাস ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলতে নায়িকার সঙ্গে আশ্চর্য সহযোগিতা করেছেন। ট্রান্স আমেরিকা কর্পোরেশন নিবেদিত এই ছবিটি ইউনাইটেড আর্টিস্ট দ্বারা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর মাধ্যমে মুক্তিলাভ করছে।

বিবিধ সংবাদ

জীবন থেকে নেয়া'র শুভমুক্তি : সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙলাদেশে এই ১৯৭১-এর গোড়ায় দিকে তৈরী 'জীবন থেকে নেয়া'র শুভমুক্তি হচ্ছে শুক্রবার, ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার জ্যোতি, মিত্রা, প্রিয়া, অরুণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে। জহির রায়হান পরিচালিত এই ছবিটিতে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, জঙ্গীশাহীর বিভীষিকার চিত্র এবং বাংলাদেশে একনায়কত্বের আবেগময় চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, কাজি নজরুল, ইকবাল প্রভৃতি রচিত গান ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন খান আতাউর রহমান। পরিচালক রায়হানের সুন্দরী স্ত্রী সুচন্দা ছবিটির নায়িকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটিকে প্রমোদকরমুক্ত করেছেন।

'কাল আজ আউর কাল'-এর শুভমুক্তি : আর-কে ফিল্মস্ নিবেদিত ও রাজকাপুর প্রযোজিত 'কাল আজ আউর কাল' ছবিটি প্রথমে ১০ ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিলাভ করবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, একথা চিত্রামোদীমাত্রই জানেন। কিন্তু হঠাৎ ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ছবিটির মুক্তি স্থগিত রাখা হয়। এখন বিপদ কেটে যাওয়ায় এই তিন যুগের আদর্শ সম্পর্কিত বিরোধকে উপজীব্য করে তৈরী চিত্তাকর্ষী ছবিটি বৃহস্পতিবার, ২৩ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করছে মেট্রো, লোটাস, মুনলাইট, দর্পণা, গণেশ, জেম, সোসাইটি (মাত্র বারোটায়) প্রভৃতি ছবিঘরে। পৃথ্বিরাজ কাপুর, রাজ কাপুর ও রণধীর কাপুর—কাপুর পরিবারের এই তিন পুরুষ ছবিটির তিন পুরুষকে চিত্রিত করেছেন এবং রণধীরের সঙ্গে সদ্য বিবাহিতা ববিতা এই ছবির নায়িকা।

'সংসার'-এর শুভমুক্তি : হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত নর্মদা পিকচার্সের প্রথম ছবি সলিল সেন রচিত ও পরিচালিত 'সংসার' আজ, শুক্রবার, ২৪ ডিসেম্বর মর্জিনা চিত্রের পরিবেশনায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও অন্যত্র মুক্তিলাভ করবে। পরিচালক সলিল সেন রচিত মঞ্চখ্যাতিসম্পন্ন 'স্বীকৃতি' নাটকের চিত্ররূপ হচ্ছে 'সংসার'। ছবিটিতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানে সুর দিয়েছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, বসন্ত চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, হরিধন, মৃণাল, অমরনাথ, মাঃ অরিন্দম, শমিতা বিশ্বাস, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া প্রভৃতি যশস্বী শিল্পী।

অবন-মহলের আসন্ন উৎসব : ১৯৭১ খৃঃ ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৯ জানুয়ারী অবধি শিশুমহলের বার্ষিক উৎসব সুরু হবে অবন-মহলে। সময় দুপুরে আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের এমন কি গ্রামাঞ্চলের রসিকবৃন্দকে এ উৎসবে যোগ দেবার সুযোগ দানের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে বলে সংস্থার অন্যতম ব্যবস্থাপক শ্রীঅসিত মিত্র আমাদের জানিয়েছেন।

এ বছরের বিশেষ অনুষ্ঠান হোলো অবনীন্দ্র ও অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী। আর এক আকর্ষণ হোলো 'রূপলেখা' নৃত্যনাট্য। উড়িষ্যার খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দ-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানে এছাড়া কয়েকটি শিশু সংস্থার সর্বভারতীয় শিল্প ও চারুকলা এবং শিশু সঙ্গীতের অনুষ্ঠানও এ উৎসবের অন্তর্ভূত হবে।

সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচালনার্থে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সভাপতিত্বে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে।

জবান চিত্রের মহরতে উপল সিংহ, পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, মৃণাল সেন, শমিত ভঞ্জ এবং অমৃতা ঘোষ। ফটো : অমৃত।

আসর সংবাদ

রক্তে রাঙা কাশ্মীর

এমনটা সহসা দেখা যায় না। ঘটনার ঘনঘটা, অভিনয়ের বলিষ্ঠতা ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ঔজ্জ্বল্য আসরে যেন ছায়াছবির মত ক্ষণে ক্ষণে চমক সৃষ্টি করে তোলে। ইতিহাস আর শিল্পে মিলেমিশে তৈরী অপূর্ব সৃষ্টিটি তার এক একটি দল উন্মোচিত করে কখনও কাঁদিয়েছে, কখনও হাসিয়েছে, কখনও বীভৎসতা ও বর্বরতায় মন শিউরে ওঠে আবার কখনও বা প্রতিশোধ আর দেশপ্রেমের অভীক মন্ত্রে হৃদয় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে একটি পালা মানুষের মনকে কতটা আবেগমথিত করে তুলতে পারে, অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর 'রক্তে রাঙা কাশ্মীর' না দেখলে তা কল্পনাও করা যায় না। অভিনয় আর শিল্পগুণে সমৃদ্ধ পালাটিকে মরশুমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পালা হিসেবে চিহ্নিত করা হলে খুব বেশী অন্যায় হবে না।

ইতিহাস কখনও শিল্প নয়, শিল্প নয় ইতিহাস। অথচ দু-ইকে মেলানোও যে যায়—তৈরী করা যায় নিটোল কাব্যের তারই নিদর্শন এ পালা। বাহ্যিক আড়ম্বরের বাড়াবাড়ি নেই অথচ মানুষের মনকে আকর্ষণ করার সমস্ত গুণই এতে রয়েছে। এর জন্য প্রাপ্য প্রশংসার ফুলগুলি ভাগ করে দিতে হয় পালাকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নট ও নির্দেশক অমিয় বসু এবং অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে।

পালাকার শ্রীব্যানার্জীর কৃতিত্ব ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে অবিকৃত রেখে কিছু কল্পনার রঙে ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে নাটকীয় মুহূর্তগুলি তিনি গড়ে তুলেছেন, সেগুলি শ্রোতাদের ভাল না লেগে উপায় নেই। নাট্য কৌতূহল সৃষ্টিতে তিনি যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন তেমনি দক্ষতা দেখিয়েছেন সংলাপ সৃষ্টিতেও। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের ভয়াবহতা, পাক হানাদারদের বর্বরতার অজস্র নিদর্শন যাতে শ্রোতাদের মস্তিষ্কে অযথা চাপ সৃষ্টি না করে তার জন্য এতে তিনি নাচ গান ও নানা মজার ঘটনারও সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন অথচ তা কাহিনীর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনটি মনে হয় নি কখনো। পালাবিন্যাসে মেনে চলা হয়েছে যাত্রার কতকগুলি প্রচলিত সত্যকেও অর্থাৎ খলনায়কদের ষড়যন্ত্র, কিছু রঙ্গকৌতুক এবং সর্বশেষ ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পালা শেষ।

পালা শুরু হয়েছে ঝিলম নদীর তীরে। সময় সেটা ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস। ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ আলী জিন্নার নির্দেশে হানাদারের ছদ্মবেশে কাশ্মীরে প্রবেশ করে পাক সেনারা। নৃশংস অত্যাচারে নিভে যেতে থাকে নিরীহ গ্রামবাসীদের জীবন-দীপ। অসহায় কাশ্মীর রাজ হরি সিং সাহায্য চাইলেন, ভারতের—কাশ্মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তির চুক্তিপত্রে করলেন স্বাক্ষর। অপ্রস্তুত ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে এলো কাশ্মীর রক্ষায়। বেজে উঠলো রণদামামা। ভারতীয় বীর জওয়ানদের অপূর্ব তেজস্বিতা, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের স্রোতে ভেসে গেল ছদ্মবেশী পাক হানাদারের দল। কাশ্মীরে এলো শান্তির মলয়সমীর।

পালাটিকে যথাযথ ও বাস্তবরূপে উপস্থাপিত করার জন্য নির্দেশক অমিয় বসু যে প্রশংসা পাবেন একথা আগেই বলা হয়েছে। বিভিন্ন দৃশ্য পরিকল্পনাই শুধু নয় শিল্পীদের দিয়ে যে বলিষ্ঠ অভিনয় তিনি করিয়েছেন বা যে দলগত সংহতির পরিচয় রেখেছেন তার জন্যও নিশ্চয়ই তিনি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে এ পালা যে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে আবার তার উল্লেখ করে বলা যায় শিল্পীরা ব্যক্তিগত চরিত্র রূপায়ণেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। অসহায় কাশ্মীররাজের অন্তরদ্বন্দ্ব যেমন চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে মূর্ত তেমনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে বিমল লাহিড়ীর আফ্রিদি সর্দার। মকবুল শেরোয়ানীর চরিত্রে সংলাপ প্রক্ষেপণ ও নাট্যমুহূর্ত রচনায় অমিয় বসু অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বলিষ্ঠ অভিনয়ে দীপ্ত চরিত্রের মধ্যে আছে শান্তি হাজরার কামাল, প্রণয়কুমারের সোলেমান। কাশ্মীরের দেওয়ান ওয়েকফিল্ড ও মন্ত্রী মেহেরচাঁদের ভূমিকায় গুরুদাস মিত্র ও নকুল দাস খল-চরিত্র অভিনয়ের প্রচলিত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। রূপসজ্জা ও অভিনয়ে এক অপূর্ব সৃষ্টি পান্না ভট্টাচার্যের জিন্না। স্ত্রী ভূমিকায় ছবি রায়ের লাইলী সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে এক সুন্দর সৃষ্টি ভাল লাগবে মায়া পালের শমীম, দীপিকা দাসের রাবেয়া, নমিতা নন্দীর মকবুলের মা। এছাড়া অভিনয়ে প্রশংসা পাবেন বিশ্বনাথ বিশ্বাস, শ্যামল দাস, কুমারেশ ব্যানার্জী, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী প্রভৃতি।

পালাটির বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টিতে মহেন্দ্র দত্ত এবং অজিত বসুর সুর যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বীভৎস রসের আধিক্য যে এ পালার একটি বড় ত্রুটি সে কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার।

অভিনয়ে : কণ্ঠরাণী, সাবিত্রী, সৌমিত্র

বিষ্ণুপ্রিয়া

সু-পরিবেশনার গুণে ধর্মীয় কাহিনীগুলি আজও যে যাত্রার দর্শকদের ভাবাপ্লুত করে তারই প্রমাণ নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার 'বিষ্ণুপ্রিয়া।' কাহিনী যতই সমাপ্তির দিকে এগিয়েছে ভক্তি আবেগে

শ্রোতাদের চোখ থেকে ততই ঝরেছে প্রেমাশ্রু। সর্বশ্রেণীর শ্রোতাই যে এ-পালা শ্রবণে অমিয় আনন্দে অবগাহন করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাটকীয় সংঘাত, সঙ্গীত ও আবেগপূর্ণ অভিনয়ে নিউ রয়েলের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ভক্তিমূলক পালার ইতিহাসে এক অপূর্ব সংযোজন।

বাল্যকাল থেকে শুরু করে নিমাই-এর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে পরিবর্তিত হয়ে প্রেম বিতরণের ঘটনাগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এ পালা। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার কৈশোর প্রেম, নিমাই-এর নাস্তিকতা, ভক্তিভাব, জগাই-মাধাই উদ্ধার ইত্যাদি এমনভাবে আসরে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে পালাকার অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রশংসা না করে পারা যায় না। সংলাপ রচনাতেও শ্রীচক্রবর্তী মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ভক্তিরসাশ্রয়ী এ পালার সংঘাত সৃষ্টিতে অধ্যাপক চক্রবর্তী কল্পনা ও ভক্তিভাবের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

প্রয়োগনৈপুণ্যে, সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী অনুসরণে ও দলগত সংহতি সৃষ্টিতে প্রবীণ নট ও নাট্য শিক্ষক সন্তোষ সিংহ'র সাফল্য সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। জগাই-মাধাই এবং কাজী উদ্ধার দৃশ্য দুটিতে যে নাট্যমুহূর্ত রচিত হয়েছে তা হৃদয়কে নাড়া দেয়। এছাড়া পালার অন্তিম দৃশ্যে শচীমাতার ভাব ও অভিব্যক্তি এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার নীরব চাহনি শ্রোতাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যেভাবে দাগ কাটে তাতে শিল্পীদের অভিনয়নৈপুণ্যের ও পরিচালকের রসবোধের তারিফ করতে হয়।

ভক্তিমূলক এ পালার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে সুরের মূর্চ্ছনা। ২৩টি গান এ পালায় আছে। সুরকার অমিয় ভট্টাচার্য তাতে নানা সুরের সংযোগ ঘটিয়ে শ্রোতাদের সুরতরঙ্গে দুলিয়েছেন। সুরের বৈশিষ্ট্যে প্রায় কোন গানই ক্লান্তিকর হয় নি।

দলগত অভিনয়নৈপুণ্যের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিনয়েও শিল্পীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নামভূমিকায় তারা পালের সংযম অভিব্যক্তি সত্যিই সুন্দর। গৌরাঙ্গের ভূমিকায় দ্বিজু ভাওয়ালকে যেমন মানিয়েছে তেমনি তাঁর অভিব্যক্তি ও অভিনয়ে চরিত্রটির বিভিন্ন ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চলন-বলন ও অভিব্যক্তিতে শক্তিশালী অভিনেতা মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর অদ্বৈতাচার্য এক সার্থক সৃষ্টি। নিত্যানন্দ রূপী জলদকুমারের সোচ্চার অভিনয় মনে রাখার মত। তাঁর গাওয়া গানটি সকলকে আনন্দ দেয়। কাজী চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন অজিত সাহা। জগাই-মাধাই চরিত্রে হরিশকুমার ও অনিল রায়কে মানিয়েছে চমৎকার। অভিনয় ও গানে শেফালী দে (মোনা) সুন্দর। এছাড়া ভালো অভিনয় করেন ছবিরাণী (শচীমাতা), তারা ভট্টাচার্য (চাপাল গোপাল), জনার্দন নন্দী (বিভূতি পাণ্ডে) প্রভৃতি। তবে পাঁচু মুখার্জীর আগমবাগীশ আমাদের হতাশ করেছে। পালাটি আরো সম্পাদনার অপেক্ষা রাখে।

বাঘা যতীন

যাত্রায় সেদিন আর নেই। এক সময় ছিল যখন যাত্রা পালার উপজীব্য হিসেবে বেছে নেওয়া হতো ধর্মীয়, পৌরাণিক বা কাল্পনিক কাহিনীগুলিকে। এখন সময় বদলেছে। যাত্রার আসরে এখন উপস্থাপিত হচ্ছে নিত্যদিনের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার কাহিনীগুলি—রূপায়িত হচ্ছে আধুনিক জীবনের কথা। এক কথায় বলা যায়, কাহিনী, উপস্থাপনা এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে এখন বিপ্লব এসেছে। বিপ্লবের কথায় বলতে হয়, বিভিন্ন দেশী এবং বিদেশী বিপ্লবের কাহিনীও আজ দেখা যাচ্ছে যাত্রার আসরে। আর এই বিপ্লবী কাহিনী পরিবেশনার ক্ষেত্রে ভারতী অপেরা নিজস্ব একটি বিশেষ পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এখন পর্যন্ত তাঁরা বিদেশী কাহিনী চয়ন না করে দেশীয় জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবের কাহিনীগুলি পরিবেশন করে চলেছেন। তাঁদের 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন', 'নীল রক্ত' যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে তারই ধারা ধরে এবার এসেছে 'বাঘা যতীন'। অগ্নিযুগের সেই বীর বিপ্লবী যিনি সর্বপ্রথম বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছিলেন তারই কাহিনী এটি। দেশপ্রেম ও বীরত্বে উজ্জ্বল, বৃটিশ নৃশংসতায় ভরা এ পালার বলিষ্ঠ রূপায়ণে ভারতী অপেরার শিল্পীরা অপূর্ব দক্ষতার নজীর রেখেছেন। অন্য কথায় তাঁদের 'বাঘা যতীন'কে মরশুমের প্রথম শ্রেণীর পালাগুলির অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। দেশপ্রেমের এমন একটি সমুজ্জ্বল পালা উপহার দেওয়ার জন্য ভারতী অপেরাকে ধন্যবাদ।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি ছুরি দিয়ে বাঘ মেরে হয়েছিলেন বাঘা যতীন, ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী। হঠাৎ করে বিপ্লবের পথে তিনি নামেননি। ধীরে ধীরে চলেছে তাঁর বিপ্লবের প্রস্তুতি পারিবারিক জীবনের মধ্যে থেকেই। ব্যর্থতা এসেছে—আবার নতুন করে শুরু করেছেন—আবার—আবার—। অথচ দুর্ধর্ষ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট একবারের জন্যও ধরতে পারেনি এই বিপ্লবের আসল নায়ক কে? যখন পারল তখন ওই টেগার্টও অভিভূত হলো—প্রণাম জানালো ইংরাজের সঙ্গে ট্রেঞ্চ ফাইটে প্রথম নিহত বীর বাঙালী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথকে। স্বাদেশিকতার প্রচণ্ড আবেগে ভরা এ নাটকে হাসি আছে—কান্নাও আছে। যে চরিত্রটি আগাগোড়া আমাদের হাসিয়ে গেলো—ঘৃণায় যার প্রতি বারবার থুতকার দিতে ইচ্ছে হয়েছে—শেষে তারই জন্য চোখ জলে ভরে উঠেছে। বিপ্লবের ওই কর্মকাণ্ডের মধ্যেও প্রেমের যে একটি ভীরু দীপশিখা আগাগোড়া অনির্বাণ ছিল অন্তিমে তাই হয়েছে এক মহৎ প্রেমের প্রোজ্জ্বল আলোকশিখা। নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি, সংলাপ রচনা ও কাহিনীবিন্যাসে পালাকার বীরু মুখার্জি মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নির্দেশক জ্ঞানেশ মুখার্জির বাহাদুরি আগাগোড়া। পালাটিকে তিনি এক শৈল্পিক সুষমায় ভরিয়ে রেখেছেন।

পালার প্রথমাংশ সংঘাতের অভাবে কিছুটা শ্লথ অথচ আশ্চর্য কৌশলে সবার মনকে কেন্দ্রীভূত করেছে আসরের ওপরে, দ্বিতীয়াংশ গতিতে দুর্বার। পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমাদেরই স্বদেশবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্বে বুক যেমন গর্বে ফুলে উঠেছে তেমনি বৃটিশ শাসকের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে মন বিষিয়ে ওঠে। দৃশ্যযোজনার গুণে শেষ দৃশ্যটিকে যেন ভোলা যায় না। বুড়িবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হলো—নিভে গেল বিপ্লবীদের জীবন টেগার্টের বুলেটে—তখন সারা প্রাণটা যেন এক অসীম শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে।

বিষয়বস্তুর পরিপাট্য ও নির্দেশনার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়, দলগত অভিনয়ে এ পালা এক আশ্চর্য সংহত রূপে প্রকাশ করেছে। দলগত অভিনয়ের পাশেই ব্যক্তিগত অভিনয়ও সমান ভাস্বর। নামভূমিকায় জহর রায় একটি অপূর্ব চরিত্র উপহার দিয়েছেন। এর আগে কয়েকটি খলচরিত্র রূপায়ণে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তারই পাশাপাশি এ চরিত্রে শান্ত, সংযত ও বৈপ্লবিক চেতনার রূপটিও তিনি সমান সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তবে তাঁর উঁচু পর্দার হাসি ভাল লাগেনি। যতীন্দ্রনাথের স্ত্রীর ভূমিকায় ছবি চ্যাটার্জি সুন্দর। জিভের সামান্য জড়তা সত্ত্বেও বন্দনা দেবীর দিদি সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। ভাল লাগে সব্যসাচী মুখার্জি, হিরণ বসুমল্লিক ও দেবকুমারের অভিনয়। হীরালাল মুখার্জি ও শচী মণ্ডলের কৌতুকাভিনয় এবং অঞ্জনা ব্যানার্জির নীলিমা মন ভরায়। ভিন্নধর্মী চরিত্র টেগার্টের চরিত্রে সুজিত পাঠকের দক্ষতা সংশয়াতীত। তবে তাঁর কাছে সাধারণের প্রত্যাশা ছিল আরো কিছু বেশী। মুকুন্দ দাসরূপী বলাই হালদারের উদাত্ত কণ্ঠের গান প্রাণের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে।

আমি মুজিব বলছি—

'বিপ্লবী ভিয়েতনাম', 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'র পর এলো 'আমি মুজিব বলছি': প্রযোজক সংস্থা সেই নিউ প্রভাস অপেরা—যাঁরা এজাতীয় পালা অভিনয়ে বারবার নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবু 'আমি মুজিব বলছি' সম্পর্কে একটা আশঙ্কা ছিল। একে জীবনী পালা আসরে দাঁড় করানই শক্ত, তারপর আবার এ-পালার নায়ক শুধু সমকালেরই নয়—জীবিতও বটে, তাঁর চরিত্র ফুটিয়ে তোলা কী খুব

সহজ হবে। কিন্তু আসরে বসে অসংখ্য শ্রোতা যেভাবে মুজিবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাতে স্বীকার করাই ভাল, পালা হিসেবে এটি শ্রোতাদের কাছে রসোত্তীর্ণ। অবশ্যই এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে বাঙ্গালী সেন্টিমেন্ট—কাহিনীর বিন্যাস ও অভিনয়ের বলিষ্ঠতা।

আগেই উল্লেখ করেছি, জীবিত চরিত্রর রূপ দেওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ রূপসজ্জা পোশাক-আসাকে সজ্জিত আসরের মুজিবকে বার বার ভুল হয়েছে বাস্তবের মুজিব বলে। অভিব্যক্তি চাল-চলনে সুন্দরভাবে মুজিবের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—শুধু কথায় যদি একটু পূর্ববঙ্গের টান থাকত তাহলে বোধহয় অনুযোগ করার কিছু থাকত না। পালাকার ও নির্দেশক অরুণ রায়ের কৃতিত্ব সেই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রাক বর্তমান অধ্যায় পর্যন্ত ঘটনাকালকে পালার মধ্যে ধরে রেখেছেন। তবে শক্ত হাতে সম্পাদনা করে কাহিনীর ব্যাপ্তিকাল আরেকটু সংক্ষেপ করলে পালাটি আরো দৃঢ় সংবদ্ধ হতো।

তাছাড়া নাটকের প্রয়োজনে শ্রোতাদের ঘৃণাকে তীব্র করার জন্য পালাকার ইয়াহিয়া ও টিক্কা চরিত্র দুটিকে পুরো-পুরি ব্যঙ্গনির্ভর করে তুলেছেন—কোন সময়ই তাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় নি। ফলে চরিত্র দুটির ওপর খুব সুবিচার করা হয়েছে এমনটা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিণতিকে যেভাবে শ্রীরায় টেনে এনেছেন তাতে তাঁর প্রশংসা করতে হয়। ভাষা আন্দোলনের সময় শাসককুলের নির্মমতা, আয়ুবশাহীর পতনের জন্য ইয়াহিয়া-টিক্কার ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পালাকার ইসলামাবাদ ও বাংলাদেশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব—তার ইঙ্গিত দিয়ে পরিণতি পর্যন্ত দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। এ-পালায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সাড়ে তিন ঘন্টা সময়ের মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে তার প্রশংসা না করে উপায় নেই। যদিও নাটক নাটক, তথ্যের ভারে তাকে ভারাক্রান্ত করা যায় না তবু এ-পালায় আশ্চর্যভাবে তথ্য-বাস্তব ও নাটকীয় কৌতূহলের মিশ্রণ ঘটেছে।

পালা বিন্যাস, প্রয়োগ কৌশল ও অভিনয়ধারার সঙ্গে কিন্তু এ পালার সঙ্গীতাংশ সমান তালে চলতে পারে নি। সঙ্গীত অনায়াসে এ-পালাকে আরো বলিষ্ঠ করতে পারত। এ-জাতীয় ছোটখাট ত্রুটির খোঁচায় তিক্ত না হয়ে দেখলে এ-পালা সকলের ভাল লাগবে বলেই মনে হয়।

নিউ প্রভাস অপেরার দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের পূর্ব-স্বাক্ষর এতেও রয়েছে। মুজিব সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে এমন নিখুঁত রূপসজ্জা সচরাচর দেখা যায় না। শিল্পী রাজকুমারের অভিনয় জীবনের এ এক আশ্চর্য সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। প্রচন্ড আবেগ নিয়ে তিনি চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন। অতি আবেগের ভারে মাঝে মাঝে তিনি নিজে শ্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু চরিত্রটি যেন অফুরন্ত প্রাণ-শক্তিতে ফেটে পড়েছে। বাঙ্গালীদের কাছে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মমত যে ম্লান হয়ে গেছে তারই বলিষ্ঠ ছবি অমূল্য ভট্টাচার্য (ভার্গব), মুকুন্দ ঘোষ (মৌলবী), জয়ন্তকুমার (হোসেন), অনাদি চক্রবর্তীর (প্রলয়) অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুঞ্জয় দে ও সাধন দাশ-গুপ্ত ইয়াহিয়া ও টিক্কা চরিত্র দুটিকে পরিচালকের নির্দেশমত তুলে ধরেছেন। খল-নায়ক রহমতের চরিত্রে অভয় হালদার অপূর্ব। কৌতুক চরিত্র ইয়াকুবরূপী রাধারমণ পালের সংযত কৌতুকাভিনয় ভাল লাগবে। ননী ভট্টের ফাদার অনেকদিন মনে থাকবে। রোশেনারা, বাণী, জুবেদা। নুরুন্নেসা চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেন কল্যাণী ভট্টাচার্য, রীতা সেন, কামনা দত্ত ও প্রতিমা ভট্টাচার্য। এছাড়া অন্যান্য শিল্পীরাও পালার চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছেন।

—নন্দ ভট্ট

মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্য চরিত্রে শম্ভু মিত্র

নাটমঞ্চের নাট্যোৎসব

শতবর্ষ পূর্তির আলোয় বাংলা রংগমঞ্চের ইতিহাস একটা অসাধারণ দীপ্তি পেতে চলেছে। অথচ আজো পর্যন্ত এমন একটি জাতীয় নাট্যশালা বা নাটমঞ্চ তৈরী হোল না যার আলোকিত সীমানায় নাট্য-সংস্কৃতির বৈপ্লবিক উত্তাল তরঙ্গতোলা চিন্তাগুলোর প্রতিটি প্রহর উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। ব্যাপারটা নিশ্চয় খুব মর্মান্তিক এবং অতীব দুঃখের। শতবর্ষের ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা করেও কেন এ জাতীয় একটা সংস্কৃতির একটি সুপরিকল্পিত কেন্দ্র গড়ে তোলা গেল না, সে প্রশ্ন ভাবিয়েছে অনেককে; অনেক চিন্তা ও অনেক উপলব্ধিই নিঃশেষিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে রূপলাভ করতে চেষ্টা করছিল অনেকদিন থেকে, কিন্তু তা সংঘবদ্ধতায় ভাষা পায়নি। সবরকম প্রতিবন্ধকতা, বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা আর অতীতের সীমাহীন স্মৃতিকে সামনে রেখে 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' তিন বছরেরও কিছু সময় বেশী জুড়ে একটি মহতী চেষ্টা চালাচ্ছেন কি করে এমন একটি পরিব্যাপ্ত সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়, যার মধ্যে প্রতিটি স্তরের শিল্পী তাঁর বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত সাধনার সুস্পষ্টতাকে রঙে রেখায়, ছন্দে, সুরে। আর সংলাপে ও সংঘাতে মূর্ত করে তুলতে পারেন। এ প্রয়োজন জাতি বা দেশের সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করার জন্য, আর মানুষ হিসেবে সবটুকু স্বাতন্ত্র নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই। এ সম্পর্কে গভীরতম চিন্তা ও আন্তর সহযোগিতা 'নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' নাট্যরসপিপাসুদের কাছ থেকে পেয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে। সম্প্রতি যে নাট্যোৎসব 'কলামন্দিরে' অনুষ্ঠিত হোল, তাতেও সেই অনুরাগ, আর বাংলার নাট্যসংস্কৃতির প্রতি সুগভীর আস্থাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। যে সময়ে এই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন কল্লোলিনী কলকাতা ছিল এক নিষ্প্রদীপ নগরী; এক নিগূঢ় অন্ধকারে ঢেকে ছিল সব কিছু। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই সীমাহীন অন্ধকারকেও উপেক্ষা করে প্রতিদিনই 'কলামন্দিরে' হয়েছে অগণিত নাট্যরসিকদের ভীড়। এই ছবি সামনে উদ্ভাসিত হোতে দেখেই হৃদয়ের উদ্বেল আশা প্রগাঢ় হয়ে ওঠে যে একদিন কলকাতার বুকেই একটি সুবৃহৎ ও সুপরিকল্পিত নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবেই। এ আশা রেখেই অবশ্য নাট্যমঞ্চের কর্মীরা এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে নাট্যরসপিপাসুদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা।

নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী এই নাট্যোৎসবে বিভিন্ন স্বাদের নাটক পরিবেশিত হয়েছে। নাটমঞ্চের নিজস্ব প্রযোজনা ছাড়া 'বহুরূপী', 'নান্দীকার' ও 'রূপকার' তিনটি নতুন নাটক পরিবেশন করেন। নাটমঞ্চের প্রযোজনায় প্রথমদিন অভিনীত হয় বিশাখ দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষসে'র বাংলা নাট্যরূপ। মগধের ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়কে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক নাটকটি রচিত হয়েছে। মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন নন্দ। নন্দের মন্ত্রী ছিলেন রাক্ষস নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ। বীরত্ব আর রাজভক্তির জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল সীমাহীন। নন্দের বাবা ভূতপূর্ব মহারাজ মুরা নামে এক শূদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন এবং এই মুরার ছেলে চন্দ্রগুপ্তই চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় নন্দকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। চাণক্য এরপর থেকে চেষ্টা চালাতে থাকেন কি করে রাক্ষসকে স্বপক্ষে এনে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকে বিপদ ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত করা যায়। শেষ পর্যন্ত চাণক্য কিভাবে বুদ্ধি আর কৌশলের বলে রাক্ষসের মুদ্রা বা শীলমোহর সংগ্রহ করলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুললেন, তারই কথা নানা সংঘাতে দুর্বার হয়ে উঠেছে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে। এই নাটকটির প্রয়োগ পরিকল্পনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংযম ও সংহত শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন। মঞ্চ পরিকল্পনায় এক আশ্চর্য স্বচ্ছতা এনে সামগ্রিকভাবে নাটকটির প্রয়োগ পরিকল্পনাকে একটি শৈল্পিক মাধুর্যে উন্নীত করেছেন খালেদ চৌধুরী। এ প্রযোজনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হোল চাণক্যের ভূমিকায় শম্ভু মিত্রের অসাধারণ অভিনয়। ধীর, স্থির ছন্দে। নিজেকে সংযত রেখে শুধু স্বরক্ষেপনের বৈশিষ্টে চাণক্যের মতো কূটকৌশলীর চরিত্রকে যে আশ্চর্য নৈপুণ্যে মনের আলোয় তুলে ধরা যায় তা প্রমাণ করলেন শ্রীমিত্র। 'রাজা ওয়াদিপাউসে'র মতো 'চাণক্য'ও তাঁর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি; এ অভিনয় শুধু তাঁরই ব্যক্তিগত জীবনের সম্পদ নয়, বাংলার মঞ্চে আজ পর্যন্ত যে কটি স্মরণীয় অভিনয় হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর 'চাণক্য' চরিত্র-চিত্রণ একটি অন্যতম সংযোজন হয়ে রইল। রাক্ষসের মন্ত্রণাকে নিখুঁতভাবে রূপ

দিয়েছেন কুমার রায়। চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এ নাটকে অভিনেতার চেয়ে নির্দেশক হিসাবেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকৃতি পাবেন বেশী। 'মুদ্রারাক্ষসে'র প্রযোজনা এর আগেও নাটমঞ্চ সমিতির আয়োজনই হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনে ছিল 'নান্দীকারে'র নতুন নাটক 'বীতংস।' জোসেফ কেসেলরিংয়ের 'আর্সেনিক অ্যান্ড ওল্ড লেস' অবলম্বনে এই নাটকটি রচনা করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তারই জীবনের মূল্য আজ কতো কম। ধর্মের নামে, বিজ্ঞানের নামে আর যুদ্ধের নামে এরকম কতো জীবন অকারণে, নিঃশেষিত হোচ্ছে, কিন্তু এর জন্য কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শত শত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, না অকারণে জীবনের এই ক্ষয়ে যাওয়ার বা খুনের সামনে হাসির কলরোল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—এই ধরণের একটা ধারণা হয়তো এই নাটকের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। বক্তব্যের এই গভীরতা আমাদের মনকে স্পর্শ করছে, কিন্তু কয়েকটি শিথিল নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি এবং সংলাপে কয়েকটি জায়গায় অকারণে রুচি ও শোভনতার সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের ব্যথিত করেছে। নাটকের গতিকে অপ্রতিহত রেখেই এগুলোকে অনায়াসে বর্জন করা যেতো। ব্যক্তিগত অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই যে দুজনের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হোলেন দীপালি চক্রবর্তী (বড় পিসী), লতিকা বসু (ছোট পিসী)। এই দুই শিল্পীর স্বচ্ছন্দ চরিত্র-চিত্রণ 'বীতংস' প্রযোজনার এক বিশিষ্ট আকর্ষণ। রণজিৎ ঘোষের 'মনমোদ সাহা' ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিশ্বরথন' দুটি স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রণ হোতে পেরেছে।

তৃতীয় দিনে পরিবেশিত 'বাংলার মাটি' নাটকও 'রূপকারে'র একটি নতুন প্রযোজনা। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর নিজের কথায় তাঁর 'বাংলার মাটি' হোল 'ভাঙ্গা বাংলার বর্তমান ভাঙ্গা মনের কাহিনী।' 'বাংলার মাটি, বাংলার জল; ধন্য হোক, ধন্য হোক হে ভগবান',—এই উদ্দীপ্ত গানের মর্ম কথাটি ধ্বনিত হয়েছে এ নাটকে। সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রাচীর তুলে নয়, হিন্দু মুসলমানের সহমর্মিতাতেই লুকিয়ে রয়েছে সমাজ ও মানবতার আসল শত্রু-নাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' এই গভীরতর সত্যকেই নানা সংঘাতে ভাষা দিতে চেষ্টা করেছে। তবে এই নাটকটির একটু সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। কেননা ১৯৫০—৫৪ থেকে '৭১ পর্যন্ত সময়ের সীমারেখায় অনেক ঘটনার বিক্ষিপ্ত ঢেউ এসে লেগেছে; অনেক চিন্তা আর চেতনারও রূপান্তর সাধিত হয়েছে।

নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সবিতাব্রত দত্ত। তাঁর চেষ্টার হয়তো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রযোজনাটি আমাদের মনকে খুব বেশী আকৃষ্ট করতে পারেনি। না অভিনয় না গান কোনটিই এ প্রযোজনার কোনরকম বৈশিষ্ট্যের নজীর তুলে ধরতে পারেনি। তবুও এর মধ্যে দেবব্রত দে (আবু মিঞা)। সুধাংশু মুখার্জী (সদানন্দ উকিল), অমল ঘোষ দস্তিদার (আনসার)-এর অভিনয় মোটামুটি ভালোই হয়েছে। নাটকের শেষ দৃশ্যের কম্পোজিশনটাও সুন্দর হয়েছে। 'রূপকারে'র কাছে একটি প্রশ্ন রাখা হয়তো অসঙ্গত হবে না—'চলচ্চিত্র চঞ্চরী' ও 'ব্যাপিকা বিদায়ের' পর আর কেন একটি প্রযোজনাও সেই 'ইমপ্যাক্ট' আনতে পারছে না?

চতুর্থ দিনের আকর্ষণ ছিল 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'চোপ, আদালত চলছে' নাটক। বিজয় তেন্দুলকারের মারাঠি নাটককে বাংলায় রূপান্তর করেছেন এস বি যোশী ও নীতিশ সেন। প্রথমেই বলি এই নাট্য-প্রযোজনাটিও 'বহুরূপী'র আর একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টি, এর জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ পাবেন নির্দেশক শম্ভু মিত্র। তাঁর অসাধারণ শৈল্পিক প্রয়োগ পরিকল্পনায় সামগ্রিকভাবে প্রযোজনাটি আমাদের আবেগ আর মননকে আন্দোলিত করেছে। আজকের সমাজে এটা একটি সত্য ঘটনা যে যখনই কারো স্খলনের সংবাদ আমরা পাই, তখনই আমরা তার বিচার করতে উদ্যত হই, যেন মনে হয় সমাজের ভালো করার যে মত আমরা প্রকাশ করেছি সেটাই একমাত্র অভ্রান্ত, তার বিরোধিতা করা অন্যায় অপরাধ। কিন্তু বিচার করতে গিয়ে দেখি যে আমরা নিজেরা পরস্পরের মধ্যে কতোটা হিংসা বহন করে চলেছি। অথচ নৈতিক মুখোশ পরে কঠোর বিচারকের আসন নিই। বিশেষ করে আসামীর কাঠগড়ায় যদি একটি

নয়ানজুলি : শমিতা বিশ্বাস, শ্যামল ঘোষাল এবং সুখেন দাস

নারীতে দাঁড় করানো হয়, তাহোলে নানা-ভাবে তাকে বিচার করতে সবাই উদগ্রীব হয়ে ওঠে। হয়তো এই মেয়েটি বাঁচবার জন্য ও সৎ ইচ্ছাকে চিরন্তন করবার জন্য সাধারণ সামাজিক নিয়মে একটু 'অপরাধ' করে বসেছিল, কিন্তু কেন তার এই পদ-ক্ষেপের শৈথিল্য; আর বাঁচবার জন্য আর কিই বা সে করতে পারতো—এ প্রশ্নগুলো আমাদের মনে আসে না। মনের মতো বেঁচে থাকতে চাইলে মানুষকে তো ক্ষত-বিক্ষত হোতেই হবে, এই সত্যটিকে আমরা ধরতে পারি না 'চোপ, আদালত চলছে' নাটকটির মধ্যে বোধহয় এই সত্যকেই ভাষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই নাটকের আসামী বেনারেবাই-এর চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন তৃপ্তি মিত্র। মিঃ কার্ণি-কারের ভূমিকায় কুমার রায় একটি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। দেবতোষ ঘোষের 'সুখাবমে' ও উৎপল ভট্টাচার্যের কার্ণিক'ও দুটি বৈশিষ্টদীপ্ত চরিত্র-চিত্রণ।

শেষদিনে নাটমঞ্চ পরিবেশিত 'দশচক্রে'র অভিনয় হয়েছে অসাধারণ। 'বহুরূপী' এই নাটকের প্রযোজনা করে এর আগে নাট্য-রসিকদের আন্তর স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'দশচক্র' হোল ইবসেনের নাটক 'এ্যান এনিমি অফ দি পিপল'এর বাংলা রূপান্তর। এ নাটকের প্রধান পুরুষ ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ সমাজের কল্যাণই চেয়েছেন আজীবন। তাই জনদরদী হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। ডাক্তার একদিন আবিষ্কার করলেন যে জল কলোনীর লোকে পান করে তা দূষিত, সুতরাং তাকে পাল্টাতে হবে। এখবর সংবাদপত্রের সম্পাদক ও আরো কিছু লোককে উদ্বুদ্ধ করলো, তাঁরা বল-লেন এটাই হবে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁদের হাতিয়ার। তাঁরা প্রমাণ করবেন এইভাবে ওপরওয়ালা লোকেরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু ঘটনার গতি পরিবর্তিত হোল অন্যখাতে। ডাক্তারের দাদা মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান অমলেন্দু গুহই বিরোধিতা করলেন, জনমত অতি শীঘ্র তার দিকে গেল। ডাক্তার চাকরী হারালেন, জনতার কাছে 'জনদরদী' হোলেন 'জনশত্রু'! তবুও ডাক্তারের আশা রইলো এমনিভাবে সত্যকে চাপা যাবে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে গিয়েও এই সত্যকেই প্রোজ্জ্বল করে তুলতে হবে জনগণের কল্যাণের খাতিরেই।

ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহের চরিত্রে শম্ভু মিত্রের অভিনয় আমাদের আবার মন ভরিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ যন্ত্রণার নিঃসীমতা ও আনন্দ বিহ্বলতার উচ্ছলতার মুহূর্তে শ্রীমিত্রের অভিব্যক্তি ও সংলাপ উচ্চারণের ভংগিমা রীতিমতো আমাদের বিস্মিত করেছে। অমর গাঙ্গুলীর 'অমলেন্দু গুহ' একটি প্রাণবন্ত চরিত্র-চিত্রণ। অনেকদিন পর শ্রীগাঙ্গুলীর স্বচ্ছন্দ অভিনয় দেখে আমাদের ভীষণ ভালো লাগলো। একটা কথা বোধহয় খুব অসত্য নয় যে পাঁচদিন-ব্যাপী নাট্যোৎসবে ব্যক্তিগত অভিনয়ের ব্যাপারে 'চাণক্য' ও ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহের চরিত্রে রূপকার শম্ভু মিত্রই আমাদের আকৃষ্ট করেছেন।

সব শেষে নাট্যোৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে। প্রথমেই বলি নাটমঞ্চের নাট্যোৎসবের স্থান কলকাতা শহর থেকে মাঝে মাঝে দূরে অর্থাৎ মফঃস্বলেও হওয়া উচিত। নাট্যোৎসব না হোক অন্তত একটি নাটকের প্রযোজনাও হোতে পারে। তাতে নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারের কাজটা আরো ত্বরান্বিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ শহর কলকাতার লোক যেমন নাট্যানুরাগী মফঃস্বলের অনেক জায়গায় আজকে পরীক্ষামূলক নাটকের চর্চা স্বচ্ছন্দগতিতেই চলছে। ওই সে সব উদ্দীপক ঘটনাগুলোকেও নাটমঞ্চের স্বীকৃতির আলোয় আনা দরকার। আর সংগে সংগে আরো কিছু সহযোগী নাট্য গোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। চার-দিন কিংবা পাঁচদিন বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে শিল্পী নিয়ে নাটমঞ্চের প্রযোজনায় যদি চারটি বা পাঁচটি নাটক নাট্যোৎসবে পরি-বেশিত হয়, তাহোলেও বোধহয় খুব খারাপ হয় না। সহমর্মিতার সেতুবন্ধন বোধহয় তাতেই আরো দৃঢ়তর হোতে পারে।

আর একটি কথা। 'নবান্ন' নাটকটি নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির প্রযোজনার তালিকায় আনা উচিত। যে নাটকটিকে কেন্দ্র করে বাঙলায় অন্যরকম থিয়েটারের আস্বাদ এসেছে তাতো নিশ্চয়ই নাটমঞ্চ সমিতির মতো সার্থক গোষ্ঠীর প্রযোজনায় অভিনীত হওয়া প্রয়োজন।

নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কর্মীরা ইতি-মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এবার মনে হয় নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কাজ কিছুটা এগোবে। এই সমিতির স্বপ্ন সফল হোলে, আমাদের মতো আরো অনেকের শৈল্পিক স্বপ্ন বিভিন্ন প্রকাশের দিগন্তে পাখা মেলে দিতে পারবে।

—দিলীপ মৌলিক

পনের বছরের জিমন্যাস্ট কুমারী রুটা ওস্টারসডর্ফ (জার্মাণী) বারের মাথায় তাঁর দক্ষতা প্রদর্শন করছেন

খেলাধুলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি
পূর্বাঞ্চলের খেলা

কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ংলা বনাম উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলের রঞ্জি ফ খেলায় বাংলা ৭ উইকেটে জয়ী য়েছে। এই খেলাটি ছিল বাংলার এ রের উদ্বোধনী খেলা।

বাংলা দলের অধিনায়ক চুনী গোস্বামী স জিতে উড়িষ্যা দলকে ব্যাট করতে ন। প্রথমদিনের খেলায় উড়িষ্যা ৯ কেট খুইয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করেছিল। ৭৪ রানের মাথায় তাদের ৫ম উইকেট ড়ে যায়। উড়িষ্যার বি আর রাও ৪১ ন করে প্রথমদিনের খেলায় অপরাজিত কেন। বাংলার অধিনায়ক গোস্বামী ১৬ ন ৩টে উইকেট পান। কিন্তু গুহ এবং সী সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি। ২৭ রানে ১টা উইকেট পান এবং দোসী ২৪ ওভার বল করে একটাও উইকেট নিতে পারেননি।

দ্বিতীয় দিনে উড়িষ্যার প্রথম ইনিংস ১৬৬ রানের মাথায় শেষ হয়। রাও ৪৫ রান করে নট আউট থেকে যান। দ্বিতীয়-দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২১৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৫০ রানে এগিয়ে যায়। বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক অম্বর রায় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেন। বাংলার খেলার সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি—২ রানের মাথায় ১ম এবং ৮ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অম্বর রায় দলকে বিপদমুক্ত করেন। তিনি ১৫৫ মিনিট খেলে তাঁর ৭৭ রানে ১২টা বাউন্ডারী করেছিলেন। অম্বর রায় ও গোপাল বসুর তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ৭৯ রান, অম্বর ও শ্যামসুন্দরের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৪৩ রান এবং ভ্রিজিবয় ও রবি ব্যানার্জির ৮ম উইকেটের জুটিতে ৫০ রান সংগৃহীত হয়। উড়িষ্যা ৫০ রানের পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ২টি উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪ রান সংগ্রহ করে। উড়িষ্যার এই দুটো উইকেট নিয়েছিলেন সুব্রত গুহ মাত্র আট বল দিয়ে।

তৃতীয় দিনে উড়িষ্যার দ্বিতীয় ইনিংস ১২১ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা ৩ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭২ রান সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে জয়ী হয়। উড়িষ্যার দ্বিতীয় ইনিংসে সুব্রত গুহ ৫০ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে দলের জয়লাভের পথ সুগম করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উড়িষ্যা: ১৬৬ রান (রাও নট আউট ৪৫ এবং এ বি গোস্বামী ৩৮ রান। চুনী গোস্বামী ১৬ রানে ৩, আর ব্যানার্জি ৩৬ রানে ২ এবং ডি সরকার ৪৫ রানে ২ উইকেট)

ও ১২১ রান (অরুণ প্যাটেল ৩৮ রান। সুব্রত গুহ ৫০ রানে ৬ এবং দোসী ২৫ রানে ২ উইকেট)

বাংলা: ২১৬ রান (অম্বর রায় ৭৭ রান। এইচ ভিজ ১৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ৭২ রান (৩ উইকেটে। পি পোদ্দার ৩০ রান)

আসাম বনাম বিহার

পূর্বাঞ্চলের রঞ্জি ট্রফির খেলায় বিহার এক ইনিংস এবং ১২৫ রানে আসামকে পরাজিত করে।

প্রথম দিনের চা-পানের কিছু আগে আসামের প্রথম ইনিংস ১৪৪ রানের মাথায় শেষ হলে বিহার দ. উইকেটের বিনিময়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে বিহার প্রথম ইনিংসের ৩০১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। তিলক রাজ ১০৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। রবিন মুখার্জির ৬৮ রান এবং রমেশ সাকসেনার ৭৯ রান উল্লেখযোগ্য। আসাম দ্বিতীয় ইনিংসের ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৩২ রান তুলে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নেয়। অঞ্জন ভট্টাচার্য আসামের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় মাত্র ১০ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

বাংলা বনাম আসাম

আসাম টসে জিতে বাংলাকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেয়। তারা প্রথম-দিকে লাভবান হয়—বাংলার ৩২ রানের মাথায় ১ম এবং ৪৬ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় উইকেটের জুটি গান্ধোত্রা এবং অম্বর রায় খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁদের ৩য় উইকেটের জুটিতে ৭৬ রান সংগ্রহ করে দেন। এরপর অম্বর রায় এবং শ্যামসুন্দর মিত্র ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৯৫ রান এবং শ্যামসুন্দর মিত্র এবং অধিনায়ক চুনী গোস্বামী ৫ম উইকেটের জুটিতে ৭৩ রান তুলে দেন। অম্বর রায় ১৫৫ মিনিট খেলে তাঁর ৯৪ রানে ১৩টা বাউন্ডারী করেন, মাত্র ৬ রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী করার গৌরব হাত ছাড়া করেন। চুনী গোস্বামী ৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে বাংলা প্রথম ইনিংসের ৩১০ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলার

অম্বর রায়

সমাপ্তি ঘোষণা করে। আসামের প্রথম ইনিংস ১৩৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। খেলার এক সময় আসামের ৬টা উইকেট পড়ে মাত্র ৫৭ রান দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সপ্তম উইকেটের জুটি চৌধুরী এবং হোসেন ৫৭ রান তুলে দলের কিছুটা মুখরক্ষা করেন। বাংলার লেফট আর্ম স্পিনার দিলীপ দোসী ৪৪ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে আসামের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। তাঁর বোলিংয়েই উইকেটকিপার জিজিবয় চারজনকে স্টাম্পড করেন।

আসাম ১৭৪ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৬৭ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে আসামের আরও ১০৭ রানের প্রয়োজন হয়।

তৃতীয় দিনে আসামের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা এক ইনিংস ও ১৭ রানে জয়লাভ করে। দোসী ৩৬ রানে ৪টে এবং সরকার ৩৫ রানে ৪টে উইকেট পান। দুটো ইনিংসের খেলায় দোসী ৮০ রানে ৯টা, সরকার ৫৯ রানে ৬টা এবং গোপাল বোস ২৬ রানে ৩টে উইকেট পান। বাংলা দলের ফিল্ডিং খুবই খারাপ হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাংলার খেলোয়াড়রা কমপক্ষে ৯টা 'ক্যাচ' ফেলেছিলেন এবং তৃতীয় দিনে গোটা চারেক।

উপর্যুপরি দুটি খেলায় সরাসরি জয়লাভের ফলে বাংলা মোট ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা আর একটা ম্যাচ খেলবে—বিহারের বিপক্ষে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা : ৩১০ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। অশোক গান্ধোত্রা ৪৩, অম্বর রায় ৯৪, শ্যামসুন্দর মিত্র ৬৫ এবং চুনী গোস্বামী নট আউট ৫২ রান। এ ঘটক ৪৯ রানে ২, এন সভাপণ্ডিত ৮৮ রানে ২ এবং এ চৌধুরী ৭৬ রানে ২ উইকেট)

আসাম : ১৩৬ রান (এ চৌধুরী ৩৪ রান। দোসী ৪৪ রানে ৫, গোপাল বোস ২২ রানে ২ এবং ডি সরকার ২৪ রানে ২ উইকেট)

ও ১৫৭ রান (এ হোসেন ৩৪ রান। দোসী ৩৬ রানে ৪ এবং সরকার ৩৫ রানে ৪ উইকেট)

বিহার বনাম উড়িষ্যা

কটকে বিহার বনাম উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বিহার ৭ উইকেটে উড়িষ্যাকে পরাজিত করেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উড়িষ্যা : ১৩০ ও ১৩৬

বিহার : ১৯২ ও ৭৫ (৩ উইকেটে)

সাউথ ইস্ট এশিয়ান পেনিনসুলা গেমস

কোয়ালালামপুরের মারদেকা স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৬ষ্ঠ সাউথ ইস্ট এশিয়ান পেনিনসুলা গেমসে থাইল্যান্ড ৪৪টি স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। ১৯৬৯ সালের চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ ২০টি স্বর্ণ পদক পেয়ে ৪র্থ স্থানে নেমে গেছে। পরবর্তী আসর বসবে ১৯৭৩ সালে।

ফুটবল খেলার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ২-১ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি চারবার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করে।

স্বর্ণ পদক জয়ের খতিয়ান

১ম থাইল্যান্ড (৪৪টি), ২য় মালয়েশিয়া (৪১টি), ৩য় সিঙ্গাপুর (৩২টি) এবং ৪র্থ ব্রহ্মদেশ (২০টি)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৪ সংখ্যা
মূল্য—১·৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট—১·৫২ পয়সা

Friday, 31st December 1971 শুক্রবার, ১৫ই পৌষ, ১৩৭৮ Rs. 1.52 P

সূচীপত্র

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা

সূচীপত্র

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা

প্রচ্ছদ : শ্রীতুষার সান্যাল

সম্পাদকীয়

॥ ১৯৭২ ॥

আর মাত্র কয়েকটি দিন। ১৯৭১-এর দিন শেষ হয়ে এল, আসছে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের নতুন বৎসর। পৃথিবীর সর্বত্র এই সময় থেকে খ্রীষ্টীয় বর্ষগণনার শুরু তাই বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভের মুহূর্তটি সর্বদেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নতুন আশা, নতুন আশ্বাস বহন করে আনে নতুন বৎসর আর সেই সঙ্গে প্রায় সবার অলক্ষ্যে অনেক আনন্দ-বেদনার স্মৃতি বুকে নিয়ে পুরাতন বৎসর বিদায় নেয়।

এই ক'টি দিন যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উৎসবের দিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যিনি পরম-পিতার বার্তা এনেছেন মানব সন্তানের কাছে" সেই মহান পুরুষ যীশু এনেছিলেন নবজীবনের বার্তা। দুর্গত মানুষের দুঃখহরণ করাই ছিল তাঁর ব্রত। তাই তাঁর জন্মদিন বড়দিন বা ক্রিসমাস হিসাবে বিশ্বের সর্বত্র পালিত হয়। যীশু ত্রাণকর্তা, বিশ্বের অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষের কাছে তিনি এনেছিলেন নবজীবনের বার্তা।

আজ এই আনন্দলগ্নে খ্রীষ্টানুসারী এক বিরাট সমাজের ভণ্ডামি ও শঠতার পরিচয় পেয়ে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আজ স্তব্ধ। যে সামরিক শক্তির পৈশাচিক বর্বরতা বাংলাদেশের নগরে ও গ্রামে নিরীহ জনগণকে নির্বিচারে দিনের পর দিন হত্যা ও লুণ্ঠন করেছে, তাদের সেই কলঙ্কমাখা হাতকে শক্তি যুগিয়েছে আমেরিকার খ্রীষ্টানুসারী সমাজের শাসকগোষ্ঠী। বাংলাদেশের মানুষ যখন জঙ্গীশাহীর প্রবল নিষ্পেষণে ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ করেছে তখন তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু সেই পাপচক্র যখন ভারতবর্ষের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী নিশ্চিহ্ন করার উপক্রম করল তখন তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন। সঙ্গে রইলেন সমাজবাদী চীন। ১৯৭১-এর দুঃস্বপ্নের এই দিনগুলির আজ অবসান ঘটেছে। আজ সম্ভাবনাময় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিমিরবিদারী নতুন দিন সমাগত। নতুন আলোয় নবদিগন্ত উদ্ভাসিত।

১৯৭১-এর অন্তিম লগ্নে প্রবল প্রতিপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে ভারতবর্ষ যে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল তার অবসান ঘটেছে। ভারতবর্ষের কণ্ঠে আজ বিজয়ীর জয়মাল্য। একটি নতুন রাষ্ট্র এই সংঘর্ষের ফলে সুপ্রতিষ্ঠ হল। সেই নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ভারত এক মহান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারত যে শৌর্য এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তা পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। ভারতের বীর যোদ্ধাগণ স্থলে, জলে, আকাশে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ভারতবর্ষের মানুষকে জগৎসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। আগামী বৎসরটি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসের অনেক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হবে। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে যাদের স্থান, ইতিমধ্যেই তাদের স্বস্থানে গমন শুরু হয়েছে।

যে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা গড়ে তুলেছেন তার পুনর্গঠনে ভারতবর্ষকে অনেকভাবে সাহায্য করতে হবে। নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের আশ্রয়হীন জনগণকে আশ্রয় দিতে হবে, অচল শিল্পসংস্থাকে সচল করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রগুলিকে ফলপ্রসূ করে কৃষিপণ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়া এই শিশুরাষ্ট্রকে নিষ্ঠুর শ্যেনপক্ষীর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকেও রক্ষা করতে হবে। ভারতের জনগণকে এই মহান কর্তব্য পালনে সবরকম ত্যাগস্বীকার করতে হবে। ভারতের বীর জোয়ানগণ আত্মবলিদান দিয়ে যে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছেন ভারতের সাধারণ মানুষও সর্বতোভাবে সেই রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।

ভারতের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পবিত্র সংকল্প নিয়ে নতুন বৎসরে ভারতের জনগণকে অগ্রসর হতে হবে। পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, বিশ্বমানবের কল্যাণ হোক ভারতবর্ষ তাই চায়। নববৎসরে ভারতবর্ষের এই আদর্শকে সার্থক করার মহান দায়িত্ব সমগ্র ভারতবাসীর। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ অশেষ সম্ভাবনা নিয়ে দ্বারপ্রান্তে সমাগত।

২৫. ১২. ৭১

মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ। মোক্ষম, ইংরাজীতে খেলার ভাষায় যাকে বলতে পারা যায় কী (key) ম্যাচ। এটার পর উভয় পক্ষেরই আর একটা করে খুব হালকা খেলা, সুতরাং এ-ম্যাচে যে জয়ী হবে, লীগ তার মুঠোর মধ্যে।

এদিকে বৌবাজারের সতেরো নম্বর ললিত দাঁ লেনে বিয়েবাড়িতে হৈ-হৈ পড়ে গেছে। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কনের বাড়িও কাছেই, অমৃত সরখেল লেনে। কথাটা চাপা থাকেনি, সেখানেও সবার মুখ শুকনো। বড়দের মধ্যে অনেকে ললিত দাঁ লেনে এসে জড়ো হয়েছেন। নানারকম জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে, লোক ছোটানো হচ্ছে চারিদিকে, কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

গোলমালের মধ্যে একজন বলে উঠল—'লাটুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে? সে হয়তো বলতে পারে।'

'ঠিক! ঠিক!...লাটু! লাটু!...কেন যে মনে পড়েনি?...দ্যাখ্ আছে কিনা!...'

—চারিদিকেই একটা সমর্থন উঠল। ছোটদের একটা দল ছুটল লাটুর বাড়ির দিকে। কাছেই, একটা ছোট্ট গলি পেরিয়ে।

একটু পরে ধরে-ঘুরে নিয়ে এল, আসতে যেন নারাজ।

বয়স বেশি নয়, তেরো-চোদ্দর মধ্যে, বেঁটে, গাঁট্টা-গোঁট্টা, একটু হাঁদা-হাঁদা চেহারা, এদিকে মেয়ে মহল আর পুরুষ মহল নিয়ে সমস্ত তল্লাটটার গেজেট, বিশেষ করে ওর নিজের বয়স থেকে আটাশ-তিরিশ বয়স পর্যন্ত সবার সম্বন্ধে। হাঁদা-হাঁদা অথচ কাজের বলে সবারই পেটোয়া। সব ঠাঁই ঘর বলে কখন কোথায় পাওয়া যাবে ঠিক থাকে না। পাড়ার ছোট্ট তেকোণা মাঠটায় ছোটদের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ হচ্ছিল, সেখান থেকে ধরে নিয়ে এসেছে।

এসে বলল—জানে না।

মুখটা একটু গোঁজ করে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বোঝা গেল জানে, বলতে চাইছে না। পিঠে হাত বুলিয়ে নানারকম প্রলোভন দেখাতে তখন আবার সহজ ভাবটা ফিরে এল মুখে। চেপে না থাকলে ওপরের ঠোঁটের মাঝখানটা একটু উলটে গিয়ে দুটো দাঁতের কিছুটা বেরিয়ে পড়ে। তাতে হাঁদা-হাঁদা ভাবটা একটু বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে অল্প একটু হাসির ভাব ফুটে ওঠে। না হাসলেও। পিঠ-চাপড়ানি পেয়ে একটু আশ্বাস দেওয়ার মতো করেই বলল—'ভাবনা নেই, শিবুদা একটা মগডালে জায়গা পেয়ে গেছে। ধরে বসবার জন্যে একটা ছোট্ট...'

'মগডাল!...বলে কি ছোকরা! মগডালে বসে আছে অথচ ভাববার কিছু নেই!...কোথায়?...কি করতে!...তার বিয়ে, আর!...'

—একটা উৎকট কলরব উঠছিল, বৃদ্ধ-গোছের একজন হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে ওকেই প্রশ্ন করলেন—'কোথায় সে মগডাল? কেন আছে বসে তার ওপর? একটু গুছিয়ে বলবি তো?'

লাটু বলল—'ম্যাচ দেখবার জন্যে। ইডেন গার্ডেনে গেট থেকে পাঁচ নম্বর গাছে। টিকিট পেলে না, জামাটামা সব ছিঁড়ে গেছে...'

অবাক হয়ে গেছে সবাই। যেন কি বলবে, কি করতে হবে সম্বিত পাচ্ছে না। বয়স্ক-গোছের একজন ভ্রূ চেপে, যেন বোঝবার চেষ্টা করে টেনে টেনে প্রশ্ন করল—'টিকিট—পেলে না—বলে—মগডালে উঠে—একা—বসে—আছে!...'

'একা নয়, তিনজন — মিত্তিরদের বকুদা, আর একজন...'

—চিত্রটার উগ্রতায় সবার যেন সম্বিত ফিরে এল।

—'কী সর্বনাশ! মগডাল, তায় তিনজন!...দেখছ কি, শীগগির ট্যাক্সি করে ছোট! দ্যাখো, ডাক্তার বোসের গাড়িটা গ্যারাজে আছে কিনা...'

একজন বলল—'গেঁদু বাড়িতে থাকে তো তাকে নিয়েই যাও, ফার্স্ট-এডের সরঞ্জাম নিয়ে—অবস্থা বললেই সে যাবে। ...কী সর্বনাশ—সেই আকাশ-ছোঁওয়া দেবদারুর গাছে!...তুই নিজের চোখে দেখে এলি?'

'তুই এলি যে চলে?'—একজন প্রশ্ন করল। তারই পিঠে অপর একজন—'এলি তো খবর দিলি না যে?'—একটু কড়া চোখেই।

লাটু এর উত্তরটা এড়িয়ে প্রথমের দিকেই চেয়ে ঠোঁট উলটে বলল—'পাকে'

আমাদের নিজেদের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ছিল যে...'

'ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান!...ঐ এক পাপ হয়েছে!...'

একটা কলরব আবার চাড়া দিয়ে উঠছিল মিশ্রকণ্ঠে, এই সময় একটা ট্যাক্‌সি এসে দাঁড়াল সিঁড়ির সামনে। একজন প্রৌঢ় খুব উদ্বেগের সঙ্গে নামতে নামতে বললেন—'নাঃ, সেখানেও সেই...এমনকি...'

সমস্বরে উত্তর হোল—'পাওয়া গেছে!!'

'কোথায়!'—সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েই একবার জটলার দিকে, একবার ভেতর-বাড়ির দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন প্রৌঢ়। বরের বাবা মতিলাল।

বৃদ্ধ লোকটি কনের ঠাকুরদাদা। একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। আবার গোলমাল উঠতে যাচ্ছিল, হাত তুলে থামিয়ে বললেন

—'গোলমাল কোর না তোমরা। পাওয়া গেছে, সে টিকিট না পেয়ে গাছে উঠে ম্যাচ দেখছে—যেমন আজকাল হয়েছে...' এমন জমাট খবরের এত জোলো রিপোর্ট সবার মনঃপূত হওয়ার নয়। এদিক-ওদিক থেকে চাপা গলায় সম্পূরণ হোল—'ইডেন গার্ডেনে...মগডালে... ইস্টবেঙ্গল-মোহন...'

'আঃ, আবার ধুনো দেয়!...তুমি ট্যাক্‌সিটা ছেড়ো না। এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছিলাম আমরা—সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্‌সিটা পাওয়া গেল, ভালোই হোল। তুমি উঠে এসো, ওরা নামিয়ে আনছে...'

'আমার বন্দুকটা নিয়ে যাবে!'—এতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে ক্ষেপে উঠলেন মতিলাল, চড়া গলায় বললেন—'না নামতে চায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলী করে নামাবে। না, ও-ছেলেকে আস্কারা দেওয়ার পাত্র নই আমি কাকা। আস্ত না নামতে চায় তালগোল পাকিয়ে নামুক।...উঃ! সূয্যি ডুবলেই যাকে বরের আসনে বসতে হবে, সে কিনা ইডেন গার্ডেনে মগডালে বসে...'

বৃদ্ধ নিজে উঠে পিঠে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে এলেন—'আর খোঁজ যখন পাওয়া গেছে। সে পড়বার ছেলেও নয় খামোকা। এসো জোগাড়যন্ত্র কর'সে।'

ভেতরে নিয়ে গেলেন পিঠে হাত দিয়ে।

দু' পক্ষেরই জনপাঁচেক ট্যাক্‌সিটা করে ছুটল। লাট্টুকে তুলে নেওয়ার কথা উঠতে আঁৎকে উঠে বলল—তাকে দেখতে পেলে দু-আধখানা করে ছাড়বে শিবুদা।

অনেকে কাজের দিকে উঠে গেলে, কয়েকজন বারান্দাতেই লাট্টুকে নিয়ে পড়ল। যারা একটু কম বয়সের।

'তা হ্যাঁরে, জানতিস তো এসে বলতে হয়। কী সর্বনাশটা হতে যাচ্ছিল ম্যাথ লিকিম!'

'শিবুদা এলেও তো সর্বনাশই!'—একটা চমচম মুখের কাছে তুলে থেমে গিয়ে [illegible] লাট্টু। ওর জন্যই তো সামলে খেতে [illegible] ও [illegible] বর্কশিপ [illegible]
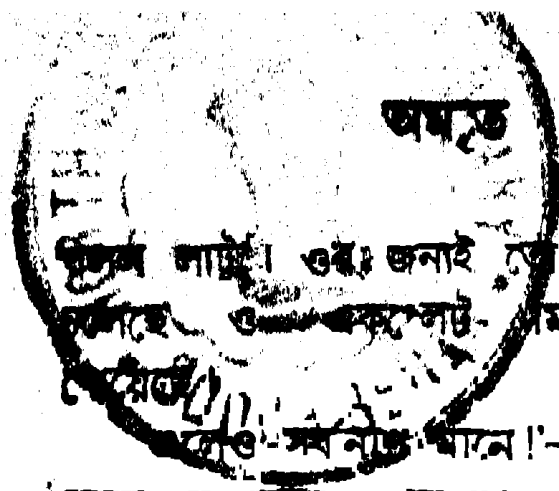
[illegible]ও-সব [illegible] মানে!'—বিস্মিত প্রশ্ন হোল কয়েকজনের মুখে।

'শিবুদা তো এ-বিয়ে করছেই না!'

'তার মানে! সব ঠিকঠাক, অথচ!...'

অবাক হয়ে গেছে সবাই।

'বিশাখাদি' তো ইস্টবেঙ্গল!'—চেবানো থামিয়ে এমনভাবে চেয়ে রইল, যেন, এত সহজ কথাটা কেউ বুঝতে পারছে না কেন!

পরে একটু টীকার মতো করে বলল—'করবে নেমে এসে, সে যদি মোহনবাগান জেতে, নৈলে নয়। চান্স কম, ওদের ব্যাক ভাস্তার পাল এসে গেছে।'

'নৈলে করবে না!'—একজন চটেই উঠল। বলল—'মামার বাড়ি পেয়েছে! ওরা বাঙাল, ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে আসনে বসিয়ে মেয়ের হাত হাতে তুলে দিয়ে—

আর মালাও নয়, লাক্‌লাইন দড়ি দিয়ে বেঁধে দেবে।'

আধা-বসা হয়ে শুনছিল, উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

লাট্টু একটা পানতুয়া মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ঠোঁট উল্টে বলল—'বিশাখাদিও তো হাত বের করবে না।'

'তার মানে!...ছোঁড়ার পেটে আজগুবি খবরের গাদি লেগে রয়েছে, অথচ বের করতে চায় না, কোন্‌দিন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে বড় রকমের! তা হাত বের করবে না কেন? বিশাখাদিদি তোর? কবে বললে তোকে?'

'আজ সকালেই।'—একটা কামড় দিলে, হাতের উলটো দিকে রসটা চাটতে চাটতে বলল। —'আমি বলতে গিয়েছিলাম কিনা শিবুদার হয়ে।'

'তা কি বললে তোর বিশাখাদিদি?'—একটু ঘন হয়ে বসেছেও সবাই।

লাট্টু বলল—'বললে—যা যাঃ, তোর শিবুদাকে বলে দিস—যেই হারুক, যেই জিতুক, আমি ও-ঘটিকে করবই না বিয়ে।'

খাওয়া হয়ে গেছে, উঠে পড়ে মুখ মুছতে মুছতে পার্কের দিকে ছুটল।

হুজুগের ওপর বিশাখার কথাটা চাপিয়ে আরও ঘোরালো করে তোলবার চেষ্টা করল কয়েকজন হুজুগেবাজ ছোকরা, কিন্তু বরের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তর সামনে কনের কথাটা বিশেষ আমল পেল না। কিছুটা নাড়াচাড়া হোল, কোন কোন মহলে কৌতুকেই, বজ্জদের মধ্যে কিছু আজকাল-কার মেয়ে নিয়ে, কিন্তু শিবু কি অবস্থায়, কি আকার-প্রকার নিয়ে ফেরে তাই নিয়েই উদ্বেগ আর কৌতূহলের মধ্যে ওদিকটা আস্তে আস্তে চাপা পড়ে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেই গাড়িতে শিবুও এল ফিরে। অক্ষত শরীরেই, যদি ভেতরে চোট-ফোট কিছু লেগে থাকে তো তা হজম করবার ক্ষমতা রাখে। শরীর অক্ষতই, তবে কামিজ আর খালতা পাত-লুনটার দিকে প্রায়-চাওয়া-যায় না। সামলে-সুমলে নিয়ে নামল মোটর থেকে। চাপ ভিড় জমেছে, বলবার লোক আছে, একজন পেছন থেকে বলল—'ওকে ঐরকমই বরাসনে বসিয়ে দেওয়া হোক! কপালে বেশ একটা আঁচড়ও আছে, চন্দনের কাজ করবে।'

একবার নীচু ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে সবার সঙ্গে উঠে গেল শিবু।

অক্ষতই। একটু খোঁড়ালও না।

এরা পৌঁছে, হন্তদন্ত হয়ে লাট্টুর নির্দেশমতো গেট থেকে পাঁচ নম্বর দেব-দারু গাছটার নীচে পৌঁছেছে, 'গোল! গোল! সাবাস ইস্টবেঙ্গল!' করে একটা আকাশ-ফাটানো চিৎকার! সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে, বোধ হয় হাত আলগা হয়ে একটা ছোট পাতলা ডাল মুঠোয় করে ওপর থেকে নীচের পড়ে ছুটে পালাবে, এরা ধরে ফেলল। শিবুই। বিশাখার সিঁদুরের জোর—ঠিক তাদের মাথায় একটা মাউণ্টেড পুলিশ ভিড় সরাতে সরাতে একেবারে জ্যামিতির সরলরেখায় নীচে এসে দাঁড়িয়েছে, শিবু সোজা তার ঘাড়ের ওপর, তারপরে গড়িয়ে ঘোড়ার পিঠ হয়ে জমি। একেবারে মগডালে ছিলও না, ওটা লাট্টুর মনগড়া। বাহাদুরি দিতে। পালাচ্ছিল, এরা ধরে ফেলল, এর পর পাঞ্জাবী পুলিশ ব্যাপারটা বোঝবার আগেই ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

একটা নতুন হৈ-চৈ উঠল। কনের বাড়িতে একটা দল ছুটল। আয়োজনে যে একটা শিথিলতা এসেই পড়েছিল অনিশ্চয়-তার আশঙ্কায়, সেটা সরে গিয়ে আবার দ্বিগুণ তৎপরতার সঙ্গে সব চালু হয়ে গিয়ে দুটো গলিই গমগম করে উঠল। বরের কারসাজিটা একটা আলাদা প্রাণ-চঞ্চলতা এনে দিয়েছে সমস্ত ব্যাপারটাতে।
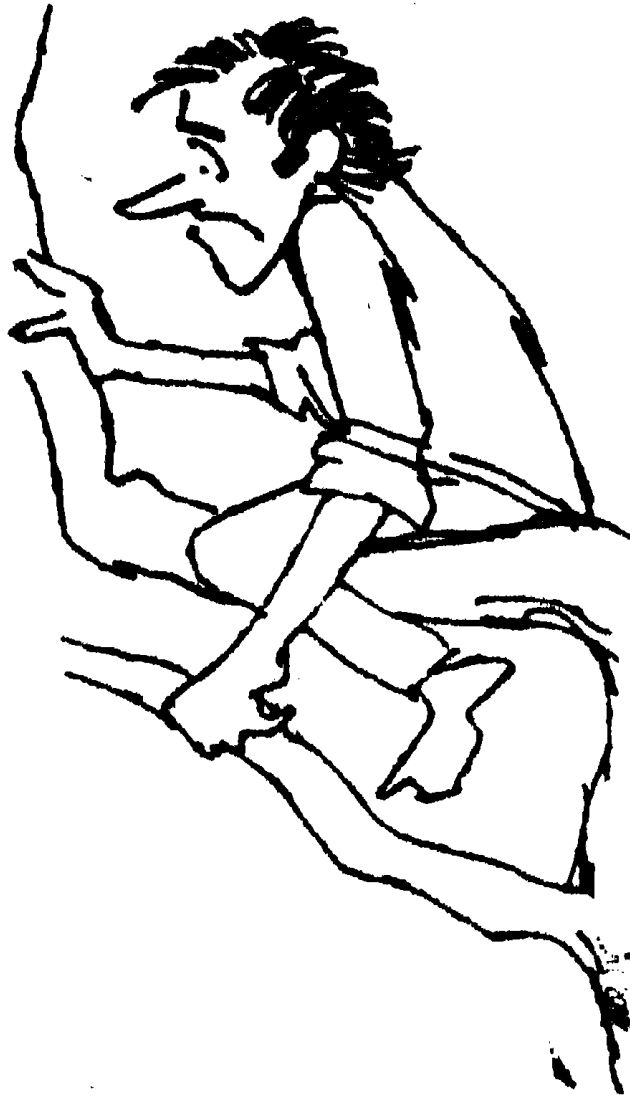
বর কিন্তু এদিকে বেঁকে বসেছে করবে না বিয়ে। কিছু রা কাড়ে না। উঠে সবার ঠেলাঠেলিতে সামনের বৈঠকখানা পর্যন্ত গিয়ে সেই যে পাশেই একটা সোফার হাতল ধরে বসে পড়েছে আর টলানো যাচ্ছে না। হাজার প্রশ্ন, হাজার বলা-কওয়া, কোন জবাবও দেয় না, মাথাটা গোঁজ করে হাতল চেপে বসে আছে।

কনের ঠাকুরদাদাকে ডাকতে পাঠানো হয়েছিল। ঘরটায় তিল ফেলবার জায়গা নেই, তিনি ভিড় ঠেলে এসে পিঠে হাত দিলেন। খোলা পিঠের ওপরই, অর্ধেকটা কাপড় নেই।

মুখটা একটু নামিয়ে গলায় আদর ঢেলে বললেন—ছিঃ, খেলাটা কি এত বড় করে দেখতে আছে? বড়ো হয়েছ, কলেজে পড়ছ। আর যদি অন্য কিছু হয়ে থাকে তো আমায় বলো না। বলতো দাদু, সব কিছুরই তো প্রতিকার আছে।'

'এর প্রতিকার কিছু নেই। মোহন-বাগান যে হেরে গেল।'

—লাট্টুর গলা। ভিড়ে লুকিয়েও নয়। সবাই ঘুরে দেখল ভিড় গলে প্রায় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কথাটা বলে ওলটান ঠোঁটে হাঁদাপনা হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ঘুরে ঘুরে দুপাশে সবার মুখের দিকে চাইল, একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল—'পার্কেও আমাদের খেলায় মোহনবাগানই রসগোল্লা খেলে কিনা—দুটো '—আঙুল তুলে দেখাল। সবাই চুপ করেই গেছে ওর বলার ভঙ্গিতে কিছুটা তাক লেগে গিয়ে। কনের ঠাকুরদাদা ওকেই, একটু বোধহয় ধমক দিয়েই কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় প্রায় খেলার মাঠেরই হট্টগোল। একপাল ছেলে—'হুররে!...ভ্রু! ভ্রু!...লাস্ট মোমেন্টে —মোহনবাগান!...

ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সবাই। তারই মধ্যে শিবুর মগডালের সঙ্গী বন্ধু ঠেলেঠুলে একেবারে সামনে এসে বলল—'শুনলাম রেডিও বন্ধ, তোরা টের পাসনি। আমি সোজা গাছ থেকে নেমে ছুটে আসছি।...এবার তুই ঝুলে পড়তে পারিস শিবে—দেখিস, বলে দিচ্ছি...'

—ঝোঁকের ওপর অতটা খেয়াল হয়নি, হঠাৎ ঠাকুরদাদার সঙ্গে চোখো-চোখি হয়ে যেতে জিভ কেটে পেছনে চাপ দিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠাকুরদাদা পিঠে হাতটা চেপে বললেন —নাও, শুনলে তো? লক্ষ্মী দাদু আমার। ওদিকে সময় হয়ে যাচ্ছে, সাজাগোজা সবই বাকি।...এবার তো সমান-সমান গো।'

একজন রসিকগোছের ও'রই সমবয়সী, শিবুর সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধও বোধহয়—ঠোঁটে হাসি চেপে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন—'সব তো হোল, কিন্তু এরপর আবার মোহনবাগান যদি ডিগবাজি খেয়ে বসে—ডাইভোর্স করে দেবে না তো নাতনীকে? একটা বরং পাট্টা লিখিয়ে নাও...'

ঠাকুরদাদা হাসতে হাসতে ঘুরে চেয়ে বললেন—'ততদিনে নাতনীই আমার ভায়াকেই ইস্টবেঙ্গল করে নেবে—সেয়ানা মেয়ে—আমিই পাট্টা লিখে দিচ্ছি, মিলিয়ে নিও।'

—সবার হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে আস্তে আস্তে শিবুকে তুলে দাঁড় করালেন।

আস্তে আস্তে পা-ও বাড়াল শিবু।

মানিকজোড়

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাম্যবাদীর উক্তি

শ্রেণীবৈরীর সঙ্গে
কোলাকুলি করি রঙ্গে।
মরছে মরুক চাষা উজবুক
অস্ত্র পাঠাই বঙ্গে।

ধর্ম-অন্ধ জঙ্গী
আফিংখোরের সঙ্গী।
ধর্ষিতা নারী কাঁদছে কাঁদুক
আমি উদাসীন ভঙ্গী।

গণতন্ত্রীর উক্তি

ডিকটেটরের সঙ্গে
কোলাকুলি করি রঙ্গে।
গণতন্ত্রীরা মরছে মরুক
শস্ত্র পাঠাই বঙ্গে।

তুমিও জোগাও অস্ত্র
আমিও জোগাই শস্ত্র।
তোমার চাইতে আমি আরো ভালো
বিতরি অন্ন বস্ত্র।

একটি কলঙ্কের কথা

পরিমল গোস্বামী

৯০ বছরের বৃদ্ধা লক্ষ্মী দেবীর কাছে এসেছি তাঁর কালের কিছু কথা শুনতে। আমি কাগজের রিপোর্টার— অর্থাৎ বিশেষ প্রতিনিধি। নানা জাতের সংবাদ সংগ্রহ করে আমাকে চিত্তহারী কাহিনী রচনা করতে হয়।

লক্ষ্মী দেবী আগেও আমাকে তাঁর সময়ের কিছু কিছু কথা বলেছেন, এবং পাঠকদের কাছে তা খুব মনোহর মনে হয়েছে। আজ তিনি শোনাবেন সেকালের অবেকটা বিয়ের কথা। কিন্তু একটা ছোট্ট ঘটনায় বিষয়ের বদল ঘটে গেল। সেই কথাটাই আজ লিখতে বসেছি। খুব চমৎকার বলতে পারেন লক্ষ্মী দেবী। বয়স হলে কি হয়, দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি আজও প্রখর, শুকনো দেহটি আজও চলনক্ষম। আমি প্রস্তুত হয়ে বসেছি তাঁর বিছানার পাশে। শীতকাল, লেপে পা ঢেকে বালিশে হেলান দিয়ে আছেন তিনি, শোয়া আর বসার মাঝামাঝি অবস্থায়।

বললেন, সেকালের কত কথা যে আছে, একালে তোমরা তার অনেক কথা হয়তো বিশ্বাসই করবে না।

এইটুকু বলেই লক্ষ্মী দেবী হঠাৎ থেমে পায়ের দিকে তাকালেন। দেখা গেল খানিকটা জায়গা উটের পিঠের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। তারপর দেখা গেল একটি শাদা মোটা বিড়াল তার আরামশয্যা থেকে লেপের পাশ দিয়ে নিচে নেমে পড়ল, এবং পিঠ ধনুকের মত বাঁকা করে হাই তুলে আড়-মোড়া ভেঙে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে আগন্তুকের উৎপাত তার ভাল লাগেনি।

লক্ষ্মী দেবী তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তার বিদায় দৃশ্য দেখলেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি যেন অতীতের দিকে চালনা করে কোনো একটা নতুন স্মৃতিকে মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কোনো কথা নেই। আমি অপেক্ষা করে বসে রইলাম। প্রায় দু মিনিট নীরব থাকার পর লক্ষ্মী দেবী বললেন সেকালের বিয়ের কথা আজ থাক, আজ বিড়ালের কথা বলি। আমার বিড়ালটাকে দেখে সেদিনের সেই কলঙ্ক-কথাটা মনে পড়ে গেল। সেও তোমার কাগজের পক্ষে বেশ মুখরোচক হবে। তা ছাড়া সে একটা বড় সমাজ ইতিহাসও বটে। কি বল, শুনবে?

কেন শুনব না? কলঙ্ককথা যদি হয় তবে তা ইতিহাস হোক না হোক, তার নিজেরও তো যথেষ্ট দাম থাকা উচিত। আপনি বলুন।

ঠিকই বলেছ। তবে শোন। কিন্তু আমার কথা যখন লিখবে, তখন আমি যেমন বলছি তেমন ভাষায় লিখো না, ভাষাটা একটু পালিশ করে নিও।

আমি কথা দিলাম। এবং আমি যে ভাষায় লিখেছি তা এই—

লক্ষ্মী দেবী বলতে লাগলেন, যখন ঘটেছিল তখন থেকেই ঘটনাটা গোপন আছে। প্রকাশ পেলে আমাদের সবারই বিপদ হত। আর যারা গোপন রেখেছিল

তাদের কেউ আর বেঁচে নেই, শুধু আমি যে কেমন করে টিকে আছি আজও, এবং কেন আছি তাই বা কে বলবে? হয়তো সেই ৭০ বছরের গোপন কথাটা আজ তোমাকে বলব বলেই। সে একটা অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা যার জন্য একটা প্রগতির বেগ মাঝপথে থেমে গেল। যেন রেলগাড়িখানা একটুখানি এগিয়ে যখন ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলতে আরম্ভ করবে, সেই সময় এনজিনখানা হঠাৎ ব্রেক্‌কে দাঁড়াল।

আমরা ঘরের বৌরা একটু একটু লেখাপড়া শেখার পরেই শিক্ষায় আর স্বাধীনতায় এগিয়ে-যাওয়া কয়েকজন মহিলা দেখলেন, এভাবে চললে তো এ কাজে অনেক দেরী হবে, তাই তাঁরা এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। এখন তোমরা যাকে অন্তর্ঘাতি কাজ বল, তাই আর কি। কয়েকজন শিক্ষিতা মেয়ে ঘরে ঘরে নানা কৌশলে প্রবেশ করে নারী স্বাধীনতার কাজে ঘরের বৌদের দীক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। আসতেন ছদ্মবেশে, ঘরের মেয়ে বৌ-এর বেশ ধরে, মাথায় ঘোমটা টেনে। নানা ছুতোয় আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার কাজে অনেক বৌকে রিক্রুট করা দরকার, তাই এই কৌশল। খুব সাবধানে একটু একটু করে তাঁরা আমাদের নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। অবশ্য সবারই পরিচিত বাড়িতে তাঁরা আসতেন। আগে পরিচয় না থাকলে গায়ে পড়ে খুব চতুরতার সঙ্গে পরিচিত হতেন এবং প্রকাশ্যে সেকেলে বৌদের ভূমিকা অভিনয় করতেন। এবং আশ্চর্য ব্যাপার অবরোধ-প্রথা ভেঙে অথচ ঘর না ভেঙে পথে বেরিয়ে আসার জন্য সবারই বেশ উৎসাহ জেগে উঠল। আমিও তো এই নবদীক্ষিতের দলে, আমার মনে যে বিপ্লব জেগে উঠেছিল তা থেকেই বুঝতে পারি ওঁদের দীক্ষাদান কতখানি সফল হয়েছিল।

খুব কঠিন কাজ। কারণ রক্ষণশীলতা তখন আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল নারী-স্বাধীনতার হাত থেকে নারীদের বাঁচানোর জন্য। অনেকে আবার মেয়েদের সামান্য লেখাপড়া শেখানোর বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছিলাম।

আমি এ পর্যন্ত শুনে লক্ষ্মী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা বিড়াল দেখে এ সব আপনার মনে পড়ল কেন? লক্ষ্মী দেবী বলেছিলেন, শোন সবটা আগে, বাধা দিও না। শোন। পুরুষকে বাদ দিয়ে পর্দা আইন ভেঙে আলোয় বেরিয়ে আসার কল্পনার মধ্যেই একটা মোহবিস্তারী ক্ষমতা আছে। বার বার শুনলে সম্মোহিত না হয়ে পারা যায় না।

এদিকে প্রচারক যুবতীদের পিছনে শুধু আদর্শবাদ নয়, পিছনে নারী-স্বাধীনতার সমর্থক অনেকেরই প্রেরণা ছিল, আড়ালে থেকে সব আয়োজন তাঁরাই করেছিলেন। তাঁরা আড়ালে ছিলেন এ জন্য যে, এটা একটা ষড়যন্ত্র বৈ তো নয়, তাই তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁদের নাম এর সঙ্গে জড়িত করতে চাননি। যাই হোক, যখন প্রায় ৫০ জন গোঁড়া পরিবারের অসূর্য-স্পশ্যা স্ত্রী প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে মনে মনে তৈরি হয়েছেন, তখন ঠিক হল তাঁদের একত্র করে ভবিষ্যতে কি করতে হবে, কিভাবে উদ্দেশ্য সফল করতে হবে সব আলোচনা করতে হবে মাঝে মাঝে। কাজটি আরো কঠিন। প্রথমত স্থানের সমস্যা, দ্বিতীয়ত ঘর থেকে এতগুলো বৌ বেরিয়ে পথে আসবেন কিভাবে, ধাপ্পা দেওয়া হবে কি কৌশলে, এ সব ভাবতে হল। কিন্তু সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। বৌদের পরামর্শ দেওয়া হল, তাঁরা বাড়িতে বলবেন কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে বন্ধ গাড়িতে চড়িভাতি করতে যাচ্ছেন এক ধনী বান্ধবীদের একটা বাগানবাড়িতে, সেখানে এক দারোয়ান ছাড়া আর কেউ থাকে না। এতে আপত্তির কিছু নেই, কেউ কিছু সন্দেহও করেননি।

যাঁরা আড়ালে থেকে সব ব্যবস্থা করছিলেন তাঁরাই কয়েকখানা পাল্কিগাড়ির ব্যবস্থা করলেন প্রত্যেক গাড়িতে একজন করে পরিচিত দীক্ষাদাত্রী রইলেন। বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত. বন্ধ গাড়িতে সূর্যদেব কাউকে দেখতে পাবেন না, ছুঁতেও পাবেন না।

বন্ধ পাল্কিগাড়ি ছিল চারখানা। তিন চার খেপে আমরা গিয়ে উঠলাম সেই বাগানবাড়িতে। কি ভাল যে লাগল ওখানে গিয়ে তা আর কি বলব। আমরা প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষশাসিত পুরোনারী এই প্রথম নারী শাসিত রাজ্যে এসে পৌঁছলোম। হঠাৎ এখানে এসে প্রথমে চেঁচিয়ে কথা বলতে ভয় হচ্ছিল, অনেক দিনের অভ্যাস কি না? কিন্তু আমাদের কোলাহলটা শেষে এমন বেড়ে গেল যে থামায় কার সাধ্য? আমরাই আনন্দে দিশাহারা, সূর্যের আলো এমন অবাধ অসংবৃত এবং হিংস্র যে তার মধ্যে মাথা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে উঠল। ঘরের নিয়মমানা বৌ আমরা হঠাৎ ছোট হয়ে গেলাম বয়সে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত নিজেদেরই গরজে শান্ত হতে হল, এবং চড়িভাতিটা মিথ্যা ছিল না বলে রান্না খাওয়া-দাওয়াও শেষ হল খুব উল্লাসের সঙ্গে। এইবার পরিকল্পনা—আমরা কিভাবে কাজ আরম্ভ করব, কিভাবে সমাজকে নাড়া দেব এইসব আলোচনার আগে একটা উদ্‌বোধনী ভাষণ দেবেন, যিনি আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদেরই একজন। আমাদের

সংগে এসেছিলেন তিনি। তাঁর নাম অমলা দেবী। আমরা সবাই হলঘরে গিয়ে বসলাম। মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা, আগেই এসব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। অমলা দেবীর ভাষণের পরে আমাকেও কিছু বলতে হবে এমন কথা ছিল।

অমলা দেবীর কথা যেটুকু মনে আছে বলি, তুমি তা বেশ ভাল ভাবে গুছিয়ে লিখো। তিনি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—আমরা কত কাল ধরে ঘরে বন্ধ থেকে বাইরের পৃথিবীটাকে একেবারেই হারিয়ে বসে আছি, আর সেই পৃথিবীটা যে চলছে তা আমরা একেবারে বুঝতেই পারি না। আমাদের কথার জোর নেই। ইচ্ছার জোর নেই, চিন্তার জোর নেই, আমাদের হাত পায়ে জোর নেই। হঠাৎ ভূমিকম্প হলে অথবা আগুন লাগলে ঘর থেকে ছুটে বাইরে যাওয়া উচিত হবে কিনা, তাও সেই বিপদের মুখে ভেবে উঠতে পারি না। এবং ছুটে বাইরে যেতে হলে মাথায় কতটা ঘোমটা থাকবে তাই ভাবতেই অস্থির হয়ে উঠি। আমাদের চিন্তা করার স্বাধীনতা নেই, অধিকারও নেই, ঘরে থেকে থেকে আমরা সাহস হারিয়েছি, ভীরুতা আমাদের মনে বাসা বেঁধেছে। এই অবস্থা অসহ্য। এ থেকে আমরা মুক্তি চাই। আমাদের এবারে বেরিয়ে আসতে হবে ঘরের বাইরে, পুরুষের আর বর্ষীয়সীদের ঠাট্টাবিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে আসতে হবে। মনের সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে কাউকে গ্রাহ্য না করে। আমাদের মনের পায়ে সেকেলে চীনা মেয়েদের পায়ের কাঠের জুতো, লোহার জুতো। মন খোঁড়া হয়ে গেছে, দেহ পঙ্গু হয়ে পড়েছে। সলজ্জ পায়ে একটুখানি হাঁটতে পারি, ছুটতে পারি না। অতএব মনের শিকল ভেঙে ফেলুন সবাই। হাতে পায়ে জোর ফিরিয়ে আনুন। মনে দুর্জয় সাহস জাগিয়ে তুলুন—

এই পর্যন্তই সেদিন বলা হয়েছিল। অমলা দেবী এক অজ্ঞাত বিভীষিকা দেখে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন, মাগো, রক্ষা কর, বাঁচাও বাঁচাও বলে বিভীষিকার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন, চেঁচাচ্ছেন আর প্রাণভয়ে লাফাচ্ছেন। তারপর এই ভয়, এই চিৎকার, ছড়িয়ে পড়ল সকল বৌয়ের মধ্যে। সবার মুখে ঐ যে, ঐ যে! আমি চিৎকার করছি, লাফাচ্ছি উঠে, তারপর হুড়োহুড়ি করে সবাই উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম। উর্মিলা দেবী শাড়ির পাড় চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠলেন, এই যে, এই যে, বলে। উলটে দেখা গেল কিছু না। শেষে দুর্গাময়ী বললেন, ওরে বাবা, এ যে আমার শাড়িতে ঢুকেছে, বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শেষে আর কারোরই কান্ডজ্ঞান রইল না। পিছনের বউদের মধ্যে নতুন করে আর্তনাদ আরম্ভ হল। সুরমা দেবী, মাগো কি হবে গো! বলে কাত হয়ে পড়লেন। কাঞ্চনলতা দেবী সতরঞ্চিতে গড়াতে লাগলেন। উর্মিলা দেবী গোঙাচ্ছেন আর ভাঙা গলায় বলছেন ঐ যে আমি অলপ্পেয়ের ল্যাজ দেখতে পাচ্ছি। বলার সংগে সংগে পাশে পড়ে-যাওয়া সৌদামিনী দেবীর শাড়ির পাড়ের ভাঁজের মধ্যে বিভীষিকা খলবল করে উঠল কৈ মাছের মতো, তিনি কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আজকের মতো আপনারা আমাকে বাঁচান! বাঁচান! হাড়বজ্জাতটা শেষে আমার শাড়িতে ঢুকেছে, আমার কি হবে হবে গো, বাড়ি ফিরতে পারব তো?—সংগে সংগে মূর্চ্ছা।

বিভীষিকাটি শেষে বিভ্রান্ত হয়ে কারো গায়ের উপর দিয়ে, কারো নাকের উপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, ধরাশায়ী বৌদের কাঁপুনি আর থামে না। ইঁদুরটা যে পালিয়ে গেছে তা তাঁরা ভাবতেই পারছেন না। কাজেই প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেল তাঁদের সম্বিত ফিরে আসতে। আমার আরো একটু দেরি হয়েছিল, আমার মনের আবেগ ছিল সবচেয়ে বেশি। নারী-স্বাধীনতার আবেগ। যেন তা প্রচন্ড গতির মুখে এক ইঁদুরের ধাক্কায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অনেকেরই অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ৫০ জন কুলবধূ প্রথম বাইরে বেরিয়ে এসে যখন সমাজের সংগে সংগ্রামে প্রস্তুত, তখনই কিনা দারোয়ানের পোষা বিড়ালটা ইঁদুর তাড়া করে ঢুকে পড়ল সভা ঘরে। তার দুটি বাচ্চার খেলার জন্য একটা ইঁদুরের দরকার ছিল। বিড়ালের ভূমিকাটা দেখলে তো? দারোয়ান চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিল, কিন্তু সব বুঝতে পেরে মুখ ঢেকে হাসতে হাসতে আড়ালে চলে গিয়েছিল। ছি ছি কি লজ্জার কথা বল তো? আমরা সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, দেরি হবে। নারী-স্বাধীনতার দেরি আছে। যে সিদ্ধি সহজে পাব ভেবেছিলাম, সিদ্ধিদাতার বাহন তাতে বাধা দিল। আমাদের ঐ মুখেই বড় সাহস, অনেক দিনের পাপের ফল।

আর একটা কথা বলি, সেদিন ভুল করেই আমরা থেমে গিয়েছিলাম। কারণ পরে ভেবে দেখেছি ইঁদুরের ভয় আমাদের মজ্জাগত। আজও একটা ইঁদুর ইচ্ছে করলে একটা বিরাট নারীবাহিনীকে অকেজো করে দিতে পারে। বাল্মীকি বেদ-ব্যাস তাঁদের সাহিত্যে কথাটা চেপে গেছেন।

শিকার কাহিনী

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা তখন আমি মাদ্রাজে থাকি। গ্রীষ্মকাল, গরমের ছুটি এসে গিয়েছে, বাইরে যাবার তোড়জোড় চলেছে। এমনি সময়ে মানুষ-খেকো বাঘের খবর পেয়ে বেসওয়াড়ায় (অন্ধ্রপ্রদেশ) এসে উপস্থিত হলাম। নরখাদকের সঙ্গে এর আগেও সাক্ষাৎলাভ হয়েছে, তবে নতুন অভিজ্ঞতার লোভ কাছে এসে পড়ায় গ্রীষ্মের ছুটিটা জঙ্গলেই কাটাব ঠিক করে ফেললাম। এখানে জঙ্গলের দুটো ফরেস্ট বাংলোই ছোক্‌রা শিকারীরা দখল করে বসেছে, গত্যন্তরে গ্রামের কাছেই একটি পরিত্যক্ত আদিমকালের ফরেস্ট বাংলোয় উঠ্‌লাম। এখানে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে গেল। আমার আসার আগে অরণ্যবাসের স্থানটি গ্রামের লোক দিয়ে পরিষ্কার করে রাখানো হয়েছিল। এসে দেখলাম ঘরের ভিতর বড় গাছের গুঁড়ি কায়েমিভাবে মাটি আঁকড়ে ধরেছে। মেঝে কোনকালে মোটা স্লেট পাথরে তৈয়ারী হয়েছিল, এখন দুই একটা টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই। গাছের গুঁড়ির আশে-পাশে নানা রকমের গর্ত, কারা ওখানে থাকে তাও অনুমান করা শক্ত নয়, কারণ ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে আবর্জনার সঙ্গে কতকগুলি টাট্‌কা ছাড়া জাত-সাপের খোলসও বাইরে ফেলে দিতে হয়েছিল, তবু নিখরচায় আস্তানাটি ভালই হল। টিলার উপরে বাংলোটি তৈরী হয়েছিল রাস্তা থেকে ৩০।৪০ ফিট উঁচুতে। বহুদিন আগে যে কারণেই হোক ফরেস্ট ডিপার্ট-মেণ্টে-এর বিচারে অকেজো বলে বাতিল করা হয়েছিল। জায়গাটিকে নিরাপদ বলা যায় না, তথাপি কাজে লাগাতে হল। জানলা দরজা উধাও হওয়ায় ঘরের ভিতর ও বাহিরে বিশেষ কোন তফাৎ নেই, ছাদের টালিও বহু জায়গায় অপসারিত হয়েছে। বেঁটে ঘর, উপর থেকে বাঘের মত কোন জানোয়ার ঘরের ভিতর ঢুকতে চাইলে বাধার বালাই নেই। যাইহোক মাথার উপর যেটুকু ছাউনী পেলাম তাকেই আশ্রয় বলে মানতে হল। কোন জানোয়ার জঙ্গলের দিক থেকে এদিকে এলে দূর থেকে চমৎকার দেখা যায়, টিলার তলায় প্রশস্ত সড়ক সোজা জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছে।

এখানে আসার আগে যিনি আমাদের বাঘের খবর দিয়েছিলেন, তাঁরই সাহায্যে

তিনটি স্থানীয় লোক সংগ্রহ করা হয়েছিল, ওদের মধ্যে একজন নাকি বাঘের খবর রাখে, আর একজনের পরিচয় পাকা রাঁধুনী, তৃতীয়টিকে ফাইফরমাস খাটার জন্য রাখা হয়েছিল। ওরা গ্রামেরই লোক। আমার আস্তানা থেকে গ্রাম মাইল দেড়েকের উপর হবে। জঙ্গলী দেশে দেড় মাইল পথকে কেউ দূর বলে হিসাবের মধ্যে আনে না। যাইহোক, সদলবলে স্টেশন থেকে গরুর-গাড়ী চড়ে এখানে আসা গিয়েছিল। গাড়োয়ান আমাদের কোনপ্রকারে নাবিয়ে দিয়েই তার ছাউনীওয়ালা গাড়ীতে চড়ে বসে বলল—'আজকে আপনারা গুছিয়ে বসুন, কাল এসে ভাড়া নেব, আমাকে আবার যেতে হবে গ্রাম ছাড়িয়ে ঐ নদীর পাড়ে। এতটা পথ পাড়ি দিতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, মাঝ রাস্তায় বাঘের মুখে পড়তে চাই না। জন্তুটা আবার সন্ধ্যের দিকে এই রাস্তাতেই টহল দিতে বার হয়। খবরটি আমার আশায় উৎফুল্ল করে তুললো। গাড়োয়ানের কথা সকলেই শুনেছিল, সে গাড়ীতে উঠে বসবার আগেই বাক্স খুলে টোটা ইত্যাদি বার করে জানলার কাছে গুছিয়ে রাখাটা প্রয়োজন বোধ করলাম। কে জানে জায়গাটা যেমন নির্জন এবং জঙ্গল ঘেঁষা তাতে বাঘ যে ঘড়ি ধরে টহল দিতে বার হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখা নেই, তাছাড়া বাঘ সময়ের আগেই যদি আহারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তার ক্ষুধাকে দোষ দেওয়া চলে না। বন্দুক, গুলী এবং পেটরা ইত্যাদি গুছিয়ে রেখে আহারের ব্যবস্থায় প্রয়োজন বোধ করলাম। স্টেশন থেকে আসবার সময় গোটাচারেক তাজা মুর্গী সঙ্গে এনেছিলাম, তাছাড়া সচল মিট-সেফে রান্নার ব্যবস্থা সবই ছিল, যেমন ডজনখানেক পলসনের টিনে রাখা মাখন, চিজ, পাউরুটি এবং আরও অনেক কিছুই ছিল, রান্নার গুঁড়োমশলাও বাদ পড়ে নি। সবকিছুই শহর থেকে বিশেষজ্ঞের উপদেশানুসারে সংগ্রহ করা গিয়েছিল। আহারের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি বার করে পাচককে ডেকে বলতে যাচ্ছিলাম, 'মুর্গী খালপোষ কর।' কিন্তু কাকে আদেশ দেবো? যে রাঁধবার জন্য এসেছিল তাকে তো দেখছি না। সে তো নেই-ই, তার সঙ্গে ফাইফরমাস খাটার লোকটিকেও পাওয়া যাচ্ছিল না।

ব্যাপার কি? তৃতীয় লোকটি বল্লে—'ওরা দুজনেই তো গাড়ীতে চলে গেল। আমাকে বলে গেল, সাহেব মুর্গী রাঁধলে তোকেও খেতে দেবে।' অবাক হয়ে গেলাম। আমি রাঁধব! আপন মনে ভাবতে লাগলাম, পাচক হিসাবে আমার খ্যাতিটা ওরা জানল কি কোরে? তাহলে কথাটা সত্যি, মানুষ-খেকো বাঘ এই রাস্তাতেই চলাফেরা করে। গ্রামের আশেপাশে নিরিবিলিতে কোন মানুষকে একলা পেলে আহারের ব্যবস্থাও করে নেয়। চলতি বিশ্বাসের উপর স্থানীয় গাড়োয়ান বাঘের গতিবিধি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলেও মোট কথা দাঁড়িয়েছিল, পশুরাজের এদিকে হানা দেবার সময় হয়ে এসেছে। ঘরে উঠে গিয়ে দু' তিনটে বড় টর্চ দেখে নিলাম, সবই ঠিক আছে। একটা লণ্ঠনও জেলে রাখলাম ঘরের মধ্যে যদিও তখন দরকার ছিল না, কারণ ফুটো ছাদ দিয়ে প্রচুর আলো আসছিল। গত্যন্তরে লোকটাকে বললাম—দুটো মুর্গীর খালপোষ করেদে। সংখ্যায় দুটো মুর্গীর কথা শোনার পর লোকটির মুখের দিকে তাকাতে বুঝলাম সে বেশ হৃষ্টচিত্ত হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই ঠিক করেছিল যে দুটোর মধ্যে একটার উপর তার দাবী আছে। লোকটা কালবিলম্ব না করে বাংলোর পিছন দিকে চলে গেল হত্যার সাহায্যে আহারের ব্যবস্থার জন্য। জীবনে কখনও হেঁসেল ঘরে ঢুকি নি রান্নার জন্য। উনুনের ব্যবস্থায় জন্য সঙ্গে কেরোসিন পাম্প-করা ষ্টোভও এনেছিলাম, সেটি চা গরমের জন্য স্টেশনেই ব্যবহার করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম কলকব্জা-ওলা উনুন কাজে লাগায় নারাজ, সোজা কথা, কল বিগড়িয়ে ছিল, গত্যন্তরে কয়েকটি পাথরের ছোট চাঁই দিয়ে উনুন তৈয়ারী করতে হল। শুকনো কাঠের টুকরো পেতে কোনই অসুবিধা হয় নি। ডেকচিতে ২।৩টে মাখনের টিন খুলে

উপদ্রুত করে দিলাম, অল্প সময়ের ভিতরেই মাখন গলে গেল। কথাসময়ে লোকটা মুরগী থালপোষ করে এনে দিল। পাক-প্রণালীর কিছুই জানিনা, এইটুকু ঠিক করেছিলাম যে, আর কিছু হোক বা নাই হোক মুরগী তো ভাজা হয়ে যাবে, কিন্তু কতক্ষণে তার হদিস পাব তাতো জানিনা। না জানলেও ক্ষতি নেই, মাঝে মাঝে কাঁটা দিয়ে টিপলেই বুঝবো, ভক্ষণীয় হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে কিনা। এই সহজ হিসাবটা এতদিন কেন যে করিনি সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়। যাইহোক এইটুকু বুঝলাম যে উঁচু দরের রান্না যদি আর্ট-এর পর্যায়ে ফেলা যায় তাহলে আমার পক্ষে কৃতকার্য হওয়া দুঃসাধ্য কিছু নয়। মুরগী তখন ফুটন্ত মাখনে ওলট্-পালট খাচ্ছে। এবার ভেবে দেখলাম, রান্নার মশ্‌লা সবই যখন প্রায় আছে, তখন আলোনা ভাজা খেয়ে মরি কেন? মশ্‌লার ডিবে বার হোতে লাগল, প্রথমেই দিলাম খানিকটা চিনি। মনে হল রসদের ভয়ে একটু কৃপণতা করে ফেলেছি, মাত্রাটা দিলাম বাড়িয়ে, হাজার হোক চিনি তো। বেশী দিলে মিষ্টি, কত আর খারাপ হতে পারে? চিনির পালা শেষ করার পর দিলাম ইচ্ছামত নুন, তারপর এল লঙ্কা ও হলুদ গুঁড়োর পালা। এদিকটার অনুমান যুৎসই মতন করতে পারি নি, যতই ডেকচির মধ্যে মশ্‌লাগুলো ঢালি কিছুতেই রং মনমত রসাল হয়ে ওঠে না। কি বিপদ! মোগলাই কোর্মা খাওয়ায় আমি অনভ্যস্থ নই। যাইহোক মুর্গী গলা মাখনে প্রায় গরগরে রান্না হয়ে উঠেছে, ঘন ঝোলের রং-ও তখন মনমাতান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, গন্ধও বেরিয়েছে খাসা। ফরমাসখাটা লোক-টাকে বোললাম—একটু খেয়ে দ্যাখ, কি রকম হয়েছে। সে পরম উৎসাহে একটি ভাঙ্গা টিনের খালি কৌটা যেটা বোধহয় জল খাবার জন্যই গ্রাম থেকে এনেছিল সেইটাই আমার সামনে ধরল। কারণ ফুটন্ত মাংস ত আর হাত পেতে নেওয়া যায় না। গোটা মুরগীকে ভাগ করারও উপায় ছিল না' তাই কোনপ্রকারে কাঁটা দিয়ে গেঁথে তুললাম এবং বহু কষ্টে মুর্গীর খানিকটা অংশ টিনের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম, বাকীটা বাইরেই রয়ে গেল। সত্যই একটা গোটা মুরগী তাকে দেওয়া হবে এতটা সে আশা করে নি, রীতিমত খুশী হয়ে সে খাদ্যসহ চলে গেল ঘরের পিছনে। মাদ্রাজ দেশের লোকেরা আবার অপরিচিতর সামনে খায় না। কাঁটা দিয়ে গেঁথে মুর্গী তোলার সময় বুঝলাম আর আগুনের উপর রাখার কোন প্রয়োজন নেই। সময় তখন এগিয়ে চলেছে সন্ধ্যার দিকে। ডেকচি আগুন থেকে নামিয়ে রাখলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই পিছন থেকে জোরে থুঃ, থুঃ শব্দ শুনতে লাগলাম, তারপরেই লোকটা উঃ, আঃ, করতে করতে বেরিয়ে এল, যেন আগুন খেয়ে ফেলেছে, তারপর কাছে এসেই বলল—'পানি, পানি।' আর একবার অবাক হতে হল। একটা গোটা মুরগী এত অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলল। যাইহোক, পানি তার মুখে দিতেই সে কুলকুচি করে ফেলল, তারপর আমার মুখের দিকে এমন একটি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল যাতে ভাবা চলে আমি লোকটাকে কৌশলে বধ করবার চেষ্টায় ছিলাম। এইরূপ দুষ্কৃতির প্রয়োজন হল কেন, তা জানতে চাইলে। সে আমার কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল। সে কি ছুট! ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া পাল্লা দেবার চেষ্টা করলে পিছিয়ে পড়ত।

ইতিমধ্যে দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিমে তখন আগুন লেগে গিয়েছে, আকাশ লালে লাল। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। ভাবতে লাগলাম লোকটাকে দৌড়ান অবস্থায় চেঁচিয়ে বারণ করলে ভাল হত। বাঘ যদি রঁদে বেরিয়ে থাকে তাহলে ধাবমান ব্যক্তিটি যে নর-খাদককে আকৃষ্ট করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চালাক বাঘের ঐ তো দোষ, মানুষকে পালাতে দেখলে সাহস বেড়ে যায়। ঘরের ভিতর ঢুকে তাড়াতাড়ি দোনলা ছররার বন্দুকে এবং ৫০০ বোরের ভারী রাইফেলের রিপিটার ম্যাগা-জিনে টোটা ভরে রাখলাম। দেখতে দেখতে লোকটা দূরে রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম না লোকটা কেন পালাল। কারণ যাইহোক এইটুকু বুঝলাম এখন আমি একলা এবং যে পোড়ো বাড়ীতে বসে আছি সেখানে আলো জ্বলায় নরখাদক মানুষের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিৎ হবে। এই সম্ভাবনা আমাকে বিব্রত করে তুললো। যেখানে আশ্রয় ভেবে আস্তানা গেড়ে-ছিলাম সেই জায়গাটাই বিশেষভাবে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল, কারণ মাচান কিম্বা মাটিতে যেভাবেই বসা যাক না কেন সেখানে অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রই জানে বিপদ কোনদিক থেকে আসতে পারে। কিন্তু আমি যেখানে আছি সেখানে প্রতিটি জানালা যেন মৃত্যুর ডাক দিয়ে মুখ হাঁ করে আছে। গ্রাম-ঘেঁষা বাঘ আগুনকে ভয় করে না, বরং পোড়ো বাড়ীতে মানুষের উপস্থিতি সম্বন্ধে কুতূহলী হয়ে ওঠে। আমার একমাত্র নিরাপদ স্থান ছিল পূব দিকে, যেখানে টিলার শেষ গভীর খাদের দিকে নেমে গিয়েছে, কিন্তু অন্য দিক থেকে যে-কোন

সময়ে বাঘ আমার কাছে এসে পড়তে পারে এবং যেভাবে অন্ধকার চারধার থেকে ঘিরতে আরম্ভ করেছে তাতে জন্তুটি ১০।১২ হাতের মধ্যে এলেও দেখতে পাব না, কারণ আত্মগোপনে ঐ রকম একটি কৌশলী জন্তু দ্বিতীয় আছে বলে আমার জানা নেই। একবার ভাবলাম লন্ঠনটা নিবিয়ে দি, পরক্ষণেই মনে পড়ল খোলশ ছাড়া বিষধরদের কথা, ওদের মধ্যে কারও বাসস্থান যে ঘরের ভিতরে গাছের শিকড়ের তলায় নেই তা কে বলতে পারে? অবস্থাটা দাঁড়াল জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের মত। এইরূপ একটি পরিস্থিতিতে থাকতে হলে সমস্ত রাত্রি জেগেই কাটাতে হবে, সুতরাং খাওয়ার পালাটা এখনই শেষ করে নেওয়া দরকার। সামনেই স্বহস্তে রাঁধা মুরগীর কোর্মার মত দেখতে মাংস সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল, বাক্স থেকে পাঁউরুটির খানিকটা টুকরো বার করে আহারে বসে গেলাম। মাংস এখনও বেশ গরম নিজের হাতে রাঁধা! গরমকে অগ্রাহ্য করে বুক থেকে খানিকটা অংশ কাঁটা এবং ছুরীর সাহায্যে তুলে নেবার আগেই জিভে জল এসে গেল। জিভের সঙ্গে খাদ্যের যোগাযোগ ঘটতেই মনে হল, ঝাল, নুন, চিনি যেন মৃত মুরগীর হয়ে জীব হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য মুখের ভিতর আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে বুঝলাম পিছনে থুঃ থুঃ শব্দের কারণটি কি। তার সঙ্গে দৌড় দিয়ে লোকটা গ্রামের দিকে যখন পালাল, তখন প্রমাণ রেখে গেল যতটুকু সে গিলেছিল ততটুকু পেটের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার পক্ষে খাদ্যকে ফেলে দেবার সাহস ছিল না, বাধ্য হয়ে অমন পরিপাটি করে রাঁধা মাংস জল দিয়ে ধুতে হল। মাত্র এক বালতি জল গ্রামের পাতকুয়া থেকে আনা হয়েছিল, তাই থেকে তৃষ্ণা নিবারণ এবং হাত-পা ধোয়ার কাজও শেষ করার কথা। কিন্তু লঙ্কার ঝাল ও নুনের অশোভনীয় প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচবার জন্য যেভাবে জল খরচ করলাম তাতে গেলাস দুয়েক শেষ হয়ে গেল। তা যাক্। পুনরায় মাংস খাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম, কোন বিশেষ উপকার হল না, খাদ্য একেবারে অখাদ্য হয়ে গিয়েছে। ফেলে দিতে হল। শেষ পর্যন্ত রুটিতে মাখন মাখিয়ে আহারের কর্তব্য শেষ করলাম।

এখন চিন্তার বিষয় হল ঘরের কোন জায়গায় বসলে দূর থেকে বাঘ আমাকে দেখতে পাবে না। একমাত্র নিরাপদ স্থান গাছের গুঁড়ির পিছনে, কিন্তু ওখানে গেলে দূর থেকে বাঘকে দেখার কোন সুবিধা নেই, কারণ গাছের গুঁড়ি দৃষ্টিকে আড়াল করে ফেলবে এবং আড়ালের পিছনে থাকলে বাঘ ঘরে ঢুকেই আমাকে দর্শন দেবে। অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠল। এই সময় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি, বড় বাছুরের মত জানোয়ারের ঝাপসা রূপ অন্ধকারের পাশ কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে বাংলোর কাছে

আসছে এবং তার আকৃতিও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাঘের চলার বৈশিষ্ট্য আমার জানা আছে, কিন্তু জন্তুটি যে বাঘ তাতে সন্দেহের কারণ ছিল, তবু দোনলাটা বগলে তুলে নিলাম, কারণ যেভাবে জন্তুটি এগুচ্ছিল তাতে কাছে এসে পড়তে এক মিনিটও সময় লাগবে না। এইটুকু সময় বন্দুকের ওজন হাতে রাখার অসুবিধা হবে না। জন্তুটি কাছে আসতে ঝাপ্সা আকার দেখেই বুঝলাম বাঘ নয় সত্যই একটা বাছুর। দলভ্রষ্ট হয়ে চরতে বেরিয়েছিল, কেমন করে দল ছাড়া হয়ে গিয়েছে, এখন একলাই গ্রামের দিকে চলেছে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। এর পরে বাঘ যদি কাছে এসে পড়ে তাহলে সর্বাগ্রে বাছুরটাই নজরে পড়বে আর নরখাদক হলেও তার মনের মত আহার সব সময় সহজলভ্য নয়, সুতরাং নাগালে পাওয়া শিকারকে সে ছেড়ে কথা কইবে না।

কপাল এমনই খারাপ যে রওনা হয়েছিলাম অমাবস্যাকে অভ্যর্থনার জন্য। সন্ধ্যা পার হতেই অন্ধকার অতি অল্প সময়ের ভিতর মসীকালর রূপ ধারন করল, দূর থেকে কেন, এমন কি কাছ থেকে দেখ্‌বার আর কিছু রইল না। যেদিক থেকে নরখাদক গ্রামমুখী হবে সেই দিকে বন্দুকে সংলগ্ন টর্চ জ্বালিয়ে বসা চলে, কিন্তু টর্চের আয়ুও নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায়, তার উপর আলো জেবলে বসে থাকলে যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তাও পণ্ড হয়ে যাবে। বাঘ টর্চের স্থায়ী তীব্র রশ্মি দেখলে চলার গতিকে মোড় ফিরিয়ে দেবে।

বাছুরটা বোধহয় এরই ভিতর টিলার তলায় এসে পড়েছিল। হঠাৎ একটা ধড়ফড়ানীর সঙ্গে গোঙ্গানীর শব্দ শুনলাম তারপর সব চুপচাপ। মুহূর্তের ঘটনা। বাঘের শিকারে আজ নতুন আসিনি, সুতরাং বুঝতে বাকী রইল না যে কি হতে পারে। শব্দের স্থান অনুমান করে পশ্চিম দিকের জানলার দিকে গেলাম। তারা রাইফেল কাঁধে তুলে শব্দের আনুমানিক স্থান ঠিক করে টর্চের সুইচ টিপ্‌তে প্রথমটায় চোখ ঝলসে গিয়েছিল, তারপর দৃশ্যটি যখন চোখের সামনে স্পষ্ট হল তখন দেখলাম বাছুরটা পড়ে গিয়েছে এবং সত্যই বাঘের আক্রমণে মরেছে, কিন্তু বাঘের পিঠ বা মাথা দেখা যাচ্ছে না, বুকও টিলার শেষ দিক আড়াল করে ফেলেছে। এখন করি কি? ল্যাজ চোখের সামনে নড়ছিল, কিন্তু দেহের ঐ অংশে গুলী চালান কখনও অভ্যাস করিনি। টর্চের সুইচ টিপে রীতিমত একটা যে বোকামীর কাজ করে ফেলেছি তাতে কোনই সন্দেহ নেই, কারণ বাঘ যেখানে বাছুরটাকে মেরেছিল সেইখানেই আহারে বসে যেত না, মানুষ চলে যে রাস্তায় সেখান থেকে বাছুরটাকে নিশ্চয়ই টেনে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেত। এইটুকু সময় অপেক্ষা করলে বাঘের সমস্ত দেহ দেখতে পেতাম এবং মারের জায়গা বেছে নেওয়ায় কোন অসুবিধা হত না। আলোর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে

যা অনুমান করেছিলাম তাই হল, বাঘ হঠাৎ মাথাটা তুলেই উপর দিকে তাকাল, এবং আলোর সূত্র বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নীচু করল এবং তৎক্ষণাৎ ল্যাজও আড়ালের মধ্যে চলে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ আলো জ্বালিয়ে বসে রইলাম, কোন দিকে সাড়াশব্দ নেই, এখন ঘরের ভিতরে থাকাও যা, বাইরে বেরিয়ে আসাও তাই। ভয়কে পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। টিলার শেষ সীমানায় এসে দেখি বাছুরটা বাস্তবিক মরেছে এবং টিলার উচ্চতা এ জায়গাটায় রাস্তা থেকে ৮।১০ ফিটের বেশী নয়। বাঘের অস্তিত্ব খুঁজে বার করবার জন্য টর্চ জ্বালিয়ে এদিকে না এসে ভালই করেছিলাম, কারণ একেই নরখাদক তার উপর সদ্য-হত আহারে বাধা পেলে মানুষকেও ভক্ষণীয়ের উপরি পাওনা বলে সংগ্রহ করে নিত। যাইহোক ঘরে বাইরের মধ্যে যখন কোন আশ্রয়ের সম্ভাবনা নেই, তখন বন্দুক এবং আমার নিশানার উপর নির্ভর করেই সবকিছুর ব্যবস্থা করে নিতে হবে। হাই ভেলসিটি রাইফেলের রেঞ্জ ভালই, কাজেই বাঘ দূরে চলে গেলেও তার চোখে আলো পড়লে তাগমারির কোন অসুবিধা হবে না। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে বন্দুক সংলগ্ন টর্চ ঘোরালাম, কিন্তু বাঘের চোখ খুঁজে পাওয়া গেল না, এরূপটি যে ঘটবে তা আগে থাকতেই অনুমান করা উচিত ছিল, এখন আর কিন্তুর উপর দোহাই পেড়ে কোন লাভ নেই। ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেও বাঘ আমাকে ভালভাবেই দেখে নিয়েছে এবং কোন কিছুর আড়াল থেকে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে, সুতরাং আহারকে রসিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন থাকলে আমাকেও চাটনী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রলোভন বেড়ে যেতে পারে আর এটাও ঠিক কথা যে এই পরিত্যক্ত ঘরটিতে বাঘ যে কখনও প্রবেশ করে নি এমন ধারণা সম্বন্ধে নিশ্চিৎ হওয়া চলে না, সুতরাং এদিকে আমার অতর্কিতে চলে আসার সম্ভাবনা খুবই আছে।

করবেট সাহেবকে স্মরণ করে জঙ্গলের দিকে টিলার রাস্তা ধরে নামতে লাগলাম। হাতে বন্দুক প্রস্তুত ছিল। জায়গাটি বেশ খোলা, কোনদিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ যে সহজ হবে না তা জানতাম। কিন্তু বাঘের আচরণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই দিনের বেলায়ও মাত্র কয়েক গজের ভিতর দেড়হাত উঁচু ঘাসের মধ্যে জন্তুটিকে বেমালুম গা ঢাকা দিতে দেখেছি, অতএব টিলার আশেপাশে যেসব বেঁটে ঝোপঝাড় আছে তার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকলে আমাকে চলার পথে পিছন থেকে যদি আক্রমণ করে তাহলে বন্দুক চালানর অবকাশ পাব না। তবু এগুতে হল, কারণ পিছিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেও ভড়কে যাওয়া চালাক বাঘ যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে টর্চের আলো দেখার পর সহজে ফিরে আসছে না; যদি তাকে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে তাহলে রাস্তাতেই পাব। এগুতে লাগলাম। প্রায় ৫০ গজ দূরে রাস্তার ধারে একটা খাদ পাওয়া গেল, খাদের তলায় খানিকটা সমতল জমি; ঐখানে দেখলাম দুটো জ্বলন্ত চোখ; রাইফেলেও স্ন্যাপ শটের মত দ্রুত গুলি চালনায় আমার অভ্যাস ছিল; ছিল বলব না শিকারে এলে অভ্যাসটাকে জিইয়ে রাখা আমার ধর্ম। তার উপর আরও ভরসা ছিল রিপিটার রাইফেলে কোন প্রকারে গুলি বেরাস্তায় গেলে সঙ্গে সঙ্গে একাধিকবার ট্রিগার টেপা যাবে। রাইফেল তুলেই দুটো চোখের মাঝখানে গুলি চালিয়ে দিলাম।

জন্তুটা একেবারে আহাম্মক, গুলি খাবার জন্যই যেন টর্চের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটি প্রায় খাড়াইভাবে উপরদিকে ৭।৮ ফিট লাফিয়ে উঠল, তারপর ধপ করে পড়ে গেল, নড়াচড়ার পালা শেষ হলে আলিস্য ভাঙ্গার প্রথায় চারটা পা টান করে সোজা করে দিয়ে। ভাল করে দেখলাম, জন্তুটা বাঘেরই জাত বটে কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ড্‌ নয়, ওটা বড়সড় লেপার্ড। বাঘের জাতকে দুবার না মারলে মরেছে বলে বিশ্বাস করা শাস্ত্রসঙ্গত কাজ নয়। অভ্যাসদোষে আর একবার বুকে লক্ষ্য করে গুলি চালালাম, লেপার্ড ভবলীলা সাঙ্গ করে মরল। তবু এখন কাছে যাওয়াটা যুক্তি-সঙ্গত মনে করলাম না, শিকারলব্ধ জীবটিকে ফেলে আসতেও মন চাইছিল না. কারণ হায়না, বনকুকুর বা শেয়ালের দল এদিকে এসে ঐ অবস্থায় লেপার্ডকে দেখলে নিঃশেষ করে ফেলতে সময় লাগবে না, কিন্তু কতক্ষণই বা পাহারায় থাকা যায়! হায়না বা শেয়ালকে ভয় নেই, জংলী কুকুর আমাকে একলা দেখলে বাঘের মত ভড়কাবে না, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে।

সবদিক বিবেচনা করে বাংলোয় ফিরতে হল। আজকের রাতটা যদি বেঁচে কাটে তাহলে শিকারের দম্ভ সম্বন্ধে কালকে ব্যবস্থা করা যাবে। ঘরে ফিরে আসতে দেখি টিলার শেষদিকে দুই শেয়ালে টাগ-অব-ওয়ার চালিয়েছে—ফেলে দেওয়া মুরগীটাকে নিয়ে। ভাবলাম একটাকে মেরে যদি লেপার্ডের কাছে ফেলে দিয়ে আসি তাহলে মাংস খাদকদের লোভ হয়ত বিভক্ত হতে পারে। পরক্ষণেই বিচার করে দেখলাম ওদের লোভের অন্ত নেই। ঘরের ভিতর এসে আমার ক্যাম্পখাটেতেই বসলাম। ডাইনে, বাঁয়ে ফরেস্ট ডিপার্ট-মেন্টের সরকারী সড়ক। ঐদিক দিয়েই যে বাঘ এসেছিল; সুতরাং এইভাবে বসার চেয়ে পিছনটা যদি কিছুর আড়ালে রাখতে পারি, তাহলে দুদিকে দৃষ্টি রাখলেই আত্মরক্ষার কর্তব্য

ভাঙাটা চলনসই হতে পারে। ক্যাম্পখাট থেকে নেমে ঘরের বাইরে এলাম এবং যেদিকে বাছুরটা রয়েছিল সেদিকে পিয়ে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসলাম, সময় কাটতে লাগল। রাত গভীর হয়ে আসছে, কখন-সখন দূরে হায়নার বিকট হাসি শুনছি; তার সঙ্গে মনে হল ফেউ-এর ডাকও শুনতে পেলাম। তবে কি বাঘ আবার ফিরে আসছে? না এটা নতুন কোন বাঘের আগমন বার্তা? নতুন হোক বা পুরোনো হোক, উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে আমাকে তন্দ্রার এলাকা থেকে বার করে আনছিল। এইটুকু জানতাম বাঘের ঘ্রাণশক্তি সব সময়ে নির্ভরশীল না হলেও, ওর দৃষ্টি ওকে ফাঁকি দেয় না।

ঠেসান দেওয়ার আরাম পাওয়ায় তন্দ্রাভিভূত হয়ে আসছিলাম, এমনি সময় সড়কের ওপারে পাহাড়ের উপর থেকে কয়েকটা ভারী নুড়ি সশব্দে রাস্তারদিকে গড়িয়ে আসতে লাগল, ঘটনাটি কোনদিকে গড়ায় জানার ইচ্ছা থাকলেও অপেক্ষা করার অবকাশ ছিল না, কারণ যাই ঘটুক ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেতাম না। কালক্ষেপ না করে পাহাড়ের উপর দিকে রাইফেল-এর নল এগিয়ে দিয়ে টর্চ টিপলাম। ৯ সেলের টর্চ প্রায় মোটর গাড়ীর হেড লাইট-এর মত উজ্জ্বল। তীব্র আলোয় দেখলাম রাস্তার গায়ে লাগা বিপরীত দিকের ছোট্ট পাহাড়ের ঠিক কিনারায় একটা প্রকাণ্ড বাঘ মাটিতে পেট ঠেকিয়ে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে। প্রতীক্ষার কি ভয়ঙ্কর রূপ! এবারেও দুই চোখের মাঝে টিপ করতে সময় লাগল না, দিলাম ঘোড়া টিপে। বাঘ এতটুকুও নড়ল না, যেভাবে বসেছিল সেইভাবেই রয়ে গেল, কেবল দুটো জ্বলন্ত চোখ ঝিমিয়ে আসতে লাগল তারপর চোখ দুটোও গেল বুজে শেষ পর্যন্ত মাথাটা দুটো থাবার উপর এসে পড়ল—সবকিছুই অসাড়। অদ্ভুত আচরণ আমাকে ভাবিয়ে তুললো। পাথরের চাঁইকে বাঘের মাথা বলে ভুল করিনি তো? অসম্ভব। যে তীব্র আলো ব্যবহার করেছি তাতে সার্জেন ডাক্তার জটিল অপারেশন করে ফেলতে পারে; ঐ আলোর মধ্যে এত কাছ থেকে পাথরকে বাঘ দেখব এমন কথা ভাবতেও বাধা আসে।

বন্দুক সংলগ্ন টর্চ নিবিয়ে ঘর থেকে অন্য টর্চ নিয়ে বাঘের উপর ফেললাম তারপর দূরবীন দিয়ে দেখি সত্যই বাঘ পাথরের মতই মরা; কোনরকম নড়াচড়া নেই। এরকমভাবে জন্তুকে আগে মরতে দেখিনি এমন কথা নয়, তবে শিকার এমন সহজলভ্য হবে এতটা আশা নিয়ে এখানে আসিনি। শেষ পর্যন্ত মানতে হল সত্যই আমার কপাল সুপ্রসন্ন সত্যই বাঘটা মরেছে এবং গুলি খেয়েই মরেছে। কিন্তু যেটা মরল সেটা যে নরখাদক সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কেমন করে এবং নরখাদক যদি না হয় তাহলে ফেউয়ের ডাক যার আগমন বার্তা জানিয়েছিল এটা কি সেইটেই? সুতরাং ঘরে গিয়ে শোবার কথা ভাবাই চলে না। কপাল সুপ্রসন্নই বটে! পুনরায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম, রাতটা জেগেই কাটিয়ে দেব বলে।

নিশাচর পাখীর ডাক শুরু হয়ে গিয়েছে কত রাত কে জানে! বেশ খানিক-ক্ষণ বসে বসেই কেটে গেল, ঘুম একেবারে নেশার মত তেড়ে আসতে শুরু করেছে। বুঝলাম যতই চেষ্টা করি বেশীক্ষণ বসে থাকা চলবে না, শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়তে হল। ঘরের ভিতর এসে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লাম, পা দুটো ছড়াতেই ঘুম যেন তেড়ে এসে চেপে ধরল, জেগে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

ঘুম ভাঙল বুনো মুর্গীদের ডাকে, আকাশ সবে তখন পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে।

কালবিলম্ব না করে আলো আঁধারের ভিতরেই আবার মরা বাঘের উপর টর্চ ফেললাম। আশ্চর্য ব্যাপার! বাঘ সেখানে নেই। সবকিছু কেমন যেন ভূতুড়ে কাণ্ড ঠেকছিল। রোদ ওঠার অপেক্ষায় থাকতে হল, তাছাড়া বাঘ যদি জখম হয়ে থাকে তবে একলা তার পিছু ধাওয়া করা উচিত

হবে না, কিন্তু দোকলা হওয়ার সম্ভাবনাই বা আসছে কোথা থেকে? একমাত্র ভরসা, গাড়োয়ানটি যদি ভাড়া নেওয়ার জন্য সকাল সকাল আসে। টাকা-কড়ি সম্বন্ধে দেখলাম এদিককার লোকেরা বেশ হুঁশিয়ার। শুনলাম দূরে গ্রামের দিক থেকে গরুর-গাড়ীর চাকার আওয়াজ। পাহাড়ে নুড়ির উপর লোহাবাঁধান গরুরগাড়ীর চাকা চললে তার আওয়াজ বহু দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায়। সন্দেহ রইল না, গাড়োয়ান আসছে তার ভাড়া আদায়ের জন্য। ধারণা ভুল হয়নি, গাড়ী কাছে আসতেই দেখলাম চেনা লোকটি সামনেই বসে আছে, তবে সে একা নয়, কালকের দুটি পলাতক ভৃত্যও গাড়োয়ানের পিছু নিয়েছে ওদের পাওনা আদায়ের জন্য। বাছাধনদের যৎসামান্য শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। উঁচু টিলার উপর উঠবার আগেই বলদদের খাটুনী কমাবার জন্য গাড়োয়ান দুটি জন্তুকে জোত থেকে খুলতে লাগল, খুব সম্ভবতঃ ওদের নিয়ে উপরে আসবে। এই অঞ্চলে দিনের বেলায়ও পুষ্ট বলদকে খোলা জায়গায় রাখতে কেউ সাহস পায় না। যে সময় গাড়োয়ান বলদদের জোত খুলছিল সেই সময় বাকী দুটি লোক টিলার পথে অনেকটা উঠে এসেছে। আমি ভরা রাইফেল নিয়ে বাংলোর উঠানে এসে দাঁড়ালাম যেখান থেকে টিলার উপরের রাস্তা সড়কে গিয়ে যোগ হয়েছে। এই জায়গাটা ত্রিকোণ, অর্থাৎ সড়ক থেকে উপরে আসতে হলে বেশ খানিকটা বাঁকা রাস্তায় চলতে হয়। বাঁকটি আমার কাজে এল; পিছনের বলদ ও গাড়োয়ানকে বাঁচিয়ে মজা দেখানর সুবিধা পাওয়া গেল। দুটি লোক গরুর-গাড়ীর এলাকা থেকে খানিকটা এগিয়ে আসার পর প্রথম লোকটির পায়ের কাছে দিলাম গুলি চালিয়ে, লোকটা আবার হিন্দুস্থানী জানে, 'মারডালা, মারডালা' বলে চিৎকার করে উঠল। আমি তখন আবার বন্দুক তুলে সেই লোকটির দিকে ধরেছি, তখন শুনলাম সে চিৎকার করে বলছে—'মারোমাৎ মারোমাৎ।'

আমিও চিৎকার করে বললাম—ইধার আও, নেহিতো মারেগা। ডাগমারি অভ্যাস করার অপূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখলাম। ভেবে-ছিলাম লোকটি উল্টোদিকে ছুটবে কিন্তু চলন্ত পায়ের গোড়লীর কাছে ফুট খানেকের মধ্যে যেভাবে গুলি পাথরের নুড়িকে ওড়ালো তাতে লোকটি বুঝেছিল যে, আমি তাকে মারবার জনাই গুলি করেছিলাম, এরূপক্ষেত্রে যদি সে 'মারোমাৎ?' বলে চিৎকার করে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা চলে না। যাই হোক কাছে আসতে বোললাম—কাল যেমন পালিয়েছিলে, আজ তেমনি ডবল কাজ করতে হবে। গ্রাম থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে এস, বাঘ মেরেছি; একটা নয় দুটো। একটা বাঘ সামনের পাহাড়ের উপরেই আছে, আর একটা রাস্তার খানিকটা ওদিকে গেলেই পাবে। লোকটা দেখলাম জীবন্ত বাঘের চেয়ে মরা বাঘকে কম ভয় করে না। লোকটা বলে—'সাহেব তুমি বাঘ মেরেছ বেশ করেছ, কিন্তু গ্রামের লোক ডেকে কি হবে?'

ইতিমধ্যে গাড়োয়ান দুটি বলদ নিয়ে উঠানে এসে উপস্থিত। বাঘ মারার কথা সে শুনেছিল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে—'সত্যি আপনি মেরেছেন?' একটু আগে যেভাবে গুলি চালিয়েছিলাম তা লোকটা দেখেছিল এবং তাতে তার ধারণা জন্মেছিল, বন্দুক চালনায় আমার অভ্যাস আছে, তবে মানুষ মেরে হাত পাকাই একথা সে কখনও ভাবতেই পারেনি, সেই কারণেই বোধহয় সেও একটু ভয় পেয়েছিল, কিন্তু মরেছে শুনে খুব খুশি হয়ে এগিয়ে এল, বলে—'যাকে মেরেছেন সেই বোধায় মাসখানেক আগে আমার গাভিন গরুটাকে খেয়েছিল, সে মস্তবড় বাঘ। কোথায় মেরেছেন চলুন না দেখে আসি।'
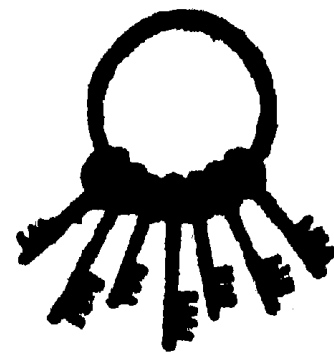
উত্তর করলাম—গুলি খাওয়া বাঘ, যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে তার পিছনে ধাওয়া করতে হলে আরও কিছু লোকের দরকার, তুমি যদি কয়েকটা মোষ আর লোক আনতে পার তাহলে খুব ভাল বখশিস দেব। বখশীষ পাওয়া সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ তার নমুনা পেয়েছিল স্টেশন থেকেই। গাড়োয়ান লোক আনতে চলে গেল বলদ দুটোকে টিলার সামনে রেখে আমাকে জানিয়ে গেল—'এ দুটো আপনার জিম্মায় রইল।'

গত রাত্রে টিলার সামনে পাহাড়ের উপরে যেখানে গুলি চালিয়েছিলাম সে জায়গাটি একটা বিরাট পাথরের চাঁই, রাস্তা থেকে সোজা খাড়াই ৫০।৬০ ফিট উপরে উঠে গিয়েছে। কপিকলে ঝুলিয়ে যদি মানুষকে তোলা যায় তাহলেই এইদিক থেকে ওখানে পেঁছান সম্ভব, অন্যথায় ভিন্ন রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, সে রাস্তার খবর নিশ্চয়ই স্থানীয় বাসিন্দারা জানে।

যে লোকটির পায়ের পাশে গুলি চালিয়েছিলাম তাকে গদগদ কন্ঠে কাছে ডাকলাম। আমার আচরণটি তার বিশ্বাসকে জখম করিয়ে দিল। লোকটা আবার পালাবার চেষ্টা করছিল, আবার কাঁধে বন্দুক নিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—নড়েছিস্ কি মারব। লোকটা বাস্তবিক নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, সে কাঁদ-কাঁদভাবে এগিয়ে এল, ভাবটা যেন কি পাপ করেছি যার জন্য এত আদরের ডাক। কাছে আসতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—এই পাহাড়ে কেমন করে ওঠা যায় বলতে পারিস? তোদের সম্বর হরিণ মেরে খাওয়াব। ভক্ষণীয় মাংসের খবর যে এদের কাছে কতটা লোভনীয় তা লেখায় বোঝাবার উপায় নেই। সে এগিয়ে এসে বল্ল—'হরিণ মারবেন?' আমি বল্লাম—নিশ্চয়ই, দেখেছি যে ডাঁহা মিথ্যার আশ্রয়ে লোকটাকে লোভ দেখালাম, কথায় বলে কার্যোদ্ধারের জন্য সুইট লাইস সব সময়ে সমর্থনীয় লোকটাকে বাঘের কথা না বলে জানালাম—কাল রাত্রে যে গুলি চলেছিল, শুনিসনি? সে বল্লে— 'শুনেছি, শুনেছি।'

তারপরেই উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'খুব বড় হরিণ না?' আমি বল্লাম—আমি গুলি করলে কি আর ছোট জিনিষ মারি? তোদের গ্রামশুদ্ধ লোকের খাওয়া হয়ে যাবে। লোকটা বেজায় খুশি, বল্লে—'চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব, কিন্তু যেতে হবে অনেক ঘুরে; এই ক্ষেত-জমি পার হয়ে ওপাশে ছোট্ট নদী আছে, সেটাকেও পার হয়ে এদিককার পাহাড় ওদিকের মাটিতে মিলেছে, সেখানে যেতে পারলে সহজেই উপরের সমতল জায়গায় পেঁছান যাবে। ওখানে আমি অনেক সাহেবকে নিয়ে গিয়েছি, তবে তারা সত্যিকারের সাহেব। ওরা খুব ভাল বখশীষ দেয়। বখশীষ পাওয়ার গোড়াপত্তন যেভাবে হল তাতে ওদিকে যাওয়ার আশা বেড়ে উঠতে লাগল। এদিকে অনেকক্ষণ কেটে গেল গাড়োয়ান আর ফেরে না। খিদেয় ভিতরটা চনচন করছে। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়ে শুকনো খানিকটা পাঁউরুটি চিবিয়ে নিলাম, তারপর লোকটাকে বললাম—কিছু শুকনো কাঠকুটো নিয়ে আয়। চায়ের জল গরম করতে হবে। বখশিষের মাহাত্মে সবকিছুই বেশ সহজ-ভাবে চলতে লাগল, এখন গাড়োয়ান কেবল লোক নিয়ে উপস্থিত হলেই হয়। শেষ পর্যন্ত দেখলাম গাড়োয়ানও কথাটা রাখল; ১০।১২ জন লোক সঙ্গে নিয়ে সে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে ২।৩টে মোষ। নিকটে আসতেই মোষের মালিক জানাল, 'বাঘ যদি মোষ মেরে দেয়, তাহলে প্রতি জানোয়ার পিছু ২০০ টাকা, আর না মারলে জানোয়ার পিছু ১০ টাকা। রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু রাজী হলেই তো হয় না, লোকটা একটু বেশী রকমের হুঁশিয়ার। পরম নির্লিপ্তের মত জানাল, 'বাঘ যদি জ্যান্ত থাকে এবং সে যদি মোষ মারার আগেই তোমার দফা শেষ করে এবং তারপর যদি মোষকে ধরে, তাহলে আমার টাকাটা দেবে কে? তাই বলি অগ্রিম ২০০ টাকা দিয়ে রেখে দাও, তারপর শিকারের শেষে হিসাব-নিকাশ করা যাবে। ব্যাপারটা যেখানে এসে দাঁড়াল তাতে বুঝলাম, গত্যন্তর নেই! এদিকে

উত্তেজনা আমাকে ক্রমান্বয়ে চেপে ধরেছে, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে বাঘ নড়েচড়ে কোথাও গিয়ে থাকলেও বেশী দূরে যেতে পারেনি, এত কাছ থেকে আমার নিশানা কখনও ভুল হতে পারে না, তাছাড়া মাথায় মেরেছিলাম। মাথার মার সবসময়ে খুব ফলপ্রদ নাহলেও কালকের সমস্ত ঘটনা এমনভাবেই আমার চোখের সামনে ভাসছে যে বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। মোষের মালিককে অগ্রিম ২০০ টাকা দিয়ে আরও ৫০ টাকা গাড়োয়ানের হাতে দিলাম, বিটার্সদের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য, এবং জানিয়ে রাখলাম, এর পরেও ওদের পাওনা রইল।

প্রথম লোকটি চায়ের জল গরম করে দিল এবং ওদের মধ্যে একজন চলে গেল বালতি নিয়ে গ্রাম থেকে পানীয় জল আনার জন্য। চায়ের পালা শেষ করতে সময় লাগল না; জল আনার অপেক্ষায় থাকতে হল। এইটুকু সময়ের ভিতরেই সকালের রোদ্দুর বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। শিকারে এলে সব সময়েই শোলার টুপি নিয়ে আসি, এবারেই সেটা ভুল হয়েছে। যাইহোক লোকজন জড় হতে বাংলোয় দুজন পাহারা রেখে আমরা চল্লাম বাংলোর সামনে বড় বাঘটিকে যেখানে মেরেছিলাম সেইদিকে। গোড়াতেই বলেছিলাম যে, জঙ্গলে দেশে দূরত্বের কোন মাপকাটি নেই। ক্ষেতজমি তো পার হল, কিন্তু ছোট নদীটি যে কোথায় তা এখনও জানা গেল না। অনুমানে বুঝলাম ক্রোশখানেক চলে এসেছি, কিম্বা রোদ্দুরের তাপে হিসাবে ভুল করেছিলাম কিনা বলতে পারি না। যে লোক পথের নির্দেশ দিয়েছিল সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা কোরলাম—তোমার সেই ছোট্ট নদী গেল কোথায়? নিশ্চিন্ত মনে সে উত্তর দিল—'সে নদী তো ইদিকে নয়, উদিকে।' থাকগে উদিকে এখন পাহাড়ের উপর উঠব কোনদিক থেকে সেটা জানা দরকার। জিজ্ঞাসা করলাম—কোনদিক থেকে পাহাড়ে উঠব? প্রশ্নোত্তর কথায় না দিয়ে লোকটা হেঁটে দেখিয়ে দিল আমরা তার পিছু নিলাম। চড়া রোদ্দুরে মাথায় নিয়ে খাড়াই পাহাড়ে ওঠা খুব যে আরামপ্রদ নয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। ধীরে উপরে আমরা বড়, ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। কপালগুণে এদিককার গাছগুলো গাঘেঁষা নয়। অনেকটা এসে পড়েছি, একটু দূরে টিলার খোলার ছাউনী দেওয়া ঘরের ছাদ দেখা যাচ্ছে। সামনে মোষগুলোকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যতই টিলার কাছে এগুতে লাগলাম, ততই মনে হল বিপদের কাছে এসে পড়েছি, বাঘ যে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে তা জানার উপায় নেই। দেখতে দেখতে আমরা তখন টিলার কাছে এসে পড়েছি। এই সময় অগ্রগামী দুটি মোষ ক্ষুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল মাটি তো নেই, নুড়িগুলো এদিক-ওদিক ছড়াতে শুরু করে দিল। সঙ্কেতটি যে কি তা আমি জানতাম। বন্দুক বগলে তুলে নিলাম। এখানেও একটি ভুল ধরা পড়ল। সটগান-এর পরিবর্তে রাইফেল সঙ্গে এনেছিলাম, হঠাৎ কোন কাছের ঝোপ থেকে বাঘ যদি আক্রমণ করে তাহলে রাইফেল দিয়ে টিপ করার অবকাশ পাব না। সটগান-এ খুব ভাল টিপ নাকরেও কাছ থেকে গুলি চালান চলে, কারণ ৩-এল জি ছররা বন্দুকের নল থেকে বেরুনর পরই অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, বন্দুকের টিপ একেবারে ঠিক না হলেও গোটা কয়েক গুলি ভাইট্যাল-স্পটে লাগানয় কোন অসুবিধা নেই। ভুল যখন করে ফেলেছি তখন ভুলের প্রতিক্রিয়া যাই হোক তা মানতে হবে। এগুতে লাগলাম মোষ দুটোর উপর লক্ষ্য রেখে, কারণ ওদের সঙ্কেতই এখন জানিয়ে দেবে বাঘ কাছে আছে কিনা। আরও খানিকটা এগুতে ক্ষুর দিয়ে দিয়ে নুড়ি ছড়ানর কারণ জানা গেল। বেশ খানিকটা শুকনো রক্ত নজরে পড়ল। চারধারে রক্তশোষক কাল পিঁপড়ে জড় হয়ে গিয়েছে। এদিক-ওদিক
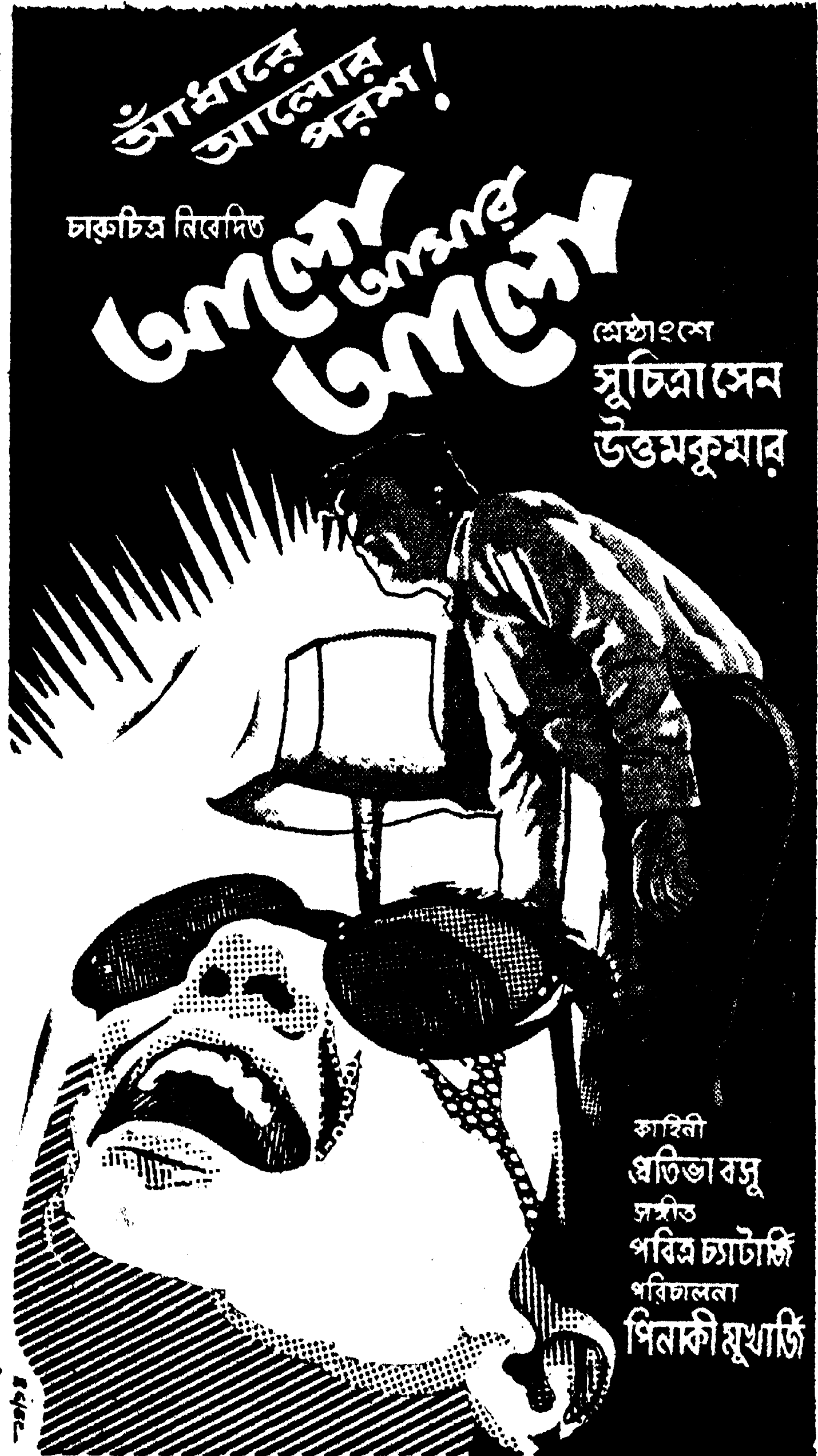
[illegible] এমনি সময় আমাদের দলে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কান্ড পড়ে গেল। সত্যাই একটা বিরাট সম্বর হরিণ আমাদের দেখে ছুট দেওয়ার সময় ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে যেটুকু হরিণের দেহাংশ দেখা গিয়েছিল তাকেই বাঘ ভেবে সবকজন বিটার আমাকে ফেলে যায় যেদিকে দৃষ্টি যায় সেইদিকে ছুট দিল। আমি একা রয়ে গেলাম, নিকটে অদৃশ্য জখমী বাঘ এবং রুখে ওঠা মোষেদের মাঝখানে। কর্তব্য ঠিক করার আগেই হঠাৎ সামনের ঝোপ সাংঘাতিকভাবে নড়ে উঠল এবং মোষের দল ঝোপের অতি নিকটে এসে পড়ায় বাঘ তেড়ে বাইরে আসার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ঝোপের বাইরে মুখ আসতেই দেখি জানোয়ার থরথর করে কাঁপছে, তার পরেই মাটিতে পড়ে গেল। তখন বাঘের সঙ্গে আমার ব্যবধান ৮।১০ গজ হবে। মোষগুলো ছিল একটু দূরে। এবার সাহসে ভর করে ডানদিকে সরে গেলাম বাঘের বুক দেখার জন্য। বাঘ তখন নিশ্চল। নড়াচড়া বন্ধ হলেও ঐ জীবটিকে আর বিশ্বাস করা চলে না। দিলাম রাইফেল-এর গুলি বুক লক্ষ্য করে চালিয়ে। শুধু বুক জখম হল না গুলি দিল বাঘের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে, তার প্রমাণ পেলাম জন্তুটির পিছন থেকে নুড়ি আকাশে ওড়ায়। বন্দুকের আওয়াজে ঝড়দলের সুফল পেলাম। প্রথম, মোষগুলো যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে ছুট দিল, দ্বিতীয় সম্বর হরিণ ছুটে পালাতে গিয়ে একেবারে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে উপস্থিত, তারপরেই সেই পাথর যেখানে কালরাত্রে বাঘের মাথায় গুলি চালিয়েছিলাম, এই জায়গার উপর থেকে লাফ মারার কোন উপায় নেই। জন্তুটা ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। রিপিটার রাইফেল প্রস্তুত ছিল, বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিলাম, হরিণটা আছাড় খেয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম গ্রামবাসীদের আহারের জন্য হরিণ নিজেই এগিয়ে গেছে এবং এতক্ষণে টিলার সামনে আমাদের সড়কের জ[illegible] গিয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে ঝোপের পিছন থেকে বাঘের তেড়ে আসা এবং থর-থর ক[illegible] কাঁপুনির পর হঠাৎ মাটিতে পড়ে যাওয়া[illegible] কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হল, মাথার খুলির ভিতর সাংঘাতিক জখমের প[illegible] মোষেদের আবির্ভাবে হঠাৎ দারুণ উত্তেজনা আসায় হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যাহোক এরপর ফিরে কাকে যে কি বলব তাও জানি না, কারণ দলের লোক সবকজনই অদৃশ্য। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলে লোকগুলো যদি কাছে থাকে তারা আরও ভয় পেয়ে যাবে। বাংলোয় যাবার জন্য, যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেইপথেই ফিরলাম, চলার পথ ঠিক করতে কিছু অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু মাঝে মাঝে শুকনো মাটিতে মোষের ক্ষুরের ছাপ থাকায় চিহ্নগুলিতে পথপ্রদর্শক ক'রে নিলাম এবং নির্ভুল পথ পেতে সময় লাগল না। বাংলোয় ফিরে অবাক হলাম, দেখি সবকটা লোক এখানে জড় হয়েছে এবং হাত বাড়িয়ে সড়কের দিকে কিছু দেখাচ্ছে। সকলের মধ্যে বেশ একটা হাসি-খুশী ভাব। কৌতূহলকে তুষ্ট করতে সময় লাগল না, কাছে এসে দেখি সত্যই প্রকাণ্ড শিংওয়ালা সম্বর হরিণ ওখানে পড়ে আছে। আমি কাছে আসবার আগে ওরা সদলবলে হরিণের মাংস কিভাবে ভাগ হবে তাই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চালিয়েছিল। উত্তেজনার কারণ এইখানে। কাছে এসে জানালাম—মরা বাঘটি তুলে না আনলে ও হরিণ কেউ খেতে পাবে না। খেতে তো পাবেই না, যা বখশিস দেব বলেছিলাম সে টাকা আমার পকেটেই থেকে যাবে। ওদের মধ্যে গাড়োয়ানই আগুয়ান হয়ে আমার কাছে এল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'বাঘটা সত্যই মরেছে?' বললাম—গিয়ে দেখে এস না। উত্তরে লোকটি বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করল এবং জানাল—ওরা যেতে রাজী আছে যদি আমি ভরা বন্দুক নিয়ে ওদের সঙ্গে যাই। বলাই বৃথা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আটজন লোকে যখন বাঘকে বহন করে আনল তখন দুপুর রোদ মাথার উপর। বাঘের চামড়া ছাড়ানর ভারও আমাকে নিতে হল, অন্যথায় চামড়াটি আর গোটা থাকত না। খালপোষ শেষ করার পর বেলা তখন বিকালের দিকে ঝুঁকেছে: এই সময় যা দেখলাম তাতে মন দমে গেল। যেখানে গত রাত্রে লেপার্ড মেরেছিলাম সেখানে অসংখ্য শকুনি আকাশে চক্র দিচ্ছে এবং একটার পর একটা নীচের দিকে নেমে আসছে। লেপার্ড-এর চামড়ার মায়া ছাড়তে হল, কারণ শকুনির সংখ্যা দেখে বুঝলাম এতক্ষণে লেপার্ড-এর চামড়া মাংস সবকিছুই শেষ হয়ে গিয়েছে, যদি কিছু পড়ে থাকে তা কয়েকটি হাড়।

এরপর শিকার সম্বন্ধে বলার আরও কিছু ছিল কিন্তু গল্পের আকার সীমার মধ্যে রাখা প্রয়োজন তাই এখানেই থামলাম।

নিক্সন নির্মাল্য
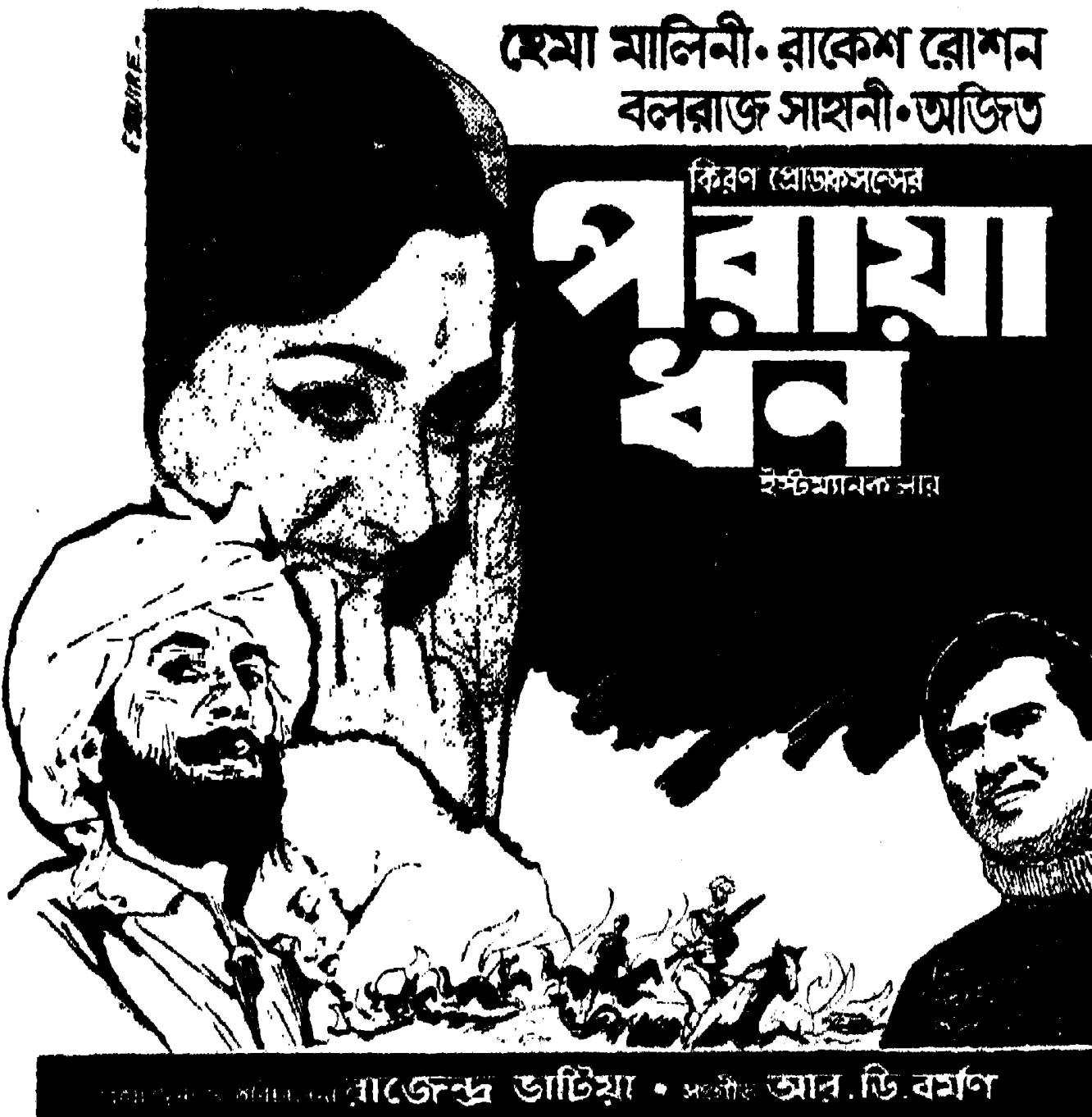
বনফুল

ও মিস্টার নিক্সন্,
তোমাদের এই মানব-প্রীতি
আন্তরিক, না, ফিক্শন্?
তোমাদের সব মিষ্টি মিষ্টি
নানান্ রকম বোলচাল
শুনছি নিত্যি দু' কান ভরে
লাগছে কিন্তু গোলমাল।
তোমাদের এক পূর্বসূরী
করেছিলেন চীৎকার
আমরা সবাই মানব-প্রেমিক
পশুকে দিই ধিক্কার।
তারই সুরে সুর মিলিয়ে
ও নিক্সন্-ভোমরা
বলছ তুমি—মজনু আমি
লায়লা হও তোমরা?
গিটকিরিতে ভরা তোমার
কি মিষ্টি সুর গলার
সুরের সঙ্গে ঝরেও পড়ছে
লক্ষ লক্ষ ডলার।
তবু দাদা, সত্যি বলছি
হচ্ছে কেমন সন্দ
গোলাপ ফুলের মাঝে কেন
আস্‌টে আস্‌টে গন্ধ?

কোর্টে ক্রিকেট

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দু-দুবার সমন জারি করাতে গেল, দু-দুবারই বিবাদী বাড়ি নেই। তৃতীয়বার গেল অফিসে। কোর্টের পিওনকে অন্তরালে ডেকে নিল জয়দেব। হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, 'এবারও গরহাজির দেখান।'

বাদী সহদেবের উকিল বিজয় ভটচাজ কোর্টের কাছে নোতুন জারির আবেদন করল। ঢোলসহরৎ করে বিকল্প জারি—সাবস্টিটিউটেড সার্ভিস। এফিডেভিট করলে, বিবাদী সমন এড়াবার জন্যে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, চক্রান্ত করে হাজির হচ্ছে না। সুতরাং সাবস্টিটিউটেড সার্ভিস চাই।

শেরেস্তা বললে, এফিডেভিটের শিলমোহরের দাম এখন আর দু টাকা নেই।

তারপরে নাজিরের ঘরে তদবির আছে। ঢোলসহরতের খাই-খরচ। সব দরাজ হাতে মিটিয়ে দিল সহদেব। দেখব হারামজাদা এবার কোন পথে পালায়।

জয়দেবের বাড়ির দোর গোড়ায় ঢোলে বাড়ি পড়ল।

আওয়াজ শুনে দেখতে-দেখতে লোক জমে গেল। কিসের উৎসব?

উৎসব না হাতি! সামান্য সমনজারি।

কিন্তু মামলাটা কিসের?

আর বোলো না। জমি-দখলের। দু ভায়ের মধ্যে ঝগড়া। দু ভাই নয় তো শুম্ভ-নিশুম্ভ।

অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এল জয়দেব। এত হৈ-হল্লা কিসের? দিন, দস্তখৎ করে সমন নিচ্ছি।

সহদেব অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, জয়দেবকে বশ্যতা মানতে দেখে উৎকট হাসিতে আনন্দ প্রকাশ করে বললে, হারামজাদা এবার শায়েস্তা হয়েছে।

সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জয়দেবের স্ত্রী প্রমীলা স্বামীকে বললে, 'বড় কর্তা যে তোমাকে অমন গালাগাল দিল, তার তুমি একটা পাল্টা বললেনা?'

'ও শালার গালাগাল তো ওকেই লাগল। আমি যদি হারামজাদা হই তবে ও কী হয়? জয়দেব আশ্বাস দিল : 'দেখ না ওকে কোর্টে কেমন তুড়ুং ঠুকি।'

প্রমীলা তৃপ্তিতে সর্বশরীর নিটোল করে দাঁড়াল স্বামীর পাশে। দেহরক্ষী হয়ে।

টাউটদের সুপারিশ বাছাই করে অনেক দেখে শুনে উকিল অজিত চাটার্জিকে জয়দেব মনোনীত করল। বললে, 'কী বলেন, মামলায় হাজির হব?'

'সেকি, সমন পেয়েছেন যখন, কেন হবেন না?'

'না কি ওকে একতরফা ডিক্রি নিতে দেব?'

'তাতে লাভ কী?'

'লাভ? সে-ডিক্রি সেট-এসাইড করার জন্যে ছানি করব। দুই শরিকের মামলা—ছানি নিশ্চয়ই এলাউড হবে।'

'যদি কোনো কারণে না হয়?'

'না হয় তো হাইকোর্টেশ্বরীর কাছে মানত করে হাইকোর্টে আপিল করব। হাইকোর্ট নিশ্চয়ই কমপ্যাশনেট ভিউ নেবে।'

'কিন্তু হাইকোর্টেশ্বরী কে?'

'ওরে বাবা, দারুণ জাগ্রত দেবী। ঘুমুনো দূরের কথা, দু চোখের পাতা একত্র করেন না। তেমনি ডায়মন্ডহারবার রোডে য়্যাকসিডেন্টেশ্বর ঠাকুরকে প্রণামী না দিলেই য়্যাকসিডেন্ট!'

'এমনি ঘুর পথে গিয়ে আপনার সুবিধে কী?'

'বুঝলেন না প্রসিডিংটা লম্বা করা—লম্বা করে বাদীকে লম্বা করতে চাই। আপনি কী পরামর্শ দেন?'

'অজিত সরল মুখে বললে, 'দেখুন আমরা উকিল, মামলা যত লম্বা হয় ততই আমাদের মঙ্গল। কিন্তু ঝোপের দুটো পাখির চেয়ে হাতের পাখিকেই বেশি দামি মনে করি। সমন যখন জারি হয়েছে তখন উপস্থিত মামলাটা ছেড়ে দিতে পারি না। ছেড়ে দিলে পরের পর্বে যদি আর আমার কাছে না আসেন।'

'কী যে বলেন। আপনি অজিত, আপনিই আমার ক্যাপটেন।'

টাউট গঙ্গাধর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। বললে, সহদেব-জয়দেব দুই ভাইই প্রকাণ্ড ক্রিকেট-খেলোয়াড়। সহদেব ব্যাটসম্যান আর জয়দেব বোলার। সহদেবের ক্রেডিটে বেশ কখানা সেঞ্চুরি জমেছে, তেমনি জয়দেবের বোলিং এভারেজও টপ—দেখবার মত।

'যখন যেমন বলবেন তখুনি তেমনি ছাড়ব।' ক্রুর চোখে হাসল জয়দেব : 'পেস আর স্পিন দুইই আমার আমারিতে আছে। গুগলি চায়নাম্যান ইয়র্কার—চাইকি বাম্পার-বাউন্সারও চলবে।

'কিন্তু আমাদের ক্যাপটেন এক নবাব ছিলেন না?'

'নবাব বলে নবাব। দুই পুরুষ ক্যাপটেন। এ বনেদি ক্রিকেটার। কিন্তু এখন তার রাজ্যও নেই নবাবিও নেই। এখন তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করছেন।'

'ভিক্ষে করছেন?'

'মানে ভোট ভিক্ষে করছেন। ইলেকশানে দাঁড়িয়েছেন যে—'জয়দেব গলা খাঁখরে বললে, 'কিন্তু আমার উৎসাহ হচ্ছে অন্য কারণে। আর্জির নকল দেখুন। মামলার ফাইলিং ডেট দেখেছেন? তারিখ তেরো।'

'কোন মাসের তেরো?'

'মাস দিয়ে কী হবে? মাস তো আর তেরো হয় না। তারিখ হক—তারিখ তেরো। তার মানে তেরো তারিখে মামলা রুজু হয়েছে। তার মানে, মামলায় বাদীর নির্ঘাৎ হার।'

অজিত বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'তেরো তো ভীষণ অপয়া। বলতেই বলে 'আনলাকি থার্টিন'। লাস্ট সাপারে যীশু আর তাঁর বারো শিষ্যের শেষ খাওয়া। সহদেববাবুও শেষ খাবেন।'

অজিত গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

তেরো'তে কত ব্যাটসম্যান ম্যাসাকার হয়েছে তার সংখ্যা জানেন?' টাউট গঙ্গাধরকে কাছে টানল জয়দেব : 'তুমি একবার বাদীর কানে খবরটা পেঁাছে দিও। ব্যাটসম্যান, মশাই, ঠিক একটা ধাক্কা খাবে আর সেই থেকে সারাক্ষণ বুক ধুকধুক করবে। শত্রুপক্ষের বুক যত ধুকধুক করে ততই সুখ।'

খবরটা পেতেই ব্যাপারটা খেয়াল করল সহদেব। তক্ষুনি তার উকিল বিজয় ভটচাজের উপর তম্বি করে উঠল : 'আপনার নাম বিজয় দেখে আপনাকে সিলেক্ট করলাম আর আপনি কিনা তেরো তারিখেই মামলা ফাইল করলেন।'

'বিজয় দেখে সিলেক্ট করলেন মানে?'

'আমাদের তিন ব্যাটসম্যান-হিরো তিনজনই বিজয়—বিজয় হাজারে, বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় মানজরেকার। কিন্তু তিনজনেই তেরোর ভয়ে জবুথবু।'

বিজয় চোখ বড় করল : 'তেরোকে ভয় কেন?'

'তেরো আনলাকি নয়? হোটেলে তেরো নম্বর ঘরে কেউ শোবে না, এরোপ্লেনে তেরো নম্বর সিটে বসবে না। রুন ম্যাকে তার ক্রিকেটের বইয়ে বারো পরিচ্ছেদের পরই চোদ্দ পরিচ্ছেদ সুরু করেছে। তেরো সংখ্যক কোনো পরিচ্ছেদই নেই।'

'এতটা?'

'হ্যাঁ, সেঞ্চুরির পথে এগুতে এগুতে কত ব্যাটসম্যান ৮৭ করে আউট হয়ে গেছে। তার মানে বুঝলেন? তার মানে সেঞ্চুরি করতে আর তেরো রাণ বাকি, সুতরাং সাতাশিতেই আউট।'

'প্লাসে আনলাকি, মাইনাসেও আনলাকি?'

ঠিক তাই। ক্রিকেটে প্রত্যেক দলে টুয়েলভথ ম্যান থাকে, কেউ আহত হলে তার বদলা খাটবার জন্যে। কখনো-কখনো দুজনও তো আহত হয়, তাই বলে থার্টিনথ ম্যান নেওয়া যাবে না। কেউ থার্টিনথ ম্যান হতে রাজিও হবে না। যদি একবার থার্টিনথ ম্যান চালু হয় ক্রিকেটই উঠে যাবে দুনিয়া থেকে।'

'কী বলছেন বুঝতে পারছি না।।' বিজয় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল : 'ঐ সংখ্যাটা তো ইংরেজের বেলায় খাটে।'

'ক্রিকেট তো এখন আমাদেরই জাতীয় খেলা হয়ে উঠেছে।'

'আমাদের কোনো সংখ্যাই অশুভ নয়।' বিজয় আশ্বাস দিল : 'আমাদের একে চন্দ্র—'

'চন্দ্রের কথা আর বলবেন না। মানুষ গিয়ে তার উপরে পা রেখেছে, তার আর মাহাত্ম্য নেই। বরং বলুন, একে সূর্য—'

'বেশ একে সূর্য, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পঞ্চ বাণ, ষড় ঋতু, সপ্ত ঋষি অষ্ট বসু, নব গ্রহ, দশ দিক, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—'

'কিন্তু তেরোতে আউট। নির্ঘাৎ আউট। উঃ, কী যে হবে।' সহদেব চোখে আঁধার দেখল।

পঙ্কজের বাবা অমিয়কেতন মুখুজ্জে তার জমিতে দুখানা বাড়ি করে পুবেরটা সহদেবকে ও পশ্চিমেরটা জয়দেবকে দলিল করে দান করে গেছেন। কিন্তু মাঝখানে কাঠা ছয় জমি এজমালি রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল এ জমিটুকু দু-ভাই একত্রে ভোগ করুক। আর এ জমিটুকুর মধ্য দিয়েই দুই ভাইয়ের সম্পর্কটা শ্যামল থাকুক।

সহদেব বলছে ও জমি আমার দানপত্র অন্তর্ভুক্ত, সহদেব বলছে আমার দানপত্রে।

সহদেবের দিকে তরিতরকারি, জয়দেবের দিকে ফুল। আর ফুল বলতে একেবারে বসরাই গোলাপ। সহদেবের মেয়ে রুমা তারই একটা ছিঁড়েছিল খোঁপায় পড়তে। আপত্তি করতে এল জয়দেবের মেয়ে

ছুলি। মেয়ের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করতে এল সহদেবের স্ত্রী সুতপা, কোমর বাঁধল জয়দেবের স্ত্রী প্রমীলা। ছোট এক কণা আগুন থেকে ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল হুতাশন।

দুই ভাই চেয়েছিল উপেক্ষা করতে। কিন্তু স্ত্রীদের প্ররোচনায় তিষ্ঠোতে পারল না। যত রকম গালাগাল নিষ্কর্মাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য সব দু ভাইয়ের মাথায় বোঝাই হতে লাগল। সে গালাগাল নিজেরাও ক্রমে-ক্রমে শিখে নিয়ে পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করলে। বোঝাতে চাইল তারা পরন্ধেরাও প্রতিকারে তৎপর হয়ে উঠেছে।

মামলা ছাড়া উপায় নেই। খাস-দখলের মামলা।

জয়দেব যেদিন জবাব দাখিল করতে কোর্টে যাচ্ছে, প্রমীলা বললে, 'ঐ দেখ বড় গিন্নি জানলায় তোমাকে ঝাঁটা দেখাচ্ছে।'

'দেখাক। ঝাঁটা খুব ভালো যাত্রা।'

'ভালো যাত্রা?'

নিশ্চিন্তে পান চিবোতে চিবুতো জয়দেব বললে, 'একেবারে ক্লিন সুইপ। যা সমস্ত আবর্জনা প্রহার করে পরিষ্কার করে সে তো নমস্য।'

কোর্টে এসে জয়দেব দেখল স্টেজের উপর গম্ভীর ধরনের স্তব্ধ একটা লোক ঠেং পেতে বসে আছে। অজিতকে জিজ্ঞেস করলে, 'এই বুঝি আম্পায়ার?'

অজিত হেসে বললে, 'হ্যাঁ।'

'আমাদের মাঠের আম্পায়ার তো শাদা খোলে মোড়া থাকে—একটা স্তম্ভের মত —এ যে দেখি কালো কুদাকার যমদূতের পোশাক পরা। কিন্তু কথা বলে না কেন?'

'মাঠের হাকিম কথা বলে?'

'তার শুধু এক কথা নোবল-এ নো হাঁকড়ানো। মাঝে-মাঝে Howzat -এ ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়ানো। নয়তো ঊর্ধ্বে আংগুল তুলে দেওয়া। আঙ্গুল তুলে দেওয়া মানেই সাবড়ে দেওয়া। হাতে মাথা কাটা শুনেছেন, এ আংগুলে মাথা কাটা।' জয়দেব অজিতের আরো কাছে সরে এল: 'এ আম্পায়ার কদ্দুর লেখাপড়া করেছে? এক থেকে দশ গুনতে পারে তো?'

'সেকী কথা?'

'মাঠে হাফ-শার্ট-প্যান্ট পরা একজনকে জিজ্ঞেস করা হল, কদ্দুর পড়েছেন? সে বললে বেশি নয়, এক থেকে দশ গুনতে পারি। তার মানে? বললে, আমি ফুটবল ম্যাচের রেফারি। কোনো ম্যাচে দশটার বেশি গোল দিতে দেখিনি। কিন্তু আপনার এ আম্পায়ার কী করে?

'এ শুধু ঘড়ি দেখে।'

কিন্তু কদিন পরেই হাকিমের সঙ্গে বিজয়ের ঝগড়া বাধল।

বিজয় মুখের থুতু আঙ্গুলে মাখিয়ে কোর্টের নথির পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছিল, হাকিম গম্ভীর স্বরে বললে, 'Please dont soil my records".

বিজয় তো হতবাক। বললে, 'এ অবমাননাকর। আমি চাই আপনি ঐ উক্তি প্রত্যাহার করুন।'

'আমি কি fact ছাড়া অন্য কিছু বলেছি? তা ছাড়া কথার আগে তো প্লিজ আছে।'
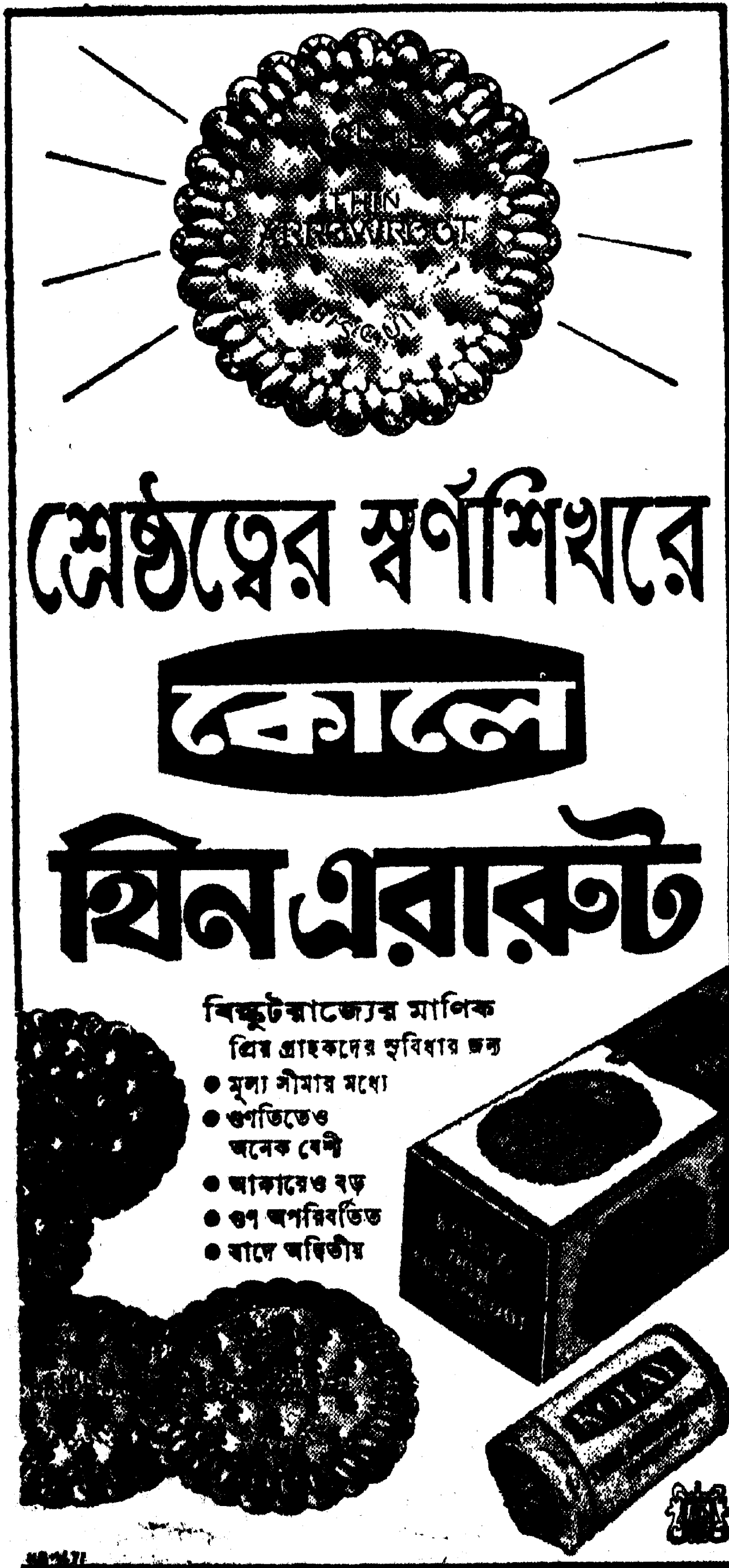
'রেকর্ড কি আপনার?'

'তবে কি আপনার? আপনার হয় তো রেকর্ড বাড়ি নিয়ে যান।'

আমি এই মামলা থেকে উইথড্র করছি। আমি চাই আমার ব্রাদার প্লিডারও এই কোর্ট বয়কট করুন।'

বয়কট! জয়দেব বলে উঠল,' 'It is not cricket'.

বয়কটকে আম্পায়ার ওকোনেলি রান আউট দিয়েছিল। বয়কটের কী দারুণ রাগ। ব্যাট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোমরে হাত রেখে চ্যালেঞ্জ করলে আম্পায়ারকে। আম্পায়ার তার সিদ্ধান্তে অনড় রইল। মাঠশুদ্ধ লোক বয়কটকে 'দুয়ো' করতে লাগল। কাগজে-কাগজে সমালোচনা বেরুল বয়কটের ব্যবহার অশোভন শুধু নয়, [illegible]

অজিত বললে, 'এটা এমন একটা ঘটনা নয় যে বয়কট করতে হবে।'

'বিবাদী বাদীর সঙ্গে কবে আবার রফা করেছে!' অভিমানে বললে বিজয়।

'শুনুন, চটবেন না।' হাকিম বললে, 'কথাটা আমি ঘুরিয়ে বলছি।

Please dont soil your tongue with my records'.

সবাই হেসে উঠল।

জয়দেব বললে, 'আপনি যদি বোলার হতেন থুতু দিয়ে আপনার বল ঘসতে পারতেন, ট্রুম্যান তো মাথায় হাত বুলিয়ে চুলের তেলে বল ঘসত।'

কথা ঘুরিয়ে নেওয়া হল বলে বিজয় আর উচ্চবাচ্য করল না।

এ সেই হল্-এর ব্যাপার হল। হল্ বল করছিল, হঠাৎ কখন মাঠ ছেড়ে চলে গেল প্যাভিলনে। রব উঠল হল্ কোথায়? মাইকে ঘোষণা হল—

Hall is busy injuring a nurse in the pavilion

—তারপরেই আবার সংশোধন এল—

Hall is busy nursing an injury in the pavilion

তারপর মাঠময় সে কী উত্তাল হাসি?

বাড়ি ফিরে এলে সুতপা সহদেবকে জিজ্ঞেস করলে, 'মামলার কী হাল?'

'দানপত্রের সম্পত্তি সীমানাসরহদ্দ ঠিক করতে হবে, দেখাতে হবে জমিটা আমার দলিলের অন্তর্ভুক্ত।

বাড়ি ফিরে এলে প্রমীলাও অনুরূপ প্রশ্ন করল স্বামীকে।

জয়দেব বললে, 'দাদার দলিল মেপে কী বেরোয় দেখি, তারপর আমার দলিল বের করব।'

প্লিডার কমিশনার বসল জরিপ করবার জন্যে।

'যে লোকাল ইনভেস্টিগেশান চায় কমিশনার তার পক্ষেই রিপোর্ট দেয়।' মন্তব্য করল জয়দেব।

'তার হাতেই খায় যে।' অজিত সায় দিল। পরে বললে, 'আপনি ঘাবড়াবেন না। দেখি কী রিপোর্ট দেয়! রিপোর্ট আমরা চ্যালেঞ্জ করব।'

ঠিক যা ভাবা গিয়েছিল। কমিশনার রিপোর্ট দিয়েছে বিরোধীর জমি সহদেবের হোলডিং-এর মধ্যে।

কমিশনারের রিপোর্ট মানলনা জয়দেব। ও ত্রুটিপূর্ণ, পক্ষপাতদুষ্ট, অবৈজ্ঞানিক।

জেরা হচ্ছে কমিশনারের। যেখানে সে ঠেকছে, আমতা-আমতা করছে, সেখানেই জয়দেব চেঁচিয়ে উঠছে : 'হাউজ্যাট।'

হাকিম বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'এই ধ্বনিটা কিসের?'

'আমরা উকিলরা যেমন I object, sir বলি, ও'রও সেইরকম একটা আওয়াজ। ক্রিকেট ম্যাচে উনি বোলার ছিলেন কিনা।' অজিত বললে বুঝিয়ে।

'শালা আবার বোলার!' সহদেব গর্জে উঠল।

পালটা হুঙ্কার ছাড়ল জয়দেব-: 'দেখুন, দেখুন শালা দাদা ছোট ভাইকে শালা বলছে!'

'হোয়াট ইজ দিস?' হাকিম তার কলম রাখল : 'ইজ দিস ক্রিকেট?'

'কনটেম্পট!' অজিত সহদেবকে লক্ষ্য করল।

'কনটেম্পট তো বিবাদীরও।' বিজয়ও ঘুরে দাঁড়াল। পরে কোর্টকে লক্ষ্য করে বললে, 'স্যার শালা কোনো গালাগাল নয়, শালা একটা পদবী। অনেকে ভগবানকেও শালা বলে।'

অজিত বললে, 'মেয়েরাও আজকাল শালা বলছে।'

হাকিম বললে, 'তারপর যে পক্ষ মামলায় হারবে সে পক্ষ হাকিমকে শালা বলবে।'

সহসা সহদেব হাত জোড় করে হাকিমের উদ্দেশ্যে বললে, 'আমি দুঃখিত। আমি ক্ষমা চাহি?'

'ক্ষমা?' যেন বিজয়ও এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

'আমি ক্রিকেট খেলি, আমি ক্ষমা চাইতে জানি। আম্পায়ারের আউট দেওয়ায় বিরক্ত হয়ে লরি ব্যাট ছুঁড়ে ফেলেছিল, তারপর সে ক্ষমা চায় নি?'

'আমি ক্রিকেটার, স্যার।' হাতজোড় করে জয়দেবও ক্ষমা চাইল : 'স্নো ছুটন্ত গাভাসকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, তার হাত থেকে খসে-পড়া ব্যাটটাকেও দিয়েছিল ছুঁড়ে—চূড়ান্ত অসভ্যতা--তারপর সে ক্ষমাভিক্ষা করেনি? ক্ষমা ক্রিকেটেরই অহংকার।'

তারপর জয়দেব নিজের বাড়ির চৌহদ্দি ভাঁওরাতে চাইল। ওর পক্ষের কমিশনার মেপেজুখে রায় দিল, বিরোধীয় জমি জয়দেবের বাড়ির কোলে।

'কোনোদিন দুই এক্সপার্ট একমত হয় না।' হাকিম বললে।

'না কোনোদিন দুই কোর্ট।

'না কোনোদিন দুই উকিল। দুই সমালোচক।'

হাকিম বললে, 'ওসব ছাড়ুন। আমি নিজেই একবার দলিল দুটো পরীক্ষা করি।'

সহদেবের দলিলে দত্ত সম্পত্তির বর্ণনার মধ্যে তোলা পাঠ দিয়ে লেখা আছে, 'মায় পশ্চিম দিকের জমি—'

তোলা-পাঠ! এ পজিটিভ ফ্রড।' জয়দেব মরীয়া হয়ে উঠল : 'এখানে Criminal lawyer কেউ আছে? Criminal lawyer

জয়দেবের দলিলেও তেমনি তোলা-পাঠ, 'মায় পূর্ব দিকের জমি—'

এবার সহদেব হুমকে উঠল 'Tampering with records! শালাকে আমি পাগলা দেখাব।'

তারপর আরো অনেক রব উঠল :

'লেখক তারিণী চাটুজ্জেকে ডাকুন-!'

'হ্যাঁ, ধরে আনুন তারিণীকে।'

'রেজেস্ট্রি অফিসের নকল তলব করুন।'

'তারিণী দারুণ ঘোড়েল। ও হয়তো সেখানেও তোলা-পাঠ দিয়েছে।'

'এ একটা চক্রান্ত।'

'এ একেবারেই ক্রিকেট নয়।'

হাকিম বললে, 'ফর্ম্যাল কমপ্লেন্ট করুন। আমি দেখছি।'

বাড়িতেও কান্না-কোলাহল শুরু হল।

সহদেব বললে, 'ছোট ভাই, কত স্নেহে-আদরে মানুষ করেছি, আমাকে দলিলজালের দায়ে জেলে পাঠাচ্ছে। একটা ফুলের জন্যে আমাকে এখন পাঁচ বছর জেল খাটতে হবে।'

জয়দেবেরও অমনি কান্না : 'বড় ভাই, কত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে আনুগত্য করেছি, আমাকে কিনা দলিল-জালের দায়ে জেলে পাঠাচ্ছে। এতটুকু ক্ষমা নেই। একটা ফুল ছেড়ে দিতে পারলাম না এখন স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে আমাকে সাত বছর শ্রীঘরে বাস করতে হবে।'

সুতপা বললে, 'তুমি মামলা ছেড়ে দাও।'

প্রমীলা বললে, 'জমিতে আমাদের কাজ নেই।'

হাকিম জিজ্ঞেস করলে, 'ফর্মাল কমপ্লেন্ট কই?'

সহদেব বললে, 'আমাদের মামলা মিটে গিয়েছে।'

জয়দেব সায় দিল : 'আমাদের দারা আমাদের বিদীর্ণ করতে পারল না।'

'অযথা আমাদের কিছু টাকা গেল, কিন্তু টাকা শুধু ব্যয় নয় অপব্যয় না করতে পারলে স্ত্রীরা স্বামীকে মূল্যবান মনে করতে চায় না।' বললে সহদেব।

'হেঁজিপেজি ভাবে।' বললে জয়দেব।

'কিন্তু', হাকিম প্রশ্ন করল : 'জমির কী হল?'

সহদেব বললে, 'জমি আমাদের এজমালি থাকল।'

জয়দেব বললে, 'আমরা দুজনে আবার দাদা-ভাই হয়ে গেলাম।'

হাকিম চেয়ারে হেলান দিল। বললে, This is cricket

সহদেব বললে, 'ঠিক সেই ব্রিসবেনের টেস্টের মত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৩৭, অস্ট্রেলিয়া ৭৩৭—ইতিহাসে এত বড় 'টাই' হয়নি কোনোদিন।'

'শেষ ওভারে দুটো বল বাকি আর একটা মাত্র রান। শেষ জুটি মেকিফ আর ক্লাইন তখনো ক্রীজে। হলকে ফেস করছে মেকিফ। হল বল করতেই মেকিফ লেগ-এ মারল। নির্ঘাত একটা রান—নিশ্চেত জয়—মেকিফ আর ক্লাইন রান নেবার জন্যে ছুটল হন্যের মত। কিন্তু কী আশ্চর্য, সোলোমন বলটা এক হাতে কুড়িয়ে নেবার সংগে সংগে বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুঁড়ে মারল উইকেটে—আম্পায়ার আঙ্গুল তুলে দিল—রান আউট। খেলা ড্র হয়ে গেল।' বললে সহদেব, আমরাও তেমনি মিলে মিশে এক হয়ে গেছি।'

'আমাদের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, সুখ-দুঃখ এক।' বললে সহদেব, মিলতে পারার মত জিততে পারা আর কী আছে?'

বিজয় বললে, তখন যে বলেছিলেন তেরো-তে কিছু হয় না, তেরো মানে হার—এখন কী দেখছেন? দেখছেন, সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী।'

হাকিম শেষ কথা বললে। বললে, উদার মাঠের ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়ে এখন যেন সংকীর্ণ ঘরে ক্ষুদ্র টেবলে পিং পং খেলতে বসবেন না।'

বাঘা যতীন

বীরু মুখারজি যেমন এক সার্থক পালা রচনা করেছেন বিপ্লবী যতীন মুখারজির কাহিনী নিয়ে—যাত্রার আসরে তাকে আরও অনেক বেশি সার্থকতা দিয়েছেন পরিচালক জ্ঞানেশ মুখারজি তাঁর অসাধারণ প্রয়োগ কুশলতায়। যতীন মুখারজির বাড়ির বহির্ভাগ থেকে নাটক শুরু হয়ে যখন বুড়িবালামের তীরে এক প্রচন্ড সংগ্রামের মুহূর্তে পেঁছয়, তার মধ্যে নাটকের কোন অংশই অহেতুক বিলম্বিত নয়, অকারণ উচ্ছ্বাসে ভরা নয়। আর প্রয়োগের যে চেহারাটি জ্ঞানেশ মুখারজি দেখিয়েছেন তাতে রয়েছে প্রচন্ড সংযম এবং অসাধারণ শিল্পবোধ। শেষের সেই চরম নাটকীয় এবং বিয়োগান্ত মুহূর্তটি এমন করে দর্শকের বুকে দাগ কাটত না, যদি না সংযম সহকারে তার পূর্বাংশ পেশ করা হত। অথচ পালার যত্রতত্র অতিনাটকীয় রসের ঝরণা বইয়ে দেবার অজস্র সুযোগ ছিল, কিন্তু পরিচালক বা নাট্যকার কেউই তাতে প্রলুব্ধ হন নি। ফলে ভারতী অপেরার "বাঘা যতীন" শুধু তার সংগ্রামী বিষয়বস্তুর জন্যই নয়, শুধু দেশপ্রেমে উদ্বোধিত করার মতই নয়, সূক্ষ্ম রসের বিচারে এক অসাধারণ শিল্পরসোত্তীর্ণ পালাগানরূপে আপামর দর্শকের অজস্র অভিনন্দন পাবার দাবি রাখে। —আনন্দবাজার

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল
ভারতী-অপেরা
১৯৩, রবীন্দ্র সরনী · কলিকাতা-৬ ॥ ৫৫-২৩৫১

অগ্নিযুগের সেই বীর বিপ্লবী যিনি সর্বপ্রথম বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছিলেন তারই কাহিনী এটি। দেশপ্রেম ও বীরত্বে উজ্জ্বল, বৃটিশ নৃশংসতায় ভরা এ পালার বলিষ্ঠ রূপায়ণে ভারতী অপেরার শিল্পীরা অপূর্ব দক্ষতার নজীর রেখেছেন। অন্য কথায় তাঁদের 'বাঘা যতীন'কে মরশুমের প্রথম শ্রেণীর পালাগুলির অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। দেশপ্রেমের এমন একটি সুমহান পালা উপহার দেওয়ার জন্য ভারতীয় অপেরাকে ধন্যবাদ। —অমৃত

শুভদা

যাত্রাপালার বিষয়বস্তুতে, প্রযোজনায় এবং প্রয়োগে সত্যি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, আজকের যাত্রা না দেখলে তা বোঝা যায় না—বিশেষ করে বোঝা যাবে না ভারতী অপেরার 'বাঘা যতীন' না দেখলে। পরিচালক জ্ঞানেশ মুখারজি আসরে যা উপহার দিয়েছেন তা নাট্যরসে টইটুম্বুর কিন্তু ওরই মধ্যে এ-দেশের মাটি আর মানুষের গন্ধ এবং দেশপ্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গের মহান দৃষ্টান্ত আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। —দেশ

...বাংলা নাট্য জগতের দিকে সারা ভারতের দৃষ্টিকে টেনে রাখার মত সর্বাঙ্গীণ আবেদন দিয়ে শ্রীমন্ডিত করা ভারতী অপেরার নবতম নাটক 'শুভদা'। 'শুভদা' শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের লেখা; এর উৎপত্তিকাল ১৮৯৮ সাল; সুতরাং এতে শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর না থাকারই কথা। কিন্তু প্রথম লেখনপ্রসূত হলেও শরৎ সাহিত্যের অনুকরণীয় বিন্যাস, স্নেহ, মায়া ও মমতায় ভরা দরদী চরিত্রগুলির নিখুঁত ছাপ 'শুভদা'র প্রতিটি চরিত্রে। প্রথম যৌবনে রচিত এবং অপক্ক হস্তে অঙ্কিত এই চরিত্রগুলিও যে কী বিরাট সম্ভাবনাময় ছিল পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জী এবং নাট্যকার ব্রজেন দে তাই উদ্ঘাটিত করে দেয়ার সুযোগ দিলেন বাংলার দর্শকদের; অদ্যাবধি শরৎচন্দ্রের যে কয়েকটি কাহিনী সার্থক নাট্যরূপের মর্যাদা পেয়েছে ভারতী অপেরার 'শুভদা' তার অন্যতম; নাটকটি দেখে একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। —যুগান্তর

যাত্রাভিনয়ের বর্তমান রূপ ও ভঙ্গি

• তুষারকান্তি ঘোষ •
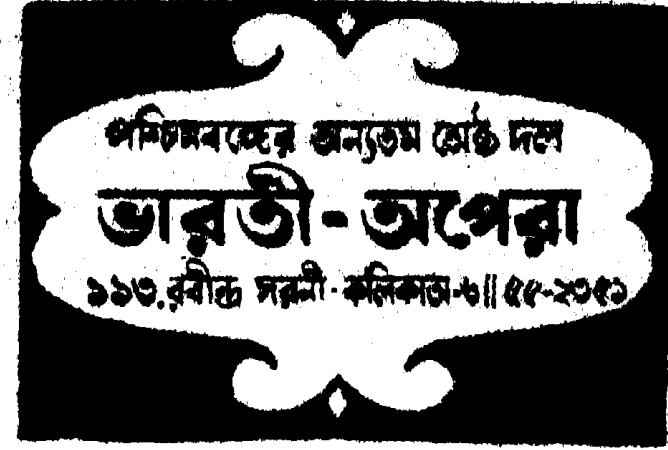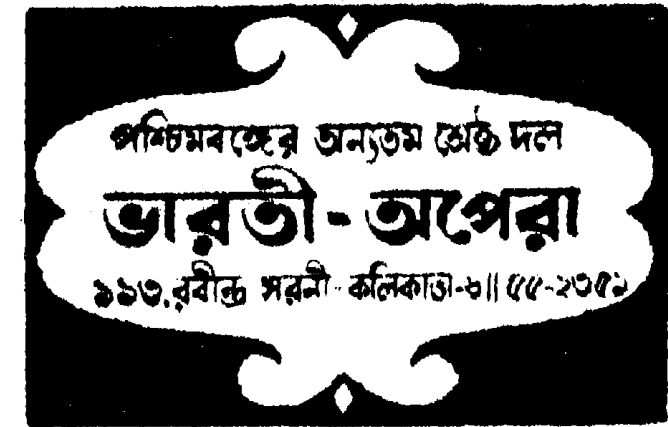
পশ্চিমবাংলায় যাত্রাভিনয় সম্প্রতি আশ্চর্য এক গতিসঞ্চার করেছে এবং যাত্রা-আসরে এর উপস্থাপনা, আঙ্গিক, উপজীব্য ও সংলাপে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে। এককালে আশংকা জেগেছিল, থিয়েটার এবং তার চাইতেও ব্যাপক সিনেমার তরঙ্গমালা একে অভিভূত ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। মনেও হয়েছিল, এ বহুলাংশে ম্লান হয়ে গেছে। যে-কোন দিন একেবারেই নির্বাপিত হতে পারে। কিন্তু এর প্রাণশক্তি দেখে অবাক হতে হয়। যাত্রা বা যাত্রার আসর যে শুধু টিঁকে রইল তা নয়, এর অভাবনীয় বিস্তার ঘটেছে এবং ঘটছে। সেদিন নাটক-থিয়েটার মহলের একজন প্রসঙ্গত বলছিলেন, যাত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সম্মাননা বা পারিশ্রমিকও নিতান্ত সামান্য নয়: কারও কারও তো হাজার দেড় হাজারের ঘরে।

কি করে এ সম্ভব হল? আমার মনে হয়, যাত্রার সঙ্গে আমাদের দেশবাসীর একটা অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ আছে; যাত্রার আসরটা একটা অস্থায়ী সামিয়ানার নীচে নয়, ওটা এদেশবাসীর মনে স্থায়ী হয়ে আছে। আসরে বসে সবাই মিলেমিশে একটা বিশেষ বিষয় উপভোগ করার মধ্যে যে আত্মীয়তাবোধ আছে, থিয়েটার বা সিনেমায় তা নেই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও যাত্রা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন এজন্য যে, যাত্রায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে যাত্রার শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয় এবং দৃশ্যপটহীন ঐ আসরকে অবলম্বন করে শ্রোতা-দর্শকের কল্পনাশক্তি সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিশীল হয়ে এগোয়। তাই উভয় পক্ষে এটি এত উপভোগ্য হয়।

বস্তুতঃ বাংলার যাত্রাভিনয়ে নিজস্ব ঐতিহ্য আছে; লোকশিল্পে এর এমন এক সবিশেষ স্থান আছে যা থেকে আজও তাকে চ্যুত করা যায় নি। যেসব কাহিনী অবলম্বন করে এযাবৎ যাত্রাভিনয় অনুসৃত হয়েছে, তার বাহ্যিক কাঠামো এখানে ওখানে কিছু কিছু বদলে গেলেও জীবনের চিরন্তন বাণী—যা অনায়াসেই শিক্ষিত অশিক্ষিত চিত্তকে স্পর্শ করে, চঞ্চল করে, উদ্বুদ্ধ করে, সতর্ক সাবধান করে—তাই উচ্চারিত হয়েছে। কেননা, এর মূলে রয়েছে ধর্ম-চেতনা, সদসদ্ মূল্যবোধ; মানুষের পাপাবিদ্ধ মন যেখানে কেঁপে কেঁপে ওঠে, আপন সত্তায় ফিরে যেতে চায়। তাই পালাকারেরাও এই চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে পালা রচনায় হাত দিতেন এবং সেইসব কাহিনী থেকে বিষয় নির্বাচন করতেন যার সঙ্গে শ্রোতাদের গভীর নৈকট্য আছে। যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরাও ঐ ভাবে উদ্বেলিত হয়ে পড়তেন বলেই অনায়াসে শ্রোতাদের দেহে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে পারতেন। অভিনয়ের মধ্যেই একই আসর কখনো রাজসভায়, কখনো বধ্যভূমিতে, কখনো জতুগৃহে পরিণত করতে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে যদি মুহূর্তেও মনে হয় এটা নিছক সতরঞ্চি-পাতা একটা সাজানো আসর মাত্র এবং তাতে কতকগুলো লোক রঙ মেখে সং সেজে নর্তন কুর্দন করছে তবে সমগ্র ব্যাপারটাই অসার্থক হয়ে যায়। এবং পালার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু আজ এই যে, যাত্রার নতুন করে ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটছে, আকৃতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তার মধ্যে কিছু ভয়-ভাবনার কারণও দৃষ্টি এড়াতে পারে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোন কোন সময় যেন ছন্দহারা হয়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ যে-নাড়ীযোগে যাত্রার আকর্ষণ তার ওপর যেন অকারণ আঘাত পড়ছে।

কৃষ্ণযাত্রা, শিবযাত্রা প্রভৃতি অবলম্বন করে আগে যা পরিবেশন করা হত, আর আজকে যা পরিবেশনের চেষ্টা হচ্ছে তার মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধানও রচনা করছে যেন; এই দুইয়ের মধ্যে একটু সেতু যেন পাওয়া যায় না। হতে পারে লোক-ভাগিদেই কিছু কিছু নতুনত্ব অনুপ্রবেশ করছে; কিন্তু তার কতখানি কৃত্রিম, কতখানি স্বাভাবিক, কতখানি এই মাটিরই রসপুষ্ট অংকুর, কতখানি টবে লালিত অপরিচিত মাটির রসপুষ্ট উদ্গম কাল তা নির্ণয় করবে বটে, কিন্তু এখনও অনুভবনীয়। ভাবনা এই, নিরবলম্ব অবস্থায় আকাশকুসুম রচনায় যেন আমরা হাত না দিই; তাতে যাত্রাসূত্রে পুরোনো মূল্যবোধ যেমন যাবে, নতুন মূল্যবোধও তার স্থান নেবে না।

আমাদের যাত্রায় রাজনৈতিক প্রচার হয় নি এমন নয় বা তা রাজরোষে পড়ে নি এমনও নয়, কিন্তু সে রাজনীতি সমগ্র সমাজের অংগ হিসেবে এগিয়েছে, সমাজটাকে চিনতে সেখানে ভুল হয় না। কিন্তু আজকাল কোন কোন অভিনয়ে রাজনৈতিক মতবাদ এমন স্পষ্টভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে যে, ওর প্রচারকার্যের নগ্নতায় অভিনয় সৌকর্যে রসোত্তীর্ণ সার্থক পালার অভাব ঘটছে। এই লক্ষণ শুভ মনে করতে পারিনে। পালায় সমকালীন জীবনের প্রতিফলন আপত্তিকর নয়, আপত্তি তার আতিশয্য, কেননা, শাশ্বত সূত্র ছিন্ন করতে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কোন মতবাদের খাতিরে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটালে তা মারাত্মক হয়ে ওঠে; রসের দিক থেকে, শিল্পের দিক থেকে, অভিনয় ও সাহিত্যের দিক থেকে তা ক্ষমার্হ হতে পারে না। বর্তমান কোনো কোনো যাত্রাভিনয় এই দোষমুক্ত নয় এই আশংকাই করি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মুকুন্দ দাসের যাত্রাপালায় শিল্পোচিত আতিশয্য হয়তো আছে কিন্তু তা জীবনসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তখনকার শাসকের বিরুদ্ধে যেসব ইঙ্গিত ছিল তা সংযমে সুন্দর ও অধিকতর চিত্তাকর্ষক হওয়াতেই শাসকগোষ্ঠী প্রমাদ গুনেছিলেন। তাঁর হাতে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে নি; যদি ঘটত শ্রোতারাই তা গ্রহণ করতেন না।

আজকের যাত্রাভিনয়ের আর একটি লক্ষণ এর ইনটেলেকচুয়াল-প্রবণতা এবং তা এত দ্রুতগতি যে, আপামর জনসাধারণের পক্ষে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা দায়। সেকালে পালাকারেরা সমাজের সমস্যা সম্পর্কে অবশ্যই লিখতেন কিন্তু তাতে সজাগ থাকত গ্রামীণ চেতনা বা আদর্শ। আজকের অনেক পালাকারের সঙ্গে এই গ্রামীণ সংযোগ বা ঐতিহ্যানুসারী পালা-

গানের সংগে পরিচয় কম। পক্ষান্তরে, তাঁদের নগর-চেতনা এবং নাগরিক মানসিকতা প্রবলতর থাকে বলে যাত্রাপালায়ও তার প্রতি-ফলন ঘটে। ফলে, এই বিমিশ্র চিন্তার সৃষ্টি কোথায় কতটা গ্রাহ্য বা তার আবেদন কত-খানি কালোত্তীর্ণ স্থির করে বলা কঠিন।

অতীতের যাত্রাপালা সম্পর্কে বর্তমান মূল্যায়ন নির্ভুল একথা বলা যায় না। অতীতে যদি কোনো সংস্কার থেকে থাকে তবে একালেও বিচার-বিবেচনায় বা সিদ্ধান্ত করার ঝোঁকেও সংস্কার আছে। সংস্কার ছাড়া পরিচালিত হতে পারে কে? যিনি বিবয়মুক্ত বা সংস্কারমুক্ত। নতুন সংস্কার চিরকালই পুরোনো সংস্কারকে বলে কুসংস্কার; কিন্তু যার বার পটভূমিকা ভুলে যায়। সেদিক থেকে, বর্তমান মূল্যায়ন অনু-সারে একথাটি যথার্থ নয় যে, সেকালে যাত্রাকে 'ইতরজনের আনন্দ' বলে সরিয়ে রাখা হত। বরং উল্টো। দেখা যায়, যাত্রা-দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদাররা বা বিত্তবান ব্যক্তিরা এবং যাত্রার আসর আলো করে বসতেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'রাই উন্মাদিনী' বা 'কৃষ্ণ প্রেম-তরঙ্গিনী'র উল্লেখ করা যায়। এতে অশ্লীলতা ছিল না বা তা নাগরিক-চেতনা বিবর্জিতও ছিল না। আমার পিতৃদেব মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ একবার আমাদের আত্মীয়স্বজন নিয়ে কৃষ্ণ-যাত্রার দল করেছিলেন। তাছাড়া, কলকাতার অনেক শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিও যাত্রার পোষকতা করতেন।

সমাজে সমস্যা আছে, শোষণ বা পীড়ন আছে, কে অস্বীকার করবে? তার ছাপ নাট্যসাহিত্য বা যাত্রাভিনয়ে পড়বে এও কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এসব বিষয় বিন্যাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ যদি একটা সংযত ধর্মীয় চেতনা না থাকে তবে তো তা কেবলই চিত্তবিক্ষেপ ও শারীরিক কসরৎ হবে। ধর্মীয় চেতনাই সব কিছু ধরে থাকে। নইলে কিছুই স্থায়ী হবে না। ভারতীয় জীবন-বোধ বা ভাবধারাই কেবল ঐ স্থায়িত্ব দিতে পারে। যুগচেতনাকে এইভাবেই আত্মস্থ করতে হবে, সেই রসে জারিয়ে নিতে হবে।

তবে আমার মধ্যে আশাবাদও প্রচুর। লক্ষ্য করেছি, সব-কিছুই একটা চরম সীমান্তে গিয়ে ধাক্কা খায় এবং সেই গতিতে ফিরতে থাকে; এক-একটা কালবৈশাখীর ঝড়ে এলোপাতাড়ি অনেক-কিছু ছুটবে, কিন্তু থিতিয়েও যাবে; আবাহওয়া পরিচ্ছন্ন হলে দেখা যাবে, এই মাটির পৃথিবী মাটির পৃথিবীতেই আছে, সেই গ্রাম, লোকালয়, সেই মানুষ, এবং চিরমানুষ রয়েছে অক্ষুণ্ণ; কালের ছিদ্রপথে অকালবোধন অপসৃত হয়েছে। উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে শাশ্বত সত্য কল্যাণ ও সৌন্দর্য।

যাত্রার সেকাল ও একাল

পঙ্কু সেন

যাত্রার সেকাল বলতে যা বোঝায় আমি সে যুগের লোক নই। তবে আমি যে সময় যাত্রায় এসেছিলাম, তাকে যাত্রার মধ্যযুগ বলা চলে। তখন যাত্রা কেবল জমিদার-বাড়ীর বা বারোয়ারীতলার বিনে পয়সার বাঈজী নাচের আসর থেকে টিকিট বিক্রির উচ্চ মঞ্চের সম্মান পেতে আরম্ভ করেছে। আগে যেমন শ্রোতাদের সংগে মিলিয়ে-মিশিয়ে আসর বসানর রীতি ছিল, সেই রীতির ব্যতিক্রম সবে আরম্ভ হয়েছে তখন। যাত্রাঅনুরাগী এবং যাত্রাজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার 'প্রভাতচন্দ্র দে মহাশয় এই টিকিট সেলের যাত্রাগানের প্রবর্তক বলা চলে। আমার সেই যাত্রায় প্রবেশ-যুগের কথা যদি সেকালের কথা বলতে কারও আপত্তি না থাকে তবে কিছু স্মৃতিচারণ করতে পারি। তখনকার দিনের নাট্যকার ছিলেন ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রমুখ বিদগ্ধ সাহিত্যসেবীরা। নাটক রচনায় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রভাব ছিল, অভিনয়শৈলীও ছিল থিয়েটারের ধারানুগ। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনের বড় বড় অভিনেতারা যেভাবে অভিনয় করতেন তাকে শ্রোতারা থিয়েট্রিকাল আখ্যা দিতেন। অবশ্য শিশিরকুমারের অভিনয়-ধারার কিছু প্রভাব যাত্রায় পড়েছিল। তখনকার দিনের নামকরা অভিনেতা ছিলেন বড় ফণী, ছোট ফণী, উপেন পাণ্ডা, জ্ঞানময় মিত্র, নগেন বসু প্রমুখ খ্যাতনামা অভিনেতৃবৃন্দ। এঁদের যেমন ছিল নাট্য-প্রীতি, তেমন ছিল সাহিত্যানুরাগ। এঁদের কাছেই নাট্য-সাহিত্য ও অভিনয়ের অনু-শীলন মন্ত্র পেয়েছিলাম আমরা। যার অভাব বর্তমান যাত্রাজগতে প্রকট। সেকালের অভিনয়ের কলাকৌশল ছিল যাত্রাশিল্পী-দের শ্লাঘার বস্তু। লোক-শিক্ষার ও লোকসংস্কৃতির এই ধারাকে শিল্পীরাও মর্যাদা দিতেন, মর্যাদা দিতেন পাড়াগাঁয়ের ও শহরের সুধীসমাজ। আজকার মত যাত্রার ঢাক কাঁধে করে কেউ তখন বেড়াতেন না সত্য কিন্তু প্রকৃত শিল্পের এবং শিল্পীর মর্যাদা ছিল অনেক। আজ বায়নার দাম বেড়েছে নাম বেড়েছে বটে কিন্তু যাত্রার অভিনয়ের মান বাড়েনি। তার একমাত্র কারণ যে অন্তরঙ্গতা ও নিষ্ঠা তখনকার দিনের অভিনেতাদের ছিল, আজকাল বোধ হয় তার বিশেষ অভাব ঘটেছে। আগের দিনের চেয়ে যাত্রার ব্যাপকতা বেড়েছে 'টপ হেডিং' কাঠামো জোরদার হয়েছে কিন্তু তবু যাত্রা আজ বিবেকহীন। অবশ্য একথা সত্য, সেকালের যাত্রার 'বিবেক' আর এখনকার দিনের নাটকে দেখতে পাওয়া যায় না। আগের দিনের সখীর নাচও (ব্যালে) উঠে গেছে, একালে ছেলেও প্রায় নেই বল্লেই চলে। এসব সে যুগের যাত্রার অংগ ছিল। কিন্তু যাত্রায় বিবেকের অন্তর্ধানের সংগে সংগে যাত্রার নাট্য নির্বাচন, অনুশীলন, সমা-লোচনা প্রভৃতি বুঝি আজকাল যাত্রাজগত থেকে উধাও হয়ে গেছে, যা আগের দিনের গৌরব ছিল।

আসল কথা স্বাধীনতালাভের পর আমাদের যুগের যাত্রার মোড় ঘুরলো। টিকিট সেলের যাত্রার প্রাচুর্য দেখা গেল আর দেখা গেল যাত্রার উপর সিনেমার প্রভাব। যাত্রার নাটকেও সস্তায় কিস্তিমাৎ করার কৌশল এল। শুধু চমক আর চমক। বিদেশী চরিত্র বা ঘটনার উপরে নাটক রচিত হতে লাগলো। গণ-বিপ্লবের মেকি কসরৎ-এ যাত্রাজগত ভরে গেল।

তবে একথা বুঝি আগে যেমন যাত্রার নাটকে লোকশিক্ষার সম্পদ থাকতো এখন তার একান্ত অভাব, যাত্রা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার মাধ্যম। তাকে মর্যাদা দিতে হবে এবং সে মর্যাদা দিতে হলে যাত্রাকে সাহিত্যপুষ্ট হতে হবে। তার জন্যে চাই ভাল নাট্যকার, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন স্বত্বাধিকারী এবং দক্ষ পরিচালক। আগেরদিনে যাত্রার হয়তো এত প্রসার ছিল না, কিন্তু বিচার ছিল। আজ যাত্রায় কোন বিচার নেই। অহংকার, আত্মম্ভরিতা, শঠতা যাত্রাজগতকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে অক্টপাশের মত জড়িয়ে আছে। আজ নাটক নেই, সত্যিকারের নাট্যকার অবহেলিত। সেদিন এমন ছিল না। যাত্রা আজ এক কানাগলিতে ঢুকেছে। ব্যবসাভিত্তিক যাত্রায় পয়সাটাই আজ বড় হয়েছে। শিল্প মারা পড়েছে। মারা পড়েছে সাধারণ শিল্পীরা। যাত্রা-জগতের গ্রহবলয় অন্ধকারে পরিপূর্ণ—নব সূর্যালোকে একে তমশামুক্ত করবার দায়িত্ব আজ প্রকৃত যাত্রামোদী, সুধীসমাজের। জাতীয় সরকারের কল্যাণ দৃষ্টিপাত জাতীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী যাত্রাকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক যাত্রা বনাম থিয়েটার

অমর ঘোষ

একটা উচ্ছ্বাস ফুলে ফেঁপে উঠলো সমুদ্রের গভীর জলে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে এলো সেটা অগভীর ফেনিলতার মাঝে। তারপর কুলুকুলু রব তুলে নয়নাভিরাম তরঙ্গভঙ্গে বালুকাবেলায় ছড়িয়ে পড়লো সেই উচ্ছ্বাস। এরপর উল্টোরথের পালা। বিন্দু জল শুকিয়ে গেল বেলাভূমিতে; কিন্তু অনেকখানি তার ফিরে গেল সেই অগভীর ফেনিলতারই ভিতর দিয়ে আবার সমুদ্রের গভীরে। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জলের এই দোলাচল চরিত্র অনেকেই দেখেছেন। নাট্যজগতের দিকে তাকালে এর একটি সুন্দর উদাহরণ চোখে পড়বে।

নাট্য পরিবেশনার যে উচ্ছ্বাস একদিন যাত্রাভিনয়ের নিরাড়ম্বরতার মাঝে জন্ম নিয়ে গ্রামীণ ভীরু কাঁপা বুকে তার পথচলা শুরু করেছিল, মঞ্চাভিনয়ের চটকদার যুগকে পিছনে ফেলে সেই পথচলাই ছড়িয়ে পড়লো চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক বেলাভূমিতে। কিন্তু নাড়ীর টানেই হয়তো তার ফিরে যাওয়ার কথা মনে পড়লো একদিন। অবহেলিত মঞ্চজগতে সাড়া জাগলো, নূতন চেতনার, নব-নব সংস্কারের ফিরতি তরঙ্গে। সে তরঙ্গোচ্ছ্বাস বুঝি আজ আরও পিছনে পিছিয়ে এসে ফাঁপিয়ে তুলেছে যাত্রাজগতকে।

কিন্তু না, যে জগৎগুলির কথা বললাম, এগুলি প্রাকৃতিক নয়—মানুষের সৃষ্ট। সুতরাং এর মধ্যে যে উত্থানপতনের চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা কোনও প্রাকৃতিক আবর্তনের নিয়মতান্ত্রিকতায় বাঁধা নয়। এর কার্যকারণ সব কিছুই মানুষের হাতে—হয়তো কিছুটা তার জ্ঞাত, কিছুটা বা অজ্ঞাত। অতএব নির্দ্বিধায় বলা চলে, এর প্রতিটি উত্থানের পিছনে যেমন রয়েছে মানুষের সাধনা, প্রতিটি পতনের পিছনে তেমনি খুঁজে পাওয়া যাবে মানুষেরই ত্রুটিবিচ্যুতি। এবং এই অনিয়মিত আবর্তন যদি কোনও উত্থান বা পতনের পর থেমে যায়, তবে পতিত জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হচ্ছে দেখে শোকাশ্রু বিসর্জন করা যেতে পারে—বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

আমার এই আলোচনার অবতারণা যে দুটি জগৎকে কেন্দ্র করে, তাদের কথায় আসা যাক। যাত্রা আর থিয়েটার। যে পশ্চিমবঙ্গ আজ কয়েক দশক ধরে সারা ভারতের নাট্য-আন্দোলনের শীর্ষদেশে অবস্থান করছে, তারাই নাট্যপ্রকরণের দুটি সমগোত্রীয় অথচ ভিন্ন স্বাদের ধারা। যাত্রা এবং থিয়েটার উভয় ধারাতেই আমরা রক্তমাংসের অভিনেতৃবর্গের মুখোমুখি বসে, তাদের পরিবেশিত রসপানের সুযোগ পাই—বহু রজনী অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনুশীলনীলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পী যখন উচ্চতর মানে ওঠার সুযোগ পান, দর্শক হিসাবে আমরাও তার শরিক হই—তাই বলা হয় এরা সমগোত্রীয়। কিন্তু থিয়েটারের ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট, যবনিকা প্রভৃতির উপস্থিতি যখন প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই একটি পৃথক মায়ালোক সৃষ্টি করে চলে, যাত্রার ক্ষেত্রে কেন্দ্রায়ত অভিনয়-ব্যবস্থা শিল্পী ও দর্শকবৃন্দকে তখন একাত্ম করে তুলতে সাহায্য করে। তাছাড়া বহু সুবিধার মাঝে থিয়েটারের পরিবেশনা হয়ে উঠেছে হুবহু বাস্তবানুগ—অপরদিকে বিবিধ অসুবিধার মাঝে যাত্রাকে পড়ে থাকতে হচ্ছে অতিরঞ্জনের মাঝে কাব্যাশ্রয়ী হয়ে। তাই এরা সমগোত্রীয় হলেও ভিন্ন স্বাদের।

যাত্রা ও থিয়েটার তাই পেয়েছে ভিন্ন রুচির দর্শকও—অন্তত কয়েক বছর আগে পর্যন্ত। নবনাট্য আন্দোলনের জোয়ারে যখন থিয়েটার জগতে নূতন চিন্তাধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নব নব আঙ্গিকের প্রয়োগ সাফল্য, জীবনবেদের প্রতিচ্ছবি বিদগ্ধ সমাজকে নূতন করে মঞ্চপ্রিয় করে তুলছে—যাত্রা কিন্তু তখনও পড়েছিল তার জুড়ির গান আর সখীর নাচের ভারে ভারাক্রান্ত পুরাণ আর ইতিহাসের বহুপঠিত আখ্যানভাগের চর্বিত চর্বণের মাঝে। সস্তার প্রমোদ উপকরণ হিসাবে গ্রামাঞ্চলেই ছিল এর যা কিছু আদর। শহরের ব্যস্তসমস্ত জীবনযাত্রার মাঝে যে সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্নতা থাকলে নিজের ঠাঁই করে নেওয়া চলে সে গুপ্তকথা তার জানা ছিল না। তবে হ্যাঁ, এদের মাঝেও চকিত চমকের মতো যে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও না দেখা গেছে তা নয়। বরেণ্য কয়েকজন প্রথিতযশা যাত্রাশিল্পী তাঁদের রসোত্তীর্ণ অভিনয় সৌকর্যে আজও অম্লান হয়ে আছেন যাত্রারসিকদের মনে। বিষয়বস্তুর একঘেয়েমির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার যেসব চেষ্টা হয়েছে মাঝে মাঝে, তার সবটাই কিন্তু বিফলে যায়নি, তবে কৌলিন্যের আসনে ওঠার জন্য যাত্রাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় যেমন রাতারাতি ফকির আমীর হয়ে যেতো রূপকথার দুনিয়ায়, তেমনি হঠাৎই একদিন দেখা গেল, যাত্রার টিকিট কাটতে লাইন লাগিয়েছে অগুনতি মানুষ। কবে-কখন-কিভাবে হলো বলতে গিয়ে, অনেকেই পঞ্চমুখে শোভাবাজার রাজবাটী অথবা রবীন্দ্রকানন আয়োজিত যাত্রা-উৎসবের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু কেন হলো, তার জবাবটি কৌশলে এড়িয়ে যান। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে যাত্রা-কাউন্টারে দর্শকদের লাইন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। আর ঐ 'কেন'-র উত্তর না খোঁজার বা চাপা দেওয়ার আড়ালে, থিয়েটার হাউসের মালিকেরা ঘন ঘন বই বদলাচ্ছেন, শিল্পীদের মাইনে কমাচ্ছেন, আর নয়তো দেনা রেখে পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হচ্ছেন।

আমি যদি শতকরা একশোভাগ যাত্রার লোক হতাম, তবে এই 'কেন'র কেঁচো খুঁড়তে যেতাম না। মঞ্চের সঙ্গেও রয়েছে আমার ওতঃপ্রোত যোগাযোগ। তাই, আঙ্গিক-প্রাধান্যের এই স্বর্ণযুগের সূচনায় তুলনামূলকভাবে থিয়েটারের বাণিজ্যিক পরাজয় আমাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত দেয়।

থিয়েটার জগতের দিকে চোখ মেলে তাকালে অতি সহজেই দুটি শ্রেণী চোখে পড়বে। একদিকে, আঙুলে গোনা যায়, কয়েকটি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ। অন্যদিকে, অগণিত না হলেও, গর্ব করে বলার মতো সংখ্যাবিশিষ্ট মঞ্চবিহীন নাটুকে দল। এই দলগুলির মধ্যে যাঁরা একই মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন, তাঁদেরও ঐ প্রথমোক্ত পেশাদার বিভাগে গণ্য করে নিলে, অবস্থাটা বোঝার পক্ষে সহজতর হবে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পেশাদার দলগুলির চটক বেশী, কারণ এঁদের হাতে রয়েছে অর্থবল—এঁরা চলচ্চিত্র-ছাপমারা শিল্পী পোষণ করতে পারেন; আকাশছোঁয়া দক্ষিণার বাজারেও এঁরা ডবল-কলম বিজ্ঞাপন বের করতে ভয় পান না; দশ-বিশ রাত্রি দর্শক সমাবেশ না ঘটলেও এঁদের পুঁজিতে টান পড়ে না; এবং অপ্রিয় হলেও 'ইহা সত্য' যে এঁদের অতি নিম্নস্তরের নাটকেও দামী কাগজের নামী সমালোচকেরা অনেক অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পান এবং বাহবা দেন।

নূতন নাটক খুলে এ'রা যে দর্শক না পান, তা নয়। কেউ কেউ আসেন সিনেমা-আর্টিস্টদের চাক্ষুষ দেখতে, কেউবা আসেন বিজ্ঞাপনের চক্কানিনাদে ভুলে, আবার অনেকে ঢুকে পড়েন ভর্তি সিনেমা হাউসে টিকিট না পেয়ে। কিন্তু ফিরতি দর্শকদের ক'জনার মুখে ইদানিং পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা যায়!

বরং এই পরিতৃপ্তি দেখা যায় কিছু কিছু ঐ দ্বিতীয় দলভুক্ত মঞ্চবিহীন নাট্য-সংস্থার অভিনয় শেষে। এদের নিজস্ব মঞ্চ নেই। দু'কলমতো দূরের কথা, দুই সেণ্টিমিটার বিজ্ঞাপন একবার মাত্র বের করতে হলে এদের দশবার মিটিং ডাকতে হয়। অভিনেত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে টাকা খরচ করাটা এড়ানো যায় না বলে, এদের নাট্যকারেরা আজকাল দুটি একটির বেশী নারীচরিত্রই রাখছেন না নাটকে। এদের কিন্তু অনেকেরই ভাবার মতো মাথা আছে, করার মতো বুদ্ধি আছে, আর আছে যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জেদ। কিন্তু দর্শক এ'দের হদিশ পান না। কারণ প্রথম অভিনয়ের ধান্দেনা মিটিয়ে দ্বিতীয় অভিনয়ের ব্যবস্থা করার বহু পূর্বেই এ'দের অনেক সংস্থা বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। এ'দের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার কোনও স্থায়ী কাউণ্টার এখনো খোলা সম্ভব হয়নি আমাদের হতভাগ্য দেশে। অগত্যা থিয়েটার জগতের প্রতিনিধিত্ব অবিসম্বাদিতভাবে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলির হাতে।

এই পেশাদার মঞ্চগুলির সবচেয়ে বড় ভয় বাঁধা-পথের বাইরে পা বাড়ানোর বিষয়ে। দু'এক কথায় এ'দের আজকের ছক হচ্ছে : নাটকটি অবশ্যই সামাজিক হবে, দু-এক জায়গায় লাইটিংয়ের কিছু মারপ্যাঁচ থাকবে, চিনি-মাখানো কুইনিনের মতো কিছু সামাজিক বা রাজনৈতিক বুলি থাকবে নরম গরম আর কিছু নামী চলচ্চিত্র শিল্পীর বাঁধা ছকে অভিনয়-উপযোগী ডায়লগ তথা সিচুয়েশন থাকবে নাটকে। এইটুকুই শেষ কথা নয়। নাট্যকার বা পরিচালকের হাতে নাটকের চূড়ান্ত রূপ স্থির হয়ে যাওয়ার পরেও, নামী এবং দামী শিল্পীরা তাঁদের স্ব স্ব অংশে কলম চালানোর বা চালিয়ে নেবার স্বাধীনতা রাখেন। এর পর নাটক প্রস্তুতির পর্ব, অর্থাৎ মহলা। 'পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাটকগুলি মহলার মাধ্যমে তৈরী হয় না, তৈরী হয় মুক্তিলাভের পর কয়েক রাত্রি শো চলার মধ্যে'— প্রত্যক্ষদর্শীরা অন্তত আমার এ উক্তির বিরোধিতা করবেন না। এবং এ উক্তি যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বিনাবাধায় বলা চলে যে এই নাটকগুলির পূর্ণ প্রকাশ কোনও একটি সুচিন্তিত মানসের ফলশ্রুতি নয়; এগুলি ঐ নামী এবং দামী শিল্পীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ।

সাম্প্রতিক যাত্রার প্রসঙ্গ দেখা যাক। দেশ বিভাগের পর এদের কর্মক্ষেত্র সাংঘাতিকভাবে সঙ্কুচিত। মূল্যবৃদ্ধির চাপে এদের নির্বাহ সমস্যা আজ আতঙ্কজনক। শুধু বাঁচার তাগিদে এরা নিস্তার সঙ্গে পথ খুঁজেছে। এবং গত তিন-চার বছরের যাত্রা-ইতিহাসের দিকে চাইলে মনে হয় বুঝি খুঁজেও পেয়েছে এরা পথ।

এদের সাফল্যের গোপন চাবি কি, এক-কথায় হয়তো বলার মতো সময় এখনও আসে নি। কিন্তু একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে কোনও অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি-গোচর হবেই, যেগুলি এই দ্রুত উন্নতির সোপানশ্রেণীর ভূমিকা নিয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখ করবো, বিষয়বৈচিত্র্য। নাটক নির্বাচন আজ আর একটিমাত্র রসে বা এক শ্রেণীর নাটকে নিবদ্ধ নেই। অথচ যাত্রা নাটকের যে মূল ধর্ম—লোকশিক্ষা, সেই ধর্ম থেকে সে এক চুলও বিচ্যুত হয় নি। একটি চিরসত্যকে আখ্যানের মূলবস্তু করে যাত্রা নাটক পরিণতির পথে এগিয়ে চলে, সহজবোধ্য ভাষায়, সহজবোধ্য পরিবেশনভঙ্গীতে। দর্শকের সংখ্যা যেখানে কয়েক হাজার, শিল্প রুচির বৈচিত্র যেখানে সংখ্যাতীত, সেখানে সবাইকে একই সঙ্গে নাড়া দিতে হলে এমন একটি সাধারণ আবেগ দরকার, যা চিরকালীন—এবং সেটি প্রকাশের মাধ্যমও হওয়া দরকার সর্বজনবোধ্য।

এর পরই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, আধুনিক যাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন রূপ। প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া যেখানে গত্যন্তর নেই, সেখানে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সিনেমা ও থিয়েটারের ভাল গুণগুলি যথাসম্ভব আয়ত্বে আনা আদৌ দোষনীয় নয়। তাই তাকে করতে হয়েছে সময় সংক্ষেপ, হতে হয়েছে সংহত এবং বেগবান। এর সঙ্গে বিশেষ করে লক্ষ্য পড়বেই, একজন পরিচালকের হাতে আত্ম-সমর্পণের ঘটনাটি। পরিচালক তথা নাট্য-শিক্ষক আগেও ছিলেন। সাধারণত দলের প্রবীণ নাটকেই ঐ পদে বরণ করা হোতো। কিন্তু অভিনেতাগোষ্ঠীর বাইরে থাকা পরিচালক (বিশেষ করে তাঁর যদি মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও যাত্রা জগতের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা থাকে) যে আগের যুগের নট-নাট্যকার-পরিচালকদের চেয়ে দল গঠনের বিষয়ে অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, একথা আজ অনস্বীকার্য—বিশেষ করে আজকের যুগে, যখন ব্যক্তিপূজোর দিন শেষ হয়ে গেছে, সামগ্রিক সৌকর্যই যখন প্রধান বিচার্য।

অনেকে হয়তো যাত্রা-নাটকে আঙ্গিকের আমদানীকেও আর একটি উন্নতির ধাপ বলে বলবেন। আঙ্গিক বলতে যদি আলোর কারসাজি বা চটকদার ম্যাজিককেই শুধু ধরা হয়, আমি তার বিরোধিতা করবো। এবং বলা বাহুল্য, যাঁরা আঙ্গিকসর্বস্ব করে বাজিমাৎ করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের ভুল ভাঙতে বিশেষ বিলম্ব হয় নি। যদি বলেন, শব্দপ্রক্ষেপণে টেপ-রেকর্ডারের ব্যবহার, দৃশ্যাদির পরিবেশ রচনায় রঙিন আলো এবং ডিমার কাজে লাগানো প্রভৃতি আঙ্গিক উন্নতি ঘটেছে যাত্রাজগতে, তবে বলবো, এ আর কিছুই নয়—দুই প্রতি-দ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা মাত্র। আগে সমকক্ষ হতে হবে, তার পরে তো এগোনোর চেষ্টা।

তবে যাত্রাজগৎ সম্পর্কেও আজ সভয়ে লক্ষ্য করার মতো একটি বিষয় আছে। জীবনীমূলক নাটক প্রযোজনার জোয়ার চলেছে এখন যাত্রা-দুনিয়ায়। যাত্রা-প্রযোজকেরা তাঁদের সহসালব্ধ এই সাফল্যের সত্যকার মূলমন্ত্রটি খুঁজে দেখার চেষ্টা না করে, অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত। এই অনু-করণের পুঁজি যেদিন হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে সেদিন নূতন কিছু পথ খুঁজে বের করার অবকাশ থাকবে না। অতএব চিন্তাধারাকে সময় থাকতেই বহুমুখী করে রাখতে হবে।

আর থিয়েটার জগৎ? বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী আসন্ন। এই গৌরবের সিংহ-দ্বারে প্রবেশ করার আগে, পেশাদার রঙ্গ-মঞ্চের কর্ণধারেরা যদি হাত বাড়িয়ে তাঁদের মঞ্চবিহীন অনুজদের ডেকে নেন পাশে, দেখবেন, বঙ্গ নাট্য-সংস্কৃতি সেই বেগবান প্রাণের স্পন্দনে তার দ্বিতীয় শতকের জয়-যাত্রার পথে এগিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে।

বিগত যুগের যাত্রানট

সুরেন্দ্রনাথ

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

কানে এল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শনিবার বিকেলে কে-একজন বিগত যুগের বিখ্যাত যাত্রাভিনেতা তাঁর ৫০ বছরের অভিনয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা বলবেন অতিথি-বক্তারূপে। একজন মানুষ টানা পঞ্চাশ বছর অভিনয় করেছেন এবং তা প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গেই—শুনে আশ্চর্য হলুম; লোভ হল ভদ্রলোককে দেখবার ও তাঁর কথা শোনবার জন্যে।

বেশ বয়েস হয়েছে—আশি পেরিয়ে গেছেন। রং যে এককালে খুবই ফর্সা ছিল, তা অনুমাণ করতে কষ্ট হয় না। মুখের ছাঁদ এবং দেহের আড়া দেখে বুঝতে পারা যায়, একদা বেশ জাঁদরেল চেহারারই অধিকারী ছিলেন। মুখ যখন খুললেন, তখন প্রথমটা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাব জনিত নিম্নস্বরে আরম্ভ করলেও শিগ্গিরই জড়তাকে কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছন্দ হলেন, আর যখন উদাত্তকণ্ঠে তাঁর অভিনীত বিভিন্ন ভূমিকার অংশবিশেষ শোনাতে লাগলেন এবং আবৃত্তি করতে করতে গান ধরলেন বা গান শেষ করেই আবৃত্তি শুরু করলেন অবলীলাক্রমে, তখন প্রেক্ষাগৃহ রীতিমত চমকিত ও মন্ত্রমুগ্ধ। ঐ বয়সে গলা অত উচ্চগ্রামে উঠতে পারে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে, ও'র সুদীর্ঘ অভিনেতৃ-জীবন সম্পর্কে যতখানি সম্ভব জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী—কাজেই তাঁকে কাছে পেতে অসুবিধে হল না। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৮৯০ সালের চৈত্র মাসের কোনো এক সোমবারের উষা লগ্নে। দেশ চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুরের কাছাকাছি কল্যাণপুর গ্রাম। মাতুলালয় হচ্ছে ফরিদপুরের নলিয়া গ্রাম। জন্ম এখানেই। ও'র মাতামহী রাজা কৃষ্ণরাম চক্রবর্তীর দৌহিত্রী। লেখাপড়া বেশী দূর এগোতে পারে নি। মাত্র থার্ড ক্লাশ (আজকালকার ক্লাশ এইট) পর্যন্ত পড়বার পরেই ছাড়তে হয়েছে রোজগারের ধান্ধায়।

১৮৭২-এ বাংলা সাধারণ রংগালয় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু পুণ্যভূমি কাশীতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সেখানে হরিহর সমিতি নামে বাঙালীদের একটি ক্লাব স্থাপনা করেছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত ঐ ক্লাবটি ছিল। ১৯০৩ সালে ঐ ক্লাব যখন 'ধ্রুব চরিত্র' নাটকটি মঞ্চস্থ করে, তখন 'ধ্রুব'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই তাঁর জীবনের প্রথম নাট্যাভিনয়। পরে কুচবিহার রাজবাড়ীতেও তিনি এই 'ধ্রুব'র ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যখন কলকাতায় আসেন, তখন মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ—পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে দানীবাবু 'সিরাজদৌলা' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সালটা সম্ভবত ১৯০৬। ঐ সময়ে কলকাতার বিডন স্ট্রীট, চিৎপুর রোড, গরাণহাটা অঞ্চলে অনেকগুলি প্রাইভেট পেশাদারী থিয়েটার ছিল। এরা শহর বা মফঃস্বলের সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহে দোল-দুর্গোৎসব বা বিবাহাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বায়না নিয়ে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় করত। এদের নাম ছিল তাজমহল থিয়েটার, অরোরা থিয়েটার, বেংগলী থিয়েটার, নিউ স্টার থিয়েটার ইত্যাদি ইত্যাদি। চিৎপুর রোড ও দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের মোড়ে ছিল প্রসিদ্ধ আকুবাবুর থিয়েটার। সুরেন্দ্রনাথ এই আকুবাবুর থিয়েটারে প্রথম যোগ দেন।

আকুবাবুর থিয়েটারে বেশ কিছুদিন থাকবার পরে শ্রীমুখোপাধ্যায় অন্য একটি প্রাইভেট থিয়েটারে যান। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমর বাধে, তখন তাতে তিনি বেংগল রেজিমেন্ট-এর সৈনিকরূপে যোগ দেন এবং মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত ঘুরে আসেন। যুদ্ধশেষে ফিরে এসে প্রাইভেট থিয়েটার—বেংগল থিয়েটারে যোগ দেন জীবন গাঙ্গুলীর সঙ্গে। ঐখানে ১৯২২। ২৩ সালে 'খনা' নাটকে 'ইন্দুনাথ'এর ভূমিকাভিনয় দেখে শিশিরকুমার ভাদুড়ী সুরেন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'সীতা' নাটকে 'কুশ'-এর ভূমিকা অভিনয়ের জন্যে মনোনয়ন করেন। কথা হয়, মাত্র ৫৲ টাকা মাসোহারার বিনিময়ে ও'কে মহলা দিতে হবে। উনি তাতেই রাজী হন।

যখন মহলা দিচ্ছেন, সেই সময়ে হুগলী জেলার নাটাগড়ের জমিদার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত যাত্রাসংস্থা বীণাপাণি নাট্যসমাজের ম্যানেজার হরিপদ রায় সুরেন্দ্রনাথকে ঐ দলে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানান মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে। এঁদের গদী বা দপ্তর ছিল ৩, পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটে। অর্থের প্রয়োজনে তিনি এই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন না এবং একলব্যের গুরুদক্ষিণা কাহিনী অবলম্বনে সোমড়া-নিবাসী মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত যাত্রানাটক 'দক্ষিণা'তে সহকারী সেনাপতি 'বানবিদ্'-এর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই তাঁর প্রথম যাত্রাভিনয়। সহকারী সেনাপতির ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু সকলের অজ্ঞাতেই 'একলব্য'র ভূমিকাটির জন্যে তৈরী হতে থাকেন। একদিন সুযোগ এসে গেল। দক্ষিণ কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডের একস্থানে 'দক্ষিণা' অভিনয়ের আসর বসেছে। হঠাৎ একলব্যের ভূমিকাভিনেতা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ম্যানেজার হরিপদ রায় মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। তখন বিপদোদ্ধার করলেন সুরেন্দ্রনাথ। 'একলব্য'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এমন ভালো হল যে, দর্শকরূপে উপবিষ্ট ব্যবসায়ী নন্দলাল সাপুই তাঁকে সুবর্ণপদক দ্বারা ভূষিত করলেন। এরপর পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'স্বাধীনতা' পালায় উনি সাজতেন 'জগমল রাও', আর প্রধান অভিনেতা প্রভাতরঞ্জন বসু অবতীর্ণ হতেন 'মন্নুলাল'এর ভূমিকায়। মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর ধারে বকসীর হাটে অভিনয় হবে। প্রভাত বসু হেঁকে বসলেন মাসিক ৩০০৲ টাকা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ রাজী না হওয়ায় তিনি দল ছেড়ে দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঐ 'মন্নুলাল'-এর ভূমিকায় অভিনয় করে পেলেন রূপোর মেডেল।

বছর তিনেক চলবার পরে বীণাপাণি নাট্যসমাজ যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন সুরেন্দ্রনাথ হয়ে পড়েছেন যাত্রাজগতের একজন নামকরা অভিনেতা। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি হরচোল লেনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ যাত্রা পার্টি'তে নিযুক্ত হয়ে পড়লেন। এটা ১৯২৮ সালের ঘটনা। ঐ দলে ছিলেন যাত্রাজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কালী রায়। [illegible]

জীবনী অবলম্বনে রচিত 'অদ্ভুত পরিবর্তন বা যুগান্তর'এ তিনিই অবতীর্ণ হতেন রত্নাকরের ভূমিকায়; আর সুরেন্দ্রনাথ হতেন রত্নাকরের সহকারী ভৈরব সর্দার। কালী রায়ের অনুপস্থিতিতে জোড়াসাঁকোর মাঠে সুরেন্দ্রনাথ 'রত্নাকর'-এর ভূমিকায় তাঁর নাটনৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রথম সুযোগ পান। ঐ আসরে দর্শক রূপে উপস্থিত রাজা দিগম্বর মৈত্রের জামাতা ও'র অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজের গলার হার ও'কে উপহার দেন।

তখন গঙ্গার ধারে ই'টখোলাতে ছিল শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলের আস্তানা। ময়দাপাটিতে ওদের দলের একদিন গাওনা হচ্ছে—সাধন ভাণ্ডারী নিজে উপস্থিত রয়েছেন। অভিনয় এমনই খরাপ হ'চ্ছিল যে, আসরের ছেলেরা ওদের 'কুকুরমারা দল ব'লে উপহাস করলে। যামিনী রায় ছিলেন সাধন ভাণ্ডারীর সম্পর্কিত কাকা? তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সাধন ভাণ্ডারী একদিন নিজে উপস্থিত হলেন সুরেন্দ্রনাথের কাছে; অনুরোধ করলেন ও'কে তাঁদের দলে যোগ দিতে—মাসিক ৩৫৲ টাকা মাইনে এবং দু'মাসের অগ্রিম। রাজী হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু কথাটা কানে উঠতেই সতীশ মুখোপাধ্যায় মশাই স্বয়ং হন্তদন্ত হয়ে ভাণ্ডারী অপেরায় এসে হাজির; বললেন, 'সুরেনকে না ছাড়লে আমি মরে যাব।' নিয়মিত মাইনে যাতে পান, তার জন্যে জামিনদার হলেন ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর মালিক কানাইলাল শীল। কিন্তু কিছুদিন ঠিকভাবে চলবার পরে সতীবাবুরা আবার যখন টাকা বাকী ফেলতে লাগলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ ও'দের জানিয়েই চলে এলেন ভাণ্ডারী অপেরায়। রাজা সুরথের জীবনী অবলম্বনে অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ রচিত 'লক্ষবলি' যাত্রানাটকে উনি সাজলেন সুরথ। বড় ভাই বিরথ সাজতেন প্রমথ ঘোষাল। ঐ অঘোরনাথেরই 'সপ্তরথী'তে উনি হলেন ভীম; কর্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মেদিনীপুর জেলার গোকুলনগরনিবাসী হৃষীকেশ চক্রবর্তী।

এই সময় ভাণ্ডারী অপেরায় যোগ দিলেন ফণী বিদ্যাবিনোদমশাই। খিল হরিবংশ অবলম্বনে ও'র লিখিত 'পুজনীয়া'তে দর্শক সহানুভূতি পাওয়া যায়, এমন করে সত্যব্রত বা সতুয়া চণ্ডালের ভূমিকাটি লেখানো হল সুরেন্দ্রনাথের জন্যে। ফলে হল কি, যেদিনই যখনই 'পুজণীয়া' নাটকের অভিনয় হয়, তখনই কোনো-না-কোনো দর্শক সুরেন্দ্রনাথের নামে স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক ঘোষণা করে বসেন। এতে দলের অন্যান্যদের ঈর্ষা হওয়াই স্বাভাবিক। ও'কে তখন জোর করে বয়স্কের ভূমিকায় অভিনয় করানো হতে লাগল। বিশথ সেন সাজছেন ফণী বিদ্যাবিনোদমশাই, ও'কে দেওয়া হল বিশথসেনের বাবা রাজা ব্রহ্মদত্তের ভূমিকা। 'বাসুদেব'-এ উনি হলেন পিশাচ ঘন্টাকর্ণ, 'রামানুজ'-এ গুহক চণ্ডাল, 'সৈরিন্ধ্রী'-তে কীচক। তাঁর এই কীচকের ভূমিকার অভিনয় দেখে নট্ট কোম্পানীর সূর্য দত্ত ও'কে ও'দের দলে টেনে নিলেন। 'ভাণ্ডারী'-তে সুরেন্দ্রনাথ তখন পাচ্ছিলেন মাসিক ৬০ টাকা মাত্র। সূর্যদত্ত ও'কে দিলেন মাসিক ১৫০ টাকা। শ্রীদত্ত ও'কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পূর্ববঙ্গে যা'বেন তো? সুরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন, বেশী টাকা পেলে যমেরবাড়ী যেতে রাজী আছি। ১৯৩১ সালে সুরেন্দ্রনাথই নট্ট কোম্পানীকে কলকাতায় আসতে উৎসাহিত করেন। এবং এই নট্ট কোম্পানীতে থাকার সময়েই সুরেন্দ্রনাথ যাত্রাজগতে দীপ্ত ভাস্করের মতো খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অঘোর কাব্যতীর্থ রচিত 'লক্ষণের শক্তিশেল'-এ রাবণ, 'শ্রীবৎসচিন্তা'য় শ্রীকন্ঠ ও পরে শ্রীবৎস, গয়াসুর-এ বিলোচন এবং 'অজামিল'-এ অজামিল, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী বিরচিত 'জগদ্ধাত্রী'তে দৈত্যসম্রাট দুর্গমাসুর, ফণী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'সম্বর্তক' নাটকে সম্বর্তক (বৃহস্পতির ছোটভাই), 'রামানুজ'-এ মহাকাল ও মধুকৈটভের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ;মেদিনী'তে মধু দৈত্য প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে তাঁর বাচন, ভঙ্গী, কন্ঠস্বরের মিষ্টত্ব এবং উত্থানপতন তাঁর অসামান্য নাটনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। গোড়াতেই সুরেন্দ্রনাথের দশাসই চেহারার কথা বলেছি। নট্ট কোম্পানীতে অঘোর কাব্যতীর্থ রচিত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকে তিনি যখন ৫২ ইঞ্চি বর্ম পরিধান করে হিরণ্যকশিপুর ভূমিকাভিনয় করতেন, তখন তা একটা রীতিমত দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ দের 'চাঁদের মেয়ে'তে চাঁদ ও 'মাণিকমালা'তে একমা নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি যখন যশের উচ্চতম শিখরে, ঠিক তখনই তিনি কঠিন টায়ফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। ফলে বেশ কিছুদিনের জন্যে সম্পূর্ণ অশক্ত হয়ে পড়েন। এটা হচ্ছে ১৯৪২ সালের কথা।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পরে সুরেন্দ্রনাথ একটি মঞ্চাভিনয়ে যোগ দেন। যশোর সম্মিলনী স্কুলে যশোহর আর্ট থিয়েটার নাম দিয়ে একটি দল অপরেশচন্দ্র বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকটি অভিনয় করেন। এই নাটকে তিনি দানীবাবু অভিনীত ভীষ্ম চরিত্রে অবতীর্ণ হন। সেটা ছিল যুদ্ধের সময়। যশোরে সৈন্যদের ছাউনী, এরোড্রোম প্রভৃতি ছিল। তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যশোরের সিভিলিয়ান এস ডি ওর সঙ্গে মিলিটারী এস-ডি-ও'ও তাঁকে পদক উপহার দেন—এইভাবে এক অভিনয়ে তাঁর জোড়া মেডেলপ্রাপ্তি ঘটে।

এরপর তিনি যোগদান করেন বিপিনবিহারী শাস্ত্রীর মালিকানায় কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীটস্থ চণ্ডী অপেরাতে। এখানে তিনি জিতেন বসাক রচিত 'মানুষ' যাত্রানাটকে কোতল খাঁ, নন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত 'যুগনেতা'-তে শিশুপাল, 'শ্রীবৎসচিন্তা'তে শ্রীবৎস ও ব্রজেন দে বিরচিত 'প্রতিশোধ' নাটকে বৈকুণ্ঠ চাকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চণ্ডী অপেরা থেকে তিনি আসেন ফরিদপুরের মহেন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভোলানাথ অপেরায়। এখানে এসে তিনি তরণীসেনবধ অবলম্বনে পঙ্কজভূষণ রায় রচিত 'রক্তাঞ্জলি' নাটকে রাবণ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক যাত্রানাটক 'বাজীরাও'-এ নরজী সিন্ধিয়ার চরিত্রে রূপদান করেন। এরও পরে তিনি গণেশ অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, ভারতী রূপনাট্যম, বীণাপানি অপেরা প্রভৃতি বিভিন্ন যাত্রাসংস্থায় অভিনয় করে মাত্র ১৯৬৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে অভিনয়ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ১৯৫১ থেকে ৬৭-র মধ্যে তিনি যেসব উল্লেখযোগ্য চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন, সেগুলি হচ্ছে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী বিরচিত 'বিন্ধ্যাবলী'তে অনুহ্লাদ, ব্রজেন দে-র 'প্রবীরার্জুন'-এ ভীম (গণেশ অপেরা) 'দেবী চৌধুরানী'তে হরবল্লভ, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৃথ্বীরাজ'-এ সমর সিংহ (নিউ গণেশ), সুরেন্দ্র বন্দ্যোর 'সরমা'তে রাবণ, শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা'য় মীরজাফর, ব্রজেন দে-র 'রাহুগ্রাস'-এ রাজগুরু (ভারতী রূপনাট্যম), জিতেন বসাক রচিত 'সীমান্ত অভিযান'-এ সুলতান মামুদ, ব্রজেন দে-র 'রাজা দেবীদাস'এ দেবীদাস ও 'চন্দ্রাবতী'তে বংশীদাস এবং জিতেন বসাকের 'বাগদত্তা'তে তুঘ্রল খাঁ (বীণাপাণি নাট্যসমাজ)।

আমরা ৮০ বছর বয়স্ক সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে কন্ঠের যে সজীবতা, বাণীর যে শুদ্ধতা, স্বরগ্রামের যে আরোহ অবরোহ, মুখচোখের যে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা লক্ষ্য করেছি, সেরকম ক্ষমতা আজকের দিনের অভিনেতাদের মধ্যে বিরল। সংলাপ বলতে বলতে অবলীলাক্রমে গান গাওয়া—সুর, তান, লয় বজায় রেখে সুললিত কন্ঠে গান গেয়ে দর্শকদের মোহিত করার ক্ষমতা আজ ক'জন যাত্রানটের আছে?

মধুকন্ঠের অধিকারী সুরেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে শিল্পী ও কবি। জীবন-সায়াহ্নে এসে তাই গেল ১৯৭১-এর ৩০ জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর দিন তিনি তাঁর জীবনের জমাখরচের যে খতিয়ান টেনেছেন, তার থেকে শেষের কয়েক পংক্তি উদ্ধার করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না :

"হৃদয়ের বীণা আজি যখন উঠেছে বাজি,
নয়নের আলোর আভাষ।

এ নয়ন থাক খোলা, এ হৃদয় দিক দোলা,
মধু হোক আকাশ-বাতাস।

ফুরায় ফুরাক খেলা, বয়ে যায় যাক বেলা,
মনে আর কোন খেদ নাই।

যার খেলা সে খেলিবে, যার চলা সে চলিবে
আমি যেন আলোটুকু পাই।"

এপার বাংলা
ওপার বাংলার

ছায়াছবি

এন-কে-জি

[illegible] নায়ক/পরিচালক উত্তমকুমার।

ফটো : অমৃত

বাংলার চিত্রশিল্প আজ বেশ কিছুকাল যাবৎ এক অভূতপূর্ব সংকটের মধ্য দিয়ে কালাতিক্রম করছে। তবুও, ভারতীয় চিত্রশিল্পের জনকের জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্য ছায়াতলে বসে ও তাঁরই আজীবনব্যাপী অনলস কর্মোদ্যোতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই সেদিন আমাদের এই শত দুঃখকষ্টে ক্লিষ্ট, শতবিশৃঙ্খলতা ও কর্মহীনতায় বিচলিত বাংলার ও বাঙালীর চিত্রশিল্পের কর্মীরা সপ্রমাণ করবার সংকল্প নিয়েছিলেন যে, চরম দুর্দিনেও সহস্র কোটি কণ্ঠে আবার আমরা বাংলা ছবির জয় ঘোষণা করব, তার শিল্পপ্রাণকে মঙ্গল শিক্ষায় প্রোজ্জ্বল করে তুলব। আমাদের শিল্পের পূর্বসাধকদের উদ্দীপ্ত সাধনাকে ব্যর্থ হতে দেব না। কিছুতেই বাংলা ছবিকে মরতে দেব না।

আজকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতিতে ফের নতুন করে বলতে ও ভাবতে আমরা সাহস পাচ্ছি, প্রেরণা পাচ্ছি যে বাংলা ছবির বোধকরি আবার নতুন করে শিল্পোত্তরণ ঘটবে, তার পূর্বদিগন্তে আবার নবারুণের উদয় আগতপ্রায়। সৃষ্টির সার্থকতায় ও শিল্পের সম্প্রসারণের নতুন উদ্যমে আবার বাংলা ছবি ফুলে-ফলে ও মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠবে। এই নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব বোধহয় জাতির চরম সংকটের মধ্য দিয়েই এল, বিধাতার অজস্র আশীর্বাদের বার্তা নিয়ে।

সবাই জানেন যে বাঙলাচিত্রের যে নিজস্ব দ্যুতিটুকু জাতির শিল্পমানসে ভাবমূর্তির মতো পুঞ্জিত হয়ে আসছে তার প্রাণবিন্দুটুকু নিহিত ছিল এপার বাংলা-ওপার বাংলা উভয়ের আকাশে ও বাতাসেই। দেশবিভাগের সর্বনাশা অভিশাপে উভয় বাংলার সেই মিলিত কৃষ্টি ও মর্মবাণী যা জন্ম নিয়েছিল একই মায়ের কোলে, একই ভাষার ও ভাবের, একই অনুভব ও অনুরাগের স্তন্যপানে,—তার কণ্ঠ সহসা যেন নিদারুণ আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার নীল আগুনে অনেক শতাব্দীর অনেক আত্মনিবেদিত শিল্পরস, অনেক পরস্পরনির্ভরতা ও প্রেমভালবাসার বন্ধন যেন মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। সেই বন্ধন ছেদনের জ্বালা, পরস্পরের হৃদয়ের সেই বেদনা রক্তের মত ক্ষরিত হচ্ছিল এতোকাল আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে। আজ নতুন বাংলাদেশে যে নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটল বিশ্বলোকের প্রাঙ্গণে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অকল্পিত নিধন ও জঙ্গীশাসকের হাতে বর্বর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে, তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার নরনারীর আছে নিগূঢ় প্রাণের টান, আছে বহু দীর্ঘকালের শুভভাবের, স্বচ্ছ সুন্দর সহমর্মী স্বাক্ষর। তাই বস্তুত দুটি বিভিন্ন দেশের

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েও বাংলা ভাষার ও বাংলা কৃষ্টির মাধ্যমে দুই বাংলার কোটি কোটি অধিবাসীর মনে রচিত হয়ে গেল আবার সেই এক ভাবসূত্রের ঐক্যবন্ধন,—নিজেদের মনের অনেক পূর্বসঞ্চিত মোহাবেশ ঘুচিয়ে আত্মসন্ধানের আলোকে নিজেদের প্রেম-প্রীতির যুগ্ম উৎসবকে নতুন করে আবিষ্কার করে। সেই নবপ্রতিষ্ঠিত মৈত্রী-বন্ধনের এক অটুট এষণা যোগাবে বাংলা ছবি। যে বাংলা ছবি প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলবে উভয় বাংলার সম্মিলিত হৃদয়ের ভাবাবেদনকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ তত্ত্ব কিছু নতুন নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেও দুটি ভিন্ন জাতির হৃদয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষকোটি হৃদয়কে একটি অদৃশ্য কিন্তু অচ্ছেদ্য সম্ভাবনার মধুর আকর্ষণে আঁকড়ে ধরে থাকে। আশা করি উভয়দেশের রাষ্ট্র ও সরকারই এই দুই বাংলার অগণিত নরনারীর এই অন্তরবার্তাকে উপলব্ধি করবেন, স্বাগত জানাবেন। কেননা, আমি বিশ্বাস করি যে সহমর্মিতার প্রেরণা ও একটি মূল কৃষ্টির ও সংস্কৃতির বিরাট প্রভাবের ছত্রতলে যে এক-মানসতার মন্ত্রশক্তি আজ পূর্ব বাংলার নরনারীকে ধর্মাচরণের কৃত্রিম বহির্বন্ধন থেকে মুক্ত করে, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নাগপাশ থেকে উদ্ধার করে পৃথক একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন মর্যাদায় ও মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করল নতুন দিনের মুক্ত মানবতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, সেই সহমর্মিতা ও সমভাবৈশ্বর্যের আদানপ্রদান উভয় বাংলাকে নতুন গরিমা দেবে—একই ভাবনদীর দুই তীর থেকে, একই বাংলা ভাষার, একই কৃষ্টির অনুরাগের পক্ষ-বিস্তারে। ভাষার বন্ধন আর ভাবের বন্ধন স্থাপনা করেছিল একদা ভ্রাতৃত্বের যে নিবিড় বন্ধন আবার তারই জয়ধ্বনিতে দুই বাংলার গগন পবন উদ্বেল হয়ে উঠবে। তার এই অর্থ বাতুল ছাড়া কেউ করবে না যে দুই বাংলা এক হয়ে যাবে আবার। তার একমাত্র অর্থ ও উদ্দেশ্য এই হবে যে আবার আমরা পরস্পরকে একই ভাষামূলক সংস্কৃতির আলোকে ও একই ভাবানুভূতির স্বচ্ছ-প্রবাহিত তরঙ্গে পূর্ণতর মহত্তর ও সুন্দরতর করে তুলতে পারব। আমাদের বাংলা ছবি, যার বিশেষ শিল্পোৎকর্ষের ঐশ্বর্য আজ বিশ্ববাসী নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছে সত্যজিত রায় প্রমুখ স্রষ্টার বিমল প্রতিভার সূত্র ধরে, সেই পরস্পরের ঋদ্ধি ও পূর্ণতাকে প্রেরণা যোগাবে।

নিছক ব্যবসায়গত হিসাবনিকাশের দিক থেকেও যেমন, সূক্ষ্ম শিল্পগত প্রসার ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকেও তেমনি বাংলা ছবি যে আপনাকে আপনি পূর্ণবিকশিত ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তুলতে পারে দুই বাংলার নরনারীকে যৌথ পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়েই মাত্র, এ সত্য অনেককাল আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। দেশবিভাগের পর বাংলা ছবির ওপর ব্যবসায়গত কি বিরাট আঘাত পড়েছিল, তা এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাংলা শিল্পকলার অনুরাগী মাত্রই জানেন। পশ্চিমবাংলায় ছিল যেমন শিল্পের দিক থেকে অধিকতর পুষ্টি, তেমনি ঐসলামিক রাষ্ট্রের শতপ্রকার কৃত্রিম বন্ধনের মধ্য দিয়ে সে তার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবসায় ক্ষেত্রকে হারিয়েছিল ওপারে। তার কারণ পূর্ববাংলার নরনারীর সহসা-সঞ্জাত কোন পশ্চিমবঙ্গীয় চলচ্চিত্রের প্রতি বিরাগ নয়, বরঞ্চ তারা মনেপ্রাণেই চাইত পশ্চিমবাংলার বহু সার্থক পরিচালক ও তারকার প্রতিভাপুষ্ট সুন্দর ছবিগুলি দেখে আনন্দ পেতে ও নিজেদের সদ্যোজাত পৃথক চিত্রশিল্পসত্তাকে সেই এপার বাংলার ছবির শিল্পালোকে অবগাহন করিয়ে সুন্দর

মুক্তি দিতে। কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুন ও পূর্ব-বাংলার মাটির বুকে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের প্রতিভাপুষ্ট বাংলাভাষাকে নির্বাসন দিয়ে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ভাষাকে রাজনৈতিক কারণে চালু করবার জঘন্য প্রচেষ্টার জন্য দুই বাংলার চিত্রশিল্পের কৃষ্টির পারস্পরিক আদানপ্রদানের সেই অভিযাত্রাকে নির্মম আঘাত হানল তার রাষ্ট্রশাসকেরা। যার থেকেই জন্ম নিল পূর্ববাংলার ইতিহাস-খ্যাত অমর বাংলাভাষার আন্দোলন, রক্ত-গঙ্গার মধ্য দিয়ে যে আন্দোলন পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীকে এনে দিল এক অপূর্ব মুক্তির বার্তা, এক অভূতপূর্ব মিলনের বাণী। সেই ভাষা আন্দোলনকেই নিশ্চয় বলা যায় আজকের এই নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মগ্রহণের সর্বাত্মক প্রেরণা।

আজকে আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, আমার মতো দুই বাংলায় যারা বাংলাভাষার ঐশ্বর্যে আপ্লুত হৃদয়, বাংলা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রাচীন ও মহৎ ভিত্তিকে যারা বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি তার সাহিত্যগত অপরূপ উৎকর্ষের জন্য, তারা প্রত্যেকেই নতুন আশায়, নতুন বিশ্বাসে বুক বাঁধবেন যে যেদিন বর্তমানের এই ক্ষণকালীন অশান্তি ও সংগ্রামের, এই রক্তক্ষয়ী হানা-হানির অবসানে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রে এবং তারই সমব্যথায় ব্যথী, সমসুখে সুখী ভারতভূমিতে আবার ফিরে আসবে শান্তি ও স্বস্তি, সেদিন উভয় বাংলাকে নতুন কৃষ্টির, নতুন শিল্পসৃষ্টির পথ দেখাবে উভয়ের বাংলা ছবি, যে ছবি আমরা পরস্পরের সঙ্গে সুন্দর ও উদার প্রতিযোগিতার উদ্যমে সৃষ্টি করতে পারব। যে ছবি দিয়ে আমরা পরস্পরের ভাবের ও কৃষ্টির পরিপূরক হতে পারব একই মাতৃভাষার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে। বাংলা গানে যে যাদু, যে গান গেয়ে উভয় বাংলার মাঝি দাঁড় টানে, উভয়ের কৃষাণ ক্ষেত চাষ করে, বাউল একতারা বাজিয়ে নাচে-গানে বিভোর হয়ে আমাদের হৃদয় উত্তাল করে তোলে সেই বাংলাভাষার জয়ধ্বনি আমরা আবার সমস্বরে বিঘোষিত করব উচ্চকণ্ঠে, আমাদের বাংলা ছবির ঐশ্বর্য ও কৃষ্টিকে লালনের মধ্য দিয়ে,—নাই বা রইল সে ঐশ্বর্যের টাকা-আনার সগর্ব ঔদ্ধত্য হিন্দী ছবির মতো। আমরা যে জিনিসকে ফিরে পাবো পরস্পরের সহায়তায় তার মহিমার মূল্যায়ন রৌপ্যাঙ্ক দিয়েই নয়।

হয়তো সেই নতুন দিনের উভয় বাংলায় বাংলা ছবির নির্মাণে আমরা অবশ্যই পরস্পরকে সাহায্য করতে, পরস্পরের সাহায্য নিতে মুক্ত হৃদয়ে প্রস্তুত থাকব। পরস্পর হয়তো শিল্পী দিয়ে, কলাকুশলী দিয়ে, যন্ত্রপাতি দিয়ে পরস্পরের প্রতি সহায়তার পূর্ণ হস্ত প্রসারিত করব। কে বেশী দিল, কে কম পেল, তা নিয়ে মাথা ঘামাব না। আমাদের লক্ষ্য হবে স্থির, এক। বাংলা ছবিকে নতুন জীবন সঞ্চারে কৃষ্টির আলোকে, সৃষ্টির মহিমায় সার্থক করে তুলতে হবে, গৌড়জনকে যা নিরবধি আনন্দসুধা পরি-বেশন করতে পারবে।

বাংলা ছায়াছবির ব্যস্ত নায়িকা অপর্ণা সেন। ফটো : অমৃত

আজকাল একটা কথা চিত্র ও নাট্য-সৃষ্টির জগতে খুব বেশী করে শোনা যায়,—সমকালীনতা। সেক্ষেত্রেও আমি বলব, আমাদের দুই বাংলার অধিবাসীদের ভাবনালোকে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যেসব বিবিধ চিন্তা ও প্রশ্ন ক্রমশই বর্ধিত রূপ নিচ্ছে, সেখানেও থাকবে আমাদের সমকালের, সম-আধুনিকভাবের পরিপোষকতা ও গুরুদায়িত্বের চিন্তা। আজকের দিনে আমরা সৃষ্টি করব দুই বাংলায় যে বাংলা ছবি তাতে যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে আমাদের লক্ষ লক্ষ নরনারীর একই পথে চিন্তাভাবনা, সামাজিকতা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির আশানিরাশার শিল্পোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। তার গাত্রাবরণ হবে পূর্ণ বাস্তব। সর্বপ্রকার যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্তি ও সর্বপ্রকার সুস্থ কল্পনাবিকাশের আস্তরণ থাকবে অন্তে। মনোবিশ্লেষণের উজ্জ্বল শিল্পালোকে চোখ মেলে সে ছবি যেন স্বাগত জানাতে পারে ভবিষ্যতের শোষণহীন, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও সভ্যতার আকর এক মুক্তমনা সমাজজীবনকে।

কলকাতার প্রথম যুগের ছবিঘর

আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

কলকাতায় প্রথম যুগের ছায়াছবি দেখানোর অগ্রদূত হিসেবে নাম করতে হয় হীরালাল সেন এবং তাঁর ভ্রাতা মতিলাল সেনের। এই সেন ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম ১৮৯৮ সালে 'রয়াল বায়স্কোপ' নাম দিয়ে অধুনালুপ্ত রঙ্গমঞ্চ রয়েল থিয়েটারে খণ্ড খণ্ড ছবি দেখাতে শুরু করেন। বিদেশী কম্পানির কাছ থেকে এক রীল-দুরীলের কমিক ছবির প্রিন্ট কিনে আর্কল্যাম্পের সাহায্যে ছবি দেখানো হত। এরপর ১৯০১ সালে তৎকালীন জনপ্রিয় নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্য তুলে সেন ভ্রাতৃযুগল ক্ল্যাসিক থিয়েটারে নিয়মিত ছায়াছবি দেখানোর বন্দোবস্ত করেন। এ ব্যাপারে নটসম্রাট অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এ'দের যথেষ্ট সাহায্য করেন। ক্ল্যাসিক থিয়েটারে অভিনীত 'ভ্রমর', 'আলিবাবা', 'হরিরাজ', 'দোললীলা', 'সরলা', 'বুদ্ধ', 'সীতারাম' প্রভৃতি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাংশ তুলে ছবির পর্দায় প্রদর্শিত হত। ১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ক্ল্যাসিক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনটি দেখলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞাপনটি ছিল :

'Bioscope-Series of superfine pictures from our World renowned plays — Vramar, Alibaba, Hariraj, Dole Lila, Sarala, Budha, Sitaram etc. will be prepared to the extreme astonishment of our partrons and friends?

প্রথম প্রথম এই খণ্ড খণ্ড ছবিগুলো দেখবার জন্য দর্শকদের খুব উৎসাহ দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে আলোকচিত্রগ্রহণের নতুন টেকনিকের অভাবে এবং অনভিজ্ঞ শিল্পীদের হাস্যকর অভিনয় দেখে দর্শকদের বাঙলা ছবি দেখার প্রতি আকর্ষণ কমে যেতে থাকে। ফলে ক্ল্যাসিক থিয়েটার থেকে ছবি দেখানো বন্ধ হয়ে যায়।

স্থায়ী ছবিঘর নির্মাণের কথা হীরালাল সেনই প্রথম চিন্তা করেন। তিনি বর্তমানে গণেশ টকীজ-এর জমিতেই রাম দত্তের সঙ্গে অংশীদারী স্বত্বে 'শো হাউস' নামে কলকাতায় প্রথম ছবিঘর গড়ে তোলেন। অবশ্য এর আগে ইণ্ডিয়ান এমুজমেণ্ট কম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রমথ গঙ্গোপাধ্যায় ও যতীন ঘোষের সহযোগিতায় কালীঘাট—হাজরা রোডে 'মনার্ক থিয়েটার' কিংবা সুরেন ব্যানার্জি রোডে বিজয়কুমার সিংহের সহায়তায় বর্তমান রিগাল ছবিঘরটি আগে তৈরি হয়েছিল কিনা, এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায়নি।

কলকাতায় বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পে হীরালাল সেন প্রমুখ বাঙালীরা প্রথম অগ্রণী হলেও পাকা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে বোম্বাইয়ের জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান নামে একজন পার্শি আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি ময়দানে তাঁবু ফেলে বায়স্কোপ দেখাতে শুরু করে অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন। শেষে ১৯০৭ সালে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস' নাম দিয়ে স্থায়ী ছবিঘর প্রতিষ্ঠা করেন।

জে, এফ, ম্যাডানের সাফল্যে অচিরেই কলকাতায় আরও দুটি ছবিঘর নির্মিত হল। প্রথমটি কর্পোরেশন স্ট্রীটে 'ইলেকট্রিক থিয়েটার' এবং দ্বিতীয়টি রোয়ার চিৎপুর রোডে 'সেণ্ট্রাল থিয়েটার'। এ দুটি ছবিঘরের মালিক ছিলেন মার্কিন মুলুকের লোকেরা। প্রদর্শনীর কাজ বেশ কিছুদিন চলার পর ছবিঘর দুটির অবস্থা সংগীন হয়ে পড়ায় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে ই. এইচ. [illegible]কাসে আর বি, এম, ক্যাপ্টেন যথাক্রমে এ দুটি ছবিঘরের স্বত্ব ক্রয় করেন।

দেখতে দেখতে ডুকাসের ছবিঘরের নাম বেশ ছড়িয়ে পড়ল। তিনি এটির নতুন নামকরণ করলেন 'বিজু থিয়েটার'। এই ছবিঘরে তখন ভাল ভাল নামকরা ছবি দেখানো হত। বিশ্বের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ডের নাম তখন কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়েছে। দর্শকরা তাঁর অভিনীত নতুন নতুন ছবিগুলো এখানে দেখতে পেতেন। ভাল ছবি দেখানোর জন্য ডুকাস সাহেবের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। অথচ ক্যাপ্টেনের 'সেণ্ট্রাল থিয়েটার' তেমন জমল না। ফলে তিনি বেনারসের কে, ডি, ব্রাদার্সের কাছে এটির ভার তুলে দিতে বাধ্য হন।

এদিকে 'বিজু'র এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে ম্যাডান সাহেব প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন। ছবিঘরের মালিকদের এই রেশারেশির ফলে কলকাতার দর্শকদের মধ্যে ছবি দেখার বেশ একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। ক্রমশই দর্শক-সংখ্যা বাড়তে লাগল। দর্শকদের ভিড় আরও বাড়ানোর জন্য ডুকাসে সংবাদপত্রে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি বি, এ, টোবাকো কম্পানির হার্মফিরিসের সহায়তায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলেন। এই নতুন পরিকল্পনার ফলে দর্শকসমাগম পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেল। ছবির প্রতি অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডুকাসে একটি ইংরেজী মাসিক সিনেমা পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এটির সম্পাদক ছিলেন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ডুকাসে যে কাজে হাত দিতে লাগলেন তাতেই সোনা ফলতে লাগল। 'বিজু'র শ্রীবৃদ্ধি দেখে তাঁর কয়েকজন ধনীবন্ধু এই ছবিঘরটি যৌথ সংস্থায় পরিণত করার প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাওয়ায় ডুকাসে এটিকে 'বিজু লিমিটেড'-এ পরিণত করলেন। ১৯১৬ সালে 'গ্রাণ্ড অপেরা হাউসে'-এ বিজু লিমিটেড স্থানান্তরিত হল। এই বাড়িটি সম্পর্কে একটি কুসংস্কার ছিল। বাড়িটি নাকি অলুক্ষণে। এখানে যাঁরাই ছবিঘর চালাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই নাকি গণেশ উল্টিয়েছেন। তাই এ বাড়িতে আসতে ডুকাসেকে অনেকেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো কথা শোনেননি। বরং নতুন উদ্যমে তিনি কর্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ করে এ বাড়িটির আগাগোড়া সংস্কার করে গ্রাণ্ড অপেরার শ্রী ফিরিয়ে আনলেন। এই ছবিঘরটির কার্যপদ্ধতির সুব্যবস্থা দেখে মেট্রো কম্পানির হাওয়েল সাহেব মেট্রো-গোল্ডেন-মায়ারের (এম, জি, এম) তোলা ছবি 'বিজু'তে পাকাপাকিভাবে দেখাবার ব্যবস্থা করে দেন। এই সময় নাজিমোভার ছবিগুলো এখানে দেখানো হত।

কলকাতায় ছবির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে মেসার্স কে, ডি, ব্রাদার্স

১৯ চৌরঙ্গী রোডের মেসার্স ম্যাসন ছিল এণ্ড রোজার্সের দোকান ঘরটি ছবিঘরে পরিণত করার জন্য ডবলিউ লেসলির কাছ থেকে লীজ নিয়ে নতুন নাম দেন 'ড্রীম ল্যাণ্ড'। পরে এটির নামকরণ হয় 'পিকচার হাউস'। মেসার্স কে, ডি, ব্রাদার্সের কর্ণধার কৃষ্ণদাস ইউনিভার্সাল ফিল্ম কম্পানির পরিবেশক সংস্থার প্রধান পরিচালক ছিলেন। এই কম্পানির নির্মিত ছবিগুলো পিকচার হাউসে দেখানো হত। তখনকার একটি শ্রেষ্ঠ ছবি Dumb girl of Portici (এ ছবিতে নৃত্যনর্তকী আনা পাবলোভা অংশগ্রহণ করেন।) দেখিয়ে কে, ডি, ব্রাদার্স প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

এই সময় বিজু লিমিটেডের মালিকদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় ডুকাসে এই ছবিঘরের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেন। এই সুযোগে কে, ডি, ব্রাদার্স ডুকাসেকে তাদের মধ্যে নিয়ে এসে ছবিঘরের সব দায়িত্ব তাঁর ওপরে ছেড়ে দেন। ডুকাসের ওপর বরাবর ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন থাকায় শীগগিরই 'পিকচার হাউস' আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

শুরুতেই ঘটল অঘটন। ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়েও 'পিকচার হাউস' বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারল না। পতন ঘটল। এই হঠাৎ পতনের কারণ হিসেবে অনেকের অনুমান, ডুকাসের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতানৈক্য ঘটায় এই ছবিঘরের পতন। ফলে স্বইচ্ছায় এই ছবিঘর থেকে ডুকাসে পদত্যাগ করেন।

কর্মবীর এবং ভাগ্যবান ডুকাসের কর্ম-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পিকচার হাউসেরও আলো নিভে গেল। কে, ডি, ব্রাদার্স তখন ম্যাডানের কাছে এটি বিক্রী করতে বাধ্য হন। ম্যাডানের সুপরিচালনায় অল্পদিনের মধ্যেই এই ছবিঘরের পূর্বশ্রী ফিরে আসে। তখনকার দিনে এটিতে সর্বনিম্ন দর্শনী ছিল এক টাকা দু' আনা এবং ভারতীয় পোশাকে এখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল। পরে অবশ্য এই নিয়মটি উঠে যায়।

এদিকে ম্যাডান কম্পানি ধীরে ধীরে বাঙালী পাড়ায় ছবিঘর নির্মাণ করতে শুরু করে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর 'কর্নওয়ালিশ থিয়েটার' নামে একটি ছবিঘর ১৯১৯ সালে তৈরি করে নিয়মিত ছবি দেখানোর বন্দোবস্ত করেন ম্যাডান সাহেব। এরপর হ্যারিসন রোডে ম্যাডান কম্পানির 'এলফ্রেড থিয়েটার'টি নির্মিত হয়। এখানে পার্শি থিয়েটার নিয়মিত দেখানো হত। [illegible] হয়। ১৯২০ সালের মধ্যে জে, এফ, ম্যাডান কম্পানি কলকাতার প্রায় ৩৭টি ছবিঘরের মালিক হয়।

ম্যাডানের প্রতিপত্তিতে বাঙালীরা যে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল তা নয়, ১৯২০ সালে খগেন ঘোষ, হরেন দাস এবং হেমন্ত দে একসঙ্গে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পে প্রবেশ করেন। এই তিন উৎসাহী ওয়েলিংটন স্ট্রীটে 'ওয়েলিংটন বায়স্কোপ' ছবিঘরটি দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বাংলাদেশে ছবি দেখা তখন লোকের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে এই ছবিঘরটি কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়। পরে অবশ্য হরেন দাস এবং হেমন্ত দে মেটিয়াবুরুজে 'ওয়েলিংটন বায়স্কোপ' ও 'ওয়েলিংটন সিনেমা' নামে দুটি চিত্রপ্রদর্শনী গঠন করেন। কিন্তু আর্থিক অসফলতার জন্য এঁদের দ্বৈত প্রয়াস চিরস্থায়ী হতে পারেনি।

ছবি-প্রদর্শনক্ষেত্রে বাঙালী বারবার অকৃতকার্য হলেও ছবি দেখানোর উদ্যম কিন্তু হ্রাস পায়নি। ১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সালকিয়ায় 'পার্ল সিনেমা' প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্যারিস থিয়েটার্স লিমিটেড সংস্থার উদ্যোগে ভবানীপুরের রসা রোডের ওপর 'রসা থিয়েটার' নামে একটি ছবিঘর ভাড়া নিয়ে বায়স্কোপ দেখানো শুরু হয়। এর আগে এমন সুরম্য ছবিঘর কোন বাঙালীর দ্বারা গঠিত হয়নি। এই ছবিঘরেই ১৯২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী ধীরেন গাংগুলী (ডি, জি,) পরিচালিত 'বিলেত ফেরত' সর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করে।

'রসা থিয়েটার'-এর কর্ণধার মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুযোগ্য পুত্র তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে এই ছবিঘরটি ১৯২৬ সালে 'পূর্ণ' থিয়েটার নামে পরিচিত হয়। বাঙালী পরিচালিত স্থায়ী ছবিঘরের মধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঙালীর দ্বারা গঠিত ভবানীপুরে এমন জনপ্রিয় ছবিঘর গড়ে উঠতে ম্যাডান কম্পানি পূর্ণ থিয়েটারকে টেক্কা দেবার জন্য রাতারাতি ভবানীপুরেই 'এম্প্রেস থিয়েটার' নির্মাণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পূর্ণ থিয়েটারকে তারা কোণঠাসা করতে পারল না। ম্যাডান সাহেব হয়তো ভেবেছিলেন, বাঙালীর বায়স্কোপ তো দুদিনেই উঠে যায়, তখন তিনিই এই পূর্ণ থিয়েটারের মালিক হবেন। কিন্তু তাঁর এ আশা কোনদিনই পূর্ণ হল না। বরং বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত ছবিঘরগুলো কলকাতায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। ১৯২৯ সালে বাঙালীদের অন্যতম ছবিঘরগুলোর মধ্যে 'চিত্রা', 'জুপিটার' এবং 'শো হাউস' প্রথম শ্রেণীর সারিতে এসে দাঁড়াল। বলতে গেলে এই সময় থেকেই বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্প ক্রমশ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল।

এরপর শুরু হয়ে গেল বাঙলা সবাক যুগের চলচ্চিত্রশিল্প। ১৯৩১ সালের শুরুতেই সবাক যুগের আরম্ভ। দেখতে দেখতে ম্যাডানের যুগও শেষ হল। আজ সত্তর দশকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কলকাতার আনাচে-কানাচে অসংখ্য ছবিঘর সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি ছবিঘর গমগম করছে দর্শকসমাগমে। একযোগে তিনটি কোথাও বা চারটি প্রদর্শনী চালিয়েও দর্শকদের চাহিদা মিটছে না। 'পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ'র সাইনবোর্ড দেখে দর্শকদের নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।

কলকাতার প্রথম যুগের ছবিঘরের আজ 'রজতজয়ন্তী', 'সুবর্ণজয়ন্তী' এবং 'হীরক-জয়ন্তী'র আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো দেখে গৌরবে বুক ভরে উঠে।

প্রবন্ধের তথ্য 'নাচঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্ববাসু রায়চৌধুরী লিখিত 'বাঙলার ফিল্ম শিল্প' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সাউন্ড অব মিউজিকের পরে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সাউণ্ড অব মিউজিকের সেই হাসিখুশি পরিবার—মারিয়ার উজ্জ্বলতা, ব্যারন জন্ ট্র্যাপের ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সেই কিছু ছেলে-মেয়েদের দুষ্টুমি, তাদের মনমাতানো গান ভোলা বড় সহজ কথা নয়। নাৎসী আক্রমণের সময় তারা অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় মুক্ত পৃথিবীতে—এ তথ্য আমাদের জানা। কিন্তু তারপর কি হলো? পরিবারটি কোথায় গেল, কিভাবে দিন কাটাতে লাগলো তা আমাদের অনেকের কাছেই অজানা।

একটু আগের থেকে বলা যাক। উনিশশো আটত্রিশ খৃষ্টাব্দেও ব্যারণ জর্জ জন ট্র্যাপ তাঁর ক্রমবর্ধমান বৃহৎ পরিবার নিয়ে টাইরোলিয়ান আল্‌পসের ভিলাটিতে বেশ শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন কাটাচ্ছিলেন। তখনো তাঁদের মনের আকাশে বারেকের জন্যেও উঁকি মারেনি সন্দেহের সেই কালো মেঘটা। তাঁরা ভাবেননি হিট্‌লারের জন্য অস্ট্রিয়া ছেড়ে তাঁদের পাড়ি দিতে হবে এক অনিশ্চিতের পথে উদ্বেগের পাথার ভর দিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে পরিবেশন করে যেতে হবে একের পর এক বৃন্দ-সংগীত। কিন্তু ব্যারণের দেশ সলস্‌বার্গের নাৎসী পতাকা উড়লে তাঁরা বুঝলেন এ ভিলায় থাকার মূল্য হিসেবে তাঁদের বিসর্জন দিতে হবে স্বদেশের প্রতি আনুগত্য—সেবা করতে হবে হত্যাকারী বর্বর নাৎসীদের। এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ব্যারন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে-দের নিয়ে সেদিন আলোচনায় বসলেন।

ব্যারনেশ মারিয়াই প্রথমে বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের দেহে প্রবাহিত রক্তের মতন। পর পর ঘটনাগুলি অনুধাবন করে দেখো, সংগীত-উৎসবের জন্য লোটে লেম্যান এখানে এসে আমাদের ছেলেমেয়েদের গান শুনে বললেন, ওদের কন্ঠে যেন স্বর্গীয় সুষমা ঝরছে। আবার আমাদের বাচ্চাদের গানই যখন শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেলো তখন চ্যান্সেলার সুজ-নিগ্ ওদের আমন্ত্রণ জানালেন ভিয়েনাতে সংগীত পরিবেশনের জন্য। আর এই মুহূর্তই তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে এটা— বলেই তুলে ধরলেন সদ্য ডাকে আসা চিঠিটা—যাতে তাঁদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগীত পরিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ভাবনার পাল্লায় শুরু হলো ওজন। অস্ট্রিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ চিন্তাহীন সুখী জীবন ছেড়ে অনির্দেশের পথে পা বাড়ানো। ভারী হলো কিন্তু অন্য-দিকের পাল্লা—তাতে ছিল তাদের প্রিয় জন্মভূমি অস্ট্রিয়ার ধীর মৃত্যু, কন্‌সেন-ট্রেশন্ ক্যাম্পের বিভীষিকা, সন্তানদের মনকে বিষাক্ত করে তোলার ছবি।

ভাবনা ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে স্থির সিদ্ধান্ত—সবকিছু রেখে তাঁরা আমে-রিকার উদ্দেশ্যেই জাহাজ ভাসাবেন। আর তাই পর্যটকের ভিসা নিয়ে ট্র্যাপ পরিবার পাড়ি দেন নিউইয়র্কে—শুরু করেন তাঁদের বৃন্দসংগীত সফরসূচী।

সংগীত আসরে ট্র্যাপ পরিবারের সম-ধুর উজ্জ্বল কন্ঠস্বর ও আনন্দোজ্জ্বল মুখ-গুলির পেছনে লুকোনো হৃদয়ব্যথা নতুন জীবন এবং পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের সমঝোতার কথা কিন্তু শ্রোতাদের কাছে অধরাই থেকে যেতো। সফরের সেই ভাঙা-চোরা ছোট্ট বাসা, এক রাত্রির আস্তানা, সস্তা খাবার জায়গা ইত্যাদি জোগাড়ের ভাবনা তাঁদের সেই সফরকে যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছিল।

ব্যারনেস মারিয়া তখন সন্তান সম্ভবা। কিন্তু সে জন্যে সফর স্থগিত রাখার কথা ছিল তার চিন্তার বাইরে। মারিয়ার নিজস্ব একটা থিয়োরি ছিল—সেটা বিতর্কিত হলেও, খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মতে সন্তানসম্ভবা মেয়েদের তখনই খারাপ লাগে যখন তাদের বুকের চেয়ে উদরের স্ফীতি বেশী হয়। তাই তিনি একই মাপের আকারে বড় পরপর পাঁচ সেট পোষাক তৈরী করেন। প্রতিটি পোষাকের সঙ্গে ছিল কৃত্রিম বক্ষদেশ।

জননী হবার কয়েকদিন আগে পর্যন্ত মারিয়া ওই পোষাকে বৃন্দ-সংগীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর দেহ সৌন্দর্যে মুখর হয়ে উঠেছিলেন সংগীত সমালোচকরা: সংবাদপত্রের পাতায় প্রথমে তাঁকে দীর্ঘদেহী উইলো গাছের মত ঋজু বলে বর্ণনা করা হয়। মধ্যপর্বে তাঁকে চিত্তাকর্ষক ও সব শেষে বলা হয় রাজ্ঞীচিতো মর্যাদাসম্পন্না। চেহা-রার এই রূপ পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ কিন্তু স্বল্পসংখ্যকই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে ট্র্যাপ পরিবারের মার্কিনী-করণ চলতে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় তাঁদের সঞ্চয়ের ঝুলি ভরে উঠতে থাকে। যেমন এক সন্ধ্যায় কোন ভোজসভায় মারিয়ার বাঁপাশে বসা সুবেশ তরুণ টিকে পরের দিন ঘরে ঘরে কয়লা দিতে দেখে মারিয়া তাকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য মাথাটা ঘুরিয়ে নিলো। যুবকটি কিন্তু সহজভাবে এসেই জিজ্ঞাসা করে—আমাকে চিনতে পারছেন না? কাল রাত্রি ভোজসভায় আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিলো।

ব্যারনেশ মারিয়া পরে তাঁর পরিবারের কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, ওরা এতে লজ্জা পায় না। তরুণটি তাঁকে জানিয়েছিল সে একেবারে গোড়া থেকে ব্যবসা শিখছে।

ব্যারনদের অবস্থা ফিরতে থাকে। দ্বিতীয় বছরে তাঁরা কুড়িটি বৃন্দ-গানের আসরে যোগ দিলেন। একটা ভাল গাড়ী এবং ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থাও হলো। পরের বছর চল্লিশটি আসরে এবং উনিশশো সাতচল্লিশ সালে তাঁরা শতাধিক আসরে যোগ দেন। এই সময় বিশ্ব-ভ্রমণের একটা কর্মসূচী বিষয়েও বিচার বিবেচনা করা হচ্ছিলো।

ট্র্যাপ পরিবারের সংগীত-পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা সহজেই এবং স্বল্প-সময়ের মধ্যেই শ্রোতাদের সঙ্গে আত্মিক ও হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন। তাঁদের অতি দ্রুত সাফল্যের এটা অন্যতম কারণ। এ ছাড়া তাঁর ছিল সহজাত রসিক মন ও নাট্য-বোধে সংগীত প্রতিভার সঙ্গে এই দুই বিশেষ গুণের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি শ্রোতা-দের চমৎকৃত ও মুগ্ধ করে দিতেন।

তবে অনেক সময় তাঁর পুঁথিগত ইংরেজী জ্ঞান বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করতো। প্রাচীন টাইরোলিয়ান শিকার-সংগীত-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন—'এটা হচ্ছে একটা শিকারের পিছু ধাওয়ার কাহিনী—এতে বলা হয়েছে একটি লোক পাহাড়ে একটি কৃষ্ণসার হরিণ শিকারে গেছে।' কিন্তু তিনি 'chamois' (শ্যাময়) কথাটিকে 'Chemise' (শিমিজ) উচ্চারণ করায় প্রেক্ষাগৃহে প্রচণ্ড হাসির ধুম পড়ে যায়। ট্র্যাপ পরিবারের প্রধান লক্ষ্যই ছিল আমেরিকায় একটি নিজস্ব বাড়ী করা। তাঁদের ইচ্ছা পূরণের জন্যই যেন স্টোয়ের ভার্মেন্ট থেকে জনৈক মিঃ রুট্‌লেজের একটা ছোট্ট চিঠি এলো। ঐ বিদেশী লিখলেন এখানে পাহাড়ের উপর আমার একটা জায়গা আছে—সেখানে ছুটি কাটাতে এলে আপনাদের ভালো লাগবে।

তাঁদের দেশ টাইরোলের মত জায়গা স্টোয়েতে একটি গ্রীষ্ম কাটিয়ে ট্র্যাপরা বুঝলেন কোথায় তাঁদের স্থায়ী বাড়ী হবে। উপত্যকার ওপরে ছশো একরের একটি খামার তাঁরা দেখলেন। খামারবাড়ীটি ভেঙে পড়েছে—ছাদ ঝুলে পড়েছে। কিন্তু চারদিকের দৃশ্যের দিকে তাকালে চোখ আর ফেরানো যায় না। 'এটা আমরা নিশ্চয়ই কিনব'—তাঁদের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর এবং তাঁরা তা কিনলেনও।

সপ্তাহ কয়েক পরেই ঘূর্ণিঝড়ে খামারবাড়ীটি উড়ে গেল। ব্যারনেস তাঁর চারিত্রিক কৌশলেই ভাস্বর হয়ে তৎপরতার সঙ্গে বললেন, মোটের ওপর আমরা এর দৃশ্যাবলীই কিনেছিলাম—বাড়ীটি নয়। আমাদের পুরনো বাড়ীটি এখন আর কষ্ট করে ভেঙে নীচে নামাতে হবে না।

কিন্তু তাঁদের বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা যেন সঙ্গে সঙ্গেই বাধা পেলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং জার্মান-ভাষীদের সন্দেহের চোখে দেখা হতে লাগলো। ট্র্যাপ পরিবারের বড় দুই ছেলে উত্তর ইতালীতে মার্কিণ স্কী বাহিনীতে থাকলেও স্টোয়েতে কেউ তা জানতো না।

তাঁরা শেষ পর্যন্ত একজন বুড়ো ছুতোরকে পেলেন যে তাঁদের সাহায্য করতে পারে। এবং সত্যিই বুড়ো তাঁদের সাহায্য করল।

কিছুদিন পরে বুড়ো ছুতোর মারা গেল। ট্র্যাপ পরিবার তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান কমে আসতে লাগল।

গ্রামের বিদ্যালয়ভবনটি মেরামতের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে একটি বৃন্দ সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে দর্শকরা মঞ্চের উপর যেন ভেঙে পড়লো।

কিছুদিন পরে স্টোয়েতে এক মহিলা সঙ্ঘে ভাষণ দিতে গিয়ে মারিয়া তাঁদের অস্ট্রিয়া ত্যাগের কাহিনী বিবৃত করলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল ঠিক তার পরের দিনই। ট্র্যাপদের খামারবাড়ীতে সারা শহরের লোক এসে হাজির। নানাভাবে নানাজনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল। কৃষক ও ব্যবসায়ীরা এলো অর্থসাহায্য নিয়ে। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র ও শিক্ষকরা নতুন বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে সার্থক সহযোগিতা দিলো। মারিয়ার ভাষায় সমস্ত জায়গায় তারা ঠিক রূপকথার দৈত্যের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে।

রূপকথার কাহিনী যেন সত্যি হয়ে উঠল ম্যানসফিল্ড পাহাড়ের কোলে যখন সূর্য অস্ত গেলো তখন তাঁদের ভাড়া বাড়ীর উপর আরাম ছাদ উঠলো পুরাতনের ওপর নতুনের ছোঁয়া লাগল। ট্র্যাপরা ভার্মেন্টবাসী হলেন।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালে ব্যারনের মৃত্যুতে এই দৃঢ়বন্ধ পারিবারিক দলটিতে প্রথম ভাঙন দেখা দিলেও মারিয়া অগস্টা ভন্ ট্র্যাপ দৃঢ়ভাবে পারিবারিক সংহতি বজায় রাখলেন। স্টোয়েতে বাড়ী শেষ করার অল্প কিছুদিন পরেই একজন প্রতিবেশী বললো, পাহাড়ের তলায় বন্ধ যুব শিবিরটিকে এবার চালাতে হবে। ট্র্যাপদের অনুরাগীরা এইভাবে লিখে চললো 'আমরা তোমাদের ভাল করে জানতে চাই।' আর তাই শেষ পর্যন্ত মারিয়া বারটি লম্বা ব্যারাকের মত বাড়ী কিনে ট্র্যাপ পরিবার সংগীত শিবিরের পরিকল্পনা শুরু করলেন।

অতিথিরা রোজ বৃন্দ-সংগীতে যোগ দেবে—এ জন্যে দেয় অর্থের পরিমাণ হবে খুবই কম। প্রতিটি সেসন্ হবে দশ দিনের। সেসানে গোটা পরিবারই যোগ দিতে পারবে। ছেচল্লিশ দিনের মধ্যেই সমস্ত কিছু তৈরী হলো। এক একটা ঘরের নামকরণ হলো এক এক সংগীত শিল্পীর নামে। যেমন কোনটার নাম হলো স্টিফেন ফস্টার হল, কোনটা মোজার্ট আবার কোনটার বা নাম হলো বাচ-এর নামে। এবং ভোজনকক্ষের নাম দেওয়া হয় রোশিনী হল। কেননা এই সংগীতরচয়িতা ছিলেন একাধারে রুটিপ্রস্তুতকারক ও রাঁধুনী। পর্যটক পরিবারগুলি শিবিরটিকে এর অনাড়ম্বর ও আনন্দঘন পরিবেশের জন্য ভালবাসতো। জোহানার রান্না অস্ট্রিয়ান খাবার যেমন হতো সুস্বাদু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও ছিল তেমনই চমৎকার। ট্র্যাপ শিবির পরিদর্শন যেন এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সকাল সাড়ে সাতটায় পাহাড়ের নীচে গীর্জা থেকে ভেসে আসতো প্রার্থনাসংগীতঃ 'হোলি গড়, উই প্রেইজ দাই নেম'। ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, ইহুদী প্রত্যেকেই গাইতেন এই গান। প্রথমবার অতিথিদের মধ্যে ছিল একজন দৃষ্টিহীন বালিকা, অবসরপ্রাপ্ত এক বিশপ, জনৈক দালাল, চিকিৎসক, দশ বৎসরের কমবয়স্ক বারোটি ছেলেমেয়ে এবং ষাট বছরের ওপরে কিছু মহিলা।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণঃ আপনি যদি বনের মধ্যে হাঁটতে থাকেন তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো দেখবেন এক পলিতকেশ মহিলা একা সংগীতসাধনা করছেন। চোখে পড়ছে পাহাড়ের উপর হয়তো কিছু মেয়ে প্রকৃত অস্ট্রিয়ান ইয়ডেল (সুইস ও টাইরোলিয়ান পর্বতবাসীদের গাওয়া এক ধরনের অস্ফুট সংগীত) শেখার চেষ্টা করছে। গাছের নীচে বসে মারিয়া হয়তো কয়েকটি ছেলেমেয়েকে শেখাচ্ছেন একটি সহজ সরল ঘুমপাড়ানী গান। রান্নাঘর থেকেও ডিস ধোয়ার শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছে কানাডিয়ান সংগীতের সুর।

সন্ধ্যায় একশো বা তারও বেশী লোক লোকনৃত্যের জন্য বৃত্ত রচনা করেছে। বয়স সেখানে কোন বাধা নয়—প্রত্যেকে নাচছে প্রত্যেকে গাইছে। ট্র্যাপ পরিবারকে এ জন্য অপরিমিত পরিশ্রম করতে হলেও তাঁরা অতিথিদের মতই এটা উপভোগ করেন। এর পর কুড়ি বছর কেটে গেছে—ব্যারনেসের বয়স এখন ষাটের ওপর—এখনও তিনি ভার্মেন্টে ট্র্যাপ পারিবারিক লজ চালাচ্ছেন। পরিবারের অন্যান্যরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বড় ছেলে রোডে দ্বীপপুঞ্জে একজন চিকিৎসক, অন্য জন ভার্মেন্টে এক খামারের মালিক। মেয়েদের মধ্যে দুজন শিক্ষিকা, একজন নিউগিনিতে মিশনারী এবং চতুর্থ জন নার্স।

দেখা যাচ্ছে উত্তর পর্বেও সাউন্ড অব মিউজিকের সুরলহরী আকাশেবাতাসে নিত্য-নতুন সুরের ঝঙ্কার তুলে চলছে।

অপরাজিতকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কথা

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজস্থানের যোধপুর জেলার পাচভদ্রা গ্রামে প্রায় মরুভূমির মাঝখানে আমার জন্ম হয়েছে ১৯০৫ সালের ২১ জুন। কিন্তু তা হলে হবে কি। আড়াই বছর বয়েস থেকে আমি আছি কলকাতায়, এখানেই আমার কাজকর্ম, লেখাপড়া, অভিনয় শিক্ষা। তাই আমি মনে করি, আমি আসলে কলকাতার মানুষ। শুধু তাই-ই নয়, কলকাতায় আসা ইস্তক উত্তর কলকাতার এই টালা অঞ্চলেই আমার জীবন কেটেছে ও কাটছে। বাড়ী বদল হয়েছে বটে, কিন্তু পাড়া বদল করতে হয়নি কখনও কোনো কারণে। ভারতী শিক্ষামন্দিরে, যা পরে ভুবনমোহন ইনস্টিটিউশনের সংগে যুক্ত হয়েছিল, আমার শিক্ষার শুরু। তারপর ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, বিদ্যাসাগর হাই স্কুল হয়ে শেষ পর্যন্ত মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি ১৯২৩ সালে। ব্যস, ঐ পর্যন্ত হয়েই পড়াশুনো খতম, কলেজের মুখ আর দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। ১৯২৪ সালেই ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অডিট ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ি। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই ১৯২৫ পড়বার সংগে সংগেই চলে আসি পোস্টাপিসে এবং দীর্ঘকাল ওখানে কাজ করে অবসর গ্রহণ করি। কর্ণওয়ালিশ (বিধান সরণি) পোস্টাপিসে ছিলুম অনেকদিন, আমাকে অনেকেই ওখানে দেখে থাকবেন।

অভিনয়ের প্রতি নেশা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। প্রথম প্রথম ফিমেল পার্ট অর্থাৎ স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করতুম। পাড়ার সানডে ক্লাবে প্রথম অভিনয় করি বিল্বমঙ্গল নাটকে অহল্যার ভূমিকায়। তারপর ঐখানেই কৃপণের ধন নাটকে করি কুন্তলার চরিত্র। এরপর যোগ দিই সে যুগের খুব নামকরা ক্লাব সান্ধ্যসমিতিতে। ওখানে প্রফুল্ল নাটকে সাজি শিবনাথ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর ছেলে ভুবনেশ মুস্তাফী নেমেছিলেন যোগেশের ভূমিকায়। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পরে সান্ধ্যসমিতি সি আর দাশ ফান্ডের অর্থভাণ্ডারে সাহায্য উপলক্ষে মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় করেছিল প্রতাপাদিত্য নাটকটি। এই আসরে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সেজেছিল প্রতাপ, ভূমেন রায় রডা, অমলেন্দু লাহিড়ী বাসন্ত রায় এবং আমি কাত্যায়ণী। যেমন টিকিট বিক্রী করা হয়েছিল, তেমনই চূড়ান্ত হয়েছিল অভিনয়। ক্লাবের অফিসে মহাত্মাজীকে আনা হয়েছিল টাকা দেবার জন্যে।

এরই কিছুকাল পরে গড়ে উঠল নতুন থিয়েটার রংমহল। ১৯৩২-এ ওখানে যখন মহানিশা খোলা হচ্ছে, তখন যোগ দিল রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমিও সঙ্গে সংগে ওখানে গিয়ে হাজির, ইচ্ছেটা ওখানেই যোগ দেব। কিন্তু যোগেশচন্দ্র চৌধুরী-মশাই আমাকে অন্য বুদ্ধি দিলেন। তিনি বললেন, 'অভিনয় যদি শিখতে চাও তাহলে ভাদুড়ীমশাইয়ের কাছে যাও—আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। গেলুম নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর কাছে। তিনি যোগেশদার চিঠি পড়ে সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করলেন। উনি তখন কোনো রঙ্গমঞ্চ নিয়ে অভিনয় করছেন না, ও'র তখন ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায়। তাতেই যখন আলমগীর অভিনয় হল উনি আমায় দিলেন বিক্রম সোলাঙ্কীর ছোট ভূমিকা। নতুন ছেলেদের অভিনয়ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যে এইটিই ছিল তাঁর কষ্টি-পাথর (টেস্ট রোল)। ও'র দলের সঙ্গে ঘুরলুম পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী। যেদিন নবীনদের দলকে উনি শেষরক্ষা করতে দিতেন, সেদিন আমি সাজতুম তাতে গদাই।

কলকাতায় ফিরে আসবার পরে কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে ভাদুড়ী-মশাই স্টার থিয়েটার অধিকার করে খুললেন নব নাট্যমন্দির। ওখানে নরেন্দ্র দেবের ফুলের আয়না অভিনীত হল। তারপর হল অভিমানিনী। দুটি বইয়েতেই আমি কোনো-না-কোনো ভূমিকায় নেমেছিলুম। এরপর যখন বিরাজবৌ খোলা হল, তখন নীলাম্বর-বেশী ভাদুড়ীমশাইয়ের সঙ্গে আমি অবতীর্ণ হয়েছিলুম নিতাই গাঙ্গুলীর ভূমিকায়। সরমাতে সেজেছিলুম শারণ, দেশের দাবীতে টাইপিস্ট। বিজয়াতে আমার মৌলিক কোনো ভূমিকা ছিল না, কিন্তু বদলি-অভিনেতা হিসেবে, বোধকরি, সবকটা পুরুষ চরিত্রই করেছি। ভাদুড়ী-মশাইয়ের 'যোগাযোগ' আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। এতে উদ্বোধন-রজনীর ঠিক আগের দিন আমাকে নবীনকৃষ্ণের ভূমিকা করতে বলা হয়। আদেশ শিরোধার্য করে নেমে গিয়েছিলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমার অভিনয় দেখে খুশী হয়েছিলেন এবং আমাকে তাঁর বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন; শিশিরকুমার আমাকে নিজে সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই 'যোগাযোগই' স্টারে নবনাট্যমন্দিরের শেষ অভিনয়। এরপর আমরা পূর্ববঙ্গের (তখনও ব্রিটিশ আমল) বিভিন্ন শহরে অভিনয় করে বেড়াই কিছুকাল।

নাট্যনিকেতন মঞ্চ অধিকার করে যখন শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম খুললেন, তখনও আমি তাঁর দলভুক্ত। উড়ো চিঠিতে আমি করি হেমন্ত মাস্টার। বিপ্রদাসে জিন্না সাহেবের মেক-আপ নিয়ে করি ব্যারিস্টারের ভূমিকা। এই বিপ্রদাস অভিনয়ের সময়েই একটি ছোট্ট কারণে আমি, শৈলেন চৌধুরী, জীবেন বসু প্রভৃতি একসংগে মিনার্ভায় চলে যাই। পরে আমি আবার ভাদুড়ী সম্প্রদায়ে ফিরে আসি। দেশবন্ধুতে পাগলা রাজা এবং দুঃখীর ইমানে জামাল। তুলসী লাহিড়ী-

মশাইয়ের প্রচুর পরিশ্রমের ফলে এই ভূমিকাভিনয়ে আমার খুব প্রশংসা হয়।

ভাদুড়ী মশাইয়ের থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরে আমি পরপর মিনার্ভা, রঙমহল, বিশ্বরূপা, সলিল মিত্র পরিচালিত স্টার থিয়েটার সেন্টার এবং সর্বশেষ কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'নটী বিনোদিনী'তে অভিনয় করেছি। প্রায় চল্লিশ বছর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে অভিজ্ঞতা কম অর্জন করি নি। যখন শিশিরকুমারের অভিনয় সম্প্রদায়ে প্রথম প্রবেশ করি, তখন মনে হয়েছিল, অভিনয় শিক্ষার ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। ও'র শিক্ষার তুলনা হয় না। উনি আমাদের বলতেন, আমি নিজে যা করি, তা করবার চেষ্টা কোরো না, আমি যা বলি, তাই কর। একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। চন্দ্রগুপ্তে আমি কাত্যায়ন করছি, উনি চাণক্য। একটা জায়গায় ঠিক ক্যাচওয়ার্ড ধরতে না পেরে আমি একটু আমতা-আমতা করেছিলুম। ওরে বাব্বা, ভেতরে গিয়ে সে কী বকুনি। মনে হয়েছিল, পৃথিবী দু-ফাঁক হয়ে যাক, আমি তার ভিতর ঢুকে গিয়ে লজ্জার হাত থেকে বাঁচি। ও'র থিয়েটার থেকে অন্য থিয়েটারে গিয়ে আমি সত্যিকারের শিক্ষা দেবার মতো কাউকে পাইনি।

সে-যুগে থিয়েটার-মহলে কিছু কিছু উচ্ছৃংখলতা ছিল বৈকি। কিন্তু সংগে সংগে এ-কথাও বলব, সে-যুগে স্টেজ বা থিয়েটারের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল, যে দরদ ছিল, এ যুগে তা দেখতে পাই না। তখন একটা 'ক্লাব মেন্টালিটি', প্রতিষ্ঠানের সকলের প্রতি একটা আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, এখন তা হারিয়ে গেছে। এখন হচ্ছে ভাবটা যেন চাকরী করতে এসেছি; কাজ কর বাড়ী যাও। তবে ওরই মধ্যে সলিল মিত্র পরিচালিত স্টারের আবহাওয়া সব থেকে ভালো। আর একটা কথা। আগেকার যুগে প্রত্যেক অভিনেতাকে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে হত। এখন এক-একজন অভিনেতাকে একই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করাতে দেওয়া হয়; ফলে, তার অভিনয়-শক্তি সীমিত হয়ে পড়ে, তার নাট্যনৈপুণ্য বিস্তার লাভ করতে পায় না।

এইবার মঞ্চের কথা ছেড়ে সিনেমায় আসি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তো অভিনয় করেছি ১৯৩২ থেকে। কিন্তু আমার সিনেমায় অভিনয় শুরু করতে হয়েছে তার থেকে আট বছর আগে ১৯২৪ সালে। ম্যাডান থিয়েটারের নির্বাক ছবি দুর্গেশনন্দিনীতে আমি একটি কাটা সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলুম। জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেজেছিলেন জগৎসিংহ। এরপর গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত শশিনাথ ছবিতে করেছিলুম আর্টিস্টের ভূমিকায়। নিউ থিয়েটার্সের সবাক ছবি পরাজয়ে সেজেছিলুম কবি—ছবিটি হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় তোলা হয়েছিল। বড়ুয়া সাহেবের দুখানি ছবিতে আমি কাজ করি; এক, শাপমুক্তি, দুই, মায়ের প্রাণ। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি প্রথমে আমাকে যে-কথা বলেছিলেন তা আমি আজও ভুলতে পারি নি। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার মতো একটা পার্ট আছে করে দেবেন?' আশ্চর্য ভদ্রলোক! আর কি সময়জ্ঞান। যদি বলেছেন যে, 'আমি আপনাকে ঠিক দুটোর সময়ে সেটে তৈরী চাই', তো একেবারে ঠিক দুটোর সময়েই দেখা যাবে তিনি তাঁর সহকারীকে বলছেন, 'কানুবাবু তৈরী হয়েছেন তো?' ১৯৪৯-এ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত প্রিয়তমাতে এক অকর্মা মোটর মিস্ত্রীর ভূমিকায় নেমেছিলুম, নাম জানিমিস্ত্রী। মজাদার হাল্কা চরিত্রটি দর্শকদের খুব ভালো লেগেছিল। যখন প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরিচালিত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছিলুম, তখন প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে হবিষ্যান্ন খেয়েছি। এযে জ্যান্ত দেবতার ভূমিকায় অভিনয় করা! অথচ ঐ একই সময়ে আমি কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলা সাহেব-বিবি-গোলামে বংশী চাকরের ভূমিকায় নেমেছি।

হিসেব করলে দেখা যাবে, আজ পর্যন্ত আমি নিদেনপক্ষে একশোখানি ছবিতে কোনো-না-কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। ১৯৩৪ সালে মন্মথ রায় এবং অখিল নিয়োগী পরিচালিত 'শুভ গ্রাহস্পর্শ' ছবিতেই আমার প্রথম সবাক চিত্রজগতে প্রবেশ। বন্ধু সুশীল মজুমদারের 'রিক্তা' থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ছবিতেই আমি স্থান পেয়েছি। শৈলজানন্দের নন্দিনী, শহর থেকে দূরে, মানে-না-মানা, অভিনয় নয় ছবিগুলিতে আমাকে আপনারা দেখেছেন। অজয় কর পরিচালিত জিঘাংসাতেও ছিলুম। একটা বাস্তবধর্মী ছবি আজ-কাল-পরশুতে নেমেছিলুম। ছবিটির সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন যেন হয়ে গেল। সুকুমার দাশগুপ্তের 'রাজগীর' কথাও মনে পড়ছে। আরও অনেক অনেক ছবির নাম এখনই স্মরণ হচ্ছে না।

এরপর লোকে নতুন করে আমাকে দেখল ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালীতে হরিহরের ভূমিকায়। ও'র দ্বিতীয় ছবি অপরাজিততেও ঐ একই চরিত্রে আমি অভিনয় করি। সম্প্রতি পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে আলো, আমার আলো ছবিতে আমি নায়িকার বাপের ভূমিকায় অভিনয় করেছি; নায়িকা সেজেছেন সুচিত্রা সেন।

সাম্প্রতিককালের বাঙলা চলচ্চিত্রজগতে একটা ব্যাপার প্রায়ই ঘটতে দেখি, যাকে আমি শিল্পী হিসেবে মন থেকে মেনে নিতে পারি না। প্রায়ই দেখি কিছু নামকরা অভিনেতা সব জিনিসই তাঁদের মতানুযায়ী চলুক, এটা চান; এই ডিকটেটারী মনোবৃত্তিকে আমি কোনক্রমেই সমর্থন করিনা। কোনো ছবির ভালো-মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ছবির পরিচালকের উপর। যদি কোনো শিল্পী তাঁর অধীনে কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হন, তাহলে তার কর্তব্য পরিচালককে নির্বিচারে মেনে চলা। আদৌ চুক্তিবদ্ধ হওয়া না হওয়া যখন শিল্পীর ইচ্ছাধীন, তখন চুক্তিবদ্ধ হবার পরে কোনো রকম বায়নাক্কা তোলা রীতিমত অসমীচীন

আমার অভিনেত্রী জীবন

সন্ধ্যা রায়

একটু গোড়ার কথা বলে নিই।

নাম আমার নবদ্বীপবাসিনী। বাবা সতীশ-চন্দ্র গুহরায়চৌধুরীর কর্মস্থান নবদ্বীপে জন্মেছিলুম বলেই এই নাম। আমাদের আদি বাস হচ্ছে যশোর জেলার বেজপাড়া গ্রামে—বর্তমানে বাংলা দেশ।

সংসারের প্রয়োজনেই অর্থ উপার্জনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমে ফিল্মে নামবার কোনোরকম কল্পনাই ছিল না। মাস-খানেক কাজ করেছিলুম ফিলিপস্ কোম্পানীর প্যাকিং ও চেকিং ডিপার্টমেন্টে। সেলস গার্ল হিসেবেও বেশ কয়েকদিন কেটেছে। দূরসম্পর্কের একজন আত্মীয়া নার্সের কাজ করেন। মাসখানেক শিক্ষানবিশ হিসেবে একাজও করেছি; কিন্তু রক্ত, ইনজেকসান, মৃতদেহ দেখে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। হ্যাঁ, সেলাই করাও শিখেছিলুম। প্রয়োজনের তুলনায় রোজগার কম; তাই কিছুতেই মন বসছিল না।

কেউ কেউ বলছিলেন, ফিল্মে চেষ্টা করে দেখ না। কিন্তু বহু লোকের কথাবার্তা শুনে ফিল্মজগৎ সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা ভীতির জন্ম হয়েছিল। যখন একটা মন বলছিল, কাজ কি বিপদের মধ্যে গিয়ে, তখন আর একটি মন জিজ্ঞাসা করছিল, মেয়ে-ছেলে রোজগারের জন্যে পথে বেরুলে বিপদ কোথায় নেই? ভাবলুম, দু-একটা ছবির শ্যুটিং দেখতে গেলে কেমন হয়. টালিগঞ্জ পাড়ার হালচালটা কতক তো বোঝা যাবে।

গেলুম শ্যুটিং দেখতে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। সালটা ১৯৫৭। ওখানে হচ্ছিল **'মামলার ফল'**; পরিচালনা করছিলেন পশু-পতি চট্টোপাধ্যায়। নতুন বৌকে নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে; এমন সময়ে কে একজন তার কোলে একটি ছোট বাচ্ছাকে বসিয়ে দিয়ে গেল। বৌ ছেলেটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। তাকে ঐরকম অবাকভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটি মেয়েকে বলতে হবে, 'দেখছ কি অমন করে? ও তো তোমার সতীনপো।' কিন্তু যে মেয়েটিকে এই কথা বলবার জন্যে আনা হয়েছে, বহুবার রিহার্সাল দেওয়া সত্বেও সে কিছুতেই ঠিকভাবে গুছিয়ে কথাকটি বলতে পারছিল না। শুনে শুনে কথাক'টা আমার পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল; এমনকি কথা বলার ভঙ্গী পর্যন্ত আমার মনে মনে রপ্ত হয়ে গেছে। প্রায় ঘন্টাখানেক চেষ্টা করবার পরে মেয়েটি সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে পরিচালক অন্য কোনো মেয়েকে আনতে বললেন। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে ভদ্র-লোকের দৃষ্টি বেশ-দূরে-বেঞ্চিতে-বসা আমার ওপর এসে পড়ল। দূর থেকেই আমাকে তিনি নিরীক্ষণ করে দেখলেন এবং সেখান থেকেই ডাকলেন, 'খুকী শোনো তো!' যদিও বুঝলুম তিনি আমাকেই ডাকছেন, তবু প্রথমটা আমি না-বোঝার ভঙ্গী করে উঠিনি। তখন পরিচালক চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহকারীকে পাঠালেন আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে। অগত্যা যেতেই হল তাঁর কাছে। যেতেই বললেন, বলতো, 'দেখছ কি অমন করে? ও তোমার সতীনপো।' আমার তো শুনে শুনে মুখস্থ হয়েই গিয়েছিল; তাই তখনি বলে দিলুম কথাগুলো। সংগে সংগে উনি বললেন, 'যান, একে মেক-আপ করিয়ে আনুন—ও করে দেবে এই পার্টটা।' সাত-পাঁচ না ভেবেই আমি মেক-আপ করে এসে ওই ছোট্ট ভূমিকাটি করলুম। এই হচ্ছে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আমার প্রথম হাতে খড়ি। গিয়েছিলুম শ্যুটিং দেখতে, হয়ে গেলুম অভিনেত্রী।

এরপর রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে শ্যুটিং দেখতে গিয়ে আমার পরিচয় হয় পরিচালক রাজেন তরফদারের সংগে। তিনি আমাকে **'অন্তরীক্ষ'** ছবিতে নায়িকার বান্ধবীর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে মনোনীত করেন। আমাকে বলা হয়েছিল মাত্র তিন-দিনের কাজ। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ঐ তিনদিন বেড়ে গিয়ে হল প'চিশ দিন। ঐখানেই রাজেনবাবুর সহকারী প্রণব বসু সলিল সেনের সংগে আমার আলাপ করিয়ে দেন। উনি আমাকে ও'র **'নাগিনী কন্যার কাহিনী'** ছবিতে দ্বিতীয় নারীচরিত্র পিংলার ভূমিকাটি দেন। নায়িকা শ্যামলার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়ে-ছিলেন মঞ্জুলা। ছবির মহরৎ কিন্তু আমাকে দিয়েই হয়েছিল এবং মহরৎ-শটে আমাকে একসংগে তিনটি সাপ হাতে করে ধরতে হয়েছে, আর স্বচ্ছন্দে আমি তা ধরেছি। একে পাড়াগাঁয়ে মেয়ে। তায় ছেলেবেলা থেকেই ডাকাবুকো, ডানপিটে। সেই কারণেই বোধহয় এটা সম্ভব হয়েছিল। সলিলবাবু হাতে ধরে আমাকে অভিনয়শিক্ষা দিয়েছেন; বলব, ছবির জগতে উনিই আমার প্রথম গুরু। এই ছবির সংগীতপরিচালক ছিলেন রবিশংকর। তিনি আমার মুখে মনসার পাঁচালী গান শুনলেন এবং খুশী হয়ে ঐ গান আমাকে দিয়েই ছবির জন্যে রেকর্ড করালেন। আমার ভূমিকাটি ছবিতে দ্বিতীয় নারীচরিত্র হলেও দর্শকদের কাছে ঐ চরিত্রটিই মুখ্য বলে মনে হয়েছিল। এবং এই পিংলার ভূমিকার জন্যে আমি 'বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাকট্রেস' (শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী) রূপে উল্টোরথ পুরস্কার লাভ করি। 'অন্তরীক্ষ' ও 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'—এই দুটি ছবিই হয়েছিল ১৯৫৮ সালে।

আমার অভিনেত্রী জীবনের শুরু এই-ভাবেই হয়। আজ পর্যন্ত বোধকরি পঞ্চাশ-খানায়ও বেশী ছবিতে কাজ করেছি। যতই কাজ করেছি, ততই অভিজ্ঞতা বেড়েছে। যত

নিমন্ত্রণ/সন্ধ্যা রায়

বিভিন্ন ধরনের চরিত্র, তত তাদের রকমারি চাহিদা; নিত্যনতুন পরিবেশ। দেবকীকুমার বসু (অর্ঘ), কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, গুরু বাগচী, বিজয় বসু, অজিত গাঙ্গুলী, অসিত সেন, ভূপেন রায়, তপন সিংহ, বিভূতি লাহা (অগ্রদূত), চিত্ত বসু, রাজেন তরফদার, সলিল সেন, তরুণ মজুমদার—বেশ অনেক পরিচালকের অধীনেই কাজ করেছি। প্রত্যেকের ধরন সমান নয়; তবে অসুবিধে ঘটেনি কোথাও।

মনে রাখবার মতো ছবি কোনগুলি? আমার মনে অবশ্য প্রতিটি ছবিই গাঁথা হয়ে আছে? তবে ওরই মধ্যে আপনারা হয়ত নাম করবেন গঙ্গা, বধূ, মায়ামৃগ, সূর্যতপা, দ্বীপের নাম টিয়ারং, পলাতক, আলোর পিপাসা, মণিহার, বাঘিনী, রূপসী, নিমন্ত্রণ, ছবিগুলির। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র পরেই যদিও 'জলেজঙ্গলে'তে অভিনয় করি, কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করি 'গঙ্গা' ছবিতে।

অভিনেত্রী-জীবনে কায়েমী হয়ে বসবার জন্য, সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করবার জন্যে আমাকে নিত্যই তৈরী হতে হয়েছে, প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। এক তো শরীরকে ঠিক রাখার ব্যাপার আছে; তার জন্যে নানারকম ব্যায়াম চর্চা ইত্যাদি ইত্যাদি। দুই, নানারকম চরিত্র জানবার, বোঝবার জন্যে কাগজকলম নিয়েও বসতে হয় নিয়মিতভাবে। বাংলা এবং ইংরাজী— দুই সাহিত্যের সঙ্গেই পরিচয় করতে হচ্ছে নিত্য নিয়মিত। তার ওপর আছে নিয়ম করে উর্দু পড়া, লেখা এবং বলা। এটা তিন বছর ধরে এক নাগাড়ে চলছে।

এই প্রসঙ্গে বোম্বেতে 'গঙ্গা' ছবির উদ্বোধনের কথা মনে পড়ছে। ঐ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ওখানে আমাকে যেতে হয়েছিল রাজনদা, মৃণাল সেন, নিরঞ্জন রায়, কণিকা মজুমদার প্রমুখের সঙ্গে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিরূপে ছিলেন বিমল রায় ও মেহবুব খাঁ। ওখানে তো আমার নাম হয়ে গেল গঙ্গা-গার্ল। হোয়াইট হাউসে যখন প্রেস কনফারেন্স হল, তখন হঠাৎ আমাকেও কিছু বলতে বলা হল। আমি কি জানি কেন, বোধকরি নেহাতই অন্যমনস্কভাবে, নমস্তে দিয়ে শুরু করে যতটুকু বলেছিলুম, সবটুকুই উর্দুতে। এবং আমাকে অবলীলাক্রমে ওরকম উর্দু বলতে দেখে উপস্থিত সকলেই নাকি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে লক্ষ্ণৌয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ক পুরস্কার আনতে গিয়ে সেখানে নগ্নতা ও সেন্সার বিষয়ে বক্তৃতাও আমি উর্দুতেই দিয়ে এসেছি। এবং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মির্জা গালিবের রচনা থেকে কিছু কিছু শুনিয়েও দিয়েছি। সম্প্রতি খাঁটি হিন্দী পড়া ও লেখা শুরু করতে হয়েছে মাদ্রাজের হিন্দী ছবিতে কাজ করছি বলে।

কবে থেকে আমার আত্মবিশ্বাস জন্মাল, একথা অনেকেই জানতে চাইবেন। এর জবাবে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করব। বিভূতি লাহার (খোকাদার) পরিচালনায় 'সূর্যতপা' ছবি হচ্ছে। উত্তমকুমারের বিপরীতে আমি অভিনয় করছি। একটি বিশেষ নাটকীয় দৃশ্যের বিভিন্ন শট তোলা হবে—সেখানে শুধু আমি এবং উত্তমদা। শটের পর শট নেওয়া হচ্ছে; ক্রমে সেই দৃশ্যের ক্লাইম্যাক্স শট এসে গেল। দু'তিন বার মনিটার (মহলা) নেওয়ার পরে আসল টেক নেওয়া হল। আমার বিশ্বাস মনিটারে আমি যেমনভাবে বলেছিলুম, আসল টেকে তার থেকে অনেক ভালো হয়ে গিয়েছিল। দৃশ্যের শেষে 'উত্তমদা' আমায় খুব তারিফ করেছিলেন। ছবিটি যখন দেখানো হয়, তখন আমি দেখে বুঝেছিলুম আমার অভিনয় কি পর্যায়ের হয়েছিল। দর্শকদের বলতে শুনেছি পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছে।—তখন এবং তখন থেকেই মনে হয়েছিল, আর পাঁচজনের মধ্যে আমিও একজন। আমার মধ্যে আমি আত্মবিশ্বাসকে খুঁজে পেয়েছিলুম।

শুটিংয়ের জন্যে দূরদূরান্তর যেতে আমার খুব ভালো লাগে। শহরের কৃত্রিমতা থেকে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে আমি যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। দু' জায়গায় গিয়ে আমার আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করেনি। এক, কন্যাকুমারী আর দুই, লছমনঝোলা পেরিয়ে কালাজঙ্গল। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বন্ধন' ছবির আউটডোর শুটিং উপলক্ষ্যে এইখানে যেতে পেরেছিলুম। সেখানে একজন সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি আমাকে পুত্রী বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি যে গুহার মধ্যে ধ্যান করতেন, তাও আমি দেখেছি। তিনি ঐ গুহার বাইরে একটি পাতিলেবুর গাছ লাগিয়েছেন; তাতে অনেক লেবু। সাধুজী বাঙালী। কথায় কথায় জানতে পেরেছিলুম, তিনি নেতাজীর সঙ্গে অনেক কাজ করেছেন এবং পরে সাধু হয়ে গেছেন। আমি তাঁর আশীর্বাদধন্য। আমি তাঁকে কিছু দিতে পারি কিনা জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেছিলেন, "যখন এখান থেকে নেমে যাবে, তখন স্বর্গাশ্রমে যা-ইচ্ছে-হয় দিয়ে যেয়ো, তাতেই আমাকে দেওয়া হবে।" আমি তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করেছিলুম; কিন্তু তাই বা কতটুকু? ইচ্ছে হয়, আমার জীবনের সমস্ত উপার্জন তাঁর চরণে উৎসর্গ করি; কিন্তু তা হবার নয়। কারণ কয়েক বছর পরে তাঁর দর্শন পাবার উদ্দেশ্যে আমি আবার ঐ কালাজঙ্গলে গিয়েছিলুম। তাঁর পাতিলেবু গাছটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু তাঁকে আর দেখতে পাইনি।

গঙ্গা । সন্ধ্যা রায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের প্রভেদ

গীতা সেনগুপ্ত

ব্রহ্মা এবং ভরতমুনি প্রদর্শিত পথে ভারতীয় নাটকের রীতি-নীতি, গঠনশৈলী, প্রয়োগকৌশল এবং ভাবাদর্শগত যে সূত্র নির্ধারিত হয়েছিল — তা হিরণ্ময় যুগের সংস্কৃত নাটক যেমন প্রবল নিষ্ঠায় রক্ষা করেছে—তেমনি তার আদর্শগত প্রভাব লৌকিক নৃত্য বা নাট্যও এড়াতে পারে নি। তারই কতকগুলি মূল সূত্র ভারত ছাড়িয়ে ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিজয়ের কালে ছড়িয়ে পড়েছে সারা এশিয়া জুড়ে। এখানেই নিরূপিত হয়েছে পশ্চিম পৃথিবীর সঙ্গে প্রাচ্য এশিয়ার নাট্যগঠনগত এবং মঞ্চশিল্পের মৌলিক ব্যবধান। তাই দেখি এশিয়ার নাট্যধারার মধ্যে কাব্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের এক বিচিত্র সমন্বয়। এদের অনুসরণ করেই আমরা এশিয়ার নাটকের মূল প্রতিপাদ্যে পৌঁছুতে পারি।

নৃত্য, কাব্য ও সঙ্গীত, এই তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রাচ্য ধারায় কাব্যই প্রধান, কাব্যই সর্বজয়ী, কাব্যেই পরিবেশ রচনা, কাব্যেই উক্তি-প্রত্যুক্তি। কার্যকারণ সম্পর্কের প্রবল ঘাত-সংঘাতে এগিয়ে যাওয়া ইউরোপীয় নাটকের বাস্তবানুগ নাট্যরূপ এ নয়। গ্রীক নাট্যেও কাব্য ছিল, শেকসপীয়রেও কাব্য আছে, কিন্তু কাব্য সেখানে ভাষাপ্রয়োগের বিশিষ্ট রীতি মাত্র। প্রাচ্যে কাব্য, কাব্যের জন্যই,—সেখানে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ, ব্যঙ্গ, অনুপ্রাস—কথার বিচিত্র কারুকার্য নিয়ে নির্মাজ্জিত হয়ে রয়েছে। সংস্কৃত-শাস্ত্রকার নাটককে বলেছেন 'দৃশ্যকাব্য'। অভিনেতাদের সমস্যাই এখানে 'কাব্য'কে দৃশ্যরূপ দেওয়ার—নাটককে নয়। তাই থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় 'লাইকে' অভিনেতাদের দেখি নাট্যের যে কোন জায়গায় থেমে গিয়ে কবিতার বিচিত্র মূর্ছনা সৃষ্টি করতে। আবার জাপানের কাবুকি নাটকও ইউরোপীয় রুচির দর্শকদের অধীর করে তোলে কাব্যের অভিনব মারপ্যাঁচে। কাব্যের সঙ্গে গ্রথিত নৃত্য ও সঙ্গীত ধারায় সিক্ত করে—বিলম্বিত লয়ে একটি গল্প শুনিয়ে দেওয়াই প্রাচ্য নাট্যের রীতি। সেক্ষেত্রে মঞ্চও হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগামিতা-বর্জিত। কাব্যের রূপায়ণে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির মাথাব্যথা তাদের নেই। কাব্যকে সঙ্গীত, দেহভঙ্গি ও মুদ্রার সাহায্যেই প্রকাশ করা সহজ। তারা কাব্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের ধারা প্রস্রবণে দর্শককে এই দুঃখময় বাস্তব জীবন থেকে দূরে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। দর্শকের মানস-মঞ্চে ফুটুক কাব্যের কুসুম, উঠুক ভ্রমর নিক্কণ, কলাপবিস্তার করে নাচুক ময়ূর-ময়ূরী। দর্শক তুমি দেখ, শোন, রসিয়ে রসিয়ে অনুভব কর তারপরে আত্মস্বপ্নে নিমগ্ন হও। মঞ্চ কতটুকু পারে সেই স্বপ্নলোকের পরিচয় দিতে, পরিবেশ সৃষ্টি করতে? তাই থাকুক সব কিছু পেছনে পড়ে—এসো এই ছন্দের, সুরের কাব্যের মাঝে হারিয়ে যাই।

প্রাচ্য নাটকে কাব্যের প্রাবল্যের জন্যই অনেক সময় স্থান, কাল, পাত্রে ইউরোপীয় রীতির অনুরূপ ঐক্য রক্ষিত হয় নি। বিশেষ করে স্থান ও কালের ঐক্য প্রাচ্যে যদৃচ্ছ ব্যাহত। অন্যদিকে নাটকীয় ক্রিয়ার গতিশীলতাও কাব্য প্রাধান্যের জন্য খণ্ডিত। অভিনেতাকে কাব্যের অগ্রগতির মাঝে যে কোন জায়গায় থেমে গিয়ে নৃত্য, গীত, আচার-আচরণ বা কাব্য বিস্তার করতে হয়। ফলে নাটকে সৃষ্টি হয় স্থির পরিবেশ মঞ্চের উপর গতির এই বিশ্রাম ইউরোপীয় ধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই স্থির কারুকর্ম-সৃজনে দর্শকদের ভাবাবেগের ধারা বাহিকতা অবশ্যই খণ্ডিত হয়। প্রাচ্য নাটকের এটাই বৈশিষ্ট্য—সে কেবল একটা গল্প বলতে চায় না, তাকে সুবিস্তৃত সুবর্ণিত উপায়ে বলতে চায়। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে যেমন শুনি দীর্ঘকাল রাগ-রাগিণীর বিচিত্র বিস্তারের মধ্যে রাজ-কুমারীর অনন্ত চলার পদধ্বনি—গায়ক এবং শ্রোতা কেউই ব্যাকুল নয় কখন সে পৌঁছবে তা নিয়ে। প্রাচ্যের নাট্যসাহিত্যেও তাই কাজের মানুষের ছুটে চলা নেই, ভ্রমণবিলাসীর মত রয়েসয়ে রসিয়ে, দেখতে দেখতে, আস্বাদন করতে করতে খাওয়া।

এই জন্য প্রাচ্যনাট্যের অভিনয়কালে কেবল অভিনেতাগোষ্ঠী থাকলেই চলে না, তাদের সঙ্গে চাই নৃত্যশিল্পী, গীতশিল্পী এবং যন্ত্রশিল্পী—যারা নৃত্য ও সঙ্গীত ধারার সাহায্যে নাটকের কাব্যভার লাঘব করে গল্পাংশ শুনিয়ে দেবে এবং অভিনেতাদের সহায়ক হবে। প্রাচ্যে এই কথকতার প্রাধান্যধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মহাকাব্যের আবৃত্তি করা থেকে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করেছে। ক্রমশ এই কথক আবৃত্তি ও সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীর সংযোগ করতে লাগলেন—পরে সংলাপের জন্য আলাদা অভিনেতাগোষ্ঠী এল—কিন্তু মূল কথকের ভূমিকা এখনও কথকতায়, কীর্তনে, পাঁচালীতে টিঁকে আছে।

সংস্কৃত নাটকে এই গল্পকারকে বলা হত 'সূত্রধার'। তিনিই কাহিনীর ভূমিকা জানতেন, দৃশ্যারম্ভ করে বীজস্থাপনা করতেন, নাটকের কাহিনীসূত্র রক্ষা করতেন এবং চরিত্রের ব্যাখ্যা করতেন ও পরিচালনা করতেন। জাপানের নাটকেও আমরা দেখি অভিনেতাদের পাশাপাশিই থাকেন 'জরুরী' নামে এক দল গায়ক, তাঁরাই সঙ্গীতধারায় কাহিনী বিবৃত করে যান এবং অভিনেতারা অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যের সাহায্যে তার ভাবাভিব্যক্তি ঘটান। কেবল সবচেয়ে সুন্দর ও আবেগপূর্ণ অংশগুলিই অভিনেতারা অভিনয় করে থাকেন। জাপানের পুতুল নাচে তো একজন মাত্র গায়কই সকল চরিত্রগুলির বক্তব্য বিবৃত করেন। জাপানের 'না' নাটকেও বাঁশী ও ড্রাম ইত্যাদি নিয়ে থাকেন যন্ত্রবিদরা এবং অভিনেতাদের বাঁদিকে মঞ্চের একটি আলাদা অংশে বসেন 'খোরাস' গায়ক দল,—তাঁরা নাট্য-কাহিনীর প্রয়োজনীয় বহু অংশই বিবৃত ও ব্যাখ্যা করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এইসব গল্পকার বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে নৃত্য ও নাট্য একই ব্যাপার। যে সব নৃত্যবিদ বা অভিনেতা বয়সের ভারে অভিনয় করতে পারেন না, তাঁরাই 'খোরাস' সঙ্গীতকারদের সঙ্গে বসেন এবং কাহিনীটি সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন,—মঞ্চে তরুণ অভিনেতারা নীরবে সুনিপুণ একান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে নৃত্যে আঙ্গিক অভিব্যক্তি ঘটান। রবীন্দ্র-নাথের 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যেও এই আঙ্গিকই দেখি—গায়কেরা গানের সাহায্যে কাহিনী বিবৃত করেন—

নৃত্যশিল্পী নাচের মাধ্যমে তার রূপায়ণ দেন।

ইন্দোনেশিয়ার দর্শকরা অনেক সময় 'দালাঙ' বা গল্পকারকেই বেশী সাধুবাদ ও সম্মান জানান। তাঁরা পরিতৃপ্ত অন্তরে ভাল আবৃত্তির জন্য গল্প-কারের প্রশংসাই আগে করেন — ভাল অভিনয়ের জন্য নৃত্যশিল্পীরা বাহবা পান প'রে। জাভার ছায়া-নাটকেও রয়েছেন এক কাহিনী-বক্তা। আমাদের লোকনাট্য 'যাত্রাভিনয়েও' অবসরপ্রাপ্ত অভিনেতাদের 'জুড়ির' কাজ করতে দেখি; জুড়ির বৃন্দ গায়করাও আংশিকভাবে কাহিনীর অগ্র-গতিকে সহায়তা করেন। 'জুড়ির' নামের সঙ্গেও তাঁদের মিল লক্ষণীয়।

এই কাব্য ও সঙ্গীতের প্রাবল্যের জনাই প্রাচ্যের নাটক অনেক বেশী ভাববাদী এবং বাস্তববিমুখ। এর ফলে সে আধুনিক জীবনের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে আসে নি। প্রাচীন ঐতিহ্যের মায়াময় স্বপ্নলোকে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুনিপুণ চেষ্টায় একের পর এক তার চড়িয়ে সেই অতি-প্রাচীন অতিমধুর সুর-ঝঙ্কার বংশানুক্রমে সৃষ্টি করে চলেছে। বর্তমান ইউরোমেরিকার ভাবধারা, তার জ্বালাময় অস্থিরতা, দর্শকদের চিত্তে নিত্যনতুনের জন্য গোবি সাহারার পিপাসা খাঁটি প্রাচ্য সংস্কৃতির রাজ্যে নেই। প্রাচ্য নাটক কাব্য-ভিত্তিক হওয়ায় আর একটা বিপদ ঘটেছে। ভাষা প্রাচীন হয়ে যাওয়ার ফলে তার অর্থ দুর্বোধ্য হয়ে গেছে, কিন্তু এর সঙ্গে দেহভঙ্গী এবং নৃত্যের এক সর্বমানবিক আবেদন আছে, তাই তা এ যুগেও উপ-ভোগ্য। এদেশে নাট্য-কাহিনীর অর্থ দর্শকদের কাছে প্রাঞ্জল করে তোলার প্রধান উপায় হল 'প্যান্টোমাইম' বা মূকাভিনয়ের প্রয়োগ। এ ছাড়াও

প্রাচ্য নাটকে রয়েছে ভাঁড়, বিদূষক প্রভৃতি লঘু হাস্যরসের সৃজনকারী অভিনেতারা। তারা সাধারণ দর্শক-দের কাছে নাটকের অর্থ বোধগম্য করে তোলে—এবং তাদের আনন্দ বিতরণ করে কৌতূহলকে অটুট রাখে। সংস্কৃত নাটকে রাজার সখা হিসেবে বিদূষক চরিত্রের উপস্থিতি আমাদের জানা। তেমনি বালি-দ্বীপেও দেখি—নাটকের অভিজাত বা রাজচরিত্রের অভিনেতার সঙ্গে একটি ভাঁড়-চরিত্রও প্রবেশ করে, সে প্রধান চরিত্র যা করেন তারই ব্যর্থ অনুকরণ করে,—যা বলেন, তাই গ্রাম্যভাষায় অনুবৃত্তি করে। ফলে সাধারণ জনসমাজ যেমন কৌতুক উপভোগ করে, তেমনি রাজ-অভিনয়ের ভাবার্থও সহজে বুঝতে পারে। চীনদেশেও সম্রাট বা সেনানায়কের গাম্ভীর্যপূর্ণ অভি-নয়ের পরে একটি হাস্যরসাত্মক 'ইন্টার-লাড' থাকে তার ভাষাও হয় কথ্য বা গ্রাম্য। এরই সাহায্যে প্রধান গল্পকে অনুধাবন করা সহজ হয়। যদিও এই লঘুচরিত্রগুলির লোকশিল্পীদের নাটকের

সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত
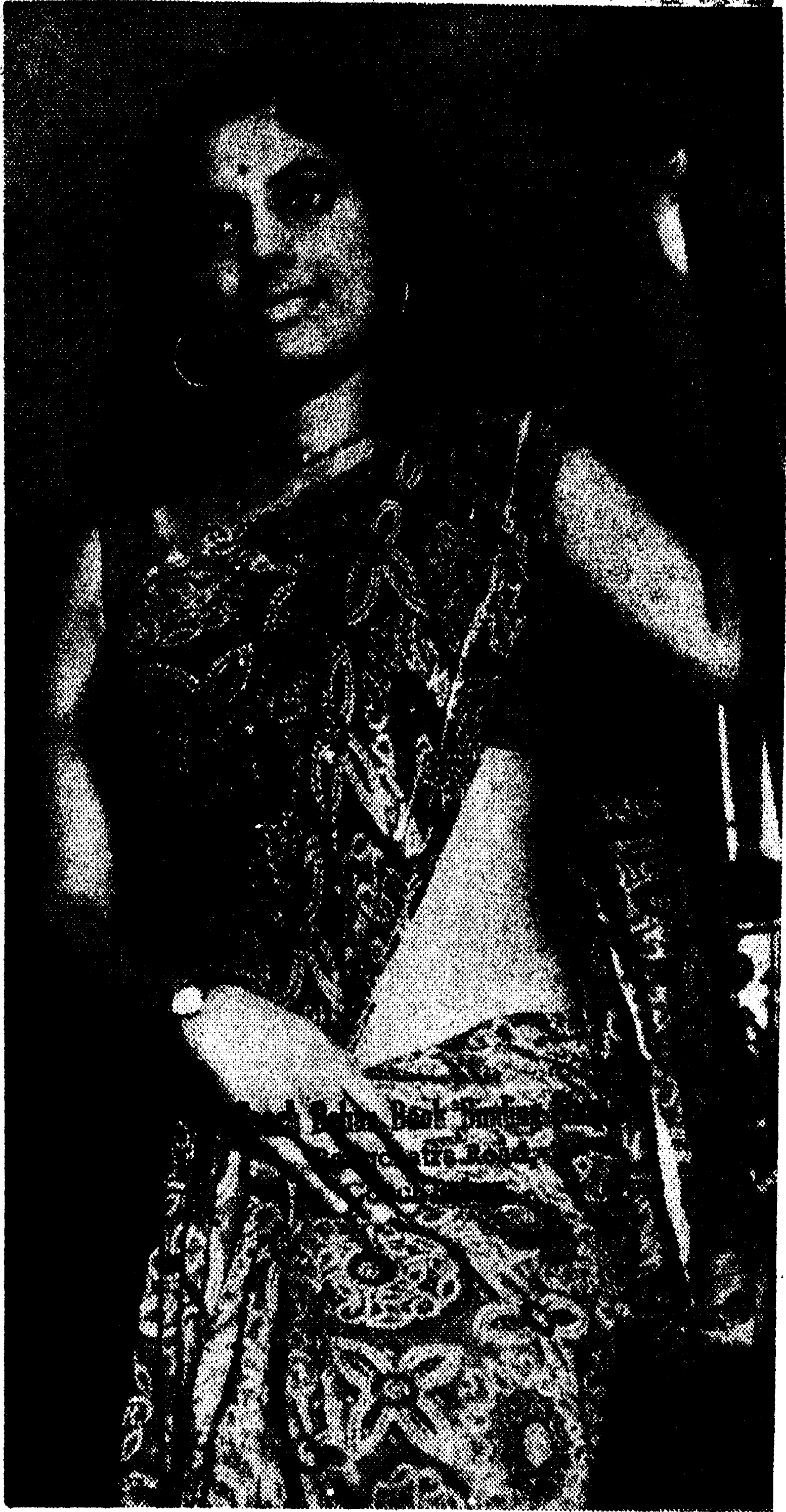
অনুরূপ অন্যান্য কতকগুলি প্রয়োজনও আছে। গুরুগাম্ভীর্যের মধ্যে এই লঘু-চরিত্র একটি সুন্দর অবকাশ ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। তাহলেও নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির ও নাটকীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা হিসেবেও তাদের স্থান অসামান্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নাট্যকাহিনী ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়সম্বন্ধ হওয়ায় তার নাট্যরূপও কাব্যিক হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকেই নাটকের শুরু এবং এখনো বহু জনসমাজের বিশ্বাস যে, দেব-অনুগ্রহেই নাটকের জন্ম এবং অভিনয়ক্ষেত্রে স্বয়ং দেবতারা উপস্থিত থাকেন। অতএব কাহিনীর যেখানে যাই ঘটুক পরিশেষে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় অবশ্য-ম্ভাবী। ইউরোপের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগত নাট্যোৎসবে আমরা কিন্তু পুণ্যের নিশ্চিত শুভ পরিণাম পাই না, যেমন তাদের 'প্যাশন প্লে' যাতে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাহিনী রয়েছে, বা 'শুভ [illegible]'

নৃত্যে, অথবা 'পি রোজারেনসন' বা 'প্লেনেথোমের দৃশ্যাবলীতে — এ ধরনের বিয়োগান্ত কারুণ্যে সুর ভারতের ধর্মীয় উৎসবে ফুটে উঠতে পারে না। আমাদের ঐতিহ্যে ট্র্যাজিডি ছিল না—যতই বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসুক, শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ হওয়া চাই।

কাব্য স্বভাবতই ভাবানুগ। এশিয়ার নৃত্যনাট্যগুলি সংগীতের ও কাব্যের সান্ত-সুর মিশ্রণে ইউরোপীয় বাস্তব সমস্যা-সম্বলিত বাস্তবানুগ গঠনভঙ্গিমার নাট্য-রূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে প্রবাহিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় সংস্কৃত নাটকে আমরা সংগীত প্রাচুর্যের উল্লেখ পাই। চীনদেশের নাটক তারের যন্ত্র এবং বাঁশীসহযোগে অভিনীত হত। এর এক একটি সংগীতদলে থাকত বারোটি নারী ও বারোটি পুরুষ কণ্ঠ। ছাব্বিশটি বাঁশী, দুটি বড় ড্রাম, ও তিনটি ছোট ড্রাম। সংস্কৃত নাটকেও 'কুতব' নামে যন্ত্রশিল্পীদের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এই সংগীত দর্শকদের যেমন আনন্দ দেয় তেমনি ভাবাবেগের ধারাবাহিকতাও রক্ষা করে। প্রাচ্য নাটকে প্রবেশ, প্রস্থান, বিচ্ছেদ সবেতেই গান — মদ্যপও গাইছে, হৃদয়ের শান্তিকামীও গাইছে—এরা যেন বিস্ময়-লোকের অধিবাসী, গানের ভাষাতেই কথা বলছে। ক্লাসিক ও অর্ধ-ক্লাসিক যুগের এই সংগীত-প্রাবল্য, আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারায় লালিত প্রাচ্য নাটকও সম্পূর্ণ এড়াতে পারে নি। তাই এখনো এদেশে বিভিন্ন ভাবাবেগের প্রকাশ সংগীত ছাড়া হয় না। প্রাচ্য মানুষের হৃদয়ের ভাষা, মুখের কথা সবকাই সুরময় — গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা। গান গেয়ে দাঁড় টানে মাঝি। এদেশে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিই গানে গানে সুরে সুরে। এই সুকুমার বৃত্তির সর্বব্যাপক আশ্চর্য খেলা, পাশ্চাত্য মানুষের কাছে এখনো বিস্ময়ের বস্তু।

থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, জাভা, বালি এই দ্বীপাবলী ছাড়া এশিয়ার আর কোন দেশের সংগীতে 'কোরাস', 'অরকেস্ট্রা' বা দ্বৈত সংগীতের প্রচলন গোড়ায় ছিল না। এশিয়া 'হারমনির' দেশ নয়, 'মেলোডির' দেশ। লোকে কান পেতে শোনে সমবেত সুর নয়, একটি একক সুরধ্বনি। পাশ্চাত্যের বহু যন্ত্রের 'অরকেস্ট্রা' এবং সম্মিলিত সুরের পিয়ানোয় মেলোডির নিখুঁত সুর ও ছন্দের কান নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচ্যের মার্গ-সংগীতে তাই 'হারমনির' প্রবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস নেই, আছে অতিনিপুণ কারুকর্ম, অতিদক্ষ কান। মেলোডির দেশ প্রাচ্য তাই পাখোয়াজ ও তবলা জাতীয় যন্ত্রই সংগীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় নিখুঁত তাল, লয়, ছন্দ রক্ষা করবার জন্য। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন স্তরে বাঁধা বহুসংখ্যক 'তাম্বুরিণ'। কিন্তু এশিয়া বর্তমান যুগে এসে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ হয়ে ও পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করে পাশ্চাত্য সংগীতে যতটা প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং তাকে উপভোগ করতে পারে, পাশ্চাত্যের পক্ষে আজও তা সম্ভব নয়—বলা চলে সংগীতের চাইতে নৃত্য ও নাট্য তাদের কাছে অনেক সহজ গ্রহণীয়।

কাব্য ও সংগীতের চেয়ে নৃত্যের আবেদন অনেক সার্বজনীন বলে ভারতের সব রকমের নাটকের মধ্যে এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল নৃত্যের সর্বব্যাপক অধিকার। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও তাই নৃত্যের—করণ, প্রকরণ, মুদ্রা, স্থান, চক্ষুকর্ম, ভ্রূ-কর্ম—ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। পাশ্চাত্য জগতে কিন্তু সংগীত, নৃত্য ও নাট্যের এমন মিশ্রিত রূপ নেই—সেখানে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া নৃত্য—নৃত্য, নাট্য—নাট্য। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির উপর খৃষ্টধর্মের প্রবল প্রভাব-বশতই দেহকে আনন্দ সৃষ্টি ও রস সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে। নৃত্যশিল্পের প্রভাব তাই তাদের জীবনের অতি ক্ষীণ অংশই অধিকার করে আছে। সেজন্যই নৃত্য থেকে এদের নাট্য সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু ভারতবর্ষে তথা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে জন্মলগ্ন থেকেই নৃত্য ও নাট্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নৃত্য এদেশে ভঙ্গির সাহায্যে কাব্যের সমৃদ্ধ ভাব-কল্পনা ফুটিয়ে তোলে, যখন কাহিনী-কার তাঁর গল্প বলে যান—তখন এই নৃত্য-শিল্পীরাই মঞ্চ আলোকিত করে রাখেন। অভিনেতারাও মঞ্চে এসে কেবলমাত্র অঙ্গ-ভঙ্গী বা মূকাভিনয়ে কায়িক অভিনয় শেষ করতে পারেন না—তাঁদেরও পরিশীলিত দক্ষতার নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এই জন্য এশিয়ার মঞ্চ অতিস্বাভাবিক কারণেই নৃত্যশিল্পের পাদপীঠ হিসেবে গঠিত হয়েছে। মঞ্চের উপরে বিভিন্ন সাজসজ্জা 'সেট'-এর বিচিত্র উপকরণ, কিম্বা বাস্তব দৃশ্যের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টির দিকে তাঁদের নজর নেই। কাব্য ও সংগীতের বিচিত্র ধ্বনিজাল এবং ভাব-কল্পনা যেমন বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনই নৃত্যের আবর্তনেই একই মঞ্চে বিভিন্ন কক্ষ পরিক্রমা দ্বারা স্থানগত দূরত্বের সৃষ্টি হয়। প্রাচ্য মঞ্চে তাই 'সেটের' ব্যবহার ছাড়াই ভিন্ন, ভিন্ন স্থান এবং দূরত্ব একই ক্ষেত্রে এসে একীভূত হয়েছে, এইভাবেই রক্ষিত হয়েছে নাটকে স্থানের ঐক্য।

নৃত্যশিল্পীরা রাজসভার সমাদরে আহূত হতেন। তাঁরা নৃত্য প্রদর্শন করতে রাজসভার মঞ্চে উঠতেন এবং চিন্তাকুল রাজহৃদয়ের বিনোদন করতেন। ক্রমশ এই নৃত্যের সঙ্গেই কাহিনী ও অভিনয় যুক্ত হতে লাগল। মঞ্চে বিবাহানুষ্ঠান মানেই ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যানুষ্ঠান। একজন যুদ্ধনায়ক বীর যুদ্ধযাত্রার আগে নেচে নিতেন, যখন তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হতেন তখনও নাচতেন। নায়ক-নায়িকা মিলনের প্রগাঢ় আনন্দেও উদ্বেল হয়ে নাচতেন. দেবতারা তাঁদের ঐশী শক্তি দেখাতে নাচতেন এবং নাট্যকাহিনী শেষ হয়ে গেলেও দেখা যেত কোন একটি দেবতা বা মানব-চরিত্র শুধুমাত্র আনন্দবিতরণের জন্যই নৃত্য করছে। পাশ্চাত্য মানুষের কাছে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে এরকম ধারা-বাহিকভাবে নৃত্য প্রদর্শন অকল্পনীয়।

নাটকে যেখানে অঙ্ক পরিবর্তন, অর্থাৎ এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে আবর্তন ঘটে, প্রাচ্য মঞ্চে তা অঙ্ক-যবনিকা বা 'সেট'-এর পরিবর্তন ছাড়াই অতিসহজ উপায় অবলম্বন করে বোঝান হয়। তা হল নাট্যকাহিনীর দুটি অংশের মাঝখানে একটি আলাদা নৃত্যানুষ্ঠানের সমাবেশ করা। নাটকের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত এশিয়ার এই নৃত্যশিল্প কোনক্রমেই কিন্তু ইউরোপের বিশেষ ছন্দে ও তালে ঘূরপাক খাওয়া 'বলডান্স' বা শারীরিক ক্রীড়াকৌশলপ্রদর্শনকারী নৃত্যের সমতুল্য নয়। এশিয়ার নৃত্য অনেক বেশী ছন্দোময়, ভাবব্যঞ্জক, অতিশয় নাট্যগুণসম্পন্ন। একে একমাত্র ইউরোপের 'ব্যালে' অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তুলনা করা চলে—যেখানে নৃত্য গভীর উপলব্ধির ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছোয়, একটি অলৌকিক লোকের সিংহদ্বার খুলে দেয় এবং একটি কাহিনী সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শত শতাব্দী ধরে এশিয়ার নাট্যজগতে যে বিবর্তন ও প্রগতি চলেছে, তাতে দেখা যায় নাটককে পেছনে রেখে নৃত্যই সমুন্নত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলিই তার হচ্ছে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
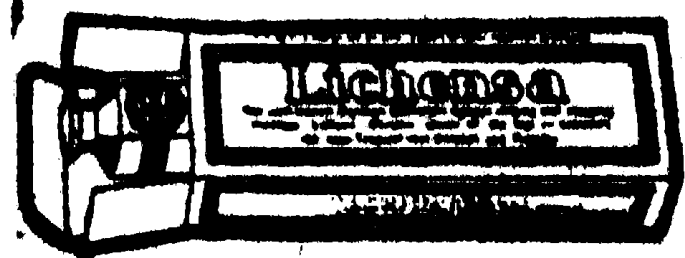
গঙ্গাপদ বসু
আমাদের গঙ্গাদা

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি গঙ্গাদার কথা প্রথম শুনি বাদল-দাকে আমার এক বন্ধুর কাছে। তার নাম বাদল। সে এখন বিলেতে। আর্ট কলেজে পড়ায়। বাদল 'পথিক' সিনেমা দেখে এসে গঙ্গাদার ডায়লগগুলো বলছিলো মজা করে। আমার যেটা আশ্চর্য লেগেছিলো তা হোলো কোলকাতার দিকের কোন লোক কী করে মানভূমের ডাইলেক্ট ঠিক ঠিক বলবেন। বাদল বললো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর বলেছেন: বিশেষ করে 'আমার হারমুনিট বাজছে ত?' কথাটা তখন ধানবাদ-ঝরিয়ার আমাদের বন্ধুবান্ধবদের আড্ডার মুখে মুখে ফিরত। আমি অনেক বছর পরে কোলকাতার একটা ঘর্মিং-শোতে ছবিটা দেখেছিলাম। বাদল ঠিকই বলেছিলো; কিন্তু শুধু ডাইলেক্ট না ওরকম চরিত্রচিত্রণ একটা সম্পদবিশেষ। যেমন জলসাঘরে ও'র চরিত্রচিত্রণ। অন্য কাউকে যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু ইতি-মধ্যে আমি ও'কে দেখেছি রক্তকরবীতে অধ্যাপকের ভূমিকায়।

এতো নরম্যাল, এতো বেশী নরম্যাল এবং পুরো প্রযোজনাটা তার চেয়ে এতোটা চড়া পর্দায় বাঁধা যে কারো কারো মনে হতে পারে অধ্যাপকের পোরশনগুলো যেন ঠিক জমলো না, যেন আরেকটু কী হলে ভালো হোতো। বহুরূপীর প্রযোজনার সব চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় গদ্যকে এমন করে বলবার চেষ্টা করেন যেন সেগুলো প্রতিদিনকার আটপৌরে কথা। রবীন্দ্রনাথের অ-স্বভাববাদী নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা তখন খুব বিতর্ক তুলেছিলো। তবু যে চরিত্রের মুখে ঐসব সংলাপ সহজে দৈনন্দিনের আটপৌরে হয়ে উঠতে পারে তা হোলো অধ্যাপকের চরিত্র। ফাগুলাল চন্দ্রা-নন্দিনী রাজা সবাইকে রবীন্দ্রনাথের কথা-গুলো নিজের করে নিতে হয়, অর্থাৎ যেমন করে বললে একজন মজুর মজুরনী কিংবা গ্রামের মেয়ে কিংবা একটা আই-ডিয়ার মুখে ঐসব ভারী কথা আটপৌরে শোনায় তার একটা চেষ্টা থাকে, কিন্তু এক-জন অধ্যাপকের মুখে ঐসব কথা সবচেয়ে সহজে আটপৌরে মনে হবে। আর গঙ্গাদার অভিনয়ে তা এতোটাই সহজ হয়ে উঠতো যে প্রায় চেষ্টাহীন অভিনয় মনে হোতো। অথচ পাশাপাশি সবাই তো আর তা করছেন না। কিন্তু নাটকের ছাত্র হিসেবে ও'র ঐ অভিনয় আমাদের কাছে একটি অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

তারপর দেখেছি উলুখাগড়া। শুনেছি ও'র রোলটা আগে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মশাই করতেন। গঙ্গাদা করতেন পাঁচু-গোপালের রোল। বোঝা গেল এক একজন অভিনেতার পক্ষে একেবারেই সহজে যে যে জিনিষ আসে তাতে তাঁর চরিত্রচিত্রণে দর্শক সহজেই তা' মেনে নেয়। অনুভবটা প্রায় এই গোছের হয়, এর চেয়ে এই রোল আর কারোর দ্বারা ভালো হওয়া মুস্কিল ছিলো। পাঁচুগোপালের রোলটা ছিলো গঙ্গাদার পক্ষে সেইরকম একটা রোল। যেমন কাঞ্চনরঙ্গে বাড়ীর কর্তা। ছেঁড়াতারে হাকিমুন্সী, চার অধ্যায়ে কানাই, ডাকঘরে পিসেমশাই, দশ-চক্রে রাধানাথ—সবই আগাগোড়াই অবি-শ্বাস্যরকমের ভালো।

মজা হচ্ছে সিনেমার যেমন একধরনের পার্ট করে নাম হলে অভিনেতার সর্বনাশ হয়ে যায়, যা পায়ো ঐ একই ধরনের রোলে অকপটবলপ রকমফের করো; থিয়েটারের ক্ষেত্রেও তাই। কথাটা বলছি দর্শকের আর পেশাদার সমালোচকের দিক থেকে।

শুনেছি এককালে সাংবাদিক জীবন ছিলো গঙ্গাদার। পরবর্তীকালে সিনেমার অভিনয় তাঁর রুজিরোজকারের পথ ছিলো, কাজেই ঐ বৃত্তে তিনিও পড়েছিলেন, এবং একথা ব্যবসারিক শিল্পের আগা-গোড়া সব শিল্পী সম্পর্কেই সত্য। এই ব্যাপারটা সাধারণভাবে শিল্পীকে বাড়তে দেয় না এবং একধরনের ফ্রাস্ট্রেশন আনে। তখন ভাবটা হয় বেশ আমি যা পারি পারি, অন্য কেউ তো আর কিছু দেবে না, এ দিয়েই যতোটা পারি, টাকাপয়সা রোজকার করে নিই।

গঙ্গাদা যদি তাই করতেন তবে আমাদের সঙ্গে তাঁর এই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সম্পর্ক থাকতো না। সেই নবান্ন নাটকে তাঁর অভিনীত চরিত্রের ছবি দেখেছি। তারপর চিরটাকাল বিনিপয়সায় গণনাট্য সংঘ আর তারপর বহুরূপী। কী করে একজন মানুষ শুধু ভালোবেসে এতটা নিষ্ঠাবান হতে পারেন ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। অনেক আত্মিক জোর পাই আমরা।

মাঝখানে একবার শুধু রোজকারের তাগিদে বিশ্বরূপার রাধা নাটকে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ও'র প্রতিভার পক্ষে ওটা কোনো রোলই ছিলো না। আসলে ব্যবসারিক মঞ্চে তো অধিকাংশ সময়েই শুধুমাত্র নামটুকু বেচে পয়সা পেতে হয়' অনেক ভালোবাসা নিয়েও যে তিনি ঐ রোলটুকু করার জন্যে এসেছিলেন, এর জন্যে নিজের সঙ্গে তাঁর অভিনয় তাকে কষ্টই দিয়েছে। আজ তিনি নেই। ভালোবেসে তাঁর সেই কষ্টটুকুর ওপর হাত বুলিয়ে দিতে

ইচ্ছে করে। এই বাধ্যতামূলক কষ্ট যে একদিন তাঁকে ছুঁয়েছে একথা ভাবলে আমি আন্তরিক ব্যথা বোধ করি। বহুরূপী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি বহুবছর। বহুরূপী ছাড়াও তিনি বর্তিকায় অভিনয় করেছেন। অন্বেষায় করেছেন। করেছেন জ্ঞানেশবাবুর সঙ্গেও। অভিনয় করতে গিয়েছেন কোলকাতার বাইরে। আর কী সহজে মেনে নিয়েছেন শিল্পকে, ভালোবাসার কষ্ট আর পয়সার সঙ্গে তার প্রতিনিয়ত অসঙ্গতিকে। নাটক লিখেছেন নিয়মিতভাবে। 'সত্য মারা গেছে' তাঁর অন্যতম পপ্যুলার নাটক। রেডিওতে অভিনয় করেছেন এবং কী করেননি। গ্রুপ থিয়েটারের কোনো শিল্পীর সঙ্গে পেশাদারী শিল্পীদের শ্রদ্ধাপূর্ণ যোগাযোগ গঙ্গাদা ছাড়া আর কারো এত বেশী করে ছিলো না। এমন নিঃশব্দ মানুষ আজকাল চোখেই পড়ে না।

আমার সঙ্গে ওঁর প্রত্যক্ষ আলাপ বহুরূপীর ছাদে বহুরূপীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। একটু পরেই ওঁর সেই একধরনের মিষ্টি মিষ্টি চোখে হাসি দিয়ে কথা শুরু করলেন এবং খুব সহজেই আমাকে হাতে ধরে ওঁর পৃথিবীতে নিয়ে এলেন।

এর পরেই একদিন ট্রামে মানিকতলায় উঠেছি। ফিরছি শ্যামবাজার। উনি বহুরূপী থেকে রিহার্সাল দিয়ে ফিরছেন। পাশে বসালেন। নাটক লেখা এবং প্রকাশ করার লিমিটেশন নিয়ে কথা বলছিলেন, আমি ওঁর বাড়ি অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলাম।

এরপর তো কতোদিন কত কথা হয়েছে। স্টুডিও থেকে একসঙ্গে ফিরেছি; রেডিওতে একাধিক নাটক করেছি একসঙ্গে। রেডিওতে একসঙ্গে শেষ নাটক করেছি আব্দুল জব্বারের লেখা ইলিশমারির চর আর আন্তন চেখভের 'দ্য প্রোপোজাল' অনুসরণে রমেন লাহিড়ী রচিত 'রাজ-যোটক'। নাট্যমঞ্চের 'রক্তকরবী'তে একসঙ্গে রিহার্সাল দিয়েছি, অভিনয় করেছি। 'মুদ্রারাক্ষস'-এর নির্দেশনায় ছিলাম গঙ্গাদার সঙ্গে, একসঙ্গে রিহার্সাল করেছি, অভিনয় করেছি। একসঙ্গে কাজ থাকলে যতোবার পেরেছি একসঙ্গেই গিয়েছি। কতোদিন হাসির কথা মজার কথা বলেছেন। উপদেশ দিয়েছেন। ওঁর অভিনয় নিয়ে (বিশেষ করে মনে আছে কাঞ্চনকন্যা ছবিতে) প্রশংসা করায় কীরকম সলজ্জ হয়ে উঠতেন। যেন বিশ্বাসই করতে পারতেন না, উনি অতো ভালো অভিনয় করেন। অভিনেতাদের মধ্যে যাঁদের সাধারণ শিক্ষা বেশী তাঁদের চালচলন অকারণে (কেননা অভিনয়ের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষামানের কোনো সম্পর্কই নেই) অসাধারণ হতে তো হামেশাই দেখি। তাই যখন কেউ শোনেন গঙ্গাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করেছিলেন তখন আমি বহুজনের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখেছি। কখনোই নিজের কিংবা নিজের সম্পর্কে কিছু জাহির করার ব্যাপারটাই ছিলো না তাঁর। বেশ একটি সহজ নিরাপদ জ্ঞানী আত্মসমাহিত মানুষ ছিলেন তিনি।

একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে তখন। কিছুদিন বিশ্রামের পর আবার শুরু করেছেন অভিনয়। শম্ভু মিত্র থেকে শুরু করে সবাই সাবধানী ছিলেন ওঁর সম্পর্কে। নিজেও বেহিসেবি ছিলেন না শরীর সম্পর্কে কিন্তু ঐ স্ট্রোক তাঁর মনের ক্ষতিকে কখনোই বাইরে প্রকাশ করতে পারতো না। শরীরের কথা বললে, একটু একটু হাসতেন, বলতেন বেশ আছি। বহুরূপীতে সবাইকে দেখেছি ওঁকে শ্রদ্ধা করতে, ভালোবাসতে।

বাঁকুড়া থেকে শের আফগান নাটক করে ফিরছি স্টেশনে অপেক্ষা করছি। খড়্গপুরে কী একটা রাজনৈতিক মিটিং হবে। বহুলোক ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নিয়ে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাদের ফিরতেই হবে তাই যেমন করেই হোক ট্রেনে উঠবো বলে দাঁড়িয়ে আছি। একজন রেলকর্মচারী বললেন, ওয়েটিং রুমটা খুলে দিতে পারি। ওখানে আর্টিস্ট গঙ্গাপদ বসু আছেন, ঘুমোচ্ছেন। ওঁর শরীরটা ভালো নেই, তাই ভীড়ের ট্রেনে উঠতে পারেন নি। কাল সকালে যাবেন।

আমাদের শের আফগান নাটকের আগের দিন বহুরূপীর নাটক ছিলো। গঙ্গাদার শরীর অসুস্থ বলে তিনি ট্রেনে ফিরবেন সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। সবার কাজকর্ম আছে বলে কোলকাতা ফিরে এসেছেন। উনি ওয়েটিংরুমে ঘুমোচ্ছেন, পরের দিন ফিরবেন বলে।

আমরা ওয়েটিংরুম খোলাইনি। ওঁকে ডিসটার্ব করিনি। তখন ঘুম থেকে তুলে আলাপ করার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া আমাদের ট্রেনে লোক যেখানে পেরেছে বসেছে, এমনকি ছাদেও।

কিন্তু ভাবা যাক অমন একটি বয়স্ক মানুষ একা থিয়েটারকে ভালোবেসে বাইরে গিয়ে ফাঁকা ট্রেনের অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে ঘুমিয়ে আছেন। গঙ্গাদার সে চেহারাটা আমরা চিনি তার সঙ্গে এই বিদ্বান নিরহঙ্কার পরিপূর্ণ মানুষটির কী দারুণ মিল!

মুদ্রারাক্ষস নাটকে প্রথম দৃশ্যেই ওঁর পার্ট শেষ হয়ে যেত। কার্টেন-কলে উনি ড্রেস ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এয়ার-কন্ডিশনড হল। খালি গায়ে ঐ অতক্ষণ থাকা ওঁর অসুস্থ শরীরে ঠিক নয়, তবু শো শেষ হতে আমি ওঁকে বললাম, 'ওরকম করে দাঁড়ালেন কেন? কেউ তো ড্রেস ছাড়েনি।' কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন গঙ্গাদা, 'আমার যে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়।'

বললাম, 'তবু ড্রেস ছাড়বেন না।'

ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'আচ্ছা।'

মুদ্রারাক্ষসে সেই ওঁর শেষ অভিনয়।

প্রতি অভিনয়ের আগে আমি ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতাম। পিঠে হাত দিয়ে বলতেন, 'জয় হোক।'

সেই জয়ধ্বনির কোনো তুলনা নেই।

অমলাশঙ্কর

নৃত্য আমার জীবনবেদ

আজ আর সে যুগ নেই যে যুগে নৃত্যকে 'নাচানাচি' বলে অপাংক্তেয় করে রাখা হোতো সমাজের বাইরে এক সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ নাচছে শুনলেই প্রাজ্ঞজনের ভুরু কুঁচকে উঠত, 'এই রে! নাচিয়ে। তার মানেই গোল্লায় যাবার দুয়ার প্রশস্ত।

আজ নাচ হোলো নৃত্যশিল্প। আর, যে নাচে সে শিল্পী। এই জন্মেই নৃত্যের যেন জন্মান্তর ঘটেছে আজ সারা দেশ যেন নাচের নেশায় মেতে উঠেছে—সারা বছর ধরে রবীন্দ্র সদন, কলামন্দিরে কত রকমের নৃত্যোৎসব। ক্ল্যাসিক্যাল, লোকনৃত্য, নৃত্য-নাট্য, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য, ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মতই এ অন্তহীন কল্লোলের আর বিরাম নেই। আর এ নাচের দর্শক সাধারণ জনতাই শুধু নয়—আসেন তাঁরাও যাঁরা সাংস্কৃতিক জগতের পুরোধাস্বরূপে।

এ জীবনেই দেখলাম এই যুগান্তকারী বিপ্লব। আর দেখেছি এই বিপ্লবের দুই মহাস্রষ্টাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্কর। একজন গানের পথ বেয়ে, নাচকে রূপ দিয়েছেন—বাণীবাহীরূপে। অপরজন বাস্তব জীবনের নানান ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে নাচের সৌন্দর্যানুভূতিতে এক আশ্চর্য উত্তরণ ঘটিয়েছেন। সারা দেশ সমগ্র জাতি আজ কৃতজ্ঞ এই দুজনের কাছেই।

নৃত্য আজ সমাদৃত, সম্মানিত। তবু মনে হয় সঙ্গীত, চিত্রশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে নাচকে সবাই একটা সীমিত শিল্পরূপেই দেখে থাকেন। তাঁদের মতে নাচ রঙ্গালয়ে মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এক উচ্চাঙ্গের চিত্তবিনোদনী শিল্প, দৈনন্দিন জীবনে এর স্থান কোথায়? কোনো অতিথি-অভ্যাগত এলে বাড়ীর মেয়েকে গান গাইতে বলা যায়। কিন্তু নাচতে? সে কি করে সম্ভব? তার জন্য চাই অর্কেস্ট্রা, সজ্জা, আলো ইত্যাদি।

এ-যুক্তি হয়ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার মন এ কথায় কোনোদিনও সায় দেয় না, নাচও জীবনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ ও অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে একথা অবাস্তব নয়। নিজের জীবনেই এ অনুভূতি এসেছে বারে বারে, নানা ছন্দে, নানাভাবে। কেমন করে সেই কথাই বলি।

শঙ্করের নৃত্য শিক্ষার গোড়ার কথাই ছিল balance grace and harmony পরিমিতি, সুষমা সামঞ্জস্য-বোধ থাকবে দেহভঙ্গি রচনায়, গতির লাস্যে, চাউনির ভাষায়। আর এ তিন বস্তুর সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ ক্ষেত্র শুধু মঞ্চের নৃত্যই বা হবে কেন? এই প্রয়োগের পরিসর বিস্তৃত করতে হবে সারা জীবনে দৈনন্দিন প্রতি মুহূর্তের চলায়, বলায়, ভাবনায়, দৃষ্টিতে। কারণ মর্মমূলে এই অনুভূতির বীজ বপন করা না হলে, পুষ্পিতসম্ভারে তা যথার্থ নৃত্য হয়ে দর্শক চিত্তে নাড়া দিতে পারে না। নাচ হয়ে ওঠে কৃত্রিম, প্রাণহীন।

শঙ্কর মন্ত্রের মতই এ-সব কথা বার বার বলতেন বলেই হয়ত অজান্তে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল এমনভাবে যে সব জিনিষ ও ঘটনার মধ্যেই মনটা অজান্তেই যেন একটা সুষমা খুঁজে বার করতে চাইত। না পেলে অস্বস্তিবোধ করত।

মনে পড়ে শঙ্করের দলে নাচ শেখার সময় কত সম্ভ্রমভরে, কত বিস্ময়ে দেখতাম ওঁর চলাফেরা ভাবভঙ্গি। কেউ এলে দু-হাত জোড় করে নমস্কার করার বিনম্র ভঙ্গিটি কত সুন্দর। কেউ কিছু বললে শ্রদ্ধাভরে শোনার ভঙ্গিটিও যেন চেয়ে দেখবার মত। আলমোড়ায় দূরে থেকে দেখতাম এক সঙ্গে বসে আলোচনারত গুরু শংকরম্ নম্বুদরী, শঙ্কর মাদামোয়া-সেল সিমকীকে। ওঁদের সুষমা ছড়িয়ে পড়ত আভিজাত্য ও সৌন্দর্যশালীনত কাজ-কর্মের ভঙ্গিতে।

দেখতাম আর বিস্ময়ে দুলে উঠত সারা মন। এই বিস্ময়ই যে হয়ে উঠেছিল আমার দৃষ্টিপ্রদীপ এ-কথা তখন বুঝি নি। বুঝেছি এখন যখন মঞ্চ-জীবন ও শিক্ষিকা-জীবনের দুটি পথরেখার বাঁকে দাঁড়িয়ে জীবনকে নিরীক্ষণ করি দর্শকের দৃষ্টিতে।

মঞ্চে যখন নাচতাম, ভুলে যেতাম আমি নাচ দেখাচ্ছি। মনপ্রাণ ডুবে যেত

নৃত্যের বিষয়বস্তুতে আর প্রতিটি দর্শককে মনে হোতো আমার নৃত্যসাথী, আমার ভাবনার রঙে তাঁদেরও চিত্ত রঞ্জিত হচ্ছে। আমার গতির রোমাঞ্চে তাঁরাও রোমাঞ্চিত এ সত্য স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতাম। তাই নাচটা কৃত্রিম অভিনয় না হয়ে—হয়ে উঠেছিল একটা মিলন-মাধ্যম—যা সহস্র, লক্ষ বিচ্ছিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন জাতির দর্শক, তথা মানুষের সঙ্গে যেন মনের মিলন ঘটিয়ে দিত।

আর জীবনে? এ যেন নূতন জন্ম। যে কোনো কাজ করতে যেতাম, অজ্ঞাতেই মনটা যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখত, তার প্রকাশভঙ্গী সুন্দর হয়ে উঠছে কিনা। ঘরের আলনা গুছানো, লিখতে বসা, এমন কি রাঁধবার সময়ও হাতা-খুন্তী ধরার ভঙ্গীর মধ্যেও যেন একটা শ্রী থাকে।

এ-ছাড়াও কোথাও যাবার সময় যেদিকেই নজর পড়ত দেখতাম তার মধ্যে যেন একটা ছন্দের নিয়ন্ত্রণ চলেছে আপনাকে জানান না দিয়েই। যেমন অশ্বত্থ গাছের সবুজ পাতাগুলো হাওয়ায় যখন দুলছে তাদের প্রতি দোলায় যেন নিক্তির ওজনে মাপা লয়-কাজ করে চলেছে। যখন আস্তে আস্তে দুলতো তখন তার লয় বিলম্বিত, যখন প্রবল বেগে দুলতো তার লয় বেগচঞ্চল। সে লয়ের সঙ্গে অনায়াসেই তবলার টোকা মেলানো যায়। এই সুষমা-বোধ ক্রমশঃ এল আরো গভীরে। দেখতাম ভাবনা, চিন্তায় এ সৌন্দর্য কতখানি আছে কতখানি নেই। দেখতাম যেখানে এই ছন্দ সৌন্দর্য্যের অভাব, সেখানেই কুশ্রীতা, সেখানেই কলহ। যেখানে সংযম পরিমিতি-বোধ আছে সেখানে হাজার মতান্তরেও মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক থাকতে পারে। যেখানে নেই সেইখানেই তা পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে দেয়। অবশ্য এটা রেওয়াজের মতই অনুশীলনের বস্তু, সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু এই কঠিন সাধনাও সহজ হয় যদি নৃত্যের আনন্দের পথ বেয়ে অন্তরে এর প্রবেশ ঘটে। এই রুচিবোধ শুধু তখন ড্রয়িং-রুমের সজ্জাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্তর ও বাহিরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষেত্রে এর কুহক মন্ত্র তার কাজ করে চলে নিঃশব্দে, নীরবে, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপের আশ্বাসে।

সমাজে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়—যখন সমৃদ্ধি হয় তখন সে সমৃদ্ধি প্রসারিত হয় শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে দর্শনে সমাজে সব ক্ষেত্রেই। যেমন বিক্রমাদিত্যের স্বর্ণযুগ, এলিজাবেথের যুগ। আবার শিল্পের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও অসুন্দরের প্রকাশ হয় কোথায়? যখন শিল্পীর নিজের জীবনই লক্ষভ্রষ্ট, ব্যর্থ, তখনই তার প্রকাশ সামঞ্জস্যবিহীন।

দেহ ও মনের এই সুসংবদ্ধ যোগাযোগ একমাত্র নাচেই বাস্তব সত্য। আর এই সহযোগিতা থেকেই নৈতিক চরিত্রবল গঠিত হতে পারে এ আমার বিশ্বাস।

উদয়শঙ্কর কালচারাল সেন্টার গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবার সময় এই ক'টি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করে-ছিলাম বলেই হয়ত এ ক'বছরেই এ প্রতিষ্ঠান এমন সার্থক সুন্দর শিক্ষা-পীঠরূপে সকলের স্বীকৃতি ও আশীর্বাদ পেয়েছে।

আমি কোনো নিয়মের বাঁধনে এদের নাচকে শৃঙ্খলিত করতে চাই নি। চেয়েছি এদের প্রাণের অবাধ আনন্দকে মুক্তি দিতে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল নাচও শেখানো হয়, যাতে দেহের গতি কোনো উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততায় পরিণত না হয়ে শিক্ষার সংযমে কল্পিত রেখা এঁকে যায় শূন্যের বুকে। এই রেখা-জ্ঞান আসে না যদি না ক্ল্যাসি-ক্যাল ঐতিহ্যে চরণ মন ও দেহ দীক্ষিত হয়। 'সীতা স্বয়ম্বরা' নৃত্য রচনার সময় রামের নাচ শেখাবার আগে বুঝিয়েছি রাম কিশোর, কিন্তু দেবতা। তাই তাঁর চলা-বলায় থাকবে স্বর্গীয় দিব্যভাব—সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে এঁর বিহার।

লক্ষ্মণ মানবিক শৌর্য, বীর্য ঐশ্বর্য-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়। অন্যায় দেখলেই তিনি তেজে জ্বলে উঠে ধনুকে তীর যোজনা করেন অন্যায়কারীকে শাস্তি দেবার জন্য। সে জায়গায় রাম তাঁকে নিবৃত্ত করেন ক্ষমাসুন্দর সংযমে। লক্ষ্মণের এই বিপরীত আচরণেই রামের গৌরব আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। তুলসী দাসের রামায়নানুসারী এই বক্তব্যই আমি পরিস্ফুট করতে চেয়েছি। এরা সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে বলেই দর্শকদের এমন উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছে।

আর একটা জিনিস আমি চেয়েছিলাম। সে হোলো এই রাম স্টেজেই সীমাবদ্ধ না থেকে যেন দর্শক চিত্তে ছড়িয়ে পড়ে। যাঁর যেটুকু আধার তিনি ততটুকুই গ্রহণ করবেন—কিন্তু চিত্ত যেন অভিভূত হয়। প্রেক্ষালয় থেকে যাবার পরও হৃদয়ে যেন রেশ থাকে। ভূরিভোজনের চেয়ে হরির লুঠেই আমি বিশ্বাসী।

আমার চাওয়া বিফল হয়নি, প্রেস সংবাদপত্র ছাড়াও স্বামীজীর আশীর্বাদেই আমি যা চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি। আমার লক্ষ্য যবনিকা মঞ্চে পড়ুক, কিন্তু দর্শকের অন্তরে নয়।

আর একটা কথা। প্রডাকশন নানা রকমের হতে পারে। কোনোটার আরম্ভ চূড়ান্ত হৈ-হৈ-এ, অবসান শান্তিতে। আর কোনোটার ধীর শান্ত সূচনা, কিন্তু পৌঁছয় উন্মত্ত কোলাহলে। আমি চাই লক্ষহীন গতি ও কোলাহল থেকে দর্শকের মন প্রশান্ত দীপ্তিতে পৌঁছাক। কারণ ভারতের সকল সাধনার লক্ষ্যই তাই।

যখন প্রথম বাইরে নাচতে সুরু করলাম বাবা আমায় সব সময় বলতেন 'মা অমা, সব সময় মনে রেখ তুমি যে আনন্দে New Empire স্টেজে নাচতে পার ঠিক সেই আনন্দেই যেন আমাদের দেশের পুকুর পাড়ে বসে বাসনও মাজতে পার।'

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষা নাচের মাধ্যমেই সহজ। আমরা শিব-পার্বতী, রাম-সীতা, রাজা-রাণী এই দেবতা ও অভিজাত চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে লোকনৃত্যে গয়লানী, কৃষাণীর ভূমিকা সমান আনন্দে নাচি। এই মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাসে নাচ থেকে জীবনেও রূপান্তরিত হতে পারে। এটা আমি আমার সেন্টারে মেয়েদের মধ্যেই দেখেছি। লক্ষপতি ধনীর দুলালী যারা ডানলোপিলো ছাড়া শোবার কল্পনা করতে পারে না, সুদৃশ্য ডাইনিং টেবিলে নানা সুখাদ্য আহারে অভ্যস্তা, তারাও কল-কাতার বাইরে নাচতে যাবার সময় থার্ড ক্লাস ট্রেনে যাচ্ছে, মাটিতে শুচ্ছে, মাটির ভাড়ে চা খাচ্ছে মহা আনন্দে, বিনা আয়াসে। এই ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অন্য সব সাধনার ক্ষেত্রেই এই দেহটা একটা বাধা একটা সীমাবদ্ধতা রচনা করে, একমাত্র নাচেই দেখি এই দেহ দিয়েই দেহাতীতের আরাধনা কি করে সম্ভব। এই জড় দেহেই নেমে আসে বিদ্যুৎ, শুধু নৃত্যেরই স্পর্শ করে। কাজেই নৃত্যের চেয়ে বাস্তব জীবনবেদ আমার কাছে আর কিছু নেই।

আজকের ফ্যাশন

সুজাতা

বহুদিন পর বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন এক বৃদ্ধা।

নাতির হাতে ভর দিয়ে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ। কি হোল? থামলে কেন? গতিরুদ্ধ নাতি বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করল।

নাতির বিরক্তি গায়ে মাখলেন না পিতামহী। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রায় গদগদ স্বরে যেন স্বগতোক্তি করলেন, আহা! কি সুন্দর। কি সুন্দর।

কি এত সুন্দর দেখলে তুমি পথের মধ্যে!

চুল।

চুল! নাতি বিস্মিত।

হ্যাঁ! দ্যাখ! ঐ যে মেয়েটি দোকানে দাঁড়িয়ে জিনিস কিনছে পেছন ফিরে। কি এক ঢাল চুল ওর পিঠ ছাপিয়ে। আহা! বহুদিন এমন লম্বা খোলা চুল দেখিনি দাদাভাই। আহা!

পিতামহীর এই সৌন্দর্য-প্রীতি ও স্তুতি গায়ে মাখল না নাতি, সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ। লম্বা চুলই এখন ফ্যাশন। নিজের চুল না থাকলে 'উইগ' চাপিয়েও লম্বা চুল এলিয়ে বেড়ায় এখন মেয়েরা। ফ্যাশান কিনা? নাতি আবার বলল। আর বৃদ্ধা শুনে বিস্ময়ে আনন্দে প্রায় বিহ্বল হলেন। এমন খোলা চুলই এখন ফ্যাশান। এমন লম্বা চুল। কিছুদিন আগেই তো উল্টোটাই ফ্যাশন ছিল না। পরের চুল পরে চুল বাড়ানো দূরে থাক, লম্বা চুলের গোছা এক কোপে ঘাড় অবধি নামিয়ে

পোলো নেক টি শার্টের সঙ্গে এলিফ্যান্ট প্যান্ট—খুব ম্যাক্সি স্মার্ট পোশাক, ছেলে-মেয়ে দুজনেই পরতে পারে।
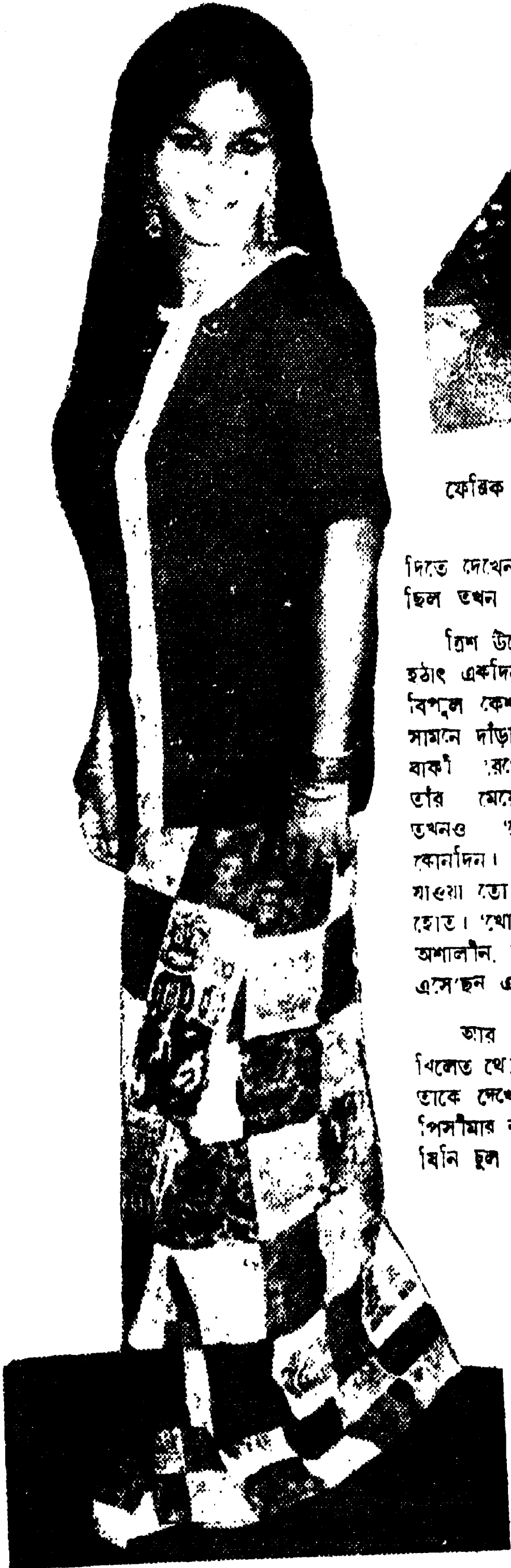
ফেল্লিক পেলেটের পাড়ে ঘেরা পুরেনো সেই ঘাগরা আর কুর্তায় মন ফিরেছে আধুনিকাদের।

দিতে দেখেন নি কি তিনি? কারণ? সেটাই ছিল তখন 'ফ্যাশান।'

ত্রিশ উর্ধ্বে তাঁর বিবাহিতা কন্যা যখন হঠাৎ একদিন তার মায়ের যত্নে লালনকরা বিপুল কেশরাজিতে 'ববছাঁট' দিয়ে মার সামনে দাঁড়াল, তিনি তখন শুধু কাঁদতেই বাকী রেখেছিলেন। মনে পড়ল বৃদ্ধার, তাঁর মেয়েরা যার অধীনে ছিল যখন, তখনও 'খোলা চুলে' রাস্তায় বেরোয়নি কোনদিন। স্কুল কলেজে 'এলোচুলে' যাওয়া তো রীতিমত অপরাধ বলে গণ্য হোত। 'খোলা চুল' 'লম্বা এলোচুল' একান্ত অশালীন, রুচি বিগর্হিত এই কথাই শুনে এসেছেন এতদিন কন্যা-বধূদের কাছে।

আর এইত কয়েক বছর মাত্র আগে: বিলেত থেকে নাতনী এল কদম ছাঁট চুল করে। তাকে দেখে হঠাৎ তাঁর নিজের কাশীবাসী পিসীমার কথা মনে পড়েছিল—প্রয়াগে গিয়ে যিনি চুল ফেলে এসেছিলেন। নাতনী, নাতনীর বন্ধুরা সকলের মাথাই তো যতদূর মনে পড়ে সেই এক ভাব। কারণ, সেইটাই যে ফ্যাশন।

সেই ফ্যাশন বদলে গেল আজ? ফিরে গেল পুরোন দিনে! পুরোন ফ্যাশন নতুন হয়ে ফিরে এল আবার।

আর তাই হয়, আজ যা 'ক্রেজ' কাল তাই অচল। তাই যদি না হবে, আজকের লম্বা ঝুল জামা যদি কাল 'মিনি' হয়ে পরশু আবার 'ম্যাক্সি'তে ফিরে না আসে তাহলে তাবৎ দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য চলবে কি করে? 'ফ্যাশান'কে তো আর শতপুরুষ বসে খাবার কাঠাল-পিঁড়ি করা যায় না। এই ত অভিমত ফ্যাশান-নিয়ন্তাদের। তাই ফ্যাশান-সচেতন মেয়েরা (এবং অবশ্যই ছেলেরাও) যুগের ফ্যাশান-অনুযায়ী বেশ-বাস, সাজসজ্জা করে থাকেন সাধারণত। সাধারণত বলার অর্থ দু-চারজন 'ফ্যাশানেবল' ব্যক্তি থাকেন, যাঁরা চলতি ফ্যাশনের মধ্যেও নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখেন। বাজারচলতি ফ্যাশনের নকল করেন না চোখ কান বুজে।

বেশ-বাসে সাজেসজ্জায় শুধু ফ্যাশনকে মানলেই যে চলে না, চোখের ভাল লাগা, যাকে বলে 'মানান', ব্যাপারটাকেও মানতে হয়, এটা তাঁরা বোঝেন। বোধহয়, বেশ-বাস, প্রসাধনের প্রথম এবং প্রধান কথা সেইটাই।

নীবিবন্ধ নাভিপদ্মের নীচে নামিয়ে পথচারীর দীর্ঘশ্বাস ওঠাতে ওঠাতে চলে গেলেন যে তন্বী তরুণী, তাকে দেখে যদি বিগত-যৌবনা স্থূলাঙ্গীর শখ হয় নিজের [illegible]

আধুনিকাদের মতে লুঙ্গীর মত সুবিধাজনক পোশাক আর হয় না।

গত কয়েক বছর থেকে চুড়িদার তো বাঙালী মেয়ের প্রায় নিজস্ব পোশাকে দাঁড়িয়েছে। স্কুল, কলেজগামী কিশোরী তরুণীদের এই আঁটসাঁট পোশাক, তাদের স্বচ্ছন্দ গতির সহায়ক সন্দেহ নেই, বিশেষে যখন ভিড়ের ট্রামে বাসে লাফিয়ে বা ধস্তাধস্তি করে উঠতে কি ছুটে গিয়ে গাড়ী ধরতে হয়।

বলা-বাহুল্য, শাড়ীর লীলায়িত বিস্তার একটু ধীর, স্থির অবসরের অপেক্ষা রাখে।

অবশ্য শাড়ীই এখন ভারতীয় মেয়ের একমাত্র পোশাক নয়, যা দেখে বিদেশীরা সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলে গদগদ হয়ে বলেন, 'হাউ এক্‌জটিক'। চুড়িদার ছাড়াও ভারতীয় মেয়েরা এখন বেলবটম 'এলিফ্যান্ট প্যান্ট' (ঢোলা পা-জামার মত) গারারা, ঘাঘরা এবং লুঙ্গী পরতে অভ্যস্ত হয়েছেন। লুঙ্গীই এদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা এবং লুঙ্গী চুড়িদারের মতই দ্রুত সাধারণ বাঙালী ঘরে প্রসার লাভ করছে।

আমাদের পুরুষেরা লুঙ্গী পরেন চিরদিনই। বস্তুত, বাড়ীতে ছুটির দিনে বাড়ীর ছেলেরা নিজস্ব লুঙ্গীর অভাবে মা বোন বা স্ত্রীর শাড়ী আলনা থেকে টেনে লুঙ্গী করে পরে কাটিয়ে দেন সারাদিন,—এমন নজির খুঁজতে বেশী ঘোরাঘুরি করতে হয় না, হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় আশেপাশে।

বেলবটম—আধুনিক ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই পরে, দুজনেরই প্রিয় পরিচিত পোশাক।

ওড়াতে, তাহলে দর্শকের আর যাই হোক চোখ ভরে না।

দেহের কতটা প্রকাশ্য রাখা সঙ্গত বা শালীন সে প্রশ্নের অবতারণা উহ্য রেখেই শুধু সৌন্দর্য ও শোভনতার বিচারেই বলা যায়, স্বাস্থ্যবতী তন্বী তরুণী যে পোশাকে বাজীমাৎ করতে পারেন, বর্ষীয়সী বিপুলাঙ্গীর পক্ষে সে পোশাক একান্তই বর্জনীয়।

অর্থাৎ 'ফ্যাশান' বলেই নির্বিচারে চলতি স্রোতে গা ঢেলে দেওয়াটা বোধহয় বোকামিই। 'বেলবটম' বা চুড়িদার ভারতীয় তথা বাঙালী মেয়ের প্রায় ঘরের জিনিস হয়ে উঠলেও 'বেলবটম' বা চুড়িদার ইত্যাদি পোশাক যে সবায়ের জন্য নয়, একথা স্বীকার করতেই হয়।

সান্ধ্য পোশাকটি বিলিতি নয়। নিতান্তই লুঙ্গী। ঢিলেঢালা করে পরা, তারই সঙ্গে চোলীকাট ব্লাউজ

কিন্তু মেয়েদের লুঙ্গী ঠিক এত সামান্য, তুচ্ছ ব্যাপার নয়। 'নিমেষে খোলা পরার' তাগিদেই হয়ত লুঙ্গীর প্রথম প্রচলন, কিন্তু লুঙ্গী আজ ভারতীয় মহিলার 'বিশেষ পোশাকে'র অন্যতম।

বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যেতে কি মোড়ের দোকান থেকে ছোট একটা সওদা করতে কিম্বা আলু পটল মাছ কেনার জন্য বাজার যেতেও চট্ করে লুঙ্গী কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ার কত সুবিধা। অবশ্যই শাড়ীর মত জমকালো লুঙ্গী—রেশমী, জরিদার ইত্যাদি সবই পাওয়া যায় এবং সান্ধ্য-পোশাক হিসাবেও লুঙ্গীর চল দ্রুত বাড়ছে।

বিয়ে বাড়ীতেও লুঙ্গীপরিহিতার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে আজকাল, বিশেষে শীতের দিনে।

মোটা লুঙ্গীর ওপর কাজকরা বাহারে জামা (টপ্) গলা থেকে কোমরের তলা পর্যন্ত ঢেকে রাখে, 'চোলি'র মত পিঠ, কোমর খুলে রেখে উত্তরের হাওয়ায় হু-হু করতে হয় না আর।

আধুনিকা মায়েরা হয়ত সেই কারণেই শিশু কন্যাকে লুঙ্গী বা চুড়িদারে সজ্জিত করেন শীতের সন্ধ্যায়।

'গারারা' শীতের দিনের উপযুক্ত পোশাক সন্দেহ নেই, এবং এই রাজকীয় ঝলমলে 'গারারাও' বিলক্ষণ জনপ্রিয় পোশাক পশ্চিমেও। জ্যাকীলিন ওনাসিস তো চুড়িদার পরেছেন কবেই, আর অনেক পশ্চিমী মহিলাই 'গারারা'র রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ পশ্চিমী পোশাক 'স্কার্টে'র মতই তৈরী পোশাক গারারা পরতে সুবিধা, অথচ রমণীয় বিস্তারে শাড়ীর মতই লাবণ্যময় এই গারারা। রাজস্থানী, হিন্দুস্থানী মেয়েদের পোশাক 'ঘাগরা'র ফ্যাশান সবেই এসেছে বড় শহরগুলিতে, ওই লুঙ্গী বা চুড়িদারের মত এখনও এত জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় নি ঘাগরা।

অবশ্যই আজকের 'ঘাগরা'র ছাটকাট আধুনিক দর্জির হাতে পড়ে কিছু অদল-বদল হয়েছে, কিন্তু সে পরিবর্তন শুধু দর্জির হাতেই। 'ঘাগরা'র সেই মোহন রমণীয়তা কম হয় নি একটুও—সপ্রতিভ আধুনিকা এই রাজাঙ্গনার পোশাকে আরো লাবণ্যময়ী মোহিনী হয়ে ওঠেন, কারণ, পুরোন পোশাকের সামান্য অদলবদল হলেও

চুড়ীদার ও সরু কুর্তা—আজ আর কাউকে চেনাতে হয় না।

মূল পোশাকের মহিমা তো অবিকৃতই আছে এবং প্রাচীন দিনের গ্রামাঞ্চলের পোশাকও যে শহরে এসে 'লেটেস্ট' ফ্যাশানে পরিণত হচ্ছে, তাতে আর সন্দেহ কোথায়। খোঁজ চলেছে নিরন্তর প্রাচীনতর পোশাকের লুপ্ত ফ্যাশনের।

অজন্তার গুহা থেকে, মিশরের মমি থেকে, মহেঞ্জোদারোর শিল্প থেকে আভরণ আবরণের নমুনার আমদানি তো শুরু হয়েছে অনেক দিনই, এখন আঞ্চলিক, প্রাদেশিক সব গন্ডী ছাড়িয়ে সব সংস্কার ভেঙে পোশাকের জগতে রীতিমত বিপ্লব এনে দিয়েছে আধুনিক মেয়েরা। এবং লক্ষণীয় যে এই ফ্যাশনের মধ্যে সহজ হওয়াটাই প্রধান লক্ষ্য। তাই আবার সহজে বেড়ে ওঠা লম্বা চুল (এমন কি মহিলাদেরও) ফ্যাকাসে সাদা ঠোঁটের বদলে (কিছুদিন আগেও যা ছিল অবশ্য করণীয় প্রসাধন) ঈষৎ গোলাপী আভা লাগা স্বাভাবিক রং,

প্রলেপবিহীন স্বাভাবিক জীবন্ত মুখই 'লেটেস্ট ফ্যাশন'। ফ্যাশনের চাকা আবার ঘুরবে, হয়ত, আবার ফিরে আসবে 'এনামেল করা' মুখ আর ছোট চুল ইত্যাদি, কিম্বা আসবে পেট-পিঠ-কাটা এক চিলতে চোলির বদলে লেসের ঝালর দেওয়া গলা থেকে ভাল করে কোমর পর্যন্ত ঢাকা 'বডি কাটের জ্যাকেট' আর সেই দেখে ওপার থেকে পিতামহীর দল মাথা নাড়বেন আর বলবেন, বাঃ! চোখ জুড়োল এতদিনে।

নায়িকার সন্ধানে

রঞ্জন মজুমদার

কৃষ্ণা বসু

আরতি ভট্টাচার্য

সোনালী গুপ্ত

বাংলা চলচ্চিত্রে, বিগত দশকে একটি ঘটনা ঘটেছিল। জনৈক সুপরিচিত চিত্র-পরিচালক নতুন একটি ছবি তৈরী করবেন বলে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তিনি তাঁর ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করতে পারলেন না। শেষ মুহূর্তে এসেও সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। এই যে তিনি করতে গিয়েও শেষপর্যন্ত হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিলেন এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বিরক্ত কণ্ঠে জানালেন, ছবির নায়িকাই পাওয়া গেল না। এটা প্রায় অসম্ভব কথা। ফিল্মের জগতে আজকাল এত নায়িকা অথচ তিনি তাঁর ছবির জন্য কোন নায়িকা পেলেন না! কথাটা বিশ্বাস করতে মন সায় দেয়নি সেদিন। কিন্তু কিছু-দিন পরে জানা গেল, তিনি যা বলেছিলেন, ঠিকই বলেছিলেন। সুপরিচিত নায়িকাদের মধ্যে থেকে কাউকে তিনি নিতে চাইছিলেন না, কারণ তাঁর ছবির গল্পটি ছিল একেবারে স্বতন্ত্র ধরনের। তিনি খুঁজছিলেন আসলে নতুন মুখ। বয়েসে তরুণ, তাজা এবং ফিল্ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞা—এমন একজন অল্পবয়সী সুন্দরী বাঙালী মেয়ে। বন্ধুবান্ধব নির্বি-শেষে অনেককেই তিনি তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন—যাতে খোঁজখবর পাওয়া যায়। কিছু কিছু পাচ্ছিলেনও বটে। কিন্তু যেমনটি চাইছিলেন ঠিক তেমনটি কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে ক্রমেই তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন। এদেশে সিনেমায় নামতে উৎসুক মেয়ের সংখ্যা শোনা যায় নাকি অগুণতি, অথচ কাজের সময় পছন্দসই কাউকে পাওয়া যায় না—বলে তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে রীতিমত অনুযোগও প্রকাশ করেছিলেন।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন একদিন সকালে তিনি ট্যাক্সি করে যাচ্ছিলেন এক বন্ধুর কাছে। সেখানে একটি নতুন মেয়ে দেখবার কথা ছিল। যেতে যেতে পথে পড়লো মেয়েদের একটি কলেজ। কলেজের সময় সেটা। বহু ছাত্রী দল বেঁধে কলেজে ঢুকছিল। চলন্ত ট্যাক্সি থেকে অন্যমনস্ক-ভাবে পরিচালক সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—এই রোখো রোখো। ড্রাইভার প্রস্তুত ছিল না। যাই হোক, কোনগতিকে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে সে সপ্রশ্নে পরি-চালকের দিকে ঘুরে তাকালো। পরিচালক তখন দেখছেন—একটি মেয়ে মন্থর গতিতে রাস্তা ক্রশ করে কলেজের দিকে এগিয়ে চলেছে। আপনমনে। সিনেমার জন্য যেমনটি তিনি চাইছিলেন, মেয়েটি হুবহু যেন সেই রকমই। আর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুহূর্তে পরিচালক সহসা তাঁর ইতিকর্তব্য স্থির করে উঠতে পারলেন না। চোখের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যে কলেজের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের বিস্মিত এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে পরিচালক ভদ্রলোক আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। তারপর সামান্য ইতস্তত করে গলা খাঁকারি দিয়ে, গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, হয়ে গেছে... চলুন।

এর পরবর্তী কয়েকটি দিন ওই একই সময়ে পরিচালক তাঁর প্রধান সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এসে কলেজের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু মেয়েটির দেখা পেলেন না। অথচ ওই মেয়েটিকেই ছবির জন্য তাঁর চাই। সকলে বোঝালেন, তা কি করে সম্ভব! আপনি তাকে সিনেমায় নামাতে চাইলেই যে সে এক কথায় রাজী হবে, তেমন নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া আরও অনেক অসুবিধা থাকতে পারে।

পরিচালকের স্থির বিশ্বাস, একবার মুখোমুখি হতে পারলে মেয়েটিকে রাজী করানো কিছু শক্ত ব্যাপার হবে না। আজ-কাল ভদ্রঘরের মেয়েদের সিনেমায় নামার পক্ষে তেমন নৈতিক বা সামাজিক বাধা নেই। বহু অভিজাত পরিবারের মেয়ে ক্রমে ফিল্মে আসছে। অতএব...

তারপর, ওই কলেজে পড়ে এমন পূর্ব পরিচিত দু'একটি ছাত্রীর মারফৎ সেই মেয়েটির খোঁজ পাবার চেষ্টা চললো, কিন্তু কেউ তার হদিশ পরিষ্কার বলতে পারলো না। তখন পরিচালক একদিন সরাসরি সেই কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সব শুনে তিনি তো প্রথমে বেশ অবাকই হলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, কিন্তু কোন্ ছাত্রীর কথা আপনি বলছেন সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না।—

বিব্রত পরিচালক তখন মেয়েটির (কী নিদারুণ অপ্রস্তুত অবস্থা!) একটা যথা-সম্ভব বর্ণনা দিলেন। কয়েকজন অধ্যাপিকা সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন। বর্ণনা

থেকে তাঁরাও মেয়েটিকে স্মরণ করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে স্টুডিওতে কয়েকটি নতুন মেয়ে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনকে 'অগত্যা' পছন্দ করলেও শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না পরিচালক। কারণ কলেজের সেই মেয়েটির আশা তখনও পরিত্যক্ত হয়নি। দু-একদিন অন্তর অন্তর পরিচালক তাঁর সহকারীকে নিয়ে কলেজের গেটের অদূরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। এই করতে করতে হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড ঘটলো। সামনের রাস্তা দিয়ে একটি বাস যাচ্ছিল। পরিচালক তখন ইতিউতি তাকাচ্ছিলেন। তিনি আচম্বিতে লক্ষ্য করলেন—সেই মেয়েটি বাসে জানলার পাশে একটি সিটে বসে আছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে। পরিচালক আর কাল-বিলম্ব করলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে সেই চলন্ত বাসেই উঠে পড়লেন। এদিকে তাঁর সহকারীটি এই রকম একটা ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে হতভম্বভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

অবশেষে মেয়েটিকে পাওয়া গেল। এবং জানা গেল, সে ছাত্রী নয়, ওই কলেজেরই জনৈকা ছাত্রীর দিদি। পরিচালক মেয়েটির অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। উচ্চবিত্ত সচ্ছল পরিবার। সব শুনে তাঁরা তো অবাক। অনুমতি দিলেন বটে মেয়ের বাবা, তবে শর্ত আরোপ করলেন একটা, মেয়ের ভাবী শ্বশুরবাড়ির এই ব্যাপারে সম্মতি পাওয়া দরকার, ওঁরা আপত্তি করলে কিন্তু মেয়ের পক্ষে সিনেমায় পার্টিসিপেট করায় অসুবিধা থাকবে। বিয়ের সব কিছুই এখন ফাইন্যাল স্টেজে রয়েছে। মেয়ের কাকা বললেন, আর তাছাড়া ও কি পারবে? জীবনে কখনও অভিনয়-টভিনয় করেনি। পরিচালক তাঁদের দ্বিতীয় ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, অভিনয়ের ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, ও আমরা ঠিক ঠিক করিয়ে নেবো—।

তারপর একদিন মেয়েটিকে স্টুডিওয় আনা হলো। পরিচালক তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সযত্নে সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। মেয়েটি এসব দেখে-শুনে বিস্মিত, চমকিত, পুলকিত। তারপর আর একদিন নেওয়া হলো তাঁর ক্যামেরা টেস্ট। সাউণ্ড টেস্ট। দুটি ক্ষেত্রেই মেয়েটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। সন্তুষ্ট পরিচালক এরপর একদিন অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে কন্ট্রাক্ট পেপার এগিয়ে দিলেন—নিন, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সই করুন। কিন্তু অ্যাণ্টি ক্লাইমেক্স হলো এখানে, এইসব কিছুর শেষে এবং একটা নতুন কিছু শুরুর মুখে মুখে। বিব্রত, অপ্রস্তুত হেসে মেয়ের বাবা জানালেন—বুঝলেন, চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি, কিন্তু ওর শ্বশুরবাড়ির ওঁরা ভীষণভাবে আপত্তি করলেন। আই অ্যাম সরি। ওঁরা একটু সেকেলেপন্থী। অতএব...!

আরও একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ হচ্ছে। সেটিও ষাটের দশকের। জনৈক খ্যাতনামা পরিচালক তাঁর একটি ছবির জন্য কিছু নতুন মুখ খুঁজছেন অথচ যথেষ্ট তেমন কাউকে পাচ্ছেনও না। বহু খোঁজা-খুঁজি করে সবাই যখন একরকম হতাশ হয়ে পড়েছেন, সেই রকমই সময়, আলোচ্য পরিচালক একদিন দোতলায় তাঁর নিজের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলেন। এমন কিছু নয়, শুধু যা একটু অবসর সময় কাটানো। সামনের বাস স্টপেজে অনবরত লোক নামা ওঠা করছে। পাশের গলির মধ্যে একদল বাচ্চা ছেলে ফুটবল খেলছে। কর্পোরেশনের লোকেরা রাস্তা খুঁড়ে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড পাইপ মেরামত করছে। ফেরিওয়ালা তারস্বরে চীৎকার করতে করতে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। সামনে একটি গার্লস স্কুল। সেখানে হঠাৎ ছুটির ঘন্টা বেজে উঠলো। দেখতে দেখতে একদল কিশোরী মেয়ে হৈ চৈ করতে করতে স্কুল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। তাদের পেছনে দলে দলে আরও মেয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো, ক্রমে তাদের ভীড়ে রাস্তাটা বোঝাই হয়ে গেল। খুব ইণ্টারেস্টিং। পরিচালক আলগোছে সব দেখছেন। একদল কিশোরী মেয়ে গোটা রাস্তাটা জুড়ে বকবক করতে করতে এগোচ্ছে—পেছনে একটা স্টেটবাস ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে—অথচ এদের যেন সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপই নেই। পরিচালক লক্ষ্য করলেন—এই দলে একটি মেয়ে—একাই যেন একশো, হাত-পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে লেকচার দিতে দিতে পথ হাঁটছে সে। আর তার ভাবভঙ্গী দেখে এবং বক্তব্য শুনে অন্যান্যরা হেসে লুটোপুটি হচ্ছে।

পরিচালক এবার সচেতন হলেন। এই রকমই তো তিনি চাইছিলেন। কিন্তু কে এই মেয়েটি?

দ্রুত তিনি রাস্তায় নেমে এলেন।

দেখেন, রাস্তায় পাশের একটি দোকানে ঢুকে সেই দলটি কি সব যেন কেনাকাটা করছে। দোকানদার মহা বিব্রত ভঙ্গীতে নেতৃস্থানীয় সেই মেয়েটিকে সামলাবার চেষ্টা করছে অথচ মেয়েটি তাতে আমলই দিচ্ছে না। দোকানদার বলছে—আরে আরে, কি করছো, কি করছো? মেয়েটি গম্ভীর মুখে জবাব দিচ্ছে—কি আর করবো? ফাউ নিচ্ছি ফাউ। দোকানদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলছে—তা বলে বোয়েম খুলে? মেয়েটি বলছে—না দিলে জোর তো করবোই।

কিছুক্ষণ পর একরাশ হৈ চৈ আর হাসি-খুশির ঝড় তুলে দিয়ে ওরা চলে গেল। দোকানদার এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে পরিচালক সমগ্র ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন, দোকানদারের সঙ্গে চোখাচোখি হতে এবার প্রশ্ন করলেন—এরা বুঝি আপনার রেগুলার কাস্টোমার? দোকানদার বিব্রত হেসে বললে—আর বলবেন না, নেবে হয়তো দু আনার সওদা, আর হট্টগোল করবে ষোলআনার। দেখুন তো কী কাণ্ড, বলে ফাউ দাও—।

পরিচালক বললেন— ঐ মেয়েটিকে [illegible]

সুচেতা রায়

শাঁওলি মিত্র

মোম মুখার্জি

—ফটো অমৃত

দোকানদার অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কান্ মেয়েটি?

—যে মেয়েটি ফাউ চাইছিল?

—ওঃ, ওকে চিনি না আবার. ছাড়ে ছাড়ে িনি। দারুণ বিচ্ছু মেয়ে। ইন্দুকে এখান-ার সবাই চেনে।

অতএব পাওয়া গেল নাম এবং ঠিকানা। িরচালক তার পরদিনই মেয়েটির বাবার ঙেগ সাক্ষাৎ করলেন। ভদ্রলোক এক সওদা-রী অফিসের চাকুরে। স্ত্রী দীর্ঘদিন গত য়েছেন। মা-মরা ছোট ছোট মেয়েদের ায়েই তাঁর সংসার। বললেন সেকি কথা! ওসব পারবে ভেবেছেন? একদম পারবে া। ও কিচ্ছু পারে না।

পরিচালক হাসলেন। বললেন—দেখাই াক না চেষ্টা করে—।

ভদ্রলোক বললেন—চেষ্টা একবার কেন, াপনি একশোবার করুন, কিন্তু কিচ্ছু বার নয় ওকে দিয়ে। আজ পর্যন্ত রাঁধতে াখলো না। ধৈর্য বলতে কিচ্ছু নেই। শুধু াড্ডা আর আড্ডা, আর যত রাজ্যের েপের বই পড়া।

পরিচালক বললেন—দেখা যাক।

তারপর যেই ফিল্মের কথা কানে যাওয়া, ারেশ্বাস, মেয়ের সেকি উত্তেজনা আর াফঝাঁপ, বলে আমায় এক্ষুনি সিনেমায় িমেয়ে দাও বাবা, পারি কি না দেখিয়ে িচ্ছ।

পরিচালক ওকে আশ্বস্ত করে সেদিন াদায় নিলেন। তারপর একদিন মেয়েটিকে ্টুডিওয় আনা হলো। খুউব খুশী সে। ন এটা কতদিনের পরিচিত জায়গা তার। ান সঙ্কোচ বা দ্বিধার বালাই নেই। কে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে লেন পরিচালক। ফলে, পরক্ষণেই কেউ লেন ওর কাকু, কেউ দাদা, কেউ মাসী ার কেউ পিসী। যেন দেখতে দেখতে নাটক মে উঠলো।

হলো ওর স্ক্রীন টেস্ট। পাশ। সাউণ্ড স্ট। পাশ পাশ। শুরু হলো ছবি। মেয়ে-র সাবলীল অভিনয় দেখে সবাই তাজ্জব। বশেষে ছবি রিলিজও হলো। দর্শকরা তুন শিল্পীর অভিনয় দেখে একবাক্যে িরফ করলেন। প্রশংসা করলেন কাগজের মালোচকরাও।

ইদানিং শুনছি, ও নাকি আর ফিল্মে ভিনয় করবে না। মুখ্য কারণ,—বিয়ে। েম বিজনেস আর শো বিজনেসের মধ্যে প্রথমটাই বেছে নিয়েছে। বিবাহিত জীবনে াজেকে এবং স্বামীকে সুখী করবার জন্যে।

এই তো মাত্র কয়েকদিন আগেকার থা। নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওতে য়ে শুনলাম ফ্লোরে আজ একটি নতুন ল্পীর ক্যামেরা টেস্ট নেওয়া হচ্ছে। ছবি-ও নতুন। ভেতরে গিয়ে দেখা হলো ভিনেতা সুখেন দাসের সঙ্গে। সুখেন লে, মেয়েটি হচ্ছে শাঁওলী মিত্র, খ্যাতনামা টকার অভিনেতা শম্ভু মিত্রর কন্যা। াগলা ঘোড়া' নাটকে শাঁওলীর দুর্দান্ত ভিনয়ের কথা অনেকের মুখেই শুনেছি, ন্তু ওকে চোখে কখনও দেখিনি, ভাবলাম এসেছি যখন তখন এই সুযোগে একবার ওকে দেখেই যাই, সুযোগ হলে আলাপ পরিচয়ও। ছবির পরিচালক আমার পূর্ব পরিচিত। ফ্লোরে যেতে তিনি সাগ্রহে শাঁওলীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মুখটি যেন বসানো শম্ভু মিত্র। বি-এ পাশ করে স্কলারশিপ নিয়ে এখন নাটকের ওপর পড়াশুনো করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর টেস্ট শুটিং দেখলাম। শাঁওলী হচ্ছে সেই ধরনের যাকে ইংরাজীতে আনঅ্যাসিউমিং বলা যেতে পারে। ক্যামেরার সামনে জীবনে এই প্রথম দাঁড়ালো। শুটিং সংক্রান্ত সমগ্র টেকনিক্যাল ব্যাপারটাই নতুন শিল্পীদের কাছে প্রথম কয়েকটা দিন খুবই গোলমেলে ঠেকে শুনেছি, কিন্তু শাঁওলীর মধ্যে তেমন কোন ভাবান্তর দেখলাম না। দাঁড়ালো, প্রয়োজন মত অভিনয়টুকু করলো তারপর, বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে এসে আবার গল্প করতে লাগলো। যেন ব্যতিক্রম বলতে কিছুই হয়নি। স্বল্পক্ষণের মধ্যে মনে হলো, শাঁওলী যদি ফিল্মে স্বেচ্ছায় থাকতে চায় তো ও বহুদূরের পথ অনায়াসে যেতে পারবে এবং অনেককে অতিক্রম করেই। ওর সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ, অভিনয় করার সহজাত ক্ষমতা এবং সপ্রতিভতা ওকে ভবিষ্যৎ জীবনে বড় হবার ক্ষমতা দিয়েছে। অল্প কথায় বুঝলাম, শাঁওলী সেই ক্ষমতা অপব্যবহার করবারও মেয়ে নয়।

বাংলা চলচ্চিত্রে ইদানিং প্রায় সব ছবিতেই নতুন শিল্পীর সন্ধান চলেছে। কেউ কেউ সৌভাগ্যবশত পেয়ে যান, কেউ পান না। নিত্য নতুন মেয়ের আনাগোনা চলেছে বিভিন্ন স্টুডিওতে। দুঃখের কথা, যাঁদের পেলে ভবিষ্যতে বাংলা ছায়াছবি উপকৃত হতে পারতো, কদাচিৎ তাঁদের পাওয়া যাচ্ছে আর যাদের ভীড়ে স্টুডিওগুলি প্রায় সর্বদাই ভরাক্রান্ত তাদের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে দূরে থাক, ছবির সাধারণ একটা চরিত্রে দাঁড় করাতেও ভরসা হয় না। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের কথা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আসে। ফিল্মের বাইরের গ্ল্যামারের শিকার এরা। সাধারণভাবে এদের না আছে কোন রুচি বোধ না আছে ন্যূনতম শিক্ষাদীক্ষা। এদের অনেকে এমন উগ্রভাবে সেজেগুজে আসে যে দেখলে মনে হতে পারে এদের কেউ কেউ আজন্মকাল শুধু ফিল্মের নায়িকা হবার স্বপ্ন দেখছে। অথচ প্রকৃত প্রতিভাবান শিল্পীর সংখ্যা কিন্তু এই মধ্যবিত্ত পরিবারেই বেশী। আর তাঁদের সঙ্গে কদাচিৎ যোগাযোগ হয় এই সন্ধানীদলগুলির।

যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকেই আসেন এখন দেশের অধিকাংশ অপেশাদার নাটকের দল থেকে। এখানে দু পক্ষের যোগাযোগ এবং যাচাই করবার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু সব দলে ভাল ভাল অভিনেতা থাকলেও ভাল অভিনেত্রীর অভাব আছে। ক্লাবের মেম্বার হিসাবে সব দলে প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী নেই, প্রয়োজনে বাইরে থেকে 'হায়ার' করে আনতে হয়। আর ওই সব ক্ষমতাসম্পন্না অভিনেত্রী অভিনয়কে জীবনের পেশা হিসাবে বেশী নিয়েছেন। নানা ক্লাব এবং অফিস রিক্রিয়েশান ক্লাবে অভিনয় করে ও'রা সাধারণত সংসার চালিয়ে থাকেন। ফলে দুটি কি একটি ছায়াছবিতে কয়েকদিন কাজ করলেও পরবর্তী ছবির জন্য একটা অনিশ্চয় অবস্থার মধ্যে ও'রা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন না।

কলকাতায় বাংলা ছবির মান সর্বদাই উন্নত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অভিনয় শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কলকাতায় এমন কোন ইন্সটিটিউট তৈরী হয়ে উঠলো না যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। পুণায় ফিল্ম ইন্সটিটিউট তৈরী হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে, কিন্তু বাঙালী মেয়ে বলতে সেখান থেকে এ পর্যন্ত একটি মেয়েই বেরিয়েছে যাকে ছায়াছবি সাগ্রহে স্থান করে দিয়েছে। সে হচ্ছে জয়া ভাদুড়ী। অথচ জয়া খান তিনেক বাংলা ছবি করে বোম্বে চলে গেল। বাংলা ছবির জগৎ তাকে ঠিক ধরে রাখতে পারলো না। সব অভিনেতা বা অভিনেত্রীই চায় বেশী সংখ্যক দর্শকের মুখোমুখি হতে। হিন্দী ছবিতে সেই প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশ্রুতি আছে। সেই সঙ্গে আছে প্রচুর অর্থ এবং যশ লাভের সুবর্ণ সম্ভাবনা। বাংলা ছবিতে সেই পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে তার কতটুকু আছে? ভাবুন শর্মিলা ঠাকুরের কথা!

তাই, বাংলা ছবিতে একটু নাম হলেই সবাই বোম্বে যাবার চেষ্টা করছেন, দেখতে পাচ্ছি। ফলে দিনে দিনে বাংলা ছবিতে নায়িকার অভাব দেখা দিচ্ছে। তবে এসব ক্ষেত্রে ফাঁকা থাকতে পারে না বলে আবার নতুন একদল শিল্পী পরমুহূর্তে এসে পড়ছেন। সেই নিয়মে ইতিমধ্যেই সত্তরের দশকে নতুন মেয়ে এসেছেন আরতি ভট্টাচার্য, অর্চনা গুপ্ত, সুমিত্রা মুখার্জি, সোনালী গুপ্তা, হাসু ব্যানার্জি, জয়শ্রী রায়, মিঠু মুখার্জি, কৃষ্ণা বসু, মধুছন্দা চক্রবর্তী, সুচেতা রায়, মণিকা মিত্র, মহুয়া রায়, মোম মুখার্জি, সুচেতা ব্যানার্জি। এ'দের মধ্যে অনেকেরই বড় হবার স্পষ্ট সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে, কয়েকজন তো সরাসরি নায়িকার ভূমিকাতেই অভিনয় করছেন, অন্যান্যরা প্রধান পার্শ্বচরিত্রগুলিতে। এখন একমাত্র ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলবে এ'দের মধ্যে কজন থাকবেন আর কে কে বিদায় নেবেন।

নাট্যসাম্রাজ্ঞীর সঙ্গে কয়েকটি মুহূর্ত

সন্ধ্যা সেন

সেদিন মহিলা শিল্পী মহল আড়ম্বর-হীন এক আন্তরিকতা দীপ্ত পরিবেশে সঙ্গীত নাটক আকাদামী পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে নাট্য-সাম্রাজ্ঞী 'সরযূ দেবীকে সংবর্ধনা জানালেন। সভা শেষে সরযূ দেবীকে প্রশ্ন করলাম 'মঞ্চ জগৎ-কেই আপনার শিল্পী জীবনের প্রকাশ মাধ্যমরূপে বেছে নেবার কারণ কি?'

উত্তরে নাট্য-সাম্রাজ্ঞী বললেন 'নিজের ইচ্ছে অথবা রুচি অনুসারে মঞ্চকে বেছে নেবার সুযোগ আসে অনেক পরে। প্রথমে কিছুটা সখ, কিছুটা অভাবের কারণে নাট্য জগতের সঙ্গে অজ্ঞাতেই যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য এর সঙ্গে ভালবাসা জন্মায় কখন থেকেই। আমার বাবার মৃত্যু হয়, আমার বয়স যখন নয় কি বড়জোর দশ বছর। গানের দিকে বাবার ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। গাইয়ে বলতে যা বোঝায়, তিনি ঠিক তা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গলাটি ভারী মিষ্টি ছিল। আর যেটুকু গাইতেন তার মধ্যে এত দরদ থাকত যে, কান পেতে না শুনে উপায় ছিল না। সন্ধ্যেবেলা আমাদের সবাইকে নিয়ে তিনি একটু করে গানে বসতেন। দরিদ্র পরিবার হলেও সকলের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় ছিল—আর গান-বাজনার প্রতি অনুরাগ ছিল সহজাত। আমার এক ভাই মারা যাবার পর বাবা কেমন যেন একটু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, তারপর আর বেশী দিন বাঁচেন নি। বাবার মৃত্যুর পর অভাবের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। একবার মেজদির বাড়ী বেড়াতে গেছি। ওখানে প্রায়ই গান গাইতে হোতো, সবাই আমার গান ভালবাসতেন বলে। একবার আমার জামাইবাবুর অফিসের এক ভদ্রলোক আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে এমিনেন্ট থিয়েটার নামে তাঁদের সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে একটি গান গাইতে বললেন। 'কুমার সিংহ'র একটি গান গেয়েছিলাম। ছোটোবেলা থেকেই আমি খুব ভাবপ্রবণ ছিলাম, একটুকু আবেগেই চোখ জলে ভরে যেত। আর আমার জন্য নির্বাচিত গানটিও ছিল দুঃখের গান। গাইতে যেয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। সবাই আমার গান ও তাঁর সপ্রাণ অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই গান শুনে এক পদস্থ ব্যক্তি (নামটা মনে নেই) আমায় একটি রৌপ্যপদক এবং আর একজন ৫্ মিষ্টি খেতে দিয়েছিলেন।

তারপর থেকে মাঝে মাঝে সৌখীন থিয়েটারেই বালকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করি। ধ্রুবতে ধ্রুব প্রহ্লাদ-এ প্রহ্লাদ ইত্যাদি। কিন্তু 'কলঙ্ক ভঞ্জন'-এ সেজেছিলাম রাধা। এতে একাধারে আমার মঞ্চে জড়তা ভাঙার শিক্ষা এবং অভিনয় দক্ষতা দুই-ই হতে লাগল। আবার অল্প-স্বল্প যা উপার্জন করতাম, অভাবের সংসারে তাও কাজেও লাগত।

তারপর অনাদি বোসের টুরিং পার্টিতে (ভ্রাম্যমান দলে) কাজ করবার আহ্বান এল। এখানে একটা করে নির্বাক ছবি আর একটা করে নাটক দেখানো হোতো। এখানে ২৫্।৩০্ মাইনেয় নিযুক্ত হলাম।

ঠাকুরের কৃপায় এত তাড়াতাড়ি সুখ্যাতির সঙ্গে প্রত্যেকটি কাজ করতে পেরেছি যে, কিছুদিনের মধ্যেই মনোমোহন থিয়েটারে যোগ দেবার সাদর আমন্ত্রণ এল। সলিল মিত্রের কাকার মিত্র থিয়েটার ভেঙে তখন 'নিউ মনোমোহন' বলে এক ভ্রাম্যমান থিয়েটার হয়। এ-যুগটিকে জীবনের এক স্মরণীয় মোড় ঘোরার যুগ বলা যায়। কারণ এইখানেই নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, দানীবাবু, তিনকড়ি চক্রবর্তী ইত্যাদি সে যুগের নাট্য জগতের দিকপাল শিল্পীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে।' 'এঁদের কথা কিছু বলবেন?' সাগ্রহে প্রশ্ন করি।

'বলতে ত ইচ্ছে করে, কিন্তু সে-সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।'

তাহলে এখন শুধু দু-একটি প্রশ্ন করব। পরাধীন ভারত থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের পথ বেয়ে বর্তমান

নাগিনী মাহাত্ম্যে/সারদাবাবু ও দিলীপকুমার [illegible] ফটো : অমৃত

প্রতিভাময়ী লীলা চন্দভারকার

...কাট যুগের বিচিত্র অধ্যায় অবধি দীর্ঘ ...টি যুগ আপনি নাট্য জগতের সংগে জড়িত। এর মধ্যে অভিনয়ের গতি প্রকৃতি, শিল্পীদের বিচিত্র চিন্তা ও প্রবণতার বিপুল অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে। এ সম্বন্ধে কিছু জানতে ইচ্ছে করে।'

'এটা বড় সুন্দর প্রশ্ন। ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইল, এখন শুধু এইটুকুই বলব যে, তখন এত নাটক ও ছবির জার্নাল ছিল না এবং নিয়মিতভাবে শিল্পীদের নিন্দা বা প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রত্যক্ষ করবারও সুযোগ ছিল না। কিন্তু মঞ্চে যাঁরা যোগ দিতেন, তাঁরা শুধু অর্থোপার্জনের জন্যেই এ জগতে আসতেন না এখনকার শিল্পীদের মতো। শিক্ষিত তাঁরা না হতে পারেন কিন্তু নাট্য শিল্পকে তাঁরা ভালবেসেছেন, অন্তরের সংগে গ্রহণ করেছেন এবং মঞ্চকে শিক্ষাক্ষেত্র জ্ঞান করেছেন। তাই তাঁদের ভাব, আবেগ ও প্রকাশের মধ্যে এমন একটা উষ্ণতা ছিল যে, দর্শক অন্তর স্পর্শ না করে পারত না। আবার দেখতে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে সময় সময় বহু দেশপূজ্য ব্যক্তিও থাকতেন। এঁদের আবেগও সহধর্মী হওয়ায় শিল্পীদের অন্তরে যেন এক নিমেষে যুগান্তরের আলোড়ন জাগিয়ে দিত।

একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। একবার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক হচ্ছে নাট্য-নিকেতনে। আমি লুৎফা, নির্মলেন্দু লাহিড়ী সিরাজ। স্টেজে নেমে সামনের সারির দিকে চোখ পড়তেই দেখি সেখানে বসে স্বয়ং নেতাজী। ওঁর উপস্থিতি আমার পক্ষে কতখানি প্রেরণাদায়ক বুঝতেই পার। স্বাভাবিক ...ই আমার দৃষ্টি বার বার ওঁর দিকে পড়ছিল। বার বারই দেখছি উনি কাঁদছেন। তাই দেখে আমারও চোখে জল আসছিল, আর এ আবেগের রং অভিনয়ে মিশলে অভিনীত চরিত্র কতখানি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে বুঝতেই পার। বেগমসহ সিরাজদ্দৌলা যখন দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, স্টেজ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আগের মুহূর্তে চেয়ে দেখি নেতাজী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ওঁরা ছিলেন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, ওঁদের এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু যে কতবড় পুরস্কার এবং সে পুরস্কার হৃদয়ের উদ্দীপনা কতখানি উদ্বেল করত, সে কথা আমরা শিল্পীরাই জানি। সব সময় ভাবতাম কেমন করে আরো সুন্দর, আরো মর্মস্পর্শী অভিনয় করতে পারব। সে পর্যায়ে কেমন করে পৌঁছনো যায়, যে-পর্যায়ে পৌঁছলে 'অভিনয়'টা শুধু অভিনয়ই থাকে না। এইভাবে দর্শকদের সংগে প্রত্যক্ষ ভাব-বিনিময়ের রোমাঞ্চ এ-যুগে মেলে কই? আর কত রকম চরিত্রে অভিনয় করেছি! দেবদাস-এ পার্বতী। ধাত্রীপান্না চন্দ্রশেখর শৈবলিনী, লেডী ম্যাকবেথ। তাছাড়া অভিনয় করেছি দুই পুরুষ, কামাল আতাতুর্ক। শাহজাহান (জাহানারা) 'প্রফুল্ল' ইত্যাদি আরো কত নাটকে।'

'একটা কথা। শাহজাহান'-এ ত শিশির-বাবু অহীনবাবু দুজনের সংগেই অভিনয় করবার সুযোগ ঘটেছে। শাহজাহান চরিত্রাভিনেতা রূপে শ্রেষ্ঠ কে?--প্রশ্ন করি। 'ডি এল রায়ের শাহজাহান' অর্থাৎ বাৎসল্য রস-প্রধান শাহজাহানের পিতৃহৃদয় চিত্রায়নে অহীনবাবু অদ্বিতীয়। আবার ইতিহাসের **'প্রেমিক শাহজাহান'**, যার মনে তাজ' ছাড়া দ্বিতীয় চিন্তা নেই— সেই চরিত্র রূপাঙ্কনে শিশিরবাবু অতুলনীয়। তখনকার শিল্পীরা পরস্পরের ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই একজন যে দিকটি উদ্ভাসিত করেছেন, সেই চরিত্রেই অভিনয় করতে গিয়ে অন্য শিল্পী অন্য কোনো দিকে আলোকপাত করার কথা চিন্তা করতেন। মৌলিক চিন্তার ছাপ থাকত বলেই সকল শিল্পীর অভিনয়েরই সমান আকর্ষণ ছিল।

আর একটি কথা মনে পড়ে। 'প্রফুল্ল' নাটক অভিনয় হবার সময় শিশিরবাবু যখন যোগেশের ভূমিকায় নামতেন, আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক দিন বিভোর হয়ে দেখতাম। সে যে কি অভিনয় না দেখলে বোঝানো যায় না। একদিন শিশিরবাবু আমায় হেসে জিজ্ঞেস করলেন 'রোজ রোজ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি এত দ্যাখ, সরযূ?' বললাম 'আপনার অভিনয়।' 'এই অভিনয় দেখেই এত মুগ্ধ? তুমি ত গিরিশবাবুর যোগেশের অভিনয় দেখ নি,

'প্রেম ও অপ্রেম'-এর সেটে পরিচালক বিমল ভৌমিক সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার এবং মাধবী চক্রবর্তীকে একটি দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ফটো : অমৃত

নতুন দিনের আলো চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যারাণী।   ফটো : অমৃত

সম্ভব। সে জিনিস আমার হয় না, কিছুতেই পারি না, কিছুতেই না'—বলে চোখ বুজে মাথায় হাত দিয়ে তাঁর সেই ব্যাকুল হতাশায় মাথা নাড়ার ছবি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। এ 'হতাশা' তাঁর তথাকথিত বিনয় নয়, এ হোলো শিল্পী চিত্তের অতৃপ্ত বেদনা। অথচ শিশিরবাবুকে নাট্যলোকের 'যুগাবতার' বললেও অত্যুক্তি হয় না। নাট্যের প্রতি ভালবাসা এ'দের জীবনে যেন জড়িয়েছিল। রোমান্টিক চরিত্রে দুর্গাদাসবাবুর জুড়ি ছিল না। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' নগেন্দ্র চরিত্র রূপায়নে একটি দৃশ্যে দানীবাবু বৃদ্ধ বয়সেও তারুণ্যের যে অনুভূতির ব্যাকুলতা ঢেলে দিয়েছেন, তা তাঁর বয়সকেও ভুলিয়ে দিয়েছে। সূর্যমুখী (তারাসুন্দরী) যখন ফিরে এলেন, তাঁর হাত ধরে নগেন্দ্র বললেন 'আর যেওনা'—সেই আর যেওনা'তে যে কি করুণ ভাব ছিল, সে কথা বোঝাবার সাধ্য নেই। তাই বলছিলাম সে যুগের অভিনেতারা এক একজন যেন এক একটি দেবতা। এ'দের সঙ্গে কাজ করতে পাওয়া মানেই শিক্ষার একটা মস্ত সুযোগ পাওয়া।'

'সিনেমায় বেশী কাজ না করার কারণ? টকির প্রথম যুগ থেকে শুরু করে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া, শৈলেনবাবু নীরেন লাহিড়ীর সস্নেহ আহবান এড়াতে না পেরে কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছি মাইক্রোফোনের রাণী (কুইন অব মাইক্রোফোন) আখ্যাও পেয়েছি, কিন্তু ছবির চেয়ে নাট্যজগতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার কারণ মাত্র চেহারাই নয়। এখানে দর্শক চিত্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাদের অন্তরে তাৎক্ষণিক সাড়া জাগাতে পারার আনন্দের একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে, যা চলচ্চিত্রে নেই।'

'এখনকার নাট্য যুগ সম্বন্ধে আপনার মত? এখন প্রতিভাবান নাট্যকার, প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পী, টেকনিকের সুযোগ—কোনো কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু একটি আদর্শ রঙ্গমঞ্চ বা ন্যাশনাল থিয়েটারের অভাবে তাঁদের প্রতিভার সম্যক বিকাশ হচ্ছে না। তাই নাট্যের আঙ্গিকগত অগ্রগতি থেমে আছে। ছবিঘরের সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, বাড়ছে এটা আনন্দের কথাই। কিন্তু চাল্লিশ বছর আগে যে চারটি থিয়েটার হল ছিল, এখনও তাই আছে। মঞ্চ সংস্থার অভাব নেই, কিন্তু সেই তুলনায় মঞ্চ কই? যিনি যতবড় শিল্পীই হোন, নিয়মিত অভিনয় দ্বারা সমালোচিত হয়ে নিজের দোষত্রুটি শোধরাবার সুযোগ না পেলে প্রতিভার সৃজন শক্তি স্তিমিত হয়ে আসে। যোগ্য পরিণতিতে পৌঁছতে পারে না।'

নাট্য-সাম্রাজ্ঞীর এই শেষ কথাগুলি মনের মধ্যে তোলপাড় করতে করতে বাড়ীর পথ ধরি। সত্যিই তো, নাট্য আন্দোলনকে সার্থক করবার জন্যে আদর্শ নাট্যশালা নির্মিত হচ্ছে কৈ?

কেন খেলা করে

মতি নন্দী

অন্যান্য বহু জিনিসের মতই সবাই ধরে নেন, খেলা এমনই একটা বিষয় যা নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে, অজস্র বক্তৃতা হয়েছে অথচ মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে অল্পই জানা গেছে। প্রথমতঃ, খেলা বলতে কী বোঝায়? বল লোফালুফি করা? জলে অবিরাম নিঃসঙ্গ সাঁতার? জনা বাইশ প্রশিক্ষিত খেলোয়াড়ের অর্থের জন্য স্টেডিয়ামভরা হাজার হাজার লোকের সামনে কলাকৌশল দেখান? দ্বিতীয় প্রশ্ন, লোকে কেন খেলা করে?

সংসদ বাংলা অভিধানে খেলা বা ক্রীড়া শব্দটির অর্থ হয়েছে—খেলা, তামাশা, আমোদজনক অনুষ্ঠান। ওয়েবস্টার অভিধানে খেলার প্রথম সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এমন কিছু যাতে মজা আছে বা যা অন্যমনস্ক করে। সংজ্ঞাগুলি খুবই শিথিল এবং এর ফাঁক দিয়ে অনেক কিছু ঢুকে যেতে পারে যাকে আমরা খেলা হিসাবে গণ্য করিনা, যেমন, একপো সন্দেশ খাওয়া বা ভাঁড়ামো করা। এতে মজা আছে, মনও কিছুক্ষণের জন্য অবসাদ থেকে রেহাই পায়। লারুশ অভিধানে ফরাসীরা বরং খেলার আঁটোসাটো সংজ্ঞা দিয়েছে—"শুধু দেহেরই নয় মনেরও উন্নতি ঘটাবার জন্য দৈহিক ক্রিয়ার নিয়মিত সুশৃংখল অনুশীলন, যাতে আনুগত্যবোধ, শক্তি, উদ্যম ও সিদ্ধান্ত নিরূপণের ক্ষমতা উৎসাহ পায়।"

এই সংজ্ঞায় অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছন যায়। তবে সম্ভবত সাধারণ বুদ্ধিতে খেলার যে সংজ্ঞা আমরা বুঝি সেটাই সবথেকে ভালঃ এমন একটা কিছু করা যাতে কাজ থেকে মনকে উঠিয়ে আনা যায় এবং তার জন্য যেন দেহকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই সংজ্ঞা মানলে চড়ুইভাতি, কি সাপ খেলা বা দাবা খেলা বাদ পড়ে যায় খেলার তালিকা থেকে এবং পাহাড়ে চড়া, সাঁতার বা ভলিবল তালিকাভুক্ত হয়ে যায়।

এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক—লোকে কেন খেলা করে?

বহু খেলার মূলে আছে কিছু পরিমাণ বাড়তি শক্তি এবং সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের বাসনা। কিন্তু পরিণত বয়সীরা খেলা বলতে যা বোঝেন, এতদ্দ্বারা তা খুবই তরলীকৃত করে বলা হল। কেন না, পরিণত বয়সীর কাছে জীবনের সবথেকে জরুরী ক্রিয়া খেলা নয়, কাজ।

ইতিহাসের বিভিন্ন আমলে, যথা প্রাচীন গ্রীসে, বয়স্ক নাগরিকরা উৎপাদনের জন্য কায়িক শ্রম করা থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল যেহেতু ক্রীতদাসরাই সে কাজ করত। ফলে তারা দীর্ঘসময় দিতে পারত খেলায়। তাদের খেলার উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ। খেলার দ্বারা দেহ গঠন সুন্দর হয় এবং এই সৌন্দর্য খেলার গতিভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রদর্শন করা যায়। পারঙ্গম ব্যক্তিকে গৌরব দান করে খেলা এবং এই গৌরবের ভাগীদার হত বিজয়ী খেলোয়াড়ের পরিবার এবং নগর। সর্বশেষে, খেলাকে তারা দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও আরাধনার অন্যতম পন্থা হিসাবে মনে করত। দেবতাদের মত মানুষও পেয়েছে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সক্রিয় দেহ যাকে পরিচালনা করছে উৎসুক মন। মানুষ একে ভাগাভাগি করে নিয়েছে দেবতাদের সঙ্গে। তাই দেহকে তারা সুন্দর ও পবিত্র মনে করত। আদি ওলিম্পিক ক্রীড়ায় কবিতা ও নাটক প্রতিযোগিতা থাকত দেহের সঙ্গে মনের সাযুজ্য নির্ণয়ে, একথা ভুললে চলবে না।

আধুনিক যুগে খেলার চাহিদাটা এসেছে প্রধানতঃ শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে। হাতে অবসর না থাকলে খেলা নিয়ে মেতে থাকা যায় না। প্রাচীন গ্রীসেও তাই হয়েছে, একালেও তাই হল। শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষ মুক্ত হল ক্ষুধার, প্রকৃতির অকরুণতার এবং গতিহীনতার হাত থেকে। শীতে কম্পমান ক্ষুধার্ত ভূমিদাসরা ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে জমি চষছে, এই দৃশ্যের বদলে দেখা গেল কারখানার মজুর, ব্যবসায়ী ও কেরাণীরা যে যার ঘড়ি ধরা কাজে ছুটছে অফিসে কারখানায় দোকানে। নতুন এই শৃংখলে মানুষ আবদ্ধ হল আবার।

সূর্যের অবস্থান এবং ঋতুর পরিবর্তন থেকে যে মানুষ একদা সময়ের হিসাব করত, শিল্প বিপ্লবের পর আভ্যন্তরীণ পরিবেশে ঘড়ি ধরে সে দিন যাপন শুরু করল। চাষ করে, কাঠ কেটে, নৌকো বেয়ে একদা শরীর ক্লান্ত হত। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক শ্রমিক অবসন্ন মনে সন্ধ্যায় যে শরীরটাকে গৃহে বহন করে আনে, সেটাকে খাটাবার কোন সুযোগই সে সারাদিনে পায়নি বা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরের আরামটি কেমন তা সে জানে না।

সুতরাং শহুরে লোকের পক্ষে খেলা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল একাধিক নতুন কারণে ঃ খেলা তাকে দৈহিক আনন্দের সুযোগ করে দেয়; বহুবিধ লোকের সংস্পর্শে আনে; কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ও শৌর্য প্রদান করে; নবলব্ধ দীর্ঘ অবসর ভরিয়ে তোলে, এবং সর্বশেষে, প্রমোদ ব্যবসায়ের এই নতুন শাখাটি ভাঙ্গিয়ে কিছু লোক অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য রাষ্ট্র খেলাকেও ব্যবহার করতে পারে এবং সেটি প্রচ্ছন্ন যুদ্ধেরই আর এক রূপ ছাড়া কিছু নয়।

স্টেডিয়ামে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে ঠাশাঠাশি করে বসে যে খেলা দেখে, সে কে? শহুরে লোক, যে তার পাশের বাড়ির লোককে চেনে না। কারখানার শ্রমিক যে সারাদিন কনভেয়র বেল্টের সম্মুখীন থাকে। অফিসের কেরাণী যে ফাইল ঘাটে আর টেলিফোন জবাব দেয়। ক্লান্ত, বিরক্ত ও নিঃসঙ্গরাই আজকের দর্শকদের বেশির ভাগ। তাদের জন্য কারা খেলা করে? একদল অসাধারণ শারীরিক দক্ষতা সম্পন্ন লোককে বিশ্বের বহুদেশে নিয়োগ করা হয়

পেশার জন্য, খেলার জন্য নয়—স্টেজে অভিনয়ও এক ধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যবর্তী ভূমিকার জন্য। এইসব খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক প্রতিভা এবং খেলার প্রতি একনিষ্ঠতার জন্য, এরা শারীরিক দক্ষতার এমন একস্তরে পৌঁছেছে যা দুই-এক পুরুষ আগে স্বপ্নেও ভাবা যেত না। এরা নতুন সম্ভাবনা উদ্ঘাটন করে, মানুষের ক্ষমতার সীমাকে ঠেলে বাড়িয়ে দেয়।

মানুষ কেন খেলা করে, তার আর একটি কারণ, যেহেতু খেলা দ্বারা সময় অতিবাহিত করা যায়। শুধু একটি কথাতেই খেলা আর কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় হয় —খেলা কিছু 'উৎপন্ন' করেনা। খেলা 'সময় কাটিয়ে দেয়' বা 'নষ্ট' করে, দুটির যে কোন একটি খেলা সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে। এই টেকনোলজির যুগের মত হাতে এত সময় মানুষ আগে কখনো পায়নি বা সময় নষ্ট করার জন্য এত ব্যস্তও হয়নি, তাই কাজের কথা ভোলাতে বা অবসর কাটাতে খেলার ভূমিকা খুবই জোরালো। 'অবসরের সভ্যতা' বলে একটা কথা চালু আছে বটে কিন্তু কথাটা যেন অর্থহীন। সারা সপ্তাহ প্রাণপণ খাটুনির পর ছুটির দিনটা কিভাবে কাটাবে মানুষ তাই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেননা অধিকাংশই এমন কাজ করে বা এমনভাবে তাদের জীবন যাপনের ছক তৈরী হয়ে গেছে যে উপভোগ্য বা সৃজনাত্মক কোন কাজে মগ্ন হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এইসব লোকই খেলার মাঠে এসে শূন্যতা ভরায়। এরা যে সবাই খেলবে তা নয়, অধিকাংশই দর্শক। দৈহিক অংশগ্রহণে অপারগ হয়ে এরা সেটা পূরণ করে মানসিক অংশ গ্রহণ দ্বারা। খেলা দেখতে দেখতে এরা প্রচণ্ডভাবে পক্ষ নিয়ে ঝগড়া মারপিটও করে থাকে। উত্তেজিত এই দর্শক নিজে খেলা করেনি কিন্তু খেলা দেখার কালে তার পেশীতে পেশীতে আহ্বান এসেছে চঞ্চলতার, কিন্তু দৌড় ঝাঁপের মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত করার কোন উপায় তখন তার নেই। তার অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি নিঃসৃত রস লড়াইয়ের জন্য তাকে উত্তেজিত করে তুলেছে এবং তখন পর্যন্ত সে যা করতে পারে সেটি হল—যত জোরে সম্ভব চীৎকার, আর খেলার পর দাঙ্গা। প্রক্সি না দিয়ে খেলার সত্যিকারের অংশ গ্রহণে এদের উৎসাহিত করলে খেলার হাংগামা বা তজ্জনিত উদভ্রান্তির যোগ্য উত্তর দেওয়া যাবে।

সংগঠিত, যন্ত্রায়িত, রেডিও চলচ্চিত্র ঔষধবটিকা—কৃত্রিম উপাদানে ঠাসা আমাদের শহুরে জীবনে খেলার প্রয়োজন আগের থেকে এখন অনেক বেশি জরুরী হয়ে উঠেছে। খেলাকে বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্নই আজ আর ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে কোন খেলাগুলো বেছে নিলে নর-নারী উপকৃত হবে।

এখন দরকার ঘরের বাইরে খোলা আকাশের নীচে বুক ভরে বাতাস টানা। মাটি ও ঘাসের ঘ্রাণ নেওয়া। আমাদের দরকার ভারী পেশীগুলিকে কাজ করিয়ে ক্লান্তিকে অনুভব করা যাতে আবার বুঝতে পারি খাদ্যের স্বাদ এবং বিশ্রামের অর্থ আছে। আমরা যেভাবে খেলাকে তৈরী করব সেইটাই খেলা, অন্যভাবে বললে খেলা যেভাবে আমাদের তৈরী করে আমরা তাই।
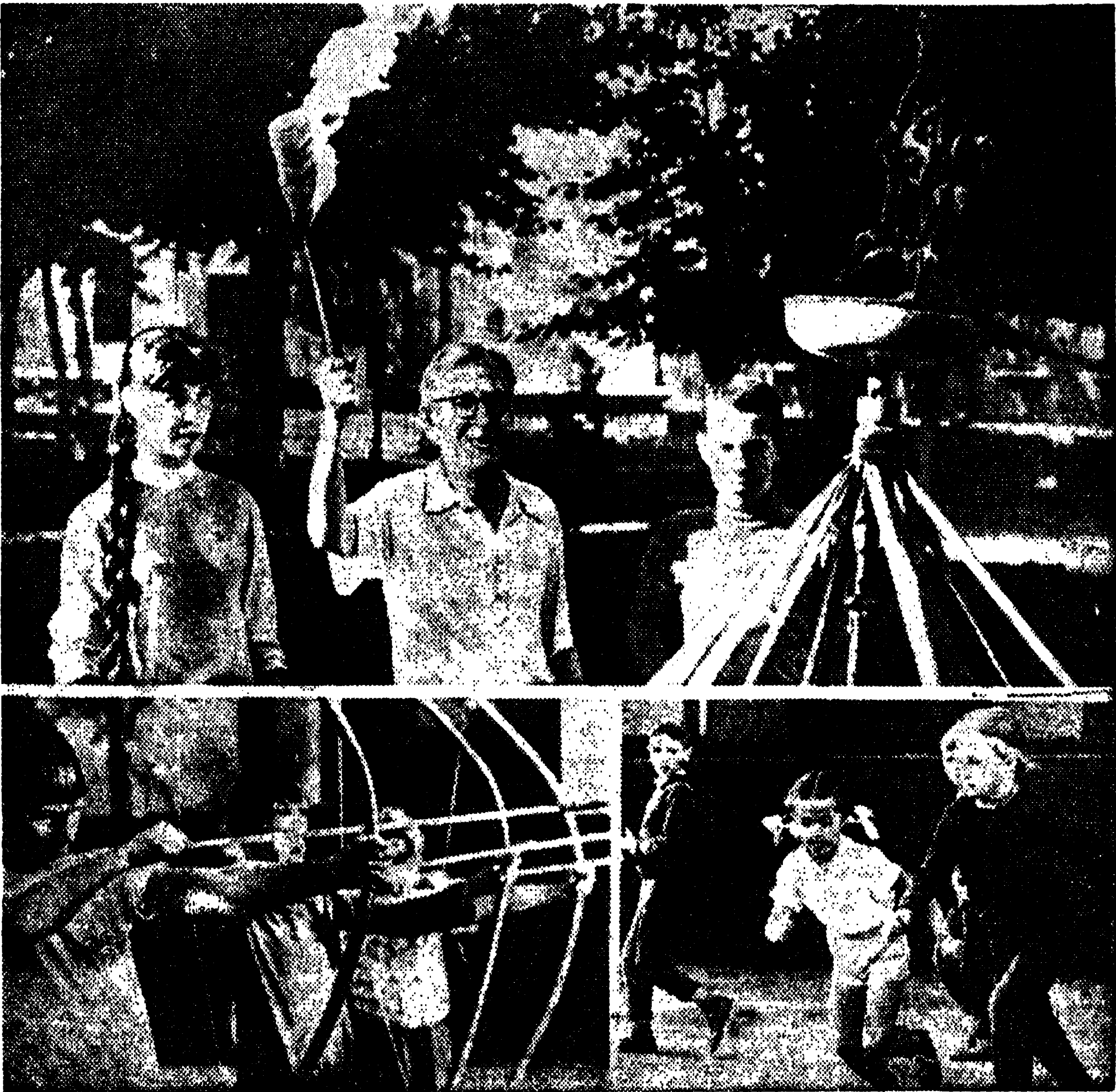
রাশিয়াতে ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব '[illegible] অলিম্পিক অনুষ্ঠান

ওরিয়েন্টিয়ারিং : এক ধরনের ক্রশ-কান্ট্রি রেস। এই খেলার বিশেষত্ব এই যে, জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি গাছের গায়ে "চেক পয়েন্ট' দেওয়া থাকে। প্রতি-যোগীদের সেগুলি খুঁজে তাদের নম্বর সেই চেক পয়েন্টে চিহ্নিত করাতে হয়। ইউরোপ অঞ্চলে এই খেলাটি খুবই জনপ্রিয়। এমনকি এই খেলা নিয়ে ইউরোপীয় এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতারও আসর বসে।

ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে [illegible] ওরিয়েন্টিয়ারিং প্রতিযোগিতায় জনৈক মহিলা প্রতিযোগী তার কন্ট্রোল কার্ডটি চেক পয়েন্টে চিহ্নিত করছেন। ডান দিকের ছবিতে একজন বালক এবং বালিকা একই সময়ে চেক-পয়েন্টে হাজির হয়েছে।

বোলার • ব্যাটসম্যান • উইকেট

বকুল ভট্টাচার্য •
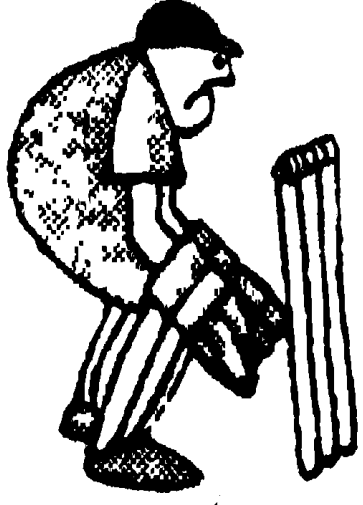
বিশ্বক্রিকেটের আসরে ভারত বর্তমান একটি উজ্জ্বল নাম। হ্যাঁ, একথা আমি কেন পৃথিবীর অনেকেই নিঃসন্দেহে আজ স্বীকার করবে যে, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দু-তিনটি দেশের শক্তিশালী ক্রিকেট দলের অন্যতম। কারণ শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক 'রাবার' জয়ের পর বিশ্বের যেসব দেশ এ সাফল্যকে কোন অঘটন ভেবেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের সন্দেহকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে ভারত, তার এক মাস পরেই ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাসেজ বিজয়ী দুর্ধর্ষ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 'রাবার' জয়ের সুবাদে। পরপর দুটি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে 'রাবার' জয়ের ঘটনাটা যে হঠাৎ ঘটেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে ব্যাপারটা যে আশাতীত ছিল না, তার প্রমাণ আছে সফর শুরুর আগে বিজয় মার্চেন্টের ভবিষ্যদ্বাণীতে। তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় যে দলটি আগামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য মনোনীত হয়েছে, কোন একটা আশাতীত ফলাফল করা তাদের পক্ষে সম্ভব।

বর্তমান ভারতীয় দলটির শক্তি মূলত স্পিনারদের ঘিরেই। গত দুটি সফরেই আমরা দেখেছি আসল জায়গায় কাজ হাসিল করেছে আমাদের স্পিনাররা। সম্পূর্ণ স্পিনারদের ওপর ভরসা করে এ ধরনের পরপর দুটো সাফল্যের নজীর হয়তো বিশ্বক্রিকেটের ইতিহাসে দুর্লভ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতের সেদিনের সাফল্যে ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতার কথা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কিন্তু ভাগ্য দেবী যে বেশীর ভাগ সময়েই নাক ঘুরিয়ে থাকেন, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা কমবেশী আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে। তাই বলছিলাম, পরবর্তীকালে শুধুমাত্র স্পিনারদের ওপর ভরসা করে বসে থাকলে আমরা বোধহয় শেষ পর্যন্ত ভুলই করবো।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চলতি বছরের ক্রিকেট মরশুমে ইংল্যাণ্ডের যে ভারত সফর করার কথা ছিল তা অনেকদিন আগেই নাকচ হয়ে গেছে। সম্প্রতি জানা গেল, ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট সাংবাদিক এ্যালেন ব্যানিস্টারের প্রচেষ্টায় যে বাছাই বিশ্বদলটির ভারত সফরে আসার তোড়জোড় চলছিল, তাও বানচাল হয়েছে। ফলে চলতি মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্বদেশে অথবা বিদেশের মাটিতে টেস্ট খেলা নেই। সুতরাং এই হলো উপযুক্ত সময়, যে সময় বর্তমান দলের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি এবং অভাব বিস্তৃতভাবে দেখা যেতে পারে এবং তা সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সাফল্য লাভ করা যেমন শক্ত, তার থেকেও বেশী শক্ত সেই সাফল্যের সম্মানকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত করা। ভারতীয় ক্রিকেট দলটি গত দুটি সফরে আশাতীত সাফল্যলাভ করলেও, একথা আমরা সকলেই বুঝেছি যে, এখনও বর্তমান ভারতীয় দলটিতে বেশ কিছু ত্রুটি এবং অভাব রয়েছে। গত দুটি সফরের প্রতিটি পদক্ষেপে যে অভাবটির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল ফাস্ট বোলারের সমস্যা। সমস্যাটি ভারতীয় দলের কাছে নতুন নয়, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বাংলার সুটে ব্যানার্জির পর ভারতীয় দলে এমন আর একটি বোলারেরও আবির্ভাব ঘটেনি যাকে রিয়েল ফাস্ট বোলার বলা যেতে পারে। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মতো মিডিয়াম পেস বোলার যে ভাল অর্থাৎ ক্লাস ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন না তারও প্রমাণ পেয়েছি গত দুটি সিরিজেই। অতএব বর্তমানে ভারতীয় দলটি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে কম করে দুজন রিয়েল ফাস্ট বোলার খুঁজে বার করতেই হবে।

আশার কথা যে, ভারতীয় দলের এই বর্তমান সমস্যাটি নিয়ে উপরমহলের কর্তারা বিশেষভাবেই চিন্তা করছেন। ফাস্ট বোলারের অভাব এবং তার সমাধান সম্বন্ধে বহু সমালোচকের বেশ কিছু সমালোচনা পত্রপত্রিকা এবং রেডিও মারফৎ আমরা পেয়েছি। তবে তার মধ্যে ভারতীয় দল মনোনয়ন কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবিজয় মার্চেন্টের সমালোচনাকে সবথেকে বেশি কার্যকরী মনে হয়েছে। ফাস্ট বোলার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন, 'খেলোয়াড় গড়ে নেওয়ার দিকেই বর্তমানে আমাদের নজর নেওয়া উচিত। অর্থাৎ কবে একজন বোলার পাওয়া যাবে সেই আশায় অনেক দিন তো চুপচাপ বসে কাটানো গেল। তার সেই আশায় বসে না থেকে এবার থেকে বোলার গড়ার দিকে মন দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ড তথা বিশ্বের স্বনামধন্য ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার লিওনার্ড হাটন-এর কয়েকটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। গত বছর ভারত পরিক্রমার সময় কলকাতায় তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য এক সাক্ষাৎকারের সুযোগে তাঁর সামনে কয়েকটি ফাস্ট বোলার সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন ছিলো, 'আপনাদের সময় যে উন্নতমানের জাত ফাস্ট বোলার সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ক্রিকেট দলেই দেখা গিয়েছিল, যেমন টাইসন, লিণ্ডোয়াল, মিলার, মহম্মদ নিসার, অমর সিং, গিলক্রিস্ট বা হল, বর্তমানে সেই ধরনের একটি বোলারকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন, বা তাঁদের মতো বোলার তৈরী হয়ে উঠছে না কেন?' উত্তরে হাটন বলেছিলেন, 'তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, এক এক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু করে জাত ফাস্ট বোলারের হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছে এবং এদের অবসর নেওয়ার পরেই দেখা গেছে ঠিক তাদের মত জাত বোলার পেতে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, যেমন এখন আমাদের করতে হচ্ছে। তবে আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে আবার ঐ ধরনের ফাস্ট বোলারের আবির্ভাব ঘটবে।' ফাস্ট বোলার হাতে গড়ে নেওয়ার সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'দেখ, রিয়েল ফাস্ট বোলার যারা তারা ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু

তুষার পরিবৃত পরিবেশে খেলার আসর

বছর	স্থান	বিজয়ী দেশ
১৯৫৬	ইটালী	রাশিয়া
১৯৬০	ক্যালিফ	রাশিয়া
১৯৬৪	অস্ট্রিয়া	রাশিয়া
১৯৬৮	ফ্রান্স	নরওয়ে

এক বর্ণাঢ্য মনোরম পরিবেশে গত ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের শৈলশহর গ্রেনবলে দশম উইন্টার অলিম্পিক গেমসের আসর বসেছিল। পৃথিবীর ৩৭টি দেশের ১৫৬০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে। সত্তর হাজার আসন সমন্বিত বিরাট স্টেডিয়ামটি জনসমাগম এবং উৎসাহ-উদ্দীপনায় মুখর ছিল। ক্রীড়া-কেন্দ্রের বাইরে লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াউৎসাহী টেলিভিসনের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অবলোকন করেন। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের তুলনায় এর জাঁক-জমক কোন অংশে কম নয়। উদ্বোধনী দিবসে স্থানীয় অধিবাসীরা হেলিকপ্টার থেকে গোলাপফুল ও অলিম্পিক পতাকা নিক্ষেপ করে এবং বাদ্যসঙ্গীত পরিবেশনে সমগ্র ক্রীড়াঙ্গনকে আনন্দমুখর করে তোলে।

শুভ্র মসৃণ বরফের ওপর খেলাধুলো চলার জন্যে উইন্টার অলিম্পিক গেমসের ইভেন্টগুলির সঙ্গে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের অনেক পার্থক্য। উইন্টার অলিম্পিকে স্কেটিং ছাড়া কোন দ্রুতগতিসম্পন্ন খেলাধুলো সম্ভব নয়: ফলে প্রতিটি ইভেন্ট স্কেটিং ব্যবহারের ভিত্তিতে রচিত। ফিগার স্কেটিং, স্পিড স্কেটিং, আইস হকি, ডাউন হিল, স্লালোম জায়েন্ট, স্লালোম, নর্ডিক স্কি-ইং বাইথলন, টোবোগানিং ববস্লেজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে অপূর্ব। আবার আমাদের অতি পরিচিত রিলে প্রতিযোগিতাও আছে। তবে এর নিয়মকানুন আলাদা ধরনের। নাম দেওয়া হয়েছে স্কী-জাম্পিং। স্পীড স্কেটিং খুবই উত্তেজনা-পূর্ণ ইভেন্ট। পুরুষদের ৫০০, ১৫০০, ৫০০০, ১০,০০০ এবং মেয়েদের ৫০০, ১০০০, ১৫০০, ৩০০০ মিটার স্পীড স্কেটিং সময়ের ভিত্তিতে উৎকর্ষ বিচার

আইস হকির একটি দৃশ্য

বরফের ওপর ফিগার স্কেটিং

করা হয়। 'ফিগার স্কেটিং' অনুষ্ঠানটি অনুপম ও নয়নাভিরাম। প্রতিযোগীদের কতকগুলি নির্দিষ্ট বাঁধাধরা ভঙ্গীতে বরফের উপর স্কেটিং করতে হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পিয়ানো বাজনার তালে তালে নিজের পছন্দমত নানান ভঙ্গীতে দর্শকদের সম্মুখে অঙ্গ সঞ্চালন প্রদর্শন করতে হয়। ফিগার স্কেটিংয়ের সঙ্গে ব্যালে নৃত্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং এর একটা শৈল্পিক মূল্যও আছে।

নীচে ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত উইন্টার অলিম্পিক গেমসের পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকা দেওয়া হল।

পদক জয়ের খতিয়ান

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
নরওয়ে	৬	৬	২
রাশিয়া	৫	৫	৩
ফ্রান্স	৪	৩	২
ইটালী	৪	—	—
অস্ট্রিয়া	৩	৪	৪
নেদারল্যান্ডস	৩	৩	৩
সুইডেন	৩	২	৩
পঃ জার্মানী	২	২	৩
আমেরিকা	১	৫	১
পূঃ জার্মানী	১	২	২

বরফের ওপর মেয়েদের স্কি রেস

পদক জয়ের খতিয়ান

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ফিনল্যান্ড	১	২	২
চেকোস্লাভাকিয়া	১	২	১
কানাডা	১	১	১
সুইজারল্যান্ড	—	২	৪
রুমানিয়া	—	—	১

বিগত দশটি উইন্টার অলিম্পিক গেমসে নরওয়ে মোট ৬বার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার যোগদানের পর নরওয়ের অপ্রতিহত গতি বিঘ্নিত হয়েছে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে রাশিয়া উপর্যুপরি তিনবার দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের আর একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান 'আইস হকি'। তৃণাচ্ছাদিত সবুজ মাঠে ফিল্ড হকি খেলার দৃশ্য আমাদের অতিপরিচিত। কিন্তু জমাট-বাঁধা সাদা বরফের মাঠে হকি খেলতে আমরা অভ্যস্ত নই। এই আইস হকির জন্ম কানাডায়। পরে আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশে খেলাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমেরিকার বিভিন্ন আইস হকি প্রতিযোগিতার মধ্যে 'স্ট্যানলী কাপের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট রাশিয়াতেও আইস হকি খুবই জনপ্রিয় খেলা। ১৯৭১ সালের বিশ্ব আইস হকি প্রতিযোগিতায় রাশিয়া চ্যাম্পিয়ন খেতাব লাভ করে উপর্যুপরি নয়বার এবং মোট ১১বার বিশ্ব খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। তাছাড়া এবার নিয়ে রাশিয়া ১৫ বার ইউরোপীয়ান আইস হকি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইতিপূর্বে আইস হকিতে আর কোন দেশ এরকম গৌরব অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেনি। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম আইস হকির সূচনা হয় মস্কোর ডায়নামো স্টেডিয়ামে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ১৯৪৮ সালে রাশিয়া শক্তিশালী চেকোস্লাভাকিয়াকে পরাজিত করে সর্বপ্রথম জয়ী হয় এবং ১৯৫৪ সালে প্রথম বিশ্ব খেতাব লাভ করে।

প্রচন্ড শৈত্য ও তুষারের মধ্যে দর্শকদের কলকল্লোলে রং বেরং-এর পোষাক পরিহিত প্রতিযোগীদের উৎসাহে, বহু বর্ণ বহু চিহ্ন অঙ্কিত বিভিন্ন জাতীয় পতাকার বর্ণাঢ্যতায় ক্রীড়াকেন্দ্রে এক অভিনব মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

তুষার শুভ্র খেলার আসরে পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের দেখে স্বপ্নের অথবা রূপকথার নায়ক-নায়িকা মনে হয়। পরবর্তী উইন্টার অলিম্পিক গেমসের আসর বসবে ১৯৭২ সালে জাপানের সাপ্পুতে। তার পরের অনুষ্ঠান ১৯৭৬ সালে আমেরিকার ডেনভারে।

ভারতবর্ষেও শীতকালীন স্পোর্টসের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ দেখা দিয়েছে। গুলমার্গে শীতকালীন অবসর বিনোদনের সঙ্গী হিসেবে স্কী, আইস স্কেটিং ও ববিং-এর ব্যবস্থা আছে। এমনকি এখানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জাও ভাড়া পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা স্কী ক্লাব অব ইণ্ডিয়া। আশা করা যায়, অদূরে ভবিষ্যতে বরফের উপর এইসব খেলাধুলা আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

প্রকৃতির গবেষণাগারে

অমল দাশগুপ্ত
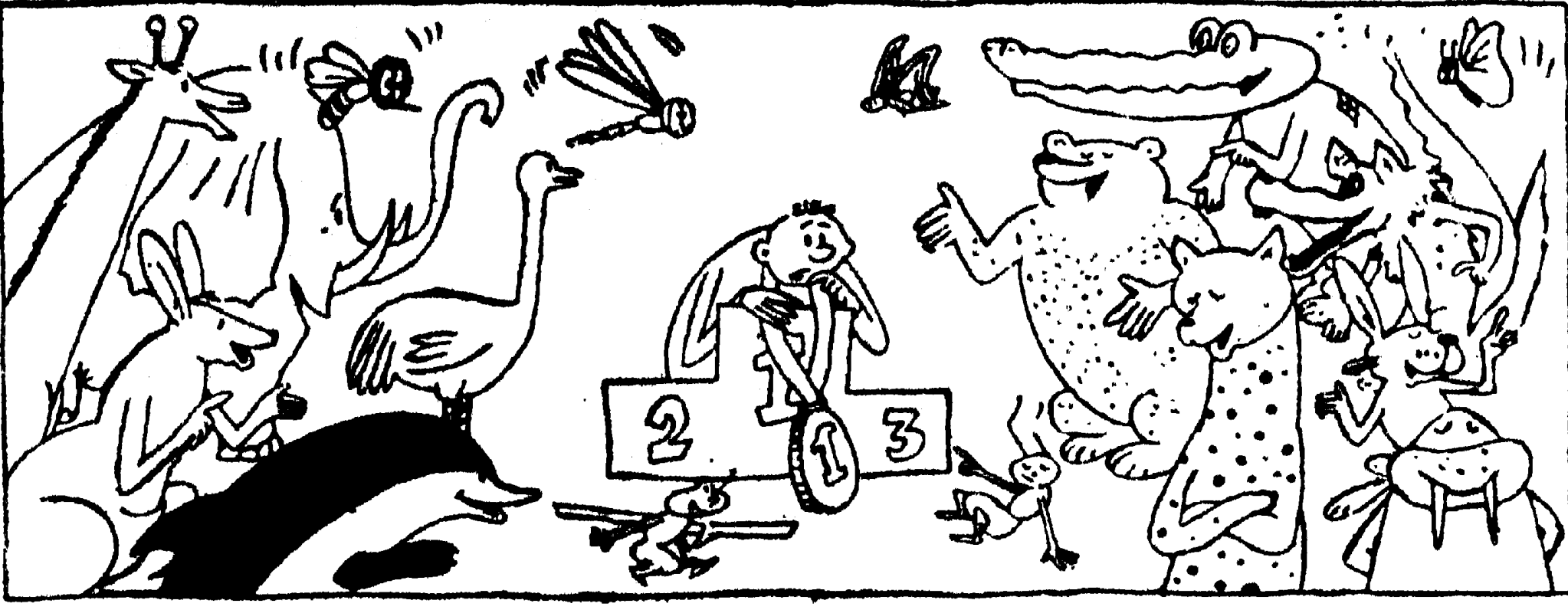
মানবিক তৎপরতার সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাপক ও সাহসী অনুপ্রবেশ ঘটছে, ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও। যাঁরা খেলা শেখান ও যাঁরা খেলা শেখেন তাঁদের সকলকেই এখন পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাহায্য নিতেই হয়। আজকের দিনের ক্রীড়া-প্রশিক্ষক বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কিছুতেই চলতে পারেন না। বিশেষ করে বিজ্ঞানের সেই শাখাটিকে জীবের লক্ষণ ও ব্যবস্থা অনুশীলন করা যার বিষয়। শাখা বলাটা ভুল হল, আসলে বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা নিয়ে গড়ে ওঠা পৃথক একটি বিজ্ঞান। অতি-আধুনিক এই বিজ্ঞানের নাম দেওয়া হয়েছে বায়োনিকস। বিশেষ করে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে বায়োনিকস-এর সাহায্য যে কতখানি ফলপ্রসূ হতে পারে সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার জন্যে এই প্রবন্ধ।

গোড়ায় এই বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার বিন্যাস ও ক্রিয়ার সঙ্গে জীবদেহের ব্যবস্থার তুলনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন। তখন বিষয়টির অনুশীলন শুরু হল। এ থেকেই শুরু নতুন একটি বিজ্ঞান, যার নাম দেওয়া হল সাইবারনেটিকস। তারই একটি শাখা, বা যমজ, বায়োনিকস। সাইবারনেটিকস-এর সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। এই বিজ্ঞানের অন্যতম প্রবর্তক নর্বার্ট ভীনার নামটি নিয়েছেন গ্রীকভাষার যে-শব্দটি থেকে তার অর্থ 'কর্ণধার'। তিনি বলছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই তিনি যখন যোগাযোগ-তত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছিলেন তখনই তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে এই তত্ত্বের রয়েছে যেমন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিক তেমনি ভাষার অনুশীলন ও যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হিসেবে বার্তার অনুশীলনের দিক, তারই সঙ্গে গণনাযন্ত্র ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উন্নতি এবং মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা। এই গোটা ব্যাপারটিকে একটি মাত্র শব্দের দ্বারা বোঝাতে গিয়ে তিনি 'সাইবারনেটিকস' শব্দটি ব্যবহার করলেন। এক কথায় সংজ্ঞা দিতে হলে বলতে হয় নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা ইংরেজিতে 'কন্ট্রোল' ও 'কমিউনিকেশন' সম্পর্কিত স্টাডি।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, আমাদের শরীর হচ্ছে একটি জটিল সাইবারনেটিক ব্যবস্থা, একে নিয়ন্ত্রণ করছে অসংখ্য স্ব-নিয়ন্ত্রিত আয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ হচ্ছে নিজস্ব অধিকারেই এক-একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের আধার। আমাদের শরীরের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়াশীল রয়েছে এমনি কোটি কোটি ক্ষুদ্র সাইবারনেটিক আধার। আর একটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপিত মস্তিষ্কে, যোগাযোগের ব্যবস্থা স্নায়ুমণ্ডলে। এই নিখুঁত আয়োজনটির জন্যেই আমাদের শরীরের রক্তের চাপ ঠিক মাত্রায় বজায় থাকে, নিঃসৃত রসগুলির উপাদানে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না, হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুস নির্ভুল ছন্দে সংকুচিত হয় ও এমনি আরো হাজার হাজার প্রক্রিয়া স্বতঃই ঘটে চলে। সব মিলিয়ে জীবদেহের অপরিহার্য ক্রিয়াপ্রক্রিয়া। জীবদেহের এই সাইবারনেটিকসকে অনুশীলন করতে গিয়েই অনেক প্রচলিত ধারণা বাতিল করতে হয়েছে। ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি।

সবচেয়ে বড়ো ঘা খেয়েছে নিজের সামর্থ্যকে অতিশয় বড়ো করে দেখার ধারণা। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মানুষ ভাবত জীব-জগতে সে সেরা সৃষ্টি, সে সবার উঁচুতে। পশুপাখিদের মনে করত তার চেয়ে অনেক নিচুস্তরের। মানুষ অবশ্যই কঠোর শ্রম ও বুদ্ধির বলে আদিম পূর্বপুরুষের চেয়ে বহু দূর অগ্রসর হয়ে এসেছে, কিন্তু তাই বলে তার পক্ষে সবটাই লাভের ব্যাপার হয়নি—হারাতেও হয়েছে কিছুটা। বিশেষ করে গতি ও ক্ষিপ্রতা। একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে, ক্ষতি যতোটুকু হয়েছে লাভের তুলনায় তা যৎসামান্য। তবু ক্ষতি তো বটে।

মানুষ যতো বুদ্ধিমান হয়েছে ততো তাকিয়েছে প্রকৃতিজগতের দিকে, আর ততো অনুধাবন করেছে প্রকৃতিজগতের নিখুঁত ব্যবস্থা।। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জগৎটি তাকে অবাক করেছে। প্রকৃতিজগতের আশ্চর্য নিখুঁত দৃষ্টান্তগুলো অনুকৃত হয়েছে তার আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনায়—মাকড়সার অনুকরণে বয়ন, বাবুই ও মৌমাছির অনুকরণে বাসা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রকৃতিজগতের চিন্তাশীল ও সার্থক অনুকরণের দৃষ্টান্ত অজস্র—আকাশে ওড়ায়, জলে ভাসায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলায়, গণনাযন্ত্র নির্মাণে, ওষুধের ব্যবহারে। তারপর বিজ্ঞান হিসেবে বায়োনিকস-এর প্রবর্তনের পরে, প্রকৃতিজগতকে অনুকরণ করে মানুষের শরীরের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলার দিকেও বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট।

এই বিজ্ঞানের সাহায্য ক্রীড়াবিদদের পক্ষে যে কতখানি ফলপ্রসূ, সম্প্রতিকালে তার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এক্ষেত্রে সম্ভাবনা আরো প্রচুর। তুলনামূলক বিচর করলে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা হবে।

একজন মানুষ সিকি-টন ভারোত্তোলন করছে, এটা নিশ্চয়ই অবাক হবার মতো

ব্যাপার। শরীরে কী পরিমাণ শক্তি থাকলে ও কতখানি অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করলে তবেই না এই বিপুল পরিমাণ ওজন উত্তোলন করা চলে! নিজের শরীরের ওজনের চেয়ে দেড়গুণ বেশি ওজন মাথার ওপরে তুলতে পারাটা সবসময়েই অবাক হবার মতো ব্যাপার। কথাটা মানুষ সম্পর্কে বলা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের বেলায় যদি এই হয় তাহলে পিঁপড়ের বেলায় কী? একটা পিঁপড়ে তার শরীরের ওজনের চেয়ে দশ-গুণ বেশি ওজন বহন করে থাকে!

দৌড়বীরের কৃতিত্বে কে না অবাক হয়! কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ছোটার পরেও তার দম ফুরোয় না! আর যে দৌড়-বীর ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটার বেগে ১০০ মিটারের পাল্লায় ছুটে দিচ্ছে সে তো সকলের প্রশংসার অধিকারী। মানুষের বেলায় যদি এই হয় তাহলে হরিণের বেলায় কী? হরিণ ছুটতে পারে ঘণ্টায় ৪৮ কিলোমিটার বেগে। উটপাখির বেলায় কী? উটপাখি ছুটতে পারে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার বেগে। ঘণ্টায় ১১২ কিলোমিটার বেগে নড়াচড়া করে এমন চ্যাম্পিয়ন দৌড়বীরের অস্তিত্বও জানা গিয়েছে।

হাইজাম্প প্রতিযোগী যদি নিজের উচ্চতার চেয়ে সামান্য বেশি উচ্চতা লাফিয়ে পার হয় তাহলেই তা রীতিমতো তারিফের ব্যাপার। কিন্তু একটি ব্যাঙের কথা ধরা যাক। সে লাফিয়ে পার হয় নিজের উচ্চতার চেয়ে দশগুণ বেশি উচ্চতা! তার বেলায় কী?
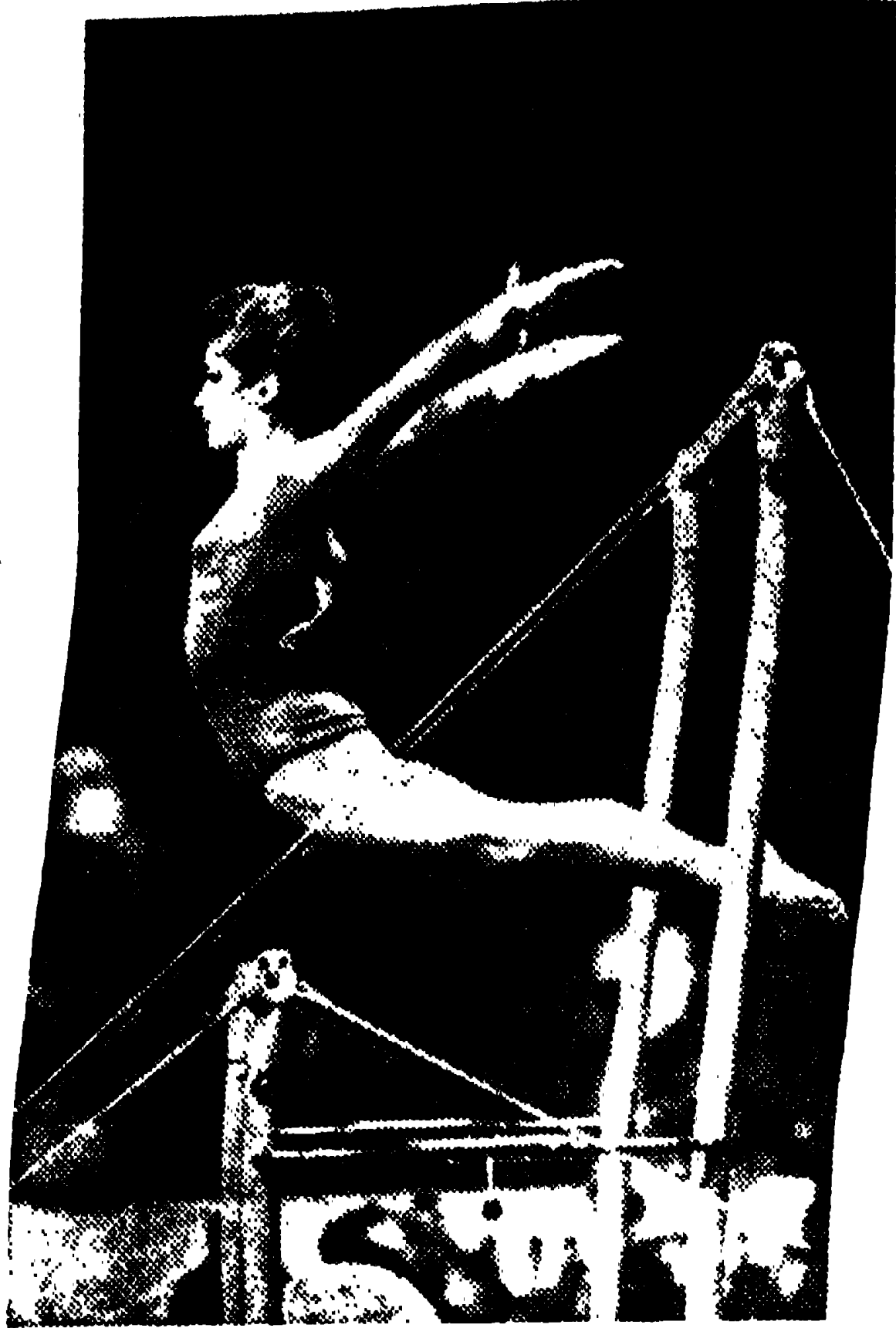
১৯৭০ সালের বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্স্‌ চ্যাম্পিয়ান কুমারী কারিন ইয়ানৎস (পূর্ব জার্মানী)

জীবজগতের এইসব বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই অবহিত ও ভাবিত—বায়োনিকস শুরু হবার আগে থেকেই। তাঁরা জানতেন, হরিণের লাফের কী অনায়াস ভঙ্গি, জল কেটে বেরিয়ে যাবার সময়ে ডলফিন মাছের লেজের কী মসৃণ সঞ্চালন, এমনি আরো অনেক কিছু।

এবং প্রকৃতি জগতকে দেখতে দেখতে এবং তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক সমস্যার সমাধানও পাওয়া গিয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। দৌড়বীরের দৌড় শুরু করার ভঙ্গিটি সবাই দেখেছেন। একটি হাঁটু মুড়ে, দু-হাতের আঙুলে মাটি ছুঁয়ে 'দ' হয়ে থাকার এই ভঙ্গিটি এল কোথা থেকে? শুনলে অবাক হতে হবে, ক্যাঙারুর কাছ থেকে। ছুট শুরু করার আগে ক্যাঙারু এমনি 'দ' হয়ে দাঁড়ায়, তারপরে ছেড়ে-দেওয়া স্প্রিং-এর মতো গোটা শরীরটাকে সামনের দিকে ধাবিত করে। ক্যাঙারুর এই ভঙ্গিটি অনু-করণ করার ফলে অন্তত কয়েক সেকেন্ড আগে পৌঁছবার কায়দা দৌড়বীরের আয়ত্তে এসে যায়। এ তো মাত্র একটা দৃষ্টান্ত। জীবজগতে এমনি দৃষ্টান্ত অনেক।

বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্স্‌ চ্যাম্পিয়ান কুমারী কারিন ইয়ানৎস

১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় দশ পর্যন্ত গোণার সময় পাওয়া যায় না, তার আগেই সমাপ্তিরেখা অতিক্রান্ত! এখনকার বিশ্বরেকর্ড ৯-৯ সেকেন্ড। মনে হতে পারে, এর চেয়ে কম সময়ে কারও পক্ষেই ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কেননা, মানুষের যতোটা সাধ্য, শরীরের প্রতিটি মাংসপেশীর ক্ষমতা সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ করে তবেই না ৯-৯ সেকেন্ডের মধ্যে ১০০ মিটার অতিক্রম! তবুও, একথাও ঠিক, অনতিবিলম্বেই অন্য একজন দৌড়বীর অবধারিতভাবে এর চেয়েও কম সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করবে। কেমন করে? তার শরীরটা কি মানুষের শরীর নয়? এখানেই বায়োনিকস-এর সাহায্য নেবার প্রশ্ন আসে।

একজন দৌড়বীরের গতিবেগ নির্ভর করে কত বেশিবার ও কত বেশী লম্বা পা সে ফেলতে পারছে তার ওপরে। সাধারণত দেখা যায়, ১০০ মিটার দৌড়ে একজন দৌড়বীর প্রতি সেকেন্ডে পা ফেলে থাকে দশবার। যদি এই পা ফেলাটিকে বাড়িয়ে দশ থেকে এগারো করে তোলা যায়--তাহলে? তাহলে এই দৌড়বীরটির পুরো একটি সেকেন্ড আগে পৌঁছে যাবার কথা।

দশ থেকে এগারোয় তুলে আনার উপায়টা কী?

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এ ক্ষেত্রে যে উপায় উদ্ভাবন করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা পরীক্ষা ব্যাঙ নিয়ে। ব্যাঙের মাংসপেশীর সঙ্গে ওজন যুক্ত করা হয়। পরে এই ওজন আংশিকভাবে সরিয়ে নিলেও দেখা যায়, মাংসপেশীর সংকোচন অনেক বেড়ে গিয়েছে (ওজন যুক্ত করার আগের অবস্থার তুলনায়)। পরীক্ষাটি বারে বারে করে দেখা হয়েছে। প্রত্যেক বারে একই ফল। তার মানে বাড়তি ওজন যুক্ত করার ফলে যে নতুন পরিস্থিতি শুরু হচ্ছে তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাংসপেশীর সক্রিয়তাও বাড়ছে। এ থেকেই উপায়ের হদিশ। দৌড়বীরের গতিবেগ বাড়াতে হলে প্রচলিত অভ্যাসটি ধ্বংস করতে হবে এবং অধিকতর বাস্তবসম্মত নতুন একটি পরিস্থিতির পত্তন করতে হবে।

অন্য একটি পরীক্ষাতেও উপায়ের হদিশ মিলছে। এ ক্ষেত্রে দৌড়বীরকে ছুটতে হয় চলন্ত মোটরসাইকেলের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায়, এমন কিছু দিয়ে বাঁধা যা ইলাস্টিক বা বাড়ে-কমে। মোটরসাইকেলের গতিবেগ বাড়লেই ইলাস্টিক বাঁধনে টান পড়ে, দৌড়বীরের মনে হয় তার মাংসপেশী থেকে যেন খানিকটা ওজন অপসৃত তখন তার দৌড় হয় আরো অনায়াস। এই পরীক্ষাকার্য বার কয়েক চলার পর দেখা যায় যে, দৌড়বীর এই নতুন গতিবেগের পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখেই ছুটতে পারছে।

হিসেব থেকে জানা যায়, গতিবেগ দশ শতাংশ বাড়াতে হলেও শক্তি খরচ করতে হয় আরো এক-তৃতীয়াংশ বেশি। তার মানে, গতিবেগ দ্বিগুণ করতে হলে শক্তি খরচের পরিমাণ বাড়ে আটগুণ। কিন্তু এতখানি চাপ সবচেয়ে সহিষ্ণু মাংসপেশীর পক্ষেও বহন করা সম্ভব নয়।
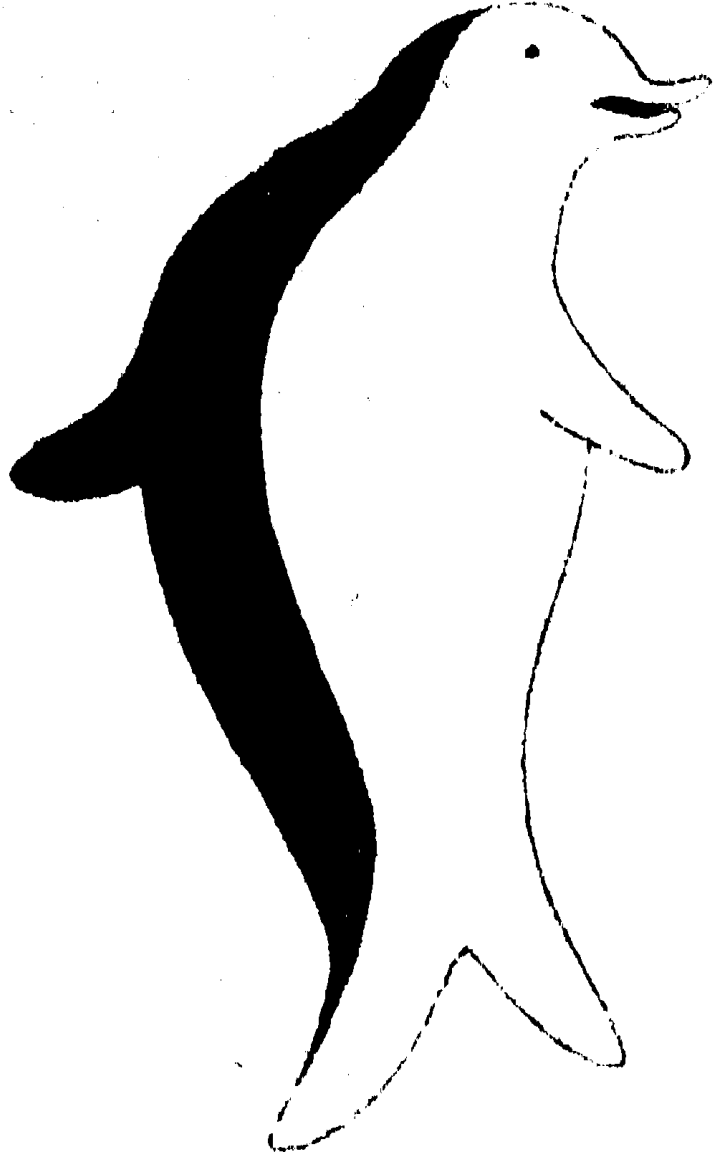
তাহলে কি যা আছে তার চেয়ে সামান্য কিছু বাড়িয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে? সবচেয়ে দ্রুত ছোটে যে-সব জীব তাদের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান—কি হরিণ, কি ঘোড়া, কি দৌড়পটু অন্য কোনো জীব—তাদের ঠ্যাঙগুলো হয়ে থাকে ঝুলে-পড়া লম্বাটে ধরনের। এমনি ধারা ঠ্যাঙ হওয়ার জন্যেই কি এই জীবগুলোর এমন দ্রুত ও এমন অক্লান্ত ছুট? তাহলে কি ধরে নিতে হয় যে যে-সব মানুষের পা পেশল ও সরু তারাই সবচেয়ে জোরে ছুটতে সক্ষম? পায়ের ওপরে মানুষের হাত নেই, ওটা জন্মসূত্রে পাওয়া। কিন্তু এই খবরগুলো জানা থাকলে লাভ হয় এই যে, বিভিন্ন ক্রীড়ার চাহিদা ও নিজের শরীরের বিশেষ গড়ন সম্পর্কে অবহিত হয়ে সঠিক ক্রীড়াটি নির্বাচন করা চলে।

সাঁতারের বেলাতেও একই সমস্যা। কী করলে আরো দ্রুত সাঁতার কাটা যায়? এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মানুষ তাকিয়েছে মাছের দিকে নয়, হাঁস ও ব্যাঙের দিকে। শেষোক্ত জীবদুটির পায়ের পাতা পর্দা দিয়ে জোড়া। সাঁতারু পাখি ও ব্যাঙ মাত্রই এমনি জোড়া পায়ের অধিকারী। আর তার ঠেলা লাগাবার আয়তনও বেশ বড়োসড়ো। ফলে এই জীবগুলো তর তর করে জল কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। এইসব সাঁতারু জীবের পায়ের অনুকরণে মানুষ তৈরি করেছে ফ্লিপার বা সাঁতার দেবার ডানা। কিন্তু এই অনুকরণ খুব একটা উঁচু পর্যায়ের হয় নি। হাঁসের পা আরো জটিল। লক্ষ করে দেখা গিয়েছে, প্রতিবার জলে ঠেলা দেবার পরেই হাঁসের পায়ের পর্দায় ভাঁজ পড়ে, পা কুঁকড়ে যায়, ফলে ঘর্ষণের এলাকা যায় অনেকখানি কমে, ঠেলার ফলে তৈরি গতিবেগ ঘর্ষণের ফলে কমে যেতে পারে না। মানুষ এমন ঠাট-বাটের পা পাবে কোথা থেকে!

ফরাসী সাঁতারু গোৎভায়ে ১০০ মিটার সাঁতার দিয়েছিলেন ৫২-৯ সেকেন্ডে, অর্থাৎ ঘণ্টায় ৭ কিলোমিটার গতিবেগে (হাঁটার গতিবেগের চেয়ে সামান্য বেশি)। কিন্তু ডলফিনের সাঁতারের বেগ ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার। ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটি জাহাজের হাল রাখা আছে। নিরেট ওক্-কাঠে তৈরি হালটি তামার পাত দিয়ে মোড়া। কিন্তু একটি তলোয়ার-মাছ সেই হাল ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছে মাখনের ভিতর দিয়ে ছুরি যাওয়ার মতো। এই তলোয়ার-মাছটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার।

এমনিতে মনে হতে পারে, জলে সাঁতার দেবার উপযোগী করেই মানুষের শরীরটি তৈরী। মানুষের সাঁতার কাটার ভঙ্গি প্রায় মাছের মতো। মানুষের আপেক্ষিক ওজনও মাছের মতো, এককের কাছাকাছি—অর্থাৎ জলের আপেক্ষিক ওজনের প্রায় সমান। জলের মধ্যে মানুষের তাই অনেকটা ভার-হীন অবস্থা।

গোড়ায় ধারণা ছিল, জলে সাঁতার কাটায় মাছের সবচেয়ে বড়ো সহায় তার শক্তিশালী লেজ ও ডানা। কিন্তু একজন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেছেন মাছ দ্রুত সাঁতার কাটে তার শরীরের আন্দোলনের সাহায্যে।

বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সাঁতারুরা যে কাজে লাগিয়েছে, ডলফিন ধরনের সাঁতার তার একটি দৃষ্টান্ত। ডলফিন নামক এই জলচর জীবটি ঢেউ জাগিয়ে তোলে আর সেই ঢেউ তাকে সামনের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাহলে মানুষই বা অপারগ হবে কেন? দেখা গেল, এক্ষেত্রে সাঁতারুকে হাত নামাতে হয় খাড়া নিচের দিকে, তোলার বেলাতেও তাই, আর পিঠটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে দিতে হয়। তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার, পা হাঁটুর কাছে না ভেঙে জোড়া রাখতে হয় আর সেই জোড়া পায়ে সজোরে ঘা মারতে হয় নিচের দিকে। সাঁতারুকে তখন দেখায় ডলফিনের মতো। বিশ্বের সেরা সাঁতারুরা এখন ডলফিন ধরনের সাঁতারের পক্ষপাতী।

বায়োনিক্স কিভাবে ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করে, এই তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এই নবীন বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তিসামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার প্রয়াসকে যে আরো অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। *

---

* সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত **স্পোর্টস** পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৭০ সংখ্যায় প্রকাশিত আলেকসান্দর স্বেতভের লেখা একটি প্রবন্ধের সাহায্য নিয়ে লেখা।

'ক্যালিসথেনিক্স'-এর এক সৌষ্ঠবময় ভঙ্গিমা

হকি বিশ্বকাপ ও ভারত

শঙ্কর বিজয় মিত্র

বিশ্ব ফুটবলের মত উন্মাদনা সৃষ্টি করতে না পারলেও বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা সাফল্যের সংগেই সমাপ্ত হয়েছে। ১৯৭১ সাল বিশ্বের হকি জগতে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং সেই সংগে স্পেনের নামও জড়িত হয়ে বিরাজ করবে। পৃথিবীতে কোন মহৎ কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না এবং বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বেও নানা বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফ আই এইচ) এর সভাপতি মিঃ রেণে ফ্রাঙ্ক সে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করে এই প্রতিযোগিতার জয়যাত্রার সূচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। ফুটবলের মত হকিও যাতে সমগ্র পৃথিবীতে জনপ্রিয় হয় তিনি সেই প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। প্রথমবারের প্রতিযোগিতার সাফল্যে তাঁর সেই প্রয়াস বিশ্বের স্বীকৃতি লাভে ধন্য হয়েছে বলা চলে।

খেলাধূলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেও হকিতে তাদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি। মিঃ ফ্রাঙ্ক আমেরিকায় হকিকে জনপ্রিয় করবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন—অখিল আমেরিকা ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নবীন মহাদেশের সমর্থন ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করেছেন।

বিশ্ব কাপে আমেরিকা মহাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি ছিল 'আর্জেন্টিনা। প্রতিযোগিতাতে আর্জেন্টিনা সর্বনিম্ন স্থান পেলেও তার খেলাতে প্রভূত উন্নতি দেখা যায় এবং ১৯৭২ সালে মিউনিক বিশ্ব ওলিম্পিকে যোগদানকারী ১৬টি দেশের মধ্যে তার স্থান নিশ্চিত হয়। অবশ্য এর অন্য কারণ আছে। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন ওলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় আমেরিকার একটা দেশকে স্থান দিতে চায়। আর্জেন্টিনা নিখিল আমেরিকা হকি প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। কাজে কাজেই বিশ্ব হকিতে সর্বনিম্ন স্থান পেলেও ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নিজস্ব স্থান করে নিতে তার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি।

এখন মিউনিক বিশ্ব ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যে ষোলটি দেশের স্থান পাবার সম্ভাবনা, তাদের একটা তালিকা ধরা যাক। মেকসিকো ওলিম্পিকের প্রথম চারটি স্থানের টীমগুলি হচ্ছে—পাকিস্থান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও পশ্চিম জার্মানী প্রতিযোগিতায় অবশ্যই যোগ দেবে। তাহলে বাকী থাকছে আর এগারটি দেশ। এদেশগুলি স্থান পাবে বিভিন্ন মহাদেশ থেকে তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের কাউন্সিল ও টেকনিক্যাল কমিটি আসছে ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাসেলসে এক সভায় মিলিত হয়ে এই টিমগুলি নির্বাচন করবেন।

মহাদেশগুলির পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমেরিকা থেকে বিশ্ব ওলিম্পিকে অপর কোন দেশের স্থান লাভের সম্ভাবনা নেই। ১৯৬৮ সালে মেকসিকো স্থান পেয়েছিল অথিল আমেরিকা প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করে। এবার সে স্থানটা দখল করেছে আর্জেন্টিনা। তাই আর্জেন্টিনা নির্বাচিত হয়েই রয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশ থেকে কেনিয়ার স্থান সুনিশ্চিত। বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় কেনিয়া চতুর্থ হয়েছে এবং সেই কৃতিত্বের নজীরেই তার এই স্থান প্রাপ্য। তবে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে অপর একটি দেশের স্থান পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে এই স্থানের জন্য জোর চেষ্টা চলছে। হকি খেলা সেখানে যভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে তাতে মনে হয়, তাদের দাবী বিবেচনা করা হবে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়া ছাড়া নিউজিল্যান্ডের স্থান লাভের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল। মেক্সিকো ওলিম্পিকে নিউজিল্যান্ড সপ্তম স্থানের অধিকারী হয়।

এশিয়া মহাদেশ থেকেও দুটি দেশকে স্থান দেওয়া হবে। তার মধ্যে জাপানের নির্বাচন সুনিশ্চিত। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জাপান যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে যোগ দেয় এবং ক্রীড়ামানের দিক দিয়ে জাপানের উৎকর্ষ এই নিশ্চয়তা এনে দিয়েছে। অপর স্থানটির জন্যে দাবীদার হবে মালয়েশিয়া ও হংকং। তার মীমাংসা হবে ব্রাসেলসের বৈঠকে। ষোলটি স্থানের মধ্যে এইভাবে পূরণ হচ্ছে দশটি, বাকী ছটি স্থান পূর্ণ করা হবে ইউরোপ মহাদেশ থেকে। প্রতিবারই এইভাবে ইউরোপীয় দেশগুলি বিশ্ব ওলিম্পিকে প্রাধান্য লাভ করে থাকে। ক্রীড়া নিয়ামক অন্যান্য সংস্থার ন্যায় বিশ্ব হকি নিয়ামক সংস্থাতেও ইউরোপীয় প্রাধান্য অব্যাহত। তাই অন্যান্য মহাদেশের দাবী দাওয়া উপেক্ষিত হয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন প্রতি-

যোগিতায় ইউরোপ ও আমেরিকা তাদের প্রভুত্ব কায়েম করে রেখেছে।

সেকথা আলোচনা না করে এখন ইউরোপীয় দেশগুলির কথায় আসা যাক। ইউরোপীয় হকি চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় এতে প্রথম চারটি স্থান দখলকারীদের মধ্যে রয়েছে হল্যাণ্ড, স্পেন ও ফ্রান্স। কাজেই বিশ্ব ওলিম্পিকে এ তিনটি দেশ অবশ্যই স্থান পাবে। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী হয় বেলজিয়াম ও ব্রিটেন। এই স্থান দখলের ভিত্তিতেও ব্রিটেন ও বেলজিয়ামের স্থান লাভের সম্ভাবনাকে বাতিল করা চলে না। পশ্চিম জার্মাণী মিউনিক ওলিম্পিকের স্থানদাতা হিসেবে অবশ্যই স্থান পাবে। আবার মেক্সিকো ওলিম্পিকের সাফল্যের ভিত্তিতেও তার দাবী প্রতিষ্ঠিত। তাই দুই জার্মাণীকেই (পূর্ব ও পশ্চিম) মিউনিক ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসরে দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

ওলিম্পিক হকি প্রসঙ্গ ছেড়ে আবার বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার কথায় ফিরে আসা যাক। স্পেনের বার্সিলোনা শহরে প্রথম বিশ্ব হকির সাফল্যমণ্ডিত সমাপ্তিতে হকি প্রেমীরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছেন। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার স্থানও নির্বাচিত হয়ে গিয়েছে। আমস্টারডাম শহর এই গৌরব লাভের প্রয়াসী এবং তারা এজন্য তোড়জোড়ও সুরু করে দিয়েছে।

প্রথম বিশ্ব হকিতে স্পেন অভাবনীয় সাফল্য প্রদর্শন করেছে। এই প্রতিযোগিতায় তারা রৌপ্যপদক অর্জনের কৃতিত্ব অর্জন করে সমগ্র বিশ্বকে চমৎকৃত করেছে। সমস্ত প্রতিযোগিতায় স্পেন দলের খেলায় যে সুশৃঙ্খল ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে স্পেনের সাফল্য আকস্মিক নয়। এর মূলে রয়েছে দীর্ঘদিনের নিয়মিত সাধনা ও নিষ্ঠা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হকির জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেন ফুটবলের মত হকিতেও দেশের উদীয়মান খেলোয়াড়দের শিক্ষণের ব্যবস্থা করে বিশ্ব হকিতে যোগদানের উপযোগী করে তুলেছে। স্পেনের ক্রীড়া ক্লাবগুলির এতে মস্ত ভূমিকা রয়েছে। এই ক্লাবগুলি একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে—আট বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক সমস্ত ছেলেকে এই সমস্ত ক্লাবে হকি খেলা শেখান হয়। স্পেনে ব্যাপক হকি প্রচলনের জন্য লীগ খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম ডিভিসন লীগে প্রতি ক্লাবের দুটি করে টীমকে খেলতে দেওয়া হয়। টারসা ও বার্সিলোনা শহরে এই ব্যবস্থা সর্বাধিক প্রচলিত। টারোসা হচ্ছে স্পেনের সর্বপ্রাচীন হকি ক্লাব। তাই বড় বড় সব খেলা ও প্রতিযোগিতা টারোসা ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

স্পেনের হকি ফেডারেশন দ্বিতীয় ডিভিসন, তৃতীয় ডিভিসন হকি লীগ ছাড়া ১৫ থেকে ১৭ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের জন্য জুনিয়ার হকি লীগ খেলা পরিচালনা করে থাকে। বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ মিলে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দুটো গ্রুপে লীগ প্রথায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন—আট থেকে বার বছর বয়সের ছেলেদের জন্যে একটা গ্রুপ এবং তের থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেদের জন্যে আর একটা গ্রুপ।

প্রতিভাবান হকি খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থাও ক্লাব কর্তারা করে থাকেন। ভারতবর্ষ থেকে কোচ সংগ্রহ করে তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম জার্মাণীর উন্নত ক্রীড়াধারায় মুগ্ধ হয়ে স্পেনের ক্লাব কর্মকর্তারা কয়েকজন পশ্চিম জার্মাণ কোচও নিযুক্ত করেছেন।

এই ব্যাপক পরিকল্পনার ফলেই স্পেন হকিতে এতটা অগ্রসর হয়েছে। স্পেনের মাটিতে প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন স্পেনকে কুপ লিউটি ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। সাধারণতঃ যে দেশ হকির উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে থাকে সেই দেশকে এই ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ যোগ্য দেশকে যে পুরস্কৃত করেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

এখন বিশ্ব কাপের খেলায় ভারতের ভূমিকা আলোচনা করা যাক। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের ভূমিকা শুধু বেদনাদায়ক নয়, লজ্জাজনকও বটে। প্রতিযোগিতার গোড়ার দিকে ভারত চমকপ্রদ কিছু দেখাতে না পারলেও আশাব্যঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। লীগ খেলার শেষে দেখা যায় ভারত একটিও গোল খায় নি এবং একটি পয়েন্টও নষ্ট না করে তালিকার শীর্ষে স্থান লাভ করেছে। খেলোয়াড়দের মনোবলও অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সকলেই আশা পোষণ করেছিলেন যে ভারত সেমিফাইনালে পাকিস্থানকে পরাভূত করে ফাইনালে উঠবে এবং সোনার পদকটি ঘরে তুলতে সমর্থ হবে। ওদিকে পাকিস্থান লীগ খেলায় তিন তিনটে মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেও ১১টা গোল খেয়ে বসে।

সেমিফাইনালে পাকিস্থানের সম্মুখীন হয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা গোড়ার দিকে প্রবল বিক্রমে খেলতে থাকে এবং এক গোলে এগিয়েও যায়। কিন্তু এর পরই সমস্ত ছবিটা যায় বদলে। আক্রমণাত্মক খেলা ছেড়ে ভারতীয় দল আত্মরক্ষামূলক খেলায় প্রবৃত্ত হয়। আর পাকিস্থান সমস্ত শক্তি সংহত করে প্রবল পাল্টা আক্রমণে ভারতকে বিব্রত করে তোলে এবং সুনিয়ন্ত্রিত আক্রমণ রচনা করে পর পর দুটি গোল করে বিজয়ী হয়। এই দৃঢ় মনোবলের জোরেই পাকিস্থান ফাইনালে স্পেনকে কোনক্রমে এক গোলে হারিয়ে দিয়ে স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেছে। আর ভারতকে দেশে ফিরতে হয়েছে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে। মেক্সিকো ওলিম্পিক, ব্যাঙ্কক এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্সিলোনা বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতকে পাকিস্থানের হাতে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ফিরে আসতে হয়। হকির শীর্ষাসন ভারত এইভাবেই খুইয়ে ফেলেছে।

ভারতের ক্রমাগত এই ব্যর্থতা আজ সমগ্র দেশবাসীর বিক্ষোভ ও মনোবেদনার সৃষ্টি করেছে। এর মূল কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হকির পরিচালক গোষ্ঠির আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় স্বার্থ ও ক্ষমতা লিপ্সার ফলে ভারতীয় হকি জগতে এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। দেশে প্রতিভার অভাব ঘটেনি, তরুণ খেলোয়াড়রা সেকথা প্রমাণ করেছেন। টিম নির্বাচনে কর্মকর্তাদের দলবাজী ও দেশের স্বার্থের ওপরে আত্মস্বার্থকে বড় করে দেখার ফলেই আজ আমরা ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে চলেছি।

যখনই এই ধরনের অনর্থ ঘটে পরিচালকগোষ্ঠী তখন সব দোষটা খেলোয়াড়দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দোষ স্খালন করেন। মেক্সিকো ওলিম্পিকে ব্যর্থতার জন্য তাঁরা গোলরক্ষক মুনীর ও কিটি, ব্যাক পার্থিবপাল, ধরম ও পুরবকস সিং, সেণ্টার হাফব্যাক জগজিৎ সিং, ফরোয়ার্ড ইন্দার সিং, তারসেম সিং, ইনাম-উর রহমান ও বলবীর সিংকে (পাঞ্জাব) বিতাড়িত করলেন। এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারত ভাল খেললেও ব্যর্থতার জন্য পরিচালকরা খেলোয়াড়দের দায়ী করলেন এবং তিনজন ফরোয়ার্ডকে বসিয়ে দিলেন। এঁরা হলেন —বলবীর সিং, হরবিন্দার সিং ও বলদেব সিং। ফলে বিশ্ব কাপ খেলার সময় ভারতীয় দলে নির্ভরযোগ্য সেণ্টার ফরোয়ার্ডের অভাব ঘটে এবং অনেকের মতে গোল করবার মত দক্ষ সেণ্টার ফরোয়ার্ডের অভাবেই বার্সিলোনায় ভারতীয় দল যথাযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়।

এবার কর্তারা কার ঘাড়ে দোষ চাপাবেন তা জানা যায়নি এবং জল ঘোলা করবার তালে থাকলেও কর্তারা এবার বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না। কারণ বিভিন্ন মহল থেকে কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি গুরুতর! আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং ভারতের সুনাম যাতে পুনরায় উদ্ধার করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হবেন।

সেকালের আমোদ প্রমোদ ও খেলাধুলা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের শিকার চিত্র

মানুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু আনন্দ চায়। শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। কাজের মাঝে মাঝে মানুষ চেয়েছে একটু আনন্দ। এই আনন্দ চাওয়ার ভেতর থেকেই নানা রকম আমোদপ্রমোদ ও খেলাধুলোর ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে পাশা খেলার কথা মহাভারতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত থেকে কাশীরাম দাস পদ্যছন্দে মহাভারত রচনা করেছিলেন। কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতে (সভাপর্বে) পাশাখেলার কথা উল্লেখ আছে:—

'হেনকালে শকুনি লইয়া পাশা সারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি।।
পুরুষের মনোরম দ্যুতক্রীড়া জানি।
দ্যুতক্রীড়া কর আজি ধর্ম নৃপমণি।।'

মহাভারতে আমোদপ্রমোদের কথাও উল্লেখ আছে। একদিকে মল্লযুদ্ধ, মৃগয়ার বর্ণনা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ধনুঃশর, গদা, অসি প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারের উল্লেখও মহাভারতের বহু স্থানে চোখে পড়ে। কাশীরাম দাস মহাভারতের আদিপর্বে দ্রোণাচার্যের কাছে রাজকুমারের সভা প্রসঙ্গে লিখেছেন:—

'রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্বত্র অভ্যাস।
ধনুখড়্গ গদা আদি সর্বত্র প্রকাশ।।'

মহাভারতে নৃত্যগীতের কথাও পাওয়া যায়।

বেদজ্ঞ পন্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর লেখা থেকে জানা যায়, ঋগ্বেদীয় শাক-সংহিতায় দ্যুতক্রীড়ার প্রধান উপকরণ অক্ষ বা পাশা। বৈদিক যুগে তিস্পান্নজন সম্মিলিত হয়ে পাশা খেলতেন। এদের মধ্যে একজনকে সত্যধর্মা (আখড়াধারী) বলা হতো।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'দ্যুতক্রীড়ার' কথা উল্লেখ আছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায় পাশা-খেলার কথা পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন:—

'মন্ত্র বলে সদাগর পাশাকৈল বশ।
ডাক দিয়া ধনপতি পাশা ফেলে দশ।।'

এককালে আমাদের দেশে মেয়ে এবং পুরুষ পাশা খেলতেন। বিষ্ণুপুরে গোল তাস নিয়ে খেলা হতো। অনেকে এই গোল তাসকে দশাবতার তাস বলে উল্লেখ করেছেন। ডকটর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেছেন, "সে যুগে পাশা খেলা খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগর গৌড়ের রাজার সহিত 'রাত্রিদিন খেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাসা।' মেয়ে পুরুষ পাশা খেলায় মত্ত হইয়া কর্তব্য কাজ অবহেলা করিতেন এরূপ বহু কাহিনী আছে। বিষ্ণুপুরে গোল তাস খেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পর্তুগীজরা এই তাসখেলা আমদানি করে। পায়রা উড়ান প্রতিযোগিতা একটি খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাওলের পদ্মাবতীতে চৌগাঁ খেলার উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমানে পোলো খেলার ন্যায়। গেন্ডুয়া অর্থাৎ কাঠের বল লোফালুফির খেলাও প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে চাঁচরী খেলার কথা আছে কিন্তু ইহা ঠিক কি রকম খেলা ছিল বলা যায় না। মল্লক্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল। কবিকঙ্কণ চন্ডীতে আছে —

'দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত
মল্লবিদ্যা শেখে অবিরতি'।

তারপর আখড়া-ঘরে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তির বৈঠক হইত। ঘনরামে ধর্মমঙ্গলে মল্লযুদ্ধ বা কুস্তির বিবরণ আছে। দৈহিক শক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ লোহার বাঁটুল চূর্ণ করা, বুকে বেলভাঙ্গা, মুঠা করিয়া সরিষা হইতে তৈল নিষ্কাশন, উর্ধ্বে তরবারি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা মুঠার মধ্যে ধরা প্রভৃতি মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে আছে। নৃত্যগীতের খুবই প্রচলন ছিল। চৈতন্যভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা আছে।"

মল্লক্রীড়ার কথা উল্লেখ আছে কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায় —

'তুলিয়া আখড়া ঘরে মল্লযুদ্ধ কেহ করে
মাল্লবিদ্যাগুলি চাপগারি।
লইয়া ঢাল খাঁড়া কেহ করে তোলাপাড়া
পশুবধে কেহ বা শিকারী।।'

পায়রা নিয়ে খেলার কথাও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন —

'সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিতমতি
পায়রা উড়ায় সদাগর।
ছাড়িয়া পাটের দোলা
সবে করে পাখী খেলা
পড়ে খসি ভূষণ অম্বর।।'

সেকালে যে ঘুড়ি উড়ানো হতো তাও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম ঘুড়ি নিয়ে হেঁয়ালির ছলে লিখেছেন:—

'বেগে ধায় রথ নাহি চলে এ পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া গা।।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে হে পন্ডিত দেহমতি।
অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি।।'

মুকুন্দরাম 'জলখেলা' প্রসঙ্গে লিখেছেন:—

'শঙ্খ পড়া বাজে সানি চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি
জল খেলা করে বামাগণ
হরিদ্রা কুঙ্কম আনি মিশায়ে কলসে পানী
কুলবধূ জলে করে রণ।।'

একদা ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা প্রভৃতিদের প্রধান আমোদ-প্রমোদ ও খেলা-ধুলো বলতে বোঝাত শিকার ও মৃগয়া। মৃগয়া করতে যখন বের হতেন সেই সময় সঙ্গে যেত বহু লোকজন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষও শিকার করতে ভালো-বাসতেন। বাঘ, হরিণ শিকার করে এবং মাছ ধরে আনন্দ করতেন। এই প্রসঙ্গে

সেকালের হাতির লড়াই
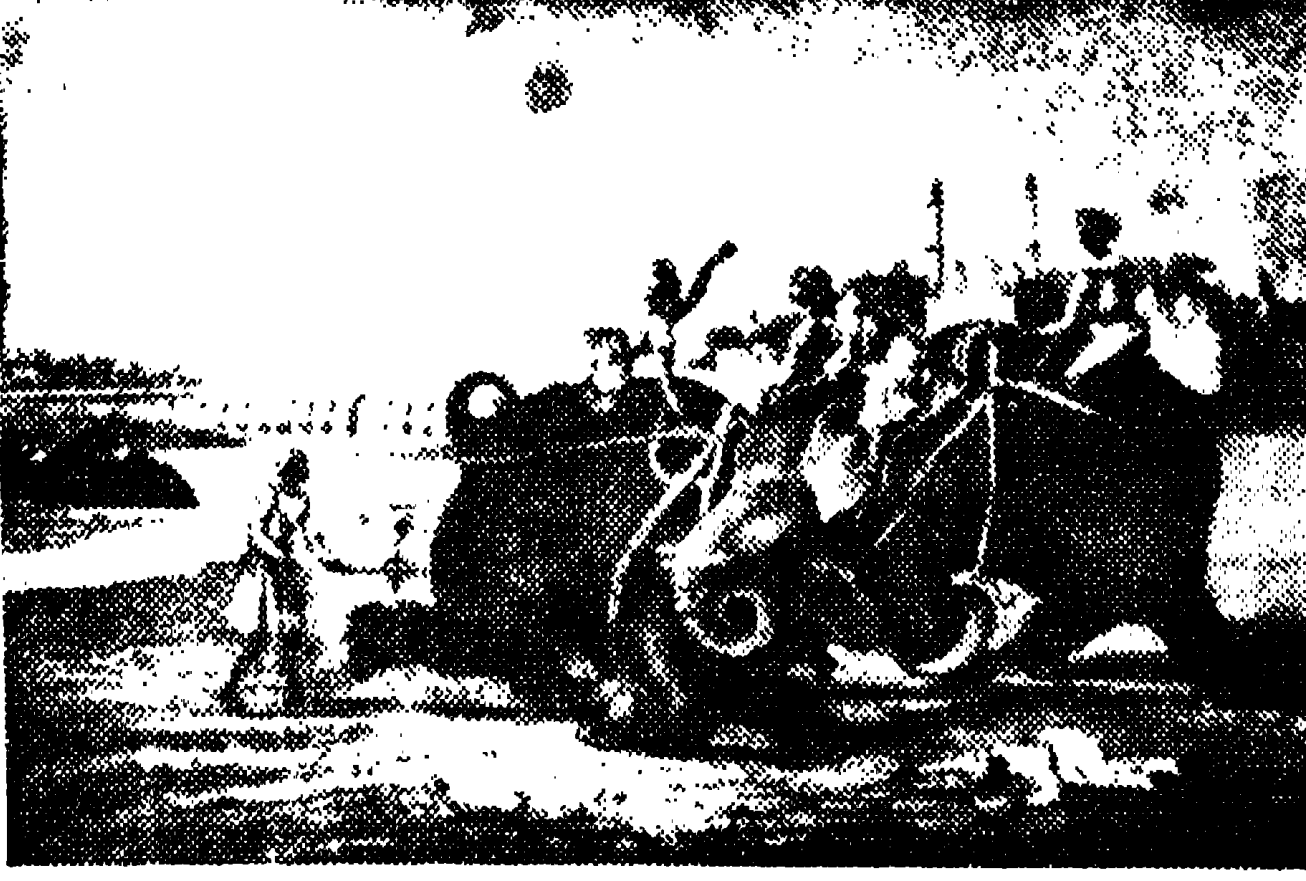
এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৩৭ সালে কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে ছিল জঙ্গল। শ্যামপুকুরের জঙ্গলে চিতা-বাঘ বাস করতো। ওই সময়ে বাঘ শিকারের কথা সেকালের একটি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষ নানাভাবে আমোদপ্রমোদ ও খেলা-ধুলা করতেন। কোথাও হতো কাঠি নৃত্য, কোথাও হতো যুদ্ধ নৃত্য বা ঢালি নৃত্য, কোথাও মুখোশ নৃত্য বিখ্যাত ছিল। নাচগানের মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ আমোদপ্রমোদ করতেন। বহু গ্রামে বা পল্লীতে ছিল কুস্তির আখড়া। সেই সব আখড়ায় লাঠি খেলাও হতো।

প্রাচীন ভারতে মেয়েরাও বাড়িতে নানা বিষয় শিক্ষালাভ করতেন। অর্জুন বৃহন্নলা সেজে বিরাট প্রাসাদে রাজকুমারীদের নৃত্য-গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন। 'পদ্মিনী' রমণীর লক্ষণ মধ্যে 'নৃত্যগীতে অনুরক্তি' একটা অপরিহার্য গুণ ছিল। বেহুলা এমন সুন্দর নাচতে গাইতে জানতেন যে, তাঁর নামই হয়েছিল 'বেহুলা নাচুনী'।

বাংলাদেশের বহু স্থানে একদা বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়ে মহলে নৃত্যগীতের আসর বসতো। বাড়ির মেয়েরা নাচগান করতেন। শুভ বিবাহ বাসর নাচগানের মধ্য দিয়ে আরও মধুর করে তুলতেন।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখেছেন —

'বৈষ্ণব নর্তনে নৃত্যকলা এদেশে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এদেশে নাচিবার কৌশল যে অদ্ভুতরূপে আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাঁচা সরার উপরি-ভাগে অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্পর্শ করিয়া নাচিতে পারিতেন, মনে হইত যেন তাঁহারা শূন্যের উপর নাচিতেছেন।

কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন :—

'না হবে ভূষণের ধ্বনি, না নড়িবে চীর,
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর।
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী,
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী।।
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচুলী,
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী।'

রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি এমন করিয়া নাচিবে যেন :—

'না নড়িবে গন্ড, মুন্ড, নূপুর কড়াই,
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই।
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুন্ডল,
না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল।'

এগুলি নিছক কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। অতি দ্রুতগতিতে স্থৈর্যের ভাব আনয়ন করি, ইহা তাহারই ইঙ্গিত।'

আমোদ-প্রমোদের জন্য সেকালে নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতো। যেমন—শঙ্খ, ঘন্টা, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, বিষাণ, বাঁশি ও নানা রকম তারের বাদ্য-যন্ত্র। খেলাধুলার মধ্যে কড়ি ও ঘুঁটির সাহায্যে নানা রকম খেলা হতো। যেমন বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আড়াই ঘর প্রভৃতি খেলা ছেলে এবং মেয়েরাও খেলতেন।

সেকালের কলকাতায় ইংরেজ সমাজে আমোদ-প্রমোদের কিছু অভাব ছিল না। ইংরেজদের অনেকগুলি কফি হাউস ছিল। কফি হাউসে বসতো জুয়ার আড্ডা। বিদেশীদের কয়েকটি হোটেলও ছিল সেই-সব হোটেলে বিদেশীরা গান-বাজনা করে আমোদ-প্রমোদ করতেন। হোটেলেও জুয়া খেলা হতো, বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা ছিল।

একদা খিদিরপুরে গার্ডেনরিচের কাছে একটি ঘোড় দৌড়ের মাঠ ছিল। আর একটি মাঠ ছিল কলকাতার ময়দানে। ১৭৮০ সালে ঘোড় দৌড়ের একটি ২০০০ টাকার চাঁদার প্লেটের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল। ১৮১৯ সাল থেকে কলকাতার ঘোড় দৌড়ের মাঠে ঘোড়ার বাজি শুরু হয়েছিল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিম দিকে কলকাতার বিখ্যাত রেসকোর্স অবস্থিত। এ রকম সুন্দর রেসকোর্স প্রাচ্য ভূখন্ডে কমই আছে। পূর্বে আখড়া অঞ্চলে একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। লর্ড ওয়েলেসলি ঘোড় দৌড় এবং অন্যান্য যাবতীয় জুয়া খেলার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

সেকালে ইংরেজ জকিদের বেশ খাতির ছিল। ঘোড় দৌড় ইংরেজ মহিলাদের কাছেও বিশেষ আনন্দের খেলা ছিল। ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে টাকার বাজি রাখারও রেওয়াজ ইংরেজ সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৭৯৩ সালে জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজে বসন্তকালীন ঘোড়দৌড় শুরু হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতার ঘোড়দৌড়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

কলকাতার গড়ের মাঠ ছাড়া টালিগঞ্জ এবং কলকাতা থেকে ১৪ মাইল দূরে বারাকপুরেও ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠ। দার্জিলিং শহরে লেবং অঞ্চলের সমতল মাঠেও ইংরেজরা ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। একদা শিলংয়ে গলফ্ খেলার মাঠ ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ খেলোয়াড়দের কাছে খুব প্রিয় স্থান ছিল। বহু দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়রা এসে গলফ্ খেলতেন।

সেকালে বিদেশীরা অনেকে গঙ্গায় নৌকা নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণ করতেন। গঙ্গার ঘাটে নানা রকম নৌকা ভাসতে দেখা যেত। কোনটি ছিল সাপের মতো, কোনটি ময়ূর-পঙ্খী নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ নর-নারী অনেকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতেন। সেকালে পাল্কি চড়ে বেড়ানোর রেওয়াজও ছিল।

সেকালের মুরগীর লড়াই

অনেকে ছিপ নিয়ে মাছও ধরতে যেতেন। এক সময় চাঁদপাল ঘাট, লালদীঘি, সার্কুলার রোড, পেরিন সাহেবের বাগান প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ নরনারীর বেড়াবার জায়গা ছিল। বহু ইংরেজ কলকাতার কাছাকাছি ঝোপ-জঙ্গলে শিকার করতে যেতেন। কলকাতার পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগ স্থলে বর্তমানে যেখানে এশিয়াটিক সোসাইটি ভবন একদা এই স্থানে ছিল ইংরেজ ঘোড়সওয়ারদের স্কুল।

একদা কলকাতার বৈঠকখানা-শিয়ালদা অঞ্চলে ছিল জকি ক্লাব। এটা ছিল সেকালের বিদেশী শিকারীদের সরাইখানা। শিকারীরা এই পথে দমদম অঞ্চলে বাঘ শিকারে যাবার সময় কিংবা শিকার করে ফিরে আসার সময় এখানে বিশ্রাম করতেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' সেকালের ধনী বাঙালীবাবুদের শখের নানা রকম কাহিনী বলেছেন। ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীবাবুরাও সেকালে আলাদা রেস কোর্স করেছিলেন। এই ঘোড়দৌড় হতো কলকাতার উত্তরে পোস্তার রাজা নরসিংহের বাগানে। ঘোড়দৌড়ের মতো সেকালে শখের থিয়েটারও হতো। তাছাড়া বাবুদের আরও একটি শখের খেলা ছিল, তার নাম বুলবুলির লড়াই। প্রত্যেক বছর শীতকালে ছাতুবাবুর মাঠে বুলবুলির লড়াই হতো। নবাবদের আমলে লখনউ শহরে বুলবুলির লড়াই এবং মুরগীর লড়াই ছিল সেকালের ধনীদের বড় আমোদের খেলা। সেকালের কলকাতার সৌখিন বাবুদের বুলবুলির লড়াই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে কবিতা রচিত হয়েছিল :—

'দুর্গাপুজো ঘণ্টা নেড়ে
খোকা হলে বাজে ঢাক।
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে
খাঁচায় পুরে কিনা কাক।।
বিষয়কর্ম গোল্লায় গেল,
লড়িয়ে কেবল বুলবুলি।
প্রকৃতি বিকৃতি হায় হায়!
মারা গেল লোকগুলি।।'

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পরে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর টাকা এসেছিল। এই সব ধনীর অধিকাংশই দালাল ও বেনিয়ানের কাজ করে প্রচুর জমির মালিক হয়েছিলেন। এদের অনেকেই ইংরেজের খেতাবও পেয়েছিলেন। বাড়িতে বারো মাসে তের পার্বণে উৎসব হতো। গানবাজনা বাইজীর নাচও হতো। অনেকে আতসবাজী পুড়িয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে আমোদ করতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখাতেও উল্লেখ আছে সেকালের 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষের কথা। এই বাবুরা দিনে ঘুমিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, বুলবুলির লড়াই দেখে, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজিয়ে, কবি, হাপ আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনে দিন কাটাতো।

সেকালে কলকাতায় ঘুড়ি উড়ানো বেড়েছিল। বহু রকমের ঘুড়ি উড়তো যেমন, ঢাউস ঘুড়ি, মানুষ ঘুড়ি, তাছাড়া আরও কত রকমের ঘুড়ি ছিল যেমন পেটকাটা, মুখপোড়া, চাঁদ-তারা, লেজ দেওয়া ইত্যাদি। অনেকে গড়ের মাঠে ঘুড়ির প্যাঁচ লড়তে যেতেন। সঙ্গে যেত ব্যান্ড পার্টি। প্রায় ২৫।৩০ বছর আগে কলকাতা শহরে ছেলেদের মধ্যে লাট্টুখেলা খুব বেড়েছিল। বহুবাজার অঞ্চলে একটি বিরাট বস্তি 'লাট্টুপাড়া' নামে পরিচিত ছিল।

সেকালে বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ নানা রকম খেলাধুলা করতেন। হা-ডু-ডু ও নুনকুঠী খেলা একদা গ্রামের মানুষের কাছে খুব প্রিয় ছিল। রসরাজ অমৃতলাল বসু বলেছেন, 'গুলিডান্ডাকে মার্জিত করিয়া ইংরাজ ক্রিকেট খেলার প্রচলন করিয়া ন্যাশানাল গেম বলিয়া গৌরব করে, আর আমরা 'ছোটলোকের খেলা' দুলেবাগদীর কাজ বলিয়া 'হা-ডু-ডু', 'নুনখাপসা' প্রভৃতিকে ঘরের বাহিরে করিয়া ফুটবলের মাঠে লাথি চালানর ইতরামি কস্ত করি।'

প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজা ও নবাবরা হাতীর লড়াই দেখে আমোদ করতেন।

সেকালে বাংলাদেশের মেয়েরাও যে সাঁতার শিখতেন তা এই সংবাদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। সংবাদটি ১৬ অকটোবর ১৮২৪ সালের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি হলো এই :—

'স্ত্রীলোকের সাহস। কএক দিবস হইল অষ্টাদশবর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থ আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াচ্ছলে কুতূহলে সন্তরণ দ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল ইহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।'

পবিত্র আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলার শক্তি অসীম। ইহা যুব সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করে। খেলাধুলার মোহিনী শক্তি তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় সুস্থ যুব সমাজকে নবপ্রাণের সঞ্চার করে।

পুরুষদের দেশান্তরী দৌড়

দেশান্তরী দৌড়

প্রশান্ত কুমার মিত্র

একটা মেশিন চালু রাখতে কী প্রচন্ড না কসরত! দক্ষকর্মী, কারিগরী বিদ্যা, মোটা টাকা মাইনে, আরো কত কি। জড় মেশিনের বুকে প্রাণের সঞ্চার করতে আধুনিক মানুষ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু যে মেশিন অটোমেটিক, প্রজাপতি ব্রহ্মার নিপুণ হাতের তৈরী, বিশ্বকর্মার কারিগরী শিল্পের সুনিপুণ নিদর্শন, সেই স্বয়ংচালিত মেশিনের প্রতি আমরা কতই না উদাসীন। হ্যাঁ, শরীরের সুস্থতা বজায় রাখার কথাই বলছি।

মানুষের একটা সহজ প্রবণতা হচ্ছে, যা সহজলভ্য, যার জন্যে মূল্য দিতে হয় না, তা মূল্যবান হলেও তার প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা মনে বাসা বেঁধে থাকে। হয়তো সেই প্রবণতাবশেই স্বয়ংচালিত শরীরের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির পরিচর্যার প্রতি আমরা এতটা বিমুখ। হয়তো সময়ের অভাবই এর কারণ। কিন্তু শরীরের ওপরের চাকচিক্য বজায় রাখতে আমাদের সময়ের অভাব হয় না। [illegible]

অভাব সুস্থতার উপকারিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও।

যেহেতু শরীরের নাম মহাশয়, অতএব যা সহাবে তাই সয়। তাই কলটি যখন বিকল হয় তখন ডাক্তারকে 'কল' দিয়ে আয়ুর দোহাই মানি। কিন্তু যে কারণগুলি বিকলের নেপথ্য পটভূমিকা রচনা করে সেই কারণগুলিকে আমরা বিধাতার অভিশাপরূপে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মহান করি এবং এই-ভাবে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাই।

ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখা গেলেও অনেকেরই কাছে ব্যায়াম গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর মধ্যে তাঁরা আনন্দ পান না। কিন্তু খেলাধুলার মধ্যে আনন্দ আছে, সেই সঙ্গে ব্যায়ামের উপকারিতাও। তাই শরীরতত্ত্ববিদেরা ক্রীড়ানুষ্ঠানেরই অনুরাগী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন কোন একটি খেলা নেই যা শরীরের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগকে সবল সতেজ ও সমৃদ্ধ করে। অবশ্য এ বিষয়ে সাঁতার এবং দৌড়ের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত-ভেদ আছে।

আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ ঘটলেও দৈহিক দিক থেকে সে হয়ে উঠছে অলস এবং কর্মবিমুখ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বার্জ এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বে কৃত্রিম উপায়ে যতটা দৈহিক শক্তি উৎপাদিত হয়েছে, তার শতকরা ৯৪ ভাগ শক্তির জন্ম হয়েছে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর সমবেত প্রয়াসে, আর বাকী ছ' ভাগের জন্য জাহাজ ভেসে চলায়, বায়ুচালিত যন্ত্রে, জলচালিত কলে এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা। কিন্তু আজ সেখানে দৈহিক শক্তি এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের মোট উৎপাদিত শক্তির শতকরা একভাগে। যান্ত্রিকতা এবং স্বয়ংচালিত যন্ত্রের ব্যাপক প্রসারই শারীরিক কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করেছে ও করছেও। শ্রমিকের কাজ আজ বহুলাংশে পর্যবেক্ষণ ও দেখাশোনা করার মধ্যেই সীমিত। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে যানবাহন আজ আমাদের দোরগোড়ায়। আরাম বিলাস এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক কর্মকুশলতার সুখ-সুবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করায় আমাদের শরীরের অংগ-প্রত্যংগের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে, ফলে পেশী ও স্নায়ুমন্ডলীর ক্ষতি হচ্ছে এবং পরিণতিতে অপুষ্ট দেহের জন্যেই সভ্য জগতের মানুষ আজ মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলছে।

অলস হয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সম্ভ্রান্ত সমাজ ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক অলিম্পিক ক্রীড়ার সূত্রপাত শুধুমাত্র অংগসৌষ্ঠব বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই হয়নি। তখন ক্রীতদাস শ্রমিকদের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত যাতে তারা সর্বদা যুদ্ধের জন্য দৈহিক শক্তির দিক থেকে প্রস্তুত থাকে। এই কারণেই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন এবং দৌড়ঝাঁপই ছিল যার বনিয়াদ। এর বহু শতাব্দী পর ব্রিটিশরা প্রাচীন অলিম্পিক গেমস অনুসরণ করে।

ওলাওঠা, মহামারী, দুরারোগ্য ব্যাধিকে আজ সভ্য মানুষ যেমন জয় করেছে, তেমনি সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে আর এক মহামারী ব্যাধিকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তা হল হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী শিরা-উপশিরার দুরারোগ্য ব্যাধি। হৃৎপিন্ডকে সুস্থ সবল রাখতে পারলে আধুনিক সভ্যতার বহু রোগ এবং উপসর্গকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা যায়।

দৌড়নোর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিশ্রামরত অবস্থায় যেখানে বড় জোর মিনিটে তিন থেকে চার লিটার রক্ত হৃৎপিন্ডের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত হয়, সেখানে নিয়মিত দৌড়লে মিনিটে ২০ থেকে ২৫ লিটার রক্ত সঞ্চালিত হয়। বেশি রক্ত প্রবাহিত হওয়ার অর্থ হার্টের পাম্প বেশি হওয়া অর্থাৎ হৃৎপিন্ডের মাংসপেশী বার বার সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়া। এই কারণেই প্রখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ উইল্হেম রাউক্স বলেছেন— 'funition creates organ', হৃৎপিন্ডের পেশীকে তার ক্ষমতানুযায়ী কাজ করিয়ে নিলে হৃৎপিন্ড তথা শরীর সবল ও সুস্থ হয়ে ওঠে। নিয়মিত দৌড়নোর মাধ্যমে আমরা হৃৎপিন্ডের চলাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্ডিওলজিস্ট জার্মান অধ্যাপক আলফ্রেড উলেনবার্জারের মতে— 'Regular running at a slow, steady pace practically rules out a Coronary'.

শরীরের চর্বি এবং ভুঁড়ি কমানো সব মানুষেরই কাম্য। নিয়মিত দৌড়ের মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় উপকার হয় আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। রক্তবাহী শিরা-উপশিরার দেওয়ালে জমে থাকা চর্বি প্রসারিত হওয়ার সময় বাধার সৃষ্টি করে এবং ফলে বিপত্তি ঘটে। কিন্তু নিয়মিত দৌড়দৌড়ি করলে অতিরিক্ত চর্বি ঝরে গিয়ে থ্রম্বোসিস হওয়ার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। ডাক্তারী শাস্ত্রে এমন নজিরও আছে, করোনারী থ্রম্বোসিসের পর চিকিৎসার অঙ্গরূপে পরিমিত দৌড়ের সাহায্যে জনৈক যুবকের যথেষ্ট স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতাতেও সে যোগদান করে।

একথা সত্যি যে দৌড়নোর থেকে হাঁটার আনন্দ অনেক বেশি। কিন্তু দৌড়ের মাধ্যমে যতটা উপকার হয় হাঁটা-চলার দ্বারা ততটা সম্ভব নয়। আধুনিক সভ্য মানুষের সময়ের মূল্য অনেক বেশি। তাই দেহের চাইতে মাথা খাটে বেশি। কিন্তু আয়ু বাড়িয়ে তুলতে হলে, সুস্থ নীরোগ দেহ গড়ে তুলতে হলে শরীরকে নিয়মমাফিক খাটাতে হবে। অথচ তাই নিয়ে দিনে আধ ঘন্টা সময় ব্যয় করতেও আমরা কার্পণ্য করি।

সব সময় অবশ্য ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় না। শহর অঞ্চলে পার্কের অভাব। আর ইচ্ছাশক্তির অভাবের পেছনে আরো একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে, সেটা হল একা একা দৌড়নোর লজ্জা। এই কারণেই পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেই দেশান্তরী দৌড় বা 'ক্রস-কান্ট্রি রানিং'-এর জনপ্রিয়তা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশান্তরী দৌড়ের বৈশিষ্ট্য হল, এক সঙ্গে বহু লোক দৌড়ায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে। যোগদানের ব্যাপারে বয়সের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলেই যোগ দিতে পারে। এতে আনন্দ আছে, ভ্রমণের উপকারিতা আছে, আলাপ পরি-

চিত্তির সুযোগ আছে, সর্বোপরি স্বাস্থ্যো-ধারের সম্ভাবনা।

বিশ্বের খ্যাতনামা দৌড়বিদ বা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নকে প্রশ্ন করে জানা গেছে যে, দেশান্তরী দৌড়কে তাঁরা অনুশীলনের নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিদেশে যে কোন খেলা—ফুটবল, সাঁতার, বক্সিং, বাস্কেট বল প্রভৃতির সূচনায় শিক্ষার্থীকে দেশান্তরী দৌড়ে যোগদান করতে হয়। সাধারণ দৌড়ের চাইতে দেশান্তরী দৌড়ে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দম ও গতি বাড়িয়ে তোলা যায়। এভাবে আধুনিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে উঠেছে এই দেশান্তরী দৌড়।

দেশান্তরী দৌড়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ আর তা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ নয়, স্বতন্ত্র ক্রীড়া হিসেবেও গুরুত্ব লাভ করেছে। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি এবং ইন্টারন্যাশনাল এমেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন দেশান্তরী দৌড়কে এ পর্যন্ত তিনটি অলিম্পিক গেমসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় এর কুলমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সঙ্গে বহু লোক দৌড়লেও ইউরোপীয় ক্রীড়া, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ বা অলিম্পিক ক্রীড়ায় মুষ্টিমেয় প্রতিযোগী যোগদানের সুযোগ পেয়েছে—অনেকটা ঘোড় দৌড় বা বাইচ প্রতিযোগীর মত।

দেশান্তরী দৌড় দু রকমের হতে পারে। যেমন ১৯১২, ১৯২০ ও ১৯২৪ সালের অলিম্পিক গেমসের ব্যক্তিগত এবং দলগত ক্রসকান্ট্রি অনুষ্ঠানে ফিনল্যাণ্ডের প্যাভো নুরমি চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

মেয়েদের দেশান্তরী দৌড়

আন্তর্জাতিক দেশান্তরী দৌড় প্রতিযোগিতাকে বে-সরকারীভাবে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে ১৯০৩ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইটালিতেও প্রতি বছর আন্তর্জাতিক 'ফোর উইন্ডমিল ক্রশ কান্ট্রি' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বের প্রবীণতম দেশান্তরী দৌড়বিদ হচ্ছেন ৯২ বছর বয়স্ক ইংরেজ জো ডেকিন। তিনি ১৯০৮-এর বিশ্ব অলিম্পিকে তিন মাইল দলগত দৌড়ের অন্যতম স্বর্ণপদক বিজেতা। তিনি এখনো নিয়মিত দৌড়ের অভ্যাস রেখেছেন এবং প্রতিযোগিতায় যোগদানও করে থাকেন।

দেশান্তরী দৌড়ে ছেলে এবং বড়রা

আজ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে দেশান্তরী দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষেও ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরী দৌড়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অনুশীলনের নির্ভরযোগ্য বনিয়াদরূপে সহিষ্ণুতা দম ধৈর্য ও গতি বাড়িয়ে তুলতে দেশান্তরী দৌড়কে কি আমরা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে পেরেছি? ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক আস্থার বিপরীতধর্মীতা এবং সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে উৎসাহী দৌড়বীরদের ভবিষ্যৎ মধ্যপথে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

দাবার ছকে পশ্চিমা ঝড় ববি ফিশার

মানস রায়
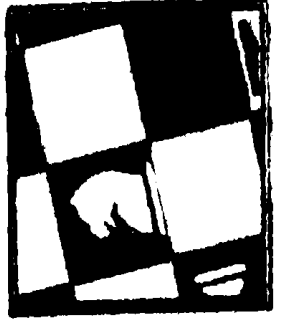
অগামী গ্রীষ্মে বিশ্ব-দাবাচ্যাম্পিয়ন বোরিস স্পাসকিকে তাঁর খেতাব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে যাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, তিনি ২৮ বছরের এক আমেরিকান দাবা-খেলোয়াড়, যাঁকে তাঁর ছোটবেলা থেকেই ভাবীকালের বিশ্ব-দাবাচ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করে আসা হচ্ছে। যুদ্ধোত্তর কালে এই প্রথম একজন নন-রাশিয়ান খেলোয়াড় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ করতে চলেছেন।

সেদিনের 'বয় প্রডিজি', আজকের পরিণত প্রতিভা ববি ফিশার নিজের দাবী অনুসারে পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ দাবা-খেলোয়াড়।

ববি ফিশারের ব্যাপারই এই রকম, তিনি সব সময়ই একটা না একটা 'স্টান্ট' দিয়ে চলেছেন। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই কোন না কোন গন্ডগোল পাকিয়ে ওঠে, কোন না কোন সংবাদের জন্ম হয়। এই গন্ডগোলের শিকার যে কেউ হতে পারেন, খেলোয়াড়, দর্শক, টুর্ণামেন্টের উদ্যোক্তা, দাবা জার্ণালিস্ট, অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব, এমনকি আমেরিকার জাতীয় দাবা সংস্থা, মায় বিশ্ব-দাবা সংস্থা পর্যন্ত।

বোৎভিন্নকের মত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নকে যিনি বলতে পারেন দাবা খেলতেই জানেন না, অ্যালেখাইনের মত খেলোয়াড়কে (যিনি অনেকের মতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়) যিনি দশজন দিকপাল খেলোয়াড়দের নামের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন (যদিও পরে ফিশার এটা সংশোধন করেছিলেন) সেই ফিশার যত আবোল-তাবোল কথাই বলুন না কেন, মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তিনি দাবার একজন দুর্ধর্ষ গ্র্যান্ডমাস্টার এবং বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন খেতাবের জন্যে একজন 'ক্যান্ডিডেট' হয়েছিলেন। কোন খেলাতেই কি সমতুল কৃতিত্ব কেউ দেখাতে পেরেছেন?

সেই ফিশার যখন মাত্র ১৮ বছর বয়সেই বিশ্ব-দাবাচ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, তখন তা দাবাখেলার পক্ষেই এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হিসেবে দেখা দেয়। ১৯৬২ সালের; 'ক্যান্ডিডেটস' টুর্ণামেন্টের পর রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টারদের বিরুদ্ধে 'প্রতারণা'র অভিযোগ এনে ফিশার ফাইড (বিশ্ব-দাবা সংস্থার সংক্ষিপ্ত ফরাসী নাম) পরিচালিত কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ৫ বছর সিদ্ধান্তে অটল থাকার পর ১৯৬৭ সালের 'ইন্টার-জোনাল' টুর্ণামেন্টে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেবারেও তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে মাঝপথে ক্ষান্ত দেন, যদিও নাম প্রত্যাহারের সময় প্রতিযোগীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন।

(এইখানে বলে রাখি, বিশ্ব-দাবা-চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতার ধারাটি এই রকমঃ—জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ - জোনাল টুর্ণামেণ্ট - ইন্টার জোনাল টুর্ণামেণ্ট - ক্যান্ডিডেটস টুর্ণামেণ্ট - মূলে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ। সমস্ত ধারাটি শেষ হতে ৩ বছর সময় লাগে।)

আর কোন দাবা-খেলোয়াড়ই মাত্র ২০ বছর বয়সের আগে নিজেকে এক জীবন্ত লিজেন্ড বা রূপকথায় পরিণত করার সুযোগ পাননি।

ববি ফিশারের পুরো নাম রবার্ট জেমস ফিশার। জন্ম ৯ই মার্চ, ১৯৪৩, শিকাগো শহরে। বাবা দেশত্যাগী জার্মান, মা পোলিশ, খানিকটা ইহুদী রক্ত আছে তার শরীরে, এবং ধর্মীয় কারণে শুক্রবারের সূর্যাস্ত থেকে শনিবারের সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি দাবা খেলেন না।

দিদি জোয়ানার কাছথেকে খেলা শেখেন ৬ বছর বয়সে, তারপর ধীরে ধীরে এ-খেলায় এমন মেতে যান যে, পড়াশুনা

ববি ফিশার

বোরিস স্পাসকি

আর বেশী করেননি, যদিও (কোথায় পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই) শোনা যায় ছাত্রাবস্থায় তাঁর বুদ্ধ্যঙ্ক নাকি ছিল ১৮৪! ছেলেবেলায় হেরে গেলে অনেক সময় কেঁদে ফেলতেন (যদিও সে-কথা আজ তিনি অস্বীকার করেন, এবং এই নিয়ে এক জার্নালিস্ট-বন্ধুর সঙ্গে তাঁর মামলা চলছে)। দিদি খানিকটা সমীহ করতেন।

নিজের মার প্রতি ফিশারের আচরণ কিন্তু মোটেই সন্তানসুলভ নয়, যদিও মার কাছ থেকে উৎসাহ না পেলে ফিশার এত দ্রুত এত উন্নতি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর মা এক সময় হোয়াইট হাউসের দরজায় ধর্ণা পর্যন্ত দিয়েছিলেন, ছেলেকে আমেরিকার জাতীয় দলের সংগে বিদেশে পাঠাবার দাবী নিয়ে। ছেলের জন্যে দাবা-প্রশিক্ষক চাই—এই মর্মে কাগজে বিজ্ঞপ্তিও দেন তিনি। এবং নানাভাবে টাকাজোগাড় ক'রে তিনি ছেলেকে বিদেশে পাঠাতেন প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্যে। বড় হয়ে ফিশার কিন্তু মাকে পারিবারিক আবাস থেকে একরকম জোর করেই বার করে দেন। ফিশারের মা এখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করে ইংলন্ডের নাগরিক।

খেলায় উন্নতিলাভের জন্যে ফিশার ছোটবেলায় ক্যাপারাব্লাংকার খেলা খুব মন দিয়ে পড়তেন, তাই পরিণত ফিশারের খেলাতেও ক্যাপারাব্লাংকার খেলার ছাপ রয়ে গেছে। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হবার পরই নাম করেন তিনি, কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালের আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পরই তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে আর কেউই এই প্রতিযোগিতা জিততে পারেননি।

আমেরিকায় দাবা খেলার উঁচু মানের জন্যে আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপকে একটি 'জোনাল' টুর্ণামেন্টের মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং প্রথম ৩ জন প্রতিযোগী সরাসরি 'ইন্টার জোনালে' খেলার অধিকার পান। ১৯৫৮ সালে ইন্টার জোনালে যোগ দিয়ে মোট ২৪ জন প্রতিযোগীর (যাদের বেশীর ভাগই নামকরা গ্র্যান্ডমাস্টার) মধ্যে যুগ্মভাবে ৫ম—৬ষ্ঠ স্থান দখল করেন। এর ভিত্তিতে, পরের বছর ক্যান্ডিডেটস টুর্ণামেন্টে যোগ দিয়েও যুগ্ম ৫ম-৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেন। এইভাবে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি বিশ্বের প্রথম দশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে নিজের নামটি পাকা করে নেন।

এর পর থেকেই ফিশারের খ্যাতি আকাশচুম্বী হয়ে ওপরের দিকে উঠেছে, যদিও অদূর ভবিষ্যতেই তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবেন, এমন আশা করা বোধহয় বাতুলতা ছিল। কিন্তু খ্যাতি ফিশারকে আচ্ছন্ন করে, ইতিপূর্বেই করতে শুরু করেছিল। ১৯৬২ সালের ইন্টারজোনাল টুর্ণামেন্টে প্রথম স্থান দখল তাঁর পক্ষে এক অসাধারণ কৃতিত্ব। বোধহয় এসময় থেকেই তিনি নিজেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে ভাবতে শুরু করেন। ৬২ সালেই হয় ক্যান্ডিডেটস এবং এই প্রতিযোগিতায় তিনি হন চতুর্থ। দুই প্রতিযোগিতার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম থাকার ফলে বোধহয় ফিশার ভালো করে তৈরী হতে পারেননি, যে অসুবিধা রাশিয়ার খেলোয়াড়দের পক্ষে কম ছিল। যাই হোক, প্রতিযোগিতার শেষে তিনি রাশিয়ার খেলোয়াড়দের প্রতারণার অভিযোগ আনেন।

ফিশারের বক্তব্য ছিল, রাশিয়ার খেলোয়াড়রা নিজেদের খুব কম চালে খেলা ড্র করে ফেলতেন, যাতে তাঁরা প্রত্যেকেই ফিশারের সংগে লম্বা লম্বা গেম খেলে তাঁকে পরিশ্রান্ত ও কাবু ক'রে ফেলতে পারেন। এই জন্যেই নাকি ফিশার আশানুরূপ ফল দেখাতে পারেননি। এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অতঃপর তিনি ফাইড পরিচালিত সমস্ত প্রতিযোগিতা থেকেই যোগদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই দুঃখজনক ঘটনা এবং ফিশারের পাল্টা কতগুলি অবাস্তব প্রস্তাবই দাবার ইতিহাসে 'ফিশার-বিতর্ক' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে ফিশারের অভিযোগ ধোপে টেঁকে না, একথা অনেক আমেরিকান খেলোয়াড়ই কবুল করেছেন। তবু, সব রকম সন্দেহ নিরসন কবার জন্যে ফাইড দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম প্রণয়ন করেন। প্রথমতঃ দাবা খেলায় দু' পক্ষের ৩০ চাল হবার আগে 'ড্র' স্বীকার করে নেওয়া বে-আইনী ঘোষণা করেন, যাতে কেউই অতঃপর সংক্ষিপ্ত ড্র করার আর সুযোগ পাবেন না। দ্বিতীয়ত, ক্যান্ডিডেটস টুর্ণামেন্টকে একটি পুরোদস্তুর 'নক-আউট' প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয় হোল, যার ফলে কারুর পক্ষেই আর পারস্পরিক বোঝাপড়া করার সুযোগ রইল না। এক ফিশারের সমালোচনার ফলেই এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়, তবু ফিশার তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

শুধু তাই নয়, '৬২ সালেই, ভার্ণায় অনুষ্ঠিত দাবা অলিম্পিকে ফিশার নিজেই বারবার এই '৩০ চালে ড্র'-র নিয়ম ভঙ্গ করেন। এ-বিষয়ে ফিশারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সদম্ভে জবাব দেন—এসব নিয়ম কম্যুনিস্ট প্রতারকদের জন্যে, আমার জন্যে নয়।

ফাইড ফিশারের এই নিয়মভংগ মেনে নেন খানিকটা খাতিরেই, যেন দুষ্টু ছেলের আবদার রাখার মত ব্যাপার আর কি।

ফিশারের এই রকম মেজাজী ব্যাপার স্যাপার এবং খামখেয়ালীপনার অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

যেমন, প্রথমবার আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত তিনি ৮-বার এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন। তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন যে, মাত্র ১১ রাউন্ডের এই প্রতিযোগিতা খুবই সংক্ষিপ্ত। সুতরাং এখন থেকে এই প্রতিযোগিতায়ও আর যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এবং নিজেই বলতে থাকেন যে, এর ফলে বিশ্ব-দাবাচ্যাম্পিয়ন হবার আশা তাঁর নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। তিনি চান প্রতিযোগিতাটি ২১ রাউন্ডের করা হোক, কিন্তু আমেরিকার দাবা কর্তৃপক্ষ তাঁর কথায় কান দেননি।

তবে আমেরিকার দাবা কর্তৃপক্ষ আরেকটি কাজ করেছিলেন। আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ একই সংগে বিশ্ব-দাবা প্রতিযোগিতার ৫নং জোনাল টুর্ণামেন্ট। এই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ৩ জন খেলোয়াড় ইন্টার-জোনালে যেতে পারেন। আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে না খেলার জন্যে ফিশার ইন্টার-জোনালে খেলার অধিকারই পেতে পারেন না। তবু অনেক চেষ্টা করে আমেরিকার দাবা কর্তৃপক্ষ ফাইড-কে রাজী করান, আমেরিকান জোনের কোন খেলোয়াড় যদি স্বেচ্ছায় ফিশারকে জায়গা ছেড়ে দেন, তাহলে ইন্টার-জোনালে খেলতে পারেন।

সেই সুবাদে ফিশারের একদা বন্ধু পল বেনকো ফিশারকে তাঁর জায়গা ছেড়ে দেন।

অথচ এই অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতি ফিশার একদিন কি দুর্ব্যবহারই না করেছিলেন।

ব্যাপারটা ঘটেছিল ওই '৬২ সালে 'ক্যান্ডিডেটস' প্রতিযোগিতার সময়ই
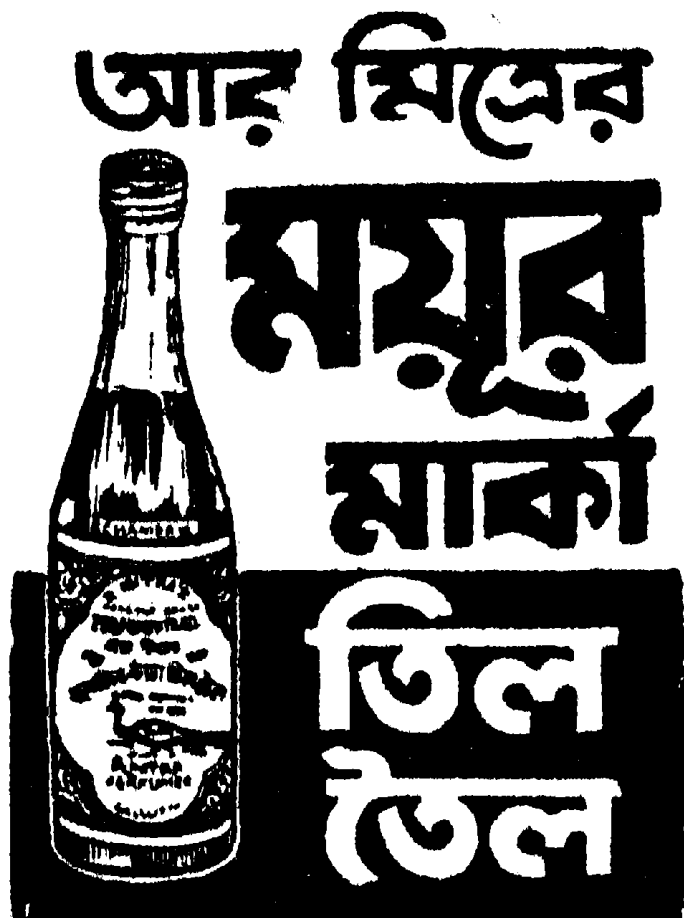
আমেরিকার দাবা কর্তৃপক্ষ ওই প্রতিযোগিতায় তাঁদের দুজন প্রতিনিধি ফিশার এবং বেনকোকে সাহায্য করার জন্যে গ্র্যান্ডমাস্টার বিসগাইয়ারকে পাঠান। মুলতুবী খেলার পর্যালোচনার সময় এরকম সাহায্য দরকার হয়। বেনকো বিসগাইয়ের কাছ থেকে এরকম সাহায্য চাইলে ফিশার গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করে দেন। তাঁর বক্তব্য, বিসগাইয়ার একমাত্র ফিশারকেই সাহায্য করতে এসেছেন।

তবে বেনকোর এবারের মহানুভবতার সদুত্তরই ফিশার দিয়েছেন। অনায়াসেই ইন্টার-জোনালে প্রথম হয়ে, ক্যান্ডিডেটসে তিনজন ডাকসাইটে গ্র্যান্ডমাস্টারকে (যার মধ্যে প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন পেট্রোসিয়ান পর্যন্ত আছেন) কচু কাটা করে তিনি এবারে অপেক্ষা করছেন বোরিস স্পাসকির বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত চাল প্রয়োগ করবেন বলে।

তবে স্পাসকির সঙ্গে খেলার ফলাফল কি হয়, তা কেউ বলতে পারেন না। ফিশার স্পাসকিকে মনে মনে খানিকটা ভয় করেন। স্পাসকি ফিশারের প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে অবশ্য বলেছেন, দাবার বোর্ডে তিনি কোন প্রতিপক্ষকেই ভয় করেন না, ভয় করেন সবচেয়ে বেশী নিজেকে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলায় স্পাসকি এবং ফিশার এপর্যন্ত মোট পাঁচবার মুখোমুখী হয়েছেন। এর মধ্যে দুটি খেলা ড্র হয়েছে, বাকী তিনটি খেলাই স্পাসকি জিতেছেন। সর্বশেষ ১৯৭০ সালে। অবশ্য, আগামী ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিসংখ্যানের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

একটি ছোট কথা এখানে বলে রাখি, প্রতিযোগিতা চলাকালীন ফিশার প্রায়শই তাঁর হোটেলের ঘর পরিবর্তন করেন, এবং সাধারণতঃ দিনে ১২ ঘণ্টা করে ঘুমোন।

তাঁর দাবা-প্রতিভাকে বাদ দিলে ফিশারের চরিত্রে অপ্রিয় দিকগুলিই বেশী। কাঁচা বয়সে জগৎ-জোড়া খ্যাতিই এর জন্যে দায়ী, এ-কথাই বলেন অনেকে। দাবা-জার্ণালিস্টদের দায়িত্বও এর পিছনে কম নয়, যাঁরা ফিশারের মধ্যে রাশিয়ার দাবা-আধিপত্য নষ্ট করার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রচার এবং খ্যাতির তুঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে তাল রেখেই ফিশার বোধহয় ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে তিনি একজন অপরাজেয় খেলোয়াড়। এইজন্যেই এক সময় তিনি নিজেকে ভুলের অতীত বলে দাবী করেছিলেন, যা আজ পর্যন্ত আর কোন দাবা খেলোয়াড়ই করেননি। তবে লক্ষণীয় ফিশার সম্প্রতি তাঁর আত্মম্ভরিতা অনেকখানিই কমিয়ে এনেছেন। সেরকম আয়োজকদেরকেও আজকাল আর বকেন না।

বিশ্ব-দাবাচ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় শুধু প্রতিভা থাকলেই চলে না, তার সঙ্গে প্রয়োজন আরো অনেক চারিত্রিক গুণ। ইচ্ছা-শক্তির প্রাবল্য বোধহয় ফিশারেরই সবচেয়ে বেশী, কিন্তু আত্মসংযম বা সেল্ফ-ডিসিপ্লিনের দিক দিয়ে স্পাসকি (এবং অন্যান্য সোভিয়েত গ্র্যান্ডমাস্টাররা) খানিকটা এগিয়ে রয়েছেন। রাশিয়ানদের আত্মসংযম শক্তিতে উন্নতির কথা আমেরিকার খেলোয়াড়রাই স্বীকার করেছেন।

ফিশার লেখাপড়া বেশী দূর করেননি, কোন বুদ্ধিগত অবলম্বন বা 'ইনটেলেকচুয়াল পারসুট' নেই তার। মনে হয়, এর ফলে তার দাবা-প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশে ব্যাঘাত ঘটতে বাধ্য। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে মনে রাখতে হবে দাবার জগতে সর্বকালের সেরা প্রতিভা যাঁরা—সেই লাসকার, ক্যাপারাব্লাঙ্কা, এ্যালেখাইন, ডঃ ইউভে, বোৎভিনিক, পেট্রোসিয়ান, স্পাসকি, তাল, স্পিসলফ এঁরা প্রত্যেকেই কমবেশী উঁচুদরের বুদ্ধিজীবী।

এবং জীবনের সুবর্ণ সময়ের প্রায় সাত-আট বছর হেলায় নষ্ট করে ফিশার নিজেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছেন কিনা কে জানে?

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান : স্পার্টাকিয়াড

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিশ্ব অলিম্পিক গেমসের পরই সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যাশনাল গেমসের গুরুত্ব। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে অলিম্পিক গেমস নিঃসন্দেহে প্রথম স্থান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ন্যাশনাল গেমস দ্বিতীয় স্থান পাওয়ার যোগ্য। আর বিভিন্ন দেশের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের তালিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যাশনাল গেমসের স্থান আজ শীর্ষদেশে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান স্পার্টাকিয়াড নামও পরিচিত। অলিম্পিক গেমস ছিল প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় ধর্মীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। প্রতি চতুর্থ বছরে এই অলিম্পিক গেমসের আসর বসতো। এই চার বছর সময়কে বলা হত অলিম্পিয়াড। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসরও প্রতি চতুর্থ বছরে বসছে, আধুনিক কালের প্রতিটি অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানের ঠিক আগের বছরে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম স্পার্টাকিয়াডের আসর বসেছিল ১৯২৮ সালে—সারা দেশব্যাপী ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর এই প্রথম। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন দেশ-বিদেশের প্রতিযোগীরা। সুদীর্ঘকাল পর ১৯৫৬ সাল থেকে নবপর্যায়ে ন্যাশনাল গেমস অর্থাৎ স্পার্টাকিয়াডের যে-আসর বসছে তা অভিনবত্বে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-মহলে নবযুগের সূচনা করেছে।

ঘটনাচক্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ১৯৬৭ সালের ৪র্থ এবং ১৯৭১ সালের ৫ম ন্যাশনাল গেমসও ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৬৭ সালটা ছিল মহান অক্টোবর বিপ্লবের ৫০তম পূর্তি বছর। অপর দিকে ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে খেলাধুলাকেও সমান মর্যাদায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান নানা ঘটনাবৈচিত্র্যে সমাকীর্ণ। বিগত পাঁচটি অনুষ্ঠানে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় এবং অঙ্গ প্রজাতান্ত্রিক রেকর্ডই ভাঙেনি, সেই সঙ্গে বহু ইউরোপীয় এবং বিশ্ব-রেকর্ডও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই ন্যাশনাল গেমসের চ্যাম্পিয়ান দলকে 'ইউ এস এস আর কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স' ট্রফি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। প্রথম চারটি অনুষ্ঠানে (১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬৩ ও ১৯৬৭) দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছিল মস্কো দল। ১৯৭১ সালে দলগত চ্যাম্পিয়ান খেতাব পেয়েছে রাশিয়ান ফেডারেশন দল। ১৯৭১ সালের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে অসাধারণ ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মহিলা-বিভাগে ১৭ বছরের জিমন্যাস্ট কুমারী তামারা লাজাকোভিচ, পুরুষ-বিভাগে বিশ্ববিশ্রুত ভারোত্তোলনকারী ভাসিলি আলেকসিয়েভ এবং দলগত অনুষ্ঠানে উক্রাইনের ওয়াটার পোলো দল। ভাসিলি আলেকসিয়েভ এক-দিনের আসরেই সাতটি বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যাশনাল গেমসে বিশ্ব-রেকর্ডের মোট সংখ্যা ছিল ১৮টি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যাশনাল গেমস আজও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। সারাদেশ জুড়ে এই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, কলকারখানার শ্রমিক, যৌথ ক্ষেত-খামারের কর্মী, অফিস কর্মচারী প্রভৃতি, অর্থাৎ সারাদেশের সর্বস্তরের

সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যাশনাল গেমসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পুরস্কার

জনগণ প্রাথমিক বাছাই পর্বের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তারপর ফাইনাল ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় মস্কোর প্রখ্যাত লেনিন সেণ্ট্রাল স্টেডিয়ামে। ১৯৭১ সালের ৫ম সোভিয়েত ন্যাশনাল গেমসের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। অপর কোন বড় দেশের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই হারে দেশের লোক অংশগ্রহণ করেন না।

অলিম্পিক গেমস আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইণ্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সদস্যভুক্ত দেশগুলিতে খেলাধুলোর সর্বব্যাপী বিস্তার। এ-ব্যাপারে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এক অভিনব শিল্পের পত্তন হয়েছে—নাম 'হেলথ্ ইণ্ডাস্ট্রি'। এই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল খেলাধুলো, ব্যায়াম এবং সুস্থ চিত্ত-বিনোদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাদেশের জনগণকে সুস্থ, সবল, কর্মঠ এবং দীর্ঘায়ু করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ খেলাধুলোর মূল্য যে-পরিমাণ উপলব্ধি করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীর অপর কোন দেশে নেই। ১৯৭১ সালের ৫ম সোভিয়েত জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ইণ্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ অ্যাভেরী ব্রাণ্ডেজ সশরীরে উপস্থিত থেকে অকপটে স্বীকার করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান যে-কোন দেশের পক্ষে অনুকরণীয়।

প্রথম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান, ১৯৫৬

ফাইনালে যোগদানকারীদের সংখ্যা ৯,২৪৪। ৯টি বিশ্ব রেকর্ড, ৩২টি জাতীয় রেকর্ড এবং ৩৫৫টি ইউনিয়ন রিপাবলিক রেকর্ড স্থাপিত হয়।

দলগত চ্যাম্পিয়ান : মস্কো দল।

দ্বিতীয় জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান, ১৯৫৯

ফাইনালে যোগদানকারীদের সংখ্যা ৮,৪৩২। ৩টি বিশ্ব রেকর্ড, ১২টি জাতীয় এবং ১৫৪টি ইউনিয়ন রিপাবলিক রেকর্ড স্থাপিত হয়।

দলগত চ্যাম্পিয়ান : মস্কো দল।

তৃতীয় জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান, ১৯৬৩

ফাইনালে যোগদানকারীদের সংখ্যা ১০,৫৩৪। ৪টি বিশ্ব রেকর্ড, ৬টি ইউরোপীয়ান রেকর্ড, ৩২টি জাতীয় রেকর্ড এবং ৩৮৯টি ইউনিয়ন রিপাবলিক রেকর্ড স্থাপিত হয়।

দলগত চ্যাম্পিয়ান : মস্কো দল।

চতুর্থ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান, ১৯৬৭

ফাইনালে যোগদানকারীদের সংখ্যা ১৬,১৩৮। ২০টি বিশ্ব রেকর্ড, ১২টি ইউরোপীয়ান রেকর্ড এবং ৪৬টি জাতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়।

চ্যাম্পিয়ান : মস্কো দল।

চিত্র-পরিচিতি : বরিস সাখালিন (রাশিয়া) : অলিম্পিক গেমস, বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা এবং ইউরোপীয়ান জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতায় মোট ১৭টি স্বর্ণ-পদক বিজয়ী

জিমন্যাস্ট তামারা লাজাকোভিচ

পঞ্চম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান, ১৯৭১

ফাইনালে যোগদানকারীদের সংখ্যা ৮,০০০। ১৮টি বিশ্ব রেকর্ড, ১৯টি ইউরোপীয় রেকর্ড, ৩১টি জাতীয় রেকর্ড এবং ২৩৭টি রিপাবলিক রেকর্ড স্থাপিত হয়।

জ্ঞাতব্য বিষয়

চ্যাম্পিয়ান : রাশিয়ান ফেডারেশন।

মস্কো শহর সোভিয়েত ইউনিয়নের খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র। মস্কো শহরে এপর্যন্ত এই ৭টি খেলার বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসেছে : ভলিবল, বাস্কেটবল, জিমন্যাস্টিক্‌স্‌, স্যুটিং, ফেন্সিং, স্পিড-স্কেটিং এবং মডার্ন পেন্টাথলন। ইউরোপীয়ন চ্যাম্পিয়ানশিপের অনুষ্ঠান হয়েছে এই খেলাগুলি নিয়ে : টেবল টেনিস, ব্যান্ডি, বোয়িং, ক্যানোয়িং, বাস্কেটবল, ওয়েটলিফ্‌টিং, বক্সিং।

অলিম্পিক গেমসের সমপর্যায়ভুক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থায়ী আসর এই মস্কো শহরে। প্রতি চতুর্থ বছরে এই আসর বসে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের খেলাধুলো অন্যান্য বড় বড় দেশের মত শুধু শহর-কেন্দ্রীক নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের শহর এবং গ্রামবাসীরা সমানভাবে খেলাধুলার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। ১৯১৭ সালে যেখানে রাশিয়ার গ্রামগুলিতে প্রাচীন খেলারও কোন সুব্যবস্থা ছিল না, আজ সেখানে ৭৯৭টি স্টেডিয়াম, ১,৫৩৯টি খেলার মাঠ, ১৬৫৮টি জিমনাসিয়াম হল এবং ২৭৭টি সুইমিং পুল। গ্রামের খেলাধুলা পরিচালনার জন্যে আছেন ২১,০০০ উচ্চশিক্ষিত কোচ। তাছাড়া আছেন ১৫,০০০ অভিজ্ঞ শিক্ষক।

খেলাধুলোয় গ্রামবাসীদের যে কি তীব্র আগ্রহ তা একটি ঘটনা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। ১৯৫৫ সালে সর্বদেশব্যাপী প্রথম গ্রামীণ ক্রীড়ানুষ্ঠানে যেখানে যোগদানকারীদের সংখ্যা ছিল ১,৫০০,০০০, সেখানে দ্বিতীয় গ্রামীণ ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রতিযোগী সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০০,০০০। গ্রামের অধিবাসীরা অলিম্পিক গেমস এবং বিভিন্ন খেলার বিশ্ব ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় পদক জয়ী হয়েছেন এমন ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করারই মত। তাছাড়া জাতীয়, বিশ্ব, ইউরোপীয় এবং অলিম্পিক রেকর্ডও যে ভেঙেছেন এমন নজির অনেক আছে।

অলিম্পিক গেমস

রাশিয়ার পদক জয়ের তালিকা

বছর	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
১৯৫২	২২	৩০	১৯
১৯৫৬	৩৭	২৯	৩২
১৯৬০	৪৩	২৯	৩১
১৯৬৪	৩০	৩১	৩৫
১৯৬৮	২৯	৩২	৩০
মোট	১৬১	১৫১	১৪৭

মহুয়াবনের মানুষখেকো

বিশ্বনাথ বসু

চামড়াসহ মাউন্টকরা বাঘের অতবড় মাথাটা ডালহৌসি স্কোয়ারের কাথ্‌বার্টসন এ্যান্ড হারপার-এর শো' কেসে দেখে আমেরিক্যান সাহেবটির তো চক্ষু ছানাবড়া।

'হোয়াট এ হিউজ জায়াণ্ট ইট্‌ ইজ?'

'ইস্‌—এটা যদি কোনরকমে হাতিয়ে একবার দেশে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি, তবে তো নিজের শিকার বলে বীরত্ব জাহির করে 'ডার্লিং'কে একেবারে তাক লাগিয়ে দেব।'

ভদ্রলোক দোকানের শো'-কেসের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক কিছু ভাবলেন। তারপর দোকানের কর্মচারীদের কাছ থেকে নীলমণি সামন্তের ঠিকানা নিয়ে অতি আশায় গাড়ী হাঁকালেন হাওড়ার গলিঘুঁজির পথে।

'ওয়ান থাউজ্যান্ড রুপিজ...? টু...? থ্রি...? ফোর...? ফাইভ থাউজ্যান্ড। প্লিজ মিঃ সামন্ত?'

'এক্সকিউজ মি মাই ফ্রেন্ড। ইট্‌ ইজ নট ফর সেল।'

নীলমণিবাবু সবিনয়ে উত্তর দিলেন।

'অল রাইট্‌ মিঃ সামন্ত, হাউ মাচ ইউ ওয়ান্ট এবাভ্‌ ফাইভ থাউজ্যান্ড?'

নীলুবাবু মুচকি হেসে এবারও সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অতি লোভে হাজারের অঙ্ক বাড়িয়েও নীলমণিবাবুকে রাজি করানো গেল না। যাবেই বা কি করে। হাজারিবাগের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাবন জয়শোয়ালের এটা যে ছিল 'বহুনি' বাঘ। অতবড় বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়াও যেমন সৌভাগ্যের কথা—ঐরূপ দুর্ধর্ষ নর-খাদককে শিকার করতে পারাটাও সেইরূপে অসীম কৃতিত্বের ঘটনা। কাজেই টাকার অঙ্কে এই কীর্তি-চিহ্নের মূল্যায়ন হয় না। তাছাড়া বাবন কোনদিনই অর্থলোভী নয়।

নাছোড়বান্দা সাহেব অনেকক্ষণ ধরে টাকার ঝুলি দুলিয়ে ঝুলোঝুলি করে না পেরে শেষ পর্যন্ত বিরক্তভাবে নীলমণি-বাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

মহুয়া কুড়োনোর মরশুম সুরু হয়েছে। আলো-আঁধারী ভোরটা যেন পাহাড়ী হিমেল হাওয়ায় মহুয়ার গন্ধে মাতাল হয়ে রয়েছে। সে গন্ধের টানে লোমশ ভাল্লুকের দল কখন কখনও হেলেদুলে চক্কর মেরে যায় মহুয়া বনে। ভরপেট মহুয়া খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে তাদের কোন কোনটা। আশপাশে অরণ্য-পল্লীর বুভুক্ষু বাসিন্দারা ... ওদের গা-সওয়া। কাজেই ঝুড়ি হাতে ... যখন আসে এরা তখন সমীহ ভরে ... জঙ্গলের কিনারার দিকে সরে যায়। ... বিসম্বাদ বড়একটা হয় না দুই দলে।

কিন্তু টিকার-চাঙের গ্রামের প... স্থিতিটা দাঁড়ালো সেদিন অন্যরকম... মহুয়ার মাতাল গন্ধে ভোরাকাটদের ... মাত্রায় না বটে, তবুও তাদের একটা ... মেরে এসে ওৎ পেতে রইলো। ভোররা... টিকার-চাঙের গ্রামের লাগোয়া মহুয়া ব... একটি ঝোপের আড়ালে।

খবর ছিল—উৎপাত চলছে ... কিছুদিন থেকে অন্য জঙ্গলে কাঠুরে... ওপর। চার-পাঁচজন লোকও পড়ে... ইতিমধ্যে। তাই গ্রামবাসীরাও ছিল সন্ত্র... গ্রাম্য শিকারীরাও ছিল সতর্ক ও সচেষ্ট... কিন্তু সুচতুর বাঘ তাদের কাছে ধরা ছোঁয়া দেয় নি কখনও কোন ফাঁকে।

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দল বেঁ... যায় মহুয়া কুড়োতে। সে কাজ ... নির্বিবাদেই চলছিল এতদিন। ভোরে... নিঃশব্দ আবছা বনে গা ছমছম যে না কর... এমনও নয়। কিন্তু বাঘের হাতে জীব... দিয়েও সুন্দরবনের বুভুক্ষু জেলে, কাঠু... মৌলীরা যেমন জীবিকার অপরিহা... তাগিদে বনে না গিয়ে পারে না—লালমাটি... পাহাড়ী বনের গরীব বাসিন্দাদেরও তেম... পেটের ধান্ধায় সব ভয়ভাবনা তুচ্ছ ক... বনের পথে পা না বাড়ালে চলে না।

প্রায় পনর বিশ একরের মহুয়াবন। বাঘ ওৎ পেতে ছিল সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু তার লাফের পাল্লার মধ্যে কেউ একলা গিয়ে পড়ে নি। মহুয়া-কুড়োনীরা ওদিকে ঘুরপাক খেয়ে গিয়েছে দু' একবার দল বেঁধে। তাই ব্যাঘ্রপুঙ্গব সুবিধে করতে পারে নি। হয়ত সাহসেও কুলোয় নি। এদিকে রোদ উঠেছে, বেলাও বাড়ছে। একটি দুটি করে ছোট ছোট দল গ্রামে ফিরছে। যারা তখনও আছে—দিনের আলোয় তারা বিক্ষিপ্তভাবে নির্ভয়ে ঘুরছে এ গাছ থেকে সে গাছের তলায়।

মানুষ ধরায় অভ্যস্ত বাঘ মানুষের হাল-চাল বোঝে। অন্তত কতকটা বুঝে নিয়েছে এ বাঘটাও গত কিছুদিনের অভিজ্ঞতায়। যদিও মহুয়াবনে ওৎ পাতার মতলব তার এই প্রথম। নিশ্চল নিঃশব্দে বসে আছে সে ঝোপের আড়ালে বুক-পেট মাটিতে সেঁটে। শুধু চোখের গোলকদুটি তার ঘুরছে এগাছ থেকে সেগাছের তলায় মানুষের ইতস্তত গতিবিধির উপর। লেজের ডগাও পাক খাচ্ছে উত্তেজনায়। শিকার লাফের পাল্লার মধ্যে আসছে না। মাঝে মাঝে কান ভেঙে পেশীবহুল সর্বদেহ সঙ্কুচিত করে ঝোঁক দিচ্ছে বিদ্যুৎগতি আক্রমণের। পরমুহূর্তে আবার সামলে নিচ্ছে। আক্রমণোদ্যোগে ডোরাকাটারা নির্ভুল হিসাবের পক্ষপাতী।

বয়স পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যেই হবে। পরিশ্রমী ও উৎসাহী যুবক। ঝুড়ি হাতে ঘুরে ঘুরে মহুয়া কুড়োতে কুড়োতে এগুচ্ছে। এখুনি ফিরতে হবে। বোঝা বেড়ে গিয়েছে। তবুও ঘুরছে শেষ বেশ যদি আরো কিছু কুড়িয়ে নেওয়া যায়। বৃদ্ধ মা, বাবা, ছোট ভাইবোন, স্ত্রী ও শিশু সন্তানাদি নিয়ে সংসারে এক গাদা খাইয়ে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের রোজগারেও পেট চলে না। তাই যাই যাই করেও মহুয়াবাগান তাকে টেনে রেখেছে আরো কিছু সংগ্রহের আশায়।

বাঘের ঘুরপাক-খাওয়া চোখের দৃষ্টি এখন এই যুবকটির দিকেই স্থির নিবদ্ধ। অন্যরা অনেকটা দূরে। লাফে নাগাল পাওয়া না গেলে তীরবেগে ছুটে গিয়েই ধরতে হবে হয়ত।

একটি প্রাণকাঁপানো বিকট গর্জন শুনে সঙ্গীরা ফিরে তাকালো সেদিকে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তারা দেখলো একটি বিশালাকায় বাঘ তাদেরই একজন সঙ্গীর গোটা মাথাটা কামড়ে ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। যে ক'জন ওরা আশপাশে ছিল ছুটে গিয়ে ধরফড়িয়ে গাছে উঠলো ও পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগলো। কয়েকজন চট্ করে গাছে উঠতে না পেরে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে দিল গ্রামের দিকে। সেদিক থেকেও তুমুল সোরগোলের আওয়াজ উঠলো। বাঘ বিরতভাবে দাঁতের কামড় না ছেড়েই কটমট করে তাকালো গাছে চড়া হল্লাবাজ লোক-গুলির দিকে। তারপর অতি রোষে কামড়েধরা লোকটাকে একটি প্রচন্ড ঝটকা দিয়ে কয়েক হাত দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে লেজ পাকাতে পাকাতে স্বাভাবিক চালে পা চালিয়ে ঢুকলো গিয়ে পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে একটা ঝোপের মধ্যে। এদিকে আক্রান্ত যুবকের অচৈতন্য দেহটা কয়েক মিনিট ধরে ধরাশায়ী অবস্থায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নিঃসাড় হয়ে গেল। বেলা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। তারিখ ১৯৬৭ সালের ১৭ই এপ্রিল।

এই ভয়াবহ ঘটনার পর সঙ্গীদের আর সাহস হয়নি গাছ থেকে নামতে। গ্রামবাসী-দেরও হিম্মতে কুলোয় নি ঘটনাস্থলে এগুতে। বরং তারা শহরের শিকারীদের খবর দেওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করলো। গ্রাম্য যুবকদের একজন তাই দেরী না করে ছুট দিল সাইকেল চেপে শহরের দিকে।

'চাতরা' হাজারিবাগের মহকুমা শহর। এই সেই অরণ্য-শহর-সিপাহী বিদ্রোহের দুর্ধর্ষ নেতৃদ্বয় মঙ্গল পান্ডে ও নাদির আলি খাঁ যেখানে তৎকালীন আঞ্চলিক বৃটিশ শাসকের কূটকৌশলে গভীর রাতের আচমকা আক্রমণে পরাজিত হয়ে নিহত হয়েছিলেন।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত হিংস্র বন্য পশু অধ্যুষিত এই চাতরা মহকুমার অরণ্যাঞ্চল ছিল সৌখীন শিকারীদের স্বর্গ-রাজ্য। এমন এক সময় ছিল যখন বিহারের বৃটিশ গভর্ণর স্যার রাদারফোর্ড ও তাঁর পত্নী লেডি রাদারফোর্ডের বাৎসরিক মৃগয়া-বিহারের তালিকায় এই চাতরা মহকুমা অগ্রাধিকার পেত।

মহুয়াবনের খবর সাইকেল আরোহীর মারফৎ চাতরা শহরে পৌঁছুলে চারিদিকে সোরগোল পড়ে যায়। মহকুমাশাসকও উদ্বিগ্ন হলেন। শহরের বন্দুকধারীরাও মুখচাওয়াচায়ি করলেন। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা সংবাদবাহককে পাঠালো জয়-শোয়ালদের বাড়ীতে এই দুর্ধর্ষ নরখাদককে মোকাবিলা করার যোগ্য লোক ঐ বাড়ীতেই আছে।

শিকার-প্রাণী আজ নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তবুও এতদঞ্চলে স্থানীয় ও বহিরাগত শিকারীমহলে চাতরার 'বাবনবাবু' একটি সুপরিচিত নাম। আসল নাম জগতেন্দ্রপ্রসাদ জয়শোয়াল-এর চেয়ে 'বাবন-বাবু' এই ডাকনামেই তিনি অধিক পরিচিত। বয়স পঁয়ত্রিশ পেরোয় নি। সাদাসিধে বিনয়ী ও মিতভাষী।

খবর যখন জয়শোয়ালদের বাড়ীতে পৌঁছুলো তখনও বাবনবাবুর ঘুম ভাঙ্গে নি। প্রতিদিনকার বহুবিধ কাজের ঝামেলার বিলিব্যবস্থা করে শুতে শুতে মধ্যরাত্রি গড়িয়ে যায়। ফলে সকালে উঠতে রোজই দেরী হয়। তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। বিছানায় পাশ ফিরে শুতে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বৈঠকখানার উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। 'বাঘে মানুষ মেরেছে' কথাটা কানে আসতেই এক ঝটকায় বিছানা ছেড়ে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাবন জয়শোয়াল বাইরে বেরিয়ে এলেন। সংবাদবাহকের কাছে সব শুনলেন। এও শুনলেন যে বাঘ তখনও মড়ি আগলে মহুয়াবনেই বসে আছে।

দেরী না করে বাবনবাবু হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর সামনে বহুলোক জড় হয়েছে। তার মধ্যে শট্-গান-ধারী তিন-চারজন স্থানীয় শিকারীও

উপস্থিত। আরো উপস্থিত সর্বক্ষণের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর বন্ধু সন্তোষবাবু—সন্তোষনারায়ণ সিং। হাতে তার .৩০০৬ বোরের রাইফেল। জিপগাড়ীটা বাড়ীর গেটেই ছিল। চেপে বসলেন বাবনবাবু উপস্থিত শিকারী ক'জন নিয়ে। স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখেন এক দঙ্গল নিরস্ত্র হুজুগে চেপে বসেছে জিপের পেছনে। নিষেধ করলেন তিনি। চোখ রাঙালেনও। কাজ হোল না কিছুই। কয়েকজন শুধু নড়েচড়ে বসলো। বাকীরা ঝুলতে রইলো গাড়ীর পেছনে। এ এক মহাবিরক্তিকর ব্যাপার। বাঘ-শিকারের ক্ষেত্রে বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু উপায় নেই। দেরী হয়ে যাচ্ছে। বাবনবাবু বাধ্য হয়ে জিপ চালালেন গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে।

শহর পেরুবার আগেই দেখা হোল মহকুমা-শাসকের সঙ্গে। খবর পেয়ে তিনিও রওনা হয়েছেন সরকারী গাড়ীতে। হাতে তাঁর একটি ২২ বোরের রাইফেল 'হর্নেট'। বাবনবাবু আড়চোখে এই কমজোরী হাতিয়ারটির দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন। বাঘের মত শক্তিশালী প্রাণী যদি এই ক্ষুদ্র রাইফেলটির শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হোত, তবে সেও হয়ত এই রাইফেলধারী সরকারী প্রশাসকের মুখের দিকে তাকিয়ে না হেসে পারতো না।

চাতরা-সিমারিয়া রোড ধরে এক মাইল এগিয়ে বাঁয়ে চার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভিতরে ঢুকলে পর মিলবে টিকার-চাপের গ্রাম। ধুলো উড়িয়ে দুটো জিপ যখন গ্রামে পৌঁছুলো তখন সেখানে প্রবল উত্তেজনা। নিহত যুবকটির আত্মীয়-স্বজনদের কান্না কানে এল। কোমলহৃদয় বাবনবাবুর চোখও জলে ভরে এল। জিপের স্টিয়ারিং-এ বসেছিলেন। ডানদিকের সিটে ঠেস দিয়ে রাখা নিজের রাইফেলটির দিকে একবার তাকালেন। ৩১৫ বোরের ম্যাগাজিন রাইফেল। বাঁটটি দু' ফালা হয়ে ফেটে গিয়েছে। তিন জায়গায় তার দিয়ে কষে বাঁধা। যদিও ম্যাগাজিন রাইফেল—তবুও বর্তমানে ম্যাগাজিনে কোন গুলী ঢোকে না। একবারে চেম্বারের ঐ 'হারাধনের একটি ছেলে'র মত একটি গুলির উপরই নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় সরকারী প্রশাসকদের জনৈক কর্তাব্যক্তি শিকারের শিক্ষানবিশি শেষ করেছেন এই রাইফেলের মাধ্যমে। বেচারা রাইফেলের তাই এই দুর্দশা। বুকে সাহস আছে—হাতের উপর বিশ্বাসও আছে।

কিন্তু সামনে অপেক্ষা করছে বনের হিংস্রতম নরখাদক শ্বাপদ। বাবনবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হোল। তবুও ভাবলেন—'বাঘ আমার ঐ প্রথম গুলিটি তো আগে হজম করুক তারপর দেখা যাবে।'

জিপ থেকে নেমে সবাই এগুলেন ঘটনাস্থলের দিকে। পেছনে হুজুগেদের মিছিল তখন আকারে আরও বেড়েছে। বাবনবাবু এর পরিণাম সম্বন্ধে সবাইকে বোঝালেন। এস-ডি-ও সাহেবও ধমক দিলেন। কেউ কোন গ্রাহ্যই করল না। শুধু শিকারীদের থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে চললো ওরা।

কাছেই মহুয়া বাগান। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছের ডালে ডালে লোক বসে মহুয়াসংগ্রহকারী ছাড়াও গ্রামের হুজুগেদের অনেকে ইতিমধ্যে দূরের গাছে গাছে চেপে বসেছে। উপর থেকে আঙুলের ইসারায় তারা শিকারীদের ঘটনাস্থলের দিক নির্দেশ করে দিচ্ছে। মহুয়াবনে ঢুকে বাবনবাবু একবার পেছনে তাকালেন। মানুষের মিছিল তখন মহুয়াবনের বাইরে থমকে গিয়েছে। পাশে তখন শুধু এস-ডি-ওসাহেব। বন্দুকধারী দু' তিনজন সঙ্গী কিছুটা পেছনে। বাবনবাবু রাই-ফেলের 'সেফ্‌টি' খুলে দিলেন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিকারীরা দেখলেন—লাস পড়ে আছে—কিন্তু বাঘ নেই। নীচের মাটিতে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে বোঝা গেল প্রকান্ড ডোরাকাটা বাঘ। কিন্তু শয়তানটা গেল কোথায়? সবচাইতে নিকটের গাছে চড়া লোক দু' একজন শিস দিয়ে শিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ও ইসারায় একটি ঝোপ দেখিয়ে জানালো বাঘ ঐ ঝোপের মধ্যেই কুকুরের মত উবু হয়ে বসে আছে। ওরা প্রথম থেকেই বাঘের ভয়ে গাছে উঠেছিল বলে স্বচক্ষে সব দেখেছে।

ঝোপটা ছিল মৃতদেহ থেকে পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে। বাবনবাবু ও এস-ডি-ওসাহেব এক পা দু' পা করে এগুলেন সেদিকে। বাবনবাবুর বিশেষ দুর্ভাবনা সাহেবকে নিয়ে। চাতরার জঙ্গলেই সাহেবের শিকারের হাতেখড়ি। সে আর কতদিনেরই বা কথা। এহেন শিকারী ·২২ বোরের রাইফেল নিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন ঐ দুরন্ত বিশালাকায় মানুষখেকোর মোকা-বিলায়। এই দুঃসাহস এক রকমের হঠকারিতা। দুর্ভাবনা দুই রকমের।

আক্রমণমুখী বাঘের মোকাবিলায় পয়েন্ট টু টু রাইফেল কোনই কাজে আসবে না। ফলে সাহেবের জান যাবে বা ও'র এলোপাতাড়ি গুলির ঘায়ে বাবনবাবু ধরাশায়ী হবেন। যদিও এস-ডি-ও নিজের বিভাগীয় দায়িত্বেই এসেছেন। তবুও বাবনবাবু বিলক্ষণ বুঝেছেন—দু'জনের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেন এখন একা ও'রই ঘাড়ে চাপলো। কিন্তু উপায় নেই।

নির্দিষ্ট ঝোপটি ক্রমে পঁচিশ ত্রিশ গজের মধ্যে এলো। সঠিক বোঝা না গেলেও বাঘের একটি চোখ যেন গাছগাছড়ার ফাঁক দিয়ে নজরে আসছে··· সাহেব বললেন। বোধহয় আর কয়েক গজ এগুতে পারলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে।

বাবনবাবু সাহেবকে থামতে ও ঝোপের দিকে নজর রাখতে বলে গাছের ওপরকার লোকদের দিকে তাকালেন। তারা আঙুলের ইসারায় জানালে বাঘ ঐ ঝোপের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এদিক থেকে শিকারীরা দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বাঘের একটি চোখ যেন এস-ডি-ওসাহেবের নজরে আসছে। বাঘ যখন তার দিকে আগত শিকার বা শত্রুর দিকে তাকিয়ে থাকে তখন তার দেহ থাকে নিশ্চল—চোখের দৃষ্টি থাকে নিষ্পলক। পাতালতার আড়ালে সে চোখ দেখে বিভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। যেটা বাঘ সামলাতে পারে না সেটা হচ্ছে তার লেজের ডগার আন্দোলন। সামান্য উত্তেজনা বা কৌতূহলের কারণ ঘটলেই লেজের ডগাটা ওদের আপনা প্রবণতায় নড়তে থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও হয়ত নড়ছিল। কিন্তু ঘন ঝোপের মধ্যে থাকায় শিকারীদের নজরে আসে নি।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান্ নাউ?' এস-ডি-ও সাহেব চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করলেন। 'ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্রসিড এনি মোর?' সাহেব ঢোক গিলে কথা শেষ করলেন।

'চালিয়ে।' বাবনবাবু রাইফেল বাগিয়ে রেখে ঝোপের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিলেন।

বাবনবাবু তো 'চালিয়ে' বলে খালাস। এখন সত্যই সামনের দিকে কিছুটা না চললে তো শিকারী হিসাবে ভদ্রলোকের কাছে মান থাকে না। সাহেবের রাইফেল মাটির সঙ্গে সমান্তরালে কোমর পর্যন্ত তোলা ও ঝোপের দিকে তাক্ করা। যাই হোক, ইতস্ততভাবে ও'রা সবে দু' চার কদম এগিয়েছেন। হঠাৎ ঝোপের দিক থেকে গর্-গর্ শব্দে একটা ভারী গলার চাপা টানা ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল। এদিক থেকে এস-ডি-ওসাহেবও তখনই কি না কি বুঝে রাইফেল বগল পর্যন্ত মাত্র তুলেই ধাঁ করে ঝোপ বরাবর ফায়ার করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে গাঁক করে একটা প্রচন্ড হুঙ্কার ছেড়ে বাঘ ঝোপ ছেড়ে পেছন দিকে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'রাইফেল কাঁধে না তুলে, নিশানা না করে এ কোন্ ধরনের গুলি হোল?' বাবনবাবু বিব্রত হলেন।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে সংগী-শিকারী ও হুজুগে দর্শকদের দ্বারা আর কি ধরনের হঠকারিতা হতে পারে বোঝবার জন্য বাবনবাবু আর একবার পেছনে তাকালেন। তিনি দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে রাইফেলের শব্দে ও বাঘের ডাক শুনে ভীতবিহ্বল দর্শককুল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালিয়েছে। কেউ কেউবা হ্যাঁচড়প্যাঁচড় করে কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে বা ফেলে চোখের সামনে ছোট বড় যে গাছ পেয়েছে তাতেই উঠে পড়েছে, অথবা, মরিয়া হয়ে ডাল ধরে ঝুলছে। সে এক কৌতুককর দৃশ্যই। বন্ধু সন্তোষনারায়ণ সিং তখন তাঁর .৩০০৬ বোরের রাইফেল বাগিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে। সংযত ও সতর্ক তিনি।

ঝোপের পেছনে চষাক্ষেত বরাবর বাঘের পায়ের দাগ পড়েছে। কিন্তু তারপর মিলিয়ে গেছে। ইতস্তত ঝোপঝাড়ের আনাচকানাচ দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত খোঁজা হোল। কিন্তু বাঘের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সূর্য মাথার ওপরে। ক্লান্ত মহকুমাশাসক প্রস্তাব দিলেন—'আজ ফেরা যাক। কাল এসে আবার খোঁজা যাবে।' বাবনবাবু রাজি হলেন না। বললেন—'আপনি স্যার যান। আমি জলের ধারে অপেক্ষা করবো। গরম কাল। সন্ধ্যার মধ্যে বাঘ জল খেতে আসবেই।' বাবনবাবুর জানা ছিল—সংস্কারান্ধ গ্রামবাসীরা কিছুতেই মৃতদেহটিকে বাঘের টোপ্ হিসাবে ব্যবহার করতে দেবে না। তাই তাঁর জলের ধারে বসার পরিকল্পনা।

তাছাড়া বাবনবাবু এও বুঝে নিয়েছেন যে বাঘ যখন মড়ি খেতে পারে নি তখন সে ক্ষিধের টানে রাতের মধ্যে নিশ্চিতই অন্য কোন লোকের উপর হামলা করবে। তাছাড়া সাহেবের রাইফেলের গুলিতে যদি বাঘ আহত হয়ে থাকে তবে সে বাঘ যন্ত্রণায় আরও হিংস্র হবে। তাই ওকে খুঁজে বের করে একেবারে নিকেশ করা শিকারীরই দায়িত্ব। সন্ধ্যার মধ্যে যতটা সময় পাওয়া যাবে সে সময় তিনি ঐ কাজেই ব্যয় করতে চান।

এস-ডি-ওসাহেব বেলা দুটো নাগাদ শহরে ফিরে গেলেন। বাবনবাবুও নিশ্চিন্ত হলেন।

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকজনও সাহস করে এগিয়ে এসেছে। গ্রামে গিয়ে কিছু খেয়ে নেবার জন্য শিকারীকে তারা অনুরোধ করলো। কিন্তু বাবনবাবু রাজি হলেন না। এখন পেটে কিছু পড়লেই শরীরে অবসাদ আসবে। পরিশ্রমের উৎসাহ কমবে। তাই তিনি গ্রাম থেকে কিছুটা খাবার জল আনিয়ে তেষ্টা মেটালেন। সহায়সম্বলহীন আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ওপর দরদ ও দায়িত্ববোধে এবং সংগী শিকারীর হটকারিতায় মনে জেদ জেগেছে। রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসার আগেই তিনি এই শয়তানের সংগে শেষ মোকাবিলা করতে চান।

'বাবনবাবু, আপনার শিকার নেশা কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া?' চাতরা শহরে জয়শোয়ালদের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে প্রশ্নটি আমি রেখেছিলাম।

'নেহি বিশ্বনাথবাবু, আপকা দোস্ত নীলুবাবু হামারা শিকারকা গুরু হ্যায়। উননে যবসে হামারা জিরনকা ভান্ডারাপর শিকার খেলনে আনে সুরু কিয়াথা উস্ টাইম্‌সে তো হাম হাফপ্যান্ট পিননেওয়ালা লেড়কা থা। উনকা শিকারকা খেল দেখকরকে ধীরে ধীরে হামারা মনমেভি শিকারকা সখ আগিয়া।'

শুনেছি কোন একটি ব্যবসায়িক সূত্রে হাওড়ার বিখ্যাত শিকারী নীলমণি সামন্তের সংগে চাতরার জয়শোয়াল পরিবারের পরিচয় হয়। অনেক বছর আগে ১৯৪৭ সালে। তখন চাতরা এলাকার জঙ্গল ছিল বুনো জন্তুতে ঠাসা। সুযোগ পেয়ে সামন্তবাবু ১৯৪৮ সাল থেকেই ঐ অঞ্চলে যাওয়া শুরু করেন। তখনকার বালক 'বাবন' ওঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। ঐ অঞ্চলের শিকারে নীলমণিবাবু বহু কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। আর ওঁর সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'বাবন' কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পড়ে শিকারে ঝুঁকেছেন ও পরবর্তীকালে স্বীয় ব্যবহার ও যোগ্যতায় সকলের স্নেহ, ভালবাসা ও প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন। গভীর মায়া ও মমতায় ভরা জয়শোয়ালের প্রাণ। তাই প্রতিবারই শিকার-প্রোগ্রামের শেষে নীলুবাবু যখনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতামুখী হন, বাবনের তখন চোখের জল যেন বাধা মানে না। শিশুর মত কাঁদতে থাকেন। অবাঙ্গালী কত মানুষের সঙ্গে তো মিশেছি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি চাতরার বাসিন্দা বিহারী 'বাবন' এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

বাঘ শিকারের জটলার মধ্যে দু-তিন মাইল দূরে থেকে একজন গ্রাম্য শিকারী এসে হাজির। নাম নারায়ণ সিং। এখানকার জংগল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। নারায়ণ সিং একটা গভীর জংলা জায়গার কথা বললে। সেটা বাঘের সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল বলে তার অনুমান। উৎসাহী গ্রামবাসীরাও ঐ জঙ্গল 'বিট' করে দিতে (জঙ্গল খেদিয়ে জানোয়ার বের করা) তৈরী। বাবনবাবু রাজি হলেন ও উপস্থিত সবাইকে উপদেশ নির্দেশ দিয়ে নারায়ণ সিং-এর কথিত এলাকার দিকে অগ্রসর হলেন। জঙ্গল-খেদানর প্রয়োজনে গ্রাম থেকে ঢোল আনতে বলা হয়েছিল। সেই ঢোল-বাজিয়েরাও ইতিমধ্যে এসে পেঁৗছে গেল।

চাতরা থেকে ত্রিবেণী সাহু নামে একটি ছেলে এসেছিল। তার উৎসাহটা একটু বেশী। সে চলছে আর পা পায়ে এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গলের আশেপাশে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। এসব হুজুগেরা কথা শোনার পাত্র নয়। তাই শ্রান্তক্লান্ত বাবনবাবু এদের সম্বন্ধে কতকটা দার্শনিকের মনোভাব। কিন্তু তাঁর চোখের সতর্ক দৃষ্টি প্রতিটি ঝোপঝাড়কে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করছে।

নারায়ণ সিং-এর কথিত এলাকা এসে গিয়েছে। পূর্ব নির্দেশমত বিটাররা বাঁদিকে বেশ কিছুটা দূরে দিয়ে জঙ্গলকে পাশ কাটিয়ে পেছন দিকে চলে যাচ্ছে। শিকারী ঘাঁটি নেবার পর ইসারা পেলে ওরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে জঙ্গল ভেঙ্গে সামনের দিকে এগুবে।

হঠাৎ ত্রিবেণী সাহু শিস দিয়ে শিকারীকে ডাকলো। বাবনবাবু চোখ ঘোরালে পর সে আঙুলের ইসারায় জানালো যে সে সামনের জঙ্গলে বাঘকে দেখতে পাচ্ছে। বাবনবাবু সতর্ক পায়ে সাহু যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার পর ডালপালার ফাঁক দিয়ে বাঘের ডোরাকাটা দেহের সামান্য একটু অংশ তাঁর নজরে এল। কিন্তু সেটি দেহের কোন অংশ ওখানে দাঁড়িয়ে তা কিছুতেই বোঝা গেল না।

বাঘের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অসাধারণ প্রখর। এত কাছে লোকের উপস্থিতি ও চলাফেরা তার কাছে নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নেই। তবু সে কাছে পিঠে অপেক্ষা করছে। এর একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে—পশ্চাদপসরণের চেয়ে প্রতিআক্রমণেই সে বেশী আগ্রহী।

বিপদের গুরুত্ব বাবনবাবু বুঝলেন। এবার ফস্‌কে এলে সে দু-একজনের জীবন না নিয়ে ছাড়বে না। গুলির আঘাত মারাত্মক হলেও মৃত্যুর আগে সে প্রতিপক্ষকে রক্তাক্ত ও বিপর্যস্ত করে যাবে। যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু তার দেহের কোন অংশ না বুঝে গুলি চালানো সমীচীন হবে না। বাবনবাবু নিরস্ত হলেন।

জঙ্গলের ওপাশে একটা অগভীর নালার মধ্যে বাঘ রয়েছে। গ্রাম্য শিকারী নারায়ণ সিং জানালে একটু ডান দিক দিয়ে ঘুরে এগুলে পর সামনের দিক থেকে নালার ভিতরটা নজরে আসতে পারে। পরামর্শটা যুক্তিযুক্ত মনে হোল। কিন্তু আশেপাশে যারা আছে তাদের নিরাপত্তা? এ এক মস্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির জটিল সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। বাবনবাবু পাশে তাকালেন। আগ্নেয়াস্ত্রধারী বন্ধুদ্বয় সন্তোষবাবু ও বিহারীলাল খাণ্ডেলওয়াল [illegible] দাঁড়িয়ে। [illegible] হাঁকের দেখা [illegible] দিতে এসেছিল [illegible] এসে [illegible] চৌধুরী সিং। কৌতূহলবশে একপা দুপা করে সেও এসে দাঁড়িয়েছে। আর দাঁড়িয়ে আছে গ্রাম্য শিকারী নারায়ণ সিং ও চাকলার কিষণজী [illegible]। [illegible] ইসারায় ওদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আগে তিনি তাদের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চান।

সঙ্গীরা নির্দেশ পালন করলো। ধীর পদক্ষেপে তারা পিছু হটে গেল। ইসারায় তাদের সতর্ক থাকতে বলে বাবনবাবু এবার আস্তে আস্তে ডানদিকে এগুলেন। প্রয়োজনীয় দূরত্বে পৌঁছে তিনি বাঁয়ে ঘুরে নালার দিকে চললেন। বাঘের আগেকার থাকা জায়গা তিনি ছাড়িয়ে এসেছেন বেশ কিছুটা দূরে। এর মধ্যে বাঘ যদি চলে গিয়ে না থাকে তবে নালার পাড় পৌঁছে জঙ্গলের ফালিটার পেছনে নালার বুকেই তিনি বাঘকে দেখতে পাবেন। দূরত্ব থাকবে তখন বড়জোর পঁচিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে।

আর কয়েক গজ দূরেই পাথরের খোয়া নুড়ি ভরা শুকনো নালা। শিকারী গতি সংযত করলেন। নিঃশব্দে অতি ধীর পদক্ষেপে এগুলেন। রাইফেলের সেফটিতে তাঁর আঙুলের স্পর্শ। না—ঠিক আছে। সেফটি তোলাই আছে। শিকারী রাইফেল উঁচিয়েই নালার কিনারে পৌঁছে সামনের দিকে ঝুঁকে চোখ ঘোরালেন বাঁদিক নালার বুকে। নালা ফাঁকা। বাঘ নেই। ব্যাপার কি? দেখা যাচ্ছে প্রায় পনের গজের মাথায় সরু নালা সামান্য বেঁকে ভেতরে ঢুকেছে। ফলে বাঁকের ওদিকটায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাঘের অবস্থান সেদিকেই ছিল। মুস্কিল হোল? এখন কি করণীয়? বাবনবাবু চিন্তিত হলেন। ঠিক সেই সময় নালার বাঁকের মুখে জঙ্গলের কিনারা থেকে একটি ছোট পাখী তিড়িং করে উড়ে গিয়ে গাছের উঁচু ডালে বসলো। অভিজ্ঞ শিকারী বাবন জয়শোয়াল জঙ্গলের এই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতকে তাচ্ছিল্য করলেন না। এ হয়ত কোন বিপদেরই পূর্বাভাস। রাইফেলটি তাঁর শিকারীসুলভ প্রবণতায় কাঁধে উঠে এল।

এই চরম রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্যে কয়েক সেকেণ্ডের অপেক্ষাও যেন অসহ্য। অপেক্ষা শিকারীকে আর বেশী করতে হোল না। বাদামীর ওপর কালো ডোরা-কাটা একটি বিশালাকায় দেহ নালার বাঁকটি ঘুরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল শিকারীর দিকে তাকিয়ে মাত্র গজ পনের দূরে। প্রতিপক্ষ দুজনেই যেন বিস্ময়াবিষ্ট।

শিকারী ভাবছেন—অরণ্যের অঙ্গিনায় ঈশ্বরের এ এক অতি ভয়াবহ অপরূপ সৃষ্টি। প্রকৃতিদেবী তাঁর সবুজ বক্ষে এই শক্তি ও শৌর্যের প্রতিমূর্তিকে লালন করেই যেন ধন্য ও গর্বিত। এর অভাবে অরণ্য অপূর্ণ। রাইফেল বাঘের কপালে নিশানাবদ্ধ। কিন্তু শিকারী স্থান, কাল, পাত্র বিস্মৃত হয়েছেন। ট্রিগার টানতে ভুলে গিয়েছেন। ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত ও বিমুগ্ধ তিনি।

ওদিকে বাঘ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিকারীর দিকে। তার দৃষ্টির প্রখরতায় যেন সর্বকালের ঘোষণা—'আমিই স্বাধিকারে অরণ্যজগতের আদিম জমিদার। আমারই এক্তিয়ারের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এতবড় স্পর্ধা কার আছে?' ক্ষণিক বিস্ময়ের আভাস অদৃশ্য হচ্ছে। চোখের চাহনিতে এখন ক্রোধ ও ক্রূরতার অভিব্যক্তি। সুঠাম পেশীবহুল দেহে উত্তেজনা বাড়ছে। লেজের সর্পিল আন্দোলনে তারই বহিঃপ্রকাশ।

বাঘের দেহ ক্রমান্বয়ে নীচু ও সঙ্কুচিত হচ্ছে। শিকারীরও সম্বিত ফিরছে। লাফের পাল্লার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি। বাঘ ছুটে তেড়ে আসবে। নিশ্চয়ই। তীব্র দ্রুত গতির সামনে গুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নাও লাগতে পারে। বাঘের কান ভাঁজ হচ্ছে। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে। আর দেরী নয়। বিদ্যুৎ ঝলকে রাইফেল গর্জে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটি গগনবিদারী গর্জনসহ বাঘ প্রচণ্ড রোষে কয়েক গজ সামনে এসে লাফিয়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই একটা ডিগবাজি খেয়ে কি না কি ভেবে পেছন ফিরে নালার বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গমনপথের দিকে নজর রেখে শিকারী এক মুহূর্তে বোল্ট টেনে রাইফেলে দ্বিতীয় গুলি ভরে নিলেন। প্রথম গুলি কি ব্যর্থ হোল? শিকারীর মন সন্দেহের দোলায় দুলছে।

নালার ওপারটা অপেক্ষাকৃত উঁচু ও কিছুটা ফাঁকা। ওখান থেকে বাঁকের ওধারের নালার অদৃশ্য অংশটা হয়ত নজরে আসতে পারে। শিকারী এক দৌড় নালা টপকে গিয়ে উঠলেন ওপারে। ওদিকে নালার বুকে ঠাসা আগাছার জঙ্গল। শিকারী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন নালার ভিতরকার আগাছার মাথা আন্দোলিত হয়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে দূরের দিকে এতে প্রমাণ হয়—বাঘ জঙ্গল ঠেলে নালা বরাবর এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। পাহাড়ী এলাকার উঁচু-নীচু জমিনে নজর আটকালো। তবুও বুঝতে অসুবিধা হোল না যে বাঘ নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে শিকারী এগিয়ে গিয়ে নামলেন বাঘ যেখানে নালার মধ্যে গুলি খেয়েছিল সেখানে এবং পরম বিস্ময়ে দেখলেন—গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘ যেখানে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়েছিল সেখান থেকে টকটকে লাল রক্তের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা নালার বুকে বরাবর বাঁক পেরিয়ে উল্টোদিকে চলে গিয়েছে। রক্তধারাটির দাগ দেখে মনে হচ্ছে—খোলা বোতল কাত করে কেউ যেন রক্ত ঢালতে ঢালতে গিয়েছে। এই প্রবল রক্তক্ষরণসুদ্ধ কপালের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে বাঘ কি করে পালাতে পারলো? ঘটনাটা শিকারীকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন করে তুললো। পরবর্তী অপরিহার্য দায়িত্বও এতে বাড়লো।

অর্থাৎ আহত বাঘ এখন যত বিপজ্জনকই হোক না কেন দৃঢ়চেতা বাবন জয়শোয়াল তাকে খুঁজে বের করবেনই। কারণ এই অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত নিয়ে বাঘ সব সময়ই এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে যে ওর ধারকাছ দিয়ে মানুষ গরু যা কিছুই যাক না কেন তার আর নিস্তার নেই। শিকারী আকাশের দিকে তাকালেন। পাহাড়ী এলাকায় সূর্য অনেকটা পশ্চিমে হেলেছে। এ অবস্থায় এমন কি দায়িত্বশীল শিকারীদের মধ্যেই অনেকে হয়ত সেদিনের মত অসমাপ্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখেন। কিন্তু বাবন জয়শোয়াল সে ধাঁচের লোকই নন। ঘটনাস্থলের কাছে পিঠের অরক্ষিত ও অসহায় লোকালয়গুলিকে তিনি পরদিন পর্যন্ত এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে রাখতে পারেন না। মনস্থির করে ফেলেছেন তিনি এবং দিনের আলো যেটুকু আছে সেটুকুই বাঘের সন্ধানে কাজে লাগাবেন।

গত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। বন্ধুবর নীলমণি সামন্তের অতিথি সহযাত্রী হিসেবে গিয়েছি হাজারীবাগ থেকে প্রায় প'য়তাল্লিশ মাইল দূরে উল্লিখিত চাতরার বনভ্যন্তরে 'জিরন' নামক গ্রামের মধ্যেকার বাবনবাবুদের খামারবাড়ীতে (ভাণ্ডারায়)। আগে আমার লেখা নীলমণি সামন্তের শিকার কাহিনীর মধ্যে বহু জায়গায় বাবনবাবুর নামের উল্লেখ আছে এবং তাঁর নামটি শ্রীসামন্তের মাধ্যমে আমার নিকটও সুপরিচিত। যদিও চাতরার অরণ্যাঞ্চলে পদার্পণ ও বাবনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এই আমার প্রথম।

'এর পূর্বে কি আপনি আর কখনও বাঘ শিকার করেছেন?' কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম বাবনবাবুকে। মাউণ্টকরা মাথা-সহ বিরাট বাঘের চামড়াটা সামনেই বিছানো ছিল।

'নেহি ভাই, এহি হামারা পয়েলা শের। মোকাতো হামেসাই মিলতা হ্যায়। লেকিন শেরকা উপার হামারা থোড়া দরদ হ্যায়। হাম জাদা নেহি ঘুমতা হ্যায় ইসকা পিছমে।'

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিকারী বাবনের যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী আমার কাছে প্রকাশ পেল তা হচ্ছে তিনি বেপরোয়া শিকারের বিন্দুমাত্র পক্ষপাতী নন। অত্যন্ত অতিথিবৎসল। বাইরে থেকে যাঁরা আসেন নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের শিকারে সহযোগিতা করেন। কিন্তু নিজে খুবই কম শিকার করেন। নইলে আমরা স্বচক্ষে দেখে এলাম-জিরনের খামারবাড়ীর সামনে ওঁদেরই ক্ষেতে প্রতি রাতে হরিণ নেমে ফসল নষ্ট করে। অথচ আমরা যে দুই সপ্তাহ তাঁর খামারবাড়ীতে ছিলাম তিনি মধ্যে মধ্যে সেখানে থেকেছেন, শোবার আগে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন। কিন্তু কোনদিনই রাইফেল হাতে পাশের ক্ষেতের ফসল বাঁচাতে নামেননি বা সে কাজে আমাদের অনুরোধও করেননি। অবশ্য বর্তমানে হরিণ শিকার বেআইনী হওয়ায় আমরাও কোনদিন কোথাও হরিণের উপর গুলি ছুঁড়িনি। কিন্তু ফসল রক্ষার জন্য নিজেদের ক্ষেতের বুকে হরিণের উপর গুলি ছোড়ায় তাঁর আইনগত অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁকে দেখেছি নির্বিকার। এ থেকেই বোঝা যায় বাবনবাবু নীতিগতভাবে শিকারে যথেষ্ট সংযমী।

কিন্তু বাঘ শিকারীরা নিজেদের নিরাপত্তার চিন্তায় সাধারণতঃ যে সংযমের পক্ষপাতি, টিকার-চাঙ্গের গ্রামের মহুয়াবনে প্রমাণ হোল বাবন জয়শোয়ালের প্রকৃতি তার সম্পূর্ণই উল্টো। তাই সময় নষ্ট না করে তিনি ঐ সিঙ্গল-শট্ রাইফেল হাতে এগিয়ে গেলেন আহত বাঘের খোঁজে রক্তের দাগ অনুসরণ করে।

রাইফেলের আওয়াজ ও বাঘের গর্জনে দূরে অপেক্ষারত দর্শক ও বিটারদের মধ্যে সোরগোল সুরু হয়েছে। অনেকে গাছের মাথায় চড়ে অনুসন্ধানরত শিকারীর দিকে নজর রাখছে। জীবন-মরণের ঝুঁকি নিয়ে শিকারী খুব সতর্কতার সঙ্গে শুকনো পাতা ও নুড়িকাঁকর এড়িয়ে নিঃশব্দে পা ফেলছেন।

রক্তের দাগ অনুসরণ করে শিকারী প্রায় গজ চল্লিশেক পেরিয়ে এসেছেন। রক্তের ধারা-চিহ্ন যেভাবে সুরু হয়েছিল এখনও ঠিক তাইই আছে। বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট হয় নি। শিকারী এখানে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্য একটি সরু নালা ডান দিকে বেরিয়ে গিয়েছে। সামনে কয়েক গজ দূরেই তার সংযোগস্থল এবং রক্তের দাগটি ডাইনে ঘুরে ঐ দ্বিতীয় নালার মধ্যেই ঢুকেছে। বাঘ ঐ সংযোগস্থল থেকে কত দূরে আছে? এত রক্তপাতের ফলে হয়ত এতক্ষণ মরে গিয়েছে। না মরলেও হয়ত মুমূর্ষু অবস্থায়। আক্রমণের হয়ত শক্তি নেই। তবুও এই দুর্ধর্ষ শক্তিশালী শয়তানকে বিশ্বাস নেই। ঐরূপ মারাত্মক আঘাত নিয়ে যে জানোয়ার এতদূরে আসতে পেরেছে, মানুষের ঘাড়ে একটা মরণকামড় বসাবার মত শক্তি যে তার এখনও নেই তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? শিকারীর মনে নানা দুর্ভাবনার ভীড়।

ওদিকে লোকজনের হল্লা শিকারীকে অন্যমনস্ক করছে। গাছের লোকগুলো উঁচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করছে। এর প্রতিবিধানের এখন আর সময় নেই—সম্ভবও নয়।

নালার বুকে যেখানে যেখানে মাটি আছে শিকারী অতি সন্তর্পণে সেই সব জায়গায় পা ফেলে গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে দ্বিতীয় নালার মুখে আড়ালে কিছু সময় চুপ করে বসলেন। কান পেতে রইলেন যদি সন্দেহজনক কোন শব্দ শোনা যায়। কোন সাড়া নেই। শুধু নিজের হৃদপিণ্ড যেন বুকের মধ্যে ঢেঁকি পেটাচ্ছে। ওদিকে হুজুগেদের কথারও কমতি নেই। বাঘ কতদূরে কি অবস্থায় জানা নেই। এই অবস্থায় গুঁড়ি মেরে বসে থাকাও বিপজ্জনক। কৌতূহলবশত বাঘ যদি ফিরে এসে উঁকি মারে তো দুজনের ছোঁয়াছুঁয়ি অনিবার্য।

আস্তে আস্তে হাঁটু সোজা করে কুঁজো হয়ে শিকারী একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেন এবং ঘাড় ঘুরিয়ে দ্বিতীয় নালার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। কি সর্বনাশ! বাঘ মাত্র দশ বারো গজ দূরে এদিকে ঘুরেই অপেক্ষা করছে। বুক পেট মাটিতে সেঁটে সে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদিককার লোকজনের সোরগোল শুনছে। আর দেরী নয়। সুবর্ণ সুযোগ। এখুনি হয়ত বাঘ এদিকে মাথা ঘোরাবে ও শিকারীকে দেখে ফেলবে।

বাবন জয়শোয়ালের সামনে এই মুহূর্তে এই হচ্ছে জীবনমরণের প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা। রাইফেল কাঁধে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। নির্ভয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে বুকভরে দম নিলেন। নেক্-শটই এই অবস্থার মোক্ষম মৃত্যু-আঘাত। স্থির লক্ষ্যে রাইফেল নিশানাবদ্ধ। ট্রিগারে একটু মৃদু চাপ। পর মুহূর্তের বজ্রনির্ঘোষ প্রাক্‌সন্ধ্যার রক্তরাঙা আকাশের নীচে বন থেকে বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে সকলকে সচকিত করলো।

বাঘ ধরাশায়ী। বে-হুঁস অবস্থায় সে এখনও বারে বারে ঘাড় তুলবার চেষ্টা করছে। পাথরের নুড়িগুলি মুখে পুরে দাঁতের চাপে কড়মড় করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। কি কড়া জান ব্যাটার! বাবনবাবু ইতিমধ্যে গুলী পালটে রাইফেল উঁচিয়েই রেখেছেন তার দিকে বলা যায় না।

'শের গির গিয়া'—'শের গির গিয়া!' গাছের ওপরকার সংবাদদাতারা চীৎকারে জানান দিলে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে হুড়মুড় করে হুজুগেরা ছুটে এসে বাঘকে ঘিরে ফেললো। ব[illegible]রা নেচে নেচে ঢাক-ঢোল পেটাতে শুরু করলে। এ যেন পাঁঠাবলির সময় কাঁসর ঘণ্টা ও ঢাক পিটিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করা। বাঘ কিন্তু তখনও দাপাদাপি করে উঠবার চেষ্টা করছে। শিকারী হতভম্ব বেকুবদের হঠকারিতায়। বাঘ যদি একবার উঠতে পারে তো কতজনের যে প্রাণ যাবে ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। যাই হোক সৌভাগ্যবশত বেহুঁস বাঘ আর উঠলো না। দশ পনের মিনিটের মধ্যে প্রাণত্যাগ করলো। বাবন জয়শোয়ালও নিশ্চিন্ত হলেন।

বাঘের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গিয়েছিল যে—একটি বন্দুকের বুলেট বহুদিন পূর্বে বাঘের দেহে বিঁধে পেশীর মধ্যে মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। অথচ উপরে কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না। এই আঘাতের যন্ত্রণা হয়ত পেশীর ভিতরে ছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সে মানুষখেকো হয়েছিল।

আরাম হারাম নেহি

কুমারেশ ঘোষ

ভেবেছিলাম, গল্পটা গল্পাকারেই লিখবো। কিন্তু ভেবে দেখলাম, হাতে সময় কম, পত্র-পত্রিকাতেও জায়গা কম (বিজ্ঞাপন আগে, না, লেখা আগে?), তাছাড়া এটা শর্টকার্ট মেডইজি-র যুগ, সবাই স্টেজে মেরে দেবার মতলবে আছে—কাজেই অযথা ঘেঁনিয়ে ঘেঁনিয়ে, পেঁনিয়ে পেঁনিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে গল্প লেখার মানে হয় না।

কাজেই আমার এই গল্পের মধ্যে ঐ যেমন, 'জয়ন্ত সেন নেকটাই ঠিক করতে করতে একটু হেসে পরে কেশে নিয়ে বললো, 'বা' পল্লবিতা রায় আধনিমীলিত আঁখি-পল্লবের ফাঁক দিয়ে দুখানা বুক-ধাকধাকাই কটাক্ষ হানলো'—এইভাবে না গেঁজিয়ে সোজাসুজি ব্যাপারটা বলি—

দপ্তর। ঘরে, অনেকগুলি টেবিল-চেয়ার। টেবিলের উপর পাহাড়-প্রমাণ ফাইল উঁচু করা। করণিকদের প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ফাইল অরণ্যে তারা ডুবে আছে। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তারা কেউ উপন্যাস পড়ছে. কেউ কবিতা লিখছে, কেউ ক্লাবের থিয়েটারের পার্ট মুখস্থ করছে, কোথাও চার জনে মিলে তাস পিটছে আর কোথাও বা সিনেমা থিয়েটার, ফুটবল, রাজনৈতিক আলোচনা চলছে।

এরই মধ্যে একটি ফাইলের গুহায় রাম আর শ্যাম দুজনে গভীর আলোচনায় মগ্ন—

রাম।। নাঃ, এভাবে আর চলে না। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যা হোক করে নাকে মুখে গুঁজে বাসেট্রামে ঝুলতে ঝুলতে আর অফিস করা যায় না।

শ্যাম।। যা বলেচিস মাইরি। তবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন না, এই যা রক্ষে। এই ধর্‌—বাহান্নটা রবিবার, তাছাড়া পুজোয় পনেরো দিন, পাওনা ছুটি একমাস, মেডিক্যাল লীভ পনেরো দিন, তাছাড়া ক্যাজুয়াল লীভ, মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চ লীভ, আর—

রাম।। আরো আছে বটে। ছাব্বিশে জানুয়ারী, পনেরোই আগস্ট, পয়লা বোশেখ, ব্যাঙ্কের হাফ-ইয়ারলি ক্লোজিং, গান্ধীজীর জন্মদিন, রবিঠাকুরের জন্মদিন, আর অরবিন্দেরটাও পাওয়া যেত, কিন্তু পনেরোই আগস্টের সঙ্গে মার্জ হয়ে যাওয়ার স্রেফ ফেঁচে গেল—

শ্যাম।। তা যাক। সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়-মার্কা ছুটিগুলো ধর্‌ এই যেমন ঈদ, মহরম, গুড ফ্রাইডে, বুদ্ধ পূর্ণিমা—হু' হু' বাবা, সেকুলার কান্ট্রি।

রাম।। হ্যাঁ, কালিপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, সরস্বতী পুজো, দোল, জন্মাষ্টমী—সব আছে বটে, তবে কতকগুলো আবার হাফ-হলিডে। দূর্‌, আধপেটা খাওয়ার মত। ওগুলোকে ফুল-হলিডে করে নেওয়া দরকার।

শ্যাম।। যা বলেচিস। এই ধর্‌ স্নান-যাত্রা, রথযাত্রা, উল্টোরথ, পুজোর ভাসান-গুলো, শিবরাত্রি, ঝুলোন, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি। তাছাড়া শনিবারগুলো অতি বিশ্রী। সেই সেজেগুজে অফিস আসতেই হয়, অথচ একটা হলিডে মুড থাকায় কাজে ঠিক মন বসে না।

রাম।। সত্যি, এর একটা বিহিত করা দরকার।

শ্যাম।। একটা জয়েন্ট পিটিশন করা দরকার।

রাম।। ছুটির একটা লিস্ট তৈরি করে বড়সাহেবকে দিয়ে সেটা পাশ করিয়ে নেওয়া বিশেষ দরকার।

শ্যাম।। কথাটা মন্দ নয়। আচ্ছা দাঁড়া লিস্টটা এখনই তৈরি করে ফেলা যাক। নে, তুই কাগজ নে। আমি ঐ বাংলা ক্যালেণ্ডারটা এনে বলে যাই— (রাম কাগজ নিয়ে বসলো, শ্যাম ক্যালেণ্ডার হাতে নিলো)—নে লেখ্, বংকিমের জন্মদিন, ক্ষুদিরামের শহিদ দিবস, রাণী রাসমণির জন্ম, বিপিন পালের জন্ম, মধুসূদনের জন্ম, বিদ্যাসাগরের জন্ম। আরো লেখ্, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীমার জন্ম, বিবেকানন্দের জন্ম। ও'র ভাই মহেন্দ্র দত্তের জন্ম, আর এক ভাই ভূপেন দত্তের জন্ম—ও'রাও কম ছিলেন না। হ্যাঁ, তারপর সরোজিনী নাইডুর জন্ম, উনি তো আমাদের বাংলাদেশেরই মেয়ে, তারপর সুরেন বাঁড়ুজ্জের জন্ম—ও'র একটা স্টাচু আছে না কার্জন পার্কে! লেখ্ কলকাতার সব পার্কের সব স্টাচুর জন্ম! ও'রা তো আমাদের মত রাম শ্যাম যদু হরি নন, ও'দের একটা স্টেটাস ছিল তাই স্টাচু হয়েছে! আর স্টেট ও'দের গৌরবে ছুটি দেবে না কেন?...ঐ দ্যাখ্ কথায় কথায় আসল কথাই ভুলে গেছি —দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম—একাধারে কবি রাজনীতিক শতবর্ষ। শতবর্ষে ফেলে দে অতুলপ্রসাদকে, আরো যারা যারা পড়ে লিখে ফ্যাল! হ্যাঁ, তারপর দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্তের জন্ম, আর ঐ যে রে, জেলে না খেয়ে মরলো—

রাম।। যতীন দাস—

শ্যাম।। হ্যাঁ, যতীন দাসের জন্ম। তারপর ঐ আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম, আচার্য ব্রজেন শীলের জন্ম—আরো সব আচার্য খুঁজে বার করতে হবে। নোট রাখ্। তারপর ঐ সব লিখিয়েদের নাম লেখ্। বংকিমচন্দ্র, রবি ঠাকুর তো হয়ে গেছে—এবার লেখ পরের গ্রুপ। শরৎ চন্দ্র, অনুরূপা দেবী, কেদার বাড়ুজ্জে, পরশুরাম।

রাম।। (লিখতে লিখতে) তা হলে তো আরো আছে—মানকুমারী, স্বর্ণকুমারী—

শ্যাম।। হ্যাঁ, লেখ সব কুমারীদের নাম।

রাম।। হ্যাঁ, লিখেছি।

শ্যাম।। এবার লেখ—অম্বুবাচী, বিপত্তারিণী ব্রত, গুরুপূর্ণিমা, লুণ্ঠন ব্রত—

রাম।। সে আবার কি?

শ্যাম।। (ক্যালেণ্ডার দেখিয়ে) এই দ্যাখ না লেখা আছে। ছুটির দিনগুলোকে লুঠ করে নেওয়াই দরকার, নইলে আর শান্তি নেই। নে লেখ, মনসা পুজো, পূর্ববঙ্গ মনসাপুজো—হ্যাঁ, এটাও হওয়া দরকার। কারণ পূর্ববঙ্গের বা বাংলাদেশের প্রায় সব হিন্দুই এখন পশ্চিমবঙ্গে। তাদের যেমন জায়গা দেওয়া হচ্ছে, তেমনি ছুটিও দিতে হবে—

রাম।। হুঁ, তারপর?

শ্যাম।। লেখ—আলোকামাবস্যা—

রাম।। সে আবার কি! সোনার পাথরবাটি।

শ্যাম।। হয়তো তাই। তুই লিখে বা তো! হ্যাঁ রক্ষাবন্ধনম, হরিতালিকাব্রত, ইতুপুজো, কেতুপুজো, গুহষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী, নীল ষষ্ঠী! যদি জামাইষষ্ঠীর ঘটা থাকতে পারে, তবে এসব ষষ্ঠীই বা ভেসে যাবে কেন? একে তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে যা ষষ্ঠীর রাজ্যপাট কেড়ে নিচ্ছো নেটিভ প্রিন্সদের মত। অন্তত ভদ্রমহিলার নামের ছুটিগুলো তো চালু হওয়া দরকার।

রাম।। তা বটে।

শ্যাম।। তাছাড়া ঐসব ষষ্ঠীতে গিন্নীরা উপোস করলে তাদের মাথা ধরে যাবেই। কাজেই রান্না হবে কী করে? আর রান্না না হলে কী খেয়ে আসবো অফিসে? উপোস করে তো আসতে পারিনে।

রাম।। ঠিকই তো।

শ্যাম।। তারপর আরো লেখ্, শালাশালীর জন্মদিন, ভাই ফোঁটা—ঐসব দিনে গিন্নীকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি যেতেই হবে। এইসব ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে তো ডোমেস্টিক শান্তি ভঙ্গ করতে পারিনে! হুঁ, তারপরে আছে বিবাহ বার্ষিকী। ওটার আজকাল রেওয়াজ হয়েছে। ঐদিন গিন্নীকে সঙ্গে নিয়ে কিছু কিনে-কেটে দেওয়া, সিনেমা দেখানো, খাওয়ানো—এসবের দরকার নেই? শুধু ঘাড় গুঁজে কলম ঘসলেই হলো! হ্যাঁ, তারপর ছেলেমেয়েদের জন্মদিন তো আছে। তাছাড়া, অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে বৌভাত, গিন্নীর সাধভক্ষণ—

রাম।। সাধভক্ষণ!

শ্যাম।। নিশ্চয়ই। এজন্যে দায়ী কে? তুমিই তো! আর সেদিন বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলার সময়ে তুমি এখানে ফাইলের মধ্যে ডুব মারলে চলবে কেন?

রাম।। সেটা অবশ্য একটা কথা। (লেখা থামিয়ে) হুঁ, তাহলে তো প্রায় তিনশো প'য়ষট্টি দিনেরই ছুটির ব্যবস্থা হয়ে গেল!

শ্যাম।। তা তো যাবেই। তবু তো ময়দানের খেলা, মনুমেন্টের মিটিং, ভি-আই-পি দেখার ছুটি, স্ট্রাইক, মিছিল ইত্যাদি ধরাই হয়নি।

রাম।। তাও তো বটে!

শ্যাম।। নে, এখন ঐ লিস্টের মাথায় লেখ্—এতদ্দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ছুটির তালিকা অনুযায়ী আগামী মাস হইতে আমাদিগকে ছুটি মঞ্জুর করিতে আজ্ঞা হয়—

রাম।। আজ্ঞা হয়টা কেমন হলো না? বরং 'নির্দেশ দিতেছি' লেখাটাই বোধহয় জোরদার হবে—

শ্যাম।। না, না। ওটা এটিকেট। আগে ইংরেজ আমলে, জানিসনে,চিঠিতে বাঁশ দিয়েও লেখা হতো—ইয়োর মোস্ট ওবি-

ডিয়েস্ট সারভ্যান্ট। তুই লেখ্ তো। বরং লিস্টের তলায় লেখ্—আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে অফিস ছাড়তে হবে। জয়হিন্দ্।
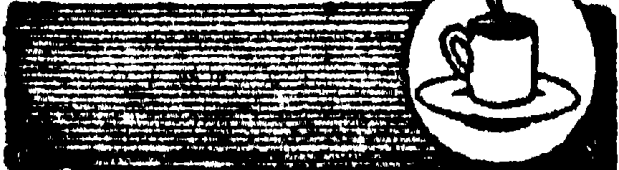
রাম।। অফিস ছাড়তে হবে—ও'দের, না আমাদের?

শ্যাম।। সেটা যে যা বুঝে নেয় নিক—লেখ্। (লেখা হলে) হ্যাঁ দে, সই করি। তুইও কর। তারপর সবাইকে দিয়ে সই করিয়ে বড়সাহেবের ঘরে পাঠাতে হবে। আরো এক কাজ করতে হবে। এই ছুটির লিস্ট অন্যান্য অফিসের ইউনিয়নের সেক্রেটারীদের পাঠাতে হবে, তাঁদের অনুরোধ করতে হবে—এই লিস্ট অনুযায়ী ছুটি তাঁরাও যেন দাবি করেন। এবং পরে মিছিল করে মনুমেন্টের তলায় একটি বড় গোছের মিটিং ডাকতে হবে। সেজন্যে নামের হ্যাংলা অথচ টাকার কুমীর এমন একটা প্রেসিডেন্ট খুঁজে বার করতে হবে। সেসব প্রোগ্রাম পরে—

কয়েক মাস পরে।

আমার এক বন্ধু আর-এম-এস'এ কাজ করে। সে একখানা খামের চিঠিকে প্রেমপত্র ভেবে খুলে তার মধ্যে যে চিঠিখানা পেয়েছিলো, সেখানার হুবহু বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশ করলাম—

ডিয়ার স্যার,

আপনাদের ২৭৫৩।৬৪নং পত্র তাং ৩।২।৭১ পাইলাম। আমাদের মাল মজুত থাকা সত্ত্বেও আপনাদের সাপ্লাই করিতে পারিব না বলিয়া দুঃখিত। কারণ আমাদের অফিসের কর্মচারিবৃন্দ ছুটি উপভোগ করিতেছেন এবং সেজন্য আমাদের অফিসের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ। এমন কি, টাইপিস্ট না আসায় এই চিঠি হাতে লিখিতে হইতেছে। মাসের পয়লা তারিখে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য অফিস খোলা রাখিতেছি—কর্মচারীদের মাহিনা পেমেন্ট করিবার জন্য।

যাহা হউক, আমরা সবিনয়ে জানাইতেছি যে, একটি অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের কথাবার্তা চলিতেছে এবং আমাদের কোম্পানীর ভার ভবিষ্যতে তাঁহারাই গ্রহণ করিবেন এবং আপনাদের অর্ডারমত মালগুলি শীঘ্রই তাঁহারা সাপ্লাই করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছি। এইসূত্রে জানাই, আরও অনেক বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠান নিষ্কৃতি লাভের উপায় খুঁজিতেছেন এবং আপনারা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

নিবেদন ইতি—

আরও কিছুদিন পরে সংবাদপত্রের খবর—পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী সংঘের চাপে পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে কাজ করিবার দিন আর পাওয়া যাইতেছে না। সব দিনগুলিই নানাবিধ ছুটিতে শেষ হইয়া যাইতেছে। বহু বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠানের দরজায় প্ল্যাকার্ড মারা হইয়াছে : আরাম হারাম হৈ। ইহাতে বঙ্গীয় জনগণের মনে কর্মবিমুখতারও ভাব আসিতেছে। এই আশংকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজকর্ম করিবার দিন আরও বাড়াইয়া দিবার প্রয়োজন হওয়ায় আরও ৩৬৫ দিন এক-এক বৎসরে ধরা হউক। তাহাতে ৭৩০ দিনে বৎসর গণনা করা হইবে এবং কাজকর্মের জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বঙ্গীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পরিষদ দাবি করিয়াছেন—ভারতীয় মতে ৬০ বিপলে ১ পল, ৬০ পলে ১ দণ্ড ইত্যাদি এবং ইংরাজী মতেও ৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট, ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা, যদি হইতে পারে তবে ৬০ ঘণ্টায় ১ দিন, ৬০ দিনে ১ মাস এবং ৬০ মাসে ১ বৎসর হইবে না কেন? তাছাড়া 'আঠারো মাসে বছর' তো সরকারী ও বহু বেসরকারী অফিসে অনেকদিন হইতেই চালু হইয়াছে। কাজেই ৬০ মাসে বৎসর চালু হইলে ছুটিছাটা ছাড়াও কাজের অনেক সময় পাওয়া যাইবে। পরিষদ আরও দাবি করিয়াছেন যে, পঞ্জিকা সংস্কার যদি হইতে পারে, তবে বৎসর সংস্কার হইবে না কেন?

অথ গণ শব্দকথা

মহেশের সন্ধ্যাহ্নিক হ'লে সমাপন
উমা আসি পদতলে বসেন তখন।
পদধূলি তুলি' শিরে মহেশেরে ক'ন—
'শব্দ-ব্রহ্ম' বুঝিয়াছি জলের মতন।
এবে মাত্র আছে এক শুনিবার আশা-
কোন্ শব্দ অগ্নি-গর্ভ নাদশক্তি ঠাসা।
শুনি' শিব চিবুকটি ধরি পার্বতীর
ক'ন—প্রশ্ন উপযুক্ত জিজ্ঞাসু ছাত্রীর।
শুন তবে—'গণ' শব্দ সর্ব-নাদময়.
যার পুরোভাগে রবে তার হবে লয়।
যে শব্দের আগে তুমি বসাইবে 'গণ'
সে শব্দেরে চেনা আর যাবে না কখনো।
লক্ষণা ব্যঞ্জনা তার বাচ্যার্থ না রবে
মুহূর্তে ভীষণাকার উগ্ররূপ লবে।
শব্দের পশ্চাৎ-দেশে জুড়িলে উহারে
তাহে শুধু শব্দটির সংখ্যা-মাত্রা বাড়ে।
এত শুনি শক্তি ক'ন— সোহাগ ভংগীতে
উদাহরণেতে, দেব, হবে বুঝাইতে।
বলেন শঙ্কর, দেবি. শুন মন দিয়া
বিশেষণে সবিশেষ দিই বুঝাইয়া।
অধিকার মানে স্বত্ব. আছে সবাকার
দিলে 'গণ' তার আগে হবে স্বেচ্ছাচার
আন্দোলন—স্নিগ্ধ অর্থে হয় প্রচারণ,
'গণআন্দোলন' মানে যৌথ আক্রমণ।
উৎসব-এর অনুষ্ঠানে আনন্দের মেলা
'গণ' জুড়ি দিলে পূর্বে মত্ততার খেলা।
'গণগুরু' হন যিনি মূক মূঢ় ম্লানে
নিরন্ন করেন 'বন্‌ধ' ফুঁকি দিয়া কানে।

'গণচেলা' শিষ্য নহে সমর্থক কয়।
'গণকর্ম'—অর্থ তার আরো কর্ম নয়।
চেতনা-র আগে 'গণ' বসাইবে যেই
চেতনের পরিণতি হবে পশুত্বেই।
'গণতন্ত্র' মানে, তন্ত্র মাতা-পিতা হীন;
'গণ'জনতন্ত্র অর্থে আরো যা সঙ্গীন।
'গণনেতা'—সর্দারই পোশাকী ভাষায়
মাঠে মঞ্চে হা-হুঙ্কারে যে লোকে মাতায়।
'গণশিল্পী' কথা প্রিয়ে শুনিবে এখন—
কবি সাহিত্যিক চিত্রী স্থপতি তক্ষণ
ভাস্কর মৃত্তিকাশিল্পী মৃৎশিল্পী, আর
গায়ক বাদক নটী নট নাট্যকার,
মেহনত করে যারা— শিল্পী সে সবাই
সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক এরাই।
'গণ'-যুক্ত শিল্পকর্ম দুর্বোধ্য সবার
না বুঝালে অর্থ তার 'গণভাষ্যকার'।
যে-দেশের শিল্পী, কবি 'গণ' দীক্ষা নিবে
সে-দেশের সর্বাঙ্গীণ বারোটা বাজিবে।
শক্তি ক'ন—শেষ দুটি শব্দ নাহি বুঝি,
'বারোটা বাজিবে' মানে কহ সোজাসুজি।
শিব ক'ন—ও-দুটির জন্ম বঙ্গদেশে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঠাসা যার 'গণপরিবেশে'।
প্রত্যক্ষ করিতে অর্থ সেথা যেতে হবে
'গণ' ক্রিয়াকাণ্ড সব দেখিবে বাস্তবে।
'বারোটা বেজেছে' মানে দেখিবে তখন;
সেই দেশে গিয়া যদি কর পদার্পণ।

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবর্ণশিখর

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ত্রিশ ।।

পাহির পাশে অমন নিভৃতে মেঘুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শর্মিষ্ঠার বড় ভাল লাগছিল। শর্মিষ্ঠার দোষ-ত্রুটি শুধরে দেবার কথাগুলো, তাকে কাজ শেখাবার জন্য অমন দরদ ঢালা কথাগুলো কানের পাশে অনবরত বেজে উঠে তার মনের মধ্যে অমৃতের স্রোত বইয়ে দিচ্ছিল। অমন হাস্য পরিহাসে শর্মিষ্ঠার মন আনন্দের মন্দাকিনী প্রবাহে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরা কয়েকটি মুহূর্ত। কিন্তু যাবার সময় মেঘু একটি কথাও তাকে ব'লে গেল না, একবার ফিরেও চাইল না। বিশেষ করে তার কাজের ত্রুটি নিয়ে এত-কথা হ'ল—এতগুলো মাইকীর সামনে, তারই অপকর্ম উপলক্ষ ক'রে, দুজন প্রৌঢ় লোককে মেঘু এমন অপদস্থ করল। তারপর মেঘুর কি একবার ফিরেও তাকানো উচিত ছিল না শর্মিষ্ঠার পানে? দুটো কথা ব'লে ক'দিনের অপকীর্তির দায় ও লজ্জা থেকে তাকে মুক্ত করে গেলে কি এমন মান নষ্ট হত মেঘুর? এই ঔদাসীন্য, মেঘুর এতটা উপেক্ষা শর্মিষ্ঠার মনে নিদারুণ আঘাত করল।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মেঘুর ব্যবহার, তার কাজ, তার কথাগুলো শর্মিষ্ঠা তার মনের মধ্যে খতিয়ে নিল।—তার জন্য মেঘু কি আর করেছে? সে নিজের কাজ ক'রে গেছে। তার সঙ্গে কথা বলেছে। শর্মিষ্ঠা কাজ করতে এসেছে, তাই মেঘুও কাজের কথাই বলেছে। নিছক কাজের কথা। তার বাইরে কোন কথাই তো মেঘু বলেনি। একবার জানতেও চায়নি শর্মিষ্ঠা কেমন আছে, কেন এত শুকিয়ে গেছে?— তার বান্ধবীরা, গাঁয়ের যত লোক কত দরদ দেখায়, অমন কত কথা জানতে চায়। সে তো তার কিছুই করল না। আর কোনদিন তো মেঘু তার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। বাগানের পথে চলতে ফিরতে কত-দিন হঠাৎ তারা সামনাসামনি পড়ে গেছে। শর্মিষ্ঠা থমকে দাঁড়িয়েছে, মেঘু মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। সে যেন তাকে দেখতেই পায়নি। তার স্পষ্ট মনে আছে অমন প্রত্যেকটি দিনের কথা। সেই বিহুর দিন শর্মিষ্ঠা যখন তাদের ঘরে গিয়েছিল, তখন মেঘু তো পাশেই ছিল। কই! একবারও তো সামনে এল না। কেতি, বতী ওরা শর্মিষ্ঠাকে ধরে নিয়ে গেল মেঘুর ঘরে, মেঘুর সামনে—মেঘু চোখ ফিরিয়ে নিল। চেয়ে রইল বইটার পানে। বইখানা কি এতই মূল্যবান? তার কি কোন দাম নেই মেঘুর কাছে? সে অপরাধ করেছে, খুবই অপরাধ। সেইজন্য কত লজ্জিত কত অনুতপ্ত, কতখানি দগ্ধ সে। তা কি সে বোঝে না?

ভুল! মানুষ মাত্রই ভুল ক'রে থাকে! কত অন্যায়, কত অপরাধ ক'রে থাকে। তার কি ক্ষমা নেই—কোনদিনই নেই! সেইজন্য কি এত শাস্তি দিতে হয়? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। তার কাছ থেকে মেঘু কোনদিন কি এমন কিছুই পায়নি, যার জন্য শর্মিষ্ঠার একটি দিনের ত্রুটি, একটি অপরাধ, ক্ষণিকের উন্মত্ত উত্তেজনার উপেক্ষা পেতে পারে? অন্ততঃ ক্ষমা—গুরুতর অপরাধের ক্ষমা। তা নয় তো শাস্তি—গুরুতর অপরাধের গুরুতর শাস্তি। তার নিজের হাতে—যাই হোক সে শাস্তি। তা মাথা পেতে নিতে রাজী ছিল সে।— কোনদিন সে ক্ষমা চাইতে যায়নি তার সামনে—সাহস নেই, তাই যায়নি। যে-কাজ সে করেছে, সে-কথা তুলতেও পারে না আর— ক্ষমা চাইতেও না।— তা কেন? গেল তো। সুযোগ দিল কই সে? মুখ ফিরিয়ে রইল। তাও কি সে বোঝেনি—তার চোখের দিকে চেয়েও কি বোঝেনি? শর্মিষ্ঠার কোন চাহনিটা সে না-বোঝে? এতদিনের এত কথা বুঝেছে—আজই এমন অবুঝ! শাস্তি! তাও তো সে পাচ্ছে। শর্মিষ্ঠা নিজের হাতে নিজেকে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে। মেঘুর মায়ের কাছে পড়তে যেতে পারে না—সেটা কি শাস্তি নয়? ঘরে পড়ছে না ছাই! মেঘুর মায়ের মতো অমন ক'রে পড়াবে কে? অমন মন ঢেলে শর্মিষ্ঠা আর কার কাছে পড়তে পারে? কতদিন সে মেঘুদের ঘরে যায় না। তাদের ঘরের আশপাশ দিয়ে চলাফেরা পর্যন্ত করতে পারে না। মেঘুর মায়ের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটু আদর নিতে পারে না। কতদিন হ'ল মেঘুর সঙ্গে একটু কথাও বলতে পারে না। এসব কি কম শাস্তি? তা কি সে বোঝে না, না বুঝতে চায় না? মেঘুর মনে এসবের কোনটাই কি জেগে ওঠে না? নিশ্চয়ই না। তা নইলে এত উদাসীন থাকতে পারে? এত অপমান করতে পারে তাকে? এতগুলো লোকের সামনে—সর্দার, মুহুরীর সামনে! সর্দার ও মুহুরীকে অপমান করা তো তারই জন্য। সে অপমান তো তারই। অমন হাসতে হাসতে মেঘু তাকেই তো অপমান করেছে। সেই অপমান করার শোধ নেবার জন্য তো মেঘু ওত পেতে ছিল। তার শোধ সে নিল তো।— সে কি পাতা তুলতে এসেছিল। সে এসেছিল মেঘুকে একটু দেখতে, ভাল ক'রে দেখতে—তার সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ খুঁজতে। সুযোগ সে পেয়েছে, কথাও বলেছে—আরো কিছু পেয়েছে সেই সঙ্গে।—যে তার মুখের পানে চায় না, তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি হবে? যে তার কথা ভাবে না—তার ভাবনা ভেবে তার আশায় বসে থেকে কি লাভ?

এই সব অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে তার হাত অচল হ'ল। মেঘুর সঙ্গে দেখা হতে তার মনের মধ্যে যে অমৃতের স্রোত বয়ে চলেছিল, তা থেমে গেল মেঘু চলে যাবার সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যে সুখে আপ্লুত হয়েছিল তার মন, তা যেমন দ্রুত গতিতে এসেছিল, তেমনই দ্রুত অপসারিত হল তার মন থেকে। বুকের মধ্যে অনুভব করল এক বিরাট শূন্যতা সেই সুখের স্থান, তার সেই শূন্যতা পূর্ণ করল দুঃখের উন্মত্ত প্রলাপ। দুঃখের সাগর মথিত হ'য়ে ভেসে উঠল দুঃখের শিলাজতু। শর্মিষ্ঠা পাতা তোলা বন্ধ করল—নিস্তেজ

ও নিষ্প্রভ হ'য়ে বসে পড়ল একটা শিরীষ গাছের ছায়ায়।

মেয়েদের কথা, মেয়েদের ব্যথা মেয়েরা যেমন বোঝে তেমনটি বোধহয় আর কেউ বোঝে না। টুকীর কোল গেনী ছুটে এল। বললে—কী হ'ল রে শর্মি?

—মাথাটা কেমন করছে।

কৌত মুখ টিপে হাসল।

—মাথাটা, না মনটা? ঠিক ক'রে বল। খেঁদির হাতটা তার কথার সঙ্গে ঘুরে এল শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর দিয়ে।

উদাস অসহায়ভাবে শর্মিষ্ঠা তাকিয়ে রইল খেঁদির পানে, কোন জবাব দিতে পারল না।

গেনী তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—ওঠ, চল, তোকে ঘরে পৌঁছে দি।

নিতান্ত নিরীহভাবে খেঁদি বললে—হাঁ, ঘরে যা, তোর হাজিরা পাত তো মেঘুই আদায় ক'রে দিয়ে গেছে।

সকলকে হতবিহ্বল করে শর্মিষ্ঠা ধমক দিয়ে বললে—চাই না আমার হাজিরা, চাই না পাত। ওসব তোরা নি'গ যে।

এবার বোঝা গেল ব্যাপারটা। কৌত নিজের হাতের তেলোয় মাথা হেলিয়ে বলে—ওমা! এই যে এত হাসাহাসি করছিলি—

বতী কথাটা টেনে নিয়ে বলে—দংশাই-ছিলি।

খেঁদি তার জের টেনে বলে—পাল্টা দংশাই দিচ্ছে—

শর্মিষ্ঠা ফুঁসে উঠল—দেখ, ওসব ধামালী করবি না আমার সঙ্গে।

—হাই লে! এর মধ্যে কি এমন হ'ল রে?

—তোদের মত লেখাপড়া-জানা মেয়ের হালচাল আমরা বুঝতে পারি না বাবা।

শর্মিষ্ঠা রক্ত চক্ষু করে বললে—না বুঝিস তো চুপ ক'রে থাক—অমন জ্বালাবি না।

ঘরে ফিরে শর্মিষ্ঠা তার মাকে বললে - মা! তুই যা বলেছিলি তাই ঠিক—

অভ্যাস অনুযায়ী শুক্রী মেয়ের কথাটা টেনে নিয়ে বললে—হাঁ, আমার কথা ঠিক না হ'য়ে যায়!

কিন্তু শুক্রীর কোন কথাটা যে ঠিক তার কিছুই বুঝে উঠল না। মেয়েটার মুখেচোখে যেন কেমন একটা ভাব। তার ভাবনা হল। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে রইল শর্মিষ্ঠার মুখের পানে বাকীটুকু শোনবার আশায় বা আশঙ্কায়।

শর্মিষ্ঠা বললে—তোর কথামত ডিব্রু-গড়ে পড়তে গেলেই ভাল হ'ত।

—হুঁ, যাবি? বলেই থমকে গেল শুক্রী। যে উত্তেজনার বশে সে মেয়েকে ডিব্রুগড়ে পাঠাতে চেয়েছিল তখন তা অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে।

ওটা শুক্রীর উত্তর না নিরুত্তর—বোঝা গেল না। মায়ের কাছ থেকে এমন উত্তর না পাওয়াই যেন ভাল ছিল মেয়ের পক্ষে। যতখানি উৎসাহের সঙ্গে মেয়ের কথায় শুক্রী সায় দিল ঠিক ততখানি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল সে। তার নিষ্পলক চোখ দুটো পড়ে রইল শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর।

সেই মুখের পানে তাকিয়ে আর কিছুই বলতে পারল না শর্মিষ্ঠা।

।। একত্রিশ ।।

সেই পাতা তোলার পর শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মেঘুর আর দেখা হয়নি। শর্মিষ্ঠাকে বাগানে কাজ করতে দেখাটা যতখানি আজব ব্যাপার, না দেখাটা ততখানি নয়। তাই তাকে আর না দেখে মেঘু ভেবে নেয় ওটা তার এক উদ্ভট খেয়াল, দু-দিনেই তার শেষ হয়েছে।

দিন কতক পর হঠাৎ দুজনের দেখা সুবর্নশিরি ঘাটে। বড়সাহেবের ফরমাশে মেঘু যাচ্ছে ডিব্রুগড়—কিছু মালপত্র কেনা-কাটা করতে। একটা ট্রাক নিয়ে সে এসেছে ঘাটে। ব্রহ্মপুত্রের উজান বেয়ে বাকী পথটা যাবে মোটর-বোটে। একখানা বোট বাগান থেকে এসে গেছে, আর একখানা আসছে। আঁকাবাঁকা নদীর পথে আসতে হয় অনেক ঘুরে। তাই ডাঙ্গার পথে পরে রওনা দিয়েও মেঘু আগে পৌঁছে গেছে। ট্রাক থেকে নেমে সে দেখল শর্মিষ্ঠাকে। মনে হ'ল সে যেন কারো অপেক্ষা করছে। মেঘু চলে গেল তার পাশে। বললে—কি রে। আর তোকে বাগানে দেখতে পাই না কেন? সখ মিটেছে, না জেঠী লাগাম টেনে ধরেছে?

শর্মিষ্ঠা চমকে উঠল, ফিরে তাকাল। এ যেন যেখানে বাঘ বাস করে সেখানেই সন্ধ্যার অবতরণ! এমন সকালে যে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতে পারে শর্মিষ্ঠার তা জানা ছিল না। সেই অন্ধকারে তার মুখ-খানা সাদা হ'য়ে ফুটে উঠল। যাকে এড়াতে, যাকে ভুলতে সে বাগান ছেড়ে যাচ্ছে, তারই সামনে পড়ে গেল! এখন সে কি করবে? মেঘুর প্রশ্নের জবাবে তার মুখ থেকে কোন কথা বের হ'ল না।

মেঘু ভাবল সে লজ্জায় পড়েছে, তাই ওটা ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রশ্ন করল—কোথায় যাবি?

মেঘুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য শর্মিষ্ঠা তৎপর জবাব দিল—ডিব্রুগড়।

সন্ধানী চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মেঘু বললে—কই, কার সঙ্গে—জেঠা কোথায়?

রাঘব সেখানে উপস্থিত থাকলে শর্মিষ্ঠার কোন ভাবনা থাকত না। তাকেই জবাব দিতে হ'ত। শর্মিষ্ঠা একা, পড়ে গেল মহাবিভ্রাটে। সে মুখ বুজে থাকলেও মেঘু তা করবে না। আর সে জবাব দিলে, এসে যাবে একটার পর আর একটা কথা। বড় কথাটা চাপা দিতে ছোট ছোট গোটা কতক কথা বলাই সে স্থির করল। এক নিঃশ্বাসে সে বলে গেল—আমি ট্রলিতে একটা সিট পেয়েছিলাম, সেটা আগে ছেড়ে দিল তাই আগে পৌঁছে গেছি। বাবা আসছে মাল বোঝাই লরীতে। তাতেও একটা বাড়তি সিট ছিল।

শর্মিষ্ঠাকে বিচলিত করে মেঘু বললে—আমাকে বললি না কেন? আমার সঙ্গে তোরা দুজনই আসতে পারতি।

শর্মিষ্ঠার চোখ দুটো একটু উঠে মেঘুর চোখ স্পর্শ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। মেঘু কখন কোথায় যায় না যায় বা কি করে, তা সে কি ক'রে জানবে! আর জানলেও শর্মিষ্ঠা যে তার সাহায্য নিতে যেত না, একথা মেঘুর জানা নেই। যতটুকু বলবার মতো কথা শর্মিষ্ঠার ছিল, তা শেষ করেছে। আর কি বলতে পারে তা ভেবে পেল না।

তার ওপর তাকে মুশকিলে ফেলতে মেঘু জিজ্ঞেস করল—কিসে যাবি? জাহাজ ছাড়তে তো অনেক দেরী। জাহাজে গেলে পৌঁছতে যেমন দেরী, ফিরতেও তেমনি হবে। চল আমার মোটর-বোটে।

শর্মিষ্ঠা ভেবেছিল মেঘু ঘাট থেকেই বাগানে ফিরে যাবে। অতএব সে ডিব্রুগড় যাচ্ছে বললেই ছাড়ান পাবে তার হাত থেকে। এখন বুঝল মেঘুও ডিব্রুগড় যাচ্ছে। তার সমস্যাটা জটিল হ'য়ে দেখা দিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা বলতে পারল না—সে ফিরবে না, ফিরবে তার বাবা। তবু তাকে এড়াবার চেষ্টা করল। বলল—না, বাবা আসুক।

তবুও ছাড়ান পায় না মেঘুর হাত থেকে।

মেঘু বললে—হাঁ হাঁ, বাবার ব্যবস্থাও ক'রে যাব। আর একটা বোট আসছে, সেটাতে জেঠাকে নিয়ে যাবার জন্য ব'লে যাচ্ছি। তোরা দুজনই সেটায় যেতে পারতি। কিন্তু আমার জন্য একজন ডিব্রুগড় ঘাটে অপেক্ষা করবে, তাই আমায় সময় মতো পৌঁছতে হবে। অনেক কাজ। তোকে এখানে একলা ফেলে রেখেই বা যাই কি ক'রে? তুই চল আমার সঙ্গে। ফিরতি মুখে চারটের সময় ঘাটে হাজির থাকবি, নইলে তোদের ফিরতে অনেক কষ্ট হবে। জানিস তো জাহাজে আসতে কত সময় লাগে। চল—

মেঘুর সাহায্য নিতে চায় না শর্মিষ্ঠা। অথচ, এটা বুঝল যে তার ব্যবস্থা না ক'রে মেঘু এখান থেকে নড়বে না। উভয় সংকটে পড়ল সে। আবার এটাও সত্য, সেইদিনই তার বাবা ঘরে ফিরলে তার মা সব খবর পায়, অনেক সান্ত্বনা পায়। বাপ-মা ছেড়ে মেয়ের বাইরে থাকতে যাওয়া এই প্রথম। তার মায়ের পক্ষে এটা কম ভাবনার, কম কষ্টের কথা নয়। সেই রাত্তিরেই বাবাকে ঘরে পেয়ে যেমন অবাক হবে, তেমনি খুশীও হবে। এমন সাত-পাঁচ ভেবে শর্মিষ্ঠা এগিয়ে চলল মেঘুর সঙ্গে।

বাগানের এক চৌকিদার ছিল মেঘুর সঙ্গে। তাকে রেখে গেল ঘাটে—সে যেন রাঘবকে নিয়ে আসে বড় বোটে। শর্মিষ্ঠাও সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে রাখল—সে তার বাবার জন্য পোস্ট অফিসের সামনে অপেক্ষা করবে।

এটা কেমন কথা! মেঘু বুঝল শর্মিষ্ঠার কথার ভাবটা—তার সঙ্গে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ডিব্রুগড় পৌঁছে যেন যে যার

পথ ধরে। অন্ততঃ এমনই একটা কাটছাঁট দেওয়া কথা।

মোটর-বোটের মেঘুই চালক। পাশে বসল শর্মিষ্ঠা। ব্রহ্মপুত্রের জল কেটে হু-হু করে বোটটা এগিয়ে চলল তীর বেগে। ছবির পর ছবি ভেসে যায় চোখের সামনে—মনোহর মনোলোভন। আলো আর রোদে আমেজ লাগা। হাওয়ায় নেই পাগলামি। মধু মধু গন্ধের বায়ু প্রবাহিত।

এমন দ্রুতগামী জলযানে চলার অভিজ্ঞতা শর্মিষ্ঠার জীবনে এই প্রথম। মাঝে মাঝে ঢেউ বেয়ে হাওয়ার ওপর উঠে যেতে চায় বোটটা। সেটার গতি, সেই গতির অনুবর্তিন বাতাসের প্রবলতা, তরঙ্গের সংঘাতে অতর্কিত তান্ডব নৃত্য প্রভৃতি শর্মিষ্ঠাকে এক বোধাতীত অনুভূতি এনে দিল। যেমন ভয় তেমনি খুশীর দোলায় দুলতে থাকল তার দেহমন। জলকণায় সিক্ত সেই দেহে হঠাৎ একটা ঠান্ডা হাওয়া লাগল। তাতে তার সারা অঙ্গ এমন সুড়সুড়িয়ে উঠল যে শর্মিষ্ঠা হেসে ফেললে।

সুবনশিরি মুখের কাছাকাছি, ব্রহ্মপুত্রের বুকে কয়েকটা চোরা-পাহাড় আছে। মোটর-বোটটা চালিয়ে প্রথমে সে ব্যস্ত ছিল সেগুলোর পাশ কাটিয়ে তার পথ নির্ধারণ করতে। তারপর বোধহয় শর্মিষ্ঠার কথা ভাবতে ভাবতে একটু আনমনা হ'য়ে পড়ে। শর্মিষ্ঠার হাসিতে সে ফিরে চাইল। বলল—কি রে, হাসলি কেন?

শর্মিষ্ঠা মানতে চায় না তা, বলে—না, কিছু না।

—ধ্যাৎ! মিছে কথা, বল না।

শর্মিষ্ঠা কোন জবাব দিল না। মেঘুও কিছু একটা ভেবে চুপ করে গেল। একটু পর একটা ঢেউ লেগে বোটটা দুলে উঠল, শর্মিষ্ঠাও হেসে উঠল সেই সঙ্গে।

—ঐ তো, আবার হাসছিস।

খিলখিল ক'রে হেসে শর্মিষ্ঠা বললে—না, বেশ লাগছে। গাটা কেমন সিরসির ক'রে উঠছে।

—সিরসির! তবে তো শীত করছে। কম্বল জড়িয়ে দেব নাকি?

—না-না, বলে, মেঘুর গা ঘেঁষে বসল শর্মিষ্ঠা। মনের সকল অভিযোগ বিসর্জন দিয়ে আবদারের সুরে সে বললে—কবে এটা চালাতে শিখলি রে?—কলঘরে কাজ করবার সময়?—ওঃ—কেমন ক'রে চলে রে এটা?

—কেন, এত কথা জানতে চাইছিস—শিখবি নাকি? খুব সোজা।

—হাঁ, শেখাবি?

বাচ্চাদের ফড়িং ধরার মতো কথাটা চেপে ধরল শর্মিষ্ঠা। ডিব্রুগড়ে পড়া আর মেঘুর কাছে মোটর-বোট চালানো শেখা, দু'টো যে এক সঙ্গে হতে পারে না তা তার মনেই হ'ল না।

শর্মিষ্ঠার ইচ্ছা। সেটা পালন করা যেন মেঘুর একান্ত কর্তব্য। সে বলল—কেই যখন শেখাতে চায় কেউ শেখাতে চাবে বৈকি।—
[illegible] আমার সঙ্গে নদীতে ঘুরে
[illegible]।

জবাবটা যেন শর্মিষ্ঠার ঠোঁটের গোড়ায় ছিল, সেখান থেকে লাফিয়ে বেরোল। সে বললে—তা ঘুরবো।

তাকে ধাঁধায় ফেলতে মেঘু বললে—তা হলে আমার চাকরিটার কি হবে?

অতি সহজ সরল জবাব দিল শর্মিষ্ঠা, বলল—কেন! কাজও করবি, তারপর—

ওর সরলতায়, আগের মতো মেঘুরও দুষ্টবুদ্ধি ফিরে এল। বলল—তবে তো রাত্তিরে বেরোতে হবে—পারবি তা?

কথার শেষে নিজের হাসিটা কামড়ে ধরল মেঘু—একটা চোখও কুঁচকে গেল দুষ্টামীর ফুলঝুরি বিচ্ছুরিত করে।

—ধ্যাৎ, দুষ্টু কোথাকার!

মেঘুর চোখের ভাষায় রাঙা হয়ে ওঠে শর্মিষ্ঠা। বসে থাকে মেঘুর গায়ের ঠেসানটা আলগা করে। কি জানি, যদি আগের মতন ক'রে বসে! পালাতেও পারবে না এখান থেকে।

হঠাৎ থমকে গেল মেঘুর আরামটা। এলোমেলো ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল একটা ঘটনা। যেদিন শর্মিষ্ঠা ছুটে পালিয়েছিল মেঘুর ঘর থেকে, সেদিনকার ঘটনাটা। দু'টো দিনের পার্থক্যটা মনে ধরে। তবুও সাহস হয় না, এগোতে চায় যাচাই ক'রে। যেমন খেয়ালী মেয়ে—কখন কি ক'রে বসে তার ঠিক নেই। হয়তো জলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কত কলঙ্কের কথা রটনা হবে তার নামে। তবু ভাবে, কলের নৌকাটায় উঠে খুশী হয়েছে সে। যেন শর্মিষ্ঠাকে আরো খুশী করতে মেঘু বাড়িয়ে দিল তার গতি—ঢেউ কেটে হেলে-দুলে চলল মোটরবোট।

শর্মিষ্ঠা চমকে চমকে ওঠে এক-একবার। ভয় পায় সে। জড়িয়ে ধরতে চায় মেঘুকে। ধরে-ধরে—ধরা হয় না। ঢেউ কেটে যায়—সমান ভাবে ভেসে চলে বোট। শর্মিষ্ঠাও সামলে নেয় নিজেকে। বেগে ওঠে ঢেউয়ের ওপর। কেন থেমে গেল ঢেউ।—ঐ তো, ঐ আবার ঢেউ আসছে। মস্ত বড় এটা। শর্মিষ্ঠা কি করবে ঠিক পায় না।

মেঘুর চোখে পড়ল শর্মিষ্ঠার ভাবটা। সে বললে—কি-রে, ভয় পাচ্ছিস?

—উঁ, না-না, বড্ড দুলছে—

মেঘুর ইচ্ছা হয় শর্মিষ্ঠাকে বলে—আমায় ধ'রে থাক—কিন্তু বলা হয় না। বললে—ঠেসান দিয়ে বেশ ক'রে হাতল দু'টো ধ'রে থাক।

হাতল দু'টো? মেঘুর বলিষ্ঠ দেহটা এত কাছে, এমন শক্ত হাতটা তার পাশে থাকতে, হাতল দু'টো? বলতে পারল না সে—এই যে, আমার হাতটা শক্ত ক'রে ধ'রে থাক। তবে তো তার কোন ভয় থাকত না, কোন ভয় হ'ত না ঐ সব ঢেউ দেখে। নাঃ! চায় না সে ঐ হাত ধ'রে নিরাপদ হ'তে।

মেঘু কি একটা ভাবছিল। সেটায় যেন একটা ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ল। তার একটা ফাঁকড়া নতুন পথ খুঁজে বার করতে চাইল। সে জিজ্ঞাসা করল—ডিব্রুগড় কি জন্য যাচ্ছিস রে?

মনের সদ্য বিতৃষ্ণা ভাবটাই ফুটে উঠল শর্মিষ্ঠার জবাবে। সে বললে—তা দিয়ে তুই আর কি করবি?

—তোর কি হয়েছে বলত আজকাল?

মেঘুর কথায় যেন বেদনাহতের সুর। শর্মিষ্ঠা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলল—কই না, কি আবার হবে!

—না—হয়নি, আজকাল তোর মেজাজের থৈ পাওয়া যায় না।

এটা আবার কি কথা? এই আজকালটা যে কতকালের কথা তা শর্মিষ্ঠা বুঝে উঠতে পারল না। কতদিন হ'য়ে গেল—এর মধ্যে কবে আর মেঘু তার সঙ্গে কথা বলেছে, তার মেজাজ বুঝতে চেয়েছে?—সেই পাতা তোলার দিন তো কথা হ'ল—তখন সে তো ভালভাবেই কথা বলেছে। যত গোলমাল তো মেঘুই করল। দু-দুটো বুড়ো মানুষকে অপমান করল, তাকেও অপমান করল। কি কুক্ষণেই না সে পাতা তুলতে গিয়েছিল। তার নিজের জীবন, তাদের সংসারের সব তোলপাড় হ'য়ে গেল।

যাই হোক, আর সে ওসব কথা ভাবতে চায় না। শর্মিষ্ঠার মেজাজের থৈ পাওয়া যায় না! মেঘু অভিযোগ করছে? পারে তো সে মেঘুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে। দুজনে মিলে নেমে যায় ব্রহ্মপুত্রের অতল তলে। চ'লে যায় নিভৃত নির্জন পাতাল-কন্যার প্রাসাদে। সেখানে গেলে শর্মিষ্ঠা দেখিয়ে দিতে পারে মেঘুকে তার অন্তর, অন্তরের অন্তর।

এদিকে মেঘু ভাবতে লাগল—ডিব্রুগড় যাচ্ছে, তা কি আর এমন কথা! অমন টেরা জবাব না দিয়ে, সোজা উত্তর দিলে কোন উৎসবটা পণ্ড হ'ত। পরেও অমন আবদার ক'রে বললে একটা কথা—সেটা তো গ্রাহ্যই করল না। এতক্ষণ পর সে একটা পথ পেল তার ভাবনাটাকে চালিয়ে নিতে। ঘাটে দেখা হবার পর থেকে শর্মিষ্ঠা যা-যা বলেছে সব খতিয়ে দেখতে লাগল।

বিপরীত দিক থেকে তখন একটা বড় জাহাজ আসছিল। সেটার ঢেউগুলোকে কাটাতে হবে। তাই নিয়ে একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল মেঘু। স্টিয়ারিংটা বারকতক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢেউ কাটাতে মোটরবোটটা অনেকবার দোল খেল। তারপর মেঘু স্টিয়ারিং ধরল সিধে ক'রে।

ওদিকে শর্মিষ্ঠাও তার নিজের ভাবে যেন স্বপ্নাবিষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে এক চমকে ভেঙে যায় তা। জাহাজটা তখন সামনে থেকে গেছে পিছনে। মেঘু কি জানো কি করল শর্মিষ্ঠা তা বুঝতে পারল না। তার রাগ হ'ল। হাতটা ধরতে দেবে না তার ওপর ভয় দেখানো! তার মনের মধ্যে যা কিছু তরল হ'য়ে আসছিল সে-সব জমাট বেঁধে গেল। হাতল দু'টো ধ'রে শক্ত হ'য়ে বসে রইল।

বোটটা সামলে নিয়ে মেঘু বললে—বড় মানুষদের অমন হ'য়ে থাকে না-রে?

শর্মিষ্ঠার মস্তিষ্কের কাঠিন্য ভেদ ক'রে [illegible] সহজ ও সিধেভাবে প্রবেশ করতে পারল না। তার কোন কথ

সরলভাবে বিচার ক'রে দেখার মেজাজ তখন শর্মিষ্ঠার ছিল না। —ঐ তো সে নিজেই বলছে—বড় মানুষের অমন হ'য়ে থাকে। তবে তো তার মায়ের কথা তাদের লাইনের আরো পাঁচজনের কথাগুলো সবই ঠিক! শর্মিষ্ঠাও ঠেস দিয়ে বললে—এক বড় মানুষের যা ঠিক আর এক বড় মানুষের বেলা তা বে-ঠিক হ'তে যাবে কেন?

ব্রহ্মপুত্রের যত উপনদী তার মুখে এবং নালা অংশে অসংখ্য চোরা-পাহাড় ও চোরাবালির দ্বীপ। অসাবধানী ও আনাড়ীর পদে পদে বিপদ সেখানে। যে কোন মুহূর্তে জাহাজ ও নৌকা বালিতে আটকে যেতে পারে, ভেঙে চুরমারও হতে পারে। কথায় কথায় বোটটা এসে পড়েছে জলে ঢাকা একটা পাহাড়ের সামনে। সেটাকে এড়াবার জন্য মেঘু আবার একটু তৎপর হ'য়ে পড়ল। তেমন মন দিয়ে সে শর্মিষ্ঠার কথাটা শুনল না, বুঝে ভেবে জবাবও দিল না। একটা ঢিলেঢালা, উলটো-পালটা কথা বেরিয়ে গেল মেঘুর মুখ থেকে। সে ব'লে ফেললে—তা হ'লে জানিস বড় মানুষ ছাড়া বড় মানুষের খাপ খায় না।

কথাটা এমন ক'রে মেঘু বলতে চায়নি। চেয়েছিল শর্মিষ্ঠাকে ওপরে রেখে বিনয় প্রকাশ ক'রে কিছু একটা বলতে। কিন্তু যা ক'রে ফেলেছে তার প্রতিক্রিয়া তো হবেই।

খালি কাঁসার বাটির মতো ঠং ক'রে বেজে উঠল শর্মিষ্ঠার বুকের ভিতরটা। সে বললে—নিশ্চয়ই জানি। আর এও জানি—সেই জন্যই সকলের পক্ষে সব জায়গায় থৈ পাওয়াও সোজা কথা নয়।

কথার শেষে শর্মিষ্ঠার বুকটা উত্তেজনায় ওঠানামা করতে লাগল প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে। হয়তো ভাবতেও লাগল মেঘুর গর্বটা খর্ব করতে তার কথাটা কতখানি উপযুক্ত হ'ল।

সোজা নয়? মেঘু ভাবল ওদের সবই কঠিন, সবই ফাঁকি তবে?

শর্মিষ্ঠার পক্ষে এমন ধরণের কথা বলা নতুন নয়। মেঘুও এককালে কত শুনেছে, তখন তা হেসে ওড়াতে পেরেছে। কিন্তু এখনকার মেঘুর ধাতে তা হ'তে পারে না। এই ক'টা বছরে মেঘুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার কাজের সঙ্গে, বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সংস্পর্শে এসে, সে যেমন নানা দিক দিয়ে এগিয়েছে, শর্মিষ্ঠাকে তেমনই পিছোতে হয়েছে তার পারিপার্শ্বিক উত্তেজনার প্রভাবে, তার মায়ের আচরণের সঙ্গে মিল রাখতে। টান আছে দুজনের পরস্পরের প্রতি, কিন্তু নেই সেই ভেদাভেদ জ্ঞানটা। শর্মিষ্ঠার আছে মেটো দম্ভ, মেঘুরও হয়েছে তেমনই বা অন্য ধরণের একটা কিছু,—হয়তো এসে গেছে কর্মসাফল্যের দম্ভ, নয়তো আত্মপ্রসাদ। কিন্তু দুজনের মনই অজ্ঞ সে বিষয়ে। জানা থাকলে দুজনে মিলেমিশে ওঠানামা ক'রে পথ খুঁজে নিত। কেউ তা চাইল না, কেউ তা বুঝল না।

বোটটা তখন অদৃশ্য পাহাড়টার পাশ কাটিয়ে নিরাপদ হয়েছে, কিন্তু মেঘুর [illegible] গিয়ে ধাক্কা খেল আর একটা ডুবন্ত পাহাড়ের গায়ে। আর কোন কথা বলতে পারল না। তার দেহটা অকস্মাৎ স্থির হ'য়ে গেল স্থাণুর মতো। দুটি নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি ঠিকরে বেরিয়ে হারিয়ে গেল চক্রবালে। যন্ত্রটার গতি হঠাৎ বেড়ে গেল—ক্রমশঃ বাড়তে থাকল। হঠাৎ দমকা বাতাসে ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ অশান্ত হ'য়ে উঠল। জল ছেড়ে বোটটা বারবার উঠতে চায় হাওয়ার ওপর। মেঘুও অনেক কৌশলে সে সব অতিক্রম ক'রে এগোতে থাকল। এগজস্ট-পাইপটার শব্দ ধ্বনিত হ'তে থাকল, সেই ধ্বনি ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সহস্র দামামার অনুরূপ দূরদিগন্তে ছুটতে লাগল, আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ ক'রে। সেই নির্জন নিস্তব্ধ ব্রহ্মপুত্রের বুকে যেন রণভেরী বেজে উঠল।

এমন কান্ড শর্মিষ্ঠা দেখেনি, অনুভব করেনি জীবনে। আগে বুঝলে সে মেঘুর সঙ্গে আসত না। সে বড় ভয় পেল। তার ভয় বাড়তে থাকল। নৌকাটা খাড়া হ'য়ে উঠল—ঢেউ, গতি, গর্জন! সে আর থাকতে পারল না, সে জড়িয়ে ধরল মেঘুকে।

—ওঃ! ভয় পেলি নাকি? কিছু ভয় নেই। এই দেখ ঠিক হ'য়ে গেল।

মেঘুর আশ্বাস পেয়ে শর্মিষ্ঠা প্রকৃতিস্থ হ'ল। সে কতটা ভয় পেয়েছে তা মেঘুও বুঝল। সে লজ্জা পেল—ধাতস্থ হ'ল, সাবধান হ'ল। বোটটার গতি ধীর মন্থর হ'ল—একভাবে সেটা চলতে থাকল। শর্মিষ্ঠা স্থির হ'য়ে বসে রইল। মেঘুর অঙ্গ স্পর্শে শর্মিষ্ঠার সন্ত্রাস রূপায়িত হয় এক অনির্বচনীয় শিহরণে। তারই আবেশে দুলতে থাকে দেহমন। তার মনে অনুতাপ হ'ল। কেন এমন ভয় পেল সে? তীরবেগে নৌকা ছুটছিল! ঢেউ, আকাশ-ভাঙা গর্জন! তাতে ভয়ের কি আর এমন ছিল? মেঘুই তো তার পাশে। আর তো ঢেউ আসবে না, আকাশটাও ফেটে পড়বে না। আর তো সে তেমন জোরে চালাবে না এই যন্ত্রের নৌকাটা। যদি শর্মিষ্ঠার ভয়ের কথাটা ভুলে যায় মেঘু—আর একবার খুব জোরে চালিয়ে দেয়, বড় বড় ঢেউ এসে নৌকাটা উলটে দেয়, আকাশটা ফেটে ভেঙে চৌচির হ'য়ে পড়ে তবু আর কিছু বলবে না সে। চুপ ক'রে চেপে ধ'রে থাকবে মেঘুর হাতটা। কই ভুল তো হচ্ছে না? একটা বড় জাহাজের ঢেউও আসছে না। জাহাজগুলো আজ কোথায় মরতে গেল? আসুক না এখন, নৌকাটাকে উলটে দিক না। তখন দুজনেই জলের মধ্যে পড়ে যাবে, একসঙ্গে ভাসতে থাকবে। তা হ'লে নিশ্চয়ই তাকে জড়িয়ে ধরবে মেঘু!

ধীর মন্থর গতিতে বোটটা চলতে থাকল। তাল আছে, তরঙ্গ নেই। কিন্তু দুজনের মনই উদ্দাম তরঙ্গে দুলতে থাকল। যে কথাটা বোঝাপড়া ক'রে নেবার ব্যগ্র বাসনা একটু আগে মেঘুর মনে জেগে উঠেছিল তা শর্মিষ্ঠার কথার আঘাতে প্রতিহত হয়েছে। তার নিঃশ্বাসে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে সে কথা। আর তা ফিরে আসবার উপায় নেই। তার দুটি চোখ স্থির হ'য়ে আছে জলের সমান্তরাল রেখায়।

শর্মিষ্ঠার মনের তরঙ্গ চলেছে হেলে-দুলে—চোখদুটো শুধু ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তার পাশাপাশি। এক-একবার পাশ ফিরে দেখে মেঘুর আচ্ছন্ন দেহটা, কল্পনায় চলে যায় ভিতরে—দেখে তাকে নিরাভরণ করে, আবার দেখে তার মুখ। মেঘুর স্থির অনাহত দৃষ্টিপথ অনুসরণ ক'রে চলে যায় দূরে, বহু দূরে—আবার ফিরে আসে একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে। মেঘুর মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে শর্মিষ্ঠার মনের সেই শূন্যতা ভরে ওঠে কত কথার স্মৃতি-সৌরভে। হঠাৎ তার মনে ভেসে উঠল বাল্যের একটি দিনের স্মৃতি।

বসন্তের শেষ। এক নির্জন দুপুর। গনগনে রোদ ভরা আকাশ। মেঘুর সঙ্গে গেছে শর্মিষ্ঠা সুবর্ণশ্রীর বাঁধানো ঘাটে। ঘাটের একপাশে বাঁধা একটা কলাগাছের ভেলা। মেঘুই আগে থাকতে তৈরি ক'রে রেখেছিল, তার এক খেলার খেয়াল চরিতার্থ করতে। সেটা দেখিয়ে সে প্রস্তাব করল শর্মিষ্ঠার কাছে—ঐ ভেলাতে দুজন উঠি। আমি লক্ষ্মীন্দর সেজে মরে পড়ে থাকব, আর তুই বেহুলা সেজে আমাকে নিয়ে যাবি ইন্দ্রের সভায়। সেখানে নাচ-গানে দেবরাজকে তৃপ্ত করে আমাকে বাঁচিয়ে আনবি।

মেঘুর অমন অশুভ কথায় শর্মিষ্ঠার মন কেঁপে ওঠে এক অজানা আতঙ্কে। তা পারবে না সে। মেঘুও ছাড়বে না। তার খেয়াল—চোখ বুজে চুপ ক'রে দেখবে সে, তাকে বাঁচাবার জন্য ইন্দ্রের সভায় গিয়ে শর্মিষ্ঠা কেমন নাচ-গান করে। ঘাট থেকে ভাটির দিকে একটু গেলেই নদীর অপর পাড়ে একটা ঢিপি, ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা। সেটাই ইন্দ্রের প্রাসাদ। যাবার সময় হাল ধরে ভেলাটা নিয়ে যেতে পারে শর্মিষ্ঠা। উজান জলে ফেরবার সময় তো মেঘুই বেঁচে উঠবে।

কিছুতেই সে রাজী হয় না মেঘুর কথামতো কাজ করতে। কিন্তু তার ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়াবার সখটা মেঘু বুঝে ফেললে। কথায় কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে ভেলায় উঠল। তারপর শর্মিষ্ঠার করণীয় কাজকর্মের উপদেশ দিয়ে মেঘু মরে পড়ে রইল। ইন্দ্রের সভায় গিয়ে নাচ-গান করবার আগে সে আর বাঁচবে না। অগত্যা তাকে হাল ধরতে হ'ল।

শর্মিষ্ঠার মনের মধ্যে একটা হাসির উৎস ফেটে গেল। তার মুখের ওপরও প্রভাব বিস্তার করল সেই হাসির উচ্ছ্বাস।

হাসে কেন মেয়েটা?

এতক্ষণ পর মেঘুর দৃষ্টি ব্যাহত হ'ল। সে ফিরে তাকাল শর্মিষ্ঠার পানে, মুখ ফিরিয়ে নিল। চোখদুটো আবার স্থির হ'ল। একবার তো হেসেছিল নৌকার দোলা খেয়ে—এখন কেন? হয়তো মজার কথা ভাবছে—কোন ঠাট্টা বিদ্রূপ!

শর্মিষ্ঠার হাসি একটু পরে থমকে গেল। জানতে পারে নি সে কতখানি হেসেছিল। সে ভেবে নিল—হয়তো মেঘু বুঝতে পেরেছে তার মনের কথা। না হবে কেন?

এমন তো সে অনেক দিন বুঝেছে। যদি বুঝেই থাকে, তবে কেন মেঘু বলছে না শর্মিষ্ঠাকে তেমন খেলা খেলতে। সেদিন ছোট ছিল, তেমন খেলার মর্ম বোঝেনি। আজ সব বোঝে, আজ আর সে কোন আপত্তি করবে না। ওটা ছিল নকল—এই তো আসল ব্রহ্মপুত্র। ভাটির দিকে বেয়ে গেলেই তো ধুবড়ি। সেখানেই তো 'নেতা ধোপানীর ঘাট'। যেখানে ধোপানীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল বেহুলা। নিজের হাতে সে কাপড় কেচে পাঠিয়ে দিত ইন্দ্রের প্রাসাদে ধোপানীর মারফত। বেহুলার কাজ দেখে তুষ্ট হলেন দেবরাজ—ডেকে পাঠালেন বেহুলাকে। দেবরাজ জানতে চাইলেন বেহুলার শোকসন্তপ্ত মনের কথা।

কে না দেখেছে সেই ঘাটের মস্ত বড় পাথরটা? আজও হাজার হাজার মানুষ যায় সেই ঘাটে, ধন্য হয় সেই পাথরে মাথা ঠেকিয়ে। মেঘু তো সব জানে। ওরই মুখে শুনেছে সে সব কথা। তবে কেন সে বলছে না শর্মিষ্ঠাকে বেহুলা সাজতে।

নিজের ভাবে সমাহিত শর্মিষ্ঠা। তার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—কেন বলছিস না?

মেঘু অবাক হ'য়ে ফিরে তাকাল, বললে—কি বলছি না?

—বেহুলা সাজতে।

কথাটা বলেই শর্মিষ্ঠা জিভ কাটল তার খিলখিল হাসিটা সামলে নিতে।

মেঘুর মন তখন শর্মিষ্ঠার আগের কথা, আগের হাসিটার রেশ ধরেই চলেছে। পুরোনো দিনের ওদের যতকিছু তামাশার কথা সব বিদ্রূপ হ'য়ে বাজতে থাকল তার কানের পাশে। একদিন সে ছিল কুলি—আজ কত ওপরে উঠেছে, আরো কত উঠবে হয়তো। তার কর্মজীবনের এতখানি সফলতা যেন কিছুই নয় শর্মিষ্ঠার কাছে, ওদের ঘরের সকলের কাছে। তাই আজও তার বাল্যগানের কথা তুলে তাকে ঠাট্টা করতে চায় শর্মিষ্ঠা। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সেই মেঘুর পাশে আজ বসে নেই শর্মিষ্ঠা। তার দিকে না তাকিয়ে মেঘু বললে—ওসব কথা ছেড়ে দে, যা দেখছিস তার ওপরই কথা বলবি।

শর্মিষ্ঠা এতক্ষণ যা ভেবে এসেছে তা তো নিছক ভাবা নয়—সে তো ভাবনার প্রলাপ। তরাই মধ্যে একটু মুখ ফুটেছে মাত্র। তাই শুধু প্রলাপের মতো বলে গেছে তার কথাটা মেঘুকে শুনিয়ে। তার কান খুলে যেতে যখন শুনল মেঘুর কথা, তখন সেটা খাপছাড়া লাগল। তাই মেঘুর জবাবটা শর্মিষ্ঠা বুঝল না, বললে—কি বললি?

—ঠিকই বলেছি।

মেঘুর মুখটা কেমন যেন ভারী ভারী দেখাচ্ছে। তাই তার কথার ভাবটা শর্মিষ্ঠা তাড়াতাড়ি বদলাতে চাইল। বললে—ভাল লাগছিল না আর, না?

—যেমন তুই বলছিস, আমিও তেমনি—

শর্মিষ্ঠা কি যে বলেছে তার খেয়াল নেই, তবু জবাব দিলে—আমি তো ভালই বলেছি।

—তবে আমিও তার জবাব দিয়েছি।

—দিয়েছিস? তবে—

—তবে কি?

—তবে কথা বলছিস না কেন?

—এই তো বলছি।

—একি কথা?

শর্মিষ্ঠার কথার ভাবে বিস্ময় লাগে মেঘুর, বলে—তবে কোন্ কথা?

কোন্ কথা! কি আর বলবে? তবে এতক্ষণ কি শোনাল সে মেঘুকে। মেঘুই বা কি শুনল, কি বুঝল, কি জবাব দিল! আবার এলোমেলো ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে গেল শর্মিষ্ঠার মন।

মেঘু ভাবতে থাকল—কি কথা সে শুনতে চায় তার কাছে? অমন করে তো কেউ বিদ্রূপ করতে আসে না। ওর কথারও কিছু বোঝা গেল না। এমনই তো ওর কথার ধরন, তার ওপর আরো বিগড়েছে। আগের মতো নেই। কেমন করেই বা থাকবে, আগের মতো মেলামেশা কই? কতদিন ওর সঙ্গে এমন নিভৃতে কথা হয়নি; আর বোধ হয় হতও না সেদিন পাতা তুলতে না গেলে। হঠাৎ গেল কেন, আবার ছাড়লই বা কেন? সেদিন পাতা তোলার সময় তো কত হেসেছে, কত কথা বলেছে। ঠিক আগেরই ধরনে। আজ যেন আবার কেমন হয়ে গেছে। কেন ও সহজ হয়ে ধরা দেয় না তার কাছে, কেনই বা নিজেও যেতে পারে না তেমনভাবে? এই তো পাশেই, লাগছে না একটু গায়ের তাপ। তা নয়—এত কাছে, তবু বসেছে কত দূরে। একটু তাকিয়ে থাকতে পারে না তার পানে। যেমন তাকিয়ে থাকত সেই বাগানে গিয়ে—অর্থহারার অর্থপূর্ণভাবে, ভাবহারার ভাব ঢেলে তাতে। দুটো কথা—সেদিনকার মতো হাসির বন্যায় ভেসে আসা দুটো কথা। তাও কি হবে না আজ?

দু-জন পাশাপাশি কত কথা ভেবে চলেছে।

শর্মিষ্ঠার মন কত ঘুরে ফিরে ক্লান্ত পাখীর মতো বাসায় ফিরল একটু বিশ্রাম করতে। চোখ পড়ল আবার ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে। শুরু হল চোখের চিন্তার ধারা। কোথা থেকে আসছে এই স্রোত? ঐ সামনের পাহাড় থেকে, আশপাশের ঐ সব পাহাড় থেকে। যেমন তাদের সুবর্নশিরি এসেছে আবার পাহাড় থেকে। ওই তো, চক্রবালে ধূমায়িত তার চিহ্ন। পাহাড়ের পর পাহাড়, যেন আর এক অজানা রাজ্য। পৃথিবীর অপর প্রান্তে, নয়তো আর একটা পৃথিবী। কত নির্জন, কত সুন্দর সে সব দেশ। তাকে নিয়ে মেঘু চলে যাক না পৃথিবীর সেই প্রান্তে। যেখানে এ রাজ্যের কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না। তবু তো আর কোন গোলমালই থাকে না। এখানকার মানুষগুলো যত সব আজে-বাজে কথা বলে, ভেঙ্গে দিতে চায় তাদের সম্বন্ধ। এখানকার কেউ তাদের মিলতে দিতে চায় না।

শর্মিষ্ঠার মনের এত কথার কিছুই জানতে পারল না মেঘু। তেমনি শর্মিষ্ঠাও জানল না মেঘুর মনের কথা। দু-জনের চিন্তাধারার কোন বোঝাপড়া হল না। ডিব্রুগড় যাবার কারণটা চেপে রাখতে শর্মিষ্ঠা যা করে বসল, তাতে তা হবারও নয়। যে ধারণার বশে যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে, তাতে আর কোন পথও তার ছিল না। এমন করেই তো মানুষ গড়িয়ে পড়ে ভবিতব্যের হাতে।

মেঘু বেশ বুঝল, প্রথম থেকেই শর্মিষ্ঠা কেমন একটা ছাড়াছাড়া ভাব দেখিয়ে আসছে। কিন্তু তার মনের গহনে মূর্ত ছিল সেই পাতা তোলার স্মৃতি। তাই সে ওর আলাপটা শুরু করতে পেরেছিল সরল-ভাবে। ধাক্কা খেয়ে পড়ল ধাঁধায়। তাতে সব কিছু জটিল হয়ে উঠল, কিন্তু তার কোন মীমাংসা হল না। তবুও এতক্ষণ সে কত বেয়েচেয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছু দিয়ে যখন কিছু হল না তখন সে নিরস্ত হল। আর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।

একজনের মনে বিকার দেখা দেয় তো আর একজনের মন বেকার। মেলবার কোন পথ খুঁজে বার করতে পারল না তারা। এমন দু-জনকে নিয়ে চলেছে যন্ত্র-চালিত নৌকাটা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল—পথ কমে আসতে থাকল, পথের শেষও হল। কিন্তু বিকার আর বেকারের সমস্যার কোন সমাধান হল না।

ডিব্রুগড় ঘাট। মোটর লঞ্চটা নঙ্গর করে মেঘুর নেমে যাবারই কথা। কিন্তু তা না করে সে হাতের ঘড়িটার পানে চাইল একটু বসে থাকার সুযোগ খুঁজতে। কথা নাই বা হল। তবুও একটু বসে থাকা।

যেন আপন মনেই মেঘু একটু হেসে বললে—ওঃ, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি। জেঠা আসুক। হাতে অনেক সময় আছে।

সেদিন বাগানে অতগুলো মেয়ের মাঝে কত হাসির কথা হল। অথচ এমন একান্তে এমন সুন্দর পথে—সময় সুযোগ সবই ছিল, সবই হারাল। কোন কথা হল না, রফাও হল না। এখনই শর্মিষ্ঠা নেমে যাবে বোট থেকে। সে থেকে যাবে শহরে ইস্কুলের বোর্ডিং-এ—মেঘু ফিরে যাবে বাগানে। সে কখন কেমন থাকবে না থাকবে তার কিছুই আর জানতে পারবে না শর্মিষ্ঠা। কেন মেঘু বলে না একবার—তোকে যেতে হবে না। তুই আমার মায়ের কাছে পড়বি, আমরা দু-জন একসঙ্গে পড়ব। মনে মনে এমন বলাবলি করতে করতে হঠাৎ শর্মিষ্ঠার চোখ পড়ল মেঘুর উদাস দুটো চোখের ওপর। সে যেন কেমন হয়ে গেল। কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বললে—জানতে চাইলি না তো কোথায় যাচ্ছি—কেন যাচ্ছি?

—তুইও তো বললি না।

কত ব্যথা মেঘুর কথায়। সেই ব্যথার গভীর স্পর্শে জেগে উঠে, বেজে ওঠে আর একটি কণ্ঠ। শর্মিষ্ঠা বললে—আমি না বললে তুই জানতে চাইবি না?

কেন চাইবে না? চাইল তো। তার কি জবাব সে পেয়েছে! তবে কেন এমন কথা বলে? ওকে বিশ্বাস কি! নিশ্চয়ই আবার কিছু একটা বলবে—এ তারই আয়োজন। শর্মিষ্ঠার জবাবটাই মেঘু ঘুরিয়ে বললে—তাতে আমার কি দরকার!

দিনটাই যেন ওদের সঙ্গে বাদ সেধেছে।

প্রথমটা বেশ ছিল, পরের কথাটা যেন বিদ্যুতের মতো ধাক্কা দিল শর্মিষ্ঠাকে। মেঘুর কথায় যে প্রচ্ছন্ন অভিমান তা সে দেখতে পেল না। পুরানো নতুন মান-অভিমানের কথার সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দেখল না শর্মিষ্ঠা। সোহাগের কথা দরকার মতো মনে থাকে আবার উবেও যায় মন থেকে। একটু আগেই মেঘুর প্রশ্নের জবাবে সে যা বলেছে, তারপর মেঘুর পক্ষে এইটুকু কথা কতখানি অপরাধের হতে পারে তা বিচার করে দেখার মন তখন শর্মিষ্ঠার ছিল না। রুদ্র বৈশাখের দুর্ণিবার ঘুর্ণিবায়ু ব্রহ্মপুত্রের বালুচরের বালি উড়িয়ে নিয়ে যেমন সীমাহীন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি মেঘুর একটি কথা শর্মিষ্ঠার মনের গহনে ঝর তুলে ঘুরতে ঘুরতে যেন চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু শর্মিষ্ঠার আর জবাব দেবার ক্ষমতা নেই। মেঘুও তখন ক্ষমতা হারিয়েছে তা বোঝবার।

দুটি দেহ নিষ্ক্রিয় নিশ্চল। স্থির হয়ে বসে রইল পাশাপাশি অচল নৌকাটার ওপর। নৌকার গায়ে ব্রহ্মপুত্রের ব্যাহত স্রোতের একটানা শব্দের সঙ্গে তাল রাখছে মৃদু তরঙ্গ। তীরে সারি সারি শাল-শিমুলের শিখরে শিখরে সমীরণের অপূর্ব সঙ্গীত সৃজন। বাতাসের স্পর্শে দুলছে দু-জনের শিথিল কেশগুচ্ছ—শর্মিষ্ঠার শাড়ীর প্রান্ত।

যতক্ষণ বোটখানা চলেছে দু-জনের মনও ধেয়ে চলেছে দিগবিদিকে। এখন সুযোগ হারিয়ে অস্থির চিত্ত স্থির হতে চায়।

আর পারে না শর্মিষ্ঠা। মেঘুর পা দুটো সে জড়িয়ে ধরবে। সে তো ক্ষমা চাওয়ার মতো দেখাবে—আগের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হবে। আবার যদি সে ব্যথা পায়! তা কি করে করবে!—তবে কি করবে? এখনি বাবা আসবে, তাকে টেনে নিয়ে যাবে মেঘুর কাছ থেকে। মেঘু তো ধরে রাখবে না তাকে।

—নামান সিগনাল দেখা যায় [illegible] আসে ইঞ্জিনটার বাঁশীর শব্দ, পথে যাত্রীরা ছোটে। —শর্মিষ্ঠার মনও মাতাল হয়ে ছোটে। তবে কপালটা ফাটিয়ে দিক মেঘুর পায়ের তলায় মাথা ঠুকে ঠুকে।

দূর থেকে আর একখানা বোটের শব্দ ভেসে আসে। দু-জনই ফিরে চাইল। এত তাড়াতাড়ি এল কেন ওটা! সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দু-জন চাইল দু-জনের পানে। শুধু চোখের চাওয়া নয়—বিদায়ের হাত মেলানো। সে হাত যেন ছাড়তে চায় না—জানেও না। নয়তো শিকলে বাঁধা পড়েছে।

তবে কি হবে? হয়তো ধিক্‌কার দিচ্ছে—একজন আর একজনকে। তবে এতক্ষণ কি করছিলে? সে চোখ শুধু শাসায়—এতক্ষণ কি করছিলে?

বড় বোটখানা এসে ঘাটে ভিড়লো। সেদিকে তাকিয়ে মেঘু একটু আশ্চর্য হল। রাঘবের সঙ্গে নিধিরামের ছেলে রথীরামও! কিছু বিছানা বাকসও আছে। যাক, সেদিকে নজর দেবার দরকার নেই মেঘুর। সে বুঝল—এরা এখন ফিরবে না। তাই শর্মিষ্ঠা বাবার জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিল। ওদের কাছ থেকে শর্মিষ্ঠাকে আলাদা করে এনে হয়তো কোন অসুবিধে করে থাকবে। নদীর পথে মোটরবোটেই মেঘু যাওয়া আসা করে। তাই প্রথম থেকেই তার মনে হয়নি যে জাহাজের যাত্রী ইচ্ছা থাকলেও একদিনে ডিব্রুগড় থেকে ফিরতে পারে না।

সেই ঘটনার পর রাঘব কোন দিন এত কাছাকাছি পায়নি মেঘুকে। তাই দু-জনের কথা বলার কোন সুযোগও হয়নি। মেঘুর ওপর রাঘবের একটা সহজাত স্নেহ আছে। এতবড় একটা ঘটনার পর এতদিন কেটে গেছে বটে, তবুও তার মনের সঙ্কোচটা কেটে যায়নি, যাতে সে মেঘুর সঙ্গে কথা বলতে পারে। সে হয়তো পারত ইনিয়ে-বিনিয়ে দু-দশ কথা বলে মেঘুকে ঠান্ডা করতে। কিন্তু শুক্রীটা যত নষ্টের গোড়া। ইস্‌কুলটা পর্যন্ত ছাড়িয়ে দিলে। মেয়েটার ইস্‌কুলে যাওয়া-আসা থাকলে মিটমাটের একটা আশা ছিল। সে আশা গেল। তার ওপর মেয়েটাকে পড়তে পাঠাচ্ছে ডিব্রু-গড়ে। যার ওপর হিংসা করে পাঠাচ্ছে সে-ই সরকারি বোটে তুলে নিয়ে কত পয়সা বাঁচিয়ে দিল, কত সাহায্য করল। এটা কি কম লজ্জার কথা! মেয়েটা হয়তো সব বলে দিয়েছে মেঘুকে, হয়তো কেন নিশ্চয়ই বলেছে। এখন সে মুখ দেখায় কি করে? সারাটা পথ এমন কত ভেবে ভেবে দুরুদুরু করছিল তার বুকের ভিতরটা।

বোটখানা ঘাটে আসতে রাঘবের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মেঘু বললে—জেঠা, আমি ভেবেছিলাম—

তবে তো মেয়েটা সব বলে দিয়েছে!

মেঘুর কথাটা কেড়ে নিয়ে রাঘব বললে—তুই ঠিকই ভেবেছিস বাবা।

শর্মিষ্ঠা হাঁ করে হতভম্ব ভাব দেখিয়ে তাকে থামাতে পারল না। সে নিজেকে সাফাই রাখতে আবার বললে—এই দেখ না, বাবুর ছেলেকে তোর জেঠী—

—ঢেউ লেগে তোর সর্দি হয়েছে নাকি বাবা? আজে বাজে কথা বলে রাঘবকে থামিয়ে দিলে শর্মিষ্ঠা।

—কই! না তো!

রাঘব বুঝল না, কিন্তু মেঘু বুঝল শর্মিষ্ঠার কথাটা। সে বললে—না, ভেবে-ছিলাম তোরা ফিরে যাবি—

—হাঁ, পারলে তো ভালই—

—না বাবা, কি করে পারবি?

—কেন পারব না! বলে, মেঘুর দিকে তাকিয়ে রাঘব আবার বললে—কতক্ষণের কাজ? কেন পারব না? দেখ, কি বুদ্ধি হয়েছে মেয়েটার তোর জেঠীর পাল্লায় পড়ে। আমি কি তেমন বোকা! ডাঙ্গার মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাই বাবুর ছেলেকেও—

—না-না, তা হবে না। বলে রাঘবকে থামিয়ে দিল শর্মিষ্ঠা।

আসলে রথীরাম আসছে তার নিজের কাজে। খবরটা শুনে শুক্রী তাকে ধরে বসে, যাতে সে একটু রাঘবের সঙ্গে থাকে শর্মি-ষ্ঠাকে ইস্‌কুলে ভর্তি করবার সময়। যদিও চিঠিপত্র দিয়ে আগেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই রথীরামের কথাটা মেঘুর কাছে বলাটা দরকার মনে করেনি শর্মিষ্ঠা। রাঘব আবোল-তাবোল কথা বলে কি লজ্জায় তাকে ফেলল। সে আগে এটা ভেবে দেখেনি যে মেঘুর সঙ্গে তার বাবা ফিরলে তাদের সংসারের সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে মেঘুর কাছে। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, আর যেন না বাড়ে। তাই রাঘবকে না আটকে উপায় নেই।

একমাত্র মেয়ে, আদুরে মেয়ে, ছেলের মতো লেখাপড়া করা মেয়ে। তার কাছে মা-বাপের একই অবস্থা। রাঘব মাথা চুলকোতে লাগল।

আগের কথাটা শেষ করতে মেঘু বললে—ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে এলে ইচ্ছা মত ফিরতে পারবি। তাই এমন করেছি, যদি কোন অসুবিধে করে থাকি তবে মাফ দিবি।

মেঘুর কথা শুনে একেবারে গলে গেল। তার মাফ চাওয়ার কথায়ও সে যেন একটা সুযোগ পেল পুরানো কথাটার মীমাংসা করে নেবার, অন্ততঃ শর্মিষ্ঠাকে সকল দায় থেকে মুক্ত করবার। তাই নিজে-দের অপরাধের জের টেনে বললে—ছেলে-পিলের কি দোষ বাবা—দোষ যদি কারো থাকে সে আমাদের, বাপ-মায়ের—

—আচ্ছা জেঠা, আমি চললাম তবে।

বাস! আর কোন কথা শুনতে চায় না মেঘু। সে রাঘবের কথার ভঙ্গি জানে। কি বলতে কি বলে তার মন মেজাজ ঢিলে করে দেবে তার ঠিক নেই। তাই তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে লাফ দিয়ে পড়ল নদীর পাড়ে। তার সঙ্গীদের কিছু নির্দেশ দিয়ে হন হন করে চলে গেল সকলের চোখের বাইরে।

রাঘব বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল। এই তার প্রথম মনে হল মেঘু এখন কত বড় হয়ে গেছে। তাই ভবতে লাগল—মানুষ যখন বড় হয় তার মেজাজ বুঝি এমনই বদলে যায়!

(ক্রমশঃ)

পতিংবরা

সুশীল রায়

যেন এক-জোড়া মেয়ে না,—এক-জোড়া পায়রা। দ্জনকে দেখতেও যেমন ফ্ট-ফ্টে, দ্জনে চঞ্চলও তেমনি। দ্রন্তপনাই তাদের সারাদিনের কাজ।

অনেকে তাদের পায়রা বলত না, বলত হরিণী। এই মাত্র ওদের এখানে দেখা গেল, আবার কিছ্ক্ষণের মধ্যেই দেখা যেত অন্যত্র।

পদ্মার কিনারের এই শহর, সারা শহরই ছিল তাদের ঘ্রে বেড়াবার এলাকা। বিশেষ ক'রে পদ্মার কিনারের উঁচু বাঁধ—এই এম্-ব্যাঙ্কমেন্ট।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়ও তাদের দ্জনকে দেখা যেত ঐ এমব্যাঙ্কমেন্টের উপরে, পিঠ-ময় এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে পদ্মার হাওয়ায় এলোচুলে এলোমেলো হাওয়া লাগিয়ে তারা পাশাপাশি হে'টে চলেছে।

তারা দ্জনেই তখন ছোট, কিন্তু তাদের ঐ বয়সেই তাদের দ্জনের নামেই বেশ নিন্দা রটেছে। অথচ, এ ব্যাপারে তাদের কোনো পরোয়া নেই। তারা ঘ্রে বেড়ায়—কখনো বনে-বাদাড়ে, কখনো-বা আম কুড়াতে।

এইভাবে দিন কাটিয়ে চলেছে দ্ই বোন—মহামায়া ও তারা।

এরা যমজ নয়, কিন্তু অনেকের ধারণা এরা যমজ। কিন্তু আসলে মহামায়া বড়, তারা ছোট। তাদের বয়সের তফাত হবে বছর-দ্ই আন্দাজ।

এদের যমজ বলে মনে করার কারণ এরা দ্জন দেখতে প্রায় এক রকম। মহামায়ার গায়ের রং একট্ বেশি ফর্সা—এই যা তফাত।

ওদের নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়ে থাকে সর্বত্র—দোকানে বাজারে বৈঠকখানায়। ওদের নিয়ে অনেক মন্তব্য করে পাড়ার ছেলেরা। কিন্তু ওসবে ওদের কান নেই, ওদের মন নেই। ওরা নিজেদের নিয়েই মশগ্ল।

হরিহর গোস্বামীর মেয়ে এরা। ইনি পৌরোহিত্য করেন। এইটেই তাঁর জীবিকা। তিনি বিপত্নীক। অবস্থা ভালো না, অন্য-

ছিল তফাতে তটস্থ হয়ে। হিমাদ্রিভূষণকে আসতে দেখেই দাসীরা সরে গেল।

আরশিতে নিজের ছায়া ফেলে হিমাদ্রিভূষণ বললেন, 'যাও। ঘরে এসো।'

ঘরে বসে উঠে দাঁড়াল মহামায়া. জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়। তোমাদের বাগানবাড়ি থেকে?"

'না। রাণীবাজার থেকে। বাবার সংগে দেখা করে এস। অনেকদিন দেখা নেই। মন তাই তোমার বড় খারাপ।'

মহামায়া বলল, 'রাজা হয়েও মানুষের মন বুঝতে পারলে—এতে কিন্তু খুব আশ্চর্য লাগছে আমার। খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।'

হিমাদ্রি বললে, 'আমি রাজা অবশ্যই। পূর্বপুরুষের পাওয়া খেতাব এখনো গায়ে লেগে আছে। রাজা তো বটেই, কিন্তু আমি মানুষ।'

মহামায়া মৃদু হেসে বলল, 'এ সংবাদ শুনে সুখী হলাম। বাবার সংগে দেখা করতে আমি যাব।'

অবিলম্বেই সব আয়োজন হয়ে গেল। যে দরিদ্রের সংসার ধন্য করে মহামায়াকে নিয়ে এসেছিলেন হিমাদ্রিভূষণ, সেই সংসারকে আবার ধন্য করতে সেখানে চললেন মহারাণী। অনেক দাসী চলল সংগে, পেয়াদা-বরকন্দাজও। কোন কষ্ট না হয় মহারাণীর তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

মহামায়া যখন এসে পৌঁছল রাণীবাজারে তখন এক বিরাট ব্যাপার। সারা শহরটাই যেন ভিড় করেছে হরিহর গোস্বামীর ছোট বাড়িটার সামনে।

মেয়েদের কৌতূহল সাধারণত বেশি হয়ে থাকে, তারাই বেশি করে দেখতে লাগল তাদের দেশের সেই দুরন্ত মেয়েটাকে।

'কী সুন্দর দেখতে হয়েছে। সত্যিই মহারাণী।'

'কত শান্ত হয়ে গিয়েছে।'

'এতটুকু দেমাক দেখছিনে কিন্তু।'

এই রকম নানা কথা তারা বলতে লাগল।

দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তার দিদিকে দেখতে লাগল তারা। তার এই সাজ নিয়ে দিদির সামনে যেতে তার খুব সংকোচ হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে তার দিদি বুঝি তাকে চিনতেই পারবে না।—এইসব ভেবে সে কিছুক্ষণ দূরে দূরেই কাটাল।

রাজেন্দ্রাণীর মত তাঁর মেয়েকে দেখে হরিহরের মুখ দিয়ে কথা বের হল না।

মহামায়া তার বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'বড্ড বুড়ো হয়ে গেছ বাবা। এর মধ্যে এত বুড়ো হলে কেন। তোমার কিসের কষ্ট—তোমার মেয়ে রাজরাণী। এতদিন গেল, একবারও আমার খবর নিলে না। একবারও গেলে না দেখতে। সুখে আছি কি দুঃখে আছি তা কি জানতে ইচ্ছে করে না?'

'তুইও তো আগে এলে পারতিস। রাজপ্রাসাদের ভিতরে কী করে যেতে হয় সেই নিয়মই যে জানি নে রে। তুই এলি, এই তো বেশ।' মেয়ের মাথার হাত বুলিয়ে বললেন হরিহর।

মহামায়া বলে উঠল, 'আমি রাজরাণী. আমি গরিবের বাড়িতে আসব কেন। তুমি দীনহীন, কিন্তু তোমার কিসের অহংকার?'

চোখ ছলছল করে উঠল মহামায়ার।

হরিহর বললেন, 'অহংকার নয় রে—ভয়। গরিবেরা ঐশ্বর্য দেখে ভয় পায়, জানিস তো!'

'আমাকে দেখে তবে ভয় পাচ্ছ, বাবা?'

'ভীষণ ভয় পাচ্ছি।' বলেই মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন হরিহর।

দূরে থেকে, খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে, তারা লক্ষ করছে। স্তব্ধ হয়ে আছে সে। কাছে আসতে যেন ভরসা হচ্ছে না। বাবার কাঁধ থেকে মাথা তুলেই মহামায়া বলল, "তারা কোথায়, বাবা। ওকে দেখছি নে যে।"

"ওই তো ওখানে।"

মহামায়া প্রায় ছুটেই গেল তারার কাছে। তারা যেন ধন্য হয়ে গেল। দিদির পায়ের ধুলো নিতেই ভুলে গেল, হঠাৎ মনে হতেই প্রণাম করল দিদিকে।

মাথা তুলেই ছেলেমানুষের মতন করে বলল, "কেমন আছিস, দিদি?"

"দিদি কী রে! মহারাণী বল্।"

একটু থতমত খেয়ে গেল তারা, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কেমন আছিস, মহারাণী?"

"যেমন দেখছিস। তুই কেমন আছিস?"

তারাও বলল, "যেমন দেখছিস।"

"খুব ভালো আছিস।" বলল মহামায়া।

"ইশ বললেই হল।" বলে তারা কী যেন ভাবল, বলল, "তোদের বাড়িতে হাতি আছে?"

"আছে রে আছে।"

"ক'টা?"

"দুটো।"

"ঘোড়াও নিশ্চয় আছে। ক'টা?"

"অনেক।"

"ক'টা ঘর তোদের বাড়িতে?"

"এক-শ দেড়-শ হবে—গুনিনি।"

এসব শুনে তারা বলল, "বেশ আছিস। আর, আমাকে বলছিস—খুব ভালো আছি। বেশ মিথ্যুক হয়েছিস।"

মহামায়া বলল, "মিথ্যে না রে, মিথ্যে না।"

কিন্তু তারা তার দিদির কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই নিল না। সে বুঝতে পারল, বড়লোকেরা এইভাবেই সান্ত্বনা দেয় গরিবদের। অতগুলো ঘর, হাতি-ঘোড়া, সেপাই-বরকন্দাজ—এসব কি যা-তা কথা!

দিন-তিনেক মহামায়া ছিল। তার তেমন কষ্ট বোধহয় হয় নি। কিন্তু তার দাসীদের নিশ্চয় খুব অসুবিধে হয়েছে—এসব নিয়ে একটু-আধটু আলোচনা সে করেছে তারার সঙ্গে।

তারা সব কথা শোনে আর অবাক হয়। তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে আকাঙ্ক্ষা—দিদির মত হতে [illegible] তার। দেশে কি আর কোনো শিকারী নেই!

তাকেও যদি কেউ শিকার করে নিয়ে যেত, তবে বেশ হত। দিদির সঙ্গে এসব গল্পও সে করে।

মহামায়া বলে, "তোকে আমি বিয়ে দেব গরিব-ঘরে।"

শুনেই ফোঁশ করে ওঠে তারা, বলে, "বেশ স্বার্থপরও হয়েছিস কিন্তু। নিজে বড়লোক হব, আর গরিব করে রাখব সবাইকে, তাই না?"

তার জাঁকজমক ঐশ্বর্য-আড়ম্বর পেয়াদা-দাসী ইত্যাদি দেখিয়ে চলে গেছে মহামায়া। উৎসবের শেষে যেমন পড়ে থাকে পোড়া মোমবাতির টুকরো, তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল হরিহর গোস্বামীর বাড়িটা।

তারাও একেবারে নিস্তব্ধ। তার মনের মধ্যে আলোড়ন চলেছে সমানে। দিদির মত হতে হবে তাকে—দিদির মতন ঐশ্বর্য তার চাই।

কিন্তু ভাগ্যের লেখা অন্যরকম। গরিব-ঘরেই বিয়ে হয়ে গেল তারার। তার বাবার উদ্যোগেই হল এই বিয়ে। মেয়েকে পার করে তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান। বীরনগর থেকে আশীর্বাদ জানাল মহামায়া।

যার সঙ্গে বিয়ে হল তারার, তার নাম মনস্কান্ত। ছোট মহকুমা শহরের মিউনিসিপাল আপিসে সে কেরানিগিরি করে। ছোট চাকরি করে সে, কিন্তু মন তার ছোট না। তার বউয়ের রূপের খ্যাতি আছে, কিন্তু সে তার এই রূপসী বউকে আড়ালে লুকিয়ে রাখার জন্যে ব্যস্ত না। আর-পাঁচবাড়ির বউরা যেমন ঘর থেকে বেরোয়, হাওয়া-গাড়ি হর্ন দিলে মাথায় কাপড় দিতে-দিতে যেমন-তেমন সাজেই যেমন খিড়কির দরজা পর্যন্ত ছুটে এসে উঁকি দিয়ে দেখে কিসের গাড়ি, মনস্কান্তর বউও তাই করে।

তিন-চার বছর হল বিয়ে হয়েছে মনস্কান্তর। এই তিন-চার বছরের মধ্যে তারার রূপের খ্যাতি খুবই ছড়িয়েছে। যেমন রূপ, তেজও নাকি তেমনি। তাকে যে দেখেছে সেই মজেছে। তার এই রূপকে আগুনের শিখা যদি বলা যায় তাহলে সেই শিখায় পাখা-পোড়াবার জন্যে অনেক পতঙ্গ যে তার চার পাশে পাক খেয়ে না-উড়েছে, এমন নয়। কিন্তু ফল কিছু হয় নি। ফল হয় নি, তার কারণ ঐ তেজ। ও-তেজের বড় তাপ। ও-তাপের খুব কাছে ঘেঁষা বড় শক্ত।

যখন দুপুরবেলা স্নানের জন্যে পুকুরে নামে তারা, তখন পুকুরের ওপারের আম-জাম-পিয়াল গাছের আড়ালে এসে কখনো-কখনো কেউ এসে দাঁড়ায়।

মনস্কান্ত তার বউয়ের রূপের খবর তো রাখেই। সারা শহরে যে এই রূপ নিয়ে কথাচালাচালি চলেছে, তাও জানে সে। এবং অনেকের যে লোভ লেগেছে তার বউকে দেখে, এ-খবরও তার জানা।

কিন্তু তাতে তার কিছু যায়-আসে না। যে-মানুষের দিল্ বড় মনটা দরাজ—নিজের

উপরে সচরাচর তার বিশ্বাস থাকেই এবং নিজের বউয়ের উপরেও।

তার বউয়ের রূপের খবর যেমন রাখত মনস্কান্ত, তার মেজাজের খবরও রাখত তেমনি। সে জানত, রূপের টানে কেউ তার নাগালের মধ্যে এলে তার তেজের তাপে সে ঝলসে যাবে।

এইজন্যে নিশ্চিন্ত ছিল মনস্কান্ত।

সে নিশ্চিন্তই ছিল বটে, কিন্তু এই মহকুমা শহরে অনেক বড় বড় বদলোকও আছে, তাদের চিন্তার শেষ ছিল না। কেবল বদখেয়ালেই না, পয়সা কাড়তেও তারা বেশ বড়। তাদের কাছে মনস্কান্ত তো তুচ্ছ।

এ আক্ষেপ যখন করত মনস্কান্ত তখন তারা বলত, "কেন গরিব হলে, বলো তো! বড়লোক হতে পারলে না?"

এইভাবেই চলেছিল তাদের জীবন।

হঠাৎ একদিন জানা গেল মনস্কান্ত খুন হয়েছে। আসামীও ধরা পড়েছে। আসামী হচ্ছে সুবিমলবাবুর ছেলে নির্মল।

মনস্কান্তর খুনের খবরে সকলেই খুব মর্মাহত, তার চেয়ে বেশি মর্মাহত হল সকলে নির্মলের গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে।

সুবিমলবাবু রাজা-উজির কিছু নন, কিন্তু অনেক টাকা তাঁর—টাকার কুমীর। এঁরই ছেলে নির্মল। বড়লোকের ছেলে বটে সে, কিন্তু কোনোরকম বদখেয়াল তার নেই। অমন ভদ্র বিনয়ী ও নিরহংকার ছেলে বড়লোকের ঘরে বেশি দেখা যায় না।

স্থানীয় সাপ্তাহিক কাগজ 'দেশদর্পণ' খুব ঘটা করে খবর ছাপল। সে খবরের মধ্যে খুনের খবর যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি তারার খবর। 'রূপের আগুন' নাম দিয়ে সম্পাদকীয় ছাপা হল।

অনেকের ধারণা, আসল আসামী ধরা পড়েনি। অন্য কেউ এই কান্ডটা করে ফাঁদে ফেলেছে এই ছোকরাকে।

বিশেষ করে উকিল বিকাশবাবুর এটা দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁর বয়স বেশি না হলেও অনেক খুনের মামলা তিনি করেছেন। তাঁর ধারণা, এর মধ্যে বেশ রহস্য আছে।

তাঁর ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে সুবিমলবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লাটে তোলার জন্যে তৈরি। বড়-বড় উকিলদের মোটা-মোটা ফী দিয়ে তাঁদের সঙ্গে তিনি সলাপরামর্শ করছেন।

কিন্তু বিকাশকে বিশেষ আমোল দিচ্ছেন না। তার ছেলেবেলা থেকে তাকে দেখছেন, একা মানুষ সে, তার চাহিদা বেশি না, তাই তার ফীও মোটা না—এই জন্যেই হয়তো তাকে গুরুত্ব দিতে পারছেন না সুবিমলবাবু।

আদালতে বসে-বসে বিকাশ দেখে যাচ্ছে মামলা। যত সাক্ষীর জেরা হচ্ছে সব শুনে যাচ্ছে সে। যার উপরে বিকাশের সন্দেহ, সেও সাক্ষ্য দিয়ে গেল। সে হচ্ছে মনোহর। তার চোখমুখের ভাব দেখেই বিকাশের ধারণা হল—এ খুনে এর হাত আছে। তাছাড়া, তার সম্বন্ধে একটু খবরও সে রাখত। তারার পিছনে সবচেয়ে বেশি লেগেছিল এই মনোহর। মনস্কান্ত মস্ত বাধা হয়েছিল বলে তাকে সাফ করে ফেলবে বলে নাকি সে শাসিয়েওছিল।

মামলা যখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে, তখন ব্যাপার বেগতিক দেখে বিকাশ গিয়ে হাজির হল সুবিমলবাবুর কাছে। কিন্তু যেহেতু তার ছেলেবেলা থেকেই তাকে তিনি চেনেন, তাই এই জটিল মামলার কিছু যে সে বুঝবে, তা তাঁর বিশ্বাস হল না।

কিন্তু বিকাশ একটু চাপই দিল। সে বুঝিয়ে বলল যে, কেস যেমন চলেছে, তাতে একজন নির্দোষের শাস্তি হয়ে যাবে। এটা হতে দেওয়া যায় না। মনোহরের কথাও একটু বলল বিকাশ।

অবশেষে সুবিমলবাবু রাজি হলেন।

হাকিমকে অনেক বলে-কয়ে অনেক আবেদন-নিবেদন করে, বিপক্ষের উকিলকে অনেক আর্গুমেন্ট দিয়ে ঘায়েল করে, অনেক নজির দেখিয়ে, পুনরায় সাক্ষীদের জেরা করার হুকুম পেল বিকাশ।

প্রথমে কয়েকজন ছোটখাট সাক্ষীকে জেরা করে সমস্ত ব্যাপারটার একটা মোটামুটি চেহারা জেনে নিল। ঐ মেয়ে এখানে বউ হয়ে আসার পর এখানকার আবহাওয়া ধীরে ধীরে কীভাবে বদলালো, কী করে তার কথা নিয়ে ছেলে-মহলে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল, কোন্ কোন্ ধরনের ছেলে এই তর্কে সবচেয়ে বেশি যোগ দিত—ইত্যাদি ব্যাপার সাক্ষীদের দিয়ে বলিয়ে নিল। এতে এটুকু বোঝা গেল যে, যাদের অশিক্ষিত বলা হয়, সেই ধরনের ছেলেরাই এতে বেশি উৎসাহী ছিল।

এতে বিকাশের সন্দেহ মনোহরের উপরেই আরও গভীর হল। মনোহরের পেট থেকে কথা বার করার জন্যে শক্তিও যেন বেড়ে গেল তার।

বিকাশ আগে প্রমাণ করে নিল যে, খুনের ঘটনার সময়, রাত দশটা বিশ মিনিটে, নির্মল সার্কাস দেখছিল। গ্রেট ডায়মন্ড জুবিলি সার্কাস তিন-আনী রাজার মাঠে তাঁবু ফেলে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছিল কিছুদিন থেকে, সেই রাত্রে নির্মল সেখানে প্রেজেণ্ট ছিল। তার সঙ্গী যারা ছিল। তারাও আদালতে হলপ করে তা বলে গেল। আসল কথা, সেখান থেকে যখন সে ফিরছিল, তখন তাকে আসামী বলে ধরা হয়। স্থানীয় মাতব্বরদের সম্মানে সেখানে সে রাত্রে একটা নতুন খেলা দেখানো হয়, নির্মল তার হুবহু বর্ণনা দিল। সার্কাসের ম্যানেজারকেও আনা হল, তিনিও বর্ণনা শুনে মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক'।

এবার মনোহরকে জেরা করার জন্যে তৈরি হল বিকাশ।

তার এক ডাক্তারবন্ধুর কাছ থেকে বিকাশ জেনে নিয়েছিল যে, খুনী রক্ত দেখে ভয় পায়, তাকে রক্ত দেখালে সে সহ্য করতে পারে না।

বিকাশ একজন মালাকরকে ডেকে একটা মোমের পুতুল তৈরি করিয়ে নিল।

আদালতে গিয়ে মনোহরকে জেরা করতে আরম্ভ করল বিকাশ। মনোহরের অতীত, তার বর্তমান, তার জীবন, তার জীবিকা, তার বিদ্যা তার বুদ্ধি, ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন করে তাকে কাবু করে নিল বিকাশ। সেদিন রাত দশটায় সে কোথায় ছিল, এগারোটার সময় কোথায়, মনস্কান্তকে সে চেনে কিনা, তার স্ত্রীর নাম কি, দেখতে কেমন, বয়স কত ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন বিপক্ষের উকিলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে করে গেল।

অবশেষে হাকিমের হুকুম নিয়ে মোমের পুতুলটি সে রাখল টেবিলে। পুতুল তো নয়, অবিকল একটি মানুষের মূর্তি। মনোহরকে জেরা করতে-করতে ছুরির ফলা বসিয়ে দিল পুতুলের গলায়। ভিতরটা ছিল লাল রঙে ভরা, টেবিলময় ছড়িয়ে গেল সেই রঙ।

চেঁচিয়ে বলে উঠল বিকাশ, 'মনস্কান্তকে হত্যা করা হয়েছে হয়তো এইভাবে।'

সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল মনোহরের।

বিকাশ বলল, 'তার স্ত্রীকে পাওয়ার জন্যে মনস্কান্তকে শাসিয়েছিল কে?'

দুই চোখ লাল হয়ে উঠল মনোহরের। আর ছাড়া নেই। এবার বিকাশ জাপটে ধরল মনোহরকে। কেবল মনস্কান্ত আর তারা, তারা আর মনস্কান্ত—এই নাম উচ্চারণ করতে লাগল বিকাশ।

কেঁদে ফেলল মনোহর। চোখ মুছতে মুছতে যা বলল, তা স্বীকারোক্তির মতই।

নির্মল ছাড়া পেয়ে গেল। মনোহরের ফাঁসি হল না, হল লম্বা জেল।

বছর-দুই লেগেছিল এই মামলার নিষ্পত্তি হতে।

সুবিমলবাবু এসে কৃতজ্ঞতা জানালেন, বললেন, 'বিকাশ, তুমি জিনিয়াস। আগে ধরতে পারিনি। তোমার জন্যে ছেলে ফিরে পেলাম। অনেক টাকাও বেঁচে গেল। টাকাটা কাজে লাগাতে চাই। তুমিও কিছু নাও।'

বিকাশ বলল, 'আমার আছেই-বা কে, খাবেই-বা কে। আপনি কাজে লাগিয়ে দিন টাকা।'

সুবিমলবাবু বললেন, 'একটা বিরাট বাড়ির খোঁজ পেয়েছি। দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছে অনেকটা পোরশন। এখনো যা আছে তাও অনেক, স্পেশালি একটা বাগানবাড়ি নদীর কিনারে বাগানবাড়িটা—একটা ইউনিক ব্যাপার। লোকটা হঠাৎ মরেছে পাওনাদাররাও ছেঁক ধরেছে। এইটে একটা মওকা। কিনব ভাবছি।'

'কিনে ফেলুন। কাঁচা টাকা হাতে রাখতে নেই। সেটা বড় কাঁচা কাজ।'

সুবিমলবাবু বললেন, 'বলছ?'

বিকাশ বলল, 'তাই করুন।'

'ঠিকই বলেছ। উকিলের পরামর্শ তো চাই-ই সব ব্যাপারে।'

ইতিমধ্যে কিছু সময় পার হয়ে গিয়েছে। মামলার ঝড়ঝাপটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা নির্মল এসে হাজির হল বিকাশের কাছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে সে, হাজতবাসের সব চিহ্ন সর্বাঙ্গ থেকে মুছে ফেলেছে।

বিকাশ বলল, 'কি খবর?'

বিনীত ভঙ্গিতে বসতে বসতে হাতে-ধরা কোঁচাটা পায়ের উপরে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ জানাতে এলাম।'

বিকাশ বলল, 'এ তো আমার পেশা, হে। এর জন্যে ধন্যবাদ কেন।'

একটু ঝুঁকে বসল নির্মল, বলল, 'একটা পার্টি দিচ্ছি। আপনাকে যেতে হবে। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

'কিসের পার্টি হে?'

নির্মল মাথা নীচু করে বলল, 'গার্ডেন পার্টি। জনকয়েক মিলে একটু হৈ-হৈ করা। এতবড় একটা মামলা থেকে বেঁচে এলাম, একটু আনন্দ করব না?'

'নিশ্চয়। আনন্দ করা তো দরকারই, একটু কেন, অনেক। মামলা জিতে কেন, তেমন মেজাজী মানুষ হলে মামলা হেরেও—'

শব্দ করে হেসে উঠল নির্মল, বলল, 'আপনি তবে যাচ্ছেন, বিকাশদা।'

বিকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূরে সে গার্ডেন?'

'তা, দূর আছে। এখান থেকে মাইল-পনেরো-ষোলো। নওহাটার রাস্তা ধরে বরাবর গেলেই আড়াইদহ, তার থেকে মাইল-দেড়েক দূরেই আমাদের এই বাগান-বাড়ি।'

'অত দূরে ব্যবস্থা করলে কেন?' জিজ্ঞাসা করল বিকাশ, বলল, 'ওদিকে তো নদী-টদীও নেই। অমন জায়গা নিলে কেন।'

নির্মল একটু হাসল, একটা চোখ একটু বুঝি ছোটই করল, বলল, 'ফূর্তি-ফার্তার ব্যাপার। একটু দূরেই ভালো। একটু আড়াল-আবডালই ভালো। কি বলেন?'

নির্মলের এই ভঙ্গি দেখে একটু যেন চমকই লাগল বিকাশের। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিকাশ বলল, 'থাক্।'

'কেন থাকবে বিকাশদা?'

'ওসব বাগানবাড়ি সহ্য হবে না। তাছাড়া, লোকেই-বা বলবে কি?'

'লোকে?' নির্মল যেন আশ্চর্য হয়ে গেল, বলল, 'ওদিকে লোকালয়ই নেই। জানবে কী করে লোকে? অত দূরে যাচ্ছি কি এমনি-এমনি? কেউ জানতে পারবে না। কখন যাবেন বলুন। ঠিক সময়ে গাড়ি এসে দাঁড়াবে। ড্রাইভার সোজা নিয়ে গিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

নিজের চেহারার আর পোশাক-পরিচ্ছদের কথা ভাবতে লাগল বিকাশ। এসব কি বাগানবাড়িতে মানায়? এসব কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হল, কিন্তু নির্মলের এক কথা—'তাতে কি, তাতে কি।'

অগত্যা নির্মলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল বিকাশ।

সুবিমলবাবু যে বাগানবাড়ির কথা বলেছেন, এটা তবে সেটা না। বিকাশ বসে-বসে ভাবতে লাগল।

ওদিকে সুবিমলবাবু তাঁর সম্পত্তি বাড়াবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

দালালের সঙ্গে বসে তিনি কথা বলছেন, বলছেন, 'বেঘোরে যখন পড়েছে, তখন দাঁও তো মারতেই হবে, কী বলেন। দর একটু কমিয়ে দিন। বলুন আপনাদের মালিকানীকে এর চেয়ে বেশি দিতে পারব না। নেশা করে ফূর্তি করে দেনা করে গেলেন—এখন সে-দেনা শুধতেই হবে তো।'

দালাল বললেন, 'কথা বলে দেখি। আপনি আর কতটা বাড়তে পারবেন জেনে যাই।'

'বাড়ব কি! তিনি কতটা নামবেন, বলুন।'

দালাল বললেন, 'অনেক নেমেছেন! কী ছিলেন, কী হয়েছেন।'

'ওসব দরদের কথা রাখুন। কাজের কথা বলুন। দেখুন, সাদা চোখে যেমন ফূর্তি হয় না, সাদা টাকাতেও এ-পার্টি হয় না। এ আমার অনেক খাটুনির টাকা, অনেক কারসাজির টাকা। একটা এয়ার-পোর্ট তৈরি করলাম, সেটা ডেমলিশ করলাম। দুটো বিলের টাকা পেলাম। কিন্তু সেখানে হাতই দিতে হয়নি। তৈরিও হয়নি, ভাঙাও হয়নি। বুঝলেন, কত কষ্টের টাকা। এইভাবেই তৈরি করেছি টাকা। তাই তো লোকে আমাকে বলে—টাকার কুমীর। সে টাকা দিয়ে তো দান-খয়রাত হয় না।'

দালাল চলে গেলেন। কয়েকদিন বাদে ফিরে এসে বললেন, 'আপনি চলুন, আপনিই সরাসরি কথা বলুন। ও'দের এখন টাকার খুব দরকার।'

অনেক দূরের পথ, ট্রেনে চেপে বসলেন সুবিমলবাবু।

দোতলার বারান্দায় রাজ্ঞীসুলভ গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে আছে মহামায়া। পরনে অতি সাধারণ শাড়ি।

নীচে নাট্যশালার চত্বরে দাঁড়িয়ে সুবিমলবাবু উপর দিকে একটু চেয়ে
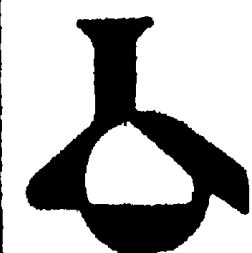
তিনি বললেন, 'আমি নিজেই এলাম কথা বলতে। আপনাদের বাগানবাড়িটা—'

উপরে মহামায়া একটু বিচলিত ও বিরক্ত হয়ে দাঁড়াল। প্যারীচরণ উপর থেকে বললেন, 'মহারানী বলছেন, ওটার কথা তিনি তো আগেই বলে দিয়েছেন, ওটি হাতছাড়া হবে না, ওটা থাকবে।'

মহামায়া বললেন, 'ওঁকে বলুন, এই রাজবাড়ির যে-অংশটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে, তার উপর তাঁর আগ্রহ আছে কিনা। আমার স্বামী একটু বে-হিসাবী ছিলেন বলে একটু ঋণ হয়ে গেছে। তাই।'

স্বকর্ণেই একথা শুনতে পেলেন সুবিমলবাবু। বললেন, 'নেব তো বটেই। আপনাদেরও টাকার দরকার। আমারও দরকার বাগানবাড়িটা—ওখানে একটা ফ্যাক্টরী করতে চাই কিনা। ওটা পেলে, এ-বাড়ির যে পোরশন চাই তার দাম আর কমাতে বলব না।'

মহামায়া এবার সম্রাজ্ঞীর মত বলে উঠলেন, "নায়েব-মশায় ওঁকে বলে দিন—যা গেছে তা গেছে, আর-সব থাকবে। বাগানবাড়ি কেন, এ বাড়িরও কোনো অংশ দিতে পারব না।"

প্যারীচরণ বললেন, "মহারাণী বলছেন—"

সুবিমলবাবু হতভম্ব হয়ে গেছেন, বললেন, "শুনেছি। শুনেছি। বেশ তো, বাগানবাড়ি না হল, এই বাড়িটার—"

মহমায়া বললেন, "ওঁকে বলে দিন—মহারাণীর ইচ্ছে নয় আর কোনো-কিছুই তিনি হাতছাড়া করেন। বলে দিন, মহারাণীর টাকার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে উনি যেন ব্যস্ত না হন। বলে দিন—মহারাণীর—"

আর কথা বলতে পারলে না মহামায়া। সে সরে গেল।

সুবিমলবাবু কী কথা বলবেন, কী করে বোঝাবেন তাঁর আগ্রহ তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

ওদিকে বিকাশের দরজায় এসে দাঁড়াল মস্ত একটা গাড়ি। দিন নির্দিষ্ট ছিল, সময়ও। বিকাশ উঠে বসল।

অনেক পথ পার হয়ে, অনেক বাঁক নিয়ে, অনেক ধুলো উড়িয়ে ছুটল সেই গাড়ি। অবশেষে নোনা-ধরা ইঁটের মস্ত ফটকের সামনে থামল সেই গাড়ি। বাগান বোধহয় ছিল এককালে—এখন সব আগাছায় ভরা। ভিতরে গাছের ছায়ায় অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বিরাট এলাকা। ঝরাপাতা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে বিকাশ ঢুকল বাগানবাড়িতে।

হৈ হৈ ব্যাপার। প্রকাণ্ড হল-ঘরে ফরাস বিছানো। অনেক তাকিয়া গড়াগড়ি যাচ্ছে, তার সঙ্গে গড়াগড়ি যাচ্ছে ওরা কারা। বাইরে আলো আছে, কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার। উপরে মস্ত ঝাড় ঝুলছে, তাতে মোম এখনো জ্বলেনি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল বিকাশ। কে-যেন কাত হয়ে শুয়েই তাকে কি নির্দেশ জানাল। বুঝল না বিকাশ।

একজন আবার একটু উঠে বসল, ভুরু-দুটো কপালের উপরে টেনে তুলে চোখ খোলার চেষ্টা করে বিকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু বিকাশকে চিনতে পারল না। বিকাশ কিন্তু তাকে চিনল—নির্মল।

চমকে গেল বিকাশ। সেদিন ওর এক চোখ একটু ছোট করা দেখেই তার আশ্চর্য লেগেছিল। আজ তার দু' চোখের দশা এই ?

পেয়াদারা ছুটোছুটি করছে—এদের চাহিদার জোগান দিচ্ছে। ওদিকে রান্নাবান্না হচ্ছে—তার শব্দ আসছে, গন্ধও।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিকাশ। বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

রান্নার শব্দ ভেদ করে নতুন ধরনের আওয়াজ পেল বিকাশ। নারীকণ্ঠের কাকলি। বারান্দার কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, পুকুরের একাংশ। এক পাল মেয়ে জলকেলি করছে।

মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে গিয়ে নির্মল-দের অবস্থা দেখে আসছে বিকাশ। আবার বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে। জলকেলির শব্দ এখন আর পাচ্ছে না। একটু আগে যারা যেন হাসির শব্দ ছড়াতে-ছড়াতে ঐ পথে ছুটে চলে গেল।

এদিকে বেলা পড়ে আসছে। ক্ষিদেয় বিকাশের নাড়ি জ্বলছে।

কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না। অগত্যা বিকাশ নিজেই উদ্যোগী হল। রান্নাঘরের দিকে চলল সে। সেখানে গিয়ে ঠাকুর বা বাবুর্চি যাকেই পাবে তাকেই সে বলবে—'পেটে যে ফায়ার জ্বলছে, খানা দাও'।

ঘর থেকে বারান্দায় এল সে। বারান্দার ঐ প্রান্তে ছোট দরজা। ঐ দরজা দিয়ে এগিয়ে যেতেই কে-যেন তার হাত ধরে টানল।

চমকে উঠল বিকাশ। বিকাশ চমকে উঠতেই বেশ শব্দ করে হেসে উঠল কে এ ?

ঐ স্পর্শে আর ঐ শব্দে বিকাশের শরীর হিম হয়ে উঠল।

এখানে আলো সামান্যই, সেই ফিকে অন্ধকারে সে স্পষ্ট দেখতে পেল ঘাগড়ায়-ওড়নায় মণ্ডিত এক পরমাসুন্দরী কন্যা।

সে বলল, "চিনতে পারেন ?"

বিকাশ উত্তর দিল না। দেখে সে বলল, "উকিলবাবুই বলি, বিকাশবাবু না বললাম। আমাকে ভুলে গেলেন এরই মধ্যে ? আমি আমি।"

"আমি মানে ? কে তুমি ?"

আবার ঐ হাসি হেসে সে বলল, "আমি আমি তারা।"

একটু পরে বলল, "ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে তো ? আসুন।"

তার সঙ্গে সঙ্গে চলল বিকাশ। অনেক ঘর-বারান্দা পার হয়ে।

হঠাৎ দাঁড়াল তারা অন্ধকার বারান্দায়। বলল, "উকিলবাবু, এই কি তোমাদের আইন ? কে খুন করল, কে গেল জেলে ?"

থতমত খেয়ে বিকাশ বলল, "কে, কে করেছে ? নির্মল, নির্মল বুঝি ?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সেই হাস্যময়ী, বলল, "না। না। না।"

"তবে ?"

ওড়না দিয়ে চোখ ঢেকে সে বলতে লাগল, "বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি নি।"

একটু থেমে বলল, "হতে চেয়েছিলাম মহারাণী। কিন্তু কী হয়ে গেলাম। দেখুন তো মহারাণীর মত দেখাচ্ছে কি না।"

আবার সে কেঁদে উঠল, বলল, "ভীষণ বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এমন হবে জানলে কি অমন কাজ কখনো করি ?"

শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল তারা। তার কান্নার শব্দ শুনে ছুটে এল এক ঝাঁক মেয়ে, মেয়েরা বলতে লাগল, "চোখে জল কেন তারা-সুন্দরীর ? তোর মনের মানুষ বুঝি—"

বিকাশ লজ্জা পেয়ে সরে এল।

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তখন বারাকপুর, রাণীগঞ্জ আর াপুরে ছিল বড় বড় সেনানিবাস। র ভাগ সৈন্য ছিল দেশী। টোটা নিয়ে ধর্ম নাশের ভয় আর অসন্তোষ য পড়েছে সর্বত্র। বহরমপুর ছাউনীতে জ সৈন্য ছিল না একজনও। টোটা খিটীমিটি শুনে কর্ণেল মিচেলের খুব রাগ। তিনি সিপাহীদের ডেকে গরম বক্তৃতা দিয়ে চোখ রাঙিয়ে ন -- কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ল কঠিন শাস্তি পাবে। বয়েই গেছে, পয়ে শান্ত হওয়া তো দূরের কথা— চলল তাদের চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা। সঙ্গীন হয়ে উঠলে বহরমপুরেব ীদের নিরস্ত্র করে নিয়ে আসা হল পুরে। কেন তা—সিপাহীরাও জানল ে পথে কোন অবাধ্যতা না করে ভাবেই এল তারা।

িতিমধ্যে বারাকপুরের অবস্থাটা কি? দেশে খুব বেশী ইংরেজ সৈন্য ছিল ধন। রকম সকম দেখে প্রমাদ গুনল ানী। রেঙ্গুন থেকে বেশ এক দল সৈন্য আনা হল কলকাতায়। বারুদের আগুন—কি, আমাদের অবিশ্বাস? পড়ল সিপাহীরা, উত্তেজনা গেল বেড়ে।

াজ সকালে কুচকাওয়াজ হত ীদের। কুচকাওয়াজের মাঠে জেনারেল স বললে—টোটায় কারু জাতি ধর্ম বে না। ইংরেজদের উদ্দেশ্য মহৎ। র শাসন শৃঙ্খলায় ভাল বন্দোবস্ত ারতবাসীকে সভ্য করে তোলাই ব্রত।

ধু মুখের কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? া বুঝতে আর বাকী নাই কিছু। িনিত্য দু চোখ ভরে সিপাহীরা স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক রূপটা। া বেড়েই চলল।

ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও অনেক ছিল বারাকপুর দেশী ফৌজে। তারা বললে—শুধু গুজবে কান দিয়ে হঠাৎ কিছু করে বসাটা ভাল হবে না। বদ লোকের মিথ্যে রটনাও হতে পারে। সত্যি-মিথ্যে জানতে হবে যাচাই করে। দেশেও তৈরী হচ্ছে ঐ টোটা। গোলা-বারুদের কারখানার কর্মীদের সঙ্গে যোগা-যোগ চাই। তারাই ঠিক বলতে পারবে আসল কথাটা।

সিপাহীদের কাজ তো সময় মাপা, তারই বা সময় কোথা, সুযোগ কই? সুযোগ মিলল।

৩৪নং রেজিমেন্টের সিপাহী আচার-নিষ্ঠ তেওয়ারী ভোর বেলা গঙ্গাস্নান সেরে শিব সূর্য্যি হনুমানজীকে ফুল জল দিয়ে ঝকঝকে পিতলের লোটায় গঙ্গাজল নিয়ে 'সিয়ারাম' 'সিয়ারাম' করতে করতে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জাতি ধর্ম বজায় রেখে শুচিবাইর মত ফিরছিল ব্যারাকে। পথে দেখা রামধারী কেওটের সঙ্গে। হা হা হেসে রামধারী বলল—অত জাতি ধর্মের গুমোর করতে হবে না তেওয়ারীজী। আসলেই নাই তা যাবে কি? আপনাদের জাতি ধর্মের মাথা খেয়ে দিয়েছে ফিরিঙ্গিরা। হিন্দু মুসলমান দুয়েরই। সবাই খেরেস্টান না হলে ওদের সুবিধে হচ্ছে না। শিব সূর্য্যি হনমানজী ছেড়ে এখন গির্জেয় গিয়ে খিরিস্ট ভজুন গে।

থমকে দাঁড়াল তেওয়ারী—ব্যাটা বলে কি? আস্পর্ধা তো কম নয়! জাতি ধর্ম তুলে কথা।

রামধারী ঠিকই বলছে। গোলা-বারুদের কারখানায় কাজ করে সে। সে নিজের হাতে গরু শুয়োরের চর্বি দিয়ে টোটার টুপিতে কাগজ সাঁটে। ভাল সাঁটা যায় এতে। সেই টুপি দাঁতে কাটলে জাতি ধর্ম রইল কি—হিন্দু মুসলমান কারুর?

সত্যি সত্যি তিন সত্যি করে মাকালীর দিব্যি করে বলে রামধারী চলে গেল হাসতে হাসতে।

মাথা ঘুরে গেল তেওয়ারীর। টলো-মলো পায়ে দৌড় দিল ব্যারাকের দিকে।

—কি হয়েছে, দৌড়াচ্ছ কেন?—রুখতে গেল দারোয়ান। এক ধাক্কায় দারোয়ানকে সরিয়ে ফেলে ছাউনীতে ঢুকে তেওয়ারী ধড়াস করে পড়ল অফিসের দাওয়ায়।

সিপাহীরা ছুটে এসে ভিড় জমালো—তেওয়ারীজীর অসুখ, মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে বাতাস করতে লাগল।—কি হয়েছে তেওয়ারীজী, কি হয়েছে?

—আর কি হয়েছে—ডাক উনিশ নম্বরের পাঁড়েজীকে -- হাঁপাতে হাঁপাতে বলে তেওয়ারী।

ইয়া ছাতি, চওড়া চেহারা, টিকালো নাক, বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ, অত্যন্ত সচ্চরিত্র যুবক মঙ্গল পাঁড়ে এসে বসল তেওয়ারীর কাছে। তেওয়ারী এক নিঃশ্বাসে বলল সব। মঙ্গল পাঁড়ের চোখে প্রলয়ের আগুন, বুকে প্রলয় ঝঞ্ঝা। তড়াক করে লাফিয়ে একটা উঁচু জায়গায় উঠে মঙ্গল বলতে লাগল — হিন্দু-মুসলমান ভাই সব, কদিন আগে থেকেই কানাঘুষায় শুনছি আমরা। আজ নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশ—সোনার ভারত জবর দখল করেছে ইংরেজরা। শাসনের নামে শোষণ চালিয়ে ধনসম্পদ লুটেপুটে চালান করছে সাগর পারে—নিজেদের দেশে। আমরা মরছি না খেয়ে। এখন আবার আমাদের জাত ধর্ম নিতে চায়। এ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের দেশ। সবাই এক হয়ে রুখে দাঁড়াও, দূরে করে দাও ফিরিঙ্গি ব্যাটাদের সাগর পারে। দেশের সর্বনাশের সময় এসেছে। এস, আমরা এক হয়ে সংগ্রাম করি কোম্পানীর বিরুদ্ধে। এই আমাদের বাঁচবার পথ। এস, দেশকে স্বাধীন কর, সংগ্রাম কর।

নিমেষে সব সিপাহী এক হয়ে নেচে উঠল—সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম।

বিদ্যুৎবেগে খবর ছড়িয়ে গেল সারা ভারতে—টোটার টুপিতে গরু-শুয়োরের চর্বি—নিঃসন্দেহ।

তখনও সত্যসন্ধ সায়েবরা বোঝাচ্ছে—টোটার মধ্যে গরু শুয়োরের চর্বি নাই। আচ্ছা, দাঁত দিয়ে না খুলে হাত দিয়ে টুপি ছিঁড়ো।

সমঝে ছাতুমুঠো—ফল হল উল্টো। সিপাহীরা বুঝল গরু শুয়োরের চর্বি আছে টোটায়, না হলে হাত দিয়ে ছিঁড়তে বলবে কেন? হাত দিয়েই বা ছিঁড়বে কেন তারা? হিন্দুরা গরুর চর্বি আর মুসলমানরা শুয়োরের চর্বি ছোঁবে না কি কেউ? উত্তেজনা টগবগিয়ে ফুটে উঠল।

১৮৫৭ সালের প্রথম দিকেই এক রাতে জ্বলে উঠল বারাকপুরের টেলিগ্রাফ স্টেশন। তারপর থেকে রোজই জ্বলতে থাকল ইংরেজদের খড়ের বাংলো। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ইংরেজরা।

কোম্পানী ভাবল যত নষ্টের গোড়া ১৯ আর ৩৪ নম্বর পদাতিক রেজিমেন্ট। ভেঙে দিতে হবে ও দুটো দল। ভেঙে দেবার তারিখও ঠিক করল তারা। কিন্তু ভাঙা আর হল না।

দেশপ্রাণ মঙ্গল পাঁড়েরও আর সহ্য হচ্ছিল না। নিপীড়িত জনগণের মুখ পানে চাইতে পারছিল না সে। রবিবার সকালে কুচকাওয়াজের আগেই হাতে গুলীভরা পিস্তল আর কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে খোলা মাঠে হাজির হয়ে জ্বলন্ত ভাষায় সিপাহীদের বলল — ভাই সব, আর দেরী নয়, দেশের সর্বনাশের সময় এসেছে, দেশ গেছে, খাবার গেছে, জাতধর্মও যেতে বসেছে। ওঠো, জাগো, বেইমান শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম কর, দেশকে স্বাধীন কর। ইংরেজ ভাগাও, দেশ জাগাও।

সব সিপাহী চেঁচিয়ে উঠল — সংগ্রাম, সংগ্রাম, বিদ্রোহ।

রবিবার ছুটির দিন। গোলমাল শুনে ছুটে এসে ইংরেজ সার্জেন্ট মেজর হগসন গর্জন করে বলল—গ্রেপ্তার কর মঙ্গলকে।

কেউ এগুলো না, কে ছোঁবে তাকে?

মঙ্গল সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ল।

হগসন পড়ল মাটিতে।

গুলীর শব্দে ঘোড়ায় চড়ে এল দুর্দান্ত ইংরেজ অফিসার সার্জেন্ট বেগ।

মঙ্গল গুলী ছুঁড়ল। মাথায় লেগে হুমড়ী খেয়ে পড়ল ঘোড়াটা। তাড়াতাড়ি উঠে মঙ্গলকে গুলী করল বেগ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বেগ তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করল পাঁড়েকে। বেগের সাহায্যে এল আর একজন ইংরেজ। একদিকে দু ইংরেজ সৈনিক আর একদিকে একা মঙ্গল পাঁড়ে। বীরের হাতে অসি, কি ক্ষিপ্র সেই অসি চালনা! ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল যাছাধনরা। অন্য সিপাহীরা দেখছিল চুপচাপ, কেউ এগিয়ে এল না পাঁড়েকে সাহায্য করতে। পাহারার কাজে কুড়িজন সিপাহী নিয়ে একজন সুবাদারও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ইংরেজ সৈন্যদেরও সাহায্য করল না সে। মঙ্গল পাঁড়ে সিপাহীদের 'ভীরু' কাপুরুষ বলে গালাগালি দিল। সুবাদারকেও ছেড়ে কথা কইল না, তাকে ও নিন্দা করল রীতিমত। তারপর রক্তমাখা তরোয়াল উঁচু করে রক্তমাখা মঙ্গল বলতে লাগল—ভাই সব ওঠো জাগো, দেশকে স্বাধীন কর।

এমন সময়ে কর্ণেল হুইলার এসে হুকুম দিল—গ্রেপ্তার কর মঙ্গলকে। কে করবে গ্রেফতার? সিপাহীরা এক সঙ্গে সোচ্চার জানিয়ে দিল—ঐ ব্রাহ্মণের এক গাছি চুল পর্যন্ত ছোঁবে না তারা।

বেগতিক দেখে হুইলার ছুটল জেনারেল হিয়ারসের বাংলোয়। সব শুনে এক দল ইংরেজ সৈন্য নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এল হিয়ারসে। দলে দলে গোরা সৈন্য আসতে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল সিপাহীরা।

হিয়ারসের হুকুম—গ্রেফতার কর মঙ্গল পাঁড়েকে।

এক পাও নড়ল না সিপাহীরা। শেষে এক মীরজাফরী মুসলমান জাপটে ধরল মঙ্গলকে।

পাঁড়ে কিন্তু পালাল না, নিজেই নিজেকে গুলী করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল মাটিতে। সেদিন ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ, দেশমাতার মঙ্গল আরতিতে রক্তজবার প্রথম অঞ্জলি।

নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল সব। ইংরেজ সেনাপতি অবাক। ভাবল — নিরপেক্ষ সিপাহীদের হাতেও অস্ত্র রাখা নিরাপদ নয়। হুকুম হল সব সিপাহীদের কুচকাওয়াজের মাঠে জড়ো হতে। ছাউনীর মাঠে সারি সারি সাজিয়ে রাখা হল কামান। যত ইংরেজ সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সেজে সারিবন্দী দাঁড়াল সামনে। মাঝখানে দেশী সিপাহীদের নিরস্ত্র করে জানিয়ে দেওয়া হল—আর তারা কোম্পানীর কর্মচারী নয়।

এইবার বিচার। ভীষণভাবে আহত হয়েছিল মঙ্গল পাঁড়ে। মৃত্যুর মুখোমুখি সে। সেই অবস্থাতেই ফাঁসির হুকুম হল তার।

বীর প্রসবিনী বাঙলা মায়ের বীর সন্তান সেই অবস্থাতেই ধীরভাবে মাথা গলিয়ে দিল ফাঁসির দড়িতে। আহত ইংরেজ সৈনিক দুজনকে সাহায্য করে নি বলে সুবাদারেরও ফাঁসি হল।

বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ল ছাউনী থেকে ছাউনীতে। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরের সিপাহীরা প্রায় সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের মেরে ফেলল। ঠিক একই দিনে মীরাট লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বেরিলি, কানপুর বিঠুর, ঝাঁসী—সব জায়গায় সিপাহীরা কর বিদ্রোহ ঘোষণা। ভারতের রাজন্যবর্গ আ সিপাহীরা একযোগ বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করে তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রা চালাতে লাগলেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলি, ঝাঁসী হল বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল। কানপুর বিদ্রোহের নায়ক হলেন নানা সাহেব। তাঁর সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী। অদ্ভুত তাঁর গেরিলা পদ্ধতির রণকৌশল। ঝাঁসীর নেতৃত্ব করেন বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাঈ। বীরবেশে ঘোড়ায় চড়ে তিনি রকম সুকৌশলে সৈন্যপরিচালনা ও যু করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে খুবই কম। মৌলবী আহম্মদ শাহ, কুমা সিং প্রভৃতি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলে ইংরেজের হাত থেকে দেশমাতার শিক মুক্ত করতে। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জলন্ধর সব জায়গায় বিদ্রোহ করল সিপাহীরা তাঁতিয়া টোপী যুদ্ধ করেছিলেন বহু দি ধরে। লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন ইংরাজ মাত্রকেই মেরে ফেলা, অস্ত্রাগা কোষাগার লুটপাট আর ইংরেজদের বা স্থান পুড়িয়ে দেওয়াই ছিল সিপাহীদ কাজ।

তখন কৌশলী ইংরেজরা এক কৌশ করল—হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপি তুলতে লাগল। মিত্রভেদ আর কি। আম্বা আরও ক'জায়গা থেকে সৈন্য আমদানী ক যুদ্ধ চালাতে লাগল। কপূরতলার রা রণবীর সিং-এর সাহায্য চাইল। ভারতে অনেক ছোট-বড় রাজা তাঁদের সর্বস্ব দি সাহায্য করলেন কোম্পানীকে। এই স রাজারা যদি ইংরেজদের সাহায্য না করতে তাহলে সম্ভবত সেই সময়েই স্বাধীন হ যেত ভারত। পলাশীর যুদ্ধে একজন মী ফাজর সাহায্য করেছিল ক্লাইভকে, সিপা যুদ্ধের সময় দেখা গেল — মীরজাফরে শেষ নাই।

ইতিমধ্যে বিলেত থেকে এসে পৌ নতুন সৈন্য দল ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। এই দিয়ে বিদ্রোহ দমন করে ফেলল ইংরেজ নানাসাহেব পালিয়ে গেলেন। এক বিশ্ব ঘাতকের কৌশলে তাঁতিয়া টোপী ধরা প ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিলেন। বাহাদুর বেগম জিনতমহলের সঙ্গে চিরদিনের নির্বাসিত হলেন ব্রহ্মদেশের পেগু শহ দীর্ঘকাল পরে সেখানেই শেষ নিঃশ্ব ত্যাগ করলেন তিনি। অনেক চেষ্টা ক নানাসাহেবের সন্ধান পাওয়া যায় না এমনি করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রা প্রথম অধ্যায় শেষ হল।

বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮ খৃস্টাব্দে, শেষ হল ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের দিকে। দেশে পূর্ণ শান্তি ফিরিয়ে আন লেগেছিল আরও কিছু দিন।

এখন বল তো—'যুদ্ধ শেখবার ইচ্ছে কেন 'টা প্রশ্ন, না 'এদেশে প্রত্যেকের শেখবার ইচ্ছে হয় না কেন 'টা প্রশ্ন।

মেঘলা রাতের অন্ধকারেও দেখতে ম স্বামীজীর দু চোখ জ্বলজ্বল আক্রমণোদ্যত সিংহের মত।

রাত সাড়ে নটা। কথা বন্ধ হল।

(কুড়ি)

দুপুরে পান্থশালায় লেখার কাজটুকু ই পাড়ি দিলুম চান্নায়। পথে দেখা স্বামীজীর বোন রাণী আর সঙ্গে।

কোলের কাছে টেনে নিয়ে রাণীপিসিমা লেন—কোথায় যাচ্ছ, বাবা, এখন?

—স্মৃতিদাদুর বাড়ী।

—কাল যাবে। আজ এস আমার বাবার ।

—এক্ষুনি আসছি পিসিমা, জানি তো মার বাবার বাড়ী। এক ছুটে গিয়ে দাদুকে বললুম—দাদু, কাল ভীষ্ম- -সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসটা শুনেছি ।

—বাহবা ভায়া, এই তো খুলেছে র মুখ, ঝরবে এখন অঝোর ঝরে। নের ভাবধারার উৎস ঐ সিপাহী র ইতিহাস, আর কর্মপ্রণালীর কেন্দ্র 'আনন্দ মঠ'। আর কিছু আটকে ব না, যা চাইছিলে সবই পাবে ক্রমশঃ।

—আচ্ছা, আজ আসি দাদু।

—সে কী হে? নিয়মের ব্যতিক্রম? এই ঘন কাজল মেঘ, এমন দিনে ফেলে চ্ছ?

—রাণী পিসিমা ডাকছেন, ও-ই ওখানে য়ে রয়েছেন, আজ যাই।

—ও রাণী, আচ্ছা, আচ্ছা, এস।

এক লাফে দাওয়া থেকে নেমে ছুটে রাণী পিসিমার কাছে। পিসিমা গিয়ে বসালেন তাঁর বাবার ঘরের রর বারান্দায়। এক পাশে খেলচে বললুম—চিন্ময়ী মায়ের সমাধি মে, আপনার বাবার বাড়ী দেখলুম, ী মায়ের বাবার বাড়ী কোথায়, মা কেমনই বা ছিলেন তিনি?

ফোঁস করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রাণী মা বললেন—বৌদির কথা বলছিস্? আর বলব রে? বলতে গেলে মহাভারত যাবে। বেঁচি গ্রামের সবজজের মেয়ে—কগুলি ভাইয়ের পর বোনটি। নাম—ময়ী। তা হিরন্ময়ীই বটে—সোনার মা। দশ বছরের মেয়েটি এসেছিল বউ তা দশ বছরের খুকী হলে কি কে বলবে খুকী, যেমন রূপ তেমনি এক ঢাল চুল [illegible]। কত দ পেতে মা এনেছিলেন পছন্দ করে।

কানপুরের বিদ্রোহের নায়ক নানা সাহেব

খারাপ হয় কখনো? বিয়ের কনে—এসেই ঘরকন্নার কাজে হাত—ঝাঁট-পাট, ঘর নিকোনো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কুটনো, বাটনা, জল তোলা—সব। কাজ কি—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিম্‌ছাম্। কে বলবে এতটুকু মেয়ের কাজ—পাকা গিন্নীবান্নীরাও হার মানে। কাজ দেখলে চোখ জুড়োয়—যেমন নিখুঁত গোছালো তেমনি চট্‌পটে। ফূর্তি কী! চটপট ক'রে ফেলে সব। মায়ের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করে। আবার রান্না করতে চায়। মা দেন না, হাতটাত পুড়িয়ে ফেলবে—এতটুকু মেয়ে। সে কী শোনে? ঠিক পারবে—হাতটাত পোড়াবে না। কত খোসামোদ। নাছোড়বান্দা। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন মা। এইটুকুন মেয়ের রান্নাই বা কি! নুন ঝাল মসলা—সব সমান, স্বাদে অমৃত। যে খায় সেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মা অবাক।

আর ব্যাভার কি মিষ্টি—ঘর পর ছোট বড় সবারই সঙ্গে। যে যেমন তার সঙ্গে তেমনি হাসি মুখে মিষ্টি কথা। বড়দের কথা মন দিয়ে শোনা, ছোটদের সঙ্গে হেসে হেসে স্নেহ-ভালবাসা ঢেলে কথা। সবাই বলে—মায়ের কি ভাগ্যি, বউ তো নয়—স্বয়ং অন্নপূর্ণা, কেউ বলে—দ্রৌপদী। তা মায়ের ভাগ্যি তো কত—অমন ছেলে বউ নিয়ে ঘর করতে পেলেন কদিনই বা।

প্রখ্যাত রণকুশলী তাঁতিয়া টোপি

ক' ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে টপ টপ করে পড়ল মাটিতে।

আঁচলে চোখ মুছে রাণী পিসিমা বললেন—আর দাদা—এখনকার স্বামিজী—সাধু সন্ন্যাসী কিছুই তো ছিলেন না তখন, কম কষ্ট দিয়েছেন বৌদিকে। তা বৌদিও কি যা তা—সীতা সাবিত্রী গোত্রের মেয়ে, হাসি মুখে সহ্য করেছেন সব। জিতেছেন সব কিছুতেই। দাদার দেওয়া কষ্টকে কি কষ্ট বলে মনে করেছেন কখনো? যেমন হাসি মুখে সয়ে গেছেন সব, তেমনি মাথা উঁচু করে মেনেছেন দাদার প্রত্যেকটি হুকুম। দাদা কি ঠকাতে পেরেছেন তাঁকে? কারুর কাছে কোন বিষয়েই ঠকবার মেয়ে ছিলেন না তিনি। যোগ্যে যোগ্যে রাজযোটক—তা হাড়ে হাড়ে বুঝে-ছিলেন দাদা। যেমন একগুঁয়ে দাদা, তেমনি একগুঁয়ে বৌদি। দুজনে সমান জোয়াল, সমান তেজী। মনে মনে খুশি হয়েছিলেন খুব। যে যাই বলুক—শেষটায় পরম সুখে সুখী হয়েছিলেন দুজনে।

মা বলতেন—মা জগদ্ধাত্রী। তা জগদ্ধাত্রীই বটে। মা যেমন চিনেছিলেন, তেমন আর কে পারবে? যেমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ তেমনি শক্তি। দুপুরবেলায় অসময়ে বাড়ীতে এসে পড়েছেন দশ-বারোজন লোক। কোথাও কিছুই নাই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রান্না করে খাইয়ে দিতেন তাঁদের। কোত্থেকে কি হল বুঝতেই পারতো না কেউ, যেন আগে থেকেই তৈরী ছিল সব। আশ্রমেও তাই। লোক আনাগোনার তো কামাই নাই, সময় অসময়ও নাই। তা কেউ কোনদিন অতৃপ্ত নিয়ে ফেরে নাই। সাধে কি আর সবাই বলত—মা। নিজের একটিও সন্তান না থাকলো তো কি—দেশ শুদ্ধ সন্তানের 'মা' ছিলেন বৌদি।

অবাক হয়ে শুনছি আর মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছি একদিনের দেখা চিন্ময়ী মায়ের সঙ্গে।

—বরোদায় যুদ্ধ শিখে এসে দাদা জড় করলেন কলকাতায়। কত জায়গার বড় বড় ঘরের ডাকাবুকো মওকা জোয়ান দলে দলে এসে যোগ দিলে। তাদের যুদ্ধ শেখাতে লাগলেন দাদা। মেরে ধরে সাহেবদের তাড়াতে হবে—এই ছিল মতলব। কলকাতায় আড্ডা গেড়ে বাসা করে নিয়ে গেলেন বৌদিকে। ঐসব ছেলেদের দেখাশোনা সেবা-যত্নের ভার ছিল বৌদির ওপর। কম খাটুনির কাজ নয়। হলে হবে কি—বৌদি হাসি মুখেই করতেন তা। কারুর শরীর কি মন খারাপ হলে মুখ দেখেই বুঝে নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন বৌদি। সকলকে মেনে চলতে হত সে ব্যবস্থা।

মাথে কি 'মা' বলতো সবাই—মায়ের মতই সেবা সত্য পেত যে।

দল হল বেশ বড়সড়, কত ডালপালা কত ফ্যাকড়া সারা দেশ জুড়ে। সায়েব তাড়াবার কত চেষ্টা। কত গোলাগুলি চলল, কত বোমা ফাটল, কত সায়েব মলো। আর অমনি দলের কত সোনার চাঁদ ছেলে ফাঁসিকাঠে ঝুললো, কত জেলে, কত দ্বীপচালান। তবু দল রইল। তারপর দলের ভেতর দলাদলি। দাদার নামের এক বাবাকে দলের ভার দিয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে কত দূরে দূরে দেশ পেশোয়ার, মীরাট, পাঞ্জাব, হিল্লি দিল্লী করতে করতে দাদা যে কোথায় কোথায় গেলেন কতদিন পরে লোকে লোকে শোনা গেল হিমালয়ে কোথায় গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন দাদা।

বাবা তখন নেই। অনেক আগেই দাদা কলকাতা থাকতেই দেহ রেখেছেন। বাবার শ্রাদ্ধের সময় এই বাড়ীতে এসেছিলেন দাদার বরোদার বন্ধু অরবিন্দ দাদা আর বারীন দাদা। কি চমৎকার লোক সব। আরও একবার এসেছিলেন অরবিন্দ দাদা—দাদার সঙ্গে কী সব শলা-পরামর্শ করতে।
বাবা নাই। বাড়ীতে মা বৌদি আর আমি। বৌদি মাকেই ধরলেন—বেরোবেন দাদার খোঁজে।

—হেই মা, তা কি হয় গো? সোমত্ত মেয়ে, স্বদেশী ডাকাতের যুগ,—একলা কি যাওয়া হয়? বৌ-মানুষ, কলকাতা আর বাপের বাড়ী ছাড়া গেছেই বা কোথা? তাও তো একলা নয়, লোকজনের সঙ্গে। মা কত বোঝালেন। তা কে কাকে বোঝায়? মা যত বোঝান বৌদিকে, বৌদিও মিষ্টি মিষ্টি করে তত বোঝান মাকে। লেখাপড়া জানা মেয়ে, দাদার প্রিয় বইগুলো পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছেন বললেই হয়, তার ওপর সংস্কৃত চর্চাও করেছেন বৌদি। মা কি আর পারেন তাঁর সঙ্গে? কত যুক্তি দেখিয়ে অনুনয় বিনয় করে আদায় করে নিলেন মায়ের অনুমতি। চোখের জলও কম ফেলেন নি—মাকে মত দিতেই হল।

কিছু টাকা, একটি ঘটি, একটি গেলাস, দু-চারখানা জামা-কাপড় ব্যাগে নিয়ে একাই বের হলেন বৌদি। আর নিয়েছিলেন দু'খানি বই—যোগবাশিষ্ট রামায়ণ আর রেলের টাইম টেবেল। পথের লোকজনদের জিজ্ঞেস করে করে কত অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করলেন দাদাকে—হিমালয়ে (আলমোড়ায়) নৈনিতালে সোহংবাবার আশ্রমে। দাদা তো অবাক, বিরক্তও হয়েছিলেন কম নয়। কিন্তু

সোহংবাবা ঘণ্টা কয়েকের আলাপেই খাঁটি সোনা দেখে খুবই আদর করেছিলেন বৌদিকে। দেখে শুনে শান্ত হয়েছিলেন দাদা।

—তারপর?

তারপর সন্ন্যাসীদের জননী জন্মভূমি দর্শন করতে হয় এই শাস্ত্রবাক্যটি তুলে বৌদি সোহংবাবার অনুমতি চেয়ে নিলেন স্বামিজীর চামায় অসবার আর অনুমতি নিলেন নিজে সন্ন্যাসিনী হবার। সোহং-বাবার ক'টি পরীক্ষায় পাশ হয়ে বৌদি পেয়েছিলেন অনুমতি। তিব্বতীবাবা আর সোহংবাবা ও'র নাম দিয়েছিলেন 'চিন্ময়ী'। সন্ন্যাস-নাম এটি।

মাসকতক পরে ফিরলেন স্বামিজী আর বৌদি। বৌদি যখন যেখানেই গেছেন চিঠি দিয়েছেন বরাবর। নইলে ভাবনার অন্ত থাকতো না মায়ের। কেঁদে অনর্থ করতেন।

বৌদি আগে বাড়ীতে ঢুকে মাকে প্রণাম করে চলে গেলেন চান করতে। ধীর গম্ভীর পায়ে ঘরে ঢুকে স্বামিজী প্রণাম করলেন মাকে। গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া চাদর, হাতে দণ্ড, নেড়া মাথা—মুখে-চোখে শান্তভাব।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন মা—কিন্তু নিমেষের মধ্যে আঁচলে চোখ মুছে আসন পেতে বসিয়ে ধীর গলায় বললেন—সন্ন্যাসী হয়েছ—খুব ভাল কথা। তবে নির্ভেজাল খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া চাই। ভড়ং করা চলবে না। যে-বংশে একজনও খাঁটি সন্ন্যাসী হতে পারে, সে-বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়, তার উর্ধ্বতন সাতপুরুষ, অধস্তন সাত-পুরুষের অক্ষয় স্বর্গে বাস হয়। খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

বয়স হয়েছে, কবে আছি, কবে নাই। ইচ্ছে হলেই তোমায় দেখতে চাই। গাঁয়ের ধারে-কাছে যেখানে খুশি জায়গা পছন্দ কর, আশ্রম করে দেব। যোগযাগ, তপ-তপস্যে—যা করতে হয় সেখানে থেকেই করবে।

একটা কথা—জীবনে হাত পাতবে না কারুর কাছে। আমাদের খাওয়া-পরা চলে যাবার মত কিছু জমি রেখে বাকিটা নাও আশ্রমের জন্যে। খরচ চলে যাবে ওতেই: ভিক্ষে মাগবার দরকার নাই। কারুর কাছে কিছু চাইবে না কখনও। তবে ভালবেসে শ্রদ্ধা করে কেউ কিছু দিলে নিতে পার, নইলে অনুগতজনে মনে কষ্ট পাবে। তবু মনে রেখ— ন্যাস মানে ত্যাগ, সন্ন্যাসী মানে ত্যাগী।

ছোট থেকেই কখনও মায়ের অবাধ্য হন নাই দাদা। দুর্দান্ত দাদা একবার ফোঁস করলে যখন কেউ সামলাতে পারত না, তখনও মায়ের একটি কথায় একেবারে জল হয়ে যেতেন। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন—বরাবর এ-ভাবটি ছিল দাদা—তা সে স্বদেশী ডাকাত-সর্দারই হন অরে সন্ন্যাসীই হন। স্বামিজী পছন্দ করলেন খাড়ির ধারে শ্মশানের পাশে ঐ জায়গাটা। মা করিয়ে দিলেন দাদার পছন্দমত আশ্রম, আর দিলেন পঞ্চাশ বিঘে জমি। সেই থেকেই স্বামিজী আশ্রমে।

আমার বিয়ের বছরকতক পরে চোখের সামনে সন্ন্যাসী নারায়ণকে দেখে মা সজ্ঞানে দেহ রাখলেন। বৌদি তো থেকেই ধরেছিলেন স্বামীর পথ। বাবা অনুমতি দিলেও যে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন স্বামি তা মনে হলেও গায়ে কাঁটা দেয়। ধন্যি বৌদি—সবকটিতেই প্রথম হয়ে করে দাদার মুখ বন্ধ করেছিলেন।

তিব্বতীবাবার 'দময়ন্তী', সোহং 'সাবিত্রী', আমাদের 'সীতা' আর 'জগদ্ধাত্রী'—আমার বৌদি। সে বৌদি পেয়েছিলুম আমরা তা কি বাবা—ঝর-ঝর করে কাঁদতে থ রানীপিসিমা।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বল বেলা গেছে, যাই, পিসিমা।

আঁচলে চোখ মুছে ধরাগলায় বললেন—বস একটু।

ঘরের ভেতর থেকে একথালা গুড়-চাঁচি ও একবাটি দুধ এনে বললেন—খেয়ে নাও বাবা। পিসির এসে কি এমনি যেতে আছে? খেয়ে পিসিমাকে প্রণাম করে ফিরলুম আ

সন্ধ্যে উৎরে গেছে। তাড়াতাড়ি পা ধুয়ে এসে জিজ্ঞেস করলুম—রা খাবেন, বাবা?

—কচুপোড়া। রাত করে ফিরলে আর কি খাওয়া যায়?

—না খেয়ে পিসিমা আসতে না যে বললুম ভয়ে ভয়ে।

—কে পিসিমা?

—রানী-পিসিমা।

—ও রানী. কি খেয়ে এলে ওখ

—যা খাইয়েছেন, রাত্রে আর খেতে হবে না, বাবা।

—দুপুরের খাওয়াটা একটু বে গেছে। রাত্রে একটু দুধ, আর কি রেণুদার খাবার আছে। রান্নাঘরে দরকারই নেই. বললুম স্বামিজীর সোজা হয়ে বসে স্বামিজী ব তারপর কি?

—যুদ্ধ শেখবার ইচ্ছে কেন এবার বরোদায় যুদ্ধ শিখতে কথা।

—বুঝেছ তো ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি, আর 'কালা আদমী'দের তাদের ব্যবহারের একটুও যে জা যুদ্ধ শেখবার ইচ্ছে হওয়াটাই স্বা না হওয়াটা কাপুরুষতা। যুদ্ধ সৈনিক হবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে দুটো কারণেই। বিশেষ করে যাবার ট্রেনে বিদেশীর দুর্ব্যবহার দেখে সরকারের পক্ষপাতিত্ব—একই নিজেদের জন্যে সুবিধা আর লোকের শত অসুবিধা—মনে

মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী

ঝাঁসির নেতৃত্ব করেন বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ

ক্ষত্রবীর রাণা প্রতাপ

...দলে দিয়ে ঐ ইচ্ছাটাকে করেছিল ...বলতর।

এ-রাজ্য, সে-রাজ্য সাত-রাজ্য ঘোরা ... সেনাদলে ভর্তি হবার চেষ্টায়। ...থাও আর হয় না। কলকাঠি টিপে ...খেছে। ভেতো বাঙালী—ভীরু, দুর্বল ...সামরিক জাতি—বদনাম দিয়ে 'বাঙালী-...র সেনাদলে নেয়া নিষিদ্ধ' বলে ফতোয়া ...রি করেছে ইংরেজ সরকার। বদনামটা ...অজুহাত, আসলে করেছে ভয়ে। অনেক ...দ্ধে বাঙালী ফৌজের কৃতিত্ব, বীরত্ব, ...হস, বুদ্ধি ও রণকৌশলের যথেষ্ট ...রচয় পেয়েছিল ওরা। তাই ভয়—এই ...টা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ-রীতি ...রণকৌশল জানলে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে ...বে। তখন হয়তো ভারত থেকে পাত-...ড়ি গোটাতে হবে বাছাধনদের। সুচতুর ...রেজ এই কৌশল করেছিল বুদ্ধিমান, ...র্যবান বাঙালী জাতটাকে পঙ্গু করে ...খবার জন্যেই। তথাকথিত স্বাধীন ...দ-মিত্র রাজারা তো ইংরেজের ধামাধরা। ...র কেউ কি সাহস করে বাঙালীকে ...নাদলে ভর্তি করে? প্রভুরা চটবেন ...। অনেক ঘুরে ঘুরে হাজির ভরতপুর ...জ্য। এক বাঙালী মোহান্তর মঠে ...আস্তানা গেড়ে যাওয়া-আসা করা হচ্ছে ...মতাবান রাজপুরুষদের কাছে। সব ...য়ালের একই রা। একই জবাব—...ঙালীর স্থান নেই সৈন্যদলে। মনটা ...ভেঙে পড়ল খুবই।

মঠের মোহান্ত মহারাজ বিচক্ষণ ব্যক্তি, ...ন শাস্ত্রজ্ঞ, তেমনি লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ। ... দেখেই ধরে ফেললেন একটা কিছু ...য়েছে। তারপর জিজ্ঞেস। সব শুনে ...ন্ধান দিলেন বরোদারাজের বাঙালী ... সচিবের আর বললেন—'মন্ত্রের সাধন ...বা শরীর পাতন' মন্ত্রের সাধনের জন্যে ...ন শরীর পাতও পাপ নয়, তখন তার ...য় একটু-আধটু ছলনার আশ্রয় নেওয়া মোটেই দোষের নয়। ইঙ্গিত দিলেন ভোল বদলের।

শুভকাজে কি দেরী করে? পাড়ি জমানো হল বরোদায়। আলাপ হল খাস সচিবের সঙ্গে। তাঁর কথায় কালেক্টর খাসীরাও যাদব, লেফটেন্যান্ট মাধবরাও যাদব, দেশপাণ্ডে রীতিমত পরীক্ষা করে সৈন্যদলে ভর্তি করে নিলেন অবাঙালী যতীন্দর উপাধ্যায়কে। পরীক্ষায় খুবই সন্তুষ্ট হয়ে প্রথমেই উঁচুপদ দিতে চাইলেন তাঁরা। কী হবে উঁচু পদ নিয়ে? যুদ্ধ-বিদ্যার গোড়া থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি শিখতে হবে তো। অক্ষর-পরিচয় নেই একেবারেই। মহাভারত পাঠ? ও চলবে না —ফাঁক থাকলে হবে না। ফাঁক মানেই তো ফাঁকি। কে রাজি হবে? ভর্তি হওয়া গেল সাধারণ সৈন্যদলে শুরু থেকে। আগ্রহ আর চেষ্টা থাকলে শিখতে আর কদিন লাগে? সব বিভাগের সব কাজ সুষ্ঠুভাবে শিখে নিতেই একের পর এক পদোন্নতি হতে হতে শেষে দেহরক্ষী।

খাস সচিব—অদ্ভুত মানুষ। বাংলারই ছেলে। বিলেত গিয়েছিলেন মাত্র সাত বছর বয়সে। শিক্ষা আরম্ভ সেখানেই। প্রথম শ্রেণী থেকেই তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা আর ধীশক্তি যেমন আশ্চর্য হয়েছিল স্কুলের ছেলেরা, তেমনি অবাক হয়েছিলেন শিক্ষকরা। ইংলণ্ডে এমন কোন ছাত্র-ছাত্রীই ছিল না যে, তাঁকে কোন বিষয়ে হারাতে পারে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও-তল্লাটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে প্রথম হয়ে বৃত্তি পান ৪৫ পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড। শুধু কি স্কুলের বাঁধাধরা বই পড়া—তার চেয়ে অনেক গুন বেশী পড়তেন বাইরের বই। তাও কি একটা ভাষা, না, একটা বিষয়? মাত্র পনেরো বছর বয়সেই ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান, ইটালিয়ান, ল্যাটিন, রাশিয়ান, স্পেনিস—সব ভাষাই রপ্ত করে ফেলে-ছিলেন তিনি। সব ভাষারই সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন তখনই। বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য ও কাব্যে এমন দখল হয়েছিল যে ঐ বয়সেই লিখতে পারতেন উচ্চাঙ্গের কবিতা। আর আবৃত্তি — এমন দরাজ গলা, আর স্পষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণও কি ছিল ওদেশের কোন ছাত্রছাত্রীর? স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় ওয়ার্ডস ওয়ার্থের একটি কবিতা আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে হেডমাস্টার ও'র গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সবচেয়ে সেরা পুরস্কার—সোনার মেডেল।

যাই হোক—সতেরো বছর বয়সে খাস-সচিব ভর্তি হয়েছিলেন কিংস কলেজে—কেম্ব্রিজ ক্ল্যাসিকাল পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে। তা তৈরীটা হয়েছিলেন কি রকম? পরীক্ষার ফল বের হলে বিলেতের লোক চমকে উঠলো—একজন বিদেশী বাঙালী ছাত্র ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপোজে রেকর্ড নম্বর পেয়ে হয়েছে 'প্রথম'। শুধু কি তাই—পরীক্ষকদের একজন আকার ব্রাউনিং বললেন—তেরো বছর ধরে পরীক্ষার খাতা দেখছি, কিন্তু ও ছেলেটির খাতার মত খাতা এই তেরো বছরে একখানিও দেখি নি।

আঠারো বছর বয়সে বি-এ পাশ করার পর গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষকরাও বলেছিলেন ঠিক একই কথা—অমন খাতা আর দেখেন নি কখনও।

বি-এ পাশ করার পর আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে বাবা ধরলেন—আই, সি, এস পড়তে হবে। ইচ্ছে না থাকলেও 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা' করে পড়লেন আর পরীক্ষাও দিলেন সব বিষয়ে। খালি ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষার দিনে তাস খেলে কাটিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলেন অনেক দেরীতে। তখন পরীক্ষা নেওয়া শেষ করে চলে গেছেন পরীক্ষকরা। ফল বের হলে দেখা

গেল সব বিষয়েই পাশ করেছেন খুব ভাল-ভাবে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা না দিলে তো আই, সি, এস হতে পারেন না। পরের বারে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দেবার জন্যে পরীক্ষকদের ডাকাডাকিতে সাড়া দিলেন না তিনি। সবাই বলল—লাভটা কি হল ঐ পরীক্ষাটি না দিয়ে?

—লাভ হল বৈকি, অনেক লাভ—আই, সি এস হতে হল না। ইংরেজ মহাপ্রভুদের কাছে দাসখৎ লেখা থেকে রেহাই পেলুম। লাভ আবার হল না কি? মস্ত লাভ।—সতেজ উত্তর।

বরোদার মহারাজাও তখন বিলেতে অক্সফোর্ড বি-এ পরীক্ষা দিতে। এঁর অদ্ভুত প্রতিভার কথা শুনে নিজে বেচে আলাপ করেন। পড়াশুনোয় এঁর কাছে সাহায্যও পান প্রচুর।

মহারাজা বুঝলেন—এই প্রতিভাবান, দৃঢ়চেতা, স্বাধীন মনের মানুষটি বিদেশীর চাকরী কখনও করবেন না। বন্ধু তো ছিলই, দেশে আসবার সময় খাস-সচিব করে সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁকে।

এক মনে শুনছিলুম, চমক ভাঙলো স্বামিজীকে চুপ করতে দেখে। তাড়াতাড়ি বললুম — ইনি কে বাবা, খাস-সচিবের নাম কি?

—নাম? অল্প একটু হেসে স্বামিজী বললেন—এঁর নাম ছিল অরবিন্দ ঘোষ, এখন—ঋষি অরবিন্দ, শ্রীঅরবিন্দ। শুনেছ এঁর কথা?

—কিছু কিছু শুনেছি, কিন্তু পড়ার কথাটা এমন করে শুনি নি কোনদিন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। তারপর এক সময়ে বলে ফেললুম—দাদাকে বলুন না বাবা, আমায় কলেজে ভর্তি করে দিতে।

—কলেজে? বলবো বৈকি বলবো। তবে এ বছর তো কলেজে ভর্তি হবার সময় পেরিয়ে গেছে। দেখা যাবে। সামনে বছর।

স্বামিজী এক লহমা মুখপানে তাকিয়ে দেখলেন। জ্যোৎস্নার আলোয় চিক চিক করে উঠল স্বভাব উজ্জ্বল চোখ দুটি।

লজ্জায় মাথা নিচু করে উঠে গেলুম রান্নাঘরে।

একুশ

সকালটা বড় ফাঁকা ফাঁকা। রোজকার ব্যতিক্রম—মাত্র পাঁচজন রোগী। তিনজন আরোগ্যের খবর দিয়ে চলে গেল, ওষুধ নিয়ে গেল বাকী দুজন। চান্নার ফকির সামন্ত মশায় এসে মিনিট কুড়ি কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। তারপর একেবারে ফাঁকা।

কলকেয় আগুন দিয়ে গড়গড়া রেখে রেণুদা লেগে গেছে ঝাঁটপাট, ধোয়া-মাজার কাজে। জলখাবার সারা। কেউ কোথাও নেই—স্বামিজী একা। বসলুম কাছে।

অল্প হেসে স্বামিজী বললেন—কী ব্যাপার, আজ ছুটি না কি?

—যতক্ষণ রেণুদার কাজ সারা না হয়।

—ততক্ষণ তোমার কি কাজ?

—কিছু না। মাত্র একদিন চিন্ময়ী মাকে দেখেছি বোলপুরে। শুনেছি পরীক্ষা করে সোহংবাবা সন্ন্যাসের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও আপনি আবার তাঁকে পরীক্ষা করে-ছিলেন। আবার কি রকম পরীক্ষার দরকার হয়েছিল, বাবা? শুনতে ইচ্ছে হয়।

—দরকার হয়েছিল বৈকি। গেরস্থ ঘরের মেয়ে, কুলের বউ—সমাজে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকার অভ্যাস। এখানে ওই ক'ঘর সাঁওতাল, তাও দূরে। এই নির্জন জায়গায় এই পরিবেশে থাকবার মত সাহস আর ধৈর্য আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে বৈকি। তার ওপরে সন্ন্যাস-জীবন, সে কি আর যা তা—ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে চলা। মনের ওপর কতখানি আধিপত্য থাকলে তবে সে জীবন যাপন করা যায়। এটাও পরীক্ষা করা বিশেষ দরকার। নইলে মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিলেই হয়েছে আর কি—একুল ওকুল দুকুল যাবে।

—কী রকম পরীক্ষা?

—প্রথমেই আশ্রম বাসে অমত করা গেল। চিন্ময়ী থাকবেই—সেবাযত্নের অজুহাত। তার কোন অভাব হবে না বলাতেও কি শুনল? সে যত 'হাঁ' তত 'না'। কোন রকমে বোঝাতে না পেরে বলা হল—সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকলে সন্ন্যাসের ব্যাঘাত হতে পারে।

আর যায় কোথা? বারুদের স্তূপে আগুন। চোখে আগুনের হলকা। দৃঢ়স্বরে বললে — মনে ভোগ-বাসনা, ভোগ্য নেই, দীন অভাবী—সন্ন্যাস তাদের জন্যে নয়। প্রচুর ভোগ্য সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও যিনি ভোগবাসনাশূন্য—অনাসক্ত সন্ন্যাসী তিনিই। যেমন হয়েছিলেন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, পার্শ্ব-নাথ, বর্ধমান মহাবীর আরও অনেকে। এই তো হাতের কাছেই—সোহংবাবা। চারি-দিকে ভোগ্যের প্রাচুর্য, সার্কাসের দল, সদা-ধরা বাঘের সঙ্গে লড়াই—দেশবাসী অবাক, রাজা-মহারাজারা খুশী, রাজসম্মান, টাকা-কড়ি, সোনাদানা। অটুট স্বাস্থ্য, দেবতার মত রূপ, গন্ধর্বের মত কণ্ঠ, বৃহস্পতির মত বিদ্যা—কি ছিল না তাঁর? রূপ, ঐশ্বর্য, পূর্ণ যৌবন, অমিত শক্তি—বেঁধে রাখতে পারল কি? একটা কেন—হাজার রূপসী যুবতী ঘিরে থাকলেই সাধ্য কি এঁদের টলায়। একটা স্ত্রীলোককে কাছে রাখতে যে সন্ন্যাসী ভয় পান—তাঁর সন্ন্যাস ভিত্তিহীন, তাঁর বৈরাগ্য মর্কট বৈরাগ্য, বক-ধার্মিক তিনি শুধু কাপড়েই গেরুয়া রঙ, মনের রঙ কোথায় তাঁর?

একেবারে মাথায় বাড়ি — পৌরুষে আঘাত। বলবার আর আছে কি—যুক্তি-সঙ্গত কথা।

হিরন্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে এল আশ্রমে। কদিনেই আশ্রমের চেহারা গেল ফিরে—সব ফিটফাট, ঝরঝরে, তরতরে গোছগাছ, কেতাদুরস্ত। কারুর কিছু বলবার নাই, যখনি যার যা দরকার, তখনি তা হাতের কাছে। কখন কার কি দরকার ও যেন আগে থেকেই জানতে পারত। রেণু তারই হাতে-গড়া।

আশ্রমে মাত্র কদিন এসেছে চিন্ময়ী, বল হল—বালাখানার অম্বুরী আর বাগবাজারের রসগোল্লা খেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে আজই। কথাটি নেই—সব গোছগাছ করে রেণুকে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল চিন্ময়ী। থানা জংশনে ৯টায় মেল ধরে সন্ধ্যের আগেই ফিরল অম্বুরী তামাক আর রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে। কলকাতায় কিছু দিন থাকলেও রাস্তাঘাট চেনা ছিল না, তবু এনেছিল।

মাস খানেক পর। বসন্ত রোগে মরা ছেলে কারা ফেলে দিয়ে গেছে পাশের শ্মশানে। বলা হল—ছোঁয়াচে রোগ, মারাত্মক। সাঁওতাল ছেলেরা আসে গরু চরাতে। রোগ ছড়াতে পারে তাদের মধ্যে। দাহ করা দরকার।

আশ্রমের কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া সেরে কাঠকুটো নিয়ে গিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঐ গলিত শব দাহ করে অবেলায় স্নান ক ফিরল চিন্ময়ী। মনে কোন গ্লানি নেই।

কদিন পরে দিন দশেকের জন্যে যে হল বর্ধমান, ধর্মদাস তা-এর বাড়ী আশ্রমে চিন্ময়ী একা। ফিরে এসে দে গেল—মংলা মাঝিকে দাওয়ায় শোবা ব্যবস্থা করে নিয়ে দিব্যি একলা আ চিন্ময়ী।

এমনি দেহ ও মনের শক্তি পরীক্ষা দরকার হয়েছিল। সবগুলোতেই জ হয়েছিল। তারপর ব্যবহার। দলে দ লোক আসার বিরাম ছিল না। সময় নে অসময় নেই, এসে পড়ত সব। ছোট-ব ইতর-ভদ্র সবাই পেত মায়ের স্নেহ-যত্ন কোন কিছু আলোচনা, শোনা বা শেখ কপালে যাই থাক, শুধু ঐটুকুর জন্য অনেকে আসত বারে বারে—থেকে যে দু-চার দিন।

সব দিক সামলে নিয়মিত পড়াশুনো করত। তার সব চেয়ে প্রিয় বই ছিল যো বাশিষ্ট রামায়ণ। ঐটি থেকেই পেয়ে অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান।

সমাধির সময়ে ছেলেরা তার ব্যব প্রিয় জিনিশগুলি সবই দিয়েছে সমা মধ্যে। দেখে-শুনে চোখে জল মুখে হা নিয়ে পরমহংস তিব্বতীবাবা বললেন—এ জিনিস যে বাদ রইল গা। চিন্ময়ীর চেয়ে প্রিয় জিনিসটি গা। তার সব প্রিয় ছিল নিরালম্বর সেবা। নিরাল মধ্যেই হয়েছিল চিন্ময়ীর আত্মপ্র সেইটাই বাদ রয়ে গেল গা।

সত্যি কথা—পৃথক অস্তিত্ব কিছু ছিল না চিন্ময়ীর। ঐ যে সমাধির উঁচু ভিত্তি, দাওয়াটা—ঐটা ওর ভেতর জায়গা আছে এই দেহ রাখবার জন্যে। দরকার নেই সমাধির।

বেলা ৯টার কাছাকাছি। রান্না গিয়ে বসলুম জলখাবার তৈরী ক ঠিক এই সময়ে বাঁ হাতে সুটকেশ ডান হাতে সন্দেশের বাক্স ও অ ফুলকপি নিয়ে কলকাতা থেকে এলেন শিক্ষিত, সদালাপী হাস্যরসিক

িবনতারা হালদার মশায়। মালপত্র রান্না-রের দাওয়ায় রেখে স্বামীজীকে প্রণাম রে বসলেন কাছে। তারপর কত কথা। লকাতায় জানাশোনা প্রত্যেকের কুশলা-শলের খবর।

জলখাবার দিয়ে এসে আরম্ভ করল ল রান্নার কাজ।

এরই মধ্যে রান্নাঘরে এসে হালদার দার ছড়া কাটলেন—

রান্নাঘরে একা
রান্না করে খোকা?

লজ্জা জড়সড় হয়ে প্রণাম করলুম। ন্তু লজ্জা করবার অবসর দিলে তো। ত ধরে কাছে বসিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস লেন হালদার মশায়, জেনে নিলেন সব রচয়। আপন-করা ব্যবহার, অল্পক্ষণেই পরিচয়ের গন্ডী কাটিয়ে চিরপরিচিতের ঠায়। শেষে হাসতে হাসতে আবার বৃত্তি করলেন তাঁর ছড়া—

রান্নাঘরে একা
রান্না করে খোকা?

ততক্ষণে অপরিচয়ের সঙ্কোচ কেটে ছ, বললুম—

উষা পিসি নাই,
খোকা রাঁধে তাই।
—বাঃ বাঃ মস্ত বড় কবি
মিলবে ভাল সবই।
তা—আন দেখি বঁটি

আনাজগুলো কুটি—বললেন হালদার য়।

আমি তো হেসে কুটি কুটি, বললুম—

ফর্দ আগে জানি
তবে বঁটি আনি।
ফর্দটা জেনে এসে বললুম—
পলতা শুকতো আর চর্চরী ডালনা
মাগুর মাছের ঝোল
আর বেশি ভাল না।

—আর কি চাই—অনেক হল—বলেই ার মশায় বললেন—

শুকতো চর্চরী আগে কুটি
ফুল কাঁপতেই মিলবে ছুটি।
—ঝোলের আলু পটল বাকি
সেটা কুটতে হবে না কি?
—থুড়ি, থুড়ি, ভুল ভুল

বাকি রবে না এক চুল—বলে হাসতে হালদার মশায় আনাজ কুটতে ান নিপুণ হাতে—যেন প্রতিদিনের । আলুর খোসা তুলে দেখিয়ে —দেখ, একটুও দাগ নেই একেবারে রসগোল্লা। মেয়েরাও পারে না এমন আলু ছাড়াতে।

তা তাই, রান্না খাওয়া সারা হল।

রির সময় বারান্দার বিছানা পিয়ো-ান্থশালার ভেতর খাটিয়ায়। পাশে আর একখানা খাটিয়ায় হালদার মশায়ের বিছানা পেতে দিয়ে গেছে রেণুদা। দুজনে গিয়ে বসা গেল আপন আপন বিছানায়।

কলকাতার কত গল্প করলেন হালদার মশায়। মাঝে মাঝে ছড়ার ছড়াছড়ি। হাসি-খুশির মধ্যে কাটল সারা দুপুরটা। শুধু দুপুরটা কেন—দুদিন ছিলেন আশ্রমে —দুদিনই কেটেছিল পুরোদস্তুর হাসি-খুশি আমোদ-আহ্লাদে।

যাবার সময় হালদার মশায়ের অনু-যোগ—স্বামীজী অনেক দিন যান নি কলকাতায়, আর সাগ্রহ অনুরোধ—যেন শীগগির একবার যান।

বিদায় বেলায় স্যুটকেস থেকে একখানি বই বের করে হালদার মশায় দিলেন আমার হাতে। তাঁরই লেখা বই—'বেঙ্গল সুইটস'। কাজে লেগেছিল বইখানি। অনেক রকম হালুয়া আর সন্দেশ তৈরী করা হয়েছিল বইটি দেখে। খেয়ে খুশী হয়েছিলেন সবাই।

হালদার মশায় চলে যাবার পরদিন কলকাতা থেকে এলেন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—মুচিপাড়া থানার পুলিশ ইন্সপেকটর। মনটা দমে গেল— এখনও আশ্রমে পুলিশের হানা, না তা নয়, আগে আগে হানা দিলেও এখন স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ইনি। এসেছেন— শাস্ত্রীয় আলোচনায় কিছু সন্দেহ দূর করতে।

দুদিন রইলেন ভূপেনদা। বেশীর ভাগ সময় কাটান স্বামীজীর সঙ্গে তত্ত্বা-লোচনায়। যাবার সময় একই অনুযোগ— স্বামীজী অনেক দিন যান কি কলকাতায়, একবার যেন যান শীগগির।

স্বামীজীকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন ভূপেনদা।

(বাইশ)

অতিথি অভ্যাগত থাকলে একটু গড়-বড় হয়ই। পাঁচ দিন পরে সন্ধেবেলা স্বামীজীর কাছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তামাক খাওয়া শেষ করে স্বামীজী বললেন—

—কি শুনবে, বল?

—আশ্চর্য মানুষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মশায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কথা, স্বামীজী।

—সে কত বিষয়ে কত আলোচনা। দু-একদিন তো নয়, বেশ ক' বছর। দিনের পর দিন কত বিষয়ে কত আলোচনা। সব কি বলা যায়? কোন্ বিষয়ে আলোচনা শুনতে চাও? — স্বামীজী চেয়ে রইলেন মুখপানে।

—দেশের রাজনীতির আলোচনা, বাবা।

—রাজনীতি? হাসলেন স্বামীজী,— নামবে নাকি রাজনীতিতে? কি লাভ শুনে?

—লাভ অনেক। বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ভাবধারার পরিচয়—এটা কি কম লাভ, স্বামীজী? শুনেছি শ্রীঅরবিন্দ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী, দেশপ্রাণ আর স্বাধীনতা বিপ্লবের নায়ক। তাঁর ভাবের উৎস জানা—একটা মস্ত লাভ।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে স্বামীজী বললেন— কত বিষয়ে কত আলোচনা হত দৈনিক কাজের অবসরে। বেশীর ভাগ সন্ধ্যে-বেলায়। কিন্তু বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব—যে কোন রাজ্যের অবস্থা, শাসনতন্ত্র বা রাজ-নীতির কথা তুললেই অরবিন্দদা বলতেন— তাই না কি? অবাক লাগত—এত বড় প্রতিভাবান বিদ্বান মানুষ, দেশের কোন খবরই রাখেন না নাকি? তাই কখনো হয়? পুরোদস্তুর সাহেব করতে চেয়ে বাপ ছোটবেলাতেই পাঠিয়েছিলেন বিলেত। তা—শিব গড়তে বাঁদর নয়, হয়েছিল বাঁদর গড়তে শিব। নিজের বিচার বুদ্ধি আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেশের ওপর বিদেশী

শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের মাত্রাটা দেখে অরবিন্দদা ছাত্রাবস্থাতেই স্কুল-কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তুমুল তর্ক করে গরম গরম বক্তৃতায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন ভারতের বুকে তাদের স্বজাতির অত্যাচার উৎপীড়নের নগ্নচিত্রটা। বিদেশী দাসত্ব-শিকল কাটবার জন্যেই ইচ্ছে করে হলেন না—আই, সি, এস। সেই মানুষ আর এই মানুষ কি এক? খটকা লাগে। বহু ভাষাবিদ হলেও বাংলার ছেলে অরবিন্দদা জানতেন না বাংলাভাষা। জানবেন কি করে? মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথাই বলেন নি কেউ, বাংলাভাষা শেখান তো দূরের কথা। তবে কি ভাষার মতই ভুলেছেন দেশকে?

নদীমাতৃক বাংলা। বছরে বছরে নদীর বুকে বন্যা, বাঙালীর বুকেও ভাবের বন্যা। ফলে — 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান', রামায়ণ, রামরসায়ণ, পয়ার, ত্রিপদী, শাক্ত-পদাবলী, বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, সহজিয়া, মরমিয়া কত কি—ভাবরসের মহাপ্লাবন। ভাবুক—বাঙালী। আর বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানটিই স্বদেশ সম্বন্ধে ভাবলেশশূন্য? না কি জেগে ঘুম? নাঃ জাগাতে হবে, বাংলার এমন সন্তানকে হাতছাড়া করা চলবে না।

উপায়? রসের ছিটেয় সবই মিঠে। আলোচনাচক্রে অবতারণা করা গেল বঙ্কিম সাহিত্য রসের। নেশা জমল। অদ্ভুত প্রতিভা—অল্প দিনেই খুব ভাল করেই শিখে ফেললেন বাংলাভাষা। আর যায় কোথা—হাতে হাতে 'ধর্মতত্ত্ব' 'অনুশীলন তত্ত্ব' 'আনন্দমঠ' মুখে — সন্তান কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম' গান।

স্বামীজী চুপ করে চেয়ে রইলেন পুবে আকাশের জ্বলজ্বলে তারাটির পানে। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলে তো—পর্বতো বহ্নিমান। জলদগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন—এই সময়ে নজরে এনে ফেলা হল সুচতুর ইংরেজের ধাপ্পাবাজী, ভারতীয় কংগ্রেসের রীতি-নীতি গতি-প্রকৃতির রূপটা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে। এটা আর কিছু নয়—দেশের জনসাধারণের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ বা আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশীয় হোমড়া-চোমড়া শিক্ষিত ধনী সমাজপতিদের নিয়ে ইংরেজদেরই গড়া একটা দল মাত্র। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা পদ্ধতি আর কি। কংগ্রেসের আন্দোলনটা ছিল শুধু আবেদন-নিবেদন, তোষামোদ। এর একটা সুস্পষ্ট ছবি এঁকেছিলেন সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ—

(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাহি কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের মালা
বহে বহে নতশির।

কাজ হল। ছাই-চাপা আগুন ঘৃতাহুতি পেয়ে জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। বোম্বাই-এর ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় এক জোরাল প্রবন্ধ লিখলেন অরবিন্দ—কংগ্রেসের ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে। লিখলেন—কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন শুধু কটি শিক্ষিত ধনীদের জন্য। দেশের কোটি কোটি গরীব অশিক্ষিত জনসাধারণের কোন উপকার হবে না এতে। এখনই এমনি আন্দোলন করা উচিত—যাতে অশিক্ষিত গরীব জনসাধারণের মঙ্গল হয়, আর চৈতন্য হয় ইংরাজ প্রভুদের। এটা বেরিয়েছিল ১৮৯৩ সালে। দেশের ছাত্র দলও ক্ষেপে উঠল কংগ্রেসের ওপর।

এর কিছুদিন আগে পুণায় ঠাকুর-সাহেব করেছিলেন একটা গুপ্ত সমিতি। তাতে শিবাজী উৎসব হয়! উদ্দেশ্য—দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণকে একত্র করে বিদেশী শাসনের সুখটা বুঝিয়ে দেশের জন্যে তৈরী করা। এর বছর খানেক পরেই মহারাষ্ট্রে 'হিন্দু ধর্মসংঘ' করে গণপতি উৎসব আরম্ভ করলেন দামোদর আর বালকৃষ্ণ চাপেকার দু ভাই। উদ্দেশ্য একই। ১৮৯৭ সালে গণপতি উৎসবে কেশরী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ছত্রপতি শিবাজীর ওজস্বিনী বাণী। ফলে কেশরী সম্পাদক লোকমান্য তিলকের দেড় বছর জেল।

এই তিলক মহারাজের ভাবধারা, কর্ম-প্রণালী, আর অদম্য স্বাধীনতা স্পৃহার কথা সময় পেলেই তোলা হত অরবিন্দদার কানে। খুব খুশি হতেন তিনি—উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে উঠত মুখ চোখ।

তারপর মহারাষ্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লব—মসীর বদলে অসি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীর দিনেই অত্যাচারী র‍্যাণ্ড আর লেফটেন্যাণ্ট আয়ার্স্টকে মেরে ফেললেন চাপেকার দু ভাই। প্লেগ কমিটির ইংরেজ সভাপতি নিহত হল গুপ্তঘাতকের হাতে। চাপেকার ভাইদের ফাঁসি হল।

এই শাস্তিকে লক্ষ্য করে 'দেশসেবকের অপরাধ' সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ বের হতে লাগল 'কাল' পত্রিকায়। লিখছেন সম্পাদক পরাঞ্জপে। ওদিকে তিলক মহারাজের 'কেশরী' পত্রিকায় বের হতে থাকে একই বিষয়ে প্রবন্ধ, লিখছেন—নাটু দু ভাই।

নির্বাসিত হলেন পরাঞ্জপে আর নাটু ভাইরা। কেমন সুশাসক সুবিচার তোমাদের দেশের ইংরেজ সরকার! 'যা খুশি তাই করি, অপগুণ না ধরি'—যা খুশি করে যাব—টু শব্দটি করতে পারে না—করেছ কি মরেছ। এই তো বিচার!

ঠিক একই সময়ে পুণায় চীপ কনস্টেবলকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হল। দশ বছরের জেল হল চারজন যুবকের।

অরবিন্দদা লিখলেন 'ইংরাজের জেল পরিচালনা' নামে এক প্রবন্ধ। বের হল ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায়। সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড এলগিন প্রবন্ধটি পড়ে জাস্টিস রাণাডেকে পাঠালেন বরোদায় অরবিন্দকে ভারতের জেলগুলির তত্ত্বাবধানের ভার নেবার অনুরোধ করতে। অত সোজা কি না—বয়েই গেছে অরবিন্দদার। যে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান তো করলেনই, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার ইঙ্গিত করে একটা প্রবন্ধ লিখলেন ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায়, আর যুবকদের মধ্যে শক্তি ও স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে বরোদায় করলেন 'তরুণ সঙ্ঘ'। এই সব দেশহিতকর কাজের জন্যে বোম্বাই হাইকোর্টের জাস্টিস রাণাডে, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক আর যুক্ত-প্রদেশের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অরবিন্দদাকে স্নেহ করতে লাগলেন যত, উৎসাহ দিতে থাকলেন তত।

এই তো অবস্থা। একদিন একটু ফুরসুৎ পেয়ে বিকেলে একা বেড়াতে বের হওয়া গেল বরোদা শহরের রাজপথে। কিছু দূরেই ভিড়—বহু লোক দাঁড়িয়েছে গোল হয়ে। ভেতরে কি—দেখা যায় না কিছু, শোনা যায় ধমক-চমক মারের শব্দ আর কাতর আর্তনাদ। দু হাতে ভিড় ঠেলে মাঝখানে গিয়ে দেখা গেল চারজন গোরা সৈনিক—বুট জুতোর লাথি মারছে এক অস্থিচর্মসার বুড়ো ভিখিরিকে, আর চারদিকে ভিড় করে মজা দেখছে তারই দেশবাসীরা। সর্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা—চালান হল দু মোক্ষম ঘুষি। দুজন সৈনিক কুপোকাৎ। আর দুজন এল এগিয়ে। বন্ধুদের সম দশা হল তাদেরও। তারপর ধুলো ঝেড়ে উঠে আরম্ভ করল গালাগালি। একজনের ঘাড় ধরে মুখের ওপর বিরাশী সিক্কা ওজনের এক ঘুষি উঁচিয়ে জানিয়ে দেয়া হল—আর একটি কথা বললেই দু পাটি দাঁত ভেঙে পড়বে রাস্তার ধুলোয়। বলেই দু লাথি দুজনের তলপেটে। তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল বাছাধনরা। তারপর উঠে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চারজনেই পিঠটান—কথাটি কয় নি আর। পরণে দেহরক্ষীর পোশাকটা ছিল তখন।

জানা গেল—সৈনিক চারজন চলে যাচ্ছিল রাজপথ দিয়ে। তাদের চলা মানেই তো মার্চ করার তালে তালে পা ফেলা। রাস্তা পার হতে গিয়ে প্রভুদের যাত্রাপথের সামনে এসে পড়ে ঐ বুড়ো ভিখিরি—তাই এই নির্যাতন।

নিশ্চেষ্ট দর্শকদের কষে ধমক লাগিয়ে ফেরা গেল বাসায়। কিন্তু স্বস্তি কোথায়? সর্বাঙ্গে দাবদাহ—মাথার চুল অবধি উঠছে খাড়া হয়ে।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে ঠাণ্ডা জলে বেশ করে চান করে লস্যি খাওয়া গেল দু গেলাস। তারপর সটান খাস-সচিবের বাড়ী।

অরবিন্দদা পড়ছিলেন বাংলা বই।

যথাযথ বিবরণ দিয়ে বলা হল—নিজের দেশে পরান্নভোজী পদলেহী কুকুরের মত থাকার নাম কি বাঁচা? মুক্তি চাই, নইলে মঙ্গল নাই।

অরবিন্দদার আয়তোজ্জ্বল দু চোখে বজ্রের আগুনের ঝলকানি।

—জ্বলুক আগুন। আজ থাক, কাল হবে।

চুপ করলেন স্বামীজী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে যেতে হল রান্নাঘরে।

(ক্রমশঃ)

অপ্সরাদের কান্না

দেবল দেববর্মা

কাঠের সিঁড়িটা বেশ নড়বড়ে। বাঁ দিকটায় আগল নেই,— একদম ফাঁকা। শুধু ডানদিকে ধরবার জন্য একটা রেলিঙ গোছের ব্যবস্থা আছে। ওঠানামা করতে গেলে নতুন লোকের ভয় হয়,—কখনও পা কাঁপে।

প্রথমদিন সিঁড়ি দেখে নীলিমা তো ভয়ে আড়ষ্ট।

—'একি স্বর্গে যাবার সিঁড়ি নাকি?' সে ফুচকি হেসে শুধোল।

—'তার মানে?' সুব্রত ফিরে দাঁড়াল।

—'বারে! উঠব কেমন করে? পা ফস্কে পড়ে যাব না তো?'—

সুব্রত অনেকখানি উঠে গিয়েছিল, নীলিমার অসহায় ভঙ্গি দেখে ফের কাঠ-বিড়ালীর মত তরতর করে নীচে নেমে এল। পরিহাস করে বলল—'ভয় করছে বুঝি? তাহলে আমার হাত ধরো। আমি না ছেড়ে দিলে তুমি নিশ্চয় পড়ে যাবে না।'

—'পাগল নাকি?' নীলিমা ভুরু কোঁচকাল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল—'তোমার মেসে কি মানুষজন নেই? হাত ধরাধরি করে উপরে উঠলে তারা কি ভাববে?'

অবশ্য এখন আর অত ভয় নেই। তিন-চার মাসে নীলিমা বেশ সহজ, অনেকখানি স্বচ্ছন্দ হয়েছে। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করে না। ডান-দিকের রেলিঙটা ধরে দিব্যি উপরে উঠে যায়। এক-একদিন সুব্রতই তারিফ করে। বলে—'এই তো, বেশ সুন্দর উঠতে পারছ। ঠিক আমাদের মত। মিছিমিছি প্রথমদিন একটা সিন ক্রিয়েট করেছিলে।'

উপরে উঠেই নীলিমার মুখখানা বিরস হল। সুব্রতর ঘর বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। আচ্ছা মানুষ যা হোক। কি রকম বে-আক্কেল! তাকে এই ভরদুপুরে আসতে বলে নিজে কিনা কোথায় ডুব দিয়ে রইল। নিশ্চয় কাছে পিঠে কোথাও গেছে। আধ-ঘন্টা-তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই ফিরবে। আর এসেই তাকে জোর তাড়া দিয়ে বলবে—'নাও, নাও। আর দেরি করলে চলবে না। তাহলে কিন্তু শো আরম্ভ হয়ে যাবে।'

পাশের ঘরের দরজাও ভেজানো। কিন্তু তালা নেই দেখে নীলিমা আশ্বস্ত হল। যাক নৃপতিদা তাহলে ঘরে আছে। আজ কোনো ছুটির দিন নাকি? নীলিমা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। পরে ভাবল ছুটি না হলেই বা কি? ইচ্ছে হলে নৃপতিদা কি একদিন অফিস কামাই করতে পারে না?

অবশ্য এখনই ফের নামতে হলে নীলিমা নিশ্চয় একটু বেকায়দায় পড়ত। অন্য কিছু নয়। নিচের তলার পুরন্দর লোকটা ভীষণ পাজি। সুব্রত বলে, ওর নানা দোষ। রেসুড়ে...মদ খায়। দিন দশ-পনের অন্তর হঠাৎ উধাও হয়। দু-এক রাত্তির কাটিয়ে আবার ফিরে আসে। তাই নিয়ে মেসে আলোচনা, কেউ বা রসালো

ইংগিত করে। লোকটার বিশ্রী স্বভাব। নীলিমাকে একা দেখলেই গলা খাঁকারি দিয়ে কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ করবে। সম্ভবত তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। কিন্তু ভঙ্গিটা কদর্য। মাঝে মাঝে নীলিমার এমন রাগ হয়। ইচ্ছে করে ওর গালে একটি থাপ্পড় মারে। অথচ সুব্রত সঙ্গে থাকলে পুরন্দরের অন্য মূর্তি। নিপাট ভালো-মানুষ। এমন মিটমিটি চায়, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

নৃপতি বোধ করি তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। দরজা খুলে রীতিমত অভ্যর্থনা। বলল—'আরে, এস এস নীলিমা। ইস একেবারে ঘেমে গিয়েছ দেখছি।' ফুলফোর্সে পাখাটা ঘুরিয়ে দিয়ে সে ফের বলল—'তুমি এখানে এই চেয়ারটার উপর বস। নইলে ভালো হাওয়া পাবে না।—'

ভ্যাপসা গরম। নীলিমার চিবুকে, কপালের উপর মুক্তোর মত টলটলে স্বেদ-বিন্দু। সে রুমাল বের করে তার মুখ, চিবুকের নিচে গলার উপর জমে থাকা ঘাম-টাম মুছতে লাগল। বলল—'আপনি ব্যস্ত হবেন না নৃপতিদা। আমি বসছি। কিন্তু সুব্রত গেল কোথায় বলুন তো?'

নৃপতি হেসে বলল—'সুব্রত আসবে এখুনি। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জল খাবে একগ্লাস?'

নীলিমা তৃষ্ণার্ত বোধ করছিল। জলের কথা শুনে খুশি হয়ে বলল—'সত্যি, খুব তেষ্টা পেয়েছে নৃপতিদা। কই, আপনার গেলাস-টেলাস কোথায়?'

—'তুমি বস চুপ করে।' নৃপতি ওকে প্রায় শাসন করল।

ঘরের এককোণে কলসীতে জল। পাশেই কাচের গ্লাস। নৃপতি উবু হয়ে মেঝের উপর বসে জল গড়াতে গেল।

নীলিমা বাধা দিয়ে বলল—'আরে! একি করছেন আপনি। আমি কি একগ্লাস জল গড়িয়ে নিতে পারি না?'

নৃপতি শুনল না। কলসী থেকে গ্লাসে জল গড়াল। নীলিমার হাতে দিয়ে বলল—'জানো'ত সুব্রত আমাকেও যেতে বলেছে।'

মুখের উপর একটা আবছায়া,—নীলিমার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল। তবু নিজেকে সে সামলে নিল। চোখের তারায় হাসির ঝিলিক এনে বলল—'ওমা! তাই নাকি? আপনিও যাবেন?'

নৃপতি হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল—কতদিন সিনেমা-টিনেমা দেখিনি। তা প্রায় চার-পাঁচ বছর হবে। সকালবেলায় সুব্রত টিকিট কাটতে যাবে। বলল—'খুব ভালো বই। আপনি যাবেন নাকি নৃপতিদা? শুনে মনে হ'ল যাই চলে তোমাদের সঙ্গে। একদিন অফিস কামাই ক'রলেই বা ক্ষতি কি?'

নীলিমা ডান হাতটা পিছনে চালিয়ে মাথায় খোঁপা, চুল-টুল ঠিক করছিল। ওকে উৎসাহিত করার জন্য বলল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো করেছেন। অফিস তো রোজই আছে। একদিন না হয় আমাদের সঙ্গে একটু হৈ-হৈ করলেন।'

এঁটো গ্লাসটা নীলিমা নিজেই ধুয়ে রাখল। নৃপতি নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে-ছিল। কিন্তু নীলিমা ভ্রু-শাসনে ওকে নিরস্ত করল। মুখে বলল—'আপনি ক্ষেপেছেন নাকি নৃপতিদা? এঁটো গ্লাস কখনও আপনার হাতে দিতে পারি? সুব্রত শুনলে কি মনে করবে বলুন তো—।'

নৃপতির গড়ন মাঝারি। গায়ের রং খুব ফর্সা নয়। মুখখানা লম্বাটে বলে মানুষটাকে ঈষৎ শীর্ণ দেখায়। বয়স পঞ্চাশের কিঞ্চিৎ বেশী। তবু মাথার চুল-গুলো এখনও বেশীর ভাগ কালো। পাতলা হয়েছে বটে, কিন্তু বিলকুল শাদা হয়নি।

বৃন্দাবন দত্ত লেনের এই মেস বাড়িটায় নৃপতি ঠিক বুড়ো বটের মত। সবচেয়ে সিনিয়র মেম্বার। প্রায় কুড়ি বৎসরের বাসিন্দা। তারপরেই দোতলার ভূপতি মল্লিক। সেও কম-বেশী বছর দশেক আছে। কিন্তু ভূপতি এবার মেস ছাড়বে মনে হয়। দুখানা ঘরের জন্য একে-তাকে বলছে। তার বাড়ি কুসুমপুরে। মশাগ্রাম স্টেশনে নেমে মাইল তিন-চার হাঁটতে হয়। মাসে দু'বার কিম্বা প্রয়োজন থাকলে তিনবারও বাড়ি ছোটে ভূপতি। কিন্তু এবার সে নিশ্চিন্ত। আর তাকে দৌড়োদৌড়ি করতে হবে না। ভূপতির এখন বাসা করা দরকার। ছেলে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছে। সামনের মাস থেকেই কলকাতায় তার ক্লাস শুরু হবে। কামাই হ'লে চলবে না। সুতরাং ভূপতিরও মেস-জীবনের ইতি। আর ক'টা দিন পরেই কলকাতায় তার গেরস্থালী...ঘর-সংসার, কলরব। ভূপতি নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাবে না।

ক্যানিং স্ট্রীটের কাছে একটা দিশী ফার্মে কাজ করে নৃপতি। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সমস্ত কাজই আছে। সকাল আটটায় স্নান। ঠিক আধ ঘন্টা পরেই ভাতের থালার সামনে বস'তে হবে। আর নটার ভোঁ বাজবার আগে পথে বেরিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। নইলে সাড়ে ন'টার মধ্যে অফিসে পৌঁছোন অসম্ভব। সারাদিন হিসেবের খাতা লেখে নৃপতি। চিঠির মুসাবিদা করে। ইনকাম-ট্যাক্স আর সেলস-ট্যাক্স অফিসের তলব আসে। লাল শালুর কাপড়ে খাতা-পত্তর বেঁধে অনেকটা পড়ুয়া ছাত্রের মত নৃপতি ট্যাক্স-অফিসের দিকে রওনা দেয়। সমস্ত কাজ-কর্ম সেরে নৃপতি যখন বাড়ি ফেরে, তখন সন্ধ্যে উতরে যায়। কোনোদিন বা একপ্রহর রাতও হয়।

দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকো সাইজের আয়না টাঙানো। বেশ বড় মাপের আয়না। কাচটাও ভালো মনে হয়। নীলিমার ইচ্ছে করছিল দর্পণে একবার নিজের মুখখানা দেখে। এই ভরদুপুরে ভবানীপুর থেকে শেয়ালদ পর্যন্ত আসা। তবু বাসে উঠেই একটা সীট পেয়েছিল সে। কিন্তু তাতে কি? যা ভিড়। গরমে আর ঘামে মুখের অবস্থাটা নিশ্চয় জবড়জং। দেখবার মত হয়েছে। তবু নীলিমা ইতস্ততঃ করছিল। অবশ্য নৃপতিদা তার চেনা মানুষ। বয়স্ক লোক। তাহলেও এই ঘরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখটুখ দেখে প্রসাধন করা কি ঠিক হবে? কিন্তু সুব্রত গেল কোথায়? সে এখনও ফিরছে না কেন?

নীলিমা একটু সরে জানালার কাছে দাঁড়াল। ছাদে রোদ্দুর। ভরদুপুরে গলির বাড়িগুলোর জানালা-কপাট বন্ধ। খোলা জানলা দিয়ে তাকালে রাস্তাটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। প্রায় টর্চের আলোর মত নীলিমার সন্ধানী দৃষ্টি গলির বাঁকটা পর্যন্ত ছুঁয়ে এল কিন্তু না,—সুব্রতর পাত্তা নেই।...

পিছন থেকে নৃপতি বলল—'তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন নীলিমা? ব'স, সে দু'হাত বাড়িয়ে চেয়ারটাকে প্রায় তুলে ফের জানালার কাছে টেনে আনল।

নীলিমা কষ্টে হাসি চাপল। নৃপতিদার এই দোষ। সে ঘরে এলেই মানুষটা এমনি ব্যস্ত হয়। কোথায় তাকে বসাবে, কি করবে যেন ভেবেই পায় না। যতক্ষণ সে ঘরে থাকবে ততক্ষণ নৃপতিদার এই কাণ্ড। শুধু তার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ। নীলিমা আপত্তি করলে কি হবে? নৃপতি কথা কানেই নেয় না।

ব্যাপারটা সুব্রত জানে। আর তাই নিয়ে ওর খালি ঠাট্টা আর রসিকতা। শুনে মুচকি হাসে নীলিমা। কখনও খুব বিরক্ত হয়। মুখ শক্ত করে তাকায়। প্রতিবাদ করে।

প্রথম প্রথম নীলিমাও অবাক হ'ত। সে ঘরে ঢুকলেই নৃপতিদা কেমন চঞ্চল, ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চোখ দুটি উজ্জ্বল, গম্ভীর মুখখানা ঠিক দেওয়ালীর রাতের রংমশালের ছটার মত খুশির আলোর আভায় চকচকে দেখায়। তার সঙ্গে কত গল্প করে নৃপতিদা এটা-সেটা, টুকরো টুকরো নানা কথা। অনেকক্ষণ পরে সে উঠতে চাইলে নৃপতিদা কেমন মেঘলা দিনের মত ম্লান ও কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কোনোদিন, ফস করে বলে—'এখনই উঠবে নাকি? আর একটু ব'স না। সুব্রত নিশ্চয় এবার ফিরবে।'

—'ওর কিছু ঠিক নেই নৃপতিদা।' নীলিমা একবার মৃদুভাবে বলে। বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। মার কাছে একটা কিছু কৈফিয়ৎ না দিলে রেহাই নেই। তবু সব জেনেও সে আর একটু বসে। নৃপতি খুশি হয়। উৎসাহের সঙ্গে ফের গল্প শুরু করে।

সুব্রত একদিন বলল—জানো নীলিমা, নৃপতিদা তোমার [illegible] ভীষণ ইন্টারেস্টেড।'

—'ওমা! তাই নাকি?' নীলিমা ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'আমার সম্বন্ধে ইনটারেস্ট কিসের?'

—'কি জানি!' সুব্রত মুচকি হাসল। বলল—'রোজ রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ছাদে বসে গল্প করি। অনেক কিছু আলোচনা হয়। কিন্তু ঘুরে ফিরে নৃপতিদার মুখে খালি তোমার কথা। কোথায় থাক তোমরা? বাড়িতে কে কে আছেন? তুমি কি করো? আমার সঙ্গে কবে থেকে আলাপ! এই সব প্রশ্ন—'

—'শুধু এই?' নীলিমা ভুরু নাচিয়ে রহস্য করল। ফের বলল—'আমি ভাবছিলাম বুঝি আরো কিছু—'

—'আরো আছে।' সুব্রত বাঁ চোখটা ঈষৎ ছোট করল। বলল—'নৃপতিদা শুধোচ্ছিলেন তুমি ক'দিন আসনি কেন? সেদিন ওর ঘরে বসে অনেকক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলে? তাই কি তোমার খারাপ লেগেছে?'

—'ওমা! খারাপ লাগবে কেন?' নীলিমা চোখ দুটো বড় করল। উনি তো আমাকে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করলেন। চাকরকে ডেকে চা-মিষ্টি আনালেন। কত গল্প করলেন আমার সঙ্গে—'

সুব্রত ছদ্ম বিস্ময় প্রকাশ করে বলল—'শুধু গল্প নয়? ফের চা-মিষ্টি? না, না, এ অন্যায়, পক্ষপাতিত্ব। আজই গিয়ে বলছি নৃপতিদাকে। চা-জলখাবার আমাদেরও খাওয়াতে হবে।'

নীলিমা মুচকি হাসল। 'নৃপতিদার দায় গেছে তোমাদের চা-জলখাবার দিতে।'

—'তা সত্যি।' সুব্রত তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমাদের জন্যে তো ফালতু খরচ। কি আছে বলো? অমন কাজল কালো চোখ, মিষ্টি হাসি।' সুব্রত আরো কিছু যেন ইঙ্গিতে বোঝাল।

—'এই অসভ্য। শীগগির থামো বলছি।' নীলিমা ওকে প্রায় শাসন করল। ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে বলল—'ছি-ছি। তুমি দিন দিন কি হচ্ছ বলো দিকি? নৃপতিদা কি তোমাদের মত ছেলেছোকরা? ওর সম্বন্ধে এসব ভাবতে আছে?'

সুব্রত তখনকার মত চুপ করল বটে। কিন্তু নীলিমার মনের ভিতরে যেন একটা কাঁটা রয়ে গেল। ঠাট্টা করে বলেছে ঠিকই, তবু কথাটা কি শুধুই পরিহাস? নৃপতিদার মনে একটা আগ্রহ, একটু দুর্বলতা কি জন্মায়নি? না হলে সে ঘরে পা দিলেই নৃপতিদা অমন চঞ্চল হয় কেন? তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে?

সুব্রত ফিরল আরো কিছুক্ষণ পরে, কৈফিয়ৎ দেবার সঙ্গে বলল—'একটা জরুরী কাজে হঠাৎ ফেঁসে গিয়েছিলাম নীলিমা। তাই ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

—'ওমা! এই বুঝি একটু দেরি?' নীলিমা চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলল। ফের কেমন একটা আব্দারে গলায় বলল—'আমি কতক্ষণ এসেছি জানো? একঘণ্টা হতে চলল।'

—'সত্যি নীলিমা খুব ব্যস্ত হয়েছিল।' নৃপতি মধ্যস্থতা করল। 'তুমি হুট করে বেরিয়ে গেলে। আমাকে অন্ততঃ বলে গেলে পারতে।'

সুব্রত একটুও অপ্রতিভ হ'ল না। বলল—'বারে! আপনি আছেন জেনেই তো আমি নিশ্চিন্ত। নীলিমাকে নিশ্চয় আপনার ঘরে অপেক্ষা করতে বলবেন। আর এখানে একটু বসতে নীলিমার অসুবিধে কিসের?' সে বাঁকা চোখে নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

হাতে সময় কম। শো আরম্ভ হতে মিনিট কুড়ি দেরি। সুব্রতর পিছু পিছু নীলিমা ওর ঘরে এসে ঢুকল। বলল—'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে কিন্তু।'

—'সে তো জানি।' সুব্রত ঠোঁট কামড়ে টেবিলে সাজানো প্রসাধন দ্রব্যগুলির দিকে তাকাল।

নীলিমা ওর বক্রোক্তিকে ভ্রূক্ষেপ ক'রল না। টেবিলের উপর কনুই রেখে সে আয়নার বুকে ঝুঁকে পড়ল। ইস! মুখখানার যা দশা। রোদ্দুরে তেতে পুড়ে একেবারে কালিবর্ণ। ঘষে মেজে একটু পরিষ্কার না করলে পাঁচজনের সামনে কখনও বেরোন যায়?

দুটো ঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিশন। কতদিনের পুরোন কে জানে। ঠিক মাঝামাঝি একটা ফুটো মতন আছে। সেদিকে তাকিয়ে নীলিমা ব্যস্তভাবে বলল—'ওমা। ওটা বন্ধ করনি কেন? একটা কাগজ-টাগজ কিছু গুঁজে দাও।'

ফুটোটা নেহাৎ ছোট নয়। প্রায় আধ ইঞ্চি হবে। ঠিক দূরবীণের লেন্সের মত। একটা চোখ প্রায় বন্ধ করে অন্য চোখ দিয়ে তাকালে পাশের ঘরের খানিকটা অংশ স্পষ্ট দেখা যায়।

কবে যেন সুব্রত বারান্দায় বেরিয়ে হঠাৎ দেখেছিল। নৃপতি খুব সন্তর্পণে ফাঁকটুকুর উপর চোখ পেতেছে। ঘরে তখন নীলিমা বসে। সুতরাং লুকিয়ে-চুরিয়ে নৃপতি কাকে দেখছিল, তা নিশ্চয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না।

শুনে নীলিমা রেগে টং। ছি, ছি। বুড়ো বয়সে এমনি বেহায়াপনা। কলকাতার মেয়েরা কেউ পর্দানশিন নয়। পথেঘাটে দিব্যি বেরুচ্ছে। আর সেও হপ্তায় দু-তিন দিন এখানে আসে। সুব্রত না থাকলে ওই মানুষটার ঘরে গিয়ে বসে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে হাসি ফুটিয়ে ওর সঙ্গে বকর-বকর করে। তাহলে এই আদেখলেপনার কি মানে হয়?

সুব্রত মুচকি হেসে বলল—'আহা! তুমি অত চটছ কেন? একটু বয়স হয়েছে বলেই কি রক্তমাংসের ইচ্ছে-টিচ্ছেগুলো সব জুড়িয়ে যাবে? তাছাড়া নৃপতিদা ব্যাচেলর মানুষ—বিয়ে-থা করলেন না। চিরকাল মেস-হোটেলে কাটিয়েছেন। তোমার মত সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখে ওর মনে একটু দুর্বলতা জাগা কিছু বিচিত্র নয়। আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখার ইচ্ছে হতে পারে।'

—'চুপ ক'র তুমি।' নীলিমা প্রায় ধমক দিল। 'কে জানে কতদিন ধরে এমনি লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখছে। আর তুমিও তেমনি। কতবার বারণ করেছি। মেসের ঘরে ওসব ঠিক নয়। কখন কে দেখে ফেলবে। দরজাটা শুধু ভেজানো থাকে। হুট করে চাকর-বাকরও তো এসে ঢুকতে পারে।'

নীলিমা এমনি। এসব ব্যাপারে তার ভীষণ আপত্তি। খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করে। হাত ড়
যায়। অথচ ।ড়া-
বাড়ি করেনি সুব্রত। ঘরের মধ্যে ওকে কাছে পেলে বুকের সান্নিধ্যে টেনে নিয়েছে: বড়জোর কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর ঠোঁটের স্বাদটুকু উপভোগ। কিন্তু তাতেই নীলিমা অস্থির। লজ্জায় রাঙা। জোর করে নিজেকে মুক্ত করেছে।

সুব্রত ছোট ফোকরটায় একটুকরো কাগজ গুঁজে দিতেই নীলিমা প্রসাধন শুরু করল, ঘাড়ে, গলায় মুঠো করে পাউডার ঢালল। পাফটা আলতোভাবে মুখের উপর, চোখের কোলে, এবং কপালের কোণে-টোনে বুলিয়ে নিল। লিপস্টিকটা ফের ঠোঁটে ঘষে, চুলে আবার চিরুনি টানল। মুখ ফিরিয়ে শুধোল, —'হঠাৎ ওকে সঙ্গে নিলে যে?'

—'কেন, তোমার আপত্তি আছে?' সুব্রত মুচকি হাসল। ফের বলল,—'পরশু সকালেই তো এখানকার বাস উঠিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। এরপর এ-ফাগুনে, ও-ফাগুনে দেখা। পথে ঘাটে কালেভদ্রে সাক্ষাৎ। তার আগে এক-দিন তিনজনে মিলে সিনেমা দেখে না হয় আনন্দ করলাম।'

প্রসাধন শেষ। নীলিমা উঠে দাঁড়াল। সুব্রতর কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল,— 'কালকের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছ নাকি?'

—'এখনও বলিনি, ভেবেছি রাত্তিরে জানাব।'

—'নৃপতিদা যেতে রাজি হবে তো?' নীলিমা এবারও ফিসফিস করল।

—'রাজি হবে বলেই মনে হয়। না হলে অন্য কাউকে ধরতে হবে।' এক মুহূর্ত থেমে সুব্রত ফের শুধোল,—'তোমার সেই বন্ধু দু'জন আসবে তো?'

—'কথা দিয়েছে আসবে।' নীলিমা বাঁ হাতের একটা আঙুল গালে ঠেকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর নিজেই বলল,— 'এমন গুরুতর ব্যাপার। কেউ কখনও কথার খেলাপ করে?'

সিনেমা হলের এক কোণে তিনটে সীট। নীলিমা একধারে বসবে ভেবেছিল। তার পাশে সুব্রত, ওধারে নৃপতিদা থাকবে। কিন্তু সুব্রতর মনের ইচ্ছে ভিন্ন। নীলিমাকে মাঝখানে রেখে সে আর নৃপতি দু'জনে দু'পাশে বসল। আসবার সময় ট্যাক্সিতেও তাই করেছে। এমন মানুষ। নীলিমা মনের বিরক্তি আর চেপে রাখতে না পেরে অন্ধকারে হাত চালিয়ে ওর কনুয়ের কাছে একটা চিমটি কাটল। কিন্তু সুব্রত নির্বি-কার। মুখটা ঈষৎ কুঁচকে নৃপতির দিকে তাকিয়ে বলল—কি মশা দেখেছেন? আমার কনুয়ের কাছে এখুনি একটা কামড়াল।'

সিনেমা হল থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এল, তখন বেলা আর নেই। সূর্য ডুবতে বসেছে।

সুব্রত বলল,—'আপনাকে বাসে তুলে দিই নৃপতিদা। আমার যেতে একটু দেরি হবে।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়।' নৃপতি তাড়া-তাড়ি বলল।

ওকে বাসে তুলে দিয়ে সুব্রত আর নীলিমা একটা রেস্তোরায় ঢুকল। বেশ ভালো রেস্তোরা। চকচকে চেয়ার-টেবিল, ঝকঝকে ওয়াশ-বেসিন। দামী পর্দা-ঢাকা গ্রীল। সুব্রত দুটো ফিস-রোল, এক প্লেট চিংড়ির ফ্রাই আর দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল। বলল,—'নৃপতিদাকে নিয়ে এলেই হ'ত। মিছিমিছি একযাত্রায় পৃথক ফল।'

—'পাগল নাকি? সিনেমা দেখালে এই ঢের।' নীলিমা ভুরু কুঁচকে তাকাল। ফের বলল,—'আচ্ছা, উনি কি রকম মানুষ বলো ত? ইন্টারভ্যালের সময় তুমি উঠে গেলে আর নৃপতিদা সারাক্ষণ আমার সঙ্গে খালি বউয়ের গল্প করলেন। পাশের লোকেরা শুনতে পেয়ে এমন করে তাকাচ্ছিল জানো?'

সুব্রত কৌতুক বোধ করল। শুধোল,— 'বউ মানে? কার বউ?'

—'আহা! কার বউ আবার?' নীলিমা চোখ নাচিয়ে রহস্য করল। সিনেমার গল্পের ঐ বউটার কথা হচ্ছিল মশায়। সত্যি সুস্মিতা সেনকে গেরস্থ-বউয়ের রোলে এমন চমৎকার মানায়। অবশ্য নৃপতিদা অন্য কথা বলছিলেন। তার মতে বউ না সাজলে মেয়েদের একটুও ভালো দেখায় না।'

—'তাই নাকি?' সুব্রত একটা ভাজা চিংড়ি মুখে তুলল।

—'আর ব'ল না।' নীলিমা ভুরু কোঁচ-কাল। 'বউ বউ করে মানুষটা একেবারে অস্থির। এর চেয়ে বাবা ওর নিজের একটা বউ থাকলেই ভালো ছিল।' একটু থেমে নীলিমা ফের শুধোল,—'আচ্ছা, নৃপতিদা কেন বিয়ে-থা করেন নি জানো?'

—'কেমন করে ব'লব?' সুব্রত মুচকি হাসল। ফের নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্য করে বলল,—'কাল রাত্তিরে নৃপতিদার ঘরে কি দেখলাম জানো?'

—'কি দেখলে আবার? তাড়াতাড়ি ব'ল না।' নীলিমার কথায় প্রচণ্ড কৌতূহল প্রকাশ পেল।

—'তখন অনেক রাত্তির। তা' প্রায় বারোটা হবে।' সুব্রত ভনিতা করে বলছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখি নৃপতিদার ঘরে আলো জ্বলছে। আমি তো অবাক। এত রাত্তিরে আলো জ্বালিয়ে নৃপতিদা কি কর-ছেন? রাত জেগে বই পড়ার কোনোদিন অভ্যেস নেই তার। তাছাড়া সাড়ে ন'টার পর নৃপতিদা তো আলো নিভিয়ে দিব্যি শুয়ে পড়লেন।'

নীলিমা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল,— 'আহা! ঘরের মধ্যে কি দেখলে আগে তাই বলো না—'

সুব্রত বলল,—'কুটোটার উপর চোখ রেখে দেখি নৃপতিদা চেয়ারের উপর বসে খুব নিবিষ্টমনে একটা ছবি দেখছেন—'

—'ছবি? কার ছবি?' নীলিমা চোখ দুটো বিস্ময়ে প্রায় কপালে তুলল।

—'একটি মেয়ের ছবি।'

—'মেয়ের ছবি? ওমা, ছি ছি! বুড়ো বয়সে নৃপতিদার ভীমরতি হয়েছে নাকি?' নীলিমা প্রায় ধিক্কার দিল। ফের বলল,— 'তা কি রকম মেয়ে? কত বয়স?'

—'কত বয়স কেমন করে বলব?' সুব্রত জিভ উল্টিয়ে দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা মাছের কুচিটুচিগুলো পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল। 'চেহারা দেখে মেয়েদের বয়স কি বোঝা যায়? তাছাড়া আমি দূরে থেকে দেখেছি। আন্দাজে মনে হ'ল উনিশ-কুড়ি কিম্বা একুশ-বাইশও হতে পারে।

নীলিমা ভুরু কুঁচকে কি ভাবল। তার-পর অনেকটা নিজের মনেই বলল,—'আচ্ছা, ছবিটা কার? নৃপতিদা ব্যাচেলর,—তার কাছে একটি কম বয়সী মেয়ের ফটো কেমন করে আসবে? কি জানি বাবা, বুড়োবয়সে নৃপতিদা আবার প্রেম-ট্রেম শুরু করলেন না তো?'

—'অসম্ভব নয়।' সুব্রত গ্লাসে চুমুক দিয়ে এক ঢোক জল গিলল। বলল,—'শেষ-কালে নৃপতিদা একটা কাণ্ড করলেন। ছবিটা বুকের কাছে চেপে ধরে কেমন ঝিম মেরে বসে রইলেন।'

—'ওমা! তলে তলে এতদূর?' নীলিমা গা দুলিয়ে হেসে উঠল। 'তাহলে আর বলতে হবে না। 'ও ছবি সেই প্রিয়তমার। বুড়ো-বয়সে তোমার নৃপতিদার ঘোড়ারোগ হয়েছে জানবে।' কথা শেষ করে সে ফের খিল-খিলিয়ে হেসে উঠল।

নেমন্তন্নর কথা শুনেই নৃপতি সোজা হয়ে বসল। —'হঠাৎ নেমন্তন্ন? কি ব্যাপার একটু খুলে ব'ল দিকি?' সে গলা বাড়িয়ে শুধোল।

ফাল্গুন মাস। দখনে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আকাশ পরিষ্কার, তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে।

সুব্রত হাসবার চেষ্টা করে বলল,—'ইয়ে মানে আমার বিয়ে নৃপতিদা। কালকে আপনাকে অফিস কামাই করে অবশ্যই যেতে হবে।'

—'কালই বিয়ে?' নৃপতি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল—'তোমার বিয়েতে নিশ্চয় বরযাত্রী হ'ব। কিন্তু এর মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল?'

—'বরযাত্রী নয় নৃপতিদা। আপনি কনে যাত্রী হবেন।' সুব্রত যেন ওর ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করল।

—'কনে যাত্রী?'

—'হ্যাঁ। নীলিমার খুব ইচ্ছে, তার পক্ষে আপনি সাক্ষী দেবেন।' একটু থেমে সে ফের বলল,—'তাছাড়া কোনো উপায় ছিল না নৃপতিদা। এ বিয়েতে নীলিমার বাবা-মা কারো মত নেই। তলে তলে ওরা অন্যত্র চেষ্টা করছেন। সুতরাং রেজেস্ট্রী অফিসেই বিয়েটা সারতে হবে।'

—'তারপর?' নৃপতি যেন আরো গভীরে যেতে চাইল।

সুব্রত হেসে বলল,—'তারপর যা হয় তাই। সার্পেন্টাইন লেনে একটা ছোট ফ্ল্যাট-ভাড়া নিয়েছি। পরশু সকালেই আমরা সেখানে গিয়ে উঠব। নীলিমার মাস্টারী আছে,—আমি নিজে একটা চাকরি করি। যা হোক করে চলে যাবে। কি বলুন?'

—'তুমি পরশুই মেস ছেড়ে দিচ্ছ সুব্রত?' নৃপতির কন্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপা কাঁপা শোনাল।

—'আমি বুঝতে পারছি নৃপতিদা, আপনার বেশ কষ্ট হবে। পাশাপাশি ঘরে তিন-চার বছর কাটিয়ে গেলাম। একটা অভ্যেস হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখ করে কি করবেন?' একটু থেমে সে ফের বলল,—মেস-হোটেলের এই তো নিয়ম। একজন গেলে আর একজন আসবে।'

নৃপতি স্যাঁতসেঁতে গলায় বলল,—'তুমি চলে যাচ্ছ। এ মাসে ভূপতিও যাবে। আজ সন্ধ্যায় শুনলাম, একতলার ঐ রেসুড়ে পুরন্দর,—সেও নাকি কোথায় বাসা করছে। শীগ্গির মেস ছাড়বে।—'

তিনতলার এই একফালি ছাদে আলো নেই। গাঢ় অন্ধকার থিকথিক করছে। পরস্পরের মুখ ভালো করে নজর হয় না।

অন্ধকারে আলো জ্বালানোর মত সুব্রত ফস করে বলল,—'এবার আপনিও একটা বাসা করুন নৃপতিদা। কেন আর মেসে পড়ে থাকবেন?'

—'আমি বাসা করব?'

—'হ্যাঁ। মানে খুব অসম্ভব যদি না হয়।' সুব্রত ইঙ্গিতে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

—'তুমি পাগল নাকি?' নৃপতি সখেদে বলে উঠল। 'কার জন্যে বাসা করব? কে থাকবে সেখানে?' সে হা-হা করে হেসে উঠল।

রাত আটটা নাগাদ নৃপতি বাড়ি ফিরল। সমস্ত দিনটা খুব হৈ-হৈ আর পরিশ্রমে কেটেছে। এখন দেহের কোষে কোষে ক্লান্তি। শরীর শিথিল হয়ে আসছে—।

সকাল সাড়ে দশটায় সে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘরে হাজির ছিল। সেখান থেকে চৌরঙ্গীপাড়ার একটা নামী হোটেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর স্টুডিওতে ছবি তোলার প্রোগ্রাম। নীলিমা আর সুব্রত দুজনেই তাকে সঙ্গে যেতে বলেছিল। কিন্তু নৃপতি রাজি হয়নি। তার অফিসে একবার না গেলেই নয়। গতকাল ডুব দিয়েছিল। কাজ-কর্ম সব পড়ে থাকবে। অন্ততঃ জরুরী চিঠিপত্রগুলো দেখা দরকার।

কাঠের সিঁড়িতে পা রেখে নৃপতি অবাক হ'ল। সুব্রতর ঘর বন্ধ। কিন্তু ভিতরে যেন আলো জ্বলছে। আশ্চর্য! তবে কি সুব্রত ফিরেছে? তাহলে ঘরের দরজা বন্ধ কেন? নৃপতি অন্যমনস্কের মত মাথা চুলকাল।

খুব সন্তর্পণে নিজের ঘরে ঢুকল সে। প্রায় তস্করের মত লঘুচরণে। নৃপতি যা ভেবেছিল তাই। ঘরে সুব্রত একা নয়,—নীলিমাও আছে। দু'জনে গল্পে মত্ত। কান পাততেই ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেল নৃপতি।

নীলিমা বলছে,—'ছবির কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলে নাকি? ওটা কার ফটো?—'

—'কি জানি। ওসব কথা কি জিজ্ঞেস করা যায়?—'

—'কেন যায় না? রাতদুপুরে ঘরে খিল দিয়ে মেয়েছেলের ফটো দেখলে দোষ নেই। সেটা বুকে চেপে ধরলেও কেউ কিছু বলবে না। আর ছবিটা কার জানতে চাইলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?—'

—'তা জানি না। তবু আমি ঘুরিয়ে বলেছিলাম,—আপনি এবার একটা বাসা করুন নৃপতিদা। তা আমায় বললেন,—তুমি পাগল নাকি সুব্রত?'

—'আহা-হা। দুনিয়া শুদ্ধু সবাই বোকা আর পাগল, উনিই কেবল সেয়ানা। এদিকে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, তা বুঝি কারো নজরে পড়ে না?—' একটু থেমে নীলিমা ফের বলল,—'তোমার এই মেসে আর কোনোদিন আসছিনে। যা লোক সব। মিছে পুরন্দরকেই দোষ দেব কেন? তোমার নৃপতিদা কিছু কম নাকি? একবার ঘরে ঢুকলে আমাকে আর ছাড়তেই চান না। বিয়ে-থা না করলে পুরুষমানুষরা এমনি হয়? ছি—'

নৃপতির মনে হ'ল, কথা নয়। যেন আগুনের ফুলকি এসে তার কানে ঢুকছে। সে দুই করতলে কান ঢেকে বিছানায় নির্জীবের মত শুয়ে পড়ল।

আরো কিছুক্ষণ পরে ও ঘরের আলো নিভল। কাঠের সিঁড়ির উপর ধুপ ধুপ পায়ের শব্দ। ওরা নেমে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নৃপতি ফের উঠে বসল। আলো জ্বালিয়ে বিছানার নীচে হাতড়াতেই পোস্ট অফিসের শীলমোহর মারা একটা পুরনো খাম তার হাতে উঠে এল। উপরে নৃপতির নাম ও ঠিকানা লেখা। সে খামের ভিতর থেকে একটা ফটো আর চিঠি বের ক'রল। ছবিটা পুরনো,—একটু রঙচটা। আঠার-উনিশ বছরের এক মেয়ে। হাসিমুখে যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ছবিটা সরিয়ে রেখে নৃপতি চিঠিটার উপর ঝুঁকে পড়ল। কতদিন আগেকার চিঠি। তা প্রায় বাইশ-তেইশ বছর হবে। গোটা গোটা অক্ষর। তার বাবার হাতের লেখা। কালিটা কেমন অস্পষ্ট, কাগজটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

প্রাণাধিক নিপু,

পলাশডাঙ্গা হইতে পুনরায় তোমার একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে। তুমি অবশ্য বিবাহ করিবে না আগেই জানাইয়াছ। কিন্তু তোমার গর্ভধারিণী কথাটা ঠিক বিশ্বাস করিতে চান না। তাহার ধারণা পছন্দমত সুপাত্রী পাইলে তুমি নিশ্চয় বিবাহ করিবে।

সেকারণে পলাশডাঙ্গার পাত্রীর ফটো তোমাকে পাঠাইলাম। মেয়েটি সুলক্ষণা,—রং ফর্সা এবং সুন্দরীও বলা চলে। তোমাদের দুইজনের রাজযোটক মিল হইয়াছে। যদি বিবাহ করিতে রাজি থাক, তবে অবিলম্বে লিখিবে। নচেৎ এ ব্যাপারে অগ্রসর হইব না।

পুনরায় তোমাকে একটা কথা লিখি। তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ। আজীবন নিঃসঙ্গ থাকার একটা বেদনা আছে। এখন অবশ্য তাহা বুঝিবে না। যৌবন চলিয়া গেলে সেই বেদনা একদিন অনুভব করিবে। কিন্তু তখন পড়ন্তবেলায় অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না। আশীর্বাদ লইও।— ইতি

বাবা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে নৃপতি নিশ্চুপ বসে রইল। ও ঘরে কেউ নেই,—নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থিক থিক করছে। কিন্তু একটা মিষ্টি সুবাসে বন্ধ ঘরের বাতাস এখনও ভরপুর। নীলিমা ঘরে এলেই ফুলের গন্ধের মত ওই সুবাসটা চারপাশে ছড়ায়। সে চলে যাবার পরও গন্ধটা কিছুক্ষণ থাকে।

বসে থেকেও নৃপতির কেমন কষ্ট হচ্ছিল। অন্তরের আরো গভীরে কোথায় যেন একটা বোবা বেদনা,......একটা অসাড় নিষ্প্রাণ অনুভূতি, কেবলি বুক ঠেলে উপরে যেতে চায়। কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারছে না।

হঠাৎ একটা কান্ড করল নৃপতি। পার্টিশনের ছোট্ট ফোকরটার উপর নাক রেখে সুব্রতর ঘরের বাতাসটা বুক ভরে টানবার চেষ্টা করতে লাগল। সেই মিষ্টি গন্ধটা যদি এখনও থাকে। সুরভিত বাতাসের এতটুকু যদি তার নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করে।—

নৃপতির কান্না পাচ্ছিল। বার্ধক্য আর যৌবনের মাঝখানে কাঠের পার্টিশনটা প্রাচীরের মত বিরাজ করছে।

প্রেক্ষাগৃহ

অনিন্দিতা/নায়িকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

(১) সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'

স্বাগত জানাই **জীবন থেকে নেয়া** ছবিকে, স্বাগত জানাই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক জহির রায়হানকে। 'জীবন থেকে নেয়া' দেখা নিঃসংশয়ে একটি নতুন অভিজ্ঞতা। বলতে পারি, বাংলাভাষায়—তাই বা বলি কেন, ভারতীয় কোনো ভাষাতেই পরিকল্পনা, গঠন, কলা-কৌশল প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই **জীবন থেকে নেয়ার** সঙ্গে তুলিত হতে পারে, এমন একখানি ছবিও আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি। আমাদের কথার যাথার্থ্য নিরূপণের জন্যে আমরা প্রতিটি চিত্রামোদীকে ছবিখানি প্রত্যক্ষ করবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।
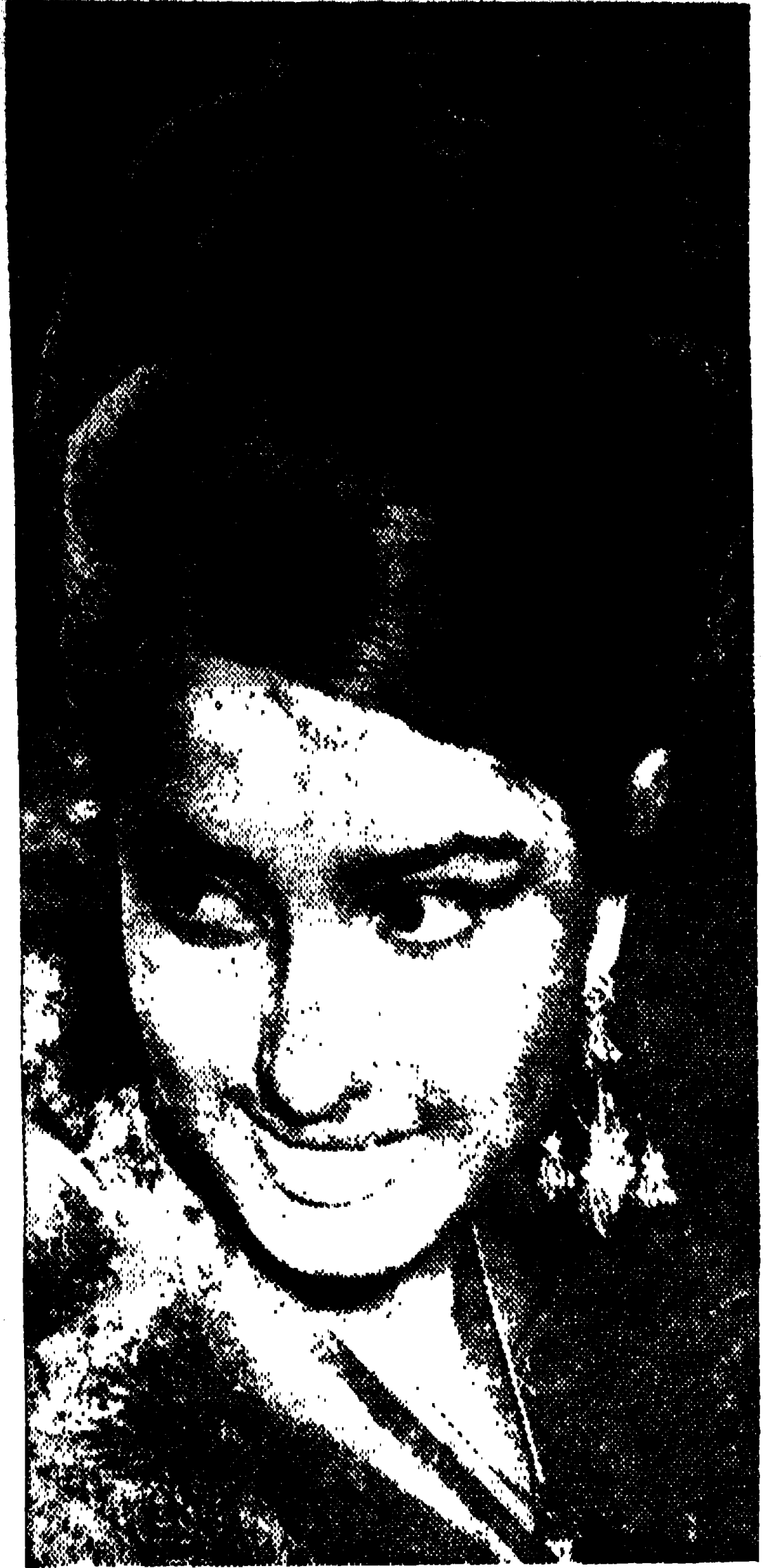
প্রথমেই যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সে হচ্ছে একটি ছোট্ট সংসারের ঘটনাকে রাষ্ট্রের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরা। দু' জায়গাতেই স্বৈরাচারী শাসন একনায়কত্বের নির্মম নির্দেশ। এবং এই অত্যাচার আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দু' জায়গাতেই লড়াই সমান্তরালভাবে একদা-পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন এবং তারই সঙ্গে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ১১ দফা দাবী আন্দোলনের দৃশ্যাবলী এবং বড় বোনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দুই ভাইয়ের ভগ্নিপতির সহযোগিতায় বিদ্রোহের দৃশ্যাবলীকে দেখানো যাতে কিছুমাত্র অবান্তর বলে মনে না হয়, তার জন্যে কাহিনীকার শ্রীরায়হান অন্তত তিনটি চরিত্রকে ঐ রাষ্ট্রীয় আন্দো-

পরদে কে পিছে/যোগীতা বালী

হার মানা হার / সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার
ফটো : অমৃত

পরায়া ধন / রাকেশ রোশন ও হেমা মালিনী

জনের সামিল করেছেন। [illegible] সখী ও বীথির দাদা আনোয়ার [illegible] দেশপ্রেমিক। সে চায় সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশগঠন করতে এবং এরই জন্য সে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়ে বারবার কারাবরণ করে। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাই রঞ্জক এবং দুই বোনের মধ্যে ছোট বোন বীথি—দুজনেই কলেজে পড়ে এবং সেই কারণে ওরাও ভাষা আন্দোলনের শরিক। এ ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন ন্যায়পথে চালিত হলে যে ক্রমেই জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রমাণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে, আনোয়ারের মধু চাকরও একদিন মিছিলে যোগ দিয়ে মৃত্যুবরণ করল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ছবিটির অভিনব গঠন-পারিপাট্য। উচ্চগ্রামের অভিনয় (হাই-পিচ্‌ড অ্যাকটিং), সংবাদচিত্র ধরনের কড়া বৈষম্যমূলক সাদা-কালো (কনট্রাস্ট) ফোটোগ্রাফী, চড়া পর্দার সংগীতের ব্যবহার ইত্যাদির সমন্বয়ে এই অভিনবত্ব সূচিত।

কলাকৌশলেও অদৃষ্টপূর্ব ও বিস্ময়কর অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয় ছবিখানির এখানে-ওখানে-সেখানে। ধরুন, স্বৈরাচারী দিদি ক্রোধভরে চীৎকার করছেন, শব্দানুলেখন-কৌশলের সাহায্যে সেই চীৎকারকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মাধ্যমে একটি বিশেষ বিস্তারিত আয়তন (ডাইমেনশন) দেওয়া হয়েছে। অন্য এক জায়গায় দিদি রেগে ফুলে ফুলে কাঁপছেন। এই দৃশ্যটি দিদির অনেকগুলি মুখকে সামান্য সামান্য সরিয়ে ওপর-ওপর উপস্থাপিত করে (প্রিয় ওভারল্যাপিং ফেসেজ) দেখানো হয়েছে, ব্যাপারটা এমন দ্রুতলয়ে ঘটানো হয়েছে যে, দর্শক মনে করতে বাধ্য হয়েছে—দিদি সত্যই রাগে যেন কাঁপছেন। কোনো লোকের ক্রোধে কম্পমান হওয়ার এমন সার্থক চিত্রায়ন ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। গানের চিত্রায়নেও আশ্চর্য অভিনবত্ব দেখা যায়। আমার সোনার বাংলা গানে বিভিন্ন শিল্পীর স্থির নিশ্চল রচনাশৈলী (স্ট্যাটিক কম্পোজিশন) এবং কারার ঐ লৌহ কপাট-এর চিত্রায়নে পায়ের বেড়ী ও হাতকড়ির সমবেত চলমান দৃশ্যের সার্থক যোজনা এই অভিনবত্বের পরিচায়ক।

সর্বোপরি যেটি বিস্ময়কর, সেটি হচ্ছে **জীবন থেকে নেয়ার** সামগ্রিক গতিবেগ।—এ রকম অসম্ভব দ্রুতলয়ে আজ পর্যন্ত কোনো বাংলা ছবি তৈরী হয়নি।

ছবির মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এই : স্বৈরাচারী দিদি, তার দুটি ভাই—বড়ভাই উকিল, ছোট ভাই কলেজ ছাত্র। দিদির স্বামী গান-পাগল মোক্তার, কিন্তু বেকার। সংসারের চাবিকাঠি দিদির হাতে: সকলেই তাঁর কড়া শাসনের অধীন। স্বার্থপর দিদি চান না ভাইরা কেউ বিয়ে করে, পাছে তাঁর কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু তাঁর গান-পাগল স্বামী একজন ঘটকের পরামর্শে গোপনে তাঁর উকীল শ্যালকের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন দেশপ্রেমিক যুবক আনোয়ারের ভগ্নী সাথীর সঙ্গে। কিন্তু ভাই যখন তার বৌকে নিয়ে বাড়ীতে পদার্পণ করল, তখনই দিদি উঠলেন খধূপের মতো জ্বলে। পরে শুরু করলেন ভ্রাতৃবধূর ওপর অত্যাচার। রান্না থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর সকল কাজকর্মের ভার ত' তার ওপর চাপালেনই, তার ওপর কড়া আদেশ দিলেন, বৌ তাঁর কাছে শোবে; কোনো-মতেই তাঁর ভাইয়ের ত্রিসীমানায় যাবে না। এর পরে যখন বৌয়ের ছোট বোন বীথি (যার সঙ্গে ছোট ভাই রঞ্জকের ভাব) এসে জানায়, তার কারারুদ্ধ দাদা আনোয়ার সাথীর খবর জানতে চেয়েছে, তখনই দিদি বৌকে চোরের বোন বলে সম্বোধন করতে

বাঙলা মঞ্চের নতুন রীতি প্রবর্তক শম্ভু মিত্র ফটো : অমৃত

শুরু করেন; কারণ তাঁর মতে চোর-ডাকাত ছাড়া কেউ জেলে যায় না। এরপরে দিদির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে রঞ্জক বীথিকে বিবাহ করে বাড়ীতে নিয়ে আসে। নিরুপায় দিদি তখন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার অভিপ্রায়ে ছোট বৌয়ের হাতে চাবির গোছা সমর্পণ করেন।

এর পরে আসে দৈবের মার। দুই ভগ্নীই এক সংগে সন্তান প্রসব করে, বড়োর হয় মৃত সন্তান, ছোটর হয় একটি সুস্থ সন্তান। বড়োর জীবন রক্ষার জন্যে স্বামীর একান্ত ইচ্ছায় বীথি দিদির কোলের কাছে রাখে নিজের সন্তানকে। কিন্তু এই শিশুকে উপলক্ষ করে দুজনের ঝগড়াতে

ইন্ধন যোগান দিদি। এবং এরই ফলে এক-দিন বীথি অজ্ঞান হয়ে গেলে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাথীর হাতে এগিয়ে দেন বিষ-মেশানো জলের গেলাস। এর পরে বিচারালয়ে কি ভাবে সত্য প্রকাশিত এবং ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তাই নিয়ে ছবির শেষাংশ রচিত।

ছবির নাম যদিও **জীবন থেকে নেয়া** তবু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই কাহিনীর সম্ভাব্যতা নিয়ে। দিদি দজ্জাল, দিদি জবর-দস্ত, দিদি স্বৈরাচারী; কিন্তু তাঁর জোরটি কোথায়? আয়ুব বা ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারী একনায়কত্বের শক্তি ছিল জঙ্গী সৈন্যবাহিনী। কিন্তু দিদির? দিদির স্বামীটিও নিরীহ এবং শ্যালকদের দলভুক্ত। দিদি নিজে যদি প্রচণ্ড বিত্তশালিনী হতেন এবং তাঁর দুই ভাই যদি একান্তভাবে তাঁরই ওপর নির্ভর-শীল হত, তাহলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু তাতো নয়; বড়ো ভাই উকিল এবং পসার-ওলা উকীল। দিদি তো পরের ধনে পোদ্দারী করছেন; তিনি ভাইদের বশে রাখেন কিসের জোরে? কাজেই এমন একটি নড়বড়ে অসম্ভব কাহিনীকে বৃহত্তর রাজ-নৈতিক জীবনের সামিল করার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সেই কারণেই ব্যাপারটাকে নেহাতই অবাস্তব বলে মনে হয়। ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের প্রথম দিককার বক্তব্যকে ষোল আনা বজায় রেখেই আমরা কাহিনীগত দুর্বলতা বিষয়ে এই কথাগুলি বলছি।

অভিনয়ে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সঙ্গীত-পাগল ভগ্নীপতির ভূমিকায় সঙ্গীত-পরিচালক খান আতাউর রহমান। স্বচ্ছন্দ তাঁর ভঙ্গী, সুন্দর তাঁর বাচন। দেশগতপ্রাণ আনোয়ার বেশে আনোয়ার হোসেনের অভিনয় অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও বলিষ্ঠ। দুই ভাই রূপে সৌকত আকবর ও রজ্জাক চরিত্রচিত্রণ করেছেন সুষ্ঠুভাবে। ঘটকের হাল্কা চরিত্রটি সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন বেবী জামান। দুই বোন—সাথী ও বীথির ভূমিকায় যথাক্রমে রোজী ও সুচন্দা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। স্বৈরাচারী দিদির কঠিন ভূমিকায় রওসন জামিলের অভিনয় যেন কিছুটা চেষ্টাকৃত ও কৃত্রিমতাপূর্ণ। অবশ্য চরিত্রটির অবাস্তবতা হয়ত এর জন্যে দায়ী।

সঙ্গীত-পরিচালনায় খান আতাউর রহমান অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুরযোজনায়, গানগুলি গাইবার ভঙ্গী-নির্ণয়ে তাঁর যেমন অনন্যতা, তেমনই অসাধারণ হয়েছে তাঁর আবহ-সঙ্গীত রচনা ও ঘটনা-উপযোগী শব্দযোজনা। সঙ্গীত ছবিটিকে একটি বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছে। সম্পাদনাও ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ।

জীবন থেকে নেয়া নানা দিক দিয়ে একটি অসাধারণ চিত্র।

(২) যুগচিন্তার বৈষম্যকে উপজীব্য করে প্রমোদ বিতরণ

আর কে স্টুডিও নিবেদিত, রাজকাপুর প্রযোজিত এবং রণধীর কাপুর পরিচালিত **'কাল আজ আউর কাল'** ছবিটির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকদের মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রমোদ বিতরণ। কিন্তু মাত্র প্রমোদ বিত-রণের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি মনগড়া কাহিনী অবলম্বন করে ছবি করলে বিজ্ঞসমাজে বাহাদুরী নেবার কিছু থাকে না বলে ছবির মধ্যে একটি সামাজিক বক্তব্য রাখবার দিকে প্রচুর ঝোঁক আছে ভারতের অন্যতম জন-প্রিয় অভিনেতা-পরিচালক-প্রযোজক রাজ-কাপুরের।

তাই কলকাতা শহরে বড়দিনের উপ-ঢৌকন হিসেবে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত **কাল আজ আউর কাল** ছবির মধ্যে শ্রীকাপুর যে সামাজিক বক্তব্যটি রাখতে চেয়েছেন, সেটি হচ্ছে যুগচিন্তার বৈষম্য, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় **জেনারেশন-গ্যাপ**। সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ও কোথাও কোথাও টেলি-ভিশনের কৃপায় পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান অধিকতর সহজ ও দ্রুত হয়ে পড়েছে ক্রমেই। ফলে মানুষ আজ জাতীয়তার বেড়া ডিঙিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে আচারে, ব্যবহারে, আহারে, পরিচ্ছদে, চিন্তায়, ভাবনায়। যে কোকা-কোলা আজ কলকাতার যুবকের তৃষ্ণা

জনতার আদালত / রমা ঘোষাল

নিবারণ করে, সেই কোকা-কোলাই তৃষ্ণা নিবারণ করছে টোকিও এবং নিউইয়র্কের যুবকের। যে মার্কসবাদ আজ সোভিয়েট রাশিয়ার তরুণকে করেছে প্রভাবিত, সেই মার্কসবাদই প্রভাবিত করছে ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলন্ড, জাপান ও ভারতের তরুণকেও। আজ মানুষ মানুষকে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য বিবেচনা করেনা, পুরুষে নারীতে বন্ধুত্বকে দূষ্য মনে করে না, বিবাহের আগে তরুণ-তরুণীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানকে অন্যায় মনে করার পরিবর্তে কাম্য বিবেচনা করে।

কাজেই যুগচিন্তার বৈষম্য আজ জ্বলন্ত সত্য ও সমস্যা এবং একে উপজীব্য করে প্রচন্ড আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র তৈরী সম্ভব। **কাল আজ আউর কাল** ছবিতে যে যুগচিন্তার বৈষম্য প্রাধান্য পেয়েছে, সেটি হচ্ছে বিবাহ সংক্রান্ত। কাপুর পরিবারের আজকের তরুণ রাজেশ জানে 'আগে ভালোবাসা, পরে বিবাহ', কিন্তু এই চিন্তা রাজেশের ঠাকুর্দা দেওয়ান সাহেবের কাছে অকল্পনীয়। বিয়ের আগে ভালোবাসা? আজকালকার ছেলেরা বলে কি? নাঃ, জাতজন্ম, গৃহস্থের পবিত্রতা—কিছুই রইল না। ঠাকুর্দা চাইলেন তাঁর বন্ধু ঠাকুর সাহেবের মেয়ে রুক্মিনীর সঙ্গে নাতি রাজেশের বিবাহ দিতে, আর নাতি চাইল সে তার বান্ধবী মণিকাকে বিবাহ করে। দুজনে এই নিয়ে হল প্রচন্ড মনান্তর। কিন্তু এতে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠল ঠাকুর্দার ছেলে এবং নাতির বাবা রাম কপুরের। রামের হয়েছে উভয় সঙ্কট। সে না পারে বাপকে উপেক্ষা করতে, আবার না পারে ছেলের বিরুদ্ধবাদী হতে। অবশেষে নাচার হয়ে রাম বাড়ী ছেড়ে হল নিরুদ্দেশ। এতে ঠাকুর্দা ও নাতি দুজনেই প্রমাদ গুণল। বিষয়ের অংশ দাবী করে নাতি ঠাকুর্দার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করতে উদ্যত হয়েও নিরস্ত হ'ল ঠাকুর্দার অপমান হবার আশঙ্কায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টির জন্যে উদ্যোগী হয়ে রাম নিজে এক কান্ড করে বসলেন। তিনি একটি বিরাট হোটেলের এক প্রশস্ত কক্ষে স্বল্প পোশাক-পরিহিতা বিদেশী তরুণীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মদ্যপের ভূমিকায় আত্ম- প্রকাশ করলেন নিজের পিতা ও পুত্রের সামনে এবং তাঁদেরও তাঁর সঙ্গে আনন্দে মাতোয়ারা হতে বললেন। ঠাকুর্দা ও নাতিতে সমঝোতা স্থাপন করে রাম বাড়ী ফিরল কিন্তু আবার ঠাকুর্দা তাঁর নির্বা- চিত রুক্মিনীর সঙ্গে রাজেশের বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় রাজেশ এবং মণিকা দুজনেই ব্যথিত হল। রাজেশ গৃহত্যাগ

করল। শেষ পর্যন্ত কি অবস্থায় পড়ে ঠাকুর্দা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং মণিকা-রাজেশের বিবাহের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটল, এই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত।

এই কাহিনীতে বর্তমান ও গত-পূর্ব যুগের চিন্তাধারার পার্থক্য নিরূপক আরও ছোটখাট ঘটনা প্রবিষ্ট করানো হলেও যুগচিন্তার বৈষম্যের গভীরে যাবার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি, কারণ যুগ-চিন্তার বৈষম্যকে উপলক্ষ্য করে একটি প্রমোদোপকরণ তৈরীই ছিল চিত্রনির্মাতাদের আসল উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য তাঁদের অনেকাংশে সিদ্ধও হয়েছে। প্রচুর নাচ, গান, উপভোগ্য হাল্কা পরিস্থিতির মাঝে মাঝে কিছু কিছু চক্ষুসজল-করা হৃদয়াবেগপূর্ণ ঘটনার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে নির্মাতারা সক্ষম হয়েছেন। অভিনয়ে স্বাভাবিকতার নিদর্শন দেখা গেছে রাজকাপুরের মধ্যে, রামের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বুদ্ধি-দীপ্ত, সহজ, স্বচ্ছন্দ। ঠাকুর্দা বেশে পৃথিরাজের অভিনয় বরাবরের মতো কিছুটা মঞ্চঘেঁষা হলেও বেশ দরদপূর্ণ। নাতি রাজেশরূপে রাজকাপুরের পুত্র রণধীর অত্যন্ত আতিশয্যপূর্ণ, প্রচণ্ড বেগবান ও সোচ্চার তাঁর অভিনয়। নায়িকা মণিকাবেশে ববিতা অনেকাংশে চলনসৈয়ের ঊর্ধ্বে ওঠেন নি। অপরাপর ভূমিকায় ডেভিড, অভি ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, তেওয়ারী, অচলা সচ্‌দেব প্রভৃতি উল্লেখ্য-অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা উচ্চ প্রশংসার দাবী করে। 'কিসিকে দিলকো সনম', 'হম যব হোগে ষাট সালকে, ঔর তুম হোগী বচপন কী', 'ভঁওরো কী গুঞ্জন হাঁয় মেরা দিল' প্রভৃতি গান বারংবার শোনবার মতো।

রাজকাপুর প্রযোজিত কাল আজ আউর কাল একটি চমৎকার উপভোগ্য চিত্র।

(৩) দিলের মন হয়েছে ধর্মযাজকের (বিদেশী)

ভ্যালেরিয়া বিলি চার বছর ধরে ভালোবাসার পরে যখন জানতে পারল তার প্রেমিক হচ্ছেন একজন বিবাহিত ব্যক্তি, তখন তার মাথায় খুন চেপে গেল। সে তার প্রেমিককে গাড়ীর চাকায় তলায় ফেলে মেরে ফেলতে চাইল। এবং তা যখন পারল না, তখন সে নিজেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হল। কিন্তু হঠাৎ টেলি-ফোন ডিরেকটারী থেকে সাহায্যহস্তকে ফোন করে সে শুনতে পেল কে একজন আশ্চর্য মিষ্টি গলায় তাকে এই সুন্দর জীবনকে সহসা শেষ করে ফেলা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, ঐ মিষ্টি গলার অধিকারী ডন ম্যারিও হচ্ছেন একজন অধ্যাপক এবং অকৃতদার। তবু ভ্যালেরিয়া সবকটা স্লিপিং পিল গলাধঃকরণ করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাইল। কিন্তু হাসপাতালে নীত হয়ে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে সে বারংবার ডন ম্যারিওর নাম করতে লাগল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ম্যারিও ভ্যালেরিয়ার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন। ভ্যালেরিয়া ম্যারিওকে দেখে মুগ্ধ হল। কিন্তু পরে ভাল হয়ে যখন সে জানল ম্যারিও একজন ধর্মযাজক, তখন সে আবার হতাশ হ'ল। তবে সে ক্ষণেকের জন্যে। তার মনে পড়ল, ধর্মযাজকদের বিবাহ করার সপক্ষে একটি মত গড়ে উঠছে। অতএব সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল ম্যারিওকে বিবাহে রাজী করাবার জন্যে। বেশী প্রয়াসের প্রয়োজন হল না, কারণ ম্যারিও-ও মনে মনে ওর সম্বন্ধে দুর্বল হতে শুরু করেছিল। কিন্তু গির্জা ও ধর্মকে সে ভালোবাসে। কাজেই সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাঁ ও না-য়ের মাঝে দুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ম্যারিও কি বিবাহ করল? —এ প্রশ্নের জবাব নিউ এম্পায়ারে প্রদর্শিত কার্লো পন্টি প্রযোজিত ও ডিনো রিসি পরিচালিত হি প্রিস্টস্ ওয়াইফ ছবিটিই দেবে।

আনন্দ সংবাদ!!

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার ১৯৭১ সালের জন্য দাদাভাই ফালকে পুরস্কার প্রদান করেছেন ভূতপূর্ব নিউ থিয়েটার্স-এর কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে। এই পুর-স্কারে ১১,০০০ (এগারো হাজার টাকা), একটি ফলক এবং একটি শাল শ্রীসরকারকে দেওয়া হবে। আমরা শ্রীসরকারের এই সম্মানে গর্বিত এবং আনন্দিত।
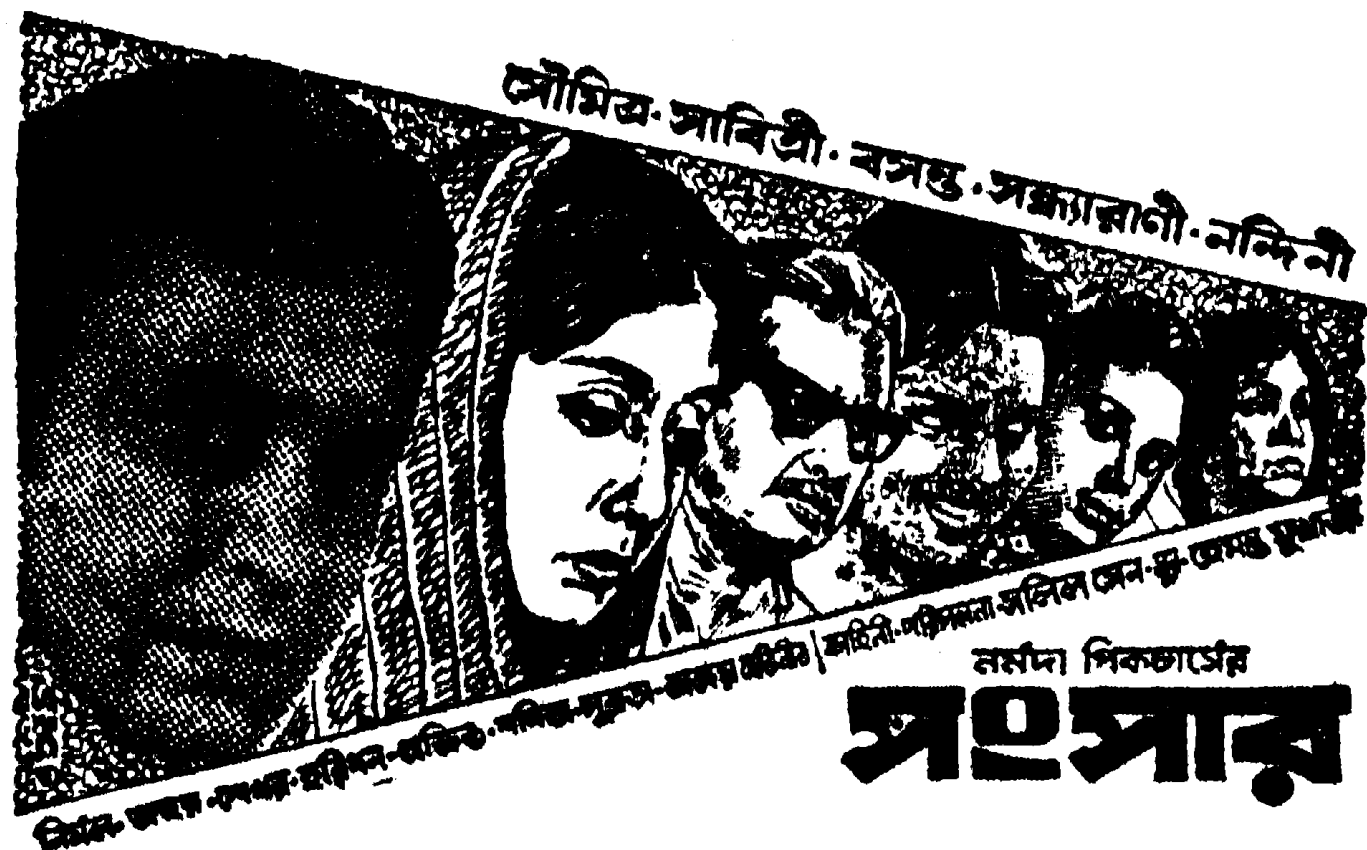
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। —ফটো অমৃত

অসামান্য বেগবান অভিনয় করেন সোফিয়া লোরেন। ভ্যালেরিয়া বিলি চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর আশ্চর্য সাবলীল বাস্তব অভিনয়গুণে। এবং তাঁর জুটি হিসেবে মার্সেলো ম্যাস্ট্রোয়ানিও উপভোগ্য অভিনয় দ্বারা দর্শকদের হৃদয়-হরণ করেছেন।

দি প্রিস্টস্‌ ওয়াইফ একখানি আশ্চর্য উপভোগ্য ছবি।

স্টুডিও থেকে

জনতার আদালত

আসচে ৭ জানুয়ারী ১৯৭২ বিদ্যাবতী ফিল্মস পরিবেশিত জনতা ফিল্মস কর্পোরেশন-এর **জনতার আদালত** চিত্র উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করছে। শোষক ও শোষিতের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব, তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ছবিখানি। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, রত্না ঘোষাল, সুখেন দাস, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন, বঙ্কিম ও অনিলকুমার অভিনীত এই চিত্রের পরিচালনা, সংলাপ ও চিত্রনাট্য এবং সুর-সংযোজনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে মধুকর গোষ্ঠী, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাপী লাহিড়ী।

চলচ্চিত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী **জীবনের জটিলতা** অবলম্বনে কো-অপ. প্রোডাকসন্স-এর প্রযোজনায় **নির্জন সংলাপ** নামে একটি ছবির কাজ শুরু করেছেন একদল তরুণ কলাকুশলী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন সুবীর হাজরা। প্রধান ভূমিকাগুলিতে থাকছেন বিবেক চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়, শ্যামল ঘোষাল ও নবাগতা ঊর্মিলা দে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন তরুণ চলচ্চিত্রকার অর্পণ চক্রবর্তী। আলোকচিত্রে বিমান সিংহ ও সংগঠনে শিশির দে। ৩১ ডিসেম্বর বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে ছবিটির কাজ শুরু হচ্ছে।

'জবান'-এর শুভ মহরৎ : মুভ প্রোডাকসন্স-এর প্রযোজনায় রুমা-রাখী-জয়-মৌ-এর নিবেদন 'জবান'-এর শুভ-মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শনিবার, ১৮ ডিসেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ছবিটির পরিচালনা, সংগীত-পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে আছেন যথাক্রমে পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত ও দীনেন গুপ্ত। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন সমিত ভঞ্জ, জয়া ভাদুড়ী, দিলীপ রায়, চিন্ময় রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অনুভা ঘোষ, দিলীপ বসু, ভাস্কর চৌধুরী ও মাস্টার জয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ছবিটিতে অতিথি-শিল্পীরূপে দেখা যাবে ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, শত্রুঘ্ন সিংহ ও রেখাকে।

'আঁধার পেরিয়ে'র শুভ-মহরৎ : মৌসুমী পিকচার্স প্রাঃ লিমিটেড-এর প্রথম চিত্রার্ঘ 'আঁধার পেরিয়ে'র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হল গেল শুক্রবার, ১৭ ডিসেম্বর নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওতে। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শিশিরকুমার চাকী হচ্ছেন নিজেই কাহিনীকার। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন নচিকেতা ঘোষ। গীত রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় থাকবেন শমিত ভঞ্জ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার ও নবাগতা গীতা মৈত্র। চিত্রগ্রহণ, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন অশোককুমার দাস।

সর্বজনশ্রদ্ধেয়া অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র

বিবিধ সংবাদ

নৃত্যনাট্যে কবি চন্দ্রাবতী : কয়েক সপ্তাহ আগে মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ 'নৃত্যম' গোষ্ঠি প্রযোজিত নৃত্যনাট্য 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' থেকে সঙ্কলিত 'কবি চন্দ্রাবতী' এক মুগ্ধকারী অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল শ্রীমতী পূর্ণিমা চাট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যলাবণ্য ও অভিব্যক্তির সম্পদে।

কবি চন্দ্রাবতীর ব্যর্থপ্রেমের অশ্রুসজল কাহিনী পূর্ববঙ্গের জনজীবনে জনপ্রিয় লোকগাথায় পরিণত হয়েছে এর মানবিক আবেদনের কারণে। দেখে ভাল লাগল বাংলার মৃত্তিকাজাত আখ্যানের এই সহজ, সরল আবেগের প্রতি যথোপযুক্ত নজর দিয়েছেন নৃত্যপরিচালক শম্ভু ভট্টাচার্য এবং কাহিনীর নৃত্যরূপায়ণে এই মৌলিকতা পুরোপুরি বজায় রেখেছেন চন্দ্রাবতীর ভূমিকায় পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়। নাচের মূল কাঠামো ছিল লোকনৃত্যের আঙ্গিনাশ্রয়ী—আবার ভাবের প্রয়োজনে কখনও বা মণিপুরীর লালিত্যে কখনও কথাকলির নাটকীয় ভঙ্গিমায় বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। পূর্ণিমা নৃত্যজগতে নবাগতা কিন্তু তাঁর অভিব্যক্তির ব্যক্তিত্বে নৃত্যভঙ্গির মাধুর্যে ও লয়নৈপুণ্যে প্রতিভাময়ী শিল্পীর সকল প্রতিশ্রুতিই আভাসিত। অভিনয়েও ইনি উল্লেখযোগ্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশে সু-গায়িকার অভাব নেই কিন্তু এইসব নৃত্যনাট্যের উপযুক্ত নৃত্যশিল্পীর অভাব অনেক সময়ই নৃত্য ও গীতের সমতা ও সংগতি রাখতে পারে না। পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের মত উচ্চমানের নৃত্যশিল্পীকে দেখে আশা হোলো এ অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ যাঁরা ঘটাতে পারেন ইনি তাঁদেরই একজন হয়ে উঠতে পারবেন। চন্দ্রাবতীর বিভ্রান্তিকারী সৌন্দর্য, তার প্রেম এবং ভাগ্যের আঘাতে স্বপ্নভঙ্গের দরুণ কবি চন্দ্রবতীতে রূপান্তরিত হওয়ার ছবি অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে।

পূর্ণিমার বিপরীতে জয়ানন্দরূপী ভানু দেও চরিত্রের প্রতি সুবিচারই করেছেন।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন পিনাকী রায়, অনীতা চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য ও সুতপা মুখোপাধ্যায়। পশ্চাৎপটে সঙ্গীতাংশের যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন মানসী পাল ও নীলরতন।

ভারতনাট্যম নৃত্যে সোনাল মানসিং : ভারতনাট্যম নৃত্যে এক নূতন শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন দি স্টুডেন্টস-অ্যাসোসিয়েশন অফ দি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেন্ট ক্যালকাটা। উদ্দেশ্য স্টুডেন্ট স্কলারশিপ ফাণ্ডের জন্য অর্থ-সংগ্রহ।

এ উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। সোনাল মানসিংকে স্বাগত জানিয়ে ইনি বলেন, 'কোলকাতায় সোনাল মানসিং-এর অনুষ্ঠান এই প্রথম। নাচ এখনও দেখিনি কিন্তু শিল্পীকে দেখেছি, সাজঘরে দেখলাম নৃত্যসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তিনি প্রণাম জানাচ্ছেন, সামনে পিছনে, ডাইনে বামে—কলালক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে। দেখেই বুঝলাম ইনি সত্যিকারের সাধিকা। ভারতীয় নৃত্য গীত শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের বস্তুই নয়, এ-হোলো দেবতার আরাধনা। এ কথা যখন হৃদয়ঙ্গম করেছেন—এ'র শিক্ষা নিশ্চয়ই সার্থকতায় ভূষিত হবে'।

সোনাল্ মানসিং-এর নাচ সুরু হোলো। ইনি দেখালেন ভারতনাট্যম ও ওড়িশী নৃত্যের সু-নির্বাচিত কিছু অঙ্গ।

ভারতনাট্যমের শব্দম, পদম ও তিল্লানা ছিল এ'র পরিবেশিতব্য বিষয়।

'শব্দম' অঙ্গকে ভারতনাট্যমের বিরাম অঙ্গ বলা যায়। শুদ্ধ নৃত্য ও বিশ্লেষণী নৃত্যের মাঝামাঝি এই অঙ্গে অভিনয়। পদক্ষেপণের ছন্দ সবই আছে তবে দৃঢ়নিবন্ধ নিয়ম এখানে কিছু শ্লথ। এ যেন বর্ণমের নানারঙ্গা গতি, ভঙ্গি ও অভিনয়ের রসোপভোগের জন্য দর্শকের মানসিক প্রস্তুতি ঘটানো।

পদম হোলো—আখ্যান ধর্মী। প্রেম, ভক্তি, ঈর্ষা, কৌতুক—ইত্যাদি বিভিন্ন হৃদয়াবেগ ভারতনাট্যমের লয়, গতিভঙ্গি মুদ্রার শুদ্ধতায় বিশ্লেষিত হয়। অভিনয় এ-অঙ্গের এক বিশেষ আকর্ষণ। তিল্লানায়, পদক্ষেপের বৈচিত্র্য, নানান লয় ও গতির প্রকার পরিকল্পায় কল্পনার মহত্ব।

শ্রীমতী মানসিং-এর নৃত্যে, আঙ্গিক দক্ষতা, লয়ের দখল, নির্ভুল মুদ্রা ও ভঙ্গির উপস্থাপনা উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের দাবীদার। কিন্তু অভিনয় অঙ্গে ব্যঞ্জনার অভাব —অভিব্যক্তিতে কল্পনার দৈন্য—তার

অসাধারণ রেওয়াজী ও উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষায়ত্ত 'নৃত্ত' বিদ্যার সঙ্গে ঠিক হাত মেলাতে পারেনি।

ওড়িষী নৃত্যে ইনি দেখালেন মঙ্গলাচরণ পল্লবী, অষ্টাপদ, বিদেহিশা বিলাস। ওড়িষী নৃত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সোনাল মানসিং নৃত্যপটীয়সী, কিন্তু ভাবগভীরা নন, পরিশ্রমে ইনি অনলস কিন্তু শিল্পচিন্তায় ধ্যানমগ্না নন। তাই এর নৃত্য দর্শকের দৃষ্টিকে আপ্যায়িত করলেও সামগ্রিকভাবে তার অনুষ্ঠান অন্তরের অতলে কোনো স্থায়ী দাগ কাটতে পারে না।

তবে তাঁর নিষ্ঠা আছে, অধ্যবসায় আছে, তিনি সুন্দরীও। তা ছাড়া নবীনা—তাই প্রথম শ্রেণীর শিল্পমানে একদিন না একদিন তিনি পৌঁছবেনই এই আশা আমরা রাখব।

শ্রীমতী মানসিংএর নাচের সঙ্গে কামাক্ষীকুপ্পুস্বামীর কণ্ঠসঙ্গীত, নাগরজনের মৃদঙ্গম, কৃষ্ণমূর্তির বাঁশী ও ললিতা শাস্ত্রীর নট্টভঙ্গাম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্নের কারণ।

সোনাল মানসিং বর্তমান কলাক্ষেত্রের অন্যতম প্রধানা শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীর শিক্ষাধীনে আছেন। এ-ছাড়া ইনি মীনাপুরের গৌরী অম্মলের কাছে 'অভিনয়' অঙ্গ, নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাঃ টি এন রামচন্দ্রনের কাছে 'করণ'এর থিওরী—ব্যবহারিক শিক্ষা করেন। ওড়িষী নৃত্যে ইনি গুরু কেলুচন্দ্র মহাপাত্রের শিষ্যা।
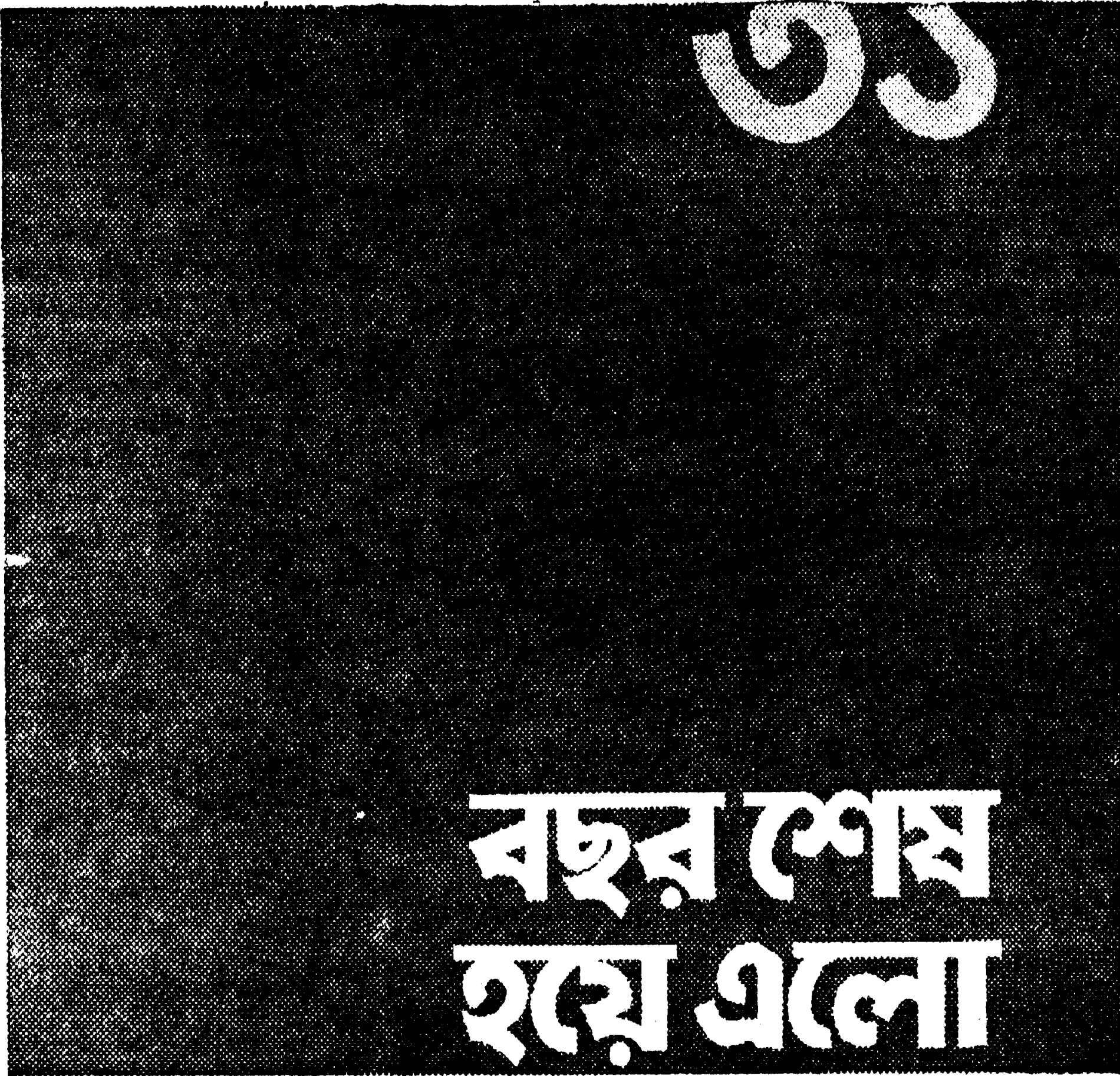
রবীন্দ্রসদনে প্রাক্-শতবার্ষিকী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন : রবীন্দ্রসদনের নাটক মঞ্চায়ন পৌঁছিয়ে গেল পরিস্থিতির কারণে। কিন্তু প্রাক-শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন সম্পন্ন হোলো—এক কাব্যসৌন্দর্য পরিবেশে।

মঞ্চের পশ্চাৎপটে নরম-সবুজের ওপর-সোনার অক্ষরে লেখা '**বাংলা নাটকের শত-বর্ষে পদার্পণ**'—মঞ্চের একপাশে শতপ্রদীপ-ধারক শিল্পশ্রীমন্ডিত আলোকবর্তিকা, সারা মঞ্চ জুড়ে সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্য ও পুষ্প-স্তবকের সমারোহের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। আর . মঞ্চে উপবিষ্ট শিল্পীদের মনে হচ্ছিল পূজারত সাধক-সাধিকা। এ-উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠান ছিল প্রধান অতিথি নটসূর্য **অহীন্দ্র চৌধুরীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন** ও মানপত্র প্রদান এবং **বিশেষ অতিথি** সর্বশ্রী বিজন ভট্টাচার্য, মলিনা দেবী. সরযু দেবীকে সম্মান জ্ঞাপন। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর হাতে এন্ডি চাদর, মালা অর্পন দিয়ে ললাটে চন্দন লেপন করলেন প্রশাসন অধিকারিকা শ্রীমতী তপতী রায়।—বিজন ভট্টাচার্য, সরযু দেবী ও মলিনা দেবীকে মাল্য, বস্ত্র ও চন্দন-তিলক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হোলো। অহীন্দ্র চৌধুরীকে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করলেন—তপতী রায় এবং শ্রীচৌধুরীর হাতে এই মানপত্র প্রদান করেন সভাপতি শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য।

এ'রা ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী শম্ভু মিত্র, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, গুরুদাস ভট্টাচার্য।

উদ্বোধনী সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' দিয়ে আসর সুরু করেন সুচিত্রা মিত্র। তারপর তপতী রায়ের আহ্বানে শত-প্রদীপের প্রথম প্রদীপটি জ্বালালেন স্বয়ং নটসূর্য এবং অন্যান্য প্রদীপগুলি সমাগত শিল্পীরা। এরপর সভাপতির অনুরোধে ভাষণ দিলেন সর্বশ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী, মলিনা দেবী, বিজন ভট্টাচার্য ও সরযু দেবী।

অহীন্দ্রবাবু এই সংকট মুহূর্তে আকস্মিকভাবে এমন সুন্দর সভার আয়োজন ও শিল্পী-বরণের জন্য রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ ও তপতী রায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নাট্য-সম্রাজ্ঞী সরযু দেবী বাংলা নাটকের প্রথম যুগে অবহেলিত নট-নটীদের নীরব আত্মদানের অবদানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদপ্রাপ্ত নাট-মঞ্চকে আমি পুণ্যক্ষেত্র বলেই মনে করি—। এখানে আমি 'নাট্য-সম্রাজ্ঞী'রূপে আসিনি এসেছি 'সেবিকারূপে'।

মলিনা দেবী সবিনয়ে বলেন—যদিও আমি বহুকাল ধরে মঞ্চের সঙ্গে জড়িত বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকারী আমি নই। কারণ বহু গুণীজ্ঞানী এ সভায় উপস্থিত। আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষকে আজকের পাওয়া এই সম্মানের জন্য।

বিজন ভট্টাচার্য বলেন—আজ শুধু বাংলা মঞ্চেরই বিশেষ মুহূর্ত নয়, বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চেও এক বিরাট নাটক চলেছে এবং তার মিলনান্তক পরিণতির জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সৌমেন বসু ও গুরুদাস ভট্টাচার্য।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ননা করেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের কথা যিনি বাংলা নাটকের মোড় ঘুরিয়ে এর অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছেন।

অলঙ্কৃত মধুর ভাষণে সমাগত গুণী ও অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ রমা চৌধুরী। এই আনন্দ-সভার মধুর অবসান ঘটান শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র—'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা' গানটি দিয়ে।
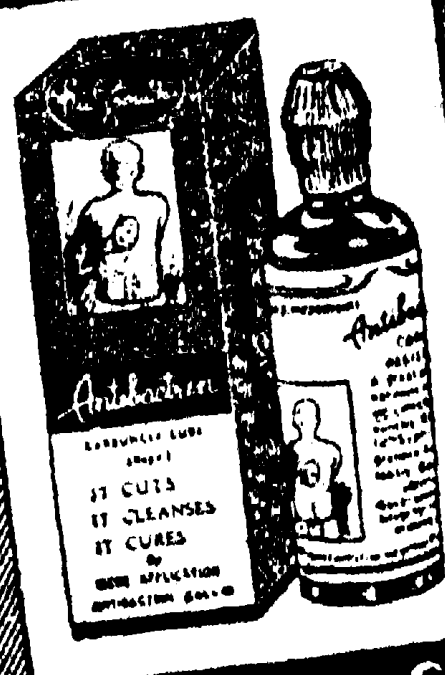
বাঙলা নাট্যশালার প্রাক্-শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

গেল ৭ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে বাঙলা নাট্যশালার প্রাক্ শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হল। যুদ্ধকালীন অপ্রদীপের জন্যে সন্ধ্যা সমাগমে শহরের যে অবস্থা হয়, সে-কথা বিবেচনা করে এই অনুষ্ঠানে জনসমাগম ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। মঞ্চে আসীন বিশিষ্ট গুণিজনের মধ্যে সময়োচিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন সর্বশ্রী সুধী প্রধান, মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, অখিল নিয়োগী এবং সভাপতি স্বয়ং। সভায় যাঁরা নিরানব্বইটি দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, তাঁর মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। সভান্তে রামনারায়ণ তর্করত্ন দ্বারা ১৮৫৪ সালে রচিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকটি সুধী প্রধান কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত ও সংক্ষেপিত হয়ে অভিনীত হয়। শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দেন, পিনাকী বসু (অনৃতাচার্য),- সানু চট্টোপাধ্যায় (ধর্মশীল), জয়ন্ত ভট্টাচার্য (শুভাচার্য), ইরা মিত্র (মাধবী), দীপা হালদার (দুষ্টা মহিলা), রাণু রায় (হেমলতা), প্রতিমা পাল (সেজমেয়ে) প্রভৃতি।

চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থাগার

সম্প্রতি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সোশ্যাল কম্যুনিকেসন সার্ভিসের উদ্যোগে ফিল্ম স্টাডি সেণ্টার নামে চলচ্চিত্রবিষয়ক একটি গ্রন্থাগার খোলা হচ্ছে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের দ্বিতলস্থ পাঠগৃহে (রিডিং রুমে)। গ্রন্থাগারটি প্রত্যহ বৈকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে বলে স্থির হয়েছে। এই গ্রন্থাগারের সদস্য হতে গেলে সোশ্যাল কম্যুনিকেসন সার্ভিসের ডিরেকটরের কাছে মুদ্রিত আবেদনপত্র ভর্তি করে বার্ষিক ২৪ টাকা চাঁদা সমেত পাঠাতে হবে। জানুয়ারী থেকে বর্ষ শুরু হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয় পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬·২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষাণ্মাষিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ

৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৫ সংখ্যা

মূল্য—৫০ পয়সা

শুল্ক— ২ পয়সা

মোট ৫২ পয়সা

Friday, 7th January, 1972 শুক্রবার, ২২শে পৌষ, ১৩৭৮ **.52 Paise**

চিঠিপত্র

আশ্বিন সংক্রান্তি—"গাড়শী ব্রত"

কল-কারখানা ও রান্না ধর্মঘটে পশ্চিমবঙ্গ (অমৃত, ২৬ সংখ্যা ৫-১১-৭১ প্রবন্ধের এক স্থানে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন—আশ্বিন সংক্রান্তির দিনের যে গাড়শী ব্রত উদযাপিত হয় তাও হয় রন্ধন ধর্মঘটের মাধ্যমেই। আশ্বিনে রাঁধিয়া কার্তিকে খায়, যে বর মাগে সেই বর পায়, এই ছড়া বলে ব্রত আরম্ভ।

এখন প্রশ্ন রন্ধন ধর্মঘটটা কবে হয়? আশ্বিনে সংক্রান্তির দিন না পয়লা কার্তিক? আশ্বিন সংক্রান্তির আগের দিন রান্না করে সংক্রান্তির দিন অরন্ধন হলে—সেই রান্না করা বাসি খাবারই কী পয়লা কার্তিক খাওয়া হয়? না কি আশ্বিন সংক্রান্তিতে রেঁধে রাখা খাবার পয়লা কার্তিকে খেয়ে সেই দিনটিকেই অরন্ধন হিসেবে পালন করা হয়?

তবে পূর্ব বাংলার বিশেষ করে ঢাকা বিক্রমপুরের গৃহস্থ বধূদের কাছে আশ্বিনের শেষ দিনটি হচ্ছে 'গাড়ু সংক্রান্তি।' এই দিন কাক ডাকার সংগে সংগেই ঘুম থেকে উঠে গোবর ছড়া দিয়ে উঠোন নিকোনা পোছানো হয়, স্নান করে ধূপধুনো ও প্রদীপ জ্বালিয়ে মাঙ্গলিক আচার নিষ্ঠা পালন হয়। দুপুরে ব্রত পালন। এবং বিকেলেও ধূপধুনো জ্বালিয়ে পথে ঘাটে দীপমালায় সজ্জিত করা হয় আর হুলুধ্বনি দিয়ে লক্ষ্মীকে বরণ ও অলক্ষ্মীকে বিদায় করা হয়।

এদিন 'হালের এবং জালের' যাবতীয় তরিতরকারী ও মাছ হেসেলে ঢুকবে না। ভাত রান্না হবে বোরো ধানের চাল দিয়ে। আর ডাল হবে খেসারীর। এই ডালে যাবতীয় শেকড়, মোচা, ডাঁটা, লাউ কুমড়ো। চাল কুমড়ো, মানকচু, গাটি কচু, ওল, মেটে আলু, কলমী, শালু, শাপলা ইত্যাদি যে সব তরিতরকারি ফলাতে চাষ করতে হয় না তাই দেওয়া হয়। এই ডালে তেল সম্বরাও দেওয়া হয় না। ববোজে যে লঙ্কা জন্মায় তাই এই ডালে দেওয়া হয়। শুকনো হলুদের পরিবর্তে কাঁচা হলুদ প্রয়োগ হয়।

তরকারিগুলি কাটার সময়েই এর কিছু অংশ কেটে ভিন্ন করে রাখা হয়। ভেজানো খেসারী ডাল, কলা, কাঁচা হলুদ, কাঁচা তেঁতুল, পান সুপুরী, সিন্দুর ধূপধুনো এই সব হচ্ছে ব্রতের উপাচার। এয়োতিদের দিয়ে ব্রত কথা। এই ব্রত কথা আবার পুরুষের শোনা নিষিদ্ধ। কথাটি সংক্ষেপে এ রকমের : পুত্রবধূ সংসারে আসার পরেই মায়ের মতো স্নেহে শাশুড়ী তাকে যাবতীয় গৃহস্থালীর ক্রিয়া-কর্ম আচার-নিষ্ঠা পালনের তালিম দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছেন। বধূও শাশুড়ীর কথা মতোই সব মেনে চলে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই শ্বশুর এক মোহিনীর জালে জড়িয়ে পড়েন। সংসারে শুরু হয় অনাচার। ঘরে অলক্ষ্মীর প্রভাবে লক্ষ্মীমাতা দূরে সরে যায়। মোহিনীর পরামর্শ মতো শ্বশুর বধূমাতার আচার নিষ্ঠা ব্রত পার্বনে বাধা দেয়। কিন্তু বধূটি গোপনে সবই করে যায়। এইভাবে আশ্বিনের সংক্রান্তি আসে, গাড়ু ব্রতে মাছ নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্বশুর বাজার থেকে মাছ নিয়ে আসেন। রান্না করে দাও বলে বৌটিকে আদেশ করেন। পিতার মতো শ্রদ্ধা ভক্তি করে বধূ তাঁর শ্বশুর মশাইকে। তাই রান্না করে দেয়, কিন্তু গোপনে গোপনে গাড়ু সংক্রান্তির ব্রত পালন করতেও ভোলে না। পরের দিন শ্বশুর ঘুম থেকে উঠেই দেখেন সেই ডাইনীটা কাকের মতো বিকট চেহারা নিয়ে পথে মরে আছে। ঘরে আবার লক্ষ্মীমাতা ফিরে আসেন।

এই আশ্বিন সংক্রান্তির রান্না করা বারো চালের ভাত এবং তরিতরকারি সহযোগে খেসারী ডালের খাবারই পয়লা কার্তিক সবাই স্নানাদি করে ভোজন করে। এই পান্তা ভাত খাওয়ার সময়েই মেয়েরা বলে থাকে—আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়, যেই বর মাগে সেই বর পায়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত 'গাড়শীর' সাথে পূর্ব বাংলার প্রচলিত গাড়ু সংক্রান্তির এই হচ্ছে ব্যবধান। আসলে পূর্ব বাংলায় আশ্বিন সংক্রান্তির দিনটি অরন্ধন দিবস হিসেবে পালন করা হয় না।

মালতী কর্মকার
বিজয়গড়
কলকাতা—৩২।

"শ্রীমদ্ভাগবত গীতা" প্রসংগে

'অমৃতে'র ২৫ কার্তিক সংখ্যায় শ্রীঅভয়ঙ্কর অতুলচন্দ্র সেনের 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা'র আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন 'ম্যাথু আর্নল্ড গীতার অনুবাদ করেছেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এবং 'গান্ধীজী ব্যারিষ্টারি পড়ার সময় বিলাতে দু-একজন নিরামিষাশী বন্ধুর অনুরোধে ম্যাথু আর্নল্ডের 'দি সং সিলেশ্চিয়াল' পড়েন এবং গীতার অসাধারণত্বে সেই তাঁর বিস্ময়ের শুরু।' গীতার ইংরাজী পদ্য অনুবাদ 'দি সং সিলেশ্চিয়াল' আর্নল্ড সাহেবের লেখা বটে তবে তিনি ম্যাথু আর্নল্ড নন, 'স্যার এডউইন আর্নল্ড'।

এই প্রসংগে উল্লেখ করি যে মার্কিণ মিঃ রবার্ট পেইন মহাত্মাজীর এক বিরাট জীবনচরিত লিখেছেন নাম তার দি লাইফ অ্যান্ড ডেথ অফ মহাত্মা গান্ধী. এই গ্রন্থের ৭২ পৃঃ মিঃ পেইন স্যার এডউইন আর্নল্ডের অনুবাদগ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যটুকু নিচে উদ্ধৃত করছি :—

> "Sir Edwin Arnold's translation, known as 'The Song Celestial', has little to commend it, for it is neither accurate nor faithful to the spirit of the original, the cumbrous blank verse lacks an essential excitement and moves at a snail's pace. Gandhi was, however, attracted by the high moral fervor displayed by the translator; some vestiges of the original could be found at intervals, and he recognised that he was in the presence of one of the great classics of ancient India" (P.72)

আমি দি সঙ সিলেশ্চিয়াল পড়া ত দূরের কথা. চোখেও দেখিনি। জানি না মিঃ পেইন নিজে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ কিনা বা মূল গীতা পড়েছেন কিনা। অথবা স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টোফার ঈশারউডের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মার্কিণ মুল্লুকে প্রকাশিত গীতার আধুনিকতম অনুবাদের সংগে দি সঙ সিলেশ্চিয়াল-এর তুলনা করে শেষোক্ত গ্রন্থখানিকে অ্যাকুরেট ও ফেইথফুল নয় বলে সমালোচনা করেছেন। আশা করব শ্রীঅভয়ঙ্কর বা অভিজ্ঞ কোন জন এ সম্বন্ধে আলোকপাত করবেন।

অনিলপ্রকাশ সোম
জামসেদপুর—১১।

অতুলপ্রসাদ প্রসংগে

শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর লেখা 'অতুলপ্রসাদ সেন গীতিকার ও সুরকার' 'অমৃত' ২৪ সংখ্যায় (শুক্রবার ৪ঠা কার্তিক, ১৩৭৮) পড়লুম।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তেত্রিশ লাইনের পর লিখেছেন 'তিনি কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেছিলেন—'

আমি অতুলপ্রসাদের জীবনী লিখব সংকল্প নেবার পর তাঁর বিষয়ে সংগ্রহের জন্য লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে খোঁজ-খবর করেছি। নিজে রেকর্ড দেখেছি। নারায়ণবাবুর প্রবন্ধটি পড়ার পর আবার গেছি এবং রেকর্ড দেখেছি। কিন্তু লক্ষ্ণৌ উপাচার্যদের নামের তালিকায় কোথাও অতুলপ্রসাদের নাম দেখতে পাইনি।

নারায়ণবাবু কোথা থেকে এ খবর সংগ্রহ করেছেন যে, অতুলপ্রসাদ 'কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেছিলেন' 'অমৃতে'র পত্র বিভাগ মারফত জানলে খুবই খুশি হব।

মানসী মুখোপাধ্যায়
লক্ষ্ণৌ

সম্পাদকীয়

শান্তির দাওয়াই
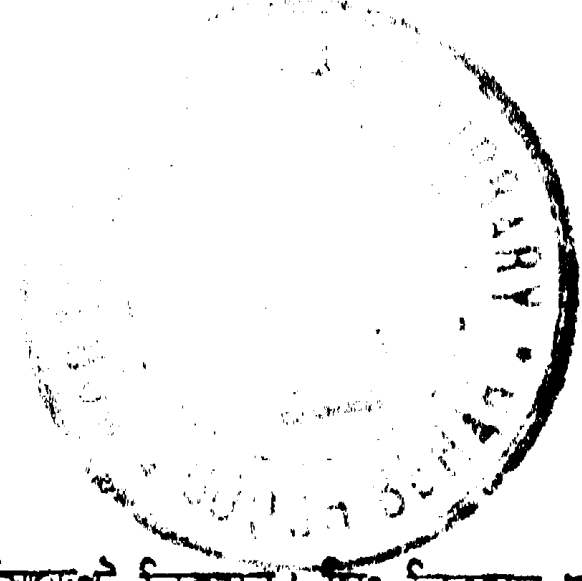
এবারকার বড়দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সওগাত মার্কিন মুল্লুক থেকে পাঠিয়েছেন প্রেসিডেণ্ট নিকসন। মিঃ নিকসন শান্তির ব্যাপারী। তাঁর হাতে বিশ্বভুবনের শান্তিরক্ষার ভার। ডুবু ডুবু ইয়াহিয়াকে বাঁচানোর জন্য তিনি কি না করেছেন। শেষ পর্যন্ত জাঁদরেল জঙ্গী জাহাজ "এণ্টারপ্রাইস" পাঠিয়েছেন গোটা কলকাতা শহরকে বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই মহৎ দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে তিনি প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে বঞ্চিত করেছেন। লক্ষাধিক সৈন্যসহ পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এত দ্রুতলয়ে আত্মসমর্পণ করবে তা কে জানত। ভারত উপমহাদেশে মার্কিন চক্রান্ত আপাতত বিফল হয়েছে, তবে পর্দার অন্তরালে ভারতকে বিপর্যস্ত করার জন্য নতুন কৌশল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলেছে একথা মার্কিন সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত তথ্যাবলী থেকে সহজেই বোঝা যায়।

আগামী নির্বাচনে বেশ সহজেই যাতে দরিয়া পার হতে পারেন মিঃ নিকসন তার জন্য অনেক রকম কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কিসিংগার নবীন চীনের সঙ্গে মিতালির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। পাক-ভারত সংঘর্ষ উপলক্ষ্যে দুই পক্ষের ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হয়েছে। তাই বড়দিনের সপ্তাহে মিঃ নিকসনের নির্দেশে উত্তর-ভিয়েতনামে যে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ঘটেছে সারা পৃথিবী সেই পৈশাচিক কাণ্ডের প্রতিবাদে মুখরিত। চীন কিন্তু চুপচাপ। ভিয়েতনামে শান্তির নামে নিকসন সাহেব যে জেহাদে নেমেছেন তার বীভৎসতা অবর্ণনীয়। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে ক্যানাডার বিদেশমন্ত্রীও ইন্দো-চীনে যুদ্ধ সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্রের এই জঘন্য ভূমিকার নিন্দা করেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতিহাস আজ বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত। একটি দুর্বল জাতি অসীম তেজ ও প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে এক প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিমান রাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মরণপণ করে লড়ছে। এই যুদ্ধে ভিয়েতনামের অজেয় মানুষগুলির দুর্দমনীয় মনোবলের কথা আজ সুপরিজ্ঞাত।

প্রেসিডেণ্ট নিকসনের নিজের দেশেও ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিরোধিতা শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে এবং বর্তমানে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মিঃ নিকসনের ভিয়েতনাম নীতির সমর্থন তাঁর স্বদেশবাসী করতে পারেন নি। ডেমোক্রাটিক পার্টির দলভুক্ত প্রেসিডেণ্ট প্রার্থী তিনজন মিঃ নিকসনের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। এখন সুপরামর্শ শোনার মত মন মিঃ নিকসনের নেই। মার্কিন রাজনৈতিক পদ্ধতি এমনই এক বিচিত্র ভঙ্গীতে গঠিত যে প্রেসিডেণ্ট ভুলের পর ভুল করলেও তিনি প্রেসিডেণ্ট পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। মিঃ নিকসনও গদীতে স্থির থাকবেন, কিন্তু ইতিহাস এমনই নির্মম দণ্ডদাতা যে প্রবল প্রতাপ অমিততেজা বিচিত্রবীর্য মানুষকেও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে তার বেশী সময় লাগে না। ইতিহাসের নিঃশব্দ শাস্তি অতি কঠোর এবং কঠিন। আজ ভিয়েতনামে যে অবস্থা তার পক্ষপাতহীন বিচার প্রয়োজন। ভিয়েতনাম ও কমবোডিয়া সম্পর্কে যা বাস্তব সত্য তা গ্রহণ করাই কর্তব্য। সত্য থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে সুফল পাওয়া যায় না। ১২ই নভেম্বর তারিখে প্রেসিডেণ্ট নিকসন বলেছিলেন, ভিয়েতনামে সংগ্রামী ভূমিকার প্রায় অবসান ঘটেছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এই প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের হেতু কি। ক্ষীয়মাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলের নিরাপত্তার কারণেই নাকি এভাবে বোমাবর্ষণ করতে হয়েছে। অপকর্মের অজুহাতের কখনও অভাব ঘটে না। ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাদলের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তার কোনো প্রমাণ কিন্তু কোনো সূত্রে প্রকাশিত হয় নি। অনেকে অনুমান করেন, প্যাথেট লাও বাহিনীকে উত্তর ভিয়েতনাম সাহায্য করছে, তাই তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য এই শান্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্যারিসের আলোচনার ব্যাপারটি দেখা যাচ্ছে মিঃ নিকসনের কাছে তুচ্ছ। হয়ত পিকিংএর সুমধুর পরিবেশে তিনি কোনোরকম সমাধান সূত্রের সন্ধান পাবেন। উপস্থিত উত্তর ভিয়েতনাম ও সেই সঙ্গে বিশ্ববাসী বুঝুক শান্তির দাওয়াই বিতরণের আধুনিকতম পদ্ধতি কত সরল এবং সহজ।

১-১-৭২

পটভূমি

কিছুদিন আগে একবার লিখেছিলাম সীমান্তে যখন রণদামামা বাজছে তখনই নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ার উপযুক্ত সময় নিশ্চয়ই নয়। এখন যেহেতু সেই রণ-দামামা স্তব্ধ তখন যদি সত্যিই নির্বাচনের ঢাকে কাঠি প'ড়ে তবে বোধহয় আর আপত্তি করা চলে না। কারণ প্রধানমন্ত্রী যদিও বলেছেন যে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিনা ঠিক বলা যায় না, তবু তিনিই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়া উচিত নয়। আর আমাদের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বা-চনটা তো স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অংগ বটেই।

সত্যি কথা বলতে কি, ডিসেম্বরের মাঝামাঝিও কেউ ধারণা করতে পারেন নি যে, ফেব্রুয়ারীতে কয়েকটি রাজ্যে বিধান-সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে। ঢাকায় পাকিস্থানী ফৌজের আত্মসমর্পণের পরেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান তরবারি আস্ফালন করেছেন। এমন কি, ১৭ ডিসেম্বর তিনি ভারতের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরও পাকিস্থানের অভিসন্ধি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা কাটেনি। সাধারণ মানুষের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, স্বরং কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন নি। তা যদি হতে পারতেন, তবে যুদ্ধবিরতি হওয়ার পরও বিধানসভার নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্যে তাঁরা একটি বিশেষ বিল আনতে উদ্যোগী হতেন না।

পশ্চিম বাংলা, গুজরাট বা মহীশূরের মতো রাজ্যে যেহেতু রাষ্ট্রপতির শাসন চালু আছে তখন সেখানে এই ফেব্রুয়ারি-মার্চে নির্বাচন না হলেও সংবিধান নামক মহা-ভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কারণ সংবিধান অনুযায়ীই রাষ্ট্রপতির শাসন তিন বছর পর্যন্ত চালু থাকতে পারে। পশ্চিম বাংলা, গুজরাট বা মহীশূর—কোথাওই ঐ মেয়াদ এখনও পেরিয়ে যায়নি। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা আসামের মতো রাজ্যের কথা স্বতন্ত্র। ঐ সব রাজ্যের বিধানসভার আয়ু মার্চেই পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বিধানসভার স্বাভাবিক সংবিধান-নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল হল পাঁচ বছর। তবে রাষ্ট্রপতি যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন সেই আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেওয়া চলে। সংবিধানের ১৭২ অনুচ্ছেদে এ-বিষয়ে বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী পার্লামেন্ট যে-কোনো বিধানসভার আয়ু পাঁচ বছরের বেশি বাড়িয়ে দিতে পারেন—তবে একসংগে এক বছরের বেশি বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর ছ' মাসের বেশি বিধানসভাকে আর জীইয়ে রাখা যাবে না।

সরকার যে এই ধরনের একটি বিল লোকসভার এই অধিবেশনেই আনতে চেয়ে-ছিলেন, তার কারণ, পরবর্তী অধিবেশন বসবে ফেব্রুয়ারির শেষে, তার আগেই কয়েকটি বিধানসভার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু সেই বিল শেষ পর্যন্ত সরকার আর পেশ করলেন না, কারণ ইতি-মধ্যে আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল। সরকার এখন নির্বাচন স্থগিত রাখার বিপক্ষে।

নির্বাচন কেন স্থগিত রাখা উচিত নয় সে-জন্য সরকার পক্ষ থেকে দু'টি প্রধান যুক্তি দেখানো হয়। এক : নির্বাচন স্থগিত রাখলে বাইরের দুনিয়ার লোক ভাববে অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হয়নি। দুই : এখন না-হয় নির্বাচন এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু এক বছর বাদে আবার যদি কোনো বিশেষ কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দরকার হয়?

বিরোধী পক্ষ এই সব যুক্তির সারবত্তা কতোটা উপলব্ধি করেছেন জানি না, তবে সরকারের মত পরিবর্তনের পিছনে যে আরো কারণ আছে সে-সন্দেহ তাঁদের মনে ছিলই। সকলেই স্পষ্ট করে সে-কথা বলেন নি, তবে অন্ততঃ স্বতন্ত্র দলের এক নেতা বলেই ফেলেছিলেন যে, কংগ্রেস পাকি-স্থানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভের ফায়দা ওঠাতে চায়। এমন কি যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি 'এখনই নির্বাচন চাই' বলে বেশ কিছুদিন ধরে সোচ্চার, সেই দলের প্রতিনিধিও দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সংগে বৈঠকে নির্বাচন সম্পর্কে তেমন উৎসাহ দেখান নি বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সি-পি-এম নেতা শ্রীসমর মুখোপাধ্যায় অবশ্য পরে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেন। কিন্তু নির্বাচন সম্পর্কে সি-পি-এম-এরও যে মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বোধহয় পলিট-ব্যুরোর সর্বশেষ প্রস্তাব।

সি-পি-এম অবশ্যই এখন নির্বাচনের বিরোধিতা করেনি। তা করা সম্ভবও নয়। পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের পতনের পর থেকে ক্রমাগত যে-দল নির্বা-চনের দাবি জানিয়ে আসছে সেই দল হলো সি-পি-এম। নভেম্বরে যখন নির্বাচন কমি-শনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন আগামী বছরের গোড়ায় অনুষ্ঠিত হবে, তখন সি-পি-এম প্রশ্ন তুলেছিল, কেন পশ্চিম বাংলাতেও একই সংগে নির্বাচন হবে না? মার্কসবাদী নেতারা তখন এমন কথাও বলেছিলেন যে, পশ্চিম বাংলায় যদি একই সংগে নির্বাচন না হয়, তবে বুঝতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলার মানুষকে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং, এত সব কথা বলার পর, পশ্চিম বাংলায় তো বটেই এমন কি অন্যান্য রাজ্যেও নির্বাচন স্থগিত রাখার কথা সি-পি-এমের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু এখন যখন পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবেই আশু নির্বাচনের পক্ষপাতী, তখন সি-পি-এমের পলিট-ব্যুরোর প্রস্তাব কিছুটা শর্তকন্টকিত। সেই সব সর্তের মধ্যে আছে, নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। রাজ-নৈতিক মহল লক্ষ্য করেছেন যে, নভেম্বর পর্যন্ত সি-পি-এমের পক্ষ থেকে নির্বাচনের শর্ত হিসেবে সন্ত্রাস বন্ধ বা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা বলা হয়নি। তখনও অবশ্যই 'কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সন্ত্রাসের' কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেই নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস বন্ধের দাবি তোলা হয়নি। বরং, এই ধারণাই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, ঐ সন্ত্রাস যদি বন্ধ করতে হয় তবে অবিলম্বে নির্বাচন হওয়া দরকার। তবে এখন সি-পি-এম আবার অন্য সুরে কথা বলছে কেন?

হতে পারে যে, সি-পি-এম মনে করছে দেশে এখন যে জরুরী অবস্থা রয়েছে তার মধ্যে সন্ত্রাস হয়ত বাড়বে। পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে তো স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, এখন এই অবস্থায় নির্বাচন হলে তা অবাধ হবে না, তার মধ্যে অনেক কারচুপি থেকে যাবে। কিন্তু জরুরী অবস্থা থাকলেই কি শাসক দলের সব সময় সুবিধে হয়? ১৯৬৭ সালে যখন দেশব্যাপী চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখনও দেশে জরুরী অবস্থা ছিল (১৯৬২ সালে ঘোষিত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয় ১৯৬৮ সালে)। কিন্তু সেই নির্বাচনেই কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটেছিল। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, অনেক রাজ্যেই ক্ষমতা হারিয়েছিল কংগ্রেস। তখন এক সাংবাদিক লিখেছিলেন যে, অমৃতসর থেকে ট্রেনে চেপে যদি কলকাতা যাওয়া যায় তবে পথে কোনো কংগ্রেসশাসিত রাজ্য পড়বে না।

ভিয়েতনামে নিকসনের শান্তি-প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

ভিয়েতনাম
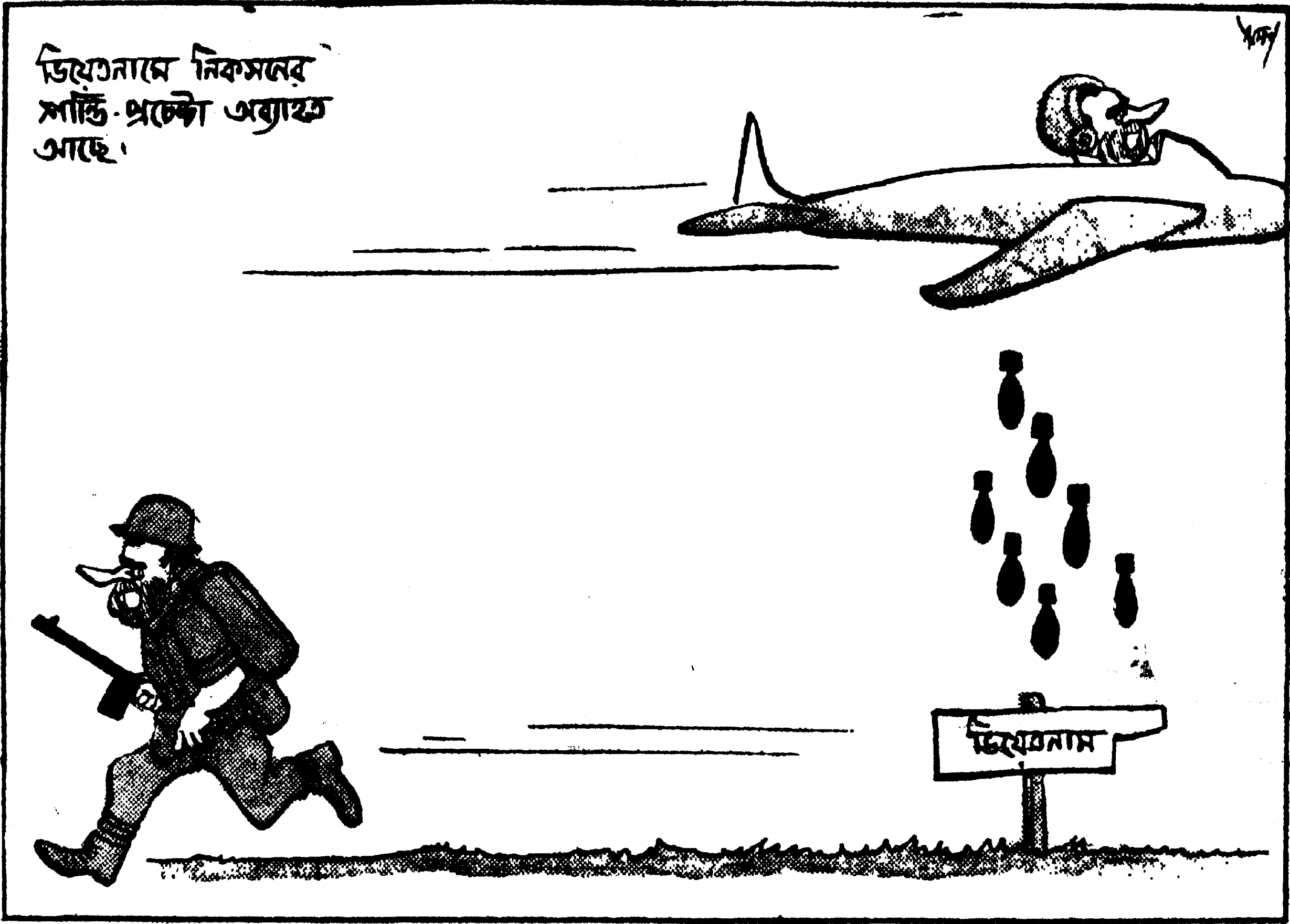
লোকসভার নির্বাচনেও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বাধীনতার পর সবচেয়ে কমে যায়। জরুরী অবস্থায় যদি অবাধ নির্বাচন সম্ভব না হয় তবে ১৯৬৭ সালে ঐ ধরণের ফলাফল সম্ভব হয়েছিল কী করে? তখন সি-পি-এম বা অপর কোনো বিরোধী দল 'অবাধ নির্বাচন হয়নি' অথবা 'নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে' বলে দাবি তুলেছিল বলে মনে পড়ে না।

এখন যেহেতু সি-পি-এম ঐ ধরণের কথা তুলছে তখন রাজনৈতিক মহল মনে করছেন যে, সি-পি-এম আগামী নির্বাচনে তাদের সম্ভাব্য ব্যর্থতার একটা আগাম সাফাই গেয়ে রাখছে। নির্বাচনে যদি সাফল্য আসে তবে তো ভালোই, না হলে বলা যাবে যে, 'আমরা আগেই বলেছিলাম অবাধ নির্বাচন হবে না'।

সি-পি-এম এখন এই কথাও বলছে যে, তারা অনেক আগেই বলে রেখেছিল যে, কংগ্রেস নিজের সুবিধেমতো সময়েই নির্বাচন করবে। পার্টির এই 'আশংকা' এখন অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের নিয়ম-কানুনের প্রতি সি-পি-এমের ভক্তি যে অচলা নয়, এ-কথা অনেকেই জানেন। তবু এদেশে যখন পার্লামেন্টারি রাজনীতিই চালু আছে, তখন তার নিয়ম-কানুন মানতে হবে বৈকি? বৃটেন থেকেই আমরা এইসব নিয়ম-কানুন রপ্ত করেছি। বৃটেনে দেখা যায়, প্রায় কখনোই ঠিক পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন হয় না, হয় তার আগেই। সরকার তথা দলের সুবিধে অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেন। ১৯৬৪ সালে শ্রমিক দল জিতলো নির্বাচনে, কিন্তু বছর না ঘুরতেই আবার নির্বাচনের আয়োজন করলেন শ্রমিক সরকার এবং সেই নির্বাচনে শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেল। সুতরাং পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে নির্বাচন ঠিক কখন হবে, তা স্থির করার ভার সরকারের ওপরেই সাধারণতঃ ছেড়ে দিতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী যে লোকসভার নির্বাচন মেয়াদের এক বছর আগেই করলেন এবং কংগ্রেস তাতে বিপুল সাফল্য লাভ করল, তাতে তিনি কোনো সংবিধান-বিরোধী কাজ করেছেন বলে কেউ অভিযোগ করেন নি। আর এখন সরকার যদি চান যে, নির্দিষ্ট সময়েই, অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে কয়েকটি বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে যদি কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক সুবিধে পায়, তবে তাকে কি কোনো দিক দিয়েই অন্যায় কাজ বলা চলে?

আসলে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর নীতির সাফল্য এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের জয়ের ফলে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং এর প্রভাব আগামী নির্বাচনের ফলাফলের ওপর পড়বেই। অনেকে চেষ্টা করছে বটে কিন্তু এই কৃতিত্ব থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে (ফলে তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে) বঞ্চিত করার কোনো উপায়ই আজ নেই। সি-পি-এম বলছে, তারাই গোড়া থেকে বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে আসছে, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার দাবি জানিয়েছে, বরং কংগ্রেস সরকারই এ-ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখায় নি। সেদিন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এক জনসভায় বললেন যে, ২৬শে মার্চ যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হত তবে এত সংকট সৃষ্টি হত না, এক কোটি শরণার্থীও ভারতে আসত না। শুধু ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই কীভাবে শরণার্থীর স্রোত রুদ্ধ হতো সে-কথা প্রমোদবাবু অবশ্য বলেন নি। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য শুনে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে, ২৬শে মার্চ ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারতেন? স্বীকৃতি দেওয়ার আগে তো একটা সরকার গঠিত হওয়া দরকার। ১৭ই এপ্রিলের আগে কি বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল? অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ সংক্রান্ত নীতির সাফল্যের বখরা নিতে গিয়ে কেউ কেউ হিসেবের গোলমাল করে ফেলছেন।

দেশে বিদেশে

লিউইস ক্যারলের আজব দেশের অ্যালিস বলেছিল, 'যতই বদলায়, ততই সবকিছু আগের মতো থাকে।'

যে বছরটা সবে গেল তার প্রথম দিনের সংবাদপত্রের শিরোনামাগুলির দিকে তাকালে অ্যালিসের ঐ কথাই মনে হতে পারে। সেদিন মার্কিন বোমারু বিমানগুলি কাম্বোডিয়ায় কম্যুনিস্ট সৈন্যদের উপর বোমাবর্ষণ করছিল, বছরের শেষে বোমাবর্ষণ চলছিল উত্তর ভিয়েতনামের উপর। এক বছর পার হয়ে এসেও ইন্দোচীনে শান্তির আশা তেমনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত সেদিন সবে নাসেরের উত্তরাধিকারীরূপে মিশরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ১৯৭১এর শেষেও পশ্চিম এশিয়া না-যুদ্ধ-না-শান্তির পরিস্থিতি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মাছ-ধরা রুশ জাহাজ নোঙর করার সুবিধা দিয়ে মরিশাস বুঝি সোভিয়েট রাশিয়াকে ভারত মহাসাগরে ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ করে দিল; এই চিন্তায় সেদিন পশ্চিমী দেশগুলি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সাল যখন শেষ হচ্ছে তখন অ্যাটলান্টিক শক্তিবর্গের চিন্তা, মল্টা থেকে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দিয়ে সে-দেশের প্রধানমন্ত্রী ডম মিন্টফ ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েট নৌবহরের শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ করে দিলেন কিনা। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালের গোড়ার দিনগুলিতে প্রধান আলোচ্য ছিল এই রাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মার্চ মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে কিনা। ১৯৭২ সালের গোড়াতেও পশ্চিমবঙ্গে একই আলোচনা চলবে।

কিন্তু, একথা বুঝতে কোন গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না যে, এইসব ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও ১৯৭২ সাল কখনই ১৯৭১ সালের মতো হবে না। পুরানো কতকগুলি প্রবণতা যেমন ১৯৭১ সাল পার হয়ে ১৯৭২ সালেও চলতে থাকবে, তেমনি কতকগুলি প্রবণতা সদ্যোবিগত বছরে পরিপূর্তি লাভ করেছে, যার ফলে বিশ্ব-রাজনীতিতে ১৯৭১ সাল এনে দিয়েছে গভীর পরিবর্তন। একদিক থেকে দেখতে গেলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব-রাজনীতির যে ধারা চলে আসছিল তার সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের বছর হিসাবে হয়তো ১৯৭১ সালটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জার্মানী, জাপান, চীন, ভারত, ভিয়েতনাম প্রভৃতি যেসব দেশ ২৫ বছর আগেকার যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত অথবা বিভক্ত হয়েছিল, ১৯৭২ সালের বিশ্ব-রাজনীতিতে সেই দেশগুলিই যে বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করবে, বিদায়ী বছরটিতেই সেই লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব-রাজনীতির ভরকেন্দ্র ছিল ইউরোপে অথবা আটলান্টিকে। একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে রাশিয়া অথবা একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে ইউরোপ কিম্বা একদিকে ইউরোপ, অন্যদিকে আমেরিকা, এই ধরনের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই এতদিন বিশ্ব-রাজনীতির ধারণাগুলি আবর্তিত হয়ে এসেছে। ১৯৭১ সাল সেই ধারণাগুলিকে মিথ্যা করে দিয়ে গেল। বিগত বছরে সেই মূলগত পরিবর্তনের স্পষ্টতম প্রতীক হয়ে থাকবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। ইউরোপ-আমেরিকার মোড়ল দেশগুলি বিশ্ব-রাজনীতির যে অংক কষে রেখেছে সেটা যে এশিয়ার মাটিতে আর মিলবে না, বাংলাদেশে তার প্রমাণ হয়ে গেল। বিগত ১৯৭১ সাল এই ধারণাই দৃঢ়মূল করে দিয়ে গেল যে, পরবর্তী বৃহৎ সঙ্ঘাতগুলি ঘটবে এশিয়ায়। এটা অর্থহীন নয় যে, একমাত্র উত্তর আয়ার্ল্যান্ড ছাড়া ইউরোপের অন্য কোথাও যখন গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না, পশ্চিম জার্মানীর ভিলি ব্রান্ট যখন তাঁর পূর্ব রাজনীতির মধ্য দিয়ে ইউরোপ মহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করলেন এবং সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও দক্ষিণ এশিয়ায় অশান্তির আগুনে জ্বলছে এবং পশ্চিম এশিয়া নূতন করে যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিবর্তিত বিশ্ব-রাজনীতিরই অন্য লক্ষণ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পুরানো শত্রুদের সঙ্গে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করছে আর পুরানো মিত্রদের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বৃটেন যখন আমেরিকার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে ইউরোপের আঙিনায় ঢুকছে, আমেরিকা তখন হাত বাড়াচ্ছে চীনের দিকে।

"সবারে করি নমস্কার'—স্বদেশের পথে বাঙলাদেশ শরণার্থী

ভারতের পক্ষে বিদায়ী বছরটা ছিল 'কঠিন চ্যালেঞ্জের এবং বহু অসুবিধা ও দুঃখযন্ত্রণার বছর, আবার সাফল্যেরও বছর।' ১৯৭১ সাল সম্পর্কে ভারত এই বলে গৌরব করতে পারে যে, তার প্রতিবেশী শত্রু যখন তার উপর এক কোটি শরণার্থীর বোঝা ও যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তাকে বিব্রত করার চেষ্টা করেছে তখন সে সার্থকভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে একই সঙ্গে গণতন্ত্রের ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে দাঁড়াবার মতো সাহস ও আদর্শনিষ্ঠা দেখিয়েছে, দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এই উপমহাদেশের বুক থেকে ২৪ বছরের পুরানো পাপ দূর করেছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নিজের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতীয় জাতি আর কখনও এত একতাবদ্ধ হয় নি, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী আগে আর কখনও রণক্ষেত্রে এমন কৃতিত্ব দেখান নি, নেহরুর পর দেশের সরকার আর কখনও দেশের মানুষের এত কাছে আসেন নি। সব মিলিয়ে ১৯৭১ সাল ভারতীয়দের মনে এমন একটা আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে যার আস্বাদ ইতিপূর্বে আর কখনও এ-দেশের মানুষ পায় নি। একই সময়ে পাকিস্তানের দুই অংশের কৃত্রিম বন্ধন চিরকালের জন্য ছিন্ন হয়ে গেছে, পাকিস্তান বলতে যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেখানেও মানুষের বিক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ পাচ্ছে। একটি সফলকাম জাতির নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বছর 'ভারতরত্ন' উপাধি পেলেন সেই বছরেই ইতিহাসের আবর্জনা-স্তূপে নিক্ষিপ্ত হলেন পরাজিত, বিভক্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ, ঘটনার এই যোগাযোগের মধ্যেই সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকবে বিদায়ী বছরটির তাৎপর্য।

১৯৭১ সালের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভারতবর্ষ তার এই সাফল্যের পাশাপাশি একথাও ভুলতে পারবে না যে, বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পরও মুক্তি পেলেন না নূতন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তেমনি ভারতবর্ষকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ১৯৭২ সালে তার জন্য আরও চ্যালেঞ্জ জমা হয়ে আছে। বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ যখন তার সামনে এসেছিল তখন লোকসভার পঞ্চম নির্বাচন সবে শেষ হয়েছে। দারিদ্র্য মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার তখন দেশের মানুষের বিপুল সমর্থনসহ সদ্য-সদ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রতিশ্রুত কাজে হাত দিতে না দিতেই এল বাংলাদেশের প্রশ্ন। সমস্ত হিসাব গোলমাল হয়ে গেল। এর মধ্যেই অবশ্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া হল, প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগসুবিধা লোপ করা হল, সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশ্নটির মোকাবেলা করতে গিয়ে পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হল। আশ্রয়প্রার্থীদের দরুন সরকারের উপর বিরাট ব্যয়ের বোঝা এসে চাপল। তার সঙ্গে যুক্ত হল যুদ্ধের খরচ, যুদ্ধে হতাহত সৈনিকদের পুনর্বাসনের খরচ, বাংলা দেশের উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠাবার ও বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের খরচ। আরও দূরের দিকে তাকিয়ে বৈদেশিক সাহায্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যও ভারতকে তৈরি থাকতে হবে। উৎসবের শেষে যেমন পাওনাদারের বিল এসে গৃহস্থকে বিড়ম্বিত করে, তেমনি ভারতের সামনে এইসব বাড়তি খরচ মেটাবার ও তার মধ্য থেকে চতুর্থ পরিকল্পনায় যতখানি সম্ভব বাঁচাবার দায় আসবে আগামী বছর।

এই সব অস্ত্র ঝিনাইদহের গোপন ঘাঁটি থেকে খুঁজে বের করেছে মুক্তিবাহিনী

বছরের শেষে পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চ-১১৮ কোটি টাকা। ভাড়া ও মাশুল বার্ষিকী পরিকল্পনার যে অন্তর্বর্তী পর্যালোচনা প্রকাশ করেছেন তা থেকে আন্দাজ করা যায়, সামনের বছর ভারতের সামনে দায়িত্বটা কত বড়। এই পর্যালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে যে, বাড়তি ব্যয়ের ফলে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনার অর্থগুলি সব ওলটপালট হয়ে গেছে। পরিকল্পনায় অনুমান করা হয়েছিল যে, উন্নয়নের খাতে ব্যয় করার জন্য চলতি রাজস্ব থেকে ১৬৭ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। সেই অংকটা কমিয়ে এখন ৮০ কোটি টাকায় দাঁড় করান হয়েছে। মূল পরিকল্পনায় অনুমান করা হয়েছিল, ১৯৬৮-৬৯ সালের ভাড়া ও মাশুলের ভিত্তিতে রেলওয়ে থেকে পাঁচ বছরে মোট ২৬৫ কোটি লাভ পাওয়া যাবে। এখনকার সংশোধিত হিসাব হচ্ছে, লাভ হওয়া দূরে থাকুক, লোকসান দাঁড়াবে বাড়িয়েও সবটুকু ঘাটতি পূরণ করা যাবে না।

পরিকল্পনা কমিশনের এই অন্তর্বর্তী পর্যালোচনা প্রকাশিত হতে হতে ঘটনা আরও এগিয়ে গেছে। এই পর্যালোচনায় হিসাব ধরা হয়েছে যে, আশ্রয়প্রার্থীদের বাবদ মোট ১৯০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এখনকার অনুমান, এগুলোতে আরও

বাপ-মা ভাই-বোন রেখে পালিয়ে এসেছিল ছেলেটি। দেশ স্বাধীন হোল। কিন্তু ফিরে গিয়ে সে কি পেল? ঘর-বাড়ীর পাশে পড়ে আছে কয়েকটি নরমুণ্ড।

অন্তত শ'দুয়েক কোটি টাকা যোগ করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ভারতকে মোট কত টাকা খরচ করতে হবে তা এখনও সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না। একটা অনুমান এই যে, সেখানে খাদ্যশস্য পাঠাবার দরুন ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা এবং মেরামত প্রভৃতি বাবদ আরও ৩০০-৪০০ কোটি টাকা দরকার হতে পারে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ খরচ কত তাও এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। দিল্লির প্রতিরক্ষা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ইনস্টিট্যুটের ডিরেকটর কে সুব্রহ্মণ্যমের অনুমান, এই খরচের অঙ্ক ১২০ থেকে ১৩০ কোটি টাকার মতো হবে। আমেরিকা যদি সব রকম সাহায্য বন্ধ করে দেয় তাহলে আরও তিন-চারশো কোটি টাকা ব্যয়ের বোঝা ভারতের উপর এসে চাপবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালু হলে ভারতের কিছু সাশ্রয়ও হবে বলে আশা করা যায়।

যোগবিয়োগের পর ভারতকে মোটের উপর প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত নোট না ছাপিয়ে এই টাকা সংগ্রহ করা যাবে কিনা বল্গাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি না নিয়ে কি পরিমাণ অতিরিক্ত নোট ছাপান যেতে পারে এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়ের পর পরিকল্পনার কতটুকু বাঁচান যেতে পারবে, এই প্রশ্নগুলি আগামী বছর ভারত সরকারকে, বিশেষ করে পরিকল্পনা কমিশনকে ও অর্থমন্ত্রীকে ভাবিত করে তুলবে।

যে বছরটি চলে গেল তার একটি সুলক্ষণ এই যে, খাদ্যশস্যে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা এই বছর অব্যাহত আছে। গম, চাল, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সব কয়টি খাদ্যফসলের উৎপাদনে ভারত এই বছর রেকর্ড করেছে। ওড়িশায় বিধ্বংসী সাইক্লোন, উত্তর ও পূর্ব ভারতে বন্যা এবং যুদ্ধের ফলে সীমান্ত অঞ্চলে চাষবাসের ক্ষতি সত্ত্বেও এই বছর অন্তত ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পিত লক্ষ্য ছিল বছরে ৫ শতাংশ। সেই জায়গায় পরপর দু-বছর উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ৫·২ শতাংশ হারে। আর একটি সুলক্ষণ এই যে, বাজারে চালু টাকার পরিমাণ বাড়া সত্ত্বেও সেই অনুপাতে মূল্যবৃদ্ধি হয় নি। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার পর্যন্ত বাজারে যোগান বেড়েছে ১১·৮ শতাংশ। গতবছর টাকার যোগান বেড়েছিল ১২ শতাংশ। অথচ গতবছর যে জায়গায় বাজার দর বেড়েছিল ৫·৯ শতাংশ সে জায়গায় এই বছর মূল্যবৃদ্ধির হার ৩·৮ শতাংশ। শিল্পের প্রসার অবশ্য আশানুরূপ হয়নি। বছরের প্রথম ছয় মাসে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১·৫ শতাংশ।

•

যে দুইটি খবর আগামী বছরে বিশেষ ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠতে পারে :—

(১) চীনের প্রতিটি শহর, প্রতিটি কমিউন, প্রতিটি কারখানা পারমাণবিক যুদ্ধ ও অন্যান্য ধরনের বোমাবর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চীনের প্রতিটি অঞ্চল স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি কারখানা, বিদ্যালয়, সংস্থা নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপন্ন করে। প্রত্যেক শহরের নিচে রয়েছে আর একটি করে শহর। মাইলের পর মাইল সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সেই মাটির নিচের শহর তৈরী করা হয়েছে। সেখানে জল, ওষুধপত্র, কাপড়চোপড়সহ সবকিছু প্রচুর পরিমাণে জমিয়ে রাখা হয়েছে। মাটির নিচে হাসপাতাল, স্কুল, নার্সারি আছে। আছে কারখানা এবং বিদ্যুৎও। দুই মিনিটের মধ্যে শিশু সমেত ২০ হাজার মানুষকে মাটির গভীর আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। প্রত্যেক বাড়ী থেকে আশ্রয়ে ঢোকার একটা পথ আছে। আর এই আশ্রয় থেকে সুড়ঙ্গ দিয়ে মাটির তলাকার দোকানে ও সম্মেলনকক্ষে যাওয়ার পথ আছে। আর মাটির তলার এই বিরাট জনপদ থেকে গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার জন্য রয়েছে মাইলের পর মাইল সুড়ঙ্গপথ।

এই খবর লেখিকা শ্রীমতী হান সুইন-এর (শ্রীমতী হানের স্বামী একজন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সামরিক অফিসার)।

(২) সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত ও চীনের সীমান্তসংলগ্ন তাজিক সাধারণতন্ত্রের সরকারী সংবাদপত্র 'কম্যুনিস্ট তাজিকিস্তানা' পত্রিকার গত ২৭ অকটোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিধ্বংসী অস্ত্রের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ থেকে জানা গেল, বড় বড় শহর থেকে লোক সরিয়ে নিয়ে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেবার জন্য শহরতলীর কতকগুলি অঞ্চল বাছাই করা হয়েছে। ও যাদের সরিয়ে আনা হবে তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার মতো বাড়ীঘরগুলির সমীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, খাওয়াবার জায়গার পরিকল্পনা করা হয়েছে, গুদামঘর ও চিকিৎসাকেন্দ্রও চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

এই খবর 'ফোরাম ওয়ার্ল্ড ফিচার্সের' ডেভিড রিম-এর।

৩১।১২।৭১ —পুণ্ডরীক

শুধুই খেলা

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

জনগণমন শুরু হতেই কল-টেপা পুতুলের মতন হল্ শুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি জনগণের স্বতঃ উৎসারিত আনুগত্য ও শ্রদ্ধার জ্বলন্ত অভিব্যক্তি! আসলে, প্রায়ান্ধকার হলের দিকে নজর ফেরালেই দেখতে পাওয়া যাবে, সেই ফাঁকে দরজা দিয়ে হুড় হুড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে দর্শকের স্রোত।

কিন্তু দরজা ফাঁকা থাকলেও রো-গুলো ত আর ফাঁকা হয়ে যায়নি, তাই ঠেলে-ঠুলে না বেরিয়ে উপায় কি? পেছন দিয়েই হোক বা সামনে দিয়ে, দাঁড়ানো দর্শকের গা বাঁচিয়ে যাওয়া কঠিন। মালা স্পষ্ট বুঝতে পারল দুটো ছোকরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ইচ্ছে করেই তার বুক ঘসটে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মালা ভেবেছিল বেরিয়েই ট্যাক্সি নেবে। সোজা বাড়ীতে যেতে পারলে আর জ্যাঠামশায়ের পুলিশী জেরার সম্মুখীন হতে হবে না। ভাববেন, সুবোধ বালিকাটির মত ভাইঝিটি তাঁর অফিস থেকে সোজা বাড়ীতে ফিরে এল। মাকে ডেকে বলবেন, বৌমা, মালা [illegible] ওকে খেতে দাও। শুধু রিনিটা আড়[illegible] পেলেই চোখ মটকে মিটিয়ে মিটিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কি রে দিদি, আজ[illegible] দত্তসাহেব পি এ-কে লিফ্‌ট দিতে গিয়ে নিউ আলিপুর না এসে ভুল করে লেকে নিয়ে গিয়েছিল? নইলে তোমার এত দেরি কেন? অফিস ছুটি হয়েছে পাঁচটায়, ট্যাক্সিতে আসতে সাড়ে ছটা পার হয়ে গেল কেন?

কিন্তু যা ভেবেছিল মালা, তা নয়। কলকাতায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকলে হয়ত ভগবানকে পাওয়া যায়, কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। পনেরো মিনিট নিষ্ফল চেষ্টার পর পায়ে পায়ে চলল সে এস-প্ল্যানেডের দিকে। দেখা যাক বাসে উঠতে পারা যায় কিনা। রিটায়ার্ড ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হয়ত একটুখানি কপাল কোঁচকাবেন, শুধু রিনিটাই ঠিক ধরে ফেলবে, নিশ্চয়ই লাঞ্চ টাইমে সটকে পড়ে তুই সিনেমায় গিয়েছিলি দিদি। দত্তসাহেব সঙ্গে ছিল নাকি রে? বলবে আর টিপে টিপে হাসবে। ভীষণ জ্যাঠা মেয়েটা!

একদিন মালা শুধু বলেছিল যে, নতুন জেনারেল ম্যানেজার অরূপ দত্ত একান্তে বলেছে তাকে সিলেকশন গ্রেডে তুলে দেবার জন্য সে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে রেকমেণ্ড করবে। আর বলেছিল, দত্তসাহেব একদিন লিফ্‌ট দেবার জন্য লেকে নিয়ে গিয়ে রেস্টুরেন্টে খাইয়েছে। ব্যস, সেই থেকে দিদির ওপর রিনির শ্যেন দৃষ্টি।

আরেঃ, ওপারের স্টপে কে দাঁড়িয়ে? মৃণাল না? মৃণালই ত। নিশ্চয়ই বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। —ব্যস, আর কিছু মনে রইল না মালার, মনে পড়ল না, সারা দুনিয়াটাই বিস্মৃতির অতলতায় তলিয়ে গেল, যানবাহনের বিপজ্জনক অলিগলি দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এপারে এসে ছুটে গিয়ে মৃণালের হাত ধরে বলে উঠল, হ্যালো মৃণাল!

হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে মালার হাতখানা তুলে প্রায় ঠোঁটেই ছুঁইয়ে ফেলেছিল মৃণাল, সামলে নিয়ে বলল, সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ আফটার এ সেঞ্চুরি, তাই না মালা?

সেজন্য দায়ী তুই, তুই, এ্যাবসলিউটলি তুই, মালা অভিযোগ করল, সে কি আজকের কথা? এটা কি মাস? জুলাই? ঠিক দু বছর হয়ে গেল। দু বছর আগে তোকে নিয়ে গ্লোবে গিয়েছিলাম—

মৃণাল বাধা দিল, কি ছবিই দেখিয়েছিলি, আজও মনে পড়ে। এয়ারকণ্ডিশনেও ঘেমে ঘেমে সারা হয়ে যাচ্ছিলাম—

আর চিমটি কেটে কেটে আমার হাটুর চামড়া তুলে দিচ্ছিলি—

এইঃ, কি যা-তা সব বলছিস, মৃণাল বাধা দিল, কেউ শুনলে কি ভাববে? তার চাইতে চল্, চা খাইগে। যা ভিড়, অন্ততঃ দু ঘণ্টার আগে বাসে ওঠা যাবে না।

ওরা দুটিতে এগিয়ে চলল।

একদা প্রেসিডেন্সী কলেজে ওদের বাংলা গ্রুপটা, না, পুরো গ্রুপটা নয়, গ্রুপের কটা মেয়ে আর কটা ছেলে দারুণ জমিয়ে তুলেছিল। হুল্লোড় করে বেড়াত। মেয়েদের মধ্যে শ্রাবণী, অতসী, বীণা, বাঁশরী আর মালা আর ছেলেদের মধ্যে মৃণাল, সৌমিত্র আর অসিত, বরুণও কিছুটা। অন্যগুলো ছিল সব বুকওয়ার্ম। মেয়েদের মধ্যে লীডার ছিল মালা আর ছেলেদের মধ্যে মৃণাল। ওরা ক্ষেপাত, 'মৃণালের মালা।' ক্ষেপাত বটে, মনে মনে কিন্তু হিংসেও করত। কেন, আমরা কম কিসে?

বি এ পাশ করে আর পড়ল না মৃণাল। বান্ধবীরা যখন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ গিয়ে নতুন জায়গায় নতুন ছেলেদের সংগে নতুন করে আসর জমিয়ে ফেলল, মৃণাল তখন ডবলিউ বি সি এস-এ সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চলে গেল জলপাইগুড়িতে। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার। তারপর মালদহ, মালদহ থেকে কুচবিহারের মাথাভাঙ্গা। তারপর এস ডি ও হয়ে যখন সে মুর্শিদাবাদের লালবাগে এল, তখন তিন বছর পার হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্সীর কথা আর মনে পড়ে না। তখন কলকাতায় আসত মাঝে মাঝে। তখনই একবার হঠাৎ মালার সংগে ইডেন গার্ডেনে দেখা। মালা প্রথমে উল্লাসে লাফিয়ে উঠল, তারপরই অভিমান, দু ফোঁটা জল, তারপর রাগ, বকাবকি, তুই সেন্সলেস, তুই ব্রুট, তুই মার্ডার করতে পারিস, তারপর যখন মৃণালের মৃণালবাহু মালার গলায় মালার মত জড়িয়ে ধরল, তখন পাথর গলল, পাথর তরল হল, তরল খুশীর স্রোতে মৃণালকে ভাসিয়ে দিল, বলল, চল্, গ্লোবে যাই। সেও দু বছর আগেকার কথা।

কেবিনে মুখোমুখি বসে সেই কৈফিয়ৎ-টাই দিচ্ছিল মৃণাল, শোন্ মালা, রাইটার্সে এসেছি মাত্র চার মাস। তুই হয়ত বলবি, ডালহাউসিতেই ত প্লি-বি বাস পাওয়া যায়, নিউ আলীপুর যেতে বিশ মিনিটের বেশী লাগে না। কিন্তু বিশ্বাস কর্, লালবাগের এস ডি ও মানে সাব-ডিভিসনাল গভর্ণর আর রাইটার্সে হোম ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারী নগণ্য—নগণ্য হেয়ার এ্যাসিস্টেন্ট ছাড়া বেশী কিছু নয়—

হেয়ার! চোখ কপালে তুলল মালা।

হ্যাঁ, হেয়ার, মৃণাল বলল, হেয়ার এ্যাসিস্টেন্ট ছাড়া আর কি! এ্যাসিস্টেন্টদের মধ্যে যে হেড, ভারচুয়েলি আমি সেই হেডের ওপরে, অথাৎ হেয়ার—

হি হি করে হেসে উঠল মালা ওর সেই বিশেষ ঢং-এ। মৃণাল অনেক বার আগে দেখেছে। আবারও দেখতে পেল, পাতলা রঙিন দুটি বর্ডারের মাঝখানে সাজানো দু সারি বেলফুলের কুঁড়ি আর ব্রেসিয়ারের থর থর কাঁপুনি। যখনই হাসবে, তখনই এমনি। ও কি ইচ্ছে করেই ঢিলে ব্রেসিয়ার পরে নাকি? লেটেস্ট ফ্যাশন? না ইলাসটি-সিটি কমে গেছে? মৃণাল ভাবল, মধুমিতাও ত ভীষণ খিলখিল করে হাসে, কিন্তু কই, তার বুকে ত ভূমিকম্প দেখা যায় না।

মৃণাল ওর সরু সরু আঙুলের ওপর চামচে দিয়ে আস্তে আঘাত করতে করতে বলল, বিশ্বাস কর্ মালা, আপন গড, চিঠি না লিখলে কি হয়, সব সময় তোদের কথা মনে হয় আর মনে পড়ে ফেলে-আসা সেই সব দিনের কথা—বিশেষ করে তুই ত আমার সারা মন দখল করে বসে আছিস।

এক টুকরো ফিস ফ্রাই ঠোঁট বাঁচিয়ে দাঁত দিয়ে মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে মালা বলে উঠল, সত্যি, যা সব কাণ্ড করতিস না যে, জেলাসিতে মরে যেত শ্রাবণী বাঁশরীরা। কেন, বজবজের সেই পিকনিকের কথা মনে নেই? জলের ধারে বালির ওপর এলিয়ে পড়ে আমাদের গল্প করতে দেখে বাঁশরীর কি রাগ, বলে বসল, পারব না আমি একা একা খিচুড়ি রাঁধতে, আর বীণাটা গোঁজ হয়ে বসে রইল, আর অতসী দাঁতে দাঁত চেপে কি ভালগার মন্তব্য করেছিল, মনে আছে? তোদের দুটো বালিশ যোগাড় করে দোব নাকি রে? আর একখানা ফুল-কাটা চাদর?

আবার সেই হাসির গমক, সেই বেল-কুঁড়ির সারি আর বুকের ভূমিকম্প। আবার মনে পড়ল মধুমিতার হাসির কথা। উঃ, কতদিন সে হাসি শুনতে পায় না মৃণাল। বাপের সংগে বেড়াতে গিয়ে নিউ ইয়র্ক কি ভালই যে লেগে গেছে, বাপ চলে এল অথচ শ্রীমতীর দেখা নেই আজ প্রায় আট মাস। লিখেছে পিসেমশাই ছাড়ছে না। সেও তিন মাস আগে। তারপর একেবারে চুপ। চিঠি লিখলেও জবাব দেয় না। নিশ্চয়ই মধুমিতা ইয়াঙ্কী বয় ফ্রেন্ডদের অঞ্জলা ভরে মধু বিতরণ করছে। যখন ফিরে আসবে, আদৌ যদি আসে, হয়ত ডিক, হ্যারী বা জোন্সদের কাউকে সংগে নিয়ে আসবে। অখ্যাত পশ্চিমবঙ্গের অজ্ঞাত এক ডবলিউ বি সি এস-এর দিকে ফিরেও চাইবে না। ওর নাম আমেরিকা!

ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বার করে ঠোঁটের কোণে বোলাতে বোলাতে মালা জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছিস রে?

মিছে কথা বলল মৃণাল, ভাবছি আমাদের প্রেসিডেন্সীর সেই মেয়েগুলো সব কোথায় ছিটকে চলে গেল, সেই শ্রাবণী, অতসী, বাঁশরী, বীণা—

আছে, সবাই আছে, তবে যা বলেছিস, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

জানিস ওদের খবর?

জানি, মালা জবাব দিল, তবে ভাল নয় খবরগুলো—

হোক না খারাপ, মৃণাল উৎসাহিত হয়ে উঠল, বল্ না, শুনি।

শোন্ তবে।

তারপর ফ্ল্যাশব্যাক শুরু করল মালা।

ভালই লেখাপড়া চালাচ্ছিল অতসী। সর্টহ্যাণ্ড শিখেছিল বলে প্রফেসরদের একটি কথাও বাদ পড়ত না। শর্টহ্যাণ্ডে টুকে নিয়ে যেত, তারপর বাড়ীতে বসে পরিপাটি করে নোট লিখে এনে আমাদের দেখাত। দেখাতই শুধু, দিত না কাউকে। পাছে অপরে মূল্যবান নোট পড়ে ওর ওপরে উঠে যায়।

হঠাৎ বীণা একদিন দেখতে পেল, লাইটহাউস থেকে একসংগে বেরিয়ে আসছে অতসী আর প্রফেসর পাকড়াশী। তখন ওখানে চলছিল মারাত্মক একখানা ছবি। নায়িকা এলিজাবেথ টেলর, সম্পূর্ণ ন্যাড হতে যার জুড়ী নেই। নায়কের সংগে যার ল্যাসিভিয়াস দৃশ্য অগুন্তি। ছবিখানার নাম, দি ইটার্নেল পেল। এই সনাতন খেলার ন্যাড পিকচার দেখতে শিক্ষক ও ছাত্রী একসংগে?

ফলে, যা হবার, তাই হল। নিজেরাই মেতে উঠল সেই চরম খেলায়। হোক না পাকড়াশীর বয়স পঞ্চান্ন আর অতসী মাত্র তেইশ, খেলা খেলাই। সেই আগুনে খেলায় একবার মেতে উঠলে ছাই হয়ে যাবার আগে আর বিরতি কোথায়?

তাই লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে একদিন অতসী সেন অতসী পাকড়াশী হয়ে গেল। কিউপিড ইজ ব্লাইন্ড। এখন সে পাকড়াশী বংশবৃদ্ধির পবিত্র কর্তব্য চরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। তিন বছরে তিনটে, আবার হবে শোনা যাচ্ছে। অন্ততঃ বাঁশরী তাই লিখেছে মালাকে।

মালা হেসে বলল, বাঁশরী নিজেই বা কি!

বড়লোকের মেয়ে। বাবা এ্যাটর্নী। খানতিনেক বাড়ী। দুখানা গাড়ী। বড়লোকের মেয়েদের প্রায়ই যেমন শখ হয়, বাঁশরীরও তেমনি গীটার শেখার শখ হল। সাউথ এন্ড পার্ক থেকে প্রতি রবিবার আসত বসন্ত রায় রোডে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে। আরও কটি মেয়ে আসত। শনিবার পুরুষদের ক্লাশ, রবিবার মেয়েদের।

এক রবিবারে ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর এক বন্ধু এলেন। ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন, দেবকুমার সেন, ফিল্ম প্রডিউসার। চা খেলেন, পাইপ দাঁতে চেপে ধরে গম্ভীর গলায় দু-চারটে কথা বললেন। নিস্পৃহ ভাব, যেন নেহাৎ ভদ্রতা রক্ষার জন্যই কলারলেস, ওভারলেস, এমন কি ইউজলেস দু-চারটে কথা। তবে যাবার আগে মোটা কাঁচের আড়াল থেকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেন মেয়েদের মুখে মুখে।

পরের রবিবার আবার এলেন দেবকুমার। এবার আর দু-চারটে কথা নয়। বেশ খানিকক্ষণ বসে ধোঁয়া ছাড়লেন আর গল্প করলেন, গল্প করলেন আর ধোঁয়া ছাড়লেন। এবার কাঁচের আড়াল থেকে জরিপী চোখের ফোকাস পড়ল মেয়েদের ফিগারে, মেয়েদের ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস-এ। বাঁশরীর সঙ্গে ত হাসাহাসিই করলেন খানিকটা।

আবার পরের রবিবার। এবার রইলেন অনেকক্ষণ। অন্য সবাই চলে গেলেও বাঁশরীকে ছাড়লেন না দেবকুমার। তাঁর আগামী ছবিতে হিরোইন করবার প্রস্তাব করলেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, অদ্ভুত তোমার ফটোজেনিক ফেস, আর ফিগার? একেবারে পারফেক্ট। প্রথম ছবিতেই তোমায় দশ হাজার দোব। বাঁশরী প্রথমটা হকচকিয়ে গেল, তারপর ভাবনা হল, তারপর বিস্ময়, তারপর খুশী-খুশী ভাব, তারপর একেবারে উৎফুল্ল, মন নেচে উঠল, চোখ নেচে উঠল, বলল, আমাদের বাড়ীতে যাবেন।

ওদের বাড়ী প্রগতির পীঠভূমি বলা যায়। সিনেমায় নামাও যেন প্রগতির চড়াই পথে একটি পদক্ষেপ! কিন্তু সোনামুঠো যাদের কাছে ধুলিমুঠোর মত, তাদের আবার টাকার দরকার কি? সিনেমাতে অভিনয় করে পারিশ্রমিক নেয়া ওদের উগ্র আভিজাত্যে বেমানান। তাই বাবা মা এক কথায় রাজী হয়ে বললেন, টাকা দিতে হবে না।

চিরাচরিত স্টাইলমত বাঁশরী চৌধুরীর ফিল্মের নামকরণ হল মঞ্জুলিকা চৌধুরী।

মঞ্জুলিকা চৌধুরী (এ্যামেচার) প্রথম ছবিতেই বাজার মাৎ করে দিল।

তারপর আবার ছবি। আবার ছবি। ছবির পর ছবি। রূপ ও অভিনয়ের জৌলুষে, বিশেষ করে যৌন আবেদনময় ভূমিকায় নায়িকা মঞ্জু হিন্দি ছবির নায়িকাদের শতেক যোজন পেছনে ফেলে অতি দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষ শিখরে উঠে গেল।

অর্থাৎ শুরু হয়ে গেল সেই সনাতন খেলা। বছর তিনেক যেতে না যেতেই সেই চরম খেলা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সে এখন আর এ্যামেচার নয়, প্রচুর টাকা রোজগার করছে, বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, থাকে লাউডন স্ট্রীটের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে, শুধু দেবকুমার কেন, পেগ ও চিকেন রোস্টে নৈশ আসর জমিয়ে তোলার জন্য অনেক কুমারই তার সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে থাকে। বার্থ ডে সেলিব্রেশনে মালাদের আমন্ত্রণ জানায়। মালা যায় না।

আর অতসী ত তাদের পাড়ার হেলেন অব ট্রয় হয়ে ছিল বলা যায়। তার প্রধান কারণ, অতসী হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে, যে সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত যত পুরুষ দেখতে পায়, সবাইকেই তার ভাল লাগে। বিশেষ করে চোঙ্গা প্যান্ট, ছুঁচলো জুতো, টি সার্ট, লম্বা জুলপী আর শ্যাম্পু-করা চুলওয়ালা ছোকরাদের দেখতে পেলেই যেন ডগমগিয়ে উঠত অতসী। হাতছানির আর অপেক্ষা করত না, নিজেই আগ বাড়িয়ে সূচনা করত কখনো চাউনীতে, কখনো টেপা হাসিতে, কখনো যুবতী শরীরে অজন্তার নানারকম জলছবি ফুটিয়ে তুলে।

বেলেঘাটায় পাশাপাশি দুটি পাড়া, রায়বাগান আর গোঁসাইপাড়া, মাঝের রাস্তায় অতসীদের বাড়ী। নো ম্যানস ল্যান্ডের মত। কিন্তু মানলে ত সেই নো ম্যানস ল্যান্ডের নিরপেক্ষতা? অতসীর ইটার্নেল খেলার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারবে কেন রায়বাগান ও গোঁসাইপাড়ার অগণিত ডন জুয়ানরা? দলে দলে এগিয়ে এল তারা। শুরু হয়ে গেল অতসীকে বাগে এনে পাইথনের মত গ্রাস করার রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে রায়বাগানের প্রিয়ঙ্কর আর গোঁসাইপাড়ার সলিল বেশ ভাল রকম জমিয়ে ফেলল। প্রিয়ঙ্করের সঙ্গে পার্ক গ্রীলে চাউমিন খেয়ে সে সলিলের সঙ্গে যেত লাইট হাউসে। লেকের অন্ধকারে ট্যাক্সির নিরালা বিবরে একজনের সঙ্গে মত্ত খেলার পর আরেকজনকে চুপি চুপি অভ্যর্থনা জানাত গভীর রাত্রে একেবারে শয়নকক্ষে।

অথচ প্রিয়ঙ্কর জানত না সলিলের কথা, সলিলও জানত না প্রিয়ঙ্করের।

অতসীর পক্ষে যখন আর এই গুপ্ত খেলার মারাত্মক পরিণতি চেপে রাখা সম্ভব হল না, বৌদিরা ধরে ফেলল, তারা জানাল মাকে, মা জানাল বাবাকে, বাড়ীসুদ্ধ সবাই নানা প্রশ্নে অতসীকে জর্জরিত করে তুলল, ঘনায়মান বিপদে হকচকিয়ে গিয়ে তখন সে স্বীকার করল সব কথা, তখনই প্রথম পরিচয় হল দুই বার্গলারের। পারস্পরিক দোষারোপ, বচসা, বিবাদ এবং হাতাহাতির পর মারমুখী হয়ে বেরিয়ে এল দুই পাড়ার মস্তানরা। রায়বাগানের হাতে পাইপ গান, গোঁসাইপাড়ার হাতে হ্যান্ড গ্রেনেড। শুরু হয়ে গেল সেকেন্ড ট্রোজান ওয়ার। অতসীদের বাড়ীর রাস্তা নো ম্যানস

ল্যান্ডের ওপর দিয়ে সাত-সাতটা লাশের রক্ত গলগল করে বয়ে চলল।

তারপরও এক আশ্চর্য খেলা খেলল অতসী। আর বেলেঘাটা নয়, প্রিয়ংকর বা সলিল কেউ নয়, নারকেলডাঙ্গার অতুল বসাক নামে একটি ছেলের সংগে অকস্মাৎ একদিন সে উধাও হয়ে গেল। অতুল নাকি ওর দূরসম্পর্কীয় মামা হয়।

মাস ছয়েক পর বাবাকে লিখেছে বোম্বে থেকে, কন্যাসহ ওরা দুজন সুখেই আছে। ওর জন্য অনর্থক যেন দুশ্চিন্তা না করা হয়।

আর শ্রাবণীটা? শ্রাবণীটা আরও ধুরন্ধর, মালা বলতে লাগল, যার সংগেই দেখেছি ওকে, মনে হয়েছে সে-ই বুঝি ওর ফেবারিট ম্যান। কিন্তু একজনকে দু'বার দেখিনি। নিত্য নতুন। যাকেই ধরবে, তাকেই তাতিয়ে তুলবে, মাতিয়ে তুলবে তারপর সীমান্তরেখায় টেনে নিয়ে এসে বলবে, দিস ফার এ্যান্ড নো ফারদার। যাকে বলে প্রেম-প্রেম খেলা। একটু পর বলল, আমার এসব ভাল লাগে না মৃণাল। মালা গম্ভীর হল।

রেস্টরেন্ট থেকে বেরিয়ে ওরা ধীরে ধীরে ফারপোর দিকে এগিয়ে চলল।

এক সময় মৃণাল জিজ্ঞেস করল, বন্ধুদের ইটার্নেল প্লের গল্প ত শুনলাম, কিন্তু তোর নিজের খবর কি?

আমার? বলে কি ভাবল মালা, তারপর গাঢ় স্বরে বলল, ওসব খেলা আমার জন্য নয় রে। ভালবাসার ব্যাপারে আমি সিরিয়াস—

তা ত বুঝতে পারছি, মৃণাল হালকা করে বলল, কিন্তু সখী, মেঘে মেঘে বে মন্দ বেলা হয়নি। তুই আমার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট একদিন প্রেসিডেন্সীতে পড়েছিলি, মনে পড়ে? তাহলে এখন তুই টোয়েন্টিসিকস। এমনি বাউন্ডুলে হয়ে আর কত কাল ঘুরবি রে? বন্ধুদের মত ইটার্নেল খেলায় মত্ত হতে না চাইলেও কাউকে ভালবাসতে দোষ কি?

যদি বলি তোকে ভালবাসি? মালা ফস্ করে প্রশ্ন করে বসল।

চট্ করে জবাব দিল মৃণাল, সরি ম্যাডাম, আই এ্যাম অলরেডি বুকড।

না মৃণাল, সত্যি বলছি, মালা সিরিয়াস হয়ে বলল, তোকে বলতে বাধা কি, আমাদের নতুন জেনারেল ম্যানেজার অরূপ দত্ত সত্যিই যেমন সফিষ্টিকেটেড, তেমনি ওর পার্সোনালিটি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ও কোম্পানীর ওয়ান অব দি পিলার্স হয়ে গেছে—

তবে আর কি, মৃণাল সোৎসাহে বলে উঠল, বল্ তবে কবে পাব সেই লাল কালিতে ছাপানো হলুদ-লাগানো সুন্দর কার্ডখানা, আগামী ১২ই ফাল্গুন শ্রীমান অরূপ দত্তের সহিত—

মালা বলল, কিন্তু আমার জ্যাঠামশাই রেগে আগুন—

জ্যাঠামশাই, মৃণালের কন্ঠে ভয়, মানে দ্যাট রিটায়ার্ড ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ?

হ্যাঁ—

ওরে ব্বাবা, তাঁর চেহারা মনে পড়লেই আমার বুক কাঁপে। কিন্তু কারণ কি রে মালা?

কারণ? মালা জবাব দিল, কারণ অরূপ হচ্ছে দত্ত আর মালা হচ্ছে মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় কখনও দত্ত হতে পারে না—

তাই বুঝি যোগিনী হয়েই আছিস?

যা বলিস্। মালার স্বর কেঁপে উঠল।

আর কিছু কথা হল না। ওদের কথা যেন সহসা ফুরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নীরবে চলবার পর হঠাৎ লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে একখানা ট্যাক্সি পেয়ে গেল মালা। দরজায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, সো হোয়েন নেক্সট উড উই মিট এ্যান্ড হোয়ার?

মৃণাল বলল, আগামী রবিবার বিকেল ছটায় ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচুর কাছে। রাইট?

রাইট। হাত নেড়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল মালা। ট্যাক্সি হুস্ করে বেরিয়ে গেল।

অপস্রিয়মান নাম্বার প্লেটের দিকে তাকিয়ে মৃণাল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ মনে হল, এই জনবহুল শহরে সে একেবারে নিঃসঙ্গ একা, আর একা ঐ মেয়েটাও।

বাড়ীতে ফিরেতে রাত আটটা হয়ে গেল মালার।

নতুন রাঁধুনী সুখদা রান্না করছিল, মা দরজার বাইরে মোড়ায় বসে তদারক করছিলেন, মালা তাঁর পেছন দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাবার সময় মা মুখ ঘুরিয়ে একবারটি দেখলেন শুধু, কিছুই বললেন না। মা অবশ্য চিরদিনই কম কথা বলেন। বিশেষ করে বাস এ্যাকসিডেন্টে বাবার শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে যেন আরও চুপ হয়ে গেছেন।

ঘরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই জ্যাঠামশায়ের জলদগম্ভীর কন্ঠ শোনা গেল, বৌমা, টিনি এল কি? তাহলে একবার পাঠিয়ে দাও।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে এলেও ঠিক শুনতে পায় বুড়ো। না কি গন্ধ পায়? ব্যাগটা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আঁচলটা টেনে-টুনে ব্লাউজের ডিপ গলা ভাল করে ঢেকে ঢুকে ধীরে ধীরে ওঘরে গিয়ে প্রবেশ করল মালা জ্যাঠামশাই, আমায় ডাকছ?

গড়গড়ার নলটা নামিয়ে আপাদমস্তকটা একবার দেখে নিলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কটা বেজেছে?

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে মালা জবাব দিল, আটটা বাজতে তিন মিনিট বাকি।

এত রাত অবধি তোদের অফিস চলে।

না জ্যাঠামশাই অফিস কোথায়, মালা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, তারপর বানিয়ে বানিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল, সোমবারটা একটু দেরীতেই ছাড়া পাই। ডাক বেশী থাকে কিনা তাই ম্যানেজার অনেকগুলো চিঠির উত্তর ডিকটেট করেন আর শুরু করেন সাড়ে চারটের পর। আজ বেরোতে প্রায় সাড়ে ছটা হয়ে গেল। এসপ্ল্যানেডে এসে দেখি ট্র্যাফিক জ্যাম। একটি লরী আর ট্যাক্সিতে কলিশন হয়েছে, দুটোই রাস্তার মাঝখানে অচল হয়ে পড়ে আছে, লরীর কারুর কিছু হয়নি ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাত অনেকখানি কেটে গেছে ফ্রন্ট প্লাস ভেঙে, রক্ত দেখে বহু লোক ছুটে এসেছে, লরী ড্রাইভারকে টেনে নামিয়ে পিটন দেবে, পুলিশ সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সব গাড়ী থেমে গেছে, বাস, লরী ট্যাক্সি টেম্পো রিকসা ঠেলা—পুরো একটি ঘন্টা লাগল জ্যাঠামশাই, সেই জ্যাম ক্লিয়ার হতে।

সবাই থাকে সোমবারের অফিসে, যতক্ষণ না তোদের সেই ম্যানেজার, মানে সেই অরূপ না স্বরূপ দত্ত চলে যায়?

নাও, শুরু হল এবার পুলিশ সাহেবের জেরা। বাঘ বুড়ো হলেও থাবল মারতে ভোলে না। রিটায়ার করলে কি হবে, এখনও বুড়ো মনে মনে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ! মালা সহজ করেই বলতে চেষ্টা করল, না, না সবাই থাকবে কেন সবাই ত আর দত্তসাহেবের পি এ নয়, শর্ট হ্যান্ড ওরা জানবে কোত্থেকে? শর্টহ্যান্ডে ডিকটেশন নিয়ে পড়ে শোনাতে হয়, উনি আবার কিছু কিছু বদলে দেন, তারপর টাইপ করে নিয়ে যাই—

তা শ্রীমান্ সাড়ে চারটের পর ডিকটেশন দেয়া শুরু করে কেন? তিনটেতে নয় কেন?

মালা এ প্রশ্নের জবাব দেবে কি করে? যে ডিকটেশন দেয়, তাকে জিজ্ঞেস করলেই ত হয়। মালা সহসা কি বলবে ভেবে পেল না।

জ্যাঠামশাই ডকলেন, টিনি! তারপর গুড়ুক গুড়ুক করে বার কতক গড়গড়া টেনে প্রচুর ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর সোজা তাকিয়ে বললেন, আগেও বলেছি তোকে আবারও বলছি ঐ স্বরূপ না অরূপ দত্ত সম্বন্ধে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে, ঝেড়ে ফেলে দাও, কুলীন মুখোপাধ্যায় কখনও মাথা মুড়িয়ে দত্ত হতে পারে না। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে নয়। আমি চলে গেলে তোরা মুচি-মুদ্দফরাস যাকে খুসী তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসিস, আমি দেখতে যাব না। বুঝলি টিনি?

জবাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল মালা, সোজা তাকিয়েছিল জ্যাঠামশায়ের চোখের

দিকে, কিন্তু পরক্ষণেই বুক কেঁপে উঠল মুখ নীচু করল সে। কৌলীন্যের গর্বে গর্বিত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জলদ-গম্ভীর স্বরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ছোকরা যদি বেশী ফর ফর করে তাহলে ওকে আমি এ্যাবডাকশন চার্জে পুলিশ দিয়ে এ্যারেস্ট করিয়ে দোব।—যা হাত-মুখ ধোগে যা।

আড়াল থেকে রিনি সব শুনেছিল। মালা যেতেই জড়িয়ে ধরল, ফিসফিস করে বলল কিচ্ছু শুনবিনি দিদিভাই। বামনত্ব নিয়ে উনি থাকুন, তুই যাকে খুশী তাকে বিয়ে করিস। রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সোজা চলে আসবি দুজনে, বলবি আমরা বিয়ে করেছি দেখি বুড়ো তখন কি করে। মাকে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি বুড়োকেও আমিই সাফ কথা বলে দোব। কিচ্ছু ভাবিসনি তুই।

এল সেই রবিবার। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। মাজল ছুটা।

ভিকটোরিয়ার স্ট্যাচুর কাছে দাঁড়িয়ে মৃণাল শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিতেই একটা ট্যাকসি এসে কাছে দাঁড়াল। এক মুঠো ফুলেল হাওয়ার মত নেমে এল মালা, হ্যালো মৃণাল।

হ্যালো। সো পাঙ্কচুয়েল ইউ আর?

ডবলিউ বি সি এস-এর কাছে পাঙ্ক-চুয়েল না হলে রক্ষে আছে? মালা হেসে জবাব দিল, লেট হলে হয়ত আমার চাকরিটাই খেয়ে ফেলবি।

মৃণাল ফিসফিস করে বলল, আজ তোকেই খেয়ে ফেলব।

গলা দিয়ে নামবে না এত বড় শরীর গলা চোকড হয়ে মারা পড়বি। বলেই মালা হি হি করে হেসে উঠল।

ওরা মেমোরিয়ালের কম্পাউন্ডে ঢুকল।

থমকে দাঁড়াল মালা, না রে, এখানে কোথাও বসবার জায়গা নেই। দেখছিস কি ভিড়।

ঠিকই বলেছে মালা। মৃণাল চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। মেয়েপুরুষ বুড়ো-বুড়ী, আন্ডাবাচ্চা আর তাদেরই মত যুবক-যুবতী চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। বেঞ্চ খালি নেই একটিও, ঝিলের চারিদিকে মানুষ গিজগিজ করছে, সবুজ মাঠের সর্বত্র যেন হাট বসে গেছে।

এক কাজ করবি? মালা বলল, চল্, গঙ্গার ধারে যাই।

সেখানেই কি ফাঁকা পাবি?

আনইউজুয়েল জায়গা খুঁজে বার করব, মালা বলল, হোয়ার ডেভিলস ড্রেড টু ট্রেড।

ওদের ভাগ্য ভাল, সত্যিই পাওয়া গেল তেমনি জায়গা। ট্যাকসি ছেড়ে দিয়ে ওরা ঘাসের ওপর বসল। কাছে-পিঠে কেউ নেই। দূরে থেমে আছে খান দুই জাহাজ আর নদীতে দুচারটে লঞ্চ আর নৌকোর আনাগোনা। পশ্চিমের আকাশ সূর্যাস্তের পরও লাল হয়ে রয়েছে। সেই লাল রং জাহাজের মাস্তুলে, নদীর জলে আর খানিকটে মালার সিল্কের সাড়ীতে।

একটু পর মৃণাল ডাকল, মালা!

উঁ।

তুই আজ যা সেজেছিস না, দেখলে মনে হয়, শ্রীরাধিকা যেন অভিসারে বেরিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে—

ভাবছিস সেই কেষ্ট ঠাকুরটি ডবলিউ, বি সি এস, মালা ঠোঁট টিপে হাসল আর সে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হোম ডিপার্ট-মেন্টের আন্ডার—থুড়ি, না না—হেয়ার এ্যাসিস্টেন্ট বলেই হি হি করে হেসে উঠল মালা। মৃণাল দেখল, সেই বেলফুলের কুঁড়ি, সেই বুকের ভূমিকম্প। এত পাতলা সিল্ক, তাই এত ফুসফুসে যে নদীর ধারের এলোমেলো হাওয়ায় সামলে রাখাই দায়। শান্তভাবে কাঁধের ওপর রাখা যায় না; আঁচলটা নিশানের মত মাঝে মাঝে উড়ে ওঠে, তারপর ঝপ করে পড়ে যায় স্লিপ করে, যেন কেউ একটানে নামিয়ে দিয়েছে পাতলা ব্লাউজের নীচে ব্রেসিয়ার স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, ডিপ গলা হয়ে যায় বে-আব্রু। আর যদি গায়ের ওপর টান টান করে জড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে বাতাসের ঝাপটায় ঝাপটায় শরীরের খাঁজে খাঁজে সেঁটে সেঁটে যায় জলে ভেজা কাপড়ের মত।

মৃণাল কিছুক্ষণ সেই পাগলা হাওয়ার দৌরাত্ম্য উপভোগ করল তারপর ডাকল, মালা!

উঁ।

কথা বলছিস না যে? পুরো তিনটি বছর যার মুখে খৈ ফুটত, এই সেদিনও রেস্টুরেন্টে যে কথার তুবড়ি ছুটিয়েছে, আজ সে এত নীরব কেন?

মিথ্যে বলিসনি মৃণাল, মালা ওর হাতের ওপর হাত রাখল এমনি জায়গায় এমনি পরিবেশে কথার কলটা যেন বন্ধ হয়ে যায়, ইচ্ছে করে চুপটি করে এমনি বসে থাকতে।

ওর হাতখানা তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল মৃণাল, তারপর বলল, তোর আঙুলগুলোর সাইজ এ্যান্ড ফরমেশন আগেরই মত চমৎকার আছে, সেই ভেলভেট স্কিন, মনে হয় মোম দিয়ে মাজা দেয়া, হাতের তালু কি লাল, মনে হচ্ছে রক্ত ফেটে বেরিয়ে পড়বে—

যাঃ, হাত টেনে নিল মালা, ফ্ল্যাটারি করতে হবে না। এর পর হয়ত বলবি, তোর এটা সুন্দর, ওটা সুন্দর, তোর বেণীটা গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করছে—

বালাই ষাট! মৃণাল বাধা দিল, মরব কেন রে? আর যদি সুইসাইডই করি, তাহলে একখানা চিরকুটে লিখে রেখে যাব, আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী অরূপ দত্তের পি-এ মালা মুখোপাধ্যায়। তোর ফাঁসি হবে।

ভাবছিস ফাঁসি হলে নরকে গিয়ে তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে?

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় আঁচলটা পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি তুলে নিতে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল মালা। মৃণাল বলল, আমি যদি ফিল্ম প্রডিউসার দেবকুমার সেন হতাম, তাহলে বাঁশরীর মত তোকেও বলতাম, পারফেক্ট ফিগার।

এক চাঁটি মারব। বলে সত্যিই মালা মৃণালের গালে আস্তে ঘা মারল।

একটা সিগারেট ধরাল মৃণাল। আয়েশ করে বার কয়েক ধোঁয়া ছাড়ল। পশ্চিম আকাশের লাল রং নিভে আসছে। থেমে-থাকা জাহাজগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। চিমনির মাথায় লাল আলোটা ঝক ঝক করছে। নৌকোর মানুষগুলো আবছা হয়ে আসছে। মৃণাল ডাকল, টিনি।

উঁ।

কাছে-পিঠে ত কেউ নেই, মৃণাল বলল, আমি যদি তোর কোলে মাথা রেখে শুই, রাগ করবি টিনি?

করতাম, যদি তোর চুল তেল চিটচিটে হত, মালা হেসে বলল, শ্যাম্পু-করা চুলে আপত্তি নেই।

পা ছড়িয়ে বসল মালা, মৃণাল ওর কোলে মাথা রেখে চিৎ হয়ে টান টান হয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

তোর মধুমিতার খবর কি রে মৃণাল? মালা জিজ্ঞেস করল।

মধুমিতা এখন নিউইয়র্কের ডন জুয়ান-দের মধু বিতরণে ব্যস্ত—

যাঃ।

আপন গড! মৃণাল বলল, আমার এক কলিগের মামা ওখানে চাকরি করেন। বন্ধুটি গিয়েছিল বেড়াতে। বলে দিয়েছিলাম ওকে। নিজে দেখা করতে পারে নি বটে, দুদুবার গিয়ে ঘুরে এসেছে, মধুমিতা বাড়ীতে ছিল না। কিন্তু ল্যান্ডলেডির কাছ থেকে ও যা তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে না, হরিবল। পরশু ফিরেছে, কালই গিয়ে-ছিলাম বন্ধুর বাড়ীতে। বলল যে, প্রত্যেক সন্ধ্যায় ওর কাছে দলে দলে পুরুষ এসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মারে, সবাই আবার চলে যায় কিনা, সন্দেহ আছে। ল্যান্ডলেডি জিজ্ঞেস করেছিল একদিন, বলেছে এক শিপিং কোম্পানীতে ও চাকরি নিয়েছে ওরা সব সেই কোম্পানীর স্টাফ, গল্প করতে আসে।

ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে গাঢ় স্বরে মালা বলল, সত্যি তোর জন্য আমার কষ্ট হয় মৃণাল।

মালার হাতখানা গালে চেপে ধরে মৃণাল বলল, আমারও হয় তোর জন্য। বিশ্বাস কর—

কেন হয়?

ছাব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল তোর. চাকরি করে যা পাস, ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে তোর, মৃণালের কণ্ঠে সমবেদনা. অথচ বিয়ে করবার স্বাধীনতা নেই, মুদগর হাতে বসে রয়েছে রিটায়ার্ড ডেপুটি কমিশনার।

মালা মৃদু স্বরে বলল, সে যে দত্ত, কায়স্থ আর আমি মুখোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ. কুলে, শীলে, বর্ণে—রূপে, রসে গন্ধে স্বাদে একেবারে অতুলনীয়া। আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস মালা, মৃণালের কণ্ঠে ক্রোধের উত্তাপ, গিয়ে তোর জ্যাঠামশাইকে বলি, মুখোপাধ্যায়কে দত্ত হতে দিতে যদি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, বেশ, দিন, তাহলে তাকে বন্দ্যোপাধ্যায় হতে দিন—

মাইরি! সত্যি বলছিস? হি হি করে হাসতে গিয়েই থেমে গেল মালা, কথা হারিয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে রইল, জাহাজগুলো সব ময়ূরপঙ্খি নৌকো হয়ে গেল, নৌকো-গুলো সব পানসি, মাস্তুলে মাস্তুলে আলোর মালা—এক মুহূর্ত, তারপর সেই ঝুঁকে, অনেকখানি ঝুঁকে মৃণালের মুখ-খানা ভাল করে দেখতে গেল, অমনি এক ঝলক দুষ্টু হাওয়া ছুটে এসে সিল্কের আঁচলটা উড়িয়ে মৃণালের মুখের ওপর ফেলে দিল।

সেই শাড়ী-ঢাকা মুখখানাই মালা দু' হাতে বুকে চেপে ধরল।

তারপর আর বাধা কোথায়?

মন যখন জানাজানি হয়ে গেল, রক্তচক্ষু ডেপুটি কমিশনারের বংশমর্যাদার পালিশে যখন আর দাগ লাগবার বিন্দুমাত্র আশংকা রইল না, তখন বেলফুলের কুঁড়ি আর রোসিয়ারের ভূমিকম্পের মত ছোট ছোট কেয়ারিগুলি উল্লম্ফনে পার হয়ে একেবারে কুঞ্জবনে প্রবেশের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ!

যেন অমৃতের আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে দুই মেরু থেকে যাত্রা করেছিল একটি পুরুষ ও একটি নারী। কণ্টকাকীর্ণ চড়াই উৎরাই পথে আকাশ গর্জন করে উঠেছিল, সর্বাঙ্গ জর্জর করে দিচ্ছিল মুষলধার বর্ষণের অগণিত সুতীক্ষ্ম শায়ক, ঝঞ্ঝার নির্মম আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল প্রতিটি পদক্ষেপ, অমাবস্যার নিঃসীম অন্ধকার সম্মুখে তুলে ধরেছিল কালো দুরতিক্রম্য যবনিকা, পথ হারিয়ে ফেলেছিল ওরা, দিশেহারা হয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল, এমন সময় কোথা থেকে ভেসে এল সুগন্ধি মলয়, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ পলকে বিলীন হয়ে গেল, নির্মেঘ আকাশে হেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ, রূপালী সুষমায় চিক চিক করে উঠল অমৃত সমুদ্র. দুজনে দেখা হয়ে গেল পথের বাঁকে. পুরুষ বলল, তোমাকেই খুঁজেছি এতদিন, আমি আছি তোমার পাশে, নারী বলল, আমিও খুঁজেছি, আমিও আছি। তারপর দুজনে হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে চলল সেই অমৃত সমুদ্রে অবগাহনের কামনায়!

আগস্ট গেল, সেপ্টেম্বর গেল, অক্টো-বরের বারো দিনের ছুটিতে বান্ধবীদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে যাবে বলে জ্যাঠা-মশাইকে অনায়াসে ভাঁওতা দিল মালা আর মৃণাল ফাঁকি দিল পুরীতে বেড়াতে যাবে বলে। গেল দুজন বোম্বে। ফাস্ট ক্লাশের রিজার্ভ করা বোম্বে মেলের কামরা, তারপর তাজমহল হোটেলের রাজকীয় সুইটে ওরা যেন হনিমুন করে এল!

বাকি রইল শুধু চিরাচরিত প্রথায় সামাজিক স্যাংশন ও আত্মীয় বন্ধুদের ভূরিভোজে আপ্যায়ন।

নভেম্বর পড়তে পড়তেই মৃণাল বলল, রেডি হও মালা, আঠাশ নভেম্বর, মানে অঘ্রানের এগারো তারিখ আমরা দুজন তোমার জ্যাঠামশাইকে ফেস করব। এ্যান্ড বি শিওর উই উড বি সাকসেসফুল।

মালা হেসে বলল, তুমি কায়া, আমি তোমার ছায়া। আমি মৃণালের মালা।

যতদূর মনে পড়ে মালার, তারিখটা বোধহয় নয় নভেম্বর, শনিবার।

কাঁটায় কাঁটায় যখন আড়াইটে, দত্তসাহেবের চেম্বারে ডাক পড়ল মালার। টাইপ করছিল, তেমনি ছেড়ে রেখে খাতা পেন্সিল নিয়ে উঠে পড়ল। হয়ত আরও চিঠি।

চেম্বারে ঢুকতেই দত্তসাহেব জিজ্ঞেস করল, ফিনিশড ওয়ার্ক, মিস মুখার্জি?

মালা জবাব দিল, ওনলি টু লেটার্স রিমেইনিং টু বি টাইপড, স্যার।

দত্ত উঠে দাঁড়াল, উলটো দিকে বসেছিল একজন সাহেব, সেও দাঁড়াল, দত্ত হাত বাড়িয়ে দিল, অল রাইট, মিঃ ডেভিডসন, শ্যাল ইনফর্ম ইউ এ্যাবাউট আওয়ার ডিসিশন উইদইন এ উইক।

থ্যাংক ইউ, ডাট।

হ্যান্ডসেক করে ডেভিডসন বেরিয়ে যেতেই দত্ত বলল, যে দুটো বাকি আছে, আমার মনে আছে, ও দুটো তেমন ইম্পর্টেন্ট নয়, সোমবার গেলেই চলবে। আড়াইটে বেজে গেছে, আজ শনিবার, আর চাকরি করতে হবে না, চল।

কোথায়?

না, না, আমার বাড়ীতে নয়, দত্ত হাসল তোমার বাড়ীতে, না, না, তাও নয় তোমার বাড়ী থেকে কিছু দূরেই নামিয়ে দোব। আবার হাসল, দ্যাট ওল্ড টাইগার—উরে বাবা!

তাহলে তুমি গাড়ীতে গিয়ে বসো, মালাও হাসল, আমি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই আসছি, কেমন?

অল রাইট।

রেড রোড দিয়ে গাড়ী ছুটেছে নিউ আলীপুরের পথে।

অরূপ বলল, একখানা পুরোনো ছবি আবার দেখানো হচ্ছে টাইগারে, সেবার দেখতে পারি নি, এবার দুখানা টিকিট কিনেছি, কাল ম্যাটিনীতে, চল। যাবে?

কি ছবি?

দি ইটার্নেল প্লে।

ধক করে হাতুড়ীর ঘা পড়ল মালার বুকের মধ্যে।

পরক্ষণেই আর একটা চমক! দূরে কে ও? মৃণালকে চিনতে কি তার ভুল হতে পারে?

সঙ্গে কে ও ?

বলে উঠল, অরূপ, অরূপ, গাড়ী থামাও, ওই যে আমার এক পুরোনো ক্লাশমেট যাচ্ছে, অনেক দিন দেখা হয়নি, থামাও প্লিজ—

খ্যাঁচ করে ব্রেক টানতে হল। নেমে পড়ল মালা। মুখ বাড়িয়ে বলল, টুমরো এ্যাট থ্রি এ্যাট টাইগার, ইয়েস?

ইয়েস। চেরিয়ো। মোটর ছুটল দক্ষিণ দিকে।

মালাও প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে পেছন থেকে মৃণালের হাত ধরল, মৃণাল সহাস্যে বলে উঠল, হ্যালো মালা। তারপরই বলল, পরিচয় করিয়ে দিই, মাই ওল্ড ক্লাশমেট এ্যাট প্রেসিডেন্সী কলেজ, মিস—ইয়েস, স্টিল মিস মালা মুখোপাধ্যায়, এ সুইট ফ্রেন্ড অব মাইন আর ইনি হচ্ছেন তিনি, সেই মধুমিতা সেন, যার অবিস্মরণীয় উপাখ্যান সবই বলেছি তোমাকে নিউইয়র্ক যাকে আর টেনে রাখতে পারল না। মাত্র দিন চারেক হল ফিরে এসেছে।

দুজনেই স্মিতহাস্যে দুজনকে নমস্কার করল।

বেশী নয়, মাত্র পনেরো দিন পরে, পঁচিশ নভেম্বর, বাড়ীতে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যেতেই মৃণালের চোখে পড়ল লেটার বক্স-এ কয়েকখানা চিঠি। দুখানা পোস্টকার্ড বাবার নামে, একখানা ইনল্যান্ড লেটার মার, দুখানা এনভেলপ ছোট বোন রীতার আর একখানা শুভ-বিবাহমার্কা হলুদ লাগানো বুক পোস্ট তার নিজের নামে। এই শুরু হল মৃণাল ভাবল। ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক বাবারা পায়তারা কষছিল, সেই অঘ্রাণ শুরু হয়েছে, বাস, বেজে উঠল বিয়ের শানাই। হয়ত কোন বন্ধুর অথবা রাইটার্সের কোন কলিগের, যাও বা না যাও, লৌকিকতা করতে হবেই—

কার্ডখানা বার করেই আগে দেখল নাম, বিনীত শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কে, জগদীশ? গড় গড় করে পড়তে লাগল; সবিনয় নিবেদন, আগামী ১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৭৮ সাল (ইং ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭১) আমার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মালার সহিত বালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অরূপের শুভবিবাহ আমার নিউ আলীপুরস্থ বাস-ভবনে—

এর পর মৃণাল কেঁদেছিল, না হেসেছিল, তার কোন সাক্ষী নেই।

আমাদের মিগ

আমাদের ন্যাট

আমাদের গর্ব

রমেন মজুমদার
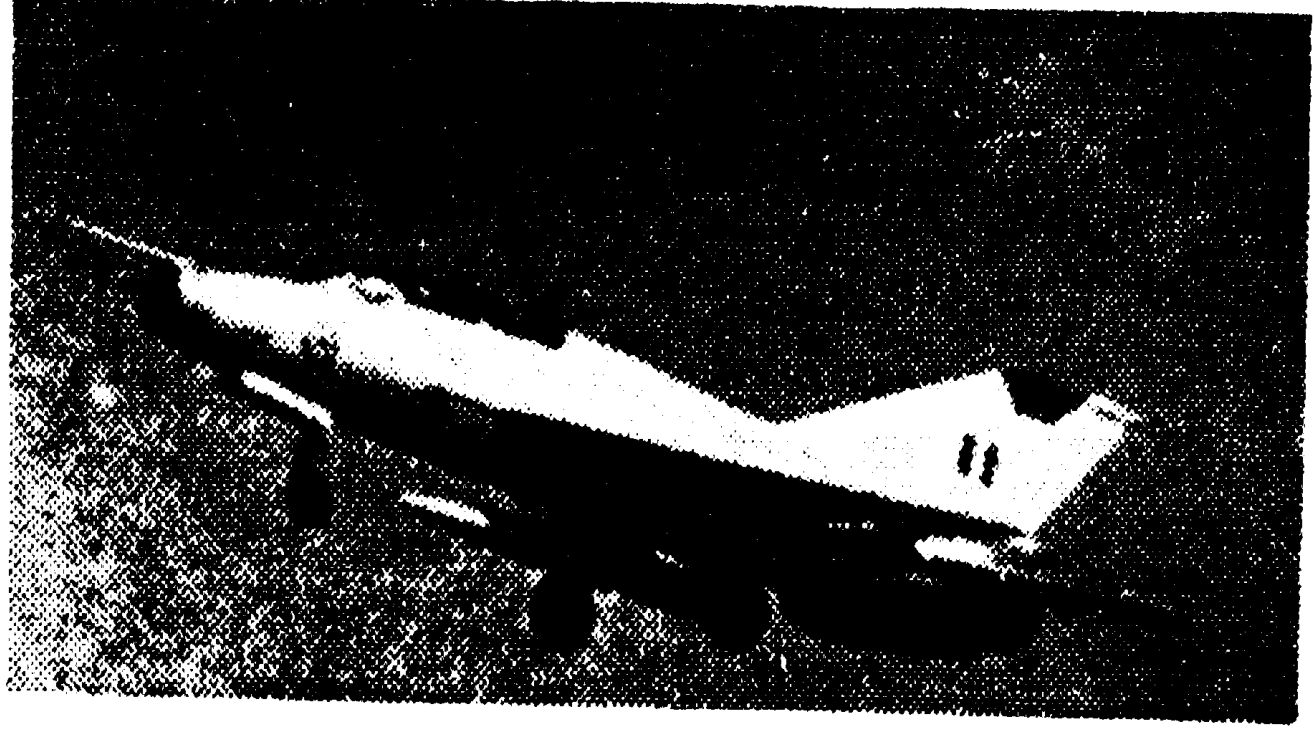
পাকিস্তানের গর্বোদ্ধত জঙ্গী প্রেসিডেন্ট গত ২৬শে নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে এক ভাষণে বলেছিলেন :

"If that woman thinks that she is going to cow me down, I refuse to take it."

পরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেছিলেন :

"In ten days I might not be here in Rawalpindi. I will be off fighting a war."

কিন্তু ইতিহাসের এমন নির্মম পরিহাস যে, সেই 'উওম্যান'-য়ের কাছেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে হল।

দশদিন নয়, সাতদিনের মাথায় তিনি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে। ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর মিরাজ আর সেবার জেট বিমান ভারতের শ্রীনগর, অবন্তীপুর, পাঠানকোট, অমৃতসর, ফরিদকোট, উত্তর লাই, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রা বিমানবন্দরের উপর আক্রমণ চালালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে শ্রীনগর, অবন্তীপুর, পাঠানকোট আর অমৃতসর—এই চারটি বিমানবন্দরের উপর বোমাবর্ষণের জন্য পাকিস্তান ১৬টি বিমান নিয়োগ করে। একমাত্র শ্রীনগর বিমানবন্দরের উপরই বোমাবর্ষণ করার জন্য ৬টি সেবার জেট নিয়োজিত হয়। অমৃতসর বিমানবন্দরের উপর বোমাবর্ষণের জন্য নিয়োজিত হয় ৪টি মিরাজ।

এর আগে বেলা ৩টে নাগাদ পাকিস্তানের ৪টি সেবার জেট আগরতলা বিমানবন্দরের উপর রকেট আক্রমণ চালায়।

পশ্চিম খণ্ডে পাকিস্তানী বিমানের বোমাবর্ষণের অব্যবহিত পরে ভারতের তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর তিনজন অধ্যক্ষ প্রতিরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পরেই পশ্চিমাঞ্চলের এয়ার কম্যান্ডের অধিনায়ক এয়ার মার্শাল এম এম এঞ্জিনীয়ার তাঁর অধীন বিমানবাহিনীকে পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। পূর্বাঞ্চলেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং পাকিস্তানী চ্যালেঞ্জের জবাবে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় খণ্ডেই মধ্যরাত্রির কিছু পরে ভারতীয় বিমানবাহিনী আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করে। ভারতীয় বিমানবাহিনী পূর্ব খণ্ডে ঢাকায় ও যশোরে আকাশযুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর বহু ঘাঁটি, পেট্রোল ডাম্প, সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফেরি, রেল স্টেশন, সরবরাহ ট্রেন ও চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর-করা জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালায়। আর পশ্চিম খণ্ডে করাচী, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর ও অন্যান্য জায়গার সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর বোমা নিক্ষেপ করে।

প্রথম দিনের এই বিমানযুদ্ধে পাকিস্তানের মোট ৩৩টি বিমান বিধ্বস্ত হয়—১৯টি পশ্চিম খণ্ডে আর ১৪টি পূর্ব খণ্ডে। পশ্চিম খণ্ডে বিধ্বস্ত বিমানগুলির মধ্যে আছে ৪টি বি-৫৭১ বমার, ১টি এফ-৮৬ সেবার জেট, ৩টি মিরাজ ও ২টি এফ-১০৪ স্টার ফাইটার। পূর্ব খণ্ডে বিধ্বস্ত বিমানগুলির মধ্যে আছে ১০টি সেবার জেট, ৩টি হালকা বিমান ও ১টি পরিবহণ বিমান। এই ১০টি সেবার জেটের মধ্যে ৭টি বিধ্বস্ত হয় আকাশযুদ্ধে আর বাকি ৩টি ভূপৃষ্ঠে।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর এই যুদ্ধে মোট ১০টি বিমান হারায়—৬টি পশ্চিম খণ্ডে ও ৪টি পূর্ব খণ্ডে। পূর্ব খণ্ডে ভারতের হারানো বিমানগুলির মধ্যে আছে ৩টি হান্টার ও একটি এস ইউ-২২।

৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পশ্চিম খণ্ডে ভারতীয় বিমানবন্দরগুলির উপর পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর আক্রমণের প্রায় ৮ ঘণ্টা পরে রাত ১টার সময় পূর্ব খণ্ডে আকাশযুদ্ধ শুরু হয় এবং তা চলে পরদিন বেলা ১টা পর্যন্ত। এই ১২ ঘণ্টার মধ্যে ১৭০ বার আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনী পূর্ব খণ্ডে পাকিস্তানী

বিমানবাহিনীকে পঙ্গু করে দিয়ে বাংলাদেশের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে।

৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শিলংয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের বিজয়গর্বিত অধিনায়ক এয়ার মার্শাল এইচ সি দেওয়ান বলেন :

"We have reached total air superiority in the Eastern sector and the PAF is almost non-existent in Bangladesh now."

প্রথম দিনের যুদ্ধের এত বড়ো সাফল্যের নজির বিশ্ব-ইতিহাসে দুর্লভ। এই অসামান্য সাফল্য কিন্তু ভারতীয় বিমানবাহিনীকে আত্মতুষ্টিতে মন্থর করে দেয় নি। ভারতীয় বিমানবাহিনী পূর্ব খণ্ডে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালিয়ে গেছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে যুদ্ধ শুরু হবার পাঁচদিন পরে।

যুদ্ধ শুরু হবার পাঁচ দিন পরে ৮ই ডিসেম্বর রাত্রে এয়ার মার্শাল দেওয়ান বলেন :

"Indian Air Force today achieved total supremacy of the sky in Bangladesh by liquidating the remaining two Sabre jets of the PAF in this area. This unique distinction has rarely been achieved by one Air Force against another in the world before."

পূর্ব খণ্ডে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সেবার জেটের মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় বিমানবাহিনী তার মিগ-২১, এস ইউ-২২ আর হান্টার বিমান নিয়োজিত করে। সেবার জেট ধ্বংসে ভারতীয় ন্যাট বিমানেরও খুব সুনাম আছে, এবং ন্যাটের অপর নাম 'সেবার কিলার'। তাই ন্যাট বিমানকে পাকিস্তানীদের খুব ভয়। শুধু সেবার জেটের বৈমানিকদেরই নয়, ১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রাইল যুদ্ধে আরবকে পর্যুদস্ত করে নাম করেছিল যে ফরাসী মিরাজ বিমান, তার বৈমানিকদেরও। ৯ই ডিসেম্বর মিরাজ বিমানের একজন পাকিস্তানী বৈমানিক আর একজন পাকিস্তানী বৈমানিককে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'আশেপাশে যদি কখনও ন্যাট বিমান দেখেন তাহলে আর ঝুঁকি নেবেন না, তৎক্ষণাৎ পালাবেন।'

এই উপদেশ পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর অনেক বৈমানিকই গ্রহণ করেছিলেন—শুধু ন্যাট বিমানের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য বিমানের ক্ষেত্রেও। ৯ই ডিসেম্বরের একটি খবর :

"The enemy is a good runner in the air. He never stands up to fight, not even in his own territory. This has been the singular experience of the stout-hearted pilots of the IAF who have been carrying out 250 to 300 sorties everyday."

প্রথম দিনের যুদ্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর তিন-চতুর্থাংশ শক্তি বিনষ্ট হবার পরে ভারতীয় বৈমানিকরা বাংলাদেশের আকাশে 'জয়রাইড' পেয়ে গেলেও সেখানে তাঁরা 'জয়রাইড' করেন নি, সেখানে তাঁরা সমানে বিজয়াভিযান চালিয়েছেন। আকাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় স্থলবাহিনীর অগ্রগমনে সহায়তা করেছেন।

কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে তখনও পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। সেখানে তারা যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত বিমান আক্রমণ চালিয়েছে। যুদ্ধের শেষ দিনেও, অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর তারিখেও পশ্চিম রণাঙ্গনের রাজস্থান খণ্ডে ভারতের মিগ-২১ পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর তিনটি এফ-১০৪ স্টার ফাইটারকে ভূপাতিত করেছে।

চোদ্দ দিনের এই যুদ্ধে পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে মোট ৯৪টি বিমান হারিয়েছে, আর ভারত হারিয়েছে নৌবাহিনীর একটি বিমানসহ মোট ৪৫টি।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান তার এফ-১০৪ স্টার ফাইটার, এফ-৮৬ সেবার জেট, মিরাজ-৫ ও মিরাজ-৩ই, আর চীনের কাছ থেকে পাওয়া মিগ-১৯ বিমান নিয়োজিত করেছিল। আর ভারত নিয়োজিত করেছিল তার মিগ-২১, ন্যাট, এস ইউ-২২ আর হান্টার বিমান।

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাধারণ ম্যানপাওয়ার ৩৫ হাজারের মতো। তার যুদ্ধ-বিমানের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০, আর অযুদ্ধ বিমানের ২০০। সাধারণতঃ ১৬টি বিমান নিয়ে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর এক একটি স্কোয়াড্রন গঠিত। কখনও কখনও এই সংখ্যার হেরফেরও হয়—১৪ থেকে ২৬। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দু স্কোয়াড্রন অতি শক্তিশালী মিরাজ-৫ ও মিরাজ-৩ই ফাইটার-ইণ্টারসেপ্টার, এক স্কোয়াড্রন এফ-১০৪ স্টার ফাইটার, ৮ স্কোয়াড্রন এফ-৮৬ সেবার জেট ফাইটার-বমার, আর ১২ স্কোয়াড্রন মিগ-১৯ বিমান ছিল।

মিরাজ সমস্ত রকম আবহাওয়ায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর শত্রু-বিমানকে ধাওয়া করতে পারে। এই বিমানের গতিবেগ শব্দের গতিবেগের চেয়েও বেশি। এক একটা মিরাজ-৫ বিমানের দাম প্রায় ১৫ লক্ষ ডলার, আর এক একটি মিরাজ-৩ই'র দাম প্রায় ১২ লক্ষ ডলার। মিরাজ-৫ ও মিরাজ-৩ই বিমানে একই এঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। এই শক্তিশালী এঞ্জিনে মিরাজ-৫ ৪০ হাজার ফুট উচ্চতায় ঘণ্টায় সর্বাধিক ১৩৮৬ মাইল বেগে উড়তে পারে। তবে সমুদ্রের উপর যখন নিচু দিয়ে চলে তখন সেখানে বাতাসের ঘর্ষণ বেশি থাকায় এই গতিবেগ কমে গিয়ে ৮৭৫ মাইলে দাঁড়ায়। ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতায় এই বিমান অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টায় ৫৯৪ মাইল বেগে উড়তে পারে। মিরাজ-৫ তার বাড়তি জ্বালানি ট্যাঙ্কে ২৫০ লিটার জ্বালানি নিয়ে একনাগাড়ে চার ঘণ্টা উড়তে পারে। এই বিমান ২০০০ পাউণ্ড ওজনের বোমা বহন করতে পারে। এর যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ ৮০০ মাইল। তবে ওঠানামা করে যুদ্ধ করতে হলে তা কমে গিয়ে ৪২০ মাইলে দাঁড়ায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯৩৭ ফুট উচ্চতায় এই বিমান যখন চলে তখন তা রেডারে ধরা পড়ে না। ভারতের পশ্চিমাঞ্চল এই মিরাজ বিমান দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল বেশি, এবং উল্লেখযোগ্য, বিশ্ববিখ্যাত এই মিরাজ বিমানকে ভারতীয় বিমানবাহিনীই প্রথম যুদ্ধকালে বিধ্বস্ত করে। এর আগে আর কখনও এই বিমান যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় নি। আরব-ইস্রাইলের প্রচণ্ড যুদ্ধেও না। ভারতীয় বিমানবাহিনীর পক্ষে এটা কম গর্বের কথা নয়।

স্টার ফাইটার আর সেবার জেটের গতিবেগ শব্দের গতিবেগের চাইতে কম। তবু এই দুটি বিমান, বিশেষ করে সেবার জেট সারা বিশ্বে নাম করেছে।

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই দুর্ধর্ষ ফরাসী মিরাজ আর মার্কিন সেবার জেট দিয়েই আক্রমণ চালিয়েছিল বেশি, এবং ভারতকে তার মোকাবিলা করতে হয় প্রধানত তার নিজের তৈরি মিগ-২১ আর ন্যাট বিমান দিয়ে।

মিগ আসলে রাশিয়ান বিমান, আর ন্যাট বৃটিশ।

মিগ

১৯৫৬ সালের ২৪শে জুন তারিখে মস্কোয় তুশিনো বিমানবন্দরে সোভিয়েত বিমানবাহিনী দিবসের প্রদর্শনীতে প্রথম এক নতুন ধরনের স্বল্প-পাল্লার ফাইটার বিমান দেখা যায়। তার পাখা ত্রিভুজাকৃতির। পরে জানা যায়, এই বিমান মিগ-২১।

মিগ-২১য়ের নানা সংস্করণ আছে : মিগ-২১এফ, মিগ-২১ পি এফ এবং মিগ-২১ এফ এল।

মিগ-২১ এফ একটা প্রমাণ রকম স্বল্প-পাল্লার পরিষ্কার আবহাওয়ায় যুদ্ধ করার বিমান। এই বিমানের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করে তৈরি হয়েছে মিগ-২১ পি এফ। আর মিগ-২১ এফ এল হচ্ছে মিগ-২১ পি এফয়েরই রপ্তানি সংস্করণ। এই মিগ-২১ এফ এল বিমানই ভারতে হিন্দুস্তান এয়ারোনটিকাল লিমিটেডে তৈরি হচ্ছে।

রাশিয়া অনেকগুলি দেশে মিগ-২১ বিমান সরবরাহ করেছে—আফগানিস্তান, মিশর, কিউবা, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ইরাক, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, সিরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়া।

এইসব দেশের বিমানবাহিনী এখন অধিক সংখ্যায় মিগ-২১ বিমান ব্যবহার করছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি মিগ-২১ বিমান তৈরি হয়েছে।

মিগ-২১ বিমানে একজন মাত্র আরোহী থাকেন। তিনিই বিমান চালনা করেন, তিনিই যুদ্ধ করেন।

মিগ-২১ বিমানের পাল্লা ৩৭৫ মাইল আর গতিবেগ ২ ম্যাক। এই বিমান তার প্রায় সমান ওজনের যুদ্ধাস্ত্র বহন করতে পারে।

ন্যাট

ন্যাট বিমানের জনক ব্রিটেনের অধুনা-বিলুপ্ত ফল্যান্ড এয়ারক্রাফট্ লিমিটেড নামে একটি বেসরকারী কোম্পানি। কোম্পানিটি ১৯৫১ সালে এক বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা হিসাবে এই বিমান তৈরি শুরু করে এবং রোলস্-রয়েস ব্রিস্টল অরফিউস টার্বোজেট এঞ্জিনসমন্বিত ন্যাটের প্রথম প্রোটোটাইপ আকাশে ওড়ে ১৯৫৫ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে।

এই ফাইটার বিমান ওজনে হালকা, আকারে ছোট—সাধারণ জঙ্গী বিমানের আকারের তিন ভাগের এক ভাগ। কখনও কখনও অর্ধেক। এবং এতে একজন মাত্র আরোহী থাকেন। তাঁকে একাধারে বিমান চালনা আর শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

ব্রিটেনে তৈরি এই ন্যাট বিমান প্রথমে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীতে ব্যবহৃত হয়। তারপর তা ভারত, ফিনল্যান্ড ও যুগোস্লাভিয়া সরকারের অনুরোধক্রমে তাঁদের সরবরাহ করা হয়। তাঁদের বিমানবাহিনী এখন ন্যাট বিমানে পুষ্ট। ব্রিটেনের পরিত্যক্ত ন্যাট বিমান নিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনী এই যুদ্ধে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা বিস্ময়কর। ফল্যান্ড এয়ারক্রাফট লিমিটেডের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে এই বিমান এখন হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের ব্যাঙ্গালোর ডিভিশনে তৈরি হচ্ছে। হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের তৈরি প্রথম ন্যাট ফাইটার ভারতীয় বিমানবাহিনীকে দেওয়া হয় ১৯৬২ সালে।

ভারতের বিমানশিল্প

হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের ব্যাঙ্গালোর ডিভিশন ভারতের প্রথম বিমান তৈরির কারখানা। এর জনক স্যার্ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ নামে একজন বেসরকারী শিল্পপতি। ১৯৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ইন্টারকন্টিনেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং হার্লো এয়ারক্রাফ্ট্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ডিরেক্টর উইলিয়ম ডি পলির সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের ফলে এই কারখানার জন্ম।

স্যার ওয়ালচাঁদ ভারতে মোটরগাড়ি-শিল্প প্রবর্তনের ব্যাপারে ১৯৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পথে সান ফ্রান্সিস্কো থেকে হংকং যাবার সময় বিমানে বসে তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ একটি খবরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল : চীনে একটি বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে পলি চীনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্যার্ ওয়ালচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ভারতেও অনুরূপ একটি বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর মনে জাগল এবং এ ব্যাপারে তিনি পলির সাহায্য চাইবেন বলে স্থির করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ পলিও ঐ একই বিমানে ভ্রমণ করছিলেন। স্যার ওয়ালচাঁদ তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে পলির সঙ্গে আলাপ করলেন এবং তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁকে জানালেন। হংকংয়ে পৌঁছনোর আগেই স্যার্ ওয়ালচাঁদ পলির কাছ থেকে বিমান-শিল্পের একটি খসড়া পরিকল্পনা ও একটি খসড়া সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে নিলেন।

বিমানটি প্রথম ম্যানিলা গিয়ে থামতেই স্যার্ ওয়ালচাঁদ ভারতের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতির কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। পাছে সেই টেলিগ্রাম তাঁর কাছে না পৌঁছয়, তাই স্যার্ ওয়ালচাঁদ ফেরার পথে প্রত্যেকটি বিমানবন্দর থেকে ঐ একই টেলিগ্রাম বার বার করে পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে সেই টেলিগ্রামের উত্তর এল। তবে প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে নয়, ভারত সরকারের তদানীন্তন বাণিজ্য-সদস্য স্যার্ এ রামস্বামী মুদালিয়রের কাছ থেকে। স্যার্ রামস্বামী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শিগ্‌গিরই এ বিষয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

এর দু' সপ্তাহ পরে কলকাতায় স্যার্ ওয়ালচাঁদের সঙ্গে স্যার্ রামস্বামীর এক আলোচনা হল। কিন্তু সেই আলোচনায় ফল বিশেষ কিছুই হল না।

ইতিমধ্যে ১৯৪০ সালের জুন মাসে প্যারিসের পতন ঘটল। ব্রিটেন ভারত সরকারকে জানিয়ে দিলেন, ভারত সরকার যেন তাঁদের বিমানের ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই করে নেন, কারণ চাপ-ক্লিষ্ট ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ফ্রান্স আর চীনের জাতীয় সরকারের বিমানের প্রয়োজনই মেটানো সম্ভব হচ্ছে না।

স্যার্ ওয়ালচাঁদ সিমলায় বসে এ খবর শুনলেন। এবং ভারত সরকারকে বললেন, দেশের যত বিমানের প্রয়োজন, তিনি তা সরবরাহ করতে পারেন। ভারত সরকার তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন। স্যার ওয়ালচাঁদ তখন পলিকে ভারতে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। পলি তাঁর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ভারতে পৌঁছেই চলে গেলেন সিমলায়। শুরু হল আলোচনা। এবং পলির সিমলায় পৌঁছনোর ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই স্থির হল, ভারতে একটি বিমান তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে।

কিন্তু বৃটিশ সরকারের সম্মতি পাওয়া সহজ হল না। বিমান উৎপাদন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ড বীভারব্রুক ভারতে বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাটিকে সহজভাবে নিতে পারলেন না। কিন্তু ভারত সরকারের তখন পিছবার উপায় ছিল না। হোম গভর্নমেণ্ট এই শর্তে ভারতে বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনে সম্মতি দিলেন যে, বিমান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইংল্যান্ড আর আমেরিকা থেকে আনা চলবে না, কারণ ইংল্যান্ডেই কাঁচামালের অভাব রয়েছে আর তাকে আমেরিকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

স্যার্ ওয়ালচাঁদের এই শর্ত গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। তিনি বাধ্য হয়ে এই শর্ত গ্রহণ করলেন। এবং ভারতের প্রথম বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হল ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে। কারখানার স্থান নির্বাচিত হল মহীশূরের ব্যাঙ্গালোরে। কারণ মহীশূর সরকারের দেওয়ান স্যার্ মির্জা ইসমাইল ছিলেন একজন দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁরই পরামর্শে মহীশূর সরকার কোম্পানির ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনতে রাজী হলেন, কারখানা স্থাপনের জমি দিলেন এবং স্বল্প-মূল্যে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কোম্পানি রেজিস্ট্রি হবার পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখেই শুরু হয়ে গেল কারখানা নির্মাণের জায়গা পরিষ্কার করার কাজ। কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল ১৯৪১ সালের ১২ই জানুয়ারী। এবং তিন সপ্তাহের মধ্যেই কারখানার প্রধান ভবনটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ১৯৪১ সালের ২৯শে অগস্ট এই কারখানার তৈরি প্রথম বিমান—একটি হার্লো ট্রেনার—ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল। কারখানা স্থাপনের মাত্র ৮ মাসের মধ্যে এই সাফল্য, এ বড়ো কম কথা নয়। তখন পুরোদমে বিশ্বযুদ্ধ চলছিল বলেই বিশেষ করে এত তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে।

১৯৪০ সালে চার কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে যখন কারখানাটির পত্তন করা হয় তখন তা করা হয় একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে। প্রথম থেকেই কারখানাটির সঙ্গে মহীশূর সরকার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪১ সালে ভারত সরকারও এতে যোগ দিলেন শেয়ারহোল্ডার হিসাবে। সেই সময়

বিমানবাহিনীকে পঙ্গু করে দিয়ে বাংলাদেশের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে।

৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শিলংয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের বিজয়গর্বিত অধিনায়ক এয়ার মার্শাল এইচ সি দেওয়ান বলেন :

"We have reached total air superiority in the Eastern sector and the PAF is almost non-existent in Bangladesh now."

প্রথম দিনের যুদ্ধের এত বড়ো সাফল্যের নজির বিশ্ব-ইতিহাসে দুর্লভ। এই অসামান্য সাফল্য কিন্তু ভারতীয় বিমানবাহিনীকে আত্মতুষ্টিতে মন্থর করে দেয় নি। ভারতীয় বিমানবাহিনী পূর্ব খণ্ডে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালিয়ে গেছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে যুদ্ধ শুরু হবার পাঁচদিন পরে।

যুদ্ধ শুরু হবার পাঁচ দিন পরে ৮ই ডিসেম্বর রাত্রে এয়ার মার্শাল দেওয়ান বলেন :

"Indian Air Force today achieved total supremacy of the sky in Bangladesh by liquidating the remaining two Sabre jets of the PAF in this area. This unique distinction has rarely been achieved by one Air Force against another in the world before."

পূর্ব খণ্ডে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সেবার জেটের মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় বিমানবাহিনী তার মিগ-২১, এস ইউ-২২ আর হাণ্টার বিমান নিয়োজিত করে। সেবার জেট ধ্বংসে ভারতীয় ন্যাট বিমানেরও খুব সুনাম আছে, এবং ন্যাটের অপর নাম 'সেবার কিলার'। তাই ন্যাট বিমানকে পাকিস্তানীদের খুব ভয়। শুধু সেবার জেটের বৈমানিকদেরই নয়, ১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রাইল যুদ্ধে আরবকে পর্যুদস্ত করে নাম করেছিল যে ফরাসী মিরাজ বিমান, তার বৈমানিকদেরও। ৯ই ডিসেম্বর মিরাজ বিমানের একজন পাকিস্তানী বৈমানিক আর একজন পাকিস্তানী বৈমানিককে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'আশেপাশে যদি কখনও ন্যাট বিমান দেখেন তাহলে আর ঝুঁকি নেবেন না, তৎক্ষণাৎ পালাবেন।'

এই উপদেশ পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর অনেক বৈমানিকই গ্রহণ করেছিলেন—শুধু ন্যাট বিমানের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য বিমানের ক্ষেত্রেও। ৯ই ডিসেম্বরের একটি খবর :

"The enemy is a good runner in the air. He never stands up to fight, not even in his own territory. This has been the singular experience of the stout-hearted pilots of the IAF who have been carrying out 250 to 300 sorties everyday."

প্রথম দিনের যুদ্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর তিন-চতুর্থাংশ শক্তি বিনষ্ট হবার পরে ভারতীয় বৈমানিকরা বাংলাদেশের আকাশে 'জয়রাইড' পেয়ে গেলেও সেখানে তাঁরা 'জয়রাইড' করেন নি, সেখানে তাঁরা সমানে বিজয়াভিযান চালিয়েছেন। আকাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় স্থলবাহিনীর অগ্রগমনে সহায়তা করেছেন।

কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে তখনও পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। সেখানে তারা যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত বিমান আক্রমণ চালিয়েছে। যুদ্ধের শেষ দিনেও, অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর তারিখেও পশ্চিম রণাঙ্গনের রাজস্থান খণ্ডে ভারতের মিগ-২১ পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর তিনটি এফ-১০৪ স্টার ফাইটারকে ভূপাতিত করেছে।

চোদ্দ দিনের এই যুদ্ধে পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে মোট ৯৪টি বিমান হারিয়েছে, আর ভারত হারিয়েছে নৌবাহিনীর একটি বিমানসহ মোট ৪৫টি।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান তার এফ-১০৪ স্টার ফাইটার, এফ-৮৬ সেবার জেট, মিরাজ-৫ ও মিরাজ-৩ই, আর চীনের কাছ থেকে পাওয়া মিগ-১৯ বিমান নিয়োজিত করেছিল। আর ভারত নিয়োজিত করেছিল তার মিগ-২১, ন্যাট, এস ইউ-২২ আর হাণ্টার বিমান।

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাধারণ ম্যানপাওয়ার ৩৫ হাজারের মতো। তার যুদ্ধ-বিমানের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০, আর অযুদ্ধ বিমানের ২০০। সাধারণতঃ ১৬টি বিমান নিয়ে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর এক একটি স্কোয়াড্রন গঠিত। কখনও কখনও এই সংখ্যার হেরফেরও হয়—১৪ থেকে ২৬। একটি হিসাব দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দু স্কোয়াড্রন অতি শক্তিশালী মিরাজ-৫ ও মিরাজ-৩ই ফাইটার-ইণ্টারসেপ্টার, এক স্কোয়াড্রন এফ-১০৪ স্টার ফাইটার, ৮ স্কোয়াড্রন এফ-৮৬ সেবার জেট ফাইটার-বমার, আর ১২ স্কোয়াড্রন মিগ-১৯ বিমান ছিল।

মিরাজ সমস্ত রকম আবহাওয়ায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর শত্রুবিমানকে ধাওয়া করতে পারে। এই বিমানের গতিবেগ শব্দের গতিবেগের চেয়েও বেশি। এক একটা মিরাজ-৫ বিমানের দাম প্রায় ১৫ লক্ষ ডলার, আর এক একটি মিরাজ-৩ই'র দাম প্রায় ১২ লক্ষ ডলার। মিরাজ-৫ ও মিরাজ-৩ই বিমানে একই এঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। এই শক্তিশালী এঞ্জিনে মিরাজ-৫ ৪০ হাজার ফুট উচ্চতায় ঘণ্টায় সর্বাধিক ১৩৮৬ মাইল বেগে উড়তে পারে। তবে সমুদ্রের উপর যখন নিচু দিয়ে চলে তখন সেখানে বাতাসের ঘর্ষণ বেশি থাকায় এই গতিবেগ কমে গিয়ে ৮৭৫ মাইলে দাঁড়ায়। ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতায় এই বিমান অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টায় ৫৭৪ মাইল বেগে উড়তে পারে। মিরাজ-৫ তার বাড়তি জ্বালানি ট্যাঙ্কে ২৫০ লিটার জ্বালানি নিয়ে একনাগাড়ে চার ঘণ্টা উড়তে পারে। এই বিমান ২০০০ পাউণ্ড ওজনের বোমা বহন করতে পারে। এর যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ ৮০০ মাইল। তবে ওঠানামা করে যুদ্ধ করতে হলে তা কমে গিয়ে ৪২০ মাইলে দাঁড়ায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯৩৭ ফুট উচ্চতায় এই বিমান যখন চলে তখন তা রেডারে ধরা পড়ে না। ভারতের পশ্চিমাঞ্চল এই মিরাজ বিমান দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল বেশি, এবং উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব-বিখ্যাত এই মিরাজ বিমানকে ভারতীয় বিমানবাহিনীই প্রথম যুদ্ধকালে বিধ্বস্ত করে। এর আগে আর কখনও এই বিমান যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় নি। আরব-ইস্রাইলের প্রচণ্ড যুদ্ধেও না। ভারতীয় বিমানবাহিনীর পক্ষে এটা কম গর্বের কথা নয়।

স্টার ফাইটার আর সেবার জেটের গতিবেগ শব্দের গতিবেগের চাইতে কম। তবু এই দুটি বিমান, বিশেষ করে সেবার জেট সারা বিশ্বে নাম করেছে।

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই দুর্ধর্ষ ফরাসী মিরাজ আর মার্কিন সেবার জেট দিয়েই আক্রমণ চালিয়েছিল বেশি, এবং ভারতকে তার মোকাবিলা করতে হয় প্রধানত তার নিজের তৈরি মিগ-২১ আর ন্যাট বিমান দিয়ে।

মিগ আসলে রাশিয়ান বিমান, আর ন্যাট বৃটিশ।

মিগ

১৯৫৬ সালের ২৪শে জুন তারিখে মস্কোয় তুশিনো বিমানবন্দরে সোভিয়েত বিমানবাহিনী দিবসের প্রদর্শনীতে প্রথম এক নতুন ধরনের স্বল্প-পাল্লার ফাইটার বিমান দেখা যায়। তার পাখা ত্রিভুজাকৃতির। পরে জানা যায়, এই বিমান মিগ-২১।

মিগ-২১য়ের নানা সংস্করণ আছে : মিগ-২১এফ, মিগ-২১ পি এফ এবং মিগ-২১ এফ এল।

মিগ-২১ এফ একটা প্রমাণ রকম স্বল্প-পাল্লার পরিষ্কার আবহাওয়ায় যুদ্ধ করার বিমান। এই বিমানের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করে তৈরি হয়েছে মিগ-২১ পি এফ। আর মিগ-২১ এফ এল হচ্ছে মিগ-২১ পি এফয়েরই রপ্তানি সংস্করণ। এই মিগ-২১ এফ এল বিমানই ভারতে হিন্দুস্তান এয়ারোনটিকাল্স লিমিটেডে তৈরি হচ্ছে।

রাশিয়া অনেকগুলি দেশে মিগ-২১ বিমান সরবরাহ করেছে—আফগানিস্তান, মিশর, কিউবা, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ইরাক, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, সিরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়া।

এইসব দেশের বিমানবাহিনী এখন অধিক সংখ্যায় মিগ-২১ বিমান ব্যবহার করছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি মিগ-২১ বিমান তৈরি হয়েছে।

মিগ-২১ বিমানে একজন মাত্র আরোহী থাকেন। তিনিই বিমান চালনা করেন তিনিই যুদ্ধ করেন।

মিগ-২১ বিমানের পাল্লা ৩৭৫ মাইল আর গতিবেগ ২ ম্যাক। এই বিমান তার প্রায় সমান ওজনের যুদ্ধাস্ত্র বহন করতে পারে।

ন্যাট

ন্যাট বিমানের জনক বৃটেনের অধুনালুপ্ত ফল্যান্ড এয়ারক্রাফট্ লিমিটেড নামে একটি বেসরকারী কোম্পানি। কোম্পানিটি ১৯৫১ সালে এক বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা হিসাবে এই বিমান তৈরি শুরু করে এবং রোলস্-রয়েস ব্রিস্টল অরফিউস টার্বোজেট এঞ্জিনযুক্ত ন্যাটের প্রথম প্রোটোটাইপ আকাশে ওড়ে ১৯৫৫ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে।

এই ফাইটার বিমান ওজনে হালকা, আকারে ছোটো—সাধারণ জঙ্গী বিমানের আকারের তিন ভাগের এক ভাগ। কখনও কখনও অর্ধেক। এবং এতে একজন মাত্র আরোহী থাকেন। তাঁকে একাধারে বিমান চালনা আর শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

বৃটেনে তৈরি এই ন্যাট বিমান প্রথমে বৃটিশ বিমানবাহিনীতে ব্যবহৃত হয়। তারপর তা ভারত, ফিনল্যান্ড ও যুগোস্লাভিয়া সরকারের অনুরোধক্রমে তাঁদের সরবরাহ করা হয়। তাঁদের বিমানবাহিনী এখন ন্যাট বিমানে পুষ্ট। বৃটেনের পরিত্যক্ত ন্যাট বিমান নিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনী এই যুদ্ধে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা বিস্ময়কর। ফল্যান্ড এয়ারক্রাফট লিমিটেডের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে এই বিমান এখন হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের ব্যাঙ্গালোর ডিভিশনে তৈরি হচ্ছে। হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের তৈরি প্রথম ন্যাট ফাইটার ভারতীয় বিমানবাহিনীকে দেওয়া হয় ১৯৬২ সালে।

ভারতের বিমানশিল্প

হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের ব্যাঙ্গালোর ডিভিশন ভারতের প্রথম বিমান তৈরির কারখানা। এর জনক স্যার ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ নামে একজন বেসরকারী শিল্পপতি। ১৯৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্টারকন্টিনেণ্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং হার্লো এয়ারক্রাফট্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ডিরেক্টর ডাবলিউ ডি. পলির সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের ফলে এই কারখানার জন্ম।

স্যার ওয়ালচাঁদ ভারতে মোটরগাড়ি-শিল্প প্রবর্তনের ব্যাপারে ১৯৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পথে সান ফ্রান্সিস্কো থেকে হংকং যাবার সময় বিমানে বসে তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ একটি খবরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল : চীনে একটি বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে পলি চীনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্যার ওয়ালচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ভারতেও অনুরূপ একটি বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর মনে জাগল এবং এ ব্যাপারে তিনি পলির সাহায্য চাইবেন বলে স্থির করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ পলিও ঐ একই বিমানে ভ্রমণ করছিলেন। স্যার ওয়ালচাঁদ তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে পলির সঙ্গে আলাপ করলেন এবং তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁকে জানালেন। হংকংয়ে পৌঁছানোর আগেই স্যার ওয়ালচাঁদ পলির কাছ থেকে বিমান-শিল্পের একটি খসড়া পরিকল্পনা ও একটি খসড়া সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে নিলেন।

বিমানটি প্রথম ম্যানিলা গিয়ে থামতেই স্যার ওয়ালচাঁদ ভারতের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতির কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। পাছে সেই টেলিগ্রাম তাঁর কাছে না পৌঁছয়, তাই স্যার ওয়ালচাঁদ ফেরার পথে প্রত্যেকটি বিমানবন্দর থেকে ঐ একই টেলিগ্রাম বার বার করে পাঠাতে লাগলেন। অবশেষে সেই টেলিগ্রামের উত্তর এল। তবে প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে নয়, ভারত সরকারের তদানীন্তন বাণিজ্য-সদস্য স্যার এ রামস্বামী মুদালিয়রের কাছ থেকে। স্যার রামস্বামী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শিগগিরই এ বিষয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

এর দু' সপ্তাহ পরে কলকাতায় স্যার ওয়ালচাঁদের সঙ্গে স্যার রামস্বামীর এক আলোচনা হল। কিন্তু সেই আলোচনায় ফল বিশেষ কিছুই হল না।

ইতিমধ্যে ১৯৪০ সালের জুন মাসে প্যারিসের পতন ঘটল। বৃটেন ভারত সরকারকে জানিয়ে দিলেন, ভারত সরকার যেন তাঁদের বিমানের ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই করে নেন, কারণ চাপ-ক্লিষ্ট বৃটিশ সরকারের পক্ষে ফ্রান্স আর চীনের জাতীয় সরকারের বিমানের প্রয়োজনই মেটানো সম্ভব হচ্ছে না।

স্যার ওয়ালচাঁদ সিমলায় বসে এ খবর শুনলেন। এবং ভারত সরকারকে বললেন, তাঁদের যত বিমানের প্রয়োজন, তিনি তা সরবরাহ করতে পারেন। ভারত সরকার তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন। স্যার ওয়ালচাঁদ তখন পলিকে ভারতে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। পলি তাঁর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ভারতে পৌঁছেই চলে গেলেন সিমলায়। শুরু হল আলোচনা। এবং পলির সিমলায় পৌঁছনোর ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই স্থির হল, ভারতে একটি বিমান তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে।

কিন্তু বৃটিশ সরকারের সম্মতি পাওয়া সহজ হল না। বিমান উৎপাদন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ড বীভারব্রুক ভারতে বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাটিকে সহজভাবে নিতে পারলেন না। কিন্তু ভারত সরকারের তখন পিছুবার উপায় ছিল না। হোম গভর্নমেণ্ট এই শর্তে ভারতে বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনে সম্মতি দিলেন যে, বিমান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইংল্যান্ড আর অ্যামেরিকা থেকে আনা চলবে না, কারণ ইংল্যান্ডেই কাঁচামালের অভাব রয়েছে আর তাকে আমেরিকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

স্যার ওয়ালচাঁদের এই শর্ত গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। তিনি বাধ্য হয়ে এই শর্ত গ্রহণ করলেন। এবং ভারতের প্রথম বিমান তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হল ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে। কারখানার স্থান নির্বাচিত হল মহীশূরের ব্যাঙ্গালোরে। কারণ, মহীশূর সরকারের দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইল ছিলেন একজন দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁরই পরামর্শে মহীশূর সরকার কোম্পানির ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনতে রাজী হলেন, কারখানা স্থাপনের জমি দিলেন এবং স্বল্পমূল্যে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কোম্পানি রেজিস্ট্রি হবার পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখেই শুরু হয়ে গেল কারখানা নির্মাণের জায়গা পরিষ্কার করার কাজ। কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল ১৯৪১ সালের ১২ই জানুয়ারী। এবং তিন সপ্তাহের মধ্যেই কারখানার প্রধান ভবনটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ১৯৪১ সালের ২৯শে আগস্ট এই কারখানার তৈরি প্রথম বিমান—একটি হার্লো ট্রেনার—ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল। কারখানা স্থাপনের মাত্র ৮ মাসের মধ্যে এই সাফল্য, এ বড়ো কম কথা নয়। তখন পুরোদমে বিশ্বযুদ্ধ চলছিল বলেই বিশেষ করে এত তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে।

১৯৪০ সালে চার কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে যখন কারখানাটির পত্তন করা হয় তখন তা করা হয় একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে। প্রথম থেকেই কারখানাটির সঙ্গে মহীশূর সরকার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪১ সালে ভারত সরকারও এতে যোগ দিলেন শেয়ারহোল্ডার হিসাবে। সেই সময়

ভারত সরকার, মহীশূর সরকার এবং ওয়ালচাঁদ তুলসীদাস খাটাউ লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্টরা সমান শেয়ারহোল্ডার। প্রত্যেকের ২০ লক্ষ টাকা করে শেয়ার।

১৯৪২ সালে ম্যানেজিং এজেন্টরা পদত্যাগ করলেন এবং ভারত সরকার তাঁদের শেয়ারগুলো কিনে নিলেন। কিন্তু তখন যুদ্ধ চলছিল বলে কারখানাটিকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্য তার দায়িত্ব-ভার মার্কিন বিমানবাহিনীর হাতে অর্পণ করতে হয়। মার্কিন বিমানবাহিনী ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই কারখানা পরিচালনা করে। তারপর তা ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রকের আওতায় চলে যায়। ১৯৫১ সালে হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণভার শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রকের হাত থেকে চলে আসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হাতে। সেই থেকে তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিরক্ষা উৎপাদন বিভাগের অধীনেই রয়েছে।

কোম্পানির শেয়ার মূলধন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা যুগিয়েছেন ভারত সরকার। ১৯৬৩ সালে কোম্পানির অবশিষ্ট অপর শেয়ারহোল্ডার মহীশূর সরকার যখন তাঁদের শেয়ার মূলধন তুলে নিলেন তখন কোম্পানিটি পুরোপুরি ভারত সরকারের হাতে এল।

১৯৬৪ সালে দেশের সমস্ত বিমান তৈরির কোম্পানি সম্মিলিত করে একটি আইন পাস হল এবং বিমান তৈরির সমস্ত ইউনিট সম্মিলিত হয়ে বর্তমান হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেড গঠিত হল। সমস্ত বিমান তৈরির ইউনিট বলতে ব্যাঙ্গালোরের এয়ারোনটিকস ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট লিমিটেড আর কানপুরের কারখানা, যা তখনও পর্যন্ত বিমানের ডিপোই ছিল শুধু।

আগেই বলেছি, যুদ্ধের জন্যই ১৯৪০ সালে ব্যাঙ্গালোরে ভারতের প্রথম বিমান তৈরির কারখানা স্থাপিত হয় এবং যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই অতি দ্রুত কারখানা স্থাপনের কাজ শেষ করতে হয়। কারখানা স্থাপনের আট মাসের মধ্যে প্রথম বিমানটি তৈরি করে আকাশে ওড়ানো হয়। তখন এই কারখানায় তৈরি হত হার্লো পি সি-৫ ট্রেনার, কার্টিস হক ফাইটার ও ভাল্টি বমার বিমান।

কোম্পানির সামনে তখন বড়ো সমস্যা ছিল পর্যাপ্তসংখ্যক কারিগর পাওয়া। বিমান তৈরি শিল্প একটা অতি আধুনিক ও জটিল শিল্প, এবং ভারতে এ বিষয়ে কারও পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু পুরোদমে কাজ চলেছে, এবং আজ এই ৩১ বছর পরে কারখানার দিকে তাকিয়ে আমরা গর্ববোধ করি যে, একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা-শিল্পে আমরা একটা কারিগরি ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছি, যা নিখুঁত-ভাবে আমাদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাচ্ছে এবং স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্তান এয়ারো-নটিক্যাল লিমিটেডের কারখানার পত্তন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই ২৯ বছরে এখানে এক হাজার বিমান তৈরি হয়েছে।

আবার, দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের দিকে তাকিয়ে আমরা সগর্বে বলতে পারি, ১৯৪০ সালের সামান্য আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত এই ৩১ বছরে ভারতের বিমানশিল্প ডিজাইন আর নির্মাণ উভয় ক্ষেত্রেই একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পেরেছে। ভারতের অন্যান্য নির্মাণশিল্পের মতো বিমানশিল্পেও প্রথমে বাইরে থেকে কল-কব্জা এনে এখানে জোড়া দিয়ে বিমান তৈরি করা হয়েছে, তারপর বিদেশ থেকে লাইসেন্স নিয়ে বিদেশের নকশা থেকে এখানে বিমান তৈরি করা হয়েছে, এবং এখন এখানেই নকশা তৈরি করে এখানকারই অনেক জিনিস দিয়ে বিমান তৈরি করা হচ্ছে।

হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমি-টেডের এক-একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এক-একটা ডিভিশন। এই ডিভিশনগুলি অবস্থিত ব্যাঙ্গালোরে, নাসিকে, কোরাপুটে, হায়দরাবাদে, কানপুরে আর লক্ষ্ণৌয়ে। হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেড এখন ভূপৃষ্ঠে আক্রমণ চালাবার উপযোগী জেট ফাইটার এইচ এফ-২৪, আকাশে শত্রুপক্ষের বিমানকে বাধাদানের উপযোগী সুপার-সনিক ইণ্টারসেপ্টার মিগ-২১, জেট ফাইটার ন্যাট, জে ট্রেনার কিরণ, আর এইচ এস-৭৪৮ বিমান তৈরি করছে।

বিগত যুদ্ধে বিস্ময় সৃষ্টি করে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে যে দুটি বিমান তারা হচ্ছে মিগ আর ন্যাট। মিগের কাঠামো তৈরি হয় নাসিকে, এঞ্জিন তৈরি হয় কোরাপুটে, আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি হয় হায়দরাবাদে। সব কিছু জোড়া দিয়ে পূর্ণ মিগ বিমান তৈরি হয় নাসিকে। আর, ন্যাট বিমান তৈরি হয় ব্যাঙ্গালোরে।

কানপুর ডিভিশনে তৈরি হয় এইচ এস-৭৪৮ বিমান। লক্ষ্ণৌয়ে নতুন যে ইউনিটটি স্থাপন করা হয়েছে সেখানে তৈরি হয় বিমানের যন্ত্রপাতি আর আনুষঙ্গিক জিনিস।

বিমান তৈরিতে অনেক যন্ত্র আর আনুষঙ্গিক জিনিসের দরকার, এবং তার অধিকাংশই এখনও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এই আমদানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর আনু-ষঙ্গিক জিনিস এখানেই তৈরি করার জন্য হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেড একটি পৃথক ডিভিশন স্থাপন করেছে। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৭২ সালেই তাতে উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে।

নাসিক ডিভিশন থেকে অধিকাংশ স্বদেশী জিনিস দিয়ে তৈরি প্রথম মিগ-২১ বিমান ভারতীয় বিমানবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে। হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেড মিগ-২১য়ের একটি উন্নত সংস্করণ তৈরির পরিকল্পনা করেছে। ১৯৭৩ সালে এই সংস্করণ তৈরি শুরু হবে বলে আশা করা যায়। এই উন্নত সংস্করণের বিমানের পাল্লা, গতিবেগ ও আঘাত-ক্ষমতা মিগ-২১য়ের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

এটা আমাদের গর্ব যে, ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেডের বিজ্ঞানীরা আর কারিগররা ভারতকে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করে দিয়েছেন বিমানশিল্পের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীতে ভারতীয় ডিজাইনে ভারতে তৈরি জেট বিমানের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেড ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্প সংস্থা। উৎপাদনের উন্নতিতে, বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ হ্রাসে, দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরিতে এই সংস্থা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিমানশিল্পের নানাদিকে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রসারিত করছে। এককথায় বলা যায়, হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্যাল লিমিটেড অন্যান্য দেশের বিমানশিল্পের সমকক্ষ হবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নব জাগ্রত সোনার বাঙলা
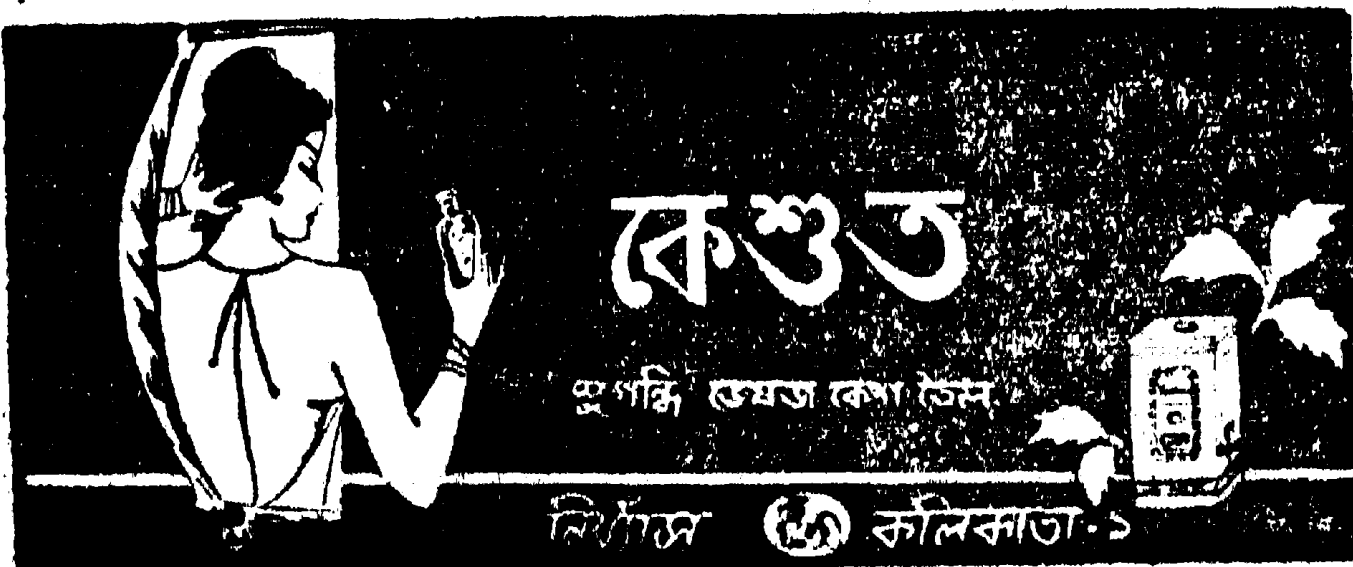
ভারতের সীমানার বাইরে এতাবৎ এমন কোনো কিছু ঘটে নি যা বাঙলাদেশের বীর সন্তানদের অপূর্ব আত্মবলিদান এবং বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর বর্বর পাক সৈন্যদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতের মানুষকে বাঙলাদেশের অসহায় জনগণের এই দুর্গতি আকুল করে তুলেছে। বাঙলাদেশের মানুষ বাঙালী, বাঙলা তাঁদের মুখের ভাষা, সেই কারণে আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাঙলার মানুষের নিবিড় যোগ। ২৫শে মার্চ-এর পর বাঙলাদেশে যে নৃশংস কাণ্ড ঘটে গেছে তার পটভূমিতে এপার বাংলায় অনেকরকম গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও কিছু কিছু হচ্ছে। এপারের কবি ও সাহিত্যিক রচিত অনেক গ্রন্থের আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা করেছি। বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র 'স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' ছাড়া সবকটি গ্রন্থ ওপার বাঙলার লেখকদের রচিত। 'স্মৃতিময় বাঙলাদেশে'র লেখক এপারের একজন খ্যাতনাম কবি ও সাহিত্যকার, কিন্তু তাঁর জন্মভূমি ছিল ওপার বাঙলায়। এই গ্রন্থের লেখক ধনঞ্জয় দাশ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন "একজন সামান্য কর্মী ও নগণ্য সংস্কৃতিসেবী" এবং সাধারণ ধারণানুসারে যে বয়সে পৌঁছালে 'স্মৃতিকথা' লেখার অধিকারী হওয়া যায় তিনি সে দলে নন। অর্থাৎ তিনি বয়সে তরুণ। এই সব কারণে তাঁর কিছু স্বাভাবিক কুণ্ঠা আছে স্মৃতিচারণে। লেখকের এই প্রচেষ্টার কিন্তু আমি সমর্থক, কারণ একথা বলা প্রয়োজন যে 'স্মৃতিকথা' রচনায় শুধুমাত্র গণ্যমান্য এবং পককেশবৃদ্ধদের একমাত্র একচেটিয়া অধিকারে নেই, অন্য দেশে 'স্মৃতিকথা' সবরকম বয়সের সবরকম শ্রেণীর মানুষ লিখে থাকেন এবং তার প্রচার বা প্রশংসা উপেক্ষণীয় নয়। ধনঞ্জয় দাশ 'স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' রচনা করেছেন স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশের উজ্জ্বলমূর্তি সামনে রেখে। তাঁর সেই স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। বাঙলাদেশ আজ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক দেশরূপে জন্মলাভ করেছে। স্বাধীন বাঙলাদেশের যে রাজনৈতিক পশ্চাৎপট তাঁর পরিচিত এবং ১৯৫৫ পর্যন্ত যার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল সেই স্মৃতিকেই তিনি এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। কোনো বৈপ্লবিক ঘটনা সহসা ঘটে না, তার পিছনে থাকে সুদীর্ঘ ইতিহাস। বাঙলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর করে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ভূমিকাংশে বলেছেন এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রামাণ্য-গ্রন্থ তাঁর হাতে আসে নি। 'স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' এই কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-গ্রন্থ। ধনঞ্জয় দাশ স্বয়ং পূর্ব বাংলার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এই কারণে কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর কারাজীবনের স্মৃতি এই গ্রন্থের সম্পদ। নুরুল আমিন সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সঞ্চিত বিক্ষোভ কিভাবে ধীরে ধীরে জ্বলে উঠেছে লেখকের অপূর্ব সংযমপূর্ণ ভাষায় তা বিধৃত হয়েছে। জাব্বার-রফিকউদ্দীন-বরকতের কলিজা ভেদ করেছে যে বুলেট সেই বুলেটই জনগণের মোহভঙ্গ করেছে। দরিদ্র অনুন্নত দেশগুলির একটি প্রবল শত্রু বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের চক্রান্ত। ওপার বাঙলার আন্দোলনও বৈদেশিক চক্রান্তের শিকার হয়েছিল তার পরিচয় সর্বত্র ছড়ানো আছে। লেখক ইতিহাস বিধৃত করেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রী অনেকে আজো জীবিত তাই এই গ্রন্থটি ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। লেখক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবাবেগ চালিত হয়েছেন কিন্তু এই জাতীয় গ্রন্থে তা অনিবার্য। লেখকের গ্রন্থের উপ-নাম বা সাব-টাইটেল হল আমার জন্মভূমি—জননী ও জন্মভূমি আবেগের বস্তু একথা কে অস্বীকার করবে?

সত্যেন সেন বিক্রমপুরের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তান। কিশোর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেছিলেন পরে বিপ্লবীদলের কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৮ পর্যন্ত তিনি রাজবন্দী ছিলেন এবং কারাভ্যন্তরে মার্কসবাদী দর্শনে আগ্রহী হয়ে পড়েন। ১৯৪৯ থেকে তিনি বার বার প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টিতে পড়ে কারাবরণ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই কারান্তরালে রচিত। এপর্যন্ত প্রায় চৌদ্দখানি উপন্যাস তিনি লিখেছেন, দুঃখের বিষয় এপার বাংলায় তার একখানিও ইতিপূর্বে আসে নি। সম্প্রতি তাঁর 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' নামক উপন্যাসদুটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। যথাসময়ে সেই উপন্যাস দুটির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। সত্যেন সেন রচিত আলোচ্য গ্রন্থটির নাম "প্রতিরোধ সংগ্রামে বাঙলাদেশ"। এই গ্রন্থে লেখক বীরপ্রসবিনী চট্টলা, খুলনার মুক্তিযুদ্ধ, বড়কামতা, সাটিয়াবাড় ও মধুপুরগড়ের যুদ্ধ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এমন অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন এপার বাঙলায় যার এক কণা সংবাদও এসে পৌঁছায় নি। ইকবাল-ভাই, বীরকন্যা তোমাকে সেলাম, তিতুর সেই গানটি প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি লেখকের লিপিকুশলতার পরিচায়ক। এই গ্রন্থের অন্তর্গত উল্লিখিত ঘটনাবলীর একটিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পরস্পরসংযুক্ত এইসব ঘটনার মধ্যে শ্রমিকআন্দোলন ভাষাআন্দোলন ও মুক্তিআন্দোলনের একটা যোগসূত্র বর্তমান। সত্যেন সেন এক বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস "প্রতিরোধ সংগ্রামে বাঙলাদেশ" এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলেন যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আহমদ ছফা তরুণ লেখক, তিনি বাঙলাদেশের মুক্তিআন্দোলনের মাঝে কলিকাতায় বসে "বাঙলাদেশের সংগ্রামের আসল চিত্রলেখা" হিসাবে রচনা করেছেন—"জাগ্রত বাঙলাদেশ"। তিনি অসুস্থ অবস্থায় এই গ্রন্থ রচনা করেছেন তাই কারো সঙ্গে আলোচনা না করে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার পূর্ণ করেছেন তাঁর 'জাগ্রত বাঙলাদেশ'কে। এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। তিনি ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন—"গ্রন্থের লেখক আহমদ

ছফা বয়সে তরুণ, কিন্তু তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি পরিণতি লাভ করেছে। সেইজন্য তাঁর ভাষা আবেগময়ী অথচ বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল।" এই কারণে বাঙলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের এই ইতিহাস রচনায় তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাণের আবেগ। আহমদ ছফার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরালো। তিনি মাত্র তিনটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেছেন এবং এইগুলির মধ্যে 'সংস্কৃতির জীয়নকাঠি' নামক অধ্যায়টি অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও লিপিকুশলতার পরিচায়ক। শুধু এই বিষয়টি নির্ভর করে তিনি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। 'জাগ্রত বাঙলাদেশ' ডকুমেন্টারী রচনা হলেও সাহিত্যরসসমৃদ্ধ।

গাজী উল হক বয়সে তরুণ। তিনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' সম্পর্কে প্রখ্যাত প্রকাশক ত্রিদিবেশ বসুর কাছে কিছু আলোচনা শুনেছিলাম। ইতিমধ্যে এই সুমুদ্রিত এবং চিত্রভূষিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক হয়ত এতদিনে সদামুক্ত বাঙলাদেশে চলে গিয়েছেন তাঁদের স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হয়েছে—এই আনন্দ শুধু তাঁর একার নয় স্বাধীনতাপ্রিয় কোটি মানুষ এই আনন্দের অংশভাগী। গাজী উল হক তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন। বাঙালীর বৈপ্লবিক প্রকৃতির বৃত্তান্ত দিয়ে। ১৯০৫-এর কাহিনী তাই তিনি স্মরণ করতে ভোলেন নি। বাঘা যতীন, গোপীনাথ, প্রমোদ চৌধুরী, সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, দীনেশ, বিনয়, বাদল, রাজেন লাহিড়ী, প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র এবং আই-এন-এ প্রভৃতি অখণ্ড ভারতের যাবতীয় বিপ্লবী বীরদের তিনি গ্রন্থারম্ভে স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন 'বাঙলাদেশ লড়েছে। লড়েছে মুক্তির জন্যে, বাংলার মুক্তির জন্যে সারা ভারতের মুক্তির জন্যে। বার বার যে আঘাত খেয়েছে, কিন্তু আঘাত খেয়ে আহত পাখীর মতো আর্তনাদ করেনি, ব্যর্থতার ক্রন্দনে ভেঙে পড়েনি।' তারপর তিনি ২৫শে মার্চ তারিখের নির্দেশের উল্লেখ করে পূর্ব-বাংলার মানুষ কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে শোষিত হয়েছেন তার বৃত্তান্ত লিখেছেন। বঞ্চনার ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সহযোগে 'সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ ও প্রতিরোধ' ও 'চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম' এই দুটি পরিচ্ছেদ অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে লিখিত হয়েছে। আবেগমুক্ত বলিষ্ঠ ভাষায় লেখক স্বীয় বক্তব্য সুস্পষ্ট করেছেন। এছাড়া 'ছয় দফাঃ স্বাধীকারের সংগ্রাম' নামক অধ্যায়টি এই গ্রন্থের মধ্যমণি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস-রচনায় এই গ্রন্থটির সাহায্য অপরিহার্য।

ওপার বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে বদরউদ্দীন উমর সুপরিচিত নাম। যুক্তি ও তথ্যের অপূর্ব সমাবেশে তাঁর রচনাবলীর সাহিত্যিক মূল্য অসীম। 'সাম্প্রদায়িকতা' নামক তাঁর গ্রন্থটি ১৯৬৬-তে ঢাকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং আলোচ্য সংস্করণটি কলিকাতায় মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে লেখক 'ভারতবর্ষে বৃটিশের ক্ষমতা ও হস্তান্তর' নামক একটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত করেছেন। তিনি মুখবন্ধে লিখেছেন—'আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম নিষ্ঠার মধ্যে যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে এ ধারণা যে বিভ্রান্তিমূলক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু তাই নয়। এ বিভ্রান্তি যে বহুলাংশে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির উৎপত্তি সেটাও যথযথ ভাবে প্রমানিত হয়।'

ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদেশিক শাসকচক্র এই বিষাক্ত অস্ত্রটি বিশেষ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে বার বার। শেষকালে দেশত্যাগের সময় সেই বিষবড়িটি দেশবিভাগের কাজে প্রয়োগ করেছে। গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি, ভারতে বৃটিশের ক্ষমতা দখল ও হস্তান্তর নামক অধ্যায়গুলি সুলিখিত এবং এপার বাংলার মানুষের কাছে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করবে। পরিশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগীতে রচিত সমালোচনার জবাবটিতে লেখক যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তা অব্যর্থ। 'সাম্প্রদায়িকতা'র কলিকাতা সংস্করণের প্রকাশে আমরা আনন্দিত।

—অভয়ংকর

---

(১) স্মৃতিময় বাঙলা আমার জন্মভূমি—ধনঞ্জয় দাশ। মুক্তধারা, ৯, এন্টনবাগান লেন। কলিকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

(২) প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলা—সত্যেন সেন। মুক্তধারা, ৯, এন্টাবাগান লেন। কলিকাতা-৯। ছয় টাকা।

(৩) জাগ্রত বাংলাদেশ—আহমদ ছফা। মুক্তধারা, ৯, এন্টনিবাগান লেন। কলিকাতা-৯। তিন টাকা।

(৪) এপারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—গাজী উল হক। পরিবেশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিঃ কলিকাতা-৭। আট টাকা।

(৫) সাম্প্রদায়িকতা—বদরউদ্দীন উমর। নবপত্র প্রকাশন. ৫৯, পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

নতুন বই

সম্রাটের ছবি (ছোটগল্পের সংকলন)—আবদুল গফ্ফার চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক মুক্তধারা, ৯, অ্যান্টনিবাগান লেন, কলিকাতা-৯। ছয় টাকা।

'সম্রাটের ছবি' কলকাতার পাঠকের কাছে নতুন, কিন্তু এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ঢাকায়' ১৯৫৯ সালে।

আবদুল গাফফার চৌধুরী শুধু ওপার বাংলায় খ্যাতিমান লেখক নন, ইদানীং এপার বাংলায় প্রভূত যশ অর্জন করেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মারফৎ। কলকাতার পাঠকের কাছে তাঁর পরিচিতি সাংবাদিক হিসেবে কিন্তু 'সম্রাটের ছবি'র গল্পগুলে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয়। দুই দশকের 'বাংলাদেশের' সমাজচিত্র ধরা পড়েছে এই গল্প সংকলনে। চোদ্দটি ছোট ও বড় গল্পে আমরা দেখি ওপার বাংলার মধ্যবিত্ত ও চাষী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের ছবি।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের খান-বাহাদুরদের রাজভক্তি দেখা যাবে সম্রাটের ছবি গল্পে। রিজিয়া ও মনসুরের সময়ের ধাপে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিধ্বনিও শোনা যাবে ওই গল্পে। তেমনি দেখা যাবে নীলকমল গল্পে শমশের আলীর অবক্ষয়-প্রাপ্ত জমিদারীর মনোবৃত্তি। যেখানে কামনা লালসাই প্রকট। কুমকুম গল্পের নায়িকা কুমকুমকে যতখানি প্রগলভ করে তুলেছেন লেখক, ঠিক ততখানি সে নয়, তার প্রকাশ তিনি চিত্রিত করেছেন অতি সুকৌশলে।

অধিকাংশ গল্পের মধ্যে লেখক মনোবিজ্ঞানের 'সেক্স কমপ্লেস' বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন, 'চেহারা' গল্পের লক্ষ্মীর চরিত্রই তার প্রমাণ। এমনি বহু চরিত্র চোখে পড়বে।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক স্রোত, রুদ্ধ মধ্যবিত্তের প্রতিবাদ চরিত্র পরিগ্রহ করেছে এই গল্প সংকলনে। লেখার স্বচ্ছ ও সাবলীল ভঙ্গী যে কোনো পাঠক সাদরে গ্রহণ করবে বলে আমাদের আশা। বই-এর ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ মনোরম।

আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার (কাব্যগ্রন্থ)—বার্ণিক রায়। পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

সবে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরুলেও প্রথম কবিতা লিখছেন না বার্ণিক রায়। এরই মধ্যে তিনি শব্দ ও সময় সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন নিজস্ব পরিমণ্ডল তৈরী করে। অবশ্য তাঁর সময়চেতনা কিছুটা এলিয়টী ধাঁচের, কিছুটা সাম্প্রতিকতায় আচ্ছন্ন ও রহস্যময়। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি নিজের পরিচয়কে সম্প্রসারিত করেছেন তেতাল্লিশটি কবিতা লিখে। দু'একটা কবিতা তো পঞ্চাশের দশকে লেখা।

'আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার' পড়তে পড়তে মনে হয়, আশ্চর্য এক স্বপ্নের জগতে তিনি বাস করছেন। তাঁর দৃষ্টি সামনে নয়, পেছনে নয়, অন্তরে নিবদ্ধ। এই কাব্যগ্রন্থে অনুভব করি—আলো অন্ধকারের দ্রুত পরিবর্তন, সূর্যাস্তের প্রচণ্ড গমোট, যৌবনের প্রচণ্ড হাহাকার। শুনি, নাগরিকতার চাপে বিধ্বস্ত এক প্রেমিকের আর্তনাদ, যে-প্রেমিক ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নর্দমার জলে নিজের মুখ দেখেছে বারবার। যদিও এই কাব্যগ্রন্থে শাশ্বত সত্যের পুনরুদ্ধারে তিনি শিথিলধী হতে চেয়েছেন প্রায় সবসময়। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করি তাঁর একটি গদ্য-কবিতার কয়েকটি লাইন: "বুকের তরল আগুন মদের রসে কালো হয়ে গেছে।......আর রক্তের আগুনে ধূমায়িত কালি আমাদের চেতনার গভীরে মদের তিক্ত জ্বালা নিয়ে ফাঁসিকাঠে-ঝোলা মৃত নদীর চর জাগিয়ে হাসছে। চরের বালি জ্যোৎস্নায় ফাল্গুনের সমুদ্র হয়ে গেছে।"

অর্থাৎ, বার্ণিক রায় ঘনিষ্ঠ বাস্তবের কাছাকাছি থেকেও প্রচণ্ডরকমে রোম্যান্টিক, প্রেমিক ও আত্মসমালোচক। হয়তো বা ছন্দ-দার্শনিকও। শহুরে মানসিকতার মধ্যে থেকেও নীল আলো, নদীর চর, অন্ধকারে প্রবাহিত নদী ও জন্মমৃত্যুর রহস্যময় ছোঁয়ায় বারবার জেগেছেন, দুঃখিত হয়েছেন, উজ্জীবিত হয়েছেন। তাঁর এই উপলব্ধির মূলে আছে দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে পরিচয়ের আভাস। অন্তত এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক পংক্তিতে, ফুট-নোটে ও বাক্যাংশে ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত ও লৌকিক অনুষঙ্গের উদ্ধৃতিতে এই রকমই একটা ধারণা হয়। কখনো কখনো তিনি ছন্দের গুরুত্বকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেছেন ছবি তৈরী করার প্রলোভনে, আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে কিংবা রূপকল্পকে অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে। অতি ব্যবহৃত গদ্যময়, পংক্তিগুলি ক্লান্তিকর:

তবুও বইটি সকলের কাছেই ভালো লাগবে। সনেটের গাঢ় বন্ধন ও গদ্যের এলানো ভঙ্গি—উভয় ক্ষেত্রেই বার্ণিক রায় স্বতঃস্ফূর্ত।

অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে (ভ্রমণকাহিনী)—সুরেশচন্দ্র সাহা। প্রকাশভবন, কলকাতা-১২ : ৫-৫০ পঃ।

বাজারে ভ্রমণকাহিনী অনেক পাওয়া যায়। চটকদার বিবরণও কিছু তাতে যে না থাকে তা নয়। কিন্তু চোখকান খোলা রেখে ভ্রমণ-বিবরণ লেখার নমুনা খুব বেশী দেখা যায় না। সুরেশচন্দ্র সাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে সেই খোলা চোখকানের সন্ধান পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ার অনেকগুলি প্রধান শহর, শহরতলী এবং গ্রামগুলি তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। তাই ভ্রমণকাহিনীতে একটা নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন সেখানকার চাষবাস, বাগান, মেষপালন, ডেয়ারি ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ বিবরণ আছে, তেমনি আছে নয়াজমানার তরুণ-তরুণীর চাল-চলনের রূপরেখা, সামাজিক সমস্যা, বিদেশাগত বাসিন্দাদের সমস্যা ইত্যাদি। এসবগুলিই লেখকের পরিচিত কোন না কোন চরিত্রকে অবলম্বন করে রচিত। ফিনু যুবক চিলহলের খামখেয়ালি, মালয়ের পুত্রয়স্বামীর অস্ট্রেলিয় সংসার, গ্রীক সাইগ্রান্ট বুইগিরিসের অকারণ অসন্তোষ, আদিবাসী সম্পর্কে সামান্যকিছু তথ্যও বাদ দেওয়া হয়নি। আর সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেশন করেছেন সিডনির বাঙালী ব্যবসায়ী মহিলা জ্যোতিরাণী রায় ওরফে মধুরাণীর জীবন ও ব্যবসায় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ কাহিনীর মাধ্যমে। এই দূরদেশে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য এবং ভারতীয় খাদ্যকে জনপ্রিয় করে যেভাবে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করছেন তা সত্যিই তারিফ করার মত। সিডনিতে তিনি একটি ইনস্টিটিউশন বিশেষ। লেখকের মুন্সিয়ানা এবং অনুভূতিশীল চোখের দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন বইটি যে সমাদর লাভ করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

চাঁদের গুঁড়ো (গোয়েন্দা-কাহিনী)—নৃপেন ভট্টাচার্য। মনালোক, ৭ অ্যান্টনীবাগান লেন, কলকাতা-৯। এক টাকা।

ক্ষীণাকারে হলেও জমিয়ে কাহিনী ফেঁদেছেন লেখক। আগাগোড়া কৌতূহল বজায় রেখে পরিশেষে অপরাধীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। হাল্কা কাহিনী। পাঠকদের বইটি ভালো লাগবে।

আর্ট অফ সুনীলমাধব সেন: অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারী কোং, ১৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিঃ ১৬। মূল্য : ২০·০০ টাকা।

১৯৪৩ সাল প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা যখন নতুন প্রকাশভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তখন শিল্পী সুনীলমাধব সেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম সদস্য। সেই গোষ্ঠীর শিল্পীরা আজ নিজের নিজের রীতিতে শিল্পচর্চা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সুনীলমাধব সেনও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছেন। ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পরীতি এঁদের সকলকেই আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু শেষকালে এঁদের অনেকেই স্বদেশামুখী হতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুনীলমাধবকে লোক-শিল্প অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। তাই আধুনিক হলেও ট্র্যাডিশনের আওতা এড়াবার চেষ্টা তিনি করেন নি। আজকে ষাট বছর বয়সেও অদম্য উৎসাহে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তিনি পেছপাও হন না। ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের প্রভাবও তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর এই ষোল-খানি ড্রয়িং ও পেন্টিং-এর সংগ্রহে যেমন একদিকে পিকাসোর ড্রয়িংয়ের প্রভাব দেখা যায়, অন্যদিকে আদিবাসী শিল্পরীতির বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীও সগৌরবে উপস্থিত থাকতে দেখি। সূক্ষ্ম কলমের রেখায় ও পাতলা ওয়াশে করা কয়েকটি সাবলীল ভঙ্গীর নারীমূর্তি, আদিম শিল্পরীতির তৈরী দশভুজার গতিময় রেখামূর্তি বইটির অন্যতম আকর্ষণ—মুদ্রণ পারিপাট্যে বইটি শিল্পরসিকদের কাছে লোভনীয় বলে বিবেচিত হবে।

আর্টিস্ট: রাজেশ্বর হাজরার কবিতা ও অসিত পালের গ্র্যাফিক। ২৬ ডক্টর লেন, কলিঃ ১৪, মূল্য : ৩-০০ টাকা।

আধুনিক কবি ও শিল্পীর সমবেত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত বই বড় একটা দেখা যায় না। সেদিক দিয়ে এই সংখ্যাটির গুরুত্ব আছে। রাজেশ্বর হাজরা তরুণ কবি হিসাবে পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর দশখানি কবিতার স্বকৃত ইংরিজী অনুবাদের সঙ্গে প্রতিটি কবিতার ওপর ভিত্তি করে শিল্পী অসিত পালের ফ্ল্যাট ডেকরেটিভ গ্র্যাফিক-গুলি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। কবিতা-গুলির অনুবাদ সম্পর্কে মাঝে মাঝে একটু খটকা লাগে বটে, তবু ভাষান্তরিত করার দুরূহতার কথা চিন্তা করলে কাজটি মোটা-মুটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বলা চলে। গ্রন্থসজ্জা ও টাইপ সাজানো প্রশংসনীয়। শুধুমাত্র সাদা কালোয় অসিত পাল বেশ সুগঠিত ডেকরেশন সৃষ্টি করেছেন।

রামায়ণ মহাভারতের গল্প। সম্পাদনা : শিবশংকর। মনালোক, ৭ অ্যান্টনি-বাগান লেন, কলকাতা-৯। এক টাকা।

ছোটদের উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের অজস্র কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প লিখেছেন জনসাতেক লেখক। গল্পগুলি শুধু ছোটদের নয়—বয়স্কদেরও ভাল লাগবে। শিল্পী চিত্ত সরকারের প্রচ্ছদ ও কাহিনী-চিত্রণে মুন্সিয়ানা আছে।

অ্যান ইণ্ডিয়ান স্কেচ বুক—হরিলাল. অক্সফোর্ড ও ইণ্ডিয়া বুক হাউস পাব্লিশিং কোং, ১৭ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য ১০-০০ টাকা।

চিত্রাংকন শিক্ষার বিলিতী বইয়ের অভাব নেই। দেশীয় শিল্পীরা এদিকে মন দিয়েছেন বটে কিন্তু এখনো উল্লেখযোগ্য বই বড় একটা দেখা যায় নি। শিল্পী হরিলাল এ কাজে হাত দিয়েছেন। স্কেচিং ও ড্রয়িং শিক্ষার যে বইটি তিনি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন তাতে শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। পেন্সিল ধরা থেকে শুরু করে প্রতিকৃতি, স্পট স্টাডি, স্কেচ, কম্পোজিশন, দেহাকৃতি অংকন, স্থাপত্য চিত্র ও পথঘাটের দৃশ্যাবলীর অংকনরীতি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনমত কালি কলম বা পেন্সিলে আঁকা সুন্দর নিদর্শন উপস্থিত করতে কোন কার্পণ্য করা হয়নি।

ব্রজদাস ঘোষের বাঙালীর কবিতা : প্রকাশক : পুনশ্চরণ সাহিত্য গোষ্ঠী রামনগর, হাওড়া—৫। দাম : তিন টাকা।

কবির এক দশকের কবিতার একটি পুনর্নির্বাচিত সংকলন। মোট বিশটি কবিতা আছে, কয়েকটি স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ, কয়েকটি সম্পূর্ণরূপে কাব্যধর্মী। কবিতাগুলিতে কবির একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ সুর অপরিবর্তিত থাকলে কবি অগণিতের মধ্যে হারিয়ে যাবেন না।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

একাল (ডিসেম্বর, ১৯৭১)—সম্পাদক : নকুল মৈত্র ও ভরত সিংহ। ২৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা—৩৭। পঞ্চাশ পয়সা।

লিটল ম্যাগাজিন পড়ার আবেদন জানিয়ে পত্রিকাটির নামপত্রে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে : "সব লিটল ম্যাগাজিনই লিটল ম্যাগাজিন নয়।" অর্থাৎ সাবধান, যা তা পড়ে সময় নষ্ট করবেন না। একটা বুক রিভিউ ছাড়া এ সংখ্যায় অন্য কোনো প্রবন্ধ নেই। গল্প লিখেছেন কৃষ্ণ মন্ডল, দিলীপ সেনগুপ্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, মনোজ নন্দী ভরত সিংহ, রমেন্দ্র রায়, যীশু চৌধুরী, নকুল মৈত্র। এবং পুস্তক সমালোচনা লিখেছেন মানিক গোস্বামী। লেখাগুলির মধ্যে ক্রোধ, বিষণ্ণতা ও তুখোড় শব্দ প্রয়োগ সবই আছে। তরুণদের ভালো লাগবে। আর প্রবীণেরা ক্ষিপ্ত হবেন।

অভিনয় (সেপ্টেম্বর—নভেম্বর) সম্পাদক : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ সাধু গদ্যে লেখা সম্পাদকীয়টি নাটকীয় এবং চমকপ্রদ। হয়তো বা তির্যকও! এ সংখ্যার চাঞ্চল্যকর খবর—জাতীয় নাট্যশালার দাবীতে রবীন্দ্রসদন কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে মন্মথ রায়ের পদত্যাগ পত্রের পূর্ণ বয়ানটি ছাপা হয়েছে শেষের দিকে। উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবীর মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সরোজ রায়, রাধারমন ঘোষ, গোপাল দে, শিশির বসু, বোম্মান বিশ্বনাথম, প্রণব চক্রবর্তী, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, অমিয় সান্যাল এবং আরো কয়েকজন। দেশবিদেশের মঞ্চ, অভিনয় ও অভিনেতা সংক্রান্ত সংবাদ, একাংক নাটক এবং নাটকের সমস্যা সম্পর্কে নানারকম আলোচনায় সংখ্যাটি আকর্ষণীয়।

কালি ও কলম (তারাশংকর স্মৃতিসংখ্যা)—সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা : ১২। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ঠিক এক বছর আগে 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিসংখ্যা' বের করে 'কালি ও কলম' আমাদের চমকে দিয়েছিলেন, কয়েকটি বিশিষ্ট লেখা উপহার দিয়ে। এ সংখ্যাটির গুরুত্বও পাঠকের কাছে ঐতিহাসিক। এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য 'কালি ও কলম' চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ তারাশংকরের বিষয়ে ভবিষ্যতে যাঁরাই আলোচনা ও গবেষণা করবেন, এ সংখ্যাটি হবে তাঁদের কাছে অপরিহার্য। তারাশংকরের সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়, বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা, সমকালীন ও অনুজ কবিসাহিত্যিকদের চোখে তিনি কেমন ছিলেন—তার একটি সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে এই সংকলনের বিভিন্ন লেখায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা লিখেছেন—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (বন্ধুবৎসল তারাশংকর) বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র (চক্ষুদান), দক্ষিণারঞ্জন বসু (মাতৃভাষাপ্রেমিক তারাশংকর), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (এক সহিত্য সম্রাট), ভবানী মুখোপাধ্যায় (বহু বিচিত্র তারাশংকর), জরাসন্ধ (তারাশংকর ও রাঢ়দেশ), সন্তোষকুমার ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, বিশু মুখোপাধ্যায় (কবি তারাশংকর), গৌরাঙ্গ ভৌমিক (কয়েক প্রহরের স্মৃতি), গৌরীশংকর ভট্টাচার্য (তারাশংকর ও সাহিত্যের অধিকার), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (ব্যবসায়ী তারাশংকর), সতীকান্ত গুহ (তারাশংকর : আমার চোখে), উজ্জ্বল মজুমদার, স্বারেশ শর্মাচার্য (তারাশংকর মানস), সুমথনাথ ঘোষ এবং আরো অনেকে। প্রতিটি লেখাই মূল্যবান। বিশেষ করে পরলোকগত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাটি সময়োপযোগী এবং অবাঙালী লেখকদের লেখার অনুবাদগুলি পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রত্যেক সৎ পাঠকের কাছে এই সংখ্যাটি মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

(আঠার)

ভয় তারককেই বেশী। ও যে কতটা জানে, কতটা বুঝেছে সেটাই ধরতে পারে না হেমন্ত। বিশেষ এই কমলাক্ষর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর থেকে আরও যেন এই ভয়টা বেড়েছে। ওর অপরাধী মন কেবলই ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তার মনটা বোঝার চেষ্টা করে। কমলাক্ষকে সামলানো শক্ত। দুবার সে, তবু হেমন্ত কঠিন হয়ে থেকে তাকে রাজী করিয়েছে—তারক যখন থাকবে, যে কদিন—সে কদিন সে আসবে না। এসে পড়লেও অত্যন্ত সংযত সহজ-ভাবে কুশল প্রশ্ন করেই চলে যাবে।

তবু হেমন্তর কেবলই মনে হয়—ছেলে অনেক কিছুই বোঝে, বুঝছে। যা দেখছে না তাও অনুমান করে নিচ্ছে।

তারক যে সাধারণ ছেলের মতো নয়—ভয়টা সেইখানেই। দারিদ্র্যে, সংসারের কদর্য নগ্ন রূপ দেখে দেখে, নানান আশ্রয়ে, নানান মানুষের মধ্যে থেকে বয়সের অনুপাতে অনেক যেন বেড়ে গেছে ছেলেটা, মনে মনে প্রবীণ হয়ে উঠেছে।

তবু, সে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাটা কতদূর, পূর্ণবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটা কী রকমের—তাও জানে কিনা, বুঝতে পারে না হেমন্ত।

প্রশ্নও করতে পারে না, কেবলই ওর অনুমানটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে, আর মনে মনে সংকুচিত হয়।

অবশ্য পূর্ণবাবুর আসাটা সয়ে গেছে ওর। মেনেই নিয়েছে কতকটা। অভিভাবক হিসেবে বা উপকারী হিতাকাঙ্ক্ষী রূপেই হয়ত। যা-ই ভাবুক, তিনি যে এ সংসারের একজন কর্তৃস্থানীয়—তা আর মেনে না নিয়ে উপায়ও নেই।

কিন্তু কমলাক্ষ? তার সম্বন্ধে কি ধারণা ওর? নিজেকেই বার বার প্রশ্ন করে আর সংশয়ে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়।

এ সংশয়ের কারণও ছিল।

খুবই শান্ত আর চাপা ছেলে তারক। সেই জন্যে তার সামান্য অস্বাভাবিক আচরণও চোখে পড়ে।

বাগানবাড়ি থেকে ফেরার প্রায় দশদিন পরে একটা শনিবার তারক বাড়ি এল। তখন কিছু লক্ষ্য করেনি হেমন্ত, খানিক পরে দেখল কেমন যেন একটু অবাক হয়ে হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছে।

কেমন খটকা লাগল ওর। প্রশ্ন করল, 'কী দেখছিস রে খোকা, আমার মুখের দিকে চেয়ে অমন করে? কিছু লেগেটেগে আছে?'

হঠাৎ যেন খুব লজ্জা পেল, মায়ের কোলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মুখ লুকোল।

'ও কি রে! এই পাগলা! এতে আবার এত লজ্জার কি হল!......কী ব্যাপার বল তো?'

জোর করে মুখটা তুলে ধরল সে ছেলের।

অনেক ইতস্তত করে আস্তে আস্তে বলল, 'অনেক—অনেকদিন পরে তোমাকে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে। ভারী ভাল লাগছে তাই।......তোমাকে খুব সুন্দরও দেখাচ্ছে!'

'দূর পাগল!......রাঙা হয়ে ওঠে হেমন্তও, 'ছাই সুন্দর দেখাচ্ছে! সুন্দরের কি বুঝিস তুই?......কোনদিন আমার দিকে ভাল করে তাকাস না তাই, তাই যেদিন তাকাস—নতুন লাগে। আমি যা তা-ই আছি!'

বলে কিন্তু গলায় তেমন জোর পায় না।

কিছুতেই যেন স্বাভাবিক হতে পারে না, গলা কেঁপে কেঁপে যায়, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও।

কারণ তার বুকের মধ্যে কাঁপছে তখন। কী দেখছে ছেলে কে জানে, কতটা দেখছে। ......এমনিই দেখে নাকি?

সে যে ভেবে বসে আছে, ধরে নিয়েছে যে, তার নতুন প্রেমের বন্যায় পরিতৃপ্তির সমস্ত চিহ্ন সে মুখ থেকে, আচরণ থেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছে—কোন আবেগের আনন্দের লেশমাত্র নেই কথা-বার্তায়, মুখের ভাবে—অন্য দিনের মতোই সহজ ও সাধারণ হয়ে উঠেছে আবার।

অথচ এ ছেলেটা দেখা মাত্র বুঝতে পেরেছে, ওর মধ্যে কী একটা বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেছে—বিবেক-বিবেচনা, শংকা, লোকলজ্জা, ভবিষ্যতের চিন্তা, সব যেন বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে, প্রবৃত্তির স্রোতে, সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে, ভেসে চলেছে!

তবে কি সে চিহ্ন মুছে ফেলা যায় নি?......

ওর এ জীবনে এই প্রথম দৈহিক আনন্দের স্বাদ পেয়েছে বলতে গেলে, ভালবাসা বা প্রেম কি, উদ্দাম আবেগ কাকে বলে বুঝতে পেরেছে; এই প্রথম যে জীবনকে অনুভব করছে, উপভোগ করছে, সেই জন্যেই কি সে আনন্দ স্নায়ুতে শিরাতে দৃষ্টিতে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, এমন চঞ্চল চটুল উন্মত্ত করে তুলেছে তাকে যে—এই কাঁচা বালকটাও দেখা মাত্র তা বুঝতে পেরেছে?

আরও বুক কাঁপে ওর পূর্ণবাবুর কথা ভেবেও।

এ ছেলেটা যা এত সহজে দেখতে পেল—তিনি কি তা পারেন না?

ভয় নিজের জন্যে নয়—এ আনন্দ এ তৃপ্তি গোপন রাখতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় কোন চারতলা বাড়ির ছাদে উঠে চেঁচিয়ে সকলকে বলে, 'আমি ভালবাসা পেয়েছি, আমাকে একটি সুন্দর কৃতবিদ্য তরুণ ছেলে প্রাণ দিয়ে প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছে—আমারও যে কিছু মূল্য আছে এ সংসারে, আমাকে পেয়েও যে কেউ এমন সুখী হয় তা তার চোখের দিকে চেয়ে জেনেছি।'

কিন্তু বলতে পারে না—কাউকেই বলতে পারে না, বরং ঢেকে রাখতে হয়, মুখোশ পরতে হয়—কমলাক্ষর কথা ভেবেই। পূর্ণবাবু তার সহায় থাকলে অনেক উন্নতি করতে পারবে। তেমনি অনিষ্ট করার শক্তিও তাঁর অসাধারণ।

তবে তারকের জন্যেই বেশী ভয় ওর।

সেদিনের পর থেকে কেবলই লক্ষ্য করে ছেলেকে, লক্ষ্য করে সে কিছু বুঝতে পারছে কিনা।

কিন্তু তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না আর। সেই প্রথম দিনের সে হঠাৎ বিস্ময় প্রকাশের পর থেকে যেন তার মুখে কুলুপ পড়ে গেছে, প্রশান্ত স্বাভাবিকতার মুখোশ পরেছে সে। তার মাও আর সে মুখোশ সরাতে পারে না, পারে না মনের তলায় গিয়ে পৌঁছতে। ...একথা সেকথায় ঐ বর্ম ভেদ করার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে কথার ছলে কথা বার করতে, পারে না। ঐটুকু ছেলে, এগারো বারো বছরের—কিন্তু কী সহজেই না কথাগুলো এড়িয়ে যায়, তার সরল সহজ উত্তরের ব্যূহ ভেদ করে মনের গভীরে পৌঁছনো যায় না কিছুতেই।

কখনও কখনও মনে হয়—কেন যে মনে হয় তা বলতে পারবে না ঠিক—সবই জানে, সব বুঝেছে তারক। বুঝে জেনেই মাকে ক্ষমা করেছে সে। হয়ত—তার যা পরিণত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা—সব দিক ভেবে বিচার করেই ক্ষমা করেছে। উষ্মা বা বিরক্তি বোধ হলে মার হয়েই যুক্তি প্রয়োগ করে, তার হয়ে কৈফিয়ৎ দেয়। ভাবে, অনেক দুঃখ পেয়েছে অভাগিনী, অনেক জ্বালায় জ্বলেছে, অনন্যোপায় হয়েই এই পথে নামতে হয়েছে তাকে।...আর, আর—যে একবার পাপের পথে অন্যায়ের পথে নামে তার আরও গভীর পাঁকে নামতে বাধা কি? নামার পথ তো সোজা, আপনিই নামে মানুষ, অনায়াসে নামে—অনেক সময় অনিচ্ছাতেও নামে। আর এ জীবনে সুখী হবার অধিকার, জীবনকে ভোগ করার অধিকার তো সকলেরই আছে—তার মায়েরই বা থাকবে না কেন? যদি এতদিন পরে বেচারী দুটো দিনের জন্যে সুখের মুখ দেখেই থাকে তো দেখুক—ছেলে হয়ে সে অন্তত এ জন্যে মায়ের বিচারক হয়ে বসবে না।

কে জানে সত্যিই তারক এই রকম ভাবে কিনা।

হয়ত নিজের সংশয় ও দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবারই উপায় এটা, সাময়িক সান্ত্বনা। নিজের সুবিধের জন্যেই এই মনোভাব আরোপ করে ছেলের ওপর কিম্বা বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ।

কমলাক্ষ আজকাল প্রায়ই গভীর রাত্রে আসে। সাড়ে দশটার পর—যখন কোন কারণেই পূর্ণবাবুর থাকার সম্ভাবনা নেই। রাত্রে থেকেও যায় এক একদিন। যে সব দিন কোন লাগসই কারণ—কৈফিয়ং দিয়ে আসতে পারে বাড়িতে।

চাকরবাকরদের কাছে আড়াল রাখতে পারে নি হেমন্ত, তাদের বিশ্বাস করতেই হয়েছে। প্রথম প্রথম যেন লজ্জায় মাথা কাটা যেত, দারোয়ান ঝিয়ের সামনে দাঁড়াতে পারত না। তাদের চোখে চোখ পড়ার সম্ভাবনা সযত্নে এড়িয়ে যেত। তারপর সব সয়ে গেছে। আগে আগে হেমন্ত অবাক হয়ে ভাবত—যে সব মেয়েরা এ পথে এসেছে, তারা কেমন করে মাথা উঁচু করে বেড়ায়, কেমন করে সহজ স্বাভাবিকভাবে মেশে লোকের সঙ্গে। প্রথম প্রথম নিজের দিকে চেয়েও অবাক লাগত। এখন বুঝতে পারে এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় এটা, লজ্জার প্রথম বাধাটা লঙ্ঘন করতে পারলে, চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে আর তেমন অসহ্য মনে হয় না।

এখন তাই দারোয়ান, ঝি, ঠাকুর—সকলেই জেনে গেছে। তারা বরং কমলাক্ষকেই বেশী খাতির করে, ভালবাসে। সুন্দর চেহারার জন্যেও বটে, মিষ্ট ব্যবহারেও বটে। টাকাকড়িতেও মুক্তহস্ত সে। এই বয়সেই ভাল রোজগার করছে, অর্থ সম্বন্ধে কোন কৃপণতা নেই তার। দারোয়ান দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে আজকাল—কমলাক্ষ রাত্রে নিজের গাড়িতে আসে না, ওর মতো সরল ছেলেও এসবগুলো শিখে গেছে কেমন আপনা থেকেই, কোচম্যান জানলে বাড়ির লোকদেরও জানতে দেরি হবে না—তাই সইস কোচম্যানের সারাদিন খাটুনির অজুহাতে তাদের ছেড়ে দিয়ে ভাড়াটে গাড়িতে আসে, কাছাকাছি কোন রোগী থাকলে কাজ সেরে হেঁটেই আসে—

ওর সামান্য পায়ের আওয়াজ পেলেই দারোয়ান দোর খুলে দিয়ে হেসে সেলাম করে, অর্থাৎ 'চলে আসুন। কোন ভয় নেই।'

যেদিন হেমন্ত না থাকে, সেদিন দূরে থেকেই হাতের ভংগীতে বুঝিয়ে দেয়—পাখী নেই। একদিন হঠাৎ কি কারণে তারক বেবারেই এসে গিয়েছিল—কি একটা বিশেষ ছুটিতে, হেডমাষ্টার রসময়বাবু নিজের গাড়িতে করে এনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—সেদিন দারোয়ান ছুটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সংবাদটা জানিয়ে সাবধান করে দিয়ে এল, 'আজ বাড়ি যান ডাক্তারদাদাবাবু, খোকাবাবু এসে গেছেন।'

সুতরাং এসব দিক থেকে আর কোন অসুবিধা নেই।

কমলাক্ষ এসেই শুয়ে পড়ে সটান। কোন কোন দিন হেমন্তর কোলে মাথা দিয়েই শুয়ে পড়ে। তবে বেশীক্ষণ না, হেমন্তর সেবা খাবার দারুণ লোভ ওর। কোলে শুয়ে থাকলে সেও আটকে থাকে—এটা যেদিন থেকে বুঝেছে, সেদিন থেকেই আর কোলে মাথা দিয়ে শোয় না বেশিক্ষণ। হেমন্ত হাসে অতবড় লোকটার ছেলেমানুষী দেখে। সে ওর মোজা খুলে দেবে। (কী ভাগ্যি জুতোটা পরে ঘরে আসে না, সেও হেমন্ত বারণ করেছে বলে), কামিজ ছাড়িয়ে নেবে, ফতুয়া খুলবে, আলনায় মেলে দিয়ে আসবে—আঁচল দিয়ে কপাল গলা বুকের ঘাম মুছিয়ে নিয়ে মাথায় বাতাস করবে—কমলাক্ষ খোকা-ছেলের মতো চুপ করে পড়ে সেই সেবা নেবে। এর তুল্য সুখ নাকি ওর কিছুতে নেই। বলে, 'তোমার ঐ হাত দুটোতে যে কী জাদু আছে তা তুমি জানো না। এমন সেবাও কেউ করতে পারে না, কারও সেবা এত ভালও লাগে না।'

অনেকবারই ঠোঁটের ডগায় আসে প্রশ্নটা, 'কেন তোমার বৌ? তার তো আরও নরম কচি হাত!'

কিন্তু করতে পারে না। বাড়ির কথা তুলতে চায় না সে, বিশেষ বৌয়ের কথা।

এখনও বিবেকে বাধে। অপরাধী বিবেক এখনও লজ্জা পায়।

পাপ এক রকম, হয়ত এটা পাপ না-ও হতে পারে। অন্যায়টা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। একটা কচি মেয়ের বুকের জিনিস কেড়ে নেওয়া, তাকে বঞ্চিত করা। এখনও ভাবলে খুব খারাপ লাগে, নিজের ওপরই ঘেন্না হয়। ...কেবলই মনে হয় আমাকে কেউ যদি এভাবে বঞ্চিত করত। বিশেষ এমন স্বামী যার, তার না জানি কী কষ্টই হবে—একথা জানতে পারলে। আর জানতেও কি পারছে না, ঠিকই পারছে। স্ত্রীর চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া যায় এ ব্যাপারে? স্ত্রীই বা কেন—কোন মেয়েছেলেরই চোখ এড়াবে না।

তাছাড়াও দেখেছে—বৌয়ের প্রসংগ তুললে মুখটা কেমন যেন হয়ে যায় কমলাক্ষর। স্বল্প দু-তিন মুহূর্তের জন্যে হলেও সেটা দেখা যায়, একটা দৈহিক খোঁচা খেলে যেমন চমকে ওঠে, মুখটা বিকৃত হয় তেমনিই। অবশ্য তারপরই হেমন্তকে বুকে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে চুম্বনে পাগল করে দেয়, তবে সে বুঝতে পারে যে এটা ভোলারই চেষ্টা, পাগলই হয়ে উঠে ভুলতে চায়। কামনায় উচ্ছ্বাসে পীড়িত বিবেককে ভাসিয়ে দিতে চায়।

শ্রাবণের শেষের দিকে একদিন কমলাক্ষ এমনি ওর কোলে শুয়ে পড়ে বলল, 'তোমার বাড়িটা বেচবে? ঐ ছোট বাড়িটা—যেটা কিনেছ?'

'কেন, বাড়ি বেচতে যাব কোন দুঃখে?' মুখঝামটা দিয়ে ওঠে হেমন্ত, 'খেতে পাচ্ছি না?'

'দুঃখে কেন, সুখেই না হয় বেচলে। কত দিয়ে কিনেছিলে, সাড়ে ছয় না?...... খরচ হয়েছে, রেজেস্ট্রী উকিল মেরামত-টেরামত নিয়ে আর এক হাজার হোক। ...আমি যদি বারো হাজার দিই?'

'সে আবার কি? তুমিই বা অমন দেবে কেন, আর আমিই বা নোব কেন?'

'হুঁ হুঁ, বাবা। আছে আছে, অর্থ আছে।...আমি কি আর দোব, আমার এক মক্কেল দেবে। রেংগুণ থেকে এসেছে, মাসখানেকের ছুটি নিয়ে—অনেক টাকা এনেছে সঙ্গে। এখানে একটা বাড়ি কিনে রেখে যেতে চায়।...খুব জরুরী, দেরি করার সময় নেই। আমাকে বলছিল, হঠাৎই মনে পড়ে গেল তোমার ঐ পচা বাড়িটার কথা। বলে দিলুম—হ্যাঁ আছে, পুরনো বাড়ি, ছোট্ট। তবে সারিয়ে নেওয়া হয়েছে, ভাল ভাড়াটেও আছে। বারো হাজার টাকা দাম চায়—বাজার দর হিসেবে হয়ত একটু বেশীই চাইছে—তবে দ্যাখো, সে তোমার গরজ।...তা রাজী হয়ে গেল এক কথায়।'

তারপর ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া মুখখানার দিকে উর্দ্ধনেত্রে চেয়ে বলে—'কী, দ্যাখো—বলে অন্যায় করলুম না তো?...অবশ্য ফেরার পথ আছে বৈকি, বললেই হবে বিক্রি হয়ে গেছে।'

'না না—অন্যায় কি! অত লাভ পেলে বেচব না কেন। এর ভেতর আরও কিছু টাকা জমেছে হাতে, এটা যদি এসে যায়—সব মিলিয়ে একটা বড় বাড়ি কিনব।'

'আছে, তাও আছে। আজ বাবা আমি একেবারে আলাদীনের পিদীম, যা চাইবে তাই দোব। ঠিক চোদ্দ হাজারেই একখানা বাড়ি বিক্রী আছে বেনেটোলা লেনের মধ্যে, তিনতলা বাড়ি—একতলা দোতলায় তিনখানা করে ঘর, তিনতলায় একখানা। এ ছাড়াও রান্নাভাঁড়ার আলাদা। সব ঠিক করে এসেছি। তবে বাড়তি দু হাজার আড়াই হাজার যা লাগে—টাকাটা আমিই দোব, তোমায় পুঁজিতে হাত দিতে দোব না।'

'খবরদার।' কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে হেমন্ত, 'ওকথা মুখে আনলে সম্পর্ক এখানেই শেষ। একটা পয়সাও দিতে এসো না কোনদিন। তোমার কাছ থেকে হাত পেতে পয়সা নেবার আগে নিজের হাত কেটে ফেলব। যা করেছি করেছি—তাই বলে বাজারের মেয়েমানুষ ভেবে টাকা দিতে আসবে—তা সইতে পারব না।'

'আরে, ছি ছি। — কী যে বলো সব!' মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে উলটো দিক থেকে ওকে বুকের ওপর টেনে নেয় কমলাক্ষ, 'অত রাগারাগি করছ, কেন?... আচ্ছা, আচ্ছা, দোব না টাকা, ভয় নেই।... বাবা! যা মেজাজ করে উঠলে, বুক কেঁপে গিছল!...তোমার যা মর্জি তাই হবে।... মোদ্দা, আলাদীনের পিদীম পেয়েছিলে আজ, কাজে লাগালে ভালই করতে!'

কমলাক্ষর বুকের চুলের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে ওর দেহের অতি প্রিয় আঘ্রাণ নিতে নিতে হেমন্ত বলে চুপিচুপি, 'তাহলে আমি চলে যাই, ছেড়ে দাও—দানোর সঙ্গে ঘর করতে পারব না।'

'দানো? সে আবার কি?' অবাক হয়ে যায় কমলাক্ষ।

'দানো নয় তো কি! আমাকে ওবাড়ির হরিদি আরব্য উপন্যাস পাঠিয়েছিল—বটতলার কোন এক দোকান থেকে চেয়ে এনে দিয়েছিল এক আনা ভাড়ায়, আমি জানি—আলাদীনের পিদীম ঘষলেই দানো আসত, সেই দানোকে যা হুকুম করত আলাদীন সে তাই যোগাত। দানো-দৈত্য যা বলো!'

হা-হা করে হেসে ওঠে কমলাক্ষ, আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলে, 'দানোই যদি হই অত সহজে ছেড়ে দোব কেন—না দত্যি-দানোর হাত ছাড়িয়ে চলে যাওয়াই অত সোজা। ধরে এবার সিন্দুকে পুরে রাখব—সেই রাজকন্যের মতো, জব্দ হয়ে যাবে। আর কোথাও কারও কাছে যেতে পারবে না কোন দিন!'

যেতে তো চায় না—থাকতেই তো চায়। এই বুকের মধ্যে এমনি লুকিয়ে থাকতে চায় যুগ-যুগান্ত।

(ক্রমশঃ)

ভিন্ন আদল ॥

কাইয়ুম খান মিলন

রোদে ঝলসানো একটি স্তব্ধ দুপুরে
হাতে একখানি খবরের কাগজ—
বিছানায় শুয়ে আছি।
তখনও আমার বুকে
'হিরোশিমা' 'নাগাসাকির' আগুন জ্বলছিল ধিকি ধিকি।

অবার এক ঝাঁক কালো এরোপ্লেন
ঐ আকাশটা ছেয়ে ফেললো;
ওরা বাজপাখির মত ঘুরপাক খাচ্ছে
আমাদের নগরটাকে ঘিরে।

আমার শ্লথ হয়ে আসা হাতের রাইফেলটা
ফের শক্ত করে উঁচিয়ে ধরলাম।
আমি এক নগররক্ষী—
প্রতিরোধের দৃঢ়তায় অটল।

আমার উদ্যত রাইফেল গর্জিত হবার আগেই
ওরা পালালো;
কেঁপে উঠলো নগরী প্রচন্ড বিস্ফোরণে।

উৎক্ষিপ্ত অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত হয়ে,
আমার প্রিয় নগরী পুড়ে ছাই হবার আগে
পুরোপুরি দৃষ্টি মেলে দেখছি ধ্বংসের লীলাখেলা।

একফালি রোদ তখন জানালা দিয়ে এসে পড়েছে বিছানায়
আর কখন যেন
হাত থেকে খসে পড়ে গেছে খবরের কাগজ,
বুঝিবা ক্লান্ত সৈনিকের তন্দ্রা নেমেছিল আমার চোখে।

এক ঝাঁক শ্বেতকপোত উড়ছে
নগরের ঘননীল আকাশে—
দেখা যায়,
জানালা দিয়ে স্পষ্টই দেখা যায়।

আজ যখন তুমি বাড়ি নেই ॥

কবিরুল ইসলাম

এক সময় খুব দূর থেকে হাওয়ায় আমি বুঝতে পারতুম
তুমি বাড়ি আছো
তোমার পায়ের প্রতিশব্দ, কণ্ঠস্বর, দরজায় টোকা
আমি নির্ভুল চিনতুম
তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা রাগ বিরাগ শরীর খারাপ
এ সবই আমার নখদর্পণে ছিলো।

আমার বাইরে-ভেতরে এখনও তোমার অঘ্রাণে
নবান্নের ঘ্রাণ লেগে আছে।

সেই এক সময় হঠাৎই একদিন আমার জন্যে
সব-সময় হয়ে গেলো :
কিছুদিনের রেখাচিত্রে চিরদিন যেন মুহূর্তে বন্দী হয়ে গেলো
—আজ, যখন তুমি বাড়ি নেই!

শুধু এক বর্ষায় ॥

অমিত বসু

এক বর্ষায় এত রক্ত ধুয়ে যাবে ভাবলে কি করে
এত হত্যা মুছে যাবে মন থেকে?
আবার শরৎ এলে সোনালী সকালে
ভুলে যাব কী বিস্তীর্ণ কবরে দাঁড়িয়ে কাল
দেখেছি অসংখ্য ধূর্ত ব্যাধের দু' চোখে
উদাসীন কপট সারল্য!

কি করে ভুলব এই পথে
কুমারী মেয়েকে পুঁতে পায়ে পায়ে এসেছি পালিয়ে
নতুন আশ্বিনে তারা চাষীর লাঙলে হবে সীতা
কি করে ভাবলে তা?
শুধু এক বর্ষায়
কি করে ভাবলে তুমি
এ কবরখানা থেকে আবার উঠবে জেগে
আমাদের হৃত জন্মভূমি।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সৈন্যদল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বারোদিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে ঢাকায় পৌঁছনোর পর নয় মাস বাইশ দিন স্থায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ঐদিন বিকাল ৪-৩১ মিনিটে পশ্চিম পাকিস্থানের দখলদার বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন লেফটেনান্ট জেনারেল এ কে নিয়াজি। তারপরেই ঢাকা হয় একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী. আর বাংলাদেশের সব নগর পল্লীর গৃহে গৃহে উত্থিত হয় সোনার বাংলার জয়পতাকা।

ভারতীয় জওয়ানরা মুক্তিবাহিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে বাংলাদেশে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে যে দু সপ্তাহও লাগবে না তা কারও অজানা ছিল না, এমনকি বহু যুদ্ধের কাদিরেল যোদ্ধা পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তা জানতেন। তবু তিনিই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতকে তাঁদের ঘরোয়া যুদ্ধে টেনে আনতে নানাভাবে প্ররোচনার সৃষ্টি করছিলেন। কিন্তু সে কূটনীতি সফল না হওয়াতে নিজেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই আগুন নিয়ে খেলার পিছনে দুটি বড় কারণ ছিল। প্রথমত, যখন তিনি বুঝলেন যে, মুক্তিবাহিনীর জয় অনিবার্য—ইতিহাসের অনপনেয় লিখন, তখনই তিনি মুজিবের কাছে হার না মেনে ভারতের কাছে হার মানার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ একটি বিদ্রোহী শক্তির কাছে হার মানার চেয়ে পাকিস্থানের তুলনায় অনেক বড় ও অনেক বেশি শক্তিধর একটি রাষ্ট্রের কাছে হার মানা পাকিস্থানের পক্ষে অনেক কম মর্যাদাহানিকর হবে। তাছাড়া তাতে দ্বিজাতি তত্ত্বের মর্যাদা রক্ষা পাবে, আর যে জাতীয় শক্তি আপন হিম্মতেই ঢাকার শাসনযন্ত্র স্বীয় আয়ত্তে আনতে অগ্রসর হয়েছিল তাকে ভারতের তাঁবেদার পুতুল সরকার বলে অভিহিত করা যাবে।

একদা ভারত উপমহাদেশের মুশ্লিম জাতির জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির অজুহাতে পাকিস্থান রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না। তাতে পূর্ববঙ্গের মুশ্লিম জনগণেরও সেদিন ছিল পূর্ণ সমর্থন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাদের কাছে এই নিষ্ঠুর সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, পাঠান পাঞ্জাবীর পাকিস্থান রাষ্ট্রে তারা অন্ত্যজ। ধর্মের দোহাই দিয়ে শুধু তাদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণই করতে চায় লাহোর-করাচির ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যলোভীরা, কিন্তু পাকিস্থান রাষ্ট্রে বাঙালীর ন্যায্য পাওনা কোনদিনই পূরণ হবে না। তাই শুরু হল পূর্ববঙ্গের মোহমুক্ত কোটি কোটি বাঙালীর পাল্টা অভিযান আর তার সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগল শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতি সৃষ্টির অলীক কাহিনী। ফলে ভৌগোলিক ব্যবধানের চেয়েও সংযোগের অতীত হয়ে উঠতে লাগল দুই পাকিস্থানের মনের ব্যবধান, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল বিগত বৎসরের শেষে অনুষ্ঠিত পাকিস্থানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে। পশ্চিম পাকিস্থান থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ১৬৯টি জাতীয় এসেমব্লীর আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন লাভ করল, আর তার জোরেই আওয়ামী লীগ হল পাকিস্থান জাতীয় এসেমব্লীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আওয়ামী লীগের ঐ বিপুল সাফল্যে প্রমাদ গণলেন পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনৈতিক ধুরন্ধররা যাদের একমাত্র কাজ হল পশ্চিম পাকিস্থানের পুঁজিপতি ও ক্ষমতালিপ্সুদের স্বার্থরক্ষা করা। নির্বাচনের আগে তাঁরা আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে আপত্তি জানান নি। কারণ তাঁদের 'সুনিশ্চিত' খবর ছিল যে, জাতীয় এসেমব্লীর নির্বাচনে মুজিবের সমর্থকদের পক্ষে আশি-পঁচাশিটির বেশি আসন পাওয়া সম্ভব হবে না। তাঁরা এটা ভাবতেও পারেন নি যে, তাঁদেরই দুই দশকের শোষণ-পীড়ন ও হৃদয়হীন উপেক্ষার কল্যাণে পূর্ববঙ্গে এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে উঠেছে মুজিবের যে অতি নির্মম নিষ্ঠুর, কঠিন আঘাত হানা ছাড়া সে দুর্গের একটি ইঁটও খোলা সম্ভব হবে না।

কিন্তু মুজিবের ছয় দফা কর্মসূচী মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না ইয়াহিয়া-ভুট্টো-কাইয়ুমদের পক্ষে। কারণ, তার অর্থ হত স্বেচ্ছায় পাকিস্থানের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দেওয়া। তাই আলোচনার অজুহাতে ও'রা সদলবলে এলেন ঢাকায়, আর সেই সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য বোঝাই জাহাজও রওনা করিয়ে দিলেন করাচি বন্দর থেকে।

সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্ভয় নিঃশঙ্ক চিত্তে ও'দের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন, কিন্তু প্রথম দিনেই স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন খানদের যে প্রকাশ্য সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে কোরাণ ছুঁয়ে তিনি ছয় দফা দাবী থেকে বিচ্যুত না হওয়ার শপথ নিয়েছেন। খানেদের দুষ্টবুদ্ধি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন বঙ্গবন্ধু, কিন্তু ঐ দুর্জয় নির্ভীক মানুষটি সেদিন পলায়নের বা আত্মগোপনের কথা মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করেন নি। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর যে প্রচণ্ড পীড়ন ও নির্যাতন শুরু হবে সে বিষয়েও তিনি দলের সহকর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে সেইমতো প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সহকর্মীদের শত অনুরোধেও নিজে গা-ঢাকা দেওয়ার প্রস্তাবে রাজী হননি। তিনি বারবার বলেছিলেন, তাঁকে ধরতে না পারলে আক্রোশে-ফেটে-পড়া খানেদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। নিজের দেশের প্রতিটি মানুষকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন বলেই আত্মহননের এমন বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের স্বার্থনিষ্ঠুর মানুষগুলির মানবিকতায় সামান্যতম আস্থা স্থাপন করেও যে মারাত্মক ভুল করেছিলেন তিনি, তা বোঝা গেল ২৫শে মার্চের সেই ভয়ংকর রাত্রে, তাঁর গ্রেপ্তারবরণে। সারা পূর্ববঙ্গ জুড়ে শুরু হয়ে গেল খানসেনাদের নৃশংস উৎপীড়ন, নিরস্ত্র অসহায় অগণিত নরনারীর গুলীবিদ্ধ দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তস্রোতে লাল হল পূর্ববঙ্গের মাটি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মারখাওয়া মানুষ সেই মৃত্যুর কাছে হার মানলো না। পরদিনই, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ, ঢাকায় এক বিশাল সমাবেশে ঘোষিত হল পূর্ববঙ্গের, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ঢাকায় পল্টন ময়দানে সমাহিত হল মহম্মদ আলি জিন্নার মুশ্লিম জাতিতত্ত্ব।

ভেতো বাঙালীদের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ছিটিয়ে পায়ের তলায় পিষে শেষ করে দেওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া ও তাঁর মন্ত্রণাদাতা ভুট্টো কাইয়ুমের দল। কিন্তু তাঁদের সব হিসেব মিথ্যা হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ভুজঙ্গের উদ্যত ফণার সম্মুখে দংশনক্ষত শোনবিহঙ্গের মৃত্যুভয়হীন সংগ্রাম চলতে লাগল মাসের পর মাস। পাক সেনাদের হাত থেকেই অস্ত্র কেড়ে নিয়ে কঠিন আঘাত হানতে লাগল মুক্তিবাহিনীর বাঙালী সেনারা। তারপর নানা সূত্র থেকে তাদের হাতে আসতে লাগল আধুনিক সমরাস্ত্র, যা দিনে দিনে মুক্তিবাহিনীকে করে তুললো আরও দুর্জয় ও দুর্নিবার।

দেশ-বিদেশের বাঙালী কূটনীতিকরা একের পর এক পাক জঙ্গীশাহীর নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে ও বাংলাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের সমর্থনে পদত্যাগ করতে লাগলেন, লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ডলার চাঁদা আসতে লাগলো দূরপ্রবাসী বাংলাদেশের মানুষদের কাছ থেকে, বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার সমর্থনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনুকূলে প্রবল জনমত গড়ে উঠতে লাগল পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে।

কিন্তু পাক জঙ্গীশাহী একবারও আপসের কথা ভাবলেন না, কারণ তা ভাবার কোন উপায়ই ছিল না তাঁর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিলে মিথ্যা হয়ে যাবে মহম্মদ আলি জিন্নার মুশ্লিম জাতিতত্ত্ব, যার উপর ভিত্তি করে চব্বিশ বছর আগে ভারতের অংগচ্ছেদ করে গড়ে উঠেছিল কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্থান। কিন্তু আজকের স্বার্থান্ধ পশ্চিম পাকিস্থানীদের কাছে তার চেয়েও বড় কথা, উপনিবেশ পূর্ব পাকিস্থান হাতছাড়া হয়ে গেলে তাদের নবাবী চলবে কেমন করে? পূর্ব পাকিস্থানের সব বড় রাজপদ তাদের দখলে; পূর্ব পাকিস্থানের পাট ও চা বেচে আসে তাদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ; সেই টাকার জোরেই সারা পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠেছে তাদের বাদশাহী কায়দার দূতাবাসগুলি এবং সেগুলির প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ পদ পূরণ করে আছে পশ্চিম পাকিস্থানের মানুষ। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্থানকে আজকের ঠাট বজায় রেখে বাঁচতে হলে পূর্ব পাকিস্থানকে তার কোনমতেই ছাড়া চলে না।

কিন্তু ইতিহাসের গতি ত কারও স্বার্থের দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলে না, সে চলে আপন অনিবার শক্তিতে সব কৃত্রিমতার বাধা অপসারিত করে; মিথ্যার বেড়াজাল ভেঙে। তাই ব্যর্থ হল সব ধর্মের দোহাই, ব্যর্থ হল নিষ্ঠুর পীড়ন। প্রায় দু লক্ষ মানুষের প্রাণবলি হল, প্রায় এক কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিল, তবু মুক্তিবাহিনীর অভিযান কালের রথযাত্রার মতো দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চললো। যারা সর্বস্বান্ত হয়েও হার মানে না, মৃত্যুকে ভয় পায় না, তাদের পরাজয় কোন শক্তিবলে সম্ভব করবে পিন্ডির স্বার্থলোলুপ রক্তপিপাসুরা?

ভারত গোড়া থেকেই বলে এসেছিল, বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণের প্রতি তার পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও বাংলাদেশের সঙ্গে পিন্ডির জঙ্গীশাহীর বিরোধকে সে পাকিস্থানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে মনে করে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঐ বিরোধের রাজনৈতিক সমাধানই সে চায়। আর তা সে চায় উদ্বাস্তু সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য, কারণ প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে ভারতের যে প্রতিদিন অন্ততঃ দু' কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, সে ব্যয় অনির্দিষ্টকাল ধরে বহন করা ভারতের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। উদ্বাস্তু ত্রাণে সারা বিশ্বের কাছ থেকে ভারত যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য এবং যা সে পেয়েছে তা প্রতিশ্রুত অর্থের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

তাই বাংলাদেশের জনগণের গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বার করার জন্য ভারত প্রথমে পিন্ডির কাছে দাবী জানায়। সে দাবীর প্রতি পিন্ডি বধির কর্ণ ফেরাতে ভারতের প্রতিনিধিরা এবং পরিশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিশ্বের দেশে দেশে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করেন; কিন্তু একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া আর কোন দেশের কাছ থেকেই ভারত উপযুক্ত সাড়া পায় নি। একদিকে ভারতের যখন এই বেপরোয়া অবস্থা, ও অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান সারা বাংলাদেশে পিন্ডির শাসন অসম্ভব করে তুলেছে, তখনই পাকিস্থানের গৃহযুদ্ধে ভারতকে জড়িত করার ষড়যন্ত্রে নামলো পিন্ডি-চক্র।

যে দুটি উদ্দেশ্যে ভারতকে পাকিস্থানের গৃহযুদ্ধে টেনে আনল পিন্ডি তার প্রথম কারণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। পাক জঙ্গীশাহী স্থির করল, যদি হারতে হয় ত' বৃহত্তর শক্তি ভারতের কাছেই হারবে, মুজিবের মুক্তিবাহিনীর কাছে নয়। তাহলে বৃহত্তর শক্তির কাছে আক্রান্ত হওয়ার রব তুলে সে বিশ্বের ছোট-বড় বহু দেশের সমর্থন এমনকি হয়ত সাহায্যও পেতে পারবে। তারপর মুক্তিবাহিনী নিজের হিম্মতেই যে ক্ষমতা প্রায় করায়ত্ত করে এনেছিল, তার শক্তিকে সে তুচ্ছ করতে পারবে, সে বিশ্বের কাছে বলতে পারবে যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সরকার সেখানকার জনগণের সমর্থিত বা আকাঙ্ক্ষিত সরকার নয়। সে সরকার সাম্রাজ্যলোলুপ ভারতের পুতুল সরকার মাত্র।

পাকিস্থানের ঘরোয়া যুদ্ধে ভারতকে জড়িত করার পিছনে পিন্ডির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্থানের ঘরোয়া সমস্যাকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত করা। ভারতের আক্রমণ শুরু হলেই ঐ বিরোধের মধ্যে এসে যাবে রাষ্ট্রসংঘ, এসে যাবে বৃহৎ শক্তিগুলি। হয়ত আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ অনিবার্য হবে এবং তারই ফলে সে ফিরে পাবে তার হাত থেকে প্রায় ফস্কে যাওয়া পূর্ব পাকিস্থান।

কিন্তু ভারতের দৃঢ়তা, ভারতীয় জওয়ানদের তড়িৎগতিতে অভিযান ও সেই সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থন পাকিস্থানের সব চাল ব্যর্থ করে দেয়। যে মুহূর্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যে, ভারত উপ-মহাদেশের বিরোধে সে কারও নাক-গলানো বরদাস্ত করবে না, তখনই ইয়াহিয়ার আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচন্ড বিক্রম ও অপরদিকে মার্কিণ জনমতকে উপেক্ষা করার সাহস হল না প্রেসিডেন্ট নিক্সনের। পাকিস্থানের সবচেয়ে দরদী বন্ধু চীনের তর্জন-গর্জনও কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ থাকল। আর রাষ্ট্রসংঘে একটির পর একটি প্রস্তাব ও ভেটোর খেলা চলতে চলতেই ভারতীয় জওয়ানদের মদতে ঢাকার শাসনযন্ত্র দখল করে নিল মুক্তিবাহিনী।

এ জয় মুক্তিবাহিনীরই

পাকিস্থান যাই প্রমাণে তৎপর হোক না কেন, ইতিহাসে লেখা থাকবে এ জয় মুক্তিবাহিনীরই। তাদের রক্ত ও অশ্রুর ঋণই শোধ করেছেন ইতিহাসের দেবতা। নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একক শক্তিতে স্বাধীনতা অর্জনের দাবি পৃথিবীর কোন দেশই করতে পারে না। আজ যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের 'ঘরোয়া' ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে তাঁদের দেশও স্বাধীন হ'ত না যদি না তাঁদের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে ফ্রান্স ও হল্যান্ড বৃটেনের 'ঘরোয়া' ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাঁদের পিতৃপুরুষদের অস্ত্র ও রসদ না যোগাতো। যে 'ষ্ট্যাচু অফ লিবার্টি' আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে নিউইয়র্ক বন্দরের প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি বৃটেনের তৎকালীন 'ঘরোয়া' ব্যাপারে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের উজ্জ্বলতম প্রতীক। যে আরব দেশগুলি আজ পাকিস্থানের 'ঘরোয়া' ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের প্রতি বিরূপ, প্রথম যুদ্ধকালে অটোমান সাম্রাজ্যের 'ঘরোয়া' ব্যাপারে বৃটেনের হস্তক্ষেপ ছাড়া তাদের স্বাধীনতাও সম্ভব হত না। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন কায়েম হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের মদতে, সেটা কম্যুনিষ্ট চীন ভুলতে চাইলেও ইতিহাস ভুলবে না। মিত্র দেশের সহযোগিতায় স্বাধীনতা অর্জনের এমন হাজার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ভারতের বীর জওয়ানদের বলিষ্ঠ সহযোগিতা যে মুক্তিবাহিনীর অনিবার্য সাফল্য ত্বরান্বিত করেছে এতে মুক্তিবাহিনীর জয়ের গৌরব লাঘব হয়নি।

ভারতের নতুন ভূমিকা

সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে ভারত বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থনে প্রকাশ্যে এগিয়ে এসে যে গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তা ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা। এতদিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সাহায্যে এগিয়ে এসেছে অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশ। এ ব্যাপারে গণতন্ত্রী দেশগুলির ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। সেই দীর্ঘানুসৃত ক্লীব নীতি পরিত্যাগ ক'রে ভারতই প্রথম এগিয়ে এসে বিশ্ববাসীকে দেখাল যে, গণতন্ত্র রক্ষায় গণতন্ত্রী দেশগুলিরও একটি প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা আছে। অত্যাচারীর অত্যাচারের চেয়ে 'ঘরোয়া' ব্যাপার ভৌগোলিক অখন্ডতা ইত্যাদির প্রশ্ন কখনও বড় হ'তে পারে না। ভারত আজ যে পথ দেখালো একমাত্র সে পথেই বিশ্বের শান্তি, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার নিরাপদ হ'তে পারে।

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

চা-বাগান অঞ্চলে ইওরোপীয়দের ক্লাব থাকে শহরে। কুলি-কর্মচারীদের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন বাগানেই। একটা হলেও এটা কয়েকটা বাগানের সমষ্টির তুল্য। তাই এখানে আলাদা ব্যবস্থা। ক্লাবের ঘর-বাড়ী, আয়োজন আসবাব সবই বাগানের সম্পত্তি। সেখানে খেলা-ধুলা করে বাগানের কুলি-কর্মচারী খরচ কোম্পানির। সভ্যরাই পরিচালক সমিতির সভ্য ও সেক্রেটারি নির্বাচন করে বটে, কিন্তু ওটা তেমন কিছু নয়, ঘরোয়া ব্যাপার। নয়তো বড়সাহেবের ইচ্ছার মর্যাদা সবার ওপরে।

নিয়ম রক্ষা করা কিছু চাঁদাও তোলা হয় সভ্যদের কাছ থেকে। তাতে এত খরচ চলে না। বাকীটা আসে বাগানের তহবিল থেকে। এটা দয়াদাক্ষিণ্য নয় নিয়ম। চাঁদা না দিলেও ক্লাবের দরজা অবারিত, তবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যায় না। তেমন লোকের জন্য, যে সব খেলার ব্যবস্থা হয় বাগানের খরচে সেইগুলোই খোলা। ক্লাব জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় সেখানে—খেলাধূলায়, আনন্দ উৎসবে ও পূজা-পার্বনে। এই দুর্গম পরিবেশে কর্মময় জীবনের একঘেয়েমি ভেঙে রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা। কুলি এবং বাবুদের ইনডোর ও আউটডোর খেলাধূলার আয়োজন প্রায় একই ধরনের। তবু বাবুদের আয়োজন কিছু বেশী। সেটা সমষ্টিগত রুচি মাত্র।

কুলিরা পছন্দ করে তাস ক্যারমবোর্ড, ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন। শেষের খেলাটা যদিও এদেশে পুরানো কিন্তু নতুন নাম নিয়ে নতুন ভাবে চালু হয়েছে। নামটার উৎপত্তি ১৮৭৩ সালে—ইংলণ্ডের ডিউক অব বিউফোর্ডের বাসস্থান থেকে। ব্যাডমিন্টন খেলতে এদেশের কুলিরাও ঘেমে নেয়ে ওঠে, কিন্তু ও-দেশের মেয়েরাও সে খেলার তালিকা করে। কুলিদের কনসার্টের সরঞ্জামও আছে। তারা নাচে-গান, [illegible] করে [illegible] মেঝেতে ঢালা সতরঞ্চির ওপর। চা-বিস্কুটের ক্যান্টিনও আছে। নেই শুধু একটা। এমন কি মাদক-দ্রব্য গিলেও সেখানে যাওয়া চলবে না। যদিও সাহেবদের সদৃশ ওদের সমাজ-জীবনে ওটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মা-বাপের সংগে বেটা-বেটিরাও একসঙ্গে বসে—ফূর্তি করে, খিস্তি-খেউর, ফাটাফাটি করে। তবু এই বিধি-নিষেধ ক্লাবের বেলা। তবুও তা চলে, আপোসে। ওটা না হলে ফূর্তিটা জমে না। কিন্তু কর্তাদের কানে গেলেই মুশকিল। তা হয় না, ঘটনা যত বড়ই হোক না কেন। দেখেও দেখে না, শুনেও কেউ শোনে না ওটা। ক্লাবটা ছোকরাদের। কাঁচ মনের প্রৌঢ় ছাড়া আর সবাই ওদের উৎসবানুষ্ঠানে ক্রিয়া-কলাপের দর্শক মাত্র। তখন বুড়াদের কাছ থেকে ওরা তারিফ পায়। তা নইলে তাদের চোখে ওটা আড্ডাখানা, নিছক বকামির স্থান। বুড়াদের মধ্যে যারা শিব-ভক্ত তাদের মজলিস বসে গাঁজিকায়, আর যারা মা-কালীর ভক্ত তাদের প্রিয় হাঁড়িয়া। ছোকরাদের অনেকের শিবভক্তি থাকলেও ওই নেশাটায় বড় একটা ভেড়ে না, তবে শেষেরটা সার্বজনীন।

বাবুরা সাহেবদের পিছু পিছু দৌড়ে না হলেও খুঁড়িয়ে চলে। তারা খেলে টেনিস, পিংপং, বিলিয়ার্ড। ব্রিজ-টেবিলও আছে। বাবুরা থিয়েটারও করে। তাই গান-বাজনার সবকিছু আয়োজন পরিপূর্ণ। সাহেবদের মতো পিয়ানোর টুংটাং যেন ভাল লাগে না তাদের। আসলে অন্য কথা। সব যন্ত্রেরই বাদক সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে, ওটা হয়ে ওঠেনি। তার বদলে অরগ্যান আর বাক্স হারমোনিয়াম—কপলার স্কেল-চেঞ্জিং। আনাড়ীর হাতে পড়ে মাঝে মাঝে সেটা বিগড়ে থাকে। সঙ্গে সংগে মেরামত হয়। আনাড়ীদের বাধা দেবার কেউ নেই। টাকা তো গৌরীসেনের। [illegible] চেয়ার-টেবিল নিয়ে, ঢালা সতরঞ্চিও আছে। পাঠাগারও আছে এদের। এখানেও ক্যান্টিন আছে—চা, কোল্ড ড্রিংকস আরো কত সৌখীন খাবার-দাবার। সাহেবরা কুলিদের অনুরূপ সংস্কারমুক্ত [illegible] পারে নি। অন্তত ইতরজনের দেখাদেখি। তাই ওটা "স্ট্রিক্টলি ফরবিডন্"। সিগরেটটাও টানতে হয় চারপাশ দেখেশুনে। বড় মুশকিল, বড় আপসোস এদের। সাহেবদের ক্লাব থেকে যেমন স্বর ও সুর ভেসে আসে তেমনটি ভাসতে পারে না এখান থেকে। ভেবেচিন্তে কারণটা আবিষ্কার করে—ভারতীয় গান আছে, কিন্তু গাইয়ে নেই সেখানে। কিন্তু ওদের যন্ত্র-সঙ্গীত, কণ্ঠ-সঙ্গীত কানে এলে বাবুরা বলবে—ওদের লাইফ আছে। পঞ্চমে সপ্তমে গলা ছেড়ে অমন কাওয়াল, ধ্রুপদ গাইতে পারে না বাবুরা। বাবুদের গানে যেন কান্না আর কান্না, নয়তো কিছু চেঁচামেচি। পাঁচ-সাত পেগ টেনে অমন সুন্দর ভাবে হৈ-হুল্লোড় করতে পারে না বাবুরা। এখানকার সবই বিশৃঙ্খল। তাই অন্য কারো বলার অপেক্ষা রাখে না, নিজেদের জীবন ও কার্যকলাপের ওপর ধিক্কার দিয়ে বলে—ড্যাম্ ইণ্ডিয়ান, ড্যাম্ নেটিভ্।

এক ডিভিশন থেকে আর একটার দূরত্ব কয়েক মাইল। চিত্ত বিনোদনের জন্য রাত-বেরাতে পায়ে হেঁটে এতটা আসা-যাওয়া সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। হিংস্র জীবজন্তু, সরীসৃপের বিষয়-কর্ম চলে রাত্রে। দিনটা তারা ছেড়ে দিয়েছে মানুষের বিষয়-কর্মের ব্যবস্থার জন্য। রাতটা তাদের ছেড়ে না দিলে অলিখিত সন্ধিভঙ্গের দায়ে পড়তে হবে মানুষকে। বাগানে, বাগানের পথ-ঘাটের সর্বত্র তাদের অবাধ গতি। চা-বাগান তো কয়েক বিঘের গোলাপ-বাগান নয়। মাইলের পর মাইল, তবু চা-খেতের মাঝে সূচ পড়লে দেখা যায়। কেটেছেঁটে রাখলেও চায়ের ঝোপ কোমর সমান। তাই ওদের চোখে তা জংগল। মানুষ যা খুশি বলুক। তাই প্রত্যেক ডিভিশনেই চিকিৎসা এবং রিক্রিয়েশনের আলাদা ব্যবস্থা। এক নম্বর ডিভিশনের ক্লাব ঘরটি গমটির কাছাকাছি। এটা যেমন বড় ওগুলো তেমন নয়, ছোট। নির্দিষ্ট [illegible] চলার উপযোগী। পূজা-পার্বণ, উৎসবের দিন বাবুদের সবাই জমায়েৎ

হয় বড় ক্লাবে। কুলিদের ডিভিশনের ক্লাব ঘরও বড়। তাদের সংখ্যা অনুযায়ী কয়েক-খানা বড় ঘর, আর তার সংগে খেলার মাঠ। বেশীর ভাগই 'এইচ' প্যাটার্নের বাংলো। অনেক পুরানো সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে এক-একটা ক্লাবের নাম।

ইওরোপীয়দের ক্লাব মাত্র একটি। সেটা 'ও' প্যাটার্ন। ভিতরে বাইরে ঘোরানো বারান্দা, মাঝে উঠোন। 'ও'টাকে 'কিউ' করতে চেষ্টা করেছে সামনের পোর্টিকো। সেটা এক নির্জন প্রান্তরের পীনোন্নত পৃষ্ঠে, মনোরম দৃশ্যের মুখোমুখি।

উত্তর-পশ্চিম কোণে হিমালয়ের হিম-শৃংগ,পশ্চিমে সুবর্ণশ্রী। উত্তপ্ত ধরিত্রীর হৃৎপিন্ড ফেটে উঠে আসে সহস্রধারা। রূপান্তরিত ও পার্লালিক শিলার হৃৎপিন্ড চুঁয়ে-আসা সহস্রের মিলিত একটি উন্মত্ত স্রোত ছুটে চলে ভূগর্ভের সম্পদ বহন করে, স্ফটিকমণির পৃষ্ঠে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে আছাড় খেয়ে, বালুকা-স্তূক ভেংগে আবর পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে। উপত্যকার বৃহৎ উপভূমি স্নেহ সলিল সিক্ত করে বয়ে গেছে এই ক্লাবটার পাশ দিয়। আজও নদীটা সম্পদ বহন করে আনে, কিন্তু সে সম্পদ তুলে আনবার কেউ নেই।

নদীটার নামের সংগে কত না ঐতিহ্য জড়িত। খৃস্টপর প্রথম শতকে গ্রীক নাবিক পেরিপ্লাসের পরিক্রমায় নদীটার কথা বর্ণিত। অতি প্রাচীন কাল থেকে এই নদীর জলে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। আহোম শাসন কালেও শত শত কর্মী নিযুক্ত থাকত এই নদীর বুক থেকে অভিনব প্রথায় স্বর্ণরেণু সংগ্রহের কাজে। নদীর জলে উদ্‌বেড়ালের লোমশ-চর্ম ফেলে রাখলে তার ফাঁকে ফাঁকে সোনার রেণু সঞ্চিত থাকত। এককালে পৃথিবীর নানা দেশে তেমন প্রথা ছিল। এমন কি ইওরোপীয়রা আমেরিকায় গিয়েও প্রথমে তেমনি করেই সোনা সংগ্রহ করেছে। ইংরাজের আমলেও সুবর্ণশ্রী নদীতে সেইভাবে সোনা সংগ্রহ হয়েছে। হিংস্র জীবজন্তু অধ্যুষিত অরণ্যের অন্তরে এই ক্লাবঘরের ভিটেতে তখন খাড়া ছিল ইংরেজ কর্মচারীর দুর্গাবাস।

অতীতের কোন একদিন সোনার বাজার গেল নেমে। উন্নত প্রথায় খনিজ উৎপন্নের তুলনায় নদীর সোনা সংগ্রহ লোকসানজনক হল। বন্ধ হল অমনভাবে সোনা সংগ্রহের কাজ। সোনা কুড়ানো যাদের কাজ, তারা তো আর বসে থাকতে পারে না। জল ছেড়ে উঠল ডাংগায়, দৃষ্টি পড়ল মাটির ওপর।

পাশ্চাত্যের ওরা ছিল লোভী, বোম্বেটে ও পরিশ্রমী। প্রাচ্যের লোক যখন ঘুমায়, প্রতীচ্যের লোক তখন জেগে থাকে, কাজ করে। অনতিবিলম্বে তাদের চোখ পড়ে প্রাচ্যের নিরীহ, অলস ও নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির প্রতি। তার ওপর ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ। ব্যবসার সংগে শুরু হয় কূটনৈতিক কর্ম। সে সবের সুদূরপ্রসারী ও অনিবার্য ফলাফল থেকে প্রাচ্য জগৎ আজও মুক্ত হতে পারেনি। পারতে পারতে দফা শেষ হবে।

ভারতবর্ষ চোখ বন্ধ করে দেখার কৌশল জানে। অতএব চোখ চেয়ে দেখাটা অহেতুক ও অমংগল। অথচ চোখ বন্ধ করলে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতীচ্যের লোক চোখ চেয়ে দেখে। চোখ বন্ধ করলে দেখতে পায় না। সে দেখায় চাই মনের বিকাশ। পাশ্চাত্যের পশ্চিমাংশে আজও তা সীমাবদ্ধ, তখনকার দিনে তা ছিল আরো বেশী। শীতের প্রকোপ থেকে নিজে-দের রক্ষা করতে ওরা বাধ্য হয় গা ঢেকে রাখতে, এখানে গ্রীষ্মের প্রতাপে অনেকেই চলে প্রায় খালি গায়ে। অতএব ওরা সভ্য, এরা বর্বর। ভেবে দেখে না, নিজের দেশে গ্রীষ্মে খেতখামার বা অমনই ধরনের কাজের সময়, এমন কি সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময় জামাগুলো কোথায় রাখে! ওরা পাপী, কিন্তু ওদের ত্রাণকর্তা আছে। ওদের চোখে জগতের একমাত্র ত্রাণকর্তাই তো তিনি, কিন্তু এখানে তা নয়। অতএব ওরা সভ্য, এরা অসভ্য। ওরা কাজ করে, চোখ চেয়ে দেখে, সারা জগৎ শোষণ করে নিজেদের দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেছে। বসুন্ধরা যে বীর-ভোগ্যা, সে কথার জন্ম যেখানেই হোক, ওরা তা প্রমাণ করেছে। ওরা সুন্দর, তাই চোখের সামনে সবই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। এরা ভিতর ও বাইরের উৎকর্ষে উদাসীন, নয়তো হারিয়ে ফেলেছে সে জ্ঞান।

কত সমারোহ শনি ও রবিবার এই ক্লাবে। স্ত্রী-পুরুষ একত্রে পানাহার চলে। জীবন-সংগিনী না করতে পারার আপশোষ হয়তো মিটিয়ে নেয় ব্রীজ-টেবিলে। প্রকাশ্যে অনেক কিছুই নীতিশুদ্ধ। তবু আড়ালে পাদুকা স্পর্শটাও বড় তৃপ্তির। টেবিলের নীচে পায়ে হঠাৎ পা ঠেকে যায়। কেউ সরিয়ে নেয়, কেউবা চেপেও রাখে। একটু শিহরণ, একটু তাপও যেন পায়। যদিও ডবল আবরণে ঢাকা দুখানা পা। চোখে চোখে খেলে যায় বিদ্যুতের ছটা। টেলিপ্যাথি। এসবের বাড়া-বাড়ি হয় বিদেশে গিয়ে। দেশে ফিরলেই আর সকলের অনুরূপ শান্তশিষ্ট সংসারি। স্বদেশে বড় ভালমানুষ এরা।

মিসেস গর্টফ্রিডকে সংগে নিয়ে মিঃ গর্টফ্রিডও এখানে আসেন। কিন্তু নিম্নতম কর্মচারীদের সঙ্গে সকল রকম খেলাধুলোয় যোগ দেন না বড় একটা। বড় জোর বিলি-য়ার্ড। তাঁর নিজস্ব খেলা গলফ্।

এক শনিবার বার-এর প্রশস্ত হলটার এক কোণে পেগ-টেবিলের পাশে দুটি বন্ধু। এডওয়ার্ড আর ম্যাকনিল। তিন নম্বর ডিভিশনের ম্যানেজার সে, সংক্ষেপে ম্যাক। গোল মুখে থ্যাবড়ান নাক—লম্বা-চওড়া, ঘাড়ে-গর্দানে প্রায় এক। এডিকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বসিয়েছে ম্যাক। কিন্তু চুপ-চাপ, কথা নেই কারো মুখে। এডি বলতে চায়, সাড়া পায় না অপর পক্ষের। অমন ভাল লাগে না তার। তবে সে ক্লাবে এল কি করতে? রিটার্ন না দিয়ে যাওয়া যায় না—এমনভাবে গেলাও যায় না। গলার জোরে তিনটে রাউন্ডই সে স্ট্যান্ড করেছে। ফোর্থ রাউন্ডটা এডি কিছুতেই ম্যাককে ছেড়ে দেবে না।

ম্যাকও ছাড়ে না, বলে—দিস ইজ মাই ডে। প্লিজ—আই বেগ অব ইউ। আজ আমার বড় দুঃখ, বড় অপমানিত হয়েছি আজ।

ম্যাক ইংরেজ না হলেও ইংরেজ। আসলে, অন্ততঃ নাম অনুসারে সে স্কচম্যান, তবে তিন পুরুষের বসবাস ইংলন্ডে। অতএব জন্ম যে ঘরেই হোক, জন্ম ও ভূবাসনে সে ইংরেজ। তাই দুটো চরিত্রের নাগরদোলায় দোলে তার মন। যখন যেটা কাজে লাগে সেটা বেরিয়ে আসে দেহের খোলসটার ভিতর থেকে। কিন্তু সেদিন নিরুপায় সে। কিছুতেই তার কথাটা শুরু করতে পারছে না। বড় বড় পেগ টেনে নিজেকে তৈরি করে নেবার চেষ্টা করছিল। 'দিস ইজ মাই ডে'—বলে সময় নিচ্ছিল। ফোর্থ রাউন্ডের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তার মনের গগনের জমাট-বাঁধা মেঘ ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। এডি তখন স্তব্ধ হল। এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে ম্যাক অর্ডার দিল ফিফথ্ রাউন্ডের।

ম্যাকের সহজ ভাব ফিরিয়ে আনবার জন্য তার প্রস্তাব স্বীকার করে এডি মাত্র একটি চুমুক দিয়েছিল সেই রাউন্ডের গ্লাসে। ম্যাকের কান্ড দেখে শঙ্কিত হয়ে সে বললে—এত তাড়াতাড়ি করছ কেন? আমি চুপ করে বসে আছি। আমার ত্রুটির জন্য মাফ চাইছি।

—ত্রুটি আমার হয়েছে। তুমি ঘাবড়িও না— আজ আমি ড্রিংক করতেই এসেছি। আমি লাকি, তোমাকে ক্লাবে না পেলে তোমার বাংলোতে যেতাম। ইউ টেক ইওর টাইম। বলে, টেবিলের ওপর থেকে ক্যারেট গোল্ডের সিগারেট কেসটা ম্যাক তুলে নিল। ঢাকনাটা খুলে একবার এডির সামনে হাতটা এগিয়ে দিল—নিজেও একটা তুলে নিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করে কেসটা রেখে দিল টেবিলের ওপর। লাইটার জেবলে প্রথম এডির সিগারেটটা ধরিয়ে দিল, পরে নিজেরটা। তারপর এক-টানে সেটার প্রায় অর্ধেকটা পুড়িয়ে দিল। সে এমনই টান যা, আজকের এডি ছাড়া আর কোন ইংরেজ, ম্যাক ছাড়া আর কোন ইংরেজকে টানতে দেখে আঁৎকে ওঠার কথা।

ইদ্রিস তখন নতুন বোতল থেকে গ্লাসে এক পেগ, পেগের পর একটু সোডা ঢেলে দিলে। সোডার বোতলটা গ্লাসের পাশে রেখে দিয়ে এডি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ম্যাক বললে—না, গ্লাস যখন খালি হবে তখন দিয়ে যাবি। বুঝলি।

—জী হুজুর। বলে, সে চলে যাচ্ছিল।

ম্যাক ডেকে বললে—কাজ নেই, জন-হেগ কটা আছে? —পাঁচটা! তাহলে এটা টেবিলে রেখে যা। আরো দুটো রাখবি। এটা খালি হলেই আর একটা দিয়ে যাস।

—ঠিক হায় চাহাব (সাহেব)।

সেলাম করে ইদ্রিস চলে গেল। এডি জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোমার?

—কিচ্ছু ভেব না—যদি বেসামাল দেখ, বাধা দিও। আর পারো তো লনের পাশে বাগানটায় ধরে নিয়ে বসিয়ে দিও। প্লিজ ডোন্ট লিভ মি।

—বেশ, আমি বসে আছি।

ম্যাক শুরু করলে—আমার বাগানের

একটা পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরানো সেকসনে গাছগুলোর একটু-আধটু পোকা ধরেছিল, সেগুলো তুলে ফেলে নতুন চারা লাগাবার কথা। ওই মেথুটা এসে বললে এতগুলো গাছ তুলে নতুন চারা লাগাতে অনেক খরচ তো হবেই, তার ওপর পাতার জন্যও অপেক্ষা করতে হবে সাত আট বছর। এর চাইতে আরো খারাপ গাছ আছে অন্য সেকসনে। এই চারাগুলো সেখানে লাগাই। আর এখানে বরং অগস্ট মাসে মাটির সমান করে সব গাছ কেটে দেব— দেখবেন শীতের আগেই সুট গজাবে। তারপর গাছের গোড় মাটিতে ঢেকে দিলেই নতুনের মতোই জোর দিয়ে উঠে যাবে গাছগুলো। দু-চারটে মরে গেলে নতুন চারা লাগিয়ে দেব। এমন করলে পাতা পাবেন বছর তিনেকের মধ্যে। এমন কয়েকটা করে-ছিলাম—একবার দেখতে পারেন।

—কথাটা আমাদের পক্ষে উদ্ভট, তবু মনে ধরল। বড় সাহেবকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিলাম। কলার-প্রুনিং নয়, আরো নীচে। দুঃখীয়া বাগানে এমন হয়। তাতে কাজ ভালই হয়েছে। তবে অনেক তোয়াজ করতে হয়েছে গাছগুলোকে—

—ছেলেটার তো মাথা আছে ম্যাক। হাজার হোক ব্রিটিশ ব্রাণ্ড আছে তো—

—ব্যাসটার্ড! ব্রিটিশ ব্রাণ্ড! তোমাদের মতো লোকের আশকারা পেয়ে এই সব হাফ-কাস্টগুলো মাথায় উঠে যাচ্ছে।

ধমকানি খেয়ে এডি চুপ করে রইল। তা না হলেও ইংরেজের স্বভাবানুযায়ীও চুপ করে যেতে পারে। এমন চুপ করে অপরের কথা শুনতে খুব কম জাতই জানে। সময় বিশেষে তারা আলোচনা করে, মতামতও প্রকাশ করে কিন্তু তর্কে প্রবৃত্ত হয় না।

ম্যাক বললে—ছোকরার আস্পর্ধা জান? এখন আমার প্রত্যেক কাজে ইন্টারফিয়ার করতে চায়। বড় সাহেবের কাছে পর্যন্ত লাগানি-ভাঙ্গানি করে।

মেথুর কথা তুলতে এডি ধাঁধাঁয় পড়ে যায়। ম্যাকের বক্তব্য বিষয়টার কোন সঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। চুপ করে তার কথাটা শুনে যাবে স্থির করেছিল। কিন্তু ম্যাকের এইটুকু শুনেই সে বেশ খানিকটা বুঝে নিল। তাই গোড়াতেই তার ভুলটা শুধরে দিতে, নয়তো উচিত বলার খাতিরে সে কথা বলতে বাধ্য হল। সে বললে—গিভ দা ডেভিল হিজ ডিউ—ছেলেটার তো তেমন স্বভাব নয়। হাজার হোক ব্রিটিশ—

ম্যাকের মাথাটা তখন একদিকে ঘুরে চলেছে। সে শুনবে কেন তার যুক্তি। এডিকে থামাতে সে বললে—ননসেনস-! পাগল হলে নাকি? আবার ব্যাসটার্ডকে ব্রিটিশ!

তবুও তার পয়েন্ট বজায় রাখতে, যা তার অধিগত বিষয়টা পরিষ্কার করতে এডি বললে—না-না, আমি বলতে চাই ছেলেটা ডিসিপ্লিন জানে—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খায় না।

এবার এডিকে আক্রমণ করে ম্যাক বললে—এতই যদি ভাল ছেলে, তবে তুমি কেন তাকে সরিয়ে দিলে? তবু তো তোমার ডিপার্টমেন্টে কাজ করত না।

এতলোক থাকতে ম্যাক তাকে ধরেছে কেন সেটা এডি বুঝল। নিজেকে সাফাই রাখতে সে বলল—আমি তো ওকে সরিয়ে দিইনি। গুণ ওর আছে, তাই ঠিকমত কাজের জন্য সুপারিশ করেছি মাত্র। ওর তো ভাল হল। ভালই তো করেছি আমি।

ম্যাক কাটছাট দিয়ে বললে—রাখ তোমার ফিলানথ্রাফি আর ন্যাকামি। কেন যে ভাল করেছ তা যেন আমার বুঝতে বাকী আছে।

কি বলে রে বাবা! এডির মাথার ভিতরটা ঘুরপাক খেয়ে গেল। মেথুর কথা উঠতে এমনই একটা আশঙ্কায় দুলছিল তার মন। নিরীহভাবে সে জিজ্ঞাসা করল—কেন, কি করেছি?

ম্যাক ধৈর্য হারাল। একেবারে সরল দিগম্বরের মতো সে বললে—আমায় একখানা বাঁশ দিয়েছ, আর কি করবে! এখন আড়তি-বাড়তি সব খরচ গ্যাটের পয়সা ভেঙে চালাতে হয়। ওর দ্বারা তো হবেই না, অন্য মুহুরী জমাদার পর্যন্ত কিছু করতে সাহস পায় না ওর ভয়ে। কেউ দুটো-দশটা বাড়তি হাজিরা লেখাতে পারে না। ছোকরা আমার ডিভিশনে আসার পর থেকে যত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম ওকে কাজের দিকে ব্যস্ত রাখতে। হোল না,, সব দিকেই ছোঁড়াটার চোখ। বাড়তি হাজিরা লেখাবার উপায় আছে!

এডি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—বড় সাহেবের কানে খবরটা তুলেছে নাকি?

নিরাশ মনে একটা আশার নিঃশ্বাস টেনে ম্যাক বললে—না, তবে তুলতে কতক্ষণ। এখন পর্যন্ত আমার কাছেই নালিশ করে—ওমুকে এই করেছে, তমুকে ওই করেছে। বাড়তি কামাই বন্ধ। একটু ড্রিঙ্ক করতাম। বাধ্য হ'য়ে তাও কমিয়ে দিতে হয়েছে।

এডি আশ্বস্ত হল। হেসে বলল—ওঃ, এই দুঃখ!

এডির প্রতি তীক্ষ্ম চোখ ফেলে ম্যাক বললে—এই দুঃখ। কথাটা বুঝি হেসে উড়িয়ে দেবার? তোমার কি! একলা তুমি। আমাদের সংসার আছে। এই রোজ-গারে ছেলেমেয়ে মানুষ ক'রে সংসার চালিয়ে মদের খরচ চলে? আর এই জঙ্গলে কাজকর্ম ক'রে একটু মদ না খেয়ে বাঁচা যায়? —নিজের ধান্দাতেই অস্থির, তার ওপর ছোকরার হাজার বায়নাক্কা। একটা না একটা লেগেই আছে।

এডি আগ্রহে মুখ বাড়াল। বলল—সে আবার কি?

ম্যাক চেয়ারে গা এলিয়ে শুরু করল লম্বা কাহিনী। বলল—তোমার ফ্যাক্টরির কুলিদের নিয়ে তো তেমন ঝামেলা নেই। বাগানে নানান ঝামেলা। এই দেখ না, ও'রাও কুলিগুলো যখন তখন সেন্দ্রা (জঙ্গলে শিকার) করতে পারে না। ওদের লাইন থেকে জঙ্গলটা অনেক দূরে। তাই মালফাল টেনে ছুটল গাঁয়ে। গাঁ আর এখানে কোথায় পাবে? অন্য লাইন থেকে শিকার ক'রে আনে যত পোষা হাঁস, মুরগী, ছাগল। এমনি প্রথা ওদের আছে। ও'রাও ভাষায় এটাকে বলে যোনি।—কুলিদের উসকে দিয়ে আবার আমার কাছে নালিশ আনল। ওরাঁওদের লাইন সরিয়ে দিতে হল জঙ্গলের কাছে।

বেশ আরামে সিগরেটের ধোঁয়াটা মুখ থেকে ফুঁকে উড়িয়ে দিয়ে এডি বললে—এটা তো ভালই হল।

দম ফিরিয়ে আনতে ম্যাক তার গ্লাসের অর্ধেকটা শেষ ক'রে বললে—ভাল হ'ল! কই, এতদিন তো আমার কাছে কেউ আসে নি। নিজেরাই ঝগড়া মারামারি করে চুপচাপ থাকত। কুলিদের সামনে যে রাশ টেনে থাকতাম সব নষ্ট হ'ল ঐ ছোকরাটার জন্য। অন্য সব জমাদার আমার ভয়ে কাঁপে, কিন্তু এটার আর ভয়ডর নেই। কি করব? বড়সাহেবটা পাগলা, বেটা আবার তাঁর পিয়ারের—নইলে টিট ক'রে দিতাম।

ম্যাক্‌কে শান্ত করতে এডি বললে—ছোকরাটা তো খারাপ কিছুই করেনি। বরং আমার মতে একটা পুরানো বিক্ষোভের নিষ্পত্তি হ'ল।

ম্যাক্ বিরক্ত হয়ে বললে—তুমি তো দেখছি ওর সবই ভাল দেখছ। দেখ না, কোন কুলির ছোকরা ঘাটিরাম মুহুরীর ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় তার ব্যবস্থা কর।

কৌতূহলে ঝুঁকে পড়ে এডি বলল—মুহুরীর ঘরের আনাচে-কানাচে! কেন?

ম্যাক তাচ্ছিল্য ক'রে বললে—ঐ যে, ওর বয়স্থা মেয়েটাকে সেজেগুজে ইসকুলে যেতে দেখে। একটা সর্দারের ছেলে ফাই-ফরমাজ খাটতে ওদের ঘরে যাওয়া-আসা করে। তাই দেখে আর একটা আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

এডি তাতে সায় দিয়ে বলে—হুঁ, তা তো শাসন করতেই হবে।

তিক্তভাবে ম্যাক বললে—যার ঘর সে সামাল দিতে না চাইলে অপরে কি করবে? ও-সবের পিছনে অনেক কথা।

এডির কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। সে বললে—সে আবার কি রকম?

ম্যাক বুঝল এডি একটা আনাড়ি। সে জবাব দিল—তুমি তো খুব নতুন নয়। তবু কিছু জান না দেখছি। শোন, ছোকরাগুলো বাবুদের ঘরে ভিড়ে যায় কাজকর্ম ক'রে দেবার ছুতোয়। যে বাবুর ঘরে বয়স্থা মেয়ে থাকে।

এত শুনেও নিরীহের মতো এডি জিজ্ঞাসা করলে—তাতে কি হ'ল?

হাত দু'টো মুঠো ক'রে দেখিয়ে ম্যাক বললে—কি আর হবে। কাজ ক'রে কর্তা-গিন্নিকে হাত করে।

আরো খোলাখুলিভাবে এডি শুনতে চাইল—তারপর?

এডির নির্বুদ্ধিতায় মাথায় হাত ঠেকিয়ে ম্যাক্ বললে—তারপর আমার মাথা। তারপর কল অফ ফ্লেস। ন্যাকা, বোঝে না যেন। একদিন নিজের কানে যা শুনেছি, অবাক কাণ্ড! এক দুপুরে আমার অফিস কামরায় বসে আছি। পাশের

বারান্দায় বাবুর্চীটার সঙ্গে একটা ছোকরা ফিস্‌ফিস করছে। ওরা জানে না, আমি তখন সেখানে। ছোকরা বলছে—লাইনের ছুকরিগুলো বড় পাজি। একটু বেসামাল হলেই এমন হৈ-হল্লা লাগিয়ে দেবে, যে জান বাঁচানো দায়। বাবুদের মেয়েরা ভাই তা করে না—মান-ইজ্জতের ভয়ে চুপচাপ থেকে যায়।

এডি অবাক হ'য়ে বললে—অদ্ভুত স্টাডি তো ছোঁড়াটার। এই সমস্যাটা বড় ব্যাপক। এমন কিন্তু সকল দেশে, সব সময়েই হয়ে থাকে। সমস্যাটা বড়—

তাকে থামিয়ে দিয়ে ম্যাক জোর গলায় বললে—তোমার মেঘু সে সব স্টাডি ক'রে সাবধান করে দিক না বাবুদের।

চিন্তাশীলভাবে এডি জবাব দিলে—তাতে মুশকিল হতে পারে। কেউ কথার ভাবার্থ বুঝবে না, অথচ রেগে উঠবে ওর ওপর, বা এমন যে কোন লোকের ওপর।

ম্যাক বললে—নিজেদের যদি চোখ না থাকে, অপরে দেখিয়ে দিলেও যদি রেগে ওঠে তবে আমি আর কি করতে পারি? আমি তো আর ও সব কথা বলতে পারি না। তবু শুধু আমায় বিরক্ত করবে। কোন ছোকরা কোন মেয়ের পিছনে লেগে আছে, কোন কুলি মাইকীর সঙ্গে কোন বাবুর ভাব-আলাপ, তার আমি কি করব? কানের পাশে বকবক করবে—আমায় তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

—এমন কাজে বয়স ও পদগৌরব দুটো থাকলেই ভাল হয়। ভেবে দেখ, তোমার দুটোই আছে। তোমার হাত দিয়েই তা হবার কথা। আমার মতে মেঘু ঠিকই করে হে।

ম্যাক ক্ষেপে উঠল। বললে—এসব আমার কাজ? মেঘু ঠিকই করে? আমি কি সমাজসেবক নাকি? আমি এসেছি কাজ করতে। ওরাও কাজ করতে এসেছে। যে যার কাজ ক'রে যাব। তার উপায় নেই। আবার ভয় দেখাবে—স্যার, একটা কিছু না করলে খুন-খারাপী হ'য়ে যাবে।

এডি বুঝিয়ে বললে—অযথা মন-মেজাজ নষ্ট কোর না। তোমার মতো অত না হলেও আমারও অনেক ঝামেলা আছে। সর্টিং রুমে অনেক মেয়ে কাজ করে। আমাকেও চোখ রাখতে হয় সব দিকে। কুলি-কামিন নিয়ে কাজ করতে হ'লে এসব দিকে নজর দিতে হবে বৈকি। তবেই না অ্যাডমিনিসট্রেসন ঠিক চলবে।

ম্যাক বললে—তা আমি নিশ্চয়ই চালাই। আমার ভয়ে সবাই তটস্থ থাকে।

এডি বললে—পার্ডন মি! বেশ, তোমার সামনে সবাই জড়সড় হয়ে রইল। তাতে তো ঐ সব জটিলতা দূর হয় না। যখন সবাই বুঝবে যে মালিকের সব দিকেই চোখ আছে তখনই সে সব দূর হবে।

ম্যাক দৃঢ় স্বরে বললে—তার একটা সীমা আছে তো। নিজের গন্ডি ছেড়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলেও বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। যাক, ও সব কথা। এই সব ঝামেলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে, আমায় বলে বলে সে এখন কতটা আশকারা পেয়েছে, সেটা শোন। —সকালে কুলিরা সব কাজে গেছে, ফর্কিং হবে। মেঘু বললে—স্যার, আজকাল ফর্কিং উঠে গেছে। শুধু সিকলিং, উইডিং আর পাতা তোলা।

ম্যাক ব'লে চলল—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তার মানে? তবুও সে দমে না, জবাব দিলে—ফর্কিং করলে গাছের সরু সরু শিকড়গুলো কাটা যায়, মাটি থেকে রস টানতে পারে না, পাতা কমে যায়।

ম্যাক উত্তেজিত হ'য়ে বললে—আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় জানলে এ সব।

হাতটা প্রসারিত ক'রে কাউকে দেখানোর ভঙ্গিতে ম্যাক বললে—ডেঁপোমি দেখ। জবাব দিলে—টোকলাই (টোকলাই একস্‌পেরিমেন্টাল স্টেশন) জার্ণালে। লোকগুলোকে, ফর্কিং করতে না দিয়ে, আগাছাগুলো পরিষ্কার করতে দিন।

খবরটা এডির চোখেও পড়েছে। কিন্তু তার তো কিছু করবার নেই এ বিষয়ে, তাই কাউকে কিছু বলে নি। ম্যাকেরই জানা উচিত ছিল এটা। মনে মনে সে মেঘুকে তারিফ না করে পারল না।

ম্যাক বললে—অতগুলো লোক ফর্ক নিয়ে গেছে। আর চিরদিন ফর্কিং হ'য়ে আসছে, এক কথায় তা বন্ধ করে দেওয়া যায়? কিন্তু বিরক্ত করতে লাগল—স্যার, অসম্ভব পাতা কমে যাবে! ফর্কিং না ক'রে দেখুন স্যার—কত পাতা বেড়ে যাবে।

দম্ভভরে ম্যাক বললে—প্রত্যেক বছর আমি টার্গেট রিচ করি, বোনাস পাই। আমায় পাতা দেখাতে চায়? যে কাজ বরাবর চলে আসছে তা আমি ফট ক'রে বন্ধ করব না। বলে দিলাম—ওসব একস্‌পেরিমেন্টাল ব্যাপারে বড় সাহেবের হুকুম হবে না।

—ছোকরা তবুও বলে—যাব স্যার? আমার যাওয়াটা ঠিক হবে কি? বরং আপনিই একটা ফোন করে জেনে নিন না স্যার।

—আমি বললাম—না, না, ওসব ছেলে-মানুষী করতে পারব না। তুমি ছেলে-মানুষ, ওসব তোমাদের মানায়। বড়সাহেব নিজেও তো জার্ণাল পড়েন। তাঁরই তো আমাকে সেটা বলার কথা।

—তাতেও মেঘু বলে—কাল এসেছে এটা, তিনি হয়তো এখনো সময় পান নি এটা পড়বার। যাব স্যার? রাগ করবেন না তো? আপনি পাঠিয়েছেন বলব কিন্তু।

—আমি বললাম, রাগ করব কেন? তুমি কাজের জন্য যাবে, যাও।

এডি বুঝল— কোন ভূমিকা না করে মেঘু হঠাৎ কথাটা বলে ফেলেছে বটে, কিন্তু ম্যাককে সামনে রাখতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। সে ভাবতে লাগল—এই পরিবেশে মানুষ হয়ে ছেলেটা এত ভদ্রতা শিখল কেমন ক'রে?

এডির মনের ভাবটা ম্যাক বুঝল না। সে তার মনের দুঃখটা ভেঙ্গে বললে—খানিক পরেই মেঘু ফিরে এল। বড়-সাহেবের নিজের হাতের লেখা একটা চির-কুট দিল আমার হাতে। শুধু কি তাই, সেটা দিয়ে দাঁত বার করে বিজয়গর্বে হাসতে লাগল। সকলের সামনে আমার মাথাটা হেঁট হল।

এডি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—কি লেখা ছিল তাতে?

মাথায় হাতটা ঠেকিয়ে ম্যাক বললে—লেখা আমার মাথা আর মুন্ডু। 'স্টপ ফর্কিং'। ভাবতে পারি নি, সত্যই ও বড় সাহেবের কাছে যাবে। আর গেলেও আমার সঙ্গে আলাপ না ক'রে তিনি এমন একটা হুকুম দেবেন। তিনি জানালেন—বড়ই দুঃখিত যে ওটা তিনি পড়েন নি আগে।

এডি হো-হো করে হেসে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল, বললে—এই ব্যাপার! এর জন্য তুমি এত মুষড়ে পড়েছ?

ম্যাক চোখদুটো টেনে বড় করে উত্তে-জিতভাবে বললে—পড়ব না! বড় সাহেবের সামনে, এতগুলো কুলির সামনে এটা কি কম অপমানের কথা?

হাসতে হাসতে এডি সামনে ঝুঁকল, বললে—একসকিউজ মি, তোমায় দেখছি ভূতে পেয়েছে। এতে তোমার অপমান হ'ল কেমন করে? তোমার মান তো বেড়ে গেল। অন্ততঃ বজায় রইল।

ম্যাক আরো উত্তেজিত হল, বললে—অপমান হল না? মান বেড়ে গেল. বাঃ! বেশ লোককে আমি দুঃখের কথা শোনাচ্ছি!

এডি টেবিলের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললে—টেক ইট ইজি মাই বয়, টেক ইট ইজি, তবেই ঘটনাটা পরিষ্কার হবে। আমি ছেলেটাকে জানি—সে তোমার নাম করেই কথা বলেছে, তোমাকে ছোট ক'রে কোন কথা বলে নি বড় সাহেবের কাছে। আর কুলিদের সামনেই বা কি হয়েছে? তুমি তো ওদের সামনেই মেঘুকে হুকুম আনতে পাঠিয়েছিলে। তার ওপর এটা পরামর্শ করবার বিষয়ই নয়। মতটা টোকলাই থেকে আসছে—হয় সেটা নেও অথবা নিও না। বড় সাহেব সেটা নিলেন। সকল বাগানই তাই করে। এতে তোমার আমার অপমান বোধ করবার কি আছে?

ম্যাক বেশ ধাঁধায় পড়ল। কিন্তু যে ধারণার বশবর্তী হয়ে তার মনটা এত-খানি ভেঙ্গে পড়ে সেটার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারল না। তার বদ্ধমূল ধারণা যে, সে নিজে জার্ণালটা পড়ে নি, মেঘু পড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এটাই গার্ট-ফ্রিডের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল। এডির কথায় সে গোড়া থেকে সব কথাগুলো মনে মনে খতিয়ে দেখতে লাগল।

কথায় কথায় আরো কয়েক রাউন্ড হুইস্কি নেমে গেছে দুজনের গলা দিয়ে। নতুন পেগটার অর্ধেকটা ম্যাক এক চুমুকে শেষ করল তার হারানো উদ্যমটা ফিরিয়ে আনতে। ম্যাকের কান্ড দেখে

এডি মুচকে হাসছে সিগারেট টানতে টানতে।

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ফুঁকে বার করে ম্যাক হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে—থাই বল, আমি ঐ ছোকরাকে বরদাস্ত করতে পারছি না। ভাইটা আমার হাতীর দাঁতের ব্যবসা করে। একলা পেরে ওঠে না বেচারা। কতবার লিখেছে—ভায়া, চলে এস এখানে। বেশ আয় হবে আমরা দু-ভাই খাটতে পারলে। শুনিনি এতদিন তার কথা। নাঃ, চাকরি ছেড়ে চলে যাব। জঙ্গলেই যখন আছি, তখন আসাম আর আফ্রিকা সবই সমান।

এডি তর্জনী তুলে ধরে ধিক্কার দিয়ে বললে—তুমি তো বড় দুর্বল চিত্তের লোক হে ম্যাক্। ভাইকে সাহায্য করতে যেতে চাও, যাও। আমার বলবার কিছু নেই। তুমি একটা ব্রিটিশ, কাজ কর ব্রিটিশ ওনড বাগানে। সামান্য একটা দোঁ-আঁশলা ছোকরার ওপর রাগ করে চাকরি ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছ? ছ্যাঃ! সেম অন ইউ!

মেঘুকে দোঁআঁশলা বলাতে ম্যাক খুব খুশী হল। মাথাটা এগিয়ে সে চাপা গলায় বললে—শুধু কি তাই? ছি-ছি! দেখছ না গর্টফ্রিড পাগলা যে ওর কথায়—

এবার এডির পালা। সে ম্যাকের কথাটা কেটে দিয়ে বললে—ডোন্ট টক ননসেন্স। মিঃ গর্টফ্রিডের কাছে তোমার চাইতে ঐ দোআঁশলাটা বড়! এই তোমার বুদ্ধি? ওকে তিনি কৃপা করেন, আর তোমায় ভালবাসেন। এটা বোঝ না?

ম্যাক ঘাড় দুলিয়ে বললে—কিসে তোমার এমন বিশ্বাস জন্মাল শুনি!

এডি সহজ মামুলি যুক্তি দেখিয়ে বলতে গেল—কেন? তিনিও ইংলিশ তুমিও—

এডিকে থামিয়ে ম্যাক বললে—পাইপ ডাউন, তিনি ইংলিশ হলেন কি ক'রে? ভুলে গেল প্রুশো-জার্মাণ ইউনিফিকেশনের সময় ও'র ঠাকুরদা সপরিবারে চলে আসেন ইংলন্ডে—উদ্বাস্তু যাযাবরের বংশধর হল ইংলিশ?

এডি অবাক হ'য়ে বললে—তাতে কি হয়েছে? এমন তো কতই হয়েছে, রোঁয়া বাছতে গেলে ইংলন্ডে কটা ইংলিশম্যান খুঁজে পাবে?

কথাটা না তোলাই বোধ হয় ভাল ছিল। এই যেন তারই ওপর এসে যায়। ম্যাক তৎপর জবাব দিলে—খুঁজে পাব না? তোমার যত উদ্ভট কথা। পুরুষ পরম্পরায় যারা ওখানে থেকে গেছে—ওটাই তাদের দেশ, তাই দেশের জন্য টান পড়ে, সেই সঙ্গে মানুষের ওপরও সে টান পড়ে।

ম্যাকের যুক্তি ধরেই এডি বললে—তা তো মিঃ গর্টফ্রিডেরও হয়েছে।

সাশ্চর্যে ম্যাক বললে—হয়েছে? তাঁর নামটা ভেবে দেখ না।

এডি বিস্মিত হল, বলল—এটা কি বললে? শুধু ইংলন্ডে কেন, অমন তো সব দেশে, সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই পাবে। যুদ্ধের সময় তিনি কি করলেন, সেটা ভেবে দেখ না, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। আর যদি তাই ধরে থাক—তবে দায়িত্বশীল সহকর্মী হিসেবে, অন্ততঃ, সাদা জাত হিসেবে কার প্রতি তাঁর টান থাকার কথা?

ম্যাক নিরুত্তর। এডি বুঝল, ওটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় না ম্যাক। সে বললে—আমার মনে হয় তা নয়—তোমার নিজেরই গলদ আছে। তাই বড় সাহেবকে এড়িয়ে থাকতে চাও।

একটু ইতস্ততঃ করে ম্যাক বললে—তা নয়, তবে ঐ মেঘুটার হাত থেকে রেহাই পেলেই হয়।

এডি হেসে বললে—তাই বল। এটা আর শক্ত কি? ক্যানিংহামের ডিভিসনে ট্রান্সফার কর না। লোকটা ফিলজফার ধরনের, মদ খায় না, এমনকি মাংস পর্যন্ত খায় না। কোন বাজে খরচ নেই তার। ওখানে দু-জনই সুখে থাকবে।

এডির প্রস্তাবটা ম্যাক লুফে নিল। বললে—কি করে তা করা যায় ভাই?—আচ্ছা, একেবারে সরিয়ে দেওয়া যায় না বাগান থেকে?

একটু অন্যমনস্কের ভাব দেখিয়ে এডি চুপ করে রইল। ম্যাকের কাছে নিজের মনের ভাবটা চেপে গেল বটে, কিন্তু গর্টফ্রিডের ওপর বিশেষ ভাব তারও আছে। তার ওপর কলঘর থেকে বিদায় করে দিয়েও তার ভয় ছিল মেঘুকে। তাই ম্যাকের শেষের অভিপ্রায়টা ভালই লাগলো তার। ম্যাককেও কাজে লাগাতে পারবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। সে বললে—কেন যাবে না! ব্রিটিশ গার্ডন, ব্রিটিশের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না, এটা কি একটা কথা!

ম্যাকের চোখদুটো উজ্জ্বল হল। সে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এডির হাতটা চেপে ধরল। বললে—ইউ আর মাই ডার্লিং। কি রকম করে তা হবে?

এডির নিজের ইচ্ছা যাই হোক, ম্যাকের সাহায্যে সাগ্রহে এগিয়ে গেল, বললে—ছেলেটোর খুব প্রশংসা করে যাবে, ডাইনে বাঁয়ে। বড় সাহেবের কাছেও—

চালটা ম্যাকের মাথায় ঢুকল না। সে বেঁকে বসল, বললে—তা পারব না। যা করেছি, করেছি—

নিরেট লোকটাকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছে এডি, সে চাপা স্বরে বললে—আরে পাগল! সরাতে হলে তাই করতে হবে। প্রশংসা করে ওকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার করে দাও।

এতক্ষণ পরে ম্যাক হাসবার একটা সুযোগ পেল। সেটা এমনই বিরাট যে জানলার পাশে গাছের ওপর পাখীগুলোও শুনতে পেলো তা, এবং তারাও তাতে যোগ দিল। সেটা থামতে সে বললে—আর ইউ সিরিয়াস? ভেবেছিলাম তোমার অগাধ বুদ্ধি। মেঘু ওয়েলফেয়ার অফিসার!

একটা ধমক দিকে এডি বললে—থামো, মেঘুর নামে হাসছ। একটা ভদ্রলোকের ছেলের কথায় তো অমন হাসতে না। জেনে রাখ, ওর যোগ্যতা কারো অপেক্ষা কম নয়।

মুখ ব্যাদান করে ম্যাক বললে—আচ্ছা, মেনে নিলাম তোমার কথা। কিন্তু তাতে তো ওর ভালই হ'য়ে যাবে।

এডি একটু মুচকি হাসল। তার কিস্তিমাতের চালটা ভেঙে বললে—হাঁ যাবে! তুমি একটি গবেট। ওকে পেলে কুলিদের বায়নাক্কা ষোলগুণ বেড়ে যাবে। অতসব তো এঁটে উঠতে পারবে না। তার ওপর সুযোগ বুঝে লেবারদের একটু উসকে দিলেই পালাতে পথ পাবে না। নয় তো খুন হয়ে যাবে। আজকাল যে সব কুলি! তাদের সঙ্গে ও পেরে উঠবে? এত ধার, ভার সত্ত্বে আমরাই বলে—

কথাটা লুফে নিল ম্যাক। বললে—দি আইডিয়া! অশেষ ধন্যবাদ! তা হলে ওর প্রশংসা করা এখন প্রথম কর্তব্য।

—নিশ্চয়ই! বেশ জোর দিয়ে বললে এডি।

—ওয়েল ম্যাক! কার প্রশংসা করা কর্তব্য? পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করে ডেভিড গিয়ে দাঁড়াল সামনে।

ডেভিডকে দেখে ম্যাক কেমন যেন দমে গেল। এডি ইসারা করল—ম্যাক যেন সাবধানে কথা বলে এই দোআঁশলাটার সামনে। ডেভিডের দিকে চেয়ে বললে—কথা হচ্ছিল মেঘুর বিষয়। ম্যাক বলছিল—ছেলেটা খুব খাটিয়ে, সিনসিয়ার।

খুশী হয়ে ডেভিড ম্যাককে জিজ্ঞাসা করলে—তাই নাকি হে ম্যাক্।

ম্যাক একরোখা লোক। এডির মতো চাপা স্বভাবের নয়, তার মতো অমন চটপট অভিনয় করতেও পারে না। প্রথমটা একটু থতমত খেল সে। এডির চোখে তার চোখ পড়তে সামলে নিল নিজেকে, বললে—নিশ্চয়ই, চমৎকার ছেলে। আরো বড় কাজ করবার যোগ্যতা আছে। বোস বোস, একটু হুইস্কি খাও। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

ডেভিড চেয়ার টেনে বসে বললে—বিলিয়ার্ড খেলছিলাম। গলাটা শুকিয়ে গেছে, তাই এদিকে এলাম।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

ইওহানেস কেপ্‌লার

ইওহানেস কেপ্‌লারের জন্ম ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে, ১৫৭১ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে চারশো বছর আগে। গ্রহের গতি সম্পর্কিত তিনটি সূত্র আবিষ্কার করে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি যে-সময়ে গবেষণা করেছিলেন তখনো পর্যন্ত সরকারীভাবে স্বীকৃত মত ছিল এই যে পৃথিবী রয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রে আর সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা এই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। অর্থাৎ এই বিশ্ব ভূ-কেন্দ্রিক। গির্জার অনুমোদন ছিল এই তত্ত্বের পিছনে, ফলে এই তত্ত্বের বিরোধী অন্য কোনো তত্ত্ব উপস্থিত করা মোটেই নিরাপদ ব্যাপার ছিল না। অথচ কোপারনিকাসের তত্ত্বে এই উল্টো কথাটাই বলা হয়েছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে সূর্য রয়েছে এই বিশ্বের কেন্দ্রে এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। অর্থাৎ বিশ্বটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে সূর্য-কেন্দ্রিক। বিশ্বের কেন্দ্রে স্থির হয়ে অবস্থান করার যে মহিমান্বিত স্থানটি ছিল পৃথিবীর তা আর থাকছে না। গির্জার ও রাজরাজড়াদের এতে প্রবল আপত্তি, ফলে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের কথা বলার মানেই ছিল ধর্মের ও রাজরাজড়াদের বিরুদ্ধে যাওয়া। তবুও কোপারনিকাসের তত্ত্বের অনুসরণে একাধিক বিজ্ঞানী গির্জা ও রাজরাজড়াদের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপের আমলেও সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের কথা বলেছিলেন। গ্যালিলিওর ওপরে নির্যাতনের কথা সবাই জানেন। কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। গিওর্দানো ব্রুনো নামে অপর একজন বিজ্ঞানীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল (১৬০০ সালে)।

কেপ্‌লারও ছিলেন এই সময়ের বিজ্ঞানী। কোপারনিকাসের তত্ত্ব চালু হয়েছিল তাঁর জন্মের প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকে কিন্তু কোনো স্বীকৃতি পায় নি। গ্যালিলিও ছিলেন কেপ্‌লারের চেয়ে সাত বছরের বড়ো, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পরে তিনিও কোপারনিকাসের তত্ত্বের পক্ষে অবিসম্বাদিত সমর্থন গড়ে তুলতে পারেন নি। কোপারনিকাসের তত্ত্বের পক্ষে অবিসম্বাদিত সমর্থনের জন্যে প্রায় দেড়শো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল, নিউটন কর্তৃক মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কারের সময় পর্যন্ত। কিন্তু এই নিউটন যে দুজন বিজ্ঞানীর দুটি কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে মাধ্যাকর্ষণের দিগন্ত অবলোকন করতে পেরেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন কেপ্‌লার ও গ্যালিলিও। বিশেষ করে কেপ্‌লার। গ্রহের গতি সম্পর্কিত তাঁর তিনটি সূত্র একদিকে যেমন কোপারনিকাসের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছে। অসীমসাহসিকতা ও দূরদৃষ্টির দৃষ্টান্ত হিসেবেও তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম একটি নাম।

গ্রহের গতি সম্পর্কিত সূত্র উপস্থিত করতে গিয়ে ১৬১৮ সালে কেপ্‌লার বলেছিলেন, এই সূত্রের পাঠক পাবার জন্যে সম্ভবত একশো বছর অপেক্ষা করতে হবে। নিউটনকে যদি বলা হয় কেপ্‌লারের সূত্রের সবচেয়ে বোদ্ধা পাঠক তাহলে অবশ্যই অঙ্কের হিসেবে পুরো একশো বছর নয়, তার আগেই তিনি এসে গিয়েছেন। ১৬৩০ সালে কেপ্‌লারের মৃত্যুর বারো বছর পরে নিউটনের জন্ম। তাহলেও একশো বছরের হিসেবটায় বড়ো রকমের হেরফের হয় নি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের পৌনে-তিনশো বছর পরে এই সূত্রকে প্রধান অবলম্বন করে যে নভশ্চারণার যুগ শুরু হয়েছে সেই দিনটির কথাও কেপ্‌লার ভাবতে পেরেছিলেন। ১৬১০ সালে গ্যালিলিওর কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন :

‘আদ্রিয়া বা বাল্‌টিক বা ইংলিশ চ্যানেলের সীমাবদ্ধ উপসাগর ও প্রণালীর এলাকায় পাড়ি দেওয়ার চেয়েও মহাসাগরের বিপুল বিস্তৃতির এলাকায় পাড়ি দেওয়াটা আরও নির্ঝঞ্ঝাট ও নিরাপদ হবে তা কে ভাবতে পেরেছিল! এমন একটি যান যদি তৈরি করা যায় যা মহাকাশের সকল আবহাওয়ার উপযোগী তাহলে এমন কি মহাকাশের বিপুল বিস্তৃতিতে পাড়ি দেবার মতো সাহসী মানুষ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে যাঁদের বলা যেতে পারে মহাকাশের অসমসাহসী অভিযাত্রী, তাঁরা না আসা পর্যন্ত আমরা বরং জ্যোতিষ্কলোকের মানচিত্র এঁকে চলি—আমি আঁকি চন্দ্রের; আর তুমি, গ্যালিলাই, বৃহস্পতির।

এই চিঠিটি আজ থেকে তিনশো একষট্টি বছর আগে লেখা হয়েছিল ভাবা যায় না।

ইওহানেস কেপ্‌লার
(১৫৭১—১৬৩০)

কেপলারের জন্ম দক্ষিণ জার্মানির ভাইল নামে একটি শহরে। সে-সময়ে জার্মানির অবস্থা, যাকে বলা হয় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, তাই। কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু সেই বিদ্রোহ পরাজিত। প্রিন্সদের হাতে গোটা দেশ খণ্ডবিখণ্ড। রাজ্যগুলো কোনোটা লুথারীয়, কোনোটা ক্যাথলিক। গোটা দেশ জুড়ে একটা অস্থির অবস্থা।

চার বছর বয়সে কেপ্‌লার বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। অসুখটি ছিল মারাত্মক ধরনের। অসুখে তাঁর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যায়, হাতদুটি প্রায় পঙ্গু। বড়ো হয়েও তিনি নিজে কোনোকালে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের পর্যবেক্ষণ-লব্ধ ফলাফল নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

তাঁর লেখাপড়া টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। মিকেল মেস্টলিন তাঁর শিক্ষক। এই শিক্ষকের কাছেই তিনি কোপারনিকাসের তত্ত্বের কথা শোনেন। কিন্তু এই শিক্ষকই নিজে যে বইটি লিখেছিলেন তাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কোপারনিকাসের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতে সাহস পান নি।

১৫৯৪ সালে কেপ্‌লার গ্রাৎস-এ গণিতের অধ্যাপক হন। ১৫৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা ‘মিস্টিরিয়াস কস্‌মোগ্রাফিকাস’।

ডেনমার্কের বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে তাঁর সঙ্গে গবেষণা করার জন্যে কেপলারকে আমন্ত্রণ জানান ১৬০০ সালে। গিওর্দানো ব্রুনোকে এই বছরেই আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। টাইকো ব্রাহে ছিলেন প্রাগে সম্রাট রুডোল্‌ফ-এর সভা-গণিতজ্ঞ। ১৬০১ সালে টাইকো ব্রাহের মৃত্যুর পরে কেপলার এই পদে নিযুক্ত হন।

টাইকো ব্রাহের বিপুল পরিমাণ ও অতি-মাত্রায় সঠিক পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলো নিয়ে তিনি যে কষ্টসাধ্য গবেষণা শুরু করেন তারই ফল গ্রহের গতি সম্পর্কিত তাঁর সূত্র।

এই সূত্রেই প্রথম বলা হল সূর্যের চার-দিকে গ্রহের গতি বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার; আর সূর্য রয়েছে এই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে। সে-কালের পক্ষে এটা যে কী বিরাট কথা আর অসমসাহসী কথা তা এখন কল্পনা করা যাবে না। তখনো পর্যন্ত বৃত্তকে মনে করা হত নিখুঁততম আকার, স্বর্গীয়, অতএব স্বর্গলোকের জ্যোতিষ্কের গতি বৃত্তাকার হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কেপলার এই স্বর্গীয় ধারণাটাকেই ভেঙে দিলেন।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, গ্রহ সূর্যের যতো কাছে তার বেগও ততো বেশি।

১৬০৯ সালে এই দুটি সূত্র উপস্থিত করার দশ বছর পরে গ্রহের আবর্তন-কাল ও গড়-দূরত্ব সম্পর্কে তৃতীয় সূত্রটি উপস্থিত করেন।

তার মা-কে (৭০ বছরের বৃদ্ধা) ডাইনী বলে সন্দেহ করা হয়েছিল এবং আশঙ্কা ছিল যে, তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। মাকে বাঁচাবার জন্যে কেপ্‌লারের মতো বিজ্ঞানীকেও দু-বছর তৎপর থাকতে হয়েছিল।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। তাঁর স্ত্রী ও সন্তান মারা যায়। সম্রাটের কাছ থেকে তিনি কোনো সময়েই নিয়মিত বেতন পান নি। এই পাওনা বেতনের দাবি তোলার জন্যেই কষ্টকর পথ পার হয়ে ১৬৩০ সালে গিয়েছিলেন সম্রাটের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে, রেগেন্সবুর্কে। সেখানেই, পৌঁছবার তিনদিন পরে, ১৫ই নভেম্বর তারিখে তিনি মারা যান।

তাঁর জীবনী অবলম্বনে অতি চমৎকার একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন রোজেমারী শুভের। উপন্যাসটির নাম 'ডাইনীর ছেলে'। (উইচেস সন) জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক থেকে প্রকাশিত সেভেন সীস বুকস-এও উপন্যাসটি পাওয়া যায়। এই উপন্যাস থেকে শুরুর প্রস্তাবনা বাদ দিয়ে খানিকটা অংশ এখানে উপস্থিত করছি।

কেপলারের জীবনী অবলম্বনে লেখা উপন্যাস থেকে

১৬১০ সালের আগস্টের পরিষ্কার একটি রাত। একজন মানুষ পিসা থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে ফ্লোরেন্সের আকাশ দেখছেন। সেই আকাশে তিনি এমন কিছু দেখলেন যা বন্ধুদের কাছে লিখে জানাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। খবরটি লিখলেন এইভাবে :

Smaismrmilmepoetaleu-
mibunenugttauiras

এই অক্ষরগুলোর অর্থ কী হতে পারে তা বার করার জন্যে পণ্ডিতরা অক্ষরগুলোকে নানাভাবে বারবার করে সাজাতে লাগলেন, অনেক ভাবনাচিন্তা করলেন ও হয়রান হলেন।

এমনি একজন হচ্ছেন ইঙ্গলেস্টাট কলেজের ধর্মনিষ্ঠ যেশুইট ফাদার, গণিতে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, খ্রিস্টোফ শাইনার। নিজের পড়ার ঘরে বসে লম্বা অস্থিসার আঙুলগুলো দিয়ে অক্ষরগুলো এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছেন। সেন্ট আন্টোনিয়ুসের দোহাই, আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, এমনও তো হতে পারে, পিসার এই মানুষটি যা আবিষ্কার করেছে তা আমিও পারতাম। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি পারংগম, ফ্লোরেন্সে যে মানুষটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আকাশে গোয়েন্দাগিরি করছে তার সমান মাত্রায় তো বটেই, বেশিও হতে পারে। বিষয়টি তিনি আয়ত্ত করেছেন জার্মানসুলভ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।...কিন্তু হায়, তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র নেই। নিতান্ত অন্ধ যদি না হয়, মনে মনে ভাবলেন, এমনি একটি যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তো যে-কেউ আকাশটাকে ফালা-ফালা করে দেখতে পারে।

এমনি আরেকজন যেশুইট ফাদার হচ্ছেন ভিয়েনার গণিতবিদ পাউল গুল্‌ডিন। লম্বা শক্তসমর্থ চেহারার মানুষটি, আত্মগত ধরনের ধীমান, এমন কিছু করতে রাজী নন যাতে শহীদ হতে হয়। আপাতবিচারে অর্থহীন অক্ষরগুলোর সারির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ভাবলেন, ধরনটি একেবারে পুরোদস্তুর ইতালীয় আর কূট-কৌশলটি কী মনোরম, পিসার মানুষটি জগতের সামনে একটি ধাঁধা উপস্থিত করেছে। সাদাসিধে ভাষায় নিজের আবিষ্কারের কথা কেন যে ঘোষণা করছে না, তা একমাত্র সে-ই জানে। যেমন করেছিল আট মাস আগে সাইডিরিয়াস নানসিয়াস নামে বৈজ্ঞানিক রচনায়, যখন ঘোষণা করেছিল যে বৃহস্পতি গ্রহের পারিপার্শ্বে চারটি তারা সে আবিষ্কার করেছে। তারপর ভাবলেন, নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ আছে যে জন্য এবারে কোনো কিছু প্রকাশ করে নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই গুল্‌ডিন অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। নিজের ধাঁধার সমাধান সে নিজেই করুক, আর কারও পক্ষে তা সাধ্য নয়।

এমনি আরেকজন রয়েছেন প্রাগে, সভা-গণিতবিদ ইওহানেস কেপ্‌লার। ধাঁধার সমাধান করার জন্যে তাঁর যেমন যথেষ্ট ধৈর্য তেমনি নিদারুণ আকাঙ্ক্ষা। বস্তুত একটি বাক্য তিনি গঠনও করলেন :

Salve umbistineum geminatum Maria proles.

তাঁকে স্বীকার করতে হল, বাক্যটা কিম্ভূত জটিল হয়ে গিয়েছে, তাছাড়া একটি অক্ষর এখনো বাকি। তাঁর এই সমাধানটির অর্থ : স্বাগত, দুই মাংসপিণ্ড, মঙ্গলের সন্তান। এ থেকে তিনি অনুমান করেছেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে মঙ্গলের দুটি চাঁদ গালিলিও গালিলাইর চোখে পড়েছে। কিন্তু একটি অক্ষর তো এখনো বাকি!

এখন ফ্লোরেন্সে থাকলে কী ভালোই না হত, ইওহানেস ভাবলেন, তাহলে গালিলাইর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, যে-কোনো রাজদণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি আকাশের দিকে ঘোরাতে পারতেন, তাকিয়ে দেখতে পারতেন আর তুলনা ও বিচার করে গাণিতিক ও ভৌতিক প্রমাণ উপস্থিত করতে পারতেন যে, 'জ্যোতিষ্কের আবর্তন সম্পর্কে' তাঁর রচনায় কোপারনিকাস ঠিক কথা বলেছেন। এখন তিনি শুধু এইটুকু চান যে, তিনি যেন রয়েছেন ফ্লোরেন্সে, বন্ধুর কথা শুনছেন, ইতালির বিরাট পণ্ডিত তাঁর বন্ধুটি তার জন্মের শহর পিসার গল্প করছে, সেই শহর— যেখানে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত মার্বেল ক্যাথেড্রাল ও তার অতি চমৎকার জলাধার, সেই আশ্চর্য ও মনোহররূপে নির্মিত হেলানো গম্বুজ, আর তখন তাঁর মনে পড়ছে বন্ধুটি যখন তার গণিতের ছাত্রদের কাছে অবাধ পতনের সূত্র প্রমাণ করবার জন্যে হেলানো গম্বুজটি ব্যবহার করেছিলেন তখন পিসার দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের সে কী আতঙ্ক, পুরনো ঘটনা মনে করে বন্ধুর সঙ্গে তিনি হাসছেন। আমার অভিনন্দন নাও গালিলাই, মনে মনে ভাবলেন। আমি জানি কেন তুমি তোমার আবিষ্কারকে একটা ধাঁধার আড়ালে রেখেছ, গিওর্দানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা তো মাত্র দশ বছর আগের।

এমনি আরেকজন হচ্ছেন মিকেল মেস্টলিন, নেকার নদীর তীরে টুবিঙেন-এ গণিতের অধ্যাপক। খৃষ্টীয় সুসমাচার অনুবর্তী লুথারীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়ার ঘরে তিনি বসে আছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই লিখেছেন তিনি, বইয়ে শান্তির খাতিরে ধরে নিয়েছেন যে পৃথিবী এখনো এই বিশ্বের কেন্দ্রে। মনে হতে পারে, এই মানুষটি, মেস্টলিন—যিনি কেপ্‌লারের শিক্ষক—তিনি কখনো কোপারনিকাসের নাম শোনেন নি।

আপন মনে বলতে লাগলেন, 'কোপারনিকাস ঠিক কথা বলেছেন তার আরো একটা প্রমাণ এ থেকে পাওয়া যাবে হয়তো। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, এই তত্ত্ব যে সঠিক তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। টলেমি সূর্যকে যে স্থান দিয়ে গেছেন সেখান থেকে সরিয়ে এই বিশ্বে সূর্যকে অন্য একটি স্থান দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের গুরু লুথার এই বলে কোপারনিকাসের শিক্ষাকে বাতিল করেছেন যে এই শিক্ষা ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধী। অতএব একজন সৎ লুথারপন্থীকে অবশ্যই এই তত্ত্বটিকে অবজ্ঞা করতে হবে। একজন সৎ লুথারপন্থী কখনোই এই তত্ত্বটির প্রচারে সাহায্য করবেন না—তবে যদি করতেই হয়, নিতান্তই যদি এড়ানো না যায়, তাহলে গোপনে।"

সম্রাট রুডোল্‌ফ প্রাগে তাঁর প্রাসাদে আহারে বসেছেন এমন সময়ে পিসার মানুষটির আবিষ্কারের কথা শুনলেন।

মুখভরা খাবার নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, এই বেয়াড়াপনা অসহ্য! হায় ভগবান, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কী যে ও দেখল তা আমাদের বলবে তো, এভাবে অন্ধকারে রাখছে কেন! আমার ভাগ্য-তারা দেখেছে হয়তো। আকাশে কী ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে বইকি!

আমরা, জার্মান জাতির পবিত্র রোমান সম্রাট, আদেশ করছি ফ্লোরেন্সের এই মানুষটি তার গোপন কথাটি প্রকাশ করুক, এই মুহূর্তে!'

গালিলাই ছিলেন তাসকানির গ্র্যান্ড ডিউকের প্রজা, রোমের জেসাস সমিতির প্রধানের দ্বারা মঞ্জুর হয়ে সম্রাটের আদেশ তাঁর ওপরে জারি হল। তাঁকে জানানো হল যে, সমিতির অধিনায়ক ক্লডিয়াস আকোয়াভিভা আপত্তি করেন নি। এই অধিনায়কটি নিজেকে যে মনে করতেন চতুর ও কূটনৈতিক তা অকারণে নয়। এমন কি তিনি বেঁচে থাকতেই লোকে তাঁর সম্পর্কে বলাবলি করত যে ডিউকের ফাদার ধর্মগুরুদের কাছে তিনি যেসব নির্দেশ পাঠাতেন সেগুলো ছিল 'চতুরতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন'।

১৬১০ সালের নভেম্বরে তাসকান রাষ্ট্রদূত, গ্র্যান্ড ডিউকের ভাই গুলিয়ানো দ্য মেদিচির মাধ্যমে অক্ষরগুলোর গোপন অর্থ প্রাগের দরবার জানতে পারলেন।

ঠিকভাবে সাজালে অক্ষরগুলি দিয়ে এই বাক্যটি তৈরি হচ্ছে :

Altissimum planetam tergeminum observavi.

অর্থ : গ্রহগুলোর মধ্যে উচ্চতমটিকে আমি ত্রি-আকারে অবলোকন করেছি। গালিলাই তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে শনিগ্রহটিকে এমন একটি কোণ থেকে দেখেছিলেন যাতে তাঁর চোখে পড়েছিল যে, 'গ্রহগুলোর মধ্যে এই উচ্চতমটির' ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রয়েছে আরো দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট তারা।

কিন্তু গোপন খবর জানার উত্তেজনা পুরোটা না কাটতেই ডিসেম্বরে নতুন আরেকটি ধাঁধা এসে গেল পিসার মানুষটির কাছ থেকে :

Haec immatura a me iam frustra lguntru oi

অর্থ : বৃথাই, বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি, আমি এটি চেয়েছি।

কেপ্‌লারও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে অর্থবহ করে তোলার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরেন্সে গালিলিও গালিলাই-এর কাছে চিঠি লিখলেন :

'প্রিয়বন্ধু, তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ, তোমার বাক্যটির অর্থ সম্পর্কে এত দীর্ঘকাল আমাদের বিভ্রান্ত অবস্থায় রেখো না। তুমি অবশ্যই দয়া করে মনে রেখো যে, খাঁটি জার্মানদের সঙ্গেও তোমাকে সম্পর্কে আসতে হচ্ছে, যারা চায় যত বেশি সম্ভব ও যতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্ভব জানতে। তুমি নির্বাক থাকতে আমি যে কতখানি অধীর তা বুঝতেই পারো।'

ইনকুইজিশনকে (পোপের বিরুদ্ধবাদীদের বিচারের জন্যে বিচারালয়) ক্লডিয়াস আকোয়াভিভা এমন কোনো ইঙ্গিত দিলেন না যাতে মনে হতে পারে কেপ্‌লারের চিঠির জবাব দেওয়া থেকে গালিলাইকে নিরস্ত করতে হবে। কেননা এই ধাঁধাগুলো সে-সময়ে সমিতির কাছে সবচেয়ে জরুরী সমস্যা ছিল না। সান্ মার্কো রিপাবলিকের গভর্ণমেন্ট রোমকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে এবং নিজেদের এলাকা থেকে সকল জেসুইটকে বিতাড়িত করেছে। ব্যাপারটা জানবার জন্যে আকোয়াভিভা গুপ্তচর পাঠিয়েছেন, গালিলাই-এর চিঠিপত্রের চেয়ে ভেনিসবাসীদের গুজব জানাটাই সে-সময়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল।

সুতরাং ১৬১১ সালের জানুয়ারিতে তাসকান রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রাগের দরবার ও সভা-গণিতবিদ দ্বিতীয় ধাঁধাটির গোপন অর্থ জানতে পারলেন :

Cynthiae figures aemulatur mater amortum.

অর্থ : শুক্রগ্রহ চাঁদের কলা অনুকরণ করে।

সম্রাট রুডোলফ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। 'এই সমস্ত গ্রহের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক রাখার ঘটনা আমার গোটা জীবনে কখনো ঘটেনি। না, এ আমার ভাগ্য-তারা নয়।' নির্বোধ এক বৃদ্ধের খ্যানখেনে ভাঙা স্বরে কথাগুলো বলে পরক্ষণেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন। অতীতের ইন্দ্রিয়-বিলাসী জীবনের স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে।

'তোমার সেই ঠাকুর্দার ভাইয়ের কথা বলো তো শুনি। আর তার সেই রক্ষিতার কথা যে দশটা মানুষকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল। কিংবা সেই ভেনিস-সুন্দরী বিয়াঙ্কার কথা, যে ছিল জগতের সবচেয়ে সুন্দরী নারী।' তাসকান রাষ্ট্রদূতের কাছে জানতে চাইলেন।

তারপরেই এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে একজন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলেন গণিতবিদ কেপ্‌লারকে একথা জানাতে যে কেপ্‌লার যেন প্রকৃতই আঁক কষে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেন। এমনও হতে পারে, এই নতুন আবিষ্কারটির মধ্যে তাঁর দেশের কিছু একটা সম্পর্ক থাকছে। তারপরে হঠাৎ রেগে উঠে দ্য মেদিচির দিকে তাকালেন।

'ওই বিয়াঙ্কার গল্পটা কেন বারবার আমাকে শোনাতে চাও বলো তো? ওটা আমি একশোবার শুনেছি, ওটা শুনতে আমার খারাপ লাগে, বিশ্রী লাগে।'

দ্য মেদিচি, ধনী অথচ পাতলা চেহারার মানুষটি, ক্রুদ্ধ স্বরে পাল্টা জবাব দিলেন, 'যেসব গল্প আপনার জানা, যে-সব গল্প শুনে আপনি আনন্দ পান, সেগুলোই বারবার আমাকে বলতে হয়, কেননা আপনি চান আমাদের গালিলিও গালিলাই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আকাশে যা আবিষ্কার করেছেন তা ভুলে থাকতে।'

'তোমার তো অনেক টাকা', আক্ষেপের সঙ্গে রুডোলফ বললেন।

'সবকিছুই টাকা দিয়ে কেনা চলে', নির্বিকার ভাবে সামান্য একটু হেসে দ্য মেদিচি বললেন, 'সবকিছু—মানুষ, গোরু, ঘরবাড়ি, জাহাজ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র।'

'আমার টাকা এত কম, ভারি বিশ্রী!' রুডোলফ গজগজ করতে লাগলেন।

'আপনি কী কিনতে চান?' শান্ত সুরে দ্য মেদিচি জিজ্ঞেস করলেন।

'গ্রহগুলো,' যেন গুরুত্বের বিষয় নিয়ে কথা বলছেন এমনিভাবেই জবাব দিলেন বৃদ্ধ।

'কিনে কী করবেন?' কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত সুর ধরে আরো এগিয়ে বিনীতভাবে রাষ্ট্রদূত জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি চাই গ্রহগুলোকে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে বাধ্য করাতে। টিকোর সে ছবিটি টলেমি দিয়েছেন সেটাই আমার পছন্দ! কী সরল আর কী সহজ! আমরা রয়েছি বিশ্বের কেন্দ্রে, সবকিছু আমাদের চারদিকে ঘুরছে।'

দ্য মেদিচি কাঁধঝাঁকুনি দিলেন। এই অজ্ঞ বৃদ্ধের দুর্ভাবনা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না।

'শেষ যে আশাটুকু ছিল যে কোপর-নিকাস হয়তো ভুল করেছে—তোমাদের গালিলাই-এর জন্যে তাও গেল!'

দ্য মেদিচি পাল্টা জবাব দিলেন, 'আমি তো শুনেছি আপনাদের কেপ্‌লারও একই কাজ করছেন—বিশ্বের যে ছবিটি টলেমি দিয়েছেন তা তিনি ধ্বংস করছেন।'

সম্রাট এবারে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, 'টাকা, টাকা' বলে ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর চোখদুটো চকচক করে উঠল। তিনি বন্যাগ্রস্ত হলেন, যেমনটি মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। 'সবাই বিদেয় হও! গ্রহগুলোকে কিনে নাও!' তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ভৃত্যরা ছুটে এসে তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা তোয়ালে জড়িয়ে দিল। সকলের অলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত বিদায় নিলেন।

সভা-গণিতবিদ কেপ্‌লার-এর পক্ষে ফ্লোরেন্সে যাওয়া সম্ভব হল না। তাই তিনি বন্ধুকে প্রাগে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন, যাতে তাঁরা একসঙ্গে গবেষণা চালাতে পারেন।

জবাবে গালিলাই লিখলেন : প্রিয় বন্ধু, তোমার আমন্ত্রণে সম্মানিত বোধ করছি, কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে আতঙ্কেরও বটে। প্রতিদিন বাজার সমেত খাওয়া আমার হাতে সইবে না; পথে চুরির শাপে আমি চলতে পারি না। পর্বত ডিঙিয়ে তোমার কাছে যাব, সে-ক্ষমতা আমার নেই। পথ দীর্ঘ, আমার স্বাস্থ্য খারাপ। তাছাড়া আমার ভয়তো টলেমির অনুগামীদের হাতে ফেলে-রেখে যেতে পারি না। টলেমির এই অনুগামীরা ছিটো এখনো পড়েনি তবু সর্বত্র বলাই চলছে। আর আমার মনের ভয় এখনো এত প্রবল যে আমার অবর্তমানে টলেমির এই অনুগামীদের মতো নির্বোধ কীট হয়ত নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।'

—ক্রমশঃ

বস্তারের পথে পথে

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

বেলা এগারটায় বম্বে মেল রায়পুরে স্টেশনে পেঁছিল। গন্তব্যস্থল—বস্তারের ফরাশগাঁও আর ভানুপ্রতাপপুর। মধ্য-প্রদেশের জেলাগুলির মধ্যে বস্তার এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। জেলা হিসাবে এর বিরাট আয়তনের কথা ভাবলে যেমন অবাক লাগে, তেমনিই মনকে ভরিয়ে দেয় এখানকার পাহাড়-নদী-বনে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয় প্রকৃতির কোলে আশ্রিত এখানকার আদিবাসীরা। সব দিক থেকে বস্তারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মনে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যায়।

রায়পুর থেকে ফরাশগাঁও ১৯৮ কিলোমিটার। মসৃণ পিচের রাস্তা সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। পথ চলতে চলতে নজরে পড়ে সোজা, চওড়া রাস্তা—মনে হয়, 'সরল রেখা'র জ্যামিতিক সূত্র মনে রেখেই যেন এর রূপ দেওয়া হয়েছিল। উন্মুক্ত দৃষ্টির সামনে রাস্তার বিস্তার কমতে কমতে যখন এক ছোট্ট বিন্দুতে গিয়ে ঠেকে, মনে হয় সেখানেই তার শেষ। কিন্তু বড়ই এগোনো যায়, বিন্দুটি আলেয়ার আলোর মত শুধুই দূরে সরে যায় আর পথিককে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যেতে যেতে দু' পাশে নজরে পড়ে বাতাসে-দোল-খাওয়া সবুজ ধানের ক্ষেত মাইলের পর মাইল। এদিকে ওদিকে তারই দু' চার টুকরোর আবার 'কালচে চেহারা' মনে হয় কেউ যেন সেখানে গাঢ় খয়েরী রঙ মাখিয়ে রেখেছে। শুনলাম, সেগুলোও নাকি ধান-গাছ। খানিকটা এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ে রাস্তার দু' ধারে সার দেওয়া বড় বড় গাছ। দূর থেকে মনে হয়, রাস্তার ওপর দেবদারুপাতা দিয়ে সাজানো বিরাট তোরণ। কিন্তু কাছে যেতে দেখা যায়, দু' পাশের গাছগুলো যেন হাত বাড়িয়ে এ ওকে কাছে টেনে নেবার খেলায় মেতে আছে। নদীর দেখা মেলে এখানে ওখানে। মাঝে মাঝে আবার বেগুনি রঙের ফুল-গাছের ঝাড় রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর। মনে হয়, প্রকৃতি যেন তার ভাণ্ডারের সব সম্পদ সাজিয়ে রেখেছে চারদিকে নিজের খেয়ালে—রসিক মন সেখান থেকে সহজেই দু' হাত ভরে নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে পারে।

রায়পুর থেকে কিছুটা এগিয়ে যেতেই বাঁ-দিকে নজরে পড়ল ছোট ছোট নতুন তাঁবুর সারি। অনেকটা জায়গা জুড়ে অসংখ্য তাঁবু। কেউ বলে না দিলেও সহজেই বোঝা যায়, এ হল বিখ্যাত মানা ক্যাম্প যেখানে বেশ কিছু বাংলাদেশ শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছেন। নগণ্য ছোট্ট গ্রাম 'মানা'কে কে-ই বা চিনত। কিন্তু উদার হাতে যেদিন সে হাজার-হাজার শরণার্থীকে বুকে টেনে নিয়েছিল, সেদিন থেকেই বিখ্যাত সে। বিরাট এলাকা নিয়ে মানা ক্যাম্প। দেশ-বিভাগের শিকার হয়ে যে সব শরণার্থীরা বহু বছর আগেই এখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তারাই এখন-কার স্থায়ী বাসিন্দা। এস্‌বেস্‌টাসের ছাউনী দেওয়া পাকা-বাড়ীতে তাদের বর্তমান আস্তানা। নানারকম কর্মসূচীর রূপায়ণের চেষ্টা চলছে এদের ঘিরে। কিন্তু এর মধ্যেই আবার নতুন তাঁবুর ছাউনীতে ছেয়ে গেছে মানা ক্যাম্প—ইতিহাসের রক্তস্বরা দিনগুলি আবার যেন ফিরে এসেছে। চারদিকে শুধু মানুষের মিছিল—রিক্ত সর্বহারা মানুষ। কিন্তু তাদের প্রাণ-চাঞ্চল্য সহজেই নজরে পড়ে।

নানা প্রশ্ন মনে নিয়ে মানা ছেড়ে আরও এগিয়ে চলেছি। ঘণ্টাখানেক যাবার পর এল 'অভনপুর'। ছোট-মাঝারি দোকানে পশরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানীরা। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা মিষ্টির দোকান। এখানকার ছানার মিষ্টি বিখ্যাত, দামেও সস্তা, হালফ্যাসানের বাড়ীও দেখা গেল দু' একটি চলতি পথে। ঘণ্টাখানেক এগিয়ে চলার পর পেঁছিলাম 'ধমতরী'। বেশ কিছু দোকানের সারি। জায়গাও বড়। ব্যবসাকেন্দ্র এটা; তাই লোকজনের আনাগোনা এদিক-ওদিক। বেলা প্রায় দুটো। খাবারের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল রাস্তার ধারে এক হোটেলের কোণে। দিব্যি গোলগাল বাঙালী-বাঙালী চেহারার এক ভদ্রলোক কাউন্টারে বসে আছেন। এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, বাঙালীই বটে—সোনার বোতাম লাগানো সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি-পরা ভদ্রলোক সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। "কি খাবেন? ভাল মাছ আছে"—বাঙালীসুলভ আতিথেয়তার প্রকাশ তাঁর চোখে-মুখে। কথায় কথায় জানালেন, বরিশালে বাড়ী—ষোল বছর আছেন ওখানে হোটেল করে। বেশ পরি-তৃপ্তির সুর তাঁর কথায়। স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় ব্যবসা তাঁর ভালই চলছে। ওখানে বাড়ী আর কিছু জমিজমাও করেছেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের এত ভেতরে, বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠান দেখে খুব ভাল লাগল। বিদায় নেবার সময় তাঁর 'আবার আসবেন' কথার রেশটুকু যেন এখনও কানে বাজে।

আবার পথ চলা সুরু। গাড়ী ছুটে চলল মসৃণ পথ বেয়ে। দু-পাশে শুধু সবুজের আভাস। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম—মাটির ঘর, পাতার ছাউনী দেওয়া দু' একটা দোকান ঘর, কিছু লোকজন—আবার নির্জন পথ। বেলা প্রায় চারটের সময় এলাম 'কাংকেরে'। দু' ধারে অনেক দোকান-পাট, রাস্তার লোকের ভিড় কাটিয়ে গাড়ী থামল। চমৎকার পাহাড়ী জায়গা কাংকের। একপাশে পাহাড়ী নদীতে অল্প জল, বালীর চড়ায় ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করছে। পেছনে বিরাট পাহাড়, তার গায়ে এখানে-ওখানে লেপটে আছে কিছু বাড়ী। ভারী সুন্দর পরিবেশ। বিকেলের পড়ন্ত রোদে কাংকেরের রূপ যেন উপচে পড়ছিল।

এর পরেই পুরো পাহাড়ী রাস্তা। গাড়ী উপরে উঠছে। নীচের গাছগুলো ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। থাকে থাকে সাজানো একটার পর একটা রাস্তা পার হয়ে চলেছি, ঠাণ্ডাও একটু একটু বাড়ছে। মোট এগারটি বাঁক ঘুরে আবার সোজা রাস্তায় গাড়ী ছুটে চলল। এবার মাঝে মাঝে দু' পাশে জঙ্গল। বিরাট বিরাট গাছ ভেতরটা আবছা অন্ধকারে ভরিয়ে রেখেছে। জঙ্গল পেরিয়ে আবার খানিকটা খোলা জায়গা। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে দু' একটি দোকান-ঘরের ভেতর হারিকেনের আলো, তাছাড়া সবই অন্ধকার। রাস্তায় কোন আলো নেই। গাড়ীর আলোতে দু' একজন পথচারীর চেহারা ফুটে উঠছিল, আবার মুহূর্তেই তারা অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিল। অজানা পথ যখন ১৯৮ কিলো-মিটারের সীমারেখায় পেঁছিল রাত তখন সাতটা। ড্রাইভার জানাল আমরা ফরাশগাঁও পেঁছে গেছি।

বস্তারের নিজস্ব সৌন্দর্যঘেরা ফরাশ-গাঁও। প্রকৃতির অকৃপণ দানের ছোঁয়াচ চারদিকে—বড় বড় গাছের মেলা, শ্যামলা-প্রান্তরের মোহময় আকর্ষণ, ঘন জঙ্গলের অবাধ বিস্তার। উঁচু-নিচু পিচের রাস্তা থেকে এদিক-ওদিক নেমে এসেছে পায়ে-হাঁটা রাস্তা। কোন কোনটা চলে গেছে দূরে গাঁয়ের দিকে—আবার কোনটা হারিয়ে গেছে জঙ্গলের বুকে। রাস্তায় দেখা মেলে সরল আদিবাসী ছেলেমেয়েদের। তাদের দ্বিধাহীন প্রাণখোলা হাসির ছোঁয়াচে শহুরে লোকের মনও হালকা হয়ে যায়। এদের চালচলনে অকৃত্রিম সরলতা, পরনে সাদাসিধে পোশাক। ছেলেদের খালি গা আর লজ্জা-নিবারণের একটু আবরণ। প্রায় সকলেরই কাঁধে-ঝোলানো ছোট কুঠার—অনেকটা কাঁধে-ঝোলানো ছাতার মত। এই কুঠার তাদের অঙ্গের ভূষণ, নিত্যসঙ্গী। এই নিয়ে তারা নির্ভয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর পথ চলে। বাঘ-ভাল্লুক কিম্বা অন্য বন্য-জন্তুর মুখোমুখি হলে তাকে এই কুঠার দিয়েই ঘায়েল করে। তাই ওখানে একটা চালু কথা—বাঘ-ভাল্লুকও দলে ভারী আদিবাসীদের এড়িয়ে চলে; কাউকে একা পেলে তবেই তাকে আক্রমণ [illegible]

পায়। আদিবাসী মেয়েদের পরনে মোটা শাড়ী, খালি গা আর তাতে কিছু কিছু গয়না। গাঢ় রঙ-এর শাড়ী এরা খুব পছন্দ করে। মেয়েরা যখন মাথা নিচু করে ক্ষেতে কাজ করে, তখন দূর থেকে মনে হয় যেন ওখানে রঙিন বাহারী ফুল ফুটে আছে। চাল-চলনে স্বচ্ছন্দ সাবলীল এরা। উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে এরা নিজেদের সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে; শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, বাঘ-ভালুক, শহুরে-সভ্যতা—সব কিছুর সঙ্গেই এদের সহাবস্থান। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এই সব ছেলেমেয়েরা নিজেদের এলাকার বাইরে বেরিয়ে এসেছে রোজগারের যোগাড়ে, জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য। কিন্তু তবুও নিজেদের বৈশিষ্ট্য তারা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করে চলেছে।

ফরাশগাঁও-এ প্রতি মঙ্গলবার হাট বসে। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা তাদের পশরা নিয়ে আসে হাটে ২০।২৫ মাইল দূরে থেকে। তাই হাটে জমাটি ভাব থাকে বেলা দশটা থেকে দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত। তার পরেই আবার দূর পথ ভেঙে ঘরে ফেরা। হাটে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের ভিড়ই বেশী- কেউ এনেছে কয়েকটা শশা, পেঁপে, কেউ এনেছে কিছু শাকসব্জী, কেউ এনেছে চাল, ডিম, মুরগী। ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে সার দিয়ে বসেছে তারা। যা দাম চাইবে, তাই দিতে হবে— এক পয়সাও কমাবে না। নোট নেবে না, খুচরো পয়সা দিতে বলে। কিন্তু সীমিত জ্ঞানের সীমানার বাইরে গেলে তারা কিছুতেই জিনিস বেচবে না। শুধুই বলবে—'দিবিশ্‌ নাই,' 'দিবিশ্‌ নাই।'

হাটে আর একটা জিনিস নজরে পড়ল। এখানে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই যেন দলে ভারী। তাছাড়া মেয়েরা সকলেই একটু যেন বেশী সাজগোজ করে এসেছে- কেউ পাতা কেটে চুল বেঁধেছে, কারও বাহারী খোঁপা, কারও সযত্নে পাটকরা চুলের সিঁথি দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ছে, কেউ পরেছে রকমারী গয়না; রকমারী রঙিন শাড়ীর আনাগোনায় হাটে যেন রং-এর ঢেউ লেগেছে। হাটের এই বিশেষত্ব অকারণ নয়। দূরে দূরান্তের আস্তানায় থাকে আদিবাসীরা। নিজেদের মধ্যে তাই দেখা-সাক্ষাৎ বা পরিচয়ের সুযোগ তাদের খুবই কম। তাই হাট হল তাদের সামাজিক মিলনক্ষেত্রও। এখানে বাপ-মা পাত্র-পাত্রীর খোঁজ করে, পছন্দ-অপছন্দ করে, বিয়ে পাকা করে। এই জন্য হাটের গুরুত্ব এদের কাছে খুবই বেশী, দলে দলে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা তাই হাটে এসে ভীড় জমায়। জীবনের জটিলতা কোনভাবেই এদের সহজ জীবনযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করে না। এর পরিচয় এদের খাদ্যবস্তুতেও। বনের মধ্যে এরা খায় বনজন্তুর মাংস, গাছের ফলমূল। লোকালয়ে এদের সঙ্গী কাঁধে-ঝোলানো ছোট লাউ-এর শুকনো খোলের এক পাত্র। তাতে থাকে ঘাসের বীজ সেদ্ধ। দুপুরে গাছ থেকে পাতা পেড়ে ঐ তরল পদার্থটি খেতে তাদের পাঁচ মিনিটও লাগে না। এই খেয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তারা। কিন্তু হাতে পয়সা থাকলেই ভিড় জমে দেশী মদের দোকানে। মদ-খাওয়া এদের এক ভীষণ নেশা- এছাড়া চলে না। ভাটি-খানাগুলোও ফেঁপে ওঠে এদের কল্যাণে।

বহুকাল ধরে আদিবাসীদের এই সহজ সরল জীবনযাত্রা তার ছকে বাঁধা গণ্ডীর ভেতরই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পরিবর্তনশীল জগতের আলোর রেশ বন-জঙ্গল ভেদ করে তাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। তাই জীবনের কূলে কূলে কালের ঢেউ আছড়ে পড়ে নি এদের—দিতে পারেনি সেখানে কোন পরিবর্তনের ছোঁয়াচ। কিন্তু অচলায়তনের দিন বুঝি শেষ হতে চলেছে। দুরন্ত ঘূর্ণি অচল রথে এনেছে মৃদু কাঁপন- চাকা যেন নড়ে চড়ে উঠছে। এই ঘূর্ণির কেন্দ্রবিন্দু হল বস্তারের এক ছোট্ট গ্রাম 'চপ্‌কা ; তাই সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আজ চপ্‌কার দিকে।

ফরাশগাঁও থেকে চপ্‌কা প্রায় সত্তর কিলোমিটার। কিছুদিন আগে সেখানে আস্তানা গাড়লেন এক সাধুজী বিহারীদাস বাবা। ধীরে ধীরে আদিবাসীদের ওপর তাঁর প্রভাব বাড়তে লাগল। বস্তারের রাজা ছিলেন আদিবাসীদের দেবতা; এই দেবতার আদেশ ছিল তাদের বেদবাক্য। কিন্তু রাজার অবর্তমানে আদিবাসীদের জীবনে যেন দিশেহারার ভাব জেগে উঠেছিল। এই সময় সাধুজীর আবির্ভাব। তাঁর প্রভাব বাড়তে বাড়তে শেষে এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে আদিবাসীরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করল, তাদের রাজার মৃত্যু হয় নি— রাজাই সাধুজীর ছদ্মবেশে ফিরে এসেছেন। রাজার শরীরের কোন কোন চিহ্নও নাকি আদিবাসীরা সাধুজীর শরীরে আবিষ্কার করল। তাই তিনিই হলেন আদিবাসীদের দেবতা—তাদের মাথার মণি। তাঁর নির্দেশ আদিবাসীদের কাছে ভগবানের আদেশরূপে দেখা দিল।

খুব সহজ কর্মসূচীর ভেতর দিয়েই সরল অশিক্ষিত আদিবাসীদের মন তিনি জয় করেছেন। ধর্মের নামে কোন দুর্বোধ্য আচার বা অনুষ্ঠানের বালাই নেই সেখানে। যারা তাঁর কাছে আসে, তাদের তিনি একটি 'কণ্ঠী' দেন গলায় ধারণ করার জন্য। এর মূল্য হিসেবে নেন, গরীবের কাছ থেকে এক সিকি আর অন্যদের থেকে পাঁচ সিকি; তবে স্বেচ্ছায় আরও বেশী দিতে চাইলে আপত্তি করেন না। এই কণ্ঠী বিতরণের ভেতর দিয়ে তাঁর বিহারীদাস নাম মুছে গিয়ে এখন তিনি শুধুই 'কণ্ঠীবাবা।' এই কণ্ঠীর সঙ্গে ধারককে মাত্র কয়েকটা নিয়ম মেনে চলতে হয়— যেমন, দু' বেলা স্নান না করে খাবে না, মাছ-মাংস খাবে না, আর মদ ছোঁবে না। এছাড়া আর কিছু করণীয় নেই কণ্ঠীধারকের।

কণ্ঠীবাবার এই নির্দেশ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল দূরদূরান্তে। আদিবাসীদের ধারণা হল যে শুধু মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়লেই হবে না, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী নিজেদের কাছে রাখাও চলবে না। এতে তাদের অকল্যাণ হবে। তখনই লেগে গেল বস্তারের হাটে হাটে এইসব বেচার হিড়িক। যে কোন দামেই বিক্রি চলল- উদ্দেশ্য হল শুধু হস্তান্তর করা। তাই দাম কমতে কমতে এক-একটা ছাগল বিক্রি হল ২।৩ টাকায়, মুরগী ১০।১৫ পয়সায়। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধা হল রোজ হাট বসে না। তাই তাড়াতাড়ি বিক্রির সুযোগ কম। তাড়াহুড়োতে প্রায় বিনাপয়সায় বিলিয়ে দিয়েও যা পড়ে রইল, তাদের পুকুরে— নদীর জলে ডুবিয়ে মারল আদিবাসীরা। এসব অল্পদিন আগের কথা। হাটে এখন হাঁস-মুরগী-ডিম প্রায় মেলেই না। যারা যারা কণ্ঠী নিয়েছে, তারা মদ খাওয়াও ছেড়েছে। দেশী মদের দোকানের ফলাও কারবার এতকাল চলে আসছিল আদিবাসীদের জন্যই। মালিকের মুনাফার অঙ্ক বেড়েই চলেছিল এদের পয়সায়। কিন্তু আজ ওখানে ভাটিখানাগুলি শূন্য। কেঁদে মরছে মালিকের দল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বিনা পয়সায় মদ খাওয়ার লোভ দেখিয়েও আদিবাসীদের ও পথে টেনে আনা যাচ্ছে না। আদিবাসীরা আগে মাসে একবারও স্নান করত কিনা সন্দেহ। কিন্তু কণ্ঠীধারণের পর এখন দিনে দুবার স্নান করে তারা। স্নান না করে আহার করে না। যাদের কণ্ঠী নেই তাদের ছোঁয়া খায় না কণ্ঠীধারীরা এমন কি একই পরিবারের লোক হলেও নয়। এইভাবে ভাই-ভাই, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বাপ মা ছেলে-মেয়ের অন্ন পৃথক হয়েছে। আদিবাসীদের সামাজিক পারলৌকিক জীবনে আজ এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে কণ্ঠীবাবার আবির্ভাবে। তাঁর বক্তব্য: অশিক্ষিত আদিবাসীদের রামনাম-এর মার্গ দর্শন করানোই তাঁর অভিপ্রায়, পয়সার মোহ নেই তাঁর; শুধু স্বতঃস্ফূর্ত দান তিনি গ্রহণ করেন আর এভাবেই টাকা জমে উঠেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। ওখানকার লোকের কিন্তু ধারণা, কণ্ঠীবাবার কয়েক লাখ টাকা আর এ ছাড়াও হাজার হাজার টাকার খুচরো পয়সা প্রায়ই শহরের ব্যাংকে জমা পড়ে। শোনা যায়, তাঁর কয়েকটা হাতিও আছে। কিন্তু তবুও আদিবাসীদের ওপর তাঁর বিরাট প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। রাস্তায়-ঘাটে-হাটে যত আদিবাসী নজরে পড়েছে তাদের বেশ একটা বড় অংশেরই গলায় কণ্ঠী। এরা তাদের বহু যুগের অভ্যাস ছেড়েছে, খাওয়া বদল করেছে, নেশার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়েছে। অশিক্ষিত আদিবাসীদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার স্রোত এভাবে ভিন্ন মুখে বইয়ে নিয়ে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছে, ভাবতেও অবাক লাগে। এই বিরাট পরিবর্তনের স্রোত শেষ পর্যন্ত এদের কোথায় নিয়ে যাবে, তার সাক্ষ্য দেবে ভবিষ্যতের ইতিহাস।

ফরাশগাঁও-এর পাট তুলে এবার ভানুপ্রতাপপুরের দিকে যাত্রা শুরু। কাংকেরে একই রাস্তায় ফিরে এসে বাঁদিকে সোজা রাস্তা চলে গিয়েছে ভানুপ্রতাপপুর পর্যন্ত—সব মিলিয়ে ১০৭ কিলোমিটার। পথে বস্তারের নিজস্ব সৌন্দর্যের নিপুণ পরিবেশন। পিচের রাস্তার দু-পাশে ছোট-বড় গাছের ছড়াছড়ি, মাঝে মাঝে জঙ্গলের আভাস। সন্ধ্যায় ভানুপ্রতাপপুরের শান্ত পরিবেশ খুব ভাল লাগল। চার পাশে বড় বড় গাছের মিছিল, টিনের ছাউনী দেওয়া কিছু আস্তানা তার পরেই ঘন জঙ্গল। শুনতে পেলাম, কিছুদিন আগেও সন্ধে আর ভোরের দিকে লোকালয়ে মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে চিতাবাঘ—ভাল্লুক। আর সাপ তো যে কোন সময়েই নজরে পড়তে পারে। ইলেকট্রিকের আলো আছে এখানে, কিন্তু রোশনাই নেই—সবই যেন টিম্ টিম্ করছে। লোকজনের বসতি কিছু আছে সরকারী অফিসের দৌলতে। অল্প কিছু বাঙালীর দেখাও মিলল বস্তারের এত ভেতরে। ডাল আলু চাল আর টাটকা তরিতরকারি বেশ সস্তা। তাই বাংলাদেশে যাবার পিছুটান তাদের আছে বলে মনে হল না। দূর দেশে বাঙালীর দেখা পেয়ে ছেলে বুড়ো সকলেই যেন তাদের আতিথেয়তার সাধ পুরোপুরি মিটিয়ে নিতে চাইছিলেন।

ভানুপ্রতাপপুরে এক অভিনব অভিজ্ঞতার কথা না বললে বস্তারের সব কথা যেন বলা হয় না। এই অভিজ্ঞতার জন্ম এক অবাঙালী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর ঠাকুর ঘরে। প্রথম পরিচয়ের দিনই যখন তিনি তার ঠাকুরঘর দেখতে আমন্ত্রণ জানালেন, খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম। সাধারণতঃ কোন অপরিচিতকে কেউ হঠাৎ তার ঠাকুরঘর দেখতে আহ্বান করে না, কেননা, ঠাকুরঘর ঠাকুরঘরই। সেখানকার যোগ নিজের অন্তরের সঙ্গে—বাইরের লৌকিকতার সঙ্গে নয়। তাই কৌতূহলী মন নিয়ে সন্ধ্যায় যখন তার ঠাকুরঘরের ভেতরে গেলাম, তখন সত্যিই তার অভিনবত্বে চমকে না উঠে পারি নি। ছোট্ট সুন্দর ঘরটির শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ, ধূপের গন্ধে চারদিকে পবিত্রতার ছোঁয়াচ। এদিকে ওদিকে দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় বাঁধানো ছবি—সবই রঙিন। সামনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিস্থ মূর্তি। এপাশে শ্রীচৈতন্য, গৌতমবুদ্ধ, রাধা-কৃষ্ণ, সিংহাসনে আসীন রাম-সীতা; ওপাশে গুরু নানক, সন্ত তুলসীদাস, সাধক রামপ্রসাদ। বাঁ-দিকে কোরান-শরিফের বাণী বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি বাঁধানো ফ্রেম; ডানদিকে যীশু খ্রীস্টের বেশ নতুন ধরনের কয়েকটি সুন্দর ছবি। এছাড়া চারদিকে সাজানো রয়েছে নানা ধর্মের, নানা মতের কত দেব-দেবীর, সাধকের ছবি। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল, এখানে ধর্মে ধর্মে কোন বিভেদ নেই, রেশারেশি নেই, গোঁড়ামি নেই, কলহ নেই। সব ধর্মেরই মূলে সেই একই প্রেরণা, একই আকূতি, একই উপলব্ধি। সেই ছোট্ট ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে মনে হল ভারতের চিরন্তন অন্তরাত্মা মূর্ত হয়ে রয়েছে- এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত, তত পথ'-এর বাস্তব রূপায়ণ। ভদ্রলোক বললেন যে তিনি প্রতিদিন গীতা, কোরান-শরিফ, বাইবেল ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন আর প্রতিটি ধর্ম গ্রন্থই তাকে সমানভাবে অনুপ্রাণিত করে। মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাস-ভরা কথাবার্তা, উদার চিন্তাধারা, সর্বধর্মে একাত্মবোধ মনকে অবাক বিস্ময়ে ভরিয়ে দিয়েছিল। বস্তারের পথে কুড়িয়ে পাওয়া এ যেন এক অমূল্য রত্ন—দিগন্তের অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে তার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছিল দিগ্‌দিগন্তে।

প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ১ থেকে ১২ ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে অবনীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলার আর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে ষাটখানির ওপর ছবি ও কয়েকটি কুটুম-কাটাম এবং তৎসহ অবনীন্দ্রনাথের লিখিত ও চিত্রিত বইয়ের সমাবেশ করা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিভিন্ন দিক এই প্রদর্শনী থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

প্রদর্শনীর ছবি থেকে আরেকবার বোঝা গেল যে আমাদের দেশের শিল্প-চেতনা ও আধুনিক শিল্পরীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের দান কতখানি। তাঁর ছবির কম্পোজিশন, রং, টোন এবং মেজাজের বৈচিত্র্য থেকে তাঁর সৃজনীশক্তির গভীরতার আবার পরিচয় মিলল। মুঙ্গের ঘাট, ভারতমাতা, অবজারভেটরী হিল, আরব্যরজনী সিরিজ, শাজাদপুরের দৃশ্যাবলী, কৃষ্ণমূর্তি ইত্যাদি প্রতিটি ছবিতেই তাঁর আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও চূড়ান্ত দক্ষতা আবার নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হল। জমিদারের কাছারীবাড়ির ছবিতে অত্যন্ত ঝাপসা রঙের প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে খানিকটা লালরঙের কাপড় পেতে এক দুঃসাহসিক রঙের সম্মেলন ঘটানো হয়েছে। মখদুম শাহের সমাধিমন্দিরের ছবিতে বা শাজাদপুরের গোয়ালপাড়ার দৃশ্যে বাংলাদেশের নিসর্গ দৃশ্যের যে রূপ তিনি ফুটিয়েছেন তা আজকের নিসর্গ শিল্পীদের কাছে একান্ত মূল্যবান দিগ্‌দর্শন বলে মনে হবে। কলকাতার ছবি তিনি বেশী আঁকেন নি কিন্তু বস্তির যে একটিমাত্র ছবি প্রদর্শনীতে সংগ্রহ করা হয়েছিল তার টোন, রং, স্পেস বিভাজন এবং সর্বোপরি মুড একটি অনবদ্য সৃষ্টি। গণেশজননী বা আরব্য-রজনী সিরিজের ছবিগুলির মধ্যে ভারতীয় মিনিয়েচার, জাপানী এবং ইউরোপীয় রীতি মিলিয়ে এমন স্বকীয়তার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে যে এগুলি সম্পূর্ণ একটা নতুন শিল্পরীতি সৃষ্টি করেছে। একটা বিশেষ মন এবং একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এ জিনিস তৈরী সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে ভাল লাগে অনেক ছবিতে সূক্ষ্ম একটু হাস্যরসের পরিবেশন যেটা আজকের শিল্পীদের কাজে একেবারেই অনুপস্থিত। বালক অলকেন্দ্রনাথের প্যাস্টেল প্রতিকৃতি, নিজের ও মুকুল দের মুখোশ ইত্যাদি ছবির মধ্যে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর আরেক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর চিত্র নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা আজও করা গেল না। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির লোহার বাক্সে আজও তাঁর অধিকাংশ শিল্পকর্ম লোকচক্ষুর অন্তরালে অযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহে যেসব ছবি আছে তা সংগ্রহের জন্য বিদেশী ক্রেতা ঘোরাফেরা করছে বলে শোনা গেল। অবিলম্বে যদি কলকাতায় স্থায়ী জাতীয় সংগ্রহশালা স্থাপন না করে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের ছবির সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হয় তবে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তার পূরণ করবার আর কোন উপায় থাকবে না।

শিল্পী : এস নন্দগোপাল (মাদ্রাজ)

●

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের ৩৬শ বার্ষিক প্রদর্শনী ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারকার প্রদর্শনীতে তিনশ'র অধিক ছবি ও মূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে। নিচের তলার সবকটি ঘরই প্রদর্শিত বস্তুতে ভরে গিয়েছে। এত ঘন-সন্নিবদ্ধ চিত্রশ্রেণী দেখাতে একটু অসুবিধে হয়। বিশেষ করে কিছু ছবি ঠিক দর্শনীয় শ্রেণীতে পড়ে না।

এবারে কলকাতার বাইরের শিল্পীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ছবির সংখ্যাই বেশী। তারপর বোধহয় দক্ষিণ ভারতের নাম করা যেতে পারে। দিল্লী ও বোম্বাইয়ের থেকে ছবি অপেক্ষাকৃত কম এসেছে। রাজস্থান, রাজকোট, বারাণসী, উড়িষ্যা ও হায়দরাবাদ থেকে অল্প কিছু শিল্পী কাজ পাঠিয়েছেন।

রিপ্রেজেণ্টেশনাল শিল্পনিদর্শনের মধ্যে এবারেও বিনোদ কর্মকারের সূর্যালোকিত শিমুলতলার দৃশ্য আগের মতই আকর্ষণীয় হয়েছে। রিপ্রেজেণ্টেশনের সঙ্গে একটা ডেকরেটিভ প্যাটার্নও তিনি রক্ষা করে চলছেন। প্রবীণ শিল্পী অতুল বসু দুখানি প্যাস্টেলে নিত্য দেখা বাড়ির দরজা ও বারান্দার অত্যন্ত সাদামাটা চেহারার ভেতর থেকে ছবি বার করে এনেছেন। একখানি মুখের ড্রয়িংএও তাঁর পূর্বদক্ষতা বজায় রেখে চলেছেন। নির্মল দত্তের 'মেমারি' ছবিটি উদ্বাস্তুদের নিয়ে তৈরী। ধূসর সবুজ মাটির ভেতর থেকে আবছা কতকগুলি মুখ যেন বেরিয়ে আসছে পূর্বস্মৃতি বহন করে। 'মনসুন মিস্ট' নিসর্গ দৃশ্য হিসেবে তেমন জমেনি, যদিও কম্পোজিশনের চাতুর্য লক্ষ্য করা যায়। স্বর্গত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের বুল ও যীশু-জীবনী অবলম্বনে কম্পোজিশনটি অনেকদিন বাদে দেখতে পেয়ে তাঁর অনু-রাগীরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। রথগোপালের কলকাতা শহরের দুখানি ড্রয়িং তার পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর দুখানি রমণী-রূপের ভিত্তিতে করা আধুনিক ডিজাইন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। তবে ফর্মের চারদিক ঘিরে চতুষ্কোণ রঙের বর্ডারটি একে যেন একটু কমার্শিয়াল-ঘেঁষা চেহারা এনে দিয়েছে। তবে কমার্শিয়াল বা ফাইন আর্টের মধ্যে পার্থক্যটার মধ্যে একটা কৃত্রিমতার আমেজ থাকে বলে মনে হয়। তাই উপরোক্ত মত কোন হীন অর্থে ব্যবহার করা হয়নি একান্ত ব্যক্তিগত রুচির প্রকাশ হিসেবেই নিতে হবে। শইলচৌহান (রাজস্থান) 'হুই পাধারেজ্যা' বলে যে ছবিটি উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে রাজস্থানী মিনিয়েচার ও আধুনিক শিল্পের স্পেস কম্পোজিশনের একটা বিচিত্র সুন্দর সমন্বয় হয়েছে। অমিতাভ দত্তের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ওপর আঁকা দুখানি বর্ণাঢ্য অ্যাবস্ট্র্যাকশন দুমড়ে-মুচড়ে না গেলে অল্প আলোতেও দেখতে ভাল লাগত। এছাড়া সুবল পাল, অমল বেরা, সজল রায়, দীপ্তি পাল, বিশ্বপতি মাইতি, সমর ভৌমিক, গণেশ হালোই প্রভৃতি কয়েকজনের কাজ উল্লেখযোগ্য।

জল রঙে ভারতীয় প্রথায় কাজের মধ্যে সুশীল সেনের হাটের পথে, প্রশান্ত রায়ের তিনখানি ছবি, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বর্মণের খোয়াই প্রভৃতি চমৎকার কাজ। গ্রাফিক বিভাগ বরাবরকার মতই দুর্বল।

ভাস্কর্যের মধ্যে এস, নন্দগোপালের অশ্বারোহী ধাতুমূর্তিটি ঢোকরা শিল্পের অনুরূপ একটা আদিম বলিষ্ঠতা নিয়ে উপস্থিত। হরিহর দেবের দ্বারপাল মূর্তির সরল গঠন ও বলিষ্ঠ রূপ মন্দ নয়। রাজুল ধারিওয়ালের 'হার্মনি ইন ইণ্টিগ্রাল' ইতিপূর্বেই সুখ্যাতি অর্জন করেছে। জে জে নারজারির 'ইয়ুথ' বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। মানিক তালুকদারের নিজের মায়ের প্রতিকৃতিটির একটা করুণ ও মধুর আবেদন আছে। ছোট কাজ কিন্তু অনুভূতি-সম্পন্ন কাজ। নির্মলেন্দু দাসের স্ত্রী-পুত্র ও সন্তানের যৌথ মূর্তিটি উপজাতীয় মূর্তি-শিল্পের প্রভাবে গড়া। এছাড়া মাধব ভট্টাচার্য, তারক গড়াই, বিপুলকান্তি সাহা, এল আই সিং প্রভৃতির ভাস্কর্য কর্মগুলি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

—চিত্ররসিক

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] থেকেই বাড়ীতে সাজসাজ [illegible] চাকরী পেয়েছে একটা আধা-[illegible]। সাধারণ বিচারে এমন [illegible] আজকাল চাকরী নয় যা [illegible] তেমন নয়। কিন্তু তবু তো [illegible] চাকরী, তাই বাড়ীতে আনন্দের [illegible]। এই মাগ্‌গী-গন্ডার বাজারে চাকরী [illegible] আর লটারীর প্রাইজ পাওয়া একই [illegible] বাবা, মা, ছোট ভাই বোন সবাই [illegible]। [illegible] করেই সকলের উৎসাহ।

অনাময়ের মা আজ সকালবেলায় গঙ্গাস্নান করে ঘট বসিয়ে পুজো করেছেন। ছোট বোন সুস্মিতা শাড়ীর আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে মার সংগে রান্নায় লেগেছে। বাবা জীবনবাবু অনেকদিন পর সাতসকালেই হাতিবাগান বাজার থেকে ভালমন্দ বাজার করে নিয়ে এসেছেন। ছোট ভাইটা অনাময়ের কাছে-পিঠেই ঘুর-ঘুর করছে। যেন অনাময়ের ফাইফরমাশ খাটতে পেলে বর্তে যায়।

দশটায় অফিস। সাড়ে আটটায় সময় দাড়ি কামাবার জন্য ভেতরের বারান্দায় এল অনাময়। সদ্য কেনা সেভিং সেট, নতুন ব্লেড, সাবান। জীবনবাবুই কিনে দিয়েছেন অনাময়ের চাকরী পাওয়া উপলক্ষে। আজ অফিসে প্রথম দিন, একটু ফিটফাট না হয়ে গেলে চলে! গালে সাবান বুলিয়ে নতুন রেজরটা টানতেই গালের কাছটা কেমন সর-সর করে ওঠে। প্রায় তিন-পাঁচ-ছয়েক পরে অনাময় আজ দাড়ি কামাতে বসেছে। তাই

দাড়িগুলো বেশ কড়কড়ে, শক্ত। আয়নায় একবার মুখটা ভালো করে দেখল। যাক্ কাটেনি, বাঁচা গেছে। এবার ওর দৃষ্টি বারান্দার জানলা গলে ওপাশের বাড়ীর রকে। সেই পরিচিত আড্ডা। গতকালও ওখানে আড্ডা মেরেছে অনাময়। আজ অমল, শংকর অজয়, বাচ্চু সবাই বসে আছে, কেবল ও ছাড়া। ওরা সিগারেট ফুঁকছে, একটা সিগারেট ভাগ করে তিনজনে। অনাময়ের বুকটা হঠাৎ কেমন হু-হু করে উঠল। শংকর, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে যাদবপুর থেকে, ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু চাকরী জোটেনি। অজয় বাংলায় এম-এ। যেমন তেমন চাকরী পেলেই নেয়। কিন্তু এখনো বেকার। শুধু একটা টুইশানি করে। আজকাল পরীক্ষা পাশ তো নকল করে, সুতরাং মাস্টার রাখবে কে। অনাময় আয়নায় নিজের ছায়া দেখে পরিষ্কার মুখ, নিখুঁত কামানো। একটা অস্বস্তিকর ভাবনা ওকে ঘিরে ধরে। ও নিজে তো এমন কিছু ব্রিলিয়ান্ট নয়। সাধারণ বি-কম পাশ। নেহাৎ বাবার মুরুব্বির জোরে নানা জায়গায় কাঠ-খড় পুড়িয়ে এ চাকরী। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অনাময়। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে সেভিং-সেট ধুয়ে পুঁছে রাখল। এবার তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে ফেলতে হবে। প্রথমদিন, অফিস একটুও লেট হওয়া চলবে না।

খেতে বসে অবাক হয়ে গেল অনাময়। এ-কি কান্ড। ওর পাতে বিরাট রুই মাছের মাথা। প্লেটে দই। মা পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে বললেন, নে, খেয়ে নে, ভালো করে। সারাদিন তো খাটতে হবে।

অনাময় হাসল। বিগত দু' বছরের স্মৃতি মনের চোরাকুঠরীতে। বাবার ভ্রূকুটি, মায়ের অভিমান, ভাই-বোনের নির্লিপ্ততা। মায়া, মমতা, ভালবাসা—কেমন যেন কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল।

কতদিন শীতের রাতে বাড়ী ফিরে ঢাকা দেওয়া ঠান্ডা ভাত আর ডাল দিয়ে ক্ষিদের আগুন নেভাতে হয়েছে।

বাড়ী থেকে বেরুবার সময় মা-বাবাকে প্রণাম করল অনাময়। তারপর রাস্তায় বেরিয়েই প্রথমে কপালের দইয়ের ফোঁটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল অক্লেশে। এসব ও বিশ্বাস করে না। ওপাশের রক থেকে ডাকল বাচ্চু, কিরে অনা, অফিস যাচ্ছিস। শুধু বাচ্চু নয়, শংকর, অমল, অজয় সবাই ওর দিকে তাকিয়ে। চোখে কিছুটা বিস্ময়, হতাশা। ওদের গালে দাড়ি। অনাময়ের চোখে পড়ল, রাস্তার ধারে মরা শিমূল গাছটা।

অনাময় বিব্রতভাবে হাসল, বলল, চলি রে—ওরা এখন সকলে নীরব, কেউ কোন কথা বলছে না, অথবা বলবার কিছু নেই। ওদের চোখের দৃষ্টি ম্লান। দেয়ালে রাইফেলের ছবি দেখছে।

অনাময় ইতস্ততঃ করে সামনের দিকে এগোল। পেছন থেকে বাচ্চুর পরিচিত গলা ভেসে এল, কবে খাওয়াচ্ছিস মাইরি। আর একটু এগোলেই অলকাদের বাড়ী। অনাময়ের চোখ আপনা থেকেই [illegible] বারান্দায় গেল। রেলিং ধরে অলকা দাঁড়িয়ে। ওর খোলা চুল হাওয়ায় উড়ছে। ওকে আজ হালকা সবুজ শাড়ীতে খুব সুন্দর লাগছে। অলকা সুখের হাসি হাসল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত নাড়ল আস্তে আস্তে। অনাময় একবার হেসে মুখ নীচু করল। অলকাকে ভালবাসে অনাময়। বিয়ে করবে, কথা দিয়েছে। কিন্তু বেকারত্ব যেন ফাঁসির দড়ির মত ঝুলেছিল এতদিন। এখন আপাততঃ আর কোন ঝামেলা রইল না। একদিন সুবিধেমত রেজেস্ট্রী করলেই হবে। অসবর্ণ বিয়ে বলে হয়ত এ-বাড়ী-ও-বাড়ীতে দু-চারদিন চেঁচামেচি হবে, তারপর সব ঠিক। ওর সামনে এখন বড় রাস্তা।

কিন্তু অফিসে পৌঁছে তাজ্জব বনল অনাময়। দশটায় অফিস শুরু। এখন দশটা বাজতে পাঁচ। অথচ সমস্ত অফিস যেন শ্মশানপুরী। কেউ কোথাও নেই। সবে জমাদারেরা ঝাড়-পাট দিচ্ছে। ক্রমে সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ অনেকেই এসে গেল। চাকরীতে জয়েন করার ব্যাপারে দু' চারজনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আরো জন-কয়েক এসে ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করে গেল। বয়সের দিক থেকে তরুণ, বেশ সপ্রতিভ। ওদের সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভাল লাগল অনাময়ের। কিন্তু অফিসের পরিবেশ হতাশ করল তাকে। কোথায় ভেবেছিল, ঝকঝকে তকতকে অফিস, সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করছে, কিন্তু এ যে মেছোবাজারের হাট। চারিদিকে হই-হই। গন্ডগোল, চা, পান, বিড়ি, সিগারেট। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং, হ্যালো— হ্যালো— তারই মধ্যে কলগুঞ্জন, তারস্বরে তর্কবিতর্ক, খাদ্যসংকট, মুজিবর রহমান, মাও-সে-তুং। অনাময় হতাশ হল, ভাবল, প্রথমদিন, কাজ-কর্ম কিছুটা অন্ততঃ করে। কিন্তু ওদের ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুনীলবাবু আসেননি আজ। বেলেঘাটা বন্ধ, তাই বাস চলেনি ওদিকে। সুনীলবাবুর বাড়ী আবার বেলেঘাটায়। সুতরাং অনাময় বসে থাকল, চা খেল, সিগারেট খেল, গল্প করল, বাড়ী থেকে আনা টিফিন খেল। ওর ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে।

টিফিনের পর কে একজন এসে ওদের সেকসনে বক্তৃতা দিল, জোরালো ভাষায়। ছুটির পর মিছিল বেরুবে পুজো-বোনাসের দাবীতে। সবাই যেন উপস্থিত থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। অনাময় ভাবছিল, কি করবে। বাবা বারবার সাবধান করে দিয়েছেন, এসব আন্দোলনের ব্যাপারে ও যেন না থাকে। সবে নতুন চাকরী, সুতরাং...।

ছুটির পর ও ভাবছিল, সুযোগ-সুবিধে বুঝে কেটে পড়বে। কিন্তু অফিসের নতুন বন্ধুরা ওকে চেপে ধরল, শেষ পর্যন্ত মিছিলে যোগ দিতেই হল।

লাল ফেস্টুন, শালু, সবকিছু তৈরী। ডবল লাইন করে মিছিল এগোবে। একজন শ্লোগান দেবে, বাকীরা গলা মেলাবে। বিকেল পাঁচটার কলকাতা। চারিদিকে যাত্রী বোঝাই ট্রাম-বাস চলেছে মাতালের মত। ওরই মধ্যে ওদের মিছিল চলেছে। রাস্তায় ভিখিরি, বুটপালিশ, উলঙ্গ শিশু, ক্যাডিলাক গাড়ী...। তারই মধ্যে মিছিল এগিয়ে চলেছে রাজভবনের দিকে। ট্র্যাফিক জ্যাম। ট্রাম-বাস স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে। থেমে থাকা ট্রাম-বাসের জানলা দিয়ে সবাই দেখছে ওদের। মন্তব্য করছে। অনাময়ের হঠাৎ মনে পড়ল, পাড়ার বেকার বন্ধুদের কথা—শংকর, অজয়, অমল, কি করছে ওরা। সেই রোজকার মত আড্ডা, সময়কে কোনমতে ধ্বংস করা। হয়ত ভাঁড়ের চা খেয়ে পেট ভরাচ্ছে। এই তো গতকালও ওদের সঙ্গে ছিল অনাময়। অথচ...। হঠাৎ অনাময়ের মনে হল, এই মুহূর্তে ওরা বড় দূরের মানুষ। ওদের সকলের মুখ এখন ভোরের কুয়াশার মত অস্পষ্ট। ঠিক ভাল করে মনে পড়ে না। ওর চিন্তা নতুন করে আবার শুরু করেছে। চাকরী, স্থায়িত্ব, মাইনে বাড়া, প্রমোশন—। নিজের অজান্তেই কখন শ্লোগানের সঙ্গে গলা মেলাল অনাময়, পুজোয় এবার বোনাস চাই—বোনাস চাই।

কলকাতা শহরে তখন ধীরে ধীরে কালো অন্ধকার নামছে।

উপজাতি জীবনচর্চা ও শরৎচন্দ্র রায়

রেবতী মোহন সরকার

উপজাতি জীবনধারা অনুশীলনের সূত্রপাতের উপর আলোকসম্পাত করতে গেলে আমাদের যেতে হবে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন আদিম জীবনযাত্রা প্রণালীর সামান্য বিবরণ কতিপয় দার্শনিকের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এই সঙ্গে বিভিন্ন পরিব্রাজকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিফলিত হয়েছিল উপজাতিদের বিচিত্র রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণা। কিন্তু এই সব বিবরণীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্পনাপ্রবণতা প্রাধান্যলাভ করেছিল এবং অনেক সময় পরিব্রাজকদের অভিজ্ঞতার দুঃসাহসিক ভিত্তি-ভূমি গড়ে তোলার জন্যেও উপজাতিদের জীবনধারাকে অবাধ ভাবপ্রবণতায় সিঞ্চিত করা হত। ফলে এদের বিবরণী তথ্যভিত্তিক হিসেবে কোনদিনই স্বীকৃত হয়নি। শিল্প-বিপ্লব পরবর্তী যুগে ইউরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্য এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রসারলাভ করল। কালক্রমে বাণিজ্যিক স্বার্থ রাজনৈতিক স্বার্থের রূপ নিল। ভারতের বুকে গড়ে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। নতুন দেশ, নতুন জাতি, নতুন ভাষা, বিদেশী শাসকদের সুষ্ঠু দেশশাসনে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যেই দেশের জাতি, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির উপর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উদ্যোগপর্ব সূচিত হল। এ ছাড়াও তদানীন্তন খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারকগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক ধর্মপ্রচারের জন্য জনজীবন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজনীয় মনে করে তাঁরাও তথ্য সংগ্রহে নেমে পড়লেন। এমনিভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সর্বাংগীন জীবনধারার রূপ পুস্তকাকারে ফুটে উঠতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সূরুতে নৃতত্ত্বে শিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক অধিকারিকের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ, ভারতের নানা উপজাতির উপর প্রকরণ গ্রন্থ প্রকাশিত হল। এগুলিই হল ভারতে উপজাতি জীবনের সর্বপ্রথম ব্যবহারিক ও পূর্ণাঙ্গ [illegible] ভারতের উপজাতি জীবন বর্ণবৈচিত্র্য অপরূপই শুধু নয় বহুরূপও বটে। তাই বিভিন্ন উপজাতিভিত্তিক প্রকরণগ্রন্থ আপন আপন রূপরঙে সমুজ্জল।

শরৎচন্দ্র রায় (জন্ম ৪ঠা নভেম্বর, ১৮৭১ খৃঃ) ছোটনাগপুরের উপজাতি-জীবনের রূপরঙের দিগন্তকে উন্মোচিত করেছিলেন তাঁর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা এবং সার্থক লেখনীর মাধ্যমে। তিনি পেশাদার নৃতাত্ত্বিক ছিলেন না অথবা কোন প্রশাসনিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্যবহারজীবি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বি-এল পাশ করার পর আলিপুর-স্থিত ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে আইন ব্যবসায় সুরু করেন। কিন্তু এর এক বছর পরে তিনি রাঁচির উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন এবং ওখানে জুডিশিয়াল কমিশনার্স কোর্টে যোগদান করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠার জোরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হিসেবে রাঁচি অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিচিত হলেন। মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্র ছিলেন উদার প্রকৃতির—হৃদয় ছিল মানব-প্রেমের অফুরন্ত উৎস। নিপীড়িত জন-মানসের প্রতি তাঁর সহৃদয় সমবেদনা ঝরে পড়ত। মানুষের প্রতি এই অকৃত্রিম ভাল-বাসাই তাঁকে কালক্রমে উপজাতি জীবন-চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। মানবদরদী শরৎ-চন্দ্র প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী হিসেবে পরিগণিত হলেন। ভারতে বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে এটি সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আইন ব্যবসায়ের সুরুতেই শরৎচন্দ্র ছোটনাগপুরের উপজাতিগোষ্ঠীর উপর বহিরাগতদের অনাচার ও অত্যাচারের ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন। এই সব জনগোষ্ঠী আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু বিচারের বিধান-লাভে বঞ্চিত হত। অনেক সময় বিচারের বিধান তাদের জাতীয় ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হত। শরৎচন্দ্রের মানবপ্রেমী হৃদয়ে অচিরেই আলোড়ন সৃষ্টি হল। তিনি দেখলেন উপজাতি জীবনের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি আইন ও বিচার

শরৎচন্দ্র রায়

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অজ্ঞতাই এই সব ঘটনার মূল কারণ। এর প্রতিকারের জন্যে শরৎচন্দ্র উঠে-পড়ে লাগলেন। ছোটনাগ-পুরের মালভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুণ্ডা উপজাতির জমিজমা ও কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার এবং বিধি-নিষেধের উপর আলোক সম্পাতের জন্যে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াকে তিনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করলেন। তিনি বলেছিলেন,

> "My professional duties as a lawyer led me to devote parti-cular attention to the land tanur-es and agrarian history of the Chotanagpur plateau.' (1)

একজন ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁর এই তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ ভারতীয় নৃতত্ত্বের এক নবদিগন্তের সন্ধান দিয়ে-ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফল 'The Mundas and their country' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। কৃষি ও জমিজমা সংক্রান্ত তথ্যের সাথে সাথে মুণ্ডা উপজাতির সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, লোকাচার, লোকসংগীত, লোককথা প্রভৃতির অজস্র তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ পুস্তকটিকে একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রূপদান করেছিল। ভারতে কোন উপজাতির এরূপ পূর্ণাংগ ইতিহাস ইতি-পূর্বে আর রচিত হয়নি। ব্যবহারজীবী শরৎচন্দ্র পৃথিবীর নৃবিজ্ঞানী জগতে এক চমকের সৃষ্টি করলেন। কলিকাতা ও পাটনা ধর্মাধিকরণে এই পুস্তকটির তথ্যাবলী প্রামাণিক হিসেবে স্বীকৃত হল।

মুণ্ডা উপজাতির জীবনধারা আলো-চনাই শরৎচন্দ্রকে নৃবিজ্ঞানের উন্মুক্ত চত্বরে পৌঁছে দিল। ছোটনাগপুরে পর্বত ও জঙ্গলঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উপ-

জাতিদের গ্রামগুলো তাঁকে আকর্ষণ করল প্রবলভাবে। সে আকর্ষণ শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করতে পারলেন না। মানুষকে জানার আগ্রহে তিনি নেমে পড়লেন প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানমূলক কর্মকাণ্ডে। এক এক করে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ, বিরহড়, অসুর, খাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিদের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিভিন্ন দিক রূপলাভ করল শরৎচন্দ্রের লেখনীর মুখে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উল্লেখিত উপজাতি সম্বন্ধে তাঁর ছয়খানি প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অজস্র মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশলাভ করে।

শরৎচন্দ্রের জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছোটনাগপুরের উপজাতি জীবন-দর্শনের মূলসূত্র উদ্ঘাটন এবং এই সেই অনুসন্ধান প্রবণতা জীবনের পরম কর্তব্যের আহ্বানে সাড়াদান প্রসঙ্গে উদ্ভূত। শরৎচন্দ্রের উপজাতি জীবনচর্চা তাই এত মর্মস্পর্শী, তাঁর প্রদত্ত বিবরণ তাই এত হৃদয়গ্রাহী। ছোটনাগপুরের নানান গাছ-গাছালীর ছায়াঘেরা, পাখির কলকাকলীতে মুখরিত উপজাতি গ্রামসমূহের জীবনধারার সাথে তিনি একাকার হয়ে গিয়েছিলেন আর বিভিন্ন উপজাতি জীবনের অন্তস্তলে প্রবেশ করেছিলেন। তা না হলে প্রতিটি উপজাতির জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যের এত প্রাচুর্য এবং বিশ্লেষণের এত প্রাণবন্ততা পরিলক্ষিত হত না। ধর্ম, লোকাচার, লোকসঙ্গীত, লোককথা, ছড়া ও প্রবচনের উপজাতি-ভিত্তিক এত সংগ্রহ অনুসন্ধানীদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

শরৎচন্দ্রের মতে ছোটনাগপুরের উপজাতি জীবনদর্শন দুইটি প্রধান সূত্রে প্রতিফলিত। একটি হল মৈত্রীবন্ধতা এবং অপরটি বর্জনকরণ। শান্তিপ্রিয় উপজাতি সম্প্রদায় পারিপার্শ্বিক হিতকারী দেবদেবীর সাথে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বনের মাধ্যমে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। আবার অপরদিকে অহিতকারী দেবতাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে দূরে থাকায় তারা অভ্যস্ত, এদের এড়িয়ে চলাই তাদের লক্ষ্য। ঠিক তেমনিভাবে এক একটি উপজাতি সম্প্রদায় পারিপার্শ্বিক শান্তিপ্রিয় অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে অগ্রসর হয় এবং বিবাদকারী গোষ্ঠীদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকতে চায়। এদের সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দায়দায়িত্ব নানা কর্মীদের উপর ন্যস্ত এবং কর্মের গুরুত্ব ও যোগ্যতা অনুযায়ী এদের উচ্চ নীচ বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মতে ছোটনাগপুরের উপজাতি ধর্মও এই জাতীয় দায়দায়িত্বে এবং উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের প্রভাবে প্রভাবিত।

ওরাওঁ উপজাতির ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলন আলোচনায় শরৎচন্দ্র অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছোটনাগপুরের বুকে দীর্ঘদিনব্যাপী বিভিন্নপন্থী ভগত এবং খৃষ্টান ও হিন্দুধর্মের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই সংঘর্ষ কিভাবে ও কেমনভাবে দেশজ ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল শরৎচন্দ্রের লেখনীতে তা প্রতিভাত হয়েছে। এই পুনরুজ্জীবন আন্দোলন যদিও ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যেই সুরু হয়েছিল তবুও এর মূলে সংশ্লিষ্ট উপজাতির অর্থনৈতিক নৈরাশ্যের বিষয়টিও বর্তমান।

ছোটনাগপুরের উপজাতি জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রকৃত এবং বিস্তৃতরূপ শরৎচন্দ্রের সারাজীবনব্যাপী পঠন-পাঠন ও গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতের মত বিচিত্র উপজাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশে নৃতাত্বিক ভিত্তিতে উপজাতিসমূহের জীবনযাত্রার অনুশীলন অত্যাবশ্যক বলে তিনি মনে করতেন। দেশের শাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মীদের উপজাতিজীবনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে বহু অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ান যায় এবং যা ঘটলে দেশ ও জাতির চরম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি জোরের সাথেই বলেছিলেন,

> 'Anyone having had occasion to watch at close quarters the administration of justice in certain aboriginal areas of India will be struck by the amount of injustice done, in spite of the best intentions by judge and magistrates and police officers of all grades, owing to the ignorance of the customs and mentality of the aboriginal tribes they have to deal with. Unnecessary panic is sometimes caused to administrative anthorities through such ignorance.' (2)

শাসকগোষ্ঠীর এই অপ্রয়োজনীয় ভীতিই যে পরিণামে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানেই তা দেখা গেছে।

'পাড়া সংঘ' (Parha Federation) ছোটনাগপুরের উপজাতিদের একটি বিশেষ সামাজিক সংস্থা। বিভিন্ন গ্রামের উপজাতিভিত্তিক অধিবাসীদের নিয়ে এই সংস্থা গঠিত এবং নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা, কৃষিকাজ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনার জন্যে বছরে একবার এই সংস্থার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। পাড়া সংঘের সর্দার 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত। এ ছাড়াও রয়েছে সর্দারের অধীনস্থ কর্মীগণ যেমন দেওয়ান, লাল, পাণ্ডে প্রভৃতি। তখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। দেশে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের তখন ভরা জোয়ার। ঠিক ঐ সময়ে মুণ্ডা পাড়া সংঘের 'রাজা" বাৎসরিক অধিবেশনের নির্দেশনামা জারি করল। 'রাজা' কথাটি তদানীন্তন জনকয়েক পুলিশ অফিসারকে চিন্তান্বিত করে তুলল। তাদের ধারণা হল ছোটনাগপুরে মুণ্ডারাজ কায়েম করার এ এক চক্রান্ত। দিকে দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। শেষে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার্স এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র রায়ের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাকে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করলেন। ব্যাপারটি শুনেই শরৎচন্দ্র বুঝলেন যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে কোন পুলিশী হস্তক্ষেপ করতে একেবারেই নিষেধ করলেন। অধিবেশনের দিন তিনি নিজে কয়েকজন সাদা পোষাকের পুলিশ অফিসারকে উপস্থিত করিয়ে তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু শুনিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্রের একাগ্রতাপূর্ণ নৃতত্বের সাধনা এমনি অজস্র উদাহরণে ভরপুর। বিভিন্ন সময়ে তিনি দেশের তদানীন্তন সরকারকে এ সব বিষয় অবহিত করে এসেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন,

> 'The study of men of different races and religions of the customs and manners of one another may help in promoting mutual amity and knitting over more closely the bonds of unity between them, and thus eventually help to banish much of the communal animosity which is the bane of Indian national life at the present day.'(3)

মানুষের অনুধ্যানের উপর রচিত শরৎচন্দ্রের নৃতত্বচর্চা তাই এত ফলপ্রসূ—কারণ মানুষের মঙ্গলকামনাই ছিল তার মানববিজ্ঞান সাধনার লক্ষ্য। উপজাতি জীবনচর্চার ইতিহাসেও শরৎচন্দ্র এক নবযুগের সূচনা করেছেন। যে নির্ভেজাল মানবপ্রেমের উপর ভিত্তি করে তার উপজাতি অধ্যয়নের হাতেখড়ি সেই মানবপ্রেমই তাকে উপজাতি জীবনে নতুন আশা উদ্দীপনা সঞ্চারে প্রবৃত্ত করেছিল। শরৎচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা যেমন একদিকে ছোটনাগপুরের জগৎকে সর্বসাধারণের সম্মুখে উদ্ভাসিত করেছিল অপরদিকে তেমনি তাঁর মহানুভবতায় উপজাতি সমাজ বিশিষ্টতালাভে ধন্য হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর শুভলগ্নে অদৃশ্যলোক হতে উপজাতি-গোষ্ঠীর উপর ঝরে পড়ছে তাঁর সহৃদয় আশীর্বাণী। ছোটনাগপুরের উপজাতি সম্প্রদায়ের ছন্দবদ্ধ জীবনের প্রতিটি স্তরে আজও বুঝি শরৎচন্দ্রের প্রভাব দেদীপ্যমান।

---

1 'The study of Folklore and Traditions in India', in Journal of the Bihar and Orissa Research Soceity: Vol, 18, part 3, Patna.

2 'The Impportance of Anthropological Studies in India,' in The New Review, 1938, Benaras

3 Do.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
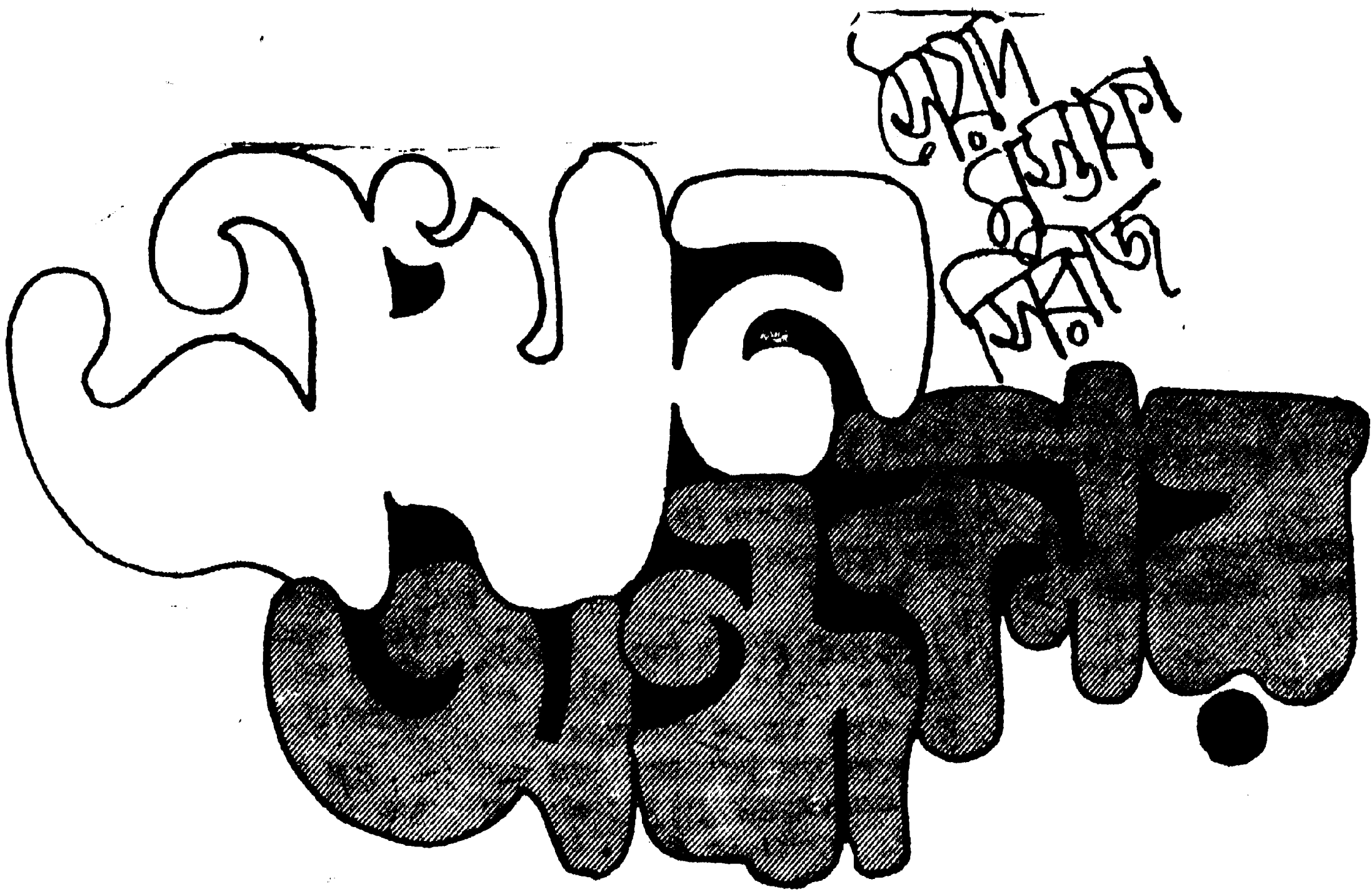
চার

প্রথম কয়েকটা দিন রুমাদের ওখানে আর যাবার অবকাশ ছিল না, চেষ্টাও ছিল ছিল না। জিয়াগঞ্জ থেকে ফিরে এসে রুমার সঙ্গে দেখা হয় নি। সে তখন কলেজে। দেখা না হয়ে বেঁচে গিয়েছিল যেন। কী লজ্জায় না ফেলেছেন পরেশদা! স্নেহ-বউদি ওখানে থাকার জন্যেই জেদ ধরে-ছিল—সেটা অসম্ভব। থাকলে অবশ্য একটা অসুবিধে থেকে বেঁচে যেত—সেটা খাওয়ার। যে লোকটি রাঁধে, সে বামুন বলেও না—কেমন নোংরা যেন। এর থেকে স্বপাক খাওয়া ভালো। কিন্তু সময় নেই। যতটা ভেবেছিল, কাজ তার চেয়েও বেশি এবং কাজেরও কোন সময়-অসময় নেই। রাত দুপুরে ঘুম থেকে তুলে লোকেরা গুদাম খুলতে বলে। আগের রাতে একগাদা মোটর পার্টস এসেছিল। সেগুলো আপাতত গুদামে রেখেছে। ওবেলা সব পাঠাতে হবে বেচুবাবুর হেফাজতে। কোথায় যাবে তা বেচুবাবু বলে নি। একটু-একটু বিরক্তি আসছিল চন্দনের। তার ওপর হক-সায়েবের বকবকানি। লোকটা তাকে ইতি-হাস শোনায়। ওই উত্তর দক্ষিণ সড়কটার নাম বাদশাহী সড়ক। হোসেন শা'র আমলে তৈরী। ওই দরগাটা রাতারাতি আরব থেকে উড়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, বুঝলেন বাবা, ওই সড়ক বেয়ে কত বাদশাহী ঘোড়-সওয়ার গেছে, কত বর্গী এসেছে তলোয়ার নাচাতে নাচাতে, এসেছে গোরাপল্টন বিদ্রোহী সিপাহীরা, সে কত ধুন্ধুমার কান্ড। আমি কান পাতলেই যেন শুনতে পাই। যখন রাত হয় ঘোর নিশুতি, আমি স্পষ্ট শুনি—ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ...

লোকটিকে যা ভেবেছিল তা নয়। এ-সব লোক ধূর্ত হতে পারে না। গ্রাম্য সরলতা এর আষ্টেপিষ্টে জড়ানো। হাসি পায়, আবার ভালও লাগে।

আর পান্ডেজী। সেও ভারি চমৎকার মানুষ। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। টান একটু-আধটু আছে। সহজে ধরা যায় না। এই চটির অনেক গল্প সেও জানে। চোখের সামনে দেখেছে, কেমন করে গড়ে উঠল একটা লাভজনক বাণিজ্য কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদের এই এলাকাটায় বানবন্যা বিশেষ হয় না। উঁচু জায়গা—অথচ জেলার শস্য ভান্ডার। চারদিকে শুধু ধানের মাঠ। তার মাঝে অজস্র ক্যানেল। চাষীরা আর বর্ষার প্রত্যাশা খুব একটা করে না। এক মহকুমা শহর কান্দী ছাড়া এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর কোন বাণিজ্যকেন্দ্র নেই। সেই হয়েছে সুবিধা। পান্ডেজী তাকে রূপপুরের এই সম্ভাবনাটার উৎস বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছে। লোকটি ঝানু ব্যবসায়ী সন্দেহ নেই। তা না হলে দূরে মুঙ্গের থেকে লোটা-কম্বল সম্বল করে এসে লাখপতি হয়ে বসল কেমন করে? মাত্র তো পঁচিশটে বছর বড়জোর।...

পান্ডেজী বলছিল, বাবুজী, রূপপুর আজ জমজমাট। ভিড় হল্লা লোকজনে দিন-রাত্রি গমগম করছে। উনিশশো তেতাল্লিশ সালে আমি যখন এলাম—চৌরাস্তার কাছে একটা 'খোপড়ি' বানালাম, আরও কয়েকটা খোপড়ি ছিল—সেখানে সন্ধ্যার আগেই লোকেরা মালপত্র বেঁধেছেঁদে যে যার গাঁয়ের দিকে চলে যেত। ওখানে একটা খুব বড় বটগাছ ছিল। সেটা পরে কেটে ফেলা হল। ওই গাছের নিচে কেবল কিছু বিদেশী গাড়োয়ান আর এই খোপড়িতে আমি একা। আঁধার ছমছম করত। একটা খুন-খারাপি কিছু হলে চেঁচিয়ে মরলেও কোন লোকের সাড়া মিলবে না। তো ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে আমি নিদ যেতাম। বাইরে গাড়োয়ানরা তাস খেলত। গান করত। গজলা করে রাত ভোর করে দিত। মাঝে মাঝে কেউ চেঁচিয়ে বলত, কে বটে! হুঁশিয়ার!.. কখনও দূরে থেকে গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা যেত। আওয়াজ বাড়ত। কাছে আসত। বটতলার গাড়োয়ানরা চেঁচিয়ে জিগেস করত—কোথাকার গাড়ি? কোথা যাওয়া হবে? ওরা গাড়ির ওপর থেকে সাড়া দিত—হুই ধনেখালি, আখেরিগঞ্জো। নয়তো—লালগোলা কাতলামারি সুপারি-গোলা। এটা কি রূপপুরের চটি? সবাই এক সঙ্গে খুসি হয়ে বলত—হ্যাঁ। চলে এস। বুঝতেই পারছেন, বাগড়ী মুলুকের গাড়ি সব। আসছে কলাইমাকড় নিয়ে রাঢ়ে ফিরি করতে। ধান নিয়ে ফিরে যাবে। বাবুজী, বাগড়ী মুলুক বড় গরীব লোকের দেশ।...

...তো, আমারও সাহস বাড়ত। সেই রাত্রে ওরা সব ঝুঁঝিখোল নেবে। গরু বলদকে খাওয়াবে। আমি সামান্য চালডাল নুনতেল লকড়িও রাখতাম। ওরা রান্না চাপাত। আর যদি যে রাত্রে আসত না, তরাস লাগত, বটতলায় কোন গাড়োয়ান থাকত না, সেই সব রাত্রে লম্ফ জেলে সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তাম। বর্ষার সময় বেশির ভাগ রাত্রে চটি ফাঁকা থাকত। বাইরে ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। চার-পারে পোকমাকড় ডাকছে। আমি রামায়ণ

পড়ছি। পড়তে পড়তে মনে জোর বাড়ছে। তো এক রাত্রে এক আজব কান্ড ঘটল।......

পান্ডেজী হঠাৎ চুপ করেছিল। বাইরে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। যেন সেই রাত্রির চেহারাটা স্মরণ করছিল।

চন্দন অন্যমনস্ক। ভাবতে অবাক লাগে, কেউ কোথাও নেই—জনপদ থেকে দূরে বৃষ্টির রাতে চটিতে একটিমাত্র লোক গানের সুরে রামায়ণ পড়ছে।...

...তো আমি রামায়ণ পড়ছি। আচানক ঝাঁপের ওপর আওয়াজ। জোরে বৃষ্টি পড়ছে। তরাস বাজল বুকে। তাহলে এতদিনে আমার পালা পড়েছে। ভগবানকে স্মরণ করে ঝাঁপ একটু ফাঁক করলাম। হা রামজী!

কপালে করাঘাত করে একটু থেমেছিল পান্ডেজী। চন্দন বলেছিল, কী? কী দেখলেন?

...দেখলাম একটা মেয়ে।

চন্দন হেসে উঠেছিল। ...মেয়ে! বাঃ, বেশ রোমান্টিক ব্যাপার তো?

...হাঁ—খুব আজব কান্ড। তিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স হবে। খুব খাপসুরত চেহারা। ফরসা রং, টানাটানা চোখ। তো এখন তার মেয়েকে দেখলেই মালুম হবে, মা কেমন ছিল।

সে আছে নাকি?

হাঁ। আছে। বলছি সেকথা। ঝাঁপ খুলেই মালুম হল মেয়েটি ভীষণ ভিজেছে। আর মনে হল, সে বেমারী—কাতরাচ্ছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই। আর তার কোলে একটি ছোট্ট লেড়কী। মা মেয়ে জোর ভিজেছে। ঠকঠক করে কাঁপছে। ভগবানের ইচ্ছা বাবুজী। আমি ঝাঁপ তুলে বললাম, ঢুকে পড়ো জলদি। বাইরে জোর হাওয়া দিচ্ছে। তত বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। আর সব খোপাড়িগুলোর দু-দিক খোলা—আটচালার মতো। সেখানে কেউ তো রাত্রে থাকে না! যাইহোক, জায়গা খুব কম আমার। তবু আশ্রয় দিলাম। বাবুজী, মেয়েটি মুসলমান। বাঘড়ীমুলুক থেকে রাঢ়ে এসেছিল ভিখ মাঙতে। আট'ন মাইল দূরে একটা গ্রাম আছে কাজিপাড়া। সেখানে কার বাড়ি বিয়ে ছিল। ভুখা পেটে অনেক গিলেছে। তারপর রাস্তা হাঁটিতে লেগেছে। গাঁয়ের লোকেরা বারন করেছিল, সন্ধ্যাবেলা, ঝড় বিষ্টির দিন, বেরিও না। কোথাও থেকে যাও। কিন্তু বয়স—মেয়ে মানুষের বয়স তখন আপনা বৈরী, বাবুজী। মন্দ লোকের ভাবসাব দেখে সাহস করতে পারে নি। লোক দেখানো কায়দায় এক জায়গায় শুয়েছিল বটে—কিন্তু যত রাত বাড়ে, মন ছটফট করে ডরে। চুপি-চুপি মেয়েকে কোলে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছিল। এখন কাজিপাড়া আর রূপপুর চটি, এর মাঝে কোন বসতি নেই। বিলকুল ফাঁকা মাঠ। রাস্তার ধারে গাছপালা যা ছিল, দুর্ভিক্ষের টানে লোকেরা তাদের ডালপালা কেটে সাফ করে ফেলেছে। লকড়ীর কাঠ বেচেছে। তারপর তো পথে নামতেই যেমন বৃষ্টি, তেমনি হাওয়া। সেই সঙ্গে সুরু হয়ে গেল পেটের বেমারি। বমি পায়খানা...

...তো বাবুজী, ভগবানের ইচ্ছা। কার রূপ ধরে কে আসে। আর আমি তো মানুষ বটে, না কী? ভাবলাম, রে শম্ভু-চরণ, তোকে রামজী পরীক্ষা করতে একে পাঠিয়েছেন। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, তেপান্তর জায়গা—বৃষ্টির রাত। আমি পারলাম না বাবুজী। শেষ রাতে মেয়েটি মারা গেল। তার বুকের কাছে তখন বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে। অনেক কান্নাকাটি করে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ঘরময় নোংরা। আমার হাত ভি নোংরা। পাথরের মতো বসে আছি।

তারপব?

পান্ডেজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, সকাল হল। বৃষ্টি কমেছিল। ঝাঁপ বন্ধ করে পাশের গ্রাম ওই হাজারপুরে মুসল-মানপাড়ায় খবর দিয়ে এলাম। ওরা এসে লাস সরাল। মুসলমানদের মধ্যে এটা আমি দেখেছি বাবুজী।...তো আমি একজনকে পাহারায় রেখে কান্দী গেলাম পায়দল। ব্লিচিং পাউডার নিয়ে এলাম। ঘর ধুলাম। অবশ্যি আমার কিছু হয় নি। এই তো দেখছেন, ষাট-পাঁচষট বয়স হল—ভালোই আছি।

সেই বাচ্চা মেয়েটির কী হল পান্ডেজী?

আরে! সে বেঁচে আছে। মুসলমান-পাড়ার ওরা এসে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বছর—কে পুষবে? আর এদিকে মনে তরাস আছে—বাচ্চাটা না খেয়ে মারা গেলে মায়ের আত্মা যদি ক্ষতি করে? ওরা আমার কাছে এল। আমি বললাম, এক কাম করো। ওকে ওই পীরের দরগায় ফকির সায়েবের কাছে পৌঁছে দাও। দ্যাখো না উনি কী বলেন! মাইলখানেক দূরে দীঘির পাড়ে—

হ্যাঁ, দেখেছি। ওই তো—ওদিকে।

ফকিরসায়েবের নাম ছিল মস্তানবাবা। ছেলে-বউ নিয়ে দরগায় থাকতেন। দরগার নামে কিছু সম্পত্তি ছিল। ওই দিয়েই চলে যেত। তাছাড়া মানত ইত্যাদি তো আছেই।

নিলেন ফকির সায়েব?

নিলেন। সে মেয়ে এখন তার স্বামীর সঙ্গে বাস করছে। মাঝে মাঝে আমাকে দেখা করে যায়। আমিও পালায় পরবে কিছু দিই।......তো, মাস্তানবাবা নিজের ছেলের সাথেই ওর বিয়ে দিয়েছিলেন। কী আজব কান্ড! আপনি তো ওকে চেনেন। ওখানে ছোট্ট একটা স্টেশনারি দোকান আছে—ওই যে সেই মেয়েটি! কাল বিকেলে এসেছিল। দোকানটা ভালই চালাচ্ছে। ওদিকে ওর স্বামী দরগা দেখা-শোনা করছে। ওরা ভালই আছে।

চন্দন অবাক হয়ে বলেছিল, সেই চুড়ি-ওয়ালী মেয়েটি? কী যেন নাম—আলতা—আলতারাণী? হ্যাঁ, হ্যাঁ—কাল বিকেলে এসে বলছিল, আমাদের গাড়ি কলকাতা যাচ্ছে নাকি। আপনাকে প্রণাম করল। বুঝেছি! জানেন—তখন কেমন লেগেছিল ব্যাপারটা!

রাস্তায় হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল রুমার সঙ্গে। চন্দন আসছিল শিশিরবাবুর ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে। একটু এড়ানোর চেষ্টা করেছিল। পারল না। ছিঃ, কী ভাববে ও! সে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায়। রুমা কলেজ ফিরতি বাস থেকে নেমেছে। অকারণে মুখ ফেরাতে গিয়ে দেখে ফেলল চন্দনকে। এগিয়ে এল তক্ষুণি।... কী মশাই, ব্যাপার কী? খুব যে কাজের লোক হয়ে উঠেছেন দেখছি!

চন্দন হাসল অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে।...না। এক্ষুণি ভাবছিলাম, এবেলা সময় আছে। বউদির কাছে যাব। কেমন আছ? বউদির জ্বরটর সেরেছে?

রুমা বলল, থাক। অত আত্মীয়তার কাজ নেই। এ তো জানতাম বাবা, জামাই-বাবুর চেলা—সে আবার কেমন হবে?

চন্দন বলল, তুমি রাগতে শিখেছ দেখছি। আমি ভাবতাম, যে ভীতু, সে রাগতে পারে না।

রুমা ভ্রূভঙ্গী করল। ...কে ভীতু? আমি?

আমার স্মৃতি বলছে—জিয়াগঞ্জের স্মৃতি।

আর আমার জিয়াগঞ্জীয় স্মৃতি বলছে, চন্দনদা নামে জনৈক ব্যক্তি ভীষণ ভীতু ছিল। যাক্ গে....রুমা হঠাৎ সিরিয়াস হল।... আরে, ওদিকে বউদি তোমার জন্যে যে অস্থির। যাচ্ছ না কেন?

সময়ই পাই নে। যা চাকরী! সময়-অসময় তো নেই—শুধু কাজ।

সে তো থাকবেই। এর নামই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা।

তুমি খোঁটা দিচ্ছ না তো?

রুমা সত্যি সত্যি একটু অবাক হয়ে বলল, খোঁটা? কেন বলতো?

চন্দন হাঁটতে হাঁটতে বলল, কিছু না—এমনি বললাম। আচ্ছা রুমা, সেই স্ক্যান্ডাল না কী—বললে না তো?

রুমা আবার স্বাভাবিক হল।...বলব কখন? তারপর আর টিকি দেখিয়েছ?

এই তো দেখালাম। এবার বলো।

কিন্তু এখন তো মুড নেই আমার। মগজে ক্লাসের লেকচার টগবগ করে ফুটছে। বাপস্। কেন যে ওসব ছাইপাঁশ শেখে মানুষ, বুঝি নে!

শিক্ষিত হবে বলে।

ফেট্!

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল দুজনে। তারপর চন্দন মুখ খুলল প্রথমে।...রুমা!

উঁ?

হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়লে যে?

না তো। এমনি। বাসের ধকল সামলাচ্ছি।

বিকেলের দিকে গাড়ির ভিড় বেশ বেড়ে যায়। চারদিক থেকে বাসগুলো এসে পড়ে। ট্রাক আসে অজস্র। ড্রাইভাররা দোকানে দোকানে চা খেতে খেতে আড্ডা দায়। পাটের মরশুম পড়েছে জোর। এখানে-ওখানে পাট বোঝাই করছে ব্যাপারীরা। ধান-চালের বস্তা জড়ো হয়ে আছে। ট্রানজিস্টার রেডিওর সোরগোলে উচ্চকিত পরিবেশ। মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে একটা করে বাস। চেঁচাচ্ছে ওরা—রূপপুর, চটি রূপপুর!...সাঁইথে সাঁইথে।...নগর ইন্দ্রাণী সাকোরঘাট। পাঁচগ্রাম, পাঁচগ্রাম!...বঁড়োয়া পুশুলে গীতগ্রাম—লাভপুর! হেই লাভপুর যানেবালে! তালেবেতালে তুখোড় ছোকরা এ্যাসিস্ট্যান্ট গানের সুরে যাত্রী ডাকছে। যাত্রীদের সাথে ভাড়া কিংবা মাল নিয়ে কন্ডাকটারের তুমুল ঝগড়া হচ্ছে। চৌরাস্তার কেন্দ্রে গোল ছোট্ট পার্কের ঘাসে কয়েকটি যুবক শুয়ে বা বসে গল্পগুজব করছে। হাতধরাধরি একদঙ্গল বাচ্চা বেড়াতে বেরিয়েছে। আগে দুটি মাতলা। এ-পরিবেশে কেমন বেমানান লাগে। হাসপাতাল থেকে এ্যামবুলান্স বেরিয়ে এল সেই সময়। পাশ দিয়ে চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। ইটখোলার দিকে হিন্দুস্থানী ও সাঁওতাল মজুরদের বসতিতে ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আবছা গানের সুরও ভেসে এল।...

> গোরা গোরা মুখড়া
> তানিকো নাতিকি
> হামরে নজর লাগি যায়,
> নজর লাগি যায় জী।।

সব মিলিয়ে রূপপুর চটিতে এই সুরে আসন্ন সন্ধ্যার অর্কেস্ট্রা। হেমন্তের কুয়াশা চালকল ইঁটভাটার চিমনী থেকে বেরোন ধোঁয়ার সাথে মিশে এক রহস্যময় ধূসরতার সামিয়ানা তৈরী করে ফেলছে। নিচে এই আজব নগর।

আর সেই অবেলায়, দ্রুত ফুরিয়ে-যাওয়া আলোয়, দূরের গাঁওয়াল সেরে কোন মুসলমান বাউল এল গাইতে গাইতে। তার পরনে লম্বা হাজার-তালির আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি, দুপায়ে ঘুঙুর, এক হাতে তারযন্ত্র, বুকে খুঞ্জনি চিমটে, অন্য হাতে একটা অদ্ভুত কমণ্ডলু।...

> আজব শহর এ এক বানাইলে কোন জন,
> হায় হায়, আজব শহর।।
> সেই শহরে রথ চালাইছে
> একজনা তার সারথি,
> দুইজনাতে রথ টানে ভাই
> দুইজন জবালায় বাতি।
> (সেই) রথের ভিতর বসে ও
> চাঁদ সদাগর,
> হায় হায় আজব শহর।।

বাউলটি আপনমনে গাইতে গাইতে চলে গেল ভিড় ভেদ করে—ভ্রূক্ষেপহীন। পথের ওপর কতক্ষণ ধরে, সব নির্ঘোষ ছাপিয়ে, বাজতে থাকল আর বাজতে থাকল, ঝুম...ঝুম...ঝুম...ঝুম...ধারাবাহিক তার চলার ছন্দ দুপায়ের ঘুঙুরে।

চন্দন ডাকল, রুমা!

উঁ?

কথা বলছ না কেন?

রুমা মুখ নিচু করে হাঁটছিল। দুহাতে বুকের কাছে ধরা বইপত্তর। মুখ তুলে একটু হাসল সে।...একটা কথা ভাবছিলাম। সেই ছেলেবেলার।

কী কথা বলো তো?

একদিন দৌড়তে দৌড়তে ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে?

না তো!

বাড়ি ঢুকতেই দিদি জোর মার দিল। ধিঙ্গি মেয়ে, লজ্জা করে না তোর? মার খেয়ে আমি কেঁদে উঠলাম। জামাইবাবু ছিল না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে সন্ধ্যা অব্দি ভিজে নোংরা গায়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর তুমি এলে। বললে, কী হল রে রুমকি?...তারপর কী করলে বলতো?

কই, মনে নেই!

বারে! তুমি টানতে টানতে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেলে। রগড়ে সব ধুইয়ে দিলে অতবড় ধিঙ্গি মেয়েটার। জানো, তখন মনে মনে কত—কত কাঁদছিলাম। চোখে নয়—মনে। মুখে হাসি ছিল কিন্তু। আর এই মনের কান্নাটা কী ছিল জানো?

ওকে চুপ করতে দেখে চন্দন বলল, কী?

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মাথার ওপর ছাদ পেলে কী হয় চন্দনদা?

আনন্দ হয়। নিরাপদ লাগে।

কান্নাটা ছিল তারই। ভাবতুম—অন্তত একজন...হঠাৎ রুমা দাঁড়াল।...আচ্ছা চলি।

কী হল?

তোমার দেরী করিয়ে দিলাম কতক্ষণ। যাও, যাও, অনেক কাজ জমে গেছে।...বলে রুমা হনহন করে চলে গেল।

চন্দন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ডানদিকের কলোনীর পথে যতক্ষণ না সে মিলিয়ে গেল, নড়ল না। তারপর আস্তে আস্তে এগোল।

পেট্রোলপাম্পের কাছে যেতেই সে দেখল পরেশের সবুজ ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। বহরমপুর থেকে ফিরল তাহলে। তাড়াতাড়ি হেঁটে কাছে যেতেই দেখল বেচুবাবু আর পরেশদা কী সব আলোচনা করছে চাপা গলায়। বেশ উত্তেজনার ছাপ রয়েছে দুজনের মুখে।

তাকে দেখে পরেশ বলল, আরে এস। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। ওদিকে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার দুঃসাহস—শিশিরদার পরামর্শ শুনিনি। জঙ্গীপুরের দিকে এক ট্রাক মাল পাঠিয়েছিলাম। ঘাট পেরোনর সময় ভরা গঙ্গায় নৌকো ডুবে সব কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে। অবশ্যি ইনসিওর করা ছিল। সেই রক্ষে। কিন্তু... বেচুদা, আমি উঠছি। এক্ষুনি আবার জঙ্গীপুরে ছুটব। চন্দন, তুমি বাকিটা শুনে নাও বেচুদার কাছে।

হন্তদন্ত উঠে গেল পরেশ। চন্দন বেচুবাবুকে বলল, বলুন দাদা।

বেচুবাবু শুধু বললেন, ইয়ে—আজ রাত্রে কিছু মাল আসছে। কখন পৌঁছবে, ঠিক নেই। গোডাউনে রেখে দেবেন। সকালে তো আমি আসছিই।...

রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের। ফরিদ ডাকাডাকি করছে। বাইরে ট্রাকের হর্ণের শব্দ হচ্ছে। সে বাইরে বেরোল।

কাগজপত্রে রুমার নাম! সে কী! এতো হওয়া উচিত কোম্পানীর নামে—বরাবর তাই হচ্ছে। ড্রাইভার বলল, বাবু, জলদি সহি দিন। ঘুম আসছে।

চন্দন বলল, সীল লাগবে না? এ-নামের সীলটীল তো নেই।

কুছু দরকার নেই। ফর দিয়ে সাঁহি দিন। বাস। ডেট দিন আগলি পরশু রোজের।

ওরা চলে গেল। গুদামে এসে চমকাল চন্দন। বলল, মাল ভেজা কেন?

ফরিদ হাসল।...কে জানে সরুন, দরজা লাগাই।

পাঁচ

হকসায়েব চুপি চুপি বললেন, এক কাজ করলেই পারেন চন্দনবাবু। ওই যে জামাইভাণ্ডারের পাশে হোটেলটা আছে—দেখেছেন? দ্যাখেননি? হোটেলটা ভাল। গত বছর উড়ে এসেছে এখানে।

চন্দন একটু হেসে বলল, উড়ে এসেছে মানে?

তা বই কি! বহরমপুরের এপারে রাধার ঘাট—দেখেছেন তো? বরাবর ওখান দিয়েই লোকে গঙ্গা পেরিয়ে শহরে যেত। কাজেই রাধার ঘাটে একটা ছোটখাট বাজারমতো ছিল। এমনি জমজমাট জায়গা। তারপর গঙ্গার ওপর সরকারবাহাদুর ব্রীজ দিলে। বেশ খানিকটা তফাতেই দিলে। তখন হল কী, রাধার ঘাট দিনে দিনে মরতে বসল।..হকসায়েব পানরাঙা দাঁত খুলে হো হো করে হেসে

উঠলেন নিজের রসিকতায়।...ঘাটের মড়া হয়ে গেল রাধার ঘাট। জন নাই, প্রাণী নাই, সুমসাম সকালসন্ধ্যে। খাঁ খাঁ করে চারদিক। সেই খাঁ খাঁ-করা রাধার ঘাটের হোটেলওয়ালি, রাধা তখন কী করে? সে—

বুঝতে পেরে চন্দন বলল, হোটেল-সমেত উড়ে এল রূপপুর চটিতে?

উৎসাহে মাথা দুলিয়ে হকসায়েব বললেন, এল। যাবে কোথায়? ওই যে—কথায় বলে, 'নদীর একূল ভাঙে তো ও-কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা'। শোনেননি গানটা? আহা-হা বড় ভালো গান।

গানের স্বাদে, কিংবা জীবনের একটা গুহ্য তত্ত্বের আবেশে আবিষ্ট হয়ে হক-সায়েব কিছুক্ষণ আপনমনে মাথা দোলালেন। তারপর বললেন, রাধা মেয়েটি বড্ড ভালো। আমাকে চাচা বলে। খুব খাতির করে। করবে না আবার? আগের দিনে রেতেবিরেতে কলকাতা-বহরমপুর নানা জায়গা থেকে এসেছি, ঘাট পেরিয়ে এসেই রাত কাটানোর আস্তানা খুঁজেছি। স্বজাতির হোটেল একটা ছিল ওখানে। কিন্তু রাধার সামনে দিয়ে সেখানের ঢোকার সাধ্যি আছে বাবা? ছিল না। ও আমার কোন জন্মের মা।

চন্দন প্রশ্ন করল, আপনি জন্মান্তর মানেন?

ধর্মে মানতে নাই, মর্মে মানি।...হক-সায়েব ফের জোরে হাসলেন। যেন চমৎকার মিল দিয়ে কথা বলার গর্বে। তারপর বলল, রাধা বড় আজব মেয়ে। বাইরে-বাইরে সে এক, ভিতরে অন্য। ওর ভিতরটা আমি দেখেছি কিনা, তাই বলছি। আমি তো মসুলমান, তা সে আমার জন্যে আলাদা খাওয়া, আলাদা শোবার ব্যবস্থা করে দিত। আমি খেতাম বাবা। এখনও হিন্দুর বাড়ি খাই—আবার কত হিন্দুও আমার বাড়ির রান্না খেয়ে তারিফ করে। বাবা চন্দনবাবু....হঠাৎ চন্দনের হাতদুটো ধরে ফেললেন হকসায়েব।...আপনাকে আমার বাড়ি খেতে হবে একবেলা। রাজী?

চন্দন বলল, ভাবছিলাম নিজেই বলব। বলুন, কবে খাওয়াচ্ছেন?

আজই হোক। খবর পাঠাই, কেমন! মোটে চার মাইল রাস্তা।...হকসায়েব উঠে দাঁড়ালেন।

চন্দন ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না। আরেক দিন হবে। বরং এক কাজ করুন না, আপনার ওই রাধার হোটেলেই ব্যবস্থা করে দিন। স্পেশাল ব্যবস্থা। মিলের ওপর হিসেব করে মাসকাবারে টাকা দেবে। এ হৃদয়রঞ্জন চক্কোত্তির রান্না আর সহ্য হচ্ছে না।

হকসায়েব বললেন, এক্ষুনি হয়ে যাবে। হৃদে ঠাকুর ফের শিশিরের গদীতে চলে যাক।

চন্দন দমে গিয়ে বলল, ওকে সেটা বলাই তো আমার পক্ষে মুশকিল। লোকটা এত ভক্তিটক্তি করে, মুখের ওপর ও-কথা বলিই বা কী করে?

সেটা ঠিক। হৃদয়ঠাকুর বড় মজার লোক। ঘোর গাঁজাখোর—দিনেরাতে সব-সময় 'বাঁশি'তে টান দিয়ে মৌতাত জমিয়ে রাখে। ঢুলুঢুলু চাউনি। তা বলে কাজের বেলা ভুলচুল বড় একটা হয় না। একটা বাদে—নুন-ঝালের ব্যাপারে তার হিসেবের গরমিল হয় দুবেলা। আর, আসল ব্যাপারটা টের পেয়েছে চন্দন। লোকটা রান্নাটান্না মোটেও জানে না। কেউ সে-কথা তুললে চোখ কপালে তুলে (ওটা তার অভ্যাস। যখন কারও সঙ্গে কথা বলে, তার দৃষ্টি আকাশে গিয়ে পড়ে এবং এইতে তাকে বেজায় রাগী মনে হয়।) হৃদয়ঠাকুর বলে, দ্যাখো হে, আখায় ফুঁ, শাঁখে ফুঁ, আর কানে ফুঁ—এই তিনটে ফুঁ হল আমাদের ইয়ে। বুঝলে কিনা? ওসব হেঁদো কথা আমাকে শুনিও না। আগুন জ্বললে যাবে, বলছি।...পরক্ষণে ফিক করে হেসে বলে, অবিশ্যি আরেকটা ফুঁ আমার আছে।

বোচুবাবু ধমক দিলে, হৃদয়ঠাকুর আড়ালে চোখ মুছতে মুছতে বলে, ভাবি তো পয়সা হয়েছে বেনের ছেলের! সান-বাঁধার বেনেগুষ্টির কীর্তি সবাই জানে! আর আমি হলাম গে গোকর্ণের অসীম প্রতাপশালী জমিদারের এক হতভাগা সন্তান। যা না গোকর্ণে। দেখে আয়, আমার বংশের কী ছিল। যা—চলে যা না! ফিরে এসে মুখ খুলিস শালা। চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। ওরে, আমার আগের পুরুষের প্রতাপে বাঘে গরু চরাত মাঠে। সে-খবর রাখিস?......

সেই হৃদয়ঠাকুর, রাতে যখন চন্দন হিসেবের কাগজ দেখছে, পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চন্দন বলে, কী ঠাকুরমশাই, মৌতাতের সময় গেল যে! এখনও বসে কী করছ?

আপনাকে দেখছি বাবা।

আমাকে? কেন বল তো?

অনেক প্রশ্নেও ব্যাপারটা ফাঁস করে না সে আপাতত। এ-কথা-সে-কথার এলোমেলো সুতো ছড়ায়। অবশেষে টের পায় চন্দন। কিছু পয়সাকড়ি চায় হৃদয়ঠাকুর। মেয়ের বাড়ি একবার যাওয়া দরকার। খালি হাতে যাওয়া ভাল দেখায় না। আর যাবেই বা কেমন করে? প্রাক্তন জমিদার-সন্তান!

হৃদয়ঠাকুরকে কথাটা নিজের মুখে বলতে পারবে না চন্দন। বেচুবাবুই বলুক। আজই বলে দিক। দুপুরে যা খাইয়েছে, দাম করতে পারলে বেঁচে যেত। তাই হকসায়েব এলে কথাটা তুলেছিল সে। হকসায়েব রাধার হোটেলের কথা বললেন। দেখা যাক না।

বিকেলটা আজ ফাঁকাই ছিল। ইন্দ্রাণী থেকে লোক এসে টাকা দিয়ে যাবার কথা ছিল। সে বেচুবাবু রইল। চন্দন বলল, বেচুবাবু, আমি আসছি। ওরা এলে আপনি একটু দেখবেন।

হকসায়েব বেচুবাবুর কানে ফিসফিস করে সম্ভবত হৃদয়ঘটিত ব্যাপারটার ফয়সালা করছিলেন এতক্ষণ। বেচুবাবু হাসতে হাসতে দুজনের উদ্দেশেই বলল, ঠিক আছে।

হকসায়েব বললেন, কই, চলুন চন্দনবাবু। আপনাকে জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে আসি।

কথাটা সাংকেতিক—কারণ, হৃদয়ঠাকুর তখন কাছাকাছি এসে পড়েছে। বারান্দার নিচে কয়লা ভাঙছিল একটা বাচ্চা ছেলে। ওদিক থেকে বারবার এসে তদারক করে যাচ্ছিল হৃদয়। এবার বারান্দায় বসে কয়লার টুকরোগুলো গম্ভীরমুখে পরখ করছে। করতে করতে বলল, ধুস্, শালা! করেছিস্ কী! এই রসগোল্লার মতো হবে —এই যে, এইটের মতো। হ্যাঁ। তবে না গনগন করে আঁচ ঠিকরে বেরোবে। সেদ্ধ হবে। বাবুদের পেটে রামরাবণের যুদ্ধ হবে না!

ছেলেটি খিকখিক করে হাসতে হাসতে কয়লা ভাঙছে। বোঝা যায়, অবেলায় বেশ মৌজে আছে হৃদয়। চাপা গুনগুন করে গান গাইছে। মনটা একটু কেমন করে উঠল চন্দনের। না—চাকরী যাচ্ছে না লোকটার। চন্দনের সঙ্গে সম্পর্কটা বোধহয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! চন্দনের স্বভাবের কানুনটা এই। পরিচয় বা জানাশোনা যত সামান্যতম থাক, সে তাকে চটাতে ভয় পায়।

বারান্দায় ওদের দেখে হৃদয় পা নাচাতে নাচাতে বলল, আজ স্যার রাত্তিরে ছানার ডালনা খাওয়াব।

চন্দন শুধু বলল, তাই নাকি! বেশ তো!

দুজনে চাপা হাসতে হাসতে রাস্তায় গিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর হকসায়েব বললেন, বাবা চন্দনবাবু, আপনি আমার ছেলের মতো। কিছুদিন থেকে একটা কথা বলিবলি ইচ্ছে করে, পারি নে। এখন বলব?

চন্দন একটুখানি দাঁড়িয়ে বিস্মিতভাবে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়।

আরো কিছুটা হাঁটার পর মুখ খুললেন হকসায়েব।...জানি না, বলাটা উচিত হবে কি না। কারণ, হাজার হোক, আমি আপনার পর—পরেশবাবু আপনার নিজের লোক। তাই—

ওঁকে থামতে দেখে চন্দন কৌতূহলী হয়ে বলল, কী বলুন না শুনি? পরেশদা... আমার খানিকটা নিজের লোক বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার সবদিকেই তফাৎ আছে।

হকসায়েব একটু হেসে বললেন, আন্দাজে—তা ধরতে পেরেছি বলেই তো কথাটা তুললাম। দেখুন বাবা, সেই যে কথায় বলে—'জেনেশুনে বিষ করেছি পান', আমার হয়েছে তাই। বাবা চন্দন, আপনি আমার ছেলে...চন্দনের হাত ধরে ফেললেন হকসায়েব।...কথাটা গোপন রাখবেন। আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—কোন সাতেপাঁচে থাকি নে। পৈতৃক জমি আছে খানিকটা। ওদিকে রেশম তাঁতের কারবার আছে গ্রামে। আমরা বাবা জোলার ছেলে। কোন ভড়ং না করাই ভালো। তা, কথাটা হচ্ছে—এই কোম্পানী। শিশিরবাবু আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল কান্দী স্কুলে। তবে তার কথায় নয়, পাণ্ডেজী আমার দোস্ত। পাণ্ডেজীর কথায় এদের সঙ্গে আমি একনৌকোয় পা দিলাম। কিন্তু বাবা, যত দিন যাচ্ছে, বুকে ভয় বাড়ছে। কী যেন একটা গণ্ডগোল চলছে কোথায়— অথচ ঠিক ধরতে পারছি নে। এরা কেউ ভেঙেচুরে কিছু বলতেও চায় না। এদিকে রাত্তিরে আমার ঘুম নেই।...

হঠাৎ কণ্ঠস্বর চাপা করলেন হকসায়েব।...জঙ্গীপুরের ওদিকে নৌকোডুবি হল। ভরা গঙ্গায় মালশুদ্ধ ট্রাক গেল তলিয়ে। শুনেছি, সেই মালের টাকা, ট্রাকের খেসারৎ পুরোপুরি ইনসিওরেন্স থেকে পাওয়া যাবে। এদিকে সে-রাতের যে মালগুলো এল...

চন্দন বলল, হুঁ। ভিজে ছিল সেগুলো।

তাহলে?

আমি কিন্তু কিছু বুঝিনি হকসায়েব। বিশ্বাস করুন।

আমি যেন বুঝেছি বাবা।

কী? কী বুঝেছেন?...চন্দনের চোখ জ্বলে উঠল এবার।

এরা নিজেরাই নৌকোর তলা ফাঁসিয়ে দ্যায়নি তো?

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল চন্দন। কিছুক্ষণ তার গলার ভিতর শুকিয়ে রইল। বুক ঢিপঢিপ করতে থাকল। তারপর সে সহজ হয়ে পা বাড়াল। বলল, তাতে আপনার কী? চলুন—পরেশদা খুব পাকা লোক।

হকসায়েবকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। চলতে চলতে বললেন, পাণ্ডেজীর কথায় আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি চন্দনবাবু। আমার সর্বস্ব বলতে পারেন।...

হোটেলের সাইনবোর্ডে লেখা আছে: রাধিকা হিন্দু হোটেল। রাধিকা বা রাধাকে দেখছিল চন্দন। বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয় নি—কিন্তু ত্রিশের বেশি তো বটেই। মোটাসোটা শ্যামবর্ণ মেয়েটি। মোটামুটি সুশ্রী চেহারা। চওড়া লাল নকসীপাড় সাদা ধবধবে তাঁতের শাড়ি পরণে। পানরাঙা লাল ঠোঁট—একটু স্থূল। কানে সাদা পাথর বসানো বেলকুঁড়ি, গলায় চেনের লকেটহার, হাতভরা সোনার চুড়ি। গিন্নীর ধরনে কাপড় পরা। আঁচলে চাবির গোছা ঝুলছে। ছোট্ট তক্তাপোষের ওপর শতরঞ্চি — তার ওপর একটা বাকসো। বাকসোর সামনে সে বসে চড়া গলায় হুকুম করছিল।...নেকি, বলি পাতাটা তুলবি না, তোকেই তুলে ফেলে দেব!...পরক্ষণে হাসি মুখে—রতন, রতনা রে! একবার যা না বাবা হারুবাবার গদীতে। সেই দুক্কুরবেলা পেঁয়াজের কথা বলে এল, আলু বলে এল—কোথা বা পেঁয়াজ, কোথা আলু! মিনসে ক্ষেতে হাঁটু গেড়ে আলু পেঁয়াজ তুলছে নাকি রে!...বসুন চাচা, বসুন। বাবু আপনিও বসুন।...মা সন্ধ্যা, অ সন্ধ্যামণি! কেটলি বসা উনুনে। আমার বাবা এয়েছেন।

তক্তাপোষে দুজনে বসে পড়ল। চন্দন চোখ বুলিয়ে নিল চারপাশে। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন বলা যায়। আসনগুলো চমৎকার। পিঁড়ি আছে, ছোট ছোট শেতলপাটি আছে, আবার গালিচা মতোও রয়েছে। বোঝা যায়, লোক অনুযায়ী আসনের ব্যবস্থা। কাঁচা ইঁটের দেয়ালে মাটির পলেস্তারা—তার ওপর চুনকাম করা হয়েছে। সবুজ রঙ। দেয়ালভরা অজস্র ক্যালেণ্ডার। দেবদেবীর বাঁধানো ছবি।

হকসায়েব বললেন, মা রাধিকে তোমার নতুন মাসকাবারি মক্কেল এনে দিলাম। কাল থেকে খাবেন। সদ্বংশের ছেলে— উচ্চ শিক্ষিত।

রাধা এক পলক চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সে আমি দেখেই বুঝেছি। বলি, সারা জীবন মা-গঙ্গার ঘাটের ধারে এমনি তো কাটিয়ে এলাম না গো! কত মানুষ দেখলাম—কত রকম রঙ, কত রকম ছিরিছাঁদ। ঘাট পেরিয়ে যায়, ঘাট পেরিয়ে আসে। আমি বসে-বসে দেখি।...অ সন্ধ্যা, দিলি জল চড়িয়ে?

ভিতর থেকে সাড়া এল—দিয়েছি পিসীমা। আর সেই সময় চন্দনের মাথার পিছনে আওয়াজ হল—কে এল গো, কে এল?

চন্দন চমকে উঠে মুখ ফেরাল। খাঁচায় একটা ময়না। বাঃ, বেশ তো! সে বলে উঠল, পাখিটা কথা বলে দেখছি। কদ্দিন পুষেছেন?

রাধা বলল, অনেক দিন। তা, আমাকে আপনি বলছেন কেন বাবু? রাধা জীবনে কখনও আপনি ডাক শোনে নাই। সবাই তাকে রাধা বলেই ডাকে—আপনিও তাই বলবেন।

হকসায়েব হেসে বললেন, রাধিকে মার কথা যাক গে, তাহলে দরদাম সব ঠিক করে নাও। আমি উঠব। ঘর যাব। মেয়েটার অসুখ।

রাধা বলল, কার অসুখ? ছোট, না বড়র গো?

বড় এখানে কোথা? ছোটর। মিলির। হকসায়েব উঠে দাঁড়ালেন।...

তা হ্যাঁ গা, আপনার বড়ছেলের খবর পাচ্ছেন-টাচ্ছেন আজকাল? শুনলাম, চিঠি-পত্র যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল! যুদ্ধটুদ্ধ বাধবে নাকি।...

হকসায়েব বললেন, ছেলেটা আমার দুষমন, গো। কী অভাব ছিল যে এদেশে পোষাল না—চলে গেল একেবারে মুলুক ছেড়ে বেমুলুকে! তুমিই বলো রাধা, আমার যা আছে—তা ও সারা জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেলেও কি ফুরুতো? কিন্তু শুনলে না। বললে, বড় চাকরী পাবে ওখানে। লেখাপড়া শিখল কি তাঁতের মাকু চালাবার জন্যে?...চলি মা। চন্দনবাবু, আসি।

রাধা হন্তদন্ত হয়ে উঠল।...ও সন্ধ্যে চাচা, চা বলেছি যে।

চা পরে একদিন খাবো।...বলে হক-সায়েব চলে গেলেন।

চন্দন দেখল, উনি রিকসো ডেকে চেপে চলে যাচ্ছেন। রিকসোটা চোখের আড়াল হলে সে কুণ্ঠিত মুখে বলল, থাক। চা খাব না। এক্ষুনি খেয়ে এলাম। কত কী লাগবে তাহলে?

রাধা কান করল না। ভিতরের দিকে এগিয়ে বলল, এখনও কেটলি চাপাস নি? ওরে মুখপুড়ি মেয়ে! দেখছ, দেখছ কাণ্ড?...বাবু, বসুন না একটুখানি। পরিচয় তো ভালমত হল না। বসুন বসুন।

একটু পরেই সে ভিতর থেকে চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে এল। নিজের জায়গায় বসে মিষ্টি হেসে বলল, এসেছেন কোথায়? কী করা হয়? আগে কোথায় ছিলেন বাবু?

চন্দন বলল, জিয়াগঞ্জে বাড়ি। এখানে—

এটুকু শুনেই রাধা লাফিয়ে উঠল।.. জিয়াগঞ্জ! বাবু আমি জিয়াগঞ্জের মেয়ে।

তাই নাকি! কোন পাড়ায় বাড়ি ছিল?

রাধা একটু হাসল। কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে। বলল, সে মনে নেই। তিন বছরের মেয়ের সেকথা কি মনে থাকে বাবু? কলকাতায় নিয়ে গেল মা। কলকাতা ছাড়লাম, তখন আমার বয়স আর কত হবে? বারো-তেরর বেশি নয়। মা মারা গেল, কেউ রইল না মাথার ওপর। এক দূর সম্পর্কের দাদা খবর পেয়ে উদ্ধার করলো নরক থেকে।

চন্দন ওর মুখে নরক শব্দটা শুনে মুখ তুলে তাকাল। রাধা সামনের পথটা দেখছে। স্থির দৃষ্টি।

...দাদা আনলে বহরমপুরে ঘাটে। রাধার ঘাটে। রাধা এসে বসল রাধার ঘাটে। সে অনেক কথা বাবু। দুঃখের দিন কেউ মনে আনতে চায় না—ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। তবু দুঃখের দিনগুলোই মনে পাকাপাকি বেঁচে থাকে। সুখের কথা চেষ্টা করেও মনে পড়ে না। তাই না বাবু?

চন্দন মাথা দোলাল।

যাকগে। এখানে কী করছেন এখন?

এই হকসায়েবদের নতুন কোম্পানীতে ম্যানেজার হয়ে এসেছি।

ওমা! তাই বলুন!

পরেশ মজুমদারকে চেনেন?

রাধা রহস্যময় ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল, খুব চিনি।

উনিও জিয়াগঞ্জের লোক।

ও মা, আমার কী হবে!...রাধা অকারণ খুশিতে ফেটে পড়ল—নাকি সবটাই তার অভিনয়!...তা, পরেশবাবু কেউ হন বুঝি?

হ্যাঁ, দূর সম্পর্কের দাদা। ইচ্ছে করেই এই মিথ্যেটা বলল চন্দন। কিন্তু এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

রাধা বলল, তাহলে তো আর কথাই নেই। আসুন কাল থেকে। কটা নাগাদ আসবেন, বলুন। দরের জন্যে কথা নেই। পরেশবাবু যা বলে দেবেন, তাই হবে। ওরে বাবা, আপনার মতো বাঁধা মানুষ পাওয়া আমার ভাগ্যি, বাবু।...ও সন্ধ্যে রতনা এল রে?...

রাস্তায় আসতেই একেবারে হৃদয়-ঠাকুরের মুখোমুখি। তার হাতে তেলের বোতল, একটা পেতলের সরা। দাঁড়িয়ে আছে একেবারে মুণ্ডহীন এককাণ্ড গাছের মত। অনড়। স্পন্দনহীন। চন্দন বলল, কী ঠাকুর! এখানে কী করছ?

হৃদয়ঠাকুর দুপা এগিয়ে যথারীতি আকাশে চোখ তুলে, ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওই বেশ্যামাগীর ওখানে গিয়েছিলেন! ছিঃ! ছিঃ! থুঃ! ওই রাধার ঘাটের পচা মড়া খানকি! স্যার, আপনার ইজ্জত গেছে। হুঁ-উ—আর নেই।

চন্দনের একটু ধমক দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু দিল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল, বেচুবাবু থাকলে বলো আমি পরেশদার বাড়ি গেছি।

চন্দনের পথ আটকে হৃদয় বলল, জানেন? ও মাগী ভাতারকে বিষ দিয়ে মেরেছিল? হাজতে গিয়েছিল? ঘাটের হোটেল উঠে গিয়েছিল ক'মাসের জন্যে—সে-খবর রাখেন? জানেন, ও এখন শঙ্কর ড্রাইভারের রাখনি (রক্ষিতা)?

চন্দন বিরক্ত হয়ে বলল, ঠাকুর—নিজের কাজে যাও।

সে এগিয়ে গেল হনহন করে। মনে হল, এসব কথার মূলে সত্যতা যাই থাক, তার সামনে এমনি করে বলাটা লোকটার স্পর্ধা ছাড়া কিছু নয়। পিছনে তখনও হৃদয় ঘোঁত ঘোঁত করছে।...

দরজা খুলে দিল লতু। চন্দন বলল, তোমার মা কেমন আছে?

লতু শুধু হাসল। বারান্দা থেকে স্নেহধারা বলল, ওর মাকে তো বিশ্বশুদ্ধ নির্বাসন দিয়েছিল—বাকি ছিলে তুমি। তুমিও দিলে।...পরক্ষণে হাসল সে।...এস। রুমা কই?

চন্দন বলল, রুমা কই, আমি কেমন করে জানব?

স্নেহধারা বলল, বারে! তাকেই তো পাঠিয়েছি তোমাকে ডাকতে। দেখা হয়নি?

(ক্রমশঃ)

নবাবী আমলে ভূমি-রাজস্ব

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

মোগল বাদশা আকবরের আমলে তাঁর প্রধান রাজস্বসচিব টোডরমল্লের বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদার হতেন এমন এক ব্যক্তি যিনি রাজ্যের পরগণা বা চাকলার অধীন নিয়মিত রাজস্ব বা করদানের ভিত্তিতে সরকারের প্রতি আনুগত্যের সর্তে পুরুষানুক্রমে কোন জমি বা ভূখণ্ড ভোগ-দখল করতেন। জমিদারী হত এই রকম কোন ব্যক্তির নামে সরকারী নথিভুক্ত কোন জমির বন্দোবস্ত। ঐতিহাসিক স্যার জন শোর-এর লেখায় এই জমিদার ও তার প্রজা, তথা জমিদার ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সঠিক সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া যায়— জমিদার ও দেশের সরকার তথা জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক হচ্ছে এমন এক ব্যাপার যা ঠিক মালিক ও তার ভৃত্যের সম্পর্ক নয়, অথচ বস্তুত এই উভয় সম্পর্কেরই মিশ্রণ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদন করে থাকেন যদিও, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানার কোন সংশ্রব নেই। দ্বিতীয়োক্ত জনের অধিকার থাকলেও তা আসল সম্পত্তির মালিকানার অধিকার নয়, একের সম্পত্তি ও অন্যের অধিকার বিশেষ বিচার বিবেচনার দ্বারা নিরূপিত হত।

মোগল আমলে জমিদারী ব্যবস্থা বর্তমান ছিল 'খালসা' ও 'জাগির' জমিতে। এই ব্যবস্থা ফৌজদারী জমিতেও বিদ্যমান ছিল। যখন কোন নতুন ভূভাগ রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হত, তখন নতুন করে জমি জরিপ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা হত। বাংলার নায়েব নাজিম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আমলেও এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। পরবর্তী নবাব শুজা-উদ-দিনের শাসনকালে পূর্ববর্তী দশ বছরের রাজস্ব সংগ্রহের এক সামগ্রিক হিসাবনিকাশ নেবারও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সে সময় কেবলমাত্র যেসব জমিতে খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদন হত, শুধু সেগুলিতে কর ধার্য হত।

মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আমলে লক্ষ্য করা যায় ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির এক সাধারণ প্রবণতা। রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি অবশ্য ছিল—অত্যন্ত ক্রূর ও নির্মম। কৃষক-সমাজের নির্দয় নিষ্পেষণ ও ঠিকেদার রাজস্ব সংগ্রাহক কর্তৃক অমানুবিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাধ্যমেই প্রায়—বেশীর ভাগ রাজস্ব আদায় হত। এই কারণেই ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তরে স্বয়ং নবাব রাজস্ব আদায়ের জন্য যে চাপ সৃষ্টি করতেন স্বাভাবিক নিয়মেই তাই গিয়ে মধ্যবর্তী আমলাদের ক্রমনিম্ন স্তর পেরিয়ে বাড়তে বাড়তে শেষ অবধি পড়ত গিয়ে প্রকৃত কৃষিজীবীদের উপর যাদের বাড়তি রাজস্ব দিয়ে শেষ অবধি সম্বল থাকত গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণমাত্র : এই নিম্নতম সম্বলের বাইরে প্রতিকারে সাম্বৎসরিক যা কিছু বাড়তি উৎপাদন হত কৃষিক্ষেত্র বা তাঁতশালা থেকে তা সবই সংগৃহীত হত রাষ্ট্রপ্রধানের কোষাগারে।

নবাব সুজাউদ্দিন ও নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের আমলে রাজস্ব আদায়ের এই কঠোরতা হ্রাস করা হয় যার পরিণতি হল 'দক্ষতার অপসরণ'। নবাব মুর্শিদকুলি যে ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন পুরোপুরি 'নিশ্চিত ও সুরক্ষিত' পন্থার পক্ষপাতী, সে ক্ষেত্রে শুজা-উদ-দিন ও আলিবর্দির অভিমত ছিল ভিন্ন। ফলে, মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আমলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব দেখা দিয়েছিল পরবর্তীকালে। বিশেষ করে আলিবর্দির আমলের লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, 'আগের বছরের প্রায় ছ-সাত লাখ টাকার বকেয়া রাজস্ব থলে ভর্তি করে নবাবের সামনে উপস্থিত করা হত। যদি এ সত্ত্বেও 'আমিন' ও জমিদারদের দরুন কোন বকেয়া পাওনা থেকে যেত তবে 'জগৎ শেঠ' উপাধিধারী দেশের প্রধান তেজারতি কারবারী বা ব্যাঙ্কার, সেই দেয় অর্থ পরিশোধের লিখিত অঙ্গীকারপত্র পেশ করতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাড়তি রাজস্ব আদায়ের উপায়স্বরূপ জমিদারদের উপর আবওয়াব বসিয়েছিলেন। এই আবওয়াব ছিল জমিদারদের নবাবকে প্রদেয় এক স্থায়ী অর্থ রাজস্ব। অবশ্য এই আদায়ের পরিমাণ ছিল নগণ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন শুজা-উদ-দিন ও আলিবর্দি নতুন করে কয়েকটি আবওয়াব বসালেন তখন তার পরিমাণ দাঁড়াল নেহাৎ কম নয়। অপরদিকে জমিদারেরাও প্রজাদের উপর এই বাড়তি আবওয়াবের দরুন নতুন কয়েকটি আবওয়াব ধার্য করলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ, শুজা-উদ-দিন ও আলিবর্দির আমলে 'জমমার' ব্যাপারে খুব কঠোরতা পালন করা হত। আমিলেরা সাধারণত জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। সামরিক কর্মচারিগণের উপর রাজ্য সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। নব-নিযুক্ত 'আমিল'দের কানুনগো নামধারী জমিজরিপ সংক্রান্ত কর্মচারীদের দপ্তরে রাজস্ব সংক্রান্ত সংগৃহীত খবরাখবর দাখিল করতে হত। কাননুগোদের এই দপ্তরগুলি ছিল প্রায় স্থায়ী আমানতখানা। বিক্রয় কোবালা হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ও বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ দ্বারা এই দপ্তর সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় রাখতে সাহায্য করত। এই বিভাগের কর্মচারিবৃন্দের ভূমিকা ছিল কতকটা দলিললেখক বা নথি-প্রস্তুতকারকের। সরকারী প্রশাসনের এই প্রশাখা ছিল একাধারে সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকারপত্র বা 'সনদ', দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্রের আকর, অন্যধারে সম্পত্তি ও জন রাজস্ব সম্পর্কিত কাজ কারবার ও ব্যবসায়ের রীতিনীতি ও আইন-কানুন নির্দেশক।

উত্তরাধিকারের যথার্থতা নির্ণয় ছিল তখন এক জটিল সমস্যা। তখন জমিদার ছিল বিভিন্ন রকমের। কতক জমিদারী ছিল মুসলমান যুগের পূর্ববর্তী সময়ের। এই-সব জমিদারদের পূর্বপুরুষগণ বিজেতা মুসলমান শাসকদের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করে নেন ও তাদের নিয়মিত কর দানের অঙ্গীকারের বিনিময়ে তাদের জমিদারীতে আগের মতই বহাল থেকে যান। দ্বিতীয় প্রকারের জমিদার হতেন তাঁরা যাঁরা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি-শূন্য পতিতজমি উদ্ধার করে, চাষাবাদ ও কৃষি বাণিজ্যের প্রচলন করে বসতি বিস্তার করেন। এদের বলা হত জঙ্গল-তোড়। তৃতীয় রকমের ভূস্বামী হতেন তাঁরা যাঁরা অর্থের বিনিময়ে জমিদারী অন্যের কাছ থেকে কিনে নিতেন বা বন্দোবস্ত নিতেন। এছাড়াও আরও একজাতের জমির মালিক হতেন তাঁরা যাঁদের বিনা-মূল্যে পুরস্কারস্বরূপ বা বদান্যতার কারণে নিষ্কর ভূমি দান করা হত।

উপরোক্ত চার প্রকার ছাড়াও আর এক রকমের জমিদার যাঁদের বলা হত 'সনদী জমিদার'। এদের ছিল নিম্নোক্ত শ্রেণী বিভাগ, যথা—

দেশের রাজা কোন ব্যক্তিকে কতক পরিমাণ পতিত জঙ্গলা জমি মঞ্জুর করতেন এই সর্তে যে সেই জমি উদ্ধার করে চাষা-

খাদ ও বসবাসোপযোগী করে তুলবার পরে সরকারকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করবে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, রাজা বা শাসক কর্তৃপক্ষ যখন কোন ভোগ দখলকারী জমিদারকে বিনা দোষে ও বিনা কারণে উৎখাত করে অন্য কোন ব্যক্তিকে সেই জমিদারীর সনদ দান করতেন। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে যখন কোন জমিদার মারা যাবার পর কোন ব্যক্তি রাজার কাছে এই মর্মে আবেদন করে যে মৃত জমিদারের কোন ওয়ারীশান নেই অতএব আবেদনকারীকে সেই মৃত জমিদারের তরফে জমিদারী কার্য চালাবার সনন্দ দেওয়া হোক, দরকার হলে কয়েক পুরুষাবধিও যতদিন না প্রাক্তন জমিদারের যথার্থ কোন উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব ঘটে। এবং এর ফলে যদি আবেদনকারী উক্ত রূপে সনন্দ লাভ করে। চতুর্থ ধরনের জমিদারী হচ্ছে সেই রকম যখন কোন প্রধান বড় জমিদার অন্য ছোটখাট জমিদারের জমিদারী বা ভূমিখণ্ড গায়ের জোরে অন্যায়ভাবে দখল করে পরে রাজা বা শাসনকর্তার কাছ থেকে রাজাকে মোটা 'নজরানার' বিনিময়ে সেই জমি নিজ ভোগদখলে রাখবার সনন্দ বা অধিকারপত্র সংগ্রহ করে। পঞ্চম প্রকারের জমিদারী হচ্ছে সেই রকম যখন কোন জমিদার কোন উত্তরাধিকার না রেখে মারা যায় তখন রাজা যদি কিছু সময় সেই জমিদারী 'খাস' অর্থাৎ নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে পরে উপযুক্ত নজরানার বিনিময়ে তা অন্যকে মঞ্জুর করেন।

পূর্বে উল্লিখিত প্রথমোক্ত চার রকমের জমিদারী ও দ্বিতীয়োক্ত পাঁচ রকমের সনন্দী জমিদারীর প্রথমটির ব্যাপারে রাজা বা নবাবের একমাত্র লক্ষ্য তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব আদায়। অন্য ব্যাপারে জমিদারই জমির সর্বেসর্বা ও খোদ মালিক।

সনন্দী জমিদারীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে বর্ণিত জমিদারী আসলে এক রকমের সরকারী চাকুরী বিশেষ। আদি জমিদারের কোন উত্তরাধিকারীর আবির্ভাবে ও জমিদারীর উপরে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠায় রাজা বা তাঁর নায়েব অর্থাৎ তাঁর প্রতিভূর কাজ হবে তাকে তার অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু যদি শেষাবধি আদি জমিদারের কোন উত্তরাধিকারী না পাওয়া যায় তবে তা রাজা বা নবাবের খাস হয়ে যাবে।

পঞ্চম পর্যায়ে বর্ণিত জমিদারী আসলে একটি অস্থায়ী শাসনকর্তার পদ ছাড়া আর কিছুই নয় যা নবাব বাহাদুর যাকে খুশী ইচ্ছেমত দিতে পারেন। কিন্তু শাসকপ্রধান বা নবাবের প্রধান কর্তব্য বিচারবিধির সুষ্ঠু প্রয়োগ কাজেই, তার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ স্থিতি বজায় রাখা ও প্রজা সাধারণের মধ্যে তার শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে—যখনই তিনি কাউকে জমিদারীর সনন্দ দান করতেন তখন তার লক্ষ্য থাকত তার আদেশের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও কার্যকারিতার উপর। অর্থাৎ তাঁর আদেশ যাতে সহজে সামান্য কারণে নড়চড় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। শাসকপ্রধান যেহেতু রাজ্যের চূড়ান্ত বিচারক, সেইহেতু তার আদেশ সামান্য কারণে ঘন ঘন হেরফের বা রদবদল হওয়ার পরিণতি—জনগণের মনে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে আস্থা ও কতকটা অবজ্ঞার ভাব জন্মানো। আবার, যতক্ষণ জমিদারের কোন উত্তরাধিকার অবশিষ্ট থাকছে, এমন কি তারা যদি পুরুষানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরেও জমিদারীর সাক্ষাৎ দখলদার নাও থাকেন তবুও সেই জমিদারী রাজা বা শাসকপ্রধানের সম্পত্তি বলে গণ্য হতে পারত না। কুর-আনের আইনেও তার ঐ সম্পত্তির উপর শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও কর গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন অধিকার বর্তায় না। অবশ্য যখন কোন জমিদার কোন রকম উত্তরাধিকারশূন্য অবস্থায় মারা যেতেন তখন তার সম্পত্তি সরকারের খাস হত।

জমিদার কর্তৃক তার ভূসম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক রাখার ব্যাপারে কানুনগোদের নির্দেশে, সরকারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় ছিল। বাদশা ফাররুখ সিয়ার কর্তৃক বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পূর্বদেশে অবাধ বাণিজ্য অধিকার দান সংক্রান্ত বাদশাহী নির্দেশনামা বা ফারমাণে উল্লেখ আছে, যে ইংরেজগণ কলকাতা ও তার চারপাশে স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে আটত্রিশখানা গ্রাম কিনতে পারবে এবং বাংলার 'দিওয়ান' এই খরিদে তার অনুমোদন দান করবে। ঐতিহাসিক বারওয়েল মন্তব্য করেন, 'সারা প্রদেশগুলিতে জমি কেনা বা মঞ্জুর শাসনকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই বেশীর ভাগ সম্পন্ন হত। তথাপি সম্পত্তি হস্তান্তরে, বিশেষ করে বড় কোন সম্পত্তির ব্যাপারে শাসকের অনুমোদন এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে কার্যত তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করা হত এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই আমার বিশ্বাস তা পাওয়াও যেত। মোগল শাসকেরা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের দ্বারা জমিদার বা জমির মালিককে অযথা সম্পত্তির অধিকার থেকে উৎখাত করার দৃষ্টান্ত বিরল। শুধু যখন ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ২৪ পরগণার জমিদারীর অধিকার দেওয়া হয় তখনই 'পুরোনো জমিদারদের উচ্ছেদ করা হয়।' আবার যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করল তখন এই সব জমিদারদের স্ব-সম্পত্তিতে পুনঃ প্রবর্তন করার ব্যাপারটিও হয়ে দাঁড়াল সম্ভবত খুব স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত কর্তব্য। এর দ্বারাই, নতুন শাসনব্যবস্থায় যে সুসংগতি ও সমদর্শিতার নীতি অনুসৃত হচ্ছিল বলে দাবী, তার প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল।

নতুন জমিদারের অভিষেক পদ্ধতি ছিল এই রকম। যখন কোন জমিদার মারা যেতেন, তার আইনসম্মত উত্তরাধিকারী 'দিওয়ান' ও 'রায় রায়ানকে' জানিয়ে দিতেন সে খবর। মৃত জমিদার যদি হতেন প্রথম পর্যায়ভুক্ত তবে সুবেদারকেই সরাসরি জানানো হত এ সংবাদ। সুবেদার এই মৃত্যুতে তার শোকবার্তা প্রেরণ করতেন ও সেইসঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রেণীর জমিদার স্থলাভিষিক্তকে পাঠাতেন সম্মানসূচক 'জোব্বা' ও দ্বিতীয়োক্তকে উপহার পাঠাতেন 'শাল'। জমিদারদের নাবালক উত্তরাধিকারীগণ এই জোব্বা ও শাল পেতেন তার অভিভাবক বা প্রতিনিধি মারফৎ। দ্বিতীয় পর্যায়ের জমিদারেরা পেতেন শুধু একজোড়া করে শাল ও শোকজ্ঞাপক পরওয়ানা।

জমিদারগণের যখন সরকারের প্রদেয় খাজনা অনাদায়ে বাকী পড়ত তখন তাঁরা সাধারণতঃ স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে জমিদারীর অংশবিশেষ বেচে দিতে চেষ্টা করতেন। এসবের ক্রেতাও হতেন অন্য জমিদারেরাই। এইভাবে বড় বড় জমিদারী ভেঙ্গে গিয়ে অনেক সময় আলাদা ছোট ছোট 'তালুক'-এর উদ্ভব হত। অনেক সময় জমিদারের জমিদারীর মধ্যেই থাকত কয়েকজন তালুকদার। তালুকদারও হত কয়েক রকমের। যেমন প্রথমত কোন জমিদার নবাব বা বাদশার কাছ থেকে কোন পতিত ও অকর্ষিত ভূখণ্ডের জন্য একটি সনন্দ সংগ্রহ করে তা কয়েকজন ব্যক্তির কাছে তালুকদারী পাট্টায় বন্দোবস্ত দিলেন। এই জমি জরিপে উল্লিখিত নয় বা এর জন্য কোন মালিকও পূর্বনির্দিষ্ট ছিল না। এই তালুকদারগণ নিজেদের চেষ্টায়, অর্থব্যয়ে জমিকে চাষ আবাদ ও বসবাসযোগ্য করে তুলতেন ও জমিদারকে এর দরুন কর দিতেন। এক্ষেত্রে জমিদার তালুকদারদের কাছ থেকে শুধু রাজস্বই লাভ করতেন জমির আসল মালিক হতেন তালুকদার এবং তিনি তা দান বা বিক্রিও করতে পারতেন।

দ্বিতীয়ত, যখন কোন তালুকদার বা জমিদার তার জমিদারীর মধ্যে তার সম্পত্তির অংশের উত্তরাধিকার অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতেন, তখন ক্রেতাই হতেন জমির মালিক ও সেই জমি দান ও বিক্রয়ের অধিকারী, জমিদাররা ও সার্বভৌম শাসক হতেন শুধু রাজস্ব পাবার অধিকারী।

তৃতীয়ত, যখন জমিদার কাউকে নির্দিষ্ট কর দানের বিনিময়ে জমি জিরাৎ দান-বিক্রয় করতেন তখন সেই তালুকদার হতেন জমির মালিক ও দান-বিক্রয়ের অধিকারী, কিন্তু জমিদার শুধু হতেন রাজস্বের অধিকারী।

চতুর্থত, কোন জমিদার যখন এমন কোন জমির দরুন কাউকে তালুকদারী পাট্টা মঞ্জুর করতেন যে জমিতে পূর্বে চাষাবাদ হত তবে সে ক্ষেত্রে যদি পাট্টাতে দান-বিক্রয়ের অধিকারী এই কথাগুলো লেখা থাকত তবেই তালুকদার হতেন সে ক্ষমতায় ক্ষমতাবান, কিন্তু যদি সেসব কথা পাট্টাতে উল্লিখিত না থাকত তবে তালুকদারের সে জমি দান বিক্রয়ের অধিকার থাকত না।

বড় ও ছোট পর্যায়ের জমিদারের পরস্পরের পার্থক্যটা ছিল শুধু মাত্রাগত, প্রকারগত নয়। মুর্শিদকুলি খাঁ শুজা-উদ-দিন ও আলিবর্দি খাঁয়ের আমলে অবশ্য ছোট পর্যায়ের জমিদারেরা দেওয়ানি সনদ লাভ করতেন না।

তৎকালীন জমিদারদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, তারা প্রধানত ভূমি-রাজস্ব আদায় ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য দায়ী ছিলেন। তাদেরকে রহুম ও রোকরও আদায় করতে হত। তাদেরকে নদীর বাঁধ মেরামত করতে হত। এই উদ্দেশ্যে 'মাথোট' বা মাথাপিছু কর আদায় করা হত, নির্মাণ বা উন্নয়নকার্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য। জনৈক ঐতিহাসিকের মন্তব্য—'পুলবন্দি'র ব্যাপারে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত জমিদারী বিধিতে, অন্য যেকোন চুক্তি বা শাসন প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের পদ্ধতির চেয়ে বেশী প্রীতিপ্রদ ও সহজসাধ্য ছিল। সাধারণভাবে জমিদারগণ তাদের এলাকায় সংঘটিত দস্যুতা ও রাহা-জানির জন্য দায়ভাগী হতেন। অর্থাৎ দস্যুতা চৌর্যবৃত্তি দমন না করতে পারলে তাদের ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত। কোন কোন অঞ্চল, যেমন বর্ধমানে কিছু নিম্নপদস্থ সরকারী আমলা রাখা হত যাদের বলা হত বকসী, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসনভার গ্রহণ করল তখন তার সামনে দেখা দিল ফৌজদারী শাসন ব্যবস্থার সমস্যা ও অসুবিধাগুলি। সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল মন্তব্য করেন যে, জমির দখলকারীকে শাসন কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব দানের ধারণাটার উদ্ভব হয়েছিল অতীতের মুসলমান শাসনের আমলে বাংলা-দেশের পুলিশী ব্যবস্থা থেকে ; যেহেতু কোন বিধি প্রয়োগে সাফল্যই হচ্ছে রাজ-নৈতিক ব্যবস্থাপনার সার্থকতার সাধারণ মাপকাঠি, তাই যে পদ্ধতি এককালে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পূর্ণোদ্যমে সাহায্য করেছিল সেই পদ্ধতিকেই নিঃসন্দেহে উপযুক্ত জ্ঞানে গ্রহণ করা হয়ে-ছিল ততদিন যতদিন দেশে পরিস্থিতি ছিল অপরিবর্তিত।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস লেখেন—আমি ধারণা করতে পারি না যে কোন সরকার সজ্ঞানে তার কোন প্রজার হাতে কখনও দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে খুশী-মত কর ধার্য করার ক্ষমতা তুলে দিতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে একটা অপপ্রথা যা হয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ও নিরুৎ-সাহী মোগলশাসকদের তাচ্ছিল্য থেকে উদ্ভব হয়েছে নয়ত খুব সম্ভব নির্দয় অর্থ-গৃধ্নু ও মুসলমান আমিনদের পরোক্ষ উৎসাহ ও সহায়তা থেকে। এরা জমিদারদের প্রজা শোষণে পরোক্ষ উৎসাহ দিত নিজেরা পরে তাদের শোষণ করবে বলে। এখন আমাদের পক্ষে অবশ্য নিশ্চিত করে ধারণা করা সম্ভব নয় সঠিক কখন এই সুবিধাটা জমিদারদের দেওয়া হয়েছিল। এই কুপ্রথাই খুলে দিয়েছিল অন্যান্য আরও অনেক দুর্নীতি ও অনাচারের রাস্তা।

মুর্শিদকুলি খাঁয়ের শাসনকালে আকবরের সময়কার অনেক পুরানো শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে পুনর্গঠিত করা হয়। যথা, বাংলার ১৬৬০ পরগণাকে ভাগ করা হয় ফৌজদার বা আমিন-এর অধীনে ১৩টি চাকলায়। বস্তুত মুর্শিদকুলি খাঁ ভূমি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সমস্যার সহজ-তর সমাধান চেয়েছিলেন। এর আরও উদ্দেশ্য ছিল বড় জমিদারদের অবাঞ্ছিত প্রভাব প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক অনাচার ও কুপ্রথা দূর করা। কোন বড় জমিদারীকে অবশ্য পরিচালনা করতে হত চাকলার মাধ্যমে। ইতিমধ্যে ছোট জমিদারীগুলি কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমরা আগেই বলেছি, মুর্শিদকুলি বড় জমিদারীর সৃষ্টি করেছিলেন প্রধানত ভূমি রাজস্ব আদায় সমস্যার সমাধান করবার জন্য।

এই প্রসঙ্গে সাধারণ প্রজা ও রায়তদের অবস্থাও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। যতদিন প্রজা তার বাৎসরিক খাজনা দিতে সক্ষম থাকত ততদিন তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলত না। এই দিক দিয়ে অন্তত সে কিছুটা নিরাপদ ছিল। পরবর্তী যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেকটারের মন্তব্য করেন—এটা একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত যে জমির সাক্ষাৎ চাষ-বাসকারী যে নিয়মিত খাজনা দেয় তাকে জমি থেকে উৎখাত করা চলবে না যতক্ষণ সে জমি দখল করে থাকবে। এর দ্বারা স্বভাবতই বোঝা যায় যে, যে খাজনা নির্ধা-রণের জন্য কোন পন্থা ও সীমানা নির্দিষ্ট ছিল এবং এই ব্যবস্থাটা শুধুমাত্র জমিদার-দের খেয়ালখুশীর উপরই নির্ভর করত না, অন্যথা এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা হত নিরর্থক।

স্যর জন শোর-এর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের লিখিত বিবরণে নবাবী আমলের জমিদারী প্রথার অন্যায় ও অনাচারগুলি প্রকাশ পায়। স্যার জনের ভাষায়, 'প্রবঞ্চকতা ও তছরুপ, অস্থায়ী সাময়িক চুক্তি, আপোষে সরকারী পাওনা হ্রাস করানোর কারচুপি, মকুব, কাটা, বাড়ানো, কাল্পনিক হিসাব-নিকাশ ও হিসাবে কাটাকুটি—বাড়ানো কমানো কার-সাজি।'

জমিদার ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক আইন-গত সম্পর্কের ব্যাপারে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী ভ্রম ও প্রমাদযুক্ত মতামত পাওয়া যায়।

ডাঃ এ কে সিনহা এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন যে, মুঘল ভারতে দখলীস্বত্ব ভূমিরাজস্ব পরিস্থিতি বৃটিশ-ভারত থেকে এতই ভিন্ন ছিল যে, ইংলণ্ডে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে কোন রকম তুলনা করতে বা মিল বের করবার চেষ্টাটাই একটা ভুল। মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় কানুনগো বা সরকারী নথি প্রস্তুতকারকের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা ইংলণ্ডের ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে না। অন্যদিকে ইতিহাসকার জেমস গ্রান্ট যে জমিদারদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—এরা বাৎসরিক ঠিকার চাষাবাদকারী—সেকথাও আদৌ ঠিক নয়।

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

তেইশ

পরদিন সন্ধ্যায় যথাস্থানে আঙিনায়। গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে স্বামীজী বললেন—তারপর?

—আগুন জ্বলছে—এবার নেভানোর কথা, বাবা।

—কে বললে নেভানোর কথা? ধমকের সুরেই বললেন স্বামীজী—এ আগুন কি যা তা? এ হল মহাযজ্ঞের আহিতাগ্নি। সমিধ আর হবি দিয়ে অনির্বাণ রাখতে হয়। পূর্ণাহুতি না পেলে নির্বাণ নাই এর।

থতমত খেয়ে একেবারে চুপ। একটু পরে ধীরে ধীরে বললুম—তা যজ্ঞবেদীটা হল কোথায়? সমিধ্ হবিই বা যোগাড় হল কোত্থেকে? আর এ মহাযজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক, উদ্গাতাই বা হলেন কে?

ঠোঁট কামড়ে ভ্রূ কুঁচকে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামিজী বললেন—দুষ্টু তো কম নয়। এইটুকু ছেলে রূপকের রূপ ভাঙতে ওস্তাদ! তারপর হেসে হেসে বললেন—শোন তবে। সব হবে একে একে। আগে প্রয়োজন, তারপর আয়োজন, তবে তো কর্ম আরম্ভ। প্রয়োজনটা শুনেছ, এবার আয়োজন।

কদিন দুজনেরই কাটল দারুন অস্থিরতার মধ্যে। বাইরে নয়, ভেতরে—যাকে বলে—অন্তর্দাহ। দারুন অস্বস্তির মধ্যে অরবিন্দদা বললেন—

—কী করা যায় বলুন তো, দাদা।

বছর পাঁচেকের ছোট হলেও আদর করেই অরবিন্দদা বলতেন—'দাদা'। এ পক্ষ থেকেও অগ্রজের আসনেই বসানো হয়েছিল তাঁকে।

বলা হল—মহারাষ্ট্র জেগেছে। তিলক হয়েছেন—মহারাষ্ট্র ললাট তিলক। পুণায় ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতি, চাপেকার ভাইদের 'হিন্দুধর্ম সঙ্ঘ' আর লোকমান্য তিলকের যুক্তি ও পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের একান্ত দরকার। তারপর ঠিক করা যাবে নিজেদের পথ।

যোগাযোগ চলল বেশ অন্তরঙ্গতার সঙ্গেই। হওয়া গেল গুপ্ত সমিতির সভ্য। অল্পদিনের মধ্যেই সভ্য থেকে গুপ্ত সমিতির সভাপতি হলেন—অরবিন্দদা। ১৮৯৬ সালেই হবে বোধহয়। বছর খানেক পরেই তিলকের আদেশে 'গুপ্ত সমিতি' 'হিন্দুধর্ম সঙ্ঘ' আর বরোদার 'তরুণ সঙ্ঘ' মিলে হল এক। গুণগ্রাহী মহামতি তিলকের নির্দেশে ঐ মিলিত সঙ্ঘের সভাপতি হলেন অরবিন্দ দা ১৮৯৭ সালে। আর বাকি থাকে কিছু—সবিস্তারে জানা গেল সব। সব সঙ্ঘেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক—সশস্ত্র বিপ্লব, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা।

পরণে গেরুয়া হাতে দণ্ড শ্রীমৎস্বামী নিরালম্ব

শিক্ষাদীক্ষা যা কিছু হবার হল, এইবার নিজেদের পালা।

শুধু মহারাষ্ট্র জাগলেই তো হবে না—জাগাতে হবে সমস্ত দেশকে—সারা ভারতকে। দিকে দিকে গড়ে তুলতে হবে—সঙ্ঘ—সমিতি—আলোচনা-চক্র। 'আনন্দমঠের' সন্তান করেই গড়ে তুলতে হবে দেশের ছেলেদের। সন্তানদের মতই দমন করবে তারা অত্যাচারীর অত্যাচার। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বলে বলীয়ান করে গড়ে তুলতে হবে তাদের। শেখাতে হবে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধবিদ্যা, আক্রমণ ও প্রতি-রক্ষার কলাকৌশল। দিতে হবে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা—মন্ত্র হবে 'বন্দেমাতরম্'। পায়ের বেড়ী ভেঙে ভারতমাতার গলায় পরাতে একতা সুতোয় গাঁথতে হবে অম্লান পঙ্কজ মালা, চরণে দিতে হবে রক্তজবার অঞ্জলি।

সব ঠিকঠাক। যজ্ঞবেদীটা স্থাপনা করা যায় কোথায়? দক্ষিণে যাই হোক কিছু হয়েছে, চাই—পূব, পশ্চিম উত্তরে। স্বাধীনতা যজ্ঞের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তো পূর্ব-ভারত—বাংলা। পলাশী যুদ্ধের পচিশ বছর পরেই ১৭৮২ সালে ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন তমলুকের রাণী বীরাঙ্গনা কৃষ্ণপ্রিয়া। সন্ন্যাসী বিপ্লব আর সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম অঙ্কুর তো এখানেই। সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হতে না হতে ১৮৫৮ সালে বিপ্লবী [illegible]

মিত্র) এর নীলদর্পণ নাটকে সায়েস্তা হয়েছে নীলকুঠির মহাঅত্যাচারী নৃশংস কুঠিয়াল সাহেবরা। ১৮৬০ সালে নীলবিদ্রোহে যোগ দিয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী কৃষক। শয়তানী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে শাদা শয়তানরা। তারপর ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনার নিরীহ প্রজারা করলে কী? সশস্ত্র বিদ্রোহে অত্যাচারী জমিদারদের নম্বইটি কাছারী জ্বালিয়ে দিলে একদিনে। প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ না করে আর পথ পেল না বাছাধনরা।

যাই বল না কেন—সাহস, শৌর্য, বীর্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর সংগঠনী শক্তিতে বাংলা ভারতের মুকুটমণি। সেই বাংলা আজ করছে কি? বিদেশী আখ্যাত 'ভেতো' বাঙালী কি পেটভরে ভাত খেয়ে অনন্তশয্যায় অনন্ত-নিদ্রায় আচ্ছন্ন? বাংলা কি আজ মহা-মোহ-মগ্নী?

না, তা নয়। জেগেছেন বাংলার বিবেক —বিশ্ববিবেক, বিশ্ব ধর্মমহাসভায় জয়মাল্য পরিয়ে এনেছেন ভারতমাতার কণ্ঠে। বরোদায় এসেছিলেন সরলা দেবী, আর মহারাজার নিমন্ত্রণে এসেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। খবর পেয়েছেন অরবিন্দদা —ঘুমিয়ে নেই, জেগেছে। শক্তিসাধনা করছে বাংলার ছেলেমেয়ে দুইই। মেয়েরা সরলা দেবীর নারী ব্যায়ামাগারে, আর ছেলেরা পি, মিত্রের অনুশীলন সমিতিতে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওজস্বিনী ভাষায় জ্বলন্ত দেশপ্রেম প্রচার করছেন দেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে।

যোগ্যতম ক্ষেত্র। বাংলার প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে বৈকি। চিরজাগ্রত বাংলা কদিন আর আচ্ছন্ন থাকবে মোহ-নিদ্রায়? তার মহাজাগরণের সময় আসন্ন।

আর দেরী নয়। বসা গেল সমিতির নাম নির্ধারণ, শিক্ষণপদ্ধতি ও কর্মতালিকার খসড়া তৈরী করতে। প্রবলের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামবার মত ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল—কিছুই নাই যখন, তখন ঝোপ বুঝে কোপ মারার কাজে 'গুপ্ত সমিতি' নামটাই হবে বেশ।

গোড়া থেকেই আলোড়ন তুলেছিল ঋষি বঙ্কিমের 'অনুশীলন তত্ত্ব' আর 'আনন্দমঠ'। শিক্ষণ প্রণালীর সূচীতে রইল সন্তানের ব্রত গ্রহণ আর শিক্ষাপদ্ধতি, মন্ত্র হল 'বন্দেমাতরম্'।

'ভবানী পূজা' 'ভবানী স্তব' প্রচার করতে হবে ভারতের সর্বত্র। অরবিন্দদা লিখলেন—'ভবানী মন্দির'। ছাপা হল পুস্তিকা আকারে। ভবানী আর কেউ নন—স্বয়ং ভারতমাতা।

উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত। অরবিন্দদার কাছ থেকে সরলা দেবীকে লেখা পরিচয়পত্র আর কিছু 'ভবানী মন্দির' নিয়ে বরোদা ছেড়ে ১৯০২ সালে আমি গেলাম কলকাতায়। সরলা দেবী মহা খুশি, পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন অভ্যাগতকে।

দেশপ্রাণা সমাজ-কল্যাণী সরলা দেবী। নিজে সুশিক্ষিতা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনা বাঙালী মেয়েদের অবরোধ-বন্দিনী দশায় ব্যথিতা হয়ে অল্পবয়সেই স্বাস্থ্যচর্চায় মন দিয়ে জুজুৎসু, লাঠিখেলা, ছোরা ও অসি-চালনায় সুনিপুণা হয়ে ওঠেন। প্রকাশ্য স্থানে বীরাঙ্গনা বেশে লাঠি ও অসি-চালনার কৌশল দেখিয়ে হাজার হাজার দর্শককে বিস্মিত করেন তিনি। তারপর বড় হয়ে নারী-ব্যায়ামাগার খুলে মেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চা ও শক্তিসাধনার ব্যবস্থা করে দেন। বীর সন্তান লাভের কামনায় মেয়েদের মধ্যে বীরাষ্টমী ব্রতের প্রবর্তনও করেন তিনি। এমনই বীরত্ব-প্রীতি সরলা দেবীর।

যাই হোক আলাপ ও আলোচনা দুই-ই হল অনুশীলন সমিতির পরিচালক পি মিত্রের সঙ্গে। সব শুনে তিনি খুশি হলেন যত, উৎসাহবোধ করলেন তত। করবেন নাই বা কেন? কর্মপ্রণালীটা ছিল বঙ্কিমের আদর্শভিত্তিক। এদিকে মিত্তিরমশায়ের বাড়ী নৈহাটী। ছোট থেকেই ঋষি বঙ্কিমের কাছে দেশমাতার পায়ের শিকল মুক্ত করার প্রেরণা তাঁর পাওয়াই ছিল। তাই রাজনীতির একটা বড় অংশে নেমেছিলেন তিনি। মতে মতে মিল—স্বমত আর পরমত হল একমত। আনন্দের আতিশয্যে সেই দিনই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সংগঠক এক-নিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী সতীশ বসুকে ডেকে বললেন—বরোদা থেকে একটা দল এসেছে, তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাদেরও। সব রকমের সামরিক শিক্ষা দেবে তারা। তাদের সঙ্গে তোমাদের সংযোগ করতে হবে।

আর কথা কি—মিত্তিরসাহেবের কথা অমান্য করবে কে? দুটি দল মিলে হল এক। মিলিত দলের সভাপতি হলেন পি মিত্তির—প্রমথনাথ মিত্র। অনুশীলন সমিতির ব্যায়ামের আখড়া ছিল মদন মিত্র লেনে। সুকিয়া স্ট্রীট থানার কাছে ১০৮নং আপার সার্কুলার রোডে আর একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। বাসা বাড়ী। হিরন্ময়ী এল এখানে। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার সুবিধেই হবে এতে। বাসা হলে কি হয়—আসলে এটি হল ব্যায়ামের বড় আখড়া—বিপ্লবাত্মক কাজের মূল ঘাঁটি—'গুপ্ত সমিতি'। ব্যবস্থা করা গেল—বয়স্ক ছেলেরা ব্যায়াম অভ্যাস করবে এখানে, আর কম-বয়সীরা করবে মদন মিত্র লেনের আখড়ায়।

অনুশীলন সমিতি কি, তার উদ্দেশ্যই

বা কি, কর্মপন্থাই বা কি—বুঝলে না তো? সেটা বুঝবে কাল। আজ এখানেই ছুটি।

চৌত্রিশ

বিকেলের বেড়ানো তাড়াতাড়ি শেষ। ফিরে দেখি স্বামিজী আগেই এসে পায়চারী করছেন সমাধিমন্দিরের চারিপাশের দাওয়ায়।

আঙিনায় বিছানা পেতে গড়গড়া রেখে গেল রেনুদা।

সন্ধ্যে হতেই স্বামিজী এসে বসলেন বিছানায়। তামাক খাওয়া শেষ।

কাছে বসতেই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী—তারপর আজ কি?

—আজ অনুশীলনের অনুশীলন, স্বামিজী—বললুম হাসতে হাসতে।

—হ্যাঁ, তাই বটে—অনুশীলনের অনুশীলন। স্বামিজীও হাসলেন, বললেন—বিদেশী ভাষায় একটা কথা আছে—Grea' men think alike. সত্যি কথা। সমগুণসম্পন্ন লোকদের মনে একই সময়ে একই ভাবের তরঙ্গ ওঠে। মহারাষ্ট্রে তিলক যখন ভাবছেন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের কথা—ঠিক ঐ সময়ে কি তারও একটু আগে থেকেই বাংলার ক'জন চিন্তাশীল মনীষীও ভাবছেন তাই। মনীষী ও মনীষা—কোনটারই কখনও অভাব হয় নাই বাংলায়। তাই মহামতি গোখলে বলেছিলেন-What Bengal 'hinks today India thinks tomorrow

'ভেতো বাঙালী' 'অসামরিক বাঙালী' গালাগালিটা গভীরে গেঁথেছিল ক'জন চিন্তাশীল সম্ভ্রান্ত বাঙালীর মনে। নাম করা যায়—বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ আর যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের। বিবেকানন্দের ওজস্বিনী বাণী সুরেন্দ্রনাথের অনলবর্ষী সুস্পষ্ট বক্তৃতা, আর যোগেন্দ্রনাথের অগ্নি-গর্ভ লেখনীতে নিঃসৃত হচ্ছিল জ্বলন্ত দেশপ্রেম। সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য যাঁদের, তাঁরা দেখলেন—দেশের সংস্কৃতি লোপ পাচ্ছে, অর্থনৈতিক কাঠামোটা ভেঙে চুরমার হচ্ছে, দিন দিন দেশের লোক দারিদ্র্যের কবলে পড়ছে, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে দেশ উজাড় হতে বসেছে। এ হতে দেওয়া চলবে না। দেশের সংস্কৃতিকে রক্ষা করা চাই, শিল্পকে বাঁচাতে হবে, উন্নয়ন করতে হবে দেশী শিল্পের। ক'জন যুবক ভাবল ভিক্ষের ঝুলিতে মুষ্টিভিক্ষাই মেলে, সমষ্টির পেট ভরে না তাতে। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন ভিক্ষা—স্বাধীনতা কি মেলে তাতে? স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় ক্ষাত্রতেজে। ক্ষাত্রতেজ জাগে শক্তি-সাধনায়। শক্তি-সাধনা চাই—দেশের ছেলেদের হতে হবে শক্তিমান। জোর যার মুলুক তার—চাই শক্তি, নইলে কিছু হবে না। ডন, বৈঠক, মুগুর, ডাম্বল, যুযুৎসু, মুষ্টিযুদ্ধ—পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠল কুস্তির আখড়া। ১৯০০ সালেরও বহু আগের কথা—বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান হয়ে উঠলেন

শ্রীমৎ সোহহংস স্বামী

—ছাতুবাবু, লাটুবাবু, অম্বু গুহ, ক্ষেত্র গুহ। হলে হবে কি—তখনও ধনী অভিজাত মহলের তো বটেই, সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরও ধারণা—কুস্তিটুস্তি — মুটে-মজুর, চাকর, বেয়ারা, দারোয়ানদের জন্যে—ওসব কি আর ভদ্রলোকের ছেলেদের কাজ?

কতকগুলো ভাল ভাল সার্কাস দল এল কলকাতায়। তার মধ্যে নাম করা যায় হার্মস্টোন সার্কাসের। এদের অদ্ভুত শারীরিক ক্রিয়াকৌশলের খেলা দেখে চমৎকৃত আর উত্তেজিত হল বাঙালী ভদ্রঘরের যুবকরা। মেতে গেল তারা শরীরচর্চায়। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠল জিমনাস্টিকের দল। হল রাধিকামোহন ঘোষের 'ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব'। এখনও আছে তা গিরীশ পার্কে। কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে উঠল ক'টা সার্কাস দল। টাইগার-ফাইটার শ্যামাকান্তের সার্কাস, প্রফেসর বোস, কৃষ্ণ বসাকের হিপোড্রাম সার্কাস দেশ-বিদেশে নানারকম ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে খ্যাতি আর সুনাম পেল যথেষ্ট।

এরই মধ্যে ঠনঠনের বেচু চ্যাটার্জি লেনের এক উৎসাহী যুবক সতীশ বসু। ছোট থেকেই ঝোঁক শরীরচর্চায়। একা নয়—সঙ্গীসাথী নিয়ে দল বেঁধে শক্তি-সাধনার ইচ্ছা। ভর্তি হল নারায়ণ বোসের জিমনাস্টিক ক্লাবে। বিখ্যাত গৌরহরি মুখুজ্জে ছিলেন সেই ক্লাবের শিক্ষক। সভাপতি ছিলেন প্রফেসর ওয়ান (Wann) সাহেব। সতীশ যখন হেদুয়ার ধারে জেনারেল এ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউটের ছাত্র, যেটা এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ—ঐ কলেজ প্রাঙ্গণেই সতীশ খুলে বসল এক জিমনাস্টিক ক্লাব। সহপাঠী আর কলেজের ছাত্ররা দলে দলে ভর্তি হল তার ক্লাবে। প্রিন্সিপ্যাল ওয়ান সাহেব খুব সাহায্য করলেন তাকে। যাই বল—ভালমন্দ নিয়েই তো মানুষ, সাহেবদের মধ্যে বেশি না হোক শতকরা দু-চারটে ভাল লোক আমদানি হয়েছিল বৈকি। তারা চাইত সাধারণ জনসমাজের মঙ্গল। ওয়ান সাহেব তাদেরই একজন। সতীশের জাতিগঠনমূলক কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন কলেজের কর্তৃপক্ষ। জনকল্যাণ প্রবৃত্তিতে খুশি হয়ে ওয়ান সাহেব খুবই ভালবাসতেন সতীশকে।

শারীরিক, মানসিক নৈতিক বলে বলীয়ান সতীশ চাইল দেশের যুবসমাজকে ঐরকমটি গড়ে তুলতে। চাইল—দেশের যুবকরা হবে ঋষি বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্বের আদর্শে, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষযুক্ত আদর্শপুরুষ। 'সকল ধর্মের ওপর স্বদেশ-প্রীতি'—ধর্মতত্ত্বের শেষ উপদেশটি মনে গাঁথা থাকবে তাদের। দেশের বর্তমান অবস্থা বুঝে প্রতিকার-প্রয়াসী হবে তারা। শক্তি-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে চাই শক্তিমানদের হাতে অস্ত্র। শুধু ডন, বৈঠক, মুগুর, ডাম্বল, যুযুৎসু, মুষ্টিযুদ্ধ শিখলেই তো হবে না, শিখতে হবে অস্ত্রচালনার কৌশল। কী অস্ত্র তুলে দেবে সে শক্তিমানদের হাতে? বঙ্কিম-অনুরাগী সতীশের মনে হল—ঋষি বঙ্কিমের আক্ষেপ—'হায় লাঠি, তোমার সেদিন গিয়াছে।' সরকারী মতে অনেক অস্ত্রই তো নিষিদ্ধ, লাঠি খেলারই প্রবর্তন করবে সে কলেজের ক্লাবে, লাঠির সেদিন ফিরিয়ে আনবে সতীশ। জানালে তার আন্তরিক ইচ্ছা কলেজ কর্তৃপক্ষকে। অনুমতি দিলেন না তাঁরা। মনে দুঃখ পেলেও এতটুকু দমলো না সতীশ। জেদ বেড়ে গেল। হেদুয়ার কাছে মদন মিত্র লেনে ছোট লাঠি খেলার আলাদা আখড়া খুলে পাশের ঘরে করল 'কার্যালয়'—মানে অফিস আর কি। নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন ভট্টাচার্য নাম দিলেন—'ভারত অনুশীলন সমিতি'। ১৯০২ সালের দোলপূর্ণিমার দিন হল ওর জন্ম।

মহা উৎসাহে সতীশ যুক্তি-পরামর্শ-উপদেশের জন্যে যেতে থাকল রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা ও আরও অনেক অভিজ্ঞ কর্তাব্যক্তি নেতৃস্থানীয় মনীষীর কাছে। সোদপুরে তেঘরার শশী চৌধুরী দলবল সমেত সতীশকে একদিন নিয়ে গেলেন ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে। উদ্দেশ্য শুনে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে খুবই উৎসাহ দিলেন তিনি। সতীশ বললে তার হিতাকাঙ্ক্ষী শশীদাকে—নাম যাই হোক তবু হয়েছে একটা, কিন্তু সমিতি যে কাণ্ডারীবিহীন কোন পরিচালক বা সভাপতি নেই।

সমিতির সাধু উদ্দেশ্য আর কর্মপন্থা শুনে খুবই উৎসাহ বোধ করলেন আশু চৌধুরী, নেতার কথা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে ভেবে বললেন—এ-কাজের যোগ্যতম নেতা বা পরিচালক হচ্ছেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র।

তারপর এক ব্যারিস্টারের কাছ থেকে আর এক ব্যারিস্টারের কাছে। আশুবাবুর কাছে প্রমথ মিত্রের নামে চিঠি নিয়ে সদলে সতীশ গেল তাঁর কাছে। সমিতির উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী আর শিক্ষণ-প্রণালীর কথা শুনে প্রমথবাবু এত খুশি হলেন যে, উৎসাহের চোটে জাপটে ধরলেন সতীশকে। কদিন পরেই সমিতির কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বা প্রধান পরিচালক হলেন পি মিত্র। কেটে-ছেঁটে একটু ছোট করে প্রমথবাবু নাম দিলেন—'অনুশীলন সমিতি'।

মাত্র সাতদিন পরিচালনার পরই আলাপ পি মিত্রের সঙ্গে। সেইদিনই সতীশকে ডেকে বললেন—বরোদা থেকে একটা দল এসেছে, তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাদেরও। সবরকমের সামরিক শিক্ষা তারা দেবে। তাদের সঙ্গে তোমাদের সংযোগ করতে হবে।

সতীশ রাজী হল। দু দল মিলে এক হল। মিলিত দলের সভাপতি হলেন পি মিত্তির। সহকারী সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং যতীন ব্যানার্জি। এই সঙ্গে দলে এলেন ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর চিত্তরঞ্জনের শ্যালক ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদার।

সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে—হালদার একটি ছোট ঘোড়া দিলেন সমিতিকে।

এইবার বিভাগ, নিয়মকানুন, শিক্ষণ-প্রণালী, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক নির্বাচন আর সভ্য নির্বাচন পরীক্ষা-প্রণালীর তালিকার খসড়া তৈরী করতে বসা গেল। পরে হবে, আজ এই পর্যন্তই।

পঁচিশ

সন্ধ্যেবেলা যথাস্থানে—আঙিনায়।

ধূমপান সেরে স্বামিজী হেসে বললেন—অনুশীলনের অনুশীলন হয়ে গেছে, এখন গুপ্ত সমিতির গুপ্ত মন্ত্রটা শুনতে চাও, কি বল?

—হ্যাঁ বাবা, আজ গুপ্ত সমিতির গোপন কথা।

চোখ বড় বড় করে স্বামিজী বললেন—পুলিশকে ভয় কর না? যদি ধরে নিয়ে যায়?

—পুলিশ? এই বেল্ঘাডাঙায় পুলিশ কোথা? ধরবে কাকে—বক্তাকে, না শ্রোতাকে?

—আসতে কতক্ষণ? হাওয়ায় খবর পায় ওরা। ধরবে দুজনকেই।—গম্ভীর গলায় বললেন স্বামিজী।

—ধরে নিয়ে যাবে কোথায়?

—একেবারে শ্বশুরবাড়ী—জেলখানায়।

—তবে তো ভালই হবে। রান্না খাওয়ার ভাবনা নেই, একটা আশ্রম বানানো যাবে জেলখানায়।

—তার যো টি নেই। রাজবন্দীদের এক একজনকে রাখে এক-একটা আলাদা আলাদা সেলে। কারুর সঙ্গে কারুর দেখা-শোনার যো নেই—দু ঠোঁটে হাসি চেপে স্বামিজী চেয়ে রইলেন মুখপানে।

—সে যাই হোক হবে তখন। করছি না কিছু, শুনছি মাত্র, তাতেও যদি ধরে নিয়ে যায়— সে ওদের কেরামতি, আমার কি দোষ? এখন বলুন তো বাবা, গুপ্ত সমিতির গুপ্ত মন্ত্রটা।

—আচ্ছা, ঠিক আছে, শোন তবে—স্বামিজী আরম্ভ করলেন—জানতো বাড়ী তৈরীর সময় করতে হয় দুটো মহল—
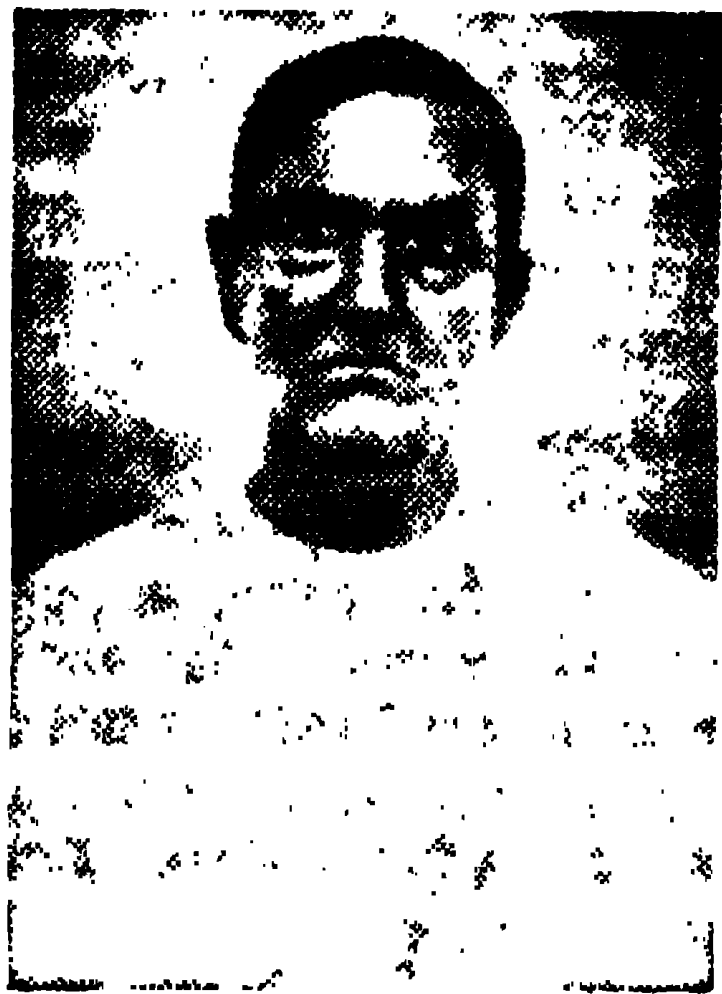
সতীশচন্দ্র বসু

জেগেছেন বাঙলার বিবেক

অন্দর আর সদর। সদর মহল—বৈঠকখানা, এখানে বাইরের লোকের সঙ্গে কাজ-কারবার, বসা-দাঁড়ানো, গল্পগুজব, তাস-পাশা-দাবা, আড্ডা, মজলিশ। অন্দর মহল—রান্না খাওয়া, বিধিবিধান, আচারবিচার, সংসার পরিচালনা, সবারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্যবিধান। কর্তৃত্ব মায়েদের।

মিলিত সমিতিরও ভাগ হল দুটো—Inner Circle আর Outer Circle আভ্যন্তরীণ আর বহির্ভাগীয়। আভ্যন্তরীণ—গুপ্ত সমিতি, বহির্ভাগীয়—অনুশীলন সমিতি। দুটো সমিতির দুটো আলাদা বাড়ী। কম-বয়সী ছেলেরা শিখবে অনুশীলন সমিতিতে আর বাছাই-করা যোগ্য, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকরা শিখবে গুপ্ত সমিতিতে।

এইবার শিক্ষা—কি কি শিখবে ছেলেরা। ডন, বৈঠক, মুগুর, ডাম্বল, যুযুৎসু, মুষ্টিযুদ্ধ তো বটেই, শিখতে হবে ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা, ছোরা, অসিচালনা, নিষিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র বন্দুক পিস্তল ছোড়া। যে যেমন করেই হোক শেখা চাই-ই।

ছেলেদের হতে হবে পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী, নিয়মানুবর্তী। খেলার মাঠ সাফ করা, সমিতির ঘর পরিষ্কার করা, অফিস লাইব্রেরী ঝাড়ু দেওয়া, আলমারির বই গুছানো, বই-এর নম্বর দেওয়া—সব

ছেলেদের কাজ। যে সময়ে যার যা কাজ পালামত করতে হবে ঠিক ঠিক।

এই তো গেল শরীর অনুশীলন, এবার মনের অনুশীলন।—চাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, জানতে হবে দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস—জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয়। পড়তে হবে দেশ-বিদেশের বীর-চরিত, স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোতাদের জীবনী, কর্মধারা—শিবাজী, রাণা প্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, কাভুর জীবন-চরিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলনতত্ত্ব, আনন্দমঠ পড়তে তো হবেই, তাছাড়া পড়তে হবে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কাহিনী।

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, টডের রাজস্থান, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ফ্রান্সের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, রাশিয়ার নিহিলিস্ট রহস্য—এসবও অবশ্য পাঠ্য। আর পড়তে হবে—রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, রণনীতি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

সবের ওপরে চাই চরিত্র গঠন—নৈতিক শিক্ষা। বিবেকানন্দের কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, অশ্বিনীকুমার দত্তের সংযমশিক্ষা হল অবশ্য পাঠ্য। তার সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী। বেদান্ত উপনিষদের অমৃতময়ী বাণী—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্' জানতে হবে বৈকি। সপ্তাহে একদিন Moral class এর ব্যবস্থা। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা আলোচনা ও কথকতার মাধ্যমে অল্প সময়ে তরুণ-মনে গেঁথে দেবেন সারাংশগুলি। ব্যবস্থা হল তার।

প্রত্যেকটি বিষয় শিখতে হবে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায়।

এই তো গেল অভ্যাসযোগ, জ্ঞানযোগের বিষয় এইবার কর্মযোগ। ছেলেদের করতে

ব্যারিস্টার পি মিত্র

হবে কি—জনহিতকর কাজ, সমাজসেবা—দীনদুঃখীর সেবা, রোগীর পরিচর্যা নিরন্নের মুখে দুমুঠো অন্ন দেবার ব্যবস্থা, বিপন্নকে উদ্ধার, আগুন নেবানো, শবদাহ, মুষ্টিভিক্ষার চাল সংগ্রহ করে বন্যার্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অনাত্মীয়া সহায়সম্বলহীনা বিধবাদের মধ্যে চাল বিতরণ করা। 'দরিদ্র বান্ধব ভান্ডার' নামে যে বিরাট সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে কলকাতায়, তা সমিতির এই সেবা-বিভাগেরই ফল। সমিতির নিষ্ঠাবান সেবক সভ্য একজন এখনও এই দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের সম্পাদক। জনতার জননিয়ন্ত্রণের ভার ছেলেদের ওপর। বড় বড় মেলা, উৎসব, পার্বণ, যোগস্নান বা সভা-সমিতিতে ভিড়ের চাপে বা অন্য কোন রকমে লোকের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থাপনা ছেলেদের। আজকাল কথায় কথায় 'ভলান্টিয়ার' বা 'স্বেচ্ছাসেবক' বলে যা শোন, ভারতে তার প্রথম প্রচলন এই অনুশীলন সমিতি থেকেই। জননিয়ন্ত্রণের কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শান্তভাবে করত ছেলেরা। তাদের কাজে খুব খুশি হত জনসাধারণ।

খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ অপরিহার্য। এ-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চাই। আনন্দ-স্ফূর্তি—মনের মস্তবড় খোরাক। আনন্দ না পেলে কিছুতে মন বসে কি? খেলার ব্যবস্থা রইল—হা ডু ডু ডু, কপাটি, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার, দাঁড়টানা, নৌকাবাচ, সাইকেল ও ঘোড়ায় চড়া। ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস—এসব বিদেশী খেলার নামগন্ধ রইল না। তাস, পাশা, দাবা, ক্যারম—কুঁড়ে খেলা, অঙ্গচালনা নেই এতে, কাজেই এসবও বরবাদ। মাঝে মাঝে দলবেঁধে দক্ষিণেশ্বর, যাদুঘর, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান, বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের বাড়ী, মাইকেলের স্মৃতি-মন্দির দেখাবার ও চড়ুইভাতি করবার ব্যবস্থা রইল আনন্দ যোগাতে।

শিক্ষাসূচী মোটামুটি হল, এখন শিক্ষক হবেন কে? একজনের কাজ নয়; এক-এক বিষয়ে এক-এক শিক্ষক। যে বিষয়ে যাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা, তিনিই শেখাবেন সেই বিষয়।

রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের কথা—জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। কি পরিশ্রমই যে করতেন ঐ নিষ্ঠাবান মারাঠী ভদ্রলোক! অল্প সময়ে সহজে দেশের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি ছেলেদের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্যে—'দেশের কথা' নামে এক অমূল্য গ্রন্থই লিখে ফেললেন তিনি। শিক্ষণ বিষয়ে তাঁর এমনি ছিল আন্তরিকতা।

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র খুব যত্নে শেখাতেন বড় লাঠিখেলা।

ঘোড়ায় চড়া, ছোরা, তরোয়াল চালনা, বন্দুক পিস্তল ব্যবহার ও রণনীতি শেখাবার ভার নেওয়া হল স্বহস্তে। সৈনিকের বেশে ঘোড়ায় চড়ে প্রকাশ্য রাজপথে বেড়ানো হত প্রায়ই—ছেলেদের সাহস ও উৎসাহ দেবার জন্যে। ছেলেও সব তৈরী হয়েছিল তেমনি—বড়লাঠিতে অতুল ঘোষ, ছোটলাঠি, ছোরা তরোয়ালে যাদুগোপাল, মুষ্টিযুদ্ধে নগেন দত্ত ও সুরদাস হয়ে উঠেছিল এক-একটি দিকপাল। জানা ছিল মার্তাজা সাহেবের পদ্ধতি। তরোয়াল খেলা শেখানো হত সেই পদ্ধতিতেই। জাপানী ওস্তাদ শেখাতেন 'গিঝিন' বা জাপানী তরোয়াল খেলা।

ঘোড়ায় চড়া শেখাবার জন্যে Riding club করা গেল ১০৮নং আপার সার্কুলার রোডে গুপ্ত সমিতিতেই। শিক্ষণের ভার স্বহস্তে নিলেও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ভার রইল মন্মথ মিত্র আর দেবব্রত বসুর ওপর।

এইবার নৈতিক শিক্ষা—চরিত্র গঠন। বিষয় অনেক, সময় কম। নেওয়া হল কিছু শর্মার পদ্ধতি। সপ্তাহে একদিন, রবিবারে Moral Class রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী পাঠ করে ব্যাখ্যা করা হত। প্রথমেই 'বন্দেমাতরম্' গান গাওয়া হত বীরোচিত সুরে। প্রায়ই অমৃতলাল গুপ্ত ধরতেন গান, ছেলেরা একসঙ্গে গাইত তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে।

(ক্রমশঃ)

জওয়ানদের সাহায্যে এক মহৎ প্রয়াস

বাংলাদেশে ভারতীয় জওয়ানদের বিরাট সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী ম্যানেকশ এবং শ্রীমতী অরোরা এক মহৎ সংকল্পে ব্রতী হয়েছেন। যুদ্ধে যেসব জওয়ান নিহত হয়েছেন এবং যাঁরা শারীরিক দিক থেকে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, তাঁদের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্যবোধ জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। এসম্বন্ধে ইঞ্জিনীয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের এক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী অরোরা বলেন যে মানুষের স্মৃতি বড়ো দুর্বল। আজকের বীর আগামী দিনে বিস্মৃত হয়ে যান। অতীতে এমন ঘটনা বহু ঘটেছে। তাই আর এ-ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যায় না। জওয়ানরা যেমন দেশের প্রয়োজনে আত্মদানে সর্বদাই প্রস্তুত, তেমনি তাঁদের সাহায্যার্থেও সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এক বিস্ময়কর সাফল্যের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে যাঁরা আমাদের মাথা উঁচু করেছেন, তাঁদের যেন ভুলে না যাই। নিহত এবং আহত জওয়ানদের পরিবারের সাহায্যকল্পে তিনি সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই সংস্থা ২৫ লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং আরো আশ্বাস দেন যে সম্ভব হলে এই টাকার দ্বিগুণ দেওয়া হবে।

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর এক সভায় শ্রীমতী ম্যানেকশও অনুরূপ আবেদন রাখেন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্থার চেয়ারম্যান ৩১ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীমতী ম্যানেকশ এবং শ্রীমতী অরোরার এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সবাই এগিয়ে আসছেন জওয়ানদের সাহায্যকল্পে। বিড়লা পরিবারের মহিলারা এক অনুষ্ঠানে ৫০ হাজার টাকা শ্রীমতী অরোরাকে দান করেন এই উদ্দেশ্যে।

এভারলাইট ইনসুলেটিং ইণ্ডাস্ট্রীজ-এর ডিরেক্টর শ্রীমতী এল এন পোদ্দার আহত জওয়ানদের জন্য এক হাজার গিফ্‌ট প্যাকেট উপহার দেন শ্রীমতী অরোরাকে। প্রত্যেক প্যাকেটে আছে টর্চলাইট, সেফটি রেজর, ডট পেন, টুথ ব্রাশ এবং চিরুনি।

এগিয়ে এসেছে পূর্ব রেল মহিলা সংস্থাও। জওয়ানদের সাহায্যে তাঁরাও পিছিয়ে থাকতে রাজি নন। এই সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীমতী অরোরাকে দেওয়া হয় ৫ হাজার টাকার একটি চেক।

শ্রীমতী ম্যানেকশ এবং শ্রীমতী অরোরার এই প্রয়াস যুদ্ধজয়ের সমান গৌরবজনক। যুদ্ধ অন্তে এই নতুন কর্মোদ্যোগ সারাদেশের নারীসমাজকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে।

জাতীয় জীবন ইতিমধ্যেই নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে। তারই প্রকাশ ধরা পড়লো সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্য মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীর ভাষণে, বেগম শরিফা তায়েবজী দেশের মুসলিম মহিলাদের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার আইনের ব্যবস্থাবলীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরও দুটি দেশের কথা।

তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক মুসলমান নারীদের মধ্যে বোরখাপ্রথার প্রচলন রহিত করে এবং ইউরোপীয় পোশাকের প্রবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

কামাল আতাতুর্কের পর মিশরে নারীসমাজের এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। পরলোকগত রাষ্ট্রপতি নাসের 'তালাক' শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের প্রচলিত নিয়ম বাতিল করে দেন। এরপর থেকে মিশরে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় এবং আদালতের রায় মাথা পেতে নিতে হয় খেয়াল-খুশি মতো 'তালাক' শব্দোচ্চারণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নারীসমাজের প্রতি ভ্রূকুটি প্রদর্শনের দিন মিশরে এখন অতীত কাহিনী।

আমাদের দেশের মুসলমান মেয়েদের এই প্রচেষ্টা যদি জয়যুক্ত হয় তবে অধিকারের ক্ষেত্রে বিশ্বের মুসলমান নারীসমাজের কাছে নিঃসন্দেহে তাঁরা নয়া নজির সৃষ্টি করবেন।

অঙ্গনা

শিশুর ক্রোধ

আমার সন্তান আমারই শৈশবের প্রতিভূ—প্রত্যেক মা-বাবাই মনে মনে একথা ভেবে আনন্দ পান। এ নিছক কল্পনাবিলাস নয়, বাস্তব সত্যও। মা-বাবার সঙ্গে শিশুর চেহারার যে শুধু মিল থাকে তাই নয় অনেক সময় স্বভাবেরও মিল থাকে। শিশুর জীবনের লীলায়িত ছন্দ দেখে মা-বাবার মনে পড়ে তিনিও ঠিক এমনটি ছিলেন। তাঁর সন্তান যেমন দুষ্টু, খেতে চায় না, খাওয়া দেখলেই পালায় আর খেতে খেতে কোলেই ঘুমে নেতিয়ে পড়ে সবই তাঁর স্বভাব এবং অবিকল সন্তানে বর্তেছে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও ঘটে। ভিন্ন পরিবেশের দরুন শিশুর স্বভাব এবং ব্যক্তিত্ব মা-বাবা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়। সন্তানের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মা-বাবা মিল খুঁজে না পেলেই কিরকম অসন্তোষ অনুভব করেন এবং মাঝে মাঝে তা প্রকাশও করে ফেলেন। শিশুর কোন কাজ হয়তো তাঁর মনঃপূত হলো না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্তব্য করে বসলেন, বংশছাড়া এই শিশু এল কোত্থেকে?

মা-বাবা সন্তানের বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ করুন অথবা তার স্বভাবে মুগ্ধ হন সে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হৃদয়ানুভূতি। মা-বাবার মধ্যে যে অনুভূতি থাকে সন্তানের মধ্যে সেই একই জিনিস বর্তমান। অনুভূতির ক্ষেত্রে সবাই সমান হয়। তবে অনুভূতির তীব্রতা এবং প্রকাশে জনে জনে কিছুটা তফাৎ নিশ্চয়ই ঘটে। মা-বাবার পক্ষে বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন যে সন্তানের মধ্যে কোন অনুভূতি বেশি সক্রিয়। আর এই অনুভূতির প্রকাশ-মুহূর্তে সন্তানের ওপর মা-বাবার ব্যবহার কেমন হবে সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

প্রভাব এবং পরিবেশের দিক থেকে অনুভূতি সাধারণত দুই রকমের হয়। আনন্দ, স্নেহ, প্রেম এসবই হলো সুখকর অনুভূতি। আর কান্না, ভয়, ক্রোধ, ঈর্ষা হলো দুঃখকর অনুভূতি। ক্রমে এই দুই অনুভূতি কল্যাণকারী এবং ক্ষতিকর ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সন্তানের দুঃখকর অনুভূতি ক্রোধ এবং ঈর্ষা যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায় এবং মা-বাবার ব্যবহার যদি কিছু পরিমাণে মনোবৈজ্ঞানিক হয় তবে এ থেকে যে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তা তিরোহিত হয় এবং পরিবর্তে তা হয়ে ওঠে কল্যাণকারী। এজন্য এ সম্বন্ধে গোড়া থেকেই মা-বাবাকে সচেতন থাকতে হয়। সন্তানের দুঃখকর অনুভূতি এবং সুখকর অনুভূতি নিয়ে পৃথক পৃথক বিচার-বিবেচনা করা উচিত। সুনিপুণ বিচারেই একমাত্র সঠিক পথনির্দেশ মিলতে পারে।

সন্তানের ক্রোধ নিয়েই প্রথমে ভাবনা-চিন্তা করা যাক। ক্রোধ বস্তুটি কি? শিশু তো সবসময় হেসেখেলে বেড়াচ্ছে। সে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য বসে থাকতে নারাজ। কিন্তু মা-বাবা সন্তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান সক্রিয় হতে পারেন না। ক্ষেত্রবিশেষে মা-বাবার সক্রিয়তা সন্তানের সক্রিয়তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ফলে সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার বিরোধ ঘনিয়ে আসে এবং তা অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের রূপ নেয়। যে মুহূর্তে শিশুর সক্রিয়তায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় ঠিক তখনই সে বিগড়ে বসে এবং তার ক্রোধ প্রকাশ পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সক্রিয়তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে তার প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে তার মধ্যে ক্রোধ প্রকাশ পায়।

ক্রোধ জীবনের এক বিরাট দুঃখকর অনুভূতি। তাই ক্রোধের প্রকাশপদ্ধতিও খুব সুবিধাজনক নয়। ক্রোধের সময় শিশুর কাছ থেকে স্বাভাবিক শিষ্টতা এবং মর্যাদা প্রত্যাশা করা অবাস্তব। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রুদ্ধ হলে মানুষের স্বাভাবিক চেহারা বদলে যায় এবং আচার-আচরণেও তার প্রতিফলন ঘটে। এসময় নিজস্ব পরিবর্তন সম্বন্ধে কেউ সচেতন থাকে না। সুতরাং শিশুর কাছে কোন সচেতনতা এই মুহূর্তে আশা করা অসংগত। যদি এই সচেতনতা থাকতো তবে ক্রোধ আমাদের এমন রিপু হয়ে দাঁড়াতো না। শিশু নিজের মর্জিমাফিক ক্রোধ প্রকাশ করে। এসময় শিশুর শ্বাসক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে, সে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, দাঁত কিড়মিড় করে। কান্নাকাটি, চিৎকার, গড়াগড়ি জিনিসপত্রের ভাঙচুর, মারপিট এবং নিজের শরীরের ক্ষতি এসবের মাধ্যমে সে ক্রোধ প্রকাশ করে। কোন কোন সময় সে আবার কটূক্তি করতেও দ্বিধা করে না। মা-বাবার কোন কথা সে এসময় শোনে না। অর্থাৎ স্বাভাবিকতা পুরোপুরি লোপ পায়। ক্রোধের মুহূর্তে আর একজনকে টিট করার জন্য শিশু অনেক সময় মা-বাবার সাহায্য চেয়ে বসে। মা-বাবার একটা জিনিস নজরে আসা উচিত যে, ছোট শিশু সেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে বড় শিশু সেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে না। বড় শিশুর ক্রোধ প্রকাশরীতি এতো সূক্ষ্ম যে তার সরলতার ঠিকানা পাওয়া ভার হয়ে পড়ে। সে নিজের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ না করে ভেতরে চেপে রাখে। এসময় তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে গলার স্বর এবং ভাবভঙ্গিতে অনেক পার্থক্য ধরা পড়ে। আর তখনই বোঝা যায় যে সন্তান ক্রুদ্ধ হয়েছে। সন্তান যদি সুস্থ পরিবেশে লালিতপালিত হয় তবে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ কদাচ ঘটে। সে ধৈর্য এবং সংযমের পরিচয় দেয়। যদি মা-বাবা অথবা অন্য কোন মধ্যস্থ সে পেয়ে যায় তবে তাঁর নির্দেশমতো কাজ করে। যদি পরিবেশের এই প্রভাব না থাকে এবং শিশু কোন মধ্যস্থ খুঁজে না পায় তবে তার ক্রোধের প্রকাশ হয় ভীষণ আর ক্রোধের বশে কোন কিছু ক্ষতিকারক কাজ করতে তার আটকায় না। শিক্ষার প্রভাবেও এই সামান্য কারণে অথবা অহেতুক ক্রোধের হাত থেকে শিশুকে বাঁচানো যায়। সাধারণত দেখা যায় যে, এরকম ক্ষেত্রে সন্তান ক্রোধের পথে না গিয়ে আপসে মিটমাট করে নিতেই ভালবাসে। শিশুর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়, নিজের মর্যাদার কথা ভাবে। এসব কারণ এবং অপরের নিন্দা ও উপহাস এড়ানোর জন্য নানাভাবে ক্রোধ লুকানোর চেষ্টা করে। এত করেও যদি ক্রোধ লুকানো না যায় তবে উগ্রতা যে অনেক হ্রাস পায় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এভাবে অবশ্য ক্রোধের সমাপ্তি ঘটে না। ভাবভঙ্গি এবং কথাবার্তায় ক্রোধ স্পষ্ট ধরে পড়ে। মুখ লাল হয়ে ওঠে, চোখের কোণে জল জমা হয়, কথা আটকে যায়। কেবল উগ্রতাটুকু থাকে না।

শিশুর ক্রোধের কারণ কি? এ সম্বন্ধে প্রথমেই বলা হয়েছে যে শিশুর স্বাভাবিক সক্রিয়তা এবং প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়াকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হলেই ক্রোধ তার মধ্যে দানা বাঁধে। শিশু যখন আপন মনে খেলাধুলো করে তখন যদি কেউ সেই খেলায় ঝামেলা সৃষ্টি করে তবে সে খেলনাগুলি তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শিশুকে মারধোর করলে, তার কোন ইচ্ছা না পূরণ করলে, তার কোন প্রিয় জিনিস নিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে সে ঠোঁট ফোলায় এবং যার পরিণতিতে ক্রোধ আরো ভয়ানক হবে।

শিশু প্রতি ব্যাপারে মা-বাবার সাহায্য কামনা করে। নিজের অসহায় অবস্থার উপলব্ধি থেকেই এই সাহায্য যাচ্ঞা। কিন্তু সব সময় মা-বাবার পক্ষে শিশুর মনের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা সম্ভব নয়। এছাড়া সংসারের কাজকর্ম তো আছে। এর ফলে শিশুর ক্রোধ হয়। সে ধরে নেয় মা-বাবা বুঝি তার প্রতি উদাসীন। আবার শিশু একটু বড়সড় হয়ে কিছু কিছু কাজ নিজে নিজেই করতে ভালবাসে। এ সময় কেউ যদি তাকে অযাচিত সাহায্য করতে যায় তো সে ক্রুদ্ধ হয়। ধরা যাক শিশু আপন সযত্ন প্রয়াসে মাটির ঘর তৈরি করে চলেছে। ঘর বারবার ভেঙে পড়ছে কিন্তু সে হাল ছাড়ছে না। তার দৃঢ়বিশ্বাস সে ঘর তৈরি করবেই। বারবার ঘর ভেঙে পড়তে দেখে যদি কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে তবে তার আত্মবিশ্বাস আহত হয় এবং তার মধ্যে ক্রোধ প্রকাশ পায়। ক্রোধের প্রকাশস্বরূপ সে ঘর ভেঙে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে।

শিশুর মান-অপমান জ্ঞান খুব প্রখর। কোন কারণে মা-বাবা শিশুকে অপমান করলে আর রক্ষে থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জলে ভরে ওঠে, কান গরম হয়ে যায়। সারা শরীর তখন তার রাগে জ্বলে যেতে। অবশ্য রাগ বেশি হয় দুর্বল এবং হীনস্বাস্থ্য শিশুদের বেশি। শিশু যদি বেশি রোগে ভোগে তাহলে অল্পেতেই সে রেগে যায় তার মত খিটখিটেও কেউ হয় না। স্বাস্থ্যহীনতা যেমন শিশুর ক্রোধের কারণ তেমনি সামাজিক অনুপযুক্ততাও। এ ধরনের শিশুদের মধ্যে ধৈর্য, সংযম প্রভৃতি সদ্গুণের একান্ত অভাব থাকে। এর ফলে ক্রোধ সে কিছুতেই দমন করতে পারে না। পরিবেশের প্রভাবও এজন্য কম দায়ী নয়। অপূর্ণ সামাজিক বিকাশের এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে লালিতপালিত শিশু যদি উপযুক্ত মাধ্যম না পায় তবে সে খুব রাগী হয়।

এই ক্রোধের কোপ থেকে শিশুকে বাঁচানো যায় কিভাবে? শিশুর স্বাস্থ্য বিকাশের পথে এক প্রধান অন্তরায়। এতে তার শরীর এবং মনের খুব ক্ষতি হয়। ক্রোধ রক্তে কুপ্রভাব বিস্তার করে যার ফলে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়। এজন্য ক্রোধ প্রশমিত করা দরকার। এজন্য মা-বাবাকে সতর্ক হতে হবে সর্বাগ্রে। মা-বাবা যদি এ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন তবে শিশুকে রাগে স্পর্শ করতে পারবে না।

শিশুর ক্রিয়াশীলতা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখা দরকার। এতে বাধার সৃষ্টি না করাই সংগত। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার দিকে নজর রেখে সেরকম অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা দরকার। যদি কখনো শিশুর ব্যবহারে হস্তক্ষেপ একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে খুব সতর্কতার সঙ্গে স্নেহময় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা করতে হবে। অর্থাৎ শিশুর মনে এই ধারণা হওয়া উচিত যে মা-বাবা সবসময় তার প্রতি স্নেহশীল। আর এই স্নেহশীলতার প্রকাশ পাবে সর্বদা প্রয়োজনে শিশুকে সাহায্য করা। কোন সময়ে যেন এতে বিরক্তি না প্রকাশ পায়।

শিশু যখন একমনে কোন কিছু করে চলে তখন তাকে বাধা না দেওয়াই সংগত। বরং দূর থেকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা চলতে পারে। কিন্তু না-চাইলে কোনক্রমেই তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। এর ফলে তার ক্রিয়াশীলতা স্বাভাবিক থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে। সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। এমন কিছু শিশুকে বলা ঠিক হবে না যে সে অপমানিত বোধ করবে। শিশুর সব আবদার-আবদার যেমন মাথা পেতে নেওয়া উচিত নয় তেমনি তার ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারেও মা-বাবা খেয়াল রাখবেন। কোন কিছু চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে ধমকানো অথবা ভয় দেখানো অনেক সময় বিপরীত হয়। শিশু রেগে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী না হয়। রাগ পড়ে এলে এর কুফল সম্বন্ধে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তবে শাসনের চেয়ে স্নেহের প্রলেপ থাকবে তাতে বেশি।

—[illegible]

নতুন আলোয় তোষলা ব্রত

এই সেদিন যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো আমি দাঁড়িয়েছিলাম একটা গলিতে। ব্লাক-আউটের রাত্রি, বেশ অন্ধকার। ঠিক আমার পাশটিতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার এক আত্মীয়া। সদ্য জংগীশাহীর উৎপীড়নে মান, ইজ্জত বাঁচাতে এসেছিলেন কলকাতায় সপরিবারে। আমার এই আত্মীয়াটি আমাকে বিদায় দিতে দোতলা থেকে নীচে এসে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বাংলাদেশের জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের কত কথাই না হয়েছিল সেদিন তাঁর সঙ্গে। বিদায় দিতে এসেও তিনি ঠিক বিদায় দিতে পারছিলেন না, বারবারই শোনাতে চাইছিলেন রূপসী বাংলার কথা। অথচ অন্ধকারের ভয়ে আমার ফেরার প্রবল তাড়া ছিল। ভদ্রমহিলাকে আবার আসব আশ্বাস দিয়ে যখন ফিরবো ভেবে পেছন ফিরেছি হঠাৎ রাস্তার সব আলোগুলো জ্বলে উঠলো। বুঝলাম বিপদ আমাদের কেটে গেছে। পরে জেনেছিলাম, নিয়াজি আলো জ্বালবার অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করেছেন অথচ ঘরে বসে সে খবরটা আমরা ঠিকসময়ে পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান, মিছিলে রাস্তা সরগরম। শ্লোগানের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো।

আমার আত্মীয়া এবার তো নাছোড়বান্দা, কিছুতেই আমায় তখন ফিরতে দেবেন না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে গুটি-গুটি তাঁর পেছন পেছন আবার ওপরে হাজির হলাম। চটপট জানলাগুলো খুলে দিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে খানিক মুক্ত হাওয়া টেনে নিলেন। এবার আর তাঁর ভয় নেই, দেশে ফিরে যেতে আর কোন বাধা নেই। এবার তারা স্বাধীন, খুশিতে মহিলাটি ছটফট করতে লাগলেন। কি করে যে খুশীর ভাষা প্রকাশ করবেন বুঝতে পারলেন না। আমি তাঁর খুশীর জোয়ারের উদ্বেল, উদ্দাম ভাব ধীর-স্থির ভাবে শুধু প্রত্যক্ষ করছিলাম। আনন্দে তাঁর চোখদুটো ছলছল হয়ে উঠলো। খুশীর আবেগ খানিক সামলে নিয়ে বললেন, 'আমার দেশে মানে আমাদের দেশে যাবে তো?' মনে মনে ভাবলাম আমার দেশ, আপনার দেশ সব এখন আজ আমরা সবাই এক হয়ে গেছি। মুখে শুধু বললাম, 'যাবো তো নিশ্চয়ই, ওটা তো আমারও দেশ। সেই ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম আজ আর ঠিক মনে নেই। তবু মনে পড়ে আমার চলার পথের ডাইনে ছিল বিরাট একটা পুকুর, সেখানে গ্রামের বধূরা নিত্যকর্ম করছিলেন, পাশে সামনে ছিল গোটাকয়েক তালগাছ তার মাথায় বসে নাচছিল কয়েকটা টিয়া-পাখী। বাঁয়ে ছিল বিরাট এক নিকানো উঠোন যেটা পেরিয়ে যেতে হয়েছিল আমাদের দালানে। খুব আবছা আবছা মনে পড়ছে।

ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'এখন হয়তো তার চিনতেই পারবে না, এখন কত পাল্টে গেছে। কিন্তু গ্রাম অনেক বদলে গেলেও আমরা কিন্তু একটুও বদলাই নি, বদলায় নি আমাদের গ্রামের প্রাচীন সংস্কৃতি। গত পৌষের কথা মনে পড়ছে। বারবার মনে পড়ছে এ-পৌষেও যদি আমরা দেশে থাকতাম এখন হয়তো ভোরে উঠে অনেকে মিলে 'তোষলা' ব্রত করতাম। এই ব্রতটি আমাদের খুব প্রিয়। সারা বছরের আরও অনেক ব্রতর মধ্যেও আমরা এই ব্রতটির জন্য অপেক্ষায় থাকি। এটা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব। পৌষের শীত-শীত ভোরে উঠে আমাদের এই চমকপ্রদ ব্রতটিতে আছে আয়োজনের এক বিরাট উদ্দীপনা। এটাই হচ্ছে সারমাটি দিয়ে ক্ষেতকে উর্বর করার ব্রত।

আমার মনে পড়ে গেল এই ব্রতটির কথা। এই 'তোষলা' ব্রত যাকে স্থানভেদে 'তুষ-তুষলি' ব্রতও অনেকে বলে। পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এ দু' জায়গাতেই এই ব্রতটির চলন আছে। প্রত্যেক দিন অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত সকালে স্নান শেষে গোবরের ছ-বুড়ি ছ-গন্ডা অথবা একশো চুয়াল্লিশটি গুলি তৈরী ক'রে কালো কোনরকম দাগ-বিহীন নতুন সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার ওপর গুলিগুলো রাখতে হয়। প্রত্যেকটি গুলিতে সিঁদুরের একটি ক'রে ফোঁটা ও পাঁচগাছি দূর্বা গুঁজে তার ওপর নতুন আতপ চালের তুষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হয়। মুলো, সরষে, শিম প্রভৃতি শীতকালের সব্জির ফুল দিয়ে ছড়া বলতে হয়। এই ছড়াগুলো হয়তো বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ধরনের, তবুও সব দেশের ছড়ারই এক অর্থ, একই উদ্দেশ্যে তাদের এই সাধনা। এই ব্রতগুলোতে তাদের দৈনন্দিন পল্লীজীবনের প্রতিচ্ছবি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। শীতের শিশিরে ভেজা সকালবেলার ঘাসে ঘাসে পা ফেলে দলে দলে মেয়েরা সরাতে বেগুনপাতা বিছিয়ে তার ওপর সারমাটির গুলি নিয়ে আলপথে এগিয়ে চলে ক্ষেতের দিকে। এই অনুষ্ঠানে কোন দলাদলি নেই, নেই শীতের সকালের উত্তরের হিমেল হাওয়ার কোন ক্লেশ। তারা এগিয়ে চলে একান্ত নির্ভীক ভাবে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায়। ব্রতটির গোড়াতেই তারা শুরু করে,—

'তোমার পুজো করে যে—
ধনে-ধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি-অন্ত।'

একে একে তারা কামনা করে গাই-বাছুরের বংশ বৃদ্ধি, 'কোদাল কাটা ধন', 'গোহাল-আলো গরু', 'দরবার-আলো বেটা', 'সভা-আলো জামাই', 'সেঁজ-আলো ঝি', 'আঁচড়-দাপা সিঁদুর', ও নগরে গিয়ে সংসার বাঁধার স্বপ্নও দেখে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করার জন্য তাদের আন্তরিক প্রার্থনাও এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে.

'তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামী-পুত্র নিয়ে যেন
সুখে করি ঘর।'

ব্রত সাঙ্গের দিন মেয়েরা সূর্য ওঠার আগেই ব্রত শেষ ক'রে ঘিয়ের প্রদীপ একটি সরায় জেলে সার বেঁধে নদীতে স্নান ক'রে তোষলা ভাসাতে যায়। ঠান্ডা হাওয়ার শীতলতাকেও তাঁরা তাদের ব্রততে ঠাঁই দিয়েছে।—

'কুলকুলানি এয়ো রানী,
মাঘ মাসে শীতল পানি,
শীতল শীতল থাইলো,
বড় গঙ্গা নাইলো।'

খানিক বাদেই পূবের আকাশ রাঙা করে সূর্য ওঠে। পৃথিবী আর সূর্যের প্রথম দর্শনকে তারা স্বাগত জানায়।

'শীতল শীতল জাগে
রাই খিয়ে মাগে,
আমাদের রায়ের বিয়ে
খাম্ কুরু-কুর দিয়ে
বেগুন পাতা ঢোলা ঢোলা,
রায়ের কানে সোনার তোলা।'

তোষলার সারমাটি আর সূর্য এদের কাছে এরা চিরকাল কৃতজ্ঞ। এই দুটো জিনিস এনে দেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তাদের ঐশ্বর্য। নদীতে সরা ভাসিয়ে আবার তারা কামনা করে, 'তুষ-তুষলি গেল ভেসে, বাপ-মার ধন এল হেসে।' এর সঙ্গে সঙ্গে সোয়ামীর ধনকেও তারা প্রার্থনা করে। ব্রত সাঙ্গ করে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যের বর্ণনা করে। এরপর তাদের ঘরে ফেরার তাড়া। সেখানে তাদের স্বহস্তে পিঠে তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তোষলা ব্রতর এই অনুষ্ঠানে আমাদের শীতের সকালের সদ্য স্নান সমাপ্ত সিঁদুর মাথা ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের কামনায় রত সবুজ ঘাসের মত কোমল মুখগুলোর কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে মানুষ আর প্রকৃতির গভীর এক সম্বন্ধ, একাত্মতা।

—অঞ্জলি চৌধুরী

হেট্‌ হেট্‌। আরে এইডা কী। এই হ' হ' হ'।

গরু তাড়াতে তাড়াতে তাহের শেখ হঠাৎ থেমে গেল।

সুটকিভর্তা দিয়ে চারটি পান্তা ভাত খেয়ে নিয়ে ভোর ভোর মাঠে বেরিয়ে পড়ে তাহের শেখ। বাঁ হাতের কনুইয়ের ভাঁজে কাঁধের লাঙলটা চেপে ধরে। হাতের মুঠোয় থাকে হুঁকোটা। ডান হাতে পাচনবাড়ি। ডগায় একটা লোহা বসানো। গরুগুলো বেয়াড়াপনা করলে ওর খোচায় ঢিট হয়ে যায় বাছাধনরা। গরু খেদানোর ফাঁকে ফাঁকে ফুড়ুত ফুড়ুত হুঁকো টানে। বাকি সময়টা নিজের মনে বকবক করতে করতে চলে। গরুগুলোর ঢিলেমী আর নষ্টামির ফিরিস্তি আওড়াতে থাকে যতক্ষণ না মাঠে এসে কাঁধ থেকে লাঙলটা নামায়। এ ওর চিরকালের অভ্যাস। কেউ এ নিয়ে ঠাট্টা করলে বলে, হেইডা তোমরা বুজবা না। এই সময় জিন আর হুরীয়া চলাফিরা করে। একলা মানুষ পাইলে ঘাঁড় মটকাইয়া হাওরের প্যাকের মধ্যে গুইজ্জা রাখব না? হের লাইগাই কথা কই। বুজব লগে আরো মানুষ আছে। কথাটা যে সত্যি নয় তা সবাই জানে। আসলে ওটা ওর অভ্যেস।

আজও যথাসময়ে বেরিয়ে পড়েছিল। গ্রামের নাবালটায় পা দিতে যাবে এমন সময় কানে এল মটরের গোঁ গোঁ শব্দ। চমকে উঠল তাহের শেখ। শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। যা দেখল তাতে থ বনে গেল। এমন অঘটনও যে ঘটতে পারে এমন কল্পনাও তাহের শেখ কোনো কালে করেনি।

লোকে বলে 'শয়তানের আইল'। তা কথাটা মিথ্যে নয়। শয়তান ছাড়া ওই পথ দিয়ে কারো চলবার উপায় নেই।

কবে যেন কোন এক কর্তাব্যক্তির শখ হয়েছিল একটা পাকাপোক্ত রাস্তা তৈরির। সদরের সঙ্গে তাহলে বিরাট একটা অঞ্চলের যোগাযোগ সহজ হয়ে যেত। কাজটা ফেঁদেও ছিল জাঁকিয়ে। গোড়ায় প্রায় কুড়ি হাত ভিত ধরেছিল। কিন্তু এখানে-ওখানে ফুটখানিক উঁচু হতে না হতেই কেন যেন হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। তারপর কেউ আর এমুখো হয় নি। এখন ওটার অবস্থা না মাঠ না পথ। খানা-খন্দ আর ভাঙ-চুর হয়ে যা আছে তার ওপর দিয়ে চলতে হলে বাঁদরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয়। আর শয়তানরা হয়তো চলতে পারে। কারণ ওদের চলাফেরা হাওয়ায় ভর করে। লাফালাফি করার প্রয়োজন হয় না।

সেই রাস্তার ওপর দিয়ে কিনা মটরগাড়ি আসছে! এর চাইতে তাজ্জব ব্যাপার আর কী হতে পারে! তাহের শেখ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। দেখতে বেশ মজা লাগছিল। গাড়িগুলোর হেডলাইট জ্বলছিল। লাইটগুলোর সে কি লাফালাফি। এই সোজা তো পরক্ষণেই আকাশের দিকে

রবি দে
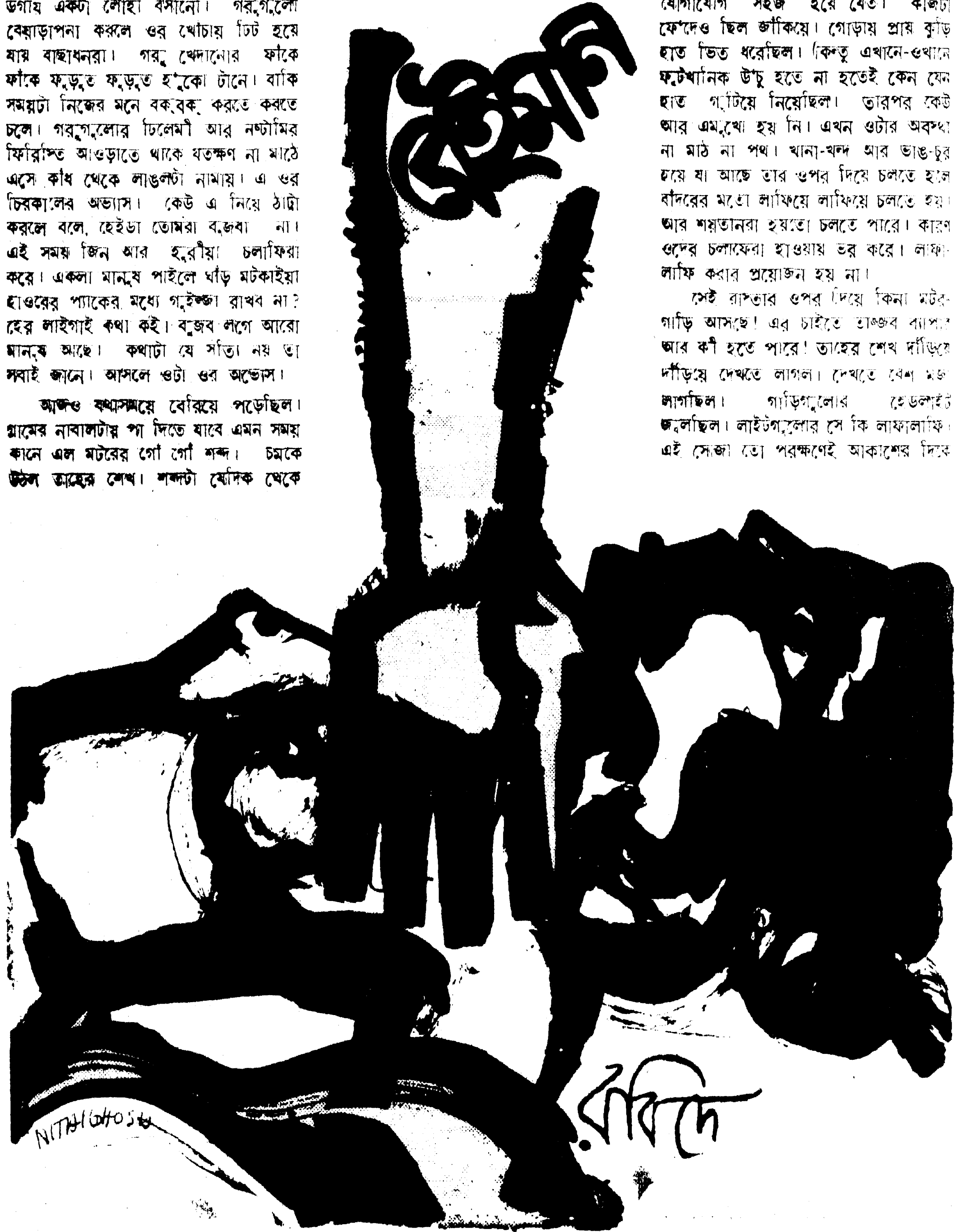
উঠে যাচ্ছে। নয়তো নিচের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

এ সময় নিতান্ত বুড়ো-বুড়িরা ছাড়া গাঁয়ের লোকের ঘুমই ভাঙে না। কিন্তু শেখের পোর কথাই আলাদা। মুরগির কক্কর-ক' কানে পড়ল কি আর রক্ষা নেই। বিছানা যেন কণ্টক শয্যা মনে হয়। এ নিয়ে শেখের বিবি চিরকাল ঝগড়াঝাটি আর কান্নাকাটি করেছে। কোন ফল হয়নি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটা রফা হয়েছিল। শেখের ভোরের খাবারটা রাত্রিবেলাই গুছিয়ে গাছিয়ে রাখা হবে। ভোরে টু-শব্দটি না করে তা-ই খেয়ে-দেয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাক কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু খবরদার কারো পাকা ঘুম যেন না ভাঙায়। শেখ মেনে নিয়েছিল শর্তটা। সেই থেকে চলে আসছে ব্যবস্থাটা। শেখ একবারো শর্ত ভংগ করেনি। সেই কবেকার কথা। তখন শেখগিন্নীর ভরা যৌবন। শেখ নিজেও তাগড়া জোয়ান।

অস্পষ্ট আলোয় শেখ বুঝতে পারছিল না কাদের গাড়ি। তাই কৌতূহলটা ছিল প্রবল। ইতিমধ্যে গরুগুলো অনেকটা চলে গেছে। ওদের থামান দরকার। তাই হাঁক পাড়ল হেই—হ' হ' হ'। কিন্তু ওর এই হাঁকডাকের তোয়াক্কা না করে গরুগুলো হেলেদুলে আপন মনে চলতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

তিনটে সামরিক জীপ। তাহের শেখের সামনাসামনি জীপগুলো এসে দাঁড়াল। সংগে সংগে সঙিন উঁচিয়ে কতগুলো খান সৈন্য জীপ থেকে লাফিয়ে পড়ল। নেমে এল কয়েকজন সামরিক অফিসার হাতের ইশারায় তাহের শেখকে কাছে ডাকল।

সময়টা ছিল মে মাসের গোড়ার দিক। সারা বাংলাদেশে তখন খান সৈন্যের নরমেধ যজ্ঞ পুরোদমে চলছে। মানুষ সর্বস্ব ছেড়ে নিরাপত্তার জন্য ভারত সীমান্তের দিকে ছুটছে। অনেকে নির্যাতিত হয়ে, অনেকে সন্ত্রস্ত হয়ে। ওদের অত্যাচারের নানা কাহিনী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এতদিন এদিকটায় ওদের আনা-গোনা ছিল না। পথঘাটের অসুবিধাই ছিল। কিন্তু আজ এদিকেও ওরা এসে গেল। স্বভাবতই তাহের শেখ ভয় পেল। প্রাণটা হাতে করে অফিসারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বর্ষা এসে যাচ্ছে। সৈন্য চলাচলের জন্য উঁচু রাস্তা দরকার। কিছুদিন পর সমস্ত নিচু রাস্তা জলের নিচে চলে যাবে। তাই এই অসম্পূর্ণ রাস্তাটাকে ব্যবহারের উপ-যোগী করে তোলার আদেশ হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের লোকজন আর ঠিকাদাররা এসেছে সামরিক প্রহরায়। সামরিক লোকেরা স্থানীয় মজুর সংগ্রহ করতে ঠিকাদারদের সাহায্য করবে।

সে-সব কথাই বলছিল তাহের শেখকে। তাহের শেখের তিন ছেলে আর দুই মেয়ে। বড় দুই ছেলে জামাল আর কামাল বাপের সংগে চাষবাস দেখাশোনা করে। ছোট ফরিদ শহরে দরজির কাজ করত। গোলমাল আরম্ভ হ'তেই বাড়ি চলে এসেছে। খায় দায় আর আবু মিঞার সাকরেদী করে। অফিসার প্রথমেই বাপ-বেটা চারজনের নাম লিখে নিল।

ইতিমধ্যে কী করে যেন কথাটা গ্রামময় রটে গেছে। লোকেদের ঘুমও ছুটে গেছে। ঘরে ঘরে চলল সলাপরমার্শ। সবাই দিনের আলো না ফুটতেই অন্ধকারের আড়ালে গ্রামের পিছন দিক দিয়ে বাড়ির বউ-ঝীদের সরিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগল। জোয়ান ছেলেরা আপাতত গা-ঢাকা দেওয়ার কথা ভাবল। সারা গ্রামে একটা চাপা সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই ক'রে উঠতে পারল না ওরা। কী করে যেন খানেরা ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিল। সংগে সংগে গ্রামটাকে ঘিরে ফেলল। পালাবার সব পথ আটকে দিয়ে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল খান সৈন্যরা। অফিসাররা বাড়ি বাড়ি ঢুকে খোঁজ করতে লাগল সমর্থ পুরুষদের। সে ছেলেই হোক আর বুড়োই হোক যাকে ধরতে পারল তাকেই মজুরের দলে ভর্তি করে নিল। কোন বাড়িতেই খেত-খামার দেখবার মতো কেউ আর থাকল না। ওসব পড়ে রইল খোদার জিম্মায়।

রিক্রুটমেন্ট এত সুচারুভাবে হয়ে যাওয়ায় ঠিকাদাররা খুব খুশি হ'ল। এভাবে লোক জোগাড় করার সুবিধে এই যে, মজুরি গোনার কোনো দায়িত্ব থাকে না। একরকম বেগার খাটিয়ে নেওয়া যায়। ফলে সবটাই লাভ।

এরই মধ্যে খবরটা আশেপাশের অনেক গ্রামেও পৌঁছে গেল। হাতে সময় পাওয়ায় সে-সব গ্রামের অনেকেই পালিয়ে গেল সোমত্ত মেয়েদের সরিয়ে দিল। থেকে গেল কিছু বুড়োবুড়ি আর যারা দিন আনে দিন খায় তেমন কিছু দিন-মজুর।

পুরো বর্ষা আরম্ভ হ'তে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। তা'হলেও ইতিমধ্যে রোজই দু'-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। মাটি ভিজে নরম হয়ে গেছে। খাল-বিলে কিছু কিছু জল জমতে শুরু করেছে। সাপলা, পানিফল আর জলো-ঘাসের শুকিয়ে নির্জীব হয়ে পড়া শিকড়-বাকড় নতুন জলের ছোঁয়ায় সতেজ হয়ে উঠেছে। এখানে-ওখানে কচি কচি পাতা জলের তলা থেকে উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। কচুরিপানা অনেক আগেই মাথাচাড়া দিয়েছে। এখন স্তরমতো চাপ বেঁধে বেঁধে আসর জাঁকিয়ে বসতে লেগে গেছে। জল বাড়ার সংগে সংগে ক্রমশই ওদের কলেবর বাড়তে থাকবে। যখন চারদিক জলে জলে একাকার হয়ে যাবে তখন বাতাসের ঠেলায়, স্রোতের টানে ভেসে বেড়াবে এ-গাঁ ও-গাঁ। এ-জেলা ও-জেলা। তারপর কোথায় চলে যাবে কেউ জানবেও না। এখানে এসে শিকড় গাড়বে অন্য কোথাও থেকে ভেসে আসা কচুরিপানার দাম।

রাস্তার কাজ চলেছে। শত-শত চাষী মাটি কেটে চলেছে উদয়াস্ত। জিরোবার ফুরসৎ নেই। ভাল করে খাবারো অবকাশ নেই। তিন দিনেই লোকগুলোর চেহারা ধসে গেছে। সর্বক্ষণ বন্দুকের পাহারা। একটু এদিক-ওদিক হলে আচমকা এসে পড়ছে বুটের লাথি, নয়তো বন্দুকের খোঁচা। মুখ বন্ধ করে জানোয়ারের মতো হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে চলেছে ওরা।

এরই মধ্যে আবার কয়েকটি দালালও জুটে গেছে। এদের মধ্যে আবু মিঞার প্রতিপত্তিটাই যেন বেশি চোখে পড়ে। লোকটা খয়ের খাঁ দলের পান্ডা। দালালী আর সর্দারী দুই-ই করছে।

সেদিন শুক্রবার। জুম্মাবার। জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য আবু মিঞার তাম্বিরে একঘন্টার ছুটি মিলেছে। আবু মিঞা বড় মিঞাদের বুঝিয়েছে, নামাজের ছুটি না দিলে পশ্চিমাদের ইসলামী চরিত্রের বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে। জয় বাংলা-আলারা যে বলে বেড়াচ্ছে পশ্চিমারা মুসলমানই নয় তা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করবে। আবু মিঞার কথার মধ্যে যে যুক্তি ছিল তা মেনে নিতে বাধ্য হল খানেরা।

তিন বেটার সংগে তাহের শেখ চলেছে বাড়িমুখো। কাঁধে ফেলে নিয়েছে কোদাল-গুলো। তাহের শেখের পা যেন চলে না। বড় ভারি মনে হচ্ছে কোদালটা। ষাটের উপর বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিনও তাহের শেখ অতবড় লাঙলটা কাঁধে নিয়ে হুঁকো টানতে টানতে যখন মাঠের দিকে যাচ্ছিল তখন লোকটার দেহের কোথায়ও জরার অস্তিত্ব আছে বলে একবারো মনে হয়নি। অথচ মাত্র তিনটি দিনের মধ্যে লোকটার সারা দেহে যেন জরা চেপে বসে গেছে। বুকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গাল-গলার চামড়া ঝুলে গেছে। চোখের সেই স্বচ্ছতার একটুকুও আর অবশিষ্ট নেই।

হঠাৎ মেয়ে কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ একটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর একটি উঠোন পেরোলেই তাহের শেখের বাড়ি। আর্তনাদটা কানে পড়তেই থমকে দাঁড়াল। কান পেতে ঠাহর করতে চেষ্টা করল কোন দিক থেকে আসছে চিৎকারটা। হঠাৎ তাহের শেখের মুখখানা ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। শরীর থেকে যেন সবটুকু রক্ত নিমেষে উধাও হয়ে গেল। কোদালের বাটটা প্রাণপণে চেপে ধ'রে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু আঙুলগুলো শুধুই আলগা হয়ে যাচ্ছে।

চিৎকার শুনেছিল তাহের শেখের ছেলেরাও। ওরাও মুহূর্তের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপরই বারুদের মত

জ্বলে উঠল। কাঁধের কোদালগুলো বাগিয়ে ধরে ওরা ঝড়ের মতো ছুটে চলল বাড়ির দিকে। বাড়িতে ছিল শেখের গিন্নী আর দুই মেয়ে গুলসান আর রাবেয়া।

জামালই প্রথম লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠে গেল। সদর দরজাটা হাট করে খোলা। ভিতরে যেন শত দৈত্যের লড়াই হয়ে গেছে। বিছানা-পাটি, বাকস-পেটরা সারা ঘরময় তছনছ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। পেছনের দোরের গোড়ায় শেখগিন্নী হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মুখের কষ বেয়ে গড়িয়ে আসা চাপ-চাপ রক্তে মাথার নিচটা লাল হয়ে গেছে। আর ...

জামালের মাথায় যেন সহস্র আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ হল। কাঁধের কোদালটা হাতে নিয়ে এক লাফে ভিতরে ঢুকে গেল। দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে কোদালটা বসিয়ে দিল খান-সৈন্যটার গর্দানে: গুলসানকে ধর্ষণ করছিল পশ্চিমা দৈত্যটা। এক কোপে ওর গর্দানটা দুফাঁক হয়ে গেল। পশুটার গর্দান থেকে তোড়ে রক্ত ছুটল। রাঙিয়ে দিল অচেতন গুলশানের মুখ-বুক। আর একটা জানোয়ার তাহের শেখের ছোট মেয়ে রাবেয়াকে ধর্ষণ করছিল। জামাল ওর সঙ্গীকে কোপ মারার সঙ্গে সঙ্গে উঠে রাইফেলের কুঁদোটা জামালের মাথায় বসিয়ে দিল। দৈত্যের মতো চেহারার লোকটার সেই আঘাতে জামালের মাথার খুলি চৌচির হয়ে ফেটে গেল। কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ে গেল নিহত খান দৈত্যটার ওপর। দৈত্যটা এবার ওর ওপর পর-পর দুবার গুলী চালাল। সেই মুহূর্তে কামাল লোকটাকে কোদাল নিয়ে আক্রমণ করল।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল কামাল। সে মাত্র মুহূর্তের জন্য। খান-সৈন্যটা জামালকে গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে কামাল লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আঘাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। কোদালের একটা কোণা লেগে খানসৈন্যটার ডান হাতের এক খাবলা মাংস ঝুলে পড়ল শুধু। আক্রমণটা ব্যর্থ হতেই কামাল পিছন ফিরে ছুটে পালিয়ে গেল। সৈন্যটা ওর আহত হাত দিয়েই কামালের দিকে রাইফেল তাক করল। কিন্তু ততক্ষণে কামাল ওর নাগালের বাইরে চলে গেছে। সেই সময়ই তাহের শেখ দাওয়ার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। গুলীটা ওর কাঁধের খানিকটা মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফরিদ কিন্তু এক পলক দেখে নিয়েই ছুটে গিয়েছিল আবু মিঞার খোঁজে। পথেই দেখা হয়ে গেল। আবু মিঞা ধীরে সুস্থে বাড়ি ফিরছিল। ব্যাপারটা আবু মিঞাকে জানাতেই ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিরস্ত্র মানুষের ওপর দালালী আর সর্দারী যত ইচ্ছে করা যায়। কিন্তু সশস্ত্র লোকের ওপর সর্দারী করার চিন্তা করতেও ভয় পায়।

এদিকে ফায়ারিংয়ের শব্দ সৈন্য ছাউনি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কম্যাণ্ডার চমকে উঠল। ভাবল মুক্তি ফৌজ বুঝি আক্রমণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ব্যাপারটা জানবার জন্য। পথেই আবু আর ফরিদের সঙ্গে দেখা। ব্যাপারটা শুনলো কম্যাণ্ডার। ওর ফর্সা মুখটা নিমেষে কালো হয়ে গেল। ও বুঝতে পেরেছিল এর পরিণাম কী হবে। সমস্ত মজুর পালিয়ে যাবে। রাস্তার কাজ যাবে বন্ধ হয়ে। দায়িত্বে অবহেলার দায়ে কোর্ট-মার্শালে ডাক পড়বে কম্যাণ্ডারের।

ক্ষেপে গেল লোকটা। ছুটে চলে গেল তাহের শেখের বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে আহত সৈন্যটাকে নিরস্ত্র করে ফেলল। যথাযোগ্য পাহারা দিয়ে সৈন্যটাকে আর তাহের শেখকে জীপে তুলে পাঠিয়ে দিল শহরে চিকিৎসার জন্যে।

তাহের শেখ আর ছেলেরা রাজনীতি বোঝে না। কিন্তু ওরা দেশের মাটিকে বড় ভালবাসে। যে মাটিতে জন্ম, আজন্ম যে মাটির আশীর্বাদে বেঁচে আছে—তাকে ওরা বড় ভালবাসে। সেই মাটির ওপর অন্যের খবরদারি যেমন ওদের পছন্দ নয়, তেমনি খুনোখুনিও ওরা চায় না। অন্য দলকে ওরা বিশ্বাস করে না। মুজিব ভাই কদ্দুর কী করবে, তাও বুঝতে পারে না।

তাহের শেখ আবু মিঞাকে বিশ্বাস করে না। লোকটা চিরদিন দালালী করে এসেছে। আওয়ামী লীগের নেতারা এলে অভ্যর্থনার কসুর করে না। অথচ লোকটা যে অন্য খয়েরখাঁ দলের একজন পাণ্ডা ব্যক্তি তাও কারো জানতে বাকি নেই! এরকম লোকগুলো খুব বিপজ্জনক। তাহের শেখ ফরিদকে পই-পই করে বারণ করেছিল লোকটার সঙ্গে যেন বেশি মাখামাখি না করে। ওদের আজকাল অনেকেই এড়িয়ে চলে। পশ্চিমা দালাল বলে লোকে বলাবলি করতে আরম্ভ করেছে।

ফরিদ বাপের কথা রাখেনি। কারণ ওর ধারণা মুসলমানের জন্য তাদের দল ছাড়া আর কোন পার্টিই থাকতে পারে না; তারপর পূর্ব-পশ্চিম বলে পাকিস্থানে কিছু নেই। সব মুসলমানই ভাই-ভাই। পাকিস্থানকে সাবাড় করবার জন্যে হিন্দুস্থান তো ওৎ পেতে বসে আছে। একবার বাগে পেলে মুসলমানের শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলবে না?

তাহের শেখ প্রতিবাদ করেছে। বলেছে তাও কি হয় নাকি? মুজিব ভাই কি এসব না বুঝে সুঝেই বলছে যে আমাদের দেশ আমরাই শাসন করব? ওরা কি মুজিব-ভায়ের চাইতেও আমাদের বেশি আপনা?

কিন্তু ফরিদ কোন যুক্তিই মানতে রাজী নয়। আবু মিঞা আর পশ্চিমা সৈন্যদের ও সুহৃদ বলেই মনে করে। পশ্চিমা খানেদের অত্যাচারের মধ্যেও কোন দোষ খুঁজে পায় না ও। কারণ ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে খানেরা যদি মুক্তি-যুদ্ধ দমন করতে না পারে তাহলে হিন্দুস্থানের লোকেরা মুসলমানদের তাবাহ্ করে ছাড়বে। ওরা নাকি এরই মধ্যে ছুরিতে শান দিতে লেগে গেছে।

সেদিন রাত্রে ফরিদকে ডেকে নিয়ে গেল আবু মিঞা নিজের বাড়িতে। ফরিদ যেতে চায়নি। আজকের ঘটনা ওর এতকালের বিশ্বাসের ভিত ধরে নাড়া দিয়ে গেছে। একটা নিদারুণ হতাশা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ও যাদের পরিত্রাতা বলে মনে করত, মনে মনে শ্রদ্ধা করত, তারাই কিনা আজ ওরই সর্বনাশ করে দিল। নিমেষের মধ্যে ওদের সুখের সংসারটা তছনছ করে দিল। বড় ভাইকে খুন করল। তাহলে আবু মিঞা বা খান-সেনাদের ওপর আর কি করেই বা ভরসা রাখা যায়। অথচ এসব কথা এতদিন ও বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে জয়বাংলা-আলাদের মিথ্যে প্রচার।

কিন্তু আবু মিঞা চতুর লোক। ওর মনের কথা আঁচ করতে দেরি হল না। ফরিদের ভাঙা মনটাকে জোড়া দেবার চেষ্টা করে বলল, এটা মাত্র ওই দুটো খান-সৈন্যের নষ্টামী ছাড়া আর কিছু নয়। নানা উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করল। বলল, তুই চল আমার সঙ্গে। গিয়ে দেখবি কম্যাণ্ডার সাহেবের কি অবস্থা। লোকটা সেই থেকে হাহাকার করছে। লজ্জায় আর অনুতাপে মরে যাচ্ছে। ও-ই আমাকে তোর কাছে পাঠাল। বলল, ভাই আবু মিঞা, তুমি ফরিদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। ক্ষতিপূরণ করব। নাহলে আমি জ্বালে মরে যাব। তাই না তোর কাছে ছুটে এসেছি। তুই অমত করিস না। চল আমার সঙ্গে। ভাল হবে।

ফরিদের আহত বিশ্বাস যেন এতে একটা আশ্রয় পেল। বিশ্বাসের নাড়া খাওয়া ভিতটা যেন আবার স্বস্থানে দাঁড়াবার অবলম্বন পেল। গেল ফরিদ।

সত্যি অতবড় অফিসারটা দুমড়ে মুচড়ে যেন নুয়ে পড়েছে। মাথার টুপিটা নামিয়ে রেখেছে। চুলগুলো উস্কোখুসকো। অমন যে দশাসই গোঁফটা যার ডগাদুটো অংকুশের মতো ছুঁচলো ছিল এখন একেবারে ঝাঁটার কাঠির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। শোক যেন এই লোকটাই পেয়েছে সবার বেশি।

বেচারা ফরিদ! নিজের শোক ভুলে এখন কম্যাণ্ডার সাহেবের শোকে শোকার্ত হয়ে উঠল।

'বস ফরিদ।' একটা টুল দেখিয়ে বলল আবু মিঞা।

কম্যাণ্ডার মুখটা তুলে একবার ফরিদের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার নামিয়ে নিল। ফরিদ স্পষ্ট দেখতে পেল ওর চোখদুটো ছলছল করছে।

'বুঝলি ফরিদ, সাহেব একেবারে ভেঙে পড়েছে। এমন একটা ঘটনা ঘটবে একেবারে

ভাবতে পারেননি। সেই থেকে শুধু বলছেন, এ-কি হল আবু মিঞা। শেষকালে পাকিস্থানী হয়ে খাঁটি পাকিস্থানীর গায়ে হাত দিল। বড় উঁচু দিল মানদেবতার। হাজার হলেও জাত-ভাই তো! ওরা যা-তা বলে লোক ক্ষেপালে কী হবে। এখন ওরা কোথায়? জানতে তো বাকি নাই কার দিলে কি আছে। মুখে জয়বাংলা জয়বাংলা বললে তো হবে না। আপনজনের মতো কাজ দেখাও। কই এই বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়াল কেউ? সব ফক্কিকার। আমাদের জন্যে তাদেরই প্রাণ কাঁদে, যারা খাঁটি মুসলমান। জানিস তো পাঠান পাঞ্জাবীদের শরীরে আছে আরব রক্ত। খাঁটি মুসলমানের রক্ত। সেইজন্যেই আজ খাঁটি মুসলমানের জন্যে সাহেবের প্রাণ কাঁদছে।'

কম্যান্ডার মাথা নীচু করে বসে আছে। মাঝে মাঝে ওর ভ্রমরচূড়া গোঁফের ডগা-দুটো নেচে নেচে উঠছিল। মনে হচ্ছিল লোকটা কাঁদতে কাঁদতে যেন নাক টানছে। আড়চোখে ফরিদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল লোকটাকে। দেখতে দেখতে শ্রদ্ধায় আর সমবেদনায় মনটা ওর গলে যাচ্ছিল।

'আমি দুঃখে লজ্জায় মরে যাচ্ছি ভাই।' শেষপর্যন্ত কম্যান্ডার মুখ খুলল। তোমাদের যে ক্ষতি হল, সে-কথা ভাবতেও আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। শেষে কিনা বেয়াকুফ সেপাইদুটো খাঁটি মুসলমানের গায়ে হাত তুলল! মেয়েদের ইজ্জতের উপর হামলা করে বসল! কথাটা আমাদের মহান প্রেসিডেন্টের কানে গেলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। পয়লা তো আমার গর্দান নেবে। তারপর অন্য কথা।' হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোতে ওর ড্যাবডেবে চোখদুটোতে জল চক্ চক্ করতে লাগল।

'না না, আপনি দুঃখ করবেন না সার। ওই সেপাইদুটোর রক্তে নিশ্চয় ভেজাল ছিল। না হলে এরকম করতে পারে কোনো মুসলমান! কই আরো তো সেপাই রয়েছে। ঠিক যেন ভাই-বেরাদার।

'সেই কথাই ওকে বুঝিয়ে বল আবু মিঞা। যে-ক্ষতি হয়ে গেল তা পূরণ করা মানুষের অসাধ্য। অথচ এর একটা বিহিত করতে না পারলে চিরকাল গুনাগার হয়ে থাকব।'

এবার ফরিদ নিঃশেষে গলে গেল। ও অভিভূত হয়ে কম্যান্ডার সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন লোকটা কোন পয়গম্বর-ফেরেস্তা।

আবু মিঞা বুঝে ফেলল যে কাজ হয়েছে। এবার আসল কথার দিকে মোড় নিল।

'বুঝতে পেরেছি সার, আপনার দিলে সত্যি সত্যি জব্বর চোট লেগেছে। ওদের কোন উপকারে আসতে পারলে হয়তো শান্তি পাবেন। ঠিক কিনা বলুন? আবু মিঞা ওর মনের কথাটাই যেন বলে ফেলল।

'হাঁ, আবু মিঞা। তুমি ঠিকই ধরেছ। কিছু একটা করতে পারলে আমি সত্যিই শান্তি পাব।'

'খুব ভাল কথা। পারেন তো ওকে একটা চাকরি করে দিন। বেকার বসে আছে। মন-মেজাজও ভাল থাকবে। সংসারেরও কিছু সাহায্য হবে। বড় ভাইটা মরে গেল। মেজটা কোথায় পালিয়ে গেল। ফিরবে কিনা কে জানে। বলতে গেলে এখন ও-ইতো সংসারের মাথা।' প্রস্তাব করল আবু মিঞা।

ফরিদের চাকরি সত্যি সত্যি হয়ে গেল। তিন টাকা রোজের রেজাকারের চাকরি।

ফরিদ চলে গেল ক্যাম্পে অস্ত্রচালনার ট্রেনিং নিতে। মা আর বোনদুটির দেখা-শুনার দায়িত্ব দিয়ে গেল আবু মিঞাকে। কিন্তু তার দিন-দশেক বাদে একদিন সকালবেলা দেখা গেল ফরিদের মা আর বোনেরা উধাও। বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হল। নানা জনে নানা কথা বলল। কেউ বলল, আবু মিঞা কোনো বদ মতলবে সরিয়ে দিয়েছে। কেউ বলল, আগের দিন রাত্রিতে অপরিচিত কয়েকটি ছেলেকে এ-গাঁয়ে দেখা গিয়েছিল। ওদেরই কাজ।

সামরিক লোকেরা কিন্তু ব্যাপারটাকে অত সহজে নিতে পারল না। ওরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করল। লোক বাছাই করতে লাগল।

ক্যাম্পের ট্রেনিং শেষ করে ফরিদ একটা দুটো অপারেশনে বেরুতে লাগল। ক্যাম্পে থাকতে থাকতেই পশ্চিমাদের ব্যাপারে ওর মোহমুক্তি ঘটেছিল। পশ্চিমারা বাঙালীদের একটা বিজিত জাতি বলেই মনে করত। সম্পর্কটা ছিল প্রভু-ভৃত্যের। নিজেদের মধ্যে কথা বলারও স্বাধীনতা ছিল না। বিদ্রূপ আর খিস্তি-খামারি ছিল নিত্যকর্ম।

যেখানেই মুক্তিবাহিনীর হাতে খান সৈনারা মার খেত তারই আশপাশের গ্রামে গিয়ে অত্যাচার চালাতে হত। খুন, ধর্ষণ, লুটপাট। সবশেষে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে হত।

যতবার এরকম অপারেশনে গেছে ফরিদ, ততবারই মনে পড়ে যেত ওর ধর্ষিতা বোনেদের কথা। নিহত বড় ভাই-এর কথা। মনটা বিদ্রোহ করে উঠত। কিন্তু ওদের হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় ছিল না। নতুন রিক্রুটদের কড়া পাহারায় রাখত।

এদিকে পুরোদমে বর্ষা নেমে গেল। দেখতে দেখতে নদী-নালা ভরে উঠল। মাঠ-ঘাট গেল তলিয়ে। জেগে রইল শুধু উঁচু সড়ক আর রেলের বাঁধগুলো। ওদের একমাত্র সরবরাহ লাইন।

বর্ষা জমে উঠতেই যুদ্ধের মোড় গেল ঘুরে। পাকিস্তানী জল্লাদের গতিবিধি হল সংকুচিত। এদিকে মুক্তিবাহিনী এই বর্ষাকেই ব্যবহার করল শত্রুর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অস্ত্ররূপে। হানাদারবাহিনীর সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগল একের পর এক সেতু আর সাঁকোগুলো ধ্বংস করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ ওগুলো রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠল। ব্যবস্থা করল পাহারার। কিন্তু অত সৈন্য কোথায়! সব সেতু আর সাঁকোতে পাহারা বসাতে গেলে তামাম বাহিনীতেও কুলিয়ে উঠবে না। গেরিলা-মার ঠেকাবে কে?

ডাক পড়ল তাঁবেদার আর মির্জাফরদের। ওদেরই আর এক নাম রেজাকার। গেরিলাদের সহজ শিকার করে ওদের বসিয়ে দিল সেতু আর সাঁকোর পাহারায়। এমনি একদল রেজাকার একটি সেতুর পাহারায় ছিল।

বুড়িগাঙ। এই নামেই ও পরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য, ওই নামটা ওকে মোটেই মানায় না। গাঙ বলতে বাংলাদেশে নদীকেই বোঝায়। অথচ কিছুতেই ওকে নদী বলা যায় না। আবার খাল বললেও বড় ছোট করে বলা হয়। ওর এমন গাল-ভরা নামটা যে কোত্থেকে এল আজ আর কেউ বলতে পারে না। শীতকালে ওর নির্জীব শীর্ণদশা দেখে কেউ হয়তো একদিন বিদ্রূপ করে ওকে ওই নাম দিয়েছিল। সেই থেকে চলে আসছে নামটা। অথচ বর্ষায় ওকে চেনাই মুস্কিল। কেমন-তর যেন হয়ে যায়। মনে হয় ঢলানী, স্বৈরিণী। চারদিক থেকে ধেয়ে আসে পাগলা ঢল। সেই ঢলের বুকে মজে যায় ও। ভাসিয়ে দেয়, নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় নিজেকে। খলখল করে হাসে আর ছলছল করে সারা অঙ্গ দুলিয়ে ছুটোছুটি করে। তখন ও বিপুলা, বিবশা। শুধু একটি জায়গায় ওর কুণ্ঠিত অস্তিত্বের নিশানা পাওয়া যায় যেখানে একটা লোহার সেতু আড়াআড়িভাবে ওকে বেঁধে ফেলেছে। সেতুর প্রস্তর আলিঙ্গনে যেখানে ও বন্দিনী। বর্ষাবিলাসিনী বুড়িগাঙ এখানে কুণ্ঠিতা। কিন্তু ক্রুদ্ধা। অনন্ত প্রতিবাদে মুখরা।

ওই সেতুটারই পাহারায় ছিল ছজন রেজাকার।

সেদিন কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। দিনের বেলাই মনে হচ্ছিল এক প্রহর রাত। আর বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন ছিল এক-একটা পাথরের কুচি। চামড়া ভেদ করে মাংসে গিয়ে খোঁচা দিচ্ছিল। বাইরে তিষ্ঠোয় কার সাধ্য। বাধ্য হয়ে রেজাকাররা গিয়ে তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিল। আগে তো প্রাণ বাঁচুক, তারপর বুড়িগাঙের সেতুর কথা ভাবা যাবে!

বাঁধের দুধারে শুধু জল আর জল। নদী-নালা-বিল সব ওই বিপুল বিস্তীর্ণ জলের তলায় অদৃশ্য। বাংলাদেশ এখন

অপূর্ব মহিমায় স্বপ্রকাশ। রূপোলী চাদরের বুকে ছোপ ছোপ সবুজের বুটির মত গ্রামগুলো ভাসমান। নানা রঙের পাল উড়িয়ে অজস্র নৌকোর আনাগোনা। দূরাগত ভাটিয়ালী আর জারি গানের সুরে বাতাস মাতাল। ধান আর পাটের সবুজ সবুজ ডগাগুলো যেন অনবরত মানুষকে হাতছানি দিচ্ছে। ডেকে ডেকে বলতে চাইছে চেয়ে দেখ, ওগো চেয়ে দেখ, আমরা এসেছি। জলে ভেসে ভেসে আমরা আছি। তোমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরে দিয়ে একদিন আমরা চলে যাব। সেদিন যেন আমাদের ভুলো না। আবার আমাদের ডাক দিও।

এমনি পাটখেতের আলের ফাঁকে ফাঁকে পাট গাছের গা বাঁচিয়ে তরতর করে এগিয়ে আসছে ছোট্ট একটা ডিঙি। চারটি মানুষের ভরেই ডিঙি ডুবুডুবু। অথচ ডুবছে না কিছুতেই। দাঁড়ির হাতের যাদুতে তরতরিয়ে এগিয়ে আসছে।

চারটি ছেলে। কত আর বয়েস। চারজনেরই কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে। পরনে লুঙি আর জার্সির মতো সবুজ রঙের গেঞ্জি। লুঙির সামনের দিকটা কাছার মতো করে কোমরে গোঁজা। তিনজন উবু হয়ে আড়াল করে বসে আছে তিনটি রাইফেল আর গ্রেনেড-ভরা হ্যাভারস্যাকটা। একজন শুধু দাঁড় বেয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টির জন্যে দশ হাত দূরেরও কিছু চোখে পড়ে না। বাঁধটা আর কতদূরে বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ ওরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। পাটখেতটা ওখানেই শেষ হয়ে গেছে। তারপরই রেলের জমি। ওখানে চাষবাস নিষিদ্ধ। তাই জায়গাটা ফাঁকা। শুধু টলটলে জল। ডিঙিটা দাঁড় করিয়ে দাঁড়ী ছেলেটা ঝুপ করে জলে নেমে পড়ল। উরু অবধি ডুবে গেল জলে। ডিঙিটা আড়ালে রাখার দরকার। তাই ঠেলে নিয়ে গেল একটু ভেতর দিকে। দাঁড়টা পুঁতে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল ডিঙিটা। এবার বাকি তিনজনে নেমে পড়ল।

এখান থেকে রেজাকারদের তাঁবুটা বেশ একটু দূরেই হবে হয়তো। বৃষ্টির জন্যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সেতুর নীচে বুড়িগাঙের মৃদু তর্জন-গর্জন শুনে দূরত্বটা আঁচ করল ওরা।

অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজছিল বলে এখন বেশ শীত করছে। ঠাণ্ডা কনকনে জলের মধ্যে দিয়ে চলার জন্যে কাঁপুনি ধরেছে। আর পাগুলো ক্রমশঃ অবশ হয়ে যাচ্ছে। পিঠগুলো অনেক আগেই কেমন যেন কাঠ মেরে গিয়েছিল। এখন ওরা উবু হয়ে হাঁটছিল। পিঠের ওপর রাইফেলগুলো রেখে এক হাতে চেপে ধরে ছিল। ভিজতে ভিজতে হাতের আঙুলগুলো সিঁটিয়ে গেছে। ধরে রাখবার মতো হাতের জোরও কমে আসছে। প্রত্যেকেই মনে মনে শংকিত হয়ে উঠল। বুঝতে পারছিল না আর কতক্ষণ ওরা এভাবে চলতে পারবে।

'খুব কষ্ট হচ্ছে নারে?' একজন জিজ্ঞেস করল কাছাকাছি যে গেরিলাটি ছিল তাকে।

'হুঁ।' মাথাটা তুলে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাথা বেয়ে হুড়মুড় করে একগাদা জলের ধারা গড়িয়ে এসে চোখদুটো প্রায় ঢেকে দিল। একটা অশ্লীল গালাগাল উচ্চারণ করে জল মুছবার চেষ্টা করল ছেলেটি। কিন্তু মোছা হল না। কারণ, হাতের আঙুলগুলো এমনভাবে অসাড় হয়ে গিয়েছিল যে, নড়াতেই পারল না।

'মনে জোর রাখিস। বুঝলি। হেরে গেলে চলবে না।' প্রথম গেরিলাটিও তাকাবার চেষ্টা করল সঙ্গীর দিকে।

'না। কুত্তার বাচ্চাগুলোকে খতম না করে মরব না।'

'হ্যাঁ। ওদের মারব। মরতে মরতেও খতম করে যাব।'

'আঃ! একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করল দ্বিতীয় ছেলেটি।

'কী রে?'

'মনে হচ্ছে পাগুলো নড়ছে না।'

প্রথম গেরিলাটি দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ের দিকে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করল। দ্বিতীয় ছেলেটি কিন্তু ঠিকই চলছিল। তবে খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর।

'না না। মনের ভুল। ঠিকই চলছিস তুই। মনটা শক্ত কর। বোধহয় ডাঙার কাছাকাছি এসে গেছি।'

'কতক্ষণ চলছি বলত?'

'ও-কথা জেনে আর কী হবে। যে-কাজে এসেছি, সে-কথা চিন্তা কর। গায়ে জোর পাবি।'

সত্যি জোর পেয়েছিল ছেলেটি। একেবারে কাঁচ বয়েস। আর এই প্রথম বেরিয়েছে অপারেশনে। সেই অনুপাতে ধকলটা পড়েছে অত্যধিক। তাই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল।

এমনি করেই তো চিরকাল মুক্তি-সংগ্রামীরা শক্তি আহরণ করেছে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শত্রুর হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার অদম্য ইচ্ছাশক্তিই শক্তি যুগিয়েছে। সেই শক্তি দিয়ে আঘাত হেনেছে শত্রুর ওপর। আঘাতে আঘাতে তাকে পর্যুদস্ত করেছে। ছিনিয়ে নিয়েছে মাতৃভূমির পবিত্র স্বাধীনতা। সেই পুরনো ইতিহাসই আজ আবার নতুন করে লেখা হচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে।

অবশেষে ওরা ডাঙার নাগাল পেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অদূরে দেখা যাচ্ছে শত্রুর তাঁবু। পাহারায় কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা আবার হাঁটতে লাগল। সামনে বেনা ঘাস আর কাশবনের ঝোপ। বাঁধ-বরাবর একটা প্রাচীরের মতো চলে গেছে আগাগোড়া। বর্ষায় জল পেয়ে লক্‌লকিয়ে উঠেছে। সুন্দর আড়ালের কাজ করছে।

ওরা তাঁবুটার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল। সেতুর দিকে মুখ করে খাটানো হয়েছে তাঁবুটা। পেছনে রেল-লাইনটা চলে গেছে এঁকে-বেঁকে।

'এক কাজ কর। হাত-পাগুলো একটু গরম করে নেওয়া যাক। আয় একে অপরের হাত-পাগুলো মালিশ করে দি।' বলল একজন।

'বুদ্ধিটা বের করেছিস ভাল। সত্যি। নিজে নিজের হাত-পা মালিশ করা যায় না। নে, আরম্ভ করে দে।' একজন সমর্থন করল।

মাথার উপর অঝোরে বৃষ্টি। মাটি ভিজে কাদা-কাদা। তারই উপর বসে ওরা দলাই-মালাই আরম্ভ করে দিল। ফাঁকে ফাঁকে চলল আক্রমণের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা।

'মনে হচ্ছে বাইরে কেউ নেই। হারামির বাচ্চারা নিশ্চয় তাঁবুর ভেতরে বসে গুলতানী করছে।' বলল একজন।

'তা আর করবে না। তিন টাকা রোজের বেইমান। তার ওপর আবার রেশন ফ্রি। লাথি-ঘুষি তো ফাউ।'

'য বলেছিস। বেইমানগুলোকে একবারে খতম করে গায়ের ঝাল যায় না। ইচ্ছে হয় একটু একটু করে আর অনেকদিন ধরে ওদের মারি।'

'ওদের কি তাঁবুর ভিতরে রেখেই খতম করতে চাস?'

'না। আমি চান্স নেওয়ার পক্ষপাতি নই। চোখের সামনে রেখে ওদের খতম করতে চাই।'

'তা হলে তো বৃষ্টি ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।'

'পাগল না ক্ষেপা। ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কেন?'

'তাহলে?'

'ওদের তাঁবু থেকে বের করে আনতে হবে।'

'কী করে?'

'আমি যা ভাবছি শোন। আমরা দু' ভাগে বাঁধের দুদিক আগলে থাকব। আমরা প্রথমে তাঁবুটার পিছন দিকে গ্রেনেড চার্জ করব। যদি তাতে খতম হয়ে যায় তো খুব ভাল। তা না হলে ওরা তাঁবুর বাইরে আসবেই। তখন দুদিক থেকে আক্রমণ চালাব।'
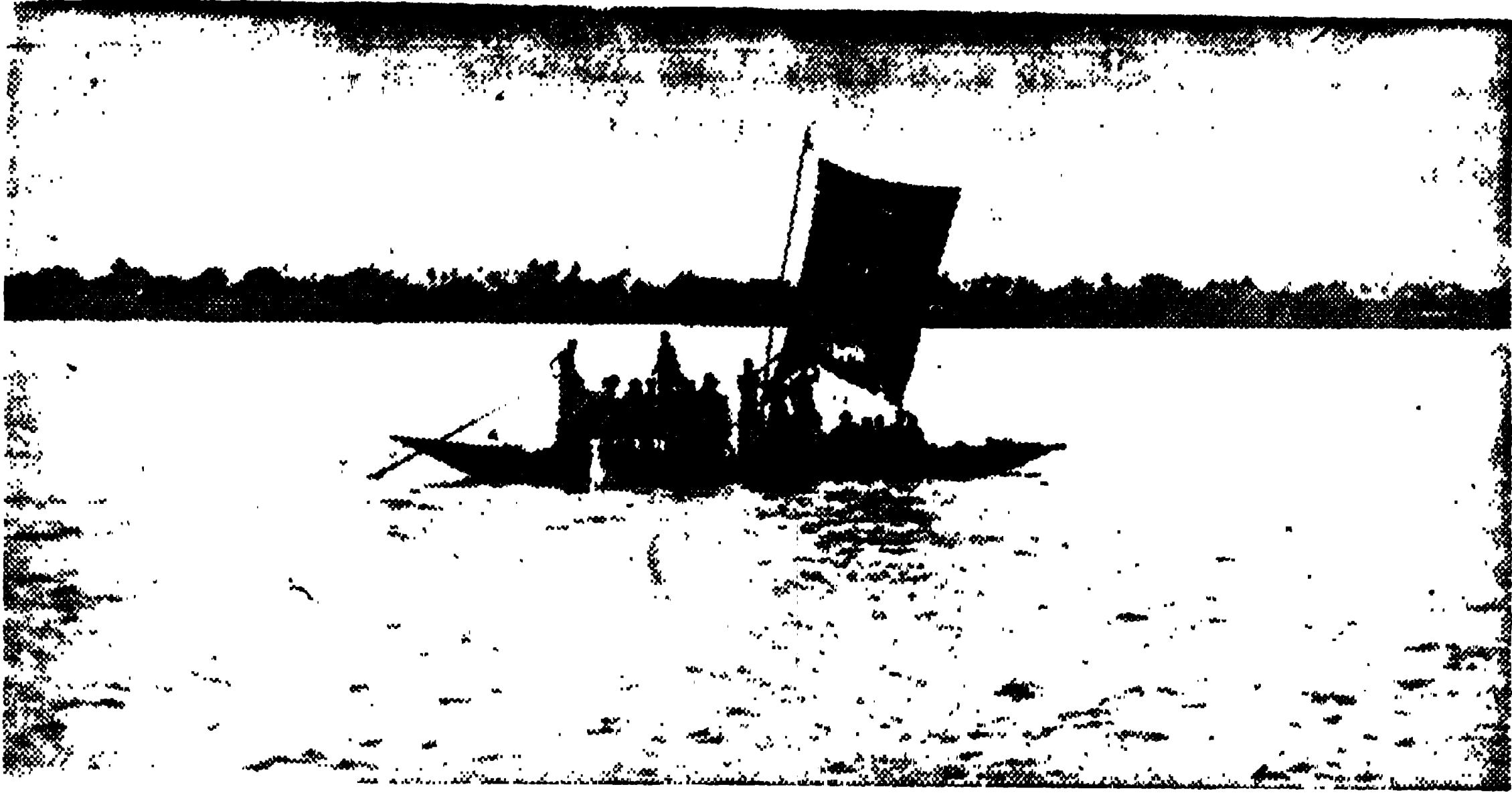
'কিন্তু তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস। ওরা ছ'জন।'

'তা হোক। ওদের চিনতে তো আমার বাকি নেই। এ নিয়ে একুশবার হল। গ্রেনেড খাওয়ার পর ওদের আর বন্দুক চালাবার হিম্মৎ থাকে না। তিন টাকা রোজের সৈন্য। অত হিম্মৎ আসবে কোত্থেকে? কাজেই তাঁবুর ভিতর থেকে অগত্যা যদি বহাল তবিয়তে বেরিয়েই আসে, তাহলেও ভাবনা নেই। আর একখানা গ্রেনেড খেলেই শেষ খাওয়া হয়ে যাবে।'

'যদি পিছন দিকে পালিয়ে যায়?'

'না। তা যাবে না। কারণ যেদিক থেকে গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে সেদিকে যেতেই পারে না। যদি পালাতেই চায় তো পোলের দিকেই পালাবে। অন্ততঃ গার্ডারের আশ্রয় নিয়ে এক হাত লড়বার সুবিধে পাবে।'

ইতিমধ্যে হাত-পায়ের জড়তা অনেকটা কেটে গেছে। জড়তা যতই কাটছে মালিশও ততই যুৎসই হচ্ছে।

এবার অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত হল ওরা। দুটো রাইফেল নিয়ে দুজন এপারে থাকল। দুজন চলল ওপারের দিকে।

বাঁধটা এখানে বেশ উঁচু। হামাগুড়ি দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল দু'জন। একজনের হাতে রাইফেল। অন্যজনের পিঠে গ্রেনেডের হ্যাভারস্যাকটা। একটা গ্রেনেড বের করে নিয়েছে হাতে।

বারে বারে পা হড়কে যেতে চায়। একে তো নেড়া বাঁধ। নতুন তৈরি বলে এখনও তেমন ঘাস গজায়নি। সমানে বৃষ্টি হওয়াতে মাটি হয়ে গেছে নরম আর পিছলা।

ওরা লাইনের ওপর উঠে গেল। এবার একেবারে পেট ফেলে সাপের মতো চলতে লাগল। সতর্ক রইল যাতে একটা পাথরও না সরে। এতটুকু শব্দ না হয়। ওরা প্রায় তাঁবুটার গা ঘেঁষে যাচ্ছে এখন। একটু অস্বাভাবিক শব্দ হলেই সতর্ক হয়ে পড়বে শত্রু। আক্রমণ করে বসবে।

এবার ওরা লাইন পেরিয়ে ওপারের ঢালে পৌঁছে গেল। গ্রেনেড নিয়ে ছেলেটি ঢালের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এখান থেকেই গ্রেনেড চার্জ করতে হবে। তাই নিরাপদ দূরত্বে পজিশন নিল। রাইফেল নিয়ে ছেলেটি আরো একটু এগিয়ে গেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসবার মুখেই যাতে ধরা যায়, তেমন একটি জায়গা বেছে নিয়ে ঢালের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

সবার পজিশন নেওয়া হয়ে গেছে। গ্রেনেড হাতে ছেলেটি সবকিছু একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। এক, দুই, তিন। মনে মনে গুনল ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে তাঁবুটার ওপর ফেটে পড়ল গ্রেনেডটা। অনেকগুলো কণ্ঠের আর্ত চিৎকার ভেসে এল তাঁবু থেকে। শুধু ওই একবার। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তাঁবুর পিছন দিকটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ফালি ফালি হয়ে তাঁবুর কাপড়টা ঝুলে পড়েছে। ওই যা একবার চিৎকার শুনা গেল। তারপর কয়েকটা মুহূর্ত এক দুঃসহ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছিল না লোকগুলো মরে গেছে না অন্য কোন মতলব আঁটছে। গেরিলারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। আলতোবাড়ি ফায়ার করার কোন মানে হয় না। অথচ ব্যাপারটা কি ঘটল তা না জেনে কিছু করাও যাচ্ছে না। কাছে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।

হঠাৎ দেখা গেল তাঁবুর গায়ে কতগুলো মাথা যেন গুঁতো মেরে চলছে। সদ্যপ্রসূত বাছুর যেমন মায়ের দুধ খাবার জন্যে না জেনে এখানে ওখানে গুঁতো মারে ওরাও অনেকটা সেরকম করছিল। হয়তো ওরা বেরুবার পথ পাচ্ছিল না।

এতে বোঝা গেল যে, সব না হলেও কয়েকটা বেঁচে আছে। এবং ওরা সুস্থই আছে। কাজেই এখন ওরা আর পজিশন বদলাল না।

অবশেষে ওরা পথ পেল। হামাগুড়ি দিয়ে একে একে চারজন তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। সর্বাঙ্গ রক্তে ভিজা। বেশ ভালরকমই চোট পেয়েছে। তবু পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল। ওরা পিছন দিকে না গিয়ে গেরিলাদের অনুমান মতো সামনের দিকেই পালাবার চেষ্টা করল। প্রত্যেকের হাতেই ছিল একটা রাইফেল। কিন্তু ওরা এত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে ওগুলো তাক করে ধরবার কথাও ভুলে গিয়েছিল। ওইভাবেই ওরা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু পালাবার আর সুযোগ হল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে রাইফেল গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল আর একটা গ্রেনেড। চারটে রেজাকারের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাঁধের ওপর।

আর দুটো?

দু'পাশ থেকে ছেলেরা এগিয়ে আসতে লাগল তাঁবুর দিকে। খুব সন্তর্পণে। নিঃশব্দে। একটা সম্ভাবনা সবার মনেই জাগছিল। ওরা কি মরে গেছে? গুরুতর আহত? অথবা শত্রুকে কাছে টেনে আনবার জন্যে ঘাপটি মেরে আছে?

হঠাৎ শতচ্ছিন্ন তাঁবুটার ভিতর থেকে একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল। অতি ক্ষীণ শব্দ একটা। মনে হল কেউ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ওরা আরো কাছে এগিয়ে এল। একজন খুব কাছে থেকে ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। তাঁবুর একেবারে পার ঘেঁষে একটা রেজাকার পড়ে আছে। মাথার এক দিকটা ওর উড়ে গেছে। ঘিলুগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃষ্টির জলে এখন ধুয়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ লোকটা তাঁবুর পিছন দিক ঘেঁষে শুয়ে বা বসে ছিল। প্রথম চোটটা পেয়েছে ও-ই। একটু ভিতর দিকে আর একজন চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ডান হাতের কনুই অবধি উড়ে গেছে। বাঁ হাত দিয়ে বুকের ডানদিকটা চেপে ধরে আছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। চোখ বুজে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টানছে। নিঃশ্বাস নেবার সময় এমনভাবে হাঁ করছে যেন ও একবারেই আকাশের নিচের সবটা বাতাস টেনে নিতে চায়।

গেরিলাটি আরো দু'পা এগিয়ে গেল। আর একটু ঝুঁকে পড়ে আহত রেজাকারটার মুখটা দেখবার চেষ্টা করল। ছেঁড়া তাঁবুর একটা ফালি একটু তুলে ধরতেই খানিকটা আলো পড়ল। এবার মুখটা বেশ দেখা গেল। মুখময় রক্তে মাখামাখি। গেরিলাটি চঞ্চল হয়ে উঠল। বন্দুকটা শক্ত করে দু' হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। নিচের ঠোঁটটা ঘন ঘন কামড়াতে লাগল। মনে হল একটা প্রচণ্ড আবেগ ও চাপতে চাইছে। ছেলেটি রেজাকারটার মুখের ওপর থেকে চোখ যেন সরাতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত হেরে গেল ছেলেটি। ছুটে গিয়ে রেজাকারটির মুখের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিৎকার করে ডাকল, 'ফরিদ!'

দুঃসহ সেই যন্ত্রণা থেকে মুহূর্তের জন্যে যেন মুক্তি পেল রেজাকারটা। ওর দেহটা একবার কেঁপে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টার পর চোখের পাতা যেন একটু ফাঁসগা হল। চকচকে মণিদুটো কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। ছেলেটি আরো একটু ঝুঁকে পড়ল। ফরিদের দৃষ্টি এবার ছেলেটির মুখে আটকে গেল। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির মতো ফুটেই আবার মিলিয়ে গেল। ঠোঁটদুটো একবার নাড়ল। মনে হলো কিছু বলতে চায়। কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না। ফরিদ হাঁ করে খানিকটা বাতাস টেনে নিল। শুকনো ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু জিবটা বের করতে পারল না। আবার বাতাস টেনে নিল খানিকটা। এবার ফিস-ফিসানির মতো শুনা গেল 'ভাইজান!'

'হাঁ।'

'তুমি গেরিলা?'

'হাঁ।'

'ওরা সব মরে গেছে?'

'হাঁ।'

'আমিও মরব।'

গেরিলাটি কোন উত্তর দিল না। বুকের ওপর রাখা ফরিদের হাতের ওপর নিজের হাতখানা রাখল। হাতখানা রক্তে ভিজে গেল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে খানিকটা রক্ত উপচে পড়ল।

'আম্মা, গুলশান, রাবেয়া?' আবার ফিসফিস করে বলল ফরিদ।

'আমি ওদের সরিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আব্বা?'

'ওকেও। ওরা আমাদের বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'আল্লা!' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু বুকের ভিতরে ততখানি বাতাস ছিল না বোধহয়। তাই খানিকটা বাতাসই টেনে নিল ফরিদ।

'খানেদের আমরা খতম করে দিয়েছি।'

ফরিদের মুখখানা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আবু মিঞা?'

'ওকেও।'

'আঃ।' একটা স্বস্তিসূচক শব্দ করল ফরিদ। 'ও আর বেইমান তৈরী করতে পারবে না।' থেমে থেমে বলল।

'না।'

'আমি বেইমান। বেইমানী করেছি—বড় কষ্ট।'

'কেন করলিরে ফরিদ?'

'বুঝিনি। আল্লা বিচার করেছেন। আল্লা—।' আর্তনাদ করে উঠল ফরিদ। মুখটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেল। সংগে সংগে মাথাটা কাত হয়ে পড়ল। বুক থেকে খসে পড়ল হাতখানা। বুকের ফুটোটা একটা কালো গহ্বরের মতো দেখা গেল। এখন আর রক্ত পড়ছে না। শেষ হয়ে গেছে। শুধু চোখের কোলে দু-ফোঁটা জল চিকচিক করছে।

'আমেন।' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল কামাল। ফরিদের সহোদর একমাত্র জীবিত ভাই কামাল। হাতের পিঠ দিয়ে নিজের চোখদুটো মুছে ফেলল। তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফালি তুলে নিয়ে ফরিদের শান্ত মুখখানা ঢেকে দিল। তারপর গট-গট করে বেরিয়ে এল।

'চল। অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল! সংগীদের দিকে তাকিয়ে আদেশের ভঙ্গীতে বলল কামাল।
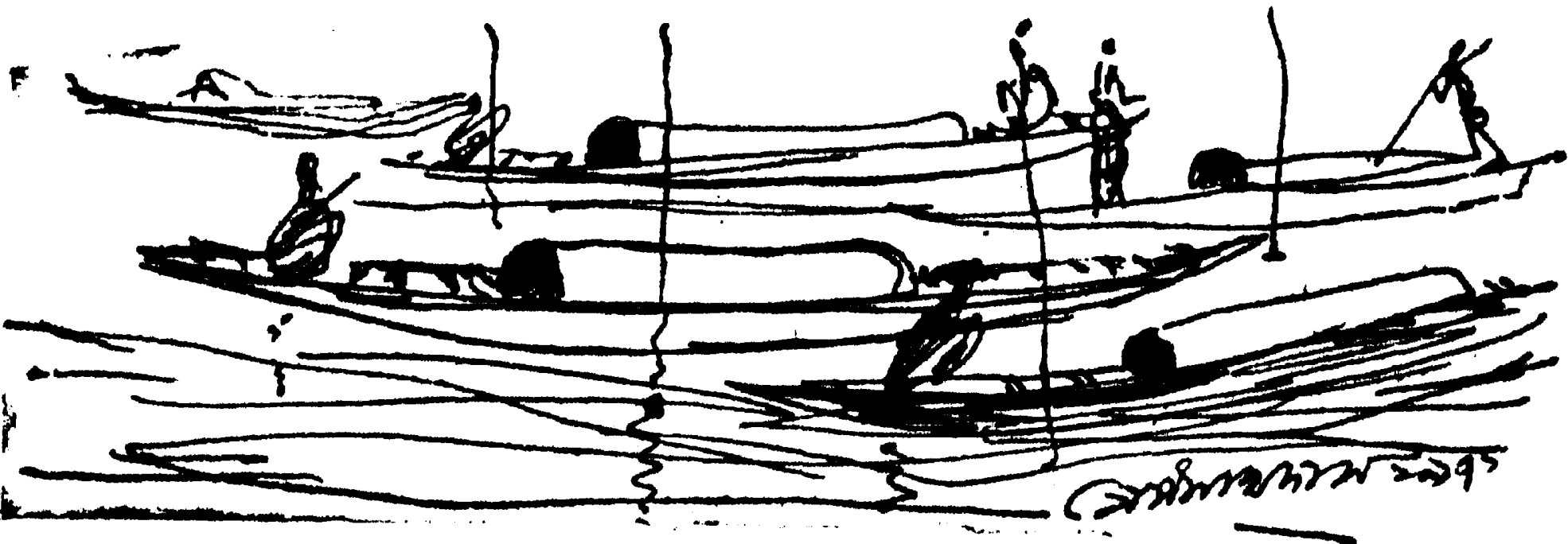
ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

অতুল চক্রবর্তী

এক ছুটির দিনে শহরের উপকণ্ঠে এক বৌদ্ধ-বিহারের মন্দির প্রাঙ্গণে তৃণ-ভূমির ওপরে বসে নিভৃতে একটু বিশ্রাম উপভোগ করছিলাম। কোলাহল থেকে দূরে স্থানটি একটু জনবিরল তাই পরিবেশটিও কল্পনা প্রবণতার অনুকূল।

লক্ষ্য করলাম দর্শনার্থীরা একে একে এসে বিগ্রহের সামনে প্রণিপাত জানিয়ে চত্বরের বড় পিতল-নির্মিত ঘণ্টাটি বাজিয়ে দিয়ে প্রস্থান করছে। ঘণ্টার প্রতিধ্বনি কিছুক্ষণ বায়ুমণ্ডলে এক সুমধুর ঝংকার সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার আকাশে। এই কম্পিত বিলীয়মান রেশ শ্রবণ করে স্বভাবতই মনটা একটু ভাব-বিনম্র হয়ে উঠল।

মনে হলো দেবালয়ের সঙ্গে ধ্বনি-বিস্তারের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন:— 'মেঘের ওপর মেঘ জমেছে, রঙের ওপর রং, মন্দিরেতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং।'

বহুদিন সান্ধ্য ভ্রমণে সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের পাশ দিয়ে গেছি। অনেকদিন গীর্জার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ডিং—ডং—ডিং-ডং—ডিং—ডং শব্দ শ্রুতিগোচর হয়েছে। ওটা সান্ধ্য-উপাসনার প্রারম্ভিক সংকেত। ও গুরুগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করে মন স্বতই শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়ে আসে।

মসজিদে সম্ভবতঃ ঘণ্টাধ্বনির রেওয়াজ নেই। কিন্তু মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের করুণ উদাত্ত কণ্ঠের আজান হয়তো অনেকেই শুনেছেন। সেই কণ্ঠধ্বনির প্রভাবও বড় কম নয়। কবি বলেছেন:—

'মসজিদ হইতে আজান হাঁকিছে
বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামোৎ
ভাবিতেছি কত দূরে।'

এতো গেল আধ্যাত্মিক জগতের কথা। আমাদের সাধারণ জীবনের ধাপে-ধাপে ঘণ্টাধ্বনির অবদান প্রভূত। শৈশবে মনে পড়ে ঠুন-ঠুন, ঠুন-ঠুন করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ফেরিওয়ালা যখন হেঁকে যেতো 'গোলাপ ছড়ি', তখন সেই চিনির ঘন রসে জমানো অপূর্ব সুস্বাদু মিঠাই সেবন করবার জন্য জিহ্বা লালায়িত হয়ে উঠত। মনে পড়ে স্কুলের দিনগুলির কথা। ঠিক বেলা দশটায় বিদ্যালয়ের পেটাঘড়ির সময়-সংকেত শ্রুত হওয়া মাত্রই খেলাধুলো পরিত্যাগ করে বিষণ্ণ মুখে ক্লাশে গিয়ে হাজির হতাম। আবার বিকেল সাড়ে চারটেয় যখন ছুটির ঘণ্টা পড়তো, দ্রুততালে একটানা ঢন্-ঢন্, ঢন-ঢন...। কী উল্লাস! কী আনন্দ তখন ছাত্রদলের মধ্যে। মুখর কোলাহলে কলরব করতে করতে বেরিয়ে আসতো সব ছেলেরা ভিড় করে।

রেলগাড়িতে চড়ে যখন কোথাও বাইরে যাওয়ার কথা হতো, তখন এক নতুন উদ্দীপনা, উৎসাহ। স্টেশনে পেঁছেই কান পেতে থাকতাম ঘণ্টা শোনবার জন্য। হঠাৎ এক সময়ে ঘণ্টা বেজে উঠতো—ঠন্-ঠন্, ঠন-ঠন...। মুহূর্তে সাড়া ও চঞ্চলতা জেগে উঠতো যাত্রীদের মধ্যে। ওটা টিকিট কাটবার ঘণ্টা। ট্রেন আসবার আর বেশি দেরি নাই। আগের স্টেশন পর্যন্ত এসে পেঁছে গেছে। গাড়ি যখন ছেড়ে যেতো, তারও ছিল একটি বিশেষ ধরনের ঘণ্টা। চারটি অথবা ছ'টি আওয়াজ হতো ছাড়া-ছাড়া ভাবে। ঠন-ঠন। ঠন-ঠন। ঠন-ঠন।

এইসব শৈশব-স্মৃতির কথা বাদ দিলেও সংসারের অনেক গুরুতর ঘটনার সংকেত-ধ্বনি হিসেবে ঘণ্টার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। দমকলের ঘণ্টা সম্ভবতঃ আমরা প্রত্যেকেই শুনেছি। ফায়ার ব্রিগেডের লাল গাড়ি যখন মুহুর্মুহুঃ ঢন-ঢন-ঢন-ঢন.. আওয়াজ করতে করতে তুফানের মত ছুটে আসে, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রাস্তার অন্য সব যানবাহন পাথরের মত দাঁড়িয়ে যায় পথ ছেড়ে দিতে।

জেলখানার পাগলা ঘণ্টিও বোধহয় অনেকেই শুনেছেন। আমার বাল্যকাল পূর্ব বাংলার ছোট একটা শহরে কেটেছে। সেখানে পাগলা ঘণ্টি শ্রবণ এবং তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ ঘটেছে আমার। পাগলা ঘণ্টির একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। দীর্ঘকাল ধরে দ্রুত লয়ে অবিশ্রান্ত বাজতে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যায় বিপদ সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে বিউগিল। জেলের প্রহরীরা যে-অবস্থায় থাকুক ছুটে বেরিয়ে আসে ব্যারাক থেকে হাতে হাতিয়ার নিয়ে। জেলখানার প্রায় মাইলখানেক দূরে ছিল পুলিশ লাইনস, সেখানেও পৌঁছে যায় সংবাদ টেলিফোনের মাধ্যমে। তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে একদল সান্ত্রী হাতিয়ার বন্দুক সঙ্গে নিয়ে ডবল-কুইক-মার্চ করতে করতে। তারপর খুলে যায় কারাগারের বড় লৌহ-কপাট। অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে সান্ত্রীদল। মাঝে মাঝে ভেসে আসে হাবিলদার জমাদারদের রুক্ষ কণ্ঠের কর্কশ আদেশ।

জেলের অভ্যন্তরে কয়েদীদের অবস্থাও হয়ে ওঠে অত্যন্ত শোচনীয়। যে যে কাজেই লিপ্ত থাকুক, ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ কক্ষ আশ্রয় করতে হয়। তারপর হয় মাথাগুন্তি এবং তালা পড়ে যায় প্রত্যেক ব্লকে। স্বস্থানে অনুপস্থিত থাকলে অথবা আইনবিরুদ্ধ আচরণ করলে কয়েদিদের ভাগ্যে যে কঠোর শাস্তির বিধান তা সহজেই অনুমেয়।

সে যাই হোক, বর্তমান কালে কিন্তু কারফিউ ঘণ্টার অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। আজকের দিনে কারফিউ-এর সঙ্গে আমরা কেই বা না পরিচিত। আজকে বেহালায়, কালকে বেলেঘাটায়, পরশু টালিগঞ্জে, তার পরদিন উত্তরপাড়ায়। এটা এখন আমাদের জীবনের এক দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ কারফিউ-এর মূল অর্থ কিন্তু এক সম্পূর্ণ বিপরীত পটভূমি থেকে উদ্ভূত।

মধ্যযুগের ইওরোপে রাত্রি আটটা অথবা নটার সময়ে নগর-রক্ষীরা কারফিউ ঘণ্টা বাজিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করে দিত যেন প্রত্যেক গৃহস্বামী তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে আগুন এবং আলো নিভিয়ে ফেলেন। তখন ইওরোপের বেশির ভাগ ঘর-বাড়িই ছিল কাষ্ঠনির্মিত। কাজেই রাত্রিতে অসাবধানতাবশতঃ ঘরে যাতে আগুন লেগে না যায় তারই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কারফিউ ঘণ্টা বাজানো হতো। সেইজন্য এখনও একে 'সান্ধ্য আইন' বলা হয়। তখনকার দিনে ক্ষৌরকারেরা সমাজের অস্ত্র চিকিৎসক হিসেবে পরিগণিত ছিল। তাই তাদের ওপরে কখনও সান্ধ্য-আইন প্রয়োগ করা হতো না।

বর্তমান যুগে সকল দেশের সেনাবাহিনীই এই সান্ধ্যআইন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজকতা বন্ধ করবার জন্য প্রয়োগ করছে। এখন আর দিনরাত্রির প্রশ্ন নেই। বিনা-ছাড়পত্রে কারফিউ এলাকায় প্রবেশ করলেই গুলী অথবা গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিতে হবে।

ঘণ্টাপ্রসঙ্গ চিন্তা করতে করতে পৃথিবীর কয়েকটি ইতিহাসবিখ্যাত ঘণ্টার কথা মনে পড়ল। তাদের মধ্যে লণ্ডনে পার্লামেন্ট ভবনের ঘড়িস্তম্ভের ওপর স্থাপিত সাড়ে তের টন ওজনের সুবৃহৎ ঘণ্টা বিগ-বেন অন্যতম। ইংরেজ জাতির জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী এই 'বিগ-বেন' এবং বিশ্ববিশ্রুত এর খ্যাতি। এটা স্থাপিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। এই ঘণ্টার নির্মাতা স্যর বেঞ্জামিন হল, বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দেহাবয়বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পার্লামেন্টের সদস্যরা এই ঘণ্টার নাম দিলেন 'বিগ-বেন'।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের পূর্ব দিবসে বিগ-বেনের ধ্বনি সংকেত বৃটিশ বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসী প্রথম শ্রবণ করল। আবার ১৯৪৯ সালে নববর্ষের পূর্ব দিবসে আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে

টেলিভিসনের পর্দায় বিগ-বেন বিষ্কবাসীর দৃশ্যপটে প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আজও ইংরেজ জাতির জীবনে, রাজ-অভিষেক থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধ-ঘোষণা পর্যন্ত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই, বিগ-বেনের সময়নির্দেশে সূচিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে প্যারিস শহরের বিখ্যাত গীর্জা নোট্রডেমের বিপুল ঘণ্টা ইম্যানুয়েলের নামও মনে পড়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়, সেই সময়ে বিপ্লবী বাহিনী ফ্রান্সের বহু গীর্জা উৎপীড়ক রাজতন্ত্রের প্রতীক মনে করে ধ্বংস করে ফেলে এবং গীর্জার ঘণ্টাগুলো সব গলিয়ে কামান তৈরির কাজে লাগায়। কিন্তু প্যারিসের নোট্রডেম গীর্জার ঘণ্টা তারা বিনষ্ট করেনি। এই ঘণ্টাটি ব্যবহৃত হতো বিপ্লবী ফৌজের বিপদ-সংকেতরূপে। এই ঘণ্টার সুদূরবিসারী তরঙ্গায়িত ধ্বনি শোনামাত্রই প্যারিসের বিপ্লবী জনতা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতো রাজপথে, আপন আপন গৃহগণ্ডী পরিত্যাগ করে, বিপন্ন সাধারণতন্ত্রের রক্ষাকল্পে। পরবর্তীকালে অবিশ্যি পুনর্বার উপাসনার আহ্বান হিসেবেও এই ঘণ্টা ব্যবহৃত হয়েছে।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফৌজ প্যারিস দখল করবার পর থেকে প্রায় চার বৎসরকাল নোট্রডেমের ইম্যানুয়েল নীরব হয়েছিল। হঠাৎ ১৯৪৪ সালের ২৪শে আগস্ট রাত্রি সাড়ে নটার পর থেকে মুহুর্মুহুঃ ইম্যানুয়েলের তরঙ্গায়িত ধ্বনি সারা প্যারিস শহর জুড়ে অবিশ্রান্ত শোনা যেতে লাগল আর দূরে থেকে ভেসে আসতে লাগল কামান ও এরোপ্লেনের গর্জন। এই গর্জন যেন ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং তা ছাপিয়ে অবিশ্রান্ত বিশ্রুত হচ্ছে ইম্যানুয়েলের ধাতব ঝঙ্কার।

কারণও ছিল। ৬ই জুন যে ইংরেজ ও মার্কিন বাহিনী নর্মাণ্ডির উপকূলে আক্রমণ করেছিল, তারা তখন প্যারিসের প্রান্ত-সীমায় এসে পৌঁছেছে। জার্মান বাহিনী ক্রমশ পিছু হটে যাচ্ছে। প্যারিসের মুক্তি আসন্ন।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট মানব-ইতিহাসের একটি শোচনীয় দিন। ঐদিন জাপানের হিরোশিমা শহরে মার্কিন বিমান কর্তৃক প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এর ফলে যে বিপুল ধনপ্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল তার বিবরণ আজ পর্যন্ত বহু লেখকই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই বায়ুচাপ এবং উত্তাপ এমন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে এক মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রায় তেষট্টি হাজার অট্টালিকা সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত কাঠামোগুলো গলে যায়। সহস্র সহস্র টন ভগ্নাবশেষ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শহরের উত্তরসীমায় স্তূপাকার হয়ে ওঠে। বায়ুমণ্ডলের এই আকস্মিক বিপর্যয়ের ফলে অবিলম্বেই এক ভয়ঙ্কর টাইফুনের সৃষ্টি হয় এবং সমুদ্র থেকে বিপুল জলোচ্ছ্বাস শহরে প্রবেশ করতে থাকে।

প্রাথমিক হিসেবে প্রায় তিন লক্ষ মানব বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষ পরিণামে নিহত হয়। এ ছাড়া পরোক্ষ পরিণামে বহু বৎসর ধরে এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া হিরোশিমার জলবায়ু দূষিত করে আরও বহু লোকের জীবন হরণ করেছে।

জাপানীরা এই বিভীষিকাময় দিনটিকে অবিস্মরণীয় করে রাখবার জন্য হিরোশিমাতে এক মর্মর মন্দির রচনা করে তার নাম দিয়েছে 'বিশ্ব শান্তি মন্দির'। এই মন্দিরের চূড়া থেকে প্রতি বৎসর ৬ই আগস্ট বেলা আটটা পনেরো মিনিটে (অর্থাৎ যখন বিস্ফোরণ ঘটেছিল) দীর্ঘকাল ধরে ঘণ্টাধ্বনি হতে থাকে—ডিং-ডং-ডিং, ডিং-ডং-ডিং, ডিং-ডং-ডিং। সে যেন বলতে চায়—সি-গো-টো, সি-গো-টো, যা-সু-মে। অর্থাৎ ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, বন্ধ করো নৃশংসতা।

এতো গেল ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঘণ্টাধ্বনির দৃষ্টান্ত। রূপ-কথার জগতেও যে ঘণ্টাধ্বনি আপন মাহাত্ম্যের আসন গ্রহণ করেছে তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

চীন মহাদেশে তখন স্যাং বংশের রাজত্বকাল, খৃষ্টপূর্ব প্রায় একাদশ শতাব্দী আগের কথা। প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট কুর্মালিং তাঁর নাটমন্দিরের জন্য নগরের কুশলী শিল্পী ওয়াংলুনকে এমন একটি ঘণ্টা নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছেন যার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে যেন বনের পশু পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে পড়ে।

ওয়াংলুন এমন ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সামনে আর কখনও উপস্থিত হয়নি। একে একে আটবার চেষ্টা করে সে ব্যর্থকাম হলো। ঘণ্টার আওয়াজ সম্রাটের আর কিছুতেই পছন্দ হয় না। অবশেষে কুপিত হয়ে সম্রাট পুনর্বার আদেশ দিলেন, নবমবারে যদি ওয়াংলুন অকৃতকার্য হয় তবে তার গর্দান যাবে। সম্রাটের আদেশ শুনে তো ওয়াংলুন বাসায় এসে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। কোন পথ সে চোখের সামনে দেখতে পেল না। দীঘির পারে বসে ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আবছা কালো জলের ওপর বিশাল রাজ-প্রাসাদ ও তার সন্নিহিত প্যাগোডার উঁচু চূড়ার প্রতিবিম্ব পড়েছে। জোনাকির আলো জ্বলতে আরম্ভ করেছে বনভূমির আড়ালে আড়ালে। ওয়াংলুন কিন্তু ঠায় বসে আছে একমনে মাথা নীচু করে। সে শুধু ভাবছে, পৃথিবী এতো সুন্দর অথচ এতো নিষ্ঠুর!

ওয়াংলুনের এক কিশোরী মেয়ে ছিল, নাম তার 'কোয়াই'। সহসা কোয়াই এসে বাবাকে বলে,—বাবা বৃথা তুমি ভাবছো কেন! এবারে তুমি চেষ্টা কর, নিশ্চয় তোমার চেষ্টা সফল হবে।

মেয়ের কথায় বাপ আবার সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। এইবার তার শেষ প্রচেষ্টা। মাটিতে একটা প্রকাণ্ড ছাঁচ কাটলো, তার পর বিরাট এক চুল্লিতে তামা, পেতল, সোনা, রুপো ইত্যাদি অষ্টধাতু গলিয়ে ঢেলে দিল ভূগর্ভস্থিত বিশাল ছাঁচের মধ্যে। নিজের কর্মোন্মাদনা এবং রাজাদেশের দুশ্চিন্তায় ওয়াংলুনের মন তখন দিশেহারা। জগতের কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করবার অবসর তার হাতে নেই। সময় প্রায় তিন প্রহর গত হলে গলিত ধাতু জমাট বাঁধবার পর ঘণ্টাটাকে ছাঁচ থেকে তুলে প্রথম আঘাত করতেই অপূর্ব করুণ মূর্চ্ছনায় বেজে উঠল—কোয়াই! কোয়াই!

আর বনমর্মরে তার প্রতিধ্বনি জাগল—শিয়ে! শিয়ে! —আমি বাবা! আমি বাবা!

হঠাৎ খেয়াল হলো ওয়াংলুনের, তাইতো! আমার মেয়ে কোয়াই কোথায়! কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুড়ো ওয়াংলুন দেখতে পেলো, ছাঁচের কিনারে তার মেয়ের পায়ের দুটি মখমল পাদুকা পড়ে রয়েছে। মনের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। বুঝতে আর কারোই বাকি থাকলো না, গলিত তরল ধাতুতে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে কোয়াই পিতার জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছে।

এবার কিন্তু সম্রাট কুর্মালিং-এর ঘণ্টাটি পছন্দ হলো। শিল্পীকে তিনি মুক্তহস্তে পুরস্কার দান করলেন। বারংবার ঘণ্টাটি বাজতে লাগল—কোয়াই! কোয়াই! —যেন বিরহী পিতার বক্ষভেদী ক্রন্দন। বারংবার বনমর্মরে প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হতে লাগল—শিয়ে! শিয়ে! —আমি বাবা! আমি বাবা!

১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির শ্রেণীবিভাগ, মুক্তির তারিখ, প্রযোজক সংস্থার নামসহ তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ছবির নাম	প্রযোজক সংস্থা	মুক্তির তারিখ	শ্রেণী বিভাগ
১।	এখানে পিঞ্জর	কলামন্দির	২২ জানুয়ারী	সামাজিক
২।	নবরাগ	এস, এম, ফিল্মস	৪ ফেব্রুয়ারী	গার্হস্থ
৩।	প্রতিবাদ	আর্ট মুভীজ	২৬ "	সামাজিক
৪।	জয়জয়ন্তী	এম-কে-জি	১২ মার্চ	গীতিবহুল গার্হস্থ
৫।	চৈতালী	বনশল-রাজশ্রী প্রোঃ	১৯ "	গীতিবহুল গার্হস্থ
৬।	সোনা বৌদি	দীনেশ চিত্রম্	২৬ "	গার্হস্থ
৭।	জননী	রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া	১৬ এপ্রিল	গার্হস্থ
৮।	এখনই	কে-এল কাপুর ফিল্মস্	৩০ "	সামাজিক
৯।	মাল্যদান	চিত্রলিপি ফিল্মস্	১৪ মে	গার্হস্থ
১০।	নিমন্ত্রণ	ভারতচিত্র	২১ "	প্রেমধর্মী গার্হস্থ
১১।	প্রথম বসন্ত	ছায়ারূপা	২৮ "	গার্হস্থ
১২।	ধন্যি মেয়ে	শ্রীপ্রোডাকসন্স	১৮ জুন	কৌতুকাশ্রয়ী গার্হস্থ
১৩।	নিশাচর	গুপ্তশ্রী প্রোডাকসন্স	১৬ জুলাই	রহস্যধর্মী
১৪।	কুহেলি	প্রিয়া ফিল্মস্	১৩ আগস্ট	রহস্যধর্মী
১৫।	প্রথম প্রতিশ্রুতি	কস্তুরী ফিল্মস্	২০ "	সামাজিক
১৬।	অন্য মাটি অন্য রং	রামকৃষ্ণ কোলে	২৭ "	সমস্যাপ্রধান
১৭।	শচীমার সংসার	মালবিকা চিত্র	২৭ "	ভক্তিমূলক জীবনী
১৮।	সীমাবদ্ধ	চিত্রাঞ্জলি	২৪ সেপ্টেম্বর	সমকালীন সামাজিক
১৯।	খুঁজে বেড়াই	গীতালি পিকচার্স	২৪ "	সমস্যামূলক সামাজিক
২০।	জয় বাংলা	মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরী	২৪ "	সমকালীন রাজনৈতিক
২১।	মহাবিপ্লবী অর	শ্রীকমলা ফিল্মস্	১৫ অক্টোবর	জীবনীমূলক
২২।	জীবন জিজ্ঞাসা	বি-এম-ডি মুভীজ	১৫ "	সামাজিক
২৩।	ত্রিনয়নী মা	রূপেশ্বরী চিত্রম্	১৫ "	পৌরাণিক ভক্তিমূলক
২৪।	আটাত্তর দিন পরে	এম-এল প্রোডাকসন্স	২৯ "	সমকালীন সমস্যামূলক
২৫।	ফরিয়াদ	পণ্য পিকচার্স	৫ নভেম্বর	সামাজিক
২৬।	ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টান্ট	জয়দীপ পিকচার্স	১২ "	হাস্যরসাত্মক
২৭।	ছদ্মবেশী	চলচ্চিত্র ভারতী	২৬ "	হাস্যরসাত্মক
২৮।	সংসার	নর্মদা পিকচার্স	২৪ ডিসেম্বর	গার্হস্থ

প্রেক্ষাগৃহ

১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির সালতামামি।

সঙ্গের তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতার আশে-পাশে (টালিগঞ্জ এবং উল্টাডাঙ্গা) তৈরী ১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির সংখ্যা হচ্ছে ২৮টি। এর সঙ্গে অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে যা হচ্ছে স্বাধীন বাঙলা দেশ) নির্মিত '**জীবন থেকে নেয়া**' (২৪ ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত) ও বাঙলায় ভাষান্তরিত (ডাবিং করা) দুখানি দক্ষিণ ভারতীয় পৌরাণিক ছবি — **হর-পার্বতী** (১২ ফেব্রুয়ারীতে মুক্তিপ্রাপ্ত) ও **সীতার বনবাস** (২২ অকটোবর মুক্তিপ্রাপ্ত) এবং একখানি বোম্বের রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের হিন্দী সামাজিক ছবি **ভাগ্য** (১২ ফেব্রুয়ারীতে মুক্তিপ্রাপ্ত) যোগ করলে মোট বাঙলা ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২টি। আগের বছরে এই সংখ্যা ছিল ২৭টি, যার মধ্যে ডাবিং করা ছবি ছিল মাত্র একটি।

পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত ২৮টি ছবির শ্রেণী বিভাগের দিকে নজর দিলে দেখতে পাওয়া যাবে, খাঁটি জীবনীচিত্র বলতে এ-বছরে মাত্র একখানিই তৈরী হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে কমলা ফিল্মস নির্মিত **মহাবিপ্লবী অরবিন্দ**। মালবিকা চিত্রের **শচীমার সংসার** মহাপ্রভুর বাল্যলীলা থেকে সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাগুলি অবলম্বনে গঠিত—এটি ভক্তি-মূলক জীবনী চিত্র বলে চিহ্নিত হলেও ছবির দৃশ্য রচনায় বহু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। রূপেশ্বরী চিত্রম নির্মিত **ত্রিনয়নী মা** সোজাসুজি ভক্তিমূলক পৌরাণিক ছবি। বাকী ২৫ খানির মধ্যে গুপ্তশ্রী প্রোডাকসন্স-এর **নিশাচর** এবং প্রিয়া ফিল্মস-এর **কুহেলি** হচ্ছে প্রধানত রহস্যচিত্র। এই দুটির মধ্যে তরুণ মজুমদার পরিচালিত কুহেলি ছবিখানি যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সে-কথা, আশা করি পাঠকদের স্মরণ আছে। এম-কে-জি নিবেদিত ও সুনীল বসু মল্লিক পরিচালিত **জয়জয়ন্তী** এবং বনশল-রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের নিবেদন সুধীর মুখোপাধ্যায় পরি-চালিত **চৈতালী**—এই দুখানি গীতিবহুল ছবির মধ্যে প্রথমখানিই যে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল,এ-কথাও আমরা ভুলি নি। বলা বাহুল্য, সাউণ্ড অব মিউজিক-এর এটি বাঙলা অনুকরণ। এ বছরে হাস্যরসপ্রধান ছবি আমরা পেয়েছি তিনখানি : এক, **ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টান্ট**, দুই, **ছদ্মবেশী** এবং তিন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত **ধন্যি মেয়ে**। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর ছাত্রী জয়া ভাদুড়ীর সাবলীল স্বচ্ছন্দ অভিনয় এবং পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরস বিতরণের দক্ষতা ধন্যি মেয়েকে বছরের সার্থকতম হাস্যরসপ্রধান চলচ্চিত্র করে তুলেছে।

বাকী ১৮ খানি ছবির মধ্যে অনাবিল প্রেমের চিত্র হিসেবে তরুণ মজুমদার পরি-চালিত **নিমন্ত্রণ** একটি অনন্যসাধারণ ছবি। বালিকার মধ্যে যৌনপ্রেম জাগরণের কাহিনী হিসেবে আমরা অতীতে পেয়েছি সমাপ্তি ও বালিকাবধূ। বর্তমান বছরে পেয়েছি **মাল্যদান**, যার কাহিনীকার হচ্ছেন রবীন্দ্র-নাথ। সমাপ্তিও রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অবলম্বনেই নির্মিত হয়েছিল।

চূড়ান্ত সমকালীন চিত্র হচ্ছে মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরী নিবেদিত **জয় বাংলা**।

পূর্ববঙ্গে জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে যখন মুক্তি-সেনারা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক তখনই ঐ সংগ্রামকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে এই ছবিখানি। এতে উভয় বাঙলার বহু শিল্পী—এমন কি সুচিত্রা মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁরা কখনও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন নি, তাঁরাও—অংশগ্রহণ করেছেন। এ-ছাড়া ছবিটির মধ্যে বহু তথ্য-চিত্রেরও সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। ঐকান্তিকতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের বাস্তবধর্মী ছবিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করবার জন্যে যে প্রস্তুতি এবং অর্থসামর্থ্যের প্রয়োজন, তার একান্ত অভাবের দরুন ছবিটি তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি।

একান্ত কর্মহীনতা এবং অর্থো-পার্জনের ন্যায়সঙ্গত সুযোগের অভাব পশ্চিমবঙ্গের তরুণ-তরুণীদের মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে এবং তাদের একটি বৃহৎ অংশকে যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করেছে, তাকে চিত্রায়িত করে এ-বছর নির্মিত হয়েছে : (১) **এখানে পিঞ্জর** (বছরের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র), (২) **প্রতিবাদ**, (৩) **সোনা বৌদি**, (৪) **এখনই**, (৫) **অন্য মাটি অন্য রং**, (৬) **খুঁজে বেড়াই** এবং (৭) **আটাত্তর দিন পরে**। মালগাড়ী ভেঙে মাল পাচার করা যাদের কাজ, সেই ওয়াগন রেকারদের জীবন অবলম্বন করে আটাত্তর দিন পরে ছবি-খানি নির্মিত হয়েছে। শিক্ষিত যুবক-যুবতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিশেহারা হওয়াকে অত্যন্ত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তপন সিংহ 'এখনই' ছবিখানির মাধ্যমে। ছবিখানির জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য এর সুবর্ণজয়ন্তী সপ্তাহ পালন। এখানে পিঞ্জর এবং খুঁজে বেড়াই ছবিতেও বেকারত্বের সমস্যা প্রোজ্জ্বলভাবে চিত্রিত।

আজকের সমাজে বৈষয়িক উন্নতির সোপান বেয়ে উপরের ধাপে উঠতে গেলে যে নৈতিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাকে চিত্রিত করেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর **সীমাবদ্ধ** ছবির মাধ্যমে। **নবরাগ**, জীবন জিজ্ঞাসা ও ফরিয়াদ ছবি নারীর মর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। **প্রথম প্রতিশ্রুতিতে** আমরা বিস্মৃত বিগত যুগের একটি সমাজচিত্র পাই। **প্রথম বসন্ত** ছবিতে আছে বিবাহের পূর্বে তরুণ-তরুণীর মনের দোলাচল অবস্থার চিত্র। **জননী** ছবির বিষয়বস্তু এর নামেই প্রকাশিত। অর্থবলে বলীয়ান হয়ে একটি অশুভ শক্তি একটি সংসারের সুখকে কিভাবে বিঘ্নিত করতে পারে, তারই নিদর্শন পাওয়া যায় বছরের শেষতম মুক্তি **সংসার** ছবিতে।

এবারে আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে মাত্র একখানি ছবি পেয়েছি এবং তারও আবেদন শিল্পগত নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ। তপন সিংহও শিক্ষিত বেকারদের জীবনপ্রশ্ন নিয়ে যে-ছবি করেছেন, তা অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শিল্পসৃষ্টিরূপে চূড়ান্ত সার্থকতা-লাভ করেনি। আমাদের রসবোধকে ঢের বেশী তৃপ্ত করেছেন তরুণ মজুমদার তাঁর নিমন্ত্রণ ছবির মাধ্যমে। নরনারীর অন্ত-র্নিহিত প্রেমের এমন সার্থক চিত্রায়ণ আমরা কচিৎ দেখেছি। শ্রীমজুমদার আমাদের একখানি সার্থক রহস্য চিত্রও উপহার দিয়েছেন। দুখানি বিভিন্নধর্মী ছবি নির্মাণ করেছেন ভূপেন রায়; এক রহস্য-ধর্মী নিশাচর এবং দুই, ভক্তিমূলক জীবনী-চিত্র শচীমার সংসার। পরিচালক বিজয় বসু ও পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরীও প্রত্যেকে দুখানি করে ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন: শ্রীবসুর তৈরী ছবি দুটি হচ্ছে নবরাগ ও ফরিয়াদ এবং শ্রীরায়চৌধুরীর হচ্ছে ত্রিনয়নী মা ও ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট। সাক্ষ্য দত্ত, সলিল সেন, সুধীর মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অগ্রদূত, যাত্রিক, অজিত গাঙ্গুলী, অজিত লাহিড়ী, উমাপ্রসাদ মৈত্র, দীনেন গুপ্ত, অজয় কর, পীযূষ বসু, পীযূষ গাঙ্গুলী, নির্মল মিত্র—এ'রা প্রত্যেকেই এ-বছর একখানি করে ছবি তৈরী করেছেন। পরি-চালক হিসেবে নতুন পা বাড়ালেন চারজন: (১) তপেশ্বর প্রসাদ, (২) সুনীল বসু মল্লিক, (৩) রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও (৪) দীপক গুপ্ত। শ্রীবসুমল্লিক অবশ্য এর আগেও বেনামে পরিচালনার কাজ করেছেন; তবে স্বনামে এই প্রথম এবং সাফল্যমণ্ডিত প্রচণ্ড অসাফল্যের দুর্ভাগ্য অর্জন করেছে রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত অন্য মাটি অন্য রং; ছবিটি মাত্র এক সপ্তাহ চলেছিল কিংবা মাত্র ছিল।

বাঙলা ছবির রাজ্যে জনপ্রিয়তম নায়ক উত্তমকুমারকে দেখা গেছে এ বছর ছ'খানি ছবিতে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা দেখেছি তিনখানি ছবিতে। বিশ্বজিৎ অবতীর্ণ হয়েছেন দুখানি ছবিতে। সুচিত্রা সেন বিজয় বসু পরিচালিত দুটি ছবিতেই (নবরাগ ও ফরিয়াদ) দর্শকদের অভিনন্দন

পরিবর্তন
হিন্দী রঙীন ছবি
প্রযোজনা ও পরিচালনা
দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া।
প্রধান শিল্পী হেনা।
কলকাতায় সুটিং চলছে
ফটো : অমৃত

করেছেন। অপর্ণা সেনকে আমরা দেখেছি চারখানি ছবিতে সন্ধ্যা রায় ও মাধবী চক্রবর্তীকে দেখা গেছে দুখানি ছবিতে। সুপ্রিয়া দেবী একখানি ছবিতেই (জীবন জিজ্ঞাসা) আসর মাৎ করেছে। নবাগতারূপে আমরা পেয়েছি বরুণ চন্দ, জয়া ভাদুড়ী, সোনালী গুপ্ত, পারমিতা চৌধুরী প্রমুখকে। এ'দের ভিতর জয়া ভাদুড়ী ইতিমধ্যেই নিজেকে হিন্দী ও বাঙলা—দুই জগতেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সঙ্গীতপরিচালকরূপে সবচেয়ে বেশী কাজ করেছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; তিনি সবসমেত ছ'খানি ছবিতে সুরযোজনা করেছেন। শ্যামল মিত্র করেছেন তিনখানিতে, মানবেন্দ্র, কালীপদ সেন, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত ও রবীন চট্টোপাধ্যায়—প্রত্যেকে দু'খানিতে। শচীন দেববর্মণ বহুদিন বাদে বাঙলা ছবিতে সুরযোজনা করেছেন; কিন্তু চৈতালীতে তাঁর কাজ বিশেষ প্রশংসা লাভ করেনি। অজয় দাস, ভূপেন হাজারিকা, অনিল বাগচী ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যেকে একখানি ছবিতে সুরযোজনা করেছেন। নতুন সঙ্গীত পরিচালকরূপে আমরা পেয়েছি হৃদয় কুশারীকে।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্যে আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পও এবারে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশ কিছুদিন স্টুডিওর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ থেকেছে। ছবিঘরগুলির রাত্রির প্রদর্শনী প্রায়ই বন্ধ থেকেছে। ভারত-পাক যুদ্ধেও নিষ্প্রদীপ কলকাতায় এনেছিল শঙ্কাজনক পরিস্থিতি। ১৯৭০-এর শ্রেষ্ঠ বাঙলা ছবি "প্রতিদ্বন্দ্বী" সর্বভারতীয় সরকারী বিচারে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। অবশ্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের সম্মানলাভ করেছেন আমাদের সত্যজিৎ রায়।

এ-বছরে আমরা হারিয়েছি প্রবীণ পরিচালক দেবকীকুমার বসু, প্রফুল্ল রায়, সতু সেন এবং ক্যামেরাম্যান-পরিচালক যতীন দাসকে।

চিত্র-সমালোচনা

বিপর্যস্ত সংসার

একটি ঐশ্বর্যমদমত্ত অশুভ শক্তি কিভাবে একটি সুখী পরিবারে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল, সেই কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে **নর্মদা চিত্র নিবেদিত ও সলিল সেন পরিচালিত "সংসার"** ছবিটির মাধ্যমে। তিন ভাইয়ের মধ্যে মেজভাইয়ের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কাপড় কলের একটি নতুন মডেলকে কটন মিলের মালিক সমরেন্দ্র বসুর প্রবাসে থাকার সময়ে তার কুচক্রী ভাগ্নে অজিত আত্মসাৎ করে নেয় এবং একটি কোম্পানীকে দিয়ে পেটেণ্ট করিয়ে ফেলে। এতে আবিষ্কারকের মুষড়ে পড়বারই কথা। কিন্তু মুষড়ে-পড়া সত্যেনকে নবপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে তার স্ত্রী শান্তি। সে নিজের গহনা বন্ধক দিয়ে স্বামীকে আর একটি নতুনতর আবিষ্কারে সচেষ্ট করে তোলে এবং নিজের গহনা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় নিজের বড় জা, জ্যেষ্ঠা ভগিনীসদৃশ সতীর গহনাগুলিও তাঁর অজান্তে বন্ধক দেবার বন্দোবস্ত করে। ফলে, একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সমরেন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এসে প্রথমটা প্রতিবেশী বন্ধুর ছেলেদের ব্যবহারে হতচকিত হয়ে যান। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর বিলম্ব হয় না। নিজের ধুরন্ধর ভাগ্নে অজিতের কারসাজিই সকল অনিষ্টের মূল; তা' জানবার পরে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন এবং সকল অন্যায়ের সমাপ্তি ঘটান।

এই কাহিনীতে রোমাণ্টিক জুটি হয়েছে ছোটভাই সুভাষ ও তার বন্ধু মলয়ের ভগ্নী মীরা। কাহিনীর টানা-পোড়েনকে এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, দর্শক এক পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন পরিস্থিতিতে অবলীলাক্রমে উপনীত হন এবং সংসারটির অভাবনীয় বিপর্যয়ে সমব্যথী না হয়ে পারেন না। এইখানেই কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার-পরিচালক সলিল সেনের সার্থকতা।

ছবির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বিভিন্ন শিল্পীর অত্যুজ্জ্বল অভিনয়। সমরেন্দ্র বেশে বসন্ত চৌধুরী যেমন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই আন্তরিক হয়েছে তাঁর অভিনয়। ভাগ্নে অজিতের ক্রূর চরিত্রটি শেখর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা জীবন্তভাবে অভিনীত হয়েছে। সাংসারিক বিপর্যয়ে এবং ধনীর অমানুষিকতায় রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে সুভাষ, তার চরিত্রটির বাস্তব রূপায়ণ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ অভিনয় করেছেন অজিতের উগ্র আধুনিকা স্ত্রী মলির

জবান/একটি দৃশ্যে শমিত ভঞ্জ ও শেখর চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
—ফটো : অমৃত

ভূমিকায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। আধুনিকা মলি যখন সমরেন্দ্রের কাছে লজ্জাশীলা বৌমা হিসেবে দেখা দিচ্ছে এবং পরক্ষণেই অসহিষ্ণুভাবে অজিতকে আক্রমণ করছে এই অভিনয় করতে বাধ্য হওয়ায়, তখন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের নাটনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। শান্তি ও সতীর ভূমিকায় যথাক্রমে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণীর সহজ দরদী অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে। অপরাপর ভূমিকায় নন্দিনী মালিয়া (মীরা), সমর মুখোপাধ্যায় (মলয়), জহর রায় (মিঃ চুন্ডা), নির্মল চক্রবর্তী (সত্যেন), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (সুবোধ), অজয় গঙ্গোপাধ্যায় (মিঃ নন্দী), হরিধন মুখোপাধ্যায় (সতীর সম্পর্কিত আত্মীয়), শমিতা বিশ্বাস (মলয়ের স্ত্রী) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। কিন্তু ছবির চারখানি গান—কি সুরযোজনা, কি পরিস্থিতি অনুযায়ী উপস্থাপনা—কোনো দিক দিয়েই উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

নর্মদা পিকচার্স নিবেদিত ও সলিল সেন পরিচালিত 'সংসার' দর্শকসাধারণের কাছে বিষয়গুণে এবং অভিনয়গুণে আকর্ষণীয়।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

রূপাঙ্কনের 'সিঁড়ি' : মৃত্যুর শূন্যতা থেকে জীবনের অর্থময় গভীরতায়, অন্ধকারের গহীনতা থেকে সূর্যস্নাত আলোর প্রসন্নতায় উত্তীর্ণ হওয়া যদি বৃহত্তর জীবনসংগ্রামের সিদ্ধি হয়, তা হোলে হয়তো স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে রতনকুমার ঘোষের 'সিঁড়ি' একটি সার্থক উত্তরণের নাটক। সম্প্রতি এই নাটকের একটি বৈশিষ্ট্যদীপ্ত শৈল্পিক প্রযোজনা 'রঙ্গনা'য় পরিবেশন করলেন 'রূপাঙ্কনে'র শিল্পীরা। এই নাটকের প্রযোজনা সংস্থার পূর্বগৌরবকে অক্ষুণ্ণ তো রেখেইছে; বরঞ্চ শিল্পীদের আরো বলিষ্ঠতর চিন্তাই ধ্বনিত হয়েছে নতুন সুরে।

একটি অসহায়, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ অগোছাল একটি ঘরের মধ্যে বসে কাঠের একটা গুঁড়িতে একটি কিশোরীর মূর্তি খোদাই করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই সেই প্রত্যাশিত প্রাণচাঞ্চল্য তাতে আসছে না, রঙ আর রেখার বিষম ব্যবধান তাই বারবার বৃদ্ধটিকে হতাশ করে তুলছে। এমনি মানসিক যন্ত্রণায় যখন সে বিপর্যস্ত তখনই ছুটে এলো সেখানে সপ্রতিভ অথচ বিভ্রান্ত একটি তরুণ—নাম তার রঞ্জন। সমাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভে সে ফেটে পড়তে চায়। কাউকে মেরে সে এই বৃদ্ধের কাছে এসে একটু আশ্রয় চাইলো। কয়েকটা ঘটনার সামনে অকপটে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ লোকটা বুঝতে পারলো যে রঞ্জনের মনের মধ্যে সৎভাবে বাঁচবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে লুকিয়ে। তারপর সেখানে হঠাৎ ছিটকে এসে পড়লো সোনালী নামে একটি যুবতী মেয়ে। সমাজের লোভী মানুষের সে এক শিকার। অনেকের লোভ আর লালসার আগুনে পুড়ে রঞ্জনের মতো সেও জেনেছে পাপ আর পুণ্য কি? বেঁচে থাকার আসল অর্থ কোথায়? হৃদয়-দুর্বলতার গভীরতম মুহূর্তে রঞ্জন আর সোনালী মিলে গেলো অনুরাগের মেল-বন্ধনে। বৃদ্ধ লোকটা তার প্রজ্ঞার আলো নিয়ে উপলব্ধি করলো এই দুটি প্রাণের মিলনেই মুখর হয়ে উঠবে যৌবনের জয়যাত্রার প্রাণময় মুখর ছন্দ। কোন এক প্রচণ্ড আবেগদীপ্ত মুহূর্তের নিয়ন্ত্রণায় জানা গেলো সোনালী আসলে এই বৃদ্ধ লোকটারই মেয়ে; কোন এক অপ্রতিরোধ্য কারণে দুজনের মধ্যে নেমে এসেছিল মর্মান্তিক ব্যবধানের কারুণ্য। পিতৃস্নেহের উদ্বেলতায় বৃদ্ধ যেন আবার এক আলোকিত সম্রাট হয়ে উঠলেন। সবশেষে একটি প্রচণ্ড কোলাহল এসে ঘিরে ফেললো ঘর। বৃদ্ধ বলে উঠলো রঞ্জনকে 'এবার তোরা পালা। আমার সোনালীকে নিয়ে তুই বাঁচ।' সবশেষে আর একবার কোলাহলের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হোল—'এবার আমাকে সিঁড়ি কর রঞ্জন।' বৃদ্ধ লোকটাকে সিঁড়ি করে রঞ্জন আর সোনালী পা বাড়ালো উত্তরণের আলোয়। যৌবনদীপ্ত জীবনের জয়যাত্রার গান বেজে উঠলো আরো ব্যাপকতর সুরে।

এই বলিষ্ঠ বক্তব্যসমৃদ্ধ নাটকটির একটি সুষ্ঠু প্রযোজনা উপস্থিত করে রূপাঙ্কনের শিল্পীরা নাট্যানিরীক্ষায় তাঁদের আন্তর নিষ্ঠাকেই প্রমাণ করেছেন। প্রয়োগ-পরিকল্পনার অভিনবত্ব এই প্রযোজনার একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। নাটকে দুটি ফ্ল্যাশব্যাকের অবতারণা সামগ্রিক নাটকের কাঠামোতে আশ্চর্য এক প্রাণবেগ সৃষ্টি করেছিল। প্রযোজনার আরো একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল আলোকসম্পাতের চমৎকার শৈল্পিক ব্যবহার। এর জন্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখেন দিলীপ দত্ত। মঞ্চ-সজ্জায় শ্রীকাশীনাথের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ধরা পড়েছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর নাম প্রথমেই মনে আসে তিনি হোলেন 'লোকটা'র রূপকার বীরেন ঘোষ। বিষণ্ণতা আর অসহায়তার কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। মোহন গঙ্গোপাধ্যায় 'রঞ্জন' চরিত্রের যে দৃঢ়তা প্রথমদিকে আনতে পেরেছিলেন, শেষেরদিকে তার বেগ কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। তবে শিল্পীর কণ্ঠস্বরটি সত্যি তার চরিত্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লোভী 'পরমেশ' চরিত্রে রূপ দিয়েছেন তারাচাঁদ ভাদুড়ী, তাঁর চরিত্র-চিত্রণ বেশ ভালই হয়েছে। দিলীপ রাহার 'পুলিশ' আরো একটি সুন্দর রূপায়ণ। 'সোনালী'র ভূমিকায় শিবানী ভট্টাচার্য মোটামুটিভাবে অভিনয় করেছেন, তবে মাঝে মাঝে চরিত্রের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হয়তো আন্তরিকতার অভাবেই ছন্দ কেটে গিয়েছে। অন্যান্য আর সব কটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনীত।

পুনরাভিনয়ে এই নাটকটির আরো সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠতর প্রযোজনা আমরা 'রূপাঙ্কন'র শিল্পীদের কাছ থেকে আশা করি।

'সর্জন'-এর দুটি নাটক: 'সর্জন' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের বিশিষ্ট প্রযোজনা 'কথায় কথায় রূপকথা' ও সঙ্গে আর একটি নাটক 'সস্তা' কয়েকদিন আগে পরিবেশন করলেন রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে। দুটি নাটকের পরিবেশনাতেই শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা ধরা পড়েছে প্রায় সর্বত্রই।

দাপট ব্যবসায়ী ননীচোরা নন্দী শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সুতীব্র চিৎকার করে উঠে আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। একে একে তাঁর মনের সামনে ভেসে উঠলো আগেকার অতি তুচ্ছ অথচ টুকরো টুকরো কয়েকটি বেদনাদায়ক ঘটনার কথা। পয়সাকে সে সস্তা দেখতো না—তাই তার কার্পণ্যের বলি হোল তার নিজের ছেলে, জামাই, বৌ সকলে। সবশেষে যখন তার নিজস্ব পাপবোধ, আর উপলব্ধির প্রহর আচ্ছন্ন করে এক মর্মান্তিক ধূসরতা নেমে এলো, তখন সেই চরম মুহূর্তে শ্মশানের ডোম ডগু দু ভাঁড় বিষ নিয়ে তার কাছে এসে হাজির হোল। সে বললো— 'কোন ভাঁড়টা নেবেন বাবু, এই চার আনাটার টা, না এই দশ পয়সারটা।' উত্তর এলো—'বাবা মরতেই যদি হয়তো এই দশ পয়সারটাই দাও—ওটাই তো দেখছি সস্তা।' মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সস্তা' নাটকের সংঘাত গড়ে উঠেছে এই ঘটনার পটভূমিকাকে কেন্দ্র করেই। সলিল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন সমীর গঙ্গোপাধ্যায় (ননীচোরা নন্দী), দীপেন সেনগুপ্ত (মনচোরা), সলিল গঙ্গোপাধ্যায় (ডগু), তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় (গুপী), মহাদেব ভট্টাচার্য (সত্যদাস), অমর ঘোষ (সদা), অমিতাভ মণ্ডল (জামাই), সুতপা চক্রবর্তী (চরণদাসী), ডোরো বন্দ্যোপাধ্যায় (সৌদামিনী)।

'কথায় কথায় রূপকথা' নাটকের পুনরাভিনয়েও সেই আগেকার বৈশিষ্ট্যই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

'সময়ের রঙ অন্য': বহরমপুরের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী 'ছান্দিকে'র শিল্পীরা সম্প্রতি একটি বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী নাটক 'সময়ের রঙ অন্য' পরিবেশন করে নাট্যচর্চায় তাঁদের আন্তরিক অনুরাগকেই পরিচিতির আলোয় তুলে ধরেছেন। শক্তিনাথ ভট্টাচার্যের রচিত এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন কিশলয় সেনগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন কিশলয় সেনগুপ্ত, সন্তোষ দাশগুপ্ত, রণজিৎ দে, গোরাচাঁদ দত্ত, প্রণবেশ মণ্ডল, মইনুদ্দিন শেখ, দুলালচন্দ্র সরকার, শক্তিনাথ ভট্টাচার্য, ছবি কর, অলকেন্দু মজুমদার। অসিত সমাদ্দার, তপন মিত্র।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে প্রবীণ পরিচালক প্রফুল্ল রায়

গেল ২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার শেষরাত্রে পাইকপাড়ার বাসভবনে প্রবীণ চলচ্চিত্র-পরিচালক প্রফুল্ল রায় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেছেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে শ্রীরায়ের সম্পর্ক নির্বাক যুগ থেকে। লাইট অব এশিয়া, সিরাজ, থ্রো অব এ ডাইস প্রভৃতি ছবিতে তিনি অভিনেতা ও প্রোডাকসান ম্যানেজাররূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বি, এন, সরকার প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট-এর হয়ে তিনি 'চাষার মেয়ে' ছবি পরিচালনা করেন ১৯৩১ সালে। ঐ বছরই তিনি গ্রাফিক আর্টস সংস্থার 'অভিষেক' ছবিটিও পরিচালনা করেছিলেন। এর পরে ১৯৩২-এ রাধা ফিল্মের হয়ে তিনি পরিচালনা করেন 'সন্দিগ্ধা' ছবি। ১৯৩৪ সালে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'চাঁদসদাগর' ছবির পরিচালক হিসেবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এর পরে ১৯৩৮-এ অভিজ্ঞান (নিউ থিয়েটার্স), '৩৯-এ পরশমণি (শ্রীভারতলক্ষ্মী), '৪০-এ ঠিকাদার (শ্রীভারতলক্ষ্মী) ও '৪২-এ নারী (নিউ টকীজ) পরিচালনা করবার পরে ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার হয়ে ১৯৪৩-র তাঁর পরিচালিত 'পাপের পথে' ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৫৩-তে আই, এন, এ, পিকচার্সের মালঞ্চ এবং '৫৬ সালে রূপায়ণ প্রোডাকসন্স-এর 'ভাদুড়ীমশাই' তাঁরই পরিচালনায় তোলা হয়েছিল।

২৪ পরগণার নৈহাটীর নিকটস্থ গরিফা গ্রামের প্রসিদ্ধ রায়পরিবারের বংশধর প্রফুল্ল রায়ের নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রতি একটি অকৃত্রিম প্রীতি ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, উদারচেতা এবং ঐতিহ্যে আস্থাবান। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে দুর্গাদাস বসুমল্লিক

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র-পরিবেশক দুর্গাদাস বসুমল্লিক গেল ১৮ ডিসেম্বর, শনিবার ইউরিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। একদা তিনি ফক্স ফিল্ম কর্পোরেশনের বুকার ছিলেন। পরে তিনি ব্রিটিশ ডিস্ট্রিবিউটার্সে যোগ দেন। এই কাজ করতে করতে তিনি প্রাইমা ফিল্মস-এর তদানীন্তন ম্যানেজার ভুবনমোহন লাহিড়ীর সঙ্গে একযোগে কোয়ালিটি ফিল্মস নামে একটি চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান খোলেন ১৯৪২ সালে এবং প্রথমেই পি, আর, প্রোডাকসন্সের 'পরিণীতা'র পরিবেশনস্বত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে শ্রীবসুমল্লিক সত্যনারায়ণ খাঁয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে নারায়ণ পিকচার্সের প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন বাদে তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুনীল বসুমল্লিক কালিকা ফিল্ম নামে একটি পরিবেশক প্রতিষ্ঠান খুললে তিনি প্রাত্যহিক কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং মাত্র পরামর্শদাতারূপে কাজ করতে থাকেন। শেষের দিকে শারীরিক কারণে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবসর জীবনযাপন করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত সদালাপী, সুরসিক ও হৃদয়বান ছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

বিচিত্রানুষ্ঠান: ভবানীপুর মডার্ন স্পোর্টিং ক্লাব রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারী

জীবনসৈকতে/অপর্ণা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
পরিচালনা : স্বদেশ সরকার। ফটো : অমৃত

পর্যন্ত। ১২ জানুয়ারী রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করবেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, স্বপন গুপ্ত, আশীষ মুখোপাধ্যায়, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য এবং তৎসহ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। ১৩ জানুয়ারী তরুণ অপেরার বিখ্যাত 'হিটলার' যাত্রাভিনয় হবে। ১৪ জানুয়ারী বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন : নির্মলেন্দু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল, অখিলবন্ধু ঘোষ, বনশ্রী সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা রায়, জহর রায়, মিন্টু দাশগুপ্ত, ডি বালসারা, আশীষ মুখোপাধ্যায়, আবদুর জব্বর (বাংলাদেশ), শেফালী রায়চৌধুরী এবং দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ই জানুয়ারী অভিনীত হবে জ্ঞানেশ মুখার্জি পরিচালিত 'গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর' নাটক।

শিশু পাঠাগারের উদ্বোধন

গত ২৫ ডিসেম্বর সকালে উত্তর কলকাতায় শিশু বিদ্যালয় মুকুল বীথির প্রতিষ্ঠাতা 'অমিয় সেনের স্মৃতিরক্ষার্থে 'অমিয় স্মৃতি পাঠাগার' নামে একটি শিশু পাঠাগারের উদ্বোধন করেন শিশু সাহিত্যিক স্বপনবুড়ো। বিকাল ৩টায় স্কুল প্রাঙ্গণে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুকুল বীথির বিভিন্ন পরীক্ষায় সফলকাম প্রাক্তন ও বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বপনবুড়ো পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বপনবুড়ো ২৫শে ডিসেম্বর দিনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং শিশুশিক্ষার উন্নতিকল্পে মুকুল বীথির প্রতিষ্ঠাতা 'সেনের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে অনুষ্ঠান

বারোই ডিসেম্বর অবনমহলে 'সাহানা' (গড়িয়া) সঙ্গীত সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে বাংলাদেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দুই বাংলার আবৃত্তিকার এবং শিল্পী মণীন্দ্র ঘোষালের একক সঙ্গীতের আসর বসে। অংশগ্রহণ করেন : আবৃত্তিতে : মন্দিরা মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ গৌতম, মুর্জিবন হক, প্রভাত দাস, গণেশ দত্ত, কায়সুল হক এবং নিবেদিতা দাস এবং সঙ্গীতে : মণীন্দ্র ঘোষাল। বাংলাদেশের বিশিষ্ট একজন আওয়ামী লীগ নেতা এবং ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্য এবং শ্রীরণেন দাশগুপ্ত সময়োপযোগী ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নির্মলেন্দু গৌতম।

দ্বাদশ বার্ষিক নিখিল বঙ্গ ব্রতচারী ও লোকনৃত্য শিবির ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়কমণ্ডলীর পরিচালনায় গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত ঠাকুরপুকুর ব্রতচারী গ্রামে উপরোক্ত শিবির সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে ওপার ও এপার বাংলার প্রায় একশত অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সপ্তম বার্ষিক শিক্ষা শিবির

২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের ৭ম বার্ষিক শিক্ষা শিবির ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত বাওয়ালীতে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে জেলার ত্রিশটি সংস্থার প্রায় ৩০০ জন তরুণ প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করে। শিবির উদ্বোধন করেন শ্রীব্রজরঞ্জন রায়। শিবিরে শ্রীবিমল বসু প্রদত্ত 'গল্পদাদু স্মৃতি' প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

তরুণ সংগীতশিল্পী সম্মেলন

'দিশারী' আয়োজিত তিনদিনব্যাপী 'তরুণ সঙ্গীতশিল্পী সম্মেলন' শুরু হবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী থেকে। নবীন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পীদের ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গীত শিক্ষকদের নামসহ আবেদন করতে হবে। নাম পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারী। ঠিকানা—৯/৪ এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা—১৪।

প্রদর্শনী ক্রিকেট

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারতীয় টেস্ট একাদশ দল বনাম ভারতীয় অবশিষ্ট দলের চারদিনব্যাপী প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় দল ৭ উইকেটে জয়ী হয়েছে। চারদিনের বরাদ্দ খেলা তৃতীয়দিনের প্রথম ৭৪ মিনিটে শেষ হয়। ভারতীয় একাদশ দলে নামকরা এই চারজন টেস্ট খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন না—সুনীল গাভাস্কার, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বিষেণ সিং বেদী এবং দিলীপ সরদেশাই। গাভাস্কার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বেদী বিশ্ব একাদশ দলে নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সফর করছেন। এই প্রদর্শনী খেলার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেও খেলা দেখে দর্শকরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন। খেলার মাঠে ত্রিশ হাজারের মত দর্শক সমাগম হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান-মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, পূর্বাঞ্চল সাম-রিক বিভাগের জি-ও-সি-ইন-সি এবং দুই দলের খেলোয়াড়দের নাম স্বাক্ষরিত এক-খানি ক্রিকেট ব্যাট নীলামের ডাকে ২৫,০০০ টাকায় বিক্রী হয়েছিল।

ভারতীয় একাদশ দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার টসে জিতে শেষ পর্যন্ত ফিল্ডিং করার দান নিয়েছিলেন। ইডেনের পীচ স্পিন বোলারদের সহায়ক ছিল। অপরদিকে ব্যাটসম্যানদের গোরস্থান। প্রথম দিনের খেলায় ১৬টা উইকেট পড়েছিল—অবশিষ্ট ভারতীয় দলের ১০টা এবং ভারতীয় একাদশ দলের ৬টা। প্রথমদিনের খেলায় মোট রান উঠেছিল ১৮৯—অবশিষ্ট ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের ৮৮ রান এবং ভারতীয় একাদশ দলের ১ম ইনিংসে ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ১০১ রান। দুই দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেছিলেন অধি-নায়ক ওয়াদেকার। অবশিষ্ট ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস মাত্র ৮৮ রানের মাথায় শেষ হয়। অফ্-স্পিনার ভেঙ্কটরাঘবন ৪৩ রানে ৬টা এবং লেফট-আর্ম স্পিনার সেলিম দুরানী ২৮ রানে ৪টে উইকেট নিয়েছিলেন। অবশিষ্ট ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস এত তাড়াতাড়ি পড়ে যে, চন্দ্রশেখর একবারও বল করার সুযোগ পাননি। এইদিন ভারতীয় একাদশ দলের ১ম ইনিংসের যে ৬টা উইকেট পড়েছিল তার মধ্যে দিলীপ দোসী ৩৬ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় একাদশ দলের ১ম ইনিংস ১০৯ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তাদের বাকি ৪টে উইকেট মাত্র ২০ মিনিটের খেলায় পড়ে যায়। এই চারটে উইকেটের মধ্যে তিনটে উইকেট নিয়েছিলেন দোসী, মাত্র ২ রান দিয়ে। প্রথম ইনিংসের খেলায় দোসীর বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৩৮ রানে ৬টা উইকেট।

খেলাধুলা

দর্শক

দিলীপ দোসী
৩৮ রানে ৬ উইকেট

ভারতীয় একাদশ দল প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ২১ রানে অগ্রগামী হয়েছিল।

অবশিষ্ট ভারতীয় দলকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এক সময় দারুণ সংকটে পড়তে হয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজের পরই তাদের ৮৭ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। ফলে অনেকেরই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস চা-পানের বিরতি সময় পর্যন্ত গড়াবে না, তার আগেই শেষ হবে। দলের এই বিপদকালে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন ৯ম উইকেটের জুটি অম্বর রায় এবং পেস বোলার ইসমাইল। তারা প্রথম ২৮ মিনিটে ৫০ রান তুলে-ছিলেন। তাঁদের ৯ম উইকেটের জুটিতে মোট ৬১ রান উঠেছিল ৪১ মিনিটের খেলায়। ইসমাইল দৃঢ়তার সঙ্গে মনের সুখে বল পিটিয়েছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক খেলা দেখে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন। অম্বর রায় ৫৮ রান এবং ইসমাইল ৩৯ রান করে আউট হন। অবশিষ্ট ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৭ রানের মাথায় শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৪৭ রান তুলতে ভারতীয় একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দু' উইকেট খুইয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। ফলে জয়লাভের জন্যে বাকি থাকে ৫৫ রানের। অপরদিকে হাতে জমা থাকে

১৯৭১ সালের আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ পুরুষ—বেলজিয়ামের পেশাদার সাইকেল চালক এডি মার্কস. ১৯৭১ সালে এডি মার্কস 'টুর ডি ইতালী' এবং উপর্যু-পরি তিন বছর 'টুর ডি ফ্রান্স' সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভের গৌরব লাভ করেন।

১৯৭১ সালের আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ মহিলা—অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছরের সাঁতারু শ্যেন গোল্ড। ১৯৭১ সালের ৯ মাস সময়ে (এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর) কুমারী গোল্ড ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার, ৮০০ এবং ১৫০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

২য় ইনিংসের ৮টা উইকেট এবং দুদিনের খেলার সময়।

তৃতীয় দিনের ৭৪ মিনিটের খেলায় **ভারতীয় একাদশ দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৫ রান সংগৃহীত হয় মাত্র** একটা উইকেট খুইয়ে। যেখানে তাদের জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ১৪৭ রানের, সেখানে তারা ৩ উইকেট খুইয়ে ১৫০ রান তুলে দেয়। এই বাড়তি তিন রান উঠেছিল **ঘটনাচক্রে। অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার** ৯৩ রান এবং সোলকার ১৩ রান করে **অপরাজিত থাকেন।** ওয়াদেকার মাত্র ৭ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অবশিষ্ট ভারতীয় দল : ৮৮ রান (অম্বর রায় ১৪ রান। ভেঙ্কট ৪৩ রানে ৬ এবং দুরানী ২৮ রানে ৪ উইকেট)।

ও ১৬৭ রান (অম্বর রায় ৫৮ এবং ইসমাইল ৩৯ রান। ভেঙ্কট **৫২** রানে ৪ এবং দুরানী ৫৪ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় একাদশ দল : ১০৯ রান (ওয়াদেকার ৩২ এবং মানকাদ ৩০ রান। দোসী ৩৮ রানে ৬ এবং মেটা ৪১ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৫০ রান (৩ উইকেটে। ওয়াদেকার নট আউট ৯৩ রান। দোসী **৫৭** রানে **২** উইকেট।

উবের কাপ

মেয়েদের উবের কাপ বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার এশিয়ান জোন সেমি-ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৬—১ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে এশিয়ান জোন ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে তাদের সঙ্গে খেলবে থাইল্যাণ্ড অথবা ভারতবর্ষ।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স

জয়পুরে আয়োজিত ৩২তম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে পাঞ্জাবী (পাতিয়ালা) এবং ছাত্রী বিভাগে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ছাত্রী বিভাগে তিনটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া মেয়েদের দুটি অনুষ্ঠানে পূর্ব রেকর্ড স্পর্শ করে। ছাত্র বিভাগে কোন নতুন রেকর্ড হয়নি। আলোচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানে **৭৫টি** বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। **ছাত্রী** সংখ্যা ছিল ১১৯। ইতিপূর্বে এত বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

ছাত্র বিভাগ : ১ম পাঞ্জাবী (৩৮ পয়েন্ট), ২য় গুরুনানক (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান)—২৩ পয়েন্ট, ৩য় মাদ্রাজ।

ছাত্রী-বিভাগ : ১ম ব্যাঙ্গালোর (২৭ পয়েন্ট), ২য় মাদ্রাজ (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান)—২৫ পয়েন্ট, ৩য় পুণা (৮ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

ছাত্র বিভাগ : হারমীক সিং (পাঞ্জাব) —১১ পয়েন্ট

ছাত্রী বিভাগ : ভি অনসূয়া বাঈ (মাদ্রাজ) —১৬ পয়েন্ট

নতুন রেকর্ড

ছাত্রী বিভাগ

জ্যাভেলিন : গুরুবাল্প কাউর (পুণা) দূরত্ব ৩৪·৪০ মিটার

১০০ মিটার হার্ডলস : কুসুম ছটওয়াল (জিওয়াজি) **সময় :** ১৫·৭ সেকেণ্ড

৪০০ মিটার রীলে : দিল্লী দল **সময় :** ৫১·৫ সেকেণ্ড

কুচবিহার কাপ

সর্বভারতীয় কুচবিহার কাপ স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে বাংলা স্কুল দল প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে বিহার স্কুল দলকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা স্কুল দল : ১৮৬ রান (এ দত্ত ৫৫ রান। সোম ৫১ রানে ৫ উইকেট)।

ও ১৭৫ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। উদয় ব্যানার্জি ৪৩ রান।)

বিহার স্কুল দল : ৫৯ রান (ডি জোসেফ ১৪ রান। বি বর্মন ২১ রানে ৭ উইকেট)।

ও ১৭৪ রান (৭ উইকেটে।)

অস্ট্রেলিয়া সফরে বিশ্ব ক্রিকেট দল

গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে বিশ্ব ক্রিকেট দল এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া সফরে ৯টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে বিশ্ব ক্রিকেট দলের জয় ৩, হার ২ এবং ড্র ৪। বিশ্ব ক্রিকেট দলের জয় (১) কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩৮ রানে, (২) ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৭২ রানে এবং টাসমানিয়ার বিপক্ষে ৮ উইকেটে। বিশ্ব ক্রিকেট দলের হার (১) দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস ও ১১ রানে এবং (২) সাউথ অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক ইনিংস ও ১ রানে।

১৯৭১ সালের সেরা খেলোয়াড়

ইউরোপের খ্যাতনামা ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভোটে বেলজিয়ামের সাইকেল চালক এডি মার্কস পুরুষ বিভাগে এবং অস্ট্রেলিয়ার পনের বছরের সাঁতারু কুমারী শ্যেন গোল্ড মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। ১৯৭১ সালে এডি মার্কস ইউরোপের বিশ্ববিশ্রুত দুই সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় (টুর ডি ফ্রান্স এবং টুর ডি ইতালী) প্রথম স্থান লাভ করেন। অপরদিকে কুমারী গোল্ড ১৯৭১ সালের (এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর) ১০০ মিটার থেকে ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারের প্রতিটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

Clinic
SHAMPOO
Contains: 0.15% 3.4.4 Trichlorocarbanilide
Clears dandruff from hair and scalp

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্‌কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে মোক্ষম কাজ করে।

ফেনা
চুল
মাথার খুলি
চুলের গোড়া

সুরক্ষিত এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে ঝলোমলো ও সুন্দর।

১ ২ ৩ ৪ ৫

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 14th January, 1972 শুক্রবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৭৮ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীশৈলেন সাহা

'এক নজরে'

নারী কর্মচারী প্রসঙ্গে : সরকারী কাজে নিযুক্ত নারী কর্মচারীদের যতদূর সম্ভব সাদাসিধে পোষাক পরা উচিত এবং তাদের নিরাবরণতার প্রবণতা যতদূর সম্ভব নিরুৎসাহিত করা উচিত---এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, নারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনার জন্য মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার নিযুক্ত এক তথ্যানুসন্ধান কমিটি।

১৯৬৯ সালে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়েককে সভাপতি করে ১৭ জন সদস্য নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয়, দু বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের নারী কর্মচারীদের বৃত্তি ও পরিবেশ সম্পর্কিত নানা সমস্যা পর্যালোচনা করে সম্প্রতি তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করেন। তাতে নারী কর্মচারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে নিয়োগ-বদলী সম্পর্কিত নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং নারী কর্মচারীদের যাতে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে সব নারী কর্মচারীর মধ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রামাঞ্চলে এবং তরুণী কর্মচারীদের শহরাঞ্চলে নিয়োগ করা উচিত। আবার অবিবাহিতা ও বিধবা কর্মচারীদের যতদূর সম্ভব পরিবহনবর্জিত স্থানে না পাঠানো উচিত এবং তাদের বাবা-মা বা অভিভাবকের কাছাকাছি রাখা উচিত। বিবাহিত নারীদের সম্বন্ধে কমিটির সুপারিশ, তাঁদের যতদূর সম্ভব স্বামীর কর্মস্থানেই রাখা উচিত এবং দূরে দেশে বদলী না করাই উচিত। যাঁদের সরকারী কাজে ঘোরাঘুরি করতে হয়, শহর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনে যেতে হয় তাঁদের রেল স্টেশনে বা বিভিন্ন সরকারী বিশ্রামাগারে অবস্থানের সুযোগে অগ্রাধিকার থাকা উচিত। ছোট শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে নির্মিত বিভিন্ন বাসগৃহ পাওয়ার ব্যাপারেও নারী কর্মচারীদের অগ্রাধিকার থাকা উচিত। কারণ বাসস্থানের অভাবে পুরুষ কর্মচারীদের যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়, নারী কর্মচারীদের অসুবিধা হয় তারচেয়ে অনেক বেশী।

মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের নারী কর্মচারীর সংখ্যা এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার। তার মধ্যে শহরে কাজ করেন পনেরো হাজার এবং মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলে ত্রিশ হাজার। তার মধ্যে গেজেটেড অফিসার ৬৪১ জন, নয় হাজারের কিছু বেশী করণিক, বিভিন্ন কারিগরী বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন প্রায় বত্রিশ হাজার। এ সব ছাড়াও আছেন আড়াই হাজার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী। নারী কর্মচারীদের নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম রক্ষার উপরেও কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তার জন্য উচ্চ পর্যায়ের স্থায়ী কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

গুটেনবার্গের বাইবেল : আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবক জন গুটেনবার্গ (১৩৯৮—১৪৬৮) তাঁর জঙ্গম মুদ্রণযন্ত্রে যে গ্রন্থ মুদ্রিত করেন তা হল বাইবেল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, গুটেনবার্গ শ' দুয়েক বাইবেল মুদ্রিত করেছিলেন, কিন্তু অর্ধ সহস্রাব্দের ব্যবধান অতিক্রম করে তার মধ্যে মাত্র খান পঞ্চাশেক এখনও টিঁকে আছে, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও স্মারক সংগ্রহকারীদের কাছে যাদের মূল্য সীমাহীন। ইতিপূর্বে ১৯২৬ সালে এক খণ্ড গুটেনবার্গের বাইবেল ৫৫ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রি হয়েছিল, যেটা গ্রন্থ-গ্রন্থের সর্বোচ্চ মূল্যরূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল এতদিন।

কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডের এক পল্লীগৃহ থেকে খুঁজে পাওয়া এক খণ্ড গুটেনবার্গ বাইবেলের জন্য আমেরিকার এক স্মারক সংগ্রহশালায় যা দাম চাওয়া হয়েছে, তা যে কোন ঐতিহাসিক স্মারকের জন্য সর্বকালের সর্বোচ্চ মূল্য। গুটেনবার্গের বাইবেল আর কোন সূত্রে পাওয়া যাবে এমন আশাই ছিল না স্মারক সংগ্রাহকদের, সেকারণে ঐ আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হওয়া মাত্র সারা পাশ্চাত্য দুনিয়ার স্মারক সংগ্রাহক মহলে আলোড়ন পড়ে যায়। একজন আমেরিকান অপ্রকাশিত দামে বইটি কিনে নিয়ে স্বদেশে চলে আসেন। তারপর তিনিই এখন নিউইয়র্কের প্রখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা 'হানস ক্রস' মারফৎ দশ লক্ষ পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় এক কোটি নব্বুই লক্ষ টাকা মূল্যে বইটি বিক্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। ধনকুবেরদের গ্রন্থ-সামগ্রী সংগ্রহের উন্মত্ততা এখন কোন পর্যায়ে পৌঁচেছে তা ঐ দামের দাবীর বহর থেকেই আন্দাজ করা যাবে।

আতশী কাচ নিয়ে সমস্যা : একটি সত্য ঘটনা, ইংলণ্ড-প্রবাসী এক আত্মীয়ের কাছে আমসত্ত্ব পাঠাতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন একজন। টিনের মধ্যে আমসত্ত্ব দেখে শুল্ক দপ্তরের কোন আপত্তি হয় নি, কারণ ফল বা ফলজাত পণ্য রপ্তানীতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু সমস্যার কারণ হল ঐ টিনের ভিতরের মুড়িগুলি যা আমসত্ত্বকে শুকে রাখার জন্য দেওয়া হয়েছিল। শুল্ক দপ্তর থেকে আপত্তি জানিয়ে বলা হল, সিরিয়াল ফুড বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, সুতরাং আমসত্ত্ব নিয়ে যেতে হলে মুড়ি বাদ দিয়েই নিয়ে যেতে হবে।

প্রায় একই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পড়েছেন আমাদের শুল্ক দপ্তর কতকগুলি আতশী কাচ নিয়ে। 'অকসফোর্ড' ইংলিশ ডিকশনারী নির্ভুলতায় ও প্রতিটি ইংরেজী শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। ১৩ খণ্ডে বিভক্ত ঐ গ্রন্থে মোট শব্দের সংখ্যা ৪ লক্ষ, ১৪ হাজার ৮২৫, এবং সমগ্র খণ্ডের মোট দাম ১৮০০ টাকা। বলা বাহুল্য, ঐ দাম সাধারণ ক্রেতার আয়ত্তাতীত। সে কারণে অকসফোর্ড ডিকশনারীর প্রকাশকরা ঐ একই গ্রন্থ অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে মাত্র দু খণ্ডের মধ্যে মুদ্রিত করেছেন এবং তার দাম ঠিক করেছেন ৫৬০ টাকা। কিন্তু অক্ষরগুলি এত ক্ষুদ্র যে আতসী কাচের সাহায্য ছাড়া পড়া সম্ভব নয়। তাই সব গ্রন্থের সংগেই একটি করে আতশী কাচ সংলগ্ন করে সব দেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু আমাদের শুল্ক দপ্তর আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে, বই আমদানীর লাইসেন্স যে কোম্পানীর আছে, আতশী কাচ আমদানী করবে সে কোন আইনবলে? আতশী কাচ আনতে হলে তার জন্য আলাদা অনুমতিপত্র চাই এবং তার জন্য যে আমদানী শুল্ক দিতে হবে তাতে সুলভ সংস্করণ মুদ্রণেরই উদ্দেশ্য প্রায় ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অচলাবস্থার সমাধান হয়েছে, কারণ অন্তত এক্ষেত্রে আতশী কাচের উপর নিয়মমাফিক শুল্ক ধার্য করলে সেটা জ্ঞানের উপরেই শুল্ক ধার্যের সামিল হবে, এটা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন। তাই গ্রন্থসংলগ্ন আতশী কাচগুলির উপর দামের এক-চতুর্থাংশ শুল্ক ধার্য করা হবে বলে সাব্যস্ত হয়েছে, যার ফলে পাঁচ টাকা দামে আতশী কাচগুলি আলাদা কিনতে পাওয়া যাবে।

দাম যাই হক, সমস্যার যে সমাধান হয়েছে, সেইটাই এক্ষেত্রে বড় কথা, তা না হলে বইগুলিকে আবার ফিরতি জাহাজেই সাগরপাড়ি দিতে হত।

৩০।১২।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

অপরাধ এবং শাস্তি

দুঃখ নিশার অবসান ঘটেছে। পূর্ব আকাশে আবার নতুন সূর্যোদয় সম্ভব হয়েছে। মাঠে ঘাটে গঞ্জে মানুষজন নির্ভয়ে চলাফেরা করছে, অতিশয় দ্রুততার সংগে নবজাতক রাষ্ট্র বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নিয়ম এবং শৃঙ্খলার আশ্চর্য পরিচয় পেয়ে বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও সাধুবাদ করছেন। দীর্ঘ ন'টি মাস ধরে পশ্চিমী খানসেনারা ঘর দোর জ্বালিয়েছে, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, পৈশাচিক নরহত্যা প্রভৃতি অবাধে ঘটেছে দিনের পর দিন। যাঁরা এই নৃশংসতার শিকার হয়েছেন তাঁরাও বীর সৈনিক, তাঁরা শহীদ। পৃথিবীর সর্বদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁদের জয়গানে মুখর। এখন বাংলাদেশের মানুষ নির্ভয়ে অনেক সত্য তথ্য উদ্ঘাটন করছেন যা পূর্বে করা সম্ভব ছিল না। এখন প্রশ্ন, সমগ্র বিশ্ব কি আজও বধির হয়ে থাকবে? আজও কি তাদের চক্ষু দৃষ্টিহীন? এমন কিছু মানুষ এই মুহূর্তে প্রকাশিত হচ্ছেন যাঁরা ক্ষমা এবং তিতিক্ষার বাণী শুনিয়ে বলছেন—অতীতকে কবর দাও। কারণ অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে মানুষ উন্মাদ হয়ে কান্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মে লিপ্ত হবে। কথাটি অবশ্য যুক্তিহীন নয়। তিক্ত অতীত স্মৃতির কথা স্মরণ করে কারো মঙ্গল হবে না এবং এমন কোনো শাস্তি নেই যা এই নরদেহধারী পশুদের প্রতি প্রযুক্ত না হতে পারে। যারা জননীর কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে নিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে উন্মুক্ত বেয়নেটের ওপর তাকে ফেলে নিহত করেছে, যারা স্ত্রীর সামনে স্বামীকে হত্যা করে চোখ দুটো খুলে নিয়ে গেছে; যারা পিতা বা স্বামীর সামনে তাদের কন্যা ও জননীকে ধর্ষণ করেছে তাদের জন্য কোন শাস্তি বরাদ্দ করা সম্ভব? হিটলারের বেলসেনের অত্যাচার এই নৃশংসতার কাছে তুচ্ছ। রাজাকার বা আল বদর প্রভৃতি পাকিস্তানী অপরাধের খিদ্‌মদগারদের শাস্তিদানে কোনো অসুবিধা নেই। বাংলাদেশ সরকার তাঁদের প্রচলিত আইনবিধি অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন। যাঁরা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, গভর্নর ইত্যাদি তাঁদের মধ্যে সবাই বাংলাদেশের নাগরিক নন, কিন্তু তাঁরা জেনেভা চুক্তির আওতায় পড়েন না।

জেনেভা কনভেনশন শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভারতবর্ষ এই নীতি অনুসারেই তাদের বিলিবন্দোবস্ত করবেন স্থির করেছেন।

জেনেভা চুক্তি কিন্তু লুণ্ঠন, গ্রাম নগর প্রভৃতির যথেচ্ছ ধ্বংসসাধন, এবং যে ধরনের গণহত্যা সামরিক প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় নি সেই সব অপরাধের জন্য কোনো রক্ষাকবচ রাখে নি। এই সব জঘন্য অপরাধ ন্যুরেমবার্গ স্ট্যাটুউটসের আওতায় পড়ে। যুদ্ধকালীন অপরাধের বিচারেই নাৎসী সমরনায়ক এবং তাঁদের চেলাদের ন্যুরেমবার্গ বিচারের পর দন্ডদান করা হয়।

এই সূত্রে আরও একটি আন্তর্জাতিক নীতি প্রাসঙ্গিক। এই নীতি ১৯৪৮-এ অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনসনে গৃহীত হয়। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, জাতীয়, জাতিগত সম্পর্কবিশিষ্ট বহু সংখ্যক নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা এবং আনুসঙ্গিক অপরাধ এই আইনানুসারে বিচার্য। ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইবুনালের নায়ক মনীষী বার্টান্ড রাসেল স্টকহোম অধিবেশনে বলেছিলেন—"মানুষ যেখানেই তাদের দুর্দশার জন্য সংগ্রাম করবে আমাদের কণ্ঠস্বর সেখানেই ধ্বনিত হবে। আত্মোৎসর্গের জন্য যেখানেই তারা নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হবে আমাদের বক্তব্য সেখানে হবে সুস্পষ্ট।'

বাংলাদেশের এক কোটি মানুষকে ন' মাস ধরে যেভাবে এক পৈশাচিক গণহত্যার শিকার হতে হয়েছে তার দায়ে প্রকৃত অপরাধীদের এই নীতি অনুসারে বিচার এবং দন্ড দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার যে সব সৈনিক ও সেনানায়কদের গণহত্যার অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচনা করবেন তাদের বিচার ভার তাঁরা নিজেরাই করতে পারবেন। ভারত সরকার এই সব যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশ সরকারের হাতে প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকার নাও করতে পারেন।

যে সব সুসভ্য দেশ এতকাল বাংলাদেশের নগরে ও গ্রামে অনুষ্ঠিত পাক বর্বরতার নীরব দর্শক ছিলেন আজ সহসা তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক পাক সেনাদলের প্রতি কল্পিত অত্যাচারের বেদনায় হাহাকার শুরু করেছেন। নিপীড়িত মানবাত্মার বিরুদ্ধে যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার উপযুক্ত শাস্তি চাই, নতুবা বিশ্বের সর্বত্র অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে নির্দ্বিধায়। একথা অবশ্য স্মরণযোগ্য, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকের বিচারে যাঁরা ক্ষমার যোগ্য ক্ষমা শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য।

৮-১-১৯৭২

শেখ মুজিবর রহমান

বনফুল

সদ্য-কারামুক্ত বীর শেখ মুজিবর রহমান,
মহিমার পুণ্য-তীর্থে আজ তব ওঠে জয়গান,
সমুদ্র-কল্লোল আজি সে সংগীতে মিলেছে আসিয়া
সব ক্ষয়, সব ক্ষতি, সব গ্লানি গিয়াছে ভাসিয়া।
চূর্ণ করি' বর্বরের অতি ক্ষুদ্র খর্ব কারাগার
শোণিত-পিচ্ছিল পথ, হে বীরেন্দ্র, হ'য়ে এলে পার,
পশুত্বের নৃশংসতা বীর্য-বলে করিয়া লাঞ্ছিত
যে তীর্থে যে সমারোহে আজি তুমি হলে সমুদিত
আদর্শের তীর্থ তাহা, মনুষ্যত্ব-আলোকে উজ্জ্বল।
ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীন, সূর্য সেন, বিনয়, বাদল,
সে তীর্থে জ্যোতিষ্কমালা। নেতাজীর আজাদ বাহিনী
স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছে সে তীর্থেতে অক্ষয় কাহিনী।
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে তীর্থের কবি যে নির্ভীক
সত্য-শিব-সুন্দরের ছন্দোময় প্রদীপ্ত প্রতীক।
সে তীর্থে ভূষিত কর,—ওই শোন তব আগমনে
সে তীর্থের ঘরে ঘরে শঙ্খ-ধ্বনি ধ্বনিছে সঘনে।
স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচিত ওগো রাষ্ট্রপতি
হে মুজিব, আমাদেরও তুমি বন্ধু প্রিয়তম অতি।
সুস্থ থাক, সুখী হও, অন্তরের শুভ ইচ্ছা লহ
চিরন্তন আদর্শের চিরস্থায়ী হও বার্তাবহ।

বাঙালির আপনজন বঙ্গবন্ধু

কৃষ্ণ ধর

বাঙালির একান্ত আপনজন, তার নিজস্ব নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে ছিনিয়ে এনেছে মৃত্যুর মুখ থেকে বাংলার সংগ্রামী মানুষ। বাংলা ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের দাবি এই মানুষটিকে কেন্দ্র করে আজ প্রতিষ্ঠিত। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দেশ তাই তাঁকে আখ্যা দিয়েছে 'বঙ্গবন্ধু।'

ঢাকা শহরের বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডি রোডের যে-বাড়িটিতে মুজিবর থাকতেন, গত বছর ২৫ মার্চের সেই কালরাত্রির পর থেকেই তা পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম এক জল্লাদবাহিনীর নৃশংস শিকারে পরিণত হয়। ন' মাস পর মুক্ত বাংলার মানুষ তাদের প্রিয়তম নেতা, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখল—গুলীবিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, সঞ্চয়িতার ছিন্নপ্রচ্ছদ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাঙা রেকর্ড। মুজিবর কেমন মানুষ এবং তাঁর শত্রুপক্ষই বা কেমন, ধানমণ্ডির বাড়িতে পা দিলেই তা পৃথিবীর নিরপেক্ষ মানুষ বুঝতে পারবে।

মুজিবের মুখে এক কথা, এক গান— আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। বাংলাদেশ, বাংলাভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির অনুরাগী এই মানুষটিকে সহ্য করতে পারেনি তাঁর প্রতিপক্ষ অন্ধবিদ্বেষপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও নৃশংস পাকিস্তানী সামরিকচক্র। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিকে গুলীবিদ্ধ করে তারা বাঙালির কাছে যা-কিছু বরণীয় ও স্মরণীয়, তাকেই হত্যা করার মূঢ়তা দেখিয়েছে। অন্যদিকে মুজিবরের শক্তির উৎস ও প্রেরণার প্রতীক হল বাংলার রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য। বাঙালির বাঁচবার অধিকারের দাবিতেই তাঁর সংগ্রাম। এই সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে তাঁকে বাংলার মানুষের পরম্পরাগত মানবিক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য—রবীন্দ্রনাথে যার মহত্তম বিকাশ ও পরিণতি।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাগর্বী, দূরদৃষ্টিহীন সামরিকচক্র মুজিবের এই শক্তির উৎস কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। সেখানেই তাদের পরাজয়। তাই কঠিনতম আঘাত করেও বাংলাদেশের প্রাণপুরুষ এই মানুষটিকে ধ্বংস করতে পারেনি পাকিস্তানীরা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানী কারাগারের অন্ধ-কুঠুরিতে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দীর্ঘ ন' মাস যাপন করে অবশেষে মুক্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই ন' মাস প্রতিদিনই আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। মৃত্যুকে আমি ভয় করিনি। কারণ, আমি জানতাম যে, আমার মৃত্যু হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেউ রোধ করতে পারবে না।

মৃত্যুভয়হীন এই অসমসাহসী
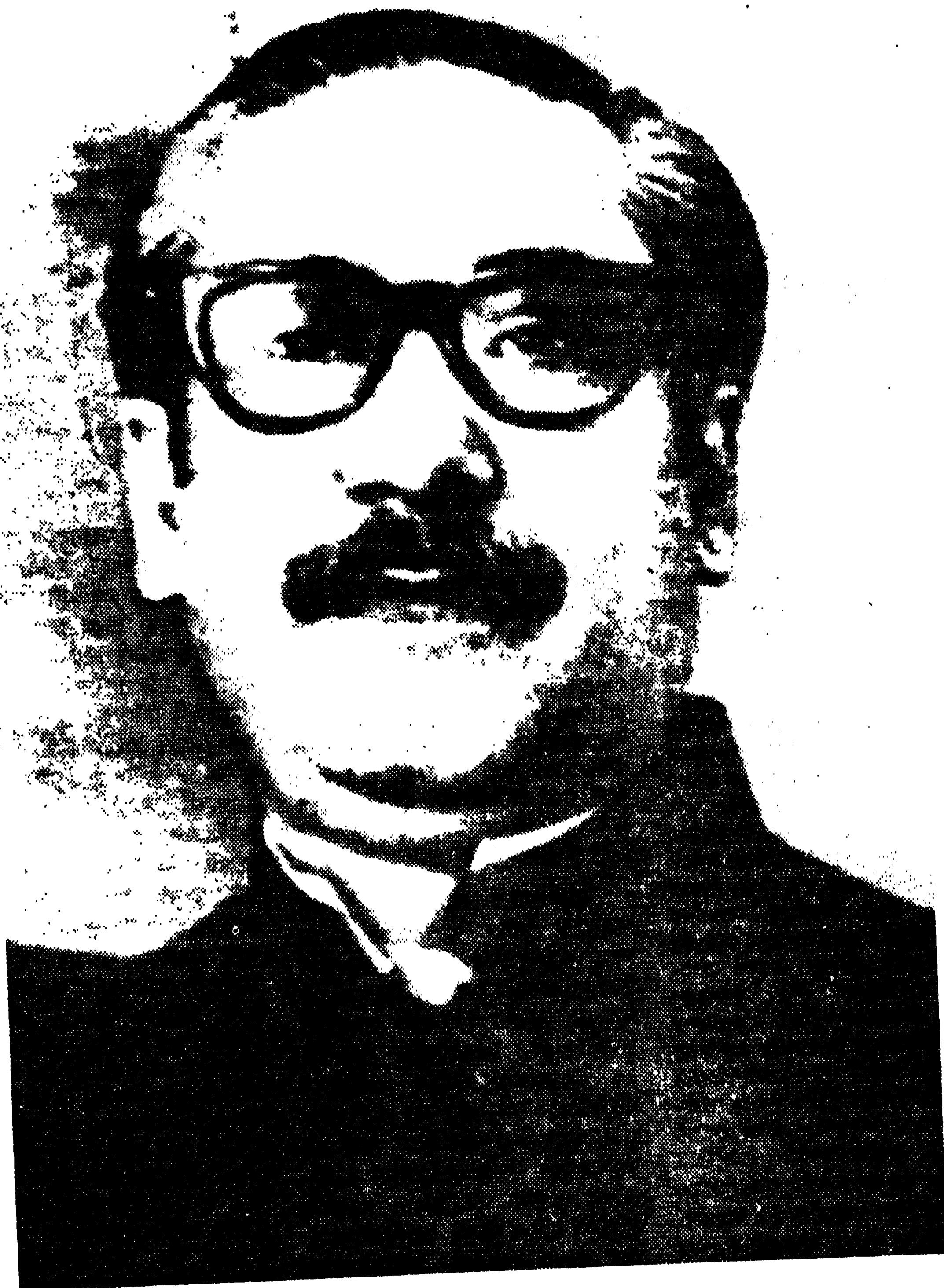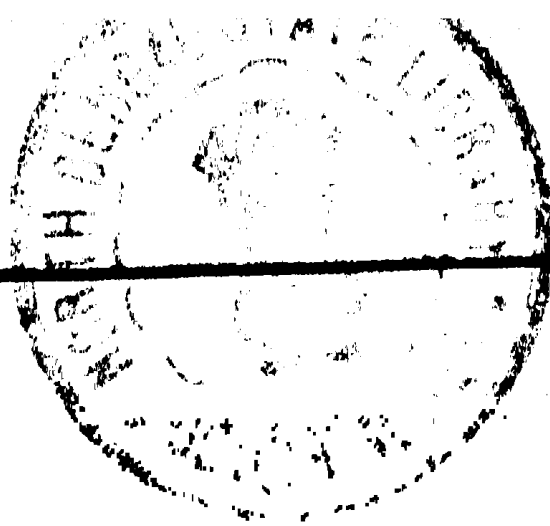
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান

মানুষটির জন্যই সাড়ে সাত কোটি বাঙালির এই অসাধারণ জাগরণ। বাংলার দুঃখী মানুষের ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা আজ এনে দিয়েছে তাদের প্রার্থিত স্বাধীনতা। এই ন' মাস মুজিবর নিজে উপস্থিত ছিলেন না রণক্ষেত্রে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ মুজিবের নামে শপথ নিয়েই পাকিস্তানী জল্লাদবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। মুজিবই ছিলেন মুক্তি-সংগ্রামের অনির্বাণ আলোকশিখা।

মুজিবর যখনই তাঁর মাতৃভূমির কথা বলেন, তাঁর কণ্ঠ হয় আবেগকম্পিত। সোনার বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর ভালবাসা অন্তহীন। একান্ন বছরের এই মানুষটি কীভাবে বাংলার হৃদয়ের মানুষ হলেন—কোন্ যাদুমন্ত্রের স্পর্শে তিনি জাগালেন বাংলার মানুষকে, তা জানবার জন্য পৃথিবীর মানুষের আজ স্বাভাবিক কৌতূহল। পাকিস্তানের সমরশক্তি দমন করে রাখতে পারল না বাংলাদেশকে। পঁচিশ বছর আগে যে সাম্রাজ্যিক চক্রান্ত ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে গিয়েছিল—বাংলার মানুষ মুজিবের প্রেরণায় সেই চক্রান্ত আজ ব্যর্থ করেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে ভারতের মানুষ ও ভারতের সেনাবাহিনীর যোগাযোগ এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছে আমাদের দুই দেশের সঙ্গে।

মুজিবরকে বাংলাদেশ অনেক প্রতীক্ষার পর আবার ফিরে পেয়েছে। মুজিবরও এই বাংলার জন্যই আজীবন প্রতীক্ষা করেছেন। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ৯ মার্চ তারিখে যে-শিশুর জন্ম, তাঁর ললাটেই ভাগ্যবিধাতা এঁকে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়কের জয়টিকা। মুজিব যখন গ্রামের ইস্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল স্বাভাবিক নেতৃত্বের স্ফুরণ। কলকাতায় যখন কলেজের ছাত্র, সে-সময়েই মুজিবর আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রতি। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবিতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলকাতায় যে-সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়, আঠারো বছরের তরুণ মুজিবর ছিলেন সেই সত্যাগ্রহী দলে। বৃটিশ সরকার সেদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। তখন থেকেই মুজিবরের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী রাজনীতির শুরু। এর পর থেকে তিনি আর কোনোদিন পেছন ফিরে তাকাননি—এক আপোষহীন সংগ্রামীর দুর্গম পথযাত্রার সূত্রপাত হয় তখন থেকেই।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলিম লীগ ভারত ভাগ করল ধর্মের ভিত্তিতে। ওরা বলল, হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি। বাংলার মুসলিম-প্রধান অঞ্চলকেও তারা ভারত থেকে আলাদা করে নিয়ে সৃষ্টি করল পূর্ব পাকিস্তান। মুজিবর তখনও কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। দেশভাগের পর তিনি চলে যান তাঁর মাতৃভূমিতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শুরু করেন পড়াশোনা।

মুজিবরের সোনার বাংলা তখন পূর্ব পাকিস্তান। সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে দেশ ভাগ করে মুসলিম লীগের জমিদার-পুঁজিপতি-ধনিক-বণিক নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্র দুঃখী মানুষকে নতুন করে শোষণ করতে শুরু করল। তরুণ মুজিব দেখলেন, স্বাধীনতার বিকৃত স্বরূপ। বৃটিশ প্রভুদের পরিত্যক্ত তখত-তাউসে বসেছে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজি-পতি-জমিদার ও তাদের সহযোগী পূর্ব পাকিস্তানী কিছু দালাল-শ্রেণীর লোক। প্রথমেই তারা ধ্বংস করতে চাইল বাঙালির জবান—তার মাতৃভাষা। দুই বাংলার একই ভাষা, এই যোগসূত্র পাকিস্তানী কর্তারা পছন্দ করলেন না। তাঁরা চাইলেন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে। পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্না ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এক বক্তৃতায় বললেন, উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সেই সভায় শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন তরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, না, বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। সে-যুগে জিন্নাহ্‌র মুখের ওপর কেউ কথা বলতে পারে, এটা ছিল অকল্পনীয়। সেই অভাবনীয় কাজ যে-তরুণ করেছিলেন, তাঁর নাম শেখ মুজিবর রহমান। মুজিবর বুঝেছিলেন, মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে না পারলে বাঙালির নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের প্রথম কাজই হয় উপনিবেশের ভাষা ও সংস্কৃতির বিনাশ। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানী কলোনি হতে চলেছে—এ-সত্য বুঝতে তরুণ মুজিবরের বেশি সময় লাগেনি।

পাকিস্তানীরা মুজিবরকে তখনি কারারুদ্ধ করল। দু বছর পর ১৯৫২ সালে মুজিব জেল থেকে বেরিয়ে এসে মৌলানা ভাসানির নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামি মুসলিম লীগের অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারি হন, ১৯৫৩ সালে নির্বাচিত হন জেনারেল সেক্রেটারি। বাংলাদেশের তরুণ সমাজে তখন শুরু হয়ে গেছে প্রতিরোধ আন্দোলন। বাংলাভাষার জন্য এই তরুণরা প্রাণ দিল ঢাকার রাজপথে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। আজকের কুইসলিং নুরুল আমিন ছিলেন সে-সময়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরই নির্দেশে বাংলার তরুণদের হত্যা করা হয় রাজপথে—সালাম, বরকতের রক্তে রঞ্জিত হল শ্যামল বাংলার বুক। ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন দিয়েই বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের সূত্রপাত। মুজিবর রহমান সেই সংগ্রামী আন্দোলনকে সংগঠিত করলেন ফজলুল হক, মৌলানা ভাসানি ও সোহ্‌রাবর্দীর নেতৃত্বে। ১৯৫৪ সালে বামপন্থী যুক্তফ্রণ্টের কাছে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হল। ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত সেই মন্ত্রিসভায় মুজিবর রহমান হলেন কনিষ্ঠতম মন্ত্রী। সেই জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা পাকিস্তানী শাসকরা বেশি দিন বরদাস্ত করেনি। কারণ, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭০—এই ষোল বছর মুজিবর এই দাবি থেকে একচুল নড়েননি। বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই তাঁর সংগ্রামের মূলমন্ত্র। তাঁর পরবর্তী ছ'দফা দাবির মূল কথাও ছিল বাংলার মানুষের স্বাধিকার, তার ন্যায়সঙ্গত বাঁচবার অধিকার।

মুজিবরের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, তাঁর সংগ্রামী সংকল্প ও আপোষহীন মনোভাবের পরিচয় পেয়েই পাকিস্তানীরা তাঁকে কোনোদিন স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। বারবার তাঁকে কোনো না কোনো অজুহাতে কারান্তরালে পাঠানো হয়েছে। মুজিবরকে কিছুতেই দমন করা যায়নি। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে তিনি নবজাগ্রত বাঙালি চেতনাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

দশ বছর ডিক্‌টেটর আইয়ুবের রাহুগ্রাসে থাকবার সময়ে বাংলার এই অসমসাহসী নেতাকে এক মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে জেলে আটক রাখা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে কুখ্যাত এই মামলায় জড়িয়ে আইয়ুব চেয়েছিলেন মুজিবরকে ফাঁসি দিতে। বাংলার মানুষ তখন আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বন্দী নেতার মুক্তির দাবিতে গড়ে তুলল দেশজোড়া আন্দোলন। সেই আন্দোলনে বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষ যোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সেটাই হল শীর্ষকাল। ১৯৬৯ সালে সেই গণ-আন্দোলনের চাপে আইয়ুব বাধ্য হলেন শেখ মুজিবরকে মুক্তি দিতে। সাজানো মামলাও হল প্রত্যাহৃত। মুক্তিলাভের পর ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক মহাসভায় মুজিবরকে এক অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেই সভাতেই তাঁকে বাংলার মানুষ আখ্যা দেয় 'বঙ্গবন্ধু'। বাংলার দুঃখী মানুষের বন্ধু মুজিবর। তাঁর হৃদয় বাংলার মাটির মতোই কোমল। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময়ে এমন তেজস্বিতাও বিরল। এই বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার সংগ্রামে যত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার রেখে গেছেন বাংলাদেশের নয়নের মণি শেখ মুজিবর রহমান তাঁদেরই সার্থক উত্তরসাধক। সেই বঙ্গবন্ধুকে আবার ফিরে পেয়েছে বাংলার মানুষ। বাংলার হৃদয়-কমলের রক্তপাপড়ি বিছানো পথে তাঁর অভ্যর্থনা হোক দুঃখী, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের উজ্জ্বল ও সুখী ভবিষ্যতের দিশারী। 'জয় বাংলা' ধ্বনি তিনিই দিয়েছেন, এই জয় এবার তাঁকেই উৎসর্গ করে বাংলার মানুষ নিশ্চিন্ত হতে চায়।

দেশ বিদেশ

অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হবে, কি হবে না তা নিয়ে শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত একটা রহস্য সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল। অবশেষে জানা গেল, স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঐ নতুন জাতির জনক শুধু বন্দিদশা থেকেই নয়, ফাঁসির দড়িতে নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন, যদিও এই পর্যালোচনা লেখার সময় তিনি তাঁর নিজের দেশ ও স্বজন থেকে অনেক দূরে।

পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার-ওয়েজের একটি বিমানে মুজিবকে লন্ডনের হীথরো বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার আগে পর্যন্ত কয়েকদিন ধরে এই বিষয়ে পাকিস্তান চূড়ান্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাঁকে নামে মুক্তি দিয়েও রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সংলগ্ন অতিথিভবনে গৃহবন্দী করে রাখলেন। জনসভায় তাঁকে নিঃসর্ত মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেও ভুট্টো আরও একদফা আলোচনার দোহাই পেড়ে মুজিবকে অন্তরিত করে রাখলেন। আমেরিকার সংবাদ-সাপ্তাহিক 'টাইম' খবর দিল, ইংরেজী নববর্ষের রাত্রিতে শ্যাম্পেনের পাত্র হাতে নিয়ে ভুট্টো বলেছেন, শেখকে তিনি দুয়েক দিনের ভিতর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু পরে ভুট্টো সাহেব জানালেন, না, এমন কথা তিনি বলেননি।

ভুট্টো বললেন, মুজিব তাঁর কথা বা অন্য কারও কথা শুনে চলার পাত্র নন। তবু, তিনি নাকি মুজিবের সঙ্গে কয়েক দফা কথাবার্তা বলেছেন। কি নিয়ে তাহলে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে?

ইসলামাবাদ থেকে বার বার রহস্য তৈরি করা হচ্ছিল বলেই শেখ মুজিবের মুক্তিপ্রতীক্ষারত মানুষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা-নিরাশার দোলায় দুলছিলেন। বলা হচ্ছিল, বাংলাদেশ যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্ততঃ একটা শিথিল ধরনের সম্পর্কও বজায় রাখে সেজন্য মুজিবকে অনুরোধ করা হয়েছে। আরও বলা হচ্ছিল, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী যাতে দ্রুত চলে যায় শেখ সাহেব মুক্তি পেয়ে তার ব্যবস্থা করবেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছিল, এগুলি কি তাঁর মুক্তির সর্ত? ভুট্টো একবার বললেন, মুজিব একজন 'খাঁটি পাকিস্তানী', তাঁর ব্যাপারে ভারতের নাক গলাবার প্রয়োজন নেই।

ইচ্ছা করেই ভুট্টো সাহেব যেন এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন যে, মুজিবের সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া হয়েছে এবং সেই বোঝাপড়া অনুযায়ীই মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। এখন স্বয়ং মুজিব এসে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ করার কথা বললেও বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ হবে, এমন কথাও মুক্তিবাহিনীর সূত্র থেকে বলা হতে থাকল। তারপর শনিবার পাকিস্তান রেডিও যখন প্রচার করল যে, মুজিবকে একখানি বিশেষ বিমানে বিদেশে পাঠান হয়েছে এবং কোথায় পাঠান হয়েছে সেটা মুজিবের ইচ্ছাতেই গোপন রাখা হয়েছে, তখন রহস্য আরও ঘনীভূত হল। বাংলাদেশের নেতারা আগে থেকেই বলছিলেন, মুজিবের মুক্তির কথা বলে ভুট্টো শেষ পর্যন্ত ধাপ্পা দিতে পারেন। শনিবার পাকিস্তানের কথামতই মুজিব 'অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে' যাত্রা করার ঘণ্টা ছয়েক পরেও পৃথিবীর কোথাও তাঁর পৌঁছবার খবর এল না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লক্ষ্ণৌতে বসে শেখ মুজিব সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন।

লন্ডনের হীথরো বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবার ও টেলিফোনে বাংলাদেশের সরকারের নেতাদের মধ্যে ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার পর শেখ মুজিব যখন মুখ খুললেন তখন অনেক রহস্যই ফাঁস হয়ে গেল।

মুজিব স্পষ্টভাষায় বললেন, বাংলাদেশ একটা বাস্তব সত্তা, যার বিরুদ্ধে কোন চ্যালেঞ্জ করা যায় না। তিনি বললেন, বাংলাদেশকে অবিলম্বে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য করা উচিত। তাঁর নিজের ইচ্ছাতেই তাঁকে লন্ডনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সেটা গোপন রাখা হয়েছিল, এই মিথ্যা রটনার মুখোশও তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন।

•

শুধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারেই নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও জুলফিকার আলি ভুট্টো ক্রমাগত কেন প্রহেলিকা সৃষ্টি করে চলেছেন। যে ভুট্টো সাহেব পাকিস্তানের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেই ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, আপোষের দলিল বলে তিনি তাসখন্দ চুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, ভারতের সঙ্গে হাজার বছর ধরে লড়বেন বলে যিনি খোয়াব দেখছিলেন, তিনিই এখন বলছেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, ভারতের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে চান, এমনকি সেইজন্য তিনি নয়াদিল্লীতে আসতেও প্রস্তুত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে 'ঐ মেয়েছেলেটা' বলে সম্বোধন করে ইয়াহিয়া খাঁ যে অসভ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারও সংশোধন করতে চেয়েছেন ভুট্টো সাহেব। তিনি এমনকি শ্রীমতী গান্ধীর পিতৃ-পরিবারের সঙ্গে ভুট্টো পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। যে ভুট্টো সাহেব এই সেদিন তাঁর 'এ গ্রেট ট্র্যাজেডি' গ্রন্থে পাকিস্তানের বিপর্যয়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে দায়ী করেছিলেন তিনি এখন বলছেন, তাঁর নিজেরও ভুল হয়ে থাকতে পারে। ভুট্টো সাহেব গত বছর পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে পারেননি; এখন তিনি বলছেন, শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের নেতা।

তবে কি জুলফিকার আলি ভুট্টোর সত্যি সত্যিই হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে? তিনি কি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে এখন সেই ভুল সংশোধন করতে প্রস্তুত হয়েছেন? ভারতের সঙ্গে তাঁর শান্তির কামনা কি আন্তরিক?

প্রগলভ ভুট্টো সাহেবের কথাবার্তা থেকে অনিবার্যভাবেই এখন এই সব প্রশ্ন উঠছে। অতীতে তিনি যা করেছেন এবং এখন তিনি যা বলছেন, এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎটা অত্যন্ত বেশী।

গত ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা থেকে চলে এসেছিলেন। তাঁরই পিছু পিছু এসেছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। তারপর থেকেই ইয়াহিয়ার ফৌজ বাংলাদেশে যে পৈশাচিক অত্যাচার শুরু করেছিল ভুট্টো সাহেব আজ পর্যন্ত তার নিন্দায় একটি বাক্যও উচ্চারণ

করেন নি। পাকিস্তানী জেনারেলদের তিনি বরখাস্ত করেছেন যুদ্ধে হেরে যাওয়ার জন্য, অত্যাচার চালাবার জন্য নয়। তারও আগে থেকে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের দাবী নস্যাৎ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ও ভুট্টো হাতে হাত মিলিয়েই এগিয়েছিলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে ভুট্টো সাহেব লাহোরে বললেন, জাতীয় পরিষদে মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে তাঁর দল যোগ দেবে না এবং তাঁর দল বাদে এই নির্বাচন হলে তিনি দেখে নেবেন। একই দিনে তিনি দাবী করলেন, ৩ মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবিত অধিবেশন স্থগিত রাখা হোক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন স্থগিত রাখলেন এবং ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখা হল। সেদিন ভুট্টো সাহেব ইয়াহিয়া শাসনের সাফাই গাইবার জন্য রাষ্ট্রসংঘে গিয়েছিলেন এবং সেই শাসনের জন্য সমর্থন সংগ্রহ করতে পিকিংয়ে ও তেহেরাণে ছুটে ছিলেন। পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া খাঁ সাহেব যে সাজানো উপনির্বাচন করেছিলেন তার ফাঁক দিয়ে ভুট্টো সাহেব ছয়টি আসন পকেটস্থ করতেও কুণ্ঠিত হননি। আজ ভুট্টো সাহেব শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে চান: কিন্তু সেদিন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ সহ লাহোর ও করাচীর যে ১৪ জন শেখের মুক্তি দাবী করেছিলেন তাঁদেরকে ভুট্টো সাহেব নিজের নাম ধার দেন নি।

ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে কে যন্ত্র, কে যন্ত্রী তা নিয়ে অবশ্য দ্বিমত থাকতে পারে। যেমন কারও কারও ধারণা, ইয়াহিয়া খাঁ আন্তরিকভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভুট্টোই তাঁকে তা করতে দেননি। অ্যান্টনি ম্যাসকারেনহাস তাঁর বইয়ে ('দি রেপ অব বাংলাদেশ') এই অভিমত খণ্ডন করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, আসলে ইয়াহিয়াই ভুট্টোকে খেলিয়েছিলেন। তাঁর মতে, ক্ষমতা হস্তান্তরের আন্তরিক ইচ্ছা ইয়াহিয়ার ছিল না। পূর্ববঙ্গের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন জেনেও প্রত্যেকের-এক-ভোট নীতিতে নির্বাচন করেছিলেন এই আশায় যে, পূর্ববঙ্গের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন না। এই কারণেই ১৯৭০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রী ও তাঁর সাংবিধানিক পরামর্শদাতা জি ডবলিউ চৌধুরী লণ্ডনে বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের সদস্যরা একজোট হয়ে যদি পশ্চিমের সঙ্গে মোকাবেলায় নামেন তাহলে বুঝতে হবে, রাষ্ট্রের অবসান হয়েছে।'

ম্যাসকারেনহাস আরও খবর দিয়েছেন যে, নির্বাচনের জয়লাভের পরই শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ভুট্টোর পিপলস পার্টি যদি আওয়ামী লীগের ছয়-দফা দাবী মেনে নেয় তাহলে তার বিনিময়ে জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব নিতে পারেন। এই নিয়ে মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে কিছু পত্র-বিনিময়ও নাকি হয়েছিল। জানুয়ারি মাসে ভুট্টো ঢাকায় যান। তার আগে ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনা হয়েছিল। ইয়াহিয়া সেই সময়ে ছয় সপ্তাহব্যাপী এক শিকার অভিযানে বেরিয়ে ছিলেন। এই অভিযানের মধ্যে তিনি লারকানায়ও গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি ভুট্টোর অতিথি হয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। কেননা, এর কিছুদিন বাদেই পেশোয়ারে একটি ককটেল পার্টির শেষে ভুট্টো সাহেব মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বলেছিলেন, 'মুজিব বাদ হয়ে গেছেন, আমিই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।'

ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে কে কার দড়ির টানে পুতুল নাচ নেচেছেন তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু যা ঘটেছে তার জন্য যে দুজনেরই দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করা কঠিন যে, ভুট্টোর হৃদয় বদল হয়েছে, তিনি অতীতের ভুল সংশোধন করতে প্রস্তুত হয়েছেন। বরং এটাই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রনেতার ভেক ধারণ করা ছাড়া অন্য পথ নেই। যে লাখখানেক সামরিক ও অসামরিক পাকিস্তানী ভারতের হাতে বন্দী হয়েছেন তাদের ফিরিয়ে আনাই এখন ভুট্টোর বড় কাজ। এই বন্দীদের আত্মীয়স্বজন পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও পাকিস্তানের অন্যত্র ছড়িয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির ঘাঁটিও রয়েছে। তাঁরা বন্দীদের ফিরিয়ে আনার জন্য ভুট্টোর উপর প্রচণ্ড চাপ দেবেন নিশ্চয়ই। সুতরাং এখন ভারতের কাছে ভাল মানুষ সাজার চেষ্টা করা ছাড়া ভুট্টোর অন্য উপায় আর কি আছে?

•

তাহলে পাকিস্তানের হাজার-সাল-তক-লড়নে-ওয়ালা প্রেসিডেন্ট মুখে শান্তির কথা বলে তলায় তলায় ভারতের সঙ্গে আর এক দফা যুদ্ধ বাধাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন? লক্ষ্য করার বিষয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখনই অবসর পাচ্ছেন তখনই দেশের মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাধতে পারে।

সুস্থবুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে অবশ্য পাকিস্তানের এখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা উচিত নয়। পাকিস্তানের প্রায় ৪০ জন জেনারেলের মধ্যে ১৮ জনই খারিজ হয়ে গেছেন। বাকী যাঁরা রইলেন তাঁদের দিয়ে পাকিস্তানী ফৌজের পুনর্বিন্যাস করা সময়সাপেক্ষ। পাকিস্তানী নৌবহরের তিনজন অ্যাডমিরাল ও তিনজন কমোডোর বাদ পড়ছেন এবং নৌবাহিনীর অধিনায়ক এখন একজন কমোডোর। আকাশপথে ভারতীয় বিমানবাহিনীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধের ১৪ দিনে ভারতীয় বিমান পশ্চিমে হাজার তিনেকবার এবং পূর্বে ১৯৭০ বার হানা দিয়েছিল। এখন তারা পূর্বদিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে পশ্চিমদিকে সমস্ত শক্তি সংহত করে দিনে ৩৫০ বার হানা দিতে পারে। অন্যদিকে, পাকিস্তানী বিমানবাহিনী তার শক্তির ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মত খুইয়েছে।

পাকিস্তানের কাছে যেসব চীনা বিমান ও ট্যাঙ্ক রয়েছে সেগুলির অকর্মণ্যতা এবারকার যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে। নতুন রসদ সংগ্রহ করতে হলে ইসলামাবাদকে তা করতে হবে পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া পাকিস্তানকে বড়রকম কোন অস্ত্র সাহায্য দেওয়া সম্ভব হবে না।

যুদ্ধবিরতি অমান্য করে আবার লড়াই বাধাবার দুর্বুদ্ধি যদি পাকিস্তানের হয় তাহলে তার জন্য যে আর একটা শোচনীয় পরাজয় অপেক্ষা করে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্বুদ্ধি তো পরিমাণের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং ভুট্টোর মতিগতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়াও সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সম্ভাবনার বিষয় ইতিমধ্যে আলোচিত হচ্ছে। একটি হল, পাকিস্তান ইরাণ ও তুরস্কের সঙ্গে জোট বেঁধে ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবে। সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ যে, ইরাণের শাহানশাহ পাকিস্তান সফর করতে এসেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম একজন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তান সফর করতে এলেন।

দ্বিতীয় আর একটি সম্ভাবনা হল, এইবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে পাকিস্তান এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবে যে, চীন তার হয়ে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করবে।

এইসব সম্ভাবনার কোনটি কার্যে পরিণত হবে কিনা বলা যায় না। তবে আগামী কয়েক মাস ভুট্টো কি করেন ও কি বলেন দুয়ের উপরই ভারতকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

•

'ডাঃ কিসিঙ্গার যা কিছু করেন, এমনকি যে টয়লেট পেপার ব্যবহার করেন তাকেও গোপন মার্কা দিয়ে রাখা হচ্ছে।'—একথা বলেছেন মার্কিন সাংবাদিক জ্যাক অ্যাণ্ডারসন।

৮।১।৭২ —পুণ্ডরীক

সাংবাদিক শিশিরকুমার

পুলকেশ দে সরকার

—পটভূমিকা—

একদা দুই 'ঝড়ের পাখী'র দেখা হয়েছিল। একজন গেলেন নীল-চাষীরা যে ঝড় তুলেছিল তারই মধ্যে, একজন থাকলেন শহুরে সাহেব-সাহেবিয়ানার নীলের বিষে। একজনের নাম এম-এল-জি, আর একজনের নাম হ্যারিশ। এম-এল-জি মন্মথলাল ঘোষ, হ্যারিশ হরিশচন্দ্র মুখার্জি। হরিশ মুখার্জির অগ্নিক্ষরা হিন্দু পেট্রিয়টে স্ফুলিঙ্গ জোগান দিতে লাগলেন এম-এল-জি, ভুলক্রমে ছাপা হত এম-এল-এল। পুলিশের ছায়া সর্বদাই পিছু নিত বলে ভুলটাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন এম-এল-জি ওরফে মন্মথলাল ঘোষ ওরফে শিশির কুমার ঘোষ। হাঁ, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমারের এই নামেই সাংবাদিকতায় প্রথম দীক্ষা হয়েছিল। ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়টের' ভ্রাম্যমান রিপোর্টার এবং আশ্চর্য, নীল-চাষী অভ্যুত্থানের সংগঠক। আরও আশ্চর্য, এ নিয়ে আত্মশ্লাঘার স্তরে মুণাক্ষরেও নামেন নি, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দুই বিশ্বাস ভাইয়ের কাহিনী লিখেছেন, তিনি নিজেকে করেছেন আত্মবিলোপ। কিন্তু তাঁকে স্বীকার করেছেন বিশ্ববিদিত ইতিহাসবিদ ডঃ যদুনাথ সরকার। পেট্রিয়টের পত্রাবলী সংকলন করেছেন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, তার ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসামুখর ডঃ যদুনাথ সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, শিশিরকুমারের এ দান ভুলে গিয়ে আমরা যেন অকৃতজ্ঞতা না করে বসি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ বা সামন্ততন্ত্রের পুনরভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা এবং বাঙলাদেশে বারাকপুরের মঙ্গল পাঁড়ে নয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই বৃহত্তর সত্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শিশিরকুমার কলকাতার 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়; বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতিও পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার প্রথম বিভাগে পাস করিয়া এক বৎসরের জন্য মাসিক ৮৲ হিন্দু স্কুল বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখিবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। গণিতে সমধিক প্রীতিই সম্ভবতঃ এদিকে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি অল্পদিনই ছিলেন।" (১)

পক্ষান্তরে, শ্রীবাগল বঙ্কিম প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভের কয়েক মাস মধ্যেই ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন। পরবর্তীকালের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই প্রথম বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। এবারে তাঁহার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছিলেন কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার প্রভৃতি (প্রমুখ?) স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ।" (২)

ধারণা হতে পারে শিশিরকুমার এঁদের সঙ্গে আইন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কোথাও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। শিশিরকুমারের আদি জীবনীকার অনাথনাথ বসু লিখেছেন : "শিশিরকুমার হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি-লাভ করিয়াছিলেন।. ...তৎকালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রগণ বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিত। বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া শিশিরকুমার বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। শিশিরকুমার কিছুদিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" (৩)

যে কথাটি কেউ না বলায় একটি ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা হচ্ছে কলকাতা থাকতেই তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখার্জির সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁরই প্রেরণায় ১৮৫৯-৬০'এর নীলবিদ্রোহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; উচ্চতর চলতি শিক্ষাগ্রহণের দিকে আর ঝোঁক ছিল না। এর একটা সূত্রও ছিল। ঘোষ-ভ্রাতাদের বাবা হরিনারায়ণ বেঁচে থাকতে এক নীল কুঠিয়ালের সঙ্গে মামলায় তিনি জিতেছিলেন। কুঠিয়াল সাহেব প্রতিহিংসাবশতঃ ঘোষ-বাড়ী আক্রমণোদ্যত হয়। কিন্তু ঘোষ-ভ্রাতাদের দৃঢ় আয়োজনের মুখে সাহেব পিছিয়ে যায়। নীলকরদের অত্যাচারের সঙ্গে ঘোষভাইদের পরিচয় ছিল। শুধু তাই নয়, ঘোষ-ভাইদের মূল ব্রতই ছিল গ্রামের উন্নতি ও লোককল্যাণ এবং এরই প্রয়োজনে দেখা দেয় একখানি 'মুখপাত্র'। শিশিরকুমারের সাংবাদিকতার এই হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়।

গড্ডালিকা প্রবাহ নয়, 'অমৃতপ্রবাহিনী'

হরিনারায়ণের পুত্রকন্যাদের এক অনন্যসাধারণ সহোদরপ্রীতি শুধু এক সূত্রে গ্রথিতই করেনি, এক অবিচ্ছিন্ন ভাব-ধারায়ও উত্তীর্ণ করেছিল। মা অমৃতময়ীকে কেন্দ্র

মহাত্মা শিশিরকুমার

---

(১) শিশিরকুমার ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ৭

(২) বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, জীবনী শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ১১-১২

(৩) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, অনাথনাথ বসু (১৩২৭), পৃঃ ৭-৮

এই জীবনী প্রকাশ সম্পর্কে গ্রন্থকার তাঁর বইয়ের নিবেদনে লিখেছেন, এটি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় বেরোচ্ছিল; শিক্ষাবিভাগের আপত্তি আশঙ্কায় তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়; পরে মানসী ও মর্মবাণীতে খানিকটা বেরোয়।

করেই এই সৌরমন্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল। মাকে মাঝখানে বসিয়ে শিশিরকুমার আর সব ভায়েদের নিয়ে গাইতেন ঃ

মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ
তবে পাপী তাপী শোকী,
মিছে তুমি কেন কান্দ
মাঝখানে জননী বসে
সন্তানগণ চারিপাশে
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে
পাপ তাপ দূরে গেল
আনন্দরস উথলিল,
বাহু তুলে মা-মা বলে,
নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ

এবং এ সংসারে হরিনারায়ণ-অমৃতময়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র বসন্তকুমার ছিলেন অন্যান্য সন্তানের চোখে ধ্রুবতারা। সহোদরা স্থির সৌদামিনী লিখেছেন ঃ "দাদার প্রতি এমন ভক্তি ছিল, আমগাছকে তেঁতুল গাছ বলিলে তাহাই স্বীকার করিতাম।......দাদার যখন ১৮ বৎসর বয়স তখন তিনি ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিয়া ইংরাজীতে মহাপন্ডিত হইয়াছিলেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিত-শাস্ত্রও শেষ করিয়াছেন। ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখিয়াছিলেন। পার্শী ভাষাও অধিকার করেন।'" (৪)

স্বয়ং শিশিরকুমার তাঁর 'অমিয় নিমাই চরিত'-এর দ্বিতীয় খন্ডটি উৎসর্গ করতে গিয়ে বসন্তকুমার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "আমি দাদাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন; ভালই গড়িয়া-ছিলেন।"

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পর হেমন্তকুমার সেকালে ভ্রাম্যমান স্টাফ রিপোর্টারের কাজ করেছেন; বিহার দুর্ভিক্ষের নিদারুণ চিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এমন নির্ভুল এঁকেছিলেন যে, তৎকালীন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত চমকে উঠেছিলেন এবং কোনো কোনো ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদকেরাও নিজেদের ভুল স্বীকারে বাধ্য হয়েছিলেন। সেকালের সারা বাংলা রাজনৈতিক সংস্থা গঠন ও সেই সূত্রে চেতন সঞ্চারের ভূমিকাও নিয়েছিলেন হেমন্তকুমার। অনুজ শিশিরকুমারের সঙ্গে তিনি এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন যে, সাংবাদিকতার কাব্যে তিনি যেন অনুচ্চারিত রয়ে গেছেন।

(৪) স্থির সৌদামিনী লিখিত 'অমৃত-বাজার ঘোষ পরিবার', আষাঢ় ১৩২০, পৃঃ ২১ ও ৩১। হেমন্তকুমার সম্পর্কে লিখেছেন, আমার মেজদাদা নিতান্ত নম্র প্রকৃতির ছিলেন, পুরুষোচিত তেজের অভাব ছিল না। তবে সেজ-দাদার মত দৌড়াদৌড়ি, কুস্তি ও খেলায় কিছু অপারগ ছিলেন।

এবং মতিলাল ঘোষ অনাথনাথ বসুর "মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ"-এর ভূমিকায় শিশিরকুমার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তিনি গুরু, আমি শিষ্য। সেজদাদা এই সত্য প্রচার করিলেন যে, we are we and they are they জাতীয় মহাসমিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সেজদাদাই মিঃ হিউমকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।" (৫)

মতিলাল ঘোষ শিশিরকুমারের কিছু লেখা সঙ্কলন করে গ্রন্থাকার দেন; সেখানেও তিনি সেজদাদা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ঃ "আমি যা সামান্য জানি, তা তাঁর কাছেই পাওয়া।" (৬)

লোকমান্য বালগঙ্গাধর লোকও অমৃত-বাজার পত্রিকায় শিশিরকুমারোত্তর লিখন-ভঙ্গি লক্ষ্য করে সবিস্ময়ে মতিলালকে জিগগেস করেছিলেন, কি ব্যাপার, কি করে আপনি আপনার দাদার ভাষা, ভঙ্গি, আবেগ হুবহু আয়ত্ত করলেন? মতিলাল বলেছিলেন, আমি তো দাদা ছাড়া আর কিছু পড়িনি। (৭)

অথচ বসন্তকুমারের নেতৃত্বে কেউই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবার সহজ রীতি অভ্যাস করেন নি, প্রতিকূল স্রোতকেই অমৃত-প্রবাহে পরিণত করে-ছিলেন। জীর্ণ জড় হিন্দুসমাজের মধ্যে বসন্তকুমারের নেতৃত্বে নন-কনফর্মিস্ট প্রটেস্টান্টরূপে; চিরাচরিত প্রথার বা রীতির প্রতি অকারণ ও নির্বিচার আনুগত্য থেকে মুক্ত প্রতিবাদীরূপে। কালটা ছিল বিদ্রোহের, ইংরেজি শিক্ষার সূচ্যগ্র দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুপ্রবেশ করেছে গভীরে, নিশ্ছিদ্র গৃহের মুক্ত বাতায়ন পথে পড়েছে পশ্চিমের আলো, প্রাচীন সতর্কতায় সুরক্ষিত সম্পদের ওপর এসে পড়েছে নব-মূল্যায়নের দাবী; বাঙলার আকাশে-বাতাসে স্থবির প্রাণহীন পৌত্তলিকতা-

(৫) অনাথনাথ বসু প্রণীত "মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ", মতিলাল ঘোষের ভূমিকা, পৃঃ ৪

(6) 'Impelled by a deep sense of gratitude towards my revered brother and spiritual guide, to whom, under God, I owe all the little that I konw'. (Indian sketches by Shishir Kumar Ghose with an Introduction by W. S. Caine: Preface, Matilal Ghose, July 1898)

(7) 'I asked him how was it that he could copy his brother so exactly in language, style and sentiment and he told me that he had studied his brother and nothing else and hence he had been able to maintain the spirit of the paper'.

(১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৯-এ ডিসেম্বর ষষ্ঠ তিরোভাব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের ভাষণ)

উত্তীর্ণ আরণ্য দর্শন উপনিষদের গম্ভীর উদাত্ত প্রতিধ্বনি। (৮)

বিদ্রোহ-বিরোধিতার জন্য ঘোষ-ভাইদেরও অবশ্য কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল; কিন্তু ঋজু মেরুদন্ডে এ মূল্য তাঁরা কড়ায় গন্ডায় পরিশোধ করেছিলেন দেশসেবায়— যে-দেশ শুরু হয়েছে গ্রামে এবং যার ভৌগোলিক বিস্তার ঘটেছে ভারতবর্ষে, মানব-সেবায় গ্রামবাসীতে যার শুরু সারা ভারতবর্ষে যার ব্যাপ্তি।

"আমার ভ্রাতারা স্বদেশপ্রিয়", লিখেছেন স্থির সৌদামিনী, নিজেদের স্বার্থের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে দেশ-বাসীর মঙ্গল হয় তাহাই করিতেন।" (৯)

ভ্রাতৃ সমাজ

"বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে শিশিরকুমার 'ভ্রাতৃসমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। বসন্তকুমার প্রেসিডেন্ট, হেমন্তকুমার সভ্য ও শিশিরকুমার সম্পাদক হইলেন। মতিলাল সাহায্য করিতেন। মাগুরা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীর মধ্যে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহায়তার নিমিত্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

"ভ্রাতৃসমাজের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মাগুরা গ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলারাও যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, সেজন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়া-ছিল। উদরান্নের জন্য পরিশ্রম করিবার পর কৃষকমন্ডলী যাহাতে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন পল্লীতে নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" (১০)

এ সম্পর্কে স্থির সৌদামিনী স্বয়ং লিখেছেন ঃ "দাদা আমাদিগের গ্রামে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল, বড় মেয়ে ও বধূদিগের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় ও চাষা লোক-দিগের জন্য চারিটি নাইট স্কুল স্থাপন করেন। বেশ স্মরণ আছে, বৌদের এরূপ উৎসাহ যে, কেহ ঘর ঝাঁট দিতেছে কি অন্য কোন কাজ করিতেছে, আর আপনা-আপনি

(8) The spread of English education and contact with western civilisation and culture in the middle of the last century brought about a change of ideas among the educated people in general, many of whom came under the influence of foreign missionaries and embraced christianity Others came under the banner of Raja Ram Mohan Roy's newly founded Bramho Samaj. .. (Life of Shishir Kumar Ghosh, Wayfarer, P.10).

(৯) অমৃতবাজার ঘোষ পরিবার, স্থির সৌদামিনী, পৃঃ৩৬

(১০) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, অনাথনাথ বসু প্রণীত, পৃঃ ২০-২৩

মুখে ;নদী ওবি ওনিসি লেনা ওখটস্ক সাগরে পড়িতেছে' বলিয়া ভূগোল মুখস্ত করিতেছে। সে কি উৎসাহ, কি তরঙ্গ, কি সুখের দিন; তাহা মনে হইলে এখনও হৃদয় নৃত্য করিয়া ওঠে।" (১১)

কালটা স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের অনুকূলে ছিল না। কিন্তু বাঁধ ভেঙে চলেছে কালের চাপে। এবং বাঙলার একটি গ্রামে—শহর থেকে অনেক দূরে—এই বাঁধ ভাঙার প্রথম ভূমিকা নিয়েছিলেন এই ঘোষ-ভাইয়েরা।

"তখন", লিখেছিলেন স্থির সৌদামিনী, "আমাদের দেশে মেয়েমানুষের লেখাপড়া করা একটা বিষম দোষের বিষয় ছিল। এমন কি, মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয় লোকের এই একটা বিষম ধারণা ছিল।...দাদার প্রথম হইতেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তখন এ প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়াই তিনি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক বাবা একথা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা' বলিয়া একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছিল। বাবা কলিকাতা হইতে সেই পুস্তকখানি আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।" (১২)

কিন্তু বিদ্রোহের মূল্য পরিশোধ এখানেই শেষ নয়।

"দাদা গ্রামে স্কুল, ডাকঘর করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর গ্রামে একটি হাট বসাইবার জন্য কৃতসংকল্প হন। ...বসন্তকুমার মাতা অমৃতময়ীর নামে বাজারের নাম অমৃতবাজার রাখিয়াছিলেন।" (১৩)

অনাথনাথ বসুও লিখেছেন : "স্নেহময়ী জননী অমৃতময়ীর নামানুসারে বসন্ত ও শিশিরকুমার বাজারটির অমৃতবাজার নাম দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মাগুরা অমৃতবাজার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।" (১৪)

আজকাল মাঝে মাঝে আদর্শ গ্রামের কথা শোনা যায়। কোন গ্রামকে নানা পরস্পরবিরোধী সংস্কার-আবর্জনা থেকে মুক্ত করে আজও আদর্শ গ্রাম সৃষ্টি করা কঠিন। সেকালে তা বহুগুণ কঠিনতর ছিল। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকও তাঁরা অতিক্রম করেছিলেন।

"শিশিরকুমার জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মনরোকে একবার স্বীয় গ্রাম পরিদর্শনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তিনটি যুবকের চেষ্টায় একটি পল্লীর অসম্ভব উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সাহেব বিস্মিত হইয়াছিলেন। ...তিনি সরকারী কার্য-বিবরণীতে 'ভ্রাতৃসমাজে'র কার্যাবলীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।" (১৫)

শিশিরকুমার এই মনরোর মন কত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর "আমার জীবন"-এ তা সকৌতুকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

"তিনি মনরো সাহেবের আন্তরিক প্রিয়পাত্র ও তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র। এ হেন দুরন্ত সাহেব তাঁহার করে যেন মোমের পুতুল। সাহেব মহোদয়ের দীর্ঘ কর্ণ দুখানি শিশিরকুমার করন্যস্ত। রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়েও শিশিরকুমার অবাধে তাঁহার দাম্পত্য-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেন।" (১৬)

কোন সন্দেহ নেই, শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমনই কোন দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল যা মনরোর মতো দুর্দান্ত সাহেবের পক্ষেও উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। অমৃতবাজার পত্রিকার অতিশৈশবে যখন লাইবেলের মকোদ্দমা চলছিল, কবি নবীনচন্দ্র সেন সেই সময় (জুলাই ১৮৬৮) যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর হয়ে এসেছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি সেই অলক্ষ্য বস্তুটি অনুভব করেছিলেন। তাঁর অনবদ্য ভাষায় সেই অনুভূতি সরস কৌতুকে লিপিবদ্ধও করে গেছেন :

"কিছুদিন পরে বেলা তিনটার সময়ে এক অপূর্ব মূর্তি আমার এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-বিশেষ বলিলেও চলে। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সমস্ত শরীরে কেবল কয়েকখানি হাড়। নাকের মুখের এমন কি সর্বশরীরের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ, কিন্তু তীব্র, উজ্জ্বল, হাস্যময়। মুখে গালভরা পান, ও গালভরা কেমন একপ্রকার বিদ্রূপাত্মক হাস্য। পানের অলক্ত রসে অধর প্রান্তদ্বয় প্লাবিত। পরিধানে সামান্য ধুতি, সামান্য পিরাণ, তাহারও নাস্তি বোতাম। তাহার উপর একখানি চাদরের দড়ি—বুকের উপর অঙ্কশাস্ত্রের পূরণের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রান্তদ্বয় স্কন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। এইত রূপ। কিন্তু মূর্তিখানি দেখিলে বোধ হয় কি যেন একটি অদ্বিতীয় লোক।" (১৭)

এ হেন সহোদরের সহযোগিতায় বসন্তকুমারের কোন ইচ্ছা পূরণেই বাধা ছিল না। গ্রামসেবা, জনসেবা, দেশসেবা, মানবসেবা-ব্রতে পত্র-পত্রিকা বা প্রচার অভাব বোধ করতে লাগলেন বসন্তকুমার-শিশিরকুমার। পত্র-পত্রিকার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে শিশিরকুমারের যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল; আগ্রহও ছিল। হরিশ মুখার্জির সান্নিধ্যে, হিন্দু পেট্রিয়টের রিপোর্টার ভূমিকায় এই প্রতিপত্তির স্মৃতি সতেজ। বছর দুইও উত্তীর্ণ হয়নি। সুতরাং বসন্তকুমারের প্রস্তাব শিশিরকুমার লুফে নিলেন।

স্থির সৌদামিনী লিখেছেন :

"দাদার এক্ষণে আর একটি কার্য বাকী। তাঁহার চিরজীবনের সাধ একখানি সংবাদপত্র বাহির করা। কলিকাতা হইতে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করিয়া দাদা আমাকে একখানি পত্র লেখেন তাহা এখনও স্মরণ আছে। দাদা এই মুদ্রণযন্ত্রটি আনিয়া এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, আমাকে ঠিক বালকের মত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি এইভাবে লেখা :

'ভগ্নি, আমি একটি জিনিস পাইয়াছি। তাহাতে আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, তোমাকে না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তুমি মনে ভাবিবে, হয়ত আমার খুব বড় চাকরী হইয়াছে। চাকরী ইহার নিকট অতি তুচ্ছ। হয়ত তুমি মনে করিবে আমার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। কিন্তু পুত্র হওয়াও ইহার নিকট তুচ্ছ। তোমরা মনে ভাব যে তোমার দাদা বড় পুণ্যবান, কিন্তু সেই হৃদয়নাথ সর্বান্তর্যামী ত জানেন আমি কত বড় পাপী। তবু এই হতভাগার উপর তাঁহার এত করুণা। আমি কলিকাতা হইতে একটী মুদ্রাযন্ত্র আনিয়াছি। আজ আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইল।'

"এই যন্ত্রে দাদা বহু চেষ্টায় 'অমৃত প্রবাহিনী' পত্রিকা নাম দিয়া একখানি পাক্ষিক পত্র বাহির করেন।" (১৮)

দুশ্চর তপস্যা-ফল

কিন্তু কিভাবে একেবারে পাড়াগাঁয়ে বহুদূরে কলকাতা থেকে প্রেস সংগ্রহ করে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সে কাহিনী কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়। একে তো কোনো গ্রামে প্রেস প্রতিষ্ঠা সেকালে সাধারণ বুদ্ধির আদৌ অধিগম্য ছিল না, তার ওপর যাতায়াতের যে-ব্যবস্থা তাতে এরকম প্রস্তাবও অনেকের কাছে বাতুলতা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কলকাতা থেকে চাকদহ পর্যন্ত ট্রেন; সেখান থেকে নৌকো, তারপর পাল্কী কি গরুর গাড়ী। চাকদহ থেকেই গ্রামের দূরত্ব ৪০।৫০ মাইল। গ্রামে উপযুক্ত কারিগর নেই, কম্পোজিটার নেই, প্রেস-ম্যান নেই; কি করে কি হবে? কলকাতা

---

(১১) 'অমৃতবাজার ঘোষ পরিবার', স্থির সৌদামিনী. পৃঃ ৩৭

(১২) (১৩) স্থির সৌদামিনী প্রণীত 'অমৃতবাজার ঘোষ পরিবার', পৃঃ ২৭—৩৮

(১৪) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, অনাথনাথ বসু. পৃঃ ২৪

(১৫) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, অনাথনাথ বসু, পৃঃ ২৪

(১৬) নবীনচন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম খণ্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রসঙ্গ

(১৭) নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', ১ম খণ্ড, শিশিরকুমার ঘোষ প্রসঙ্গ

(১৮) অমৃতবাজার ঘোষ পরিবার, স্থির সৌদামিনী, পৃঃ ৪২

থেকে সব-কিছু আনা ব্যয়-সাপেক্ষ, এক-প্রকার সাধ্যাতীত। "তখনকার দিনে সুদূর পল্লীঅঞ্চল হইতে সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প অনেকের নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক মনে হইলেও ঘোষ-ভ্রাতৃগণ ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। তাঁহারা এই সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।" (১৯)

কিছু অনেক টাকা জোগাড় হতেই শিশিরকুমার রওনা দিলেন কলকাতায়। ছাপাখানার খোঁজ করতে করতে একটি প্রেসের সন্ধান পাওয়া গেল। এক উদ্যোগী ভদ্রলোক একটি মুদ্রাযন্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক উপকরণ কিনেছিলেন। কিন্তু তা চালাতে পারেন নি এবং কিছুদিন পর মারা যান। দুঃস্থ বিধবা চাইছিলেন ওটা বিক্রী করে দিতে। শিশিরকুমার খবর পেয়ে সেখানে হাজির হলেন এবং ৩২ টাকা দিয়ে প্রেসটা কিনে নিলেন। কাঠের মুদ্রা-যন্ত্র, নাম বেলিন প্রেস।

কিন্তু তারপর? কম্পোজ, ছাপা ইত্যাদি জটিল কাজ কি করে সম্পন্ন হবে? শিশির-কুমার এবারও এক অসাধ্য সাধন করলেন। "একটি ছাপাখানার মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অমানুষিক পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই অক্ষর সাজান ও কম্পোজ করা হইতে ফর্মা ছাপানো পর্যন্ত সব কাজই একরূপ শিখিয়া লইলেন।...... ইহা ১৮৬২ সনের শেষভাগের কথা।...... গ্রামের ছুতারের সাহায্যেই কাঠের মুদ্রা-যন্ত্রটি মেরামত করিয়া খাটানো হইল। শিশিরকুমার কয়েকজন যুবককে অক্ষর সাজান হইতে কাগজ ছাপা পর্যন্ত সকল কাজই শিখাইতে লাগিলেন। অভীপ্সিত সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প অদূর-ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আপাতত সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করাই স্থির হইল।" (২০)

মুদ্রাযন্ত্রেরও নাম হয়েছিল অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্র। ক্ষয়ে-যাওয়া টাইপ-সমেত কেসগুলো পায়ার ওপর দাঁড় করানো হল। শিশিরকুমার নিজে কম্পোজ করা, ম্যাটার ইম্পোজ-করা ইত্যাদি কাজে এমনই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, তিনি স্টিক (যাতে প্রথম অক্ষর সাজানো হয়) হাতে নিজের প্রবন্ধ কাগজে না লিখেই সরাসরি কম্পোজ করতে পারতেন। অর্থাৎ, একই হাতে সম্পাদনা, কম্পোজিং ও প্রিণ্টিং। শুধু কি তাই? রোলার ও টাইপ-কাস্টিংও করতে হত। ম্যাট্রিস, কালি, এমন কি কাগজও তৈরী করতে হত। কাগজ তৈরী করতে পারেন নি, কিন্তু কালি করেছিলেন চমৎকার।

কাগজ কেমন হয়েছিল? এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের 'সোম প্রকাশ' থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন আমি উদ্ধৃত করছি :

'অমৃত প্রবাহিনী—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ইহাতে বিজ্ঞানাদিঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিতেছি, এখন এ সকল বিষয়ে ভাল লোকে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অমৃত প্রবাহিনী যশোহরে হইতেছে। ইহাও এ দেশের একটি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এতদিন মফঃস্বলে ঈদৃশ বিষয় সকলের অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না।' (২১)

ব্রজেনবাবু মৃণালকান্তি ঘোষকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, অমৃত প্রবাহিনী দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। ১২৭০ সালের পৌষ মাসে সম্ভবত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায় সংসারের জন্য অর্থোপার্জনে মনোযোগ দিতে হল। পত্রিকার সম্পাদক বসন্তকুমারকেও একই কারণে স্বগ্রাম ছেড়ে বাঁকুড়া যেতে হল।

চার বছর দু মাস পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২০এ ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক বাংলা অমৃত-বাজার পত্রিকার আবির্ভাব। কিভাবে এবং ইতিমধ্যে কি হয়েছিল?

---

(১৯) (২০) শিশিরকুমার ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ১১—১২

(২১) শিশিরকুমার ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩

বিচার

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

ক্লিং, ক্লিং ক্লিং

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কি একখানা বই পড়ছিল অনঙ্গ। বইখানা মুড়ে টেবিলের ওপর রেখে বিরক্তিসূচক একটা ভঙ্গী করে তুলে ধরল রিসিভারটা।

'হ্যাল্লো...'

'আপনি কি অনঙ্গ চৌধুরী?' অপর প্রান্ত থেকে কে জিজ্ঞেস করল পুরুষের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, আমিই কথা বলছি। কী চান আপনি?'

'আপনার বন্ধু শান্তনু আপনাকে একটা খবর দিতে বলেছে। কিছুক্ষণ আগে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ওর। আপনি কি এখনই ওর ফ্ল্যাটে একবার আসতে পারেন? ওর অবস্থা খুবই খারাপ।'

'কী বললেন? অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শান্তনুর?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে অনঙ্গ—'কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট? কেমন করে হল?'

কোনো জবাব নেই।

'হ্যাল্লো...হ্যাল্লো...'

রিসিভারের হুকটায় সজোরে বার বার আঘাত করতে করতে চেঁচাতে থাকে অনঙ্গ।

লাইনটা কেটে দিয়েছে—কোনো সাড়াশব্দ নেই।

ক্র্যাডল-এর ওপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখল অনঙ্গ। তার মুখ দিয়ে অর্ধস্ফুটভাবে বেরিয়ে এল ক্রুদ্ধ একটা শব্দ—'ড্যাম!'

পোশাক বদল করতে করতে অনঙ্গ ভাবতে লাগল। কী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে শান্তনুর? ঘণ্টা তিনেক আগে ম্যাঙ্গো লেনের অফিসে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। এরই মধ্যে এমন কী ঘটল যাতে ওর জীবন সংকটাপন্ন হয়েছে? সম্ভবত বাড়ি ফেরার সময় মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। শান্তনু গাড়ি চালায় নিতান্ত বেপরোয়াভাবে।

মনে মনে ঐ সিদ্ধান্ত করে রাস্তায় এসে নামল অনঙ্গ। হাতঘড়িটার দিকে তাকাল একবার। আটটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকী। শীতের রাত—অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। দু-চার পা এগোতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে উঠে বসল ভিতরে। তারপর ড্রাইভারকে টালিগঞ্জের একটা ঠিকানা দিয়ে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিল।

শান্তনুর স্বভাবটা সত্যিই বেপরোয়া ধরনের। এত বেশী স্পীডে গাড়ি চালায় ও যে যে-কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে

পারে। কতবার এ সম্পর্কে সে ওকে সাবধান করে দিয়েছে, কিন্তু সেকথায় ও কান দিতে চায় না—হেসে বলে, ওটাই ওর এখন একমাত্র এক্সাইটমেন্ট, অন্য কিছুতে আজকাল ও আনন্দ পায় না।

পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে অনঙ্গর। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কত কাণ্ডই না করেছে তারা! টাকা লুঠেছে দু'হাতে, খরচও করেছে খেয়াল-খুশি মতো। প্রতিটি দিন ছিল উৎসাহ ও উত্তেজনায় ভরা। কী সে জীবন!

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই অনঙ্গর চমক ভাঙ্গে যেন। পুরোনো দিনগুলোর স্মৃতিচারণে বাধা পড়ে। যে লোকটি শান্তনুর অ্যাকসিডেন্টের খবরটা দিল, সে ওকে আসতে বলেছে শান্তনুর ফ্ল্যাটে। সত্যিই যদি শান্তনু সাংঘাতিক রকমের আঘাত পেয়ে থাকে, তবে ওকে হাসপাতালে পাঠালো না কেন? ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত মনে হয় অনঙ্গর।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ড্রাইভার তাকে পৌঁছে দিল গন্তব্য স্থানে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে অনঙ্গ এসে দাঁড়াল শান্তনুর ফ্ল্যাটের সামনে। দরজার পাশে ইলেকট্রিক বেলের বোতাম টিপতে যাবে এমন সময় দরজাটা খুলে গেল আস্তে আস্তে। কে একজন নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ত্বরিতগতিতে চলে গেল তার পাশ দিয়ে আর যাবার সময় কি একটা ঠাণ্ডা কঠিন জিনিস গুঁজে দিয়ে গেল তার হাতে।

অনঙ্গ সবিস্ময়ে দেখল তার হাতে একটা পিস্তল। হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল সেইদিকে। তারপর কতকটা আত্মস্থ হয়ে অপরিচিত লোকটির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'শুনছেন মশাই, এটা আমায় দিয়ে গেলেন কেন? এ নিয়ে আমি করবো কী?'

কিন্তু ততক্ষণে অপর ব্যক্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনি আকস্মিক ও নিঃশব্দ তার গতিবিধি যে অনঙ্গর একবার মনে হল, ও বুঝি জীবন্ত মানুষ নয়, অশরীরী প্রেতের ছায়া। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হল একটু। কিন্তু পরক্ষণেই পিস্তলের কঠিন শীতল স্পর্শ এ ধারণাটা সরিয়ে দিল মন থেকে। প্রেতাত্মা আর যাই করুক, পিস্তল নিয়ে ঘুরতে পারে না নিশ্চয়ই।

ভারী জুতোর আওয়াজ কানে এল অনঙ্গর। সিঁড়ি দিয়ে কে একজন ওপরে উঠে আসছে। এইমাত্র যে লোকটি চলে গেল, সে আবার ফিরে আসছে না তো? কী তার মতলব কে জানে! শক্ত করে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরল অনঙ্গ, দরকার হলে ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না সে।

সিঁড়ির দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনঙ্গ। সিঁড়ির বাঁকের মুখে যখন এক দীর্ঘদেহী পুলিশ অফিসারকে দেখা গেল তখন ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হল তার চোখ দুটো। পুলিশ অফিসারের পিছনে একজন কনস্টেবল। কতকটা বিমূঢ়ের মতো অনঙ্গ তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

অত্যন্ত সতর্কভাবে পুলিশ অফিসার এগিয়ে গেল অনঙ্গর দিকে। তারপর গম্ভীর অথচ কঠোর স্বরে বললে, 'পিস্তলটা দিন আমাকে। তারপর চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'কী বলছেন আপনি? আপনাদের সঙ্গে যেতে হবে? কেন? কিসের জন্য-' অনঙ্গ বললে বিমূঢ়ভাবে।

'কেন? তাও আবার বুঝিয়ে দিতে হবে?'

অনঙ্গর কাছে এগিয়ে এল পুলিশ অফিসার। 'ধরা যখন পড়েছেন, অপরাধ স্বীকার করাই আপনার পক্ষে ভালো।'

'অপরাধ স্বীকার করবো?' ভয় ও বিস্ময়ে অনঙ্গর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। দু' পা পিছিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে।

'আপনি কী বলছেন আমি মোটেই বুঝতে পারছি না। আপনার মাথা খারাপ হয়েছে—'

উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল অনঙ্গ।

পকেট থেকে রিভলবার বার করে ফ্ল্যাটের ভিতর সাবধানে ঢুকল পুলিশ অফিসার।

'আমার কথা বুঝতে পারছেন না? শুনুন, চালাকি করে কোনো সুবিধে হবে না।' পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে দাঁড়ায় অনঙ্গর সামনে।

'আপনি যদি নির্দোষ হন, তবে বলুন এ ব্যাপারটা ঘটল কি করে?' অনঙ্গর পিছনে মেঝের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল পুলিশ অফিসার।

অনঙ্গ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'এ যে শান্তনু! কে এ কাজ করলে?' সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে পিস্তলটা সশব্দে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

শান্তনুর নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে একটা ভাঙ্গা চেয়ারের ওপর। গায়ের শার্টটা ভিজে গেছে রক্তে। দেহের নীচেও বেশ খানিকটা রক্ত। তখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে। ঘরের আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড। চেয়ারগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, একপাশে কাৎ হয়ে পড়েছে বুক কেসটা, টেবিল-ল্যাম্পটা গড়াগড়ি দিচ্ছে মেঝের ওপর। মরবার আগে শান্তনু যে তার আততায়ীর সঙ্গে রীতিমত লড়াই করেছিল এটা সুস্পষ্ট।

শান্তনুর রক্তমাখা দেহটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অনঙ্গ। মাথাটা তার ঝিমঝিম করে ওঠে।

'কে..কে খুন করল শান্তনুকে?' ভয় ও উত্তেজনায় অনঙ্গর কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসে।

অনঙ্গকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল পুলিশ অফিসার। আশ্চর্য! আপনি কিছুই জানেন না দেখছি! আপনার নাম কি অনঙ্গ চৌধুরী?'

অনঙ্গ ঘাড় নাড়ে হতভম্বের মতো!

'আপনি হয়তো স্মরণ করতে পারবেন কয়েক মিনিট আগেই টালিগঞ্জ থানায় আপনি ফোন করেছিলেন এই বলে...'

'থানায় ফোন করেছিলাম আমি!' বিস্ময়ভরা চোখে পুলিশ অফিসারের পানে তাকায় অনঙ্গ—'ভুল করছেন আপনি।'

'আমার মনে হয় আপনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, মশাই', বিরক্তির সুরে বললে পুলিশ অফিসার। তারপর সঙ্গী কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ও'র সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। ও'কে নিয়ে চলো থানায়।'

কনস্টেবল এগিয়ে এসে অনঙ্গর হাত ধরল।

'বাঃ! আমি কিছুই করিনি অথচ আমায় থানায় নিয়ে যাবেন!' নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে অনঙ্গ।

'তবে ফোনে আপনি অপরাধ স্বীকার করেছিলেন কেন?' অসহিষ্ণুভাবে বলে পুলিশ অফিসার—'কেন বলেছিলেন আপনার পার্টনার শান্তনুর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় খুন করেছেন তাকে? আপনি যদি পরে অপরাধটা অস্বীকার করারই মতলব করে থাকেন, তবে ওসব কথা বলেছিলেন কেন? তাছাড়া আপনাকে আমরা ধরেছি পিস্তল সমেত। আপনি কি বলতে চান এই পিস্তলটা টয়-পিস্তল?'

'বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি শান্তনুকে', হাঁপাতে হাঁপাতে বলে অনঙ্গ, 'থানাতেও ফোন করিনি আমি। আমি যখন এই ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি অমনি একজন লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমার হাতে এই পিস্তলটা গুঁজে দিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'বেশ, এসব কথা থানায় গিয়ে বলবেন। এখানে আর কোনো ঝামেলা করবেন না।' গম্ভীরভাবে বললে পুলিশ অফিসার। তারপর সঙ্গীকে ইসারা করল অনঙ্গকে নীচে নামিয়ে আনার জন্য।

বাড়ির সামনেই অপেক্ষা করছিল পুলিশ-ভ্যান। অনঙ্গকে ওরা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে।

থানায় একটা ঘরে অনঙ্গকে বসিয়ে রেখে চলে গেল ওরা। একটু পরেই একজন হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন অনঙ্গর সামনে। তিনি যে পুলিশের একজন বড় কর্তা তা বুঝতে দেরী হল না অনঙ্গর। অনঙ্গকে গোটাকতক প্রশ্ন করার পর তিনি বিদায় নিলেন গম্ভীরমুখে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল এসে অনঙ্গকে টেনে নিয়ে চলল 'সেল'এ ভরে দেবার জন্য। অনঙ্গ প্রতিবাদ করল আর্তকণ্ঠে, কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করল না।

'সেল'এর মধ্যে অনঙ্গর দিনগুলো কাটতে থাকে যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। নিরালা ছোট্ট কুঠরিটার মধ্যে যতই সে চীৎকার করুক না কেন, কেউই তার আর্ত চীৎকারে সাড়া দিত না। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে তার সমর্থনে পুলিশের হাতে অভ্রান্ত প্রমাণ রয়েছে। নিজেকে নির্দোষ

প্রমাণ করার জন্য অনঙ্গ যাই বলুক না কেন, ওদের সিদ্ধান্তের এতটুকু নড়চড় হবে না। অনঙ্গ ঝগড়া করে তার পার্টনার শান্তনুর সঙ্গে এবং তাকে গুলি করার পর শান্তনুর ফ্ল্যাট থেকেই টেলিফোনে দোষ স্বীকার করে পুলিশের কাছে। অবশ্য পরে সে সমস্ত ব্যাপারটা অস্বীকার করেছে, কিন্তু সেটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। খুন করার পর খুনীরা সাময়িক উত্তেজনার বশে অনেক সময় অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু পরে ঐ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে শাস্তির ভয়ে।

'যে-লোকটি আমায় পিস্তল দিয়ে সরে পড়ে সেই খুনী। সেই থানায় ফোন করেছিল আমার নাম নিয়ে।' বার বার চীৎকার করে বলে অনঙ্গ।

'কে সেই লোকটি?' জিজ্ঞেস করে পুলিশের লোকেরা। 'তার চেহারা কিরকম? সে আপনার পার্টনারকে খুন করতে যাবে কেন?'

ওদের সমস্ত প্রশ্নের জবাবে অনঙ্গ শুধু বলে, 'আমি জানি না...আমি জানি না।'

আদালতে বিচারের সময় বিচারকের মনোভাবও যে পুলিশের অনুকূলে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। অনঙ্গ যে মিথ্যা কথা বলছে এরকম একটা সন্দেহ গোড়া থেকেই তার মনে দেখা দিয়েছে। স্বীকারোক্তির ব্যাপারটা উপেক্ষা করলেও পুলিশ যেসব প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে অনঙ্গর বিরুদ্ধে তা কোনমতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। খুন করার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে ওকে এবং ওর হাতে তখনও সেই পিস্তলটা ছিল যা দিয়ে শান্তনুকে গুলি করা হয়।

আসামী পক্ষের উকিল অবশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, খুনের জন্য দায়ী এক অজ্ঞাত ব্যক্তি। শান্তনুকে যখন খুন করা হয় তখন অনঙ্গ ঘটনাস্থলে ছিল না—সে তখন মোটরে করে শান্তনুর ফ্ল্যাটের দিকেই আসছে।

'আসামী যে ঘটনাস্থলে ছিল না এটা কি ও'রা প্রমাণ করতে পারেন?' বিচারককে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন সরকার তরফের উকিল—'ও'রা কোনো সাক্ষী হাজির করতে পারেন এ সম্পর্কে?'

আসামী পক্ষের উকিল জানালেন, সেই মুহূর্তে সাক্ষী হাজির করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে সময় পেলে তাঁরা সাক্ষী এনে হাজির করতে পারেন। মামলা যাতে কয়েকদিনের জন্য মুলতুবি রাখা হয় আদালতের কাছে প্রার্থনা জানালেন তিনি। যে ট্যাকসিচালক অনঙ্গকে শান্তনুর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছিল তার খোঁজ করতে হবে। শান্তনু যখন খুন হয় তখন অনঙ্গ যে তার ট্যাকসিতে করে শান্তনুর ফ্ল্যাটের দিকে আসছিল এটা সে নিশ্চয়ই আদালতকে বোঝাতে পারবে।

বিচারক মামলা মুলতুবি রাখলেন। সময় দেওয়া হল আসামী পক্ষকে সাক্ষী যোগাড় করার জন্য।

দিন যায়—এক-একটা দিন যেন এক-একটা যুগ। কয়েদখানায় অনঙ্গর দুশ্চিন্তার অবধি নেই। মনে তার আশা, সে যখন নির্দোষ, তখন কেউ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য। সে যেন এমন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে মগ্ন যা থেকে জেগে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রতিদিন সকালে ঘুমভাঙার পর যখন সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায় তখন উৎফুল্ল হয়ে ভাবে, হয়তো সে রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে থাকবে একটা, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে সেই দুঃস্বপ্ন। কিন্তু চারদিকে তাকাতেই ভুল ভেঙে যায় তার। গভীর বিষাদে ছেয়ে যায় তার মনটা। সে বুঝতে পারে, হত্যার অভিযোগে কয়েদখানায় সে বন্দী।

যে ট্যাকসিচালকের খোঁজ করা হচ্ছিল তার কোনো পাত্তা নেই। সে যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে। অনঙ্গ এখন বুঝতে পারে, মুক্তির আশা দুরাশা। গভীর নৈরাশ্যে ডুবে যায় তার মন। ক্রমশ তার চিন্তাশক্তি যেন পঙ্গু হয়ে আসে। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ উঁকি দেয় তার মনের মধ্যে। হয়তো সে-ই তার বন্ধু শান্তনুকে খুন করেছে! হয়তো যে-লোকটিকে শান্তনুর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল সে তার কল্পনার সৃষ্টি! সমস্ত ব্যাপারটার স্মৃতি এমনি ঝাপসা হয়ে গেছে [illegible] সে ঠিক করতে পারে না সে প্রকৃতিস্থ কিনা।

বিচার শুরু হল আবার। আসামী পক্ষ নতুন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে না পারায় সরকারী উকিল সগর্বে উত্থাপন করলেন তাঁর দাবী। আসামীই নিঃসন্দেহে শান্তনুর হত্যাকারী। আদালতে ইতিপূর্বে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করা হয়েছে তাতে অনঙ্গর অপরাধ প্রমাণিত।

মামলাটি জুরিকে [illegible] দেবার সময় বিচারকও বললেন, সরকারী উকিলের সঙ্গে তিনি একমত। তবে জুরিকে তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জুরির আসনে যাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে উঠে ভিতরের একটি ঘরে প্রবেশ করলেন পরামর্শের জন্য।

[illegible] অনঙ্গর চোখ [illegible] লোকদের। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। হাতের আঙুলগুলো যেন একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল জুরি।

'আপনারা কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন?' প্রশ্ন করলেন বিচারক।

রুমাল দিয়ে কপালটা একবার মুছে নিয়ে ফোরম্যান গম্ভীরমুখে বললেন 'হাঁ।'

স্তব্ধতা নেমে এল বিচারকক্ষে। জুরির মুখপাত্র বললেন, 'আমাদের মতে আসামী দোষী।'

অনঙ্গর আর্ত কণ্ঠের চীৎকার প্রতিধ্বনিত হল নিস্তব্ধ আদালত কক্ষে।

'আমি নির্দোষ! আমি নির্দোষ! খুন আমি করিনি...'

কাঠগড়ার রেলিঙটা দুহাতে চেপে ধরে উন্মাদের মতো চেঁচাতে থাকে অনঙ্গ।

প্রহরীরা এগিয়ে আসে তাকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিচারক বললেন, 'নরহত্যার অভিযোগে তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিলাম।'

অনঙ্গ একবার বিচারকের মুখের পানে তাকাল অসহায় দৃষ্টিতে, তারপর হতাশা-ভরা একটা আর্তনাদ করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো।

অনেকক্ষণ পরে—কতক্ষণ তা সে অনুমান করতে পারে না—যখন সে চোখ মেলে তাকাল তখন সে দেখল কয়েদখানায় সে ফিরে এসেছে। তবে এটা যে সেই আগেকার কয়েদখানা নয় তা সে বুঝতে পারে। শরীরটা খুবই দুর্বল মনে হয়, তবু টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর হাত দুটো মুঠো করে সজোরে আঘাত করতে লাগল দরজার ওপর।

'আমি নির্দোষ! আমাকে মুক্ত করে দাও!' উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করতে থাকে অনঙ্গ।

তার ঐ আর্ত চীৎকার সেই অন্ধকার কুঠরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই কাছে ফিরে আসে যেন তাকে ব্যঙ্গ করার জন্য।

'দরজা খুলে দাও—বেরিয়ে যেতে দাও আমাকে'—

এবার শুধু হাত দিয়ে নয়, পা দিয়েও অনঙ্গ সজোরে আঘাত করতে লাগল দরজার ওপর।

আওয়াজ শুনে ছুটে আসে জেলের প্রহরীরা। তারা তাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে বলপ্রয়োগ করল না, কোনো কটু কথাও বলল না তাকে। তাকে তারা শান্ত করবার চেষ্টা করল মিষ্টি কথা বলে। তাদের ব্যবহারে রূঢ়তার আভাসমাত্র নেই, বরং যেন অতিমাত্রায় মোলায়েম। তাদের এই সদয় আচরণের অন্তরালে যে মনোভাবটা ছিল সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে অনঙ্গর কাছে। ওরা জানে আর কয়েকটা দিন পরেই সে স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের মত, তাকে শান্ত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই আর। কথাটা মনে হতেই মাথাটা তার ঝিমঝিম করে ওঠে, আছড়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে অসহায় শিশুর মতো। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে, তারপর কখন যে চোখ দুটো বুজে আসে জানতে পারে না।

দিন যত যায় ততই যে তার আয়ু দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে এটা সে ভাবতে পারে না কোনমতে। বরং সে নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করে, সে যখন নির্দোষ তখন মুক্তির একটা উপায় হবে নিশ্চয়। প্রকৃত অপরাধী যে, শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়বেই, নয়তো সে আত্মসমর্পণ করবে পুলিশের কাছে।

প্রতিদিনই মনে মনে কতবার সে যে মুক্তির দৃশ্যকে কল্পনায় সজীব করে তোলে

তা বলা যায় না। কল্পনার চোখে সে দেখে যেন জেলের প্রহরীরা দরজার তালা খুলে তাকে বাইরে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে,—বলছে, 'আসুন আমাদের সঙ্গে।' তারপর ওয়ার্ডেনের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, 'ভয়ঙ্কর একটা ভুল হয়ে গেছে—আপনি যে নির্দোষ তা আমরা জানতে পেরেছি এখন। তারপর একটু দ্বিধাজড়িত কন্ঠে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি ক্ষমা করতে পারবেন আমাদের?' ক্ষমা? সানন্দে আমি ক্ষমা করছি তোমাদের', উৎফুল্লকন্ঠে জবাব দেয় সে।

কল্পনা কিন্তু রূপায়িত হয় না বাস্তবে। কেউই আসে না তাকে মুক্ত করার জন্যে। প্রহরীরা অবশ্য দুবেলা খাবার দিয়ে যায়, ধীরভাবে শোনেও তার অভিযোগ, কিন্তু তার আসন্ন মুক্তির কথা কেউ বলে না।

'সেল'এর মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে অনঙ্গ, চোখের দৃষ্টি সবসময় বন্ধ দরজাটার ওপর। কিন্তু কেউই দরজা খুলে সুসংবাদ বহন করে আনে না। উৎকন্ঠায় দিনে দিনে তার দেহ শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে, চোখের দীপ্তি কমে আসে, কিন্তু তখনও আশা ছাড়তে পারে না একেবারে। তখনও আশা করে, শেষ মুহূর্তে মুক্তির খবর আসবে নিশ্চয়ই।

আরো কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর, ফাঁসির দিন যখন ঘনিয়ে আসে তখন সে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না। হাত দুটো মুঠো করে কেবলই চীৎকার করতে থাকে খাঁচায় বন্দী নিপীড়িত পশুর মতো, অভিশাপ দেয় তাদের যারা তাকে অন্যায়ভাবে আটক করে রেখেছে জেলে।

প্রহরীরা খাবার দিতে এলে ক্ষিপ্তের মতো সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'খাবার আমি চাই না—কিছুই চাই না আমি। চলে যাও এখান থেকে—তোমরা সবাই ষড়যন্ত্র করেছ আমার বিরুদ্ধে। তোমরা সব খুনী—নির্দোষ মানুষকে মেরে ফেলবার মতলব করেছ!'

অবশেষে এল সেই ভয়ঙ্কর দিন যেদিন তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। যথাসময়ে প্রহরীরা এসে হাজির হল তার 'সেল'-এ। তাদের দেখেই ভীত বিবর্ণমুখে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল অনঙ্গ, 'তোমরা কেন এখন এসেছ আমি জানি। আমি যাবো না—যাবো না। আমায় তোমরা ফাঁসি দিতে পারবে না!' দুগাল বেয়ে টস্ টস্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে তার।

ঠিক সেই মুহূর্তে জেলখানার একজন কর্মচারী এসে খবর দিল, আসামীর এক পিতৃবন্ধু এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে। কর্মচারীর পিছুনেই ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর হাতে একখানা খাম। খামটার ওপর নজর পড়তেই আশায় আনন্দে দুলে ওঠে অনঙ্গর বুক।

'আমার মুক্তির আদেশ এনেছেন?' সাগ্রহে প্রশ্ন করে অনঙ্গ।

'না। এটা একখানি চিঠি—তোমাকে লিখেছেন তোমারই এক আত্মীয়।' ভদ্রলোকের কন্ঠস্বর ধীর ও গম্ভীর।

'চিঠি? কে লিখেছে? চিঠি লিখতে পারে এমন তো কাউকে মনে পড়ছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'চিঠিখানা পড়ো, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।' খামখানা অনঙ্গর হাতে দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন গম্ভীরভাবে।

খামের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—ফাঁসির আগে অনঙ্গকে যেন দেওয়া হয়। দু'চোখে পরম বিস্ময় নিয়ে অনঙ্গ পড়ল লেখাটা। খামের বাঁ দিকের একটা কোণে পত্রলেখকের নাম ও ঠিকানা।

থর থর করে কাঁপা হাতে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করল অনঙ্গ।

চিঠির গোড়ায় কোনো প্রীতিসম্ভাষণ নেই। চিঠিতে লেখা—

অনঙ্গ, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে এমন এক অপরাধের জন্য যা তুমি করোনি। চিন্তাটা মোটেই প্রীতিকর নয় তোমার কাছে, ঠিক কিনা? অবশ্য এ শাস্তি যে তোমার প্রাপ্য নয় তা আমি মনে করি না। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনো পরিণাম তোমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি। দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে তিলে তিলে মৃত্যু—যেমন করে নিঃশেষ হয়েছে মীনাক্ষীর জীবন—সেটাই ছিল উপযুক্ত শাস্তি তোমার মতো নির্বিবেক পাষণ্ডের।

মীনাক্ষীকে মনে পড়ে? আমার একমাত্র সন্তান, আমার আদরের মীনুকে? মীনা সত্যিই সুন্দরী ছিল। বিদ্যাবুদ্ধিও কম ছিল না তার। তবে সে ছিল অত্যন্ত ভাবপ্রবণ আর সেইজন্যেই তোমার মিথ্যা কথায় প্রতারিত হয়েছিল সে। শুনেছি বাক্চাতুর্যে তোমার নাকি জুড়ি নেই। মিথ্যার জাল বুনে মানুষের মন ভোলাতে হয় কি করে তা খুব কম লোকই জানে তোমার মতো। মেয়েরা যে তোমার চাতুরী ধরতে পারবে না এটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

মীনুর সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করেছিলে তা নিতান্ত অমানুষিক। তোমার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করেছিল সে—ভেবেছিল তুমি তাকে বিবাহ করে রাজরাণীর মতো সমাদরে রাখবে। সেইজন্যেই সে গৃহত্যাগ করে চলে যায় তোমার সঙ্গে। হ্যাঁ, সে ভেবেছিল তোমার কথা কখনোই মিথ্যা হতে পারেনা। তাকে সতর্ক করে দেবারও ছিল না কেউ। আমি তখন বিদেশে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যস্ত। মীনুকে এখানে একা ফেলে রেখে যাওয়া আমার যে কত বড় অন্যায় হয়েছিল তা এখন বুঝতে পারছি। এর জন্য আমি কোনোদিনই ক্ষমা করবো না নিজেকে। দেশে ফিরে এসে শুনলাম, ওর সঙ্গে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছ তুমি—আর শুধু তাই নয়, তুমি ওকে চালান করে দিয়েছ তোমার বন্ধু শান্তনুর কাছে। তোমার সাধ মিটে গিয়েছিল হয়তো, তাই বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলে ওকে। শান্তনুও ভালো ব্যবহার করেনি ওর সঙ্গে—আর তার নিষ্ঠুর ব্যবহারের ফলেই ওর মৃত্যু ঘটে। সেইজন্যে শান্তনুই হল আমার প্রথম শিকার।

হ্যাঁ, শান্তনুকে খুন করেছি আমি... আর এখন তোমায় ওরা ফাঁসিকাঠে লটকাবে সে খুনের অভিযোগে। যা আমি আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছিলাম তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমিই তোমাকে ফোন করেছিলাম শান্তনুর ফ্ল্যাট থেকে—অবশ্য শান্তনুকে হত্যা করার পর। ফোন করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। শান্তনুর ফ্ল্যাটে। রাস্তায় যখন তুমি বেরিয়ে পড়েছ তখন ফোন করলাম পুলিশকে। আর আমিই তোমার হাতে পিস্তলটা গুঁজে দিয়েছিলাম যাতে খুনের দায়ে পুলিশ তোমাকে ধরে। প্রতিশোধটা যে আমি পূর্ণমাত্রায় নিয়েছি এটা তুমি স্বীকার করবে নিশ্চয়ই।

তোমার ফাঁসি হয়ে যাবার পর একথা ভেবে আমি তৃপ্তি পাবো যে, দুটি ঘৃণ্যতম নরপশুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি চিরদিনের মত। আমার একমাত্র আফসোস এই যে, তোমার দুর্ভোগটাকে আরো কিছুটা দীর্ঘতর করতে পারলাম না।

পুনশ্চ—নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য এ চিঠি ব্যবহার করার মতলব করো না। প্রথম পৃষ্ঠা দিকে তাকালেই আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

স্বপ্নোত্থিতের মতো চিঠির নির্দেশ পালন করল অনঙ্গ। প্রথম পৃষ্ঠার দিকে যখন সে তাকাল তখন একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। একটু আগে যেখানে দেখেছিল পত্রলেখকের স্বীকৃতি—খুনটা যে সে-ই করেছে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে—সেখানে কালির কোনো চিহ্নই নেই। লেখাটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনকি, প্রথম পৃষ্ঠার ওপর যখন সে চোখ বোলাচ্ছে সেইসময় সে লক্ষ্য করল, দ্বিতীয় পৃষ্ঠার লেখাটাও মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

চিঠিটা এমন কোনো অদ্ভুত কালি দিয়ে লেখা যা বাতাসের সংস্পর্শে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

'গার্ড!' অধীরকন্ঠে অনঙ্গ চীৎকার করে ওঠে, 'এদিকে একবার এসো চট্ করে। আমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ দেখে যাও! লেখাটা মিলিয়ে যাবার আগে একবার দেখে নাও তোমরা।"

প্রহরীরা অপেক্ষা করছিল 'সেল'-এর বাইরে। অনঙ্গর চীৎকার শুনে ছুটে এল তারা। চিঠিখানা সাগ্রহে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরল অনঙ্গ। প্রহরীরা যখন দেখল, ওটা একখানা সাদা কাগজ, লেখা নেই কিছু, তখন তারা ভাবল, ভয়ে উত্তেজনায় প্রলাপ বকছে অনঙ্গ।

'সেল'-এর বাইরে তারা নিয়ে এল অনঙ্গকে। তারপর ওর হাতটা ধরে আস্তে আস্তে চলল ফাঁসিমঞ্চের দিকে।

'আমি নির্দোষ—আমায় ফাঁসি দিতে চাও তোমরা?' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অনঙ্গ।

তার গলায় যখন দড়ির ফাঁস পরানো হল তখনও তার চীৎকারের বিরাম নেই। তারপর তার পায়ের তলায় গুপ্ত দরজাটা হঠাৎ উন্মুক্ত হল এবং তার চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল নিতান্ত আকস্মিকভাবে।

ডক্টর বাঙালী আবদুল মান্নান

আজাহারুদ্দীন খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক সাহিত্যিক আমার পরিচিত ছিলেন। পাক হানাদারদের অত্যাচার থেকে তাঁরা বেঁচে-বর্তে আছেন কিনা জানি না। প্রতিদিনই আমার পরিচিতজনের মৃত্যুসংবাদ পাই—ব্যথা-বেদনায় মন ভারী হয়ে আছে। কার কথা ফেলে কার কথা লিখবো, সবাই আজ মনের আকাশে ভিড় জমিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার দুজন বন্ধুর কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন ডঃ গোলাম সাকলায়েন ও ডঃ কাজী আবদুল মান্নান। অধ্যাপক সাকলায়েনের কোন সংবাদ নেই—অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, পাই নি উত্তর। মান্নান সাহেবের খবর পেয়েছি। সে-খবর যত না আনন্দের তার থেকে বেশী দুঃখের। তিনি আছেন কিন্তু রাজশাহীতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কোন খবর নেই। পাকফৌজের অত্যাচারের তাঁরা বলি হলেন কিনা কে জানে। মান্নানসাহেব অখণ্ড বাংলাদেশের কোন এক জায়গা থেকে আমাকে কয়েকটি চিঠি লিখেছেন। ঠিকানা বলার অসুবিধে আছে কেননা তাঁর আত্মীয়-স্বজন যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তাঁদের বিপদ হতে পারে এমন কি তাঁরও বিপদ হতে পারে। তাঁর কয়েকটি চিঠির প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি-

: কি বলে শুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না। আজকাল সব কথার আগেই নিজের দুঃখের কথাটা বড় হয়ে উঠে। পূর্ববাঙলা থেকে পশ্চিমবাংলা আসা নিষিদ্ধ ছিল, এ-বাংলার চিঠি ও-বাংলায় পৌঁছাতো না। এক নিষিদ্ধ দেশের মানুষ ছিলাম আমরা। কিন্তু নিষেধ আমরা মানতে চাই নি। তাই পাকফৌজ আমাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। আমাকে তারা খুঁজছে।...অনেকটা আকস্মিকভাবেই নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছি এবং এ পর্যন্ত বেঁচে আছি। কিন্তু এ কোন্ বাঁচা! স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, বাড়ী-ঘর, বড় সাধের লাইব্রেরী সব হারিয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় আছি।...

২৫শে মার্চ আমি ছিলাম ঢাকায়। সেখান থেকে রাজশাহীর দিকে ফিরতে পারি নি। পাকফৌজ যেসব অধ্যাপককে হত্যা করার জন্য তালিকাভুক্ত করেছিল, আমি তার মধ্যে ছিলাম। (১৮-৫-৭১)

: এক-একটা ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী... এসে পৌঁছাচ্ছে। বাবার সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করছে। আমার দুটি মেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। কি যে দুর্ভাবনা। রাত্রে আমার ঘুম হয় না। কি করবো, কোথায় গেলে তাদের পাবো? তাদের শৈশব ও কৈশোরের শত-সহস্র ঘটনা, তাদের মান-অভিমানের অসংখ্য চিত্র চোখের সামনে ভাসতে থাকে। জানি না নিজেকে কতদিন সুস্থ রাখতে পারবো। (২৫-৫-৭১)

: অশেষ কষ্ট স্বীকার করে পাগলের মত অনেক জায়গায় ঘুরলাম, আমার ফ্যামিলির কোনই খবর পেলাম না। এখন সন্দেহ হচ্ছে ওরা বেঁচে আছে কিনা। দোয়া করবেন। (১৭-৬-৭১)

লেখাপড়ায় নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রেখেছেন যে মানুষটি তাঁকেই আজ পাক ফৌজ সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে পথের ফকির বানিয়ে দিয়েছে। লেখাপড়ার চর্চা মাথায় উঠেছে, কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই তাঁর সাধের সীমা অতিক্রম করে চলেছে। মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছেন। নিঃস্ব কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি কতদিন টিকে থাকতে পারবেন? ভয়াবহ বেকার সমস্যার দিনে শুধু দুটো হাত-পা নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না, পেটে বিদ্যে থাকলেই পেটের আগুন নেভে না।

পূর্ব বাংলার বাংলা সাহিত্যের গবেষণার বিস্তারিত সংবাদ আমাকে দিতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পরলোকগত অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় মান্নান সাহেবের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর একটি প্রবন্ধ পড়ে আমি তাঁকে চিঠি লিখি। সেই চিঠির সূত্র ধরেই আমরা দুজনে হৃদয়ের কাছে চলে এসেছিলাম।

মান্নানসাহেবের জন্ম মালদহে ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বরে। ম্যাট্রিক ও আই-এ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ার সময় দেশ ভাগ হয়। রাজশাহী কলেজ থেকে বি-এ অনার্স পাশ করেন। অনার্স কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসারে পড়েন কিন্তু পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনার্সে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী দ্বিতীয় হন। সে বছর কেউ প্রথম শ্রেণী পান নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৬২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিসে দোভাষী সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করে পি-এইচ-ডি পান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার পদে নিযুক্ত হন। তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'সাহিত্য পত্রিকা', 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', 'সাহিত্যিকী'তে বেরিয়েছে। 'সাহিত্য পত্রিকা'য় তাঁর প্রকাশিত রচনার তালিকা—

১৩৬৬ শীত—উনিশ শতকের সাহিত্য-পত্র ও মুসলিম মানস (পৃঃ ৫১—৮৮)

১৩৬৭ বর্ষা—মুসলিম কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান কাব্য (পৃঃ ৭৭—১১৬)

১৩৭৫ বর্ষা—মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মসলমান গদ্যলেখক (পৃঃ ৩৫—৭২)

মান্নান সাহেবের প্রথম বই 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' ১৯৬১ সালে বেরোয়। বইটি বেরিয়েই বিদ্বৎ-সমাজের সাদর অভিনন্দন লাভে সমর্থ হয়। বইটি পাকিস্তানে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম গবেষণাগ্রন্থ এবং প্রথম গবেষণাগ্রন্থ-রূপে এটি ১৯৬২ সালের সেরা গ্রন্থ হিসেবে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করে। 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কারে'র প্রধান বিচারক ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

ছাত্রাবস্থায় বাংলা সাহিত্য পড়তে গিয়ে এবং কর্মজীবনে সাহিত্যের অধ্যাপনা করতে গিয়ে যে প্রশ্নটি তাঁর মনে বারবার জেগেছে সেটি হল যে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রকৃত ভূমিকা কী, আধুনিক সাহিত্য সাধনায় বাঙালী মুসলমানের অবদান কতটুকু এই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের প্রকৃত জবাব তিনি বাজার চলতি ইতিহাস ও গবেষকদের রচনায় খুঁজে পান নি। বরং তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় নিরপেক্ষ সাজার জন্য কতিপয় মুসলমান লেখকের নাম তাঁরা এমনভাবে দিয়েছেন যাতে পড়তে গেলে মনে হবে বাদ দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না কেননা সেখানে তাদের সাবেয় অস্তিত্ব নেই, পঠনের স্পৃহা জাগাবার তাগিদ নেই, নিরাবলম্ব অস্থায় তাঁদের নাম ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' (অকটোবর ১৯৪০) নামে তাঁর একটি বই আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন সেটি বাজারে পাওয়া যায় না। সে-বইয়ে যুক্তির চাইতে আবেগ বেশী এবং সেটি প্রধানতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য লিখিত। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চারটি বক্তৃতা দেন। এই গ্রন্থে পল্লীগীতিকারদের সম্পর্কে আলোচনা আছে কিন্তু এই আলোচনা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত করে দেখাতে পারেন নি বরং সেটি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে। তবু, তিনি যে পথিকৃতের নিদর্শন স্থাপন করে গিয়েছেন সেই পথে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার কোন প্রয়াস পরবর্তী রচনাকারেরা করেন নি—কিছু কিছু বিক্ষিপ্তভাবে যেমন ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থ বেরুলেও বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় মুসলমান রচিত কোন গ্রন্থ না থাকায় মুসলমান রচিত সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে নি ফলে অজ্ঞানতা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের নিদর্শন যদিও কিছু দীনেশচন্দ্র সেন দিয়েছিলেন কিন্তু আধুনিককালে অর্থাৎ উনিশ শতকের সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের অবদানের স্বরূপ নির্ণয়ের কোন চেষ্টা এযাবৎ করা হয় নি। এই অভাব থেকেই মান্নান সাহেব তাঁর 'আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মুসলিম সাধনা' বইটি লেখার প্রেরণা পান। তিনি গ্রন্থের নিবেদন অংশে বলেছেন, 'বাংলা-সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করতে গিয়ে যে-প্রশ্নটি বারবার মনে জেগেছে তা হচ্ছে আধুনিককালে পাশ্চাত্য শাসন, শোষণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালী হিন্দুর বিচিত্র মানসিক বিকাশ ঘটেছে; বাংলা সাহিত্য অপরূপ শোভা এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু এতে বাঙালী মুসলমানের ভূমিকা কতটুকু? প্রায় বার বছর ধরে এ প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে আসছি। মুস্কিল হচ্ছে, একালের মুসলমান লেখকদের সাহিত্যিক প্রয়াস কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ায়, এখন তা বিক্ষিপ্ত ও দুর্লভ। দীর্ঘকাল ধরে আমি নানাভাবে সেগুলো সংগ্রহ করে, তাঁদের প্রয়াসের সূত্র বের করার চেষ্টা করেছি। বর্তমান পুস্তক সে-চেষ্টারই প্রথম ফল। কেমন হল জানি না; তবে, আমার এ-প্রচেষ্টা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-অবদানের যথার্থ মূল্যায়নে কিছুটা সহায়ক হতে পারে, এটাই আমার একমাত্র ভরসা।' (লেখকের নিবেদন, সেপ্টেম্বর, ১৯৬১) যারা অখণ্ড বাংলা দেশের সাহিত্যে অবহেলিত ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নবজাগ্রত মুসলমান সমাজ সাহিত্যে নিজেদের স্বরূপ চেনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সেজন্যে পূর্ব বাংলায় হিন্দুরচিত সাহিত্যের সংগে মুসলমান রচিত সাহিত্যের পঠন শুরু হয়ে যায়। ফলে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদানের গবেষণা প্রবলভাবে শুরু হয়। মান্নান সাহেবের বইটি এ জাতীয় গবেষণার প্রথম বই। গ্রন্থভুক্ত অধ্যায়গুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি, ধারাবাহিক সংযুক্তিকরণে অনেকাংশে শিথিল হলেও ১৮৬৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত মুসলমান লেখকদের সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে এক সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। মোট চারটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সমাপ্ত—পটভূমি, মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াস, মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়াস, জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের বিশেষ অবদান থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল। এই নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঙালী মুসলমানের সামাজিক ইতিহাসের কয়েকটি দিক সম্পর্কে লেখক প্রথমে আলোচনা করেছেন।

পটভূমি অধ্যায়ে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত থেকে দেশের মাটিতে তারা কিভাবে জেঁকে বসল, শাসন ও শোষণে কোন সততার বালাই না রেখে অর্থনীতির কাঠামো কিভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলল তার বিবরণ দিতে গিয়ে মান্নান সাহেব বলেছেন, 'উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যেই, বাংলার পণ্য বিদেশী শাসকের সীমাতীত ক্ষুধার ইন্ধনে পরিণত হয়; দেশের ভূমি এবং কৃষক তাদের শোষণের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়; দেশের বনেদী সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধিজীবী-সমাজ বেকার ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। আর এই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে প্রবল বৃটিশ সাম্রাজ্য।' (পৃঃ ৬)

আধুনিক বাংলা হিন্দুসমাজে ও মুসলমান সমাজে ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়া এবং তার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান সমাজের অনীহার কারণ সামাজিক ও অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখাতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে ইংরেজ শাসনকে বাংলাদেশের মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করে নি। ছোটবড় বিদ্রোহ চারদিকে দেখা দিয়েছে। কৃষক বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, জমিদার বিদ্রোহ, ওহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি হয়েছে কিন্তু শাসক কঠোর হস্তে দমন করেছে। শাসকের কঠোরতা দেখে হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে তৎপর হয়েছে কিন্তু মুসলমান সমাজে আগ্রহ জন্মায় নি। কেন জন্মায় নি তার কারণও মান্নান সাহেব নির্দেশ করেছেন, 'ইংরেজ আমলে বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস, পাশ্চাত্য জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার ইতিহাস,—ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের ইতিহাস—তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।.. ইংরেজ এ-দেশে ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চার যে-ব্যবস্থা করেন, তা গ্রহণ করার মত মানসিকতা, আর্থিক সংগতি বা সামাজিক পরিবেশ মুসলমানদের ছিল না। সর্বোপরি তারা ইংরেজের প্রচেষ্টার আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারে নি। দেশে প্রচলিত শিক্ষার সমস্ত ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করে দেশের সুবিস্তৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবহেলা করে এবং দেশবাসীর ভাষা ও ভাবনাকে অস্বীকার করে এক শ্রেণীর নকল ইংরেজ তৈরির পরিকল্পনায় মেকলে যে শিক্ষা প্রবর্তন করেন, বাঙালী মুসলমান দীর্ঘকাল তার থেকে দূরে থেকে গেছে। এতকাল তারা ফারসীর মা[illegible] যে-শিক্ষা গ্রহণ করে আসছিল, ইং[illegible]কার তার আর্থিক অবলম্বনগুলো[illegible] আত্মসাৎ করে যখন ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলো, তখন তারা সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠলো। এটাকে তারা মনে করলো তাদের ধর্মের ব্যাপারে বিদেশী জাতির হস্তক্ষেপ।' (পৃঃ ৩৫-৩৬) ফলে মুসলমান সম্প্রদায় মোল্লাদের পরিচালিত মক্তব-মাদ্রাসায় আরবী-ফারসী ভাষার মানে-মতলব না বুঝেই অন্ধভাবে তালিম নিতে শুরু করে দিল এবং দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ধর্মকে তারা আঁকড়িয়ে বেঁচে থাকার উপায়স্বরূপ বলে মনে করল। আধুনিক জগৎ ও জীবন থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। তাদের মধ্যে অন্ধ আবেগ, সংকীর্ণতা, অন্ধ ধর্মনিষ্ঠা, সংস্কার আচ্ছন্নতা অত্যধিক বেড়ে গেল। ভুল যখন ভাঙল তখন তারা দেখতে পেল যে হিন্দুসমাজে শিক্ষা-দীক্ষায় নতুন বুদ্ধিজীবী এক বিত্তবান সমাজ গড়ে উঠেছে। শহরে বিত্তবান মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জেগেছিল, সংখ্যায় তারা ছিল মুষ্টিমেয় কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চাকে তারা অনভিজাতের লক্ষণ বলে মনে করত। এর বাইরে গ্রাম বাংলার বৃহত্তর সমাজ ছিল যারা ইংরেজী শিক্ষাকে আর্থিক দুরবস্থার দরুণ গ্রহণ করতে পারে নি তবে তারা শহুরে মুসলমানদের থেকে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক চর্চা অব্যাহত রেখেছিল। নতুন জীবনবোধ তাদের মধ্যে জাগতে দেরী হয়েছিল কিন্তু গ্রাম বাংলার মুসলমানরাই মধ্যযুগের সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল। বুদ্ধিজীবী হিন্দু সমাজের প্রভাবে এবং ব্যর্থতা ও হতাশার গ্লানিতে পুরোনো সংস্কৃতিতে আস্থা হারিয়ে নতুন জীবনবোধের প্রতি ক্রমে আসক্তি জেগে উঠল। তারপর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান রচিত সাহিত্যে নতুন জীবনবোধের বিকাশ দেখা দিল। প্রথম জাগরণের ঊষালগ্নে দ্বিধাজড়িত আধুনিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কী ছিল, তাদের সাহিত্যকর্ম কোন পথে বাঁক নিয়েছিল সে-সম্পর্কে মান্নান সাহেব বলেছেন, 'নিজের সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা এবং সেই চেতনা থেকে জাগ্রত আত্মমর্যাদাবোধ সাহিত্যিকদের একদিন যেমন আত্মগত কথাকে প্রবলভাবে বলার শক্তি জুগিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আত্মচিন্তাকে অতিক্রম করে অপরের কথা ভাববার প্রেরণাও দিয়েছে। সে-প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি।... স্বীয় সমাজের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন হয়েছেন; এটাকে মনে করেছেন তাঁদের জাতীয় দুর্গতি; বাংলা ভাষায় পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য চর্চাকে তাঁরা ভেবেছেন জাতীয় কল্যাণের একমাত্র পন্থা; এবং একথা তাঁরা বারবার নির্দেশও করেছেন। এ সময় থেকে মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাসও কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' (পৃঃ ৮৫-৮৬)

মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াসে পঁচিশ বছরের (১৮৬৪-৮৮) সাহিত্য চর্চার ইতিহাস (পৃ, ৮৪-১৪১) বিবৃত করেছেন। এ ইতিহাস প্রধানত সাহিত্যের অনালোচিত বিস্মৃত তথ্যকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে টেনে আনার ইতিকথা। ফলে যেক'টি মুসলমান রচিত গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছেন সে-ক'টির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মধ্য দিয়েই বাংলা গদ্য রচনার সূচনা করেন। তারপর মিশনারী ধর্মপ্রচারক ও উইলিয়ম কেরী প্রাণসঞ্চার করেন, রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ সেই গদ্য রচনাকে সাহিত্যগুণান্বিত করে তোলেন। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে মুসলমানরা এসেছে অনেক

পরে। মীর মশাররফ হোসেন মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। তাঁর পূর্বে আরও দু-চারজনের আবির্ভাব হয়েছিল। গোলাম হোসেন, খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী, সেখ আজিমদ্দী। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক কে? ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীই প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক এবং তাঁর রচিত 'উচিত শ্রবণ' গ্রন্থ গদ্যের প্রথম নিদর্শন। কিন্তু মান্নান সাহেবের মতে গোলাম হোসেন প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক। তিনি নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেছেন, 'সমাজ সচেতনতা বা বাস্তবতাবোধের কোন পরিচয় 'উচিত শ্রবণে' নেই। সে-পরিচয় আমরা প্রথম পাই গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী'তে। এটি ১২৭১ সালে অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ছাপানো হয়। এ পর্যন্ত মুসলমান লিখিত গদ্য-পুস্তকের যে-সব খবর আমরা পেয়েছি, তাতে এটিই প্রাচীনতম; কাজেই গোলাম হোসেনকে প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক বলে ধরা যায়। বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে যে সচেতনতা আধুনিক সাহিত্যের মূল-কথা, মুসলমান লেখকের মধ্যে তার-পরিচয় 'হাড় জ্বালানী' পুস্তকেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়।' (পৃঃ ৮৮) মান্নান সাহেবের এই সিদ্ধান্ত তাঁর শিক্ষক অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ও তাঁর সমবয়সী গবেষক ডঃ আনিসুজ্জামান মানতে পারেন নি। তাঁরা ডকটর শহীদুল্লাহ সাহেবের সিদ্ধান্ত-কেই পাকা বলে মনে করেন, কেননা তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে খোন্দকার শামসুদ্দিন সিদ্দিকীর 'উচিত শ্রবণ' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় (দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত পৃঃ ৫৮-৫৯ জুন ১৯৫৬ সং এবং মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য পৃঃ ১৯০—১৯২ অকটোবর, ১৯৬৪)। অবশ্য মান্নান সাহেব তাঁর ত্রুটি পরে 'সাহিত্য পত্রিকা'র বর্ষা ১৩৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্যলেখক' প্রবন্ধে সংশোধন করে নিয়েছেন এবং ঐ প্রবন্ধে আরও কয়েকজন গদ্যলেখকের সন্ধান দিয়েছেন।

গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী' নক্সা, শেখ আজিমদ্দী রচিত 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮) প্রহসন, মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' (১৮৬৯) উপন্যাস, 'বসন্তকুমারী' নাটক (১৮৭৩), আবদুল করিমের 'জগৎমোহিনী' (১৮৭৫) নাটক, আসরফ আলি রচিত 'বাল চিকিৎসা' (১৮৭০) প্রবন্ধ জাতীয় রচনা, মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত 'জোব্দাতল মসায়েল' (১৮৭৩), শেখ আবদুর রহিমের 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৮) ও শেখ আবদোস সোবহানের 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন শুধু এই যুক্তিতে যে, অন্য কোন সাহিত্যের ইতি-হাসে এসব গ্রন্থের পরিচয় দূরের কথা নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই, থাকলেও কী জাতীয় গ্রন্থ বোঝার উপায় নেই।

এই গ্রন্থের সব থেকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সুলিখিত অংশ হচ্ছে 'মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়াস' অধ্যায় যার মধ্যে মুসলমান পত্র-পত্রিকার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে (পৃঃ ১৪২—৩১০)। ১৮৪৯ থেকে ১৯১৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত 'আজীজন নেহার' (১৮৭৪ পাক্ষিক), 'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪ মাসিক), 'আহমদী' এসলাম তত্ত্ব (১২৯৫ আশ্বিন), 'সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক' (১২৯৮ ভাদ্র মাসিক), 'মিহির' (১৮৯২ জানুয়ারী মাসিক), 'হাফেজ' (১৮৯৭ জানুয়ারী মাসিক), 'কোহিনুর' (১৩০৫ আষাঢ় মাসিক), 'প্রচারক' (১৩০৫ মাঘ মাসিক), 'লহরী' (১৮৯৯ কবিতা মাসিক), 'নূর-অল-ইমান' (১৩০৭ আষাঢ় মাসিক), 'নবনূর' (১৩১০ বৈশাখ মাসিক), 'বাসনা' (১৩১৫ বৈশাখ), 'আল-এসলাম' (১৩২২ বৈশাখ, মাসিক) প্রভৃতি পত্রিকার যে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন সেটি বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান অবদান বলে স্বীকৃতি পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ রচনাকে তিনি বিক্ষিপ্ত প্রয়াস এবং পত্রিকা প্রকাশকে সঙ্ঘবদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়াস বলে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু এই চিহ্নীকরণ সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত হয় নি, কেননা উভয় অধ্যায়েতেই এমন কয়েকজন লেখক আছেন যাঁরা দুবার আলোচিত হয়েছেন। তাছাড়া ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের পর মুসলমান লেখকদের গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। অধ্যায়ের নামকরণ ঐভাবে না করে সোজাসুজি এক অধ্যায়ে লেখকদের গ্রন্থ আলোচনা ১৮৬৪—১৯১৭ পর্যন্ত অপর অধ্যায়ে মুসলমান প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ইতিহাস প্রথম থেকে হাল আমল পর্যন্ত করলে পারতেন। তিনি তাই করেছেন তবে শুধু অধ্যায়ের নামকরণে আমার আপত্তি আছে। তবে লেখকদের ব্যক্তিচেতনা কিভাবে সমাজচেতনায় সম্প্রসারিত হয়েছে তার পরিচয় গ্রহণে কোন অসুবিধে হয় না তথ্যের বিন্যাসকরণে তাঁর কৃতিত্ব ঐখানেই।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে মুসলমান কবিদের রচিত জাতীয় আখ্যান কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৩১১—৩৫৪)। এই আলোচনার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, হিন্দু লেখকদের রচনায় একদিকে যেমন স্বাধীনতার কথা আছে তেমনি অপরদিকে ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জানাতে গিয়ে তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারিত হয়েছে। এরই প্রতিধ্বনি হয়েছে মুসলমান রচিত জাতীয় আখ্যান কাব্য কেননা আধুনিক সাহিত্যরীতির পাঠ তাঁরা হিন্দুদের কাছ থেকেই নিয়েছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় আর মুসলমান কবিরা আখ্যানকাব্য রচনা করতে শুরু করলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে বিশ শতকের গোড়ায়। মাঝে ঐ যে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়লেন সেটি আর পূরণ করতে পারলেন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁরা সেই দূরত্ব একেবারে কমিয়ে ফেললেন। পূর্ব বাঙলার ইদানীং-কার সাহিত্যসৃষ্টি সে কথার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত যার মধ্যে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র সমুজ্জ্বাসিত। মুসলমানদের জাতীয় আখ্যানকাব্য রচনার সময়কালে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন বিশ্বব্যাপী কিন্তু মুসলমান কবিরা স্বাভাবিক কারণে উনিশ শতকের সুরে গলা সেধে চলেছেন। নজরুল ইসলামের আবির্ভাবেই তাঁদের তপোভঙ্গ হল, চমক দিয়ে তিনি যেন তাঁদের ঘুম ভাঙালেন। সংকীর্ণতার আবর্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান লেখকদের মুক্তি দিলেন, শাশ্বত মানবতার মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এইখানেই।

বাঙলাদেশ মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হবার পরই তাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী হিন্দুস্তানী ভাষার শব্দাবলী কিস্সা-কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে। বাইরের মুসলমান যারা বাঙলাদেশে এলো তারা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করলেও গোড়ার দিকে তাদের বাচনভঙ্গীর মধ্যে আরবী-ফারসী ভাষার শব্দ ও উচ্চারণ টান রয়ে গেল যেমন সাহেবেরা বাংলা বলেন। মুসলমানী জীবনযাত্রা চিত্রণের তাগিদে হিন্দু কবিরাই বাংলা আরবী ফারসী হিন্দুস্তানী শব্দাবলী মেশান ভাষায় পুঁথি রচনা প্রথম করেন। এই দোভাষী রীতির প্রচলন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', দ্বিজ গিরিধরের 'সত্যপীরের পাঁচালী' (১৬৬৩), কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' এই রীতির প্রথম পুঁথি। মুসলমানরা এই রীতিতে তখনও কাব্যচর্চা শুরু করেন নি—তখন চলেছে আলাওলের যুগ। তিনি বিশুদ্ধ বাংলা রীতিতেই কাব্যরচনা করেছেন। হিন্দু কবিদের দেখাদেখি মুসলমান কবিদের মধ্যেও দোভাষী রীতিতে কাব্য রচনার আগ্রহ দেখা দিল। ফলে মুসলমান কবিরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেন। এক দল মনে করলেন দোভাষী রীতিতে ইসলামী ক্রিয়াকাণ্ড, পীর পয়গম্বরদের কথা বলা ভাল তাতে ধর্মের বক্তব্য মূলানুগই হবে এবং যদি কিছু আরবী ফারসীর কিসসা বর্ণনা করতে হয় সেটিও মূলের কাছাকাছি যাবে। আর এক দল মনে করলেন দেশীয় বাংলা ভাষাই হবে মুসলমানদের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম বাহন। বলা বাহুল্য এই দ্বিতীয় দলের পরিপোষক ছিলেন আলাওল দৌলত কাজী প্রমুখ। ধর্মীয় বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার রীতি খুব

প্রবল হয়ে প্রথমে ওঠে নি, জনসাধারণের ভাষাতেই জনতার কথা তাঁরা বলতে চেয়েছেন। ধীরে ধীরে যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে মুসলমানরা আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে তখনই দোভাষী রীতিতে কাব্যচর্চা দেখা দিয়েছে তাও সমগ্র বাঙলাদেশব্যাপী নয়, কলকাতা ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চলেই এর প্রচলন বেশী ছিল। ইংরেজ শাসন প্রথমের দিকে যে অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেই অঞ্চলগুলিতেই দোভাষী রীতিতে কাব্যচর্চা বেশী করে হয়েছিল। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফকীর গরীবুল্লাহ এই দোভাষী রীতির প্রথম মুসলমান কবি। 'ইউসুফ জেলেখা', 'আমীর হামজা', 'হুজনামা', 'সোনাভান', 'সত্যপীরের পুঁথি' তাঁর রচনা। তাঁর পর সৈয়দ হামজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে হিন্দু কবিরা দোভাষী রীতিতে কাব্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সে-রীতি পরি-ত্যাগ করে আধুনিক জীবনবোধের দিকে ঝুঁকে পড়তে চেষ্টা করেছেন। ভারতচন্দ্রের সংলাপে মিশ্র ভাষার রীতি দেখা যায় কিন্তু সেটির ঝোঁক নতুন জীবনবোধের দিকে। মুসলমান সমাজ ইংরেজ আগমনে এক চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। তখন তাদের মনোবল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, দোভাষী রীতিকে আশ্রয় করে সাহিত্যে বেঁচে থাকার পথ খুঁজেছে। বিশেষ করে ওহাবী ও ফরায়জী আন্দোলনের নেতারা মূল ইসলামে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়ায় আরবী-ফারসী ভাষার চাপ বাংলা ভাষার ওপর বেশী করে পড়েছে। দোভাষী রীতি সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকের মতে বিচ্ছিন্ন রীতি বলে মনে হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস যদি গভীরভাবে অনু-ধাবন করি তাহলে দেখা যাবে যে সেটি মোটেই বিচ্ছিন্ন ধারা নয় বরং মান্নান সাহেবের কথায়

> 'Dobhasi Bangla sprang up from the mixture of two cultures —Muslim and Hindu.' (Preface),

বেদের ভাষা সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃত (Buddhist Hybrid) কিম্বা ব্রজবুলির উৎপত্তি ও বিকাশ যেমন একটা নিজস্ব পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের মধ্যে বিকশিত হয়ে যুগ-দায়িত্ব পালন করে শেষ হয়ে গেছে তেমনি দোভাষী রীতিও একটি যুগের মানস চর্চার স্মারকচিহ্ন হিসেবে সাহিত্যে রয়ে গেছে। সংক্ষেপে দোভাষী রীতির ইতিহাস হল এই। এই চমকপ্রদ বিষয়ের সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত ইতিহাস মান্নান সাহেব

'The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর পূর্বে দীনেশচন্দ্র সেন, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ বিক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন কিন্তু মান্নান সাহেবই প্রথম তার একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থেও তাঁর বিপুল পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বইটি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর থিসিস। T.W. Clark -এর অধীনে তিনি গবেষণা করেন। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত—মোট তেরটি অধ্যায় আছে। প্রথম দুটি অধ্যায় দোভাষী পুঁথির ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণের পটভূমি হিসেবে মুসলমান অধিকারের পর থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তৃতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে দোভাষী পুঁথির উদ্ভব ও বিকাশ এবং তার সার্বিক মূল্যায়ন করে-ছেন। আলোচনার সুবিধার্থে দোভাষী সাহিত্যকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন Narrative Poetry, Elegiac Poetry, Didactic Poetry বাকী অধ্যায়-গুলিতে দোভাষী রীতির উদ্ভবের কারণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ে দোভাষী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর পূর্বে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মতামত তিনি বিচার করে দেখিয়েছেন যে,

'all these comments are brief and very general' (P 181) তিনি বলেছেন,

> The majority of critics have no attempt to analyse the language. The passing analyses made by S. K Chatterjee and S. Sen are not sufficient to explain the nature and character of Dobhasi diction. No critic has made a detailed examination of the Dobhasi texts or constructed the history of the literature in that diction. (P 181)

মান্নান সাহেবই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে তার স্বরূপ-নির্ণয় ও সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি গ্রন্থের সমগ্র বক্তব্যের সারাংশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

> "The problem of the origin of Dobhasi as a literary diction must be studied against the back ground of the history of Bengal. It is reasonable to assume that if the Muslim had not conquered Bengal and settled there, Dobhasi would never have come into existence. Whatever the literary stimuli and other factors which contributed to its later development, its origin must be sought in the mixed culture which grew from the living together of different peoples'. (P 246)

সব দোভাষী পুঁথি যে ভাল সেকথা কোথাও তিনি বলেন,

> 'Much has been written in that language. Some of it, admittedly, is of a low standard, but some of it has considerable literary quality Nevertheless, whatever its standard it is right that Dobhasi poetry should be judged by criteria which derive from literature, and from that only'. (P 252)

এই বইটি সম্পর্কে T. W. Clark মান্নান সাহেব সম্পর্কে যা বলেছেন সেটির সঙ্গে সকলেই কণ্ঠ মেলাবেন,

> 'Dr. Mannan brought to his researches not only a thorough and unremitting industry and a critical acumen but also a capacity for objective and impartial assessment. It is often difficult to resist partisan pressure, with all that they mean by way of special pleading; but if literary studies are to be of abiding value they must be guided by literary criteria only and rigidly avoid conclusions based on other factors. It was his ability to weigh issues justly that was to me the most gratifying feature of Dr. Mannan's approach to his subject". (Foreword).

একথা শুধু এ গ্রন্থ সম্পর্কেই নয় সব গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কথা লোকে জানে না যিনি একদিন বিদ্রোহাত্মক কবিতা লেখার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। খুব বেশী দিনের কথা নয় ১৯৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে বাঙালীর কাছে আজ মরলে কাল দুদিন—সেদিক দিয়ে অবশ্য অনেকদিন বিগত হয়েছে। সিরাজী সাহেবের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে ৮০।৯০ পৃষ্ঠার একটি চটি বই তিনি লিখেছেন যেটি বিস্মৃত প্রতিভার সম্যক পরিচয়দানের সহায়ক।

মীর মশাররফ হোসেনকে একটি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রথম সম্মানদান করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালার দ্বিতীয় খণ্ডে সেই জীবনীটি রয়েছে। মীর সাহেবের গ্রন্থতালিকা তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু সব বই তিনি দেখার সুযোগ পাননি। এ বাঙলায় তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' সহজলভ্য, আর পূর্ববাঙলায় বিষাদ সিন্ধুর সঙ্গে জমিদার দর্পণ নাটক। এ

ছাড়া তাঁর আরও খান ত্রিশ গ্রন্থ রয়েছে যা দুষ্প্রাপ্য। লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য বই আছে। মান্নান সাহেব অমানুষিক পরিশ্রম করে মীর সাহেবের রচনাগুলি উদ্ধার করে "মশাররফ রচনাসম্ভার" চার খণ্ডে তৈরী করেছিলেন। এই কাজটিকেই তিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে মনে করেন। তাঁর নিজের জবানীতে, 'আমার সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য কাজ মীর 'মশাররফ রচনা-সম্ভার সম্পাদনা। মশাররফের ৩৬টি বইয়ের মধ্যে ২৪টি গদ্যগ্রন্থ। বিচিত্র ধরনের লেখা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, রসরচনা, নকসা প্রভৃতি। প্রায় ২০ বছর নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ঐ ২৪টি গদ্য গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলাম ৪ খণ্ডে। প্রতি খণ্ডে ছিল প্রায় একশ পৃষ্ঠার ভূমিকা এবং তার সঙ্গে কালানুক্রমিকভাবে গ্রন্থ। প্রতিটি খণ্ড ছিল ৬০০ থেকে ৭০০ পৃষ্ঠা। এটি বাঙলা একাডেমী ছাপাচ্ছিলো। জানি না এখন এগুলো আছে কিনা। এ সম্পদ হারালে এর পুনরুদ্ধার আর হবে না। শুনেছি আমার বাসার সব লুঠ করেছে। কাজেই এগুলো হারালে চিরকালের জন্য হারাবে।' (পত্রাংশ ২৫-৫-৭১)

মান্নান সাহেবের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মতান্তর হতে পারে কিন্তু তাঁর রচনা-শৈলীর এমনই গুণ, কি ইংরেজি কি বাংলা, পাঠক গ্রন্থ পড়ার সময় তার মতানুবর্তী হয়ে পড়বেন। সাধারণত গবেষণা গ্রন্থ তথ্যের ভারে নীরস হয়ে ওঠে কিন্তু মান্নান সাহেবের রচনারীতির গুণে তথ্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি, রচনারীতির প্রবাহে সেগুলি মিশে গেছে। মনেই হয় না যে তিনি পাঠককে তথ্য দিয়ে ভড়কে দিতে চাইছেন বরং যুক্তি-শৃংখলা বজায় রেখে তথ্যগুলি এমনভাবে তিনি বিন্যস্ত করেছেন যে, সেটি রহস্য উপন্যাস পড়ার মত আমেজ আনে। রহস্যের পর রহস্য উন্মোচনে পাঠকের চিত্ত যেমন অধীর হয়ে ওঠে তেমনি বক্তব্য উপস্থাপনের গুণে মান্নান সাহেবের বইগুলি পড়তে পড়তে তথ্যের প্রতি ক্রমশঃ আগ্রহান্বিত করে তোলে। বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রধান শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা।' এই সরলতাই মান্নান সাহেবের গদ্য রচনার প্রসাদগুণ। তাঁর যুক্তিসিদ্ধ মন, উদার জীবনবোধ, মার্জিত রুচি ও সংস্কারমুক্ত সাহিত্যবোধ পাঠকের সাহিত্যরুচিকে মার্জিত ও উন্নত করে। রচনার মধ্যে তিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস আনতে পেরেছেন বলে বক্তব্য তথ্যের ভারে নুয়ে পড়ে নি, পাঠকের দৃষ্টিতে সেটি উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

কথা শেষ করার আগে আমি আবার প্রথম কথার সূত্রে ফিরে যেতে চাই।

পাক ফৌজ তাঁকে প্রাণে মারে নি কিন্তু মারার অধিক শাস্তি দিয়েছে। তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কোন খবর নেই। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে ভরা অনেক দিনের পরিশ্রমে গড়া সাধের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে। গ্রন্থের বিনষ্টি সন্তানের মৃত্যুবেদনার সমতুল্য। তিনি ৮-৭-৭১ তারিখের চিঠিতে লিখছেন 'আমার পরি-বারের কোন খোঁজ পাই নি। মনটা কাঁদছে। আমার জন্য দোয়া করবেন। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা। বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই আস্থা রেখে তিনি বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। এ বঙ্গে আধুনিক কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ যেখানে পঠিত বলে গৃহীত সে-বঙ্গের সাহিত্যিকের কাছে তিনি অমৃতমন্ত্রের উৎস।।

পরিশিষ্ট

কাজী আবদুল মান্নান রচিত গ্রন্থপঞ্জী

১। **আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা।** প্রথম খণ্ড। বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। ১৯৬১ : ১৩৬৮। পৃ (॥·)+৩৫৪। (১২), ৳ ডিমাই ২২ সেমি। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। পৃঃ ৫২৫।

উৎসর্গ : জ্ঞানের সাধনায় আজন্ম পথপ্রদর্শক আমার ওয়ালেদ জনাব আবদুল গফুর সাহেবের দস্ত মুবারকে।

2. The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal (upto 1855 A.D.) Department of Bengali and Sanskrit, University of Dacca, Dacca 2 September 1966. P. (16) 274, ৳ Demy, 22cm.

Dedication — To my respected teachers : Dr. 'Muhammad Enamul Haq. Professor Ganesh Charan Basu, Professor Muhammad Abdul Hai Foreword — T. W. Clark.

৩। **ইসমাইল হোসেন শিরাজী।** কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। ১৯৭০।

৪ **মশাররফ রচনা-সম্ভার।** সম্পাদনা। খণ্ড ১—৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। (যন্ত্রস্থ)।
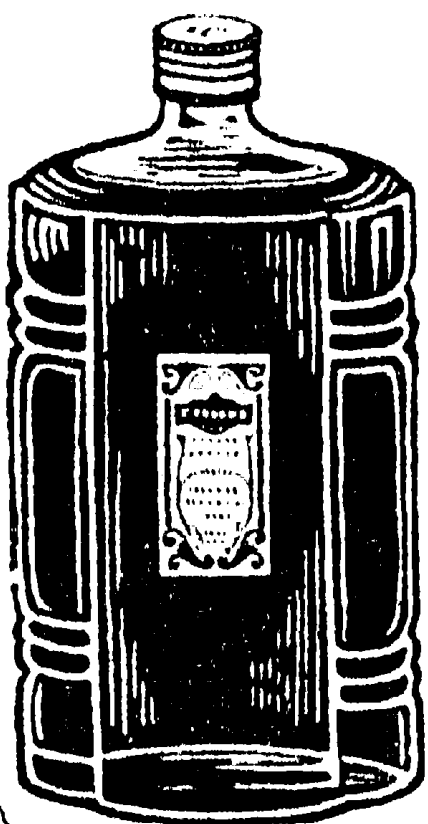
সাহিত্য সংস্কৃতি

ভুট্টো-মুজিব সংবাদ

পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের সব চেয়ে বর্ণবহুল ব্যক্তিত্ব। উগ্র-ধরণের কথাবার্তা বলে আসর মাৎ করার কাজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অনেকটা এই কারণেই তিনি পাকিস্তানি রাজনীতির আসরে অতি অল্প বয়সেই প্রবেশ লাভ করেন এবং চুয়াল্লিশ বছরের এই রাজনৈতিক নেতা সম্ভবত পৃথিবীর তরুণতম রাষ্ট্রপিতা। জুলফিকর আলির মুখও যেমন দড় কলমও তেমনই তীক্ষ্ণ। কিছুকাল আগে তাঁর লেখা "দি মিথ অব ইনডিপেনডেন্স" সর্বত্র প্রশংসালাভ করে। বিশ্বরাজনীতির ধারা বিষয়ে মিঃ ভুট্টোর জ্ঞান বিশেষ তীক্ষ্ণ; তার প্রমাণ পাওয়া যায় "পীস কিপিং বাই দি ইউনাইটেড নেশন্স" নামক সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধে।

২৫শে মার্চের ঘটনার সময় ঢাকায় ইয়াহিয়ার পাশে উপস্থিত ছিলেন মিঃ ভুট্টো। ইয়াহিয়ার জঙ্গী-পরামর্শদাতারা ছাড়া মিঃ ভুট্টো যে সেই ২৫শে মার্চের আগের কয়েক দিনের আলাপ-আলোচনায় কি ভূমিকা নিয়েছিলেন তা এখনও প্রকাশিত হয়নি তবে যখন প্রকাশ পাবে তখন বিশ্ববাসী জানতে পারবেন পাকিস্তান ও দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভটত্ব বিনাশে মিঃ ভুট্টোর অবদান কতখানি। মিঃ ভুট্টো ঢাকা থেকে ইসলামাবাদে পৌঁছে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। পাকিস্তান রক্ষা পেল।" কথাকটি অল্প কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ।

মিঃ ভুট্টো অতিশয় চতুর ব্যক্তি। বর্তমানে তাঁর মত ধুরন্ধর পুরুষ বোধকরি আর নেই। তিনি আগেভাগেই অনুমান করেছিলেন পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়ার নীতি কার্যকর হবে না এবং একদিন হয়ত জনগণের কাছে তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তাই আগেভাগেই তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন—তার নাম "দি গ্রেট ট্রাজেডি"। এই পুস্তিকাটি পাকিস্তানের পাঠকদের কাছে লেখকের ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ। যে কোনো পুস্তক পাঠ করে পাঠক যে কোনো অভিমত প্রকাশ করতে পারেন। গ্রন্থের মধ্যে আসল লেখকের মূর্তিটি কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকলেও স্বয়ংপ্রকাশ। মিঃ ভুট্টো এবং মুজিবের মধ্যে এই কদিন কি ধরনের আলাপাচার হয়েছে তার একতরফা বিবরণ এই পুস্তিকায় পাওয়া যাবে। মিঃ ভুট্টো নিজেকে একজন সোস্যালিস্ট বলে মনে করেন এ ছাড়া তিনি ফেডারেলিস্টও বটে। তাঁর মতে পাকিস্তানে সহ-অবস্থানের নীতি বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা এবং আকাঙ্ক্ষা মেটানোর প্রতি অধিকতর আগ্রহের জন্য। তাঁর মতে—

> "No Muslim country, no Muslim people have done so much disservice to Islam as a handtul of discredited leaders in Pakistan by misusing the great name of Islam to allow an inquitous economic system to flourish in Pakistan".

তাঁর মতে নির্বিচারে শোষণ করা হয়েছে জনগণকে এবং তার সামগ্রিক ভার বহন করতে হয়েছে পূর্ব-পাকিস্তানকে। শুধু পাকিস্তান নয় একটি তৃতীয় জগৎ গড়ে তোলা সম্ভব শুধু সোস্যালিজমের দ্বারা। পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর সুবিচার করা হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের নিম্নস্তরের মানুষ হিসাবে গণ্য করেছেন এবং স্বয়ং আয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি অতিমাত্রায় বিরূপ ছিলেন। ১৯৬৬-তে লাহোর শহরে অল পাকিস্তান ন্যাশন্যাল কনফারেন্সে আয়ুবের বিরোধীরা এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন এবং এইখানেই শেখ মুজিবর রহমান সর্বপ্রথম তাঁর ছয়দফা-সূত্রের কথা প্রকাশ করেন।

মিঃ ভুট্টো লিখেছেন এর প্রতিক্রিয়া অতিশয় বিরূপ হল এবং ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবর রহমানকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হল এবং ছাড়া হল ১৯৬৯-এ যখন আয়ুব খাঁন বিদায়-পথে।

অবশ্য মিঃ ভুট্টো যে আয়ুব খানের চাইতে মুজিবর বা তাঁর ছয়দফা-সূত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা নয়, কারণ ভুট্টোর মতে—

> "The Formula taken as a whole was a veiled charter for confederation which contained the Genesis of constitutional secession".

মিঃ ভুট্টো বার বার 'ফরেন পলিসি' কথাটির অর্থ বিকৃত করেছেন তাঁর নিজের সুবিধামাফিক। "তৃতীয় জগৎ"-এ (সমাজতান্ত্রিক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সাহায্য—এই সব ব্যবস্থার জন্যই ফরেন পলিসির প্রয়োজন—এই তাঁর মত। মিঃ ভুট্টোর তাই আশংকা ছয়-দফা সূত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে বৈদেশিক ব্যবস্থার অনেকটা মোটা অংশ চলে যাবে। শুধু যুদ্ধ ইত্যাদির ব্যাপারটুকু কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এই মন্তব্য করার সময় মিঃ ভুট্টো কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের এই বিষয়ক ব্যাখ্যার অংশটুকু এড়িয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সংক্রান্ত বিষয়টি দেশের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামোর অভ্যন্তরে বিচার করা হবে এবং ফেডারেল গভর্ণমেন্ট তার জন্য দায়ী থাকবেন। মিঃ ভুট্টোর কাছে এই বিষয়টি অতিশয় কঠিন এবং জটিল, বাকী বিষয়গুলির বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

মিঃ ভুট্টোর মতে শেখ মুজিবর একজন পাশ্চাত্য-অভিমুখী মডারেট এবং সোস্যালিজম সম্পর্কে তাঁর প্রীতি মৌখিক মাত্র।

এর পর ১৯৭০-এর নির্বাচন। নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিরাট সাফল্যে স্বাভাবিক কারণেই মিঃ ভুট্টো একেবারে বেকায়দায় পড়লেন। তাঁর তখন একমাত্র লক্ষ্য হল যেন-তেন-প্রকারেণ মুজিবরের প্রাধান্য ক্ষুন্ন করা। তিনি গ্র্যান্ড কোয়ালিশনের পরিকল্পনা করলেন মুজিবরকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে, সেদিকে সফল না হওয়ায় তিনি ইয়াহিয়া খানকে ধরলেন। নিজের মত ইয়াহিয়ার ওপর চাপালেন। মিঃ ইয়াহিয়া মিঃ ভুট্টোর টোপ গিললেন এবং ন্যাশনাল এসেম্বলীর অধিবেশন স্থগিত রাখলেন। এর পর মিঃ ভুট্টো লিখছেন—

> "Many political figures in the West Wing demanded that absolute power should innedially-be transferred to the Awami League both at the National and provincial level".

এইসব পরামর্শদাতা মনে করেছিল দুটি প্রান্তকে একসূত্রে ধরে রাখার ব্যাপারে মুজিবর হলেন সংযোগ-সেতু।

এই দাবী ক্রমশঃই প্রবল হয়ে উঠল। মুজিবরের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণের ইঙ্গিত এই দাবীর অন্তর্নিহিত অর্থ। আর তার মানে তাঁর সেই ছয়দফা সূত্র মেনে নেওয়া। মিঃ ভুট্টো আত্মগতভাবে এই উক্তি করে বলছেন—পশ্চিম খণ্ডের কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা স্পষ্টতই মুজিবরের ছয় দফা-সূত্র আক্ষরিকভাবে মেনে নিতে চাইলেন।

মিঃ ভুট্টো দেখলেন মহাসংকট। তিনি একা এবং বিচ্ছিন্ন। শেখ মুজিবর, পশ্চিম খণ্ডের কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে পারেন এবং তার ফলে মিঃ ভুট্টো একেবারে একা পড়ে যাবেন, রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন ভুট্টো কল্পনাতীত।

সেই কারণে ২১শে মার্চ তারিখে তিনি যখন ঢাকায় পৌঁছলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে তখন তাঁর মানসিক অবস্থা অতিশয় তিক্ত। মুজিবর রহমান এবং অন্য সব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হবে বটে কিন্তু কি জানি কি হয় ত তাই তিনি 'Overcome by an indescribable Sensation".

এই অবর্ণনীয় অস্বস্তি এবং তার পরবর্তী বিবরণ আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করার বাসনা রইল।

(1) THE GREAT TRAGEDY (A Pamphlet by Mr. ZULFIQAR ALI BHUTTO.

(2) BHUTTO EXPOSES HIMSELF — (An Artical By A. G. Noorani.

—অভয়ংকর

নতুন বই

প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম (প্রবন্ধ)—ডক্টর প্রভাতরঞ্জন দত্ত। গ্রন্থসংহিতা, ৬৩।১এ, সেলিমপুর লেন কলকাতা—৩১। বারো টাকা।

পুরাকালে মানুষের জীবন ও সমাজের আধার ছিল ধর্ম। ধর্মের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত [illegible] বাঁধা ছিল প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্র জীবন। আজ একালের নতুন দৃষ্টিতে প্রাচীন কালের জনজীবনের দিকে নজর ফেরালে শুধু বিস্মৃতিটাই বড় হয়ে বাজে। অজ্ঞানের অন্ধকারে যেন সবকিছু ঢাকা। মাঝে মাঝে কিছু গবেষক এবং সাহিত্যকর্মী প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিরলস পরিশ্রম দিয়ে এবং অনুশীলনের ফলে বিস্মৃত ঐতিহ্য ও চিন্তাভাবনাকে এ যুগের সামনে মেলে ধরে জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হন।

সেকালে রাজধর্মের ওপর নির্ভরশীল ছিল সবকিছু—চিন্তা চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি সভ্যতা—জীবন ও ধর্মাচরণের যাবতীয় অঙ্গ। প্রধানত রাজধর্মকে কেন্দ্র করে স্পন্দিত হত জন ও রাষ্ট্রজীবন। আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠেনি—ব্যবহারিক দৃষ্টিও ছিল অতি প্রখর। রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রাচীন ভারতের চিন্তা ও চেতনা ছিল বাস্তব-ভিত্তিক এবং ফলপ্রসূ। দেবভাষার দুর্বোধ্যতা ও জনসাধারণের অনীহার দরুণ প্রাচীন ভারতের সার্বিক চিন্তাধারার ওপর অপরিচয়ের যে অন্ধকার ঘনিয়েছিল প্রভাতরঞ্জন দত্ত তা বিদূরিত করার সাধনায় প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রপরিচালনার মূল সূত্রগুলিকে প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করে সন্দেহাতীতভাবে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন। বৈদিক সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক তথা উপনিষদ প্রভৃতি আকরগ্রন্থ থেকে রাজধর্ম ও দণ্ডনীতির উৎসউদ্ধার ও সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করে ভারতীয় মনীষার পরিচয় তুলে ধরেছেন প্রশংসনীয়ভাবে। বৈদিক তাঁর বক্তব্য বিষয়কে বলিষ্ঠভাবে সুপরিস্ফুট করেছেন মহাভারত, রামায়ণ কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্রনীতি, কামন্দক প্রভৃতির সহায়তায়। বক্তব্য বিষয়কে আটটি অধ্যায়ে শ্রেণীবিন্যাস করে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রায় বিস্মৃত ভাবধারাকে নতুন যুগের আলোয় তুলনামূলক আলোচনায় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন। প্রভাতরঞ্জন দত্ত এই বরণীয় গ্রন্থের জন্য বিদগ্ধজনের অভিনন্দন অবশ্যই লাভ করবেন।

রূপ থেকে রূপে (গল্পসঞ্চয়ন)—সুমথনাথ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

সুমথনাথ ঘোষ স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী। তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ ইতিমধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। 'বনরাজিনীলা', 'ছায়াসঙ্গিনী', 'বাঁকা স্রোত', 'রাগলতা' প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'রূপ থেকে রূপে' নামক গ্রন্থটিতে সুমথনাথের কয়েকটি সাম্প্রতিক গল্প সংকলিত হয়েছে। 'কেবল ভোগ করে নিন' 'পাঁক থেকে পদ্ম', 'পুরস্কার', 'গৃহপ্রবেশ', 'তামাক', 'মৎস্যগন্ধা' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে অসামান্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ছোটগল্পের মান আজ অনেক উন্নত। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প আজ তার বর্তমান আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুমথনাথের গল্পগুলি সহজবোধ্য অথচ আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে লিখিত। ছোট গল্প তাই ছোটগল্পই হয়েছে। ছোটগল্পের মেজাজ এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যে সার্থক গল্প সমৃদ্ধ। বাঙালীর [illegible] সজীব চিত্র রূপ থেকে [illegible] পাঠক চিত্তকে সহজেই অভিভূত করে। চিত্রধর্মী কাহিনীর ইদানীং অভাব ঘটেছে সুমথনাথ সেইদিক থেকে এক বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন. নির্ভার, নিটোল এবং নিখুঁত ছোট গল্প রচনায় এক সুন্দর দৃষ্টান্ত তাঁর সাম্প্রতিক গল্পসঞ্চয়ন 'রূপ থেকে রূপে'। গ্রন্থটির ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোরম।

গণ্ডার (অনুবাদ নাটক) — অনুবাদক : সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী। ৩০২ আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫ টাকা।

'গণ্ডার' নাটকের মূল রচয়িতা বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ইউনেস্কো। এই নাটক একদিন ওদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাট্যকারের জন্ম রুমানিয়াতে হলেও, তাঁর জীবন ও কীর্তি ফরাসীদেশে। ইউনেস্কো 'গণ্ডার' নাটক রচনা করেন ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে—তখন তাঁর বয়স ৪৬ বছর। এরও এক বছর পরে

প্যারী শহরে ন্যাটকের প্রথম অভিনয় হয়। নাটক প্রকাশিত হবার পর ইউনেস্কো বর্তমান জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের খ্যাতি অর্জন করেন।

এক সময় 'গণ্ডার' নাটক নিয়ে ওদেশে বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং এই আন্দোলনের প্রসঙ্গে নাট্যকার বড় সুন্দরভাবে বলেছিলেন, 'নাট্যকার কেবল একটা নাটক রচনা করেন। হয়তো তাঁর মনের চিন্তা তাতে প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন মতবাদ প্রকাশ করবার ইচ্ছে তাঁর থাকে না।' আরও স্পষ্ট করে ইউনেস্কো জানান, 'প্রত্যেক নাট্যকার মানুষের জীবনধারণের কোন একটা 'সমস্যা তাঁর নিজের জীবনের প্রধান সমস্যা বলে মনে করেন। বিভিন্ন নাটকে তাই নাট্যকারের সেই একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়।'

ফাঁকির ওপর ফাঁকি চাপিয়ে যে সৌধ তৈরী করা হয়েছে তার স্থায়িত্বকে গণ্ডার নাটকে ইউনেস্কো মূল্যায়ন করেছেন। হাসি আর ব্যঙ্গকে ইউনেস্কো তাঁর নাট্য রচনার মাধ্যমে করেছেন শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সে প্রয়াস অভূতপূর্বভাবে সাফল্য লাভ করে। এখানেই নাট্যকারের নাট্য রচনার স্বার্থকতা।

'গণ্ডার' নাটকখানি বাংলায় অনুবাদ করে শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী নাট্যপিপাসু মানুষের কাছে এক স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। যদিও প্রয়োজনবোধে তিনি ইউনেস্কোর 'গণ্ডার' নাটকের চরিত্রগুলির বাংলা নামকরণ করেছেন। সেদিক দিয়েও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই ধরনের নাটক বর্তমান বাংলা সাহিত্যের নাট্যভাণ্ডার পূর্ণ করবে। নাটকটির বহুল অভিনয় কামনা করি।

পদ্মার জল লাল (নাটক) : প্রণবেশ চক্রবর্তী। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন, ২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ১-৫০ পয়সা।

যশোহর অঞ্চলের মুক্তিফৌজ অধিকৃত একটি গ্রামের কাহিনী এই নাটকের পটভূমি। স্বাধীন বাংলার সাত কোটি মানুষের ভাগ্য বিপর্যয়ের যে ইতিহাস আজ বিশ্ববাসীর কাছে সমবেদনার—গণতন্ত্রের নামে শোষণতন্ত্রের যে বর্বর ইতিকথা আজ বিশ্বদরবারে পেয়েছে একবাক্যে ধিক্কার আর ঘৃণা তারই নিখুঁত কয়েকটি চিত্র নিয়েই এ নাটক। আর এ বিষয়ে নাট্যকার তাঁর এ রচনার জন্য অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

সঙ্কলন ও পত্র-পত্রিকা

ঝংকার (ঈদ সংখ্যা)—নুরুল ইসলাম। কানকুলি। গার্ডেনরীচ। কলকাতা-২৪ দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ঝংকারের ঈদ সংখ্যা সমস্ত শ্রেণীর পাঠককে তৃপ্তি দেবে রচনার সুনির্বাচনে। গল্প, নাটক, কবিতা, সিনেমা, মঞ্চ এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনার সমাবেশে পত্রিকাটি বেশ আকর্ষণীয় হোয়েছে। লিখেছেন: নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাল, মতিয়ার রহমান, প্রভাতকুমার সিংহ, আবদুল [illegible] মন্মথ রায়, সমীরকুমার, আজিবুর রহমান, অনিমা দত্ত, আবদুর রহমান এবং আরো কয়েকজন।

সর্বার্থ (সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : পূর্ণেন্দু সেন। বিনয় সরকার ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্স। ২১ সাউথ এন্ড পার্ক, কলকাতা : ২৯। পনেরো পয়সা।

আকারে ও আয়তনে ক্ষীণকায় হলেও এ পত্রিকার লক্ষ্য দেশের সার্বিক উন্নতি এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সর্বাত্মক বিকাশ। এ জন্যেই এ পত্রিকাটি সমাজকল্যাণকামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ সংখ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল অধ্যক্ষ সুধাকান্ত দে-র : 'রাজা রামমোহন: কয়েকটি সমস্যা' নিবন্ধটি। নব্য বাংলার রূপকার রামমোহনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করেছেন যা তথ্যাভিজ্ঞদের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাবে। রামমোহনের জীবন নিয়ে এমন আলোচনা এর আগে আর হয়নি।

স্বরান্তর—সম্পাদনা অমল রায়চৌধুরী। ২ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা : ১২। এক টাকা।

ছোটগল্পের এই পত্রিকাটি নবপর্যায়ে এই তৃতীয়বার বেরুল। সম্পাদনায় আন্তরিকতার ছাপ পত্রিকাটির সর্ব অবয়বে। এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে সতেরোটি ছোট গল্প। নবীন গল্পকারদের গল্পই এ সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ—যুবমানসের প্রতিফলন এ গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। রমানাথ রায়, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, সুবিমল মিশ্র প্রমুখের গল্পগুলি উল্লেখ করার মতো।

বিবর্তন (নভেম্বর-ডিসেম্বর '৭১) সম্পাদনা: পথিকগোষ্ঠী। ডিমাপুর, নাগাল্যান্ড। ষাট পয়সা।

প্রবাসে বয়স্ক বাঙালীরা দলে ভারী হলে স্কুল-পাঠশালা, দুর্গাবাড়ী-কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার আয়োজনে লেগে যান। আর তরুণরা পেছিয়ে থাকেন না—একটা ড্রামাটিক ক্লাব, নিদেনপক্ষে একটা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেনই। কোনখানেই একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা বাঙালীর ধাতে নেই। সব কালে সব যুগে এই ধারা চলে আসছে। এই ধারাবাহিকতার ঢেউ লেগেছে নাগাল্যান্ডেও— 'বাস্তবধর্মী গল্প-কবিতার সংকলন' ত্রিমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'বিবর্তন' তারই নিদর্শন।

স্বাস্থ্য-দীপিকা— সম্পাদক : নিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। ২, ফরডাইস লেন, কলকাতা : ১৪। ষাট পয়সা।

স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় এই মাসিক পত্রিকার নবম বর্ষের নবম সংখ্যাটি মনোরোগ ঔষধাসক্তি, ট্যারা চোখ ও তার চিকিৎসা, চর্মরোগ, প্রকৃতি ও পরিবার, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রভৃতি নানান ধরনের রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ। এ কে দেব, আই এস রায়, এ গোস্বামী, হরিদাস ব্যানার্জি, শংকরপ্রসাদ রায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা লিখেছেন, সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মানুষদের বোধগম্য করে। 'নেশা' সম্পর্কে সম্পাদকীয়টিও উল্লেখ্য।
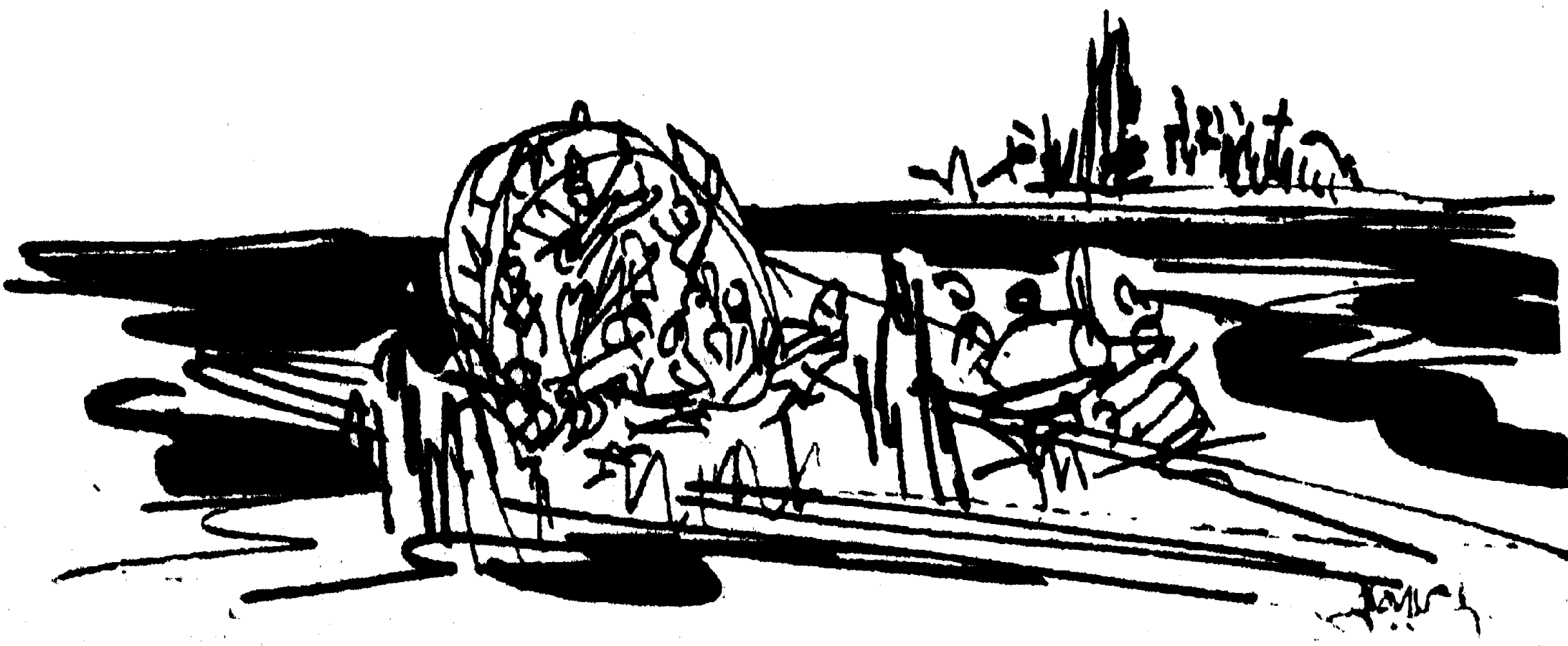
আমাদের মা ।।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

মাতৃস্তন্যে আমার প্রয়োজন ফুরোবার আগেই দেড়বছরের মধ্যে আমার ছোটভাই এসে পড়ে। ট্রুথ ইজ বিউটি, তাই না, এবং যদি তা হয় তবেই বিউটি ট্রুথ। এ-রকম সত্যের খাতিরে সংবাদপত্রকেও এ-কথা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে জানাতে লজ্জা করে না যে আমার মাকে তাঁর উপর্যুপর সন্তানদের পয়োধরদ্বটি ভাগ করে দিতে হয়েছিল। আমার ছোটভাই ছিল অধিক বলশালী ও অসম্ভব জেদী, যে-জন্যে, শুনেছি, স্তনান্তরে আমি কখনো যেতে পারিনি।

না না! এটা রূপক না। আমার মা বেঁচে রয়েছেন এবং আমার দুভাই আজো বেঁচে। যখন বুড়োখোকারা তেলের শিশি ভাঙল, সেই ১৯৪৭-এ আমাদের বয়স ১৩-১৪, আর কত? ইছামতীর অপর-পারে পেঁৗছে বনগাঁ-সাতক্ষিরা রোড ধরে এগিয়ে যেতে যেতে তবু— আজ—এতকাল পরে এটাই রূপক হয়ে দাঁড়াল; আমার মতন যাঁরা ঘটি, কিম্বা যাঁরা জন্মেছেন স্বাধীনতার পরে, পূর্ব-বাঙলার মাটিতে এ-জীবনে এই প্রথম পা-দেওয়ামাত্র তাঁরা সকলেই আমার কথা বুঝবেন, আমি আশা করি। যে, যুগান্তের যেন শেষে, হ্যাঁ, অবশেষে, পদক্ষেপ গুণে এখন আমি আমার মা'র সেই স্তনান্তরের দিকে চলেছি, অনাস্বাদিত যা—এবং, ভ্রমণ বলতে তো এই একটাই যা এপিক—এবং যার বৃন্তে ঠোঁট না রাখলে আত্মা, হ্যাঁ, আত্মা...প্রবঞ্চিত আত্মা আমার কখনো তৃপ্ত হতে পারে না। রূপক কী কঠিন সত্য, ওহ্। রূঢ়তায় রূপকের চেয়ে বাস্তব আর কী, যা 'আত্মা' শব্দটিকে গলায় চেন বেঁধে এই প্রথম আমার বাকরীতিতে টেনে আনে।

এই তো গত রবিবারেই আমি ছিলুম মুক্ত সাতক্ষিরায়। আমি ছিলুম। আমি সে-সম্পর্কে কিছু লিখতে চেয়েছিলুম। আমি চেয়েছিলুম। কিন্তু এ-পর্যন্ত লিখেই কেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!
কেন আমার এমন মনে হচ্ছে কেন যে, এই কি আমার রচনার শুরু, অথবা, এটি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে নাকি। বাস্তবিক-শুরু হয়েছিল তো লেখাটি? এ কেমন এক্সপ্রেশান, হায়,

যার শুরুতেই লেখা হয়ে গেল,

সমাপ্ত।

...এবং যা শুরুই হ'ল না, তা শেষ করব কেমন করে! পউষের হিমঘন ভোরবেলায় আমার যুবতী মা'র ধারালো চুলের মত অগণন রশ্মিফলকের ভেতর র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ঢুকে যেতে যেতে আমার হুবহু-এম্নি মনে হয়েছিল, ঠিক আজকের এই বলতে-চাওয়ার মত। যে, এ কেমন যাত্রা, যা শুরু হ'ল গন্তব্য থেকে। শেষ দিয়ে। সমাপ্তির পর।

সমস্ত রাত ধরে ।।

আশিস সান্যাল

সমস্ত রাত ধরে আমি তোমায় অনুধাবন করলাম।
চলতে চলতে চলতে
এক সময়
ভীষণ অবিশ্বাসের মধ্যে
আমি চিৎকার করে উঠলাম।
কম্পমান আকাশ
জলতরঙ্গের মতো
দুর্মর প্রত্যাশায় শব্দ করে উঠলো।

শূন্য থেকে শূন্যে
অন্ধকারে—
সেই অবিস্মরণীয় শব্দের শিহরণ
হরিণ শিশুর মতো
ছুটতে ছুটতে ছুটতে
নক্ষত্রপুঞ্জের দেশে
হরিৎ অরণ্যের অন্তরালে থমকে দাঁড়ালো।

চলতে চলতে ছোটা—
ছোটা মানেই তো জীবন
মানে প্রগতি
মানে বিস্ফোরণ—
সেই বিস্ফোরণের মধ্যে
ভালোবাসার বীজ রোপণ করে
আমি সমস্ত রাত ধরে তোমায় অনুধাবন করলাম।

প্রতীক্ষা করতেই হয় ।।

কাজল ঘোষ

বলেছিতো,
হাত পেতে বসে থাকো
তাহলেই পাবে
যা চাইছো বহুদিন ধরে।
বলেছিতো,
প্রতীক্ষা করতেই হবে
প্রার্থিত সম্পদ পেতে কিছু
শ্রম প্রয়োজন হয়।
বলেছিতো,
রাতে হোক দিনে হোক
যা চেয়েছো হাত পেতে
তা যদি দেবার হয়
সব কিছু অবশ্যই ধরা দেবে
তোমার বিশ্বাসে।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ১৯ ।।

পরের দিন পূর্ণবাবুকে কথাটা বলতে তিনি চমকে উঠলেন।

'বাড়ি বিক্রী করে দেবে! সে কি। কেন? ভাড়া তো পাচ্ছ!'

'তা হোক। মোটা লাভ পাচ্ছি বেচব না কেন?'

'মোটা লাভ? সে আবার কি। কে দিচ্ছে এত লাভ তোমাকে? কত দাম পাচ্ছ?'

তারপর সব শুনে, কেমন এক রকম শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'তাই নাকি। কমল কি আজকাল বাড়ির দালালি ধরল নাকি? ...তা ভাল। কই এরকম লাভের প্রস্তাব তো আমাদের কাছে আনে না কখনও; বাড়ি তো আমাদেরও এক-আধখানা আছে!'

হেমন্ত কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো করেই বলে, 'তেলা মাথায় তেল ঢালে নি ভালই করেছে। কেন, গরিব মানুষ আমি দুটো পয়সা পাচ্ছি তাতে কি তোমার হিংসে হচ্ছে?'

'না, তা নয়।' অন্যমনস্কভাবে বলতে বলতে অতর্কিতে অন্য প্রশ্ন করলেন, 'তা কমল তোমাকে এ খবর দিলে কখন?'

প্রশ্নটা যে হঠাৎ এই পথে যাবে তা ভাবে নি হেমন্ত, একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু ইতস্তত করলেও চলবে না, এ লোকটির শুধু চোখই নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে আছে ওর দ্বিধা বা সংকোচ লক্ষ্য করার জন্য। সে বলে ফেলল, 'কখন বললে?...আজ সকালেই তো!'

'আজ সকালে তোমার পাথুরেঘাটার কেস ছিল না?'

আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে পূর্ণবাবুর দৃষ্টি।

উত্তর দিতে গিয়ে আরও কি ফাঁদে পড়ে কে জানে, তাই হেমন্ত অন্য পথ ধরল, সেও কড়াগলায় বললে, 'আমার কোথায় কোন দিন কি কেস থাকে—তোমার যে দেখছি সব মুখস্থ। কেন বলো দিকি, আমার পেছনে এমন গোয়েন্দাগিরি ধরেছ! এত ঝকমারি কিসের আমার যে চোপর দিনের হিসেব তোমাকে দিতে হবে!'

বলে রাগ করে উঠে চলে গেল।

বেঁচেও গেল দৈবক্রমেই।

ঠিক সেই সময় এপাড়া থেকেই একটা ডাক এসে গেল, একটি মেয়ের অসময়ে প্রসব-ব্যথা উঠেছে— এখনই একবার যেতে হবে। সুতরাং পূর্ণবাবুরও আর কোন প্রশ্ন করার অবসর মিলল না, হেমন্তকেও কৃত্রিম বিরক্তির মধ্যে আত্মরক্ষা করতে হল না।

তবু, খুব শিক্ষা হয়ে গেল এবার, মনে মনে বললে সে বারবার, কমলাক্ষর কোন কথা এখানে বলার আগে দুজনে ঠিক করে নিতে হবে—কখন সে এসেছিল দরকার হলে সে সময়টা কি বলবে পূর্ণবাবুর কাছে। দুজনে দুরকম না হয়ে যায়।

রাত্রে কমলাক্ষকে কথাটা বলতে সে জিভ কাটল। বলল, খুব বেঁচে গেছ কিন্তু। আমাকে আজ সককালবেলাই একবার কলেজে যেতে হয়েছিল, খুব শক্ত একটা অপারেশন ছিল। বদরীবাবুর কেস, উনি আমাকেও থাকতে বলেছিলেন। সে কথা পূর্ণ-বাবুও জানেন। সেই জন্যেই বোধ হয়—কখন এসেছিলুম জানতে চেয়েছেন, মানে কখন আসি সেটা আঁচ করতে চান।...আবার যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলো বেলা এগারটায় এসেছিলুম। তুমি তো বলছ দশটার মধ্যে ফিরে এসেছিলে—আমিও ওখান থেকে বেলা দশটা নাগাদ বেরিয়েছি। দরোয়ানকেও সেই ভাবে শিখিয়ে রাখো—। বলা যায় না, উনি ওদের কাছেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

কিন্তু এবিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না পূর্ণবাবু, সেদিনও না, তার পরের দিনও না। লজ্জার মাথা খেয়ে ঝি-চাকরকেও জিজ্ঞাসা করে দেখল, তাদের কাছেও কিছু জানতে চান নি।

কতকটা নিশ্চিন্ত হল দুজনেই।

কমলাক্ষর খদ্দেরের তাড়াহুড়ো ছিল। কার্য করানোর বৃথা হাঙ্গামা না করে তিনি ওর কথার ওপরই বিশ্বাস করে বাড়িটা কিনে নিলেন একেবারে। বারো হাজার টাকাই দিলেন। অন্য যে বাড়িটার কথা বলেছিল কমলাক্ষ, হেমন্তর তরফ থেকে বায়না করে কাগজপত্র নিয়ে ধমুবাবুর মুহুরীকে জিম্মা করে দিলে। ভাদ্র মাস পড়ে গেল, আশ্বিনের আগে রেজেস্ট্রী হবে না, সুতরাং অত তাড়া কি?

পূর্ণবাবু শুনলেন সব, কোন মন্তব্য করলেন না আর। কমলাক্ষ আসছে যাচ্ছে, হেমন্তকে রেজেস্ট্রী আপিসে নিয়ে যাচ্ছে সবই শুনলেন। প্রকাশ্যেই আসছে সে, দিনের বেলায়, সে আসার সময়টাও তাই বলতে বাধা নেই। হেমন্তের পীড়াপীড়িতেই রাত্রে আসাটা দু-একদিন বন্ধ করল কমলাক্ষ। গোয়েন্দাগিরি পূর্ণবাবু ঠিক করেন নি সেদিন পাথুরেঘাটার কেস-এর ব্যাপারে, পরে শুনেছিল হেমন্ত। তারাই ওকে খবর দিয়েছিল, নির্বিঘ্নে ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার খবর। স্বাভাবিকভাবেই। তবে সন্দেহ হলে যে গোয়েন্দাগিরি করবেন না—এতটা নিশ্চিন্ত হওয়ারও কোন কারণ নেই। সাবধানে থাকাই ভাল।

কিন্তু কমলাক্ষ দুর্বার, অধীর। কোন মতে দুটো একটা দিন ধৈর্য ধরে থাকলেও— বেশী দিন সামলাতে পারল না নিজেকে।

শুধু এইটে করল—দু-একদিন আগে থাকতে বলে কয়ে রেখে খুব গভীর রাত্রে আসতে লাগল। সাড়ে এগারোটা বারোটায়। তবে সেদিনগুলোয় আর রাত্রে ফিরতো না ভোরবেলা উঠে চলে যেত।

তবে, দেখা গেল পূর্ণবাবুর কাছে ওরা শিশু। তাঁর পরিণত বুদ্ধির সংগে ওদের তরুণ বুদ্ধি পাল্লা দিতে পারল না। অতি পুরাতন ফাঁদেই একদিন ধরা পড়ে গেল ওরা।

হঠাৎ শোনা গেল পূর্ণবাবু মাদ্রাজ যাচ্ছেন, সেখানে কি ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে। কমলাক্ষ আগেই শুনে এসেছে হাসপাতালে যে ওঁকে যেতে হবে। কবে যাওয়া হবেন তাও সেখান থেকেই শুনেছে। দু-তিন দিন আগেই যাচ্ছেন—কারণ ওদিকের কোন নদীতে বন্যা হয়েছে—গাড়ি যাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, উনি জাহাজে যাবেন।

সকলেই বারণ করল, হেমন্তও—পূর্ণবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন। হেমন্তর উদ্বেগটাও আন্তরিক। এই লোকটি সম্বন্ধে অদ্ভুত মনোভাব তার—ঘৃণা কি বিদ্বেষ আনতে পারে না সম্পূর্ণ আবার শ্রদ্ধাও রাখতে পারে না। ভাল তো বলতে পারেই না।...

যেদিন যাওয়ার কথা, আগের দিন টিকিট পর্যন্ত দেখিয়ে গেলেন পূর্ণবাবু কথার ছলে, বারবার সাবধানে থাকার নির্দেশ দিলেন। কমলাক্ষ তো আসেই—তবু ওর সইসকেও যে রোজ খবর নিতে বলেছেন তাও জানালেন। আর কিছু চাই কিনা প্রশ্ন করলেন, তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন বেলা দশটায় জাহাজ ছাড়বে—সুতরাং আর দেখা হবে না, সেই ভাবেই বলে কয়ে গেলেন।

মুক্তি ঠিকই—এ কদিন পূর্ণ অবকাশ—তবু কমলাক্ষ কখন আসবে তার কিছু ঠিক করা ছিল না। হেমন্তর ধারণা যেমন রাত্রে আসে তাই আসবে, হয়ত কিছু আগে—সন্ধ্যার পরই এসে যাবে। কমলাক্ষও কিছু ভেবে রাখে নি বিশেষ করে—সন্ধ্যার পরটা যাতে নিজস্ব করে পায় সেইভাবেই কাজ করেছিল। হঠাৎ বেলা একটা নাগাদ আবিষ্কার করল—সামনের ঘণ্টাতিনেক, মানে বেলা চারটে পর্যন্ত হাতে কোন কাজ নেই, অখণ্ড অবসর।

বাড়িই ফিরছিল, যেতে যেতে কি মনে হল গাড়ি ঘুরিয়ে এদিকে চলে এল। তাও সন্দেহ ছিল হেমন্ত বাড়ি থাকবে কিনা। দারোয়ান যখন হাসিমুখে সেলাম করে জানাল দিদিবাবু আছেন, বোধ হয় বিশ্রাম করছেন— তখন ঝাঁ করে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে পান খেতে বলে— পা টিপে টিপে সটান ওপরে উঠে গেল।

হেমন্ত ঘুমোচ্ছিল। নিঃশব্দে ভেজানো দরজা খুলে কমলাক্ষ কখন ঘরে ঢুকেছে তা টেরও পায়নি, একেবারে বিছানায় পাশে এসে শুয়ে পড়তে চমকে ঘুম ভেঙে গেল তার। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে খুশীই হল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে প্রথমে পাখা নিয়ে খানিকক্ষণ বাতাস করল, তারপর যথারীতি মোজা-জামা খুলতে বসল।

ছুটোছুটি করে এই সময়টায় কাঠ হয়ে পড়ে থাকে কমলাক্ষ, অতবড় মানুষটাকে সাঁড়িয়ে জামা খুলে নিতে কষ্ট হয় হেমন্তর—হাঁপায়, সেইটে উপভোগ করে। আজও সেই পর্ব চলছে—নিঃশব্দে দরজার কাছে আরও একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটল—পূর্ণবাবু।

এমন দুপুরে কেউ কোথাও নেই দেখে দারোয়ান—সদ্য একটা গোটা টাকা বকশিস পাওয়ার কৃতজ্ঞতায় কমলাক্ষর জন্যেই—নিজে মনভোলা করে বরফ আনতে গেছে। এই পচা গরমে ঘর্মাক্ত হয়ে এসেছে লোকটা, হাতের কাছে না চাইতে ঠাণ্ডা জল পেলে আরও খুশী হবে, সেই সঙ্গে দিদিবাবুও—এই আশাতেই। এই রাস্তার ওপরই তিনটে বাড়ী পরে পানের দোকান, যেতে আসতে বরফ নিতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী লাগার কথা নয়, এর মধ্যে আর কী হবে? ওপরে দিদিবাবুর ঘরে তো ওরা জাগাই আছে, নিচেও ভাঁড়ার ঘরে চাবি দেওয়া, তাছাড়া সামনেই ঝি আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছে, এঁটো বাসন, রান্নাঘরে থাকে—সেখানে ঠাকুর শুয়ে—চুরি হবার সম্ভাবনা নেই।

সবই হিসেব করেছে সে, পূর্ণবাবুকে ছাড়া।

পূর্ণবাবু কিছু দিন ধরেই সন্দেহ করছিলেন, হেমন্ত বা কমলাক্ষ চাকর দারোয়ানদের হাত করেছে, তাই তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করে মিছিমিছি নিজে খেলো হতে চান নি। তারচেয়ে নিজেই একটু কষ্ট করবেন সেই ভাল। নিজের গাড়িও নয়, ঘণ্টা হিসেবে একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এবাড়ি থেকে একটু দূরে একটা গাছতলায় অপেক্ষা করছেন বেলা এগারোটা থেকে। তিনি জানেন, সকালে একবার করে হাসপাতালে যায় কমলাক্ষ, তারপর নিজের রুগী দেখতে বেরোয়। কোন কোনদিন হাসপাতালেই এগারোটা বেজে যায়। যাই হোক, একেবারে সকালে না আসতে পারলে এগারোটার আগে আর পারবে না। সকালে সবাই কর্মব্যস্ত থাকে, কমলাক্ষরও তাড়া—বিশ্রাম লাভের সময় সেটা নয়। তার অনুপস্থিতিরই যদি নিতে চায় তো—নিভৃত অবসর খুঁজবে। সন্ধ্যা তো আছেই, সে অন্য ব্যবস্থা—এখন এই বেলা চারটে পর্যন্ত একটু দেখে যাবেন এই সংকল্প করেই গাড়ি ঠিক করেছেন।

মাদ্রাজ যাওয়ার ব্যাপারটাও সাজানো। আসলে এ যাত্রা যেতে পারবেন না, সেই কথাই লিখে দিয়েছেন তাদের — জাহাজের টিকিট আজই গোপনে ফেরৎ দিয়েছেন। কিছু টাকা দণ্ড গেছে, তা যাক। এর একটা এসপার ওসপার দেখতে চান তিনি।

এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢোকার ইচ্ছা ছিল না তাঁর আর একটু সময় দেবেন ওদের এই রকমই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুটো কারণে তাড়া করতে হল। ভাদ্রের নির্মেঘ দুপুর—অসহ্য গুমোট। তার গাড়ির দু পাশের পাখিগুলো তোলা—বসে বসে গলদ-ঘর্ম হচ্ছিলেন। শৌখিন জাপানী হাত-পাখার হাওয়ায় মানাচ্ছিল না। একনাগাড়ে পাখা চালাতেও পারেন না, হাতে ব্যথা করে। তার ওপর যখন দেখলেন দারোয়ান দরজা ভেজিয়ে ওদিকে চলে গেল—তখন আর এ সুযোগ নেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। কে জানে, তিনি গেলে দারোয়ান বাধা দিতে পারত না ঠিকই—কোন কৌশলে সতর্ক করে দিত হয়ত। পূর্বনির্দিষ্ট কোন সংকেত করত। তারচেয়ে এই ভাল।...

এখানে এসে বুঝলেন—তাঁর আন্দাজই ঠিক ছিল, আর একটু পরে এলেই ভাল হত, প্রণয়নাট্যের মধ্যে পৌঁছতে পারতেন একেবারে। তবে তাতেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। যা দেখলেন এই যথেষ্ট। বাকীটা আন্দাজ করে নিতে কোন অসুবিধা নেই। ঠিক হাতেনাতে ধরা যাকে বলে—তা হয়ত হল না—তবে তিনি তো আর মকদ্দমা করতে যাচ্ছেন না, আইনত কিছু করার শক্তিও তাঁর নেই—তখন অত প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বা কি লাভ?

পূর্ণবাবু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মিনিট-পাঁচেক এই প্রণয়লীলা দেখলেন।

কমলাক্ষ তো চোখ বুজেই আছে, হেমন্তও তখন তার কামিজ খোলা শেষ করে ভেতরের মেরজাইটা খোলার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে—দরজার দিকে চাই-বারও অবসর পায় নি। পূর্ণবাবু আরও কিছুক্ষণ এইভাবে থাকলেও কেউ টের পেত না, তবে তাঁরই আর সম্ভব হল না এ দৃশ্য সহ্য করা। তিনিই কথা বলে উঠে এদের সচেতন করে দিলেন।

এক রকমের অতি শীতল কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের বিশেষ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটালুম মনে হচ্ছে!'

ধড়মড় করে উঠে বসল কমলাক্ষ। দিনে-দুপুরে ভূত দেখার অবস্থা তার। হেমন্তরও মুখ সাদা হয়ে গেল দেখতে দেখতে—কারও মুখেই কথা সরল না।

পূর্ণবাবুই যেন কৈফিয়ৎ দিলেন একটা, 'আমার যাওয়া হল না — এইটেই বলতে এসেছিলুম। তা তুমি তো দেখছি ব্যস্তই আছে। আমি না থাকলেই সুবিধে হত বোধ হয়। দুটো দিন মুখ বদলাতে।'

ঈর্ষা, বিদ্বেষ—এবং প্রচণ্ড ক্রোধ—ভেতরে ভেতরে রক্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর, সেটা আড়ে একবার ওঁর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারল হেমন্ত। তবু এই আপাত শান্ত ভাবটা কেমন করে বজায় রাখছেন, এই দুঃসহ দাহের মধ্যেও, সেটাই ভেবে অবাক না হয়ে পারল না। একান্ত লজ্জার সংগে ভেতরেই মনে মনে তারিফ করল সে। লোকটা জীবনের পাঠ-শালায় অনেক শিক্ষা নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

কমলাক্ষ এ ধরনের কোন অবস্থায় পড়ে নি কখনও, হেমন্তর মত বিচিত্র অভিজ্ঞতাও

নেই জীবনের। সে মাথা হেঁট করে বসে ঘামতে লাগল।

অগত্যা কথা কইতে হল হেমন্তকেই। সেও খুব একটা জোর পেল না কথায়, আমতা আমতা করে বলল, 'না, এই—মানে গরমে ঘেমে খুব কষ্ট হয়েছে কিনা—নেতিয়ে পড়েছে একেবারে—'

'তা তাতে এই নিচের ফরাসেও বসা চলত, এখানে শুয়ে পড়লেও ক্ষতি ছিল না।...বাইরের হাসপাতালে ঘোরা কাপড়ে খাটে শোবার খুব একটা দরকার ছিল কি? ...আমি অবিশ্যি এ আদর পাব না তা জানি। আশাও করি না, অল্প বয়স যৌবন-কালের অনেক পাওনা, এ বয়সে সে লোভ করাও মুখখুমি—তা ভালই, তবে যার বিয়ে হয়েছে, সবে একটি সন্তান হয়েছে, তার মাথা না খাওয়াই ভাল, তুমিও একটা ছেলে নিয়ে ঘর করো।...আর এই ওর উন্নতির সময়, উঠতি বয়স, খাটবে কাজের দিকে মন দেবে—সে-ই ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত—আমোদ ফূর্তির জন্যে তো পড়েই রইল সারা জীবন।...

দিন কিনে নিক আগে — এখন থেকে জীবনটা বরবাদ করে দিও না। আচ্ছা আসি।...মাদ্রাজ আর যাচ্ছি না, বলে দিয়েছি তাদের—'

আর দাঁড়ালেন না পূর্ণবাবু। যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনিই চলে গেলেন। দরজার কাছেই দারোয়ানের সঙ্গে দেখা—বরফ আর লেমোনেড নিয়ে ফিরছে—সে এমনই হতভম্ব হয়ে গেল যে, একটা সেলাম করার কথাও মনে রইল না তার। বিস্ময়ে ও নানা জানা-অজানা আশঙ্কায় মুখটা যে ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ না গাড়িতে গিয়ে উঠলেন পূর্ণবাবু তা আর বুজল না।

তিনি যদি কঠোর ভর্ৎসনা করতেন, রাগারাগি চেঁচামেচি করতেন তাহলে হেমন্ত তার উপযুক্ত জবাব দিতে পারত। সেও যেন কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ওঁর এই ঘটনাটাকে এমন শান্ত নিরুত্তাপভাবে গ্রহণ করাতে। যে ঝগড়ার কথা একটিও তুলল না, তার প্রতি কোন অবিচার হয়েছে এরা অন্যায় করেছে এমন একটি অনুযোগও করল না—তাকে কড়া কথা শোনানো যায় কী করে?...

কমলাক্ষ তো সেই যে মাথা নিচু করে বসে ছিল—তেমনিই বসে রইল, মাথা তুলে হেমন্তর দিকেও তাকাতে পারল না এক-বার। ছেলেমানুষ, লজ্জা ঝেড়ে ফেলার শিক্ষা এখনও পায় নি—মনে হল লজ্জায় ও ভয়ে পাথর হয়ে গেছে সে। কপালের ঘাম অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল—হাত তুলে সেটাও মুছতে পারল না।

অনেকক্ষণ এই অভিভূতভাবে বসে রইল সে। দারোয়ান বরফ লেমোনেড দিয়ে যেতে কৃতজ্ঞভাবে সেটাই শুধু যা এক চুমুকে খেয়ে নিয়েছিল এর মধ্যে—ঐ যা প্রাণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল একবার। এই গরমে এত ঘামের মধ্যে বরফ খাওয়া ঠিক হচ্ছে না বুঝেও হেমন্ত কোন বাধা দিতে পারল না, ওর প্রয়োজন বুঝে কি বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

তার পরও, কিছুক্ষণ সেইভাবে বসে থাকার পর, আস্তে আস্তে উঠে এক সময়, মেরজাই আর কামিজটা টেনে গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে হেমন্তর সঙ্গেও একটা কথা বলতে পারল না—সাধারণ বিদায় সম্ভাষণও না। 'আজ আসি' কি 'এখন আসি' এটুকুও না।

মনে হল শুধু পূর্ণবাবু নন, হেমন্তর কাছেও নিজেকে অপরাধী বোধ করছে সে।

চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে হেমন্ত আবিষ্কার করল যে মোজাটা ফেলে শুধুই জুতো পায়ে দিয়ে চলে গেছে সে। অন্য দিন হেমন্তই যাওয়ার আগে মোজা পরিয়ে দেয়—আজ দুজনের কারুরই সে খেয়াল হয় নি।

॥ ২০ ॥

কমলাক্ষ পরের দিনও এল না। তার পরের দিনও না। পর পর পাঁচটা দিন কেটে গেল—না পেল হেমন্ত তার দেখা, না পেল কোন খবর।

পূর্ণবাবু সেই একটা দিনই আসেন নি, তার পর দিন থেকেই নিয়মিত আসছেন। তবে কে জানে কেন, হেমন্তর কঠিন মুখভাব দেখেই বোধ হয়—কোন ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করেন না। একটু-খানি বসেন, কুশল প্রশ্ন করেন, এক পেয়ালা চা খান, আধ ঘন্টাটাক থেকে চলে যান। এখানের বাতাসেই যেন তাঁর অনাদর, উপেক্ষার ভাব, অন্তত তাই মনে হয়। আসা-যাওয়ার সময় দারোয়ান শুধু গম্ভীরভাবে একবার উঠে দাঁড়ায়, ঝি-ঠাকুর কেউ কোন সম্ভাষণ করে না। এই নীরব অবহেলায় পূর্ণবাবু ক্রুদ্ধ হন মনে মনে কিন্তু এ নিয়ে রাগারাগি করতে পারেন না। এসব ভৃত্যবর্গ তিনিই নিয়োগ করেছিলেন কিন্তু এরা আইনত হেমন্তরই লোক, বিশেষ সে-ই এখন এদের সম্পূর্ণ খরচ চালায়, পূর্ণবাবুর কাছ থেকে এক পয়সাও নেয় না। পূর্ণ-বাবু মধ্যে মধ্যে উপহার হিসেবে দু-একশ টাকা জোর করে দিয়ে যান—কি ওর পোস্ট আপিসের হিসেবে জমা করে দেন, সেটা অতিরিক্ত, হেমন্তর কোন প্রয়োজন নেই, সহজে নিতে চায়ও না।

সুতরাং জোর নেই এদের কারও ওপর, ভয় দেখাবার উপায় নেই। বিরক্ত হন, সে বিরক্তিটা প্রকাশ করতে না পেরে আরও ক্রুদ্ধ, আরও ক্রুর হয়ে ওঠেন।

এ অবহেলার কারণটা বুঝেই আরও বিরক্তি তাঁর। এরা কমলাক্ষর ভক্ত, তাকেই পছন্দ করে। সেদিন ছিঁচকে চোরের মতো লুকিয়ে ঘাপটি মেরে থেকে, চুপি চুপি এসে তাকে ও ওদের মনিবকে অপদস্থ করার খবরটা নিশ্চয় অজ্ঞাত নেই কারও—সেই কারণেই এই বিতৃষ্ণা। নীরব ধিক্কারে ওরা তাকে অসম্মান করতে চায়—শোধ তুলতে চায় কমলাক্ষর অপমানের।

এ অবস্থায় পূর্ণবাবুর কাছে কমলাক্ষর খবর জানতে পাওয়া যায় না। সে যে আসছে না—একথাও গায়ে পড়ে বলতে চায় না হেমন্ত। আসবে না-ই বা কেন? পূর্ণবাবুর কি অধিকার আছে তার আসা বন্ধ করার?...অকথিত যুক্তিরও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, 'ঠাকুরঘরে কে না আমি তো কলা খাইনি' এই গোছের হয়ে পড়বে। তাই মুখ বুজে সহ্য করা ও মনে মনে ছটফট করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

পাঁচ দিনের দিন কমলাক্ষর সইস এল খবর নিয়ে।

বাবুর পরশু দিন থেকেই খুব জ্বর—বুকে নাকি সর্দি বসেছে। পাড়ার ডাক্তার দেখছিলেন, বড় ডাক্তারবাবু, মানে পূর্ণবাবু খবর পেয়ে আজ এসেছেন, তিনিই দেখে ওষুধ দিচ্ছেন। বুকে পুলটিশ লাগাতে বলেছেন। আজ এর মধ্যেই দুবার এসে দেখে গেছেন, বলেছেন কোন ভয় নেই, রাত্রেও আবার আসবেন, দরকার হয় রাতে থেকেই যাবেন। নিজে মিকসচার তৈরী করিয়ে এনে বসে থেকে খাইয়ে গেছেন। খুবই করছেন—নিজের ছেলের মতো।

বাবু ওরই মধ্যে এক ফাঁকে রামখেলাওনকে ডেকে চুপি চুপি বলেছেন—এই খবরটা এখানের মাইজীকে দিয়ে যেতে। বলেছেন, 'মাইজী নিশ্চয় খুব ভাবছেন, তাঁকে বলে আয় যে কোন ভয় নেই, একটু ভাল হয়ে উঠলেই গিয়ে দেখা করব।...বলিস যে বড় ডাক্তারবাবু খুবই করছেন আর ঠিক সময়ে যখন ধরা পড়েছে শিগগিরই আরাম হয়ে উঠবে। তবে এই তো অবস্থা—খবর-টবর যদি ঠিক মতো পাঠাতে না পারি—খুব যেন না ভাবেন তিনি।'

আর বলতে পারেননি, এইটুকু বলেই হাঁপিয়ে গিছলেন নাকি। খুব কষ্ট হচ্ছিল কথা বলতে।...

হেমন্তর বুকের মধ্যেটা ছাঁৎ করে উঠল। বুকে সর্দি বসা মানে নিমোনিয়া। সেদিনের সেই বরফ জল!

ইস। যদি মায়া না করে বাধা দিত, গেলাসটা কেড়ে নিত।

সে স্থানকাল পাত্র ভুলে ব্যাকুলভাবে একেবারে রামখেলাওনের হাত দুটো চেপে ধরে বললে, 'বাবু কিছু বলতে পারুন আর না পারুন, তুমি এসে একটু খবরটা দিয়ে যেও বাবা, লক্ষ্মীটি! আমি তোমাকে বকশিশ দেব।

জিভ কেটে রামখেলাওন বলল, 'ছি-ছি! বকশিশের কথা কি বলছেন মাইজী, এ তো আমারও কাজ। এ বাবু মনিব না আসেন বড়া ভাইয়ার মতো, এঁর বিমারীতে হামাদের হাতপাও ভি ঠান্ডা হয়ে গিয়েসে। হাপনি খুব চুপ থাকুন মাইজী, হামি

শুনো বেলা খবর পৌঁছাইয়ে দিব। বাবু হাপনাকে কত পিয়ার করেন সো কি হামি লোক জানছি না?...নিজের বহিনের মতো দেখেন।'

সইস চলে গেল—কিন্তু হেমন্তর ঠিক কণ্টকশয্যার অবস্থা। বসতে পারে না শুতে পারে না, খাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না।

অসুখ করে অবশ্য—সব বয়সেই করে। বুকে সর্দি বসাটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। প্রথমেই ধরা পড়েছে—ভয়ের কারণও কম হবারই কথা। তবু—বুকের মধ্যে একটা অসহায় হতাশ ভাব বোধ করে সে, অকারণেই চোখে জল এসে যায়। অমঙ্গলের ভয়ে যত সামলাবার চেষ্টা করে ততই উপচে পড়ে তা। কেবলই মনে পড়ে যায় শাশুড়ীর কথাটা। ডাইনীফাইনী নয়, বাজে কথা—ওর জন্মক্ষণেই বিধাতার কি অভি-সম্পাত আছে, ওর সুখের বাসা বার বার পুড়বে, যাকে অবলম্বন করতে যাবে তাকেই হারাবে।...

ঠাকুরের ছবির সামনে মাথা খুঁড়তে লাগল বার বার—'ঠাকুর ওকে ভাল করে দাও, আমি কাছে চাই না, দেখতেও চাই না, আর ওকে আসতেও দেব না কোনদিন—শুধু ও ভাল হয়ে উঠুক, হে ঠাকুর!'

পূর্ণবাবুর এত স্নেহ এত উদারতা—এটাও কেমন ভাল লাগে না।

মানুষটাকে এতদিন কয়েক বছরই দেখছে—অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ লোক, যে কোন অনিষ্ট করেছে বলে মনে করেন একবার সে লোককে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন না, দীর্ঘদিন কেটে গেলেও সেকথা ভোলেন না—সুযোগের অপেক্ষা করেন শুধু প্রতিশোধ নেবার। বহু বছর অপেক্ষা করতে হলেও ধৈর্য ধরে থাকেন, ভুলে যান না কখনই। ...এ ও'র মুখেই অন্য লোক অন্য ঘটনাপ্রসঙ্গে বহুদিন শুনেছে হেমন্ত. কেমন করে কাকে কতদিন পরে জব্দ করেছেন—সেই বিবরণ নিজেই দিয়েছেন পূর্ণবাবু।

সেই লোক, শুধু ছাত্র বলে—ভাল ছাত্র হলেও—ও'র মতে এত খানি বিশ্বাস-ঘাতকতা যে করেছে, তাকে ক্ষমা করে তার নিরাময়ের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—এ যেন বিশ্বাস হয় না কিছুতেই।

একবার মনে হল বদরীবাবুর কাছে ছুটে যায়, কে খুব ভাল ডাক্তার আছেন কোথায়—তিনিই বলতে পারবেন—রসিক-বাবুর খুব নাম হয়েছে আজকাল—ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে বলে। বদরীবাবুরও ছাত্র কমলাক্ষ—বিশ্বস্ত প্রিয় ছাত্র, তিনি শুনলে এখনই একটা ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল কী বলবে ও'কে? কেন পূর্ণবাবুকে বিশ্বাস বা ভরসা করতে পারছে না—কী জবাব দেবে?

শুধু ওর লজ্জার কথা হলেও ইতস্তত করত না, এ বিপদে মান-অপমান কিছুই মানত না সে—এর মধ্যে যে কমলাক্ষরও লজ্জা, অপমানের প্রশ্ন জড়িত আছে। এসব কথা শুনলে বদরীবাবু কমলাক্ষকে কি চোখে দেখবেন? তিনি শুনেছেন জানলে কমলাক্ষও যদি রাগ করে?

কিছুই করা হয় না তাই।

শুধু ছটফট করে আর ঠাকুরের সামনে মাথা খোঁড়ে মাটিতে। 'ওকে ভাল করে দাও ঠাকুর, আর কখনও কাছে আসতে দেব না। ওর মুখ দেখব না, এ মুখ দেখাব না!'

সইস পরেরদিন আসে শুকনো মুখে। খবর দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, 'নেহি মাইজী, কুচ্ছ আচ্ছা খবর নেহি আছে। তবিয়ৎ উনকা বহুত খারাপ! মাইজী হামার তো আচ্ছা লাগছে না, হাপনি একবার গিয়ে দেখিয়ে আসুন।'

'সে কি! কী বলছ রামখেলাওন! এ কী সর্বনাশের কথা বলছ তুমি।'

আর্তনাদের মতো স্বর বেরোয় হেমন্তর গলা দিয়ে।

দেখতে দেখতে দুই চোখে তার জল ছাপিয়ে উঠে ঝরে পড়ে।

দুহাতে কপাল চাপড়াতে থাকে সে।

রামখেলাওনও কাপড়ের খুঁটে চোখ মোছে। বলে, 'হাঁ মাইজী, হামার তো ভাল লাগছে না কুছ। কথা ভি বোলছেন না, ডাকলে সাড়া ভি দিচ্ছেন না।...বড়া ডাক্তার-বাবু অনেক করছেন কোশিস—কুচ্ছ কাম হচ্ছে না।'

যাওয়ার কথা হেমন্তও ভাবছে বৈকি। অসুখ শুনে পর্যন্তই তো ছটফট করছে যাওয়ার জন্যে। কে দেখছে, কে সেবা করছে কে জানে। হয়ত সেবাই হচ্ছে না। এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা তার, শুধু ধাত্রী-বিদ্যাই নয় সেবার বিদ্যাও শিখেছে—সে যেতে পারলে অনেক কিছুই করতে পারত। পূর্ণবাবুকেও চোখে চোখে রাখতে পারত—কী করছেন না করছেন।

কিন্তু তারা যদি ঢুকতে না দেয়? যদি অনধিকারচর্চাভাবে, অপমান করে?

কী শুনেছে তারা ওর সম্বন্ধে কে জানে। এতদিনের এই উন্মত্ত প্রণয় যে তাদের চোখে চাপা আছে তা সম্ভব নয়। কমলাক্ষ তার উন্মত্ততা চেপে রাখতে পারেনি নিশ্চয়ই, তার স্বভাবেই এ ধরণের সতর্কতা নেই। মুখ-চোখের ভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে সব কথা। বিশেষ দীর্ঘ রাত্রে বাড়ি আসছে, সপ্তাহে দু-তিন দিনই সারারাত বাইরে কাটিয়ে আসছে—এর অর্থ কারও না বোঝার কথা নয়। মা ও স্ত্রী তো বিশেষ করে বুঝবেই। যাদের সর্বনাশ হয় তারা ঠিক বুঝতে পারে। আড়ালে ইংগিতে, চোখের পল্লব ফেলার টের পায় তারা।

তাছাড়াও, এসব কথা বাতাসের আগে ছোটে।

কতলোক গরজ করে জানিয়ে এসেছে হয়ত। হয়ত পূর্ণবাবুই শুনিয়েছেন এর ভেতর। সইস কোচম্যান কত লোকই তো জানে। আজ যদি হেমন্ত সে বাড়িতে 'অবিদ্যে', 'পিশাচী', 'ডাইনী' প্রভৃতি এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অভিধায় পরিচিত হয়ে থাকে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কাউকে দোষ দিতেও পারবে না সে।...কমলাক্ষের জন্যে সেসব অপমানও সে সইতে রাজী আছে—যদি তাকে সেবা করার সুযোগ পায়। কিন্তু সে আশা যে নেই—তা নিজের মনেই বুঝতে পারছে!

পরের দিন রামখেলাওন আর এল না।

এ না আসার একটাই অর্থ হয়। আরও বাড়াবাড়ি হয়েছে, কিম্বা কিম্বা—

সারা সকাল ঘর বার একতলা দোতলা করে বেলা দশটা নাগাদ আর থাকতে পারল না হেমন্ত, দারোয়ানকে ডেকে বলল, 'তুমি একবারটি যাও শিউপূজন, কোথাও থেকে কারও কাছ থেকে খবরটা নিয়ে এসো—যেমন করে হোক। পরিচয় দিও না, কোথা থেকে যাচ্ছ বলো না, তাহলে হয়ত মন্দ কিছু বলতে পারে। এমনিই—। তোমাকে কি চিনতে পারবে? একদিন গিয়েছিলে, সেও তো বাবুর সংগেই দেখা হয়েছে শুধু?...কী জানি কি করবে, আমি আর ভাবতেও পারছি না কিছু। যা হয় করো, যা ভাল বোঝো—শুধু খবরটা—'

বলতে বলতেই কেঁদে ফেলে।

'আমি এখনই যাচ্ছি দিদিবাবু', শিউ-পূজন ব্যস্তভাবে বলে, তারও মুখ শুকিয়ে গেছে কদিনে, 'ছুটেই যাচ্ছি। সে আমি ঠিক খবর বার করে নেব।...রামজী ভগবান ভালই করবেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, অত উপকারী লোক—তার কখনও অনিষ্ট হয়!'

এইটুকুই যেন অনেকখানি আশ্বাস। অশিক্ষিত ভৃত্যশ্রেণীর লোক, তার মুখের দুটো ফাঁকা সান্ত্বনা—তাকেই যেন ঈশ্বরের অভয় বলে মনে হয়। সেইটেকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে।

সে আশ্বাস পেতেও দেরি হয় না অবশ্য। এগারোটা, বারোটা—একটা বেজে গেল, শিউপূজন ফেরে না।

তখন পাগলের মতো একবস্ত্রে নিজেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে।

ঝি এসে ধরে, 'কোথায় যাচ্ছ দিদিমণি, তুমি কি পাগল হয়েছ? এমনভাবে একা কোথায় যাবে? চাদরটা পর্যন্ত নাওনি—। যেতে হয় আমিও যাই চলো।'

'তবে তুই আয়, যেমন আছিস তেমনি আয়। চাদরে আমার দরকার নেই, লাজ-লজ্জা মান-অপমানের কথা ভাববার ঢের সময় পাবো।...একটা গাড়ি ডাক বরং—না না, ঐ হ্যারিসন রোডের মোড়েই পাবো—'

'রসো। বলি গাড়ি চড়লে পয়সা তো লাগবে, এক মিনিট সবুর করো—'

ঝি ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢোকে, পয়সা আর চাদরের জন্যে, আর ঠিক সেই সময়েই নজরে পড়ে—শিউপূজন ফিরছে—ভিজে কাপড়ে।

কাপড়-জামা সব সপ-সপ করছে ভিজে, সদ্য সবশুদ্ধ বোধহয় কোথাও ডুবে চান করে এসেছে—বোধহয় গঙ্গাতেই—

পাথর হয়ে গেল হেমন্ত। সব আকুলতা যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল ওর।

এই স্নান করে আসার অর্থ—নিজের মনের মধ্যে বারম্বার অস্বীকার করার চেষ্টা সত্ত্বেও—অনুমান করতে পারে সে।

সর্বনাশ যা হবার হয়েই গেছে, কিছুই বাকী নেই আর।

শিখপূজন ওকে দেখেই হাহাকার করে কেঁদে উঠল, 'দিদিবাবু—রামজী দয়া করলেন নাই, ও হো হো—'

আর কিছু শুনতে পারল না হেমন্ত আর কিছু মাথাতেও গেল না।

সব শূন্য, সব অন্ধকার হয়ে গেল।

গভীর শান্তি, গভীরতর সুপ্তি।

কোথাও কেউ কি পড়ল দড়াম করে? শব্দ হল যে?...কোথায় বহুদূরে যেন কারা হৈ-হৈ করে উঠল, 'দ্যাখ দ্যাখ—ধর ধর'—এই ধরনের শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল কারা—চারিদিকে চেঁচামেচি—তারপরই সব শান্ত, নিস্তব্ধ।

হেমন্তর জ্ঞান হল সন্ধ্যার একটু আগে।

চোখ চেয়ে ও প্রথমটায় যেন কিছুই দেখতে পেল না। তারপর একটু একটু করে চোখে পড়ল সব।

এ আবার কি? সবাই মিলে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কেন ওর মুখের ওপর?

ডাক্তার কৈলাসবাবু কেন এখানে?

ওঁকে কে ডাকল, কার জন্যে এলেন উনি? এ পাড়ার মধ্যে বড় ডাক্তার, অনেক ফি, দু টাকা বোধহয়—কিম্বা চার টাকা।

ভ্রূ কুঁচকে তাড়াতাড়ি হাত তুলে অভ্যাস মতো মাথার কাপড়টা টেনে দিতে গেল, পারল না। হাতের পালকাতে অসহ্য ব্যথা, হাত নাড়া যাচ্ছে না।

কৈলাসবাবু বললেন, 'গুড, সেনস ফিরেছে। এনটায়ার সেন্সই। হাত নাড়তে যাচ্ছিল মানে মাথায় কাপড়টা টানতে চাইছে।...লজ্জা যখন এসেছে তখন পুরো জ্ঞানটাই ফিরেছে। আর ভয় নেই।...আমি চলি এখন। এখানে তোমরা কে থাকবে? আপনার লোক কেউ নেই?...ইনি তো নার্স না মিডওয়াইফ, কলেজে খবর দিয়ে একজন ভাল নার্স কাউকে আনিয়ে নিলে ভাল হয়।...এনি হাউ, তোমরাই বুঝে নাও। এই মিকসচার মানে শিশির ওষুধটা চলবে তিন ঘণ্টা অন্তর। আর একটু জ্ঞান ফিরলে দরজা জানলা বন্ধ করে পাশ ফিরিয়ে—এই এমব্রোকেশ্যান মানে মালিশটা রইল—মালিশ করে দিও মাজায়, পিঠে, হাতের পালকায় কনুইয়ে। মালিশ গরম গরম করতে হবে না, মালিশ হয়ে গেলে আবার সেমিজ কি জামা পরিয়ে-- কী পরেন তা তো জানি না, সেমিজই তো দেখছি—একটু সেক করো কেউ। আগুনে ধরে কাপড় তাতাতে পারো কিম্বা লণ্ঠনের মাথায় রেখে—ফ্লানেল হলে ভাল হয়, না পেলে সুতীর কাপড়ই গরম করে করে সেক দিও—'

কৈলাসবাবু উঠে পড়লেন।

এইবার পরিষ্কার সব মনে পড়ছে।

দারোয়ান চান করে ভিজে কাপড়ে আসছিল—চিৎকার করে কেঁদে উঠল—তারপর আর কিছু মনে নেই।

বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সেই রাস্তার ওপরই—ফুটপাথে, তাতেই বোধহয় সর্বাঙ্গে এই অসহ্য ব্যথা।

এইবার আরও মনে পড়ল।

সর্বনাশের কথাটা। সব শেষ হয়ে গিয়েছে। ওকে ভালবাসবার, ওর জন্য চিন্তা করবার, ওকে দেখাশুনো করার কেউ আর রইল না। সমস্ত বিবেক বিবেচনা ত্যাগ করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মত্তের মতো ভালবাসবার যে একটি মাত্র লোক পেয়েছিল জীবনে, মাত্র এই কয়েক মাস—সে আর নেই।

আর কোনদিন তাকে দেখতে পাবে না, চিরকালের মতোই চোখের সামনে থেকে মুছে গেল সে। আর কেউ অমন আবেগগাঢ় আলিঙ্গনে পিষ্ট করবে না কোনদিন, পাগলের মতো সর্বাঙ্গে চুমু খাবে না। অবোধের মতো সরল শিশুর মতো উৎসাহে উজ্জ্বল, আনন্দে উচ্ছল—বিন্দুমাত্র প্রত্যাখ্যানে আউতে পড়া সুন্দর মুখ আর কখনও চোখে পড়বে না, শুনতে পাবে না সেই স্তুতি করার মতো রূপ ও গুণের প্রশংসা—কেউ তার জন্যে, শুধুমাত্র তাকে চোখের দেখা দেখার জন্যে তিনক্রোশ রাস্তা হেঁটে গিয়ে পাঁচিল ডিঙোবে না কোনদিন। সব শেষ, সব শেষ।

কে জানত সেদিন যে, সেই লজ্জায় অনুশোচনায়—ওর অপমান ও সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হবার জন্যেই অনুশোচনা—ম্লান মুখে যে চলে গেল সেদিন যাওয়ার আগে একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করে যেতে পারল না, সেদিনের সেই বিবর্ণ স্বেদাক্ত মুখে অপরাধীর মতো পালিয়ে যাওয়াই শেষ যাওয়া! যদি আর একবারও অন্তত দেখা হত, অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে সেদিনের সব লজ্জাকর আঘাত মুছে নিতে পারত—আর একটিবার অন্তত সেই ফুলের মতো কোমল নির্মল মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারত—তাহলেও বোধহয় এত ব্যথা বোধ করত না।...

আশ্চর্য! তবু মৃত্যু তো হল না।

স্বামীকে খেয়েছে, কমলাক্ষকে খেল—আরও কী আছে অদৃষ্টে! আরও কত আঘাত দেবার জন্যে বাঁচিয়ে রাখছেন ভগবান?

ভাবতে ভাবতেই ডুকরে কেঁদে উঠল হেমন্ত চিৎকার করে।

'চুপ করো চুপ করো দিদিমণি। এই শরীল তোমার।...তিনি আজ বেঁচে থাকলে, এই যে পড়ে গেছ, ভিরমি গেছ—পাগল হয়ে উঠত। তার মুখ মনে করে থির হও একটু—'

দারোয়ান দরজার কাছ থেকে বলল, ওবাড়ির বড়দিদিবাবুকে খবর দিয়ে এসেছি চারুর মা, তিনি আর ওবাড়ির বাবু এসে পড়বেন এখুনি—'

এই অবস্থা দেখে ঝি দারোয়ান ঠাকুর—ওরাই নিশ্চয় নিজেদের বুদ্ধিতে খবর দিয়েছে। স্বাভাবিক সেটা। তাকেই জানে ওরা, গোপালীকে—দুঃখে সুখে সেই একমাত্র আপনজন। সুতরাং এ বিপদে দিশেহারা হয়ে তাকে খবর দেবার কথাই আগে মনে পড়েছে। এটুকু ওরা বুঝেছে যে পূর্ণবাবুকে এখন এই অবস্থায় ডাকা উচিত হবে না; কমলাক্ষের শোকে মূর্চ্ছা গেছে হেমন্ত, এখনও জ্ঞান হচ্ছে না—এ সংবাদ তাঁর পক্ষে রুচিকর হবে না, সম্ভবত হেমন্তরও সহ্য হবে না এ সময় তাঁর সঙ্গ।

তার মানে—লজ্জা ও অপমানের যেটুকু বাকী ছিল—সেটুকুও আজ পাওয়া হয়ে গেল। কমলাক্ষের ব্যাপারটা এতদিন গোপালীরা জানত না, কোথাও কারও মুখে গুজব শুনলেও এতটা নিশ্চয় শোনেনি—এবার আর কিছুই জানতে শুনতে বাকী থাকবে না। গোপালী শোধ তুলবে না প্রথমদিককার সে অপমানের—তেমন মানুষই নয় সে—কিন্তু হেমন্ত মুখ দেখাবে কি করে? সে কিছু বলবে না বলেই তো আরও লজ্জা ওর।

তবু মনে হল—সেও আর পারছে না

এ দুঃসহ শোকের কথা কাউকে না জানালে, এ সুদুর্লভ প্রেমের কথাও—সে আর থাকতে পারবে না। গোপালীর মতো মানুষ, যে স্নেহ করে, যার বুক পৃথিবীর তাবৎ মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসায় পূর্ণ—তেমনি একজনকে না পেলে তার কাছে দুঃখের বোঝা উজাড় করতে না পারলে বুকটা ফেটে যাবে ওর।

গোপালীর কাছে হার মানাতেও সুখ।

(ক্রমশঃ)

অযোধ্যা পাহাড় ও পুরুলিয়া

সমীর সেনগুপ্ত

পুরুলিয়া শহর থেকে মাইল বারো গেলে বরাভূম স্টেশন। সেখান থেকে পশ্চিমে বাঘমুণ্ডির দিকে মোড় ফিরলেই দৃশ্যপট বদলে যায়। বরাভূম পর্যন্ত পরিচিত ল্যাটেরাইট ডাঙাজমি, খেতে মাঝে-মাঝে টাঁড়বরো বা পাথুরে স্তূপ। এ দৃশ্য বাঁকুড়া মেদিনীপুরে তো বটেই, বীরভূমেও দুর্লভ নয়। কিন্তু এখান থেকে পশ্চিমে বাঁক নিলে মাইল দুইয়ের মধ্যেই যে-ভূদৃশ্য জেগে ওঠে তার সঙ্গে আমাদের চিরচেনা বাংলাদেশের কোনো মিল নেই। শাল আছে, তাল নেই; আম-জামের বদলে মহুয়া, আর পলাশ, পলাশ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মনে হয় সমস্ত প্রান্তর শিখাহীন আগুন হয়ে দহনহীন জ্বালায় জ্বলছে। বীরভূমের ল্যান্ডস্কেপে যে পাহাড় দিগন্তে হালকা নীলে কবিত্বময়, এখানে সে পাহাড় রাস্তার পাশে চলে এসেছে। নিঃশব্দ গম্ভীর চেহারা, বনে বনে নিবিড়, গ্রানাইটের চূড়ায়-চূড়ায় শেষ বেলার পড়ন্ত রোদ। পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাস এগিয়ে চলে গভীরতর জঙ্গল আর গম্ভীরতর পাহাড়ের দিকে। পথের পাশে কয়েক বিঘে সমতল জমি, তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা—মাঠা বাংলো। বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে কয়েকদিন ছিলেন। বাংলোর প্রায় পিছন থেকে উঠে গেছে মাঠাবুরু পাহাড়, সোজা দেড় হাজার ফুট। বিভূতিভূষণের নানা গল্পে ও স্মৃতি-চারণে এই পাহাড় এই অরণ্য ফিরে-ফিরে এসেছে।

কিন্তু এখানেই আমাদের পথের শেষ নয়। শেষ আরেকটু এগিয়ে, অযোধ্যা গ্রামে। বাঘমুণ্ডি এখান থেকে চার মাইল। বাস চলে গেলে এ অঞ্চলের নির্জনতা ও আদিম চেহারা আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এখান থেকে গোরুর গাড়ি আপনাকে অযোধ্যা পাহাড়ের পাদমূলে পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে মাইল তিনেক হাঁটাপথ—আরোহণ দু হাজার দুশো ফুট। পুরুলিয়া থেকে যদি জিপ সংগ্রহ বা ভাড়া করতে পারেন, তাতে চড়ে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত পৌঁছনো যায়। কিন্তু তাতে পৌঁছনোই হয়, যাওয়া হয় না। কারণ অযোধ্যা পাহাড়ের যে বিরল সৌন্দর্য, যার তুল্য আর কিছু দার্জিলিং জেলা ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোথাও আছে বলে জানি না, তার বেশির ভাগই আপনার চোখের অগোচর থেকে যাবে যদি এই পথটুকু জিপে চড়ে যান।

উপড়ে ওঠবার দুটি রাস্তা আছে। একটি স্বতশ্চলশকটের উপযোগী করে, পূর্তবিভাগের শ্রম ব্যয়ে তৈরি। তবে তাঁরা চেষ্টা করেছেন পাহাড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রেখে যাতে পথটি বানানো যায়। কোনো-কোনো জায়গায় পাহাড়ি ঝর্ণার গতিপথের উপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। একপাশে ধাপে-ধাপে নেমে গেছে পাহাড়, অন্য পাশে উলঙ্গ পাথরের উপর থেকে ঝুঁকে আছে গাছের ডাল ও মোটা-মোটা লতা। ঝর্ণার স্রোতোধারায় উপর দিয়ে দিয়ে রাস্তা যেখানে, সে-অংশ উপলখণ্ডে আকীর্ণ, তাদের আকার মটরদানা থেকে বাঁধাকপি পর্যন্ত। তার ভিতর দিয়ে নেমে আসছে ক্ষীণ কিন্তু বেগবতী স্রোতস্বিনী। মোটের উপর, জিপের পক্ষে রাস্তাটি দুরূহ, অ্যামবাসাডরের পক্ষে চেষ্টা করা আত্ম-হত্যার শামিল। অন্য পথটি পাকদণ্ডী, দুরারোহ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। একবার গিয়ে-ছিলুম জিপে সেবার পাহাড়ের পাদদেশে দুটি গ্রামবাসী তরুণীর সঙ্গে দেখা; জিপের আরোহী আমি ও বন্ধুবর জনৈক স্থানীয় রাজপুরুষ। আমাদের অজ্ঞাত কোনো কারণে আমরা বনবালাদের সকৌতুক উচ্চহাস্যের কারণ হয়েছিলুম। ক্ষণকাল পরে তারা পাকদণ্ডী পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো আমরা যুবতী কর্তৃক উপহসিত হয়ে বিমর্ষ চিত্তে চক্রপথে এগোলুম। উপরে উঠে দেখি, তারা তাদের অমলিন বিদ্রূপ হাস্য নিয়ে সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পাকদণ্ডি পথে কত দ্রুত ওঠা যায় তা বোঝাবার জন্য ঘটনাটির উল্লেখ করলুম। ও পথে এই গতি অবশ্য নগবাসীর পক্ষেই সম্ভব, নগরবাসীর পক্ষে নয়। তবে পাকদণ্ডি পথ অনেক বেশি মনোহর। পাহাড়ের শিরা-উপশিরার মতো এই পাক-দণ্ডিগুলি ছড়ানো; স্থানীয় গ্রামবাসী কাউকে প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিলে দৃশ্য উপভোগে পথশ্রম অনুভূত হবে না।

অযোধ্যা পাহাড়ের উপর থেকে দুটি জলধারা নেমে এসেছে নিচে—তুর্গা আর বামনি। এদের ঝর্ণা বললে কম বলা হয়, আবার স্রোতস্বিনী বললে অবিচার করা হয়। শীতে ক্ষীণা, বর্ষায় প্রগলভা। নাম দুটি অবশ্যই আদিবাসীদের দেয়া নয়; বামনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণী আদিবাসী নাম হলেও হতে পারে, কিন্তু তুর্গা অর্থাৎ তুরগা-র মতো বিশুদ্ধ শালীন ও ভাব-ব্যঞ্জক নাম এ অঞ্চলে আদিকাল থেকে সংস্কৃতভাষী সভ্যতার সংস্পর্শ সম্পর্কে কৌতূহল জাগায়। পাহাড়ের কটিদেশের কাছে তুর্গা একটি খেলাঘরের প্রপাত সৃষ্টি করেছে। নদী এখানে চওড়ায় আন্দাজ পাঁচ ফুট, প্রপাতের খাড়াই হবে ফুট পনেরো। জায়গাটি জিপ চলাচলের পথ থেকে প্রায় একশো ফুট নিচে। শ্লেট পাথরের অসংস্কৃত

ধাপ বসিয়ে বসিয়ে বনবিভাগ থেকে সিঁড়ি করে দেয়া আছে। সমস্ত পাহাড়টিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিয়ে বনবিভাগ যে মাত্রাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। মনে হয় কোনো কল্পনাপ্রবণ অফিসারের এদিকে দৃষ্টি পড়েছিলো। সিঁড়ি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেটি জলপ্রপাতের দ্বারা তৈরি একটি চমৎকার পুল। স্থির পরিষ্কার জল নিচ পর্যন্ত দেখা যায়, ছোটো-ছোটো মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে তাদের প্রতিতুলনায় গম্ভীর পাথর দাঁড়িয়ে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে এখানে চুপ করে শুয়ে থাকা, অলসভাবে একটি ঘণ্টা কাটানো জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলির একটি।

দুর্গম বন-পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠায় সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার মতো দ্রুত পট পরিবর্তন হবে। উপরটি বিশাল সমতলভূমি, ইংরেজিতে যার পারিভাষিক নাম টেবল ল্যান্ড। বেশ কয়েক বর্গমাইল আয়তন। গ্রাম। ক্ষেত। মোষ চরছে। নিচেকার অরণ্য ও পাহাড়ের কোনো চিহ্নই নেই। আর তার মাঝখানে, পাহাড়ে চড়ার পরিশ্রমের পর হাতছানি দিয়ে ডাকছে বনবিভাগের চমৎকার বাংলো। একে ভোগ করতে গেলে আসবার সময় পুরুলিয়া বনবিভাগ থেকে অগ্রিম অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে আনতে হবে। বাংলোতে দুটি ঘর, চারজনের থাকবার চমৎকার ব্যবস্থা এবং সবচেয়ে মজার কথা, ঘরে বাতি জ্বলে—গোময় বাষ্পের। সামনের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে চারিদিকে তাকালে মনে হবে না বাইশশো ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে রয়েছেন। চারদিকের ভূমি প্রায় সমতল। বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরের সাধারণ ভূদৃশ্যের মতো চেহারা, তবে সূক্ষ্মভাবে দেখলে যেন মনে হয় এর প্রকৃতি আরেকটু আদিম। তবে সে আমার বোঝার ভুল হতে পারে।

বনবিভাগের বাংলোয় থাকার জন্য কোনো মূল্য দিতে হয় না। বনবিভাগের বাংলোয় থাকার অর্থই হচ্ছে আপনি তাদের অতিথি। শুধু ধোপা জমাদার বিদ্যুৎ (এক্ষেত্রে গোময় বাষ্প) ইত্যাদির জন্য সামান্য কিছু খরচ দিতে হয়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরোতে পারেন যদি বন্য জন্তু দেখার উৎসাহ থাকে। জন্তু অবশ্য বিশেষ কিছু নেই, আদিবাসীরা শিকার করে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। তবু কিছু বুনো শুয়োর ও ভাগ্য ভালো থাকলে হরিণ চোখে পড়তে পারে। পাহাড়ের কটিদেশের কাছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বনবিভাগের তৈরি অবজার্ভেশন টাওয়ার আছে। সিমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রায় পনেরো ফুট উপরে বসবার ব্যবস্থা এখানে একটা রাত কাটানো একটা বড়ো অভিজ্ঞতা। জানোয়ার নাই-বা দেখতে পেলেন, আদিম পৃথিবীর একটি অরণ্যের মধ্যে খোলা আকাশের তলায় এক রাত কাটানো কি কম কথা?

অযোধ্যা থেকে ফেরার পথে চোরদা গ্রাম হয়ে আসতে ভুলবেন না। বাঘমুন্ডি থেকে মাইল চারেক, চোরদা বা চোরিদা গ্রাম। এখানেই তৈরি হয় পুরুলিয়ার ছৌ নাচের বিখ্যাত মুখোশ। কলকাতার সেলস এম্পোরিয়মের তুলনায় আশাতীত রকম স্বল্প মূল্যে কয়েকটি সংগ্রহ করেও আনতে পারেন।

তবে অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে আমার একটি অসম্ভব বিষণ্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিলো, সেটির এখানে উল্লেখ করি। পাহাড়ের উপরে গ্রামের ধারে আমরা দুই বন্ধু বেড়াচ্ছি, একটি বৃদ্ধ আদিবাসী মহিষ চরাচ্ছে, তার পৌত্রবধূ খাবার দিতে এসেছে তাকে। আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টায় রত আছি, পাঁচ-ছ বছরের একটি উলঙ্গ শিশু গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগলো। তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেই সে আতঙ্কিত স্বরে 'দিকু, দিকু' বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে গিয়ে তরুণীর আঁচলের মধ্যে মুখ লুকালো, শত প্রবোধেও সে-দুর্গ থেকে বেরোলো না। খানিক পরে মায়ের আড়ালে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন থেকে ভয়কাতর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে প্রস্থান করলো। শুনলাম, 'দিকু' মানে ফরশা পোশাক-পরা ভদ্রলোক। এবং আমরা যেমন শিশুদের 'জুজু আসছে' বলে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াই, ওরা তেমনি শিশুদের 'দিকু আসছে' বলে ভয় দেখিয়ে শান্ত রাখে।

পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে নামতে নামতে দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমি চোখে পড়লো। ওদের আর আমাদের মধ্যেকার এই অসেতুসম্ভব ব্যবধান কি কোনোদিন ঘোচানো যাবে। আমাদের শিশুরা বড়ো হয়ে জানতে পারে জুজু বলে কিছু নেই। অথবা এই জানতে পারাটাই বড়ো হওয়া। কিন্তু অযোধ্যা পাহাড়ের ওই শিশুটি কি কোনোদিন জানতে পারবে, দিকু বলে কিছু নেই, অথবা তারা সত্যিই কিছু মানুষ-খেকো নয়? ওকে এই কথাটি বুঝিয়ে দেবার মতো কী কাজ করছি আমরা?

পুরুলিয়ার মকর উৎসব

ছৌ নাচের মুখোসপরা পুরুলিয়ার আদিবাসী

এখন অসময়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

(ছয়)

একটু চমকে উঠেছিল চন্দন। বুকের ভিতর মৃদু শিহরণ অনুভব করেছিল।

স্নেহবউদি তাকে ডেকেছেন বলে নয়, রুমা তাকে ডাকতে গেছে বলে। নিজের এ-চমক আর অস্বস্তিকর শিহরণের কারণ খুঁজছিল সে। স্নেহধারা অনর্গল কথা বলছিল, তার কাণে যাচ্ছিল না কিছু। কেন এটা হচ্ছে? সে ভাবছিল। লতু বা ইনতুকে হাইওয়ের দিকে পারতপক্ষে যেতে দ্যায় না স্নেহধারা। কাজেই রুমাই যাবে—সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং রুমার এই যাওয়াটার মধ্যে চন্দনের একটা গভীর অথচ অস্বস্তিকর আনন্দ জড়িয়ে রয়েছে যেন। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সে এখানে এসেছে। এর মধ্যে কোনদিন অবশ্য রুমাকে তার আস্তানায় পাবার আশা সে করেনি। এটা ভাবেও নি। এখন মনে হচ্ছে, রুমা তার ওখানে গেলে এবং কীভাবে সে কাজ করছে, কী কাজ করছে, কেমনভাবে খাচ্ছে দাচ্ছে-শুচ্ছে খোঁজখবর নিলে ভারি ভালো লাগত! এমনকি সামান্য দুঃখমেশানো অনুযোগও তার মনে এসে গেল, এখনও তো সে বিদেশী—কেন যায়নি রুমা—এতদিন? রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সদাচেনা লোকও কিছু সঙ্গ দ্যায় অকারণ কথাবার্তা বলে, এবং সে তো নিছক ভদ্রতার ব্যাপার। রুমাও তাই করেছে। চন্দন নিজের মনের অন্ধকার নিকটায় তাকিয়ে শব্দহীন প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল—তাহলে কি সে রুমার প্রতি কোন অভাবিত প্রত্যাশা লালন করে বসে আছে নিজের অজ্ঞানতে?

স্মৃতির যতটুকু আপাতত দেখা যাচ্ছে, সেটুকুতে চোখ রাখল সে। তার সঙ্গে রুমার বয়সের তফাৎ কমপক্ষে আট থেকে দশ বছর তো বটেই।...হুঁ, দশই বলা যায়। বি-কম পাশ করল যখন, তখন তো তার বয়স কুড়ি পেরোচ্ছে। তখন সময়টা ছিল বর্ষা। গঙ্গার জলের রঙ বদলে গাঢ় গেরুয়া হয়ে উঠেছিল। ঘাটের পাশের আকন্দ আর পেত্নীঝোপগুলো ডুবে গিয়েছিল। ঘাটবাবু তেওয়ারীজীর আটচালাটা বটগাছের নিচে উঠে এসেছিল। কূলে কূলে ভরা গঙ্গার ওপারে আজিমগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে-যাওয়া ট্রেনের তীব্র হুইসল প্রতিধ্বনিত হত দ্বিগুণ জোরে। আর সেবারই ভরা গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতে চন্দন লক্ষ্য করেছিল, রুমা তার ফ্রক খুলে গা মুছছে না। শুধু তাই নয়, সে ডাকছেও না চন্দনকে—চাঁদুদা, গা মুছিয়ে দিয়ে যাও। রুমার অনাগত যৌবনের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল ঠিক সেই সময়। সেদিনও একটু অস্বস্তি জেগেছিল তার মধ্যে। একটা আবছা বেড়া যেন দেখা যাচ্ছে—তার ওদিকে রুমার খোলামেলা প্রান্তরটা নিষিদ্ধ ঘোষিত হচ্ছে। পিঠ ফিরিয়ে রুমা চুল থেকে জল ঝাড়ছিল। উঠে এসেছিল চন্দন। হঠাৎ অকারণে তার চুল ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই! খবরদার চাঁদু বলবিনে! সোজা মাঝগঙ্গায় ছুঁড়ে দেব বলছি। চানুদা বলতে পারো না?

রুমা চেঁচামেচি করছিল।...আঃ, লাগছে, লাগছে!...তার এ-প্রতিবাদের মধ্যে একটা নতুন ব্যাপার ছিল সেদিন। সে ক্রমাগত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। পরক্ষণে চন্দনও টের পেয়ে গিয়েছিল, এটা রুমার যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা। এবং নিজের দেহকে নারীদেহ বলে চিনে ফেলেছে। তাই একটু লজ্জা পেয়েছিল সে।

আরও একদিন অভ্যাসমতো তাকে দুহাতে জড়িয়ে শূন্যে তুলতে গিয়ে তার আঙুলে একটা নতুন নরম স্পর্শের স্বাদ জড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল সে। খুব শিগগির বুক দেখা দিয়েছিল রুমার।

এসব কাণ্ড বারেবারে ঘটেছে। পারুল বিরক্ত হয়ে বলেছে, আঃ! কী হচ্ছে! ওকে জ্বালাতন করিস কেন চানু? তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি আর হবে না। ও আর কচি খুকিটি হয়ে নেই, মনে রাখিস।

বাইরের লোকেরা তাকে চাঁদু বলত—আজও বলে। বাড়ির লোকেরা বলে চানু। চাঁদু শব্দে কী যেন ঠাট্টা মাখা রয়েছে—এত বিশ্রী লাগে! স্নেহবউদি প্রথম প্রথম চাঁদু বলত—পরে হয়তো রুমার দেখাদেখি চানু বলতে শিখেছিল। কিন্তু রুমা—ভারি দুষ্টু চঞ্চল সে, ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর চাঁদু শব্দটা ব্যবহার করে বসত। চন্দনের খুব রাগ হত। কিন্তু রুমার দেহমনের সেই নতুন যুগটা শুরু হলে আর দৈহিক নির্যাতন করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। গায়ে হাত দিতেও তার অস্বস্তি হত। অগত্যা মুখের কথায় রাগ ঝাড়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এবারে সে লক্ষ্য করছে—এরা দুই বোনে তাকে পুরো নাম ধরেই ডাকছে। এ বুঝি তার বয়সের সম্মান দেওয়া। অথচ রুমা আজ চাঁদুদা বলে ডাকলে তার খারাপ লাগবে না। এবং চানুদা বললে তো খুবই ভাল লাগবে। লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, রুমার যে ছোট্ট দেহটা একদা সে পুতুল

হিসেবে ব্যবহার করেছিল নিঃসঙ্কোচে—রুমা ক্রমাগত দিনে দিনে যত কিশোরী হয়ে উঠছিল, তার সেই দেহ আর অমন করে নিঃসংকোচে ছোঁওয়া যেত না, অথচ সেটা তখনও তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি।

আজ এসে দেখল, সে রুমার কাছে পুরো বহিরাগত। রুমার দেহের কথা ভাবতেও দারুণ লজ্জা-সংকোচ ও পাপবোধ হুড়মুড় করে এসে পড়ছে। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার, রুমার রক্তমাংসহাড়ে গড়া ওই দেহের প্রত্যেকটি সেণ্টিমিটার তার পুরো মুখস্থ। রুমার ডান উরুতে কালো কালো কয়েকটা পাঁচড়ার দাগ, তলপেটের তিলদুটো (ভারি আশ্চর্য এটা), পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নিচে যে তিনকোণা হাড়টা অর্থাৎ 'পিকচণ্ডু অস্থি'—সেটা গোটাটা হালকা নীল রঙের, আর দুটি স্তনের মধ্যেকার একটা ফোঁড়ার দাগ—এইরকম অনেক কিছু এখনও তার চোখের সামনে স্পষ্ট। চোখ বুজলে সেই ন্যাংটা মেয়েটাকে দেখতে পায়। এবং আজ এইটেই যেন বড় অস্বস্তিকর। ভীষণ কৌতূহল উদ্রেককারী। অথচ কেমন যেন কোন সরকারী এলাকার মতো—যার চৌহদ্দীটা তারকাঁটায় আকীর্ণ, গেটের মাথায় লেখা আছে ঃ প্রবেশ নিষিদ্ধ। আইনত দণ্ডনীয়। আর দণ্ডণীয় বলেই যেন, এখন এই মুহূর্তে, স্নেহবউদির অনর্গল বাক্য-ব্যূহের মাঝে নিরাপদে বসে থাকতে, তার ভীষণ সাধ জাগল রুমার দেহের সেই সুপরিচিত দাগগুলো দেখতে। দাগগুলো কি মিলিয়ে গেছে? ক্রমাগত যোগানপাওয়া অঢেল রক্তমাংসমেদ আর লালিত্যের নিপুণ কারিগরি কি তাদের মুছে ফেলতে পেরেছে পুরোপুরি? না মুছলে সে যেন কিছু কলঙ্কের প্রতীক হয়ে থাকবে। সৌন্দর্যের মাঝখানে কিছু খুঁত থেকে যাবে। দেখতে তো বটেই, শুনতেও খারাপ লাগে যে রুমার পাঁচড়া বা ফোঁড়া হয়েছিল! তাই না? অবশ্য তিলদুটোর কথা আলাদা। কিংবা পাছার ওই তেকোণা হাড়ের নীলচে রঙটার কথাও। কিন্তু ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে দেখতে। আচ্ছা, রুমাকে যদি বলা যায় কথাটা— সে কি দেখাতে পারবে এখন? নির্ঘাৎ পারবে না। এই দেখাতে না-পারাটা তো বটেই, চন্দনের কথাটা বলতে না পারাটাও বেশ অদ্ভুত মানুষের জীবনে। মানুষের সমাজের সম্ভবত এইসব আইন। সেই আইন কম বয়স থেকে মানুষদের শেখানো হয় ক্রমাগত এবং তারা নির্দ্বিধায় মেনে চলে। কিন্তু না মানলেই বা কী ঘটতে পারে? যদি না মানে রুমা, মানে না চন্দন?...হিমহিম সন্ধ্যায় তার শরীর ঘেমে উঠল। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করল নিজের মধ্যে। সে জানল, অনবরত ফিসফিস করে কে ভিতরের অন্ধকার থেকে আইনভাঙার প্ররোচনা দিচ্ছিল। এবং ভিতরের অন্ধকারে একটা গুরুতর হুড়ো-মস্তি উপদ্রব শুরু হয়েছিল। যা তার রক্তকে গরম ও পরিশ্রমী করে তুলেছে।

স্নেহবউদির কথা শোনা গেল।...তা বল তো ভাই, আমি কী করি! তুমিই বলো, শুনি!

থতমত খেয়ে চন্দন বলল, হ্যাঁ—তাই তো!

স্নেহধারা বলল, তাই তো বললে চলবে না চন্দন। তুমি আমার মায়ের পেটের ভায়ের মতো। কখনো তোমাকে পর ভাবিনি—আজও ভাবিনে। তোমাকে কাছে পেয়ে আজ আমার ভাঙা হাড় জোড়া লেগেছে। তুমিই একটা পথ বাতলে দাও।

চন্দন শুকনো হেসে বলল, আমি কী পথ বাতলাবো?

স্নেহধারা মুখ ফিরিয়ে কান্না চেপে বলল, তাহলে তুমিও বলছ আমি বিষ খাব, নয়তো গলায় দড়ি দেব?

চন্দন আঁতকে উঠে হন্তদন্ত বলল, না, না। সে কী বউদি! সে-কথা কে বলতে পারে তোমাকে!

কথা কেড়ে স্নেহধারা বলল, পারে না কেন? খুব পারে। সোজাসুজি না হয় বলে না—ইসারাতে বলে!

চন্দন হেসে উঠল।...যাঃ! কে বলে? পরেশদা তো?

স্নেহধারা বলল, তোমার পরেশদা বলতে যাবে কেন? বারে! তাহলে যে ওর ক্ষতি হবে। আমি ওর কথা শুনে মরব—আর এমন নিরুপদ্রব বুড়িটি পাবে কোথায় যে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে কানামাছি খেলবে? আমি থাকাটাই তো ওর খাঁটি ঘিয়ের লেবেল।

চন্দন হাসতে লাগল। তারপর বলল, যাঃ, যত্ত সব ফালতু কথাবার্তা!

স্নেহধারা বোঁ করে ঘুরে বসল। ওর দিকে ঝুঁকে কুটিল ষড়যন্ত্রসংকুল চোখে ফিসফিস করে বলল, রুমা—আমার মায়ের পেটের বোন, বুঝেছ? যাকে তিন বছর বয়স থেকে মানুষ করেছি, সেই রুমা এখন লায়েক হয়ে কলেজে পড়ে শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করে আমার......

চন্দন দারুণ আবেগ, উত্তেজনা আর প্রতিবাদে তাকে থামিয়ে দিল—বউদি! কী বলছ? ছিঃ, এ-কথা তোমার মুখে শোভা পায় না!

যদিও স্নেহধারার কথাগুলো সে আদতে শোনেইনি, পটভূমিকাটা তার সবই অজানা, তবু সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

স্নেহধারা একটু সরে বলল, তুমি জানো, এই বাড়িটা ছাড়া আর আমার নামে কিছু নেই? বুঝতে পারছ, ওই লোকটার ভালমন্দ হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে আমি কী অবস্থায় পড়ব ছেলেমেয়ে নিয়ে? যা-কিছু করেছে—সব সে রুমার নামে করেছে। আর সেই জোরে আমার ছোট বোন হয়ে রুমা আমাকে ধমকায়। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে দ্যায়। এত সাহস সে পেল কোথায় বুঝতে পারছ না? লতুর বাবার সামনে রুমা আমাকে সেদিন যা অপমান করল, যদি মায়ের পেটের বোন না হত—যদি ছেলেবেলায় ওই অনাথ বোনটাকে মায়ের মতো মানুষ না করতাম, আমি—আমি ওকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতাম! হ্যাঁ—কাটতাম।......

হাঁফাতে হাঁফাতে সোজা হয়ে বসল স্নেহধারা। ওর মুখের আধেকটায় আলো পড়েছিল। ছায়ার মধ্যে থাকা চোখটা জন্তুর মত নীল জ্বল জ্বল করছে। অজানা ভয়ে চন্দনের বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে দু-তিনটে মিনিট কথা বলতে পারল না। সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে থাকল। বাইরের ঘরে ছেলেমেয়েদের পড়ার শোর-গোল শোনা যাচ্ছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখল এক বুড়ো ভদ্রলোক ওদের পড়াচ্ছেন। চন্দন অস্বস্তিতে অস্থির হচ্ছিল। বেশ তো ছিল—হঠাৎ আজ এখানে এসে পড়াটা ঠিক হয়নি। মনে হচ্ছে, এ-বাড়িতে অনেক ফাটল, আর সাপের উপদ্রব আছে। এটা একেবারেই ভাবতে পারেনি। আশ্চর্য! রুমার প্রতি তার দিদির এই মনোভাব এখন? রুমা কি এটা জানে? যদি না জানে, তাহলে তো রুমার জানা দরকার এটা। বাইরে-বাইরে চমৎকার সংসারযাত্রা দিনরাত্তির কাটানো গল্প-গুজব—একটা আপনজনের মিষ্টি আব্-হাওয়ার গেরস্থালী, অথচ ভিতরে এই! পরেশদাও কি এটা জানে? চন্দনের দৃঢ় ধারণা হল— ওরা দুজনে কেউ ব্যাপারটা জানে না। জানা তো দূরের কথা, ভাবতে পারাও যে অসম্ভব। পরস্পর যে সম্পর্ক, যে করুণ দুঃখময় অতীতকাল, যে পটভূমি রয়েছে—তাতে এমন ঈর্ষাহিংসার আভাসও যে অকল্পনীয় মানুষের পক্ষে! কিন্তু স্নেহবৌদি মারাত্মক ভুল করছে। রুমা তার দিদিকে—তার মায়ের প্রতিমা এই মেয়েটিকে, ভুল করেও কি কোনদিন প্রবঞ্চনা করতে পারে? তাছাড়া ধুরন্ধর বুদ্ধিমান পরেশদা অত বোকা নয়। নাঃ, এটা স্নেহ-বউদিরই একটা দীনতাবোধ। একটা হীন-মন্যতা। স্নেহবউদি তো এত নীচ মনের মেয়ে ছিল না! তাহলে কি সম্পদের সেই সনাতন যখ তার ভালো মনটাকে কবে বলি দিয়ে ফেলেছে?

সে স্নেহধারার দিকে তাকাতে পারছিল না। এত ছোট হয়ে পড়েছে স্নেহবউদি! ভাবল, নাকি অবুঝ মেয়েমানুষের মন—বেশি লেখাপড়াও শেখার সুযোগ পায়নি, এ নিতান্ত সরল সংশয়। সংসারে তো এমন ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাই সে ভীত হয়ে পড়েছে। চন্দন মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে গেল। আর দেখল, আলোয় থাকা চোখটায় জল চকচক করছে—স্নেহবউদির গাল ভেসে যাচ্ছে। সে বলে উঠল, বউদি, বউদি! কী, হল কী তোমার? মিছিমিছি যাতা সব ভেবে খামকা মন খারাপ করছ

কেন বল তো! আমি তো আছি—আমি এখানেই থাকব। যদি এখানে নাও থাকি—যেখানেই থাকি না কেন, তুমি ভেবো না—কিছু ভেবো না বউদি, তোমার সবকিছুর দায়িত্ব আমার রইল। তুমি বিশ্বাস করো—

চন্দন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। কেন রুমার প্রতি এ সংশয়-সন্দেহকে একটুও বরদাস্ত করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল—রুমা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার অব্যাহতি দরকার। বেচারা রুমা!

স্নেহধারা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসো আসছি। তোমার চা খাওয়া হয়নি। ভুলেগিয়েছিলাম ভাই!

সে বেরিয়ে গেল। চন্দন একটু হালকা সুরে বলল, রুমা আমাকে হয়তো খুঁজে তোলপাড় করছে রূপপুর ঘাট। অবশ্য বেচুবাবুকে আমি খবর পাঠিয়ে এসেছি, এখানে আসছি বলে।

বারান্দায় একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে স্নেহধারা জবাব দিয়ে গেল, রুমা তোমাকে ডেকে দিয়ে কান্দী যাবার কথা। ও বেরোচ্ছিল, তাই বললাম—তবে একবার ডেকে দিয়ে যাস।

চন্দন বলল, এখন সন্ধ্যাবেলা কান্দী কী? আজ কলেজ ছিল না? যায় নি?

দূর থেকে ফের জবাব এল—আজ রোববার না? কী কাজ আছে নাকি—তাই গেল। লায়েক হয়েছে। নিজের খুশিতে চলে। কে আটকাবে বলো?

চন্দন ধড়মড় করে দরজার কাছে গিয়ে বলল, ফিরবে কখন রুমা?

স্নেহধারা ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। শুনতে পেল না কথাটা। পরক্ষণে চন্দন একটু সংকোচ অনুভব করে সরে এল। আগের জায়গায় বসল। এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল যেন। রুমার প্রসঙ্গে —অন্তত বউদির ওইসব শোনার পর ব্যস্ততা প্রকাশ করাটা তার অশোভন। সে সতর্ক হল। বউদির সামনে রুমার সঙ্গে বেশি মেলামেশাটা ঠিক হবে না। তাহলে বউদি তাকে আর বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস না করে অবশ্য নিজেই ঠকবে। মেয়েরা বড় অদ্ভুত!

কিন্তু রুমা রাত্রিঅব্দি কান্দীতে কী করতে গেল? সিনেমা দেখতে? ওর সাহস স্বীকার করতে হয় তাহলে। নাকি কারো সঙ্গে গেছে? সে পুরুষ, না মেয়ে? চন্দন ঘড়ি দেখল। এখন সাতটা প্রায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত। যদি ছটার শোয়ে যায়, নটায় বেরোবে ছবি-ঘর থেকে। তারপর বাসে চাপবে। আধঘণ্টা পরপর বাস আছে রাত দশটা অব্দি। এখানে পৌঁছতে আধঘণ্টা সময় যথেষ্ট। তার মানে সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা অব্দি বাসস্টপের কাছে অপেক্ষা করলে রুমাকে দেখতে পাওয়া যাবে। রুমাকে দেখাটা জরুরী নয়। কার সঙ্গে গিয়েছিল—সেইটে দেখাই জরুরী। সে যদি কোন ছেলে হয়, তাহলে কি দুঃখ পাবে চন্দন? চন্দন, তুমি কি দুঃখিত হবে তবে? নিজের দিকে তাকাল সে। কোন স্পষ্ট জবাব পেল না। রুমার পক্ষে এখন প্রেম করাটা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়। বিবেকসম্মত নয়। অশোভন। বিশেষ করে তার জামাইবাবু তার নামে অনেক সম্পত্তি রাখার পর থেকে রুমাকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকা দরকার। আশ্চর্য লোক পরেশ মজুমদার! যেন তার অবোধ শালীটির চারপাশে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অলক্ষিত তারের বেড়া দিয়ে ফেলেছে—শুধু তাই নয়, তাতে মারাত্মক ইলেকট্রির চার্জ করে রেখেছে। যদিও কোথাও কোন বোর্ড দেওয়া নেইঃ সাবধান, ছুঁইলেই বিপদ। এগার হাজার ভোল্ট। এবং একটা মড়ার মুণ্ডুর নিচে দুটো আড়াআড়ি হাড়!

চন্দন আপন মনে হাসতে গিয়ে দেখল এই কৌতুককর কল্পনার দরুণ যে পরিচ্ছন্ন হাসির দরকার—তার পিছনে যথেষ্ট জোর নেই। সে রুমার বাস থেকে নামার দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে বিপন্ন বোধ করল। বউদির ঘরের ভিতরটা দেখতে থাকল। সুদৃশ্য খাটের ওপর সম্ভবত ফোমের গদী—নক্সাকাটা রক্তলাল চাদর। চমৎকার খয়েরি বেডকভারটা পায়ের দিকে উল্টে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে। ভাবতে কেমন লাগে—অত চড়া রঙ স্নেহধারার পছন্দ। কোণে মস্তো রুপোলি ফুলদানীতে একতোড়া প্লাস্টিকের ফুল। সত্যিকার ফুল রাখলেই পারে' বউদিরা এখানে ফুলবাগান করেনি কেন? ছোট্ট উঠোনটা সব পুরনো ভাঙাচোরা মোটর-পার্টসে ভরতি। একটা লাউ কিংবা কুমড়ো-গাছ দেখেছিল মনে পড়ছে। সেটা টিউব-ওয়েলের পাশে। অনাদরে পাঁচিল বেয়ে উঠেছে। অথচ একদিন এক টুকরো মাটির জন্যে যেন মাথা খুঁড়ে মরত স্নেহবউদি। মনে হত, বাসার পাশে একটুকরো জমি পেলে বউদি তার শ্রীহীন সংসারটাও ফুলে-ফলে ভরে তুলবে। চন্দন লক্ষ্য করল ঘরটার দেয়ালভরা শুধু ক্যালেন্ডার আর ক্যালেন্ডার। সবগুলোতেই দেবদেবীর ছবি। সিঁদুরের ছোপ। একটা তাকে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি। অন্যটায় সিদ্ধিদাতা গণেশ। রামকৃষ্ণ সারদামণি। বড় বড় দুটো লোহার আলমারির মাথাতেও অজস্র পুতুল—পুতুল বলা ভুল, প্রায় সবই প্রতিমা। একটা আল-মারির কপাট মোড়া যায় না। উজ্জ্বল রড-লাইটের গায়ে পোকা থিকথিক করছে। কবে কালীপুজো গেছে—এখনও পোকা কেন? তার চেয়ারের পাশে একটা র‍্যাক। র‍্যাকে ঢাকনাদেওয়া কতকগুলো বাক্স। জিয়াগঞ্জের সংসারের সেই বাক্সোগুলো সম্ভবত। তার সামনে কাঠের আলমারিতে কাচের ভিতর দেখা যাচ্ছে একগাদা কাঁসার বাসন! কাঁসার বাসন আজকাল কেউ কেনে নাকি? নির্ঘাৎ বউদির সে আমলের লোভ ও সাধ এ ব্যাপারে প্ররোচনা দিয়েছিল। আলমারিটার মাথায় চারটে ছোটবড় পেতলের ঘড়া আর বালতি দেখেও খারাপ লাগল তার। এতবড় ঘরটা হাঁসফাঁস করছে এতসব জিনিসপত্রের চাপে। বউদিটার রুচি-বোধ বদলায়নি। হয়তো বেশি লেখাপড়া জানলে বদলাত। ক্যালেন্ডারের মাথায়-মাথায় সেই সুচেনা হাতের কাজগুলোও শোভা পাচ্ছে। বউদির হাতের কাজ সব। ফ্রেমগুলো বদলায়নি এখনও। মানাচ্ছে না এখানে। 'পতি পরম গুরু', দুটো হরিণ, একটা বাঘ, আল্পনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোর জোরে তখন মেয়ের বাবারা হবু বরের বাবার সামনে হাসিমুখে দাঁড়াতে সাহস পেত। আচ্ছা, বউদি এখনও গান করতে পারে না? খুব ভাল একটা না গাইলেও নেহাৎ মন্দ গাইত না। চন্দন খুঁজে দেখল মাথার কাছে প্রকান্ড রেডিও—আর তার পাশেই একটা কালো ঢাকনাদেওয়া বাক্সো। সম্ভবত বউদি প্রথম সুদিনে একটা ভাল হারমোনি-য়াম কিনে ফেলেছিল। আগে ওটা না কিনে

রেডিও কেনার কথা ভাবা যায় না। কারণ, জিয়াগঞ্জের জীবনে যখন পরেশদা হারমোনিয়াম সারাত, একবার রায়চৌধুরীবাবুদের মেয়ের খুব চমৎকার একটা ফোল্ডিং বেলোওয়ালা হারমোনিয়াম নিয়ে বউদির সঙ্গে পরেশদার জোর কথাকাটাকাটি হয়েছিল। ওরা যন্ত্রটা নিতে এসে দ্যাখে, স্নেহধারা আসর জাঁকিয়ে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গান গাইছে। রায়চৌধুরীবাড়ির মেয়ে। সোজা শুনিয়ে দিল যা শোনাবার।...সারাতে দিয়েছিলাম। অমনি বরে বাসরের আসর জাগাতে তো দিইনি! অত সাধ থাকলে কিনলেই পারেন একটা!...ব্যস! পরেশদা সবে বাড়ি ঢুকছে। কথাটা শুনেছিল। তারপর যা হবার হল।

স্নেহধারার দুঃখটা বহুদিন ছিল। শুকনো হেসে বলত, বাসরের আসর জাগার দিন অনেকেরই আসে—কিন্তু ভগবান সবাইকে তো আসল জিনিসটি দ্যায় না ভাই। ওই শাকচুন্নীর গলা আমিও শুনেছি। ফাংশনে গাইতে গিয়ে তো চিঁচিঁ ছাড়া রা বেরোল না সেদিন। আমি গেরস্তঘরের বউ, নৈলে......

নৈলে যা হবার ছিল, তা অনুমান করা যায়। বউদির সে-সাধ ফুরিয়ে গেছে কিনা জানতে ইচ্ছে করছিল। আজ স্নেহধারার আলনা-বাকসোভরতি কাপড়, গয়নাগাঁটি, চমৎকার হারমোনিয়াম। সে সেজেগুজে বাসরের আসর জমালে, এবং জিয়াগঞ্জের মস্তো বড়লোক সেই রায়চৌধুরী বাড়ির মুখরা মেয়েটি অভাবিতভাবে এখানে এসে পড়লেও আর বুঝি পরম তৃপ্তির হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠবে না। সময় সব সাধকে এমনি করে পরাস্ত করে ফেলে।......

স্নেহধারা এল এতক্ষণে।

ট্রে-ভরতি চায়ের কাপ, একটা বাটিতে গরমাগরম তেলেভাজা, কিছু লংকাভাজা ও মুড়ি। এতক্ষণ বুঝি ওইসব করা হচ্ছিল। চন্দন বলল, আরে, এসব কী!

স্নেহধারা এখন অন্যরকম। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে। একটু আগের সেই হিংসুটে চেহারার কথা ভাবতে পারা যায় না। আঁচলে কপালের দিকটা আলতো মুছে বসল। বলল, খাও। একেবারে আসা ছেড়ে দিলে তুমি। জানো, তোমার জন্যে প্রতিবেলা একমুঠো বেশি চাল দিতে বলি গ্যাঁদাকে? নিত্যি ভাততরকারি ফেলা যায়! কে খাবে? গ্যাঁদা ছোঁড়াটা তো লাটসায়েব। ও একবেলার খাবার অন্যবেলায় ছোঁয় না। বলে, অসুখ হবে। আমি বলি...হাসতে হাসতে স্নেহধারা বলল, আমি বলি—হ্যাঁরে বাঁদর, তুই যে বলিস—একসময় পেটের জন্যে নাকি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলি! তখন ও বলে কি জানো? বলে—মানুষ যখন যেমন, তখন তেমন। আজ যদি তাড়িয়ে দাও বউদি, ফের তাই হবে।

চন্দন একমুঠো মুড়ি তুলে দেখল, হাত চবচব করছে। আলগোছে মুখে ফেলে দিয়ে ভাবল, শুধু তেলেভাজাটাই খাবে। তারপর বলল, ওকে পেলে কোথায়?

স্নেহধারা বলল, তোমার দাদা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। তখন তোমার দাদা ট্রাক চালাত নিজেই। সাঁইথে থেকে আসছে রাত্রিবেলা। দ্যাখে, ব্রীজের কালভার্টের ওপর দিব্যি আদুড়গায়ে ঘুমোচ্ছে। দেখে মায়া হল। নিয়ে এল। তখন তো ছোট্ট বাচ্চা। গলায় পৈতে ছিল। বামুনের ছেলে। মা-বাবা কেউ নেই। দূরসম্পর্কের দাদার বাড়ি ছিল। বলে—দাদা না বিয়ে করবে, আমার না ইয়ে হবে! বিয়ে আর ইয়ে! বোঝো!

জোরে হেসে উঠল স্নেহধারা। চন্দন বুঝল, অনেকদিনের জমানো কথাগুলো বেরিয়ে যাওয়ায় সে হালকা হতে পেরেছে। চন্দন বলল, বউদি, আর গান করো না? হারমোনিয়াম তো রয়েছে দেখছি!

স্নেহধারার মুখটা পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ, সখ তো ছিলই ভাই। তবে মাঝে একবার অম্বলের অসুখ হল। তারপর সেটা যদি সারল, তো একটার পর একটা আর বিরাম নেই। চেহারাখানাই দেখছ শুধু, ভেতরটা ফোঁপরা। আর আগের মতো খাটতে পারিনে। অবিশ্যি খাটবার দরকার হয়ও না। ওরা করেটরে।

স্নেহধারাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে চন্দন বলল, তাহলে একবার 'বাসরের আসর' জাগাও দিকি। জাঁকিয়ে বসি।

দুজনে হেসে উঠল। স্নেহধারা বলল, মনে আছে তোমার? ...তারপর এগিয়ে গেল হালকা চঞ্চল পা ফেলে। চন্দন লক্ষ্য করল, স্নেহবউদির চেহারা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে এক বেমানান কিশোরী—সরল, বোকাসোকা, গেঁয়ো—সত্যিকার অবলা।

নিপুণ ভঙ্গীতে স্নেহধারা হারমোনিয়াম বের করছিল বাকসো থেকে। পরম যত্নে, সতর্কতায়, নিষ্ঠায়—যেন ছন্দপাত না ঘটে, তালে যেন ভুল হয় না।......

বাসস্টপের কাছে চুড়ির দোকানটা। পান্ডেজীর গল্পটা মনে পড়ল। কিন্তু চুড়িওয়ালী মেয়েটি চন্দনকে চিনতে পারবে কি? যদি নিজে থেকে না ডাকে, সে কী অছিলায় দোকানে ঢুকবে এবং বসে থাকবে তাই ভাবছিল। কোথাও না বসে রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তখন রাত নটা পাঁচ বাজছে। চন্দন কাছে যেতে যেতে ঝাঁপ ফেলে দিল আলতারাণী। পাশে একটা চায়ের দোকান অবশ্য আছে। একদঙ্গল পাটের ব্যবসায়ী সেখানে ভনভন করছে। বসার তিলমাত্র জায়গা নেই। খাবারের দোকান আছে অনেকগুলো। জায়গা ছিল। কিন্তু কিছু না খেয়ে এমনি বসে থাকা ভাল দ্যাখায় না। চেনাচিনিটা হয়ে গেলে অবশ্য অন্য কথা। চন্দন নিজের আচরণের প্রতি অবাক হল। হঠাৎ সে যেন চোরের দলে ঢুকে পড়েছে!

কেন সে আড়াল থেকে রুমাকে লক্ষ্য করতে চায়? কেন তার এ সন্দিগ্ধতা? আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। প্রশ্নগুলো তার জ্বলন্ত ইচ্ছার চারপাশে ওইসব আলো-মোহিত পোকামাকড়ের মতো থিকথিক করে উঠল। জ্বালাকর একটা অস্বস্তি তার অস্থির করল। নিজের ওপর রাগ হল তার। আর সেই সময় সামনে একটা বাস আসছে। দুটো হেডলাইটের দুফালি আলো ঝকমকে তলোয়ারের মতো এগিয়ে আসছে। দ্রুত রাস্তার একপাশে সরে গেল চন্দন। ছায়া ঘেঁষে দাঁড়াল। পরক্ষণে বাসটা তাকে পেরিয়ে যেতেই হনহন করে সে চলতে থাকল বাসার দিকে। একবারও পিছু ফিরে স্টপে থেমে যাওয়া বাসটা দেখবার সাহস পেল না।

বাসার সামনে রাস্তার ওপর তিন-চারটে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছায়ার মধ্যে কারা বসে জটলা করছিল। আগুন ধকধক করে উঠছিল সেই ভিড়ে—কড়া কটু গন্ধ। ড্রাইভাররা গাঁজা টানছে। চন্দন যেতে যেতে হৃদয়ের কন্ঠস্বর শুনতে পেল।...চাঁদু এবার নির্ঘাৎ ডুবেছে মা গঙ্গায়—মাইরি ভজুদা, তোর দিব্যি। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, মাগী ওকে পটকে ফেলেছে। ইদিকে পরেশের শালীর সঙ্গে নাকি বে হচ্ছে সামনে মাসে—বেচুবাবু বলছিল। বড্ড ভাবনায় ফেলে দিলে হে! শালাকে বন্ড ভালবাসি কি না!

ভেবেছিল দৌড়ে গিয়ে একটা লাথি ঝাড়বে শুওরটার পাছায়—কিন্তু হঠাৎ শরীরটা অবশ লাগল। এ কি আনন্দের প্রচন্ড উচ্ছ্বাস, নাকি সন্ত্রাসের ভীষণ আঘাত! প্রায় টলতে টলতে সে বারান্দায় উঠল। বেচুবাবু বলল, আসুন। এইমাত্র পান্ডেজী খোঁজ করছিলেন।

(ক্রমশঃ)

একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র

বিমল বসু

জন্ম : ১৫ই জানুয়ারী, ১৯০৫
মৃত্যু : ২২শে জুলাই, ১৯৬৩

কথাশিল্পী, কথক, অনুবাদক, ছায়াচিত্রের নবরূপকার, জীবনী-সাহিত্যে পথিকৃৎ বেপরোয়া অ-বিষয়ী শিল্পসাহিত্যের রূপমুগ্ধ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্চর্য ছবি এঁকেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল' যুগের রূপকথায়।

এই বোহেমিয়ান সত্যিকার শিল্পী-মানুষটির ওপর এক ভিন্ন দৃষ্টি থেকে আলোকপাত করা হয়েছে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষভাবে লেখা এই নিবন্ধে।

'সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে মানুষের জীবন।' —এই মহৎ উক্তিকে সার্থক করে দরদী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (চট্টোপাধ্যায়) সারা জীবন ধরে অক্লান্তভাবে জীবন-পরিক্রমা করে গেছেন। শিল্পে-সাহিত্যে তাঁর দেশ-জোড়া খ্যাতি। কথাশিল্পী হিসেবে স্রষ্টা হিসেবে হয়তো এদেশের ওদেশের বহু কথাশিল্পীর সঙ্গে জীবনশিল্পী নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য মিল ও সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু 'মানুষ' হিসেবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অদ্বিতীয় একক। এখানে তিনি দ্বিতীয়রহিত। অন্য কারো সমান বা সমকক্ষ নন। আমার এক-এক সময় মনে হয়েছে কথাশিল্পী সাহিত্যস্রষ্টা নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণকে 'মানুষ' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন— নিজেকেই নিজে অতিক্রম করে গেছেন নানা দিক দিয়ে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সৃষ্ট সাহিত্য মানুষের জয়গানে ভরা। আশার ভালোবাসার উদ্দীপনার প্রেরণার বাণীকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে নিবেদন করেছিলেন এদেশের এ যুগের সকল শ্রেণীর মানুষের উদ্দেশে।

কল্পলোকবিহারী কবিদের এবং গজ-দন্তমীনারশীর্ষে অবস্থানকারী কথাশিল্পী-দের মহৎ সৃষ্টিতে এদেশ ধন্য হয়েছে। এই সমস্ত কথাশিল্পীদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবতার অসাধারণ গুণে আকীর্ণ। ভালোয়-মন্দোয় আলোয়-আঁধারে এই সমস্ত চরিত্রগুলি অবিনশ্বর হয়ে আছে এবং থাকবেও।

বাংলা ও ভারতের কবি ও কথা-শিল্পীরা মানুষের জয়গানে মুখর হলেও তাঁরা কিন্তু সাহিত্যিক জীবনে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন—জনসাধারণের জয়গান গাইলেও জনসাধারণ থেকে তাঁরা নিজ বৈশিষ্ট্য নিজেদের তৈরী-করা দাম দেওয়ালের মাঝে বন্দী করে রেখেছেন, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এক এবং অভিন্ন হয়ে যায় নি। এদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানামা সব কবি এবং শিল্পীদের সম্পর্কে নির্দ্বিধায় একথা বলা চলে।

কিন্তু 'কথাশিল্পী' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং 'ব্যক্তি' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। দুটি জীবনধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ 'মানুষ' নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে 'কথাশিল্পী'র মুখোশ পরতে হয়নি। কথাশিল্পী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মানুষের মুখোশ পরে জনসভায় বা মনুষ্যসমাজে বিচরণ করতেন না। তাঁর কোন আবরণ আভরণ ছিল না। তিনি ছিলেন সর্ব কৃত্রিমতা মুক্ত।

এইখানেই এদেশের অন্য সব কথা-শিল্পীদের সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ দুস্তর ব্যবধান। মানুষের দুঃখে দুর্দিনে তিনি গজদন্তমীনারশীর্ষ থেকে 'সাহিত্যিক অশ্রুপাত' করতেন না—অপরের দুঃখ-বেদনাকে একান্তভাবে নিজের বলে মনে করে তা দূরীকরণে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এগিয়ে যেতেন। এই মনোভাবের সংখ্যাহীন প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনে।

কলকাতা বেতারে (অধুনা যা আকাশ-বাণী নামে খ্যাত) ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭

এগারো বছর তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে কাটাবার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই এগারোটি বছর সপ্তাহের পাঁচটা দিন তাঁকে একান্ত কাছ থেকে দেখবার ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো নিঃসংকোচে মেশবার সুযোগ আমার হয়েছে। উদার প্রসন্নতায় অপার দাক্ষিণ্যে তিনি সস্নেহে আশ্রয় দিয়েছিলেন আমার মতো এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্যকে। তাঁর কাছে কাছে থেকেছি। তাঁকে যতই দেখেছি ততই তাঁর সেই পরিচিত বহুকথিত উক্তি : 'সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে মানুষের জীবন' বার বার মনের গভীরে গুঞ্জরিত হয়ে ফিরেছে।

একদিনের কথা বলি। তাঁর আশ্চর্য-সুন্দর কণ্ঠস্বর অনুপম স্নিগ্ধমধুর কথন-ভঙ্গি অসাধারণ পাণ্ডিত্য আমার তরুণ মনকে মুগ্ধ করেছিল। একদিন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলাম—নেপেনদা, আমি আপনার মতো হতে চাই।

আমার মতো? সহজ আনন্দে হেসে উঠলেন। স্বাভাবিক লাবণ্যে যেন আরো উজ্জ্বল হলেন। তারপর তেমনিই অনিন্দকণ্ঠে একান্ত সহজভাবে বলে উঠলেন : তরল আগুনে অগ্নিসিদ্ধ হয়ে পথের ধারে ড্রেনের এক পাশে পড়ে থাকতে পারবি?

জীবন-সত্যের কী অকুণ্ঠ নির্মম প্রকাশ! এমনি সহজ সরল অনায়াস ছিলেন তিনি। নলচের আড়ালে তিনি তামাক খেতেন না, পারতেন না, তা করতে ঘৃণাবোধ করতেন। বলতেন : এই লুকোনো বাই থেকেই আমরা সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনছি। সবকিছু লুকিয়ে গোপন করে চেপে গিয়ে সমাজদেহে আমরা এমন ব্যাধির সৃষ্টি করছি যার সঠিক হদিশ আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে।

সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর জীবনের গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—অনেকটা প্রাণ-বায়ুর মতো। তার সঙ্গে ছিল নিষ্ঠা শ্রদ্ধা আন্তরিকতা। সাহিত্য নিয়ে ছেলেখেলা করা তাকে হালকা হাসির রঙ্গ-রসিকতার সামগ্রী করে তোলা তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। সাহিত্য ভুসিমালের সামগ্রী নয়। তা সাধনার জিনিস। তাড়াহুড়ো করে হাবিজাবি লিখে সাময়িক পত্রিকার কিস্তি মেটানো বা আসন্নপ্রকাশ বইয়ের আয়তন বৃদ্ধি করে মুনাফা লোটার প্রস্তাবে তাঁর সায় ছিল না। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যসতীর্থদের—বিশেষ করে কল্লোল-যুগের বিশেষভাবে চিহ্নিত খ্যাতনামা কথাকারের ব্যবসায়ী মনোভাবের কৌতুকের বহু কাহিনী গল্পচ্ছলে মাঝে-মধ্যে বলতেন তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হবার আশঙ্কা আমার আছে। প্রসঙ্গত প্রায়ই বলতেন : 'খুনী একজনকে খুন করে কিন্তু একজন লেখক মারে সহস্র জনকে তার বিষাক্ত লেখনী দিয়ে।' যা তাঁর অন্তরের নিগূঢ় সত্তার সায় পেত না তা তিনি কিছুতেই—অর্থের লালসায় বা খ্যাতির লোভে—করতে পারতেন না। চাইতেনও না।

এরকম একাধিকবার ঘটনার সাক্ষী লেখার জন্যে অগ্রিম টাকা পেয়েছেন। জোর করে লিখিয়ে নেবার জন্যে অনেকসময় অগ্রিম টাকা কেউ কেউ জোর করে দিয়ে যেতেন। টাকা পেয়েছেন, নির্ধারিত একটা তারিখও দিয়েছেন কিন্তু লেখা হয়ে উঠছে না। কখনো সময়ের অভাব, কখনও বা মুডের। গোঁজামিল দিয়ে লেখা তিনি লিখবেন না। তাতে নিজেকে প্রতারণা করা হয়—তা তিনি করেন কি করে। এদিকে দিনের পর দিন লোক এসে এসে ফিরে যাচ্ছে অথচ তিনি লিখতে পারছেন না, এদিকে লেখা আদায় করতে বদ্ধপরিকর মানুষগুলোও নাছোড়। এই 'টাগ-অব-ওয়ারে' জয় হত তাঁর। চল্লিশের দশকের বেতার অফিস গার্স্টিন প্লেস—রয়টার অফিস (এখন পি টি আই অফিস) থেকে এক মিনিটের পথ। গার্স্টিন প্লেসের চত্বরে নেপেনদা বেরিয়ে এলেন, এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে, উড়ছে অশান্ত হাওয়ায় কাঁধের চাদর, গরদের পাঞ্জাবি গায়ে। বিব্রত মুখ। 'কে এসেছ ভাই লেখা নিতে?' কবিতার ক'চরণ যেন আবৃত্তি করলেন এমন স্নিগ্ধমধুর সুরেলা কণ্ঠ। ওঃ তুমি!—না আমি লেখা দিতে পারব না, আমার লেখা আসছে না. আমি...আমি লিখতে পারছি না—চাপা স্বরে যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। অগ্রিম নেয়া টাকা ফেরৎ দিলেন।

আর একবার তাঁর টাকার খুব দরকার। তার উৎস-মুখের সূত্রসন্ধানে তিনি খুব ব্যস্ত—এমনি সময় প্রলুব্ধ করার মতো একটা প্রস্তাব হঠাৎ এসে হাজির। এক-তাড়া নোটের বড়সড় বান্ডিল তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জনৈক প্রকাশক বিশেষ ধরণের লেখার প্রস্তাব করতেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘৃণাভরে হাত দিয়ে নোটের তাড়াটায় একটা ঝটকা মারলেন, তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক্রোধভরা কণ্ঠে গর্জে উঠলেন : আমি 'টেলার' নই—অর্ডার মতো মাল যারা সাপ্লাই দিতে পারে তাদের কাছে যান!

এই ধরনের মেজাজের প্রকাশ দেখেছি সুখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। হাজার টাকায় অর্ডারী ছবি আঁকার প্রস্তাব তিনি ফুৎকারে শুধু উড়িয়েই দেননি—লম্বা-চওড়া বলী সৈনিকের মতো জোয়ান-জবরদস্ত শিল্প-প্রেমিক এই মানুষটি এমন হুংকার ছেড়েছিলেন যে অর্ডার দেনেওয়ালা প্রায় ছুটে পালিয়ে ছিলেন।

শিল্প শিল্পই—তাকে কিছুতেই পণ্য-সামগ্রী করে তোলা যাবে না—অর্ডার মতো মাল সাপ্লাই দিতে মুখিয়ে থাকা শিল্পী-লেখক লেবেলওলা ব্যক্তিরা বহাল তবিয়তে এই কম্মটি করতে থাকুন। অভাব ও বিপত্তির অংকুশের সহস্র প্রহারে বিদ্ধ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তা পারেন না, পারেননি শিল্পীবন্ধু দেবব্রতও। হাতকাটা জেল্লা আপেলের ভজের ক্যানভাসারদের মতো নানান ধরণে লেখা পত্রিকার অফিসে অফিসে ফিরি করে বেড়ানো হাটুরে লেখক নাম-ধারীরা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ-দেবব্রতদের মতো স্বাতন্ত্র্যধর্মী শিল্প-প্রেমিক মানুষদের এই জীবনবেদ ও জীবনবোধ সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না—পারবেন না যাঁরা সাহিত্যের হাটে ভুসিমালের কারবারে বিস্তর পয়সা করেছেন, গাড়িবাড়ি করেছেন। শিল্প-শিল্পই তা ভোগ্যপণ্যবস্তু হতে পারে না। আর এর রূপকার যাঁরা—যাঁরা সত্যিকার শিল্পী তাঁদের কেনা যায় না. তার মূর্ত প্রতীক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ—আজও এই বিকিকিনির হাটে তার জান্তব প্রমাণ শিল্পী দেবব্রত।

পয়সার জন্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে লিখতে হত সত্যিই। শিল্পসাহিত্যের সব পূজারীকে তা করতেই হয় পোড়া 'পেট'-এর জন্যে। কিন্তু পয়সার জন্যে শিল্প-কলালক্ষ্মীকে নটীর ভূমিকায় নামানো, শিল্পের-সাহিত্যের নাম করে 'প্রসটিটিউসন' করা—প্রাণ থাকতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তা করতে পারতেন না। অর্থাৎ যা তাঁর বিশ্বাসে বোধে ধারণায় অভিজ্ঞতায় এবং শিল্পবস্তুর সঠিক মূল্যবিচারের বিরোধী পয়সার জন্যে তা করতে বাধত—আপোস করতে জানতেন না। তাই অভাবের দংশন তাঁকে নিত্য ভোগ করতে হত এবং তা করতেন হাসিমুখে।

সাহিত্যের মুখ চেয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকের সম্মানরক্ষায় যদি কেউ সত্যি-কার অর্থে 'শহীদ' হয়ে থাকেন তবে তিনি যার নাম নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বহু গ্রন্থের স্বত্বত্যাগ তাঁকে করতে হয়েছিল সামান্য অর্থের বিনিময়ে। অবশ্য এজন্যে মাঝে মাঝে তিনি খেদ করতেন। তবে অ-ব্যবসায়ী শিল্প-সাহিত্যসাধকদের এ হাল নিত্যকালের। সত্যিকার যাঁরা শিল্পী তাঁরা হবেন অভিমানী, তীব্র সংবেদনশীল, অসন্তুষ্ট, আপোসবিরোধী। নতজানু হয়ে আপোস করে গোঁজামিল দিয়ে অর্ডারী মাল সাপ্লাই দিয়ে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে যাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতেই ব্যস্ত শিল্প ও শিল্পীসত্যের সত্যিকার আলোকে তাঁদের লোভী ধূর্ত ব্যবসায়ী চেহারা অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কালের ও কলালক্ষ্মীর বিচারে শিল্প-সাহিত্যের তাঁরা কেউ নন। কিন্তু 'ঠক বাছতেই গাঁ উজাড়'—সত্যম-শিবম-সুন্দরম-এর পূজারী 'কোটিতে গোটিক'—একালে এই সত্তর দশকে তাঁরা বিরলদর্শন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ জন্ম-যাযাবর, নিজ ভালো-মন্দ সম্পর্কে একান্ত উদাসীন এক আশ্চর্য মানুষ। সাহিত্যের নবরূপকার মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত আশ্চর্য মিল ছিল। অন্তত একটি ক্ষেত্রে।

'গরমিল' ছবির কাহিনী লিখে বেশ মোটা টাকা পেয়েছেন—সম্ভবত সাতশো

টাকা। এক বুধবারে টাকাটা তাঁর হাতে এসেছিল। তারপরের মঙ্গলবার গল্পদাদুর আসর-এ হাজির হতেই হাসিমুখে বললেন ঃ পাঁচিও না দরকার আছে।

আসর শেষ হলেই দুজনে বেরুলাম। পায়ে পায়ে এগুচ্ছি। নেপেনদা কেমন যেন অন্যমনস্ক। ডানহাতটা আমার কাঁধে তুলে দিয়েছেন। ভাল লাগছে এমনি করে বন্ধুর মতো তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর এক সময় নেপেনদা মুখ তুললেন ঃ বিমল, আমায় এখুনি গোটা পঁচিশ টাকা যোগাড় করে দিতে হবে ভাই।

পঁচিশ টাকা! চমকে উঠলাম! ক'দিন আগে যার হাতে ছিল সাতশো টাকা আজ তারই দরকার পঁচিশ টাকা!

বললাম—ক'দিন আগেই তো সাতশো টাকা পেয়েছেন।

হাসলেন।—কিছু নেই—শনিবার মাঠে কিছু হারিয়েছি—আর লীলাচ্ছলে আবৃত্তি করে উঠলেন যেন ঃ আর কিছু গেছে বাটে।

কোন গোপনতা নেই, কোন ছল নেই, কোন অছিলা নেই। জীবনের সত্যকে এমন অকুণ্ঠভাবে কে প্রকাশ করতে পারে?

তাঁকে চলতি পথের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে টাকাটা যোগাড় করলাম। অনেক আবেদন-নিবেদন করে অনেক কষ্টে ঋণ হিসেবে যাঁর কাছ থেকে টাকাটা পেলাম আজকের আকাশবাণীতে তিনি স্বনামেই ধন্য। কিন্তু আরো বিস্ময় আমার জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল।

পঁচিশ টাকা তাঁর হাতে দিতেই স্নেহভরে আমার পিঠটা একবার চাপড়ে দিলেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের (পুরাতন নাম বহুবাজার স্ট্রীট) ভারতসভা ভবন (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল)-এর সামনে আর একজনের মুখোমুখি হলেন নেপেনদা। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। তিনি একটু দূরে নেপেনদাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় ফিসফিস করে কি যেন বলতে লাগলেন। আমি বোকার মতো পথের ওপর একা দাঁড়িয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল নেপেনদা পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে টাকা কটা বার করে সেই ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে দিলেন। আমার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ চলো।

দিয়ে দিলেন টাকাগুলো?

বেচারা বড্ড অসুবিধায় পড়েছে......

নিজের অসুবিধার কথা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেলেন। কেউ অসুবিধায় পড়েছে জানতে পারলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। এই-ই নেপেনদা। অন্য কবি ও শিল্পীদের মতো 'সাহিত্যিক অশ্রুপাত' করে নিজের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন না। 'মানুষ' নৃপেন্দ্রনাথ আর সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রনাথ ছিলেন এক এবং অভিন্ন।

হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন ঃ ফ্রান্সিস এদেশে সত্যিকার জীবনী-গ্রন্থ লেখা হয় না। এদেশের বিখ্যাত সুখ্যাত নামী আর দামী মানুষদের জীবনীর পাতা উল্টে দ্যাখ—সবাই যেন স্বর্গের দেবতা পথভ্রষ্ট হয়ে পথভুলে এ পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। এ মর্তের মৃত্তিকার কোন দাগ কোন গ্লানিমা কোন অসম্পূর্ণতা স্বনামধন্যদের জীবনের কোথাও কোনখানে নেই। কিন্তু তাই কি সম্ভব? ভালোমন্দ মিশিয়েই তো মানুষ—তার ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতা অসুন্দরতা আছে বলেই ভালোয়-মন্দোয় আলোয়-আঁধারে মানুষ মানুষই—দেবতা নয়।

আমি হাসিমুখে বলেছিলাম ঃ আপনার জীবনী তাহলে আমি লিখব।

লিখবি? পারবি? যদি পারিস তাহলে আমি যা তাই লিখিস। বিধাতার মতো অকরুণ নিষ্ঠুর উদাস অথচ পরম মমতায় আঁকবি ভালোয়-মন্দোয় ভরা এই আমিকে। পারবি লিখতে?

জবাব দিতে পারি নি। তখন মনে পড়ছিল আর একজনকে—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অন্তরসঙ্গিনী শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সেই 'রাজলক্ষ্মী'কে—সামাজিক অনুমোদন না নিয়েই সেই হৃদয়বতী মহিলা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের যাযাবর ঘরছাড়া পথহারা জীবনকে স্বাভাবিক খাতে প্রবহমান করাবার আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন লোকলোচনের অন্তরালে থেকে। সামাজিক নিন্দা অখ্যাতি ও পরিবাদই সেই মহীয়সী মহিলার জন্যে স্তূপীকৃত হয়ে রইল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনসমুদ্র মন্থনে অমৃত নয়—গরল তিনি পান করে গেলেন। এঁর চেষ্টায় যত্নে প্রাণসাধনায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বহু দুর্বলতা পরিহার করে স্থিতধী হতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরো একদিনের একটি ঘটনা। সালটা সম্ভবত ১৯৪৩-এর কাছাকাছি। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ হাজির আমাদের বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের বাসাবাড়িতে। এসেই সরবে ঘোষণা করলেন ঃ মা, আমি আজ রাত্রে খাব। নিজের নিমন্ত্রণ নিজেই সেরে রাখলেন।

এই হঠাৎ আসা, হঠাৎ খাওয়ার বাসনা ঘোষণা করা—এতে কারো কোনো অসুবিধা হতে পারে কিনা সে বিষয়ে তিনি নির্বিকার।

বড়মাপের মানুষেরা বুঝি এই রকমই হন ঃ আত্মভোলা জীবন-উদাসীন লাভক্ষতি সুবিধা অসুবিধা প্রশ্নে অনুদ্বিগ্ন। ঠিক এমনি উদাত্ত কণ্ঠের ঘোষণা শুনেছিলাম ইন্দিরা দেবীর চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের বাসায় রাত সাড়ে নটায় বিপ্লববাদিনী বীণা ভৌমিকের (দাস) কণ্ঠে ঃ ইন্দিরা, দুটি খাব, আর রাতটুকু থাকব। খাওয়া থাকা ইত্যাদি জাগতিক ব্যাপারে এঁরা কেমন যেন অনুদ্বিগ্ন—আর এমনি মানুষদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে হাজার মানুষের সাদর স্বাগত আনন্দসম্ভাষণ।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ স্নান করলেন। ঘোলের সরবত খেলেন। রাত্তিরের খাওয়া শেষ করে আমার হাত ধরে টানলেন—চলো।

কোথায়?

জাহান্নামে! আনন্দে কৌতুকে প্রাণখোলা উচ্ছল হাসিতে আমার উদ্বেগ যেন ফুঁ দিয়ে কোথাও উধাও করে দিলেন।

একটা রিকসায় দুজনে আরোহী হলাম। জগৎ-সংসার এবং শিল্প-সাহিত্য নিয়ে টুকিটাকি নানা কথা হতে লাগল, ব্যক্তিজীবন নিয়েও। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ তোমাদের সাধারণ মানুষের 'লক্ষ্মণের গন্ডী'-কাটা জীবন-পরিধি দিয়ে বড়মাপের মানুষদের বিচার করতে যেও না—তাহলে তাঁদের ওপর অবিচারই করবে। শিল্প-সাহিত্যের যাঁরা সত্যিকার সাধক তাঁদের জীবন-দৃষ্টি এবং নীতিবোধের বেড়াটা অনেক বড়। সাধারণ মানুষের 'ডুস' অ্যান্ড 'ডোন্টস' ওঁদের ওপর প্রয়োগ করলে অবিচার করা হবে, অন্যায় হবে।

এক সময়ে হঠাৎ চমক ভেঙে দেখলাম উত্তর কলকাতার একটি বিশেষ পল্লীতে এসেছি যেখানে নিত্যই রূপাভিনয় হয় 'কান্না-হাসির দোলদোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা'র। রিকসা থেকে নামলাম একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটা কিন্তু আশ্চর্যভাবে কলগুঞ্জনহীন। জনপদবধূদের এলাকার মধ্যে থেকেও এ বাড়ি যেন অন্য জগতের। বাঁহাতি সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলাম। চপল চাউনির বিদ্যুৎচমক দিয়ে কেউ অভ্যর্থনা জানাল না।

এত অবাক লাগছে বলবার নয়। আমি মুখ তুলে নেপেনদার দিকে একবার তাকালাম। নেপেনদা আর্তস্বরে আপন মনেই যেন বলে উঠলেন...ও এখানে নেই, মুর্শিদাবাদ গেছে। আমি এ ঘরে একা কিছুতেই থাকতে পারছি নে তাই...কাতর দৃষ্টি আমার দিকে ফেরালেন...বিরহী চিত্তের সে ব্যাকুল-কাতর দৃষ্টি ভোলবার নয়। আমার বুকের মধ্যে তখন যেন একটি আর্তস্বর গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল...'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' একজনের সামান্য সময়ের জন্যে অদর্শন মনের জগতে যে করুণ মূর্ছনার সৃষ্টি করে তখন একা থাকা বিভীষিকা হয়ে ওঠে। হৃদয়ে তোলে হা-হা শূন্যতার ঘূর্ণিঝড়। তখন শূন্যঘরে একা একটা রাত কাটানো প্রায় অসম্ভব মনে হয়—তাই-ই হয়েছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের। শূন্যতা যেন তাঁকে খ্যাপা কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছিল আর এই শূন্যতার তীক্ষ্ণ শায়কে আহত রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে তিনি উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। সত্যিকার নিবিড় প্রেম-অনুরাগ-ভালোবাসা প্রেমিক-হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করতেই বুঝি ভালোবাসে, ভালোবাসে হৃদয়ের ক্ষত-মুখ থেকে শতমুখে রক্ত ঝরাতে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনে এই 'রাজলক্ষ্মী'ই জীবনলক্ষ্মী হয়ে উঠেছিলেন যার তিলেক বিরহ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আর 'রাজলক্ষ্মী'ও এই প্রেমমুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে

সুনাম খ্যাতি অর্থ-পরমার্থের সম্ভাবনা-ভরা উজ্জ্বল ভাবিষ্যৎকে অবলীলায় ত্যাগ করেছিলেন। এত নিবিড় সখ্যতা অন্তরের গভীর নিষ্ঠা ও ভালোবাসা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে এমনভাবে জানা যেন এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি। 'রাজলক্ষ্মী' যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনের কি ছিলেন সেদিন এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করলাম। ভালোবাসা এত নিবিড় এত সূক্ষ্ম এত গভীর হতে পারে! আশ্চর্য! একটা রাত 'রাজলক্ষ্মী'র বালিসে মাথা রেখে বিরহী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের শয্যাসঙ্গী হয়ে কেটে গেল—আজ মনে হয় সে সব যেন স্বপ্ন।

স্থূলরসের কারবারী হয়তো এ কাহিনী শুনে মুচকে মুচকে হাসবেন আমি কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের শূন্যঘরে দিনযাপনের কাতর আর্তস্বরের মধ্যে আর এক তৃষিত হৃদয়ের কাতর কান্নাকে ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। সে তৃষিত পিতৃহৃদয় 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের।

১৯৩০-৩১ সাল। ধর্মতলার খেলাৎ (চন্দ্র ক্যালকাটা) স্কুলে পড়ি। বিভূতিবাবু আমাদের বাংলা পড়াতেন। বাচ্চা ছেলেদের কি ভালোই না বাসতেন। একদিন স্কুলে দারুণ কানাকানি। বিভূতিবাবু ক্লাস ফোরের প্রিয়দর্শন একটি অল্পবয়সী ছাত্রকে গাল টিপে আদর করে একান্তে কাছে ডেকে চুপি চুপি বলেছিলেন : দেবু, আমাকে একবার বাবা বলে ডাকবি! এই নিয়ে স্কুলে কি তোলপাড়! কদর্য বিদ্রূপে ঝলসে উঠল বহুমুখ। বয়স্ক মানুষরা হাসাহাসি আর হুল্লোড় করে কি যেন একটা ইঙ্গিত করতে লাগলেন। স্থূল ব্যক্তিরা নানা কুৎসিত রটনা করতে মুখিয়ে উঠতে লাগলেন এই আর্ত আকুতির মধ্যে অন্য গন্ধ পেয়ে। সে আর এক কাহিনী। তখন সব কিছু ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি নি। আজকে এই পঞ্চাশোর্ধে দুটি আর্ত আকুতি : বিরহী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এবং তৃষিতহৃদয় বিভূতি-ভূষণের—চিরন্তন মানবমনের দুই সুর এক এবং অভিন্ন বলে মনে হয়। আর তখনই অন্যলোক থেকে ভেসে আসা একটি আনন্দকণ্ঠ মর্মলোকে গুঞ্জন করে ফিরতে থাকে :

'তোমাদের সাধারণ মানুষের লক্ষ্মণের গন্ডীটানা জীবনপরিধি দিয়ে বড়মাপের মানুষদের বিচার করতে যেও না।...'

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ জীবনে ছিলেন চরমবাদী। জীবনের সরলতম সহজতম শর্টকাট তাঁর জানা ছিল না। তা তিনি জানার চেষ্টাও করতেন না। প্রচণ্ড আবেগে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবদানের নিরিখ করবেন মহাজনরা। তাঁর যৌবনোত্তর স্বর্ণময় জীবনের অনেকগুলো বছর বেতারকে জনপ্রিয় করে তোলার দুস্তর কল্পনায় আনন্দে অঞ্জলি ভরে তিনি দান করে গেছেন—কলকাতা বেতারের এক নগণ্য প্রাক্তন কর্মী হিসেবে সেকথা আজকের দিনে কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারি না। বিদ্যার্থী মন্ডল (স্কুল ব্রডকাস্ট) শুরু হয়েছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রাণসাধনায়। পরম মমতায় বিস্তর পরিশ্রম করে অসাধারণ প্রাণস্বপ্নে অপরিসীম ত্যাগস্বীকারে বিদ্যার্থী-মন্ডলকে দক্ষ স্থপতির মতো খুঁদে খুঁদে গড়ে তুললেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। মন্ডল শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় হল। তার-পরেই ডাক পড়ল তাঁর বেতারের আর এক বিভাগকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে —মেতে উঠলেন তিনি 'পল্লীমঙ্গল আসর' নিয়ে। এই আসরকে গ্রামময় বাংলায় জন-প্রিয় করে তোলবার জন্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ নতুন উদ্যমে নব নব পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। ট্রেনে বাসে গরুর গাড়িতে পায়ে হেঁটে গ্রাম-বাংলার পরিক্রমা করলেন কোন লাভ কোন পুরস্কার কোন বাসনা চরিতার্থতার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রেখে। 'গল্পদাদুর' (যোগেশচন্দ্র বসু) পরলোক-গমনের বেশ কিছুকাল পরে 'ছোটদের আসর' (১৯৪২ সাল থেকে গল্পদাদুর শ্রদ্ধাস্মরণে যার নামকরণ করা হয়েছে 'গল্পদাদুর আসর') পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'দাদুমণি' এই ছদ্ম-নামের আড়ালে থেকে। যে কাজেই তিনি হাত দিয়েছেন তাই-ই তাঁর অমৃত স্পর্শে যেন প্রাণ পেয়েছে। বেতারকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে যে কটি মানুষ নিঃশব্দে আপনাদের নিবেদন করে গেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম।

অথচ প্রাণ থেকে প্রিয়তর সেই বেতারকে শিল্পসাহিত্যের মুখ চেয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে ছিন্ন পাদুকার মতো অনায়াসে ত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধা তাঁর হয় নি। প্রতিষ্ঠা অর্থ সুনাম—সব কিছুই তিনি একান্ত অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে-ছিলেন কোন দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে।

ঘটনাটি সামান্য হলেও শিল্পসাহিত্যের সম্মান রক্ষার নিরিখে অসামান্য।

তখনকার দিনে এবং এখনও এদিনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাস করে বেতারকেন্দ্রগুলির বিভিন্ন বিভাগে পরি-চালক হয়ে বসেন যাঁরা ভাগ্যের পরিহাসে শিল্পসাহিত্যের তাঁরা কেউ নন—অথচ পদাধিকার বলেই মোহন্তগিরিটা তাঁরাই পেয়ে থাকেন। অবিভক্ত বাংলায় চল্লিশ দশকে এমনি একজন মোহন্ত ছিলেন মিঃ এ জেড জামান। অকারণে মানুষকে আঘাত করতে খোঁচা দিতে ছোট করতে তাঁর বাধত না। এক ছটাক সাহিত্যগুণ যাঁর মগজে ঠাঁই পায় নি পদাধিকারবলে তিনিই সাহিত্যসাধক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের বেতার-প্রচারের জন্যে নির্দিষ্ট লেখাগুলি সম্পর্কে উন্নাসিকতার সঙ্গে একসপার্টস ওপিনিয়ন দিতে শুরু করলেন — আসলে ফ্রয়েডীয় ভাষায় 'পারভারসন'-এ ভুগছিলেন ভদ্র-লোক— স্বনামীগুণী-সম্মানীয়কে নানাভাবে ভীতিবিরক্ত—ইংরেজিতে যাকে বলে 'টিজ' করা—করে প্রভূত আনন্দ পেতেন। তখন বাংলাদেশে লীগ মিনিস্ট্রির আমল। এই ধরনের মানুষরা বিশেষ ধর্মের দোহাই পেড়ে এবং তখত-তউসের অধিকারী বিধায় যেন হাতে মাথা কাটতেন। মিঃ জামানের জেহাদী জহ্লাদীপনা চলতে লাগল বেতারের নানা কর্মী-মানুষের ওপর। যাঁরা চালাক-চতুর তাঁরা কখনও আপস করে, কখনও মাথা নীচু করে ঝড় এড়াতে লাগলেন।

কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনে আপোস বলে কোন কথা ছিল না। সাহিত্যের সত্য যেখানে অনুপস্থিত, সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি যেখানে নিত্য অনাদৃত উপহাসিত সেখানে সাহিত্যপ্রাণ নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কেমন করে মুখের কপট হাসি ঝুলিয়ে ক্লান্তকর দিনগুলি অতিবাহিত করবেন! ব্যক্তি-জীবনে শুধু নয় শিল্পসাহিত্যের অনধি-কারীদের কাজীগিরি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

মিঃ জামানের ধৃষ্টতার প্রতিবাদে একদিন সরোষে হাতের বেতারস্ক্রীপ্ট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেতার থেকে চলে এলেন। আর তিনি বেতারে ফিরে যান নি। যা ছিল তাঁর প্রাণের মতো সাহিত্যের মুখ চেয়ে তাকে অনায়াসে চিরকালের জন্যে বর্জন করলেন। এই আকস্মিক বিদায়গ্রহণে ব্যক্তিজীবনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু তার চেয়েও ক্ষতি হয়ে-ছিল বেতার ও বেতারশ্রোতাদের। বেতারের শ্রেষ্ঠ সংগঠক কথক কথাকার বেতার থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলেন।

শুধু বাংলা সাহিত্য বা কলকাতা বেতারকেন্দ্র নয় কর্মক্ষেত্রের যেখানেই তিনি স্পর্শ রেখেছেন তাঁর প্রতিভার পরশ-পাথরের ক্ষণিক ছোঁয়ায় তা সোনা হয়ে উঠেছে।

উন্মাদ অস্থির কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মতো পরিভ্রমণ করেছেন তিনি শিল্প-সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে। সব শেষে বেতার ছেড়ে এসেছিলেন তিনি ছায়াচিত্রের জগতে। সেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। মর্ত থেকে বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই রেখেছেন প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর।

এক এক সময় আমার মনে হয়েছে শিল্পসাহিত্যের রূপমুগ্ধ এই মানুষ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টুর্গেনিভের অমর সাহিত্য সৃষ্টি 'রুদিন' উপন্যাসের পাতা থেকে নেমে এসেছেন বাংলার মাটিতে—অস্থির উদ্দাম কখনো, কখনো অকারণ উল্লসিত, কখনো বিষণ্ণ, যা কিছু মহৎ বৃহৎ অপ্রাপনীয়—যা কিছু সুন্দর শ্রেষ্ঠ অভাবনীয় তারই সাধনায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবন-মন-প্রাণ নিবেদিত।

এই অসম্ভবের সাধনায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সারা জীবন মেতে ছিলেন।

আসল ও নকল তাজমহল

নারায়ন সেনগুপ্ত
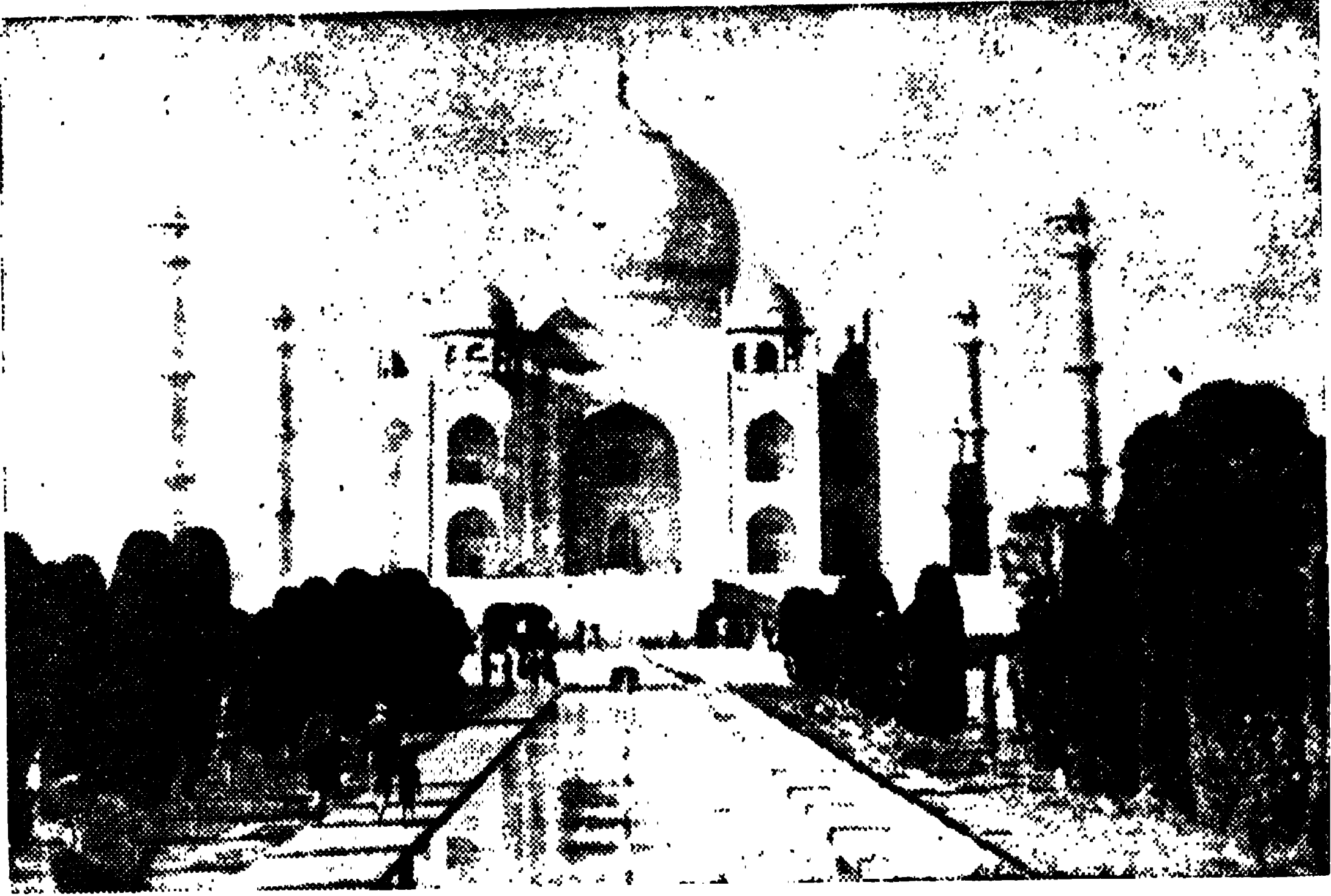
বিশ্ববিখ্যাত আগ্রার তাজমহলের নাম অন্তত শোনেননি এমন অভাজনের সংখ্যা বোধকরি ভারতে নেই। কিন্তু নকল তাজমহলের নাম অনেকেই হয়তো শোনেননি ...দেখেছেনও বোধহয় আরো কমসংখ্যক ভাগ্যবান। যদিও নাম তার ঠিক নকল তাজমহল নয়...কিন্তু আকারে প্রকারে আর বিন্যাসে তাজমহলের সঠিক নকল রূপায়ণ।

ঐতিহাসিক ঔরঙ্গাবাদ যাঁরা গেছেন—তাঁরা পরিতৃপ্ত হয়েছেন অজন্তা ইলোরার মোহময়ী গুহাশিল্প দেখে, বিমোহিত হয়েছেন ঐশ্বর্য, গরিয়সী ঔরঙ্গাবাদ দুর্গ দেখে, কিন্তু ততোধিক বিস্মিত হয়েছেন—বিবি-কা-মোকবারা দেখে। অন্তত আমিও হয়েছি। চলন্ত বাসটা যখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর গাইড বন্ধুর হুঙ্কার শোনা গেল—'নেমে পড়ুন, বিবি-কা-মোকবারা এসে গেছে।' চমকে উঠি। একি আগ্রা নয়? একি শাজাহান নির্মিত বেগম মমতাজের স্মৃতি-সৌধ তাজমহল নয়? নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে পেলাম। না, এ তাজমহল নয়। তবে এত সাদৃশ্য কেন? জবাব—তাজমহলের অনুকরণে তৈরী করা হয়েছে বলে।

ধীর পদযুগলে বিবি-কা-মোকবারা চত্বরে প্রবেশ করলাম। নয়নযুগল সার্থক করে দেখতে লাগলাম। পরিতৃপ্ত হলাম... ধন্যও বুঝিবা।

আগ্রার তাজমহল তৈরী করেছিলেন সাজাহান, তাঁর বেগম মমতাজের জন্যে—যার পূর্বের নাম ছিল—আরজুমন্দ বানু বেগম।

বিবি-কা-মোকবারা তৈরী করেছিলেন ঔরঙ্গজেব—তাঁর বিবি দিলরাস বানু বেগমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। দিলরাসের পূর্ব নাম ছিল রাবিয়া দাওরানী।

তাজমহল নির্মাণের প্রধান আর্কিটেক্টরের নাম—উস্তাদ ইসা আফেন্দি।

বিবি-কা-মোকবারার আর্কিটেক্টর-দ্বয়ের নাম—আতাউল্লা এবং হাস্‌পোতারাই।

শ্বেতশুভ্র সমুজ্জ্বল, তাজমহল নির্মাণের শ্বেতপাথর আনানো হয়েছিল জয়পুর থেকে।

বিবি-কা-মোকবারা তৈরীর শ্বেতপাথর আনানো হয়েছিল জয়পুর থেকে। এই প্রসঙ্গে জনৈক ইউরোপীয় ভ্রমণীয়া লিখেছেন—

"Going one time from Surat to Golconda, I meet in five days journey from Auramgabad. More then 300 wagons laden with this marble, the least drawn by twelve oxen". These marbles was being transferred for building this Mackbara.

আগ্রার তাজমহলের আয়তন বিশাল। বিবি-কা-মোক্‌বারার আয়তন আনুমানিক ৫০০ গজ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০০ গজ।

বিবি-কা-মোকবারার সামনের প্ল্যাট-ফরমটি একটি পালিশকরা লাল-রঙের পাথরের উপর অবস্থিত। আয়তন প্রায় ৭২ বর্গফুট।

আগ্রার তাজমহল কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য চিরদিন শীর্ষস্থানে থাকবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। প্রধান তোরণটি যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাসাদ। তোরণের দৈর্ঘ্য ১৫১ ফুট প্রস্থ ১১৭ ও উচ্চতা ১৮০ ফুট। এটি ২১১ বর্গফুটবিশিষ্ট একটি খাস বেলেপাথরের উপর অবস্থিত। এটি একটি দ্বিতল প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশ-দ্বারের বৈশিষ্ট্য হলো—দ্বারগাত্রে কোরাণের বাণী উদ্ধৃত আছে। কিন্তু আশ্চর্য লেখ-গুলি উপর বা নীচ যেদিক দিয়েই পড়ুন না কেন সর্বক্ষেত্রে একই রকম মনে হবে। প্রধান তোরণ অতিক্রম করে সমাধিক্ষেত্র পর্যন্ত দু'পাশে একাধিক ফোয়ারা ও ঝাউগাছবীথি ভ্রমণীয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিবি-কা-মোকবারা কিন্তু এদিক দিয়ে হতাশ করেনি লোভাতুর ভ্রমণীয়াদের। চারিপাশের ঝাউবিথি, বাগিচা, ফোয়ারা অবিরত আনন্দদান করছে।

মূল সমাধিক্ষেত্র অর্থাৎ তাজের সৌন্দর্যের সমতা রক্ষা করে চারি কোণে চারিটি মিনার তৈরী হয়েছে।

বিবি-কা-মোকবারাও কিন্তু এক্ষেত্রে পেছিয়ে নেই। তারও প্রধান সমাধিক্ষেত্রের চারিদিকে চারটি মিনার রয়েছে। প্রতিটির উচ্চতা আনুমানিক ৭২ ফুট।

তাজের প্রধান গম্বুজের মাথার উপর যে কীলক রয়েছে সেটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০২ ফুট এবং কীলকটির ওজন প্রায় ৩২ মণ।

মোকবারার শীর্ষদেশে পৌঁছালে মুহূর্তে বুঝি এক অপারিসীম আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়। এক অনিন্দ্যসুন্দর নির্ভেজাল স্বচ্ছ পরিবেশ।

তাজের ও বিবি-কা-মোকবারার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। উভয়েই রূপসী। শ্বেতপাথরের অপরূপ কারুকার্য...গঠন-প্রণালী...শিল্পচাতুর্য চিরদিন ভ্রমণপিয়াসী মানুষকে কাছে ডেকেছে—ডাকবেও। ঠাঁই দিয়েছে—দিবেও। এই দুটি শিল্পপ্রতিমার অবস্থান ভৌগোলিক ক্ষেত্রে ভারতের ভিন্ন প্রান্তে হলেও অন্তরের ঐশ্বর্যে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্যরকম মিল রয়েছে। আমরা তাজমহল ও বিবি-কা-মোকবারার যে বাইরের রূপের গঠনশৈলীর মিল দেখে অবাক হয়েছি—তাজমহলের সহোদরা হিসেবে অনুমান করেছি তারও বড় সত্য তারও প্রকৃষ্ট নজীর লুকিয়ে রয়েছে ঐ শ্বেতশুভ্র সমুজ্জ্বল, একফোঁটা নয়নের জলের মাধ্যখানে।

চতুর্দশ কন্যার জন্মদানের পর ৭ই জুন, ১৬৩১ খৃঃ মমতাজ সকল মায়াবন্ধন ছিন্ন করে চলে যান। আর কি আশ্চর্য ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী।

দীল রাস বানু বেগমও তাঁর পুত্র মহম্মদ আকবরের জন্মদানের পর ৮ই অকটোবর ১৬৫৭ খৃঃ পরলোকগমন করেন।

তাই সম্রাট শাজাহান ও ঔরঙ্গজেব বোধহয় একই বেদনার দ্বৈতসঙ্গীত গাইতে চেয়েছিলেন তাজমহল ও বিবি-কা-মোকবারার শ্বেতপাথরের খিলানে খিলানে।

বিবি-কা-মোক্‌বারা

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(তেত্রিশ)
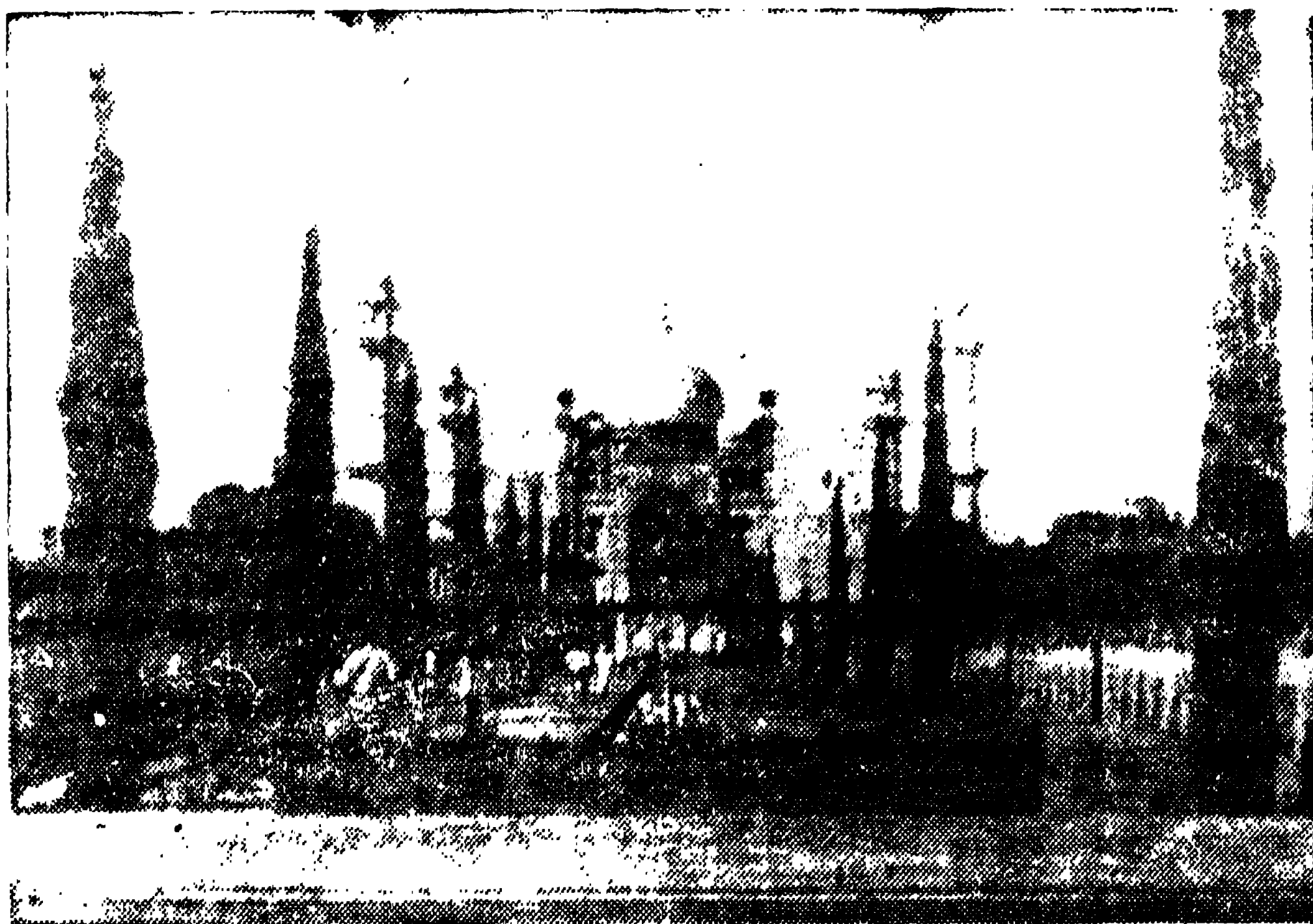
হঠাৎ ডেভিড এসে পড়ায় আলোচনাটি তখনকার মত স্থগিত থাকে। পরে দু-জনের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত জল্পনা-কল্পনা হয়। সেই কল্পনার বিশদ রূপ দিতে আরো কিছু দিন কাটল। ওদের কথার মধ্যে ডেভিডের উপস্থিতিটাও যেন বিধিনির্দিষ্ট। এডি কৌশলে তাকেও দলে ভিড়িয়ে নিল। তার জন্য কোন বেগ পেতে হল না এডিকে। কারণ পূর্বের ঘটনাতেই ডেভির অকপট বিশ্বাস জন্মেছে যে এডি মেঘুর হিতৈষী। তাই এক্ষেত্রে এডির কথা মত কাজ করতে ডেভি যে শুধু সম্মত তা নয়, বিশেষ আগ্রহান্বিত।

কথানুরূপ সবাই একে একে হাজির হল গটফ্রিডের বাংলোয়। সেখানে অপরাপর আলোচনার পর শুরু হল মেঘুর প্রশংসার প্রহসন। এডি বেশ গুছিয়ে বলতে পারে, ম্যাক পারে শুধু সায় দিতে। কিন্তু মেঘুর ওপরওলা হিসেবে ম্যাককেই কথাটার পত্তন করতে হয়, তারপর এডির ওকালতিতে সেটা প্রতি পদে এগিয়ে চলে। ডেভি তো এক পা তুলেই থাকে মেঘুর প্রসঙ্গে। তবু স্থির করেছিল ওদের সামনে রেখে পিছন থেকে সে ঠেস দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পড়ে তার গণ্ডী ছাড়ালো। আলোচনার মধ্যে, পরে এসেও সে এগিয়ে গেল। গটফ্রিডের ভাব দেখে তার উৎসাহ বেড়ে যায়, তাই তা না করে উপায় ছিল না। তার একান্ত আশা মেঘুকে জাতে তোলা। ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেই জাতে উঠে যায় ছেলেটা। অথবা জাত অনুযায়ী হয় কাজটা। তারপর একবার গীর্জায় ঘুরিয়ে আনলেই খাঁটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। তবেই না ছেলেটাকে যত আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্ধার করা যাবে।

একদিকে দুজন খাঁটি ইংরেজ, সমাজ ধর্মে প্রোটেস্টান্ট—প্রডাকটস অব স্টার্ন রিয়্যালিটি, আর একজন অ্যাংলো-পাহাড়ী রোম্যান ক্যাথলিক—পাশ্চাত্য সংস্কারে পিঞ্জরাবদ্ধ ভারতীয় খাস-মেজাজ। অপর দিকে মাত্র একজন, জন্মে লুথেরান খৃস্টান, সত্যানুসন্ধিৎসু পারত্রিকপ্রাণ গটফ্রিড—বেদান্ত দর্শনে প্রভাবিত। ইংরেজও বটে। কিন্তু অনেকের মতে সেটা ভৌগোলিক—মনে-প্রাণে তিনি নাকি জার্মান আভিজাত্যে ভরা। কারণ, তিনি জার্মানীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গর্বিত শরণাগত যাযাবরের পৌত্র। জন্মে অভিজাত স্যাক্সন বা জার্মান, ভূবাসনে ইংরেজ, কর্মে লুথেরান সাম্প্রদায়িক পাদরী—এমন একটি ধর্মপরায়ণ লোকের সন্তান গটফ্রিড।

পূর্ব পুরুষের আভিজাত্যের আবর্তন ভেদ করে অনেক কিছু জটিলতা তাঁর চোখে পড়ে না, তাঁর মনেও স্থান পেতে পারে না। নিজেকে সঙ্কুচিত করে কোন কিছুই তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে চান না। সব কিছুই সরলভাবে গ্রহণ করা, সকল সমস্যার সরল সমাধান করা গটফ্রিডের চরিত্রগত অভ্যাস। তবুও প্রথমটা তাঁর মনে হয়েছিল মেঘুকে এরই মধ্যে এতটা তুলে দেওয়া বড় বাড়াবাড়ি হবে। এরা বলে কি? তবু তিনি সরাসরি উড়িয়ে দিলেন না কথাটা, কোন তর্কেও প্রবৃত্ত হলেন না। চুপ করে রইলেন, চুপ করে শুনতে লাগলেন সকলের কথা।

গটফ্রিডের স্বভাবে এডি সবিশেষ অভ্যস্ত, অভিজ্ঞ। সেই অভিজ্ঞতার ওপরই তার ছক কাটা হয়েছে। গটফ্রিডের নিষ্ক্রিয় মুহূর্তের প্রতিটি পলে এডি কাজ করে গেল। একে একে বিচার করে সে দেখাতে লাগল মেঘুর কর্মদক্ষতা। তারা যে দেশের লোক, যে পরিস্থিতিতে তারা মানুষ তাতে তো এমনই বোঝে। এমন করেই তো তারা কাজ ও কর্মীর মর্যাদা দিয়ে থাকে। নিছক কাজের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কোন রকম সংস্কারই এর বাদ সাধতে পারে না। অন্তত তাদের মনে তা থাকার কথা নয়।

সত্যের অপলাপ না করলে মানতে হয় যে, মেঘুর পক্ষে বলবার আছে অনেক। আর সেটা পড়েছে এডির হাতে। সে জানে, নিজেদের দেশে যেমনই হোক, এখানে পদ নির্বাচন শিক্ষা ও বংশমর্যাদা সাপেক্ষ। দুটোর একটাও নেই মেঘুর। কিন্তু, তার বিপক্ষে যা কিছু ছিল তা এডির হাতে শোধন হয়ে গেল। এইটুকু না করলে এমন বিষয় অচল থেকে যায়। আগের বারেই অচল থাকত, এবার তো থাকতই। মানুষের বাহ্যিক যোগ্যতা যতই থাক, তা দিয়ে তো সংসারে সব কাজ চলে না। ভিতরের বস্তুটাই আসল, সেটা যাচাই করে দেখতে হবে। এমনইভাবে এডি তার বক্তব্যটা পেশ করল যে গটফ্রিড তাতে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পারলেন না, তাছাড়া এরা তার অনুজতুল্য বিশ্বস্ত কর্মচারী। এদের সঙ্গে মেঘুর দৈনন্দিন কাজের সম্যক সম্পর্ক। এরা তাকে যতটা দেখে ও বোঝে ততটা তার দ্বারা সম্ভব নয়। কারো বিষয়ে কখনো এরা এমনভাবে বলে না। এরা যখন সুপারিশ করছে তখন মেঘু নিশ্চয়ই অতটা যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাগানে হাজিরা খাটার সময় মেঘু যা করেছে তা গটফ্রিডের জানা। তার ওপর এডি এবং ম্যাক যে সব দৃষ্টান্ত দিল সে সব তো মেঘুর কাজের এলাকার বাইরে। যে কাজের জন্য ওরা বলছে সে কাজ তো সে প্রকৃত পক্ষে করেই যাচ্ছে। সে কাজ তো তার মনে-প্রাণে, তার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এমন অনুসন্ধিৎসু মন, এমন দরদী মনই তো চাই সে কাজে। তবে আর আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে।

গটফ্রিড জানেন মেঘু একনিষ্ঠ কর্মী। কুলিদের মধ্যে থেকেও সে উঠে আসছে। এতটা উঠেও তাদের ছেড়ে আসতে চায় নি। অমন পরিবেশে আশৈশব বসবাস করেও ছেলেটা নিজের কৃতিত্বে লেখাপড়া শিখে, কাজকর্ম শিখে মানুষ হয়ে উঠছে। অতুলনীয়ভাবে সে সকলের দৃষ্টি মন আকর্ষণ করে চলেছে। অন্তত এ সবের অভিজ্ঞানস্বরূপ এমন একটা পুরস্কার সে অর্জন করেছে। এটা একটা দেখবার, এবং দেখাবারও জিনিস হবে।

মেঘু ওদের সুখ-দুঃখের কথা যতটা বুঝবে এমনটি অপরে বুঝবে না, সে ওদের সকল সমস্যার যেভাবে যতখানি সমাধান করতে পারবে, ততখানি আর কাউকে দিয়ে হবে না। এমনিভাবে তার সেবাযত্ন দিয়ে যদি বাগানের কুলিদের মন মেঘু জয় করতে পারে, যদি সে চালানী কুলিদের দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছায় বিরক্তি আনতে পারে যদি কুলিকামিনদের ওপর ট্রেড-ইউনিয়ন কর্তাদের প্রভাব সে শিথিল করতে পারে তবেই

না বাগানে সর্বাঙ্গীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—সকল পক্ষেরই ভাল হবে। তবে আর তাঁর ভাবনা কি! এতগুলো লোক বছর বছর আনা-নেওয়ার খরচ বেঁচে যাবে, বাগানের কাজও গমগমিয়ে চলবে। এমনি ধরনের ভাবনায় গর্টফ্রিড তখন বিভোর।

আপদগ্রস্ত ম্যাকের আপদ বিদায় করবার প্রচেষ্টা সফল হতে চলল। গর্টফ্রিড ওদের প্রস্তাব ও যুক্তি মনে মনে খতিয়ে তা অনুমোদন না করে পারলেন না। এক নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন তাদের কথায় কতখানি মূল্য তিনি দেন। অতএব তাদের বুদ্ধি ও বিচারের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে তিনি সম্মত হলেন।

বাগানের অফিস ও কল-কারখানা এক নম্বর ডিভিশনের প্রায় মাঝামাঝি গুমটির পাশে। সকল কাজকর্ম চালাবার জন্য যে কেন্দ্রীয় অফিস সেটার ম্যানেজার উইলিয়ম। ইংলণ্ডে এমন নামের সংক্ষেপ হয়—বিল। কিন্তু এখানে তাকে সবাই ডাকে—উইলি। অপরাপর ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ওয়েলফেয়ারটাও তার হাতে। আগে এই কাজটা গা-ঢাকা দিয়ে থাকত ডিভিশনের ম্যানেজারের হাতে। ঝামেলা বেড়ে যেতে আলাদা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, নয়তো নতুন ডিপার্টমেন্ট খোলার পর ঝামেলা বেড়ে গেছে। তবুও উপযুক্ত লোকাভাবে প্রত্যেক ডিভিশনর জন্য পৃথকভাবে অফিস হয়ে ওঠে নি। একটু কাজ শিখলেই কেন্দ্রীয় অফিস থেকে বদলী করে দেওয়া হয় বিভাগে। তাই কেন্দ্রীয় অফিসটাও তেমন পাকাপোক্ত হবার ফুরসত পাচ্ছে না। কাজটা আর এভাবে রাখা যায় না। তাই মেঘুকে নেওয়া স্থির হল উইলির কার্যভার লঘু করবার জন্য। তখনই তার তলব হল বড়সাহেবের সামনে হাজির হবার জন্য। অনতিবিলম্বে সেখানে এসে মেঘু শুনলো গর্টফ্রিডের সিদ্ধান্ত।

এমন একটা কাজের ভার পেয়ে মেঘু হতভম্ব হয়ে গেল। কাজ পাওয়ার আনন্দের চেয়ে কাজ নেওয়া না-নেওয়ার সমস্যাটা বড় হয়ে দেখা দিল। পারবে—কি পারবে না, কাজটা নেবে—কি নেবে না। মেঘুর মগজে বিষয়টার সকল দিক জটিল হয়ে উঠে ফুট কাটতে থাকল। এ কাজ নিলে সে কোথায় উঠে যাবে—না নিলে কোথায় পড়ে থাকবে! কাজ নিল, পারল না—চার পাশ থেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ! উঃ, কি অপমান! ঝিমঝিম করে উঠল মেঘুর মস্তিষ্কের ভিতর যত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। চায় না, চায় না সে অমন কাজ। চায় না মানের নেশায় মশগুল হয়ে অমন অপমান কুড়াবার পথ পরিষ্কার করতে।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে গর্টফ্রিডের কাছে মেঘু কাতর কাকুতি জানাল—স্যার, আমি কুলি-মজুর লোক, বাগানের কাজেই বেশ আছি। এসব কি আমাকে দিয়ে হবে!

গর্টফ্রিড একটু হেসে বললেন—কেন হবে না? মানুষই সব কাজ করে।

মেঘু উদ্বেগ প্রকাশ করে বললে—স্যার, এ কাজে কত লেখা-পড়ার দরকার—কত নোট লেখালেখি—

গর্টফ্রিড দৃঢ় স্বরে বললেন—সে ভাবনা আমার। লেখাপড়া যা জান তাতেই আমি খুশী। নোট কি? ওসব দেখতে-শুনতে,, দেখাতে-শোনাতে বেশ—ওতে কাজ হয় না। আগে কাজ করে যাও, পরে ওসব কথা ভেবো। ওর জন্য কিছু আটকাবে না। আমার স্টাফ তোমায় সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবে।

ভাঙা স্বরে মেঘু বললে—স্যার—

গর্টফ্রিড বুঝলেন একটু রাশ টেনে কথা না বললে ছেলেটা প্রকৃতিস্থ হবে না—তা না হলে তার আত্মসঙ্কোচ দূর হবে না। তিনি বললেন—কাল থেকে তুমি অফিস যাবে। উইলি তোমায় বুঝিয়ে দেবেন আমাদের পলিসি ও আর সব বৃত্তান্ত। আজ ছুটি, ঘরে গিয়ে জিরোও। দিস ইজ মাই ফাইনাল।

মেঘুর সকল কথা বন্ধ হল। তার চাইতে নিঃশ্বাসটা বন্ধ হলেই যেন ভাল ছিল।

আর সকলের উদ্দেশে গর্টফ্রিড বললেন —তোমাদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, না? আচ্ছা, এবার তোমরা যে যার কাজে যেতে পার।

কাউকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে গর্টফ্রিড উঠে ভিতরে চলে গেলেন। এডি আর ম্যাক হেসে হর্ষ প্রকাশ করল। তারাও উঠে পড়ল—মেঘুকে শুভেচ্ছা জানাল তার হাতটায় সজোরে এক ঝাঁকানি দিয়ে। কিন্তু দুজনেই উপলব্ধি করল তাদের হাতে যতখানি জোর মেঘুর হাতটা ততখানি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এমন সময় ডেভির ডান হাতটা সজোরে পড়ল নিস্তব্ধ বিহ্বল মেঘুর কাঁধের ওপর। মেঘুকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সে বললে—কনগ্র্যাচুলেশন মাই বয়, কি ভাবছ? আমরা আছি, জিঃ এমঃ আছেন—চল-চল, তোমায় ঘরে রেখে আসি। সন্ধ্যায় আমার বাংলোয় চায়ের নিমন্ত্রণ রইল তোমার।

মেঘুর মনের গগনে তখন ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাবস্থা। এই কেঁদে কেটে পড়ে আর কি। ডেভিডের কোন কথার জবাব সে দিতে পারল না। আর কিছু না বলে ডেভি তার হাতটা মেঘুর কাঁধে রেখে তাকে ঠেলে নিয়ে চলল। পুলিশ সার্জেন্টের হাতে যেন কয়েদীর মত বাঁধা পড়ে মেঘু ডেভিডের অনুসরণ করল।

(চৌত্রিশ)

কাজের সঙ্গে মেঘুদের ঘরও বদল হবার কথা। তেমন ঘরবাড়ী স্টাফ লাইনে, গুমটির পাশে। কিন্তু মেঘুরা সেখানে গিয়ে এক পক্ষের দৃষ্টিপথারূঢ়, ও অপর পক্ষের চক্ষুশূল হয়ে বাস করতে চায় নি। অমন ত্রিশঙ্কুর মতো বসবাস করা অপেক্ষা যেমন ছিল তেমন থাকাই শ্রেয় মনে করল তারা। এ বিষয়ে ঘরের সবাই একমত।

সেখানকার সকল পরিস্থিতি গর্টফ্রিড সবিশেষ জ্ঞাত। প্রত্যেকটি বিষয় তাই তিনি বিচক্ষণভাবেই বিচার করে দেখেন। তাই তিনি ধরাবাঁধা পথে চলেন না। মেঘুর যুক্তিটা তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন, তারিফও করেন। ওদের সবাই যেভাবে বসবাস করতে চায় তাতেও সকলের দৃষ্টি কম আকর্ষণ করবে না। কিন্তু সেটা হবে অন্য ভাবের। তাতে তারা সকলের স্নেহাস্পদ ও প্রিয় হয়ে উঠবে। তাই তাদের পুরানো ভিটেতেই নতুন একখানা কোয়ার্টার ওঠে। খুব কম খরচে খানকতক ছোট-বড় ঘর তৈরী হয়, নিতান্ত প্রয়োজনীয় গৃহ-সরঞ্জামে সাজানো সেটা। পদানুযায়ী ঘর এবং আসবাবও তারা নিতে চায় নি। সহৃদয় গর্টফ্রিডের জন্য এখানে সবই সম্ভব। এমনটি কিন্তু আর কোন বাগানে সম্ভব নয়।

সেখানে মেঘুকে নামিয়ে দিয়েই ডেভিড ফিরে গেল না। সে জানত, বিলি ঘরেই আছে। ডেভিডের নির্দেশে মেঘু তাকে ডেকে এনে বসাল। তিনজনই পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল একটু সময়। ডেভিডই প্রসঙ্গটা শুরু করল, সে বিলিকে জানিয়ে দিলে মেঘুর নতুন কাজের কথা। বুঝিয়ে দিল ছেলেটা কেমন ঘাবড়ে গেছে—তাকে যেন বেশ করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে দেয় তারা।

ডেভিডের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে বিলি খুব খুশী হল, আশ্চর্য হল। ঠিক তা নয়। তার মনের মধ্যে মেঘুর ভবিষ্যতের একটা সীমা নির্ধারিত ছিল। সেই সীমা সে আগেই উত্তীর্ণ হয়েছে। এত তৎপর যে আর একটা আসতে পারে তা সে ভেবে উঠতে পারে নি। তার বুকের মানিক যে কোনদিন এমন দীপ্ত হয়ে উঠে, বাগানের মানিক, এই রাজ্যের মানিক হয়ে উঠতে পারে, এটা তার স্বপ্নাতীত। তাই যতটা খুশী সে হল তার চাইতে অনেক বেশী হল আশ্চর্য। সে আর মেঘুকে কি বোঝাবে। বিস্ময়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। তার নিজেরই মনের ভিতর থেকে এক অজানা কান্নার উদ্বেগ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

সেই বিস্ময়-বিহ্বল চোখের পানে তাকিয়ে ডেভি বললে—মানুষের মন কাজের প্রেরণা পায় যথোচিত গুণাবধারণে। তার জন্য কত মানুষকে কত দিন অপেক্ষা করে থাকতে হয় কত ধৈর্য নিয়ে। সেই ধৈর্যের ফল কেউ পায় কেউ পায় না।

ডেভিডের ওইটুকু কথায় তার অতীত দিনের অভিজ্ঞতাটা প্রতিফলিত হল। নয়তো কথাটা বলতে বলতে নিজের জীবনের কত কথা তার মনে হল। কত দুঃখের কত কষ্টের সে সব কথা। কত নীচে থেকে তাকে কাজ শুরু করতে হয়েছে। কত পরিশ্রম করেছে, কত ওপরওয়ালার কত হুকুম তামিল করেছে; বিরক্ত হয়েছে, খুশীও হয়েছে এক-একজনের ব্যবহারে, কথায়। কিন্তু আসলে কিছুই হয় নি; নাম বদলে ক্যাণ্ডা থেকে হয়েছে ডেভিড, এক কারখানা থেকে গেছে আর এক কারখানায় —তবুও না। অনেকের দেখাদেখি ভেবেছিল ওয়েলস দেশীয় পিতৃত্বের জের টেনে এ্যাণ্ড্রু ডেভিড হলেই সেও ধাপে উঠে যাবে। কিন্তু, তাতে তার ভাগ্যে দু-কূলই গেল। একটা

ছেড়ে গেল আর একটায়, সেখানে পাত পেল না। কিছুই হয় নি যতক্ষণ না দেখা পেয়েছে আর একজন সমগোত্রীয়ের।

তাই না মেঘুকে দেখতে পেয়ে নিজের কর্মকালীন দুঃখ-দৈন্যের কত চিত্র তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, তাই না ডেভিড মেঘুকে তৈরী করে তুলতে কত চেষ্টা করেছে, কত যত্ন নিয়েছে। নিজে ভুক্তভোগী, তাই সে মর্মে মর্মে জানে সে সবের দুঃখ-কষ্ট, তাই সে তেমন কষ্ট ভোগ করতে দেয় নি মেঘুকে। নিজের কাছ ছাড়াও করতে চায় নি তাকে।

বিলির সামনে কথা বলতে বলতে, সে সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন ডেভিডের মাথা নুয়ে পড়েছে, মুখ বন্ধ হয়েছে, মুখ খুলেছে তার কিছুই সে জানতে পারে নি। এর মধ্যে বিলির কতখানি ভাবান্তর হল তাও তার চোখে পড়ে নি। নিজের জীবনের সে সব কথা খতিয়ে সংক্ষেপে করে সে বললে—কিন্তু মেঘুর ভাগ্যে যে তা এমন অকস্মাৎ আসবে, এত অল্প সময়ের মধ্যে যে তার এতটা উন্নতি হবে তা শুধু আমি নয়, আমরা অনেকেই বুঝে উঠতে পারি নি। স্বয়ং হের গর্টফ্রিডও না।

জীবন ভরে লছমী কত কষ্ট করেছে। কত কষ্ট করে সে মেঘুকে বড় করে তুলেছে। মেঘুও বড় হয়ে তা ভুলে থাকে নি। জোর করে সে বন্ধ করেছে লছমীর হাজিরা খাটা। ঘরের কাজও মেঘু জোর করে অনেক কমিয়ে দিয়েছে। পারে নি তার ঘর গোছানো বন্ধ করতে, আর পারে নি তাকে রান্নাঘর থেকে সরাতে। কত চেষ্টা করেছে তার চুল্লীর সামনে বসে থাকা বন্ধ করতে। তার দরকারও ছিল না। কারণ, বিনা খরচে তাদের প্রত্যেকেরই চাকর-চাকরাণী পাবার কথা। কিন্তু লছমী বেঁকে দাঁড়ায়। তারা অন্য কাজ করুক। রান্না আর ঘর গোছানো তার হাতে থাকবে। অতএব তারা নেয় মাত্র দুটি লোক। এইটুকু নিজের হাতে না করতে পারলে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই দায়। কি-ই বা কাজ! এই কটা তো মানুষ—এইটুকু কাজের জন্যও যদি অন্য লোক আনতে হয় তবে কি লজ্জা! তার মরে যাওয়াই ভাল।

অতটা চায় না বেচারা মেঘু। ছোট-মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার ইচ্ছাই তাকে মাথায় তুলে নিতে হয়। ছোটমাও মনের আনন্দে চারজনের কাজ চটপট শেষ করে, চারকে আবার কোন কায়দায় পাঁচ দিয়ে গুণ করে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকে। এক-একজনের প্রশ্নে এক-এক রকম জবাব দেয় এমনভাবে কি বসে থাকা যায়? ওমা! এটা না হলে কি চলে? এটা মেঘুর জন্য, ওটা দিদির।

লছমী তখন ছিল রান্নাঘরে, মেঘুর জন্য কি যেন একটা খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত। ঘরের সামনে মোটর গাড়ীর শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে ডিভি সাহেব! কত-বার সে দেখেছে তাকে—গুদামের সামনে যখন কোঁচড় ভরে চা-পাতার বিতরণ নিতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, তখন, যখন মেঘুর জন্য খাবার নিয়ে গেছে কারখানার সামনে, তখন। কতদিন সে পড়ে গেছে ডেভিড সাহেবের মুখোমুখি, ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ডিভি সাহেব নিজে মেঘুকে ডেকে দিয়েছে, নয়তো তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কারখানার ভিতরে মেঘুর সামনে। এমনি-ভাবে চেনা-জানা হয়ে যেতে কত সময় কত কথাও বলেছে সাহেব লছমীর সঙ্গে।

সেই সাহেব এসেছে তাদের ঘরে। লছমী হাঁপাতে-লাফাতে সামনে এল। সাদর সম্ভাষণে সাহেবকে বসাল। পারে তো নিজের চুল দিয়ে মুছে দেয় বসবার চেয়ারটা, কাপড়টা বোধ হয় ময়লা। মোটা-মুটি কথাটা বুঝেই সে আবার হাঁপাতে-হাঁপাতে, হাসতে-হাসতে চলে গেল রান্না-ঘরে — সাহেবের অভ্যার্থনার আয়োজন করতে।

মেঘুর অবসন্ন দেহটা কোনমতে এলিয়ে আছে তার মায়ের পাশে। অবচেতন মনের মধ্যে কত কথা ওঠানামা করছে। কত ভাবনার জোয়ার-ভাঁটা বইছে সেখানে। শৈশবে সে ভাবতে শিখেছে, আশৈশব সে ভেবে আসছে। এত মহলা সত্ত্বেও সেদিনের ভাবনার কুল-কিনারা সে খুঁজে বার করতে পারল না।

বিলির বুকের মধ্যে একটানা বয়ে চলেছে কত কথার স্রোত। নিজের মুখখানা লোকলজ্জার আড়ালে লুকিয়ে রাখার জন্য, যেদিন সে এই বাগানে বাস করতে এসে-ছিল সেদিন থেকে সে কত কথা ভেবেছে চা-বাগানের বাইরে ভদ্র সমাজের মধ্যে বসবাস করলে পাঁচজনের দেখেশুনে হয়ত ছেলেটার লেখাপড়া হত, হয়ত একদিন সে মানুষ হতে পারত। এখানে যদিও বাবুরা আছে, তাদের ছেলেমেয়েরাও আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশার, তাদের পড়া-শোনার আশপাশ দিয়ে চলাফেরা করবার সুযোগ তো মেঘুর হয় নি কোনদিন। বাবুদের ছেলেরা দেখেছে মেঘুকে। সে দেখা ওপর থেকে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা—ঘৃণা নয়ত করুণার সে দেখা। সেই ঘৃণা গায়ে মেখে নিতে, সেই করুণা কুড়িয়ে নিতে মেঘুও যায় নি কখনো। সে ঘৃণার রাস্তা ধরেই চলেছে তার বন্ধুদের সঙ্গে তাই মেঘু যখন বাগানে কাজ করতে গেছে বিলি ভেবেছে—ছেলেটাকে জন্মের মতো কুলি করে দিল সে। তার এই কুলি-জীবন থেকে উদ্ধার পাবার কোন পথ সে খুঁজে বার করতে পারে নি। নিজেকে কত অপরাধী মনে করেছে। নিজের সরমের জন্য এত মরমের বস্তুর পানে ফিরেও চায় নি সে। ছেলেটার ভবিষ্যতের সব আশা-ভরসা শেষ করে দিয়েছে। মা হয়েও সে এমন করতে পেরেছে।

সেই মেঘু এখানে থেকেই লেখাপড়া শিখল, শিখছে। মেঘুর কাজে উন্নতিও হল! একদিন যে কথা তাকে কত দুঃখ-বেদনা দিয়েছে, সেদিন তা আনন্দের আরতি, তার কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে নি। ডেভিড যত কথা বলে গেছে তার সব কটা বিলির কানেও পৌঁছয় নি তার হৃদয়ের উৎসবের হট্টগোল ভেদ করে। তাই ডেভিড কত কথা বলে গেল, কিন্তু তার জবাবে কিছুই বলতে পারল না বিলি। নয়তো বলবার মতো কোন কথা হাতড়ে পেল না।

ডেভিডের কান দুটো খাড়া ছিল বিলির মুখ থেকে কিছু একটা শোনবার আগ্রহে। কিন্তু তা হল না। তাই সে হঠাৎ কথা বন্ধ করে মনে মনে আলোচনা করতে থাকল। মেঘুর বিষয় যে দু-চার কথা সে জেনেছে শুনেছে, তার ওপর দিয়ে কখন তার মন মৃদু বিচরণ শুরু করে দিল। মনের সেই অবস্থায় যেন তার একটি ভাব পূর্ণতা লাভ করল। এবং পাকা ফলটির মতো প্রবল মাধ্যাকর্ষণে সেটি শিথিল বৃন্তচ্যুত হয়ে নেমে আসতে চাইল।

হঠাৎ ডেভি হেসে উঠল। সেই হাসির রেশ টেনে সে বললে—মেঘু সাহেব হতে চেয়েছিল, সে সাহেবের কাজই পেয়েছে। বাকীটুকু আমি করে তবে ছাড়ব। আমি তাকে সাহেব—

কথাটা শেষ না করেই খুব ব্যস্তভাবে সে থেমে গেল, একটু ভেবে আবার শুরু করে বলল—থাক, সে পরের কথা। আচ্ছা, গুড—। এই পর্যন্ত বলে, চলে যাবার জন্য চেয়ার ছেড়ে ডেভিড উঠে দাঁড়াল।

ডেভিডের উদ্দীপক নির্ঘোষ মেঘু ও বিলির মনে বা মুখের ওপর কোন প্রতি-ক্রিয়া করল না। কিন্তু সেই মুহূর্তে লছমী তার প্রতিক্রিয়া দেখাল প্রস্থানোদ্যত ডেভিডের পথরোধ করতে। চা তৈরীর সরঞ্জাম বোঝাই ট্রেখানা টেবিলের ওপর রেখে লছমী বললে—চা না খায়ে যাতে নাই পারবেক।

ব্যস্ততার জের টেনে ডেভিড বললে—নাঃ, এখন আর চা খাব না। থাক, আর একদিন হবে।

লছমী ছাড়বে না, বললে—বাঃ, তা কি রকম হয়! কুনোদিন হামদের ঘরে আপোনি নাই আসেছে। তার উপর ইমন খবরটা আনে দিলেন। শুধু খবর কিনো, কামটাই তো কইরে দিলেন।

কথাটা শুনে ডেভিড খুশী হল, কিন্তু বিনয় দেখিয়ে বললে—আমার কি ক্ষমতা আছে। সবই ওর ভাগ্য, ওর কাজের গুণ।

বিজ্ঞের মতো লছমী বললে—সি সোব জানে, সোব বুঝে হামরা। তাই হামি কইছি, চা না খায়ে যাতে নাই সেকবে ইখান থাইকে।

লছমীর বোধশক্তিটা ডেভিড মেনে নিল। সে খুশী মনে আবার বসল, এক বাটি চা-ও ঢেলে নিল। চায়ের বাটিতে চামচে নাড়া দিয়ে বললে—জান যদি, তবে আর একটু জেনো—এক পট চা আর খাবার খাইয়ে ছাড়ান পাবে না।

ডেভিডের মুখে ফুটে উঠল একটা অর্থপূর্ণ হাসি। এই দুটো ঘরের ভাব-ধারায় এতই পার্থক্য যে ডেভিডের কথার তাৎপর্য এদের কারো বোধগম্য হবার নয়। লছমী নগদ মজুরী খেটে জীবন কাটিয়েছে। ধার বাকীর ধার ধারে না। যেমন বুঝল, তেমন জবাব দিয়ে সে বলল—তোবে কি খাইবেন? কি লাগে কহেন।

একবার কথাটা বলতে গিয়েও ডেভিড নিজেকে সামলে নিয়েছে। এত তৎপর ঠিক হবে না, পরে সময় বিশেষে বলবে। কিন্তু এদের সংগে এত আলোচনার সুযোগ, বা এদের এত কথা শোনাবার প্রয়োজন তার হয় নি কখনো। তাই সেদিনই সে বুঝল, যখনই হোক, খুলে বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আভাস ইঙ্গিতে বোঝবার মত চতুর নয় এরা। তাই আবার মনের কাঁচা কথাটা পেকে উঠে তখনি বুঝি টুপ করে পড়ে যায় ডেভিডের মুখ থেকে। সে হাসতে হাসতে বললে—হুঁ, খাবার যা চাইব তা দিতে পারবে। কিন্তু আর কিছু যদি চেয়ে বসি?

কথাটায় যেন কেমন এক ধাঁধা লাগল লছমীর। তাদের কাছে তার মতো লোকের এমন করে চাওয়ার কি থাকতে পারে! শুনেছে সে খুব কড়া লোক, ভালও। তবু তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। এপাশ-ওপাশ চোখ ফিরিয়ে কি যেন দেখে নিল, ভেবে নিল। মেঘু আর বিলির মুখেও কোন ভাবান্তর লক্ষ্য হল না। তারপর নিজেকে ঠেলে-সামলে জবাব দিলে—হামরা দুখীয়া, হামদের আর কি আছে। ই ঘরের হামরা সব কেইটা আপনার গোলাম আছি।

লছমীর অমন কথায় ডেভিড বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, বলল—ছি ছি! তুমি কি ভেবেছ আমি তোমাদের সেই চোখে দেখি!

সাহেব ছি-ছি, বললে! কি যেন অন্যায় হয়ে গেছে। লছমী বেশ অপ্রতিভ হল। তার কালো মুখ সাদা হল। সাদা মুখ থেকে চোখ দুটো বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে মেঘুর পানে চাইল। মেঘুর কোন সাড়া না পেয়ে সে বিলির শরণাপন্ন হল।

এতক্ষণ পর বিলি কথা বলতে চেষ্টা করল, বা বাধ্য হল। লছমীর অসহায় ভাবটার সূত্র ধরে পিছিয়ে গেল ওদের দুজনের কথায়। সে-সবের যোগাযোগ করে সে যেমন সিদ্ধান্তে পৌঁছল তেমনই জবাব দিল। বিলি বললে—লছমী ঠিকই বলেছে মিঃ ডেভিড। মেঘুকে আপনি স্নেহ করেন, যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। তা নইলে সে এতটা উঠতে পারত না। মেঘু আপনার ছেলের মতো। সেই সংগে আমরাও আপনার কাছে কৃতজ্ঞতায়—

ব্যস, এর বেশী আর কিছু শোনবার আশা করে নি ডেভিড। তাই বিলির কথা শেষ হবার আগেই সে শুরু করে দেয় তার কথা। একটু প্রশস্তি ভালবাসে না এমন মানুষ সংসারে বিরল। ডেভিড এত খুশী হল যে, বিলির কথাটা কাটতে চাইল না। তাদের একেবারে গোলামী থেকে কৃতজ্ঞতার পর্যায় আনাতে ডেভিড আশ্বস্ত হল। মেঘুকে পুত্রবৎ সমর্পণ করার জন্য সে বড় তুষ্ট হল। তার মর্মার্থ যতখানি টানা যায় ততখানি টেনে ধরেই জবাব দিল। সে বলল—বেশ বেশ, মনে থাকে যেন। আর যেন কথাটা না ঘোরে।

আন্তরিকতার আবেগ ঢেলে বিলি বললে—সে আনুগত্য, সেটুকু কৃতজ্ঞতা চিরদিনই আমাদের কাছ থেকে পেতে যাবেন মিঃ ডেভিড। নিঃসংশয়ে তা বিশ্বাস করবেন।

দুটো ঘরের মধ্যে যত তফাতই থাক, বিলি তো আর লছমীর মতো নয়। তাই ডেভিডের মনের কথা না জেনেও বিলি এতখানি বলে ফেলতে পারল। আর বিশেষ জানবারই বা কি এমন থাকতে পারে। তার বিবৃতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতায় সমাবিষ্ট। তবে এটা ঠিক যে ডেভিডের কথার ভাবার্থ বুঝে বিলিকে জবাব দিতে হলে, সেটা যে কি হত তা বলা সহজ নয়।

যতটা ভেবেছিল ডেভিড ততটা আনাড়ী নয়তো এরা! এই তো বেশ বুঝ-দারের ধরনে কথা বলছে। পলকের জন্য ডেভিডের চোখ দুটো স্থির হল বিলির মুখের ওপর। তার উৎসাহ গড়িয়ে পড়ে সে মুখ দেখে। তখনই তার উচ্ছ্বাস পড়তে চায় বিলির কানে। কি একটা ভেবে আবার থেমে গেল। সবই যখন ঠিক আছে তবে এখন থাক। তবুও পুরোপুরি লাগাম কষতে পারল না, খানিকটা আবেগ গড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে তার কথা শোনাবার মতো এমন মানুষের দেখা সে পায় নি জীবনে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডেভিড বললে—আমায় যেন ভুল বুঝো না তোমরা। আমার এই দেহটার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি একটি শিশুর দারিদ্র নিষ্পেষিত দিনের ব্যথাভরা কত স্মৃতি। তখন তার নাম ডেভিড ছিল না—ছিল কাঞ্চা। আমি তোমার কথা বিশ্বাস না করলে, কে করবে মিসেস জনসন?

মিসেস জনসন!

এমন সম্বোধন বিলি বহুদিন শোনে নি। হঠাৎ তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। নিজের দুঃখের ভারে ডেভিডের এতখানি বুকভরা ব্যথার নিঃশ্বাসটা কোথায় তলিয়ে গেল। এই একটু আগে সে যেমন বলেছে, তেমনভাবে সময়োচিত সৌজন্য রক্ষা করতে একটা কথাও বলতে পারল না বিলি। সময়োচিত কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না বিলির মুখে।

কথাটা বলেই ডেভিড স্থাণুর মতো স্থির হয়ে বসেছিল নতমুখে। মনটা তার যেখানেই থাক না কেন, কান দুটো ছিল সতেজ। কথাটা যখন বলা হয়ে গেছে, তখন বিলির দুটো সহানুভূতিসূচক কথা শুনতে হবেই। নির্দিষ্ট সময়টা অনেক আগেই পার হয়ে গেল। তার আশা পূর্ণ হল না। তখন সে মুখ তুলে চাইল। বিলির মুখ দেখে সে ব্যথিত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। যত বড় সজাগ সাহেবই হোক না সে আজ, তার ভিতরের কাঞ্চাটিও ঘুমিয়ে নেই। তাই ডেভিড বুঝল — কি ভুল সে করেছে। নিজের ব্যথা ও আনন্দ মাখামাখি হয়ে, তাতে হাবুডুবু খেতে বিলিকে তার হারানো সম্মানটা দিতে গিয়ে সে কি করে বসল। আর কোন কথা বলে বিলির দুঃখ কমাতে গিয়ে, তা বাড়িয়ে তুলতে চাইল না। চুপচাপ চা-খাওয়া পর্ব শেষ করে ডেভিড বিদায় নিয়ে চলে যাওয়াই স্থির করল। যাবার আগে তার বাংলোয় চা খেতে যাবার কথাটা মেঘুকে মনে করিয়ে দিল।

লছমী এতক্ষণ এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ওদের ইংরেজী কথাগুলোর কিছুই বোঝে নি সে। শুধু মিসেস জনসন কথাটা বুঝেছে। তার পরেই কে কেমন হয়ে গেল। বিলিকে সে ভালই জানে। বাকীটুকু সে আন্দাজ করে নিল।

ডেভিড উঠে দাঁড়াতে কেউ যখন কোন কথা বলল না, তখন লছমীকেই যেতে হল এগিয়ে। মেঘু আর বিলি যখন দুঃখে-আনন্দে এতই ম্রিয়মাণ তখন লছমীর কাছ থেকেই বিদায় নিয়ে আসতে হল ডেভিডকে।

(ক্রমশঃ)

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আধ্যাত্মিক উন্নতির উপদেশ, সাধন-পদ্ধতির ব্যাখ্যা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালনের উপায় ও নির্দেশ দেওয়ার জন্যে সত্যচরণ শাস্ত্রী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বেলুড় মঠের শরৎ মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতা নিয়মিত এসে সভ্যদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন। বেদ উপনিষদের অমৃতের সন্ধানও দিতেন শরৎ মহারাজ বা স্বামী সারদানন্দ। ছেলেরাও গড়ে উঠেছিল—জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্তভাবনাহীন। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' শুনতে শুনতে তারা যে অমৃতের পুত্র—এ ধারণা মর্মে মর্মে গেঁথে গিয়েছিল তাদের।

ইতিহাস পড়াবার ভার স্বয়ং মিত্তির সাহেবের। ক্লাস হত তাঁর নিজের বাড়ীতে। করোদার দলের কথা শুনে প্রথম দিকেই এলেন সিস্টার নিবেদিতা। হাতে দিয়ে গেলেন তাঁর বিপ্লববাদ সংক্রান্ত সংগ্রহ গ্রন্থ। আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইটালীর মুক্তিদাতা ম্যাটসিনি ও গ্যারি বল্ডীর জীবনী, রমেশ দত্ত, ডিগবী ও দাদাভাই নৌরজীর অর্থ-নীতির বই, অধ্যাপক ওকাফুরার বই। বিদেশী মেয়ে নিবেদিতা ভারতকে করে নিয়েছিলেন নিজের মাতৃভূমি। তাই ভারত কল্যাণে নিবেদিত-প্রাণা সার্থকনাম্নী নিবেদিতা। পরাধীন ভারতের দুঃখ বেজেছিল তাঁর কোমল প্রাণে, তাই ভারতের স্বাধীনতা কামনা করেছিলেন মনে প্রাণে।

ছেলেদের পড়াতে হবে—পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত হল নিবেদিতার দেওয়া বইগুলি। অন্য বইগুলি নিয়ে কোন কথা নেই—চলল বেশ. একটু মুস্কিলে পড়তে হল ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর জীবনী নিয়ে। বিচিত্র জীবন-চরিত, বিদেশী চোস্ত ভাষায় লেখা বড় বই। শিক্ষিত হলেও ছেলেরা সবাই তো আর বিদেশী ভাষায় খুবই কৃতবিদ্য হয়ে ওঠে নাই। পড়ে বোঝাতে সময় লাগে। এত সময়ই বা কোথায়? দেখে শুনে অল্পদিনেই যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ সহজ সরল। সাবলীল ওজস্বী ভাষায় বাঙলায় অনুবাদ করে ফেললেন ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী। মুস্কিল আসান।

পড়া আর পড়ানেওলা হল এবার পোড়ো বাছাই—সভ্য নির্বাচন আর সভ্য হবার নিয়ম। স্বাস্থ্যবান—তা শরীর মন দুদিকেই. দেহে যেমন বল, মনেও তেমনি চাই শৌর্য, তেজ, একাগ্রতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আনুগত্য আর বিশ্বস্ততা। পরীক্ষা করা হত ছেলেদের নানাভাবে। কঠোর পরীক্ষায় পাশ করতে হত তাদের। 'মরতে ভয় কর না? দেশের জন্যে মরতে পার'?—এইরকম কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হত তাদের। উত্তরগুলো শুধু মুখের কথা না বুকের কথা—তাও যাচাই করে নেওয়া হত নানা-ভাবে। তা ছাড়া আরও পরীক্ষার বিষয় ছিল ছেলেদের অজ্ঞাতসারে। বাড়ীর লোকের সঙ্গে ব্যবহার, কি রকম ছেলের সঙ্গে মেলামেশা, কি রকম কাজে নেশা (হবি) সব দেখে নেওয়া হত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নির্বাচিত হলে ভর্তি।

আঙুল কেটে রক্তে সই করতে হত প্রতিজ্ঞাপত্র। ছেলেরা প্রায় সবই তো হিন্দু। হিন্দুর শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কার। ধর্মের ছোঁয়াচ চাই। বেদান্ত উপনিষদ থাক্, সর্ব উপনিষদ সার শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'গীতা' হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আর বীরধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ঢাল তরোয়াল। নিয়ম হল—এক হাতে গীতা আর এক হাতে ঢাল তরোয়াল ছুঁয়ে শপথ করে সই করতে হবে গুপ্ত সমিতির পত্রে। মন্ত্র রচিত হল সংস্কৃতে। দীক্ষিত গুরু ছাড়া দীক্ষা দিতে পারবে না আর কেউ। তাই কদিন পরেই সমিতির পরিচালক ও কর্তৃ-পক্ষ বলেছিলেন—'সিক্রেট সোসাইটির উদ্দেশ্য, কার্য প্রণালী ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা যা আগে স্থির করেছিলাম, তা থেকে অনেক নতুন জিনিস এঁর (যতীন ব্যানার্জির) কাছে পেলাম। যেমন—লাঠি ও তরোয়াল ঘুরোন, কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদি শেখা, আর সভ্য হতে হলে ঢাল, তরোয়াল সাক্ষ্য করে গীতা ছুঁয়ে দীক্ষা দেওয়া। ক্ষমতা প্রাপ্ত দীক্ষিত গুরু ব্যতীত আর কেউ দীক্ষা দিতে পারে না। দীক্ষার মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পরীক্ষার পর দীক্ষা দেওয়া হয়। এর আগে আমাদের কোন মন্ত্র ছিল না. ধর্ম কিংবা ভগবানের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ ছিল না।'

প্রতিজ্ঞাপত্রের সারাংশ—কোন মন্ত্রণা বা তথ্য প্রকাশ করবে না, কোন প্রতারণা করবে না, সমিতির বিরুদ্ধ আচরণ করবে না। রাজশক্তির গুপ্তচর বৃত্তি করবে না। প্রাণ পর্যন্ত পণ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাহায্য করবে। কাজ সফল করবার প্রয়াসে যত্নবান হবে। আদেশ—তা যে আদেশই, আদেশ মাত্রই বিনা দ্বিধায় সেই মুহূর্তে পালন করবে। অযথা কৌতূহল প্রকাশ করবে না।

এ রকম মন্ত্র-গুপ্তি শিক্ষা দেওয়া হত যে একজন কি করছে, কেন করছে অন্যজন তা জানতে পারত না। এমন কি—যে করছে সে নিজেই জানত না তা। কোথাও চিঠি দিতে হবে—চিঠিতে কি লেখা আছে তা জানবার উপায় নাই। কাউকে কিছু বলতে হবে—মুখস্থ করা কথা কটি: কেন বলছে তা জানে না, অনেক সময় কি বলছে—তাও জানে না—মুখস্থ করা সাংকেতিক। কোথাও জুতোর বাকস দিয়ে আসতে হবে. কেমন জুতো খুলে দেখবার হুকুম নাই. জুতোর বদলে পিস্তলই যাচ্ছে হয়তো। দায়দায়িত্ব সব কিছুই ন্যস্ত ছিল এমনি বিশ্বাসের ওপর। বিশিষ্ট নেতারা পিছনে থেকে সংগোপনে পরিচালনা কর-তেন এই সব। তাঁরাই ছিলেন Brain behinds the organisat'on প্রতিষ্ঠানের মগজ। নিয়মকানুন কর্মপ্রণালী

তো একরকম হয়ে গেল, এরপর কর্মক্ষেত্রে। দু চোখ রগড়ে চুপ করলেন স্বামিজী।

—সংস্কৃতে দীক্ষা মন্ত্রটা কি বাবা? জিজ্ঞেস করলুম সাগ্রহে।

—দীক্ষা মন্ত্রটা?—উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে চেয়ে ঠোঁট নেড়ে স্বামিজী গন্ গন্ করলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—

—নাঃ থাক্, শুনে কাজ নাই। বড়দের জন্যে, তোমার মত ছোটদের জন্যে নয়।

চুপ করলেন স্বামিজী।

সব সময়ে ছোট থাকলে চলে না, মাঝে মাঝে বড় হবার দরকার হয়, তার তো উপায় নেই—খুঁত খুঁত করতে করতে চলে গেলুম রান্নাঘরে।

খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে ঘুম হল না অনেকক্ষণ। বার বার মনে হতে লাগল—সত্যানন্দ, ধীরানন্দ—আনন্দমঠের সন্তানদের কথা। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি অনেক রাত্রে।

ছাব্বিশ

রীতিমত সান্ধ্য-আসর।

তামাক খাওয়ার পর তাকিয়া কোলে সোজা হয়ে বসে স্বামিজী বললেন—

—অনুশীলনের অনুশীলন, গুপ্ত সমিতির গুপ্তমন্ত্র—সব সারা। আর কি—ব্যস্।

—সারা কোথা, সবে তো শুরু। সম্পাদকমশায় এলেন মাত্র। সম্পাদনাটা শুনতে হবে না?

—অনুশীলন, গুপ্ত সমিতির গুপ্ত মন্ত্র, আবার—সম্পাদনা? নাঃ, পুলিশ না আসা পর্যন্ত ছাড়বে না দেখছি—অধরোষ্ঠ চেপে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে ঈষৎ মাথা নেড়ে বললেন স্বামিজী।

—আশ্রমে কত লোকই তো আসে। আসুক না পুলিশ, ক্ষতি কি?

আসবে—ঐ পর্যন্তই, যাবে—লাঠি বন্দুক ফেলে ভূপেনদার মতই দন্ডকমন্ডলু হাতে।

—এঃ সবাই তোমার ভূপেন দা, লাঠি বন্দুক ফেলে যাবে দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে—স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন স্বামিজী।

থতমত খেয়ে একটু চুপ করে থেকে বললুম—তা ছাড়া আর কি? যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ। এ আশ্রমে পুলিশ এলেই তাকে হতে হবে—ভূপেনদা। না হলে বুঝতে হবে—পুলিশ নয় রে ফুলিশ। পুলিশ ফুলিশ যেই আসুক, আগে তো সম্পাদনাটা হয়ে যাক।

—শান্তশিষ্ট গোবেচারা ভালমানুষ বললেই মনে হত। তা নয়—খুব দুষ্টু, একটা ঝঞ্ঝাট না বাধিয়ে ছাড়বে না।

ঝঞ্ঝাট কি হয়েছিল কম! কাজ তো দুটি—সভ্যদের পুষ্টি, সমিতির পুষ্টি, কর্ম—অনন্ত। সভ্যদের পুষ্টি—রুটিন মাফিক সুশৃংখল নিরঙ্কুশ শিক্ষায়, আর সমিতির পুষ্টি—সুযোগ্য সভ্য, সুশিক্ষিত সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ও অর্থ সংগ্রহে। বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র। প্রথম কাজটিতেই হাত দেওয়া গেল প্রথমে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হল ছেলেদের শিক্ষার ওপর।

ক' মাসের সমবেত চেষ্টায় বেশ স্বাস্থ্য-সুন্দর, উৎসাহী, কর্মঠ, পরোপকারী উদার হয়ে উঠল ছেলেদের দল। আভিজাত্যের গুমোর ভাঙল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের, আর ভুল ভাঙল মধ্যবিত্তদের। সভ্য হবার আবেদন আসতে লাগল সব শ্রেণী থেকেই। মণিহারের মধ্যমণির মত উজ্জ্বল রত্নও যোগাড় হয়েছিল অনেকগুলি। তার মধ্যে প্রথম পাদের একটি—ওই যাদুগোপাল। যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতি। চলন, বলন, গতি প্রকৃতি—সিংহের মত। চোখ কি—সন্ধানী আলোর মতই জ্বল-জ্বলে— অন্তর্ভেদী, মুখ দেখেই বুঝতে পারত লোকের মনোভাব। কাজে কর্মে সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে একটি ব্রহ্মাস্ত্র। অমিততেজা, অমিতবিক্রম,—অভী, দেশের জন্যে উৎসর্গিত-প্রাণ। বুল ডগের Tenasity যা ধরবে তা করা চাই। যে কোন দুরূহ কাজের ভার দিলেও শেষ না করে ছাড়ত না কখনও। পরে কটি কেন্দ্র পরিচালনার ভার পড়েছিল যাদুর ওপর। দেশ তখন মীরজাফরে ভর্তি। গুপ্তচরদের কাছে খবর পেয়ে বৃটিশ প্রভুদের শনির দৃষ্টি পড়ল যাদুগোপালের ওপর। গ্রেফতারের ফতোয়া জারি করল। তা গ্রেফতার করবে কাকে? ও কি সেই ছেলে! কত কৌশলে কত রকমারি ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল নানান জায়গায়। যাদুগোপালকে ধরে দিলে ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলে সরকার। ধরা না দিলে ধরবে কে? ঘোষণাই সার হল, পুরস্কার পেল না কেউ। শেষ দিকে অবশ্য ধরা দিয়েছিল—অনেকটা আশাহত হয়ে। বাঙলায় ঢোকা নিষিদ্ধ করে সরকার অন্তরীণ করলে রাঁচিতে। এখনও সেখানে ডাক্তারী প্রাকটিস করছে যাদুগোপাল।

সমিতি পরিচালিত হতে থাকল বেশ ভালভাবেই। এর উচ্চ আদর্শে আকৃষ্ট হল জনসাধারণ—বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়। দলে দলে পরীক্ষা দিয়ে সভ্য হতে লাগল তারা সবরকম বিপদের ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করে। নেতৃবৃন্দেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, হাইকোর্টের উকিল রাসবিহারী ঘোষ খুব সাহায্য করলেন সমিতিকে।

এইবার সমিতির প্রসার। জনগণের একান্ত আগ্রহ আর সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে প্রধান কেন্দ্রের আদর্শে কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে খোলা হল শাখা-সমিতি। বছরখানেকের মধ্যেই দর্জি-পাড়া, পটলডাঙ্গা, গ্রে স্ট্রীট, খিদিরপুর হাওড়া, সালিখা, শিবপুরে হল শাখা-সমিতি। এইসব শাখার সভ্যদের শেখাবার জন্যে কেন্দ্র-সমিতি থেকে পাঠানো হত শিক্ষক। প্রত্যেক শাখা-সমিতিতেই থাকতেন এক একজন সুযোগ্য পরিচালক।

প্রসার চাই। শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে তো হবে না—সারা বাংলায় সারা ভারতে ছড়াতে হবে সমিতির আদর্শ। সমিতি খোলা হল কলকাতার আশে পাশে উপকণ্ঠে। প্রত্যেক শাখায় রাখা হল সুযোগ্য পরিচালক। বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর ও হরিপালে হল শাখা-সমিতি। বালী সমিতির পরিচালক ছিলেন—রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরে অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ ও জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হরিপাল ও তারকেশ্বরে ডাক্তার আশুতোষ দাস।

সমান উৎসাহ, সমান উদ্দীপনা—পরি-চালক ও পরিচালিত—দু দলেই। সমিতি দিন দিন প্রগতির পথে।

উপকণ্ঠের কাজ সেরে যাত্রা করা গেল চন্দননগরে। প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের কাছে। দু-তিনদিন ধরে আলাপ-আলোচনা হল অনেক। সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালীর কথা শুনে খুবই উৎসাহবোধ করলেন, তবে জানিয়ে দিলেন বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নামতে পারলেন না তিনি। একটি সংঘ পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে। পরোক্ষে সাধ্যমত সাহায্য করবেন। আলো-চনার মোড় ঘোড়ান গেল—দেশ তো নিজের সংঘই পরিচালনা করুন দেশের ভাঙাচোরা অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে গড়ে তুলে। দেশের গরীব গুর্বো কারিগর শ্রেণীর নিজেদের পরিশ্রমে দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাবার ব্যবস্থা করুন নিজের সংঘে। তাও দেশের কাজ, সমিতির উদ্দেশ্য।

মনে ধরল কথাটা। সমাজহিতৈষী ত্যাগীপুরুষ মতিলাল রায় বললেন—কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রী, তাঁতি—সমাজের কারিগর শ্রেণীর লোকেরা যাতে নিজেদের পরিশ্রমে খেয়ে পরে সংসার চালাতে পারে, সুখেস্বচ্ছন্দে থাকতে পারে এমন একটা প্রতিষ্ঠান সংঘে যুক্ত করলে কেমন হয় ব্যানার্জি মশায়? কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান। কাঠের নানারকম আসবাবপত্র, মাটির বাসন পুতুল খেলনা, তাঁতের ভাল ধুতি শাড়ি তোয়ালে পর্দার প্রয়োজন ও চাহিদা কম নয়। আধুনিক রুচিসম্মত নতুন নতুন ভাল ডিজাইনের ঐ সব জিনিস বাজারে ছাড়লে কেমন হয়? একটা যৌথ শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। সমবায় প্রথায় কাজ করে বিক্রয়লব্ধ অর্থে কারিগরদের উপযুক্ত পারি-শ্রমিক দিতে পারা যাবে না কি? অবশ্য প্রথম প্রথম প্রচার কাজেও পরিশ্রম ও খরচ

করতে হবে যথেষ্ট। এই রকম একটা কিছু করলে কেমন হয়?

—খুব ভাল হয়, রায়মশায়। গোলামীর নেশা কাটবে, অভাবের তাড়নায় জর্জরিত হতে হবে না, মনের আনন্দে শিল্প সৃষ্টি করবে কারুশিল্পীরা। তাদেরও দুঃখ ঘুচবে দেশের লোকেরও রুচি খুলবে। সমিতির উদ্দেশ্যের এও একটা দিক। এইভাবেই করে যান দেশের কাজ। গড়ে তুলুন ভাঙাচোরা অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে। শুভস্য শীঘ্রম্—দেরী করবেন না।

ক'দিন থাকা গেল মতিলাল রায়ের অতিথি হয়ে। কী আদর যত্ন অতিথি সৎকার! অবসর সময়টা কাটত নানা আলোচনায়। কাজ বলতে —ঘোরাঘুরি, প্রচার, সভ্য সংগ্রহ। যোগাড় হল বেশ কটি করিৎকর্মা পছন্দ সই ছেলে। সমিতির সভ্য হবে তারা। করা গেল 'সুহৃদ সম্মিলনী'—শাখা সমিতি। এখানেই দীক্ষিত হল সব। সেরা ছেলে জুটেছিল পনেরো বছরের রাসবিহারী বসু।

তারপর কলকাতায়। আলাপ হল পি মিত্রের সঙ্গে। সব শুনে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললেন—খুব ভাল কাজ—জাতি গঠনমূলক কাজ। স্কুল কলেজে পড়ে গোলামীর নেশা যেন ছেলেদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া করবেই বা কী, স্কুল কলেজের পড়া শেষ করে? ওগুলো গোলাম তৈরীর কারখানা বৈ ত নয়। না হল কোন শিল্পশিক্ষা, না হয় কারিগরি শিক্ষা। কোনরকম Practicle Technical শিক্ষার ব্যবস্থাই নেই ওখানে। জীবিকার জন্য সংসার চালানোর জন্যে যা হোক একটা পেশা চাই তো। কাজেই শিক্ষিতদের গোলামীই পেশা গোলামীই নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমিতিরও এদিকটা একটু ভাববার বিষয়। এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন একটা কারিগরি শিক্ষা পেতে পারে ছেলেরা। তবেই ভবিষ্যতে স্বাধীন জীবিকার পথ দেখাতে পারে তারা।

আলোচনা চলল সতীশ বসু, সুরেন ঠাকুর, শশী চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন, সুরেন হালদার, আরও কজন হোমড়া-চোমড়া সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে। ফলে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' প্রতিষ্ঠা। কেতাবী লেখা-পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রইল নানারকম টেকনলজি ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থা। এর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয় প্রত্যেক ছাত্রকেই শিখতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। প্রতিষ্ঠানের জায়গা নির্বাচিত হল। কলকাতার কাছেই যাদবপুরে পল্লী প্রচুর জায়গা, স্থানীয় বাসিন্দারাও কর্মী শ্রম-জীবী শ্রেণীর। শিক্ষার আলো পায়নি তারা! ম্লান হয়ে থেকেই কারিগরির দিকে ঝোঁক। যোগ্য ছাত্র মিলবে অনেক। শিক্ষার আলোয় সুপথ দেখতে পাবে—সুনিপুণ কারিগর হয়ে উঠবে তারা।

সবই ঠিক—কিন্তু অর্থ সমস্যা। ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। টাকার জন্যে বড় কাজ মহৎ কাজ আটকায় না কখনও। মুক্ত হস্তে দান করলেন রাজা সুবোধ মল্লিক, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। এইবারে শিক্ষক। ভাগ্যগুণে প্রত্যেক বিভাগের জন্যেই মিলে গেল সুশিক্ষিত সুযোগ্য শিক্ষাব্রতী। এঁদের মধ্যে নাম করা যায় বিখ্যাত শিক্ষক অরবিন্দপ্রসাদ ঘোষের। যেমন তাঁর শিক্ষা-দানের পদ্ধতি তেমনি তিনি সময়ানুবর্তী।

যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজির নাম শুনেছ তো? জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরই পরবর্তী নামান্তর। কত বড় বড় নামকরা ইঞ্জিনীয়র বের হচ্ছে এখান থেকে।

একদিন এলেন ভগিনী নিবেদিতা। প্রতি রবিবার মর‍্যাল ক্লাসে তো বটেই প্রায়ই আসতেন তিনি সমিতিতে। সমিতির সঙ্গে প্রাণের নিবিড় টান ছিল তাঁর। বিদুষী তেজস্বিনী আইরিশ মেয়ে— বিবেকানন্দের মানসকন্যা। তা—মানসকন্যাই বটে। বিবেকের—'হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী...বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, আমার কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'—বীর বাণীর মূর্ত প্রতীক। বিবেকানন্দ বলতেন—My role is to awaken the nation.

এই গুরুবাক্যকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। ভারতবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন তিনি। তার খেসারত দিতে হয়েছিল তাঁকে—গুরুদেবের স্মৃতি বিজড়িত বেলুড় মঠ ত্যাগ করে। বেদনাদায়ক হলেও সংকল্প সাধনের জন্যে, গুরুদেবের আরব্ধ কাজসম্পন্ন করবার জন্যে অতি প্রিয় বেলুড় মঠের সংশ্রব ছেড়েছিলেন নিবেদিতা। ঘোরতর ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন তিনি। ভারতবাসী স্বাধীন হোক—এই ছিল তাঁর প্রাণের কামনা। আবেদন নিবেদনকারী কংগ্রেসের ওপর আস্থা ছিল না তাঁর। কংগ্রেসের নেতাদের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—
slaves want to make slaves.
নিবেদিতার মত গুরুবাক্যানুসারী। ইংরেজরা থাকতে ভারত কখনও স্বাধীন হতে পারে না—এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা।

বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন নিবেদিতা, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করে কারুর সন্দেহভাজন হতে চাইতেন না। তাই তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করেছেন খুব কম। কিন্তু গুপ্ত সমিতির সভ্যদের উৎসাহিত করতে যখন বক্তৃতা দিতেন নিবেদিতা মনে হত একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। পেসিনসন যে বলেছেন— "Flamlike" তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। গুরুর ধর্ম—স্বধর্ম, গুরুর জাতি—স্বজাতি, গুরুর দেশ—স্বদেশ হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার। ১৮৯৯ সালে গুরুপ্রাণা নিবেদিতা লিখলেন— Kali the mother গ্রন্থ। তাঁর অমর লেখনীতে মাতৃকণ্ঠে নিনাদিত হল তাঁর গুরুদেবেরই উদাত্ত কণ্ঠের বীর বাণী—

> Arise my child and go forth a man. Bear manfully what is your lot to beat; that which comes to thy hand to be done, do with full strength and fear not. Forget not that I, the giver of manhood the giver of womanhood, the holder of victory am thy mother. Ask nothing, seek nothing, plan nothing. Let my will flow through thee, as the ocean through the empty shell.
>
> Shrink not from defeat; embrace despair. Pain is not different from pleasure, if I will both. Rejoice therfore when you come to the place of tears and see me smile.

অনেক যুক্তি পরামর্শ হল নিবেদিতার সঙ্গে। চিত্তজয়ে সমর্থা, শত্রু জয়ে সমর্থা, বীরাঙ্গনা—নিবেদিতা। সমিতির উদ্দেশ্য ও অরবিন্দদার সঙ্গে একমত একপথ নিবেদিতা হয়েছিলেন সমিতির অন্যতম পরামর্শদাত্রী। তাঁর কাছে শেখবার বিষয়ও ছিল অনেক। শুধু রাজনীতিতেই নয় রণ-নীতিতেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বিশেষ করে বিপ্লবতন্ত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। নিবেদিতা জাতিতে আইরিশ—জন্ম-সূত্রেই বিপ্লবিণী। স্বামিজীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তাঁর ছিল সংগ্রামী জীবন। ১৮৯১ থেকে ৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন Mutual aid এর বক্তা ক্রপট-কিনের সাক্ষাৎ শিষ্যা। পার্নেলের প্রভাবও

নান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

—এ তো নতুন কথা নয়, চিরন্তনী সত্য, তবে? কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ—শোকই বা কি, মোহই বা কি? আসলে জন্ম মৃত্যুই বা কোথা? ভুলো না, বার বার আবৃত্তি মনে রাখবে। তারপর অভ্যাস-যোগে সত্যদর্শন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণে
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

কোথা মৃত্যু, জন্মই বা কোথা? ভুল বিষয়ে মনকে বিচলিত করলে নিজের শত্রুতা নিজেই করা হয়। সেটা তো কাম্য নয়, নিজের বন্ধু নিজে হও—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব
রিপুরাত্মনঃ।

নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। আত্মবন্ধু হয়ে নিজেকে উদ্ধার কর, আত্মশত্রু হয়ে নিজেকে অবসাদগ্রস্ত করো না।

গৈরিক আঁচলে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসে গলা ঝেড়ে সন্ন্যাসিনী বললেন—সাধ্য মত চেষ্টা করছি। মন প্রকৃতি-চঞ্চল বায়ু-গতি। বায়ুর গতিকে আটকানোর মতই মনের গতিকে সংযত করা অতি দুষ্কর। অনেকখানি হয়ে এলেও স্নেহ মমতা যে যেতে চায় না, স্বামিজী। শিকড় গেড়ে বসে থাকে যেন মনের নিভৃত অন্দরে। নির্মম হওয়া যায় কই?

—দুষ্কর, সন্দেহ নেই। তবু হবে 'আমার' এই মমত্ববোধটুকু ছাড়লেই।

মমেতি মূলং দুঃখস্য,
নমমেতি চ নির্বৃতেঃ
শুকস্য বিগমে দুঃখ
ন দুঃখ গৃহ মূষিকে।

পোষা শুক পাখিটি মলে কষ্ট হয়। কেন? পাখিটি 'আমার' ভাব আছে বলে। ঘরের ইঁদুর মলে কষ্ট হয় না, 'আমার' ভাব নেই বলে। এই মমত্ব বোধটুকু যায় অভ্যাস আর বৈরাগ্যে।

'স্নেহ মমতার বল জগতে দুর্জয়।' মহাধনুর্ধর বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনও ঠেকেছিলেন। তোমারই মত সমস্যা তাঁর। উত্তর পেয়েছিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো,
মনো দুর্ণিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়,
বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।

দুরূহ, দুষ্কর—সন্দেহ নেই। তবু তো মানুষ করছে। জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা হচ্ছে। কবির কথায়—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে,
যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

হুঁশিয়ারী চাই। হুঁশিয়ার হয়ে সচেতন হয়ে চললেই দুর্গম সুগম হবে, দুস্তর হবে—সুস্তর। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। নর আর ঈশ্বর, নরশক্তি আর ঐশীশক্তি একই—অভিন্ন। এই কথাটাই তো সহজ করে বলেছেন বৈষ্ণব কবি—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

সুতরাং আত্মদীপ ভব। নিজের আলো নিজে জ্বালো। মনের অন্ধকার দূর কর। এগিয়ে চল। ওসব সুখ দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দাও মন থেকে, পথের বোঝা পথেই পড়ে থাক, ঘাড়ে বইতে যাবে কেন? পরম সুখের সন্ধান কর।

বেলা প্রায় এগারোটা। রান্না শেষ। গামছা কাপড় নিয়ে নদীতে স্নান করে এলেন নির্মলা মা। শিউলীতলায় পাথরের বেদীতে বসে স্বামিজী স্নান করলেন তোলা জলে। তারপর খাওয়া শেষ।

রান্নাঘরে খেতে বসে নির্মলা মা জিজ্ঞেস করলেন—উষা কোথা? রান্না করে কে?

উত্তর শুনে বললেন—ঐটুকু হাতে স্বামিজীর রান্নার গন্ধমাদন বইতে পারে, খোকা? বাহাদুর ছেলে।

খাওয়ার পর নির্মলা মা এলেন পান্থ-শালায় নিজের বিছানায়।

কাশীর গল্প শোনা হল অনেক।

সাড়ে তিনটে বাজতেই পাড়ি দিলুম চায়ায়। কত দিন যাওয়া হয় নাই স্মৃতি-দাদুর কাছে। 'শনৈঃ পন্থার' খবরটা দিতে হবে বৈ কি।

দাদুর আর কি কাজ—ঘুম ভেঙে উঠে ভুড়ুক ভুড়ুক গুড়ুক টানছেন। চোখে চোখ পড়তেই দেয়ালে হুঁকো ঠেকিয়ে রেখে বাঁ হাত গালে মধুর সুরে কীর্তন ধরলেন—

নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজ ভাল
(দিন ভালো যাবে হে—
ও কালো মুখ দেখনু যখন)
দিন যাবে আজ ভালো।

হেসে উঠে বললুম—ও বাব্বাঃ, বেলা ৪টেয় আপনার প্রভাত? জানলে কি এত ভোরবেলা এসে কাঁচা ঘুমটা ভাঙাই, দাদু? অজানতে যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। তবে দিন আর যাবে না, ভালয় হোক, মন্দয় হোক চলেই গেছে। এখন কেমন আছেন, বলুন।

—ভাল আর থাকতে দিলে কই, বন্ধু? কুঞ্জ ভঙ্গ করে গেলে কি অন্য পক্ষ ভাল থাকে? কোন কুঞ্জে অধিষ্ঠান হয়েছিল কদিন?—মুখে চোখে বেশ একটু অভি-মানের ঢেউ খেলিয়েই বললেন বুড়ো।

—আশ্রমিক কুঞ্জে, দাদু। কদিন সময় করে উঠতে পারি নি মোটেই। এখন ভাঙা কুঞ্জটা গড়ে তুলুন।

—কাজে কাজেই। কুঞ্জবিহারী এসেছেন যখন ভাঙাকুঞ্জে জোড়া লাগতে আর কতক্ষণ? উঠে এসে বস মাদুরে। তারপর বল সংবাদ কি।

বললুম সব—কলকাতার ভেতরে বাইরে, মেদিনীপুরে, চন্দননগরে — শাখা-সমিতি, ভাল ভাল জোয়ান সভ্য যোগাড় করার কথা।

পিঠ চাপড়ে দাদু বললেন—বল কি ভায়া, এরই মধ্যে ফরাসী রাজ্য পর্যন্ত হয়ে গেছে? বলেছি না,—একবার মুখ খুললে ঝরবে ঝর ঝর করে? বড় যে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলে মন্দিরের নজ-রাণাটা। এইবার? আচ্ছা ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে ছেলে ধরার কথা কিছু বলে নাই যতীন?

—হ্যাঁ, বলেছেন। অনেকগুলি ভাল ভাল করিৎকর্মা সভ্য যোগাড় হয়েছিল ওখান থেকে। তার মধ্যে সবের সেরা পনেরো বছরের রাসবিহারী বসু।

—বলেছে কিছু, কি করে পেল ওকে?

—না তা তো বলেন নি।

—শোন তবে। যতীনের মুখেই শোনা। সন্ন্যাসী হলে কি হবে দেশের স্বাধীনতার চিন্তা ওর শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুতে মেশানো। খুবই সংযতবাক, যখন তখন যার তার কাছে বলে না কিছু। বলবে কি—গুপ্ত সমিতির মন্ত্রগুপ্তির দীক্ষাগুরু যে—যতীন। অবিচার আঘাতও পেয়েছে অনেক। তার জন্যে কোন ক্ষোভ কোন গ্লানি নাই ওর মনে। কখনও কাউকে

বিন্দুমাত্রও দোষ দেয় নাই যতীন। নির্বিবাদে বীরের মতই সহ্য করেছে সব। যতই হোক অন্তরের অন্তঃস্তলে আশা-ভঙ্গের—ব্যর্থতার ব্যথা তো একটা আছেই। ব্যথার সায়র উছলে উঠলে ছিটে ফোঁটা একটু-আধটু ছড়িয়ে পড়ে বৈ কি। তাও পাত্রবিশেষের কাছে।

চন্দননগরে মতিলাল রায়ের অতিথি যতীন রাত্রে খাওয়ার পর বেড়াচ্ছে গঙ্গার পশ্চিম পাড় ধরে। বেড়াতে বেড়াতে চলে গেছে অনেক দূরে শ্মশানের কাছে। রাত হয়েছে অনেক—দুপুরে রাত। যতীন শুনলে ঠক্ ঠক্ শব্দ। লোক নাই, জন নাই, চিতাও জ্বলে নাই—নিশুন নিবৃত্ত আঁধার রাতে কিসের শব্দ শ্মশানে? কৌতূহলী যতীন এগিয়ে গেল। দেখে 'ক না—লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান সুন্দর সুঠাম এক তরুণ একটা মড়ার মাথা নিয়ে ছুঁড়ছে আর একটা মড়ার মাথাকে টিপ করে। পাশে সমবয়সী একটি মাত্র সঙ্গী। তারও হাতে একটি মড়ার মাথা। জিজ্ঞেস করে জানল—খেলছে তারা, এ রকম খেলায় বেশ মজা লাগে, ভয় করে না একটুও।

রতনে রতন চেনে। পাক্কা জহুরী যতীন, অন্তর্ভেদী সন্ধানী দৃষ্টিতেই বুঝলে গুপ্ত সমিতির সভ্য হবার সুযোগ্য ছেলে—অমিত সাহস রাসবিহারী বসু। দু-চার কথায় দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগিয়ে ঠাঁই ঠিকানা নিয়ে দিয়ে ফিরল যতীন।

কদিন পরেই গোঁসাইঘাটে মতিলাল রায়ের বাড়ীতেই গুপ্ত সমিতির শাখা সমিতিতে দীক্ষা নিল রাসবিহারী কজন সঙ্গী সমেত। তারপর দলে থেকে কী দুর্জয় দুঃসাহসের কাজ করেছিল রাস-বিহারী—শুনো যতীনের কাছে।

এই রাসবিহারী বসু বর্ধমান জেলারই ছেলে। শাকনারা পোস্ট অফিস সুবলদহ গ্রামে ছিল রাসবিহারীর বাবা বিনোদ-বিহারী বসুর পৈতৃক বাড়ী। রাসবিহারী জন্মের ক বছর পরেই ছোট বোনের জন্মের সময় রাসবিহারীর মা মারা যান। বিনোদ-বিহারী আবার বিয়ে করেন। তারপর সুবলদহের পুরনো বাড়ী ছেড়ে ফরাসী চন্দননগরে নতুন বাড়ী করে বসবাস করেন। ডুপ্লে কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্র অবস্থায় যতীনের নজরে পড়ে রাস-বিহারী।

বেলা গড়িয়ে এসেছে। দাদুর কাছে বিদায় নিয়ে আশ্রমে এসে দেখি বিকেলে স্নান সেরে রান্নাঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বলছেন নির্মলা মা—কদিন তোমার ছুটি, খোকা।

স্বামিজী বেড়িয়ে ফেরেন নি তখনও।

।। (২৯) ।।

পিছুটান নেই, সাঁঝ আসর জাঁকিয়ে বসেছি নিশ্চিন্ত মনে। যথাসময়ে গড়গড়ার নল নামিয়ে রেখে স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

হেসে বললুম, মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ফেরার পর কি হল, বাবা?

—সে অনেক কথা, সব শুনতে হবে? কি লাভ শুনে—গম্ভীরস্বরে বললেন স্বামিজী।

—লাভ? স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লব প্রচেষ্টার সূত্র, প্রগতি, উত্থান, পতন ফলাফল জানা কি দেশবাসী প্রত্যেকেরই উচিত নয়, বাবা। লাভ লোকসানের হিসেব করছি না, উচিত বলেই জানতে চাইচি।

স্বামিজী হাসলেন। —শোন তাহলে। কলকাতায় ফেরা হল। প্রচার ও প্রসার হল পশ্চিমবাংলার কিছু অংশে। কিন্তু এই-টুকুই তো সব নয়, বাংলার বৃহত্তর অংশ হল পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ। শুধু বাংলা হলেই তো হবে না, বাংলা তথা সমস্ত ভারতেরই সমিতি করে জাগিয়ে তুলতে হবে সারা দেশের জনগণকে। মহাউৎসাহ আর উদ্দীপনায় প্রমথ মিত্র আর বিপিনচন্দ্র পাল গেলেন ঢাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে ঢাকায় গড়ে উঠল 'অনুশীলন' সমিতি। এইখানে মিত্র-মশায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে সভ্য হলেন বিখ্যাত লাঠি ও অসিসঞ্চালক শ্রীপুলিন-বিহারী দাস। খ্যাতনামা তুর্কী অসি-সঞ্চালক মার্দাজা সাহেবের কাছে বিশেষ পদ্ধতিতে অসিসঞ্চালন শিখে পুলিন দাস এমন সুনিপুণ হয়েছিলেন যে অসি, ছোরা, ছোট লাঠি, বড় লাঠিতে তাঁর জুড়ি ভারতে আর কেউ ছিল না বললেই হয়। যোগ্যতম দেখে ঐ বিষয়গুলির শিক্ষার ভার পুলিন-বিহারীর হাতেই দেন মিত্রমশায়। পরম আগ্রহেই পুলিনবিহারী নেন সে ভার। সংগঠন শক্তিতেও বড় কম ছিলেন না তিনি। অনেক জায়গায় অনেকগুলি শাখা সমিতি করে স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন বেশ ভালভাবেই। সে কি দু দশটা? পরে দেখা গেছল ৬০০টি শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন পুলিনবিহারী দাস।

এমনি করে বরিশালে 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরে 'ব্রতী সমিতি', ময়মনসিংহে 'সাধনা সমিতি' স্থাপিত হল। পরে সব কেন্দ্রগুলিরই পরিচালনার ও ছেলেদের ছোরা, তরোয়াল, লাঠি খেলা ও ব্যায়াম শিক্ষার ভার পড়েছিল পুলিন-বিহারীর ওপর।

এতো গেল শারীরিক শিক্ষা,—মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেও ভোলেন নাই মিত্রমশায়। জেলায় জেলায় স্কুল কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলীর আলোচনা করে বুঝিয়ে এলেন—ছাত্রদের চরিত্রগঠন ও নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব তাঁদেরই। বরিশালের শিক্ষাগুরু অশ্বিনী-কুমার দত্ত ব্রতী হলেন ছেলেদের চরিত্র-গঠনে। সহকারী হলেন—জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁদের তৈরী ছাত্ররাও শিক্ষকতায় ব্রতী হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন অনেক জায়গায়। গ্রামে গ্রামে স্কুলে শিক্ষকতার পদ নিয়ে ছেলেদের চরিত্র গঠনের ভার নিলেন তাঁরা। আরবালিয়া গ্রামে প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে এলেন দৃঢ়চেতা নির্ভীক সুরেন্দ্রনাথ সেন। ঐ গ্রামে আগে থেকেই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সমান উৎসাহী অবিনাশ ভট্টাচার্য। প্রেমিকে প্রেমিকে মিলন—দুই দেশ-প্রেমিক। পরে কিশোরগঞ্জে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলে প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সেন চলে যান।

উত্তর ও পূর্ববাঙলায় প্রসারের কাজটা মন্দ হল না। সমিতি হল অনেক-গুলি। এবারে চাই জনসাধারণের মধ্যে ভাবপ্রচার। এগিয়ে এলেন বরিশালের সুকবি সুগায়ক মুকুন্দ দাস। লিখলেন দেশাত্মবোধক নাটক—মাতৃপূজা আরও কখানি। সে কি লেখা! উদ্দীপনাপূর্ণ জ্বলন্ত ভাষা, বিষয় সংস্থা ও পারিপাট্যও সেইরকম। তারপর যাত্রার দল করে নিজে অধিকারী হয়ে যাত্রা অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে। শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জাগল চেতনা, দেশের অবস্থা বুঝলো তারা, শুরু করল দেশের কথা ভাবতে। হিন্দু-মুসলমান—দু সম্প্রদায়েরই কি বালক কি বৃদ্ধ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় টগবগ করে উঠলো মুকুন্দ দাসের বীরকণ্ঠের গান শুনে—

'সাজরে সন্তান হিন্দু মুসলমান
ধররে কৃপাণ হওরে আগুয়ান
নিতে হয় মুকুন্দেরে নাওরে সঙ্গে

মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।' এমনি আনন্দ উপচারের মধ্যে বীররস পরিবেশন করে গণচেতনার কাজ নিয়ে দেশসেবায় ব্রতী হলেন মুকুন্দ দাস।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে আটঘাট বেঁধে কলকাতায় ফিরলেন প্রমথ মিত্র। বাকী পশ্চিমবাঙলার বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলা। নিজে গিয়ে বহরমপুরে করা হল ব্যায়াম সমিতি। ব্যায়ামকুশলী বাল্যবন্ধু ভোলানাথ পাঠককে ভার দেওয়া হল এই সমিতির। সংগঠনশক্তিতে ভোলানাথও বড় কম ছিল না, অনেকগুলি শাখাসমিতি করেছিল সে।

সারা বাঙলায় প্রসারের কাজটা হল ভালই। কিন্তু তাইই তো সব নয়—প্রসার ও প্রচার চাই সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও। জাগরণের প্রয়োজন সারা দেশের—সমস্ত দেশবাসীর। সেদিকে মন দেওয়া গেল। সংগঠনকে জোরদার করে হানতে হবে আঘাত।

সমিতির রীতিনীতি কর্মপদ্ধতি, অগ্রগতি—সমস্তই সবিস্তারে জানানো হচ্ছিল অরবিন্দদাকে। ইতিমধ্যে একবার ছদ্মবেশে গোপনে এসে সমিতির কর্মপন্থা পর্যালোচনা করে ও কাজ দেখে খুব খুশি হয়েই ফিরেছিলেন বরোদায়। তারপর ১৯০৩ সালে ভাই বারীন্দ্রকে নিয়ে অরবিন্দদা সম্পাদকের সঙ্গে মিলিত হলেন যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মশায়ের বাড়ীতে। এখানে পাওয়া গেল ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। আর পাওয়া গেল একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। Tiger of Tigers বললেই ঠিক হয়,—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —বাঘা যতীনকে। যেমন বলিষ্ঠ তেজোদৃপ্ত চেহারা, তেমনি তেজোদৃপ্ত হৃদয়।

—বাঘা? ডাকনাম বাঘা, না—বাঘের মত চেহারা বলে বাঘা, স্বামিজী?

—ডাকনামও নয়, বাঘের মত চেহারার জন্যেও নয়। বাঘ মেরে বাঘা। একবার যুবক যতীন গেছে কুষ্ঠিয়ার কাছে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। গাঁয়ের আশেপাশে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল। মাঝে মাঝে বাঘ এসে ঐসব ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থেকে গ্রামে হানা দেয়। গ্রামবাসীদের ছাগল, ভেড়া, গরু বাছুর এমন কি ছোট ছেলেপিলেদের ওপর আক্রমণ চালায়। আতঙ্কেই থাকতে হয় গ্রামীণ লোকদের।

যতীন যখন ঐ গ্রামে তখন গুজব রটল —জঙ্গলে বাঘ এসেছে। মারতে হবে। লাঠি শড়কী, দা, কাটারী, কুড়ুল, কোদাল—হাতের কাছে যে যা পেল নিয়ে ছুটল বাঘ মারতে। একজনের একটিমাত্র বন্দুক—সেই যা ভরসা। বাঘ মারার নামে যতীনের বীর হৃদয় নেচে উঠল। আত্মরক্ষার জন্যে একখানা ভোজালী নিয়ে সে চলল বাঘ মারা দেখতে।

বাঘ তখন জঙ্গলে লুকিয়ে। গ্রামবাসীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে হৈ-হুল্লো তুলে কেনেস্তা পিটিয়ে জঙ্গল পিটিয়েও বাঘ বের করতে পারল না, অথচ বাঘ যে আছে জঙ্গলে, সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ আগেই কে' জানে স্পষ্ট দেখেছে—বাঘ। তাই মহাউৎসাহেই জঙ্গল পিটতে লাগল তারা। বাঘেরও তো প্রাণের ভয় আছে, কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে? হুঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বাঘ, পড়বি তো পড় একেবারে যতীনের সামনেই। বন্দুকধারী বন্দুক ছুঁড়লে। গুলি বিঁধল না বাঘের গায়ে, শুধু মাথার চামড়া একটু ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। বাঘ তো মহাখাপ্পা—নখদাঁত উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যতীনের ওপর। যতীন নিমেষের মধ্যে বাঁ বগলে চেপে ধরে বাঘকে আঘাতের পর আঘাত হানলে ডান হাতের ভোজালী দিয়ে। বাঘও তো কম নয়, এক সময়ে ঝটকা মেরে যতীনকে ফেলে দিয়ে কামড়ে ধরল তার হাঁটু। পাশের বীরপুরুষেরা দাঁড়িয়ে দেখছে আর হায় হায় করছে—গেল বুঝি ছেলেটা, আর আশা নেই। সেই অবস্থাতেই যতীন ঝটকার বদলে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিপুলবিক্রমে আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল বাঘের মাথায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঘের ভবলীলা সাঙ্গ। আঁচরে কামড়ে জখম হয়ে বেশ কিছুদিন ভুগতে হয়েছিল যতীনকে।

আর একবার যতীন আসছে ঘোড়ায় চড়ে যশোর জেলার এক গ্রামের পথে। চেনা পথ—নিশ্চিন্ত মনেই আসছে সে। সঙ্গে বন্দুকও ছিল একটা। মাঝপথে এক জায়গায় ঘোড়া থেমে গেল—আর নড়তে চায় না। যুবক বুঝলে নিশ্চয়ই ভয়ের কিছু দেখেছে ঘোড়াটা। এদিক ওদিকে চেয়ে চেয়ে যতীন দেখল সত্যিই তো, একটু দূরে একটা বাঘিনী খেলা করছে তার বাচ্চাগুলিকে নিয়ে। তক্ষুনি গায়ের জামা খুলে যতীন বেঁধে দিল ঘোড়ার চোখ দুটি। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে বাঘিনীর পাশে গিয়ে তাগ করে ছুঁড়ল বন্দুক। অব্যর্থ লক্ষ্য—বাঘিনী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। যতীন বাঘের বাচ্চাগুলিকে কোলে তুলে নিয়ে চলল গন্তব্যস্থানে। এইজন্যেই সবাই নাম দিয়েছিল বাঘা যতীন।

এতো গেল বাঘের সঙ্গে—আবার সিংহের সঙ্গে শাদা সিংহের বন্য বর্বরতার সঙ্গে লড়তেও পিছ-পা হয়নি যতীন। একবার দার্জিলিং যাবার পথে শিলিগুড়ি স্টেশনে তেষ্টা পেয়েছে যতীনের। গাড়ী থেকে নেমে প্ল্যাটফরমের কল থেকে কাঁচের প্লাসে জল নিয়ে আসছে যতীন। সামনেই যাচ্ছিল চারজন গোরা সৈনিক। যতীন পাশ কাটিয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু সৈনিকদের একজন ঠেলা দিয়ে দিল যতীনের হাতের প্লাস ফেলে। জল তো পড়লই, কাঁচের প্লাসও গেল টুকরো টুকরো হয়ে। সৈনিকদের হো হো হাসি—মহাকৌতুক। এমনি কৌতুক হামেশাই করত তারা এদেশী লোকদের সঙ্গে—ভেতো বাঙালী কি আর করবে—এই ভেবে। কিন্তু যতীন কি তাই? রাগে কেঁপে যতীন সৈনিককে বসিয়ে দিল প্রচণ্ড এক ঘুঁষি। তখন চারজনে একসঙ্গে আক্রমণ করল তাকে। শরীরে অপরিমিত শক্তি—যতীনের সঙ্গে পারছিল না তারা। শেষে একজন পকেট থেকে ছুরি বের করে বসিয়ে দিল ঘা। ছুরির ঘা খেয়েও দমলো না যতীন। আহত সিংহের মতই প্রচণ্ডবিক্রমে চালাতে লাগলো ঘুঁষির পর ঘুঁষি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সব কটা সৈনিক প্ল্যাটফরমে চিৎপাৎ।

সে সময়ে শাদা চামড়া ছিল দেশের বিভীষিকা—সেই সময়েই যতীনের এই কাণ্ড। সৈনিকরা ধরাশায়ী হলে কি পালালো যতীন? নিজের নাম ঠিকানা সৈনিকদের দিয়ে বলল—ইচ্ছে করলে কোর্টে মামলা করতে পার আমার নামে—আবার হাজির হব তোমাদের সামনে। এমনি অমিতবিক্রম অমিত সাহসী যতীন। এই tiger of tigers যতীনকে পাওয়া গেল দলে।

দীক্ষা নিয়ে বারীন্দ্র গুপ্ত সমিতির সহকারী সম্পাদক হয়ে থেকে গেলেন কলকাতায়। অরবিন্দদা ফিরলেন বরোদায়।

কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির সভ্য হলেন দেবব্রত বসু আর স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তখন উৎসাহ-উদ্দীপনার আগুন ছুটল। সমিতির প্রাণ-সঞ্জীবনী মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল দেশবাসী। দলে দলে দীক্ষিত যুবকেরা শিক্ষিত হতে লাগল—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুনিপুণ হয়ে উঠল গেরিলাযুদ্ধে। চক্রের পর চক্র গড়ে উঠল দিকে দিকে। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা—সর্বত্রই ছড়াল প্রাণ-সন্দীপনী 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র। সবারই মনে আশা, প্রাণে উদ্দীপনা—স্বাধীনতার হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়? বাঁচার মত বাঁচতে চাই—হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু।

রাত হয়েছে। কথা বন্ধ করে উঠলেন স্বামিজী।

(ক্রমশঃ)

চার গোলাপের গুচ্ছ ও একটি মুখ

অশোক হালদার

তরোয়ালের মত ছিপছিপে ধারালো শরীরে সাহেবী স্মার্টনেস ঝলসে বিনায়ক সান্যাল গদীমোড়া পুরুষ্টু চেয়ারে এসে বসলেন।

আজ সকাল থেকেই সান্যাল সায়েবের সীটে বসেনি অবনীশ। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অপর দিকে যে কয়েকখানা অতিথি-অভ্যাগতদের বসবার চেয়ার সাজানো থাকে, তার একটাতে বসে অপেক্ষা করছিলো সান্যাল সায়েবের। দু' মাস বাদে সান্যাল সায়েব রিজ্যুম করছেন আজ—অবনীশও তাই পুনর্মূষিক-ভব। সান্যাল সায়েব পাকা-পোক্ত অফিসার। মাস গেলে সব কেটেকুটেও দেড় হাজারের মত ড্র করেন। তাঁর সঙ্গে নিজের ফারাক যে আসমান-জমিন, অবনীশ তা বোঝে, আর বোঝে বলেই স্ট্যাটাসের দূরত্ব বজায় রাখার জন্যে ঐ অফিসারের চেয়ারে বসেনি, যদিও চার্জ মেক-ওভার করার আগে পর্যন্ত ওই অফিসার।

—সো মুখার্জি, ক্যারেড অন স্মুথলি। দামী সিগারের সৌরভে এয়ার কন্ডিশনড ঘরের হাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করলো অবনীশ। কিন্তু কিছু বললো না। পরিশীলিত ঠান্ডা হাসিটুকু শুধু রাখলো ঠোঁটে।

তারপর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চার্জ টেক-ওভার মেক-ওভার পর্ব চুকিয়ে নিজের টেবিলে চলে এলো।

—মুখুজ্জে তাহলে ফিরে এলো। বাণ ছুঁড়লো লাহিড়ি।

অবনীশ গ্রাহ্য করলো না। মাত্র দু'মাসের লীভ ভেকান্সিতে অফিসিয়েট করার ব্যাপার। নেহাৎ কলকাতায় গন্ডগোল, তা না হলে বোম্বে থেকে কোন জুনিয়ার অফিসারকে পাঠাতো।

বাড়িতে সুখবরটা ভাঙতে কোন উচ্ছ্বাস দেখেনি ললিতার। শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অবনীশের দিকে পেছন ক'রে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় স্বামীকে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে সোজা প্রশ্ন করেছিল—কত বাড়লো তা'হলে?

—মান্থলি শ' আড়াই মত।

—তাহ'লে দু'মাসে পাঁচশো। বিড়বিড় ক'রে সরল যোগটুকু ক'রে ঠোঁটের কোথায় হাসি ছিটিয়ে বললো—তাহ'লে কাল থেকে তুমি অফিসার। এ্যাঁ, ড্র করবে ছ'শ প'চিশ প্লাস আড়াইশ'। এবার হিসেব করতে একটু সময় নিলো। তারপর সখেদে বললো—এঃ, ফোর ফিগারেও এলো না।

কিছুটা হতাশ হ'লো অবনীশ।

কিন্তু ললিতার আসল চোট-টা গিয়ে পড়লো নিজের বাবা-মা-ভাই বোনদের ওপর। বাপের বাড়ি গেল। দশ মিনিটের বেশী থাকলো না। বসলো না, দাঁড়ালো না। ঘুরঘুর করলো এঘর-ওঘর, ফিস্‌ফিস্‌ করলো জনেজনের সঙ্গে, ঘোড়দৌড় করালো বৃদ্ধ বাবাকে দোকানে, মা-কে পাঠালো স্টোভ-এ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অবনীশের হাতে হাজির করালো চা-মিষ্টি আর ট্যাক্সিতে গিয়ে যখন লাফিয়ে উঠলো অবিকল হিন্দী সিনেমা স্টারের মত, তখন ট্যাক্সির জানলায় মুখ-গলানো বাবার কথার মাঝখানেই ড্রাইভারকে হুকুম করলো চালিয়ে সর্দারজী।

এরপর চললো পাড়ায়-পাড়ায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি খুঁজে খুঁজে হারিকেন ভিজিট আর প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নেওয়ার ধুম।

এমনি ক'রে কপ্‌্‌রের মত দ্‌'টো মাস উবে গেল।

লাহিড়ি বললো—কী মুখ্‌খুজ্জে! দাঁড়কাক হ'য়ে বুঝি মুষড়ে পড়েছো। একেবারে স্পিকটি নট্‌।

এমন সময় ছেলেটি এলো। সিধে অবনীশের টেবিলে এসে বললো—আমি মিঃ অবনী মুখার্জির সঙ্গে দেখা করবো।

অবনীশ চিনলো না। চেয়ার টেনে বসালো।

ছেলেটি চেয়ারটা আরো একটু টেনে এনে অবনীশের ঘনিষ্ঠ হলো।

—একটা চাকরীর জন্যে এসেছি। অবনীশ মুখার্জি আমার পিসেমশাই হন। আমায় অবশ্য চেনেন না। আমরা হাজারিবাগে থাকি। আসা-যাওয়া, দেখা-সাক্ষাৎ নেই। মা বললো—যা একবার, পরিচয় দিবি, তারপর বাড়ি গিয়ে পিসীর সঙ্গে দেখা করবি। নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবে ললিতা।

অবনীশের চোখে চোখ ফেলে বললো—ললিতা মানে পিসী আর কি।

—বুঝেছি। গম্ভীর অবনীশ মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে ব'ললো—কিন্তু মিসেস মুখার্জি যে দারুণ অসুস্থ, তাঁর সঙ্গে তো দেখা করতে পারবে না।

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। বিমর্ষ হেসে বললো—আমার লাকটাই খারাপ। এতদূর থেকে এলুম। তাছাড়া পিসেমশাই অফিসার মানুষ। আমার সব কথা কি শোনার সময় আছে তাঁর।

ছেলেটির মুখে হতাশা ঘনাতে দেখে ললিতার ওপর রাগ হলো। এ-রকম একটা কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে ভেবে তখনই সাবধান ক'রে দিয়েছিল ও-কে।

—তুমি যে কী কান্ড ক'রছো! সবাই ভাবছে কী না কী। পিওরলি একটা স্টপ-গ্যাপ অ্যারেঞ্জমেন্ট্‌......

—ও তুমি বুঝবে না। সে সব দিনকাল আর নেই গো। নিজের ড্রাম নিজেকেই পেটাতে হয়।

তা' ড্রাম পিটিয়েই চললো ললিতা। যে দু-একখানা চিঠির জবাব এলো, তাদের প্রশংসায় এবং যাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া এলো না তাদের পরশ্রীকাতরতার নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলো।

—অথচ কলকাতায় এতো গন্ডগোল। ছেলেটির কথায় অন্যমনস্ক অবনীশ সাড় ফিরে পেয়ে বললো—ঠিকই তো, নেহাৎ চাকরী, তাই আমাদের থাকতে হচ্ছে এখানে, তা না হ'লে......। বাক্য সম্পূর্ণ না ক'রে ছেলেটির উৎসুক চোখে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো—তুমি যে কেন কলকাতায় আসতে চাইছ! বেশতো আছো হাজারিবাগে।

ছেলেটি বললো—সে-ও তো ঐ চাকরীর জন্যেই। অস্ফুট বললো—বি-এ পাশ করা বাইশ বছর বয়স যে কী!

ছেলেটির দীর্ঘনিশ্বাসের বেদনা অবনীশকে কাঁটার মত বিঁধলো। সুদূর হাজারিবাগ থেকে চাকরীর আশায় এই খুনোখুনির শহর কলকাতায় ছুটে এসেছে ছেলেটি। অফিসার পিসেমশাই একটা-না-একটা কাজে লাগিয়ে দেবেন। উঃ কী কান্ডটাই না ক'রছে ললিতা।

—পিসেমশাই-এর সঙ্গেই না হয় দেখা ক'রে যাই—এসেছি যখন এতদূর। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে যাবার উদ্যোগ ক'রলো।

ইলেক্‌ট্রিক্‌ শক্‌ খাওয়ার মত চমকে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠলো অবনীশ। দৃঢ় থাবায় চেপে ধরলো ছেলেটির কাঁধ। কী ভাগ্য, পরমুহূর্তেই থাবা শিথিল করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার ভঙ্গিতে হাতটা মেরুদন্ড বরাবর নামিয়ে এনে কাছে সরে এলো তা'র।

—এতো তাড়াহুড়ো—তাড়াহুড়ির কাজ নয়, ভাই। ছেলেটিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবনীশ গলা নামিয়ে বললো। সহকর্মীদের উৎসুক দৃষ্টির আড়ালে যেতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে করিডরে এসে দাঁড়ালো।

—আমার চাকরীর কথা শুনলে তো তুমি ভিরমি যাবে। আজকাল তবুতো নয়-নয় ক'রে এধার-ওধার দু-পাঁচটা চাকরী-বাকরী হ'চ্ছে, আর আমাদের সময়ে। লিফটের দিকে এগুতে এগুতে অবনীশ দম-দেওয়া পুতুলের মত ব'লে যাচ্ছিল—সব হ'তো চাকরী ছাড়া। বয়স হ'তো, গোঁফ হতো, দাড়িও হ'তো...কিন্তু চাকরীটাই হ'তো না।

ছেলেটির চোখে কৌতুক দেখে অবনীশ তার পাতলা ঠোঁটে মিহি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে নাকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে-পড়া লিফটের স্বল্পপরিসর কামরায় ঢুকে পড়লো ছেলেটিকে নিয়ে। সহযাত্রীদের মধ্যে আর মুখ খুললো না। উদাস-চোখে মাথার ওপরের খাঁচায়-পোরা ঘূর্ণায়মান সিলিং-পাখা দেখতে দেখতে একতলায় পৌঁছে গেল।

লিফট থেকে বেরিয়ে ছেলেটি বললো—পিসেমশাই বুঝি একতলায় বসেন।

ছেলেটির দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে এবং চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে অবনীশ এবার বললো—ওঃ তোমাকে বলিনি বুঝি! স্যার তো এক সপ্তার ট্যুরে...।

ছেলেটি অবিশ্বাসের চোখে তাকালো এবার। স্বগতোক্তি করলো—পিসীমার অসুখ আর পিসেমশাই ট্যুরে!

অবনীশের কানে এলো কথাটা। হাসি-মুখে ছেলেটির পিঠে হাত ছুঁইয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে বললো—

—তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। কোয়াইট ইমপ্রেসিভ্‌। ঠিকই ধরেছো।

ছেলেটিকে নিয়ে রাস্তায় নামলো অবনীশ।

—তবে কি জানো, ছোট-ই হোক বড়ই হোক, চাকরী চাকরী। আর তোমার পিসে-মশাই হ'লেন কর্মবীর। কাজ ছাড়া ও'র একটা দিনও কাটে না। সেই জন্যেই তো ওপরঅলার নজরে পড়েছেন। আরো উঠবেন, দেখে নিও তুমি চড়চড় করে উঠবেন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ছেলেটি অবনীশের মুখে। অবনীশ তা দেখেও দেখলো না। ওর দৃষ্টি তখন একটা ট্রামে নিবদ্ধ। নম্বরটা পড়তে পেরে নিশ্চিন্ত হলো।

—ঐ ট্রাম আসছে। তুমিতো এখন হাওড়া স্টেশন।

ট্রামটা আগের স্টপে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটি কিছু বললো না দেখে অবনীশ আবার ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে ওর পিঠে হাত রাখলো।

—এতক্ষণ আলাপ করলুম, তোমার নামটাতো বললে না, ভাই।

—আমার নাম সুকুমার...সুকুমার চট্টো-পাধ্যায়।

চট্টোপাধ্যায়, চ্যাটার্জি নয়—অবনীশ লক্ষ্য করলো। চ্যাটার্জি হবে, সঙ্গে উঠবে চোং-প্যান্ট আর চকর-বকর হাওয়াইয়ান।

—সুকুমার! আমার ছোট শ্যালকের নামও সুকুমার। ভারি ভালো ছেলে। সুকুমাররা দেখছি সুকুমার হয়। এগিয়ে-আসা ট্রামটাকে দেখতে দেখতে অবনীশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

'তাহ'লে সুকুমার, আমি দাঁও বুঝে স্যারকে তোমার কথা বলবো'খন, তুমি কিছু ভেবোনা, নিশ্চিন্দি হয়ে হাজারিবাগ ফিরে যাও' বলে, একরকম ভিড় ঠেলে জায়গা ক'রে ছেলেটিকে ট্রামে তুলে দিলো অবনীশ।

ট্রাম ছেড়ে দিলো। চলন্ত ট্রামটার দিকে তাকিয়ে টের পেলো ও'র মেরুদন্ড বেয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম সড়সড়িয়ে নামছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে গাল-গলা-ঘাড় মুছে পরম আরামে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর চললো আপিসমুখো।

আজকাল সন্ধ্যের দিকে কোন কাজ রাখে না অবনীশ। ছুটির পরে সিধে বাড়ি ফিরেই আসে। সব বাড়িতেই এক অবস্থা ঘরের মানুষ ঘরে ফিরতে দেরি করলে নানান বাজে চিন্তা-ভাবনা এসে জেঁকে বসে ঘরে-ঘরে, ফিরে এলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে সকলের।

কিন্তু আজ ছুটির পরে অবনীশের মনটা লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত উদ্দাম হয়ে উঠলো। আসলে ছেলেটি চলে যাবার পর থেকেই কেমন একটা খুশি-খুশি উত্তেজনায় ওর বুকের ভেতরটা উথাল-পাথাল হচ্ছিল। কী করবে কী না করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। আনন্দের আতিশয্যে আশপাশের সহকর্মী-দের চা খাইয়ে দিলো, সিগারেট দিলো। লাহিড়িও বাদ গেলো না।

লাহিড়ি অবশ্য আনন্দের প্রোটেস্ট্ চা-সিগারেট খেলো।

—একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কবজী ভোর খাওয়াতে হবে মুখুজ্জে।

—হবে হবে। চোখটিপে আরো একটা সিগারেট ঘুষ দিলো অবনীশ।

শুধু বেরুবার মুখে মনটা একটু বিস্বাদ হয়ে গেলো। গেটের সেন্ট্রি উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট্ করলো না। সকালেও করেছিলো। বিকেলে করলো না। ডিসিপ্লিনড্ ফোরস-এর কাছে ভগবানের চেয়েও বড় ডিসিপ্লিন।

রাস্তায় নেমে হালকা-হালকা বাস-ট্রাম চলে যেতে দিলো। লাফিয়ে চড়ে বসলো না। ফুটপাথ ধরে হাঁটলো। হকারের জিনিস-পত্তর ঘাটাঘাটি করলো, দর-দাম করলো, শেও পর্যন্ত একটা পলিথিনের গেলাস, এক-পাতা সেফটিপিন এবং ঠিক খেয়ালের ঘোরে নয়, ললিতাকে ভেবেই, আর মাত্রই দশ নয়ায় পাওয়া গেলো বলেই কিনে ফেললো চার গোলাপের গুচ্ছ। ফোলিও-ব্যাগে টিফিন-কৌটো আর গেলাসের মধ্যে সন্তর্পণে রাখলো সেটা। ললিতার হাতে তুলে দেবার আগে যেন পাপড়ি না খসে নিটোল থাকে। হঠাৎ গোলাপই বা কিনে বসলো কেন। সাতাশ বছরের স্ত্রীর জন্যে কেউ গোলাপ কেনে। স্ত্রী না হয়ে 'ইয়ে' হ'লে একটা মানে খুঁজে নেওয়া যেতো গোলাপ কেনার মনের অবচেতনে সব সময়ে যে তিরতিরে স্রোতের নদী, তার অতলে ডুবুরী নামানো যায় না। যদি যায়, ওই হাজারিবাগের ছেলেটার সংগে গোলাপের একটা কিছু কাকতালীয় যোগের সম্পর্ক হয়ত টেনে-হিঁচড়ে বের করা যায়। হাজারিবাগের গোলাপ নাকি বিখ্যাত। তাই কি ওর গোলাপের দিকে হাত বাড়ানোর পেছনে ওই হাজারিবাগের সুকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের হাত আছে।

সে যাই হোক। ছেলেটিকে কিন্তু একটু গাড়ী পাওয়ালে ভালো দেখাতো অন্ততঃ। ললিতা-পিসীর অফিসার স্বামীর প্রেসটিজ বাড়তো। তা'র জন্যে অবনীশ কিছু খরচ-পত্তর করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। রেস্তোঁরায় যাবার কথা একবার ভেবেওছিলো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেটিকে নিয়ে আর বেশী কালক্ষেপন করতে সাহসে কুলোয়নি। কখন কি বলে বসে, বেঁকে বসে। নেহাৎ বিহারের দেহাতী অঞ্চলের ছেলে। বাংলায় হলে বলেই বসতো—আপনার মশাই অত উঁচু উঁচু কথা রাখুন। মিস্টার মুখার্জির ঘরটা দেখিয়ে দিন ব্যস্। আমার পিসেমশাই, আমি বোঝাপড়া করবো তাঁর সংগে। তখন তো স্বখাত সলিলে ডুবতে হতো। ঐ জন্যেও আরো হাওড়া স্টেশনের কথাটা তুললো। সরাসরি কি সত্যিই বলা যায়—তুমি আজকের ট্রেনেই হাজারিবাগ ফিরে যাও। তবুতো কলকাতাকে খুনোখুনির শহর বলেছে, আরো বলেছে, এ-পাড়া ও-পাড়া যাওয়া-আসা বন্ধ বিশেষ করে অচেনা মুখের।

এতে ছেলেটি ওর ওপর বিরক্ত হয়েছে বলে, মনে হয় না। আর হ'লেই বা কী করা যাবে। এ-ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারতো ও? ললিতাকে সব খুলে বলবে, সে যদি বোঝে দিন কয়েক পরে একটা পোস্ট-কার্ড ছাড়বেখন,—এখন বড্ড কড়া-কড়ি নতুন চাকরীতে। লোকজন বিশেষ নিচ্ছেই না কোম্পানী। যা দু-একটা চাকরী হচ্ছে, খোদ বম্বের হেড-আপিসের স্যাংশান চাই। তবে আমরা চেষ্টায় আছি। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই জানাবো। এ-রকম একটা বয়ান হবে নিশ্চয়ই চিঠিটার। হ্যাঁ, আরো একটা কথা। ঝট্ করে বিনা নোটিশে না আবার এসে পড়ে ছেলেটি, মানে ঐ সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। হাসির কতকগুলো বুদ্বুদ্ গলার নালিতে আটকে থাকলো অবনীশের। সেইজন্যে মানে ওর আসা বন্ধ করতে পুনশ্চ দিয়ে জুড়ে দিতে হবে—কলকাতার অস্বাভা-বিক অবস্থার জন্যে সুকুমারকে যেন আসতে না দেওয়া হয়। সে যা হোক কিছু একটা করা যাবেখন। বিপদ থেকে তো উদ্ধার হয়েছে।

বাড়ি ফিরে কিন্তু কতটা ক্লান্ত হয়েছে, টের পেলো অবনীশ। এই বয়েসে এতো হাঁটাহাঁটি আর সয়না। কী যে ঘোর চাপলো তখন মাথায়। তবু যদি বাড়ির দিকে হাঁটতো কাজের কাজ হতো।

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে ললিতা বললো—জানো, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে।

অবনীশ ভাবলো রোজকার মত এ-পাড়া ও-পাড়ায় ধোমা-বোমার কথা বলবে ললিতা। তাই খুব একটা কৌতূহল বোধ করলো না। তবুও স্ত্রীকে ওব্লাইজ করার জন্যে চোখ রাখলো ললিতার চোখে।

—কী কাণ্ড! হাজারিবাগ থেকে তরুবৌদির ছেলে এসে হাজির।

—এ্যাঁ, কে? অবনীশের ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ো-পড়ো হলো।

—তরুবৌদির ছেলে এসেছিলো হাজারিবাগ থেকে, চাকরীর জন্যে। টেবিলে কী একটা রাখার ছুতোয় অবনীশের দিকে পিছন ফিরে ললিতা বললো—তুমি অফিসার হয়েছো লিখেছিলুম, তাই।

—তারপর? অবনীশের গলায় চোখের কোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করলো।

—তারপর দাঁড়াও বাবা, বসি। উত্তেজনায় গনগনে-মুখে তোলপাড়-বুকে ধপাস্ করে বিছানায় শুয়েই পড়লো ললিতা।

—বিকেল সাড়ে তিনটে চারটে। আধ-ময়লা কাপড়ে তখন। ছেলেটা এসে বললো—ললিতা পিসীর অসুখ, তাই খবর নিতে এলুম। আমার মার নাম তরু, হাজারিবাগ থেকে আসছি।

—আমার মাথায় চট্ করে একটা মতলব ঝিলিক দিলো, বুঝলে কি না। বিছানায় উঠে বসে চোখ বড়-বড় করে ললিতা বললো—কী বললুম জানো?

অবনীশ কিছু বললো না। চোখের সামনে সে তখন ছেলেটির গোল-গাল মুখ-চোখ, ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা অবয়বগুলো দেখতে পাচ্ছিলো। কিন্তু ওর কানে আসছিলো ললিতা বলছে কি-চাকরদের বলার ভঙ্গী অবিকল নকল করে—মা তো বেঘোরে পড়ে আছেন গো ছেলে। ডাগ্‌তোরবাবু ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেছে।

অবনীশ চোখ ফিরিয়ে ললিতাকে দেখলো। ওর গলায়, নাকের ডগায়, গোঁফে পুঁতির মত ঘাম, মুখমণ্ডল সিঁদুরে, চোখ বিস্ফারিত, ওষ্ঠাধরে কিন্তু সগর্ব বিজয়িনীর হাসি।

স্বামীর দৃষ্টিতে তারিফ দেখে ললিতা দ্বিগুণ উৎসাহে বললো—কী কল-টা মোক্ষম হয়নি?

অবনীশ বোবা চোখে তাকিয়েছিলো ললিতার মুখে। কিন্তু ভাবছিলো সুকুমার ট্রামে উঠে চলে যাবার পরে ও-র নিজের মুখের চেহারাটা কেমন দাঁড়িয়েছিলো। এখন যেমন ললিতাকে তার চিনতে কষ্ট হচ্ছে, এতো দিনের দিবারাত্রের সম্পর্কে অচেনা-অচেনা লাগছে, তেমনি ললিতা-ও কি তখন ও-কে দেখলে চিনতে পারতো!

গলায় মজার বুড়বুড়ি কেটে অবনীশ অবশ্য বললো—ছেলেটা নিশ্চয়ই কেটে পড়লো। যা দাওয়াই দিয়েছো একখানা!

— না গো, এক দৃষ্টে তোমার ফটোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলো, কিছুতে নড়ে না, জিগেস করলে, ইনি কে?

এ্যাঁ, তুমি কি বললে! অবনীশের হৃদস্পন্দন যেন থেমে থাকলো।

—বললুম ঐ তো বাবু। এরপর সুড়সুড় করে সরে পড়লো ছেলেটা। ললিতা জোন্-অব্-আর্কের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো।

অবনীশের মাথাটা ঝুঁকে পড়লো।

কানে এলো, ললিতা বলছে, এটা কী গো?

দেখলো ললিতার হাতে চার-গোলাপের গুচ্ছ। অবনীশের মনে হলো গোলাপ-গুচ্ছে লুকিয়ে আছে একটা মুখ।

'আঃ, কী সুন্দর' ব'লে গোলাপ-গুচ্ছে নাকে চেপে ধরা ললিতা-কে দেখে একটা প্রচণ্ড ঘৃণার কুয়াশায় ডুবে যেতে থাকলো অবনীশ।

ইণ্টারপোল

অশোককুমার মিত্র

অপরাধীর লুকোবার জায়গা নেই। যদি আজকে কেউ অপরাধ করে, আর সে যদি অন্যদেশে পালিয়ে যায়। অদৃশ্য একটা জাল তাকে খুঁজে বার করবেই। সেই জাল তাকে অনুসরণ করবে যতক্ষণ না সে ধরা পড়বে। এই জালের নাম ইনটারপোল।

অপরাধীদের ধরবার জন্যে একটা জাল ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। প্রতিষ্ঠানটির নাম ইনটারন্যাশনাল পুলিশ। সংক্ষেপে ইনটার-পোল।

আয়ারল্যান্ডে ১৯৬২ সাল। ৭ জানুয়ারী, সকাল থেকে বরফ পড়ছে। এমনি এক সময়ে জার্মান এক ভদ্রলোক ৪৫ বছর বয়েস, চুলগুলো লাল, ডাবলিনের গ্রেশাম হোটেলে ঢুকলেন। তিনি নিজের নাম লেখালেন আইজাক স্মিথ। তার পরদিন সেই ভদ্রলোক বেলফাস্টে গেলেন। সেখানের বেলফাস্ট ব্যাংকিং করপোরেশন থেকে লেটার অফ ক্রেডিট দেখিয়ে এক হাজার পাউন্ড তুললেন। এই লেটার অফ ক্রেডিট ছিল পেরু ব্যাংকের নামে।

লেটার অফ ক্রেডিটটা ছিল জাল। কিন্তু ওটা এমন নিখুঁত ছিল যে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। দিন দুই বাদে সেই ব্যক্তিই ঐ লেটার অফ ক্রেডিট দেখিয়ে অন্য আর একটি ব্যাংক থেকে ১৬০০ ডলার ভাংগায়।

তার পরদিন ঐ ব্যক্তিই পলরুথ নামে পরিচয় দিয়ে সুইশ পাশপোর্ট দেখালেন। ৯০০ পাউন্ড আইরিশ মুদ্রা ভাংগালেন।

এই সব ঘটনা ঘটবার পর দেখা গেল, সব কটি ব্যাংকই প্রতারিত হয়েছে। পুলিশে খবর গেল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড খবর পেলেন। ঝানু গোয়েন্দারা অনুসন্ধানে তৎপর হলেন। এই অবসরে স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডে খবর গেল, যে একইভাবে এডিনবার্গ-এর একটি ব্যাংক প্রতারিত হয়েছে। অথচ দুটি ক্ষেত্রেই বর্ণনার হুবহু মিল। তফাৎ এই, যে লোকটি বেলজিয়াম পাশপোর্ট দেখিয়েছিল তার নাম টম বিল।

এখন এই সময়ের মধ্যে আইজাক স্মিথ, পলরুথ ওরফে টম বিল, এই ব্যক্তি প্রায় ৭০০০ হাজার পাউন্ড নিয়ে গাঢাকা দিয়েছে।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত নথীপত্রে এই সব নামের কোন লোককেই পাওয়া গেল না।

এরপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আলোচনায় বসলেন, এই লোক আন্তর্জাতিক প্রতারক দলের সদস্য। আর দক্ষিণ আমেরিকা ও ইংলন্ডের মধ্যে এর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ।

লোকটির সমস্ত বিবরণ পাঠান হলো প্যারিসে। এই প্যারিসেই ইনটারপোলের হেড অফিস। হেড অফিসে বিখ্যাত গোয়েন্দারা, সমস্ত বিবরণ নিয়ে, ছবি আঁকতে সুরু করলেন। একটা ছবি আঁকা হলো। তারপর সেই ছবি আর প্রদত্ত বিবরণ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কমপিউটার মেশিনে, এই কমপিউটার বলে দেবে ছবিটা ঠিক হয়েছে কিনা। অর্থাৎ অপরাধীর মুখের ছবি খানিকটা আঁচ করা যায়।

পরবর্তী অধ্যায় হলো, সেই ছবির কপি আর বিবরণ পাঠান হলো সমস্ত দেশে; এইভাবে প্রাথমিক পর্যায় সম্পন্ন হয়।

১৯২৩ খৃঃ ভিয়েনার পুলিশ প্রেসিডেন্ট এবং পরে অস্ট্রিয়ার চ্যানসেলার ভিয়েনায় আলোচনায় বসলেন। এই আলোচনা চক্রের নাম ছিল ক্রিমিন্যাল পুলিশ কংগ্রেস। আলোচনা চক্র থেকেই এই বিশেষ অপরাধ প্রতিরোধ বাহিনীর জন্ম।

ইনটারপোলের অপরাধ তত্ত্ব বিভাগে তিনটি শাখা বিভাগ আছে, আংগুলের ছাপ, ছবির বিভাগ আর পাশপোর্ট জালিয়াতি নিরোধ বিভাগ। এছাড়া আছে, রেডিও ফটো পাঠাবার বন্দোবস্ত। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধিত হয়।

অতি আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও কমপিউটার দিয়ে অপরাধী নির্ণয় করা হয়। অফিসের তিন লক্ষ নথীভুক্ত অপরাধীর যেকোন একজনের সম্পর্কে কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

এখানে ৬৫ হাজার অপরাধীর আংগুলের ছাপ আছে। ন' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অপরাধীর বিবরণ বর্তমানে আছে। এই সমস্ত বিবরণ রেডিও ও কমপিউটারের মাধ্যমে তৈরী। ১৯৬৫ খৃঃ ইনটারপোল নয় হাজার অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

ইনটারপোলের অফিস একটা স্বয়ং-শাসিত অঞ্চল। বারোটি বেতার প্রেরক যন্ত্রে বেতার সংবাদ আদান প্রদান করা হয়ে থাকে। প্যারিসে মূল বাড়ীটা তৈরী করতে মোট খরচ পড়েছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

আন্তর্জাতিক পুলিশের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো মাদক দ্রব্যর চোরাই চালান বন্ধ করা। অফিসের চোরা চালান বন্ধ করার জন্যে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। মার্কিন দেশের মাদকদ্রব্য নিরোধ সমিতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগ রেখে ইনটারপোল কাজ করে চলেছে। যদিও মার্কিন দেশ এই ইনটারপোলের সদস্য নয়।

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেসটিগেশন তাদের নিজেদের আন্তর্জাতিক অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে থাকেন।

বর্তমানে ১০৩টি দেশ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এই সব দেশের টাকায় গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ বাহিনী। প্যারিসের সেন্ট ক্লাউরে দশতলা বাড়ীর প্রতিটি ঘরই গবেষণাগার।

ইনটারপোলের গোয়েন্দারা প্যারিসেই থাকুন অথবা অন্য কোন দেশেই থাকুন, তাঁদের বিশ্রাম নেই। দিনের পর দিন তাঁরা অপরাধীর পেছনে ধাওয়া করবেন ও যা সংবাদ সংগ্রহ করবেন সবই প্যারিসে পাঠাবেন। প্রতি বছর তাঁরা মিলিত হন প্যারিসে, কীভাবে প্রতারকদের সমূলে ধ্বংস করা যায়, এই থাকে তাদের আলোচনার মূলবস্তু।

ইনটারপোলের প্রেসিডেন্ট মিঃ জীন নীপস্টের মতে বেশীর ভাগ মাদকের চোরাই-চালান আসে চীন, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, মধ্য আফ্রিকা থেকে এবং এদের গন্তব্যস্থল হলো আমেরিকা, ইটালি ও ফ্রান্স। ইনটারপোলের তৎপরতায় বর্তমানে মাদক চোরাই চালানের এক বিরাট চক্র ধরা পড়েছে ইটালীর পুলিশের হাতে। গত বছরেও মাদক চোরাই চালানের তিনশ জন চালানদারকে গ্রেপ্তার করেছে ইনটারপোল কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে পাথরের মূর্তি, পুরানো ছবি চালানদারদের ধরার জন্যে ইনটারপোলের অবদান অসামান্য।

এসব ছাড়া, আন্তর্জাতিক অপরাধ-বিজ্ঞানের গবেষণা করার জন্যে একটি গবেষণাগার খোলা হয়েছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি অপরাধীকে অনুশীলন করে তার অপরাধের কারণ নির্ণয় করে তাকে সংপথে চালিত করার চেষ্টা করা।

কোন অপরাধীই ইনটারপোলের চোখ এড়িয়ে পালাতে পারে না। একমাত্র উপায় মৃত্যুবরণ করা। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইনটারপোল বিচার করে না। যে দেশের অভিযোগ আছে, সেই দেশের পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়ে থাকে।

১৯৬৩ খৃঃ জুলাই মাসে বেইরুটের ব্যাংকে একটি লোক ২ হাজার ডলার পাউন্ড ভাংগালেন। তারপর দিন দেখা গেল নোট-গুলি জাল। সংগে সংগে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানাল, পুলিশ ইনটারপোলের হেড অফিসে বর্ণনা পাঠিয়ে দিল, ইনটার-পোল সমস্ত দেশের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে বিবরণ পাঠাল, এছাড়া নৌ, বিমান ও ট্রাভেল এজেন্টদের জানানো হলো এবং দেখা গেল, এক হাজার পাউন্ডসহ একজন লোক কুয়ায়েট বিমান বন্দরে ধরা পড়লো, তারপর সনাক্তকরণ করলেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এই লোকটিকে জেরা করতেই একটা বিরাট দল ধরা পড়ে। এদের লক্ষ্য ছিল, ডলার জাল করা ও তা ভাঙ্গান। লোকটির নাম ডানিয়েল ওয়ালকট। গত বছর ১৯৭০ বোম্বাই পুলিশ আবার তাকে ধরেছিল চোরাই চালানের সদস্য হিসাবে।

অঙ্গনা

প্রত্যাশিত সমর্থন

খবরে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক গৃহিনীর কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একটি চিঠি পেয়েছেন। ওই চিঠিতে ভদ্রমহিলা লিখেছেন যে, ভারত মনে করছে আমরা ভারতের বিরোধী। কিন্তু আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, আমি আপনার পক্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও। আমাদের দেশের ভারত বিরোধী নীতি আমরা সমর্থন করি না। এ ধরনের চিঠি তিনি আরো পাচ্ছেন।

এ রকম চিঠি পাওয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে আশ্চর্যের কিছু নয়। বর্তমান সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এই উপমহাদেশে যে নয়া ইতিহাস গড়ে উঠলো তার সমস্ত কৃতিত্বের মূলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী—ভারতীয় জনগণমনের একচ্ছত্র অধি-নায়িকা। বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং আমাদের মধ্যে যখন তিক্ততা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং পরিমাণে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন: আমাদের এই সংগ্রাম জাতীয় মর্যাদার সংগ্রাম। তাঁর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল এক নতুন জীবন লাভ করলো। নতুন চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে সারা দেশ এবং জাতি এই জাতীয় মর্যাদার সংগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালো। এক অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তায় সারা দেশ তখন জ্বলছিল।

ইতিহাস কখনো পুনরাভিনীত হয় না। ইতিহাসের গতি সম্মুখ পানে। সে থেমে থাকতে জানে না এবং পিছিয়েও চলতে পারে না। চঞ্চলা নদীর মতই তার কণ্ঠে একই সুর: শুধু ধাও, শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও। তবু এখানে এসে ইতিহাস একবার যেন কানে কানে কি কথা জানান দিয়ে গেল। সহসা মিল খুঁজে পাওয়া গেল। ভারতের ইতিহাস এক বিরাট ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সে ইতিহাস বীরত্বের। সেই বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস আবার অভিনীত হলো। আর একবার অভিনীত হয়েছিল এক খণ্ডাংশে এবং এদেশেরই বুকে। নিজের দেশ ইংরেজের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁসীর রাণী দেশবাসীর কাছে সর্বস্ব পণের আবেদন করেছিলেন আর ইংরাজ রেসিডেন্টকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোন কিছুর বিনিময়েই দেশকে তিনি ইংরেজের হাতে তুলে দেবেন না। পরিণাম জানা ছিল রাণী লক্ষ্মী-বাঈয়ের—প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর এই অসম সংগ্রামে তাঁর পরাভব সুনিশ্চিত। একদিকে প্রবল-প্রতাপ ইংরাজ আর অন্য দিকে এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের তিনি রাণী। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ চলে না। শুরু হলো ঝাঁসীর স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রাম। সমস্ত দেশবাসী সর্বস্ব পণ করে সেদিন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ইংরাজের রণপিপাসা এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু সোজা আঁচড় কেটে ইতিহাস এগিয়ে গেল। সারা দেশ জুড়ে তখন পরাধীনতার শৃঙ্খল ঝনঝন করে বাজছে। ঝাঁসী তা থেকে বাদ পড়তে পারে না। তাই স্বাধীনতারক্ষার সব প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু ইতিহাস

কোলে ধারণ করলো রাণী লক্ষ্মীবাঈ আর তার সহযোগী বীরদের।

ইতিহাস কোথাও থেমে নেই। সে ঠিক এগিয়ে চলেছে। সারা দেশে ইংরাজের পরাধীনতার শৃঙ্খল পরানো এক সময় সমাপ্ত হলো। এ পর্যন্ত ইতিহাসের গতি ছিল এক দাগের। কোথাও কোন আঁকাবাঁকা নেই। একতরফা এগিয়ে গেছে। যখনই কোথাও কোন ব্যতিক্রম নজরে পড়েছে তখনই তা সযত্নে বুকে তুলে নিয়েছে। এবার কিন্তু ইতিহাস নতুন মোড় নিল। পরাধীনতার জালে আবদ্ধ সারা দেশ সেই জাল ছেঁড়ার সংকল্প নিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগলো। মুক্তির সংকল্পে সেদিন সারা জাতি দৃঢ় সংকল্প। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একই শপথে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইতিহাসের পাতা থেকে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের আত্মা নতুন ব্যঞ্জনায় জেগে উঠেছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত বীর মাতঙ্গিনী রক্ত ঢাললেন। প্রীতিলতা ওয়াদেদার শহীদ হলেন। এগিয়ে এলেন ভারতীয় বীরাঙ্গনার দল। সেদিন সারা দেশ জুড়ে নারী জাতির অভূতপূর্ব জাগরণ। বীরের পাশাপাশি চলেছেন বীরাঙ্গনা। একই শপথে তাঁরা দৃপ্ত। চোখে তাঁদের স্বাধীনতার স্বপ্ন, কন্ঠে নবজীবনের গান।

বিশাল আমাদের দেশে বিরাট বৈচিত্র্য। কিন্তু তারই মধ্যে বিরাট ঐক্য। এতদিন এ বস্তু ধরা পড়ে নি। স্বাধীনতার প্রশ্নে এই ঐক্য সর্বপ্রথম ধরা পড়লো। সারা পৃথিবী বিরাট বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে স্বাধীনতার প্রশ্নে এই দেশ এক এবং অভিন্ন। যে বিপুল সম্ভাবনা সেদিন দেখা দিয়েছিল তাকে পরবর্তীকালে যথাযথভাবে ধরে রাখা যায় নি। স্বাধীনতার প্রশ্নে সব ভেদাভেদ তুচ্ছ, সবাই যেমন একই পতাকা-তলে সমবেত হয়েছিলেন সেই ঐক্যে যেন চিড় ধরছিল। সবাই এই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছিলেন। নিন্দুকেরা সরব হয়েছিলেন যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কথাটা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আর টি'কছে না। অনেকেই শংকিত ছিলেন এই ভেবে যে, তবে কি আমাদের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে?

এই ঘনায়মান আশংকা সহসা এক ফুৎকারে উবে গেল। ইতিহাস যেন ক্ষণিকের জন্য একটু ছেলেখেলা শুরু করেছিল। বৃহত্তর বাঁক নেবার মুহূর্তে আমাদের একটু ভাবিয়ে তুলেছিল। এবার ইতিহাসের বাঁক নেওয়া সম্পূর্ণ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখা গেল যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কথাটাই সত্যি। জাতীয় সম্মানের প্রশ্নে সারা দেশ ঐক্যবদ্ধ। বিদেশী শত্রুর মোকাবিলায় সবাই এক। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এমন ব্যাপক জনজাগরণ আর হয় নি। সারা পৃথিবী অবাক মানলো। জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো নিন্দুকেরা নিজ নিজ গর্তে লুকিয়ে পড়লো। আর ইতিহাসকে যিনি এই খাতে প্রবাহিত করলেন তিনি হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সোনার কাঠির স্পর্শে তিনি গোটা দেশকে জাগিয়ে তুললেন।

এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল অনেকদিন আগে ইংল্যান্ডে। রাণী প্রথম এলিজাবেথ তখন ইংল্যান্ডের সিংহাসনে। সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল চক্রান্ত। প্রতিবিপ্লবে সারা ইংল্যান্ড কেঁপে উঠলো। কিন্তু রাণী এলিজাবেথ অকুতোভয়। নিজের উপর প্রবল আস্থা নিয়ে তিনি দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে এবং সেই সঙ্গে দেশের অখন্ডতা রক্ষা করতে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল দেশবাসী। নতুন বলে বলীয়ান হয়ে তিনি প্রতিবিপ্লবীদের পর্যুদস্ত করে দিলেন। এর পর ঘনিয়ে এলো আর এক বিপদ। শুরু হলো বৈদেশিক হানা। তিনি কঠোর হলেন। বিদেশী হানাদারের দল লেজ গুটিয়ে পালালো। এভাবে সমস্ত শত্রুকে পর্যুদস্ত করে তিনি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে স্মরণীয় কাল। এ সময়ই শুরু হয় দেশ আবিষ্কারের পালা। আর এলিজাবেথের রাজত্বকালেই স্যার টমাস রো আসেন ভারতবর্ষে। প্রথম রাজদূত তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে।

ইংল্যান্ডে যা সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশে তা সম্ভব হবে না সেকথা কেউ কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু তা হবে মূর্খের স্বর্গবাস। বরং তাদের মনে রাখতে হবে যে সেদিনের তুলনায় সভ্যতার ইতিহাস আজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেদিন যা সম্ভব ছিল না আজ তা হাসতে হাসতে সম্ভব। সুতরাং আসমুদ্র হিমাচলের এই বিরাট এবং ব্যাপক জনজাগরণ ব্যর্থ যাবে না। একে ধরে রাখতেই হবে আর এখান থেকেই শুরু হবে আমাদের নতুন ইতিহাস। বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান অন্তে দেশে ফেরার পর স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন : সারা দেশ জাগছে। ঘুমন্ত সিংহ এবার জাগরণের অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। জাগরণের চিহ্নসকল সুস্পষ্ট এবং বিরাট সম্ভাবনাময়। স্বাধীনতাসংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেই জাগরণ শুরু হয়েছিল এবং বিশাল সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আজকের এই জাগরণ যেন নতুন করে পথ চলার ইঙ্গিত। ইতিহাস এবার সুনির্দিষ্ট গতিপথে প্রবাহিত। জাতীয় জীবনের ব্যাপক বিকাশ শুরু হবার পালা এবার। অনেক সাধনায় যে ধন আমরা পেয়েছি তা যেন হেলায় না হারাই।

কিন্তু এজন্য প্রয়োজন আমাদের নারীশক্তিকে ব্যাপকভাবে উদ্বোধিত করার। শহরের কথা বাদ দিয়ে এজন্য প্রয়োজন গ্রামের দিকে তাকানো। গার্গী-মৈত্রেয়ীর দেশের রমণীকুলের উপর এখন সেই মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধ। সভ্যতা দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে, দেশে দেশে নারীজাতির মুক্তি সাধিত হচ্ছে, কিন্তু

টুকরো খবর

প্রেসিডেন্ট নিকসন সম্প্রতি এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে হোয়াইট হাউসে কোন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের পদার্পণ ঘটতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও জানান যে খুব শিগগির এটা ঘটবে বলে মনে হয় না। তবে মহিলা প্রেসিডেন্ট যে যথার্থ যোগ্যতার পরিচয় দেবেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। উওমেন্স লিবারেশন সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে মিস এবং মিসেস-এর পরিবর্তে চিঠিপত্রে মিস্টার লেখার জন্য সম্প্রতি যে আন্দোলন চলছে সে ব্যাপারে তিনি একটু প্রাচীন-পন্থী। তিনি মহিলাদের ক্ষেত্রে মিস এবং মিসেস পছন্দ করেন। তবে যে কেউ ইচ্ছে করলে মাস্টার লিখতে পারেন।

আন্তর্জাতিক মহিলা সমীক্ষক সংস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দশজন মহিলার একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই তালিকায় অভিনেত্রী থেকে শুরু করে মিলিটারী অফিসার সবাই স্থান পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে মা হিসেবে প্রিন্সেস গ্রেস অব মনাকো, অভিনেত্রী ক্যান্ডিস বার্গেন, অফিসার জয় টমলিনসন ফেলান, স্ত্রী ইরানের রাণী ফারা দিবা, সাংবাদিক ন্যান্সী ডিকারসন, সমাজকর্মী সি. স্মিথ, মডেল জাঁ স্রিম্পটন, স্টুয়ার্ডেস মার্জেস মিলার, গায়িকা ডিহান ক্যারয়ল, মিলিটারি অফিসার রবিন উগিলে।

এই সংস্থার বর্তমান সদস্যসংখ্যা সাত হাজার। পৃথিবীর ছয়টি দেশের মহিলারা এই সংস্থার সদস্য এবং তাঁদের বার্ষিক চাঁদা দশ ডলার।

আমাদের নারী সমাজের অধিকাংশের এখনো এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যে লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে নারী জাতির সমানাধিকারের যে অঙ্গীকার সংবিধানের মাধ্যমে ঘোষিত হলো তা থেকে আমাদের দেশে নারী সমাজের বিরাট অভ্যুত্থান আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি। একথা অবশ্য বলা চলে না যে এদেশে নারীসমাজের কোন অগ্রগতি হয় নি। অগ্রগতি নিশ্চয়ই হয়েছে। শিক্ষা-জগতে আমরা অনেককে হার মানিয়েছি। অফিস এবং আদালতে আমরা আর এই মুহূর্তে সংখ্যায় নগণ্য নই। এসব স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় আমাদের পক্ষে এই অগ্রগতি সামগ্রিকের তুলনায় তেমন সন্তোষজনক নয়।

বিশ্বের দিকে দিকে চোখ ফেরালে অবাক মানতে হয়। সে দেশের নারী সমাজ নিজেদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে। এজন্য তাঁদের প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে। পুরুষের একচেটিয়া অধিকারে হাত পড়ায় পুরুষদের বক্রোক্তি এবং রসিকতা তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে, তবু তাঁরা সংকল্পে অটল থেকে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমাদের দেশে মধ্যযুগীয় কলংকজনক ইতিহাস থেকে মুক্তি পেতেও ঠিক আমাদের ততখানি ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয় নি। সেই অন্ধকার অধ্যায় থেকে মুক্ত হবার পর আমরা দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশীদার হয়েছি। সকলের সঙ্গে মিলে বুকের রক্ত দিয়েছি। বিদেশী শক্তির পাশব অত্যাচার সহ্য করেছি। তারপর দেশের মুক্তিলগ্নে আমরা স্বাভাবিক অধিকারে পুনরায় অভিষিক্ত হয়েছি।

এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে নারীজাতির বিরাট অভ্যুদয় ঘটলো না। এর কারণ হলো যে আমরা নিজেদের নিয়েই মশগুল ছিলাম। যে যার নিজের সাফল্যেই হাসি-খুশি। এই খুশির ঝিলিক যে আরো অনেক মুখেই ফুটিয়ে তোলা যায় সে কথা আমরা তেমনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করি নি। খবরের কাগজ মারফত মেয়েদের নানা সাফল্যের সংবাদ পেয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছি। দেশের নারী সমাজের বৃহত্তর অংশই যে আজো অজ্ঞাত এবং অবহেলিত সে খবর রাখার প্রয়োজন আমরা কোনদিন অনুভব করি নি। আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম যে এবার আমাদের অগ্রগতি প্রায় সম্পূর্ণ। এই ভাবনা আরো দৃঢ়মূল হলো যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির রাশ ধরলেন। তখন তো আর কোন কিছু আমাদের চিন্তা করার মতো মানসিকতাই ছিল না।

কিন্তু আজ সে প্রয়োজন আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। সারা দেশ জুড়ে এখন এক নতুন প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। এই বিরাট অভ্যুদয় ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবে না কোনক্রমেই। এজন্য প্রয়োজন নারী জাতির সচেতনতা। ব্যাপক সচেতনতায় যদি আমরা উদ্বুদ্ধ হতে পারি তবে এই স্পন্দন কোনক্রমেই ব্যর্থ হবে না এবং একে ধারণ করে দেশ ও জাতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো যাবে। তাই আমাদের যে অংশ এখনো মধ্যযুগীয় অনাচার এবং শোষণে অবসিত হচ্ছে তাঁদের কাছে নতুন যুগের আলো পৌঁছে দিতে হবে। তাঁদের বাদ দিয়ে যে দেশ ও জাতির অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে না এটুকু তাঁদের কানে পৌঁছে দিলেই যথেষ্ট। এতোদিন যদি এদিকে দেওয়া সম্ভব হতো তবে হয়তো মাঝখানের বদনামটুকু আমাদের সওদা করতে হতো না।

ইতিমধ্যেই শেকলভাঙার আওয়াজ কানে আসছে। মহারাষ্ট্রের মুসলমান মহিলা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বহু বিবাহ এবং সম্পত্তির প্রচলিত অধিকারের বিরুদ্ধে সারা দেশের মুসলমান নারী সমাজকে সংগঠিত করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে জনমত সংগঠিত করতে পারলে এক বৈপ্লবিক কার্য সম্পন্ন হবে। আইনের মাধ্যমে যা সম্ভব না, জনমত সংগঠনের মাধ্যমে তাই সম্ভব হয়ে উঠবে এবং দেশের আইনও সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপ নেবে।

এমনিভাবে শেকলভাঙার আওয়াজ আজ সর্বত্র ধ্বনিত করতে হবে। তবেই এই জাগরণ হবে সম্পূর্ণ। হাজার প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে রাণী এলিজাবেথ যেমন ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন তেমনিভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও ইতিহাসে এক নয়া স্বর্ণ-যুগের সংযোজনায় সক্ষম হবেন। সূচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এক প্রস্থ সাফল্যেরও আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। আর এই বলিষ্ঠ নীতির বাস্তব রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহিনীর অভিনন্দন। 'স্ট্যাচু অব লিবার্টির' দেশের লোক আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিরাট পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবেন নিঃসন্দেহে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এই অভিনন্দনে দায়িত্ব আমাদের আরো বাড়লো। আর সেই বর্ধিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই অর্থাৎ আমাদের নারী সমাজকে আত্মসচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রধান-মন্ত্রীর হাতকে আরো শক্তিশালী করে তবেই আমরা এই অভিনন্দনের মর্যাদা রাখতে সক্ষম হবো।

প্রমীলা
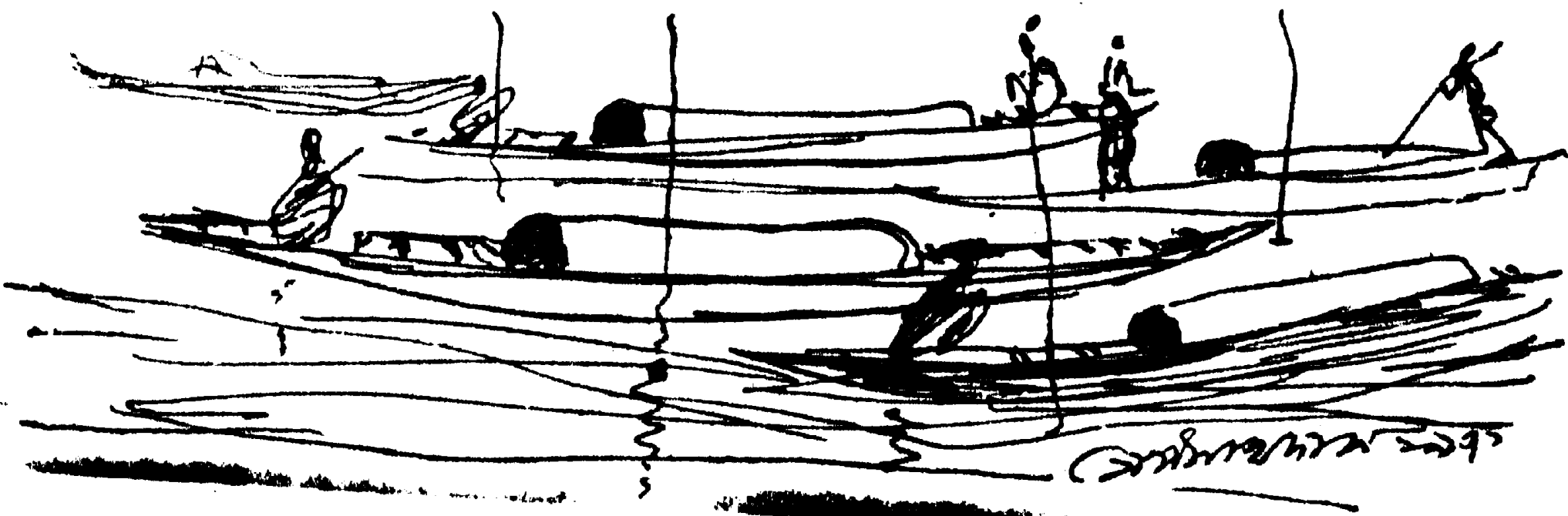
প্রতিধ্বনি

নির্মলেন্দু গৌতম

জ্যোৎস্নার রাত্রিগুলোয় উঠোন জুড়ে হোগলার পাটি বিছিয়ে দেয় বাতাসী। উঠোনের টগর গাছটা তখন জ্যোৎস্নায় ছবির মতো দেখায়। সাদা ফুলগুলো জ্যোৎস্নার ফুল ব'লে ভুল হয় তখন। উঠোনের দক্ষিণ দিকে আকাশ-ছোঁয়া নারকোল গাছের পাতায় পাতায় ঝলমল ক'রে ওঠে জ্যোৎস্না। আতা গাছটার আলো-ছায়া মাটির ওপর আলপনার মতো দেখায়। তুলসীতলায় নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাপ্রদীপ নিঃশব্দে পুড়তে থাকে।

সন্ধ্যে থেকেই নিশিকান্ত সেই হোগলার পাটির একধারে ব'সে দোতরায় সুর তুলে যায়। সুর তুলতে তুলতে একসময় সবকিছু ভুলে যায় নিশিকান্ত। বুকের মধ্যে তখন দারুণ একটা অভাব, অতৃপ্ত মাছের মতো খেলে বেড়ায়। মনে হয় কেবল জ্যোৎস্নার আকাশে ভেসে বেড়ায় তার দোতরার সুর, মাটিতে প্রতিধ্বনি তোলে না। বাতাসীকে সেসব কথা বলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বলে না। বাতাসী যে বুঝতে পারবে না এসব, নিশিকান্ত তা স্পষ্টই জানে। জানে বলেই বলে না।

সন্ধে ফুরোতে ফুরোতেই গগনরা আসে। হোগলার পাটি ক্রমে ভ'রে যায়। ওদের হাতে খোলে শব্দ ওঠে। থমকে শব্দ ওঠে। মাটির মধ্যে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। দোতরার শব্দ ভেসে যায় জ্যোৎস্নার আকাশে। গানের সুর, ফসলের ক্ষেত, নদীর রুপালী স্রোতে গড়িয়ে অন্য গ্রামে চলে যায় উদাসী সন্ন্যাসীর মতো।

বাতাসী বারান্দার খানিক জ্যোৎস্নায় নিঃশব্দে ব'সে থাকে।

দোতরা থামিয়ে একসময় নিশিকান্ত বলে, 'আজ গান গেয়ে রাতটুকু ফুরিয়ে ফেলতে সাধ হচ্ছে হে।'

গগন বলে, 'কথাটা মিথ্যে বলোনি নিশিকান্ত-দা।'

রহস্য ক'রে যতীন বলে, 'রাত কাকে বলছো? এতো আলোয় রাত নামবে কি ক'রে?'

'তা বটে!' গভীর গলায় বলে নিশিকান্ত।

বারান্দায় বাতাসী নড়ে-চড়ে বসে। কথাটা বোধহয় ভালো লাগে তার। শুরু হয় গান। রাত গভীর হয়। গানের

সুর আরো নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে। নিশিকান্ত গেথে বুকের দোতরা বাজায়। জ্যোৎস্নার আকাশে ভেসে যাওয়া সুর অতৃপ্তির বেদনা হয়ে বুকের মধ্যে ফিরে আসে।

তারপর একসময় গানের শেষে সবাই চলে যাবার পর দোতরাটিকে অসম্ভব যত্নে কোলের ওপর রেখে নিশিকান্ত আরো অনেকক্ষণ ব'সে থাকে হোগলার পাটির ওপর। বাতাসী স্থির হয়ে তেমনি ব'সে থাকে বারান্দায়। বাতাসী বোধহয় জানে, নিশিকান্ত এই সময়টুকু গভীরভাবে কিছু ভাবে। কাজেই কথা বলে না সে। বিরক্ত হয় না।

নিশিকান্ত ভাবে, একদিন বাতাসীকে তার অতৃপ্তির বেদনার কথা নিশ্চয়ই বলবে।

আজও তেমনি উঠোন জোড়া জ্যোৎস্নায় হোগলা পাটিতে ব'সে গান হলো গভীর রাত পর্যন্ত।

গানের শেষে সবাই উঠতেই দোতরাটিকে কোলের ওপর সযত্নে শুইয়ে নিশিকান্ত বললো, 'রোজই গান গেয়ে রাত ফুরোবার কথা বলি, তা আর হচ্ছে না হে।'

'কেন হচ্ছে না বলোতো?' গগন শুধালো।

নিশিকান্ত বললো, 'কি জানি! যাকগে একদিন ধ'রে রাখবো সবাইকে।'

সঙ্গে সঙ্গে যতীন বললো, 'গগনকে রাখতে পারবে না নিশিকান্তদা।'

'কেন?'

'নতুন বিয়ে করেছে। বাইরে রাত কাটালে বউ সন্দেহ করবে যে।'

'ওঃ!' বলে হেসে ফেললো নিশিকান্ত।

গগন হেসে সলজ্জভাবে বললো, 'বৌ আমার তেমন নয় হে।'

আর কেউ কিছু বললো না। বাঁশের ছোটো গেট পেরিয়ে এতোক্ষণ গাওয়া গানের সুর গুন-গুন করতে করতে চলে গেলো।

দোতরা নিয়ে বসলো নিশিকান্ত। যতোই সুর তুললো দোতরায় ততোই সে সুর জ্যোৎস্নার আকাশ থেকে অতৃপ্তির বেদনা হয়ে ফিরে এলো বুকের মধ্যে।

এখানে দীর্ঘদিন আছে নিশিকান্ত। এই উঠোনে দীর্ঘদিন ধ'রে গানের আসর বসছে। রৌদ্র জলে দিন কাটানো গ্রামের মানুষগুলো সন্ধ্যে ফুরোতেই এখানে আসে। আসর জুড়ে বসে। গান গায়। ফিরে যায় গভীর রাত্রে। মাঝে মাঝে অবশ্য আসর বসে না। নিশিকান্তকে সেসব দিন এ-গ্রামে ও-গ্রামে গান গাইতে যেতে হয়। এই তো নিশিকান্তর জীবিকা। অবশ্য গান গাওয়া জীবিকা হলেও সুখ আছে। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। গ্রাম ভেঙে লোক আসে তার গান শুনতে। তার দোতরার প্রশংসা করে, গানের প্রশংসা করে। গভীর রাত্রে যখন দোতরা বুকের মধ্যে নিয়ে নিশিকান্ত গ্রামের নির্জন পথ ফুরিয়ে ফেরে তখন তাদের সমস্ত প্রশংসা নিশিকান্তকে আশ্চর্যভাবে ধন্য ক'রে দেয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে নিশিকান্ত।

এসব কথা কোনোদিন বাতাসীকে বলে।

বাতাসী কোনো কথা বলে না। নিশিকান্ত জানে, তার সেই খ্যাতি সে তার সহজ বুদ্ধি দিয়ে গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করে। কিছুটা বোঝে। আর বোঝে বলেই দোতরাটাকে অসম্ভব যত্নে সাজিয়ে রাখে। নিশিকান্ত এইটুকুতেই খুশী। বাতাসীর কাছে আর কি সে চাইতে পারে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন সময় ফুরলো, নিশিকান্ত টের পেলো না। প্রায় শেষ রাতে উঠলো নিশিকান্ত। বারান্দার কাছে এসে দেখলো, বাতাসী ঘুমিয়ে পড়েছে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে।

নিশিকান্ত বেশ কিছু সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলো, 'বাতাসী—'

সেদিন পাশের গ্রাম থেকে বায়না নিয়ে ফিরছিলো নিশিকান্ত।

বেশ দেরী হয়ে গেছে কথাবার্তা শেষ করতে। হেমন্তের বেলা ফুরিয়ে আসছে প্রায়। পথ কমাবার জন্য পথ ছেড়ে জমির আলপথে নেমে পড়লো নিশিকান্ত।

প্রায় সব জমিতেই ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। কাটা চলেছে কিছু কিছু জমিতে। বিকেলের আলোয় ধান কাটার নিঃশব্দ ছবি দেখতে নিশিকান্তর অন্যরকম লাগছিলো। নিজেরই বাজানো দোতরার সুর ভেসে আসছিলো কানে। কেমন একটা অতৃপ্তি ঠেলে উঠলো। বুকের ভেতর নিশিকান্ত কষ্ট বোধ করলো। অন্যমনস্ক ভাবে দ্রুত হাঁটতে থাকলো আলপথ দিয়ে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলো নিশিকান্তকে।

নিশিকান্ত দাঁড়িয়ে পড়লো। পেছন ফিরে দেখলো ওপাশের জমি থেকে গগন, অনাথবন্ধু, যতীন সোৎসাহে ডাকছে তাকে। তিনজনের হাতেই কাস্তে। বোধহয় সারাদিন ধান কাটছে ওরা।

'চলে এসো নিশিকান্তদা।' গগন চেঁচিয়ে বললো।

যতীন বললো, 'একটা বিড়ি খাইয়ে যাও। অনেকক্ষণ বিড়ি খাইনি।'

'দাঁড়াও যাচ্ছি।' নিশিকান্ত আলপথ থেকে জমির মধ্যে নামলো।

ধান কেটে নেওয়া জমির মধ্যে গোড়াগুলো মাথা জাগিয়ে আছে। কাজে কাজেই খুব সাবধানে পা ফেলে গগনদের কাছে পৌঁছুলো নিশিকান্ত।

'তুমি আমাদের দেখতে পাওনি নাকি?' গগন শুধালো।

সঙ্গে সঙ্গেই যতীন শুধালো, 'কি এমন ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলে?'

নিশিকান্ত কি বলবে? যে কথা ভাবছিলো, সে কথা তো আর বলা যায় না। সুতরাং মৃদুস্বরে শুধু বললো, 'সংসার হাঁটতে চলতে ভাবায় হে।'

গগন বললো, 'তা হবে।'

নিশিকান্ত আর কথা বাড়াতে দিলো না। পকেট থেকে বিড়ি বের করে দিলো তিনজনকেই। নিজে একটা ঠোঁটে গুঁজলো। তারপর দেশলাই জেলে সবার বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরালো।

ধানের আঁটিগুলো একপাশে সাজানো। নিশিকান্ত তার ওপর বসলো। ধানের অদ্ভুত একটা গন্ধ পাচ্ছে নিশিকান্ত। সে গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঠের সোনালী ধানগাছগুলোর ভেতর বাতাসে আশ্চর্য এক শব্দের তরঙ্গও জেগে উঠছে। নিশিকান্ত স্পষ্টই শুনতে পেলো। রোমাঞ্চিত হলো নিশিকান্ত। বিড়িটা হাতের কাছেই ধরা রইলো তার।

'ইদিকে কোথায় গিয়েছিলে?' অনাথবন্ধু শুধালো হঠাৎ।

'একটা বায়না নিয়ে এলাম গানের।'

গগন শুধালো, 'কবে হচ্ছে গান?'

'পরশু।'

সেই শব্দ, সেই গন্ধ নিশিকান্তকে ক্রমশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে থাকলো। হেমন্তের স্নিগ্ধ বিকেলের আলোয়, হাওয়ার বিপুলে আকাশের অসাধারণ নৈঃশব্দে নিশিকান্ত নতুন ক'রে কি যেন ভাবতে শুরু করলো।

'আজ পূর্ণিমা। সারারাত গান হলে মন্দ হয় না নিশিকান্তদা!' গগন কাছে এসে বললো।

অন্যমনস্ক ভাবে নিশিকান্ত বললো, 'হবে।'

বলে হাতের বিড়িটাকে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো নিশিকান্ত।

গগনের হাতের কাস্তে ঝকঝক করছে। সারাদিন ধান কাটা চলেছে। বোধহয় গরম হয়ে আছে কাস্তে। নিশিকান্ত হাত বাড়িয়ে গগনের হাত থেকে নিজের হাতে নিলো কাস্তেখানা। নিতেই মনে হলো, সত্যি-সত্যি কাস্তেখানা উত্তপ্ত হয়ে আছে।

'কী, ধান কাটবে নাকি?' গগন হেসে শুধালো।

'তোমার কাস্তে দেখে ধান কাটতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।' নিশিকান্ত গভীর আবেগে বললো।

'কাটো না, একটু সাহায্য হয় আমার।' গগন ফের হাসলো।

উঠে পড়লো নিশিকান্ত।

'সত্যি সত্যি কাটবে নাকি?' অবাক হয়ে শুধালো অনাথবন্ধু।

'দেখি কাটতে পারি কিনা।'

ব'লে এগিয়ে গিয়ে ঝ'ুকে বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে ধান গাছের গুচ্ছ ধরে কাস্তে টানলো নিশিকান্ত। ফের ঝ'ুকলো, ধানের গুচ্ছ ধরলো বাঁ হাতে, ফের কাস্তে টানলো। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো কাস্তে টানার শব্দে।

অনাথবন্ধু বললো, 'তোমাকে ধান কাটতে দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে কিন্তু।'

'তাহলে এবার থেকে তোমাদের সংগে লেগে যাই কি বলো হে গগন?'

রোমাঞ্চিত গলায় বললো নিশিকান্ত। বলতে বলতেই ফের টান দিলো কাস্তেয়। আর সংগে সংগেই অনুভব করলো, কাস্তেটা তার আঙুলে বসে গেছে।

দ্রুত কাস্তে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো নিশিকান্ত। স্থিরভাবে আঙুলটা চোখের সামনে এনে রক্তে ভেসে যাওয়া আঙুলটা দেখলো কয়েক মুহূর্ত।

'ইস, আঙুলটা কেটে ফেললে শেষ পর্যন্ত!' গগন উদ্বিগ্ন গলায় বললো।

অনাথবন্ধু আর যতীন ঝ'ুকে পড়লো আঙুলের ওপর।

'নাহ্, তোমার হাতে কাস্তে দেয়া ঠিক হয় নি।' গগন যেন কাস্তে দেয়ায় অপরাধী হয়ে গেছে।

'না না, ঠিক হয়েছে। আঙুল কেটেছে বলে এমন কিছু হয়নি। এখুনি বাড়ীতে গিয়ে মলম-টলম যাহোক একটা কিছু লাগিয়ে নিচ্ছি।'

বলে আর দাঁড়ালো না নিশিকান্ত। সাবধানে মাঠের মধ্য দিয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকলো। কেবল পেছন ফিরে দেখলো অনাথবন্ধু, যতীন আর গগন বিশাল মাঠের মধ্যে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সন্ধ্যে হতে হতেই হোগলার পাটি বিছিয়ে বসলো নিশিকান্ত। আজ সারারাত গান হবে। সবারই অনেক দিনের ইচ্ছে। শুধু আঙুলটা কেটে যাওয়ায় দোতরা বাজাতে পারবে না নিশিকান্ত। কেবল গান গাইবে।

কাটা আঙুলটা চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো নিশিকান্ত। খুব বেশী না কাটলেও মন্দ কাটে নি। অনেকখানি রক্তও পড়েছে। এতোক্ষণ বাঁধা ছিলো আঙুলটা, অস্বস্তি হচ্ছিলো বলে খুলে ফেলেছে।

বাড়িতে ফেরবার পর রক্ত দেখে বাতাসী ভয় পেয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো। তারপর সব শুনে নিজেই মলম এনেছে, বেঁধেও দিয়েছে নিজে।

এখনও বাতাসী ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তার আঙুল নিয়ে। নিশিকান্ত মনে মনে হাসলো।

আবারও মাঠে যাবে নিশিকান্ত। কাস্তে নামিয়ে ধান কাটবে। ঝকঝকে কাস্তের সেই উত্তাপ এখন তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। নিশিকান্তর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

বসে থাকতে থাকতেই সন্ধ্যে ফুরোলো একসময়। রাতও গড়িয়ে গেলো কিছুটা।

এখনও ওরা এলো না কেন? উঠে এসে একবার গেটে দাঁড়ালো নিশিকান্ত। নির্জন রাস্তা জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে কেবল। কেউ নেই কোথাও।

মাঠ থেকে ফিরতে হয়তো দেরী হয়েছে ওদের। নিশিকান্ত গেট থেকে ফিরতে ফিরতে ভাবলো। ফের এসে বসলো পাটির ওপর: আস্তে আস্তে নিজের মনে গান গাইতে থাকলো।

ঠিক এমনি সময় গেটে শব্দ হলো। নিশিকান্ত মুখ ফিরিয়ে দেখলো অনাথবন্ধুদের।

'তোমার আঙুল কেমন আছে?' অনাথবন্ধু ঢুকতে ঢুকতেই শুধালো।

'ভালো।......তা তোমরা দেরী করে কেন?'

তোমার আঙুল কেটে যা রক্তারক্তি হয়েছে—ভাবলাম আজ আর তোমায় কষ্ট দেবো না।' গগন বললো আস্তে আস্তে।

যতীন বললো, 'তাই যাত্রা দেখতে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার খোঁজটা নিতে এসেছি।'

নিশিকান্ত শুধু বললো, 'ভালো করেছো।'

ওরা আর দাঁড়ালো না। ব্যস্তভাবে চলে গেলো।

মনটা খারাপ হয়ে গেলো নিশিকান্তর। রাত্রিটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেলো। ফিরে দেখলো বারান্দায় বাতাসী তেমনিভাবে বসে। বাতাসীকেও কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

দোতরা নিয়ে নিঃশব্দে পাটির এক কোণায় বসলো নিশিকান্ত। জ্যোৎস্নার আকাশের দিকে তাকালো। তারপর সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আঙুলের দিকে তাকালো। কি এক অনুভব তাকে ছু'য়ে যাচ্ছে। দোতরার তারে আঙুল রাখলো নিশিকান্ত। সুর তুললো। সে সুরের প্রতিধ্বনি শুনলো মাটিতে। আশ্চর্য সমস্ত অতৃপ্তির বেদনা ভেসে গেলো কোথায়! নিশিকান্তর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো অপার্থিব কোনো আনন্দে। চোখ বুঁজলো নিশিকান্ত। সোনালী ধানের ভেতর বাতাসে আশ্চর্য শব্দ-তরঙ্গ জেগে ওঠার অনুভব, পাকা ধানের গন্ধ মাঠময় ছড়িয়ে পড়বার অনুভব নিশিকান্তের কাটা আঙুলে বাজানো জ্যোৎস্নার আকাশ থেকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া দোতরার সুরে।

বুকের মধ্যে নিবিড়তম সুখের উত্তাপ কুড়িয়ে পেলো নিশিকান্ত। অসম্ভব তৃপ্তিতে তারপর নিজেই উদাসী সন্ন্যেসীর মতো ফসলের ক্ষেত, রূপোলী নদীর স্রোতে ভেসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে যেতে থাকলো।
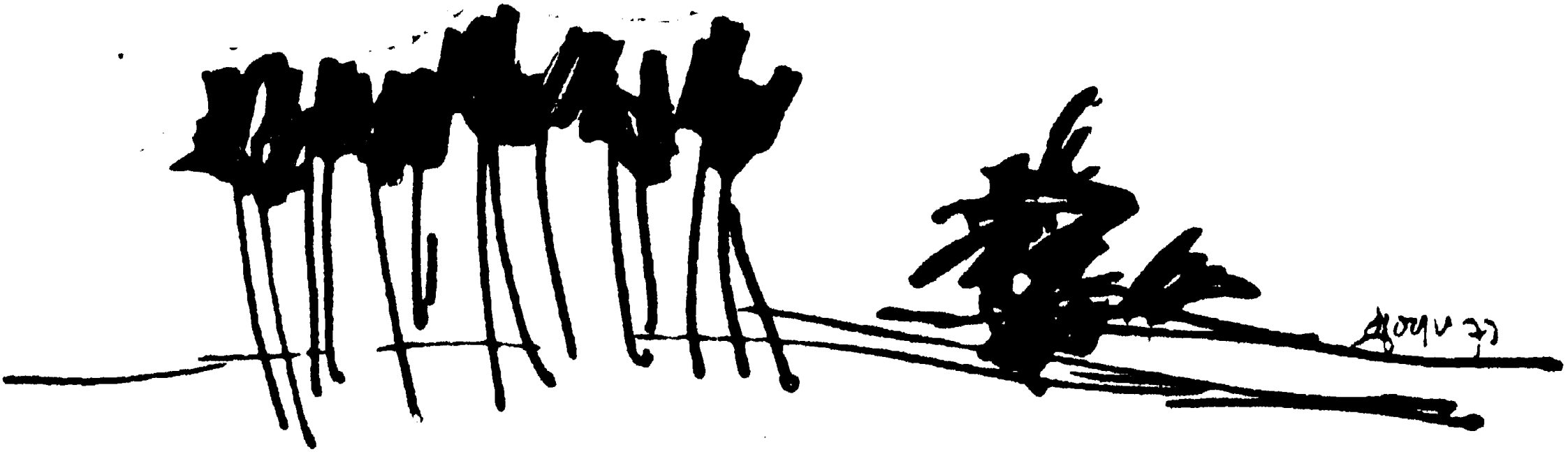
পটভূমি

এই লেখা যখন আপনারা পড়বেন খন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ঠিক বলা যায় া, কিন্তু এই লেখার সময় পর্যন্ত পশ্চিম ংলা বিধানসভার নির্বাচন সম্পর্কে কটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন ঝুলে রয়েছে। -কথা ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ত্যন্ত প্রত্যাশিতভাবেই অবিলম্বে এই জ্যে নির্বাচন চেয়েছেন। এ-কথাও ঠিক , প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে পি এম নেতা জ্যোতি বসু এখনই র্বাচনের পথে নানা অসুবিধের কথা ল্লেখ করলেও নির্বাচনের বিরোধিতা রেন নি। অর্থাৎ এই রাজ্যের দুটি প্রধান জনৈতিক দলই মার্চে নির্বাচনের পক্ষে। ন্তু এ-কথাও সত্যি যে, রাজ্য সরকারের শাসনের অন্ততঃ একাংশ এখনই নির্বাচন ন না! তাঁদের আশঙ্কা, মার্চের মধ্যে সব রণার্থীকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো ম্ভব হবে না। সুতরাং, অনেক সরকারী র্মচারীকেই তখনও ঐ কাজে ব্যস্ত কতে হবে। সেই অবস্থায় কি রাজ্যব্যাপী র্বাচনের দায়িত্ব নেওয়া প্রশাসনের পক্ষে ম্ভব হবে? এই ধরনের সন্দেহ যে শুধু জ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যেই আছে া নয়, নয়াদিল্লীর অনেকের মন থেকেও ই সন্দেহ এখনও যায় নি। তাই রাজ-নীতিক দিক দিয়ে মার্চে নির্বাচন অত্যন্ত ভিপ্রেত হলেও তাঁরা এ-বিষয়ে এখনও নস্থির করতে পারছেন না।

তবে এই অনিশ্চয়তার আবহাওয়ার ধ্যেও বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি যে কানোরকমে ব্যাহত হচ্ছে তা বলা চলে না। ংগ্রেসের পক্ষ থেকে তো ইতিমধ্যেই র্থী তালিকা পেশ করার জন্যে বিভিন্ন জেলা কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন কি আগামী নির্বাচনে বিজয়লক্ষ্মী দি কংগ্রেসের গলায় মালা দেন তবে কে খ্যমন্ত্রী হবেন, সে-আলোচনাও শুরু য়ে গেছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর দিল্লীর নিরাপত্তা ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় আবার ফিরবেন কিনা, দেশ কংগ্রেস চাইলেও শ্রীমতী গান্ধী সেই ভাবে রাজী হবেন কিনা এইসব প্রশ্ন খন থেকেই উঠেছে। এইসব আলোচনার ধরন কে রাজনৈতিক মহলের অনুমান, মার্চে র্বাচন হবেই, রাজ্য কংগ্রেস এটা একরকম ই নিয়েছে। তার কারণ, কংগ্রেসের র্বাচনী আলোচনায় সিদ্ধার্থবাবু অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার সদস্য হিসেবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের চিন্তাধারার সঙ্গে সুপরিচিত। নির্বাচন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, এ-কথা যদি সিদ্ধার্থবাবু জানতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই নির্বাচনী আলোচনায় এতোটা উদ্যোগী হতেন না।

জোট বাঁধার ব্যাপারেও কংগ্রেস উদ্যোগী হচ্ছে, তবে সেটা ঠিক আনু-ষ্ঠানিক জোট বাঁধার রূপ নেবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। কংগ্রেস এখন সংগঠন এবং রাজনৈতিক চেহারার দিক থেকে আগের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। সুতরাং, আগামী নির্বাচনে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতাই এখন দলের লক্ষ্য। খুব যদি হিসেবের গণ্ডগোল না হয়, তবে কংগ্রেসের পক্ষে এবার সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোও অসম্ভব নয়। তবু যে কংগ্রেস কোনো কোনো দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত চায় তার কারণ, প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ সি পি এমের সাফল্যের সম্ভাবনাকে ক্ষীণতর করে তোলা। এই আঁতাত কী চেহারা নেবে তা এখনও স্পষ্ট হয় নি, শুধু এইটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আইয়ের একটা সমঝোতা হবেই। কংগ্রেসী মহলের চিন্তাধারা এবং সি পি আই রাজ্য কমিটির সাম্প্রতিক প্রস্তাব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হয় না।

ওদিকে অপর শিবিরে সি পি এমও তার সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টকে প্রসারিত করতে আগ্রহী, তবে এ-ব্যাপারে একমাত্র আর এস পি ছাড়া আর কোনো দলের কাছ থেকেই এখনও আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায় নি। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আর এস পির ত্রিদিব চৌধুরীর আলো-চনার ফলে দুই দলের সমঝোতা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। আর এস পি নানা দিক দিয়ে সি পি এমের সঙ্গে অতীতে একত্রে কাজ করেছে। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত না-হওয়া সত্ত্বেও গত বিধানসভাতেও আর এস পি নানা ব্যাপারে সি পি এমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া গত নির্বাচনেই ঐ দল ঠেকে শিখেছে যে, 'একলা চলরে' নীতিতে বিশেষ লাভ নেই। কংগ্রেসের সঙ্গে কোনোরকম বোঝাপড়ার সম্ভাবনা যখন আর এস পি বাতিল করে দিয়েছে তখন সি পি এমের সঙ্গে আঁতাতই একমাত্র বিকল্প। অবশ্য কিছুদিন আগে আর এস পি এই রাজ্যে কংগ্রেস এবং সি পি এমের মাঝখানে একটা তৃতীয় ফ্রণ্ট তৈরির জন্যে উদ্যোগ শুরু করেছিল। এখন যদি ঐ দল সি পি এমের সঙ্গেই হাত মেলায় তবে বুঝতে হবে তৃতীয় ফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়, অথবা ঐ ধরনের ফ্রণ্ট তৈরি করে কোনো লাভ নেই—আর এস পি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে।

•

আর এস পি যদি মনস্থির করে ফেলে তা হলেও কিন্তু জোট বাঁধার ছবিটা খুব স্পষ্ট হবে না, কারণ ফরওয়ার্ড ব্লক বা এস ইউ সির মতো দল এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। আসলে গত নির্বাচন থেকেই এই মাঝের ছোট দলগুলির যে সঙ্কট শুরু হয়েছে আগামী নির্বাচনের আগে তা আরো ঘোরতর হয়ে উঠতে পারে। ফরওয়ার্ড ব্লকের চুঁচুড়া অধিবেশনে অবশ্য এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, সি পি এম বা কংগ্রেস, কোনো শিবিরের সঙ্গেই এই দল হাত মেলাবে না। এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত কতোটা টিকবে বলা মুস্কিল, কারণ দলের একাংশ যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী তেমনি অপর অংশ আবার সি পি এমের সঙ্গে বোঝাপড়ায় উৎসুক। এই টানাপোড়েনের ফলে যদি কোনো দিকেই যাওয়া না-হয় তা হলেই যে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্কট কাটবে তাও নয়, কারণ নিঃসঙ্গতার বিপদ খুব কম নয়।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে একটি বামপন্থী মোর্চা গড়ে তোলার জন্যে প্রথম আহবান জানিয়েছিল এস ইউ সি। তখনও নির্বাচন হবে, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। তবু এস ইউ সি এই আহবান জানিয়েছিল। সেই আহবানে বিশেষ কিছু ফল হয় নি। তার জন্যে অবশ্য অন্যান্য বামপন্থী দলকে দোষী করা বোধ হয় বৃথা। কারণ ঐ সময়ে এস ইউ সি যেভাবে রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছিল তার মধ্যেই কিছু কিছু বৈপরীত্য অনেকের চোখে পড়েছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেন বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত তার কারণ হিসেবে এস ইউ সি ঐ বিশ্লেষণে বলেছে যে, কংগ্রেসের প্রগতিশীল শ্লোগান একেবারেই ভাঁওতা। এই সব শ্লোগানের আড়ালে কংগ্রেস আসলে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকে পদদলিত করে বিপক্ষ দলগুলিকে নির্মূল করার চক্রান্ত করেছে। কিন্তু এস ইউ সি এ-কথা স্বীকার করেছে এই তথাকথিত প্রগতির শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে বহু ছাত্র ও যুবক আজ কংগ্রেসের পতাকা-তলে সমবেত হয়েছে। যুবশ্রেণী যে এইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে, তার জন্য অবশ্য কয়েকটি বামপন্থী দলও দায়ী বলে এস ইউ সি মনে করে। সেই দলগুলির মধ্যে
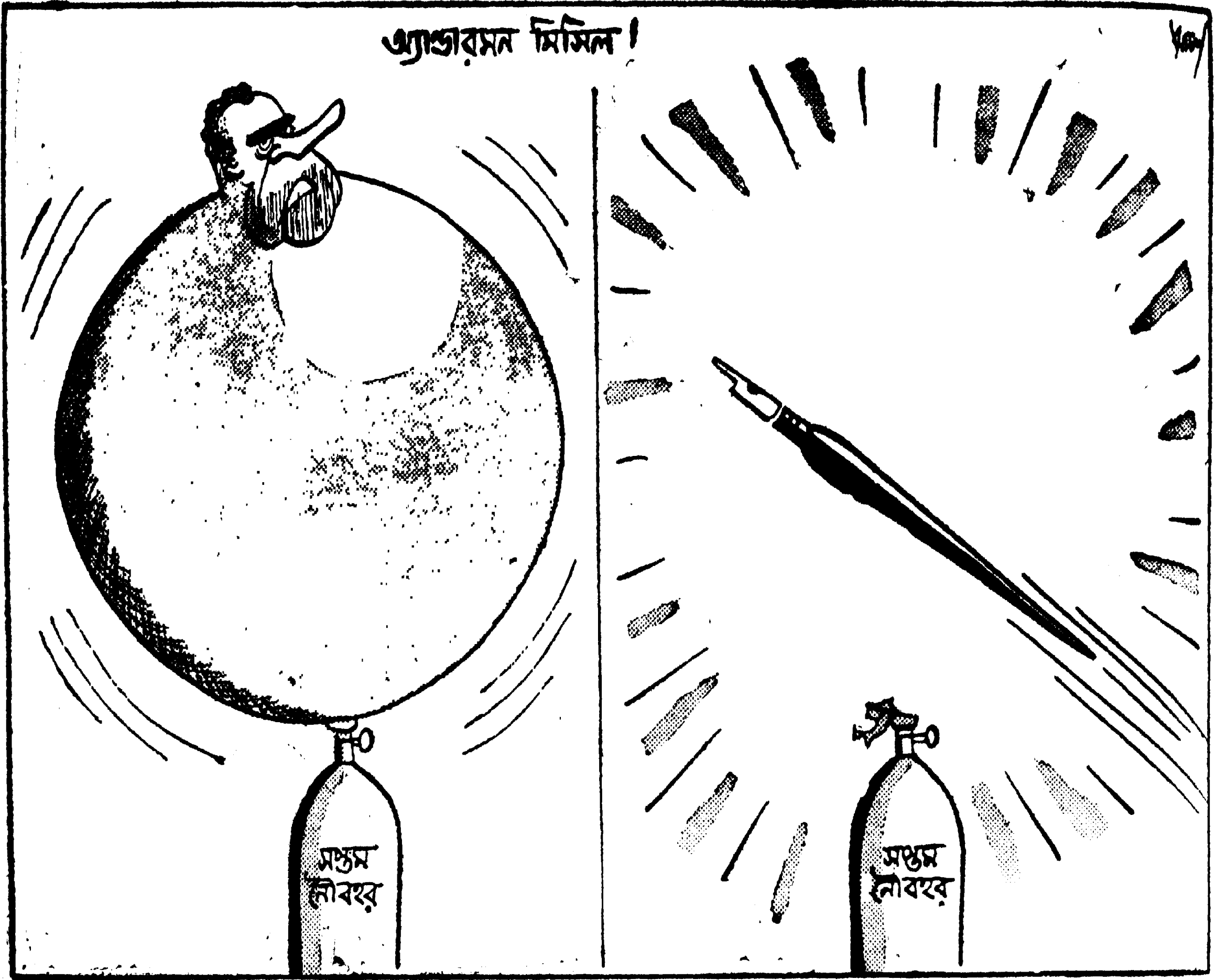
আছে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি। তারা শ্রীমতী গান্ধীর এইসব তথাকথিত প্রগতিশীল ব্যবস্থাকে সমর্থন করে কংগ্রেসের 'ইমেজ' সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। কিন্তু এস ইউ সি এইসব ব্যবস্থার মধ্যে প্রগতির নামগন্ধ খুঁজে পায় নি। কারণ ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের মতো প্রস্তাব কংগ্রেস অনেক আগেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কোনো প্রস্তাব অনেকদিন আগে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরে তা কার্যকর করা হল বলেই কী তা যথেষ্ট প্রগতিশীল বলে গণ্য হবে না? আসল প্রগতি কোন্‌টা? প্রস্তাব গ্রহণ, অথবা তা কার্যকর করা?

সে যাই হোক, এইসব প্রগতিশীল শ্লোগানের আড়ালে কংগ্রেস যাতে ফ্যাসি-বাদ কায়েমের সুযোগ না-পায় তার জন্যেই এস ইউ সি 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার' সৃষ্টি করার আহবান জানায়। অবশ্য এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড় বাধার কথা উল্লেখ করাতেও এস ইউ সি ভোলে নি। সেই বাধা হল সি পি এমের 'সঙ্কীর্ণতাবাদী বিভেদ-কামী' রাজনীতি। তাই এস ইউ সি ঐ ধরনের রাজনীতি ত্যাগ করার জন্যে সি পি এমের প্রতি আহবান জানিয়েছে। কিন্তু সি পি এম সম্পর্কে অতীতের যে অভিজ্ঞতার ইতিহাস এস ইউ সি বিবৃত করেছে তাতে সি পি এমের প্রতি এই আহবানের সার্থকতা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। এস ইউ সির স্পষ্ট অভিযোগ —বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে জোতদার, পুলিশ, গুন্ডাবাহিনীকে জড় করে সি পি এম সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেস আজ যেভাবে বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে, সি পি এমও তখন ঠিক একই পথ গ্রহণ করেছিল। এস ইউ সির আহবান অনুযায়ী যদি সি পি এম এখন সংকীর্ণতা ও বিভেদের রাজনীতি পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি দেয়, তবু সি পি এম যে ভবিষ্যতে সেই প্রতিশ্রুতি রাখবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? বিশেষত যে দল (অর্থাৎ সি পি এম) একবার 'ফ্যাসিস্টসুলভ' আচরণ করেছে তারা কি ভবিষ্যতে সেই ধরনের আচরণের লোভ সামলাতে পারবে? এ ছাড়া, আর একটা প্রশ্নও অনেকের মনে দেখা দিয়েছে। তা হল, এস ইউ সি একই সংগে কীভাবে কংগ্রেস এবং সি পি এমের বিরুদ্ধে 'ফ্যাসিবাদী আচরণের' অভিযোগ আনতে পারে? তা হলে কি কংগ্রেসের ন্যায় একটি 'প্রতিক্রিয়াশীল' দলের মতো একটি মার্কসবাদী দলের পক্ষেও ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠা সম্ভব? তা যদি হয় তবে ঐ দলের নেতৃত্বে (পশ্চিমবাংলায় যে-কোনো বামপন্থী মোর্চার নেতৃত্ব যে সি পি এমের হাতেই যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই) বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের মধ্যে আশার আলো জনসাধারণ দেখতে পাবে কী করে?

এস ইউ সি যদিও আশা করছে যে, এই ধরনের বামপন্থী ফ্রন্ট গড়ে তুলে কংগ্রেসকে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার আসল চেহারা ফাঁস করে দেওয়া সম্ভব, তবু দলের চিন্তাধারা থেকে মনে হয় এ ব্যাপারে তারা নিজেরাও বোধহয় খুব আশাবাদী নয়। তার কারণ সি পি এম সম্পর্কে যেমন সি পি আই সম্পর্কেও তেমনই এস ইউ সির মনে বেশ সন্দেহ রয়েছে। কারণ সি পি এম বিরোধিতার নামে কংগ্রেসের সংগে সহযোগের দ্বারা সি পি আই আসলে কংগ্রেসকেই শক্তিশালী করছে বলে এস ইউ সির নেতাদের ধারণা। আবার সি পি এমও সি পি আইয়ের চরিত্র উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে তাকে ক্রমশ কংগ্রেসের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। অর্থাৎ দুই কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতিতে লাভবান হচ্ছে একমাত্র কংগ্রেস।

এই অবস্থায় কি এস ইউ সি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছে? সেই জন্যেই কি বামপন্থী ফ্রন্টের মারফৎ গণআন্দোলনের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এস ইউ সিকে 'বিপ্লবের মারফৎ বর্তমান পুঁজি-বাদী শোষণমূলক রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার' আহবান জানাতে হচ্ছে?

৭-১-৭২ —দেবদত্ত

জলসা

একটি মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর

রবীন্দ্রসদনে টালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর এক বিচিত্র মধুর সান্ধ্য-উৎসব উপহার দিয়েছে নৃত্য ও সঙ্গীতানুরাগীবৃন্দদের।

অনুষ্ঠানের শুরু—এ-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী শ্রীমতী শীলা সেনের অতুলপ্রসাদের গান দিয়ে। পরিচিত শিল্পীগোষ্ঠীর তালিকায় ইনি পড়েন না। কিন্তু কণ্ঠস্বর মধুর এবং শিক্ষা ও অনুশীলনগত পরিবেশনায় উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট আভাস আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সুনির্বাচিত কয়েকটি কবিতা ছাড়াও বাংলাদেশের দুজন কবির দুটি কবিতার আবৃত্তিতে যুগের বার্তা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তিতে নাট্যরস জমে উঠেছিল দারুণভাবে। বিশেষ করে "দেবতার গ্রাস"—কবিতায় বহু চরিত্র, বহু ঘটনা ও দৃশ্যের যে চিত্রকল্প রূপে তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে অভিনয় প্রতিভার স্পর্শ ছিল বলেই তা এমন সমাদরে গৃহীত হয়েছে।

ধীরেন বসু পাঁচখানি নজরুল-গীতিতে কবির বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত করেন। এ ছাড়া উপরি পাওনা রূপে পাওয়া গেল বাংলাদেশের ওপর রচিত একটি সুন্দর গান।

সুচিত্রা মিত্রের 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ' 'গহীন গাঙের' ভাটিয়ালীর উদাসী মেঠো-সুরের পথ বেয়ে থামল 'কৃষ্ণ কলি'-র মধুরতায়।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সংগীত সংগতে উপভোগ্য হয়েছিল রুবী দত্তর নৃত্য।

এ-ছাড়া অশোকতরুর তিনখানি গান শ্রোতাদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছে। বিশেষ করে তাঁর 'একদিন যারা মেরেছিল গিয়ে' গানটি চিত্তস্পর্শী হয়ে ওঠে শুধুমাত্র নূতনত্বের কারণেই নয়, যুগ-বেদনার স্পন্দন এতে শোনা গেল এইটিই হোলো বড় কথা।

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ছয়টি গানে তাঁর জনপ্রিয়তার মান অনাহত ছিল।

নজরুলের ৩টি গান 'নমো, নমো' 'পথহারা' ও 'বাগিচায় বুলবুলি'—খুব মিষ্টি করে গেয়েছেন পূরবী দত্ত।

যোগেশ দত্তর মূকাভিনয়ে তাঁর চিন্তা-শীল মনের ছায়া প্রতিবিম্বিত। এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য প্রতিষ্ঠান অধিকর্ত্রী শ্রীযুক্তা মমতা ঘোষ ধন্যবাদার্হ।

আসন্ন সংগীত সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্ট সেন্টারের পক্ষ থেকে মহাজাতি সদনে আগামী ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী উচ্চাঙ্গ ও লঘুসংগীতের দুটি আসর নিবেদিত হবে। কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রসংগীতে থাকবেন সর্বশ্রী মুনাব্বর খাঁ, এ কানন, কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা পট্টনায়ক, শান্তি মুখোপাধ্যায়, নীতা সাহা, নিখিল বন্দ্যো-পাধ্যায়, ভি জি যোগ, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, মণিলাল নাগ, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য বিমল মুখোপাধ্যায়। নৃত্যে—মনু পাল, সুমিত্রা মিত্র, মালশ্রী সেন। আধুনিক গান—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পিন্টু ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, অনুপ ঘোষাল, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিককুমার ও বসন্তকুমারের কণ্ঠে আশা ও কিশোরের গান, আশালতা গাঙ্গুলী বনশ্রী সেনগুপ্ত, তন্দ্রা ব্যানার্জি, শিখা ভট্টাচার্য, বালসারা, শৈলেন লাহা (হরবোলা), সুমিতা গুপ্ত, রাধাকান্ত নন্দী।

গ্রামোফোন কোম্পানীর ডাইরেক্টর ডি, পি, অঘোরাম বাঙলাদেশের মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমদকে জাতীয় সঙ্গীতের রেকর্ড উপহার দিচ্ছেন।

বাংলাদেশ সরকারকে গ্রামোফোন কোম্পানীর দেশাত্মবোধক সংগীতের রেকর্ড উপহার

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী মুজিবনগর থেকে ঢাকায় সরিয়ে নেওয়ার অনতিপূর্বে গত ২২শে ডিসেম্বর মুজিব-নগরে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ ডি পি অঘোরাম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহমদের হাতে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' এবং অন্যান্য সম্প্রতি প্রকাশিত দেশাত্মবোধক সংগীতের রেকর্ডগুলি উপহার দেন। অন্যান্য রেকর্ডের সঙ্গে নজরুলের 'বাংলাদেশ' এবং অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের 'পূর্ব-পশ্চিম' আর রবিশংকর ও আলি আকবরের বিখ্যাত রেকর্ড 'জয় বাংলা' প্রভৃতিও ছিল।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহমদ রেকর্ডগুলি প্রকাশের জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীকে ধন্যবাদ জানান। চিত্রে মিঃ অঘোরামকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে রেকর্ড উপহার দিতে দেখা যাচ্ছে।

আনন্দানুষ্ঠান

সম্প্রতিকালে সঙ্গীত ও নৃত্যের অনেক আসরে উপস্থিত হবার সুযোগ ঘটেছে কিন্তু নৃত্য-গীত ও ইন্দ্রজালের এমন কাব্যধর্মী সমন্বয় এর আগে কখনও দেখিনি যেমনটি দেখলাম সেদিন মহাজাতি সদনে যোগী যাদুকর মৃণাল রায়-সৃষ্ট 'মায়ামহলে'। অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ জওয়ানদের সেবায় নিবেদিত হবে।

৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রীবিজয়সিং নাহার ও প্রধান অতিথি অর্ধেন্দুশেখর নস্কর শ্রীরায়কে অভিনন্দন জানান সম্প্রতি তাঁর জাপান সফরে ওদেশের গুণীমহলকে মুগ্ধ করে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মান উন্নত করেছেন বলে।

'মায়ামহল' এক বেকার যুবকের হতাশা ও স্বপ্নের কাহিনী। জীবন সংগ্রামে পরিশ্রান্ত তরুণ শহরের বাইরে এক গাছ-তলায় বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর স্বপ্নের পথ বেয়ে তার মায়ামহলে পৌঁছানো এবং এখানের অধীশ্বরীর কাছে পাওয়া যাদুদণ্ডের দাক্ষিণ্যে একটার পর একটা রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা ও রাতারাতি অঘটন-ঘটন-পটু হয়ে ওঠা।

নাচের ছন্দে ছন্দে হঠাৎ শূন্যে দুলে ওঠে দেবদূতের আবাস, শূন্যপাত্র থেকে উচ্ছ্বসিত হয় জলের ধারা, ধূসর মাটির বুকে নন্দনকাননের চোখজুড়ানো সৌন্দর্যের রঙমহল। তারপর স্বপ্নমদির সংগীতধ্বনির ইঙ্গিতে নানান দেশের [illegible] তরুণের বিভিন্ন দেশভ্রমণ [illegible] হয় এবং বিভিন্ন দেশের ইতিহাসানুযায়ী অতীত[illegible] ও অতীতের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ [illegible] অনুষ্ঠান দেখলাম।

—[illegible]

মেরে আপনে/শত্রুঘ্ন সিনহা, আসরানি এবং মীনাকুমারী

প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্রম প্রযোজিত অসমীয়া ছবি মরীচিকার একটি দৃশ্যে নিপম গোস্বামী ও পরুপা দেবী এবং অপর একটি দৃশ্যে নৃত্যরতা অমীয়া চৌধুরী।

[illegible] রমণী।   ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

পরলোকে পাঠানোর পবিত্র কর্ম

একদা একটি গোবৎসকে তার দুরারোগ্য ব্যাধিযন্ত্রণা থেকে মুক্তিদানের জন্য মহাত্মা গান্ধী তাকে হত্যা করবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। তখন এই 'সানুগ্রহ হত্যাকে' (মার্সি কিলিং) উপলক্ষ্য করে পত্রপত্রিকায় তুমুল বাদানুবাদ চলেছিল। এর পরে উনিশ শো চল্লিশ দশকের প্রথমার্ধে যখন আমরা ফ্রাংক কাপরা পরিচালিত এবং ক্যারী গ্র্যান্ট ও বোরিস কার্লফ অভিনীত 'আর্সেনিক অ্যান্ড দি ওল্ড লেশ' ছবি দেখি, তখন দুই ধার্মিকা রমণীর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনহীন বৃদ্ধদের নিঃসঙ্গ জীবন থেকে অব্যাহতি দেবার উদগ্র বাসনায় তাদের পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে হত্যা করবার কান্ডকারখানা দেখে যতখানি না হেসেছিলুম, তার চেয়ে বেশী তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। জোসেফ অটো কেসেলরিং অবশ্য মূল নাটকখানি লিখেছিলেন মঞ্চের জন্যে এবং নিউইয়র্ক শহরের ফুলটন থিয়েটার মঞ্চে এটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৯৪১-এর ১০ জানুয়ারী তারিখে। এবং এই মঞ্চাভিনয়েও বোরিস কার্লফ ছিলেন জোনাথান ব্রুস্টার-এর ভূমিকায়। আসলে বোরিস কার্লফ অভিনীত এই চরিত্রটি বিশেষ করে তাঁরই জন্যে রঙ্গ-প্রযোজক হাওয়ার্ড লিন্ডসে ও রাসেল ক্রুসের পরামর্শানুসারে নাট্যকার কেসেলরিং নূতন করে সৃষ্টি করেছিলেন।

লোকনাট্য প্রযোজিত জয় বাংলা যাত্রাভিনয়ে শিবদাস মুখার্জি, নিরঞ্জন ঘোষ, প্রফুল্ল গোস্বামী ও সুবিমল আদক

সম্প্রতি কেসেলরিং-এর এই বিদ্রূপাত্মক নাটকটির অনুসরণে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে-নাটকটি রচনা করেছেন, তার নাম দিয়েছেন—বীতংস। বীতংস বা বিতংস কথাটির আভিধানিক অর্থ (১) অলঙ্কার-বিশেষ এবং (২) পাশ, বা পক্ষিবন্ধন রজ্জু, জাল বা ফাঁসকল। এই বিশেষ নামকরণে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কি বলতে চেয়েছেন যে, প্রৌঢ়া ধার্মিকা রমণীদ্বয় যে-কাজকে তাঁদের চরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ মনে করেন, সেই কাজই আসলে হচ্ছে তাঁদের ফাঁসকল? শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মূল

নাটকের শেষাংশ সম্পর্কে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নান্দীকার সম্প্রদায় এই 'বীতংস' নাটকটিকে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করছেন রঙ্গনা-তে। এই উপলক্ষ্যে তাঁরা যে ভূমিকালিপি সংবলিত পত্রটি প্রকাশিত করেছেন, তাতে 'বীতংস'-এর পরিবেশ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : 'যে পৃথিবীতে বিজ্ঞান ধনিকের পণ্য, ধর্মের জন্য নরহত্যা অধর্ম নহে, পররাজ্যলোভী-যুদ্ধ সাধারণ ঘটনামাত্র, আমরা সেই পৃথিবীর অধিবাসী। আসুন সেই পৃথিবীকে লইয়া কিঞ্চিৎ হাসা যাউক।' অর্থাৎ যে-কাহিনী নাটকটির মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে, তাতে আর যাই থাকুক না কেন, হাসির খোরাক আছে যথেষ্ট।

এবং 'বীতংস' নাটকে যে হাসির খোরাক আছে এবং নাট্যাভিনয়টি যে অবিমিশ্রভাবে উপভোগ্য, একথা অবিসংবাদীভাবে সত্য। বৈষ্ণব ভেকধারী বহু নরাধমই আমাদের দেখবার ও জানবার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু তরি-তরকারী কোটা বা কাটা না বলে যাঁরা বানানো বলে থাকেন, তাঁদেরই দলভুক্ত দুজন প্রৌঢ়া নিঃসঙ্গ একক জীবনযাপী বৃদ্ধদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের অকুতোভয়ে হত্যা করছেন এবং এই হত্যা-লীলাকে মনেপ্রাণে ধর্মাচরণ বলে মনে করছেন. এই অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ। প্রৌঢ়া দুই পিসিমার 'ধর্মসম্মত' হত্যার বিপরীতে তাঁদের বেপরোয়া ভাইপো বিশ্বরঞ্জনের স্রেফ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হত্যাকাণ্ডকে মুখোমুখী দাঁড় করানোর ফলেই যে বিষয়বস্তুর উপভোগ্যতা বহু অংশে বর্ধিত হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য এবং এর জন্যে মূল নাটকের প্রথম প্রযোজকদ্বয় নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এই যে, তাঁর বাঙলা রূপান্তরে কোনো বিদেশী গন্ধ নেই, মাত্র ভাষান্তর না হয়ে তাঁর রচনা একটি মৌলিক নাটকের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

অভিনয়ে অত্যন্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ছোট পিসির ভূমিকায় লতিকা বসু। তাঁর বাচন, অঙ্গভঙ্গী, বিশেষ করে চোখের চাউনি, কথার মাঝে মাঝে কীর্তনের সুর ভাঁজা—সবে মিলে এমন একটি উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে, যা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। তাঁকে সর্বাংশে সাহায্য করেছেন—উপমা স্বরূপ বলা যেতে পারে, ঠিক শানাইয়ে পোঁ ধরার মতো—বড়পিসি বেশে দীপালি চক্রবর্তী। শুভরঞ্জন, যিনি উভয়বিধ হত্যালীলার হেঁয়ালীতে প্রথমটা হাবুডুবু খেয়েছেন এবং পরে প্রতিকারে সচেষ্ট হয়েছেন এবং যিনি পেশায় নাট্যসমালোচক ও ধার্মিকপ্রবর বিশ্বেসমশাইয়ের অনূঢ়া কন্যা খুকুর প্রেমের নেশায় মত্ত,—সেই শুভরঞ্জনের ভূমিকায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় যথেষ্ট সাবলীল হলেও তাঁর বাচন আরও স্পষ্টোচ্চারিত ও স্বচ্ছন্দ হওয়ার অবকাশ আছে। বরং প্রেমিকা খুকুবেশিনী কেয়া চক্রবর্তী অবস্থা বিশেষে পরিবর্তনশীল ভাবপ্রকাশে ঢের স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নিজেকে জেনারাল কারিয়াপ্পা-মনে-করা চিত্তরঞ্জন-রূপে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় উৎকেন্দ্রিকতাকে প্রচন্ডভাবে দেখাতে গিয়ে সর্বত্র সমতা রক্ষা করতে পারেন নি। বেপরোয়া বিশ্বরঞ্জনের চরিত্রটি সুডৌলভাবে চিত্রিত হয়েছে নাট্য নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা। কিছুটা প্লাস্টিক সার্জারীর কেরামতী যদি তাঁর মুখমণ্ডলের মেক-আপ মারফত ফুটে উঠত, তাহলে দর্শকদের কিছু উপরিলাভ হত। তাঁর সঙ্গী ডক্টর মেঘনাদ সাহা (মূলের প্রোঃ আইনস্টাইন) বেশে রুদ্রাজিৎ ঘোষ বাচনে এবং ভঙ্গীতে একটি চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় সকলেই উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন. মঞ্চসজ্জা অনাড়ম্বর হয়েও নাটকের চাহিদা পূর্ণ করেছে।

মঞ্চাভিনয়

সিরাজদ্দৌলা : আজকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের প্রয়োজনা পুরোনো বলে মনে হোলেও তার আকর্ষণ বোধ হয় একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়নি। মাঝে মাঝে এই ধরনের নাটকের শিল্পীদের তীব্র গতিবেগসম্পন্ন অভিনয় প্রয়োজনাকে অসম্ভব আকর্ষণীয় করে তোলে। এমনি একটি সুষ্ঠু অভিনয় সেদিন ই-পি-এম স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব (দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে)-এর শিল্পীরা পরিবেশন করলেন মহাজাতি সদনের মঞ্চে। সেদিনকার নাটক ছিল শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা'। পর পর তিন বছর চন্দ্রগুপ্ত, শাহজাহান ও কর্ণাজুন নাটক প্রযোজনা করে এঁরা যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন, 'সিরাজদ্দৌলা'র মধ্য দিয়ে তা আরও গভীরতায় বিস্তৃতি পেলো।

শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই সংঘাতসমৃদ্ধ নাটকটি সত্যি প্রাণের সুরে মুখর হয়ে উঠেছে। প্রতিটি শিল্পী অভিনয় করেছেন চরিত্রের সঙ্গে তা মিলিয়ে। বিশেষ করে 'সিরাজ' চরিত্রের যন্ত্রণাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চের আলোয় মূর্ত করে তোলেন নির্মল ঘোষ। আগের তিনটি নাটকে তাঁর যে স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তা আবার প্রতিষ্ঠিত হোল এই নাটকে। গোলাম হোসেন, ওয়াট আলেয়া চরিত্রে পরেশ চ্যাটার্জি, সত্যপ্রি দাশগুপ্ত ও প্রতিমা পাল সাবলীল অভিনয় করেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর রাখেন ইঁরা মিত্র, অমল সরকা শশী ঘোষ, আশুতোষ সরকার, প্রভাত ে আবহসঙ্গীতে ছিলেন মডার্ন আর্টিস্ট।

হাইলাকান্দিতে নাট্যাভিনয় : সংঘা সমৃদ্ধ 'বিদ্রোহের বন্দী' নাটকটি কলকা থেকে অনেক দূরে হাইলাকান্দি (কাছা আসাম)-তে বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপন সঙ্গে মঞ্চস্থ হোল। হাইলাকান্দি সং পরিবেশন কেন্দ্রে এই নাটকটির অভিনয় আয়োজন করেছিল মহকুমা সরকারী ক চারী সংস্থা। প্রযোজনার দিক থে এইটেই ছিল এঁদের প্রথম প্রচেষ্টা। বি প্রথম পদক্ষেপেই অনেক সম্ভাবনার প্র শ্রুতি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। নাট্যনির্দেশ দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাংলাদেশের নাট্যশিল্প। শিবু ভট্টাচার্য। কয়েকটি মুখর মুহূর্ত সৃষ্টিতে শ্রীভট্টাচার্য যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। কয়েকটি ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেন বেণীমাধব চৌধুরী, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, প্রবীর ভট্টাচার্য, গোপাল গর্গ, গীতাঞ্জলি গোস্বামী, প্রীতিকণা পাল, গৌরী ভট্টাচার্য, সন্তোষ মজুমদার। সমগ্র প্রযোজনার দায়িত্ব ছিল মহকুমাধিপতি শ্রী বি কে মিত্রের ওপর।

।। প্রতিযোগিতা ।।

oo কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা : নাট্যসম্পাদক, রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি, কোন্নগর, হুগলী।

o জাগৃতি পরিচালিত একাংক নাট্য-প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, জাগৃতি, ২৫ ফেরীঘাট রোড, আতপুর, ২৪ পরগণা।

কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট আয়োজিত বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৮শে জানুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট, ৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

স্বর্ণলতা অবলম্বনে যাত্রা-নাটক 'সরলা'

আজ থেকে সাতানব্বই বছর আগে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'। প্রকাশ মাত্রই উপন্যাসখানি বাঙালীর ঘরে ঘরে আদৃত হয়। পরে স্বর্ণলতা উপন্যাসের প্রথম খন্ডটি নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু দ্বারা নাট্যাকারে গ্রথিত হয়ে যেদিন 'সরলা' নামে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে এই বাঙালী ঘরের অসামান্য সহ্যশীলা দুঃখিনী বৌটির আদর বিন্দুমাত্রও কমে নি, তারই অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে সুশীল নাট্য কোম্পানী অভিনীত 'সরলা' যাত্রা-নাটক।

দেবনারায়ণ গুপ্ত দ্বারা যাত্রা-নাটকাকারে গ্রথিত এই 'সরলা' কাহিনীটি এমনই বিচিত্রভাবে ও দ্রুতগতিতে বিভিন্ন রসের পরিবেশন মারফত দর্শক সমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে যে, নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা এই যাত্রাভিনয়ে কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি নবরূপে প্রত্যক্ষ করলুম। সে হচ্ছে তাঁর নাট্যপরিচালক রূপ। তাঁর দ্বারা শিক্ষিত হয়ে প্রমদা, সুখদা ও শ্যামা (এই ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন যশস্বিনী অভিনেত্রী কেতকী) যে আশ্চর্য নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তা আজকের যাত্রাজগতে রীতিমত বিরল। বিশেষ করে প্রমদার ভূমিকাভিনেত্রীর বাচন, অঙ্গভঙ্গী, গমনাগমনভঙ্গী ও বিশেষ করে অর্থব্যঞ্জক চক্ষুর ঘূর্ণন, নর্তন ইত্যাদির তুলনা নেই। সহৃদয়া শ্যামার প্রমদার খলতার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো সার্থকভাবে অভিব্যক্ত কেতকীর অভিনয় কুশলতার মাধ্যমে। শশীভূষণ, বিধুভূষণ, জমিদার বজ্রনারায়ণ, দার্শনিক কালীকৃষ্ণ, দারোগামোহন বক্সী প্রভৃতি চরিত্র অত্যন্ত সু-অভিনীত। উদ্ভ্রান্ত যুবক রাজ্যেশ্বরের উদাত্ত কণ্ঠের গান—বিশেষ করে তাঁর মুখের রবীন্দ্রসঙ্গীতটি হৃদয়স্পর্শী। আর গদাধরচন্দ্রের ভূমিকায় 'জিবভারী' হয়ে যাওয়ায় ট-ট করে কথা-কওয়া (ডুডুও খাই, টামাকুও খাই) ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্তজয়ী অভিনয় 'সরলা' যাত্রাপালার একটি বিশেষ আকর্ষণ।

যাত্রামোদী মাত্রই সুশীল নাট্য কোম্পানী নিবেদিত এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'সরলা'-পালা দেখে পরম খুশী হবেন।

শুভমের অভিনয়ঃ শুভম শিল্পীগোষ্ঠী তাদের নতুন দুটো একাঙ্ক নাটক নিয়ে রামমোহন লাইব্রেরী হলে শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের জীবনী অবলম্বনে 'ডেভিড হেয়ার এবং রক্তবৃষ্টি' অভিনয় করবেন। রচনা ও নির্দেশনাঃ অমর রায়চৌধুরী। নির্দেশনায় সহযোগী মণি বিশ্বাস। অভিনয়ঃ মণি বিশ্বাস, সুধা রায়চৌধুরী এবং অমর রায়চৌধুরী।

বিবিধ সংবাদ

অমূল্য মান্নার অসমীয়া ছবি 'মরীচিকা' এবং অন্যান্য

আসামের উদীয়মান কথাছবি পরিচালক অমূল্য মান্না, অসমীয়া কথাছবি জগতে এক নতুনত্বের সন্ধান এনে দেবার সংকল্প নিয়ে কয়েকটি ছবিতে হাত দিয়েছেন। যথা গোয়ালপাড়া (অসম) এবং মুক্তিপথে এগিয়ে থাকা ছবি—'মরীচিকা'। শ্রীমান্না উক্ত ছবিতে এমন অনেক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন যা বহু পরিচালক অসাধ্য মনে করেন। বাস্তব কতকগুলি দৃশ্যের ভিতরে তিরিশ ফুট উঁচু ব্রীজের উপর থেকে জীবন্ত মানুষকে মৃতদেহরূপে ব্যবহার করে নিচে নদীতে ফেলা হয়েছে। অমূল্য মান্নার নিজস্ব ছবি—'পথের আর জীবন'-এ দেখানো হয়েছে বহু বাস্তবধর্মী দৃশ্য। আর একটি নতুন ছবিতে তিনি হাত দিয়েছেন আসামের পটভূমি মিকির পাহাড়ের পটভূমিকায়। ছবির নাম 'রাহুর প্রেম।' প্রযোজনা মিকির হিলসের রঙ-রূপ ফিল্মস।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতি বৎসরের মতো এবারও 'শিল্পী সংস্থা' সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্র, চিত্র, আবৃত্তি প্রভৃতি এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত।

সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে 'মেমসাহেব'-এর শুভ সূচনা

পম্পি ফিল্মস-এর ৩য় প্রচেষ্টা নিমাই ভট্টাচার্যের 'মেমসাহেব'-এর শুভ সূচনা গেল ৫ জানুয়ারী টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে প্রযোজিকা-সংগীত পরিচালিকা অসীমা ভট্টাচার্যের সংগীত নির্দেশনায় শুরু হয়েছে। নেপথ্যে কন্ঠদান করেছেন—অসীমা ভট্টাচার্য।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবির দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন—উত্তমকুমার ও অর্পণা সেন। এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

সুদূর আমেরিকা থেকে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের 'ম্যাকবে অ্যাণ্ড মিসেস মিলার' ছবির একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃটিশ তারকা জুলী ক্রিস্টী পূর্ববংগের (বাংলাদেশের) শরণার্থীদের সহায়তা করবার জন্যে লণ্ডনের পূর্ববঙ্গ শরণার্থী ত্রাণ-ভাণ্ডারে' ৫০০ পাউণ্ড দান করেছেন।

*

ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের 'এ ডেথ ইন ভেনিস' (পরিচালনা লুসিনো ভিসকন্তি) জাপানের আর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (কলা বিষয়ক চলচ্চিত্রোৎসবে) ১৯৭১-এর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে গ্রাণ্ড প্রিক্স পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে।

স্ট্যানলী কুবরীর (স্পেস ওডেসি খ্যাত) এ ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' ছবিটি নিউ-ইয়র্ক চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি এবং কুবরিক শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন, ওয়ার্ণারের 'ক্লুট' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে জেন ফাণ্ডা বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

গিরিশ স্মারক আলোচনা সভা

বাংলার সাধারণ নাট্যশালা ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর শতবর্ষে পড়েছে। একশো বছরে সাধারণ নাট্যশালার মাধ্যমে বাঙ্গালী কি পেয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা ও যাঁদের অবদানে সাধারণ নাট্যশালা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করার জন্য কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদের পক্ষ থেকে গেল ২ জানুয়ারী ৮৯।এ, শ্যামবাজার স্ট্রীটস্থ ভবনে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ডকটর অজিতকুমার ঘোষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডকটর উমা রায় সন্তোষ সিংহ ও অখিল নিয়োগী।

সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস বিবৃত করে সকলেই এ আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাট্যশালার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে, জাতীয় জীবনের সকল দিকের একটি বাস্তবরূপ, সমাজের নিখুঁত ছবি নাট্যশালার মধ্যে পাওয়া গেছে। দেশাত্মবোধে, মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে নাট্যশালা এতকাল যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আসছে তা আগামী-দিনে আরও বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। নাট্যকার, নট, নটী পরিচালক, প্রযোজক ও নাট্যকর্মী যাঁরা অনলসভাবে পরিশ্রম করে নাট্যশালাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁদের শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করা সংস্কৃতি রসিক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে ডকটর অজিতকুমার ঘোষ আরও বলেন—যে অপেশাদার নাট্য সংস্থাগুলির অবদান অসাধারণ। জাতীয় নাট্যশালা ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটক নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সমাজচিন্তার এমন নিদর্শন এর মধ্যে পাওয়া গেছে যা কালজয়ী হয়ে রয়েছে। বাগবাজার সাধারণ নাট্যশালার যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম নাট্যপ্রেমিকেরা চিরকাল মনে রাখবেন।

সংসদ সচিব ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানান এবং এই বছর সংসদের পক্ষ থেকে গিরিশচন্দ্রের একটি নাটক অভিনীত হবে ও শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হবে, একথা সভায় ঘোষণা করেন। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অতীত ও বর্তমান যুগের নট, নটী, পরিচালক প্রযোজক ও অন্যান্য দুর্লভ ছবির প্রদর্শনী করা হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সিনে ক্লাবের প্রথম পরীক্ষামূলক ছবি 'ফেরার'

চলচ্চিত্র পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'জন্মান্তর' এবং 'কোন একদিন' ছবির মধ্যে দিয়ে বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন। এবারে তিনি শুরু করেছেন পরীক্ষামূলক প্রয়াস 'ফেরার' প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে আসা দুই কয়েদী একজন বাঙালী অপরজন পাঞ্জাবী এদের চোখে অর্থাৎ ফ্ল্যাসব্যাকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে শহরের বিশৃঙ্খল অবস্থা আর বেকার যুবকদের অবসাদ, অন্য দিকে গ্রাম বাঙলার শস্য-শ্যামলা রূপ—দুই পলাতক কয়েদী শহর থেকে গ্রাম বাংলাতেই আশ্রয় পেল—পেল গ্রাম বাংলার লোকেদের সহানুভূতি এবং এদের সাহায্যেই ওরা পৌঁছুতে পারলো ওদের গন্তব্যস্থলে। এ-সব ঘটনার কোনটি হাসিতে ভরপুর আবার কোনটি বিষাদে ভরা। এ ছবির সম্পূর্ণ কাজ চলেছে শহরের বুকে অর্থাৎ রাস্তাঘাটে এবং গ্রাম বাংলার মধ্যে। গেল নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ২৫ পর্যন্ত ভারত-পাক যুদ্ধের মধ্যেও বসিরহাটের অন্তর্গত ধান্য-কুড়িয়ার গ্রামে ছবির শ্যুটিং চলেছে। ছবির কাজ প্রায় শেষ, সামান্য ক'দিন শ্যুটিং করলেই সম্পাদকের টেবিলে চলে যাবে। শিল্পীরাও নবাগত এ'রা কোনদিন অভিনয় করে নি—সত্যেন গাঙ্গুলী, কচ মুখোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্য ভট্টাচার্য, পাপিয়া মুখোপাধ্যায়, গার্গী বসু, বিভূতি ভট্টাচার্য ও প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কাহিনী, চিত্রনাট্য পরিচালনা অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রায়ণ বিজয় দে, সঙ্গীত সরোজ কুশারী।

টালিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠান গেল ২৭ ডিসেম্বর 'রবীন্দ্র সদনে' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণকল্পে এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পী সর্বশ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, পূরবী দত্ত, রুবী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, প্রদীপ ঘোষ, যোগেশ দত্ত অংশ গ্রহণ করেন। প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী শীলা সেন উদ্বোধন সংগীতে অংশ গ্রহণ করে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার্থে 'অন্বেষা'র প্রয়াস

নব-নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা নাট্যকার ও চলচ্চিত্রশিল্পী গঙ্গাপদ বসুর স্মৃতিরক্ষা মানসে সুখ্যাত নাট্য সংস্থা 'অন্বেষা' একটি অসাধারণ স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি-জগতের প্রায় সকলেই এই সংকলন গ্রন্থে লিখেছেন। এ'দের মধ্যে আছেন : সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোঃ, অপর্ণা সেন, মাধবী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোঃ, সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোঃ, অজিতেশ বন্দ্যোঃ, শেখর চট্টোঃ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, এন কে জি,, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, সেবাব্রত গুপ্ত, জ্যোতির্ময় বসুরায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী, মন্মথ রায়, বিজন ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। মোট ৭৯টি রচনার এই অসামান্য সংকলনের শ্রীবৃদ্ধি করেছে খালেদ চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ।

'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'

পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর নতুন ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য গত ২৬শে ডিসেম্বর বিরাট ইউনিট নিয়ে বীরভূমের ইলামবাজার অঞ্চলে রওনা হয়ে গেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ঐ ছবিতে দেখা যাবে কিছু দুরন্ত প্রকৃতির ছেলেদের মজার মজার কাণ্ড-কারখানা। আর তাদের ভূমিকায় অভিনয় করবেন অধিকাংশই নতুন মুখ। উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল দত্ত, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ বোস, হিরন্ময় মিত্র, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা মিশ্র প্রভৃতি থাকবেন এ ছবির ভূমিকালিপিতে।

অনেক সোনালী দিন : নীরেন সেন রচিত 'অনেক সোনালী দিন' নাটকটি সম্প্রতি হুগলী চণ্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের প্রযোজনায় জঙ্গলপাড়ায় অভিনীত হোল। বারীন রাও ও বিমল দত্ত নির্দেশিত এই নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন অসিত দাশগুপ্ত, সুবীর চক্রবর্তী, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, নিত্য চক্রবর্তী, বিমল দত্ত, প্রতিভারঞ্জন মজুমদার, বারীন রায়। মঞ্চপরিকল্পনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন সুনীল ব্যানার্জি ও অমরেন্দ্র মুখার্জি।

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্বদল বনাম অস্ট্রেলিয়া

৩য় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট

বিশ্ব একাদশ : ১৮৪ রান (টোনি গ্রিগ ৬৬, সুনীল গাভাস্কার ৩৮ এবং ইন্তিখাব আলম ৩৮ রান। ডেনিস লিলি ৪৮ রানে ৫ উইকেট)।

ও ৫১৪ রান (গারফিল্ড সোবার্স ২৫৪, জাহির আব্বাস ৮৬ এবং পিটার পোলক ৫৪ রান। লিলি ১৩৩ রানে ৩ এবং টোরি জেনার ৮৭ রানে ৪ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ২৮৫ রান (গ্রেগ চ্যাপেল নটআউট ১১৫, ম্যাসী ৩৪ এবং স্ট্যাকপোল ৩২ রান। সোবার্স ৬৭ রানে ৩, গ্রিগ ৪১ রানে ৪ এবং আলম ৪৫ রানে ২ উইকেট)।

ও ৩১৭ রান (ডগ ওয়াল্টার্স ১২৭, বেনো ৪২ এবং চ্যাপেল ৪১ রান। বিষণসিং বেদী ৮১ রানে ৪ এবং আলম ৮৩ রানে ৩ উইকেট)।

মেলবোর্নে বিশ্ব একাদশ বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব একাদশ দল ৯৬ রানে জিতে গেছে। ব্রিসবেনের এই দুই দলের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিত ছিল এবং পার্থের দ্বিতীয় খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১ রানে জিতে ১-০ খেলায় এগিয়েছিল। বর্তমানে দুই দলেরই খেলার ফলাফল সমান-সমান (১-১)।

প্রথম দিনেই বিশ্ব দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৮৪ রানের মাথায় শেষ হয়। পার্থের ২২ বছরের ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি ভয়ংকর মূর্তিতে বল করে বিশ্ব দলের প্রথম সাত জনের পাঁচজন খেলোয়াড়কে খেলা থেকে বিদায় করেন। তিনি তাঁর বোলিংয়ের প্রথম ওভারেই ওপনিং ব্যাটসম্যান একারম্যানের উইকেট মাটি থেকে উপড়ে দেন। খেলার একসময় তাঁর পরপর দু' বলে দুই প্রখ্যাত ব্যাটসম্যান গ্রেমী পোলক এবং সোবার্স আউট হন। মাত্র ২৬ রানের মাথায় বিশ্ব দলের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় ৫ম উইকেট জুটী গ্রীগ এবং গাভাস্কার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে রানের অংক যা কিছুটা ভদ্রস্থ করেন। গ্রীগ বিশ্ব দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৬ রান তুলেছিলেন। এইদিন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট পড়ে ৫৮ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৮৫ রানে শেষ হলে তারা ১০১

গারফিল্ড সোবার্স

রানে এগিয়ে যায়। এর জন্যে সমস্ত কৃতিত্ব গ্রেগ চ্যাপেলের প্রাপ্য। চ্যাপেল ১১৫ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল এক উইকেট পড়ে ৫৮। পূর্ব দিনের ৫৮ রানের সঙ্গে কোন রান যোগ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় দিনে তাদের ২য় উইকেট পড়ে যায়—পিটার পোলকের বলে ইয়ান চ্যাপেল বোল্ড হন। ইয়ানের ভাই গ্রেগ শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১১৫ রান করে নটআউট থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, এই গ্রেগ প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে দলের দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গ্রেগ চ্যাপেল ২৩৮ মিনিট খেলে তাঁর ১১৫ রানে একটা ওভার বাউন্ডারী এবং পাঁচটা বাউন্ডারী করেন। তাঁর শতরান পূর্ণ হয় ২১৯ মিনিটে। অস্ট্রেলিয়ার ১৪৬ রানের মাথায় যখন ৭ম উইকেট পড়ে এখন অনেকেই ভেবেছিলেন অস্ট্রেলিয়া কোনমতেই বিশ্ব একাদশ দলের ১ম ইনিংসের ১৮৪ রান ডিঙ্গিয়ে যেতে

ডগ ওয়াল্টার্স

পারবে না। কিন্তু চ্যাপেল ৮ম উইকেটের জুটি জেনারের সহযোগিতায় ৪৩ মিনিটে ৪২ রান এবং ৯ম উইকেটের জুটিতে ম্যাসির সহযোগিতায় ৮২ মিনিটে ৯৭ রান তুলে দলকে ১০১ রানে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় বিশ্ব দলের একটা উইকেট পড়ে ৪২ রান উঠেছিল।

তৃতীয় দিনে বিশ্ব একাদশ দলের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৪৪ (৭ উইকেটে)। ফলে তারা প্রথম ইনিংসের ১০১ রানের ঘাটতি পূরণ করে ২৪৩ রানে এগিয়ে যায়। হাতে জমা থাকে তিনটে উইকেট এবং সোবার্স ১৩৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনি ১৩৫ মিনিটে ১৬টি বাউন্ডারীসহ তাঁর শতরান পূর্ণ করেন। মেলবোর্ন মাঠে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। এই সেঞ্চুরীর ফলে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অল রাউন্ডার সোবার্স পৃথিবীর যে-সব বড় মাঠে খেলেছেন সর্বত্রই সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করলেন।

চতুর্থ দিনে বিশ্ব একাদশ দলের ২য় ইনিংস ৫১৪ রানের মাথায় শেষ হয়। সোবার্স 'ডাবল সেঞ্চুরী' (২৫৪ রান) করেন। তাঁর এই ২৫৪ রানে ছিল ৩৩টি বাউন্ডারী এবং দুটি ওভার বাউন্ডারী। অষ্টম উইকেটের জুটিতে পিটার পোলক (৫৪ রান) এবং সোবার্স দলের ১৮৬ রান যোগ করেন। সোবার্সের এই ডাবল সেঞ্চুরীকে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইনিংস বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর আরও বক্তব্য, গত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের খেলা দেখেছেন কিন্তু সোবার্সের এই খেলা অতুলনীয়। স্যার ব্র্যাডম্যান তাঁর এই অভিমতকে সুদৃঢ় করার জন্যে বলেছেন, 'যে-কোন লোকেরই কোন কিছু সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণটি প্রয়োগ করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। একথা মনে রেখেই আমি বলছি সোবার্সের এই ইনিংসের খেলা সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

বিশ্ব একাদশ দলের ২য় ইনিংস ৫১৪ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি ৫৩০ মিনিটে ৪১৪ রান তুলতে পারলেই অস্ট্রেলিয়ার জয় হবে—খেলার এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস খেলতে নেমে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ফলে খেলায় জয়লাভের জন্যে তাদের আরও ২৭৫ রান তুলতে বাকি থাকে। হাতে জমা থাকে ৭টা উইকেট এবং পঞ্চম দিনের খেলা।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই অস্ট্রেলিয়ার আরও চারটে উইকেট পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় ডগ ওয়াল্টার্স মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। মেলবোর্ন মাঠে আয়োজিত প্রথম শ্রেণীর খেলায় ইতিপূর্বে অপর কোন

খেলোয়াড় মধ্যাহ্ন ভোজের আগে সেঞ্চুরী করেন নি, ওয়ালটার্সই প্রথম। লাঞ্চের আগে ১৬টি বাউন্ডারী নিয়ে তাঁর রান দাঁড়ায় ১০২। পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের সাড়ে তিনঘণ্টা আগে ৩১৭ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস শেষ হলে বিশ্ব একাদশ দল ৯৬ রানে জিতে যায়। আগের দিন আঘাত লাগায় ওয়াটসন শেষ দিনে ব্যাট করতে নামেন নি। সুতরাং ১ম উইকেট পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস শেষ হয়। বিশ্ব একাদশ দলের দুজন বোলার পিটার পোলক এবং নরম্যান গিফোর্ড অসুস্থ থাকায় পঞ্চম দিনে বল করেন নি।

বিশ্ব একাদশ বনাম অস্ট্রেলিয়ার এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটিংয়ে গারফিল্ড সোবার্স (২য় ইনিংসে ২৫৪ রান), গ্রেগ চ্যাপেল (১ম ইনিংসে নটআউট ১১৫ রান) এবং ডগ ওয়ালটার্স (২য় ইনিংসে ১২৭ রান) এবং বোলিংয়ে ডেনিস লিলি (১ম ইনিংসে ৬৮ রানে ৫টি উইকেট)।

পরলোকে গোবর গুহ

অতীতকালের বিশ্বখ্যাত মল্লবীর যতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে গোবর গুহ ৮০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। গোবরবাবুর পিতামহ অম্বিকাচরণ, পিতা রামচরণ এবং পিতৃব্য ক্ষেত্রচরণ গুহ ভারতীয় কুস্তির আসরে এক নতুন ঘরানার প্রবর্তক এবং ধারক ছিলেন। এই গুহ-ঘরানার আখড়াতেই গোবরবাবুর প্রাথমিক কুস্তি শিক্ষা। পরবর্তীকালে পিতার আগ্রহে তিনি ভারতবিখ্যাত মল্লবীরদের কাছে মল্লযুদ্ধের তালিম নিয়েছিলেন।

১৯১০ সালে গোবর গুহ ভারতবিখ্যাত মল্লবীরদের সঙ্গে ইউরোপ সফরে গিয়ে আন্তর্জাতিক মল্লযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। দু বছর পর ১৯১২ সালে দ্বিতীয়বারের ইউরোপ সফরে গোবরবাবু স্কটল্যাণ্ডের জিমি ক্যাম্পবেল এবং এডিনবরায় জিম ঈএসেনকে পরাজিত করে মল্লযুদ্ধে ব্রিটিশ এম্পায়ার খেতাব জয়ী হন। তাঁর বিশ্ব খেতাব জয় ১৯২০ সালের আমেরিকা সফরে, অ্যাড সান্তেলকে হারিয়ে। এই লড়াই ৭০ মিনিট স্থায়ী ছিল। আমেরিকায় তিনি সাত বছর (১৯২০-২৬) অবস্থান করে মল্লযোদ্ধা হিসাবে প্রভূত সম্মান এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁর দুটি মল্লযুদ্ধ স্মরণীয় হয়ে আছে—বিখ্যাত গলপু পালোয়ানের সঙ্গে দু ঘণ্টা ৪০ মিনিটের লড়াই এবং ১৯২৯ সালে পার্কসার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত ছোট গামার সঙ্গে লড়াই। এই দুটি লড়াইয়ের ফলাফলই অমীমাংসিত থাকে। এক সময়ে ভারতীয় কুস্তির আখড়ায় গুহ-ঘরানার যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

গোবর গুহ

গোবরবাবু ছিলেন সেই ঘরানারই একজন কীর্তিমান পালোয়ান। ১৯৩৬ সাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত (২ জানুয়ারী, ১৯৭২) তিনি তাঁর ১৯ নম্বর গোয়াবাগান স্ট্রীটের আখড়ায় তপস্বীর জীবনযাপন করেন। এই আখড়ার মাটিতেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ কুস্তি লড়লেন-মৃত্যুর সঙ্গে। এ মৃত্যুবরণ পরাজয় নয়—তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ জয়।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদের ফতে ময়দান ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৩৩তম জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র বিপুল সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। তারা দলগত অনুষ্ঠানের চারটি পুরস্কারই জয়ী হয়েছে—পুরুষ বিভাগে বার্না-বেলোক কাপ, মহিলা বিভাগে জয়লক্ষ্মী কাপ, বালক বিভাগে রামনুজন ট্রফি এবং এ বছরের নতুন বালিকা বিভাগে পদ্মাবতী কাপ। এ বছর নিয়ে মহারাষ্ট্র উপর্যুপরি সাতবার মহিলা বিভাগের দলগত পুরস্কার জয়লক্ষ্মী কাপ জয়ী হল। মহারাষ্ট্র পুরুষ বিভাগের বার্না বেলোক কাপ পেয়েছে বার বারের বেশী; মহারাষ্ট্র ইতিপূর্বে দলগত বিভাগের সমস্ত পুরস্কারই জয়ী হয়েছে তিনবার—১৯৫৮ সালে আমেদাবাদে, ১৯৬৫ সালে জলন্ধরে এবং ১৯৬৬ সালে মাদ্রাজে।

এ বছরের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের কাইটি চার্জম্যান মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' বিজয়িনী হয়েছেন। তাছাড়া চার্জম্যান উপর্যুপরি তিনবার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাবও জয় করেন।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : বি শৈকুমার (মহীশূর) ২১-১৭, ২৪-২২ ও ২১-১৯ পয়েন্টে নিরজ বাজাজকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : সুহাস কুলকারনি এবং বাচা (মহারাষ্ট্র) ২১-১৫, ১৮-২১ ও ২১-১৮ পয়েন্টে মীর কাশিম আলী এবং দিলীপ রাজ সাকসেনাকে (হায়দরাবাদ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : কাইটী চার্জম্যান (মহারাষ্ট্র) ২১-১৯, ২১-১৯ ও ২১-১৬ পয়েন্টে রূপা মুখার্জিকে (বাংলা) পরাজিত করে উপর্যুপরি তিন বছর ত্রিবাঙ্কুর কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কাইটী চার্জম্যান এবং কে প্যাটেল (মহারাষ্ট্র) ২১-১৮, ২১-১৬ ও ২১-১৪ পয়েন্টে রূপা মুখার্জি (বাংলা) এবং কলাবতী সীতারামকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কাইটী চার্জম্যান এবং খোদাইজী (মহারাষ্ট্র) ২১-১৭, ২১-১৪ ও ২১-১৪ পয়েন্টে উষাসুন্দররাজ এবং কল্যাণ জয়ন্তকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

চিঠিপত্র

ধলভূমের ছড়া প্রসঙ্গে

'অমৃত' ১১শ বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবঙ্কিম মাহাতোর 'ধলভূমের ছড়া' প্রবন্ধটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রয়েছে।

প্রথমত, ধলভূম মহকুমা লৌহ-নগরী জামসেদপুরসহ চাকুলিয়া, বহড়াগোড়া, ধলভূমগড়, ঘাটশিলা, মোসাবনী, ডুমুরিয়া, পটকা, গালুডি, হলুদপুকুর, গামারিয়া ও পটমদা ইত্যাদি থানা জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। অথচ বঙ্কিমবাবু ধলভূমগড় ও চাকুলিয়ার নিকটবর্তী মুষ্টিমেয় কয়েকটি গ্রাম থেকে সংগৃহীত ছড়াকে ধলভূমের ছড়া বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সংকলিত ছড়াগুলির উচ্চারণ ও ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য অনুসারে দৃঢ়তার সঙ্গে এ-কথা বলা যায়। ছড়াগুলো ধলভূমের প্রতিনিধিমূলক ছড়ার দাবি করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধটিতে একাধিক পরস্পর-বিরোধী অভিমত বা ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে আছে—'ধলভূমে বঙ্গীয় লোকেদের সরাসরি যাতায়াত বা আত্মীয়তা বন্ধন একরকম ছিল না বলা চলে।' অথচ লেখক প্রথমাংশেই স্বীকার করেছেন—'১৮০০ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে এই রাজ্যটিও (ধলভূম) যুক্ত হয়।' কিন্তু আমরা জানি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৬০ বছর পূর্বে ১৭৪০ খৃঃ বাংলা, বিহার, ওড়িশার নবাব হন আলিবর্দী খাঁ। বলা বাহুল্য ধলভূম এই সময়ের বহু পূর্ব থেকে বাংলার অভিন্ন অঙ্গ ছিল। ধলভূমের তথাকথিত রাজারা বড় ধরনের জমিদার মাত্র ছিলেন, বা এই ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যের সার্বভৌমত্ব ছিল না। আর বাংলার সঙ্গে ভৌগোলিক বাধা-নিষেধমুক্ত চিরকালের।

যেখানে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বাধা-নিষেধ ছিল না, সেখানে সরাসরি যাতায়াতের অভাবও নিশ্চয়ই ছিল না। ধলভূমের সঙ্গে সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার আত্মীয়তা বহু প্রাচীন। এই অঞ্চলের অধিবাসী বেশির ভাগ আদিবাসী অর্ধ-উন্নত জাতি বা উপজাতি। তাই আত্মীয়তা বন্ধন স্বজাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একটা বাধা হয়তো এই হতে পারে যে, পূর্বে ধলভূমগড়-ঘাটশিলায় নরবলি হত। অনেকে ভয়ে এই অঞ্চলে বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে সাহস পেত না।

তৃতীয়ত, '(ধলভূমে) বই-পত্রের যাতায়াত একেবারে হাল আমলের। অথচ এই ছড়া ঠাকুমা, তস্য ঠাকুমার মুখে যুগে-যুগে ধ্বনিত হয়েছে।' একথা স্বীকার করেও বঙ্কিমবাবু লিখেছেন—'ধলভূমের এই সব ছড়ার অনেক পংক্তিই বাংলাদেশের শিশুদের জানা। ছড়ায় পাঠান্তর একটা স্বাভাবিক ঘটনা। লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে পরবর্তীকালে একটি ছড়ায়ই কয়েকটি রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।' লেখকের মতানুসারে যদি সত্যই ধলভূমে বঙ্গীয় লোকেদের সরাসরি যাতায়াত না থাকত, তবে ব্যাপকভাবে বাংলার খাঁটি জিনিস কি করে ধলভূমে গেল? ঠাকুমা, তস্য ঠাকুমার মুখে-মুখে যুগ-যুগ ধরে ধ্বনিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা, একথা স্বীকার করতে লেখকের দ্বিধা কেন? অবশ্য তিনি যদি এর পুষ্টির জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করতেন, তবে সন্দেহের কোন কারণই থাকত না।

চতুর্থত, বইপত্রের যাতায়াত একেবারে হাল আমলের, এই উক্তিটির স্বপক্ষেও কোন যুক্তি নেই। আমরা জানি শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক ১৮০০—১৮০১ খৃঃ বাইবেলের বঙ্গানুবাদই প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ। আর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত বই প্রকাশিত হয়েছে এর অনেক পরে। যখন বাংলা দেশেই বইপত্রের প্রচলন হাল আমলের, তখন ধলভূমের কথা উঠতেই পারে না। তাছাড়া, ধলভূম তো তখন বাংলারই অংশ ছিল। বঙ্কিমবাবুও স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশ ও ধলভূমের মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিকগত মিলের। আমরা জানি, ভাষা ও সংস্কৃতি কৃত্রিম বাধা-নিষেধের বেড়াজালে আটকে থাকে না।

প্রসঙ্গত এও উল্লেখ করছি যে, ধলভূমে কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা বা প্রচলন ছিল না। তবু যেসব আদি ধলভূমবাসী পরিবারের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তার মধ্যে আমাদের পরিবারটি অন্যতম এবং আমরা ধলভূমের অন্যতম আদি অধিবাসী। ঘাটশিলা ছিল পূর্ব-ধলভূমের শিক্ষার পীঠস্থান। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ ও ধলভূমের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক একই ছিল।

সবশেষে এ-কথাই বলব যে, ধলভূম অঞ্চলের প্রচলিত বহু ছড়ার সঙ্গে সংলগ্ন জেলা মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় প্রচলিত ছড়ার প্রায় হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। অশিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিতদের মুখে-মুখে প্রচলিত ও প্রসারিত হতে হতে কম-বেশী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। তাই, ধলভূমের ছড়া বলতে যা বোঝায়, তা শুধু পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত বিশুদ্ধ ছড়ার বিকৃত রূপ মাত্র, নয় কি?

—অসিতবরণ নামাতা, জগদ্দল (২৪-পরগণা)।

রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী

সম্প্রতি ২৫শ সংখ্যা অমৃতে (১১ই কার্তিক, '৭৮) প্রকাশিত সুজিতকুমার সেনগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী' ও সে সম্পর্কে ২৯ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত জনৈক পত্র-লেখকের বক্তব্য পাঠ করেছি।

'রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী' প্রবন্ধটি যে খুবই সুন্দর—এ-বিষয়ে আমি পত্র-লেখকের সঙ্গে একমত। তবে লেখক সুজিতকুমার সেনগুপ্তকে প্রশ্ন করতে চাই, চৈতন্য লাইব্রেরীর সঙ্গে সেযুগের প্রায় সব মনীষীর যোগ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামটি অনুপস্থিত রইল কেন? এটা খুবই বিস্ময়ের কথা নয় কি? চৈতন্য লাইব্রেরী স্থাপিত হবার পর প্রায় তিন বছর তো তিনি জীবিত ছিলেন। যিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি যাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ, বহু স্থানে তিনি অযাচিতভাবে বুক দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মান-অপমান তুচ্ছ করে। এদেশে যথার্থ শিক্ষা প্রসারের জন্য সেই বিদ্যাসাগর চৈতন্য লাইব্রেরীর পরিকল্পনা থেকে দূরে রইলেন কেন? এর পেছনে কি এঁদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধই কাজ করেছে? আমরা জানি, এঁদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তীব্র মতবিরোধ ছিল।

এবার লেখকের পরিবেশিত একটি তথ্য সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সে-কথা বলি। লেখক বলেছেন—'পাদ্রী আলেকস টমরী মহাশয় বার্ধক্যের কারণে অবসর গ্রহণ করে ভারতবর্ষ থেকে জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছিলেন।' অতি বাল্যকালে (প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে) একথা আমি শুনেছি যে, আলেকস টমরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যু হয়েছিল এই বাংলাদেশেই এবং তাঁর কবরও এখানেই রয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে আলেকস টমরী (১৮৭০—১৯২০) ফলক-খচিত সমাধিটি সম্ভবত তাঁরই।

—অসীম রায়, কলিকাতা-৭।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল	
বার্ষিক	টাকা	২৫·০০	টাকা	৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২·৫০	টাকা	১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা	১·০২
ষাণ্মাসিক	টাকা	০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৭ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 21st January, 1972 শুক্রবার, ৭ই মাঘ, ১৩৭৮ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীকমল সাহা

'এক নজরে'

শাশুড়ী-বধূ সংবাদ ঃ

এই অসম যুদ্ধের সূচনাকাল নির্দিষ্ট করা কঠিন, তবে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই যে এই বিয়োগান্ত নাটকের গণনাতীত পুনরাবৃত্তি ঘটে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুরা জটিলার হাতে (তৎসহ ননদিনী কুটিলা) বধূ শ্রীরাধার লাঞ্ছনার কাহিনী বোধহয় সহস্রাব্দের ব্যবধান লঙ্ঘন করে আজও ভারত হৃদয়মানস বেদনারসে সিঞ্চিত করছে। সেদিন পত্রান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৫ সালের জানুয়ারি মাসের, অর্থাৎ ঠিক সাতাশ বছর আগের 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি, যাতে বলা হয়—'কলিকাতার কোন ভদ্রগৃহের বা... বৎসরের একটি পুত্রবধূ একটি সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছিল বলিয়া জটিলা শাশুড়ী খুন্তি পোড়াইয়া তাহার গাত্রের নানাস্থানে দাগাইয়া দেন। শিয়ালদহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রামশংকর সেনের বিচারে এই শাশুড়ীর ৪ মাস কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। শাশুড়ীগণ সতর্ক হউন, সেকালের বৌ-জ্বালান ধর্ম পালন করিবার এ সময় নয়।'

উল্লেখিত সংবাদ-কণাটুকুর শেষ ছত্র বিশেষ লক্ষণীয়, যেখানে শাশুড়ীঠাকরুনদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'সেকালের বৌ-জ্বালান ধর্ম' পালনের দিন শেষ হয়েছে। অর্থাৎ, সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানোর মতো, সেকালেরও সেকাল ছিল যখন শাশুড়ীদের দোর্দণ্ড-প্রতাপের কাছে অবলা বধূদের নিষ্প্রতিকার আত্মবলিদান অতি স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। তাই আশঙ্কা হয়, পঁচাশি বছর বাদেও হয়ত বা কোন লেখক বা সাংবাদিক 'বর্তমান' কালের এই 'শাশুড়ী-বধূ-সংবাদ'-এর সঙ্গে সেদিনের ঘটনাবলীর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কৌতুকবোধ করবেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে, একপক্ষ প্রায়ক্ষেত্রে স্বামীহীনা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃসম্বল বৃদ্ধা এবং অপরপক্ষ স্বামীসোহাগিনী যৌবনবতী হওয়া সত্ত্বেও পরাজয় দ্বিতীয়পক্ষকেই মানতে হয়। আর তার চেয়েও মারাত্মক কথা, একদিন শুধু উড়কি ধানের মুড়কি দিয়ে যাঁর মনভোলানো সম্ভব ছিল, আজ সোনায় নগদে আসবাবে ঘর ভরিয়ে দিয়েও সে মন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এমনকি সব দেওয়ার পরেও যদি শুধু ফুলশয্যার তত্ত্বের মাছটাই একটু ছোট হয়ে যায় তাহলে হয়ত নিরামিষাশী হওয়া সত্ত্বেও, শাশুড়ী বধূর বিরুদ্ধে সেই যে 'স্টেট অফ ওয়ার' ডিক্লেয়ার করবেন তার নিষ্পত্তি উভয়পক্ষ বেঁচে থাকা পর্যন্ত আর হবে না। শাশুড়ীঠাকরুনের এই আক্রোশের অন্যতম কারণ বোধহয় এই যে, বিবাহের পূর্বে যাঁদের 'স্বরূপটি' প্রকাশ পায় তখন তাঁদের টিকিটিরও আর দর্শন মেলে না। ফলে সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে বাড়ির ঐ মেয়েটির উপর যার আর সেখান থেকে পালানোর উপায় থাকে না। তারপর গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা যদি একান্তই অসহনীয় হয় তবে, শুধু ঐ শ্বশুরবাড়ী নয়, এই দুনিয়া থেকেই পালানোর ব্যবস্থা বধূটিকে নিজের হাতে করে নিতে হয়।

সংবাদে প্রকাশ, ১৯৬৯ সালে শাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সারা ভারতে ৩,২৫৯ জন বধূ আত্মহত্যা করেছে। এই সংখ্যা মোট আত্মহত্যার ১৫ শতাংশ।

পিকাসোর কাছে দাবি ঃ

বিশ্ববন্দিত শিল্পী পাবলো পিকাসোর অবৈধ সন্তান, বাইশ বছর বয়স্কা মডেল শ্রীমতী পালোমা রাইজ-পিকাসো তাঁর নব্বুই বছর বয়স্ক পিতার কাছে কন্যারূপে স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে ফরাসি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। পিকাসোর প্রাক্তন রক্ষিতা ফ্রাঁসোয়াজ জিলোটের গর্ভজাত দুটি সন্তানের মধ্যে পালোমা অন্যতমা।

পিকাসোর নব্বুই বছর বয়স পূর্ণ হল সেদিন, আর সেই সঙ্গে ফ্রান্সে বসবাসের সত্তর বছর। কিন্তু অমন স্মরণীয় দিনে পিকাসো জনসমক্ষে উপস্থিত হন নি, যারো সহস্রাধিক অমর শিল্পের স্রষ্টা সেদিনও ইজেল-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে তুলি চালিয়ে যান, আর ইচ্ছা প্রকাশ করেন, জীবনের শেষ দিনে ঐ ইজেল-এর সম্মুখেই যেন তুলি হাতে নিয়ে পড়ে গিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যিনি চিরকালের শিল্পী ও অবিনশ্বর স্রষ্টা, তাঁর কাছে সমকালীন বিশ্বের নিন্দা প্রশংসার হয়ত কোন মূল্য না থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর কন্যার হয়ে এ প্রশ্ন অবশ্যই করা যেতে পারে যে, তাঁর তুলির মানসকন্যারাই কি তাঁর কাছে একমাত্র সত্য, আর আত্মজের দাবি মিথ্যা? জগতের খ্যাতি অখ্যাতি তুচ্ছ যাঁর কাছে, মানুষের গড়া সামাজিক বিধিরীতি যাঁর বিবেচনায় মূল্যহীন, তিনি মানুষের সৃষ্ট আইনকে এত বড় বলে ভাবলেন কেন, যার আড়ালে পড়ে আপন কন্যাও পর হয়ে গেল?

লাইবেরিয়ায় ফাঁসি ঃ

সাতাশ বছর পরে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়ায় একজনের ফাঁসি হল। দণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নাইজেরিয়ার এক অধ্যাপক, দু বছর আগে 'বিশপ অফ লাইবেরিয়া'কে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

দক্ষিণ অতলান্তিকের উপকূলে, পশ্চিম আফ্রিকার তেতাল্লিশ হাজার বর্গমাইল স্থান নিয়ে গঠিত লাইবেরিয়া রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হয় ১৮২০ সালে। মার্কিন মানবতাবাদী সংস্থা 'এমেরিকান কলোনাইজেশন সোসাইটি'র উদ্যোগে গঠিত ঐ উপনিবেশটির রাষ্ট্রজীবনের সূচনা হয় আমেরিকার বারো হাজার মুক্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে। মুক্ত দেশ (লিবার্টি) এই অর্থেই ঐ দেশের নাম হয় লাইবেরিয়া এবং তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরোর নামানুসারে রাজধানীর নাম হয় মনরোভিয়া।

লাইবেরিয়া সেই থেকে সব ব্যাপারেই আমেরিকান: তার সংবিধান রচিত হয়েছে মার্কিন সংবিধানের ধাঁচে, তার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব কিছুতেই মার্কিনি প্রভাব। ঐ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতেই বছর ত্রিশেক আগে লাইবেরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট টাবম্যান মৃত্যুদণ্ডদানের 'সেকেলে' ব্যবস্থা ফাঁসি তুলে দিয়ে আমেরিকা থেকে বৈদ্যুতিক চেয়ার আনেন। কিন্তু চেয়ার আনার পর আবিষ্কৃত হল যে, লাইবেরিয়ায় প্রচলিত সবচেয়ে জোরালো বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ দিয়েও মানুষ মারা সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট টাবম্যান আর সে লজ্জার কথা প্রকাশ করলেন না, মাঝ থেকে লাভবান হল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা। প্রেসিডেন্ট সেই থেকে একটানা পঁচিশ বছর সব মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণভিক্ষা মঞ্জুর করে এসেছেন। গত জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট টাবম্যানের মৃত্যু হয়।

প্রেসিডেন্ট টাবম্যানের সুদীর্ঘ শাসনের অবসান হওয়ার পরেই লাইবেরিয়ায় অশান্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, ফলে পরবর্তী শাসকরা মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তনের তাগিদ বোধ করেন। সেইজন্যই আবার লাইবেরিয়ায় 'সেকেলে' ফাঁসি-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন হল।

১৩।১।৭২ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

জয় হোক নব অরুণোদয়

আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। এতে আমরা ভারতীয়রা আনন্দ অনুভব করি এই ভেবে যে, গত চব্বিশ বৎসর ধরে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত অবিচল নিষ্ঠায় সংসদীয় গণতন্ত্রের পথই অনুসরণ করে এসেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সমালোচকরা এর যে ত্রুটিই দেখান না কেন, এখন পর্যন্ত সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক উন্নয়নের ও মানবাধিকার রক্ষার সুষ্ঠু পথ হিসেবে পৃথিবীর বহু দেশে সমাদৃত। দেশ ভাগের পর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন যে-অংশ পাকিস্তান নাম নেয়, তা সংসদীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে এক জগাখিচুড়ি কাঠামো দাঁড় করায়। এবং তাতে সামরিক নায়করাই একের পর এক ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পান। পাকিস্তানের জনসাধারণ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। গণতন্ত্রের নামে চলে নানা ব্যভিচার। সংখ্যাগরিষ্ঠের কোনো দাবিই মানা হয় না। তার ফল কী বিষময় তা আমরা দেখতে পেলাম। পাকিস্তান তার জন্য চরম মূল্য দিল। বাংলাদেশের মানুষ মানবাধিকারের ভিত্তিতে ওড়াল বিজয়-বৈজয়ন্তী। 'জয়বাংলা' প্রকৃত অর্থে জয় গণতন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি —কোনো সংকীর্ণ আঞ্চলিক অর্থে তা ব্যবহৃত হয়নি।

বহুদিন প্রতীক্ষার পর বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক সরকার লাভ করেছে। রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার জন্ম। বাংলাদেশের অবিসম্বাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁর অবর্তমানে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে বসানো হয়েছিল। পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে এসে বঙ্গবন্ধু তাঁর সরকারের রদবদল করেছেন। রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে তিনি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি নিজে রাষ্ট্রপতি থাকলে কার্যত সব ক্ষমতা তাঁরই হাতে কেন্দ্রীভূত হত। প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর ক্যাবিনেটের ক্ষমতা হত সীমাবদ্ধ। পাকিস্তানে তথাকথিত প্রেসিডেন্টরা ক্ষমতা অপব্যবহারের যে কলংকিত ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে নবজাত বাংলাদেশ আর সেই পথে পা দিতে ইচ্ছুক নয়। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলাদেশকে সঠিক সংসদীয় গণতন্ত্রের পথেই এগোবার নির্দেশ দিলেন।

আমাদের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী এবং আত্মার আত্মীয় সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর বাসভূমি বাংলাদেশ চিরস্থায়ী মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে ভারতের সঙ্গে। এই বন্ধন শুধু ভাবাবেগের নয়, আদর্শের বন্ধনেই আমাদের দুই দেশের মৈত্রী থাকবে অটুট। সংসদীয় গণতন্ত্রের নতুন পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন ওপারের বাঙালীরা। আমাদের দেশে এই পদ্ধতির যে-পরীক্ষা চলছে এবং যা পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসী স্বীকার করে নিয়েছে তা থেকে বাংলাদেশ পাবে প্রেরণা এবং শিক্ষা। আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষাকে আরও সার্থক এবং ত্রুটিমুক্ত করতে পারব নিঃসন্দেহে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এবং পশ্চিমবাংলার ঘনিষ্ঠতার উজ্জ্বলতম সূত্র হল সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা। ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধনে আমরা ভারতের বাঙালীরা ওপারের বাংলাদেশের সঙ্গে আবদ্ধ। বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দুই দেশের মানুষকেই দিয়ে গেছেন এক অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার। বাংলাদেশের জনগণের জাগরণে বাংলাভাষা সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের দান অনস্বীকার্য। পাকিস্তানী শাসকরা বাংলাভাষা ও রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল বলেই শুরু হয়েছিল গণ-প্রতিরোধ। সেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই পরে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের রূপ নেয়। আজ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'। বাঙালীর জাতীয় ঐক্যের অন্যতম প্রতীক নজরুল ইসলামের 'চল চল চল—ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল' সঙ্গীতটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের সমরসঙ্গীত রূপে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের স্বপ্নের বাংলাদেশ আজ রূপ নিয়েছে বাস্তবে। তার রাষ্ট্রকাঠামো গণতান্ত্রিক, সামাজিক লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। এই তিন আদর্শের সমন্বয়ে বাংলাদেশ এশিয়ার নবীনতম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও, তার জাতীয় ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। পাকিস্তানী রাহুগ্রাস মাঝের চব্বিশ বছর বাঙালীর অস্তিত্বকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে রেখেছিল। আজ সে মুক্ত। বাংলার নয়নাভিরাম শ্যামল দিগন্ত উদ্ভাসিত করে হয়েছে নতুন সূর্যোদয়। একে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই আর উপেক্ষা করতে পারবে না।

মহানায়ক সুভাষচন্দ্র

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নেতাজী সুভাষচন্দ্র হিমালয়ের মতো এক বিরাট বিস্ময়। আমাদের অতি সীমিত জ্ঞান এবং দৃষ্টির দূরত্ব দিয়ে, সেই বিস্ময়কে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। এইরূপ মহাজীবনের উপাদানকে ভিত্তি করেই বহুকাল পরে মহাকাব্যের নায়ক, তার কাহিনী, তার চরিত্র, তার সূর্যাস্তের রঙে-আঁকা বিয়োগান্ত পটভূমি রচিত হয়।

বস্তুতঃ মহাকাব্যের যুগ অতিক্রান্ত। কিন্তু মহৎ উপন্যাসের যুগ অনাগতকালের জন্য প্রসারিত। আগামীকালে যদি কোনো-দিন, কোনো মহান লেখক ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন, যাঁর প্রজ্ঞা, প্রতিভা, যাঁর কবিত্ব, মহর্ষি ও মহাকবি ব্যাসদেবের কিছু ভগ্নাংশেরও অধিকারী হয়, তবে তিনি আর এক মহাভারতের চিত্রশালা নির্মাণ করতে পারবেন, যার মধ্যে আমাদের দেশ, কাল, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের জীবন, আমাদের দুঃখ-বেদনা মৃত্যুহীনতার রঙে আঁকা থাকবে।

মহাভারতের শেষে, ছোট্ট চারটি শ্লোকে মহাকবি ব্যাসদেব তাঁর রচিত এই বিরাট সৃষ্টির নির্যাসটি বলে দিয়েছিলেন। এই চারটি শ্লোকের শেষের শ্লোকটির অর্থই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যার মধ্যে নেতাজীর চরিত্রের আভাস লক্ষ্যণীয়। এতে তিনি বলছেন : কামনা বা লোভবশতঃ, এমন কি জীবন রক্ষার জন্যও কখনো ধর্মকে ত্যাগ করবে না। ধর্ম নিত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখ অনিত্য। জীব নিত্য, কিন্তু শরীরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অনিত্য।

অর্থাৎ ধর্ম থেকে, সত্য থেকে, জীবনের মূল সুর থেকে, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে সরে না যাওয়াই মহাজীবনের মূল কথা। সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনেতিহাসের মধ্যে, এই সত্য থেকে বিচ্যুতি কখনো ঘটে নি। আজ যখন রাজনীতিতে চালাকিটাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপাদান হয়ে উঠেছে এবং চালাকিটাই সবচেয়ে বাহবা পাওয়ার প্রেক্ষাগৃহ হয়ে উঠেছে—দেশপ্রেম নয়, তখন একথা শুনলে আমাদের চমকে উঠতে হয় যে, 'নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলি-স্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত। স্বদেশ সেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করি নাই। —স্বরাজ লাভের পূণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিয়ত থাকতে পারি।' (তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ ৯৮)।

নেতাজীর জীবনে এই সত্য থেকে বিচ্যুতি কখনো ঘটে নি, জীবনের বিনিময়েও তিনি এই ধর্মকে ত্যাগ করেন নি। সমসাময়িককালে এক গান্ধীজী ছাড়া এমন মৃত্যুঞ্জয়ী সেনাপতি, এমন মহাকাব্যের নায়ক, আর কেউ ছিলেন না এবং নেই। মহাভারত রচয়িতা যে সত্যবোধের ওপর সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো ফেলেছিলেন, সেই সত্যবোধের পরিচয় পেলাম আমরা এঁদের জীবনে।

॥২॥

আপাতদৃষ্টিতে যে চরিত্রকে বিরাট, কঠিন ও ইস্পাতের মত অনমনীয় বলে মনে হচ্ছে এবং সত্যই যা তাই, তার মধ্যে কিন্তু

এমন কিছু কিছু অতিকোমল ও করুণ উপাদান ছিল, যা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এই আপাতঃ তুচ্ছ, এই অনুল্লেখ্য ছোট ছোট উপাদানগুলি কিন্তু তাঁর মহাজীবনের পরিচয়ের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষ্য বহন করছে। তাঁকে প্রকৃতভাবে চেনার প্রকাশ্য রাজপথে পৌঁছতে হলে, এইসব ছোট ছোট গলিপথ ধরেই আমাদের হাঁটতে হয়। এই উপাদান থেকেই জানা যায়, তাঁর জীবনের আসল ধাতুটি কি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র মহৎ কবিমনের অধিকারী ছিলেন। প্রকৃত অর্থে তিনি কবি, তিনি প্রাজ্ঞ, তিনি স্রষ্টা, তিনি মণীষী, তিনি দার্শনিক, পদ্য বা ছড়া লেখক নন। যাঁর প্রায় সমগ্র পরিচয়, রাজনীতির রুক্ষ পাথুরে মাটির নীরস জমির মত আদিগন্ত পড়ে আছে, তাঁর মনের নির্জন অবসরে, সেই মানুষটি কিন্তু কারাগারের জানালার ফাঁক দিয়ে মুক্ত আকাশ দেখছে। এই ছোট জানালাটুকুর আলো দিয়েই আমরা তাঁকে চিনতে পারি, এবং এই চেনাটাই আসল।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সুভাষচন্দ্র চিঠি লিখছেন মান্দালয় জেল থেকে : 'এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত করে যে জ্বালা বোধ হয়, সে জ্বালার মধ্যেও কোনও সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালোবাসি—যাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি, এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়।'

তাঁর এই ভালবাসার দেবী আর কেউ নয়, সে দেশ—যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি উৎসর্গীকৃত। এর পর তিনি লিখছেন : 'এখানে না এলে বোধহয় বুঝতুম না সোনার বাংলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধহয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী'—

যখন ক্ষণেকের তরে বাংলার বিচিত্র রূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে ওঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাংলার মাটি, বাংলার জল—বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।' (তরুণের স্বপ্ন : পৃঃ ১০৫)

এই অনুভব, এই ভাষা, রাজনৈতিক বিবৃতি বা রাজনৈতিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই মানসিকতা সম্পূর্ণতঃ মহৎ সাহিত্যের।

তিনি রাজনৈতিক নেতা, এবং ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এমন দীপ্ত, জ্বলন্ত, বীর্যবান নেতা আর কেউ সমসাময়িককালে ছিলেন না। গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বতন্ত্র চরিত্রের। কিন্তু নেতাজী তুলনাহীন। এমন নেতা, যিনি পরবর্তীকালে পড়তেন যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ, 'ওয়ার স্ট্যাটেজি'র বই, তিনি কিন্তু বলেন,—'আমি স্বীকার করি, আমি স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্নই আমি ভালবাসি। এই স্বপ্ন আমার কাছে জীবন্ত সত্য। এই স্বপ্ন থেকেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি—এই স্বপ্নের অভাবে আমার বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত।' (অমরাবতী ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ)।

টলস্টয়ের যে বইটি তরুণ গান্ধীজীকে এক সময় অনুপ্রাণিত করেছিল, যা তাঁর সমগ্র জীবনধারাই পাল্টে দেয়, সে বইটির নামও বিস্ময়কর। বইটি 'The kingdom of God is within you' তোমার মনের মধ্যে, আত্মার মধ্যে এক সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘুমিয়ে আছে—তুমি তাকে জানো। এমার্সনেরও এমনি একটি কথা আছে—সকল মহৎ মানুষকেই এই অন্তর্লোকের শান্ত আলোর দিকে তাকাতে হয়। এই অন্বেষণই তাঁর প্রকৃত পরিচয় বহন করে, বাইরের চড়া সুরের কোলাহল নয়।

ঠিক এই অন্তর্লোকের আলোয় যখন সুভাষচন্দ্রকে দেখা যায়, তখন মনে হয়, যাঁকে দেখছি, তিনি কি শুধু রাজনৈতিক নেতা? তিনি কি শুধু এক মহান বিপ্লবী? যদি সুভাষচন্দ্র এই নেতৃত্বের এই বিপ্লবীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ হতেন, তবে আর যা হোক, আমরা তাঁকে নেতাজীরূপে পেতাম না। আমরা যাঁকে পাই, তিনি সেই নেতাজী, যিনি রাজর্ষি, অর্থাৎ একাধারে রাজা এবং ঋষি। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে তিনি রাজার মত পরাক্রমশালী, তিনি বীর, তিনি অসামান্য দক্ষ সেনাপতি, তিনি শূন্য থেকে শুরু করে বিরাট নির্মাণ-যজ্ঞের হোতা। কেবল তিনি-ই শুধু রিক্ত দুটি হাত নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের মত বাহিনী গড়ে তুলতে পারেন।

কিন্তু এর পরে, এর শেষে, যে-জীবন তাঁর শুরু হয়, সে-জীবন কিন্তু ঋষির। সেখানে 'Live from with' সেখানে আত্মাকে জানা শুরু হয়, সেখানে শুরু হয় অন্বেষণ, জীবনের উপলব্ধির। সেখানে শুরু হয় সংগীতের জন্য আকুল পিপাসা। বাইরের বাধার প্রাচীর তখন অবলুপ্ত। এই নিরুদ্বিগ্ন, এই নিরুৎক্ষিপ্ত, এই শান্ত আলোয় যখন সুভাষচন্দ্রকে দেখি, তখন মনে হয়, এক বিস্ময়কর স্বতন্ত্র জগতের সামনে এসে আমরা নতশিরে দাঁড়ালাম। এইটিই যেন তাঁর প্রকৃত কোলাহলহীন জগৎ।

শুধু এই মহর্ষি বলতে পারেন, এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাইরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি।' (তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ ৫২)।

এই অন্তরের মধ্যে আবাস নির্মাণ, এই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় মনে অপূর্ব শান্তির স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্নতা—এ তো পেশাদার বিপ্লবীর কথা নয়—এ রাজর্ষির বাণী। এ গভীর অধ্যাত্মবোধের পরিচয়—যা সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করাও সহজ নয়।

সুভাষচন্দ্রের কাছে আত্মার সংজ্ঞা ছিল—'বিশ্বের চরম সত্তাই আত্মা'। এ সংজ্ঞা সচরাচর অশ্রুত। আত্মা—মানেই আমরা দর্শনশাস্ত্রের কোন 'মিস্টিক' শব্দের অস্পষ্ট ছায়াপাত বলে মনে করি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই সংজ্ঞা, তাঁর জীবন থেকে উপলব্ধ সত্য ছিল।

॥ ৩ ॥

সুভাষচন্দ্র কারাগারের সেই প্রশান্ত দিনগুলিকে একটি অভাব অনুভব করতেন তা হোলো গান শোনার কোন অবকাশ না থাকা। অথচ ইউরোপীয় বন্দীদের এই সুযোগ ছিল।

তাঁর গান শোনার একটি সত্য ঘটনা দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করব। এ ঘটনা রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম গুরু কিরণশশী দে-র কাছ থেকে শোনা।

কিরণবাবু শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে বোম্বাইতে গানের শিক্ষকতা করছেন। তখনো রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন। সময়টা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পরের ঘটনা।

সুভাষচন্দ্র বোম্বে গেছেন। ওঁর সঙ্গে কিরণবাবু পরিচিত ছিলেন। এই সূত্রেই কিরণদার এক ছাত্রী, (তিনি একজন ধনী গুজরাটির পত্নী) সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে চান। সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু সময় করে ঐ ছাত্রীর বাড়ী গেলেন। কথাবার্তা ও নানান আলোচনার (রাজনীতি নয়) শেষে সুভাষচন্দ্র গান শুনতে চাইলেন। প্রথমে হোলো গুজরাটি ছাত্রীর গলায় রবীন্দ্রসংগীত। পরে কিরণদা ও উক্ত মহিলা সমবেত কণ্ঠে সুভাষচন্দ্রকে একটি গান শোনান। গানটি এই—

'অয়ি ভুবনমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরনী
জনকজননী।'

* * *

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।

গান শেষ হলো। কিরণবাবু দেখলেন, নেতাজী চোখ বুজে স্তব্ধ বসে আছেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে।

গান যাঁর চোখে জল আনে, এমন দুর্লভ, এমন অমৃত ভাবাবেগ যাঁর জীবনের উপাদান, শুধু তাঁর পক্ষেই নেতাজী হওয়া সম্ভব। আর সকলে বড়জোর নেতা হতে পারেন—নেতাজী হওয়ার জন্য তাঁদের জন্ম নয়।

নেতাজী অর্থ মহানায়ক, যিনি যুগপ্রবর্তক এবং চিরস্মরণীয়।

মহাত্মা শিশিরকুমারের নয়শো রূপেয়া

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমালোচনা সাহিত্যের একটি অঙ্গ। নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনা নিশ্চিতরূপে সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করে। একটি ভাল গল্প কিংবা প্রবন্ধ পড়ে যে আনন্দ হয়, একটি ভাল সমালোচনা পড়লে তার চেয়ে কম আনন্দ হয় না। শুধু তাই নয় সাধারণত লেখকগণ মনে করেন যে তাঁর লেখাই সবচেয়ে ভাল। একমাত্র নিরপেক্ষ সমালোচকই লেখার দোষগুণ দেখিয়ে দিতে পারেন। যদি সাহিত্য বিপথে যায় তাহলে নির্ভীক সমালোচনাই সাহিত্যকে সুপথে আনতে পারে।

আমরা এখন যে সমালোচনা দেখি তাতে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করে থাকি—সেটা কিছু মাত্রাহীনতা। হয় উচ্চপ্রশংসা নয় অতিমাত্রায় নিন্দে এবং সব সময়ে যে এই নিন্দা প্রশংসা তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাও নয়। একজন নামজাদা লেখকের বই হলে সমালোচক তার পক্ষে কিছু পক্ষপাতিত্ব করা আশ্চর্য নয়। আবার একজন অজ্ঞাত লেখককে যদি তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা না করা হয়, সেটাও অনুচিত। অবশ্য অধিকাংশ সমালোচকই তাঁদের বিবেকমত সমালোচনা করেন।

কিন্তু ১০০ বছর আগে আমাদের বাংলাদেশে কিরূপ সমালোচনা হত তার একটি নিদর্শন দেওয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন বঙ্গদর্শনে কিরূপ নির্ভীক সমালোচনা করতেন তার একটি উদাহরণ এই সঙ্গে মুদ্রিত হল।

বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় কিছুদিন চলবার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে আবার বঙ্গদর্শন কিছুদিনের জন্য বেরিয়েছিল। এই দ্বিতীয়বার বঙ্গদর্শন বার করবার জন্যে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে একদিন নবীনচন্দ্র সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই আলোচনা সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র তাঁর "আমার জীবন" নামক আত্মজীবনীতে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারি যে বঙ্কিমবাবুর নিরপেক্ষ সমালোচনায় বহু লোক তাঁর শত্রু হয়েছিল এবং কেউ কেউ তাঁকে প্রহার করবার আয়োজন করছিল। এ সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র নিজেই যা লিখেছেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—"পরদিন প্রাতে আমি 'বঙ্গদর্শনে'র পুনঃপ্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন 'বটে! 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা। কিন্তু কি করিব? আমি একে ত দাসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের এবং পরিশ্রম শক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং 'বঙ্গদর্শনে'র প্রায় তিন ভাগ লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাজেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি, কোনও কোনও গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্যন্ত সংকল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার জর্জ কেম্বেলের পর বোধ হয়, আমি এ বাঙলার গালাগালির প্রধান পাত্র (I am the worst abused man in Bengal next only to Sir George Campbell) তোমরা 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রচার করিতে চাহ, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইব না।" সম্পাদক হলেন সঞ্জীববাবু।

পরে নয়শো রূপেয়ার আসল গ্রন্থকার কে তাহা প্রকাশিত করা হয়েছিল। এই নাটক ৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা হয়। বিখ্যাত নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি সাতুলালের ভূমিকায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

নয়শো রূপেয়ার প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, কেবলমাত্র কলিকাতা স্মিথ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত এই উল্লেখ ছিল।

মহাত্মা শিশিরকুমার

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ

বাজারের লড়াই
ও
নয়শো রূপেয়া

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ
প্রণীত

মূল্য দুই টাকা

১৩৫৪

বঙ্গদর্শন—বৈশাখ ১২৮০
নয়শো রূপেয়া

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই। যে যে গুণ থাকাতে হাম্লেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই। একটি গুণের কথা বলি। মানসিক পরিবর্তন। একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু ব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায় তাহা ভাল নাটকে সুন্দররূপে চিত্রিত থাকে। ওথেলো—সদাশয় ওথেলো—যে অতি অল্পকাল মধ্যে স্ত্রী-ঘাতক হইবেন; অনন্ত চিন্তাশীল হাম্লেট যে স্বীয় জীবনের জীবন ওফিলিয়াকে বিসর্জন করিবেন; সেই প্রণয়িনীর পিতাকে স্বহস্তে বধ করিবেন: কার্য্য-কুশল রাজসম্মানধারী ম্যাকবেথ যে নিদ্রিত, গৃহাগত, অন্নদাতা রাজাকে স্বগৃহে হত্যা করিবেন, তাহা পূর্বে জানা যায় না; কি কৌশলে, কিরূপে, মানব-চিত্তের এরূপ পরিবর্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।

নয়শো রূপেয়াতেও তাহা নাই। (নয়শো রূপেয়া। কলিকাতা, স্মিথ কোম্পানী) কিন্তু ইহাতে অন্য কতকগুলি গুণ আছে।

১। গ্রন্থকার অতি সহজ ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু এরূপ চেষ্টারও সম্যক প্রশংসা করা উচিত। সংস্কৃতের গৌরব এত অধিক হইয়াছে যে এখন আর প্রায় সহ্য হয় না। নাটকের কামিনী, মোহিনী, কমলা, বিমলা, সকলেই স্বামীকে "জীবিতেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করেন, "সুশীতলসমীরসঞ্চারিতসুখদসায়ং-কালে প্রাসাদোপরি পদচারণা" করেন; "শাক সূপ পূপ পায়স পিষ্টকাদি" ভোজন করেন; "দুগ্ধফেণনিভ" শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহারা যাহাই করুন না কেন,—আমরা তাঁহাদের কথোপকথনে জ্বালাতন হইয়াছি। তাহাতেই এই নয়শো রূপেয়া গ্রন্থকারের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

কিন্তু গ্রন্থকার সংস্কৃত বাহুল্য এড়াইতে গিয়া গ্রাম্যতা দোষে পতিত হইয়াছেন; একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:—

শশীর মা। "বাছা তুই ছেলে মানুষ, তাই লোকে বলে আর তাই শুনিস যে সতীনকে বুনের মত ভালবাসে। সর্ব্বস্ব যাক * * মরে যাক, তাও প্রাণে লয়, হাসতে হাসতে * * ভাগ দেয় না জানি সে কেমন মেয়ে। সরলা মা তুই আমার সন্তানের বয়সী, আমার শশী থাকলে এই তোর মত হত, তবু আমার মনের কথা কটি একটি তোকেই বলি, তোকে বলে যেন আমার তৃপ্তি হয়। বাছা সকল তার ভাগ দেওয়া যায় * * ভাগ দেওয়া যায় না। আহাহা!—আমার...আমার বড়-সাধের...!"

ভর্ত্তা শব্দের অপভ্রংশে যে শব্দ, তাহাই আমরা লুপ্ত রাখিয়াছি। তাহা গ্রাম্যতা ভিন্ন অন্য দোষে দুষ্ট নহে। উহা পাঁচবার ব্যবহার না করিয়া ঐ শব্দের পরিবর্তে 'সোয়ামী' পদ ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হইত না অথচ এত গ্রাম্য দেখাইত না।

এই উপলক্ষে আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। গ্রন্থের এক এক স্থানে অশ্লীল পদ ব্যবহার করা হইয়াছে; যাহাদের মুখ হইতে সেই সকল কথা নির্গত হইয়াছে তাহাদের তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করাই সম্ভব কিন্তু তাহাতেই গ্রন্থকারের মার্জনা হয় না। অশ্লীলতা

দাষের উচ্ছেদ করণ জন্য অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদ্রূপ করিলে, কেহই কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না; তাহাতে অশ্লীলতার বৃদ্ধি ভিন্ন আর হ্রাস হইবে না।

২। গ্রন্থকার যেমন শব্দাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছেন সেইরূপ অলঙ্কারাড়ম্বরও পরিত্যাগ করিয়াছেন। নায়িকাদের কর্ণের অলঙ্কার, সীমন্তের অলঙ্কার, গাল বলি বলিয়া তাঁহাদের মুখের রাশি রাশি অলঙ্কার আমরা সহ্য করিতে পারি না। 'নলিনীলোচনে' 'বিধুবদনে' 'গিধিনম্রবনে' আমরা জরজর হইয়াছি; 'বচন চন' আর সহ্য হয় না।

কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গ্রন্থকার অলঙ্কারাধিক্য দোষ এড়াইতে গিয়া অতি দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন। শো রূপেয়া গ্রন্থে বোধহয় দুই তিনটি উপমা বা রূপক নাই। এদিকে আবার ছে শব্দ-প্রাণ রস-চাতুর্য্য ব্যবহার করিতে য় এই ভয়ে গ্রন্থকার নাটকে একটি গান ন নাই, এক ছত্র ছন্দোবন্ধ কথা দেন াই। চপলা বিমলাকে বলিতেছেন ঃ—

"টাকায় সব হয়। দিদী ও শ্লোকটি ানিস কি? টাকা দিলে বাঘের দুধ লে। মাইরি আমি ভুলে গিয়েছি।" শ্লোকময়ী বাঙালীর মেয়ে গ্রন্থকারের ক্তে পড়িয়া বিদ্যাসুন্দরের শ্লোক ভুলিয়া গল। ইহাতেও আহ্লাদ হয়। শাদা কথায় নের রসভাব প্রকাশ করিতে দেখিলে আমরা আহ্লাদিত হই।

৩। গ্রন্থের প্রধান গুণ নিঃস্বার্থ শুদ্ধ প্রণয় ভাব ব্যক্ত। এমন সব গুণেই আমরা গ্রন্থকারগণের শত দোষ মার্জ্জনা রিতে পারি। আমরা গ্রন্থ হইতে একটি শ্য তুলিতে ইচ্ছা করি।

সরলা ও রঞ্জনে ছেলেবেলা হইতে ণয় হইয়াছিল। সরলা যে বাড়ীর মেয়ে ঞ্জন সেই বাড়ীর দৌহিত্র। রঞ্জন সরলার পিতা রামধন মজুমদারের জ্ঞাতি ভাগিনেয়। সরলা রঞ্জন দাদার কাছে ড়িত; তাহাতেই ক্রমে উভয়ে অনুরাগ য়। রামধন মজুমদার শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-- র্থপিশাচ—সরলাকে ব্যবসায়ের ভাল দ্রব্য লিয়া বোধ করিত; যে অধিক মূল্য দিবে াহাকেই বিক্রয় করিবে স্থির করিয়াছিল; ঞ্জন এই সকল জানিয়া আপনি সর্ব্বস্বান্ত ইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পণ প্রদানে স্বীকৃত ইল। রামধন টাকা পাইতেছে সম্পর্ক-রোধে কোন প্রতিবন্ধকতা বোধ করিতে ারিল না বরং গ্রামের বিদ্যাভূষণের মত নান প্রকারে গ্রহণ করিল; বিবাহের কলই স্থির। সরলা এই বিবাহ ঠিক র্ম্মসঙ্গত হইতেছে না বোধে মনে বড়ই ন্তিত হইল, প্রাণে ব্যথিত হইল; ব্যথার থী রঞ্জনকে এ ব্যথার কথা জানাইবার না তাঁহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে আহ্বান রিল। সরলা আপনার কোমল হৃদয় [illegible] হল, "যাকে ভালবাসি সে যাহা বলিবে তাহাই বুঝিয়া যাইব; আজ তা হতে দিব না।" সরলা এইরূপ ভাবিয়া আসিয়াছিল। পাঠক দেখুন সরলা কি বলে। তাহার নিঃস্বার্থ প্রণয়ের,—বিশুদ্ধ প্রণয়ের—প্রগাঢ়তা উপলব্ধি করুন আর তাঁর সরল হৃদয়ের সেই ব্যথায় একটু ব্যথী হউন।

"রঞ্জন। ......এই যে কে আসছে, সরলাই বটে।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা, তুমি এখনও কাহিল আছ, আমার হাত ধোরে দাঁড়াও।

সরলা। না, তুমি একটু তফাত দাঁড়াও। আমার খুব নিকটে এস না।

রঞ্জন। বিষয়টা কি বল দেখি? আমার ত ভয় কোরেছে। তুমি ভয়ে রাত্রে একা বেরুতে পার না, পূর্ব্বে লজ্জায় আমার সঙ্গে দিনের বেলায় কথা বোলতে পার নাই, আজ এই রাত্রে—

সরলা। শোন, আমার অপরাধ নাই। বিপদে পড়লে লোকের ভয়ও থাকে না লজ্জাও থাকে না।

রঞ্জন। সে কি! বিপদ আবার কি! আমার শুনে যে ভয়ে গা কাঁপছে। সরলা চল একটু তফাত যাই। কাল বাড়ীতে ক্রিয়া বোলে এখনও কেউ কেউ ঘুমায় নাই, কে দেখবে।

সরলা। দেখে আর কি করবে? একটু ঠাট্টা করবে। তা আমি সহ্য করতে পারি। যার সঙ্গে কালকে এমনি সময় থাকলে দোষ না হয়, তার সঙ্গে নয় আজকে দুটো কথাই বোল্লেম।

রঞ্জন। বিপদটা কি?

সরলা। কালকে তোমায় আমায় একটা কাণ্ড হবে।

রঞ্জন। বে হবে তাই বোলছ?

সরলা। তাই বলছি। তা নাকি সম্পর্কে বাধে?

রঞ্জন। এই কথা, তবু ভাল। তুমি ক্ষেপেছ নাকি?

সরলা। আমার তোমার কাছে একটি মিনতি, শুনবে ত?

রঞ্জন। অবশ্য শুনব।

সরলা। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে হবে, আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

রঞ্জন। আচ্ছা বল শুনছি।

সরলা। সম্পর্কে নাকি বাধে?

রঞ্জন। আমি স্বরূপ বোলছি আমি ঠিক জানি না। কেউ বলে বাধে, কেউ বলে বাধে না। আমাদের এ প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়েছেন যে হতে পারে।

সরলা। তুমি না তাঁরে কিছু টাকা দিয়েছ?

রঞ্জন। তা কি তুমি জান না, পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা নিতে গেলেই টাকা দিতে হয়।

সরলা। তাঁকে যখন টাকা দিতে চাও, তার আগেও কি তাঁর এ মত ছিল?

রঞ্জন। কথাটা হচ্ছে এই, আমাদের শাস্ত্রে—

সরলা। তোমার পায়ে পোড়ছি আমার কথার উত্তর দাও।

রঞ্জন। না, তখন আর এক রকম মত ছিল। তাই কি?

সরলা। তা এই যে তোমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে তোমার মনোমত ব্যবস্থা দিয়েছেন।

রঞ্জন। তা নয়। আমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমার মনোমত ব্যবস্থা তল্লাস করে দিয়েছেন।

সরলা। তুমি আমাকে বঞ্চনা কোরবে না আমার মাথা খাও।

রঞ্জন। না।

সরলা। তোমার নিজের মনের বিশ্বাস কি বল দেখি?

রঞ্জন। একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমার নিজের মনের বিশ্বাস যে, ঠিক শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু তাই বোলে যে বেতে কিছু দোষ হবে তা আমার বিশ্বাস হয় না। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক ছাড়া আর তাবৎ দেশের লোক আপন খুড়তুত, পিসতুত, মামাত বুনকে বে করে। তাদের মধ্যে আমাদের মত কত শত বিদ্বান, ধার্ম্মিক লোক হোয়ে থাকে। যদি এ সমুদয় বিবাহ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হোত, তবে এরূপ কখনই হোত না। তুমি আমার দূর সম্পর্কের মামাত বুন, তোমার সঙ্গে বে হোলে দোষ হবে?

সরলা। যদি তোমার মত আমার বিদ্যা থাকতো তবে হয়ত আমার ও সন্দ হোতো না।

রঞ্জন। বিশেষত তোমার মা বাপ, গুরু, পুরোহিত, কুটুম্ব গ্রামস্থ লোকে তোমায় আমায় বে দিচ্ছেন, দোষ হয় তাদের হবে, তোমার আমার কি?

সরলা। মা বাপে টাকা নিয়েছেন, গুরু, পুরোহিতে টাকা নিয়েছেন, গ্রামস্থ লোকে ফলার খাবে। যাদের বে, ভোগ কেবল তাদের।

রঞ্জন। তবে তুমি এখন বল কি? বে বন্ধ কোরবো?

সরলা। সম্পর্কে যদি বাধে তবে তুমি আমায় নিয়ে করবে কি?

রঞ্জন। তবে আমার কি ইচ্ছা আমি বেতে ক্ষান্ত দেব।

সরলা। তাহলে তোমার পক্ষে ভাল হয়।

রঞ্জন। তোমার পক্ষে?

সরলা। তা শুনে তোমার দরকার কি?

রঞ্জন। তা বটে। কিন্তু তা না শুনলে আমি তোমার কথায় উত্তর দিব কিরূপে?

সরলা। আমার তা হলে জ্বালাযন্ত্রণা সব ঘুচে যায়।

রঞ্জন। তা হয় ত এখনি বন্ধ কর। আমি ত বোলেছি সরলা, তুমি আমার দিকে তাকাইও না। তবে আমি জন্মের মত বিদায় হই? কিন্ত বিদায় হবার আগে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আজ এরূপ ভাব দেখছি কেন?'

সরলা। কিরূপে ভাব?

রঞ্জন। তুমি আমার উপর রাগ কোর্‌লে কেন?

সরলা। আমি তোমার উপর রাগ করিনি।

রঞ্জন। রাগ না কর, আমার উপর যদি কিছু স্নেহ মমতা ছিল তা গেল কেন?

সরলা। কিসে বুঝলে?

রঞ্জন। এই যে বোল্লে আমার সঙ্গে তোমার বে না হলে তোমার জ্বালাযন্ত্রণা সব ঘুচে যাবে।

সরলা। হাঁ তা যায়।

রঞ্জন। সরলা তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কোরো না। আমার ধন, প্রাণ, মান, মন, সর্বাসর্ব্বস্ব তোমায় সঁপেছি। তুমি প্রকারান্তরে বোলছ আমার উপর স্নেহ মমতা কিছু কমে নাই, আজ যদি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে একজন বে করে নে যাবে। তখন বল দেখি আত্মহত্যা ব্যতীত আমার আর কি উপায় থাকবে।

সরলা। তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হলে আর গোল কি?

রঞ্জন। তোমার কষ্ট হবে না।

সরলা। হবার আগে ঔষধ খাব।

রঞ্জন। তবে আমায় কেন সে ঔষধ একটু দেও না?

সরলা। তুমি অমন কথা মুখের আগায় এন না। তুমি আমার চেয়ে সহস্র গুণে ভাল, আর একটি বে কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমার পৃথিবীতে থেকে ফল কি?

রঞ্জন। তবে তুমি প্রাণত্যাগ কোরবে?

সরলা। আর আমার পথ কি আছে? তুমি ক্ষান্ত দিলে, কাল বাবা আমারে আর একজনের গলায় গেঁথে দেবেন।

রঞ্জন। তবু আমাকে বে কোরবে না?

সরলা। আমি কোরতে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়ে কি কোরবে?

রঞ্জন। কেন বুঝতে পাল্লেম না।

সরলা। আত্মহত্যা না কি বড় পাপ।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশ অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই, অমন পাপ পৃথিবীতে আর নেই।

সরলা। তাইত। তুমি যদি এক কাব কর তবে এ পাপের দায় হোতে এড়াই। তুমি যদি আমারে—।

রঞ্জন। কি বোলছিলে বল।

সরলা। তুমি যদি আমারে বে কর।

রঞ্জন। তুমি আবল তাবল বকছো কেন?

সরলা। শোন কিন্তু দুইজনে—।

রঞ্জন। আবার চুপ কোরলে কেন?

সরলা। দুই জনে—।

রঞ্জন। আবার চুপ করলে কেন?

সরলা। (অধোবদন) দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বো। তুমি আর একটা বে কোরো। আমি তোমার কাছে থাক্‌ব। আমি তার চেয়ে আর সুখ চাইনে।"

এই দৃশ্যে কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়াই আমরা উদ্ধৃত করিলাম, গুণের পরিমাণ পাঠকের রুচি ও বিবেচনার অধীন।

৪। নাটকখানিতে অল্প সৃষ্টি চাতুর্য্যও আছে। সাতুলাল একটি অপূর্ব্ব জীব· অপূর্ব্ব বটে কিন্তু অভাবনীয় নহে। সাতুলালের চরিত্রে এমন কিছু গৌরব নাই যে গ্রন্থকার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন; সাতুলাল গাঁজার নিমচাঁদ, সুতরাং নিমচাঁদের ছোট ভাই; এ কথাও বলা যায় যে এখনকার নাটককারগণের পক্ষে এটি বড় অল্প কথাও নহে। যে দেশে রাম লক্ষ্মণ সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি হইয়াছে সেই দেশে নিমচাঁদ এখন আধিপত্য করিতেছে; সাতুলাল সেই সাহসে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছেন; সাতুলালেরও শরীরের পূর্ণতা আছে; মুখের চেহারা দেখিলেই চেনা যায়; দূর হতে স্বর শুনিলে বুঝিতে পারা যায়; নিকট বসিয়া থাকিলে তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে হয়, তাহার সেই আহ্লাদের প্রকৃতিতে আবার যখন ক্রন্দন দেখি তখন তাহার প্রতি একটী অপূর্ব্ব প্রীতি হয়, সাতুলালের এত গুণ আছে যে, সে নিমচাঁদের কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইবে বড় আশ্চর্য নয়। আমরা সমালোচনা শেষ করিলাম। গুপ্ত গ্রন্থকারের এই খানি যদি প্রথম ফল হয় আমাদের ভরসা হইতেছে, তিনি ভাষা ও রস পরিচালনে আরো একটু শিক্ষিত হইলে তাঁহার গ্রন্থ আদরণীয় হইবে।

পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

দেশে বিদেশে

রাওয়ালপিণ্ডির বিমানবন্দর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে পাকিস্থান ইণ্টারনাশনাল এয়ারওয়েজের একখানি বিমান যখন আকাশে উড়ল তখনও ৮ জানুয়ারির ভোরের আলো ফোটে নি, আর ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানে শেখ সাহেব যখন তাঁর বজ্রকণ্ঠে সেই চূড়ান্ত ঘোষণা শোনালেন, "পাকিস্থানের সঙ্গে আমাদের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে" তখন ১০ জানুয়ারির দিনের আলো নিভে এসেছে।

এই তিনদিনের মধ্যে অভূতপূর্ব ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল; শেখ মুজিবেরই নিজের ভাষায় "অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা"র "হতাশা থেকে আশায় বেঁচে ওঠার" চূড়ান্ত পর্ব শেষ হল। এই তিন-দিনের মধ্যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রিয়তম নেতা জল্লাদের কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির শ্বাস নিলেন, সাড়ে নয় মাসের পুরোনো জীর্ণ মলিন পোষাক পরে ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে বৃটিশ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর সরকারী কাগজপত্রে স্বাক্ষর দিচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতিরূপে বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী এ এম সঈমকে শপথ গ্রহণ করানোর পর বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর পাশে রয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

প্রধানমন্ত্রী হীথের সঙ্গে দেখা করলেন, ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর একখানি কমেট বিমানযোগে নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হয়ে ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের জনসাধারণকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করার জন্য ও সেদেশের এক কোটি বাস্তুচ্যুত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন এবং সব শেষে, ঢাকায় বাঁধভাঙা জনতার তরঙ্গশীর্ষে ভাসতে ভাসতে তাঁর ভবিতব্য-নির্দিষ্ট নেতৃত্বের আসনটি গ্রহণ করলেন। একটা দ্রুত সঞ্চরমান চলচ্চিত্রের মতো যেন সব ঘটনা ঘটে গেল, একটা পুরাতন, দুঃস্বপ্নময় অতীতের সঙ্গে সমস্ত যোগ যেন কোন অলক্ষ্য অথচ অমোঘ ইঙ্গিতে ধ্বসে পড়ল।

এই তিনটি দিন ইতিহাসের পাতায় অনেকগুলি নূতন নজীর রেখে গেল। শেখ মুজিবের আগে, আর কোন জননায়কের কথাই মনে করা যাবে না যিনি বলতে গেলে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েই নিজের আরব্ধ সংগ্রামের সাফল্য দেখেছেন এবং যিনি সেই ফাঁসির মঞ্চ থেকেই সরাসরি একটি মুক্ত জাতির নেতৃত্বের আসনে উঠে এসেছেন। অন্য আর একটি দৃষ্টান্তের কথাও মনে করা যাবে না যেখানে একটি জাতির সার্থক মুক্তিসংগ্রামের নেতা তাঁর নিজের মানুষদের কাছে যাওয়ারও আগে অন্য দেশের রাজধানীতে এসেছেন শুধু সেই মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে।

আর শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর আপনজনদের কাছে যে সম্বর্ধনা লাভ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা যাবে এমন কোন ঘটনা ইদানীংকালে ঘটেছে? বীরের ঘরে ফেরার প্রথম দৃশ্য কেউ কোনদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। ১০ জানুয়ারির সেই অপরাহ্নে ঢাকা শহরের মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতা, তাঁদের প্রিয় "মুজিব ভাই"কে নিয়ে কি করবে তা যেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। রেডিওর সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঢাকার একজন সাধারণ মানুষ বলেছিলেন, "কইল্যাজাডা ফাটাইয়া যদি দেখাইতে পারতাম তা হইলে বোঝতেন, কেমন মনে হইতাছে।" লেনিন, গান্ধী, মাও, দ্য গল, টিটো, কাস্ত্রো প্রভৃতি অনেকেই তাঁদের জীবদ্দশাতে সংগ্রামের সাফল্য দেখেছেন, জোমো কেনিয়াট্টা, নক্রুমা, ম্যাকারিওস প্রভৃতি অনেকে কারাগার থেকে বেরিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেছেন। কিন্তু শেখ

বাংলা দেশ

সীমা : উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে ভারত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

জনসংখ্যা : সাড়ে সাত কোটি।

ভাষা : বাংলা।

আয়তন : ৫৫১২৬ বর্গমাইল।

জেলা : ১৯।

মহকুমা : ৫৭।

থানা : ৪১৭।

গ্রাম : ৬০ হাজার।

সড়ক : ২৫০০ মাইল।

রেল লাইন : ১৮০০ মাইল।

নৌ-বন্দর : চট্টগ্রাম ও চালনা।

নগরী : ঢাকা চট্টগ্রাম ও খুলনা।

ছোট শহর : ৮০।

প্রধান নদী : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ইছামতী এবং আরো কয়েকটি।

পাটকল সংখ্যা : ৪২। নতুন পাটকল তৈরি হবে ২০।

রপ্তানী দ্রব্য : কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চামড়া।

শহরবাসী : শতকরা ১২·৫।

গ্রামবাসী : শতকরা ৮৭·৫।

সাক্ষর ব্যক্তি : শতকরা ২০।

মুজিবর রহমান যে বিজয়গৌরব নিয়ে, তাঁর স্বজনদের যে গভীর প্রীতির উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘরে ফিরলেন তার আর তুলনা নেই। সুভাষচন্দ্র বসু যদি দেশে ফিরতে পারতেন একমাত্র তাহলেই বোধ হয় ঐ ধরনের দৃশ্য আমরা দেখতে পেতাম।

•

শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এসে তাঁর জাতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সাংবিধানিক স্থায়িত্বের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাকিস্থান তার ২৪ বছরের অধিককালের জীবনে এখনও কোন সংবিধান তৈরি করতে পারে নি, অথচ বাংলাদেশ তার যাত্রা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সংবিধান প্রণয়নের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১৯৭০

তাজুদ্দিন আমেদ

মনসুর আলী
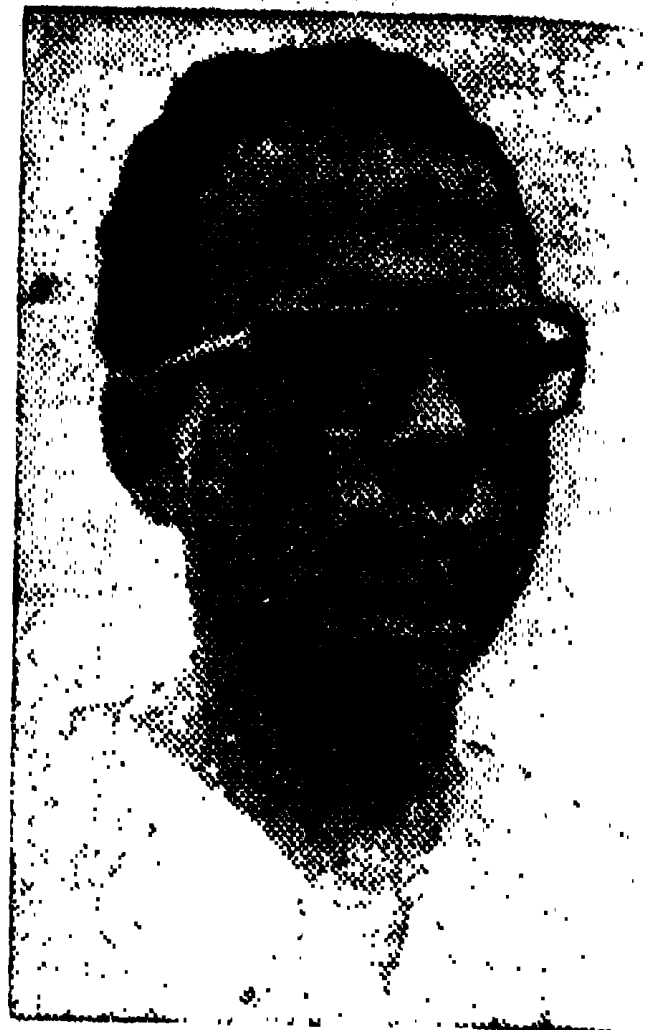
কামারুজ্জমান

ফণিভূষণ মজুমদার

প্রফেসর ইউসুফ আলী

আবদুস সামাদ আজাদ

সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে সাবেক পাকিস্থানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে বাদ দিয়ে অন্য সকলকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হবে এবং এই গণপরিষদ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা করবে। যেসব নির্বাচিত সদস্য পাকিস্থানের শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের অবশ্য এই গণপরিষদে গ্রহণ করা হবে না। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই বাংলাদেশের এই গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সামরিক শাসনের অবসান করে গণতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবন্ধ। কিন্তু তিনি সামরিক আইন করে বাতিল করবেন সেকথা বলছেন না, পরিষদের অধিবেশন ডাকতেও রাজী হচ্ছেন না। অথচ, একই সময়ে বাংলাদেশে পুরোপুরি অসামরিক শাসন চালু হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, সেখানে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন চালান হবে। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অনুগামীরা যে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার পুরোনো পাকিস্থানী ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলবেন না তার প্রমাণ তাঁরা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে আওয়ামী লীগের নেতারা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের একটি প্রতিশ্রুতিকেই রূপ দিলেন। আওয়ামী লীগের ছয় দফার মধ্যে প্রথম দফাটিতেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ যে ভারত ও পাকিস্থানের অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার পর পাকিস্থানের সর্বোচ্চ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না সেদেশের গবর্ণর-জেনারেল অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করেছিলেন। আর ভারতের নেতা জওহরলাল নেহরু গ্রহণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পদ। তার ফল হয়েছিল এই যে, পাকিস্থানে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিভূ হিসাবে আমলাদের হাতে। কিন্তু ভারতে সেটা হতে পারে নি; বরং ভারত যে ওয়েস্ট-মিনস্টার ধাঁচের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে চলবে সেটা পাকাপাকি-ভাবে তার সংবিধান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের ক্যাবিনেট-কেন্দ্রিক পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের চেয়ে প্রেসিডেনশিয়াল শাসনব্যবস্থাই সম্ভবত আজকের পৃথিবীতে অধিকতর জনপ্রিয়। পৃথিবীতে যে প্রায় ১৩৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে সেগুলির মধ্যে বাংলাদেশ সহ মাত্র ২৬টিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চালু রয়েছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

জহুর আমেদ চৌধুরী

কিন্তু প্রেসিডেনশিয়াল শাসন পদ্ধতিতে ক্ষমতার যে অপব্যবহার হতে পারে তার দৃষ্টান্ত শুধু পাকিস্থানে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জনমতের কোনরকম তোয়াক্কা না করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর খেয়ালখুশীমত সরকারী নীতি তৈরি করতে পারেন এবং সেই নীতি ভুল বলে প্রমাণিত হলেও সেটা শোধরাবার কোন উপায় নেই, একথা ভারত-পাকিস্থান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আর একবার প্রমাণিত হল। সুতরাং বাংলাদেশের নেতারা বেশ ভেবেচিন্তেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন।

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সেদেশের নেতাদের সামনে প্রশ্ন এসেছিল, বাংলাদেশের নূতন শাসনব্যবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের স্থান কি হবে। একথা হয়তো ঠিক যে, মহাত্মা গান্ধীর মতো শেখ মুজিবুরও যদি কোন সরকারী পদ গ্রহণ না
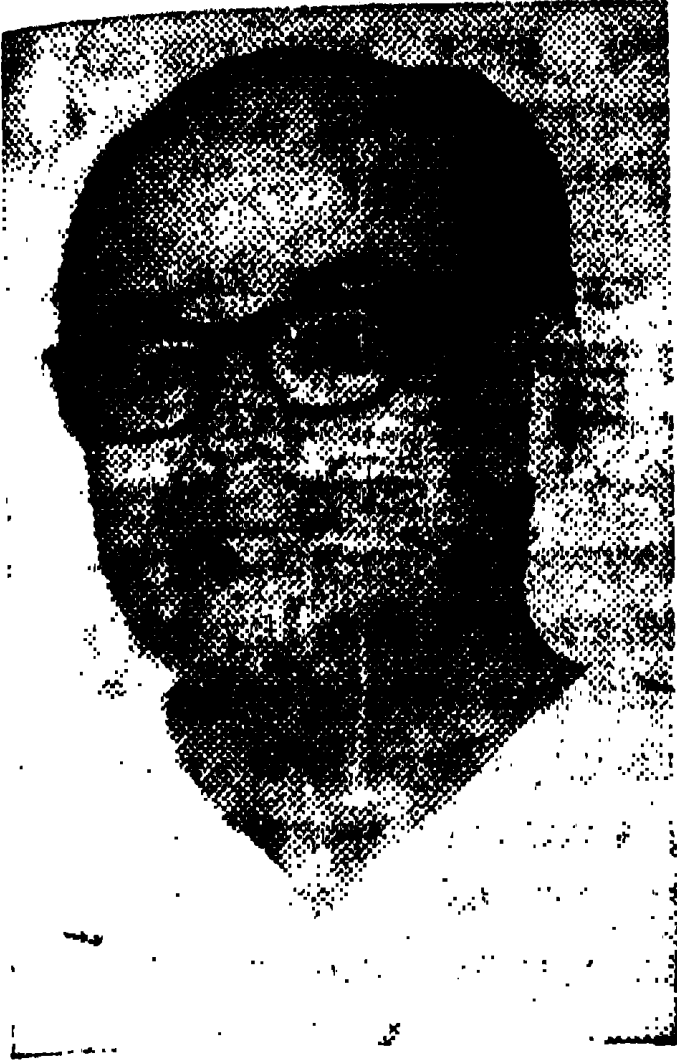
শেখ আবদুল আজিজ

বাঙলাদেশ মন্ত্রিসভা

শেখ মুজিবর রহমন—দপ্তর, মন্ত্রিসভা বিষয়ক, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র পণ্য ও বেতার দফতর।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম—শিল্প ও বাণিজ্য।

তাজউদ্দিন আমেদ—অর্থ, ভূমিরাজস্ব ও পরিকল্পনা।

ক্যাপটেন মনসুর আলি—যোগাযোগ।

খোন্দকার মোসতাক আমেদ—সেচ, বিদ্যুৎ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

আবদুস সামাদ আজাদ—আগের দফতরে আছেন (পররাষ্ট্র)।

আবদুল হেনা কামারুজ্জমান—ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

শেখ আবদুল আজিজ—কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায়।

প্রফেসর ইউসুফ আলি—শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

জহুর আমেদ চৌধুরী—স্বাস্থ্য, শ্রম সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা।

ফণি মজুমদার—খাদ ও অসামরিক সরবরাহ।

ডাঃ কামাল হোসেন—আইন ও সংবাদ বিষয়ক, সংবিধান প্রণয়ন, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ।

করে সরকারের বাইরে থেকে যেতেন তাহলে "বঙ্গপিতা" হিসাবে তিনি সকল দল ও চলতি রাজনীতির ঊর্ধ্বে একটা স্থায়ী ও সুনিশ্চিত মর্যাদার অধিকারী হতেন। এমনকি, গত ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করার সময় তাঁকে যে রাষ্ট্রপতির পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল সেই পদেও যদি তিনি অধিষ্ঠিত থাকতেন

মুস্তাক আমেদ

তাহলে একটা দল-নিরপেক্ষ বিতর্কাতীত মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সরকার পরিচালনায় তাঁর কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকত না। কেননা, ক্যাবিনেট-শাসিত পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে ক্যাবিনেটের প্রধানই সরকারের প্রধান, ঐ শাসনপদ্ধতিতে একমাত্র সাংবিধানিক সংকটের সময়ে ছাড়া অন্য সময় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা গৌণ। সংবাদ এই যে, শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে মহাত্মা গান্ধীর মতো সরকার থেকে পৃথক রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা নূতন জাতির গঠনের সময়ে শেখের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় নেতৃত্বই চেয়েছেন। সেই কারণেই তাঁরা তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে এনে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়েছেন।

আর সময় না নিয়ে এখনই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করার পিছনে সম্ভবত আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন মহল থেকে সম্প্রতি কানাঘুষায় এইরকম একটা রটনা চলছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং সেদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা এখন আর আওয়ামী লীগের আয়ত্তে নেই। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে সম্ভবত সেই রটনাকে স্তব্ধ করতে চাওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান নূতন নির্বাচন ও সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন, এমনকি সর্বদলীয় সমন্বয় কমিটিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের আত্মবিশ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

●

শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো সংগত-

পাকিস্থান স্রষ্টাদের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের ঘৃণার পরিচয় ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ছবিটি ঢাকাতে গৃহীত।

ভাবেই বিশ্বজনমতের প্রশংসা লাভ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর বিদায়ের আগে শেখকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব করেছিলেন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেও ভুট্টো সাহেব বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ইয়াহিয়চক্র কিভাবে দেশকে ধোঁকা দিয়ে গেছেন সেকথা তিনি এখন পাকিস্তানের মানুষকে জানিয়ে দিতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছে। পাকিস্তান যখন যুদ্ধে রত তখনও ইয়াহিয়া সুরা ও নারী-সংগে নিজেকে কিভাবে ডুবিয়ে রেখেছিলেন তার কুৎসিত কাহিনী "ডেইলি টেলিগ্রাফ" পত্রিকার মারফৎ প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। খাস পাকিস্তানের টেলিভিসনে ইয়াহিয়ার ভজনখানেক "বান্ধবীর" ছবি দেখান হয়েছে যাঁরা ইসলামাবাদে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে বিস্তর আমদানী লাইসেন্স বার করে নিয়েছিলেন। ভুট্টোর তথ্যমন্ত্রী পীরজাদা বলেছেন যে, ইয়াহিয়া পাকিস্তানের সামরিক পরাজয়ের কথা দেশের মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন করে ভুল করেছিলেন। পাকিস্তানের পথে পথে এখন "ইয়াহিয়াকে ফাঁসি দাও" বলে প্রাচীরপত্র দেখা যাচ্ছে। যদিও ইয়াহিয়া যা করেছেন তাতে ভুট্টোর সহযোগিতার কথাটা চেপে যাওয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বর্বর অত্যাচারের সামান্যতম নিন্দাও এখন পর্যন্ত করা হয় নি তাহলেও অতীতকে অস্বীকার করার যেটুকু প্রয়াস দেখা যাচ্ছে সেটুকুকে সুলক্ষণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ভুট্টো সাহেব কি নিজের অতীত ভুলে গিয়ে তাঁর দেশের মানুষকে আজকের বাস্তব পরিস্থিতিকে তার চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত মেনে নিতে প্রস্তুত করবেন? তিনি কি তাঁর দেশের মানুষকে একথা বোঝাতে আরম্ভ করবেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ধরে রাখার জন্য ইসলামের দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে? ইস্তকলাল পার্টির নেতা প্রাক্তন এয়ারমার্শাল আসগর খাঁ ও পাকিস্তানের কয়েকটি সংবাদপত্রের পরামর্শ অনুযায়ী ভুট্টো কি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেবেন? ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ত্যাগ করে তিনি কি এদেশের সংগে শান্তিতে ও সদ্ভাবে থাকার পথের সন্ধান করবেন?

আরও কিছুদিন না গেলে সম্ভবত এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। ভুট্টো একই সংগে নরম-গরম গাইছেন। অতীতের সংগে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করার কোন ইচ্ছা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্ত প্রতিফলিত হচ্ছে না। শেখকে মুক্তি দিয়েও তিনি শেখের গতি-বিধি ও মনোভাব সম্পর্কে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা ধোঁয়াটে রহস্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এখনও তিনি শেখ "শেষ কথা বলেন নি" বলে দেশের মানুষের সামনে স্তোক দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার অপরাধে পোল্যাণ্ড ও বুল-গেরিয়ার সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করেও তাঁর সরকার একটা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবী প্রত্যাখ্যান করে ভুট্টো সাহেব বলেছেন, জাতীয় পরিষদ আহ্বান করলে এখন পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। ঐ কথাটাকেই আর একটু ঘুরিয়ে তিনি বলেছেন যে, জাতীয় পরিষদে তো তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছেই, তিনি সেখানে তাঁর যে কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে পারেন। ভুট্টো সাহেব নিশ্চয়ই একথা বুঝতে পারছেন যে, জাতীয় পরিষদে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং বাংলাদেশ এখনও পাকিস্তানের অংশ, এই দুটি পরস্পরবিরোধী দাবী তিনি বেশীদিন চালিয়ে যেতে পারবেন না। কারণ, বাংলাদেশ পৃথক হয়ে যাওয়ার আগে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে যাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলি ভুট্টো নন। শেখকে মুক্তি দিয়ে ভুট্টো সাহেব নিজেকে পাকিস্তানের ভগ্নাংশে জনগণের নির্বাচিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; কিন্তু বাংলাদেশকে যতদিন তিনি পাকিস্তানের অংশ বলে চালাবার চেষ্টা করবেন ততদিন তাঁর নেতৃত্বের দাবীও অসার হয়ে থাকবে।

●

"বাংলাদেশের মুক্তির পর এখন পাকিস্তানের নাম দেওয়া উচিত বাকিস্তান।" —একথা বলেছেন জনসংঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী।

১৪।১।৭২ —পুণ্ডরীক

পটভূমি

পশ্চিম বাংলার রাজনীতির আলোচনায় যে বার বার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে তার কারণ এই রাজ্যের রাজনীতিতে এবং আসন্ন নির্বাচনে ওটা অন্যতম 'ইস্যু'। আগামী মার্চের নির্বাচনী প্রচারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ যে ঘুরে-ফিরে আসবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই 'ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনিটার কথাই ধরুন না। একথা ঠিক যে, গত মার্চের নির্বাচনেও আমরা শুনেছিলাম 'দুই বাংলায় এক আওয়াজ, ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ।' কিন্তু তখন ঐ ধুয়োটা তেমন জোরদার মনে হয় নি, কারণ অনেকের কাছে ওটা একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। এপার বাংলায় গত নির্বাচনের সময়েই মুজিবের জয়ধ্বনি উঠলেও ওপার বাংলায় ইন্দিরার জয়ধ্বনি ওঠে নি। ওঠা সম্ভবও ছিল না। এবার অবশ্য এই শ্লোগানের অনিবার্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। দুই বাংলাতে সত্যিই আজ এক আওয়াজ—ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ!

এপার বাংলাতে অবশ্য আর একটা আওয়াজও শোনা গেছে। সেটা হল 'ইন্দিরা-ইয়াহিয়া এক হ্যায়।' কিন্তু পাকিস্থানের কারাগার থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবর রহমান যে-সব বিবৃতি দিয়েছেন তার পর ঐ আওয়াজের কী দশা হবে সেই প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন। কারণ দিল্লীতে এবং ঢাকায় একাধিক ভাষণে শেখ মুজিব শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে শ্রীমতী গান্ধীকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করেন। ভারতের রাজনীতির সঙ্গে নেহরু পরিবারের তিন পুরুষের যোগাযোগের কথাও শেখ মুজিব উল্লেখ করেছেন। দিল্লীতে প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় তো তিনি নিজে একটি প্রশ্ন তুলে নিজেই তার উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, 'আমাকে প্রশ্ন করা হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শের সঙ্গে আপনার এতো মিল কেন?' নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন : 'এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল।'

এখন প্রশ্ন উঠেছে, শেখ মুজিব যেখানে শ্রীমতী গান্ধীর নীতি-আদর্শের সঙ্গে নিজের মিলের কথা নিজেই বলছেন, সেখানে ইন্দিরা ও ইয়াহিয়াকে একই আসনে বসাবার চেষ্টা কি আর সফল হবে?

'ইন্দিরা-ইয়াহিয়া এক হ্যায়' ধ্বনি যে-মহল থেকে তোলা হয়েছিল সেই মহল থেকেই বলা হয়েছিল যে, যে সরকার নিজের দেশে গণতন্ত্রকে পদদলিত করেছে তারা অন্য দেশে গণতন্ত্রকে সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু শেখ মুজিব বারবার তার ভাষণে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের, বিশেষতঃ শ্রীমতী গান্ধীর সাহায্যের কথা স্বীকার করেছেন। শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যে শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত প্রয়াসের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'শ্রীমতী গান্ধী আমার জন্যে দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে তিনি চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে এবং তাঁর সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।' এর পরেও যদি কেউ বলেন, বাংলাদেশের সংগ্রামে ইন্দিরা গান্ধী কোনো সাহায্য করেন নি তবে আর জবাব দেওয়ার কিছু থাকে না। তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে, শ্রীমতী গান্ধী যদি গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী হন তবে তিনি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করলেন কী করে? তাহলে কি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়? কিন্তু যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীকে গণতন্ত্রের শত্রু বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন তাঁরাও স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের সংগ্রাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরাট জয়। সুতরাং, আজ একই সঙ্গে বাংলাদেশের সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জয় এবং শ্রীমতী গান্ধীকে গণতন্ত্রের শত্রু বলার আর উপায় নেই।

তারপর ওঠে বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের প্রশ্ন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গোড়া থেকেই বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনের বেশি একদিনও ভারতীয় ফৌজ বাংলাদেশে থাকবে না। কিন্তু যুদ্ধ মিটতে না মিটতেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর প্রস্তাবে অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানানো হয়। তার আগে মার্কসবাদীদের জনসভায় আভাসে-ইঙ্গিতে এমন কথাও বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে ভারতীয় ফৌজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা নিঃশংয় নন। শেখ মুজিব তাঁর মুক্তির পর নানা ভাষণে কিন্তু ভারতীয় ফৌজের ভূমিকার কুণ্ঠাহীন প্রশংসা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন, যেদিন তিনি বলবেন সেই দিনই ভারতীয় ফৌজ যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবে এ-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। আর এটা তাঁর নিছক অনুমান নয়, কারণ দিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরই তিনি ঐ মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ, ভারতীয় ফৌজ বাংলাদেশে রয়েছে ঐ দেশের পূর্ণ সম্মতিক্রমে এবং তারা কতোদিন সেখানে থাকবে সেটা ঠিক হবে দুই দেশের সরকারের মধ্যে আলোচনার দ্বারা। এই অবস্থায় যদি কোনো দল অবিলম্বে ভারতীয় ফৌজকে সরিয়ে আনার দাবি তোলে তবে সেটাকে খুব জোরদার রাজনৈতিক 'ইস্যু' করে তোলা যাবে বলে মনে হয় না।

এইসব কারণেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পশ্চিম বাংলায় আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ নীতির খুঁত ধরে সরকার তথা কংগ্রেস দলকে বিব্রত করা যাবে না। ফলে এই নীতির সাফল্যের পুরো কৃতিত্বটাই কংগ্রেসের ওপর বর্তাবে এবং কংগ্রেস সেটাকে পুরোপুরি কাজেও লাগাবে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের নানা সংবাদকে বেশ খানিকটা জায়গা দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় রমনার ময়দানে শেখ মুজিবের বক্তৃতার বিশদ বিবরণও 'গণশক্তিতে' ছাপা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রীমতী গান্ধীর প্রশংসা করে শেখ মুজিব যে-সব কথা বলেছেন তার একটিও ছাপা হয় নি!

•

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে যদি কংগ্রেসকে বিব্রত না-করা যায় তবে বিরোধীরা আর কোন্ কোন্ প্রসঙ্গকে নির্বাচনী 'ইস্যু' করে তুলবেন? অবশ্যই শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নকে বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার এখন যে রীতিমতো উন্নতি হয়েছে এটা যে-কোনো লোকেরই বুঝতে অসুবিধে হবে না। ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের সময় অবস্থার যতোটা উন্নতি হয়েছিল ততোটা উন্নতি অবশ্য বজায় রাখা যায় নি। রাজ্যের নানা স্থানে ছোটখাটো ঘটনা ছাড়াও কলকাতার বুকে একাধিক বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। তবু গত বছর এই সময় নির্বাচনের মুখে যে আতঙ্কের আবহাওয়া রাজ্যের মানুষের প্রায় শ্বাসরোধ করেছিল তা এখন অনুপস্থিত। গত ফেব্রুয়ারী-মার্চের মতো এবার নিশ্চয়ই কেউ ভাবছেন না যে, নির্বাচন আদৌ হতে পারবে কিনা অথবা ভোটদাতারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোট দিতে যেতে পারবেন কিনা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগী দলগুলি নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'আধা-ফ্যাসিস্ট' অত্যাচারের অভিযোগকে কাজে লাগাতে চাইবে। ইদানিং যে-সব সংঘর্ষ ঘটছে সেখানে সাধারণতঃ দুইয়ের বেশি পক্ষ নেই। সেই দুটি পক্ষ কংগ্রেস এবং মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। মার্কসবাদীদের অভিযোগ, কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস সন্ত্রাসের পথে সি-পি-এমকে উৎখাত করতে চায় এবং সেই কাজে কংগ্রেসকে সাহায্য করছে পুলিশ ও প্রশাসন। তার ওপর সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত করার মধ্যেও সি-পি-এম কংগ্রেস সরকারের ফ্যাসিবাদী মনোভাবের পরিচয় পেয়েছে। কিন্ত অনেকেই এটা লক্ষ্য করেছেন যে, এইসব অভিযোগ নিয়ে রীতিমতো সোরগোল তুললেও সি পি এম এইসব 'ইস্যুকে' কেন্দ্র করে কোনো গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। পার্টির পক্ষ থেকে অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে পুজোর পর বিরাট গণ-আন্দোলন সুরু হবে এবং তা চরমে পৌঁছবে নভেম্বরে। কিন্তু পুজোর আগেই সরকারী কর্মচারী-

ঝাড়-ফুঁক!

...জোড়া লাগ...
জোড়া লাগ......

দের বরখাস্ত করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে জোরদার গণ-আন্দোলনের সুযোগ যখন সি পি এমের সামনে এল, তখন পার্টি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। কোনো রকম একটা বন্ধ্ পালনের মধ্যে দিয়েই সব দায়িত্ব যেন সারা হয়ে গেল।

সি পি এমের এই অক্ষমতার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক মহল পার্টির রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি নামকাওয়াস্তে দল ছাড়া এখন সি পি এমকে প্রায় একলাই চলতে হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনেও সেই নিঃসঙ্গতা খুব একটা কাটবে বলে মনে হয় না।

•

আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে যদি কংগ্রেস খুব অসুবিধেয় না-ও পড়ে, তবু আর একটি দিক থেকে যে আক্রমণ আসবে তা কাটিয়ে উঠতে কংগ্রেসকে কিছুটা বেগ পেতে হবে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। গত জুন মাসে পশ্চিম বাংলায় যখন রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় তখন প্রশাসনের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল দুটি। এক. আইন-শৃঙ্খলা এবং দুই, এই রাজ্যের উন্নয়ন। আইন-শৃঙ্খলার কথা আগেই এসেছে, এখন বৈষয়িক উন্নয়নের প্রসঙ্গে আসা যাক। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার রাষ্ট্রপতির শাসনের চেহারা যে ভিন্ন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পশ্চিম বাংলার সমস্যা সম্পর্কে নয়াদিল্লী এবার অনেক বেশি সজাগ। সবকিছু আমলাদের ওপর ছেড়ে না-দিয়ে এবার একজন পুরোদস্তুর মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে পশ্চিম বাংলার ব্যাপার দেখাশোনা করার জন্যে। এই রাজ্যের কয়েকটি কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্যে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকার যে তৈরি তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। কলকাতার যানবাহন সমস্যা সমাধানের জন্য ভূগর্ভ রেল প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্যে ১৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। শিল্পপতিদের নতুন কল-কারখানা খোলার জন্যে ন'-দফা সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষ এখন প্রশ্ন তুলতে পারে, এইসব প্রস্তুতি সত্ত্বেও আসলে কাজ কতোটা এগিয়েছে? কতো বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে? ক'টা নতুন কল-কারখানা খোলা হয়েছে? ক'টা বন্ধ কারখানা আবার চালু হয়েছে?

এ-সবই খুব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং কংগ্রেসও নিশ্চয়ই এর উত্তর দেবে। কংগ্রেস একথা বলতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের পর মাত্র মাস ছয়েক কেটেছে। তার মধ্যে আবার ডিসেম্বর মাসটা গেছে পাকিস্থানের সঙ্গে লড়াইয়ে। সুতরাং কাজ হয়ত খুব বেশি এগোবার সময় হয় নি। তার মধ্যেই বেশ কয়েকটি বন্ধ কারখানা চালু হয়েছে, আরো কয়েকটি বন্ধ বা বিপন্ন কারখানার ভার সরকার নিজের হাতে নিতে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার হলদিয়ায় সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বে-সরকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যেও যেন আগের তুলনায় কিছুটা বেশি উৎসাহ দেখা দিয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের যে সর্ব-ভারতীয় বণিক-সভা আছে তার একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পশ্চিম বাংলায় এখন লগ্নীর আবহাওয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল, সুতরাং এখন এই রাজ্যে নতুন লগ্নী করা যেতে পারে। তা-ছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার ফলেও পশ্চিম বাংলার বৈষয়িক ব্যবস্থা চাঙা হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

এই সবই আশাব্যঞ্জক লক্ষণ, কিন্তু এগুলি এখনও প্রধানতঃ সম্ভাবনার পর্যায়েই রয়েছে। অথচ রাজ্যের বৈষয়িক সমস্যাগুলি অত্যন্ত জরুরী, যার আশু সমাধান দরকার। তাই রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের প্রসঙ্গ আগামী নির্বাচনে একটা বড় 'ইস্যু' হয়ে উঠবে এবং মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি এই উপলক্ষে এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যের প্রশ্নকেও নতুন করে টেনে আনবে।

১৪।১।৭২ —দেবদত্ত

মানবেন্দ্র পাল

প্রত্যয়

চিঠিখানা অনেক সংকোচে ভাঁজ করে একটা সাদা খামে পুরল রাজেন। তার ড্রয়ারে পোস্টাপিসের খাম, আলাদা সাদা খাতা টিকিট পোস্টকার্ড বা সাদা খামের অভাব ছিল না। সহজভাবে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে নিজের সুবিধের জন্য এমনি নানা ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। এখন তো ইচ্ছে করলেই চট করে গিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করা যাবে না। অথচ আত্মীয়র সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে চলবে কী করে? মানুষের ঘনসান্নিধ্য যদি একান্ত দুর্লভই হয়ে ওঠে তবু চিঠিপত্রে যোগটা রাখতেই হয়। হৃদয়বিনিময় চাই-ই। নইলে মানুষ স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

একজনের কথা মনে পড়ল। সে হঠাৎ একদিন মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে পায়চারি করতে করতে আবিষ্কার করল, এ দুনিয়ায় সাচ্চা মানুষ একটিও নেই। সব অসাধু, স্বার্থপর, পাপী। একমাত্র সে-ই খাঁটি মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তার সব মানুষের ওপর ঘৃণা জন্মে গেল। বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়ল, আত্মীয়স্বজনদের মুখদর্শন করল না—এমনকি স্ত্রীর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য বাইরের রকে গিয়ে শুতে লাগল। এরপরই এর স্থান হল পাগলা-গারদ।

মানুষ হয়ে মানুষকে ত্যাগ করে থাকার চেষ্টা করলে তাকে নয় আত্মহত্যা করতে হয় নইলে পাগলা-গারদে আশ্রয়।

রাজেন এ তত্ত্বে কিন্তু চিরদিন বিশ্বাসী ছিল না। এ উন্মেষ তার সম্প্রতিকালে। তাই এখন ড্রয়ারে চিঠি লেখার সরঞ্জাম সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হয়।

এই যে এখন চিঠিখানি লিখে রাজেন সেটি সাদা খামে ভরল—সেও অনেক ইতস্তত করে। চিঠিখানি যাকে লেখা হচ্ছে সে একটি মেয়ে। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। ষোড়শী অষ্টাদশী নয়—বলা যায় বর্ষীয়সী। এখানেই থাকে। তবে ভিন্ন পাড়ায়। সেখানে রাজেনেরই একটা একতলা বাড়ির একদিকে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে তারা—মা আর মাসি।

এই চিঠিটা সেই মেয়ের হাতে পৌঁছনো চাই।

প্রথমে ভেবেছিল ডাকেই ছেড়ে দেবে। কিন্তু—যে মেয়ের সঙ্গে এতদিনের ঘনিষ্ঠতা, একই জায়গায় থেকে সেই চিঠি ডাকঘর মারফৎ পাঠানোর মধ্যে কেমন একটা অসহায় ভাব আছে যা সে নিজে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না।

এ চিঠিটা সে নিজেই দিয়ে আসতে পারে—এটুকু পথ হাঁটায় খুব একটা অসুবিধে নেই। আর চিঠি—বিশেষ করে এই ধরণের চিঠি সোজাসুজি হাতে-হাতে দেওয়াই ভালো। এতে শুধু পৌরুষই যে আছে তা নয়, চিঠিখানা যে ঠিক মানুষটি পেল এ বিষয়ে অন্তত নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

কিন্তু—কিন্তু—সত্যিই কি আজ আর সেই পৌরুষ তার আছে? সেই তেজোদীপ্ত যৌবনোদ্ধত ভাব? বরুণা যদি চিঠি না নেয়? সে যদি 'বসুন আসছি' বলে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে নিজে পালিয়ে যায়? পালাবার জায়গার তো এখন আর অভাব নেই তার।

রাজেন সাদা খামে চিঠিখানা ভরল বটে, কিন্তু মুখ আঁটল না। এখনো দ্বিধা।

রাজেনকে নিয়ে সমালোচনার অন্ত নেই। পয়সার জোর আছে, বিদ্যেও আছে। কিন্তু তবু বাড়িতে বাড়িতে তাকে নিয়ে যে চাপা আলোচনা হয় তা মোটেই সুখকর নয়। মেয়েরা বেশি আলোচনা করে তার চরিত্র নিয়ে। চরিত্র বলতে সাধারণত যা বোঝায় সে জিনিসটা নাকি রাজেনের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। তার জন্যে রাজেনের কোনো সংকোচের বালাই নেই। সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে সে নাকি বলে—চরিত্ররক্ষা ব্যাপারটা একটা ফল্‌স সেন্টিমেন্ট।

এমন কথা শুনলে কোন সতীসাধ্বীর না রাগ হয়? তাঁরা সকলেই সতীসাধ্বী। সুতরাং তাঁদের রাগ করার অধিকার আছে। তাই তাঁদের মতে রাজেনের মুখদর্শনও পাপ।

এসব কথা রাজেনের কানে যে আসে না তা নয়। সে তো হা-হা করে হেসে ওঠে। বলে, আমার ওপর ওদের রাগ তো হবেই। সবার হাঁড়ির খবর যে আমার জানা। ওদের কার হাতের লেখার নমুনা না আমার কাছে আছে? অবশ্য লেখাগুলো যে সব আমার উদ্দেশ্যেই তা নাও হতে পারে। আসলে আমার কিছু কালেকশন আছে। ধরো তোমাদের সোমা মৈত্র—যার সুনামে তোমরা মুখর—তার তিনটি প্রেমপত্র আমি উত্তরপাড়ার একটি ছেলের কাছ থেকে কিনেছি পঁচিশ টাকা দিয়ে। এমনি অনেকেরই। দেখতে ইচ্ছে কর তো দেখাতেও পারি। তবে ওরা যেটা বলে তাতে ভুল বা বাড়াবাড়ি কিছু নেই। আমি মোটেই ভালো নই। ভালো হওয়া মানে যদি ভণ্ডামি আর ন্যাকামি করা বোঝায় তাহলে আমি অমন ভালো হতে চাই না।

রাজেনের এই চেহারাটা পরিষ্কার জানা ছিল বলেই বরুণারা যখন রাজেনদের ইঁটখোলার কাছে নতুন বাড়িটায় ভাড়া এল তখন সকলেই বরুণার ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠেছিল।

তবে মেয়েটি নাকি ভালোমানুষ। ছ্যাবলা নয়, চনমনে বয়েসও নয়। লাজ-লজ্জা আছে। বেশেবাসে আধুনিকতার নামগন্ধ নেই। বরং সর্বাঙ্গ এমনভাবে ঢেকে রাখে হঠাৎ দেখলে মনে হয় দেহ নয় তো যেন কাপড়ের স্তূপ।

কেউ কেউ আবার এমনও ভাবল, ভালোমানুষ মেয়ে বলেই মরবে। নষ্ট-হওয়া মেয়েদের যদি স্ট্যাটেস্টিক নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে শতকরা নব্বুইজন হচ্ছে বোকা, সরল, অথবা ইংরাজিতে যাকে বলে টু গুড!

এসব ঘরোয়া আলোচনা। কিন্তু ওদের মধ্যে ব্রততী মেয়েটি এই ধরণের আলোচনার পক্ষপাতী নয়। সে বললে, ওই নিষ্পাপ সরল মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে। সময় থাকতে সাবধান করে দেওয়া উচিত।

ব্রততী গেল বরুণাদের বাড়ি। এক-দিনের মধ্যে এই প্রথম একটি মেয়ে এল বরুণার সঙ্গে আলাপ করতে। নইলে এতদিন তো এরা এই নির্জন জায়গায় মুখ বুজেই পড়েছিল।

আলাপ হল। কিন্তু তেমন প্রাণে প্রাণে মিলল না। গল্পের মধ্যে, কথাবার্তার মধ্যে আন্তরিকতার সুর নেই।

ব্রততী প্রথমেই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, তুমি সবসময়েই চাদর জড়িয়ে থাক নাকি?

বরুণা উত্তর দিতে পারেনি। লজ্জার হাসি হেসেছিল।

ব্রততী বিরক্ত হয়ে বলেছিল, বাড়াবাড়ি।

এবার উত্তর দিলেন বরুণার মাসি।—বাড়াবাড়িই বটে। ছোটোবেলা থেকে কী যে অভ্যেস।

ব্রততী সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর বললে, ও একরকম ম্যানিয়া।

বরুণা চুপ করেই রইল। ওর মাসি এবার একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, তা ম্যানিয়া বলতে পার।

ব্রততী এবার ঘরের চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ভুরু কুঁচকেই আছে। যেন সবতাতেই বিরক্ত।

—ওটা কি? তানপুরা? গান-বাজনা কর নাকি?

বরুণা মুখ নিচু করে বললে, আগে করতাম।

—এখন কর না কেন? বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করা গেল না বোধ হয়?

মাসি বললে, এখনো করে বইকি। নতুন জায়গায় এসে মন বসাতে পারেনি। নইলে বনগাঁয়ে যখন ছিলাম—

—আগে বুঝি বনগাঁয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ। বনগাঁও অবশ্য নিজের দেশ নয়।

—তা বনগাঁ ছেড়ে এখানে এলেন কেন?

মাসি বললেন, গঙ্গার তীর। মরবার আগে মুখে একটু গঙ্গাজল পাব। নবদ্বীপে খুব চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তেমন বাড়ি পেলাম না।

এমনি সময়ে দূরে রাধামাধবের মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘন্টা বাজল। মাসি ব্যস্ত হয়ে বললে, তুমি ওর সঙ্গে গল্প করো। আমি ঠাকুর প্রণাম করে আসি।

বরুণার মাসি চলে গেলে ব্রততী স্বমূর্তি ধারণ করল। বরুণা চা করতে যাচ্ছিল, ব্রততী বাধা দিয়ে বললে, থাক্ থাক্, চা-টায়ের দরকার নেই। কতকগুলো দরকারি কথা ছিল তোমার সঙ্গে—সেটা আগে সেরে নিই।

এমনিতেই প্রথম আলাপের সূত্রপাতে ব্রততীর কথায়-বার্তায় বরুণা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। এবার কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। শাস্তি পাওয়া ছাত্রীর মতো নিঃশব্দে ব্রততীর সামনে এসে বসল।

—কেমন লাগছে জায়গাটা?

—ভালো।

—খুব নির্জন নয়?

—আমাদের নির্জনে থাকা অভ্যেস আছে।

—আচ্ছা, রাজেনবাবুকে কেমন লাগে?

জায়গায় কথা হতে হতে হঠাৎ একেবারে—

বরুণা ক্ষণকালের জন্যে মুখটা নিচু করে বললে, ও'দের সবাইকেই বেশ ভালো লাগে।

—সবাইকে পেলে কোথায়?

—রাজেনদা একদিন ও'দের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

—ও! এর মধ্যে বাড়ি ঘুরে আসা হয়েছে!

বরুণা অপরাধীর মতো চুপ করে ছিল।

—রাজেনবাবু বোধ হয় প্রায়ই আসেন?

—হ্যাঁ। ও'র লাইব্রেরিঘর যে ওপাশে। সেইজন্যে—

—থাক্ থাক্ সেসব জানি। ওটা একটা মন্দ ফাঁদ নয়।

বরুণা অবাক হল।

—ফাঁদ মানে?

—বুঝতে পারবে। সেইজন্যেই গায়ে পড়ে সাবধান করতে এসেছি। ফাঁদে পা দিয়ো না। ওর মিষ্টি হাসিতে ভুলো না। শয়তান লোক।

এই বলেই ব্রততী হঠাৎ উঠে পড়ল।

—এ কী চললেন?

—হ্যাঁ। এই কথাটা বলার জন্যেই আমার আসা। এখন বাঁচা-মরা তোমার নিজের হাতে।

ব্রততী নাটকীয়ভাবে এসেছিল, নাটকীয় ভাবেই চলে গেল। বরুণার মাথাটা তখন এমন ঝিম-ঝিম করছিল যে উঠে গিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে সে ক্ষমতা ছিল না।

বরুণা একটু বেশিই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলেই কি ফাঁদে পা দেওয়া হয়? মানুষকে ভালো লাগলেই কি অধঃপাতে যাবার পথ খুলে যায়? রাজেনদা কি সত্যিই এত খারাপ লোক? কই তার ব্যবহারে তো তেমন লক্ষণ কিছু পাওয়া যায়নি?

তাছাড়া একজন ভদ্রলোক যে পড়া-শোনা নিয়ে থাকে, বাড়িওলা হয়েও যার ব্যবহার অমায়িক—যে মানুষ স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে এই রান্নাঘরে বসে মাসিমার বাটি থেকে জোর করে মুড়ি কেড়ে খায়,—নিজে হাতে চা তৈরি করে খাওয়ায়—শিশুর মতো সরল এই মানুষটিকেও শয়তান ভাবতে হবে? তা হলে তো দুনিয়ার কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না। কোনো পুরুষের সঙ্গেই কথা বলা যায় না।

আর তা ছাড়া তার বুকের মধ্যে ছুরির যে তীক্ষ্ণ ফলা বিঁধে আছে সে যন্ত্রণার তো কোনোদিনই উপশম হবে না। ব্রততীদি যে ভয় পাচ্ছেন তার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলেই। একদিনের আলাপেই তো একেবারে আবরণ খুলে

কেলে দিয়ে নিজেকে ধরে দেওয়া যায় না। তা যদি যেত তাহলে ব্রততীদির মতো মেয়েকেও চমকে উঠতে হত। সহানুভূতি না দেখিয়ে পারত না। বুঝতে পারত—যে মেয়েরা অনেক পেয়েছে বা অনেক পাবে বরুণার নাম তাদের তালিকায় নেই। কাজেই দু-একজন পুরুষ বন্ধু যদি নিঃস্বার্থভাবে তার সঙ্গে মিশতে আসে সেখানে কটাক্ষ না করাই ভালো। আর তো কিছু নয় শুধু মেশা। একটু কাছে বসে গল্প, একটু হাসি, একটু সরস ঠাট্টা। পুরুষের সঙ্গ ভালো লাগে না কোন মেয়ের? ব্রততীদির লাগে না? তবে তার বেলায় সেই ভালো লাগাটুকুর ওপর জবরদস্তি কেন?

মনের এই আবেগের সঙ্গে সঙ্গে বরুণা উঠে দাঁড়াল। এসব বাজে জিনিস নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। অনেক কাজ আছে।

এমনি সময়ে সুন্দর সুরেলা গলায় গুড ইভনিং বরুণা দেবী' বলে রাজেন এসে ঢুকল।

—দরজাটা কি আমার জন্যেই খোলা ছিল?

মুহূর্তে বরুণার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

সেই বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেনও বোধহয় একটু থমকে গিয়েছিল।

—কী ব্যাপার?

—কিছু নয়। ভার ভার গলায় উত্তর দিয়েছিল বরুণা।

—কিছু নয় মানে? পরিষ্কার দেখছি 'কিছু একটা' হয়েছে। আমার কাছে কি লুকানো চলে? আমি অন্তর্যামী।

বলতে বলতে রাজেন বরুণার দিকে এগিয়ে এল। আর বরুণা অমনি মাটির ওপরেই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে শক্ত হয়ে বসে পড়ল।

রাজেন কাছে এসে কোমরে দু হাত রেখে বেশ একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে হাসল। বলল, আচ্ছা আমি কাছে গেলেই তুমি অমনি জবুথবু হয়ে বস কেন বলো তো? ভাবটা যেন—ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো।

বলেই নিচু হয়ে দুহাত দিয়ে বরুণার মুখটা তুলে ধরে চুমু খেল। বরুণা মুখ সরিয়ে নিল না। চোখ বুজিয়ে রইল।

তারপর যেইমাত্র রাজেন পিছন থেকে ওকে তোলবার চেষ্টা করল অমনি বরুণা প্রাণপণে দুহাত দিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে দেহটা এমনভাবে চেপে রইল যেন শক্ত একখানা পাথর!

রাজেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। বললে, নাঃ, খেলোয়াড় মেয়ে দেখছি। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

এই বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতেই লক্ষ্য পড়ল বাইরের দরজাটা খোলাই রয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফিরে এসে দেখল বরুণা নেই। শোবার ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে।

অনেক অনুনয়-বিনয় করে রাজেন ওকে ডাকল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

—আমি তাহলে চললাম।

বলে অনেকক্ষণ ঘাপটি মেরে দরজার পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বরুণা দরজা খুলল না।

এমনি সময়ে বাইরের দরজায় শেকল নড়ে উঠল। রাজেন বুঝল মাসিমা এসেছেন। অন্ধকারে পা টিপে টিপে পার্টিসানের দরজা খুলে লাইব্রেরী ঘরে চলে গেল।

বরুণা ঠিক করেছিল, রাজেন এলে ব্রততীর কথা বলবে। একবার অবশ্য ভেবেছিল, ওসব নোংরা কথা নিয়ে আলোচনা করবে না। আবার ভেবেছিল একেবারে চেপে যাওয়াটাও কি ঠিক হবে? একজন এসে আর একজনের নামে লাগানি-ভাঙানি করে গেল—চুপ করে তা মেনে নেওয়া উচিত? তার চেয়ে বলে ফেলাই ভালো। তারপর তার যা কর্তব্য তা সে করুক।

রাজেন তো এসেওছিল; কিন্তু কিছু বলার ফুরসৎ দিল কই? এসেই একেবারে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। খুব যে খারাপ লাগে তা নয়। তার তো এ জন্মে স্বামী নিয়ে ঘর বাঁধার সৌভাগ্য হবে না। কোনো পুরুষই তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। তাই—এইটুকুই লাভ, এইটুকুই আনন্দ। কিন্তু তাই বলে দুটো কথাও বলবে না? দুটো মিষ্টি কথা—দুটো ভালোবাসার কথা? তার সঙ্গে একটু রাগ? একটু অভিমান?

এ নিয়ে পরে একদিন বরুণা রাজেনকে একটু ভর্ৎসনা করেও ছিল। রাজেন হেসে বলেছিল, দেখো ওসব প্রেম-ভালোবাসায় আমি বিশ্বাসী নই। ওগুলো বড়ো ঠুনকো—এই বাতাসে ফোলানো রং-বেরঙের বেলুনের মতো। এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যাই বেশি। জলের গভীরতা কত বোঝবার জন্য পাড়ে বসে ঢিল ফেলতে ফেলতেই যাদের বেলা ফুরিয়ে গেছে। আমি ঠিক সে দলে নই।

বরুণার কাছে এসব একেবারে নতুন কথা। তেমন করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ তার হয়নি। ঠাকুর-দেবতা ব্রত-উপবাস এই নিয়েই তার দিন যায়। আর অবসর সময়ে ট্রাঙ্ক থেকে মলাট-ছেঁড়া জীর্ণ নিউজ প্রিন্টে ছাপা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো পড়ে। কোনো নায়ককে সে এমন নগ্ন স্পষ্ট কথা বলতে দেখেনি। তাই সে অবাক হয়ে এই স্পষ্টবাদী পুরুষটির দিকে তাকিয়ে রইল।

রাজেন তারপর বলেছিল এই যে প্রেমপত্র লেখা এ যে কী অসহ্য ন্যাকামি তা বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি কেউ বোঝবার চেষ্টা করে না। একটি মাত্র

বক্তব্য—তোমায় আমি চাই—এইটেই ইনিয়ে-বিনিয়ে কাব্য করে, ভাষার জাল বুনে লিখেই চলেছে। আমি এই ভেবে আশ্চর্য হই—নষ্ট করার মতো এত সময় আছে? যৌবন ঠিক কবে থেকে শুরু বলতে পার? ঠিক কবে শেষ হিসেব রাখ? হিসেব আমরা রাখি না বলেই ঠিক।

শুনতে শুনতে বরুণা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল রাজেন শুধু স্পষ্টবাদীই নয়—ও যেন একজন ব্যতিক্রম। এত বড়ো সত্য কথা পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোনো পুরুষ এর আগে ভাবেনি—অন্তত মুখ ফুটে বলেনি।

কিন্তু—

কিন্তু যদি তার নিজের কথা ধরা যায় তা হলে?—না, না অতটা ভেবে কাজ নেই। যেদিন ঐ রাজেন তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে মাটি থেকে দু-হাত করে দাঁড় করিয়ে দেবে—এই মোটা চাদরটা গা থেকে খুলে পড়ে যাবে, শাড়িখানা খসে পড়বে, ব্লাউজটা বোতামের বন্ধন ছিঁড়ে—না-না—অসম্ভব। সেই মুহূর্তে ওই রাজেনই তাকে ফেলে রেখে হতাশায় পালিয়ে যাবে।

তার চেয়ে এই ভালো। দুটো ভালো-বাসার কথা—দু-চারটে প্রেমপত্র—কিম্বা বড়ো জোর ওই যেমন করে মুখটা তুলে একটু আদর!

চেষ্টার ত্রুটি করেনি বরুণা। ওইটুকুর মধ্যেই যাতে সীমাবদ্ধ থাকে এমন অলিখিত শর্তও করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শর্ত মানা হয়নি।

অন্য দিনের মতো সেদিনও সন্ধের পর মাসিমা চলে গিয়েছিলেন রাধামাধবের আরতি দেখতে।

মাসি চলে গেলেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে যায়। আর তো কেউ নেই। প্রথম প্রথম বরুণার ভয় করত। —এই বুঝি পাঁচিল টপকে কেউ এসে তার মুখে কাপড় গুঁজে দিল।

এখন আর ভয় করে না। অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন অন্য ভয়—এই বুঝি রাজেনদা এসে পড়ল।

রাজেন প্রায় প্রতিদিনই আসে। আসে ওদিকের লাইব্রেরি ঘরে। তারপর যখন জানতে পারে মাসি চলে গেছে তখন চুপি-চুপি চোরের মতো আসে এবাড়িতে।

এটাও বরুণার একরকম অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু কেমন ভয় করে। ব্রততীদির কথা মনে হয়—ফাঁদ! শয়তানের ফাঁদ! সে কি তাহলে সত্যিই শয়তানের ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে?

এসব মনে হতেই ভয়ে বুক কাঁপে। তবু অধীর প্রতীক্ষা—এখনই এসে পড়বে। এখনই—

বরুণা বসেছিল শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নিয়ে। কিন্তু পড়ায় মন বসছিল না। বারে বারেই উৎকর্ণ হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল আজ যেন রাজেন বড্ড দেরি করছে।

এমনি সময়ে রাজেন এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। আজ কেন বরুণা তাকে নতুন চোখে দেখল। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা, দুচোখে ঝকমকে দৃষ্টি, গালের নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছে চওড়া জুলফি, গোঁফের ছাঁটের মধ্যে দুরন্ত ইশারা। শার্টের আস্তিনে গোটানো। শক্ত কঠিন হাত দুটো যেন আকাশের চাঁদকে মাটিতে ছিনিয়ে আনার জন্যে উদ্যত। আর—আর হচ্ছে আকর্ষণীয় ওর পা দুটো। পুরুষ মানুষের ওরকম চওড়া থাই না হলে যেন মানায় না।

একদিনের কথা মনে পড়ল। দুজনে মিলে দালানে বসে একই বাটি থেকে মুড়ি খাচ্ছিল। লঙ্কার দরকার। লঙ্কা না হলে বরুণার চলে না। তাড়াতাড়ি উঠে লঙ্কা আনতে যাচ্ছিল হঠাৎ রাজেনের মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল, দিল ডান পাটা বাড়িয়ে। ডিঙিয়ে যায় কী করে? বরুণা তারপর অনুরোধ করল পা-টা সরাবার জন্যে। রাজেন যেন শুনতেই পায়নি, চোখ বুজিয়ে মুড়ি চিবোতে লাগল। তখন বরুণা ওর পায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল. তারপর চিমটি কাটতে লাগল—শেষে অধৈর্য হয়ে মাটিতে বসে পড়ে ওর পা-টা দুহাত দিয়ে তোলবার চেষ্টা করল। পা-টা একটু উঠল বটে কিন্তু পায়ের সমস্ত ভারটা এবার নেমে এল তার কোলের ওপর।

উঃ লাগছে! সরান—সরান! বাবাঃ পা নয়তো লোহার থাম!

সেই থেকে রাজেনের পা দুখানার ওপর বরুণার কেমন একটা বিদঘুটে আকর্ষণ। সুন্দর মুখ হলে সবাই প্রশংসা করা যায়—কিন্তু পা?

বরুণা বুঝতে পারছিল এখনি ওই ডোরাকাটা বাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু রাজেন এবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল না। দরজার দুই পাল্লায় দুহাত রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে চটুল নায়কের মতো বললে, বারান্দার সাদা আলোটা জ্বালিয়ে রেখেছ কেন?

বরুণা চাদরটা সর্বাঙ্গে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, আলো জ্বালিয়ে রাখব না তো অন্ধকারে বসে থাকব?

—বাঃ রে! তোমাকে বলেছিলাম না মাসিমা চলে গেলে নীল বালবটা জ্বেলে দেবে? সেইজন্যেই তো খরচা করে একটা নতুন পয়েন্ট করে দিয়েছি। নইলে বারান্দায় কে আবার কবে নীল বাল্‌ব জ্বালায়?

কথাটা বরুণার বুকের মধ্যে কল্লোল জাগিয়ে তুলল। গা-টা রোমাঞ্চিত হল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ওই খরচের কথাটা না তুললেই পারত।

রাজেনের সঙ্গে এই মেলামেশার মধ্যে একটা জিনিস অন্তত বরুণা বুঝেছে—রাজেন টাকাটা বেশ চেনে। একদিন মাসি বললে, ছেলেটার সব ভালো কিন্তু বিবেচনাটা একটু কম। আমাদের সঙ্গে এত মেশে কিন্তু মাসের সাত তারিখের মধ্যে ভাড়া না পেলে যা তাগাদা শুরু করে—কাবুলেকেও হার মানিয়ে দেয়।

বরুণা অবশ্য রাজেনের হয়েই বলেছিল—তা ঠিক সময়ে ভাড়া না পেলে চাইবে না? আমাদের তো অমনি-অমনি থাকতে দেয়নি। এই ভাড়াটার ওপর হয়তো ও'র অন্য কোনো কাজ নির্ভর করে।

মাসি একটু ঝেঁঝে উঠেই বলেছিলেন, তাহলে বাড়িওলার মতো থাকলেই হয়। এত 'মাসিমা' 'মাসিমা' করা কেন?

কথাটা অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মাসি একটু নরম হয়ে বলেছিলেন, তা তুই ওকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারিস—মণি অর্ডারের ওপর আমাদেরও নির্ভর। ঠিক সময়ে টাকা না এলে কী কষ্টে সংসার চালাতে হয় তা তো কারো অজানা নয়। টাকা তো মেরে দিচ্ছি না।

বরুণা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, আমি কেন বলতে যাব?

প্রতিবাদ জানিয়েই মাসির সামনে থেকে উঠে চলে এসেছিল। মাসি আর এ নিয়ে কোনো কথা বলেনি।

গায়ে হাত লাগতেই বরুণা চমকে উঠল। দেখল রাজেন কখন পা টিপে টিপে এসে পেছন থেকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে। অন্যদিন সে জড়িয়ে ধরে তার কতকগুলো বাঁধা কর্তব্য মুখের ওপর দিয়েই সারে। কিন্তু আজ যেন তার অন্য মতলব। কোনো ভূমিকা নয়, ইতস্তত নয়—সোজাসুজি গায়ের চাদরটা সরাবার চেষ্টা করছে। আজ যেন তার একটি মাত্র লক্ষ্য—এই চাদরঢাকা দেহটা। এই চাদরের নীচে কী রহস্য আছে তা স্পর্শ করে দেখতে চায়।

বরুণাও অভ্যাসমতো দুই হাঁটুর মধ্যে বুকটা চেপে মুখ গুঁজে বসে রইল।

কিন্তু এবার আত্মরক্ষা করা কঠিন। অন্যবার মাটিতে বসে থাকে। সেখান থেকে দু হাতে তোলবার চেষ্টা করত রাজেন। ভারী দেহটা সহজে তুলতে পারত না। কিন্তু আজ বরুণা মাটিতে বসে নেই। বসে আছে উঁচু চৌকির ওপর পুরু তোষক-পাতা বিছানায়। ধবধবে চাদর। কোথাও এতটুকু কুঁচকে নেই। বালিশের ওয়াড়-গুলো এত পরিষ্কার—এত সুন্দরভাবে সাজানো যেন ফুলশয্যার আয়োজন।

রাজেনকে তাই এবার বেশি পরিশ্রম করতে হল না। দু হাতে করে তোলবার চেষ্টা না করে ওর দেহটা জড়িয়ে নিয়ে বিছানায় ঠেলে দিল।

বরুণা একবার শুধু চাপা আর্তনাদ করে উঠল—না, না, না। আপনার পায়ে পড়ি!

বলে চাদরটা প্রাণপণে জড়িয়ে নেবার শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। দুটো বাঘথাবা তার বুকের ওপর সজোরে এসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজেন যেন কেমন হত-বুদ্ধি হয়ে গেল!

—এ কী!

বরুণা এবার ব্যাকুলভাবে রাজেনের দু হাত টেনে নিয়ে দ্রুত নিশ্বাসে বললে, ভগবান মেরেছেন। প্ল্যান্ড হয়েছিল। ডাক্তার বললে, ক্যানসার। একটা দিক বাদ—

বলতে বলতে ফ‍ুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রাজেন তার ভিজে চোখের ওপর বারে বারে চুমু খেতে লাগল।

এতদিন বরুণা পুরুষদের সম্বন্ধে যে-ধারণা করে এসেছিল, তা হল না। অঙ্গহীন দেহ বলে রাজেন তো হতাশায় পালিয়ে গেল না। বরঞ্চ সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীরভাবে আদর করতে লাগল।

তখন?

তখন আর কি ফেরা যায়? এতখানি ভালোবাসা, এতখানি সহানুভূতি—তার চেয়েও বড়ো কথা এই এতকাল পর ভুল ধারণার অবসান—তাহলে তো এ-জীবন একেবারে ব্যর্থ না-ও হতে পারে, এ-যৌবন বাইরের কোনো বিশেষ একটা প্রত্যঙ্গের 'পরেই নির্ভর নয়, দেহের প্রতি লোমকূপে তার সাড়া, দেহের যেখানেই পুরুষের স্পর্শ, সেখানেই ইন্দ্রিয় সজাগ! তাহলে? তাহলে আর কি? বাধা? অসম্ভব—অসম্ভব—

বরুণা দু' চোখ বুজল।

মাসি একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বললে, তুমি তো বাচ্চা ছেলেমানুষটি নও। যেভাবে রাজেনের সঙ্গে মিশছ তার পরিণতি কী বুঝতেই পার। ওকি সত্যিই বিয়ে করবে?

লজ্জায় বরুণা চুপ করে রইল।

মাসি কড়াইয়ে দুনো জোরে খুন্তি নেড়ে বললে, চুপ করে থাকলে আমি কী বুঝব বলো।

বরুণা মাথা নীচু করে বললে, আমি ওসব জানি না।

—জানি না বললে তো চলবে না। তোমাকেই জানতে হবে।

বরুণার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, সে আমি পারব না।

বলেই উঠে পালিয়ে গিয়েছিল।

বিয়ে! কথাটা যেন তার কাছে একেবারেই নতুন। এ নিয়ে তো কোনোদিন কল্পনাও করেনি। রাজেন কি সত্যিই তাকে বিয়ে করবে? কে স্পষ্ট করে বলবে সে-কথা? কেমন করে সে-কথা জিজ্ঞেস করবে? এ কি মুখ ফুটে বলা যায়?

রাজেন প্রায়ই আসে। প্রতিবারই বরুণা ভাবে, আজ নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর জিজ্ঞেস করা হয় না। কে জানে হয়তো ভাববে—অবিশ্বাস! তাই বোধহয় শর্ত-শপথ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কাজ নেই ওকে রাগিয়ে। যদি আর না আসে?

কিন্তু আসা সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল। এতখানির জন্যে বরুণা প্রস্তুত ছিল না।

একদিন রাজেন কলকাতা যাচ্ছিল। একজন মহিলা চলন্ত গাড়িতে বাচ্চা কোলে করে উঠতে যাচ্ছিলেন—পা স্লিপ করে গেল। বাচ্চাটা কোলে নিয়েই দেহটা তাঁর প্রায় অর্ধেক নেমে গিয়েছিল প্ল্যাটফর্মের নীচে। এমনি সময়ে রাজেন তাঁকে ঝাপটে ধরে টেনে প্ল্যাটফর্মের ওপর ফেললে। কিন্তু নিজে আর টাল সামলাতে পারল না—ট্রেনের শেষ বগিখানার দুখানা মাত্র চাকা চলে গেল তার পায়ের ওপর দিয়ে।

হাসপাতালে পড়ে ছিল পুরো ছ'মাস। অনেকেই দেখা করতে গিয়েছিল। মাসির সঙ্গে বরুণাও গিয়েছিল কয়েকবার।

তারপর এই সুস্থ হয়ে ফিরেছে। এখন পা নেই। স্বাধীনভাবে যখন খুশি যেমন খুশি চলাফেরা করতে পারে না। এখন অবলম্বন চাই। খুব দামী কাঠেরই ক্রাচ তৈরি হয়েছে। তবু তা কাঠই।

তার এত বড়ো দুর্ঘটনা নিয়েও অনেকে অনেক কথা বলেছে। সবই তার কানে আসে। ব্রততী নাকি বলেছে—পরোপকার না ছাই! সুন্দরী মহিলা না হলে ইনস্পিরেশন আসত না।

অন্য সময় হলে রাজেন হা-হা করে হেসে উঠত। কিন্তু আজ আর হাসতে পারেনি। হঠাৎ প্রচণ্ড অভিমানে অত বড়ো পুরুষটার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

প্রায় এক বচ্ছর পর রাজেন ক্রাচের সাহায্যে রাস্তায় চলাফেরা শুরু করল। সে যে কী কষ্ট! যেন নতুন করে হাঁটা শিখছে। প্রথমে বাড়ির কাছাকাছি, তারপর পাড়ার মধ্যে, তারপর একদিন প্রচণ্ড সাহসে ভর করে একান্ত মনের জোরে বরুণাদের বাড়ি গিয়ে হাজির। যদিও বরুণার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মন ব্যাকুল, তবু লজ্জায় সংকোচে রাজেন প্রথমেই দেখা করতে পারল না। গেল লাইব্রেরী-ঘরে। এক বছরেরও পরে দরজা খোলা হল। দামী দামী বইগুলোর কতকগুলো ড্যাম্প লেগেছে, কতকগুলো উই-এ কেটেছে। সমস্ত ঘরে ঝুল আর মাকড়সার জাল। রাজেনের মনে হল এ-ঘরে বুঝি আর তার প্রবেশাধিকার নেই। এরা যেন কেউ আর তাকে চায় না।

সেখান থেকে এবার রাজেন ধীরে ধীরে অতি সংকোচে বরুণাদের ঘরে এল।

হঠাৎ খট্ খট্ শব্দে বরুণা চমকে উঠে তাকালো।

চোখাচোখি হতেই রাজেন একটু হাসল—ম্লান হাসি।

কিন্তু বরুণা হাসতেও পারল না। সে অনেকক্ষণ শুধু একদৃষ্টে রাজেনের কাটা পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

সে সময়ে তার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না।

—ঘেন্না করছে?

বরুণা তাড়াতাড়ি বললে, না, ঘেন্না করবে কেন?

কিন্তু 'না'টা তেমন যেন জোরের সঙ্গে বলতে পারল না।

—তবে? ভয়?

—আপনাকে আবার ভয় কিসের? আপনি তো চেনা মানুষ।

—মানুষটা চেনা ঠিকই। কিন্তু এই বিকৃতিটা?

বরুণা আর উত্তর না দিয়ে বললে, বসুন।

বলেই ভুল সংশোধন করলে, দাঁড়ান। চেয়ারটা এনে দিই।

এই বলে বরুণা ঘরের ভেতর থেকে একটা চেয়ার এনে দিল।

রাজেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘরের ভেতরে তো আজ ডাকল না!

—আপনি বসুন, মাসিমাকে ডেকে আনছি।

—উনি কোথায়?

—সমীরদাদের বাড়ি গেছেন একটু।

—সে আবার কোথায়?

—ও জানেন না বুঝি? ওই যে নতুন বাড়িটা তৈরি হয়েছে। ওখানেই ভাড়াটে এসেছে। সে তো আজ চার-পাঁচ মাস হয়ে গেল।

রাজেন খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখল সামনেই যে জমিটায় এই সেদিনও বকুলগাছটা ছিল—সেটা আর নেই। সেখানে সুন্দর একখানি বাড়ি উঠেছে।

—আপনি বসুন, মাসিমাকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বলেই বরুণা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু আঁচড়ে, মুখে তাড়াতাড়ি একটু স্নো মেখে বেরিয়ে গেল।

রাজেনের দৃষ্টি অনেকক্ষণ তাকে অনুসরণ করল। বরুণা আর আগের মতো নেই। এখন প্রসাধন করতে শিখেছে, চলায়-ফেরায় যেন প্রাণের প্রেরণা।

একটু পরেই মাসিমা এলেন। কিন্তু—একাই।

প্রতিমুহূর্তে রাজেন বরুণাকে আশা করতে লাগল। এখনই নিশ্চয় আসবে। ওই যেন পায়ের শব্দ—ওই যে চাঁপা রঙের শাড়ির মতো কী দেখা গেল না?

মাসিমা নিজে হাতেই চা করে দিলেন। ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে চা খাওয়াও হয়ে গেল—তারপর উঠি-উঠি করে শেষ পর্যন্ত উঠতেও হল—কিন্তু বরুণা এল না।

এই সেই বরুণা। এর কাছেই আজ রাজেনকে চিঠি পাঠাতে হচ্ছে। ঠিক করল চিঠি নিজে হাতেই দেবে। তবু মুখ আঁটবার আগে চিঠিটা বের করে আর একবার পড়ল।—

সেদিন তোমার আচরণেই সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বাস করো, বড়ো কিছু দাবী করে আমি যাই নি—সে অধিকারও হয়তো আজ আর আমার নেই। আমি গিয়েছিলাম শুধু তোমাদের সুখশান্তির মধ্যে একটু আশ্রয় খুঁজতে। ওইটুকুই তো আজ আমার রিলিফ। ওটুকু থেকেও কি আমায় বঞ্চিত করবে?...

রাস্তায় শব্দ হচ্ছে খট্ খট্ খট্। মানুষের পায়ের শব্দ নয়। দুখানা কাঠের ওপর ভর করে মানুষের দেহ একখানা চলেছে। একটা কুকুর এই অদ্ভুত আবির্ভাবটাকে লক্ষ্য করে সোচ্চার হয়ে উঠল।

কিন্তু রাজেনের সেদিকে খেয়াল নেই। সে শুধু হিসেব করছে বরুণাদের বাড়ি আরো কত দূর।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভুট্টো-মুজিব সংবাদ (২)

ছায়াক্রান্ত মন নিয়ে ২১ মার্চ ঢাকায় এলেন মিঃ ভুট্টো। সেই কালের কথা ভুট্টো লিখছেন—'আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমাদের এই ভূমি, আমাদের দেশের মানুষ যাঁরা বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টিতে অংশ নিয়েছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পৃথক হয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন।'

তিনি আরো ভাবতে পারেননি যে তাঁর দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাকিস্তান থেকে নিজেদের ছিন্ন করে নেবেন।

তিনি তাই লিখেছেন—'গত কয়েক বছরে এতখানি অসন্তোষ জমে উঠেছে আমাদের ভাই-বোনদের অন্তরে যে তাঁরা বিদ্রোহ করতে পারেন এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।'

এই সব বিলাপোক্তির পরও মিঃ ভুট্টো যেভাবে কাজ-কর্ম করেছেন তার দ্বারা একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে তিনি প্রকৃত অবস্থাটা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

এই পুস্তিকায় মুজিব-ভুট্টো আলোচনা অংশটুকু বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং কৌতূহলপ্রদ। মিঃ ভুট্টো যেমনটি লিখছেন তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেলঃ

"২২শে মার্চ তারিখে আমি প্রেসিডেন্ট হাউসে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে গিয়ে হাজির হলাম। মুজিবর রহমান এলেন ঠিক এগারোটার সময়। আমরা পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে কয়েকটি মামুলি কথা-বার্তা বিনিময় করলাম...

"মুজিবর রহমান তারপর প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন যে আওয়ামি লীগের প্রস্তাবে তিনি তাঁর চূড়ান্ত অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন কিনা। প্রেসিডেন্ট স্মরণ করিয়ে দিলেন এ বিষয়ে আমার সম্মতি প্রয়োজন আর সেই কারণেই আলোচনাসভায় আমার এই উপস্থিতি।

"এই কথায় মুজিবর রহমান মন্তব্য করলেন প্রস্তাবগুলি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে এখন প্রেসিডেন্টের কাজ আমাকে (মিঃ ভুট্টো) বোঝানো। তারপর আরও বললেন, মিঃ ভুট্টো যখন নীতির দিক থেকে প্রস্তাবগুলি মেনে নেবেন তখন আনুষ্ঠানিক আলোচনা চলতে পারে তবে তার আগে পর্যন্ত সমস্ত আলোচনা মামুলি ধরনের—

"কফি পান করার পরই আওয়ামি লীগ নেতা বললেন, আমার তাড়া আছে কারণ ভোরের দিকে তাঁর একজন সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এই কথা বলেই উনি উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রেসিডেন্টের কাছে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য গাড়ি পর্যন্ত গেলাম।

"যাত্রাপথে আমরা যেই মিলিটারি সেক্রেটারির কামরায় পৌঁছিলাম, সেখানে বসেছিলেন জেনারেল মহম্মদ ওসমান, জেনারেল ইসাককে (প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্টের নৌবাহিনীর এ-ডি-কং) শেখ মুজিবর রহমান তাঁদের বললেন, আপনারা একটু বাইরে যান আমি এঁর সঙ্গে একটু কথা বলব।

"আমি তাঁর এই ভঙ্গীর পরিবর্তনে বিস্মিত হলাম। উনি আমার হাতটা ধরে পাশের আসনে বসালেন। উনি বললেন, অবস্থা অতিশয় গুরুতর এবং তার সমাধানে তিনি আমার সাহায্য চান।

"এই সময় ঘরে কথা বলা নিরাপদ হবে না বিবেচনা করে আমরা দুজনে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের কামরার পিছনে বসলাম।

"মিলিটারি সেক্রেটারির কামরায় যেসব কথা হয়েছিল শেখ মুজিবর রহমান সেইসব কথা পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বললেন অবস্থা এখন অনেক দূর গড়িয়েছে এখন আর ফেরার পথ নেই।

"তাঁর মতে আমার পক্ষে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হওয়াটাই শ্রেয়। তিনি জোর দিয়ে বললেন এছাড়া আর বিকল্প পথ নেই। তিনি স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন যে আমাদের দুজনকে একমত হতে হবে।

"উনি আমাকে বললেন, আমি পশ্চিম পাকিস্তানে যা ইচ্ছা করতে পারি। আমাকে তিনি সমর্থন করবেন আর তার বিনিময়ে আমি পূর্ব-পাকিস্তানকে ছেড়ে দেব এবং আওয়ামি লীগের প্রস্তাব রূপায়ণে তাঁকে সাহায্য করব। তাঁর প্রস্তাব আমি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী হব তিনি পূর্ব পাকিস্তান দেখবেন। তাঁর মতে সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার এই একমাত্র পথ। আমাকে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করে বললেন কখনও ওদের ওপর বিশ্বাস রাখবেন না, ওরা যদি তাঁকে আগে ধ্বংস করে পরে তাঁকেও ধ্বংস করবে।

"আমি জবাবে বললাম, আমি বরং মিলিটারির হাতে ধ্বংস হব, ইতিহাসের হাতে ধ্বংস হতে চাই না।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলাদেশে যে স্বল্প সংখ্যক গবেষক নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ, তাঁদেরই অন্যতম প্রধান খ্যাত-নামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক যোগেশ-চন্দ্র বাগল মারা যান গত ৭ জানুয়ারি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

কৃতী ছাত্র শ্রীবাগল ১৯২৪ সালে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর এম-এতে ভর্তি হয়েছিলেন যথারীতিই। কিন্তু পারিবারিক অসুবিধের জন্যই শেষপর্যন্ত তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ। এবং পরে সাংবাদিক হিসেবে শুরু করেন জীবন। যোগ দিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিয়্যু'-তে। সম্পাদকীয় বিভাগে হলেন যুক্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ ব্যক্তিকে এখানেই পান সহ-কর্মীরূপে। একসময় ছাড়লেন এই চাকরি। যোগ দিলেন 'দেশ' পত্রিকায়। সহকারী সম্পাদক হিসেবেই এসেছিলেন এই কাগজে। কিন্তু নানান কারণেই তিনি টিঁকতে পারলেন না এখানে। ফিরে এলেন 'প্রবাসী'তেই। ১৯৪০ থেকে '৬১ পর্যন্ত একটানা বিশ বছর কাজ করলেন এখানে। তারপর চাকরি থেকে নিলেন অবসর। দৃষ্টিক্ষীণতার জন্যই অবসর।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর যোগ। কখনো গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন, কখনো বা সহ-সভাপতির ভূমিকা। বলা বাহুল্য, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। এছাড়া তিনি ইণ্ডিয়ান রেকর্ডস কমিশন, রিজিওন্যাল রেকর্ডস কমিশন—পশ্চিমবঙ্গ, ভারতকোষ সম্পাদনা সমিতি প্রভৃতির সঙ্গে ছিলেন সদস্য হিসেবে যুক্ত।

এপর্যন্ত তাঁর মোট একুশখানি বাংলা, চারখানি ইংরেজি বই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা সাত। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ইংরেজি রচনা বিশেষ উল্লেখ্য।

সাহিত্যসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ নানান সময়ে পেয়েছেন সম্মাননা। ১৯৬৬ সালে অমৃতবাজার-যুগান্তর গোষ্ঠী প্রদত্ত শিশিরকুমার পুরস্কার ছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার (১৯৫৬), সরোজিনী স্বর্ণ-পদক (১৯৬২) তিনি লাভ করেন। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর বক্তা-পদ ১৯৫৮-য় এবং শরৎচন্দ্র স্মারক-বক্তৃতা দেন ১৯৬৮-তে।

[illegible] হিন্দি লেখকের মৃত্যু

হিন্দি সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখক পদুমলাল পান্নালাল বক্সি সম্প্রতি রায়পুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশুক্লা পদুমলাল পান্নালালের পরলোকগমনে শোকবার্তায় বলেছেন, 'তাঁর মৃত্যুতে হিন্দি সাহিত্যের জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল।'

টেগোর ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন

সম্প্রতি কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এবং মিঃ লিওনার্ড এমহার্স্টকে প্রদান করা হয় সম্মানসূচক রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য উপাধি। মিঃ এমহার্স্ট অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর পক্ষে লেডি রাণু মুখার্জি গ্রহণ করেন ঐ উপাধি। এছাড়া ইনস্টিটিউটের বারোজন ছাত্রকে দেওয়া হয় রবীন্দ্র-জ্ঞানতীর্থ উপাধি।

শ্রীবিশী তাঁর ভাষণে বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীত মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছে নৈতিক সাহস আর অনুপ্রেরণা।

জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ সান্নিধ্যের কথা তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে।

সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ভারতীভবন

মধ্যবিত্ত আর শ্রমিক-অধ্যুষিত এলাকা হল আসানসোলের বার্ণপুর। কিন্তু তাই বলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই এ-অঞ্চলের মানুষ। আর তার প্রমাণ মিলবে ভারতী-ভবনের যে-কোন বছরের কার্যকলাপ দেখলেই। এ-বছরও তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন সাহিত্য প্রতিযোগিতার। গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ রচনা ঘিরেই অনুষ্ঠিত হবে এই বার্ষিক প্রতিযোগিতাটি। বিশদ বিবরণের জন্য ভারতীভবন, বার্ণপুর, বর্ধমান-এর গ্রন্থাগার সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

কবি সম্মেলন

আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এক কবি সম্মেলন। উপলক্ষ কৃত্তিবাস স্মৃতি উৎসব উদযাপন। ব্যবস্থা করেছেন কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদ। এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য নতুন কবিদের উদ্দেশে একটি আবেদন প্রচার করেছেন সংস্থার সম্পাদক। তাতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কবিদের তাঁর সঙ্গে কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদ, ফুলিয়া-বয়ড়া, নদীয়া-র যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন।

"উনি আমাকে প্রস্তাবে রাজী হওয়ার জন্য জোর দিলেন, সুরুতেই দুটি কমিটি গঠনের জন্য বললেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একক সংস্থা হিসাবে ন্যাশনাল এসেম্বলী ডাকা অসম্ভব, অনির্দিষ্টকালের জন্য তা বন্ধ রাখা প্রয়োজন।

"উনি বললেন, আমাদের দুজনের আবার গোপনে একটা বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমি যেন মিঃ গোলাম মুস্তাফা খেরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। পরদিন তিনি একজনকে পাঠাবেন মিঃ খেরের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য।

"মুজিবর রহমান এসেম্বলি অধিবেশনের ব্যবস্থা এমন কি ক্ষণস্থায়ী অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। যে ব্যবস্থা তিনি এখন গ্রহণ করতে মনস্থ তা সমগ্র দেশের জন্য—ন্যাশনাল এসেম্বলী অধিবেশন না ডেকেই তিনি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করাতে চান। এইসব কথা বলে তিনি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম এবং পরস্পর বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলাম। আওয়ামি লীগ নেতার সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎকার—'

এরপর একেবারে জেলে তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে দেখলেন। আজ মুজিবর বন্দী এবং তিনি প্রেসিডেন্ট। সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই পট আজ সকলের জানা।

মিঃ ভুট্টো অতঃপর লিখেছেন—'শেখ মুজিবর রহমানকে বিদায় দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বোঝা গেল তিনি তাঁর কামরা থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। প্রেসিডেন্ট সহাস্যে বললেন—

"the honeymoon between the two of you".

তোমাদের দুজনের হানিমুনের ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলাম। আমি বললাম এ জাতীয় সংলাপ রাজনীতির অঙ্গ।'

এরপর মিঃ ভুট্টো প্রেসিডেন্টসাহেবকে সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত উভয়ের আলাপ-আলোচনার অংশগুলি জানালেন এবং যেসব কথা সংগোপন রাখার তা গোপন রাখলেন। তিনি লিখছেন—

"I also conveyed to the President my considered opinion of the Awami League leader's proposal ...... I told President Yahya Khan that I would not be a party to the proposed scheme as it inevitably meant two Pakistans".

মিঃ এ জি নুরানী মিঃ ভুট্টোর এইসব আলোচনার এক সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন—বোঝা যাচ্ছে মিঃ ভুট্টো প্রেসিডেন্টকে বিচ্ছিন্নতার ভয় দেখানোর জন্য শেখসাহেবের সঙ্গে তার আলাপাচারের অংশ বিশেষ ব্যবহার করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজের কদর বাড়িয়েছেন। দেখিয়েছেন তিনি একজন মহান দেশপ্রেমিক। মিঃ ভুট্টোর দুটি কমিটি হিসাবে এসেম্বলীর অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারটি শেখসাহেবের বিশ্বস্ত সহকর্মী মিঃ তাজউদ্দীনের উক্তিতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা দুটি বিভিন্ন প্রান্তের জন্য দুটি পৃথক অধিবেশন ডাকতে বলবেন কেন? বরং যিনি সংখ্যালঘু দলে এ প্রস্তাব তাঁর কাছ থেকে আসাই সম্ভব।

যাই হোক, মিঃ ভুট্টোর বিবরণে দেখা যায় তাঁর সহকর্মী মিঃ খের ২৪শে মার্চ তারিখে মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন। মিঃ খের বললেন, এই সাক্ষাৎকারের পর যে নতুন কিছু বলার নেই। আর তার কিছুক্ষণ পরেই সুরু হল সেই কুখ্যাত ২৫শে মার্চের কলঙ্কময় অন্ধকার রাত।

২৬শে মার্চ মনোবাসনা পূর্ণ করে মিঃ ভুট্টো করাচী ফিরে গেলেন।

শেখ মুজিবর রহমান বন্দী হলেন। মিঃ ভুট্টো বললেন—'থ্যাংক গড—আই হ্যাভ সেভড পাকিস্তান।' (আমি পাকিস্তানকে রক্ষা করলাম)। অন্তেন্দ্রিয়ের আড়ালে হাসলেন।

মিঃ ভুট্টো নাকি সর্বদা [illegible] বলেছিলেন—

"He was a leader of the people and merited respect".

এরপর তিনি মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। মুজিবর সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—

"Sheikh Mujibur Rahaman is an impressive personality and he impressed easily".

তথাপি তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে 'ওরিজিন্যাল থিঙকার' বলে মনে করেননি।

সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় মিঃ ভুট্টো গোড়া থেকেই মুজিববিরোধী। ১৯৭০ ডিসেম্বরের কিছু পূর্বে তিনি জেঃ জেনারেল পীরজাদাকে (প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসর) কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন শেখ মুজিবর বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। এই ধারণা তাঁর বদ্ধমূল থাকায় তিনি নিয়মিতভাবে শেখসাহেবের বিরোধিতা করেছেন প্রকাশ্যে এবং গোপনে। কিন্তু এই রাজনৈতিক খেলায় তাঁর পরাজয় হয়েছে সেই মানুষের হাতে পাকিস্তানকে এক এবং অখণ্ড রাখার চাবিকাঠি যাঁর হাতে ছিল তাঁর কাছে। সেই মহান নেতার নাম শেখ মুজিবর রহমান আজ যিনি এক নবজাগ্রত জাতির জনক।

—[illegible]

---

(1) THE GREAT TRAGEDY — (A Pamphlet) By Z. A Bhutto;
(2) BHUTTO EXPOSES HIMSELF By A. G Noorani,

নতুন বই

ভাগবতী কথা—লেখিকা বিভাবতী দেবী কাব্যভারতী প্রকাশকঃ শ্রীকানাইলাল চ্যাটার্জি পি-৪৯৮, বেলতলা রোড কলিকাতা-২৯। পৃষ্ঠা ৩৬৪। মূল্য ৮.৫০।

বর্তমান যেখানে সমস্যায় জর্জরিত এবং হতাশায় ব্যাপ্ত, সেখানে লঘু উপন্যাস কিম্বা আধুনিকতার নামে দুর্বোধ্য কবিতার প্রাচুর্য, সে সময়ে আরেক আকাশে সূর্যোদয়, বিনম্র ভক্তি আর শ্রদ্ধাপ্লুত কাব্যগাথায় অনেকদিনের শাশ্বতবাণী আবার উচ্চারিত। ভাবতে ভালো লাগে লেখিকা কত সহজ করে, গ্রামীণ মা-বোন বধূদের কথা মনে রেখে তাঁর মানস সাধনার রূপ দিয়েছেন 'ভাগবতী কথায়'। শ্রীমদ্ভাগবত চিরদিনের চিরকালের ভক্তজনকে দিয়েছে অমৃতের আস্বাদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় তাঁদের হৃদয়মন আপ্লুত হয়েছে। 'ভাগবতী' কথা' সেই চির আদরণীয় শ্রীমদ্ভাগবতেরই সাবলীল পদ্যানুবাদ। পড়তে পড়তে মুগ্ধ হতে ইচ্ছে করে, শেষ না করে উঠতে পারা যায় না। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে লেখনী ধরলেও ছন্দে ভাববৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনায় লেখিকার দক্ষতা এবং রূপাকাশলী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

সমগ্র বইটিতে মনোরম ছন্দে একাধারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলামাধুরী বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতির রূপরসগন্ধকে ব্যাখ্যা করেছেন।

নির্দ্বিধায় একথা বলা যেতে পারে, ঘরে ঘরে এই 'ভাগবতী কথা' পরমভক্তির সহিত আদৃত হবে। যে কোন ভক্তিমতী মহিলার কাছে বা ভক্তজনের কাছে 'ভাগবতী কথা' সম্মান সমাদর লাভ করবে। এর ব্যাপক প্রচার হলে দেশ ও দশের উপকার হবে, এই বিশ্বাস। গ্রন্থের তুলনায় বইটির মূল্য অনেক কম, প্রচ্ছদ অনিন্দ্যসুন্দর, বাঁধাই মনোরম।

শেষ বিন্দু (উপন্যাস)—মানস গুহ। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

ধু-ধু প্রান্তরে কেউ কোথাও নেই—শুধু ওরা দুজনা। চেহারায় এতটুকু মিল নেই, বয়সেও বিস্তর ফারাক। ভিন্ন স্বভাবে—ওরা দুজনেই কম কথার মানুষ, অকারণেই গম্ভীর, রঙ-তামাশার ধার দিয়েও যায় না—তবু ওরা দুজনে একে অন্যকে গভীরভাবে ভালবাসে, একে অন্যের সান্নিধ্য মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করে—দুজনেই নেশাভাঙে বুঁদ হয়ে থাকে।—টাঁরা আর ছোটোবিলাস—দুই গঙ্গাপুত্র শ্মশানভূমি-মুলুক খোলায় দুই জবরদস্ত রাজা। এদের নিবাত নিষ্কম্প জীবনে হঠাৎ একদিন ঝড়ের ঘূর্ণি নিয়ে এল মাদারিওয়ালা নন্দলাল ও তার যুবতী বউ কুন্তী—বিচিত্র চরিত্রের এক মেয়ে। এই কুন্তীই টাঁরা আর ছোটোবিলাসকে অন্য অনাস্বাদিত জীবনের সন্ধান এনে দিলে—কুন্তীকে ঘিরে শুরু হল ওদের দুজনার মধ্যে স্থূল জান্তব হিংস্র লড়াই।—এদের দুজনার সংগ্রাম, আর শান্তি নিয়েই 'শেষ বিন্দু'র কাহিনী জমে উঠেছে। তরুণ লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে নিচুতলার জীবনের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। শ্মশানভূমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত চরিত্রগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন কথাকার মানস গুহ। কাহিনী বিস্তারে, বুননে ও চরিত্র বিশ্লেষণে পরিণত চিন্তার ছাপ আছে, কাব্যমণ্ডিত ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে পরিমিতি-বোধ কাহিনীকে বেগবানও করেছে। নতুন ধরনের উপন্যাস সাহিত্য পাঠকদের খুশী করবে।

ক্ষকদয়াল বসুর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ

অনেক দিন ধরেই শয্যাশায়ী ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষাবিদ কৃষ্ণদয়াল বসু। বৎসরাধিককালই রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে করছিলেন লড়াই। অবশেষে নির্বাপিত হল তাঁর জীবনদীপ। গত ৮ জানুয়ারির শেষ রাতেই মারা গেলেন কবি।

জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালের ২৭ জানুয়ারি ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত নিকলা গ্রামে মাতুলালয়ে। কর্মজীবনে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতার বৃত্তি। সেকালের প্রবাসী, বিচিত্রা, উপাসনা প্রভৃতি কাগজে প্রায় নিয়মিতই বেরুতো তাঁর রচনা। এবং তাঁর কবিত্বশক্তি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। লাভ করেন কবিগুরুর প্রশংসা। কৃষ্ণদয়াল বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'মোহনা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২, আর তার চার বছর আগে অনুবাদ করেছিলেন ইবসেনের একটি নাটক। মেঘদূতও তিনি অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করেন। শিশুসাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট অবদান রুনুঝুনু, ছড়া ও ছন্দ কথা নিয়ে খেলা, এন্ডারসনের গল্প প্রভৃতি।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

রাজজ্যোতিষী (জানুয়ারী '৭২)—সম্পাদক বীরেশ্বর চক্রবর্তী। জ্যোতিষ বার্তালয় ১/২এ নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৪। দেড় টাকা।

যতদিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল। কৌতূহল আছে এই সম্পর্কে আলোচনার, শিক্ষণ ও পঠন-পাঠনের। সাময়িক সাহিত্যে নবাগত রাজজ্যোতিষী এই দিক দিয়ে একটা অভাব দূর করবে। আলোচ্য সংখ্যায় আছেঃ জ্যোতির্বিদের ডায়েরী থেকে বিবাহ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, শুভদিনের নির্ঘণ্ট, প্রশ্নোত্তর বিভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ, জ্যোতিষশাস্ত্র শিখুন, মাসিক রাশিফল, রাশিগত ফল, ভারত ভাগ্য-বিধাত্রী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে আলোচনা। বলা বাহুল্য জ্যোতিষশাস্ত্র অনুরাগী ও বিরাগীদের নানান প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের সদুত্তর এর মধ্যে পাবেন।

বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব ম্যাগাজিন—সম্পাদনাঃ আশিস সেনগুপ্ত। বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব, বাটানগর, ২৪ পরগণা।

শুধু খেলাধুলা নয়—সৃজনশীল সাহিত্যের দিকে সদস্যদের আন্তরিক প্রীতি প্রশংসনীয়ভাবে রূপলাভ করেছে এই সাময়িকীর মধ্যে। সংস্থার বিবিধ কর্মধারার—সংগীত প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সম্পর্কীয় প্রতিযোগিতা, নাটকাভিনয়, পাঠকক্ষ প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় প্রমাণ এর সক্রিয়তা এবং সাফল্য।

বিচিন্তা (দ্বিতীয় '৭৮)—সম্পাদনাঃ বাদলচাঁদ রায়। ২৭৫ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। এক টাকা।

অন্য পাঁচটা পাঁচমিশেলী সাহিত্য পত্রিকার মতো নয়, প্রথম দর্শনেই মনে দাগ কাটে। দৃঢ় প্রত্যয় এর সাময়িকীর প্রতিটি রচনায়। লিখেছেন ভবানী সেন, বিষ্ণু দে, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শঙ্খ দাশগুপ্ত প্রভৃতি। বুদ্ধকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ ভট্টাচার্য। বিষ্ণু দের 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার গবাক্ষ' চিন্মোহন সেহানবীশের 'চার প্রবীণ ...' ও ... কুমার সেনগুপ্তের 'অশোককানন—একটি সমীক্ষা' সবচেয়ে উল্লেখ্য রচনা। বলা বাহুল্য এ সাময়িকীটি সিরিয়স পাঠকদের খুশি করবে।

জোনাকি-মন (পৌষ '৭৮) সম্পাদকঃ সুন্দরগোপাল সাহিত্যরত্ন। পড়াশোনা, চরগৌরীতলা, বোলপুর, বীরভূম। পঞ্চাশ পয়সা।

ভারের চেয়ে ধার বেশি। ক্ষীণাকার হলেও লেখাগুলি সুলিখিত। শান্তিনিকেতন এবং বোলপুরের, অনেক অজানা তথ্য এর মধ্যে পাওয়া যাবে। লিখেছেনঃ ডঃ ..., ..., অভয়পদ রায়, সৌমেন অধিকারী প্রমুখ।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

।। ২১ ।।

ক্রমে ক্রমে সবই শোনা গেল। পূর্ণবাবু কিছুদিন আসেননি বটে, তিনি পাকা লোক, প্রাথমিক শোকের প্রবল আঘাত সামলাবার সময় দিতে হয় এটা তিনি জানেন—তবু খবরগুলো জানার অসুবিধা হল না। গোপালজীর বন্ধু পরিচিত লোক চারিধারে, সেই খবর যোগাড় করল।

কমলাক্ষের অসুখের খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন পূর্ণবাবু। তারপর থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর ওর বিছানার পাশ থেকে নড়েন নি।

নিজেই ওষুধ দিয়েছেন, বুকে সেঁক দেবার ব্যবস্থা করেছেন, নিজে হাতে মসনের পুলটিশ বসিয়েছেন, মিকসচার তৈরী করিয়ে এনে বসে থেকে খাইয়েছেন ঘড়ি ধরে, জ্বর দেখেছেন, বাতাস করেছেন। ওঁর মতো বয়স্ক লোক কোন ছাত্রের জন্যে এরকম অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সেবা করে—তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কমলাক্ষ বাঁচেনি—সে তার ভাগ্য।

তারপরও অনেক করেছেন। প্রায়-বালিকা স্ত্রী এবং মায়ের কথা চিন্তা করেই আরও দ্রুত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়েছেন: যাদের বুকে শেলের মতো বেজেছে, মর্মান্তিক আঘাত লেগেছে যাদের—যাদের জীবন মরুভূমি হয়ে গেল এই একটি লোকের মৃত্যুতে—তাদের চোখের সামনে থেকে মৃতদেহটা যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া যায় ততই মঙ্গল, এই ভেবেই তিনি প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন, বেলা নটায় যে মারা গেছে তার শব সাড়ে দশটার মধ্যে রওনা করিয়ে দিয়েছেন এবং সাড়ে এগারোটায় সেটা চিতায় তোলার ব্যবস্থা করেছেন। নিজের পাড়া থেকে ব্রাহ্মণের ছেলে আনিয়েছিলেন তিনি, তাদের প্রচুর টাকা দিয়েছেন—শ্মশানে খাওয়ার জন্যে এবং গাড়ি ভাড়া করে ফেরার জন্যে।

তিনি যে মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিয়েছেন তা তুলনাহীন। কিন্তু কমলাক্ষর পরিবারের লোকেরা এতে খুশী নয়। ওর ছোটভাই ছেলেমানুষ—এরা স্ত্রীলোক, তাও একজন সদ্যবিধবা নাবালিকা, তার মাত্র পনেরো ষোল বছর বয়স। তারা এই আকস্মিক আঘাতে শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কিছু ভাবার কি সিদ্ধান্ত নেবার—অথবা কোন কাজে বাধা দেবার মতো অবস্থা তাদের ছিল না। বিশেষ পূর্ণবাবুর মতো লোক যেখানে অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে সব করাচ্ছেন, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে, সেখানে কে কি বলবে? পাড়ার দুচারজন খবর পেয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরও কারও কিছু বলার কথা মনে থাকেনি। বরং তাঁরা এতখানি আন্তরিকতায় অভিভূত ও কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন।

আপত্তি ও অসন্তোষ উঠেছে পরে।

এই শহরেরই উপকণ্ঠে ওদের অনেক আত্মীয় আছে। সাঁতরাগাছি বরানগরে কাকা জ্যাঠারা থাকেন। খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই একপাল। রাবণের বংশ ওদের, তার মধ্যে অন্তত পাঁচ ছ'জন কমলাক্ষর থেকে বয়সে বড়, ভাল কাজ করে সবাই, রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী লোক তারা। শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুর গোঁসাই-বাবুদের কুটুম। তিনি অসুখের খবর পেয়েছিলেন বটে—পূর্ণবাবুই নাকি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে যে এত গুরুতর অসুখ তা বলেননি। জ্বর, বুকে একটু 'প্যাচ' মতো হয়েছে, এইটুকুই বলেছিলেন। ওর শ্বশুর অবিনাশবাবু নিজে সেদিন অসুস্থ ছিলেন, তাই তখনই আসতে পারেন নি। পরেরদিন আপিসে এসেই ছুটি করে বেরিয়েছেন—কিন্তু ততক্ষণে মৃতদেহটা সুদ্ধ পাচার হয়ে গেছে। ছুটে শ্মশানে গিয়ে দেখেছেন চিতা জ্বলে গেছে ততক্ষণে। বারো বছরের ছোটভাই, সে কিছুই বোঝে নি, তাকে যা করতে বলেছেন এঁরা, সে তাই করেছে। সবচেয়ে বড় কথা কমলাক্ষর বোনের শ্বশুরবাড়ি গোয়াড়িতে একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখা হয় নি।

এঁরা সকলেই নানা কথা বলতে লাগলেন। নানারকম কানাঘুষো উঠল। শেষ পর্যন্ত কানাঘুষোতেও সীমাবদ্ধ রইল না সন্দেহটা। অভিযোগ বেশ স্পষ্ট আকার ধারণ করল। হেমন্তর কথাও উঠল। পাঁক ঘুলনোর শেষ রইল না, কদর্যতা তার নগ্নতম রূপ নিয়ে দেখা দিল। দুর্নাম কেমন করে কোথা দিয়ে ঠিক পৌঁছে যায়—যেন বাতাসে ভর দিয়ে হাঁটে। দেখে অবাক হয়ে গেল সে। ...পূর্ণবাবুর বাক্ষিতার সঙ্গে কমলাক্ষর প্রেম হয়েছিল, তার ফলে অবৈধ সম্পর্ক, সেই আক্রোশেই তিনি বিষ দিয়ে মেরেছেন কমলাক্ষকে।

কে জানে আগেও কোথাও কিছু খাইয়েছেন কিনা, তার ফলেই হয়ত এই অসুখ।

সরল বিনত ছেলে কমলাক্ষ। তার পক্ষে মাস্টারমশাইকে সন্দেহ করা কল্পনাতীত। অসুখ হওয়ার পরে চিকিৎসক সেজে এসে ওষুধের নাম করে বিষ দেওয়া তো আরও সোজা। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ শেষ করে তবে বিছানার পাশ ছেড়েছেন। শুধু তাই নয়—সবচেয়ে যেটা বড় প্রমাণ হতে পারত ওঁর বিরুদ্ধে, সর্বাগ্রে সেইটেই নষ্ট করিয়েছেন—রোগীর বিষজর্জর মৃতদেহটা।

একটা কথা আর একটাকে টেনে আনে, যেমন এক পাপ ঢাকতে শতেক পাপ করে মানুষ।

এখন শোনা যাচ্ছে কমলাক্ষর অসুখের খবর পূর্ণবাবুকে কেউ দেয়নি। সেক্ষেত্রে উনি খবর পেলেন কেমন করে?

উনি ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ হতে পারেন—এসব সাধারণ রোগের চিকিৎসা প্রণালী এখনও পর্যন্ত ও'র মনে থাকার কথা নয়। কোন বড় ডাক্তার বা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক—যাঁরা বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত—এ কাজ করেন না। এটাকে তাঁরা ধৃষ্টতা বা অনধিকার চর্চা বলে মনে করেন।

বিশেষ যখন ডাক্তারের অভাব নেই, কমলাক্ষর অসুখ হয়েছে শুনলে কলেজের বহু ডাক্তারই ছুটে আসতেন, সবাই ওকে স্নেহ করেন। কাউকেই একটি কথা বলেননি পূর্ণবাবু। ওষুধ কি দিয়েছেন কেউ জানে না। মিকস্‌চার ও পুরিয়া নিজে হাতে তৈরী করে এনেছেন মেডিকেল কলেজের ডিসপেন্সারী থেকে। অতবড় প্রবীণ ডাক্তার ও অধ্যাপক, কি ওষুধ নিচ্ছেন কার জন্যে, তা নিয়ে সেখানে কেউ মাথা ঘামায় নি।

সবচেয়ে অমার্জনীয়—এই তাড়াহুড়ো ক'রে দাহ করানোটা। যেখানে আশেপাশেই লাটের ফিরিঙ্গি আত্মীয়—সেখানে কেউ একটা খবর পেল না, কেউ জানল না, ভিন্ন পাড়ার অনাত্মীয় লোক এসে নিয়ে গেল—অনাথ ভিখিরীর মতো শ্মশানে গেল সর্ব-জনপ্রিয় আত্মীয়দের বুকের মণি ছেলেটা—শ্বশুর-শালা-কাকাদের পর্যন্ত জানানো হল না, এটা রীতিমতো সন্দেহজনক বৈকি!

অভিযোগটা ক্রমেই যখন বেশ স্পষ্ট ও সরব হয়ে উঠল, তখন কেউ সেটা পুলিশের গোচর করে থাকবেন। কারণ থানা থেকে লোক এসেছিল পূর্ণবাবুর বাড়ি—একদিন নয় দুদিন, এটা সবাই জানে। পুলিশ মেডিক্যাল কলেজেও গিয়েছিল, আউটডোর ডিসপেনসারীর যে ভারপ্রাপ্ত কম্পাউন্ডার তাকেও নাকি থানায় যেতে হয়েছিল, একরাত হাজতেও ছিল সে।

জেল না হোক চাকরিটা যেত, কিন্তু তাতে পূর্ণবাবুও রেহাই পান না, সেই জন্যেই বেঁচে গেল লোকটা। পূর্ণবাবু বৃথাই এতদিন কলকাতায় ডাক্তারি করেন নি, তাঁর নিজের বিভাগে যথেষ্ট নামডাক, বদরীবাবুর পরেই তাঁর প্র্যাকটিশ। তাছাড়াও, বর্তমান লাটসাহেবের স্ত্রীর কী একটা জরায়ুঘটিত অসুখ হঠাৎ বেড়ে উঠতে—সে সময় কোন সাহেবডাক্তার কলকাতায় ছিলেন না, বদরীবাবুও বোম্বেতে গিয়েছিলেন পরীক্ষা নিতে—পূর্ণবাবুকেই ডাকতে হয়েছিল, আর পূর্ণবাবু নাকি ভালও করেছিলেন লাটপত্নীকে।

সেই খাতিরটা কাজে লাগল এবার। লাটসাহেবের ভ্রুকুটিতে সাহেব পুলিশ কমিশনার সমস্ত রকম 'ইনকোয়ারি' বন্ধ করে দিলেন, সব মামলাটাই ধামাচাপা পড়ে গেল। একটি পুত্রহারা বিধ্বস্ত ও একটি স্বামীহারা বালিকার কান্না লাটপ্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছল না। পূর্ণবাবু সেখানে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় ব্যক্তি।

এসব ঘটনার—অভিযোগ অনুসন্ধান ও তার অকালমৃত্যুর পালা শেষ হতে হতে বেশ কিছুদিন কাটল। এ খবর হেমন্ত একদিনেও পায়নি, দফায় দফায় পেয়েছে। তবে আগেই পূর্ণবাবু একদিন এসেছিলেন, কমলাক্ষর মৃত্যুর দিন দশ বারো পরে। বোধহয় শ্রাদ্ধের পরের দিন।

এইখানেই পূর্ণবাবুর একটু হিসেব ভুল হয়ে গিছল বোধহয়।

ব্রাহ্মণের মেয়ে হেমন্ত, অশৌচান্তের দিন কবে, কবে শ্রাদ্ধ—এ তো তার জানাই। সেদিন সারাদিন খায়নি, সারাদিনই কেঁদেছে। গোপালী এসেছিল, সেও শান্ত করতে পারেনি, খাওয়াতে পারেনি কিছু। নিয়ে যেতে চেয়েছিল সঙ্গে, তাতেও রাজী হয়নি। নিভৃতে কাঁদতেই চায় সে, চায় চোখের জলে তর্পণ করতে মৃতের উদ্দেশ্যে—চায় প্রায়শ্চিত্ত করতে। কেউ কিছু বলুক না বলুক, হেমন্ত নিজের মনে বুঝেছে, তাকে ভালবেসেই প্রাণ হারিয়েছে কমলাক্ষ, তার জন্যেই।

ঠিক সেই সন্ধ্যাতেই এসেছেন পূর্ণবাবু।

শীর্ণ শুষ্ক মুখ, রোদনারক্ত চোখ দেখে পূর্ণবাবুর বুকেও দাহ দেখা দিয়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু হেমন্তর শরীরে প্রতি লোমকূপে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে, সোজা নিচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'যাও! বেরিয়ে যাও বলছি! ...যদি এখনও মান-অপমানের জ্ঞান কিছু থাকে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও! ...নিকাল যাও! নইলে দারোয়ান ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াব!'

পূর্ণবাবু বোধকরি ঝড়তুফানের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, ঠিক এ বজ্রপাত আশঙ্কা করেন নি। প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেন, তারপর—ঝি চাকরদের সামনে লজ্জা ও অপমান ঢাকতে, যেন এটাকে তামাশা বলে নিয়েছেন এইভাবে—হাসি হাসি মুখে আমতা আমতা করে কি বলতে গেলেন ঃ ঠিক শোনেনি হেমন্ত, তবে তার মনে হয়েছিল পরে, বলেছিলেন—'না, মানে খুব ব্যস্ত ছিলুম বলেই কদিন—' ইত্যাদি। যেন কদিন না আসাতেই হেমন্তর রাগ হয়েছে।

কিন্তু হেমন্ত এবার সংহারমূর্তি ধারণ করল বলতে গেলে, চিৎকার করে উঠল, 'বেরোও, বেরোও বলছি, আভি নিকালো! বেহায়া, বেইমান! লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে দাঁত বার করতে এসেছ এখানে! আশ্চর্য, তোমার রক্তে কি কোথাও এতটুকু মনুষ্যত্ব নেই? এর পরেও তুমি আসতে পারলে এখানে? কোন বাপে জন্ম দিয়েছিল তোমাকে—তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। একটা বাপে দিয়েছিল বলে মনে হয় না, হাড়িচাঁড়ালের জন্ম তোমার!'

পূর্ণবাবুর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল এবার। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে, পাগলকে থামাবার মতো করে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এই, কী হচ্ছে কি—বাপ তোলা—'

'চোপ! চোপ রও বলছি! রাক্ষস খুনে কোথাকার। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে সেই রক্তমাখা হাতে হাজির হয়েছ এসে—পীরিত করতে! যাও বলছি। এই শিউপুজন—এই লোকটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও বাড়ি থেকে, আর কখনও ঢুকতে দিও না।'

পূর্ণবাবু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন। এতদিনের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার মুখোশ খসে পড়ল তাঁর। কুৎসিত একটা ভঙ্গী করে বললেন, 'অ। রসের নাগর মরেছে বলে একেবারে বুক ভেঙে গেছে, না?... আমি বেইমান! তুই কি? খানকি, খানকির ঝাড়। আমার দেওয়া বিছানায় বসে তাকে নিয়ে সোহাগ করতে লজ্জা করেনি? তখন এত লজ্জাসরমের জ্ঞান ছিল কোথায়?'

'আমার লজ্জাসরম হবে কেন?' সদম্ভে জবাব দেয় হেমন্ত, 'আমি তো উচিত কাজই করেছি! যে পথে এনেছ, সে পথের এই তো স্বাভাবিক পরিণাম! বেইমানীটাই বা কিসের? ...তোমার সঙ্গে আমার দোকানদারি সম্পর্ক—কেনাবেচা। যা দিয়েছ তার দুনো উশুল হয়ে গেছে। বিকিয়ে তো দিইনি নিজেকে, কেনা বাঁদী নই কিছু। মন্তরপড়া পরিবারও নয়। তোমারই তো বোঝা উচিত ছিল, উচিত ছিল হিসেব ঠিক রাখা—এ পথে যে এসেছে একবার, নামতে শুরু করেছে—সে আর থামবে কেন?...ইজ্জৎ ধর্ম সবই যখন গেছে, তখন বুড়োকে নিয়েই খুশী থাকব কিসের জন্যে? তুমি তোমার সুখ দেখবে—আমি দেখতে জানি না!'

বলতে বলতে হাঁপিয়ে যায় যেন। উপবাসে, কাঁদনের অবিরাম কান্নায়, আর বিলাপে শরীর ভেঙে এসেছে। একটু চুপ করে থেকে, দুহাতে বুক চেপে ধরে বলে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলাতেই পাপ হল আমার, চান করে প্রাচিত্তির করতে হবে। তুমি বিদেয় হও, ঝিকে গোবর জল ছড়া দিতে বলি—।'

পূর্ণবাবুর মুখ পৈশাচিক ক্রূরতার মধ্যেই বিবর্ণ হয়ে উঠল, বোধহয় অতিরিক্ত ক্রোধেই। কিন্তু তিনি আর দাঁড়াতে সাহস করলেন না, কোনরকম বাকবিতণ্ডা করতেও না। কোনদিকে চাইতেও পারলেন না, আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বিলুপ্ত রাজধানী গঙ্গে

উৎপল চক্রবর্তী

বেড়াচাঁপায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি

এই সেই গঙ্গে!

পেরিপ্লাস-গ্রন্থ আর টলেমির ভ্রমণ-বৃত্তান্তে গংগারাষ্ট্রের রাজধানী সুবিশাল গঙ্গে বন্দর!

আমি জানি না। কোন ঐতিহাসিক এখনো কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি, এই সেই বিখ্যাত গঙ্গে কি না। শুধু স্থানটির প্রাচীনত্ব, অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনের ভগ্নাংশ, অদূরে বিদ্যাধরী নদীর অবস্থিতি, স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চলের নাম—অনুসন্ধিৎসু মানুষের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে, ঐতিহাসিককে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হতে অনুপ্রাণিত করেছে আর আকর্ষণ করেছে অসংখ্য পর্যটককে, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যাঁরা ছুটে এসেছেন এই ইতিহাস সমৃদ্ধ জলভূমিতে!

আজ আমি পা রাখলাম সেখানে।

বিংশশতাব্দীর পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে মাত্র তেইশ মাইল উত্তরে। শ্যামবাজার খালধার থেকে ৭৯, ৭৯এ বা ৭৯সি বাসে উঠলে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই পেঁছে যাওয়া যায় আনুমানিক ৩৫০ খৃস্ট পূর্বাব্দ থেকে খৃস্টীয় ১ম, ২য় ৩য় শতকের বাংলার রাজধানী 'গঙ্গে'তে যার আধুনিক নাম বেড়াচাঁপা বা দেবালয় বা চন্দ্রকেতুরগড়। না। এখনো কোন সীলমোহর কোন শিলালেখ কোন তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় নি, যা থেকে নিঃশংসয় হওয়া যায় এই বেড়াচাঁপাই সেই গঙ্গে। তবু মাটির গভীর গোপনে সংগুপ্ত এমন বহু প্রমাণ আজ উন্মুক্ত যা থেকে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছেন ঐতিহাসিকেরা, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম স্থানগুলির মধ্যে বেড়াচাঁপা অন্যতম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'দেগঙ্গা', গঙ্গানদীর অন্যতম শাখা বিদ্যাধরীর গতিপথ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অনেকেই প্রায় নিশ্চিত হয়েছেন এই বেড়াচাঁপাই সেই 'গঙ্গে' বন্দর বলে।

অনেক ঐতিহাসিক এসেছেন বেড়াচাঁপাতে, নানাবিধ প্রমাণ পেয়ে তাঁদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়েছে, মৌর্য সুঙ্গ কুষাণ গুপ্ত পাল সেন বা মুসলামান যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রায় সুনিশ্চিত করেছে তাঁদের। রোমাঞ্চিত হতে হয়, ভাঙগা মন্দিরের ভিত, পোড়ামাটির মূর্তি, গড়, দীঘি আর মৃৎপাত্রের টুকরো দেখে। অভিভূত হয় কল্পনা, প্রায় দু হাজার বছর আগে এই বেড়াচাঁপাই ছিল প্রাচীন ভারতের প্রাচীন বাংলার সভ্যতার অন্যতম একটি পীঠস্থান, ঐ বিদ্যাধরী জলস্রোত বেয়েই ভেসে আসত গ্রীস, রোম, মিশর, চীন থেকে পণ্যবাহী জাহাজ, এই বন্দর থেকেই বিদেশে রপ্তানী হতো সোনা, মণিমুক্তা বিচিত্র সূক্ষ্ম রেশম আর কার্পাস বস্ত্র, নানা রকমের মশলা আর গন্ধদ্রব্য। বিশ্বাস করতে গিয়ে বিস্ময়ে উত্তাল হয়ে ওঠে কল্পনা, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এইটি ছিল বিশাল গংগারাষ্ট্রের রাজধানী, বিপাশা নদীর পূর্বতীরের পরাক্রান্ত 'গঙ্গানগর', পেরিপ্লাস আর টলেমি যাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে। এরই উল্লেখে প্রাচীন গ্রীক আর লাতিন লেখকেরা, দিয়োদোরাস, কার্টিয়াস, প্লুতার্ক, সলিনাস, প্লিনি, টলেমি, স্ট্রাবো প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন, এরই সমৃদ্ধ বর্ণনায় বিশেষণের মুক্ত-প্রয়োগে অকুণ্ঠিত ছিলেন পরবর্তীকালের ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও।

আজ আমি পা রেখেছি সেই বেড়াচাঁপায়। হাজার হাজার বছর ধরে পরিভ্রমণরত পর্যটক আত্মার সংগী আমি বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে দেখছি বেড়াচাঁপাকে।

এর নাম বেড়াচাঁপা কেন?

জিজ্ঞেস করেছি স্থানীয় এক বৃদ্ধ মানুষকে। উত্তেজিত উৎসাহে তিনি শুনিয়েছেন এক আশ্চর্য অলৌকিক কাহিনী।

বহুকাল আগে, আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে এখানে এসেছিলেন পীর গোরাচাঁদ। এদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য যে কয়জন পীর এসেছিলেন ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অসামান্য ক্ষমতাবান ছিলেন এই পীর। সেই ক্ষমতারই প্রমাণ দেবার জন্য তিনি একবার লোহার বেড়ার উপর চাঁপাফুল ফুটিয়েছিলেন। সেই থেকেই এর নাম বেড়াচাঁপা।

—আর ঐ যে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখছেন, বললেন সেই গ্রাম-বৃদ্ধ, —এমন অসংখ্য মন্দির ছিল আগে এখানে। সেই থেকেই এর নাম দেবালয়। আর রাজা চন্দ্রকেতু এখানে রাজত্ব করতেন বলে এর আর এক নাম চন্দ্রকেতুরগড়। চন্দ্রকেতুরগড় বা বেড়াচাঁপার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সর্বপ্রথম কবে সচেতন হয়ে ওঠেন? যতদূর জানা গেছে, ১৯৪৮ সালে আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ থেকে প্রথম ও পরে ১৯৫০ সালে ও ১৯৫৬ সালে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। অবশ্য এরও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিখ্যাত বিদেশী পুরাতাত্ত্বিক লঙহার্স্ট এ জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। এবং তার কিছু পরে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে এক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এবং 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্রই সম্ভবত সর্বপ্রথম চন্দ্রকেতুগড়ের সুউচ্চ ঢিপি, পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'দেগঙ্গা' নামটি বিশ্লেষণ করে এইটিই গ্রীক বিবরণীতে উল্লিখিত বিশাল 'গঙ্গে' নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে ইঙ্গিত করেছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধীক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ও এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন নানা পত্র-পত্রিকায়। রাখালদাস যখন এসেছিলেন তখন চন্দ্রকেতুগড়ের খননকার্য শুরু হয়নি। তবু স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তিনি নিঃশংসয় হয়ে লিখেছিলেন, 'মুর্শিদাবাদের মহীপাল ও রাঙগামাটি, নদীয়ার বল্লাল দীঘি, হুগলীর সপ্তগ্রাম ও মহানাদ, যশোহরের ভরত-ভায়না, ঢাকার সাভার, ধামরাই, [illegible] সোনারগাঁ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন [illegible]

বেড়াচাঁপায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তি

বশেষের তুলনায় চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুরগড় অতি প্রাচীন স্থান।'

১৯০৯ খৃস্টাব্দে ভূতত্ত্ব বিভাগের চিত্রকর নৃপেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে এই জায়গাটি সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন এবং তিনি তাঁর পার্শী শিক্ষক মৌলবী খয়র উল আনাম ও ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন।

তখন বারাসর-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে চালু ছিল। বেড়াচাঁপা স্টেশনে নেমে এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে তিনি চন্দ্রকেতুরগড়ের ধ্বংসাবশেষের মুখোমুখি হয়েছিলেন। অবশ্য তখন তিনি দু-একটি পুকুর ও কতকগুলো মাটির ঢিবি ছাড়া কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু যে সব প্রাচীন ঐতিহাসিক সামগ্রী তিনি স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে দেখেছিলেন সেগুলি তাঁর মতে 'অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও পুরাতন'।

চন্দ্রকেতুরগড় দূরে থেকে উঁচু পুকুরের পাড় বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে এটি একটি পুরনো দুর্গের ভগ্নাবশেষ, এমন কি লক্ষ্য করলে এর এক অংশে দুর্গের প্রধান বা সিংহদ্বারের চিহ্নও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। সিংহদ্বারের ধ্বংসাবশেষের কাছ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট বড় ঢিবি দেখে সহজেই অনুমান করা চলে এর বিস্তার বহুদূর অবধি ছিল। এই গড়েরই কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে 'ধনপোতা' নামে। লোকে বলে, রাজা চন্দ্রকেতু বিদেশী আক্রমণের সময় এইখানেই তাঁর ধনরত্ন পুঁতে রেখেছিলেন।

রাখালদাস বেড়াচাঁপা স্টেশনের কাছে একটা চালকলে তিনটি খুব পুরনো প্রত্নবস্তু দেখেছিলেন। প্রথমটি হলো একটি চারপেয়ে পাথরের চৌকি। বিহারে বা মধ্যপ্রদেশে এগুলিকে বলে 'গোরেয়া'। নালন্দা তক্ষশিলা ইত্যাদি প্রাচীন জায়গাগুলি খননের সময় এই জাতীয় 'গোরেয়া' পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে সম্ভবত একমাত্র বেড়াচাঁপা থেকেই এটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একটি অত্যন্ত প্রাচীন ছোট মৃন্ময়ী 'মাতৃ-মূর্তি' পাওয়া গেছে, যা বাংলার চন্দ্রকেতুরগড় ছাড়া আর কোথাও নেই এবং কৌশাম্বী কান্যকুব্জ ইত্যাদি প্রাচীন জায়গাতেই এর নিদর্শন কিছু পাওয়া গেছে। হাজার হাজার বছর আগে এই জাতীয় মূর্তি ভূমধ্যসাগর থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত মাতৃ-মূর্তিরূপে পূজিত হতো। মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পাতেও এই জাতীয় মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া একটি কালো পাথরের স্তম্ভের ভগ্নাবশেষও তিনি দেখেছিলেন। এর পালিশ অনেকটা অশোকের স্তম্ভগুলোর পালিশের মতো সুন্দর।

আশুতোষ চিত্রশালার ব্যাপক অনুসন্ধান ও খননের ফলে চন্দ্রকেতুরগড়ের প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহাসিকতার প্রমাণগুলি সকলের সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রচুর রৌপ্য-লাঞ্ছিত মুদ্রা, খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পোড়ামাটির সীল, রোমান পানপাত্র, গ্রীক-প্রভাবিত পোড়ামাটির মূর্তি, মৌর্য, সুঙ্গ ও কুষাণ-যুগের বহু টেরাকোটা, কিছু খেলনা-রথ যার ভেতর হাতি, ভেড়া এবং ঘোড়ার মূর্তি আছে এবং যা বৈদিক দেবতা ইন্দ্র অগ্নি ও সূর্যের বাহন হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও অসংখ্য মিথুনমূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলি খৃস্টপূর্বাব্দ ১ম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর।

গুপ্তযুগের তিনটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুরগড় থেকে। নিকটবর্তী হাতিপুর গ্রামের পুকুর থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহের দৃশ্য সম্বলিত একটি এবং আর একটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত মুদ্রা সংগ্রহ করেন গ্রামবাসিগণ। হাবড়া শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীগৌরীশংকর দে গ্রামবাসীর কাছ থেকে আর একটি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, যার এক পিঠে ধনুর্ধর মূর্তি, অপর পিঠে লক্ষ্মীমূর্তি এবং 'সমুদ্র' কথাটি লেখা আছে। দুর্লভ এই মুদ্রাগুলি একমাত্র বেড়াচাঁপাতেই পাওয়া গেছে—স্থানটির প্রাচীনত্বের এও এক প্রমাণ।

আর একটি পোড়ামাটির সূর্যের রথ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র পশ্চিম ভারতের পর্বতগুহায় পাথরে খোদাই ছবিগুলি। খনা-মিহিরের ঢিবির কাছ থেকে একটি লাল পাথরের বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে যা মথুরার শিল্পীদের দ্বারা তৈরী বলে বিশ্বাস করা চলে। একটি মহাবীরের মূর্তি সংগ্রহ করেছেন শ্রীগৌরীশংকর দে যেটি সর্বপ্রথম এখান থেকেই পাওয়া গেল। এছাড়াও প্রাচীনকালে মন্দিরগুলি কিভাবে তৈরী হতো তার ছোট ছোট পোড়ামাটির নমুনাও অসংখ্য পাওয়া গেছে। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে দু সপ্তাহব্যাপী খনন ও অনুসন্ধানের ফলে আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার চন্দ্রকেতুরগড়ের প্রাচীনত্বকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। দেখা গেছে, বিভিন্ন যুগের সভ্যতার স্তরগুলি এই জায়গাটির মাটির নীচে প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই আছে। মৌর্য, সুঙ্গ, কুষাণ যুগের ঘরবাড়ীর চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, দেখা যায় স্পষ্ট, মাটি, কাঠ, বাঁশ, টালি দিয়ে তৈরী সেইসব ঘরবাড়ীর এমনকি একবার আগুন লেগে নগরীর অনেক বাড়ী যে নষ্ট হয়েছিল তাও বেশ বোঝা যায়। মৌর্যযুগের একটি পয়ঃপ্রণালীর চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে ঐ খননের ফলে।

এই বেড়াচাঁপা থেকে দশ মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে মৌর্যযুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে আর আট মাইল দক্ষিণে খাস বালান্দা গ্রামে গুপ্তযুগের

একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে যা পরবর্তী মুসলমান যুগে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই বালান্দাই কি সেই বালবলভী রাজ্য—যেখানে মন্ত্রী ছিলেন মহাপণ্ডিত ভবদেব ভট্ট? নেপালী পুঁথিতে উল্লিখিত বালান্দা মহাবিহারই কি এই খাস বালান্দার মন্দির? আর কিছু দূরবর্তী ভাণ্ডাড় গ্রামে পাওয়া বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তিই কি এই বিহারের প্রধান মূর্তি! হয়তো তাই। আর তাই, মৌর্য শুঙ্গ কুষাণ গুপ্তযুগের ঐতিহ্যবাহী ঐ বিদ্যাধরীর তীরে খাস্ক্রা গ্রামে পালযুগের নিদর্শনও উৎকীর্ণ রয়েছে মূর্তিতে। উপেক্ষা করতে পারেন নি পাল-সম্রাটগণ এই বিশাল নগরীকে। কিন্তু সেনযুগের কোন চিহ্ন নেই বেড়াচাঁপাতে। আছে, পরবর্তী মুসলমানযুগের মসজিদ আর অলংকৃত টেরাকোটা, আছে অজস্র কিংবদন্তীর গল্প।

ঐ খাস বালান্দারই নিভৃত সমাধিতে ঘুমিয়ে আছেন পীর গোরাচাঁদ যিনি এসেছিলেন রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যে মুসলমান ধর্ম প্রচার করতে।

কে এই রাজা চন্দ্রকেতু? ইতিহাস নীরব। কোথাও কোন শিলালিপি কোন তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করেন নি এই রাজার কোন দানপত্র দানের স্বাক্ষর, কোন দিগ্বিজয়ের ইতিবৃত্ত।

শুধু বেড়াচাঁপার মানুষ আগ্রহী-শ্রোতার কাছে বলেন এক আশ্চর্য

কাহিনী। তাঁরা বলেন, বিজয়ী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু। সঙ্গে নিয়েছিলেন একটি সাদা এবং একটি কালো পায়রা। বলে গিয়েছিলেন রাজা, রাণী আমি যদি যুদ্ধে জিতি তবে সাদা পায়রা উড়ে আসবে তোমার কাছে। যদি হারি, তবে কালো পায়রা। প্রতীক্ষা করছিলেন রাণী, যুদ্ধে জিতেও ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু, কিন্তু ঘটনাচক্রে ছাড়া পেয়ে উড়ে এল কালো পায়রাটি। পরাজয়ের নিশ্চিত চিহ্ন দেখে দীঘির জলে আত্মহত্যা করলেন রাণী। বিজয়ী রাজা ফিরে এসে এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে নিজেও আত্মহত্যা করলেন। এই রাজ্যও অধিকার করে নিলেন মুসলমান শাসকেরা।

কবে কোথায় কোন দীঘির জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন রাণী আজ আর কেউ জানেন না, কোনখানে ছিল রাজা চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ তাও আজ কেউ বলতে পারেন না, শুধু সকলের মনে আজও বিজয়ীর আসনে বসে আধিপত্য করছেন রাজা চন্দ্রকেতু। আর যে পীর গোরাচাঁদ একদিন অলৌকিক চাঁপাফুল ফোটানোর খেলায় বিস্মিত করেছিলেন এ রাজ্যের অধিবাসীদের তাঁরও সব খেলা আজ শেষ হয়ে গেছে। অদূরে হাসনাবাদে তাঁর সমাধিকে ঘিরে বছরে একটি দিন বিরাট মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তজন আসেন সেই মেলায়, আসে ঐ বিদ্যাধরী বেয়ে পণ্যবাহী নৌকোর মিছিল।

না, সেই বিদ্যাধরীর প্রবল প্রবহমানতা আজ আর নেই। হারিয়ে গেছে মৌর্য সুঙ্গ কুষাণ গুপ্ত পাল আর মধ্যযুগের সম্রাটদের লীলাভূমি সমৃদ্ধিশালী গঙ্গে বন্দর। ইংরেজ আমলের সেই ছোট রেলপথও আজ নেই। এখন শ্যামবাজার বসিরহাট ইটিন্ডাঘাট যাবার খাস রাস্তা প্রাচীন এই জায়গাটির বুকের উপর দিয়ে বহন করছে যাত্রী আর পণ্যসামগ্রী।

আজ এখানে ব্লক উন্নয়ন অফিস, পলিটেকনিক্যাল স্কুল, ছাত্র ও ছাত্রীদের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, জে এল আর অফিস, দুটো সিনেমা হল হয়েছে। বিদ্যুৎ আলো উদ্ভাসিত করেছে সভ্যতার আলোয় একদা-উজ্জ্বল মহানগরী গঙ্গে আজকের নগন্য গ্রাম বেড়াচাঁপাকে। মহানগরীর সেই প্রশস্ত রাস্তার চিহ্নও নেই, নেই কলকোলাহলমুখর নগরজীবনের চাঞ্চল্য চাপল্য। শান্ত স্নিগ্ধ এই গ্রাম বেড়াচাঁপা শুধু এখন রথযাত্রা আর বাসন্তী পুজোর দিন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। গ্রামবাসিগণ বলেন, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর সমারোহ বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে এখানকার বাসন্তী পুজোর উৎসবকে অনায়াসে তুলনা করা যেতে পারে। প্রধান সড়কের একপাশে আছে কালীবাড়ী। নিত্যপুজো হয় সেখানে। দূরের বিদ্যাধরী যেন অতীত স্মৃতির এক অশ্রুরেখার মতো ম্লান বিধুর। গ্রীস, রোম, মিশর, চীনের সপ্তডিঙা তার ইঙ্গিতে আর এসে পৌঁছয় না বেড়াচাঁপার ঘাটে, বিদেশী পর্যটক আর বণিকের পদচিহ্ন, বিস্ময় বিমুগ্ধ উচ্চারণ আর বেচাকেনার কলরোলে মুখর হয় না গঙ্গে বন্দর।

তবে এখনও সেই ঐতিহ্যের ক্ষীণ ধারা যেমন বিদ্যাধরী স্তিমিত প্রবাহ বহন করে চলেছে, তেমনি মাঝে মাঝে গাড়ী ছুটিয়ে আসেন সৌখীন বিদেশী পর্যটক আর দেশী সংগ্রাহকেরা। কিন্তু গঙ্গে বন্দর দেখতে নয়, বহুমূল্য ব্যয় করে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করতে।

আসেন কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসু মানুষ, বিচক্ষণ ঐতিহাসিকগণ, তাঁরা এর প্রায়-বিলুপ্ত চিহ্নগুলির এমন দ্রুত নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা দেখে আতঙ্কিত আশঙ্কিত হন। স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি সাধ্যমতো যত্নে মমতায় অনেক নিদর্শন সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বস্তুত তাঁদের এই উদ্যম যদি না থাকত, আজ অতীত গরিমায় সমৃদ্ধ বেড়াচাঁপার কোন চিহ্নই হয়তো পাওয়া যেত না। তাঁদের কাছে সমগ্র জাতিরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি অবিলম্বে এখানে একটি টুরিস্ট ব্যুরো এবং মিউজিয়াম তৈরী করেন তবে বাংলার প্রাচীনতম এই রাজধানীটির অস্তিত্ব দীর্ঘকাল মানুষের শ্রদ্ধা বিস্ময় কৌতূহল আকর্ষণ করতে পারবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আজ সারা দিন বেড়াচাঁপার ধ্বংসস্তূপের কাছে শুনে দেখার চেষ্টা করেছি এর বৈভব আর বিত্তের কাহিনী, এর পরাজয় আর পতনের ইতিবৃত্ত। এতবড় একটি রাজ্য তার সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে আজ এমন উপেক্ষা অনাদরের নগণ্য গ্রাম হয়ে গেল কেন—তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশের আবহমানের ইতিহাস বলে কোন শক্তিশালী সম্রাটের পরাজয়, সিংহাসনের অধিকার নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিদেশী শত্রুর পদসঞ্চার, নদীর গতিপথ পরিবর্তন—বা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়—এরই ফলে বারবার বাংলার রাজধানীগুলি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সরে গেছে। খৃস্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে বাংলার রাজধানী 'গঙ্গে'র ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি উপেক্ষণীয় ছিল না, কিন্তু চতুর্থ শতক থেকেই দেখা যাচ্ছে পুষ্করণা, সমতট, বঙ্গ এই তিনটি নাম বাংলার রাজধানী হিসেবে উল্লিখিত। তবে কি বিদ্যাধরী তখন গতিপথ পরিবর্তন করেছে, আর তারই ফলে গঙ্গে বন্দর পরিত্যক্ত হয়ে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে পুষ্করণায় বা সমতটে বা বঙ্গে। আর এই তিনটি স্থানই কি সমগ্র বাংলার রাজধানী। নিশ্চয় তা নয়। তা হলে?

ইতিহাস বলে পরবর্তী ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সমগ্র বাংলার রাজধানী হিসেবে আধিপত্য পায় পুণ্ড্রবর্ধন। এবং সপ্তম শতকে শশাঙ্কর গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনই প্রাচীন বাংলার উল্লেখযোগ্য রাজধানী। রাজধানী পরিবর্তনের এই বিচিত্র ধারার কারণ কিভাবে খুঁজে পাবো আমি। রাষ্ট্রবিপ্লব না প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিদেশী অধিকার না নদীর গতি পরিবর্তন—গঙ্গে থেকে রাজধানী সরে যাবার কারণ কি? আজ সারাদিন তেমন কোন নিদর্শন খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি আমরা।

এখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এবার ফিরতে হবে আমাকে। না, কোন পর্যটক-তরী বিদ্যাধরীর ঘাটে অপেক্ষা করে নেই। এই গঙ্গে বন্দর থেকে পাল তুলে সে তরী দিয়ে ভিড়বে না দূরের ডায়মণ্ড হারবারের কাছে প্রাচীন হরিনারায়ণপুর বন্দরের ঘাটে। বা ওই বিদ্যাধরীর আর এক শাখা লাবণ্যবতী বেয়ে আধুনিক ব্যারাকপুরের কাছে বিলুপ্ত আর এক বন্দরের ঘাটে।

চকিতে মনে পড়ল, ওই লাবণ্যবতীই তো এখন নাউই নদী বা কাটাখাল নামে পরিচিত। আর ওর পাশেই তো আছে এক জনপদ যার নাম 'গঙ্গানগর'।

তবে কি এই নাম হাজার বছর আগের সেই স্মৃতিকেই বহন করছে নদী লাবণ্যবতীর জলধারার মতো! কে জানে, ঐতিহাসিকরা নিশ্চয় এ বিষয়ে ভেবে দেখছেন বা দেখবেন। আর একটু পরেই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার কর্কশ আর্তনাদ তুলে এসে দাঁড়াবে কলকাতাগামী বাস। গঙ্গে থেকে এগোতে হবে গঙ্গার দিকে।

বাস আসার আগে বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে ধ্বংসস্তূপগুলো দেখার চেষ্টা করছি। অন্ধকারে ঢেকে গেছে তাদের অস্তিত্ব। আধুনিক সভ্যতার বিদ্যুৎ চমকে উদ্ভাসিত বেড়াচাঁপার মাটির গভীরে যেন প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার উজ্জ্বলতা।

গড়ের সিংহদ্বারে আজ আর রাজপ্রহরীর অতন্দ্র পদচারণা নেই, আছে হিংস্র শ্বাপদের নিঃশব্দ আনাগোনা, মন্দিরে আর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ হয় না, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজে না—শুধু মাঝে মাঝে সরীসৃপের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের শব্দে শিউরে ওঠে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। নিভে যাবে আর একটু পর বেড়াচাঁপার আলো। নিবিড় অন্ধকারে শুধু সহস্র তারার আলো আর জোনাকি গঙ্গে নগরীর হৃদপিণ্ডের মতো আশায়-নিরাশায় জ্বলবে আর নিভবে। দূরে বিদ্যাধরীর স্রোতের শব্দ ক্ষীণ বিলাপের ধ্বনির মতো বাতাসে গুমরে উঠবে। ভোরের প্রতীক্ষা করবে চন্দ্রকেতুরগড়। কবে কে এসে নিশ্চিত প্রমাণের আলোয় উদ্ভাসিত করবে তাকে, সব শংকা উৎকণ্ঠা শেষ হয়ে প্রমাণিত হবে এই সেই 'গঙ্গেনগরী'। নতুনকালের নতুন মানুষেরা সুপ্রাচীন এই গৌরবের পীঠস্থানকে যথোচিত মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে।

বাস আসছে। বেড়াচাঁপা ছাড়বার আগে ভাবছি, পীর গোরাচাঁদের ফোটানো সেই চাঁপার সুবাস কেমন ছিল জানি না, কিন্তু প্রাচীন গঙ্গের ঐতিহ্য ঐশ্বর্যের লৌকিক সুবাস আজ হাজার বছর পরেও এখনো মিলিয়ে যায় নি। এই মুহূর্তে যদি উপযুক্ত যত্ন না নেওয়া হয়, তবে কালের অনিবার্য আক্রমণে একদিন তা নিঃশেষে হারিয়ে যাবে—দেশকে যাঁরা সামান্য মাত্রাতেও ভালোবাসেন, তাঁদের নিঃশ্বাস তবে রুদ্ধ হয়ে আসবে—আবহমান বাংলার ইতিহাসের বাতাস আবিল হয়ে উঠবে মলিনতায়।

বিজ্ঞানের কথা

চন্দ্রের অভ্যন্তর

বিজ্ঞানের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর

ধরাকৃতিবিদ্যা (জিওডেসি) ও ভূ-পদার্থবিদ্যার (জিওফিজিকস) আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের পঞ্চদশ সাধারণ অধিবেশনে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের অধ্যাপক স্ট্যানলি রানকর্ণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ডঃ য়েলেনা লুবিমোভা। সংবাদ-পত্রের একজন প্রতিনিধির কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে তাঁরা দুজনেই চন্দ্রের গঠন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছে মস্কোর একটি পত্রিকায়। তার একটি ইংরেজি অনুবাদ আমাদের হাতে এসেছে। এই দুজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করছি।

চন্দ্রের আভ্যন্তরিক গঠন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ডঃ লুবিমোভা বলেন, সাধারণ অধিবেশনেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কোনো ঐক্যমতে পৌঁছনো যায় নি। বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রথমেই জানা দরকার চন্দ্রের অভ্যন্তর-ভাগ ঠান্ডা না গরম। যদি ঠান্ডা হয় তাহলে চন্দ্রের আভ্যন্তরিক গঠন সম্পর্কে একরকম ব্যাখ্যা। যদি গরম হয় তাহলে অন্যরকম। চন্দ্রের অভ্যন্তরে বস্তুর গঠন কী রকম? চন্দ্রের কেন্দ্রস্থলে কি লোহ আছে? চন্দ্রের অভ্যন্তরের বস্তু গতিশীল না স্থির? চন্দ্রের চৌম্বক ক্ষেত্র নেই কেন?

অথচ, চন্দ্রের অভ্যন্তর-ভাগ ঠান্ডা না গরম সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় চন্দ্রের চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুসন্ধান থেকেই। চাঁদের অভ্যন্তর-ভাগের বস্তুতে বিদ্যুতের প্রবাহ কতখানি হতে পারে তারই ওপরে নির্ভর করে চন্দ্রের চুম্বকত্ব। আবার এই বিদ্যুতের প্রবাহ থেকেই ধরে নিতে হয় তাপমাত্রা ও গতিশীলতা। অর্থাৎ, চন্দ্রের ভিতরটা যদি গরম হত, চন্দ্রের ভিতরকার বস্তু যদি গতিশীল হত, সেই বস্তু যদি এমন হত যাতে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে—তাহলে অবশ্যই বিদ্যুতের প্রবাহ তৈরি হত, তাহলে অবশ্যই চন্দ্রের চুম্বকত্ব থাকত। যেহেতু চন্দ্রের চুম্বকত্ব নেই, অতএব ধরে নিতে হয় চন্দ্রের ভিতরটা ঠান্ডা। এই হচ্ছে একদল বিজ্ঞানীর মত।

কিন্তু ডঃ লুবিমোভা মনে করেন, চন্দ্রের ভিতরটা গরম, চন্দ্রের ভিতরের বস্তু যথেষ্ট গতিশীল—যার ফলে চন্দ্রের ভিতরের বস্তু স্তরে স্তরে বিভক্ত হতে পেরেছে।

তাহলে চন্দ্রের চুম্বকত্ব নেই কেন?

টেলিস্কোপে চাঁদের চেহারা

এ-প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক রানকর্ণ বলেন, চন্দ্রে চুম্বকত্ব নেই—একথা বলা যেতে পারে নিতান্তই বর্তমান চন্দ্র সম্পর্কে। চন্দ্র থেকে যে শিলা পৃথিবীতে এসেছে তা বিশ্লেষণ করে কিন্তু শেষ চুম্বকত্বের (রেসিডুয়েল ম্যাগনেটিজম) হদিশ পাওয়া গিয়েছে। চন্দ্রের এই শিলার বয়স ৩৭০ কোটি বছর। এত প্রাচীন শিলা পৃথিবীতে পাওয়া যায় নি। তার মানে ধরে নিতে হয় যে চন্দ্রে এক সময়ে চুম্বকত্ব ছিল, এখন নেই। কেন নেই?

পৃথিবীর কেন চুম্বকত্ব আছে? কেননা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আছে এমন গতিশীল ভারী পদার্থ যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে (যেমন, লোহ)। এই পদার্থের অবিরাম গতিশীলতার জন্যেই পৃথিবীর চুম্বকত্ব। তাহলে চন্দ্রের শিলার শেষ চুম্বকত্ব থাকার অর্থ দাঁড়ায়—চন্দ্র গড়ে ওঠার গোড়ার পর্বে চন্দ্রের কেন্দ্রস্থলে ছিল তড়িৎ-পরিবাহী গতিশীল বস্তু। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যেমনটি আছে।

তাহলে চন্দ্র তার চুম্বকত্ব হারাল কি করে? চুম্বকত্ব তৈরি হবার যেটি ব্যবস্থা—অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে তড়িৎ-পরিবাহী গতি-শীল বস্তু থাকা—সেটি অচল হলে তবেই চুম্বকত্ব খোয়া যেতে পারে। চুম্বকত্ব যখন নেই তখন নিশ্চয়ই অচল হয়েছে। অধ্যাপক রানকর্ণ বলেন, অচল হয়েছে সম্ভবত এ-কারণে যে চন্দ্রের ভিতরকার ভারী পদার্থ-গুলো ক্রমে গিয়ে জড়ো হয়েছে কেন্দ্রস্থলে, ফলে মাপে কমেছে। অনুরূপ মাত্রায় চুম্বকত্বও কমে গিয়েছে। কমতে কমতে এখন না থাকার মতো।

অধ্যাপক রানকর্ণ জোর দিয়ে বলেছেন যে চন্দ্রের ভিতরটা যে গরম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং চন্দ্রের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে লোহ। তবে চন্দ্রের ভিতরকার বস্তু গতিশীল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তিনি মনে করেন, এই বস্তু গতিশীল, যদিও অতি-মাত্রায় শ্লথ। প্রমাণ কি? প্রমাণ, চন্দ্রের উপরিতলে পাওয়া নিঃসৃত লাভা। চন্দ্রের ভিতর থেকে লাভা উঠে আসছে—তার মানেই ধরে নিতে হয় যে চন্দ্রের ভিতরটা গরম এবং তা জমাট অবস্থায় নেই।

তাহলে কি এ ব্যাপারে চন্দ্র ও পৃথিবীর ভিতরকার গঠনে কোনো অমিল নেই?

এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক রানকর্ণ বলেন, সাধারণভাবে বিচার করলে অমিল নেই। বিশেষভাবে বিচার করলে অবশ্যই আছে। সবচেয়ে বড়ো অমিল—চন্দ্রে না আছে বায়ুমণ্ডল, না সমুদ্র, না চৌম্বক ক্ষেত্র। তাছাড়া চন্দ্রে সবসময়েই মহাজাগতিক কণার অবাধ বর্ষণ চলেছে।

চন্দ্র কী দিয়ে তৈরী?

ডঃ লুবিমোভা বলেন, চন্দ্র তৈরি হয়েছে বাইরের মহাশূন্যে বস্তু জড়ো হবার ফলে। জন্মের সময়ে এই বস্তুর তাপমাত্রা ছিল দ্রবীভবনের কাছাকাছি। প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে এই বস্তু পরবর্তীকালে স্তরে স্তরে বিভক্ত হয়েছে। সম্ভবত চন্দ্রের গঠনটি এই রকম: চন্দ্রের ত্বক প্রায় ৯৯ কিলোমিটার পুরু এবং এই ত্বকটি বিশেষ ধরনের (পৃথিবীতে যা প্রায় নেই) ব্যাসল্ট উপাদানে তৈরী। ত্বকের নিচে পরপর দুটি স্তর, তারপর কেন্দ্রস্থল বা কোর। কেন্দ্রস্থলের আকার সম্পর্কে ধারণা করা শক্ত, সম্ভবত [illegible] ব্যাসার্ধ ৩০০ কিলোমিটারের কাছা-কাছি [illegible] চন্দ্রের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কেন্দ্রস্থলটি সম্ভবত ভারী পদার্থে তৈরী,

ডঃ বিক্রম সারাভাই

নামেও বিক্রম, কাজেও বিক্রম এক অসাধারণ বিজ্ঞানীর মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে জীবনাবসান হল। তিনি যদি শুধু একজন মাত্র গবেষক হতেন তাহলেও তাঁর এই স্বল্পায়ু জীবনের অসম্ভব রকমের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তার জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে প্রচুর সংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংগে তিনি যুক্ত, তাঁর তৎপরতা যদি শুধু এই বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত তাহলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সংগঠন-প্রতিভাবিশিষ্ট একজন সার্থক কর্মীর বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতেন। ডঃ সরাভাই ছিলেন একাধারে দুই-ই—গবেষক ও সংগঠক। তাই আজকের দিনের ভারতে তিনি ছিলেন প্রায় এক অতুলনীয় পুরুষ। যদি তুলনা করতেই হয় তবে সম্ভবত একমাত্র নাম হোমি জে ভাবা। কিন্তু আজ থেকে ছ-বছর আগে শেষোক্ত মানুষটিকেও আমরা হারিয়েছি। তবে হোমি জে ভাবার তিরোধানের শূন্যতা অপূর্ণ থাকেনি, বিক্রম সরাভাই সে-স্থান নিতে পেরেছিলেন স্ব-বিক্রমেই। প্রথমোক্ত জন সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, ভারতকে তিনি পারমাণবিক যুগে দাঁড় করিয়ে গিয়েছেন। আর শেষোক্ত জন সম্পর্কে একথা বলতেই হবে যে তিনি শুধু যে সেই অবস্থান থেকে ভারতকে আরো অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছেন তাই নয়, মহাকাশ-গবষণায় নবীনতর ক্ষেত্রেও ভারতের স্ব-প্রত্যয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে গিয়েছেন। থুম্বা থেকে উৎক্ষিপ্ত ধাবমান রকেটের মতোই ক্রমবর্ধমান গতিশীলতার একটি পরিচয়ও এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে এই অকাল-মৃত্যুর পরেও রকেটের গতি অব্যাহত থাকবে, এমন কথা নিশ্চয় করে এখনো বলা যাচ্ছে না। এই অব্যবহিত মুহূর্তে দ্বিতীয় মৃত্যুকে তাই দেশের পক্ষে অপূরণীয় একটি ক্ষতি বলেই মনে হচ্ছে।

শ্রীমতী ইন্দিরার ভাষায়, ডঃ সরাভাই ছিলেন অত্যুজ্জ্বল এক নবীন বিজ্ঞানী। তাঁদেরই একজন যাঁরা আমাদের দেশকে এক নতুন রূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী। পরমাণু শক্তি কমিশনের কাজ তিনি পরিচালনা করতেন দূরদৃষ্টি ও পৌরুষের সংগে। তিনি ছিলেন মানব-জীবনের সংগে বিজ্ঞানকে সম্পর্কিত করার ঐকান্তিক ভাবনায় ভাবিত একজন অতি-উৎসাহী ও অতি-উদ্যমী বিজ্ঞানী—শুধু গবেষক মাত্র নন। এখানেই তাঁর অসাধারণত্ব।

বিজ্ঞানের কথার পরবর্তী লেখায় আমরা এই অসাধারণ বিজ্ঞানীর জীবন ও গবেষণা উপস্থিত করব।

তার উপরের দুটি স্তরে রয়েছে সিলিকন শিলা ও সিলিকেট।

অ্যাপোলো ১৬

আগামী ১৭ই মার্চ তারিখে অ্যাপোলো-১৬ চন্দ্রের দিকে যাত্রা করবে। এটি হবে মানুষের পঞ্চম চন্দ্রাবতরণ অভিযান। ইতিপূর্বে অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ চন্দ্রের 'মারিয়া' অঞ্চলে অবতরণ করেছিল, অ্যাপোলো-১৪ চন্দ্রের ফ্রা মরো মালভূমিতে অ্যাপোলো-১৫ হ্যাডলী অ্যাপেনাইন এলাকায়।

অ্যাপোলো-১৬ অবতরণ করবে চন্দ্রের একটি সুউচ্চ আগ্নেয়গিরির এলাকায়। অন্যতম উদ্দেশ্য, এই এলাকার আগ্নেয়-গহবর থেকে শিলার নমুনা সংগ্রহ করা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সুউচ্চ আগ্নেয়গির থেকে সংগৃহীত এই শিলা থেকেই চন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্তের অনেক নতুন সূত্র জানা যাবে, সম্ভবত পৃথিবী ও সমগ্র সৌরজগতের বিবর্তনের ইতিহাসও।

অ্যাপোলো-১৬ অভিযানের যাত্রীদলের সংগেও চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘোরাফেরা করার জন্যে একটি গাড়ি থাকবে। যেমন ছিল অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের যাত্রীদলের সংগে।

অ্যাপোলো-১৬ অভিযানের যাত্রীরা নতুন যে জিনিসটি সংগে নিয়ে যাবেন তা হচ্ছে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক মানমন্দির। এটি চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে মানমন্দির স্থাপন করার বিশেষ সুবিধে এই যে চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল না থাকার দরুণ পর্যবেক্ষণ হতে পারে অবাধ। পৃথিবীর মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করার সময়ে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা ইত্যাদির জন্যে নানা অস্পষ্টতার সম্মুখীন হতে হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, চন্দ্রপৃষ্ঠের এই মানমন্দির থেকে তোলা আলোকচিত্র আমাদের এই ছায়াপথের বিবর্তন সম্পর্কে অনেক নতুন খবর জানাবে।

অ্যাপোলো-১৬ অভিযানেও তিনজন যাত্রী থাকবেন। চন্দ্রে পৌঁছে একজন চন্দ্রের কক্ষে থাকবেন, অপর দুজন চন্দ্রের মাটিতে নামবেন।

মহাকাশে ভিড়

'বর্তমান বছরের (১৯৭১) ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫ হাজার বস্তু মহাকাশের কক্ষপথে ছাড়া হয়েছে। এই সংবাদ জানিয়েছে নাসার গডার্ড স্পেস ফ্ল্যাইট সেন্টার। এর মধ্যে ঐ সময় ২২২৮টি বস্তু কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ ছিল। এর মধ্যে ১৬৯৪টি যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং ৫৩৪টি ৮টি রাষ্ট্র এবং দুইটি বৈজ্ঞানিক কনসর্শিয়াম থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে।' ('আমেরিকান রিপোর্টার' থেকে।)

বিজ্ঞানের সংগে পঞ্চাশ বছর

ইংরেজিতে জনবোধ্য বিজ্ঞানের বই লিখে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জে জি ক্রাউথার নামটি সুপরিচিত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি একজন উজ্জ্বলতম তারকা। তাঁর নিজের ভাষায়, পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি বিজ্ঞানের সংগে ঘর করছেন। সম্প্রতি তাঁর এই পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি 'ফিফ্‌টি ইয়ার্স উইথ সায়েন্স' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

জে জি ক্রাউথার লিখছেন, পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় তিনি লিখতে শুরু করেন ঘটনাচক্রে। ১৯২৪ সালে তিনি অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সংগে যুক্ত ছিলেন, টেকনিকাল ও বৈজ্ঞানিক বই প্রকাশনার কাজে। এই কাজের মধ্যে থেকেই তিনি জেনেছিলেন কী ধরনের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রয়োজন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবেশনের জন্যে আরো অনেক পত্রিকা চাই। এমনি একটি পত্রিকা কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তা জানবার জন্যে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখতে লাগলেন। এই পত্রিকাগুলি হচ্ছে 'নিউ স্টেটসম্যান', 'নেশন', 'স্পেকটেটর' ও 'মানচেস্টার গার্ডিয়ান'। কয়েকজন সম্পাদকের সংগে দেখাও করলেন।

সম্পাদকদের সংগে কথাবার্তা বলে তাঁর ধারণা হল যে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের চাহিদা আছে। তখন তিনি এই বিষয়টির ওপরে আরো মনোযোগ দিলেন এবং ভাবতে লাগলেন এই চাহিদা তিনি নিজেই পূরণ করতে পারেন কিনা। তিনি দেখলেন, বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে জীবিকা অর্জন করার সম্ভাবনা খুবই কম। তার একটি কারণ, প্রবন্ধের জন্যে যৎসামান্য পারিশ্রমিক। বিখ্যাত যেসব বিজ্ঞানী পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন তাঁরা তাঁদের জীবিকার জন্যে প্রবন্ধ লেখার জন্যে প্রাপ্তব্য দক্ষিণার ওপরে কিছুমাত্র নির্ভরশীল নন।

তাছাড়া, এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের এত সময় ছিল না যে নিজের শাখার বাইরে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কী ঘটছে সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে ঘন-ঘন প্রবন্ধ লেখেন। এ-কাজটি করতে পারেন কেবলমাত্র বিজ্ঞানের লেখকরা যাঁরা অধিকাংশ সময় এই কাজে নিয়োজিত করবেন। আরো অসুবিধে দেখা দিত বিজ্ঞানের বিষয়ে লেখার মাধ্যমে সাংবাদিকতা করার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের মনোভাবের দরুন। সে-সময়ে অনেকেই মনে করতেন যে জুলিয়ান হাকসলি বা জে বি এস হলডেন দৈনিক

চাঁদের ভিতরে লুনিক-২ যেখানে ভেঙে পড়ে

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ বিজ্ঞানীরা স্পষ্টই বলতেন যে, সাধারণ পাঠকদের জন্যে বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার কোনো বাসনা তাঁদের নেই। তবে হ্যাঁ, রয়েল সোসাইটিতে নির্বাচিত হবার পরে লিখতে পারেন।

কুড়ির দশকে একদিকে ছিল বিজ্ঞানী-দের এই মনোভাব, অন্যদিকে সামাজিক পরি-স্থিতির চাহিদা, এবং এই দুয়ের সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বিজ্ঞানের যথাযথ অগ্রগতি ও প্রয়োগের ওপরেই নির্ভর করছে জাতীয় নিরাপত্তা। রসায়নে ও প্রয়োগ-গত অপটিক্স-এ পিছিয়ে থাকার দরুন যুদ্ধে ব্রিটেন প্রায় হারতে বসেছিল। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল গভর্ণমেন্টকে ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞানের ওপরে আরো নজর দিতে হবে এবং এ জন্যে আরো অর্থব্যয় করতে হবে। এজেন্য অবশ্যই চাই সমস্যা সম্পর্কে জনগণের বোধ ও আর্থিক আনুকূল্য। কাজেই পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় বিজ্ঞানের ওপরে প্রচুর মনোযোগ পড়া উচিত। ব্যবস্থা থাকা উচিত বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের সমস্যা তৎপরতার সঙ্গে জনসমক্ষে উপস্থিত করার—যাতে বিজ্ঞানের তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে জীবন্ত একটা আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।

এ-কারণে সাধারণের কাছে যিনি বিজ্ঞানের কথা বলতে চাইবেন তাঁকে অবশ্যই তাঁর বেশির ভাগ সময় একাজেই দিতে হবে। তিনি ভাবতে লাগলেন, 'মানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার মাধ্যমে এ-কাজটি তিনি করতে পারেন কিনা। এই প্রস্তাবটি পেশ করার জন্যে তিনি শেষ পর্যন্ত 'মানচেস্টার গার্ডিয়ান'-এর তৎ-কালীন বিখ্যাত সম্পাদক সি পি স্কটের সঙ্গে দেখা করলেন। সেটা ১৯২৮ সাল, তার আগে দু-বছর ধরে তিনি এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সম্পাদকমশাই জানা-লেন, তিনি ক্রাউথারকে মাত্র দুটি মিনিট সময় দিতে পারেন এবং সে জন্যে ক্রাউথারকে মানচেস্টারে গিয়ে দেখা করতে হবে। তথাস্তু, ক্রাউথার তাই করলেন।

সম্পাদকের ঘরে বসতে বলার আগেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন মিঃ ক্রাউথার, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'বিজ্ঞানের বিষয়ের সাংবাদিক হতে চাই আমি।'

'মুশকিল কি জানেন মিঃ ক্রাউথার, বিজ্ঞানের বিষয়ের সাংবাদিক বলে কোনো জীবিকা নেই।'

'না, নেই। কিন্তু আমি এই জীবিকাটি আবিষ্কার করতে চাই।' ক্রাউথার বললেন।

তখন সম্পাদকমশাই তাঁকে বসতে বললেন। দু মিনিট মাত্র বরাদ্দ ছিল কিন্তু কথা গড়াল এক ঘণ্টারও ওপরে। বিজ্ঞানের বিষয়ে সাংবাদিকতার প্রয়োজন যে জরুরি সামাজিক প্রয়োজন এ বিষয় তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ ভাবে উপস্থিত করলেন। তারপরে প্রস্তাব করলেন তিনি 'মানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি নিযুক্ত হতে চান। সম্পাদকমশাই বললেন, ব্যাপারটা পত্রিকার পক্ষে নতুন, অতএব তাঁকে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, পক্ষকালের মধ্যে তিনি তাঁর অভিমত লিখে জানাবেন।

পক্ষকালের মধ্যেই লিখেছিলেন। জানিয়েছিলেন, নিজেকে বৈজ্ঞানিক প্রতি-নিধি হিসেবে পরিচয় দিলে ক্রাউথারের পক্ষে যদি কাজের সুবিধে হয়তো তিনি তা দিতে পারেন।

তারপরে ত্রিশের দশকে শুরু হল অর্থ-নৈতিক সংকট। দেখা দিল ব্যাপক বেকারী ও দারিদ্র্য, তৎসহ অপুষ্টি। সমাজকে আরো ভালোভাবে সংগঠিত করার জন্যে ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে বিজ্ঞানকে একটা উপায় হিসেবে দেখতে শুরু করল সাধারণ মানুষ। বিজ্ঞানে আগ্রহ বাড়ল। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় আরো বেশি বিজ্ঞানের লেখার জন্যে চাহিদাও বাড়ল। একই সময়ে ঘটে গেল বিজ্ঞানের জগতে পরপর অনেকগুলো বড়ো রকমের আবিষ্কার। যেমন, নিউট্রনের আবিষ্কার, যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি। এত বড়ো দুটি ঘটনা ১৯৩২ সালের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। পরমাণুর শক্তি যে অচিরেই মানুষের হাতে ধরা পড়বে তা বুঝতে আর কারও বাকি থাকল না। বিজ্ঞানের ক্ষমতা যে কতখানি সে সম্পর্কে একটা প্রত্যয় গড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের পৃষ্ঠাতেও আরো ভালোভাবে বিজ্ঞানের কথা প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সেরা সেরা সাংবাদিকদের পাঠানো হতে লাগল বিজ্ঞানের খবর সংগ্রহ করার জন্য। জে জি ক্রাউথার ছিলেন এই সেরা সাংবাদিকদলের পুরোধা। সে সময়ের একাধিক যুগান্ত-কারী আবিষ্কারের প্রথম জনবোধ্য বিবরণ তাঁর কলম থেকেই পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৩৯ সালে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ। ততোদিনে বিজ্ঞান-বিষয়ক সাংবাদি-কতা ও লেখা রীতিমতো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার একটি লক্ষণ ছিল এই যে খবরের কাগজে বিজ্ঞানের লেখা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মনোভাবও বদলে গিয়েছিল। উচ্চস্থানে আসীন যেসব বিজ্ঞানী কুড়ির দশকে খবরের কাগজে বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখাকে অবজ্ঞা করতেন তাঁরাই এখন খবরের কাগজের প্রচার ও সমর্থনকে উচ্চ-মূল্য দিতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিজ্ঞানের বিষয়ে সাংবাদিকতা ও লেখার দাম আরও বেড়ে গেল। বেঁচে থাকার সংগ্রামে বিজ্ঞান হয়ে উঠল একটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

জে জি ক্রাউথারের 'ফিফটি ইয়ার্স উইথ সায়েন্স' বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞান-বিষয়ের অপর একজন কৃতী লেখক রিচি ক্যালডর বলেছেন, জে জি ক্রাউথার হচ্ছেন বিজ্ঞান লেখকদের মধ্যে একজন 'প্রবল-পুরুষ'। জে জি ক্রাউথার শুধু যে বিজ্ঞানের বিষয়কে জনবোধ্যরূপে প্রচার করেছেন তাই নয়, ভাবনাচিন্তা করেছেন বিজ্ঞান সম্পর্কেও—বিজ্ঞানের ব্যবহার, অপব্যবহার, অ-ব্যবহার ও সর্বোপরি তার সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কেও। মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করার সকল আন্দোলনে তিনি শামিল হয়েছেন। তাঁর লেখা বই—'সায়েন্স ইন মডার্ন সোসাইটি' ও 'দ্য সোশ্যাল রিলেসন্স অফ সায়েন্স'—এই আন্দোলনের সপক্ষেই যোগ্যুগান্ত।

—[illegible]

সুখ দুঃখ ফেলে এসেছি ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সুখ দুঃখ ফেলে এসেছি পথের উপর
তারা রোদে জ্বলে শীতে নিভে যায়
যাবার কিছু নেই হারাবার কিছু নেই জেনে
ফেরার কথা ভুলে যাই ফিরে ফিরে দেখার কথা মনে থাকে না
ফেলে আসা দিনগুলোতে আমার ঘর দরজার পাশে ফুটে থাকা
স্বর্ণ চাঁপা

অরুণ-বরুণ কিরণমালার ধ্রুবপদে বাঁধা আনন্দ
গ্রহণে নির্মাণে দানে প্রতিদানে মুখর দিনরাত্রির রত্নখচিত মোহময়
পরিচ্ছদ

খুলে রেখে এসেছি পথের উপর
নৈরঞ্জনার স্থির জলে অবগাহন কোরে এসেছি
বোধিবৃক্ষের ছায়ায়
আমি এখন পায়সান্ন গ্রহণ করবো
দীর্ঘ উপবাসে ক্লিষ্ট এই আমি
পায়সান্ন গ্রহণ করবো সুজাতা!

নিঃসর্ত দানে ভরে উঠুক আমার শূন্য ভিক্ষাভাণ্ড
আর আমি তা ফিরিয়ে দেবো তোমাদের
যাবার কিছু নেই হারাবার কিছু নেই জেনে
সর্তহীন ফুল ফোটাবার এই আয়োজন
নিঃস্ব হবার আয়োজন এই আয়োজন
তাই সুখ দুঃখ ফেলে এসেছি পথের উপর
তারা রোদে জ্বলে শীতে নিভে যায়

একটি সুবর্ণ নামে ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শান্ত নদীর ধারে
এক খন্ড অন্ধকারের উপনিবেশ
গড়ে ওঠে আশ্চর্য চমকে।
বিশ্রামের সামান্য অবকাশে
একটি সুবর্ণ নাম সেখানে
মুহুর্মুহুঃ হাসির আলো ছড়িয়ে দেয়,
আর আমি সেই আলোর নেশায়
অন্ধ আবেগে চুর হয়ে থাকি।

কবিতার রামধনু তখন আকাশে,
শান্ত নদীর বুকেও তখন
কবিতারই মৃদু মন্থর তরঙ্গমালা।
আর সেই সুবর্ণ নাম সে সময়
মুহুর্মুহুঃ অনবদ্য নৃত্য ভঙ্গিমায়
কবিতারই ছন্দে ছন্দে
প্রেমের বন্দনা গেয়ে চলে।
নীরব নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায়ও
বিবেকানন্দ ব্রীজের কোলে
অজস্র হাসির আলো ছড়িয়ে পড়ে,
আর সেই হাসির আলোর ঝর্ণায়
আমি প্রাণভরে স্নান করে উঠি।

ধ্রুবপদ ॥

প্রদীপ দাশশর্মা

কে কাকে ফেরাবে
দিনকে রাত্রি না রাত্রিকে দিন
কে কাকে ফেরাবে
জন্মান্ধের সান্দে ঝুলন্ত তারে দুলছে রাত্রি ও দিন
আনন্দ ও বিষাদ পাশাপাশি শুয়ে আছে
রক্তের নদীর উপর দিয়ে বহে যাচ্ছে একটি ফুল
এক বিপুল রমণ জ্বলছে তোমার খর মুখে,
উত্তাপহীন চোখ তবু অশ্রুতে বিপন্ন
ঘৃণা কাকে ঘৃণা
তুমি কি ঘৃণা দিয়েই ভালবাসা ফেরাবে
ভালবাসা কি তোমার শেষ নৌকা,
না, প্রথম উদ্ধার!

সুকনাশির

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পঁইত্রিশ)

ডেভিড চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় লছমীর কাজ। মেঘুকে লাইরে খাইরে শুনতে বসল ঘটনাটা। আদি অন্ত সব শুনে, সে মেঘুকে বোঝাল এতে এত ভয় পাবার আছে কি। এমন ধরনের কাজ তো মেঘু হামেশা করে থাকে। তার জন্য বরাব্দ মায়নাটাই যা পায় না। পদের নামটা যত গালভরাই হোক না কেন, কাজটা তেমন শক্ত লাগল না লছমীর কাছে। তার চাই জমাদারী, কলম কাটা, এমন কি পাতা তোলাও অনেক শক্ত। লছমী তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করে মাত্র। তখন তাকে হারাতে গেলে, তার কাছ থেকে জিতে আসার চেষ্টা করলে, অথবা তার মতামত খন্ডন করবার চেষ্টা করলে এমন অবস্থার সূচনা হয় যে, তাতে অপর পক্ষের হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রেও তার মতটা প্রমাণ করতে যে সব যুক্তি সে উদ্ভাবন করল তাতে সবাই হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল। অমন অবস্থায় অতক্ষণ থাকার পর, অতখানি হেসে মেঘু অনেকটা হালকা হ'ল। নিজে হালকা হ'তে সব কিছুই হালকা বোধ হ'তে থাকল। অতএব লছমীরই জয়।

এমন সময় একটা পাখী হকথক ক'রে ডেকে উঠল। সেটা শোনা মাত্র লছমী লাফিয়ে উঠল—তখনি নাকি খুব ঝড়-বৃষ্টি আসবে। বিলিকে নিয়ে সে চলে গেল বাইরে কাপড়-চোপড় তুলে আনতে। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে মেঘু তাকিয়ে রইল আকাশের পানে।

একটু পরই ঝড় গর্ভে নিয়ে এল মেঘ। আকাশটা কাল হ'য়ে গেল জমাট বাঁধা মেঘে। মুষলধারে নামল বর্ষাধারা। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো দমকা বাতাসের আঘাতে ভেঙেচুরে সৃষ্টি করল ঘন ঝঞ্ঝটিকা। বাতাসের প্রবলতার সঙ্গে ঝঞ্ঝটিকার ঘনত্ব কখনো বেড়ে যায় কখনো কমে যায়। কয়েকটা বজ্রপাতের পর ঝড়-বৃষ্টির আতিশয্য কিছু কমল। জল-বৃষ্টির [illegible] চলল নতুন মেঘ। সেইদিকে চেয়ে মেঘু

কত কি ভাবতে লাগল এলোমেলোভাবে। অনেকদিন পর সে যেন তেমন ভাববার সুযোগ পেল। ঝাণ্টার সঙ্গে ক্যাপসুলিটাও কেটে গেছে। মেঘুর দৃষ্টিও প্রসারিত হয়েছে বহু দূর পর্যন্ত। ভাবতে ভাবতে কখন বৃষ্টির ধারা বেয়ে তার চোখ দুটো নেমে এল নীচে—ঘর-বাড়ীগুলোর চালায়। এক-একটা টিপির ওপর সাহেবদের বাংলো, বাবুদের কোয়াটার, অগণিত কুলি-লাইন। বর্ষণ ধূসর বাতাসের ফাঁক দিয়ে একে একে সব চোখে পড়ল তার। ভারতবর্ষের নানা উপজাতির বসবাস সে-সব লাইনে। বাগানের খাতায় তারা মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা। এক দলের পূর্ব পুরুষ অতীতের কোন একদিন এখানে এসে পাকা পোক্ত হ'য়ে বসে গেছে। দেশ ব'লে কিছু নেই, অথবা এই তাদের দেশ এবং ঘর-বাড়ী। যদিও বংশপরম্পরায় প্রচলিত পিতৃপুরুষের গৌরবময় কাহিনীর সঙ্গে জড়ানো পিতৃভূমির স্মৃতির রেশ মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ইন্দ্রজাল বুনে থাকে, যদিও না-দেখা আত্মীয়ের কথা বলতে বলতে ব্যথিত হ'য়ে ওঠে তাদের চিত্ত।

লাইনের ঘরগুলো দু-রকম। পাকা দেওয়ালের ওপর টিনের লম্বা সেড—ঘর, ঘরের সামনে বারান্দা। খোপ খোপ ভাগ করা এক-একটা গৃহস্থের জন্য— বারান্দায় রান্না। জানালা আছে, কিন্তু তা খোলা দেখা যায় না। সেখানে যায় চালানী কুলিরা, অন্ততঃ তাদের বেশীর ভাগ: পাশের ঘরে ফুসফুসের ওঠানামাটাও গোপন থাকে না, কথা তো থাকেই না।

শুধু কি কথা! দেখেও কত। সকলের ক্লান্ত দেহ পড়ে থাকে সুখে, রাত্রির আশ্রয়ে। শ্রমজীবীর একমাত্র ভোগ্য সেই রাত্রি, যার কাটে উসখুস ক'রে তার কান খাড়া হয় পাশের ঘরের ফিসফিসানিতে। তারপর এগিয়ে যায় চোখ, দরজার ফাঁক দিয়ে চলে যায় ঘরের মধ্যে। চুলির মিটমিটে আলো, কিংবা অন্ধকার ভিতরটা। চোখ জ্বলে ওঠে দপদপ করে, দুটো দেহ ফুটে ওঠে চোখের সামনে। চিনে ফেলে বেশ। ওই জোড়াই তো প্রতি হাটে ওকে কিনে দেয় এটা-ওটা। কি খেলা! কেঁচোর মতো কিলবিল করে বাচ্চা-কাচ্চা, তবুও সাধ মেটে না।

ঘরের 'মটা' যায় আড্ডায়, হাঁড়িয়া পানে—মাইকীটা বসে থাকে আকণ্ঠ সোহাগ নিয়ে। সোহাগের ঢালাঢালি চলে। ভাদ্র মাস আর কাটতে চায় না সারাটা বছরে। ভোমরা এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, নেতিয়ে-পড়া ফুলটাকে সতেজ ক'রে তোলে।

ভীরু, সাবধানীরা কাজ সারে ফাঁকে-ফুরসতে আনাচে-কানাচে, ঝোপে-জঙ্গলে—সাহসী, আয়েশীরা ডেকে আনে ঘরেই। গোপন সুখের কথায় ফুলে ওঠে। এক বৌয়ের সঙ্গে আর এক বৌ ফুল-পাতিয়ে নেয়—ফোলাটা কমিয়ে নিতে, সুখের ওপর সুখের প্রলেপ দিতে। সুখের কথা সইকে বলতে আরো সুখ, সুখের জের টেনে রাখতে। আরো সুখ একের কথা অপরকে বলতে। হিংসাও মেশানো থাকে সেই সুখের সঙ্গে। মুখে মুখে চলে যায় কথা—তখনই বাধে যত গোলমাল।

কাচ্চা-বাচ্চা সব ঠাসাঠাসি এক ঘরে। মুরগী ছাগলও তফাৎ রাখার উপায় নেই জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে। একের হাঁস-মুরগী চলে যায় অপরের ঘরে। ওদের কাছে সব ঘর সার্বজনীন। মানুষ এতটা পারে না। তাই নিয়ে কত ঝঞ্ঝাট। ঘরে ঘরে যেমন ভাব, তেমনি ঝগড়াও।

কুঁড়েও আছে। খড়ের চালা, ছিটে বেড়া। জানালা নেই, ঝাঁপ বসানো দরজা। বেশ কিছু তফাতে এক-একখানা ঘর, সঙ্গে কাঠা কয়েক জমি। এলোমেলো ঘর-বাড়ী, বড় রাস্তার দুপাশে গলিঘুঁজির অন্ত নেই সে সব ঘিরে। আশে-পাশে খানা-ডোবাও থাকে—মশা মাছি, কীট-পতঙ্গের জন্মস্থান। অভ্যস্তরা চলে যায় হনহন করে, আগন্তুকের গোলক ধাঁধা। প্রতি গৃহস্থের এক-একখানা ঘর—তৈরি ও মেরামত সব বাগানের খরচে। কাঁচা ঘরের বাকী তিন ভিটেতেও ঘর ওঠে। নিজের দরকারে, সামর্থ্যে। অর্থ লাগে না। ঘর বাঁধার সব কিছু পাওয়া যায় বনে-জঙ্গলে। সচ্ছল সংসারে ঢেঁকির চালা, গোয়াল, ধানের মরাইও ওঠে।

কুলিদের ঘর-সংসারের সঙ্গে তুলনা ক'রে আরো কত ঘর-সংসারের কথা মেঘুর

মনে ভেসে ওঠে। বাবুদের কোয়ার্টারস, সাহেবদের বাংলো।

এ অঞ্চলে যখন তখন ভূমিকম্প হতে পারে। তাই এককালে দালান গাঁথার প্রথা ছিল না। তবুও কি সুন্দর নকসায় সে-সব ঘর-বাড়ী! যেমনটি দেখা যায় পাশ্চাত্য দেশের পুরানো শহরে ও গাঁয়ে। পৃথিবীর সর্বত্র এ-দেশের এমন অনেক কিছুরই মিল চোখে পড়ে, যা তত্ত্ববিদের টনক নাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন খাসিয়া পাহাড়ের মতো ঘর কর্ণওয়াল ও কেমব্রিজের গাঁয়ে, প্রাচীন রোম্যানদের সঙ্গে খাসিয়াদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সামঞ্জস্য, নেপালী শব্দ নেদারল্যাণ্ডে, সংস্কৃতের ব্যাপক মাতৃত্ব স্বীকৃতি।

ঘর-বাড়ীগুলোর ভিটে পাকা, নয়তো কাঠের পাটাতন। শালের খুঁটির ওপর ঢেউ খেলানো টিনের চালা। নানান নকসায় কাঠের বেড়া, নয়তো কাঠের ফ্রেমে বাঁধা ইক্রার (কঞ্চির মতো) দু-পাশে মাটির, বা বালি-সিমেন্টের প্লাস্টার। ইক্রার ওপর তেমনই প্লাস্টার করা সিলিং। রঙ করা ফ্রেমের মাঝে এক-একখানা চুন ধরানো ঝকঝকে পাটা। দরজা-জানালায় কাঁচের প্যানেল। সার্সি-খড়খড়িও থাকে বড় মানুষের ঘরে। এক-একজনের পদমর্যাদা অনুযায়ী এক-এক ডিজাইনের বাংলো। সামনে ফুলের, পিছনে ফলের বা সবজির বাগান। সৌন্দর্যবোধ ও সাশ্রয়ের সমন্বয় এটা। যেমনটি দেখা যায় জাপানে ও ইউরোপের প্রায় সর্বত্র।

কোন কোন বাড়ীতে পাকা দেওয়াল, খড়ের চালাও থাকে। সে সব সাহেবদের। খড়ের চালা প্রায় উঠে গেছে, যদিও গ্রীষ্ম-কালে বড় আরামদায়ক সেটা। কিন্তু, সেখানে হয় কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ও পাখীর বাসা। আর ওদের জন্য আসে সাপ।

এসব ঘরের সঙ্গে কতখানি পার্থক্য ঐ কুলি বস্তির ঘরগুলোর। আশেপাশে জমিও আছে, নেই তা ব্যবহার করবার বোধ শক্তি। ফুল তো দূরের কথা সবজিটাও বিরল। এরাই একখানা কুঁড়ে ঘরের আঙিনায় তারা পিতৃভূমির স্বাদ পায়। এখানকার বাড়ী-ঘরে, পথেঘাটে, গাছের মাথায় তাদের পিতৃপুরুষের কোন না কোন স্মৃতি জড়িত। কাজের অবসরে মালিকের দেওয়া একখণ্ড জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে আসছে কোন না-জানা দিন থেকে। কিন্তু এখানকার কাজে ছুটি হ'লে তার সবই শেষ। অবশ্য গুরুতর অপরাধ না করলে তা হয়ও না। চা-বাগানের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ এদের চোখে পড়ে না, পারেও না। সব দেশে, সব শ্রমজীবীরই প্রায় তেমন অবস্থা। যে কয়লার বস্তা ঘাড়ে নেয় সে আলুর বস্তা পছন্দ করে না। তাই দরকার হলে চলে যায় আর কোন বাগানে, শুরু হয় নতুন জীবন। কচিৎ কখনো কেউ ছিটকে পড়ে অসমীয়া গাঁয়ে ব্যক্তিগত কারণ বশতঃ, ধীরে ধীরে মিলে-মিশে লুপ্ত হ'য়ে যায় নীচের স্তরে।—নানা জাতের সংমিশ্রণে, মেলামেশায় কুলি-দের আচার-ব্যবহার যেমন বদলেছে তেমন কথার সঙ্গে মিশে বিকৃত হ'য়ে আছে বহু ভাষার শব্দ—বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া আরো কত কি।

আর একদল চালান হ'য়ে আসে কোন কোম্পানীর মারফৎ তিন বছরের মেয়াদে। মেয়াদ শেষ হ'লে বাগানের খরচেই তাদের পাঠিয়ে দিতে হবে দেশে। চুক্তি ভাঙলে আসাম এমিগ্রেশন অ্যাক্টের হুমকি। মন-মেজাজ বসে গেলে, এক-আধ টুকরো জমি-জমা পেলে কেউ বা থেকেও যায় স্থায়ীভাবে। এদের আচার ব্যবহার, ভাব-ভাষা নিজস্ব। সামাজিক ও বাচনিক পরি-বর্তন বিরোধী এদের মন, অথবা এত মন্থর যা চোখে পড়ে না।

বৃষ্টির তোড়টা কমে এল। সেই সঙ্গে মেঘুর নিরবচ্ছিন্ন ভাবনায়ও ব্যাঘাত ঘটল। মেঘুর ঘরে ডেভিড সাহেবের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ে বস্তিতে। তাই নিয়ে ঘরে ঘরে অনেক অনুধ্যায় হ'য়ে গেছে ঝড়-বৃষ্টির সময়। এক-একজন, এক-একরকম আন্দাজ করে, কোনটাই মনে ধরে না। সৃষ্টি হয় একটা সাংশয়িক কৌতূহল, বৃষ্টি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সেটাও বেড়ে ওঠে সকলের মনে। বৃষ্টিটা একটু কমে যেতে পাড়ায় প্রৌঢ় আর বুড়োরা ঝাঁপি মাথায় বেরিয়ে পড়ল। একে একে জমায়েত হ'ল মেঘুর ঘরে। লছমী তাদের খাতির ক'রে বসাল মেঝেতে, পান তামাকও দিল: বিলি আর মেঘুও এল তাদের ভয়সংকুল কৌতূহলী চোখের সামনে। নিগা সর্দার অনাড়ম্বরে জানতে চাইল ডেভিড সাহেবের আসার কারণটা। এপক্ষের হ'য়ে কথাটা লঘুভাবে ব্যক্ত ক'রে লছমী।

পদোন্নতি! মেঘুর? বেশ বেশ। সবাই হতভম্ব, আশ্চর্য! সবাই খুশী। মেঘু এতবড় কাজ পেয়েছে? তবে তো বাগানটাই বুঝি এসে গেছে তাদের হাতে। এবার তো তাকে শুনিয়ে-বুঝিয়ে দিতে হবে সব কথা, তাদের ওজর আপত্তির সকল কথা। লছমীর নিজের যে ধারণাই হোক, ওদের বিস্ময়টা সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করল। সকলের অমন সব কথায়, তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মেঘুর কাজটার বিষয় সে নতুন ক'রে ভাবতে লাগল। আগে সে জিতেছিল, এবার সে হারতে শুরু করল মনে মনে।

সকলের মনে জেগে উঠল নতুন পুরানো যত কথা, এলোমেলো অগোছাল ভাবে। বলতে বলতে ভুলে যায়, ভুলতে ভুলতে মনে হয়। শুনতে শুনতে শুধরে দেয়—কেটে দেয়, জুড়েও বা দেয় কেউ। কে কবে এখানে এসেছে, এসেছে কার বাপ-ঠাকুরদা। থেকে গেছে স্থায়ীভাবে, অথবা থাকতে বাধ্য হয়েছে। আইনের রক্ষা-কবচ তখনো তৈরি হয়নি তাদের জন্য। জেনে বা না জেনে ঢুকে পড়েছে, তাতেই জীবন বিকিয়ে দিয়েছে বাগানের মালিকের কাছে। সেই দাসত্বের জের তারা টেনে চলেছে পুরুষ পরম্পরায়। একখানা ভিটে, একখানা চালা, একটুকরো খেত-খামারের মাটি ভোগ ক'রে আসছে বটে বাপ-দাদার আমল থেকে। কিন্তু, সবই দাসত্বের বিনিময়ে। দাসত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা। যদি—যেদিন দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন হবে, সেদিন নেমে যেতে হবে পথে ছেলেমেয়ের হাত ধরে। যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হবে সরকারী সড়কে। মাথার ওপর থাকবে শুধু মেঘের সামিয়ানা। মুক্তি চাইলে এমনিভাবে দিতে হবে তার মূল্য। এই গতিশীল জগতে দাসত্বের এমনই স্থিতিশীলতা। নিজের বাসভূমে এক দুর্ভিক্ষের দিন অন্নের সংস্থানে, অর্থের সংস্থানে এখানে ঢুকে বসেছে, আজ অর্থাগমের কত রাস্তা খোলা, কিন্তু এমনই কাজ তারা শিখেছে যাতে অকর্মণ্য হ'য়ে গেছে অন্য কাজে। তাতেই পায়ে বেড়ি বাঁধা হয়েছে। একদিন অর্থের লোভে অন্ধের মতো, অবোধের মতো এখানে এসে-ছিল, আজ চোখ খুলে গেছে—এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু তা হবারও উপায় নেই।

সবই নিয়মে বাঁধা এ সংসারে। এই নিয়মের কাছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ, বিলুপ্ত। মনের সকল ইচ্ছাঅনিচ্ছা পেষাই হ'য়ে গেছে যান্ত্রিক নিয়মের কাছে। প্রতি-দিন সকালে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই যন্ত্রটার সামনে। সুখ-

দুঃখের কোন আবদার চলবে না। কোদাল কাটারি নিয়ে যেতে হবে কাজে—শরীর বইছে না, মন টানছে না, তবুও। নয়তো দাঁড়াও ডাক্তারের সামনে। নাড়ি তো চলছে, গায়ের তাপও ঠিক আছে! মিলবে না ছুটি। তাপ যেন শুধু শরীরেই হ'য়ে থাকে, নাড়ী জমাট না বাঁধলে যেন শুয়ে-বসে থাকে না কোন মানুষ! নয়তো শুয়ে-বসে থাকতে নেই শুধু তাদেরই। মনের বিকার তাদের জন্য নয়। তাদের দেহের, মনের আঘাত অপমানের কথা বড় একটা যায় না আদালতে, গেলেও তা প্রহসনের মতো। আদালত যেন বিমুখ তাদের প্রতি। সেখানে সাক্ষীর ওজন নেওয়া হয়। একপক্ষ দরিদ্র, নিরুপায় তার কি আর সাক্ষী থাকে—অপর পক্ষ ধনী, ত্রিভুবন কাঁপে যার দাপটে! আদালত বুঝিবা খাতির করে আদালতের মতো। দুঃখীয়ার সাক্ষী পাল্টা অভিযোগে সাজা পাবে, হয়তো জেলের মধ্যে থাকবে আজীবন।

এমন একদিন ছিল যেদিন শাসকের সামনে দাঁড়ালে কি হবে, না-হবে ভারতে পারেনি কেউ। সারাটা দিন-রাতের মধ্যে তাদের যা কিছু হ'তে পারতো, হয়েছেও। শাসক! হাঁ, শাসক। নবাব-বাদশা তারা দেখেনি। কিন্তু সেই বাদশাহী প্রথার অনেক কিছু চর্কি ঘুরে গেছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে, সমাজের ওপর দিয়ে।

এমন কত কথা তাদের মনে হ'ল—একে একে ব'লে গেল মেঘুর সামনে। বিলি, লছমী ও রাবণের সামনে। একপাশে গুম হয়ে বসেছিল নিগা সর্দার। বয়েসের সঙ্গে সামর্থ তার গেছে, গেছে সর্দারী। আছে শুধু নামটা জীর্ণ-শীর্ণ শোক-তাপ-ক্লিষ্ট দেহের খাঁচাটা আঁকড়ে। দুঃখদগ্ধ কত না স্মৃতি জড়ানো-জমানো আছে সেই শীর্ণ বুকের পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সে শুনছিল সব কথা। শুধুনো হাড়ের পাতলা ঢাকাটা ফুলে ফুলে উঠছে ওদের সকলের কথার সঙ্গে। কথা পান করে করে নেশায় ভরপুর সে। হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে সে বললে—উ' সোব পুরনা বাত কোহে কি হোবে! আবে খাটে খাটে জান খতম করলি তো কি হোইলো? লেড়কা-লেড়কী নাই ছিল তো, আবে কোন খাবা দিছিল? আবে যেতনা বন্দি বাত নিকালছে—এড়ি দি উ' সোব। নওতুন বাত নিকাল। পুরনা কহানী কি জানছিলি তুঁরা? কেতনা শুনবি?

পুরানো কথা বন্ধ করতে গিয়ে নিজেই তা শুরু করল। তারই উপসংহারে নিগা পত্তন করল আর একটার। বললে—সাক্ষী! সাক্ষী চাস? সাক্ষী তো নেই বাবা। এই বুড়োর বুকের ভিতরটা দেখ—সব সাজানো আছে থাকে থাকে। এই সুবর্ণশির নদীর বুকে, বাগানের ঝোপে-জঙ্গলে, মাটির নীচে দু-দশটা নরকংকালও দেখাতে পারি। আর ঐ জঙ্গলের মধ্যেও একখানা। ঐ জাঁর (অশ্বত্থ জাতীয়) গাছটার তলায়, পাঁচ ফুট মাটির নীচে ছ-ফুট দু ইঞ্চির একখানা হাড্ডি। আমার বাবার।

উপস্থিত জানা না-জানা সকলেরই বুকের ভিতরটা এক অনির্বচনীয় বেদনায় পাক খেয়ে গেল। মেঘুও চমকে উঠল। বললে—তোর বাবার। কত কথা শুনেছি, কিন্তু সেটাতো শুনিনি কখনো।

দুবা-সর্দারের ছেলে নিগা-সর্দার হাতটা তুলে ধরে বললে—পাঁচ কুড়ি বছরের পুরানো বাগান বাবা। ক'টা কথা আর জানে সবাই। এই বাগানে আমিই এখন সকলের চেয়ে বুড়ো, আমার বুকের মধ্যে সবচাইতে বেশী জ্বালা। এতদিন পর একজন পেয়েছি। তোর কাছে সকল কথা বলে যাব। কত বাবু এখানে এসেছে, ছোকরাগুলো তাদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে। কত বলেছি—ওরে হারামি ওদের সঙ্গে, ওদের চোখগুলো শিয়ালের মতো। কিছু হবে না ওদের দিয়ে, শুধু গোলমাল করে যাবে। ভুগব আমরা। ক্ষেপে উঠেছে আমার ওপর—উঃ, চুপ থাক বুড়া! ভাল ভাল বাবুর নামে এমন কথা বলবি তো মাথা ভেঙে দেব।

আমি বলেছি—তা ভাঙ। এই বুড়োর মাথাটা আজও যে ভাঙা যায়নি সেটাই তো অবাক কান্ড! —হঠাৎ গায়ের চাদরটা নিগা খুলে ফেলল। এই দেখ। বলে, মেঘুকে দেখিয়ে দিল নিগা তার গায়ে মাথায় কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন, তার বিজয় টিকা। নানা কারণে মালিকপক্ষের বিরোধিতা করে এক-এক সময় যেমন পেয়েছে, ফিরিয়েও দিয়েছে তেমন। মরেনি তবুও। তাকে তাড়ানোও যায় নি। তার পিছনে তখন বাগানের সমস্ত কুলি। ভয়হীন, সাহসী সে, চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছে। কখনো রণে ভঙ্গ দিতে শেখে নি। তাই না বলেছে—যদি পারিস নিজেরাই বুক ফুলিয়ে দাঁড়া। পরের বুদ্ধিতে নেচে উঠিস না। ছোকরাগুলো বলেছে—বুদ্ধি থাকে বিদ্যায়। আমাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধিও নাই। কি দিয়ে আমরা সাহেবদের সাথে লড়ব! তাইতো নেতাদের পিছনে ঘুরি।

বলেছিলাম—বাবা, বুদ্ধিটা বিদ্যার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। আর লড়াই করতে চাই সাহস। তা যদি থাকে তো সবাই মিলে একবার দাঁড়া দেখি আমার সামনে।

সবাই টিটকারি দিয়ে উঠল—বুড়ো পাগলা হয়েছে, নেতা হতে চায়। হুঁঃ! নেতা না ন্যাতা!

আমায় নেতা দেখাল বেটারা। জানে না একদিন আমার হুকুমে হাজার হাজার লোক উঠত-বসত। ওরা আমার বুদ্ধি নিল না। কিন্তু দু-দিন পরেই টের পেল সব—পাগলা কে? পকেট বোঝাই করে বাবু চলে গেল—আমাদের মাথার ওপর ঘুরে বেড়াতে থাকল লাঠি আর বুকের ওপর চড়ল শাসনের চাকা। তখন তো এই বুড়োকেই দরকার হয়েছিল। রক্ষা পেল সব, কিন্তু আবার ভুলে গেল। আবার নতুন রূপে নিয়ে আর এক বাবু এল—সেই শিয়াল! ছুটল তার পিছনে আমাদের ছেলেরা, তারা কি করে চিনবে সে সব লোক? কি সব ঘষা-মাজা কথা! পাগলা না হয়ে উপায় আছে, এই সব মুরুকখু দুঃখীয়া ভেড়ার পালের।

যে বাবুর কথা ওঠে তার সঙ্গে সোময়ার ছিল বেশী খাতির। তারই ওপর বুঝি কটাক্ষ হল সেটা! সে ফুঁসে উঠল—কি! আমরা ভেড়ার পাল?

—ভেড়া নয়তো কি? বলে তেড়ে উঠল নিগা। বয়েস বুদ্ধির সঙ্গে ক্ষমতা কমে আসে। কিন্তু নিগা এখনো কম যায় না।

তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে মেঘু মিটিয়ে দিতে বললে—আরে ঝগড়া করিস কেন? শুনতে দে না ওর কথা, তুইও বলিস পরে।

—আবে উ' জানেছে কি? যে কহিবেক।

—আঁ—ঃ উ' সোব জানেছে। সময়া গজগজ করে ওঠে।

—নাহি তো কি? তুঁর বাবুটাকে রাঁচি যাতে নাই কহিলি কিনো? যিখানে চাইর পুইসা বাচ্চা, আট পুইসা মাইকী আরু চারি আনা মটা (পুরুষ) দিন
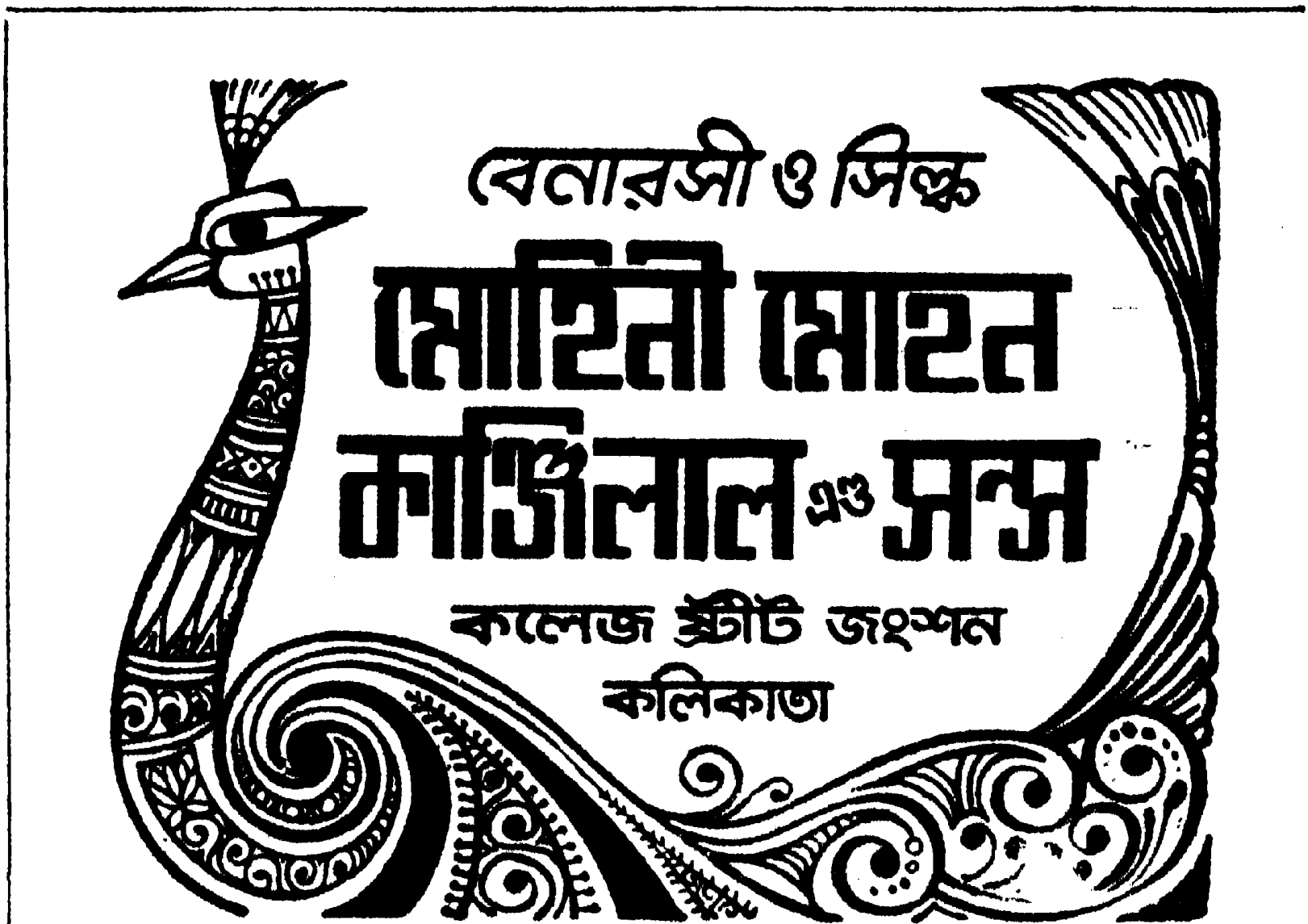
ভোর কামলা খাটে। তভি ভি কাম নাই মিলছে—নিজে হামে দেশ গেইছিলি, তো দেইখে আসেছি রে মেঘুয়া।

—তু' কহে নাই দিছিলি কিনো রে?

—আবে হামে কেনে কহে দিবে রে? তু'র বাবুটা দুঃখ ঘুচাকা আইছে, তো চু'ইরে নাই লিছে কাহে? উ'খনে পু'ইসা নাই রে, কেনে যাবেক?

—বোড়ি পু'ইসা দেনেওয়ালা!

বড়াই জিনিসটা থাকে মানুষের মর্যাদার মজ্জায়, ক্ষমতাও রাখে। ব্যক্তির, পাড়ার, গাঁয়ের, জাতের ও সকল মতবাদের লড়াই হয় তারই ওপর। সেটা কেমন সুন্দর মর্তকে স্বর্গ থেকে পৃথক করে তো রাখেই, তার ওপর স্বর্গেও বিভেদ সৃষ্টি করে। নারদ মুনির সালিসী না থাকলে স্বর্গটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সকল দ্বন্দ্বের শেষ হত। মর্তে তেমন কেউ নেই বলে সেটা ভেঙ্গেই চলেছে।

তবে এখানে অন্ততঃ মেঘু আছে। সে আবার দুজনের মাঝে পড়ে তাদের থামিয়ে দিতে বললে—আঃ! কাইজা (ঝগড়া) কথা বাদ দি না। তু' বাবুটা-কথা বল্ না রে।

—হাঁ-তো, কহিছি তো — ওত্না দরদ, তো খেতি-কাম-করা মানুষগুলাকে নাই দেখছে কেনে! এক জানেছে কারখানা! তো কইলা খনি নাহি গিলো কেনে রে বাবুটা?

সিখানে তু'র ছোলিটা থাকল যে রে। ব'লে, সোমুয়া মাথাটা এক ঝাঁকানি দিল। এবার খুব জব্দ করেছে নিগাকে।

—হাঁ, সি খাতিরে তো জানেছি সোব গুমর। হাঁ-রে মেঘু! হামার লেড়কাটা তোখন যোয়ান হোইল তো, এক ছুকরী ভাগায়ে পালায়ে গেইল একদম ঝরিয়া। আবে চোরাই কা রুপেয়া খতম তো কি খাবি! চু'ইকে গিলো কইলাখনি। দিনভর এক ডাবা মাল ভাংগে বুঝাই করকে ভাংগে, গিলো কলিজা। কেতনা দুঃখ পায়ে ফিন পলায়ে আসি ফিরলো ঈখানে। আবে ঈ'-রোকম আরাম কাঁহা পাইবি?

—হাঁ, উ'ই তু'র গা-ভিতরে আরামটা চু'ইকে আছে।

মেঘু বাধা দেয়—আঃ, আবার।

নিগা বলে—হাঁরে বেইমান, উ' বাত তো এখুনে কহিবি। তু'দের খাতিরে লড়াই খাটি হামার পিলসনটা (পেনসন) মার গিলো, নাহি তো দামুয়া রোকম পাই গেলি হয় পিলসন।

তর্ক করে তো সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সোমুয়ার আর জবাব নেই। তবুও সে হোঁস-ফোঁস করতে থাকল। মেঘু কথাটা ঘুরিয়ে দিতে বললে—সি বাবুটা কি হোইলো।

—আবে কি হবেক! শহরে ভাল নোকাড়ি হোইলো।

—নোকরি হোইলো? এক বাবু পাকিট বোঝাই কোরল, আউর এক বাবু নোক্রি নিল?

—আবে এ্যাইসা কেতনা হোইছে। মেঘুর পানে তাকিয়ে ছলছল চোখে নিগা বললে—আরে বাবা! কেউ সত্যকার দরদ নিয়ে আসে না। আমার দুঃখ ঘোচাতে আমি জান কবুল না করলে, দোসরা আদমির কি দায় কেঁদেছে?

তর্কাতর্কির ধাক্কা লেগে কথাটার মোড় ঘুরল বটে, কিন্তু মনের অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল জান কবুলের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নিগা বললে—উঠতি বয়েসের বোনটাকে যেদিন ধরে নিতে এল—বাবা রুখে দাঁড়াল। মাথায় বসিয়ে দিল এক লাঠি। অমনি ছ-ফুট দু-ইঞ্চি দেহটা গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দেখতে চাস? চল মাটি খুঁড়ে দেখিয়ে দেব। কিন্তু লাঠির ঘায়ে জখমি মাথাটাকেও যেতে হল মাটির নীচে—ঐ কবরখানার মধ্যে আছে।

—মরে গেল সে!

—মরবে না! তাই তো বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা আছে একটু। তা নইলে কি আজ তোর সঙ্গে কথা বলবার জন্য বেঁচে থাকতাম রে! সেই থেকে একটু একটু করে দিন বদল হতে থাকল। — তবুও আমার মেয়েটার ওপর এদিন নজর দিতে এসেছিল একজন। সাহেবটা নতুন। খাড়া হয়ে বললাম—জান না আমি কার ছেলে? আমার বাবার নাম দুবা-সর্দার। দুর্বাশা! যার লাঠির ঘায়ে প্রাণ হারিয়ে মখমল (ম্যাকসওয়েল) সাহেবের দেহটা ঐখানে চাপা আছে।

নিগার জীর্ণশীর্ণ দেহটা ফুলে উঠল, চোখ দুটো জ্বলতে থাকল।

—ম্যাকসওয়েল সাহেব! যার নামে ঐ ক্লাবটা?

—হাঁ, ওটার নকসা সে করে দেয়, তাই তার নামটা থেকে যায়। নতুন সাহেবটা চমকে উঠল। বোধ হয় শুনে থাকবে সব কথা। বোনটার কথা নিয়ে বিলাত পর্যন্ত লিখালিখি হয়ে গেছে। একটা সাদা লোক গেল যে রে! বিলাতের কোম্পানী সাহেব (ডিরেকটর) তখন এসেছিল গটফি (গেটফ্রিড) সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে।

—আমাদের এই গটফ্রিড সাহেব?

—হাঁ, আমি বড় সাহেবের কাছে ছুটে গেলাম, নালিশ দিলাম। হুজুর মা-বাপ। আমাদের জান-প্রাণ, মান-ইজ্জত সব তোমার হাতে। তা যদি যায় তবে আর এ-প্রাণ নিয়ে কি করব! তোমারও নাম থাকবে না। গটফি সাহেব সব বুঝল—আমার মেয়েটাকে সরম করে বকশিশ দিল, পরে নতুন সাহেবটাকে বিলাতে চালান দিল। সেই থেকে মান-ইজ্জত নিয়ে আছি। তারপর থেকে যত সাহেব আসছে সব ভদ্দর।—কাজ তো আমরা সব করে রেখেছি রে। তোরা এখন আর কি করবি? ধান-চাল মাপবি, দুটো পয়সা হাজিরা বাড়াবি, আর কি করবি? আরে ও সব তো এমনি হবে। জানিস না বড় বড় শহরে বাবুরা, সাহেবরা মিলে মিটিং করে। শুধু শুধু এখানে হৈ-হল্লা করে ভাল সাহেবটার মন ভেঙ্গে কি লাভ? চাকা ঘুরে গেছে। আমরা যা পাই তার জন্য অনেকে হেঁদিয়ে মরছে। সে সব তো বেটাদের চোখে পড়ে। তবু এখন দশটার ওপর আমরা দশ হাজার মিলে জুলুম চালাচ্ছি। আমরা চাই কোন মতে পয়সাটা। কেউ তা দেবে না, দিতে পারে না। দেখছিস না সব ভাল ভাল সাহেব-কোম্পানী বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যারা আসছে তাদের সঙ্গে তোরা পারবি না। যখন বুঝবি পেরেছিস, তখন দেখবি সব শেষ হয়ে গেছে। নিজেদের পায়ে কুড়াল দিচ্ছিস ওদের তাড়িয়ে। ওরা কাজ করিয়েছে, শাসন করেছে, পয়সা দিয়েছে। এখন কেউ শাসন করে না, শাসন করতে চায় না, জানেও না। তাই তো আমাদের ঘরে এত গোলমাল, কেউ চোখ দেয় না সেদিকে। দশটা বাগান ঘুরে দেখে আয়। দেখবি, এখন চাই কাম আর চটপটে লাভ, এ যেন জুয়া ফটকা।

—এত খবর তুই কোথা পাস?

—হাঁরে বাবা, মিছা বলি নি। আমার ঘরে দশ-বাগানের কুটুম-বন্ধু আসে, তারা সব বলে যায়। আমাদের সময় নানা দুঃখ-দৈন্য নানা ঝঞ্ঝাট ছিল, তাই আমাদের চলতে হয়েছে তেমনিভাবে। আজ আর অত নেই। তবু আজকালকার ছোকরা-গুলো সব দিক দিয়ে গোলমাল করছে। সাহেবদের ভিতর যতটুকু দোষের ছিল তা আমরা দূর করলাম, তাদের ভাল করলাম। আর ভাল লোকগুলোকে এখন চলে যেতে হচ্ছে। রামের দোষে তোরা এখন শ্যামকে ধরে জবাই করছিস। খবর নিয়ে দেখ না কাছাড়ে কি হল? ডিব্রুগড়ে, জোরহাটে, জলপাইগুড়িতে কি হল? কটা সাহেবকে কচুকাটা করা হল। কি তাদের অপরাধ? জুলুম মাফিক কাজ করতে পারে নি। তোদের কথা শুনলে তাদের চাকরি থাকে না, কারবারও বজায় থাকে না—জুলুম বজায় না রাখলে জান যায়। তারা মরদ বটে, তাদের সাহস আছে, তারা জান দিল। তোদের কি হল? কি হল তা বুঝল যখন পেটে হাত পড়ল। বাগানের কোন বেটা না জানে, যে এক রাউণ্ড পাতা না তুললে সর্বনাশ হয়ে যায় বাগানটার। আমরা জান নিয়েছি, জান দিয়েছি, কিন্তু বাগানটা বজায় রেখেছি। এখন সব গেছে আনাড়ীর হাতে। তাতে আরো গোলমাল বেড়েছে। তোর কটা কথা বলব! ধর না একটা, যারা এত বড় রাজ্য চালাচ্ছে তারা যদি একটা নোটিশ লিখতে না জানে—তবে তোরা কি করবি, মালিকরা কি করবে, যারা জান দিল তারা কি করবে?

—নোটিশ লিখতে জানে না?

—হাঁরে হাঁ। নোটিশ দিল ফলনা মুলুকে ফলনা টাকা হাজিরা দিতে হবে। আগের কাজ, আগের নিরিখ বদল হবে না। সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টার বেশী কাজ করাতে পারবে না কুলিদের। তোরা ধরলি আগের নিরিখ—মালিক ধরল দিনে আট ঘন্টা কাজ। লাগল গোলমাল। কাজ বন্ধ, হুটোপুটি, মারামারি, কাটাকাটি, পুলিশ-মামলা। আজকাল আর মালিক সাহেবরা কোন মামলা চাপা রাখে না। কত কত মামলা করবি। আমাদের দিনে কত কাণ্ড হয়েছে, কিন্তু পুলিশ-কাছারির মুখ দেখে
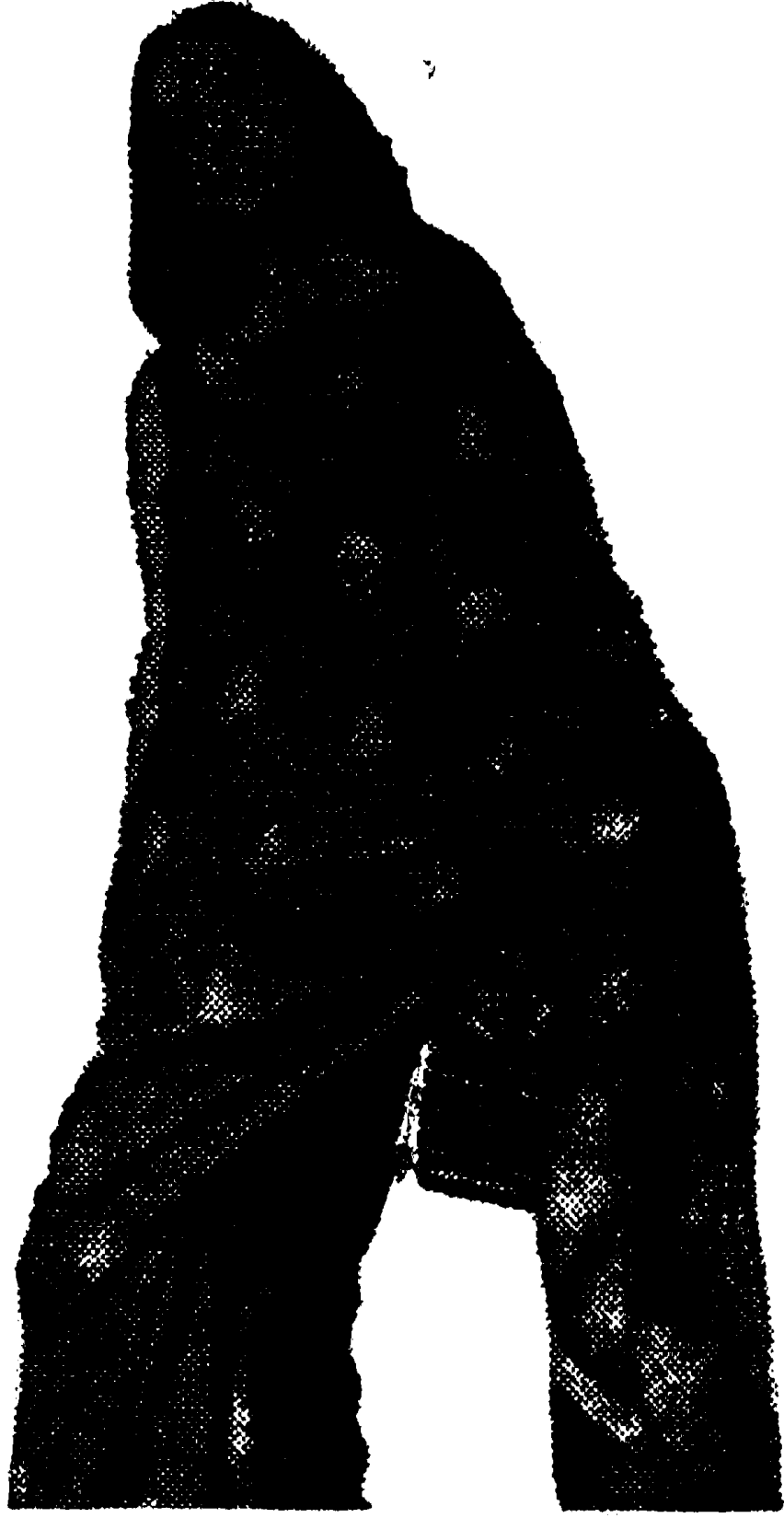
নি কেউ। তাতে সুবিধা, অসুবিধা দুটোই ছিল বটে, তবুও বলব, সে অনেক ভাল ছিল। ধর আমার কথাটাই বলছি। যখন বাবা একটা মারল নিজেও মরল, তখন সেটা যদি আদালতে যেত তবে আরো কয়েকটাকেও যেতে হত, অন্ততঃ আমার ছাড়ান ছিল না কোন মতে। বাবার সঙ্গে আমি যাই তাতে দুঃখ ছিল না, আমার মাইকীটার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কি দুর্গতি হত! আর সকলে কি বিপদে পড়ত। কিন্তু কোম্পানী সব গুম করে দিল। যাদের মাটি খাবি, যাদের কাজ করবি, তাদের সঙ্গে গোলমাল করে ক'দিন থাকবি? আজ কিছু সুবিধা করে নিয়ে ধেই-ধেই করে নেচে উঠবি, কাল কোন একটা দোষ ধরে তোকে বার করে দেবে। সত্য কথা বলতে গেলে, সেদিক দিয়ে কোন বাগানেই তার ঘাটতি নেই। তেমন করলে তোর ক্ষমতা আছে আর এই মাটিতে বাস করবার? আইন আছে তোর পক্ষে?

নিগা পুরানো পোড় খাওয়া লোক। সে-যুগের সঙ্গে তুলনা করে সে স্বর্গ রাজ্যে আছে। তাই তার কথার ধরনও তেমন। এখনকার ছোকরাদের সঙ্গে তার, বা তার মতো লোকের, বনিবনা হয় না। তবুও যে সারতত্ত্ব তার মনের মধ্যে বসে গেছে তা সে ব'লে যায় সময় বিশেষে।

নিগার কথায় সায় দিতে গিয়ে মেঘু ধোঁকায় ফেলে দিল নিগাকে। মেঘু বললে—যা বলেছিস। তবে দেখ, এর ভালমন্দ দুটো দিকই আছে।

—কি রকম? এইটুকু ব'লে, নিগা থমকে গেল। তার চোখ দুটো ছিটকে পড়ল মেঘুর ওপর।

—মাটি-বাড়ী পেলি, বাগানের কাজ করলি—তোরও চলে গেল, বাগানও বজায় রইল। তুই কাজ ছেড়েও বাগানে থেকে গেলি। কাজের জন্য নতুন কুলি এল, তাদের রাখে কোথা?

এতক্ষণ নিগার কথাটা চলছিল এক-ভাবে, এবার ধরল অন্য রূপ। সে গরম হ'য়ে উঠল মেঘুর কথায়। বলল—আমার বাপ কাজ করেছে বলে আমার নাতিকেও কাজ করতে হবে! তা না করলেই সব ছেড়ে চলে যেতে হবে! বল, কোন দেশে এমন নিয়ম আছে? কেন অন্য জমিতে তাদের বসিয়ে দিক।

—সব বাগানে তো আর এত বেশী জমি থাকে না। ছোট বাগানগুলো যে মারা যায় তবে। নিয়ম তো এক রকম হওয়া চাই।

কথাটা তুলে নিগা কি মুশকিলেই পড়ল। সেটার মীমাংসা না হ'লে তখনি বুঝি তাকে মাটি-বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। লাঠিটা মাটিতে ঠুকে নিগা বললে—নিয়ম যদি বললি, তবে বল—কোন জমিদারের ক্ষমতা আছে, তিন পুরুষ পর মাটি থেকে দখলকারকে উৎখাত করে?

মেঘু হেসে উঠল। নিগার কাঁধ দুটো ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—এটা জমিদারি নয় যে রে। এখানে সবাই আছে বাগানে কাজ করবার জন্য। তাদের কাজ দিতেই হবে, ঘর, ওষুধপথ্য ও নিয়মিত সব সুবিধা দিতে হবে। চাষের জমি দেওয়া না-দেওয়া মালিকের মর্জি। কোন কোন বাগানের সঙ্গে জমিদারি থাকে, সেখানে প্রজাও থাকে। তারা খাজনা দেয়, বাগানে কাজ করবার কোন বাধ্যকতা নেই তাদের। কাজ করলে তারা শুধু হাজিরা পায়, তোদের মতো আর সব সুবিধে তাদের প্রাপ্য নয়। অনেক বাগানের পাশে বস্তি আছে। আজকাল অনেক বস্তির লোক বাগানে নিয়মিত কাজ ক'রে মালিককে খুশী করতে চেষ্টা করে—তোদের মতো সুবিধে পাবার জন্য। এ-সব তো তোরা জানিস।

খন্ড খন্ডভাবে সব নিয়মই নিগার জানা, সকলেরই জানা, কিন্তু সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তার বিরুদ্ধে মনটা বিষিয়ে আছে অনেক দিন থেকে। সুবিধের আঠারো-আনা বুঝে নিতে চায় সবাই, অসুবিধের এক-আনাতেও মন মানে না। মোট কথা কাজ না করেও যেন ভিটে না যায়। এমন ভূমিদ্বীপে বিনা কাজে জীবন-ধারণের আর কোন উপায় নেই, সেটা বুঝলেও তর্কের খাতিরে চোখ বুজেই থাকে। তাই কথাটা নিগা বুঝল, কিন্তু এত সহজে তর্কটা ছেড়ে দিতে চাইল না। বিশেষ ক'রে তর্কে প্রবৃত্ত হ'য়ে তার আশঙ্কাটা প্রবল হয়ে উঠল। সে বললে—যদি রুখে দাঁড়াতে পারিস তবে দেখবি—এমন একদিন আসবে যেদিন এখান থেকে কেউ আমাদের উঠিয়ে দিতে পারবে না। একদিনে এতটা হয় নি। যা হয়েছে তা আমরাই হইয়েছি। বাইরে থেকে কেউ এসে করে দিয়ে যায় নি, যাবেও না। আমি তা বিশ্বাস করতে পারব না।

কথাটা বাড়িয়ে এক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি না করাই ভাল। তাই একটু ভেবে সে অন্য কথায় গেল। বলল—আজকালকার ছোকরা-গুলো শুধু নাচ-গান নিয়েই পাগল। আমাদের পুরানো দিনের কথা, দুঃখ-কষ্টের কথা কেউ শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না। তুই ছেলেটা তেমন নয়। তোর কাছে বললে প্রাণটা ঠান্ডা হবে। তবে শোন :

—সাহেবরা যখন এখানে বাগান করতে আসে, সেদিনের আসাম কি ভীষণ জঙ্গলে-ভরা চারদিক! হিংস্র জন্তুজানোয়ারে ভরা। দিনেও ঘরের বাইরে যাওয়া টান। ঘরেই বা কি নিরাপদ! হাতীর দল যখন তখন এসে কুলি লাইনের ঘর ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। আছাড় দিয়ে কত মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। কত ইংরেজও গেছে অমনভাবে। আর কি সাপের উপদ্রব—ছোট সাপ, বড় সাপ, মোটা মোটা গাছের মতো পড়ে থাকত ঝোপে-জঙ্গলে, পথে-ঘাটে—গরু ছাগল গিলতে পারে!

—গরু ছাগল গিলতে পারে?

—হাঁ-রে।

বাধা পেলে নিগার কথার জোর বেড়ে যায়। সে বললে—জরুর গিলতে পারে। কত রকম পোকা, দেখা আর না-দেখা। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আরো কত ব্যারাম। একবার ধরলে আর বাঁচন নেই। নতুন মানুষ আসে, সব দেখে-শুনে চিত্তির চড়ক। মাথায় ভাবনার ঘোরপাক, কাজ করে কে? তা না করে উপায় আছে! পিছন থেকে সপাং।

—সপাং! মেরেছে?

—হাঁ, তবু পালাবার পথ নেই। ফাঁদে পড়লে কি না মরে ছাড়ান আছে! কিন্তু এ তারও বাড়া। নিজে মরতে হবে, ছেলে-মেয়েদেরও রেখে যেতে হবে মরবার জন্য। কে বোঝে কোথায় কতদূর এসেছে। আসবার আগে শুনেছে কামরূপ কামাখ্যা স্বর্গ-রাজ্যে যাচ্ছে। কত পয়সা খেত-খামার! ইচ্ছা করলে জমিজমা নিয়ে বসে যাবে, নয়তো কিছুদিন পর ফিরে আসবে বড় মানুষের মতো, ক্ষুধার্তের মন মাতানোর পক্ষে যথেষ্ট। —কিছুদিন পর? —কি দরকার বেকার মুলুকে ফিরে যাবার? ঐতো জমি, কর খেত-খামার। —খেত? ধান পাকার আগেই তা সাফ—আসবে শুয়র আর হরিণ, ইন্দুর তো আছেই। —পাহারা? তখন? তখন মাচানে হার্টফেল করে মরবি—শিকারের গোঙানি আর শিকারীর গর্জন শুনে। গন্ডার বা হাতী এলে আর হার্ট-ফেলের ঝামেলা থাকে না। মাচানে সাপ বেড়াতে আসাটা ভবিতব্য। এ-সব ছেড়ে পালাবি? দিনে চারপাশে নন্দীভৃঙ্গী পথ আগলে থাকত। রাত্রে? স্বয়ং শিবই ছিল ওদের পক্ষে—চারপাশে পাহারা। পালাত একদিন, যেদিন যমের দূত পথ পরিষ্কার করে দিত। যে স্বর্গে এসেছিল সব, এমনি করে সেই স্বর্গেই রয়ে গেছে। বৈকুণ্ঠে উঠলে কি আর পতন আছে রে!

এককালে এমন কত গল্পই না বলেছে নিগা। সবাই তখন মন দিয়ে শুনেছে। ঘটনা যত গুরুতর, যত নির্মমই হোক তা বহু পুরানো হয়ে গিয়ে রূপকথার পর্যায় ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাই তখন একনিষ্ঠ শ্রোতার বড় অভাব। তার ওপর নিগার গল্পের ব্যঙ্গোক্তি বহু মুখে বহুভাবে প্রচলিত। সেই ব্যঙ্গোক্তির তলায় ঢাকা পড়ে থাকে আসল তথ্যটা জানবার কৌতূহল ও আগ্রহ। ছেলে ছোকরারা তো হাসি-ঠাট্টা করে তার কথার মাঝে। সেদিন কিন্তু মেঘুর সঙ্গে সবাই উৎসুক হয়ে শুনেছে। তাই অনেক দিন পর সেও একটা সুযোগ পেয়েছে। বোঝাগুলো নামিয়ে একটু হালকা হতে চায়। সে বললে—আর এক উৎপাত তার ওপর। ঐ সব পাহাড় থেকে লোকগুলো নেমে এসে কখন যে কি করবে তারও ঠিক ছিল না।

—ওরা আবার কি করেছে?

—কি না করেছে? দু-দশটা মানুষ ধরে নিয়ে গেছে। আর কি তাদের খোঁজ-খবর পাওয়া গেছে?

—খোঁজই পাওয়া যায় নি?

নিগাকে গল্পে পেয়েছে। সে চলে গেল আর এক কথায়। বললে—প্রায় তিন কুড়ি বছর আগে, চোখের সামনের ঘটনা, শোন

তবে। ইংরেজের ফরেস্ট বিভাগের গোটা পঞ্চাশ লোক বন্দুক নিয়ে উঠে গেল ঐ উত্তর দিকের পাহাড়টায়। তারা চালাকি করল—যাচ্ছে জঙ্গলে জরিপ্ করতে। ওরা তখন স্বাধীন! কি তোয়াক্কা করে ইংরেজদের, ইংরেজের মাইনে খাওয়া বাবুদের, ওদের পছন্দ হল না তা। গরম হয়ে উঠল সব। দুশমনগুলোকে বেঁধে নিয়ে উঠে গেল।

—দুশমন!

—আবে আংরেজকা আদ্মি, দুশমন্ নাই তো কী আছে? —আর তাদের খবর নেই। থাকবে কি করে? মানুষ থাকলে তো?

—কোথায় গেল মানুষ?

—গেল ওদের পেটের মধ্যে। হামে কি জানে কুঁথাকে গেলো? শেষের কথার জের টেনে নিগা একটু হাসল।

—পেটের মধ্যে, কেমন করে?

—যেমন তোদের পেটে যায় কোর্মা-কাবাব্।

—খেয়ে ফেললে?

—তা কি আর জানবার উপায় ছিল, যদি না একটা লোক ফিরে আসত।

—একটা ফিরে এল? কেমন ক'রে?

—দু-দশ মাইল উঠে যায়, আর নাচ-গানে মেতে ওঠে। আগুন জ্বলে। সেই আগুনে ফেলে দেয় দু-চারটে দুশমনে।

—আগুনে পুড়িয়ে মারল?

—আবে কোন জানেছে আগুনে পুড়ায়ে মারল, না মারে পুড়াইল—না আগমে জিয়ায়ে রাখে দিল কাওই (কৈ) মাছ্লি রোকম্।

—তারপর?

—রাস্তায় বেশীর ভাগ মানুষ শেষ ক'রে মাত্র কয়েকটা নিয়ে পৌঁছল ওদের রাণীর কাছে। রাণী একটা জাতের ধরণ। রাণীর কথা ওরা মেনে চলে। এক-এক অঞ্চলে এক-একটা রাণী। যে ক'জন বেঁচে ছিল তার মধ্যে একটি রাণীর ছেলেটার চেনা।

—চেনা! কেমন করে?

—ছেলেটা নাকি তেজপুরে না কোথায় পড়াশোনা করত, তখন সেই লোকটি ছিল তার মাস্টার। ছেলেটা তার বাপ-মাকে বলল—একে রক্ষা করতে হবে। এই দুর্ধর্ষদের হাত থেকে কাউকে বাঁচানো—সে কি সোজা কথা! ছেলেটা চেয়েছিল সব কটাকে. বাঁচাবে। তা হ'ল না। রোজই রাত্রের উৎসবে একটা দু'টো যেতে থাকল। যাবে না কেন? দুশমন যে। কিন্তু বোঝ, যে লোকটা বেঁচে আছে তার মনের অবস্থা! রাণী বললে—এই মানুষটা বড় রোগা। একে এখন পুড়িয়ে লাভ নেই। কিছুদিন খাইয়ে-দাইয়ে একটু মোটা ক'রে নেও।

সবাই বললে—তা ঠিক, কিন্তু যদি পালিয়ে যায়?

ঠিক হ'ল রাণীর ঘরেই রেখে দেওয়া হবে লোকটাকে। অনেকদিন পর লোকটার শরীর ভাল হ'ল। নয়তো ওরা তাই বলল। এবার হোক।

রাণী বলল—এখনো ভাল হয় নি আর দিন কতক থাক না।

ওরাও ছাড়ে না। রাণীও ছুতোর পর ছুতো করে, শেষে আর পারে না। পাহাড়ীদের সন্দেহ হ'ল। ঠিক করল তারা লোকটাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে—শেষ শত্রু শেষ ক'রে ফিরবে।

মহা ভাবনায় পড়ল রাণী আর তার মরদটা, তার ছেলেটাও। দিনরাত সঙ্গে সঙ্গে রাখে লোকটাকে, রাত্রে শুয়ে থাকে রাজা-রাণীর কাছে—ছেলেটা জেগে পাহারা দেয়। ওরা বুঝে গেছে মানুষটাকে নিতে দেবে না। মরিয়া হ'য়ে উঠল ওরা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক'রে মানুষটাকে কেড়ে নেবে। এতগুলো লোকের সঙ্গে ছেলেটার মা-বাবা কি ক'রে পেরে ওঠে! পালানো ছাড়া গতি নেই। রাণী বলল—তাই কর। মানুষটাকে নিয়ে ছেলেটা পালাল এক রাত্রে। বাপ-মায়ের জীবন বিপন্ন, নিজের জীবনও। তবুও মাস্টারকে সে রক্ষা করবে।

কথা বলতে বলতে নিগার দেহটা ফুলে উঠেছে। শুনতে শুনতে ঘর-ভরা সকলের নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে। হাওয়া বইছে না ঘরে। তার মাঝে শুধু নিগা হাত-পা নেড়ে বলতে থাকল—এদিকে ইংরেজের সিপাহীরা পাহাড়ময় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিখোঁজ মানুষগুলোর খোঁজে। কারো দেখা নেই, পাহাড়ীরা সব ঘরকন্না ছেড়ে পালিয়েছে দুর্গম গিরিকন্দরে। ওদিকে রাজা-রাণীর ব্যবস্থা শেষ ক'রে তারাও পালাবে। এমন সময় কুমার ও মাস্টারের সঙ্গে ইংরেজ সিপাহীদের দেখা।

সিপাহীরা ওদের দু'জনকে নিয়ে এগিয়ে চলল সেইসব মানুষগুলোর খোঁজে। কুমারের সাহায্যে তাদের খুঁজে বার করতে একটা এলাকা ঘিরে ফেললে। তার মা-বাবাও বিপন্ন তাদের রক্ষা করতে হবে।

রাজা-রাণীর গলায় পাথর বেঁধে খাদের নীচে ফেলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এমন সময় ইংরেজের সিপাহীরা সেখানে পৌঁছল। রাজা-রাণীকে ফেলে সকলে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তখন সিপাহীরা চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অনেক পাহাড়ীকে প্রাণ দিতে হ'ল পালাবার চেষ্টা করতে ও লড়তে গিয়ে, কয়েকটা হ'ল বন্দী। সেই থেকে পাহাড়টা ইংরেজের হাতে এল পুরোপুরিভাবে।

এই ছিল এখানকার চারপাশের অবস্থা। এই সবের সঙ্গে লড়াই ক'রে থাকতে পারে এমন মানুষ, যারা পশুর সামিল। এ কি আমাদের মতো নিরীহ বেচারির স্থান!

পাহাড়ীদের গল্পটা একদমে শেষ ক'রে নিগা একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর তারই রেশ ধরে আরো কত কথা বলা-কওয়া হ'ল। একটা নিঃশ্বাস টেনে নিগা ধীরে ধীরে তার বক্তব্যটা শেষ করতে গিয়ে শুরু করল আর এক অধ্যায়। সে বলল—মন বসেছে বটে, না বসে উপায় ছিল না তাই বসেছে। আমাদের ছিল উভয় সঙ্কট। দেশে ফিরলে খেতে পাব না, এখানে যত বিপদ আপদই থাক না কেন তবু তো দুটো ভাত যাবে পেটে। আমাদের জাত-গুষ্টি যারা দেশে আছে, তাদের তো এখনো প্রায় সেই অবস্থা। সাহেবদের কথাই ধর না, তারাও তো এসেছিল পেটের ধান্দায়। কত ডেগুয়া (অবিবাহিত) সাহেব পর্যন্ত এইসব দেখে-শুনে পালিয়ে গেছে। আবার কত সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেবও এসেছে। একটা দু'টো রাত, তারপরই ফিরে গেছে শহরে—শিলং নয়তো দার্জিলিং। সেখান থেকে বিলাত, আর এ-মুখো হয় নি। তখন আমাদের দিকে ফিরে চেয়েছে তারা। ঐ একটিবার কর্তারা আমাদের মানুষ বলে দেখেছে। যখন তাদের মাতাল দেহের মধ্যে ফিনকি দিয়ে উঠেছে স্ফূর্তির ফোয়ারা। লাইনের কত মেয়ের গা ধোওয়া হয়েছে সেই ফোয়ারার জলে। কর্তাদের লোভ আর থামে না। এক কর্তার নজর পড়ল চীনা-শিল্পীর পরিবারে।

—চীনা এল কোথা থেকে রে?

—আগে যে চীনা কারিগর ছিল রে।

—পরদিন সকালে দেখা গেল তিনটে শ্বেতাঙ্গের প্রাণহীন দেহ।

—মরে গেল! কিসে?

—হাঁ-রে, সাহেবদের খুন ক'রে চীনারা পালিয়েছে। বুঝতে আর বাকী রইল না কিছু। তাই কুলি-লাইনের কালা-আদমির ওপর জুলুম হ'ল না। তবু আমরা বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম কিছুদিন। কর্তারা গম্ভীর। কিছুদিন সামলে চলল। তা কি আর সম্ভব! রক্ত-খেকো বাঘ যে। আবার যেমন ছিল।

—যেমন ছিল? কি হ'ল?

—কি আর হবে, রক্ত ঠান্ডা ছিল, আবার গরম হ'ল রে। ব্যারামটা তো নতুন নয়, অতি আদিম। কালা জাতও ওষুধ শিখে রেখেছে হুন্দে জাতের কাছে। সাদা-চামড়া নি-খোঁজ। শ্বেতাঙ্গের আত্মার সন্ধানে গেল কয়েকটা কৃষ্ণাঙ্গ।

—সাহেব খুন হ'ল? কালাও গেল সেই সঙ্গে!

—হবে না? তবেই না চোখ ফিরিয়েছে। এদিকে আর আসে না। শৈলাবাস থেকে ধরে নিয়ে আসে—শিলং থেকে, দার্জিলিং, লুসাই পাহাড় থেকে। মণিপুরে চোখের দোলা দিল, কিন্তু সুবিধা হ'ল না। এমন ক'রে তাদের বোঝাতে হয়েছে কুলিদেরও মান-ইজ্জত আছে, তা তারা রক্ষা করতে জানে। এর জন্য কি কম রক্ত গেছে!

মেঘু অবাক হ'ল। তাদের মধ্যে এমন অভিজ্ঞ লোক আছে, এত কথা জানে নিগা-বুড়া!

সে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, অত সব কি তোর নিজের চোখে দেখা?

—চীনাদের কথা, আরো কত কথা বাবার মুখে শোনা। কিন্তু নিজেও কম দেখিনি। আমার কথাগুলো মিথ্যা নয় রে। সব বলতে গেলে নিজেদেরই লজ্জার কথা বেরিয়ে পড়ে। আমাদেরই বাপ-দাদা রক্ত দিয়ে যা একদিন রক্ষা করেছে, তা ভেঙ্গে দিয়েছে আমাদেরই লোক। নইলে আমাদের ঘরে ওদের বংশধর থাকতে পারে? ওদের বাচ্চা, বাবুদের বাচ্চা কোলে পেয়ে মাইকীগুলোর গরব কত! গরব নিয়ে করে তো সেই কুলিগিরি। একটা-একটা ক'রে দেখিয়ে দিতে পারি। কেউ দুটি পয়সার লোভে নিজের মান-ইজ্জত ছেড়ে দেয় তো আমি কি করব? তবে হাঁ, জুলুম বন্ধ হয়েছে দুবো-সর্দার মাটি পাবার পর থেকে। সবাই স্বীকার করবে।

কথাটা যে মেঘুর প্রতি কটাক্ষ নয় তা সে বুঝল। সবাই বুঝল। তবুও মেঘুর চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠে নিভে গেল। হঠাৎ অসম্মানিত বোধ করল সে। দেহটাও যেন সিঁটিয়ে গেল। বিলির বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। লক্ষ্মীর বুকে দুটো [illegible] এক কতখানি বড় [illegible] পাখির পাতা অসম্ভব আয়তনে টেনে ধরে, তাদের দু-জোড়া চোখ স্থিরভাবে ফেলে রেখে দিল নিগার মুখের ওপর। আর সবাই এক সঙ্গে উসখুস ক'রে উঠল। সবাই চেষ্টা করল, গাঁজার ধোঁয়ার মতো ঘর ঘর কাশি আটকে রেখে দিতে। ঘরখানার বাতাস নিঃশেষ হ'য়ে চুপসে চেপে ধরতে চাইল সকলকে। এক অজানা উৎকণ্ঠায় ঘরখানা স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

সে সবের কিছুই বুঝল না নিগা। আরো কতদূরে যেত বলা যায় না, যদি না তাকে ছেড়ে দিতে হ'ত বিষয়টা। তার সামনে তখন আর একটা সমস্যা হাজির হ'ল।

বৃষ্টিটা থেমে থেমে ছিল কালো জমাট বাঁধা মেঘের গর্ভে। নিগার কথায় এদের ভিতরটা যখন কালো হ'য়ে উঠল তখন ওপরে আকাশের জমাট বাঁধার সমারোহ শেষ। শেষ আর শুরু, দুটি বিভিন্ন বিপরীত শব্দ কিন্তু কত নিকট সম্বন্ধ। শেষের গর্ভে জন্ম নেয় শুরু। হঠাৎ আকাশ ফেটে নামল বৃষ্টি। সেই সঙ্গে বুধের মনে হল পুরানো দিনের একটা কথা। যার জের টেনে তখন পর্যন্ত তারা ভুগে আসছে। সে বললে—এই দেখ বাবা, এসেছি বৃষ্টি মাথায় ক'রে, আবার ফিরতে হবে ভিজতে ভিজতে। রোদ-বৃষ্টির দিনে কোন দেশের মানুষ ছাতি ছাড়া চলে?

বুধের অভিযোগটার অর্থ মেঘু বুঝল, কিন্তু তাৎপর্যটা বুঝল না। এককালে বাগানের এলাকায় কারো ছাতি মাথায় চলাফেরা করবার হুকুম ছিল না। কবে কোন আগন্তুকের মাথা, কোন অর্বাচীন কুলির ছাতি ঢাকা মাথা লুটিয়ে পড়েছে হুকুম অমান্যের অপরাধে। কিন্তু সেই জন্য যে এরা এখনো ছাতি মাথায় দেয় না মেঘু অতটা বোঝে নি। তাই সে বললে—কেন! আজকাল আর সেদিন নেই। ছাতি মাথায় দিতে পারিস, বাবুরা তো দেয়।

—বাবুরা দেয়? দেখিস না, সাহেবের গাড়ী দেখলে বাবুরাও ছাতি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে। আর বাবা, এতদিন যতর সব বড়-বড় ঝঞ্ঝাট নিয়ে সবাই এত অস্থির ছিলাম যে ঐ সামান্য জিনিসটার জন্য একটা মাথার মায়া ছেড়ে দিয়ে ওটা হাতে নিয়ে কেউ দেখতে চায় নি। একটা হুকুম করিয়ে দিস তো বেঁচে যাই। এই জল বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না, রোদেও পুড়ে মরতে হয় না।

মেঘু মনে করত কুলিদের ঝাঁপিটা সাহেবের অজ্ঞান, আর বাবুরা ছাতি নামিয়ে সম্মান দেখায়। তার পিছনে যে ভয়ের কিছু থাকতে তা কখনো ভেবে পায় নি। মেঘু বললে—আচ্ছা, তাই হবে। এটা আর এমন কঠিন কি!

—হাঁ বাবা, তাই জানা। তবে আর ছাতি নিয়ে দূর-দূর বুকে চলতে হবে না। তোদের [illegible] বেঁচে যাবে, আমাদেরও হাজিরা বাদ পড়বে না। আর একটা কথা, পাকা ঘর যদি দিতে চাস তো ভিটে ছাড়া করিস না। তোরা একটা দিলি, আমরাও তো দরকার মতো দু-একটা তুলে নিতে পারি। আমাদের কি ঐ সার-বন্দীর একটা খুপরীতে পোষায়? ওখানে ছেলেমেয়ে, হাঁস-মুরগী নিয়ে দিনরাত ঝগড়া লেগে থাকে। ধান-কলাই শুখাই কোথা, গরু-বাছুরটা রাখি কোথা, দু-একটা লতা-পাতাই বা বোনা-বুনন করি কোথা? এ-সব কথা সাহেবরা বুঝতে চায় না। তারা চার চোখের শোভা, একটানা ঘর। এ কি লাইনের ওপর রেলগাড়ী? যাত্রীরা একটি-বার উঠবে আর একটিবার নামবে, এর মাঝের সময়টা পা-গুটিয়ে বসে থাকবে। ও-সব তোদের চালানী কুলিদের জন্য রাখ। আমাদের তো আর চালান দিবি না। যাবই বা কোথা? সব ঘুচে গেছে। একদিন ভগবান পাঠাবে যমের দরজায়। এর মধ্যে আর দিকদারি দিস না, ঐ রেলগাড়ীটায় বোঝাই করিস না।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। সোঁ-সোঁ ক'রে বাতাসও বইছে তার সঙ্গে। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ভেদ ক'রে এল মোটর গাড়ীর হর্ন। সবাই সচকিত হ'ল, মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেল।

দরকার হ'ল না তার। দরজার মুখে ডেভিড সাহেবের বেয়ারা! সে জোড় হাতে মেঘুকে নমস্কার ক'রে বললে—সাহেব সেলাম দিয়েছেন। বৃষ্টির জন্য গাড়ী এনেছি, আর এই ছাতি।

সেই মুহূর্তে মেঘু বুঝল, নিগার কথা শুনতে শুনতে তার বুকের ওপর কতখানি ভারি একটা পাথর-চাপা পড়েছে। মেঘুর মন চাইছে না এদের ছেড়ে আর কোথাও যেতে। সে বললে—একটু পরে গেলে হয় না মা?

বিলির মনে হ'ল একটু আগে ডেভিডের সামনে তাদের যথেষ্ট ত্রুটি হয়ে গেছে, আর যেন না হয়। সে তৎপর জবাব দিল—তা কি হয়! তুই যা, আমরা কথা বলছি এদের সঙ্গে।

লক্ষ্মী বেয়ারাকে বললে—তুমি একটু বসেন বাবু।

অগত্যা মেঘুকে উঠে দাঁড়াতে হল। নিগারও কথা বন্ধ হ'ল। কিন্তু মেঘু তাকে বলে দিল, সে যেন মাঝে মাঝে এসে তাকে শুনিয়ে যায় সব কথা, বিশেষ ক'রে একদিন যেন বুঝিয়ে দেয় তার পেনসন বন্ধ হবার কারণটা। নিগা হয়তো বুঝল, ওটা মেঘুর কৌতূহল নিবৃত্তির ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু বিলি ধরে নিল নিগার কপালে বৃষ্টিটা ছিল, তাই এতক্ষণ পর কথাটা মেঘুর কানে এল।

খুশীর প্রাচুর্যে ঝকমক ক'রে উঠল বুধ নিগার নিষ্প্রভ দুটি চোখ। আর সবার মুখে ফুটে উঠল এক অবর্ণনীয় বিস্ময়। ডেভিড সাহেব চা খেতে ডাকে, গাড়ী পাঠায়! তাদের মেঘু এত বড় হয়েছে!

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গের নতুন বন্দর হলদিয়া

ভবানী ঘোষ

মঙ্গলকাব্যের নায়িকা ভাগীরথীকে প্রত্যক্ষ করতে গেলে আজ সপ্তদশ শতকের ফান ডেন ব্রোকের নকসাই একমাত্র সম্বল। যন্ত্রযুগের প্রতিযোগিতায় সমস্ত পুরাতন ঐতিহ্য যেভাবে পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন, তেমনিভাবেই ভাগীরথীর গঙ্গা প্রবাহ পরিবর্তনে আদি গঙ্গার প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত-প্রায়, আজ তা গল্পকাহিনী। ইংরেজ আমলের ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে আদি গঙ্গার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, পুরাতন আদি গঙ্গা আজ জীর্ণ-শীর্ণ টালি সাহেবের নালায় পরিণত। শোনা যায় জনাব আলিবর্দী খাঁর নবাবী আমলে কলকাতার খিদিরপুরের ওপারে হাওড়ার দক্ষিণে ভাগীরথী-প্রবাহকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। কারণ আদি গঙ্গা পলির প্রাবল্যে নৌপথের অযোগ্য হয়ে পড়ায় সম্ভবত নবাব আলিবর্দী আজকের এই সোজা দক্ষিণবাহী খাল বা কাটি গঙ্গা তৈরী করে প্রাচীনতর সরস্বতী নদীর দক্ষিণতম খালের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। নতুন পথের সন্ধান পেয়ে ঊর্মিউচ্ছলা ভাগীরথী তার পুরাতন ধারাকে পরিত্যাগ করেছিল। ইংরেজদের আগমনের পর যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ইংরেজ আমলের প্রথম দিক থেকেই এই নতুন গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছে ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর কলকাতা। তৈরী হয়েছে খিদিরপুর ডক। আর এই পোতাশ্রয়কে কেন্দ্র করে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রসার ঘটেছে আধুনিক শিল্পের, কৃষির ও কৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর।

কিন্তু আলিবর্দীর কাটি গঙ্গারও আয়ু চিরন্তন হয় নি, পলির দাপটের কাছে তাকেও হার স্বীকার করতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই যে গঙ্গার অবস্থা অচল হয়ে উঠতে থাকে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৭ সাল থেকে গঙ্গার বুকে ড্রেজারের চলন থেকে। এই সময় থেকেই হুগলীর বুকে সঞ্চিত পলি ড্রেজার দিয়ে কেটে মারমুখী প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজ চলাচলের রাস্তা খোলা রাখবার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট পলি কাটা হয়েছে ২ কোটি টনের মতো। জমার হার তার অনেক বেশী। একথা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে, শক্তিশালী প্রকৃতির সাথে শুধুমাত্র ড্রেজার দিয়ে পাল্লা কষা চলে না। ফলে সমুদ্র থেকে কলকাতায় আসতে হলে এই পথে যে ১৫টি মগ্ন চড়ার জন্ম হয়ে প্রতিদিন পরিপুষ্টি লাভ করছে, জাহাজকে কলকাতা বন্দরে পৌঁছতে হলে এগুলোকে সাবধানে বাঁচিয়ে চলতে হয়। এছাড়া হুগলী নদীর গভীরতা কোথাও ৩০ ফুটের বেশী নয়।

এদিকে সারা পৃথিবীতেই জাহাজের আকার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। কারণ ছোট জাহাজের তুলনায় বড় জাহাজ অনেক বেশী অর্থকরী। কিন্তু কলকাতা বন্দরে বড় জাহাজ দূরে থাকুক, কোন মাঝারী আকারের জাহাজও এসে পৌঁছতে পারে না। তাই কলকাতায় জাহাজ আগমনের সংখ্যা দিন দিন কমছে। গত বিশ বছরে বন্দরে আমদানী বা রপ্তানীকৃত মালের পরিমাণ প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য ও শিল্প বৃদ্ধি ঘটেছে বহুশত গুণ। কেবলমাত্র বন্দরের ধারণ ক্ষমতার অভাবেই যে কলকাতা বন্দরের এই অর্থনৈতিক অবনতি সেকথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন কলকাতা বন্দরের 'মৃত্যু' ঠেকান কোন রকমেই সম্ভব নয়। এই কারণেই কলকাতার বিকল্প যে কোন একটি উপযুক্ত জায়গা খোঁজার কাজ শুরু হয়েছিল বহু দিন ধরে। অবশ্য শহর কলকাতা থেকে 'বন্দর' কথাটি মুছে গেলে অংকের হিসাবে কলকাতার কি থাকে, সেটি এক জটিল ও বহুবিতর্কিত সমস্যা। সে সমস্যার ভয়াবহ রূপের মধ্যে না গিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র হলদিয়া সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে।

কলকাতার বিকল্প হলদিয়া :

কলকাতা বন্দরের অনিশ্চিত অবস্থার কথা চিন্তা করেই যে হলদিয়া বন্দরের কথা উঠেছে, একথা অনস্বীকার্য। বিশেষজ্ঞদের শেষ রায়ে কলকাতার মৃত্যু যখন সরকারী-ভাবে সমর্থিত হল, তার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৬২ সালে হলদিয়া বন্দর নির্মাণের জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী হল এবং ঠিক হল যে কলকাতার ৬৫ মাইল দক্ষিণে, অর্থাৎ কলকাতা ও সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় হলদিয়া বন্দর গড়ে উঠতে পারে। হুগলী ও হলদি নদীর সঙ্গমস্থলে, মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সুতাহাটা থানার প্রায় ২০ বর্গমাইল জুড়ে গড়ে উঠছে নতুন হলদিয়া বন্দর। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার হলদিয়া প্রকল্প অনুমোদন করেন। সেই থেকে কাজ শুরু হয়েছে নতুন বন্দর তৈরীর।

কিন্তু হলদিয়া প্রকল্প শুধুমাত্র বন্দর নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এই হলদিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে এক বিরাট শিল্পনগরী। ভারত স্বাধীন হবার আগে থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র বৃহত্তর কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলেই পূর্ব ভারতে সমস্ত শিল্প প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কালে কলকাতার বাইরে দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। কিন্তু এছাড়া এত দিন পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অন্য সমস্ত অঞ্চলগুলিই রয়েছে অনুন্নত, হলদিয়া বন্দর প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবার ফলে নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত পশ্চাত-পদ জায়গাগুলিতেও নতুন উন্নতির জোয়ার আসবে।

হলদিয়া বন্দরের প্রতিষ্ঠার ফলে এই অঞ্চলে কি ধরনের অগ্রগতি হবে তার সমীক্ষা করতে গেলে চোখে পড়বে যে এই বন্দর তৈরীর প্রয়োজনে সেখানে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা (infrastructure) সরকারকে তৈরী করতে হবে, তার দ্বারা প্রথমত এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প গড়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত হলদিয়াতে তৈল শোধনাগার ও সার তৈরীর কারখানা তৈরী হচ্ছে। তৃতীয়ত পেট্রকেমিকেল, অন্যান্য রাসায়নিক শিল্প এবং মেট্রলজিক্যাল শিল্প গড়ে উঠবে। চতুর্থত বহুত পরিমাণে সরকারী ও বেসরকারী অর্থ বিনিয়োগের ফলে এই অঞ্চলের কৃষিজাত কাঁচা মালের দ্বারাও বহুপ্রকার শিল্প গড়ে উঠবে। যার ফলে শুধু স্থানীয় অধিবাসীরাই লাভবান হবেন না। এই প্রকল্পে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত পশ্চাতপদ নিম্নবঙ্গের অর্থনীতিতে এক সম্পূর্ণ নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে, যার দ্বারা গোটা দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রের চেহারাটাই পাল্টে যাবে বলে আশা করা যায়।

নতুন বন্দর নতুন শিল্প উদ্যোগ :

হলদিয়া প্রকল্প আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-জগতের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট ৬০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে যার মধ্যে মোটে ৭ কোটি টাকার কাছাকাছি বৈদেশিক মুদ্রা লাগবে। সরকার ইতিমধ্যেই ভবিষ্যৎ

শিল্প উদ্যোগের প্রয়োজনে ২,০০০ একর জমি আলাদা করে রেখেছেন, যার মধ্যে ১০০০ একর জমি কেবলমাত্র তৈল শোধনাগার ও সার প্রকল্পের জন্য রাখা হয়েছে। এছাড়া বাদবাকি অংশ বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে।

আধুনিক যুগে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত উন্নত দেশই বন্দরের সংলগ্ন বিভিন্ন ধরনের বৃহৎ শিল্প-প্রকল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। কারণ, বন্দর-সংলগ্ন শিল্প-উদ্যোগ অর্থকরী দিক থেকে বিশেষ লাভজনক হয়। বন্দরের সংলগ্ন শিল্পগুলির পক্ষে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি ব্যাপারটি যেমন সহজসাধ্য হয়, অন্যদিকে তেমনি তৈরি জিনিস রপ্তানির ব্যাপারটা খুব সহজে ও কম খরচায় সারা যায়। এইভাবে বন্দর সংলগ্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের উন্নতিও বর্ধিত হয়, আর এই উন্নতির পথ ধরেই ভবিষ্যতের উন্নততর অর্থনীতির রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। হলদিয়ার নতুন বন্দর পরিকল্পনা ও তার সঙ্গে যে শিল্প-উদ্যোগের পরিকল্পনাটির রূপরেখার ইতিমধ্যেই কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তার দ্বারা এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, নতুন বন্দর ও নতুন শিল্প-উদ্যোগের পারস্পরিক লেন-দেনের মধ্যে দিয়ে হলদিয়া অঞ্চল নিকট ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-উদ্যোগের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

শিল্প-উদ্যোগের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়ে সরকার হলদিয়াতে যে তৈল শোধনাগারটি স্থাপন করছেন, সেই শোধনাগারে দুই-এক বছরের মধ্যেই ২.৫ মিলিয়ন টন তৈল শোধন করা যাবে। এবং তারপরে এই ক্ষমতাকে ৩·৫ মিলিয়ন টন পর্যন্ত খুব শিগ্গিরই বাড়ানো হবে। বন্দ-যুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খনিজ তেলের যে পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধি হচ্ছে তার ফলে এখানে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সও তৈরী করা হবে বলে স্থির হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে শোধনাগারের ক্ষমতাকে ৫ মিলিয়ন টন পর্যন্ত বাড়াতে হবে। কিন্তু অন্যান্য শিল্প উন্নতির সহায়তা করবার ব্যাপারে এই পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যেমন—বস্ত্রের জন্য কৃত্রিম সুতা তৈরীর ব্যাপারে, সিন্থেটিক রবার তৈরীর প্রয়োজনে, অন্য অনেক ধরনের রাসায়নিক বস্তু তৈরীর ব্যাপারে এবং রং তৈরীর জন্য, এছাড়াও বহুবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরীর জন্যই এই পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে। শুধু তাই নয়, এই শিল্পগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং এগুলি এই বন্দরের সংলগ্ন স্থানে তৈরী হবার ফলে এই সমস্ত শিল্প-জাত দ্রব্যের দামও অনেক কম পড়বে। এছাড়া এখানে তৈরী হচ্ছে ভারতের অন্যতম বৃহৎ সার তৈরীর কারখানা।

উন্মুক্ত বাণিজ্য কেন্দ্র?

হলদিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আশা পোষণ করে ভারতের শিল্পপতিগণ হলদিয়া বন্দরকে উন্মুক্ত বা স্বাধীন বন্দর হিসাবে গণ্য করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন। অনুমোদনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি করবেন এখনও স্থির হয়নি, তবে হলদিয়ার উন্মুক্ত বন্দর অঞ্চল হলে রপ্তানি-বাণিজ্য যে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং রপ্তানি-বাণিজ্য বর্ধিত হলে সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিরও উন্নতি ঊর্ধ্ব-গামী হবে, যার ফলে বেকার সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, সব সমস্যাই একটি সুনির্দিষ্ট সুষ্ঠু পথে পরিচালিত হবার অবকাশ পাবে।

হলদিয়াকে উন্মুক্ত বাণিজ্য-কেন্দ্র করবার ব্যাপারে ইতিমধ্যে যে সমস্ত বাধার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি প্রধানত ভারতে প্রথম উন্মুক্ত বন্দর কান্ডালার ব্যর্থতার উদাহরণ থেকে। কারণ, কান্ডালার অনুরূপ উন্মুক্ত বন্দর অঞ্চল করা সত্ত্বেও বিশেষ কোন অর্থকরী লাভ হয়নি। কিন্তু এ-কথা এখানে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভৌগোলিক দিক থেকে কান্ডালা ও হলদিয়ার অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এবং হলদিয়া হচ্ছে কলকাতা বন্দরের বিকল্প বন্দর, যে কলকাতা বন্দর কিছুদিন আগেও সমগ্র পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, এবং মধ্য এশিয়ার বাজারে ভারতীয় মাল রপ্তানি ও আমদানির প্রাণকেন্দ্র ছিল। বর্তমানে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই কলকাতা বন্দরে এই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ভাঁটা পড়েছে। কিন্তু বন্দরের সমৃদ্ধির জন্য যে পশ্চাদ-ভূমি ও আশাপ্রদ অর্থনৈতিক আবহাওয়ার প্রয়োজন, সেটি পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও বিশেষভাবে বিরাজমান। অতএব হলদিয়াতে বন্দর প্রতিষ্ঠা হলে যখন প্রকৃতির বাধা কেটে যাবে, তখন হলদিয়া পুরাতন কলকাতা বন্দরের সমস্ত প্রাণশক্তি ও নিজের প্রাণশক্তি একত্রিত হয়ে এক অতি অপরিহার্য বন্দরে রূপান্তরিত হবে,—যে সম্ভাবনা কান্ডালা বন্দরের কোনদিনই ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবার আশা নেই। এছাড়া কান্ডালা বন্দর স্বাভাবিক জাহাজ চলাচল রাস্তার উপর গড়ে ওঠেনি। এছাড়া বন্দরের সমৃদ্ধির যে মূল চাবিকাঠি থাকে তার সমৃদ্ধশালী পশ্চাদভূমির উপর নির্ভরশীল, সে পশ্চাদভূমি থেকেও কান্ডালা বন্দর বঞ্চিত। এই কারণেই হলদিয়া আর কান্ডালাকে কোন সময়ই সম্ভাবনার দিক থেকে এক স্তরে নামানো যায় না।

হলদিয়াকে মুক্ত বন্দর অঞ্চল করবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে আরো একটা কথা বলতে হয় যে, এখনও যখন ভারতবর্ষের বাজারে বিভিন্ন তৈরী শিল্পজাত জিনিসের আমদানির পরিমাণ সুপ্রচুর, তখন এই আমদানি বাণিজ্যের সুবিধার্থেও যদি হলদিয়া বন্দরকে মুক্ত বন্দর হিসাবে ঘোষণা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাও কম লাগবে। কারণ তখন রপ্তানিকারী দেশগুলি এই মুক্ত অঞ্চলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এই স্থানে তাদের এসেম্বল প্ল্যাণ্ট বসাবেন। কারণ, এইখানে এই ধরনের প্ল্যাণ্ট বসালে তাদের স্বদেশ থেকে তৈরী মাল আনবার সময় প্যাকিং, ফিটিংস ইত্যাদিতে যে বিরাট খরচ পড়তো, সেটি কম হবে। অন্যদিকে শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের শিল্প বিকাশের সাহায্যদানে আরো বৃহত্তর বিদেশী সংস্থা লেন-দেনে এগিয়ে আসবেন। তাই হলদিয়াতে নতুন বন্দর প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যদি তাকে মুক্ত বন্দর হিসাবে ঘোষণা করা যায়, তবে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব ভারতের বিভিন্ন শিল্প উন্নতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা প্রত্যক্ষ করা যাবে।

স্থানীয় কাঁচামাল ও স্থানীয় শিল্প :

আগেই বলা হয়েছে যে, হলদিয়া অবস্থানের দিক থেকে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পড়েছে, যে জেলাটিকে আমরা সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার হিসাবে উল্লেখ করে থাকি। আর এই উল্লেখ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে যে, কৃষি-জাত কাঁচামালের উৎপাদনে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের সবচাইতে সমৃদ্ধশালী অঞ্চল কিন্তু এতদিন সরকারী শিল্প-উদ্যোগের ঢিমে-তেতাল নীতির ফলে এই বিরাট সম্ভাবনাময় জেলাতে বিশেষ কোন শিল্প বিকাশ সম্ভব হয়নি। খড়্গপুরের রেলওয়ে ওয়ার্কসপের কর্মীর সংখ্যা বাদ দিলে কেবলমাত্র স্থানীয় লোকসংখ্যার ৫,৫১৫৩২০ জন (১৯৭১ সেন্সাস) লোকের মধ্যে মাত্র ১৭,২৫০ জন বিভিন্ন কারিগরী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। অথচ এর মধ্যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে এবং অন্য যে-কোন অঞ্চলের চাইতে মেদিনীপুর জেলা অঞ্চল বহুবিধ সুবিধার অধিকারী। কিন্তু সরকারী দূরদৃষ্টির অভাবে এমনি ধরনের একটি সম্ভাবনাময় অঞ্চলকে তাঁরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু হলদিয়া প্রকল্পের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে মেদিনীপুর অঞ্চলের কৃষিজাত ও কাঁচামাল দ্বারা নতুন শিল্প-উদ্যোগ দেখা দেবে, এ-কথা অনস্বীকার্য।

এছাড়া হলদিয়াকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে গড়ে উঠবে বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ছোট ছোট সরকারী শিল্প। ১৯৬৯ সালে সরকারী উদ্যোগে হায়দ্রাবাদের সরকারী ইনস্টিটিউট মেদিনীপুর অঞ্চল সার্ভে করে যে একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন, তার মধ্যে দেখা যায় যে, হলদিয়া বন্দর ও প্রকল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি কি ধরনের দ্রুত হারে এগিয়ে যাবে।

দিদি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কাল। শীতটা তাই আজ জেঁকেই পড়েছে।

রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই ডিসপেনসারি খালি। যারা দ্যাখাতে এসেছিল একে একে ওষুধ নিয়ে বিদায় নিয়েছে। উঠবো উঠবো করছি, একটি ষোল সতের বছরের ছেলে চাঁর্ সসংকোচ পদাবিক্ষেপে ঢুকলো ডিসপেনসারিতে। জিজ্ঞেস করলুম—'কি চাই?'

ছেলেটি দ্বিধাজড়িত কন্ঠে বোললে—'ক'দিন থেকেই চেষ্টা করছি আপনাকে সুবিধে মত ধরবার, পারছি না।'

বিরক্ত হয়ে বেশ ভারিক্কী গলায় জিজ্ঞেস করলুম—'কেন, আমার সংগে কি প্রয়োজন তোমার?'

আমার বিরক্তি লক্ষ্য করে ছেলেটি প্রথমে ভয় পেয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই আমার টেবিলের খুব কাছে সরে এসে বোললে—'আমরা থাকি পাশের বস্তিতে। আমাদের ঘরের পাশেই থাকেন একজনরা, আমি তাঁকে মাসীমা বলি। তাঁর স্বামীর খুব অসুখ। আপনি যদি দয়া করে একটিবার দেখে আসেন।'

বোললুম—'তোমাদের ওখানে তো অন্য ডাক্তারবাবু আছেন, তবে আমাকে কেন?'

ছেলেটি হাত কচলাতে কচলাতে বোললে—'আপনাকেই নিয়ে যেতে বোলেছেন। এমন কথা বোলেছেন, হাতে পায়ে ধরে যেমন করে পারি যেন আপনাকে নিয়ে যাই।'

ছেলেটির কথা শুনে একটু অবাক লাগলো। আমি এখনো এমন কিছু নাম করতে পারি নি যার জন্যে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে হাতে পায়ে ধরতে হবে। এর ভেতর অন্য কোন ষড়যন্ত্র নেই তো?

আমার মনের কথা হয়তো বুঝলো ছেলেটি। তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো—'না না, এখুনি না গেলেও চলবে। যদি বলেন, কাল দিনের বেলায় আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

ছেলেটির কথায় মনের অমূলক ভয়টা কেটে গেল। বোললুম—"আমার ব্যাগটা নাও।"

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে বোলে উঠলো—'আজই যাবেন? বেশ রাত হয়ে গেছে কিন্তু।'

—'তা হোক, চল। কাল সময় করে উঠতে পারবো না।'

চিন্তাধারাটা তখন অন্য খাতে বইছে। বস্তির চিকিৎসা লাভজনক, পশার বাড়ে হু হু করে। তার ওপর বর্তমান সময়ে বস্তিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। সর্বোপরি, স্থানীয় ডাক্তারকে না ডেকে, ডেকেছেন আমাকে। বোলেছেন, যেমন করে হোক্ যেন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়—এটা একটা বাড়তি সম্মান। সুতরাং যেতেই হবে।

হেঁটেই চলেছি আমরা। বস্তির গলি-ঘুঁজির মধ্যে দিয়ে ছেলেটি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে। অনেকটা এসে একটা চালা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে ছেলেটি—'মাসীমা, ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

একটা কালিপড়া লন্ঠন হাতে বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এলেন একটি মহিলা।

—'ডাক্তারবাবুর দ্যাখা হয়ে গেলে আমাকে ডাকবেন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো',—বোলেই ছেলেটি পাশের একটা গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লন্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় মহিলাটিকে দেখতে পাই নি ভালো করে। মহিলাটি লন্ঠনটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বোললেন—'এস।'

চমকে উঠলুম! গলার স্বরটা খুব চেনা-চেনা! আর এই অপরিচিত ডাক্তারকে তুমি বোলেই বা কে ডাকবে এই বস্তির মধ্যে!

সিঁড়ি বেয়ে উঠলুম দাওয়ায়। মহিলাটি হেসে বোললেন—'চিনতে পারছো?'

এইবার চিনেছি। এ হাসি তো ভোলবার নয়। এ হাসির হিল্লোল যে এখনো আমার কানে ঝংকার তোলে। এ সেই মৃদুদি,—আমার ছোটবেলার বউ।

......'ও বর, পালাচ্ছো কেন? এই তো তোমার বউ দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার অপেক্ষায়।'

খেলছিলুম মাঠে। হঠাৎ ঝড় ওঠায় ছুটতে ছুটতে বাড়ী যাচ্ছিলুম। মৃদুদির কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম একটু কাল। ঝড়ের একটা দমকা বাতাস এসে ধাক্কা দিতেই ঢুকে পড়েছিলুম বাড়ীর মধ্যে। আমার রকম দেখে মৃদুদি বেশ জোরে হেসে উঠেছিলেন। হাসতে হাসতেই বোলেছিলেন—'কি বর রে বাবা। বউকে দেখেও পালিয়ে গেল!'

অনেকদিন আগেকার কথা, বয়েসটাও তখন খুবই কম। তবুও স্পষ্ট মনে আছে,—ঝড়ের দাপটে মৃদুদির চুল উড়ছে, পরনের কাপড়ও দাপাদাপি করছে। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুটি উপভোগ করছে ঝড়ের মাতন।

মৃদুদির মা মৃদুদির রকম দেখে দরজাটা অল্প ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে বোলে উঠলেন—'ও মৃদু, এই ভর সন্ধ্যে-বেলায় খালি গায়ে সদরে দাঁড়িয়ে কেন?'

গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে মৃদুদি জবাব দেয়—'কি যে বল মা তার মাথা-মুন্ডু নেই। খালি গা কোথায়? গায়ে তো কাপড় দিয়ে আছি।'

'কাপড় জড়াবারই বা দরকার কি? একটা জামা গায়ে দিলেই তো পারিস।'

—'বিষম গরম, জামা পরলে হাঁসফাঁস করে শরীর।'

ঝংকার দিয়ে ওঠেন মা—'ঢঙের কথা শুনলে গা জ্বালা করে ওঠে। ঝড়ে চতুর্দিক কাঁপছে, গরম দেখলি কোথায়? আর গরম শুধু তোর একার, না? এত যদি গরম, তাহলে কাপড় জড়াবারই বা দরকার কি? খালি গায়ে থাকলেই পারিস।'

এইবার মেয়ের ঝংকার দেবার পালা—'মেলা বাজে বক্ বক্ কোরো না। যাও, নিজের কাজে যাও।'

গজ্ গজ কোরতে কোরতে মা ভেতরে চলে যান্—'কি জানি বাপু, সোমত্ত মেয়ে-মানুষ গায়ে শুধু কাপড় জড়িয়ে সদরে দাঁড়িয়ে থাকে কোথাও শুনি নি! রাজ্যের পুরুষমানুষ পথ দিয়ে যাচ্ছে......। মা গো মা, কি বেহায়া মেয়ে আমার পেটে এসেছিল।'

দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন্ মৃদুদির বাবা। দু একবার উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে বেশ মোলায়েম সুরে বলেন—'হ্যাঁ মা মৃদু, গায়ে একটা জামা দিলে হত না? বিকেলে তো পুকুরে আচ্ছা করে সাঁতার কেটে এলি, ঠান্ডা লেগে একটা অসুখ-বিসুখ করবে যে।'

বাপের দিকে এক পলক চেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে মেয়ে—'সারাদিন মক্কেলের পেছনে কাঠি দিয়ে আশা মেটেনি? এখন এসেছ আমার পেছনে টিকটিক করতে? যাও, নিজের কাজে যাও। পচা কাগজের বান্ডিল নিয়ে বোস গে।'

মুখটা কাচুমাচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বাবা বলেন—'রাগ করিস কেন মা। তোর ভালোর জন্যেই বলি। চ মা, ভেতরে চ।'

মেয়ে বিরক্ত মুখে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বোলে ওঠে—"থাক্, আমার ভালোর কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না। অনেক ভালো তো আমার করেছো, আর কেন?'—কথাগুলো বোলেই দুমদুম করে পা ফেলে অন্দরে ঢুকে যায় মেয়ে।

...মৃদুদির মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখছিলুম। আমাকে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে মৃদু হেসে মৃদুদি বোললেন—'খুব অবাক হয়েছো তো?'

মৃদুদির এ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারলুম না।

কিন্তু অবাক হবারই তো কথা। সেই মৃদুদি এই হয়েছে! গায়ের সেই কাঁচা সোনার রং আর নেই, রংটা হয়েছে কলংক-ধরা পুরোনো বাসনের মত। দেহে মাংসের চিহ্ন খুবই কম, গালের দুপাশের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চেনা যায় শুধুমাত্র সেই পুরোনো হাসি দেখে। ঠোঁটের ওপর এখনো সেই হাসির ঝিলিক খেলে বেড়াচ্ছে।

নির্বাক বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত মৃদুদিকে দেখতে দেখতে আবার সেই পুরোনো ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল আমাদের আধা-সহর আধা-পাড়া গাঁ পল্লীকে।

আমাদের যেখানে আদিবাস সেখানে সহরের আদপকায়দা পুরোপুরি ঢোকেনি তখনো। কিছুটা সহরের হাওয়া যে আচমকা ঢুকে পড়েনি তা নয়, তবে তখনো প্রতিবেশী প্রতিবেশীর খবর রাখতো, দুপুরে মেয়েরা বেরোতো পাড়া বেড়াতে। কোথাও বা পানদোক্তা সহযোগে তাসের আড্ডা বসতো নিয়মিত।

আমাদের বসতবাড়ীটা ছিল বেশ পুরোনো। বাড়ীর সামনেই এক ফালি সরু রাস্তা পুব থেকে পশ্চিমে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ীর উল্টোদিকে খানতিনেক বাড়ীর পরেই মৃদুদিদের বাড়ী। তার পরেই একটা বেশ বড় পুকুর। পুকুরটা ওঁদেরই। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল বেশ উঁচুই ছিল। কালের আঘাতে আর ছেলেদের দৌরাত্ম্যে ইঁট খসতে খসতে পাঁচিল অনেকটা নিচু হয়ে গিয়েছিল। আমার বেশ মনে আছে, রাস্তার ধারের দিকটায় পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে ভেতরের অনেকটা অংশ দ্যাখা যেত। পুকুরের পরেই রাস্তার বাঁকের কাছে একটা প্রকান্ড বাঁশ ঝাড়। হাওয়া বইলে বাঁশগুলো দুলে দুলে উঠতো, পাতার বিশ্রী একটা সর্ সর্ শব্দ হত। ছোটবেলায় সন্ধ্যের পর বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে বেশ ভয় ভয় করতো, ছম্ ছম্ করতো গা।

মৃদুদিদের বাড়ীতে আমাদের যাতায়াত ছিল অনেকদিনের। কিছু কিছু মনে পড়ে। তখন আমার বয়েস হবে বোধ হয় বছর সাতেক। দুপুরবেলা মার সঙ্গে যেতুম মৃদুদিদের বাড়ী। ওখানে ওঁদের বোসতো তাসের আড্ডা, নয়তো খোস-গল্পের মজলিস আর পাঁচজন পাড়ার মহিলাকে নিয়ে। মার সঙ্গে আমাকে দেখেই ওঁদের মধ্যে কেউ বোলে উঠতেন—'ও মৃদু, তোর বর এল।' মৃদুদি অমনি আমাকে কোলে টেনে নিয়ে আমার কপাল গাল চুমোয় ভরিয়ে দিতেন আর বোলতেন—"তোমরা সব দ্যাখ, শিবপুজো করে কি রকম শিবের মতন বর পেয়েছি আমি। চাঁদের মতন বর, সোনামণি বর।"

আমারো সেই সময় বদ্ধমূল ধারণা ছিল মৃদুদিই আমার বউ। বর-বউ-এর সম্পর্কটা তখন ঠিক বুঝতুম না, কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁরে অবু, তোর বউ কে রে? অকপটে উত্তর দিতুম—"মৃদুদি"। বা কেউ যদি জানতে চাইতো—কাকে বিয়ে করবি রে তুই? অসঙ্কোচে জবাব দিতুম—'মৃদুদিকে'।

তখন বোধ হয় সাত পেরিয়ে আটে পড়েছি। টিনের সুটকেশ নিয়ে স্কুলে যাই। স্কুলে যাবার সময় একবার মৃদুদির বাড়ী ঢুকে যাই। মৃদুদিকে না দেখলে মনটা

কেন কি জানি না। সারাদিন অন্যমনস্ক থাকি স্কুলে, পড়াশোনা কিছুই ঢুকতো চায় না মাথায়। আবার স্কুল থেকে ফিরেই কিছু খেয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ি মৃদুদিদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। বিকেলের খেলাধূলো বিশেষ কিছুই ছিল না। সমস্ত বিকেলটা ঘুরতুম মৃদুদির পেছন পেছন। মৃদুদি পুকুরে সাঁতার কাটতেন, পাড়ে বোসে দেখতুম আমি। কোন কোনদিন প্যান্ট ছেড়ে আমিও নেমে পড়তুম পুকুরে। সাঁতার শেখাতেন মৃদুদি। মৃদুদির কাছেই সাঁতার শিখেছিলুম আমি। আমার বুকের ওপর একটা হাত দিয়ে ভাসাতে ভাসাতে নিয়ে যেতেন খানিকটা দূর, তারপর হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে দূরে সরে গিয়ে বোলতেন—"হা. পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাড়ে চলে যা।" হাত-পা ছুঁড়ে যাবার চেষ্টা করতুম, খানিক এগোতুম, তারপরেই জল খেয়ে ডুবুডুবু অবস্থা হত। আমার অবস্থা দেখে এগিয়ে আসতেন মৃদুদি, চেষ্টা করতেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। মৃদুদি নাগালের মধ্যে এলেই আমি প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরতুম মৃদুদিকে। মৃদুদি কখনো বোলতেন—"ও রকম করে জড়িয়ে ধরলে আমি শুদ্ধু ডুবে মরবো যে রে।" আবার কখনো বা ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে আমাকে ভাসাতে ভাসাতে নিয়ে যেতেন পাড়ে। একদিন, অনেকটা জল খেয়ে ফেলেছি তখন, রাগের চোটে লাফিয়ে উঠে মৃদুদির চুলের গোছা ধরে ফেলেছিলুম। মৃদুদি না পারেন চুলের গোছা ছাড়াতে না পারেন সাঁতার কাটতে। দুজনেই আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছি নিচের দিকে। হঠাৎ দেখি, আমি মৃদুদির বুকের ওপর, উনি চিৎ সাঁতার কেটে এগোচ্ছেন পাড়ের দিকে। কি উপায়ে যে উনি চুল ছাড়িয়ে আমাকে বুকের ওপর টেনে নিয়েছিলেন সে আমি আজো জানি না। পাড়ে এসে হাসতে হাসতে শুধু বোলেছিলেন—"ওরে মুখপোড়া বর, আমাকে ডুবিয়ে মারার মতলব।"

স্থিরদৃষ্টিতে মৃদুদির মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। আমার তাকানো দেখে হয়তো মৃদুদি একটু লজ্জা পেলেন, অকারণে হ্যারিকেনের পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বোললেন—"কোটপ্যান্ট পরে জেন্টু-মেন্টু হয়ে গেছ তো, তাই তুই বোলতে সাহস হল না।"

এইবার কথা ফুটলো আমার মুখ দিয়ে, বোললুম—"তুই বোললেও মনে করার কিছু ছিল না আমার।"

অল্প হাসলেন মৃদুদি। লক্ষ করলুম গালের সেই চির পরিচিত টোল। হাসলে মৃদুদির গালে একটা টোল পড়ত, তাতে মুখের সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে দিত। হাসতে হাসতেই আমার হাতটা ধরে বোললেন—"ভেতরে এস।"

মৃদুদির স্পর্শে আমার সারা দেহে একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল। আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহের প্রতিটি অংশ আমাকে মনে করিয়ে দিলে বহুদিন আগেকার আর একটা নরম স্পর্শের অনুভূতি।

হাফ ছুটি হয়েছে সেদিন, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরেছি। কিছু খেয়েই যথারীতি গেছি মৃদুদির বাড়ী। আমার সেই বয়েসেও মৃদুদির সঙ্গ একটা নেশার মত পেয়ে বসেছিল আমাকে। একদণ্ড মৃদুদির কাছ ছাড়া হতে মন চাইত না। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখতুম মৃদুদিকে। মা বকাবকি করতেন—"বিকেলে মাঠে খেলতে যাবি, তা না মুদুদের ঘরের মধ্যে ঢুকে বোসে থাকিস।" এর জন্যে দুএক ঘা মারও খেয়েছি বাড়ীর লোকের কাছ থেকে, কিন্তু কিছুতেই আমাকে অন্যদিকে টানতে পারে নি।

ঘরে ঢুকেই দেখি সামনে একটা আয়না রেখে চুল বাঁধছেন মৃদুদি। ঘরের একপাশে মৃদুদির মা একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছেন। আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন মৃদুদি। ইঙ্গিতে বোসতে বোললেন পাশে। আমার বেশ মনে আছে, আমি না বোসে দাঁড়িয়ে রইলুম। মৃদুদির পিঠের কাপড় উঠে গেছে, গায়ে জামা ছিল না, হাতের অনেকটা পর্যন্ত দ্যাখা যাচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুদির গায়ের রং দেখছিলুম—এত ফর্সা হতে পারে মানুষ! ঠিক যেন ফিকে হলুদ রং করা মোম। চকচক করছে।

আমাদের দিকে একবার চেয়ে মৃদুদির মা বোলে উঠলেন—"গায়ের কাপড়টা ভালো করে দিবি তো।"

মৃদুদি তখন চুলের গোড়ার ফিতে বেঁধে তার একটা দিক দাঁতে করে কামড়ে ধরে আছেন। সেই অবস্থাতেই বোললেন—"কেন, কে এমন আছে এখানে, যে গায়ের কাপড় দিতে হবে ভালো করে?"

সেলায়ের সুতো দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে জবাবে বোললেন মৃদুদির মা—"ছেলেমানুষ হলেও অরু তো পুরুষ মানুষ।"

দাঁতে চেপে ধরা ফিতেটা ছেড়ে দিয়ে মৃদুদি চাইলেন আমার দিকে। তারপর যা কাণ্ড করলেন আজও পর্যন্ত আমি তা ভুলতে পারি নি। আমার বয়েস তখন ন'দশ বছর হবে, মৃদুদির বোধ হয় বাইশ টাইশ। ঐ বয়েসে আমার মধ্যে কোন দেহজ চেতনার ভাব থাকা সম্ভব ছিল না বোলেই আমার মনে হয়, অন্ততঃ ডাক্তারী শাস্ত্রে তার কোন প্রমাণ আমি পাই নি। কিন্তু সেদিনের সেই বিচিত্র অনুভূতির কথা এখনো মাঝে মধ্যে আমার মনে পড়ে।—"ওরে আমার পুরুষ মানুষ রে,"—বোলে মৃদুদি আমার হাত ধরে টেনে আমাকে নিজের কোলের ওপর বসালেন। তারপর দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরলেন। বেশ জোরেই আমাকে চেপে ধরেছিলেন মৃদুদি, লাগছিল আমার, অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল,—তবুও নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করিনি। মৃদুদির নরম বুকের গরম আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যেন একটা তন্দ্রার অনুভূতি বোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে রয়েছি, শত্রুর শত আক্রমণও আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মৃদুদির রকম দেখে মৃদুদির মা ওপাশ থেকে বোলে উঠলেন—"ওকি হচ্ছে মৃদু! দিনের দিন তুই বড্ড বেহায়া হয়ে উঠছিস। ছেড়ে দে ওকে।"

মার কথায় কি না জানি না, মৃদুদি আমাকে তুলে বসিয়ে নিজের গায়ের খসে পড়া কাপড় ঠিক করে নিয়ে বোলে উঠলেন—"চল হে পুরুষমানুষ, এবার পুকুরে চল। তোমাকে বুকে নিয়ে সাঁতার কাটিগে যাই।" আমার হাত ধরে মৃদুদি ঘরের চৌকাঠ পেরোলেন। মৃদুদির মার চাপা কণ্ঠ শুনলুম—"ছি ছি গলায় দড়ি। সাধে কি আর ঐ মেয়ে নিয়ে ঘর ঘর করতে পারলে না। বেহায়াপনার কোন বাচবিচার নেই গা।"
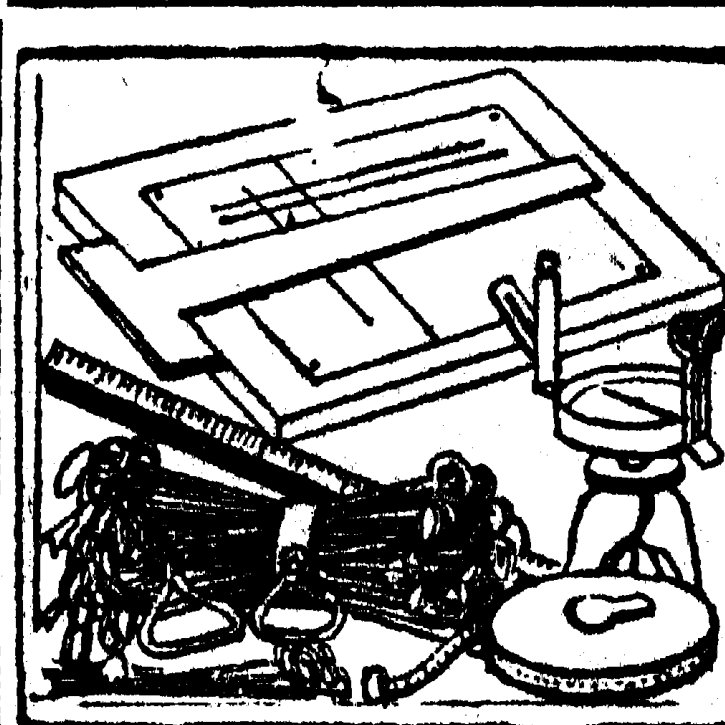
...হ্যারিকেন হাতে ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মৃদুদি. বললেন—'দু একদিন চেম্বারে দেখেছি, ঢুকতে সাহস হয়নি। তাই পাঠিয়েছিলুম ঐ ছেলেটিকে। আমার স্বামীর খুব অসুখ অবু. তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।' মৃদুদির কথার স্বরে ব্যাকুলতার আভাষ পেলুম।

মৃদুদির স্বামী! বহুকাল থেকেছি পাশাপাশি. কখনো দেখিনি মৃদুদির স্বামীকে। মৃদুদির যে বিয়ে হয়ে গেছে সেটা যখন প্রথম জেনেছিলুম তখন আমার বয়স বোধহয় বছর বারো। মৃদুদির সিঁথিতে সিঁদুর দেখতুম কিন্তু সেটা যে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পাসপোর্ট সেটা ঠিকমত উপলব্ধি করতুম না। এরও কিছু পরে জেনেছিলুম মৃদুদির স্বামী মৃদুদিকে নিয়ে ঘর করে না। বিকল্পে মৃদুদি স্বামীর ঘর করেন না। বাপের বাড়ীতেই থাকেন। একদিন জিজ্ঞেস করেই বসেছিলুম —'মৃদুদি তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?' হেসে জবাব দিয়েছিলেন মৃদুদি—'ওমা, তাও বুঝি জানিস না তুই!"

—"কোথায় তোমার বর?"

আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে বোলেছিলেন—"তুই তো আমার বর।"

তখন বয়েসটা একটু বেড়েছে। বর-বৌয়ের সম্পর্কটা কিছু কিছু অনুমান করতে পারি। মৃদুদির কথা শুনে মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি মুখটা নিচু করে নিয়েছিলুম।

আমার রকম দেখে বেশ জোরে হেসে উঠেছিলেন মৃদুদি, বোলেছিলেন—"ওমা, এখন বয়েস হয়েছে বলে বুঝি বৌকে আর পছন্দ হচ্ছে না?" কথাটা বলেই দুহাত দিয়ে আমাকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের বুকের ওপর, চুমু খেয়েছিলেন আমার মাথায়।

এক একটা করে বছর পার হয়েছে বয়েসটাও বেড়েছে সেই অনুপাতে। পড়ার চাপ পড়েছে, খুব বেশী আর যেতে পারি না মৃদুদির বাড়ী। তবুও ফাঁক পেলেই চলে যাই, না গেলে কি রকম যেন একটা অস্বস্তি হত মনের মধ্যে।

তখন বেশ বেড়ে উঠেছি, স্কুলের ওপরের দিকেই পড়ি। মৃদুদির বাড়ী যাই অভ্যেসমত, কিন্তু কি রকম যেন একটু লজ্জা লজ্জা করে। এড়িয়ে চলতে চাই মৃদুদিকে। দুচারটে মামুলি কথার পরই সরে পড়ার চেষ্টা করি। মৃদুদির ব্যবহারে কিন্তু বিশেষ কোন পার্থক্য দ্যাখা যেত না, তখনও "বর বর" বোলে ডাকতেন, বোলতেন—"বরের আমার লজ্জা হয়েছে. তাই আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। ও সব চলবে না। বর যখন বোলেছি তখন ভাত-কাপড় আদায় করবই।" নিজের কথার রেশ টেনে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তেন। লোক-জনের বাচবিচার নেই. মুখের নেই রাখ-ঢাক,—সকলের সামনেই বোলতেন অকপটে।

মৃদুদির মা মৃদুদির রকম দেখে ক্ষেপে যেতেন, বোলতেন—"বেহায়ার একশেষ। যত বয়েস বাড়ছে ধিঙ্গিপনাও বাড়ছে তত। রঙ্গ দেখে পিত্তি জ্বালা করে ওঠে।"

ফোড়ন কাটেন মৃদুদি—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা। আমারো চারদিক ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, তবু রঙ্গ আমার কমলো না। তুমি জ্বলে জ্বলে কি করবে বল?" মৃদুদির মা মুখটা বাংলার পাঁচের মত করে সরে যেতেন দৃশ্যপট থেকে।

......লণ্ঠন হাতে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন মৃদুদি, পেছন পেছন ঢুকলুম আমি।

একটা তক্তাপোষে মলিন বিছানার ওপর শুয়েছিলেন মৃদুদির স্বামী। লণ্ঠনটা টুলের ওপর রেখে মৃদুদি স্বামীর উদ্দেশ্যে বোললেন—"শুনছো, অবু এসেছে।"

মৃদুদির স্বামী বোধ হয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। মৃদুদির ডাকে চোখ খুলে বোলে উঠলেন—"এসেছো ব্রাদার। এস এস! কিন্তু বড্ড যে দেরী করে এলে ব্রাদার।"

—"এই আমার স্বামী অবু,'—বোলে অকারণে একটু হাসলেন মৃদুদি। হাসির তাৎপর্যটা ঠিক বুঝতে পারলুম না আমি।

মৃদুদির স্বামী আস্তে আস্তে উঠে বোসলেন বিছানার ওপর। মৃদুদিকে দেখিয়ে বোললেন-"হ্যাঁ ব্রাদার, এই আমার সাতপাকের পরিবার। নব্য উকিলটিকে দেখে লোভ লেগেছিল শ্বশুর মশায়ের। আমারো লোভ লেগে গেল তোমার এই দিদির ওপরের চটক দেখে। হয়ে গেল চার হাতের মিলন এক অশুভক্ষণে। কিন্তু দুচারদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলুম দারুণ ঠকেছি আমি. আমাকে ঠকানো হয়েছে। তখন রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য আমি। সমস্ত

রাগ গিয়ে পড়ল তোমার এই দিদির বাপের ওপর। ওঁর বেশ কয়েক হাজার লোক-ঠকানো টাকা, শাশুড়ীর গয়নার বাক্স আর শ্বশুরমশায়ের সম্পর্কে এক ভাইঝিকে নিয়ে সরে পড়লুম এক রাতে তোমার এই দিদিটিকে ওষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে। কিন্তু বরাতে টিঁকল না রাদার। গয়না সমেত সেই ভাইঝিটি কিছুদিন পরেই সরে পড়লেন এক সংগীতবিশারদের সংগে।

শুনতে ভালো লাগছিল না ও সব কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তে বস্তির নোংরা পরিবেশের ছোট্ট ঘরটার মধ্যে বসে হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একটা দিনের ঘটনা।

......স্কুলের শেষ পরীক্ষার খবর পেয়েই দিতে গিয়েছিলুম মৃদুদিকে। স্কুলের গণ্ডী শেষ, আরম্ভ হবে কলেজের জীবন। সেই প্রথম মৃদুদিকে দেখেছিলুম কিছুটা গম্ভীর। খবর শুনে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন আমার কাছে। দু-একবার আমার মাথায় হাত বুলোলেন, মনে হল, ওঁর হাতটা যেন হঠাৎ কেঁপে উঠলো। মাথা থেকে হাত সরিয়ে দু-হাত দিয়ে আমার মুখটা তুলে ধরে কপালে চুমু খেলেন। মনে মনে কি বোলেছিলেন তা আমি শুনতে পাইনি, তবে ওঁর ঠোঁট দুটো মৃদু মৃদু নড়ছিল সেটা দেখেছিলুম আমি।

তখন গোঁফের রেখা দ্যাখা দিয়েছে। মেয়েমানুষের স্পর্শে একটা শিহরণের অনুভূতি আসে দেহে, চুম্বনের তো কথাই নেই। হঠাৎ যেন কি রকম হয়ে গেলুম, চেষ্টা করলুম মৃদুদির হাত ছাড়িয়ে দু'পা পিছিয়ে যেতে। পারলুম না। শক্ত হাতে ধরেছেন আমার দুটো কাঁধ। সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে বোললেন—"এইবার আরম্ভ হবে কলেজে পড়া। এখানে ভালো কলেজ নেই, তোকে পড়তে যেতে হবে কলকাতায়। কলেজের পড়া শেষ হলে ডাক্তারী পড়তে হবে তোকে। তুই ডাক্তার হবি, দেখবি, মেয়েমানুষের এমন কি দৈহিক ত্রুটি থাকতে পারে, যাতে সে স্বামীকে খুসী করতে পারে না! এটা তোকে করতেই হবে অবু।" সেদিনই শুধু মৃদুদির চোখের কোণে জলের আভাস দেখেছিলুম।

অবাক হয়ে শুনেছিলুম মৃদুদির কথা। কথা শেষ করে মৃদুদি চলে গিয়েছিলেন ছাদে, আমি নেমে পড়েছিলুম রাস্তায়।

চলে এসেছিলুম কলকাতার হোস্টেলে। প্রথম প্রথম প্রতি শনিবারই চলে যেতুম বাড়ীতে, দ্যাখা করতুম মৃদুদির সংগে। মৃদুদি হেসে হেসে কথা বোলতেন, জিজ্ঞেস করতেন টুকিটাকি কথা, ধমক দিতেন রোগা হয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু আমাদের মাঝখানে কোথায় যেন একটা ব্যবধানের পাঁচিল উঠে গিয়েছিল। [illegible] গিয়েছিল আগেকার সেই অকৃত্রিম সম্পর্ক'। অন্ততঃ আমার তাই মনে হত। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতুম মৃদুদিকে,—আগের চেয়ে কিছুটা রোগা, কিন্তু তাতে যেন তাঁর দেহের লাবণ্য আরো ফুটে বেরিয়েছে। রঙটা যেন আরো বেশী উজ্জ্বল। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে হেসে ফেলতেন মৃদুদি—, জিজ্ঞেস করতেন—"কি অত দেখছিস রে চেয়ে চেয়ে? বোলতুম—"তোমাকে। তুমি তো রোগা হয়ে গেছ।"—তা তো হবেই। তুই আমাকে বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছিস, এরা পেট ভরে খেতে দেয় না আমাকে। তুই রোজগার কর, তখন দেখবি কি রকম মোটা হয়ে গেছি।"

মৃদুদির এই ধরনের রসিকতা শুনে তখন যেন কি রকম মনে হত, ঠিক বুঝতে পারতুম না মৃদুদিকে। লজ্জায় হেঁট হয়ে যেত ঘাড়টা।

তারপর কত সপ্তাহ কেটে গেছে, মাস পার হয়ে গেছে, বছরও ঘুরে গেছে। পুজোর ছুটির বন্ধে বাড়ী গেলুম, শুনলুম, মৃদুদি নাকি কোথায় চলে গেছেন। সহরের বাইরে আধা-সহর আধা-পাড়াগাঁয়ে এইভাবে চলে যাওয়াকে মানুষ কি দৃষ্টিতে দ্যাখে সেটা সকলেরই জানা। এর সোজা মানে দাঁড়ায়,—গৃহত্যাগ বা কুলত্যাগ। সে আবার কি! কোথায় যাবেন মৃদুদি? একটা মৃদু গুঞ্জন শুনতে পাই চারদিকে, কিন্তু সোচ্চারে কেউই বলে না কিছু। মা-বাবাকে দুঃখ করতে শুনেছি, মৃদুদির এই অকস্মাৎ অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে অনেকেই ব্যথা প্রকাশ করেছে, কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে কাউকেই ঘোঁট পাকাতে দেখিনি। মৃদুদির বাবা তখন মারা গেছেন; ইচ্ছে হয়েছে, মৃদুদির মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি,—কি রহস্য জড়িয়ে আছে মৃদুদির অন্তর্ধানের সংগে? রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেয়েছি মৃদুদির মাকে, সদরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি ঢুকে গেছেন ভেতরে। আর জিজ্ঞেস করতে মন চায় নি।

মৃদুদির রহস্যময় অন্তর্ধান আমার ভেতরে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বেশ কিছুকাল মাথায় ঘুরতো ঐ একই চিন্তা—মৃদুদি শেষে চলে গেল বাড়ী ছেড়ে! কতদিনের কত ঘটনা, মৃদুদির দৈনন্দিন ব্যবহার, সবই মনে পড়তো। বুকের ভেতরে একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করতুম, থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠতো বুকের ভেতরের সূক্ষ্ম তন্ত্রী-গুলোতে।

সময়ের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে এসেছিল মৃদুদির স্মৃতি। ডাক্তারী পাশ করে যখন বেরিয়েছি, তখন মৃদুদিকে একরকম প্রায় ভুলেই গেছি। শুধু মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত অনুভূতি বোধ হত, মনে পড়তো মৃদুদির দেহের নরম স্পর্শ।

কতকাল পরে আজ মৃদুদিকে আবার দেখলুম। ভেতরে একটা অদ্ভুত আলোড়ন চলছিল, অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল শতছিন্ন মলিন বিছানার ওপর রোগজীর্ণ মানুষটাকে দেখে।

মনের বিরক্তি চেপে রেখে বোললুম—"কিন্তু আপনার অসুখটা কি?"

—"অসুখ? ব্রাদার, অসুখটা কি জানতে হলে যা বোলছিলুম ওগুলো শোনা দরকার। অসুখ আমার মাথায়, বুকে, পেটে সব জায়গায়,"—বোলে জায়গাগুলো হাত দিয়ে দ্যাখালেন। "মাথাটা ঝিমঝিম করে, বুকটা ধড়ফড় করে, পেটে অসহ্য ব্যথা।"

—"আচ্ছা, আপনি শুয়ে পড়ুন, দেখি কোথায় আপনার কি হয়েছে।"

শুয়ে পড়লেন মৃদুদির স্বামী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখলুম। দেহে কিছু আর নেই বিশেষ। মাথার বুকের অসুখ দুর্বলতার জন্যে। পেটে হাত দিয়ে কিন্তু চমকে উঠলুম, লিভারের অবস্থা খুব খারাপ। জিজ্ঞেস করলুম—"লিভারটাকে এমন অবস্থায় আনলেন কি করে?"

ভদ্রলোক আবার উঠে বোসলেন হাঁফাতে হাঁফাতে। একটু দম নিয়ে বোলতে শুরু করলেন—"তবে আর বোলছি কি! পুঁজি না নিয়েই মেয়েমানুষের কারবার শুরু করলুম। আমার ব্যবসা কি রকম ছিল জান? শিখ-পাঞ্জাবীর দেশে সেলুনের ব্যবসা আর কি! ব্যাটারা চুল দাড়িই কাটে না তো সেলুন চলবে কি করে? আমারো পুঁজিবিহীন কারবার ফেল করলো। চেয়ে দেখি চারদিক ফাঁকা, সব পালিয়েছে। রয়ে গেছে শুধু নেশাটি। ভিক্ষে করেও নেশা চালাতে হয়। এই ভিক্ষে করতে করতেই একদিন দ্যাখা তোমার দিদির সংগে। সিঁথির সিঁদুরের জোরে

উনি এসেছেন আমার এই পচা প্রাণটা ফিরিয়ে আনার জন্যে।" কথা শেষ করেই ভদ্রলোক প্রবল বেগে কাশতে আরম্ভ করলেন। কাশতে কাশতেই বোললেন—"মনে কোরোনা ব্রাদার, যে শরৎ চাটুজ্জের সেই সাপুড়ে আর অন্নদাদিদির গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি। যা বোললুম একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। জীবনে কখনো কারুর সেবা পাইনি, মরণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ যে সেবার স্বাদটুকু পেয়ে গেলুম এইটুকুই আমার কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে ব্রাদার।"

কাশি থামার পরও ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন। আমারো কোন কিছু বলার মত মনের অবস্থা নয় তখন। ভদ্রলোকের বেদনার কাহিনী শুনতে অজ্ঞাতে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সেই ঝাপসা চোখের সামনেই সেবাপরায়ণা মুদুদির মূর্তিটি ভেসে উঠলো। মুদুদির সেবার স্পর্শ তো আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মিশে আছে। আমার চেয়ে কে বেশী জানে, মুদুদির সেবার গভীরতা কতখানি? মুদুদির হাতে কি যাদুর পরশ মাখানো আছে যাতে মরণাপন্ন রোগীকেও রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়?

বিকেলে সাঁতার কাটার জন্যে কিনা জানি না, সেবার আমার হল টায়ফায়েড। একশো তিন চার ডিগ্রী জ্বর। বেহুঁসের মত অবস্থা। বাবা একটু রাগ রাগ ভাবে বোলালেন—"হবেই তো। বিকেল বেলা পুকুরে সাঁতার কাটলে ভীম-ভবানীরও টায়ফায়েড হবে। আর মুদুটাও হয়েছে তেমনি। নিজে মেতে বেড়ায়, ছেলেটাকেও মাতিয়ে নিয়ে বেড়ায়।" মার বুদ্ধি সুদ্ধি নাকি সংসারী মানুষের মত ছিল। খাঁটি কথাটা বোলে ফেলেছিলেন—"যেমন করেছে, ফলও ভুগছে ও। রাত জেগে জেগে চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখেছো একবার?"

অসুখের প্রথম কটা দিনের ঘটনা বিশেষ কিছুই জানি না। তারপর যখনই চোখ খুলেছি, দেখেছি, মুদুদি বসে আছেন আমার মাথার পাশটিতে। হয় কপালে জলপটি দিচ্ছেন, নয়তো হাত বুলোচ্ছেন মাথায়। মুদুদি জিজ্ঞেস করেছেন—'কি কষ্ট হচ্ছে সোনা?' কথা বোলতে ভালো লাগেনি। ঘাড় নেড়ে মুদুদির হাতটা টেনে নিয়েছি আমার কপালের ওপর। মুদুদির ঠাণ্ডা হাতটা আমার জ্বরতপ্ত কপালে প্রলেপের কাজ করেছে।

ঠায় বোসে আছেন মুদুদি আমার পাশটিতে। মা হয়তো বোলছেন—'ও মুদু, এবার একটু গড়িয়ে নে না মা। আমি না হয় খানিক বসি।' মুদুদি সোজা জবাব দিয়েছেন—"তুমি বরং গড়িয়ে নাও। সকাল হলেই তো সংসারের ঘানিতে লাগতে হবে।" মা হেসেছেন অল্প, বোলেছেন—"বরকে বুঝি অন্য কারো জিম্মায় দিয়ে বিশ্বাস নেই?" সে কথার জবাব না দিয়ে মুদুদি আমার উত্তপ্ত কপালে স্নেহের চুম্বন এঁকে দিয়েছেন। মা কি বুঝেছেন তিনিই জানেন। আর কোনো কথা না বোলে শুয়ে পড়েছেন আমারই খাটের একপাশে।

সকাল হয়েছে, বাবা ঢুকেছেন ঘরে। দেখেছেন, সেই একভাবেই বোসে আছেন মুদুদি। কুণ্ঠা বোধ করেছেন বাবা, বোলেছেন—"হ্যাঁ মা মুদু, এবার মুখে হাতে জল দিয়ে কিছু মুখে দে।" বিরক্ত হয়েছেন মুদুদি, জবাবে বোলেছেন—"চ্যাঁচামেচি কোরো না এখানে। দেখছো সবেমাত্র একটু ঘুমিয়েছে। তোমায় অপিস যেতে হবে, তার ব্যবস্থা কর গে যাও।" —'হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি"—বোলে তাড়াতাড়ি বাবা বেরিয়ে গেছেন ঘর ছেড়ে।

কেন জানি না, আমার মনে হত, মুদুদিকে সকলেই একটু ভয় করে চলতো। ও'র নিজের বাবা-মা তো বটেই, অন্য লোকও বেশ ভয় করতো ও'কে। এর যে কি কারণ ছিল সে কথা আমি তখনো জানতুম না, এখনো জানি না। মুদুদি যে খুব মুখরা ছিলেন তা নয়, তবে সত্যি কথাটা বেশ স্পষ্ট করে বোলতে পারতেন। এটাই হয়তো একটা কারণ হতে পারে।

অথচ মুদুদি ছাড়া চলতো না কারো। মেয়ের বিয়ে, শ্রী গড়তে হবে—ডাক মুদুকে, ছেলের বিয়ে বরণ ডালার দরকার—খবর দে মুদুকে। ওমুকের ছেলে হয়েছে, চলে এল ছেঁড়া কাপড় মুদুদির কাছে। কাঁথা তৈরী করে দিতে হবে। নতুন জামাই এসেছে, মাংস রাঁধতে হবে, দৃশ্যপটে আবির্ভূতা হলেন বিপদতারিণী মুদুদি। বাসরঘর যেমন জমিয়ে রাখতে পারতেন মুদুদি, তেমনি আঁতুড়ঘরেও মুদুদি ছিলেন অপরিহার্য।

......নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে মুদুদির স্বামীকে বলি—"কিছু ভয় নেই। ঠিকমত চিকিৎসা করলেই ভালো হয়ে উঠবেন। আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

আমার কথা শুনে খানিকটা হাসলেন ভদ্রলোক, বোললেন—"নেশা করে মাথাটার দফা গেছে সত্যি, তবে এখনো বুঝি কিছু কিছু। শিবের বাবার সাধ্যি নেই আমাকে ভালো করে, তুমি তো সামান্য ডাক্তার। ভড়কি দিও না ব্রাদার। ওষুধের দরকার নেই, পাঁচটা টাকা দাও, একটা বোতল আনতে পাঠাই। এক মাসের ওপর হল পেটে ছিটে ফোঁটা মাল পড়ে নি।"

হাঁ করে শুনছিলুম মুদুদির স্বামীর কথা। আমাকে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে উনি বোলে চললেন নিজের কথা—"বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই ব্রাদার, কোন লাভ নেই। কি হবে এইভাবে বেঁচে থেকে? আর আমাদের মত মানুষের জীবনের মূল্য কি?—সাতাশ টাকা। বড় জোর চল্লিশ টাকা। তবে মরণের মুখে দাঁড়িয়ে আজ দুঃখ হচ্ছে তোমার দিদির কথা ভেবে। আমার মত একটা অসভ্য জানোয়ারের জন্যে বাপেরবাড়ীর অমন নিশ্চিন্ত আশ্রয়টি হারালে। হয়তো এবার ওকে ভিক্ষেতেই বেরোতে হবে।" ভদ্রলোকের চোখের কোন দুটো চিক্ চিক্ করে উঠলো, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েকটা জলের ফোঁটা।

অসহ্য লাগছিল পরিস্থিতি। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলুম ঘরের বাইরে। মুদুদি এলেন আমার পিছু পিছু।

কথা বোললেন মুদুদি—"ছেলেটিকে ডাকি, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

হাতঘড়িতে সময় দেখলুম, রাত প্রায় বারোটা। বোললুম—"না, তার দরকার নেই, আমি একলাই যেতে পারবো। কাল সকালে ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও, ওষুধ দেবো।"

দু'পা এগিয়ে আবার থেমে পড়লুম। মুদুদির দিকে চেয়ে বোললুম—"একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

—"কি কথা?" বোলে হাসলেন মুদুদি।

—"স্বামীর কাছেই যদি এলে তো ওভাবে এলে কেন?"

একটুকাল থেমে মুদুদি জবাবে বোললেন—"ওছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না ভাই।"

এর বেশী আর কিছু বোললেন না মুদুদি, আমিও জানবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করলুম না। এই প্রথম শুনলাম মুদুদির মুখে ভ্রাতৃ সম্বোধন। মনটা কি রকম যেন আনচান করে উঠলো। যা কখনো করিনি তাই করলুম। হেঁট হয়ে প্রণাম করলুম মুদুদিকে। মুদুদি চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চুমু খেলেন। দেখলুম, মুদুদির দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

......কয়েকদিন পরে সেই ছেলেটি এসে মুদুদির স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে গিয়েছিল। জানিয়েছিল, মুদুদি আর সে বাসায় নেই, কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না।

এখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে মুদুদির কথা, ভেবে অবাক হয়ে যাই, কেন তিনি আমাকে একটা কঠিন রহস্যের মধ্যে রেখে গেলেন? কেন প্রকাশ করে গেলেন না তাঁর ঐভাবে চলে আসার রহস্য। ভাবতে ভাবতে মাথার শিরাগুলো জট পাকিয়ে যায়। চোখ দুটো অকারণেই ঝাপসা হয়ে আসে, দেহে একটা শিহরণ অনুভব করি।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, তার আদর্শের রূপায়ণ, সেখানে আইন-শৃংখলা রক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই নানা ধরনের জল্পনা কল্পনা, আলাপ-আলোচনা চলছে। কিন্তু বিশ্বভারতী শুধু কি একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, না একটি আইডিয়া, এই প্রশ্ন নিয়ে রবীন্দ্রানুরাগী অনেকেরই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমেই বলে রাখি যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোন যোগ নেই, কোন বিশিষ্ট রুচির, রীতির, নীতির বা দল বেদলের মাদলের ধারক ও বাহকও আমি নই। একটা বিরাট প্রতিভার বিচিত্র সৃষ্টি সুষ্ঠুভাবে বেঁচে যায় এই কামনাই আর পাঁচজন অতি সাধারণ স্বদেশবাসীর মতই আমার কাম্য। আমরা অন্য যুগের মানুষ। সে যুগের হাওয়ায়, চিন্তায় চেতনায় ভাবে ভাষায় আত্মসৃষ্টিতে মগ্ন রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। এর ফল দ্বিমুখী হয়েছিল—আমরা আত্মকর্মক্ষম সচেতন হইনি, কেবলি 'মামেকং শরণং ব্রজ' করে চেয়েছি ঐ শাল-প্রাংশু মহাভুজর্ষির দিকে। তিনি বসে আছেন ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় শুভ্র নীরবতার মধ্যে। পথে যেতে যেতে যখনই বাতি নিভেছে, যখনই শুনেছি বন্দীবন্যাবারির গুহাবিদারণের কলরোল বা অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য, তখনই জোড় করে গদগদ হয়ে বলেছি তাঁকে ও তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী মনীষীদের—যেমন রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ—হে বন্ধু, হে পিতা, হে ত্রাতা, মন্ত্র দাও, বুদ্ধি দাও, জ্ঞান দাও, হিংসা কণ্টকিত মরুভূমিতে পথ দেখাও। তাঁরাও তিমির-অমা নিবিড় রাতে অভয় পাণি প্রসারিত করে বলেছেন—মাভৈঃ, এগিয়ে চল, হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো দাও গো আমার হাতে, একলা পথের চলা রমণীয় হবে। আজকের এই ক্ষুব্ধলুব্ধ তপ্তক্রান্ত দিনে, বিচ্ছিন্ন সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের মুখে এই ধরনের বিশ্বাস পরিক্রমা প্রায় অচল, মোহাবিষ্ট ভাবগদগদ আবিলতা শুধু পরিত্যাজ্য নয়, দুষ্পাচ্য। পথ দয়াহীন, দুর্গম, উপলখণ্ডে আকীর্ণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবাদ আমাদের গণ্ডীকে আজ প্রসারিত করে দিয়েছে শুধু সীমাহীন শূন্যে নয়, আণবিক যোগ-বিয়োগের অস্তিত্বের গণিততত্ত্বে, সামাজিক ক্ষেত্রে অন্ন বস্ত্র হয়নি, জীবন ও জীবিকার মধ্যে নেই সামঞ্জস্য আচ্ছাদন নাই মাথার উপর, রোগে পাই না ঔষধপথ্য আরোগ্য ব্যবস্থা, এখন আর কবির কথায় মন ভরে না, বিশ্বাস আশ্বাসে প্রত্যয় আসে না, আসে ক্রোধ, লোভ, হিংসা, রিরংসা, সন্দেহ সংশয়, গঞ্জনা হয় উগ্রতর। চলমান জনতার বেগ এবং অনভিব্যক্ত আশার তাড়না শুধু উজিয়ে নিয়ে চলেছে। জাতির জীবনে আজ নবনব সমস্যা, নূতনতর প্রশ্ন, নূতন মূল্যমানের হচ্ছে সৃষ্টি। বলা হচ্ছে আজ আর জীবনকে মেনে নেবার যুগ নেই, আজ হচ্ছে বিচারবিবাদ বিতর্ক কলহের যুগ। তার মন্থনে অমৃতের সঙ্গে যে হলাহল উঠবে তাকে কণ্ঠে ধরবার শক্তি অর্জন করতে হবে, নীলকণ্ঠ না হলে শ্রীকণ্ঠ হওয়া যায় না। রুদ্রের প্রসন্ন মুখ প্রদীপ্ত হয় সেই আলোড়িত জনমানসে। সেই প্রসন্নতাই বুদ্ধিকে প্রশান্ত করে, হৃদয়কে পবিত্র করে, শক্তিকে মঙ্গলের তীর্থে উত্তীর্ণ করে দেয়! এই ধরণের উক্তিকে আজ সেকেলে বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়—বলা হয় আজ আর মাথা পেতে জীবনকে মেনে নেওয়ার যুগ নেই, আজ শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও বিস্ফোরণের যুগ, বিস্ফোরণের যুগ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই আমরা সন্দিহান হয়ে উঠেছি, বিচার বিশ্লেষণ করে বলছি তাঁর যুগের সমস্যাকে তিনি যে চোখে দেখেছিলেন যে মন নিয়ে ভেবেছিলেন, সে সৃষ্টি-দৃষ্টির প্রয়োজন নেই। তাঁর লেখার মধ্যে যখন দেখি যে তিনি বলছেন—অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু, চাই স্বাস্থ্য, চাই বল আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু—তখন অ্যাওয়ারনেস হয়তো আছে, কিছুটা অ্যাকসেপটেন্সও, কিন্তু আইডেন্টিফিকেশান কোথায়? আজ পুত্র পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন, পিতানোহসি বলে ধ্যানমগ্নও হওয়া যায় না, আজ স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বিচ্ছিন্নতা, পুরুষের সঙ্গে নারীর, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের রাজার সঙ্গে প্রজার, আজ আর স্বদেশী সমাজ নিয়ে চলে না, আজ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ—চলবে না, চলবে না। আজ ক্ষুধিতের বিড়ম্বনা, মানুষজন্তুর হুহুংকার, অতৃপ্তের প্রবঞ্চনার মাঝে রাজার ঘরের দুলালের ফিউড্যাল এ্যারিস্টোক্রেসির ভাব-গদগদ রোমান্টিক ভাবালুতা কি মানায়, সত্যের শিবের সুন্দরের নামে যেখানে অসুন্দরই বাসা বেঁধেছে জাতির জীবনে প্রত্যেকটি রন্ধ্রে। রবীন্দ্রনাথ কী ও কে—এই নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই—তিনি পোয়েট, পেট্রিয়ট, প্রফেট, আলাপচারী, পথচারী, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, বিশ্ববরেণ্য মনীষী, সাধক, ভুবনডাঙার ভুবনজয়ী বংশীধারী আবার শ্রীনিকেতনের হলধারী কৃষাণের জীবনের শরিক। তিনি যেমন বুর্জোয়া, তেমনি প্রলেটেরিয়াট, তিনি জাপানে গিয়ে দেখলেন ন্যাশনালিজমের ভূতকে, রাশিয়ায় গিয়ে কালেকটিভ ওয়েলথের সদ্য পাকা ফলকে, জার্মানীতে পেলেন 'বাজবদুমেত-ধর্মান'র মত সম্মান। তাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হলে একটু স্থির ধীর তথ্যগতচিত্ত হয়েই করতে হবে। আজকের সমাজজীবনে শুধু শিক্ষা-ক্ষেত্রে নয়, প্রতিটি স্তরে প্রতিরোধের প্রশ্ন উঠেছে, ভালোমন্দর বিচার হচ্ছে শুধু যুক্তি-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নয়, হিংসা কণ্টকিত পথে। সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সমস্যা আছে, তার সমাধানের নিজস্ব একটি দিক যেমন আছে, তেমনি আছে একটি সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিধি। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুধু রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে যেমন গজদন্ত-মিনার গড়ে তোলা যায় না তেমনি রবীন্দ্র-আদর্শ বিচ্যুত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই শান্তিনিকেতনের লালমাটিতে উর্বর হবে না একথাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এর প্রতিটি কংকরে, প্রতিটি আম্রকুঞ্জে—প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ব্যবস্থাপনায় সুরের তরঙ্গে মন্ত্রের উদাত্ত উচ্চারণে উদ্দীপনায় নিহিত আছে একটি সাধকের সাধনা, তাঁর ধ্যান, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর রূপক্রিয়া, তাঁর কল্পনা, তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস। এ এক নূতন ধরনের পঞ্চবটীর পীঠস্থান। কালের যাত্রায় যুগোপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু যত তাণ্ডবনৃত্যই হোক, লোলজিহ্ব ভীম ভৈরবের ভীষণ আরাব আসুক, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে পারে না, চায়ও না। কারণ যে কবি বলতে পারেন

আজ বেদ মন্ত্রে হে বজ্রী তোমার করি স্তব
তব মন্ত্র রব
রৌদ্ররাগিণীর দীক্ষা নিয়ে মোর শেষ গান
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের 'ছন্দ'
জাগুক হুংকার
বাণী বিলাসীর কন্ঠে ব্যক্ত হোক ভৎর্সনা
তোমার

তিনিই শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করতে পারেন সবকিছু সম্পূর্ণতা।

নিজে যা পারিনি দিতে নিত্য আমি থাকি
তাঁর খোঁজে
সেটা সত্য হোক

এই উদারতাই, এই সমীকরণের বিশ্বাসই কবির আশাকে ভাষা দিয়েছে, সত্য করেছে, মহত্তরের সুর মিলেছে সেখানে, বৃহত্তের মহতের, মহত্তমের অভীপ্সায়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সাবজেকটিভ অ্যাডুলেশন এটা নয়,

তাঁর কথামত অবজেকটিভ ভ্যালুয়েশন এই দুই-এর মধ্যে সুষ্ঠু সমাধান বিধানই আজকের দিনে বর্তমান সমস্যার একমাত্র উপায়—কীভাবে এটা সম্ভব তার বিচার-বিশ্লেষণ সুধীগণ করবেন আমরা দূর থেকে এই আশাই করবো। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তির আতিশয্যেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে মূল প্রশ্নটি শুধু রীতিগত নয় নীতিগত —রবীন্দ্রনাথের আদর্শে রূপায়িত বিশ্বভারতী আর আজকের আইন-শৃংখলা-বন্ধ সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটি কি একই মূল্যমান ও স্বীকৃতি বহন করে? আইনতঃ হয়তো তাই, কারণ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধান রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়েই একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তার প্রথম পরিশিষ্টে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত কর া হয়েছে। শান্তরসাস্পদ তপোবনের প্রতিষ্ঠা হয়তো আজকের দিনে অনেকের কাছে মিডিয়েভল রিভাইভ্যালইজম বা ...জিয়ামের শোপিস বলেই মনে হবে, কিন্তু শহরের কোলাহল হতে দূরে স্নিগ্ধ পরিবেশে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা এমনই কি অসম্ভব যেখানে শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'আমাদের মনকে তুমি বড় করে দিয়েছো।' রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ছিল এবং আজকের বিশ্বভারতী আইনেও আছে যে পঞ্চশীলের একটি শীল যেন হয় 'ক্লীডের' দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি—আজ সর্বত্রই এই 'ক্রেডো' নিয়েই দ্বন্দ্ব—সুবর্ণগোলক যেন। এই থেকেই জনগণের মনে উৎসারিত হচ্ছে ক্রোধ, সংশয়, সন্দেহ, বিচ্ছিন্নতা শান্তম শিবম অদ্বৈতমের সংগে নিষ্ঠা প্রেম ভালবাসা শ্রদ্ধা মমত্ববোধও করেছে অন্তর্ধান। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের দরজায় এমন এক দেবতার নাম লিখতে চেয়েছিলেন যাতে অপদেবতা ভাগে। জগদানন্দ রায়কে লিখিত এক চিঠিতে দেখি তিনি বলেছেন—বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথছি। রথীন্দ্রনাথের ডায়েরী ও কবির নানা ভাষণে দেখি বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ তাঁর মনে দানা বাঁধছে। তিনি বলছেন যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ বিদ্যা দান করা। রবীন্দ্রনাথ ও অন্য মনীষীদের সংস্পর্শে এখানে সেই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল,—তাঁর কর্মসঙ্গীরা ছিলেন দরিদ্র, কিন্তু অন্তরে ঋদ্ধিমান, তাঁদের ছিল আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা যে আজ নেই কি শিক্ষক, কি ছাত্র কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শাসনযন্ত্রে অধিষ্ঠিত উত্তমপুরুষের মধ্যে একথা বলবার মত অশ্রদ্ধা আমার নেই, কিন্তু প্রশ্ন আছে। কারণ কল-কল্লোলিত কলকাতাতেই ক্ষয়ক্ষতি, লুন্ঠন, বোমবাজী, দাংগাহাঙ্গামা, পরীক্ষাগৃহে অসদুপায় অবলম্বন, ঘেরাও-এর অন্তহীন অবক্ষয়ের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার বিশ্বাস ক্ষুণ্ন হয়নি—আমি স্বচক্ষে দেখেছি তারই মধ্যে তাদের নিরলস সারস্বত সাধনার দৃষ্টান্ত—হোক্ না তাদের সংখ্যা কম হোক না আমাদের কালের দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে তাদের মতানৈক্য। হালই ভাঙুক, পালই ছিঁড়ুক, সময়ের সংগে সমন্বিত হয়ে স্রোতের মুখে এগিয়ে যাবে তারা এই আস্থার প্রতি সায় আছে আমার যদিও আজ চতুর্দিকে নৈরাশ্যের বান ডেকেছে, হিংসার উন্মত্ততা এসেছে, জীবন ও জীবিকার নেই সমন্বয়, হিংস্র নখর হয়ে উঠেছে সমাজ চেতনা, কলকাতার বুকে ও তার উপকণ্ঠে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

নাম ও স্থান মাহাত্ম্যে ও অর্থ সাহায্যের নির্ভরতায় যখন বিশ্বভারতীর মত একটি প্রতিষ্ঠানকে নবরূপায়ণে গঠন করবার সুযোগ এলো, তার জনবল, বাহুবল, অর্থবল বাড়লো তখন তার মনোবলকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শুধু রবীন্দ্র-মানসপুত্রী বিশ্বভারতীরই সৌকর্য বাড়তো না, আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট অভাবও পূরণ হতো। রবীন্দ্রনাথের তাই ইচ্ছা ছিলো, তাঁর নিজের সীমিত প্রচেষ্টায় সেই সাধনাকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছিলেন, আজ তা হয় নি একথা স্বীকার করতে দোষ নেই। বিশ্বভারতী একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ভাবেই গড়ে উঠেছে তার রীডার প্রফেসার লেকচারাররা আছেন, আছে দাবী-দাওয়া, কর্মিসভা, মিছিল, বিক্ষোভ, ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন। তার সম্পদ হবে মনের, হৃদয়ের, সেখানে শান্তির অক্ষয় অধিকার অক্ষুণ্ন হবে না, সেখানে ত্যাগ, নিষ্ঠা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা মুছে যাবে না। সেখানে শিক্ষক-ছাত্র-কর্মী সমাজ একটি মঙ্গলদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হবেন, এটা কি শুধু কবি কল্পনা। সত্যিকার শিক্ষককে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শান্তিনিকেতন নিজেই তার প্রমাণ। এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সে চেষ্টা হয়েছিল—গুণিজন সমাবেশে। হ্যারল্ডল্যাস্কীর কাছে পড়বার জন্য ছাত্র জুটতো পৃথিবীর সর্বদেশ থেকে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে। রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা শুনতে জমায়েত হতো বহু ছাত্রছাত্রী যারা দর্শন পড়তো না বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল না। সেকালে পার্শিভাল সাহেব বা প্রফুল্ল ঘোষের কাছে ইংরাজী পড়বার জন্যই লোক সমাগম হতো ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সিলভা লেভী, উইনটার নিজের ক্লাসে পড়বার জন্য ছাত্ররা যেতো কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে, ডিগ্রীর মোহ কাটিয়ে। আজও কতো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্য রসিকরা ছাত্রছাত্রী পান শুধু রিসার্চ, বা ফেলোশিপের জন্য নয়, জ্ঞানের, সততার শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহে।

রবীন্দ্র সংস্কৃতি-তথা ভারত সংস্কৃতি চর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতীকে গড়ে না তুলে একটি অতি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে এর পরিণতি আমাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের পরিচয় দেয়। তাই আজ শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতী টুরিস্ট কেন্দ্র, অবসরপ্রাপ্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের আশ্রয়স্থল, গীতবাদ্য নৃত্য শিক্ষার একটি সহজ সুলভ প্রতিষ্ঠান যাকে বলা হয়েছে 'পল্লী বাংলার বুকের উপরে ভাসমান বাবু-কালচারের হাউস-বোট।' আজ যদি এই প্রতিষ্ঠানটিকে রবীন্দ্র ভাবনায় উজ্জীবিত করতে হয়, তাহলে চাই একদল নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা - ছাত্রছাত্রী দল যাদের ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিত্য, চারিত্র শক্তি অপরদের উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করতে পারবে, রবীন্দ্র চর্চার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে করা চলবে অর্থাৎ যার মান হবে আজকের ভাষায় পোস্ট-মাস্টার ইনস্টিটিউট অফ স্টাডিসের কাজের মত—একটা উচ্চ ও উন্নত মানের ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার, পঠন-পাঠনের সারস্বত কেন্দ্র। সাধারণ শিক্ষা বিভাগ থাক, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হবে বিদ্যাসৃষ্টি, শুধু বিদ্যাদান নয় এবং তার এক একটি শাখা গড়ে উঠবে এক একটি সারস্বত তপস্বীর তত্ত্বাবধানে—সেটা শুধু ভারতের চিত্তবৃত্তির নানা প্রকাশের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে না, তার মহিমা আপন আপন অংগনসীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশে সর্বকালের প্রতিভা থেকে প্রাণরস অর্জন করবে—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। তবেই বিশ্ব-ভারতীর মাধ্যমে রবীন্দ্র স্মৃতি সৌধ বিরচন সার্থক হবে। তা না হলে আর পাঁচটা ছোট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত বিশ্ব-ভারতী টিঁকে থাকবে ততদিন, যতদিন তার অর্থ সাহায্য সরকারী কোষাগার থেকে অব্যাহত থাকে। আমাদের উত্তর পুরুষরা এখনই ঘাড় বেঁকিয়ে দার্শনিক ভংগীতে বলতে শুরু করেছেন—রবীন্দ্রনাথ কে? তিনি অতীতের ঐতিহ্য হন নি শুধু গোটাকতক গান ও নৃত্যের পালার জন্য—আর তাঁর জীবন রীতি, সাহিত্য সৃষ্টি সে তো উপনিষদ বেদবেদান্ত বৈষ্ণববাদের সংগে কিছুটা ইউরোপীয় বা প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান মিশিয়ে সুপক্ক খেচরান্ন—কোথায় কাফকা বা বো বোদলেয়ারের মত অতলস্পর্শী গভীরতা-বোধ, মানসিক যন্ত্রণা বা অপরাধ-বোধ বা বিচ্ছিন্নতার সুর? ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি তো দি গেট অ্যারিসটোক্রাট আমরা না হয় বলবো দি গ্রেট সেনটিমেন্‌লও বটে—এহ বাহ্য এহ বাহ্য আগে কহ আর আজকের প্রশ্ন সুনীতি দুর্নীতির প্রশ্ন নয়—বেঁচে থাকার প্রশ্ন, প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও প্রাণ হে। বেদনার পাত্র শুধু অমৃতে ভরাবে, ভরবে বিষে—শুধু কাজলে চলবে না—নয়নে নজর থাকা চাই।
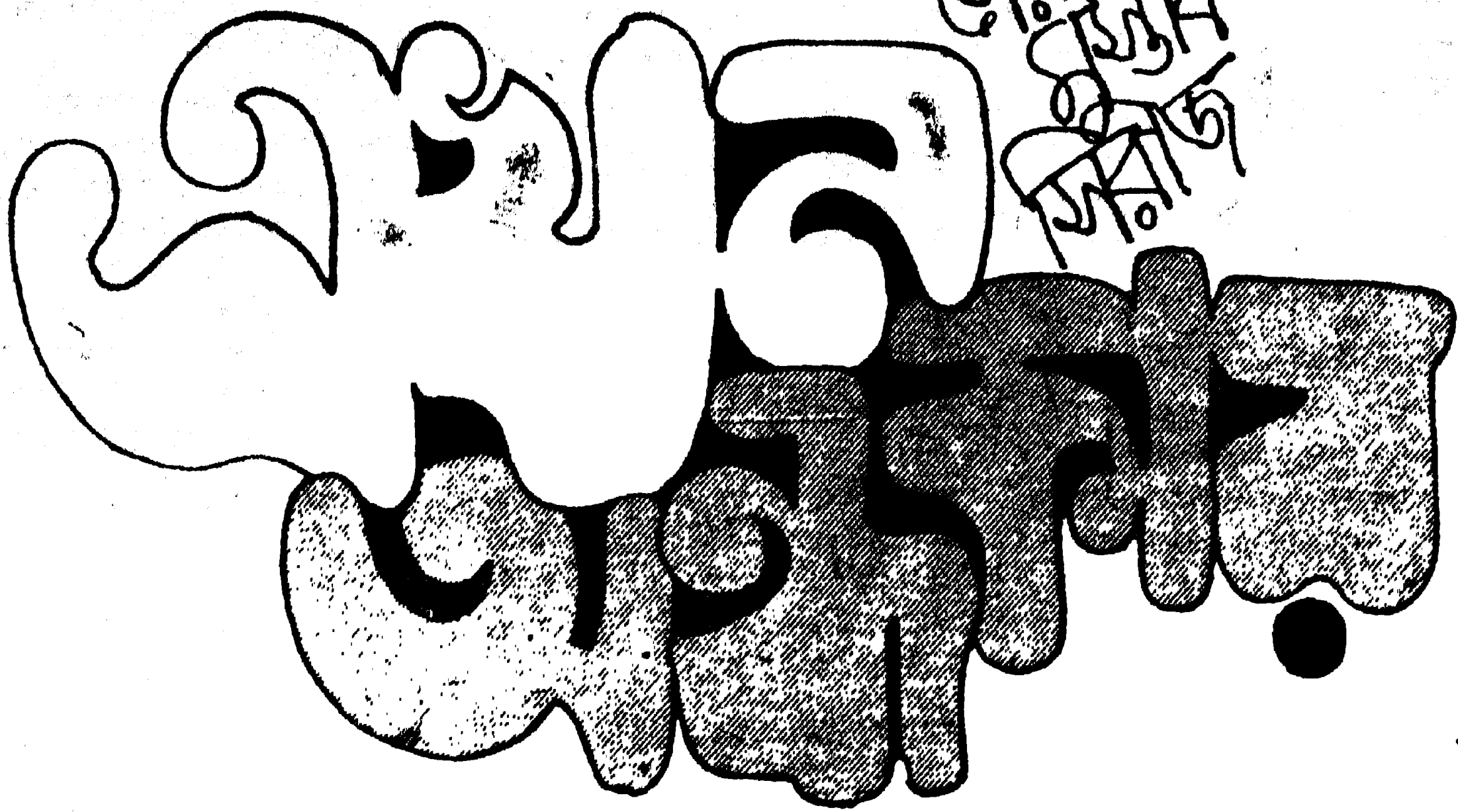
এখন অন্ধকার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

।। সাত ।।

পাণ্ডেজীর গদীর দিকে যাচ্ছিল চন্দন। রাস্তার পাশে একটা খাটিয়া পেতে হেমন্তের সকালটা আয়েসে উপভোগ করছে [illegible] সর্দারজী। কেউ চা খাচ্ছে, কেউ [illegible] করে [illegible]। তাদের একজন চন্দনকে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, নমস্কার স্যার। কেমন আছেন?

লোকটার চেহারা দেখে সর্দারজী বলেই মনে হয়। মাথায় পাগড়ি, দাড়ি-গোঁফ আছে, হাতে যথারীতি কাঁকন। থমকে দাঁড়াল চন্দন। কেমন যেন চেনাচেনা লাগছে মুখটা। সে বলল, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলুম না।

লোকটা হাসতে হাসতে উঠে এল।... আমি ব্রজ—ব্রজমোহন। গঙ্গার ওপারে আমি গাড়ী চালাতুম—মনে পড়ছে না স্যার?

চন্দনের আবছা মনে পড়ল। ক বছর আগে বহরমপুর-জিয়াগঞ্জ রুটে একটা স্টেশনওয়াগন প্যাসেঞ্জার বইত বটে। তার ড্রাইভারের নামও ছিল ব্রজ—আলাপ-সালাপ ছিল সামান্য। কিন্তু সে তো অন্য লোক!

ব্রজ বলল, চেহারা বদলে ফেলেছি—বুঝলেন? এমনি সখ গেল সর্দারজী সাজতে। যাক গে, শুনলুম—আপনি রূপপুরে এসেছেন। কিন্তু দেখা হচ্ছিল না এ্যাদ্দিন। কেমন আছেন?

চন্দনের আরও কিছুটা মনে পড়ল। কনকপাড়ার রাজকমলবাবুর স্টেশনওয়াগন চালাত ব্রজ। ভারী আলাপী লোক ছিল সে। একবার যেন তার কাছে খাতির করে ভাড়া নেয় নি। কোত্থেকে আসছিল সে—হ্যাঁ, লালবাগ থেকে। শীতের সময় ছিল সেটা। চন্দন বলল, ভাল আছি। আপনি এদিকে কবে থেকে ব্রজবাবু?

ব্রজ পানরাঙা দাঁত ও জিভ বের করে হাত জোড় করল।...আপনি-টাপনি বলা কেন স্যার? তখন কিন্তু তুমি বলতেন। ও লাইনে সবাই তাই বলত। বলবে না কেন? বাগদীর ছেলে—চালাতুম রিকসো। তার প্রমোশন হল মোটর ড্রাইভারীতে। হলে কী হবে? আমি কিন্তু মনে মনে যা ছিলুম, তাই থেকে গেলুম আজও। চলুন, চা খাওয়া যাক।

চন্দন ওর অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ হল। বলল, এখনও কি সেই গাড়ীটাই চালাচ্ছেন?

ব্রজ ফের করজোড়ে বলল, তুমি বলুন স্যার—আগের মতো।

হেসে চন্দন পা বাড়াল।...রাজকমলবাবুর খবর কী?

ব্রজ বলল, ভালই। এরুটে গত বছর পারমিট পেয়েছেন। আগের রুটটা তো ক্যানসেল হয়ে গিয়েছিল। আর বলবেন না। কত রকম গোলা চলে এ লাইনে।

সামনের চায়ের দোকানটা বেশ গোছানো ছিমছাম। রেস্তোরা বলাই ভালো। কারণ ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'স্যাণ্ডু-ভ্যালি রেস্টুরেন্ট।' ভিতরে তিন-চারটে টেবিলও আছে—সবুজ রেকসিনে মোড়া। চেয়ার আছে। বাইরের বেঞ্চে বসতে যাচ্ছিল চন্দন। ব্রজ ভিতরে ঢুকে ডাকল, আসুন—খালি আছে।

ভিতরে ঢুকে চন্দন দেখল, দুটো 'লেডিজ'ও রয়েছে পর্দা ঢাকা। কাউন্টারে একজন লম্বাটে রোগা প্রৌঢ় ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে কাগজ পড়ছেন। এখানে ঢুকলে মনে হয় না যে সামান্য দূরেই বিশাল ধানের মাঠ রয়েছে। শহরের ঝলমলে আভিজাত্যের আদল সামনে এসে দাঁড়ায় তক্ষুনি। ফাঁকা টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে ব্রজ বলল, পরেশবাবুর কাছেই শুনেছিলুম — আপনি এসেছেন। সময় পাইনে একেবারে। দু বেলা দুটো করে আসা-যাওয়া ট্রিপ। সামলাতে প্রাণান্ত হই। গাড়ী ছাড়বার সময় চেহারাটা দেখবেন না! হাঁ হয়ে যাবেন। দু ধারে লোক, মাথায় লোক, সামনে বনেটে লোক। এক ইঞ্চি ফাঁক পাই দেখবার—আন্দাজ করে গাড়ী চালাই। বাপ্‌সে, দিনে দিনে যত গাড়ি বাড়ছে, ভিড়ও তত পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। ওই-ওই দেখুন না! ওই তো যাচ্ছে!

রাস্তায় একটা চলন্ত বাস দেখাল ব্রজ। বলল, এই সাত সকালেই এমন ভিড়। মাইরি স্যার, লোকে যেন আর এক জায়গায় চুপচাপ বসে থেকে সুখ পায় না। ছোটাছুটি গুঁতোগুঁতি—ফেট্‌!...ব্রজ তেঁতো মুখে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফিক করে হাসল হঠাৎ।...ফ্যামিলি এনেছেন না একা?

চন্দন বলল, একা।

ব্রজ সিগ্রেট বের করে এগিয়ে দিল। ...খান। আপনাকে আমার খুব ভালো লাগত—তাই মনে ছিল। আসলে এই রকমই হয় স্যার। আপনি এডুকেটেড লোক—ভাল বুঝবেন। কোন কোন লোককে দেখে খুব আপনার জন মনে হয়। আপনাকে আমার মনে ছিল।...

সে গলা তুলে ফের বলল, সীতাংশুদা, দুটো চা। মামলেট দুটো।

চন্দন বলল, শুধু চাই হোক।

নাঃ, খান।...ব্রজ চাপা গলায় বলল।... শালা এ পাপের জায়গায় এসে মন খুলে কথা বলার লোক খুঁজে পাইনে। কী আনন্দ না হচ্ছে! জানেন স্যার! এখানে সব ব্যাটা চোর—সব্বাই গলাকাটা! পয়সা ছাড়া রূপপুরে কেউ কিছু চেনে না। আপনি নতুন লোক—জেনে রাখা ভালো। খুব সাবধানে থাকবেন স্যার।

চন্দন বলল, আপনি একা থাকেন, না ফ্যামিলি নিয়ে?

ব্রজ হাসল।...ফের আপনি বললেন? ঠিক আছে, বলুন। হ্যাঁ—ফ্যামিলি নিয়েই আছি। পাগল হয়েছেন? একা থাকলে একটা পয়সাও রাখতে পারতুম ভেবেছেন? রূপপুর সেদিকে বড্ড সেয়ানা। পরে বুঝবেন সব। তা—হাতে সময় আছে? চলুন না, বাসাটা দেখে আসবেন। কাছেই।

চন্দন ঘড়ি দেখে বলল, পরে একদিন হবে। এখন পাণ্ডেজীর গদীতে যাব। একটু কাজ আছে।

কাউন্টার থেকে প্রৌঢ় লোকটি অর্থাৎ সীতাংশুবাবু বললেন, ব্রজ; তোমার ফার্স্ট ট্রিপ কটায় হে? আমার ছোট মেয়েকে কদমতলায় নামিয়ে দিয়ে যেও।

ব্রজ বলল, সাড়ে দশটা। আগে থেকে ব্যাগফ্যাগ রেখে যেতে বলবেন।

চা-মামলেট এসে গেল। রীতিমতো কাঁটা-চামচ ছুরিও। চন্দন বলল, এখানে বাড়ি করেছেন, না বাসা?

বাড়ি? ব্রজ চোখ বড় বড় করে বলল। আমার বাড়ি হবে? রূপপুরে? কী যে বলেন, সবাই কি পরেশবাবু হতে পারে স্যার? কপাল—লাক্।

সীতাংশুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, লাক না হাতি। আজে-বাজে করে পয়সা ওড়ালে কী হবে? তুমি তো ঈশ্বরের কৃপায় কম রোজগার করো না ব্রজ। দুজনেই রোজগার করো। সুরকিকলের পাশে এমন চমৎকার প্লটখানা জলের দামে বিক্রি হল—বললুম নিলে না।

ব্রজ বলল, যখন বললেন—তখন যে আমার অবস্থা টাইট। সীতাংশুদা, আর খোঁজখবর থাকলে বলবেন—চেষ্টা করা যাবে। স্যার, আলাপ করিয়ে দিই। আমাদের সীতাংশুদা—জায়গা জমির দরকার হলে রূপপুরে ইনি ছাড়া চলে না কারো। আর দাদা—ইনি আমাদের পরেশবাবুর লোক।...

চন্দন নমস্কার করে বলল, আমার নাম চন্দন...

বাধা দিয়ে সীতাংশুবাবু বললেন, জানি। পরেশ বলছিল। আপনার বাড়ির জন্যে জমি আমিই দেখছি। এ তো আনন্দের কথা। পরেশের কাছে সব শুনেছি চন্দনবাবু।

চন্দন কৌতূহলী হয়ে বলল, কী শুনেছেন?

খুক খুক করে একটু হাসলেন সীতাংশুবাবু।...ব্রজ, ইনি পরেশের পরম কুটুম্ব হচ্ছেন জানো তো হে? সেই যে ওর শালী রয়েছে—সেই মেয়েটি হে, কলেজে পড়ে। বড় আনন্দের কথা।

ব্রজ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। গোঁফ পাকিয়ে হেসে বলল, আরে খ্যাস! ভালো, ভালো। ভারি সমৎকার মেয়ে। কিন্তু কী কাণ্ড! আমি ভাবতুম, এনার বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে।

চন্দন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ স্নেহধারার মুখটা মনে পড়ল তার। আশ্চর্য, তলে তলে পরেশদা এত সব করছেন, স্নেহবউদি একটুও জানে না। সে চাটুকু দ্রুত গিলে নিয়ে বলল, এখন উঠি ব্রজবাবু। পরে দেখা হবে।

ব্রজ বলল, উঠবেন? চলুন — আমিও একবার বাসায় যাব। চান-খাওয়াটা সেরে নিতে হবে। সাড়ে দশটায় ট্রিপ।

সীতাংশুবাবু বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন চন্দনবাবু। আমার সঙ্গে আলাপ অবশ্য হত শিগগির। আপনার জন্যে ভালো জায়গা একটা পাচ্ছি—কিন্তু বড্ড দর হাঁকছে। মোমিনপুরের তোফাজ্জেল হাজির জায়গা। ইটখোলার কাছে পুকুরটা দেখেছেন? রাস্তার ধারে বারো কাঠা জায়গা। পিছনে ফাঁকা—এক পাশে পুকুর। ইলেকট্রিক ফেসিলিটিও পাবেন। দেখা যাক।

পথে এসে ব্রজ বলল, লোকটা জমিজায়গার দালালী করে। ভীষণ কিপটে আর চালাক। ওই যে বললে, মেয়ে যাবে—তার মানে কি জানেন? খাতির। জন্ম নেবে না। মালিকের গাড়ী—তার লোকসান হলে সেটা আমারই অধর্ম। অথচ শালা, কী যে হয় আমার—এরকম দরদস্তুরি করতে পারি নে! পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসি নি, কেউও সঙ্গে যাবে না পয়সা।

পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। খোলামেলায় উজ্জ্বল রোদে একটা প্রাণচঞ্চলতা পরিব্যাপ্ত রয়েছে চারপাশে। বাস লরী রিকসোর আনাগোনা চলেছে। দোকানে দোকানে ভিড় জমছে। হঠাৎ কোনও একটুখানি ফাঁকে আদিগন্ত ধানক্ষেতের পারে ধূসর দিগন্ত রেখা চোখে পড়ছে—তখন মনে পড়ে যায়, পৃথিবীটা খুব ছোট নয়। চন্দন বলল, আপনার বাসাটা কোথায়?

ব্রজ জবাব দিল, সামনেই।

ডাইনে বাঁয়ে এখানে রেশম তাঁতের আখড়া। রাস্তার ধারে সুতো ছড়িয়ে রেখেছে কাঠি পুঁতে। চরকি ঘোরাচ্ছে কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা। হলুদ রেশমের সুতো ঝকমক করছে রোদে। একখানে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—রূপপুর রেশমশিল্পী সমবায় লিমিটেড।

তারপর সুরকি কল, হার্ডওয়ার স্টোর্স, চালকলের বিশাল এলাকা। কালো কালো দুটো চিমনী থেকে ধোঁয়া উড়ছে। সিমেন্ট বাঁধানো প্রসারিত চত্বরে মজুরনীরা রোদে ধান শুকোচ্ছে। এক প্রান্তে চমৎকার একেলে ছাদের বাংলো বাড়ির সামনে ঝকমকে কালো অ্যামবাসাডর গাড়ি।

সামনে কাছেই পাণ্ডেজীর গদী। ব্রজ বলল, আমি এখানেই থাকি। বাঁদিকে ওই পুকুর দেখছেন—বটগাছ, পাশে ওই টালির ঘরটা। ওই। দু কামরা ঘর—মানে কুড়ি টাকা ভাড়া। কাঁচা ইঁটের দেয়াল। নিজের খরচায় পলেস্তারা আর চুনকাম করে নিয়েছি। একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান না। যাবেন—আর আসবেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করল চন্দন। রাস্তা থেকে এগোলে পুকুরপাড় দিয়ে সরু একফালি পায়েচলা পথ। পুকুর পাড়ে কলাবাগান। সবজী ক্ষেত। কাঁটার বেড়া। ভিতরে রাশভারী চেহারার একজন প্রৌঢ় খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো গাছের গোড়ায় ঝুঁকে কী দেখছে। একটি মেয়ে জলের ধারে কলাগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়ে হাঁস তাড়াচ্ছে। এখানটায় এসে মনে হয় পুরো পাড়াগাঁ। জলের শব্দ, হাঁসের ডাক, গাছপালা, পাখ-পাখালি, আলো-ছায়াময় কিছু ঘাসের জমি, নির্জনতা—অন্য সুর অন্য জীবন। পিছনের বিস্তৃত পটভূমিতে আকাশছোঁয়া ধানক্ষেত আর দূরের কুয়াশা।

ছোট্ট উঠোনে ঢুকে ব্রজ ডাকল, হাসি, ও হাসি, দ্যাখো কে এসেছেন!

ব্রজর বউ বেরিয়ে এল। বেশ ছিমছাম আঁটোসাঁটো চেহারা — [illegible] মেয়ে।

খুব সাজগোজের ঘটা নেই। কিন্তু উচ্ছলতা আছে চলাফেরায়। একটু থমকে দাঁড়াল সে।
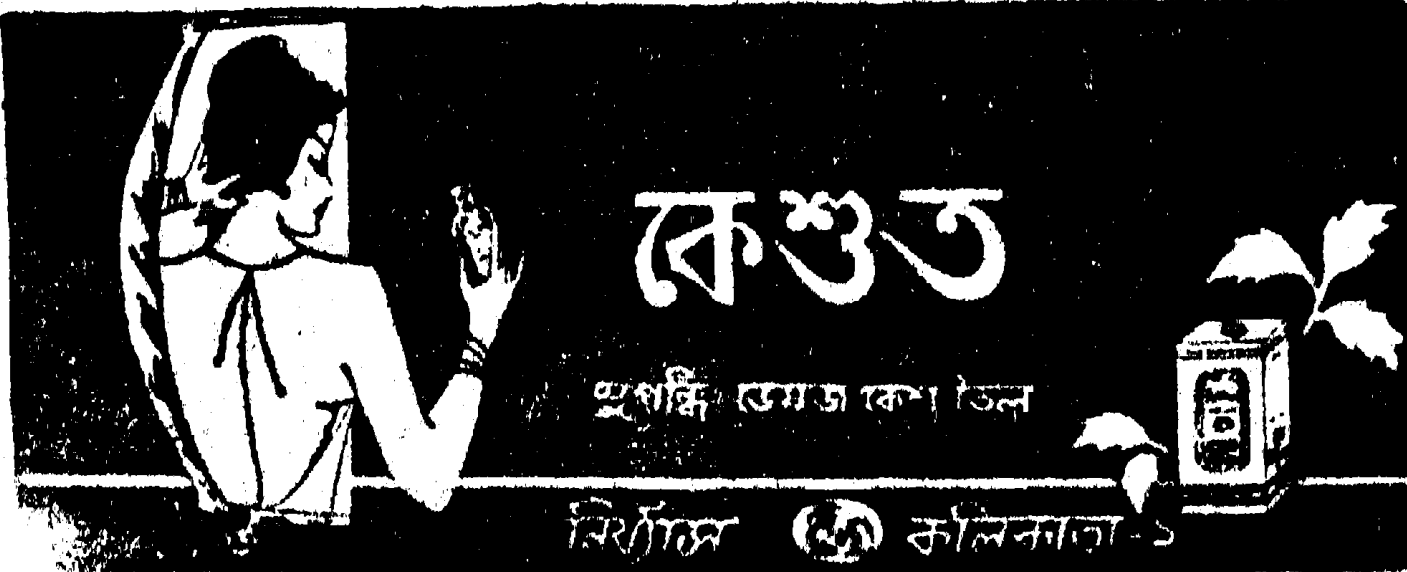
ব্রজ বলল, আমাদের পরেশবাবুর ইয়ে—মানে সেই যে গো, তুমি বলছিলে আলাপ আছে—পরেশবাবুর শালী! ওনার সঙ্গে শিগগির বিয়ে হবে।

ওমা তাই নাকি?...ব্রজর বউ হাসি মুখে নমস্কার করল।...আসুন, আসুন।

চন্দন বলল, আজ আসি ব্রজবাবু। পরে একদিন আসব'খন।

হাসি কম্বল বিছিয়ে দিল ক্ষিপ্র হস্তে। ...না, না। তা কী হয়? রুমিদি আমার কত চেনা। কী ভালো মেয়ে! আপনি বসুন।

চন্দন পা ঝুলিয়ে বসল। ব্রজ বলল, হঠাৎ আজ দেখা হয়ে গেল। আরে, এ'র সঙ্গে আমার আগে চেনা ছিল যে। জিয়াগঞ্জের লোক। ওদিকের রুটে থাকতে আলাপ। চন্দনবাবু, একবার লালবাগ পীরতলার কাছে গাড়ি ঠেলতে লাগিয়েছিলুম, মনে পড়ছে?

চন্দন বলল, কী জানি।

হাসি হেসে উঠল। ... তোমার গলায় দড়ি জোটে না! রুমিদি শুনলে কী বলবে! ওর বরকে তুমি গাড়ি ঠেলতে লাগিয়েছিলে। আ ছি ছি!

ব্রজ বলল, যা কাল পড়েছে স্যার, আমরা দুজনেই রোজগার করছি। বুঝলেন? সীতাংশুদা ঠিকই বলছিল—বাড়ি একটা করতেই হবে। তাই বউকে একটা কাজ জুটিয়ে দিলুম। অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানে। হাসপাতালের কাজ। শিগগির নার্সের ট্রেনিং পেয়ে যাবে—তখন মাইনে আরও বাড়বে। তবে একটা অসুবিধে স্যার, নাইট ডিউটি। আমি ভাবছিলুম, এসে দেখব হয়তো ঘুমোচ্ছে।...

হাসি বলল, অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম কষ্ট হত। বসুন, আসছি। ওগো, তুমি শোন।

চন্দন টের পেয়ে বলল, আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমার তাড়া আছে। ব্রজবাবু, আজ উঠি। কেমন?

হাসি হন্তদন্ত হয়ে বলল, না-না, তা কি হয়? রুমিদি আমাকে গাল দেবেন। আপনার অসম্মান করেছি শুনলে—

চন্দন শুকনো হেসে বলল, শোনাচ্ছে কে? তাছাড়া—এখনও কিছু ঠিক নেই। আচ্ছা, আসি।

হাসি হাসিমুখে নমস্কার করে বলল, এবার যখন আসবেন—দুজনেই আসবেন।

ব্রজ পিছনে কিছু দূর এসে এগিয়ে দিয়ে গেল। বলল, আবার আসবেন স্যার। বউকে তো দেখলেন। মানুষ হিসেবে খুব ভালোই। তবে—যাকগে। আপনার দেরী করিয়ে দিলুম। আচ্ছা। নমস্কার স্যার।...

রাস্তায় এসে চন্দন একটু দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল—আচ্ছা, রুমি কি এসব জানে? মনে হয়, সে কিছুই জানে না। যখন জানতে পারবে, তখন সে কী ভাববে?

অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হল সে। রাগ হল পরেশদার ওপর। এর কোন মানে হয়? চন্দনের বাবা-মা বেঁচে আছেন — তাঁদের মতামতের ব্যাপার আছে, এদিকে রুমি আর তার দিদি স্নেহধারার মতামতের খুবই মূল্য থাকতে পারে। অথচ পরেশদা রাজ্যশুদ্ধ সব রটিয়ে তাকে যেন একটা তামাশার পাত্র করে তুললেন। পরেশদা কলকাতা থেকে ফিরলেই এর একটা ফয়সালা করে ফেলতে হবে।

পাণ্ডেজী বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখে হাত তুলে ডাকলেন। সারবন্দী কয়েকটা বড় বড় ঘর, টানা বারান্দা, মধ্যিখানে গেটমতো। ভিতরের প্রশস্ত উঠোনে অজস্র তেলের পিপে। ভাঙা গাড়ির সরঞ্জাম। আবার কিছু ফুল গাছও রয়েছে। ওপরে দোতলায় পূব কোনায় একটা ঘর।

গেট দিয়ে দুজনে ঢুকল। কুলিরা পিপে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরের উঠোনে। এক পাশে টিনের গুদামও

দেখতে পেল চন্দন। একজন সামান্য খোলভূষিওলা পাণ্ডেজী আজ এতদিন পরে এসবের মালিক হয়েছেন!

ভিতরের বারান্দায় অজস্র স্তূপীকৃত বস্তাভর্তি মালপত্র। শ্বাসরোধকারী কেমন অদ্ভুত সব গন্ধ—লঙ্কা, সরষের তেল, খোল কিম্বা রবিখন্দের। খোলা সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উপরে উঠল। লম্বা টানা প্রশস্ত ছাদ—এক প্রান্তে একখানা ঘর। ছাদে দাঁড়িয়ে সারা রূপপুর নজরে পড়ে। ভারী সুন্দর লাগল সে দৃশ্য। পরিব্যপ্ত প্রাণ-চঞ্চলতা সেখানে। তালা খুলতে খুলতে পাণ্ডেজী বললেন, কেমন লাগছে চন্দন-বাবু?

চন্দন বলল, অপূর্ব।

পাণ্ডেজী বললেন, হাঁ। হামি দেখি। এখানে বৈঠ করে রূপপুর চটিকে দেখি। বাবুজী, রূপপুরকে হামি কী বলি জানেন? হামারি বহু রূপকুমারী!

হাসতে লাগলেন পাণ্ডেজী।...আসুন। রোদ লাগবে গায়ে। ভিতরে বসি।

এঘরে পাণ্ডেজী একা থাকেন! ঘরের ভিতরটা দেখে অবাক হল চন্দন। দড়ির খাটিয়ার ওপর সামান্য একটা গুটানো বিছানা। মেঝেয় এক কোণে একটা কেরোসিন কুকার আর দু-চারটে তৈজসপত্র। খাটিয়ার নীচে একটা টিনের সুটকেস—রঙচটা, জীর্ণ। দড়িতে ঝুলছে কিছু কাপড়চোপড়, গামছা। ব্যস, ব্যক্তিগত জীবনযাপনের জন্য যা কিছু জরুরী আসবাব—তা এটুকুই।

খাটিয়ার বিছানাটা সযত্নে বিছিয়ে পাণ্ডেজী বললেন, বসুন — আরাম করে বসুন চন্দনবাবু। হামি চায় বানাই।

যেভাবে পাণ্ডেজী কুকার জ্বাললেন এবং কেটলি চাপিয়ে দিলেন, দেখে মনে হল লোকটি সব কিছুতে দারুণ নিষ্ঠাবান—অতিমাত্রায় সতর্ক। নিজের হাতেই সম্ভবত সব কাজকর্ম করেন। এমন লোকের উন্নতি না হয়ে পারে না। চন্দন বলল, কাল সন্ধ্যায় আমার খোঁজ করেছিলেন শুনলাম।

পাণ্ডেজী উঠে এসে পাশে বসলেন।... হাঁ, একবার গেলাম ওখানে, তো আপনার কথা ভি শুধোলাম। তেমন জরুর কিছু না।

চন্দন বলল, একবার পরেশদার বাড়ি গিয়েছিলুম।

হেসে উঠলেন পাণ্ডেজী।...যাবেন, আলবাৎ যাবেন। তো কাল রাত্রে দেখলাম—তখন নও কি দশ বাজবে, ছোটি দিদি বাস থেকে নামল। আমার সঙ্গে খুব ভাব আছে তো! খুব আলাপ।...হাসতে হাসতে পাণ্ডেজী বললেন, তো শুধোলাম, এত রাত্রে কোথা যাওয়া হল তোমার? সিনেমা? তামাসা করলাম। খুব ভালো মেয়ে।

পাণ্ডেজীও কি রুমার সঙ্গে তার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে চান? একটু বিরক্ত হল চন্দন। কিন্তু ততক্ষণে একটা তীব্র কৌতূহল—যা গত রাত্রে তাকে প্ররোচনা দিয়ে বাস স্ট্যান্ডের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, ফের সাড়া দিয়েছে মনে। সে বলে ফেলল, রুমা বেশ সাহসী হয়ে গেছে দেখছি তো! একা সিনেমা গিয়েছিল রাত্রে?

পাণ্ডেজী কুকারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, না। সাথে বাণীবাবুর ছেলে ছিল।

চমকে উঠল চন্দন। শুকনো গলায় বলল, সে কে?

চেনেন না? আলাপ হয় নি?... পাণ্ডেজী কেটলির ঢাকনা খুলে চা দিতে দিতে বললেন, বাণীবাবু হেডমাস্টার। ওর ছেলে। কলেজ পাস করে বেকার বসে আছে। তবে ছেলেটা ভালই। গান-বাজনায় বহুত ওস্তাদ। এখানে হামেশা কত রকম ফাংশান হয়—গান করে।

কিছুক্ষণ নীরবতা। চায়ের কাপে চামচের শব্দ। হাইওয়ের যানবাহনের শব্দ। আকাশভরা রূপপুরের সোনালী রোদ আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে—তারপর যেন ফের স্বাভাবিক হল। চন্দনের হাতে চায়ের কাপ। সে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে চুমুক দিল। প্রসন্ন থাকার চেষ্টা করে বলল, চমৎকার চা করেন তো পাণ্ডেজী!

পাণ্ডেজী পাশে বসে বললেন, রূপপুর কেমন লাগছে চন্দনবাবু?

চন্দন মাথা দোলাল। ...ভালই।

হাঁ—ভালো। মাথা ঠিক রাখলে পয়সা কামানোর এমন সুবিস্তা কোথাও নেই। তো একটা কথা বাবুজী।

পাণ্ডেজীকে চুপ করে যেতে দেখে চন্দন বলল, কী কথা?

কথা এই—কী, পরেশবাবু আপনাকে এনেছে। আপনি পরেশবাবুর লোক। হামি আপনার পর। কেমন কিনা?

চন্দন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

হামি শুনেছে, পরেশবাবুর শালী—ছোটি দিদির সাথে আপনার বিভা হবে। বাত ইয়ে ভি ঠিক হ্যায়। খুব ভাল কথা আছে। লেকিন বাবুজী, যদি কিছু মনে না করেন...

চন্দন ছটফট করে বলল, না না। আপনি বলুন।

আপনি খুব সাদাসিদা মানুষ চন্দবাবু। ঔর পরেশবাবু পাকা লোক। দয়া করে ওর কানে তুলবেন না কথাটা—আপনার ভালোর জন্যে বলছি। পরেশবাবুকে আপনি বিশওয়াস করবেন না।

চন্দন বলল, তার মানে?

পাণ্ডেজী চাপা গলায় বললেন, পরেশবাবু যো কুছ করেন, সব কোই মতলবকে লিয়ে করেন। এই যে আপনার সাথে শালীর বিভা দেবে, উসকা পিছেভি কোই মতলব আছে। শুধু এই কথাটা মনে রাখবেন, ব্যস!

কী মতলব আছে?

পাণ্ডেজী হেসে উঠলেন।...ক্যা মালুম! মনে হল, কুছ মতলব না থেকে পারে না। ও খুব সহজ লোক নয়, বাবুজী। কাজকাম করছেন, করুন—ভাবনা নেই। লেকিন খুব সমঝসে—বুঝেশুনে করুন।

চন্দন একটু ভেবে বলল হ্যাঁ—আরও একজন, মানে — হকসায়েবও বলছিলেন একথা। তবে আমার কী? জেনেশুনে কোন অন্যায় কাজ করব না। ব্যস, চুকে গেল।

হাঁ, তাই বলছি বাবুজী। যাক, ছোড় দিন।...পাণ্ডেজী চায়ের কাপ দুটো ধুতে বাইরে বেরোলেন। ছাদের কোণে পাইপের মুখে বাঁধানো জায়গা। জলের বালতি রয়েছে সেখানে। সব ব্যবস্থা নিখুঁত।

চন্দন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, চলি পাণ্ডেজী। ভেবেছিলুম কোন জরুরী কাজের জন্য খুঁজছিলেন—তাই এসেছিলুম।

পাণ্ডেজী বললেন, আরে বসুন, বসুন। গপ্পসপ্প করা যাক।

চন্দন বলল, না। বেচুবাবু অপেক্ষা করছেন এতক্ষন। পরে আসবখন। আজ আপনি ওদিকে যাবেন না?

যেতেও পারি।...বলে কাপ দুটো ঘরে রেখে এলেন পাণ্ডেজী। তারপর নীচে অবধি এগিয়ে দিলেন চন্দনকে।

একটা রিকসা করে ফিরল চন্দন। বাসায় এসে দেখল, রুমা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

(ক্রমশঃ)

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

॥ ৩০ ॥

সন্ধ্যেবেলায় নির্দিষ্ট জায়গায়। যথাসময়ে স্বামিজী হেসে বললেন—তারপর তোমার মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কতদূর?

খেই ধরিয়ে দিলুম।

—হুঁ—স্বামিজী আরম্ভ করলেন—বারীন্দ্র যোগ দেওয়ায় কাজের সুবিধা হল খুবই। বহির্ভাগীয়, আভ্যন্তরীণ—দু কার্যকরী কেন্দ্রই পরিচালিত হতে থাকল সুষ্ঠুভাবে। এখন প্রচার আরও জোরদার হওয়া দরকার। শুধু সভাসমিতি, বক্তৃতা, আবেদন, নিবেদনই যথেষ্ট নয়, চাই জোরাল সংবাদপত্র, যা দেশের প্রতিজনের কানে শুনিয়ে দেবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার উৎপীড়নের নগ্ন রূপটা, প্রচার করবে ইংরেজ-বিদ্বেষ, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের পথ দেখিয়ে সংহত করবে জনসাধারণকে।

দেশহিতৈষী বিপ্লবী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বের করলেন মাসিক পত্রিকা—'পিপল এন্ড প্রতিবেশী', পৃষ্ঠপোষক হলেন নরেন্দ্রকুমার বসু, যতীন্দ্রনাথ সেন, রাজকুমার সেন, অধ্যাপক শশীভূষণ সরকার। সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ থাকলেও উদ্দেশ্যসাধনে পর্যাপ্ত হল না কাগজখানি। পূর্ণ বিপ্লববাদী না হয়ে এ যেন হল আধাবিপ্লববাদী। এগিয়ে এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

সংসার-বিরাগী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী উপাধ্যায় পৃথিবীর সর্বধর্মশাস্ত্রজ্ঞ হলেও ছিলেন খৃষ্টান। খৃষ্টধর্মের গভীরে গিয়ে খৃষ্টানদের অন্যায় অত্যাচার দেখে বিস্মিত মর্মাহত, চোখ খুলল। হিন্দু হতে চেয়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইলেন ভাটপাড়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের কাছে। তর্করত্নমশায় লিখলেন—আপনার মত সাধুরা সর্বদাই শুচি, প্রায়শ্চিত্ত না করলেও কোন ক্ষতি নেই। একান্তই যদি প্রয়োজন মনে করেন গঙ্গা স্নান করে পাঁচটি কড়ি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে মনে মনে বলতে হবে—হিন্দুর অখাদ্য কিছু খাব না, আর হিন্দুধর্মের বাইরে কোন কাজ করব না।

খৃষ্টান ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু হলেন। সমাজে হৈচৈ পড়ে গেল। হিন্দু সমাজ থেকে খৃষ্টান, মুসলমান—যা খুশি হওয়া যায়, কিন্তু বিধর্মীরা হিন্দু হতে পারে না—এই সংস্কার। প্রথমে কিছু কথা উঠলেও হিন্দু সমাজ সাদরেই গ্রহণ করল উপাধ্যায়কে। হিন্দু উপাধ্যায় বের করলেন 'সন্ধ্যা' পত্রিকা। সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব নিজে। লেখায় আগুন ছুটল, মারমুখী হয়ে উঠল দেশবাসী যুবা বৃদ্ধ। মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা বরিশাল থেকে এসে বের করলেন—'নবশক্তি'। শক্তি যোগাল দেশবাসীকে। বিপিন পাল ইংরেজীতে বের করলেন—'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা। এই হল স্বদেশী যুগের পত্রপত্রিকা। আর ছিল 'ভারতী।' ইটালীর বিপ্লব সম্বন্ধে নিজের লেখা ধারাবাহিক প্রবন্ধ বের হতে থাকল এই পত্রিকায়।
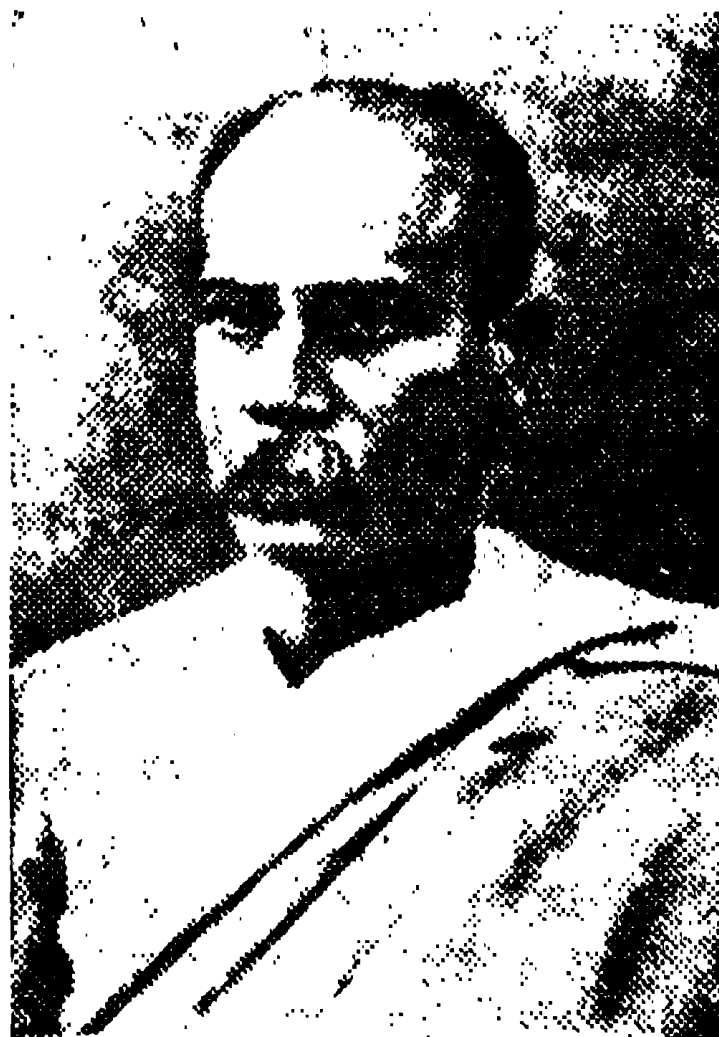
গান আর সুর—সঙ্গীত আর সঙ্গীত মানুষের মনকে জাগাতে—ভাবাবিষ্ট করতে—উদ্দীপিত করতে পারে সহজেই। কবি মুকুন্দ দাস যাত্রাগানের মাধ্যমে কতকটা করছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে ঘরের পাশেই—কলকাতায়। 'সন্ধ্যার' সুচিন্তিত প্রবন্ধও বের হয় তাঁর। দলে টানতে হবে তাঁকে। তাঁদের বাড়ীতে—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে সে সময়ের বাঙালী চিন্তাশীল নেতা নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু আরও বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত মনীষী ব্যক্তির আলোচনা সভা বসে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদাদের সঙ্গে। সভায় আলোচনা হয়—দেশকে কি করে স্বাধীন করা যেতে পারে। এমনি এক আলোচনা সভায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ রচনা করে পড়ে শোনান রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ী বাঙলায় একটি পীঠস্থান। দেশের সমস্ত বিশিষ্টজনের সমাগম তো হয়ই এখানে, বিদেশী শাসকগোষ্ঠী—লাট বড়লাট সাহেব সুবোদের সঙ্গেও দহরম মহরম কম নয়। পার্টি তো প্রায় লেগেই আছে। তবু এ বাড়ীর একটি ছেলেও কখনো বিদেশী পোশাক পরে নাই। বাঙলা তথা ভারতের সংস্কৃতি যেন বাসা বেঁধে আছে এই বাড়ীতে। বস্তুত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক, পোষক ও বাহক এই বাড়ীটি। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত বেশভূষা, নৃত্যকলা, অভিনয়, চিত্রকলা—দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিটি আঙ্গিকেরই মুখোজ্জ্বল হয়েছে এই বাড়ী থেকে। আর এই বাড়ীর উজ্জ্বলতম রত্ন রবীন্দ্রনাথ। এঁকে চাই।

জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে শিবমন্দিরের আঙিনায় ছিল অনুশীলন সমিতির

বিখ্যাত লাঠি ও অসি সঞ্চালক
পুলিনবিহারী দাস

শাখা। পাড়ার যুবক সভ্যরা ব্যায়াম চর্চা করত সেখানে। রবীন্দ্রনাথের ছেলে বছর পনেরো বয়সের রথীন্দ্রনাথ সভ্য হয়ে আসত এখানে। ঐ ক্লাবে বড় লাঠি আর বক্সিং শেখাতেন যতীন্দ্রনাথ শেঠ। একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্র শেঠ ঠাকুরবাড়ী গিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে। রবি ঠাকুর বললেন—তোমরা যুবক কর্মী , আমি কবি মানুষ। তোমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমাদের মনকে জাগাবার জন্যে কতকগুলো গান রচনা করব ও শোনাব তোমাদের।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী বীর যুবাদের উদ্দীপনা যোগাতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন —'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল, একলা চল, একলা চলরে,' 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরি, নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়.' 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

শুধু লেখা নয়, নিজে সুর দিয়ে অনেক-বার গেয়ে শুনিয়েছেন সমিতিতে এসে।

আর কি? শুভযাত্রার মঙ্গল শঙ্খ। কবি মহলে ভাবের বন্যা। কালীপ্রসন্ন বিদ্যা-রত্ন লিখলেন—

মা গো, যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে।

যখন মুদে নয়ন করব শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে
তখন সবাই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে।।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন—

'ধনধান্যেপুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ওযে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র.' 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ'। কান্ত-কবি রজনীকান্ত লিখলেন—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই। সত্যেন দত্ত লিখলেন—কোন দেশেতে তরু-লতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল, কোন দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয়রে দূর্বা কোমল? আর অগ্নিবীণার ঝঙ্কার দিলেন বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল, ওয় ধ্বংসপথের যাত্রীদয়।' কবি দাক্ষিণ্যও পেয়েছিলেন তেমনি। রাজদ্রোহের ধুয়া তুলে

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

সন্ত্রস্ত সরকার বইখানি নিষিদ্ধ তো করলই, কবিকেও পুরল হুগলী জেলে।

জন-জাগরণের ত্রিশূলে — সভাসমিতি, বক্তৃতা আর গান। গানের কথা শুনলে, এবার শোন সভাসমিতি আর বক্তৃতার কথা—

সভাসমিতির হিড়িক পড়ে গেল খুব। করতেই হল প্রয়োজন বোধে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতায় মাতিয়ে তুললেন। এঁরা বক্তা—শুনলে সভায় আর তিল ধরবার জায়গা থাকত না। বক্তৃতা হোত ইংরেজীতে। সভায় পাঞ্জাবী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, বেহারী, উড়িয়া, বাঙালী—বিভিন্ন শ্রোতা। এক দেশীয় ভাষা অন্য দেশীয় বোঝে না, কিন্তু ইংরেজী বোঝে সবাই। তাই বক্তৃতা ইংরেজীতে। উদ্দেশ্য এক হলেও পথ ও মতের একটু তফাত ছিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পালের মধ্যে। প্রাঞ্জল ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর সমকক্ষ বক্তা একমাত্র বিপিন পাল ছাড়া কেউই ছিলেন না। বিপিনচন্দ্র ইংরেজী বাংলায় সমান বক্তৃতা দিতে পারতেন। সেদিক থেকে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন একটু খাটো, বাংলায় তত ভাল বলতে পারতেন না। যাই হোক এঁদের বক্তৃতায় প্রচুর উদ্দীপনা আর প্রেরণা পেত দেশবাসী।

পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গে আন্দো-লন হয়ে উঠেছিল বেশ জোরদার। হবে না কেন? ওখানকার ছেলেরা খুব কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী কাজেই শক্তিমান। আর একগুঁয়ে —যা ধরবে তা করা চাই। সভাসমিতির হিড়িকও তাই বেশি ওখানে।

জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে সুরেন্দ্রনাথ সেন গেছেন কিশোরগঞ্জে। ১৯০৫ সালেই হবে বোধহয় ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুবার্ষিকী সভা কর-লেন সুরেন্দ্রনাথ সেন। অরবিন্দদা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেশ সমাজপতি—সব জননায়করা উপস্থিত হলেন সেই সভায়। বিদেশী বেনেদের ব্যবসার মূলে কুড়ুল মেরে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোটা দুর্বল করে দেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ ধরলেন আমেরিকার পদ্ধতি। সভায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করলেন তিনি। অরবিন্দদা ও আর আর নেতারা সর্বান্তকরণে সমর্থন করলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম হল ফার্স্ট বয়কটার ছোট সুরেন্দ্রনাথ।

তারপর আগস্ট মাসে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভা। মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী, মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী, জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জাস্টিস এ চৌধুরী, ব্যারিস্টার জে চৌধুরী, বাংলার সমস্ত রাজা মহারাজা গণ্যমান্য লোক ছিলেন এই সভায়। আর ছিলেন অরবিন্দদা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ—সব নেতা। বাংলার মারমুখী যুবকরা যে ছিল তা বলাই বাহুল্য। তিল ধরবার ঠাঁই ছিল না সভায়। সভা পরিচালিত হয়েছিল তেমনি শৃঙ্খলার সঙ্গে। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল—বিদেশী বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ আর জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব।

কিছুদিন পরে বরিশাল কনফারেন্স। সে এক কান্ড। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভার আয়োজন করা হল বরিশালে। সভা-পতি হবেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। তখন পূর্ববঙ্গের ছোটলাট মহা অত্যাচারী ব্যামফিল্ড ফুলার। তাঁর অত্যা-চার নির্যাতনের কাহিনী কথায় বলা যায় না—যাকে বলে অকথ্য। তিনি গুর্খা সিপাই রেখেছিলেন অনেক। 'স্বদেশী' সন্দেহেই তারা নিরস্ত্র নিরীহ জনসাধারণের ওপর নির্বিচারে চালাতো বেত লাঠি ছুরি ছোরা। ছেলেমেয়ে কেউই রেহাই পেত না এই নির্যাতন থেকে। বরিশালে সভা হবে শুনেই সভা ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিলেন ফুলার আর হুকুম দিলেন—'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করতে পারবে না কেউ, করলেই বেত্রদন্ড। বছর দশেকের ছেলে একটি রান্নাঘরে বসে মনের আনন্দে গাইছিল—'বন্দে মাতরম' গান। পুলিশ রাস্তায় টেনে এনে বেত মারল তাকে।

বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতাদের বরিশাল প্রবেশের নিষে-ধাজ্ঞা জারী করলেন। সুরেন্দ্রনাথের বয়ে গেছে সে আদেশ মানতে। অন্য নেতারাও কি মানলেন। বাংলার পূব পশ্চিম দু অংশের হিন্দু মুসলমান সব নেতারাই হাজির হলেন বরিশালে। সভা আরম্ভের দিন বিরাট শোভাযাত্রা। লোকে লোকে লোকারণ্য—জনসমুদ্র বললেই হয়। সবারই মুখে বন্দে মাতরম ধ্বনি। শোভাযাত্রার সামনের গাড়ীতে সস্ত্রীক আবদুল রসুল আর আবদুল হালিম গজনভি। তার পেছনের গাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, কাব্যবিশারদ কৃষ্ণকুমার মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ব্যারিস্টার জে চৌধুরী—এইসব বীর সন্তান। সেই সময়ে বরোদা থেকে

কর্মিদের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন অরবিন্দদা। তিনিও উপস্থিত বরিশাল কনফারেন্সে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। রাজাবাহাদুরের হাবিলী থেকে এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যরা বেরিয়ে এল রাজপথে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। আর যায় কোথা? পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট কেম্প সাহেব শোভাযাত্রার ওপর ছুটিয়ে দিলে নিজের খ্যাপা ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ছুটে এল পুলিশের উদ্যত লাঠি বুনো পশুর মত আক্রমণ করল নিরস্ত্র জনতাকে। রক্তাক্ত হয়ে উঠল রাজপথ। শোভাযাত্রার মধ্যে ছিল মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ছেলে বীর যুবক চিত্তরঞ্জন। বন্দে মাতরম ধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছিল সে। ঐ ধ্বনি বন্ধ করবার জন্যে পুলিশ লাঠি মারতে মারতে চিত্তরঞ্জনকে ফেলল পুকুরের জলে। এক গলা জলে দাঁড়িয়েও বন্ধ হল না 'বন্দে মাতরম'। পুলিশের প্রতিটি লাঠির ঘায়ের পরে পরেই বীরকণ্ঠে হুংকার ওঠে 'বন্দে মাতরম'। শেষে জলেই অচৈতন্য হয়ে পড়ল চিত্তরঞ্জন। মৃত ভেবে লাঠি বন্ধ করল পুলিশ। কাছের লোকজন জল থেকে তুলে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচাল চিত্তরঞ্জনকে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে সভা পন্ড করবার উদ্দেশ্যেই এইরকম পাশবিক নির্যাতনের আদেশ ছিল পশুপ্রকৃতি ফুলারের। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল কি? কান্নায় ভারী বাতাস, রক্ত ভেজা মাটি, কর্মীরা আহত, নেতারা লাঞ্ছিত অপমানিত, নিরস্ত্র জনতা রক্তাক্ত—সভা বন্ধ হল না তবু। সভাশেষে পুলিশ ধরল সুরেন্দ্রনাথকে আইন অমান্য অপরাধে। বাগ্মীগুরুকে বন্দী! ক্ষেপে উঠল ছেলের দল। পুলিশের বিরুদ্ধে নানারকম বিক্ষোভ দেখাতে লাগল তারা। সে এমন চরমে উঠল যে বিক্ষোভ প্রবল বিদ্রোহের রূপ নেয় আর কি? সুরেন্দ্রনাথের জরিমানা হল চারশ টাকা। জরিমানা তো হল—দেবে কে? সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজী হলেন না জরিমানা দিতে। সবারই আনন্দ হুঙ্কার—ঠিক, ঠিক। কিসের জরিমানা? অন্যায়কে স্বীকার করা হয় নাই—তাই? মানবো না, মানবো না, মানবো না তোমাদের অন্যায় জুলুম। 'বন্দে মাতরম' ছেলেরা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নাম দিল— surrender not

কিছুতেই জরিমানা দেবেন না সুরেন্দ্রনাথ। তাহলে জেল। ব্যারিস্টার জে চৌধুরী চারশ' টাকা দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে খালাস করে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

বরিশালের তিক্ততায় ক্ষেপে উঠল জনসাধারণ। দিকে দিকে প্রতিবাদ-সভা। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, আন্দোলন হয়ে উঠল নিত্যিকার ব্যাপার সারা বাংলা জুড়ে। 'বয়কট' কথাটা একটা উন্মাদনা জাগালো। এক হুজুগে যেন মাতল সারা দেশ। বিদেশী ছাড়তে হবে, স্বদেশী নিতে হবে—সবারই মুখের বুলি। একটা তাগিদ বোধ করল প্রত্যেকেই। তাগিদ এল কোত্থেকে, কিসের তাগিদ, কার তাগিদ— জানে না কেউ, জানতে চায়ও না। জিজ্ঞেস করলে বলে—'হুকুম আয়া।' কার হুকুম, কিসের হুকুম তাই বা কে জানে। জানে শুধু— বিদেশী ছাড়তে হবে, স্বদেশী নিতে হবে, স্বদেশকে কিছু দিতে হবে। এই তাগিদেই মাতল সবাই। কুলি, মুটে, মজুর, দারোয়ান, গাড়োয়ান—বাদ রইল না কেউ। দেশের কথা ভাবতে শুরু করল সারাদেশের লোক। গড়ে উঠল অনেকগুলি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান—শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, কলকাতার ন্যাশনাল ট্যানারি, বেঙ্গল কেমিক্যাল। এণ্টি সার্কুলার সোসাইটি, কমলালয়, ছাত্র ভাণ্ডার—এইরূপ স্বদেশী জামা-কাপড়ের দোকানও হল অনেকগুলি। বিলিতি কাপড়ে আগুন লাগল, বিলিতি সৌখিন জিনিস ফেলে দেওয়া হল। বিলিতি সাবান সিগারেট হটিয়ে চলন হল দিশী সাবান, বিড়ি আর চুরুটের।

বিলিতি জিনিস বর্জন — ছেলেরা দোকানে দোকানে পিকেটিং করল, মানে— দোকানে দোকানে ক্রেতাদের বিদেশী জিনিস কেনা বন্ধ করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ বললেন—এ কী? যার ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবে, যার ইচ্ছে হয় করবে না। লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়াই তো কাজ, জবরদস্তি করা কেন?

ছুটোছুটি পড়ে গেল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের। অনেক টাকার বিদেশী মাল তাদের গুদামে। হাতে-পায়ে ধরে অনেক টাকা দিতে চেয়ে তারা এক বছরের ছাড় চাইলে মজুত মালগুলি কাটাবার জন্যে। তাদের কথার সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথও বললেন—ছাড় দেওয়া হোক এক বছরের জন্যে, মিছামিছি দেশের লোকের লোকসান করিয়ে কী হবে? তা কে শোনে কার কথা? এমন ঋষিকল্প বিশ্বকবির কথাও কি কানে গেল কারুর? বিলিতি বর্জন বজায় রইল—চলতে লাগল পিকেটিং।

ঠাকুরবাড়ীর যুবকরাও কি চুপ করে রইলেন? তাঁরা খুলে বসলেন দিশী জুতার দোকান, 'স্বদেশী ভাণ্ডার' নাম দিয়ে। শুধু জুতা কেন—উৎসাহী যুবক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর নানান জায়গা ঘুরে যোগাড় করলেন দিশী জিনিস—হীরেটি থেকে জিরেটি পর্যন্ত—যা পাওয়া যায় যেখানে। এমনি করে দোকানে আলতা-সিন্দুর থেকে ঢাকাই মসলিন, শাড়ি, টাঙ্গাইল, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের ধুতি, শাড়ী, মুর্শিদাবাদের গরদ, বীরভূমের তসর, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, খাগড়া ও বাগড়ার পিতল-কাঁসার বাসন, ইলামবাজারের গালার খেলনা—বাদ রইল না কিছুই। আবার 'মাতৃভাণ্ডার' নাম দিয়ে স্বদেশী বস্ত্র দোকান খোলবার জন্যে চাঁদা তুললেন কত।

এই সময়েই ঠাকুরবাড়ীর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন চতুর্ভুজা

ভারতমাতার ছবি—হাতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রতীক—অন্ন, বস্ত্র, অক্ষমালা ও পুঁথি। এই ভারতমাতার ছবি পতাকায় বড় করে এ'কে ঠাকুরবাড়ীর ছেলেরা দেশের জন্যে চাঁদা তুলতে বের হলেন পথে পথে। চাঁদা উঠেছিল বেশ। রাস্তার মুটে-মজুররাও তাদের সারাদিনের মজুরীটি পর্যন্ত দিয়েছিল স্বদেশী তহবিলে।

সর্বত্র সভা-সমিতি, আন্দোলন, গণ-জাগরণ—সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন বাংলার বড়লাট লর্ড কার্জন। 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে'—উল্টোটাই হয় বুঝি। যে বাংলার মাটিতে উত্থান, সেই বাংলার মাটিতেই পতন হয় বুঝি বৃটিশ রাজত্বের। উপায়? পূর্ব বাংলার দুর্ধর্ষ প্রকৃতির যুবকদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকদের মিলনের পথ বন্ধ করতে হবে। ভাবলেন হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টির কথা। চালবাজ বেনেবুদ্ধির মগজে খেলল বঙ্গ-বিভাগের কথা—আলাদা করতে হবে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা। ১৯০৪ সালে বঙ্গভঙ্গের খসড়া করে লর্ড কার্জন পাঠালেন বিলেতের মন্ত্রিসভায়। প্রবল প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বললেন অরবিন্দ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রাণপণ করলেন বঙ্গভঙ্গ রদ করতে। তাঁর সহ-কারী হলেন রবীন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, বিপিন পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, লিয়াকৎ হোসেন, এ, রসুল, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত—যত গণ্যমান্য দুর্বৃত্তা দেশনেতারা।

প্রতিবাদ-সভা হতে লাগল প্রত্যহ। সবচেয়ে বড় সভা হল বাগবাজারের জমিদার পশুপতি বসুর বাড়ীর বিরাট আঙিনায়। লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েৎ হল সেই সভায়। 'বন্দে মাতরম্' গান গেয়ে আরম্ভ হল। সভার কাজ। আরও কত দেশাত্মবোধক গান, কত বক্তৃতা হল বঙ্গ-অঙ্গচ্ছেদের কুফল বুঝিয়ে। অন্তর থেকে স্বদেশের জন্যে একটা তাগিদ অনুভব করল দেশের প্রতিটি মানুষ।

বিপিনচন্দ্র পাল

কিন্তু হলে হবে কি—শত আবেদন-নিবেদন প্রতিবাদ-আন্দোলন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না বৃটিশ সরকার। বঙ্গভঙ্গের দিন ঠিক হল ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর। প্রতিবাদে ঠিক ঐ দিনটিতেই নেতারা করলেন হিন্দু-মুসলমানের রাখী বন্ধনের অনুষ্ঠান। ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি—রাখীবন্ধন। 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই'—। নামলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কেউ-কেটা নয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথ করবেন রা খী ব ন্ধ ন — আনুষ্ঠানিক উৎসব নিখুঁত হওয়া চাই। অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় বিধান চাইলেন ক্ষেত্রমোহন কথক ঠাকুরের কাছে। মহাখুশি হয়ে বিধান দিলেন তিনি। গাড়ীঘোড়া নয়—খালি পায়ে হেঁটে জগন্নাথ ঘাটে গঙ্গাস্নানে যাবেন সবাই। স্নানের পর সকলের হাতে রাখী পরাবেন সকলে। মন্ত্র রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। জগৎজোড়া খ্যাতিমান কীর্তিমান রবীন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটে যাবেন গঙ্গাস্নানে। রাস্তায় লোক ধরে না—বাড়ীর জানালায়, বারান্দায়, অলিন্দে, ছাদে, গাছের ডালে কাতারে কাতারে লোক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে।

ঠাকুরবাড়ীর ছেলে, বুড়ো, যুবা, মনিব, চাকর-বাকর সবসমেত রবীন্দ্রনাথ চলেছেন, গঙ্গাস্নানে। সে এক শোভাযাত্রা, মেয়েরা খই ছড়াচ্ছেন, শাঁখ বাজাচ্ছেন, মিছিল চলেছে গান গাইতে গাইতে—রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রসঙ্গীত—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান।

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক এক হউক
হে ভগবান।

ঘাটে লোকে লোকারণ্য রবিঠাকুরকে দেখতে—রবিঠাকুরের স্নান দেখতে। স্নান সারা হল। সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল রাখীর গাদা। এ ওর হাতে রাখী পরালে সবাই। রবীন্দ্রনাথ পরালেন যাকে কাছে পেলেন তারই হাতে। বাছবিচার নেই—সহিস, কোচোয়ান, দারোয়ান, গাড়োয়ান, পথের পথিক, অতিথ, ফকির, ভিখিরি—সবারই হাতে। মিছিল ফিরছে। চিৎপুরের বড় মসজিদে ঢুকে মোল্লা মৌলভী মুসলমান ভাইদের হাতে রাখী পরিয়ে এলেন রবীন্দ্র-নাথ। শুধু কি রাখী পরানো—রাখী পরিয়ে কোলাকুলি। সবাই তো ভয়ে তটস্থ—হয় বুঝি একটা রক্তারক্তি। তা হয়নি, সবারই মনে জেগে উঠেছে দেশাত্ম-বোধ। হাসিমুখেই রাখী পরলেন মুসল-মান ভাইরা।

কিন্তু হল কী? বঙ্গভঙ্গ রদ হল না—আইন পাশ হয়ে গেল ১৯০৫ সালে। ১৯০৪ সালে বঙ্গভঙ্গের খসড়া, একটা অন্তর্ভেদী ঘর ভাঙার সূচনাও হল ঠিক ঐ সালেই।

কথা বন্ধ হল নির্মলা মায়ের ডাকে। রাত হয়েছে—খাওয়াদাওয়া সারতে হবে।

কোলের ওপর বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে ডান হাতের আঙুলগুলি চালিয়ে চোখ বুজে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্বামিজী। তারপর উঠে গেলেন খাবার জায়গায়।

একত্রিশ

সন্ধ্যেবেলা তামাক খাওয়া শেষ হতেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে বসলুম—ঘর কাদের আর ঘর ভাঙার সূত্রটাই বা কেমন করে হল স্বামিজী?

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস। স্বামিজী বললেন—ঘর দেশমাতার সন্তানদের। জান তো ঘরের আগুন বাইরে বের করতে নাই, বাইরের আগুন ঘরে আনতে নাই। নাইবা শুনলে সে-কথা।

দমে গিয়ে একটু চুপ করে ভেবে বললুম—দেশমাতার সন্তানদের ঘর তো আমাদেরই ঘর। নিজেদের কথাই শুনব জানব তা ঘরের আগুন বাইরে বের করা হচ্ছে কি করে? কোথাও আগুন জ্বললে তো সাবধান হওয়া যায় নিভানো যায়।

একটু হেসে স্বামিজী বললেন—'অগ্নিং সমুদ্রে গচ্ছ' মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। সে-আগুন আর নাই, নিভোবে কি?

স্বামিজী বলতে চান না—স্পষ্ট বোঝা গেল। খুঁত খুঁত করতে করতে বললুম, বঙ্গভঙ্গের ধুমধাড়াক্কার কথা শুনলুম আর নিজেদের ঘর ভাঙার কথা শুনতেই দোষ?

—দোষ আর কি? স্বখাত সলিলে ডোবার মত স্বহস্তে জ্বালা আগুনে পুড়বে আর কি! শোন তবে—

—রণনীতি শেখাবার ভার নিজের ওপর। বেশ কড়াকড়ি ছিল নিয়মানুবর্তিতার। প্রতিপক্ষের সঙ্গে শারীরিক বল আর শস্ত্রবলে সমান হলেই তো চলবে না, সমান হতে হবে গুণেও। আর যাই হোক ইংরেজরা যেমন নিয়মানুবর্তী তেমনি সময়ানুবর্তী। ছোট থেকেই ঘুম থেকে ওঠা, মুখ ধোওয়া, নাওয়া, খাওয়া, কাজকর্ম, চলাফেরা, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলো—সবই ওদের ঘড়ি ধরে। সময়ের তালে তালে চলে ওরা। সময়ের মূল্য বোঝে, তাই নষ্ট হতে দেয় না একটুও। এতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে বেশ। বিশেষ করে সৈন্যবিভাগে নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা অপরিহার্য। এ গুণটি আছে ওদের। দেশের লোকেরই বা থাকবে না কেন? লোভের জিনিস হল—গুণ। এতে যে লোভ করে আর যার ওপর লোভ করা যায়—কারুরই ক্ষতি হয় না কিছু। বিজ্ঞজনে বলেন—

পাইতে পরের গুণ লোভ কর মনে
সেই তো লোভের বস্তু জানিবে যতনে।

দেশের লোকেই বা ও গুণটি নেবে না কেন? তাই বেশ কড়া নজর রাখা হয়েছিল সময় আর নিয়মানুবর্তিতার ওপর। যে-সময়ের যে কাজ তা হওয়া চাই-ই।

রণনীতি শেখাবার সময় বাঁধাধরা। একদিন নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা কেউ আসে নাই ক্লাসে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা গেল কারুর আসবার নামগন্ধ নাই। পরদিনও তাই। কী ব্যাপার—বলা নাই, কওয়া নাই—এতগুলি ছেলে উধাও। না বলে, অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাবার নিয়ম ছিল না। এত স্পর্ধা? কী হল এদের, গেল কোথায়?

এলেন সিস্টার নিবেদিতা। ভাবান্তর দেখে জিজ্ঞেস করে কারণ শুনেই বললেন—ক'টি ছেলে গিয়েছিল তাঁর পিস্তলটি চাইতে। তারকেশ্বরে এক জায়গায় প্রচুর ধনসম্পত্তির সন্ধান পেয়ে ডাকাতি করতে যাবে তারা। নিবেদিতা জিজ্ঞেস করে জেনেছিলেন — সম্পাদকের অনুমতি না নিয়েই বেরিয়েছে সব। খুব অসন্তুষ্ট হয়েই নিবেদিতা দেন নাই তাঁর পিস্তল।

পরিষ্কার বোঝা গেল ব্যাপারটা, কিন্তু ছেলেদের আস্পর্ধায় সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল রাগে।

তিন চারদিন পরে ফিরল শিক্ষার্থী ছেলের দল। অনুপস্থিতির কৈফিয়ত তলব করা হল। সবাই চুপ, টুঁ শব্দটি নাই কারুর মুখে। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। সত্য গোপন করতে চাইল তারা।

দেহান্তর হয়েছে নির্মল মহারাজের

অপরাধ গুরুতর। অপরাধের ওপর অপরাধ—বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া, আবার সত্য গোপন। কী আস্পর্ধা! আগুনে ঘৃতাহুতি। চাবুক হাতে নিয়ে বলা হল—সত্যি না বললে রক্ষে থাকবে না কারুরই।

এইবার মুখ খুলল। ভয়ে ভয়ে সবাই বললে—বারীনদার প্ররোচনায় তারকেশ্বরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল তারা প্রচুর ধনরত্নের খবর শুনে। গিয়ে দেখা গেল ধনরত্নের বালাই নাই—কয়লার কাঁড়ি। ডাকাতি করে নাই, সন্ধান নিয়েই ফিরেছে।

বারীনের হল খুব রাগ। এতখানি কড়াকাড়ি পছন্দ করলেন না তিনি। অরবিন্দদা, বারীন্দ্র দুজনেরই অনুমোদন ছিল এরকম কাজে, ছিল না—ভগিনী নিবেদিতার আর নিজের।

অরবিন্দদা বলতেন—হত্যা পাপ নয়, উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে। একেবারে কুলক্ষয়। কিন্তু তার পেছনে ছিল ধর্মরাজ্য স্থাপনের মহতী চেষ্টা। তাই কুলক্ষয়ের পাপ স্পর্শ করে নাই অর্জুনকে। অনুনয় বিনয়ে হবে না যখন, ডাকাতি আর গুপ্তহত্যা দ্বারা ভীতির সঞ্চার করতে হবে বৃটিশবর্জিত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভের জন্যে। পুরোপুরির সন্ত্রাসবাদ।

ঠিকই, যুক্তিযুক্ত কথা। কিন্তু ডাকাতি আর গুপ্তহত্যায় দেশের লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে, সন্ত্রস্ত করতে মন সায় দেয় নাই, নিবেদিতারও না। আগে সংগঠনকে জোরদার শক্তিশালী করে আঘাত হানতে হবে—এই ছিল মতবাদ। তার জন্যে চাই অস্ত্র—বন্দুক, পিস্তল, বোমা। সমকক্ষ হতে হবে অস্ত্রসজ্জায়।

সমিতির সভাপতি মিত্রসাহেবের কানে কথা তোলা হল এমনভাবে যাতে তাঁর মন ওঠে বিষিয়ে। হলও তাই। সম্পাদককে দল থেকে সরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন তিনি। সে সুযোগ দেওয়া হল না তাঁকে। নিজেই সার্কুলার রোডের আড্ডা ছেড়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে এক মেসে উঠে আনুপূর্বিক সব বিবরণ দিয়ে কলকাতা আসবার আমন্ত্রণ জানানো হল অরবিন্দদাকে।

অরবিন্দদা এসে শুনলেন দু'পক্ষেরই সব কথা। সত্য প্রকাশ হল। বারীন্দ্র ও দলের ছেলেদের পূর্ণ সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতে উপদেশ দিয়ে বরোদায় চলে গেলেন অরবিন্দ। এও ১৯০৪ সালেরই ঘটনা।

মিলেমিশে পূর্ণ উৎসাহে কাজ আরম্ভ হল আবার।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

এক নদী রক্ত পেরিয়ে…

মিছিল-নগরী কলকাতা। অজস্র, অসংখ্য মিছিল দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু গত বছর এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে একটি মিছিলের কথায় আমাদের স্মৃতি উদ্বেল হয়ে ওঠে। মিছিলের মেজাজে তা ছিল যেমন ভিন্ন তেমনি চরিত্রবৈশিষ্ট্যেও স্বতন্ত্র। সে ছিল একটি মহিলা মিছিল। দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বিচারে নয়, প্রাণস্পন্দনে তা ছিল অতুলনীয়। মিছিলে সমবেত প্রায় পাঁচশো মহিলার কণ্ঠস্বর বাঁধা ছিল একই গ্রামে। একটিমাত্র শ্লোগানে সেই পাঁচশো মহিলা কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলঃ বীরাঙ্গনা রোশেনারা জিন্দাবাদ। ঢাকার রাজপথে রোশেনারার ঐতিহাসিক আত্মদানে এমনি-ভাবে মুখর হয়ে উঠেছিল: কলকাতার রাজপথ। ঢাকা উওমেন্স কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী রোশেনারা বেগম। আজাদী-উত্তরকালে সেদেশে নারী-শিক্ষা এবং নারী-প্রগতির যে জোয়ার এসেছিল রোশেনারা বেগম সেই আলোকেই প্রদীপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে সারা জাতির জীবনের গতিপথ গেল বদলে। বৈপ্লবিক এই পরিবর্তন রোশেনারা বেগমের জীবনের গতিপথেও এসে দাঁড়াল। তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিতে এতো-টুকু ভুল করলেন না। পাকিস্তানী ফৌজের পাশবিকতা তখন এমন এক পর্যায়ে উন্নীত যে জীবন এবং মৃত্যু দুই-ই সেখানে সমার্থক। তাই জীবনের পরোয়া না করে রোশেনারা এক দুর্জয় সংকল্পে স্থির হলেন। বুকে মাইন বেঁধে নিয়ে ঢাকার রাজপথে পাকিস্তানী ট্যাংকের সামনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। পিষ্ট হলেন রোশেনারা। কিন্তু ততক্ষণে তিনি সংকল্পে সিদ্ধি লাভ করেছেন। একটি প্যাটন ট্যাংকের মারণ-হুংকার চিরতরে স্তব্ধ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে রচিত হলো আত্মদান এবং বীরত্বের নয়া ইতিহাস।

রোশেনারার এই আত্মদান ব্যর্থ হলো না। সেই বীরত্বপূর্ণ পথে এগিয়ে এলেন সেদেশের অসংখ্য মহিলা। তাঁদেরই একজন হলেন নাজমা বেগম। পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মেজর ওসমানের বীরাঙ্গনা পত্নী তিনি। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর এই রমণী ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্রী। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে গৃহাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বামীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। প্রেরণা জুগিয়েছেন, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন শত শত মুক্তি-যোদ্ধার মনে। শত্রুর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে চুয়াডাঙায় তাঁদের আবাস বিধ্বস্ত হয়েছে। দুই মেয়ের হাত ধরে জীবন-মরণের সেই সন্ধিক্ষণে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছেন— পালিয়ে যাননি। মৃত্যুর এই প্রচণ্ড গর্জন উপেক্ষা করে এই অকম্পিতা নারী প্রতিদিন স্বামীকে রণসাজে সাজিয়েছেন, আহত জওয়ানদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছেন আর তত্ত্বাবধান করেছেন জওয়ানদের পাকশালা।

কুমিল্লার মেয়ে নাজমা বেগম। বাংলা-দেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে অদৃশ্য হৃদয়-বন্ধন হেতুই মেজর ওসমান স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাক-মুহূর্তে পাঞ্জাব থেকে চুয়াডাঙায় বদলি হলেন। মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক মুহূর্তও দ্বিধা করলেন না। সারাদিন তাঁর কেটে যায় রণাঙ্গনে। এদিকে নাজমা বেগমও স্থির হয়ে বসে থাকেন না। জওয়ানদের পাশে থেকে তিনি তাঁদের জুগিয়ে চলেছেন উৎসাহ আর প্রেরণা। সর্বক্ষণ তাঁর ওষ্ঠদ্বয়ের ওঠা-পড়ায় ধ্বনিত হচ্ছে, জয় আমাদের হবেই।

নাজমা বেগম রোশেনারার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করেছেন। সেদেশের নারীসমাজ উদ্বুদ্ধ হলেন রোশেনারার আত্মদানের মহান আদর্শে। দেশের দিকে দিকে জেগে উঠতে শুরু করলো মুক্তিসংগ্রামী নারীবাহিনী। হানাদারদের মোকাবিলায় তাঁরাও এসে দাঁড়ালেন মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি। শত্রুর প্রতি সতর্কতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তার ভার নিয়েছিলেন তাঁরা। শ্রীহট্টের মুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন একজন সাংবাদিক। হঠাৎ দুজন সাইকেল আরোহী তরুণী সেই সাংবাদিকের গতিরোধ করেন— উঁচিয়ে ধরেন রাইফেল। ইতিমধ্যে এসে

পঁচিশে মার্চ রাতে শব্দ শুনেছি শুধু
— গুলির, মেশিনগানের। [illegible]
[illegible] কেঁপে উঠেছে দালান। ভেবেছি
ভোর হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ
[illegible] আগুন।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পড়েন দুজন মুক্তিসেনা। তাঁরাই সাংবাদিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তরুণীদের সংবাদদাতার পরিচয় দেন। পরিচয় পাবার পর তাঁরা রাইফেল নামিয়ে নিলেন এবং সাইকেলে উঠে নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন।

মুক্তি-আন্দোলনে কিশোরীরা যেমন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন তেমনি আহতদের সেবাশুশ্রূষার দায়িত্বভারও তাঁরা নিয়েছিলেন। মুক্তিসেনাদের খাবার বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা আর পালন করেছেন পুরোপুরি স্কাউটের দায়িত্ব।

এদিকে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচার তখন সারা দেশ জুড়ে নিত্য নতুন কাহিনী রচনা করে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড তৎপরতায় দিশাহারা হয়ে তারা নারী নির্যাতনের আসল স্বরূপে প্রকাশ হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তারা একদিন হানা দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস রোকেয়া হল-এ। পাক চমূদের গ্রাস থেকে ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্য পঞ্চাশজন ছাত্রী ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুর প্রশস্ত পথে ওদের ফাঁকি দিলেন। এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল ওদের একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।

কিন্তু সর্বত্র তা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর সুযোগটুকু পর্যন্ত পায়নি মেয়েরা। আর মেয়েদের উপর অত্যাচার যে এমন-নির্মম হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। দিনাজপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের নারীরাও এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি। ইয়াহিয়ার ফৌজ মিশন ভবনে হামলা চালায় অতর্কিতে এবং চরম অত্যাচারে লাঞ্ছিত করে সেখানকার মিশনারী মেয়েদের। কোনক্রমে পাক দস্যুদের চোখ এড়িয়ে এই মিশনের সংগে যুক্ত একজন যাজক এবং তাঁর স্ত্রী পূর্ব দিনাজপুরে চলে আসেন। তাঁদের কাছ থেকেই শোনা যায় অত্যাচারের এই জঘন্যতম অধ্যায়।

পাক জংগীশাহীর অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি বুদ্ধিজীবীরাও। বুদ্ধিজীবী এবং মহিলা বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনার সূত্রপাত হয় এখানেই যার সমাপ্তি হয় ঢাকার আত্মসমর্পণের পর আল বদর বাহিনী কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মাধ্যমে।

অসাধারণ বীরত্ব, অকথ্য নির্যাতন আর এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ অবশেষে তার ঘোষিত সংকল্পে সফল হলো। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার পতন হয়। বাংলাদেশ লাভ করলো 'সাত রাজার ধন এক মানিক' স্বাধীনতা। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ২৭ ডিসেম্বর মিনু হাদী তাঁর মনের কথা আর অভিজ্ঞতা লিখে

[illegible]

জানালেন এপার বাংলার এক বান্ধবীর কাছে :

মিত্রা,

আজ থেকে নতুন নামকরণ করলাম তোর। আজই বিকেলে তোর কার্ডটা পেলাম। পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবছিলাম—কি ভাবছিলাম বলতে পারবো না, শুধু চোখদুটো ভরে উঠেছিল।

বন্ধু, স্বাধীনতা পেয়েছি সত্যি কিন্তু দিতে হয়েছে অনেক। ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যাই। উঃ! রক্ত, মৃত্যু, ধর্ষণ, অত্যাচার আর নির্যাতনের এক ভারাক্রান্ত অধ্যায়। আজও ভাবতে অবিশ্বাস্য মনে হয়, আমরা সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো সত্যিই কাটিয়ে এসেছি এবং ভাবছি বর্তমানের এই অনুভূতি যেন স্বপ্নের মত। পর্ণা, লিখে তোকে কতটুকু আমি বোঝাতে পারবো বল? সে যে না দেখলে, না শুনলে মধ্যযুগের ইতিহাস বলে মনে হয়। মনে হয় মানুষ আজও মহাকালে যায়নি, শহর গড়েনি, সভ্যতা শেখেনি। অরণ্যের হিংস্রতর আদিম জন্তুর চেয়েও সে অধম।

মৃত্যুকে বারবার আলিঙ্গন করে বেঁচে আছি আমরা—এই ঢাকার মানুষরা। প্রথম থেকেই ছিলাম এখানে। পঁচিশে মার্চ রাতে শব্দ শুনেছি, শুধু গুলীর, মেশিনগানের। মানুষমারা কলের। বারবার কেঁপে উঠেছে দালান। ভেবেছি ভোর হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ ভোরে ফেটেছে বোমা, জ্বলেছে আগুন। মানুষকে দেখেছি কারফিউ নামক দৈত্যের শিকার হতে। তারপর আরও দেখেছি মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ ছুটেছে পাগলের মত—শহর ছেড়ে গ্রামে। অথচ গ্রামকে গ্রাম মিলিটারি দিয়েছে জ্বালিয়ে মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্বের খবর পেয়ে। মানুষ মরেছে,—যেমন করে মরে ইঁদুর...নিঃশেষে।

সে না দেখা, না শোনাই ভাল। ইতিহাস যখন পড়তাম ভাবতাম সেই তাঁরা কত ভাগ্যবান যাঁদের সামনে ইতিহাস সৃষ্টি হয়—পড়ার মত, ভাবার মত ইতিহাস। এবার আমি আরও অসংখ্য অসহায় বাঙালীর সংগে এবার দেখলাম, ইতিহাস চলেছে—চলেছে নৃশংস পাশবিকতার পথ বেয়ে। রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন বেদনার ইতিহাস।

তবু তার পাশাপাশি দেখেছি জীবনকে। সুনিশ্চিত ধ্বংসের মাঝে জীবনস্পন্দনের দুরন্ত প্রচেষ্টা। কিছুতেই হারবো না, হেরে যেতে পারি না—মরণপণ করে এগিয়ে এসেছে এদেশের মায়ের সন্তান, বোনের ভাই, হাজার হাজার সোনার ছেলে। বেদনায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। স্বাধীনতার এই সবচেয়ে সুখী সময়টাতে চোখ ভরে ওঠে—মুচড়ে ওঠে মন। দুঃসহ যন্ত্রণায় অবরুদ্ধ হয় চেতনা। হাসিমুখে যাঁরা দিয়ে গেল প্রাণ, সেই যাঁদের রক্তে মুক্তি পেল এই দেশ—তাঁদের কি ফিরে পাব আর?

যাঁরা বেঁচে আছেন, ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে তাঁদের কথা শুনলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। গুলীর মুখে তাঁদের কেউ পানিতে ঝাঁপ দিয়ে বেঁচেছে, ধরা পড়ে কেউবা মেক-আপ নিয়ে ট্রাউজার পাল্টে বেরিয়ে পড়েছে। জুতো আর নকল ব্যাণ্ডেজের মধ্যে বিস্ফোরক নিয়ে তাঁরা ডি আই টি-র ছয়তলায় ঘটিয়েছে বিস্ফোরণ। কেউবা গাড়ির মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ঘটিয়ে ঈদের কেনাকাটায় মুখর বায়তুল মোকাররম (মার্কেট) প্রাঙ্গণে মৃত্যুর উৎসব করেছে।

তোর মনে হবে...কোন ডিটেকটিভ বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিস।

আজ ভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। বন্ধ যদিও। আমরা শহীদদের একটা সংকলন বের করছি। সেজন্যেই মুক্তিসেনারা এসেছিলেন ওখানে। নিতান্ত সাধারণ বাঙালী ছেলে। কি সহজভাবে কথা বললেন। মনে হতেই চায় না, ও'দের প্রত্যেকেই সংগ্রাম করেছেন জীবনকে পণ করে। সংকলন বের হলে তোকে এক কপি পাঠাব ইনশাল্লাহ।

আমার মনটা সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে ইণ্টেলেকচুয়ালদের উপর বর্বরতর হামলায়। যার শিকার আমার প্রিয় অধ্যাপকেরা। তাঁরা নিহত হয়েছেন নৃশংসতম প্রক্রিয়ায়। ঢাকার কোন একটা ইনস্টিটিউট রুমে অসংখ্য চোখ পাওয়া গেছে—উপড়ে ফেলা মানুষের চোখ। কল্পনা করতে পারিস কোন্ যুগে আমরা পৌঁচেছি! আর চরম দুঃখের কথা এই—হত্যাকারী 'বদর বাহিনী' (মিলিটারী সৃষ্ট) মধ্যে শুধু অবাঙালী নয়, বাঙালী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক পর্যন্ত ছিল।

রোকেয়া হল-এ (আমাদের ছাত্রী-নিবাস) আটচল্লিশটা কঙ্কাল পাওয়া গেছে। আর আমরা মরতে মরতে বেঁচে গেছি, আর দু'দিন দেরি হলে কাউকে বাঁচতে হতো না। ওরা সব বাঙালী অফিসারদের একটা লিস্ট করেছিল—কনফারেন্সে ডেকে মারার লিস্ট। আমাদের আজিমপুর কলোনী গভর্নমেণ্ট অফিসারদের কলোনী। প্রথমে এটা এবং পরে অন্য কলোনীতে হাত দেওয়ার কথা ছিল। পালাবার পথ ছিল না। তাই ঢাকাতেই ছিলাম। তবে যুদ্ধের শেষ চারদিন এই বিল্ডিংয়ে না থেকে আমার এক ভাইয়ের বাসায় ছিলাম। একটু ভিতরে আর কি। এ-বাসার সামনেই বড় রাস্তা। স্ট্রীট ফাইট হলে তো শেষ। আর আত্মসমর্পণ না করলে ঢাকা তো গুঁড়িয়ে যেত।

তবু মুক্তি আমরা পেয়েছি। শোষণের হাত থেকে—অন্যের মুখ চেয়ে থাকার দুঃসহ গ্লানি থেকে। আর সেজন্যে তোর কাছে, তোদের দেশের কাছে এবং সারা ভারতের শুধু নয়—সারা দুনিয়ার প্রণম্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মহান ভারত এবং রাশিয়ার সাহায্য আমরা বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবো না।

এবার খুলনা আসবি না? আমি শিগগির যাচ্ছি কিন্তু।

আমার বুকভরা ভালবাসা রইল। উত্তর দিতে এক মুহূর্তও যেন দেরি না হয়।

তোর বর্ণা

রক্ত, আত্মদান আর অশ্রুর বিনিময়ে লব্ধ এই স্বাধীনতায় নারী-পুরুষের অবদান সমান গৌরবের। ইতিহাস এই গৌরবকে বহন করবে যুগ থেকে যুগান্তরে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ অনুপ্রেরণা জোগাবে পুরুষপরম্পরায়।

—প্রমীলা

বাঙলাদেশের মেয়েদের চোখে কলকাতার মহিলা সমাজ

বাঙলাদেশ এখন স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী। এ স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক। বিগত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে, তার অন্তরালে আরও সুবৃহৎ বিপ্লব ঘটেছে বাঙলাদেশের সমাজে। সে ছবি সবার চোখে ধরা পড়েনি। এই সমাজ বিপ্লবের মূল্য রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়েও অনেক মহৎ, অনেক বৃহৎ। যে বিপ্লব ঘটান সহজ ছিল না। অনেক দেশেই ঘটেনি। বাংলাদেশের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা মধ্যপ্রাচ্যের ঐশ্লামিক অনেক রাষ্ট্রেই ঘটেনি। সেই দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক ভাগ্যবান।

গত বিশ বছরে মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' ঘটেছে সেই সব দেশের সমাজ আমি দেখেছি। সমাজের মূল কাঠামো হল দেশের মহিলারা। তাদের ভাবগতি, মনোবৃত্তি, চাল-চলনের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে সামাজিক বিপ্লব। মধ্যপ্রাচ্যের ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের মহিলা সমাজে আমি খুব বেশী পরিবর্তন দেখিনি। তবে, হ্যাঁ, সিরিয়া এবং লেবাননে খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে। সাধারণ সমাজে নয়। এমন কি মিশর-এর মতন প্রগতিবাদী দেশেও খুব বেশী সামাজিক বিপ্লব ঘটেনি। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের মহিলা সমাজ এখনও মধ্যযুগের নাগপাশ ছেদ করতে পারেনি। যা পেরেছে বাংলাদেশের মহিলা সমাজ। সেদিক থেকে গত এক বছরের বিপ্লব বাংলাদেশে সার্থক হয়েছে, একথা জোর গলায় বলতে পারি। সেদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ হতভাগ্য। তারা অনেক পিছনে পড়ে রইলেন। যা হওয়া উচিত ছিল অনেক আগে তা কিন্তু ঘটেনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে। কেন ঘটল না তার বিশ্লেষণের সময় আসবে। গত তিন বছর ধরে বাংলাদেশে যা শান্ত ও নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটছিল তার ইতিবৃত্ত সবার জানার কথা নয়। বাংলাদেশের মহিলা সমাজ, বিশেষ করে ছাত্রীরা পাক সরকারের ঐশ্লামিক আদেশ অমান্য করে বোরখা পরিত্যাগ করে, কলেজের ছাত্রীরা কপালে টিপ পড়ে এবং পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের মতন চলাফেরা সুরু করে। তাই নিয়ে ভীষণ আন্দোলন সুরু হয় ওখানে। তাদের কাফের ও হিন্দু সমাজের প্রতিফলন বলেও ঘোষণা করে পাক সরকার। বাংলাদেশের মেয়েরা তাতে কিন্তু দমেনি।

বাংলাদেশের বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে বহু মহিলা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমন কি বহু মেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁরা সম্মুখ সমরে যেমন যোগদান করেছেন তেমনি সেবিকা হিসেবেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিলেন নিজেদের। গত এক বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে আমি দেখেছি বহু বাঙালী মহিলাকে বোরখা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসতে। সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক সমাজে পর্দার কৃত্রিম আবরণ কোনো দিন ছিল না। তাঁরা সেদিক থেকে অনেক 'প্রগতিশীল'। যত গণ্ডগোল মধ্যবিত্ত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে নিয়ে। সেই মধ্যবিত্ত সমাজই ছিল এতকাল শাসক ও শোষক। তাদের নির্দেশে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সমাজে বিপ্লব এসেছে এই সেদিন। তার আগে নয়। কিছু মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মহিলাদের আমি দেখেছি বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে বোরখা পরে, কিন্তু মুখের পর্দাটা সরিয়ে চলাফেরা করতে। যা সম্ভব ছিল না প্রাক-বিপ্লবোত্তর যুগে। এই পরিবর্তনের মূল্য কম নয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন এসেছে তাদের মধ্যে যাঁরা পাক হানাদারদের বর্বরতায় অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতায় বাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা অনেক কিছু দেখেছেন কিছু বা তাঁরা শিখেছেন। এখানেই শান্ত ও নিঃশব্দ বিপ্লবের সার্থকতা। তাঁরা কলকাতা ও তার মহিলা সমাজ সম্পর্কে কি ভাবছেন কি দেখছেন তাই নিয়ে আমি বহু মহিলাকে প্রশ্ন করেছিলাম।

পাক সেনাদের বর্বর অত্যাচারে যে এক কোটি শরণার্থী এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের সবাই বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে কাটিয়েছেন গত আট-ন' মাস। এ'দের অনেকেরই কলকাতা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাঁরা এখন ঘরে ফিরছেন। তাঁদের ঘরে ফেরার পালা।

যেসব উদ্বাস্তু গত বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা দেশ ছেড়ে এদেশে বসবাস করতেই এসেছিলেন। তাঁরা কলকাতা দেখেছেন। কলকাতা সমাজের সঙ্গে অনেকে মিশেও গেছেন। এবারের শরণার্থীরা এক গ্রাম থেকে এসে ভারতের অন্য গ্রামের ক্যাম্পে বাস করেছেন। তাঁদের কলকাতা বা নগর জীবন দেখার সৌভাগ্য ও সুযোগ-সুবিধে ঘটেনি। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক শরণার্থী গত আট-ন মাস কলকাতায় বা তার শহরতলীতে কাটিয়ে গেছেন। যাঁরা কলকাতায় ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই বুদ্ধিজীবী, এ্যাডভোকেট-ব্যারিস্টার, পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক ইত্যাদি।

বাংলাদেশে এ'রা ছিলেন অবস্থাপন্ন। এই সমাজের মহিলারা কলকাতা ও কলকাতার মেয়েদের সম্বন্ধে কি ভাবেন এবং এ'দের সম্বন্ধে কী-ই বা তাঁদের মনোভাব তাই জানতে আমি কয়েকজন মহিলাকে প্রশ্ন করেছিলাম। আমার প্রশ্ন ছিল ঃ— কয়েক মাস তো কলকাতায় কাটালেন, কলকাতা আপনাদের কেমন লাগল? কলকাতার মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাদের মতামত দিন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আলি আহসানের পত্নী বলেছেন —যদিও তিনি ঢাকার মেয়ে কিন্তু তাঁর শৈশব কেটেছে এই কলকাতায়, বিয়ের পরও তিনি কলকাতায় ছিলেন বেশ কয়েক বছর। তাঁর শৈশবের কলকাতার সঙ্গে বর্তমান কলকাতার অনেক ফারাক। শহর আরও নোংরা হয়েছে, হয়েছে আরও ঘিঞ্জি, লোকের ভিড়, ট্রামেবাসে ভিড় দেখে তিনি কয়েক মাস বেশ চিন্তিত ছিলেন।

শ্রীমতী আলি আহসান নিজেও সাহিত্যিকা। পঁচিশ বছর পরে কলকাতায় মেয়েদের অনেক স্বাধীন দেখছেন। তাঁরা অনেক কর্মঠ। এটা তাঁর ভাল লেগেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ কুরেশীর পত্নী শ্রীমতী নাসিম বলেছেন— কলকাতার মেয়েরা নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুরে বেড়ান, বাজার-হাট করে দেখে তাঁর ভাল লেগেছে। বহু মেয়ে ট্রামেবাসের ভিড়েও অফিস করেন, বাজার করে দেখে তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

'বান্ধবী' পত্রিকার সম্পাদিকা বেগম মুশতারি শফি বলেছেন—আমিও ছোটবেলায় কলকাতায় ছিলাম। এখন কলকাতা দেখে দুঃখ হয়। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে গেছে এই শহর। রাস্তায় বেরুলে জনস্রোতের ধাক্কা খেতে হয়। ট্রামেবাসে চড়ার জো নেই।

বেগম শফি আরও বলেছেন—কলকাতার মেয়েরা যেন একটু বেশী রকমের বিদেশী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছেন। পোষাকে-আশাকে বাঙালীপনা কমে যাচ্ছে। তাতেও বিদেশী প্রভাব বাড়ছে। এরকম কিন্তু বাংলাদেশে নয়। এখানে এসে কলকাতার মেয়েদের কাছে কিছুই শিখতে পেলাম না। তবে কলকাতার মেয়েরা অনেক স্বাধীন হয়েছেন, তাঁরা আর পরনির্ভরশীল নয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকা (যিনি নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন) বললেন—কলকাতায় শিশুদের নিয়ে বসবাস করা বড়ই কষ্টকর। খোলামেলা জায়গা খুবই কম। শহরটা যেন বড্ড ঘিঞ্জি। তবে ও বাংলার চেয়ে এখানকার মেয়েরা অনেক স্বাধীন।

বি-এ ছাত্রী কুমারী শ্যামলী রক্ষিত জানালেন—কলকাতার দুর্দশা দেখে খুবই খারাপ লেগেছে। মেয়েদের জীবন এখানে বেশ কষ্টকর ও কঠিন। তবু তারই মধ্যে মেয়েরা জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রীরা আরও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। তাদের কোনো দুর্ভাবনা নেই। আমাদের কাছে কল্পনারও অতীত।

অধ্যাপিকা এম চৌধুরী বলেছেন— মেয়েদের পুরো স্বাধীনতা দেখে তাঁর খুব ভাল লেগেছে। এ'দের প্রশংসা করতে হয়। নিজেরাই বাজার-হাট করেন। কত স্বাধীন। তবে কলকাতার নগর জীবন বড়ই কষ্টকর।

সাত-আট মাস যাঁরা কলকাতায় কাটালেন তাঁরা এখন দেশে ফিরছেন। এ'রা শুধু যানবাহনের অপেক্ষায় ছিলেন। কেউ গেছেন প্লেনে, কেউ যাচ্ছেন ট্রেনে বা জাহাজে। সবাই দেশে ফিরছেন। তার সঙ্গে এ'রা কলকাতার কিছু স্মৃতিও বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বা গেছেন। সেই স্মৃতি হয়ত দুই বাংলার সেতু-বন্ধনের সহায়ক হবে একদিন।

দিলীপ মালাকার
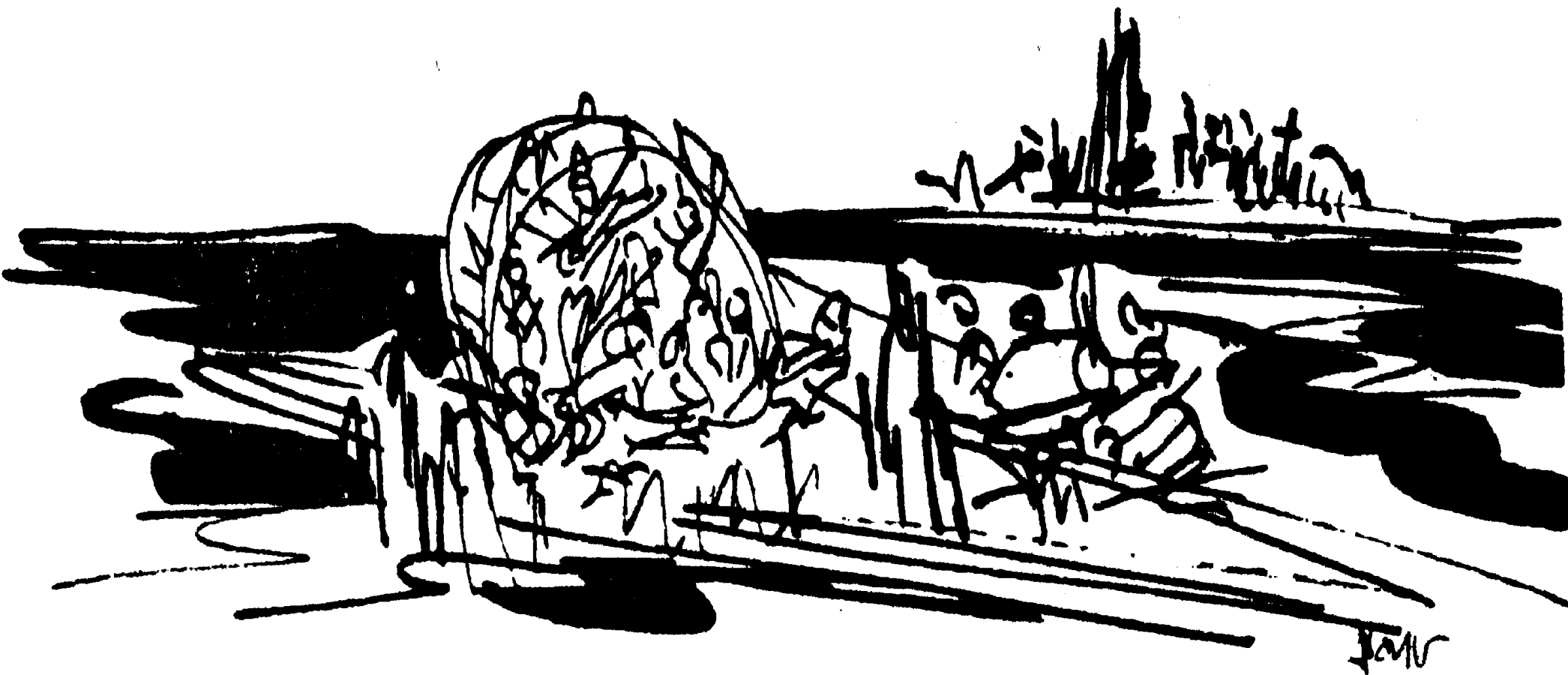
পত্রিকাভবনে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীঅমূল্যকুমার গোস্বামী, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এবং কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে (প্রথম সারিতে বাঁদিক থেকে ডানদিকে) দেখা যাচ্ছে।

মহাত্মা শিশিরকুমার স্মরণোৎসব

কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ অমরত্ব লাভ করে। কর্মী পুরুষ শিশিরকুমারের জীবন-চর্চাই ছিল কর্মময়। বৈষ্ণব ধর্মের আলোক-বর্তিকায় প্রোজ্জ্বল। এই মহাত্মার সদৃশ জীবন একান্তই দুর্লভ।

ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব সাধকেরা প্রতি বছর মিলিত হন শিশিরকুমারের তিরোভাব দিনে। এবছর পত্রিকাভবনে আয়োজিত স্মরণোৎসবে সুধীজন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রভুপাদ শ্রীঅমূল্যকুমার গোস্বামী। বৈষ্ণব সম্মেলন এবং স্মরণোৎসবের উদ্বোধন করে কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ বলেন, মহাত্মা শিশিরকুমার ছোটবেলা থেকেই জনহিতকর কার্যে মেতে ওঠেন। নিপীড়িত জনগণের সেবায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, মহাত্মা শিশির-কুমারই সত্যিকারের অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক। তেজোদীপ্ত লেখনীর দ্বারা তিনি তৎকালীন বৃটিশ সরকারকে কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত বৃটিশরাজকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বড় কঠোর-কঠিন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডক্টর শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেন, পরাধীন ভারতে জাতির দুর্গতি দেখে মহাত্মার কোমল প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। ঝিমিয়ে পড়া সমাজটাকে জাগিয়ে তোলার জন্য মহাত্মা ছোটবেলা থেকেই দেশের কাজে নেমে পড়েন। এবং তাতে তিনি সার্থকও হন।

'অমিয় নিমাই চরিত' রচয়িতা শিশির-কুমারই প্রথম পথিকৃৎ যিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-বেদনা আমাদের সামনে প্রথম তুলে ধরেছেন।"

সভাপতির ভাষণে প্রভুপাদ শ্রীঅমূল্য-কুমার গোস্বামী বলেন—সামাজিক জীবনে, কর্মজীবনে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি পৃথিবীর আদর্শ পুরুষ। এমন সর্বতো-মুখী প্রতিভাসম্পন্ন জীবন পৃথিবীতে বিরল। একটা বিরাট প্রেম সরোবর ছিলেন তিনি। আদর্শভ্রষ্ট জাতিকে বাঁচাতে হলে আজ তাঁর আদর্শ প্রচারের বড় বেশী দরকার।

শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত বলেছেন—মহাত্মা শিশিরকুমারের সমগ্র জীবনটাই ছিল একটা ধ্যান, একটা নিরব-চ্ছিন্ন কর্মস্রোত, যা সহস্র বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছিল, একটামাত্র ভাব-প্রবাহকে অবলম্বন করে—এবং সেইভাবের সার কথা ছিল 'ভারতীয় ঐতিহ্যের এবং ভারতীয়দের চিন্তাধারার বিশ্ব-স্বীকৃতি এবং একটি আদর্শ জাতীয়তাবাদের প্রচার। এই সাধনার যূপকাষ্ঠে তিনি নিজের এবং স্বীয় পরিবারের জীবনকে আহুতি দিয়ে-ছিলেন—ফলে গড়ে উঠেছিল আজকের এই বিশ্বপ্রসিদ্ধ এবং ভারতের সর্বজনপ্রিয় নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মতাবলম্বী সংবাদ প্রতিষ্ঠান — অমৃতবাজার পত্রিকা —যা বিধাতার আশীর্বাদে শতায়ু হয়েছে এবং সহস্রায়ু হবে।

মহাত্মা শিশিরকুমারের জন্মদিন বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে গেলেও, আমি নিজের কানে মহাত্মার অন্যতমা প্রবীণা

জেনারেল মানেকশ　　অ্যাডমিরাল নন্দা　　এয়ার মার্শাল লাল

সেনানায়করা পদ্মবিভূষণ

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান যথাক্রমে জেনারেল মানেকশ, এ্যাডমিরাল নন্দা, ও এয়ার চীফ মার্শাল পি সি লালকে পদ্মবিভূষণ উপাধি দেওয়া হয়েছে। ভারত রত্নের পর এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় উপাধি।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এই উপাধি দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ'রা ছাড়া ভারতীয় বাহিনীর ১২ জন উচ্চ পর্যায়ের অফিসারকে পদ্মভূষণ উপাধি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্থল বাহিনীর ৮জন, নৌ ও বিমান বাহিনীর ২ জন করে অফিসার আছেন। প্রাপকদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিউর, লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে পি ক্যানডেট ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আছেন। এ'রা হলেন যথাক্রমে সাদার্ণ, ওয়েস্টার্ণ ও ইস্টার্ণ কম্যাণ্ডের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং।

রেলের দুজন অফিসারকে পদ্মশ্রী উপাধি দেওয়া হয়েছে।

অল্পসংখ্যক লোক ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পাকিস্থানকে পরাজিত ও বাংলাদেশকে মুক্ত করে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের এই সম্মানলাভ।

জেনারেল ম্যানেকশ বহিরাক্রমণ থেকে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। চীফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান হিসাবে জেনারেল ম্যানেকশ বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে সহ-যোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় ফৌজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরীর ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডমিরাল নন্দা ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে শত্রু বিধ্বংসী শক্তিতে পরিণত করেছেন এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধে চূড়ান্ত কৃতিত্ব দেখান। তাঁর রণকৌশলের ফলেই ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পক্ষে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল।

এয়ার চীফ মার্শাল লাল নিজে একজন নির্ভীক ও সক্ষম বৈমানিক। তিনি ভারতীয় বিমানবাহিনীর আত্ম-রক্ষা ও আক্রমণ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য নিরলস কাজ করেছেন।

এয়ার চীফ মার্শাল লালের নেতৃত্বে ভারতীয় বিমানবাহিনী বাংলা-দেশকে মুক্ত করতে এবং পশ্চিম খণ্ডে শত্রুর পরিকল্পনা বানচাল করতে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

দ্রৌর মুখে শুনেছিলাম যে শিশির-১৮৪০ সালের ১৫ আগস্ট সকাল-জন্মেছিলেন। তখন কেউ কল্পনা পারেনি যে ঐ দিনটিতেই ভারতের নতা দিবস উদযাপিত হবে।

তিনি বলেন, শিশিরকুমারের সরল, স্বর, পাশ্চাত্য ডিগ্রী বর্জিত সাধক-নর লেখনীতে যেমন ক্ষুরের ধার ছিল, নির্ভরতার উপযুক্ততাও ছিল।

হাত্মা শিশিরকুমারকে রাজদ্রোহিতার ধে অভিযুক্ত করে জেল খাটাবার করেছিলেন দি ইংলিশম্যান পত্রিকার বীমস গাত্রদাহে। তাঁর সেই মতলবটি হয়ে যাওয়ার পর ঢাকা গেজেটের অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন : স্ট্রীটের কাগজখানির কর্ণধার যে, অমৃতবাজারের সম্পাদকের অর্ধদণ্ড আর সেই সঙ্গে কিছুদিন ঘানি টানার ব্যবস্থা করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। এই কথা যে সে নিতান্তই নির্বোধ কারণ অমৃতে-র ঐতিহ্য এবং প্রাণশক্তি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। আমরা বলব যদি ক্ষমতা থাকে তো তারা তাদের কল্পনাকে কাজে পরিণত করুক। এই খবর দেশে ছড়িয়ে পড়লে আসমুদ্রহিমাচল জেগে উঠবে এবং ফলে ওদের রাণীমাকে সিংহাসন ফেলে ভারতে ছুটে আসতে হবে।' এইরকম শ্রদ্ধা ও ভক্তি মহাত্মা শিশিরকুমার পেয়েছিলেন দেশে ও বিদেশে।

অতীতের সেই পরাধীন ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্যক্তিরাও একথা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন ভারতীয় সংবাদপত্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকবে, ততদিন মহাত্মা শিশিরকুমারের স্মৃতি অম্লান থাকবে—এক মহান ব্যক্তিরূপে আদর্শ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল প্রতীক চিহ্ন হিসেবে সংবাদপত্র শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে।

মঙ্গলাচরণ করেন শ্রীপাদ দিলীপকুমার গোস্বামী, উদ্বোধন সঙ্গীত করেন শ্রীভূপেন দাস। কবি শ্রীপান্না মাইতি শিশিরায়ণ বন্দনা করেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে গত ২৫শে পৌষ সোমবার বাগবাজার পত্রিকা ভবনে বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে সকালে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজী ও শ্রীনিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের মঙ্গলারাত্রিক অন্তে শ্রীশ্রীনাম সংকীর্তন পরিচালনা করেন, শ্রীঅনিলবরণ রায়। মৃদঙ্গ সঙ্গত করেন শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা। কৃষ্ণনগর গৌরবিনোদ সঙ্ঘের শ্রীঅঞ্জলি দে ও শ্রীঅঞ্জলি দাস গৌরকীর্তন পরিবেশন করেন। সকাল আটটায় শ্রীঅমূল্যচন্দ্র নন্দী এবং শ্রীগৌরী লাহিড়ী, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত পাঠ করেন। শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজ স্তবাঞ্জলী পাঠ করেন।

প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিকেলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করেন। সভান্তে শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় সদলে ধ্রুপদ গান করেন। রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির সাংস্কৃতিক শাখার সভাবৃন্দ কর্তৃক জয়-দেব নাট্যাভিনয়ের দ্বারা মহোৎসব পূর্ণ হয়।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত
চরিত্রে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। ছবি: অরুণ

অনুপকুমার ও শাঁওলী মিত্র
পরিচালনা
পীযূষ গাঙ্গুলী
ছবি: অরুণ

দংশক-এ নায়িকা রেহানা সুলতানা

…-সমালোচনা

…ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর …পুষ্ট পরীক্ষামূলক চিত্র?

…মায় ব্যবহৃত জিজ্ঞাসার … সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করছে, …ং বেদী রচিত, প্রযোজিত ও … এবং দাচি ফিল্ম নিবেদিত …য় তোলা ছবি 'দাস্তাক' সত্যই … পরীক্ষামূলক ছবি কিনা। …ং বেদী হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের …াম-করা সংলাপ ও চিত্রনাট্য-…দী ছবির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশে … দেখা যায় পরিচর্যালিপিতে …ক রূপে। এ অবস্থায় সহসা … স্বলিখিত একটি কাহিনীর …প্রযোজকরূপে আত্মপ্রকাশ কর-…প্রশ্ন আদৌ অস্বাভাবিক নয়। …তাঁর লিখিত কাহিনীর চিত্ররূপ …জকরা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ …বলেই তিনি নিজেই অগ্রসর …র প্রযোজনার জন্যে এবং এ-…তিনি ফিল্ম ফিনান্স কর্পো-…র্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য দানে …তে সক্ষম হয়েছেন সৌভাগ্য-…ভাবিকই বোম্বাই শহরের উৎকট … সমস্যা একটি নিম্নমধ্যবিত্ত …ণ দম্পতির জীবনকে কি …বিপর্যস্ত করেছিল, এই কাহিনী …র আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে …হওয়া ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন চল-…কদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। …ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর ঘোষণায় প্রকাশ যে, একমাত্র দিল্লী অঞ্চল (ছবি পরিবেশনার অঞ্চল) থেকেই কর্পোরেশন প্রদত্ত ঋণের টাকা পরিশোধিত হয়ে গেছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ছবিটি প্রযোজকদের সন্দেহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আর্থিক সাফল্যলাভ করেছে।

বোম্বাই শহরের বাড়ী ভাড়া সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণকে নিশ্চয়ই পরীক্ষামূলক বলা চলে। কিন্তু এই কাহিনীর বিস্তারে যে-সব পরিস্থিতি ও দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই প্রলুব্ধকর এবং সেগুলি একটি চিত্রকে ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারে। ধরুন, সেই বিশেষ দৃশ্যটি, যেখানে নায়িকা শল্মা শয্যায় শায়িতা, নায়ক হামিদ তার দেহকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে তার ব্লাউজের বোতাম

জনতার আদালত / অনিলকুমার, অসিতবরণ ও ভারতী রায়।

খুলছে, তার বক্ষাবরণীর কাঁধের ফিতাকে নামিয়ে দিচ্ছে এবং মুখে গান গাইছে : তুম্ সে কহুঁ একবাত, পরো সে হল্কী—হল্কী, সেখানে দর্শকমনকে যেভাবে কল্পিত শৃঙ্গারোপভোগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কৌশলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা শৈল্পিক সার্থকতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্যের একটি সুনিশ্চিত অস্ত্র নয় কি?

কাহিনী উপস্থাপনে ও বিস্তারে শৈল্পিক সম্ভাব্যতার (আর্টিস্টিক প্রব্যাবিলিটির) প্রশ্নও তোলা যায়। নায়ক হামিদ শহরের মুন্সিপ্যাল কর্পোরেশনের একজন চাকুরে। সে এক পানের দোকান-দারের মধ্যস্থতায় যখন একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিল, তখন সে বাড়ীর অপর বাসিন্দাদের সম্পর্কে বা পল্লী সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর নিল না, এটা কি আদৌ বিশ্বাস্য? বরং পরিবর্তে যদি বলা হত, অন্য কোথাও বাড়ী ভাড়া পাওয়া ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে সে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ জেনে-শুনেই ঐ ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল এবং পরে উপর্যুপরি উপদ্রুত হয়ে বুঝেছিল, ওখানে বাস করা যতটা সহজসাধ্য ভেবেছিল, ততটা আদৌ নয়, তাহলে কাহিনী উপস্থাপনায় একটি বিশ্বস্ত রূপ দেওয়া যেতে পারত। এরূপ পরিবেশকে যখন ভদ্র এবং প্রতিবেশীদের যখন বিশেষ সভ্য বলে মনে হল না, তখনও নায়িকা শব্নমার পোশাক পরিবর্তন বা প্রসাধনের সময়ে জানলাকে খোলা রেখে কৌতূহলী প্রতিবেশী যুবকদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে কি? এই ধরনের আরও প্রশ্ন উত্থাপিত করা যায়।

তবু বলব, ছবিটিতে এমন বহু মুহূর্ত ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, যা অত্যন্ত উপভোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসম্মত। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিত্য উদ্বেগের মধ্যে বাস করা যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তখন স্বামীসহ শব্নমার পিতৃগৃহে যাত্রা, সেখানে জামাতার আদর-আপ্যায়নের জন্যে শ্বশুরের নিজস্ব পারিতোষিক স্বরূপ স্বর্ণপদক বিক্রয়ের চেষ্টা বা শব্নমার বয়ঃপ্রাপ্ত ছোট বোনের বিচিত্র ব্যবহার—সবই দর্শককে একটি আশ্চর্য শিল্পানুভূতি দ্বারা আচ্ছন্ন করে। পিঞ্জরমুক্ত ময়নার পুনরায় নিজ বাসস্থানে ফিরে আসা এবং অনাহারে মৃত্যুবরণ করাও যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। শব্নমার মনোজগতের আলোড়নও বিচিত্র দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে বিধৃত। সাধারণ ছবিতে প্রায়ই গান শোনাবার জন্যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। এই ছবিতে কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনে গান এসেছে এবং অত্যন্ত সার্থকভাবে এসেছে।

অভিনয়ে নায়িকা শব্নমবেশে রেহানা সুলতানা প্রথম চিত্রাবতরণে যে আশ্চ[র্য] নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভার[ত] সরকারের 'উর্বশী' পুরস্কারেই স্বীকৃ[তি] ধন্য। ক্যাথারিন হেপবার্নের মতো রেহানার দর্শনধারি যথেষ্ট নিরেস; কি[ন্তু] চোখ তাঁর কথা কয় এবং অভিনয় ক[স্তু] যে কী, তা তিনি সম্যক আয়ত্ত করেছেন। তিনি আজ নির্দ্বিধায় ভারতীয় চলচ্চি[ত্র] জগতে প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী। নায়[ক] হামিদের ভূমিকায় সঞ্জীবকুমারও ভার[ত] সরকারের ভরত পুরস্কার লাভ করেছে[ন]। তাঁর অভিনয় যথেষ্টই সংযত, অভিব্য[ক্তি] ব্যঞ্জনাময়। তবু বলব, তাঁর সাফল্যের জ[ন্য] কাহিনীকার পরিচালক রাজেন্দ্র সিং বে[দী] বহুল পরিমাণে দায়ী। জনৈক সহানুভূতি-শীল শ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধ মুসলমানে[র] ভূমিকায় মনোমোহন কৃষ্ণের সহজ সাবলী[ল] অভিনয় যে কোনোও দর্শকের দৃ[ষ্টি] আকর্ষণ করবে। স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন পা[ন]-ওয়ালার ভূমিকায় আনোয়ার হোসে[ন] বাস্তব অভিনয় করেছেন। হামিদে[র] শ্বশুরের ছোট্ট ভূমিকায় নিরঞ্জন শ[র্মা] স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। যেমন করেছে[ন] আপিসের টাইপিস্ট বেশে অঞ্জু মহে[ন্দ্রু]। হামিদের প্রতি সহানুভূতিশীলতা এ[বং] তার চারিত্রিক স্খলনে গভীর বেদনাবে[াধ] অত্যন্ত সহজেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছে[ন]। শামসাদ বেশে শাকিলা বানু ভোপাল[ী] অভিনয়ে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে চরিত্রের বি[...] ছাপটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। অন্যান্য স[ব] ভূমিকাই সু-অভিনীত।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভা[গের] মধ্যে সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীতে ক[...] বসুর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া [...] বহু দৃশ্যে—বাস্তবধর্মী ফোটোগ্রাফী[...] ক্যামেরার বিচিত্র উপস্থাপনায় 'তমসে ক[হুঁ] এক বাত, পরো সে হল্কী-হল্কী' গানের সর্বশেষ শট্‌টি—কাচের জানা[লার] ওপর বৃষ্টির বিন্দু বিন্দু ধারাপাত অবিস্মরণীয়। পরিস্থিতি রচনায় সু[...] রায় পরিকল্পিত দৃশ্যপট যেমন সাহ[ায্য] করেছে, ছবিটির গতি নিয়ন্ত্রণে হৃষী[কেশ] মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনাও তে[মনি] কার্যকরী।

ছবিটির সাফল্যের মূলে সঙ্গী[ত] পরিচালক মদনমোহনের দান অসামা[ন্য]। মজরু সুলতানপুরীর রচনায় [...] আশ্চর্যভাবে তিনি রাগাশ্রয়ী সুরযো[জনা] করেছেন, তেমনই সঙ্গীতরচনায় প্রয়ো[জন] মতো যন্ত্রের ব্যবহারে তিনি আ[...] নির্বাচনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আব[হ] সঙ্গীতের প্রয়োগেও তিনি অভিনব পরিমিতিবোধের নিদর্শন রেখেছেন।

নানাদিক দিয়ে রাজেন্দ্র সিং বে[দী] প্রযোজিত ও পরিচালিত 'দাস্তাক' অ[...] ও সমগ্রভাবে উপভোগ্য।

(২) 'আপন জন'-এর হিন্দী চিত্র[...]

এক একটি বিষয়বস্তু আছে, একান্তভাবেই স্থান ও কাল নি[...]

...দন, রাজনৈতিক আদর্শের বিরোধ ...ত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করে কম্যুনিস্ট ...গুলি ছাড়া প্রতিটি রাজ্যে, যেখানে ...নো-না-কোনো ধরনের শাসন-ব্যবস্থা ...দ আছে। আমাদের ভারত হচ্ছে ...তান্ত্রিক দেশ। কাজেই ভারত ইউনিয়ন ...ন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাজ্যেও রয়েছে বিভিন্ন ...জনৈতিক দল—শাসক কংগ্রেস, সংগঠন ...বাদি) কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, মার্কস-...দী কম্যুনিস্ট পার্টি, জনসংঘ, স্বতন্ত্র, ...ফরওয়ার্ড ব্লক, বোলশেভিক পার্টি ইত্যাদি ...ত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে রাজ-...নৈতিক মতবিরোধ। কিন্তু এই রাজনৈতিক ...তবিরোধকে উপলক্ষ্য করে এবং রাজ-...নৈতিক নেতাদের প্রশ্রয়ে আমাদের ...পশ্চিমবঙ্গে বেকার যুবকেরা যে-ভাবে এক ...শ্রেণীর সমাজবিরোধীদের সঙ্গে মিশে ...তারা, পাইপগান থেকে শুরু করে বোমা, ...স্টার পর্যন্ত ব্যবহার করে মানুষের জীবন ...নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মেতে উঠেছিল, ...ভারতের অন্য কোনো রাজ্যভুক্ত জনগণ তা ...কল্পনাও করতে পারে না। আমরা ব্যক্তিগত ...অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গ ...রাজ্য, বিশেষ করে কলকাতা সম্বন্ধে অন্য ...রাজ্যের লোকের মনে এক অজ্ঞাত ...ভীষিকার চিত্র জেগে উঠত এবং কেউ ...কলকাতা শহর থেকে এসেছে শুনলেই ...তাকে তারা নানা রকম উদ্ভট এবং সময় ...সময় অবান্তর প্রশ্ন দ্বারা বিব্রত করত। ...বাঙালী যুবক মাত্রই অস্পৃশ্য হয়ে ...উঠেছিল।

ইন্দ্র মিত্র রচিত যে কাহিনীটিকে ...অবলম্বন করে পরিচালক তপন সিংহ ...'আপন জন' চিত্রটি প্রস্তুত করেছিলেন, ...সে কাহিনীর বক্তব্য আজকের দিনের ...শহর-কলকাতাবাসী এবং কিছুটা পরিধি ...বিস্তার করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রত্যক্ষ ...অভিজ্ঞতালব্ধ মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ...করবে, ঠিক সেই পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া ...ভারতের অন্য কোনো রাজ্যবাসীর মনে ...হবে বলে আমরা ভাবতেই পারি না। ...শুধু তাই নয়; ঐ কাহিনীকে বাস্তব রূপে ...দেওয়া বাঙালী পরিচালক তপন সিংহের ...পক্ষে কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তস্থিত ...টালিগঞ্জে বসে যতখানি সহজসাধ্য হয়েছে, ...ঠিক ততখানি কিছুতেই সম্ভব নয় একজন ...অ-বাঙালী পরিচালকের পক্ষে শহর-...কলকাতা থেকে অন্যূন তেরশো মাইল ...দূরবর্তী বোম্বাই শহরে বাস করে।

স্থান-কাল-পাত্রঘটিত এই দুস্তর ...অসুবিধা সত্ত্বেও এন, সি, সিপ্পি নিবেদিত ...উত্তম চিত্র-এর রঙীন ছবি 'মেরে আপনে' ...যে তার বক্তব্যকে প্রায়-বাস্তবভাবে তুলে ...ধরতে পেরেছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে ...কাহিনীর মর্মটিকে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক ...গুলজার সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করতে ...পেরেছেন এবং যাতে তিনি এর বাস্তব ...পটভূমি থেকে কোনো ক্রমেই বিচ্যুত না ...হন, তার জন্য সম্ভবত বাঙলা 'আপন জন' ...ছবিটিকে সাধ্যমত অনুসরণ করে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন। কাউকে কাউকে এমন কথাও বলতে শুনলুম যে, 'মেরে আপনে' হচ্ছে 'আপন জন'-এর কার্বন কপি।—না, তা ঠিক নয়। তা যদি হোতো, তাহলে দুই দলে শেষ মারামারির দৃশ্যে শ্যামরূপী বিনোদ খান্না ও ছেলুবেশী শত্রুঘ্ন সিংহ বোম্বাইকৃত হিন্দী ফিল্মগুলিতে বহু দৃষ্ট হিরো-ভীলেনের লড়াইয়ের ঢংয়ে

পরস্পরের সঙ্গে জাপানী 'জুডো'-প্যাটার্নের দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতো না। পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে বোমা, স্টেনগান, পাইপগান, রিভলবার নিয়ে দু'দলে লড়াই চলে, সেখানে 'জুডো'র স্থান কোথায়? আর বোমা নামক বস্তুটি নাড়াচাড়া, বহন বা ব্যবহার করতে হয় অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে; সামান্য অসতর্ক হলে বহন বা ব্যবহারকারীর মৃত্যু অনিবার্য। একশ্রেণীর সমাজবিরোধীর কাছে বোমা প্রায় ডাল-ভাতের সামিল হয়ে গেছে, এই কথা বোঝাবার জন্যেই পরিচালক তপন সিংহ 'আপন জন'-এ মাস্তানদের গান গাইতে গাইতে বোমা লোফালুফি করা দেখিয়েছেন, যদিও বাস্তবে এটা অসম্ভব। কিন্তু হিন্দী ছবিটিতে একটি শট্-এ দেখানো হয়েছে, বোমাকে পথের ওপর গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে; এটা যে কতখানি বিপজ্জনক কাজ, তা জানলে এই শট গ্রহণ থেকে পরিচালক বিরত থাকতেন।

সকলেরই জানা আছে, জনৈক গ্রাম্য প্রাচীনার চোখে বর্তমানের শহুরে হৃদয়-হীন জীবনযাত্রা যে দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করে তারই চিত্রায়ণ আছে 'আপন জন' বা

গমেরে আপনে'তে। সেই প্রাচীনার নাম দেওয়া হয়েছে আলোচ্য হিন্দী ছবিতে আনন্দী। এই ভূমিকায় মীনাকুমারী বৃদ্ধার অপরূপ রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে মিষ্ট শান্ত বাচনভঙ্গী ও প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে চরিত্রটিকে মাধুর্যময় ও জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ অভিনেত্রী জীবনে এই ভূমিকাভিনয় একটি স্মরণীয় বর্তিকা। ছবিটিতে দুই দলপতির শ্যাম ও ছেনোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিনোদ খান্না ও শত্রুঘ্ন সিংহ। এঁরা দুজনেই চরিত্র দুটির বাস্তব রূপায়ণে সাধ্যমত শক্তি ব্যয়িত করেছেন। যে-দলপতির 'আপন জন' রূপে আনন্দীর শহরে আগমন, সেই অরুণ ও লতার ভূমিকায় দেবেন বর্মা ও সুমিতা সান্যাল চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। শ্যামের একদা-প্রণয়িনীবেশে যোগিতা বালী একটি শুভ্র তারুণ্যের প্রতীক। দুই নির্বাচন-প্রার্থীরূপে অসিত সেন ও মেহমুদ উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছেন; যদিও বাঙলা 'আপন জন'-এর রবি ঘোষ ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় তা অত্যন্ত নিষ্প্রভ। দুই মাস্তান দলভুক্ত রথু, বিল্লু, সরযু প্রভৃতি প্রায় সকলেই সুযোগমত নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আনন্দীর কৈশোর অবস্থার রূপদানে আমিনা করিম এবং তাঁর স্বামী নিরঞ্জনবেশী অভিনেতার অভিনয়ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। স্বয়ং গুলজার লিখিত গানগুলিতে সুরযোজনায় এবং আবহসঙ্গীত রচনায় সলিল চৌধুরী অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

এন, সি, সিপ্পি নিবেদিত উত্তম চিত্র-এর 'মেরে আপনে' কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সদ্য বিগত অশান্ত দিনগুলির একটি বাস্তব চিত্ররূপে অনস্বীকার্যভাবে সার্থক। —নান্দীকর

অনুভা ঘোষের শেষ ছবি পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবান। মহরতে অমৃতের আলোক-চিত্রশিল্পী ছবিটি তোলেন।
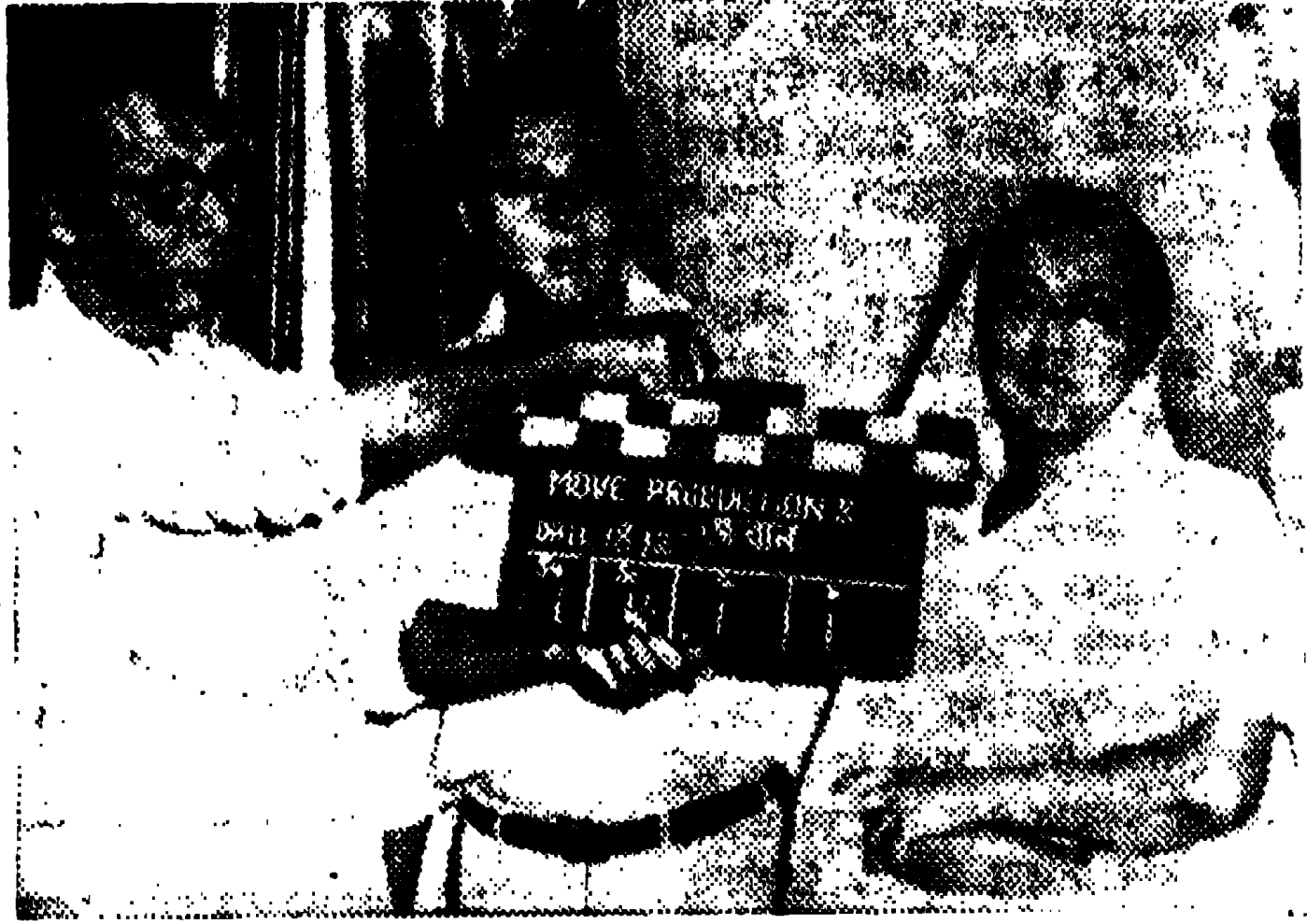
অনুভা ঘোষ (গুপ্তা)-এর অকালে পরলোকগমন

এ দুঃসংবাদের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না। শনিবার সকালে রেডিওতে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা শুনলুম, গেল রাত্রিবেলা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে জনপ্রিয়া চিত্রাভিনেত্রী অনুভা ঘোষ পরলোকগমন করেছেন। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলুম। এই সেদিন ও'দের কালীঘাটের হালদারপাড়া রোডের বাড়ীতে তাঁর সদাহাস্যময়ী মুখের মধুর বাণী দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিলুম। কৈ, শরীরের কোথাও তো অসুস্থতার চিহ্নমাত্রও লক্ষ্য করিনি! না, তাঁর মৃত্যুর একদিন আগেও কেউ তাঁকে কোনো কারণেই ক্লান্ত পর্যন্ত দেখেননি। তবু কালের অমোঘ আকর্ষণে তিনি সহসা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হলেন এবং কাউকে প্রস্তুত হতে না দিয়েই পরলোকে প্রস্থান করলেন।

শ্রীমতী মৃদুলা গুপ্তাকে—আগে এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন—আমি প্রথম দেখি ১৯৪৩ সালে নাট্যনিকেতন মঞ্চে (বর্তমানে বিশ্বরূপা) সাহিত্য বাসর কর্তৃক অভিনীত 'চিরকুমার সভা'য় নীরবালা বেশে। অক্ষয়ের ভূমিকায় ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের দ্বিজেন সান্যাল। এই ভূমিকার অভিনয় দেখেই আমি তাঁর মধ্যে অভিনেত্রী রূপে সার্থক হবার সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলুম। তাঁকে তখনই চলচি[ত্রে] যোগদানের আহ্বানও জানানো হয়েছি[ল,] কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি মনস্থির ক[রে] উঠতে পারেননি। পরে ১৯৪৬ সালে তি[নি] বাঙলা চলচ্চিত্রে যোগ দেন। তাঁর প্রতি[ভার] সম্যক স্ফুরণ দেখা যায় দেবকীকুমার [বসু] পরিচালিত 'কবি' ও 'রত্নদীপ' চি[ত্রে।] 'কবি'র ঠাকুরঝি চরিত্র তাঁর [এক] অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সে-যুগের ফু[টবল] খেলার মাঠে তাঁর উদ্দেশ্যে 'ঠাকুরঝি' [ধ্বনি] এখনও আমাদের কানে ভাসছে। এর অ[ব্যবহিত পরে] অমর মল্লিক পরিচালিত 'স্বামীজী' ছবি[তে] এক নর্তকীর ভূমিকায় তিনি দর্শকে[র মনে] সুগভীর রেখাপাত করেন। মৃত্যুর অ[ব্যবহিত পূর্ব] পর্যন্ত তিনি প্রায় একশো ছবিতে বি[ভিন্ন] রসের ভূমিকায় কাজ করেছেন। তা[র] মধ্যে স্মরণীয় হচ্ছে : অঙ্কুশ, ব[...] রত্নদীপ, শ্রীশ্রীমা, শেষ পর্যন্ত, হাঁসু[লী] বাঁকের উপকথা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, দিবারা[ত্রির] কাব্য প্রভৃতি। এই সেদিনও আমরা তাঁ[কে] 'ছদ্মবেশী' ছবিতে দেখেছি। তিনি মহি[লা] শিল্পীমহলের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলে[ন।] অভিনেত্রী সংঘের সঙ্গেও তিনি [যুক্ত] ছিলেন। বিশিষ্ট নাট্য সম্প্রদায় 'চলা[চল'-] এর তিনি ছিলেন সম্পাদিকা এবং [এই] সম্প্রদায় নিবেদিত 'ঠগ', 'স্বপ্ন নয়', '[...] ও ব্যতিক্রম' প্রভৃতি নাটকে তিনি অংশ[গ্রহণ] করেছিলেন।

মঞ্চাভিনয়

সন্দীপনমের 'বিষাইছে বায়ু' :
'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো; তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো'—কল্যাণকামী মানুষের শত্রু ও প্রবঞ্চকদের বিরুদ্ধে ন্যায়াধীশ বিধাতার কাছে মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের যে উদ্বেল অভিযোগ, তাই বোধহয় 'সন্দীপনম' প্রযোজিত 'বিষাইছে বায়ু' নাটকের সৃষ্টির মর্মমূলে রয়েছে। আজকের জটিল প্রশ্নমথিত সমাজে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অন্ধকার মানুষের কোমল ও চিরন্তন অনুভূতির আকাশকে আচ্ছন্ন করতে চলেছে, তার মধ্যে থেকে কিভাবে প্রাপ্তির সুখ, আর না-পাওয়ার যন্ত্রণার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি আলোকিত সকালের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, তার একটি শুভ ইঙ্গিত অমিয় মুখোপাধ্যায় রচিত এই নাটকের সংলাপে আর সংঘাতে ভাষা পেয়েছে।

নাটকটির কাহিনী এগিয়েছে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যে গুমরে কেঁদে ওঠা এক যন্ত্রণাকে ঘিরে। পরিবারের কর্তা একজন আদর্শবান বৃদ্ধ শিক্ষক, তার সংসারে রয়েছে বড় ছেলে বিমল, ছোট ছেলে বীরু, আর বিবাহযোগ্যা মেয়ে কুন্তী। কুন্তীর বিয়ের ব্যবস্থা নিয়েই আসল জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সংসারে; অনেকে দেখে যাচ্ছে কুন্তীকে, কারো হয়তো পছন্দ হচ্ছে না, কারো হয়তো দেনা-পাওনা নিয়ে প্রশ্ন জাগছে। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত একটি মর্মবেদনার প্রহরে [এসে] পৌঁছলো। পরিবারের অত্যন্ত আপনজন বিমানের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জিতুর ক[াছ থেকে] শেষপর্যন্ত প্রস্তাব এলো 'কুন্তী'কে [বধূ]রূপে বরণ করে নিয়ে এই মানসিক তমিস্রা দূর করতে। জিতুর কাছে প্রস্তা[ব] প্রথমে বিস্ময়ের হোলেও, গভীরতার [প্রেক্ষিতে] লক্ষিতে তাকে প্রাণময়তায় সে স্বীকার [করে] নিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করল না। এ[...]

দার্জিলিং-এ সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার স্যুটিং-এ অনুভা ঘোষ-এর এই ছবিটি তোলেন অমৃতের আলোকচিত্রশিল্পী।

কের অন্ধকার অপসারিত হোলেও, চমকা আর একটি দিগন্তে ঝড় নামলো। বীরু হোল একটি দলের শিকার। বীরুর প্রত্যাশিত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হত্যাকারীর বন্ধু 'প্রণবের' হোল অনুতাপ। মর্মে মর্মে দগ্ধ হয়ে সে অনুভব করলো বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের পথ এ নয়। জিতুই দেখালো সবকিছু ঝড়ঝঞ্ঝাকে সামনে রেখে, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অটুট রেখেই এগোতে হবে সামনের দিকে।

কাহিনীর মধ্যে আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র নিজেকে জড়িয়েছে খুব সঙ্গত কারণেই, সে হোল এক উন্মাদপ্রায় অধ্যাপক, 'হিংস্র' রাজনীতির রক্তপাত যার স্বাভাবিক সত্তাকে লুপ্ত করেছে। কাহিনীর অগ্রগতির মাঝে মাঝে বাইরে থেকে নানা সুরের, নানা অর্থের কবিতা আবৃত্তি শোনা গেছে যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার বেদনার কথা। তবে একটা কথা, অধ্যাপককে মঞ্চের আলোয় না আনলেও চলতো। নাটকের মধ্যে 'জিতু' ও 'কুন্তী'র খানিকটা হৃদয়দুর্বলতার অধ্যায় আনলে হয়তো ভালো হোত।

নাট্যকার নিজেই নিয়েছেন নির্দেশনার দায়িত্ব। তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সঙ্গে মিশেছে শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা, আর তাতেই সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে সামগ্রিক প্রযোজনাটি। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর নাম প্রথমেই মনে আসে তিনি হোলেন 'জিতু'রূপী অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। চরিত্রটির সঙ্গে তিনি যেন মিশে যেতে পেরেছিলেন, আর এতো সাবলীল চরিত্রচিত্রণ মঞ্চে খুব বেশী চোখে পড়ে না। এর পরেই নাম করতে হয় আদর্শ শিক্ষক 'ব্রজেনবাবু' চরিত্রের রূপকার জ্ঞান মুখার্জির। হৃদয়-যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্ত তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চের আলোয় মূর্ত করে তুলেছেন। সমীর রায়ের 'বীরু'ও হয়েছে স্বচ্ছন্দ; আর 'কুন্তী'র চরিত্রটি ইন্দিরা দে-র মর্মস্পর্শী অভিনয়ে সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু হতাশ করেছেন অশোক চ্যাটার্জি ; তাঁর বিমল চরিত্রের রূপায়ণ প্রায় সব সময়েই জড়তা আর শৈথিল্যে ভরে থেকেছে। অধ্যাপক সত্যেনের কণ্ঠে আবৃত্তিগুলো আরো উদাত্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সুশান্ত ভট্টাচার্য তারক বিশ্বাস, উমাশঙ্কর বোস, সুললিত গোস্বামী।

সংগঠনীর 'লালবাঈ' : বারাসতের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সংগঠনী'র শিল্পীরা গতবারে 'একটি পয়সা'র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবারে যে নাটকটির মহড়া চালাচ্ছেন তার নাম হোল 'লালবাঈ'। প্রচন্ড ঘাতপ্রতিঘাতসমৃদ্ধ এই নাটকটির নির্দেশনায় রয়েছেন শ্রীবরুণশঙ্কর চ্যাটার্জি। সঙ্গীতপরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালের ওপর। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নিচ্ছেন বরুণশঙ্কর চ্যাটার্জি, শিশির চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ দে, কিরণ চ্যাটার্জি, রামপদ মুখোপাধ্যায়, সমরজিৎ দে, আশা দত্ত, অঞ্জলি ভট্টাচার্য।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার : অমৃত-বাজার-যুগান্তর-অমৃত কর্মচারী সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' নাটকটি পরিবেশিত হবে বিশ্বরূপার মঞ্চে। শ্রীপ্রমথ বিশীর কাহিনী অবলম্বনে নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীজয়দেব বসু। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীসুধীর মুস্তাফি। আলোক সম্পাত ও আবহসংগীত ও মঞ্চ-পরিকল্পনায় রয়েছেন শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেবেন ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন ঘোষ, আশীষ ভট্টাচার্য, আঁধারকান্তি ঘোষ, রমেন মজুমদার, প্রকাশ ঘোষ, সুধীর মুস্তাফি, মাঃ কুণাল, অনল দাস, নৃপেন ভট্টাচার্য, দিলীপ মৌলিক, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, হিমানী গাঙ্গুলী ও চিত্রিতা মণ্ডল।

সল্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'মেঘে ঢাকা তারা' : সল্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা কিছুদিন আগে শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকটি পরিবেশন করেন। ছিন্নমূল মানুষদের দুঃখ-বেদনায় ভাস্বর এই নাটকটির প্রযোজনা শিল্পীদের মরমী অভিনয়ে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই নাটকটির প্রায় প্রতিটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীই তাঁর স্বকীয় চরিত্রের অতলে ডুবে গিয়েছিলেন। তবুও এ'র মধ্যে শ্যামল রায়চৌধুরী, বীথি গাঙ্গুলী (নীতা), শ্রীমতী পাইন (কাদম্বিনী), যতীন রায় (শংকর), ভূপেন বিশ্বাস (মধু), শিবকুমার মুখার্জি (সনৎ) ও সঞ্জিতা মুখার্জি (গীতা)র প্রয়াস বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

'এক পেয়ালা কফি' : এ্যালায়েন্স এ্যাসুউরেন্স গ্রুপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের শিল্পীসভ্যরা সম্প্রতি সরলা মেমোরিয়াল হলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক 'এক পেয়ালা কফি' মঞ্চস্থ করলেন। বিমল ব্যানার্জি ও হেমন্ত ব্যানার্জি নির্দেশিত এই নাটকটির পরিবেশনায় অনেক শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যই চোখে পড়েছে। অভিনয়ে যাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে মুন্সিয়ানা দেখাতে পেরেছেন তাঁরা হোলেন বিমল ব্যানার্জি (অরুণ গুপ্ত), সন্তোষ দাস (ব্রজেন রায়), হেমন্ত ব্যানার্জি (বীরু বোস), শাশ্বতী রায় (পারুলবালা)।

রেনেসাঁসের 'জীবন ও নাটক' : উত্তর কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী রেনেসাঁসের শিল্পীরা সম্প্রতি অজিত মজুমদারের 'জীবন ও নাটক' নামে একটি পরীক্ষামূলক নাটক পরিবেশন করে নাট্যচর্চায় তাঁদের আন্তর নিষ্ঠাকেই প্রমাণ করেছেন। শ্রীপ্রতুল দাস নির্দেশিত

নান্দীকার প্রযোজিত নতুন নাটক **বীতংস**-এর একটি দৃশ্যে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিমল মুখোপাধ্যায়। নাটকটির নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই নাটকটির প্রযোজনা মোটামুটিভাবে সপ্রতিভই হয়ে উঠেছিল। যাঁদের সাবলীল অভিনয় দর্শকমনে রেখাপাত করে তাঁদের মধ্যে অমিয় গোস্বামী, তুষার গোস্বামী, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, জহর চৌধুরী, শংকর দত্ত, মৃণাল গোস্বামী ও দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওয়াই এম সি এ'র 'সোনার হরিণ' : ওয়াই এম সি-এ কলেজ শাখার সভ্যরা কয়েকদিন আগে শচীন ভট্টাচার্যের 'সোনার হরিণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। প্রথমেই বলি নাটকটির প্রযোজনা হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল, আর এই দুর্বলতা আর শৈথিল্যের মূলে রয়েছে শিল্পীদের অগভীর অভিনয়। তাই নির্দেশক দিলীপ দত্তের সম্পূর্ণ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে নাটকটির পরিবেশনা নাট্যরসপিপাসু মনের কোন স্তরই ছুঁয়ে যেতে পারেনি। প্রধান চরিত্রে যাঁরা অংশ নেন তাঁরা কেউই কোনরকম বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত করতে পারেন নি। নায়িকা 'শ্বেতা'র ভূমিকায় মমতা চক্রবর্তীকে অসহায় মনে হয়েছে : উচ্চারণে ও ভঙ্গিমায় কোনটাতেই শ্রীমতী চক্রবর্তী নিজের উপস্থিতিকে এতটুকু সার্থকতায় ভরিয়ে দিতে পারেন নি। অন্যান্য রূপকারদের মধ্যে ছিলেন প্রশান্ত সিংহ (অভিজিৎ), প্রশান্ত গায়েন (জয়ন্ত), সব্যসাচী সেন (মধু), প্রভাত ব্যানার্জি (শেখর), রবি ব্যানার্জি (চাণক্য), দীপক (ভবানী), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (ডাঃ বসাক), এইচ মাল (গোকুল)। আবহসংগীতে ছিলেন নেপচুন শ্রীমাল ও সুব্রত পাল।

সম্প্রতি স্বর্গীয় পি সি সরকারের পুত্র প্রখ্যাত যাদুকর প্রদীপ সরকারকে বম্বেতে যাদু প্রদর্শনীর পর অভিনন্দিত করছেন চিত্রাভিনেতা অশোককুমার।

[illegible] পদাবলী সংগীত গ্রহণানুষ্ঠানে উৎপলা সেন, পরিচালক উত্তমকুমার ও সুরশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

বিবিধ সংবাদ

সিনেমা টিকিটে সারচার্জ

শরণার্থীদের প্রতি ব্যয়ে সাহায্যের জন্য ১৭ জানুয়ারী, গেল সোমবার থেকে প্রতিটি সিনেমার টিকিটের ওপর অতিরিক্ত দশ পয়সা করে সারচার্জ গৃহীত হবে।

চলচ্চিত্র সেন্সার বোর্ডের গঠনে আশু পরিবর্তন

জি ডি খোসলা অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশকে কার্যকরী করার উদ্দেশে চলচ্চিত্র সেন্সার বোর্ডকে ঢেলে সাজানো হবে বলে প্রকাশ। এই ঢেলে সাজানো কাজটি ঠিক কিভাবে হবে, তার বিশদ বিবরণের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।

জগৎ মুরারীর নতুন কার্যভার গ্রহণ

পুণা ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল জগৎ মুরারী জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি ঐ পদ ত্যাগ করে ফিল্মস ডিভিশনের কন্ট্রোল ও প্রধান প্রযোজকরূপে কর্মভার গ্রহণ করছেন।

শিশু-চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

২২ পল্লী সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে কলকাতা ভবানীপুরস্থ সুভাষ উদ্যানে (নর্দার্ন পার্ক) আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসে (২৬শে জানুয়ারী' ৭২) চতুর্থ বার্ষিক 'বসে-আঁকো' শিশু-চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতাটি ৮ থেকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনটি বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিয়মাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা—(ক) মেসার্স জি. সি. লাহা (প্রাঃ) লিঃ, ১ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩, (খ) মেসার্স স্টুডেন্টস পেপার কনসার্ন, ৪৩।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯, (গ) দি ডুপ্লিকেটার্স, ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলিকাতা-২০, (ঘ) এন সি দাঁ এন্ড কোং, ৯ ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট, কলকাতা-১, ২৩-১০৬৯, (ঙ) লাকি টী কোং, ৭৬-এ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০, ৪৭-৩১৬২।

জনতার আদালত : আজ জনতা ফিল্ম কর্পোরেশন-এর শুভেন্দু, সন্ধ্যারাণী, রত্না ঘোষাল, খুশি ব্যানার্জি, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ, সুখেন, অনিলকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, রসরাজ, নির্মল ঘোষ, অশোক মৈত্র, ও নবাগতা চৈতালী দত্ত অভিনীত 'জনতার আদালত' উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অন্যত্র মুক্তিলাভ করছে। এর পরিচালক মধুকর গোষ্ঠী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত—কালীপদ সেন ও বাপী লাহিড়ী এবং প্রযোজক—অনিলকুমার; ছবিখানির পরিবেশক—বিদ্যাবতী ফিল্মস।

চলচ্চিত্রে নেতাজী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

আজীবন সংগ্রামী সত্যদ্রষ্টা সুভাষচন্দ্রের জীবন নাটকীয়তার ঘনঘটায় পরিপূর্ণ। নাটক তাঁর ছাত্রজীবনে, নাটক তাঁর আই সি এস চাকুরী ত্যাগে, নাটক তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে, কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে ও পদত্যাগে, নাটক অন্তরীণ অবস্থায় অন্তর্ধানে—আর বিদেশের মাটিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী সংগঠন ও ভারত উদ্ধারে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে আর সবশেষে এক মহারহস্যের অন্তরালে অপসৃয়মান তাঁর উত্তরজীবন যে অনন্ত জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে তার বুঝি কোন তুলনা হয় না। যাঁর জীবন এত নাটকীয়তায় এত কৌতূহলে ভরা—যিনি ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজা সেই সুভাষচন্দ্র নাটক বা চলচ্চিত্রতে কিন্তু প্রায় অনুপস্থিত। উত্তরজীবনের রহস্যই সম্ভবত তার কারণ।

কোন পেশাদারী মঞ্চে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কোন নাটক হয়নি, সেরকম উল্লেখযোগ্য কোন অপেশাদার প্রযোজনার কথাও মনে পড়ছে না। এ ক্ষেত্রে যাত্রা কিন্তু এগিয়ে আছে। অতীতে তাঁরা সুভাষ-ভাবাদর্শের ওপর লেখা পালা আসরস্থ করেছেন। সাম্প্রতিককালেও নিউ আর্য অপেরা 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' এবং তরুণ অপেরা 'আমি সুভাষ' পালা দুটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

চলচ্চিত্রেও নেতাজী একেবারে অনুপস্থিত, একথা বললে ভুল বলা হবে। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ভারতে নেতাজী সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারাধীন বীর যোদ্ধাদের মুক্তির জন্য গঠিত কমিটির একটি শাখা (শ্রীপারিখ, বিঠলভাই জাভেরী ইত্যাদিকে নিয়ে গঠিত) বোম্বাইতে সুভাষচন্দ্রের ওপর এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন। ব্রহ্মদেশ থেকে ডঃ শিশির বসু এবং তাঁর পিতা যেসব টুকরো টুকরো চিত্র সংগ্রহ করেন সেইসব এবং অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে চিত্রটি নির্মিত হয়। নেতাজীর দেশত্যাগের কিছু পূর্ব থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ এ ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানও এতে স্থান পায়। ১৯৪৭ সালেই সারা দেশের চিত্রগৃহগুলিতে ছবিটি দেখানো হয়।

কিন্তু হঠাৎই ছবিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতের ফিল্ম ডিভিসন ছবিটির অনেক খোঁজখবর করেন কিন্তু কোথাও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। সংসদে গত ১৯৭০ সালে এই নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডাও হয়। সরকারীভাবে বলা হয় ছবিটি নিখোঁজ।

এই নিখোঁজ ছবির একটি কপি কিন্তু নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো উদ্ধার করেছেন। তাঁরা এই ছবিটি এবং অন্যান্য আরো কিছু নিয়ে ওই তথ্যচিত্রটির সম্পূর্ণ নতুন একটি কপি প্রিন্ট করেছেন। নতুন ছবির নাম দিয়েছেন "নেতাজী ইন অ্যাকসন ১৯৩৯—৪৪"। ছবিটি ১৯৭১ সালের ২৩শে জানুয়ারী থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে। রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষে ডঃ শিশির বসু গত বছর ইউরোপ সফরকালে নেতাজী সম্পর্কে আরো কিছু চিত্র সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন।

জাপানেও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়। এই ছবিটির একটি কপি ১৯৭০ সালের ১৬ই আগস্ট এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে জাপানের সুভাষচন্দ্র বসু একাডেমীর পক্ষ থেকে শ্রীমতী কে এমোরি চিত্রটি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে উপহার দেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নেতাজী সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের দাবী ক্রমেই জোরালো হতে থাকে। অনেক টালবাহানার পর ফিল্ম ডিভিসন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা প্রথমে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক চিত্রপরিচালককে নেতাজী জীবনী চিত্রটি নির্মাণের দায়িত্ব দিতে চান। কিন্তু তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলে বোম্বাই-এর জনৈক প্রথম শ্রেণীর চিত্রপরিচালককে ওই ভার দিতে চাওয়া হয়। কিন্তু তিনিও কর্মব্যস্ততার দোহাই দিয়ে প্রস্তাবটি এড়িয়ে যান। এরপর প্রায় জোর করে ফিল্ম ডিভিসন মৃণাল সেনকে ওই ভার দেন। মৃণালবাবু ছবিটির প্রাথমিক কাজেও হাত দেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ছবিটি করলেন না। এরপর আশীষ মুখার্জিকে ছবিটি নির্মাণের ভার দেওয়া হয়।

এতো গেল সরকারী উদ্যোগে তথ্যচিত্র নির্মাণের দীর্ঘ প্রচেষ্টার তালিকা। অন্যদিকে এপর্যন্ত নেতাজীকে নিয়ে কাহিনীচিত্র হয়েছে দুটি—একটি হিন্দী—একটি বাংলা।

হিন্দী ছবিটি বাংলা ছবির আগেই ভারতের বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি পায়। কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাজীর প্রতি অবাঙালীদের প্রীতি ও বাঙালীদের বিরোধিতার যে নজীর রয়েছে, তারই যেন পুনরাবৃত্তি হলো।

হিন্দী জীবনীচিত্রটির নাম 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'। আদর্শলোকের ওই ছবিটি ১৯৬৬ সালের ১৫ই এপ্রিল কলকাতাসহ সমগ্রভারতে একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করে। এ ছবিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রাবস্থা থেকে আই এন এ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের সংগ্রামকে বিধৃত করেন পরিচালক হেমেন গুপ্ত। নামভূমিকায় অভি ভট্টাচার্য যেন অনুপ্রাণিত হয়ে অভিনয় করেন। তাছাড়া সামরিক সজ্জায় তাঁকে মানিয়েছিলও চমৎকার। ছবিটির সঙ্গীতপরিচালক ছিলেন সলিল চৌধুরী।

এই বছরই ২৪শে জুন কলকাতায় মুক্তি পায় বাংলা 'সুভাষচন্দ্র'। পীযূষ বসু পরিচালিত এ কে বি পিকচার্সের ওই ছবিটিতে সুভাষচন্দ্রের বাল্যকাল থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান ও প্রথম কারাবরণের ঘটনা প্রদর্শিত হয়। এদিক থেকে হিন্দী ও বাংলা ছবি দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক বলে বলা যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই ছবিটিতে অত্যন্ত সচেতনভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বাল্যাবস্থা, কটক র‍্যাভেনশ স্কুলের ছাত্র হিসেবে কার্যকলাপ, শিক্ষক বেণীমাধব দাস, অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র সেন ও বিপ্লবী হেমন্ত সরকার, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মাধ্যমে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ও রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কারাবরণের ঘটনা তুলে ধরা হয়। এ ছবিতে সুভাষচন্দ্রের নেতাজী রূপ দেখা না গেলেও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত এতে ছিল।

অপরেশ লাহিড়ী সুরারোপিত ছবিটিতে ৭ খানি গান আছে। প্রতিটিই দেশাত্মবোধক। এগুলি সুপ্রযুক্ত না হলেও এর আবেদন অন্তরের গভীরে নাড়া দেয়। বিশেষ করে লতা মুঙ্গেশকরের 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' এখনও লোকের মুখে মুখে ঘুরছে।

চলচ্চিত্রে সুভাষচন্দ্রের এই স্বল্প উপস্থিতির নিরীখে আজ সমগ্র জাতির উচ্চকিত দাবী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আরো তথ্যনির্ভর রসসমৃদ্ধ জীবনীচিত্র চাই। বিশেষ করে বাংলায় সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের চিত্ররূপ দেখতে জাতি আজ আগ্রহে উদ্বেল। জাতির এ দাবী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে—বাংলার চলচ্চিত্র প্রযোজকদের কাছে। এ দাবী আজ আরো জোরালো ওপার বাংলার কণ্ঠস্বরে।

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব একাদশ বনাম অস্ট্রেলিয়া

চতুর্থ আন্তর্জাতিক খেলা

সিডনিতে বিশ্ব একাদশ বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট পর্যায়ের চতুর্থ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাটি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। বর্তমানে এই দুই দলের খেলার ফলাফল সমান (১—১)। উভয় দলই একটি করে খেলায় জিতেছে—অস্ট্রেলিয়া পার্থের দ্বিতীয় খেলায় এক ইনিংস ও ১১ রানে এবং বিশ্ব একাদশ দল মেলবোর্ণের তৃতীয় খেলায় ৯৬ রানে।

বিশ্ব একাদশ দলের খুবই কপাল ভাল যে, বৃষ্টির জন্যেই তারা এযাত্রা পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়ার সত্যিই দুর্ভাগ্য। ব্যক্তিগতভাবে অস্ট্রেলিয়ার গ্রেগ চ্যাপেলেরও দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ১৯৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। ফলে মাত্র ৩ রানের জন্যে তাঁর দ্বিশত রান পূর্ণ না হওয়াতে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে নগদ ১০০০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার তিনি হাতছাড়া করেন। এ যেন হাত ফোস্কে পোড়া শোলমাছের জলে ভেসে যাওয়ার মত অবস্থা।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩১২ রানের মাথায় শেষ হলে বিশ্ব একাদশ দল বাকি সামান্য সময়ের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ৬ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে বিশ্ব একাদশ দলের ১ম ইনিংস ২৭৭ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৩৫ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ২০ মিনিটের খেলায় হাতে দশটা উইকেটই জমা রেখে ১১ রান সংগ্রহ করে।

বিশ্ব একাদশ দলকে তাদের ১ম ইনিংসের খেলায় দ্বিতীয় দিনে দারুণ সংকটে পড়তে হয়েছিল। মাত্র ৬৮ রানের মাথায় তাদের ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়। দলের প্রথম পাঁচজন খেলোয়াড়—অ্যাকারম্যান, গাভাস্কার, আব্বাস, গ্রেমী পোলক এবং সোবার্স মাত্র ৫৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন। অপরদিকে শেষ দিকের পাঁচজন—গ্রেগ (৭০ রান), ইঞ্জিনীয়ার, ইন্তিখাব (নট আউট ৭৩), কুনিস এবং বেদী তুলেছিলেন ২১৪ রান। বিশ্ব একাদশ দলকে পর্যুদস্ত করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়াম ফাস্ট বোলার বব ম্যাসী। তিনি ১১০ রানে ৭টা উইকেট নিয়েছিলেন—প্রথম ৬টা উইকেট মাত্র ২৭ রানের বিনিময়ে। অস্ট্রেলিয়ার খারাপ ফিল্ডিংয়ের সুযোগেই বিশ্ব একাদশ দল শেষপর্যন্ত ১ম ইনিংসে ২৭৭ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের ৬৮ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ার পর অস্ট্রেলিয়া কম করে ৬টা সহজ 'ক্যাচ' মাটিতে ফেলেছিল। বিশ্ব একাদশের মুখরক্ষা করেন অল-রাউণ্ডার ইন্তিখাব। তিনি দলের ৯নং খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে নামেন এবং বেদীর সঙ্গে ১০ম উইকেটের জুটিতে দলের অতি মূল্যবান ৪৭ রান তুলে দিয়ে শেষপর্যন্ত নিজস্ব ৭৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৭ম উইকেটের জুটিতে টনি গ্রীগ এবং ইঞ্জিনীয়ারের ৬৬ রান এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে গ্রীগ এবং ইন্তিখাব আলমের ৮২ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪১৪ (৬ উইকেটে)। চ্যাপেল ভ্রাতৃদ্বয় সেঞ্চুরী করেন—আয়ান ১১৯ রান এবং গ্রেগ নট আউট ১০৭ রান। অনেকের ধারণা, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম শ্রেণীর খেলায় এক ইনিংসে দুই ভাইয়ের সেঞ্চুরী করার নজির এই প্রথম।

এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ব একাদশ দলের বিপক্ষে চলতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজে (১৯৭১-৭২) এই নিয়ে আয়ান চ্যাপেল তিনটি সেঞ্চুরী করলেন এবং বর্তমানে তাঁর মোট রান দাঁড়াল ৫০৫ (গড় ৭২)। অপর দিকে গ্রেগ চ্যাপেলের দ্বিতীয় সেঞ্চুরী—উপর্যুপরি খেলায়। ২য় উইকেটের জুটিতে আয়ান এবং স্ট্যাকপোল ১১৪ মিনিটে ১৫৩ রান তুলে খেলার ভিত শক্ত করেন। স্ট্যাকপোলের দুর্ভাগ্য, তিনি মাত্র ৫ রানের জন্যে শত রান পূর্ণ করতে পারেননি।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের কিছু আগে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ৫৪৬ রানের মাথায় শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৮২ রান তুলতে বিশ্ব একাদশ দল ২য় ইনিংস খেলতে নামে। তাদের হাতে ৬১০ মিনিট সময় ছিল। বিশ্ব একাদশ দলের ২য় ইনিংসের গোড়াপত্তন খুবই শক্ত হয়েছিল। প্রথম উইকেটের জুটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাকারম্যান (৮৭ রান) এবং ভারতের সুনীল গাভাস্কার ১৫৫ রান তুলেছিলেন। কিন্তু প্রথম উইকেট জুটি ভাঙার পরই দলের ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। চা-পানের পরবর্তী খেলায় মাত্র ৯ রানের বিনিময়ে বিশ্ব দলের ৫টা উইকেট পড়ে যায়—৪টে উইকেট পড়ে ৪ রানে (২৭ বলে)। বিশ্ব একাদশ দলকে এইভাবে কাবু করেন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ স্পিন বোলার কেরী ও'কিফ। তাঁর উপর্যুপরি দুই বলে আউট হন পাকিস্তানের জাহির আব্বাস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেমী পোলক। অধিনায়ক সোবার্স এই অবস্থায় খেলতে নেমে শেষপর্যন্ত তাঁকে 'হ্যাটট্রিক' করতে দেননি। খেলার এক সময় ও'কিফের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ২০ বলে মাত্র ৩ রান দিয়ে ৩টে উইকেট। চতুর্থ দিনের শেষে বিশ্ব

সুঁটে ব্যানার্জি ঃ হাতে সম্বর্ধনা সভায় প্রাপ্ত স্মারক

একাদশ দলের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৫ উইকেট পড়ে ১৭৩। হাতে জমা ৫টা উইকেট এবং ৫ম দিনের খেলা—অপরদিকে জয়লাভের জন্যে তখনও দরকার ৪০১ রানের।

পঞ্চম দিনে বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভই হয়নি। ফলে অস্ট্রেলিয়া নিশ্চিত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। এ যেন বাড়া ভাতে ছাই পড়ার মত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩১২ রান (স্ট্যাকপোল ১০৪, জন বেনো ৫৪ এবং মার্স নট আউট ৭৭ রান। বেদী ৮৪ রানে ৪ এবং ইন্তিখাব ৭৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ৫৪৬ রান (আয়ান চ্যাপেল ১১৯, গ্রেগ চ্যাপেল নট আউট ১১৭, স্ট্যাকপোল ৯৫, ও'কিফ ৫৪ রান। ইন্তিখাব ১০২ রানে ৪ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ : ২৭৭ রান (গ্রীগ ৭০, ইঞ্জিনীয়ার ৩৬, ইন্তিখাব নট আউট ৭৩ রান। ম্যাসী ১১০ রানে ৭ উইকেট)

ও ১৭৩ রান (অ্যাকারম্যান ৮৭ এবং গাভাস্কার নট আউট ৬৮ রান। ও'কিফ ৩৪ রানে ৩ উইকেট)

সন্টে ব্যানার্জির সম্বর্ধনা

উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক ওভাল ক্রিকেট কমিটির উদ্যোগে দেশবন্ধু পার্কে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন প্রবীণ ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীসন্টে ব্যানার্জিকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় বাংলার চারজন প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় (সন্টে ব্যানার্জি, পঙ্কজ রায়, এন চৌধুরী এবং মন্টু ব্যানার্জি) এবং বাংলা ক্রিকেট দলের চারজন প্রাক্তন অধিনায়ক (কার্তিক বসু, কমল ভট্টাচার্য, নির্মল চ্যাটার্জি এবং পি বি দত্ত) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅমর ঘোষ উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীসন্টে ব্যানার্জিকে একটি সুদৃশ্য স্মারক উপহার দেন।

রঞ্জি ট্রফি

ধানবাদে টিস্কো স্টেডিয়ামে আয়োজিত রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের লীগ খেলায় বাংলা প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে বিহারকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করেছে।

প্রথম দিনে বাংলা প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৮৮ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক চুনী গোস্বামী ১০৩ রান করে আউট হন এবং অশোক গান্ধোত্রা ১০৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। বাংলার ৯২ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে গেলে চুনী গোস্বামী এবং গান্ধোত্রা ৫ম উইকেটের জুটিতে ১০৫ মিনিটে ১৪৪ রান যোগ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

দ্বিতীয় দিনে বাংলা দলের ১ম ইনিংস ৩১৪ রানের মাথায় শেষ হলে বিহার ১ম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

শেষ তৃতীয় দিনে বিহার দলের ১ম ইনিংস ২৬৩ রানের মাথায় শেষ হলে বাংলা ১ম ইনিংসের খেলায় ৫১ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৬ উইকেটের বিনিময়ে ৭৫ রান তুলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই অবস্থায় বাকি পাঁচ মিনিট খেলার সময়ে বিহার ১ উইকেটে ১৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

পূর্বাঞ্চলের লীগ পর্যায়ের খেলায় বাংলা প্রথম স্থান লাভ করার সূত্রে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার মূল পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা : ৩১৪ রান (চুনী গোস্বামী ১০৩ এবং গান্ধোত্রা ১০৭ রান। সন্দীপ রায় ৫৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ৭৫ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

বিহার : ২৬৩ রান (দলজিৎ সিং ৯৪ এবং রবিন মুখার্জি ৫৯ রান। সুব্রত গুহ ৫৪ রানে ৪ এবং দোসী ৭০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯ রান (১ উইকেট)

কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৭২ সালের অস্ট্রেলিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে মোট চারবার অস্ট্রেলিয়ান সিংগলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

পরলোকে রবীন্দ্র মিত্র

প্রবীণ হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীরবীন্দ্রলাল মিত্র ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

সুদক্ষ হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীমিত্র এক সময় মোহনবাগান দলের পক্ষে ক্রিকেট খেলায় অধিনায়কত্ব করেছিলেন। শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

Clinic
SHAMPOO
Contains 0.15% 3.4.4 Trichlorocarbanilide
Clears dandruff from hair and scalp

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৩৯ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 4th February, 1972 শুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৩৭৮ .52 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীঅর্ধেন্দু রায়

'এক নজরে'

নর ও বানর : প্রাণীতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রাণীজগতে মানুষের নিকটতম আত্মীয় বানরের সহজাত বুদ্ধির সীমা সম্পর্কে আমাদের ধারণা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। তবু লিখন, পঠন, বাচন প্রভৃতি ক্ষমতায় ও স্মৃতির সঙ্গে চেতনার সংযোগ, দৃষ্টির সঙ্গে শ্রবণের সংযোগ, বুদ্ধির সঙ্গে স্পর্শের সংযোগ প্রভৃতি পারদর্শিতায় মানুষ অনন্য—এ বিষয়ে এতদিন বিশেষ কোন দ্বিমত ছিল না। অর্থাৎ একটি লোককে আমরা যেমন দেখে চিনতে পারি তেমনই তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারি যে সে এসেছে। আবার পকেটে হাত দিয়ে শুধু স্পর্শের দ্বারা অনুভব করতে পারি কোনটি কত পয়সার মুদ্রা। আর এইভাবে মানুষ অবাধে ও মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টির সঙ্গে শ্রবণের বা বুদ্ধির সঙ্গে স্পর্শের সংযোগ করতে পারে বলেই সে লিখন পঠন বা বাচনক্ষম।

কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকার কয়েকজন প্রাণী-তত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক কয়েকটি শিম্পাঞ্জি ও ওরাং-উটানের উপর দীর্ঘ দিন দৃষ্টি রেখে ও অদের নানাভাবে পরীক্ষা করে এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অন্তত ঐ দুই শ্রেণীর বানরের স্মরণশক্তি আছে এবং তারা চেনা বোঝা ও ছোটখাট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে। আর বানরের ঐ ক্ষমতা-গুলিকে যদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাড়িয়ে তোলা যায় তবে তারা হয়ত একদিন লিখন-পঠনেও সক্ষম হবে। প্রথমত, দেখা গেছে যে কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই শিম্পাঞ্জি আয়নায় নিজেকে চিনতে পারে, যেটা আর কোন পশুর পক্ষেই সম্ভব হয় নি এতদিন। শিম্পাঞ্জির খাঁচায় আয়না রেখে দেখা গেছে যে, কিছু দিন বাদেই আয়নার সামনে বসে সে চিরুনি দিয়ে গায়ের লোম আঁচড়ায়, গা চুলকায়, এমন কি দাঁত খোঁটে।

সম্প্রতি লণ্ডনের বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ ষ্টিল রাসেল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ ডাভেনপোর্ট ও ডঃ রজার্স শিম্পাঞ্জিদের যে কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছেন তা তাঁদের দাবীমতো বানরের বুদ্ধির রহস্য উদ্ঘাটনে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তাঁরা পনেরোটি শিম্পাঞ্জি নিয়ে ঐ সব পরীক্ষা শুরু করেন, যার মধ্যে এগারোটি ৬০ থেকে ৯০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। তাদের প্রথম পরীক্ষায় জানালার বাইরে গাছে ঝুলন্ত একটি বস্তু দেখান হয়, তারপর ঘরের মধ্যে রাখা দুটি জিনিসের দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরান হয় যার মধ্যে একটি ঠিক ঐ গাছে ঝোলান বস্তুর মতো এবং আর একটি অনেকটা ঐ রকম হলেও কিছুটা ভিন্ন। শিম্পাঞ্জিরা কিন্তু ভুল করে না, তারা ঐ গাছে ঝোলানো বস্তুর অনুরূপ জিনিসটিই প্রশিক্ষকদের হাতে তুলে দেয় আর এইভাবে প্রমাণ করে যে স্মৃতি ও দৃষ্টির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের স্বাভাবিক শক্তি তাদের আছে। তারপর তাদের কয়েকজন আবার ঐ বস্তুটির ফটো চিনেও প্রশিক্ষকদের অবাক করে দেয়। মার্কিন প্রশিক্ষকরা বলেছেন, ফটো চেনার ব্যাপারে শিম্পাঞ্জি কটি কিছু কিছু সভ্যতার সংস্পর্শবর্জিত আদিম মানুষকেও হারিয়ে দিয়েছে। ডঃ রাসেল অবশ্য অতটা উৎসাহিত মন্তব্য করেন নি, কিন্তু বলেছেন যে স্মৃতি থেকে ছবি চেনা আর অক্ষর চেনার মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। সুতরাং বানর যদি একদিন নরের মতোই গম্ভীর হয়ে বসে 'অচল অক্ষর' পাঠ নেয় তবে সেটা সেদিনের মানুষের কাছে খুব বেশী বিস্ময়কর বলে মনে হবে না। আজ পশ্চিমী দুনিয়ায় কাজের মানুষ হল সবচেয়ে দুর্মূল্য, সে অভাব হয়ত একদিন বানর দিয়ে বহু পরিমাণে পূরণ করা সম্ভব হবে।

বই চুরি : লাইব্রেরী থেকে দুষ্প্রাপ্য বই চুরি করা বা পাতা কেটে নেওয়াটা এতদিন আমরা এদেশীয় অসভ্যতা বলেই জানতাম। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, বৃটেনে ঐ সমস্যাটি এত মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে যে তার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পর্যন্ত স্মরণ নিতে হয়েছে। বৃটেনে সমস্যাটি অত বড় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ সেদেশের অর্থশালী ব্যক্তিদের প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহের বাই। শেকসপীয়রের কোন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বা মিলটনের কোন রচনার পাণ্ডুলিপি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেনার লোকের অভাব নেই ইংলণ্ড বা আমেরিকায়, আর তারই জন্য সেদেশের বই চোররা এত তৎপর।

সম্প্রতি লণ্ডনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় লাইব্রেরীগুলির কর্মাধ্যক্ষরা এক বৈঠকে বসে এই জাতীয় সমস্যাটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারাও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্থির হয় যে, গ্রন্থাগারগুলির সব বইতে অদৃশ্য রাসায়নিকের সাহায্যে একটি কোড নম্বর লেখা থাকবে, এবং কোন দোকানে বা কারও সংগ্রহ-শালায় যদি ঐ কোড নম্বর লেখা বইর সন্ধান মেলে তবে তা কোন খেসারত না দিয়েই বাজেয়াপ্ত করা হবে। অবশ্য প্রতি-কারের চেয়ে প্রতিশোধকের উপরেই তাঁরা বেশী জোর দিয়েছেন। স্থির হয়েছে, প্রতিটি বড় গ্রন্থাগারে অতি সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা হবে।

সুইডেনে প্রস্তাব : কিছুদিন আগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্যতম দেশ ডেনমার্কের পার্লামেন্টে এক অত্যুগ্র বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে ভাই-বোনে বিবাহ থেকে শুরু করে দুই পুরুষে সহবাস, দুই নারীতে সহবাস প্রভৃতি নরনারীর সব রকমের সম্ভাব্য যৌন সম্পর্ক আইনসম্মত করার দাবীতে প্রস্তাব এসেছিল। ডেনমার্কের সরকার পক্ষীয় দল অবশ্য বিপুল ভোটে সে দাবী নাচক করে দেয়। সম্প্রতি সুইডেনের পার্লামেন্ট সদস্য শ্রীস্টেন সজোহম দাবী তুলেছেন, সুইডেনে পুরুষ, নারী উভয়ের জন্যই সরকারী উদ্যোগে পতিতালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীসজোহমের বয়স চুয়াম বছর এবং তিনি তিন সন্তানের পিতা। সুইডেনে যেভাবে দ্রুতগতিতে পোজিং স্টুডিও, ম্যাসাজ হোম, পর্ণোগ্রাফির দোকান ও পতিতালয় বেড়ে যাচ্ছে তা দেখেই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন, অন্যথায় নারীদের জন্যও স্বতন্ত্র পতিতালয় (পতিত+আলয়) স্থাপনের বেপরোয়া প্রস্তাব তিনি করতেন না। তাঁর প্রস্তাব শুনে অবশ্য সাংবাদিকরা কৌতুক করে বলেন, ওগুলো যদি সরকারের হাতে চলে যায় তবে ত তার পুরুষ ও নারী বাসিন্দাদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দিতে হবে এবং তাদের প্রমোশন পেনশন ছুটি ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রস্তাবক অবশ্য সেকথা শুনেও দমেন নি। বলেছেন, যদি দরকার হয় ত তাও করতে হবে, কিন্তু সমাজের বুকে প্রকাশ্যে এই বেলেল্লাপনা আর সহজভাবে মেনে নেওয়া যায় না। অন্তত এ ব্যাপারে সরকারের যে কিছু করণীয় আছে সেটাও সরকার স্বীকার করুক। আধুনিক সভ্যতার বল্গাহারা উদ্দামতা মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা ভাববার অবকাশও আজ মানুষের নেই।

২৭।১।৭২ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

উপমহাদেশে নবযুগের সূচনা

আমাদের এই উপমহাদেশে আজ নবযুগের সূচনা হতে চলেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং সেই সংগ্রামে ভারতের জয়ই তার কারণ। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে তার শক্তি ও সম্পদকেই শুধু খণ্ডিত করা হয় নি, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ ও সংঘর্ষ চিরন্তন করে রাখার চক্রান্তও ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। পঁচিশ বছর ভারত এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে নিরলস উদ্যমে। সেই সংগ্রাম আজ আংশিকভাবে সফল। পাকিস্তানের মতিগতি পরিবর্তন করতে না পারলেও, তার রাহুগ্রাস থেকে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই জয় আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত আদর্শেরই জয়। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মানুষের স্বাধিকার স্বীকৃতির জয়।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গত সপ্তাহে সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই সংঘাত ছিল আসলে দুই ভাবধারার সংঘাত। পাকিস্তানের শাসকরা যে অন্ধতা নিয়ে রাজ্যশাসন ও মানুষের অধিকার দলন করছিলেন তার সঙ্গে বেধেছিল সংঘর্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের। আমাদের পূর্ব প্রান্তের প্রতিবেশী বাংলাদেশ সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই অত্যাচারী, মানবতাবিরোধী অপশাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। এখন আমাদের দুই দেশের মানুষের সর্বাত্মক প্রয়াসে মানবিক সম্প্রীতি, গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় করার সুযোগ উপস্থিত। এই কাজে আমরা পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণেরও সহযোগিতা চাই। কারণ, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই তিন দেশ নিয়ে গঠিত আমাদের উপমহাদেশে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির সূচনা হতে পারে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই। এই সত্য যদি পাকিস্তানের নেতারা বিস্মৃত হন তাহলে আরও দুঃখ ও দুর্দশাই তাঁরা ডেকে আনবেন নিজেদের জন্য।

ভারতবর্ষের এই নৈতিক জয়ে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষুব্ধ এবং হতাশ। তারা বার বার একথা বলতে চাইছে যে, দরিদ্র ভারত কিছুতেই নিজের ঘর সামলাতে পারবে না। দারিদ্র্যের চাপেই তার এই সামরিক জয় ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ভারতের শত্রুরা কোনোদিন আমাদের গণতান্ত্রিক ও জোটনিরপেক্ষ নীতি বরদাস্ত করতে পারে নি। এই কারণেই পাকিস্তানকে সামরিক জোটে ভিড়িয়ে, তাকে বিনামূল্যে ঢালাও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারতের দু দিকে একটা সামরিক বেষ্টনী তৈরী করে রেখেছিল। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি। ভারতবর্ষ দারিদ্র্য জয় না করতে পারলেও, তার গণতান্ত্রিক, জোটনিরপেক্ষতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ধনাঢ্য সামরিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। ভারতবর্ষের এই সংযম ও আত্মবিশ্বাস গোটা এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ ম্যাকনামারা সম্প্রতি ভারত পরিদর্শনে এসে ভারতের অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, গত কয়েক বৎসরে ভারত বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে। পৃথিবীর সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ভারত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই উন্নয়নে ভারত নিজস্ব শক্তি ও উৎপন্ন সম্পদ সার্থকভাবে নিয়োগ করতে পেরেছে। বৈষয়িক অগ্রগতির প্রার্থিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারি নি বটে, কিন্তু সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আদর্শে ভারতের নিষ্ঠা অবিচল। এই সত্য বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তাব্যক্তিদের নজর এড়ায় নি।

ভারত-বিরোধীদের হতাশার কারণ এই যে, এত বড় একটি দেশ যার দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা এত ব্যাপক তার পক্ষে গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে এবং কোনো ধনাঢ্য দেশের কাছে আত্মবিক্রয় না করে কিভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শে বৈষয়িক উন্নতির পথে এগুনো সম্ভব। সামরিক দিক দিয়ে বৃহৎ শক্তিরূপে গণ্য হবার কোনো আকাঙ্ক্ষা ভারতের নেই। কিন্তু ভারতকে আজ উপেক্ষা করারও কোনো উপায় নেই কোনো বৃহৎ শক্তির। এশিয়ায় ভারতের অবস্থান এবং উপস্থিতি স্বীকার করে নিয়েই আন্তর্জাতিক ধুরন্ধরদের এখন অবস্থার মূল্যায়ণ করতে হবে। এতদিন ভারত সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রচার ছিল যে, ভারত দরিদ্র ভিখিরির দেশ। তাকে সব সময়েই বিত্তশালী দেশগুলোকে দানখয়রাতি করে যেতে হবে। বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে ভারত বিব্রত ঠিকই। তার দারিদ্র্যও সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু ভারত নিজের চেষ্টায় আজ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে চলেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরনির্ভরশীলতা বর্জনের প্রয়াস চলছে। স্বার্থান্ধ ভারতবিরোধীরা এতকাল এই উপমহাদেশে বিরোধ ও সংঘর্ষ জিইয়ে রেখে সামরিক খাতে প্রভূত ব্যয়-বরাদ্দ করতে বাধ্য করত আমাদের। পাকিস্তানের বিপর্যয় ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয় সেই ব্যয় হ্রাসে সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করি। শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করার আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যদি ব্যর্থ করা যায় তাহলে ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতায় এই উপমহাদেশে এক নবযুগের সূচনা অবধারিত।

পটভূমি

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'সি পি এম কতো দিন পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?' জবাবে প্রমোদবাবু বলেছিলেন, 'যতোদিন নির্বাচন হবে।' অর্থাৎ সি পি এম পার্লামেণ্টারী পথে থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করবে প্রধানত 'শাসকগোষ্ঠীর' ওপর, কারণ নির্বাচন হবে কি হবে না তা স্থির করার দায়িত্ব শাসকগোষ্ঠীর। সি পি এম নেতারা প্রায়ই বলে থাকেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আঘাত প্রথমে আসে শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকেই। নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হবে সেই রকমই একটা আঘাত। নির্বাচন যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে অবশ্য পার্টির পক্ষে বিকল্প পথ গ্রহণ অনেক সহজ হয়। কিন্তু যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, অথচ পার্টির বিচারে যদি মনে হয় সেই নির্বাচন অবাধ হবে না, তখন পার্টির কর্তব্য কি হবে? নির্বাচন বয়কট? পশ্চিম বাংলায় মার্চেই নির্বাচন হতে পারে, এই কথা যখন শোনা গেল তখন এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে, সি পি এম হয়ত এই নির্বাচন বয়কট করবে। তার কারণ, এবার নির্বাচন 'অবাধ' হবে না বলে সি পি এম মনে করে। সেই ধারণাকে সি পি এম নেতারা যে শেষপর্যন্ত প্রশ্রয় দেন নি এবং নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন তার কারণ, নির্বাচন বয়কট করলে তার যে বিকল্প পার্টির কাডারদের সামনে তুলে ধরতে হয় তার জন্যে পার্টির নেতৃত্ব এখনও প্রস্তুত নয়।

দেশের বর্তমান অবস্থায় পার্লামেন্টারী পথই শ্রেষ্ঠ পথ কিনা, এ-নিয়ে সি পি এমের মধ্যে যে মতপার্থক্য আছে, সেটা কিছু গোপন কথা নয়। কিন্তু পার্লামেন্টারী পথের সমর্থকেরাই যে এখনও পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন এবং ইদানীং যে তাঁদের হাত কিছুটা শক্ত হয়েছে তার মূলে আছে লোকসভার বিগত নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্য। যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মারফৎ 'শাসকগোষ্ঠী' (অর্থাৎ কংগ্রেস) এখনও ক্ষমতা দখল করতে পারছে, তাই সি পি এমের ধারণা তারা এখনও গণতন্ত্রের 'মুখোসটা' বজায় রাখবে, অর্থাৎ সরাসরি ফ্যাসিবাদ প্রবর্তন করবে না। যতো দিন সেই 'মুখোস' বজায় থাকে ততোদিন সি পি এমেরও পার্লামেন্টারী পথ ত্যাগের কোনো প্রয়োজন হবে না।—যুক্তিটা হচ্ছে এই ধরনের।

কিন্তু মেদিনীপুরে সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ শাখার দ্বাদশ সম্মেলনের পর রাজনৈতিক মহলে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সেই প্রশ্ন হল—সি পি এম কি এখন একটি পথ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে পার্টি নতুন পথে মোড় নিতে পারে? এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ঐ সম্মেলনে গৃহীত 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির কাজ' সংক্রান্ত প্রস্তাবের কয়েকটি অংশ প্রসঙ্গে।

এবারের রাজ্য সম্মেলনে সব সি পি এম নেতাই এক সুর গেয়েছেন—কংগ্রেসের আধা-ফ্যাসিস্ত শাসনের ফলে গণতন্ত্র বিপন্ন। সি পি এম নিজেকে এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও নেতা বলে মনে করে। সেই সি পি এমকে দুর্বল করা যাচ্ছে না বলেই এখন কংগ্রেস সন্ত্রাসের পথ নিয়েছে—পার্টির এই প্রচারধারা অন্য সব বক্তব্যকে ছাপিয়ে উঠেছে মেদিনীপুরে। 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির কাজ' সংক্রান্ত প্রস্তাবের এক জায়গায় বলা হয়েছে : 'প্রচলিত আইন-কানুনের কোনো বালাই নেই। বেপরোয়া মামলা সাজানো, গ্রেপ্তার, মারপিট ছাড়াও ব্যাপক লুটপাঠ, গৃহদাহ ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিদের হত্যা নির্বিচারে চলেছে। ইতিমধ্যে ৫৬৮ জন নেতা ও কর্মীকে খুন করা হয়েছে। এলাকার পর এলাকায় গণতান্ত্রিক শক্তিকে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে। হাজার হাজার কর্মী, এমন কি স্থানীয় এম এল এদের পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ এলাকায় ঢোকা অসম্ভব করে তোলা হচ্ছে।'

এই অবস্থায় সি পি এম কি করবে? কি যে করবে তা এখনও পাকাপাকিভাবে ঠিক হয় নি। 'আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের জন্যে' যে-সব এলাকায় গণসংগঠনের কাজ প্রকাশ্যভাবে চালানো দুষ্কর হচ্ছে সেখানে কিভাবে সংগঠন চালানো যায় সে-সম্বন্ধে সাব-কমিটিতে আলোচনার জন্যে আপাততঃ পার্টি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বিকল্প পথ সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পার্টির নেতারা দিয়েছেন, পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবেও কিছু আভাস রয়েছে। রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনের সময়েই শ্রী পি সুন্দারাইয়া বলেছিলেন, যে-সব এলাকায় প্রকাশ্যে কাজ করা যাচ্ছে না সেখানে পার্টি গোপনে কাজ করার জন্যে তৈরী হয়েছে। কয়েক জায়গায় 'নতুন পদ্ধতিতে' কাজ শুরুও হয়ে গেছে।

'বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির কাজ' সংক্রান্ত প্রস্তাবেও সংগঠনের পদ্ধতি ও কাজের ধারাকে নতুন অবস্থার উপযোগী করে তোলার কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, 'নতুন অবস্থার কথা মনে রেখে বৈপ্লবিক সংগঠনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি অনুযায়ী সংগঠনকে মজবুত করতে হবে।...বলশেভিক দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের আদর্শে সমগ্র পার্টিকে আরো উদ্বুদ্ধ হতে হবে।' সি পি এম যে বরাবর আইনী পার্টি থাকবেই, এমন কথা পার্টির নেতারাও ধরে নেন নি। 'বুর্জোয়া' নির্বাচনের মোহ সম্পর্কে পার্টির কর্মীদের ইতিপূর্বে সতর্ক করে দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু পার্টিকে 'গোপনে' কাজ করতে হবে, তার কাজের বর্তমান পদ্ধতি বদলাতে হবে, এমন কথা এর আগে কখনও প্রকাশ্যে বলা হয় নি। কিন্তু পার্টি যখন এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, শাসকগোষ্ঠী আধা-ফ্যাসিস্ত পথ গ্রহণ করেছে তখন গোপনে কাজ করার সিদ্ধান্তকে অনেকে অপ্রত্যাশিত বলে মনে করছেন না।

তাছাড়া গোপনে কাজ করা সি পি এম কর্মীদের পক্ষে যে অভাবিতপূর্ব ব্যাপার তাও নয়। মেদিনীপুর সম্মেলনে ক্রেডেনসিয়ালস কমিটির রিপোর্টেই বিভিন্ন আত্মগোপনকারী কর্মীর কাজের কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একজন কর্মী এগার বছর আত্মগোপন করে কাজ করেছেন, তেরজন পাঁচ থেকে দশ বছর, ১০৩ জন এক থেকে পাঁচ বছর এবং ১৯৩ জন প্রায় বছর খানেক।

কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন—পার্টির কাজের পদ্ধতি যদি বদলায় তবে সেই নতুন পদ্ধতি কি পার্টির বর্তমান চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করবে না? অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে অনেক এলাকাতে যদি পার্টিকে গোপনে কাজ চালাতে হয় তবে তার পরেও পার্লামেন্টারী পথের প্রতি সি পি এমের নিষ্ঠা কি অটুট থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বিধানসভার নির্বাচনের পর। নির্বাচনে যদি সি পি এম এবং তার সহযোগীরা সফল হতে পারে তবে পার্টি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, পার্লামেন্টারী পথের সব সুযোগ এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কিন্তু ফলাফল যদি পার্টির পক্ষে প্রতিকূল হয় তবে পার্টির নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

•

সি পি এমের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে পৌনে দু বছর ধরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে।

কিন্তু গত তিন বছরে পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়েছে দু গুণেরও বেশী। ১৯৬৮ সালে দমদমে একাদশ সম্মেলনের সময় সদস্য সংখ্যা ছিল ষোল হাজারের কিছু বেশী। ১৯৬৯ সালে, অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট কায়েম হয়েছে এবং সি পি এম রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিমান পার্টি তখনও দলের সদস্য সংখ্যা একুশ হাজার পূর্ণ হয় নি। গত বছর পার্টির পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। আর এখন এই ১৯৭২ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে পৌনে দু বছর ধরে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে সেই সময়েই সবচেয়ে দ্রুত হারে পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ-থেকে দুটো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এক : এই তথা-কথিত আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব সি পি এমের পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এর ফলে পার্টি হীনবল তো হয়ই নি, বরং তার শক্তি এক নতুন পর্যায়ে পৌঁচেছে। পার্টি এও আশা করছে যে, এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তার শক্তি আরো বাড়বে। কারণ ১৯৭২ সালে দশ হাজার নতুন সদস্য এবং ৪০ হাজার সহায়ক গ্রুপের সদস্য সংগ্রহ করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই হতে পারে যে, সি পি এম যে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের কথা এত জোর গলায় বলছে সেটা সত্যিই ততোটা মারাত্মক নয়। সত্যিই যদি শাসক-গোষ্ঠী, অর্থাৎ কংগ্রেস ফ্যাসিস্ত কায়দায় বিরোধী দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইত তবে কি সি পি এম এত দ্রুত এত শক্তি বৃদ্ধি করতে পারত? ফ্যাসিস্ত শাসনের আমলে বিপক্ষ দলের এমন বাড়বাড়ন্তের নজির আর কোনো দেশে দেখা যায় নি। ৫৬৮ জন সি পি এম নেতা ও কর্মী খুন হয়েছেন বলে পার্টি দাবী করলেও ঠিক কোন্ সময়ের মধ্যে এঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যদি ধরা যায়, পৌনে দু বছরের সন্ত্রাসের মধ্যেই এঁরা নিহত হয়েছেন, তবে অনেকে এই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে অন্যান্য দলের (কংগ্রেসসহ) কেউ কি খুন হন নি? অবশ্যই হয়েছেন। তাঁরা খুন হলেন কাদের হাতে? শাসকগোষ্ঠী নিজেরা এমন সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল যে তাতে নিজেদের লোকেরাও প্রাণ হারালেন?

সুতরাং এ-কথা মনে হতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থাকে সি পি এমের প্রস্তাবে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকের জন্যেই ঐ বিশ্লেষণে অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। সেই ফাঁকটা যে কোথায় তা খুঁজে বার করাও খুব একটা কষ্টসাধ্য কাজ নয়। ১৯৬৮ সালে পার্টির একাদশ সম্মেলন থেকে ১৯৭২ সালের দ্বাদশ সম্মেলনের মধ্যে যে-সময় অতিবাহিত হয়েছে সেই সময়ে যে হিংসার রাজনীতি এই রাজ্যে চালু হয়েছে তার কোনো সৎ বিশ্লেষণ পার্টি করতে পারে নি—অথবা করতে চায় নি। গত পৌনে দু বছরে এই রাজ্যে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি চালু হয়েছে, এই কথাটা যে সত্য নয় তা প্রমাণ করতে কারোই কোনো কষ্ট হবে না। হিংসার রাজনীতি শুরু যখন হয়েছিল তখন ক্ষমতায় ছিলেন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং সেটা শুরু হয়েছিল ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের মধ্যে দিয়েই। অতীতের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলেই আর এস পি এবং এস ইউ সি ১৯৭২ সালে সি পি এমের সঙ্গে হাত মেলাতে এসেও ভবিষ্যতের জন্যে কিছু রক্ষাকবচ চেয়েছে। আর এস পি দবী তুলেছে আত্মসমালোচনার মারফৎ অতীতের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করার, যাতে ভবিষ্যতে সেই ভুল আর না-হয়। এস ইউ সি তো সরাসরি একটা আচরণ বিধিই দাবী করেছে।

*

১৯৬৮ সালের পর থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে তার কোনো সঠিক বিশ্লেষণ যে সি পি এম করতে চায় নি তার কারণ তা হলে সরকারী সন্ত্রাসকে এত বড় করে দেখানো যায় না। এবারের নির্বাচনী অভিযানে সি পি এমের প্রধান হাতিয়ার যে হবে এই আধা-ফ্যাসিস্ত শাসনের অভিযোগ সে বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ গত বছর মধ্যবর্তী নির্বাচনে পার্টির মুখ্য শ্লোগান ছিল পশ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবিচার। তার কয়েক মাস আগেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে হয়ে গিয়েছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে যে ছয়-দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ বিপুল সাফল্য লাভ করে তার প্রধান কথা ছিল স্বশাসন। সি পি এমও ঐ সময়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্যগুলির জন্যে আরো ক্ষমতা চেয়ে ছয়-দফা দাবি তৈরী করেছিল। সেই শ্লোগান যে সি পি এমের পক্ষে বেশ সহায়ক হয়েছিল তার প্রমাণ ঐ নির্বাচনের ফলেই পাওয়া গিয়েছিল।

এ-বছর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের জন্যে সি পি এমের পক্ষ থেকে প্রথম ডাক দেওয়া হয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কলকাতা বৈঠকে (১২—১৫ জানুয়ারী, ১৯৭২)। ঐ ফ্রন্ট গঠনের জন্যে পার্টি একটি এগার-দফা কর্মসূচীও পেশ করে। তার মধ্যে অবশ্যই এক জায়গায় রাজ্যের প্রকৃত স্বশাসনের দাবি তোলা হয়েছে, কিন্তু সেটা নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে — সংবিধান সংশোধনের দাবির প্রসঙ্গে। এগার-দফা কর্মসূচীর মধ্যে একটি বিশেষ দফা এই দাবির জন্যে পৃথক করে রাখা হয় নি। ইতিমধ্যে যে অঙ্গ-রাজ্যগুলির স্বশাসনের সব দাবি পূর্ণ হয়ে গেছে, সি পি এম তা নিশ্চয়ই বলবে না। তবু সি পি এম আজ নতুন শ্লোগান নিয়ে নির্বাচনে নামছে। এই নতুন শ্লোগান পার্টিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে সাহায্য করে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

২৭।১।৭২ —দেবদত্ত

সুস্বাগত বিজয়ী বীর
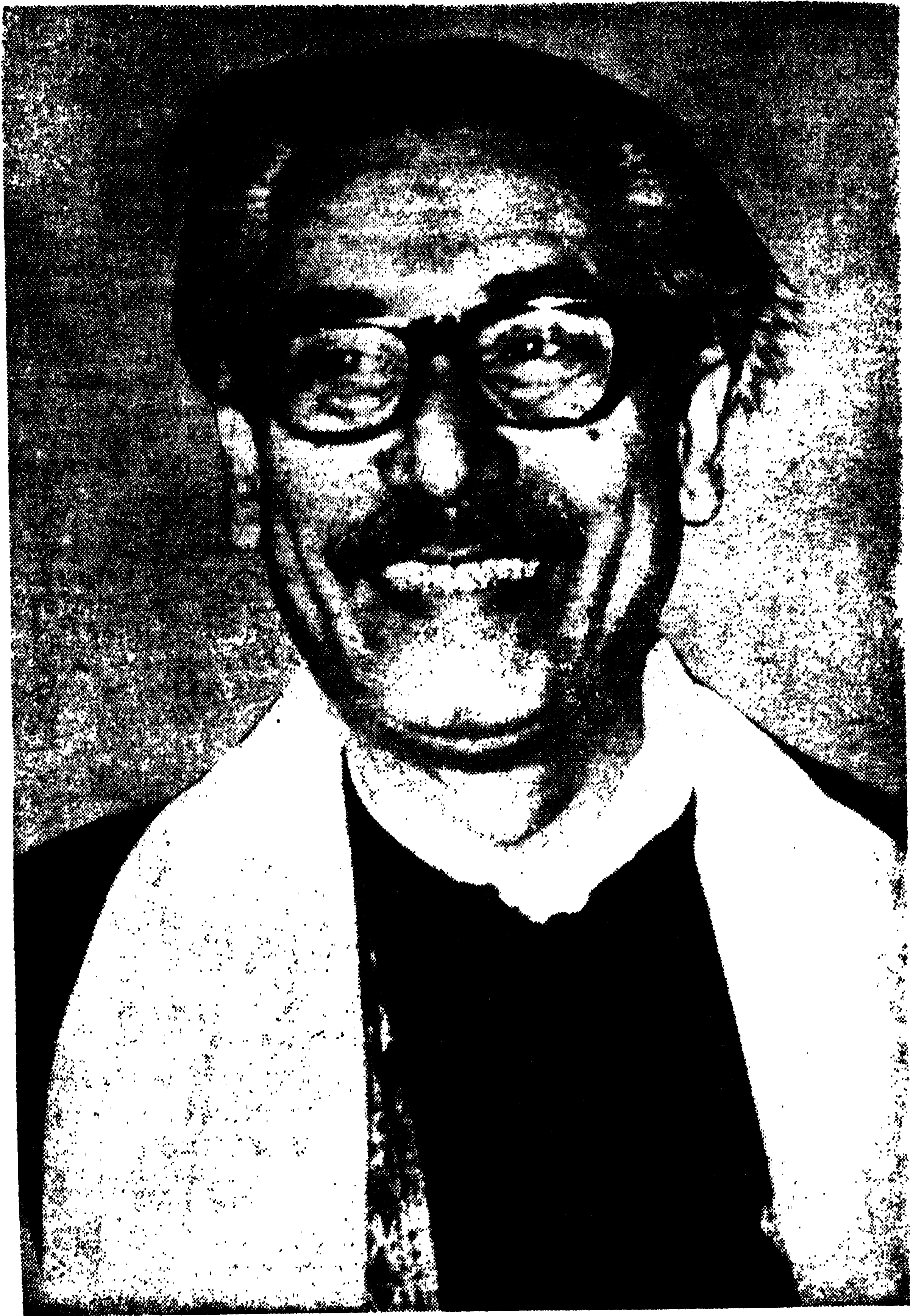
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
[আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় উপলক্ষে আমাদের সাদর সম্ভাষণ]

সুস্বাগত বঙ্গবন্ধু

বাঙলা দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথা দিয়েছিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসবেন। তাঁর সেই কথা তিনি রেখেছেন। ইয়াহিয়ার কারাগার এবং ফাঁসির দড়ি থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকার মাটিতে পা দেওয়ার এক মাসের মধ্যেই তিনি কলকাতায় আসছেন।

গত ১০ জানুয়ারি তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের আকাশের উপর দিয়ে উড়ে দিল্লি থেকে ঢাকায় যান তখন অনেকে আশা করেছিলেন, তাঁর বিমান হয়তো কলকাতা বিমানবন্দরের মাটি ছুঁয়ে যাবে। সেরকম একটা খবরও ছিল। বিমান-বন্দরে লাখ লাখ মানুষ গিয়ে সেদিন হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিল।

আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান যখন কলকাতায় আসবেন তখন এই শহরের ও গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে তাঁকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানাবেন তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নের মণি, এই বীর বঙ্গ সন্তানকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য, তাঁকে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাবার জন্য কলকাতার মানুষ যে বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন তার বোধ করি কোন তুলনা পাওয়া যাবে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যদি কোনদিন ফিরে আসেন তাহলে কলকাতার রাস্তায় কি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে তারই হয়তো কতকটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব কলকাতার মাটিতে পা দিলে।

আবেগে, উচ্ছ্বাসে উৎসাহে কলকাতা সেদিন কল্লোলিত হবে। কামনা এই যে, সেই সংগে কলকাতা তার সংযম ও শৃংখলা হারাবে না।

—পুণ্ডরীক

দেশে বিদেশে

স্বাধীন বাংলাদেশকে সোভিয়েট রাশিয়ার স্বীকৃতি পাকিস্তান ও তার বান্ধবদের প্রতি একটি বড়রকমের কূটনৈতিক চপেটাঘাত।

বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া প্রথম যে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিল। সোভিয়েট রাশিয়া বাংলা-দেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রথম থেকে যে নৈতিক সাহায্য, সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়ে এসেছে তাতে এটা অবধারিত ছিল যে, সে কোন এক সময়ে নবজাত বাংলা-দেশকে একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে মেনে নেবেই। সেই অবশ্য-ম্ভাবী ভবিতব্যকে ঠেকাবার জন্য ইসলামাবাদের শাসকরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো রাশিয়ার কাছ থেকে সময় ধার চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে ভারতীয় সৈন্যরা চলে গেলেই তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, আর এই কথাবার্তার ফলাফল না জানা পর্যন্ত যেন রাশিয়া ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, তাড়াহুড়া করে সে যেন বাংলাদেশকে স্বীকার করে না বসে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বললেন, তিনি মস্কোতে গিয়ে রুশ নেতাদের সংগে বার্তাচিত করতে চান। মস্কোর মন ভেজাবার চেষ্টার রটিয়ে দেওয়া হল যে, পাকিস্তানের লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ও জেলখাটা বামপন্থী ফৈজ আহমদকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত করে রাশিয়ায় পাঠান হচ্ছে।

পাকিস্তান এভাবে আদাজল খেয়ে না লাগলে রাশিয়া আরও আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিত কিনা তা বলা যায় না; তবে, পাকিস্তান যে সোভিয়েট রাশিয়াকে ঠেকাতে পারে নি সেটা দেখাই গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার এই স্বীকৃতি পাকি-স্তানের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। কেননা, পাকিস্তান এই ব্যাপারে তার নিজস্ব 'হলস্টাইন' নীতি ঘোষণা করেছে—যে দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে তার সংগে পাকিস্তানের আড়ি। এই নীতি অনুসারে ভারতের সংগে তো বটেই, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের সংগেও পাকিস্তান তার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ব্রহ্মদেশ ও নেপালের ব্যাপারে পাকিস্তান অত দূর না এগিয়ে শুধু রেংগুন ও কাঠমাণ্ডু থেকে রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু, এখন বাংলাদেশের স্বীকৃতি যখন এসেছে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে তখন পাকিস্তান কি করবে? সে কি এই বৃহৎ শক্তির সংগে তার সম্পর্কচ্ছেদ করবে? সেই

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করেছেন

সাহস কি তার হবে? আর, যদি সে তাই করে তাতে কার লোকসান—পাকিস্তানের, না রাশিয়ার?

পাকিস্তান অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই মস্কো থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে দেশে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো পরিস্কার করে বলেছেন, রাষ্ট্রদূতকে সলাপরামর্শের জন্যই দেশে আসতে বলা হয়েছে, তার মানে এই নয় যে, পাকিস্তান মস্কো থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে আনছে।

সোভিয়েট রাশিয়াকে নিয়ে ডজন-খানেক দেশের সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেন। ইসলামাবাদের হলস্টাইন নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আরও অনেক দেশই এখন বাংলাদেশকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ক্যানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মিচেল শার্প বলেছেন যে, কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ খুব শিগগিরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করবে। তিনি বলেছেন যে, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয় দেখিয়ে পাকিস্তান এই স্বীকৃতি আটকাতে পারবে না।

ইসলামাবাদ ইতিমধ্যে বৃটেনের উপর এই বলে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, বাংলাদেশকে মেনে নেওয়া হলে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছেড়ে দেবে। কমনওয়েলথের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বারবাডোস ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বৃটেন বা ক্যানাডার মতো কমনওয়েলথ রাষ্ট্র যদি এখন সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাহলে পাকিস্তান কি করবে সেটা কিছুদিনের মধ্যে বোঝা যাবে বলে আশা আছে।

তবে, ইতিমধ্যে এটা পরিষ্কার যে, পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছাড়লে অন্তত বৃটেনের শাসক দলের একাংশ অখুশী হবেন না। কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষী কট্টর রক্ষণশীল এনক পাওয়েল সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বাংলাদেশকে বৃটিশ স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই সর্ত আরোপ করেছেন যে, বাংলাদেশকে কমনওয়েলথের ভিতর স্থান দেওয়া চলবে না। পাওয়েলের মতে, পাকিস্তানকে কমনওয়েলথের ভিতর ঢুকতে দিয়ে গোড়াতেই ভুল করা হয়েছিল। এখন সেই ভুলের কিছুটা সংশোধন তিনি করতে চাইলেন বাংলাদেশকে একটি কমনওয়েলথ-বহির্ভূত রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিয়ে। তাতে তাঁর লাভ এই যে, এক কলমের খোঁচায় বৃটেনে পাকিস্তানী নাগরিকদের একটা বিরাট অংশ কমনওয়েলথ নাগরিকত্বের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে সম্পূর্ণ 'বিদেশী' হয়ে যাবেন।

তাছাড়া, এমনিতেই এখন কমনওয়েলথ সম্পর্কে বৃটেনের আগ্রহ কমতির দিকে। তার নজর এখন ইউরোপের দিকে। ব্রাসেলসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ইউরোপের অভিন্ন বাজারের সদস্য হওয়ার জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। এই সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং নরওয়েও ঐ বাজারে যোগ দিল। প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাশ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ঐ চারটি দেশ ইউরোপের অভিন্ন বাজারের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐ চারটি দেশের যোগদানে সম্প্রসারিত হওয়ার পর ইউরোপের অভিন্ন বাজার পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বাণিজ্য-গোষ্ঠীতে পরিণত হবে এবং সারা পৃথিবীর বাণিজ্যের ৪১ শতাংশ তাদের আয়ত্তে থাকবে (আমেরিকার হাতে ১৪ শতাংশ সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে ৪ শতাংশ এবং জাপানের হাতে ৬-৫ শতাংশ থাকবে)। এই বৃহৎ বাজারের সুবিধা নেওয়ার জন্য এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর সমৃদ্ধির অংশ পাওয়ার জনাই বৃটেন এখন বেশী উৎসুক, তাতে কমনওয়েলথের দড়িতে যদি একটু টান পড়ে তা নিয়ে বৃটেনের খুব বেশী মাথা ঘামবে না।

২৭-১-৭২ —পুণ্ডরীক

বাঙলার মন্দির

পঞ্চানন রায়

[বাঙলাদেশের পুরাকীর্তি সম্পর্কে আজ নতুন করে গবেষণা শুরু হয়েছে। নানাস্থানের মাটি খুঁড়ে আজ উদ্ধার করা হচ্ছে বাঙলাদেশের লুপ্ত পুরাকীর্তি—ভগ্নমূর্তি ইত্যাদি। বাঙলার মন্দিরগুলিও প্রাচীন বাঙলার স্থায়ী কীর্তিরূপে আজও দেশী বিদেশী বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। মন্দির নিয়ে গবেষণা যে কম হয়েছে তা নয়। কিন্তু বেশীরভাগ গবেষকই মন্দিরের শিল্পকর্ম নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছেন। মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ নিয়েও আলোচনা ও আলোকচিত্রগ্রহণ চলছে। লেখক বাঙলার এক নিভৃত পল্লীতে সারা জীবন পুরাকীর্তি ও মন্দির সম্পর্কিত গবেষণায় রত আছেন। পল্লীবাঙলার এখানে-ওখানে যে মন্দির আজ নিতান্ত উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়ে রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে লেখা প্রবন্ধগুলি মারফৎ তিনি তা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত মন্দিরগুলির কয়েকটি ইতিমধ্যেই কালকবলিত হয়ে একেবারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু চিত্রের সাহায্যে সেগুলির জীবিত রূপটিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙলার মন্দিরের বেশীরভাগ ফটো তুলেছেন মন্দির-প্রেমী শ্রীযুক্ত ডেভিড ম্যাকাচ্চন সাহেব। দুঃখের বিষয় মন্দিরপ্রেমী ভারততত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত ম্যাকাচ্চন গত ১২ জানুয়ারী কলকাতায় মাত্র ৪১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।]

বাঙলার চালামন্দির

বর্তমানের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মধ্যে বাঙলার প্রাচীন রূপটি আজ ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বাঙলার মন্দির-মসজিদ যেকালে শঙ্খ-ঘণ্টা ও নমাজের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করত সে মন্দির-মসজিদের জীর্ণ দেহের ভেতরে আজ কেবল শোনা যায় শিকরের আর ঝিঁ-ঝির বেসুরো একটানা শব্দ। মন্দির-মসজিদ আজ নিতান্তই উপেক্ষিত, কোথাও বা হিংস্র শ্বাপদ আর সর্পকুলের আবাসস্থল। আজও গ্রামবাঙলার ও শহরের বুকে যে মন্দির-মসজিদ তার আকাশচুম্বী চূড়া নিয়ে বিরাজ করছে তারা এ যুগের মানুষের কাছে নিতান্ত অনাবশ্যক বলে মনে হলেও এককালে তারা যে বাঙলার জনজীবনের এক বিরাট প্রয়োজন মেটাত তা বেশ বুঝতে পারা যায়। বাঙলার মন্দিরগুলির পরিকল্পনার মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার প্রত্যক্ষ পরিচয় যতখানি মেলে ততখানি অন্য-কিছুতে পাওয়া যায় না। দেবদেবীর আবাস-স্থল হিসেবেই বাঙালী তৈরী করেছিল মন্দির। কিন্তু সে মন্দির তৈরীর মধ্যে বাঙালী ধরে রেখেছে তার আপন ঘরকে। গ্রামের গরীব বাঙালী বাস করে দোচালা-চারচালা খোড়ো ঘরে। তাই সে তার প্রিয় দেবতার জন্যে তৈরী করে দোচালা বা চার-চালা জাতের মন্দির। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে নেই কোন জৌলুস বা রাজকীয় ঐশ্বর্য। এ ধরনের মন্দির আজও দেখা যায় গ্রাম-বাঙলার ক্ষেতপ্রান্তরে—অথবা কোন কৃষক-বাঙালীর চারচালা মেটে ঘরের পাশে—অথবা মেঠো রাস্তার একপাশে। বাঙালী কৃষক দেবতাকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন বলেই নিজের ঘরের আকারে তৈরী করেছিলেন তাঁর দেবতার ঘর। আর সেকালের রাজারাজড়ার নির্মিত মন্দিরে রাজকীয় ঐশ্বর্যের ছটা যতখানি ফুটে উঠত গ্রাম-বাঙলার অনেক মন্দিরে তা দেখা যেত না। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেদের কেউ কেউ অবশ্য মন্দিরে যে রাজকীয় ঐশ্বর্যের ছাপ না রেখেছেন তা নয়, তবে সাধারণ বাঙালী তার মেটে ঘরের আদর্শে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যে মন্দির তৈরী করাতেন তার নমুনা বাঙলার গ্রামগুলো ঘুরলেই পাওয়া যাবে। বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বলতে হয়—প্রধানতঃ দুজাতের মন্দির সেকালে তৈরী হয়েছিল। এক হল, সরল দরিদ্র বাঙালীর ঘরের অনুকরণে তৈরী অনাড়ম্বর অলংকার-বিহীন বা অল্প অলঙ্কারযুক্ত মন্দির। আর সম্পন্ন বাঙালী বা জমিদার রাজারাজড়ার তৈরী বহু অলঙ্কারযুক্ত জাঁকজমকে পরিপূর্ণ বিশালাকার মন্দির। এই উভয় জাতের মন্দিরের মধ্যেই সেকালের ধর্মপ্রাণ বাঙালী যে দেবতাকে আপন করে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারা যায়।

যাহা ঔপচারিক পুজোর জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন হয় একটি পবিত্রস্থানের। মন্দিরের উদ্ভব এই প্রয়োজন থেকে। মন্দির হল দেবতার বাসস্থান। শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে, মন্দ্যাতে সুপ্যতে অত্র মন্দিরম্ অর্থাৎ যেখানে নিদ্রিত হওয়া যায়। মন্দধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে কির-প্রত্যয় করে মন্দির শব্দ গঠিত হয়েছে। অমরকোষে মন্দির শব্দের মানে দেওয়া হয়েছে গৃহ। শাস্ত্রের মতে মন্দির প্রতিষ্ঠাকারী পুণ্যলোক লাভ করেন। এই ফলশ্রুতির জন্যে প্রাচীনকাল থেকে মন্দির নির্মাণে লোকের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। পরে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মন্দিরশিল্পে এক বিরাট বিপ্লব দেখা দিল।

মন্দিরের গঠনরীতির সঙ্গে মানবদেহের গঠনরীতির এক অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়। একালের এক চিন্তাশীল লেখক এ সম্পর্কে বলেছেন,

'ইহারা নাকি মানবদেহের এক একটী প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে (১) পাদপীঠ (২) পাদভাগ (৩) তালজঙ্ঘা (৪) বন্ধন (হাঁটু) (৫) উপরিজঙ্ঘা (৬) কটি (৭) কাণ্ড (৮) স্কন্ধ (৯) গ্রীবা (১০) আমলক (১১) (খর্পর) (Cranium) (১২) কলস (১৩) চক্র প্রভৃতি মনুষ্য-দেহাদির ন্যায় বিভিন্ন ভাগ নির্দিষ্ট আছে এবং শিরোভাগে যে কলস তাহা নাকি পরমাত্মস্থান সহস্রারেরই প্রতীক। সেই স্থান হইতে অমৃত ক্ষরিত হইয়া জীবকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে।

"মন্দিরের নিম্ন হইতে উর্ধ্বতম অংশ পর্যন্ত যেমন মনুষ্যদেহানুগত বিভাগ, ইহার ভূমিভাগেও (ক্ষেত্রসমতলেও) সেইরূপ বিভাগ। তিনটি প্রাঙ্গণ বা ন্যূনপক্ষে তিনটি দ্বার অতিক্রম করিয়া ইষ্টদেবতার দর্শন পাইতে হয়। এই তিনটি প্রাঙ্গণ বা দ্বার মানবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে তিনটি দেহের প্রতীক। এই তিন দেহ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হয়। কোনও কোনও পুরাতন মন্দিরে ইষ্টবিগ্রহের পরে ভিত্তিগাত্রে একটি আবৃত গবাক্ষ থাকে। গবাক্ষের সেই আবরণ উত্তোলন করিলে অসীম আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই অসীম আকাশই নাকি সীমাহীন

মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের অন্তর্গত রাধাপুর গ্রামে শীতল রায়ের দোচালা মন্দির। ফটো : [illegible]
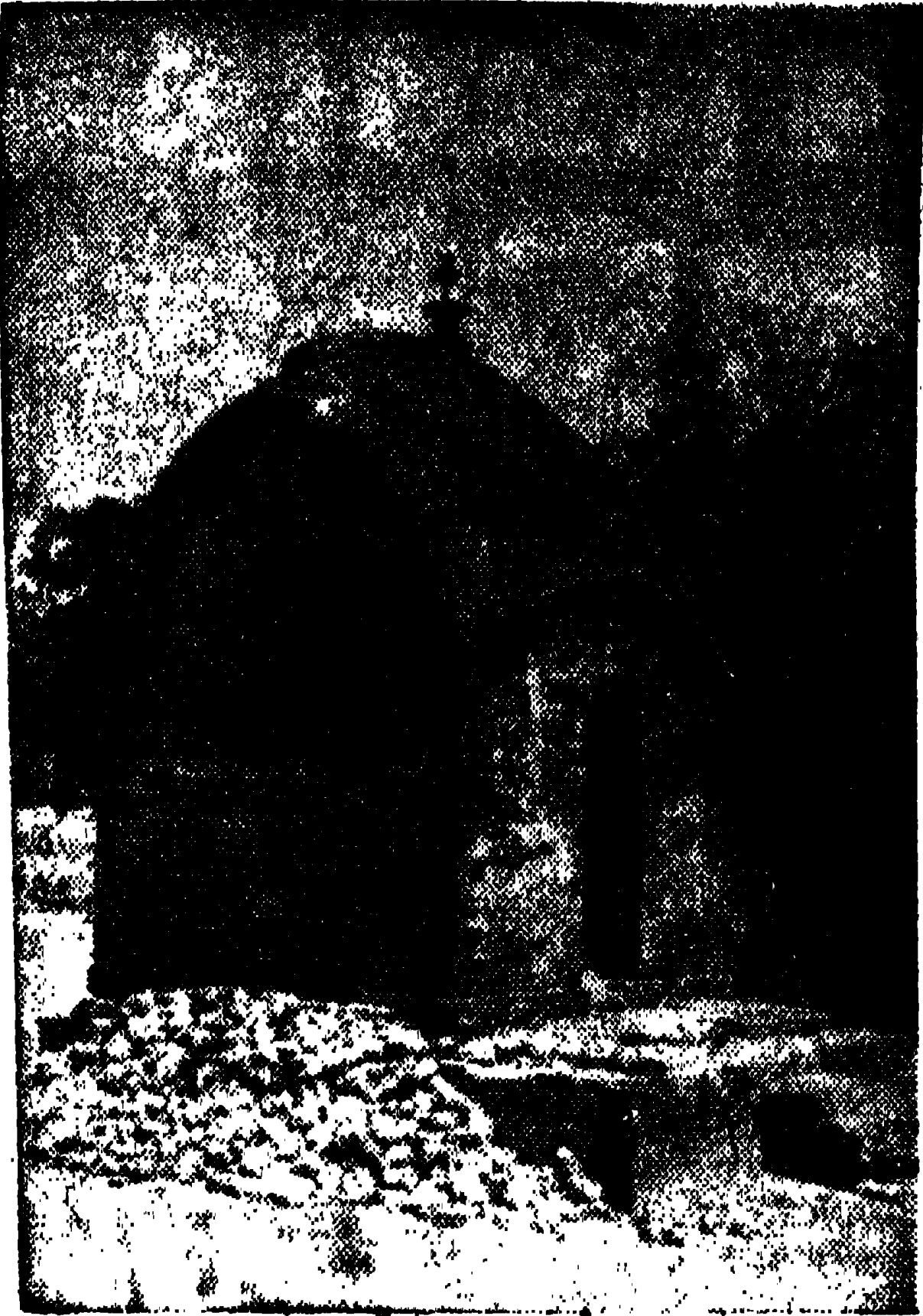
সেই নির্বিকল্প শুদ্ধ চৈতন্যসত্তারই নির্দেশক।"

উদ্ধৃত অংশে মন্দিরতত্ত্বের যে কথা বলা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতে ১। মেরু ২। মন্দার ৩। কৈলাস ৪। কুম্ভ ৫। সিংহ ৬। মৃগ ৭। বিমান-চ্ছন্দক ৮। শ্রীবৃক্ষ ৯। মৃগাধিপ ১০। বল-ভিচ্ছন্দক ১১। বর্তুল ১২। সর্বতোভদ্রক ১৩। গজ ১৪। নন্দন ১৫। নন্দিবর্ধন ১৬। হংস ১৭। বৃষ ১৮। সুপর্ণ ১৯। পদ্মক ২০। সমুদ্গক—এই বিশপ্রকার মন্দির নির্মাণ প্রবর্তিত হয়েছিল। উৎসবের জন্যে মন্দিরের সঙ্গে মণ্ডপও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই মণ্ডপের সংখ্যা ও নামগুলো হল ১। পুষ্পক ২। পুষ্পভদ্র ৩। সুবৃত্ত ৪। মৃতনন্দন ৫। কৌশল ৬। বুদ্ধিসংকীর্ণ ৭। রাজভদ্র ৮। জয়াবহ ৯। শ্রীবৃক্ষ ১০। বিজয় ১১। বাস্তু-কীর্ণ ১২। শ্রুতেশ্বর ১৩। যজ্ঞভদ্র ১৪। বিশাল ১৫। সংশ্লিষ্ট ১৬। শত্রুমর্দন ১৭। ভাগপঞ্চ ১৮। নন্দন ১৯। মানব ২০। মান-ভদ্র ২১। সুগ্রীব ২২। হর্ষণ ২৩। কর্ণিকার ২৪। পদার্ধক ২৫। সিংহ ২৬। শ্যামভদ্র ২৭। সুভদ্র ২।

শাস্ত্রমতে শুভলগ্নে যোগ্য উপকরণ সংগ্রহ ও স্থান নির্বাচন করে বিধি অনুসারে মন্দির তৈরী করতে হয়। যথাবিধি মন্দির প্রতিষ্ঠার পর শাস্ত্রানুসারে দেবতা স্থাপন করতে হয়। অবিচ্ছেদে নিত্য ও নৈমিত্তিক পুজো করতে হবে।

শাস্ত্রের বিধানে ঐসকল মন্দির ও মণ্ডপ নির্মাণ কেবল অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। সাধারণের সাধ্য ঐ পদ্ধতির মন্দির রচনায় উপযোগী নয়। চিরবিপ্লবী বাঙলাদেশে তাই নিজস্ব মন্দিরশৈলীর উদ্ভব হয়েছিল। পুরানো ও বিদেশী রীতিকে নিজস্ব ভাব ও কল্পনায় আপন করে নিয়ে বাঙালী এই উভয় রীতির সরলী-করণকে সম্ভব করে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতে পর্বতের অনুকরণে সুউচ্চ ও বহুচূড় মন্দির তৈরীর পদ্ধতি চলিত ছিল। এদের এক-একটির জন্যে যেমন বিশাল আয়তনের ভূমি ও বহু সরঞ্জামের প্রয়োজন হত তেমনি অলঙ্করণ ও উপকরণের বাহুল্যও ছিল অপরিহার্য। পর্বতাকৃতি মন্দিরগুলি উত্তর ভারতে দেউল ও বহুচূড় দেবালয় বলে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ভারতে গোপুরমগুলি পর্বতেরই অনুরূপ। বাঙালী তার চির-কালের চালাঘরকেই সহজ সরল মন্দিরে রূপায়িত করে আঞ্চলিক ধারাকেই চালিত করে।

দোচালা, চারচালা আটচালা প্রভৃতি ছাউনীর মেটেঘর বা মাটিমন্দির আবহমান-কাল ধরে গ্রামবাঙলায় পাড়ায় পাড়ায় বাস-স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ওগুলি তৈরীর পদ্ধতি সরল ও খরচও অল্প বলে জনসাধারণের আর্থিক সঙ্গতির অনুরূপ ও আয়ত্তসাধ্য। তাই ঐ সকল চালাপদ্ধতির মন্দির তৈরীর দিকে বাঙালীই প্রথম প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পরে বাংলার বাইরে আসামে ও ত্রিপুরায়ও এ ধরনের মন্দিরের প্রসার দেখা যায়।

বাংলার মন্দিরনির্মাণশৈলী হল তিন প্রকার : ১। নিজস্ব ২। মিশ্র ও ৩। বৈদেশিক। নিজস্ব মন্দিরগুলি হল : ১। দোচালা ২। জোড়বাংলা ৩। চারচালা ৪। আটচালা ৫। বারোচালা ৬। চাঁদনী ও দ্বিতল চাঁদনী। মিশ্রমন্দিরগুলি হল : ১। একরত্ন বা আলগোছচৈত্যা ২। পঞ্চরত্ন ৩। নবরত্ন ৪। ত্রয়োদশরত্ন ৫। সতেররত্ন ৬। একুশরত্ন ৭। পঁচিশরত্ন ও বিবিধ। সতেররত্ন মন্দির পঞ্চতল, একুশ-রত্ন ষটতল ও পঁচিশরত্ন সপ্ততল হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে বাংলায় এই শেষোক্ত তিন শ্রেণীর মন্দিরের উল্লিখিত তলগুলি নেই। উদাহরণস্বরূপ বর্ধমান জেলার কালনায় লালজীর পঁচিশচূড়ো মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে উল্লিখিত সাতটি তল নেই। রাজনগরের একুশরত্ন মন্দিরেরও ছয়টি তল নেই (রাজনগরের একুশরত্ন মন্দিরের ছবিটি ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ রবিবারের 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়েছিল)। বর্তমান প্রবন্ধে ভূমি বা গ্রাউণ্ডকে একতল ধরে তল নির্ণয় করা হয়েছে। চার-তল পর্যন্ত এদেশে আছে। এ ধরনের মন্দিরে তেরোটি রত্ন বা চূড়া আছে। বাকিগুলির চূড়া একই তলে বিন্যস্ত। বিদেশী রীতির মন্দিরগুলি হল ১। উৎকলীয় দেউল ২। উত্তর ভারতীয় বহুচূড় ৩। দক্ষিণ ভারতীয় ৪। বৌদ্ধ ৫। খৃস্টীয় ও ৬। ইসলামীয়। কোন কোন মন্দিরের পাদপীঠগুলির আকৃতি সর্বতোভদ্রাদিমণ্ডল বা তান্ত্রিক যন্ত্রাকার। মন্দিরের গা ও চূড়োতে থাকে তান্ত্রিক যন্ত্র।

মন্দিরের খিলানগুলোরও নাম আছে। এগুলি হল ১। দরুণ ২। চামচিকা ৩। হাইকোর্ট ৪) হাঁসগলা ৫। গোল ৬। বিবিধ। থামগুলির নাম হল ১। ইমারতি ২। কলা-গেছ্যা ৩। গোল ৪। চৌকা ৫। চুমকি ৬। বিবিধ। অলঙ্কারগুলির নাম ১। তুরঙ্গ ২। কমলাতুরঙ্গ ৩। কোণ ৪। বন্দকা ৫। সোনগেছ্যা ও ৬। খাঁজবন্দী। আরও নানা প্রকারের অলঙ্কারের নাম এখন লুপ্তপ্রায়।

শিবমন্দিরে বৃষ ও গৌরীপট্ট, দেবী-মন্দিরে খর্পর ও বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়-বিন্যাসের রীতি বাংলার এ ধরনের মন্দির-গুলিতে লক্ষ্য করা যায়। বদ্ধসিংহ, দ্বার-পালদ্বয়, আমলা কলস, চক্র, ত্রিশূল, বিল্বপত্র, যন্ত্র প্রভৃতিরও মন্দিরশীর্ষে বিন্যাসের রীতি দেখা যায়। দ্বারপাল সাধা-রণতঃ দুটি থাকে। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার জোতমুরারির শিবা-লয়ের প্রতি থাকে যুগ্ম দ্বারপাল আছে।

মন্দিরে পুত্তলিকা বিন্যাসেরও একটা রীতি আছে। নীচের দিক থেকে ওপরে

* কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অমরেন্দ্র দেবকুমার দত্ত বিরচিত 'আচার্য ভবতত্ত্ব', পৃষ্ঠা-৫৬

* হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র ও মৎস্যপুরাণ

ক্রমে ক্রমে থাকে : ১। জীবজন্তু ২। মানবীয় সামাজিক ৩। পৌরাণিক ৪। রামায়ণীয় ৫। মহাভারতীয় ও ৬। বৈদিক ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এইভাবে মানবমনকে ক্রমশ পরমাত্মমুখী করা হয়েছে।

মানুষের বাসের জন্যে দোচালা ঘর সহজেই তৈরী করা যায়। দোচালা মন্দির তৈরীর পরিকল্পনা তা থেকেই এসেছে। স্বল্পবিত্ত মানুষের পক্ষে এ ধরনের মন্দির তৈরী করা সহজ। এভাবে বাংলার নিজস্ব মন্দিরনির্মাণপদ্ধতিতে দোচালা মন্দিরের আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের দেখা এ ধরনের তিনটি মন্দিরের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল বাগবাজারের শিবালয়। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বাড়ীর সামনে এই মন্দিরটির প্রাঙ্গণে একসময় রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডা বসত। এর থেকে মনে হয় মন্দিরটি অন্তত দেড়শ বছরের পুরানো। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার বড় অস্থলের একটি সমাধিমন্দিরও দোচালা। ঐ জেলারই দাসপুর থানার রামপুর গ্রামের কালু রায়ের মন্দিরটিও দোচালা। এই দুটিতেই কোন লিপি নেই। তবে দুটিই একশ বছরের পুরানো। উল্লিখিত এ তিনটি মন্দিরে কোন অলঙ্করণ বা পুত্তলিকা নেই।

বাগবাজারে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বাড়ির সামনে দোচালা শিবমন্দির। ফটো : ডেভিড ম্যাক্‌কাচন
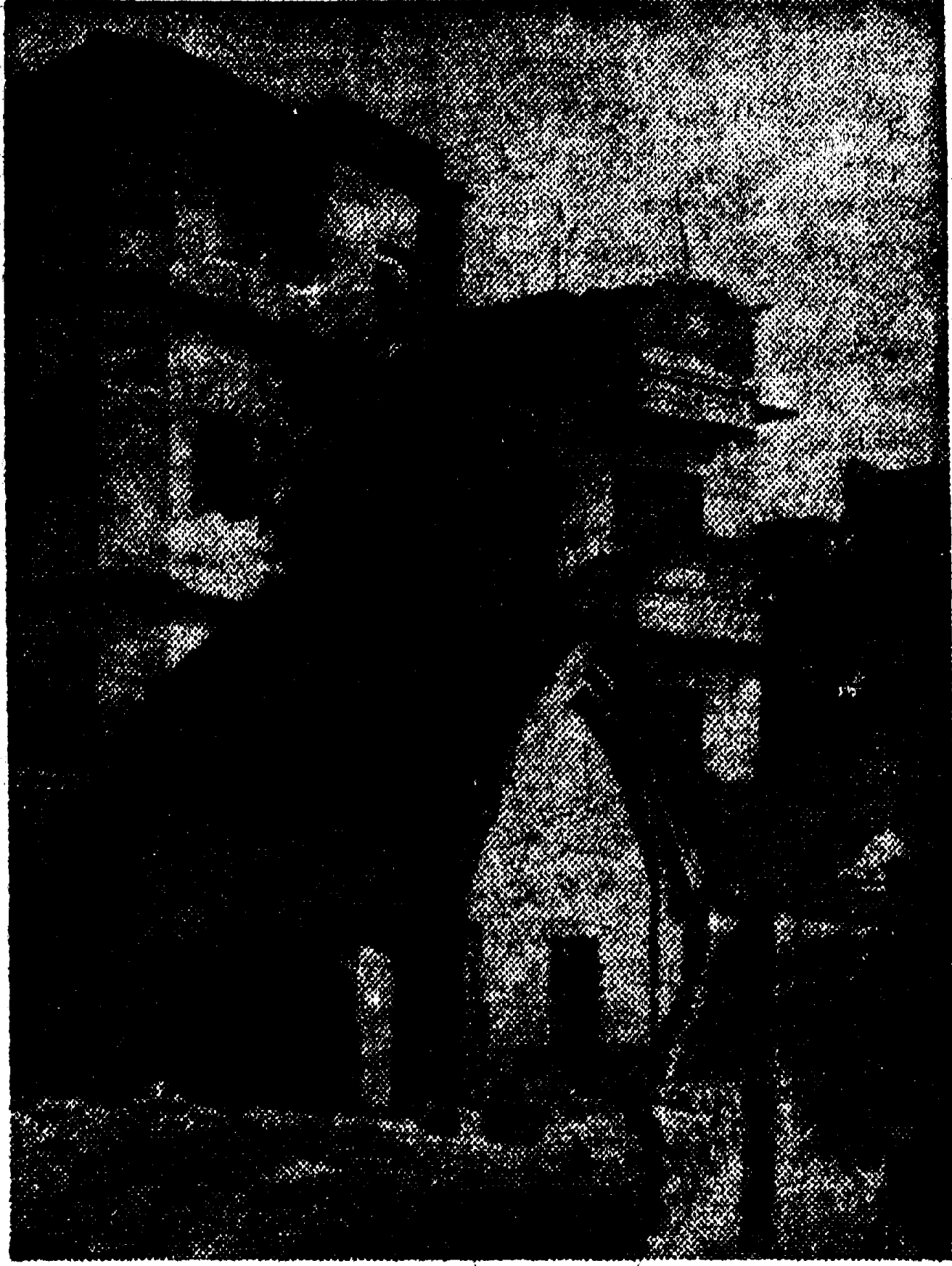
চারচালা মন্দিরগুলির মধ্যে নদীয়া জেলার চাকদহ পালপাড়ার মন্দির মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের কামারদের সিংহবাহিনীর মন্দির, ঐ জেলারই দাসপুরের পাঠক গোঁসাইয়ের সমাধিমন্দির সবচেয়ে পুরানো। পালপাড়ার মন্দিরে কোন লিপি নেই। স্থানীয় জনপ্রবাদ অনুসারে এই শিব-

ঘাটালে সিংহবাহিনীর চারচালা মন্দির। ফটো : ডেভিড ম্যাক্‌কাচন

মন্দিরটি স্থাপন করেন রাজা গন্ধর্ব রায়। আদি কবি কৃত্তিবাসের আত্মচরিতে গন্ধর্ব রায়ের নাম আছে। এর থেকে মনে হয় ঐ মন্দিরটির বয়স প্রায় পাঁচশ বছর। ঘাটালের সিংহবাহিনীর মন্দিরের নির্মাতা হলেন জিতারাম কর্মকার। ১৪১২ শকাব্দ বা ১৪৯০ খৃস্টাব্দে এটি তৈরী হয়। মন্দিরটির সামনে যে জগমোহন অংশ আছে সেটি চারচালা। দাসপুরের মন্দিরে কোন লিপি নেই। পাঠক গোঁসাই ছিলেন চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক। মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ার গঙ্গার ঘাটে একটি চারচালা মন্দিরে সংস্কৃতলিপি আছে। বীরভূমের বক্রেশ্বরে বহু চারচালা মন্দির আছে, কিন্তু সেগুলিতে কোন লিপি নেই। বিষ্ণুপুরের একটি চারচালা মন্দিরের সংস্কৃত লিপির অংশ 'মহীভবার্ণবধু'—এর অর্থ হল ১৫৮১ শকাব্দ বা ১৬৫৯ খৃস্টাব্দ। মন্দিরটি মাড়ুই বাজারে অবস্থিত। অপর চারচালা মন্দিরটি দলবার মধ্যে সুধাম যোড়বাংলা মন্দিরের উপরে বর্তমান। বীরভূমের সিউড়ি শহরেও অনেক চারচালা আছে। আসামের কাছাড় জেলার খাসপুরের রণচণ্ডী মন্দির চারচালা শ্রেণীর।

পাশাপাশি দুটি দোচালা মন্দিরের মিলনকে যোড়বাংলা মন্দির বলে। বিষ্ণুপুরের দলবার মধ্যে ঐরূপ দুটি যোড়বাংলা আছে। মনে হয় এই দুটি যোড়বাংলাই বাংলাদেশে এ ধরনের মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একটির শিখরে চারচালা, অপরটিতে আট-

চালা মন্দির অবস্থিত। দুটিরই ওপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। প্রথমটির ভেতরে ও বাইরের গায়ের সব জায়গায়ই পুত্তলিকা বিন্যাসের সমারোহ। সিঁড়ি সংখ্যা তেত্রিশ। তিনটি 'দরুণ' খিলানে দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধ 'ইমারতি' থাম। মন্দিরটি ৯৬১ মল্লাব্দ বা ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে তৈরী হয়। এর লিপিটি হল,

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে সুধাংশু।
রসাঙ্কাঙ্কে সৌধমিদং শকেহব্দে।।
শ্রীবীরহাম্বীরনরেশসূনু
র্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ।।

এখানে 'শকাব্দ' অর্থে মল্লাব্দ ধরা হয়েছে। মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৪ যোগ করে খৃস্টাব্দ হয়। বিষ্ণুপুরের দ্বিতীয় যোড়বাংলাটি ভগ্ন। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা, রাণীচক ও লালগড়েও যোড়বাংলা মন্দির আছে।

আটচালা মন্দিরের সংখ্যা বাংলাদেশে সকলের থেকে বেশী। এদের গঠনরীতি মোটামুটি দু প্রকারের—বিষ্ণুপুরী কাটাচাল—পরস্পর পৃথক চারটি করে আটটি চাল। খড়ের আটচালার চালের মাঝখান কাস্তে দিয়ে কেটে এক ধরনের আটচালা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের আটচালায় ওপরের চারটি চাল নীচের চারটি চাল থেকে আলাদা। বিষ্ণুপুরের আটচালা রাসমঞ্চ দ্বিতীয় রীতির আটচালার প্রধান নিদর্শন। প্রথম রীতির নিদর্শন হল বিষ্ণুপুরের গোপালার কাছাকাছি আটচালা শিবমন্দির। এ ধরনের মন্দির কর্ণগড়, গড়বেতা, শিলদা ও বাঁকায় আছে। এ স্থানগুলি মেদিনীপুর জেলায়। আর একটি আটচালা মন্দির আছে পুরুলিয়ায় মুরাডি স্টেশনের কাছে ব্যাংপুরে। শিলদার (ঝাড়গ্রাম মহকুমায়) মন্দিরের সংস্কৃতলিপিটি হল, 'পক্ষবেদসমুদ্রেচ শশিসংখ্যাতঅব্দযু' ইতি। এর অর্থ হল, পক্ষ—২, বেদ—৪, সমুদ্র—৭, শশি—১ ডান দিক থেকে অঙ্কগুলি সাজালে হবে ১৭৪২ শকাব্দ বা ১৮২০ খৃস্টাব্দ। দ্বিতীয় শ্রেণীর আটচালা মন্দির হল বাংলায় সব থেকে বেশী। এদের মধ্যে সবথেকে প্রাচীন হাওড়া জেলার গড়ভবানীপুরের অম্বিনাথের মন্দির। এর প্রতিষ্ঠাকাল দেওয়া আছে শকাব্দ ১৩০৬ (বা ১৩৮৪ খৃস্টাব্দ), মাহ শ্রাবণ। তারকেশ্বরের মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১৩৪৫ শকাব্দে বা ১৪২৩ খৃস্টাব্দে। মেল্যাকের (হাওড়া জেলা) গোপালজীর মন্দিরের লিপিতে ১৫৭৬ শকাব্দের উল্লেখ আছে। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার ঠাকুরবাড়ীর আটচালা মন্দির বাংলাদেশে সকলের থেকে বড় মন্দির মনে হয়। আয়তনের দিক থেকে এর পরেই আসে শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির, কলকাতার নন্দরাম সেনের শিবালয়, কালীঘাটের মা কালীর মন্দির ভূকৈলাসের শিবালয়যুগল ও নিমতলার (কলকাতা) মদনমোহন দত্তের মন্দির। গুপ্তিপাড়ার মন্দিরের সঙ্গে শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির একই রেখায় অবস্থিত। মেদিনীপুর জেলার রাণীচকের মন্দির (প্রতিষ্ঠাকাল সন ১২২৯ সাল), হেমন্তনগর, হরিরামপুর, ব্রাহ্মণবসান প্রভৃতি স্থানের (মেদিনীপুর জেলা) মন্দিরগুলির সামনের অংশ পুত্তলিকামণ্ডিত। কোন কোন মন্দিরে তিন বা পাঁচটি চূড়া আছে। চূড়ার ওপর স্থাপিত ধাতুর তৈরী ত্রিশূল, বিল্বপত্র বা চন্দ্রকলা। অনেকগুলির থাম ইমারতি। খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দির ১৬৭৩ শকাব্দে নির্মিত। হাওড়া জেলার অনেক স্থলে ওপরের চারটি চাল ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে গিয়েছে। কোন কোন আটচালা মন্দির দ্বিতল। ওপরের চারটি চালের নীচে একটি কক্ষ। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত চেতুয়া-বাসুদেবপুরের চক্রবর্তীবংশের শ্রীরূপরামের মন্দির এ ধরনের ছিল। বর্তমানে এটি নিশ্চিহ্ন। হাওড়ার রাণীবাজারে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ও রাজবল্লহাটের কয়েকটি মন্দির আটচালা শ্রেণীর। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গুপ্তকক্ষ আছে।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত জলসরা গ্রামে একটি আটচালা মন্দিরের উপরে আবার চারটি চাল থাকায় এটিকে বারোচালা মন্দির বলা যেতে পারে। মন্দিরটি পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত। বাঁকুড়া শহরের দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে এক্তেশ্বরের দেউল মন্দিরের পাশে দুটি ও মাথায় একটি করে চারচালা থাকায় এটিকেও বারোচালা বলা যায়।

বাংলার চালামন্দির সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। এ ধরনের মন্দির গ্রাম- ও শহর বাংলার স্থানে স্থানে যে আরও ছড়িয়ে আছে তা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় এদের মধ্যে উন্নতপর্যায়ের অলঙ্করণযুক্ত কিছু কিছু মন্দির আজ অবলুপ্তির পথে। কোন কোনটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে পোড়ো জমিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামের রূপরামের মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। ঐ গ্রামের চক্রবর্তীবংশের প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটিকে আর কোনকালেই দেখা যাবে না (লেখক কর্তৃক গৃহীত এর একটি আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য) উপযুক্ত রক্ষণ ও দৃষ্টির অভাবে প্রাচীন বাংলার এসব পুরাকীর্তি যে ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছে তা নানা স্থানের মন্দির দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

ছায়ায় আলোয়

শান্তি পাল

কলের জল পড়ার ছরছর শব্দে ঘুম ভাঙল মিহিরের। জানলার বাইরে সদ্য ফোটা ভোর। এ সময় কাকের ডাকে নির্জনতা অনুভব হয়। কলের মুখটা কাল অসাবধানে খুলে রেখেছে কেউ। সারারাতের শুকনো উঠানে শব্দ করে জল ঝরে যাচ্ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে চারিপাশ। উঠে গিয়ে বাঁকানো টিনের নলটা কলের মুখ ও চৌবাচ্চার মধ্যে সংযুক্ত করে দেবার কথা ভাবল একবার। পরক্ষণেই আলস্যের অনিবার্যতায় ডুবে গেল সমস্ত শরীর। এত সকালে ওঠা ওর কোন দিনই অভ্যাস নয়। আচমকা শব্দটার জন্যে তাই, নইলে এখনো চোখের পাতা জড়িয়ে আছে, ভারী আর আচ্ছন্ন অবস্থায়। বাড়ীর আর কেউ এখনো ওঠেনি। একটা গভীর ঘুমের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন সমস্ত আবহাওয়ায় বিছানো। এখন এই মোটমাট শান্ত নিরিবিলি ছবির মত সকালটাকে ক্রমশ বেশ ভালো লেগে যাচ্ছিল মিহিরের। ওর ছোটখাট ঘরখানির টেবিল চেয়ার বইয়ের র‍্যাক ও এখানে খাটটুকু ঘিরে এখনো পাতলা অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে। প্রথম সকালের নরম অস্ফুট আলো আস্তে আস্তে খোলা জানলার গরাদের গা থেকে ভেতরে ঢুকে মলিন দেয়ালগুলোতে আলতো আঙুল বোলাচ্ছে। দেখে দেখে মিহিরের মনটা বেশ প্রসন্ন পরিষ্কার লাগল। আলস্য ছাড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল তাই। কলের কাছে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে টিনের পাতটা আটকে দিল।

—মন্টু এত সকালে উঠেছিস আজ?

মুখ ফিরিয়ে দেখল মা। নিজের ঘরের দাওয়ার ওপর।

—এমনি, ঘুমটা ভেঙে গেল। তুমিও তো উঠে পড়েছ অন্ধকার থাকতে। মা হাসলেন ঠোঁটের কোণে—

—আমি রোজ এই সময় উঠি। তুই জানতেও পারিস না কোন দিন। তোর তো এখন মাঝরাত্তির।

বলতে বলতে মা উঠোনের টিন ঘেরা কলতলার ভেতর ঢুকে গেলেন। মিহির ঘরে এসে হাত মুখ মুছল তারপর চেয়ারে বসল খানিকক্ষণ চুপচাপ, বস্তুত তার এই সময়টা কেমন যেন অতিরিক্ত মনে হচ্ছে। সারাদিনের ব্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে একেবারে বেমানান। চারদিকের সৌম্য নির্জনতার মধ্যে টেবিল ঘড়িটা বেশ শব্দ করে বাজছে। রাস্তার কে খঞ্জনী বাজিয়ে দেহতত্ত্ব গাইতে গাইতে গেল। কলঘর থেকে মায়ের স্নানের শব্দ আসছে। শুনে শরীরে ঈষৎ শিরশিরে শীত বোধ করল মিহির। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা বেজে গেছে। বাইরে কাকের ডাক জোরালো হয়েছে। মিহিরের জানলার সামনে রাস্তার ওপারের ফুটপাথে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। ঘন পাতার ফাঁকে লাল ফুলের থোকাগুলি কি রকম পবিত্র লাগছে। পাশের ঘরে এতক্ষণে ছোট বোন সবিতার গলা পাওয়া যাচ্ছে। সবিতা ভোরের কলেজে যায়। অন্য দিন মিহির ওর যাওয়া টের পায় না। আজকে ওর বেণী দুলিয়ে ফিটফাট পোশাকে কলেজে যাওয়া দেখতে পাবে ভেবে ভাল লাগল মিহিরের। আসলে ও এখনো সবিতাকে বড় হওয়া কলেজে পড়া মেয়ে বলে ভাবতে পারে না। রাগ হলে এখনো ধমকে ওঠে, ছোট মেয়ের মত শাসন করে। সবিতাও মেনে নেয় নীরবে, মাথা নীচু করে সরে যায় ভয়ে কিংবা রাগে, অথবা অভিমানে, কে জানে।

—মেজদা তোর চা। কখন নিঃশব্দে সবিতা ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবিতার এ্যান্টিক্রীজ শাড়ীর ভাঁজে শব্দ ওঠে না। মিহির চেয়ে দেখল একবার, দু'পাশের কপালের ওপর দিয়ে নামিয়ে টানটান করে চুল বাঁধাটা কেমন বেমানান ঠেকল তার কাছে। তবু কিছু বলল না সে বিষয়ে।

—কলেজে যাচ্ছিস? প্রশ্ন করল শুধু।

—হাঁ, আজ আবার ক্লাস পরীক্ষা আছে। দেরী হয়ে গেল বোধহয়। এতখানি রাস্তা বাসেই কত সময় চলে যায়। ব্যস্ত

পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সবিতা হঠাৎ দরজার কাছ থেকে ফিরে দাঁড়াল।

—তুই আজ এত সকালে উঠেছিস?

—এমনি, ঘুমটা ভেঙে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল মিহির।

—বেশ নতুন ঘটনা মনে হচ্ছে। শান্ত অথচ কেমন একরকম রহস্যের গলায় বলে উঠল সবিতা তারপর নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে। এবং সবিতার উক্তি ও চলে যাওয়াটা রেখাপাত করল মিহিরের মনে। এতক্ষণ যে কথাটা চিন্তায় আসে নি সেই কাল রাত্রের ঘটনাটা ভাবল মিহির। মার কাছে তার প্রস্তাবটা বেশ একটু নতুন চিন্তার খোরাক হয়েছে ভেবে মিহির কৌতুক বোধ করল। সংগে সংগে সামান্য লজ্জাও পেল। মার কাছে অমন সরাসরি নিজের বিয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে গিয়ে কাল রাত্রেও দ্বিধায় সংকোচে বারবার ঘেমে উঠছিল, মিহির। মা চুপচাপ সব শুনে খানিকক্ষণ বাদে মন্তব্য করেছিলেন—ভালই তো। মিহিরও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে গিয়ে স্বস্তি পেয়েছিল। রাত্রে নিশ্চয়ই প্রসংগটা সবিতার কাছে তুলেছিলেন মা। তাই সবিতা নতুনত্বের ইংগিত করে গেল। নিঃশব্দে চাপা হাসিতে মুখ ভরে গেল মিহিরের। বাইরে প্রথম সকালের আলো ক্রমশঃ উজ্জ্বল পাখা বিছিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এতক্ষণে দাদা বৌদি ছোটভাই সমীর সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে। ওদের কথাবার্তার টুকরো, হাত-মুখ ধোয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিজেকে এখন কেমন সুখী সুখী মনে হল মিহিরের। বাবা মা ভাইবোন বউদি ভাইপো ভাইঝি নিয়ে তার জাজ্জ্বল্যমান সংসার। তার ভরাভরন্ত জগৎ এবং এই জগতের ঠিক মাঝখানে সে আর একটি নতুন মুখের ছবি এনে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। তার স্নেহ প্রেম অভিমান অনুরাগের কেন্দ্রবিন্দু করে।

পাশের ঘরে সমীর রেডিও খুলেছে। এখনো প্রোগ্রাম সুরু হয় নি। শুধু একটানা পিপপিপ শব্দ। এই এক দোষ সমীরের। যতক্ষণ ঘরে থাকবে রেডিও চালিয়ে রাখবে, তার থেকে যেমন আওয়াজই বেরোক। শুধু এই নয়। আরও দোষ আছে সমীরের। দোষ না গুণ কে জানে। এই বয়সের ছেলে অভিভাবকদের আওতার বাইরে চলে গেলে যেসব সমস্যা দেখা দেয় আর কি। বাড়ীর সকলে বিরক্ত ওর ওপর। সবার সংগে খিটিমিটি। রেডিওর একঘেয়ে শব্দটার অস্বস্তি লাগছিল মিহিরের, তবু সমীরকে ডেকে আপত্তি জানাল না। আজকের সকালটায় কেমন চারিদিকে খুশির আলো খেলছে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে। এরকম ভাল লাগার মেজাজে বিরক্তি প্রকাশ করতে ইচ্ছে হল না।

—মন্টু, মিহিরের দাদা অধীর চটির শব্দ করে দরজার কাছ থেকে ডাকল। দ্বিতীয় সিগারেটের আধখানা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলে দিল মিহির। তারপর সাড়া দিল, —কি বলছ দাদা।

অধীর ঘরে এল। পাতলা চেহারা। গায়ে সুতীর চাদর জড়ানো। মিহিরের দিকে একখানা দশ টাকা নোট বাড়িয়ে ধরল।

—তোর সেদিনকার টাকাটা, এই নে।

—কি হবে টাকা, ওটা আবার দিচ্ছ কেন? মিহির খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করে তাকাল অধীরের দিকে।

—সেদিন ছিল না বলে তোর কাছ থেকে নিয়েছিলুম। এখন তো আমার কাছে টাকা রয়েছে, তুই ফেরৎ নিয়ে নে।

—থাকগে আমার ফেরৎ চাই না। তুমি ওটা রেখে দাও। মিহির শব্দ করে হাই তুলল। শরীর টানটান করে উঠে দাঁড়াল। অধীর সামান্যক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর আস্তে আস্তে নোটটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল,

—না, টাকাটা তুই নিয়েই রাখ। কখন কি দরকার লাগে কে জানে।

অধীর কথা ক'টি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাঝে মধ্যে প্রয়োজনে প্রায়ই অধীর ওর কাছ থেকে টাকা নেয়। তবু কোন দিন এভাবে ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সে কারণ ঘটনাটা মিহিরের কাছে সম্পূর্ণ নতুন রকম লাগল। এবং এই নতুনত্বের উপলব্ধি তার সামনে আজকের চমৎকার সকালটার রং পাল্টে দিল। আজ ভোর থেকে এ পর্যন্ত তার প্রতি মায়ের দৃষ্টিপাত বোনের ব্যংগোক্তি এবং দাদার শান্ত প্রত্যাখ্যান সমগ্রভাবে যেন একটা প্রতিরোধের মূর্তি হয়ে উঠল। এবং সংগে সংগে তার মনে হল তার নতুন জীবন শুরু করার প্রস্তাবে কেউ সুখী বা উৎসাহিত হয়নি। এরকম চিন্তার মধ্যে তার মন ক্রমশ বিমর্ষ হতে লাগল। প্রভাতের পরিষ্কার নরম আলো, উঠানে তার প্রিয় ভাইপো ভাইঝিদের কলরব কোন কিছুই তার মনকে আনন্দ ভাবনায় সংপৃক্ত করতে পারছিল না। পাশের ঘরে বাবার কাশির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কিছুদিন ধরে এই কাশিটা যেন সারতে চাইছে না। এবার ভাল করে ডাক্তার দেখিয়ে সারানো উচিৎ ভাবল মিহির। পুজোর ঘর থেকে মা চেঁচিয়ে দাদাকে বাজারের ফর্দ দিচ্ছেন। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল পৌনে সাতটা। অন্য দিন এর থেকেও বেলায় ওঠে মিহির। দাদা বাজার থেকে আসার পরে। বাজার করাটা অধীরের নৈমিত্তিক দায়িত্ব। মিহিরের ওসব আসে না। বস্তুত মিহির একটু অলস প্রকৃতির। চাকরীটুকু কোন মতে বজায় রাখে। তারপর আড্ডা দিয়ে এড়িয়ে গড়িয়ে কাটায়। অধীর সে তুলনায় খুব সংসারপ্রবণ। পেশায় স্কুলমাস্টার, চারটি সন্তানের পিতা। এমন কিছু বয়স না, তবু সাংসারিক নানা সমস্যায় বিব্রত, চিন্তাক্লিষ্ট। দাদার কথা ভাবতে গিয়ে একটু আগের ঘটনাটা আবার মনে পড়ল মিহিরের। টাকাটা এতক্ষণ সত্যিই তুলে রাখেছে সে তবু মনের ভেতরটা খচখচ করছে। খানিক পরে প্রতিদিনের মত আজও বৌদি করুণা চা টোস্ট নিয়ে এল মিহিরের ঘরে। খবরের কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে দেখল মিহির। রোজ এসময় দু-একটা কথা বলে মিহির, কোন দিন হাসিঠাট্টাও হয়; ভাইপো ভাইঝিদের ঘরে ডাকে, আদর করে খুনসুটি করে। আজ আর সেসব কিছু ভাল লাগল না। চুপচাপ চা খেতে সুরু করল। করুণা দাঁড়াল ক' সেকেন্ড। তারপর কাজে চলে গেল।

মঞ্জুদের বাড়ীর গলিটা আজকে অন্ধকার। সাবধানে দেখেশুনে পা ফেলতে হচ্ছে। না জেনে এসে পড়েছে বলে আফশোস করল মিহির। তেমনি নোংরা চারিপাশ। সরু গলির দু'পাশের সমস্ত বাড়ীগুলির সন্ধ্যাবেলার উনুনে ধরানো ধোঁয়া এখনো বাতাসে জড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে। জানালা গলে আসা স্বল্প আলোয় পথ দেখে দেখে মিহির মঞ্জুদের বাড়ি পৌঁছুল। বসবার ঘরেই সুবিমল ছিল, খাতাপত্র নিয়ে কি লেখায় ব্যস্ত। মিহিরকে দেখে খুশী খুশী ভাব করল।

—এই অন্ধকারে এলি কি করে বলত?

—হ্যাঁ, না জেনে বেশ মুস্কিলে পড়েছিলাম, বড় রাস্তায় দিব্বি আলো জ্বলছে আর তোদের এই গলির মুখ থেকেই অন্ধকার। এতটা চলে এসেছি, ভাবলাম, তোর সংগে দেখা না করেই ফিরে যাব। বলতে বলতে মিহির অস্বস্তি বোধ করছিল, ও যদিও পরিষ্কার গলায় কথা বলতে চাইছিল তবু গলার সামান্য অপ্রস্তুত ভাব ঢাকা যাচ্ছিল না। সুবিমল সম্ভবত সেটা লক্ষ্য করল না। ওর দিকে সামান্য সরে এসে চাপা গলায় বলল,

—ঘন্টা দেড়েক আগে পাড়ায় জোর এ্যাকশন হয়ে গেল, ভাগ্যিস কিছুটা পরে এসেছিস। জীবন অতিষ্ঠ করে দিল ভাই। ছাপোষা লোকদের ছেলেপুলেদের নিয়ে শান্তিতে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন।

সুবিমলের বসার ঘরটি ছোট, একপাশে সরু তক্তপোষ পাতা, এপাশে পুরনো আমলের কাঠের চেয়ার টেবিল দুটো। একটা ছোট্ট কাঁচ লাগানো বই রাখার আলমারি। ঘরের একপাশে জুতো ছাড়ার জায়গা। তক্তপোষটিতে রাতের বেলা সুবিমলের বাবার শোয়ার ব্যবস্থা।

—বৌদি কোথায়? মিহির অন্দরে ঢোকার দরজার দিকে তাকাল।

—নিশ্চয়ই তাঁর পীঠস্থানে অর্থাৎ রান্নাঘরে। সুবিমল কৌতুক করে হাসলে। যা না, ভেতরে সবাই আছে! আমিও আসছি, হাতের এই কাজটা সেরে।

ওদের অন্দরে মিহিরের অনেক দিনের যাতায়াত। সুবিমলের অনুপস্থিতিতেও ও অনায়াসে ওদের ঘরদোর এমন কি রান্নাঘরেও অবাধে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। তবু আজ ওকে ভেতরে পাঠাবার জন্য সুবিমলের

সৌজন্যমূলক অনুরোধটুকু কানে বাজল। বস্তুত ইদানিং কয়েক দিনের মধ্যে যখনই ও এদের বাড়ীতে এসেছে, এরা যেন অতি-মাত্রায় আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। হয়ত এর কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে মিহির বেশ অস্বস্তিই বোধ করে।

ভেতরের দরজাটা দিয়ে ঢুকতে বাঁদিকে রান্নাঘর চোখে পড়ে। রান্নাঘরে শোভনাকে দেখে বেশ সহজ হয়ে নিল মিহির।

—প্রসাদ-টসাদ কিছু পাওয়া যাবে নাকি দেবী। মিহির ঠাট্টা করল।

—প্রসাদ কেন। ভোগের আয়োজন তো সম্পূর্ণ, দয়া করে গ্রহণ করলেই কৃতার্থ হবো। শোভনা উঠে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাসল। শোভনা হাসতে পারে খুব মিষ্টি করে। মিহির ভাবল সেই জন্যই সম্ভবত সুবিমল স্ত্রীকে এত ভালবাসে। ভেবে মিহিরও হেসে ফেলল।

—হাসছেন যে।

—এমনি। আপনাকে দেখে হাসি আসে, মনের মেঘ কেটে যায়।

—আহা আমি কি সার্কাসের জোকার। শোভনা কৃত্রিম রাগ দেখাল।

—না, আমি তা বলিনি।

—খুব হয়েছে, এখন ভেতরে চলুন। চায়ের জল ফুটে এল বোধহয়। শোভনা খুব সুস্মিত ভঙ্গিতে ওকে ভেতরের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিল তারপর আবার ফিরে এল রান্নাঘরে।

ভেতরে পাশাপাশি দুখানা ঘর। সুবিমলের বৃদ্ধ বাবা একটা আরাম চেয়ারে বসে আছেন। মাথার চুল সাদা, তবু একদা সুপুরুষ ছিলেন বোঝা যায়। সুবিমল মঞ্জু বা রত্না কেউই বাবার রঙ চেহারা পায় নি। সেকথা বললে মঞ্জু প্রথমে কৃত্রিম রাগ দেখায়, তারপর হেসে বলে

—খুব হয়েছে না হয় আমি কালো, তবু তো এই অসুন্দরের জন্যেই পাগল হলে।

একান্ত নির্জনে মিহিরের মুখোমুখি বসে এ সময় মঞ্জুর ভঙ্গিটা কেমন অহঙ্কারী হয়ে ওঠে, ভাবল মিহির, সারা মুখে ওর কেমন একটা দীপ্ত আভা ছড়ায়।

—কি খবর, মিহির বাবা মা সব ভাল তো?

সুবিমলের বাবার প্রশ্নে মন থেকে মঞ্জুর চিন্তা সরিয়ে তাকাল মিহির। আজ-কাল উনি মিহিরের বাবা মার খোঁজ নেন। ঠোঁট টিপে হাসিটা গিলে ফেলল মিহির। একটান বিড়ি খেয়ে উনি সামান্য জোরে বললেন,—

—বউমা মিহির আইছে, অরে চা দ্যাও। তা বসো মিহির, দিনকয় অইলো তোমারে দেখিনা ক্যান?

আগেও মিহির খুব একটা নিয়মিত বা ঘনঘন এ বাড়ীতে আসত না। এখন সম্ভবত দেরী করে এলে এ'রা সংশয়ে পড়ে যান।

—প্রায়দিনই অফিস থেকে বেরুতে দেরী হয়ে যায় এদিকে আর আসা হয় না। মিহির কোন মতে বলল। ঘরের চারিদিকে অকারণ দৃষ্টি বোলাল, দেয়ালে দুটো ক্যালেণ্ডার সামান্য হাওয়ায় নড়ছে। দু-চারটি আসবাব, সুন্দর করে ঝাড়ামোছা তবু রং ওঠা শ্রীহীন অবস্থা এদের স্বল্প জীবিকার কথা প্রচার করে।

—দ্যাশের যা অবস্থা হইছে না, সুবিমলের বাবা আলোচনা সুরু করার মত বললেন, আমাগো মতন সাধারণ লোকেরা যে কি কইর‍্যা সংসারপাতি করুম।

—তা যা বলেছেন জ্যাঠামশাই। মিহির সায় দিল, নিজের উক্ত জ্যাঠামশাই কথাটা কি রকম কানে বাজল খট করে। এখনো পর্যন্ত মঞ্জুর বাবাকে ঐ বলেই ডাকতে হচ্ছে।

—যখন তখন পাড়াঘরে পুলিশের যাতায়াত, বৃদ্ধ হঠাৎ গলাটা নীচু করে বললেন, আর পোলাপান গুলোও হইছে তেমন।

ও'র বক্তব্যের মাঝখানে মিহিরের মনে সহসা সমীরের মুখখানা ভেসে উঠল। কাউকে মন খুলে বলতে পারে না, তবু ছোট ভাইটার চালচলন নিয়ে সর্বদা ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিতে ভোগে মিহির।

—বাবা এতদিন দেশছাড়া, তবু কথার টানটা আর ত্যাগ করতে পারলেন না। কত চেষ্টা করলাম এদেশী ভাষা রপ্ত করাতে' শোভনা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠল।

পুত্রবধূর কথায় মৃদু হেসে ফেললেন বৃদ্ধ, তারপর চা নিলেন।

—আপনি ও ঘরে চলুন, ও ঘরেই সকলে চা খাব। শোভনা মিহিরকে বলল।

—আয় মিহির দেখি তোর দেবী কি খাদ্যবস্তু জোগাড় করেছেন। সুবিমল দরজার কাছ থেকে ডাকল। অতঃপর উঠে পড়ল মিহির। ওদের সঙ্গে পাশের ছোট ঘরে এল। এ ঘরটায় মঞ্জু ও রত্নার বসবাস পড়াশোনা সবকিছু। একটা ছোটখাট ছোট স্টীলের টেবিল চেয়ার আয়না, তাকের ওপর চামড়ার সুটকেশ ও জয়পুরী ফুলদানী ইত্যাদি ছিমছাম সজ্জায় ঘরখানা মানানসই লাগে। অবশ্যই এসব শৌখিনতার সুযোগ সুবিমলই বোনদের দেয়।

বস্তুত বোনদুটিকে সে যথেষ্ট ভালবাসে এবং এদের ভবিষ্যৎ ভেবে সে সর্বদাই চিন্তাকুল।

চেয়ার টেবিলে মুখোমুখি বসে মঞ্জু রত্না দুই বোন। পড়ছিল অথবা সম্ভবত ঠাট্টা-তামাশা করছিল। কারণ একপলকে মিহিরের চোখে পড়ল রত্নার ঠোঁটে মিটমিটে দুষ্টু হাসি। আর মঞ্জুর মুখভাবে নিঃশব্দ লজ্জা ও ভাললাগার উত্তাপ। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়াল। শোভনা টেবিলের উপর জলখাবারের পাত্রটা রেখে মঞ্জুকে বলল

—রান্নাঘর থেকে চায়ের ট্রে-টা আনো ত মঞ্জু।

মঞ্জু বেরিয়ে যেতে সুবিমল সামান্য হেসে বলল,

—মঞ্জুটা একেই লাজুক, তার ওপর বিয়ের কথাবার্তা হতে একেবারে জড়সড় হয়ে গেছে।

—উনি অন্তঃশীলা, রত্না ঠাট্টা করে উঠল, তলে তলে সবকিছু ঘটিয়ে রেখে ওপরে মুখ ঢাকেন।

—তুমি থামো রত্না, শোভনা হাসতে হাসতে কৃত্রিম ধমক দিল, তুমি যা মুখরা ও রকম কিছু ঘটালে তুমি নিজেই খবরের কাগজে ছাপাবে তা বুঝতে পারছি।

—বৌদি আমায় ঠিক চিনেছে, রত্না হি হি করে হেসে উঠল।

এদের পরিহাস কৌতুকের মাঝখানে পড়ে মিহির ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করছিল।

মঞ্জুর টেবিলের ধারে খোলা জানালা দিয়ে গলিপথের অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। সামনে কোন উঁচু বাড়ী না থাকায় এখান থেকে একচিলতে শ্লেটরঙা আকাশ নজরে আসে। চেয়ারে বসে বসে সেই কালচে আকাশ ও দ্যুতিমান নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন একটা শূন্যতার ভাব বুকের ভেতর উপলব্ধি করল মিহির। এই তার প্রিয় ঘর, এই সব আত্মীয়সম মানুষগুলি ও তাদের হাসি কলরব, কিছুই যেন এই মুহূর্তে তার সেই শূন্যতাবোধকে ভরিয়ে তুলতে পারছিল না। বস্তুত এই মুহূর্তে মিহির বাড়ী ফিরে গিয়ে তার নিজের সেই ছোট্ট শ্রীহীন ঘরখানায় দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিল। এবং ভাবতে ভাবতেই ঘরের মধ্যে মঞ্জুর অস্তিত্ব টের পেল ও।

চা খেতে খেতে নানারকম আলাপ-আলোচনা, হাসিগল্প চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা, বিশেষত রত্না এদের মধ্যে খুব সপ্রতিভ এবং সর্বদাই মজার মজার বিষয় অবতারণা করতে পারে। মিহিরও হাসছিল এদের সঙ্গে, টুকরো আলোচনায় যোগ দিচ্ছিল। শুধু স্বাভাবিক লজ্জায় মঞ্জু চুপচাপ। মিহিরের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল না পর্যন্ত। কথার অবসরে দু-একবার কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল মিহির, তারপর বলে উঠল,

—এবার উঠব আমি, বেশ রাত হয়ে এল।

—হ্যাঁ, গলিটা আবার যা অন্ধকার হয়ে আছে। দাঁড়া, তোকে এগিয়ে দেব।

—দরকার নেই, আমার চেনাপথ, বেশ চলে যেতে পারব।

মিহির হাই তুলে বলল, ওর শরীরে খুব ক্লান্তি আসছিল।

—দাঁড়া না, সুবিমল প্রায় ধমক দিয়ে উঠল। জোর দিয়ে বলল, একটু অপেক্ষা কর, এক্ষুনি আসছি আমি, টর্চ নিয়ে গলির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দেব'খন।

সম্ভবত কোন অসমাপ্ত কাজ মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুবিমল। শোভনা উঠে গেছে আসর ছেড়ে।

এখন রত্নাও শূন্য চা ও খাবারের কাপ-ডিশগুলি ট্রের ওপর গুছিয়ে নিয়ে, বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে মঞ্জু ডাকল,

—কোথায় যাচ্ছিস।

—এগুলো সরিয়ে রেখে আসি। বলে অন্তর্হিত হল রত্না। ওর চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা বেশ অর্থবহ মনে হল মিহিরের কাছে। এসবের প্রয়োজন ছিল না। মনে মনে ভাবল মিহির। এতক্ষণ সবার মধ্যে থেকে মনের ভেতর সূক্ষ্ম একটা ভাললাগা বেশ দানা বেঁধে উঠছিল। মঞ্জুর নিকট-সান্নিধ্যে থেকেও ওকে কাছাকাছি পাচ্ছি না, এরকম একটা নিরুপায়তার বোধ মধুর ব্যথার মতন মনে মনে উপলব্ধি করছিল মিহির। অতঃপর সুবিমলরা যে ওদের এমন একা করে রেখে নিভৃতির সুযোগ দিয়ে গেল, এটা হঠাৎ মিহিরের কাছে অদ্ভুত ও বিসদৃশ ঠেকল। সুবিমল কোন মতে তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় এবং সেকারণ ওরা সবাই মিলে যথা-সম্ভব দ্রুত মঞ্জুকে তার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে এই ধারণাটা তার মনে প্রকট হয়ে উঠল। অথচ, মিহির ভাবল, চূড়ান্ত পর্যায়ে কথা দেবার আগে মিহির ও মঞ্জুর মেলামেশা নিয়ে সুবিমল দু-একবার বেশ বিরক্তিও প্রকাশ করেছিল। যাকগে, মিহির ঠোঁটে সামান্য হাসির রেখা টেনে ভাবনা-গুলোকে ঝেড়ে ফেলল, তারপর তাকাল মঞ্জুর দিকে। মঞ্জু খাটের ওপর বসে অযথা মনোযোগে সেলাই করছিল।

মিহির ডাকল, মঞ্জু!

—তুমি এখনো এভাবে এ বাড়ীতে আসবে?

কৃত্রিম রাগের গলায় বলল বটে মঞ্জু তবু ওর চোখেমুখে খুশী ঝলসাচ্ছিল।

—তোমাকে দেখব বলেই তো আসি।

চোখের দৃষ্টি পেলব করল মিহির, গলার স্বরে আর্দ্রতা আনল।

—এরপর দেখে দেখে বিরক্তি এসে যাবে'খন।

—ভবিষ্যতের খাতাটা এর মধ্যেই দেখে রেখেছ বুঝি?

মিহির চেয়ার থেকে উঠে দু'পা এগিয়ে গেল ওর দিকে।

—দাদা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, মঞ্জু চাপা গলায় বলল, এখন থেকেই জিনিষপত্রের ফর্দ শুরু করেছে।

—আর তুমি?

—বয়ে গেছে, মঞ্জু ঠোঁট ওল্টালো।

ওর সেই ফোলানো ঠোঁট সলজ্জ হাসি ও চোখের কটাক্ষে মিহির আশা আনন্দ কামনা-বাসনার আশ্চর্য ছবি দেখল। শুধু মিহিরের জন্যেই নয়, ওর সমস্ত সত্তা যেন এই মুহূর্তে জীবনের যাবতীয় পাওনা বুঝে নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

—সুবিমলকে আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলো, আগে ঘরদোর গোছাই তবে তো ঘরণীকে নিয়ে যাব। মিহির ঊর্ধ্বে পুরনো সিলিং-এর দিকে চেয়ে বলল।

—নিশ্চয়ই, আমারো তাই মত, সাজানো গোছানো ঘর নইলে মনই উঠবে না আমার, বলে পরিচিত সেই অহংকৃত হাসি হাসল মঞ্জু।

—এখন যাই তাহলে, মিহির আলতো হাতে মঞ্জুকে ছুঁতে গেল।

—কি হচ্ছে—শাসন করে একটু সরে বসল মঞ্জু।

মিহির জানে এখন কেউ আসবে না এদিকে। রান্নাঘর থেকে শোভনা ও রত্নার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মঞ্জুর ছোট্ট ঘরে আলো উজ্জ্বল, খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস কেমন নিঃশব্দে সারা ঘরে বিস্তৃত হচ্ছে। এখন মিহিরের বেশ কাছাকাছি মঞ্জুর নরম শরীর, শান্ত মুখ, চুল, হাসি, চোখের ঝিলিক —যেসব উপাদান মিলিয়ে তৈরী মঞ্জুকে সে অসম্ভব ভালবাসে। মিহিরের ইচ্ছে হল মঞ্জুর চুলের মধ্যে সামান্যক্ষণ মুখ ডুবিয়ে রাখে অথবা দুটো বাহুমূলে শক্ত করে ধরে ওকে বুকের একদম কাছে টেনে আনে। ইচ্ছেগুলো মনের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠতেই সহসা মিহির বলে উঠল,

—যাই, মঞ্জু কেমন? তারপর সুবিমলকে ডাকতে ডাকতে ঘরের বাইরে চলে এল।

এখন রাত ঘন হয়ে আসছে। জানলার বাইরে পথের মিটমিটে আলোয় কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে কেমন মলিন জড়ভূত অস্তিত্ব মনে হচ্ছে। মৃদু হাওয়ায় শরীরে ঈষৎ শীত বোধ হওয়ায় মিহির জানলা থেকে সরে এল। তার-পর দেয়ালে টাঙানো ছোট্ট চৌকোনা আয়নায় নিজের মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে ডেকে উঠল,

—মা।

মা কাছাকাছি ছিলেন। মিহিরের ডাকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—কি বলছিস, মন্টু?

—সমীরকে দেখিনা কেন বলত?

—দুদিন পর এইমাত্র বাড়ী ফিরল ছেলে, মা ভারী গলায় উত্তর দিল।

—দুদিন পর। আশ্চর্য বিমূঢ়তায় মার মুখের দিকে তাকাল মিহির, তার মানে ও বাড়ীতেই ছিল না? কোথায় গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল তা তোমাকে?

—বলেছিল দুদিন বাড়ী ফিরবে না।

কোথায় গিয়েছিল তা জানি না। আজকাল কোন কথার উত্তর দেয় না ও।

—অদ্ভুত, মিহির দাঁত চেপে জ্বলে উঠল, আমাকে জানাওনি কেন কথাটা?

—জানিয়ে কি হবে, মা যেন কিছুটা অসন্তোষের স্বরে বললেন, আর তাছাড়া ওর খোঁজ তুইও তো রাখিস না।

—বাঃ, বাপ্পো বিরক্তিতে উচ্চারণ করল মিহির, তারপর আরও কড়া কিছু বলতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল মা ঘরের বাইরে চলে গেলেন। অত্যন্ত অসহিষ্ণু মন নিয়ে পায়চারী করতে করতে বাইরে এসে দেখল দাদার ঘরের সামনে করুণার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সমীর কথা বলছে।

—সমীর, বেশ ভারী গম্ভীর গলায় ডাকল মিহির।

সমীর ফিরে তাকাল, চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে।

—তুই দুদিন বাড়ী ছিলি না?

—শুনেছ তো। সমীর স্বাভাবিক চাপা গলায় অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিল।

—কোথায় ছিলি দুদিন?

মিহির দালানের ম্লান আলোয় খুঁটিয়ে সমীরকে লক্ষ্য করছিল, উঠতি বয়সের অমন সুন্দর ঝাড়ালো চেহারাটা ক্রমশ কেমন যেন কোলকুঁজো পাকানো গোছের হয়ে যাচ্ছে। চুল বড় বড় অবিন্যস্ত, প্যান্টের পা সরু হতে হতে বকের ঠ্যাং-এর আকার নিয়েছে। ওকে দেখে অকারণে মিহিরের বুকের ভেতরে মৃদুভাবে মোচড় দিয়ে উঠল। ছোটবেলায় মিহির ওকে অসম্ভব ভালবাসত। ওর যত আবদার সবই ছিল মিহিরের কাছে। সময়ের করাত কি রকম অজ্ঞাতে সম্পর্কটাকে চিরে চিরে ক্রমশ দুজনকে তফাৎ করে দিচ্ছে।

—কথা বলছিস না যে সমীর? মিহির সামান্য চাপা ঋজু গলায় বলল,

তোর চালচলন আজকাল মোটেই ভাল লাগে না।

সমীরের চোখেমুখে ঠোঁটে যেন একটা ঔদ্ধত্যের হাসি স্বল্প আলোতেও দেখা গেল. মাথা নীচু করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হঠাৎ সমীর বলে ফেলল,

—এই বাজারে যে যার নিজের চরকায় তেল দেওয়াই ভাল, সবাই তাই করে থাকে।

—সমীর, প্রচণ্ড রাগে গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠল মিহির, তার সামনে এখন সমস্ত পৃথিবীটা উত্তেজনায় ঘূর্ণপাক খাচ্ছিল। সে কি করবে ভেবে পাবার আগেই করুণা এসে তাকে হাত ধরে ঘরে টেনে আনল। কি রকম বিমূঢ়ের মতন চেয়ারে বসে পড়ে করুণার দিকে তাকিয়ে রইল মিহির। এমন সব আশ্চর্য ঘটনাও যে ঘটতে পারে তা যেন মিহির এই প্রথম বুঝল।

—কি দরকার তোমার অমন গায়ে পড়ে কথা বলবার? করুণা বোঝাতে চাইল ওকে।

শুনে বিরক্ত দৃষ্টি মেলে চাইল মিহির।

—প্রয়োজন হলে ওকে আমি শাসন করব এটা কি খুব আশ্চর্য ব্যাপার নাকি?

—না, প্রয়োজন নেই, করুণা বেশ দৃঢ় গলায় বলল, সমীর এখন বড় হয়েছে, নিজের ভাল-মন্দ বোঝে, তুমি কেন অযথা ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাও? তাছাড়া এমনিতে সংসারে তোমার সঙ্গে ওর সম্পর্কই তো প্রায় নেই।

সেটা ইদানিং হয়েছে, মিহির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, তারপর খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। মিহিরের ঘরের মুখোমুখি ছোট্ট উঠোনের ওপাশেই অধীরের ঘর। ওঘরেরও দরজা খোলা, পর্দা সরানো। মিহির দেখল দাদা নিজের খাটের ওপর চোখে আড়াআড়ি হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। অর্থাৎ সমীরের ব্যাপারে দাদারও কথা বলার প্রয়োজন নেই। যেহেতু সেও নিজের চরকাতেই তেল দিচ্ছে এ পর্যন্ত। টেবিলে কনুই রেখে হাতের মুঠোয় চিবুকের ভর দিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল মিহির। ওকে শান্ত ও নীরব হতে দেখে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল করুণা। একটু পরে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল মিহির। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। পথের আলোগুলি ক্ষীণ। রাত বেশ গভীর হওয়ায় সরু রাস্তাটা নির্জন। কদাচিৎ একটা রিকসা অথবা মোটরের চলাচল দেখা যাচ্ছে। ম্রিয়মান আলোয় কৃষ্ণচূড়া গাছের অস্তিত্ব ধূসর, প্রেতায়িত। ফুলগুলি বর্ণহীন কালচে। মিহির শরীর টান করে আলস্য ছাড়াল। হাই তুলল দুবার। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। বন্ধ দরজার ওপাশে বাড়ীর ভেতর আর কোন সাড়াশব্দ নেই। সম্ভবত শুয়ে পড়েছে সবাই। মিহিরের কিন্তু লেশমাত্র ঘুম ছিল না। অদ্ভুত সমস্ত চিন্তায় ওর মাথাটা ভার হয়েছিল। আশ্চর্য, সমীর এমন উদ্ধত ভাঙ্গিতে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলল অথচ তা নিয়ে এতটুকু আন্দোলন হল না সারা বাড়ীতে। এমনি ঘটনাটা নিয়ে মাও কোন রকম উচ্চবাচ্য করলেন না। মিহিরের কাছে দু-একটা কথা আলোচনার জন্য একবার এসে দাঁড়ালেন না পর্যন্ত।

শুয়ে থাকতে ভাল লাগল না বলে মিহির বিছানায় উঠে বসল এবার। রগ দুটো টিপে ধরল দু আঙ্গুলে। আজকের ব্যাপারটা ভেতরে যেন রীতিমত নাড়া দিয়েছে মিহিরকে, এবং এর খুঁটিনাটি ভাল করে লক্ষ্যও করেছে মিহির। তার মনে পড়ল একটু আগে তার টেবিলে গ্লাসে করে রাতের জল রেখে যাওয়ার সময় গুণগুণ করে গান গাইছিল সবিতা। দাদা যথারীতি নিশ্চুপ। বৌদি বাচ্চাদের সঙ্গে চেঁচামেচি কলরব করেছে নিয়মমাফিক। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটে যায়নি আজ সংসারে। এই সব মিলিয়ে মিহিরের বুকের মধ্যে অননুভূত একটা উপলব্ধি নাড়া দিচ্ছিল কেবল। এই সংসার থেকে আমি আস্তে আস্তে . দূরে সরে যাচ্ছি, মিহির নিজেকে শুনিয়ে বলল, অথবা এই সংসার আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমশ। আমার কোন দোষ নেই। ঘটনার অনিবার্য জোয়ারে আমরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পড়ছি। এসব ভাবতে ভাবতে অকারণেই ঠোঁটের কোণে হাসি এল মিহিরের। তার মনে পড়ল, যেদিন সে বিয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে, তারপর থেকেই কেমন অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে তফাৎ করে দিয়েছে তাকে। অথচ ছেলেদের মধ্যে এই মিহিরের ওপরই মা-বাবার আস্থা বেশী। বস্তুত মিহিরই এই বাড়ীর কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি, আশা ভরসা সব। বাবা বহুদিন রিটায়ার্ড, রুগ্ন। দাদার সামান্য আয়, তিনটি পোষ্যের সংস্থান করতেই নাজেহাল। সমীর টিউশনি করে পড়ার খরচটুকু চালায় মাত্র। একমাত্র মিহিরেরই চাকরি ভাল। আয় ভাল অঙ্কের। অতএব সংসারের সব দায়দায়িত্ব এমনকি সবিতার পড়াশুনো অথবা বিয়ে দেবার দায়িত্বও সব মিহিরের। সে কারণ পরিবারের মধ্যে ওর স্থান একটু সম্ভ্রমপূর্ণ। আজ সেই স্থান থেকে নিজের বিচ্যুতি লক্ষ্য করে তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে মিহির।

রাতের হাওয়া কেমন একটা নির্জনতার স্বাদ মেখে সারা ঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাথার চুলে আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল মিহির। সিগারেট ধরাল। নিঃশব্দ পথ, বিষণ্ণ আলো, ঘুমন্ত গাছ ও নির্বাক নক্ষত্ররাজি দেখল। দেখতে দেখতে তার মঞ্জুর কথা মনে পড়ল। মঞ্জু নির্ঘাত এখন ঘুমে আচ্ছন্ন। সম্ভবত সে ঘুমোবার আগে মিহিরের কথা ভেবেছে, এবং সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবেই ভেবেছে মিহিরের ঘরের কথা। সুন্দর সাজানো গোছানো নতুন একটি জগতের স্বপ্ন দেখেছে বহুক্ষণ ধরে। কল্পনা করে বড় একটা শ্বাস ফেলল মিহির। মঞ্জুর সেই স্বপ্নের জগতের সঙ্গে মিহিরের বাস্তব পৃথিবীর একটা সংঘাত এরই মধ্যে কেমন দানা বেঁধে উঠেছে সেটা লক্ষ্য করেই হয়ত। এবং অদূর ভবিষ্যতে নিজের চারিপাশে সেই অবশ্যম্ভাবী দোটানার ছবিটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দারুণ ক্লান্ত বিরক্ত বোধ করল মিহির। নির্জন রাতের নিঃসীম একাকীত্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিহির বুকের মধ্যে সেই অদ্ভুত শূন্যতাকে উপলব্ধি করল আবার।

প্রতি পদক্ষেপে আমি ॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রতি পদক্ষেপে আমি
ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি সামনে
অনন্ত সময়ের দিকে।
আমার নিষ্কম্প্র পদক্ষেপ।

সময়ের প্রতিটি গ্রন্থিতে থেমে
জটিল প্রশ্নের সমাধান
কখনো করেছি রিক্ত হাতে,
কখনো বা এড়িয়ে গিয়েছি।
দারুণ কাজের চাপ, সমস্যা অনেক;
সময় নিষ্ঠুর বড়ো, কখনো কখনো ভয়াবহ।

কিন্তু আর ভয় নয় কিছুতেই,—
অভয় না যদি থাকে
পাশবিক নৈরাজ্যে বসতি নয়,
বাঁচতে চাই মানবিকতায়—
আদর্শে, শ্রদ্ধায়, প্রেমে, শুশ্রূষায়, স্নে[illegible]
আনন্দে, আশায়।

তাই আমার নিষ্কম্প্র পদক্ষে[illegible]
অনন্ত সময়ের দিকে।

পিঁ[illegible] পেতে রাখবো ॥

[illegible] লাইরী

নয় মাস মাঠের ভিতর তাঁবু টাঙানো ছিলো
সেই তাঁবু উঠিয়ে এখন যে-যার ফিরে যাচ্ছো
প্রতিটি মুখের উপর গুমোট মেঘ
সরে সরে

রোদ্দুর উঠছে;
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
চোখের মধ্যে চিকচিক করছে
নয় মাসের ছন্নছাড়া জীবন
পিছনে ঠেলে

পার হয়ে যাচ্ছো মেঘ বৃষ্টি বুকের কুয়
সবুজ দুর্বায় ভ'রে উঠছে ঘরের রাস্তা,
পায়ের শব্দে শুনতে পাচ্ছি
স্বাধীনতা স্বাধীনতা।
এমন উজ্জ্বল দৃশ্যের মুখোমুখি
আজ আর বলবো না, ফিরে যেয়ো না;
বরং বলবো : ভাই বন্ধু এসো
এবার আর মাঠের ভিতর তাঁবু নয়
ঘরের মধ্যে পিঁড়ি পেতে রাখবো।

আজ যদি ॥

প্রণয়কুমার কুন্ডু

আজ এই মুহূর্তেই সব যুদ্ধ থেমে যেত যদি
থেমে যেত পৃথিবীর সব রক্তক্ষয়
ঘৃণা মৃত্যু আর্তনাদ ভয়
যদি সব থেমে যেত সত্যিই যদি থেমে যেত
বোমারু প্লেনের শব্দ ট্যাংক টর্পেডো
যদি সব জমা হ'তো আগামী দিনের মুজিয়মে
কিংবা যদি মুছে যেত
পুড়ে-যাওয়া তৃণক্ষেত্র পৃথিবীর সব তৃণভূমি
যদি শস্যে পূর্ণ হতো পূর্ণ হ'তো যদি

তখনই তো
সবচেয়ে আমাদের প্রেম
পূর্ণ হ'তো এবং তখন
আমরা সব নরনারী নির্ভয়ে বাঁধতাম ঘর,
আমাদের শিশুরাও সতেজ সবুজ
অন্তত মৃত্যুর ভয়ে মাঝরাতে ভাঙতো না ঘুম
হয়ত তখন কোনো পুড়ে-যাওয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই
এক কোণে স্বপ্ন দেখে শুভ্র এক নরম ফুলের
কোনো ক্যাকটাস
হয়ত তখন বুঝি পাহাড়ের বুকে জমা কংকালগুলো
স্থির হয়ে শুয়ে থাকতো অরণ্যছায়ায়
সাত সাগরের
থেমে যেত স্নায়ু-উত্তেজনা

এবং তখন আমরা বলতে পারতাম
জ্যোতির্গময়
আমরা সব নরনারী পৃথিবীর নরনারী বৃদ্ধ শিশু সব
পরস্পর গল্প করতাম কথা পরস্পর
আমরা সব বলতে পারতাম চমৎকার দিন
মৃত-ইতিহাস ফেলে এসে
মানুষের সভ্যতার হয়ত সেই সম্ভাবিত দিনে
দাঁড়াতাম আমরা এক আকাশের নীচে
যেখানে সবুজ নীল সূর্য ইন্দ্রধনু।।

কাছের মানুষ যোগেশচন্দ্র

মিনতি মিত্র
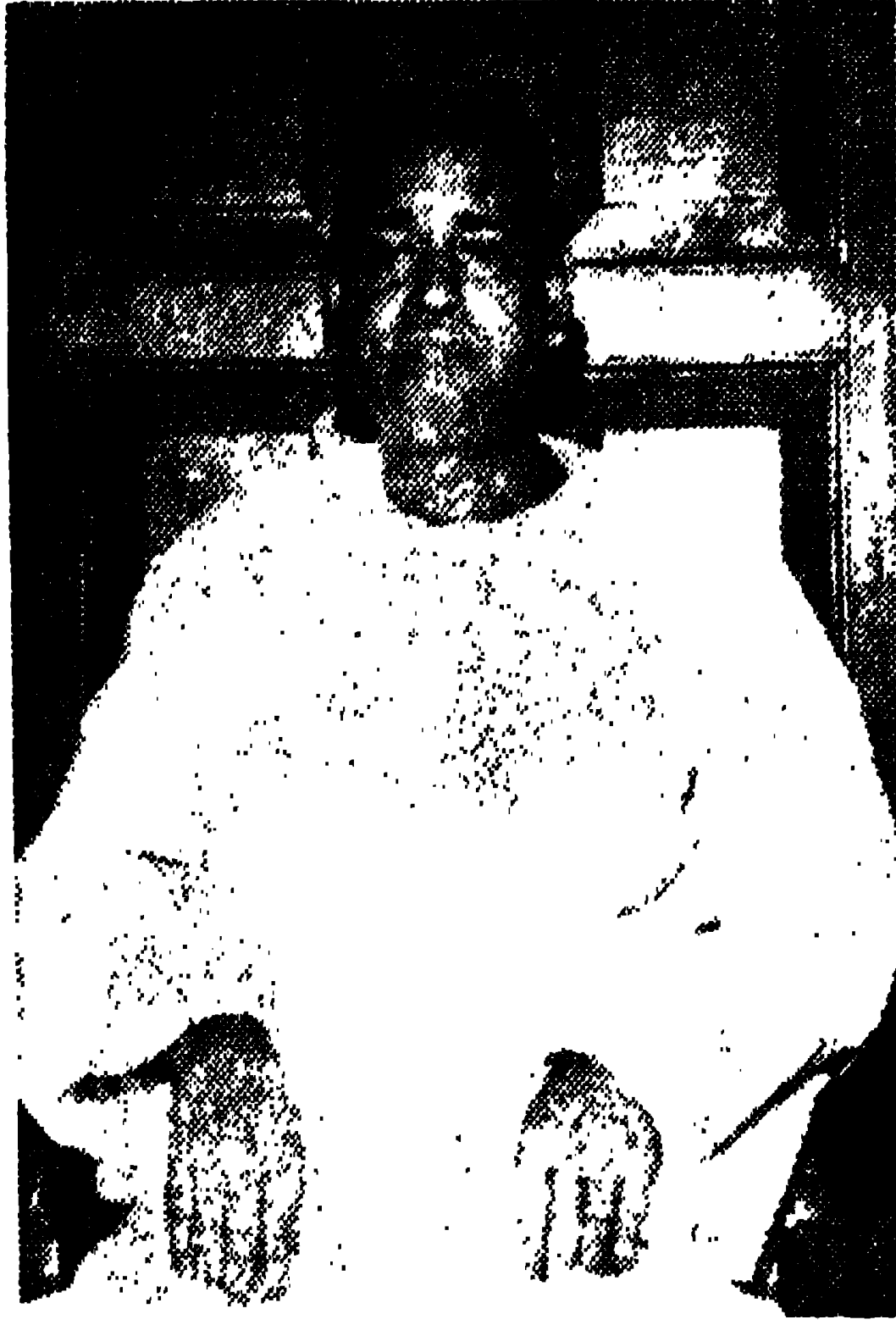
যোগেশচন্দ্র বাগল

সকালবেলায় উঠে দু-একটা টুকরো কাজ সেরে নিচ্ছিলাম। বেরোবার জন্যে এখনি তৈরী হতে হবে। দেখলাম একজন ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের বাড়ী আসছেন। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে একটু আড়ালে থেকে শুনবার চেষ্টা করলাম তাঁর কথা। তিনি উত্তেজনাবশবর্তী হয়ে সোজা একেবারে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন আর তারপরে যে সংবাদটি আমাদের দিলেন তার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। সংবাদটি হল, গতকাল রাত্রে যোগেশচন্দ্র বাগল মশাই পরলোকগমন করেছেন। অবশ্য যোগেশবাবু আজ দু মাসের ওপর হয়ে গেল ভুগছিলেন। কিন্তু ইদানীং রোগব্যাধি নিরাময় হয়ে আসছিল এবং তাঁর বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছিলাম তিনি এই সপ্তাহেই বাড়ী আসছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কি হল বোঝা গেল না। পরে জেনেছি, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, যা আমাদের সকলেরই কল্পনাতীত।

মৃত্যু সব সময়ই বেদনাদায়ক এবং সকল সময়ই আকস্মিক। কিন্তু তিনি আমাদের পরিবারের এত অন্তরঙ্গ ছিলেন যে, এই আকস্মিকতা সহজে কাটিয়ে উঠবার নয়। তিনি সকলকেই এত সহজে আপন করে নিতেন যে, একথা আমাদের কখনও মনেই আসত না, তিনি একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাই যখন যোগেশবাবু কাউকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ী চলে আসতেন, আমি যে অবস্থায়ই থাকতাম ছুটে আসতাম তাঁর কাছে এবং সাড়া দিয়ে আমার উপস্থিতি জানাতাম। খুবই বিব্রতবোধ করতাম এই জন্য যে, তাঁর এত অসুবিধে সত্ত্বেও তিনি নিজে এসেছেন। তাই নিয়ে অনুযোগ করলে তিনি বলতেন, তোমরা কাজের লোক, তোমাদের ডেকে পাঠাতে আমার ভরসা হয় না। এতে আরও লজ্জিত হতাম। মনে মনে ভাবতাম এমনি করেই বোধহয় মানুষ মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হয়। এমন মানুষ আজও আছেন এবং আছেন বলেই আমরা এঁদের যথেষ্ট মূল্য দিতে ভুলে থাকি। এঁদের লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই একটা যুগের অবসান হবে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রচারবিমুখ। তিনি অনেক মহা-মহা লোকের সঙ্গে কাজ করেছেন, অনেক বড় সভায় যোগ দিয়েছেন, বড় বড় গবেষণামূলক কাজ করেছেন—কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি হারানোর পর থেকে অর্থাৎ ইদানীং কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা হলে অথবা কোন বড় সভায় যোগ দিতে হলে তিনি বলতেন—'ওরে বাবা, ও সব মানুষ কি আমার সঙ্গে দেখা করবেন'। যদি জিজ্ঞাসা করতাম, 'একথা বলছেন কেন?' তিনি বলতেন, 'না, বড় ব্যাপারে আমার বড় ভয়, আমি এই আমার মত মানুষদের নিয়ে থাকি, সেটাই ভাল। এককালে যা করেছি তা করেছি—এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, যুগ বদলে গেছে।'

আজ প্রায় তিন বছর হল তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে গিয়েছিলেন। তার আগেও তিনি নিজের কাজটুকু নিজে করতে পারতেন। কিন্তু ইদানীং তিনি একেবারেই পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলেন। সে জন্যে তাঁর আক্ষেপ ছিল কিন্তু তিনি সোচ্চার ছিলেন না। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কাউকে দোষারোপ করা এমন কি অদৃষ্ট বা বিধাতাকে ধিক্কার দেওয়া — যা সাধারণ লোকে সাধারণ ব্যাপারেই করে থাকে তাও তিনি করতেন না। এই রকমই নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন যোগেশচন্দ্র বাগল।

আজীবন পড়াশুনো করে গেছেন তিনি। প্রবাসী পত্রিকায় কাজ করতেন প্রথম দিকে। তাঁর অনুসন্ধানী মন ঐ সময় সাহিত্যের রসধারায় সিঞ্চিত হয়। এই সময়েই বিভিন্ন সাহিত্যিক তথা স্বদেশপ্রেমিকের সান্নিধ্যে আসেন তিনি। এবং নিজের প্রকৃত কর্মক্ষেত্রটি খুঁজে পান। তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে বঙ্গভারতীর সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করে গেছেন। তাঁর কয়েকখানি বই বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যে বিষয়ে সাধারণ লোকের চোখ পড়ে না সেই সব বিষয়ের প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। প্রসঙ্গত 'বঙ্গের নব্য সংস্কৃতি' বইটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বইটি যেন তৎকালীন সভা, সমিতি বা সংস্থার প্রামাণ্য অভিধান তথা ইতিহাস। গবেষকদের পক্ষে এ বইটির মূল্য যে অপরিসীম সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দু চোখ ভরে তিনি যখন জগতের শোভা দেখতে পেতেন তখন তিনি যা কাজ করেছেন, আমার মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বার পর। ইদানীং তিনি সকালবেলায় উঠেই হাত মুখ ধুয়ে শিশুদের মত বই-পত্র নিয়ে তৈরী হয়ে বসে থাকতেন। নির্দিষ্ট সময়ে একটি ছোট ছেলে এসে তাঁকে কাগজ পড়ে শোনাত। কাগজ পড়া শোনা শেষ হয়ে গেলে আসতেন আর

একজন যিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের বা প্রবন্ধের বিভিন্ন পর্যায় লিখে নিতেন তাঁর মুখ থেকে শুনে আর লেখকের কাছে বসে তাঁকে পাঠ বলে দেওয়াই ছিল বাগল-মশাইয়ের কাজ। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করতে আসতেন অনেকেই পালা করে। সবাই এই কাজকে তাঁদের দৈনন্দিন কর্ম-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা সকলেই ভালবাসতেন তাঁদের অতি সরল, মৃদুভাষী যোগেশদাকে। তাঁর এই প্রকৃত ভ্রাতৃসুলভ আচরণে তাঁর স্মৃতি ও শ্রুতি দুই-ই খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল আর তাই কাজও এগিয়ে চলত খুব তাড়াতাড়ি। তাঁর কাছে কেউ যদি কোন জিজ্ঞাস্য নিয়ে যেত তাহলে তিনি খুব খুশী হতেন এবং তাকে সে বিষয়ের যথোচিত সন্ধান দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। পরে জিজ্ঞাসু সে প্রশ্ন ভুলে গেলেও তিনি ভুলতেন না। তিনি পুনরায় খোঁজ নিতেন, জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা মিটেছে কি না।

সাহিত্যের আওতায় চিরজীবন কাটিয়ে এসে, নিউ ব্যারাকপুরে তাঁর নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ আর একক মনে হয়েছিল। তাই অত্যন্ত সংগোপনে গড়ে তুললেন একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যিক গোষ্ঠী, নাম দিলেন 'সাহিত্যিকা'। এর নিয়মাবলীও তৈরী করলেন পুরনো কালের সাহিত্য গোষ্ঠী 'সাহিত্যিকা'র অনুসরণে। 'সাহিত্যিকা'র অধিবেশন প্রতি মাসে একবার করে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই গোষ্ঠী বা সভার অধিবেশনকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন। সব কিছু হারিয়ে তিনি একেই জোর করে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তার অবশ্যই অনেক কারণ ছিল। তবে মূল কারণ যেটি সেটি হল এর মাধ্যমে মানুষের সঙ্গলাভ। সেইটি ত চরম লাভ। অপর দিক থেকে দেখতে গেলে, এই লাভটিই পরমতম। কারণ সাহিত্যের গোড়ার কথাই ত নিকটত্ব এবং সহিত-ত্ব।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। সামান্য পোশাকপরিচ্ছদ, সাধারণ জীবনযাত্রাই ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি যখন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখন প্রায়ই তিনি বলতেন, 'তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। জীবনে ধন নয়, বিলাস নয় এই একটাই মাত্র ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে নয় আমি আর এগোই। তাই হোক।' এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়ে গেলেন। তার জন্যে তিনি কোনদিন অদৃষ্টকে অভিশাপ দেন নি। এ জন্যে আমাদের মাঝে মাঝে বিস্ময়বোধ হত। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগেও এই দৃষ্টিহীনতা মোচন করার জন্যে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ব্যগ্রতাও দেখিনি। এর একমাত্র কারণ কি সঙ্গতিহীনতা না ঈশ্বরের প্রতি অভিমান। বর্তমান সরকার যখন মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন অনেকের মনেই এই প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু তাঁর মনে এ নিয়ে কোন বিক্ষোভ কোনদিন দেখা যায় নি। তিনি কি ভক্ত সুরদাসের মত জগতের বাইরের রূপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর আরাধ্য প্রেমময়ের পূজা করতে পেরে সুখীই হয়েছিলেন?

আজকের এই শোকের মুহূর্তে বেশী কথা বলার অবসর নেই। যত দিন যাবে ততই তাঁর অনুরক্ত বন্ধু-বান্ধব, পাঠক, সজ্জন অনেক কথা বলতে পারবেন এবং বলবেন। আজ তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

সাহিত্যে সংস্কৃতি

॥ অন্তরের অন্তরালে ॥

তত্ত্বমসি। তুমিই সেই। কথাটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে এসেছে। কি সেই বস্তু, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। উপনিষদের অজস্র কাহিনী এবং উপমার জাল ছিন্ন করে সত্য বস্তুটিকে আবিষ্কার করা সহজ ব্যাপার নয়। সংশয় থাকে, মনের গহনে জেগে থাকে অনন্ত জিজ্ঞাসা। কে আমি? কোথা থেকে এলাম? জ্ঞানীরা এ প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয়ে বলবেন—এ প্রশ্ন নির্বোধের। হয়ত তাই।

তবু সন্তোষজনক জবাব কোনো কালেই মেলেনি। সাধু-সন্তদের জীবনে কোনো রহস্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে জোড়াসাঁকোয় একদা প্রভাতে রবীন্দ্রনাথের মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি লিখেছিলেন—

'প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।'

আর প্রশ্ন যখন পশ্চিম সাগর তীরে উচ্চারিত হল তখনও প্রশ্নের উত্তর পেল না দিবসের শেষ সূর্য। ওমর খইয়াম বলেছেন—'এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি শুনেছি— কিন্তু তবু বার বার সেই দোর দিয়েই বেরিয়ে এসেছি যে পথে প্রবেশ।'

একালের একজন মানুষ কিন্তু উত্তর পেয়ে গেছেন এই দাবী করেছেন। তাঁর এই দাবীর যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অবরে মেনেন, কোনো সিদ্ধ যোগী বা সাধু-সন্ত নন। হাকসলীর মতো নানা পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি কোনো এক সিদ্ধান্তে যে পৌঁছেচেন তা নয়—তথাপি তিনি যখন বলেন—আত্মানুসন্ধানের পর আত্মবস্তুর রহস্য উদ্ঘাটন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে তখন তাঁর বক্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। মিঃ মেনেন উচ্চশিক্ষিত এবং সুরসিক। অধিকাংশ সাধু-সন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেন নি কিন্তু মেনেন সুপণ্ডিত, তাই তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'দি স্পেস উইদিন দি হার্ট' নামক গ্রন্থটির যথাযোগ্য বিচার প্রয়োজন। মেনেনের এই আত্মকথা নিজের গভীরে প্রবেশ করে সেই আত্মবস্তুকে সন্ধান করার অভিযাত্রার কাহিনী এবং সেই কারণে তাঁকে অনায়াসেই সাধু-সন্তদের সগোত্র বলা যায়।

ত্রিবিংশ পোপ জনের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি নাকি এই অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন। মনে হয় অবরে মেনেনকে আশীর্বাদ দেওয়ার সময় তিনি হয়ত সুপাত্র বা অপাত্র বিচার করেন নি। মিঃ মেনেনকে পোপের কাছে ইংরেজ বলে পরিচিতি দান করা হয়েছে। মিঃ মেনেনের পিতৃদেব ভারতীয় এবং জননী ছিলেন আইরিশ রমণী। তিনি নিজে কি? আইরিশ-না-ইনডিয়ান? পোপ জন ঠিকই বুঝেছিলেন, তাই অবরে মেনেন যখন হাঁটু মুড়ে বসে মহামতি পোপের করাঙ্গুলি চুম্বন করছিলেন তখন তিনি বললেন—

"Look at those bones, Look at those eyes! My son, you are Indian, are not you?'

মিঃ মেনেন মনে ভাবলেন যে, পোপকে বলা ঠিক হবে না যে, আংশিকভাব তাঁর অনুমান সত্য। পোপকে সংশোধন করার রীতি নেই, বিশেষ করে তিনি যখন কোনো মতামত দেন, তাই মেনেন ভাবলেন অস্থি এবং চক্ষুর চেয়ে দূরে তিনি যাবেন, মনের গহনে অবগাহনে সত্যকে সন্ধান করে আবিষ্কার করবেন আমি কে? বুদ্ধ—যিনি সিদ্ধার্থ তিনি বোধি বৃক্ষের তলায় বসে তপস্যা করেছিলেন, জ্ঞানের সন্ধান করেছিলেন। রোমের পিয়াজা ফারনেসের কক্ষে নিজেকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন মেনেন। বর্তমান কালেও এই কক্ষ সত্যসন্ধানী মানুষের পক্ষে এক উত্তম পরিবেশ বলা যায়। সেই কক্ষে বসে মাঝে মাঝে 'ফেটুচিনি' এবং রোমান ব্ল্যাক কফি পান করে মেনেন তাঁর সাধনায় ব্রতী হলেন। আত্মানুসন্ধানে যথাযথ পদ্ধতি কি তার ইঙ্গিত মেনেন দেন নি। কিপলিঙের 'কিম'-এ লামা আরো কঠোর পথে সাধনা করেছেন। বেচারী লামা যখন কার্য কারণ ইত্যাদি সন্ধানে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি এক বৃক্ষকোটরে প্রবেশ করে অন্ন জল ত্যাগ করে দু দিন ধরে কঠিন তপস্যা করলেন, প্রাণায়ম করলেন বার বার—

'inbreathing and over breathing in the prescribed manner.'

এ সব নিরর্থক ব্যাপার নিয়ে মেনেন মাথা ঘামান নি। তাঁর মতে আত্ম-সন্ধানীর পক্ষে নির্জনতার প্রয়োজন নেই। মনোরম পরিবেশে প্রচুর গ্রন্থাদিতে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা, কিম্বা চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, স্মারকচিহ্ন ইত্যাদি কোন কিছুই সাধনার পক্ষে প্রতিকূল নয়। আসল কথা হল নিজের কামরায় আবদ্ধ থাকা, সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরের লোকজনের দ্বারা বিঘ্নিত না হওয়া। উপবাস, মিঃ মেনেনের মতে নিরর্থক অনুশীলন। সে যাই হোক, সমগ্র গ্রন্থটি পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং সহজ ভঙ্গীতে বিধৃত। মেনেনের পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম আত্মাবিষ্কার কর্মটি সমাধা করতে হবে, তার পর সব বেশ সহজ। এই কাজটি শেষ হলে আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিকে আরো কয়েকটি দৃঢ়তর প্রক্রিয়া সাধন করতে হবে—

'He should eat and drink a bare minimum. He should not fast, because fasting draws back his attention to the body and his aim now to forget it He must eliminate all the small things that add to his bodily comfort—the hot bath. the comfortable chair, the too comfortable bed, Above all he should fight down

the demand to exercise, to go out into the world and strech his legs. He should lie relaxed in his room and stay there.'

কিন্তু ধরুন এই রকম একটি নিরিবিলি কক্ষ পাওয়া গেল, এক প্লেট ইতালীয় খাদ্য পদার্থ ফেটুচিনিও সংগ্রহ করা গেল—কিন্তু ততঃ কিম? তারপর যা হয় তা হল মিঃ মেনেনের মতে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত—

'One by one you strip away those parts of your personality which consist of the things that you do because the world taught you to do them—"

পেঁয়াজের খোসার মত জীবনের বিভিন্ন স্তরও ছাড়ানো হয়ে যাচ্ছে. বাল্যে পিতামাতার উপদেশ, বিদ্যাশিক্ষা, কর্মজীবন সামাজিক প্রতিষ্ঠা.—সবই এইভাবে পেঁয়াজের ছাড়ানো খোসার মত খসে পড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরূপ উপমা দিয়ে প্রায় অনুরূপ উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখ কর্তব্য।

এর পর আসছে ব্যক্তিগত ব্যাপার—আপনার গোপন আশা, আপনার ভয়, আপনার স্বপ্ন ইত্যাদি,—এরাও বিসর্জিত হবে। এরপর আসবে আপনার প্রেমলীলা, যৌনজীবন প্রভৃতি। মিঃ মেনেন বলছেন—এ সবও বিসর্জিত হবে। এইভাবে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এক সময়ে একেবারে সেই বস্তুতে পৌঁছানো যাবে। — উপনিষদের মতে — 'হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ ভূমি'—এক মহাশূন্য।

আর কোনো বাধা নেই, আপনার উত্তরণ সম্পূর্ণ।

এই যে পৌঁছে যাওয়া, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানোর এই ব্যাপারটি আরাম কেদারায় উপবিষ্ট অভিযাত্রীর পক্ষে কত সহজ। সমরসেট মমের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'রেজারস এজে'র নায়ক লারীকে অনেক কঠোর পন্থায় তার ব্যক্তিজীবনের অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে রমণা মহর্ষীর আশীর্বাদে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হয়েছে। মেনেনের কোনো গুরুর প্রয়োজন হয় নি, তিনি একাই সব কিছু করেছেন, তবে স্বীকার করেছেন যে, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণকৃত 'ছান্দোগ্য উপনিষদে'র অনুবাদ থেকে সাহায্য পেয়েছেন।

এই সব নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনের পর আত্মানুসন্ধানীর আরো করণীয় আছে—

Then he should shut himself alone in some quiet place and think.'

এর পরই লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানো সহজ হবে।

মিঃ মেনেনের এই 'কনফেস্যন'—(স্বীকারোক্তি কথাটি প্রতিশব্দ হিসাবে যথাযোগ্য নয়) বিশদ বিবরণসহ লিখিত। প্যারিসের বই-দ্য-বুলোর বনবীথির নিবিড় ছায়ায় তিনি প্রথম যেদিন ট্যাকসির গহ্বরে প্রেমলীলা করেছিলেন তার বিস্তারিত কাহিনী যেন সেন্ট আগস্টিনের পাপ স্বীকার ঘটিত উক্তির মতোই চমকপ্রদ। মিঃ মেনেন অবশ্য সেন্ট আগস্টিনের পাপকে তেমন গুরুত্ব দিতে পারেন নি। তিনি বৃহত্তর পাপের সন্ধানে ঘুরেছেন। বৃহত্তর সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে সংঘর্ষে তাঁর অত্যধিক আগ্রহ।

পাপবিশ্ব পাশ্চাত্য অভিমানী কিম্বা ময়ূরপুচ্ছধারী মিঃ মেনেন মস্তক মুণ্ডন না করে ছুটেছেন সাইকিআট্রিস্টের চেম্বারে মনঃসমীক্ষণের প্রয়াসী হয়ে। এটা তাঁর য়ুরোপীয় সত্তার কান্ড, আবার প্রাচ্যদেশীয় সত্তা ধর্ম এবং গুরু অনুসন্ধানে মিঃ মেনেনকে আগ্রহী করে তুলেছে।

মিঃ মেনেন কার্থলিক ধর্মাশ্রয়ী হয়ে তাঁর পাপের কনফেস্যন শুরু করলেন একদিন অপরাহ্নে নির্জন সিসটিন চ্যাপেলে মঁসিয়ে ও' হ্লাহার্টির কাছে। মিঃ মেনেন স্বীকার করলেন তাঁর সমকামিত্বের অপরাধ। মিঃ মেনেন লিখেছেন — মঁসিয়ে ও' হ্লাহার্টি সেই বিশাল সিসটিন চ্যাপেলে ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা নগ্ন বালকদের ছবি, রোমের জনপথে তারা ঘুরে বেড়াত। মঁসিয়ে ছবির দিকে লক্ষ্য করে বসলেন।

That's no problem at all or they would not be there!'

মিঃ মেনেন পুরোহিতের এই প্রজ্ঞায় সচকিত হয়ে উঠলেন এবং সেন্ট আগস্টিন-এর 'দি সিটি অব ফ্রিডমে'র অতিরিক্ত কিছুর সন্ধানে ব্রতী হলেন। এমন সময় মৃত পিতার উপদেশ মনে পড়ল। তিনি 'উপনিষদ' সংগ্রহ করে তার পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন। সন্ধান করতে লাগলেন সেই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর—কে তুমি: পিয়াজা ফারনেসের সেই নির্জন দিনগুলির অবসানে তিনি নাকি উত্তর পেয়ে গেলেন।

এই কথা বলতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা কম! বুকে হাত রেখে কজন সত্য কথা উচ্চারণ করতে পারে?

তিনি বলছেন উপনিষদের উপদেশ তাঁর জীবনে কার্যকর হয়েছে, কারণ তা যদি না হত তাহলে তিনি এই গ্রন্থ লিখতেন না।

মিঃ মেনেন একজন প্রখ্যাত উপন্যাসকার। তাঁর রচনা বিতর্কমূলক। এই স্মৃতিকাহিনীও তাই বিতর্কের ঝড় তুলেছে।

—অভয়ঙ্কর

THE SPACE WITHIN THE HEART: By AUBREY MENEN: Published by Mcgraw-Hill: Price —$5.95 only.

সাহিত্যের খবর

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী স্মরণসভায়

ঢাকার রেসকোর্স। তার কাছেই বাংলা একাডেমি। আর সেই একাডেমির সামনেই হাজির হলেন বাংলাদেশের অগণিত বুদ্ধিজীবী, পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকজন। কারো চোখে জল, কারো বা চোখে ঘৃণার ছায়া, ক্রোধের আগুন। বেদনামথিত সে-এক আশ্চর্য পরিবেশ। প্রিয়জন হারানোর শোকম্লান পরিবেশ। এরই মাঝে অনুষ্ঠিত হল বুদ্ধিজীবীদের স্মরণসভা।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল ফজল। স্মৃতির ভারে বেদনাহত এই কথাশিল্পী ভাষণ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন সংগ্রামের মধ্যে কোন মহৎ চেতনা গড়ে না উঠলে সে সংগ্রাম অর্থশূন্য, আবেদনহীন। সৈয়দ আলি আহসান, সর্দার ফজলুল করিম, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ শহীদ-বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারত-বাংলা সংস্কৃতি সংসদ

ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল দুই দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি সভা। বিচারপতি শঙ্করীপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শওকত ওসমান, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, প্রবোধ সান্যাল, উপাচার্য রমা চৌধুরী, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত, সুমথনাথ ঘোষ, সুশীল রায় প্রমুখ নবগঠিত 'ভারত-বাংলা সাংস্কৃতি সংসদে'র আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। কলকাতায় সংসদের মূলকেন্দ্র আর ঢাকা ও দিল্লীতে স্থাপন করা হবে আঞ্চলিক কমিটি। ২১৭ জন সভ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। এই সভা থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী কবির জন্মভূমি যশোহরে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশে ব্যাপক হারে শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী হত্যার বিরুদ্ধে গত ২৩ জানুয়ারী হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হল এক প্রতিবাদ সভা। হাওড়া জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়। সম্মেলনে ওপার বাংলার সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবদুল গফফার চৌধুরী এবং কবি-সাংবাদিক মহাদেব সাহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের রাম বসু, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গণেশ বসু, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী রায়, শম্ভু রক্ষিত প্রমুখ কবিতা পাঠ ও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ধ্রুব মুখোপাধ্যায় ও ভবানীপ্রসাদ সেনশর্মা।

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ২৩ ॥

ভাগ্যের কাছে বারবার মার খাওয়ার ফলে এটুকু বেশ বুঝেছে হেমন্ত যে তার জীবনে ভেঙে পড়ার অবকাশ নেই। যুদ্ধ করতে হবে তাকেই করতে হবে। অকরুণ অদৃষ্টের সঙ্গে সারাজীবন যুদ্ধ করাই তার ভাগ্যলিপি।

তাই সে চোখ মুছে শান্তভাবেই আবার নেমে আসে ঠাকুরঘর থেকে। নিজেই গাড়ি ডাকিয়ে খোঁজ করে করে রসিকবাবু ডাক্তারের কাছে যায়। কৈলাসবাবুও বড় ডাক্তার কিন্তু নাকি বড় বেশী ব্যবসাদার। অনেক রোগী দেখেন, সেজন্যে কোন রোগীকেই খুব ভাল করে দেখার সময় পান না। বিশেষ, এক্ষেত্রে রোগী ডাক্তার, চক্ষু-লজ্জায় ফীও নিতে পারবেন না, সেহেতু হয়ত মনোযোগও দেবেন না তত। তা ছাড়াও—রসিকবাবুর রোগ নির্ণয় নির্ভুল একথা অনেকের কাছেই শুনেছে।

রসিকবাবু মন দিয়ে সব শুনলেন, হেমন্ত নিজের পরিচয় দিল, ছেলেরও। দেখা গেল তারককে চেনেন তিনি, ভাল ছাত্র হিসেবে ওর কথা মনে আছে তাঁর। রোগের বিবরণ শুনতে শুনতে মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, কোন মন্তব্য করলেন না—শুধু পরের দিন সকালেই দেখতে যাবেন কথা দিলেন। ওর মতো ডাক্তারের পক্ষে এইটেই যথেষ্ট—রোগ কঠিন না বুঝলে এত তাড়াতাড়ি দেখতে যান না।

এলেনও যথাসময়ে—ঠিক নটায় এসে পৌঁছলেন।

অনেকক্ষণ ধরে রোগীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন প্রথমটায়, তারপর নাড়ি ধরলেন। চোঙাটাও বার করলেন কিন্তু তখনই বুকে বসালেন না। ধরে বসে প্রশ্ন করলেন, 'এর বাবা কী রোগে কত বছর বয়সে মারা গেছেন—বলতে পারবেন?'

'পারব বৈকি!' হেমন্ত আনুপূর্বিক অবস্থাটা বর্ণনা করল।

পুরনো ম্যালেরিয়া, দূষিত পিলে-লিভার তা থেকে রক্তহীনতা—কতকটা ক্ষয় রোগের মতো। তার মধ্যেই বলতে গেলে তারকের জন্ম, ওর বাপের প্রায়-মুমূর্ষু অবস্থায়। অপুষ্ট শিশু জন্মেছিল, ভাল কোন খাদ্যও পায়নি মাতৃস্তন্য ছাড়া। সৌভাগ্যক্রমে সেটার অভাব ছিল না তাই বেঁচেছে। তার পরও শৈশব কেটেছে নিদারুণ দুঃখ ও অভাবের মধ্য দিয়ে। কোন মতে জীবনটাই রক্ষা পেয়েছে শুধু, দেহ গড়ে উঠতে পারেনি। পরে সে অবস্থা যখন পার হয়ে এসেছে হেমন্ত, তখন পড়াশুনো শুরু হয়েছে, হোস্টেলেই কেটেছে বছরের মধ্যে দশ মাস সময়। সেখানের খাদ্যও যেমন অস্বাস্থ্যকর, যত্ন করে খাওয়াবারও লোক নেই। আসলে যত্ন জিনিসটাই জোটেনি জীবনে।

রসিকবাবু শান্তভাবে বসে শুনলেন সব, তারপর ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলে চোঙাটা বসালেন বুকে, বুক পিঠ দেখা শেষ হলে আঙুলের ডগাগুলো টিপে দেখলেন, চোখের পাতা সরিয়ে ভেতরের কোলটা।

তারপর উঠে বাইরে এসে হেমন্তকে বললেন, আপনি তো সবই বুঝলেন—থাইসিস হয়েছে, যক্ষ্মা যাকে বলে। কবিরাজরা এই ধরনের যক্ষ্মাকে বলেন ক্ষয়কাশ, ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে আনে শরীর। পুরানে বলে চন্দ্রের এই রোগ হয়েছিল প্রথম। ...এর কোন ওষুধ কি চিকিৎসা নেই। ভাল খাওয়া আর ভাল বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া, এই এর যথার্থ চিকিৎসা। ওষুধ দিচ্ছি একটা—যাতে ভাল খাওয়া হজম হয়—তবে তাতেও কতদূর কি হবে বলতে পারি না।'

হেমন্তর চোখ দিয়ে দর দর ধারে জল পড়তে শুরু হয়েছে বহুক্ষণ ধরেই। এবার নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। তাড়াতাড়ি আঁচল মুখে দিয়ে সামলাল সেটা, পাছে তারকের কানে যায়। তারপর সেইখানে মেঝেয় বসে পড়ে ডাক্তারের পা দুটো চেপে ধরে বলল, ডাক্তারবাবু, বহু দুঃখের ধন আমার। জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যেমন করেই হোক বাঁচিয়ে দিন বাছাকে আমার। যা করতে বলবেন, তাই করব।'

বড় ডাক্তার বহু মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করেন। দেখতে দেখতে মনেও কড়া পড়ে যায়। মা বাপের সন্তান শোক, বিধবা স্ত্রীর হাহাকার—কিছুতেই তেমন দাগ কাটে না আর। রসিকবাবুও এই আকুলতায় বিচলিত হলেন না। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'যা করতে বলব তা পারবেন না। এক বছর একটা জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্রে রাখতে পারবেন—পুরো একটি বছর? কোথাও নামা চলবে না। জাহাজ কয়লা জল নেবার জন্যে যদি বা থামে—রোগী নামবে না। দেখুন—পারবেন? আগেও একজনকে বলেছিলুম, তার লোকবল অর্থবল দুইই ছিল, তারা একটা গোটা জাহাজ ভাড়া করে রুগীকে রেখে দিয়েছিল চোদ্দ মাস, সেরেও গেছে। পারবেন সে ব্যবস্থা করতে?'

বুকের মধ্যেটায় যেন একটা হিম-হিম ভাব বোধ করে হেমন্ত। একটা অন্ধকার হতাশা। এত পয়সা তার নেই। শতাংশের একাংশও নেই বোধহয়। তাছাড়া কে থাকবে রোগীর কাছে? এসব ভাবতে

বলাও পাগলামি তার কাছে। এক অমলাক্ষ থাকলে—। থাক, তার কথা। কে জানে সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত কিনা।...

ওর মুখ দেখে উত্তরটা অনুমান করেন রসিকবাবু। বলেন, 'পারবেন না তা জানি। সামান্য আয় আপনার, নিজের ওপর সব কোথা থেকে করবেন? যা পারবেন তাই দেখুন গে—কোন ভাল পাহাড়ে জায়গায় যান কিম্বা সমুদ্রের ধারে। পুরীতে অনেকে যাচ্ছে আজকাল। তবে হাওয়া ভাল হলে কি হবে, ওখানের জল ভাল নয়। পাহাড়ই ভাল, উঁচু কোন পাহাড়—দার্জিলিং কি কশৌলি কি সিমলে—যেখানে বিশুদ্ধ হাওয়া পাবেন, ভাল খাবার হজম হবে, স্নায়ু বিশ্রাম পাবে।... দু-এক জায়গায় স্যানাটোরিয়ামও হয়েছে। সেখানে রাখতে পারেন আরও ভাল, আপনাদের দায়িত্ব কমে যায়, ওসব জায়গায় ডাক্তার একজন সর্বদাই থাকে। তবে তাতেই যে ভাল হয়ে উঠবে ছেলে, এমন ভরসা আমি দেব না। জাস্ট একটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আচ্ছা, নমস্কার।'

পরিষ্কার কাটা কাটা কথা। মিথ্যা আশ্বাস বা আশা দেবার কোন চেষ্টা নেই: তেমনি ফীও নিলেন না ওর কাছ থেকে। বললেন, 'ডাক্তারের কাছ থেকে ফী নেওয়া আমাদের নিয়ম নয়।'

হেমন্ত অনেক চেষ্টায় কথার শক্তি সংগ্রহ করে। বলতে যায়, 'কদিন পরে আর একবার দেখে—একটু, মানে—'

কথাটা শেষ করতেও পারে না যেন ভরসা করে।

'দরকার হবে না।...এই ওষুধগুলো আইয়ে যান যা লিখে দিচ্ছি, আর যত তাড়াতাড়ি পারেন চেঞ্জে নিয়ে যান। ডাক্তারের আর করার কিছু নেই।'

দিশাহারা হয়ে পড়ার কথা হেমন্তর কিন্তু তা হল না।

দিশাহারা হলে চলবে না। সে আর একটা যুদ্ধের জন্যই কোমর বাঁধল।

হাহাকার করার বিলাপ করার ঢের সময় পড়ে রইল, হয়ত বা জীবনভোরই। এখন ছেলের চিকিৎসার কথাই ভাবতে হবে। সেই সময়টাই বরং কম। কে জানে কতটা এগিয়ে গেছে রোগ, সর্বনাশের আর কতটুকু বাকী আছে।

চিন্তারও সময় ছিল না। মন স্থির করেই ফেলল সে।

জাহাজ ভাড়া করে এক বছর সমুদ্রে রাখা সম্ভব নয়, যথাসর্বস্ব বিক্রী করে দিয়েও যদি রাখা যেত তো প্রস্তুত ছিল সে। ঠিক কত খরচ পড়বে তা জানে না—কিন্তু নিজের সহজ বুদ্ধিতেই এটুকু বুঝল যে, ওর এই সামান্য খুদকুঁড়ো সম্পত্তির জোরে সে-কথা চিন্তা করাও পাগলামি।

বাকী রইল এখন পাহাড়—কি কি সমুদ্রের ধার।

পুরীর জল ভাল নয়, ডাক্তারবাবু বলে গেলেন। সমুদ্রের ধারের অন্য শহরেরও বোধহয় একই অবস্থা। সুতরাং পাহাড়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। পাহাড়ও—বেশব নাম করে গেলেন রসিকবাবু, তার কোনটা কোথায় ওর ভাল জানা নেই। দার্জিলিংটা জানে। জানে, মানে নাম শুনেছে। কাছাকাছি এটাও জানে। অনেকেই যায় মধ্যে মধ্যে। গোপালীরা বহুবার গিয়েছে। খরচও কম নাকি যাওয়ার। ওর পক্ষে দার্জিলিং যাওয়াই সহজ, সম্ভব।

সেই মতোই প্রস্তুত হতে লাগল হেমন্ত।

মুশকিল হয়েছে গোপালীরা এখানে নেই। বিপদ যখন আসে, আগে থাকতে আটঘাট বেঁধেই আসে। যারা সহায়সম্বল হতে পারবে—অদৃষ্ট আগে থাকতে তাদেরও বিপন্ন করেন। চিরদিনের বান্ধব ও ভয়ত্রাতা গোপালীরও বোধহয় শেষ অবস্থা। উদুরী হয়েছে তার। ছেলের চাকরির এইসব কথাবার্তা, যাওয়ার আয়োজন ও এই অসুখ—এর মধ্যে আর যাওয়া হয়নি ওদের বাড়ি, তবে মোটামুটি খবর রাখে। ধনুবাবু বেশ কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসা করার পর ভুবনেশ্বর না কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছেন। সেখানের নাকি জল ভাল, লিভার ভাল হয়।

সুতরাং বিপদে পড়লেই যার কথা প্রথম মনে হয়—তার কাছে যাওয়া চলবে না।

বদরীবাবুকে সব ব্যাপারে বারবার বিরক্ত করতে সাহস হয় না। বত্রিশ টাকা নাকি ফী করেছেন তিনি আজকাল, তবু রুগীকে গলাধাক্কা দিতে হয় এত ডাক তাঁর।

না, তাঁর কাছেও যাওয়া চলবে না। পূর্ণবাবু—পূর্ণবাবুর কাছে গিয়ে পড়লে তিনিই সব করতে পারতেন, সব ব্যবস্থাই —এটা ঠিক কিন্তু ছেলের জন্যেও তা পারবে না হেমন্ত। অন্তত অন্য সব পথ বেয়ে বেয়ে দেখে হতাশ হবার আগে নয়।

অনেক ভেবে শেষপর্যন্ত কুমার কন্দর্প মিত্রকে গিয়ে ধরল সে।

মাসকতক আগে তাঁদের বাড়ির একটি প্রসূতির জীবনসংকট অবস্থায় প্রায় মাসখানেক নিত্য যেতে হয়েছিল। সেই থেকেই ও'দের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেছে ওর।

কুমার বাহাদুর বিখ্যাত জহুরী। জহুরী বলাও হয়ত ঠিক হবে না। জহরৎ বিশেষজ্ঞ। বড় বড় জহুরীরা পাথর যাচাই করিয়ে নিয়ে যায়, তিনি যে দাম বলে দেন, সেই দাম সকলে মেনে নেয় এক কথায়। এতে তাঁর মোটা টাকা আয়ও হয়। হেমন্তর কাজে তুষ্ট হয়ে কন্দর্পবাবু একটি মূল্যবান চুনী উপহার দিয়েছেন। সেটা তুলে রেখেছিল হেমন্ত—যদি কখনও তারকের বৌ আসে তাকে আংটি গড়িয়ে দেবে বলে।

কন্দর্পবাবু কলকাতার ধনী ও অভিজাত সমাজের মধ্যেও একজন প্রতিষ্ঠাবান লোক। জহুরী তিনি সবদিক দিয়েই। কিম্বদন্তী তাঁর দুটি করে রক্ষিতা রাখার প্রয়োজন হয়—একই সঙ্গে। এছাড়াও ছুটো যাকে বলে তা তো আছেই। রাত দশটায় বেরিয়ে একাধিক স্ত্রীলোকের দরজা ঘুরে বাড়ি ফেরেন কোনদিন রাত তিনটেয়, কোনদিন বা আরও পরে। তারপর পূজো (নিষ্ঠাও আছে ষোল আনা) সেরে আহার করে শুতে যান যখন তখন প্রায়ই পূর্বাকাশ অরুণাভা ধারণ করে। ওদিকেও—বেলা বারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে, প্রাতঃকৃত্য স্নান সেরে জলযোগ করেন তিনটেয়, তারপর কাজকর্ম দেখেন চারটে সাড়ে চারটে পর্যন্ত—ফলে মধ্যাহ্ন-ভোজনটা হতে হতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় প্রায়ই।

কিন্তু এসব তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। হেমন্তর অভিযোগ করার কোন কারণ নেই। ওর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই ভদ্র ব্যবহার করেছেন। কথায়-বার্তায় আচারে-আচরণে সৌজন্য-শিষ্টাচারের এতটুকু অভাব পায়নি কখনও। এমনিও উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক। গানবাজনার শখ খুব। নিজেও জানেন। শৌখীন থিয়েটারের প্রচণ্ড নেশা। ফরমাশ দিয়ে নতুন নাটক লিখিয়ে নিজেরা বন্ধুবান্ধব মিলে অভিনয় করেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস কি জীবনযাত্রা কিম্বা চরিত্র নিয়ে হেমন্তর মাথা ঘামানোর দরকার কি?

অনেক ভেবে তাই বিকেলবেলায় কন্দর্পবাবুকে গিয়েই ধরল হেমন্ত। তিনি তখন এক ইহুদী জহুরীর সঙ্গে বসে কতকগুলো পাথর পরীক্ষা করছিলেন। হেমন্ত গিয়ে দাঁড়াতে কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন এবং একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ও বসতে নিজে বসলেন।

'কী ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ-?' প্রশ্ন করলেন তারপর।

প্রসঙ্গের সূচনাতেই চোখে জল এসে যায়। প্রাণপণেই সামলে নেয় তবু। দুঃখের কাহিনী শোনানোই যথেষ্ট, তার সঙ্গে চোখের জল ফেলে মানুষটাকে বিব্রত বিরক্ত করে লাভ নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা—বিশেষ করে হেমন্তর বর্তমান প্রয়োজনটা শুনে যেন নিশ্চিন্ত হলেন কন্দর্পবাবু। বললেন, 'এই! কিছু ভাববেন না আপনি। বর্ধমানের মহারাজা আর চকদীঘির জমিদারবাবু ওখানের মুরুব্বী, আমি এখনই কথাবার্তা বলে ঠিক করে দিচ্ছি—যাতে ভাল ঘর পায়, দেখাশুনোরও না কোন

দ্রুটি ঘটে। আপনি যত তাড়াতাড়ি যেতে পারেন সেই চেষ্টা দেখুন গে, এদিকের ভার আমার রইল। কবে যাবেন জানালে টিকিট করিয়ে একটা কামরা রিজার্ভ করিয়ে সঙ্গে লোক দেব—আপনাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কোন অসুবিধে হবে না।'

দার্জিলিং পৌঁছবার কি সেখানে নেমেও সত্যিই কোন অসুবিধে হয়নি। যেখানে নামল ওরা—স্যানাটোরিয়ামের লোক ঠেলা চেয়ার নিয়ে উপস্থিত ছিল। সেই রকমই নাকি নির্দেশ ছিল চকদীঘির রাজাবাহাদুরের। সবচেয়ে ভাল ঘরই পেল তারক, হেমন্তর নিজেরও থাকার কোন অসুবিধা না হয়, কন্দর্পবাবুর তদ্বিরে সে-ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন সেখানের কর্তৃপক্ষ।

হেমন্তও যথাসাধ্য কেন—সাধ্যের অতীতই চেষ্টা করল ছেলেকে ভাল করে তোলার। ভাল খাওয়া, ওষুধপত্র কোনটারই ত্রুটি রাখল না। ডাক্তাররা যখন যা বলেন, নির্বিচারে বিনা দ্বিধায় সেই ব্যবস্থা করে—খরচের কথা চিন্তা না করেই। সেবারও কোন অভাব রইল না। নিজে তো আছেই। আরও একটি নার্স রাখিয়ে দিল, যাতে পালা করে দুজনে থাকতে পারে।

আপত্তি করে তারকই। বারবার ব্যাকুল হয়ে বলতে যায়, 'এ কী পাগলামি করছ মা বলো তো! ধনেপ্রাণে মরতে চাও। কত টাকা আছে তোমার? কুবেরের ঐশ্বর্য তো নয়। বাঁচাতে আমাকে পারবে না তা তো বুঝতেই পারছ—অপর মা হলে বুঝত না, কিন্তু তুমি তো জানো সব—মিছিমিছি এমন সর্বস্বান্ত হয়ে লাভ কি?'

আবার কখনও বলে, 'আমি শত্রুই এসেছিলুম তোমার কোলে, জীবনে কখনও এক পয়সা তো আনতে পারলুমই না—সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেলুম মাঝখান থেকে। ভিক্ষে করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে রেখে গেলুম!'

প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে হেমন্ত ধমকে ওঠে, 'তুই চুপ করবি, না মাথামুড় খুঁড়ে মরব তোর সামনে?...আমি গলায় দড়ি দিয়ে তোর সামনে না ঝুললে বুঝি আর শান্তি হচ্ছে না তোর?'

অগত্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে যায় তারক।...

আর সবই হয়—শুধু বাইরে বেড়ানো হয় না। ডাক্তাররা বলেন, ঠাণ্ডায় দেশ ঘরের দোর-জানলা তো বন্ধ রাখতেই হয়—বাইরে একটু একটু বেড়াতে না পারলে পিওর এয়ারটা যায় না ফুশফুশে। তার একটা কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখুন—'

তারক বলে, 'যাক না দুটো দিন, একটু বল পেলেই—'

'কিন্তু সে বল পেতে হলে আগে ঐ হাওয়াটা দরকার।' ডাক্তার আড়ালে মন্তব্য করেন।

নিজের পায়ে না হেঁটে পাহাড়ে পথে হাওয়া খাবার উপায়—ঠেলাগাড়ি করে বেরনো। একরকম জাপানী ঠেলাগাড়ি পাওয়া যায় এদেশে—রিক্‌সা না কি বলে—সামনে দুজন, পিছনে দুজন লাগে ঠেলে তুলতে, আরও দুজন বাড়তি লোক থাকে সঙ্গে, কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার জায়গায় ঠেলবে বলে। ফলে বিকেলে বা সকালে দু'ঘণ্টা বেরনো মানেও অনেকগুলি টাকার খেলা। এছাড়া আছে ডাণ্ডি—ছোট চেয়ার, চারজন বেয়ারা কাঁধে করে নিয়ে যায়। কোনটাতেই খরচ কম নয়। রেসিডেন্ট ডাক্তার নিজে একজনের সঙ্গে কথা কইয়ে দিতে গেলেন, সে মাসকাবারী একশো টাকার কম রাজী হল না। টাকা দুহাতে খরচ করছে ঠিকই, কিন্তু কত আর আছে তার হাতেই বা? এক উপায় আছে বাড়ি বাঁধা দেওয়া কি বিক্রী করা, সে-ও কিছু একদিনে হয় না।

অগত্যা ম্লান মুখে নিরস্ত হতে হয়।

কিন্তু বেশী দিন চুপ করে থাকতেও পারে না। প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে লড়তেই তার শক্তি বেড়ে গেছে, কোন কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না।

এতই যখন করছে এইটুকুই বা বাকী রাখবে কেন?

এক অসমসাহসিক প্রস্তাব করে বসে শেষপর্যন্ত।

সেক্রেটারীকে গিয়ে বলে, 'আপনাদের ঐ চাকাওলা চেয়ারটা পাওয়া যাবে? ভোরে বা সন্ধ্যায়? একটু দিন না ছেড়ে। ওসময় তো রুগী আনা কি পোঁছে দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না!'

সেক্রেটারী বিস্মিত হয়ে বলেন, 'তা পেতে পারেন, কিন্তু ঠেলবে কে? আমাদের যারা আছে, তারা বাড়তি কাজের অনেক মজুরী চাইবে—'

'না না, বাইরের লোক কেউ নয়। আমিই ঠেলে নিয়ে যাব।'

সেক্রেটারী ভদ্রলোক অবাক। বেশ কিছুক্ষণ মুখে কথাই সরল না তাঁর। তারপর বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাহাড়ীরাই ঠেলে তুলতে পারে না এই পথ, দুটো লোক হিমসিম খেয়ে যায়, আপনি তুলবেন কি। এমনিই এইটুকু উঠে কার্ট রোড পৌঁছুতেই হাপরের মতো হাঁপাতে হয় আমাদের।'

হেমন্ত হাসে। ম্লান হাসি কিন্তু তার মধ্যেই কঠিন সঙ্কল্প ফুটে ওঠে দুই ঠোঁটের ভঙ্গীতে। বলে, 'ছেলের জন্যে মা অসাধ্য সাধন করতে পারে, এ তো আপনাদেরই পুঁথিপত্রে লেখে সবাই। এটা কথার কথা ভাবেন কেন?...পয়সা দেবার ক্ষমতা যখন নেই তখন নিজের খাটুনিতে সেটা পুষিয়ে দিতে হবে বৈকি!'

তবু অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেন সেক্রেটারী শিশিরবাবু, বোঝাবার চেষ্টা করে তারকও, রাগারাগি করে, কাঠ হয়ে পড়ে থাকে—উঠতে চায় না—শেষ পর্যন্ত কিন্তু সকলকেই হার মানতে হয়। হেমন্ত বলে, 'বেশ, তাহলে আমিও এই দিব্যি গালছি, মুখে এক ফোঁটা জল দেব না আমি, তোর সামনে না খেয়ে মরব। তা হলেই তোর মনোস্কামনা পূর্ণ হবে তো?'

এর পর আর হার মানা ছাড়া উপায়ই বা কি!

সত্যিই অসাধ্য সাধন করে হেমন্ত। এতটা যে পারবে তা সে নিজেও ভাবেনি। মনে হয় যেন—কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তিতেই—তার দেহে যাকে বলে মত্ত হস্তীর বল আসে।

খুব ভোরেই ছেলেকে ডিম-রুটি আপেল খাইয়ে, নিজেও একটু দুধ খেয়ে
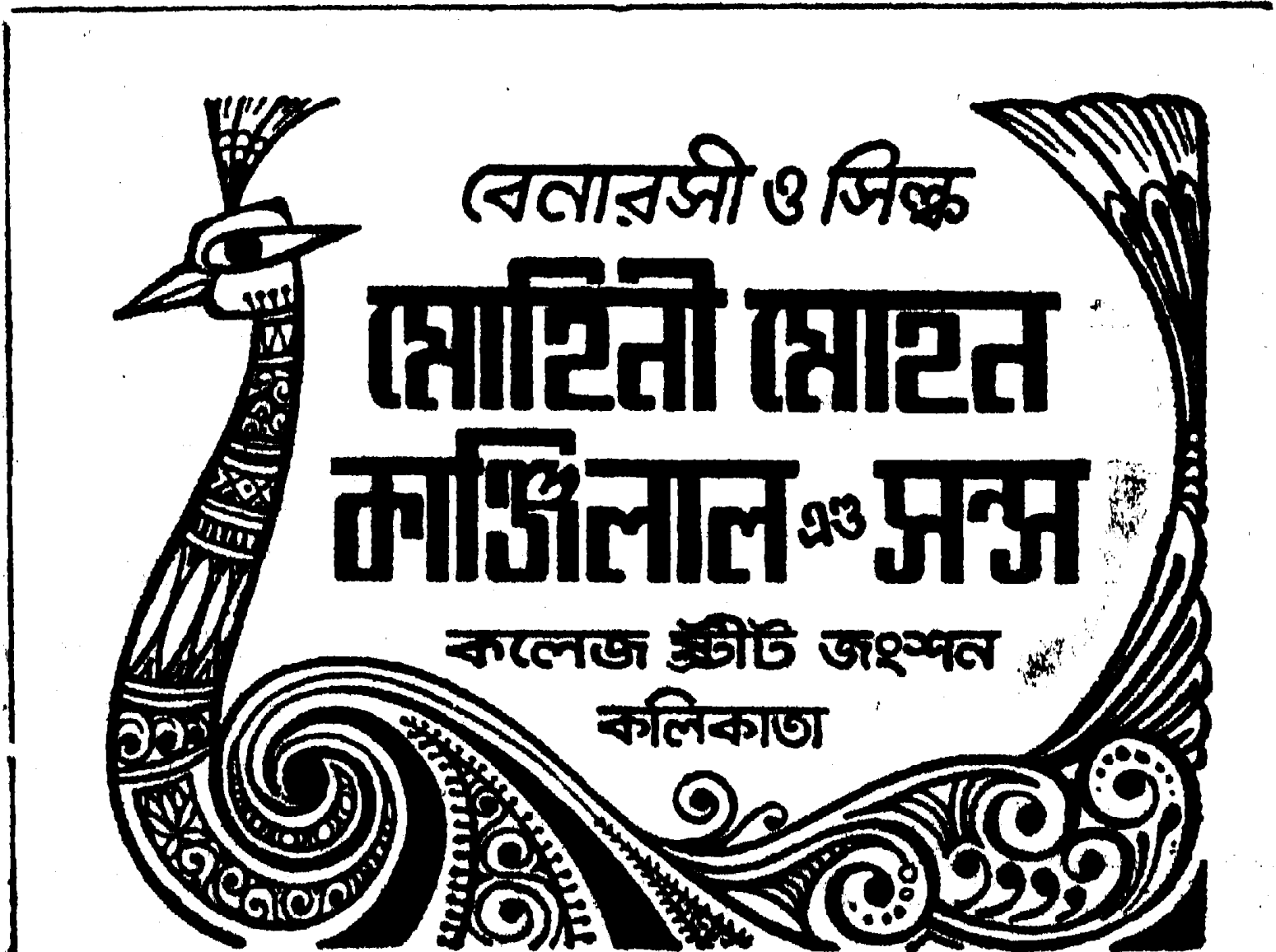
নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম দু-একদিন কার্ট রোডের ওপরে আর উঠতে পারত না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরও ওপরে—মল, দুচার দিন পরে সেখান থেকে ক্যালকাটা রোড, কোনদিন বা সোজা অকল্যান্ড রোড ধরে বার্চ হিল, কোনদিন জলাপাহাড় উঠে যেত।

সেক্রেটারী য্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী—ডাক্তার, সকলেই ঘোরতর আপত্তি করতে লাগলেন। বললেন, 'শেষে আপনি নিজেই দেখছি এই রোগ বাধিয়ে বসবেন। একী করছেন?'

হেমন্ত জবাব দেয়, 'তাহলে তো বেঁচে যাই ডাক্তারবাবু, এমন ভাগ্য কি আমার হবে? আপনারা একটু ভগবানকে জানান না — যেন আমারও এই কালব্যাধি ধরে। আশীর্বাদ করুন না।'

তারপর বলে, 'এত ভাগ্য করে আসিনি ডাক্তারবাবু। আমার ভবিষ্যৎ আমি বুঝে নিয়েছি। গত জন্মে নিভৃতে বসে শুধু বোধহয় পাপই করে এসেছিলুম—এ জন্মেও অনেক করেছি—তার শাস্তি ভোগ করতে হবে না? এত সহজে অব্যাহতি পেলে ভগবানের খেলাটা জমবে কেন আমাকে নিয়ে!'

কঠিন আত্ম বিদ্রূপের হাসি হাসে সে বলতে বলতে।

কিন্তু যতই যা করুক—তারকের অবস্থার যে উন্নতি হচ্ছে না, সেটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এমনিই রোগাটে ধরনের সে বরাবর, ওর পিতৃকুলের সকলেই রোগা—সেই মতোই হয়েছিল—এখন সেই সামান্য মেদও নিঃশেষিত হয়ে, মনে হয় যেন হাড়গুলোতেও ক্ষয় ধরেছে। আহার্যের অভাব নেই, খাওয়ার শক্তিটাই চলে গিয়েছে। এতটুকু দুধ কি একটা ডিম খেয়েই যেন হাঁপিয়ে ওঠে, খেতে পারে না আর। আগে এ নিয়ে যথেষ্ট বকাবকি করত হেমন্ত, এখন বুঝতে পারে যে সত্যিই ওর কষ্ট হচ্ছে, আর কিছু বলে না।

শেষ যে হয়ে আসছে সেটা তারকও বুঝতে পারে। কোটরগত গোলকের মধ্যে একদিন দৃষ্টিটা ছিল জ্বলজ্বলে, ক্রমশ সেটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে আসে, সেই সঙ্গে উদাসীনও। এ চাউনি হেমন্ত চেনে, এমনি দেখেছিল সে স্বামীর চোখেও—মৃত্যুর আগে। এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে আর কিছুতেই কোন আসক্তি কোন কৌতূহল নেই। শুধু যেন জীবনের এই বিড়ম্বনা থেকে ছুটি পেলেই বাঁচে, অবসর চাইছে প্রাণপণে।

অবসন্ন হয়ে আসে হেমন্তর বুকের মধ্যেটাও। কেমন একটা সর্ব-অন্তর-হিম-করা অবসাদ বোধ করে। এই গত আট-ন মাস কাল যে ভূতের মতো পরিশ্রম করেছে, নিত্য চেয়ারে করে ঠেলে নিয়ে বেড়িয়েছে, নিচের ভিকটোরিয়া ফলস থেকে ওপরের বার্চহিল, বোটানিক্যাল গার্ডেনস, জলাপাহাড় পর্যন্ত—রাতের পর রাত জেগেছে তার সঙ্গে—সেই অমানুষিক শ্রমের সমস্ত ক্লান্তি যেন ওকে পেয়ে বসে। একেবারেই ভেঙে পড়ে সে।

এমনিও চেয়ারে বসেও আর বেরোতে পারে না তারক, তাতেও যেন কষ্ট হয়—শীর্ণমেদহীন দেহের অস্থি-পঞ্জর নরম গদী আঁটা চেয়ারে বসেও আরাম পায় না। কোন মতে বিছানায় লেপ-কম্বল মোড়া অবস্থায় পড়ে থাকে।

হঠাৎ এর মধ্যে একদিন যেন খানিকটা সুস্থ বোধ করে। সেটা কার্তিক মাসে কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তার ওপারে গৌরীশঙ্করের চূড়োটা ঝকঝক করছে রোদে—তারক নিজেই বিছানায় উঠে বসে বললে, 'মা আমাকে একটু ঐ রোদে বসিয়ে দেবে একটিবার? কতদিন যে রোদ পোয়াইনি, মনেই পড়ে না।'

হেমন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলে, 'বাইরে যে বড্ড ঠান্ডা রে, পারবি সহ্য করতে?'

ম্লান হাসে তারক। বলে, 'সব সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছি এবার, আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই মা।...যাওয়ার আগে পৃথিবীটা যেন বড্ড ভাল লাগছে, একবার ভাল করে দেখে নিই।...লক্ষ্মীটি মা, একটু বাইরে বসিয়ে দাও কোনমতে।...কতকাল কলকাতা দেখিনি বলো তো। খুব ইচ্ছে করছে—। সম্ভব হবে না তাই, নইলে কলকাতাতেই চলে যেতাম। সেই ভীড়, ঘিঞ্জি গলি, গাড়ী-ঘোড়া—সব যেন টানছে আমাকে, মনে হচ্ছে সে-ই স্বর্গ।'

আর কিছু বলে না হেমন্ত। তার চোখে জলও আসে না আর।

চোখের জলের উৎসই যেন গেছে শুকিয়ে।

লোকজন ডেকে বাইরে যেখানটায় রোদ এসে পড়েছে, সেখানে একটা ইজিচেয়ার পাতিয়ে দেয়, তারপর ঠেলা চেয়ারে তুলে সেইখানে এনে বসিয়ে দেয় ওকে—নিচে পিছনে অনেকগুলো বালিস দিয়ে। মাথায় টুপি পরিয়ে দু-তিনখানা কম্বল চাপা দিয়ে মুড়ে দেয়।

'এককাপ কফি দিতে বল তো আমায় মা।...যাবার আগে খুব আব্দার করে যাচ্ছি না?...আমি নিজেই তো এসেছি, নিয়েই যাই—ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। না না, পালিও না। এখানে বসো, আমার কাছে। সামনা-সামনি, না—এইখানে, আমার গায়ে হাত রেখে—'

তারপর কেমন একরকমের ইচ্ছাতুর উৎসুক দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সেই দেখার ভঙ্গিতেই বুক কেঁপে ওঠে হেমন্তর, আসন্ন সর্বনাশের আভাস পায় যেন। মনে হয় যেন কেউ পরিচিত প্রিয় পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে এবার, এই জীবন থেকে।

'বাবা, ঘরে চ এবার, তোর ক্লান্তি লাগছে—' আসতে বলে হেমন্ত।

বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে মার মুখের দিকে চায় তারক, কেমন একরকমের বিচিত্র বিদ্রূপের হাসি ওর মুখে, বলে, 'ভয় করছে? আর ভয় ক'রো না। ভয়ের কারণ আর থাকবে না। আজ খুব সুস্থ বোধ করছি। বরং কদিন যেন সব কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছিল, আজ স্পষ্ট পরিষ্কার মনে পড়ছে—ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনটা, সমস্ত ঘটনাগুলো। সেই আমাদের পালিয়ে আসা পর্যন্ত—সব। এমন কি আবছা আবছা যেন ঠাকুমার চেহারাটাও দেখতে পাচ্ছি—'

তারপর একটু থেমে কংকালের মতো তুষার-শীতল হাতখানা মার হাতের ওপর রেখে বলে, 'অনেক দুঃখ পেয়েছ জীবন-ভোর—আমার জন্যে মরতেও পারোনি। তার ওপর এই শেষ মার খাওয়াটাও আমার হাতেই ঘটলো।...তবে ভয় নেই, যদি কোন একটিও সৎ কাজ করে থাকি, ভগবানকে যদি একদিনের জন্যেও ডেকে থাকি, জন্মান্তরে তোমার কোলেই ফিরে আসব আবার; সেবার অনেক অনেকদিন বেঁচে থাকব, মা আর বেটা। না, আর কেউ নয়। স্ত্রী নয়, ছেলে নয়, মেয়ে নয়, কেউ নয়। শুধু তুমি, মা আমার।'

তারপর বলে, 'যাবার সময় হয়ে এল, বুঝতেই তো পারছো। আজ এত সুস্থ বোধ করছি—সেইজন্যেই আরো, পিদিম নেভার আগেই জ্বলে ওঠে বেশি করে—শেষবারের মতো—এ সব পিদিমের বেলাতেই খাটে। তাই বলে তুমি যেন ভেঙে পড়ো না মা, আত্মহত্যা করতে যেও না। তা হলে মরেও শান্তি পাবো না, তার চেয়েও যেটা বড় কথা—তোমার কোলে ফিরে আসতে পারবো না।...চিরদিনই সব আঘাত সয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছ—এবারেও, একটু চেষ্টা করলেই দাঁড়াতে পারবে। কাজ ক'রে যেও, কাজের মধ্যেই মানুষের মুক্তি, শান্তি। আমি তোমার বেইমান অকৃতজ্ঞ ছেলে—এই মনে ক'রে আমাকে ভুলে যেও—'

আর সহ্য করতে পারে না হেমন্ত, প্রাণপণ সংযমের বাঁধ ভেঙে হাহাকার বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে—ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে চলে যায় সেখান থেকে, নিজের ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

সেই কান্নায়-ভেঙে-পড়া পালিয়ে-যাওয়া মার গতিপথের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে তারক, মুখে তার ঈষৎ একটু হাসির আভা। করুণ—না তৃপ্তির হাসি, ঠিক বোঝা যায় না।

ছেলের মনের ইচ্ছা বুঝে সেইদিনই হেমন্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে গিয়ে ধরে—ওরা কলকাতা ফিরতে চায়, সম্ভব হবে কি?

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে, 'এখন, এই অবস্থায়?'

'অবস্থা যে আর ভালো হবে না সে তো বুঝতেই পারছেন রায়মশাই। মিছি-মিছি, যে জন্যে এনেছিলুম তা যখন হলোই না—এখানে এই নির্বান্ধব অবস্থায় ফেলে রাখি কেন? হাড় কখানাই তো সার হয়েছে— এই অগঙ্গার দেশে আর নাই রাখলুম, গঙ্গার তীরেই দেব বরং!'

অপ্রতিভ রায়মশাই তাঁর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'কিন্তু শরীরের যা অবস্থা, সেই কথাই বলতে চেয়েছিলুম, এই এতটা পথ, নানারকমের যানবাহনের ধাক্কা কি সামলাতে পারবেন?...বিছানা থেকে যাকে তোলাই যাচ্ছে না, তাকে কি করে নিয়ে যাবেন। বলা তো যায় না—বলতে নেই—পথেই যদি—'

'তা হোক। আতান্তরে পড়ি পড়ব, এখানেই বা আতান্তর কম কি? আপনি যদি দয়া ক'রে একজন লোক সঙ্গে দিতে পারেন—একটি কোন বাঙ্গালীর ছেলে—তাহলে আমি তার যাওয়া-আসা ফার্স্ট ক্লাস গাড়িভাড়া দেবো, খাওয়া-দাওয়া সমস্ত খরচা—তা ছাড়াও পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক।...দেখুন যদি সেটা করতে পারেন—একজন লোক সঙ্গে থাকলেই আমি সাহস পাবো।'

'দেখি—কথা বলি। কিন্তু—' চিন্তিত মুখেই বলেন রায়মশাই, আরও যা বলতে যাচ্ছিলেন, যা বলা উচিত, তা এই বিধবা একমাত্র পুত্রের জননীকে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না।...

অবশ্য প্রয়োজন হয় না আর বলার।

সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় তারক। কথাও বলে না, কারও দিকে চায়ও না। কিছু খাওয়াতেও পারে না। হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসে, অনেক গরম জলের বোতল রেখে, সেঁক দিয়েও তাকে গরম করা যায় না। কপালে গলায় চটচটে ঘাম। খবর পেয়ে বৃদ্ধ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এসে এক পুরিয়া মকরধ্বজ বার করেন জামার পকেট থেকে, নিজে হাতে মধু দিয়ে মেড়ে জোর ক'রে মুখ খুলে জিভে লাগিয়ে দেন। তাতেও কোন কাজ হয় না, শরীরের উত্তাপ ফেরে না আর।

আরও একটু পরে রাত দশটা নাগাদ গলায় ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয়। অর্থাৎ সমাপ্তির শুরু।

হেমন্ত এতক্ষণ যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছিল, ডাক্তার ও নার্সের নির্দেশ মতো তাদের সাহায্য করছিল, এইবার অকস্মাৎ সে যেন স্বাভাবিক ও কর্ম-তৎপর হয়ে উঠলো। ঘটনার রশ্মি এতক্ষণ যেন ছিল ভাগ্যের হাতে, এইবার সে সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিল। টিপটে ওষুধ

কলকাতা থেকে গঙ্গার জল এনেছিল, সেই গঙ্গাজল দৃঢ় ও অকম্পিত হাতে ছেলের মুখে ঢেলে দিয়ে, পাশে বসে ছেলের বুকে হাত রেখে অর্ধস্ফুটকণ্ঠে তারক ব্রহ্ম নাম শোনাতে লাগল। তার সেই মূর্তি দেখে ডাক্তার, রায়মশাই এবং নার্স—যেন ভয় পেয়েই পা-পা করে পিছিয়ে ঘরের বাইরে ঘেরা বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

তারকের আর চৈতন্য ফিরলো না, চোখও খুললো না।

প্রদীপের সঙ্গে সে-ই তুলনা দিয়েছিল সকালবেলা— নিঃশেষিত-তৈল প্রদীপের মতোই আস্তে আস্তে নিভে গেল।

ঠিক কখন শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে তা কেউ টেরও পেলো না। ডাক্তার যখন নিজে থেকে এসে দেখলেন, তখন আর কিছুই নেই। তাঁদের অনুমান বেশ কিছু-ক্ষণ আগেই মারা গেছে সে, হয়তো রাত তিনটে নাগাদ।

॥ ২৪ ॥

ভেঙে পড়তে নিষেধ করে গিয়েছিল তারক কিন্তু এতটা স্থৈর্য সম্ভব হয় না। যে যায় সে দায়সারা একটা সান্ত্বনা দিয়ে যেতে পারে অনায়াসে, কিন্তু যাকে থাকতে হয়, যার যায়—সে সেই ফাঁকা কথাটাতে কোন সান্ত্বনা বা অবলম্বন খুঁজে পায় না।

শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তবু একরকম করে ধৈর্য ধরে থাকে হেমন্ত. তার 'কাজ' করতে হবে, শেষ কাজ তার, শেষ সেবা—শেষ খাওয়ানো। সে কর্তব্যে না কোন ত্রুটি ঘটে, কোথাও না কোন খুঁত থেকে যায়,—এইটেই সব সময় মনে ছিল, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া চিত্তবৃত্তি-গুলোকে এই এক চিন্তায় বেঁধে রেখেছিল তেরোটা দিন কোনরকমে—কিছুতেই ভেঙে পড়তে দেয়নি। 'শেষ খাওয়ান' হিসেবেই মনে মনে আয়োজন করেছে—শ্রাদ্ধের দিন তাই সমস্ত কৃত্যই ঠিক ঠিকভাবে ক'রে গেছে, এমন কি পিণ্ডদান পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেছিল দেশ থেকে কোন জ্ঞাতিকে টাকার লোভ দেখিয়ে এনে তাকে দিয়ে পিণ্ড দেওয়াতে, কেউ বলেছেন, ব্রাহ্মণ সমস্ত সময়েই সব কাজেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, কোন ব্রাহ্মণকে দিয়ে করাতে—কিন্তু কোন প্রস্তাবেই রাজী হয়নি হেমন্ত, প্রবল আপত্তিতে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। সে থাকতে উটকো পরলোকে শ্রাদ্ধ করবে তার ছেলের। পাগল নাকি! এতকাল 'স খাইয়েছে সেই খাওয়াবে ছেলেকে, আর সে খাওয়ানোতে কোন ত্রুটিও ঘটতে দেবে না।

দেয়ওনি তা। খুব যত্ন করেই সব আয়োজন করেছে, পুরোহিতের নির্দেশ এতটুকু অমান্য করেনি। দেখে দেখে সেরা জিনিসগুলোই কিনেছে দানের জন্যে। যা যা খেতে ভালবাসতো তারক তাই দিয়েই নিজে হাতে পিণ্ডি মেখেছে. উৎসর্গ ক'রাতে অতিরিক্ত কাউকে দরকার পড়ে। তেমনি সব

আহার্যেরই আয়োজন করেছে ব্রাহ্মণ-ভোজনে। তারক তার সঙ্গে তার হাতে নিরামিষ রান্না খেতে ভালবাসতো, নিয়ম-ভঙ্গের দিন স্নান করে তেল হলুদ মাছ পুরোহিতকে দিয়ে—নিজে সেই সমস্ত রান্না ক'রে তিনটি ব্রাহ্মণকে খাইয়েছে।

বোধহয় নিজের সহ্যশক্তির ওপর এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি: প্রকৃতি এতখানি অনাচারের শোধ তুলবে বৈকি। শ্রাদ্ধ পর্ব চোকা পর্যন্ত একাগ্র সাধনার মতো একমুখে যে চিন্তা ওর স্নায়ু-গুলোকে ধরে রেখেছিল, সে বন্ধন আলগা হওয়ামাত্র তারা যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, একেবারে পাগলই হয়ে উঠলো। ওর দাসী-চাকররা এতদিন যে শোকের অভাব দেখে বিস্মিত বোধ করছিল, আড়ালে যা নিয়ে বলাবলি ও মন্তব্যের শেষ ছিল না—এখন সেই শোকের প্রাবল্যেই বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়লো। তারা বহুদিন ধরে আছে, তাদের মতো খানিকটা ভালোও-বাসে—তবু নিকট আত্মীয়, আপনার কেউ নয়—এ শোকে সান্ত্বনা দেওয়া তাদের সাধ্যাতীত। তাছাড়া এক্ষেত্রে কি করা উচিত সে জ্ঞানও তাদের নেই। সাধারণ মানুষ নিয়ে, নিজেদের আত্মীয় সমাজ নিয়েই তাদের অভিজ্ঞতা—এই সব-দিক-দিয়েই অসাধারণ অস্বাভাবিক মানুষটাকে সামলা-বার মতো কোন ধারণাও তাদের নেই। এতকাল বিপদে-আপদে যাকে সর্বাগ্রে খবর দিয়েছে, ডেকে এনে নিশ্চিন্ত হয়েছে, সে গোপালীও এখানে নেই—নেই জেনেও ছুটে গিয়েছিল—কিন্তু সে এখনও ফেরেনি। তারা একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়লো।

সত্যিই কটা দিন যেন একেবারে পাগল হয়ে গিছলো হেমন্ত। ঘরের জিনিষপত্র টেনে বাইরে ফেলেছে, বিলেতি কাচের আর কাচকড়ার বাসনগুলো টান মেরে আছড়ে ভেঙেছে; ভালো ভালো কাপড়গুলো—ইদানিং ও কালোপেড়ে শাদা শাড়ি পড়ছিল বসে কুচি কুচি করে দিয়েছে, ঢিব ঢিব করে মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলিয়েছে; নিজের দেহ নিজের নখ দিয়ে নরুণ দিয়ে চিরে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করে ক'রে তুলেছে; কারণে অকারণে এদের গালাগালি দিয়েছে—ঝি-চাকরদের। বারান্দা থেকে রাস্তার লোককে ডেকেও গালি-গালাজ করেছে। অর্থাৎ পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ।

এ অবস্থায় কি করা উচিত, কাকে খবর দেবে, কাকে ডাকবে কিছুই ভেবে পায় না ঝি-চাকররা। হাসপাতালেই হয়তো পাঠানো উচিত কিন্তু কে পাঠায়, কাকে গিয়ে বললে ব্যবস্থা হতে পারে তা তারা জানে না বললেই কিছু করতে পারে না। পাগলা গারদ আছে একটা শুনেছে

তারা—কিন্তু কে অভিভাবক দাঁড়াবে, এখানেই বা কে কি করে, টাকা-কড়ির ব্যবস্থা আছে—তাদের এখন মনিব কে—এসব চিন্তা তাদের বুদ্ধির ও কল্পনার অগোচর। চলে যেতে পারলে বেঁচে যায় তারা—কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় একটা খালি বাড়িতে একটা পাগলকে রেখে পালাতেও যেন মন সরে না। মায়াও পড়ে গেছে এতদিনে। ধনুবাবু থাকলে তাকে খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতো—তিনিও গোপালীকে নিয়ে কাশীতে গিয়ে আছেন।

ইতস্ততঃ করতে করতে ইতিকর্তব্য স্থির করতে করতেই ছ-সাতটা দিন চলে গেল। কিন্তু কিছু একটা যে না করলেই নয় আর। সবচেয়ে সমস্যা কিছুই খাচ্ছে না। চান করানো খাওয়ানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। একদানা ভাত এমন কি একটু দুধও কেউ খাওয়াতে পারে না, ঘুম তো নেই-ই চোখে। ফলে রাস্তার পাগলীদের মতো চেহারা হয়ে দাঁড়ালো, রুক্ষ জটা পাকানো চুল, কোটরগত চক্ষু, কঙ্কালসার দেহ। তাও ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত।

এও চলছিল তবু, যেদিন বাকস থেকে দশ টাকা একশো টাকার নোটগুলো বার করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগল, নগদ টাকা আধুলি সিকি নর্দমায় ফেলতে শুরু করলো—সেদিন আর স্থির থাকা সম্ভব হলো না। একদিন যে দ্বিধা ও সঙ্কোচটা ছিল, তা সত্ত্বেও যার কথা প্রথম থেকেই মনে পড়েছে—দারোয়ান শিউপূজন গিয়ে সেই পূর্ণবাবুকেই খবর দিল।

পূর্ণবাবু এসব খবরই রাখছিলেন বৈকি।

বয়স হলেও, বৃদ্ধ হয়ে-পড়া যাকে বলে তা তিনি হননি। এখনও হাসপাতালে যাতায়াত করেন নিয়মিত, রোগীও দেখেন। এ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ আগের মতোই আছে, অক্ষুণ্ণ। তারকের অসুখ হওয়ার খবর তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছেন; রসিকবাবুকে দেখানো, কন্দর্পবাবুর সহায়তায় দার্জিলিং নিয়ে যাওয়া—কোন খবরই তাঁর জানতে বাকী ছিল না। স্যানাটোরিয়ামের রেসিডেন্ট ডাক্তার তাঁর ছাত্র—সেখানেই গেছে সংবাদ পেয়ে তাকে চিঠি লিখে নিয়মিত খবরা-খবর জানাতে বলেছিলেন। সুতরাং রোগীর 'প্রোগ্রেস'—এক্ষেত্রে অবনতির খবর—দশ-পনেরো দিন অন্তরই পাচ্ছিলেন, মৃত্যুসংবাদও পেতে দেরি হয়নি।

তারপর থেকেই তিনি এখানে আসার জন্যে ছটফট করছেন মনে মনে, কিন্তু সাহসে কুলায়নি। কমলাক্ষর মৃত্যুর পর যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তার অপমানটা প্রায় ভুলে এলেও হেমন্তর সেই রণরঙ্গিণী মূর্তি ভোলেননি। আবারও সেই চেহারার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো ভরসা নেই তাঁর।

কিন্তু শিউপূজন যখন গিয়ে এই অবস্থা জানালো তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। আজ প্রথম একটা আশ্চর্য সত্যোপলব্ধি হল তাঁর, তাঁর কাছে বিস্ময়কর অন্তত, নিজেকেও দেখতে পেলেন সেই সত্যের আলোয়। হেমন্ত সম্বন্ধে দৈহিক লিপ্সাটা কবে একটু একটু করে অন্তর্হিত হয়েছে—সে স্থানটা অধিকার করেছে একটা সত্যকার ভালোবাসা। কামনার পঙ্কে ফুটে উঠেছে নির্মল প্রেমের পদ্ম। আজ একটা পরিচ্ছন্ন প্রীতিবোধ, মেয়েটার জন্য আন্তরিক উদ্বেগই বোধ করছেন তিনি, অন্য কিছু না।

কিন্তু পূর্ণবাবুর বিস্মিত হবার পালা সেদিন নিজের মানসোপলব্ধিতেই শেষ হয়নি—আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল তাঁর জন্যে।

লাঞ্ছনা সইতে হবে জেনেই এসেছিলেন। জ্ঞান থাকলেও সইতে হতো, এখন তো যা শুনলেন—পরিপূর্ণ পাগলের অবস্থা—হয়তো মারধোরই করে বসবে, হয়তো বা আঁচড়ে-কামড়ে দিতে আসবে—কদর্য গালাগালি তো আছেই। সেসব সহ্য করার জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন। তবু কতকটা ভয়ে ভয়েই সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—আক্রমণটা কিভাবে, কোন চেহারায় আসবে কিছু জানা নেই বলেই ভয়।

সেসব কিছুই ঘটলো না। পূর্ণবাবু যখন পৌঁছলেন তখন—সকালের প্রচণ্ড উন্মত্ততার প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত—ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে, হয়তো এই উন্মত্ততারও কোন অর্থও খুঁজে পাচ্ছে না, যে শান্তি আশা করেছিল তা না পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে; কিংবা হয়তো কিছু ভাববার কি বুঝে দেখারও ক্ষমতা নেই আর। ঠিক সেই সময়টায় তাই সামনের দেওয়ালের দিকে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। এত স্থির যে, হঠাৎ দেখলে আশঙ্কা হয় নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা।

ওর দিকে চেয়ে মমতা ও করুণায় চোখে জল এসে গেল পূর্ণবাবুর। এই কি সেই হেমন্ত, সেই আশ্চর্য সুন্দরী নারী, তাঁর ঈপ্সিতা ও প্রিয়তমা? যার জন্য পরিণত বয়সেও তিনি ঈর্ষায় পাগল হতে বসেছিলেন?...মলিন ছিন্নভিন্ন বস্ত্র, বিপুল চুলের ভার রুক্ষ জট পাকানো ধূলি-ধূসর ক্ষত-বিক্ষত দেহ, কোটরগত শুষ্ক চোখ—জবাফুলের মত রক্তাভ—এর মধ্যে আজ সেই রূপ ও আকর্ষণের কোন চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গাঢ় কণ্ঠে ডাকলেন, 'হেম', 'হেমন্ত।'

অকস্মাৎ যেন পাথরে প্রাণের আভাস জাগলো। চমকে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে চাইলো হেমন্ত। যেন ওর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কাকে চেনবার চেষ্টা করলো, একটু পরে পরিচয়ের আলোও দেখা দিল চোখে। তারপর এই ক'দিনের অবিরাম কান্না ও চিৎকারে ভেঙে যাওয়া ধরাধরা গলায় কতকটা স্বগতোক্তির মত করে বললো, 'তোমার চোখে জল? তুমি কাঁদছ? তুমি আমার তারকের জন্যে কাঁদছ?...আঃ বাঁচলুম। কেউ ছিল না, একজনও কেউ কাঁদবার নেই বাছার জন্যে এ পৃথিবীতে, কেউ নেই—সেই দুঃখটা আমার সবচেয়ে বেশী বেজেছে। আহা—যদি বিয়েটাও হয়ে যেত, তবু একটা বিধবা বৌ থাকতো আমার সঙ্গে কাঁদবার জন্যে—'

তারপর, বলতে বলতে যেন আরও খানিকটা সম্বিৎ ফিরে পায় পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে, নিজের অবস্থা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠে, হু-হু করে কেঁদে উঠে পূর্ণবাবুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। অশ্রুরুদ্ধ স্খলিত কণ্ঠে বলে, 'তোমার মনে কষ্ট দিয়েছিলুম, তোমাকে অপমান করেছি কমলাক্ষর মা-বউয়ের সর্বনাশ করেছি—সেই পাপেই আমার একমাত্র অবলম্বন চলে গেল, একটা ছেলে ছিল তাও সইলো না। তুমি আমাকে মাপ করো। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম—ভালোমন্দ পাপপুণ্য কোন জ্ঞান ছিল না।'

পূর্ণবাবু সেইখানেই, মেঝের উপর বসে পড়ে জোর করে ওর মাথাটা তুলে কোলের ওপর টেনে নিয়ে বললেন, 'ওসব কথা থাক হেম, আমরা দুজনেই সমান পাপী, সমান অপরাধী। আমার কাছে তোমার কোন অন্যায় কোন পাপ হয়নি। তুমি শান্ত হও। ভগবান কাকে কখন কি প্রয়োজনে নেন তা কেউ বলতে পারে না। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে স্তোকগুলো ফাঁকা সান্ত্বনার কথা বলে কোন লাভ নেই—তুমি কাজ শুরু করো, স্বাভাবিক হও—তোমার কাজের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পাবে একদিন।'

একটা যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগে হেমন্তর দেহমনে, চমকে উঠে বসে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। সেও সেই কথা বলে গিয়েছিল বটে। ঠিক ঠিক।' পরক্ষণেই কেমন যেন অসহায় আর্তকণ্ঠে বলে, 'কিন্তু আমি কি পারবো—আবার, আবার ওইসব কাজ করতে। করতে গেলেই যে মনে পড়বে শেষ দিনগুলোর কথা। আমি পারবো না গো।'

'কাজ বলতে ওই কাজই বা ভাবছ কেন

করলে করার মতো কাজের অভাব হবে না। তুমি এখন ওঠো তো, স্নান করো, পরিষ্কার হও। তারক বেঁচে থাকলে তোমার এ চেহারা দেখে সে কি ভাবতো বল তো? কত কষ্ট হতো তার!"

আর কোন প্রতিবাদ করে না হেমন্ত। বরং যেন অবসন্ন ভেঙে পড়া দেহটাকে— যেমন ছড়িয়ে পড়া কোন জিনিস কুড়িয়ে নেয় মানুষ তেমনি করে—কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এতদিনের অনাহার ও অর্ধাহার, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শোকের ক্লান্তি—সব মিলিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেটা উন্মত্ততার মধ্যে বোঝা যায় নি কিন্তু এখন বোঝা গেল। কলঘরের দিকে যেতে গিয়ে টাউরি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ঝি তাড়াতাড়ি ধরে ফেললো। তারপর সে-ই ধরে নিয়ে গেল, হেমন্ত প্রতিবাদও করলো না, বাধাও দিল না।

সেদিন এবং পরের দুটো দিন পূর্ণবাবু ওখানেই রইলেন। অন্য কোন সম্পর্ক সম্ভব নয়—সে কথা কারও মনেও রইলো না, প্রয়োজন দুই বন্ধুর মতোই শুধু কাছাকাছি থাকা, সান্ত্বনা ও আশ্বাস আহরণ করা। দুঃসহ এক শোকেরই বুঝি প্রয়োজন ছিল মধ্যের বিপন্ন তিক্ততা মুছে ফেলার জন্যে, কিংবা তারও বেশী, এমন করে দুজনের কেউই কাউকে পায় নি কখনো এত ঘনিষ্ঠ এত অন্তরঙ্গভাবে। পরস্পরের সাহচর্য যে উভয়েরই কাছে এত মধুর ও শান্তিপ্রদ হতে পারে— দুজনের কারুরই এতদিন সে ধারণা ছিল না।

একটু শান্ত হতে পূর্ণবাবু প্রস্তাব করলেন, 'তুমি দিনকতক একটু ঘুরে এসো হেম, তা নইলে সহজ হতে পারবে না।'

'ঘুরে আসব? কোথা থেকে?'

'একটু তীর্থে-টীর্থে যাও না, কখনও তো কোথাও যাও নি।'

'তীর্থে?...হ্যাঁ, তাই যায় বটে। কিন্তু একা কোথায় যাব? কিছুই তো জানি না। তুমি যাবে?'

'না। আমার শরীর ভাল নয়, বুড়োও তো হয়ে পড়েছি, অত ঘোরাঘুরি সহ্য হবে না। আমি বড়জোর কোন একটা জায়গায় গিয়ে বসে থাকতে পারি। বেশ—আমি বরং কাশী পর্যন্ত যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, সঙ্গে তোমার ঝি চারুর মাকে নাও আর আমার পুরুতমশাইকে দিই; তাঁরও বয়স হয়েছে—তবু তিনি এখনও অনেক শক্ত আছেন আমার চেয়ে, তাছাড়া অনেকবার তিনি সেথো হয়ে গিয়েওছেন এসব তীর্থে। মোটামুটি কাশী গয়া বৃন্দাবন হরিদ্বার প্রয়াগ এইগুলো সেরে এসো, যদি ইচ্ছে হয় ওদিকে দ্বারকা পর্যন্তও যেতে পারো। বাকী থাকে এক জগন্নাথ সেটা একটু উল্টো দিকে পড়ে—তা সে ওদিক থেকে ফিরে এসেও যেতে পারবে।'

হেমন্ত যে খুব উৎসাহিত হয় তা নয়—তবু আর কোন অবলম্বন, কোন পথ খুঁজে না পেয়েই যেন— রাজী হয় শেষ পর্যন্ত। এবার এই পাগলামী—পূর্ণবাবু বলেন হিস্টিরিয়া—কাটবার পর যেন ভেতরে ভেতরে বড় দুর্বল, অসহায় হয়ে পড়েছে। নিজে থেকে কিছু ভাবা কি ভেবেচিন্তে কিছু করার শক্তি নেই। বেশীক্ষণ কিছু যেন ভাবতেও পারে না, মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায়। তার চেয়ে পূর্ণবাবুর মতো হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক স্থানীয় বয়স্ক লোকের ওপর চিন্তার ভারটা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করা ঢের ভালো।

তীর্থে গিয়ে শোকটা না ভুলুক, এই উপকারটাই হয়। নিজেকে যেন ফিরে পায় হেমন্ত, নিজের পূর্ণ পূর্ব সত্তাকে। আঘাত সহ্য করা, বিপদে অবিচল থাকা—আকস্মিক কোন ঘটনায় মাথা ঠান্ডা রেখে উপায় নির্ধারণের যে শক্তি নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্যে একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল, সেই শক্তিটাই ফিরে আসে। মনের শূন্যতাটা পূর্ণ হয় না—তীর্থ-দেবতারা ছেলের স্থান ভরিয়ে দিতে পারেন না—চিন্তাশক্তিটা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রায় তিনমাস ধরে ঘুরে বেড়ায় হেমন্ত। অনেক পরে ওর হুঁশ হয় টাকার কথাটা—এত খরচ কোথা থেকে হচ্ছে। তখন পূর্ণবাবুদের পুরোহিত হেরম্ব ভট্টচায জানান যে, পূর্ণবাবুই অনেক টাকা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন—খরচের কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আগে হলে প্রতিবাদ করতো, নিজে টাকা আনাবার চেষ্টা করতো—কিন্তু কে জানে কেন, এখন এ কথায় একটা যেন স্নেহের পরিচয় পেয়ে নিজেকে অনেকটা নিরাপদও মনে হয়।

অনেক ঘোরে। কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, অযোধ্যা, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, নাথদ্বার হয়ে দ্বারকা পর্যন্ত। শুধু গয়াটা যায় না, ছেলের সপিন্ডকরণ হয়নি এখনও—সেটা না সারলে গয়ায় পিন্ড দেওয়া যাবে না। আরএকবার গয়ায় এসে এ সম্পর্ক চিরদিনের মত চুকিয়ে দেবে।

দ্বারকা থেকে এ পথে আর ফেরা যায় না। ভ্রমণের নেশায় ওকে পেয়ে বসেছে। হেরম্ব ভট্টচাজ একটু গাঁইগুঁই করতে লাগলেন, ঝিয়েরও বাড়ীর খবরের জন্য মন উতলা—হেমন্ত একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে যায় ওদের। উজ্জায়নী অবন্তী হয়ে নর্মদা সেরে কাটনী বিলাসপুরের পথে পুরী এসে পৌঁছয়। এইখানেই যাত্রার ইতি করতে হয়। বৈতরণী ও বিরজা দর্শনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু এবার সঙ্গীরা যেরকম বেঁকে দাঁড়ালো, মনে হলো আর দেরি করলে ওকে ফেলেই পালাবে তারা।

কলকাতায় ফিরে কোথায় উঠবে এ কথাটা আগেই ভেবে রেখেছিল। ও বাড়িতে আর নয়। তারকের স্মৃতি ও বাড়ীর অণুপরমাণুতে জড়ানো। ওখানে গেলেই সেইসব চিন্তা এসে ছেঁকে ধরবে ওকে—আবারও হয়তো পাগলামীর ভূত চাপবে মাথায়। পূর্ণবাবুকে তাই লিখে দিয়েছিল, 'আমার [illegible] রেখো—ও বাড়ির কোন জিনিসও আনিও না, এই যে বিছানা আর বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই নিয়েই উঠবো, এতেই আমার চলে যাবে।'

পূর্ণবাবু স্টেশনে এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে। হেরম্ব ভট্টচাযকে সেইখান থেকে বিদায় করে দিয়ে হেমন্ত আর ঝিকে গাড়িতে তুলে নিলেন। আগে মনে হয়নি কথাটা, গাড়ি চলতে শুরু করার পর গঙ্গা পেরিয়ে পরিচিত পুরনো হ্যারিসন রোড না ধরে যখন স্ট্র্যান্ড রোডের পথ ধরলো তখন মনে পড়লো, গন্তব্যস্থানটা এখনও জানা হয়নি। হেমন্ত প্রশ্ন করলো, 'বাড়ি কোথায় ঠিক করলে?'

'কোথাও এখনও ঠিক করিনি। দুটো তিনটে দেখে রেখেছি, তুমি নিজে দেখে যেটা পছন্দ হয় ঠিক করো। বালিগঞ্জের দিকে একটা ছোট বাড়ি বিক্রিও আছে খুব সস্তায়—যদি পছন্দ হয় কিনে নিতেও পারো। আর এ অঞ্চলেই যদি থাকতে চাও, সেও আমি ঠিক করে রেখেছি—চোরবাগানে একটা, ঠনঠনেয় একটা—দেখে পছন্দ করে নিও। এ দুটোই ভাড়া অবিশ্যি—'

'তাহলে আমরা এখন উঠছি কোথায়?' হেমন্ত একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করে।

'বালিগঞ্জে— আমার ঐ বাগানবাড়িতেই। রান্নার লোক একজন ঠিক করে রেখেছি, গিয়েই হাত পোড়াতে বসতে হবে না। লোকও একটা হল বাড়তি। দারোয়ানরা তো আছেই, তাছাড়াও আমার সরকার এখন ঐখানেই থাকে একটা ঘরে সপরিবারে, তোমার খুব একটা নিবান্দা পুরী বলে মনে হবে না। তুমি এখন নেমে চান-খাওয়া করো বিকেলে আবার গাড়ি পাঠিয়ে দেবখন—বাড়িগুলো দেখে এসো। আর আর যদি ওখানেই থাকতে চাও এখন কিছুদিন—কি কিছু বেশীদিন, কি চিরকালও—স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো, আমার কোন আপত্তি কি অসুবিধে নেই। আমার তো আজকাল আসাই হয় না—তবু বাড়িটা ব্যবহার হবে।

আবার সেই বাগানবাড়ি।

কমলাক্ষর স্মৃতি—

পরক্ষণেই প্রবল মাথা নাড়ে—আপন মনেই। জোর করে, যেন দৈহিক অর্থেই চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে।

নাঃ, সেসব চিন্তা আর না। সেসব অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, পেছনেই পড়ে থাক।

জীবনে এ অধ্যায় ধুয়ে মুছে গেছে। আর এসব কথা ভাবতে কি তাকে মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়।

ছেলে নতুন পথ দেখিয়ে গেছে, কর্মের পথ—কর্মব্যস্ততার মধ্যে মুক্তির পথ—সেই পথেই সে যাবে।

গোবিন্দ যদি দয়া করেন, তাঁর পায়েই মন দেবার চেষ্টা করবে সে।

বিজ্ঞানের কথা

ডঃ অম্বলাল বিক্রম সরাভাই

মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে ডঃ অম্বলাল বিক্রম সরাভাই-এর জীবনাবসান হল। ত্রিবান্দ্রমে তিনি গিয়েছিলেন রেলমন্ত্রী কর্তৃক থুম্বা রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ২৯শে ডিসেম্বর রাতেও থুম্বা রকেট স্টেশনের দু-একজন কর্মীর সঙ্গে প্রায় বারোটা পর্যন্ত তাঁর আলোচনা চলেছিল। তারপরে শুতে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালে দরজায় টোকা দিয়েও তাঁর সাড়া পাওয়া যায় নি। ডাক্তার-দের অভিমত, ভোর তিনটে থেকে ছ'টার মধ্যে কোনো এক সময়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এইদিন সকালেই তাঁর বোম্বাই যাওয়ার কথা ছিল সেই যাত্রা চিরকালের মতো স্থগিত থাকল। ভারতে ও বিশ্বে বহুবিস্তৃত এক কর্মক্ষেত্রে বড়ো রকমের এক শূন্যতা সৃষ্টি করে অকালেই মহাযাত্রা করলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের একজন সবচেয়ে ব্যস্ত বিজ্ঞানী, কখনো কখনো ঘুমোবার সময়টুকু পর্যন্ত এই ব্যস্ততার গ্রাসে পড়ত। বছর শেষ হবার আগের দিনের ঘুমটি কিন্তু চিরঘুম হয়ে রইল। সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদ্মবিভূষণ খেতাবে সম্মা-নিত করেছেন (ইতিপূর্বে ১৯৬৬ সালে পদ্মভূষণে)। এই খেতাবও মরণোত্তর হয়ে থাকল। তবে, দেশের ও বিদেশের বিজ্ঞানী-মহলে, এবং দেশের মানুষের কাছেও, তিনি যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ও যে প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞানীর কাছে যার চেয়ে বড়ো খেতাব আর কিছু নেই, তা তিনি প্রচুরই পেয়েছিলেন। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে যে-জীবনে সমাপ্তি-রেখা পড়ল সার্থকতার বিচারে সেটি আরো অনেক বড়ো। সমস্ত দিক থেকেই ডা অম্বলাল বিক্রম সরাভাই ছিলেন মস্ত মাপের একজন বড়ো বিজ্ঞানী।

জন্ম ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে, আমেদাবাদে। পিতা ছিলেন বিশিষ্ট শিল্প-পতি অম্বলাল সরাভাই। সম্পন্ন পরিবারেই তাঁর জন্ম। তিনি অনায়াসেই শিল্পপতি হতে পারতেন, তার বদলে যে বিজ্ঞানী হয়ে-ছিলেন সেটা সম্ভবত শিশুকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর একটা প্রবল ঝোঁক থাকার দরুন। কারণ যাই হোক, অন্তত আমাদের দেশের বিজ্ঞান জাতে লাভবান

শিক্ষালাভ আমেদাবাদের গুজরাট কলেজে ও কেমব্রিজের সেণ্ট জন্‌স কলেজে। শেষোক্ত কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে অনার্স সহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে স্নাতক। পরে ১৯৪৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেছিলেন। তার আগে ১৯৪৬ সালে এক বছরের জন্যে তিনি কেমব্রিজের ক্যাভেন্‌ডিশ ল্যাবরেটরিতে নিউক্লিয়র পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যেই ডক্টরেট ডিগ্রী।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫—এই পাঁচ বছর গবেষণা করেছিলেন ভারতের সর্বাগ্রগণ্য বিজ্ঞানী সি ভি রামনের অধীনে, বাঙ্গা-লোরের ভারতীয় বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে। সে-সময়ে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কসমিক বা মহাজাগতিক বিকীরণ।

১৯৪৮ সালে আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি। প্রতি-ষ্ঠার সময় থেকেই তিনি এই ল্যাবরেটরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই যোগ বজায় ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ছিলেন মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক পদার্থবিদ্যার প্রফেসর।

প্রথমে বাঙ্গালোরে ও পরে আমেদাবাদে ও অন্যত্র এই মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই তিনি মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তখনো পর্যন্ত প্রচলিত ধারণাকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন। প্রচলিত ধারণাটি ছিল এই যে পৃথিবীর ওপরে বর্ষিত মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা সর্বত্র সমান। ১৯৪৮ সালে বাঙ্গালোরের আব-হাওয়ায় গবেষণা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন সময়ের পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতাও বাড়ে কমে। আবার, প্রতি এগারো বছরে সৌর তৎপরতার যে চক্রটি সম্পূর্ণ হয় সঙ্গে এই বাড়া-কমার সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে তিনি বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালাবার জন্যে সহযোগী গবেষকদের সাহায্যে

গবেষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন আমেদাবাদে, গুলমার্গে, কোদাইকানালে ও দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ায়। এ থেকেই এসে পৌঁছলেন মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সৌরচক্রের সম্পর্কগত আবিষ্কারে।

মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই সম্ভবত মহাকাশ-গবেষণায় তাঁর আগ্রহ। এই আগ্রহ এমন এক সময়ে যখন দেশের প্রয়োজনের দিক থেকেও তার চরিতার্থতার জন্যে সক্রিয় হওয়া চলত। ডঃ সরাভাই তাঁর সমগ্র জীবনেই ঘটনার আনুকূল্য লাভ করেছেন, এ-ক্ষেত্রেও করলেন।

এ প্রসঙ্গেই অপর যে বিজ্ঞানীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য —তিনি হচ্ছেন ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। ডঃ ভাবা ছিলেন ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে ভারতকে তিনি পারমাণবিক যুগে দাঁড় করিয়ে গিয়েছেন। সকলেই জানেন, ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লিটি স্থাপিত হয়েছে ট্রম্বেতে, ১৯৫৬ সালে। তার এক বছর পরেই সোভিয়েত স্পুৎনিকের উৎক্ষেপণ। শুরু হয় মহাকাশ গবেষণার যুগ আর তার চমকপ্রদ অগ্রগতি। ভারতেও তার ধাক্কা এসে পৌঁছয় এবং ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের মহাকাশ গবেষণার জাতীয় কমিটি। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন ডঃ বিক্রম সরাভাই। ততোদিনে তিনি মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক গবেষণার জন্যে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এবং বহু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে (১৯৫৩ সালে ফ্রান্সে, ১৯৫৫ সালে মেক্সিকোয়, ১৯৫৬ সালে স্টকহলমে, ১৯৫৭ সালে ইতালিতে, ১৯৫৯ সালে মস্কোয়, ১৯৬০ সালে ফিনল্যান্ডে ও ১৯৬১ সালে জাপানে) মৌলিক বৈজ্ঞানিক পাঠ করে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছেন। ভারতে সে সময়ে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের কৃতী গবেষক, ৪৩ বছর বয়স্ক এই তরুণ বিজ্ঞানীই সম্ভবত এই নতুন জাতীয় কমিটি পরিচালনার পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

যোগ্যতার পরিচয়ও দিলেন বছরখানেকের মধ্যে। ১৯৬৩ সালে থুম্বায় শুরু হল ভারতের প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ। ডঃ ভাবা যেমন ভারতকে পারমাণবিক যুগে দাঁড় করিয়েছেন, ডঃ সরাভাই তেমনি ভারতকে প্রবেশ করিয়েছেন মহাকাশ গবেষণা যুগে। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৭৫ সালের মধ্যেই ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

ডঃ বিক্রম এ সারাভাই

ডঃ ভাবার মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পুরো দায়িত্বভার নিয়ে এবং যোগ্যতার সঙ্গে তা পালন করে ডঃ সরাভাই সেই শূন্যতা পূরণ করেছিলেন। এই অসাধারণ কৃতিত্বের পরে তিনি নিজেও যে এত তাড়াতাড়ি এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে যাবেন, বাহান্ন বছরের এ তরুণ বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখেও তা কল্পনা করা যায় নি। তবে আশ্বাসের কথা, বহু কৃতী ছাত্র তিনি তৈরি করে গিয়েছেন, বহু কৃতী সহকর্মীও। আশা করা চলে, এই শূন্য স্থান পূরণেও বিলম্ব হবে না। যিনি বড়ো বিজ্ঞানী তিনি শুধু গবেষণাই করেন না, গবেষণা যাতে অব্যাহত থাকে সে জন্যে উত্তরসাধকও তৈরি করে যান।

ডঃ সরাভাই ছিলেন বিশ্বের একজন সবচেয়ে ব্যস্ত বিজ্ঞানী। সেটা যে কতখানি সে সম্পর্কে ধারণা হতে পারে যদি তিনি যেসব প্রতিষ্ঠান ও তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার একটা তালিকা উপস্থিত করা যায়। ডঃ সরাভাই ছিলেন বিশুদ্ধ ও ফলিত পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের মহাজাগতিক রশ্মি কমিশনের সদস্য এবং মহাজাগতিক রশ্মির হ্রাসবৃদ্ধি সংক্রান্ত উপ-কমিশনের সেক্রেটারি, ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাদেমির ফেলো ও তার কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য, লন্ডন ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য কেমব্রিজ ফিলজফিক্যাল সোসাইটির সদস্য, আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য, ভারতের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত গবেষণা পরিষদের ফিজিক্যাল রিসার্চ কমিটির চেয়ারম্যান, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত গবেষণা বোর্ডের সদস্য, আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বর্ষের, ভারতীয় জাতীয় কমিটির সদস্য, ভারত গভর্ণমেন্টের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের নিউক্লিয়ার স্ট্যান্ডিং বোর্ডের সদস্য,পরিকল্পনা কমিশনের বিজ্ঞানী ও হেলথ প্যানেলের সদস্য, ভারত গভর্ণমেন্টের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন তৎপরতার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নিউক্লিয়র অস্ত্রাদির সম্ভাব্য ব্যবহার সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করার জন্যে যে বিশেষজ্ঞমণ্ডলী রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

তিনি ছিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের আওতায় মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে একটি সম্মেলন আহ্বান করার জন্যে সক্রিয় বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর অন্যতম।

তিনি ছিলেন ভারত গভর্ণমেন্টের প্রতিরক্ষা সরবরাহ বিভাগের ইলেকট্রনিকস কমিশনের চেয়ারম্যান, ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান, ভারতের স্পেস রিসার্চ সংগঠনের চেয়ারমান, পাগওয়াশ কনটিন্যুইং কমিটির সদস্য, ভারত গভর্ণমেন্টের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটির সদস্য সুইডেনের আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংঘর্ষ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক পরিষদের সদস্য।

তিনি ছিলেন ১৯৭১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি এজেন্সির সাধারণ সম্মেলনের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সভাপতি।

তিনি ছিলে মাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (এম আই টি) পরিদর্শক অধ্যাপক।

তিনি ছিলেন মাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট গবেষণা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

এইসব প্রতিষ্ঠান ও তৎপরতার ধরণই এমন যে শুধু কাগজে-কলমে শোভাবর্ধক হয়ে থাকা চলে না, রীতিমত সক্রিয় হতে হয়। ডঃ সরাভাই এই আশ্চর্য সক্রিয়তার পরিচয়ও রেখে গিয়েছেন। সংগঠন ও গবেষণা—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি হতে পেরেছিলেন অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত। একাধারে এমন সমন্বয় বড়ো একটা দেখা যায় না।

বিশ্বের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় ও একাধিক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বিবরণীতে তাঁর নিবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

—অরুণকান্ত

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(আটত্রিশ)

পিতৃপুরুষের প্রথানুরূপ যৌবনে গটফ্রিড পুরোহিতের কর্মে অভিষিক্ত হন। লেগে থাকলে সেদিক দিয়েও বহু উচ্চ পদে ওঠার কথা। কিন্তু তাঁর মনের স্বচ্ছন্দ তাতে বাদ সাধে। তিনি উপলব্ধি করেন, বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে এমন অনেক কাজ করতে, এবং এমন অনেক কথা বলতে হয় যা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেন না। অনেকেরই তেমন অবস্থা হয়েছে। তারা বৃত্তির বা কর্মানুশাসনের খাতিরে মানিয়ে চলে। সে যুগে বহু দেশ ছিল ইংরেজের অধীনে। কিন্তু সে সব অনুন্নত দেশে আজকের মতো বাজার ছিল না। সেসব স্বাধীন হবার পর গঠনমূলক দ্রব্যের চাহিদা বেড়েছে, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। তাই তখনকার দিনে বৃত্তি নিরূপন বর্তমানের ধরনে সুলভ ছিল না। একটা পথ বেছে নিলে সেটার অদল-বদল বড় দুরূহ হত। তাঁর বাপ-পিতামহেরও তেমন হয়েছে। যৌবনে মঠে যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে মত-বিভ্রাটে পড়ে তা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। জার্মাণীর স্যাক্সনি রাজ্যে তাঁদের বিষয় সম্পত্তি ছিল, কাজ না করেও চলে যেত ভাল ভাবে। তবুও তাঁরা শিক্ষকতা ও লেখালিখির কাজ করতেন। সময় এল, রাজনৈতিক, অন্তত ধর্মনৈতিক মতামতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আর তাঁদের সেখানে বসবাস করা সম্ভব হ'ল না। অতএব তারা চলে আসেন ইংলণ্ডে। সেখানকার উদারতার কোলে এমন বহু লোক স্থান পেয়েছে।

স্যাকসনরা প্রাচীন টিউটন জাতের শাখা বিশেষ। উত্তর খণ্ডে অনেক দেশের ভাষা টিউটন ভাষার অন্তর্ভুক্ত, যেমন দক্ষিণে ল্যাটিন এবং পূর্বাংশে স্লাভ—সকলেই আর্য-ভাষার মাতৃত্ব দাবী করে। এককালে স্যাক-সনদের ক্ষাত্রবীর্যের প্রভাব ব্রিটেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেখানে পর পর তারা [illegible] রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে, এবং বহু-দিন পর্যন্ত তা চালিয়েও আসে। সময়ে নিজের দেশে তারা বলহীন হয়ে পড়ে। প্রুশিয়ানরা ছিল মহাপরাক্রমশালী হুন জাতি উদ্ভূত। পূর্বাংশে তারা যত বড় রাষ্ট্র গড়ে তোলে, পশ্চিমাংশে জার্মাণীর রাজ্য-গুলো তেমনই খণ্ড ছিন্ন। প্রুসিয়ার রাজা উইলিয়মের আশা সমগ্র জার্মান রাজ্য-গুলোর ওপর প্রুসিয়ান শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তার করা। সেই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয়—সেনাপতি মুলৎকে ও যুদ্ধমন্ত্রী রুন। রাশিয়া ও ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূতের কাজে বিসমার্ক হাত পাকিয়ে রেখেছেন কূটনীতির চালে। তাই রুনের পরামর্শে রাজা তাকে মন্ত্রিসভার সভাপতি করেন। তার নেতৃত্বে প্রুসো-জার্মান একীকরণের প্রচেষ্টা চলে। এতদিন পর ঘটনার ঝাঁজটা কেটে গেছে, তাই কথাটা শোনায় বেশ। যদিও এটার আসল উদ্দেশ্য সমগ্র জার্মানী প্রুসির রাষ্ট্রাধীনে আনা। রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা তো আছেই, এমন কি ধর্মকর্মও বাদ পড়েনি। তাই ছোট-খাটো রাজ্যগুলো অস্ট্রিয়ার ছত্রতলে তার বিরোধিতা করে। অস্ট্রিয়ার বিরাট সৈন্যবল, তার বিরুদ্ধে প্রুসিয়ার অল্প সংখ্যক অথচ নিপুণ সৈন্যের হাতে উন্নত অস্ত্র ও বিস-মার্কের কূটনীতি। এই দ্বন্দ্বে রাশিয়া ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকে এবং ইটালি প্রুসিয়ার পক্ষে আসে।

ইতরজনের জাতিগর্ব থাকতে পারে, কিন্তু বিরাট শক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধের সামনে নিঃসহায় তারা। এর অনিবার্য ফলাফল যারা আন্দাজ করতে পারে তারা এসব থেকে দূরে সরে থাকে। তাই পৃথিবীর এক এক অংশ থেকে এক-এক জাত চলে গেছে অপর অংশে। সেই সময় গটফ্রিডের পিতামহ জন্মের মতো স্যাকসনি ত্যাগ করে চলে আসে। অনেকেই তেমন করে। তাই সেখানকার বাজারে বিষয়-সম্পত্তি ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই বেশী। সেই মন্দা বাজারে সম্পত্তি বিক্রি ক'রে যা এনে-ছিলেন তাতে তেমন [illegible] চলে না। তা সত্ত্বেও গটফ্রিডকে বৃত্তি পরিবর্তন করতে হয়।

ধর্মপীঠ নির্দেশ দেয় তাঁকে ভারতবর্ষে যাবার জন্য। সেটা ভাল লাগল, কিন্তু উদ্দেশ্যটা বাদ সাধল। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ ক'রে তাদের ধর্মান্তরে দীক্ষিত করতে হবে। এটার প্রথমাংশটা পছন্দ হ'ল, দ্বিতীয়টাতে বেঁকে বসলেন। এর মধ্যে তিনি অনেক জেনেছেন। ভারতবর্ষ নব আবিষ্কৃত দেশগুলোর মতো নয়। হ'তে পারে গরিব, পরাধীন কিন্তু বহু প্রাচীন সভ্যতার একটা কীর্তিস্তম্ভ, এবং সেই মাটিতে উদ্ভূত সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও শাস্ত্র বিদ্যমান। তিনি বোঝেন, বিদেশী ধর্মের প্রভাবে তারা দেশাত্মবোধ হারাবে। তাদের আনুগত্য আসবে পরদেশের ওপর। একদিন সময় আসবে, পশ্চিম জগতের উন্নত দেশগুলোর মতো ভারতও তার জন-সমস্যা দূর করবে, অনুন্নতকে উন্নত করবে। তার আগেই ঐ সব লোক পরদেশীয় ধর্ম-মতের কবলে পড়লে ভারত একদিন সে সবের মুখোমুখি এসে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। অথচ যে রাজনৈতিক কারণে ওসব করা, তার কোন সুসার হবে না! ইংরেজকে একদিন সেখান থেকে চলে আসতেই হবে।

শুকদেব, ব্যাসদেবের দেশকে তিনি ওভাবে বিধ্বস্ত করতে নারাজ। তাই জীবিকার জন্য তিনি গেলেন অন্য পথে। মনে ক্ষীণ আশা ছিল—চায়ের কাজটা শিখলে হয়তো ভারতবর্ষে আসবার পথটা একদিন সুগম হবে। নিজের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে এসে তখন দেখা যাবে, কতখানি করা যায় নিজের ইচ্ছা মতো। মঠের কর্ম-ত্যাগের পর তিনি স্বাধীনভাবে নিজেকে তৈরি করতে লেগে গেলেন তার জন্য।

ইওরোপের বহু ভাঙ্গাগড়া গটফ্রিডের চোখের সামনে ঘটেছে। তাঁর পরিবারস্থ পূর্বাপর অনেকেই তাতে অংশ গ্রহণ করেন। এবং গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে সমস্ত জগতের ইতিহাস তাঁর নখদর্পনে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি খুঁজে বেরিয়েছেন বিশ্বজনীন বার্তা। সেই প্রচেষ্টার পথে বাধা পান ম্যাকস-মূলারের সন্ধান। তিনি ভারতকে নিজ ভূমি বলে স্বীকার করে গেছেন। এবং তাঁরই

রচনাবলী মারফৎ পান ভারতবর্ষের সন্ধান। বিশেষভাবে তিনি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার, ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে জগতের হিতার্থে, সর্বকালের উপযোগী এমন চিরন্তনবাণী আর কোথাও পাননি তিনি। গীতার সদৃশ এমন সংক্ষিপ্ত ও তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ তাঁর চোখে পড়েনি। পাতঞ্জল দর্শনের মতো ব্রহ্মজ্ঞানের গুপ্তভাণ্ডার আর কোথাও উন্মুক্ত ক'রে দেখাতে পারেনি। তাঁর মতে এমন দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয় আর কোথাও জানা নেই। শঙ্করাচার্যের সর্ব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ জগতের এক অপূর্ব বৈভব।

ঐ সবের সঙ্গে গর্টফ্রিড তুলনা ক'রে দেখেন পাশ্চাত্য জগতে প্রবর্তিত জ্ঞান সম্ভার—আরব্য জগৎ উদ্ভুত ও গ্রীকো-রোম্যান ভাবে পুনর্গঠিত। সেই শিক্ষার পরিবেশে তিনি পান শুধু বিরোধ—বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের, এবং সম্প্রদায়ের অভ্যান্তরীণ শাখা বিশেষের মধ্যেও। এদের কেউ কাউকে স্বীকার করে না, যেটুকু করে তা অপরের মতামত, এমন কি সিদ্ধ পুরুষেরও ভুল প্রতিপন্ন করবার জন্য। তার ওপর আছে এক-এক মহাপুরুষের অসামান্য দাবী—একমাত্র আমিই ভাগবত কৃপা পেয়েছি। আমি যা করেছি তা আর কারো দ্বারা সম্ভব হবে না। সকল মানুষ পাপী, একমাত্র আমিই মানবের ত্রাণকর্তা।

গর্টফ্রিড কোন মতে তা গ্রহণ করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, অধুনা পাশ্চাত্যের বহু মনীষী অমন সব নির্ব্যাজ কথায় হালেন, অমন সব মতামতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান, এবং তৎপরিবর্তে ভারতীয় ধর্মমত প্রসারণের সম্ভাবনা ও নির্দ্বন্দ্ব স্বীকার করেন।

কর্মবলে, ভক্তিবলে, বা যেভাবেই হোক, এক রক্ত-মাংস বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে যদি কিছু সম্ভব হ'তে পারে—অপরের দ্বারা, বহুর দ্বারা কেন তা সম্ভব হবে না! কাজ যত কঠিন হোক, পরীক্ষা যত দুরূহই হোক মানুষের পক্ষে তা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। এবং এই বিশ্বাস জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই থাকা উচিত।

পূর্ব-পশ্চিমের এই ভেদাভেদ গর্টফ্রিডের মনে একদিকে যেমন এনে দেয় দ্বন্দ্ব, তেমন অপরদিকে জাগিয়ে তোলে অনুপ্রেরণা। তাই তিনি আবিষ্ট হয়ে পড়েন প্রাচ্যের জ্যোতির্ময় আলোক সম্পাতে। বেদান্তে তিনি পেলেন তিনটি মূল তথ্য—সকল মানুষই অমৃতের পূর্ণাবয়ব সন্তান; সকল মানুষের উদ্দেশ্য সেই অমৃতের সন্ধান ও অমৃতে বিলুপ্তি; সকল ধর্মের উৎস একই অমৃত।

এর মধ্যে তো কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিশিষ্টের কথা, অথবা কোন গ্রাম্য ভাব নেই! এমন অমৃতময় বাণী তিনি পশ্চিমের কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাননি। উপরন্তু তাদের কারো এমন সাহস নেই যে, এর একটাও স্বীকার করে। তা হলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হবে। ওসব বিভিন্ন বাক্যাবলী, বিভিন্ন অভিধানের আখ্যা ব'লে পাশ কাটিয়ে যায়। যুক্তি না থাকলে অমন ভাবেই তার যাতিপাত হয়।

স্তিমিত সূর্যালোকের স্পর্শে, ধর্মের দিক দিয়ে, দর্শন তত্ত্বের দিক দিয়ে পশ্চিমাংশ দুর্বল, আশাহীন—অমৃতের সন্ধান তার কল্পনাতীত তাই তা দুর্লভ, অসম্ভব; উদিত কিরণের তেজে পূর্বাংশ সবল, আশাবাদী—তার মৃত্যুঞ্জয়ী কল্পনা প্রসূতে অমৃত, সুলভ না হলেও সম্ভব। তাই পশ্চিমাকাশের তলে ভারত সদৃশ মুনি-ঋষির মহাপুরুষের আবির্ভাব বিরল, অসম্ভব; কিন্তু পূর্বে গগনমার্গের মহিমায় তা সম্ভব হ'য়ে চলেছে—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য এমন প্রাঞ্জলভাবে কে আর কোথায় তুলে ধরেছে জগতের সামনে—

ভৃগু মুনির পুত্র, বারুণী পিতার নির্দেশে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্যের সন্ধানে বার বার পরিব্রাজক হ'য়ে ঘুরে বেড়ান। একটি পর্যায় শেষ করে তিনি পিতৃ সমীপে নিবেদন করেন—সকল রহস্যের মূল অন্ন। কারণ, জগতে সকল জীব ও বস্তুর সৃষ্টি অন্নে, তাতেই স্থিতি এবং লয়—অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হ'য়েও পঞ্চভূতে—মহাভূতানি তার অবস্থান। আবার সেই পঞ্চভূতে সকল জীবের উৎপত্তি।

বলা বাহুল্য যে পাশ্চাত্যের পদার্থ বিজ্ঞান তার চারটি দেখতে পায়; কিন্তু পঞ্চমটি যদিও শূন্যরূপে অঙ্ক শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি বৃদ্ধি করে অবস্থিত তবু তার আসল ভাবার্থ পায়নি। অধুনা স্পেস তার অংশ বিশেষ।

তত্ত্বটির পূর্বাভাস—প্রবর্তিত চক্রং—গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে আছে, এবং এই কর্মচক্র বেদ বিহিত। তবুও ভৃগু মুনি পুত্রের সেই সিদ্ধান্ত চরমরূপে গ্রহণ না ক'রে তাকে আবার পর্যটনে পাঠালেন।

অপর পর্যায় শেষ ক'রে তিনি নিবেদন করলেন—ইচ্ছা সকল সৃষ্টির উৎস। কারণ, ইচ্ছায় সকল জীবের সৃষ্টি, পালন ও লয়। সকল জীব লয় প্রাপ্ত হয়েও ইচ্ছারূপে নিবেশিত থাকে।

পাশ্চাত্যের বিবর্তনবাদও ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টিতত্ত্ব অন্নময় বা প্রাণময়, মনোময় বা ইচ্ছাময়, জ্ঞানময় বা আনন্দময় যাই হোক, সকল তত্ত্বেরই সমর্থন পাওয়া যায় শাস্ত্রে। ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী, তবে তিনি জীবের এবং সকল বস্তুর, অন্নে, প্রাণে, মনে, জ্ঞানে ও ইচ্ছায় অবস্থিত। তাই ইচ্ছাময় তার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে বলেন—ভূতগ্রামম্‌ বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

কিন্তু মুনিবর সেটাও চরম সিদ্ধান্ত ব'লে গ্রহণ করলেন না, পুত্রকে আবার পাঠালেন। সেবার ফিরে এসে তাঁর উপলব্ধি জ্ঞাপন করলেন—ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তু নিয়মের দ্বারা চালিত, নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞানে। অতএব জ্ঞানই সকল রহস্যের মূল—জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। সকল বস্তু বিলীন হয়েও জ্ঞান-রূপে তা বিদ্যমান, এবং সেই জ্ঞানেই তার সৃষ্টি।

পুত্রের তাদৃশ সমীক্ষা ও উপলব্ধিতে ভৃগুমুনি তুষ্ট হলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন জ্ঞানের তত্ত্বান্বেষণে।

এই জ্ঞানের তত্ত্ব জগতের কোন অংশে কতখানি জ্ঞাত, তা যুক্তি-তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু মনে রেখাপাত করবার মতো ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও কিছু গর্টফ্রিড খুঁজে পাননি। তিনি দেখলেন, যেভাবেই হোক, কর্মচক্র থেকে জীবের বা জগতের পরিত্রাণ নেই। এবং কর্ম না-করা অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেয়। তাই তিনি ভাগবতসিদ্ধ কর্ম নির্ধারণে প্রবৃত্ত হলেন। এবং তাঁর সন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ক'রে নিজের চোখের সামনে রাখলেন।

সকল জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা, সকল রহস্য, গুণ ও রসের উৎস হয়েও পুরুষ স্থির—সর্বগুণরহস্যাতীত, সকল রসগুণের ঊর্ধ্বে: সর্বগুণাবৃত প্রকৃতি চঞ্চল রসময়। তাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিত রূপান্তরে পুরুষ নির্বিকার; চঞ্চল প্রকৃতি গুণরস-রহস্যময়, সবিকার, মুগ্ধাবিষ্ট, মায়াময়। পরমপুরুষের কৃপায় প্রকৃতি হ'তে জাত তিনটি গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তম—সকল প্রাণী ঐ গুণের পর্যায়ভুক্ত এবং গুণানুসারে বিভক্ত।

ত্রিবিধ গুণ বিশেষে—যার যেমন মনোভাব তার তেমন নিষ্ঠা হ'য়ে থাকে, আবার যার যেমন নিষ্ঠা তেমনই স্বভাব। এবং সেই অনুসারে আহার-বিহার কর্মাচরণের ব্যবস্থা। শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা এইসব গুণের প্রভাব কাটিয়ে মুক্তি লাভও সম্ভব।

শরীরের চেয়ে ইন্দ্রিয় বড়, ইন্দ্রিয়ের চেয়ে বড় মন, তার চেয়ে বড় বুদ্ধি, যিনি বুদ্ধির চেয়ে বড় তিনিই আত্মা। বুদ্ধির সাহায্যে বায়ু অপেক্ষা, বিদ্যুৎ অপেক্ষা, বেগবান ও চঞ্চল মনকে স্থির ক'রে কামনা ধ্বংস করা যায়। এবং কামনা ধ্বংস হ'লে পরম শান্তি লাভ হয়।

অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান বড়, তার চেয়ে ত্যাগ বড়। সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগ করতে পারলেই শান্তি পাওয়া যায়।

কেউ ধ্যান ক'রে মন বিশুদ্ধ হ'লে সেই মন দিয়ে বুদ্ধিতে আত্মাকে দেখতে পান; কেউ বিবেক-জ্ঞানের বলে তাঁকে দেখতে পান; আর কেউ বা কামনাশূন্য কর্মের দ্বারা তাঁকে দেখতে পান।

তমোগুণ যদি অজ্ঞান থেকে জাত হ'য়ে থাকে, এবং কর্মস্পৃহা বিলুপ্তি ও ভূত-প্রেতের পূজা যদি তামসিকতার লক্ষণ, তবে স্তিমিত পশ্চিম আজ তমসাচ্ছন্ন। মদ মাৎসর্য গর্বিত ধনমান লোভী যক্ষ সেবক রাজসিকের দেশও পাশ্চাত্য জগত।—যে নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইওরোপের পূর্বাংশ বৃথা চেষ্টা করে চলেছে, সেই নিষ্পেষণবিধি প্রবর্তনের জন্য পশ্চিমাংশ মেতে উঠেছে। সেখান থেকে ভূতের নাচ

সৃষ্টি হয়ে সারা পৃথিবী মাতিয়ে তুলেছে। সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পঙ্ক তোলার পিছনে রয়েছে জীবের ও জৈব প্রকৃতির কোটি কোটি বৎসরের যুক্ত প্রচেষ্টা। কিন্তু তমোরজোগুণাসক্তের যৌথ অবিমৃশ্যকারিতায় পৃথিবী চলেছে ধ্বংসের পথে। পশ্চিম আজ তমসা ধরণী বিবশা, ধরণী আজ তমসা পশ্চিম বিবশা।

কল্পনায়, পশ্চিম নিরাকার একেশ্বরবাদী। আবার ত্রয়ম্বকও একে তিন, তিনে একও আছে। পরমার্থ শান্ত ধর্মবিরুদ্ধ, তাই সে তত্ত্বের বালাই নেই। আছে শুধু প্রার্থনা। তাই কার্যক্ষেত্রে, ভজনে ঐ তিন মূর্তির নামাবৃত্ত হয়—পিতা, পুত্র ও ধর্মাত্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তুলনায় এক নির্ব্যাজ, শূন্যগর্ভ কল্পনার প্রতিচ্ছবি। তাছাড়া আছে সাম্প্রদায়িক পরমহংসে এবং অপরিতোষণীয় মতদ্বৈধ। এবং একের বাইরে অপর মতামত অগ্রাহ্য—ইনফাইডেল তারা। সেখানকার সকল মঠ ও পুরোহিতের কার্যকলাপ চালিত হয় সকল মানুষ সমাজ নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করবার আশায়। তারা অসীম ধৈর্য নিয়ে সেবা যত্ন ক'রে যায় পতিতের মন জয় করতে।

লন্ডনে থাকার সময় গার্টরুড এক মঠে যেতেন গীতার ব্যাখ্যা শুনতে। একদিন ষষ্ঠ অধ্যায়ের সঙ্গে শুনলেন পাতঞ্জল যোগসূত্রের বিশদ বিবরণ। সব শেষে এল প্রশ্ন ও উত্তরের সময়। কয়েকজন ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চাইলেন দীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি।

স্বামীজী তার উত্তরে বললেন—এখানে ধর্মত্যাগ বা দীক্ষার কোন প্রশ্ন নেই। যাঁরা গৃহী, তাঁরা গৃহস্থালি বজায় রেখে, নিজ ধর্মে থেকেও যোগসাধনা করতে পারেন। তাতে যথাসাধ্য সাহায্য আমরা করতে পারি। দীক্ষার প্রশ্ন আসে সন্ন্যাসব্রতীর। কারণ, তাতে অনেক অনুশাসন—সংযম, অভ্যাস, অধ্যাপন, আহার, আচার, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি মেনে চলার প্রয়োজন। তাও আমরা চাওয়া মাত্র দিই না। বেশ কিছুদিন সমীক্ষা ক'রে দেখি। পরীক্ষার ফল অনুযায়ী ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারলে, তবে আসে সে কথা। আমাদের মন্ত্রদানও উদার, প্রত্যেক ব্যক্তির অভিরুচি যাচাই সাপেক্ষ তা। আপনাদের কাউকে আমি হয়তো বলবো যীশু মূর্তি চিন্তা করতে, নয়তো মেরী। তাই হঠাৎ নিজ ধর্ম ও সংস্কার ত্যাগ করিয়ে কাউকে বিভ্রান্ত করতে বা কষ্টে ফেলতে চাই না।

এমন কথোপকথন শুনে গার্টরুড বিস্ময়াভূত হয়ে পড়েন। পাশ্চাত্যের যে কোন ধর্মযাজক, যে কোন লোকের এমন প্রস্তাব লুফে নিতেন। কিন্তু স্বামীজী নির্বিকার চিত্তে তা শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, পরন্তু যুক্তি দেখিয়ে, তাদের ইচ্ছা নিবৃত্ত করতেও চেষ্টা করলেন। অবশ্য পরে শ্রোতাদের মধ্যে কাউকে সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে মঠে যোগ দিতেও দেখেছেন। অনেক ইংরেজ, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, [illegible] ক্যানেডিয়ানও দেখেছেন [illegible]

সকলের নির্মল প্রকাশক, জ্ঞান দিয়ে তা জীবকে বন্ধন করে। পূর্বাপর বহু প্রশ্ন বিচার করে গার্টরুড উপলব্ধি করলেন—পাশ্চাত্যের বিধানে, প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাবাপন্নের পক্ষে কর্মস্পৃহা পূর্ণ হবার কোন আশা নেই। সেখানকার শিক্ষার যে অংশ সঙ্কীর্ণতার পথে নিয়ে যায় তা পড়ে রইলো একপাশে।

দূরে থেকে যার দীপ্তি গার্টরুডের মনকে এত উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে, সামনে এসে দেখলেন তার জরাজীর্ণ অবস্থা। হাজার হাজার বছরের মতামত বৈকল্য, পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, নিশ্চেষ্টতা ও বৈদেশিক ভাবধারার সংঘাতে দেশটা এসে দাঁড়িয়েছে কোথায়! হিমালয় সম উচ্চ আদর্শ বিচ্যুত হ'য়ে কেমন ছন্নছাড়া হ'য়ে গেছে। গার্টরুডের মনে এই সব প্রশ্ন, তার প্রতিকারের চিন্তা বহুদিন থেকে ওঠানামা করছে। কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে জড়িত। বাগানের সকলের জন্যও তিনি যথাসাধ্য করেন, তার বাইরেও তার কাজ প্রসারিত। গ্রহণক্ষম, গ্রহণোন্মুখ মেয়েকে পেয়ে তিনি ভারতবর্ষের বৃহত্তর সমস্যার কথাগুলো একে একে তার সামনে তুলে ধরলেন, যাতে সে বৃহত্তর পটভূমিকায় সমস্ত জিনিস যাচাই ক'রে দেখতে পারে, বুঝতে পারে, যাতে তার মনের প্রসারতা লাভ করে। সেই অনুপাতে, সেই প্রসঙ্গে বাগানের সমস্যাটাও টেনে নিয়ে তুলনা করে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। যাতে অন্তত বাগানের কুলি-সংক্রান্ত কাজের ভারটা তার হাতে দিয়ে নিজে অন্য দিকে মন দিতে পারেন।

প্রাচীন ভারতের বৃত্তি নিবন্ধ চার বর্ণ কালের প্রবাহে চৌষট্টি বৃত্তিতে প্রসারিত, বিভক্ত। অল্প হলেও বর্তমানের সংঘাতে ওপরের তিনটে অনেক ভাঙাচোরা হ'য়ে, ওঠানামা ক'রে চলেছে, কিন্তু নীচেরটা অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ পড়ে আছে সেই তিমিরে। এই শ্রেণী, যা তারই এক অংশ নিয়ে গার্টরুডের কাজ। তাই এটার ধরন-করণ তিনি ভালই বোঝেন। এটা পৃথিবীব্যাপী সমস্যা। শিক্ষার ভিত্তি, গৃহ নির্মাণের ভিত্তির চিন্তা মানুষ করে, কিন্তু সমাজের ভিত্তিতে মানুষ উদাসীন। মানুষের প্রতি মানুষ বিমুখ সেখানে।

একটি রেখার একপাশে পূর্ব অপর পাশে পশ্চিম। কত কাছাকাছি দুটির সত্তা, কিন্তু বর্তুলাকারে চলে যায় কত দূরে। তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল ভাবধারা, কর্মানুশীলন ও সমাজ বিন্যাসের তুলনা করা সুকঠিন। তবে পাশ্চাত্য সমাজের মূলেও তিন বর্ণের, এবং এককালে তার দুটো অন্তত ছিল জন্মগত—বৃত্তিগত নয়। ভারতের চতুর্থ বর্ণ পাশ্চাত্যের তৃতীয় বর্ণের অন্তর্ভুক্তমাত্র। তা কেন, প্রকৃতপক্ষে ঐ তৃতীয় বর্ণই তো অতীতকাল থেকে সেদিন পর্যন্ত দাসত্ব ক'রে গেছে আর সকলের। যে ভাবেই হোক, শূদ্র সেখানেও আছে। তাদের আনন্দ অপরাপর আর্থিক অনুন্নত দেশের প্রতি কটাক্ষপাত করে। জগতে ধারাই এই। তবে ইওরোপের শূদ্রবোধটা শতাব্দীর শিল্প-বাণিজ্যার্জিত সমৃদ্ধির আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। অস্তাচল জেগে ওঠার বহু পূর্বে উদয়াচল ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফলে ভারতবর্ষে হয়েছে তার উলটো। আজ তাই ভারতের তুলনায় শূদ্র সমস্যাটা তেমন উৎকট নয় সেখানে। যদিও সেই তিনবর্ণ একদিন তৈত্রিশে উঠেছিল, কিন্তু যুগের প্রভাবে কর্মাকর্মের বিপ্লবের সংঘাতে তা নেমে এসেছে। তবুও শ্রেণীর শেষ হয়নি। তবে এখন সেখানে শ্রেণী নির্ধারণ হয় শিক্ষায়, কাজে ও অর্থে। ঐতিহ্য অভিজাতও আছে। এই কাজের বিভিন্ন স্তরে শূদ্রের সমাবেশ। তাদের বেতনের নিম্ন হার পূর্বাঞ্চলের তুলনায় এত বেশী যে কাউকে পরোয়া না ক'রে তারা সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে। অবশ্য যাদের আয়ত্ত হয়েছে সেটা। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই অস্থানে মুক্তার মালা। খরচ করতে না জেনে পয়সা হাতে এলে যেমন হয়। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ইস্কুলে যায় বটে, কিন্তু কথামালার ওপর উঠতে পারে না। শিক্ষার মর্ম না বুঝিয়ে ইস্কুলে আটকে রাখার ফল এটা।

পশ্চিমে অপরাপর চাকরিজীবীর মতো এক ধর্মযাজক ধর্মানুষ্ঠানের শীর্ষে উঠতে পারে। কিন্তু ভারতে তা সম্ভব হয় সেবার

ত্যাগে, ব্রহ্মজ্ঞানে। যে দেশের আদর্শ বাণী—দরিদ্র নারায়ণ, জীবে শিব জ্ঞানে সেবা, যে দেশের দেবী সর্বভূতে বৃত্তিরূপে সংস্থিতা সেই দেশের শূদ্র উপেক্ষিত, নিষ্পেষিত। তাকে পদদলিত করে ভারতবর্ষের কত নির্যাতন হয়েছে, তবুও তাকে পিছনে রেখে ভারতবর্ষ এগিয়ে যেতে চায়। এই অতি প্রাচীন প্রশ্নটা মেঘু পেয়েছে প্রাচীনতম গ্রন্থে, সেখানেই দেখেছে সমস্যার বিধিব্যবস্থা। উপলব্ধি করেছে তার প্রতি মানুষের গোঁড়ামি, উপেক্ষা। তার জন্য বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী কত কথা বলে গেছেন। সেই সব সংবাদ, সেইসব বাণী মেঘুর অন্তরে সুপ্ত ছিল এতদিন। সময় মতো তা মূর্ত হয়ে উঠল। অথবা দুটো জগতের মনুষ্য সমাজ-বিন্যাস ও ধর্মকর্মের ভাবধারার ইতিহাস তুলনা করে বুঝিয়ে গার্টক্লিড জাগিয়ে দিলেন মেঘুকে। এমন সব কথা তিনি এক-একদিন এক-এক ভাবে শুরু করেন, শেষ করেন। একদিন অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তিনি বললেন—চলে যাও, ওদের মানুষ করে তোল। মানুষের মতো জীবন যাপন করুক ওরা। জন্মেছ মানুষ হয়ে কাজ করে যাও মানুষের কল্যাণে। ভেঙে যাও, গড়ে তোল। একটা দাগ রেখে যাও সংসারে। জীবন ধন্য কর।

মেঘু যখন বাগানে কাজ করে, তখন চেষ্টা করেছে সকলকে বাড়তি কাজ করাতে, সকলের কামাই বাড়াতে। তাদের খরচ নিয়ন্ত্রণ করবার দিকে তেমন বিশেষ মন দেয়নি তখন। কিন্তু এখন তা নয়। এখন তার দৃষ্টি সকল দিকে। অপরাপর সকলের মতো মেঘুও গার্টক্লিডকে দয়ালু বলেই জেনে এসেছে। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝতে লাগল সেই দয়ার পরিসর, ব্যাপকতা, তার উৎস। গার্টক্লিডের ঔদার্যে সে মুগ্ধ হল। তাঁর প্রত্যেকটি উপদেশ সে ইষ্ট কবচের মতো শিরোধার্য করে নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হল। তাই তার কাজের প্রসারতা বাগানের রীতিনীতি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে পড়ল। তাই মেঘু চাইল কুলিদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে। তাদের গড়ে তুলতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের উপযোগী করে। যে পয়সা তারা কামাই করে, যেসব বরাদ্দ সুখ সুবিধে তারা পেয়ে থাকে তাতে অনায়াস না হলেও তা সম্ভব। তার ওপর মেঘু নিজেও অনেক কিছু প্রেরণামূলক পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। কিন্তু, এমন সংস্কার বিরোধী তাদের মন যে মেঘুর সব কথায় সায় দিতে পারে না মনের ভিতর থেকে। নিজেদের কল্যাণের কথা মনে স্থান পায় না। তারা চায় না তা। চায় না তাদের দৈনন্দিন জীবনের দুষ্কৃতি দূর করতে। তারা চায় না আর কেউ এসে তাদের সামাজিক জীবন-প্রবাহে, তাদের সংস্কারে হাত দিক, তাদের অনাবিল উদ্দাম জীবন প্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিক। তবুও যুক্তিতে মেঘুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। কথায় কথায় সে বলে বসে—আমিও তো তোদেরই একজন। কেন আমার অবিশ্বাস? আমার কথায় তোদের কোনটা খারাপ হয়েছে দেখিয়ে দে।

ভেবে দেখতে গেলে সবই সত্য। এমন কথার কি জবাব দেবে তারা। সবাই নির্বাক হয়ে বসে থাকে। জবাব না থাকলেও থাকে গোঁড়ামি, একটা কিন্তু ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে মনের তলায়। এমন ধরনের জনসমষ্টির নীচে পড়ে থাকার একটা কারণ যেমন ওপর থেকে চাপ, তেমনি আর একটা কারণ তাদের মাটিতে লেপটে থাকার উগ্র স্পৃহা। মেঘুর যতন যেখানে যে তাদের টেনে তুলতে গেছে সেখানেই সে বুঝেছে তাদের কেন্দ্রাভিমুখী টান। নিজের সব কিছু আঁকড়ে থাকতে চায় সবাই। নিরামিষাশীকে আমিষাশী করার মতোই কঠিন এটা। এখানে সকল অনুনয় ব্যর্থ। তাই এমন ক্ষেত্রে ফলাফল অতি মন্থর।

কলাপাতা ছেড়া যায়, কিন্তু তার নিজের ভাবে। তারাও চায় সব কিছু আসুক তাদের ভাবে। চায় পয়সা—যেভাবেই খরচ করুক, চায় পাকাঘর—যেভাবেই ব্যবহার করুক না সেটা। চিকিৎসায় বাঁচিয়ে তুলতে হবে, মরবার জন্য যত ব্যবস্থাই করুক না কেন সেদিকে নজর দেওয়া চলবে না। সস্তায় চাল-ডাল দিতে হবে না, তারা চায় জমিজমা, বেশ কিছু চাষের জমি। ওটা না থাকলে বনেদী হওয়া যায় না। কিন্তু ফসলের ওপর চোখ দিয়ে রেশন বাদ দেওয়া চলবে না। প্রথমটা গতর খাটানো, শেষেরটা প্রাপ্য। শুধু চাই আর চাই, দেবার মাত্র কয়েকটা ঘন্টা। তাও না দিয়ে পারলেই ভাল। সেদিকে পৃথিবীর কারো পিছনে নয় চা-বাগানের কর্মীরা। এককালে ছিল বটে, কিন্তু আজ সকলের ওপরে!

মেঘু তার সাধ্যমত জমিজমা দিয়েছে, আরো দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। চাষের সময় ট্র্যাকটর দিয়ে জমিগুলো চষে দেবার ব্যবস্থাও করছে। যাতে চাষের কাজে ওদের বেশী সময় দিতে না হয়। তাতেও শুক্রীর ভাইরা দল পাকিয়ে আজেবাজে কথা তুলে গোলমালের সৃষ্টি করতে আসে। তাদের জমি আছে অনেক আগে থেকেই। নতুন নিয়মে কোন লাভ নেই তাদের। সেটা বোঝে সবাই। তাই কোন ফল হয় না তাতে। চোখের সামনে সবাই দেখে কত কাজ, মেঘুকে অবিশ্বাস করে কি করে। তার কথা না শুনেই বা কেন নিজেদের লোকসান করতে যাবে? সেদিক দিয়ে স্থায়ী কুলিদের মোটামুটি বেশ গুছিয়ে নিল মেঘু।

চালানী কুলিরা দেশে ফিরে গিয়েও মজুর খাটে। তাও সব সময় জোটে না। তবুও ফিরে যায় মাটির টানে, জাত-কুটুমের টানে, নয়তো যাদের সঙ্গে এসেছে তাদের টানে। জোট বেঁধে আসে, জোট বেঁধে যায়। হাতের পয়সা নিঃশেষ করে কিছু দুঃখকষ্ট পেয়ে আবার ফিরে আসে বাগানে। নইলে কুলি-চালান দেওয়া ব্যবসা চলে কি করে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে দেশে ফিরে না গেলে কোম্পানি দায়মুক্ত হবে। বাগানে থাকাটা বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে লাভেরই। তা তারা বোঝে না, বোঝাতে পারে না কেউ। কিন্তু মেঘু বোঝালো। ছোটবেলা থেকে সে গল্প বলতে ওস্তাদ। এখন সেটা খুব কাজে লাগলো। সাদা দুনিয়ার উপনিবেশিকদের নজির দিয়ে সে বোঝালো। যখন যে দলকে ধরে, বুঝিয়ে তবে ছাড়ে এমন ধৈর্য ধরে তাদের সঙ্গে এত কথা কে আর বলেছে মেঘুর আগে। কোলে তুলে ওদের শিশুর মতো আদর করতে গেলে কোলটা তেমন শক্ত হওয়া চাই, নীচু হয়ে চুমু খাওয়াও বড় মানুষের, বড় হৃদয়ের কাজ। ওসব রইল বড় সাহেবের জন্য। ওদের সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে চলাই মেঘুর চিরদিনের অভ্যাস। সেটাই সহজ তার পক্ষে, সে তাই করে চললো।

নানা গল্পকাহিনী শেষ করে মেঘু যায় কাজের কথায়, বলে—যে দেশের টানে ফিরে যেতে চাস, সেখানে তোরা দিন-মজুর, একটা কুঁড়েও নেই। এখানে বাঁধা কাজ, হাজিরার ওপরও কাজ পাবি, মাথাপিছু বিঘা দু-বিঘা মাটিও পাবি। খেতের মাটি ভাঙিয়েও দেব কলের লাঙল দিয়ে। তাছাড়া আর সব বাঁধা-বরাদ্দ সুখ-সুবিধের কথা তো জানিসই। এত কম সময়ে এমন কামাই করতে পারবি না কোথাও। ভেবে দেখ কোনটা লাভের। আমিও বুঝি, ফাঁকি-কথা বলবি না আমার কাছে এখন চলে যা, ভেবেচিন্তে জবাব দিবি।

এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে সবাই। পথে গুনগুন করে যে যার মতামত প্রকাশ করে। ঘরে ফিরেও হয় পরামর্শ। মাইকীগুলো বেঁকে বসে। দলের জোর তারা। পোড়-খাওয়া মাইকীরা তেমন নয়। তারা বাস্তব বুঝেছে। মন থাকলেও ঐ কষ্টের মধ্যে ফিরে যেতে চায় না। এমনি করে দল ভেঙে যায়। মেঘুর কাছে ফিরে আসে এক-একজন, ফিসফিস করে কথা কয়—সবাই ভয় দেখায়, জীবনে দেশে ফিরতে পারবি না। এত টাকা গাড়ী-ভাড়া। কোথায় পাবি?

মেঘু হাসে, বলে—ওরে একবার যদি জমিজমা নিয়ে বসে যাস, তবে আর যেতে চাইবি না কোনদিন। কি তোদের আছে সেখানে? চেনাজানা জাত-কুটুম নিয়ে তো এখানেই থেকে যাবি। বহু লোকের এমন হয়েছে।

—হুঁ তা ঠিক। আচ্ছা আরো তিনচার বছর পর যদি ফিরে যেতে চাই—ঠিক যেতে নয়, একটু দেখাশোনা করে আসতে—তবে পথ খরচ মিলবে?

একটু ভেবে নিল মেঘু, বলল—বেশ, গোটা পঞ্চাশেক টাকা মাথাপিছু দিয়ে দিতে পারি।

যে যা বলে তাতেই মেঘু রাজী। হাতে যেন স্বর্গ পেল গঞ্জাম জেলার গোবিন্দন, বললে—লিখে দিবি তো সে কথা?

—তা দেব, যদি মুখের কথা বিশ্বাস না হয়।

একটু গাঁইগুঁই করে গোবিন্দন বললে—তোর নিজের বাগান তো নয় কোম্পানির! তাই একটু লেখা।

কথায় আবেগ ঢেলে মেঘু বললে—ওরে আমার হলে বুঝিয়ে দিতাম সকলকে, আমি কি চাই। আমিও তো তোদেরই মতো পরের চাকরি করি। তোর কাছ থেকে কাজ বুঝে নেয় সর্দার, আমার কাছ থেকে বুঝে নেয় সাহেবরা। আমার কাজেরও হিসাব আছে।

বেশ অবাক হল গোবিন্দন, বলল—তোর কাজেরও নিরিখ আছে? সে আবার কেমন।

মেঘু হাসল। সকল গোলমেলে কথা সহজ করে দিয়ে বললে—আছে বৈকি। সোজা ব্যাপার। তোদের কতখানি দেব, তার বদলে কতখানি পাব। বড়সাহেব বোঝেন—তোদের

ছাড়া বাগান চলবে না, বাগান ছাড়া তোদেরও গতি নেই। তাই তিনি চান তোদের খুশী রাখতে, খুশী রেখে তোদের কাছ থেকে কাজ নিতে। তোদের খুশী করতে আমায় দিয়েছেন তোদের সঙ্গে কথা বলতে, কাজ করতে।

বাগান ছাড়া ওদের গতি নেই—কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তেমন ভাল লাগার নয়। আর একটা ভাল কথার সন্ধান পেল। তাই ভুলে গেল ওটা। বড়সাহেবের পক্ষে কুলিদের খুশী রাখার ইচ্ছাটা ভালই লাগল। কিন্তু তার সীমাটা পরিমাপ করা যেমন কঠিন হল, তেমনই অবোধ্য হল তার মধ্যে মেঘুর কাজের নিরিখটা। তাদের কাছে সহজ কথা জটিল হয়ে ওঠে। তবু জটিল কথা সহজ করতেও জানে তারা। তারা তো গাছের সংখ্যায় কলম কাটার নিরিখ শেষ করে, লাগি মেপে জঙ্গল খোড়াই করে, পাতা ওজন করে পয়সা পায়। একেই তো বলে নিরিখ, এসব তো তারা করেই। মেঘু আবার কি হেঁয়ালির কথা বলে। সে যাই হোক, ভবী কিন্তু তার কথাটা ভুলল না। গোবিন্দন বললে—তবে একটু লিখে দিবি? আর মাটি-বাড়ী—

—দেখ, মাটি তৈরি করতে কোম্পানির অনেক খরচ হবে। ঠিক মতো কাজ করবি তো তোরা, দরকার হলে হাজিরার ওপর? দু-মাস পর চলে যেতে চাইবি না তো?

—নিশ্চয় করব।

—দেখবি, তা নইলে অকেজো বলে সরিয়ে দেবে আমায় এখান থেকে।

—তা হবে না, তোকে পেয়ে সবাই সুখে আছে। তোর জন্য আমরা জান দেব।

কথার মাঝে হাজির হয় পুরুলিয়ার পিল্লাদ। সে সায় দিল গোবিন্দনের মতে।

মেঘু হেসে বলল—আমার জন্য জান দিবি, নিজেদের ভালর জন্য পুরানো অভ্যাসগুলো ছাড়বি না।

হেসে পাঁচখানা হল পিল্লাদ, বলল—তোর যেসব সৃষ্টিছাড়া কথা। তুই যা বলিস তা কি করে হয় বল? বাপ-দাদার আমল থেকে, পুরানো—

মেঘুর মুখে ফুটে উঠল হাসি-গম্ভীর ভাব। সে বললে—পুরানো? বাপ-দাদার আমল? রামের বনবাস তো খুব পুরানো, পারবি তোর ছেলেটাকে বনবাস দিতে? দশরথের মতো তিনটে বউ ঘরে রাখতে পারবি?

—ওর বাবা! একটার ঠেলায় অস্থির—

—তবে তোদের মেয়েদের দ্রৌপদীর মতো পাঁচটা মরদ!

—রাম রাম! দেবতাদের কথা নিয়ে কি যে বলিস! বলে, নাককান মলা দিল পিল্লাদ মেঘুর কৌতুক কানে তোলার দায়-মুক্ত হতে।

পিল্লাদের কাণ্ড দেখে মেঘু আরো রগড় করতে বললে—তবে ধৃতরাষ্ট্রের মতো একশোটা ছেলে।

হেসে উঠল লোকটা, বললে—দুটোয় মিলে দিনরাত রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগিয়ে থাকে, এর বেশী হলে তো রাম-কুরুক্ষেত্র।

ওসব ঠাকুর দেবতার সয়, আমাদের মতন কীট-পতঙ্গের—

—কীট-পতঙ্গ? আচ্ছা, ডোমেরা চিতাব আগুনে ভাত রান্না করে খায়—পারবি তা?

—রাধামাধব! ওসব ছোট জাত। তোকে কি আজ ভূতে পেয়েছে নাকি?

বটে! দেখাচ্ছি কাকে ভূতে পেয়েছে। তোর কাছে ওরা ছোট জাত, তুইও তো ছোট জাত কারো কাছে।

—আমরা কেন ছোট জাত হতে যাব রে! আমাদের হাতে বামুন জল খেতে পারে।

মেঘুর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। কথায় দরদ ঢেলে সে বললে—তোদের আচার-ব্যবহার, চালচলন দেখে লোকে কি ভাবে বলত?

—কি আবার ভাববে? এই আমাদের ধর্ম।

—ধর্ম? হাঁড়িয়াটাও ধর্ম?

—হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ওটা না হলে যে আমাদের চলে না রে। পরদিন সকালে আর উঠতেই পারব না, গা-গতর ব্যথায় বিষিয়ে থাকে। হাজিরা বাদ পড়লে কে ভাত দেবে রে।

—গা-গতর বিষিয়ে থাকে? আমিও তো হাজিরা খেটেছি, কই—

—তোর কথা বাদ দে—

—আচ্ছা, আরো তো কত লোক তোদের মতো কাজ করে, সবাই হাঁড়িয়া খায় কি? তোদের—

—আরে হাঁড়িয়া না খাক, ভাঙ খায়। একটা না একটা নেশা সবাই করে।

—না, সবাই নেশা করে না। গাঁয়ে গিয়ে দেখ। এখানে হিন্দুদের কেউ কেউ হয়তো ভাঙ টানে, কিন্তু মুসলমানরা কোনটা ছোঁয় না। দু-চার ঘন্টা নয়? তারা উদয়াস্ত খাটে।

সত্যই। হিন্দুদের অনেকে লুকাছাপা করে মদভাঙ টানে বটে, কিন্তু মুসলমান আর খ্রীস্টানরা ওসব ছোঁয় না। ছুঁলে জাত যাবে। ওপথে হবে না, পিল্লাদ কথাটা ঘুরিয়ে দিলে—নেশা কি খারাপ রে? জানিস না, স্বয়ং শিবশম্ভুও নেশা করে।

মেঘু হেসে ফেললে, বললে—এখন কিন্তু তুই-ই দেবতার কথা তুললি।

মেঘুর কথায় পিল্লাদ হাবলা বনে গেল। গাঁইগুঁই করে বললে—তুলব না! তুই যে নেশার কথায় এলি—বাবার নাম নিয়েই তো আমরা নেশা করি। ওটা যে আমাদের ধর্ম।

মেঘু ব্যথিত হল, বলল—ধর্ম! ছোট বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের সামনে হাঁড়িয়া টেনে, তাদরও হাঁড়িয়া খাইয়ে গোল্লায় দিস। তারা বড় হলে আর তাদের লাগাম টানতে পারিস না। কটা বাবুর ঘরে অমন দেখেছিস?

হাল ছেড়ে দিয়ে পিল্লাদ বললে—ওসব ভদ্দর লোকের কথা।

মেঘু বললে—এই দেখ, তোদের কাছে কেউ ছোট জাত, আবার কেউ বড়, ভদ্দর। তোরাও তো ভদ্দর হতে পারিস।

মেঘুর পাগলামি কথা শুনে পিল্লাদ হেসেই অস্থির—আমরা কি করে ভদ্দর হব রে!

হ্যাঁ, তোরাও ভদ্দর হতে পারিস। বাবুদের চাকর-বাকরদের কথাটা ভেবে দেখতো। তাদের চাইতে কত জঘন্য আমাদের চরিত্র।

মেঘুর ধৈর্য অসীম। সে শুরু করে দিল মানুষের জীবনের নানা কথা, মানুষের ক্রমোন্নতির কথা, সমাজবিন্যাসের কথা। এমন কত চিত্র পিল্লাদের চোখের সামনে তুলে ধরল। সকলের সামনে তুলে ধরল এক এক করে।

গরম লোহা পিটিয়ে গড়া হয় কত জিনিস। তার চাইতেও শক্ত মানুষের মনের সংস্কার। কিন্তু বোঝাতে চাইলে কোন কথাটা বোঝানো না যায়! রামায়ণ, মহাভারত, দেবদেবী, কীটপতঙ্গ, ভদ্দর-অভদ্দরের কথাগুলো এক-একজনের মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে দিল। সকলের মাথার মধ্যে জোট পাকিয়ে রইল মেঘুর কথাগুলো। মেঘুই আবার গেরোগুলো খুলে দিয়ে পরিষ্কার করে দিল তাদের ভাবনার পথ।

এমনি করে এক জনসমষ্টি থেকে আর একটায়, এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায়, যেখানে যেমন দরকার তেমন বুঝিয়ে চললো মেঘু। নিজের হাতের ডিভিশন কটায় একদিন সে হয়ে পড়ল ছত্রপতি। তার কাজের সঙ্গে অধিকারও বিস্তৃত হতে থাকল অন্য ডিভিশনগুলোতে।

(ক্রমশঃ)

হেসাডির আদিবাসী

হেসাডি

সমীর সেনগুপ্ত

দিনতিনেকের ছুটি আছে হাতে, বেড়াতে যেতে চান? দীঘা পুরোনো হয়ে গেছে, শান্তিনিকেতন-বিষ্ণুপুর-মুর্শিদাবাদ শেষ করে এসেছেন? চলুন তাহলে একটা নতুন জায়গায় যাওয়া যাক, বায়ুবদলের বায়ুগ্রস্তদল যে জায়গার খবর জানে না। চেনামুখের মিছিল আর বাড়িঘরের সরল-রেখার জ্যামিতি দেখতে-দেখতে যদি ক্লান্তি এসে থাকে, তাহলে চলুন পাহাড় আর জঙ্গলে, ওঁরাওদের দেশে।

রুকস্যাক-এর দরকার নেই—বড়োসড়ো যে-কোনোরকম একটা ব্যাগ নিশ্চয়ই বাড়িতে আছে? জামাকাপড় আর টুথব্রাশ ভরে নিন। কেডস থাকে তো ভালো, নাহলে হাওয়াই চটিতেই চলবে। যে-কোনো জামা-কাপড় নিতে পারেন—পুরুষদের জন্য পাজামা-পাঞ্জাবি, মহিলাদের আটপৌরে শাড়ি হলেই যথেষ্ট। দার্জিলিং তো যেতে বলছি না যে হোটেলের প্রতিবেশীকে নতুন স্পোর্টস কোটটা দেখাতেই হবে।

রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সেরে হাওড়া স্টেশনে চলে আসুন। মনে করে পাড়ার সিটি বুকিং আপিস থেকে চক্রধরপুরের টিকিট কিনে নেবেন। ৩১২ কিলোমিটার রাস্তা, ভাড়া পড়বে তৃতীয় শ্রেণীতে আন্দাজ টাকা আটেক, তাছাড়া শয্যারক্ষণী। দশটা বেজে দশ মিনিটে রৌরকেল্লা এক্সপ্রেস ছাড়বে।

একঘুমে রাত শেষ—চক্রধরপুর পৌঁছবেন ভোর চারটে আঠারোয়। একটু খেয়াল রাখবেন যেন পেরিয়ে না যায়। একা থাকলে সজাগ থাকতে হবে একটু, দলচর হলে পালা করে রাত জাগা কিছুই নয়। সারারাতের ট্রেনভ্রমণের পর ভোরবেলা ইস্টিশন থেকে বেরিয়ে গরম শিঙারা-জিলিপি এবং চা যিনি খান নি তাঁকে তার স্বাদ কোনোমতেই বোঝানো যাবে না।

চা-টা খেয়ে চাঙা হতে হতে ছটা বাজবে। চক্রধরপুর বাজারের দোকানগুলো এইবার খুলতে আরম্ভ করেছে। র‍্যাশন ব্যাগটা এনেছেন তো সঙ্গে? সেইটে নিয়ে বাজারে চলে যান—হেঁটেই যেতে পারবেন, ইস্টিশান থেকে আধ মাইলও হবে না। চমৎকার সরু চাল পাবেন, কলকাতার তুলনায় কল্পনাতীতরকম সস্তা। কিছু চাল, ডাল, নুন-মশলা ও তেল কিনে নিন। আলু-পেঁয়াজও নেবেন। ব্যাস, এবার আপনি বনবিহারী হবার জন্য প্রস্তুত। আর হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি—ধূমপায়ীদের সিগারেটের তিনদিনের র‍্যাশন।

এবার মোড়ে ফিরে আসুন। রাঁচিগামী বাস আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। সেটার চেহারা যদি পছন্দ না হয়, যে-কোনো ট্রাক ড্রাইভার বাসভাড়ার পয়সার বিনিময়ে সানন্দে আপনাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত. যাতে ইচ্ছে হয় উঠে পড়ুন। ভাড়া পড়বে সিকেপাঁচেক।

চক্রধরপুর ছাড়িয়ে মাইল ছয়েক সমতল; তারপর দেখতে পাবেন গম্ভীর চেহারা নিয়ে পাহাড় আপনার দিকে এগিয়ে আসছে, এবং সে-দৃশ্য ভালো করে উপভোগ করবার আগেই বাস একটা দ্রুত বাঁক নিয়ে গিরিবর্ত্মের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

আপনার ডানদিকে পাহাড়, বাঁদিকে খাদ ; ঘুরে ঘুরে উপরে উঠবে বাস, জানালা দিয়ে হঠাৎ চোখে পড়বে বহু নিচে সমতল ভূমি। শাল আর মহুয়ার জঙ্গল ভেদ করে বাস উঠে যাচ্ছে। সামনে হঠাৎ চেয়ে দেখবেন আর রাস্তা নেই, ব্যাসাল্টের খাড়া দেয়াল উঠে গেছে প্রায় তিন হাজার ফুট, উপরে অরণ্যের ফাঁকে প্রথম রোদ। বাস সামান্য একটু বাঁক নিতেই পাহাড় দুফাঁক হয়ে যাবে, সামনে আবার দেখা যাবে সাপের পিঠের মতো চকচকে পালিশ করা রাস্তা।

পৃথিবীর আদিমতম স্থলভাগ গণ্ডোয়ানার অংশ ছিলো এটি; এসব পাহাড়ের কাছে হিমালয় নেহাৎ ছেলেমানুষ। হঠাৎ দেখতে পাবেন সরু একফালি নদী কলকল করতে করতে চলেছে অনেক নিচে—ওর নাম হির্ণি। ভালো করে দেখতে পাবার আগেই পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

চব্বিশ মাইল দীর্ঘ এই ঘাট বা পার্বত্য অঞ্চল—ছোটোনাগপুর মালভূমির প্রত্যন্ত। জনপদ বলতে যা বোঝায় তা কোথাও নেই এ অঞ্চলে, শুধু পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে নগণ্য সব গ্রাম। বিহার পূর্ত ও বনবিভাগের বাংলো আছে অনেকগুলি—টেবো, হেসাডি, সোংরা, মুরু। যে-কোনো একটিতে গিয়ে উঠতে পারেন। আগে থেকে রিজার্ভ করার কোনো প্রয়োজন হয় না বিহারে—যদি খালি থাকে, চৌকিদারকে বললেই খুলে দেবে ঘর। এবং খালি থাকে প্রায়শই। সরকারী কর্তারা আসেন কালেভদ্রে, এবং কলকাতার নেহাৎ মুষ্টিমেয় কিছু পাঁড় ভ্রমণকারী মাঝে মাঝে গিয়ে পড়েন। বাংলোগুলির মধ্যে টেবোরটি সবচেয়ে সুসজ্জিত, কিন্তু অবস্থানের দিক দিয়ে হেসাডির কোনো তুলনা নেই। রাস্তার ধারে সহসা খানিকটা সমতল জমি। আয়তনে একটি ফুটবল মাঠের মতো। মাঝখানে বাংলো। বাংলো পেরিয়ে আরো খানিকটা খোলা জমির ওপাশ দিয়ে হির্ণি নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপারে তাকালে দেখা যায় একের পর এক শৈলমালা, গভীর জঙ্গলে আবৃত। রাস্তার এপারেও পাহাড় উঠে গেছে। দুঘরের সাজানো বাংলো, চারজনের মতো বিছানা, বাসনপত্র, সুসজ্জিত স্নানাঘর। থাকার খরচ একজনের দৈনিক একটাকা। চৌকিদার থাকে মাঠের প্রান্তে, আপনার ডাক শুনে এসে খুলে দেবে ঘর, তুলে দেবে জল, ঝাঁটপাট দিয়ে দেবে। বারান্দায় আরামকেদারা টেনে জিরিয়ে নিন। চৌকিদার চা করে দেবে। চা-চিনি-দুধ অবশ্য সরবরাহ করতে হবে আপনাকে।

চারপাশে আরণ্যক নৈঃশব্দ্য। দূরের রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে বাস যাবার শব্দ ছাড়া সে নিস্তব্ধতার ছেদ পড়ে না কখনো: চুপ করে বসে থাকলে উপলব্যাহতগতি হির্ণির কলকল শব্দ কানে আসবে।

বেলা দশটা বাজে—খাবার চেষ্টা দেখতে হয়। মুরগি খেতে চান? পোলট্রি ফার্মের ব্লটিং কাগজের মতো স্বাদের মুরগি নয়, সমবায়িকার ডীপ ফ্রিজে রাখা পনেরোদিন আগেকার জমাট বাঁধা মুরগি নয়। সত্যিকারের গ্রীনফেড চিক, কলকাতার বাজারে যার একেকটির দাম পাঁচ টাকা, ওজন দুশো গ্রাম? সে মুরগি এখানে পাবেন—রাঁচির বাজারের লোভী দালালদের প্রভূত আনাগোনা সত্ত্বেও এখনো একেকটি 'দিস টাকা'—অর্থাৎ এক টাকায়। আপনার বাংলোর সামনেই চ'রে বেড়াচ্ছে—চৌকিদারেরই সম্পত্তি। সে মুরগি রান্না করতেও হয় না। পরিষ্কার করে নিয়ে পেটের মধ্যে একটু মাখন পুরে উনুনের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকে নিন—কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সদ্ব্যবহার করুন। পার্কষ্ট্রীটের অভিজাত চীনে দোকানের চিলি চিকেনের স্বাদ ভুলে যাবেন, কথা দিতে পারি।

স্নান করতে চাইলে চৌকিদার জল তুলে দিয়ে যাবে। কিন্তু হেসাডি গিয়ে ওভাবে স্নান করায় মজা নেই। চলুন নদীতে। হাঁটুভর নদী, স্বচ্ছ জল, পাথরের খাঁজে খাঁজে মাছ। গা ডুবিয়ে ব'সে থাকুন। বরফ-ঠাণ্ডা স্রোতের জলে স্নান সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা।

হির্ণির প্রপাত হেসাডি বাংলো থেকে মাইলখানেক, পিচের রাস্তা থেকে সামান্য ভিতরে। প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু থেকে ধাপে ধাপে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিচে। শুনেছি বিহার সরকার এই প্রপাতকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি করবার পরিকল্পনা করছেন। তা করুন, নিশ্চয়ই তাতে গ্রামাঞ্চলের প্রভূত উন্নতি হবে, আমার খুশি হওয়াই উচিত। কিন্তু আজন্ম বুর্জোয়া শিক্ষায় লালিত মন গোপনে একটু দুঃখিত না হ'য়েও পারে না। নিবিড় বনে পাহাড়ের আড়ালে এই ছোটো কিন্তু অতুলনীয় প্রপাতটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হ'য়ে যাবে তাহ'লে। যদি সুযোগ হয়, সে পরিকল্পনার কাজ শুরু হবার আগে আরেকবার গিয়ে হির্নিকে দেখে আসবো। দুদিকে খাড়া দেয়াল, দেয়ালের উপরে শাল আর মহুয়ার জঙ্গল। সামনের পাহাড় থেকে ঝরে পড়ছে হির্নি, জলের পিছনে অস্পষ্ট একটি গুহার আভাস। পাহাড়ের গা বেয়ে গুহায় পৌঁছুতে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি—শ্যাওলায় পা রাখা যায় না। স্রোতের মধ্যে মধ্যে দানবের অস্থির মতো বড়ো-বড়ো কালো পাথর—সাবধানে পা ফেলে তার একটার উপর পৌঁছে চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় সারা বিকেল। ধীরে ধীরে আঁধার করে আসে, পাহাড়ের মাথায়-মাথায় রাঙা রোদ খেলা করে। দূরের কোনো ওঁরাও গ্রাম থেকে মাদলের আওয়াজ শোনা যায়—তাও যেন এই পার্বত্য দৃশ্যের অঙ্গ।

মুরুতে হাট বসে প্রতি বুধবার—হেসাডি [illegible]। বুধবারের আগে [illegible] না। সেদিন দেখবেন [illegible] উঠছে। চৌকিদারকে সেদিন একভাবে পাবেন না।

হেসাডির পল্লী দৃশ্য

সামনের রাস্তা দিয়ে দেখতে পাবেন, দলে-দলে আদিবাসী রমণী-পুরুষ চলেছে রাঁচির দিকে—সেদিকেই হাট। মাথায় ঝোড়া, হাতে ছাগলের দড়ি। আপনিও তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে নিন। বাসে ভিড় হবে এদিন, আপনি একটা ট্রাক ধরুন। কিম্বা ওই যে আদিবাসী দলটি চলেছে ওদের সঙ্গ নিন না? ঘণ্টা-দুই লাগবে হেঁটে গেলে। কলকাতায় বসে কথাটা অবাস্তব শোনাচ্ছে, এমনকি হাস্যকর। এখানে আমরা শেয়ালদা থেকে মৌলালি যেতে ট্রাম ধরি, সাত মাইল মানে এসপ্লানেড থেকে যাদবপুর। কিন্তু ওই পরিবেশে ওটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে যদি হাটুরেদের দলে ঢুকে পড়তে পারেন, তাহলে বুঝতেই পারবেন না কখন পেরিয়ে এলেন রাস্তাটুকু। এমনকি ফেরার পথেও হয়তো যানবাহনের সাহায্য নিতে ইচ্ছে করবে না।

বিশাল হাট। রাস্তার একপাশে চাল, ডাল, তেল, তরকারি আচার ইত্যাদি খাদ্য-বস্তু ও জামা-কাপড়, অন্যদিকে নিত্য-ব্যবহার্য পণ্যের সম্ভার। এবং এক প্রান্তে অপরিহার্য হাঁড়িয়া। সেদিকে গেলে দেখবেন মাদল বাজছে, শালপাতার পাত্রে হাঁড়িয়া নিয়ে উবু হ'য়ে বসেছে আদিবাসী রমণী ও পুরুষ, বিক্রেত্রী তরুণী কালো মুখে সাদা হাসি, ছুঁড়ে দেবে, 'বাবু খাবি কেনে হাঁড়িয়া?' আর পাবেন মহুয়া ফল—নটফলের মতো দেখতে, আকারে আরেকটু ছোটো, রং আরেকটু ঘন। শুকনো ফল। একমুঠো মুখে ফেলে দেখুন। নেশা হবে না ভয় নেই। আমসত্ত্ব আর পেয়ারার জেলি মেশালে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি স্বাদ, একটুখানি কষায় মিশ্রিত। দুধে গুলে চিঁড়ে-মুড়ি দিয়ে খেতে অনবদ্য। খানিকটা কিনে নিতে পারেন—কলকাতার বন্ধুরা অনেকেই খাননি নিঃসন্দেহে।

আর কিনতে পারেন লাহাঙ্গা—আদিবাসী রমণীদের উৎসবকালীন পরিধেয়। মোটা সুতোয় বোনা তিনহাতি বস্ত্র, পাড়ে ও আঁচলায় লাল সুতোয় যে ডিজাইন তোলা তা গত হাজার বছরে একটুও বদলায় নি। একেকটির দাম পড়বে পাঁচ-ছ' টাকা। টেবিল-ঢাকনি, দরজার পর্দা, ছোটো বিছানার বেডকভার—অনেক কিছু করা যায় এ দিয়ে। কলকাতার কোনো কায়দাদুরস্ত লোকশিল্প বিপণিতে হঠাৎ যদি পেয়েও যান, কুড়ি টাকার কমে পাবেন না এজিনিস। আর কিনতে পারেন আদিবাসীদের মাপবার পাত্র যার স্থানীয় নাম কুইলা। কাঠ কুঁদে বানানো ঘটির আকারের সুদৃশ্য পাত্র। ভাগ্য ভালো হলে এই একই জিনিস মিশ্র-ধাতুর তৈরি পেয়ে যেতে পারেন, আদিবাসী কামারের তৈরি, তার উপর অসাধারণ সব নকশা তোলা। মূল্য কাঠেরটির ছ'-আনা, ধাতুর হ'লে টাকা তিনেক।

এবার ফেরার পালা। বেলা পড়ে এলো হাটুরেরা গাঁয়ের দিকে ফিরছে। দেখুন, হেঁটেই ফিরবেন নাকি? পা ব্যথা করছে? তবে বাসেই চলুন। ভিড় হবে একটু হাট-বারে, তা কতটুকুই বা রাস্তা, কুড়ি মিনিটে পৌঁছে যাবেন হেসাডি। চৌকিদারের যে মেয়েটি রোজ আপনার জল তুলে দেয়, সে হাট থেকে কেনা পুঁতির নতুন দুল পরে আপনাকে দেখাতে দৌড়ে আসবে।

তারপর ছুটি ফুরোবে একদিন, মোট বাঁধতে হবে, চৌকিদারকে হিসেবের কড়ি চুকিয়ে দিয়ে বাসের আশায় রাস্তায় দাঁড়াতে হবে এসে। বাস আসবে। ছাতের উপর মালপত্র তুলে দিয়ে আসনে বসে পিছনে তাকাতে না-তাকাতেই অদৃশ্য হ'য়ে যাবে হেসাডি বাংলো, সমতল জমিটুকু, আর আপনাকে এগিয়ে দিতে আসা চৌকিদার আর তার বৌ। শুধু হির্নি নদী বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিয়ে যাবে। সেও অদৃশ্য হ'য়ে যাবে একসময়, পাহাড় জঙ্গল ফুরিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে তিনদিনের অরণ্যবাস। চক্রধরপুরে বাস এসে গেলো, ফিরতি ট্রেণ একঘণ্টা পরে। তারপর ট্রেণের চাকার তালে-তালে অর্ধঘুমন্ত রাত কাটলে চিরকেলে চেনা লোকের কলকাতা।

কলকাতার ধাপামেল

একদালে কলকাতার সার্কুলার রোডের পূর্বদিকে ফুটপাথের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি যাতায়াত করতো। নাম ছিল কলকাতার মিউনিসিপ্যাল রেলওয়ে। এই রেলগাড়ির আর একটি আটপৌরে নাম ছিল, লোকে ব্যঙ্গ করে বলতো—ধাপামেল। শহরের ওপর দিয়ে ধাপামেলের আনাগোনা বহুদিন হলো বন্ধ হয়েছে। রেলগাড়ির আগে একজন রেল-কর্মচারী সাইকেল চড়ে যেতেন। যেখানে রাস্তার ক্রসিং পড়তো, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি লাল-ঝাণ্ডা তুলে ধাপামেলের আগমন-বার্তা জানিয়ে সকলকে পারাপার করতে নিষেধ করতেন। শহরের জঞ্জাল ভর্তি ধাপামেল ধীরে ধীরে গন্তব্য-পথে এগিয়ে যেত।

কলকাতার লালদীঘির ধারে ছিল ডালহৌসি ইনস্টিটিউট। বাড়ির পিছনে রাইটার্স বিল্ডিং এবং গির্জার ছবি

কলকাতার টুকিটাকি

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৩ খৃঃ পরে এবং ১৮৭৬ খৃঃ মধ্যে জঞ্জাল শহর থেকে তুলে দ্রুত ধাপা অঞ্চলে ফেলে আসার ব্যবস্থার জন্য মিউনিসিপ্যাল রেলওয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থার জন্য সেকালে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। থিয়েটার রোডের মোড় থেকে সার্কুলার রোড ধরে বাগবাজার পর্যন্ত এই রেলগাড়ি যাতায়াত করতো, এবং রেলপথ খালের ধারে এবং গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করতো। সেকালে নদী এবং খাল পথে রাস্তা তৈরি করার জন্য বহু জিনিস আনা হতো। সেই সব রাস্তা তৈরি করার মাল-মশলা এই রেলপথ দিয়েও শহরে প্রবেশ করতো। ইট, পাথর, লোহার পাইপ ইত্যাদি রাস্তা তৈরি করার সরঞ্জাম ধাপামেল তুলে এনে সেকালের ক্যামবেল হাসপাতালের ফুটপাথে পাহাড়ের মতো জমা করে রাখতো।

প্রথম দিকে ৮ মাইলের রেলপথ তৈরি হয়েছিল। ১৮৭৭ খৃঃ এই রেলপথ আরও বাড়িয়ে ১২ মাইলের মতো করা হয়, এবং ১৯১০-১১ খৃঃ কর্তৃপক্ষ আরও তিন মাইল রেলপথ তৈরি করেছিলেন। রেলের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেজন্য একজন ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করা হয়েছিল।

তিনি নিয়মিতভাবে রেলগাড়ির যাতায়াত এবং যাতে দ্রুত জঞ্জাল ভর্তি গাড়ি শহর থেকে নিয়ে ধাপায় পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থার কোনরকম নড়চড় না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তাছাড়া তিনি রেলগাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এমনকি ওয়ে-ইন্সপেক্টার, ড্রাইভার এবং অন্যান্য কর্মচারীরা যাতে ঠিকমতো কর্তব্য পালন করেন, সেইদিকেও তিনি তদারক করতেন।
সেখানে ধাপামেল সার্কুলার রোড প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রতিদিন শহরের প্রায় ১০০০ টনের বেশী জঞ্জাল রেলগাড়িতে ভর্তি করে ধাপায় পৌঁছিয়ে দিত। ওখানে নীচু জলা মাঠে জঞ্জাল ঢালা হতো। এই বৃহৎ নিম্নভূমিতে কলকাতা শহরের জঞ্জাল ও ময়লা ফেলে এর অনেক অংশ ইতিমধ্যে ভরাট করানো হয়েছে।

কলকাতায় টেলিফোন

ওরিয়েন্টাল টেলিফোন কোম্পানী ১৮৮১ খৃঃ ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে কলকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এই সময় কলকাতার টেলিফোন লাইন এবং এক্সচেঞ্জ অফিস ছিল ঐ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে। কলকাতার কর্পোরেশন টেলিফোন কোম্পানীকে রাস্তা, ফুটপাথ ও অন্যান্য জমির ওপর টেলিফোনের খুঁটি, পাইপ এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম বসাবার অনুমতি দিয়েছিল।

টেলিফোন কোম্পানীর সঙ্গে কলকাতার কর্পোরেশনের নতুন চুক্তি হলো ১৮৮৩-৮৪ খৃঃ। ঐ সময় বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানী নামে একটি নতুন কোম্পানী গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান পূর্বোক্ত কোম্পানীর কাছ থেকে কলকাতা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন স্থাপনের কাজ গ্রহণ করে। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় টেলিফোনের ব্যবহার খুব দ্রুত বেড়ে যায়।

১৯৪৩ খৃঃ ১ এপ্রিল তারিখে ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে।

ডালহাউসি ইনস্টিটিউট

কলকাতার লালদীঘির দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রাসাদটি কয়েক বছর পূর্বে তৈরি হয়েছে। এটি 'টেলিফোন ভবন' নামে পরিচিত। পূর্বে এই জায়গায় ছিল 'ডালহাউসি ইনস্টিটিউটে'র বাড়ি। বর্তমানে সেই বাড়ির আর কোন চিহ্নমাত্র নেই। ডালহাউসি ইনস্টিটিউটের বাড়িতে ছিল একটি প্রকাণ্ড হলঘর। সামনে ছিল বারান্দা এবং বই পড়ার ঘর। পাথর দিয়ে ঢাকা দেওয়াল। বহু ইংরেজের মর্মর মূর্তি এবং ছবি হলঘরের শোভাবৃদ্ধি করতো। এই হলঘরে সেকালে বিদেশীদের সভা হতো। গান-বাজনা প্রভৃতি বহু উৎসব এখানে হয়েছিল।

এমন অন্ধকার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এক

জোর শীত পড়বে মনে হচ্ছে। বিকেল থেকে উত্তরের মাঠ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে শুরু করে। ব্লক আপিসের লম্বা ইউক্যালিপটাসে নাড়া দিতে দিতে তারপর হাইওয়েতে এসে পড়ে। দুধারের বাজার দোকানপাট ভিড়—সবখানে ঠাণ্ডা ছড়াতে ছড়াতে হাওয়াটা চলে যায় দক্ষিণের মাঠে। সন্ধ্যায় গাছগাছালির মাথায়-গায়ে টুপি আলোয়ানের মতো কুয়াশা জড়িয়ে যায়। আলোর বালবে পোকামাকড়ের ভিড় কমে গেছে। এইসব সন্ধ্যা আর রাতে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে রূপপুর চটিকে দেখলে মনে হয় কাচের ভিতর এক আজব শহর। লোকজন যেন ঝিমুচ্ছে। সবকিছু যেন দূরে চলে গেছে পরস্পর। চায়ের দোকানগুলোয় আশেপাশের গ্রাম থেকে আড্ডা দিতে আসা ছেলেছোকরারাও শিগগির বাড়ি ফিরতে চায়। জায়গায়-জায়গায় সাইকেলের গাদা—কোথাও মোটর সাইকেল; একটা-একটা করে খালি হতে থাকে। কেউ পীচের পথে, কেউ শিশিরভেজা কাঁচা রাস্তা—কেউ বা স্রেফ সরু আলপথেই দুচাকা গড়িয়ে বাড়ি ফেরে। তাদের অনেকের হাতেই ট্রানজিসটার। অনেক রাতে নির্জন ধানের মাঠে যোশেফের গায়ক সগর্জনে গান গাইছে শুনলেও কোন ফসল পাহারাদার চাষা আজকাল চমকে ওঠে না। হয়তো তার মাঠের কুঁড়েতেই বাজছে একটা যন্ত্র, কাচ-ভাঙা হেরিকেনের পাশে।

এ অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বরাবর একটু বেশি। রূপপুর ছাড়িয়ে—অর্থাৎ চালকল পেরিয়ে ফাঁকা মাঠ দুদিকে, অঘ্রাণ রাতের হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

পরেশ বলল, ফেরা যাক। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে হে।

চন্দনের শীত করছিল, তা সত্যি। শার্টের ওপর হাতাকাটা সোয়েটার মাত্র। পায়েও মোজা নেই—স্লিপার। হাঁটতে হাঁটতে কথার ঝোঁকে বেশ দূরে আসা গেছে। সে আড়ষ্টভাবে বলল, হ্যাঁ—একটু শীত করছে এবার।

ওকে সিগ্রেট দিয়ে পরেশ নিজে একটা চুরুট ধরাল। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মাঠের দিকে কার ট্রানজিসটারের আওয়াজ। সাঁকোর ঘাট—রূপপুর রাস্তায় দিগন্তে শিসিয়ে উঠছে মোটরগাড়ির আলো। পরেশ বলল, হ্যাঁ—যা বলছিলুম। তোমার বউদির একটা ভয় আছে, আমি জানি। খুব ভালভাবেই জানি। আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে, জানো? যখন কপালগুণে কিছু-কিছু পয়সাকড়ি আসতে লাগল, একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে, ভয় হবে না কেন? তাছাড়া আমি বেচু-বাবুও নই—বাপুতি ধনসম্পত্তিও কিছু ছিল না। আমার সোর্স অফ ইনকাম যদি পুলিশ জানতে চায়, জবাব কী দেব? তখন সব রুমার নামে গছালুম। এ দিয়ে পার না পাই, অন্তত সাময়িকভাবে মাথা তো বাঁচবে। পরে ভাবলুম, হয়তো ভুল হল।

চন্দন বলল, রুমার [illegible] নিন। কাগজপত্রেও [illegible] গেল।

পরেশ [illegible] হ্যাঁ—সে তো ঠিক। সই [illegible]। কিন্তু এখনও সেদিন আসেনি ভাই। তোমার বউদির নামে কিংবা নিজের নামে যে নেব, তার সময় এখনও আসেনি। মাথার ওপর অনেক খাঁড়া ঝুলছে। ভয় হচ্ছে, তারপর যদি হঠাৎ ফেঁসে যাই—ওরা বিপদে পড়বে। চার-পাঁচটা কেস রয়েছে এনফোর্সমেন্ট আবগারি আর আই বির। পিকিউলিয়ার সব চার্জ। তদন্ত শেষ হলেই ওরা ফাইনাল রিপোর্ট দেবে। তখন কোর্টে প্রকাশ্যে মামলা শুরু হবে। অনেক করে চাপা দিচ্ছি তো ফের গজিয়ে উঠছে। কেন গজাচ্ছে, একটু-একটু টের অবশ্য পাচ্ছি। আমার চারপাশে শত্রু ভাই চন্দন। সরকারী লোকদের মুখবন্ধ করেও করা যাচ্ছে না। আবগারির কেসটাই ধরো। গত বছর চাপা পড়ে গেল। নিশ্চিন্ত হলুম। হঠাৎ গত সেপ্টেম্বরে ফের মাথা চাড়া দিল। হরিবল্ ব্যাপার! একদণ্ড সুস্বস্তিতে থাকবার উপায় নেই। অবশ্য আমি জানি, কে এসব করছে। কে তলে-তলে খোঁচাচ্ছে।

চন্দন অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল, কে?

অবাক হয়ো না। লোক চিনে রাখা তোমার খুবই দরকার। খোঁচাচ্ছে আমাদের বেচুবাবু।

কী আশ্চর্য!

পরেশ চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, সাপের সঙ্গে ঘর করছি। ইচ্ছে করেই করছি। আমার আলফা কনসার্ন গড়ার উদ্দেশ্য একটিই—তা হচ্ছে, ওদেরও দলে টানা। যাতে একা না ডুবি, ডুবতে হলে ওদের নিয়েই ডুবব।...হেসে উঠল সে। ...ভাই চন্দন, এ রূপপুর এক আজব জায়গা। এখানে কোন সমাজ নেই, একতা নেই—সবাই সবার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিট করতে চায়। কেন চাইবে না?

কারো সঙ্গে কারো তো বাপের জন্মে চেনাজানা ছিল না। সবে পনেরবিশ বছর ধরে নানা জায়গার মড়া এসে একঘাটে জুটেছে। আর এসে অব্দি চলেছে জোর কম্পিটিশান। কে কত বড় হবে, কে সবচেয়ে বেশি পয়সা করবে। এ শালা এক শয়তানের আখড়া। দুনিয়ার যত শয়তান কপাল ফেরাতে এখানে চলে আসছে। আমিও তাদের একজন। তুমি নিশ্চয় টের পাচ্ছ এতদিনে?

চন্দন বলল, কী জানি! আমার তো অন্যরকম লাগে। আসাঅব্দি যাদের-যাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে, খারাপ মনে হচ্ছে না।

পরেশ আরও হেসে বলল, তুমি যোগীপুরুষ। কাদের কথা বলছ, আমি জানি। ব্রজ, কিংবা তার বউ, নয়তো পাণ্ডেজীর বেটি আলতারাণী—নয়তো ভালোমানুষ হকসায়েব। আরে দূর, দূর! ওরা রূপপুরের কে?

আর পাণ্ডেজী?

পাণ্ডেজী! ওর মতো ঝানু চালাক মানুষ আমি কোথাও দেখিনি। চন্দন, পাণ্ডেজীকে ধোওয়া তুলসীপাতা মনে করো না। পয়সা চিনতে ওর জুটি নেই। বলবে, সৎপথে থেকে পয়সা করেছে। পাগল, পাগল! পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের বাজারে পাণ্ডেজী মানুষের অখাদ্য বেচেছে খাদ্যের দামে। এখনও সে-লাইন সমানে চলেছে। সোজা আঙুলে যেমন ঘি ওঠে না, সোজা পথে পয়সাও আসে না। ক্রমে ক্রমে টের পাবে সব।

চৌমাথা পেরিয়ে ওরা বাঁদিকে ঘুরল। বাজার এলাকা শুরু হয়েছে এখান থেকে। চন্দন বলল, আজ তাহলে বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন। বউদি খুব খুশি হবে কিন্তু।

পরেশ একটু হাসল।...কাটাব। বেচারা এখনও কথাটা যখন শোনে নি—আজ বলতে হবে। হাজার হোক, রুমার প্রকৃত গারজেন তো সে। কিন্তু আশ্চর্য। ইচ্ছে করেই চারদিকে এতটা রটালুম ভাবলুম তোমার বউদির রিঅ্যাকশনটা কী দেখা যাক। অথচ ও কিছু জানে না বলছ। এমন গবেট মেয়ে রে বাবা! আমি তো অতশত খবর রাখিনে। হয়তো মেশেও না কারো সঙ্গে।

চন্দন বলল, আমারও তাই ধারণা। বউদি যেন এখানে এসে মানিয়ে নিতে পারে নি এখনও। আগে অবশ্য......

পরেশ বাধা দিয়ে বলল, কী ছিল আগে? ও বরাবর ওইরকম একলাষেঁড়ে মানুষ। জিয়াগঞ্জে তো তুমি দেখেছ—দরকার ছাড়া কারো সঙ্গে কথাই বলত না। হ্যাঁ বলত—ঝগড়ার সূত্র পেলে।

চন্দন বলল, যাঃ! বউদি মোটেও ঝগড়াটে মেয়ে নয়।

নয়। কারণ, একটুতেই কেঁদে ফেলে। ...পরেশ হাসতে লাগল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল।...চলো, চা খাওয়া যাক। তারপর তুমি যাবে নিজের জায়গায়, আমি যাব... ওহে সীতাংশুদা, চা খেতে যাচ্ছি।

'সাংগুভ্যালি' রেস্তোরা থেকে সীতাংশুবাবু হাত তুলে হাসছিল।... ...আসুন মজুমদারমশাই।

চন্দন হঠাৎ বলল, কিন্তু আমার কথা তো কিছু শুনলেন না পরেশদা।

পরেশ মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমার কথা? কিসের?

আছে।

শুনব'খন। এস, খানিক আড্ডা দিই। আজ ছুটির হাওয়া লেগেছে হে!

দুজনে ভিতরে গিয়ে বসল। তিনটে টেবিল ঘিরে কজন যুবক বসে রয়েছে। পর্দা সরিয়ে 'লেডিজে' ঢুকল পরেশ। যুবকেরা সিনেমাস্টার নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়েছে। পরেশ বিকৃত মুখে চাপা মন্তব্য করল, শুওরের বাচ্চারা!

সীতাংশুবাবু এসে দাঁড়াল।...কাল সকালেই যেতুম আপনার কাছে। হাজি-সায়েব এসেছিলেন বিকেলে। রাজি করিয়েছি। সামনে ওনার মেয়ের বিয়ে। আপনি রেডি তো?

পরেশ বলল, সে হচ্ছে। এখন চা লাগান।

সীতাংশুবাবু চেঁচিয়ে বলল, ভুলু, দুটো স্পেশাল চা। আর কিছু দিতে বলি?

পরেশ চন্দনকে বলল, খাবে কিছু?

চন্দন মাথা দোলাল, নাঃ!

শুধু চা সীতাংশুবাবু।...পরেশ চুরুটটা নিভিয়ে রাখল।

সীতাংশুবাবু বলল, চন্দনবাবু কেমন আছেন? আর তো এলেন না এদিকে!

পরেশ বলল, আলাপ হয়েছে চন্দনের সঙ্গে? বাঃ!

চন্দন মৃদু হাসল। সীতাংশু বলল, আলাপ না হয়ে যো আছে! রূপপুরে তো খাঁটি ভদ্রলোক বড় কম পায়ের ধুলো দেন—আমাদের ভাগ্যি। মজুমদারমশাই, খুব ভালো কুটুম্ব পাচ্ছেন কিন্তু। সে আমি একপলকেই বুঝে গেছি। আজ না হয় জমির দালালী করছি, একসময় ঘটকালি করতুম যে!

পরেশ বলল, তাও বটে! ভাই সীতাংশুবাবু, তাহলে একটা দায়িত্ব নিতে হয় আপনাকে।

আলবাৎ নেব। বলুন।

শিগগির একবার জিয়াগঞ্জ ঘুরে আসবেন? নামঠিকানা সব দিচ্ছি। ছেলে লায়েক হয়েছে—কিন্তু মাথার ওপর বাবা মা বর্তমান।

সীতাংশু ব্যস্ত হয়ে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি। শুভস্য শীঘ্রং। বলেন তো কালই রওনা দেব। আগামীকাল বার ভালো তিথি নক্ষত্রও ভালো। একটু আগে পাঁজি দেখছিলুম।

পরেশ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আগামীকাল? দেখুন—দিনক্ষণের ব্যাপার দেখেটেখে আপনিই ঠিক করুন।

চন্দন আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, পরেশদা, ওসব হবে। পরে হবে। আমার কথা আছে।

চা এসে গেল। পরেশ বলল, চা খাও। তুমি আমাদের ব্যাপারে নাক গলিও না। সীতাংশুদা, আমি ফাইনাল বললুম। ব্যাপারটা আমার মাথায় এসেছিল, কিন্তু ঠিক করতে পারছিলুম না—কে যাবে। আমিও যেতে পারতুম! কাকামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি বহুকাল। ...যাকগে, মেঘ না চাইতে জল। আমার আবার দুটো দিন একটু তাড়া আছে। ঘুরে আসুন, তারপর আমি নিজে যাব। সামনে বোশেখ নাগাদ সব চুকিয়ে ফেলতে হবে। রুমারও তখন লম্বা ছুটি।...

কতক্ষণ পরে ওরা বেরোল। পথে এসে পরেশ বলল, তাহলে তুমি এসো। আমি এগোই।

চন্দন ঠোঁট ফাঁক করল—কিন্তু কিছু বলতে পারল না। পরেশ এখন ভিন্ন মুডে আছে। এখন কিছু বলে লাভ হবে না—সে জানে। বড্ড জেদী লোক পরেশ।

চন্দন খুব আস্তে আস্তে নিজের বাসার দিকে চলল।......

বাড়ির দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ দাঁড়াল পরেশ। অনেকদিন একটা জায়গায় যাওয়া হচ্ছে না। সংকোচও কিছুটা, সময়ও হয়ে ওঠে না। যাবে নাকি একবার? অবশ্য রাত্রিবেলা—শীতের দরুন লোকচলাচল কম ওদিকটায়। ব্লক এলাকার সুঁড়ি রাস্তা বড় পার্কটার পাশ দিয়ে—অন্যদিকে বড় বড় শিরিশ অশোক দেবদারু গাছের জটলা। ঘন ছায়া জমে থাকে সেখানে। তারপর বাংলো প্যাটার্ন বাড়িটা—মাঠের ধারে। ওই নির্জন জায়গায় কী সাধে বাড়ি করেছিল নন্দীগ্রামের নুটুবাবু। তার শিকারের নেশা ছিল প্রচণ্ড।

নুটুবাবুর ট্রাক ছিল একটা। তখনও কোন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী এখানে গড়ে ওঠেনি। ওই ট্রাকটা এলাকার কারবারীদের ভাড়া খাটত। পরেশ নুটুবাবুর ড্রাইভার ইসমাইলের অ্যাসিস্টাণ্ট হয়ে রূপপুরে ঢুকেছিল। ইসমাইলই টেনে এনেছিল তাকে। তারপর ইসমাইল মারা গেল। তখন পরেশ হল নুটুবাবুর ট্রাকের ড্রাইভার। বাড়ির সামনে একটা গ্যারেজ ছিল এই শিরিশ গাছের কাছে। সেখানেই থাকত পরেশ আর তার পরিবার। রুমা ওখান থেকেই স্কুলে ভর্তি হল। নুটুবাবুর বউ এত ভালবাসত ওদের। কতদিন পরে পরেশ বড় রাস্তার ধারে একটা বাসা নিল। গ্যারেজ ঘরের ঘুপটিতে কুলোচ্ছিল না। সে-বাসাতেও এসেছে নুটুবাবুর বউ। খোঁজখবর নিয়েছে বরাবর। পরেশের ভাগ্যের চাকা ঘুরছিল দ্রুত। নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পরও নুটুবাবুর বউ গেছে

দু'একবার। হঠাৎ নুটুবাবু বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করল। বছর পাঁচ আগের কথা। পরেশের মনটা মুষড়ে পড়ে সেসব পুরনো কথাগুলো ভাবলে। দেখতে দেখতে কোথায় চলে এল সে। এ পাঁচটা বছরে সে এত উঁচুতে চলে এসেছে যে পিছনের দিকটা বড় উদ্ভট মনে হয়।

তা—, নুটুবাবুর আত্মহত্যার পর থেকে তার বউ আর পরেশের বাড়ি একদিনও যায়নি। কিন্তু পরেশ এসেছে বরাবর। এসেছে, কিছু রটনাও হয়েছে রূপপুরে, নানা গুজব ছড়িয়েছে। স্নেহ-ধারা মাথা ভেঙেছে—অবশেষে যেন হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেছে। তবু মেয়ে-মানুষের মন, এখনও মাঝে মাঝে সে ফেটে পড়তে চায়। রমা তাকে সামলায়। পরেশ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে।

গাছতলায় নিচে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল পরেশ। হঠাৎ বুক কাঁপল তার। কেন সে এমন চোরের মতো ওবাড়ি যাচ্ছে? দিনের বেলা সবার সামনে বুক ফুলিয়ে গেলেই বা কী! কারও তো সাধ্য নেই পরেশ মজুমদারের সামনে এসে বলে, কোথায় যাচ্ছ?

উঁচু বারান্দাওলা বাংলোধাঁচের বাড়িটার সামনে আলো জ্বলছে। লনের দুপাশে সুদৃশ্য ফুলগাছগুলো আজও তেমনি রয়ে গেছে। পরিচর্যার অভাব হয় না। ওদিকের মাঠে বেশ খানিকটা জমি আর পুকুর আছে নুটুবাবুর। তাই বাড়ির পিছনে একটা খামার রয়েছে।

বারান্দায় চেনে আটকানো কুকুরটা একবার ডেকেই চুপ করে গেল। পরেশ তার চেনা মানুষ। লনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল সে। ভিতর থেকে আওয়াজ এল—কে এল, দ্যাখ তো বিলাস।

বিলাসবুড়ো ওদের পুরনো চাকর। বারান্দায় এসে পরেশকে দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে কর্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, পরেশবাবু। তারপর চলে গেল।

পরেশ জানে, বুড়োটা তাকে পছন্দ করে না। সে বারান্দায় উঠতে উঠতে ডাকল, বউদি আছো নাকি?

ভিতর থেকে সাড়া এল, এস।

এ্যালসেসিয়ানটা পরেশের পায়ে গা ঘষতে শুরু করেছে। পরেশ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। কুকুরটা সমানে গরগর করতে থাকল। পর্দাটা ফাঁক হয়ে থাকায় ভিতরের আলোয় সুনন্দিতাকে দেখা যাচ্ছিল। নিবিষ্টমনে উল বুনছে সে। পরেশকে সে দেখছিল না বা দেখছে না এটা ঠিক—কিন্তু তার ঠোঁটের হাসির ঝিলিক পরেশ দেখতে পাচ্ছিল। সে ঘরে ঢুকে বলল, উল বুনছ! কার জন্যে?

হয়তো তোমারই। ...বলে সুনন্দিতা হাসিভরা শান্ত মুখটা তুলল। ...কলকাতা থেকে কখন ফিরলে?

পরেশ সামনে বসে বলল, আজ সকালে। কলকাতা গেছি কেমন করে জানলে?

সুনন্দিতা বলল, জানতে পারি। আমার স্পাই আছে।

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর পরেশ বলল, আমার পিছনে স্পাই লাগিয়ে কোন লাভ হবে না। কই, সেই এ্যাশট্রেটা দাও। আরাম করে সিগ্রেট খাই। আর, কড়া করে কফি খাওয়াও তো আজ। শরীরটা কীরকম লাগছে যেন। ততক্ষণ আমি মৌজ করে গান শুনি।

উল রেখে হাসিমুখে সুনন্দিতা পাশের রেডিওর চাবি ঘোরাল।

পরেশ বলল, হাল্কা গান কোথায় বাজছে দ্যাখো। বরং সিলোন ধরো না!

চটুল সুরে গান বেজে উঠলে সুনন্দিতা বলল, ব্যাপার কী? তুমি তো ক্লাসিক গান না হলে কানে আঙুল দাও। আজ আবার কী হল শুনি? বউ পিটি দ্যায়নি তো?

পরেশ সিগ্রেট ধরাল। তারপর বলল, কী জানি—আজ কিস্যু ভাল্লাগছিল না শালা। তাই চলে এলুম তোমার এখানে।

সুনন্দিতা সশব্যস্তে কিন্তু চপল স্বরে বলল, এখানে শালাফালা চলবে না। কতবার বলে দিয়েছি না? এখনও ড্রাইভারী চালটা ছাড়তে পারলে না—আশ্চর্য!

পারলুম কই? আমি—মাইরি বউদি, জন্ম-গাড়োয়ান! কী নেশা না ধরে গেল রূপপুরে এসে!...পরেশ শান্তভাবে বলতে লাগল। ...বিশ্বাস করো। একটা রাত্তির কোথাও চুপচাপ শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে। কই, কফি বলো!

সুনন্দিতা যেতে যেতে বলল, আজ রাত কাটাবে কেমন করে?

পরেশ জবাব দিল, সেইজন্যেই তো তোমার এখানে এসে গেলুম।

একা ঘরে কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগ্রেট টানতে থাকল পরেশ। সে নুটুবাবুর কথা ভাবছিল। এ ঘরের দেয়াল ভরতি যা সব রয়েছে, একজন শিকারীর অস্তিত্ব ঘোষণায় তা যথেষ্ট। জীবজন্তুর চামড়া বা মুণ্ডু,

শিকারী নুটুবাবুর ছবি—সব মিলিয়ে যেন একটা সাংঘাতিক কিছু নিরন্তর ওঁৎ পেতে আছে এ ঘরে, যা গা ছমছমানির পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর নুটুবাবু আত্মহত্যা করে মরেছিলেন—এ ঘরে নয় যদিও, এ বাড়িতে তো বটে। তাই একটা প্রাগৈতিহাসিক আবহা শক্তি যেন থমথম করে—অন্তত পরেশের তাই মনে হয়। মজার কথা, কোন তন্ময় মুহূর্তেও হঠাৎ তার চমক খেলে যায়। পিছনে এসে কেউ দাঁড়ায়নি তো? আজও পরেশের ধাঁধা গেল না যে নুটুবাবু গুলিটা ছুঁড়তে চেয়েছিলেন অন্য একজনকে লক্ষ্য করেই, এবং দুর্ভাগ্যবশত তা লাগল তাঁর নিজের মাথায়। তাই বটে। এইরকমই হয় সংসারে। আসল শত্রু হয়তো নিজের মধ্যেই রয়েছে।

সুনন্দিতা ফিরে এল। শ্যামাঠাকরুণ আজ সকাল সকাল চলে গেছে। কিছু খাবে?

পরেশ মুখ না তুলে জবাব দিল, না। শুধু কফি।

সুনন্দিতা বসে বলল, কিন্তু সত্যি গান শুনছ?

কেন? ...একটু চমকে উঠল পরেশ।... নাঃ, শুনছি তো। ভালো লাগছে। আচ্ছা, বউদি, ওরা সব আর আসে-টাসে না?

কারা?

নুটুদার ভাইপো-ভাইঝিরা!

নাঃ। ...সুনন্দিতা হাসল। ...আমি তো একঘরে হয়ে গেছি। জানো না তুমি?

পরেশ একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের মামলাটা তো এখনও চলছে!

চলছে। আবার শুনছি, এবার নাকি জোর করে ধান তুলে নেবে। বিলাস গিয়েছিল নন্দীগ্রাম—শুনে এসেছে।

কী? ...বলে পরেশ জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল।

সুনন্দিতা হেসে বলল, তা তুমি চমকে উঠছ কেন? নেবে—আমার নেবে। তোমার কী? তুমি শক্তিমান মানুষ—তুমি আত্মরক্ষা করতে পারো। আমি যে অবলা!

পরেশ ভ্রু কুঁচকে বলল, কিন্তু তুমি তো কক্ষনো কিছু বলো না আমাকে।

বললে কী করতে? হ্যাঁ—করতে হয়তো। তোমার নাকি অনেক লোকজন আছে। কিন্তু তাতে আমার একদিক আটকাতে আরেকদিক......

হঠাৎ ওকে থামতে দেখে পরেশ বলল, কী হত?

সুনন্দিতা অকারণে রেডিওর ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, থাক ও কথা। আজ আমারও খুব খারাপ লাগছিল। বিকেলে ভাবলুম, একবার ঘুরে আসি। হল না। অমিত আর তার বোন এল।

অমিত—মানে, হেডমাস্টারের ছেলে? ও আসে নাকি এখানে?

চমকে উঠলে যে?

না—এমনি।

সুনন্দিতা মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, অনেকদিন থেকে একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছিলুম। তুমি রুমার নাকি বিয়ে লাগাচ্ছ শুনলুম? আজই বিলাস বলছিল। কোথায়?

পরেশ কোন জবাব দিল না। অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে থাকল।

এত শিগগির কেন ওর সর্বনাশ করছ? পাসটাস করুক। তাছাড়া এখন তো তোমার ক্ষমতা আছে। রুমা এম এ পড়বে বলছিল।

রুমা আসে নাকি?

না। বললুম যে, আমি সবার কাছে একঘরে হয়ে গেছি।

কী কথা বলবে বলছিলে একটু আগে? রেডিওটা কমিয়ে দাও তো।

সুনন্দিতা কমিয়ে দিল আওয়াজটা। তারপর স্থিরদৃষ্টে তাকাল ওর দিকে। বলল, শুনে আবার হইচই করে ফেলো না! নিজের কেলেঙ্কারী তো যথেষ্ট বাড়িয়েছ—আবার...

কিসের কেলেঙ্কারী? বাঃ!

আমার ধারণা অন্য কোথাও বিয়ে হলে রুমা সুখী হবে না।

পরেশ মুখ তুলে বলল, কোথায় সুখী হবে বলছ?

আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি—সে তুমি জানো। আমার মতে ওর বিয়েটা অমিতের সঙ্গে হলেই ভাল হয়। অবশ্য যদি এক্ষুনি বিয়ে দিতে চাও। ...সুনন্দিতা উঠে দাঁড়াল। ...জল হয়ে গেছে এতক্ষণ। আসছি।

সে চলে গেলে পরেশ ভ্রু কুঁচকে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। শীতভাবটুকু চলে গিয়ে গরমের ভাগ টের পেল সে শরীরের ভিতর দিকে। বুকের বোতাম খুলে দিল আনমনা হাতে। তারপর আপনমনে একটু হাসল। সুনন্দিতা তাহলে অমিতের সঙ্গে রুমার মেলামেশার খবর রাখে। রূপপুর চটির আরো অনেকেও হয়তো রাখে। কিন্তু সে তো অসম্ভব ব্যাপার! রুমা আর চন্দনের প্রতি তার মনে একটা পুরনো প্রতিশ্রুতি ঠিক দলিলের মতোই সুরক্ষিত থেকে গেছে। এর অন্যথা হয় না—হতে পারে না।

দুই হাতে সুনন্দিতা এসে গেল তক্ষুনি। ...অনেকদিন আমি কফি খাইনি। ভাগ্যিস তুমি এলে। একা কফি খেতে আমার ভালো লাগে না।

সে হাসল। কফি তৈরী করতে করতে ফের বলল, এবার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শীত পড়ে গেল। তাই না? আজই ভাবছিলুম—কদিন বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। গাড়িফাড়ি তো তোমার কৃপায় পেয়েই যাব। পাব না?

পরেশ মাথা দোলাল।

কিন্তু...সুনন্দিতা বিকৃতমুখে বলল, ...কিন্তু এদিকে আমার শিরে সংক্রান্তি। ফসল উঠতে শুরু করেছে। তার ওপর ওদের শাসানিও শুনতে পাচ্ছি। কেন যে বিষয়সম্পত্তি থাকে মানুষের!

পরেশ একটু হাসল। ...না থাকলে তো চলে না। আমার গ্যারেজবাসের জীবনটা তো স্বচক্ষে দেখেছ। এবং তোমাদেরই গ্যারেজ ছিল সেটা।

সুনন্দিতা সেদিকে কান করল না। বলল, তোমার বউ জানলে কুরুক্ষেত্র করবে আজ। এতক্ষণ হয়তো টেলিগ্রাম পৌঁছে গেছে। বাপ্‌স! কী জায়গায় এসে জুটেছিলুম। সত্যি বলছি, আমার অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। ব্যবস্থা করে দেবে? ধরো, বহরমপুর—কিংবা অগত্যা কান্দীতেই! সব বেচে দিয়ে চলে যাব।

পরেশ কফির কাপ তুলে নিয়ে বলল, জায়গা বদলালেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় না। নিজেকে বদলাতে পারবে তো?

সুনন্দিতা একটু ঝুঁকে এল। অস্ফুট প্রশ্ন করল, তার মানে?

মানে তুমি বোঝ না?

না।

একটু চুপ করে থেকে পরেশ বলল, তুমি কি রেগে গেলে বউদি?

সুনন্দিতার কণ্ঠস্বর একটু চাপা শোনাল। সে বলল, রাগ করতে কবে ভুলেছি। কিন্তু কী করব আমি বলতে পারো? এই ভুতুড়ে বাড়িতে আর কতকাল এমন করে বাস করব? কেন বাস করব? কার জন্যে? সম্পত্তি আগলাতে যখ বসিয়ে রেখে গেছে যেন। নাঃ এ অসহ্য লাগছে পরেশ। আমি আর পারছিনে। হাঁফিয়ে উঠেছি। কোন কোন রাতে ঘুম ভেঙে যায়—হঠাৎ চমকে উঠি। কেন এখানে শুয়ে আছি? একা—কেউ কোথাও নেই। বাড়িটা আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। বিশ্বাস করো, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। রাগে দুঃখে যেন্নায় জ্বলেপুড়ে মরি। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু...কিন্তু তাও যে পারি নে ছাই! আমার বড্ড ভয় করে। এখনও যেন কত কাজ বাকি থেকে গেল জীবনে। কত সাধ—কত ইচ্ছে......

পরেশ হাত বাড়িয়ে ছুঁল ওকে। সশব্যস্তে বলল, আঃ, চুপ করো। আরে হল কী তোমার! কাঁদছ কেন? বউদি, এই!

(ক্রমশঃ)

মার্কিন মুলুকে বাঙালীর ঐতিহ্য ও রামদুলাল

নারায়ণ দত্ত

চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর কোথায় গেল? কোথায় গেল ধনপতি-শ্রীমন্তর বাণিজ্য যাত্রার ছবি? কাছে সিংহল, শ্যাম-কাম্বোজ, জাভা-বালির দ্বীপময় ভারতবর্ষ থেকে সুদূরে গ্রীস, রোম কিম্বা সেই ম্যাজিকের দেশ মেক্সিকো—ভারতীয় তথা বাঙালী নৌবাহী একদিন এই সব অজানা তটে তাদের বাণিজ্যবস্তু নিয়ে নিয়মিত হাজিরা দিত, সে কি কেবলই কল্পনা? কোন কবির স্বপ্ন?

বাঙালী শুধু কেরাণীর জাতি—এই কি তার সত্য পরিচয়? বৃটিশের কেরাণী-তৈরীর কারখানার 'প্রোডাক্ট' হিসেবেই কি বাঙালী মনীষার স্ফূর্তি? না। বেশী দূরে যেতে হবে কেন, এই সেদিনও বাঙালী ব্যবসায়ীর নামে ছিল মার্কিণ জাহাজ। বিশ্বাস করা শক্ত, তবু এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই। ইংরেজরা যখন এদেশে এল তখন বাঙালী কেরানী হয় নি। তারা বেনিয়ান হয়েছে, কালা জমিদার হয়েছে, প্যাটোয়ারীর কাজ করেছে, কিন্তু অফিসে কলম পেশার চাকরী করেছে—রাইটারের দল। এবং শুনলে হয়ত প্রত্যয় হবে না, তারা কলকাতার ইংরেজ ব্যবসাকে 'ডিকটেট' করেছে। সেকালের ধূলিধূসরিত কর্ম-যজ্ঞের ইতিহাস যেদিন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, সেদিন আর এই সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না, ব্যবসায়ী হিসেবে বাঙালীর মর্যাদা কারও চেয়ে কম নয়। এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাম-দুলাল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'অন্ন সমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধ সংকলনে বার বার রামদুলালের কথা বলেছেন : 'অনেকেই কায়স্থ-কুলোদ্ভব রামদুলালের দে'র নাম শুনিয়াছেন। এক-শত বৎসর পূর্বে তিনি ৫।৭ টাকার বেতনের সরকার হইতে নিজ অসামান্য প্রতিভাবলে একজন বড় সওদাগর ও ধন-কুবের হইয়াছিলেন।'

কিন্তু সওদাগর বা ধনকুবের বলতে রামদুলালের সবটা বোঝায় না। 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক গিরিশ ঘোষ মশায় তাঁর জীবনকে বলেছেন 'মীথ'—অবিশ্বাস্য রহস্যময় গল্প। কিন্তু সেই গল্প-রহস্যের চাবি কাঠি বোধ করি বাঙালীর ঐতিহ্যগত ব্যবসা-বুদ্ধি—কালক্রমে তার অপমৃত্যু ঘটেছে মাত্র। বলা যায়, কোন নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম অভি-শাপে সেই শাণিত ক্ষুরধার বুদ্ধি কোন অতলগর্ভ চোরাবালির মধ্যে পড়ে একদা বিলীন হয়ে গেছে, বাঙালী আর তার খোঁজ রাখে না।

রেকজানী গ্রামের নাম শুনেছেন? আজকাল ত কাগজে কাগজে বহু গ্রামেরই খবর বেরোয়। তেমনি এই ছোট্ট গাঁখানার খবর অখরে-সখরেও পান নি আপনারা? শহর কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। দমদমের কাছে এই অখ্যাত গ্রামে বলরাম দে ছিলেন ছোট্ট পাঠশালার পণ্ডিত। হাতের লেখা ত নয় ছবি। আর তাই সম্বল করেই বলরাম তাঁর শিষ্যদের পাঠ দিতেন। মাসের শেষে কিছু ধান মিলত, কিছুবা খড়। এই গুরুদক্ষিণায় একটা মোষের গাড়ী বোঝাই করে বলরাম যেতেন গঞ্জ কলকাতায়। সেইসব বোঝা বিক্রী করে যা সামান্য কিছু কড়ি মিলত, তাই দিয়ে চলত গুরুমশায়ের সারা মাসের কৃচ্ছ্র-সাধন। দুবেলা জুটত কি জুটত না।

কিন্তু একদিন আর মোষের গাড়ী জুটল না। পা জোড়া ভরসা করেই সন্ত্রাসে ইংরেজ রাজত্বে কলকাতার দিকে ছুটলেন বলরাম। কি ব্যাপার? না বর্গী এল দেশে। অষ্টাদশ শতকের তখন মধ্য ভাগ। বৃদ্ধ আলিবর্দী খাঁ ঘোড়া ছুটিয়ে সেই সব নিষ্ঠুর পার্বত্য দস্যুদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে মরছেন। কিন্তু তবু তাদের এঁটে উঠতে পারছেন না। ভীত, ত্রস্ত মানুষ আশ্রয়ের জন্যে পালাচ্ছে। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এই পলায়নের মিছিলের কথা শোনা যায় :

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।।
পালালেন কায়স্থ কুলতিলক
কায়স্থ বৈদ্য যত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল।

কিন্তু বলরামও ত একা নন। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী। অন্তর্বত্নী। সেকথাও বলেছেন গঙ্গারাম :

গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে।।

হ্যাঁ, বলরামের স্ত্রীও প্রসব হলেন কলকাতার পথে। রাস্তায় জন্ম নিলেন উত্তরকালের দিকপাল বাঙালী রামদুলাল।

কলকাতা শুধু ইংরেজ রাজত্বের নিরাপদ আশ্রয় নয়, কলকাতা রামদুলালের মাতুলালয়। দাদামশায় রামসুন্দর বিশ্বাস। তাঁরও অবস্থা তথৈবচ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। নিজেরই দুবেলা দু মুঠো জোটে না, মেয়ে-জামাই এসে হাজির। কিন্তু এই বোঝা বেশী দিন বইতে হয় নি বিশ্বাসকে। দু-এক বছরের মধ্যেই বলরাম দেহ রাখলেন। স্বামীকে অনুগমন করলেন স্ত্রী। রামদুলালের তখন এক ভাই, এক বোন। রামসুন্দর তাঁদের ভিক্ষাবৃত্তি করে দুবেলা দু মুঠো জোটান। তাঁর নিজেরও পরিবার ত বড় কম নয়। সেই নিদারুণ দারিদ্র্যই তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন নির্বিকার চিত্তে।

রামদুলালের দিদিমা ধান ভানতেন। কাক-ডাকা ভোরে গঙ্গা স্নান সেরে তিনি ঢেঁকিতে পাড় দিতে যেতেন, আর সন্ধ্যায় কুদকুড়ো যা মিলত তাই নিয়ে ঘরে ফিরতেন। এমনি যখন রামদুলালের দিন যায়, কি না যায়, হাটখোলায় তখন মদন দত্তর ভারী বোলবোলা। এলাহী ব্যাপার। এসো জন, বসো জন নিয়ে দত্তমশায়ের

সুবৃহৎ সংসার। যেমন ব্যবসাপত্তর, কাজ-কর্ম, তেমনি পোষ্যজন। লোকজনে অমন সুবৃহৎ প্রাসাদ নিত্য গম-গম করছে। সেই বাড়ীতেই একদিন রামদুলালের দিদিমার ডাক এল। মদন দত্ত একজন কায়েতের মেয়ে খুঁজছিলেন—রান্নাবান্না করবে। রামদুলালের দিদিমা সেই কাজে বহাল হয়ে গেলেন। এবং একদা তিনি হাত ধরে নিয়ে এলেন ছোট্ট নাতি রামদুলালকে মদন দত্তর বাড়ী।'

কলকাতায় তখন দুই দিকপাল। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, আর হাটখোলার মদন দত্ত। আর সেকালের সমাজে তাঁরা যেন দুই বিরাট বটবৃক্ষ। হাজারো হাজারো ঝুরি-নামা শাখা-প্রশাখায় লক্ষ পাখির বাসা। তার নীচে বহু পথচারীর আশ্রয়। সুবৃহৎ আশ্রিত গোষ্ঠীর মধ্যে মদন দত্তর বাড়ীতে মানুষ হতে লাগলেন রামদুলাল। মদন দত্তর ছেলেরা কলাপাতায় লেখা করে। আর সেই ফেলে দেওয়া কলাপাতা আবার ধুয়ে নিয়ে লেখেন কিশোর রামদুলাল। তালপাতায় লিখে ফেলে দেয় বাবুর বাড়ীর ছেলেরা। রামদুলাল তাই জল করে ধুয়ে আনে গঙ্গার ঘাট থেকে। তাতেই দাগা বুলোয়। আঁক শেখে। মুখে মুখে শুভঙ্করীর নামতা শেখে। আর শেখে দত্ত বাড়ীর গোমস্তা মুহুরীদের কাছ থেকে চলতি ইংরিজি। কলকাতায় তখন ইংরিজি আমল শুরু হয়ে গেছে।

এই সময়ে রামদুলালের এক বন্ধু জুটে যায় — নন্দকুমার বসু। নন্দকুমার এককালে তমলুকের লবণগোলার সরকারী দেওয়ান হয়েছিলেন। সেকালে সেটা মস্ত চাকুরী। কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। রামদুলালের বয়স তখন ষোল। দুই বন্ধুতে মিলে দত্তমশায়ের সন্তানীর কারবারে বিনে মাইনের উমেদার হয়ে ঢুকে পড়ল। হাটখোলা থেকে খিদিরপুর। অনেকখানি পথ। মাথার ওপর খরা রোদ। তাত কত বাড়ে, গরম হয় রাস্তার বালি। মাঝে মাঝে মনে হয় মরুভূমি। বালির ঝড় ওঠে। সেকালে ছাতা ব্যবহার একটা বড়-মানুষী ব্যাপার। একদিন এমনি গরমের দিনে দুই বন্ধুতে মিলে যুক্তি করে দুপুরে কাছারি না গিয়ে সোজা দত্তবাড়ীর দালানে শুয়ে ঘুম। তারা ত আর চাকরী করে না। এই চৈত্রের খর রোদে নাই বা গেল কাজে। ছেলেমি বুদ্ধি আর কাকে বলে!

মদন দত্তর কিন্তু দশটা চোখ। চারিদিকে নজর তাঁর। অত দাসদাসীর ভিড়েও ছেলে দুটো যে চাকরীতে যায় নি, এটা তাঁর নজর এড়ায় নি। 'হুমরোহো' 'হুমরোহো' করে তাঁর পাল্কিটা সেদিন একটু আগেই ফিরল বাড়ী। এবং বাড়ী পেঁাছেই দত্তমশাই চলে গেলেন রামদুলালের আস্তানায়। রাম আর নন্দ দুই বন্ধুই তখন গাঢ় নিদ্রায়।

—অসুখ করেছে নাকি? কপালে হাত দিয়ে অনেকটা স্বগতোক্তিই করলেন মদন দত্ত। রামের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সামনে ভূত দেখলেও এতটা চমকাত না তরুণ রামদুলাল। চোখ কচলে উঠে দাঁড়াল তড়াক করে।

—কাছারী যাও নি? ভারী গলায় জিজ্ঞাসা। কি বলবেন রামদুলাল? শরীর খারাপ? মাথা ধরেছে? অন্য কোন অসুখ? মিথ্যা কথার জাল অনায়াসেই বিছাতে পারতেন। কিন্তু, না। হাত জোড় করে সহজ সত্যটাই বললেন। দারুণ গ্রীষ্মে কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে। বাড়ী ফিরে এসে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—ননির পুতুলের মত এত সহজে কাতর হয়ে পড়লে, জীবনে চলবে কি করে? কাজ করবে কি করে? কিছুটা ব্যঙ্গের রেশ ছিল মদন দত্তর গলায়। দমবার পাত্র নয় রামদুলাল। দুম করে বলে ফেলল, 'দিয়ে দেখুন না কাজ। পারি কিনা?'

এ তো 'চ্যালেঞ্জ'। মদন দত্তকে তাল ঠুকে আহবান। এতটুকু ছেলে। মদন দত্ত একবার বুঝি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালেন। বুঝিবা ছেলেটার ভেতর পর্যন্ত দেখে নিলেন। তারপর সেই ভারী গলায় বলে গেলেন, আচ্ছা, কাল কাজে যেও।

চাকরীই দিলেন রামদুলালকে। বিল সরকারের চাকরী। কোম্পানীর বিল নিয়ে বাড়ী বাড়ী ধর্ণা দিতে হত। টাকা আদায় করতে হত। এসে বুঝে দিতে হত ক্যাসে। কোন কোন দিন রাত হয়ে যেত। শেয়াল ডেকে উঠত সেকালের সাঁঝের কলকাতায়। বাঁশ আর হোগলা বনে শুরু হত এক নাগাড়ে ঝিঁঝির ডাক। অজস্র জোনাকীতে ছেয়ে ফেলত বন-শিমুলের মাথা। ষোল বছরের কিশোর রামদুলাল হেঁটে হেঁটে যেতেন কলকাতা থেকে দমদম, এমন কি সুদূর টিটাগড়। টাকা আদায়ের অবস্থা এখনও যেমন সেকালেও তেমনি। কোন সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা টাকার জন্যে আটকে রেখে অবশেষে বিলটা দেখে বলত—এটা আবার কিসের পাওনা? এই তারিখে এই মাল ত যায় নি? তরুণ রামদুলালের মাথায় বজ্রাঘাত। আবার সেই দীর্ঘ কয়েক ক্রোশ পথ পেরিয়ে কলকাতায় মদন দত্তর গদীতে ফিরলেন। খাজাঞ্চীবাবুর কাছে হিসেবের জায় মিলিয়ে নিয়ে আবার ফিরে গেলেন সেই দমদম কি টিটাগড় কি আরও দূরে বারাকপুরে।

এ ছাড়াও ঝামেলা আছে। সেকালের কলকাতায় চোর-ডাকাতের উপদ্রব বড় কম ছিল না। বাজারে বাজারে গোরা সৈন্য আর মাঝিমাল্লার নিত্য কলহ। আর তাই নিয়ে হুলস্থুল। কালা-কলকাতা শশব্যস্ত। তাছাড়া 'হারে রে রে' করে মশাল জ্বালিয়ে ডাকাতির বহর বড় কম না। শাসন তখনও বেশ পাকাপোক্ত নয়। এমনি দুর্দিনের কলকাতায় মুখে গোঁফের রেখা ওঠে নি ভাল করে—তরুণ রামদুলাল টাকা আদায় করে বেড়ায়। পায়ে পায়ে সারা কলকাতা চষে বেড়ায়।

একবার হয়েছে কি, দমদমের এক গোরা সাহেবের কাছে অনেক টাকা পাওনা। বিল সরকার রামদুলাল এত্তেলা দিয়েছে সেই দুপুর থেকে। সে যেন তার ধৈর্যের পরীক্ষা। গা ঘেঁষা-গা ঘেঁষা অন্ধকার নেমেছে দমদমের সাহেবী আস্তানায়। কোথাও মোমবাতি, কোথাও জ্বলতে শুরু করেছে

সেজ, ঝাড় লণ্ঠন। সাহেব তাঁর অনেক টাকার তমসুক সব উসুল দিয়ে দিলে। অদূরে বুঝিবা কর্কশ গলায় প্যাঁচা ডেকে উঠল। ঘরে ফেরা পাখীদের পাখসাটে ঝুপড়ি তেঁতুল বটের বন অকস্মাৎ সরব হয়ে উঠল। দমদমের আকাশে সন্ধ্যার তারা ফুটেছে দু-একটা।

বিল সরকার রামদুলাল করে কি? এতদূর পথ। অন্ধকার পথ। নিরাপদ নয়। কারও বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেবে রাত্রির জন্যে? কিন্তু এত টাকা তার কাছে, যদি জানাজানি হয়ে যায়? কার মনে কি আছে কে জানে? বাজারে গিয়ে আশ্রয় নেবে—সেখানে গোরা সৈন্যরা আছে না? কি করি ভাবতে ভাবতে রামদুলাল ছন্নছাড়া ভিখিরীর মত সেই টাকার পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ে রাত কাটিয়ে দিলে! অন্ততঃ রামদুলালের জীবনীকার সম্পাদক গিরীশ ঘোষমশাই ত সে কাহিনী বলেছেন।

এই পাঁচ টাকা মাইনের চাকরী করতে করতে একশ' টাকা জমিয়ে ফেললেন রামদুলাল এবং বাগবাজারে একটা কাঠের গোলা খুললেন। দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে অবসর সময়ে নিজের দোকানে এসে বসতেন। দাদামশাই রামসুন্দর তখনও বেঁচে। সেকালের একটা 'স্পেলিং বুক' যোগাড় করে সত্তর বছরের বৃদ্ধ দু'বেলা কেবল চাকরীর দরখাস্তের মুসাবিদা করেন ইংরিজিতে। সংসারের সব ভার ত তখন রামদুলালের!

মদন দত্তর নজর সব দিকে। এই সামান্য ছেলেটির অসামান্য নিষ্ঠা, ব্যবসাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বিল সরকার থেকে রামদুলালকে তিনি জাহাজ সরকার করে দিলেন। মাইনে দশ! আর সে বড় বিচিত্র চাকরী। নৌকা করে সোজা নদীর মোহানায় চলে যেতে হত আর সেখানে জাহাজের মাল খালাস করে নিজেদের কোম্পানীর নৌকায় বোঝাই দিতে হত। আর এই মাল গুণতি নিয়ে মাঝে মাঝেই লেগে যেত ধুন্দুমার। গোরা কাপ্তেন চোখ পাকিয়ে গলা ফুলিয়ে দুর্বোধ্য ইংরিজিতে বলে, মাল মোটেই কম হয়নি। 'বিল অব লেডিং'-এ যা' যা' ফিরিস্তি আছে, সবই বুঝিয়ে দিয়েছি। রামদুলাল মাথা নাড়তে থাকে। মনিবের মাল সে বুঝে পায়নি। চোখ রাঙালে হবে কেন বাপু। ইংরিজি লিখতে জানে না সে। কিন্তু বুলি মোটামুটি সড়গড় হয়ে গেছে তার। কাপ্তেন যদি মনে করে থাকে ধমকে সে রামদুলালকে ঠাণ্ডা করে দেবে তাহলে সে ভুল বুঝেছে। কথায় কথায় তাপ বাড়ে। কণ্ঠস্বর উদারা, মুদারা তারায় গিয়ে ঠেকে। এমন কি ঘুষোঘুষি পর্যায়ে গিয়ে ওঠে। হাতাহাতি। তাতেও কায়দা করতে পারে না জাহাজের কাপ্তেন, মাঝিমাল্লা। কারণ মাল বুঝে না পেলে রামদুলাল বুঝে পাওয়ার সই দিতে রাজী নয়। সে ত মনিবের নিমক খায়।

সব গল্পই মদন দত্তর কানে গিয়ে ওঠে। এবং তার সততার পুরস্কার দিতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু শুধু টাকায় বুঝি এই পরিশ্রমের পরিমাপ হয় না। রামদুলাল আর তাঁর বন্ধু নন্দকুমার ডিঙি-নৌকায় ডায়মণ্ড হারবার যাচ্ছিল। মাঝে ঝড়-জল। নৌকা গেল উল্টে। দুই বন্ধুতে সাঁৎরে এলেন খিদিরপুরে। আর একবার। সেও ডায়মণ্ড হারবারের ঘটনা, যা দুর্ঘটনা। অকস্মাৎ আকাশ কালো করে এল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক যেন বুনো দাঁতাল শুয়োরের মতো তেড়ে বেগে এসে আকাশখানা দুফাঁক করে দিয়ে যাচ্ছিল। আর নৌকার বুকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের দুই উদ্যোগী তরুণ বারবার চেঁচিয়ে বলছিল, মাঝি বৈঠা সামাল।

আর সামাল! আরব্য উপন্যাসের সেই বীভৎস দৈত্যের মত ঝড়জলের মধ্যে সেই নৌকাখানার ঝুঁটি ধরে একেবারে আছড়ে মারল গঙ্গার জলে সেই অকাল-সন্ধ্যায়। কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার ঠিক রইল না। কেবল আশ্চর্যের ব্যাপার—দুই বন্ধুর যখন জ্ঞান ফিরল, তারা দেখল এক জেলেবাড়ীতে শুয়ে। তাদের মাটির ওপরে পাতা হোগলায় বোনা চ্যাটা। সেইটেই তারা কোন মতে গায়ে জড়িয়ে সে রাতের শীত কাটাল। এবং দুই বন্ধুরই সেদিন মনে হল, হোক হোগলা, কিন্তু এই চ্যাটা বেশ উষ্ণ। এবং সারাজীবন সেই রাতকে কখনও ভোলেননি রামদুলাল। যখন তিনি ধনকুবের, সারা কলকাতা তাঁর ইঙ্গিতে চলে, তখনও তার বিছানার নীচে থাকত সেই হোগলার কাঠি। সেই রাতের স্মৃতি।

কিন্তু এত কেবল দুঃখের দিক। এই যে জাহাজের অভিজ্ঞতা, এটাই তার ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেকালের গঙ্গার মোহানায় বালির চরে আঘাত লেগে অনেক জাহাজ ডুবে যেত। সেই ডোবা জাহাজ কিভাবে তোলা যায়, তার ডুবে যাওয়া মাল কি করে উদ্ধার করা যায়—সবই রামদুলালের নখদর্পণে। এত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর কোন বাঙালীর ছিল না সেকালে। অনেক গোরা কাপ্তেনের চেয়েও এ বিষয়ে তিনি দড়। কাজেই টালি কোম্পানীর নিলেম ঘরে এই সব ডোবা জাহাজের যখন ডাক হত, রামদুলাল আসলে আন্দাজ করতে পারতেন, কি রকম ডাকলে, মুনাফা উঠবে কত। তাঁর 'স্পেকুলেশন' করার আশ্চর্য ক্ষমতার আসল রহস্যটা এখানে।

একবার হয়েছে কি, আর যে গল্প ত প্রবাদের মত ছড়িয়ে আছে সেকালের কাহিনীতে। টালি কোম্পানীতে জোর নিলাম চলছে। বহু খদ্দেরে হলঘর জমজমাট। নানা জিনিস বিক্রি হচ্ছে। নীলামওলা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছে—সতরশ টাকা—এক। সতেরশ টাকা দুই। সতেরশ—তিন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছালেন রামদুলাল। মদন দত্ত ঐ টালির নিলামে কয়েকটা জিনিস কেনবার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রামদুলাল দেরী করে ফেলেছিলেন। নিলাম শেষ হয়ে গেছে। বাকী কেবল একটা ডুবো জাহাজের নিলাম। সে খবর আগেই পেয়েছিলেন রামদুলাল। একেবারে গঙ্গার মোহানায় জাহাজটা মালপত্তর সমেত ডুবে যায় কয়েক মাস আগে। এবং তাঁর স্বাভাবিক কৌতূহল বশেই ডায়মণ্ড হারবারে অন্য কাজে গেলেও রামদুলাল সেই ডুবো জাহাজের খবরাখবর করেছিলেন। তত্ত্বতল্লাস নিয়েছিলেন। সেদিনের নিলামের ইস্তাহারে পরের দাগেই ডাক উঠেছিল সেই ডুবো জাহাজ।

নিলামঘরে লোক ছিল না তা নয়। কিন্তু সেই ডুবো জাহাজের খবর রাখত না কেউ। কাজেই রামদুলালের ডাকে নিলামওলা গলা ফাটিয়ে বার-বার বলা সত্ত্বেও রামদুলালের ওপরে আর কেউ দর দিলে না। চোদ্দ হাজার টাকায় সেই মাল সমেত ডোবা জাহাজটা বিক্রি হয়ে গেল। অবশ্য ক্রেতার নাম উঠল হাটখোলার মদন দত্ত। টাকা মিটিয়ে বিক্রি পাকা করে রসিদ নিয়ে রামদুলাল যাই নেমে আসছেন টালি কোম্পানীর নিলামঘর থেকে, হন্তদন্ত হয়ে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত এক সাহেবের বাচ্চা ঢুকল নিলামঘরে। টালি কোম্পানীর কর্তা সাফ জানিয়ে দিলে, ডুবো জাহাজটা শুধু নিলাম হয়ে যায়নি, মদন দত্তর জাহাজ সরকার নগদ টাকা দিয়ে খরিদটা পাকা করে গেছে।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। সাহেব রামদুলালকে ধরলে পাশেরই একটা ঘরে। সেখানে সরকারমশাই একটু হুঁকো টান-

ছিলেন বোধ হয়। সাহেব একেবারে গ্‌দোর আর কি। ঐ ডুবো জাহাজটা তার চাই। যত চাই বলে আর তত তেড়ে আসে। ভাবে, কালা আদমি, ভয়েই সরে যাবে। কিন্তু রামদুলাল শুধু হাসে। অমন সাহেব সে অনেক দেখেছে। ওসব তড়পানি তার অজানা নয়। সাহেব যখন বুঝলে এ বড় শক্ত ঠাঁই, তখন বললে, আচ্ছা কিছু লাভ নিয়ে ছেড়ে দাও জাহাজটা। রামদুলাল ভাবলেন, বাছাধন পথে এস। শেষবেশ, প্রায় এক লক্ষ টাকা মুনাফা নিয়ে সেই ডুবো জাহাজ হাত-ফের করলেন জাহাজ সরকার রামদুলাল।

সন্ধ্যা হয় হয়। রামদুলাল গুটি গুটি এসে ঢুকলেন মদন দত্তর কাছারীতে। মথা নিচু করে জোড়হাত করে দাঁড়ালেন। লাখ টাকা লাভ এবং সে টাকা ত সহজেই আত্মসাৎ করতে পারতেন রামদুলাল। সে ত দূরের কথা, রামদুলাল ভাবছিলেন, মালিকের হুকুম ছাড়া এই চোদ্দ হাজার টাকার ফাটকা খেলা উচিত হয়েছে কি তাঁর? টাকা ত মদন দত্তর। তিনি ত এই নিলাম ডাকতে বলেন নি। তবে? সেকালের বিবেক কাঁটার মত বিঁধছিল!

হিসেবপত্র থেকে মদন দত্ত একসময় চোখ তুলে তাকালেন: কি খবর রামদুলাল? টালির নিলামে গিয়েছিলে? ঘাড় নেড়ে তাঁর সব টাকা আর সেই লাভের লাখ টাকা মনিবের সামনে নামিয়ে দিলে রামদুলাল। তারপর বললে আনুপূর্বিক ঘটনা। মদন দত্ত চিনতেন রামদুলালকে। এবার নতুন করে পরিচয় হল। মদন দত্ত বললেন, রাম এ টাকা তোমার। ভাগ্য তোমাকে দিয়েছে। আমি নেবার কে? রামদুলালও নতুন করে চিনলেন দিকপাল মদন দত্তকে।

এইটেই সুরু। ভাগ্য দু'হাত ভরে দিতে লাগলেন রামদুলালকে। শোনা যায়, রামদুলাল যখন মারা যান তখন তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেত অনেক পরের কথা। এরই মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সাগর পারে এক নতুন স্বাধীন জাতির উদ্ভব হ'ল। এক নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার খুলে গেল এক অবহেলিত উপনিবেশে। 'নিউ ওয়ারলড'। সতেরশ ছিয়াত্তর। চৌঠা জুলাই।

এবং এতে যে ব্যবসার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল সেকথা অখ্যাত এক পরাধীন দেশের অশিক্ষিত এক বাঙালীর চোখে ধরা পড়ল নির্ভুলভাবে। কলকাতার বাজারে মার্কিন যে সব জাহাজ আসত, রামদুলাল তাদের সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। ওদের যে মালপত্র আসে সেগুলি ভালো দরে বিক্রির আয়োজন করতে লাগলেন। যেসব মাল তাদের কাটবে ভালো, আমেরিকার বাজারে, তাদের জন্যে সেইসব সওদাদের গস্ত করাতে লাগলেন। দরকার মত বিশ্বাস করে টাকা দাদন দিতে লাগলেন। মার্কিন ব্যবসার কলকাতার এক-মাত্র এজেন্ট হয়ে গেলেন রামদুলাল দে। অচিরে সেই নতুন দেশের নাবিক ব্যবসায়ীর মুখে মুখে ফিরতে লাগল রামদুলালের নাম। আর লাভের টাকায় ফেঁপে উঠলেন শুধু সেই সব মার্কিন ব্যবসায়ীরাই নয় দে-মশায় নিজেও।

রামদুলালের সেরেস্তার কাগজপত্র ঘেঁটে সবশুদ্ধ পঁয়ত্রিশটি মার্কিন ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া গেছে—যাঁদের কলকাতার ব্যবসার একমাত্র এজেন্সী ছিলো দে-মশায়ের কারবার। 'বেঙ্গলীর' সম্পাদক গিরিশ ঘোষের কল্যাণে জানা গেছে, শুধু বোসটন বন্দরেই রামদুলালের সঙ্গে কারবারী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল সতের। এই বোসটন বন্দরে চায়ের পেটি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া নিয়েই না আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হয়েছিল। আর সেখানেই বাঙালী ব্যবসা বুঝি পাকাপোক্ত হয়ে বসেছিল। কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। বোসটনের কার-বারগুলি ছিল জি আর মিনট। জি-ওয়ারেন। জে-ইয়াং। জে এস এ্যামরি। টি উইগলেস ওয়ারব। জে টি কলারিজ। এইচ আরভিং। জে জে বাউডিচ। বি রিচ এণ্ড সন্স। ঈ-রোডস। এফ ডবলিউ এভারিট। ডবলিউ গডার্ড। ম্যাকি এণ্ড কলারিজ। এইচ লী: ও গড্‌উইন। থিউরিং এবং পারকিন্স। নিউইয়র্ক শহরে যে পনরটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামদুলালের ঘনিষ্ঠ কাজ-কারবার ছিল সেগুলি হচ্ছে—মেসারস লেনক্স এণ্ড সন। জি এস হিগিনসন। মেসারস সি এণ্ড ডি স্কিনার। মেসারস সিংগলটন এণ্ড মেজিক। এস অস্টিন জুনিয়র। ডবলিউ সি এ্যাপলটন। ঈ হি ক্রোকার। ঈ ডেভিস। জে জে ডিকসওয়েল। ডবলিউ ব্রাউন। এ বেকার জুনিয়র। জি ব্রাউন। টি সি বেকন। এম কারটিস। বেয়ারিং ব্রাদারস। ফিলাডেলফিয়ায় ছিল মেসারস গ্রান্ট এণ্ড সেটান কোম্পানী দে-মশায়ের মস্ত খদ্দের। সালেমে পিকারিং ডজ ও ডবলিউ ল্যাণ্ডর: নিউবেরী বন্দরে ঈ এস র‍্যান্ট ও জে এইচ টেলকম্ব এবং মারভেল-হেডে জে কুপার। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ধলা কাপ্তেনরা সাদা চামড়ার হৌস-দের ছেড়ে বাঙালী ব্যবসায়ীদের হাতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সমর্পণ করে বসে-ছিল। এবং রামদুলালের সঙ্গে তাদের প্রসন্নতা এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে, মার্কিন ব্যবসায়ীরা একটা জাহাজেরই নামকরণ করে ফেলল, রামদুলাল দে। রাম-দুলালের জীবনকালে অন্তত তিনবার এই জাহাজটা আমেরিকার কূলে তার নোঙর ফেলেছিল তার প্রমাণ আছে। অতলান্তিক মহাসাগরের অশান্ত উত্তাল সমুদ্রকে হেলায় পরাজিত করে রামদুলালের আরও তিনটি ব্যাণিজ্য জাহাজ অষ্টাদশ শতক শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের অভ্যুদয়ের গোড়ার দিকে সাগরযাত্রা করেছিল—সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম।

মার্কিণ ব্যবসায়ীদের কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। আঠারশ' এক। মার্কিন ব্যবসায়ীরা চাঁদা তুলে জর্জ ওয়াশিংটনের এক পূর্ণ মাপের প্রতিকৃতি আঁকাল। লম্বায় নয় ফুট, চওড়ায় ছয়। কয়েকদিন আগেই ওয়াশিংটন আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। এবং সেই মূল্যবান প্রতিকৃতিটি কাকে উপহার দিল তারা? সাগর পারের এক নগণ্য বাঙালী রামদুলাল দেকে।

রামদুলালের মোটা পয়সা অবশ্য ফেয়ারলি ফারগুসন এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ানগিরি করে। তা নিয়েও অনেক গল্প। তবে রামদুলাল নিজেই ত একটা মস্ত কাহিনী। সামান্য ভিক্ষান্নে জীবন সুরু করে কলকাতার সমাজকেই ত তিনি তাঁর সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছিলেন—দু হাতে লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্যই শুধু পাননি, তার জীবনটাকেই একটা গল্পে পরিণত করে গেছেন।

তাঁর জীবনীকার বলেছেন, 'রামদুলাল মে জাস্টলি বি সেড টু বি পায়নিয়ার অফ আমেরিকান কমার্স ইন বেঙ্গল। অর্থাৎ রামদুলালকে ন্যায়তই বলা যেতে পারে বাংলায় মার্কিন ব্যবসার পথিকৃৎ। কিন্তু দুঃখের কথা, রামদুলাল যে পথ দেখালেন, সে পথ তারপরই আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। আরব্য উপন্যাসের ধন-ভাণ্ডারের দরজা খোলার যে রহস্য শব্দটি তিনি জানতেন, তারপরই আর কেউ তা খুঁজে পেলে না। বাবু কলকাতা, লাটুবাবু ছাতু-বাবুর কলকাতা তাঁর ঐশ্বর্য ভোগ করলে, কিন্তু সে ঐশ্বর্য আহরণ করতে শিখলে না। রামদুলালের সব সাফল্যের মধ্যে বোধ করি এইটেই একটা মস্ত ট্র্যাজিডি! তবে, কথা এই, বাঙালীর যখন অতীত আছে, তখন তার ভবিষ্যৎ থাকবে না কেন?

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

তেত্রিশ
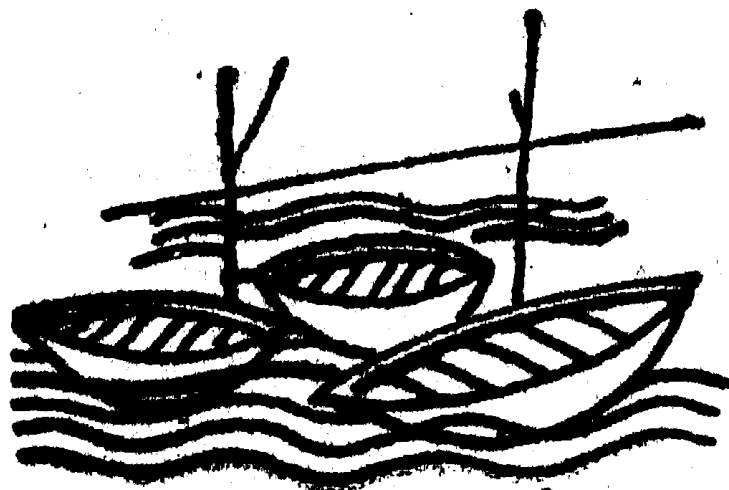
সকালবেলা রান্নাঘরে। যদি কিছু টুকটাক সাহায্য করা যায় নির্মলা মাকে। দরকার হয় না, একাই একশ তিনি। নিপুণ হাতে চটপট কাজ করতে করতে হাসিমুখে গল্প করেন। কাশী, ব্যাসকাশী, গয়া, বুদ্ধগয়া, লক্ষ্ণৌ, নৈনিতাল, কলকাতা, ঢাকা কত জায়গার কত গল্প। বসে বসে শুনি আর দেখে দেখে শিখি ঢাকাই রান্নার উপকরণ প্রকরণ। ঢাকার বিখ্যাত বন্দ্যো বংশের মেয়ে—সোহংস্বামী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন। শুধু ঢাকার কেন অনেক দেশের অনেক রকম রান্না, অনেক রকম পিঠে পুলি ক্ষীরমুরলী করতে করতে জানেন নির্মলা মা। রোজই একটা না একটা বাড়তি কিছু করে খাওয়ান সকলকে।

আশ্রমবাসিক পর্ব শেষ হয়ে এসেছে, দিন চারেক পরেই নির্মলা মা যাবেন কাশী। শৈশবে হারানো মাতৃস্নেহের মধুর আস্বাদন পাচ্ছিলুম অনাবিল স্নেহযত্নে। এত শীগগির বঞ্চিত হতে হবে তা থেকে? অন্তরের অন্দরে জেগে উঠল আসন্ন মাতৃ-বিয়োগ ব্যথা। উঠে গিয়ে শুকনো মুখে বসলুম দক্ষিণের বারান্দায় স্বামিজীর কাছে।

লোকজন রোগীর দল চলে গেছে। পিয়ন দিয়ে গেছে কখানি চিঠি। একের পর একখানি পড়তে পড়তে স্বামিজীর আনন্দোজ্জ্বল মুখে ফুটে উঠছে ঈষৎ হাসির রেখা। সবগুলি পড়া শেষ হলে আস্তে আস্তে বললেন—নাঃ কলকাতা একবার যেতেই হবে।

চিঠি পড়া শেষ হতেই নজর পড়ল। বললেন—কী ব্যাপার? আষাঢ়ে মেঘ নেমেছে যে!

—কিছু না।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে স্বামিজী বললেন—সত্য গোপন করাও মিথ্যাচার—আশ্রমবিরুদ্ধ কাজ।

—শরীর ভালই আছে, কিছু হয় নি, বাবা।

ভুরু কুঞ্চিত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে স্বামিজী বললেন—তা হলে মন খারাপ নিশ্চয়ই।

অস্বীকার করবার জো কি?

স্নেহের দেনা-পাওনার কারবারে পাওনার আশায় নিরাশ হয়ে মন গিয়ে পড়েছিল দেনার খাতায়—স্নেহাস্পদের দিকে। বললুম—নির্মলা মা চলে যাবেন, আর তো সময় হবে না, আজ একবার বাড়ী গিয়ে খোকাকে দেখে আসি, বাবা।

—খোকার আবার খোকা? বল নি তো এতদিন—হো হো করে হেসে উঠলেন স্বামিজী।

—হ্যাঁ তাই, খোকা আমার, ছেলে দাদার।

একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় স্বামিজী বললেন—শোনা গেছে দুলালের মুখে, দশদিনের ছেলে রেখে চিকিৎসার জন্যে এগারো মাস মাকে থাকতে হয়েছিল বর্ধমানে। দশদিনের আঁতুড়ের শিশুকে লালনপালন করেছিলে তুমি। খুব ভাল—শিশুচর্যাটা পুরোপুরি শেখা হয়েছে হাতেকলমে। বিকেলে যাও, কাল সকালেই ফেরা চাই।

স্বামিজীর কথা মতই কাজ হল। তবে পরদিন সকালে ফিরলুম একা নয়—সঙ্গে খোকা শিবু।

শেখানো ছিল। আশ্রমে পৌঁছে স্বামিজীকে প্রণাম করতেই স্বামিজী বললেন—ওইটুকু শিশুকে নিয়ে এলে? থাকতে পারবে মা ছেড়ে?

—মায়ের চেয়ে ও আমাকেই বেশি চেনে, বাবা। কিছুতেই ছাড়লে না, এমন কান্না আরম্ভ করল যে সামলানো দায়। আনতেই হল। দুদিনে ভুলিয়ে দিয়ে আসব।

—তোর নাম কি রে?—স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন খোকাকে।

বললুম—বাবা বলেন শিবরাম, সবাই বলে শিবু। আপনি না দেখেই দাদাকে বলেছিলেন 'পরিমল' নাম রাখতে।

—এতখানি রাস্তা, এইটুকু ছেলেকে আনলে কি করে? গাড়ীতো নাই—বললেন স্বামিজী।

হেসে বললুম—কখনো কোলে, কখনো চালিয়ে এনেছি, বাবা।

দুদিন আর কিছু হল না। নাওয়ানো, খাওয়ানো, খেলা দেওয়া, শোওয়ানো নিয়েই থাকতে হল। মাঝে মাঝে বসিয়ে স্বামিজীও কত কথা বলেন ওর সঙ্গে।

বিকেলে মাঠে নিয়ে গিয়ে 'বুড়ী ছোঁওয়া' খেলা দেন।

দুদিন পরেই শিবুকে রেখে আসা হল বাড়ীতে। নির্দিষ্ট দিনে নির্মলা মা চলে গেলেন কাশী।

কর্মসূচী যথাপূর্ব।

শরতের সকাল। নির্মল নীল আকাশ, মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে শাদা শাদা মেঘ। মাঠের ধারে ধারে নদীর পাড়ে পাড়ে কাশফুল মৃদু হাওয়ায় চামর দুলোচ্ছে। পুকুরে পুকুরে পদ্ম কুমুদের সমারোহ। সমস্ত প্রকৃতিতে পুজোর আমেজ।

সকাল সকাল বিদায় নিয়েছে আগন্তুকের দল। জলযোগ পর্ব শেষ। বারান্দায় স্বামিজী একা। বেশ নিরিবিলি। স্বামিজীর ডাকে গিয়ে বসলুম কাছে। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে স্বামিজী বললেন—ছেলেটিকে তুমি খুবই ভালবাস, কেমন? কত ভালবাস—মায়ের চেয়েও বেশি?

—ভালবাসি, স্নেহ করি, ঠিকই। কত ভালবাসি কি করে বলি, বাবা? ভালবাসার কি মাপকাঠি আছে। মায়ের চেয়ে বেশি? পড়েছি—

'সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার
অপার অতল মাতৃস্নেহ পারাবার।'

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই।

এত স্নেহ আসে কোত্থেকে জান?

—ওর কষ্ট দেখলে কষ্ট পাই। তাই যাতে ওর বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয় তাই করি।

—ঠিকই। ওর কষ্ট দেখলে কষ্ট পাও। ওকে সুখী দেখলে সুখী হও তো?

—নিশ্চয়ই। খুব আনন্দ হয়, নিজেকে পরম সুখী বলে মনে হয়।

—এই জন্যেই স্নেহ কর। নিজে সুখী হও বলে, আর পরোক্ষে থাকে ভবিষ্যতে তোমায় সুখী করবে—এই আশা। তা হলেই দেখ—

আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা,
ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ
কৃতি জন্যা ভবেৎ চেষ্টা,
চেষ্টা জন্যা ভবেৎ ক্রিয়া

মূল সূত্রটি হল এই—

আত্মতৃপ্তি তরে উদিত কামনা
কামে চেষ্টা উপজয়
চেষ্টাতে করম হয় সম্পাদিত
তাহে সুখ দুঃখ হয়।

মূল সূত্রে দেখা গেল নিজের তৃপ্তির জন্যেই, নিজের সুখের জন্যেই স্নেহ, দয়া, মায়া, ভাব, ভালবাসা, আসক্তি। আসলে—আত্মসুখের আশাতেই সব। এই আশা আবার কি জানতো?

আশাহি পরমং দুঃখং
নৈরাশ্যং পরমং সুখং
যথা কান্তাশা সঞ্ছিদ্য
সুখং সুস্বাপ পিঙ্গলা।

এক সময়ে অপরূপ রূপবতী কিন্তু গতযৌবনা নটী পিঙ্গলা সুপটু হাতে অপটু দেহকে গয়নাগাঁটি সাজপোশাক, নানারকম অঙ্গরাগে প্রসাধন করে রোজ রাত্রে অপেক্ষা করত প্রেমিকের। কেউ আসত না। রাতের পর রাত জাগাই সার, শরীর ক্লান্ত অবসন্ন, মন নিস্তেজ। তাই আশা ছেড়ে দিল সে। সেদিন থেকে সুখে ঘুমোত পিঙ্গলা।

সকলেরই সবচেয়ে প্রিয় বস্তু—আত্মা। নিজেকে সবাই ভালবাসে সবচেয়ে বেশি। তাই ভালবাসার পাত্রকে আত্মবৎ দেখে, তার সুখকে নিজের সুখ, তার দুঃখকে নিজের দুঃখ ভেবে আত্মহারা হয়। প্রিয়বস্তুকে প্রিয়পাত্রকে ভাবে—'আমার'। মস্ত বড় গ্রন্থি এটি। আশার ছলনা, মায়ার বাঁধন। এ থেকে জীব যত দুঃখ পেয়েছে তত আর কিছুতে নয়। 'আমার' 'আমার'ই হচ্ছে সব দুঃখের মূল।

মমেতি মূলং দুঃখস্য,
নমমেতি চ নিবৃত্তে
শুকস্য বিগমে দুঃখং
ন দুঃখং গৃহমূষিকে

'আমার' ভাবে বলেই তো পোষা শুক পাখিটি মারা গেলে লোকে কেঁদে ভাসায়, দুঃখের আর শেষ থাকে না। কিন্তু ইঁদুরটির বেলায়? ঘরের ইঁদুর মরে গেলে তো দুঃখ করে না,—আমার আমার ভাবে না বলেই। সংসারে যত অনর্থের মূলেই হচ্ছে এই 'আমার' ভাব। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার বিষয় আশয়, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা। এই থেকেই যত হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি—যত অনর্থ যত অশান্তি।

বৈষ্ণব মহাজনরা বলেন—

সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

আবার আশাকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগী করম দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।

এ শুধু রাধারই আক্ষেপ নয়—সর্বকালের সর্বজনস্বীকৃত চিরন্তনী সত্য। সংসারের প্রত্যেকের পক্ষেই 'কানুর পিরীতির' এই-ই ফল। যা খেয়ে খেয়ে মরে, তবু নজর খোলে না। কানু পিরীতি ছাড়তে পারে না। আশা আসক্তি আর আকর্ষণে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে—একটা ছাড়ে তো আর একটা ধরে।

তোমরাও ও একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ।

দিনের সঙ্গে রাত, আলোর সঙ্গে অন্ধকার, গ্রীষ্মের সঙ্গে শীত, কায়ার সঙ্গে ছায়া, জীবনের সঙ্গে মৃত্যু, সুখের সঙ্গে দুঃখের মতই আকর্ষণের সঙ্গে বিকর্ষণের আঘাত অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই আকর্ষণই মহা মোহ। আপাতদৃষ্টিতে ফুলের মালা, পরিণামে বিষের জ্বালা। মোহের ওপর মুগুর বা মুগুরের ঘা আছেই—তবে মুক্তি। কিন্তু মোহের ওপর মুগুরের আঘাতটা যে কি মর্মভেদী! অনেকেই সহ্য করতে পারে না। এ আঘাতটা প্রায়ই আসে অবজ্ঞা আর অপমানের শক্তিশেল হয়ে।

জ্ঞানী যাঁরা তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা জানেন মোহের স্বরূপ—সুখ দুঃখে সমজ্ঞান তাঁদের, 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ'।

কিন্তু সাধারণ লোক? অবজ্ঞা আর অপমানের গ্লানি তাদের মর্মদাহী। সে মর্মদাহ নিভোয় প্রতিশোধের উল্লাসে। তার অন্তরে জ্বলে ওঠে যে আগুন, সেই আগুনে প্রতিপক্ষকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে তবে শান্ত হয়। যদি তা না পারে তবে সেই আগুনে হয় নিজেরই তুষানল। তিলে তিলে পুড়ে নিজেই ছাই হয়।

দেখেছ তো—বাপবেটায়, খুড়ো-ভাইপোয়, ভাইয়ে ভাইয়ে, আত্মীয়ে আত্মীয়ে কত বিবাদ বিসম্বাদ, লাঠালাঠি, মারামারি, মামলা মোকদ্দমা। ফল হয় কি—কখনো একপক্ষ কখনো দুপক্ষই উৎসন্নে যায়। জেদের বশে রোখ চড়ে, দুপক্ষের আগুনে দুপক্ষই পোড়ে। ভাল হয় না কারুরই।

কিন্তু বড় যাঁরা, মহৎ যাঁরা—তৈরী থাকেন সব অবস্থায়। তাঁরা অপমানের আগুনকে নিভিয়ে ফেলেন ক্ষমার শান্তি জল ঢেলে।

নিজেকে তৈরী কর। বড় হও মহদাশয় হও। বিষয়ের চেয়ে আশয় বড়। পড়েছ তো—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ
মা গৃধ কস্যস্বিৎ ধনম্।।

ইষ্টমন্ত্রের মত মনে রাখবে শ্লোকটি—এর চেয়ে বড় কথা আর নেই। মনে রাখবে খুব ভাল করে।

জগতে দুঃখ আছে। দুঃখে জগৎকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়া ভাল।'

অদূর ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটি সেদিন না বুঝলেও স্বামিজীর তিরোধানের বেশ কয়েক বছর পরেই তিলে তিলে অনুভব করেছিলুম ঐ আঘাতের মর্মান্তিক তীব্রতা। বিষয়ের আশায়—শ্রদ্ধা প্রীতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম জীবনপথের নিঃসঙ্গ প্রান্তরে।

চৌত্রিশ

সন্ধ্যেবেলা সময় পেতেই জিজ্ঞেস করলুম—দুর্বল আর ছেলেমানুষ পেয়ে জুলুমবাজি আর নির্যাতন চলল কি শুধু ছাত্রদেরই ওপর? বড়রাও তো করছিলেন সভাসমিতি, দিচ্ছিলেন জোরাল বক্তৃতা, তুলছিলেন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। —তাঁদের কিছু করতে পারে নি?

—করতে আবার পারে নি? করেছিল বৈ কি—ধরপাকড়, অত্যাচার, নির্যাতন, জেল—বাকি রাখে নাই কিছুই। তবে জবাবও পেয়েছিল মুখের মত, শত অত্যাচারেও দমে নি কেউ।

সভাসমিতি তো ছিলই। ছিল বিপিন পালের অতি আশ্চর্য শৌর্যশালী ওজস্বিনী ভাষা। আগুন ছুটে যেত। এর ওপর যুগান্তর। যুগান্তরই বটে। বাঙলা ভাষারও যুগান্তর এনে দিয়েছিল। তখন তেজালো ভাষা ব্যক্ত করবার উপযুক্ত সুষ্ঠু ভাষা ছিল না—বাঙলা। একটা বড় অভাব। যুগান্তরের লেখকগোষ্ঠী দূর করল সেই দীনতা। তেজালো জোরালো ভাষায় আগুন ছুটল। বলার ভেতর দিয়ে বিপিন পাল আর লেখার ভেতর দিয়ে যুগান্তর বিক্ষিপ্ত মানুষের মনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার

করল। বাঙলা ভাষায় যুগান্তর হল এই স্বদেশিকতার মাধ্যমেই।

তার পর 'সন্ধ্যা'। এর ভাষা হল বেশ মজাদার। খুব সাধারণ লোকদের মন মুগ্ধ করেছিল। শিরোনামা আর সম্পাদকীয় লেখার ঢংই ছিল আলাদা। অল্পশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকেরাও মনের মত রসদ পেত এতে। বাঁ বগলে কাগজের তাড়া আর ডানহাতে একখানি কাগজ উঁচু করে ধরে ফেরিওয়ালা যখন রোজ সকালে কাঠ-ফাটানো গলায়—'লে মাটি দে চাপা' 'সুশীলের তুড়ি লাফ ফিরিঙ্গিকে বলায় বাপ' 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে' 'কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা' 'ক্ষুদে লাট ফুলার' 'লাঠি খটাখট্ বোম্ ফটাফট্' শিরোনামাগুলি আউড়ে হেঁকে যেত রাস্তায়—সে কী ভিড় কাগজ কিনতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাগজের তাড়া ফাঁক। তাও কি পেত সবাই। দরদালান, দেউড়ী, রকে, রাস্তায় এক একখানি কাগজ পড়তেই ভিড় করত তিরিশ বত্রিশজনে।

এমনি করে জনজাগরণের কাজে আগুন ছুটিয়ে দিচ্ছিল—যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি আর ইংরেজী 'বন্দেমাতরম'। সে কী গরম গরম লেখা। দেশের খবর জানতে চায় সবাই। ছেলে, মেয়ে ছোট, বড় কাগজ পড়ে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে দেশ। সরকারের টনক নড়ে—শোন দৃষ্টি পড়ে পত্র-পত্রিকাগুলির ওপর। গুজব শোনা গেল—কাগজগুলি বন্ধ করে দেবে সরকার, গিরেফতার করবে কাগজওলাদের।

কাগজের সম্পাদক মশায়দের—গ্রেপ্তার হোনেওয়ালাদের কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন পূর্ণ লাহিড়ী ছিল জাঁদরেল গোয়েন্দা। নানারকমে গুপ্ত সংবাদ ফাঁস করে দিয়ে ধরপাকড়ের সাহায্য করত সরকারকে। ধরপাকড়ের আভাস উঠতেই উপাধ্যায় লিখলেন 'সন্ধ্যা'য়—

সে সুখের দিন কবে বা হবে
টিকটিকি পূর্ণ লাহিড়ী
ওয়ারেণ্টো হাতে দেবে।
কারাগার স্বর্গ মানি,
'মা' বলে টানব ঘানি......

শুরু হল ধরপাকড়। প্রথমেই কপাল খুলল যুগান্তরের। রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আর প্রেসের মালিক অবিনাশ ভট্টাচার্যকে। বিচারের দিন আদালত লোকে লোকারণ্য। বিচার আরম্ভ হল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে। স্বপক্ষ সমর্থন করতে বলা হল ভূপেন দত্তকে। উকীল ব্যারিস্টাররা তো বিনাপয়সায় আসামীর পক্ষ নিতে রাজী। কিন্তু আসামী রাজী হলে তো! স্বয়ং বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন দত্ত কোন উকিল ব্যারিস্টার দিলেন না নিজের পক্ষে। কারুর অপেক্ষা না করে স্বলিখিত জবানবন্দী দিলেন সোজাসুজি কিংসফোর্ডের হাতে। লিখলেন—দুঃখিনী জননী জন্মভূমির জন্যে যা কর্তব্য বুঝেছি তাই করেছি, তোমার যে শাস্তি ইচ্ছা হয় দিয়ো—সানন্দে বইব।

I have done what I thought to be my duty to my country. You may mete out any punishment you like. I will bear it cheerfully.

কিংসফোর্ড তো জবানবন্দী পড়ে অবাক। বললে—কী হতে চলেছে এসব? (What things are coming to ?) ভূপেন দত্তর জেল হল এক বছর।

অবিনাশবাবু উকিল দিলেন নিজের পক্ষ সমর্থন করে। অনেক নজির দেখানোর পর বিচারে সাব্যস্ত হল—পত্রিকার জন্য দায়ী সম্পাদক আর মুদ্রাকর, প্রেসের মালিক দায়ী হতে পারেন না। বেকসুর খালাস পেলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য।

কিছুদিন পরেই যুগান্তর অফিসে আবার পুলিশের হানা। কর্মকর্তারা কেউ ছিলেন না, ছিলেন—আড়বেলিয়ার শৈলেন্দ্র আর স্বর্ণেন্দু ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য দু ভাই। পুলিশকে ঢুকতে দিলেন না তাঁরা। আরম্ভ হল মারপিট। পুলিশদের আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম দিয়ে ভট্টাচার্য দু ভাই গেলেন পালিয়ে। ধরা পড়লেন শৈলেন্দ্র আর একজন যুবক। শৈলেন্দ্রের তিন মাস আর যুবকটির এক মাস জেল হল কিংসফোর্ডের বিচারে।

ধরপাকড় জেল জরিমানা হলে কি হয় —লেখা চলল সমান উত্তেজনাপূর্ণ। আবার পুলিশের হানা। ধরা পড়ল মুদ্রাকর বসন্ত ভট্টাচার্য। বসন্ত ভট্টাচার্যের দু বছর জেল হল ঐ কিংসফোর্ডের বিচারেই।

অত্যাচারী কিংসফোর্ড। দেশের যুবকরা খাপ্পা হয়ে উঠল তার ওপর।

এইবার পুলিশের শুভদৃষ্টি 'সন্ধ্যার' ওপর। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রবন্ধ লিখলেন —'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'। রাজদ্রোহীতার গন্ধ পেল ইংরেজ। গ্রেপ্তার হলেন সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আর মুদ্রাকর হরিচরণ। তবে জামিনে খালাস রইলেন বিচারের দিন পর্যন্ত। খালাস হয়ে এসেই আবার এক গরম গরম মজাদার প্রবন্ধ—'চলে যাব কাঁচকলা দিয়ে'। বিচারের দিন সে এক মজার কান্ড। আদালতে হাজির হবার সময় উপাধ্যায় মুদ্রাককে সাজালেন বরসজ্জায়—পরণে জরিপাড় শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে সিল্কের ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, গলায় যুঁই ফুলের গড়ে মালা, কপালে বরচন্দন, কব্জিতে হলুদমাখা মঙ্গলসূতো, হাতে দর্পণ। নিজে ধোপদুরস্ত ধুতি চাদর পরে সাজলেন বরকর্তা, হাতে একছড়া কলা। তারপর কত বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে ঢাক ঢোল কাঁসি বাঁশী ব্যান্ড বাজিয়ে বর শুভযাত্রা করল। মেয়েরা খৈ ছড়িয়ে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিল। মহা কৌতুক। রাজপথে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াল বরযাত্রা দেখতে। ঠিক সময়ে বর বরযাত্রী নিয়ে বরকর্তা পৌঁছলেন আদালত প্রাঙ্গণে। বাজিয়েদের কি উদ্দাম বাজনা। এবারও সেই কিংসফোর্ডের এজলাস। সামান্য একটা বামুনের ধৃষ্টতা আর দুঃসাহস দেখে কিংসফোর্ড তো রেগে টং। বললেন—দেখাচ্ছি মজা, উপযুক্ত শাস্তি পাবে এর জন্যে। ব্রহ্মবান্ধব হো হো করে হেসে বললেন—বেটা ফিরিঙ্গির সাধ্য কি যে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেয়। সেদিন আর বিচার হল না। হৈ হল্লা আর বাজবাজনার চোটে আদালত বসতেই পেল না—তা বিচার হবে কি? দিন পেছিয়ে গেল। মহা উল্লাসে ফিরলেন সবাই।

এরপর ঘটে গেল এক ঘটনা। ব্রহ্মবান্ধবের ছোটবেলা থেকেই ছিল অন্ত্রবৃদ্ধির রোগ। সেটা হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় রইল না। অস্ত্রোপচার করা হল ক্যাম্বেল হাসপাতালে। এই বয়সে সহ্য করতে পারলেন না—ব্রহ্মবান্ধব। মারা গেলেন বিচারের ধার্য দিনের আগেই। ব্রাহ্মণের কথা কি মিথ্যে হয়? কাঁচকলা দেখিয়েই চলে গেলেন ব্রহ্মবান্ধব। খুব ধুমধাম শোভাযাত্রা করে ব্রহ্মবান্ধবের শবদেহ নিমতলা শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হল ঘি আর চন্দনকাঠে। এতবড় শোভাযাত্রা এত ফুল আর মালার ছড়াছড়ি কলকাতায় আর কখনো হয় নাই এর আগে।

মামলার সম্বন্ধে ব্রহ্মবান্ধব বলেছিলেন 'অষ্টরম্ভা ভবিষ্যতি'। তাই-ই হল। বিচারের দিন ব্রহ্মবান্ধবের নামে মামলা তুলে নিল কিংসফোর্ড। উপায় কি—মামলা করবে কাকে নিয়ে? তবে দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল মুদ্রাকরের।

ব্রহ্মবান্ধবের প্রবন্ধ—'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' বের হয় ১৩ই আগষ্ট ১৯০৮ সালে। উপাধ্যায় মামলা সোপর্দ হল ৩১শে আগষ্ট—ইংরেজ সরকার আর আদালতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে উপাধ্যায় বলেন—

I accept the entire responsibility of the paper and the article in question But I don't want to take any part in the trial, because I dont believe that in carrying any humble share of this God appointed mission of 'Swaraj' I am in anyway accountable to this alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development.

কী লেখা, কী শক্তি সঞ্চার। ব্রহ্মবান্ধবের পর আর কে লিখবেন এমন করে? কে এমনভাবে জাগাবেন দেশকে? একটা দিকপাল চলে গেলেন।

এইবার 'নবশক্তি'। 'মিটমাট অসম্ভব' প্রবন্ধের জন্যে ধরা পড়লেন মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দু বছর জেল হল তাঁর। বন্ধ হয়ে গেল নবশক্তি।

এরপর পালা 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার। সেই একই—সেই রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ লেখকের নাম নাই। কাজেই সম্পাদক। সম্পাদকের নাম লেখার আইন ছিল না তখন। বিচারের দিন কাঠগড়ায় অরবিন্দদা। আদালতে তিল ধরবার ঠাঁই নাই। বিধুভূষণ আর কালিচরণ দুই মিথ্যুক দিল মিথ্যে সাক্ষী। তবু অরবিন্দদার বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ হল না। চিত্তরঞ্জনের মত উদীয়মান তরুণ ব্যারিস্টারবা ছুটে এলেন অরবিন্দদাকে বাঁচাতে। কিংসফোর্ডের জেরার উত্তরে

গম্ভীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে অরবিন্দদা বললেন—

If to announce freedom is a crime then I am the first criminal.

ব্যারিস্টাররা প্রমাদ গণে কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে বললেন—রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধটি যে অরবিন্দর লেখা তা প্রমাণ করা চাই। কিংসফোর্ড বললেন— এরকম স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষা একমাত্র অরবিন্দ ছাড়া এ দেশের আর কেউ লিখতে পারে—এ আমি বিশ্বাস করি না।

ব্যারিস্টাররা জোর গলায় বললেন—বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর মামলা চলে না, প্রমাণ করতে হবে।

সাক্ষী মানা হল বিপিন পালকে। তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক, কাজে কাজেই ছেড়ে আসার সময় সম্পাদনার ভার দিয়ে আসেন কার ওপর—সেকথা বেরুবে তাঁর কাছ থেকেই। বিপিন পাল এজাহার তো দিলেনই না, বললেন—শপথ নেব না, সাক্ষ্যও দেব না আমি।

আদালত অবমাননার দায়ে ছয় মাসের জেল হল বিপিনচন্দ্রের, বেকসুর খালাস পেলেন অরবিন্দদা।

> বয়সে বড় হলেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—
> অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
> হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
> বাণীমূর্তি তুমি, তোমা লাগি নহে মান,
> নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান
> চাই নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
> বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
> পরিপূর্ণতার তরে, সর্ব বাধাহীন—
> যার লাগি নরদেব চির রাত্রিদিন
> তপোমগ্ন।

মামলার শেষ শুনানীর আগে বিপিনচন্দ্র নবশক্তিতে লিখেছিলেন—'কেন সাক্ষ্য দিলাম না।' গোলদীঘিতে বক্তৃতায় বলেন। মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনও বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে সভায়। বিপিনচন্দ্র বলেন—'বন্দেমাতরম' আমার মানসপুত্র। ইংরাজ সরকার খুবই দয়ালু, তাই আমাকে বলেছে নিজের হাতে পুত্রের বুকে ছুরি বসাতে। আমি কেমন করে পারি তা? না পারার ফল ভোগ অবশ্যই করতে হবে। কারাযন্ত্রণা। তা হোক প্রভু যীশুও এমনি বিদেশী আদালতে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে কাঁটার মুকুট পরে ক্রুশে প্রাণ দিতে হয়েছিল সাধারণ অপরাধীদের সংগে। কিন্তু যে সত্যের জন্যে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তিনি—সেই সত্যকে কি ধামাচাপা দিতে পেরেছে কেউ? আমাকেও ভাই, তোমাদের কাছছাড়া হতে হবে, জননী জন্মভূমির সেবায় বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু এটাও ধ্রুব সত্য যে—আমাদের এই লাঞ্ছনা, অপমান নির্যাতন ভারতের স্বাদেশিকতাকে করে তুলবে আরও শক্তিশালী। তার আয়ুকে দেবে সহস্র গুণ বাড়িয়ে।

বিপিনচন্দ্রের জেল—তাই কি ক্ষমা? যুবকরা ক্ষেপে উঠে আদালত ঘর ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলল। পনেরো বছরের ছেলে সুশীল সেন এক ফিরিঙ্গি পুলিশ সার্জেন্টের চাবুক খেয়ে লাফিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে উঠে লাগালো এক মোক্ষম ঘুসি। সুশীলকে পনেরো ঘা বেত মারার আদেশ দিল কিংসফোর্ড। হাত-পা বেঁধে বেত মারতে অচৈতন্য হয়ে পড়ল সুশীল। আরও ক্ষেপে উঠল যুবকরা। যেনতেন প্রকারেণ মেরে ফেলতেই হবে এই অত্যাচারী বিচারক কিংসফোর্ডকে—হল তাদের সংকল্প।

রাত অনেকখানি, কথা বন্ধ করলেন স্বামিজী।

(পঁয়ত্রিশ)

সন্ধ্যেবেলা কাছে বসতেই স্বামিজী নিজেই আরম্ভ করলেন—এর বছরখানেক আগে ১৯০৬ সালে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আছেন তখন। মত আর পথ নিয়ে ঠোকাঠুকি লাগল বারীনের সঙ্গে মিত্তির সাহেবের। মিত্তির সাহেব চাইছিলেন প্রথমে দেশের যুবকদের সুসংহত করতে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকটা ভাবেন নাই তত। বারীন চাইছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—তখনই। যুগান্তর আর মুরারিপুকুর আড্ডা নিয়েই ছিলেন বারীন। যুগান্তরের কর্মীরা বারীনের মতে। অরবিন্দদা ও বারীন একমত। দেখা গেল যুগান্তর ঝাঁকটা যেন একটু আলাদা হয়ে পড়েছে মূল কেন্দ্র থেকে। অবশ্য দু দলেরই মাথার ওপর মিত্তির সাহেব। বারীন প্রমুখ অরবিন্দ-অনুবর্তী যুগান্তর দল তখনই সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়ে সমিতির কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করলেই মিত্তির সাহেব দেন নাকচ করে। সন্ত্রাসের সমর্থক বারীন আর যুগান্তর দল চান ডাকাতি, লুঠতরাজ, গুপ্তহত্যা, রাহাজানি করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি। নিবেদিতার মত ছিল না এতে। নিজেরও না। সন্ত্রাস সৃষ্টিতে কাজ হয় ঠিকই। কখন? সমগ্র দেশের জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে সংহত হলে পর। হতাশায় ধৈর্য হারিয়ে উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে মানুষ যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে যায় তা কখনো সফল হতে পারে না। বরঞ্চ ফল হয় উল্টো। ডাকাতি করে দু-একবার ঘায়েল করলেও পরে দেশী লোকের স্বার্থে হাত পড়তে পারে। তখন সমিতির ওপর আস্থা হারিয়ে বিরুদ্ধ গান গাইবে তারা। সব ভেস্তে যাবে। শিক্ষিত সমাজের হয়তো কিছু ভাল হতে পারে এইরকম সন্ত্রাস সৃষ্ট রাজত্বে। শিক্ষিতরা চান রাজশক্তি আসুক তাঁদের হাতে, খেয়ে পরে সুখে থাকুক তাঁদের আত্মীয়স্বজন। কিন্তু সেটার মূল্যমান কি? দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা তো মাত্র শতকরা পাঁচজন। তাদের সুখসুবিধাতে সারা দেশের হল কি? বৃহৎ জনসংখ্যা—চাষী মুটে মজুর—এদের কি হল। ওরকম ব্যাপারে কোন সমর্থন পাবে কি জনসাধারণের। তা পেতে পারে না। আর বৃহৎ জনগণের সমর্থন না পেলে ওরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ কি? জনগণের আন্তরিক সহানুভূতির একান্ত অভাবই, এর একমাত্র কারণ। এর জন্যেই ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া টোপী, নানাসাহেব, কুমার সিং, বাহাদুর শা আর হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান বীর সৈনিক গেলে ভেসে। জনগণকে সংহত করতে পারেন নি তাঁরা। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু জনগণের সহযোগিতা, সমর্থন, সহানুভূতি পাওয়া গেল না কেন? কারণ কর্তৃপক্ষ মানে—যজ্ঞের হোতারা চেয়েছিলেন কোম্পানী আমলের অবসান ঘটিয়ে বাদশাহী আমল ফিরিয়ে আনতে। জনসাধারণ পছন্দ করে নাই তা। করবে কেন? বর্গীর হাঙ্গামা, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অত্যাচার, অনাচার, জমিদার জায়গীরদারদের উৎপীড়ন, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি যে আমলে—সেই বাদশাহী আমল ফিরিয়ে আনতে চাইছিল না জনসাধারণ। তারা চেয়েছিল—সুখ, শান্তি, স্বস্তি। কোম্পানী আমলই বল, আর বাদশাহী আমলই বল, কোন আমলেই তা কখনো সম্ভব নয়, সম্ভব—একমাত্র নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায়।

সিপাহী যুদ্ধের বিফলতার একমাত্র কারণই সাধারণের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সমর্থন হারানো।

যাই হোক প্রস্তাবের পর প্রস্তাব—একেবারে সবই তো নাকচ করে দেওয়া যায় না। সুষ্ঠু পরিকল্পনায় ডায়মন্ডহারবার ই-বি-আর, চাংড়িপোতায় রেল স্টেশন লুঠ করা হয়। পরিচালনা অনুশীলন সমিতির। তারপর ঢাকায় বাহড়া ডাকাতি। এটি করা হল জলপথে। সে বেশ দুঃসাহসিক কাজ। পুলিশ লঞ্চকে ফাঁকি দিয়ে তাদের চোখের ওপর দিয়েই পেরিয়ে গিয়েছিল লুটেরা নৌকাগুলি। এ দুটিই করে অনুশীলন সমিতি—দুটিই সার্থক। এই সময়েই হাটগেছিয়ায় ডাকপিয়নের হাত থেকে মেল ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় ক্ষুদিরাম। এরপর যা হয় তা ছোটখাট ক্ষুদে ডাকাতি—সবগুলিই পরিচালনা করেন বারীন ঘোষ। প্রায় সবগুলিতেই হাত পড়ে কিছু না কিছু দেশী লোকের টাকায়। বারীন চালিত কোন ডাকাতিই সফল হয় নাই। ফলও হয়েছিল উল্টো। শেষে এমন হয়েছিল যে স্বদেশী করছে শুনলে নিজেরা তো আসতে চাইতই না, ছেলেপিলেদেরও আসতে দিতে চাইত না সাধারণ লোকে।

মহারাষ্ট্র জেগেছে—বাঙলা জেগেছে। কিন্তু এই দুটি প্রদেশ মাত্র নিয়েই তো সারা ভারতবর্ষ নয়। উত্তর ভারত আর্যাবর্তে আর দক্ষিণ ভারত দাক্ষিণাত্যে বহু প্রদেশ। বীরপ্রসূ পাঞ্জাব কি করছে? ওখানে প্রচার চাই। দুর্জয় সাহসী বীর সৈনিক মিলবে ওখানে। ১৯০৬ সালে পাড়ি জমানো গেল পাঞ্জাবের পথে। ওখানে আলাপ হল সর্দার অজিত সিং ও তাঁর ভাই কিষেণ সিং-এর সংগে। তখন বৃটিশবিরোধী মনোভাব সবেমাত্র দুজনের মনে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। সমিধ সংগ্রহ হয়েই ছিল, অল্পকিছু আলাপ আলোচনার পরই জ্বলে উঠল হোমাগ্নি। বাঙলার অনুশীলন সমিতির কর্মপদ্ধতিতে বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে দু-ভাই-ই এই শর্মার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত হয়ে

পড়লেন বলা চলে। এই কিষণ সিং পরবর্তী বীর শহীদ ভগত সিং-এর বাবা। অজিত সিং আর কিষণ সিং-এর মাধ্যমে যোগাযোগ হল লালা হরদয়াল সিং ও গুরুদিৎ সিং-এর সংগে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বর্ষা ধারায় উর্বরতা বাড়ে—ফসল ফলে প্রচুর। এদের ক্ষেত্রেও হল তাই। আলাপ আলোচনার পর সকলেই প্রাণপণ করলেন দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে—ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে। বীরেন্দ্রকেশরী লালা লাজপত রায় গুণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শীর্ষস্থানীয়। তাঁরই হাতে রইল পাঞ্জাবে স্বাধীনতা যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নি।

পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক আর বাঙলায় বিপিনচন্দ্র পাল— এই 'লাল-বাল-পাল' হল ভারত স্বাধীনতাকামীদের ইষ্টমন্ত্র।

পরে লালা হরদয়ালের কর্মক্ষেত্র হয় আমেরিকা। সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্যে হরদয়াল আমেরিকায় করলেন 'গদর পার্টি' অর্থাৎ বিপ্লবী দল। পরে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় যুগান্তর দলও গড়েছিলেন সেখানে।

পাঞ্জাব থেকে রওনা হওয়া গেল আম্বালায়। রত্ন মিলল। আম্বালায় ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, পেশোয়ারে ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ, আর শিয়ালকোটে লালা অমরদাস। পাঞ্জাবের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তো পরে আফগানিস্থানকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করে বসেছিলেন। যাই হোক ওদিকের প্রচার কাজ বেশ সার্থক রূপ নিল।

ফেরা গেল বাঙলায়। দেখা গেল পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো—বেশ জটিল। আবার খিটিমিটি শুরু হল বারীন আর যুগান্তর দলের সংগে। ১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে আরম্ভ হল বারীন প্রমুখ দলীয় কিছু লোকের মিত্তির সাহেবকে কর্ণামৃত বর্ষণ। মিত্তির সাহেবের মনমেজাজ গেল বিগড়ে। সমিতি থেকে এই শর্মাকে অপসারণ করাই ঠিক করলেন তিনি। যোগেন্দ বিদ্যাভূষণ মশায় বহু চেষ্টা করলেন মিত্তির সাহেবের মত বদলাবার জন্য। ফল হল না। অনমনীয় মনোভাব নিয়েই সমিতি থেকে শর্মাকে অপসারণে বাধ্য করলেন মিত্তির সাহেব।

সে সময়ের মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। চোখের সামনেই স্পষ্ট প্রতিভাত হল এত কষ্টে গড়া সমিতির ভবিষ্যৎ রূপটা। কাউকে কিছু না বলে নির্বিবাদে যাত্রা করা গেল উত্তরাখন্ডের পথে। ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ে নৈনিতাল। মহাজ্ঞানী তিব্বতীবাবার প্রধান শিষ্য পরমহংস সোহংবাবার আশ্রম। মনোরম পরিবেশ। নিমেষেই অবসাদ কেটে মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। তারপর দেবাদিদেবের মত সাক্ষাৎশালপরা সোহংবাবার জ্যোতির্ময় মূর্তি। চক্ষু সার্থক হল। কিছুদিন আশ্রম বাস, সোহংবাবার তত্ত্বালোচনা। নিত্যপ্রাণ অমৃত প্রলেপ। মাসখানেকের মধ্যেই এই গৈরিক। সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করে তিব্বতীবাবা নাম দিলেন—নিরালম্ব।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের তিরোধানের খবর ঐ বছরেই ১৯০৭ সালে অক্টোবর মাসে। জ্যোতিষ্কের কক্ষচ্যুতি। দারুণ মানসিক চাঞ্চল্য—ভীষণ অস্বস্তি। আসা গেল কলকাতায়। আগে ব্রহ্মবান্ধবের অনুরোধে 'সন্ধ্যার' সম্পাদকীয় লিখতে হয়েছিল কবার। এবারও কর্মকর্তারা ভার দিলেন সম্পাদনার। লেখা গেল প্রবন্ধ—'মরি নাই আমি আসিয়াছি।' অতি তেজালো প্রবন্ধ। 'সন্ধ্যা'র পরিচালকমন্ডলী পছন্দ বা সমর্থন করতে পারলেন না এইরকম গরম রাজনীতি। হল মতান্তর। সন্ধ্যার সংগে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে ওঠা গেল অন্নদা কবিরাজ মশায়ের বাড়ী। সেখানে আসতেন যুগান্তরের পরিচালকরা। অন্নদা কবিরাজ অনেক সাহায্য করতেন তাঁদের। সে সময়ে যুগান্তর চালাতেন নিখিল মৌলিক, কার্তিক দত্ত আর কজন। আলাপ হল তাঁদের সংগে। তারপর চবস্থানে প্রস্থান। একেবারে সোহংবাবার আশ্রমে।

বছর দুয়েক পরে হিরন্ময়ী লোটা-কম্বল সম্বল করে একা এসে হাজির আশ্রমে। তারপর সোহংবাবার কাছে সন্ন্যাসের প্রার্থনা। মাস দুই পরে জন্মভূমি দর্শন সন্ন্যাসোত্তর নীতি ব'লে এখানে আসা আর মায়ের কথায় মায়ের তৈরী করিয়ে দেয়া এই আশ্রমে থাকা।

কথা শেষ হল কিন্তু মনটা উশখুশ করতে লাগল সমিতির শেষ পরিণতি জানবার অধীর আগ্রহে। কদিন অন্য কোন কথাবার্তা হল না কলকাতা যাবার যোগাড় যন্তরের কথা ছাড়া।

১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মংলা মাঝির ওপর আশ্রম দেখাশোনার ভার দিয়ে একদিন বিকেলে স্বামিজী যাত্রা করলেন কলকাতায়। সংগে রেণুদা ও আমি। এবারে থাকবার ব্যবস্থা দর্জিপাড়ায় জয়মিত্রের বাড়ীর দোতলায় প্রকান্ড হলঘরে।

রোজ সকালে বিকেলে অনেক গুণী জ্ঞানী বিদ্বানের সমাগম হয় এখানে। প্রত্যেকের সংগেই পৃথক পৃথক আলোচনা।

বিকেলে বেড়ানো ঠিকই ছিল। রোজই এক একদিকে বেড়াতে যেতে হত স্বামিজীর নির্দেশে। দূরে গাড়ী ট্রামে, কাছে পিঠে হেঁটে। এমনি করে কলকাতার অনেক অংশ চেনা হয়ে গেল তখনই।

ছত্রিশ

জয়মিত্রের বাড়ীতে স্বামিজী। আগেই খবর পেয়েছেন সব—পরিচিত অনুগত জন। আসা যাওয়া শুরু হল সকালে বিকেলে—যাঁর যখন অবসর। আসেন অনেকে। ভিড় করে নয়—একজন দুজন করে। শিক্ষক, অধ্যাপক, জ্ঞানী বিজ্ঞানী কবি, লেখক গায়ক, ধনী ব্যবসায়ী—সবশ্রেণীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষ। আলোচনা হয় স্বামিজীর সংগে একান্তে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা। কত জনের কত গোপন কথা, কত প্রশ্ন, কত সমস্যা। যত প্রশ্ন, তত উত্তর, যত সমস্যা তত সমাধান। হাসিমুখে খুশি মনে চলে যান সবাই—যা চাওয়া তাই পাওয়া ভাব। দু একদিন অন্তর নিয়মিত আসেন পূর্বপরিচিত জীবনতারা হালদার মশায় আর পুলিশ ইন্সপেক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ভূপেন্দ্রবাবুর আলোচনা আধ্যাত্মিক আর হালদার মশায়ের সাংবাদিক। এত খবরও রাখেন ইনি—একখানি জ্যান্ত গেজেট। আকৃতি, প্রকৃতি, হাবভাব, বেশ ও বয়সে পার্থক্য থাকলেও এক জায়গায় সবার মিলটুকু বেশ বোঝা যায়। 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই' ভাবটুকু। অতি সহজেই দূরকে নিকট ও পরকে আপন করবার ক্ষমতা সকলেরই সমান। 'অহং নিজ পরবেতি'র লেশমাত্র নেই এঁদের কারুর মধ্যে। এখানেই প্রথম দেখলুম বসাক ফ্যাক্টরীর মালিক বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিজয় বসন্ত বসাক মশায়কে। সংগে রসায়ন শাস্ত্রবিদ শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ধর মশায়।

দুদিন পরে সকালে এসে হালদার মশায় খবর দিলেন—আলিপুর জেল থেকে ছাড়া পেলেও শীগগির বাঙলা ছেড়ে যেতে হবে যাদুদাকে। রাঁচিতে অন্তরীণ করা হয়েছে তাঁকে। মাত্র সতেরো দিন থাকতে পাবেন কলকাতায়।

স্বামিজী দেখতে চাইলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে।

পড়ন্ত বিকেল। শান্ত স্নিগ্ধ আবহাওয়া। স্বামিজী একা। ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এক দীর্ঘাকৃত পুরুষ এসে প্রণাম করে বসলেন স্বামিজীর কাছে। স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ, উজ্জ্বলায়ত চোখ, সমুন্নত নাক, বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা। হাসিমুখে কুশল বিনিময়ের পর স্বামিজী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন আমাদের দিকে। সে চাউনির অর্থ বুঝি। রেণুদা ও আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বসলুম ওপাশের বারান্দায়।

প্রায় দু' ঘন্টা পরে স্বামিজীর ডাকে গেলুম ঘরে। স্নেহআদরে অভিষিক্ত করে দিলেন যাদুগোপালবাবু। সংগে সংগে হয়ে গেলেন যাদুকাকা। হাতে ছিল দুখানি বই, দিলেন পড়তে—'যূথপতি' আর 'চিত্রগ্রীব'—তাঁর ভাই মার্কিন প্রবাসী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা। স্বামিজীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন যাদুকাকা।

সন্ধ্যেবেলা জিজ্ঞেস করলুম স্বামিজীকে—উনি কে বাবা, কি করেন? সোজা হয়ে বসে স্বামিজী বললেন—একজন আদর্শ মানুষ। জ্ঞানী, গুণী, কর্তব্যনিষ্ঠ দেশপ্রাণ কর্মবীর। পেশায় ডাক্তার—যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। ভাল চিকিৎসক। দেশের সেবায় দশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। মানুষের মত মানুষ। হবে নাই বা কেন? ভিৎটা যে ছিল পাকাপোক্ত। জানতো—জ্ঞানের অধিকারী কে? 'মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যবান এবং বেদ। জ্ঞানের অধিকারী সে—যার মা আছে, বাবা আছে আর আছে আচার্য বা শিক্ষক। মা, বাবা, আচার্য আর কার নাই?—সবারই আছে। তবে সবাই কি জ্ঞানের অধিকারী? না, তা নয়। মা বাবা হলেই তো হয় না, চাই আদর্শ মা, আদর্শ বাবা। আচার্যও চাই আদর্শ। তা—মা হওয়া কি সহজ কথা? মায়ের কাজ

শরীরের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনের জমি তৈরী করে দেওয়া, উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করা, সার দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়ানো—কৃষাণীর কাজ। শিশুকাল থেকেই এমন ভাব এনে দিতে হবে—যাতে ছেলের মনে জাগে জ্ঞানের পিপাসা। যেমন ধর মা মদালসা। দোলনায় দোল দিতে দিতে মা গাইছেন—

শুদ্ধোহসি বুদ্ধোহসি নিরঞ্জনোসি
সংসারমায়া পরিবর্জিতোসি।

মানে—

শুদ্ধ যে তুই বুদ্ধ যে তুই
তুই রে নিরঞ্জন।
নিত্য যে তুই সত্য যে তুই
তুই যে সনাতন।।
সফল জগত সাগরপারের
তুই যে মহাকবি।
তোরই রূপের আলোক পেয়ে
জ্বলছে যে ঐ রবি।।
তোর অপরূপ সুরের হাওয়ায়
গাইছে পাখি গান।
তোরই গায়ের সুবাস মেখে
বাতাস মাতায় প্রাণ।।
ওঠ রে অমল, দেখরে চেয়ে
হৃদয়-ভরা ধন।
অভয় যে তুই সুধার হাসি
হাসরে সকল ক্ষণ।।

দোলনা থেকে এরকম শুনতে শুনতে একটু বুঝতে শিখলেই ছেলের মনে জাগবে—প্রশ্ন, এটা কি, ওটা কেন, ও কাকে বলে, এর মানে কি? এইসব। পরিপ্রশ্ন। এই হল ক্ষেত্র তৈরী—মায়ের চাষ আবাদ। কৃষাণীর কাজ।

মা মদালসার প্রত্যেকটি ছেলে হয়ে উঠেছিলেন — বৈরাগ্যবান, আত্মজ্ঞ। মহাপুরুষ।

এরপর বপন—বীজ বোনা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য, মনুষ্যত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতির সারাংশগুলি গেঁথে দেবেন ছেলের মনে। বীজ বোনা হবে।

এইবার আচার্য। আচার্য করবেন জলসেক অন্তরের স্নেহরসসিক্ত সুশিক্ষায় ও সুপরিচালনায় উপ্ত বীজ পুষ্ট অঙ্কুরিত হয়ে ফলেফুলে বিকশিত হয়ে উঠবে যথাকালে। এই হল মা, বাবা আর আচার্য। এমন মা বাবা আর আচার্য কি সবাই পায়? পরম সৌভাগ্য—যাদুগোপাল পেয়েছিল আদর্শ মা, বাবা, আর শিক্ষক।

মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে তাম্রলিপ্ত ছিল এককালে বাঙলার প্রসিদ্ধ বন্দর। এখন তমলুক। এই তমলুকে ছিল যাদুগোপালদের বাড়ী। ছোটবেলায় মা গল্প শোনাতেন রামায়ণ, মহাভারত, ভারতের ইতিহাস আর শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, বিদ্যাসাগর এই সব মহাপুরুষের জীবনী। শোনাতেন বাঙলার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র রাজাদের কথা, রাজ্য পরিবর্তনের কথা মুসলমান নবাবদের কথা। মুসলমান-দের কথা শুনে আর চোখে দেখে ছেলে জিজ্ঞেস করত এরা আমাদের কে? মা বলতেন—ভাই। ছেলের বিশ্বাস হত না—বেশভূষা আচারব্যবহার আলাদা, ভাই হবে কি করে? মা বলতেন—বহুরূপী দেখেছ তো, রোজ রকম রকম সাজে সেজে আসে, মনে হয় আলাদা আলাদা লোক। সাজ-পোশাক খুললে দেখা যায় একজন মানুষ। তেমনি সাজপোশাক খুললে সবার ভেতর একই মানুষ। বড় হও বুঝবে। সাজ-পোশাক দেখে মানুষ চিনতে নাই। ওগুলো বাইরের জিনিস—মুখোশ। ভেতরে যে চেহারা আছে তাই হচ্ছে আসল পরিচয়। সেখানে সব এক। তাকে বলে 'মানুষ'। মানুষ হিসেবে সব এক। এক দেশের মানুষ সব ভাই ভাই।

আবার বিদ্যাসাগরের জীবনী বলতে গিয়ে শেখাতেন—শুধু দয়ার সাগরই নন, যেমন তেজী তেমনি মাতৃভক্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর। আত্মসম্মানবোধও ছিল তীব্র। তখন নব্য বাঙলার হুজুগ। বিদেশী লেখাপড়া শিখে অনেকে দেশী পোশাক, দেশী চালচলন ছেড়ে বিদেশী ঢং-এ চলতে লাগল। এত বড় লোক বিদ্যাসাগরের কিন্তু সেই মোটা ধুতি চাদর পায়ে তালতলার চটি। লাটসাহেবের নিমন্ত্রণ। বিদ্যাসাগর গেছেন সেই বেশে। দরবারী পোশাক না হলে লাটসাহেবের কর্মচারী ঢুকতে দেবে না দরবারে। না দিলে নাই দিল—জাতীয় পোশাকের মর্যাদা ক্ষুন্ন করবেন না বিদ্যাসাগর। সোজা ফিরে এলেন ঘরে। এদিকে বিদ্যাসাগরকে দরবারে না দেখে খোঁজ করে সব জেনে লাটসাহেব দুঃখ প্রকাশ করলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগরের জন্যে দরবারী পোশাকের নিয়ম রইল না। এমনি তেজস্বী ছিলেন বিদ্যাসাগর, এমনি ছিল তাঁর জাতীয়তা-বোধ।

মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গাঁয়ে বাড়ী, বিদ্যাসাগর কাজ করেন কলকাতায়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। মা ডেকেছেন বিদ্যাসাগরকে, সাহেব ছুটি দিতে নারাজ। বিদ্যাসাগর চাকরী ছেড়ে দেবেন তবু মায়ের ডাক উপেক্ষা করতে পারবেন না। সাহেব বাধ্য হলেন ছুটি দিতে। বিদ্যাসাগর পৌঁছলেন দামোদরের তীরে। ঝড়বৃষ্টি ভীষণ দুর্যোগ—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—দুকূল ছাপিয়ে দামোদরের বান। মাঝি চাইল না নৌকো ছাড়তে। কুছ পরোয়া নাই—'জয় মা' বলে প্রবল বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে দামোদর পেরিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। এমনি মাতৃভক্ত ছিলেন তিনি।

রামকৃষ্ণদেবের কথায় বলতেন—মানুষে মানুষ দেখার মত রামকৃষ্ণদেব দেখতেন ভগবানকে। দেখতেন মাতৃরূপে, ডাকতেন 'মা' বলে। বলতেন—মা নয় সামান্য ধন। বলতেন—এক মায়ের ভেতর সব মা, সব মা-ই এক, মায়ের ক্ষয়ও নাই, লয়ও নাই। মা সর্বত্রই বিরাজ করছেন। মায়ের চেয়ে বড় দেবতাটেবতা কেউ নেই রে।

এমনি করে রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্যের বীরত্বকাহিনী মা মুখে মুখে বলতেন ছেলেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ আর দেবী চৌধুরাণীর গল্প শুনিয়ে বলতেন—এখন দেখ দেশের বেশির ভাগ লোকের বেশি দুঃখ, কম ভাগ লোকের অতিরিক্ত সুখ। সমাজের এরকম ব্যবস্থাটা ভাল নয়। হতে হবে বেশির ভাগ লোকের সুখ আর কম ভাগ লোকের অতি অল্প দুঃখ। ভাবা চাই কি করে আনা যাবে দেশের সে অবস্থাটা। কে সে কাজ করবে? কি করেই বা তা করা যাবে? ঐ এক বঙ্কিম চাটুজ্যে সে কথা ভেবে লিখে গেছেন। 'বন্দেমাতরম'কে মূলমন্ত্র ধরলে যদি সে ব্যবস্থা হয়। দেশমাতার পুজো চাই—এই পথই পথ।

এই ছিল মায়ের শিক্ষা। আর বাবা? বাবা চাইতেন ছেলেদের সাহসী, বলবান, বীর্যবান, জ্ঞানী বিজ্ঞানী করে তুলতে। বলতেন—'নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্যঃ' দুর্বলের কিছু হয় না—বল চাই, বীর্য চাই, নইলে দেশের দশের তো দূরের কথা নিজেরও কোন কাজ হবে না।

সুশিক্ষিত পাকা লাঠিয়াল রেখে ছেলেদের লাঠি তরোয়াল খেলা শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তার জন্যে টিটকারী শুনতে হত তাঁকে। অন্য বন্ধুরা বলতেন—ভদ্রলোকের মাথায় পোকা ঢুকেছে। ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে ছোট-লোক তৈরী করছেন। অনেকে মুখের ওপর বলতেন—বলি ও বাবু, ছেলেগুলো কি দারোয়ানী করবে? বাবা হাসিমুখেই শুনে যেতেন সব, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না কিছু।

তারপর আচার্য। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে। জুটেছিলেন তেমনি। প্যারী-মোহন দাস—যেমন সচ্চরিত্র তেমনি মনে-প্রাণে দেশপ্রেমিক। দেশের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা তাঁর নখদর্পণে। বহু ভাষাবিদ ব্রজেন শীল, বিপিন পাল ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি-- বোঝ কি রকম মানুষ।

এই সত্যবাদী স্পষ্টবাদী শিক্ষক ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বলতেন—এতে যা লেখা আছে তা না বললে বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের পাস করাবে না। পাসের জন্যে তা না লিখে উপায় নাই। এতে যেখানে যেখানে মিথ্যে আছে সব বলে দিচ্ছি তোমাদের। মনে রাখবে। পরে বইএর শিক্ষা মন থেকে মুছে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুশিক্ষা থেকে বাঁচতে চাও তো একটা motto অন্তরে স্থির রাখবে—

Unlearn what you learn here,
যা শিখছ তার অনেক কিছু ভুলে যেও।
পরাধীনতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ—
নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস করা কৃতি ছাত্রদের সম্বন্ধে বলতেন—দেখ, যারা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে কৃতী ছাত্রদের ছাপ নিয়ে বেরোয় তারা প্রায়ই আমাদের পর হয়ে যায়। তারা বেশির ভাগই নেয় সরকারী চাকরি—ঢুকে পড়ে বিদেশী গোত্রে। শোচনীয় অবস্থা। দেশমাতা কত কৃতী সন্তানদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এইভাবে। স্বাধীন দেশে লোকে লেখাপড়া শেখে মানুষ হবার জন্য, আর এদেশে শেখে চাকরি পাবার জন্যে। এটা চরম দুর্ভাগ্য।

প্যারীবাবু স্বদেশপ্রেমের বীজ বুনে দিতেন ছাত্রদের মনে। শুধু বীজ বোনা নয় জলসেকও করতেন তাতে। বলতেন—জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা দূর করতে হবে। জানতো—পান্ডবেরা পাঁচ ভাই, আর কৌরবরা একশ ভাই ছোট থেকেই বিবাদে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু বাইরের শত্রুর সামনে তারা একজোট—একশ পাঁচ ভাই। এখন আমরা হারিয়েছি এ গুণটি। ইংরেজদের এটি মস্ত বড় গুণ। নিজেদের মধ্যে শত বিবাদ-বিসংবাদে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও দেশের স্বার্থে অন্যের সামনে রুখে দাঁড়ায় এক-জোট হয়ে। আর একটা মস্ত গুণ—নিয়মানুবর্তিতা। নিজেদেরই তৈরী নিয়মে কাজ করে যায় সবাই। এদিক ওদিক নেই এক চুলও।

এ দুটি চাই—একতা আর নিয়মানু-বর্তিতা। পথ চলতে দিক ভুল না হয় তার জন্যে চাই কম্পাস। দেশমাতার পূজোর সংকল্প—অসাধ্য সাধন করেও দেশকে বড় করা যায় যার ফলে—সেই সংকল্পই হবে কম্পাস। সেটা হবে— 'যে যায় যাক, যে থাকে থাক, শুনিয়ে চলিনু তোমার ডাক'।

রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তিমূলক 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী' গানটি ক্লাসে বোর্ডে লিখে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্যারীবাবু। ছাত্ররা লিখে নিয়ে মুখস্থ করে গাইত এটি। এই ছিলেন যাদুর আচার্য।

এই রকম আদর্শ মা, বাবা, আচার্য যার—সেই জ্ঞানের অধিকারী। হয়েছেও তাই! বিদ্বান, সুবিবেচক, কর্তব্যনিষ্ঠ, বীর, দেশপ্রেমিক—আদর্শ মানুষ যাদু-গোপাল। সমিতি ছেড়ে আসবার সময় একটি ছাড়া সব কটি মূল কেন্দ্রের পরি-চালনার ভার দেওয়া হয়েছিল বাঘা যতীনের ওপর। তার মধ্যে কটি খুব ভাল ভাবেই চালিয়েছিল যাদুগোপাল। সরকারী নির্যাতনও ভুগতে হয়েছিল বেশ। জেল খেটেছে অনেকবার। আত্মগোপন করে থাকতেও হয়েছিল বহুদিন। এবার জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরী করা হয়েছে রাঁচিতে। মাত্র কদিন থাকতে পারে কলকাতায়। তাই ডেকে পাঠানো হয়েছিল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনার জন্যে। ওর সে পরিকল্পনা নিখুঁত।

বাইত্রিশ

দু সপ্তাহ জয় মিত্রের বাড়ীতে কাটিয়ে বিজয়বসন্ত বসাক মশায়ের সাগ্রহ আমন্ত্রণে স্বামিজী গেলেন তাঁর বাড়ী ১৫নং নন্দ মল্লিক লেনে। থাকবার জায়গা দোতালার দক্ষিণের হলঘরে। কিছুদিন থাকতে হবে এখানে।

স্বামিজীর ওষুধ আর আশ্রমের ঝরণার জলে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেও বসাকবাবুর বড় ছেলেটি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বা চলত পারে না এখনও। তা না পারুক, বসে বসেই বেশ তাড়াতাড়ি এঘর ওঘর করতে পারে সে। কত আদর করে স্বামিজী নাম রাখলেন—তৈমুর লঙ্গ।

লোকজনের আসা যাওয়া কিছু কম। বিকেলবেলা স্বামিজী বেড়াতে যান বসাক বাবুর গাড়ীতে চড়ে। হালদার মশায়ের আসা যাওয়া নিয়মিতই। আর দু একদিন অন্তর নিয়মিত আসেন বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট থেকে ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র নন্দী। সদালাপী সদাশয় মানুষ। বিচক্ষণ চিকিৎসক। বড় হাউস সার্জন ছিলেন কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে। এ্যালো-প্যাথি চিকিৎসা করতে করতে হোমিও-প্যাথি চর্চা শুরু করেন। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে এমন ব্যুৎপন্ন হন এ শাস্ত্রে যে 'মেটিরিয়া মেডিকা' 'রোগ লক্ষণ ও চিকিৎসা' হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান' বই লিখে ফেলেন নিজেই। হোমিওপ্যাথি হয়ে ওঠে বেশি প্রিয়, তাই এ্যালোপ্যাথি ছেড়ে নিজের ডিসপেনসারীতে শুরু করেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। আশ্চর্যরকম ফল পান রোগীরা।

সেদিন বেশ সকালেই এসেছেন ডাক্তার-বাবু। শরতের শিশিরভেজা পীচের রাস্তা। শিশির ভেজা ঘাসের বালাই নেই এখানে। এ যে খাস কলকাতা। বাঙলার মাঝে হলেও 'কোন দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয় রে দুর্বাকোমল' সিরিজের নয় এটি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে এ পল্লীতে সে পল্লীতে পার্ক বা রেলিং ঘেরা উদ্যান। সেগুলিতেই যা শিশির ভেজা শ্যামল কোমল দুর্বাদল মাথা তুলে উঁকি মেরে বাঙলার সমগোত্রত্ব বজায় রাখছে।

প্রণাম করে বসলেন ডাক্তার নন্দী।

—একটু একটু ঠাণ্ডার আমেজ, তবু এত সকালে যে—হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন স্বামিজী।

সারাদিন অবসর পাবেন না, তাই এ সকালেই এসেছেন ডাক্তারবাবু। বললেন—স্বামিজী, বড় আশ্চর্য হয়ে গেছি, কদিন একটা বিষয় লক্ষ্য করে।

পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেলেও বেদান্ত উপনিষদের কটা সূত্র সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। মনে হত কি করে হয়? কোন প্রমাণ বা কোন নজির নেই। ধরুন 'অনরো অনীয়ান মহতো মহীয়ান'। অণুর থেকেও অণু আবার মহৎ অর্থাৎ সবচেয়ে বড় যে মহাকাশ তার থেকেও বড় ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ব্রহ্ম অণুর থেকেও ছোট আবার মহাকাশ থেকেও বড়। মনে হত এ কি করে হতে পারে? একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী দুই বস্তুর উপমা। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ঐ সুরেরই প্রতিধ্বনি। মন যেন স্থির সত্য বলে মেনে নিতে পারত না। কোন প্রমাণ নেই—হয়ত অভ্রান্ত সত্য নয়। সত্যিই কি তাই? ঋষিবাক্য মিথ্যা হবে? 'প্রমাণাভাবাৎ' —প্রমাণের অভাবে? মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করত। বিনা প্রমাণে সত্য বলে মেনে নিতে পারতুম না। আবার বহুদর্শী আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিবাক্যও ভুল বলতে সঙ্কোচ হত। সেই সন্দেহের নিরসন হয়েছে একটা সামান্য ঘটনায়। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি একই কথা। অর্থাৎ আর্যঋষিরা বলতে চেয়েছেন ঐশ্বরিক শক্তি বা পরমাত্মা জাগতিক সৃষ্ট পদার্থ সমস্তের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান—তা সে যত বড় বা যত ক্ষুদ্র পদার্থই হোক।

এ্যানাটমির ক্লাস। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে শিরায় শিরায় রক্তকণিকা আর শ্বেত-কণিকার কান্ডকারখানা। দুটিই পরিমাণে পরমাণু না হলেও অণু তো বটেই। পর্যবেক্ষণে দেখা গেল এক একটি রক্ত-কণিকা বা শ্বেতকণিকার অদ্ভুত শক্তি। এমনিতে শিরায় শিরায় সর্বাঙ্গে চলাফেরা করে জীবনীশক্তি তো বজায় রাখছেই। এটা প্রতি মুহূর্তের কর্ম, করে চলে নিয়মমত। কিন্তু এদেরই মত বা এদের চেয়েও ক্ষুদ্র একটি রোগবীজানু বা জীবানু কোন গতিকে অণুপ্রবিষ্ট হলে সে কী প্রলয় কান্ড! তাকে অভিভূত বা গ্রাস করবার জন্যে কি দুর্দম্য প্রচেষ্টা এদের। রোগ জীবাণুগুলিও চুপ করে থাকে না মোটেই। তারাও সমানে লড়াই চালিয়ে যায় নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবার জন্যে। একপক্ষ হারে এক পক্ষ জেতে। রক্তকণিকা জয়ী হলে রোগ জীবাণু ধ্বংস হয়, আর রোগ জীবাণু জয়ী হলে রক্তকণিকাকে দুর্বল ও দূষিত করে সারা শরীরে রোগ বিস্তার করে। স্বীকার করতেই হয় ছোট থেকেও ছোট বা বড় থেকেও বড় সব পদার্থই সম-শক্তিতে শক্তিমান।

দেখা যাচ্ছে 'অনরো অণীয়ান মহতো মহীয়ান' বা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' নিছক কল্পনাবিলাস বা মৌখিক গালভরা স্তোক-বাক্য নয়। এর গভীরে আছে বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাচীন আর্যঋষিদের বহুদর্শিতা, দূরদর্শিতা, ধ্যান, জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতির কথা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা নজিরও হয়ত তাঁরা রেখে গেছলেন। কালস্রোতে তা আজ লোপ পেয়েছে।

স্বামিজীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা। ধীরে ধীরে বললেন—দৃষ্টি খুলেছে। ঠিকই ধরা হয়েছে বিচারের পথ। এগিয়ে চলুন।

—বৈদিক যুগ—অতদূরেই বা যেতে হবে কেন? অনেক পরে পৌরাণিক যুগেই দেখুন। একই ভাব চলে এসেছে। মূর্তির প্রচলন—প্রয়োজনে সাকার উপাসনা—রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধি। শাক্ত বৈষ্ণব সব মতেই। শাক্ত মতে চণ্ডীতেই দেখুন—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা' —ছায়া, কায়া, মায়া, মোহ, জ্ঞান, অজ্ঞান, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাগরণ, জীবন, মৃত্যু—সব

রূপেই পাবেন। কোন্ রূপ? এতো অরূপকেই রূপে ধরা, অব্যক্তকেই ব্যক্ত করার প্রয়াস মাত্র। দেবী সূক্ত দেখুন। তাই এদের মন্ত্র—

সর্ব্বরূপময়ী দেবী
সর্ব্বংদেবীময়ং জগৎ
অতোহং বিশ্বরূপাম্
ত্বাম্ নমামি পরমেশ্বরীম্।

এইরকমই শৈবরা বলেন—

বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং

আবার বৈষ্ণবদের দেখুন—গীতার বিশ্বরূপ। মন্ত্র—

যস্মিন্ সর্বে যতঃ
সর্বে যঃ সর্বে সর্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্বময়ো দেবো
তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ

পেলেন রূপ? সাকারের মধ্যেই নিরাকার, সীমার মধ্যেই অসীম। বিশ্ব-প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন বলেই তো রবীন্দ্রনাথ আন্তর প্রকৃতির সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই তো বলেছেন—'সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'। এই সত্যস্বরূপ। সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথ।

চুপ করে শুনছিলেন ডাক্তার নন্দী। শুনতে শুনতে চোখ বুজে এসেছিল। স্বামিজীর কথা শেষ হতেই বললেন—অনেক কিছুই জানবার আছে, জ্ঞান অনন্ত। আচ্ছা, আজ চলি স্বামিজী।

—বসুন একটু, চা খেয়ে যান—বললেন স্বামিজী।

চা হালুয়া খেয়ে স্বামিজীকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন ডাক্তার নন্দী। বাড়ী তো এই কাছেই। সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমাকে। দেখা হল তাঁর বাড়ী আর ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী স্কুল।

কদিন পরে। বেলা দশটা। বেয়ারার সঙ্গে বিখ্যাত মৃৎশিল্পী শ্রীগোপেশ্বর পাল এসে প্রণাম করে বসলেন স্বামিজীর সামনে।

স্বামিজী বললেন—একটি কাজের জন্যে ডাকা হয়েছে আপনাকে। যোগ্যতম ব্যক্তি। আশ্রমে একটি সমাধি মন্দির আছে। দাওয়া বেশ উঁচু কিন্তু ভেতরটি ফাঁকা। ছেলেপিলে ভেড়াছাগলের উৎপাতে নোংরা হয় বড়। তাই ভেতরে সিমেণ্টের কোন কোন মূর্তি বসিয়ে ফাঁকা জায়গাটি বন্ধ করবার ইচ্ছা। জানোয়ারদের কথা ছেড়ে দিলে অন্তত মানুষের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে। কি মূর্তি দেয়া যায় বলুন তো? দেবদেবীর চলবে না। এইটি করে দিতে হবে আপনাকে, অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের পরিবর্তে।

—যাঁর সমাধি তাঁর, বা অন্য কোন মহাপুরুষের মূর্তি দেওয়া যায়, স্বামিজী, দেবদেবীর মূর্তি চলবে না যখন—বিনীতভাবে বললেন শিল্পী জি. পাল।

মাথা নেড়ে স্বামিজী বললেন—না, যাঁর সমাধি তাঁর মরদেহের অনুকৃতি দেওয়া চলবে না। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মত মহাপুরুষদের মূর্তি দেওয়াও সমীচীন হবে না। সন্ন্যাসিনীর সমাধি—আত্মতত্ত্বানুসন্ধান ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

দুই ভ্রূ কুঁচকে চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে স্বামিজী বললেন—জনক রাজসভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আর বিদুষী গার্গীর তত্ত্ববিচার মূর্তি দিলে কেমন হয়? অবশ্য রাজসভার কিছু থাকবে না—সামনাসামনি বিচারাসনে শুধু দুটি মূর্তি—যাজ্ঞবল্ক্য আর গার্গী।

—বেশ ভালই হবে, স্বামিজী—বললেন গোপেশ্বরবাবু।

—তা হলে মাটির দুটি ছোট মডেল করে আনবেন, দিন কয়েক আছি এখানে—বললেন স্বামিজী।

—নিশ্চয়ই আনব—বলে যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর ভাব রূপ ও পোশাকের বর্ণনা শুনতে চাইলেন পালমশায়।

স্বামিজী বুঝিয়ে দিলেন সব খুঁটিনাটি। নমস্কার করে চলে গেলেন শিল্পী।

কয়েকদিনের দরকার হল না, পরদিন বিকেলেই শিল্পী এলেন মাটির দুটি ছোট মূর্তি নিয়ে। দেখলেন স্বামিজী। একটু আধটু যা খুঁত ছিল দেখিয়ে দিলেন। কাঁচা মাটি। অতি অল্পসময়ে নিপুণ হাতে তক্ষুনি সংশোধন করে দিলেন পালমশায়। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা। নৈপুণ্যও তেমনি।

দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেল। আশ্রমে ফেরার খবর পেলে সেখানে গিয়ে মূর্তি করে দিয়ে আসবেন বলে চলে গেলেন শিল্পী গোপেশ্বর পাল।

দু' সপ্তাহ বেশ আনন্দেই কাটল বসাকবাবুর বাড়ীতে। লাভের অঙ্কটা ভারী হল আমারই। মিলল—কাকা, কাকীমা, জেঠাইমা, ভাই, বোন। সাময়িক নয় আজীবনের। আজও তাঁদের অনাবিল স্নেহপিঞ্জরে বন্দী।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল সেপ্টেম্বর মাস। অকটোবরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আগমনীর সুর। কিন্তু সে সুর কই এখানে? পুকুরে পুকুরে পদ্ম-কুমুদের মেলা, মাঠের ধারে ধারে পুকুরের পাড়ে পাড়ে কাশফুলের দোলা, শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসে শিউলী ফুলের মেলা, ঘরে ঘরে আলপনা, পথে পথে কুমার, মালী, তাঁতি, ঢাকী ঢুলীর আনাগোনা? নাঃ সে সব কিছু নেই এখানে। থাকলেও অগুনতি লোকের ভিড়ে হারিয়ে গেছে সব—খুঁজে পাওয়া দায়। মনটা উন্মুখ করে উঠল ছোট গ্রামখানির জন্যে—সেই আটের দুর্গা প্রতিমা, দে বাড়ীর বড় এলোকেশী, বরবাকুলের ছোট এলোকেশী বেরাবাড়ীর কৈলাসে হরপার্বতী প্রতিমার জন্যে। একদিন নিরিবিলিতে আস্তে আস্তে জানালুম স্বামিজীকে পূজার সময় বাড়ী যাওয়ার কথা। স্বামিজী হাসলেন, কিন্তু ছোট বলে উপেক্ষা করলেন না। কদিন পরেই ফিরলেন আশ্রমে।

সেবার তার রেণুদার হাতে দিয়ে পূজার কদিন কাটিয়ে আসা গেল গ্রামের বাড়ীতে।

পূজার পর আশ্রমে। কদিন পরেই বসাক কাকুর চিঠি। সপরিবারে গোমো যাবেন তৈমুরলঙ্গের স্বাস্থ্যলাভের আশায়। সঙ্গে যেতে হবে স্বামিজীকে—সনির্বন্ধ প্রার্থনা। আবার বাঁধাছাঁদার তোড়জোড়।

কতদিন আশ্রমে ছিলেন না, আবার স্বামীজী যাবেন আশ্রম ছেড়ে। ওস্তাদসহ ঝণ্টুর দলের আসা-যাওয়ার হিড়িক পড়ে গেল খুবই। তিন-চার দিন অন্তর অন্তরই আসতে থাকল সব। সেই হৈ-হুল্লোড়, রান্না বান্না খাওয়া-দাওয়া। অবশ্য মাসে অন্তত দু দিন আসা-যাওয়া হৈ-হুল্লোড় বরাবর চলে আসছিল যথানিয়মে।

বনপাস গ্রাম থেকে আর এক দল আগন্তুক বেড়ে গিয়েছিল আমার আশ্রম বাসের কিছু দিন পর থেকেই। স্নেহময়ী মহিলার দল। এঁরাও চাল ডাল তরিতরকারী ফলমূল সন্দেশের হাঁড়ি নিয়ে তাঁদের স্নেহাস্পদ খোকাকে দেখবার ছুতোয় দল বেঁধে আসতেন সূর্য্যি ওঠার সঙ্গ সঙ্গেই। প্রাচীনা, প্রৌঢ়া, মধ্যবয়সী—সবাই থাকতেন দলে। হৈ-হুল্লোড়ের নাম গন্ধ নেই—শান্তভাবে আসা, শান্তভাবে খিড়ি স্নান, শান্তভাবে রান্নাবান্না। টুঁ শব্দটি নেই-পরম শ্রদ্ধায় ভক্তিভরে স্বামীজীকে খাওয়ান। তারপর আশ্রমিক সঙ্ঘকে অতি যত্নে খাইয়ে ভক্তিভরে নিজে-দের প্রসাদ পাওয়া। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্বামীজী ঘর থেকে বের হলে দক্ষিণের বারান্দায় বসে যাঁরা যা জানবার জেনে নিতেন স্বামীজীর কাছে। পড়ন্ত বেলায় রোদ পড়লে স্বামিজীকে প্রণাম করে চলে যেত সবাই!

ঝণ্টুর দল আর দলপতিদের কতকগুলি সমাজবিরোধী ধর্মবিরোধী কাজ দেখে আশ্রম আর স্বামিজীর ওপর দারুণ অশ্রদ্ধার ভাব ছিল মহিলাদের অনেকেরই। বলতেন—আশ্রম তো ছাই—যত সব মেলেচ্ছ কাণ্ড, মেলেচ্ছর আড্ডা। ওখানে আবার পা দেয় মানুষে। জাতজন্ম ধম্মকম্ম খোয়াতে সাক্ষাৎ মেলামেশায় স্বামিজীর ব্যক্তিত্বের গুণে আর উপদেশ শুনে মেয়ে-দের মন থেকে সেই ভাবটি উবে গেল একেবারে। প্রায় সকলেই হয়ে উঠলেন স্বামিজীর ওপর শ্রদ্ধাশীলা ভক্তিমতী। না হয়ে উপায় কি? প্রত্যেকেই আপন আপন প্রশ্নের জবাব পান শাস্ত্রসম্মত, যুক্তিযুক্ত কাজেই মনের মত। বিরোধী ভাব থাকবার যো কি?

ফুলের সুবাসমাখা দক্ষিণী সমীরণের মতই অনাবিল আনন্দের হিল্লোলে কাটছিল আশ্রমের দিনগুলি। এরই মধ্যে এক-দিন কলকাতা থেকে এলেন বসাক কাকুর লোক। তাঁর সঙ্গে যেতে হল কলকাতা। কলকাতা থেকে সপরিবারে বসাক কাকুর সঙ্গে গোমো—স্বামিজী, রেণুদা আর আমি। (ক্রমশঃ)

খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল

অঞ্জন রায়

খুলনা মুক্তির ঘটনাটি একটি ব্যতিক্রম। খুলনা মুক্ত হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রামের মত নিষ্ঠুর ধ্বংসের গ্লানি নিয়ে নয়। শুধু টেলিফোন একসচেঞ্জ ছাড়া শহরের গুরুত্ব-পূর্ণ আর কিছু নষ্ট হয়নি। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে এই শহরের গুরুত্ব হবে অপরিসীম। খুলনার উপকণ্ঠে খালিশপুরে ভৈরব নদীতীরে বছরে ৫৪,০০০ টন উৎপাদনক্ষম খুলনা নিউজ-

বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে সবশেষ মুক্ত-শহর খুলনা। উত্তরে দৌলতপুর—শিরোমণিতে তীব্র ট্যাঙ্ক লড়াই-এর পর আগুয়ান মিত্র-বাহিনী সেদিন শহরের উপকণ্ঠে, প্রায় একই সময়ে পূর্বে ভৈরব নদীর অপর তীর থেকে গোলা ছুঁড়ে চলেছিলেন ভারতীয় গোল-ন্দাজেরা। পাক-বাহিনীর অধিনায়ক নিয়াজীর আত্মসমর্পণের সংবাদ খুলনাস্থ পাক-বাহিনী জানতো না। তাই সম্পূর্ণ বেষ্টিত না হয়ে ওরা আত্মসমর্পণ করেনি। সেদিন দুপুরে খুলনা শহরের প্রতিটি বাড়ির রুদ্ধদ্বার কক্ষে কক্ষে ফিস ফিস উত্তেজনা। হঠাৎ সচকিত গতিতে খুলনার সারকিট হাউসের ভেতর ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে পড়েন দুজন সবল পুরুষ। পরনে ছেঁড়া প্যান্ট জীর্ণ, কর্দমাক্ত—গায়ে গেঞ্জি, মুখ-ভরা দাড়ি, পিঠে আগ্নেয়াস্ত্র। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে উড়িয়ে দেন মুক্ত আকাশে স্বাধীন বাংলার মুক্ত পতাকা। তাঁদের (মুক্তি বাহিনীর মেজর জয়নাল আবেদিন এবং ক্যাপটেন 'দাদু') সুরে সুরে সুর মিলিয়ে মুক্তির জয়ধ্বনি দিতে সারকিট হাউস ময়দানে ততক্ষনে জমে গিয়েছেন জনাছয় খুলনাবাসী।
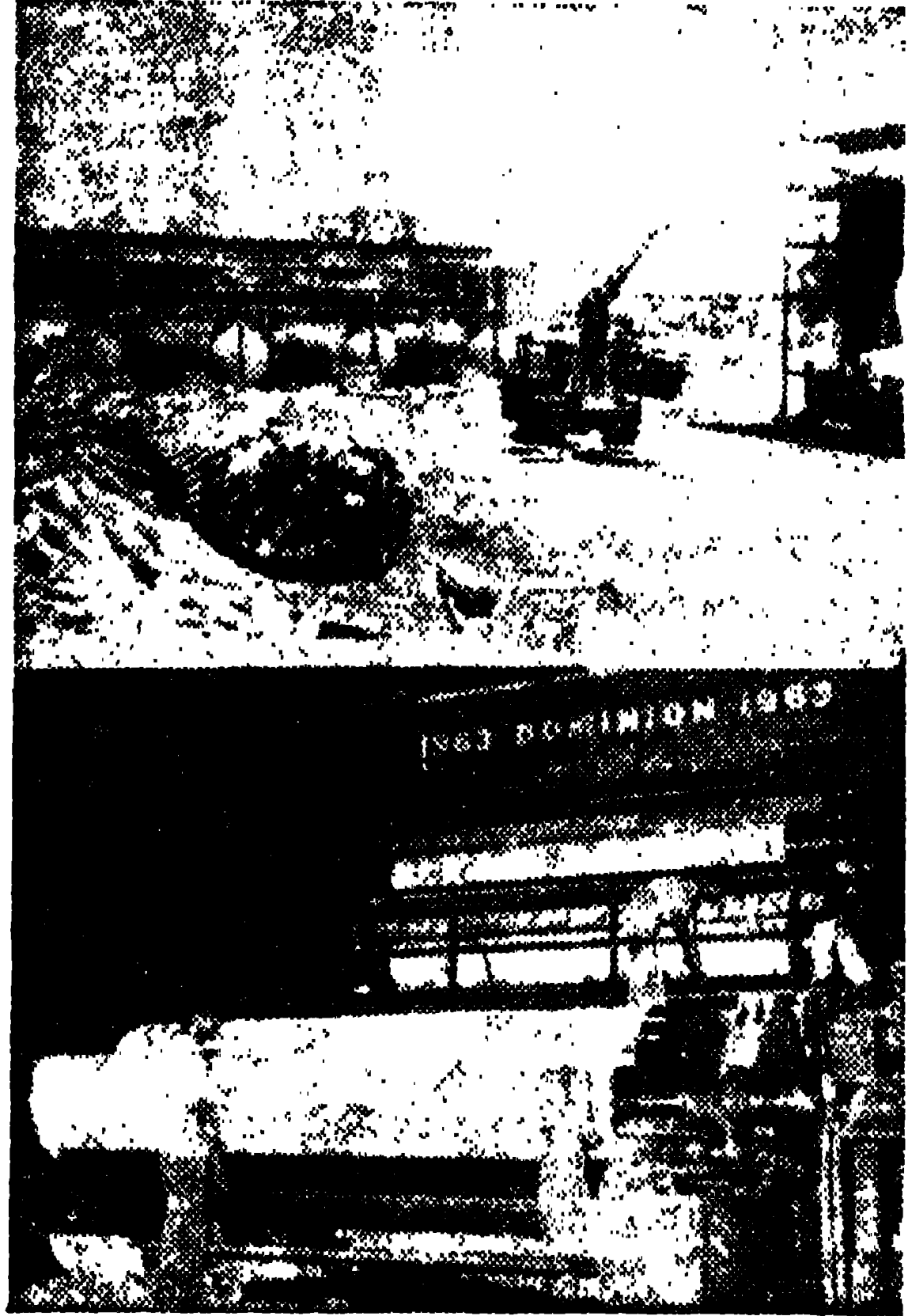
উপরে : গেওয়া কাঠের ছাল তুলে মিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
নিচে : মেশিনে কাগজ তৈরী হচ্ছে।

খুলনা নিউজপ্রিন্টের ধারে ভৈরব নদীতে সুন্দরবন থেকে আনা গেওয়া কাঠের সারি।
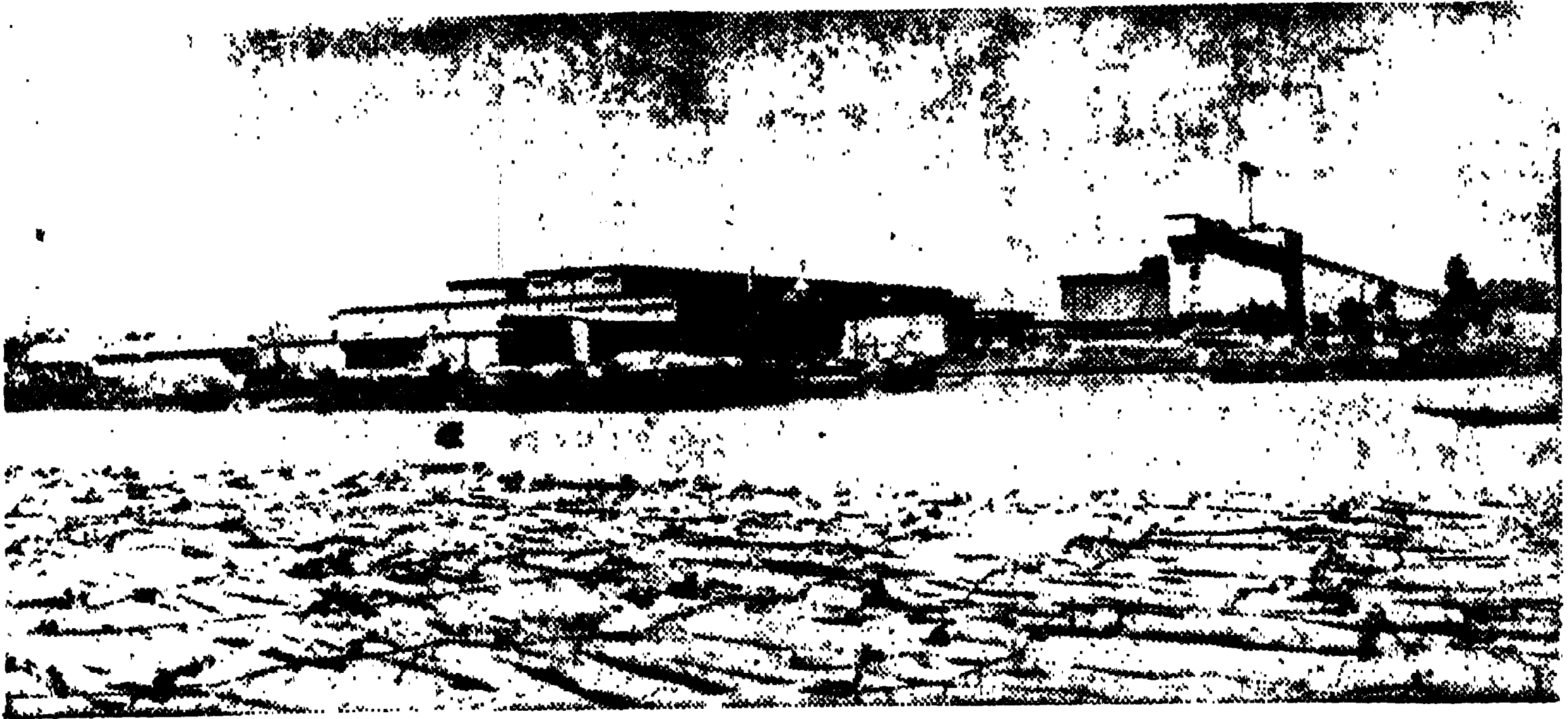
প্রিন্ট মিলটি অবস্থিত। স্বাধীন বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই কারখানাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে পাক-সেনাদের সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় নিউজপ্রিন্ট মিলের বাঙালী জেনারেল ম্যানেজার একরামুল আমীন সাহেব পাক-সাহায্যপুষ্ট কিছু অবাঙালী অধঃস্তন অফিসারের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ জেনারেল ম্যানেজার হয়ে পড়েন ক্ষমতাচ্যুত। আর অবাঙালী অফিসারেরা মিলের সর্বময় কর্তা হয়ে ইচ্ছামত বাঙালী শ্রমিক ছাটাই ও 'বিহারী' নিয়োগ করতে থাকেন। পাক প্রচার যন্ত্র ও রাজনীতিবিদদের ঘোষণা অনুযায়ী এইসব অফিসারদের ধারণা হয়েছিল যে অমিতশক্তিশালী 'ইসলামের রবপুত্র' পাক-বাহিনীকে কাফের হিন্দুস্থানীরা হাজার বছরেও পরাজিত করতে পারবে না। মিলটিকে তাই তারা ধংস করার প্রয়োজন মনে করেন নি। শেষ সময়ে যশোর পতনের পরেও মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে তারা বিপদত্রাতার ভূমিকায় দেখবার আশা পোষণ করেছিলেন। পরে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এইসব অফিসারেরা ভারতীয় সেনাদের আশ্রয় লাভ করে ভারতে চলে এসেছেন।

পাক-বাহিনীর সন্ত্রাসের রাজত্বের সময়েও কিন্তু মিলের উৎপাদন বন্ধ থাকেনি। গত ৩রা ডিসেম্বর ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ৬ই ডিসেম্বর থেকে মিলটি বন্ধ হয়ে আছে। অভাব 'ফারনেস অয়েলের'। আওয়ামী লীগ অথবা স্বাধীন বাংলার সমর্থক বাঙালী কর্মচারিগণ, যাঁরা গত বহু মাস পালিয়ে, আত্মগোপন করে বা মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন তাঁরা এক এক করে ফিরে আসছেন। নিউজপ্রিন্ট মিল এখন পুনর্মিলন ক্ষেত্র। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছেন। কেউবা হাসছেন, কেউবা কাঁদছেন। মিলের বর্ষীয়ান সুপুরুষ সিকিউরিটি অফিসার আবু সৈয়দ সাহেব একমাত্র হিন্দু অফিসার শ্রীঅমর চক্রবর্তীকে বুকে জাপটে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন শিশুর মত। তাঁকে বলতে শোনা যায়—স্যার, আমার নিজের ভাইকে শয়তানেরা মেরেছে। আপনাকে যে আবার জীবন্ত অবস্থায় দেখবো, সে আশা করিনি!' খুলনা নিউজ-প্রিন্ট মিলে এই এক প্রশ্ন এখন সবার মুখে, সবার কাছে।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের উদ্যোগে (বর্তমান নাম বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন) এবং কানাডার স্যানডওয়েল লিমিটেডের সহযোগিতায় খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৯ সালে। মিলটি তৈরী করতে খরচ হয় ১৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

কাগজ তৈরীর প্রধান কাঁচা মাল নরম কাঠ 'গেওয়া' সুন্দর বনে পাওয়া যায়। সেখান থেকে কেটে পশুর নদীর জলে সেগুলিকে জড়ো করা হয়। তারপর জলযানের সাহায্যে টেনে রূপসী নদী হয়ে ভৈরবে—নিউজপ্রিন্ট মিলের সংলগ্ন জেটিতে নিয়ে আসা হয়। অপর কাঁচা মাল নরম কাগজের মণ্ড আসতো কানাডা থেকে কলম্বো পরিকল্পনায়। আর 'ফারনেস অয়েল' আসতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে জলপথে, চট্টগ্রামে পরিশ্রুত হয়ে।

১৯৫৯-৬০ সালে, অর্থাৎ মিলে উৎপাদন আরম্ভ হওয়ার বছরে ১৫,১৫১ টন কাগজ তৈরী হয়। তার ভেতর ১২,০৮৬ টনই ছিল নিউজপ্রিন্ট এবং ৩০৬৫ টন অন্যান্য কাগজ। ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদনের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৪৪,২৬৭ টন। এর ভেতর ৩৫,৭৪০ টন ছিল নিউজপ্রিন্ট ও ৮৫২৭ টন ছিল অন্যান্য কাগজ। নিউজপ্রিন্ট ছাড়া অন্যান্য উৎপাদিত কাগজগুলি হল মোড়কের কাগজ, বই ছাপার 'গ্লেজড নিউজপ্রিন্ট', দেশলাই-এর বাকসের নীল কাগজ, খাম তৈরীর কাগজ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে নিউজপ্রিন্টের চাহিদা বছরে ১০,০০০ টনের কিছু বেশী। পাকিস্তানকে (পশ্চিম) যোগানো হত বছরে ৩০,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট। উদ্বৃত্তটা হত রপ্তানী উত্তর কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে। এখন আর পাকিস্তানকে সরবরাহের বাধ্যবাধকতা নেই। তাই নিজের দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও বাংলাদেশ সরকার বছরে ৪০।৪২,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী করতে পারবে যদি উৎপাদনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ১৯৭০-৭১-এর মহা-দুর্যোগের বছরেও খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের উৎপাদন ছিল ৩৫,৮৫৪ টন।

এখন কথা হল নিউজপ্রিন্ট আমদানী নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কোন চুক্তি হলে তা ভারতের পক্ষে লাভজনক হবে কিনা?

ভারতবর্ষে নিউজপ্রিন্টের চাহিদা বছরে ২ লক্ষ টন। মধ্যপ্রদেশের নেপা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপন্ন হয় বছরে ৩০,০০০ টন। বাকীটা ভারতকে করতে হয় আমদানী। তবে নিউজপ্রিন্টের অভাবে ভারতীয় কাগজ-কলগুলির প্রস্তুত (ভারতের কাগজের প্রয়োজন বছরে ১০ লক্ষ টন। ৫৭টা কাগজ-কলে তৈরী হয় প্রায় ৮ লক্ষ টন কাগজ) সাদা ছাপার কাগজও অনেক সংবাদপত্র ব্যবহার করে। যাই হোক, ১৯৭২ সাল নাগাদ নেপায় নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াবে বছরে ৭৫,০০০ টনে। হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকায় নির্মীয়মান নিউজপ্রিন্ট কারখানা সরবরাহ করবে বছরে ৬০,০০০ টন। তবুও ভারতে নিউজপ্রিন্টের চাহিদা থাকবে, আর সেজন্যে যেতে হবে বিশ্বের বাজারে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের তৈরী কাগজ ভারত তাই আমদানী করবে সাগ্রহে।

মিলের দু হাজার কর্মী আবার সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন উৎপাদনের কাজে। শুধু প্রয়োজনীয় ফারনেস অয়েল পেলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উৎপাদন শুরু করা যাবে বলে জানান মিলের এ্যাসিসটেন্ট পারসোনাল অফিসার আবদুস হাকিম সাহেব। আর মিলের প্রতিটি বাঙালী চান ভারতে পাঠানো কাগজ যেন শুধু এপার বাংলা বাঙালীদের কাছেই পৌঁছয়।

উপেক্ষিতা লক্ষ্মী

তারাপদ সাহা

উপেক্ষিতা কাব্যে নয়—সমাজে—বৈষ্ণব-সমাজে। বলছি আমি নিমাইয়ের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর কথা। দ্বিতীয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রশস্তিতে বৈষ্ণব-সমাজ পঞ্চমুখ, স্মরণে বিগলিত অথচ প্রথমাকে নিয়ে উচ্চবাচ্য তেমন শোনা যায় না। কিন্তু কেন—এর কারণ কি? বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী সনাতন রাজপন্ডিতের মেয়ে, বুদ্ধিমন্ত খাঁর দৌলতে নিমাইয়ের সংগে বিয়ে হয়েছিল তার রাজার হালে, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়, আর লক্ষ্মী দরিদ্র বল্লভাচার্যের কন্যা, বিয়ে হয়েছিল তার নিতান্ত গরিবের মত,—তাই কি? বল্লভাচার্য নিমাইকে কিছু দিতে পারেননি। বনমালী ঘটক সম্বন্ধ উপস্থাপিত করলে তাঁকে বলতে শুনি—

আমি যে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই।
কন্যা মাত্র দিব আমি হরিতকী দিয়া।
চৈ, ভা—আদি ৯ অ.

বিষ্ণুপ্রিয়া অবশ্য নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পর স্বামীধ্যানে তাঁরই প্রদর্শিত পথে সুদীর্ঘ কাল কঠোর তপস্বিনীর জীবনযাপন করেছিলেন, সেটা আদৌ উপেক্ষণীয় নয় জানি, মানি, কিন্তু প্রেমই কি উপেক্ষণীয়? বলছি আমি লক্ষ্মী এবং নিমাইয়ের পারস্পরিক মানবিক প্রেমের কথা। চৈতন্য জীবনচরিতে পাই লক্ষ্মী ও নিমাইয়ের বাল্যবিবাহ হলেও সেটা প্রেমের বিবাহ, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার সংগে নিমাইয়ের বিবাহ প্রয়োজনের, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের নয়।

চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়—অতি বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্মী ও নিমাই পরস্পরের

প্রেমে আকৃষ্ট। যৌবনের উন্মেষেই নিমাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বনমালী ঘটককে মায়ের কাছে পাঠিয়ে কৌশলে অনিচ্ছুক মায়ের মত করিয়ে এ বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

এ প্রেমের প্রথম পরিচয় গঙ্গার ঘাটে। দুরন্ত নিমাই গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নানা উৎপাত করে, সে উৎপাতে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ নর-নারীই বিপন্ন বিব্রত নয়, ছোট ছোট মেয়েরাও। মেয়েরা মনোমত পতি লাভ করবার জন্য গঙ্গার ঘাটে গিয়ে 'শিবপুজো' করে. নিমাই গিয়ে বলে, তুই কাকে পুজো করছিস, আমায় পুজো কর, আমিই তোর মনোমত বর দেব. নৈবেদ্য আমায় দে, মালা আমায় দে। যে দিতে চায় না তাকে বলে, তোর বুড়ো বর হবে, অনেক সতীন. আর ছেলেমেয়ে হবে কানা কুঁজো আর খোঁড়া।

বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীও একদিন গঙ্গার ঘাটে এমনি পুজায় বসেছিল, নিমাই তাকে উৎপাত করতে গেলে, যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, তার বর্ণনা দিতে কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখেছেন—

একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান।।
তারে দেখি প্রভুর হইল অভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভু দরশন।।
সাহজিক প্রীতি দোঁহার করিল উদয়।।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয়।।
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা ছলে দোঁহার হইল প্রকাশ।।
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর।।
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্পচন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন।।
প্রভু তাঁর পূজা পাইয়া হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা।।

এই প্রেমের বর্ণনায় লোচনদাস লিখেছেন—বল্লভ আচার্যের কন্যা. রূপে গুণে শীলে ধন্যা,—লক্ষ্মী তার নাম—

গঙ্গাস্নানে যায় সেই সখীর সাইতে।
বিশ্বম্ভর হরি তাহা দেখিল আচম্বিতে।।
একদৃষ্টে চাহে প্রভু সুস্মিত আনন।
দেখিয়া জানিল তাব জন্মের কারণ।।
লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভুপাদপদ্ম দেবী শিরে করে নিল।।

বুঝতে কষ্ট হয় না—লোচনের বর্ণিত এ সাক্ষাৎকার গঙ্গার ঘাটের সেই প্রথম সাক্ষাৎকার নয়, এ পরের ঘটনা; নিমাই যখন যৌবনে উপনীত হয়েছেন। এ সাক্ষাতের পরেই বিবাহের আয়োজন। কবিরাজ গোস্বামী এ সাক্ষাতের বর্ণনায় লিখছেন—

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে।।
পূর্বসিদ্ধ ভাব দোঁহের উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইলা।।
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন।।

বিয়ের ব্যাপারটা কবিরাজ গোস্বামী এক কথায় সেরে দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটা অমনি এক কথায় হয়নি, এর জন্য লক্ষ্মী-লাভে উৎসুক তরুণ নিমাইয়ের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে পাই বনমালী ঘটক লক্ষ্মীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে শচীদেবীর কাছে গেলে ঘটককে তিনি তেমন পাত্তা দেন নি, তিনি বলেছেন, ..."পিতৃহীন বালক আমার। জীউক, পড়ুক আগে. তবে কার্য আর।।"

শুনে মুখ ভার করে ফিরছিলেন বনমালী, পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

কোত্থেকে আসা হ'ল? জিজ্ঞাসা করলেন নিমাই। বনমালী বললেন, গিয়েছিলাম তোমার জননী সম্ভাষিতে।

তোমার বিবাহ লাগি বলিলাঙ তানে।
না জানি শুনিঞা শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে।।

শুনে নিমাই মনে মনে হেসে—আচ্ছা দেখে নিচ্ছি আমি—ভেবে বাড়ি এসে মাকে বললেন—

আচার্যেরে সম্ভাষণ না কৈলে ভাল কেনে?

বুদ্ধিমতী মায়ের বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না, পরের দিনই বনমালীকে ডেকে এনে—

শচী বোলে 'বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তা করহ বলিল এই আমি।।

এই ত গেল নিমাইয়ের আগ্রহের দিক, ওদিকে লক্ষ্মীর আগ্রহের কথা শুনিয়েছেন জয়ানন্দ। তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে পাই লক্ষ্মীর মা শচীদেবীকে বলছেন, আমার মেয়ে ছেলেবেলায় তার বাপকে বলত,—

ওগো বাপু মোরে বিভা দিহ সেই বরে।।
বকুল ফুলের মালা চাচর চুলে বান্ধে।
কুঙ্কুমে মাজিয়া সরু পৈতা বাম কান্ধে।।
এখন জিজ্ঞাসিলে লাজে হেট করে মাথা।

জয়ানন্দের বর্ণনায় নিমাইয়ের আগ্রহ আরও প্রবল আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তাতে পাই গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীকে দেখার পর নিমাই বনমালীকে গিয়ে বলছেন, আমার বাপ লক্ষ্মীর বাপকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন যে লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—'অতএব ঘটক হৈয়া তুমি করহ সম্বন্ধ।'

যে লক্ষ্মী ছেলেবেলা থেকে নিমাইকে পতিরূপে কামনা করেছে সামনে পেয়ে পুজার মালাটা তার গলায় পরিয়ে দিয়েছে—বৈষ্ণব-সমাজে তার স্মৃতি যেন যোগ্য সমাদর পাচ্ছে না।

বিবাহের পর বেচারা লক্ষ্মীর জীবিত-কাল মাত্র দুই বৎসর। এই দুই বৎসর নিমাইয়ের ঘরে যেন শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ—

এই লক্ষ্মী বধু আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে।।
চৈঃ ভাঃ

নিমাই মহা খুশী—

অধরে তাম্বূল দিব্য বাস পরিধান।
সর্বকায়ে পরিহাস মূর্তি...।। চৈঃ ভাঃ

সন্ন্যাসী অতিথির জন্য লক্ষ্মী রান্না করতে গেলে নিমাই তার পাশে এসে বসেন—

তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রাঁধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি বৈসে।।
চৈঃ ভাঃ

এদিকে অতি ভোর বেলা উঠেই লক্ষ্মী গৃহকার্যে ব্যস্ত—

দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খচক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল।।
চৈঃ ভাঃ

এছাড়াও বড় কথা—'শচীর সেবায় তার মন।'—আর লক্ষ্মীর চরিত্র দেখে নিমাই—'মুখে কিছু না বলেন সন্তোষ অন্তর।'

তখন শচীর সংসার যেন এক পরিপূর্ণ শান্তির ছবি। জয়ানন্দ লিখেছেন—পূর্ব বঙ্গে যাবার আগে নিমাই লক্ষ্মীকে বাপের বাড়ি যেতে নিষেধ করলেন। লক্ষ্মী—'না গেলা বাপের বাড়ি শাশুড়ী ছাড়িয়া।' নিমাই বলে গেলেন—

আমার মায়েরে সেবা করিও নিরবধি।
কাঁধের যজ্ঞসূত্র তারে দিল দয়ানিধি।।

নিমাইয়ের অবর্তমানে লক্ষ্মী—

গৌরাঙ্গের পৈতা পূজে মাল্যচন্দনে।।
প্রভুর চরণধূলি তিলক ললাটে।
দুগাছি পাদুকা না দেখিলে প্রাণ ফাটে।।
গৌরাঙ্গ বিগ্রহচিত্র কঠিনেতে লেখি।
হরিদ্রাবসন করি নিত্যরূপ হেরি।।

লক্ষ্মীই তাহলে গৌরাঙ্গচিত্রের প্রথম পুজারিণী।

এর পরেই একদিন রাত্রে শচীগৃহে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! বেচারা লক্ষ্মী শচী-মায়ের পাশে শুয়ে আছে, শেষরাত্রে কাল-সাপে এসে লক্ষ্মীকে দংশন করলে—'দংশিল দক্ষিণপদে কনিষ্ঠ আঙ্গুলি। 'লক্ষ্মী বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে বলে, 'বিষজ্বালায় মরি মা চক্ষু নাহি দেখি।'

খবর পেয়ে লক্ষ্মীর বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী সবাই এলেন। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, ঔষধ—কত কি করা হল। বিষ-কিছুতেই নামল না। দেখে—

লক্ষ্মীমুখে চুম্ব দিয়া বলে শচীমাতা,
অনাথিনী লক্ষ্মী মা ছাড়িয়া যাও কোথা।

মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে লক্ষ্মীর উক্তি আরও করুণ, আরও মর্মস্পর্শী, চরিত্র স্বামিপ্রেমে অত্যুজ্জ্বল। লক্ষ্মী বলছে—

যখন আমার ঠাকুর গেল বঙ্গদেশে।
কাঁধের পৈতা মোরে দিলেন সন্দেশে।।
সেই পৈতা আমার গলায় দেহ আনি।
প্রবোধিয়া ঘরে নেহ মাতাঠাকুরানী।।
আমা অন্তর্জলে নেহ বিলম্বে কি কাজ।
গঙ্গা ছাড়ি ঘরে মরিবা ও বড় লাজ।।
চৈ০ম জয়ানন্দ।

এ উক্তি, এ দৃশ্য, এ চরিত্র কি ভুলবার. অনেক পণ্ডিতেরই ধারণা লক্ষ্মীকে হারানোর বেদনা নিমাই ভুলতে পারেননি লক্ষ্মীর বিরহই নিমাইকে কৃষ্ণাভিসারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এই ক্রুদ্ধ দিন

মিহির আচার্য

দেয়ালে সমস্ত শক্তি রেখে পাথরের মতো মুখে সেবা আবার বলল : 'না।'

'দেখুন ভালো করে দেখুন।'

'বলছি তো না।'

'আপনি একটা কলেজের মাস্টার। আপনার কাছে অন্তত সত্য কথা আশা করি। বুঝতেই পারছেন শেষ কাজ করার জন্যে এর আত্মীয়দের খবর দেয়া দরকার।'

'আমি চিনিনে। কোনোদিনও চিনতাম না।'

'বেশ। আমাদের দায়িত্ব অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমরা মর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর বেওয়ারিশ লাশটাকে ডোম পুড়িয়ে দেবে।'

পুলিশ-স্টেশন থেকে থমথমে মুখে বেরিয়ে এল সেবা। না, পা টলল না। কোনো উত্তেজনাও নয়। তারপর রিক্শা ডাকল। রিক্শার দোলায় শরীর দুলছে। শক্ত করে সীট আঁকড়ে রইল। যেন দোদুল্যমান শরীরটা না টলে পড়ে গাড়ি থেকে।

না, আমি চিনিনে। একটা জীবনে সমস্ত কিছু চেনা সম্ভব নয়। কেউ পারে না। আমি কী সব সময় আমার মেয়েদের মুখ মনে রাখতে পারি! শীলা না লাবণ্য না অজিতা। হ্যাঁ, আমি শুধু এটুকুই চিনলাম যে, ওটা একটা পুরুষের প্রাণ-হীন শরীর। জীবিতাবস্থায় আরো দশ-জনের মতোই ওরও একটা নাম থাকা স্বাভাবিক। কল্যাণ কিংবা আনন্দ, কী প্রণবেশ। কিন্তু...

সেবার ভিতরের অন্তর্বাস-সুদ্ধ ঘামে জবজবে। রক্ত কী শীতল হয়ে আসছে! হিল হিল করে কাঁপছে সর্বশরীর। কিন্তু ...মৃত-মানুষের কী কোনো নাম থাকে! ডেড বডি। আমি, সেবা মিত্র, কলেজের হিস্ট্রির লেকচারার, আমার সঙ্গে ডেড-বডির সম্পর্ক কী? জীবিতের সঙ্গে মৃতের কী সম্পর্ক থাকতে পারে! আমার

বাবা দাশরথি মিত্র, আমার মা কুসুম মিত্র, আমার ভাই সৌম্য মিত্র। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। প্রতিদিন একই বাড়ির ছাদের তলায় আমাদের নিত্য যোগ। সকালে আমি চা করি। বাবার ঘরে চা পৌঁছে দিই। সৌম্যকে ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে তুলতে হয়। তারপর আমার স্নান। মা সামনে বসে এটা-সেটা খাওয়ান। আমার শরীর খারাপ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাবা বেরোবার সময় জরদার কৌটো আনতে স্মরণ করিয়ে দেন। সৌম্যর মিউজিক কনফারেন্সের টিকিটের টাকা দিয়ে আসতে হয়। এগুলিই হচ্ছে সম্পর্ক। আমাদের বেঁচে থাকাটাই পরস্পরকে এক-সূত্রে বেঁধে রাখে। মৃতের সঙ্গে কারুরই কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমারও নেই। যেহেতু মৃতের কোনো দাবি নেই।

না ঃ আমি ওকে চিনিনে। কোনোদিনও না। কী করে বলব ওর নাম নির্মল চৌধুরী কিনা। হতেও পারে, নাও হতে পারে। শুধু শুধু অনুমানে নির্ভর করে লাভ কী। আসলে একটা মৃতদেহ। অবশ্য পুরুষের। এইমাত্র। বৃথা তার নাম গবেষণার প্রয়োজন নেই। কী বলছেন? ওর কামিজের পকেটে আমার নাম-ঠিকানা পাওয়া গেছে? আমি যখন জীবন্ত লোকের বাসিন্দা, তখন আমার নাম-ঠিকানা তো থাকবেই। সেজন্যে আমি দোষী নই। মৃতদেহটি কোথা থেকে কোন্ সূত্রে সেটি যোগাড় করেছে সেটা আমার জানার কথা নয়। বেঁচে থাকলে প্রশ্ন করা যেত। দেখতেই পাচ্ছেন ও বেঁচে নেই। কাজেই সে-প্রশ্নও অনুক্ত থাকছে। ও সত্যি সত্যি নির্মল চৌধুরী কিনা, সাদার্ন এ্যাভিনুর পরিমল চৌধুরীর একমাত্র ছেলে কিনা, এরিয়াল পাবলিসিটি ফার্মের অন্যতম এক্সিকিউটিভ কিনা—সমূহ প্রশ্নের সমাধানের বিষয়টি একান্ত আপনাদেরই। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমি জানিনে। ওর পকেটে আমার ঠিকানার ব্যাপারটাও কেমন আমার কাছে ধাঁধার মতো লাগছে। ওকে জীবিতাবস্থায় পেলে আমিই সোজাসুজি প্রশ্ন করতাম। প্রশ্ন নয়, কৈফিয়তই চাইতাম। দেখুন মশায়, পকেটে কুমারী অধ্যাপিকার নামধাম লিখে পথে ঘোরাটা ভব্যতা ও শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে। মেয়ে কলেজের অভিভাবকেরা শিক্ষকের এই বেপরোয়ামি নিশ্চয়ই সুনজরে দেখবেন না। বলুন ঃ আমার ঠিকানা-সংগ্রহের হেতুটি কী? আমি তো আপনাকে চিনিনে। কোনোদিনও দেখিনি। কেউ কী আপনাকে আমার ঠিকানাটা দিয়েছে? কেন? আমি আপনার কী উপকার করতে পারি? বয়স্ক হলে না হয় বুঝতে পারতাম আপনার বি সি এস ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে এসেছেন। কিন্তু...আপনার বয়েস দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। হি-হি। নিজে পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছেন, এদেশে এ-রীতি কেমন দুঃসাহসিক নয়! প্রেম ইত্যাদির ব্যাপারটাও এভাবে ঘটে না।

এ-সমস্তই কল্পনা। যেমন নির্মল চৌধুরীর নামের অস্তিত্বটাও অনুমান-নির্ভর।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমরা বিশেষ দুঃখিত।'

'এ তো আপনার কর্তব্য। দুঃখ আমার যে, আপনাদের কোনো উপকার করতে পারলাম না। আচ্ছা নমস্কার।'

;নমস্কার।'

'রিকশা। রাখো।'

দরজায় পা দিতেই বাবা বললেন ঃ 'আমাকে ডাকলে না কেন? আমি তো...'

সেবা বলল ঃ 'তুমি ঘুমিয়েছিলে।'

'কী হল?'

'ও কিছু নয়। একটা ভুল খবর পেয়ে...'

'সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'হুঁ...'

'ওগো খুকিকে চা দাও।'

সেবা শোবার ঘরে ঢুকল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। না কি ঘুম পাচ্ছে।

মা চা নিয়ে এলেন।

খুকি—

'মা!'

'তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'আমাকে লুকোসনে।'

সেবা জোর করে হাসল। 'এমন এমন মজার ব্যাপার ঘটে...'

মা অবাক চোখে মেয়ের হাসি লক্ষ্য করলেন। 'মজা...'

'কে না কে নির্মল চৌধুরী...'

'নির্মল!'

'নির্মলের মতো...'

'একটা লোক খুন হয়েছে...ওদের কাছে খবর ও নির্মল চৌধুরী...তা সে যাই হোক বলো তো আমি কী করে হলফ করব ও নির্মল চৌধুরী কিনা...'

'খুকি।'

'বা, ওর জামার পকেটে নাকি আমার ঠিকানা পাওয়া গেছে। মা শুনছ, হি-হি, কেমন মজার খবর না?'

'খুকি তুই অমন করছিস কেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে—'

'মা তোমার এত বুদ্ধি, এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?'

'তোর এই চেহারা দেখে আমার কান্না পাচ্ছে।'

'কান্না। এমন মজার ব্যাপারেও তোমার কান্না পায়? একটা লোক খুন হয়েছে। এটি কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বলো, আশ্চর্যের? কথাটা হল ওর গায়ে নির্মল চৌধুরীর লেবেল এঁটে দেয়া! যেন এটা একটা ভীষণ জরুরী ব্যাপার। মৃতদেহের নাম থাকে মা, তুমিই বলো? চলতি কথায় বলে মড়া। তা যদি একটা নামী-দামী লোক হত।'

'ও তাহলে নির্মল নয়?' মা বললেন।

'কে জানে। আর যদি হয়ও আমাদের কী করার আছে। আমরা তো আর ওর আত্মীয় নই। ওর মা আছে, বাবা...'

'তাহলে ওরা ওকে নির্মল বলে...'

'মা তোমার এতদিনে বয়েস হয়েছে। আহা, তোমার কথাই না হয় ধরা গেল, ও নির্মল। বেশ নির্মল-ই। তুমি নির্মলকে চেনো নাকি?'

'বা!'

'মনে হচ্ছে তুমি নির্মলকে চেনো।'

'খুকি পাগলামো করিসনে।'

সেবা বলল : 'মা তুমি এবার আমাকেই পাগল করে দেবে।'

মা বললেন : 'তুই নির্মলকে চিনিসনে?'

'আহা, আমি।'

'খুকি, আমার দিকে চা।'

'এই তো চেয়েছি।'

'নির্মলকে কারা খুন করল?'

'বা, আমি। তুমি আমাকে...'

'আমি তোর মা—'

'মা, তুমি কী বলবে আমি ওকে খুন করেছি? আমি ওকে চিনিনে কোনোদিন..'

'নির্মল তো সেদিনও আমাদের বাড়িতে এল।'

'মা, মাগো—'

'তোরা ছাদে বসে অনেকক্ষণ গল্প করছিলি। আমি কফি বানিয়ে দিলাম। তুই গান গাইছিলি...'

'মা, তুমি...'

'নির্মল গত মাসে চাকরিটা পেয়েছে। তোরা ফাল্গুনে...'

'ও, মা। তুমি থামবে? আমার ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে কেউ বলেনি। যা জানো না, যা বোঝো না।'

'না, এ হতে পারে না।' মা কঠোর গলায় বললেন।

'মা তুমি পৃথিবীর কতটুকু জানো? এই ঘর, আর বারান্দা...'

'একজন মা কতটুকু জানতে পারে খুকি তুই কী করে জানবি। নির্মল আমার কাছে বিয়ের অনুমতি নিয়েছিল, ওকে আমি আশীর্বাদ করেছিলাম...'

'মা তোমার পায়ে পড়ি। প্লিজ।'

মা বললেন : 'আমাকে থানায় নিয়ে চল। আমি ওকে দেখব।'

সেবা বলল : 'তা হয় না।'

'তুই বলে আসতে পারলি ওকে তুই চিনিসনে।'

'আমি আর কী করতে পারতাম। ও তো আর বেঁচে নেই। অথচ আমাকে এখনো অনেকদিন বাঁচতে হবে। আমি মেয়ে কলেজের মাস্টার আমি ইচ্ছে করলেও তা ভুলতে পারিনে। তুমি কী বলতে চাও আমি মৃতদেহকে ছুঁয়ে অন্ধকার ঘরে বসে থাকব। আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে না, কলেজে যেতে হবে না?'

মা কাঁদছিলেন। 'পোড়ারমুখী, তুই এখনো হিসেব করবি?'

সেবা বলল : 'মা কেঁদো না। দ্যাখো তো আমার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। রোজ রোজ কাগজে এত খুনের খবর শুনেছি একেক সময় মনে হয় সকালে উঠে দেখব আমি নিজেই খুন হয়ে গেছি। আমরা পৃথিবীতে কেউই বাঁচতে আসিনি। আজ কিংবা কাল।'

'ওরে চুপ কর। আমি আর শুনতে পারছিনে।'

'মা লক্ষ্মীটি, তুমি আমাকে বোঝবার চেষ্টা করো। আরো সকলের মতোই আমাকেও প্রতিমুহূর্তে হিসেব করে চলতে হয়। কাল আমাকে কলেজে যেতে হবে, টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে হবে। চান করতে হবে, খেতে হবে। কারণ আমি বেঁচে আছি এখনো। বেঁচে-থাকার পাপ আমাকে বহন করে যেতে হবে।'

'তুই ওকে ভালোবাসতিস, আমি তোদের...'

'মা ভালোবাসা দিয়ে কাউকে বাঁচানো যায় না। তাহলে নির্মল বাঁচত। মা, তুমি আমার অবস্থাটা একবার ভাবো। আমাকে কাল থেকে বেঁচে-থাকার প্রক্রিয়াগুলো যথাযথ পালন করে যেতে হবে। কাউকে আমি কিছু বলতে পারব না। বলা যায় না। তুমি জানো নির্মল আমার কে আমার কতখানি। নিঃশব্দে ওর মৃত্যুর বোঝাকে আমায় সারা জীবন বয়ে যেতে হবে। ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম। মা শুনছ?'

'খুকি—'

'ওর দেয়া আংটিটা এখনো আমার আঙুলে। আমাকে নিয়ত স্মরণ করিয়ে দেবে আমি স্বাধীন নই, আমি আরেক জনের। আমাকে প্রতীক্ষা করে যেতে হবে কেউ জানতে পারবে না আমি কিসের অপেক্ষা করছি। মা। মাগো...'

'খুকি, চুপ কর।'

'সারা জীবন আমি সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্বে কাল কাটাব। একেক সময় নিজেকেই প্রশ্ন করব, আমি কুমারী না বিধবা...'

'খুকি!' মা চিৎকার করে উঠলেন।

'মা ভয় পেও না। এই তো আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখেমুখে কী কোনো ভয় দেখেছ এই তো আমি হাসছি।'

'না থাকি না। আমি তা কিছুতেই হতে দেবো না।'

'কী বলছ মা?'

'ভালোবাসার স্মৃতি নিয়ে কী কেবল বাঁচা যায়?'

'মা—'

'ধর নির্মলের শক্ত অসুখ হতে পারত। অন্য কোনোভাবে ওকে আমাদের হারাতে হত...'

সেবা হেসে উঠল। 'মা, তুমি এবার বেঁচে-থাকার হিসেব করছ। নির্মলকে তুমি অনুমতি দিয়েছিলে, আশীর্বাদ করেছিলে...'

'আমি বুঝতে পারিনি সেবা। একটা মৃত মানুষকে স্বীকার করাটাই শেষ কথা নয়। এ তুই ভালো করেছিস। আমি আগে বুঝিনি।'

সেবা বলল : 'নিজের মেয়ের বেলায় তুমি পক্ষপাতিত্ব করছ মা। ধরো তুমি যদি নির্মলের মা হতে! কাউকে কথা দিলে তাকে রক্ষা করতে হয় মা। নির্মলের বাড়ির লোকেরা জানে আমি ওদের বউ। নির্মল আমাকে নির্বাচন করে গেছে।'

মা ক্লান্ত গলায় বললেন : 'ও তো নেই। তুই কীভাবে কথা রক্ষা করবি?'

সেবা উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়াল।

'একি, কোথায় বেরোচ্ছিস এখন?'

'নির্মলদের বাড়ি যাব।'

রাজপথে পড়েই সেবার মনে হল পৃথিবীটা ভয়ানক অসুস্থ এখন। সূর্যের তেজ মুমূর্ষু। ফুটপাথ ধরে শবযাত্রার স্রোত। বাস-এ প্রাণপণ শক্তিতে উঠে পড়ল সেবা। সে কী আবার ঘামতে আরম্ভ করল। রক্ত আবার হিম হয়ে আসছে। আর, সেই হিম হিল কাঁপুনিটা।

আমি কোথাকার টিকিট কাটব। কণ্ডাকটরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে গন্তব্য আমি ভুলে গেছি। আহা, মনে পড়ল। আমি নির্মলদের বাড়ি যাচ্ছি। নির্মলদের বাড়ি। কেন? ওরা কী এতক্ষণে কোনো সূত্রে খবর পেয়ে গেছে। নির্মলের ডেডবডি কী বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এমন যদি হয় ওরা এখনো খবর পায়নি। তাহলে আমি কী করব? সেবা, হঠাৎ এই সময়ে তুমি? এলাম। আসতে নেই বউদি? নির্মল তো বাড়িতে নেই। নেই বুঝি? কোথায় গেছে? ও আজ আপিসে যাবে না? কী জানি ভোরবেলায় কী কাজে বেরিয়ে গেল। তাহলে হয়তো সোজা আপিসে চলে যাবে? তাহলে আমি যাই। কিছু বলতে হবে? অ্যাঁ, না। ও তোমাদের বুঝি সন্ধ্যে-বেলায় অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করা আছে? আমাদের তো আর সুযোগ হল না। আমি চলি বউদি। ওকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

ধ্যেৎ, কী ভেবে যাচ্ছে সেবা। বাসটা ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়েছে।

সত্যি আমি কোথায় যাচ্ছি এখন? নির্মলের বাড়ি। কেন, আমি গিয়ে কী করব? নির্মল নেই। আচ্ছা, নির্মল অত ভোরে কী কাজে বেরিয়েছিল? ও কী জানত খুন হবে।...ও যদি অত সকালে না বেরোত তাহলে বেঁচে যেত।...আমি ওবাড়িতে যেতে পারব না। বরং পাবলিক ফোন থেকে খবর নেই। কাকে ডাকব? বউদিকে? কিন্তু কী বলব? হ্যালো বউদি, একটা জরুরি দরকারে ফোন করছি। নির্মলকে একবার ডেকে দেবেন? না : পারব না। নির্মলকে কোত্থেকে ডেকে দেবে ওরা! আমি তো জানি নির্মল নেই! আশ্চর্য অত ভোরে ও বেরোল কেন? মরবার আগে কী ও জানতে পেরেছিল? মরবার আগে ও কী চিন্তা করছিল? ওর মার কথা, না আমার কথা?...এই রাক্ষোস কী করছ, খোলা ছাদে, একটুও যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, না ছাড়ো, মা এসে পড়বেন, না আমি চোখ খুলব না, কিছুতেই না, কী বলছ, আমার চোখে আলোর সাপ, স্তব কোরো না, নিজেকে বলির পাঁঠার মতো লাগে...

আরে, আমার স্টপ এসে পড়েছে।

ভিড় ঠেলে নেমে পড়ল সেবা।

রাস্তা পার হতে হবে। পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সেবা। গাড়ি, গাড়ি, আর গাড়ি। আবার ঘাম হচ্ছে, শীত-শীত করছে। ট্র্যামরাস্তা পেরিয়ে গলিতে ঢুকে ডানদিকে মোড় নিলেই বাড়িটা।

সেবা অনেক কষ্টে রাস্তা পেরোল।

গলিতে পা দিতেই হোঁচট খেল।

কে? বরেণ না? নির্মলের ভাইপো।

নিদারুণ কাঁপতে লাগল সেবা।

'তুমি।' বরেণ বলল : 'আমাদের বাড়ি যাচ্ছ?'

সেবার দম বন্ধ অবস্থা। কোনোক্রমে বলল : 'হ্যাঁ। কেন?'

বরেণ বলল : 'যাও। আমি আসছি।'

'এই—' বরেণকে থামালো সেবা।

'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, না, মানে—'

'কাকু?'

'অ্যাঁ—'

'বাড়িতে গিয়ে দ্যাখো...'

'অ্যাঁ, কী দেখব?' ভয়ানক নার্ভাস বোধ করল সেবা।

'আছে না বেরিয়ে গেছে বলতে পারব না।'

সেবা বুক উজাড় করে নিশ্বাস ছাড়ল।

'আমি তাহলে যাই, অ্যাঁ—'

'যা, যাবে না কেন?'

'না, তাই বলছি।'

বরেণ হন হন করে ছুটল।

আমি কিছু বুঝতে পারছিনে, সেবা স্বগত উচ্চারণ করল : বরেণ অমন হন হন করে কোথায় ছুটল? কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি কী ফিরে গিয়ে ওকে ধরব? বরেণ কী তার কাছে কিছু গোপন করল? বরেণ কী সব জানে? আমি এখন কী করব? সেবা গলির মোড়ে যেন আটকে পড়েছে। এ বাড়িতে এখনো যদি দুঃসংবাদটা না পৌঁছে থাকে! তাহলে আমাকে কঠিন অভিনয় করে যেতে হবে। আমি কী কোনোদিন অভিনয় করেছি? যদি না পারি, যদি ভেঙে পড়ি। যদি... কেউ কী আমাকে এখন লক্ষ্য করছে? এ-গলিতে অনেকেই আমাকে চেনে। নির্মলের সঙ্গে দেখেছে। কিংবা, এমন যদি হয় দুঃসংবাদ পৌঁছে গেছে, আর আমি হঠাৎ এসে পড়লাম! যোগাযোগটা কী হিসেব-করা মনে হবে না!...তুমি এই সময়ে কী করে এলে? তবে কী আগেই খবর পেয়েছিলে? কে খবর দিলো? আমরা তো...। বিশ্বাস করুন আমি কিছু জানতাম না, রাত্রে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে...। স্বপ্ন? না, মানে...। অসহ্য অসহ্য, সমস্ত শরীরটা যেন ফেটে পড়বে সেবার। পালাব? কিন্তু...বরেণ আমাকে দেখেছে। ও বাড়ি গিয়ে বলবে। কাছাকাছি এসে আমার এই হঠাৎ পলায়ন! না : আমি পালাব কেন, কোথায় পালাব? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।

সাহসভরে এগোল সেবা।

দূরের থেকে ছাই রঙের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। হালে রং করা হয়েছে।

পিছনে গাড়ির হর্ন। চমকে উঠল সেবা। পিছন থেকে পুলিশের গাড়িটা কী তাকে অনুসরণ করেই এসেছে! তবে কী... না। গাড়িটা গলি পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'বউদি—'

'আরে, কী ব্যাপার অনেকদিন পরে।'

'সময় পাইনে।'

'তা পাবে কেন?' বউদি হাসল : 'আসল কাজ তো পাকা।'

সেবা জড়সড় হয়ে খাটে বসল।

'বোসো। চা আনি।'

'খেয়ে এসেছি।'

'আহা। কী ব্যাপার ঠাকুরপোর সঙ্গে কী ঝগড়া করেছ?'

'বউদি—'

'তোমাকে কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। রাত্তিরে ঘুম হয়নি?'

সেবা হাসল। 'অনেকদিন পর দেখছি, ভাই। বউদি—'

বউদি বলল ঃ 'নির্মল কিন্তু বাড়ি নেই।'

সেবা অন্যমনস্ক হল। 'তাই বুঝি? কোথায় গেছে?'

'ও কী বলে যায়? কিছু বলতে হবে এলে?'

'অ্যাঁ!...না। আর কী বলার আছে?'

বউদি ভ্রূ তুলল ঃ 'সব বলা শেষ হয়ে গেছে বুঝি?'

'আমাকে কিছু বললে?' সেবা চমকালো ঈষৎ।

'আজ কলেজ নেই বুঝি?'

'আজ যাব না।'

'তাহলে তাড়া কী। এ বেলা খাওয়া-দাওয়া করে যাবে। ঘন্টেশকে বললে ও ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে আনতে পারে।'

সেবা বলল ঃ 'আজ সময় নেই। একটু কাজ আছে।'

বউদি অবাক হল। 'উঠছ নাকি? মায় সংগে দেখা হয়েছে?'

'উনি তো ঠাকুরঘরে। পরে একদিন আসব।'

সেবা উঠে দাঁড়াল। 'বউদি—'

'কিছু বলবে?'

সেবা মাথা নাড়াল।

'নির্মল এলে বলব।'

সেবা আবার পথে নেমে এল।

কোথায় যাওয়া যায়? কী করব? এ বাড়িতে দুঃসংবাদ এখনো পৌঁছয়নি। আমার কী বলা উচিত ছিল বউদিকে? অন্তত একটা আভাস দেয়া? বউদির মুখ চেয়ে আমি বলতে পারলাম না। বউদি যদি নিজের থেকে সন্দেহ করত, এইভাবে আমার পাগলের মতো ছুটে-আসা থেকেও যদি কিছু অনুমান করত, তাহলে আমার পক্ষে বলা সহজ ছিল। স্পষ্ট করে না বলতে পারলেও আমি কান্নায় ভেঙে পড়তাম!

সেবা ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল।

আপিসযাত্রী বোঝাই ট্রাম-বাস্। ওঠা যাবে না।

আচ্ছা, এই ওষুধের দোকান থেকে একটা ফোন করব? নির্মলের বাবা কী দাদা ফোন ধরবে। কে? কোথা থেকে বলছেন? আমাকে আপনারা চিনতে পারবেন না। হ্যাঁ নির্মলবাবু খুন হয়েছেন...। কী বলছেন? নির্মল খুন হতে যাবে কেন? ও তো কারুর...। আপনার ভুল খবর। আপনারা একবার পুলিশ স্টেশনে খোঁজ করুন। হ্যালো হ্যালো—

না ঃ আমি পারব না, পারব না। আতঙ্কের অন্ধকার বৃত্তে সেবা যেন হারিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত এঁটে অনেকক্ষণ যন্ত্রণাটাকে আটকাল সেবা। একটার পর একটা বোঝাই ট্রাম-বাস্ গড়িয়ে চলেছে। অন্যমনস্ক সেবার হঠাৎ মনে হল ও ফুটপাথ থেকে সিগারেট কিনে নির্মল বুঝি এসে পড়বে!...এত ঘনঘন সিগ্রেট না গিললেই নয়? উপায় কী? না হলে ব্যক্তিত্ব থাকে না! আহা। তোমরা যা করো সব ভালো তাই না? সংসারটা যখন আমাদেরি। হিজ মাস্টারস সারভিস, বুঝলে না? তবু যদি একা থাকতে পারতে! কিশোর বয়েসে একা ছিলাম, যৌবনে একা থাকে পাগলে।

এবার এই বাস্‌টায় উঠতে হয়। নির্মল তুমি কী কৈশোরে ফিরে গেলে? সেই একা থাকার দিনগুলো?...নির্মল নেই, আমি ভাবতে পারছি নে। আমি আছি, নির্মল নেই। নির্মল তুমি যৌবনে একা থাকতে চাওনি!

সেবা বাস্-এ উঠে পড়েছে। মহিলা সীটের দুজন যুবক বিরক্ত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিল। সেবা ধপ্ করে বসে পড়ল। শব্দ করে বাস্ এগিয়ে চলল।

কোনো মানে হয় না, সেবা স্বগত বলল ঃ কলেজে গেলেই হত। মেয়েরা হাঁ করে বসে থাকবে। আমার অনার্স-এর মেয়েরা ভারি ভালো। কী নাম ওর, চন্দনা, ওর সেদিন বিয়ে হয়ে গেল, চিঠি দিয়ে বারবার অনুরোধ করেছিল ঃ দিদি আসবেন কিন্তু।...না যাওয়া হয়ে ওঠেনি। চন্দনা ক্লাসের পর আরো সুন্দর দেখতে হয়েছে কটা বাজল? ইশ্, বারোটা। মা ঘরে আছেন। আমি না গেলে মায় খাওয়া হবে না। মা আলসারের রুগী। মা! আমি কী করে বাড়িতে ফিরব? মা, ভালোবাসা দিয়ে কাউকে রক্ষা করা যায় না। মা...নির্মল.. তোমার চোখে আলোর সাপ...আহা 'তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ'...

'আমি এখানে নামব।' নিজের চিৎকারে নিজেই চমকে উঠল সেবা।

দরজার সম্মুখের সমস্ত বাধাকে ঠেলে দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সেবা।

তারপর দৌড়নোর ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সেবা বলল ঃ 'আমি সেবা মিত্র, আমি স্বীকার করছি, আমি এই লোকটাকে দীর্ঘকাল চিনি, হ্যাঁ এই নির্মল চৌধুরী, সাদার্ণ অ্যাভিনুয়ে বাড়ি, এর বাবা মা দাদা বৌদি...'

থানার অফিসার হেসে বললেন ঃ 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। না, আপনার আর সাহায্যের দরকার হবে না। আমরা এর পরিচয় একটু আগেই পেয়েছি। অনেকদিন থেকে একেই আমরা খুঁজছিলাম। একটা অ্যান্টি-সোশ্যাল, ক্রিমনাল...'

সেবা থরথর করে কাঁপতে লাগল। 'আপনারা ভুল করছেন, সাংঘাতিক ভুল, আমি বলছি ও নির্মল, নির্মল চৌধুরী...'

অফিসার বললেন, 'আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু আমাদের নথিপথ ভুল করে না।'

সেবা কঠিন হয়ে বলল ঃ 'আমি আরেকবার বডিটাকে দেখব।'

'দুঃখিত। লাশটাকে অনেকক্ষণ মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

সেবার চোখের সামনে সবকিছু দুলে উঠল, পা টলতে লাগল, একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার প্রাণপণ প্রয়াসে অবলম্বন হারিয়ে তার অনাবৃহীন দেহটা সিমেন্টের মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের জন্ম

[illegible]
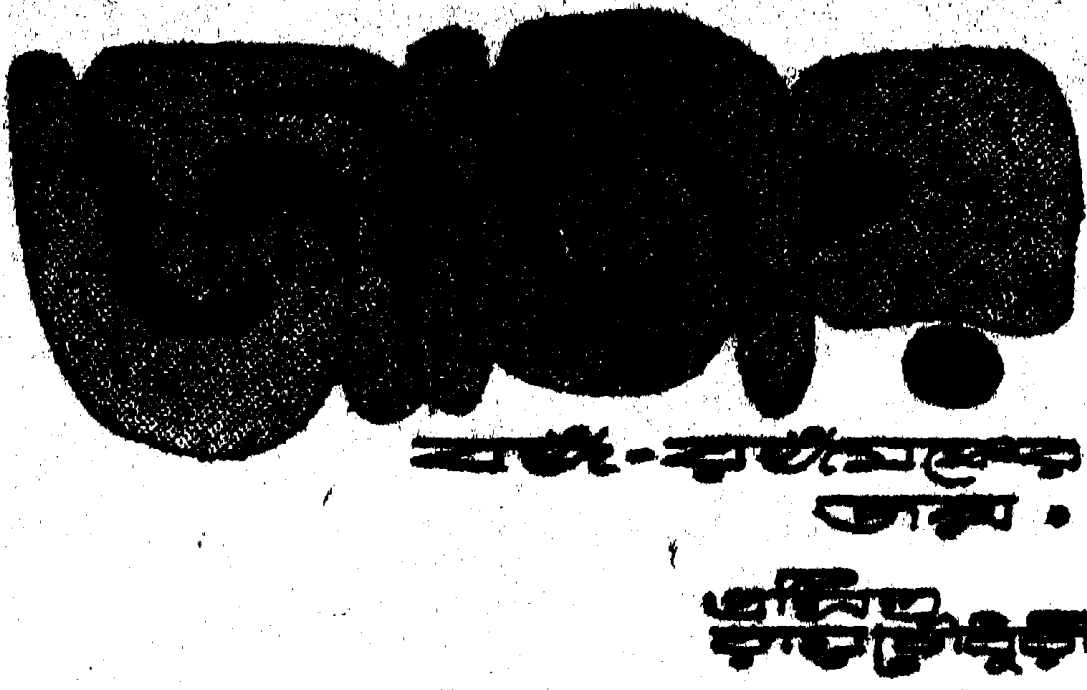
ডিসেম্বর মাসের কনকনে ঠাণ্ডা রাত। শীতটা বেশ জেঁকেই পড়েছে। তবু জোড়াসাঁকোর ৩৬৫ নং অপার চিৎপুর রোডের মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর সামনে লোক জমেছে কিন্তর। লোক আসার বিরামও নেই। ধর কোম্পানীর গ্যাসের আলোয় জায়গাটা ঝলমল করছে। ব্যাপার কি? বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালার আজ দোর খুলছে। লোকে টিকিট কেটে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পনের' অভিনয় দেখবে। অভিনয় করবেন অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী অমৃতলাল বোস প্রভৃতি। নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন। কদিন আগে সারা কলকাতায় প্লাকার্ড পড়েছে। মাত্র।০, ॥০, ১৲ বা ২৲ টাকার টিকিট কিনলেই থিয়েটার দেখতে পাওয়া যাবে। এমন ব্যাপার কলকাতার জীবনে আর ঘটে নি। একেবারে হৈহই রইরই কাণ্ড। হুতোম মিথ্যে বলেন নি—কলকাতা হুজুগের জায়গা। সারা কলকাতা একেবারে ভেঙে পড়েছিল চিৎপুর রোডের সান্যাল বাড়ীর উঠানে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে। তারিখটা ছিল ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খৃস্টাব্দ।

অভিনয় দেখে প্রীত হলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দুঃখ করে বললেন,—উড সাহেবের ভূমিকায় গিরিশ থাকলে কি ভালই না হত।

গিরিশ কে? বাগবাজারের গিরিশ ঘোষ। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। অভিনয়ে প্রবল ঝোঁক। ১৮৬৭ সালে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় দেখিয়ে বেশ নাম করেছেন। দর্শকদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে, ধরলেন 'সধবার একাদশী'। দীনবন্ধু মিত্রের প্রখ্যাত প্রহসন। পোশাক-পরিচ্ছদের বালাই নেই, শুধু থানকয় দৃশ্যপট খাড়া করে নিলেই হবে। ১৮৬৯ সালের অকটোবর মাসে বাগবাজারের মুখুজ্যে পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে স্টেজ তৈরী করে হল সধবার একাদশীর অভিনয়। নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখে নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—গিরিশ, এ নাটক তোমার জন্যই যেন লিখেছিলাম — নিমচাঁদকে তুমি কথার জীবন্ত করেছ। সব্যসাচী অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীকে প্রশংসা করলেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়, বললেন,—'জীবনের অটলকে লাথি মেরে যাওয়া— Improvement on the author

তরুণ সারদাচরণ মিত্র (পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন) সধবার একাদশীতে গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখে লিখেছিলেন—'গিরিশ ঘোষের নিমচাঁদের অভিনয় জীবনে কোন দিন ভুলবো না—তিনি বাংলার নব্য ধরনের নাটকাভিনয়ের স্রষ্টা'। গিরিশ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র মশায়কে যথার্থ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকটি দীনবন্ধুকে উৎসর্গ করে লেখেন—'মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়ের স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।'

গিরিশ ঘোষ কাজ করতেন, এট্‌কিনসন এণ্ড কোম্পানীতে। তাঁর বড় শ্যালক ব্রজনাথ দেব ছিলেন তাঁর বড়বাবু। শ্যালক, ভাগিনীপতি দুজনেই ছিলেন ন্যাটামোদী। দুজনেরই ইচ্ছা বাঙালীর নিজস্ব একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরী করা। যেখানে বাঙালী দর্শক সম্মানের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে নাটকের অভিনয় দেখতে পারে। কলকাতার ধনীদের বাড়ী থিয়েটার হত, সেখানে আমন্ত্রিত হতেন ধনীর বড়লোক আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। সাধারণ ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশের আগ্রহ প্রকাশ করলে দ্বাররক্ষানের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতেন। টিকিট কেটে থিয়েটার দেখার কথা ভাবাই যেত না। অবশ্য ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কলকাতায় এসেছিলেন এক রুশ দেশীয় সাহেব—নাম হেরাসিম্ লেবেডফ্। গোলকনাথ দাস বলে এক বহুভাষাবিদ্ বাঙালীর কাছে লেবেডফ্ বাংলা শেখেন। তিনি ১৮৯৫ কি ৯৬ সালে পুরানো চীনা বাজারের ডোমতলায় গলিতে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে একটা থিয়েটার মঞ্চ তৈরী করেন। Disguise বলে একটা ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করে এই থিয়েটারে অভিনয় করান। টিকিট কেটে বাঙালী দর্শক এই অভিনয় দেখেছিল সাগ্রহে।

তারপর সাহেবদের 'চৌরঙ্গী' ও 'সাঁসুচি' থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলেও সাধারণ বাঙালী সেখানে যেতেন না। কারণ নাটক হত ইংরেজী। তবে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত ধনী সম্ভ্রান্ত বাঙালীরা সেখানে কখনো সখনো যেতেন। সাহেবদের থিয়েটার দেখে ধনী বাঙালীদেরও আগ্রহ হয় নাটক অভিনয়ের।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীন বোস, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নাটকাকারে পরিবর্তিত করে স্বগৃহে অভিনয় করান। কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই দেখা চোখে ব্যাপারটা বেশ নতুন লাগে বৈ কি! তার উপর নাট্যমঞ্চে অভিনেত্রীর আবির্ভাব। নবীন বোসই প্রথম বঙ্গ নাট্যমঞ্চে মহিলা শিল্পীর আমদানি করেন। কিন্তু সেকালের সমাজ এটাকে মেনে নেয় নি। তাই পাথুরেঘাটা কি জোড়াসাঁকোর, বেলগাছিয়া কি সিমলের ধনীগৃহের নাট্যমঞ্চে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষেরাই।

১৮৫৭ সালে, পাথুরে ঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে হল রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুল সর্বস্বের অভিনয়। দেখে চমকে গেল সবাই। তাই তো, বাঙালী নাট্যকারের হাতে মৌলিক নাটকও তো বেশ খোলে! বাংলা নাটক লেখার ধুম পড়ে গেল। মাইকেল লিখলেন শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী—অভিনয়ও হল—বেলগাছিয়া আর শোভাবাজারে। তাঁর প্রহসন দুটি—একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ কিন্তু অভিনয় করতে কেউ সাহস করলেন না।

দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেলের একেই কি বলে সভ্যতার অনুকরণে লেখেন সধবার একাদশী'। এই 'সধবার একাদশী' প্রহসন গিরিশ ঘোষ তাঁর বাগবাজারের অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করিয়ে প্রচুর প্রশংসা পান। উৎসাহ পেয়ে শ্যালক ব্রজবাবুর সহযোগিতায় চাঁদা তুলতে লাগলেন সওদাগরী অফিসের দালালদের কাছ থেকে। উদ্দেশ্য বাঙালীদের জন্য একটা স্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা। শ্যামপুকুরের 'গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের বাড়ীর উঠানে নাট্যমঞ্চ তৈরীর কাজ সুরু হয়ে গেল।

কিন্তু অকস্মাৎ ব্রজবাবুর মৃত্যু হওয়ায় নাট্যমঞ্চ তৈরীর কাজেও ইতি পড়লো। গিরিশবাবুও শোকার্ত হয়ে অভিনয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহ হলেন। এদিকে বাগবাজারের দল দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতীর মহলা দিচ্ছে পরম উৎসাহে—কাশী থেকে এসেছেন অমৃতলাল বোস। অথচ দলের নেতা গিরিশবাবুর আগ্রহ নেই। এমনি সময় সংবাদপত্রে বেরুলো—চুঁচুড়ায় লীলাবতী অভিনয় হচ্ছে, অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আর সাধারণী সম্পাদক অক্ষয় সরকার। লীলাবতী নাটকটিকে কাটছাঁট করে অভিনয়ের উপযোগী করে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। পড়ে উত্তেজিত বাগবাজারের দল ছুটে এল গিরিশবাবুর কাছে। অর্ধেন্দু মুস্তাফী বললেন,—চুঁচুড়ার দলের কাছে হেরে যাব আর তুমি বসে দেখবে? গিরিশবাবুও একান্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, কখনো না—নাট্যকারের একটি কথাও বাদ না দিয়ে অভিনয় করতে হবে, শুধু অভি-

মন্দ নয়, চুঁচুড়ার দলকে অভিনয়ে হারাতে হবে।'

শ্যামবাজারে বৃন্দাবন পাল লেনের রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে নাট্যমঞ্চ তৈরী সুরু হল। গিরিশবাবুর চেষ্টায় ব্রজবাবুর বাড়ী থেকে সংগৃহীত হল তাঁর তৈরী মঞ্চের কাঠ-কাঠরা। ধর্মদাস সুর মঞ্চ তৈরীর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করলেন। এখানি সময়ে বাগবাজার থিয়েটারের লীলাবতীর রিহার্সাল দেখতে আসতেন 'হিন্দুমেলা' খ্যাত নবগোপাল মিত্র। 'ন্যাশানাল পেপারের' সম্পাদক ছিলেন ইনি। সব ব্যাপারে ন্যাশানাল কথাটি চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন বলে লোকে এঁকে ন্যাশানাল নবগোপাল বলতো।

এঁরই প্রস্তাবে বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের নাম বদলে 'দি ক্যালকাটা ন্যাশানাল থিয়েটার' রাখা হয়। পরে অভিনেতা মতিলাল সুরের অনুরোধে ক্যালকাটাকে বাদ দিয়ে শুধু ন্যাশানাল থিয়েটার রাখা হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ন্যাশানাল থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হল লীলাবতী। অভিনয়ে অংশ নিলেন—ললিতের ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ। হরবিলাস ও ঝি—অর্ধেন্দু মুস্তাফী। নদের চাঁদ—যোগেন্দ্র মিত্র। ক্ষিরোদবাসিনী—রাধামাধব কর: মেজোখুড়ো—মতিলাল সুর আর ভোলানাথ—মহেন্দ্র বসু।

অমৃত বোস 'যোগজীবনের' ভূমিকায় মহলা দিচ্ছিলেন কিন্তু কাশীর ডাঃ লোকনাথ মৈত্র এসে তাঁকে কাশীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এ যাত্রা আর তিনি অভিনয়ে যোগ দিতে পারেন নি।

নাট্যকার দীনবন্ধু এসেছিলেন অভিনয় দেখতে। ড্রপসিন পড়তে না পড়তেই স্টেজে এসে হাততালি দিয়ে কৌতুক হাস্যে বললেন 'এবার চিঠি লিখবো—দুয়ো বঙ্কিম।' সাঁত্য অতুলনীয় অভিনয় করেছিলেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দু শেখর আর যোগেন্দ্র মিত্র।

ইতিমধ্যে কলকাতায় এল এক বিলাতী ভ্রাম্যমাণ নাটুকে দল। এঁরা অভিনয় করলেন গড়ের মাঠের কাঠের থিয়েটারে। গড়ের মাঠের এই নাট্যশালাটি তৈরী করে দিয়েছিলেন লুলতামা বোলে নামে এক ব্যক্তি। শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখতে এখানে ভীড় করেন।

প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু অতীতের স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে লিখেছেন,—'গড়ের মাঠের এই কাঠের বাড়ীটিকে আমরা 'ড্রুরি লেনের কনভেন্ট গার্ডেনের প্রতিবিম্ব ভাবিতাম। আর অভিনেতা এলেন, লুইশ, ক্যারি জর্জ প্রভৃতিকে কীন, ক্যাম্বল, গ্যারিক, সিডনসদের প্রতিনিধি ভাবিতাম।'

এই নাটুকে দলের অভিনয় ও মঞ্চসজ্জা তরুণ অভিনেতাদের প্রেরণার কাজ করেছিল। এর উপর 'লীলাবতীর' অভিনয়ে সারা দেশে সাড়া পড়ে গেল। ন্যাশানাল থিয়েটার ঠিক করলেন এবার তাঁরা দীনবন্ধুর বিখ্যাত নাটক নীলদর্পণের অভিনয় করবেন। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করে মাইকেল সাহেবদের কাছে নিগৃহীত ও তিরস্কৃত হয়েছিলেন আর তাঁর অনুদিত গ্রন্থ প্রকাশ করে রেভারেণ্ড লঙ্ এর কারাবাস হয়েছিল। সাহেবদের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের বিদ্রোহের ভিত্তিতে নাটকটি লেখা। কাজেই তরুণ অভিনেতারা খুব উৎসাহের সঙ্গে রিহার্সাল দিতে সুরু করলেন। বাগবাজারের ভুবন নিয়োগী গঙ্গার অন্নপূর্ণাঘাটের উপর তাঁর বৈঠকখানা এদের ছেড়ে দিলেন মহলার জন্য।

কিন্তু অতর্কিতে একটা কারণে বাধা এসে উপস্থিত হল। অভিনেতাদের কেউ কেউ বললেন,—চাঁদা তুলে থিয়েটারের খরচা ওঠে না, কাজেই টিকিট বিক্রী করে খরচা তোলা হোক। কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। কিন্তু দলের নেতা গিরিশচন্দ্রই প্রতিবাদ করলেন—বললেন, না, টিকিট বিক্রী করে অভিনয় করার সময় এখনও হয়নি। এই মঞ্চের জাতীয় নাট্যশালা নাম বটে কিন্তু এর সাজ-পোষাক, সরঞ্জাম অতি সামান্য—এই দীনমূর্তির রঙ্গমঞ্চে পয়সা নিয়ে অভিনয় দেখালে সেটা ভিক্ষা গ্রহণের সামিল হবে- সাধারণের মধ্যে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হবে। আগে রঙ্গমঞ্চের মঞ্চসজ্জার যথেষ্ট উন্নতি হোক তারপর টিকিট বিক্রীর কথা চিন্তা করা যাবে। কিন্তু অতি উৎসাহী কয়েকজন অভিনেতা দলনেতা গিরিশচন্দ্রের কথা শুনতে রাজি হলেন না। সুতরাং স্বাধীনচেতা গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রাণপ্রিয় ন্যাশানাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন।

'নীলদর্পণে' সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় মহলা দিচ্ছিলেন রাধামাধব কর। গিরিশবাবুর সহিত তিনিও ন্যাশানাল থিয়েটার ছেড়েছিলেন। দলের নতুন পরিচালক অর্ধেন্দু মুস্তাফী পড়লেন বিপদে। ইতিমধ্যে কাশী থেকে অমৃত বোস এসেছিলেন কলকাতায়। অমৃতবাবু ছিলেন অর্ধেন্দু মুস্তাফীর সহপাঠী। বন্ধুর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে 'সৈরিন্ধ্রীর' ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হন।

চিৎপুরের সান্যাল বাড়ীর উঠান মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে স্টেজ তৈরী সুরু হল। আর্ট স্কুলের ছাত্র ও ন্যাশানালের অভিনেতা ক্ষেত্র গাঙ্গুলী আর ধর্মদাস সুর আপ্রাণ খেটে নাটমঞ্চ তৈরী করলেন।

প্ল্যাকার্ড ছাপানো হল। অভিনেতাগ নিজেরাই বেরুলেন মই ঘাড়ে করে সারা কলকাতায় প্লাকার্ড মারতে। পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু কৌতুক ভরে সেই সব দিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন,—

তাই দেখিয়াছে লোক লাল দীঘি ধারে.
প্লাকার্ড ম' য়েতে উঠে ভূনিবাবু মারে।

ভূণিবাবুই অমৃতলাল বসু।

১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ লোকে টিকিট কেটে জাতীয় নাট্যশালায় নীলদর্পণের অভিনয় দেখে গেল। ন্যাশানাল থিয়েটার লীলাবতীর আমলে ছিল প্রাইভেট থিয়েটার—এখন থেকে হল পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয়।

গিরিশচন্দ্রকে তাঁর ভক্তশিষ্যেরা বেশী-দিন দূরে থাকতে দেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তা অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র নাট্যশালার মাধ্যমে কেমন করে জাতীয় ভাব ও দেশপ্রেমের স্ফুরণ ঘটিয়ে দিলেন তা আরেক কাহিনী।

গিরিশচন্দ্রের আহ্বানেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদধূলিতে বাংলার নাটমঞ্চ পবিত্র হয়েছিল।

অঙ্গনা

খাওয়াদাওয়া এক সমস্যা
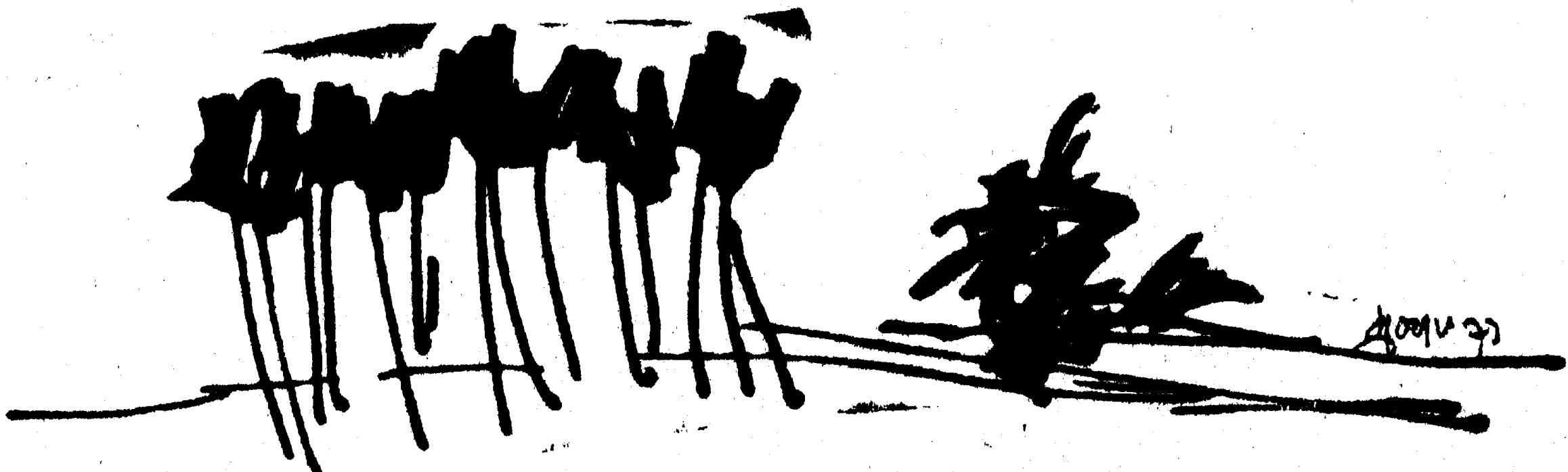
আমাদের দেশের ঋষিবাক্য : ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। সোজা কথা হলো যে দেহযন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে হবে এবং সে জন্যেই দরকার হলে ধার-দেনা করেও খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন অবহেলা চলবে না। অবহেলা হলে আর কোন কথা নেই, কোন মার্জনা নেই, দেহযন্ত্র বিগড়ে বসবে। আর দেহ যদি বিগড়ে বসে তবে বেঁচে থাকাই অর্থহীন। ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই তখন বরণীয়। তাই যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সুস্থ-সবল দেহে টান টান হয়ে বাঁচবো। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কম খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ তেমনি বেশি খাওয়াও শরীরের পক্ষে সহায়ক নয়। বরং কম খাওয়া তবু ভালো কিন্তু বেশি খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা আছে 'কম খাবি তো বেশি খা আর বেশি খাবি তো কম খা।' তার মানে অল্প দিন বাঁচার ইচ্ছে থাকলে বেশি খাও কিন্তু যদি বেশি দিন বাঁচতে চাও তবে কম মানে নিয়মিত খাবে। খাবার সময়, খাদ্য এবং খাদ্যগুণ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেহযন্ত্রকে সচল রাখতে গ্রহণীয় খাদ্যের ক্রিয়া ত্রিবিধ : দেহের বৃদ্ধিসাধন, শরীরে শক্তি জোগান এবং সক্রিয়তা বজায় রাখা।

দেহের বৃদ্ধির পক্ষে প্রোটিন অত্যাবশ্যক। চর্বি, কার্বোহাইড্রেটস এবং খনিজ পদার্থও এ-কাজে প্রোটিনের সহায়তা করে। শরীরের কোন অংশে কতটুকু প্রোটিন দরকার তা নির্ভর করে দেহযন্ত্রের পক্ষে সেই অংশের প্রয়োজনীয়তার উপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে দেহের অস্থি নির্মাণে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বেশি। প্রায় সব কিছুতেই প্রোটিন আছে। কিন্তু সর্বত্র সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে প্রোটিনের মাত্রাও ভিন্ন। প্রাণী এবং প্রাণী-জাত দ্রব্যে প্রোটিনের মাত্রা বেশি। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে এবং দেহের গঠনের পক্ষে এইসব দ্রব্য খুবই কার্যকরী। আর একটি জিনিসে প্রচুর প্রোটিন আছে তা হলো ডাল। স্বাস্থ্য এবং স্বাদ এই দুই দিক থেকেই ডাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাল এখন আমাদের প্রায় নিত্য আহার্যের তালিকায়। আর নিরামিষভোজীর পক্ষে প্রোটিনের প্রধান উৎস হলো ডাল। আজকের মাগগি-গন্ডার দিনে নিরামিষ এবং আমিষভোজীর কাছে ডাল সমান গুরুত্বপূর্ণ। মাছ, মাংস, ডিম এমনিতেই দামে চড়া এবং এ-সব জিনিস রোজ সাধারণ গৃহীর পক্ষে সংগ্রহ করাও দুষ্কর। প্রোটিনের এই অপূর্ণতায় ডাল আমাদের খুবই সহায়ক। কেউ কেউ আবার এমন কথাও বলে থাকেন যে ডালে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে। তবে একথা ঠিক যে, গমের তুলনায় ডালে দ্বিগুণ প্রোটিন আছে। এছাড়া চাউল, গম, জোয়ার, বাজরা এবং ভুট্টার মধ্যে যথেষ্ট প্রোটিন আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আনাজপাতি কুটতে গিয়ে আমরা অনেক প্রোটিন নষ্ট করে ফেলি। কারণ, আনাজের খোসায় ভেতরের তুলনায় এই পদার্থটি বেশি থাকে। এমনিতেই অবশ্য আনাজ এবং ফলফলাদিতে এর মাত্রা সামান্য।

খাবার দাবারে যদি প্রোটিনের মাত্রা কম থাকে তবে দেহের বাড়বৃদ্ধি বাধা পায়। রেলইঞ্জিনে কয়লা না পড়লে যে অবস্থা প্রোটিনের অভাবে আমাদের শরীরের দশাও তেমনি। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, কার্য-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং কোন কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় না। তাই এ সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন একটি উপাদানের যেন কোন রকমেই ঘাটতি না পড়ে। এই পদার্থটির অভাব ঘটলে শরীর যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে তেমনি দুর্বল শরীর হয়ে ওঠে রোগের ডিপো—দেশ এবং জাতির পক্ষে যা চরম অকল্যাণকর। তাই বিশেষভাবে শিশুর খাওয়া এবং খাবার-দাবার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। দেহবৃদ্ধির এই প্রধান উপকরণটির অভাব হলে তাদের দেহের পুষ্টিসাধন হবে না এবং তার খেসারত দিতে হবে সমগ্র জাতিকে। এদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে যুবক-যুবতীদের তুলনায় শিশুর প্রোটিনের দরকার সবচেয়ে বেশি। আর এ জন্যই সন্তান-ধারণের আগে ও পরে মায়েদের প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ভেষজ প্রোটিনের তুলনায় প্রাণিজাত প্রোটিন সহজপাচ্য। দুধ থেকে মাখন তুলে নেওয়ার পর প্রোটিনের ব্যাপারে কোন গুণগত পার্থক্য হয় না।

শরীরে শক্তি জোগায় কার্বো-হাইড্রেটস। প্রোটিনও শক্তি জোগায় এবং কার্বোহাইড্রেট কম পড়লে তখন প্রোটিনই ভরসা। তবে স্নেহজাত পদার্থ প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে বেশি শক্তি জোগায়। দুধ, ঘি, মাখন, পনীর প্রভৃতি হলো স্নেহ পদার্থ। প্রাণী জগৎ থেকে পাওয়া স্নেহ পদার্থ ভেষজ স্নেহ পদার্থের তুলনায় অনেক হিতকর। প্রাণিজগৎ থেকে যে স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায় তাতে ভিটামিন 'এ' থাকে কিন্তু ভেষজ স্নেহ পদার্থে এই ভিটামিন থাকে না। স্নেহ-পদার্থ শরীরে শক্তি জোগায় নিঃসন্দেহে কিন্তু এটি সহজপাচ্য নয়। সে জন্য এই পদার্থ খুব বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে এটি বাদ দিলে চলবে না। খুব একটা ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকলেও মোটামুটিভাবে সারা দিন রাত্তিরের খাবার-দাবারে চল্লিশ থেকে ষাট গ্রাম স্নেহ পদার্থ থাকা সুস্বাস্থ্যের দিক থেকে একান্ত দরকার।

শক্তিপ্রদানকারী পদার্থের মধ্যে কার্বো-হাইড্রেটের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরে শক্তি জোগায়। আনাজ-পাতিতে এই পদার্থ খুব বেশি পাওয়া যায়। এই পদার্থ সহজে পাওয়া যায় বলে আমাদের খাদ্যে এর খুব প্রাচুর্য। খাদ্যে যদি এই পদার্থের প্রাচুর্য ঘটে তা হলেও খুব একটা ক্ষতি হয় না। বরং উপকারই হয়। দেহে শক্তি জোগান দেওয়া হলো এর আসল কাজ। তাই সব বয়সেই কার্বো-হাইড্রেট উপযোগী। বাচ্চাদের বেলায় কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে প্রোটিনের গুরুত্ব অনেক অপূর্ণতা দূর করে দেয়। তাই বড়ো বয়সে কার্বোহাইড্রেটের প্রাচুর্য চললেও সব বয়সে তা চলবে না। অল্প বয়সে খাদ্যে এই পদার্থ বেশি হলে নানা-রকম গোলযোগ দেখা দেয়। সে জন্য লক্ষ্য রাখা দরকার যে, প্রোটিন থেকে আহৃত খাদ্যগুণের পর যে ঘাটতিটুকু থাকবে কার্বোহাইড্রেট একমাত্র তাই পূরণ করবে।

শরীরকে সক্রিয় রাখার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খনিজ লবণ। এর অভাবে শরীর যথাযথ কাজ করতে পারে না অর্থাৎ সক্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায়। খনিজ লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং লোহ হচ্ছে প্রধান। পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং সোডিয়ামও শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এ-সব লবণ খাদ্যদ্রব্যে পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম বেশি পাওয়া যায় দুধ, পনীর, শাকসব্জী এবং আমিষে। সকলের পক্ষেই ক্যালসিয়াম বিশেষ হিতকর। কাঁচা জিনিসে ফসফরাস পাওয়া যায়। কিন্তু পাকলে পর এই লবণের মাত্রা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের অভাবে হাড়েরা কেমন যেন শুকিয়ে যায়। ফলে তার গঠন ক্রিয়া বিশেষভাবে বাধা পায়। শিশু ক্ষয়রোগী হয়ে পড়ে। এই রোগ অবশ্য ভিটামিন ডি-এর অভাবেও হতে পারে।

শরীরের পক্ষে লৌহ হচ্ছে পরম প্রয়োজনীয় উপাদান। রক্তের লাল রক্তের হিমোগ্লোবিন এই লৌহ থেকেই উৎপন্ন হয়। লৌহের অভাবে হিমোগ্লোবিন হ্রাস পায় এবং অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। রক্তের এই লাল অংশ শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ায় সাহায্য করে। মাংস, ডাল, টমাটো, পালং শাক, গম প্রভৃতিতে লৌহ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। রক্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় লৌহ শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শরীর অসুস্থ হলে লৌহযুক্ত খাদ্য বেশি গ্রহণ করা উচিত। কারণ, রক্তের জোর থাকলে রোগ সহজেই কাবু হয়ে যায়। এ জন্যই দেখা যায় যে রক্তের তেজ শরীরে বেশি হলে রোগাক্রমণ সহজে ঘটে না।

শরীরের পক্ষে আর একটি দরকারী জিনিস হলো ভিটামিন। ভিটামিনের প্রয়োজন মাত্রায় খুব বেশি না হলেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। ভিটামিন শরীরকে নানাভাবে সক্রিয় রাখে। ভিটামিন নানা প্রকার। প্রত্যেকটি ভিটামিন শরীরের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন-এ পাওয়া যায় দুধ, ঘি, মাখন, ডিম এবং মাছের তেলে। গাজর, আম প্রভৃতি ফলে এই ভিটামিন আছে। ঘি, মাখন বা ডিম না খেতে পারলে গাজর এবং আম সেই অভাব পূরণ করে। ভিটামিন-এর অভাবে দৃষ্টিবিভ্রম জাতীয় রোগ হয়। এ জন্য স্কুল-কলেজে যে-সব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে তাদের এই ভিটামিন প্রয়োজনীয় মাত্রায় সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ-ছাড়াও কয়েকটি রোগ দেখা দেয় এই ভিটামিনের অভাবে। রাতে ঠিকমতো চোখে দেখা যায় না, বেশি আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়, চোখে ছানি পড়ে যায়। চোখের রোগে তাই ঘি, মাখন বেশি মাত্রায় খাবার নির্দেশ আছে। ইদানীং কি ছেলে, কি বুড়ো সবাইকে চোখের রোগে ভুগতে দেখা যায়। এর কারণ এই ভিটামিনের অভাব। আবার আমাদের অজ্ঞতাবশত এই ভিটামিন প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। ঘি বেশি গরম করলে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গরুর দুধের ঘিয়ে মোষের দুধের ঘিয়ের তুলনায় বেশি ভিটামিন থাকে। মাথা যাঁরা ঘামান তাঁদের পক্ষে এই ভিটামিন প্রায় ত্রাণকর্তা। ঘি নিয়ে অনেক কথা বলা হলো অবশ্য কিন্তু খাঁটি ঘি পাওয়া আজকের দিনে মুশকিল। তাই ঘি বাদ দিয়ে অন্য জিনিস থেকে এই ভিটামিনের অভাব মিটিয়ে নিতে হবে।

সব ভিটামিনই আমাদের শরীরকে নানারকম রোগাক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়। এদিক থেকে ভিটামিন বি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ভিটামিনের অভাবে বেরি-বেরি, হাত-পায়ের রোগ, পেটের অসুখ প্রভৃতি নানা রোগ হয়। ভিটামিন বি পাওয়া যায় দুধ, সবজি, ফলমূলে প্রভৃতিতে। মাছ-মাংস-ডিমের কথা বলাই বাহুল্য। ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল এবং আ-চালা আটায় ভিটামিন বি প্রচুর পাওয়া যায়। বেশি গরম করলে বা অনেকক্ষণ জ্বাল দিলে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

এর পর ভিটামিন সি। রোগাক্রমণের হাত থেকে এই ভিটামিনও কম বাঁচায় না। এর অভাবে হাড়, দাঁত, মাড়ি সব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগাক্রমণে সহায়তা করে। হাড়ের অস্থিসন্ধিতে রোগ বাসা বাঁধে এবং সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে। মাড়ি থেকে পুঁজ এবং রক্ত পড়ে। এই ভিটামিনের অভাবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় দাঁত। পায়োরিয়া হয় এই ভিটামিনের অভাবহেতু। ভিটামিন সি কিন্তু মোটামুটি সহজলভ্য। পেয়ারা, কাঁচা লঙ্কা, লেবু, টমাটো, অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতিতে এই ভিটামিনের অবস্থান। এই ভিটামিনের আর এক ভাণ্ডার হলো আমলকী। আমলকী শুকিয়ে গেলেও ভিটামিন নষ্ট হয় না। অন্য ফলের বেলায় কিন্তু এই নিয়ম খাটে না। ভিটামিন বি-এর মতো এই ভিটামিন আগুনের সংস্পর্শে এলে খুব হ্রাস পায়।

আর একটি ভিটামিন হলো ডি। মাছের লিভার অর্থাৎ তেলে এই ভিটামিন সুপ্রচুর থাকে। বাচ্চাদের পক্ষে এই তেল খুব হিতকর। এই ভিটামিনের অভাবে বাচ্চাদের বাড়-বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ডিম, দুধ, ঘি প্রভৃতিতেও এই ভিটামিন আছে। এছাড়া রোদ থেকে আমরা এই ভিটামিন সরাসরি দেহে গ্রহণ করতে পারি। এই ভিটামিন গর্ভবতী রমণীর পক্ষে একান্ত হিতকর। এই ভিটামিনের অভাবে বাচ্চা রুগ্ন হয় এবং সব সময় নানা রোগাক্রমণের আশংকা থাকে। বাচ্চার শরীর শুকিয়ে যেতে পারে এই ভিটামিনের অভাবে। এই ভিটামিন শরীরের মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস পৌঁছে হাড় মজবুত করতে খুবই সাহায্য করে।

ভোজ্যদ্রব্যের মাত্রার উপর শরীর নির্ভর করে না, একথা সকলকে মনে রাখতে হবে। শরীরের পক্ষে যতটা প্রয়োজন ততটাই খেতে হবে আর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ তাতে আছে কিনা। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে মুটে-মজুরের শরীর এমন মজবুত অথচ আমাদের শরীরের এমন হাল কেন? একথা সত্যি নয় যে মুটেমজুররা আমাদের চেয়ে ভাল খাওয়া-দাওয়া করে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ওদের যে পরিমাণ ক্যালরির প্রয়োজন তার চেয়ে ওরা অনেক কম পায় তা সত্ত্বেও মজুরদের দেহ পেশল হয়। এর আসল কারণ হলো কায়িক শ্রম। এই কায়িক শ্রমের অভাবে আমাদের খাদ্য সহজে হজম হয় না এবং শরীর গঠনে সহায়ক হয় না। এর ফলে আমরা রোগে ভুগি। আবার অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে এবং কায়িক শ্রম না করায় প্রায়ই আমাদের শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়। তখন এই চর্বি কমানো এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ এই চর্বির হাত থেকে বাঁচার জন্য ইচ্ছে মতো খাওয়া কমিয়ে বসে থাকে। এর ফল হয় বিপরীত। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ওজন কমে যায়। এভাবে নিজের ডাক্তারি নিজে করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের ক্ষতি করেন। শরীর ঠিক রাখতে হলে চাই প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং সুষম। খুব বেশি খাওয়ার দরকার যেমন নেই তেমনি কম খাওয়াও ক্ষতিকর। শরীর টিপটপ রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম দরকার। যাঁরা কায়িক পরিশ্রম করেন না তাঁদের পক্ষে ব্যায়াম অভ্যাস ছাড়া শরীর সুগঠিত করা এবং আয়ত্তে রাখা সম্ভব নয়। ইদানীং অবশ্য মেয়েরা এদিকে ঝুঁকেছেন।

পুরুষ বাজার করে এনে দিয়েই খালাস। যত সব ঝক্কি ঝামেলা মেয়েদের। এই দুর্মূল্যের বাজারে সব পাতে ঠিকমতো পরিবেশন করা এক বিরাট সমস্যা। তাই বাজার আসার পর অনেক গিন্নিকেই দেখা যায় যে গালে হাত দিয়ে ভাবছেন কিভাবে কি করবেন। তারপর এই সুষম আহারের ফিরিস্তি। তিনি হয়তো রেগে আগুন হবেন। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখবেন যে, হাতের কাছেই সুষম খাদ্য হাজির। শুধু একটু ভেবেচিন্তে পরিবেশন করা দরকার। মাছ-মাংস-ডিম রোজ দরকার নেই। ডাল আছে, তাতে সব শূন্য স্থান পূরণ হয়ে যাবে। আর এই শীতকালে আনাজপাতির খুব একটা অসুবিধা নেই। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার সমস্যাটা চেষ্টা করলে সমাধান মিলতে পারে।—আপনারা কি বলেন?

—প্রমীলা
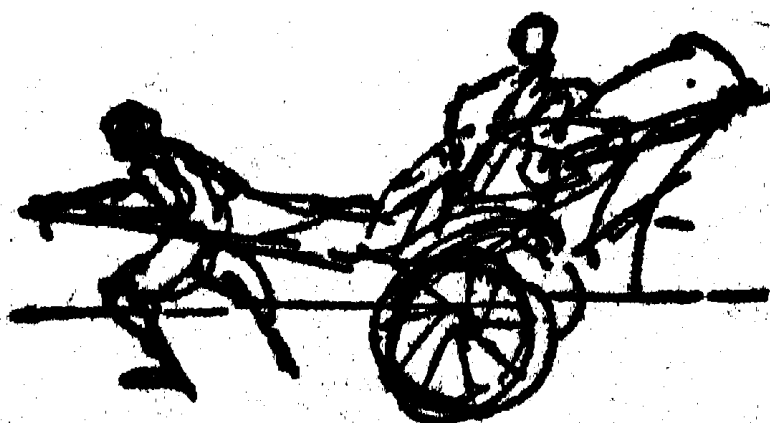
একটি প্রাচীন লোককলা

অঞ্জলি চৌধুরী

বাংলাদেশের লোকশিল্প, লোকসংগীত এ-সবের সঙ্গে আমরা এখন আর ওতপ্রোতভাবে জড়িত নই। অবশ্য লোকশিল্প বা লোককলা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। তবুও বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবন ধারণের ক্লান্তিকর যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে বাংলার লোককলাকে আঁকড়ে ধরে রাখার মত অবসর খুব অল্পই আছে। নানাবিধ প্রাচীন লোককলার মধ্যে আলপনার ব্যবহার আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে।

আলিম্পন বা আলপনা শিল্প বাংলার এক সুপরিচিত প্রাচীন লোককলা। এই লোককলার সঙ্গে বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরাই বিশেষভাবে পরিচিত, কারণ পারিবারিক ধারাকে বহুলাংশে অনুসরণ করে আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে। মা, দিদিমা ও ঠাকুরমাদের কাছ থেকে ক্রমশঃ উত্তরাধিকারীসূত্রে মেয়েরা এ শিল্প আয়ত্ত করে থাকেন।

এই লোককলার নিজস্ব একটা ঢং আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, আছে ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক মূল্য। হিন্দুদের কোন পূজা-পার্বন, ব্রত, বিয়ে, অন্নপ্রাশন এককথায় প্রতিটি উৎসবেই এর গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে অতি নিপুণভাবে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোন না কোন বিষয়কে এই আলপনার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, ধানের ছড়া আর লক্ষ্মীদেবীর পদদ্বয়কে লক্ষ্মীপূজার আলপনায় স্থান দেওয়া হয়েছে। মা-ভগবতী দুর্গতিহারিণী দশভুজারূপে অসুরকে বিনাশ করেছেন। তিনিই আবার জগদ্ধাত্রীরূপে জগতকে পালন করছেন। চতুর্ভুজা এই সিংহবাহিনী দেবী রক্তবর্ণবস্ত্র পরিহিতা প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর উপবেশন করেন। তাই এই দেবীর আরাধনা করতে কুলবধূগণ শুভ্র শতদল পদ্ম অঙ্কন করেন। পূজা-পার্বন, ব্রত হল মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা মনস্কামনার রূপ কিন্তু আলপনা তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর ছবি।

একটি মূল পদ্মের ভিতরের অংশ

আলপনা গৃহস্থের বাড়ী, পূজামণ্ডপ প্রভৃতিকে অল্প খরচে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মনোরম করে তোলে ও পরিবেশকে করে পবিত্র। আলপনার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন প্রকার মাঙ্গলিক চিত্র আঁকা যায়। দেবদেবীর পূজার স্থান চিত্রিত না হলে ঘট স্থাপন করা যায় না। প্রথমেই আলপনা দেওয়ার স্থানটিকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। পরে আতপ চালের পিঠুলি গোলায় একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে আলপনার রেখা টানা হয়।

কলমি লতা

শঙ্খ লতা

খুন্তি লতা

সাধারণতঃ মোটা দাগ কাটার সময় বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে টানতে হয়। ন্যাকড়া ছাড়া তুলো দিয়ে আলপনা দেওয়া চলে। বর্তমানকালে অবশ্য বড় বড় অনুষ্ঠানে জিঙ্ক অক্সাইড গুলে তুলি দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। তুলি দিয়ে আলপনা দিতে দক্ষ হাতের দরকার। কোথায়ও কোথায়ও শুধু সাদা রং-এ আলপনা না এঁকে নানা রং দিয়েও আলপনার জমি ভরাট করা হয়। রঙীন আলপনায় ইওলো অকার, ইণ্ডিয়ান রেড, গ্রীন এই তিন রং-এরই বেশী ব্যবহার আছে। বহুল রং-এর আলপনা দেখতে অনেক জমকালো।

আলপনা দিতে স্কুল কলেজে শিক্ষানবিশীর দরকার হয় না। আলপনা মনের কামনাকে রূপ দেবার এক বাহ্যিক আকৃতি। স্কুল কলেজের শিক্ষিতদের আলপনা দিতে গিয়ে মনের ভাবকে প্রকাশ করতে অনেক ভাবতে হয় কিন্তু কোন রকম শিক্ষা ছাড়াই অনেকে স্বচ্ছন্দে মনের চিন্তাকে আলপনায় রূপ দিতে পারেন। কোন রকম ব্যাকরণ না জেনে ঠিক ঠিক জিনিসের সহজ চেহারাটির ছাপ দিতে তাদের দক্ষতা ও নিপুণতার কোন সংশয় নেই। যেমন সুবচনীর হাঁস, সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় গাছ, মানুষ, পাখী তাঁরা অল্প কয়েকটি আঁচড়েই এঁকে দেন। মানুষের মনের তীব্র আবেগ যদিও শিল্প সৃষ্টি করে অবশ্য আবেগের বশে সৃষ্ট সব জিনিসই শিল্প হয় না। তবুও তাঁরা যখন নানারকম পদ্মের (বাস্তব ও কল্পনা মিশ্রিত) এবং বহুবিধ লতা (শঙ্খলতা, খুন্তিলতা, কলমিলতা ইত্যাদি) মিলিয়ে এক একটি আলপনার জন্ম দেন তা শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিন্দু থেকেই বিরাট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। সেইজন্য বিন্দুকে কেন্দ্র করেই আলপনার সৃষ্টি। আলপনার বৃত্ত বিন্দু হতেই উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য আলপনা কেবলমাত্র বৃত্তাকারেই দেওয়া হয় না। বৃত্তাকার, চৌক, ত্রিকোণ উপরন্তু যদি কোন বস্তুর পাশে বা সামনে আলপনা দিলে সাধারণতঃ তার আকারকে কেন্দ্র করেই দেওয়া হয়। আজকাল কোন কোন বাড়ীতে বসবার ঘরে, ফুলদানির চারপাশে, সিঁড়ির কোণে কোণে আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে। এতে অল্প ব্যয়ে যেমন সুন্দর রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি সুষ্ঠু পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়। আলপনা দিতে গিয়ে পুরনো ঢংকে হুবহু নকল করতে আজকাল আর কেউ পছন্দ করেন না। অজন্তার ডিজাইনেও আলপনা দেবার চলন দিনদিন বেড়েই চলেছে। তবে বিয়ে, পূজা-পার্বন (গৃহদ্বারে মঙ্গলকলসী), চরণপদ্ম (লক্ষ্মী পূজায়), শতদল পদ্ম (শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজায়) অষ্টদলপদ্ম (কার্তিক পূজায়), মীন পদ্ম, অষ্ট কলসী, শঙ্খপদ্ম, মঙ্গল পদ্ম (বিবাহের যে কোন মাঙ্গলিক উৎসবে) প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আজকালও অনেকে প্রাচীনপন্থী হতেই ভালবাসেন।

গৌতম চিত্রের জীবনটাই নাটক চিত্রে আরতি ভট্টাচার্য
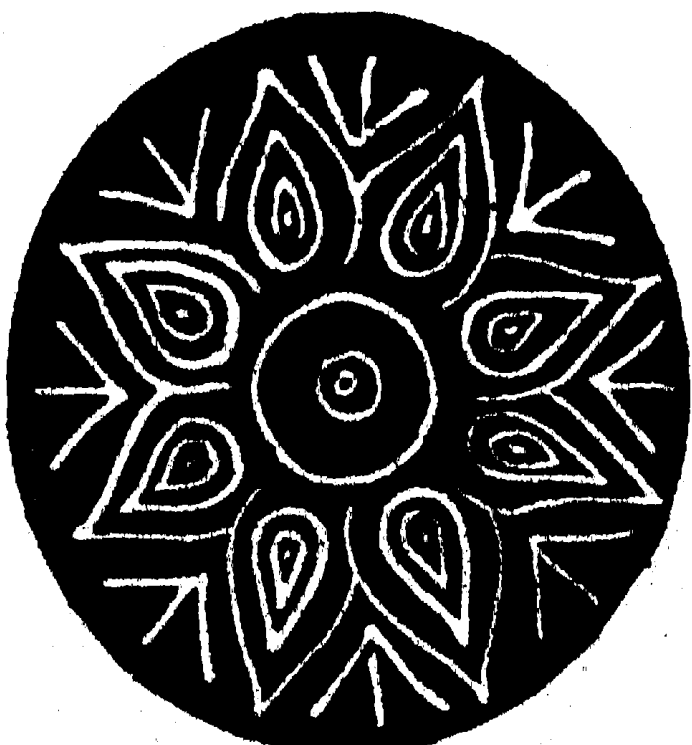
একদা, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে বাঙলা দেশ বলতে পশ্চিম ও পূর্ব—উভয় বঙ্গকেই বোঝাতো। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বলে জন্ম নিল ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান। কিন্তু ভারী মজার রাজ্য এই পাকিস্তান—একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এর অবস্থিতি সম্ভব হ'ল না; পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মাঝে নিম্নতম ব্যবধান রইল ১,২০০ মাইল। ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্য, বোধ করি, এই প্রথম জন্ম নিল পৃথিবীর বুকে। কিন্তু ধর্মান্ধতা মানুষের বাস্তববোধকে বিনষ্ট করতে পারে না। তাই পূর্বপাকিস্তানবাসীরা যেদিন বুঝতে পারল, তাদের চোখে ধর্মের ঠুলি এ'টে দিয়ে ও 'ভারত আমাদের চিরশত্রু'—এই শ্লোগানকে জীইয়ে রেখে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ তাদের দিনের পর দিন সর্ব দিক দিয়ে নিঃস্ব করে তুলছে, সেই দিনই তারা বে'কে বসল এবং প্রথমে ভাষা আন্দোলন দিয়ে শুরু ক'রে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড নিগ্রহ সহ্য ক'রে নিজেদের স্বাধীনতাকে কায়েম করল। সত্য বটে, ভারত তাদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে মদত দিয়েছে, কিন্তু সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানবাসী একান্ত হয়ে চরম লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়ে ও রক্ত-প্লাবনে স্নান ক'রে অর্জন করেছে তাদের একান্ত বাঞ্ছিত স্বাধীনতা। তাই তারা পাকিস্তান নামটিকে সজোরে ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের বাসভূমের নবনামকরণ করেছে—বাঙলা দেশ।

আমরা যে-রাজ্যে বাস করি, তার নাম রয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ—শুধুই পশ্চিমবঙ্গ এবং আমাদের রাজ্য বাঙলা দেশ থেকে আলাদা। 'ও আমার সোনার বাঙলা' বলতে এখন থেকে শুধুই বোঝাবে নবজাত রাজ্য বাঙলা দেশকে, আমরা থাকব তার বাইরে পড়ে। কিন্তু এপার বাঙলা, ওপার বাঙলার মধ্যে থেকে গেল আত্মিক যোগাযোগ, ভাষা ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য বন্ধন। কোনো রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণ কমিটি এই যোগকে কোনো দিন ছিন্ন করতে পারেনি এবং পারবে না।

এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হচ্ছে চলচ্চিত্র। পাকিস্তানী শাসকবর্গ পশ্চিমবঙ্গজাত বাঙলা ছবিকে সেদিনের পূর্ব-পাকিস্তানে ঢুকতে দেননি এবং তার পরিবর্তে তাঁরা ওখানে আমদানী করছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন উর্দু ছবি। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানীরা তা নীরবে হজম করতে পারেন নি। যে-দিনই ও'দের ওখানে ছবি তৈরী শুরু হ'ল, সে দিন থেকেই ও'রা অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন ও'দের নিজের চোখে দেখা বাঙলা ছবিকে। বাঙলা ছবির কাহিনীগত প্রভাবের কথা ছেড়েই দি, ছবির নামকে পর্যন্ত তাঁরা ধ'রে রাখতে চাইলেন তাঁদের ছবির নামকরণে। তাই দেখি, তাঁরা তৈরী করেছেন, কাঁচকাটা হীরে, দীপ নেভে নাই, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, স্মৃতিটুকু থাক, গাঁয়ের বধূ, সমাধান, স্বরলিপি, বলাকা মন, অশ্রু দিয়ে লেখা প্রভৃতি ছবি।

কিন্তু আজ সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঙলাদেশের সরকার ভারতে নির্মিত

বাঙলা ছবিকে তাঁদের রাজ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়ার কথাই শুধু নয়, চিন্তা করছেন বাঙলা সংস্কৃতির যোগসূত্রকে মজবুত করবার জন্যে। তাই দেখছি, ইতিমধ্যেই সেখানে পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে দেখানো চলছে তিনটি রবীন্দ্রকাহিনী চিত্র—কাবুলিওয়ালা, ছুটি ও চারুলতা। আশা করা অন্যায় হবে না, বাঙলাদেশের জীবনযাত্রা যতই স্বাভাবিক হয়ে আসবে, ওখানে ততবেশী ক'রে ভারতে নির্মিত বাঙলা ছবির প্রদর্শনী চালু হতে থাকবে। এবং নিশ্চয়ই বিপরীতভাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বাঙলাদেশে নির্মিত বাঙলা ছবি দেখার সুযোগ পেতে থাকব। এও নিশ্চয়ই সম্ভব হবে, ভারত-বাঙলাদেশ সহযোগিতায় চলচ্চিত্র নির্মিত হবে কলকাতা এবং ঢাকায়। বাঙলা চলচ্চিত্ররাজ্যে এই পদ্মা-গঙ্গার শুভমিলন পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙলাদেশ উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত শুভকর হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। জয় বাঙলা!! জয় বাঙলা ছবি!!

স্টুডিও থেকে

'লাট্টু'র চিত্রগ্রহণ শুরু

গত ২১ জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর শুভতিথিতে অরুণ রায়চৌধুরী প্রোডাকসন্সের প্রথম শিশুচিত্র 'লাট্টু'র চিত্রগ্রহণ কাজ বাণ্দৃশ্য গ্রহণ মাধ্যমে শুরু হয়। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন অজিত গাঙ্গুলী। চিত্রগ্রহণে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। গানের সুর দেবেন—হিমাংশু বিশ্বাস। প্রথম দিনের চিত্রগ্রহণে ছিলেন নবাগত প্রতিভাবান শিশুশিল্পী মাঃ প্রিন্স, বঙ্কিম ঘোষ, শিপ্রা গাঙ্গুলী ও আরো অনেকে। বাংলা চলচ্চিত্রে এর পূর্বে অনেক শিশুচিত্র হয়েছে 'লাট্টু' কাহিনী বৈচিত্র্যে, পরিবেশন নৈপুণ্যে ও অভিনয় বৈশিষ্ট্যে এক নতুনত্ব সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়। দামাল ছেলে 'লাট্টু'—। এই লাট্টু চরিত্রের জন্য নির্বাচিত শিশুশিল্পী মাঃ প্রিন্স—। পরিচালক ও প্রযোজক এই নতুন শিল্পীটির মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়েই এমন একটি ছবির চিত্রগ্রহণে হাত দিয়েছেন বলে জানা যায়। এন্-এ ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'বিরাজ বৌ' ফেব্রুয়ারীতেই আসছে

জানা গেল সুনীল রাম নিবেদিত কে. সি. দাস প্রোডাকসন্সের শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলাতে চলতি ছবি 'জনতার আদালতে'র পরই মুক্তিলাভ করবে। পরিচালনা করেছেন মানু সেন। সুর দিয়েছেন কালিপদ সেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সলিল সেন। সম্পাদনা হরিদাস মহলানবীশ। কণ্ঠসঙ্গীতে : সন্ধ্যা মুখোঃ, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল। প্রধান চরিত্রাভিনয়ে আছেন—উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী, অনুপকুমার বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, কমল মিত্র, তরুণকুমার, জহর রায়, জীবেন বসু, নৃপতি, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, রাজলক্ষ্মী শর্মিলা দাস, শিবানী ঘোষ, গৌর শী, আনন্দ মুখার্জী, বেচু সিংহ, শীতাংশু দাস প্রভৃতি।

মিলি পিকচার্স ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

'রূপসী বাঙলা'

দুই বাংলার শিল্পী সমন্বয়ে 'রূপসী বাঙলা'র শুভ মহরত অনুষ্ঠান ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি কলকাতার স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওপার বাংলার খ্যাতনামা অভিনেতা রাজ্জাক নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য গত ২৭ জানুয়ারি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

সুজনী প্রযোজিত আলোচ্য ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তরুণ কাহিনীকার ও সাংবাদিক শ্রীরণেন মোদক; পরিচালনা ও সংগীত-পরিচালনা করছেন যথাক্রমে সরোজ রায় ও পূর্ণ দাস বাউল; পূর্ণ দাস 'রূপসী বাঙলা'য় একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়ও করছেন। নায়িকার চরিত্রে 'এপার বাংলার' একটি নতুন মুখ ছবিতে দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন দুই বাংলার বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ।

পদ্মভূষণ বি. এন. সরকার ফটোঃ অমৃত

পদ্মশ্রী সুচিত্রা সেন এবং ওয়াহিদা রহমান ফটোঃ অমৃত

চলচ্চিত্র জগতের গুণিজন সম্মাননা

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটগিরি ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের যে-সব কৃতি ব্যক্তিকে সম্মানভূষিত করেছেন, তার মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে মাত্র নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার হিসেবেই নয়, বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান ও সদস্য, ভারতীয় চলচ্চিত্র উপদেষ্টাপর্ষদ ও পুণা ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সভা এবং ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম ফিল্ম সেমিনারের চেয়ারম্যান হিসেবে এবং অন্যান্য নানাভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অগ্রগতিতে তাঁর বিশিষ্ট দানের কথা স্মরণ ক'রে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন। মাত্র কিছুদিন আগেই এই একই কারণে তাঁকে 'ফালকে-অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়েছে। আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রজগতের নায়িকাশ্রেষ্ঠ সুচিত্রা সেন 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করেছেন। বোম্বের চলচ্চিত্রজগতের যাঁরা এই 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জনপ্রিয় চিত্রপরিচালক ও সম্পাদক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, 'দাস্তাক' ছবির পরিচালক ও জনপ্রিয় সংলাপলেখক রাজেন্দ্র সিং বেদী ও জনপ্রিয়া অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান।

'রূপসী বাঙলা' ছবির পরিচালকের সঙ্গে আলোচনারত ওপার বাঙলার [illegible] নায়ক রাজ্জাক।

মঞ্চাভিনয়

চিত্রাভিনেত্রীর জীবন কি দাম্পত্য জীবনের পরিপন্থী?

স্টার থিয়েটারের সাম্প্রতিক নাটক মঞ্জরীতে এই প্রশ্নই তুলে ধরা হয়েছে এবং নায়িকার চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে তার সুষ্ঠু এবং সঙ্গত উত্তরও দেওয়া হয়েছে। মঞ্জরীর কাহিনী আশাপূর্ণা দেবীর রচনা এবং নাট্যরূপ দিয়েছেন পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত। গৃহস্থ বাড়ীর সর্বগুণবতী, শিক্ষিতা, সুন্দরী বধূ যদি সহসা চিত্রাভিনেত্রী হবার জন্যে কৃতসংকল্প হন—সে হোক না নিজেরই বড়ো ভগ্নিপতির প্রযোজিত ছবিতে— তাহ'লে সংসারে যে-আলোড়নের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, তা' এ-নাটকেও হয়েছে। প্রাচীনপন্থী শাশুড়ী একে মোটেই ভালো চোখে দেখেন নি: বড়ো ও মেজো জায়েরা নিজেদের সীমিত বিদ্যা নিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না—একবার যাচ্ছেন সপক্ষে এবং আবার কখনও যাচ্ছেন বিপক্ষে, দুই-ভাসুর কলেজের অধ্যাপক ছোট ভাইকে অশেষ স্নেহ করেন ব'লে ছোট বৌয়ের সিনেমায় যোগদানকে একান্তই ছোট ভাইয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করেন এবং একমাত্র ননদ নির্বিষ সর্পের মতো 'আমার বাপের বাড়ীর মুখ পুড়লো' বলে আপসে-থাপসে বেড়ান। আর অধ্যাপক স্বামীদেবতা স্ত্রীর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে তার উদ্দেশ্যে 'তোমাকে দেখে দেখে ক্লান্তি নেই, এতো যে দেখি তবু ভরে না মন'-বলে গান গাইলেও স্ত্রীর চিত্রাভিনেত্রী হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় নন এবং বেশ বোঝা যায়, স্ত্রীকে অগাধ ভালোবাসলেও তার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা নেই। ফলে, দু'জনের সম্পর্কে চিড় খেল, দু'জনে দু'জন থেকে ক্রমেই তফাতে স'রে গেল। পেটের সন্তানটি নষ্ট হওয়ায় ভুল বোঝাবুঝি বেশ বেড়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামী বোধহয় নিজের ভুল বুঝতে পারলেন: তাঁর স্ত্রী যে ঠুনকো খেলনা নয়, তার চরিত্রকে মসীলিপ্ত করা যে অসম্ভব এর প্রমাণ পেয়ে হয়ত' খুশী হলেন।

অতি নাটকীয়তাকে বাদ দিয়ে স্বাভাবিকতার পথেই মূল নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য যেখানে হাল্কা রসের অবতারণা করা হয়েছে, সেখানে কিছুটা বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা গেছে সম্ভবত শিল্পীদের রাস আলগা দেওয়ার জন্যে। যেমন প্রোডাকসন-ইন-চার্জ ও প্রোডাকসন-বয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির দৃশ্যটি।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় নায়িকা মঞ্জরী বেশে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের। এই কুশলী শিল্পীটি যে-রকম দৃঢ় পদক্ষেপে নাট্যলক্ষ্মীর সিংহদ্বার লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তিনি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে কীর্তিত হবেন। বাচনে, ভাবপ্রকাশে কি আশ্চর্য দক্ষতাই না তিনি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন। তাঁর বিশেষত্ব, চরিত্রকে বাস্তব ও বিশ্বাস্য করবার জন্যে তিনি হাসি,খুশী, খুনসুড়ির অভিনয়েও যেমন পারদর্শী, মর্মবেদনাকে সাশ্রুনেত্রে প্রকাশ করতেও তিনি সমান কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর মাধ্যমে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নায়ক অভিমন্যু লাহিড়ীর ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত অন্তরের ভালোবাসা ও হৃদয়ের ক্ষোভ দুইই সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কণ্ঠের গান চারটি সম্ভবত এখনও তাঁর ধাতস্থ হয়নি—এর জন্যে সময় লাগে। সুন্দর স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন নীলিমা দাস মঞ্জরীর দিদি সুনীতির ভূমিকায়। আর একজনও স্বাভাবিক অভিনয়ের চমৎকারিত্বে আমাদের মুগ্ধ করেছেন: তিনি হচ্ছেন বড়ো জার ভূমিকাভিনেত্রী মেনকা দাস। হিমানী গাঙ্গুলীকে আমরা আগে নামকরা নাট্যসংস্থাতে বহুবার দেখেছি, এই প্রথম তাঁকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে দেখলুম। সুনীতির কন্যা চঞ্চলা বেশে তিনি যেটুকু নাটনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করেছেন। মঞ্জরীর বড়ো ভগ্নীপতি বিজয়ভূষণ বেশে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয়ের একটি সুন্দর নিদর্শন রেখেছেন। অপরাপর ভূমিকায় স্টারের শিল্পীরা যে সুযোগমতো সু-অভিনয় করবেন, এতো জানা কথা; কারণ, নাট্য পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের অভিজ্ঞতা এ-বিষয়ে অল্প নয়।

অনিল বসু পরিকল্পিত দৃশ্যপট এই নাটকটির একটি বিশেষ সম্পদ; বিশেষ ক'রে বোম্বাইয়ে মঞ্জরীর ফ্ল্যাট এক অভিনব সৃষ্টি; এই দৃশ্যের আলোক নিয়ন্ত্রণও দর্শনীয়। মাত্র অভিমন্যুর বাড়ীর বাইরের ঘরটিকে অভিমন্যুর ঘরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন মনে হ'ল, এই অসামঞ্জস্য সংশোধনীয়। আবহসঙ্গীত রচনায় কমলেশ মৈত্রের কৃতিত্ব লক্ষ্যণীয়।

স্টারের নব অর্ঘ 'মঞ্জরী' নাট্যরসিকদের কাছে একটি নতুন স্বাদের নাটক বলে অভ্যর্থিত হবে।

—নান্দীকার

স্টারের বর্তমান নাটক 'মঞ্জরী'তে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও দীপিকা দাস

রঙমহলে : সুবর্ণ গোলক

বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নাট্যসেবী, নাট্যামোদী ও নাট্যগোষ্ঠীদের বিশেষ অনুরোধে সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুবর্ণ গোলক' নাটকখানির চলতি নাটক 'আমি মন্ত্রী হব'র পরই রঙমহলের নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠান হিসাবে প্রস্তুতি চলেছে। নাটকখানি রচনা করেছেন—সন্তোষ সেন। রঙমহলের নিয়মিত শিল্পীগোষ্ঠী ছাড়াও কয়েকজন নতুন শিল্পীকে 'সুবর্ণ গোলক' নাটকে দেখা যাবে। 'সুবর্ণ গোলক' আজকের সমাজের ওপর হাসির চাবুক বোলাবে।

যুব গোষ্ঠী

গেল ২৪শে জানুয়ারী রাত্রি আটটায় বি টি রোডস্থ সি-আই-টি বিল্ডিংস-এর যুব গোষ্ঠী আয়োজিত স্বপন বসু ও ধীরেন দত্তের ব্যবস্থাপনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' নাটক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীগণপতি সুর। অভিনয়ে যাঁরা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন, প্রণব বসুচৌধুরী, তুষার মুখার্জি, রতন পাল, অলোক মুখার্জি ও নাট্য পরিচালক সত্য রায়চৌধুরী। অন্যান্যের অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী যথাযথ হয়েছে।

লোকউৎসবে মাটির কেল্লা

আশুরালী বান্ধব নাট্য সমাজ (ডায়মণ্ড হারবার)-এর শিল্পীরা গত ২০শে জানুয়ারী দলের নবতম প্রযোজনা রঞ্জন দেবনাথের 'মাটির কেল্লা' যাত্রাপালা আসরস্থ করলেন স্থানীয় লোকউৎসবে অমৃতলাল পাড়ুই-এর নির্দেশনায়। অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, টগরচন্দ্র মল্লিক, সন্তোষ মণ্ডল, বিষ্ণুপদ মণ্ডল, অশ্বিনী দাস, অমূল্য মণ্ডল, সহদেব হালদার, চন্দ্রশেখর সামন্ত, এবং পরিচালক স্বয়ং। এছাড়াও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : নারায়ণ মণ্ডল, সুদর্শন হালদার, রুহিত দলুই, গান্ধীরাম মণ্ডল মনোরঞ্জন হালদার, প্রফুল্ল বৈদ্য, কণক হালদার। সুকণ্ঠ বলরাম গায়েনের সঙ্গীত-সহযোগিতা উল্লেখ করবার মতো। লোক-উৎসবের সভাপতিত্ব করেন নিরঞ্জন সামন্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

ধূমকেতু ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মঞ্চাভিনয়

চাকপোতার (হাওড়া) সুপরিচিত সংস্থা 'ধূমকেতু ক্লাবের' বিদ্যা-উৎসব উপলক্ষ্যে গত ২১শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় সংস্থা-প্রাঙ্গণে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিমাই মান্না।

অজয় দাসের উদ্বোধন সংগীতের সঙ্গে সভার কাজ শুরু হয়। শ্রীবঙ্কিম [illegible] সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ ভাষণ দেন: অনুষ্ঠানে দীপান্বিতা মান্না, মহাদেব পাত্র, রাম দে, বঙ্কিম চক্রবর্তী, গোপাল রাণা, রণজিৎ মালিক, নিমাই মান্না প্রমুখ অংশ নেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (আমতা শাখা) শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

পরিশেষে সংস্কৃতি সংস্থা 'অনুপ্রবেশ' ও 'অগ্নিশিখা' গোষ্ঠী 'কাস্তে শানাও' নাটকদুটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন।

'অতিগে'র দুটি নাটক : সৌখীন নাট্য-সংস্থা হিসেবে নতুন হোলেও 'অতিগে'র শিল্পীরা তাঁদের প্রথম পদক্ষেপেই বেশ কিছু সম্ভাবনাকে দৃঢ়তার ভাষায় চিহ্নিত করেছেন। দক্ষিণ কলকাতার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে সম্প্রতি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাইরের দরজা' ও অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটক দুটির পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তাঁরা নাট্যচর্চায় তাঁদের আন্তরিক নিষ্ঠাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

একটি যুবতী মেয়ের চিন্তা ও কল্পনার মধ্য দিয়ে 'বাইরের দরজা' নাটকের সংঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছে। মাঝ রাতে মেয়েটি (মঞ্জু) দরজা খুলে তার প্রণয়ী (কমল)-এর প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমলের পরিবর্তে এলো অশোক, মঞ্জুর কিশোর-বয়সের প্রেমিক। অতঃপর কমলের প্রবেশ এবং ঘটনা আবর্তিত হোল তিন-জনের মুখরতাকে কেন্দ্র করেই। এই তিন-জনের কাছে ভীতিস্বরূপ থাকে এক পাহারাওয়ালা যে তাদের ওপর সর্বদা দৃষ্টি রাখে এবং তাদের অনুসরণ করে। হয়তো এই পাহারাওয়ালা চরিত্রকে তিনজনের বিবেক হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মঞ্জু তার কল্পনার মধ্যে এতো ঘটনা দেখছিল। তার চিৎকারে তার বাবা আসে এবং তার ভুল ভাঙায়। এই হোল নাটকের মূল কাহিনী। এই নাটকের প্রয়োগপরিকল্পনায় কয়েকটি মুহূর্ত ছিল যা সত্যি সত্যি দর্শকদের আবিষ্ট করে রেখেছিল। মঞ্জুর ভূমিকায় পম্পা সেন মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন; চরিত্রটির ভয়, বিরক্তি, অসহায়তা তিনি স্বাভাবিকভাবেই ফুটিয়েছেন। কিন্তু স্বরক্ষেপনে কিছুটা আড়ষ্টতা ছিল। অশোকের ভূমিকায় সুজিত চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কয়েকটি জায়গায় তাঁর সংলাপ আরো একটু গভীরতর আবেগে ভরে থাকলে ভালো হোত। কমল ও বাবার ভূমিকায় আদিত্য মিত্র ও শান্তনু ঘোষ চলনসই অভিনয় করেছেন। পাহারাওয়ালার ভূমিকায় রাহুল মুখোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তি সত্যি প্রশংসার দাবী

রূপশ্রী মল্লিক প্রযোজিত 'অপরাহ্ন বিলাস' ছবিতে মুখোপাধ্যায় ও শেখর চ্যাটার্জি

রাখে। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অসিত দাশগুপ্ত।

দ্বিতীয় নাটক ছিল 'বিবাহ বিভ্রাট'। রসরাজ অমৃতলাল বসুর এই হাসির নাটকটির কাহিনীর সঙ্গে অনেক নাট্যরসিকেরই পরিচিত আছে। এই উচ্ছল হাসির নাটকটির প্রযোজনায় 'আতগে'র শিল্পীরা বেশ কিছুটা প্রাণময়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন। নন্দলাল, ঘটক ও ঝির চরিত্রে রাহুল মুখার্জি, সুজিত চ্যাটার্জি ও ইলা রায়চৌধুরী খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন। তবে ঝির কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতা ও ঘটকের অতি নাটকীয়তা মাঝে মাঝে নাটকের অগ্রগতিকে বেশ খানিকটা ব্যাহত করেছে। সাহেব মিঃ সিং-এর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেন মঙ্গলময় ঘোষ।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন পদ্মা সেন, কুমার ঘোষ, শান্তনু ঘোষ, অলকা ঘোষ বীরু দত্ত, অসিত রায়চৌধুরী চম্পা সেন, কেয়া ঘোষ, আদিত্য মিত্র। এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সুজিত চট্টোপাধ্যায়।

মহারাজ নন্দকুমার : সম্প্রতি জলস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং প্রমোদ সংস্থার স্টোর্ডিম্যাসন ইউনিটের সদস্যরা বিশ্বরূপার মঞ্চে পরিবেশন করলেন ঐতিহাসিক নাটক 'মহারাজ নন্দকুমার'। মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত এই নাটকের সামগ্রিক প্রযোজনা সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয় যে, শিল্পী নির্বাচন প্রায়ই ঠিক হয়নি, তবুও কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে নির্দেশকের শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। যে দুজন অভিনয়ে নাটকের গতিকে মোটামুটিভাবে অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন তাঁরা হোলেন 'নন্দকুমারের' রূপকার পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় ও ক্লেভারিং-এর রূপকার সমীর বসু। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সুবল বসু, ননীলাল মুখোপাধ্যায়, অজিত বসাক, গোপাল ব্যানার্জি গুরুপদ দাস মহাপাত্র, অজিত সরকার, নারায়ণ ঘোষ, শিশির মুখার্জি, সুব্রত বসু, শাশ্বতী রায়, হিমানী গাঙ্গুলী, দীপা হালদার, দীপ্তি চ্যাটার্জি।

ধৃতরাষ্ট্র : ধনঞ্জয় বৈরাগীর সফল নাটক 'ধৃতরাষ্ট্র' কয়েকদিন আগে ডায়মণ্ড হারবারে মঞ্চস্থ হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন সেখানকার ইউথস সংস্থা। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নেন অনিল দত্ত ও বটু রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন অশোক রায় অনিল দত্ত, ধর্মব্রত সিংহরায়, দেবীপ্রসাদ রায়, তড়িৎ রায়, স্নিগ্ধেন্দু সিংহরায় দিবাকর ঘোষ, বলাই চক্রবর্তী, সত্যেন পুরকাইত অজিত বসু, সঞ্চিতা মুখার্জি, মালা দাস, সবিতা মুখার্জি।

নয়ালী'র আগামী অনুষ্ঠান : নয়ালী'র শিল্পীরা আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পরিবেশন করবেন 'রূপসী বাংলা' ও অবন ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল'। পরিচালনায় রয়েছেন দীপালি বসু রায়। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেবেন চিত্রা ঘোষ, বুলবুল মুখার্জি, শুক্লা গাঙ্গুলী, সুনির্মল দাশগুপ্ত, গীতশ্রী দত্ত, প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী ও শ্রীলতা বসু রায়।

বিবিধ সংবাদ

৩২জন অন্যান্য বিশিষ্ট বোম্বাই চিত্রতারকা ও নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পীদের বাঙলাদেশ সফর

ভারতীয় জওয়ান ও মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য চারদিনের কর্মসূচীকে রূপদানের জন্যে অভিনেতা সুনীল দত্তের নেতৃত্বে লক্ষ্মণ মঙ্গেশকার, মনোহর দীপক, মহেন্দ্র কাপুর, ওয়াহীদা রহমান, মালা সিংহ, নার্গিস, মধুমতী প্রভৃতি বত্রিশ জন শিল্পীর একটি দল রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটি প্লেনে চেপে বাঙলাদেশ অভিমুখে রওনা হচ্ছেন।

বি, এন, সরকার বি, এফ, জে, এ-র সদস্যবৃন্দ দ্বারা সংবর্ধিত

গেল সোমবার, ৩১শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ 'ফালকে পুরস্কার' ও 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা ভূষিত হওয়ার জন্যে বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনগৃহে একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করেন।

সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

কোন্নগর সাংস্কৃতিক পরিষদ পরিচালিত ৬ষ্ঠ বর্ষ অখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও ৪র্থ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে যথাক্রমে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ১২ই মার্চ' ৭২ থেকে। নাম দেবার শেষ দিন ১২ই ফেব্রুয়ারী ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী '৭২র মধ্যে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা,—শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, কোন্নগর সাংস্কৃতিক পরিষদ, বাঞ্ছারাম মিত্র লেন, কোন্নগর, হুগলী।

সোদপুর তরুণ সংঘ

সোদপুর গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেটে তরুণদের সংস্থা তরুণ সংঘ তাদের নিজস্ব মাঠে প্রতি বছরের মত এ-বছরেও বাগ্‌দেবীর আরাধনা এবং নেতাজী সুভাষের শ্রদ্ধা-স্মরণে ২৩শে জানুয়ারী মনোজ্ঞ ও বর্ণাঢ্য পরিবেশে বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে। এ যুগ্ম উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিশোর ও তরুণদের আঁকা 'বাংলাদেশ' চিত্র-প্রদর্শনী। সুখ্যাত শিল্পী নবেন্দু সেনগুপ্ত, ও অমরেশ ঘোষের সহযোগিতায় ছবিগুলি এঁকে তন্ময় পাঠক, পলাশ সিকদার, পীযূষ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ কিশোর বয়সী ছেলেরা। চিত্র-প্রদর্শনী জনসাধারণের প্রশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২৩শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন এম-পি অনঙ্গমোহন দাশ। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় রায়চৌধুরী ও উমা চক্রবর্তী।

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ১২ই জানুয়ারী রবীন্দ্রসদনে গোদরেজ স্টাফ এসোসিয়েশন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন গোদরেজ কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার শ্রী ভি বি শাহ্। সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসংগীত দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নৃত্য পরিবেশন করেন মিস্ জে। অনুষ্ঠানের সেরা আকর্ষণ ছিল উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি। শ্রীজ্ঞানেশ মুখার্জির নির্দেশনায় নাটকটি সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ করেন গোদরেজ স্টাফ এসোসিয়েশনের সদস্যরা। বিভিন্ন চরিত্রে মৃণাল ঘোষাল, মনীশ নন্দী, কমল দাস, অজিত ব্যানার্জি, সুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং নদীয়া গোস্বামীর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়া অরুণ বসু, ছোট মেয়েটি বনানী গোস্বামী, কে পি এ্যান্টনি, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য এবং অনিল দাসের চরিত্রচিত্রণেও উল্লেখের দাবি রাখে। জাতীয় সংগীত দিয়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

একটি প্রশংসনীয় উদ্যম

ডাঃ মীরা ব্যানার্জি, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হরিপদ চক্রবর্তী, এস বি সেন, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ঘোষাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমলয়কুমার মৌলিক ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দের উপস্থিতিতে ২৬শে জানুয়ারী সকালে 'বারাকপুর বিদগ্ধ পরিষদ' পরিচালিত বারাকপুর মহকুমার মুখপত্র 'বিদগ্ধ' পত্রিকার পক্ষ থেকে বারাকপুর মিলিটারী হাসপাতালে আহত ও অসুস্থ জওয়ানদের ফল, বিস্কুট, মিষ্টি ও ফুল উপহার দেওয়া হয়। ২৬শে জানুয়ারী উক্ত পত্রিকার প্রতিষ্ঠা দিবস।

গীতালির সারস্বত সম্মেলন

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সংগীত শিক্ষায়তন গীতালির সারস্বত সম্মেলনটি মহাসমারোহে বিগত শ্রীপঞ্চমী তিথিতে উদ্‌যাপিত হল শ্যামবাজারস্থ ৩বি, ললিত মিত্র লেন-এ। সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম গীটার অনুষ্ঠানটি প্রশংসনীয়। অনীশ রোজারিওর পরিচালনায় এতে অংশগ্রহণ করেন আবু তালেব সাব্বির আহ্‌মেদ, দেবকুমার পাইন, কল্যাণ সেন বরাট ও চিন্ময় মল্লিক। এছাড়া শিবনাথ সাহার একক গীটারও উপভোগ্য। কণ্ঠসঙ্গীতে শান্তা সাহার রাগ মালকোশ ও পঙ্কজ সাহার রাগ বাগেশ্রী সকলের সুখ্যাতি লাভ করে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এই আসরে সারেঙ্গী ও তবলায় সহযোগিতা করেন যথাক্রমে কেদার মিশ্র ও গোরাচাঁদ অধিকারী। উমা সরকার, বাণী মুখার্জি, মীরা সরকার, ওয়ালিউর রহমন ও গৌরী সরকার কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মঞ্জরী রক্ষিত, মাধুরী মিত্র, রুবী চ্যাটার্জি, রীতা দাস, শীলশ্রী পাল ও পার্থসারথি ভাজন। সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগিতা করেন কাজল ভট্টাচার্য ও পঙ্কজ সাহা।

রূপসজ্জায় : দিলীপ চক্রবর্তী। পরিচালনা : গন্ধর্ব বাগচি। ফটো : অমৃত
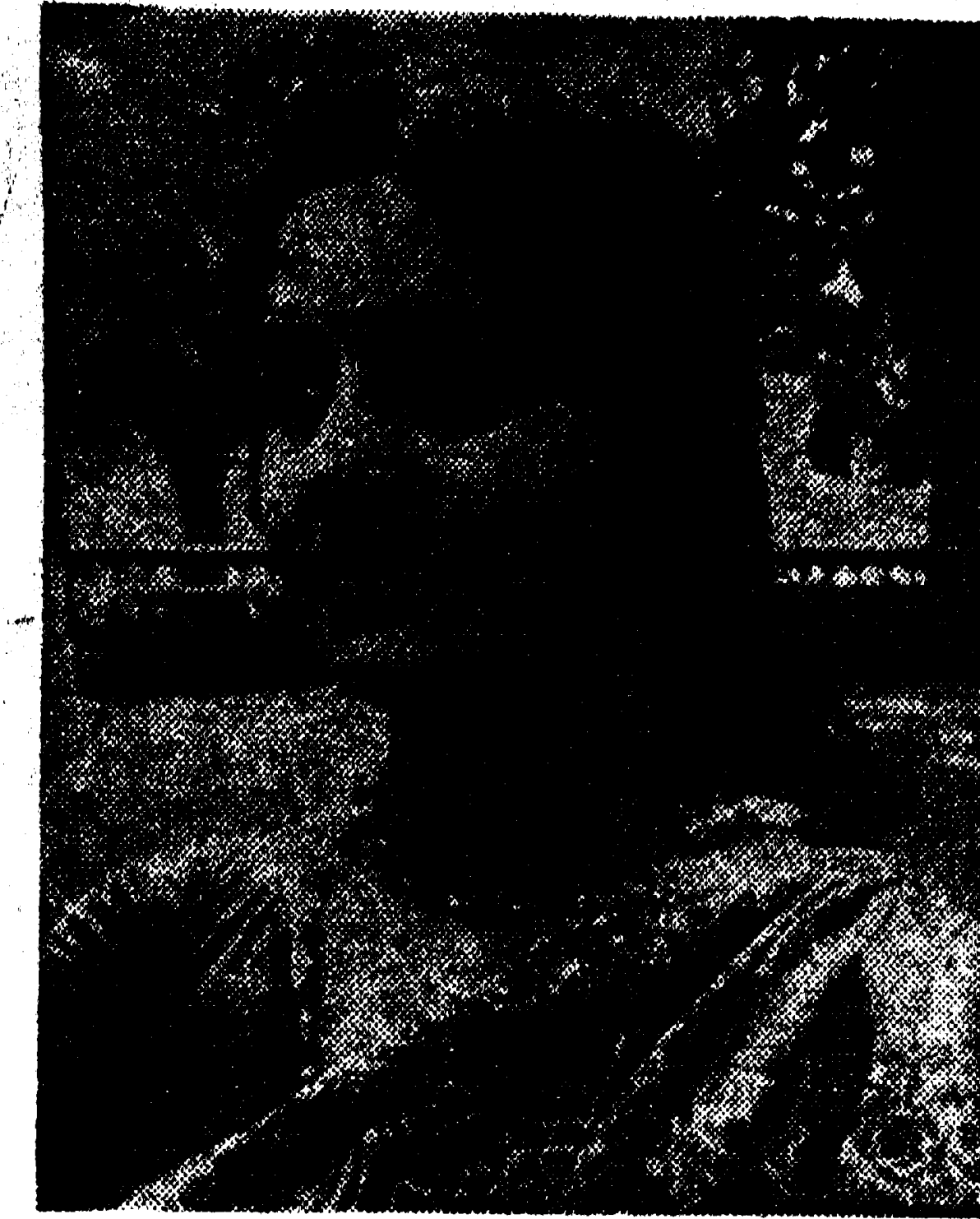
মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান

হুগলী জেলার ডানকুনি দশমহাবিদ্যা আশ্রমে গত ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী বাক্‌সিদ্ধ সাধক সর্বানন্দদেবের ৫৫৮তম শুভ সিদ্ধি দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য উদ্বোধন ও মঙ্গলাচরণ করেন অনুষ্ঠানটির। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীভট্টাচার্য প্রাঞ্জলভাবে দশমহাবিদ্যার রূপ ব্যাখ্যা করেন। এর পর পূর্ব সিঁথির ধর্ম সংঘ পরিবেশিত 'সর্বানন্দ লীলাগীতি' অতীব মধুর ও চিত্তাকর্ষী হয়। স্থানীয় শিল্পীদের শ্যামাসংগীত ও বিভিন্ন ধর্মসংগীত পরিবেশটি আরো হার্দ্য ও মধুর হয়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রণব সান্যাল, গৌতম বটব্যাল, বীরেন সাহা, অজিত দে, বিজয় সাহা ও গীতা দেবী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সবশেষে অনুষ্ঠান পরিচালক গৌরবিনোদ সাহা ও অনুষ্ঠান সম্পাদক শিবেন্দুবিকাশ সর্বাধিকারী উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বালিতে বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ২১ জানুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যায় বালি ডিংসাই পাড়াস্থ বিশ্রামভবন প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রথীন বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় এবং অমিতাভ মজুমদারের সুষ্ঠু পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণ করেন সুখ্যাত শিল্পীরা—বিমল ভূষণ, সাধন মৈত্র, তারক দে, মানিক ব্যানার্জি, অনিল ঘোষ, শিখা মজুমদার, সুস্মিতা মিত্র, মহাদেব সাহা ও সুবীর দত্ত। সঙ্গতে সহায়তা করেন দীপেশ দত্ত, ভোলানাথ শর্মা, অজয় পাল, অনিল দাস ও গৌরহরি সাহা। প্রখ্যাত যাদুকর এ সি সরকার মঞ্চে আবির্ভাব ও অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলেন। সবশেষে বিশিষ্ট অর্কেস্ট্রাশিল্পী নিমাই দাস ও তাঁর সম্প্রদায়ের অপূর্ব 'বৃন্দবাদন' দিয়েই আনন্দ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয়েছিল রম্য ও উপভোগ্য।

'মিত্রম্'এর প্রথম প্রচেষ্টা

কলকাতা কর্পোরেশনের হেডঅফিসের অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের কর্মীরা 'মিত্রম্'

শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শুভ আবির্ভাব তিথি পালন
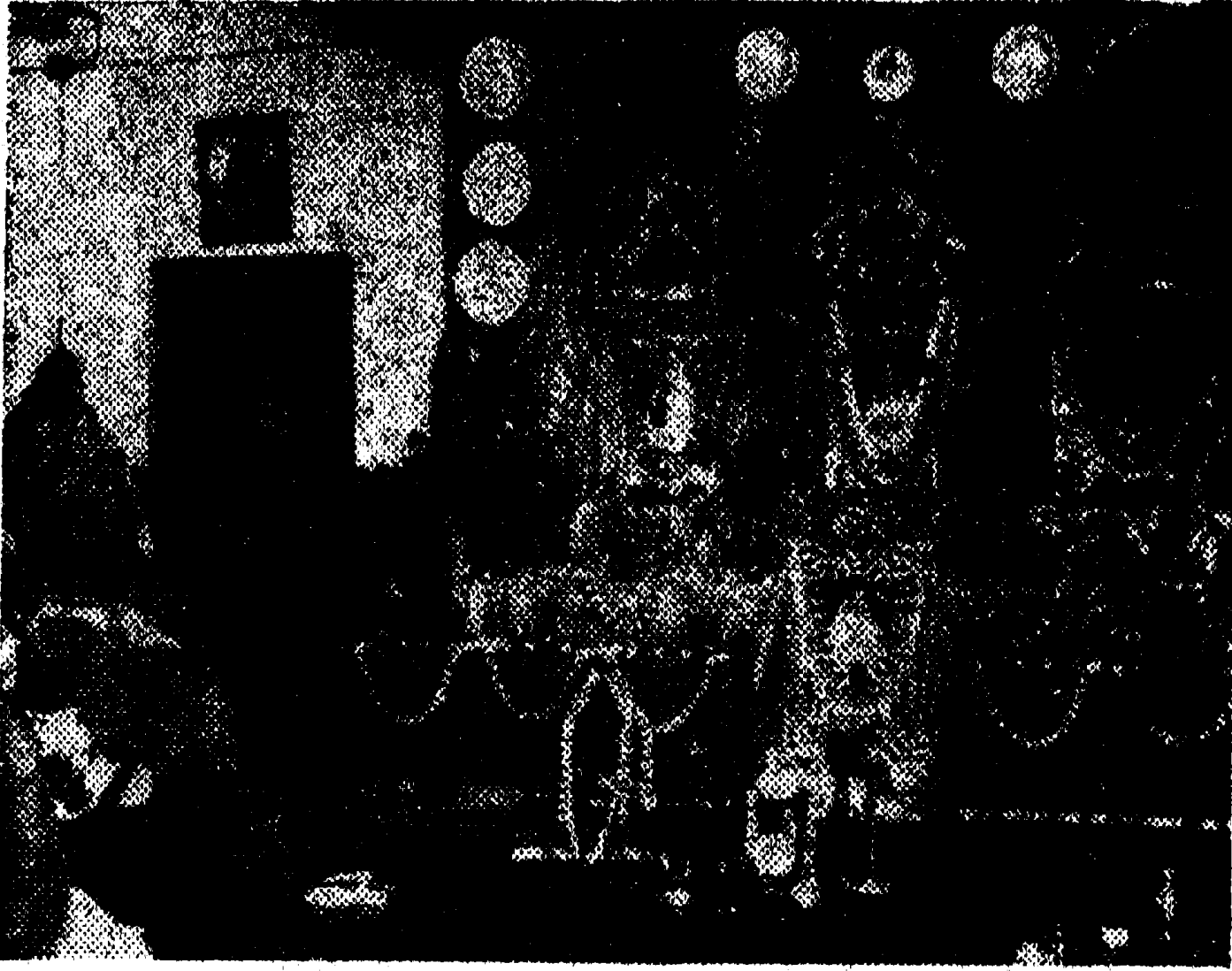
নাম নিয়ে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী, '৭২ মঙ্গলবার স্টার মঞ্চে প্রবোধ সান্যালের 'হাসুবানু'র নাট্যরূপ অভিনয় করবেন বাংলাদেশের জোয়ানদের সাহায্যার্থে। নাট্যরূপ ও পরিচালনা যথাক্রমে সর্বশ্রী গিরীন চক্রবর্তী ও শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য।

শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শুভ আবির্ভাব তিথি

গত শুক্রবার (২৮।১।৭২) ৬২এ গৌরীমাতা সরণিস্থিত (কলকাতা-৪) শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শুভ আবির্ভাবতিথি উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম হয়।

'এবম্'-এর বার্ষিক নাট্যোৎসব

ডি গুপ্ত লেন (সিঁথির)-এর বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা এবম্ তাঁদের বার্ষিক নাট্যোৎসবে নাট্যপ্রেমীদের উপহার দিলেন গেল ২ জানুয়ারী '৭২ (রবিবার) সকাল ৮-৩০টায় শ্রীআশিস সরকার রচিত ও পরিচালিত দুটি নাটক 'ওরা পড়ছে' ও 'লগ্নভ্রষ্টা'। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

দুটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : সর্বশ্রী নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত সরকার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অসীম ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি, অসিত কুণ্ডু, মলয় রায়, গৌতম বসু, মানস রায়, উৎপল চক্রবর্তী, অসীম ভট্টাচার্য, রাজা ব্যানার্জি, নমিতা গাঙ্গুলী ও শিশু অভিনেত্রী পিংকু সরকার। সফল মঞ্চ নিবেদনের জন্যে নাট্যকার-পরিচালক শ্রীসরকার অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংসদের দশম বার্ষিক উৎসব

সিঁথির বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা রামকৃষ্ণ সংসদের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল গেল ২ জানুয়ারী রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর নাটমণ্ডপে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন শ্রীপ্রেমাংশু চৌধুরী (ক্রি-এ-সি, পশ্চিমবঙ্গ) এবং মঙ্গলাচরণ করেন ডঃ রমা চৌধুরী ও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র।

এদের এই উৎসবেও সর্বধর্ম দিবস প্রতিপালিত হয় শোভাবাজারের সুখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গনেশচন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন : সর্বশ্রী জে সি দে (চেয়ারম্যান রেডক্রশ), ডঃ এ বি গাঙ্গুলী (সম্পাদক, বেতার জগৎ), রাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় (শেরিফ), মিঃ নাঙ্গিয়া

শান্তা সাহা

(ম্যানেজার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক), মিঃ এম আর কৃষ্ণন (পোস্টমাস্টার জেনারেল), এন এন ঘটক (নটজ্যোতি), প্রফেসর ব্রজনন্দন গোস্বামী, ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ পি কে গুপ্ত প্রমুখ সংসদের পক্ষ থেকে মাল্য অর্পণ করেন ও উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে শ্রীগুরুসরণ গোস্বামী ও ভবানীপুরের নূপুর ড্যান্স একাডেমীর কুমারী বন্দনা সেন।

সংসদ বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য শুভেচ্ছা-বাণী লাভ করেছেন মহামান্য রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ, মাননীয় প্রধান বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট ও শ্রদ্ধেয় শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে।

অনুষ্ঠান শেষে সংসদ সম্পাদক নাট্যকার হরিপদ বসু ও স্থায়ী সভাপতি 'প্রসাদ প্রসঙ্গ' সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জীবন্ত স্ট্যাচু : কলকাতার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার একটি শাখার রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি বিশ্বরূপা'র মঞ্চে পরিবেশন করলেন শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'জীবন্ত স্ট্যাচু' নাটকটি। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন ইনস্পেকটরের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ নাটক। দলবদ্ধ অভিনয়ে এই নাটকের শিল্পীরা সত্যিই নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন। যাঁদের চরিত্র-চিত্রণ দর্শকদের মুগ্ধ করেছে তাঁরা হোলেন শঙ্কর রায়, সত্যকিঙ্কর ব্যানার্জী, সজল পাইন, অমিত সেনগুপ্ত, মুকুল দাস, মায়া রায়, ঝুমা মুখার্জি।

রূপকল্পের তিনটি নাটিকা : রূপকল্প নাট্যশিক্ষায়তনের শিল্পীরা কয়েকদিন আগে মুক্ত অংগনে তিনটি ভিন্ন স্বাদের নাটিকা পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের আন্তর স্বীকৃতি লাভ করেছেন। নাটক তিনটির নাম হোল 'আক্রান্ত', 'ছন্নছাড়া' ও 'অসমাপ্ত'। তিনটি নাটকের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হোলেন দিলীপ মুখার্জী, কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী, সুকুমার মুখার্জি, পার্থকুমার ব্যানার্জী, অসীম চৌধুরী, দিলীপ চ্যাটার্জী ও পল্লব চ্যাটার্জী। নাট্যকার পার্থকুমার ব্যানার্জীই তিনটি নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় ও সুন্দরবন অঞ্চলের বালী পল্লীমঙ্গল সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি এই প্রমোদ-শিক্ষামূলক ভ্রমণের নেতৃত্ব করেন শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সিংহ। পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফিসার শ্রীঅনিলবরণ রায় ও তাঁর সহকারীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন সংস্থার পঞ্চাশজন সদস্য-সদস্যা সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের সুযোগ পায়। এর মধ্যে একদিন বালী হাই স্কুলে বসে আনন্দমেলার আসর। গান-আবৃত্তিতে অন্য সকলের সঙ্গে গ্রামের ভাইবোনেরা অংশ নেয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনিলবরণ রায়, প্রধান অতিথি হয়েছিলেন শ্রীগৌরহরি মিশ্র। সভাপতি শ্রীরায় সুন্দরবনের বনপ্রকৃতির নদী-গাছ, পশুপাখিদের সম্বন্ধে নানান কথা মনোহর ভঙ্গিতে বিবৃত করেন। গ্রাম সম্পর্কেও নানান আলোচনা চলে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন শ্রীসাধন মজুমদার।

আনন্দবাজার পত্রিকা এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ১৯৭১ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় বিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক সি প্রসাদের হাতে রোভার্স কাপটি তুলে দিচ্ছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

রোভার্স কাপ

১৯৭১ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে ভাস্কো স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ২-বার এবং মোট ৫-বার (১৯৫৫, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭০—৭১) রোভার্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায়

এই নিয়ে মোহনবাগানের উপর্যুপরি ৮-বার এবং মোট ১৩-বার ফাইনাল খেলা হল। ১৯২৩ সালে মোহনবাগান প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে রোভার্স কাপের ফাইনালে শেষ পর্যন্ত ১-৪ গোলে সেই সময়ের দুর্ধর্ষ ডারহামস গোরা দলের কাছে হার স্বীকার করেছিল।

আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলার শেষে আনন্দবাজার পত্রিকা এবং বাংলা সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ বছরের প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮টি দল খেলেছিল তার মধ্যে কলকাতারই ছিল এই চারটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং বি এন আর। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান ৩-২ গোলে গোয়ার সালগাওকারকে, ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে বি এন আরকে, মহমেডান স্পোর্টিং ৩-২ গোলে জলন্ধরের লিডার্স ক্লাবকে এবং গোয়ার ভাস্কো স্পোর্টস ক্লাব ৪-০ গোলে ১৯৭০ সালের রানার্স-আপ মাহীন্দ্র এ্যান্ড মাহীন্দ্র স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।

সেমি-ফাইনালের একদিকে মোহনবাগান ১-১ ও ২-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। এবং অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বনাম ভাস্কো স্পোর্টস ক্লাবের খেলাটি প্রথম দিন ২-২ গোলে এবং দ্বিতীয় দিন ১-১ গোলে ড্র যায়। তৃতীয় দিনের খেলার দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে রেফারী ইস্টবেঙ্গল দলের কাজল মুখার্জিকে মাঠ ত্যাগের আদেশ দিলে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়রা উত্তেজিত অবস্থায় খেলা বন্ধ রেখে রেফারীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। ফলে রেফারীও খেলা বন্ধ করে দেন। এই সময়ে ভাস্কো স্পোর্টস ১-০ গোলে অগ্রগামী ছিল।

প্রতিযোগিতার কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত রেফারীর রিপোর্ট পর্যালোচনা করে ভাস্কো স্পোর্টস দলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

আন্তঃরাজ্য জাতীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

কোট্টায়ামের আন্তঃরাজ্য জাতীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা ৩রা ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শেষ হবে। এবারের প্রতিযোগিতায় এই ৭টি বিভাগ আছে—পুরুষ, বালকদের সিনিয়র, জুনিয়র এবং সাব-জুনিয়র বিভাগ; মহিলা, বালিকাদের সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ। প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সংখ্যা ৮১টি। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল ভিত্তি করেই মিউনিক অলিম্পিক গেমস এবং সিংহলের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় অ্যাথলেটিক দল গঠন করা হবে।

কোট্টায়ামে আন্তঃরাজ্য জাতীয় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী

পশ্চিমবাংলা দলে ৩৭ জন অ্যাথলিট নির্বাচিত হয়েছেন। পুরুষ দলের নেতৃত্বপদ লাভ করেছেন মনোরঞ্জন পোড়েল এবং মহিলা দলের শ্রীরূপা চ্যাটার্জি। এখানে উল্লেখ্য, বিগত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মনোরঞ্জন পোড়েল পুরুষ বিভাগে এবং শ্রীরূপা চ্যাটার্জি মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন।

ধ্যানচাঁদ হকি ট্রফি

আগ্রায় আয়োজিত সর্বভারতীয় ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লীর নর্দার্ন রেলওয়ে ১—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী মীরাটের শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের হরবিন্দর সিং দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ১৫ মিনিটের মাথায় জয়সূচক গোলটি দেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতীয় অলিম্পিক দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কে ডি সিং (বাবু) বলেন, যুবকরা খেলাধুলাকে 'আবশ্যিক' হিসাবে গ্রহণ না করলে ভারতবর্ষ কোনদিনই উন্নত ক্রীড়ামানে পৌঁছতে পারবে না। হকি খেলায় জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার অগ্রগতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমাদের কোনরকম বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত হবে না। যেহেতু অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় পনের দিনের মধ্যে একটি দলকে কম করে বারটি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয় সেই হেতু তিনি তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠন করা উচিত মনে করেন।

'পদ্মশ্রী' উপাধি

১৯৭২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের ২৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি সরকারী খেতাবে যাঁদের সম্মানিত করেন তাঁদের মধ্যে দুজন খেলোয়াড়—অজিত ওয়াদেকার এবং ভাগবৎ চন্দ্রশেখর 'পদ্মশ্রী' খেতাব

ভাগবৎ চন্দ্রশেখর

লাভ করেছেন'। এখানে উল্লেখ্য, অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল ১৯৭০-৭১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে 'রাবার' জয় করে। এই দুই জয় বিশেষ গৌরবের এই কারণে যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের এই প্রথম 'রাবার' জয়, অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের কাছে ইংল্যাণ্ডের প্রথম পরাজয়। ১৯৭০-৭১ সালের ২য় টেস্টে ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে জয়লাভের সূত্রে টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ৪) ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে। ১৯৭১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের তিনটি খেলার মধ্যে দুটি খেলা ড্র যায়। ওভালের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ৪ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী

অজিত ওয়াদেকার

হয়। ভারতবর্ষের এই জয়লাভের মূ[illegible] ছিল চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং ঃ

১ম ইনিংসে—৭৬ রানে ২ উইক[illegible]
২য় ইনিংসে—৩৮ রানে ৬ উইক[illegible]
মোট ১১৪ রানে ৮ উইকে[illegible]

জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদে আয়োজিত [illegible] কাবাডি প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভা[illegible] ভারতীয় রেল দল এবং মহিলা বিভা[illegible] মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এখা[illegible] উল্লেখ্য, এই নিয়ে মহারাষ্ট্র মহিলা বিভা[illegible] উপর্যুপরি ১৭ বার এবং রেল দল পুর[illegible] বিভাগে উপর্যুপরি দুবার খেতাব জ[illegible] হল।

জাতীয় স্নুকার প্রতিযোগিতা

আলিগড়ে আয়োজিত ১৯৭১ সা[illegible] জাতীয় স্নুকার প্রতিযোগিতার ফাইনা[illegible] রেলওয়ের টমাস মণ্টেরো ৬-৩ ফ্রেমে মহ[illegible] শূরের অরবিন্দ শাভুরকে পরাজিত ক[illegible] পাঁচ বছর পর পুনরায় জাতীয় চ্যাম্পিয়[illegible] হয়েছেন। মণ্টেরো শেষ চ্যাম্পিয়ান হ[illegible] ছিলেন ১৯৬৬ সালে শ্যাম স্রফকে পরাজি[illegible] করে। অরবিন্দ শাভুর এই নিয়ে উপর্যুপ[illegible] তিনবার ফাইনালে খেলে পরাজিত হলেন।

প্রতিযোগিতার একদিকের সে[illegible] ফাইনালে টমাস মণ্টেরো ৫-৩ ফ্রেমে [illegible] বছরের বিজয়ী শ্যাম স্রফকে পরাজিত [illegible] ফাইনালে উঠেছিলেন। অপর দিকের সে[illegible] ফাইনালে অরবিন্দ শাভুর ৫-৪ ফ্রেমে বি[illegible] য়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান গুজরাটের সত[illegible] মোহনকে পরাজিত করেছিলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৪০ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক— ২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday, 11th February, 1972 শুক্রবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৭৮ .52 Paise

প্রচ্ছদ—শ্রীপ্রদীপ দাস

এক নজরে

অপরাধ ও শাস্তি ঃ ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক পত্রিকা 'মেনসা জার্নাল' বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিশ্বের জনমত সংগ্রহের জন্য তার বিভিন্ন দেশের পাঠকদের কাছে একটি প্রশ্ন তালিকা পাঠায়। তাতে দেখা যায় যে, মৃত্যুদণ্ড অথবা অন্যান্য কঠোর দণ্ড সম্পর্কে আধুনিক বিশ্বের অভিমত যতটা উদার হয়েছে বলে মনে করা হয় আসলে কিন্তু ততটা হয় নি। যেমন, মৃত্যুদণ্ড রদের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন, যদিও এ ব্যাপারে অনেক বেশি সমর্থন পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়েছিল। অবশ্য এক একটি দেশ মৃত্যুদণ্ড রদের পক্ষে বিপুলভাবে সাড়া দেয়, কিন্তু অন্য দেশের রক্ষণশীলতার জন্য মোট সমর্থকের হার কোনক্রমে পঞ্চাশ শতাংশ অতিক্রম করে। যেমন জার্মানীর শতকরা ৮৩ জন মৃত্যুদণ্ড রদের পক্ষে মত দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা মাত্র ৪৭ জন মনে করেন যে, মৃত্যুদণ্ড লোপ পাওয়া উচিত। শতকরা ৭১ জন বলেছেন, বন্দীকে শুধু রুটি-জল আহার দিয়ে পীড়ন করা অত্যন্ত অন্যায় ও অমানুষিকতা। শতকরা ৫০ জন বলেছেন, কোন অপরাধেই কারও নির্জন কারাবাস হওয়া উচিত নয়। শতকরা ৫৮ জন বলেছেন, বন্দীকে যৌনজীবন থেকে বঞ্চিত রাখার ফল খারাপই হয়, সুতরাং কোন বন্দী তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত। শতকরা ১৪ জন মাত্র বলেছেন যে, কাউকে কোন অবস্থাতেই কারারুদ্ধ করা উচিত নয়।

মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে, ১৫ থেকে ২৪ বছরের উত্তরদাতারা শাস্তির ব্যাপারে পঞ্চাশোর্ধের তুলনায় অনেক বেশি উদার। তবে তার ব্যতিক্রমও আছে কিছু কিছু। যেমন কাউকে ধর্মচ্যুত বা একঘরে (এক্সকমিউনিকেশন) করার বিরুদ্ধে যুবকদের মধ্যে অভিমত দিয়েছেন শতকরা ৩৬ জন, যে জায়গায় বৃদ্ধদের মধ্যে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন শতকরা ৫২ জন। দ্বীপান্তর, নির্বাসন প্রভৃতি শাস্তির বিরুদ্ধেও বৃদ্ধরা যুবকদের তুলনায় অধিক সোচ্চার।

পত্রিকাটির দীর্ঘ প্রশ্ন তালিকার সব কটির উত্তর দেন ২৮০ জন। অনেকে তার বাইরেও নিজ থেকে কিছু কিছু সুপারিশ করেন। যেমন শতকরা ৩০ জন বলেন যে, দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডশেষে পুনর্বাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া উচিত।

শিশু মাতৃত্ব ঃ বাকিংহামশায়ারের চিকিৎসক ডঃ জন গিলিব্যাণ্ড সম্প্রতি ইংলণ্ডের 'রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিন'কে জানান যে, তাঁর প্রসূতিসদনে দুটি তেরো বছরের কম বয়সের মেয়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একজনের বয়স ১১ বছর ১০ মাস, অপরজনের ১২ বছর ১০ মাস। ডঃ গিলিব্যাণ্ড জানান যে, প্রথমোক্ত মেয়েটি যখন অন্তঃসত্ত্বা হয় তখন তার গর্ভপাত জন্য তার কাকা তাকে সাংঘাতিক আঘাত হানে, কারণ ঐ কাকাই তার সন্তানের পিতা। আঘাতে মেয়েটির মাথার খুলি ফেটে যায়, কিন্তু গর্ভস্থ ভ্রূণের কোন ক্ষতি হয় নি তাতে। অপর মেয়েটির সন্তানের পিতা তার বৈমাত্রেয় ভাই। ডঃ গিলিব্যাণ্ড এই প্রসঙ্গে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ষোল বছরের কম বয়সের মেয়েদের গর্ভের জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের নিকটাত্মীয়দের কেউ দায়ী।

বৃটেনে ইতিপূর্বে আর মাত্র তিনটি মেয়ে একাদশ বর্ষপূর্তির আগে সন্তানের জননী হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য 'রেকর্ড' স্থাপন করেছে পেরুর একটি মেয়ে—পাঁচ বছর বয়সে জননী হয়ে। তার পূর্বে নারীত্বপ্রাপ্তি ঘটে মাত্র আট মাস বয়সে। পাঁচ বছর বয়সে সিজারিয়ান অপারেশন করে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ করানো হয়। মা ও সন্তান উভয়েই জীবিত আছে।

চার্চ ও যৌন জীবন ঃ বিশ্বের সব দেশে ধর্মভীরু মানুষ সদুপদেশের প্রত্যাশায় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ধর্মযাজকদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসে। বিষয়-আশয়, সাংসারিক অশান্তি প্রভৃতি বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়ে থাকেন ধর্মযাজকরা। কিন্তু যে সমস্যা, বিশেষ করে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রায় সকলকে সর্বাধিক অভিভূত করে থাকে সেই যৌনসমস্যা নিয়ে কথা বলার কোন স্বাধীনতা নেই ধর্মযাজকদের। কারণ চার্চের মতে এখনও পর্যন্ত যৌন বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ধর্মের এক্তিয়ারবহির্ভূত। কোন কোন প্রগতিশীল ধর্মযাজক চার্চের বাইরে বিষয়টি নিয়ে অনুগতদের সঙ্গে আলোচনার পক্ষপাতী এবং তাঁরা আলোচনা করেনও। কিন্তু লণ্ডনের সেণ্ট স্টিফেন্স চার্চের যাজকপ্রধান রেঃ শাড ভারা প্রশ্ন তুলেছেন, যে সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসার উপর সমগ্র সমাজের নৈতিক মান নির্ভরশীল তা কেমন করে ধর্মের এক্তিয়ারবহির্ভূত হতে পারে? তাহলে ধর্মের কাজটা কি? যে ধর্ম জীবনের সবচেয়ে জটিল ও দুরূহ সমস্যায় সমাধানের পথ দেখাতে পারে না, সে ধর্মের ব্যবহারিক সার্থকতা কতটুকু? তিনি অভিযোগ করেছেন, বাস্তব জীবনের সমস্যা থেকে ধর্ম ও চার্চ এইভাবে নিজেকে সরিয়ে রেখে শুচিতা বজায় রাখতে চেয়েছে বলেই পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষ আজ চার্চ থেকে অনেক দূরে, নাগালের বাইরে চলে গেছে। রেঃ ভারা তাই স্থির করেছেন, এখন থেকে তিনি যৌনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 'ফোরাম' পত্রিকায় নিয়মিত লিখে যাবেন। যৌনবিষয়ক আলোচনায় ফোরাম অগ্রণী পত্রিকা। রেঃ ভারা চার্চের কুসংস্কারের ও মিথ্যা শুচিতাবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছেন চার্চের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই। তিনি তাঁর আলোচনায় এইটাই দেখাতে চাইবেন যে, যৌন কার্যকলাপ মানেই ধর্মবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হওয়া নয়। এবং আর পাঁচটা কাজের মতো সে কাজেও কোন বিভ্রান্তি ঘটলে তা অপনোদনের দায়িত্ব চার্চেরই। মানুষ যখন বিভ্রান্ত তখনই সে ধর্মের শরণ নেয়। সে অবস্থায় তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া, আর যাই হোক তা ধর্ম নয়।

রবিনসন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জাপান যখন আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে দেশের এক সৈনিক শত্রুর হাতে ধরা না দিয়ে গভীর অরণ্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে। তখন হয়ত তার কাছে কিছু খাদ্য ছিল, সেই সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদ আর সভ্য জীবনের অনিবার্য সঙ্গী ছুরি ও দেশলাই। কিন্তু একে একে তার কৃত্রিম সম্বল ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রকৃতির দান দিয়ে সে অভাব পূরণ করতে থাকে। গুয়াম দ্বীপের অরণ্যঘেরা এক পর্বতকন্দর হয় তার বাসভূমি, বল্কল হয় পরিচ্ছদ, ফলমূল হয় খাদ্য। কিন্তু তবু সে শহরে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করে না। আর এইভাবে নীরব, নিঃসঙ্গ, অরণ্যচারী মানুষটি আহার অন্বেষণের অবকাশে সমুদ্রের ঢেউ গুণতে গুণতে কাটিয়ে দেয় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। সেদিনের সেই একুশ বছর বয়সের বেপরোয়া সৈনিক এত দিন পরে আটান্ন বছর বয়সে আবার সভ্য দুনিয়ায় ফিরে এসেছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। অসুস্থ অবসন্ন দেহে সে যখন সমুদ্রপারে পড়েছিল তখন দুটি জাপানী জেলে তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে আনে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী

এপারের বাংলা সাগ্রহে অপেক্ষা করে ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য। সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর আগমনে। ভারত ও বাংলাদেশ, বিশেষ করে দুই বাংলার মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় প্রত্যেক সভাতেই ভারতের সঙ্গে তাঁর দেশের বিশেষ মৈত্রী সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করে থাকেন। কোনো কোনো বিদেশী শক্তি এই বিশেষ সম্পর্কে ফাটল ধরাবার ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। কিন্তু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গভীরতম সঙ্কটের দিনে আমাদের দুই দেশের মধ্যে আত্মদানের রক্তেরাঙা যে রাখিবন্ধন গড়ে উঠেছে তা পৃথিবীর কোনো শক্তিই পারবে না ছিন্ন করতে। বঙ্গবন্ধুর এই প্রত্যয়সিদ্ধ উজ্জ্বল ঘোষণা স্মরণীয় হয়ে থাকবে দুই দেশের অধিবাসীর মনে। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের দুই দেশের ভাগ্যও, সুখে এবং দুঃখে, একসূত্রে বাঁধা থাকবে। এ শুধু ভাবাবেগের কথা নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমধর্মিতায় গড়ে উঠবে এই বন্ধুত্বের বন্ধন। তারই গোড়াপত্তন হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। অনেক বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছেন। এই বাহিনীর অপসারণ না হলে নাকি তাঁরা বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবেন না। যার অস্তিত্ব আজ সূর্যের মতো সত্য তাকে অস্বীকার করা নিজেদেরই সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয়। পৃথিবীর বহু দেশ, তার মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো বৃহৎ শক্তিও আছে, এই নবজাত রাষ্ট্রকে জানিয়েছে কূটনৈতিক স্বীকৃতি। পাকিস্তানের ভগ্নাংশের সিভিলিয়ান ডিকটেটর জুলফিকার আলি ভুট্টো বার বার আপশোষ করছেন যে, বৃহৎ দেশগুলো বড় তাড়াহুড়ো করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তিনি ইতিমধ্যে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম দেশগুলো সফর করে এসে চীনা নেতাদের সঙ্গেও শলাপরামর্শ করেছেন পিকিং গিয়ে। তিনি এখনও "পূর্ব পাকিস্তান"-এর স্বপ্ন দেখেন। এখনও "মুসলিম বাংলা"র কথা বলেন তিনি। সেই "মুসলিম বাংলা" মুসলিম প্রধান হলেও তা যে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে, এই সহজ সত্যটুকু তিনি স্বীকার করতে চান না। এদিকে প্রায় প্রতিদিনই তাঁর "মুসলিম বাংলা"য় পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর নৃশংসতার ঘটনা আবিষ্কৃত হচ্ছে। ইসলামের নামে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তা বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গণকবরখানা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

অথচ বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে চরম সংযম পালনের আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেছেন। কিন্তু পাকিস্তানীরা যাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল বাঙালীদের হত্যার জন্য, তারা এখনও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করে নি। এ হল প্ররোচনামূলক কাজ। সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার পথ এ নয়। ভারতীয় বাহিনীকে এখন অবাঙালীদের রক্ষা করতে হচ্ছে। ঐ অবাঙালীরা এতকাল অন্ধভাবে পাকিস্তানী শাসকদের সমর্থন করে এসেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গেও তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। এদের পক্ষে পাকিস্তানে চলে যাওয়া ছাড়া বাঞ্ছনীয় পথ আর কিই বা আছে; মোট কথা, বাংলাদেশকে আর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে দেওয়া চলবে না কোনো মতেই। বহু রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। এবার সেই স্বাধীনতাকে সংহত করার সময়। বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বর্তমান সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। নবতিপর বৃদ্ধ মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানিও স্বদেশে ফিরে গিয়ে বলেছেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে শেখ মুজিবর রহমান তাঁর পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন। এমন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য আজকের যুগে সত্যিই দুর্লভ। বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পরও অনেক দেশে দেখা গেছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রমাণ দিলেন যে, তাঁরা বৃথাই আত্মদান করেন নি। রক্তের মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ত দিয়েই রক্ষা করবেন তাঁরা সমস্ত রকম বিচ্ছেদকামী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ সমস্ত রকম সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের জন্য। বন্ধুত্ব যেখানে অকপট, মৈত্রী যেখানে নিঃস্বার্থ সেখানে সহযোগিতার পথে কোনো বাধা থাকতে পারে না। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর জয়ধ্বনিতে মুখর কলকাতা, ঢাকা, নয়াদিল্লী পৃথিবীর কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এই জয় আমাদের দুই দেশের আদর্শের জয়, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জয়, ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে মুক্ত মানবাত্মার জয়। আমরা বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাই।

পটভূমি

কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি মিলে পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনকে কেউই অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলবেন না, কিন্তু তাতে এই মোর্চা গঠনের গুরুত্ব একটুও কমে না। কংগ্রেস এবং সি পি আই, দু'দলের নীতি বিবর্তনের দিক থেকেই এর তাৎপর্য অসীম।

আজ পর্যন্ত কংগ্রেস এই রাজ্যে অপর কোনো দলের সঙ্গে চুক্তি করে অথবা আঁতাত করে ভোটযুদ্ধে নামে নি। এমন কি গত বছরে যখন আজকের তুলনায় কংগ্রেস আরো হীনবল ছিল তখনও না। ১৯৬৭ পর্যন্ত অবশ্য কংগ্রেস এই ধরনের চিন্তাকে মনের কোণে ঠাঁই দেয় নি। কারণ নির্বাচনে অপর কারো সাহায্য নেওয়ার দরকারও দেখা দেয় নি। ১৯৬৯ সালে দরকার দেখা দিলেও কংগ্রেস ঐ পথে যায় নি। তার একটা কারণ, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর মতো উল্লেখযোগ্য কোনো দলই তখন ছিল না, অন্যান্য প্রায় সব দলই যুক্তফ্রন্টের ছত্রতলে মিলিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস সব ক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি ঠিকই, অনেক আসনে অন্য দলের প্রার্থীদের সঙ্গে একটা অলিখিত বোঝাপড়াও ছিল, কিন্তু ঘোষিত আঁতাত কোথাও নয়। গত বছরেও সি পি আই তথা আট পার্টি জোটের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত না-হোক, অন্ততঃ একটা বোঝাপড়ার জন্যে উদ্যোগ হয়েছিল। সে-চেষ্টাও সফল হয় নি। অন্যান্য কারণের মধ্যে এর জন্যে দায়ী ছিল কংগ্রেসেরই একাংশের মনোভাব। তাঁরা সি পি আইয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে জোট বাঁধতে রাজী ছিলেন না।

এবারেও যে কংগ্রেসের সব স্তরের সব কর্মী সি পি আইয়ের সঙ্গে মোর্চা গঠনকে একেবারে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছেন তা নয়। কেউ কেউ এখনও সাবেকী কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তা ছাড়া যে ৪১টি আসন সি পি আইকে দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও মতভেদ দেখা গেছে। অনেকে বলেছেন, ঐ ৪১টি আসনের মধ্যে বেশ কয়েকটিতেই সি পি আই প্রার্থীদের তুলনায় কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনাই ছিল বেশি। কিন্তু এই সব বিবেচনা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্ব এবার সি পি আইয়ের সঙ্গে শুধু আসন বণ্টনের বোঝাপড়াতেই আসেন নি, সরকারীভাবে গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করেছেন, যুক্ত কর্মসূচী তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন এবং যুক্ত ঘোষণা থেকে মনে হয় যে নির্বাচনের পর সে-রকম অবস্থা দেখা দিলে সি পি আইয়ের সঙ্গে একত্রে মন্ত্রিসভাও গঠন করবেন ("একটি প্রগতিশীল ও স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করে তোলবার জন্যে গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করেছি," "প্রধান কর্তব্য হবে...এক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ও জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা")।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে, কোনো দলের সঙ্গে কোনো সরকারী আঁতাত হবে না, শুধু কিছু আসন ভাগাভাগি হতে পারে। সেই সব দল হল সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, গোর্খা লীগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে সি পি আইয়ের দাবি অনুযায়ী একটি আঁতাত এবং কর্মসূচীতে রাজী হতে হয়েছে। অর্থাৎ সি পি আই এই ভেবে খুশি হতে পারে যে, তারা "যে কোনো মূল্যে" কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায় নি।

•

এই হাত মেলানোর মধ্যে দিয়ে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস সম্পর্কে সি পি আইয়ের দ্বন্দ্বযুগের অবসান ঘটল। গত বছরেই নির্বাচনের আগে এই রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হোক, এটাই ছিল সি পি আইয়ের কেন্দ্রীয় নেতাদের ইচ্ছা। ১৯৭০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবকে পশ্চিম বাংলা শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, "প্রথমে বাংলা কংগ্রেসকে দলে নিয়ে আট-পার্টি জোটকে ন'-পার্টি করো, তারপর কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসো।" কিন্তু পশ্চিম বাংলা শাখা সেই নির্দেশ মানতে পারে নি। তার একটা কারণ, আট-পার্টি জোটের অনেক শরিক কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় রাজী ছিল না। তবে সবচেয়ে বড় কারণ, সি পি আইয়ের মধ্যেই একাংশ ছিলেন এই সমঝোতার বিরোধী। কারণ তাঁদের মতে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের তদানীন্তন নেতৃত্ব যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল না। পার্টির জাতীয় পরিষদের নির্দেশ এইভাবে বানচাল হয়ে যায় দেখে ভবানী সেন প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতারা কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন, স্থানীয় সহকর্মীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতেও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো ফল হয় নি।

১৯৭১ সালের নির্বাচনে এই রাজ্যে সি পি আই তথা আট-পার্টি জোটের বিপর্যয়ের পরই কিন্তু পার্টির মধ্যে জোর সমালোচনা দেখা দেয়। এই অভিমত তখন সোচ্চার হয়ে ওঠে যে, জাতীয় পরিষদের নির্দেশ অমান্য করার ফলেই পার্টির এই হাল হল। শেষ পর্যন্ত যে সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে ডঃ রণেন সেনকে বিদায় নিতে হল এবং তার জায়গায় এলেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তার অন্যতম কারণও হল এই নির্বাচনী নীতি সংক্রান্ত সমালোচনা।

গত সেপ্টেম্বরে পার্টির রাজ্য সম্মেলনের পর গোপালবাবু নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে, গত নির্বাচনে কোনো সুস্পষ্ট নীতি ছিল না বলেই সি পি আই তেমন সুবিধে করতে পারে নি। এই অস্পষ্ট নীতির ফলে শুধু যে বিধানসভায় পার্টির আসন সংখ্যা কমে যায় তাই নয়, সাধারণভাবে পার্টির সদস্য সংখ্যাও কমতে থাকে। তাই এখন সময় এসেছে একটা নির্দিষ্ট ট্যাকটিক্যাল লাইন বেছে নেওয়ার। সেই লাইন কী হবে, তা স্থির হয়ে যায় ঐ রাজ্য সম্মেলনেই—সেটা হল কংগ্রেসের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা। অবশ্য তার আগে আগস্টে দিল্লীতে জাতীয় পরিষদের গৃহীত পার্টি কংগ্রেসের খসড়া প্রস্তাবেই ঐ লাইন নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯৭০ সালের অনুরূপ লাইন পার্টির পশ্চিম বাংলা শাখা অগ্রাহ্য করলেও, ১৯৭১ সালে সেই লাইন মেনে নেওয়া হল। শুধু মেনে নেওয়া হল তাই নয়, ১৯৭২ সালে সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে একটা মোর্চাও গঠন করে ফেলল।

পার্টির এই লাইন সম্বন্ধে সকলেই যে একমত, এ-কথা মনে করার অবশ্য কোনো কারণ নেই। জাতীয় পরিষদের বৈঠকেও দেখা গেছে, রাজ্য সম্মেলনেও দেখা গেছে যে, পার্টির ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে একাধিক মত বর্তমান। কেউ সি পি এমের সঙ্গে সহযোগিতায় এখনও বিশ্বাসী, আবার কেউ কংগ্রেস বা সি পি এম দুই তরফ থেকেই তফাৎ থাকতে চান। তবে সি পি এমের সঙ্গে সি পি আইয়ের মত-পার্থক্য এমন স্তরে পৌঁছেছে যে সেই সহযোগিতার পথ বন্ধ। আর কংগ্রেস এবং সি পি এম থেকে সমদূরত্বের নীতি যে কতো বিপজ্জনক তা গত নির্বাচনেই পার্টি ভালোভাবে টের পেয়েছে। তাই এখন কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতাই সি পি আইয়ের সামনে একমাত্র বিকল্প পথ।

•

গত নির্বাচনের সময় সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় না এলেও, নির্বাচনের পর অবশ্য ছবিটা পাল্টে যায়। আট-পার্টি জোটের কোনো কোনো শরিকের মতামত উপেক্ষা করে সি পি আই গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনে যোগদান করে এবং কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করে। তারপর আরো নানা ব্যাপারে দু'দলের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হতে থাকে। ইদানীং দুই দলের যুব শাখা একত্রে অনেক আন্দোলনও সুরু করেছেন, যেটা পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

যে-সব কারণে সি পি আই কংগ্রেসের নিকটতর হয়েছে তার মধ্যে একটি হল রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিবর্তন। পুরানো নেতাদের অনেকেই বিদায় নিয়েছেন এবং এখানে যে অ্যাড হক কমিটি তৈরি হয়েছে তাতে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটি তৈরি হওয়ার পর যাঁরা প্রথমেই সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে-

ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সি পি আই নেতা ভবানী সেন।
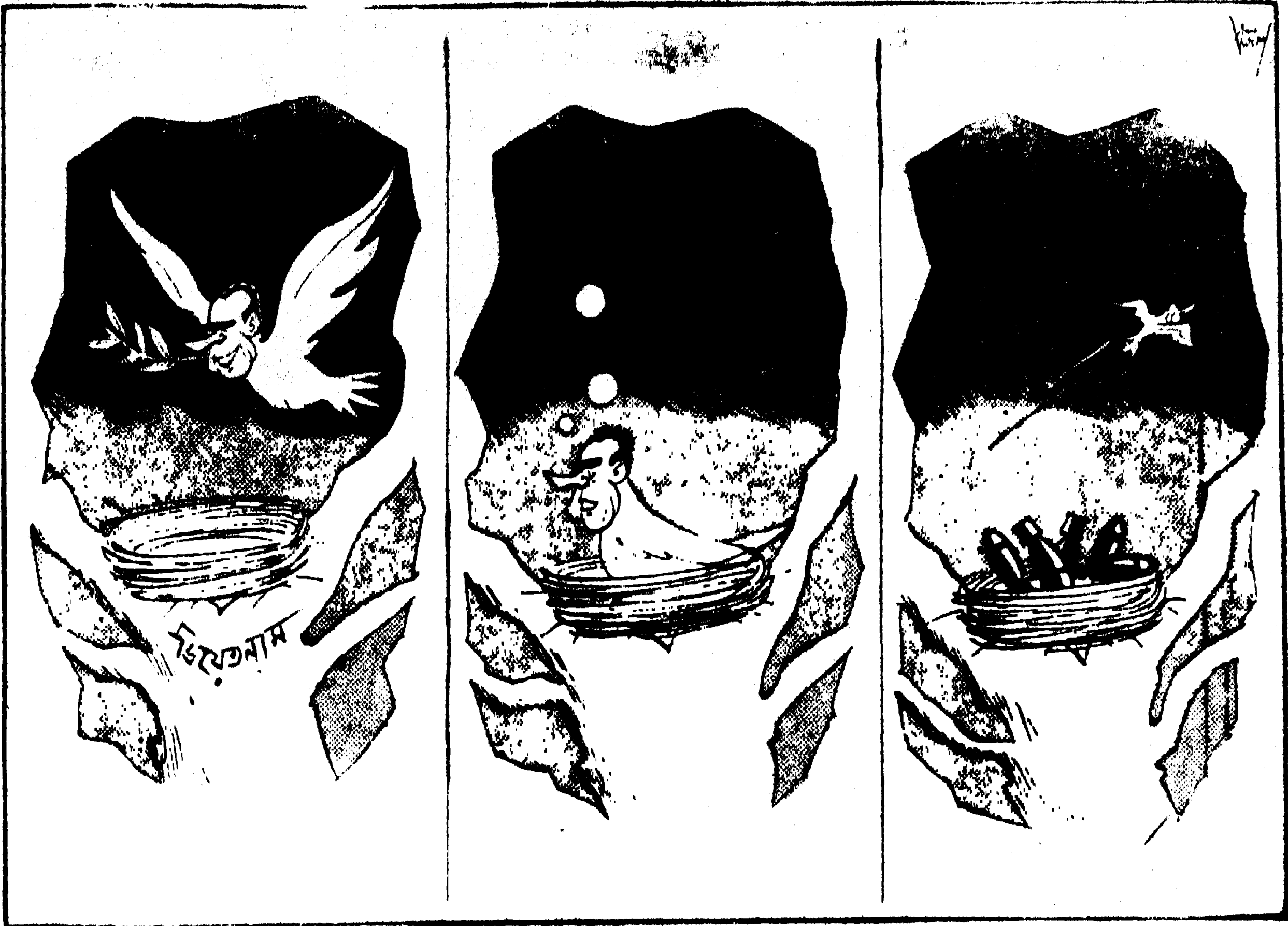
দ্বিতীয় কারণ হল, সর্বভারতীয় রাজনীতি। শৃংখলাবদ্ধ পার্টি হিসেবে সি পি আইয়ের পশ্চিম বাংলা শাখার পক্ষে বেশিদিন কেন্দ্রীয় নেতাদের নীতি উপেক্ষা করে "স্বাধীন" নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কেরলে যে কংগ্রেস ও সি পি আই মোর্চার ওপর সুখে একত্রে সংসার করছে তার প্রভাবও পড়েছে পার্টির সিদ্ধান্তের ওপর।

তৃতীয় কারণ, সি পি আই বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে যে, কেন্দ্রে যদি গণতন্ত্রের পক্ষে শক্তি সমাবেশ না-করা যায় তবে সি পি আই বা অন্য যে-কোনো বামপন্থী দলের অর্থনৈতিক কার্যসূচী স্বপ্নবিলাস থেকে যাবে। কারণ অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ছাড়া ঐ কার্যসূচী রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। এর উদাহরণ হিসেবে সি পি আই পশ্চিম বাংলায় বিগত দুটি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চায়। কিন্তু কেন্দ্রে কিভাবে গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ ঘটানো হবে, সি পি এমের সঙ্গে সি পি আইয়ের মতপার্থক্যটা প্রধানতঃ সেই কারণেই। কংগ্রেসের . প্রগতিশীল অংশকে সি পি আই ঐ সমাবেশের মধ্যে আনতে চায়, সি পি এম তা চায় না। কিন্তু সি পি আইয়ের এই নীতি যে ক্রমশঃই বেশি করে সফল হচ্ছে তার প্রমাণ হিসেবে কংগ্রেসের ভাইন থেকে সুরু করে সংবিধান সংশোধন এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারত সরকারের ভূমিকা পর্যন্ত নানা ঘটনার উল্লেখ করতে চায় সি পি আই। সি পি আইয়ের অভিযোগ, সি পি এমও এই সব প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশকে সমর্থন করেছে, কিন্তু তবু এখনও ভণ্ডের মতো সর্বাত্মক কংগ্রেস-বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের কাজের মধ্যেও সি পি আই ইদানীং প্রগতিশীলতার চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে এবং ভারত-সোভিয়েট চুক্তির প্রতি সমর্থন, ভাগচাষীদের শতকরা ৭৫ ভাগ ফসলের অধিকার সংক্রান্ত আইন পাস, ট্রাইবুনালের হাতে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ভার দেওয়ার প্রস্তাব ইত্যাদি সেই প্রগতিশীলতার নিশানা।

তবে কংগ্রেস এবং সি পি আইয়ের নিকটতর হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের ভূমিকা এবং ভারত-সোভিয়েট চুক্তি। এই দুটি ব্যাপার শুধু যে পার্টির কাছে কংগ্রেসের কাছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং গণতন্ত্রী চেহারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তাই নয়, সি পি আই ও কংগ্রেসকে একত্রে কাজ করার বহু উপলক্ষও এনে দিয়েছে।

সি পি আই ও কংগ্রেসের এই মিলিত গণতান্ত্রিক মোর্চা কতোদূর সাফল্যমণ্ডিত হবে তা ভোটদাতারাই স্থির করবেন আগামী ১১ই মার্চ, তবে ইতিমধ্যে একটা কথা বোধ হয় বলা যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আইয়ের এই আঁতাতের ফলে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভেদ চূড়ান্ত রূপ নিল। গত বছর নির্বাচনেও দুই পার্টির মধ্যে শত্রুতার কোনো ঘাটতি ছিল না। সি পি এম সি পি আইকে 'দালালের দালাল' বলে আপ্যায়িত করেছে, আবার সি পি আইও সি পি এমকে বিভেদ-সৃষ্টিকারী হঠকারি বলে গাল দিতে ছাড়ে নি। তবু নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর যখন দেখা গেল কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তখন সি পি এম সরকার গঠনের জন্যে সি পি আইকে আহ্বান জানাতে দ্বিধা করে নি। এমন কি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতনের পরেই সি পি এম যখন একটি বৃহত্তর বামপন্থী ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানায় তখনও সি পি আইকে সেই ফ্রন্টে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছিল: কিন্তু এবারের নির্বাচনের পর যদি ১৯৭১ সালের মতোই অবস্থা দাঁড়ায় তখনও কি সি পি এম চাইবে সি পি আইয়ের সহযোগিতা? সে পথ এখন বন্ধ হয়ে গেল।

৩।২।৭২ —[illegible]

দমদম বিমানবন্দরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দ্বিতীয় আর একটি বৃহৎ বিশ্বশক্তির অনুমোদন লাভ করল। বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে রাশিয়া আগেই তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এবার বৃটেনও দিল।

ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন সম্প্রতি বলেছেন যে, ভারত ভাগ করার জন্য তিনি এখন দুঃখবোধ করেন। পাকিস্তান বৃটেনেরই সৃষ্টি। হাজার মাইলের বেশী ব্যবধানে তার দুই অংশকে দুটি পৃথক ভূখণ্ডে স্থাপন করে এবং দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির জনসমষ্টিকে কেবলমাত্র ধর্মের বন্ধনে বেঁধে রাখা যাবে বলে আশা করে বৃটেনই ২৫ বছর আগে বাংলাদেশ সৃষ্টির বীজ বপন করে রেখেছিল। ২৫ বছর আগে যাঁরা ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন তাঁরাই আজ পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার ঘটনাটি মেনে নিলেন—এর মধ্যে কোথায় যেন ইতিহাসের দেনা শোধের একটা ধারণা লুকিয়ে আছে।

বাংলাদেশকে বৃটেনের এই স্বীকৃতিদান পাকিস্তানের উপর একটি বড় রকমের কূটনৈতিক চপেটাঘাতের শামিল। বৃটেন বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার কার্যকলাপ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করতে বাধ্য। বৃটেন, ভারত ও পাকিস্তান, সকলেই কমনওয়েলথের সদস্য। সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতাই বলে, পাকিস্তানের সঙ্গে বৃটেনের যে শুধু একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে তাই নয়, পাকিস্তানের প্রতি বৃটিশ সরকারের একটা বিশেষ দুর্বলতাও ছিল। পশ্চিমী সামরিক জোটে পাকিস্তান শুধু আমেরিকারই নয়, বৃটেনেরও শরিক। সুয়েজের পূর্বাঞ্চল থেকে বৃটিশ শক্তি সরে গেলে যে 'শূন্যতা'র সৃষ্টি হবে তা পূরণ করার জন্য বৃটেন ঐ অঞ্চলের জন্য পাকিস্তানের একটি বিশেষ ভূমিকা নির্দিষ্ট করে রেখেছে। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের ভিতর যে একটি প্রভাবশালী পাকিস্তান-প্রেমী গোষ্ঠী রয়েছে সে বিষয়ে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসনের স্বীকারোক্তি

দেশে বিদেশে

রয়েছে। এই গোষ্ঠীর ভুল পরামর্শেই যে তিনি অন্যায় করে ভারতকে কচ্ছের রান সংক্রান্ত বিরোধে 'আক্রমণকারী' বলে অভিহিত করেছিলেন সেকথা তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন। এই বৃটেন যখন পাকিস্তানের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তখন সেটাকে বৃটেনের নীতি পরিবর্তন বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বৃটেনের হাত চেপে ধরার জন্য ইসলামাবাদের পরাজিত নায়কদের চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তাঁরা কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে এসে বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। কমনওয়েলথের সেক্রেটারি-জেনারেল আর্নল্ড স্মিথ তাঁদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, বৃটেন কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য বই নয়, অতএব বৃটেনের কাজের জন্য গোটা কমনওয়েলথ সম্পর্কে বিরাগ প্রকাশ করার অর্থ নেই। তাঁর সেই কথা পাকিস্তান সরকার কানে তোলেন নি। পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে আসার ফলে বৃটেনবাসী পাকিস্তানীরা 'বিদেশী নাগরিক'-এ পরিণত হয়ে অসুবিধায় পড়বে জেনেও ভুট্টোর সরকার নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করতে পিছপাও হন নি। পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছাড়ায় বৃটেন দুঃখপ্রকাশ করেছে বটে; কিন্তু এই ব্যাপারে পাকিস্তান যে বৃটেনকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারবে না লণ্ডন সেকথা আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল। বৃটেন এখন ইউরোপের আঙিনায় পা বাড়িয়েছে। ইউরোপের অভিন্ন বাজারে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য সে চেষ্টা করে আসছিল তা সার্থক হতে চলেছে। হয়তো তার ফলেই ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে বৃটিশ সরকার এখন পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত নূতন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে পারছেন। নিরাপত্তা পরিষদে ফ্রান্সের সঙ্গে একযোগে বৃটেনও আমেরিকার, পাকিস্তান-উদ্ধার-প্রয়াসে শরিক হতে অস্বীকার করেছে। বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি

দেওয়ার অনেক আগেই বৃটিশ সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে কার্যত একটি স্বাধীন সরকারের প্রধানের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে আতিথ্য দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হীথ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, বৃটিশ বিমানবহরের বিমানে তাঁকে ঢাকায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান বৃটেনের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীরই ন্যায্য পরিণতি।

এই স্বীকৃতিদানের সংবাদ ঘোষণার সময়টিও তাৎপর্যপূর্ণ। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের ভারত সফরে আসার আগের দিন এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। দেশে ফেরার পথে স্যার আলেকের পাকিস্তানে যাওয়ার কথাও আছে। কিন্তু ইসলামাবাদের সঙ্গে আলোচনার অপেক্ষা না করেই বাংলাদেশকে বৃটেনের স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ভারতের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্কের আরও উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তানের গায়ের জ্বালা বাড়ল।

বৃটেন সমেত কমনওয়েলথের ছয়টি দেশের স্বীকৃতিলাভের পর এখন বাংলাদেশ খুব সম্ভবত কমনওয়েলথে যোগ দেবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বসভায় বাংলাদেশের ন্যায্য আসন লাভ ঠেকাতে না পেরে এখন ইসলামাবাদের শেষ ভরসা ইসলামের দোহাই পাড়া। কোন মুসলমান-প্রধান দেশ এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি, এই কথাটার উপর পাকিস্তান জোর দিচ্ছে। এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চীনও জোর গলায় কথাটা বলেছে। যদিও ঢাকার ধর্মনিরপেক্ষ সরকার নিজেদের ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার বলে অভিহিত করেন না তাহলেও মুসলমান জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান সারা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় (ইন্দোনেশিয়ার পর)। কোন মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র বাংলাদেশকে মেনে নিচ্ছে না, এটা দেখিয়ে পিণ্ডি ও পিকিং সম্ভবত প্রমাণ করতে চাইছে যে, দুনিয়ার মুসলমানরা বাংলাদেশের মানুষদের কাজ সমর্থন করেন না। কিন্তু এই প্রচারও আর খুব বেশীদিন টিকবে বলে মনে হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের কাছে খবর এসেছিল যে, পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলমান-প্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরে অবশ্য জানা গেছে যে, ঐ খবর ঠিক নয়। কেননা, ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ আদম মালিক বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হলে এবং ইসলামাবাদ ও ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে তবেই তাঁরা সেই দেশকে স্বীকৃতি দেবেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে এখন আর পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করছে না। আফ্রিকার একটি মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র সেনিগল ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ডাঃ আদম মালিক যাই বলুন, ইন্দোনেশিয়ার স্বীকৃতিও সম্ভবত আর খুব দূরের ব্যাপার নয়।

ইসলামের নামে উদ্ধার পাওয়ার আশায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো সম্প্রতি লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মিশর ও সিরিয়ায় সফর করে এলেন এবং পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য কয়েকটি মুসলমান-প্রধান দেশে সফর করতে পাঠাচ্ছেন, তাঁর একজন মন্ত্রীকে। এর আগে ভুট্টো সাহেব ইরান ও তুরস্ক সফর করে এসেছেন। এই দেশগুলি অনেক বিষয়েই পরস্পরের সঙ্গে ভিন্নমত। মিশর ইজরায়েলের পরম শত্রু, টিউনিসিয়া ইজরায়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়। লিবিয়া পশ্চিমী সামরিক জোটের ঘোরতর বিরোধী, ইরান ও তুরস্ক পশ্চিমী জোটের শরিক। কিন্তু ভুট্টো সাহেব এইসব দেশকে দিয়েই কবুল করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের শাসন ও শোষণের অধিকার বজায় রাখাই দুনিয়ার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রকৃত উপায়। আর এই চেষ্টায় ভুট্টো সাহেব যে কিছু সাফল্যলাভ করেন নি তা নয়।

বৃটেন যেমন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরের প্রাক্কালে পাকিস্তান তেমনি কমনওয়েলথ ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর পিকিং সফরের প্রাক্কালে। পিকিং-এ

নাম কেনার জন্য ভুট্টো সাহেবের সম্ভবত চমকপ্রদ কিছু করার প্রয়োজন ছিল। পিকিংয়ে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ও তাঁর দলবলকে জমকালো সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে, যদিও তুষারপাতের জন্য ঐ সম্বর্ধনার আয়োজন কতকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। চেয়ারম্যান মাও ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে ভুট্টো সাহেবের মোট প্রায় সাড়ে আটঘন্টা কথা হয়েছে। এই কথাবার্তার মোটের উপর কি ফললাভ হয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে মন চাঙা করার মতো কিছু মিঠা কথা ভুট্টো সাহেব দোস্তের কাছ থেকে শুনে এসেছেন। এটা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয় যে, সফরের শেষে চীন-পাকিস্তান যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, তারা উভয়েই মনে করে, বাংলাদেশে ভারত হচ্ছে আক্রমণকারী এবং সেখান থেকে দখলদার ভারতীয় বাহিনী সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই নৈতিক সমর্থনের বেশী আর কোন বাস্তব সমর্থনের আশ্বাস কি ভুট্টো সাহেব পিকিং থেকে নিয়ে আসতে পেরেছেন? বি-বি-সি-র খবর হচ্ছে, চীন পাকিস্তানকে তার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনামূল্যে যোগান দেবে বলেছে। তাছাড়া, চীন এর আগে পাকিস্তানকে যে তিনটি ঋণ দিয়েছে সেগুলি পরিশোধের দায় থেকেও সে পাকিস্তানকে অব্যাহতি দিয়েছে বলে প্রকাশ। চীন থেকে ভুট্টো সাহেব নৈতিক ও বাস্তব সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যাই পেয়ে থাকুন না কেন, এটা পরিষ্কার যে, সবগুলি বিষয়ে চীন পাকিস্তানের সঙ্গে একমত হতে পারে নি। যেমন চৌ এন-লাই ও জুলফিকার আলি ভুট্টো কর্তৃক স্বাক্ষরিত যুক্ত ইস্তাহারের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, ভুট্টো সাহেব মনে করেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হবে সেটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা স্থির করতে হবে এবং সে ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপ চলবে না।' যৌথ বিবৃতিতে ভুট্টোর এই মত উল্লেখ করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, চৌ তাঁর সঙ্গে একমত কিনা অথবা চৌ-এর মত কি যৌথ বিবৃতিতে তার উল্লেখ করা হয় নি। ভুট্টো সাহেব চান যে, 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে ভারতীয় সৈন্য সরে এলে সেখানকার নেতাদের সঙ্গে নূতন করে কথা বলা হবে। ভারতীয় সৈন্যদের সরে আসার প্রয়োজন সম্পর্কে চীন পাকিস্তানের সঙ্গে একমত; কিন্তু নূতন করে আলোচনা আরম্ভ করার ব্যাপারে চীন চুপ।

●

বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে ভারতীয় ফৌজ সরিয়ে আনলে কি কাণ্ড ঘটতে পারে সম্প্রতি ঢাকায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমানের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুক্তিবাহিনীর তরুণরা তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করেছেন; কিন্তু পাকিস্তানের দালালদের হাতে, বিশেষ করে পাকিস্তানী ফৌজ আত্মসমর্পণ করার আগে যে অবাঙালীদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে গেছে তাদের হাতে এখনও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এরা যে এখনও সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ঢাকার অবাঙালী-প্রধান মীরপুর এলাকায় তল্লাসী চালাতে গেলে সেখানকার কিছু অধিবাসী প্রতিরোধ করে। বি-বি-সির খবর হচ্ছে, অবাঙালী দালালদের এই পাল্টা আঘাতের ফলে ইতিমধ্যে পুলিশ ও সৈন্য মিলিয়ে প্রায় শতখানেক মারা গেছেন। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, বেশ কিছু পাকিস্তানী সৈন্য উর্দি ছেড়ে মীরপুর এলাকায় অবাঙালী অধিবাসীদের ভিতর আত্মগোপন করে আছে।

●

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে বিধান-সভাগুলির নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই প্রস্তুতিতে কংগ্রেস অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইতিমধ্যে যেসব বক্তৃতা করেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে, এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রধান স্লোগান হবে, রাজ্যে রাজ্যে স্থায়ী সরকার চাই এবং সেসব সরকারের সঙ্গে 'কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গতি থাকা চাই'।

বাংলাদেশে ভারতের বিরাট সামরিক ও নৈতিক জয়ের পর এখন দেশের হাওয়া নিশ্চয়ই কংগ্রেসের অনুকূলে; কিন্তু কংগ্রেসের ভিতরেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজ যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যদি সে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যেত তাহলে পর পর তিনজন অনিচ্ছুক মুখ্যমন্ত্রীর উপর কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের চাপ দেওয়ার দৃশ্য দেখতে হত না। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালের মন্ত্রিসভা নির্বাচনের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছেন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্যামাচরণ শুক্ল ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রায় একই পরিস্থিতিতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনজন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই প্রদেশ সংগঠনের ভিতর একটি অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী রয়েছেন এবং ঐ তিনজনই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, বিশেষভাবে শ্রীমতী গান্ধীর, আস্থা হারিয়েছেন। শুক্লের জায়গায় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন মন্ত্রী প্রকাশচন্দ্র শেঠি এবং চৌধুরীর জায়গায় আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (অ্যাড হক) সভাপতি শরৎচন্দ্র সিংহ। নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্য মন্ত্রিসভার বদল হল এবং সেই মন্ত্রিসভার প্রধান হলেন এমন কেউ যিনি রাজ্য বিধানসভার সদস্যই নন, এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

●

সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীদের জন্য একটি বারো-দফা আচরণ-বিধি প্রণয়ন করেছেন। এই আচরণবিধিতে যেসব নিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে, বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের লোকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা চলবে না, ব্যক্তিগত কুৎসা, অসমর্থিত অভিযোগ বা বিকৃত প্রচার করা চলবে না, অন্য দলের সভা ভাঙা বা পোস্টার ছেঁড়া চলবে না, আইন ও শৃংখলা রক্ষা করতে গিয়ে সরকারী অফিসাররা এমন কিছু করবেন না যাতে নাগরিক অধিকার অযথা ক্ষুন্ন হয় এবং নির্বাচন অভিযান পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটে, ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না, নির্বাচনী প্রচারের জন্য মসজিদ, গির্জা, মন্দির প্রভৃতি উপাসনাস্থানগুলিকে ব্যবহার করা চলবে না ইত্যাদি।

●

৫১ বছর বয়সে রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেবের মৃত্যুতে ভারতের প্রতিবেশী নেপাল তার আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীসম্পন্ন রাজাকে হারাল। ১৭ বছর ধরে তিনি রাজত্ব করেছেন। শাহ বংশে তাঁর আগে আর কেউ এতকাল রাজত্ব করেন নি। কিন্তু শুধু যে সেইজন্যই তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে স্মরণ করবেন তা নয়। নেপালকে আধুনিককালে নিয়ে আসারও প্রধান কৃতিত্ব তাঁর। হিমালয়ের বদ্ধ আবেষ্টনী থেকে সে দেশকে তিনিই বের করে নিয়ে এসেছেন। তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে নেপাল প্রথমে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ও পরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ দিয়েছে।

রাজা মহেন্দ্রের আমলে ভারত ও নেপালের মধ্যে কখনও কখনও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে; কিন্তু সেই ভুল বোঝাবুঝি স্থায়ী হয় নি। বিশেষত, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। রাজা মহেন্দ্র মারা যাওয়ার অল্প কয়েকদিন আগে টি ডি অলম্যান 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় লিখেছেন:

'একটি পর্যটন পুস্তিকায় নেপালকে বর্ণনা করা হয়েছে 'চীন ও ভারতের মধ্যে আটক পড়া একটি দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন পার্বত্য রাজ্য' বলে। সাধারণভাবে যতটা অনুমান করা হয়ে থাকে এই বর্ণনা ততটা সঠিক নয়, বিশেষভাবে পূর্ববাংলায় ভারতের দ্রুত বিজয়ের পর। নেপাল ও পূর্ববাংলার মধ্যে রয়েছে মাত্র ২০ মাইল ভারতীয় এলাকা। ভারতের জয়ে এই কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে যে, কাশ্মীর অথবা নেফার চেয়েও বেশী করে নেপাল হচ্ছে ভারতের অংশ। গত এক দশক কাল যাবৎ নেপাল ভারত, চীন ও পাকিস্তানকে খেলিয়ে নিজের টলমলে স্বাধীনতা রক্ষা করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। নেপালের পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতম অংশ ছিল, ভারতের প্রভাবের প্রতিষেধক হিসাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপনের নীতি। সেই নীতি এখন অকেজো হয়ে গেছে। অতএব এখন নেপালের পররাষ্ট্রনীতির উপর এবং তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের উপর ভারতের প্রভাব আরও বেশী হবে।'

৪।২।৭২ —পুণ্ডরীক

বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের জীবন সাধনা

শিবদাস চক্রবর্তী

জন্মসূত্রে বাঙালী হয়েও যাঁরা ভারতবর্ষকেই 'স্বদেশ' বলে গ্রহণ করেছেন, সেই স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-কামনায় নিজেদের কণ্ঠ ও লেখনীকে নিয়োজিত করেছেন এবং স্বদেশের কল্যাণসাধনায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হয়েও যাঁরা 'জন্মভূমি' বাংলার প্রতি অন্তরের নিগূঢ় অনুরাগরঞ্জিত মমতা পোষণ করেছেন, বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালীর স্বদেশচর্যার ইতিহাসে তেমন দুটি উজ্জ্বল নাম হচ্ছে—দেশসেবক বিপিনচন্দ্র পাল এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। বিংশ শতকের প্রারম্ভিক দশক অবশ্য আরও দু'জন মহাকীর্তিমান বাঙালীর অপরিমেয় অবদানে সমৃদ্ধ। তাঁরা হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিশ্ববন্দিত ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। তবে এঁরা দু'জনেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই স্বদেশ চর্যার যে একান্ত প্রত্যক্ষ দিক সক্রিয় রজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, তা' থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিন্ন সাধন মার্গে প্রস্থান করেছিলেন।

সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব কিছু বিলম্বিত হলেও বিপিনচন্দ্র এবং চিত্তরঞ্জন, এই দু'টি নামই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ জুড়ে বাঙালী তথা ভারতবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সর্বভারতীয় স্বীকৃতিতে 'লাল-বাল-পাল'-এর অন্যতমরূপে আগে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন। [illegible] বয়সেও বিপিনচন্দ্র ছিলেন চিত্তরঞ্জনের চেয়ে বারো বছরের বড়ো,—অগ্রজকল্প। স্বদেশ-সাধনায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই দু'জন মনীষীরই আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ভূখণ্ডে। বিপিনচন্দ্র ছিলেন শ্রীভূমির সন্তান, আর চিত্তরঞ্জনের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল ঢাকা বিক্রমপুর। সর্বভারতীয় ধারণার শক্তিমান প্রবক্তা হয়েও দু'জনের কেউ-ই বাঙালীর বিশিষ্ট জীবন-সাধনার কথা কোনোদিন বিস্মৃত হননি। আবার দু'জনেই ধর্মমতে ব্রাহ্ম হয়েও, মর্মমতে ছিলেন বৈষ্ণব। এক কথায়, উনিশ শতকীয় সমন্বয়ী সাধনার দু'জনেই ছিলেন সিদ্ধ সাধক।

স্বদেশ-সাধনার অন্তরঙ্গ আকৃতিই একদা স্বদেশপ্রাণ এই দুই মনীষীকে একান্তভাবে পারস্পরিক সান্নিধ্যে টেনে এনেছিল, আবার সেই স্বদেশ-সাধনার অকৃত্রিম আকৃতিই একদা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দিয়েছিল। বিশ বছরের একান্ত মধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্কও সেদিন তাঁদের স্বদেশ-চিন্তা ও স্বদেশ-সাধনার পথরোধ করে দাঁড়ায়নি।

ব্যক্তিগতভাবে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ হবার অনেক আগে থেকেই দাশ-পরিবারের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার সূচনা হয়। পূর্বপুরুষের ধর্মমত পরিত্যাগের অপরাধে পিতা কর্তৃক ত্যাজ্যপুত্র ঘোষিত হওয়ার পর বিপিনচন্দ্রকে অপরিসীম অর্থকৃচ্ছ্রতার সম্মুখীন হতে হয়। ক্রমশঃ একটি ছোট অথচ ক্রমবর্ধমান পরিবার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। কিন্তু স্থায়ী আয়ের কোনো পথ তাঁর সামনে তখন খোলা ছিল না। জীবিকার সন্ধানে তিনি এই সময় শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার কাজ নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কোথায়ও তাঁর পক্ষে বেশীদিন কাজ করা সম্ভব হয় না। এই দুর্যোগের দিনে চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত বাবু দুর্গামোহন দাশ মশায় পিতার মতো অপরিমেয় স্নেহে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে বিপিনচন্দ্রের অর্থকৃচ্ছ্রতা মোচনের চেষ্টা করেন। একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকা যখন 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' নামে রূপান্তর পরিগ্রহ করে, তখন চিত্তরঞ্জনের পিতৃদেব ভুবনমোহন হন এই পত্রিকার বিঘোষিত সম্পাদক এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করেন দুর্গামোহন দাশ। এই সময় বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং দাশ-পরিবারের আনুকূল্যে এই পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। আত্মজীবনীতে বিপিনচন্দ্র জানিয়েছেন যে, এখানেই তিনি ইংরেজী সাংবাদিকতায় নিয়মিত শিক্ষালাভ করেন এবং ধীরে ধীরে এই পত্রিকার প্রধান লেখকরূপে গণ্য হন। এ হচ্ছে ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সূচনা হয় অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর ঊষা লগ্নে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তিভোগীরূপে বিপিনচন্দ্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন।

[illegible] নিউইয়র্ক জাতীয় পদক [illegible] আমন্ত্রণে তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকা যান। নিউইয়র্কে পদার্পণের পর একটি ঘটনা ঘটে যা তাঁর অন্তর্জীবনে এক অভাবিত পরিবর্তনের সূচনা করে। নিউ-ইয়র্কের যে-হোটেলে বিপিনচন্দ্রের বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই হোটেলে গিয়ে উঠতেই হোটেলের অধ্যক্ষ তাঁকে জানালেন যে, তিনি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন শুনে একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হোটেলের পাঠাগারে অপেক্ষা করছেন। বিপিনচন্দ্র প্রথমেই সেই কক্ষে গেলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই সেই ভদ্রলোক আসন ছেড়ে এগিয়ে এসে সাগ্রহে করমর্দন করে বললেন—'স্যার, আপনি এক বিরাট দেশ থেকে এসেছেন। বিধাতার নির্দেশে জগতের শিক্ষাদাতার স্থান আপনারাই গ্রহণ করবেন। কিন্তু যতদিন না জগতের অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদের সমকক্ষ হতে পারছেন, ততদিন পর্যন্ত আপনারা আপনাদের বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে পারবেন না।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এর কয়েক বছর আগে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবক্তা-রূপে স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিনী মানুষের মন জয় করে এসেছিলেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি এই ভদ্রলোকের মনে অপরিসীম সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধ পোষণের মূলে স্পষ্টতই স্বামীজীর অবদান ছিল অনেকখানি। সে যাই হোক, এই মার্কিন ভদ্রলোকের সসম্ভ্রম অথচ বাস্তবনিষ্ঠ উক্তি বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়। তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে, কিন্তু ফিরে এলেন স্বদেশের স্বাধীনতার সাধনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ সৈনিকরূপে। তিনি বলেছেন—'আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্ববৃত্ত সাধন যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ, একথাটা সম্যক্‌রূপে জ্ঞান এবং সম্যক্‌রূপে ভাব দিয়া ধরিতে পারি নাই। মার্কিন প্রবাসের এইটিই হইল আমার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ লাভের বিষয়।'

এই ধারণার প্রেরণাতেই নবীন ভারত গঠনের রঙীন স্বপ্ন বুকে নিয়ে ১৯০১ খৃস্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের সম্পাদনায় ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া' ভূমিষ্ঠ হয়। 'নিউ ইণ্ডিয়া'র লক্ষ্য নির্দেশক বাণী ছিল—'ফর গড, হিউম্যানিটি অ্যাণ্ড ফাদার-ল্যাণ্ড'। নিউ ইণ্ডিয়ার স্তম্ভে বিপিনচন্দ্র ভাবী নবীন ভারতের যে ভাব-মূর্তি প্রচার করেছিলেন, সে-ভারত শুধু হিন্দু-ভারত নয়, মুস্লিম ভারত নয় কিম্বা শুধু ইংরেজ-ভারতও নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একই জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, একই লক্ষ্যে জাগ্রত এক সম্বন্ধ বিশাল মানবগোষ্ঠীর বাসভূমি ভারতবর্ষ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নব্যস্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসারে নিউ ইণ্ডিয়ার মহিমান্বিত ভূমিকা আজ ইতিহাস-স্বীকৃত। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগের নেপথ্যেও দাশ-পরিবারের যথেষ্ট আনুকূল্য ছিল। দুর্গামোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন দাশ ছিলেন এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সেদিনকার তরুণ উদীয়-মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন ছিলেন অন্যতম ডিরেক্টর। এই সময় থেকেই বিপিনচন্দ্র এবং চিত্তরঞ্জনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত হয় এবং অগ্রজের চিন্তা ও ভাব-ধারা অনুজের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে অগ্রজ ও অনুজ হরিহর আত্মায় পরিণত হন। 'বন্দেমাতরম মামলায়' বিপিনচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন, স্ব-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্রকে প্রধান লেখকরূপে গ্রহণ, বিপিনচন্দ্রের 'ন্যাশনালিটি অ্যাণ্ড এম্পায়ার' নামধেয় গ্রন্থ প্রকাশের সময় প্রকাশকের কাছে আর্থিক ঝুঁকির প্রত্যয়-প্রতিভূরূপে নিজের নাম অঙ্গীকার প্রভৃতি ঘটনা বিপিন-চন্দ্রের প্রতি চিত্তরঞ্জনের অগাধ আস্থা এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় বহন করে। ১৯২১ খৃস্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল।

প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে প্রকৃতপক্ষে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা-কাল থেকে এই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মঞ্চের নেপথ্যে থেকে মঞ্চের সৌকর্য বিধান এবং মঞ্চ-নায়কদের যথাযথ ভূমিকা পালনে বুদ্ধি, অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এই সাহায্যের হাত সব চেয়ে প্রসারিত হয়েছিল বিপিনচন্দ্রের দিকে। চিত্তরঞ্জনের জনৈক প্রখ্যাত জীবনী-কার লিখেছেন—'বিপিনচন্দ্রের রাজনীতি সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির জন্য তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং সর্বদা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ আলোচনা করিতেন।' বিপিনচন্দ্র নিজেও দেশবন্ধু সম্পর্কে লিখেছিলেন—'দেশচর্যায় আমি তাঁহার ভার বহন করিতাম। সংসার প্রতিপালনে তিনি আমার ভার বহন করিতেন।'

দুজনেই ছিলেন মনে-প্রাণে আগে ভারতীয়, পরে বাঙালী। কিন্তু কেউ-ই বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়ে ভারতীয়ত্বের সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ, বাঙালীত্ব জন্মগত, অতএব অনুভববেদ্য সত্য, আর ভারতীয়ত্ব সাধনগত, অতএব চিন্তালব্ধ সত্য। সাধনার সামগ্রিকতায় ক্ষেত্রে কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। দুয়ের সমন্বয়েই সাধনার পূর্ণাঙ্গতা।

বাঙালীর জীবন-সাধনার এই সমন্বয়ী চেতনার অভাব লক্ষ্য করে একদা বিপিন-চন্দ্র লিখেছিলেন—'...বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা, ভাব ও কর্মভাণ্ডারে বাংলার আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার উল্লেখমাত্র তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলে।' তাত্ত্বিক বিপিনচন্দ্র সূত্রকারে এই বৈশিষ্ট্যকে 'স্বাধীনতা ও মানবতা' নামে চিহ্নিত করেছেন। বিপিন-চন্দ্রের ভাষায় 'বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্মে, বাংলার সাহিত্যে ও শিল্পকলাতে, বাংলার সমাজজীবনে — সকল বিষয়ে বাঙালীর এই বিশেষত্বটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

তাঁর মতে—'এই বিশেষত্বটা আধুনিক নহে —অতি পুরাতন। যতদিন বাঙালী সৃষ্ট হইয়াছে ততদিন হইতে এই বিশেষত্ব তিলে তিলে ফুটিয়াছে।' বাংলা ও বাঙালীর ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেছেন—'...এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙালী চরিত্র ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। রূপের পরিবর্তন হইয়াছে কেবল, মূল বস্তু নষ্ট হয় নাই; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।' এ উক্তি অনেক দিন আগেকার। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাংলা দেশে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটে গেল, সে সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে বিপিনচন্দ্র কথিত বাঙালীর স্বাধীনতা ও মানবতার সংগ্রাম। যে প্রাণাবেগ বাংলাদেশের বাঙালীকে অকল্পনীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে মান ও প্রাণ পণ করে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সার্থকতা এনে দিল, সেই প্রাণাবেগের উৎস হচ্ছে — বাঙালীর বাঙালীত্ব সংরক্ষণের ঐকান্তিক আকৃতি।

চিত্তরঞ্জনের জনৈক প্রখ্যাত জীবনীকার বলেছেন—'চিত্তরঞ্জন খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বাংলার বৈশিষ্ট্য, বাংলার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তবে বাঙালীকে তিনি কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন।' অগ্রজ ও অনুজের ব্যক্তি-চেতনায় কি অদ্ভুত মিল! দেশবন্ধুর

মহাপ্রয়াণের পর তাঁর প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র 'সর্বসাধারণের পাঠের জন্য' ১৯২৬ খৃস্টাব্দে মার্চ মাসে যে পত্র লেখেন, তাতে দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের সার্বিক পরিচয়দান করতে গিয়ে লিখেছিলেন—'বাংলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয়, দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।... ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে, বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণী ও লেখা হইতে শিখিয়াছি।' যাঁর ব্যক্তিত্বের উপাদানসমূহ বাঙালীর সভ্যতা, শিক্ষা ও সাধনাসঞ্জাত, তাঁর ভাব ভাবনার অঙ্কুরগুলি যে বাঙালীত্ববোধের ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়ে এবং সেখান থেকে পরিপুষ্টির রস আহরণ করে বিশ্বজনীনতার মহাকাশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়াবে, তাতে আর বিস্মিত হবার কি আছে!

বিপিনচন্দ্র এবং চিত্তরঞ্জন, উভয়েই বাংলার স্বকীয়তা সম্পর্কে সমানভাবে সচেতন ছিলেন। বিপিনচন্দ্র সেই স্বকীয়তাকে 'বৈশিষ্ট্য' নামে অভিহিত করে তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও মানবতার সাধনার মধ্যে তার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন। আর চিত্তরঞ্জন সেই স্বকীয়তাকে 'চিরন্তন সত্য' নামে অভিহিত করে কবির দৃষ্টিতে 'বাংলার প্রাণ'-এর মধ্যে তার প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। চিত্তরঞ্জনের নিজের ভাষায়—'বাংলার জল, বাংলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নবভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্তন, আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে।...সে যে বাংলার প্রাণ,—বাংলার মাটি, বাংলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ'। চিত্তরঞ্জনের কবি দৃষ্টিতে—'বাংলার ঢেউ খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুগন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপধুনো-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মতো কুটির প্রাঙ্গণ, বাংলার নদনদী, খাল-বিল, বাংলার মাঠ, বাংলার ঘাট, তালগাছঘেরা বাংলার পুষ্করিণী,... বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার তুলসীপত্র...বাঙালীর জীবন, আচারব্যবহার, বাংলার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ।' চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের সাধনায়, চণ্ডীদাসের পদ রচনায়, রামপ্রসাদের শক্তি-সাধনায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার ব্যাখ্যানে বাংলার মাটি ও জলের মধ্যে নিহিত সেই চিরন্তন সত্য,—'বাংলার প্রাণ' বিচিত্র ধারায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই জন্য বিপিনচন্দ্র এবং চিত্তরঞ্জন উভয়েই এঁদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করেছেন।

পরিণত বয়সে বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লিখতে বসে বিপিনচন্দ্র মুখবন্ধেই বলেছিলেন—'আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে চাই, সুখসমৃদ্ধিশালী অন্য কোন দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা।'

আর ভবানীপুর সম্মিলনে সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জনের যে অভিভাষণ সেদিন অচিরেই বাঙালীর মনোরাজ্যে মুকুটবিহীন রাজারূপে স্বীকৃতির আসন দান করে তার প্রারম্ভিক অংশ ছিল এই রকম : 'আমার বাংলাকে আমি আশৈশব প্রাণমন দিয়া ভালোবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে, আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।'

এককালের দুই অবিসম্বাদিত সর্বভারতীয় জনগণমন অধিনায়কের কণ্ঠে বাঙালীপ্রাণতার কি অপূর্ব বাঙ্ময় প্রকাশ! আর, বাংলার মোহিনী মূর্তি ধ্যান করতে গিয়ে প্রথমেই কি এঁদের মানসদৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে নি যথাক্রমে শ্রীহট্টের 'পৈল' এবং ঢাকা বিক্রমপুরের 'তেলিরবাগ' গ্রামের ছবি,—যে দুটি বর্তমানে নবীন স্বাধীনতার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত 'বাংলাদেশ'-এর অন্তর্গত?

তুমি এভাবেই ॥

শরৎকুমার নন্দী

তুমি এভাবেই রেখে যাও ভালোবাসা—
গাছের পাতায় ধুলো ধুয়ে দাও প্রচুর শিশিরে :
মাটির ভিতর জীবনের গন্ধ নড়ে ওঠে,
নিমঝাপনের অভিশাপ ঝরে যায় ভেসে যায়
যেভাবে নদীর জলে ভেসে যায় পৃথিবীর মলিনতাগুলি।

তুমি এভাবেই স্পর্শ রাখো গাছের শিকড়ে—
কঠিন মাটির থেকে উঠে আসে মঞ্জরিত ফুল,
তারপর সায়াহ্নের বেদনার রঙে
অনন্য মুখের প্রতিভাস
বুকভরা গাঢ় ভালোবাসা—আনত শরীর :
সহস্র আলোকবর্ষ দূরে থেকে নেমে আসে নক্ষত্র তোমার।।

পুনর্জন্ম নিতান্ত দুর্লভ ॥

রবীন সুর

অথচ সমস্তক্ষণ প্রত্যাশার অধীর আগ্রহ
নিঃশব্দে লুকিয়ে আছে অবিশ্বাস্য ঘটনার চমক দেখায়,
এলোমেলো ইচ্ছার হাওয়ায়
ডানামেলে উড়ে উড়ে দূরের দিগন্তরেখা তীব্র আবর্তনে
অধীরতা বারংবার ফিরিয়ে দিয়েছে
পরিচিত ডালপালাঘেরা আস্তানায়।

আসলে কিছুই অতর্কিতে ঘটানোর সম্ভাবনা
বীজের ভিতর নেই—
বাঁজা জমি, জল নেই, রুক্ষ বালিয়াড়ি :
কাঁটা গাছ, মর্কুটে, গুল্মেই যার প্রাণপাত,
বারংবার মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে
বিস্তর সবুজ ঘেঁটে সমারোহে পুনর্জন্ম নিতান্ত দুর্লভ।

এখন মধ্যাহ্ন সবে শুরু ॥

শান্তনু দাস

প্রতিটি তন্তুতে আজ মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপ
মাথায় উষ্ণীষ নিয়ে বনের আলাপ :
কিভাবে এলুম বেয়ে পথ,
কিভাবে শপথ
বুকেতে বজ্র হয়ে বেজেছিলো প্রভু,
প্রতিটি মুহূর্তে আজ ভয়ঙ্কর বনের প্রতিভূ.
নীরব ঔরসে জাগে শিখা
তবু জানি কি আদেশ শিলাপটে আঁকা :
লিখেছে বিধাতা।

অথচ সবাই কোন্ জীবন-আস্বাদে
নরম বিড়াল হয়ে পাপোষে লুটোয়,
দিঘির দর্পণ দেখে মুখে,
এভাবেই সুখে বা অসুখে
দিন যায়।

তাকে নিয়ে নিমগ্ন বিলাসে থাকা
মোর ধর্ম নয়,
কখনো বিনয় দেখে ভেবো না মলয়
আমি নতজানু হয়েছি কখনো,
কারণ বুকের মাঝে মশাল নেভানো
আজ নয়,
সেই পথে আমি জেনো স্থির,
যখন বারুদ হয়ে জ্বলবে সময়।।

পলাশপুরের শ্মশানে

চন্ডী মন্ডল

যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি। না, তার চেয়ে বেশী!

বেশী নয়, কলকাতা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পথের একটি লোক্যাল লাইনের শেষ স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরিয়েই বাস। একটা ট্রেন আসে, একটা বাস ছাড়ে। বাস যাবে পঁচিশ কিলোমিটার দূরের মহকুমা শহর। যাকে যেখানে যেতে হয়! মাঝপথে এক জায়গায় নামতে হয়েছিল। জায়গাটার নাম নেই। নাম একটা আছে, নামী নয়! রাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় ধুধু মাঠ। বর্ষা আর শরতে এটাই সম্ভবত ধানক্ষেত। বাকী ঋতুগুলোয় দিগন্তব্যাপী মাঠ শুধু। গাছপালার চিহ্ন নেই। জনপদের চিহ্ন নেই। চমকে যেতে হয়।

বাসটা মিলিয়ে গেছে কখন। স্তব্ধ পথ নিঃসাড়ে পড়ে আছে। শূন্য রাস্তার বুকে জ্বলছে রোদ। দুপুর কাঁপছে দূর মাঠে। মাঠ যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে, ঝাপসা সবুজের আভাস বসতির ইঙ্গিত দেয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে!

কার নিঃশ্বাসের মতো এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল তপ্ত কপালের ওপর দিয়ে। জুড়োলাম কিছুটা। কার হাসির মতো মধুর এক ঝলক মর্মর শব্দ! কিছু দূরে রাস্তার পাশে রোদে দাঁড়িয়ে একটা অশ্বত্থ গাছ। তার ছায়ায় একটা সাইকেল রিকসা!

আমার শুভ দৃষ্টিটুকুর অপেক্ষায় ছিল বুঝি এতক্ষণ!

—বাবু যাবেন কদ্দুর?

—পলাশপুর, পলাশপুর হাইস্কুল।

—অদ্দুর রেকসা তো যাবে নি বাবু!

—কত দূরে যাবে? —আচ্ছা চল তো যত দূর যাওয়া যায়।

গরুরগাড়ীর পথে নামল রিকসা। ধুলো উড়ে চলল পিছনে পিছনে।

—তোমার রিকসা কতটা যাবে?

—আপনাকে চম্পাপতীর কাচে পৌনচে দোব!

—চম্পাবতী?

—যে গেরামটা পথ্থম পড়বে। উ আজ্ঞা যেকেনে গিয়ে ঠেকেচে। আপনার দুক্রোশ পত হবে!

—তারপর কী হবে?

—হেঁটে যেতে হবে!

—কদ্দূরে?

—চম্পাপতীর পরে উপাচ্ছিরি—।

—মুপশ্রী?

—হাঁ. মস্ত বড় গেরাম আপনার! উপ-ছিরির পরে পড়বে ময়নাগুঁড়ি। ময়নাগুঁড়ি পেইরে আপনার পলাশপুর। গেরামের পথ ধরে ছায়ায় ছায়ায় চলে যাবেন!

—কেন রিকসা যাবে না কেন?

—আস্তা আপনার বড় সংকিন্ন!

—তা কতটা পথ হাঁটতে হবে মনে হয়?

—খুব বেশী নয়, জোর তিন ক্রোশ।

—তিন ক্রোশ! —ছমাইল! অতটা পথ—সঙ্গে আমার এই জিনিসপত্র—।

—আমার ঘর তো চম্পাপতী। আমি আজ্ঞে রেকসা চালাই আবার আপনার মুটেও খাটি। চাষের জমিজমা তো নি!

[illegible]

মাঠে জন খাটি। খেতে অনেক বাবু। ছেলে-পিলে আমার অনেকগুলো, পরিবার আছে, বুড়োবুড়ি বাবা-মা—সব আমার ওপরে নেভভর।

—তুমি চেন নাকি পলাশপুর হাইস্কুল?

—চিনবনি বলেন কী! ওই এটাই তো ইস্কুল ইদিকের দশখেনা গেরামের মধ্যি! খুব বড় ইস্কুল কিন্তুক আপনার। বেরাট কোটাবাড়ি! বনমালী চৌদুরী, জমিদার ছ্যাল এক্কালে—তিনি গত হয়েচে তা আপনার বিশ-পাঁচিশ সাল হবে; তিনিই পিতিষ্টা করেছিল উ ইস্কুল। তেনার বড় ছেলে নীলমণি—নীলমণি চৌদুরী একন ইস্কুলের সেক্রেটারী।—আপনি বুজিন নতুন গুরুমশাই আসতেচেন কোলকাতা থেনে? সে আমি পথম দেকেই বুঝেচি।

—আচ্ছা শোন, পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে যাবে কি বল?

—সুয্য পাটে বসবে তার অগ্রেই আমরা পোনচে যাব।—সে আপনাকে ভাবতে হবে নি।

ভেবে নিতে হয় কোন চম্পাবতীর কালে পলাশপুরে পলাশ বন ছিল। ঠোঁটে হলুদ রঙ মেখে, চোখে আবির দিয়ে রূপসী ময়নার দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসত পলাশের ডালে। এখন চারপাশে বাবলা বন। বাবলার ডালে লেজ দোলায় ফিঙে। সময়টা বাবলা ফুলের। ছোট গোল গোল ফুল-গুলোর মৃদু একপ্রকার গন্ধ আছে; গন্ধে মোহও যেন আছে কিছুটা! ঝাঁকড়া-মাথা খেজুর গাছ বিস্তর। শেয়াকুল, বঁইচি, ফণিমনসা—নাম না জানা আরো নানা কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়। আর বাঁশ বন। বিকেলে বাঁশবনের আলো-আঁধারে শুকনো বাঁশ পাতার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে জটলা করে, ঝগড়া করে—ওগুলোকে বলে বুঝি ছাতারে পাখি। আর শালিখ—সর্বত্র, সারাক্ষণ। পেঁপে গাছের বাহারী পাতায়, সজনে গাছের শুকনো ডালে, শূন্যে—বাতাসে। কিচির-মিচির কিচির-মিচির! শুকনো ডোবা। বর্ষায় জল ছিল, প্রমাণ—ছাতা মাথায় অগুনতি কচুগাছ!

জমিদারের হারানো ক্ষমতাটা এখন কচুরিপানার দখলে। পুকুরে পুকুরে তার একচ্ছত্র উদ্দাম বিস্তার। তার কৃপণ করুণায় ভাঙা ঘাটে ভোর থেকে ভিড় করে পাঁজা পাঁজা বাসী বাসন কাঁখে অন্তঃপুর-বাসিনীরা। গল্পে, কলহে, কলকাকলীতে সারা সকাল কাটিয়ে একপ্রহর বেলায় শুরু হয় তাদের স্নান-যাত্রা। বিচিত্র গড়নের কলসী, ডাবর—সন্তান কাঁখালে পথে নামা। পলাশপুরে তালপুকুর আছে একটা। চার পাড়ে অসংখ্য তমালের সারি। নীল জলে ছিঁড়ছে কলমিলতার সুদৃশ্য দাম। ওঠে জলে, কলমি ফুলের জলজ সুবাস ওঠে বাতাসে। কতকালের জীর্ণ ফাটল-ধরা শ্যাওলা-পড়া সানের ঘাটে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা— যুবক-যুবতী শিশুর ভিড়। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-চণ্ডাল—জাত-ধর্ম নির্বিচারে স্নান এখানে প্রতিদিনই পুণ্য-স্নান! দর্শনীয়।

দর্শনীয় গৃহগুলিও। এক-একটা মাটির ঢিপি। জানালাবিহীন; খড়ের চাল, দৈবাৎ টালির। চালের ওপর লাউ-কুমড়ো গাছের লতানে বাহার। এমন রাজ্যে মৃত জমিদারের প্রাসাদটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম। এক-তলা ইঁটের স্তূপটির দেয়ালের প্লাস্টার শতবর্ষ আগে অন্তর্হিত। বিস্তৃত ইঁটের পাঁজরে বিবিধ লতা, লতানে গাছ-গাছালির অবাধ সবুজ বিস্তার। ছাদের জীর্ণ কার্ণিসে বট, অশ্বত্থ, নিম ডালপালা মেলেছে। পাতার প্রাচুর্যেও রঙে নিশ্চিন্ত বসতির সুস্পষ্ট আভাস!

দুপুরের শুরু থেকে পথ নির্জন হতে শুরু হয়। দীর্ঘ দুপুর, তেমনি অসহ্য রোদ। গাছের পাতা নড়ে না। পাতার ছায়ায় বসে ঘুঘু ডাকে। ঘুম ডেকে আনে।

রোদ পড়ে আসে। গাছের ছায়া বাড়ে। পথে ছায়া নামে। বাতাস ওঠে। সুনীল আকাশে মেঘের জোয়ার আসে। দিনের লোয়ার এসে ঠেকে বেলাশেষের আকাশে।

বাহারী আকাশে তখন নানা রঙের আলোর বাহার। ফড়িং আর প্রজাপতি রঙে রঙে সেজে হাওয়ায় পাখনা মেলে দেয়। বকের দল সারি সারি ডানার দাঁড় বেয়ে নীড়ে ফেরে। নীল সন্ধ্যায় ফিরে যায় দিন। প্রশান্তিতে মন ভরে যায়, হৃদয় ভরে যায়।

ক্ষণিক পরেই কিন্তু শূন্য হয়ে যায়। খান খান করে ভেঙে যেতে যায়। অন্ধকার যেন ওত পেতে ছিল, সন্ধ্যা হয়েছে অমনি ছুটে এসেছে। আতঙ্কে কালো হয়ে যায় চরাচর। ঘন কালিমায় ভরে যায়, মুছে যায় সব কিছু। আমার হ্যারিকেনের আলো হ্যারিকেনটাকে কোনমতে আলো করে কেঁপে কেঁপে জ্বলতে থাকে।

গ্রামের মুদি দোকানে কেরোসিন থাকে না কোন কোনদিন। সেদিন রাত্র কাটে না। সপ্তায় দু'দিন পিওন আসে। খবরের কাগজ আসে। পৃথিবীতে তখন নতুন দিন শুরু হয়ে গেছে, সেই পুরনো খবর পড়লে পৃথিবীর খবর রাখছি এরকম অভিমান হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু সময় কাটে কিছুটা! কিছু বই আছে সঙ্গে, বেশীর ভাগই মহাপুরুষদের জীবনী।

ট্রাজেডির অন্ধকারে মহাপুরুষগণ শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে চলে পড়েন দিনের পর দিন। নিজের জীবন নিয়ে আমি মর্মান্তিক বিড়ম্বনায় আর্তনাদ করি। দিন যদি কাটে তো রাত্রি আর কাটে না। রাত্রি শুরু হলে সকাল হয় না! পাষাণ হয়ে আমার বুকে চেপে বসে! উদ্বেগে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে! মৃত্যু নিশ্চিত, মর্মে মর্মে অনুভব করি। আমার সাধনার কল্পনা নিতান্তই অর্থহীন—অবাস্তব কল্পনা মনে হয়। অন্তত আমার জন্যে … নয়! ইচ্ছা করে ফিরে যাই—পালাই! এখানে আর একদিনও নয়!

একদিন নয় দু'দিন নয়, এক বছর দু'বছর নয়; এখানে যে কতদিন — থাকা বার শ্রীকুমারবাবু গত পঁচিশ বছর ধরে প্রমাণ করে আসছেন। আমার একমাত্র সঙ্গী শ্রীকুমারবাবুই শেষ পর্যন্ত আমার সান্ত্বনা।

পরিচয়ের প্রথম পর্বে ভদ্রলোকের প্রশ্ন, 'আপনি এই বনে এলেন কেন? দেশোদ্ধারের পরিকল্পনায়? কিন্তু এতো দেশদ্রোহীর চেহারা নয়! দেশকে দেখবার কল্পনায় নাকি? দৃষ্টিতে সেই কৌতূহল তো দেখছি না! বরং অমন উজ্জ্বল মুখে চোখ দুটো আপনার খুবই বেমানান। অধ্যাপনাকে যদি আদর্শ হিসেবে বরণ করে থাকেন—আপনার তো কলেজে পড়ানোর কথা! আর স্কুলকেই যদি শিক্ষার পীঠস্থান ভেবে থাকেন, যতদূর জানি কলকাতায় স্কুলের অভাব ছিল না!'

অভাবটা যে কী, কীসের—এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম। 'অভিজ্ঞতা হয়ত আপনারও কিছু আছে, নতুন করে আমি কী বলব আপনাকে! সেই যে গত যুদ্ধে চাকরীর বাজারে আগুন লেগেছিল, সেই আগুন তো আর নেভেনি! আমরা কোনদিন যুদ্ধ চাইনি অথচ আমাদের হতভাগ্য দেশে সেই আগুন আজ জ্বলছে দাউ দাউ করে। পুড়ছে হাজার হাজার ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, শত শত ব্রিলিয়ান্ট স্কলার! ছাই হয়ে গেছে যাচ্ছে কত বি-এ, এম-এ! বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—।'

জানি না শ্রীকুমারবাবু আমার সম্বন্ধে কী বিশ্বাস করেছিলেন। নিজের কথা তিনি বলেছিলেন, 'কলকাতায় হোস্টেল-বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করতাম। বাবা-মা দেশে থাকতেন। আমার কোন ভাই-বোন ছিল না। মা মারা গেলেন। একদিন বাবাও গেলেন। আমি একা হয়ে গেলাম। একা এবং স্বাধীন হয়ে গেলাম আমি। দেশে কিছু জমি জায়গা ছিল। জ্ঞাতিরা সেগুলো আত্মসাৎ করে নিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিল। বসতবাড়িটুকু একজনের জিম্মায় রেখে এসেছিলাম, বছর পঁচিশ আগে সেই শেষ দেশে যাওয়া আমার।'

স্বজনহীন একা মানুষ যিনি সংসারে, সংসারের পিঞ্জরে বন্দী হননি যিনি, স্রোতে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন; ভাসতে ভাসতে কোন কূলে এসে পৌঁছে অকূলে পৌঁছবার দিন গুনবেন। কিন্তু কেন জানি না, শ্রীকুমারবাবুকে দেখে আমার অন্য কথা মনে হয়েছিল। এই নির্জন বন দেশে পঁচিশ বছর আগে চিরদিনের মতো এসে-ছিলেন, প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তাড়নায় যেন নয়, পলায়নের মতো— আত্মগোপনের মতো কিছু যেন ছিল সেটা! শ্রীকুমারবাবুর মুখে সন্ন্যাসীর প্রশান্তি দেখিনি। বয়স মানুষকে এত বৃদ্ধ করে আগে কখনো দেখিনি!

বিকেলে স্কুল ছুটির পর ছাত্র এবং অন্যান্য মাস্টারমশাইরা যে যার বাড়ি চলে যায়। আমি আর শ্রীকুমারবাবু, আমাদের বাসায় ফিরে আসি আমরা। স্কুলের কাছেই দু'কামরা একটা মাটির বাড়ি, একটা দেউল। বিকেলের চা খেয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ি। গল্প-করতে-করতে মাঠের পথ দিয়ে অনেক

নয়ে পাড়ি দিই। সন্ধ্যার নীড়ে ফিরে মুখোমুখি বসি। একদিন আমি তাঁর ঘরে যাই, একদিন তিনি আসেন আমার ঘরে। অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়। একই বিষয়ে অনেকবার আলোচনা হয়। বয়েসের ব্যবধানে আলোচ্য বিষয়ে যে গণ্ডী থাকে, সেই সীমা অজান্তেই কখন আমরা পেরিয়ে যাই।

বাইরে অন্ধকার জমাট প্রাচীর তুলে আমাদের ঘরটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। একটা রাত্রি শেষ হয়। আর একটা রাত্রি শুরু হয়। আমরা বিবরান্তরে চলে যাই। আমাদের ব্যবধানের এক-একটা পর্দা সরে যায়। দুজনে দুজনের খুব কাছে এসে পৌঁছই। একই অস্তিত্বে পরিণত হয়ে যাই কখন! একই ভাব, ভাবনা এবং ভাগ্যের পথিক! একই লক্ষ্যে পৌঁছবার সঙ্কল্প নিয়ে এসে উঠেছি একই পান্থশালায়।

একদিন আর কোন কথা ছিল না। বললাম, 'শ্রীকুমারবাবু, আজ বলুন আপনার অতীত জীবনের গল্প!'

অন্যের বেলায় সেটা হাসি নয়, কিন্তু সেটাই তাঁর হাসি, হেসে বললেন, 'শ্রী তো আমি বর্জন করেছি কবে!' নির্মল কৌতুক, না শ্রী-শূন্য মুখে তাঁর ইঙ্গিত ছিল কোন নির্মম সত্যের!

তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললাম, 'দাদা, বলুন সেই গল্প—আপনার ট্রাজেডি!'

মুখের দিকে তাকিয়ে সেই অস্বাভাবিক

হাসি হাসলেন। 'সে কাহিনী নাই বা শুনলেন। কী লাভ!'

বালকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তবু অভিজ্ঞতা হবে!'

আবার সেই হাসি! এবার সেটা আরো নিষ্ঠুর। সেই হাসি দিয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করেননি তিনি। নিজেকেই বিদ্ধ করলেন। মুখে তাঁর যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে। ক্ষতের মতো!

বললেন, 'ঘটনা সামান্যই এবং নাটক বর্জিত।'

'তার মানে খুব সিরীয়াস ঘটনা বলুন!'

কুমারবাবু আমার নাবালকত্বের প্রতি মনে মনেই করুণার হাসি হাসলেন সম্ভবত। মুখে কোন মন্তব্য করলেন না। তাঁর মুখটা আমার মুখের দিকেই তেমন রইল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি আমার মুখের থেকে সরে গেল। নিজেকেই যেন শোনাচ্ছেন এমনভাবে শুরু করলেন।

"গল্প বলতে সাধারণ একটা কাহিনী। একটি যুবক আর একটি কিশোরী। কোথায় তাদের প্রথম দেখা, তাদের প্রথম পরিচয় কেমন করে; পরিচয় পরস্পরের মনে তাদের পরিচিত করেছিল, দুজনের হৃদয়ের মিলনে দেখা দিয়েছিল ভীরু প্রেমের অঙ্কুর; সেই অঙ্কুর কুসুমিত হল; সেই অবোধ কুসুম স্বপ্ন, আবেগ, অনুভব, শিহরণের ছোঁয়ায় দিনে দিনে বিকশিত হয়েছিল শত সোনালী পাপড়ি মেলে, গন্ধে তার দুজনেই তারা হয়েছিল সমান বিস্মিত, বিহ্বল; কতদিনে, কেমন করে, সেই ইতিহাস বর্তমান ইতিহাসে অপ্রয়োজনীয় অংশ বলেই অনুল্লেখ্য।

প্রেম সার্থক হল বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝে, প্রেমের সার্থকতার সাধারণ যে মানদণ্ড—সেই মিলন তাদের হয়নি। তাদের বিয়ে হল না শেষপর্যন্ত।

এ-জীবনে দুজন দুজনকে না পেলে, চিরদিনের মতো দুজন দুজনের না হলে দুজনের জীবন শূন্য হয়ে যাবে, মিথ্যা হয়ে যাবে—এই বোধ, বুদ্ধি দুজনেরই ছিল সমান। তবু অনেকের বেলায় মিলন সত্যিই যেমন হয় না, একটা না একটা বাধা থাকে; তাদের মিলন হয়নি; একটা বাধা ছিল। ছেলেটির ছিল উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পরীক্ষা-পাশের কৃতিত্ব, ভবিষ্যত সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। কিন্তু মেয়েটির বাবা বংশ এবং অর্থ-গৌরবে অনভিজাত ছেলেটিকে মেলাতে পারেন নি তাঁর ভাবী জামাতার কল্পনার সঙ্গে। অর্থ এবং আভিজাত্যের চরমে অধিষ্ঠিত অভিমানী ভাক্তার তাঁর একমাত্র মেয়েটিকে শিক্ষার আর রুচির স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কিন্তু নিজের স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দেননি। পিতা হিসাবে কন্যার চরম স্বাধীনতাটা তিনি নিজের অধিকারে রেখেছিলেন।

সেই অধিকার তাঁর বিপন্ন হতে পারত! পিতাকে পরাস্ত করতে প্রস্তুত ছিল কন্যা। কিন্তু সেদিনের আদর্শবাদী তরুণটি সেদিন তা হতে দিল না। দয়িতার তীব্র অনুযোগে তাকে সে সান্ত্বনা দিয়েছিল এইভাবে: 'তোমার বাবার ইচ্ছাকে পরাস্ত করে তোমাকে লাভ করে আমার যে জয় তাতে গর্ব থাকতে পারে, কিন্তু গৌরব নেই জেনো। জেনো, এমন সাধারণ নয়—আমার ভালবাসা, অন্য একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে তোমাকে আমি ভুলে যাব!

তোমাকে পাওয়ার অপূর্ণতা নয়, না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে তোমাকে পূর্ণরূপে পাওয়ার যে পথ আছে সেই মহত্তর পথের পথিক হব আমি। দুজনের হৃদয়ে একটি যে পথ রচিত হয়েছে একদিন, সেই পথ মুছবে না কখনো! অ মুছবার নয় কোনদিন!'

'তারপর?' আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। 'আপনি মেনে নিলেন ব্যর্থতা?'

কুমারবাবু যেন নিজেরই প্রশ্নের জবাবদিহি করছেন এমন ভাবে শুরু করলেন।

'মনে হবে ব্যর্থতা দিয়ে শুরু হল আমার জীবন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আমার যা ছিল তা ব্যবহার করে আমি ভবিষ্যতে গড়ে নিতে পারতাম অনায়াসে। কিন্তু সমস্ত সুযোগ এবং সম্ভাবনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, নিজের তৈরী ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে আমি আসল সার্থকতা উপলব্ধি করতে চেয়েছিলাম। অপূর্ণতার পথে পূর্ণ হতে চেয়েছিলাম।'

গভীর প্রত্যাশায় কুমারবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। উদ্ভাসিত হওয়ার বদলে আরো নিভে গেছে সেই মুখ।

নিজেকে অপরাধী মনে হল। বললাম, 'দাদা, রাত অনেক হল!'

অন্ধকার মুখে অন্ধকার হাসি! 'ভোর হতে এখনো দেরি আছে!'

হ্যারিকেনের কাচে এত কালি পড়েছে, আসবাব শূন্য ঘরে সেই ক্ষীণ আলো এমন রিক্ত পরিবেশ রচনা করেছে, মনে হয় সব কিছু ক্ষয়ে যাবে: নিঃশেষ হয়ে যাবে জীবনের যা কিছু আছে অবশিষ্ট। কুমারবাবু আলোর শিখাটা বাড়িয়ে দিলেন। ঘরের রিক্ততা আরো পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। উদ্বেগে আকণ্ঠ ডুবে গেলাম আমি। কুমারবাবু আমাকে মুক্তি দিলেন না।

'গল্পের শেষটা শেষ করার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার।'

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। এক তান্ত্রিকের সামনে আমি বসে আছি: কীসের মোহে না মায়ায় আবিষ্ট হয়ে পাথর হয়ে বসে আছি আমি স্তব্ধ শ্মশানে। চারপাশে প্রেতের ছায়া। কুমারবাবুর এতদিনের সাধনার আজ শেষ দিন। আজ চরম লগ্ন! তাঁর করোটির মতো মুখ অমানুষিক উল্লাসে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। দুটো চোখের কোটরে প্রদীপ জ্বলছে লেলিহান শিখায়। নাভিকুণ্ড থেকে মন্ত্র উঠতে লাগল কঠিন কর্কশ স্বরে।

জীবনে শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই রহস্যময় হয়ে থাকে না। রহস্যময় ব্যাপারটা আসলে ফাঁকি, আর সেই ফাঁকি একদিন ধরা পড়েই। জীবন এমন বাস্তব, কোন কিছু অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতার স্থান নেই এখানে। সকালের কুয়াশা সারাদিন থাকে না।

জীবনে ট্রাজেডী কিছুতেই এড়ানো যায় না।

'বছর পাঁচেক আগে কোথায় যেন যাচ্ছি আমি। একজনের সঙ্গে দেখা। তার বয়েস হয়েছে। সেই মুখ, সেই চোখ কিন্তু রঙ বদলে গেছে। সে লাবণ্য নেই। পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে সাংসারিক কথা বলছে। কিশোর-কিশোরী দুটি ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে তাদের পাশে।

'চুলে আমারও অল্প পাক ধরেছে। দেহে আমারও বয়স স্থায়ী বাসা বেঁধেছে! কিন্তু একজন নিশ্চয়ই আছে যে আমাকে ঠিক চিনতে পারবে, অন্তত একজন তো চিরদিন আমাকে মনে রাখবে—যে বিশ্বাসের ওপর আমি আমার এতদিনের সাধনার স্বর্গ রচনা করেছিলাম, আমার সেই বিশ্বাস একদিন আমাকে বঞ্চনা করবে এমন করে এতদিন পরে যখন আমার পিছনে ফিরে যাবার পথ নেই, কোন পথ নেই সামনে! কে জানত এমন অসময়ে দেখা হবে তার সঙ্গে!

আমাকে সে দেখেছে। অনেকবার সে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে। অপরিচিত সহযাত্রীর মতো আমাকে দেখেছে সে. অপরিচিতার মতো তাকিয়েছে!

জানি না এমন ঘটনা কে বিশ্বাস করতে পারে! আমি পারি নি।

ভেবেছি, সে চিনেছে ঠিক। এতদিন পরে এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়া! সংকোচের বাধা পেরিয়ে মনের আসল ভাব সে মুখে ফোটাতে পারছে না।

কিন্তু মন থেকে মোহের কুয়াশা মিলিয়ে গেছে তক্ষুণি! আর কতবার আমি নিজেকে বঞ্চনা করব!

তার মুখ দেখে তার মন দেখেছি। আমার কোন স্মৃতি নেই সেই মনে। চিনিয়ে দিলেও সে আমাকে চিনতে পারবে না!'

'তারপর? তারপর?'

'আর কী! আমার সাধনার শেষ—শেষের এই দিনগুলো পড়ে আছে!

শবদাহের পরেও শবদাহের চিহ্ন কিছুদিন পড়ে থাকে না শ্মশানে!'

হ্যারিকেনটা জ্বলছে ধিকি-ধিকি. কুমারবাবুর মুখ দেখতে পেলাম না।

সেই মুখ দেখার আর কী আছে! ছাই হয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো জ্বলছে!

শ্রীকুমারবাবু প্রেমের কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন, হতাশার আগুনে জ্বলছেন।

একই অন্ধকারে, একই আসনে বসে আর একজন, প্রত্যাশা নেই—কোন আশা নেই যার, দেখছে নৈরাশ্যের দাহ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অতুলপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে অনেকগুলি জীবনী লেখা হয়েছে, এবং স্মৃতিচারণ-মূলক কিছু রচনাও ইতস্তত প্রকাশিত হতে দেখেছি। দুঃখের বিষয় এই মহান পুরুষের জন্মশতবার্ষিকী যে সমারোহে প্রতিপালন করা কর্তব্য ছিল তা হয়ে ওঠে নি, তথাপি প্রচুর পরিশ্রমসহকারে যাঁরা অতুলপ্রসাদের জীবন ও কর্মের আলোচনা করেছেন তাঁরা আমাদের অভিনন্দনযোগ্য, বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ণতা তাঁরা অন্তত আংশিকভাবে পূর্ণ করেছেন।

মানসী মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল গবেষণা করে নানা তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করে 'অতুলপ্রসাদ' এই নামে অতুলপ্রসাদের যে জীবনীগ্রন্থটি রচনা করেছেন বাংলা জীবনীসাহিত্যে তা অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

লেখিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লক্ষ্ণৌ শহরের বাসিন্দা হয়ে অতুলপ্রসাদের গান এবং অতুলপ্রসাদের রহস্যময় জীবনেতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হন। ১৯৬৫ থেকে তিনি এই কাজে ব্রতী হন এবং অতুলপ্রসাদ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৌষ ১৩৭৮-এ তাঁর প্রায় ৩২৭ পৃষ্ঠা-ব্যাপী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালী মনীষার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতুলপ্রসাদ ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ। কারণ মাত্র ত্রিশের দশকে তাঁর 'গীতিগুঞ্জ' প্রকাশিত হয়। অথচ তার কত কাল আগে তিনি গীতিকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কোনো কারণেই হোক অতুলপ্রসাদের কবি-প্রতিভার স্বীকৃতি মেলে নি, কারণ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত কোনো কাব্য সঞ্চয়ন বা এনথোলজীতে অতুলপ্রসাদের রচনা সঙ্কলিত হয় নি। অবশ্য তার জন্য অতুল-প্রসাদ দায়ী নন, অপরাধ তাঁর স্বদেশ-বাসীর।

মানসী মুখোপাধ্যায়ের 'অতুলপ্রসাদ' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন—

'এই বই নির্ভেজাল একটি জীবনী-গ্রন্থ। আর সে জীবনী একজন মানুষের, যে মানুষটি ছিলেন দোষে-গুণে গড়া শুধুই মানুষ—দেবতা বা মহামানব নয়।'

এই গ্রন্থের লেখিকা অসীম নিষ্ঠায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন সূত্র থেকে। অতুলপ্রসাদের কিছুসংখ্যক চিঠি ও কয়েকটি ভাষণ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না, লেখিকা তাই অতুল-প্রসাদকে যাঁরা জানতেন সেই সব ব্যক্তিদের সহযোগিতা ও স্মৃতির ভিত্তিতে গ্রন্থটি গড়ে তুলেছেন। সার্থক গবেষকের মত অনেক তথ্য একাধিক ব্যক্তির দ্বারা তিনি সমর্থন করিয়ে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

লেখিকা কৈফিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন—

'ভগবান তাঁর জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তাঁকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মা'র দ্বিতীয় বিবাহে অতুলপ্রসাদের বেদনাতুর মানসিক অবস্থা ডিকেন্সের স্মরণীয় চরিত্র ডেভিড কপারফিল্ডের মতই করুণ। তারপর তরুণ বয়সে সেই যুগে সমাজের বিরুদ্ধাচারণ করে নিজের মাতুল কন্যাকে বিবাহ করার মধ্যে তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা ও অমিত দুঃসাহসের পরিচয় আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগায়।'

প্রকৃতপক্ষে এই ক'টি লাইনের মধ্যে অতুলপ্রসাদের মানসিকতার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়।

মানসী মুখোপাধ্যায়ের অন্যাবিধ সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই, কিন্তু যে অনন্যসাধারণ লিপি-কুশলতায় তিনি 'অতুলপ্রসাদে'র জীবন ও কর্মের ইতিহাস রচনা করেছেন তা বিস্ময়কর। সার্থক কথাশিল্পীর মতো তিনি সমগ্র বক্তব্যটি পরিবেশন করেছেন। তার ফলে একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ সুখপাঠ্য কাহিনীর মতো মনোরম ও কৌতূহলো-দ্দীপক হয়ে উঠেছে।

বাংলার নবজাগরণের যুগে ঢাকা শহরে অতুলপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধে তখন সমগ্র বাংলা দেশকে চঞ্চল করে তুলেছে, সেই পরিবেশে গড়ে উঠেছেন অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ পারিবারিক জীবনের বিস্তৃত আলোচনায় অতুলপ্রসাদের বংশানুক্রম এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকা বলেছেন, অতুলপ্রসাদের জীবনে তাঁর মাতামহের প্রভাব অসামান্য এবং অতুলপ্রসাদ তাঁর মাতামহকে 'ঠাকুর-দাদা' বলতেন। কালীনারায়ণ ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর ব্রহ্মের মহিমায় তিনি বিশ্বাসী হয়ে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করেছেন। অতুলপ্রসাদ ঠাকুরদাদার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকায় তাঁর শিশুমনকে ঠাকুরদাদার সংগীত, কাব্য ও চিত্রানুরাগ গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সেই শৈশবে তিনি 'শকুন্তলা' নামে একটি নাট্যাভিনয় দেখে এমন প্রভাবিত হন যে, পরবর্তী জীবনে 'বঁধু ধর ধর মালা পর গলে'—গানটিতে ঐ নাটকের একটি গানের সুর দিয়েছিলেন।

পূর্বেই লেখিকার একটি উদ্ধৃতি দ্বারা একথা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি যে, অতুলপ্রসাদের বিচিত্র জীবনকথা কত জটিল, এবং সেই জটিল জীবনের পরিচয় দান করা সহজ কর্ম নয়। লেখিকা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সংবেদনশীল মনো-ভঙ্গীতে বিধৃত করেছেন। লেখিকার অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম জয়যুক্ত হয়েছে একথা অকুণ্ঠভাবে বলা যায়।

যে পরিবেশে অতুলপ্রসাদ মানুষ, ঢাকা এবং পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে প্রতিভার বিকাশ, তারপর কলিকাতা, ইংলণ্ড এবং লক্ষ্ণৌ শহরে অতুলপ্রসাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক এবং রোমাঞ্চকর। অতুলপ্রসাদের জীবনে প্রথম আঘাত লাগে ১৮৯০ খৃস্টাব্দের জুন মাসে যখন তাঁর বড়মামা স্যার কৃষ্ণ-গোবিন্দের পত্রে জানা গেল তাঁর জননী হেমন্তশশী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত দুর্গা-মোহন দাশকে বিবাহ করায় পিতৃহীন অতুলপ্রসাদ যেন মাতৃহারা হলেন। সেই বছরই তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত প্রবাসে সাহিত্যচর্চার জন্য এডমণ্ড গসের আশীর্বাদ নিয়ে যে 'স্টাডি সার্কল' তৈরী হল তার বৈঠকে সরোজিনী নাইডু এবং মনোমোহন ঘোষ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং দ্বিজেন্দ্র-লাল ও অতুলপ্রসাদ স্বরচিত গান শোনান।

মানুষ অতুলপ্রসাদ

চিত্তরঞ্জন ও শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্য রস পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। এইভাবেই শুরু হল অতুলপ্রসাদের সাহিত্য জীবন। দেশে ফেরার পথে রচিত হল 'প্রবাসী চলরে ফিরে চল'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের প্রথম পরিচয় 'খামখেয়ালী আসরে'। অতুলপ্রসাদ স্বয়ং লিখেছেন—

'তখন আমার বয়ঃক্রম প্রায় একুশ-বাইশ। শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে লইয়া গিয়া তাঁর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম'। এদিকে হেমকুসুমের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে বিবাহের কাহিনীও চমকপ্রদ। হেমকুসুম আর অতুলপ্রসাদ মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন, সুতরাং আইন ও সমাজগত বাধা ছিল। হেমকুসুম একদিন আত্মহত্যার অভিনয় করলেন। আত্মীয়-বান্ধবরা বিরোধী। শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ) পরামর্শ দিলেন স্কটল্যাণ্ডের 'গ্রেটনা গ্রীনে' কাজিন বিবাহের আইনসিদ্ধ রীতি আছে। এই পরামর্শে অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে নিয়ে বিলাত যাত্রা করলেন ১৯০০ খৃস্টাব্দে, বিলাতেই প্র্যাকটিস শুরু করলেন এবং সেখানেই প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু সেখানে প্র্যাকটিস না জমাতে পেরে জনৈক মুসলমান বন্ধুর পরামর্শে লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯০২ খৃস্টাব্দে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেন। তাঁর জীবনে আর এক অধ্যায় শুরু হল এই লক্ষ্ণৌ শহরে এবং তাঁর সমস্ত কর্মজীবন এইখানেই কাটে।

১৯২৩-এর মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন লক্ষ্ণৌ শহরে এলেন তখন নাকি তাঁকে একজন বলেছিলেন নবাব আসফউদ্দৌলা নেই লক্ষ্ণৌ কি যাবেন। তার জবাবে কবি বলেন—আসফউদ্দৌলা নেই কিন্তু অতুলপ্রসাদ আছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই চার দিনের সফরে অতুলপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হলেন। অতুলপ্রসাদের স্ত্রী মতবিরোধহেতু অন্যত্র ছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আগমনবার্তা শুনে ঘরে ফিরে এলেন, অতুলপ্রসাদ পুলকিত হলেন। অতুলপ্রসাদ বালক-বালিকাদের নিয়ে গাইলেন—'এসো হে এসো হে ভারতভূষণ মোদের প্রবাস ভবনে—'

এর পর রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই চলে গেলেন। হেমকুসুমও চলে গেলেন। অতুলপ্রসাদের জীবনে অন্ধকার নেমে এল। এই পর্বটি লেখিকার রচনানৈপুণ্যে অনবদ্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদের জীবনের এই বিয়োগান্ত দিকটির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা অকারণ উচ্ছ্বাস বা অবান্তর বাগবিস্তার না করে শিল্পসম্মত রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

বিভিন্ন সময়ে অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত গানগুলি কিভাবে লিখিত হয়েছে তার বিবরণও লেখিকা উপযুক্ত স্থানে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

অতুলপ্রসাদ শুধু দরদী কবি নন, তাঁর দানলিপ্সা ছিল প্রচণ্ড। শোনা যায় এ বিষয়ে তিনি দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরই সমকক্ষ ছিলেন। মানবদরদী কবি অতুলপ্রসাদ যে কি বিরাট পুরুষ ছিলেন তা লেখিকা বিভিন্ন ঘটনা এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিধৃত করেছেন। ৬৯টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ জীবনীর মধ্যে সামগ্রিকভাবে মানুষ অতুলপ্রসাদকে নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। অতুলপ্রসাদের তিরোধানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'অতুলপ্রসাদের মৃত্যুকে আমি স্বীকার করি না, তিনি এক সুরলোক থেকে অন্য সুরলোকে গেছেন।'

লেখিকা পরিশিষ্ট অংশে অনেকগুলি চিঠিপত্র, অতুলপ্রসাদের বিভিন্ন রচনাবলী, উইল, এবং কিছু গানের পাণ্ডুলিপি সংযোজিত করেছেন। এ ছাড়া গ্রন্থটিতে অতুলপ্রসাদের বিভিন্ন বয়সের অনেক ছবি এবং পাণ্ডুলিপির ছবিও এই গ্রন্থের সম্পদ। অতুলপ্রসাদের এই পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন।

—অভয়ংকর

অতুলপ্রসাদ (জীবনকথা) — মানসী মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক — সিগনেট বুক শপ। কলিকাতা—১২। বার টাকা।

ভ্রম সংশোধন — এই স্তম্ভে আলোচিত অমিয়সূদন ভট্টাচার্য প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' নামক গ্রন্থটির মূল্য বারো টাকা।

সাহিত্যের খবর

নেহরু রচনাবলীর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

গত ২৫ জানুয়ারী দিল্লীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জওহরলাল নেহরুর লেখা নির্বাচিত রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। জওহরলাল নেহরু তহবিল কর্তৃক প্রকাশিত এই খণ্ডে জওহরলালের জীবনের গোড়ার দিকের লেখা চিঠিপত্র, বক্তৃতা ও অন্যান্য রচনা সঙ্কলিত করা হয়েছে। এই খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

সাহিত্যিক বিধুভূষণ বসুর জীবনাবসান

স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিধুভূষণ বসু গত ৩১ জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। জন্মেছিলেন তিনি খুলনা জেলার বিরুপুর গ্রামে। পরবর্তীকালে সে যুগের দেশনেতাদের সঙ্গে হয়েছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বদেশী প্রচারে তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালের সহকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধুভূষণের অগ্নিবর্ষী লেখনী সেকালের স্বদেশব্রতীদের দিয়েছিল প্রবল প্রেরণা। আর তার ফলে তাঁর ওপর নেমে এসেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের স্টিম রোলার। ১৯০৯ সালে খুলনা জেলার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত 'পল্লীচিত্র'-তে 'প্রতিকার' গল্পের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক এনেছিল রাজদ্রোহিতার অভিযোগ। চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে হলেন তিনি দণ্ডিত। তাঁর ৪ খানা উপন্যাস ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত করেছিল, কিন্তু কোনদিনই তাঁর লেখনীকে স্তব্ধ করতে পারেনি। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা আর গান লিখেছেন সংখ্যাহীন। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রাদলের জন্যও লিখেছিলেন তিনি বহু গান ও পালা। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় ছয় মাস আবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়েই প্রধানত তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি রচিত।

অভিযোগের দায়ে লিবিয়ার সাংবাদিকগণ

লিবিয়ার বর্তমান সরকার গোটা দেশের নামকরা ২৮জন সাংবাদিককে নানান অভিযোগে বিচার করার এক ব্যবস্থা করেছেন। উপরন্তু সাংবাদিকদের শায়েস্তা করার অছিলায় কয়েকদিন আগে হঠাৎ একদিনের জন্য সমস্ত দৈনিকের প্রকাশও বন্ধ করে দেন সরকারী কর্তৃপক্ষ। বলা বাহুল্য এইসব একতরফা কার্যকলাপের জন্য কোন কারণই দেখান হয়নি।

ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের দাবী

আলজেরিয়ায় অত্যাচার করার জন্য বুক ফুলিয়ে গর্ব করেছিলেন ফরাসী ছত্রীবাহিনীর জেনারেল জ্যাকুইস ম্যাসু। এই অপরাধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ফ্রান্সের খ্যাতনামা সাহিত্যিক অভিনেতা, আর বামপন্থী রাজনীতিকেরা। তাঁরা দাবি করেছেন জেনারেলের এই গর্বান্ধিত মনোভাবের উপযুক্ত বিচার করতে হবে। ৭৯জন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রে এই দাবি করা হয়। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে জাঁ পল সার্তরে বিশেষ উল্লেখ্য।

বলা বাহুল্য ম্যাসু তাঁর 'আলজিয়ার্সের আসল লড়াই' বইতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অকথ্য নির্যাতনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন।

নতুন বই

মুখর মর্মর (ঐতিহাসিক রেখাচিত্র)—বিভা সরকার। মেসার্স এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স (প্রা) লিঃ, কলিকাতা—১২। চার টাকা।

ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে কত প্রেমস্মৃতিবিজড়িত কাহিনী, কত না দীর্ঘশ্বাস, কত হাহাকার। ইতিহাসের সবটাই যুদ্ধবিগ্রহ আর কূট চক্রান্তে ভরা নয়। জল থেকে হাঁস যেমন ক্ষীরটুকু গ্রহণ করে, যাঁরা রসগ্রাহী তাঁরাও তেমনই ইতিহাসের পাতা থেকে মানব-মনের গভীর গহনের সংবাদ আহরণ করেন। শ্রীমতী বিভা সরকার কবি এবং কথাশিল্পী, তিনি তাঁর কাব্যধর্মী লিপিকুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন ইতিহাসের কাহিনী। এই কাজে তথ্যাদির নিখুঁত প্রয়োগ বিষয়ে তিনি অতিসতর্ক, তাই মাখনলাল রায়চৌধুরী ও স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ ইসলামী ও মুঘল ইতিহাসের সার্থকনামা গবেষকদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং সুকৌশলে তার যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। তিনি এক বিচিত্র আঙ্গিকে ঘটনাবলী পরিবেশন করেছেন, দেশপর্যটনে বেরিয়ে বাঙালী রমণীর চোখে তিনি ইতিহাসের ধ্বংস-স্তূপ পরিক্রমা করেছেন তীর্থপথিকের মন নিয়ে। মোগল হারেমের 'সাজঘরে পৌঁছে তিনি তাই শুনেছেন বেদনাভরা আর্তনাদ। মোগল সম্রাটদের সঙ্গে রাজস্থানের হিন্দু রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাঁরা মোগল হারেমে এসে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন—আর একে একে আকবর, সেলিম, আলমগীর প্রমুখ শাসকবর্গ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন এবং বিলীন হয়েছেন। তবু আজো আছে তাজমহল, আজো আছে অজস্র স্মৃতিসৌধ আর মসোলিয়ম। লেখিকার অসীম কৃতিত্ব তিনি স্বচ্ছ সহজ ভঙ্গীতে সেই সব কাহিনী পরিবেশন করেছেন এবং তাঁর পরিবেশনভঙ্গীর মৌলিকত্ব প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণপারিপাট্য শোভন ও সুরুচিসঙ্গত।

আবগারী দারোগার ডায়েরী (সত্য কাহিনী)—সুভাষ সমাজদার। বাক-সাহিত্য (প্রা) লিমিটেড, কলিকাতা—৯। পাঁচ টাকা।

সুভাষ সমাজদার প্রণীত 'ঢেউ কথা কয়', 'ঝড় জানে অরণ্যকে' এবং 'হারেমের নায়িকা' রসিকসমাজে সমাদৃত হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'আবগারী দারোগার ডায়েরী' কিন্তু সত্যই একটি চমকপ্রদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখক যে একদা একসাইজ সাব-ইনসপেক্টর হিসাবে কাজ করেছিলেন তা এই গ্রন্থ পাঠে জানা গেল। ১৯৫১—৫৮ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতটি বছর তিনি কলকাতা, ব্যারাকপুর, ব্যান্ডেল, চন্দননগর, কোন্নগর প্রভৃতি শহরতলীতে এই কাজের সূত্রে ঘুরেছেন এবং হোম ইন্ডাস্ট্রিজের মত দেশী মদ চোলাই-এর কারবার প্রত্যক্ষ করেছেন। রাতের অন্ধকারে শহরের 'বার'-গুলিতে কিভাবে নটী আর বারবধূর দল গাঁজা-আফিং-কোকেন প্রভৃতির আন্তর্জাতিক চোরা চালানের কারবারে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন তা লেখক দেখেছেন। এই সময়কার কয়েকটি কেস থেকে তিনি সাহিত্য সমাজে পরিবেশনের বিষয়বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন এবং বাঙালী পাঠকদের কাছে 'আন্ডার ওয়ার্লডে'র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেশ করেছেন। শুধু নীরস সাংবাদিক রিপোর্টাজ নয়, লেখকের শিল্প সচেতন মন সমগ্র ঘটনাগুলির মধ্য থেকে মানবিক দিক যথাযথভাবে আহরণ করেছেন এবং সংযম ও নিষ্ঠার সঙ্গে তা পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থ অনায়াসে কেচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত হতে পারত, কিন্তু সুদক্ষ লেখক রসবস্তুটুকুই পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। বিদ্যুৎ-চমকের মতো 'স্মাগলার' নামক সামাজিক অস্তাকুড়ের বাসিন্দার মধ্যে তিনি উদার এবং মহাপ্রাণ মানুষের প্রতিভাস দেখেছেন। রাজারহাটের যোগেশবাবুর মত চরিত্র এ-যুগে বিরল। ছোটবাবু যোগেশ দরিদ্র কিন্তু লোভী নয়। আবগারী বিভাগের ছোটবাবু কোনো দয়ার দান গ্রহণে রাজী নয়। সুরেন আর তার কোলে-পিঠে মানুষ-করা মেয়ে সারা (যে ইদানীং সকলের সঙ্গেই নাচে) প্রণবের জন্য তার অপরাধ স্বীকার করা ইত্যাদি অনেক নাটকীয় ঘটনা সমাবেশে 'আবগারী দারোগার ডায়েরী' কলিকাতার আন্ডার-ওয়ার্লডের একটি নিখুঁত রেখাচিত্রে পরিণত হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ মনোরম।

গীতার বাস্তবসম্মত অর্থ ও ব্যাখ্যা (আলোচনা)—ডাঃ শিবদাস ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দশ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থের লেখক একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক। এম-বি, ডি-টি-এম পাশকরা এই চিকিৎসক তাঁর বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গীতার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা করেছেন। শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি, নীলকণ্ঠ, শ্রীঅরবিন্দ, তিলক মহারাজ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ গীতার ভাববাদী ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞানসম্মত নয় সেই কারণে লেখক বাস্তবসম্মত অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন এবং নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে ভাববাদী ব্যাখ্যা-কারদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তথাপি ডাঃ ভট্টাচার্যের বক্তব্য অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত এবং যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি বাস্তববাদীদের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীতে গীতার এই বাস্তবসম্মত অর্থ করেছেন, তার মধ্যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় আছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে দার্শনিক মতের সমন্বয়ে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি যে সহজগ্রাহ্য যুক্তির অবতারণা করেছেন, তার পরিবেশন ভঙ্গী সহজ এবং স্বচ্ছ। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

উত্তাল পদ্মা উত্তাল মেঘনা (বাংলাদেশের কাহিনী)—সুবোধ চক্রবর্তী। সু-প্রকাশন। ৩০।১, কলেজ রো, কলিঃ ৯। সাড়ে দশ টাকা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ইতিমধ্যে অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী সাহিত্যরসসমৃদ্ধ ভাষায় পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত সোনার বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস লিখেছেন। লেখক ৩রা মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন। সেই দিন বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান এক জনসমাবেশে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন 'ভাই সব। আজ আমাদের বহু প্রতীক্ষিত সেই দিন এসেছে।' এই দিনটিতেই তিনি ঘোষণা করলেন 'আজ আমরা গলা ছেড়ে বলতে পারি যে আজ থেকে আমাদের এই বড় আদরের মাতৃভূমির নাম আর পূর্ব-পাকিস্তান নয়, আজ থেকে এর নাম হল বাংলাদেশ। 'জয় বাংলা।' সহস্র কণ্ঠে সেই ঘোষণা সমর্থিত হল। তারপর নয় মাসের ইতিহাস আজ সকল মানুষের জানা আছে। বর্বর ইয়াহিয়া খানের শয়তান সেনাদল বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের প্রতি যে পৈশাচিক অত্যাচার করেছে সে কথা বিশ্ব-জগতে সর্বত্র প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থের লেখক ভারত খন্ডিত হওয়ার প্রাকমুহূর্তে ঋষি অরবিন্দ যে বাণী দিয়েছিলেন সেই বাণী উল্লেখ করে বলেছেন সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভুলে দুটি জাতকে আবার আনতে হবে পাশাপাশি। আজ বাংলাদেশ বাস্তবাকার লাভ করেছে। আজ জয় বাংলা, জয় মুজিবর রবে সোনার বাংলার আকাশবাতাস মুখরিত। এই শুভ লগ্নে সুবোধ চক্রবর্তী প্রণীত 'উত্তাল পদ্মা উত্তাল মেঘনা' নামক সুপ্রচুর তথ্যসম্বলিত গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করবে। লেখককে অশেষ ধন্যবাদ যে তিনি মার্চ ১৯৭১-এর ইতিহাস লিখলেও এই অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় বাংলায় বিপ্লব-বাদের ও পারিপার্শ্বিক অনেক খুঁটি-নাটি ইতিহাসের নিখুঁত পরিবেশন করেছেন। বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দান করেছেন। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

বর্ধমানের লোকশিল্প: সাঁজি

দীপক কুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন আজ বিলুপ্তপ্রায়, সাঁজি তাদের মধ্যে অন্যতম। যদিও এই শিল্পটির প্রচার ও প্রসার পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর অংশে ঘটেনি, তবুও শিল্প ও অংকন পদ্ধতির অভিনবত্বে শিল্পটি রসিকজনের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম। এই শিল্প কৃষ্ণসেবীর কাছে কৃষ্ণসেবার অঙ্গ, বাঙালীর নিজস্ব আবিষ্কার ও রীতিপদ্ধতিতে প্রাচীন পট শিল্পের অনুকারক। বৃন্দাবনের ব্রজবাসীরা এটির প্রচলন ও সংরক্ষণ করেছিলেন, এবং বর্ধমানের মহারাজাদের প্রথম দিকেই এই শিল্প বর্ধমান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে অবক্ষয়ের স্রোতে অন্যান্যগুলির মতো এ শিল্পও বিরল হয়ে এসেছে। প্রকৃত পক্ষে শিল্পটি একান্তভাবেই বৃন্দাবনের, বর্ধমান মহারাজাদের গুণগ্রাহীতায় বাংলাদেশে আসে ও অন্যান্য ধর্মসংস্কৃতির মতো এই শিল্পটিকেও বাঙালী আপন করে নেয়।

সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকেই চিত্রসেনের পূর্বে বাংলাদেশে এই শিল্পটির আগমন ঘটে। বর্ধমানেই প্রথম, লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে। পটের ঢং-এ কোথাও সরল, কোথাও স্বগত ছন্দে আঁকা দেবদেবীর মূর্তি ও তাদের বর্ণবিন্যাস বাঙালীর প্রাচীন শিল্পরীতি ও পদ্ধতির পরিচায়ক। তুলট কাগজে, কিংবা অভ্রে নরুনে (বিশেষ ধরনের যন্ত্র, কাঠের ব্লক করতে যেমন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়) দিয়ে কেটে কেটে দেবদেবীর মূর্তির ডাইস (স্টেনসিল) তৈরী করা হয়। বিভিন্ন লীলার জন্য বিভিন্ন স্টেনসিল ব্যবহার করা হয়। বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য প্রত্যেকবার পূর্ণাঙ্গ ডাইসটি মাটির চতুষ্কোণ বেদীতে প্রত্যেকবার ছয় থেকে আটবার স্থাপন করে মূর্তিগুলি সম্পূর্ণাঙ্গ করা হয়। সেই সঙ্গে থাকে বিচিত্র নকাশী আলপনা।

সাঁজি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের লোকায়ত রূপ। তাই এর একটা বিশেষ উপলক্ষ আছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণসেবী ব্রজবাসীরা পিতৃপক্ষে ঈশ্বর তর্পণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি করতেন। সকালে গঙ্গায় তর্পণ করতেন ও সন্ধ্যায় ইষ্টের অঙ্গরাগ উপাসনা দিয়ে দিনের আচারক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। এই অঙ্গরাগের বিবর্তিত রূপ সাঁজি। পরবর্তীকালে শিল্প হিসাবে এর উন্নতি ঘটে। সন্ধ্যাবেলায় এই রীতিকরণ হয় বলেই এর নাম সাঁজি। তৎসম প্রতিশব্দ সম্ভবতঃ সন্ধ্যাকালীন। সন্ধ্যাবেলায় বিগ্রহের সম্মুখে মাটির চতুষ্কোণ বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ লীলার ছবি গুঁড়ো রং-এর সাহায্যে আঁকা হয়। ভাদ্র মাসের শেষ পূর্ণিমায়—যা থেকে পিতৃপক্ষের শুরু, সাঁজি শুরু হয়—আর অমাবস্যা—মহালয়ার দিন শেষ হয়। এই পনেরো দিনে শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার রূপায়ণ হয় ঐ চৌকোনা মাটির বেদীর উপরে। প্রথম দিনে শ্রীকৃষ্ণজন্ম, দ্বিতীয় দিনে পূতনাবধ, এবং এর পর যথাক্রমে ননীচুরি, গোচারণ, বকাসুর বধ কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন বা নৌকাবিলাস, অক্রূর আগমন বা সত্যভামা কংসবধ, চারমূর্তি (ষড়ভুজ মহাপ্রভু, কৃষ্ণকালী, রামরাজা, যুগল মিলন) অনন্তসজ্জা দ্বারকা মহারাস (রাসমণ্ডলে অঙ্কিত চতুষ্পার্শ্বে আট জোড়া যুগলমূর্তি ও মধ্যস্থলে স্বয়ং কৃষ্ণ ও রাধার যুগলমূর্তি) বেদীর উপর অঙ্কিত হয়। মহারাসেই শ্রীকৃষ্ণলীলার সমাপ্তি।

সাঁজির বিশেষত্ব এর রংয়ের ব্যবহার। এই চিত্রাঙ্কনরীতিতে গুঁড়ো রং ব্যবহার করা হয়—গোলা রং নয়। বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য চালগুঁড়ির সঙ্গে কাঠকয়লা গেঁড়িমাটি প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয় কিন্তু কোথাও তা জলের সঙ্গে মিশিয়ে নয়—ঝুরো হিসাবে। এই ঝুরো রং নিপুণ হাতে পরিষ্কার করে নিকানো বেদীর ভিজা মাটিতে বসে যায়। শিল্পী অতি সযত্নে সূক্ষ্ম নিপুণতায় বেদীতে অঙ্কিত দেবদেবীর ভাব ও ছন্দ বিমূর্ত করে তোলেন। প্রাচীন পটশিল্প ও সাঁজির ছন্দ সাযুজ্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

কালনা লালজী মন্দিরের শেষ সাঁজি শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে এই শিল্পরীতি অধ্যবসায়ের সঙ্গে আয়ত্ত করেন। এঁর পিতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লালজীর মন্দিরের পুরোহিত ও শিল্পী ছিলেন। এঁরা চারপুরুষ ধরে এই শিল্পটির অনুশীলন ও সংরক্ষণ করে আসছেন। এঁদের আদি বাস হুগলী জেলার বালিগ্রামে। বর্ধমান মহারাজার অনুগ্রহে দেবসেবার জন্য কালনার লালজী মন্দিরে আশ্রয় পান। ও পূর্বতন পুরোহিতমহাশয়ের কাছে সযত্নে এই শিল্পরীতি অনুশীলন ও আয়ত্ত করেন। তার পূর্বে বৃন্দাবনাগত ব্রজবাসীর কাছে শিখেছিলেন প্রধান পুরোহিত।

বর্তমানে রাজানুগ্রহবঞ্চিত মন্দিরগুলিতে বিগ্রহের নিত্যপূজাই বিঘ্নিত সেখানে স্বাভাবিক কারণেই লোকশিল্পের ঠাঁই হয় না। সেই অবক্ষয়ের ভাঁটির টানে সাঁজিশিল্পটিও অন্তিমদশায়। বর্ধমানের লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরেও সাঁজির আসর বসে না, কালনার লালজী মন্দিরেও নয়। গুণগ্রাহীতার অভাবে প্রাচীন সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শনগুলি সভ্যতার সমুদ্রমন্থনে আপনার আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু শিল্পী ও শিল্প এই হৃদয়সূত্রে গ্রথিত। শিল্পী ছাড়তে পারেন না শিল্পচর্চা। তাই কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপন গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীকে নিবেদন করেন শিল্পীহৃদয়ের ভাব ও ছন্দে সৃষ্ট শিল্পকর্মকে। অম্বিকা কালনার লালবাগান মহল্লার রাধাবল্লভজীর মন্দিরে এই প্রাচীন লোকশিল্পটি মৃত্যুর দিন গুনছে। কোন গুণী কি নেই যিনি তাকে বাঁচাতে পারেন?

পূর্বপুরুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

(দ্বিতীয় পর্ব)

এতদিনের ভবঘুরে বৃত্তির পর বাগান-বাড়ির শান্ত নির্জনতা বড় ভাল লাগে হেমন্তর। একটু যেন বোঝাপড়া করে নিতে পারে নিজের সঙ্গে—চিন্তাগুলোকে থিতিয়ে গুছিয়ে নিতে পারে। এতকাল একটু শান্তির জন্যে ছুটে বেড়িয়েছে একটা তীর্থ থেকে আর একটা তীর্থে—তাতে ফল কি হয়েছে ছেলের শোক কতটা ভুলতে পেরেছে তা বুঝে মিলিয়ে দেখার অবকাশ পায় নি। সেই অবকাশটাই পেল এখানে এসে।

শান্ত হয়েছে অনেকটা, শান্তি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। চুপ করে নিজেকে নিয়ে থাকতে পারাটাই অনেকখানি শান্তি। কোন কাজ নেই, কাজের তাড়াও নেই। এককালে বাইরের কাজ ছিল, তারপর ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে একবছর প্রায়, তারও পরে এই ছুটোছুটি একদেশ থেকে আর এক দেশে।

বহুদিন পরে বোধহয় জীবনে এই প্রথম ছুটি পেল সে, কর্মহীন দায়িত্বহীন পূর্ণ অবকাশ। শোকশূন্যতা তো আছেই, জীবনের একমাত্র অবলম্বন উদ্দেশ্য গেছে হারিয়ে—সে শূন্যতাবোধ ও হাহাকার মনের একটা দিক পাথর করে রেখেছে—স্মৃতিও আছে তার সঙ্গে, সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কত ঘটনা কত মানুষের স্মৃতি ভীড় করে আসে—বিশেষ এই কর্মহীনতার অবসরে যেন বেশী করে ঘিরে ধরে তারা—কিন্তু এতো চিরদিনের সঙ্গী হয়ে রইল, এরা তো থাকবেই। এসব সত্ত্বেও এই নির্জনতা, এই নৈষ্কর্ম্য ভাল লাগে। কিছু না করার, না করার কথা ভাববার অধিকার—এও তো এক-রকমের মুক্তি।

পূর্ণবাবুও তা বোঝেন। তিনি তাই বিকেলের দিকে আসেন, ঘন্টাখানেক বসে গল্প করেন, কোন কোন দিন বা আরও একটু বেশী থাকেন—তারপর চলে যান। কী করবে এখন, কাজকর্ম আরম্ভ করবে কিনা' এ প্রশ্ন তোলেন না। এমনকি, সেই যে বাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল—কেনা বা ভাড়ার—সে কথাটাও মনে করিয়ে দেন না।

এর মধ্যেই একদিন সংবাদ আসে—গোপালীর শেষ সময় উপস্থিত।

ধর্মবাবু খবর পাঠান, ওকে দেখতে চাইছে সে। হেমন্তর মনের অবস্থা তিনি বুঝতে পারছেন—তবু যদিই সে কটা দিন গিয়ে একটু থাকতে পারে তো খুব ভাল হয়, তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

অনিচ্ছাতেও যেতে হয়।

আবার, আর একজন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু দেখার ইচ্ছা নেই। সে যা দুর্ভাগিনী তাকে যে ভালবাসে সে বাঁচবে না এ তো জানা কথাই—কিন্তু সে কথা ধর্মবাবুকে বলা যায় না। কাউকেই বলা যায় না। ওর মনের কথা কেউ বুঝবে না—ভুল বুঝবে, অকৃতজ্ঞ ভাববে।

তাই যেতেও হয়। চুপ করে বসে থাকতেও পারে না। সেবার ভারও তুলে নিতে হয়। শিক্ষিত অভ্যস্ত হাত তার। সেবার কোন ত্রুটিও ঘটে না। তবে বারবার ঐ একটা কথাই মনে হয়, না এলেই ভাল হত। অনেক-দিন দেখে নি গোপালীকে, বৎসরাধিক কাল। সেই চেহারার এই হাল হয়েছে—সেই রূপের এই পরিণতি—না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এচেহারা দেখতে না এলেই ভাল হত—নিজের মনে কেবলই ঐ কথাটা বলে হেমন্ত। এ কাকে দেখতে এল সে। না দেহে না মনে কোথাও ওর পরিচিত সেই গোপালীর অস্তিত্ব নেই; সেই হাসিখুশী পরোপকারী কোমলপ্রাণা অথচ আত্মবিশ্বাসী মেয়েটির। দীর্ঘকাল জোয়ার ফলে মাথাতেও কেমন গোলমাল হয়ে গেছে—কখনও চিনতে পারে কখনও পারে না। কী যেন বলতে চায়, কী যেন বলার ছিল মনে পড়ে না। সবচেয়ে বারে বারেই তারকের কথা জিজ্ঞাসা করে। কখনও মনে হয় তার অসুখের কথাটাও মনে নেই, কখনও আবার সে কথা মনে পড়ে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁরে সে কেমন আছে, খোকা? সেরে উঠেছে বেশ? কোথায় আছে, চাকরি করছে?......বে দিবি না?......আসতে বলিস একবার। কতদিন দেখি নি।'

এই সময়গুলোই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। চোখের জল রোধ করা যায় না। ধর্মবাবু হয়ত তারকের মৃত্যুর খবর জানান নি তাকে। জানালেও ভুলে গেছে গোপালী। এখন আর নতুন করে জানাতে গিয়ে মৃত্যু-পথযাত্রিনীকে আঘাত দিয়ে লাভ কি! গোপালী তারককে আপন ছেলে না হোক, আপন বোনপোর মতোই ভালবাসত—তা হেমন্ত জানে।

আরও কষ্ট হয় যখন গোপালীর ছেলে হেমন্তর চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। সাতাশ আটাশ বছরের ছেলে, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় সুকান্তি ছেলে, শালের কোঁড়ের মতো সজীব সতেজ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ওকে দেখে আর তারকের কথা মনে হয়। আপনা থেকেই যেন বুক ভেঙে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। এ নিঃশ্বাস পড়া উচিত নয়, অকল্যাণ হবে হয়ত ছেলেটার, নজর লাগছে—গোপালীর ছেলের যদি অমঙ্গল হয় এ নিঃশ্বাসে, তার অপরাধের শেষ থাকবে না—তা বুঝেও সামলাতে পারে না নিজেকে।

সৌভাগ্যক্রমে গোপালী অল্পেই অব্যাহতি দিয়ে যায় ওকে। মাত্র সাত আটদিন থাকতে হয়েছিল হেমন্তকে, তার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। হঠাৎই শেষ হয়ে গেল

করেছিল। বেশী দিন বাঁচবে না আর, সবাই জানত, তবু এমন আকস্মিক চলে যাবে কেউ ভাবে নি।

হেমন্ত কাঁদল না। কান্না আর তার ছিল না। ইহজগতের যে কটি বন্ধন ছিল, যে কটি অবলম্বন, ভগবান একে একে সব ঘুচিয়ে টেনে নিলেন। সবকটি প্রিয় ব্যক্তি চলে গেল—সে যাদের ভালবাসত, তাকে যারা ভালবাসত—সব। এই বোধহয় তার ললাটলিপি, স্নেহ প্রেম ভালবাসার কোন বন্ধন ভগবান তার রাখবেন না—কে জানে তাঁর কী উদ্দেশ্য সাধিত হবে এতে।...আবারও শাশুড়ির সেই কথাটা মনে পড়ে। সত্যিই কি সে পিশাচী, তার নিঃশ্বাসে সবাই শুকিয়ে মরে যায়?

এবারের এই তীর্থযাত্রার মধ্যে বৃন্দাবনে একটা কথা শুনেছিল সে। গোপীনাথের মন্দিরে কথকতা হচ্ছিল, একদিন বিকেলে শুনতে গিয়েছিল। কথক প্রভুপাদ শ্যামকিশোর গোস্বামী না কে—মনে নেই ঠিক—কথাপ্রসঙ্গে বিষকন্যার কথা বলেছিলেন। সেও কি সেই বিষকন্যা?

কে জানে, তাই যদি হয়—তার কি দোষ! ভগবান তাকে যেমন তৈরী করেছেন, সে তেমনি হয়েছে।...

চারিদিকে যখন সকলে হাহাকার করে কাঁদছে—প্রৌঢ় দুঁদে এ্যাটর্নী ধনুবাবু পর্যন্ত আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেন—তখন তার মধ্যে শুষ্ক চোখে পাথরের মতো বসে এই কথাগুলোই ভাবছিল সে।...

বোধহয় তার আসাটাই অন্যায় হল, চক্ষুলজ্জায় পড়ে না এলেই ভাল হত।

কে জানে, সে না এলে হয়ত আরও দুটো দিন বাঁচত গোপালী—অবুঝের মতো এই কথাটাই মনে হয় বার বার।

কোন অর্থই নেই এ-কথার, তাহলে যতদিন একত্র ছিল, তখনই ওর নিঃশ্বাসে গোপালী মরতে পারত—এসব জেনেও কথাটা মন থেকে একেবারে দূর করতে পারে না।...

ওর এই শুষ্ক চোখ ও কঠিন মুখভাবের কারণ বুঝতে পারে না অনেকেই। 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর' এই কথাটাই ভাবে কেউ কেউ।

গোপালীর মৃত্যুতে একটা সত্য পরিষ্কার হয়ে যায় ওর কাছে।

'কী করবে তা স্থির করতে না পারলেও, কী করবে না সেটা ঠিক করে ফেলে।

নিজের বাড়িতে আর ফিরে যাবে না সে। ও-কাজ আর করতে পারবে না।

রোগীর বিছানার পাশে বসলেই ওর তারকের কথা মনে পড়বে, গোপালীর কথা। তাছাড়া এ-কাজ সে নিয়েছিল তারকের জন্যই। সে-ই যখন রইল না, তখন কার জন্যে এই রক্ত-পুঁজ ঘাঁটতে যাবে, যা ওদের দেশে অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়েরা করে এসেছে বার বার—ছেলে প্রসব করানো কুৎসিত দৃশ্য সহ্য করবে বার বার।

এটা করবে না স্থির করে ফেললেও, কী করবে সেটা ঠিক করতে পারে না।

পূর্ণবাবু অবশ্য বলেন, 'কিছু আর না করলেও চলবে তোমার, একটা লোক—চলেই যাবে। বড় বাড়িটাও যদি ভাড়া দাও, দুখানা ছোট বাড়ির একখানাতে থাকো—তাহলে একশো টাকা না হোক, সত্তর-আশি তো পাবেই। টেক্স-খাজনা বাদ দিয়েও যা থাকবে, একটা মানুষের হেসেখেলে চলে যাবে। তখন তো আর এতগুলো লোক রাখারও দরকার হবে না—একটা ঝি থাকলেই চলবে।'

তারপর বলেন, 'আর যদি এখানে না থাকতে চাও, বাড়ি ক'খানাই বেচে দিয়ে টাকাটা কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করো—কিছু না হয় এক-আধ হাজার পোস্টাপিসে রেখে দিলে, হঠাৎ দরকারের জন্যে—যা সুদ পাবে তাতেই কোন তীর্থে গিয়ে কাশী কি বৃন্দাবনে বাস করতে পারবে অনায়াসে।'

'রক্ষে করো' প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে হেমন্ত, 'অমন দুর্গতি যেন আমার কখনও না হয়। যা দেখে এলুম! কাশীতে আট-দশদিন ছিলুম তো, বৃন্দাবনে আরও বেশী দিন—দিন-পনেরো বোধহয়—তাতেই ঐসব বিধবাদের দেখে নিয়েছি। ঐ যারা মাসিক তিন টাকা চার টাকা আয়ে দিন কাটায়। ওখানে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।...মন পড়ে আছে এইখানে, 'পরের মেয়ে বৌ এসে সেখানে রাজত্ব করছে আমি এখানে একা পড়ে আছি'—এই হিংসেতে জ্বলেপুড়ে মরছে দিনরাত। যার ছেলেমেয়ে নেই, ভাগ্নে কি ভাশুরপো সাহায্য করে, তারাও জ্বলছে, মন পড়ে আছে সম্বন্ধগুলো এইখানে, সংসারেতে—কেবল ভাবছে সবাই মিলে তাদের ওপর অবিচার করছে, কিংবা তারা যেমন গুছিয়ে সংসার করত, এরা কি তা পারছে? এতটি অপচয় করছে—অথচ তাকে দু' টাকা বেশী দিতে বুক ফেটে যায়। কাশীতে গোপালবাড়ি কি দশাশ্বমেধে কথা শুনতে যায়। বৃন্দাবনে গোপীনাথের মন্দিরে রাধারমণের মন্দিরেও গিয়ে দেখেছি—হয়ত ভাগবত পাঠ হচ্ছে—সেখানে বসে বসে গুজ গুজ করে বেটা-বৌ, নয়ত দেশে যে-সব আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের নিন্দে করছে এতটি। দর্শনে বেরোয়—তা ঐ বেলপাতার ডগা করে শিবের মাথায় একটু জল দিল কি না দিল—আধ পয়সার আনাজ কি এক পাছলার শাক নিয়ে কচাকচি, হাঁ করে খাবারের দোকানের রকমারি মিষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিঃশ্বেস ফেলে, কেউ বেড়ানোর নাম করে মাছ কেনে, কেউ অতটা না করলেও অকারণেই মাছের বাজারে উঁকি মারে—কোন্ মাছ কী দরে কে কিনল, লোককে থামিয়ে সে তা জিজ্ঞেস করে। ওভাবে বেঁচে থাকতে আমি চাই না।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবারও বলে, 'তাছাড়া এখন থেকে গিয়ে চুপচাপ বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করা—কবে মরব সব জ্বালা জুড়োবে তার দিন গোনা—অথচ মরণের ভয়ে শিটিয়ে থাকা—ও আমার ধাতে সইবে না। আরও কতকাল বাঁচতে হবে ঠিক তো নেই, ভগবানের যা রকমসকম, মনে হয়—আমাকে ভালমতো দগ্ধাবেন বলেই পাঠিয়েছেন—অনেক কালই বাঁচতে হবে হয়ত—এই দীর্ঘকাল চুপচাপ বসে খাওয়া? কোন কাজ হাতে না থাকলে পাগল হয়ে যাবো।...না, ও হবে না। দেখি, যদি অন্য কোন কাজ খুঁজে না পাই—শেষপর্যন্ত কোন হাসপাতালেই চাকরি নোব। এ-কাজ যদি করতেও হয়, টাকা নিয়ে আর করব না—পরের দোরে ছুটোছুটিও না। সময় নেই অসময় নেই ডাকলেই ছুটতে হবে, তার জন্যে তিন-চারটে লোক পুষে ঠাট সাজিয়ে বসে থাকা—আর নয়।...হাসপাতালে কাজ করি সে এরকম। বাঁধা সময় বাঁধা কাজ। এখানে যদি পাই বিনি মাইনেতেই করব সেও ভাল।'

কিন্তু অতকিছু করতে হয় না, কর্মক্ষেত্র একটা আপনা থেকেই চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। হঠাৎই।

বাড়ি বিক্রী করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে সেই পুরনো দালালকে একটা খবর দিয়েছিল। কী রকম এখন দরটর যাচ্ছে খানিকটা জানবার জন্যেই আরও—দালাল ফণীবাবু চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন।

'ছোট বাড়িটা বিক্রী করবেন মা-ঠাকরুণ। ঐ নেবুতলার বাড়িটা? খুব ভাল দর পাবেন। আপনি সারিয়ে সুরিয়ে রঙ করিয়ে এখন বেশ পছন্দসই করে

দিয়েছেন জে, খদ্দেরকে দেখালেই পছন্দ করবে।'

'কত দর উঠবে আপনি আশা করেন?'

ফণীবাবু এই কাজে ঘুঘু হয়েছেন। তিনি অত সহজে ভাঙবার লোক নন। হাত কচলাতে কচলাতে সবিনয়ে হেসে প্রশ্ন করলেন, 'আজ্ঞে আপনি কতটা পেলে খুশী হন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে হিসেব করে নিল হেমন্ত, বাড়িটা ন' হাজারে কেনা, রেজেস্ট্রী খরচাটরচা নিয়ে আরও পাঁচশো, মেরামত খরচা আয় একটা অতিরিক্ত কলঘর ও ছাদের নতুন একটা রান্নাঘর নিয়ে ধরো দেড় হাজারের মতো খরচ হয়েছে, সামান্য দু-একশো বেশিও হতে পারে, মোট এগারো হাজারই ধরা উচিত। ভাড়া পাচ্ছে মাসে আটাশ টাকা করে—ট্যাক্স ছোটখাটো মেরামতি প্রভৃতি দিয়েও অনেক পেয়েছে এই দেড় বছরে।

সে দ্রুত সবটা ভেবে নিয়ে কতকটা মরীয়া হয়েই বলল, 'পনেরো দিতে পারবেন?'

'একটু শক্ত হবে মা-ঠাকরুণ।' ফণীবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'খুব বোকা খদ্দের না হলে ও-বাড়ির জন্যে অত কেউ দেবে না।...বোকা খদ্দের তো সব সময় মেলে না।...ভাড়া তো ঐ, টাকাটা অন্য কোথাও লগ্নী করলে ঢের বেশী পাবে, কোন ভাল মারোয়াড়ীর গদিতে জমা রাখলে তো কথাই নেই।...আচ্ছা দেখি, কতদূর কি করতে পারি।'...

ফণীবাবু ফিরে এলেন তিনদিনের মাথাতেই।

বললেন, 'মা, ভাল দাঁও পেয়ে গেছি। ভেতরটা তো দেখাতে পারি নি, সে আপনি গিয়ে না দাঁড়ালে ধরুন ভাড়াটেরা বাড়ি দেখাবে কেন—বাইরে থেকে দেখিয়েছি, তাতেই চৌদ্দ পর্যন্ত উঠেছে। এতেই ছেড়ে দিন মা ঠাকরুণ, এতও কেউ দেবে না। আর দু'-একটাকে বাজিয়ে দেখেছি। বারোর ওপর উঠতে চায় না কেউ।'

হেমন্ত সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির করে ফেলে, 'আমি রাজী, আপনি বায়না করান।'

[illegible] পর ফণীবাবু চলে গেলে পূর্ণবাবুকে [illegible]লে, 'তুমি যে সেই বালিগঞ্জে কি বাড়ির কথা বলেছিলে, সে বিক্রী হয়ে গেছে?'

'না এখনও হয়নি। পড়েই আছে।'

'কী রকম বাড়ি, কত বড়? জমি কতটা?'

'রোস, মনে করি। অত কি আমার মুখস্থ আছে। কেন বলো দিকি, এত তাড়া—?'

'বলোই না তুমি। তারপর বলছি।'

পূর্ণবাবু ভেবে নিয়ে বলেন, 'দেড় কাঠার ওপর বাড়িটা বসেছিল বোধহয়। দুখানা ঘর, কল পাইখানা—ছিলে কোঠাটায় কেবল টিনের চাল, সেইখানেই রান্নাঘর, বাইরের দিকে একটু সরু বারান্দা আছে, ভেতরেও আড়াই হাত চওড়া রক। জমি সব শুদ্ধ সাড়ে ছ কাঠা।

'কত চাইছে?'

'বারো হাজারের কম দেবে না। ছোট হোক, নতুন বাড়ি।'

'তুমি কথা বলো ভদ্রলোকদের সঙ্গে। আমি কিনব।'

'সে কি! তারপর? কী করবে নিয়ে? ভাড়াটে পাবে না ওখানে। যে বাড়ি করেছিল সে ভাড়া দেবে বলেই করেছিল, অত নির্জন জায়গায় কেউ আসতে চায় না। লোকালয়ের বাস বলতে মনোহরপুকুর, সেখান থেকে তিরিশ ফুট রাস্তা গেছে এখনও কাঁচা—তা থেকে আবার কুড়ি না পঁচিশ ফুট পথের ওপর এই জমি। পথ যা ম্যাপে দেখালো, হিসেব করে আটিয়ে নিতে হবে। তাও—বাড়ি ছাড়া জমি যা আছে, রোড ফ্রন্টেজ পঁচিশ ফুটের বেশ হবে না। আশপাশে কাঁপ ক্ষেত মটর ক্ষেত, গরমের দিনে এমনি পড়ে থাকে। শুনেছি কারা যেন দাঁওয়ে ঐ সমস্ত ক্ষেতগুলো কিনে নেওয়ার তালে আছে—সবটা কিনে নিজেরা রাস্তা বার করে ফালি ফালি বিক্রী করবে—তবে সে ধরো সুদূরপরাহত, যাকে বলে বিশ বাঁও জল।'

'তা হোক, তুমি ঠিক করো। আমি গিয়ে থাকব।'

'তুমি থাকবে? পাগল নাকি! থাকতে পারবে—একা সেই তেপান্তরের মাঠের মধ্যেখানে?'

'কেন, এই তো রয়েছি। এই বা কি এমন সদরবাজার জায়গা!'

'এখানে থাকা আর সেখানে থাকা! এখানে আমার চাকর দারোয়ান আছে. মালী আছে. সরকারবাবুরা আছে। সেখানে তোমার ঝিকেই রাখতে পারবে না। একরাত কাটাতে হলেই খসে পড়বে।'

'তা পড়ুক। একাই থাকব না হয়। আমার অত ভয়ডর নেই আর। গয়না টাকাকড়ি সেখানে কিছু রাখব না যে ডাকাত পড়বে. নিজেরও সে বয়েস নেই যে লুটে নিয়ে যাবে। আমি নিজে ঐ বাড়িতে বাস করে যদি পাশের জমিতে বাড়ি তুলতে পারি. তাহলে ভাড়াটেও আসবে—চাই কি বিক্রীও করতে পারব। এখন কেউ নেই তাই. আমি থাকলে তো আর সে-কথা বলতে পারবে না যে বিজনপুরী. জনমনিষ্যি নেই কোথাও!'

'কী জানি। আমার তো মনে হয় এটা বড় বেশী ঝুঁকি নিচ্ছ!'

ঝুঁকি আর কি! না হয় ফেলে চলে যেতে হবে. বাড়ি পড়ে থাকবে। আজ না হয় পাঁচ-সাত বছর পরে তো খদ্দের পাব। আমারও কিছু এমন অবস্থা নয় যে ঐ কটা টাকার জন্যে ডান হাত বন্ধ থাকবে।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে. 'যে অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে প্রায় এক বছর কাটিয়েছি—সে তুমি ভাবতেও পারবে না। লোকালয় থেকে কত নিচে স্যানাটোরিয়াম. শ্যাওলাধরা বড় বড় গাছ আর কালো কালো পাহাড়। দুপুরবেলাই ভাল আলো আসত না। কুয়াসায় ঢেকে থাকত মাসের মধ্যে বিশ দিন। কাছাকাছি কোন জনবসতি নেই. দূরে দূরে গুর্খাদের খুপরি খুপরি ঘর হয়ত এক-আধখানা. তাও তার বাসিন্দারা তো সুপুরি-পচানো মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে দিনরাত।...নিচে একটা ঝরনা. তার কি গর্জন. ভোরে সন্ধ্যায় সে-আওয়াজ কানে গেলে বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠত! তার মধ্যে যখন অত কাল কাটিয়েছি. তখন এ বেশ থাকতে পারব।'

'দ্যাখো—যা ভাল বোঝো।'

পূর্ণবাবু আর কিছু বলেন না।...

নেবুতলার বাড়ি বিক্রী হয়ে যায়, বালিগঞ্জের জমি-বাড়িও কেনা হয়।

এই যেন একটা কাজের রাস্তা পেয়ে যায় হেমন্ত। সে ফণীবাবু ছাড়াও দু-একজন দালাল লাগিয়ে দেয়. ভাঙ্গা পুরনো বাড়ি কোথায় সস্তায় আছে কেনার জন্যে। নিজের যে দুখানা বাড়ি এখনও আছে. তাতে মিস্ত্রী লাগিয়ে নতুন করে রঙ করায়।

ঐ বাড়িটা—কমলাক্ষর স্মৃতি তারকের স্মৃতিমাখা ঠিকই. কিন্তু সেই জন্যেই বিক্রী করবে সে. মনস্থির করে ফেলে। যারা চলে গেছে তাদের ব্যবহার-করা জিনিস আসবাব বুকে করে সারাজীবন দগ্ধানোর কোন মানে হয় না। ভুলে যাওয়াই ভাল।

শুধু বাড়ি নয়—ওখানের খাট-বিছানা আলমারি ঝাড় বাতিদান—সব বেচে দেবে সে। দরকার হয় আবার কিনবে—কিন্তু ওসব জিনিস আর সে দেখতে চায় না। পুরনো চাকর-বাকরকেও সরানো দরকার, বড় বেশী সান্ত্বনা দিতে আসে যখন-তখন।

মধ্যে এই ক'মাসের নিষ্ক্রিয়তায় ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল হেমন্ত—এবার সে প্রচণ্ড উৎসাহে কাজে নেমে পড়ল। পূর্ণবাবু ঠিক বুড়ো হয়ে না পড়লেও আজকাল আর আগের মতো অত ঘোরাঘুরি করতে পারেন না. নিজের কাজই কমিয়ে দিয়েছেন আগের থেকে। সুতরাং তাঁকে দিয়ে আর বিশেষ সাহায্য হয় না। যা করতে হয় ওকেই করতে হয়। প্ল্যান-মেকারকে দিয়ে বালিগঞ্জের জমির প্ল্যান করায়। নিজেই বাতলে দেয় কি করতে হবে। জমি কেনার সময় দেখা গেল পঁচিশ নয়. প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ ফুট ওপনিং আছে রাস্তার ওপর। তা থেকে আট ফুট রাস্তার জন্যে ছেড়ে সামনের জমিতে একখানা মাঝারি ও পিছনের সব জমি জুড়ে বড় একখানা—মোট দুখানা বাড়ির প্ল্যান করায়। লাগোয়া নয়. বিচ্ছিন্ন। যাতে বিক্রী করার সময় অসুবিধা না হয়। প্ল্যান-মেকার পরামর্শ দিয়েছিল, 'লাগোয়া করলে অনেক জমি বেঁচে যাবে আপনার. তেমন বোঝেন চওড়া দেওয়াল করুন—বিক্রীর সময় অর্ধেক দেওয়ালের স্বত্ব লিখে দেবেন. তাহলে আর ঝগড়া-বিবাদের কোন প্রশ্ন থাকবে না।'

'তাহলেও থাকবে। আপনি এখনও মানুষ চেনেননি। তাছাড়া. মাঝে একটু ফাঁক থাকলে ঘরগুলো হয়তো ছোট করতে হবে. তেমনি চারদিকে ফাঁকা বাড়ির হিসেবে বেশী দাম উঠবে। যা বলছি আপনি সেইভাবেই করুন।'

প্ল্যান তৈরী হওয়ার পর শোনা গেল ঘুষ ছাড়া নাকি প্ল্যান পাস হয় না। দুখানা প্ল্যানে একশো টাকার মতো লাগবে।

হেমন্ত ভুরু কুঁচকে বললে. 'ঘুষ? তাই নাকি? আচ্ছা. দেখা যাক।'

তারপর নিজেই একদিন খোঁজ করে মিউনিসিপ্যালিটির আপিসে গেল। বয়স হলেও এখনও হেমন্তর চেহারায় যথেষ্ট জেল্লা. আজকাল পুরোপুরি বিধবার বেশ ধরেছে সে—শুভ্র দামী কাঁচির থানধুতি পরনে. গায়ে সাদা চাদর—গিয়ে দাঁড়াতেই সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর যখন গলা বেশ চড়িয়েই সে বললে, 'শুনেছি আপনাদের এখানে ঘুষ না দিলে নাকি প্ল্যান পাস হয় না, আমি স্বামীপুত্রহীনা মেয়েছেলে—আমার কাছেও কি ঘুষ খাবেন. না—প্ল্যানটা ছেড়ে দেবেন?... পনেরো দিন দেখব. এর মধ্যে যদি প্ল্যান না পাস হয় তো আমি সব খবরের কাগজের আপিসে আপিসে গিয়ে বলে আসব আপনারা ঘুষ চেয়েছিলেন, দিইনি বলে প্ল্যান পাস হয়নি। আমার নামে মানহানির মামলা এনেও কিছু করতে পারবেন না, আমি আদালতে গিয়ে হলপ করে বললে আমার কথাই হাকিম বিশ্বাস করবেন।'

সে একটা হৈ চৈ ব্যাপার আপিসে। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকলেই একসঙ্গে কথা কইতে চান। কে একজন—বড় গোছের কেউ হবেন—টেবিল ছেড়ে উঠে এসে একটা চেয়ারে হেমন্তকে বসিয়ে তখনই ডিপার্টমেন্ট থেকে প্ল্যান আনিয়ে দেখে বললেন. 'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান. পনেরো দিন লাগবে না. চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই প্ল্যান পেয়ে যাবেন। প্ল্যান ঠিক আছে—কোন গোলমাল হবে না।'

এর পর আরও যা করে বসল হেমন্ত পূর্ণবাবু সুদ্ধ অবাক হয়ে গেলেন। মিস্ত্রিকে ডেকে পাঠিয়ে তার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে ইট-চুন-সুরকী. কাঠ-কাটরা দর-দস্তুর করে বায়না দিয়ে এল এবং বালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে উঠে এসে নিজেই দাঁড়িয়ে ভিত কাটাতে শুরু করে দিল। নতুন বাড়িতে আসার আগে গৃহপ্রবেশের কোন পুজো-আর্চা বা হোম-যাগ করল না. নতুন ভিত কাটার আগেও না। মুসলমান মিস্ত্রী পর্যন্ত ওর এই দুঃসাহসে হকচকিয়ে গেল. বললে 'সে কি—মাটির বুকে কোদাল চালানো—একটু নব-রত্ন না কি দেন যেন আপনারা. ঠাকুরের পুজো—সেসব কিছু করাবেন না?'

হেমন্ত কঠিন হাসির ফাঁকে জবাব দিল. 'ওসব অনেক করেছি মিস্ত্রী তার ফলও দেখলুম। এবার কিছু না করেই দেখতে চাই।

পূর্ণবাবু অন্য দিকের কথা বললেন, 'ছোটখাটো মেরামত সে এক রকম. তাও তো আগে আগে আমিই করিয়ে দিয়েছি—কিন্তু এ একটা গোটা বাড়ি করানো এ কি তুমি পেরে উঠবে? মিস্ত্রী মজুররা ঠকাবে, মালপত্রের দাম জানো না. ওসব ঘুরে ঘুরে দেখে মাল চিনে কিনতে হয় দর-দস্তুর করে—বেশী দাম নেবে হয়ত. নয়ত মালের পরিমাণে ঠকাবে—ও তুমি পারবে কেন? বরং ভাল দেখে একজন ঠিকেদার রাখো. তার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত

করে দাও। সে একটা লোকের ওপর বরং নজর রাখা সহজ।'

সেও তো কিছু মজুরী নেবে, কত সদরে নেবে আর কত চুরি করবে—তাও তো জানি না। তাতেও তো ঠকতে হবে খানিকটা, অথচ তাতে কাজটাও শিখতে পারব না। তাই যদি হয়—ঠকে আর ঠেকেই না হয় শিখি এবার। ঠকলে এই একবারই ঠকব। এই বাড়িটা করার সময়ই। এটা করতে করতেই কাজটা শিখে নিতে পারব আশা করছি—পরে যখন করাব তখন আর কারও ওপর ভরসা করতে হবে না।'

পূর্ণবাবু কাঁধের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করে হাল ছেড়ে দেন।

এই সব নিয়ে যদি ভুলে থাকতে পারে তো থাক। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই।

তবে, বাড়ি বাড়ি যখন গাঁথুনির কাজ শেষ করে ছাদ পেটানো ও পলেস্তরার কাজ হতে শুরু হল তখন খরচের খাতায় মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে পূর্ণবাবুও স্বীকার করেন যে খুব বেশী একটা কেউ ঠকাতে পারে নি ওকে।

এই বাড়ি উঠছে দেখে পাশেও এক ভদ্রলোক বাড়ি তুলতে শুরু করে দিলেন। মনে হল এদিক দিয়েও হেমন্তর হিসেব ঠিক, এবার এখানে আস্তে আস্তে বসতি শুরু হয়ে যাবে, ওর ভাড়াটে বা ক্রেতার অভাব হবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

দীর্ঘদিন পর শ্রীমতী শানু লাহিড়ীর একটি তৃপ্তিকর প্রদর্শনী হয়ে গেল অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসে। কলকাতার কলারসিকদের কাছে শানু লাহিড়ী অপরিচিত নন, তবে দীর্ঘকাল আসাম-প্রবাসের ফলে তাঁর হালের কাজ হয়তো অনেকেই দেখেন নি। দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ শিষ্যত্বহেতু নীরদ মজুমদারের প্রভাব তাঁর রঙে ও বিশেষত রেখায় স্পষ্ট; কিন্তু নীরদ মজুমদারের কাজের যা বিশেষত্ব, সেই কিমাকার পৌরুষ তাঁর ছবিতে অনুপস্থিত, তার পরিবর্তে ছবিকে নিজস্ব গীতলতায় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তিনি। মোট আটাশটি ছবির মধ্যে প্রথম আটটি 'প্রণয়নৃত্য' নামক এক অভিধায় চিহ্নিত। এর উদ্দেশ্য ছবির মাধ্যমে স্পষ্ট হল না। এর সবকটিই কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক, কিন্তু পরবর্তী চিত্রসমূহের মধ্যেও উক্ত বিষয়ের অভাব নেই।

শানু লাহিড়ির কাজ আশ্চর্য তৃপ্তি-প্রদ। বুদ্ধি এবং বোধের সেই কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য তাঁর ছবিতে বর্তমান, নেহাৎ অদীক্ষিত দর্শকের কাছে ছাড়া তা তাঁর ছবির প্রতি বিহঙ্গ চোখে দৃষ্টিপাত করলেও বোঝা যাবে। বৃন্দাবন ও পঞ্চদশ শতক থেকে বহুদূরে, উনিশ শো বাহাত্তরের কলকাতায় কৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তির্যক হয়েই ধরা দেবেন, জলের গভীরে রৌদ্র-রেখা যেমন বেঁকে-বেঁকে যায়। কিন্তু শুধু, গভীরতা ও শ্যাওলাদামের আড়ালে, উজানে ওঠা মাছের শুল্কআলায় সূর্যালোক তির্যক, কিন্তু নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে: তেমনি বহু যুগের ওপার থেকে শ্রীরাধাকে পাই, ব্যবধানহেতু বহুতর ধারণাগত পরিবর্তনসমেত, কিন্তু নির্ভুল ভাবে শ্রীরাধা। সে-তুলনায় বরঞ্চ পদ্মিনী ও আলাউদ্দিন খিলজিকে ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকার করতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হয়।

— পরিশেষে একটি কথা। ছবির নাম কি বাংলায় দেয়া চলতো না? এবং পরিচয়-পত্রটি কি বাংলায় ছাপানো যেতো না? আমাদের প্রতিবেশীরা যখন আমাদের ভাষার কারণে বিদ্রোহ করে জয়ী হচ্ছে, তখনো কি আমাদের ইংরেজির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে নিজেদের মুক্ত করবার সময় আসেনি?

অ্যামেরিকান য়ুনিভার্সিটি সেন্টারে (১ বিধান সরণি, কলকাতা-১২) চৈতন্য কলা-বিজ্ঞান কেন্দ্র একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। এটি ১৮ থেকে ২৫ জানুয়ারি প্রত্যহ বেলা একটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। অবনীন্দ্র-শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্রদের অঙ্কিত মোট ৬২টি ছবি এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

শিল্পী ঃ শানু লাহিড়ী

চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় কলারসিকদের কাছে পরিচিত নাম। এককালে প্রবাসী-ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় তাঁর বহু ছবি আমরা দেখেছি—এখানে তাঁর কয়েকটি বড়ো-বড়ো কাজ দেখা গেলো। অবনীন্দ্র-শিষ্যদের যাবতীয় গুণ ও দোষ তাঁর ছবিতে উপস্থিত; রং ব্যবহারের সেই বিষম মেজাজ, এলায়িত মনোরম রেখাবিন্যাস, এবং কিঞ্চিৎ নবিশি ধরণে বস্তুবিন্যাস। কয়েকটি সুন্দর পোর্ট্রেট দেখা গেলো; কিন্তু শান্তিনিকেতনীয় ভঙ্গির রেখা-বিন্যাসের মাধ্যমে কয়েকটি সম্ভবত তান্ত্রিক বিষয়ের ছবি কিঞ্চিৎ ধাঁধার সৃষ্টি করেছিলো।

শ্রীশুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের তাৎক্ষণিক স্কেচের হাত বেশ ভালো; যতগুলি স্কেচ প্রদর্শিত হয়েছে, সাবধানে তার অর্ধেক সংখ্যককে বাদ দিয়ে প্রদর্শন করলে খুবই ভালো বলা যেতো। তাঁর স্টুডিয়ো (২৮) ছবিটি বেশ চিত্তাকর্ষক; অনেকটা রুসোর মতো একধরণের অবাস্তব বাস্তবতা এসেছে ছবিটির মধ্যে---প্রদর্শনীর অন্যতম ভালো ছবি। শ্রীমতী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়ের অনেক দিন আগে আঁকা মিনিয়েচার দুটি (৬২) মনোহর---বিশেষ ক'রে ডানদিকেরটি। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছবি ভালোই —কোথাও কোথাও গগনেন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁর ছবির নামগুলো কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পিত বলে বোধ হ'লো। এফেক্ট জিনিসটা ভালোই—কিন্তু কতদূর ভালো তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

তবে আমার কাছে এই প্রদর্শনী দেখতে যাবার অন্যতম পুরস্কার ব'লে মনে হয়েছে শ্রীমুকুন্দলাল ভাদুড়িকে আবিষ্কার করা। বাস্তবিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই তরুণ শিল্পী. ছবির যথার্থ বোধ এঁর ভিতরে রয়েছে ব'লে মনে হ'লো। এঁর 'পেন এ্যান্ড ইংক' (৫১) বাস্তবিক ভালো ছবি, যে-কোনো সংগ্রহে স্থান পাবার উপযুক্ত। এঁর আইকন (৫৪ ও ৫৫) দুটি রুয়ো অথবা স্টেইনড গ্লাস পদ্ধতিকে মনে করিয়ে দেয় —তেমনি মোটা মোটা ঘন কালো রেখার অন্তরাল থেকে বর্ণাঢ্য আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে আসা। নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মে অবস্থান করতে পারলে ইনি যশস্বী হবেন আশা করি।

—চিত্ররসিক

মন্দির প্রেমী ডেভিড ম্যাককাচ্চন

প্রণব রায়

কলকাতার ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়িয়ে কিছু দূরে ভবানীপুর বেরিয়্যাল গ্রাউন্ড। এ্যাংগ্লিকান চার্চের থমথমে নির্জন পরিবেশ। কলকাতার রাস্তায় গাদাগাদি করে যাওয়া লোকের ভীড় নেই এখানে। বেরিয়্যাল গ্রাউণ্ডের সমাধি-মন্দিরের তেমন কোন আভিজাত্য এখানে চোখে পড়বে না। কতগুলি নিতান্ত আড়ম্বরহীন সমাধি-মন্দির সূচিত করছে অন্তিম-প্রয়াণের বেদনাময় স্মৃতি। গত ১৫ই জানুয়ারী (১৯৭২) সেই আভিজাত্যবিহীন সমাধিভূমির এক পাশে শুইয়ে দেওয়া হ'ল সুদূর ইংল্যাণ্ডের ওয়ারউইকশায়ারের এক ব্যক্তিকে। নাম ডেভিড ম্যাককাচ্চন। নামটি হয়তো বিশেষ পরিচিত ঠেকবে না অনেকের কাছে। কিন্তু যাঁদের এ নামটি ও ব্যক্তিটির সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁরা ডেভিড ম্যাক্‌-কাচ্চনের অন্তিম বিদায়কে আজ কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছেন না, বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না এখনও, যে তিনি তাঁদের সত্যিই ছেড়ে চলে গেছেন একেবারে। অবশ্য তাঁর এদেশ ছেড়ে চলে যাবার কথা ছিল এবছরের সেপ্টেম্বর মাসে, অন্তত সেরকম কথা তিনি তাঁর অনেক বন্ধুকেই বলেছিলেন, লিখেও ছিলেন কাউকে কাউকে। কিন্তু তার আগেই যে তাঁকে এখান থেকে চিরবিদায় নিতে হবে সেকথা কেউই কল্পনা করতে পারেন নি।

ডেভিড ম্যাককাচ্চন জন্মেছিলেন ইংল্যাণ্ডের ওয়ারউইকশায়ারে উনিশ শ' তিরিশ সালে। কেম্ব্রিজ থেকে জার্মাণ ও ফরাসী-সাহিত্যে ট্রাইপস পেয়ে তিনি পরে সেখান থেকেই এম-এ পাশ করেন। বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক হয়ে তিনি এদেশে প্রথম এসেছিলেন উনিশ শো সাতান্ন সালে।

তারপর উনিশ শো ষাট সাল থেকে যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েছিলেন। উনিশ শো সত্তর-এর সেপ্টেম্বর থেকে উনিশ শো একাত্তরের আগস্ট পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের সাসেক্সের ব্রাইটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও হয়েছিলেন। আর গত বৎসরের শেষের দিকে আবার ফিরে এসেছিলেন এদেশে।

কিন্তু ডেভিড ম্যাককাচ্চনের এ পরিচয়ের জন্যেই তিনি এদেশের অনেকের কাছে আদৌ স্মরণীয় হতেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত ভারতপ্রেমিক—বিশেষ করে বাঙলার অনেকের কাছে তিনি ছিলেন অধিক আকর্ষণের। বাঙলা দেশ তথা পশ্চিম বাঙলার নানা স্থানে যে অসংখ্য মন্দির আজও কালদৃষ্টি এড়িয়ে বেঁচে রয়েছে, যাদের আজ অনেকগুলিই জীর্ণ ও দেবতাবিহীন হয়ে হিংস্র সর্পকুলের ও বন্য জীব-জন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হয়েছে, ম্যাককাচ্চন ভালোবেসেছিলেন তাদের ভালোবেসেছিলেন তাদের বহু বিচিত্র পোড়ামাটির কারুকার্যকে, আর ভালো-বেসেছিলেন এদেশের মানুষদের। বিশেষ করে তাঁদের যাঁরা মন্দিরচর্চায় আজীবন কাটিয়েছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রিধারী, পৃথিবীর কয়েকটি আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে ডেভিড ম্যাককাচ্চন এদেশের মন্দিরকে যে কি করে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়ের। উনিশ শো ষাট সাল বা তার আগে থেকেই এই ইংরেজ সুধী তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন এদেশের মন্দিরকে। সন্ধান পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়েছেন যেখানে মন্দির আছে সেখানে, তা সে স্থান যতই দুর্গম ও বিপদসংকুল হ'ক না কেন। তাই কলকাতার কিছু কিছু মন্দির যেমন তাঁকে আকর্ষণ করেছে, তেমনি আকর্ষণ করেছে কোন অখ্যাত দুর্গম পল্লীর মন্দির। মন্দিরের নেশায় আবার কখনও বা তিনি ছুটেছেন [illegible] পূর্ব পাকিস্তানে, কখনও বা ওড়িষ্যায়, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে।

এপার বাঙলা ওপার বাঙলার বহু বিচিত্র মন্দিরের অসংখ্য ছবি তুলেছেন ম্যাককাচ্চন। এসব মন্দিরের পোড়ামাটির শিল্প ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। এদের ছবিও তিনি তুলেছেন অনেক—ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ভারতের তথা বাঙলার প্রতিটি মন্দিরের বিবরণ ও ইতিহাস লিখে রেখে যাবেন আগামী দিনের কৌতূহলী গবেষকদের জন্যে—যাঁরা হয়তো ভবিষ্যতে অনেক প্রাচীন মন্দিরকে আর দেখতেই পাবেন না, খুব শীঘ্রই যেসব মন্দির কাল-কবলিত হয়ে পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাঁর তোলা অনেক মন্দিরের ছবি আজ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ-শালায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু আসল মন্দির হয়তো এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ম্যাককাচ্চন তাই অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন তাঁর কাজ। সম্ভবত বিশ্বভারতীতে থাকা-কালীনই তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ চৌদ্দ-পনর বছর ধরে একটানা কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো সাইকেলে পশ্চিম বাঙলা তথা বাঙলা দেশের অসংখ্য মন্দির 'দর্শন' করেছেন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে কোনটিকেই তিনি অবহেলা করেন নি। মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির কারুকার্যের মধ্যে প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালীমনের যে পরিচয় নানা চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে কলাপ্রেমিক ম্যাককাচ্চন তাকে উপলব্ধি করেছিলেন অন্তর দিয়ে, তাঁর ক্যামেরায় সেগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

মন্দির নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ডেভিড ম্যাককাচ্চন ভারত ও বাঙলার মন্দির সম্পর্কিত প্রকাশিত কোন গ্রন্থের চেয়ে এদেশের গবেষক ও স্থানীয় জন-সাধারণের মতামতকে যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে যাওয়া ছিল তাঁর এক বিশেষ আকর্ষণ। এ আকর্ষণ ছিল প্রধানতঃ দুটি কারণে : (১) দাসপুর গ্রামটি হচ্ছে বাঙলাদেশের কতগুলি বিশেষ শ্রেণীর

মন্দিরের অধিষ্ঠান। এখানকার সূত্রধর যাঁরা অনেককাল আগে থেকেই মন্দির-শিল্পে তাঁদের অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তাঁদের দেওয়া নামে পরিচিত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর মন্দির সম্পর্কে তাঁর দারুণ কৌতূহল ছিল। (২) দ্বিতীয়ত এই থানার অন্তর্গত চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামের অধিবাসী আজীবন গবেষক-সুধী, উনিশ শতকের বিখ্যাত নৈয়ায়িক উমাচন্দ্র ন্যায়ভূষণের প্রপৌত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় ম্যাককাচ্চনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, গবেষণা-স্পৃহা ও অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা। ম্যাককাচ্চন এই প্রবীণ সুধী গবেষকের সান্নিধ্য লাভের জন্যে প্রায়ই ছুটে আসতেন শ্রীযুক্ত রায়ের বাসুদেবপুর গ্রামের পল্লীভবনে। সুদূর ইংল্যান্ড থেকেও তিনি এই প্রবীণ সুধী গবেষকের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয় গত দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বাঙলার মন্দির, বিশেষ করে দাসপুর থানার মন্দির—তাদের গঠনরীতি, নির্মাতা প্রভৃতি বিষয়ে যে গবেষণা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, পণ্ডিত ম্যাককাচ্চনের স্বাভাবিকভাবেই সেজন্যে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বোধ জেগেছিল। [সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রায়ের বাঙলার মন্দির সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ ম্যাককাচ্চনের তোলা ছবিসহ 'অমৃতে' প্রকাশিত হচ্ছে] মৃত্যুর আগে ম্যাককাচ্চন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও গবেষণাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিলেন একটি গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে। গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন তিনি 'লেট মিডিয়ভাল টেম্পলস অব বেঙ্গল'। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি বর্তমানে এ-বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি এই বইটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করলে স্বর্গত এই সুধী গবেষকের প্রতি যথোচিত সম্মান ও উৎসর্গে বঙ্গ-সংস্কৃতির বহুদিনের বিরাট প্রয়োজন মিটবে।

গত বৎসর সাসেক্সের ব্রাইটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা কালীন ডেভিড ম্যাককাচ্চন 'ফোয়েস্ট' পত্রিকার জুলাই-আগস্ট-এর সংখ্যায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম হ'ল 'পঞ্চমাকন্ড টেম্পলস অব বেঙ্গল'। এ প্রবন্ধে বাঙলার রত্নমন্দির ও তার গঠন-প্রণালী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এছাড়া বর্তমান বাংলা দেশের (আগের পূর্ব পাকিস্তান) নানা স্থানে ঘুরে তিনি বেশ মন্দির দেখেছেন ও তাদের বহু ফটো তুলেছেন সেগুলি সম্পর্কেও তিনি একটি মূল্যবান নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। ঢাকায় ইতিহাস পরিষদের 'ইতিহাস' পত্রিকায় ১৩৭৫ সালের পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় সেটি 'পূর্ব পাকিস্তানের মন্দির' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাককাচ্চন ইংরেজীতে মূল রচনাটি পাঠ করেছিলেন ঢাকার ইতিহাস পরিষদ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান পুরাকীর্তি সেমিনারে। এছাড়াও মন্দির সংক্রান্ত আরও অনেক নিবন্ধ নানা সময়ে তিনি বহু সুপরিচিত পত্রিকায় লিখেছিলেন।

বাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির সম্পর্কে চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামের সুধী গবেষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় দীর্ঘকাল ধরে যে গবেষণা করে এসেছেন তা থেকে জানা যায়, বাঙলার মন্দিরগুলি মূলতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) নিজস্ব, (২) মিশ্র, ও (৩) বৈদেশিক। চালা ও চাঁদনী জাতীয় মন্দিরগুলি বাঙালী সূত্রধরদের নিজস্ব পরিকল্পনায় রচিত হয়েছিল খোড়ো ঘরের চারচালা, আটচালা ইত্যাদির অনুকরণে। বাঙালী যে স্বর্গের দেবতাকে তাঁর ঘরের দেবতা করতে চেয়েছিলেন এ-মন্দিরগুলির গঠনরীতির সংগে বাঙালী ঘরের গঠনরীতির আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য থেকে তা সহজেই প্রমাণিত হয়। চাঁদনী-মন্দির কতকটা থামওয়ালা অট্টালিকা আকারের। কোন কোন স্থানে দোতলা চাঁদনী-মন্দিরও দেখা যায়, যেমন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাটানের দোতলা চাঁদনী-মন্দির। মিশ্র-রীতির মন্দিরগুলির মধ্যে বাঙালী সূত্রধরের নিজস্ব পরিকল্পনা ও বাংলার বাইরের সূত্রধরদের মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি একই সংগে রূপায়িত হয়েছে। আলগোছটংগী বা একরত্ন টাইপের মন্দির ও অন্যান্য রত্নমন্দির এ-জাতীয় মন্দিরের মধ্যে পড়ে। বৈদেশিক শ্রেণীর মন্দির মধ্যে পড়ে উৎকলীয় দেউল, বুদ্ধগয়া টাইপের দেউল প্রভৃতি যেগুলিতে বাঙলার বাইরের মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। শ্রীযুক্ত রায়ের এ মতকে বিচক্ষণ ম্যাককাচ্চন উপেক্ষা করতে পারেন নি। এসম্পর্কে তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হ'ত তা শ্রীযুক্ত রায়কে লেখা ম্যাককাচ্চনের কয়েকটি চিঠিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। দাসপুরের মন্দিরগুলিতে যে নানা শ্রেণীর থাম বা খিলান দেখা যায় শ্রীযুক্ত রায় তাদের বিশেষ (টেকনিক্যাল) নামগুলি সর্বপ্রথম ম্যাককাচ্চনকে জানিয়েছিলেন, যেমন ইমারতি থাম, কলাগেছ্যা, দরুণ, হাইকোর্ট, খিলান ইত্যাদি। মৃত্যুর আগে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির জন্যে 'অন্ত-মধ্যযুগীয় বাঙলার মন্দির' ('লেট মিডিয়ভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল') শীর্ষক বইটিতে শ্রীযুক্ত রায় প্রদর্শিত এই নামগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শ্রীযুক্ত রায়ের গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততার প্রতি এই বিদেশী সুধী গবেষকটির অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন স্থানের মন্দির সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্যে বহু চিঠিপত্রও তিনি লিখেছিলেন।

পুরাতত্ত্ব ও মন্দিরপ্রেমী ম্যাককাচ্চন উনিশ শো সত্তরের শেষের দিকে ইংল্যান্ড যাবার আগে মন্দির সম্পর্কে যে একটি বড়ো আকারের বই লিখতে শুরু করেছিলেন তা' জানা যায় শ্রীযুক্ত রায়কে সে বছরের ছাব্বিশে জুলাই তারিখের একটি চিঠি থেকে।

দাসপুরের মন্দিরশিল্পী সূত্রধরদের দেওয়া বিভিন্ন রীতির দেউলের ও তাদের থামগুলির নাম ম্যাককাচ্চনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি ঘাটাল শহরের রঘুনাথ মন্দিরে কোন শ্রেণীর থাম আছে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করে শ্রীযুক্ত রায়কে চিঠি লিখেছিলেন।

এ ধরণের আরও বহু চিঠিতে তাঁর জানার আগ্রহ গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীযুক্ত রায়ের সংগে তাঁর সম্বন্ধ কতকটা ছিল গুরু-শিষ্যের মতো। মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন তিনি প্রবীণ মনীষীকে—আর উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক অন্তরংগ যোগসূত্র। শ্রীযুক্ত রায়ের বাসুদেবপুরের পল্লীভবনে ডেভিড ম্যাককাচ্চনের জন্যে ছিল অবারিত দ্বার। আজ তাঁর এই অকাল-বিয়োগে সেই পরিবারটির সকলেই হয়ে উঠেছেন শোকমগ্ন। সপ্ততিপর বৃদ্ধ ও রোগাক্রান্ত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় এই বিদেশী তরুণটির অসাধারণ নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম লক্ষ্য করে একদিকে শ্রদ্ধায় ও অন্যদিকে গভীর প্রীতিতে তাকে আবদ্ধ করেছিলেন। বাঙলার মন্দিরগুলি আজ যেভাবে ভগ্নস্তূপে পরিণত হচ্ছে এবং যেভাবে ক্রমাবলুপ্তির পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে অথবা কোন কোন জায়গার মানুষজনেরা প্রাচীন বাঙলার এ শিল্পকর্মগুলির কোন মূল্য বুঝতে না পেরে এগুলিকে নষ্ট করে ফেলছেন প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার জন্যে দুঃখিত হবেন। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই বিদেশী তরুণটির এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা বোধ লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এদেশে তাঁর কাজ শেষ করে তিনি যে এ-বছরের শেষের দিকে দেশে ফিরে যাবেন সেকথাও ম্যাককাচ্চন লিখে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তাঁর অসমাপ্ত বিরাট কাজ ফেলে রেখে তিনি চিরকালের জন্যে চলে গেলেন। আর অন্তিম শয্যা রচিত হ'ল এদেশেরই মাটিতে—যে দেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, যে দেশের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ছিল তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। বালীগঞ্জের নন্দী স্ট্রীটের তাঁর ঘরটি আজ বিষাদময় নিঃসঙ্গতা অনুভব করছে। যে ঘরের চারদিকের জানালার ধারে ধারে সাজানো রয়েছে বাঙলার নানা জায়গা থেকে আনা পোড়ামাটির কারুকার্যের ভগ্ন অংশ। অসংখ্য মন্দিরের ছবি অসাধারণ যত্নের সংগে রক্ষিত হয়ে আছে আলমারীর থাকে থাকে—আর আছে অসংখ্য বই যার মধ্যে তিনি মগ্ন থাকতেন বেশীর ভাগ সময়। আজ ভারততত্ত্ববিদ মন্দিরপ্রেমী এই 'বাঙালী'র অকাল মৃত্যুতে অগণিত বন্ধু বিষাদে মগ্ন—বঙ্গভারতী ম্রিয়মানা।

ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট

নির্মল সরকার

টেবিলের তলা থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা তুলে কমলেশবাবু সেটা ওপরে রাখলেন। কাজটা কেন যে তিনি করলেন তা তিনি নিজেই জানেন না। পায়ের কাছে যে জিনিসটা এতদিন পড়েছিল সেটা হঠাৎ ওপরে তোলার কোন কারণ ছিল না। তবুও তিনি সেটা তুললেন এবং টেবিলের ওপর রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

জিনিসটা টিনের তৈরী—বেশ মজবুত ধরনের। সাধারণতঃ যেসব বাস্কেট বেতের বা ঐ ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরী এটি সেরকম নয়। সেই কারণেই ওটা এতদিন ধরে তাকে কাজ দিয়ে এসেছে। ওপরের দিকটা চওড়া—তলার দিকটা অপেক্ষাকৃত সরু। এককালে ওটার গায়ে সবুজ রং ছিল এখন কয়েক জায়গায় রং চটে গিয়ে মরচে ধরেছে।

কমলেশবাবুর মনে পড়ল এটা তিনিই কিনে এনেছিলেন চাঁদনীচক থেকে। ঠিক কতদিন আগে তা অবশ্য তাঁর মনে নেই—কিন্তু অনেকদিন আগে। অনেকদিন আগে বোধ—ওটা তখন নতুন ছিল, চকচকে নতুন।

ওটা দেখে সকলেই খুশী হয়েছিল বলে কমলেশবাবুর মনে পড়ল। তাঁর স্ত্রী হেমলতা ওটার খুব তারিফ করেছিল। তাঁর মেয়ে মিন্টুর বয়স তখন কত? বোধহয় দশ কিংবা এগারো। ওটা নিয়ে সে বসে গেল ওর ওপরে ছবি আঁকতে—ছবিগুলো অবশ্য মুছে গিয়েছিল সংগে সংগে। কি এঁকেছিল মিন্টু? সাপ, ব্যাঙ না পুতুল? না, মনে পড়ছে না কমলেশবাবুর—সাপ, ব্যাঙ বা পুতুলের কথাই বা ভাবলেন কেন তিনি? অল্পবয়সে এগুলোই কি ওদের ভাল লাগে? বড় হয়ে মিন্টু আর ওসব কথা ভাবেনি কোনদিন নিশ্চয়। তাছাড়া ওটাতো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট—ওর কথা ভাবতেই বা কার বয়ে গেছে।

একটা টিনের বাক্স বই তো নয়। কিন্তু বিস্কুট বা লজেন্সের কাগজের বাক্সর মতো এটা ফেলেও দেওয়া হয়নি। পায়ের কাছে ওটা তার স্থান সংকুলান করে নিয়েছে। ওরও কিন্তু প্রয়োজন আছে। একবার ওটা কোথায় যেন নতুন চাকরটা তুলে রেখেছিল। অনেক অসুবিধা হয়েছিল সেই তাকে সমস্তটা কর মাসে। হেমলতা চুল বাঁধার পর চিরুনী পরিষ্কার করে তাতে ফেলতে পারেনি, মিন্টু ছবি আঁকা টুকরো কাগজগুলো ছড়িয়ে রেখেছিল মেঝের ওপর—আর কমলেশবাবুর তো কথাই নেই। অনেক বদ অভ্যাস আছে তাঁর—কাগজছাড়া সিগারেটের টুকরো, দেশলাই কাঠি ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস তিনি এই ছোট গহ্বরটার মধ্যে নিক্ষেপ করে থাকেন। একবার জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ফেলে প্রায় লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন বলে মনে পড়ল তাঁর: নেহাৎ ওটা টিনের, অন্য কোন জিনিস দিয়ে তৈরী নয় তাই সেবার অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গিয়েছিল সবাই।

একগাদা কাগজের টুকরো, খালি সিগারেটের প্যাকেট, পোড়া সিগারেটের টুকরো আর দেশলাই কাঠি সমেত ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা তুলে টেবিলের ওপর রাখতে দ্বিধাবোধ করলেন না কমলেশবাবু। ওটা এতদিন পায়ের তলায় থেকেও নির্বিবাদে আবর্জনার বোঝা বুকে ধরে চুপ করে অন্ধকারে মিশিয়েছিল। সহনশীলতার প্রতিমূর্তি যেন ওটা। ওর মধ্যে একটা কাপড়ের ফালি দেখতে পেলেন কমলেশবাবু। হঠাৎ মনে হল এদিক দিয়ে ওই কাপড়ের ফালিটারও সহনশীলতার প্রশংসা করতে

হয়। তুলো ধুনে তার আঁশ বার করে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতো তৈরী, তারপর অজস্র চাপের মধ্যে যাওয়াআসা করে কাপড় বোনা। এতেও কিন্তু শেষ হল না, এরপর মানুষের দেহে ওঠার আগে অনেক কাটা-ছেঁড়া, তারপর যতদিন আয়ু ততদিন ধোপার পাটে আছাড়ের পর আছাড় খাওয়া। আর অবশেষে একটা ফালির আকার নিয়ে আর একটা হতভাগ্যের কাছে আশ্রয় নেওয়া! কোথায় যেন একটা অদ্ভূত মিল রয়েছে বলে মনে হল কমলেশবাবুর।

কমলেশবাবু যখন তন্ময় হয়ে মরচে পড়া, রং ওঠা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তখন গাড়ীটা এসে দরজায় দাঁড়াল। মিন্টুর গাড়ীর আওয়াজ তাঁর কাছে খুবই পরিচিত। তাছাড়া আরও একটা আওয়াজও এগাড়ীর সঙ্গে তিনি পেয়ে থাকেন—বুমবোর কলকণ্ঠ। বুমবো মিন্টুর তিন বছরের ছেলে।

ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকবার পর কমলেশবাবুর হুঁশ হল। মুখ তুলে তাকাতে লক্ষ্য করলেন, মিন্টু যেন কেমন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাবে কোন বৈচিত্র্য নেই। বুমবোর হাতটা ধরে সে একদৃষ্টে টেবিলে রাখা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—আরে বুমবোবাবু, বললেন কমলেশ, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

—এই আসছি, ছেলের হয়ে উত্তর দিল মিন্টু তারপর এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করে বলল, বাবা তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?

ইদানীং কমলেশবাবুকে একথাটা প্রায়ই শুনতে হচ্ছে। প্রশ্নটা যে কত ডিপ্রেসিং সেটা ওরা বোঝে না বলেই তাঁর ধারণা। মাথা নাড়লেন তিনি। না, তাঁর শরীর ভাল আছে। হৃৎপিন্ড ধুকধুক করছে, চোখে দেখতে পাচ্ছেন, কানে শুনতে পাচ্ছেন; তাছাড়া লিভার তাঁর যথেষ্ট সক্রিয়। কথাটা তিনি রেডিওর বিজ্ঞাপন থেকে প্রায়ই শুনে থাকেন।

—তবে? মিন্টু বাবার দিকে তাকাল জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে।

—তবে কি? এবার একটু ভ্রূকুঞ্চিত হল কমলেশবাবুর।

—তোমায় যেন কেমন মনে হচ্ছে, কিছু হারিয়েছ নাকি? মিন্টু আবার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে তাকাল।

—না, কিছু হারায় নি তো। বুমবো-বাবু তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এগিয়ে এস। আহ্বান জানালেন কমলেশ-বাবু। বুমবো কিন্তু মায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। মিন্টু আর কিছু বলল না, ছেলের হাত ধরে ভেতরের দিকে চলে গেল।

একটু অবাক হলেন কমলেশবাবু। বুমবো তাঁর কাছে এগিয়ে এল না কেন রোজের মতো। মায়ের সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে রইল অমনভাবে। শরীর খারাপ না মেজাজ? মিন্টুই বা অত তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল কেন ছেলেকে নিয়ে? জগদীশের সঙ্গে ঝগড়া করেছে? শরীর খারাপ? ওয়ান-টু-থ্রি—টুং টুং—না উত্তর দিতে পারলেন না কমলেশবাবু। আই কিউ, বিয়ো নর্মাল? কথাগুলো মনে ভেবে মাথা নাড়লেন তিনি।

হেমলতা সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়ে-ছিলেন। সস্নেহে তিনি মেয়ে আর নাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, জগদীশ আসল না?

——না, ওর কোথায় যেন কাজ আছে। আচ্ছা মা বাবার কি হয়েছে?

—হবে আবার কি? এই তো চা খেয়ে ওঘরে গেল; তোর সঙ্গে দেখা হয়নি?

—হয়েছে, তবে কেমন যেন অন্যমনস্ক বলে মনে হল।

—সে তো চিরকালই, ও আর নতুন কি—মুখ ঘোরালেন হেমলতা।

—দেখলুম টেবিলের ওপর ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে।

—রিটায়ার করার পর ওইরকম সব আজগুবি খেয়াল হয়েছে। সেদিন দেখি গুদামঘরের চাবি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে-ছিল ভেতরে।

—গুদামঘরে কি আছে? জিজ্ঞেস করল মিন্টু।

—কি আবার থাকবে—ভাঙাচোরা কাঠ-কাঠরা, টিন, ক্যানেস্তারা এইসব আর কি।

—বাবার বোধহয় শরীর খারাপ হয়েছে, মিন্টু বলল।

—শরীর নয়, মেজাজ খারাপ। মাস গেলে মাইনের টাকাটা পাচ্ছে না। তাই ওই-রকম করে বেড়াচ্ছে।

—বাইরে যায় না? বন্ধুবান্ধবদের তো খুব পছন্দ করত।

—এখন আর অফিসের কারুর কথা বলেই না। নরেনবাবু, সন্তোষবাবু ওদের সঙ্গে যে অত দহরমমহরম ছিল, এখন ভুলেও আর ওদের নাম পর্যন্ত উত্থাপন করে না। তবে সেদিন দেখলুম বরেনবাবুকে একটা চিঠি লিখছে।

—কে বরেনবাবু?

—ছোটবেলার বন্ধু। আমি দেখিনি কখনও কিন্তু—কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন হেমলতা।

—কি ভাবছ মা? মিন্টু তাকাল মায়ের দিকে।

—ভাবছি, আমি আগে যেন শুনে-ছিলুম বরেনবাবু মারা গেছে।

—তাহলে বাবা বরেনবাবুকে চিঠি লিখছে মানে—বিস্মিত হল মিন্টু।

—তাই ভাবছি; সে যাক, বুমবো খেয়ে এসেছে নাকি?

—না, ও এখানে খাবে। কথাটা শুনে খুশী হলেন হেমলতা। মন থেকে আগের দুর্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেল।

খেতে বসে বুমবো হঠাৎ প্রশ্ন করল, মা দাদুর কি হয়েছে?

—কি আবার হবে, কিছু নয়, তুমি খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। আর একটু বড় হাঁ কর—সোনা ছেলে।

—মা, আবার ডাকল বুমবো।

—কি।

—দাদু ওটা নিয়ে কি করছিল?

—কোন্‌টা?

—ওই যে, ময়লা ফেলা হয় যাতে সেইটা—একটা হাত তুলে বোঝাতে চেষ্টা করল বুমবো।

—দেখছিল হয়ত, নাও দুধটা খাও এবার।

—কি দেখছিল দাদু, ওটা তো ময়লা ফেলা বাক্স।

—হ্যাঁ, মানে কিছু খুঁজছিল বোধহয়—যা হোক একটা উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গটা বন্ধ করতে চাইল মিন্টু।

কমলেশবাবু সত্যিই খুঁজছিলেন।

অবশ্য কি খুঁজছিলেন তা এখন আর তিনি মনে করতে পারছেন না। তবে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা টেবিলে তোলার আগে তিনি কি যেন ভাবছিলেন। মিন্টুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে পড়ে সেটা তলিয়ে গেছে যেন কোথায়! বরেনকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু সেটা পোস্ট করা হয়েছিল কিনা সেটা আর মনে পড়ছে না। সেই চিঠিটা হয়ত ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকবেন কিন্তু আব-র্জনার মধ্যে বরেনের চিঠি খুঁজে পাবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে এবার। অবশ্য কমলেশবাবু আর একটা চিঠি বরেনকে লিখতে পারেন কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে তার ঠিকানাটাই তিনি মনে করতে পারছেন না। শৈশবের বন্ধু বরেন—মধুবনীর বরেন। কি আবেগ আর আনন্দ ছিল সেই বন্ধুত্বের মধ্যে। বনে বনে ঘুরে বুনো কুল খাওয়া আর প্রজাপতি ধরার জন্যে আকুল হয়ে ছুটোছুটি......

—তুই আমার নাম ধরে ডাক, দেখ কেমন প্রতিধ্বনি হয়—বলেছিল বরেন। কমলেশ চীৎকার করে ডেকেছিলেন...... বরেন—বরেন।

প্রতিধ্বনি শুধু ফিরিয়ে দিয়েছিল রেন—রেন। তাকে যখন বরেন ডেকেছিল তখন শোনা গিয়েছিল শুধু লেশ—লেশ। দুই বন্ধু খুব হাসাহাসি করেছিল এ নিয়ে........।

বরেনকে তাঁর দরকার। মধুবনীতে আবার তিনি ফিরে যাবেন। সেই ছায়াঘেরা গ্রামের নির্জন দুপুরের মধুর স্বাদ কমলেশবাবু আবার অনুভব করলেন যেন।

ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্য থেকে একটা টুকরো কাগজ তুললেন তিনি।

বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের একাংশ—যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর......

—মেয়ের সম্বন্ধ খ‍ুঁজছ? হেমলতা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে।

—মিন্টুর বিয়ে, এর মধ্যে? অবাক হয়ে তাকান কমলেশবাবু।

—বয়স কত হয়েছে তার হিসেব রাখ?

হ্যাঁ, তা রাখি তবে আজকাল আরও বড় বয়সে বিয়ে হচ্ছে।

—তাহ'লে মেয়েকে খুবড়ো করে ঘরে রেখে দাও—এবার ঝংকার তুললেন হেমলতা।

—কি মুস্কিল, অন্ততঃ এম-এটা পাশ করুক—উত্তর দিলেন কমলেশবাবু।

—কেন, ও কি মাস্টারী করবে নাকি?

বেহাগ বাজছিল সানাইয়ে। বিয়ে বাড়ীর কোলাহল, উলুধ্বনি আর ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন মিন্টু হারিয়ে গেল।

ঝন ঝন করে ফোনটা বেজে উঠল অকস্মাৎ। কমলেশবাবু শব্দটা শুনে চমকে উঠেছেন। ফোনটা ধীরেসুস্থে তুলে কানে দিলেন তিনি।

—হ্যালো, আমি সন্তোষ কথা বলছি, আওয়াজ এল অপরদিক থেকে।

—কে সন্তোষ? জিজ্ঞেস করলেন কমলেশবাবু অবাক হয়ে।

—অফিসের সন্তোষ সেনগুপ্ত, এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

—ও, হ্যাঁ, কেমন আছ? জিজ্ঞেস করলেন কমলেশবাবু।

—আমি তো ভালই কিন্তু তোমার সাড়াশব্দ নেই কেন?

—ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম তাই—

—কেন হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন, বাড়ীর খবর সব ভাল তো?

হ্যাঁ ভাল, ওদিক দিয়ে অসুবিধে কিছু নেই। আমি একটা জিনিস খুঁজছি। কোথায় যে হারালো বুঝতে পারছি না।

—কি জিনিস, টাকাকড়ি না গয়নাগাটি?

—না, ওসব কিছু নয়।

—তাহলে অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে?

চিঠিটা ভুলে কোথাও ফেলে দিয়েছি কিনা বুঝতে পারছি না—তাই খুঁজছি।

—কি একটা চিঠি হারিয়েছে বলে তুমি আমাদের একেবারে ভুলে গেলে—ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন সন্তোষবাবু।

—না না, ওটা আমার ভয়ানক দরকার—না হলে চলবেই না। আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা কইব, এখন ছেড়ে দিচ্ছি। ছিন্ন হল সম্পর্ক।

কিছুদিন আগে কমলেশবাবু জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। [illegible] মেথর ঝাড়ুদার সবাই কাজে বেরিয়েছে। রাস্তার নর্দমা বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করছে একটা লোক। আবর্জনা জমা করে রাখছে সে এক এক জায়গায়। ঠেলাগাড়ী নিয়ে অপর একজন সেগুলো তুলে নিয়ে জমা করছে ডাস্টবিনের কাছে। ডাস্টবিন অনেক আগেই ভরে গিয়েছে। আবর্জনা স্তূপাকার হয়ে ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। দৃশ্যটা কমলেশবাবুকে মুগ্ধ করেছিল। অনুভূতিটা সম্প্রতি তাঁর মনে যেন শিকড় গেড়েছে। এর আগে তিনি ডাস্টবিনের অনেকদূর দিয়ে নাকে কাপড় চেপে চলে যেতেন। পারতপক্ষে আবর্জনার দিকে তাকাতেন না। এটাই স্বাভাবিক বলে তিনি জানতেন কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে এই অদ্ভুত পরিবর্তন কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঘটেছে কেন তিনি তা বুঝতেও পারেন নি। এখন তিনি এসব দেখতে চান ভাল করে। একটা বিরাট কাজ সকলের অগোচরে নিঃশব্দে এটা অনুভব করে কমলেশবাবু অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল এর একটা যেন বিশিষ্ট আবেদন আছে, অপ্রকাশিত একটা অর্থ লুকিয়ে আছে কোথায়।

অফিসের ফেরৎ কমলেশবাবুর জামাই জগদীশ যখন মিন্টু ও বুমবোকে নিতে এল তখন হেমলতা এবং মিন্টু সবিস্তারে ঘটনাটি তার কাছে পেশ করল। জগদীশের বুঝতে দেরী হল না যে শ্বশুরমশাই ডিপ্রেসানে ভুগছেন। কথাটা শুনে মিন্টু যেন একটু চিন্তিত হল। বলল—তাহলে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে ডাকা হোক।

—সে আবার কে? জিজ্ঞেস করলেন হেমলতা। কথাটা তিনি এই প্রথম শুনলেন। জগদীশ ব্যাপার বুঝিয়ে দিতে তিনি একটু ভেবে বললেন—পেনসন পেয়ে একটু ভেঙে পড়েছে হয়তো, তাছাড়া অন্য কোন কিছু অসুবিধে নেই। ঘুমও হচ্ছে, খাওয়াদাওয়াও চলছে রীতিমত।

—না, মা, আমার মনে হয় একজন কাউকে দেখানো দরকার। তাই ঠিক হল।

নীচে নেমে ওরা দেখল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা তখনও টেবিলের ওপর রয়েছে আর কমলেশবাবু সেটা দুহাতে জড়িয়ে বুকের কাছে ধরে আছেন।

বাঙলার মন্দির

পঞ্চানন রায়
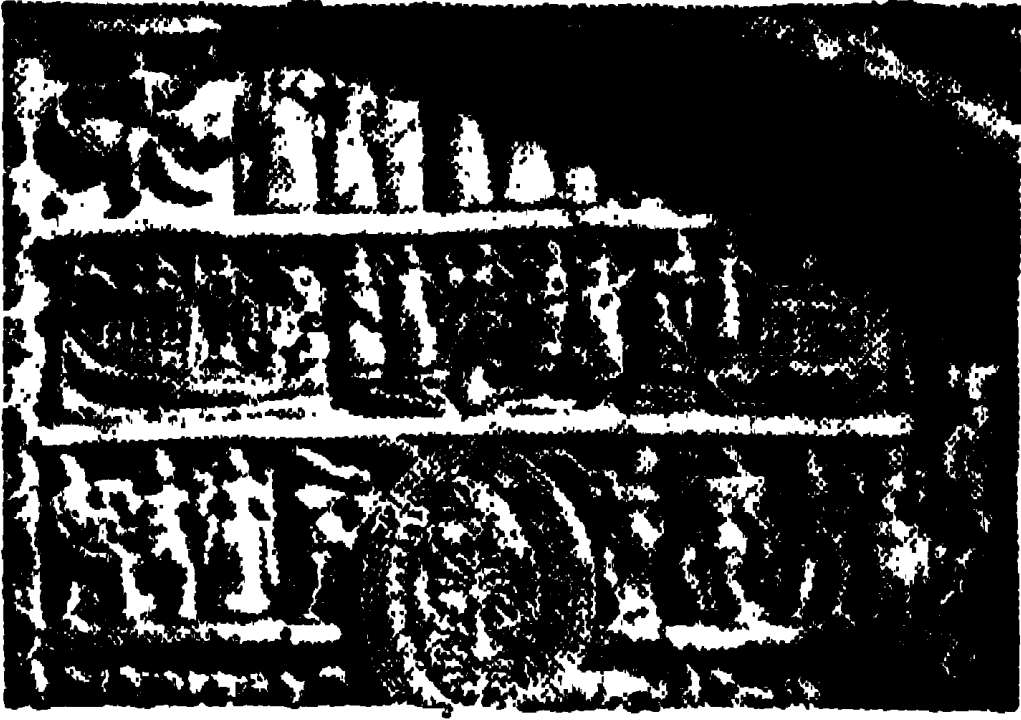
বাঙলার মন্দিরশৈলী ও চালামন্দির সম্পর্কে আগের প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। মন্দির নির্মাণে বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতির মধ্যে পড়ে দোচালা, যোড়্‌বাংলা চারচালা, আটচালা, বারোচালা। চাঁদনী ও শিবতল চাঁদনীও পড়ে নিজস্ব শৈলীর মধ্যে। এই নিজস্ব শৈলীর মন্দির-গুলিতে বাঙালী তার মৌলিকত্ব দেখিয়েছে। স্বর্গের দেবতার জন্যে সে তৈরী করেছে ঘর, নিজের চালাঘরের অনুকরণে। আজও বাঙলার অনেক স্থানে এই চালামন্দিরশিল্পের অনুকরণ করে চলেছেন বাঙলার মন্দিরশিল্পীরা। ভগবান রামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে গৃহদেবতা রঘুবীরের জন্যে একটি চালা-ঘরের আকারের মন্দির শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিমন্দিরের পাশেই বিরাজমান। এছাড়া শান্তিপুর ও অন্যান্য স্থানেও এধরনের চালামন্দির তৈরীর কাজ চলছে দেখে প্রাচীন বাঙলার মন্দির তৈরীর নিজস্ব পদ্ধতির কথা মনে পড়ে যায়। এধরনের মন্দিরে বহুচূড় ও বহুতলবিশিষ্ট মন্দিরের তুলনায় কম জাঁকজমক থাকলেও এগুলি যে বাঙালীশিল্পীর এক বিশেষ মানসিকতা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মন্দিরশিল্পের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে বাঙলার এই চালামন্দিরের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

মন্দিরশিল্পে বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতির মধ্যে চাঁদনী ও শিবতল চাঁদনী হল অন্যতম। সমতল ছাদযুক্ত সাধারণ অট্টালিকা শ্রেণীর মন্দিরের নাম চাঁদনী। ছাদগুলি প্রধানত খিলানে গঠিত। মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল রাজবাড়ীর বহু কক্ষে এধরনের খিলানের ছাদ আছে। অনুমান করা যায় প্রাচীনকালে অনেক প্রাসাদের ছাদ খিলানেই তৈরী হত। কোন কোন বংশে কড়িকাঠ ব্যবহার চলিত না থাকায় ফলেও ছাদ খিলানে গঠন করতে হত। সাধারণত পারিবারিক দেবতার মন্দিরগুলি এই ধরনের—মন্দিরগুহের অলিন্দে দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্ধ স্তম্ভ থাকে। এদের খিলান তিনটি দুটি স্তম্ভের মাঝে মাঝে বর্তমান। এ শ্রেণীর বৃহৎ [illegible]

মিশ্ররীতি ও অন্যান্যপ্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী স্তম্ভের সংখ্যা বেশী। আমাদের জানা এ শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে দাসপুর থানার (মেদিনীপুর জেলা) মহল্য কৃষ্ণীরায় (রামকৃষ্ণপুরে) অধিকারীদের 'গোকুল-বৃন্দাবন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 'বৃন্দাবনচন্দ্র মুরারিমোহন জীউর চাঁদনী বাং সন ১১১১ সালে প্রতিষ্ঠিত। মনে হয় চাঁদনী-মন্দির শ্রেণীর মধ্যে এটি সর্বপ্রাচীন। এ শ্রেণীর মন্দিরের ছাদের সম্মুখদিকে দ্বারের উর্ধ্বে কলসীর ওপর বিষ্ণুচক্রাদি থাকে। মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলের কাছাকাছি সামাটগ্রামে মদনগোপাল জীউর মন্দির বেশ বড়ো। এ শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বোধহয় এটি বৃহত্তম।

এপর্যন্ত বাঙলার মন্দিরের নিজস্ব শৈলীর কথা বলা হল। এছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে যেগুলিকে মিশ্র শ্রেণীর অন্তর্গত করতে হয়। এ শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে একরত্ন বা আলগোছটৌংগী সম্ভবত আদিম ও সর্বপ্রাচীন। এ রীতি সারনাথের ধামেকা স্তূপ অথবা কাশ্মীরের শঙ্করাচার্য মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। আলগোছটৌংগীর তাৎপর্য হল, একটি চাঁদনী মন্দিরে যেন আলগোছে একটি টৌংগী বা চূড়া বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিত্তির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। একজন্যে এধরনের মন্দিরের নাম এরূপ হয়েছে। ঐ চূড়াগুলি বহু খাঁজযুক্ত দেউল কিংবা ছত্রাকার হয়। ওপরে কলস ও বিষ্ণুচক্রাদি থাকে। বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর মন্দির এ শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীনতম বলে মনে হয়। ৯২৮ মল্লাব্দে বা ইংরেজী ১৬২২ খৃষ্টাব্দে রাজা বীরসিংহ তৈরী করেন এ মন্দির। লিপির একাংশে কাল-সূচক বাক্যটি হল 'বসুকরনবগণিতে মল্লাব্দে', অর্থাৎ বসু—৮, কর—২, নব—৯। ডানদিক থেকে পড়লে ৯২৮ মল্লাব্দ হয়। দ্বারশীর্ষে লিপির নীচে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটি হাতী ও পাশে নারীমূর্তি। বাঁশ-বেড়িয়ার রাজা রামেশ্বর দত্তের এ শ্রেণীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১৬০১ শকে বা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে। কালসূচক অংশটি হল, "মহীব্যোমাঙ্গসিতাংশুগণিতে শকবৎসরে" অর্থাৎ মহী—১ ব্যোম—০ অঙ্গ—৬ সিতাংশু—১ বা ১৬০১ শকাব্দ।

রাজা শোভা সিংহের দেওয়ান বলরাম চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত আলগোছটৌংগী মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল : সন ১১০৬ সাল। এতে পূর্ণাঙ্গ টেরাকোটা ফিরতন ছিল। মন্দিরটি [illegible]

মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে 'বলরাম চৌধুরীর মন্দির স্থাপিত হয়েছিল বাং ১১০৬ সালে বা ইং ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে। বলরাম চৌধুরী চেতুয়া বরদার বিদ্রোহী জমিদার রাজা শোভা সিংহের দেওয়ান ছিলেন। আজও দাসপুরে প্রায়-লুপ্ত গড়খাই পরিবেষ্টিত তাঁর বাস্তব চিহ্ন পাওয়া যায়। বলরামের এ মন্দিরটি আজ মহাকালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে। (পূর্বে গৃহীত এর একটি আলোকচিত্র এপ্রসঙ্গে দেওয়া হল)

একরত্ন বা আলগোছটৌংগী শ্রেণীর মন্দির আজও দেখতে পাওয়া যায় ভাগীরথী তীরের বহুস্থানে, বিষ্ণুপুরে, মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি কর্ণগড়ে, দাসপুর থানার বহুগ্রামে, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে হাওড়ার গড়ভবানীপুরে (ভুরশিটরাজ প্রতাপনারায়ণ স্থাপিত) ও জলপাইগুড়িতে ('জল্পেশ্বর মন্দির')। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে দোতলায় উঠবার সিঁড়িও আছে।

মিশ্ররীতির অন্যান্য ভাগ হল, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন প্রভৃতি। পাঁচটি রত্ন নিয়ে হয় পঞ্চরত্নমন্দির, নয়টি

চেঁচুয়ায় (মেদিনীপুর জেলা) রাধা-গোবিন্দের মন্দির, স্থাপিত ১০৮৮ সাল ইং ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ।

সন ১২৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত সুরেশ-পুরের পঞ্চরত্নমন্দির (জে বদ্যনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত) সম্মুখে লেখক দন্ডায়মান।

চূড়া নিয়ে হয় নবরত্ন। এভাবে যাদশ সংখ্যাযুক্ত চূড়া বা রত্ন থাকবে তাদশ সংখ্যাবিশিষ্ট রত্নমন্দির হবে। অবশ্য পাঁচ কি নয়টি চূড়া থাকলেই চলবে না, মন্দির নির্দিষ্ট তলযুক্তও হওয়া চাই। দাসপুর থানার চেঁচুয়া-গোবিন্দনগর গ্রামের গোস্বামীদের রাধাগোবিন্দের মন্দির পঞ্চচূড় মন্দিরের মধ্যে বেশ প্রাচীন। এর প্রতিষ্ঠাকাল হল বাং ১০৮৮ সাল, ১৫ই মাঘ অর্থাৎ ইংরেজী ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ। পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলি দ্বিতল। অনেকগুলিতে ওপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। বিষ্ণুপুর দরবারে শ্যামচাঁদ রায়ের পঞ্চরত্ন বাংলাদেশে এ শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মন্দিরের ভেতর, বাইর ও সিঁড়ির সর্বত্রই পুত্তলিকার সমারোহ। এ মন্দিরে মল্লরাজ বীর হাম্বীর রঘুনাথ ও বীরসিংহের নাম যুক্ত আছে। মন্দিরটির শিল্পী হলেন, "শ্রীশ্যামরায়শরণ বিষ্ণুদাস"। নির্মাণকাল ৯৪৯ মল্লাব্দ বা ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ।

ঘাটাল মহকুমার রাধানগর নবগ্রামে গোপীনাথের বিচিত্র পঞ্চরত্ন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ১৬৪০ শকে বা ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে। লিপির কালসূচক অংশটি হল, "খবেদরসসংযুক্ত শাকে চৈব নিশাপতৌ," অর্থাৎ খ(আকাশ)—০ বেদ—৪ রস—৬ নিশাপতি (চন্দ্র)—১ বা ১৬৪০ শকাব্দ। দাসপুর থানার চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামের মুক্তারাম ভট্টাচার্য পঞ্চরত্ন মন্দিরটি তৈরী করান। ১৭২৩ শতাব্দে বা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। মন্দিরটি এখন ভূমিসাৎ হয়েছে। মন্দিরটির লিপির একটু অংশ হল "দহনযমনগন্দৌ" ইত্যাদি। এ দুটি মন্দিরেই কোন পুত্তলিকা নেই। মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, সুরতপুর-গুড়লি ও নাড়াজোলে পঞ্চরত্ন শ্রেণীর আরও মন্দির আছে। প্রথম চারটি স্থানের মন্দিরগুলিতে বহু পুত্তলিকা দেখা যায়। শেষোক্ত স্থান দুটির মন্দির প্রাচীন। সুরতপুরের হাজারীদের মন্দির ১৬৭৭ শকাব্দে বা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

নবরত্ন মন্দিরের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল দিনাজপুরের (বর্তমান বাংলাদেশে) অন্তর্গত কান্তনগরের শ্রীশ্রীকান্তনাথের মন্দির। এটির নির্মাণকাল হল ১৩৭৪ শকাব্দ বা ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ। কালসূচক অংশটি হল, "শাকে বেদাব্ধিকালক্ষিতি-পরিগণিতে" অর্থাৎ বেদ—৪ অব্ধি (সমুদ্র)—৭ কাল—৩ ক্ষিতি—১ বা ১৩৭৪ শকাব্দ। নবরত্ন মন্দিরের মধ্যে নানাদিক থেকে এটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। এর একটি দারুময় প্রতিরূপ কলকাতার যাদুঘরে আছে। মন্দিরটির দুদিকের দেওয়াল পুত্তলিকামণ্ডিত। কলকাতার প্রাচীন জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন উচ্চতায় শহীদ মিনারকেও ছাড়িয়ে যেত। এ মন্দিরটির ছবি ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধে আছে। মেদিনীপুরের নাড়াজোল-রাজবাড়ীর গোবিন্দ জীউর মন্দিরের সম্মুখের দেওয়ালের আটচল্লিশটি খোপে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত পুত্তলিকা আছে। টালিগঞ্জের রামনাথ মণ্ডলের নবরত্ন ১৭১৩ শকে নির্মিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য এরই আদর্শে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির নির্মিত হয়। ঘাটাল মহকুমার নিমতলা রাণাপুরে তাঁতিদের ও ঘাটালের গোস্বামীদের নবরত্ন মন্দিরদ্বয় সঠাম ও পুত্তলিকাবহুল। বীরভূমে জয়দেব-কেঁদুলির নবরত্ন মন্দিরের সম্মুখভাগে আঠারো হাত দুর্গার পুত্তলিকা আছে। কলকাতার শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের ঠাকুরবাড়ীর নবরত্নে মিশরীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়। মণ্ডপে দুর্গাপুজার সময়ে এতে দেবতা থাকেন। মণ্ডপটি বহু প্রাচীন চিত্রশোভিত। নবরত্ন শ্রেণীর মন্দির ত্রিতল।

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বর মন্দির ত্রয়োদশরত্ন। এ মন্দিরটির স্থাপত্যরীতি নতুন। ১৭৩৬ শকাব্দ বা ইং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়। কাল-সূচক অংশটি হল, "শাকাব্দে রসবহ্নিমৈত্র-গণিতে" ইত্যাদি। মন্দিরটি চতুস্তলযুক্ত। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার খড়ারেও চতুস্তল ত্রয়োদশ রত্ন মন্দির আছে। এ মন্দিরের লিপিটি নিচে উদ্ধৃত করা হল :

"শ্রীশ্রীসীতারাম জীউ। শকাব্দা ১৭৮৬। ১১।২৪ শ্রীব্রজলাল মাজি সাং উদয়গঞ্জ পং বরদা। গঠনকারী শ্রীকার্তিক-চন্দ্র মিস্ত্রী ও শ্রীমাহিন্দনাথ মিস্ত্রি সাং

মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামের ইসলামীয় রীতির একটি মন্দির ঐ গ্রামের গুলাব দত্তের প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির চূড়া মসজিদের গম্বুজের ন্যায়।

আজুড়িয়ার বৈদেশিক শ্রেণীর দেউল মন্দির। সম্মুখভাগে লেখক দণ্ডায়মান।

সেনহাটি পং জাহানাবাদ সন ১২৭১ সাল ২৪ চৈত্র।"

মন্দিরটিতে ষড়ভুজ হয়গ্রীব, বন্ধ-স্থানে জগন্নাথ ও খোপে খোপে পুত্তলিকা আছে। কবাটে দেবদেবী মূর্তি ক্ষোদিত।

ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণায় সতেরো চূড়ার মন্দির আছে। নিয়মানুযায়ী এ মন্দিরের পঞ্চতল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটি হল ত্রিতল এবং এর ওপরের দুটি তলেই সব কটি চূড়া আছে।

একুশ রত্নমন্দির পদ্মাতীরে (বাংলা-দেশ) রাজনগর গ্রামে রাজা রাজবল্লভের রাজধানীতে ছিল। এখন তা লুপ্ত। মন্দিরটি ছিল ষট্তল। এটি ও রাজনগরকে ধ্বংস করে পদ্মার বিশেষ নাম কীর্তিনাশা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলের রাসমঞ্চের চূড়া পঁচিশটি কিন্তু উহাও ত্রিতল, উপরের দুটি তলেই সব কটি চূড়া আছে (১২+১৩)

বর্তমান যুগেও নবরত্ন মন্দির কয়েকটি তৈরী হয়েছে, তবে এদের ওপরে উঠবার সিঁড়ি নেই। রত্নগুলির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। কোন খাঁজ, অলংকরণ বা কোণ নেই।

সকলের থেকে প্রাচীন মন্দিরগুলি হল উৎকলীয় দেউল। জটা, বরাকর বক্রেশ্বর, চন্দ্রকোণা, কর্ণগড়, এগরা খার্জা, গড়বেতা, তমলুক ঢেকুর, বিষ্ণুপুর দরবার প্রভৃতি স্থানে খাঁটি উৎকলীয় রীতির দেউল আছে। অন্যত্র ঐ ঢংয়ের যে দেউলগুলি আছে সেগুলি বাঙালী শিল্পীদের হাতে কিছুটা পরিবর্তিত রূপ পেয়েছে। সম্প্রতি কলকাতায় কয়েকটি উৎকলীয় দেউল নির্মিত হয়েছে। পদ্মার তীরে রাজা কেদার রায়ের মাতার দেউল সমাধিমন্দির ছিল। পদ্মার ভাঙনে সেটি ধ্বংস হলেও 'প্রবাসী'—পত্রিকায় তার ছবি বের হয়েছিল বলে সেটির চিত্র পাওয়া সম্ভব। দাসপুরের আজুড়িয়ায় এ শ্রেণীর শীতলামন্দিরে পুত্তলিকা বিন্যাস আছে। মেদিনীপুর শহর ও চিল্কীগড়ে এ শ্রেণীর মন্দিরগুলি উচ্চতায় বেশ বড়। কাঁথির এগরা ও বাহিরির এ শ্রেণীর মন্দিরে ও ঘাটাল দাসপুরের রত্নেশ্বর বাটীর দেউলে লিপি আছে। বর্ধমানের অজয়নদের তীরবর্তী ভুবনেশ্বর গ্রামের উক্ত শিবের ইছাই ঘোষের দেউল প্রায় তেরশ' বছরের পুরানো।

উত্তরভারতীয় বহুচূড় মন্দিরগুলির মধ্যে কলকাতার পুরানো টাঁকশালের কাছাকাছি 'জগন্নাথের মন্দির প্রাচীনতম। এটি বিখ্যাত লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত। তারাসুন্দরীর এ শ্রেণীর সতেরো চূড়ার মন্দির সেবাইত আশুতোষ চক্রবর্তী বাং ১৩০১ সালে ১৬ই চৈত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার বড়বাজার ও মন্দির স্ট্রীটে এ শ্রেণীর দুটি ছোট দেবালয় আছে। মন্দির স্ট্রীটের মন্দিরটিতে লিপি আছে, কিন্তু সেটি হল লুপ্ত কোন প্রাচীন মন্দিরের। নতুন মন্দিরটি কালোড়িয়া পরিবারের দান। বর্ধমান রাজগঞ্জ অঞ্চলের 'রাধাদামোদর জীউর মন্দির দ্বারকার রণছোড়জীর বহুচূড়ের আদর্শে মহান্ত ব্রজমোহন শরণদেব নির্মাণ করান। মেদিনীপুর নাড়াজোলের 'রামচন্দ্র জীউর প্রস্তর মন্দির ১৭৪১ শকাব্দায় নির্মিত ও কতকটা চাঁদনীর মত। নাড়াজোলের দ্বিতীয় রাজা মোহনলাল খাঁন বারাণসীর শিল্পীদের দিয়ে এটি নির্মাণ করান। কলকাতার জৈন-মন্দিরগুলিও বহুচূড়। কালনার (বর্ধমান জেলা) লালজীর মন্দিরে বহু দেউলচূড়া আছে। সম্মুখে চারচালামণ্ডপ ও গিরি-গোবর্ধন।

কলকাতার রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে (বর্তমানে রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে) মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের বাস্তুতে প্রাচীন চকমিলান বাটীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্কটেশ্বর মন্দির দক্ষিণ ভারতীয় রীতির একটি শ্রেষ্ঠ দেবালয়। মন্দিরটি মর্মরে গঠিত। এটির সম্মুখে একটিমাত্র অষ্টতাল গোপুরম্, পৌরাণিক ঘটনার পুত্তলিকা-বিমণ্ডিত। অদ্বৈত মল্লিক লেনের একটি মন্দিরেও এ রীতি প্রকট।

বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের উত্তর-পশ্চিমে খগরো গ্রামে রাজা খগাদিত্য-স্থাপিত 'খগেশ্বরের মন্দির বৌদ্ধরীতির একমাত্র দেবালয় বলে মনে হয়। এটি

বৈকুণ্ঠপুরে অম্বলের চাঁদনী মন্দির, প্রতিষ্ঠার তারিখ শকাব্দ ১৭৬৮ সন ১২৫৩ সাল। এতে হাঁসগলা খিলান ও কলাগেছ্যা থামের ব্যবহার করা হয়েছে। কলাগেছ্যা থামের উল্লেখ হুতোম প্যেঁচার নক্সায় আছে।

দিনাজপুরের (বর্তমান বাংলাদেশের) কান্তনগরের কান্তনাথের নবরত্ন শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুঠাম, পুরানো ও সর্বাঙ্গে পোড়ামাটির কাজ আছে। এর একটি মডেল কলকাতার যাদুঘরে আছে। প্রতিষ্ঠাকাল শকাব্দ ১৩৭৪, ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ।

বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের উত্তর-পশ্চিমে খগড়ো গ্রামে খগেশ্বরের মন্দির। কতকটা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ কিন্তু মাত্র একটি চূড়া। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে পাঁচটি রত্ন বা চূড়া আছে। সিউড়ির ছ'মাইল পশ্চিমে ভাণ্ডীর বনে বিভাণ্ডক ঋষির পূজিত ভাণ্ডেশ্বর ও বক্রেশ্বরের শিবের দেউলেও বৌদ্ধরীতির ছাপ আছে।

কলকাতার রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের গৃহদেবতার মন্দির খৃষ্টীয় গীর্জার অনুরূপ ক্রমসূক্ষ্ম চোরবাগান মুক্তারাম-বাবু স্ট্রীটের মল্লিক পরিবারের নীলমণি মল্লিক তাঁর মাতুলালয় থেকে শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ পেয়ে ইং ১৭৭৫ থেকে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় এ মন্দির স্থাপন করেছিলেন। মন্দিরের বর্তমান রূপ গত শতকের শেষদিকে রাজা রাজেন্দ্র-লাল মল্লিক পরিকল্পনা করেছিলেন। ঝাড়গ্রামে সাবিত্রীমন্দির ও নুনিয়া গ্রামের মন্দিরগুলিও এই শ্রেণীর।

রোমের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের আদর্শে নির্মিত কলকাতা খিদিরপুর ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের মন্দিরটি এ শ্রেণীর নিদর্শন। বাগবাজারের অন্নপূর্ণামন্দিরও অনেকটা অনুরূপ।

ইসলামীয় রীতিতে গঠিত মন্দির-গুলির দুটি শ্রেণী। একটি সমতল ছাদের ওপর নির্মিত গম্বুজ। এ শ্রেণীর মন্দিরের নিদর্শন ভূকৈলাসে ও নুনিয়া গ্রামে আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীটির দেউল ক্রমশ তাজমহলের রূপ নিয়েছে। এধরনের মন্দিরগুলির উপরের দিকে সংখ্যা দেওয়া খাঁজের শ্রেণী। এর একটি নিদর্শন হল চেতুয়া-বাসুদেবপুর গ্রামের (মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানা) গুলাব দত্তের শিবালয়। সম্ভবত সন ১১৭২ সালের কাছাকাছি এটি নির্মিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলার কালনায় কুমার প্রতাপচন্দ্রের মহিষী প্যারীকুমারী ১৭৭২ শক (বাং ১২৫৬ সালে) বা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এ শ্রেণীর একটি শিবালয় সোনা-মুখীর মিস্ত্রী রামহরিকে দিয়ে নির্মাণ করান। বীরভূমেও এ শ্রেণীর দুটি মন্দির আছে।

ঝাড়গ্রামের (পুরানো ঝাড়গ্রাম) রাজ-মাতা শিবলিঙ্গের অনুরূপ একটি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজবংশের গৃহ-দেবতাগণের পঞ্চরত্ন মন্দিরের সর্বাঙ্গ বালা (belt) ভূষিত। ঝাড়গ্রামের কালীমন্দিরও ক্রমসূক্ষ্ম।

উপরের উল্লিখিত রীতির মন্দিরগুলিই বাঙলাদেশে সর্বাধিক দেখা যায়। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আরও বহু মন্দির বাঙলা-দেশে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্ত-র্ভুক্ত যশোহরে ত্রিকোণ কালীমন্দির বর্তমান। ফরিদপুরে বালা-ভূষিত দেউল মন্দির আছে। চট্টগ্রামের নবগ্রহ মন্দির, আদিনাথের মন্দির ও চন্দ্রনাথের মন্দির-গুলির রীতি পৃথক। বাঙলাদেশের কুমিল্লা শহরের জগন্নাথের মন্দির তিনতলা। এর চূড়াগুলি ক্রমসূক্ষ্ম কতকটা বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের ন্যায়। বাঁকুড়ার মল্ল-মহাদেবের মন্দিরটিও বিচিত্র। মধ্যে আমলক বিশিষ্ট প্রাসাদ ও দুপাশে দুটি অর্ধপ্রাসাদ।

বাঙলার এই নানা শ্রেণীর মন্দির নির্মাণে শিল্পীরা যে তাঁদের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির-গুলির গঠন-প্রণালীতে তাঁরা ভারতের তথা বহির্বিশ্বের সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দেব-স্থান নির্মাণের পদ্ধতিকে একান্ত আপন করে নিতে পেরেছিলেন। মন্দির নির্মাণে তাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব কিছুমাত্র যে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাপকও সম্প্রদায়গত মনোভাব ভুলে গিয়ে এসব শিল্পরীতিকে সাদরে বরণ করে নিতেন। এর থেকে প্রাচীন বাঙলার মন্দির-নির্মাতা ও মন্দির-প্রতিষ্ঠাপকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলে।

ছিল না তাতে সন্দেহ নেই।

(এই প্রবন্ধের আলোকচিত্রগুলি ডেভিড ম্যাককাচন কর্তৃক গৃহীত)

পাকবিড়র‍্যার জৈনমন্দির

শান্তি সিংহ

আমরা অনেকে সময় ও সুযোগ পেলে ভুবনেশ্বর - পুরী - কোনারক - অজন্তা-ইলোরার চিহ্ন বা ভগ্নচিহ্ন ধরে অতীতের বুকে চলে যাই। অনেকে সাধ ও সাধ্যের মিল হয় না বলে দুঃখ করে থাকি' কিন্তু আমাদের অতি-পরিচিত 'মুখর দিনের চপলতা মাঝে'-ও যে অতীতের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার খবর আমরা রাখি না।

পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমান্তে পুরুলিয়া নাকি 'সবার নিচে সবার পিছে'। এহেন পুরুলিয়া আমাদের অনেকের কাছে বিশেষ কোন আবেদন জানাতে পারে না। কিন্তু এই পুরুলিয়ারই বহু গ্রামে বা প্রান্তে শিল্প-সংস্কৃতির অতীত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

পুরুলিয়া শহর থেকে মাইল-পঁচিশ দক্ষিণ-পশ্চিমে পাকবিড়র‍্যা গ্রাম জৈন-যুগের সাক্ষী হিসেবে নীরবে অপেক্ষা করছে। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। এ-পাড়াকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'টোলা'। মাহাতো, কর্মকার, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির বাস। গেঁয়ো পথের দুধারে খড়ের চাল। মাটির দেওয়াল। পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন দেওয়ালে দেহাতী মানুষের সরল শিল্প-ভাবনার সুন্দর ছাপ উঠেছে ফুটে।

গ্রামের এক প্রান্তে আশন-বট-মহুয়া-কদম-শিমুল প্রভৃতি গাছে ঘেরা একটি থান। গ্রামের লোকেরা তেল-সিঁদুর মাখিয়ে কালভৈরব বলে জৈন তীর্থংকর-দের পুজো করে। এমনকি মাঝে-মধ্যে বলিদানও হয়।

একটি বড় আশন গাছের তলায় আচ্ছাদনহীন পাথরের দেওয়ালযুক্ত মন্দিরে জৈন তীর্থংকর পদ্মপ্রভের দণ্ডায়মান সুঠামভঙ্গিযুক্ত সুন্দর মূর্তিটি রয়েছে। মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় আট ফুট। এই বড় মূর্তিটির পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের অনেকগুলি (গোটা আটেক) জৈনমূর্তি এবং প্রতিমা সর্বতোভদ্রিকার দুটি মূর্তি আছে।

এই ভগ্ন দেবালয়ের সামনে পাথরের স্তূপওয়ালা আরো তিনটি ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। এইগুলিতে কোন মূর্তি নেই। উচ্চতায় এরা প্রত্যেকে প্রায় ত্রিরিশ ফুটের মত।

এই মন্দিরগুলির সামনে খুব বড় চত্বর। চত্বরটি ঠিক বর্গক্ষেত্রের মতো। এই বর্গক্ষেত্রের চারকোণে চারটি পাথরের ভরাট কলস বসানো আছে। কলসগুলির মুখে কুঁদ দিয়ে পল্লবের নকসা করা হয়েছে।

এই স্থানটির একটু দূরে গ্রামের মাঝে একটা ভাঙ্গা মাটির ঘরের ভিতরে বেশ কিছু জৈনমূর্তি বর্তমানে জড়ো করা আছে। গ্রামের লোকেরা এই জৈনমূর্তি-গুলিকেও কালভৈরব বলে পুজো করে।

'আচারাঙ্গ সূত্র' থেকে জানা যায় যে, মহাবীর সুব্বভূমি, বজ্জভূমি, লাঢ় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। রাঢ়ভূমির পশ্চিমে বর্তমান পুরুলিয়া থেকে পরেশ-নাথ পাহাড় পর্যন্ত অঞ্চল জৈনধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

সরল গ্রামবৃদ্ধদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, বহু মূর্তি ইতিপূর্বে চোরা-ব্যবসায়ী ও শৌখিনবাবুদের দ্বারা অপ-হৃত হয়েছে। এখনও যে মূর্তিগুলি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলিও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। গ্রাম্য পূজারী ব্রাহ্মণের ফুল-বেলপাতা ছাড়া এ-মূর্তি-গুলির যেন বেশী কিছু পাওনা নেই।

সুবর্ণশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(উনচল্লিশ)

কতদিন মেঘুর অদৃষ্টের ওপর পাথরখানা চাপা ছিল তার তার সে ততদিন অনুভব করতে পারে নি। সেটা নেমে যেতে বুঝল যে কি গেল তার মাথার ওপর থেকে। ভারমুক্ত মজুরের অপ্রত্যাশিত পুরস্কার লাভের মতো তার চোখের সামনে শুধু কর্মের সফলতা, জীবনের স্বপ্ন। যেন এক মায়ামৃগ। মায়ামৃগের মতো তাকে কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে তার কিছুই বুঝল না সে। বোঝবারই বা কি এমন আছে? তার দিক থেকে যখন কোন ত্রুটি নেই, কথায় এবং কাজের। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কত কি হতে পারে তা মেঘুর জানা নেই। এত বড় প্রতিষ্ঠানে নানা জাতের, নানা স্বভাবের মানুষের কাছ থেকে যে নানা ভাবের উপদ্রব আসতে পারে তা মেঘুর জানা নেই। সরল মনে সুখশান্তির বীজ সে ছড়িয়ে চলেছে। স্বপ্ন দেখছে তার চারা, ফুল-ফল। সেখানে গরল গাছ! এমন ভাবনা তার মনের রাজপথ দিয়ে আসা-যাওয়া করবার অবসর পায় নি কখনো।

অকস্মাৎ শীতের স্বচ্ছ আকাশ ভেদ করে এল একখানি বজ্র!

বাগানে তখন প্রুনিং-এর কাজ চলেছে। ম্যাক কাজকর্ম দেখে বেড়ায়। কখনো জমাদার, কখনো মুহুরীদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে খবরা-খবর নিয়ে যায়, কখনো বা দু-চারটে কুলির পাশেও গিয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন ম্যাক নিঃশব্দে চা-খেতের গলি ধরে চলেছে চা-গাছের মাথায় মাথায় চোখ বুলিয়ে। কোনটার মাথা ঝোপ সমেত দুলছে শীতের শান্ত হাওয়ায়—কোনটার মাথা কাটা গিয়ে স্থির হয়ে আছে। সর্দার, মুহুরী তৎপর কুলিদের কাজ বুঝে নিতে। তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে কুলিদের পিছনে। একে ছেড়ে ধরছে ওকে। শীতেও গরম লাগে। জমাদারের জামা ভিজে গেছে। প্রায় বোবা হয়ে গেছে ম্যাকের কথার জবাব দিতে দিতে। গাছের ডগায় কাজের ভুলগুলো সাক্ষী দিয়ে তাকে কাঁপিয়ে তুলেছে কাঠগড়ার আসামীর মতো। কোনটার ডগা কলমের মতো হয় নি—ছেতরে গেছে, কোনটার ডগা গেছে ফেটে, কোনটার ডগাগুলো সমানভাবে কাটা পড়ে নি—এক পাশ উঁচু, এক পাশ নিচু। যার ফলে ডগায় 'সুট' দেবে না, ডগা শুখিয়ে যাবে—পাতা তোলার 'লেভেল' রাখবে কোথা? এমন কত কি দোষ হয়ে গেছে কাজে—গাছের ডগায়।

জমাদার হাঁক দেয় মুহুরীকে, মুহুরী ধরে সর্দারকে, সর্দার চোটপাট করে কুলির ওপর—সব হুড়ুম-দুড়ুম কাজ! কোন মতে হাজিরাটা বজায় রেখে পালাবার তাল। ভুল শুধরে তবে ছুটি! নয়তো পয়সা কাটা যাবে, হাজিরা বাদ যাবে!

কুলিরা গরম হয়ে ওঠে—হাতের ওপর, সবল হাতের দুর্বল আঘাতের ওপর, পেটের খিদেটার ওপর, ঘরের মানুষটার ওপর—কেন সে দুটি বেশী ভাতে জল দিয়ে রাখে নি কাল রাত্তিরে। ওমুক-জাদী জানে না? সাহেবের পাল্লায় পড়লে বেলা হেলিয়ে ছাড়বে। যখন তার নিজের পেটে খিল ধরবে তখন তারা ছাড়ান পাবে। সব শেষে রেগে ওঠে লাল মুখটার ওপর—রোজই আসবে হেলতে দুলতে কাজ খতম করে যাবার সময়। কেন! একটু আগে আসতে পারে না বাবু? যখন কাজ শুরু হয়—যখন সাঁই সাঁই করে ছুরি চলে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত, তখন দেখিয়ে দিলে তো আর দোকর খাটুনি হয় না। এখন আর পাঁচ কোপে গাছ শেষ হবার উপায় নেই। একটি একটি ডলা ধরে কলম তুলে দিতে হবে। এখনো নিরিখ শেষ হতে বাকী। ভেবেছিল যাবার পথে সবাই মিলে দুটি মাছ মেরে ঘরে ফিরবে। কদিন ধরেই ভেবে আসছে সুবর্ণশ্রীর জলে বাঁধ দেবে। কিন্তু সাহেবটা! আজও হবে না তা। মনে জেগে ওঠে নিরামিষ গ্রাসের বিস্বাদের স্মৃতি। বিষন্ন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে মন, দগ্ধ দেহের মধ্যে বিকৃত অধৈর্য মন। বাঁ-হাতের মুঠিতে গাছের ডগা, ডান হাতে চোপ। এক কোপে কলম। বিচ্ছিন্ন ডগাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিগবিদিক।

শীতের ইথার উঠল কেঁপে কেঁপে। হঠাৎ ইংরেজী হিন্দী মেশানো একটা বড় নির্ঘোষ—ড্যাম সোয়াইন, শুয়ের কি বাচ্চা!

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে চাইল ইথারের ঢেউ ধরে। একটা ডগা ছিটকে পড়েছে ম্যাকনিজের স্নোয়ার-প্লাসটার ওপর। সেটা চুরমার হয়ে ছিটকে পড়েছে চার পাশের মাটিতে। পঞ্চাশ টাকায় কদিন আগে সেটা গড়িয়ে এনেছে, তার শূন্যেটা উবে গেছে। চক্ষুশূন্যও হতে পারত, নাকের ডগায় যদি না থাকত ঐ স্নোয়ার-প্লাস্টার মতো বাম্পার। একটু ছালও উঠে গেছে। লাল মুখের সেই ক্ষত অংশে দেখা দিয়েছে রক্তের আভা। দিতে হবে কত কি ওষুধের প্রলেপ।

অত কথা ভেবে দেখে কে? পেটের মধ্যে সক্রিয় রাম-রাবণ। বাতাস শ্রান্ত-ক্লান্ত, হার মেনেছে তপ্ত শরীরের ঘাম লেহন করতে না পেরে। সাহেবের মুখ-নিঃসৃত বজ্রে আলোড়িত বাতাস। সেই বজ্র নির্ঘোষিত শব্দে কেউ ভয়ার্ত চকিত, কারো বা ব্যাহত হয়েছে হাতের গতি। আর একটা কোপের সঙ্গে ছুরি সমেত ডান হাতটা উঠে গেছে নিজেরই বাঁ-হাতের ওপর। ফিনকি দিয়ে ছুটেছে রক্ত লোকটার হাত থেকে। মাথায় রাগ, নাকমুখ হোঁস-ফোঁস করে চোখের রোষে। তার ওপর গালি, তারও ওপর অমন আঘাত!

সাহেবের অমন গালি কুলিদের জল-ভাত। কিন্তু সেদিন কাজ করল কিছু বেশী। জলের সঙ্গে ভাতটা পচে বজবজে হয়ে উঠেছে। গালিটা সুদ সমেত ফিরিয়ে দিল লোকটা, বিশেষ করে শেষেরটা।

স্বল্পাহারীর পক্ষে কুলিদের হাতের জল-ভাতটাই অনেক বেশী। তার ওপর অমন পচা বজকানো, উগ্র পুতিগন্ধ তাতে। গর্জন করে উঠল ম্যাক।

—হোল্ড ইয়োর টং, বাস্টার্ড! নইলে—বলে, শর্টের পকেট থেকে ম্যাক বার করল পিস্তল।

সাহেবদের মুখই কামানের সমান। সেটা তাদের বেশ জানা। কিন্তু সেদিনকার সবই বাড়াবাড়ি। সেই কামান যখন পিস্তলের শরণাপন্ন, তখন কুলিরাও জন্ম ডাণ্ডল গোদা পায়ের।

—তবে রে শা!

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়, তৈরীট শ্লোকের মর্মার্থ—হয়তো জানে না, নয়তো ভুলে গেছে। সবাই তা জানে, সবাই ভুলে যায় যখন তার দরকার।

লোকটার হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে ছুরিটা উড়ে গেল ম্যাকের মাথায় টাকটার ওপর দিয়ে। সাহেবের টুপিটা পড়ল মাটিতে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাঁজটা চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা।

—খুন! খুন!

হৈ-হৈ, রৈ-রৈ চারপাশে! এপাশ ওপাশ থেকে দু-চারটে ছুরিও উড়ল আকাশে। কয়েকটা গুলির শব্দও শোনা গেল। তাতে জখম হল কারো হাত, কারো বা পা।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। কোথা দিয়ে কেমন করে কি ঘটে গেল। তার পরই ম্যাকের গাড়ীটা ছুটল।

(চল্লিশ)

সাধারণত তিন বছর অন্তর গর্টক্লিফ একবার বিলেতে যান। সেটা তাঁর ছুটি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় 'বাসম্যানস হলিডে'—অর্থাৎ স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকি যেমন ধান ভানে। বাজেট ও অপরাপর প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সমাধান হয় সেই সময়। কিন্তু তখন এক বিশেষ জরুরী কাজের ডাকে তিনি বিলেতে গেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এমন একটা ঘটনা ঘটল।

বাগানের কাজের ভার উইলিয়ামের হাতে। ঘটনা শুনে ছুটে আসে উইলিয়ামস্, ছুটে আসে মেঘু কুলিদের গরম চোখের সামনে। গরম তাদের দেহ, গরম মন-মেজাজ। দল বেঁধে সব জমা হয়েছে। এর চেয়ে কত বড় ঘটনা ঘটে গেছে। তবুও এতটা হৈ-চৈ পড়েনি। এমন গরম কথা শোনেনি কেউ কুলির মুখ থেকে। ম্যাকের মকুরামী ভেঙ্গে দেবে তারা। তাকে হাজির করতে হবে তাদের সামনে।

উইলি দাঁড়িয়ে আছে মেঘুর পাশে। মাঝে মাঝে মেঘুর কাঁধে হাত রেখে দু-একটা কথাও বলছে। কিন্ত জনতার মধ্য থেকে আসছে যত অসংলগ্ন দাবী। মেঘু চায় আহত লোক ক'টাকে আগে বাগানের হাসপাতালে পাঠাতে, পরে কথা হবে। তা হতে দেবে না, তারা চায় আগে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।

——আন মেকি সাহেবকে! আন—। সমবেত দাবী।

মেঘু জিজ্ঞাসা করে—সাহেবকে পেলে এখন কি করতে চাস তোরা?

তারা জানে, সাহেবকে পাবে না, তাই চায়। পেলে কি করবে বলতে পারে না। শুধু চাই, তাকে চাই। হয়তো জানে—বলতে পারে না, নয়তো পেলে দেখা যাবে। পূর্বাঞ্চলের যে-কোন শহরে গাড়ী চাপা পড়লে যেমন হয়। আহতের প্রাণ বাঁচানো আগে নয়, আগে প্রতিহিংসা। এ দৃশ্যও তেমন। অশ্লীল কিন্ত জনতায় অলংকৃত উল্লাস সে দেখো। হতে পারে সে দেখা ভাবল। শুধু দাবী, কুলির দাবী। সাপের সঙ্গে তখন নেউলও মিলে গেছে। গোত্রও মিলেছে। এমন একতা আর কখনো চোখে পড়ে না। নিজেদের যত দলাদলি সব শিকায় উঠেছে তখন। আহত ভাই, সামনে উন্মত্ত জনতা। তাদের দাবী।

—মনে কর আমি মেকি সাহেব, কি করবি কর। বলে, মেঘু এগিয়ে গেল।

—তুই মেকি সাহেব হলে তোকে পাগলা কুকুরের মতো পিটিয়ে মারতাম। বললে, উন্মত্ত একটা ছোকরা।

এমন একদিন ছিল যখন কুলির মুখের এমন কথা সাহেবের কানে গেলেও কয়েকটা কুকুর তখনি লুটিয়ে পড়ার কথা। অবশ্য তখন অমন ছোকরাও বিরল ছিল। সময়ের সঙ্গে সব বদলে গেছে। ভীরুর সামনে সাহস থাকে অটল, কিন্তু সাহসের মুখোমুখি হলে তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। ব্রিটিশ চারত্র যত উদ্ধতই হোক, সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তা ওঠানামা করে, অথবা তা করতে বাধ্য হয়। এই খবরটা ফাঁস হয়ে তাদের গর্ব ধীরে ধীরে খর্ব হয়ে পড়ে সর্বত্র। তবু কিন্তু ঠাট বজায় রেখে চলে। যতটা পারা যায়। সশস্ত্র প্রহরীরা সচেতন আশে-পাশে। চেয়ে আছে তারা উইলির বিহ্বল চোখের পানে। সন্ত্রস্ত উইলির ভিতরটা দপ্ধে ওঠে রাগের বৈদ্যুতিক সংক্ষোভে। এতখানি স্পর্ধা এদের এল কোথা থেকে! মেঘুর জায়গায় সাহেব থাকলে কি এমন হত! এখনি সে ঢিট করে দিতে পারে সব, কিন্তু গর্টক্লিফের হুকুম নেই। মেঘুই করবে কুলিদের যা-কিছু সমস্যার সমাধান। হুকুমটা দেবার সময় কি বড় সাহেব আজকের মতো একটা পরিস্থিতি, ও তার পরিণাম ভেবে দেখেছেন? কি করবে উইলি! নাঃ, তবুও হুকুম। যুদ্ধবিগ্রহে তো আছেই, সকল কাজেকর্মে ঊর্ধ্বতনের হুকুম মেনে চলাই ব্রিটিশ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ঐখানেই তাদের সকল সাফল্যের চাবিকাঠি। সবাই নেতা হতে যায় না, নেতা একটি। তাদের দেশের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু দুটি মাত্র দল এখন খাড়া আছে। অথচ সমুদ্রের পূর্ব পাড়ের ছোট্ট একটা দেশে আঠারোটি দল।

মেঘু সাহস দেখালো।—তাতেই যদি তোরা খুশী, তবে তাই কর। বলে, মেঘু আরো এগিয়ে গেল।

মূর্খ মেঘুটা করে কি! একবার উইলির পানে ফিরেও তাকায় না, নিজেও বোঝে না কি করবে! এদিকে বড় সাহেবের হুকুমে বাঁধা উইলি। ওদিকে মান যায়। উইলি পিছনে থাকতে পারল না, সেও এগিয়ে চলল মেঘুর সঙ্গে।

এক সর্দার ছেলেটার ওপর গর্জে উঠল—অসভ্য! জানিস না, কার সঙ্গে কি কখন কথা বলতে হয়? [illegible] [illegible], [illegible] নাহি সাঁতা—

আর এক সর্দার এগিয়ে গেল, সর্দারের কথায় শ্লেষ ধরে বললে—বো কি সাঁতা উঁবি পরের কি বাচ্চা! কথার সঙ্গে তার হাতের চোট্টা পড়ল উন্মত্ত ছেলেটার গালে।

পড়ে যায় যায়—কোনমতে টালটা সামলে নিল ছেলেটা। গালে হাত দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। সকলের চক্ষু একটা কিছু পেল লক্ষ্য করবার।

ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে মেঘু সান্ত্বনা দিল। সবাইকে বললে—ওরে, মনে দুঃখ হলে, বা সমষ্টিবন্দেখের উত্তেজনায় অমন অনেক কথা মানুষ বলতে পারে। ওতো ছেলেমানুষ।

উইলি ভাবল—দিল সব নষ্ট করে! বেশ সেম্-সাইডে ঘুরে গিয়েছিল ঘটনাটা।

মেঘুর ওপর গরম হয়ে উঠল সর্দার। বললে—বলতে পারে? তুই তো বেশ! তা বলে এমন বেয়াদপের মতো কথা বলবে? আজ তোকে বলল, কাল সবাইকে বলবে। তুই আদর দিয়ে নষ্ট করে দিলি ছোকরা-গুলোকে।

উইলি অবাক! সাহেবরা তো ভাবেই কুলিরাও তাই বলে!

সর্দারের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে মেঘু বললে—আচ্ছা রে আচ্ছা, আমিই আবার ভাল করে দেব। এখন লোক ক'টাকে হাস-পাতালে নিয়ে যেতে দে। আগে তো চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, পরে শোনা যাবে তোদের কথা।

ছোকরাটার কথা নিয়ে যেন পাইকারী-ভাবে আছাড় খেয়ে পড়েছিল সবাই, কিন্তু মেঘুর কথায় তারা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, এর বিচার চাই, বিচার চাই!

চারপাশ থেকে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই—বিচার চাই!

(একচল্লিশ)

যে শান্তি ও শৃঙ্খলা গর্টক্লিফ্ বাগানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার জন্য তাঁকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। মনে যত কল্পনাই থাক, আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনো তার অপব্যবহার করতে চাননি তিনি। তাঁর মতে অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়ার মধ্যে আসে লোভ। লোভ ও ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর ধাতের বাইরে। তিনি চান মানুষের কর্তব্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে। ভোগ করতে শিখে ভোগ করুক। নিজের বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ বুঝে নিক তার প্রাপ্য। তেমন করে গড়তে চাইলে যুগ কেটে যায়। গঠন যত বড়ই হোক, তা ভাঙ্গা যায় মুহূর্তে। গর্টক্লিফের এতদিনের চেষ্টায় গড়া জিনিস হয় ভাঙ্গল, নয় ভাঙ্গবার পথে এগিয়ে চলল তাঁর অনুপস্থিতিতে। মেঘুর পক্ষে

সেটা মর্মান্তিক বেদনা ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

গুমটির অফিসে মেঘুর কামরায় কুলিরা জমা হয়েছে সেদিনকার ঘটনাটা নিয়ে। অনেক কথা হল—নরম, গরমও। কিন্তু যা তারা বলতে এসেছে, তা বলে না, যা শুনতে চায় তাও শোনে না। মেঘুও বুঝে ওঠে না ওদের আসল কথাটা, তাই জানতে চাইল—কি চাস তোরা? খুলে বল না।

এ ঠেলে দেয় ওকে, ও ঠেলে দেয় তাকে। কেউ কিছু বলতে পারে না। অগত্যা তখনই সবাই মিলে এক সর্দারকে তাদের বক্তা মনোনীত করল। সে মনের কথাটা সংক্ষেপ করে বললে—বিচার চাই।

—কে বিচার করবে, আমরা করব না তোরা করবি?

—তোরা কর, তুই-ই কর না।

—আমি তো বলেছি, ম্যাক্ সাহেবকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না এক্ষেত্রে।

—এতগুলো মানুষ খুন করলে!—

—খুন কোথায় রে! একটু-আধটু জখম হয়েছে। গুলীগোলা বার করে দিয়েছে, দু-দিনে দাগ মিলিয়ে যাবে। যত-দিন ঘরে থাকতে হবে সবাই হাজিরা পাবে, আরো কিছু পাবে—আমি তার ব্যবস্থা করছি।

—গুলী মারল, খুন নয়?

—গুলী ছুঁড়েছে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। তার আগে যে ভাতুয়া ছুরিটা ছুঁড়ল। যদি সাহেবের মাথার টুপিটা না থাকত, তবে কি হত তা ভেবে দেখেছিস?

বুঝেছে সবাই, কিন্তু বোঝানো দায়। অথবা যা বুঝেছে তাতেই মত্ত। তেমন অবস্থায় তো অনেকে হাতীর সঙ্গে পাল্লা দেয়। ওরা পিছিয়ে থাকবে কেন! যে পিছিয়ে থাকে তার হাতে গাঁয়ের মোড়লি থাকে না। সর্দার বললে—তবে এখানে কোন বিচার হবে না?

একটা বেপরোয়া ভাব তার কথায়। মেঘু তা বুঝল, বলল—এখানে না হলে কোথায় যাবি তোরা?

—কেন, লেবার-অফসার, আদালত্।

—আদালতে খুনে বলে প্রমাণ হবে ভাতুয়া, তার সাজা হবে। সাহেব বলবে, তোরাই আগে ছুরি ছুঁড়ে মেরেছিলি। সবাইকে দেখিয়ে দেবে। আদালতে তোরাই তা স্বীকার না করে পার পাবি না। তোদের কি হয় তাও বলা যায় না।

জানা থাকলেও, খোলাখুলি না বললে অনেক কথার তাৎপর্য অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয় না। ওরা ধরে নিয়েছিল গুলী করাটাই বড় অপরাধের, তাতেই চাপা পড়েছিল ছুরি চালানোর কথাটা। মেঘুর কথায় উপস্থিত সকলের চোখেমুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। তাই গোপন কথাটা সামলে রাখতে পারল না। সব ফাঁস করে দিয়ে সর্দার বলল—ইউনিয়নবাবু বলেছে, মেকি সাহেব তোদের কাছে ক্ষমা চাইলে তবে মিটিয়ে নিবি।

ম্যাকের কথা তুলতে মেঘু তেমন লক্ষ্য করল না যে তারা অপরের কথায় চলছে। সে বললে—ওরে বাবা! কে তার কাছে এমন কথা বলতে যাবে? জানিস তো যে রাগী।

—তা তো জানি, তাই তো তাকে টিট করতে চাই। বলে, সর্দার একটু হাসল।

—কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবে না। কে দোষী সে-কথা ছেড়ে দিলাম। অপর কোন সাহেব হলে ছোট-সাহেবকে দিয়ে রাজী করানো যেত—তোদের সামনে দুঃখ প্রকাশ করত। কে তাকে বলতে যাবে এ-কথা? ভেবে দেখ, আমি তার কাছে চাকরি করেছি। আর ছোট সাহেবও বলবার মতো খুঁজে পাচ্ছেন না কিছু। উলটে ম্যাক্ সাহেবের ইচ্ছা ভাতুয়ার সঙ্গে আরও কয়েক ঘর কুলি তাড়িয়ে দেবে।

—তাড়িয়ে দেবে?

—চেষ্টায় আছি সেটা যাতে না হয়। বাজে খেয়াল ছেড়ে দে—আমার কথা মতো চলবি তো দেখবি কত সুবিধা করে দেব। সবাই মিলে আমার পিছনে থাক।

হুঁঃ। বক্তৃতা শুনে শুনে চুল পেকে গেছে—হ্যাঁ! ইউনিয়ন বাবু তো সাবধান করে দিয়েছে—পটিয়ে-সটিয়ে অনেক কথা বলবে কিন্তু মেঘু, ভুলবি না যেন! এই তো, মেঘু তো ঠিক তেমন কথাই বলছে। হাজার হোক বাবুর বুদ্ধি! মেঘুর সব কথা উড়িয়ে দিয়ে সর্দার বললে—তবে তো ইউনিয়ন বাবু ঠিকই বলেছে!

—কি বলেছে ইউনিয়ন বাবু?

—বলেছে তোদের তাড়িয়ে দেবে। কিছুতেই ছাড়বি না যেন তোদের দাবী।

কত কাজ তারা করিয়ে নিয়েছে মেঘুকে দিয়ে, আজ তাড়িয়ে দেবার ভয়ে তার কাছে না এসে তারা গেছে ইউনিয়ন বাবুর কাছে। সে বুঝল তার ওপর আজ আর ওদের তেমন ভরসা ও বিশ্বাস নেই। মেঘুর খুব দুঃখ হল। সর্দারের দিকে তাকিয়ে সে বললে—বেশ, তবে দু'দিন সবুর কর, বড় সাহেবকে আসতে দে—তিনি এসে যা হয় করবেন।

মেঘুর মনের ভাবটা সর্দার বুঝল না। সে নিজের ভাবেই ব্যস্ত, বললে—বড় সাহেব বিলেতে গেলে তো ছ-মাস, অত-দিন কি চুপ করে থাকা যায়?

—সে ছুটিতে গেলে, এবার গেছেন কাজে। খুব জলদি ফিরবেন।

—বিলেত! তার কী ঠিক আছে? ইউনিয়নবাবু—

এদের জন্য মেঘু এত করে তবু সবার মত গেছে ইউনিয়নে। ঘটনাটা নিয়ে জল্পনা দিয়ে সে কত কথা বলেছে তাদের, তবু ইউনিয়নবাবু! তার দুঃখটা রাগে পরিণত হল। এত ঠাণ্ডা মেঘু কিন্তু এক্ষেত্রে নিজেকে সামলাতে পারল না। বললে—ইউনিয়নবাবু, ইউনিয়নবাবু—কি চায় সে?

—কাজ বন্ধ করাতে চায়।

—তোরা কি চাস?

—তোরা যখন কিছু করবি না—উলটে তাড়িয়ে দিবি, তখন—

কথাটা টেনে নিয়ে মেঘু বললে—কাজ বন্ধ না করে উপায় কি! এই তো কথা?

সবাই নিরুত্তর।

অপরাপর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হলে বাজার নষ্ট হয়, কিন্তু চায়ের বাজার থাকে। তবুও কাজ বন্ধের পরিণাম বেশী ভয়াবহ। কাজ বন্ধটা যেমন সহজ, শুরুটা তেমন নয়। বছরের কালটিভেশন খরচটা বরবাদ। আবার গাছ ছাঁটাই করে দেড় মাস দু'মাস অপেক্ষা করতে হয়, তারপর যদি সময় থাকে তবেই না কাজ হবে। মোট কথা, বছরটা গেল। এক বছরের লোকসান সামলাতে লাগে কয়েক বছর। এবং অতটা বোঝবার সামর্থ না থাকলে বাগানের হাতবদলও হয়। লাভ হলেই না তাতে ভাগ বসানো যায়। কিন্তু লোকসান হলে! এসব কথা কুলিরা জানে। মাথা ঠাণ্ডা রাখার যোগান দিতে গিয়ে সব ভুলে থাকে। সকল দিক ভেবে মেঘু ঠাণ্ডা হল। এত ঠাণ্ডা যে, একটা দামী খবরের কোন গুমর রাখল না। একটু রেখে-ঢেকে কায়দা করেও কথাটা ছাড়ল না। সে বললে—বলছি তো, আমরা চেষ্টা করছি যাতে কাউকে তাড়ানো না হয়। ছোট-সাহেব চেষ্টা করছেন ম্যাক্ সাহেবকে ঠাণ্ডা করতে। আমি বলছি এতদিন যা হয়ে এসেছে, এখন তা হতে দেব না। দোষ করলে শাসন কর, কিন্তু ভাত মেরে নয়।

এদের কাছে সাহেবদের স্বভাব মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা—বদ-মেজাজী আর ভাল মানুষ। এর বেশী বিশ্লেষণ আসে বাবুদের মারফৎ। তাই সবাই জেনেছে বড় সাহেব ওঠাবসা করেন ছোট সাহেবের কথায়। সেই ছোট সাহেব আছে মেঘুর পেছনে। এত সহজে যদি একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবে আর একটাই বা হবে না কেন?

উৎসুক হয়ে সর্দার জিজ্ঞাসা করল—আর ক্ষমা চাওয়াটা?

খুন করতে গেলি তোরা, আর ক্ষমা চাইবে ম্যাক্-সাহেব! কে তোদের এমন পণ্ডিত করে পাঠাল রে?

হবে না কেন তা? ওদিকে ইউনিয়ন-বাবুর বুদ্ধি, এদিকে তাদের মেঘু। যে মেঘু তাদের সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে চলে।

—তুই না আমাদের লোক বলেছিলি! তুই তো সাহেবদের টেনেই কথা বলছিস!

—তোদের লোক বলে ন্যায়-অন্যায় সকল কথায় সায় দেব, তোরা কি তাই ভেবেছিলি নাকি?

কথাটা হামাগুড়ি দেওয়া মেঘুর মতো লাগল না।

সর্দার ভেবে দেখল, ইউনিয়নবাবু তো ঠিকই বলেছে। সে বললে—তবে আর আমাদের কাজ বন্ধ না করে কি উপায় আছে, বল!

মেঘুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তার সকল ভাবনা-চিন্তা ও তর্ক-বিতর্কের শেষ করে সে বললে—বেশ তাই করিস। দুটো দিন সবুর কর, বড় সাহেবকে টেলিগ্রাম করি আসতে বলে। তিনি এলে আমি এ-কাজ ছেড়ে দেব, ইচ্ছা হয় তিনি অন্য কাজ দেবেন, নয়তো বাগান ছেড়ে চলে যাব।

মুখে যে যাই বলুক, সকলেরই মনে কিন্তু একটা ধাক্কা লাগল। সবারই মন স্পর্শ করল কথাটা। মেঘু তাদের কম বল-ভরসা নয়। তাই বেশ ভাবনাও হল।

—তুই কাজ ছেড়ে যাবি কেন?

মেঘুর ভিতরটা স্থির-গম্ভীর। মন আর কথা কাটাকাটি করতে চায় না। তবুও একটু হালকা হতে চাইল তার শেষ কথাটা শেষ করে। জবাব দিল—সে-কথা তোদের বোঝাতে পারব না, সেটা আমি এতদিন পর বুঝেছি। আর তা বোঝাতে চাইও না। তোরা শুধু কাজ বাগাতে এসেছিলি আমার কাছে, আসলে ইউনিয়ন-বাবুই তোদের সব।

—এতদিন তো বাবুই দেখে এসেছে আমাদের। এবারও থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারি, লেবার অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মেঘু বললে—হাঁ হাঁ, সে সব জানি। সে বুঝতে পেরেছে তোরা অন্যায় করেছিস। তাই থানায় গিয়ে যত মিছে কথা বলছে। ধর্মঘটের ভয় দেখিয়ে তোদের রক্ষা করতে চায়। কিন্তু এত কান্ড করবার কোন দরকার ছিল না, যতক্ষণ আমি এখানে আছি। আজ আমি এখানে বসে না থাকলে তোদের যে কি বিপদ ছিল তা তোরা বুঝতে পারবি না।

ওরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

—তুই তো আজ এসেছিস, এতদিন তো ইউনিয়নবাবুই রক্ষা করেছে সব বিপদ আপদ থেকে। যদিও সবাই জানে গার্টফিল্ডের আমলে ইউনিয়নটা নামমাত্র আছে, তবুও একেবারে চোখ উল্টে কথা বললে লোকটা।

একটু চক্ষুলজ্জা, একটু সঙ্কোচ নিয়ে ওরা কথাটার পত্তন করে কিন্তু আসলে সবাই তৈরি হয়েই তার অফিসে চড়াও হয়েছে। সব খাঁতিয়ে দেখতে ঘটনাটা পরিষ্কার ভাবে দেখা দেয় মেঘুর সামনে। এমন ক্ষেত্রে যেমনটি প্রয়োজন তেমন ধৈর্য ও বিচক্ষণতা দেখল না সে। আগেও দেখায় নি, এখনো পারল না তা। সে বললে—তবে যা তোদের ইউনিয়নবাবুর কাছে।

দলের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল—সময় মতো তুই যে আমাদের ছেড়ে দিবি তা আমরা জানি।

—জানিস? বলে, সিধে হয়ে বসল মেঘু।

এমন কথা সে কখনো শোনে নি ওদের মুখ থেকে। যতখানি দুঃখের ভারে সে ভেঙে পড়ল, যতখানি রক্তের ঝলক উঠে গেল মেঘুর মাথায়, ঠিক ততখানি শান্তভাবে সে বললে—তোরা জানিস তোদের ছেড়ে দেব? তা কেন, আমি ছেড়ে দিয়েছি আর তাই তোরা গেছিস ইউনিয়নবাবুর কাছে। এই তো বলতে চাস এখন। এতক্ষণ শুধু যাচাই করে দেখছিলি—না? তোদের মাথায় আমার কোন কথা, কোন যুক্তি আজ আর ঢুকবে না। আজ তোদের মাথায় ভূত চেপেছে। তা নইলে, এমন কথা বলার আগে তোদের মনে আসত—আমাকে দিয়ে এই ক-মাসে তোরা কত কাজ করিয়ে নিয়েছিস, আর তোদের ইউনিয়নবাবুর কাছ থেকে কত কাজ পেয়েছিস [illegible] সে [illegible] তোদের [illegible] ইউনিয়ন[illegible] বোঝে, আমার হা[illegible] ছি[illegible] জন্য তোদের [illegible]

অনেক [illegible] কথাটা শোনাতে।

—বাবু অনেক টাকা পয়সা খরচ করেছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু নেয় নি। তোরা যা দিয়েছিস, বা করেছিস তা কাজ নেবার জন্য। বাবু খাটছে আমাদের জন্য, তার তো কোন লাভ নেই।

—তা তো হবেই। তোরা বিপদে না পড়লে, তোদের বিপদে না ফেললে—আবার তারপর তা থেকে তোদর রক্ষা না করলে তার নাম হবে কি করে!

শেকড় নেমে গেছে অনেক নীচে। মেঘুর মনের দুঃখের আগুনে ফুৎকার দিয়ে সর্দার বললে—সে বেচারা তো আমাদের রক্ষা করতেই চেষ্টা করছে, বিপদে ফেলেছিস তোরা।

—ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সাহেব, সব আসবেন ঘটনার তদন্ত করতে। তখন বুঝবি কে তোদের রক্ষা করতে চায়—বাবু না আমি?

হাকিম পুলিশের নামই অস্বস্তিকর, তার ওপর তদন্ত। একটা খতিয়ে দেখেনি আগে। তাই তাঁদের সশরীর হাজির ও তদন্তের খবরে শঙ্কিত হল সবাই। সর্দার জানতে চাইল—তাই যদি হবে তো হাকিম-পুলিশের কাছে কেস্ দিলি কেন?

—পুলিশ পর্যন্ত চলেছে, এতটা চেপে রাখার দিন আর নেই আজকাল। আমরা যা দিয়েছি তা সামাল দেওয়া যাবে। কিন্তু তোরা যা দিয়েছিস তা কি সামাল দিতে পারবি

—তোমরা বড়লোক, ধনী তোদের সঙ্গে পারি না বলেই তো বাবুর বুদ্ধি নেওয়া।

—আমি ধনী নই, ধনীর নিমক খাই, কিন্তু কাজ করি তোদের। আমি চাইনি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়ে যায়। তোদের সঙ্গে কথা হল এক, কিন্তু কাজ হ'ল আর এক। আমার কথা মতো কাজ হলে সাহেবরা আজ কি মুশকিলে পড়ত।

—তুই শুধু সাহেবদের কথাই ভাবছিস। আমাদের—

—এমন কথা তোরা কোথায় পেলি? আসলে তোরাই আমাকে চাস না।

এক বৃদ্ধের চোখ দুটো ছলছল হলো। সে উঠে দাঁড়াল, বলল—চাই না। নেমে আয় তোর চেয়ার ছেড়ে, তোকেই আমরা ইউনিয়ন বাধ্ করে দেব।

সবাই যোগ দিল তার কথায়—হাঁ-হাঁ।

মেঘু হাসল—ধন্যবাদ। আমায় নিয়ে তোদের কোন লাভ হবে না। অমন সত্য-মিথ্যায় মেলানো-মেশানো কেস্ সাজানো হবে না আমাকে দিয়ে। তার ওপর এখানে বসে যা করতে পারব, তোদের কাছে গেলে তাও পারব না। তাছাড়া যতদিন এখানে থাকব বড়সাহেবের গোলামী ভিন্ন আর কোন কাজ করতে পারব না।

মেঘু ঠেসান দেওয়ার সঙ্গে টিল্টিং চেয়ারটা হেলে গেল পিছনে। তার কথায় মর্মার্থ বোঝবার মন মেজাজ তখন নেই কারো। তারা ধরে নিল তাদের অমন উদার আবদারের কথায় মেঘুর কাট-ছাঁট জবাব। কুলিদের কথকের মাথাও চাড়া দিয়ে উঠল এক পলকে। সেও মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল—জানিরে জানি সে কথা। আমাদের দিকে মুখ তুলে চাওয়ার উপায় আছে তোর? এক সাহেব তোর অন্নদাতা পিতা, আর এক সাহেব জন্মদাতা।

দুটোর কোনটাই আজ তার কাছে সরমের নয় বরং গরবের। কিন্তু বলার ভঙ্গিটা! তা না হলেও মেঘু ধরে নিল তেমনই। চেয়ারটা লাফিয়ে সিধে হল। মেঘু খাড়া হয়ে বসল। কাচ-ঢাকা টেবিলটার ওপর তার শক্ত হাতের মুঠি ঠুকল। কিন্তু কথা বলল দূঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে—শুধু এটুকুই জানিস তোরা। এটা আর জানিস না যে, সেই জন্যই তোদের কল্যাণ কামনা করতে শিখেছি ও পেরেছি। তোদের ঘরে জন্ম নিলে শিখতাম নিজেদের মধ্যে মারা-মারি করতে, খুনখারাপি করতে।

আগুন লাগল! মেঘুর কথায় যে অর্থ তারা ধরে নিল তারই জবাব দিল—তোরাও হয় তো এখনো বুঝিস নি—আমাদের হাতের কাছে দুনিয়ার সকল জীবই সমান সেটা মাছ হোক বা মানুষ—

—সাট্ আপ্। র‍্যাস্কল্স্।

ঘরখানা কেঁপে উঠল উইলিয়মের বজ্র নির্ঘোষে। এক পাশ দিয়ে উইলি তর্জনী তুলে প্রবেশ করল মেঘুর ঘরে। এমন ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য তাদের অজানা নয়। বরং এটাই তারা জানে ভাল করে। তাই অপর পাশ দিয়ে কুলিরা বেরিয়ে গেল সভয়, ত্রস্ত—সন্ত্রস্ত পদে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেঘু। উইলি তার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। চিন্তিত, অথচ স্থির তার মুখ। ফিসফিস করে সে বলল—বেশ একটা চক্রান্ত চলছে। গোলমাল অনি-বার্য। কোনমতে আর কয়েকটা দিন। জিঃ এম আসছেন ফ্লাই করে। তুমি অনেক কথা সরলভাবে বলে দেও। এটা কাউকে বোল না যেন।

টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে উইলি ইঙ্গিত করল মেঘুকে বসতে। সামনে ঝুঁকে পড়ে সে বললে—দু-দিনের জন্য জিঃ এমঃ গেছেন, তাঁকে ব্যস্ত করতাম না এখানকার কথা জানিয়ে। ফায়ারিং কেসটা কিছু নয়। কিন্তু কুলিরা নালিশ করেছে এমিগ্রেশন কন্ট্রোলারের কাছে—আমরা তাদের দেশে ফিরে যেতে দিচ্ছি না, চুক্তি মতো এমন কত কাজ করি না। আসলে ফিরতে চায় না বলে যে বণ্ড দিয়েছে সে কথা চেপে গেছে। লেবার কমিশনারকে জানিয়েছে—এক হাজিরার পয়সা দিয়ে দু-হাজিরার কাজ নেবার জন্য জুলুম করছি। এসবের জন্য ভাবনা ছিল না, আমাদের রেকর্ড পরিষ্কার। কিন্তু এসব কাজে কুলিদের উসকে দিয়েছে আমাদেরই লোক—বিশেষ করে ম্যাক্ আর এডি। অনেক পয়সা খরচ করেছে ওরা ইউনিয়নটা হাত করতে সেটাকে চাঙ্গা করে তুলতে। এতক্ষণ ম্যাকের নাম ধরে নেকামি করছিল। ওরা জুলুম করবে ম্যাক-কে হাজির করাতে, ওদিকে ম্যাকও আসবে না। বেশ স্ট্রাইক লেগে যাবে। কেউ বুঝবে না কি হল।

—ম্যাক সাহেব! এডি সাহেব! তাঁরাই তো আমার—

—হাঁ, তোমায় সরিয়ে দিয়েছে তাদের কাছ থেকে। সে অনেক কথা। এখন তারা আমাদের মুশকিলে ফেলতে চায়—তোমায় আমায়, বড় সাহেবকেও। ষড়যন্ত্র চলছে অনেক দিন, শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

কথাটা শুনে মেঘু ধাঁধায় পড়ে গেল। হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল উইলির পানে। আর কোন কথা কথা খুঁজে পেল না, কোন প্রশ্ন করতে পারল না।

উইলি তার কথাটা বুঝল, বললে—এর পিছনে অনেক কথা। জান তো বড়সাহেবের ঠাকুরদাদা ছিলেন অভিজাত স্যাকসন, অর্থাৎ জর্মান। এতকাল ইংলণ্ডে আছেন এঁরা তবু ইংরেজদের কাছে বিদেশী গন্ধ দূর হল না।

—কেন?

—চাকরির হিংসা। সেখানকার ছেলেরা এখানে এসে তাঁর অধীনে কাজ করে। অথচ বড়সাহেব এতবড় কাজটা পেলেন কত সহজে।

এতবড় গোলমালের ব্যাপারটা তলিয়ে গেল মেঘুর মনের তলায়। তখন পার্টিক্রফ্টের বিষয়টাই মস্ত বড় হয়ে উঠল তার মনে। সে জানতে চাইল—সহজে! কি রকম?

—তুমি শোন নি? যৌবন বয়সে তিনি চাকরি করতেন লণ্ডনে এক খুচরা চায়ের দোকানে। অবশ্য শ'খানেক কর্মচারীর ভার ছিল তাঁর হাতে। সেখান থেকে গেলেন মিনসিং লেনে এক চায়ের দালালের অফিসে টি-টেস্টিং শিখতে। সেখানে তিনি আণ্ডার ব্রোকার হলেন। তার পরই এখানে। তাঁর সৌভাগ্যটা এখানকার সবাই সহজভাবে নিতে পারে না। তিনি কিন্তু সকলের প্রতিই ভ্রাতৃ-ভাব পোষণ করেন।

—টি-টেস্টিং তো খুব শক্ত কাজ, সহজ হল কি করে?

—তা আর বলে কে! তার ওপর ব্রোকার ও অকসনার হিসেবেও তিনি বেশ নাম করেন। তাঁর নীলাম ডাকার ভঙ্গিতে পড়তি বাজারও গরম হয়ে উঠত। আমাদের কোম্পানির ডিরেকটাররা বাগানের খুব দুঃসময়ে তাঁকে পাঠান, তাঁর কাজে হোম-অফিস অত্যন্ত খুশী। আগে এখানে কত গোলমাল লেগে থাকত, তার ফলে লোক-সানের ওপর লোকসান। কিন্তু এঁর আমলে কোন দিন স্ট্রাইক হয় নি। কুলিদের জন্য তিনি অনেক করেছেন, তবুও লাভ হয় প্রচুর।

—হাঁ, তা শুনেছি।

—আজ তিনি এখানে নেই, তাই এই সুযোগে নির্জীব ইউনিয়নকে সজীব করে তুলে একটা ঝন্‌ঝাট বাধিয়ে দিতে চায়।

—তাতে লাভ?

—লাভের আশাতেই তো হচ্ছে এ-সব। যদি আমাকে আর বড় সাহেবকে ডিস্-ক্রেডিট করতে পারে, তবে ম্যাকই সর্বময় কর্তা হয়ে বসবে। তার মামার এক বন্ধু কোম্পানির ডিরেক্টর, আর ডিরেক্টরদের ক্ষেপীয় ভাগই লক্‌ম্যান।

(ক্রমশ)

অরণ্যের প্রতিরোধ

বিনয় মাহাতো

মোগল রাজশক্তির সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন মহারাণা প্রতাপ, ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন হায়দার আলি, টিপু সুলতান, রণজিৎসিং,—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের সেই সংগ্রামের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন পশ্চিম সীমান্ত বাংলার যে অখ্যাত নৃপতি—তাঁর সেই বীরোচিত সংগ্রামের কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথাও ঠাঁই পায় নি। বিদেশী ঐতিহাসিকের কথা বাদই দিলাম, স্বদেশী ঐতিহাসিকেরাও এই সংগ্রামকে নিতান্ত জংলী অভ্যুত্থান বিবেচনা করে আলোচনার যোগ্য বিষয় বলেই মনে করেন নি। কিন্তু আদিবাসীদের সংগ্রাম বলে উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে না দেখে সহৃদয়তার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, এক অখ্যাত নৃপতির নেতৃত্বে সংঘটিত আদিবাসীদের এই সংগ্রাম ছিল দেশপ্রেমী মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার এক গৌরবময় সংগ্রাম। তাঁদের এই সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানের মধ্যে। আশ্চর্যের বিষয় সভ্য ভারতবাসী আদিবাসীদের এই সংগ্রামে কোন প্রকার সাহায্য না করেই নিরস্ত থাকেন নি, উপরন্তু তাঁরা এই সংগ্রাম দমন করার জন্য বৃটিশের পক্ষ নিয়ে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাই আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল কেবল তাঁদেরই মধ্যে,—পরিচালিত হয়েছিল তাঁদেরই আপন উদ্যোগে এবং ঐক্যে।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর বৃটিশ শাসকেরা কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্যসমূহ জয় করে তাঁরা সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়ানোর দিকেও মনোযোগ দিলেন। যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলমান শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সেই সমস্ত অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বৃটিশ শাসকদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ, এবং প্রায় সমগ্র মানভূম জেলা ও এই সমস্ত জেলা সংলগ্ন বিহার রাজ্যকে নিয়ে গঠিত গভীর অরণ্যে আবৃত জঙ্গলমহল অঞ্চলে (প্রাচীন ঝাড়খণ্ড) মুসলমান শাসন কোন কালেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বিশেষত ঝাড়গ্রাম, ধলভূমগড়, জাম্বনি, শিলদা প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান শাসনের কোন প্রকার অস্তিত্বই ছিল না। মোগল শাসনের শেষভাগে এই জঙ্গলমহলের জমিদার বা রাজারা স্বাধীনভাবেই তাঁদের রাজ্য শাসন করতেন। তাই ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার স্থির করলেন যে, ঐ অঞ্চলে সৈন্য পাঠিয়ে রাজা এবং জমিদারদের রাজস্ব দিতে বাধ্য করবেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জঙ্গলমহলে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে লাগল। জঙ্গলমহলের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের চরিত্রে এমন একটা দাসত্ববিরোধী সহজ বিদ্রোহীর ভাব ছিল যে, এঁদের উপর কোন প্রকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

১৭৬৭ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি এবং সেই বৃটিশ সরকারের আয় বাড়ানোর জন্য এই সমস্ত অঞ্চল থেকে রাজস্ব সংগ্রহের অভিপ্রায়ে লেফটেনেন্ট ফার্গুসনের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের জমিদার এবং রাজাদের পরাভূত করে, রাজস্বদানে বাধ্য করানোর জন্য, জমাদার সার্জেন্টসহ চার কোম্পানী সিপাহী প্রেরণ করা হল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি পৌঁছালেন কল্যাণপুরে, সেখানকার জমিদার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন, এবং কোম্পানী নির্ধারিত হারে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু কল্যাণপুর থেকে কিছুটা এগিয়ে ফার্গুসন প্রবল বাধা পেলেন ঝাড়গ্রামের রাজার কাছ থেকে। বাধা পেয়ে ফার্গুসন ঝাড়গ্রামের রাজার গড় আক্রমণ করলেন। ফার্গুসনের গতি রোধ করা ঝাড়গ্রাম রাজের সম্ভব হল না। তিনিও কল্যাণপুরের জমিদারের মত কোম্পানীকে রাজস্বদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইভাবে একে একে রামগড়, লালগড়, শিলদা, জাম্বনি প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারেরা বৃটিশ সেনাপতির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। জাম্বনি থেকে ফার্গুসন এগিয়ে চললেন আরও পশ্চিম দিকে ঘাটশিলা অভিমুখে। এই ঘাটশিলার মুখে ফার্গুসন প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন। প্রায় দু হাজার তীর-ধনুকধারী আদিবাসী যোদ্ধা পথে অবরোধ সৃষ্টি করে ফার্গুসনের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। আধুনিক এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে এই তীরধনুক সম্বল যোদ্ধাদের পক্ষে এঁটে ওঠা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। ফার্গুসনের গোলার মুখে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ঘাটশিলা বা ধলভূমগড়ের রাজা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, সম্মুখযুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর গতিরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি সম্মুখযুদ্ধ পরিহার করে ফার্গুসনের যাত্রাপথে গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন এবং হঠাৎ আক্রমণে বৃটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই ধরনের আকস্মিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েও ফার্গুসন কিন্তু তাঁর অগ্রগমন অব্যাহত রাখেন। পথে তাঁর বেশ কিছু সৈন্য মারা পড়ল তবু ১৭৬৭ খৃস্টাব্দের ২২শে মার্চ তিনি ঘাটশিলার নিকটবর্তী ধলভূমগড় রাজার দুর্গ নরসিংগড়ে উপস্থিত হলেন। উপায়ান্তর না দেখে বৃদ্ধ রাজা আপন দুর্গে অগ্নিসংযোগ করে গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দুর্গে অগ্নিসংযোগের উদ্দেশ্য হল দুর্গে সংরক্ষিত সমস্ত খাদ্যশস্য পুড়িয়ে ফেলা। দুর্গ ছেড়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণের আগে তিনি কেবলমাত্র আপন দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ফার্গুসন যাতে কাছাকাছি অঞ্চল থেকেও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে না পারেন তার জন্য নিকটবর্তী গ্রামগুলোও জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বাহুবলে ফার্গুসনকে মারতে না পেরে ভাতে মারার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা সফল হওয়ার আগেই তিনি ফার্গুসনের হাতে ধরা পড়লেন। বিচারের জন্য তাঁকে পাঠান হল মেদিনীপুর জেলে, এবং তাঁর জায়গায় রাজা করা হল তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধলকে। সিংহাসনে বসে জগন্নাথ ধল বৃটিশ রাজশক্তির বাৎসরিক ৫৫০০ টাকা করদানের প্রতিশ্রুতিও

দিলেন। এর পর আরম্ভ হল ধলভূমগড়ের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিচার করলে দেখা যাবে, জগন্নাথ ধলের এই করদানের প্রতিশ্রুতির মধ্যে আদৌ আন্তরিকতা ছিল না। শুধু আন্তরিকতার অভাবই নয়, এই ধরনের চুক্তি স্থাপন করে তিনি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন বলা চলে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি শক্তিশালী বৃটিশ রাজশক্তির সঙ্গে শেষবারের মত বোঝাপড়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তিনি গোপনে এই অঞ্চলের সমস্ত রাজপরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে শক্তি সঞ্চয় করলেন। তারপর ১৭৬৮ খৃস্টাব্দে বৃটিশ রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করে প্রতিশ্রুত করদান বন্ধ করে-দিলেন, এবং পুনরায় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। এবারে বৃটিশ কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দুই কোম্পানী সিপাহীসহ পাঠান হল লেফটানেন্ট রূকিকে। রূকি ধলভূমগড় রাজার দুর্গ নরসিংহগড় আক্রমণ করলে, জগন্নাথ ধল পুনরায় দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সামনা-সামনি লড়াই করা সম্ভব নয়। রূকি জগন্নাথ ধলকে ধরতে না পারলেও তাঁর ভাই নিমু ধলকে বন্দী করলেন। এদিকে জগন্নাথ ধলের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের সমস্ত জমিদার এবং প্রজা সঙ্ঘবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছেন। সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কোম্পানী রূকির পক্ষে এই অবস্থার মোকাবিলা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তাঁর জায়গায় পাঠালেন ক্যাপ্টেন মরগ্যানকে। মরগ্যান এসেই উপলব্ধি করলেন সমস্ত রাজ্য বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবে সজ্জিত হয়ে আছে। শুধু ধলভূমগড়ই নয় পাশাপাশি সমস্ত রাজ্য জগন্নাথের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এ অবস্থায় দুর্গ রক্ষা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে মরগ্যান এক কৌশল অবলম্বন করলেন। জগন্নাথের পরিবর্তে রাজপদে বসালেন তাঁর ভাই নিমু ধলকে। অবশ্য নিমু ধল আদৌ জগন্নাথের ভাই বা রাজ-পরিবারের কেউ ছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এই নিমু ধলের যে বর্ণনা মরগ্যান দিয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি রাজপরিবারের কেউ ছিলেন না। শুধু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই ধরে-বেঁধে একজন কাউকে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই রাজার সামান্যতম বস্ত্রের সংস্থান পর্যন্ত ছিল না, মরগ্যান লিখেছেন,—

"Now that we have a new Rajah. Jhou company must supply him with money, victuals, for he has the least of either.. ......He is wretchedly poor. I think you should send him a present of some pieces of clothes and some silchs. for he cuts a woeful figure for a Rajah".

এদিকে জগন্নাথ ধলও কিন্তু বৃথা বসে থাকেন নি। গভীর অরণ্যের গোপন আস্তানা থেকে বারংবার অতর্কিত আক্রমণে তিনি মরগ্যানকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। মরগ্যান কোনক্রমেই এই আদিবাসী যোদ্ধাদের আয়ত্বে আনতে পারছিলেন না। বিদ্রোহীরা কখনো সামনা-সামনি লড়াই করতেন না। তাঁরা হঠাৎ বোলতার ঝাঁকের মত তীর-ধনুক নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতেন, অতর্কিতে বৃটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পর-মুহূর্তেই আবার গভীর অরণ্যে পালিয়ে যেতেন। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁরা সর্বদাই একটা দূরত্ব এবং আড়াল বজায় রেখে চলতেন, আর সেই নিরাপদ দূরত্ব থেকে বৃটিশ বাহিনীর উপর তীর যোজনা করতেন। বৃটিশ বাহিনী পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই আবার জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করতেন। ফলে তাঁদের কাউকে হত্যা করা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর, পক্ষেও ছিল প্রায় অসম্ভব। স্বাধীনতা রক্ষায় আদিবাসী যোদ্ধাদের এই অনমনীয় দৃঢ়তা লক্ষ্য করে মরগ্যান লিখেছিলেন—

"To tell you frank my real sentiments of the affairs of the country at present, I think it will be a more difficult job to settle it than it was at first lo conquer it"

এই অদৃশ্য যোদ্ধাদের নিয়ে মরগ্যান ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সারা দিন তাঁর করার কিছুই ছিল না,—আক্রমণের প্রতীক্ষা করা ছাড়া। কিন্তু প্রতীক্ষিত মুহূর্তে আক্রমণ ঘটত না কখনোই। মরগ্যান লিখেছেন,—

"I am really tired of doing nothing, and my poor sepoys fall sick continually".

রাজা জগন্নাথ ধল এই অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিলেন। তাই তাঁর উপর চরম কোন ব্যবস্থা গ্রহণও কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজা জগন্নাথ ধলের ভালো-মন্দ কিছু ঘটলে, তার প্রতিক্রিয়া ঐ অঞ্চলের জমিদারদের মধ্যেও দেখা দেবে মরগ্যান সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন। জগন্নাথ ধলের পশ্চাদ্ধাবনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মরগ্যান লিখেছেন,—

"The consequence of it will be that, all the people of the country will run to the devil, and the country cannot possibly be settled for many months. But what can I do with the rascals when he neither comes in nor answer purwannahs".

ধলভূমগড়ের সমস্ত মানুষ মরগ্যানের প্রতি সমস্ত প্রকার সহযোগিতা বন্ধ করে দিয়ে-ছিলেন। খাদ্যশস্যের সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছল। প্রকৃতপক্ষে নরসিংহগড়ের দুর্গে তিনি প্রায় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করছিলেন। মারাত্মক খাদ্যাভাবে সেনা-বাহিনীর মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে-ছিল। তাঁর সেই অবস্থার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তিনি লিখেছেন,—

"Send me a supply of fowls by the return of the daks for I have nothing to eat".

তারপর বর্ষাকাল এসে গেলে পার্শ্ব-বর্তী সুবর্ণরেখা নদী কাণায় কাণায় ভরে উঠল। জলযানের অভাবে মরগ্যান নরসিংহগড়ের দুর্গে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। এদিকে খাদ্যের কোন সংস্থান নেই। পার্শ্ব-বর্তী গ্রামগুলিও জনশূন্য। মরগ্যান বাধ্য হয়ে সিপাহীদের দৈনিক বরাদ্দ কমিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে আর সমস্যার কতটুকু সমাধান হবে। অবস্থা প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠলে মরগ্যান ১৭৬৮ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে কোনক্রমে একটা নৌকা সংগ্রহ করে জগন্নাথ ধলের উদ্দেশ্যে সুবর্ণরেখা অতিক্রম করে হলদিপুকুরের দিকে যাত্রা করলেন। আগেই বলেছি জগন্নাথ ধলের অনুগামীরা কখনো সামনা-সামনি লড়াই করতেন না, তাঁদের গোপন তৎপরতার আর একবার প্রমাণ পাওয়া গেল,—মাঝ নদীতে মরগ্যান আবিষ্কার করলেন তাঁর

গোলা ফুটো হয়ে গেছে, নৌকোর খোলের মধ্যে অবিরাম গতিতে জল ঢুকছে। এর ফলে নদীতে ডুবে সিপাহীদের কেউ মারা যায় কিনা সে সংবাদ সরকারী তথ্যে নেই। যাই হোক ফরগুসান কোনক্রমে হলুদ-পুকুরে এসে পৌঁছালেন। সেখানেও সর্বাঙ্গীণ অসহযোগিতার মধ্যে একটা প্রাচীন জলার ধারে তিনি প্রায় বন্দী হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেই বলেছেন জীবনে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁকে আর কখনো হতে হয় নি। সেখানেও তাঁর সিপাহীরা অসুস্থ হতে থাকে। এই অবস্থায় অসহায়ভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে ঔষধ এবং খাদ্য প্রার্থনা করা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না।

এর কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনী-পুরের রেসিডেন্ট জানাচ্ছেন,

"Ghatsila was entirely settled and going on in a proper channel"

কিন্তু এই properly settled ঘাটশিলাতেই ১৭৬৯ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিদ্রোহের আগুন আবার দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। কোম্পানীর সিপাহীদের একাংশের সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের এক বিরাট বাহিনী নতুন রাজাকে (নিমু ধল) বিতাড়িত করার জন্য ধলভূমগড় আক্রমণ করল। কিন্তু এই আক্রমণও নাকি ক্যাপ্টেন ফ্রবসের অধীনে প্রেরিত এক বাহিনী অল্প কালের মধ্যেই দমন করেছিলেন। কিন্তু ফ্রবসের ধলভূমগড় ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত সিপাহীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য পাঠানো হল লেফটান্যান্ট গুডিয়ারকে, সঙ্গে দেওয়া হল দু কোম্পানী সেপাই। কিন্তু অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না।

১৭৭৩ খৃস্টাব্দে রাজা জগন্নাথ ধল তাঁর অনুগত প্রজাদের একত্রিত করে পুনরায় নরসিংহগড় দুর্গ আক্রমণ করলেন। এবারের অভ্যুত্থান ছিল অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশী জোরদার। ধরণও ছিল অনেক বড়। ক্যাপ্টেন ফ্রবসকে পুনরায় পাঠানো হলো এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য। কিন্তু তেমন কিছুই করা গেল না, লুঠ-তরাজ এবং সিপাহীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চলতে থাকল অব্যাহতভাবে। এই বিদ্রোহ দমনে অসহায়তার কথা বর্ণনা করে মেদিনী-পুরের রেসিডেন্ট তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখেছিলেন—

'As soon as the harvest is gathered in, they carry their grain to the tops of the hills. or lodge it in other fastnesses, that impregnable; so that however they are pushed by a superior force, they retire to the places, where they are quite secure and bid defiances to any attack that can be made against them"

পরিশেষে তিনি জানাচ্ছেন,—

the Zamindars are refractory and the inhabitants are rude and ungovernable".

পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে দেখা দিল বিখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহ। জঙ্গল-মহলের অরণ্যচারী আদিবাসী সম্প্রদায় প্রধানতঃ অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করেই তাদের জীবিকানির্বাহ করতেন। কিন্তু এই অঞ্চলে ইংরেজদের অনভিপ্রেত আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে, বনজ সম্পদ ব্যবহারের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরম্ভ হয়। এর ফলে আদি-বাসী সম্প্রদায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সুযোগ বুঝে রাজা জগন্নাথ ধল এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলা-লেন। তিনি এগিয়ে এলেন তাঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। উপায়ান্তর না দেখে ভার-প্রাপ্ত লেফটান্যান্ট গভর্নমেন্টকে লিখলেন, এই উদ্ধত রাজা জগন্নাথ ধলকে পুনরায় সিংহাসনে বসানো ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই তাঁকে পুনরায় ধলভূমগড়ের দুর্গে অধিষ্ঠিত করার কথা সরকার যেন বিবেচনা করে দেখেন। তাছাড়া তিনি খবর পেয়েছিলেন,—

The hill fellows in the whole environs have agreed to join Jagannath Dhal or act in concert with him to drive our sepoys out of every part of the country".

শুধু তাই নয়, এই সময়ে তাঁর গোলা-বারুদও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। তিনি লিখেছেন, তাঁর অস্ত্রাগার ধ্বংসের জন্য মাত্র দু-তিনজন অসমসাহসী যুবকই যথেষ্ট। রাতের অন্ধকারে তাঁরা যদি চেষ্টা করেন তবে সিপাহীদের প্রাণপণ প্রতি-রোধ সত্ত্বেও তাঁরা কোম্পানীর অস্ত্রাগার ধ্বংস করে দিতে পারবেন। তাই বর্তমানে আমাদের অভিযান বন্ধ রাখা দরকার। এই অবস্থায় তাঁরা (বিদ্রোহীরা) আক্রমণ করলে, দুর্গ থেকে দূরেই তাঁদের প্রতিরোধ করতে না পারলে তাঁদের (বিদ্রোহীদের) জয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা সিপাহীদের থেকে সাহস এবং শৌর্যে কোন অংশেই কম নন, এবং সংখ্যায়ও সিপাহীদের থেকে অনেক বেশী, বন্দুক যেমন তীর-ধনুক অপেক্ষা অস্ত্র হিসাবে উন্নত তেমনি তীর-ধনুকও বেয়নেটের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। আর জগন্নাথ ধলকে বশে আনতে না পারলে সুবর্ণরেখার এই প্রান্ত থেকে মহা-মান্য কোম্পানী এক আনাও রাজস্ব আদায় করতে পারবেন না। এবং তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন এই ধরনের লুঠ-তরাজ এবং অগ্নিসংযোগ চালিয়ে যাবেন।... এমতাবস্থায় রাজা জগন্নাথ ধলকে পুনরায় সিংহাসনে বসানো যায় কিনা কোম্পানী যেন বিবেচনা করে দেখেন।...

যাই হোক ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে কোম্পানী রাজা জগন্নাথ ধলকে পুনরায় ধলভূমগড়ের রাজা বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। অবশ্য রাজা জগন্নাথ ধলও কোম্পানীকে নামমাত্র রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন।

বলা বাহুল্য অরণ্যচারী এই রাজার অনমনীয় প্রতিরোধের সংগ্রাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথাও ঠাঁই পায় নি,—তবু অখ্যাত নৃপতি তাঁর আদিবাসী প্রজাদের সহযোগিতায় ইংরেজ বণিকদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে যোজনা করেছেন এক আশ্চর্য উজ্জ্বল অধ্যায়।

নেপালী লোকসংগীত

নবকুমার ঘোষাল

নেপালী জাতীয় জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ লোকসংগীত। এই লোকসংগীতের মধ্যেই নেপালী গ্রামজীবনের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে। গ্রামীণ উৎসব, নৃত্য, গীত-বাদ্য—সবই লোকসংগীতের সহজ সুরে প্রাণবন্ত। চিরতুষার শুভ্র পর্বতের পটভূমিতে ঢাক ও বাঁশী বাজিয়ে গানগুলি গাওয়া হয়। এই সংগীত কৃষকের অন্তরকে নাড়া দেয়। দেশের প্রতি তার মমতা জাগায়। তার কঠোর পরিশ্রমের কথাও বলে। আর প্রকাশ করে জীবনের ছোটো বড় আবেগের লীলাবৈচিত্র্য।

গায়েনরা সারেঙ্গী বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে লোকসঙ্গীত গেয়ে বেড়ায়। সারেঙ্গী পার্বত্য অঞ্চলের একটা অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র। গায়েনরা যারা এই সারেঙ্গী বাজিয়ে গান গায়, তাদের গতানুগতিক চারণ কবি বলা হয়। বীর সন্তানদের বীরত্ব-কথা এবং অতীত মহাকাব্যের ঘটনাবলী তারা কবিতায় ধরে রাখে। কতকগুলি বংশ-পরম্পরায় মুখে মুখেই চলে আসছে। আবার কতকগুলি চলতি ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। চারণ কবিরা দরিদ্র। সাধারণত পেটের দায়েই তাদের গান গেয়ে বেড়াতে হয়। তবে গ্রাম-বাসীরা তাদের বিমুখ করে না। কারণ লোকসংগীত এবং নৃত্য তাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

গায়েনরাই হচ্ছে নেপালী লোক-সংগীতের ধারক ও বাহক। তারা যে কত দরিদ্র, তা তাদেরই একটি পদে জানা যাবে। পদটি নেপালে খুব জনপ্রিয়।

থনে ছমল ছহাইনা,

লৌগুহান সারঙ্গীকো তন্তি।

আমার খাবার মত চাল নেই। আমাকে সারেঙ্গীর তারে ঝংকার তুলতে দাও।

চৈত্র মাসে বসন্তকালীন ফসল কাটতে গিয়ে কৃষক যে গান গায়, তাতে বসুন্ধরার মাহাত্ম্য কথাই ধ্বনিত হয়েছে। এই বসুন্ধরাই তার মুখে অন্ন তুলে দেয়। তাই কৃষক গায়—

কতি রম্‌রো মেরাম্ভি পান্দ্রে গোরু,

কতি রম্‌শো মেরো হাল।

কতি রম্‌রো মেরো উব্‌জানি বালি,

রম্‌রো ছহা মিহিনেতকো ফল।

আমার বলদ জোড়া কেমন সুন্দর। কেমন সুন্দর আমার লাঙল। আমার উৎপন্ন ফসল কি ভালো। শ্রমের ফলও কত ভালো।

ধরতি আমাই, ধরতি বাবাই,

বস্‌বত পোশুহ্‌ অন্ন,

প্যারো মা গরছহ্‌, সন্‌মান গরছহ্‌,

ধরতি আমাই, ধন্য!

ধরিত্রী আমার মাতা, ধরিত্রী আমার পিতা। এর কাছ থেকে আমি শস্য পাই। ধরিত্রী, জননী, আমি তোমায় ভালোবাসি, সম্মান করি। তোমায় ধন্যবাদ!

নেপালের তিনটি শহর ও হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকটি সংগীতে গ্রাম্যকবির ভালোবাসার সহজ ধারণাটি প্রকাশ পেয়েছে।

হিমালই চুলি তয়ো পরিবত্ত

হিউন কাইলে জমিন্‌ছহ?

বাগে কো পানি উয়েকো চিত্ত,

কহন গয়ি থামিন্‌ছহ?

সেখানে হিমালয়-শৃঙ্গের উপরে কখন তুষার জমবে? বেগবতী নদী আর উড়ন্ত হৃদয়, কোথায় গিয়ে তারা থামবে?

সুন জাস্‌তো নেপাল কে

রম্‌রো দেখছহ,

স্বর্গ ছহ সন্‌সারম।

সুন জাস্‌তো প্রেম্‌লে

সুন জাস্‌তো দেখছহ,

মায়াকো সন্‌সারম।

আমাদের সোনার নেপাল দেখতে কত সুন্দর। এই পৃথিবীতে এ যেন স্বর্গ। প্রেমের জগতে আমার সোনার প্রেয়সী দেখতে ঠিক চাঁদের মত।

হিমালয়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রেমিকের অন্তরে শান্তি নেই। সে আর বাঁশী শুনতে চায় না। কারণ বাঁশীর সুর তার বিচ্ছেদ বেদনাকে আরো দ্বিগুণ করে তুলবে। প্রিয়জন বিচ্ছেদে হৃদয় অস্থির বলে সে সুন্দর হিমালয় প্রকৃতিকেও উপভোগ করতে পারছে না। প্রেমিকের এই বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে গ্রাম্য কবির গানে।

হিমালই চুলি কে য়তি রম্‌রো,

সর্পকে কাঞ্চুলি।

য়ো পাপী মন্‌মে বিরহ ছল্‌য়ো,

ন বাজাউ বান্‌সুরি।

সাপের খোলসের মত হিমালয় শৃঙ্গ কত সুন্দর! এই পাপী আমার হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত করেছে। তুমি আর বাঁশী বাজিও না।

গৃহস্বামীকে সামরিক কাজে যোগ দেবার জন্যে ঘর বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে যেতে হয়। তখন কতকগুলি পারিবারিক সমস্যা এসে দেখা দেয়। সেই সময়ে বধূ একমাত্র শাশুড়ীর কাছেই নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সব কিছুর চাহিদা ভুলে গিয়ে সে বৃদ্ধা শাশুড়ীর স্নেহের স্পর্শ পেতে চায়। তখন শাশুড়ীই তার একমাত্র অবলম্বন।

চোলিয়াই মালাই চহিন্‌ দাইনা বজ্যাই,

তিম্‌রি পিয়ারি, কথাই, তিম্‌রি পিয়ারি!

পাতুক মালাই চহিন দাইনা, বজ্যাই,

তিম্‌রি পিয়ারি, কথাই, তিম্‌রি পিয়ারি!

আমি ব্লাউস চাই না, মা। আমি তোমার ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা। আমি শাড়ি চাই না, মা। আমি তোমার ভালোবাসা চাই, ভালোবাসা।

যে গুণের জন্যে নেপালবাসীরা বিশ্ব-বিখ্যাত, সেই অসমসাহস ও শৌর্যবীর্যও কতকগুলি লোকগীতের উপজীব্য হয়েছে। বীর পিতার বীরপুত্র বাঘ শিকার করেছে। বাঘ শিকারের অদম্য সাহস তার মুখে প্রতিফলিত হচ্ছে। গীতিকার এই কথাই ভারী সুন্দর করে বলেছেন।

বীর বাবাকো ছোরো মা বাঘকো শিকার,

দেউতলে দিই যবনি,

দেউতলে দিই নি য়ো রূপ।

বীর বাবাকো ছোরলে মারিদিই নি বাঘ,

ছেহ রাইমা উনকো ফল

কস্তহ বাহাদুরি।

বীর পিতার পুত্র বাঘ শিকার করেছে। ঈশ্বর তাকে যৌবন দিয়েছেন। আর দিয়েছেন রূপ। বীর পিতার পুত্র বাঘ মেরেছে। বাঘ শিকারের সাহসে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অকটোবর কিংবা নভেম্বর মাসে দেওয়ালীর সময়ে পাঁচদিন ধরে নেপালে 'দুসহরা' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে নেপালবাসীরা ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীকে শ্রদ্ধা জানায়। কেবলমাত্র এই পাঁচদিনই তারা ইচ্ছেমত জুয়া খেলতে পারে। এটা দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত। উৎসবের শেষদিন অর্থাৎ পঞ্চম দিনটি 'দেউসে' নামে পরিচিত। এইদিন ছেলেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রতিটি বাড়ির সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে বাসনা জানায় এবং তার বিনিময়ে কিছু পয়সাও আশা করে।

গ্রামপ্রধান নেপালের জাতীয় জীবনের মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে এইসব লোক-সংগীতে। এই সংগীতগুলিকে নেপালের জাতীয় সম্পদ বলতেও দ্বিধা নেই। এগুলি বাদ দিয়ে নেপালের অন্তরাত্মাকে বোধহয় জানা যাবে না। আধুনিক সাহিত্যের প্রসার নেপালে নিশ্চয়ই হয়েছে। তবুও বলতে হয়, লোকসংগীতগুলিই হিমালয় রাজ্য নেপালের প্রাণ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতের যেমন একটা সর্বজনীন মানবিক আবেদন আছে, নেপালী লোকসংগীতগুলিরও ঠিক তাই।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

(এগারো)

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সুনন্দিতা. এটা সে পারে। তার ঠোঁট আর চিবুকের মাঝখানে সেই দৃঢ়তার চিহ্নটা আবার ফুটে উঠতে দেখল পরেশ। আর দিনে দিনে বেশ খানিকটা মুটিয়ে যাচ্ছে সুনন্দিতা। আপাতদৃষ্টে মনে হয় না, ওর ভিতরে তেমন কোন অসুখী-ভাব আছে। শুধু চোখের নীচে বাদামী ছোপগুলো যা স্পষ্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে। সেটা অনিদ্রার দরুণ না হতেও পারে।

সুনন্দিতা খুব বড় ঘরের মেয়ে—পরেশ জানে। চেহারাতেও উঁচু ঘরানার ছাপ উজ্জ্বল। কাশিমবাজারের এক হৃতমান বংশের এই দুলালীটিকে নুটুবাবু এক-রকম লুঠ করেই এনেছিল। ওর বাবা-মা এখন ছোটমেয়ের কাছে জব্বলপুরে আছেন। একমাত্র ভাই—নুটুবাবুর বন্ধু, চীন-ভারত যুদ্ধে মারা যায়। সুনন্দিতা বিয়ের পর থেকেই ওদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত।

পরেশ এখানে আসার পরই টের পেয়েছিল এ দম্পতি অসুখী। সুনন্দিতার জন্যে তার সমবেদনা ছিল বরাবর। মাতাল হয়ে নুটুবাবু বউর ওপর কম জুলুম করত না। পরেশ ড্রাইভারকে এসব হাঙ্গামা সামলাতে হত। নুটুবাবু গর্জন করত—খবর্দার পরেশ! তুমি আমার ড্রাইভার—তুমি শালা চাকরের বাচ্চা চাকর—কক্ষনো আমার ঘরে ঢুকবে না। গালি মার দেগা হাম।...পরেশ জানত নুটুবাবু তাকে মনে মনে ভয় করে। তাই তার হাত থেকে গুলীভরা বন্দুক কেড়ে নিতেও পিছপা হত না সে। আর নুটুবাবু যখন ঘরে নেই, সুনন্দিতার সঙ্গে সে এখানে আড্ডা দিত। সুনন্দিতার মনের অনেক খবর সে টের পেত। সত্যি বলতে কী, সুনন্দিতার দুর্বলতার পুরো সুযোগ পরেশ নিয়েছিল। তা না হলে সে আজও সামান্য ড্রাইভারই থেকে যেত। সুনন্দিতা স্পষ্ট বলত, আমার ভবিষ্যত কী—তা-তো বেশ জানি। ছেলেপুলেরও কোন আশা নেই। মাতালের পাল্লায় পড়ে শেষ বয়সে আমায় পথে-পথে ভিক্ষে করে বাঁচতে হবে। তার চেয়ে তুমি কিছু করে নাও পরেশ। তুমি দাঁড়াতে পারলে হয়তো আমিও পায়ের নীচে মাটি পাবার প্রত্যাশা রাখি।

হ্যাঁ, পরেশ কৃতজ্ঞ সুনন্দার কাছে। নুটুবাবু যে টাকা হয়তো মদে জুয়ায় স্ফূর্তিতে কিংবা দূর দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে খামখেয়ালী শিকার অভিযানে খরচা করে উড়িয়ে দিত—সে টাকা সুনন্দিতার সহযোগিতায় পরেশের পকেটে গিয়ে ঢুকত। নুটুবাবু টের পেত কি-না কে জানে? তবে শেষদিকে পরেশকে সে যেন সন্দেহের চোখে দেখত। অবশ্য সেটা তার বউর ব্যাপারে—টাকা-পয়সার দরুণ নয়। সুনন্দিতাকে সে বিশ্বাস করতে পারত না। সুনন্দিতা দেহ-মনে তাকে যেন নিরন্তর ঠকিয়েছে। নুটুবাবুর মনে অজস্র প্রতিদ্বন্দ্বী কাল্পনিক পুরুষের ছবি ছিল—যারা সুনন্দিতার দেহ-মনের সারাংশ মেরে দিচ্ছে। আর 'আমি শালা হ্যাংলা কুকুরের মতো একপাশে একটুকরো এঁটো হাড় কামড়াচ্ছি।' এই হল কিনা নুটুবাবুর অবিশ্রান্ত খেদোক্তি।

অথচ আগাগোড়া ব্যাপারটা অসত্য। পরেশ সুনন্দিতার কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে বড়জোর নিছক ছুঁয়েছে মাত্র—তার বেশি কিছু কদাচ নয়। এমন কি একদিন সুনন্দিতা কী কথায় হাসতে হাসতে পরেশের গায়ের ওপর পড়েছিল—নির্জন ঘরে, তবু নয়। পরেশ খালি টাকা চিনত। বরাবর টাকা চিনে গেছে। যেন তার ওইটেই একটা নিষ্কাম সুতীব্র সাধনা।

আর আজ এতদিন পরে সে টাকার কথা ভুলে সুনন্দিতাকে দেখছিল। হ্যাঁ, আজই। এতদিন ধরে যে চারদিকে কত কেলেঙ্কারীর গুজব রটেছে, স্নেহধারার সঙ্গে কত কী হয়ে গেছে—তা ছিল মিথ্যাকে কেন্দ্র করে গড়া। আজ কিন্তু ভিতরে একটা অন্য ক্ষুধার উদ্রেক সে লক্ষ্য করল। তার শরীর শিরশির করে উঠল। কার সামনে সে বসে আছে? কার কাছে সে আনাগোনা করেছে এতদিন? তার মানবীসত্তার দিকে রক্তমাংসের দিকে পরেশের চোখ পড়ল। মনে হল, খুব একটা ভুল করা গেছে। টাকা চেয়েছিল কিন্তু টাকা একটা জিনিসকে তার আয়ত্তে আনতে দেয়নি। এখনও দিল না। সেটার নাম স্বস্তি। আজ হঠাৎ কেমন করে টাকার প্রয়োজনও তুচ্ছ হয়ে পড়ল কে জানে। ক্লান্ত, ক্লান্ত এবং ক্লান্ত! ধাবমান গর্জনকারী একটা শক্তি তাকে অবিশ্রান্ত রাতের পর রাত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটুও বিশ্রাম দেয় না। কিন্তু আজ বিশ্রামের দরকার। তার লোলুপ চোখ সুনন্দিতাকে বিশ্রামের আশ্রয় চেয়েছিল। এবং হঠকারী তীব্র আকর্ষণে সে দ্রুত উঠে গিয়ে সুনন্দিতার পাশে বসল। পিঠে হাত রাখল।

সুনন্দিতা ততক্ষণে অবশ্য সামলে নিয়েছিল নিজেকে। পরেশকে এভাবে কাছে দেখে সে খুব আস্তে বলল 'বল্লাস আছে। তুমি সরে বসো লক্ষ্মীটি।

পরেশ সোফায় হেলান দিল। সুনন্দিতার পিঠ থেকে হাতটা তুলে সেই হাতে কফির কাপটা নিল। চুমুক দিতে থাকল।

সুনন্দিতা একটু সরে বলল, তুমি এসে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দিলে। জ্ঞানবাবুর মেয়ের জন্যে বুনছিলুম ওটা। বলেছি আজ রাতেই শেষ করে দেব। সকালে এসে গায়ে চাপিয়ে বাড়ি যাবে। দ্যাখো তো, এখন কী করি!

পরেশ বলল, জ্ঞানবাবুর মেয়ের সোয়েটারের অভাব নেই। যাদের অভাব আছে—তাদের......

সুনন্দিতা ঘুরে বসল। ...তোমার ধারণা যে গরীবদুঃখীদের জন্যে আমি কিছু দিইটিই নে? এই তো—এবার পুজোতেও কাপড় দিয়েছি। ইচ্ছে আছে, ধানটান উঠলে কিছু কম্বল দেব।

পরেশ হাসল।...ও নিয়ে কিছু হয় না। যাক গে। একটা কথা বলি। চলো না কোথাও কদিনের জন্যে ঘুরে আসা যাক। যাবে?

আমারও কেমন ভাল্লাগে না কিছু।

কে যাবে? তুমি? আমার সঙ্গে?

কেন? আপত্তি আছে তোমার? সেবার তো গিয়েছিলে মেসেঞ্জোর!

সে স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলুম।

তাও বটে। —বলে পরেশ চুপ করে রইল।

সুনন্দিতা বলল, আমি খুব পারি। তুমি পারবে না—তা দিব্যি কেটে বলতে পারি। ফিরে এলে বউ তোমাকে ঝাঁটাপেটা করে ছাড়বে না!

ফিরে না এলে কী হয়?

সুনন্দিতা ওর চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, কী বললে?

কানে কি কম শুনছ আজকাল?

সুনন্দিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, তুমি সাহসী মানুষ—তা জানি। কিন্তু সব জায়গায় তো শুধু সাহস দিয়ে কিছু করা যায় না। বসো, আসছি।...

পরেশ একটু আগে তার বলা কথাটার গুরুত্ব টের পেল সুনন্দিতা চলে যাবার পরই। চমকে উঠল। এবং অদ্ভুতভাবে ভালোও লাগল। ফিরে না এলে কী হয়। ঠিক এই কথাটাই কি সে বলে বসেছে? কী মানে হতে পারে এর? হতে পারে অনেক কিছুই। হাতের মুঠোয় অজানতে সাপ ধরে ফেলেছিল যেন। বিষদাঁত সুদ্ধ সাপের মাথাটা চেপে ধরে থাকতে তার এত ভাল লাগছে!

কিন্তু এখনও সময় হয়নি—দেরী আছে সে-সুসময় আসার। সংসারের ক্ষেতে অনেক বীজ সে বুনেছে পরিশ্রমী চাষার মতো। সেই ফসল—তার বউ-ছেলেমেয়ে টাকাপয়সা ঘরবাড়ি, সবকিছু মাঝে মাঝে দূরে থেকে তাকিয়ে বড় ভালো লাগে। অথচ সেখানেই সে নিজেকে সমাপ্ত দেখতে সুখী হয় না। আরো আছে—আরো কোন সংসার, বীজ এবং ফসল। আশ্চর্য লাগে পরেশের। একদিন ভালো খাওয়াপরা স্বচ্ছন্দ সচ্ছল জীবনযাপনকেই অনন্ত সুখের খনি মনে হত। আজ একটু করে তা সব বিস্বাদ লাগছে।

নাকি এই স্ববিরোধই তার স্বভাবে নিহিত। তাই সারা জীবনে বারবার সে পেশা বদলেছে। এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঝাঁপ দিয়েছে। নাকি পয়সা রোজগারটাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ভাবা যায় না যে কী আক্লেশে একজন মানুষ হারমোনিয়াম মেরামত করতে করতে ইলেকট্রিক তারের দিকে কারিগরীর আঙুল বাড়াতে পারে, এবং ফের কী সহজে মোটরগাড়ির স্টিয়ারিংটা ধরে ফেলে!

আর এখন, পরেশের হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, কলক্রমে তার পায়ের নিচে কিংবা শরীরের কোথাও কোথাও অদ্ভুত সব চাকা গজিয়েছে। তার অস্তিত্ব থেকে গতির গর্জন বাজছে। ধাবমান বিশাল ট্রাকের মতো তার সে অস্তিত্ব, এবং অবিশ্রান্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা উপযুক্ত কঠিন কংক্রিটের হাইওয়ে—যে রাস্তার কোন শেষ নেই। সে মাঝে মাঝে চন্দনকে ঠাট্টার স্বরে বলে, দ্যাখো তো হে আমার হাঁটুর কাছটায় টাকার অঙ্কুর গজাচ্ছে নাকি? শালা—ঠিক ওইরকম মনে হয়। আস্ত গাড়ি হয়ে উঠছি যেন। ...

পরেশের ভয় হল। এই ভীষণ গর্জনকারী গতিবান শক্তির ভারী চাকার নিচে স্নেহধারা—লতু-সনতুরা গুঁড়িয়ে পিষে খতম হয়ে যাবে না তো?

সুনন্দিতার কথা শোনা যাচ্ছিল কিচেনের দিকে। সে আসবার আগেই পরেশের চলে যেতে ইচ্ছে হল। পরেশের মনে উদ্দাম ঝড় এখন। শরীর অবশ লাগছে। যেন এই-সব সময় বড় হঠকারী—ত্বরিতে অঘটন ঘটাতে পারে। অশান্তির আবহাওয়াটা ক্রমে খুব স্পষ্ট হতে লেগেছে। সে উঠে দাঁড়াল তক্ষুনি। আর কুকুরটা তার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্বলজ্বলে চোখে তাকে দেখতে থাকল। মনে হল, কুকুরটা তার অবস্থা টের পেয়ে গেছে। সে তাকে পালাতে দেবে না বলে সাবধানে পথ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে।

ও কি। চলে যাচ্ছ নাকি? —সুনন্দিতা পিছন থেকে বলল। পরেশ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে হাসবার চেষ্টা করছিল। সুনন্দিতার মুখেচোখে এবং সারা দেহে কিছু ঝিলিক—যা যে কোন বিধবার পক্ষে ভারি অশ্লীল। অথচ সুনন্দিতাকে সেগুলো চমৎকার মানিয়ে যায়। বৈধব্য তার মতো মেয়েকে মোটেও ছুঁতে পারেনি—পরেশের মনে হল।

পরেশ বলল আসি। ঘুম পাচ্ছে। কদিন রাত জাগার ধকল যা গেল।

ঘুমোবে?... কেমন হাসল সুনন্দিতা। আমি তো তোমার খাবার যোগাড় করে এলুম ওদিকে। হাঁস মারতে বললুম।

এত রাত্রে! হাঁস মারতে বললে!—পরেশ আঁতকে উঠল। —তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

মাথা খারাপ তো তোমার। তাই আবোল তাবোল কী সব বলছিলে। —সুনন্দিতা এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। ড্রয়ার খুলে এক প্যাকেট তাস বের করে ফের বলল, বেশি দেরী হবে না। মোটে তো সাড়ে আটটা। দশটার মধ্যে খাওয়া হবে। তারপর ঘুমোতে যেও। ততক্ষন এস তাস খেলি। নাকি লুডো খেলবে?

পরেশ ইতস্তত করে বলল, দুজনে কী তাস খেলব? নাঃ, আজ আসি। ঘুম পাচ্ছে।

সুনন্দিতা চটুল হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেলে—তাই না পরেশ?

ভয়? তীক্ষ্নদৃষ্টে তাকিয়ে পরেশ জবাব দিল। —কী জানি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ভয় তুমিই পেয়েছ। তাই ...

সুনন্দিতা পাখা বাড়িয়ে ওর হাত ধরে টানল। —ফেট। সবতাতেই জেদাজেদি তোমার। হাঁসটার কী হবে? এতক্ষণ বিলাস মুণ্ডু কেটে রক্তারক্তি করেছে। এস।

পরেশ অগত্যা বসল। বসে বলল, তুমি তাহলে এখনও পালন-টালন সুরু করনি?

কিসের পালন?

এই যে হবিষ্যি নিরামিষ—আর কী সব করেটরে।

সুনন্দিতা তাস শাফল করতে করতে বলল, গোড়া থেকেই করিনি—আর এতদিন পরে! আজেবাজে কথা ছাড়ো। খেলায় মন দাও।

দুজনে খেলার এই মজাটা পরেশই একদা শিখিয়ে দিয়েছিল সুনন্দিতাকে। প্রথমে চারখানা করে তাস নেবে দু-পক্ষ। একই রঙের নম্বর পরপর মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। বাকী তাসগুলো থেকে না দেখে একটা করে তুলবে—রং মিলিয়ে সেটা রাখবার হলে রাখবে, নয়তো ফেলে দেবে। সবসময় হাতে কিন্তু চারটে তাসের বেশি থাকবে না। যখনই চারটে তাস একই রঙের পরপর নাম্বারে মিলে গেল এক পয়েন্ট পেল সে পক্ষ। আরও অনেক মজার

মজার খেলা পরেশ জানে। ম্যাজিকও জানে কতরকম। সুনন্দিতাকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত। সুনন্দিতা শিখেও নিয়েছিল কিছু। সেসব দিন গেছে যেন স্বপ্নের মতো। নুটুবাবু ঘরে নেই। পরেশ গাড়ি নিয়ে ফিরেছে দুপুরবেলা। স্নেহধারাকে লুকিয়ে এক ফাঁকে পরেশ এসে আড্ডা দিয়েছে ভিতরের ঘরে।

এই, আমার পয়েন্ট হল —সুনন্দিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হরতনের বিবি গোলাম দশ নয় দেখিয়ে দিল।

পরেশ তাস দেখাল। ইস্কাবনের দশ সাত ছয় হরতনের সায়েব। সে বলল, ঠিক করতে পারছিলুম না কোন রঙটা সাজাবো। ইস্কাবন রাখছিলুম—হঠাৎ হরতনের সায়েবটা এসে গেল। ভাবলুম,

সুনন্দিতা বলল, কী ডাকাত রে বাবা! আমার সায়েব নিয়ে বসে আছ। এদিকে বিবি বেচারা কেঁদে সারা! —হাসতে হাসতে সে গড়িয়ে পড়ল সোফায়।

এখনও 'পেসেন্স' খেল নাকি? —পরেশ আনমনে প্রশ্ন করল।

খেলি। একা আর কী করব? ভাগ্যিস শিখিয়েছিলে।

বইটই পড়লে পারো?

ভাল্লাগে না। পরেশ! ফের পয়েন্ট মেরেছি! আজ কী কপাল আমার! সুনন্দিতা তাস মেলে ধরল। —দু পয়েন্ট। শেষে গোলমাল করো না কিন্তু।

পরেশ তাস তুলে বলল, ধ্যুৎ! কিছু মিলছে না।

আসলে তুমি মনই দিচ্ছ না খেলায়।

উঁ?

কী? হয়েছে কী তোমার, শুনি?

পরেশ বিপন্ন মানুষের মতো অসহায় মুখে জবাব দিতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ—কিছু একটা হয়েছে—খুব গুরুতর—কিন্তু সেই সময় বিলাস বাইরে থেকে বলল, হয়ে গেছে মা। একবার আসুন ইদিকি।

সুনন্দিতা বলল, বিলাসকা লক্ষ্মীটি! মাংস কেটে ধুয়ে রাখো না একটু। আমি যাচ্ছি।

পরেশ একটু হেসে বলল, বুড়ো খচে আমাকে দেখে। তুমি যাবে তো যাও—নৈলে কী কাটতে কী কেটে বসবে।

সুনন্দিতা হঠাৎ লাফিয়ে এসে ওর হাত ধরল। —আরে, তুমিও তো চমৎকার রান্না করো। তাস থাক। চলো রান্না করবে।

পরেশ আড়ষ্টভাবে বলল, চলো।

সুনন্দিতা বয়স ফেলে পিছনে চলে গেছে যেন। পরেশ একটু অবাক হল। বেমানান লাগছে সুনন্দিতার এ উচ্ছ্বাস এ চপলতা। ক্রমশ তার অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছে। অথচ সুনন্দিতাকে ছেড়ে চলে যাবার মত জোরও সে খুঁজে পাচ্ছে না। সে তাকে অনুসরণ করে কিচেনে ঢুকল। দেখল বিলাস মাংস কাটছে। মুখটা বিকৃত। ওদের দেখে সে বলল, বঁটিটা শান দিতে হবে। ধারটার নেই গো।...

লতু-মানতুরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রুমা আজ পাশের ঘরে একা শুয়েছে। জমাইবাবু বাড়ি থাকলে সে দিদির ঘরে শোয় না। স্নেহধারা টেবিলঘড়ির দিকে তাকাল। রাত সাড়ে দশটা। পলকে ঘুমের আমেজ কেটে গেল তার। পরেশ এখনও ফেরে নি। সে বাইরে এসে দাঁড়াল। সামান্য আলোর ছটায় বাইরের ঘন কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। শীত পড়েছে বেশ। নিঃঝুম হয়ে পড়েছে রূপপুর। আজ স্নেহধারার জেগে থাকবার প্রবল চেষ্টা—একটা সুন্দর আকাংখিত আনন্দের প্রস্তুতি চলেছিল মনে সন্ধ্যা থেকেই। পরেশের প্রতি অন্তত আজ একটুও অনুযোগ অভিযোগ মনে ছিল না। আহা, এখন বেচারা হয়তো সত্যি সত্যি ফুরসৎ পায় না—এত কাজের চাপ! করুণায় মমতায় দুঃখে স্নেহধারার মেয়েমন টলটল করছিল। যখন টাকাপয়সা ছিল না, দারিদ্র্য আর হতাশার ছিল সর্বকিছু হতশ্রী—তখন স্বামীকে সে নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েছে। আজ টাকাপয়সা আর সচ্ছলতা যখন এল তখন স্বামীকে যেন বেচে দিতে হল তাদের কাছে। অথচ সবগুলোই সে মেয়ে হিসেব পেতে চায়। টাকাপয়সা স্বাচ্ছন্দ্য স্বামী—সব একসঙ্গেই তার দরকার। এ এক দুর্ভাগা স্নেহধারার যে পরেশ ক্রমাগত তার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। সেই গুরুতর শঙ্কায় সে সবসময় আড়ষ্ট। হাসিখুশি থাকাটা তার নিজের কাছেই নিন্দনীয় হয়ে পড়ে।

স্নেহধারা অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছিল। বারান্দায় সে থামের পাশে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কেন এত দেরী হচ্ছে পরেশের? হাজার কথায় তোলপাড় হতে থাকল তার মনে। কিছুক্ষণ পরে আর ধৈর্য ধরতে পারল না সে। গ্যাঁদাকে একবার পাঠাবে চন্দনের ওখানে? হয়তো তাসটাস খেলছে—কিংবা...

শিউরে উঠল স্নেহধারা। তার বুকের ভিতর কান্নার প্রবল চাপ ঠেলে উঠল। রান্নাঘরের পাশে ঘুপটি তিনদিক ঘেরা জায়গাটায় খাটিয়া পেতে গ্যাঁদা ঘুমোয়। সে ওকে চুপি চুপি ডাকল, গ্যাঁদা, ওরে! শুনছিস? গ্যাঁদা?

রুমা পাছে জানতে পারে, তাই সাবধানে সে ওকে জাগানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু এত ঘুম ছেলেটার! ঠিক মড়ার মতো নিস্পন্দ ঘুমোচ্ছে। গুঁতো-গুঁতিতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চাপা গলায় কানের কাছে মুখ রেখে অনবরত ফিসফিস করে ডাকল স্নেহধারা। ছেলেটার গায়ে কেমন কটু গন্ধ। ভিতর-ভিতর এত নোংরা হয়ে থাকে ও, স্নেহধারা জানত না। পুরু খসখসে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই কম্বলটা পরেশের ড্রাইভারী আমলের জিনিস। সেই পুরনো গন্ধটাও টের পাচ্ছিল স্নেহধারা। কেমন যেন কলকব্জার গন্ধ—স্মৃতির দিকটা কাঁপিয়ে দেওয়া! স্নেহধারা গ্যাঁদার চুল টেনে দিলে 'উঁ' শব্দ করে পাশ ফিরল মাত্র। জাগল না তবু। স্নেহধারা রেগে চাপা গলায় বলে উঠল, কী ঘুম বাপু! বাড়িতে একটা আপদ-বিপদ হলেই বা কী! চাদ্দিকে শত্তুর—আর এই পুঁচকে দারোয়ান বসিয়ে যায় আগলাতে। হুঁঃ! আবার বলে কি না—গ্যাঁদা তো রইল! এই ছোঁড়া! উঠবি একবার?

দরজা খোলার শব্দে স্নেহধারা কাঠ হয়ে গেল। রুমা বেরিয়েছে। সে স্নেহধারাকে দেখে বলে উঠল, ওখানে কী করছ?

স্নেহধারা উঠে দাঁড়াল।...ছোঁড়াটা কী নোংরা হয়ে ঘ্নোর রে! বিছানায় হয়তো পেচ্ছাপও করে। ছিঃ, ওর হাতে আমরা খাচ্ছি!

রুমা শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল, হঠাৎ আবার ওর পিছনে লাগলে কেন? জামাইবাবু আসেনি?

গম্ভীরমুখে স্নেহধারা জবাব দিল, না।

অসবে'খন। তুমি ঘুমোওগে মা। আমি জেগে আছি। আসবে'খন।

স্নেহধারা তার ঘরের দিকে এগোল। কিন্তু দরজা অব্দি গিয়েই আর নিজেকে গোপন রাখতে পারল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, রুমা, এক কাজ করতে পারিস?

কী?

যে মানুষ—বলা যায় না। হঠাৎ আবার যায় চড়লে কোথায় গাড়ি নিয়ে চলে গেলেই হল। এদিকে কে খেল না-খেল, কী ঘুমুল, সেদিকে কে খোঁজ রাখে—কেই বা ভাবে!

রুমা বলল, না না। আজ কোথাও যাবে না তো। বলে দিয়েছে। আমি জানি।

স্নেহধারা একটু রেগে উঠল।... আমার বুঝি ক্ষিদেটিদে নেই? রাত বারোটা বাজতে চলল, কারো খেয়াল আছে? এ্যাদ্দিন তো না-খেয়ে না-খেয়ে পিত্তি জ্বালিয়ে মেরেছে— এখন সামনে ভাতের থালা নিয়ে উপোস করো। কী, পেয়েছে কী আমাকে?

রুমা একটু হাসল।...বারে! তুমি খেয়ে নিলেই পারো। খাচ্ছ না কেন?

যা বুঝিস নে, তা নিয়ে কথা বলতে আসিসনে। তুই শোগে যা।...স্নেহধারা আরো রেগে গেল এবার।

রুমা হাসতে হাসতে বলল, বড় মুসকিলে পড়া গেছে!' এমন আদিখ্যেতা করে নাকি কেউ! স্বামী-স্ত্রী তো অনেক দেখছি বাবা! তোমাদের মতো আর একটিও নেই। কেট্!

স্নেহধারা আরও রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল—কারণ, রাগটা সাবধানে বাঁচিয়ে নিরাপদে শান্ত থাকাটাই তার আজ রাতের একান্ত ব্রত। সে হাসিতে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিল অনেক ব্যর্থ হতাশ রাতের পর এই একটা রাতকে। তাই হেসে ফেলতে তার দেরী হল না। এবং সৎসাহসে, সে চাপা গলায় বলল, রুমা—চন্দনের ওখানে একবার খবর দেওয়া যায় না রে? এত দেরী হচ্ছে যখন, ঠিকই কিছু হ্যাঙ্গামা হয়েছে।

রুমা বলল, কী হবে আবার?

কী জানি! ওর তো আবার চারদিকে সব শত্তুর। এত দেরী তো হবার কথা না।

কিন্তু যাবে কে এখন? আমি বাবা পারব না, বলে দিচ্ছি।...

রুমা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে স্নেহধারা কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল সে। ঘরে ঢুকল। সাত-ব্যাটারি একটা টর্চ আছে পরেশের। টর্চটা নিল সে। চাবির গোছাও নিল। নিঃশব্দে দরজায় তালা দিল। ভিতরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক।

বাড়ির সদর দরজাতেও বুদ্ধি করে তালা আটকে দিল স্নেহধারা।...

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল দুজনে। মাথার ওপর আদ্যিকালের সেই জাম-গাছটা। পায়ের মাটির ওপর একদা একটা গ্যারাজঘর ছিল—যেখানে ছিল একজন সামান্য ড্রাইভারের সংসার। এখানটায় বাড়ির সামনের আলো পৌঁছয় না। ঘন ছায়ার সঙ্গে অন্ধকার ওতপ্রোত হয়ে গেছে। ক'পা এগোলেই সরু রাস্তাটা। পরেশ বলল, তাহলে আসি।

সুনন্দিতা তার এত কাছে যে গায়ে-গায়ে ছোঁওয়াছুঁয়ি হচ্ছিল। সে সম্ভবত নিঃশব্দে হাসছিল। এইসব সময় মেয়েদের ভারি রহস্যময় লাগে। সে বলল, বেশ ভালো লাগল—অনেকদিন পরে। আসা তো ছেড়েই দিয়েছ।

এবার আসব। আমারও বেশ কাটল।

আচ্ছা পরেশ!

বলো।

সত্যি বলছি, একবার চলো না কদিন কোথাও ঘুরে আসি।

পরেশ হাসল।...পরেশ মজুমদার খুব সাংঘাতিক লোক রূপপুরে—তা জানো তো? তার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে সবাই অনেক ভেবেচিন্তে তবেই পা বাড়ায়। হ্যাঁ, একটা কথা। কদ্দিন থেকে মাথায় ছিল—বলা হচ্ছিল না। কথাটা সিরিয়াসলি বলছি—শোন। আমাদের নতুন কোম্পানী হয়েছে, শুনেছ?

শুনেছি। অমিত বলছিল।

এক কাজ করো। তুমি কোম্পানীর একটা মোটা শেয়ার নাও।

আমি? সুনন্দিতা হাসল।...অত টাকা কোথায়?

টাকার ভাবনা তোমার নেই। সে আমি ম্যানেজ করব। শোন, কাল চন্দনকে পাঠাব তোমার কাছে। কাগজপত্র সব দেখেটেখে সই করে দেবে। নেক্সট মিটিং-এ পাস করিয়ে নেব।

না, না! আমাকে ওসবে জড়ানো কেন? আমি মেয়ে—ওসব কী বুঝি?

পরেশ নিঃসঙ্কোচে সুনন্দিতার কাঁধে হাত রাখল। একটু হেসে বলল, বুঝতে দেরী হবে না। আমার এ-কথাটা তোমাকে রাখতেই হবে কিন্তু। কারণ আছে, পরে বলব'খন। না—না, ভাববার কিছু নেই। তোমার সাহায্য আমার দরকার।

ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরটা গরগর করে উঠল আর তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল গাছপালার ফাঁক দিয়ে—রাস্তাটা থেকে। চকিতে দুজনে সরে দাঁড়াল। পরেশ ক'পা এগিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, কে আলো ফেলছে রে? কে তুই?

এ-পরেশ অন্য পরেশ। আলোটা স্থির। নেভেনি। পরেশ ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফের, কোন শুওরের বাচ্চা? কথা বলছিস না কেন?

সে লাফ দিয়ে কাছে চলে গেল। টর্চটা কেড়ে নেবার মুহূর্তে তার পা থেকে মাথা অব্দি একটা চমক শিসিয়ে উঠল। পরেশ ফিসফিস করে বলল, তুমি!

স্নেহধারা চেরা গলায় চেঁচাল সঙ্গে সঙ্গে—ছোটলোক! ইতর! জানোয়ার!

ক্ষিপ্রহাতে ওর মুখ চেপে ধরে একটু ঘুরে পরেশ দেখল, সুনন্দিতা হাল্কা পায়ে লন পেরিয়ে বারান্দায় উঠছে। আর বিলাস—শয়তান বিলাসবুড়ো কুকুরটার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। কুকুরটা সমানে গরগর করছে।

পরেশ স্নেহধারাকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে গেল। স্নেহধারা ছটফট করছিল। অব্যক্ত গোঙানি উঠছিল। পরেশ চাপা গলায় বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিলু? এ তুমি কী করছ? চুপ, চুপ। সব বলছি—শোন।

স্নেহধারা তাকে এবার দুহাতে খামচাতে শুরু করেছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাস আর ফোঁপানির শব্দ উঠছে অন্ধকারে। গাছপালার ভিতর অন্ধকারে যেন দুটি প্রাগৈতিহাসিক জীবের ধস্তাধস্তি চলেছে। পরেশ অবশ্য তাকে সামলানোর চেষ্টা করছিল।

একটু পরেই সে স্নেহধারাকে তার হাত থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে দেখল। রাস্তার শক্ত খোওয়ায় মুখ ঘষে স্নেহধারা গোঙাচ্ছিল। পরেশ হিসহিস করে বলল, যদি চুপচাপ আমার সঙ্গে না উঠে এস, আমি চলে যাব বলে দিচ্ছি। থাকো তুমি, এখানে পড়েই থাকো। আমি যাচ্ছি। বিলু, শেষবার বলছি, খিটকেল করো না।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর সে হন-হন করে একা চলতে শুরু করল। অন্ধকারে মাটিতে আহত সরীসৃপের মতো স্নেহধারা তখনও ছটফট করছে।

([illegible])

সংলাপে—অগ্নিযুগ-স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(শ্রীমদ্ স্বামী নিরালম্ব)

ত্রিভঙ্গ রায়

আটত্রিশ

গোমোয় বাসাবাড়ী ঠিক করা ছিল আগে থেকেই। বেশ খোলামেলা আলো-হাওয়াযুক্ত সুন্দর একতলা বাড়ীটি। অনেকগুলি ঘর। চারিদিকে পেয়ারা গাছ। পেয়ারা বাগান বললেই হয়। বড় বড় পেয়ারা ডালে ডালে। বারো মেসে ফল—কতক কাঁচা, কতক ডাঁশা, কতক পাকা। পাকা পেয়ারার সুবাসে চারদিক ম' ম'। ঘরের ভেতর থেকেও সামনে দেখা যায় শ্যামল ধূমল পরেশনাথ পাহাড়। পাহাড়ের দূরত্ব বোঝা ভার। যত কাছে মনে হয় আসলে তত কাছে নয়, বেশ ক মাইল দূরে। এদিকে ওদিকে দিগন্ত রেখায় দেখা যায় কয়েকটা নাম না জানা পাহাড়ের ধূমল শিখর।

গোছগাছ করতেই কেটে গেল দুদিন। সদর দরজার দু পাশে দুখানি বড় ঘর—বৈঠকখানার মত। এরই একখানি হল স্বামীজীর থাকবার জায়গা আর এক-খানিতে সংসার দেখাশোনা করবার লোক উপেন্দ্রনাথ বসাক, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, রেণুদা আর আমি। ভেতরের ঘরগুলি যাঁর যেমন সুবিধা সাজিয়ে নেওয়া হল তেমনি করে।

এর পর দৈনন্দিন কর্মসূচী। সবই নিয়মে বাঁধা। স্বাস্থ্যলাভের আশায় আসা—অনিয়ম চলবে না। সকালে বিকেলে বেড়াতে হবে সকলকেই। খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদ — যে সময়ের যা—সবই ঠিক হল স্বামীজীর নির্দেশমত। আগে থেকে পরিচয় তো ছিলই, এখন হয়ে গেলুম আপনজন—ঘরের ছেলে। বিশেষ করে বসাক কাকুর মেয়ে বছর সাতেকের অমলা, ছ বছরের কমলা আর ভাইঝি লতিকা জানল আপন দাদা বলে।

বড় আনন্দেই কাটে। বেড়ানো, খেলা, হাসিখুশি, হৈ-হুল্লোড়ে মশগুল হয়ে থাকি সব। শৈশবে হারানো মাতৃস্নেহের পুনরাস্বাদ। অন্তরস্পর্শী অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ—কাকিমা, জেঠাইমা, পিসিমায়ের। আপন পর ভেদ নেই, সব সন্তানই সন্তান-ভাব। Universal motherhood যাকে বলে। কোথায় এক অচেনা অজানা পাড়াগেঁয়ে ছেলে আর কোথায় কলকাতার প্রখ্যাত সম্পদশালী ঘরের মায়েরা। স্নেহ শ্রদ্ধার দুটি উৎস মিলে ঝর্ণার দুর্বার গতি।

কি আনন্দ, কি স্ফূর্তি। কদিন কাটল আশপাশের কাছাকাছি জায়গা দেখে। অল্প দূরে পাহাড়ী লোকদের হাট-বাজার। সেই বেতের বোনা ধামাকুলো, উচ্ছে বেগুন পটল মূলো — সবই। সাঁওতালদের মত কালো কালো বলিষ্ঠ চেহারা কত দেহাতী পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ। মাথায় পাগড়ী বা লাল ডুরে গামছা বাঁধা, হাঁটু পর্যন্ত ছোট মোটা কাপড় পরা, কত পুরুষ, তেল-চুকচুকে খোঁপায় ফুল, গায়ে ঝকঝকে রঙের শাড়ি, মোটা মোটা রুপোর বা কাঁসার বাহবালা মল পেঁচে পরা কত স্ত্রীলোক দল বেঁধে মিষ্টি সুরে মেঠো গান গাইতে গাইতে হাটে যায়, হাটের শেষে মাথায় বড় বড় ঝুড়ি ভর্তি সওদা নিয়ে ঘরে ফেরে। ছুটি কাটাতে হাওয়া বদলাতে আসা কত দেশের কত বাঙালী অবাঙালী বাবুরাও থলে ভর্তি আনাজ-পাতি তরিতরকারী কিনে আনেন ঐ হাট থেকে।

এরই মধ্যে একদিন দেখে আসা গেল পরেশনাথ পাহাড়। ট্রেনে গোমোর পরের স্টেশন নিমিয়াঘাট। সেখান থেকে এখানে ওখানে পাথর ছড়ান কাঁকড় বিছানো রাঙ্গা মাটির পথ। মাঝে মাঝে বড় বড় শাল পিয়াল শিমুল গাছ।

মাইল খানেক পরে পাহাড়ের পাদদেশ। সেখান থেকে ওপরে উঠেছে পাকদণ্ডী রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর, যেন গড়াতে গড়াতে থেমে গেছে মাঝ পথে।

দল তো নেহাৎ ছোট নয়, বড়ই বলতে হয়—মা, ছেলেমেয়ে বাবুরা সব। মাত্র দুজন আছেন বাসায় স্বামীজীর কাছে—উপেন্দ্রবাবু আর রেণুদা।

কতক্ষণ কোস্তাকুস্তি কেরামতি করে ওঠা গেল পাহাড়ের চূড়ায়। ওপরে একটি ডাক বাংলো। সামনে অনেকখানি জায়গা বসবার দাঁড়াবার জন্যে চেঁচে-ছুলে সমতল করা। পাহাড়টির অনেকগুলি ছোট ছোট শিখর। শিখরে শিখরে এক একজন জৈন তীর্থঙ্করের এক একটি ছোট ছোট সুন্দর মর্মর মন্দির। এমনি চব্বিশটি শিখরে চব্বিশটি তীর্থঙ্করের চব্বিশটি মন্দির। মন্দিরে কোন মূর্তি নেই, শুধু শ্বেত-মর্মরে খোদাই চরণচিহ্ন।

ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে সবগুলি দেখে এসে ডাকবাংলোয় হাত-মুখ ধুয়ে সঙ্গে আনা খাবারগুলির সদগতি করা গেল সবাই মিলে। তারপর আবার পাকদণ্ডী। এবার চড়াই নয় উৎরাই। পাহাড়ে ওঠা শক্ত নামা সহজ—হুড় হুড় দূরে দূরে করে নামা, তবে পা ফসকালেই বিপদ। যাই হোক নামা গেল—অবশ্য অনেকের পা ফুলে ঢোল।

সন্ধ্যেবেলায় বাসায় ফিরে দু ঘন্টা বিশ্রাম। তারপর রান্নাবান্না খাওয়ার পর সারা রাতের মত বিশ্রাম।

সকালে স্বামীজীর কাছে বলতে হল ভ্রমণকাহিনী।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, নতুন কর্মতালিকা। একা পাওয়া যায় না স্বামীজীকে। প্রায় সব সময়েই কেউ-না-

কেউ থাকেন কাছে। এদিকে মন উশখুশ—'তারপর' 'তারপর' করে। তারপর হল কি? ভারত জোড়া কেন্দ্রসমিতি, ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ,—বিরাট কর্মক্ষেত্র—বিরাট কর্ম-প্রচেষ্টা। সব ছেড়েছুড়ে চুপচাপ রইলেন কেমন করে সন্ন্যাস নিয়ে? সেও তো সন্ন্যাস। বহুজন হিতায় যে কর্ম, সে তো নিষ্কাম কর্মযোগ। তবে? বহুজন হিতায় ছেড়ে শুধু আত্মহিতায়কেই আঁকড়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন স্বামীজী? সুযোগ খুঁজি, মেলে কই? অবশেষে মিলল একদিন। দিন কয়েক পরে হালদারদাদু—সুরেন্দ্রনাথ হালদার মশায় চলে গেলেন কলকাতায়। সন্ধ্যের পর রোজই স্বামীজীকে আগলে থাকতেন ইনি। বসে বসে আগড়ম বাগড়ম কত গল্পই যে করতেন। বিরাম ছিল না, গল্পের পিঠে গল্প। সেই হালদার দাদুই গেলেন কলকাতায়।

বেশ ঠাণ্ডা। শীতের আমেজ। বাংলার চেয়ে শীত বেশী হলেও কনকনে ঠাণ্ডা নয় এখনও। সন্ধ্যেবেলা স্বামীজী একা। কাছে বসে বললুম—ভারত জোড়া সমিতি-কেন্দ্র, দেশ উদ্ধার—কত বড় দায়দায়িত্বের কাজ—সব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন, স্বামীজী? সমিতির কাজ কিভাবে চলল তারপর? কলাকলাই বা কি হল?

ওষ্ঠাধর চেপে দু চোখ ছোট করে স্বামীজী কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মুখ-পানে। তারপর মৃদু হেসে বললেন—তা থাকবার ক্ষেত্র কি? মাতৃস্নেহ আর মাতৃভক্তি—দুটোই সমান জোয়াল—লোহার শিকল। ছেঁড়া শক্ত। সন্ন্যাসই বল, আর যোগযাগ, তপতপস্যাই বল, ওর কাছে সবেরই হার। জানত গল্প — 'হাম কমলি ছোড়তা হ্যায়, লেকিন কমলি হামকো নেহি ছোড়তা'। দুই সাধু বেরিয়েছেন দেশ পর্যটনে। সম্বল তো লোটা আর কম্বল। অনেক ঘুরে শ্রান্তক্লান্ত সাধু দুজন কম্বল বিছিয়ে শুয়েছেন জঙ্গলের কাছে এক গাছ তলায়। ক্লান্ত শরীর, শোওয়া মাত্র গভীর ঘুম। এমন সময়ে বেরিয়েছে এক প্রকাণ্ড ভালুক। শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে এক সাধুর। তিনি তো লোটা কম্বল নিয়ে দে ছুট। কিছু দূর গিয়ে খেয়াল হতেই চেঁচিয়ে ডাকছেন সঙ্গীকে—ভেইয়া, জলদি আইয়ে, জলদি আইয়ে। অপর সাধু ঘুম ভেঙে সামনে চেয়েই চিত্তির চড়কগাছ, তড়াতাড়ি লোটাটি নিয়েই দে ছুট। রইল পড়ে কম্বল। কিন্তু কম্বল না হলে কি চলে—শীতের দিন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সাধু গাছতলায় ফিরেছেন কম্বলটি নিতে। এদিকে ভালুক মশায় যে দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছেন কম্বলে। কালো কম্বল, কালো ভালুক—বেবাক মিশে গেছে কালোয় কালোয়। সাধু কম্বল মনে করে ধরেছেন ভালুকটাকেই, ভালুকও জাপটে ধরেছে তাঁকে। দেরী দেখে প্রথম সাধু হাঁকছেন—জলদি আইয়ে, ভেইয়া, কমলি ছোড়কর চলা আইয়ে। তখন অপর সাধু বলছেন—আরে ভেইয়া, হাম তো কমলি ছোড়তা লেকিন কমলি হামকো নেহি ছোড়তা।

হয়েছিল তাই। কম্বল ছাড়লে কি হবে, কম্বল কি ছেড়েছিল? যুক্তি, পরামর্শ পরি-কল্পনা, মতলব—সবই বাতলাতে হত আশ্রমে থেকেই। কখন কখন যেতে হত কলকাতায় সভ্যদের ডাকে।

—তারপরে কি হল, স্বামীজী—বললুম বেশ আগ্রহের সঙ্গেই।

গড়গড়া দিয়ে গেল রেণুদা। নল টানতে টানতে স্বামীজী বললেন—চলে আসবার কিছু আগে। ১৯০৭ সাল ডিসেম্বর মাস। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আয়োজন হচ্ছে সুরাটে। সব প্রদেশের নরম দল শ্রেষ্ঠ উকিল রাসবিহারী ঘোষকে অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করলেন। কিন্তু গরম দলের সবাই সভাপতি নির্বাচন করলেন — বালগঙ্গাধর তিলককে। তখন রাজনৈতিক চেতনা পুরোপুরি জেগেছে বাংলায় আর মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে সবে আরম্ভ। তাই সারা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করলেন তিলককেই। হলে হবে কি—নরম দল যে আবেদন নিবেদনের পক্ষে, বিপ্লবের নামে হৃৎকম্প। তিলক বিপ্লবী। তাই নরম দল রাজী হলেন না। মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের লোক দলে দলে ডেলিগেট হাজির হতে লাগলেন সুরাটে। বাংলা থেকেও গেলেন ডেলিগেটরা। নেতা হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। বৈধতার প্রশ্ন তুলে বলা হল ডেলিগেটদের ভোটে নির্বাচিত হোক সভা-পতি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও আরও কজন নেতা গেলেন চটে। যাই হোক ভোট হল।

ভোটের জোরে গরমপন্থীরা সভাপতি করলেন তিলককে। সভাপতির অভিভাষণের শুরুতেই তিলক বললেন—

We want absolute autonomy free from British control

আর যায় কোথায়? নরমপন্থীদের হৃৎ-কম্প। পুলিশ ডাকলেন সভা থেকে 'গরম-পন্থীদের' দূর করে দিতে। এতই সোজা! শুরু হল টেবিল চেয়ার ছোড়াছুঁড়ি মার-পিট। পৈতৃক পরাণটুকু নিয়ে নরমপন্থীরা তিন লাফে পগাড় পার। তিলকের অভি-ভাষণ শেষ হবার আগেই পুলিশ এসে বের করে দিল সকলকেই। সুরাটের কংগ্রেস—সে এক লণ্ডভণ্ড দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড আর কি!

পাঞ্জাব আর ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে প্রচারের কাজ বেশ জোরদার করেই চলে আসা হয়েছে। অরবিন্দদা গেলেন বোম্বাই, পুণা ও অন্যান্য কটি জায়গায়। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের প্রচারবাণী 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'—মর্মস্পর্শ করল সবারই। ফলে নরমপন্থীরা হয়ে পড়ল কোণঠাসা।

পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক আর বাঙলায় বিপিন-চন্দ্র পাল হলেন গরমপন্থীদের মুখপাত্র। ভারতের নেতা হলেন এই—লাল-বাল-পাল, আর বাঙলা, পুণা, পাঞ্জাব হল ভারত-স্বাধীনতার তীর্থক্ষেত্র। সকলেরই আশা ভারত-স্বাধীন হবেই এবার। পাঞ্জাবের শিখ শক্তি, মহারাষ্ট্রের মারাঠী শক্তি আর বাঙালীর তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি—এ ত্রিবেণী সঙ্গমের ঢেউ সামলাবে কে? হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যাবে মদমত্তমাতঙ্গ-বৃটিশ সরকার। এবার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা।

বিপ্লবীদের সাহস আর উৎসাহ গেল খুব বেড়ে। তাদের আর সবুর সইছিল না। অরবিন্দদার ফিরে আসা পর্যন্তও অপেক্ষা করল না তারা। আরম্ভ করে দিল বিপ্লবের কাজ। ছোটলাট ফুলারের ট্রেণ উলটে দেবার জন্যে বোমা নিয়ে উল্লাসকর গেল পূর্ব-বঙ্গে। ট্রেনের একখানি গাড়ী লাইন থেকে পড়ে গেলেও ছোটলাটের গাড়ীখানি অক্ষতই রয়ে গেল।

এরপর ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেনকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হয় গোয়ালন্দে, তাও ফস্কে যায়। তবে কুষ্টিয়ায় এক পাদ্রীকে মারা হয় গুলী করে।

অরবিন্দদা ফেরেন ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারীতে। তারপর বোমা ফেলা হয় চন্দননগরের মেয়রের ঘরে। বৃটিশ প্রভুদের চক্ষু চড়কগাছ—এসব হচ্ছে কি? গুপ্তচর, গোয়েন্দা পুলিশ বাড়ানো হল প্রচুর সংখ্যায়। সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তারা সন্ধান করতে লাগল বিপ্লবী যুবকদের। যে সব কর্মচারী কোন বিপ্লবীকে ধরে বেপরোয়া শাস্তি দিত, তারা সরকারের নেকনজরে পড়ত, বেতন বাড়ত, পদোন্নতি হত। তাই হয়েছিল অত্যাচারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের। ইংরাজরাজের অনুগ্রহ পেয়ে পদোন্নতি। মজঃফরপুরে বদলী হয়ে হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। হল তো হল—বাঙালী যুবকরা ভোলে নাই সেই চরম অত্যাচারী অবিচারী কিংসফোর্ডকে। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র—বিপ্লবী নেতারা ঠিক করল মজঃফরপুরে গিয়ে মারতে হবে তাকে। পাঠানো যায় কাদের? এসব কাজে এক-জনকে পাঠানো ঠিক নয়। অকুস্থলে গিয়ে যদি কোন রকমে না পারে বা সাহসহারা হয়, ফিরে এসে অনেক আজে বাজে কৈফিয়ৎ কাটতে পারে। তাই পাঠাতে হয় দুজনকে। যেতে রাজী হল নরেন্দ্র গোঁসাই। সঙ্গে যাবে একজন সহকর্মী। নির্ধারিত দিনের আগে মা, বাবা ও স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে গেল নরেন। গেল তো গেল, আর ফিরল না—ধনী বাপের একমাত্র সন্তান। তখন ভার দেওয়া হল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর ওপর। ক্ষুদিরামের বয়স মাত্র আঠারো বছর, পড়ে কলকাতা ন্যাশনাল কলেজে। প্রফুল্ল আরও ছোট—মাত্র ষোল বছরের, রংপুর ন্যাশন্যাল স্কুল ছেড়ে কলকাতা ন্যাশন্যাল কলেজে সবে

পড়তে আরম্ভ করেছে। দুই কিশোর বিপ্লবী বীর।

হেমদাস আর উল্লাসকর কাঠের হাতল দেওয়া একটা বোমা তৈরী করে গোপীমোহন দত্ত লেনে। এই বোমাটাই সঙ্গে দেওয়া হবে। বারীন্দ্র প্রফুল্ল চাকীকে ৩২নং গোপীমোহন দত্ত লেনে নিয়ে গিয়ে তার একটা ব্যাগে পুরে দিলেন ঐ বোমা। তারপর প্রফুল্লকে নিয়ে গেলেন ৩৮।৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে। সেখানে ছিল হেমদাস আর ক্ষুদিরাম। বারীন্দ্র আর হেমদাস দু কিশোর বীরকে উপদেশ দিলেন—যা যা করতে হবে সব খুঁটিনাটি। যাবার সময় দুজনকে তিনটে পিস্তল দিলেন। যদি কোন কারণে বোমা ছোঁড়া নিষ্ফল হয় তা হলে ব্যবহার করতে হবে পিস্তল। আর বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলেন যদিই ধরা পড়ে তাহলে যেন কোন রকমে স্বীকারোক্তি করা না হয়। বিশেষ করে গুপ্ত সমিতি বা কোন বিপ্লবী কর্মীর নাম যেন ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করা না হয়। এ উচিত নয়। নীরবে সব অত্যাচার সহ্য করাই বীরের কাজ। তেমন তেমন দেখলে আত্মহত্যা করেও আত্মরক্ষা করবে, কিন্তু স্বীকারোক্তি কখনো নয়। রাশিয়ার বিপ্লবীদের এই ছিল প্রথা।

কিছুদিন আগে কিংসফোর্ডকে মারবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল এক Book bomb একটা মোটা বইয়ের ভেতরের পাতা গোল করে কেটে তার মধ্যে এমনভাবে বোমা এঁটে দেওয়া হয় যে বইখানা খোলবামাত্র বোমা ফাটবে। সৌভাগ্য বলতে হবে—কিংসফোর্ড না খুলেই রেখে দিয়েছিল বইখানা।

যাই হোক অমিত সাহসী দুই বীর কিশোর কলকাতার কড়া পুলিশের সজাগ চোখে ধুলো দিয়ে মজঃফরপুরে হাজির হল। ২৪শে কি ২৫শে এপ্রিল ১৯০৮ সালে। দুজনে আশ্রয় নিল এক ধরমশালায়। সেই রকম নির্দেশই ছিল।

বললাম—আগে একটু শুনেছি ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকীর কথা, কিন্তু এদের পুরো পরিচয় তো জানি না স্বামিজী।

দু চোখ বুজে একটুখানি চুপ করে রইলেন স্বামিজী। তারপর বললেন—মেদিনীপুর জেলায় মোহবনী গাঁয়ের ত্রৈলোক্যনাথ বসুর ছেলে ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরামের বড় তিন বোন আর দু ভাই। বড় ভাই দুটি অকালে মারা যায়। তারপর ক্ষুদিরামের জন্ম। তাই পাড়াগেঁয়ে রীতিতে যমকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে তার দিদি কিনে নেন তাকে। নাম হয় ক্ষুদিরাম। ছোটবেলায় গাঁয়ের পাঠশালায় ভর্তি হয় ক্ষুদিরাম। মাত্র ছ বছর বয়সেই মা মারা যান। বাবা আবার বিয়ে করেন। তাই বা কদিনের জন্যে? বিয়ের এক বছর পরেই মারা যান ত্রৈলোক্যবাবু। তার আগে ক্ষুদিরামের দু দিদির বিয়ে হয়েছিল। বড়দিদি অপরূপা দেবী নিরাশ্রয় ভাইবোনকে নিয়ে যান তাঁর শ্বশুরবাড়ী হাটগেছিয়ায়। সেখান থেকে ছোট বোনটির বিয়ে দেন। ভাই ক্ষুদিরাম থাকে তাঁর কাছে। বছর খানেক পরে জ্ঞাতি ভাই অবিনাশবাবু ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়ীতে। নিছক নিঃস্বার্থ উপকারের জন্যে নয়, পেছনে ছিল ক্ষুদিরামের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারের লোভ। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর কাছে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা অত্যাচার সইতে হত ক্ষুদিরামকে। মারধোর তো ছিলই, পেটভরে খেতেও পেত না অনেকদিন। অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে রাগে দুঃখে পালিয়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম লুকিয়ে থাকে এক জঙ্গলে। বাঘ ভালুকও ছিল সেখানে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কেউ খোঁজ করলে না হতভাগা ছেলেটার তখন সে জঙ্গলের ভেতর দিয়েই চোদ্দ পনেরো মাইল পথ হেঁটে হাজির হল মেদিনীপুরে। শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুদিরাম আশ্রয় নিল এক ভদ্রলোকের বারান্দায়। কপালক্রমে ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীর কাছেই থাকতেন ক্ষুদিরামের ভগ্নিপতি অমৃতলাল রায়ের ভাই। তিনি ক্ষুদিরামকে পাঠিয়ে দিলেন অমৃতলালের কাছে।

অমৃতলাল রায় কাজ করতেন তমলুকের সেরেস্তাদারীতে। সেখানকার হেমিলটন স্কুলে ক্ষুদিরামকে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন তিনি। কিছুদিন পরে অমৃতলাল বদলী হন মেদিনীপুরে। ক্ষুদিরাম এখানকার কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়।

পড়াশুনোয় মোটেই ভাল ছিল না ক্ষুদিরাম। একঠেঙো, হাঁটুগাড়া, ইটেখাড়া, গাধার টুপি, বেত—যত রকমের শাস্তি আছে ক্লাশে সবই ভোগ করতে হয়েছে তাকে। তবে খেলাধুলো, দল বাঁধা, স্বাস্থ্যচর্চা, সৎসাহস, দুঃসাহসের কাজে তার জুড়ী ছিল না। পাড়ায় কলেরা, বসন্ত মহামারী—ক্ষুদিরাম এগিয়ে চলল রোগীর সেবায়। কোথাও দুর্ভিক্ষ, ক্ষুদিরাম দল বেঁধে চলল আর্তত্রাণে। কোথাও বন্যা—চলল ক্ষুদিরাম বিপন্নের উদ্ধারে। কোথাও আগুন লেগেছে কোমর বেঁধে বালতি হাতে দলবল নিয়ে চলল ক্ষুদিরাম আগুন নেভাতে। এই ছিল ঐ দুরন্ত দুর্ভাগা ছেলেটির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

দিদির বাড়ীতেও কষ্টের শেষ ছিল না ক্ষুদিরামের। বাড়ীর সব ফাইফরমাস তো খাটতে হতই, তার ওপর কারণে অকারণে যন্ত্রণা দেওয়া হত তাকে। প্রায়ই পান্তাভাত খেয়ে যেতে হত স্কুলে। অনেকদিন আহার জুটত না—অনাহার। সত্যেন বসু তখন ছিলেন ওখানে। তিনি জানতে পেরে মাঝে মাঝে পেটভরে খাওয়াতেন ক্ষুদিরামকে। তখন মাত্র চোদ্দ বছর বয়স তার। তারপর সত্যেনবাবুর কাছে সমিতির সভ্য হল কেমন করে শুনেছ। লাঠি, তরোয়াল ছোরা খেলা বন্দুক পিস্তল ছোড়া মুষ্টি যুদ্ধ—সবেই পাকা হয়ে উঠেছিল ক্ষুদিরাম। সমিতির যোগ্যতম শিষ্য যদিও বয়স নেহাৎ কাঁচা।

একবার মজা হয়েছিল বেশ। মেদিনীপুরে এক মারাঠী কেল্লায় শিল্প প্রদর্শনী। ফটকের কাছে ক্ষুদিরাম বিলি করছে ছোট্ট বই—সোনার বাংলা। রাজদ্রোহজনক লেখা ছিল এতে। পুলিশ ধরল ক্ষুদিরামকে। আর যায় কোথা—ঘুসির ওপর ঘুসি চালালে ক্ষুদিরাম। এমন সময় প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক সত্যেন বসু এসে হাজির। পুলিশ তখন পাকড়াও করেছে ক্ষুদিরামকে। সত্যেন বসু ছিলেন কালেক্টরীর একজন ডেপুটীবাবুর এজলাসের কেরানী। পুলিশটি চিনত তাঁকে। সত্যেন বলে উঠলেন—এ্যা ক্যা কিয়া? ইয়ে তো ডিপুটি বাবুকা লেড়কা হ্যায়, উসকো পাকড়ায়া? থতমত খেয়ে পুলিশ ক্ষুদিরামকে দিল ছেড়ে। কিন্তু একটু পরেই ভুল বুঝতে পেরে পুলিশ আবার ধরতে গেল ক্ষুদিরামকে। আর পাত্তা পায়, ক্ষুদিরাম ততক্ষণে উধাও। কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল ক্ষুদিরামকে। তমলুকের একটা নির্দিষ্ট বাড়ীতে থাকত সে। কিন্তু এই গা ঢাকা দিয়ে থাকা

যেমন বিপজ্জনক তেমনি কষ্টকর। কৌশলে নিজেই ধরা দিল আলিগঞ্জের তাঁতশালে।

তারপর রাজদ্রোহের মামলা ক্ষুদি-রামের বিরুদ্ধে। প্রথম রাজদ্রোহ মামলা। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে সত্যেন বেপরোয়া হয়ে হেসে হেসে বললেন, সে মনে করেছিল ডেপুটিবাবুরই ছেলে: বেশ রহস্য করেই বললেন সত্যেন বসু। অপমান বোধ করলেন ম্যাজিস্ট্রেট। চাকরী গেল সত্যেনের।

এই দুঃখে গড়া দুখিনী মায়ের পুজোর ফুল অমিতশক্তি ক্ষুদিরাম।

আর প্রফুল্ল চাকী? বগুড়া জেলার নীরদচন্দ্র চাকীর মেজ ছেলে। বড়দাদা প্রতাপচন্দ্র চাকী, ছোট দুভাই জগৎচন্দ্র আর চারুচন্দ্র। রংপুরে ন্যাশন্যাল স্কুলে পড়া শেষ করে ভর্তি হয়েছিল কলকাতা ন্যাশন্যাল কলেজে। ষোল বছরের কিশোর তেজে ষোলকলায় পূর্ণ। পূর্ববঙ্গে ছোট-লাট ফুলারের ট্রেন ধ্বংসের কাজে উল্লাস-করের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল যাদের প্রফুল্ল ছিল তাদের মধ্যে। সেখানেই দেখা যায় তার অদ্ভুত কার্যতৎপরতা আর একাগ্রতা। ক্ষুদিরামের কার্যতৎপরতা আর একাগ্রতা সম্বন্ধে সবিশেষ জানত হেম দাস। তাই এই দুটি তরুণকেই মনোনীত করা হয়েছিল কিংসফোর্ড হত্যার কাজে।

রাত হয়েছে। খাবার সময়। কথা শেষ না হতেই বন্ধ হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল 'তারপরে' 'তারপরে' প্রশ্ন নিয়ে।

উনচল্লিশ

বাসা থেকে অল্প দূরেই বয়ে চলেছে নাম-না-জানা ছোট পার্বত্য নদী। কী স্বচ্ছ শীতল নির্মল তার জল। উচ্ছল উপকূল। দুধারেই এখানে ওখানে ছোট-বড় মাঝারি নানা আকারের পাথর। নদী-বুকে জলস্রোতের মধ্যেও কচ্ছপের মত পিঠ ভাসিয়ে জেগে আছে শিলাখণ্ড। সকালে বিকেলে এই সব শিলায় বসে উপভোগ করা যায় চারিদিকের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সকলে মিলে নদীতে স্নান করে আসা হয়। তবে রোজ নয়—দু-একদিন অন্তর। স্বামিজী যান প্রায়ই। দুবেলা অনেকদূর বেড়ানো তো দৈনন্দিন কার্যসূচীর মধ্যে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মায়েরা যান একদিকে, স্বামিজী একা অন্যদিকে। ভাই-বোনদের সঙ্গে মায়েদের দলেই যেতে হয় আমাকে।

সবুর আর সয় না—কতক্ষণে সন্ধ্যে হয়। বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে দেখি দূরে নদীর ধারে শিলাখণ্ডের ওপর বসে আছেন স্বামিজী। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় স্বামিজীর গেরুয়া কাপড় চাদরে জ্বলন্ত আগুনের শোভা। দল ছেড়ে এক ছুটে গিয়ে দাঁড়ালুম স্বামিজীর পাশে।

স্বামিজী বললেন—বস, দেখ সূর্যা-স্তের শোভা।

শোভাই বটে—মনোরম। দূরে পাহাড়-মালার মাথায় পাহাড়ের চূড়ায় মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে নদীর জলে গুলাল গুলে হোলী খেলে রক্তরাঙা সূর্যদেব পাটে বসলেন। পশ্চিম দিগন্তে রঙের খেলা ধীরে ধীরে মলিন হয়ে আসছে।

বললুম — মজঃফরপুরে ধরমশালায় থেকে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল কি করলেন, স্বামিজীর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। বললেন—করলে সবই। তবে চালে ভুল, কিস্তি মাৎ হল না।

—কি রকম? ভুল করবার মত মানুষ বলে তো মনে হয় না ওঁদের — বিস্ময়ভরা চোখে চাইলুম স্বামিজীর পানে।

—তা কি বলা যায়? মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। ইংরেজীতে বলে To err is human আর দেশী কথায় মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম—মুনিদেরও ভুল হয়, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা।

একটু হাসলেন স্বামিজী। মাধুর্যহীন শুকনো হাসি—অতি দুঃখে অসহায়ের মুখে ফুটে ওঠে যে করুণ হাসি। বললেন —ধরমশালায় থাকে দুজন—ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল। অল্প দূরেই কিংসফোর্ডের কুঠী। দুজনে এদিকে ওদিকে ঘোরে ফেরে, পথ-ঘাট সব চিনে রাখে। কিংসফোর্ডের বাংলোর কাছে রেকেট কোর্ট। সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করে কিংসফোর্ডের গতিবিধি। দুদিন কাটে। ২৯শে এপ্রিল রেকেট কোর্টের কাছে গিয়ে নজর রাখে, পাত্তা পায় না কিছুই। পাবে কি ক'রে? সমিতির দেশহিতৈষীদের সঙ্গে সঙ্গে দেশদ্রোহী মীরজাফরের সৃষ্টিও তো কম হয় নাই। কদিন আগে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কিংসফোর্ডকে খবর দিয়েছে—দুটি ছেলে যাচ্ছে তাঁকে বধ করতে। সেদিন থেকেই কাছারি আর ক্লাব ছাড়া অন্য কোথাও বের হয় না কিংসফোর্ড। বাংলোর ফটকে দু'জন সশস্ত্র পুলিশও পাহারা দেয় সেদিন থেকে। যাই হোক ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার রেকেট কোর্টের কাছে গিয়ে ক্ষুদিরাম নজর রেখেছে বাংলো পানে। প্রফুল্ল বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে বসে ভাবছে—কি করা যায়। খানিক পরে ছুটে গিয়ে ক্ষুদিরাম চুপি চুপি বলল তাকে—কিংসফোর্ড এইমাত্র ফিটনে চড়ে গেছে নেটিভ ক্লাব হাউসে। নাচ-গান, পান-ভোজন আমোদ প্রমোদ তো আছে। ফিরতে দেরী হবে নিশ্চয়ই। অন্ধকারটাও ঘন হবে ততক্ষণে। এই সুবর্ণ-সুযোগ। এখনই একটা হেস্তনেস্ত করা উচিত। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়।

নতুন উৎসাহে দুজনে ছুটে হাঁটা পথ হয়ে গেল ক্লাব-হাউসের কাছে। তখন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা। দেখে-শুনে বুঝল—সাহেব আরও কিছুক্ষণ থাকবে সেখানে। ক্ষুদিরাম রইল, প্রফুল্ল গেল যথাযথ ব্যবস্থা করতে। একটু পরেই ফিরে এল রীতিমত তৈরী হয়ে। কাছেই লোক চলাচলের পথ। পথের পাশে একটা মস্ত বড় গাছ। দুজনেই তৈরী হয়ে দাঁড়াল এই গাছটির আড়ালে, পথপানে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে।

টং—টং করে ক্লাবের ঘড়িতে বাজল আটটা। যে যার বাংলোয় ফেরবার জন্যে উঠে পড়ল ক্লাবের সবাই। খালি কিংসফোর্ড আরও ক-মিনিট রয়ে গেল কি একটা কাজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী প্রিংগলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি ছিলেন ক্লাবে। তাঁরা বের হলেন কিংস-ফোর্ডের ফিটনের মত অবিকল একখানা ফিটনে চড়ে। হতে পারে কিংসফোর্ডের গাড়ীতেই চড়েছিলেন তাঁরা।

গাড়ীর ঘর-ঘর শব্দ। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল দেখল কিংসফোর্ডের গাড়ী, সেই রং, সেই ঘোড়া অবিকল, শাদা চামড়ার মানুষও ভেতরে। নিশ্চয়ই কিংসফোর্ডের গাড়ী—সন্দেহ নেই এতটুকু। নিঃশব্দে বোমা ছুড়ল, বোমা ফাটল ভীষণ শব্দে। দুজনেই দেখল গাড়ীটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, ঘোড়া দুটো পাগলের মত ছুটো-ছুটি করছে, দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। পায়ের জুতো খুলে ফেলে দুজন দুদিকে তীরবেগে ছুটল। ক্ষুদিরাম সমস্তিপুরের দিকে আর বাঁকিপুরের দিকে প্রফুল্ল। তারা জানতেও পারল না—কিংসফোর্ড বহাল তবিয়তে, তার বদলে প্রাণ দিলে দুই নির্দোষ নারী। মনে হয় রাতের অন্ধকারের জন্যেই এতবড় ভুলটা হয়েছিল তাদের।

তারপর হুলুস্থুল কাণ্ড। রামনগর স্টেটের সুপারভাইজার মিস্টার উইলসন বসেছিলেন বাংলোর বারান্দায়। বোমার শব্দে ছুটে এসে দেখেন কি-না—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার, গাড়ীর পেছনটা জ্বলছে দাউ-দাউ করে। গাড়ীর ভেতরে শ্বেতাঙ্গ মহিলা। লোকও জুটেছে চারদিকে। তাদের সাহায্যে অনেক কষ্টে মিস কেনেডির কাপড়ের আগুন নিভোলেন মিঃ উইলসন। চমকে উঠে বাংলোর পুলিশ প্রহরী দুজনও ছুটে এসেছে ততক্ষণে। তারা দুজন আর উইলসন ধরাধরি করে আহত মিস ও মিসেস কেনেডিকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেলেন বাংলোয়। তারপর দস্তুরমত চিকিৎসা। ফল হল না। শুক্রবার রাত্রে মিস ও শনি-বার রাত্রে মারা গেলেন মিসেস কেনেডী।

খবর পেয়ে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট হাজির। অপরাধী ধরবার তোড়জোড়। তক্ষুনি দুজন দারোগাকে পাঠালেন দুদিকে —বাঁকিপুর আর মোকামাঘাটের দিকে। প্রত্যেক স্টেশনে পুলিশ রেখে সন্দেহজনক

লোককে তল্লাসী করবার অর্ডার দেওয়া হল। চারিদিকে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হল, যে-কেউ হত্যাকারীকে ধরে দেবে—হাজার টাকা বখশিস পাবে।

মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্লকে এদিক-ওদিক বেড়াতে দেখে একদিন এক পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় থাকে তারা। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল বলেছিল—কিশোরীবাবুর বাড়ী। কিশোরীবাবু জমিদারের লোক, থাকতেন জমিদার বাড়ীতে। তল্লাসী হল সে বাড়ী, মিলল না কিছুই।

পুলিশ চারদিকে তার করে জানিয়ে দিল—দুটি ছেলে, একজনের মাথায় পাগড়ী, একজন খালি মাথা, একজনের গায়ে শার্ট, জুতো কারুর পায়ে নেই, জুতো ফেলেই পালিয়েছে। পুলিশী পোষাক ছেড়ে সাধারণ মানুষের পোশাক পড়ে অনেক পুলিশ কর্মচারী বের হল নানাদিকে আততায়ীদের খোঁজ করতে।

ওদিকে সারারাত জেগে খালি পায়ে চব্বিশ-পঁচিশ মাইল দৌড়ে পাড়ি দিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ক্ষুদিরাম। ঘামে জবজবে সারা শরীর, গলা শুকিয়ে কাঠ, পিপাসা পেয়েছে খুব। কোনরকমে ওয়াইনি ষ্টেশনে এসে এক মুদীর দোকানে ঢুকে বসেছে। সেখানে লোকেরা বলাবলি করছে—মজঃফরপুরে এক সাহেবকে মেরে ফেলেছে কে। শুনে আনন্দই হল, মুদীর কাছে এক গ্লাস জল চাইল ক্ষুদিরাম। কিন্তু খাওয়া আর হল না। জলের গ্লাসটি মুখে তুলেই দেখতে পেল দুজন পুলিশ আসছে। ক্ষুদিরাম তো তৈরী অবস্থাতেই ছিল, নানারকম নিষিদ্ধ জিনিস সঙ্গে আছে বৈ-কি। জলের গ্লাস নামিয়ে রেখে বের হচ্ছে এমন সময় একজন পুলিশ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—কোথা হ'তে আসছে সে। আসছে বাঁকিপুর থেকে, যাবে তেজপুরে—ক্ষুদিরামের উত্তর। কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—পুলিশ জিজ্ঞেস করল অনেক খুঁটিনাটি। আন্দাজে বলা—কাজে কথায় একটু গরমিল হল বৈ-কি। সন্দেহ করে একজন পুলিশ চেপে ধরল ক্ষুদিরামের ডান হাতখানা। শুরু হল ধস্তাধস্তি। পকেট থেকে পড়ে গেল ভারি পিস্তলটা। আর একটা ছিল একটু ছোট, বাঁ-হাত দিয়ে যেই সেটা বের করতে যাবে ক্ষুদিরাম অমনি আর একজন পুলিশ বাধা দিয়ে পাকড়াও করল তাকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসার্ত ক্ষুদিরাম আর রক্ষা করতে পারল না নিজেকে।

সেদিন ১লা মে শুক্রবার। বেলা ৯টা আন্দাজ ক্ষুদিরাম বন্দী হল পুলিশের হাতে। বন্দী হ'য়ে পুলিশের কাছেই জানতে পারল ক্ষুদিরাম—কিংসফোর্ড মরেনি, মরেছে দুজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোক।

—ছিঃ ছিঃ এ-কি হ'ল?—অত্যাচারীটা বেঁচে গেল আর সে হত্যা করল কিনা দুজন নিরপরাধিনী নারীকে? নিজের ওপর ধিক্কার জন্মালো ক্ষুদিরামের।

ফটো : শিশির দাস

—ক্ষুদিরাম তো ধরা পড়লেন, প্রফুল্লর কি হ'ল, স্বামিজী?—ভিজে চোখে জিজ্ঞেস করলুম স্বামিজীকে।

—হ্যাঁ, প্রফুল্ল। প্রফুল্লও খালি পায়ে সারারাত হেঁটে হেঁটে মজঃফরপুরের চারটে ষ্টেশন পর পৌঁছল সমস্তিপুরে। দোকানে থেকে নতুন কাপড় নতুন জুতো কিনে বেশ বদলে ফেলল। তারপর মোকামা ঘাটের ইনটার ক্লাসের টিকিট কিনে বসে পড়ল গাড়ীতে। সেই কামরাতেই ছিল সিংভূমের পুলিশ সাব-ইনসপেকটর নন্দলাল মুখুজ্জে। জাঁদরেল ইনস্পেকটর। প্রফুল্লর নতুন কাপড় নতুন জুতো আর ফোলা পা দেখেই সন্দেহ হল তার। বেশ চালাকি করে ঘনিষ্ঠভাবে গল্প শুরু করল প্রফুল্লর সঙ্গে। সে কেমন গল্প—প্রফুল্ল মনে করল—ইনি একজন দেশ-দরদী, স্বদেশহিতৈষী। আবার ভুল করল প্রফুল্ল, যতই হোক—ছেলেমানুষ তো। নন্দলাল আশপাশের লোকদের বলল মজঃফরপুরে হত্যার কথা। মজঃফরপুর থেকেই আসছিল নন্দলাল। ওখানকার গভর্ণমেন্ট উকিল শিবচন্দ্র মুখুজ্জের নাতি সে।

হত্যার কথায় আগ্রহ করে অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন করছিল প্রফুল্ল। নন্দলালের সন্দেহ বেড়ে যায়। হঠাৎ নন্দলালের কি একটা কথায় প্রফুল্ল চটেমটে উঠে যায় অন্য কামরায়। কিন্তু 'কমলি নেহি ছোড়তা' হল পেয়ে গেছে, একদিনে হাজার টাকা—সেটা কি কম? নন্দলাল প্রফুল্লর কামরায় গিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা চেয়ে প্রফুল্লকে ভুলিয়ে আনে নিজের কামরায়। আবার আরম্ভ হয় স্বদেশ-প্রেমের গল্প। প্রফুল্লও মনে করে নিজেদের মতাবলম্বী বন্ধু। এরপর ট্রেণ থেকে নেমে ফেরি ষ্টীমার। দুজনে পার হয়ে গেল মোকামাঘাটে। আবার ট্রেণ। বোলচালে এমনই মুগ্ধ হয়েছে প্রফুল্ল যে নন্দলালের সমস্ত

মালপত্র স্টীমার থেকে ট্রেন পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে দিল নিজে। কুলি করতে দেয়নি নন্দলালকে। স্বরূপটা বোঝে নাই তো তখনও। প্রফুল্ল হাওড়ার একখানা ইন্টার-ক্লাসের টিকিট নিয়ে আসছে প্লাটফরম দিয়ে। নন্দলাল একজন পুলিশকে হুকুম দিল—গ্রেপ্তার কর।

প্রফুল্ল স্তম্ভিত। চীৎকার করে বললে —এ্যাঁ, তুমি বাঙালী হয়ে গ্রেপ্তার করছ আমাকে? বলেই দৌড়। তা যাবে কোথা? অনেক পুলিশ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সারা স্টেশনে। আর একজন কনস্টেবল ধরল প্রফুল্লকে। এক প্রচণ্ড ধাক্কায় কনস্টেবল গড়াগড়ি। তখন পিস্তল বের করে আরও ক'পা এগিয়ে গেল প্রফুল্ল। আর একদিক থেকে এসে পড়ল আর একজন কনস্টেবল। প্রফুল্ল গুলী ছুঁড়ল—কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, লাগল না কনস্টেবলের গায়ে। এদিকে মাটিতে পড়া পুলিশটা ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে প্রফুল্লর দিকে এগোচ্ছে তখন। আর উপায় নাই। প্রফুল্ল স্থির দাঁড়িয়ে পিস্তল ঘুরিয়ে ধরল নিজের দিকে। দ্রাম-দ্রাম— আওয়াজ হল দুবার। থুতনি আর চিবুকের নিচ দিয়ে দুটো গুলী কণ্ঠাস্থি ভেদ করল। শেষ বার 'বন্দে মাতরম' বলে লুটিয়ে পড়ল প্রফুল্ল।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে অনেকক্ষণ। নির্মল নীল আকাশে অষ্টমীর চাঁদের আধ-হাসি। সেই হাসিতে ভরে গেছে চারদিক। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে নেচে-নেচে চলেছে হাজার চাঁদ। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। কথা শুনতে শুনতে হুঁশ ছিল না এতক্ষণ। স্বামিজীর সঙ্গে ফিরলুম বাসায়।

চল্লিশ

সন্ধ্যেবেলা—কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। স্বামিজীর ঘর থেকে গড়গড়া নিয়ে বেড়িয়ে এল রেণুদা। ধূমপান শেষ। ভেতরে গিয়ে বসলুম স্বামিজীর সামনে। বললুম—প্রফুল্ল চাকী তো নিজেকে আহুতি দিলেন দেশ-মাতার যজ্ঞে, ক্ষুদিরামের কি হল, বাবা?

—মজঃফরপুর থেকে চব্বিশ মাইল দূরে ওয়াইনি স্টেশন। এখানেই ধরা পড়েছে ক্ষুদিরাম। মজঃফরপুরে খবর এল শুক্রবার বেলা একটায়। তৎক্ষণাৎ সেকেণ্ড ক্লাশ ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট। আসামীকে নিয়ে ফিরবে সন্ধ্যার ট্রেনে।

চারদিকে খবর ছড়িয়েছে —একজন বাঙালী স্বদেশী আসামীকে ধরে আনা হচ্ছে মজঃফরপুরে। স্টেশনে লোকে-লোকারণ্য বিকেল থেকেই। সে কি গোল-মাল—ঠেলাঠেলি—হৈ-চৈ কাণ্ড! গাড়ী ঢুকল স্টেশনে। গাড়ীর দরজা জানালা ছেঁকে ধরল সব আসামীকে আগে দেখবার জন্য। একটি ফার্স্টক্লাস কামরায় শোনা গেল—'বন্দে মাতরম'। গাড়ী থেকে নামল আসামী।

—এই আসামী? বছর আঠারো বয়সের কিশোর—চিন্তালেশশূন্য প্রশান্ত মুখ, উজ্জল চোখ, প্রফুল্ল মুখ। এই ছেলে গিয়েছিল বোমা তৈরী করে জজসাহেবকে মারতে? এ কখনো হয়? বিশ্বাস হয় না কারুর।

আসামী ঘন ঘন চীৎকার করতে থাকে —'বন্দে মাতরম'। কিন্তু জনতা ধ্বনি দেয় —'বন্দে মাতরম'।

পরদিন স্টেটসম্যান লিখল—
The Railway Station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, he looked quite determined. Deputy came out of a first class compartment with the boy, who walked all the way to the phateon kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety On taking his seat the boy lustily cried — Bande Mataram.

বাইরে ছিল ফিটন। ফিটনে উঠে বসল ক্ষুদিরাম। একদিকে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আর একদিকে পুলিশ অফিসার। ভিড় ঠেলে গাড়ী গেল সাহেবের কুঠিতে। গাড়ী থেকে নামিয়ে ক্ষুদিরামকে রাখা হল সেখানে। ভিড় সরিয়ে দেওয়া হল। সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রইল দরজায়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান অপেক্ষা করছিলেন জবানবন্দী নেবার জন্যে।

—কি জবানবন্দী দিলেন? স্বীকারোক্তি করলেন ক্ষুদিরাম? —রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করলুম।

ওষ্ঠাধর চেপে স্বামিজী বললেন—হ্যাঁ, সেই ছেলে কিনা? ইস্পাতে তৈরী। জবানবন্দী দিলে, বললে সবই—তবে সবদিক বাঁচিয়ে। গুপ্ত সমিতি, প্রফুল্ল—সব ধামাচাপা। বললে—

—'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' আরও অনেক কাগজ পড়ে কিংসফোর্ডকে মেরে ফেলতে মনস্থ করি। খবরের কাগজ পড়া ছাড়া বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও অন্য অনেকের বক্তৃতা শুনে প্রেরণা পাই। কিংসফোর্ড সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানলেও তিনি যে অনেককে জেলে পুরেছেন—তা জানি। কেউ আমাকে পাঠায়নি। পাঁচ-ছদিন আগে মজঃফরপুরে এসে ধরমশালায় থাকি। সঙ্গের ছেলেটির নাম—দীনেশচন্দ্র রায়। বাড়ী বলেছিলেন—বাঁকিপুরে। আগে কখনো দেখিনি। হাওড়া স্টেশনে আলাপ। কথা-বার্তায় জানি একই উদ্দেশ্যে তিনিও আসছিলেন মজঃফরপুরে। একই সঙ্গে ধরমশালায় থাকি। লক্ষ্য করি কিংসফোর্ডের গতিবিধি। দেখি—সন্ধ্যেবেলায় বের হন, সকালে বের হন না কিংসফোর্ড। সুযোগ খুঁজি। দীনেশের কাছে ছিল রিভলভার আর বোমা। আমার কাছে দুটো রিভলভার, কুড়িটা ছোট ও চৌদ্দটা বড় কার্টিজ। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট আর বড়বাজারে কেনা হয়েছিল রাত্রিবেলায়। আমার লাইসেন্স নাই। অমৃতলাল দাস নামে এক ভদ্রলোক এনে দিয়েছিলেন পঁচিশ টাকা আর পনেরো টাকা নিয়ে। ব্যাগে কাপড় জড়ানো টিনের কৌটোয় ছিল বোমা। কিছু টাকা কড়িও ছিল ঐ ব্যাগে।

ঐদিন সন্ধ্যেবেলা জজ সাহেবের কুঠির কাছে থাকি। দুজন লোক জিজ্ঞেস করে—কোথায় থাক? বলি—কিশোরীবাবুর বাড়ী। কিশোরীবাবুকে দেখি নাই কখনো, শুনেছিলুম ধরমশালার ম্যানেজার তিনি। এরপর ওখান থেকে চলে এসে জজ সাহেবের বাড়ী না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি গাছতলায়। দীনেশ বোমা তৈরী করে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে। আমার খুব বেশি ইচ্ছে হওয়ায় আমিই তা ছুঁড়েছিলাম। সামান্য ভুলের জন্যে মারা গেলেন দুটি নিরপরাধিণী স্ত্রীলোক। বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে ছিল না এঁদের মারবার।

তারপর প্রফুল্লর শব এনে সনাক্ত করতে বলা হয়। প্রফুল্লর মুখপানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ষুদিরাম বলে—এইটাই দীনেশের শব।

২৩শে মে সীতামারীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বারটেড-এর কাছে আর একদফা জবানবন্দী দিতে হয়। কিছু কিছু তফাৎ থাকলেও মূল ছিল একই। সকলকে বাঁচিয়ে সমস্ত দোষের বোঝা নিজের ঘাড়েই চাপিয়ে নিয়েছিল ক্ষুদিরাম। এরকম অপরাধের শাস্তি যে প্রাণদণ্ড—তা তার অজানা ছিল না। তবু একটুও বিচলিত হয় নাই সে। কিন্তু অজ্ঞাতে নির্দোষ স্ত্রীলোকদের মেরে তার মনে অনুশোচনাও বড় কম হয় নাই।

দেখছ—গুপ্ত সমিতি আর প্রফুল্লকে কিরকম ধামাচাপা দিয়েছিল ক্ষুদিরাম।

প্রফুল্ল কঠোর শাস্তি না পায়—এই ছিল তার ঐকান্তিক কামনা। যখন দেখল— প্রফুল্ল আর নেই, তখন আগের জবানবন্দীর অদল-বদল করল কিছু।

৮ই জুন সোমবার বিচারের দিন। গভর্ণমেন্ট বিচারক নিযুক্ত করল বাঁকিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ কারন ডফকে।

কারন ডফ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি করেছ এই অপরাধ?

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদিরাম উত্তর দিল—হ্যাঁ, আমি করেছি এই কাজ।

কারনডফ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আসামী দোষ স্বীকার করলেও দস্তুরমত বিচার করতে হবে।

নজন এসেসর ডাকা হল।

কোন উকিল ছিল না ক্ষুদিরামের পক্ষে।

মজঃফরপুরের নামজাদা উকিল কালিদাস বসু স্বেচ্ছায় সরকারের অনুমতি চেয়ে নিয়ে হলেন ক্ষুদিরামের উকিল।

সেদিন আর বিচার হল না, পরদিন মঙ্গলবার বিচার। এদিন কালিদাসবাবু ছাড়া আরও দুজন উকিল উপস্থিত হলেন ক্ষুদিরামের পক্ষে—কুলকমল সেন আর নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। এইদিনে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আরমস্ট্রং, ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যান, বারের ডেপুটি জ্যোতিষ সেন সাক্ষ্য দেন। জেরা করেন কালিদাস বসু।

১৩ই জুন বুধবারে আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষে এলেন বিখ্যাত উকিল সতীশবাবু। কেনেডির কোচম্যান ও নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। কালিদাসবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করেন ক্ষুদিরামকে বাঁচাতে। তাঁর সব চেষ্টাই বিফল হয়।

সেদিন উকিল সতীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম যা বলে তা শোনবার মত—শেখবার মত। প্রথমে নিজের সমস্ত পরিচয় দিয়ে ক্ষুদিরাম বলল—আমার মা নেই, বাবা নেই, কাকা নেই, মামা নেই—কেউই নেই। আছেন কেবল এক দিদি আর তার ছেলে-মেয়েরা। আমার দিদির বিয়ে হয়েছে অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে। আমার জেঠতুত ভাই আছেন অবিনাশ বসু। ইনি আমার কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। এঁরাই আমার একমাত্র আত্মীয়।

সতীশবাবু বলেন—কাউকে দেখতে ইচ্ছা হয়?

ক্ষুদিরাম বলে—হয় বৈকি, আমার জন্মভূমি মেদিনীপুরকে। দিদি আর তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখতে ইচ্ছে হয়।

—তোমার মনে কোন দুঃখ আছে?

—কিছুমাত্র না।

—তোমার মনে কোন ভয় হয়?

ক্ষুদিরাম হেসে কুটি কুটি, বললে—ভয় হবে কেন? আমি কি গীতা পড়ি নি?

উকিল সতীশবাবু একটু থেমে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ক্ষুদিরামের মুখ পানে। তারপর বললেন—দেখ, তোমাকে রক্ষা করবার জন্যেই এসেছি আমরা। তুমি তো আগেই অপরাধ স্বীকার করেছ?

মাথা উঁচু করে দৃপ্ত কণ্ঠে ক্ষুদিরাম বললে—কেন স্বীকার করব না? যে কাজ করেছি তা স্বীকার করব না?

আদালত শুদ্ধ সবাই অবাক। সতীশবাবু বুঝলেন—মৃত্যুকে পরোয়া করে না এ ছেলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সতীশবাবু বললেন— ভগবানকে স্মরণ রেখো, ক্ষুদিরাম।

বিচার শেষ হল সেদিনের মত।

আবার শুক্রবার। কজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল। মজঃফরপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রোলাণ্ডও সাক্ষ্য দেন এদিন।

তারপর কালিদাসবাবুর বক্তৃতা।

তার উত্তরে জজ সাহেব এসেসারদের অনেক কথা বলে বিচারের ভার দিলেন তাঁদের ওপরে। এসেসাররা মত দিলেন—ক্ষুদিরাম নরহত্যা অপরাধে অপরাধী।

জজসাহেব রায় দিলেন মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যাকে স্বেচ্ছায় হত্যা করার জন্যে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির হুকুম হল।

হুকুম শুনে মিটি মিটি হাসতে থাকল ক্ষুদিরাম।

কালিদাস বাবু অনেক চেষ্টায় হাইকোর্টে আপীল করলেন প্রাণদণ্ড রহিত করতে।

জাস্টিস ব্রেট আর রাইভস-এর কাছে শুনানী আরম্ভ হয়।

ক্ষুদিরামের পক্ষে হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল নরেন্দ্রকুমার বসু বললেন—হুজুরের নিকট নিবেদন করছি—এই বালকটির কিশোর বয়স। নিম্ন আদালত মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। তা সমর্থন করবার আগে আমি যা বলেছি তা ভেবে দেখুন, এই ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা যায় না।

কিন্তু জজ সাহেব দুজন ফাঁসির হুকুমই বহাল রাখলেন।

তবু কালিদাসবাবু হাল ছাড়লেন না। দরখাস্ত করলেন ছোটলাটের কাছে। ঠিক করলেন—সেখানে ফল না পেলে প্রাণভিক্ষা চেয়ে দরখাস্ত করবেন সম্রাট এডওয়ার্ডের কাছে।

এই জন্যে ফাঁসির দিন পেছিয়ে দেওয়া হল। কথা ছিল ফাঁসি হবে বৃহস্পতিবার। সেদিন ফাঁসি হল না বটে, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল, রক্ষা পেল না ক্ষুদিরাম।

২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩১৫ সাল, ইংরেজী ১১ই আগস্ট ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ—ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন।

খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে ক্ষুদিরাম ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা সেরে নিল। যার যার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তাও শেষ। তারপর দেশমাতৃকার কাছে চিরবিদায় নিয়ে ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে চলল বধ্যভূমির দিকে। সে সময়ে তার হাসিমুখ, প্রফুল্ল চিত্ত আর প্রশান্ত মূর্তি দেখে দর্শকরা সবাই অবাক। চারিদিকে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মিলিটারী পুলিশ দর্শক হিসাবে দুজন য়ুরোপীয় দুজন বাঙ্গালী আর দুজন বেহারী দাঁড়িয়ে।

হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠল ক্ষুদিরাম।

জল্লাদ এল। ক্ষুদিরামের গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল। দিল তো দিল—ক্ষুদিরাম জিজ্ঞেস করল ফাঁসির দড়িতে মোম দেওয়া হয় কেন?

কারাধ্যক্ষ ফাঁসির হুকুম পড়ে শুনিয়ে দিল সকলকে।

মুহূর্তের মধ্যে মঞ্চ সরে গেল। চোখের পলকে ঝুলে পড়ল ক্ষুদিরামের দেহ।

সকলের চোখে জল। দুজন জেল ডাক্তার খাটিয়ায় শুইয়ে ক্ষুদিরামের পুণ্য দেহ নিয়ে এলেন জেলখানার বাইরে।

বন্ধুর মত বন্ধু কালিদাসবাবু সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ক্ষুদিরামের শবদেহ বয়ে নিয়ে চললেন গণ্ডক নদীর দিকে। রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়—বাংলার প্রথম শহীদের পুণ্যদেহখানি দেখবার জন্যে। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিধ্বনি। লক্ষ লক্ষ চোখে বসুধারা। পথ কি পাওয়া যায়? দুজন পুলিশ আগে আগে গিয়ে ভিড় সরিয়ে পথ করে দিতে থাকল শববাহকদের।

শ্মশানে সাজানো চিতায় তুলে দেওয়া হল অমর ক্ষুদিরামের মরদেহ। ধু-ধু জ্বলল চিতা। বাংলার অগ্নি-শিশু মিশে গেল অগ্নিদেবের কোলে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির খবর পৌঁছল কলকাতায়। যুবকরা শোক পোশাক পরে খালি পায়ে গেল স্কুল-কলেজ অফিসে। কতজন করলে নিরামিষ হবিষ্যান্ন। সারা দেশ শোকে মুহ্যমান।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের অগ্নিবীণার ঝংকার উঠল—

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন,
জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে
করব তারে লয়,

মোরা আপনি মরে মরার দেশে
আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি,
মৃত্যুজয়ের ফল।

অতৃপ্ত আশা, অতৃপ্ত ক্ষুদিরাম, তাই আউল, বাউল, ভিখারীরা আজও একতারা, খঞ্জনী বাজিয়ে পথে পথে গেয়ে বেড়ায়—

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।।
কলের বোমা তৈরী করে দাঁড়িয়ে
ছিলাম পথের ধারে
(মাগো) জজ সাহেবকে মারব বলে
মারলাম দুই নির্দোষী।।
হাতে যদি থাকত ছোরা, তোর
ক্ষুদি কি পড়ত ধরা
রক্তে হত ছড়াছড়ি (মা) দেখত
ভারতবাসী।।
শনিবার দুটোর সময় পুলিশ কোর্ট
হল লোকময়
জজ মেজেস্টর বিচার করে রায় দিল
(মা) ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি পরো না
মা বিলিতি শাড়ি
(মাগো) মনের দুঃখু রইল মনে
হল না স্বদেশী।
দশ মাস দশদিন পরে ক্ষুদিরাম
তোর আসবে ফিরে (মাগো)
(তখন) যদি না চিনতে পারো মা,
দেখবে গলায় ফাঁসি।।

(ক্রমশঃ)

হাউস ফায়ার পার্টি আগুন নেভাচ্ছে। ফটো : অমৃত

অগনা

দেশ শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত। যে কোন অংশে যে কোন সময় বিপদের সম্ভাবনা। বিপদসংকেতসূচক সাইরেন বেজে উঠলো। শত্রুসৈন্য আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান গর্জন করে উঠলো। শত্রুসৈন্যকে বাধা দিতে এগিয়ে গেল বিমানবাহিনী। তবু সব সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে শত্রুর বিমান লক্ষ্যস্থলে বোমাবর্ষণ করতে সক্ষম হলো। মুহূর্তে শান্ত নিরুপদ্রব জনপদ হয়ে উঠলো ত্রস্ত। আক্রান্ত জায়গার কোন কোন অঞ্চলে জ্বলে উঠলো আগুন। প্রাণহানিও হয়তো বা। আহতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। চকিতে সে খবর ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। সাইরেনে বিপদমুক্তির সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো উদ্ধারকারীবাহিনী। তাঁরা এক এক করে আহতদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে এলেন। দু-তলা বা তিন তলা এমনি সব উঁচু বাড়ি থেকে দড়ির মইয়ের সাহায্যে নানা কৌশলে তাঁরা আহতদের উদ্ধার করলেন। এবার সেই আহত ব্যক্তিদের নিয়ে আসা হলো স্ট্যাটিক ফার্স্ট এইড পোস্টে। তাঁরাও সেখানে হাজির এবং সঙ্গে ডাক্তার। ক্ষয়ক্ষতির গুরুত্ব বুঝে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাবার পর হয়তো মোবাইল ফার্স্ট এইড সার্ভিসের স্বেচ্ছাসেবিকারাও ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন। শুরু হলো আহতদের সেবা-শুশ্রূষা। আঘাত সাধারণ হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর আঘাত যদি গুরুতর হয় তবে আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে।

একদিকে এমনিভাবে আহতদের উদ্ধার এবং চিকিৎসা চলছে আর অন্যদিকে একদল স্বেচ্ছাসেবিকা আগুন নেভাতে ব্যস্ত। দলের নেত্রীর হাতে একটি ছোট কুড়ুল। অন্য সকলের হাতে জল এবং পাইপ। তাঁরা কালবিলম্ব না করে কাজে নেমে পড়লেন। দলনেত্রী পাইপ হাতে নিয়ে নির্দেশ দিলেন, ওয়াটার অন। সঙ্গে সঙ্গে জল ছাড়া হলো। জল দিতে দিতে আগুন একটু নিস্তেজ হলে জল বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি সেই কুড়ুল দিয়ে এবার আগুনের অবস্থা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। ফিরে এসে আবার জল চালু করার নির্দেশ দিলেন। সমানে জল এসে পড়তে লাগলো সেই প্রায় বাগ-মানানো আগুনের উপর। ইতিমধ্যে জল ফুরিয়ে যেতে একজন ছুটলেন জল আনতে। জল পাম্প করা কিন্তু অব্যাহত। সেই স্বেচ্ছাসেবিকা জল নিয়ে আসার পরও আগুনে জল ছিটানো থামলো না। হাত বদল করে এক-একজন পাম্প করছেন। আস্তে আস্তে আগুন নিভে এলো। দলনেত্রী আবার পরীক্ষা করলেন। এবার তিনি নির্দেশ দিলেন, ওয়াটার অফ। আগুন কব্জু। সকলের মুখে পরিতৃপ্তি এবং সাফল্যের হাসি।

এসবই হলো সিভিল ডিফেন্স অর্থাৎ অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজ। দেশ যখন শত্রুসৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন এই সংস্থার গুরুত্ব অসাধারণ। সাইরেন বাজিয়ে শত্রুর আক্রমণের সংকেত দিয়ে জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া যেমন সিভিল ডিফেন্সের দায়িত্ব তেমনি আক্রমণ পরবর্তীকালে তাঁদের উদ্ধার এবং সেবাশুশ্রূষার দায়িত্বও এই সংস্থার। অথচ এমন একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ধারণাই স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন যে সকাল ৯টায় সাইরেন বাজার সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে মস্ত লাভ। এরপর সিভিল ডিফেন্সের আরো অনেক কিছু জানার এবং করার আছে সে চিন্তা আমরা মাথায় আনি না। এজন্য সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও বড়ো কম নয়। এবারের যুদ্ধে সর্বপ্রথম কিছু কিছু পোস্টার আমাদের নজরে এসেছিল, আপনার ওয়ার্ডেনকে চিনুন। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত আমরা যুদ্ধকালীন মুহূর্তেও খোঁজখবর নিয়ে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে পরিচয় করে উঠতে পারি নি। কেউ কেউ অবশ্যই পেরেছেন। না হলে এরকম অসামরিক প্রতিরক্ষা সংগঠন গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। এ-ব্যাপারে ওয়ার্ডেনদের কর্তব্যনিষ্ঠাও অনস্বীকার্য। কারণ, সিভিল ডিফেন্সের প্রায় সব ব্যাপারটাই নির্ভর করে স্থানীয় ওয়ার্ডেনের ওপর। স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকা নির্বাচন করেন তিনি। কিন্তু সবার এই কর্তব্যনিষ্ঠা তেমন নজরে পড়ে না।

যুদ্ধকালীন মুহূর্তে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয় গুজবে কান দেবেন না। গুজবে জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়। অহেতুক আতংক নিবারণের জন্যই এই ব্যবস্থা। অনেক এসময় গুজব রটে এবং লোকজন আতংকগ্রস্ত হন। কোন সীমান্তবর্তী শহরে শত্রুসেন্য হয়তো শেলিং শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই শহরের বাসিন্দারা ভয় পেয়ে দল বেঁধে পালাতে আরম্ভ করলেন। কিভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে তাঁরা জানেন না। সহজ রাস্তা ধরে তাঁরা হুড়মুড় করে ছুটতে লাগলেন। এর প্রভাব পড়লো সেই জনপদের উপর। স্থিরবুদ্ধি না করে তাঁরা পালাতে শুরু করলেন। এভাবে প্রতিটি জনপদের অধিবাসীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পালাতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা সামনের দিকে চলেছেন। কিন্তু কত দূরে গেলে যে নিরাপদ আশ্রয় পাবেন তা তাঁরা জানেন না। যে পথ ধরে তাঁরা পালাচ্ছেন সেই পথে হয়তো শত্রুর বিমান আক্রমণ হতে পারে। তখন ঘটবে বিপদের উপর বিপদ। এই মুহূর্তে এগিয়ে আসবেন সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবিকারা। তাঁরা পলায়নপর জনসাধারণকে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন এবং যাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার তাঁদের সরিয়ে নিয়ে যাবেন, পরে বাদবাকীদের তাঁদের ঘরবাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দেবেন যে, প্রয়োজন মনে করলে এবং সে রকম বিপদ দেখা দিলে তাঁরাই তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবেন। এরকমভাবে হুড়মুড় করে পালানোর কোন প্রয়োজন নেই।

শত্রুর বিরুদ্ধে জওয়ানরা লড়ছেন রণাঙ্গনে। দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি নাগরিকের তখন কঠিন দায়িত্ব। একদিকে, জওয়ানদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য রসদ জোগান রাখতে হবে অব্যাহত। যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁরা লড়বেন সেগুলো যেন ঠিকমতো তাঁদের হাতে গিয়ে পৌঁছায়। রসদের যেন কোন অভাব না হয়। সেজন্য উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকাদের কড়া নজর রাখতে হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকা চাই এবং উৎপাদন যাতে আরো বাড়ে সেদিকে তাঁরা সব সময় সাহায্য করবেন। অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের নৈতিক বল উন্নত করা দরকার। শত্রুর সৈন্যের আক্রমণের মুখে সাধারণ মানুষ কোন মতেই যাতে আতংকগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে যেমন তাঁদের সতর্ক থাকতে হয়, তেমনি হুঁশিয়ার থাকতে হয় গুজব রটনা সম্পর্কেও। যুদ্ধকালে শত্রুরা নানাদিক থেকে এবং নানাভাবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় কোন ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যাওয়ার পরও জনগণের নৈতিক বল অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে। এই হলো সিভিল ডিফেন্সের সামগ্রিক কর্মসূচী।

যদিও ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে সিভিল ডিফেন্স ব্যবস্থার সূত্রপাত তবু এই প্রয়োজনীয় সংস্থাটি তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের আক্রমণের সময় সিভিল ডিফেন্স কিছু কিছু কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু তাও তেমনভাবে সফল হয়নি। সিভিল ডিফেন্স প্রকৃত অর্থে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে এ বছর। সব জায়গায় অবশ্য এই ভূমিকা তেমন নজরে পড়ে না কিন্তু এদিক থেকে ব্যতিক্রম হলো ব্যারাকপুর মহকুমা। যুদ্ধের সময়ে গুরুত্বের দিক থেকে শহরগুলিকে এ এবং বি এই দুভাগে ভাগ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রুপের শহরের ঝুঁকি বেশি। এই শহরে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনাও বেশি। ব্যারাকপুর এ গ্রুপের শহর এবং নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অস্ত্র কারখানা, বিমান ঘাঁটি, রাডার স্টেশন, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এবং সর্বোপরি মিলিটারি বেস এসব মিলিয়ে এই শহরের গুরুত্ব খুবই। অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শহরের অভ্যন্তরে এই শহরের সুদৃঢ় অসামরিক ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়।

শহরের প্রতিটি পরিবার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সিভিল ডিফেন্সের কর্তব্যের একটি অঙ্গ। যদি সহসা শত্রুপক্ষের কোন আক্রমণ ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকা বিপর্যস্ত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী দল গিয়ে উদ্ধারকার্য চালাবে এবং আন্দাজ করার চেষ্টা করবে ক্ষয়ক্ষতি কতটা হতে পারে। আসল প্রশ্ন কিন্তু লোকজন সংক্রান্ত। সেই এলাকায় কত লোক আছে সেটা যেমন জানতে হবে তেমনি কোন বাড়িতে কজন লোক তাও জানতে হবে। এতে উদ্ধারকার্যের অনেক সুবিধা হয়। সাধারণত দিনের বেলায় পুরুষেরা বাড়িতে থাকেন না। কাজ-কর্মে এসময়টা তাঁরা বাড়ির বাইরেই থাকেন। আবার ছেলেমেয়েরা হয়তো পড়ে স্কুল-কলেজে। এসময়ে ওরা সেখানেই থাকবে। বাড়ির কেউ হয়তো থাকেন বাইরে। এসব তথ্য সযত্নে ধরে রাখা হয় হাউসহোল্ড রেজিস্টারে। এটিকে বলা হয় সিভিল ডিফেন্সের বাইবেল। এই রেজিস্টার যদি হাতের কাছে থাকে তবে উদ্ধারকার্যে কোন অসুবিধা হয় না আর অযথা হয়রানি হতে হয় না। কারণ, কে কোথায় আছেন আর কজন বাড়িতে আছেন এ তথ্য তো হাতের কাছে হাজির। ব্যাপারটিকে আরো সহজ করে বললেন ব্যারাকপুর সিভিল ডিফেন্সের এ ডি সি সাহেব। তিনি বললেন যে, ধরুন আমার বাড়িতে আমরা স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে তিনজন। আমার ছেলে পড়াশোনা করে নরেন্দ্রপুরে। দিনের বেলা আমি থাকি অফিসে। একমাত্র আমার স্ত্রী সারা দিন বাড়ি থাকে। আমার বাড়ি যে এলাকায় সেখানে যদি কোন আক্রমণ ঘটে তবে উদ্ধারকারী বাহিনী বাড়ির সকলের জন্য হয়রান না হয়ে শুধু আমার স্ত্রীর খোঁজ করবে। হাউসহোল্ড রেজিস্টারে আমাদের ইন আর আউট সবই নোট করা আছে। তিনি আরো জানালেন যে, একাজটা অল্প-লোকের সাহায্যেই অনায়াসে করা যায়। অনেক

হাউস ফায়ার পার্টি জল পাম্প করছে   ফটো : অমৃত

বাড়ির মহিলারা ছেলেদের সামনে মুখ খুলতে চায় না। কিন্তু মেয়েরা ঠিক কাজ আদায় করে নিয়ে আসে।

সিভিল ডিফেন্সে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো কন্ট্রোল রুমে। সেন্ট্রাল ওয়ার্নিংহাউস থেকে বিপদজ্ঞাপক বার্তা সর্বপ্রথম আসে মহকুমায়। তারপর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। হয়তো কোন জায়গা থেকে আহতদের অপসারণের জন্য উদ্ধারকারী বাহিনী চেয়ে পাঠানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে রিজার্ভ উদ্ধারকারী সেই স্থান অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং নিরুপদ্রব এলাকা থেকে উদ্ধারকারী চেয়ে এই ঘাটতি পূরণ করা হলো। শহরের কোন জায়গা আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপে সেই জায়গাটি নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো হলো। যুদ্ধকালীন সময়ে এখানকার কন্ট্রোল রুমে নয়জন মেয়ে সর্বক্ষণ ডিউটি দিতেন। এখন অবশ্য ডিউটি দেন একজন। এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তাই সিভিল ডিফেন্সের অতটা সাজ-সাজ ভাব আর নেই। কিন্তু কাজ এখানে চলছে। নিয়মিত ট্রেণিং হচ্ছে। দলে দলে ছেলেমেয়ে আসছেন ট্রেণিং নিতে। এ'রা সবাই আসছেন বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে। একটা কথা এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে, প্রতিটি বড় কারখানায় নিজস্ব সিভিল ডিফেন্স থাকবে। যদি কোন আক্রমণ ঘটে তবে তার পরবর্তী অবস্থার মোকাবিলা তাঁরা নিজেরাই করবেন। এখান থেকে ট্রেণিং পেয়েছেন এমন অনেককে স্থানীয় কারখানাগুলি চাকরি দিয়ে নিয়ে গেছেন নিজেদের সিভিল ডিফেন্সকে জোরদার করার তাগিদে।

ব্যারাকপুরের সিভিল ডিফেন্স এরিয়া হলো ৬৩-৬০ স্কোয়ার কিলোমিটার। এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে আছে ১৫টি সিভিল ডিফেন্স শহর। শীঘ্রই আরো একটি শহর এর অন্তর্ভুক্ত হবে। চীফ ওয়ার্ডেন, পোস্ট ওয়ার্ডেন বা ডেপুটি চীফ ওয়ার্ডেনের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। এই শহরে চীফ ওয়ার্ডেন বা ডেপুটি চীফ ওয়ার্ডেনের মধ্যে কোন মহিলা নেই। কিন্তু পোস্ট ওয়ার্ডেনদের মধ্যে দশজন এবং সেকটর ওয়ার্ডেনদের মধ্যে কুড়িজন মহিলা আছেন। ওয়ার্ডেন হচ্ছেন পুরোপুরি অনারারি। মহল্লার বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী লোকেরাই এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অসামরিক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সকলের। তাই পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও এগিয়ে এসেছেন সংকট মুহূর্তে দেশের সেবা করার জন্য। আর সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বিপদ-মুহূর্তে সাহায্যকারী প্রতিটি দল।

আগুন যদি খুব বড় না হয় তবে সিভিল ডিফেন্সের হাউস ফায়ার পার্টি সহজেই তা বাগ মানাতে পারে। এর মহড়াও দেখলাম। ইলেভেন ক্লাশের ছাত্রী ইন্দ্রাণীর নেতৃত্বে শত্রুর আক্রমণে জ্বলে ওঠা আগুন নেভানো হলো অসাধারণ দক্ষতায়। ইন্দ্রাণী সদ্যোমাত্র সিভিল ডিফেন্সে এসেছে। দৃঢ়তার সঙ্গে সে জানালো যে বিপদের মুখে আত্মনির্ভরতা এবং সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়েই একাজে এসেছি। নিজে শিখবো এবং আরো সবাইকে শেখাবো। একই মনোভাব প্রকাশ করলেন স্ট্যাটিক ফার্স্ট এইডের শক্রা এবং কবিতা। এই অঞ্চলের সিভিল ডিফেন্সের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কালিমতী কর। পেশায় তিনি শিক্ষিকা। ওয়েলফেয়ার সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই মহকুমার শতাধিক মেয়ে। কম্যুনিকেশনের জন্যও একই রকম পুরনো। যুদ্ধের সময়ে তিনি কন্ট্রোল রুমে কাজ ক'রছেন। এখনও কাজ করছেন।

প্রতিটি পোস্ট ওয়ার্ডেনের নেতৃত্বে থাকবে একটি স্ট্যাটিক ফার্স্ট এইড পার্টি। ১৬ জন হবে এর স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকা। একজন স্থানীয় ডাক্তার এ'দের সংগে যুক্ত থাকবেন। বিপদের সময় আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব এ'দের। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। হাউস ফায়ার পার্টিতে অবশ্য স্বেচ্ছাসেবিকার সংখ্যা হবে মাত্র ৪ জন। ইতিমধ্যেই এই মহকুমায় ২০ জনের বেশি মেয়ে হাউস ফায়ার পার্টিতে যোগ দিয়ে ট্রেণিং নিয়েছেন। এ'দের সংখ্যা দিনে দিনেই বাড়ছে যুদ্ধকালীন সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, প্রয়োজনের তুলনায় ট্রেণিং নিতে এগিয়ে এসেছিলেন অনেক বেশি ছেলেমেয়ে। অসামরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কে এখানকার অধিবাসীদের এই আগ্রহের কারণ বোঝা গেল একটু পরেই। এ ডি সি সাহেব এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন আমার হাতে। তাতে আছে সেই কথাটি, আপনার ওয়ার্ডেনকে জেনে নিন। কিন্তু এটুকু বলেই দায়িত্ব শেষ হয়নি। ওয়ার্ডেনের নাম-ঠিকানা সহ সেই কাগজ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে প্রতি বাড়িতে। এছাড়া সিনেমায় নিয়মিত স্লাইড দেওয়া হয়েছে। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর এবং সকল সহকর্মীর আন্তরিকতা। যার ফলে প্রকৃত অর্থে অসামরিক প্রতিরক্ষা এখানে গড়ে উঠতে পেরেছে।

সিভিল ডিফেন্সের ট্রেণিংপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকারা যে শুধু যুদ্ধের সময়ে দেশের সেবা করবেন তা নয় যে কোন প্রয়োজনে তাঁরা এগিয়ে আসবেন। বাংলাদেশ থেকে যখন দলে দলে শরণার্থী এদেশে আসতে শুরু করে তখন এই মহকুমার সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবিকারা এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সাহায্যার্থে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এমনিভাবেই তাঁরা কাজ করে চলেন। আসন্ন নির্বাচনেও তাঁদের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপক বিকাশ আমাদের দেশে একান্ত প্রয়োজন। ব্যারাকপুর মহকুমা এদিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। দেশের সর্বত্র নিজেদের স্বার্থে নিজেরাই প্রতিরক্ষার কাজে এগিয়ে আসবে। এই মনোভাব জাগ্রত করাই হলো সিভিল ডিফেন্সের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যারাকপুর মহকুমায় ছাত্র-ছাত্রী এবং পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে যে চেতনা প্রসারলাভ করেছে সে চেতনার আলোকে উদ্দীপিত হোক সমগ্র দেশ—গড়ে উঠুক সত্যিকার প্রতিরক্ষা, দেশরক্ষা আর আত্মরক্ষা।

—প্রমীলা

মাঘমণ্ডল ব্রত

• অঞ্জলি চৌধুরী •
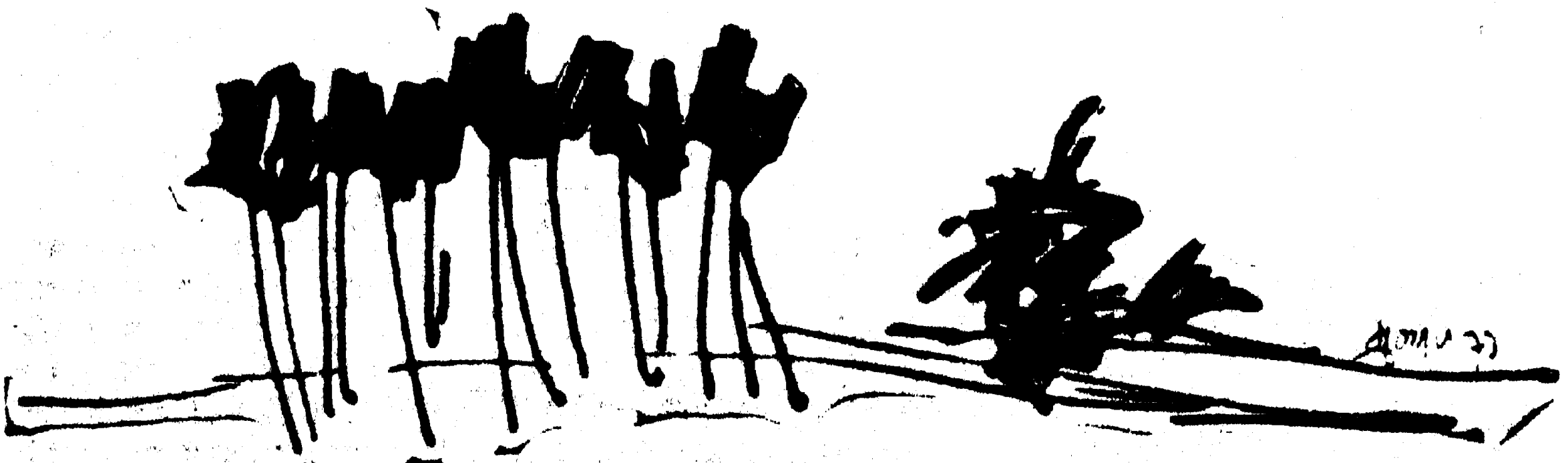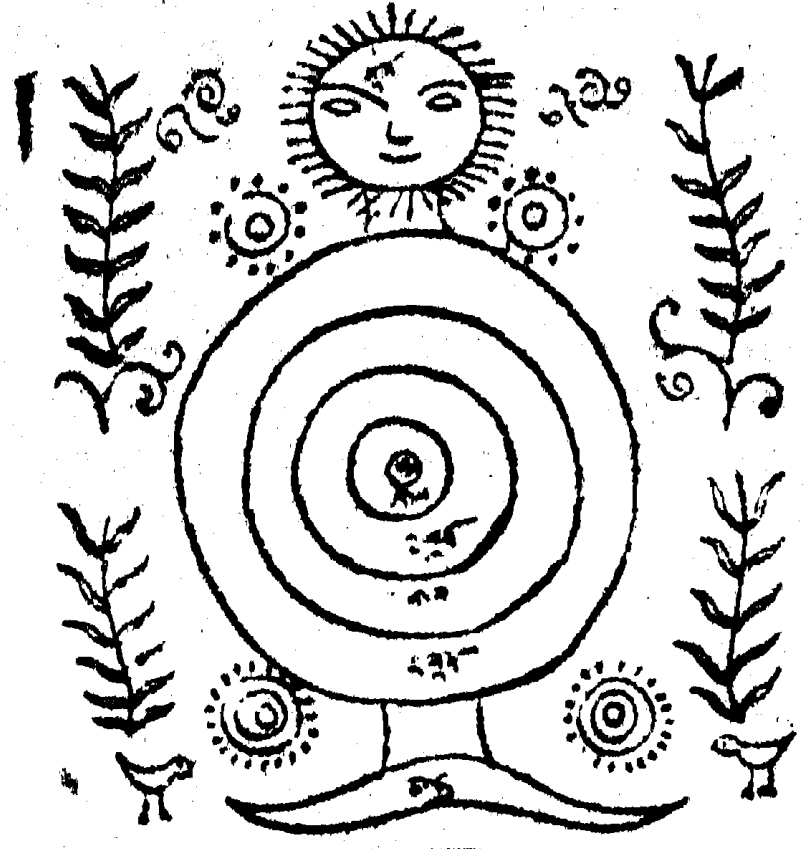
বাঙালীদের ব্রত আর পালা-পার্বণের অন্ত নেই। এই ব্রত আর পালা-পার্বণের মধ্য দিয়ে বাঙালী ঘরের মেয়েরা তাদের জীবনকে, সংসারকে সুখী আর সুন্দর করে গড়ে তোলার কামনা করে। সাধারণত ছড়ায়, আলপনায় তা সোচ্চার হয়ে ওঠে। মাঘমণ্ডল মাঘ মাসের এক উল্লেখযোগ্য ব্রত।

পৌষের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয়ে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত চলে। এই ব্রত করে কুমারী মেয়েরাই। উঠানের এক পাশে মাটি দিয়ে অল্প উঁচু বেদী (লাউল) করে তার সামনে ছোট চারকোণা একটা গর্ত করতে হয়। ব্রতীর সংখ্যা বেশি হলে প্রত্যেকের জন্য দুটি করে গর্ত থাকে। এই ব্রতে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, আটঘাট, দেবদ্বার, মাঘমণ্ডল ও বিবিধ অলঙ্কার দিয়ে আলপনা চিত্রিত করতে হয়। এই আলপনা নানাবিধ রং দিয়ে জমকালো করার রেওয়াজ সব জায়গায় দেখা যায়। নীল গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, চকের গুঁড়ো, হরিদ্রাচূর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ, আবির গুঁড়ো, ইঁটের গুঁড়ো প্রভৃতি দিয়ে মা-মাসী-পিসিরা ব্রতের আলপনা ও উচ্চ বেদী সাজিয়ে দেন। স্থানভেদে উচ্চ বেদী নানা রকম ফুল দিয়ে সাজানো হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাঁদা ফুল দিয়েই বেদী জমকালো করা হয়। পরে ব্রতী আলপনার একধারে আসনে বসে ব্রত শুরু করে। সাধারণত ব্রতী যথাক্রমে তিনটি আঁটি (সরষে ফুল, পলাশ ফুল নয়তো মাদার ফুল ও গাঁদা ফুল সঙ্গে দূর্বা দিয়ে) জল নেড়ে ব্রতকথা উচ্চারণ করে।

মাঘমণ্ডল ব্রতটিতে আছে তিনটি অংশ। প্রথমত সূর্য ওঠার আগেই ব্রতীরা তাদের সূর্য ওঠার ছড়া শুরু করে। পুকুর পাড়ে এসে ব্রতীরা, ফুলবালারা পা মেলে জল ছিটিয়ে রাত্রের শিশিরে ভেজা ফুলগুলির সঙ্গে খেলা শুরু করে। তারপর শুরু হয় তাদের ব্রতর ছড়া—

ফুলবালারা—চোখে মুখে জল দিতে
কি কি ফুল লাগে?
ফুলেরা—ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া
দুটি ফুল লাগে!

মালিনী তখন জিজ্ঞেস করে—সেই ফুলে খান কি?

ফুল—নল ভেঙে জল খান।

ক্রমে মেয়েরা, ফুলবালারা, ফুলেরা এ ওর গায়ে ঢলাঢলি, হাসাহাসি করে পুকুরের জল দিয়ে মুখ চোখ পরিষ্কার করে, তাই দেখে মালিনী বিস্মিত হয়ে গেলে ব্রতীরা উত্তর দেয়—

হাসিস না লো, খুশিস না লো,
তুই তো আমার সই!
মাঘমণ্ডলের বর্ত করুম,
ঘাট পামু কই?
মালিনী—আছে আছে লো ঘাট,
বামুনবাড়ির ঘাট।
মেয়েরা—রাত পোহালে বামুন গো
পৈতে ধোওনের ঠাট।

অর্থাৎ মেয়েরা বামুনদের পৈতা-কচল্যানোর ঘাট বলে সেই ঘাট পরিহার করছে।

মালিনী একে একে গোয়ালবাড়ির ঘাট, নাপিতবাড়ির ঘাট, ধোপাবাড়ির ঘাট, ভুঁইমালির ঘাট, মেলেনী বুড়ির ঘাট প্রভৃতি ঘাটের কথা মেয়েদের সুধালো। কিছুই তাদের পছন্দ হয় না। তারাও বাদানুবাদ করে মালিনীর কথা খণ্ডন করার জন্য বলে 'গয়লাগো দই-ক্ষীরের হাঁড়ি ধোওনের ঠাট, নাপিতগো খুর ধোওনের ঠাট, ধোপাগো কাপড় ধোওনের ঠাই, ভুঁই মালিগো কোদাল ধোওনের ঠাট, মেলেনী-বুড়ির ফুল ধোওনের ঠাট।' এর পর ধীরে ধীরে মেয়েরা আর মালিনীরা ফুল তোলার ছড়া বলে ফুল তোলার কাজ সাঙ্গ করে।

এবার সূর্যঠাকুরের ওঠার পালা। সাধ্যসাধনা করার পর সূর্যঠাকুর উঠতে চাইছে। কিন্তু কুয়াশা তার পথরোধ করে আছে। মেয়েরা তখন কুয়াশা ভাঙ্গার ছড়া শুরু করলো—

উঠ উঠ সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
সূর্য—না উঠিতে পারি আমি
ইয়লের লাগিয়া।
মেয়েরা—ইয়লের পষ্টকাটি শিয়রে থুইয়া
উঠিবেন সূর্য কোনখান দিয়া?
মালিনী সূর্য ওঠার পথ বাতলে দিয়ে বলে—
উঠিবেন সূর্যঠাকুর বামুনবাড়ির
ঘাটখানি দিয়া।

মাঘমণ্ডলের ব্রতী

তবুও সূর্য ইয়ল অর্থাৎ কুয়াশার জন্য উঠতে পারে না। শেষে বুড়ো মালিনীর ঘাট—জল যেখানে ফুলের সৌরভে ভরা সেখান দিয়ে সূর্যের উদয় হলো। এইবারে মাধবের কন্যা চন্দ্রকলাকে সূর্যের ভাললাগা ও বিয়ে পর্ব শুরু হয়।

বাসর ঘরে চন্দ্রকলা সূর্যকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তা যেন বাঙালী ঘরের প্রতিটি বিবাহিতা মেয়ের অন্তরের কথা। নতুন বিবাহিতা মেয়েদের জিজ্ঞাসা, বিস্ময় সবই প্রকাশিত হচ্ছে চন্দ্রকলা আর সূর্যের কথার মধ্য দিয়ে।

চন্দ্রকলা—তোমার দেশে যাব সূর্য
মা বলিব কারে?
সূর্য—আমার মা তোমার শাশুড়ি,
মা বলিও তারে।
চন্দ্রকলা—তোমার দেশে যাব সূর্য,
বাপ বলিব কারে?
সূর্য—আমার বাপ তোমার শ্বশুর,
বাপ বলিও তারে।

এই যে দুটি পরিবারের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক, এক পরিবারের লোককে অন্য পরিবারের একজন আপন করে নেওয়ার যে উদারতা, তা প্রতিটি বাঙালী পরিবারের ঘরের কথা। এই বিয়েতে সূর্য হাতি, ঘোড়া, জাজিম, লেপ, তোশক, ঘটি, বাটি, থালা আরোও অনেক কিছু পেলো। সূর্যের এই বিয়েতে তার পূর্বের স্ত্রী গৌরী 'কুঁইয়া পাঁটি' দেখে বলে—

"থামু না লো থামু না লো, শিয়রে থুমু,
রাতখান পোহাইলে কাউয়ারে দিমু।"

নববধূ চন্দ্রকলাকে নিয়ে সূর্য জাঁকজমক করে বাড়ী ফিরছে দেখে সূর্যের মা বলে—

"আসবেন সূর্য বসবেন খাটে,
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,
গা হেলাবেন সোনার খাটে,
পা মেলাবেন রূপার পাটে,
— — — — — —
সুপারি খাইবেন ছড়া ছড়া,
খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা,
চুন খাইবেন ধুতুরী ভরা,
পিক ফেলাইবেন লাহা লাহা।"

এরপর সূর্যের পুত্র 'লাউল বা লাউল' (সূর্যপুত্র)-এর বিয়ে। তার আয়োজনে ঘরামী, মালি-মালিনী, ঘটক, ব্রাহ্মণ, কুমোর, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, জেলেনী, রাঁধুনী, সিকদার সকলেই ব্যস্ত। লাউলের জেঠতুতো ভাই শিবাই পাত কাটতে উদ্যত। মালি তাকে ডেকে বলে,

শিবাই রে, শিবাই রে, না কাটিও পাত।
শিবাই—বাইছা বাইছা কাটুমনে
সবরি কলার পাত।
মালি—সবরি কলার পাতে নাকি
লাউলে খায় ভাত?
বাইছা বাইছা কাটো গিয়া
চিনিচম্পা কলার পাত।"

এরও পরে দেখছি লাউলের ছেলের জন্ম হয়েছে। লাউলের ছেলের কি নাম রাখা হবে তাই এক বিরাট গবেষণার বিষয়।

'আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু।
বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।
কমলা দিয়া কমল নাম থুমু।
জল দিয়া জয় নাম থুমু।
রাজার বেটা রাজার ছেইলা
রাজা নাম থুমু।'

লাউলের ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে একশত ভগিনী নিয়ে লাউলের স্ত্রী হলামালা চলে নাইতে। স্নান শেষে তারা যখন জল থেকে উঠে আসে, তখন মধুমাস শেষ। বৈশাখের ঝড় উঠেছে আকাশে বাতাসে। লাউলের বিদায় নেবার পালা। হালামালার শত ভগিনী বিদায়ের পূর্বে লাউলকে কিছু খেয়ে যেতে অনুরোধ করে—

'খাও খাও লাউল, গোটা চারি ভাত,
আমরা শত বইনে ফ্যালাম-নে পাত।'

অথচ বৈশাখের ঝড়ের গর্জন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। লাউলকে আর আটকে রাখা যাচ্ছে না। তাকে বিদায় দিতেই হবে।

'আজ যাও লাউল, কাল আইসো।
নিত্য নিত্য দেখা দিও।
বছর বছর দেখা দিও।'

ব্রতীদের পালা সাঙ্গ হয় এরপর। তারা ভাসিয়ে দেয় লাউলকে। প্রত্যেক ব্রতীকে পরপর পাঁচ বছর এই মাঘমণ্ডলের ব্রত করতে হয়। সাধারণতঃ পাঁচ বা ছয় বছরের মেয়েরাই এই ব্রত শুরু করে। এই ব্রতটির মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় শীত শেষে বসন্তরূপী লাউলের আগমন ও বিদায়। আমাদের ঘরের মেয়েরা তাদের নিত্যকাজের মাঝে এই বসন্তকে আপন করে নিয়ে তাকে আবার বছর বছর ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানায়।

—[illegible] চৌধুরী

বংশধর

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

পিণ্টু এই সাত পেরিয়ে আটে পা দিল। হাতে-পায়ে মোটেই দুরন্ত নয়, বরং কেমন যেন একটু নির্জীব ধরনের। একটু ভয়তরাসে প্রকৃতির। বছর-খানেক আগেও কথায় কথায় কাঁদত, ঘ্যানর-ঘ্যানর করত, ভরদুপুরে ফেরিওয়ালা কৃত্রিম গলায় হেঁকে গেলে, ভয় পেত। পিণ্টুকে সামলাতে ওর মা অনেক সময় বলত, ঐ ফেরিওয়ালা আসছে। আমি ছেলেকে এরকম মিথ্যে ভয় পাওয়ানো পছন্দ করি না, ওতে ওর ব্যক্তিত্ব খর্ব হবে, পৌরুষ দানা বাঁধতে পাবে না। প্রথম সন্তান, ডাক্তার-বদ্যি অনেক করেছি, সবাই বলে, ইল্ হেলথ্, ওর মায়ের পুরো ন মাস হবার আগেই ও জন্মেছে, অনেক কষ্টে ওকে বাঁচাতে হয়েছে, পিণ্টুর এক মাস বয়স থেকে ওকে সমানে ওষুধ খাওয়াচ্ছি। ওষুধে আর ফুডে একটু মোটাসোটা অবশ্য হয়েছে, কিন্তু ভয়-ভয় ভাবটা একেবারে যায়নি। কেউ হঠাৎ ডাকলে চমকে ওঠে, খাটে শুয়ে যতক্ষণ না ও ঘুমোয় ঘরে আলো জেলে রাখতে হয়, ও ঘুমোবার আগে লাইট নেভালেই ও কান্না জুড়ে দেবে। অন্ধকারে ওর বিষম ভয়।

বাড়িতে মুরগী কাটতে দেখে পিণ্টু কেঁদেকেটে ভিরমি গিয়েছিল। ওর জন্যেই বাড়িতে সিং-মাগুর জিয়নো থাকত, ওর সামনে সেগুলোকে কাটার আগে পিটিয়ে মারা চলত না। পিণ্টুর স্নায়ুই বোধহয় কমজোরি। স্বাস্থ্যের সঙ্গে শুনেছি মনের একটা নিকটসম্বন্ধ আছে, ওর স্বাস্থ্য যা হোক ফিরেছে, কিন্তু মনের গঠনটা তেমনি দুর্বল রয়ে গেছে। এর জন্যে অবশ্য আমাদের বাড়ির পরিবেশ, আর বিশেষ করে আমার বাবা অনেকখানি দায়ী।

বাবা ছিলেন এতদঞ্চলের নাম-করা উচ্চশিক্ষিত মানুষ। চেনা-জানা সবাই ওঁকে বেশ সমীহ করে চলত। ধুতি-পাঞ্জাবি চটি আর পাট-করা চাদরে পরিপাটি হয়ে বাবা বেরুতেন, মোটামুটি বড় চাকরিই করতেন, কিন্তু ঐ বাঙালীয়ানা ত্যাগ করেননি, কত ফ্যাশন এল গেল, কিন্তু বাবার ঐ এক সাজ। এমনকি যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, মাত্র বছর-দুয়েক মারা গেছেন, আমরাও, মানে আমি বা আমার ভাইরা কেউ বাবার মত সাবেকী পোষাক ছাড়া অন্য কিছু পরতে পারিনি। পোষাকের ঐ সাবেকী একনিষ্ঠতার জন্যেও পাড়া-প্রতিবেশীরা আমাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখত। পিণ্টুকেও এক প্রস্থ ধুতি-পাঞ্জাবি করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা, একটু বড় হতেই ওকে নিয়ে হাত ধরে বেড়াতে বেরুতেন, সবাই দেখত এক বৃদ্ধের পাশাপাশি একটি শিশুও ছোট্ট ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেজায় জবুথবু হয়ে হাঁটছে। পরিচিত কেউ কৌতূহলী প্রশ্ন করলে বলতেন, 'বাল্য-শিক্ষা দিচ্ছি নাতিকে। বই-শেলেট ধরার আগে অনেক কিছু শেখাবার থাকে, তাই মাঝে মাঝে নিয়ে বেরুই।' বাবা সন্ধে-আহ্নিক জপতপ করতেন, পাশে পিণ্টুকে বসিয়ে রাখতেন, পিণ্টুও চুপচাপ ঠায় বসে থাকত, কখনও কখনও ঠাকুর্দার মত চোখ বুজে থাকতেও দেখেছি।

মলিনা একমাত্র ছেলের এসব জ্যাঠামি একেবারেই পছন্দ করত না। শ্বশুরমশাইকে কিছু বলতে পারে না, তাই চোটটা এসে পড়ত আমার ওপর। ওর ইচ্ছে পিণ্টুকে একালের ছেলেদের মত স্মার্ট সার্টস আর সর্টস পরাবে, তাই পরে ছেলে ছুটবে খেলবে, তা না অল্পবয়সেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। আমিও ধুতি-[illegible]

সেটা কোনদিনই পছন্দ নয়, কিন্তু ছেলেকে ও বাপ-ঠাকুর্দার মত হতে দেবে না।

বাবার জন্যেই আমাদের বাড়ির সব কিছুই সাবেকী, পুরনো চোঙাওলা একটা গ্রামোফোন আছে, রেকর্ডও সব পুরনো-কালের—কে এল মল্লিকের শ্যামাসঙ্গীত, লালচাঁদ বড়ালের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, তা-ও সাহানা দেবীর। রেডিওতে বাংলা ছায়াছবির গান শোনে মলিনা। শুনে শুনে দু-একটা গানের কলি মুখস্থ হয়েছিল পিন্টুর, অতি উৎসাহে একদিন ঠাকুর্দাকে শোনাতে গিয়েছিল নিজে গেয়ে, বাবা বলেছিলেন, 'ওসব গান করতে নেই ভাই, ওতে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, রুচিবিকার হয়।' মলিনা বলেছিল, 'পিন্টুকে উপলক্ষ্য করে আসলে আমাকে শোনানো বুঝি না কিছু?'

বাবা আমাদের বাড়িটাকে একটা অচলায়তন করে তুলেছিলেন, একালের হাওয়া তাতে ঢুকতে দেননি। ফলে পিন্টুর মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না, ছেলেমানুষী অস্থিরতাও ছিল খুব সামান্য। বাবা মারা যাবার পর, মলিনার তাগাদায়, অনেক ডাক্তার-বদ্যি করতে হয়েছে। মলিনা ছেলেকে একটু বার-মুখো করবার চেষ্টা করল, বিকেলে খেলতে পাঠায়, সমবয়সী ছেলেদের মত আধুনিক পোষাকআষাক পরায়, বাড়ির দাওয়ায় 'অবাক জলপান' থিয়েটার করতে উৎসাহ দেয়। তাতেই, লক্ষ্য করলাম, ওর জবুথবু ভাবটা অনেক কমেছে, বেশ ছটফটে হয়েছে। ইস্কুলে ভর্তি হয়, যেতে-আসতেও বেশ আগ্রহ দেখা গেল। ব্যাণ্ডেল চার্চের সাহেব-দের ইস্কুলে পড়ে, ইস্কুলের ইউনিফর্ম সাদা সার্ট আর নীল হাফ প্যান্ট পরে, পিঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে যখন ইস্কুলে যায়, মলিনা গেট পর্যন্ত আসে, মনে মনে তারিফ করে বুঝতে পারি। পিন্টুর হাঁটাচলা ওর মনের মত হচ্ছে। বাবা নেই, পুজোপাঠ বন্ধ সুতরাং পিন্টুও আর বসে না, পুরনো গ্রামোফোনের বদলে রেকর্ড প্লেয়ার এসেছে, তাতে নতুন নতুন আধুনিক গান বাজে, মলিনা পিন্টুকে কোনদিন বলে, 'গা' কোনদিন বলে, 'নাচের গান, নাচতে পারিস?'

পিন্টুর এক বন্ধু জয়দেব গান শুনতে আসে মাঝে মাঝে, সে নাচতে পারে, কোমর-দোলানো ট্যুইস্ট, মলিনার পীড়াপীড়িতে নেচে দেখিয়েছে, সেই থেকে পিন্টুকে নাচে উৎসাহ দেয় ও। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন কেউ এলে নতুন রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে শোনায় মলিনা, আর সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিছু না বলতেই কোমর দুলিয়ে নাচে পিন্টু, গানও করে। আমি এসব আদপেই পছন্দ করি না একদিন বলেও ফেলেছিলাম, ফোঁস করে উত্তর হল, 'তা পছন্দ করবে কেন! কেমন বাপের ছেলে দেখতে হবে ত!'

আমি সেদিন অফিসে যাইনি, বৈঠকখানা ঘরে বসে কী যেন একটা পড়ছিলাম, পিন্টু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল। ইস্কুল থেকে অমন হঠাৎ ফিরে আসার কী কারণ ঘটল বুঝতে পারলাম না। অভাবিত ছুটিছাটা হয়ে গেলে যে আনন্দ-ফুর্তির ভাবটা থাকে তা মোটেই নেই ওর চোখে-মুখে, বরং কেমন যেন ভয়তাড়িত। ওকে ঐ রকম পড়ি-কী-মরি করে আসতে দেখে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কী হল রে খোকা?' আমার আতঙ্কিত গলা শুনে ভেতরবাড়ি থেকে ওর মা বেরিয়ে এল, মলিনার সবতাতেই হা-হা করে হামলেপড়া অভ্যেস, কিছুএকটা হলেই, একমাত্র ছেলে বলেই বোধহয়, এমন করবে যেন ছেলের প্রতি মায়ের মনোযোগ পুরোপুরি প্রমাণ হয়। আর তাতে ছেলেও হচ্ছে তেমনি, মাকে দেখলে আর রক্ষা নেই, মুহূর্তে ওর খুশি-আহ্লাদ-ভয় ত্রাস অতিরঞ্জিত দেখাবে। ঘরে বসে সেদিনও তাই দেখলাম। গেটের সামনে পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে পিন্টুকে বুকের মধ্যে আগলে ধরল মলিনা, একহাতে ছেলের পিঠের ব্যাগটা নামাতে নামাতে, আর এক হাতে ছেলের অবিন্যস্ত চুল পাট করতে করতে বলল, 'অমন হাঁপাচ্ছিস কেন? কী হল?' আমি ওতে খুব বেশি গুরুত্ব দিলাম না। কী আর এমন হতে পারে? কেটেছড়ে যায়নি দেখতেই পাচ্ছি, হয়ত কোন কুকুরে তাড়া করেছে, বা রাস্তার ষাঁড় দেখে ভয় পেয়েছে, সেরকম ভয় ত পিন্টু হামেশাই পায়। মলিনাকে দেখে পিন্টুর চোখ যেন আরো বিস্ফারিত দেখাল, ভয়ে ও ক্লান্তিতে মুখ পাংশুটে; কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলছিল, মলিনা বলল, 'চল ঘরে বসবি চল। কী হয়েছে পরে শুনব, আগে একটু জিরিয়ে নিবি চল। ইস ঘামে একেবারে জবজব করছে।' ওকে খাটের ওপর বসিয়ে পাখা খুলে দিল মলিনা।

ব্যাপার কিন্তু খুব সামান্য নয়, বরং খুব উদ্বেগজনক। খবরের কাগজে মাঝে মধ্যে এরকম দু-একটা তখন সবে বেরুতে শুরু করেছে, কিন্তু আমাদের হুগলি শহরে অমন কিছু চিন্তার বাইরে। বাড়িতে মুরগী কাটতে দেখে যে পিন্টু কেঁদেকেটে ভিরমি গিয়েছিল, সে দেখে এসেছে ইস্কুলের গেটের সামনে বুড়ো রাজেন স্যারকে ভোজালি দিয়ে গলা কেটে দিয়েছে একটা ছেলে। ইস্কুল-গেটের ওপারেই তালপোল পাকানো ভিড় দেখে উঁকি দিয়ে দেখেছিল পিন্টু, আধকাটা গলা, শ্বাসনালী কেটেও আরো গভীরে বসেছে ভোজালি, তাইতেই শ্বাসনালীটা হাঁ হয়ে আছে, মাথাটা লটকে আছে ঘাড়ের পাশে, কালচে লাল রক্ত চাপ-চাপ জমাট বেঁধে আছে অনেকখানি জায়গায়। রাজেনবাবুর কাছে আমিও পড়েছি, তাই সব শুনে আমিও দেখতে গিছলাম। সে দৃশ্য আমিও সহ্য করতে পারছিলাম না, একটা জ্যান্ত মানুষকে কশাইয়ের মত নির্দয়তায় কেউ ঐরকম করে কাটতে পারে ভাবতে পারি না। কল্পনা করতে পারি কী ভয়ঙ্কর 'শক' লেগেছিল পিন্টুর দুর্বল স্নায়ুতে, ও পালিয়ে এসে বেঁচেছে, আমাদেরও বাঁচিয়েছে, নইলে হয়ত ঐখানেই মাথা ঘুরে পড়ত। বাড়িতেও ওকে নিয়ে কম হাঙ্গামা হয়নি। ঐ খুনের দৃশ্য পিন্টুর শিশুমনের ওপর একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল; রাতে ঘুমের ঘোরেও বিড়বিড় করেছিল, দু-একবার স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়েও উঠেছিল। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ওকে সেই দৃশ্য ভোলাবার চেষ্টা করি, কিন্তু সহজে তা ওর মন থেকে যায় না। বরং আমাকে বাড়িতে পেলে হাজারো প্রশ্ন করল, 'রাজেন স্যারকে মারল কেন', 'রাজেন স্যার কী করেছিল', ইত্যাদি।

কয়েকদিন পিন্টুকে ইস্কুলে যেতে দিলাম না, ওকে সঙ্গ দেবার জন্যেই আমি কামাই করছি। আমাদের এই মফস্বল শহরেও কিছুদিন যাবৎ ছোটখাট হামলা-বাজি, বোমা-পটকা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছিল, কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনা তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। ইস্কুল-টিচার রাজেন মিত্তিরের মৃত্যুতে শহরটা যেন থমথম করতে লাগল। যাই হোক, আমি দুবেলা পিন্টুকে বোঝাতে লাগলাম, এসব খুন-খারাপি জঘন্য অপরাধ, যারা করে তারা সমাজের শত্রু। পিন্টু বেশ মনোযোগ দিয়ে সব কথাগুলো শুনল, তারপর জিগ্যেস করল, 'তাহলে যে ছেলেটা রাজেন স্যারকে খুন করেছে তাকে সবাই মিলে ধরে না কেন?'

কয়েকদিন পরে ইস্কুল থেকে ফিরে আবার ঐ কথা তুলল পিন্টু। বুঝলাম অনেকদিন পরে আবার ইস্কুল যাচ্ছে, সেখানে রাজেনবাবুর খুনের কথাটথা হয়, ক্লাশের ছেলেরাও ছেলেমানুষী জল্পনা-কল্পনা করে, তাতেই নতুন করে আবার মনে পড়ছে ওর। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, পিন্টু এরই মধ্যে অনেক খবরাখবর নিয়েছে, কৌতূহল বেড়েছে, কিন্তু আগের সেই ভয়-ভয় ভাবটা আর নেই।

আমি বললাম, 'খুন যেই করে থাক, শাস্তি সে পাবেই, পুলিশ তাকে নিশ্চয়ই ধরবে। ধরে জেলে পুরবে।'

পুলিশের নামে পিন্টুর ভীষণ ভয় ছিল, বাবা বলতেন, 'লালজুজু।' ঐ লাল-জুজুর ভয় প্রথম প্রথম পুলিশ-ফাঁড়ি

মায়ের সঙ্গে নিয়ে একা ইস্কুলে যেতে চাইত না, কতদিন ঐটুকু আমি পার করে দিয়ে এসেছি। একা যেতে আসতে পুলিশ-ফাঁড়িটা ও দৌড়ে পার হত শুনেছি। ইস্কুলে ভর্তি হবার অনেক আগে থেকেই ওর পুলিশে ভয়, 'লালজুজু' বলে বাবা সেটা আরো গভীর করে দিয়ে গেছেন। বাবা বলতেন, 'পুলিশকে ভয় পাওয়া ভাল, ও থেকে সিভিক সেনস ডেভেলপ করে।' কিন্তু আগের মত পুলিশ-ভীতি মনে হল পিন্টুর আর নেই, বলল, 'ধরবে না আরো কিছু! বাটুদা ত' পুলিশ ফাঁড়িতে বসে আড্ডা দেয়।'

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। বাটু পাড়ার মস্তান, ওয়াগন ভাঙে, দাঙ্গা করে, ছুরি বোমা পাইপগান নিয়ে ঘোরে। এমন কোন অপকর্ম নেই যা ও করতে পারে না। চকরাবকরা লুঙ্গি প'রে, খালি গায়ে একটা আদ্দির পাঞ্জাবি চড়িয়ে, গলায় সোনার মফচেন ঝুলিয়ে বাটু যখন সদলবলে ঘোরাঘুরি করে তখন অনেকেরই হৃদকম্প হয়। আমিও শুনেছি, অনেকেই দেখেছে, বাটু রাজেন মিত্তিরকে ভোজালি দিয়ে গলা কুপিয়েছে, কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ বলবে না, সাক্ষী দেওয়া দূরে থাক। পিন্টু কিন্তু বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বসে বলল, 'বাটুদা রাজেন স্যারকে খুন করেছে।'

'তোকে কে বলল?'

'কে আবার বলবে! সব্বাই জানে।'

আমার অজ্ঞতায়, না কি জেনেও না জানার ভান করার ভীরুতায় কে জানে, পিন্টু যেন একটু অবাক হল।

ঐ ঘটনার পর থেকেই আমি সতর্ক হলাম।

অফিস থেকে ফিরলেই এক এক রাত্রে মলিনা এক এক খবর দেয়, 'জানো, এ পাড়ায় আর থাকা যাবে না।'

'কেন, কী হল আবার?'

সব বৃত্তান্তই সেই বাটুকে নিয়ে। ওর দলের নিত্য নতুন কর্মকাণ্ডের কাহিনী। যেন বাটু বিনে গীত নেই। একদিন বলল, 'বাটুকে কি পুলিশ চোখে দেখে না?'

আমি কোন কথা বললাম না। মলিনা বলল, 'বাটুরা নাকি পাইপগান দিয়ে একটা ছেলেকে খুন করেছে, জি টি রোডে লাশ পাওয়া গেছে।'

'তার আমি কী করব!' আমি স্পষ্টতঃ বিরক্ত হলাম।

'পাড়ার এতগুলো মানুষ, সবাই মিলে ওকে সায়েস্তা করতে পার না?' প্রশ্ন করে মলিনা।

'হ্যাঁ, গুণ্ডার পেছনে লাগতে গিয়ে জীবন যাক আর কী।'

পাশে বই নিয়ে বসেছিল পিন্টু, মলিনা ওকে পড়তে বসায়, বইয়ে মন নেই, আমাদের কথাবার্তা শোনে কান খাড়া করে। আমার কথায় খুব মজা পেল পিন্টু, বলল, 'বাটুদার সঙ্গে বাবা পারবে না।'

আমি ধমক দিলাম ওকে, 'পড়ো তুমি, খালি ছেলে কোথাকার।'

মলিনাকে আড়ালে সতর্ক করে দিলাম, বললাম, 'তোমাদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই! ছেলেটার সামনে ঐ গুণ্ডা-বদমাসদের মাহাত্ম্যকীর্তন বুঝি না করলেই নয়?'

মলিনা ফস করে বলল, 'আহা—হা! শুনতে যেন কিছু বাকি থাকবে। বিকেলে খেলতে যাচ্ছে, ইস্কুলে শুনছে, পাড়ায় শুনছে, দেখছে; ছেলেমানুষ বলে বুঝি কিছু বোঝে না?'

'আমাদের থেকে বেশি বোঝে। তাই যতটা পারা যায় সামলে চলতে হয়।' আমি অন্য কাজে মন দিই, কথা বাড়াই না।

যে বাটুকে পিন্টু পুলিশ-ফাঁড়িতে আড্ডা দিতে দেখেছে, সেই বাটু আবার অদৃশ্য হল; আমি পাড়ায় ঘুরি না, তবে শুনলাম ওকে আর নাকি দেখা যাচ্ছে না। দেখা না গেলেই ভাল। ইস্কুল থেকে এসে একদিন পিন্টু খবর দিল, 'এইবার বাটুদাকে ধরবে, পুলিশ মাইকে বলেছে, আমাদের ইস্কুলের পাশ দিয়ে গাড়িতে করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে বলতে গেছে, বাটুদাকে ধরিয়ে দিতে পারলে হাজার টাকা দেবে।'

বুঝলাম ইস্কুলে ওদের ক্লাসের ছেলে-দের মধ্যেও এই নিয়ে কথা হয়েছে, বাটুকে পুলিশ ধরতে পারবে কী পারবে না, তা-ই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; পিন্টু বলল, 'জানো বাবা, জয়দেব বলছিল পুলিশের বন্দুক আছে, বাটুদারও বন্দুক আছে। সত্যি?'

'জানি না। তোর অত খোঁজে দরকার কী?'

পিন্টুর কৌতূহলের শেষ নেই, বলল, 'আচ্ছা বাবা, পুলিশের সঙ্গে বাটুদার লড়াই হলে কে জিতবে?'

আমি বললাম, 'পুলিশ ওকে গুলি করে মারবে।' আমার ভঙ্গিটা এমন হল যেন আমিই পুলিশ হয়ে গেছি, বাটুকে সামনে পেয়ে গুলি করছি। তাতেই পিন্টু ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমি অন্য ঘরে যাচ্ছিলাম, শুনলাম পিন্টু বলল, 'ইস্, বাটুদা পুলিশকে পটকে দেবে। পেটো ঝাড়বে।'

পিন্টু দিন দিন নির্ভয় হয়ে যাচ্ছে, কাছাকাছি প্রায়ই বোমার শব্দ হয় ইদানীং, শুনতে পেলেই গেটের কাছে দৌড়ে যায়, বলে, 'ঐ পেটো ঝাড়ছে।' শব্দ শুনে দিক নির্দেশ করে, 'মা, ঐ গঙ্গার ধারে পড়ল।'

মলিনা ওকে গেটের বাইরে যেতে দেয় না, সামলায়, 'এদিকে চলে আয়। পুলিশ কিন্তু আজকাল ছোট ছোট ছেলে-দের ধরছে—কথা বার্তা করার জন্যে। বাটুদা—বাটুদা করো না, কেউ শুনতে পেলেই তোমাকে ধরবে এই বলে দিলুম।'

ঘরের মধ্যে পালিয়ে আসে পিন্টু। কিন্তু বাটুর কথা ভোলে না। একা একা ওকে আর ইস্কুলে যেতে আসতে দিতে ভরসা হয় না, কখন কোথায় কী ঘটবে কে জানে! কিন্তু তাই বলে ত' আর রোজ রোজ কামাই করতে দেওয়া যায় না। ইস্কুল যাবে আর আসবে, রাস্তায় কারো সঙ্গে বাজে কথা বলবে না, কোথাও মিছিমিছি দেরি করবে না, এসব পাখি-পড়ানো উপদেশ সত্ত্বেও এক-একদিন অনেক দেরি করে ফেরে পিন্টু। মলিনা উদ্বেগে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, চেনাজানা ছেলেদের কাছে খোঁজখবর নেয়; হঠাৎ এসে উদয় হয় পিন্টু। কী ব্যাপার? কিছু না কিছু বলে মাকে বুঝিয়ে দেয় ছেলে, আমি শুনে বুঝতে পারি পিন্টু গল্প বানাতে শিখেছে।

একদিন মলিনার কাছে একটা সত্যি ঘটনা শুনলাম।

দেরী করে ইস্কুল থেকে ফিরল পিন্টু, মলিনা কিছু জিগ্যেস করার আগেই সোৎসাহে বলল, 'জানো মা, বাটুদা আবার এসেছে।'

'আসুক।' কঠিন হবার চেষ্টা করল মলিনা : 'এত দেরি হল কেন তাই বল আগে। খুব খেল হয়েছে, না?'

সত্যি কথা বলল পিন্টু। ছেলেরা আসছিল ইস্কুল থেকে, অনেকদিন পরে হঠাৎ আবার বাটুদাকে রাস্তার ধারে একটা দোকানের সামনে বসে থাকতে দেখে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করল, বাটু চেঁচিয়ে বলল, 'নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছিস রে?' বলতে বলতে এগিয়ে এল বাটু, বেশির ভাগ ছেলেই ওর চেলা, নাম ধরে ধরে জিগ্যেস করল, 'বল্ কী বলছিলি?' ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল পিন্টুদের, বলল, 'কিছু না বাটুদা।' বাটু বলল, 'আমাকে নিয়ে কিছু বলছিলি না?' ছেলেরা অস্বীকার করল, আর একটু হলেই কেঁদে ফেলবে এমনি অবস্থা। বাটু রেগেছে না মজা করছে কিছুই বুঝতে পারছে না ওরা। হঠাৎ বাটু বলল, 'তা হলে এবার সবাই মিলে একসঙ্গে বল দিকিনি, বাটুদা কী জয়!' ওরা তাই বলল। বলেই চলে আসছিল ওরা, বাটু আসতে দিল না, দুম্ করে একটা স্টেশনারি দোকানে ঢুকে এক বয়ম লেবেঞ্চুস এনে উপুড় করে ঢেলে দিল, বলল, 'তোরা যে যা পারিস নিয়ে নে।' মলিনা বলল, 'তুই নিলি?' পিন্টু বলল, 'জয়দেব খোকন সত্য মণ্টু সবাই নিয়েছে। না নিলে বাটুদা প্যাঁদাত।'

এসব শুনে আমার আর মাথার ঠিক রইল না। কী সব বিচ্ছিরি কথা শিখছে! নাতির মুখে 'পেটো' 'প্যাঁদাত' ইত্যাকার

অর রোয়াকের ভাষা শুনলে আমার বাবা কী করতেন জানি না, আমি ছেলেকে বেধড়ক পেটালাম। একমাত্র বংশধর, শেষ-পর্যন্ত গুন্ডা হবে! বাটু ওর হীরো! ওর মনকে ওদিক থেকে সরিয়ে নির্দোষ উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের প্রতি আকর্ষণ করার জন্যে অবসর সময়ে বিপ্লবীদের গল্প বলতে শুরু করলাম। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর গল্প, বাঘা যতীনের গল্প, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের গল্প। ওরাও বোমা-বন্দুক চালিয়েছে, মানুষ মেরেছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল আলাদা; বাটুদের মত গুন্ডামি করেনি। বলতে বলতে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু পিন্টু খুব বেশি উৎসাহিত হয়েছে বলে মনে হয়নি। স্বাধীনতা বস্তুটা কী সেটাই ওকে ভাল করে বোঝাতে পারিনি, যত বেশি বোঝাতে গেছি ততই ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। আমি শেষে বলেছি, 'ঘুমোও এবার।' যতক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় ততক্ষণই নিশ্চিন্ত। জাগলেই বোমার শব্দ [?], বারুদের গন্ধ, হৈ-হুল্লোড়।

মলিনা বলে, পিন্টু ত আগে এরকম ছিল না!

বাবার সেকেলেপনা কোনদিনই ওর পছন্দ ছিল না, তাই বললাম, 'তুমি ছেলেকে একটু বেশি আধুনিক করে ফেলেছ।'

'সব ছেলেই ঐরকম।' মলিনা বলে, 'পাড়ার ছেলেগুলো সব পাজী, ওদের সঙ্গে মিশে মিশেই পিন্টুটা গোল্লায় গেল।'

আমি বলি, 'মিশতে দিও না।'

মলিনা বলে, 'তুমি ত' বড়োয়া দিয়েই খালাস। সারাদিন ওকে বাড়িতে আটকে রাখব?'

লক্ষ্য করেছি, আজকালকার ছেলে-গুলোর বাইরেই যত চেকন-চাকন; মুখের ভাষা খেলা ধুলো সবই নোংরা। কেউ একটা ভাল কথা বললে বলবে 'টপ্ দিয়েছে' অশ্লীলতার [?] কথা বললে বলবে 'দিয়েছে'।

খেলার মধ্যে সিগারেটের প্যাকেট-ছেঁড়া তাস নিয়ে বাটুটু খেলা, বাড়ির আলতা বা কাজল নিয়ে গিয়ে সঙ সাজা, আরো সব কী কী। ঐ সিগারেটের তাস জেতা-জিতি নিয়ে দলাদলি মারামারি পর্যন্ত। আমি মাসকাবারে পিন্টুকে একটা ছোট ফুটবল কিনে দিলাম, বললাম, 'তাস মার্বেল ছেড়ে ফুটবল খেলবে, আমি মাঝে মাঝে ছুটিছাটার দিনে গিয়ে দেখে আসব কেমন খেলছ।'

বল পেয়ে পিন্টু খুব খুশি।

মলিনা ওর বন্ধু-বান্ধবদের সবাইকেই চেনে, কাদের নেবে কাকে বাদ দেবে সব বলে দিল। বার বার বলে দিল, 'গালাগাল মন্দ করবে না, খেলা হয়ে গেলেই বল নিয়ে বাড়ি চলে আসবে।'

প্রথম প্রথম কয়েক দিন ঘরে-বাইরে খেলল পিন্টু।

তারপর একদিন রবিবার ছেলে খেলতে গেছে, বল দেখলাম খাটের নীচে পড়ে আছে। বললাম, 'বলটা নেয় নি যে খোকা?'

'বল ত' আর নেয় না দেখি।' মলিনা বলল, 'ওখানেই ত' পড়ে আছে কদিন ধরে।'

পাড়ার মধ্যে, কাছেই একটা ছোট মাঠ, মাঠ না বলে বাড়ির ঘেরা উঠোন বলাই ভাল, সেখানে বিকেলে খেলে পিন্টু আর ওর বন্ধুরা। ইদানীং পিন্টুর ওপর কড়া নজর রেখেছি, দেখেছি ঐ শীলেদের বাড়ির ঘেরা উঠোনেই ওরা হৈ হৈ করে, কয়েক দিন বল খেলতেও দেখেছি। পিন্টুর মতি গতি অনেকটা ফিরেছে বলে মনে হয়। বাটুদের অপকর্ম আগের মতই চলছে পাড়ায়, এখন অনেকটা সয়ে এসেছে, তাই নিয়ে আগের মত আর হৈ হৈ হয় না; পিন্টুও বাটুদা বাটুদা করে বাড়িতে গল্প করে না। তবু আরো কিছুদিন চোখে চোখে রাখতে হবে, তাই হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ওদের খেলার মাঠের দিকে। বিকেলের আলো পড়ে এসেছে তখন।

রাস্তার দিকে পাঁচিল, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না, কোলাহলও বিশেষ নেই, সুতরাং খেলা-ধুলো হুটোপাটি যে হচ্ছে না তা বেশ বুঝতে পারলাম। হয়ত চোর পুলিশ খেলছে, বা গোল হয়ে বসে গল্প-সল্প করছে, যাই করুক, একটু গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে পা টিপে টিপে ঢুকলাম মাঠের মধ্যে, যাতে নোংরা খেলা কিছু চলতে থাকলে হাতেনাতে ধরতে পারি।

ঢোবার মুখটাতে পা দিয়েই চমকে উঠলাম। ছেলেগুলোকে চিনি, কার ছেলে, কার কী নাম জানি। আমি এসেছি ওরা টের পায়নি, আমার সামনে একটা ভয়ঙ্কর ছবির মত ওরা স্থির হয়ে আছে। মুখ থেকে একটা আর্তনাদের মত বেরিয়ে এল, 'ও কী, সর্বনাশ!'

সত্যর খালি গা, বুকে অনেকখানি রক্ত, ও অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছে, জয়দেব আর খোকন পেছন থেকে ওকে ধরে আছে। সামনে উদ্যত ছুরি হাতে পিন্টু। ওর ছুরির আঘাতেই সত্যর ঐ অবস্থা। আমার গলার আওয়াজ পেয়েই পিন্টু ছুরি নামাল, ক্ষিপ্র হাতে ছুরিটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল, ছুটে পালাতে গেল, আমি ওকে ধরে ফেললাম। স্থির চিত্রটা চঞ্চল হল, মুহূর্তে ভেঙে গেল। সত্য বুকটা মুছে হাসতে হাসতে দৌড় লাগাল। পেছনে পেছনে জয়দেব, খোকন, পার্থ, গোকুল সবাই। মাঠ খালি হয়-হয়।

'আমি বললাম, 'এসব কী?'
'আমরা খুন-খুন খেলছিলাম।'

ইস্কুল-গেটের সামনে রাজেন স্যারের আসল খুনের দৃশ্য দেখে একদিন ঊর্ধ্ব-শ্বাসে পালিয়ে এসেছিল পিন্টু, একটা নকল খুনের দৃশ্য দেখে আমি শিহরিত হলাম। আমারও তেমনি পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল, কিন্তু একমাত্র বংশধরকে ছেড়ে একা চলে যেতে পারলাম না।

নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত যোদ্ধৃকবি পাবলো নেরুদার প্রতি ॥

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মসির লেখনী অগ্নি অশনি গর্জে যাহার হাতে
অসির চেয়েও নিশিত হয়েছে প্রতিশোধ তৃষাতে,
রক্ত তপ্ত দৃপ্ত সে অসি করেছে ঝনৎকার
তাহার অসিরে তার লেখনীরে জানাই নমস্কার।

পাব্‌লো নেরুদা আরেক ভুবনে ভূগোলার্ধের পারে
নির্যাতীতেরে স্বজাতি করিলে অর্পিলে আপনারে।
উৎপীড়িতের পীড়ায় তোমার সুখের স্বপ্ন টুটে
উৎপীড়কের প্রতি ক্রোধে খুন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে।

'কুড়িটি প্রেমের কবিতার সাথে 'হতাশা মথিত গান'
বদ্‌লিয়ে রুচি কল্পনা মুছি শুদ্ধ করিয়া প্রাণ,
ঊর্ধ্ব গগনে উড়িয়া চাহিলে শ্যেনসম চারিদিকে
ম্যাড্রিড্‌ হতে স্ট্যালিন্‌গ্রাডেরে দেখিলে নির্নিমিখে।

বদ্‌লেয়ারের সূক্ষ্ম মিহিন্‌ ঊর্ণনাভের পারা
গীতিকবিতার রেশমি সুতার ছাড়িলে কাব্যধারা।
ধরিলে তীক্ষ্ণ 'ড্যামোক্ল'-সম ক্ষুরধার তরবাল
মরি-মারি-করি দাঁড়াইলে বীর বীর্যোদ্ধত ভাল।

শিশুর রক্তে বন্যা বহিছে নারীর নির্যাতনে
ফ্যাসিস্ট দানব রচে রৌরব শান্ত গৃহাঙ্গনে।
হিরোসিমা হতে নাগাসাকি হতে ঢাকায় হাহাকার
রূপধরে 'গন্‌জালি ভি ডালা' ও টিক্কা ভুট্টো ইয়াহিয়ার।

তাদের শোণিতে তর্পণ করি তৃপ্ত হইলে কবি
রক্তবীজের নিজের রক্তে করিলে হোমের হবি।
নিপীড়িত জনগণের চারণ তুমি আপনার জন
ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে বঙ্গ করে অভিনন্দন।।
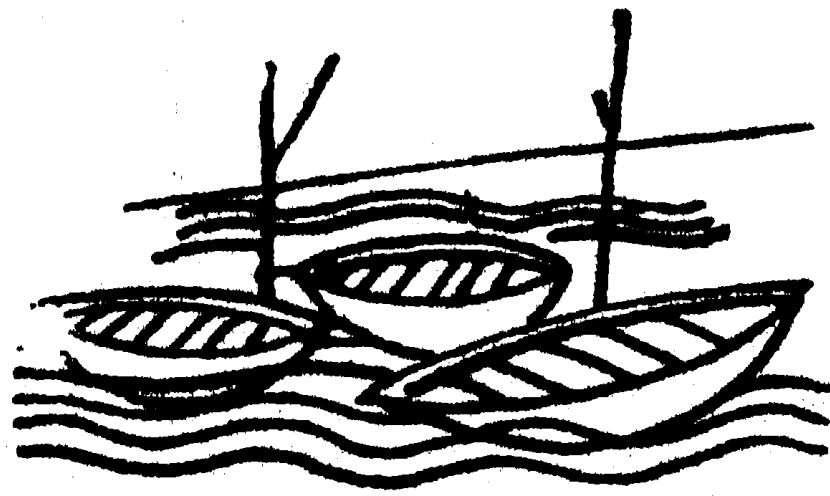
অরূপ প্রযোজিত দুই শতাব্দীর বাংলা গানে সুচিত্রা মিত্র, হিমঘ্ন রায়চৌধুরী, কেরামৎ খাঁ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলসা

দুই শতাব্দীর বাংলা গান

অরূপ গোষ্ঠী নিবেদিত 'দুই শতাব্দীর বাংলা গান' কয়েক মাস আগে শুনেছিলাম রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। আবার শুনলাম রবীন্দ্রসদনেই। এবারে হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর সঙ্গে গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র। ভাবব্যাখ্যায় ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবলাসঙ্গতে ছিলেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃদঙ্গে হরেন মান্না। অন্যান্য যন্ত্রে বিভূতি ঘোষ, কমল মল্লিক, শান্তিলাল রায়চৌধুরী, কেদার নন্দী, চাঁদু ব্যানার্জি ও ঘনশ্যাম পাইন। 'সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে। গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়'।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাটাই সেদিন বারবার মনে পড়ছিল হিমঘ্নবাবু ও সুচিত্রা মিত্রর গান শুনতে শুনতে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—রামমোহন শুধু আমাদের সমাজজীবনেই এক যুগস্রষ্টা নন, সঙ্গীতজগতেও তাঁর অবদান অনবদ্য। তিনি প্রথম বাংলায় বাইশটি ধ্রুপদ গান রচনা করেন, এর আগে বাংলায় ধ্রুপদ গান ছিল না। পরে কিছু খেয়ালও রচনা করেছেন।

সেদিন পরিবেশিত ঊনচল্লিশটি গানের রামমোহন, বঙ্কিম থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ, গোবিন্দ অধিকারী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যদু ভট্ট, মুকুন্দ দাস, কালী মির্জা, নীলকণ্ঠ, শ্রীধর কথক, নিধুবাবু, রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল-কেও আস্বাদ করা গেল। নানা ভাব ও ছন্দের মালা গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে যুগের পটভূমিকা পরিবর্তন ও তার সঙ্গে রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গি রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গীর রূপান্তরের ছবিটির শুধু শিল্পমূল্যই নেই শিক্ষামূল্যও যথেষ্ট।

সুচিত্রা মিত্রের গানের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। হিমঘ্নবাবুর অগ্রগতি ও পরিশীলিত গায়কীতে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা সুপরিলক্ষিত। প্রথমেই শ্রীমতী নূপুর সেন ৪ খানি গান গেয়ে শোনান, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ ও পুরাতনী।

সি-এল-টির উৎসব

এবার অবনমহলে সি-এল-টি উৎসবের সেরা আকর্ষণ ছিল মধুরাঙ্গ, রূপলেখা ও শকুন্তলা নৃত্যনাট্য।

শিশুরাই প্রকৃতির নিকটতম প্রতিবেশী—তাই ছন্দ, ভঙ্গিমা, হাসি-কান্না এদের অভিব্যক্তিতে এত সহজ-সুন্দর। এই জন্মগত আনন্দ ও উচ্ছলতা যথাযোগ্য পরিচালনার গুণে যে কত শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে, তারই উজ্জ্বল নিদর্শন সমর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'মধুরাঙ্গ'। অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত এই অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদের ন'টি গান সমবেত নৃত্য-সঙ্গতে পরিবেশিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদের গানে আমরা বিরহীর বেদনার্ত হৃদয়ের রূপটির সঙ্গেই পরিচিত। কিন্তু এ-সঙ্গীতেরও যে আর এক রূপ আছে যা উচ্ছল, প্রাণবন্ত ছন্দবৈভবে ভরপুর, তারই নিদর্শন মিলল শিশু রংমহলের নানারূপ ভাব ও গতির মনোহারিত্বে। কোনো বিশেষ আঙ্গিকে নৃত্যগুলি সীমিত নয়। ভাবের প্রয়োজনেই কখনও এসেছে কথকের বিদ্যুৎগতি, কখনও কথাকলির নাটকীয়তা, কখনও বা মণিপুরী লালিত্য।

একক নৃত্য ছাড়াও কোনো গীতি-নৃত্য যে এভাবে জমে উঠতে পারে এ-অভিজ্ঞতা সত্যিই বিরল।

আর এক উল্লেখযোগ্য নৃত্যানুষ্ঠান রূপলেখা নৃত্যনাট্য। মায়া চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শুধুমাত্র কথক আঙ্গিক-ভিত্তিক নৃত্য দিয়ে একটি কাহিনীর উপস্থাপনা এক শিল্পসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। বিশেষ করে মাদলনৃত্যের ছন্দ-সৌন্দর্য যেন এক গতিবান রেখাচিত্র হয়ে উঠেছিল।

অন্তরাল থেকে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করেছে সমর চট্টোপাধ্যায়ের রচনা ও প্রিয়লাল চৌধুরীর সঙ্গীত। সজ্জাপরিকল্পনার কৃতিত্ব শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্তের।

মধুরাঙ্গে শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পিণ্টু ভট্টাচার্য, অতসী ঘোষাল ও স্নিগ্ধা ঘোষ গীত গানগুলি যেন প্রাণ ভরে দিয়েছে।

'নৃত্যের তালে তালে' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নৃত্যশ্রী মীরা দাশগুপ্ত পরিচালিত শকুন্তলা নৃত্যনাট্য কালিদাসের যুগে মনকে পৌঁছে দিয়েছে। বিশেষ করে দুষ্মন্তর সভায় নর্তকীদের নৃত্য-দৃশ্যটির জম-জমাট ভাব প্রেক্ষাগৃহে এক আনন্দমুখর পরিবেশ রচনা করে।

অভিনয়ের অঙ্গে কৃতিত্ব প্রাপ্য সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (দুষ্মন্ত), ডলি ভট্ট (শকুন্তলা), অনুসূয়া (পূরবী শীল), প্রিয়ংবদা (চম্পা মুখোপাধ্যায়), ভরতের

গোকুল নাগ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে রতন ঝঙ্কারের হাত থেকে শ্রীনাগকে মানপত্র গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীদের মধ্যে আমজাদ আলি খাঁ, আমীর খাঁ, মণিলাল নাগ ও ভি জি যোগকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ভূমিকায় আড়াই বছরের এবং হরিণের চরিত্রে তিন বছরের শিশু এবং তিন থেকে চার বছরের বয়সের ঋষি-বালকের নৃত্য দেখবার মতই।

অনুষ্ঠান শেষে এঁদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান সমর চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া একটি সান্ধ্য জলসায় গান শোনালেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, অতসী মুখোপাধ্যায়, অদিতি সেনগুপ্ত, স্নিগ্ধা ঘোষ, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ দত্ত, তন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী ও শুক্লা। বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে অজয় গাঙ্গুলীর মূকাভিনয় ও শান্তনু রায়ের আবৃত্তি।

উৎসবের এক প্রধান আকর্ষণ ছিল সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িশী নৃত্য।

শ্রীগোকুল নাগের সম্বর্ধনা

মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে 'রামচন্দ্র ভবনে' প্রখ্যাত সেতারশিল্পী সুরস্রষ্টা শ্রীগোকুল নাগের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হল গত ২২শে জানুয়ারি। স্বর্গত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত প্রিয় শিষ্য ও বিষ্ণুপুর ঘরানার ঐতিহ্যবাহী শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের বহু সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। পণ্ডিত রবিশঙ্কর সমেত বহু খ্যাতিমান শিল্পী প্রথম জীবনে শ্রীনাগের কাছে নাড়া বেঁধেছেন। প্রায় সর্ববাদ্যবিশারদ শ্রীগোকুল নাগ এমন এক শিল্পী যিনি সঙ্গীতকে বদ্ধ খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। শ্রীগোকুল নাগ শুধু গুণী নন, তিনি গুরু। গুরু হিসেবে নিজের যা কিছু মহৎ ও বৃহৎ তার সবটাই তিনি উজাড় করে দিয়েছেন শিষ্যদের মধ্যে। কতশত পাত্র তিনি অমৃতে ভরে দিয়েছেন, কত প্রাণে জ্বেলেছেন আলোকশিখা। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এহেন গুরুর প্রতি সম্মান জানিয়ে উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদের কিছুটা ঋণমুক্ত করলেন।

সেদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরী, প্রধান অতিথি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা যথা : শ্রীসৌম্যেন ঠাকুর ও শ্রীরতনঝঙ্কারের কণ্ঠে এই কথাগুলোই বারবার উচ্চারিত হলো। সম্বর্ধনা উপলক্ষে সেদিন সারারাতব্যাপী এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ। তিনি সরোদে মালকোষ পরিবেশন করেন। বয়সে তরুণ হলেও চিন্তাধারায় তিনি যে অতি পরিণত ও সুদক্ষ শিল্পী তার প্রমাণ মিলেছে তাঁর নিখুঁত আলাপ, গৎ ও ঝালার কাজে। এঁর সঙ্গে তবলায় সংগত ক'রেন কলকাতায় নবাগত বারাণসীর তরুণ শ্রীআনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের শিল্পী শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার বেহাগ রাগে খেয়াল পরিবেশন করলেন। এর পর ভারতখ্যাত স্বনামধন্য খেয়াল গায়ক ওস্তাদ আমীর খাঁ প্রথমে বাগেশ্রী কানাড়া ও পরে কলাশ্রী, মিশ্রযোগ ও পরছ বসন্ত রাগে খেয়াল পরিবেশন করলেন। তবলায় সঙ্গত করেন শ্রীশ্যামল বসু। আমীর খাঁর সুললিত কণ্ঠস্বরের আমেজটিকে আরও ঘন করে তুললেন পরের শিল্পী পণ্ডিত ভি, জি, যোগ। তিনি বেহালায় রাগ যোগ পরিবেশন করেন। এর পর বাহার, বসন্ত, ললিত, দরবারী, তিলোকামোদ, সোহনী, ভৈরবী, রাগের সংমিশ্রণে 'রাগমালা' শোনালেন। এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এ ছাড়া তিনি পাহাড়ী রাগে একটি ধুন ও ভৈরবী রাগে ঠুংরী শোনালেন। এঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীকানাই দত্ত। আসরের সবশেষ শিল্পী ছিলেন শ্রীগোকুল নাগের সুযোগ্য পুত্র ও শিষ্য শ্রীমণিলাল নাগ। তিনি সেতারে 'আহীর ভৈরব' শুনিয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দের প্লাবন বইয়ে দিলেন আসরের প্রাণকেন্দ্রে। তবলায় সঙ্গত করলেন স্বনামধন্য কেরামতুল্লা খাঁ।

সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে শ্রীগোকুল নাগের ললিত রাগে সেতার পরিবেশনের মধ্যে উপস্থিত শ্রোতারা বিষ্ণুপুরের কিছু বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করলেন ও এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন। শ্রীনাগের সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করলেন শ্রীঅনিল রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে সেদিন বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও ব্যক্তি আসরে উপস্থিত ছিলেন।

'ত্রিবেণী' প্রযোজিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'

রবীন্দ্রনাথের গান ও নৃত্যের সুবৃহৎ অবদানে 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র একটি বিশেষ স্থান আছে গান ও নাটক নিয়ে কিশোর কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকচিহ্নরূপে।

এখানে নাট্যরস তথা বক্তব্যটাই বড়, সুর তারই অনুগামী।

এই দিকটির প্রতি সঙ্গীত-পরিচালিকা সুমিত্রা সেন যথাযোগ্য নজর রেখেছেন বলেই প্রথম থেকে শেষ অবধি এত আনন্দদায়ক হয়েছে। নৃত্যপরিচালনায় ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী সাধন গুহ। নৃত্যরচনা ও নৃত্যে সাধন এই গীতিনাট্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখেছেন সকলরকম আতিশয্য বর্জন করে।

নৃত্যাংশে বাল্মীকির ভূমিকায় শিবশংকরণ তাঁর উচ্চমানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বালিকা চরিত্রে প্রশংসা করবার মত অভিনয় ও নৃত্য দেখিয়েছেন ইন্দ্রাণী সেন। সঙ্গীতাংশে বাল্মীকির প্রথমের দিকের হিংসামত্ততা, বালিকাকে দেখে অন্তরে করুণার জাগরণ ও শেষের দিকের নিস্পৃহ বৈরাগ্য ও ধ্যানে আত্মলীনতার নাটকীয় গতি ও পরিণতি অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে যেন ছবির মতই ফুটে উঠেছে। বালিকার ভীতত্রস্ততা, আশ্রয়উন্মুখ কাতরতা সুমিত্রা সেন চিত্তগ্রাহী করে তুলেছেন। প্রথম দস্যুর গানগুলির কৌতুকময় ব্যঞ্জনায় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা প্রেক্ষাগৃহে হাসির বন্য বইয়ে দিয়েছেন।

চিত্র-সমালোচনা

রবীন্দ্র-কাহিনীর হিন্দী চিত্ররূপ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পটির নামকরণ করেছেন—সমাপ্তি। কিন্তু এই 'সমাপ্তি' অবলম্বনে রাজশ্রী প্রোডাকশন্স লিমিটেড কৃত, তারাচাঁদ বড়জাত্যা প্রযোজিত এবং সুখ্যাত শিল্পনির্দেশক সুধেন্দু রায় পরিচালিত হিন্দী ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে—উপহার। বন্যহরিণীর মতো চঞ্চলা যে মেয়েটি তার 'দীর্ঘ, পরিপুষ্ট, সুস্থ, সবল' শরীর সত্ত্বেও তার নারীসত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, সমবয়সী মেয়েদের প্রতি যার অবজ্ঞার সীমা ছিল না, গ্রামের যত ছেলেই ছিল যার খেলার সাথী, বিবাহের পরে যে তার বাধাবন্ধনহীন জীবনকে কঠিনভাবে শৃংখলিত করবার জন্যে স্বামীকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?', যে-মেয়ে স্বামীর চুম্বন প্রার্থনাকে অদ্ভুত বিবেচনা করে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, সেই মেয়েই সহসা স্বামীর সাহচর্যচ্যুত হবার পরে নিজের জীবনকে বিস্বাদ বোধ করেছিল এবং 'একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণী প্রকৃতি তার সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায়' ভরে ওঠায় সেই মেয়েই প্রথম সুযোগেই তার সুকোমল বাহুপাশ দিয়ে তার স্বামীকে সুকঠিন বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিল এবং তার পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দিয়ে অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে ভরিয়ে তুলে একদা স্বামীর প্রার্থিত একটি উপহারের (মূলে আছে—পুরস্কার) পরিবর্তে অজস্র উপহার বর্ষণ করেছিল।

স্বামী অনুপ (মূলের অপূর্ব) তার গোছা প্রকৃতির—যাকে ইংরাজীতে বলে টমবয়—স্ত্রীর ওপর কোনোরকম বলপ্রয়োগ করে তার ন্যায্য অধিকার আদায়ের চেষ্টাকে, দস্যুবৃত্তি করে কেড়ে লুটে নেওয়াকে আত্মাবমাননা বলে মনে করে। 'সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।' তাই যখন একটি চুম্বনোপহার লাভের হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা অশ্রুজলধারার মধ্যে শত চুম্বনোপহারে সমাপ্ত হল, তখনই ঘটল কাহিনীরও সমাপ্তি।

একদা সত্যজিৎ রায় এই রবীন্দ্র কাহিনীটিকে 'তিনকন্যা'র অন্তর্ভুক্ত একটি চার রীলার ছবির মাধ্যমে চিত্রায়িত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত 'সমাপ্তি' নামেই এবং তাতে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত কোনো কোনো ঘটনাকে [illegible]। প্রথমে যে-স্বামীকে নায়িকা মৃণ্ময়ীর শত্রু বলে মনে হয়েছিল, সেই স্বামীকে ক্রমে বন্ধু জ্ঞান করবার পক্ষে এইসব ঘটনার গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। তবে ছোট ছবির পরিপ্রেক্ষিতে সকল ঘটনার অন্তর্ভুক্তি হয়ত সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য হিন্দী রঙীন সংস্করণটিতে কাহিনীবর্ণিত সকল ঘটনাই স্থান পেয়েছে।

[illegible]/অপর্ণা সেন ও [illegible] চট্টোপাধ্যায়। পরিকল্পনা ঃ পিনাকী মুখোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

সংগীতা মাহাতো/ওমপ্রকাশ ও কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় পরিচালনা : তপন সিংহ
ফটো : অমৃত

তবে অবাধ স্বাধীন জীবনকে বিবাহবন্ধন শৃঙ্খলিত করেছে, এই পীড়াদায়ক জ্ঞানকে ছবির মাধ্যমে রূপায়িত করবার জন্যে আরও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সন্নিবেশের প্রয়োজন ছিল, মাত্র শাশুড়ীর ঝাঁঝালো বাক্যবাণের প্রয়োগই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়; বরং এর দ্বারা শাশুড়ীর চরিত্রকে অযথা কটু 'বৌ-কাটকী' রূপ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা সন্নিবেশের ব্যাপারে অনায়াসেই রবীন্দ্রকাহিনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশের নিম্নলিখিত বর্ণনাকে কাজে লাগানো যেতে পারত :

'মৃণ্ময়ীর মা ও পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীকে অহর্নিশ উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুত গমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত হৃদয়ে মৃণ্ময়ী মনে করিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বসিয়া বলিল, 'আমি বিবাহ করিব না।'

কাহিনীটির চলচ্চিত্রায়নের ব্যাপারে যদিও এটি পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা, তবুও বহির্দৃশ্যগুলি গৃহীত হয়েছে দক্ষিণ-ভারতে। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তা-বোধের অভাবই প্রযোজককে এ-ব্যাপারে বাধ্য করেছে। পাত্রপাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশের সাজসজ্জা মারাঠী ঢঙের। অথচ ঘটনা যে কলিকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের এ তথ্য চিত্রকাহিনীতে স্বীকৃত।

অভিনয়ে প্রধান চরিত্র মৃণ্ময়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন 'ধন্যি মেয়ে' ও 'গুড্ডি'-খ্যাত জয়া ভাদুড়ী। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্র-চরিত্রটিকে রূপে রসে সঞ্জীবিত করতে এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছেন। বিশেষ করে, ছবির শেষ ভাগে তাঁর নাট্যনৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবু তুলনামূলকভাবে বলতেই হয়, অপর্ণা সেন ছবির রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করেই এই মৃণ্ময়ীর চরিত্রটিকে যে-রকম জীবন্তভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, জয়া ভাদুড়ী ঠিক সেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছুতে পারেননি। অনুপের চরিত্র স্বরূপ দত্ত তাঁর স্বভাবগত জড়তাকে অনেকাংশে বর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। নায়কের মায়ের ভূমিকায় বহুদিন বাদে কামিনী কৌশলকে দেখা গেল। চিত্রনাট্যে অঙ্কিত বিরূপতার প্রতিমূর্তি তিনি হয়েছেন ছবির তিন ভাগ। শেষাংশে বধূর প্রতি ক্ষমা ও সহানুভূতিশীলতাকে তিনি অতি সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। অপরাপর ভূমিকায় নানা পালসিকার (রামবাবু—মৃণ্ময়ীর বাবা), লীলা মিশ্র (অভিজ্ঞা পড়শী), মাস্টার রিপলে (রাখাল—মৃণ্ময়ীর বালকবন্ধু) প্রমুখ সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে মদন সিংহের ফোটোগ্রাফী ও বাবুভাইয়ের শিল্প-নির্দেশনা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচায়ক। আনন্দ বক্সী রচিত ও লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরারোপিত চারখানি গানের মধ্যে শেষের দু'খানি—'ময় এক রাজা হুঁ' এবং 'সুনী রে নগরিয়া, সুনী রে সেজরিয়া' গান দুখানি সুগীত।

সাধারণ প্রমোদোপকরণ হিসেবে ছকে-ফেলা হিন্দী ছবির ছড়াছড়ির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ছোট গল্প অবলম্বনে 'উপহার' ছবি হিন্দী ছবির দর্শকদের উপহার দিয়ে প্রযোজক তারাচাঁদ বড়জাত্যা একদিকে যেমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই রসিক দর্শক-জনের প্রীতি উৎপাদন করেছেন। ছবিখানি ১০ই ফেব্রুয়ারী, থেকে মেট্রো সিনেমায় দেখানো হচ্ছে।

—নান্দীকার

স্টুডিও থেকে

জীবন-সৈকতে

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত মায়ারাণী পিকচার্সের পঞ্চম নিবেদন 'জীবন-সৈকতে' চিত্রটি স্বদেশ সরকারের পরিচালনায় প্রায় শেষ হয়ে এল। কর্মব্যস্ততা ও স্বামীর নিঃসঙ্গতাবোধ পৃথিবীর অনেক সংসারে যে ঝড় সৃষ্টি করে ও ভাঙন ধরায়, তারই আবেগঘন একটি কাহিনী 'জীবন-সৈকতে'।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন এই ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন চন্দ্রাবতী, দিলীপ রায়, কণিকা ও নবাগতা মণিকা মিত্র। কাহিনী লিখেছেন তীর্থ চট্টোপাধ্যায়। সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত।

অন্ধ অতীত

দশ বছর আগেকার একটি হত্যার সত্যকার আসামী কে—এই রহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনী হল 'অন্ধ-অতীত'। এই চিত্রকাহিনীতে হত্যাকারীরূপে মিথ্যা অভিযুক্ত হয়ে জেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে থাকতে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে একজন আর যার নিতান্ত অনিচ্ছায় এই খুনটি ঘটেছিল জেলের বাইরে থেকে বিবেকের দংশনে সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

অসীম সরকার প্রযোজিত উষা ফিল্মসের এই অপরাধ-চিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, গীতা দে, তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ ও নবাগতা বুলন হাজরা।

পরিচালনা করেছেন হীরেন নাগ ও সুররচনা করেছেন শ্যামল মিত্র।

'বহুরূপী'র চিত্রগ্রহণ শুরু!

'পান্না হীরে চুণী', 'সোনা বৌদি' খ্যাত প্রযোজক দীনেশ দে দীনেশ চিত্রম্-এর পতাকাতলে 'বহুরূপী'র চিত্রগ্রহণ গেল ৪ জানুয়ারী থেকে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে শুরু করেছেন। ছবির শ্যুটিং এ-পর্যায়ে একটানা চলবে ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত।

প্রণব রায়ের লেখা কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা করছেন 'নবজাতক' ছদ্মনামধারী একদল অভিজ্ঞ কলাকুশলী। ছবির দুই প্রধান শিল্পী হলেন—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। নায়িকা চরিত্রে বোম্বের মধুছন্দাকে দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—নিরঞ্জন রায়, নবাগতা মণিকা মিত্র, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও বিজন ভট্টাচার্য।

ইতিমধ্যে অজয় দাসের সুরারোপে ছবির তিনটি গান রেকর্ড করা হয়েছে, কণ্ঠদান করেছেন মৃণাল চক্রবর্তী, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও নবাগতা মীণা মুখোপাধ্যায়।

'লাট্টু'র কাজ শুরু

অরুণ রায়চৌধুরী প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'লাট্টু'র কাজ সরস্বতী পুজো দিবসের শুভতিথিতে অজিত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় শুরু হয়েছে। অজিতবাবুর নিজেরই কাহিনী এবং চিত্রনাট্য। 'লাট্টু' শ্রীরায়চৌধুরীর প্রথম কিশোর চিত্র। নাম-ভূমিকায় আছেন—মাঃ প্রিন্স। সুর দিচ্ছেন—হিমাংশু বিশ্বাস। জানা গেছে যে, ছবিখানির চিত্রগ্রহণ কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এন-এ ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

স্ত্রী: আর সামান্য কিছু দৃশ্য গ্রহণের পরই বেবী অরুন প্রোডাকসনের নিবেদন 'স্ত্রী' ছবির কাজ সমাপ্ত হবে। সলিল দত্ত চিত্রনাট্যায়িত ও পরিচালিত এ ছবির কাহিনীকার বিমল মিত্র। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন রায় চৌধুরী। নচিকেতা ঘোষের সুর সংযোজনায় মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করবে বলে আশা করা যায়। 'অপরিচিত'র পর উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আবার দুর্ধর্ষ অভিনয় করতে দেখা যাবে নবাগতা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্যের বিপরীতে। পার্শ্বচরিত্রে রূপদান করছেন জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান শঙ্কর, শ্রীমান অরিন্দম, রত্না মুখার্জী ও নবাগতা কাকলি রায়। পরিবেশনার দায়িত্ব এন টি ফিল্মস-এর।
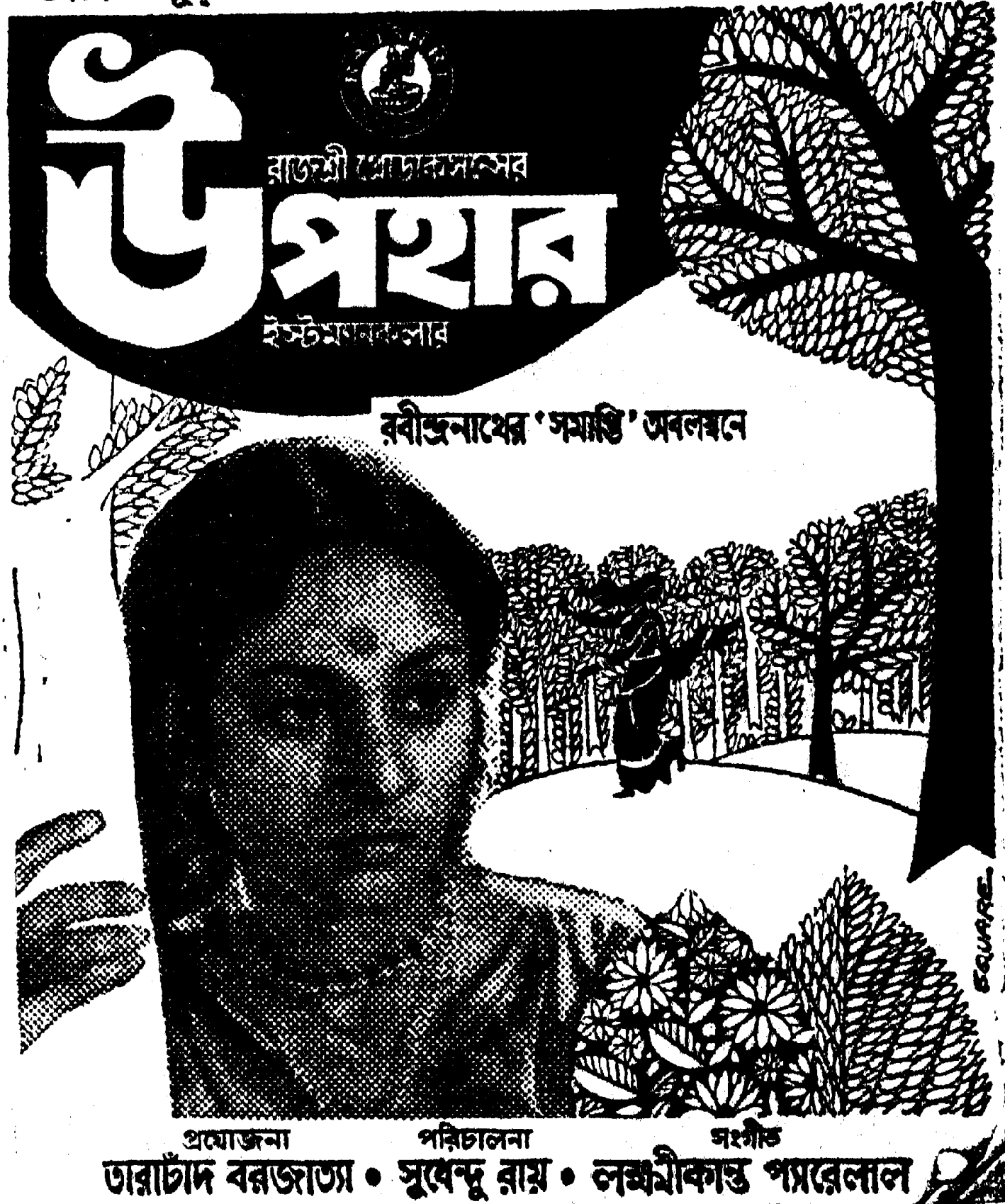
মঞ্চাভিনয়

নান্দনিকের 'চাঁপাডাঙার মেলা': কান্নার প্লাবন নেই, যন্ত্রণার নিঃসীমতা নেই, ব্যর্থতার দুঃসহ গ্লানি নেই—শুধু হাসি আর হাসি, শুধু হাসির উজ্জ্বল বন্যায় মঞ্চের আলোর বৃত্ত ভরে উঠছে। আজকের দিনে নাটক দেখতে বসে এ ছবি খুব বেশী চোখে পড়ে না; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে পরাজয় ও ব্যর্থতার রুদ্ধ হাহাকার, নয়তো অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাষা পায় নাটকের সংঘাতে। সেখানে হাসির বদলে যন্ত্রণার কারুণ্যেই মর্মন্তুদ হয়ে ওঠে মন। 'নান্দনিক' সংস্থার 'চাঁপাডাঙার মেলা' নাটকের প্রযোজনায় এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা গেছে। নাটক দেখতে বসে

বাঁদিকের ছবির তিনটি মুখ্য চরিত্রে জহর রায়, উত্তমকুমার ও তরুণকুমার, পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ফটো : অমৃত

ফাটা হাসিতে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত জন আর উপলব্ধি। একটা মুহূর্তের জন্যও সেই হাসির উচ্ছলতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এ নাটক তুলে ধরেছে অনেক মুখর মনের মেলা, আর এরই মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছে হৃদয়ের বিচিত্রমুখী তরঙ্গের উচ্ছলতা। প্রতিটি মুখ যেন আমাদের চেনা, প্রতিটি ভঙ্গিমার সঙ্গে যেন আমাদের হৃদয়ের যোগাযোগ। মঞ্চের আলোয় মূর্ত হয়ে ওঠা ঘটনার সঙ্গে যেন দর্শকের এক নিবিড় সেতুবন্ধন হয়েছে, 'চাঁপাডাঙার মেল' নাটকটির হাসির অনাবিল উচ্ছলতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি ইংগিত—সেটা বিদ্রূপের। বিদ্রূপ করা হয়েছে আজকের চলতি সমাজের অতি চালাক মানুষদের। চালাকির দ্বারা কোন গভীরতর কাজ কোনদিনও হোতে পারে না, এ সত্য আভাসিত হয়েছে এ নাটকে।

নাটকটির প্রযোজনায় যেটি সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য, সেটি হোল এর সুষ্ঠু, সুসম্বদ্ধ অভিনয়। টিমওয়ার্কে এতটুকু শৈথিল্য কোথাও চোখে পড়েনি। এর জন্য প্রথমেই প্রশংসার দাবী রাখেন নির্দেশক সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও আন্তর নাট্যচেতনা নাটকটির প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়েছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে বলা যেতে পারে প্রায় প্রতি শিল্পীই চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন। এবং তাতেই সামগ্রিক অভিনয়ের গতি হয়েছে তীব্রতর। পার্থ ভট্টাচার্যের 'মদন', প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফটিক' অসাধারণ দুটি চরিত্র চিত্রণ হয়েছে। দর্শকদের হাসির উচ্ছলতা সব সময়েই মুখর হয়ে উঠেছে রজত ঘোষ (জুয়াড়ী) সুভাষ রায় (ফেরিওয়ালা), সঞ্জয় দত্ত (ঘটক), প্রণব মুখোপাধ্যায় (খুড়ো), প্রদীপ দাস (মদনের বাবা) এর প্রাণবন্ত অভিনয়কে ঘিরে।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অমর ভট্টাচার্য, বেলা রায়, মণি দে, টুটু মুন্সী, বিদেশ গুহ নিয়োগী, প্রিয় চট্টোপাধ্যায়, পুলু সাহা, ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উচ্ছল হাসির প্রতিটি প্রহর গানের সুরে নতুন করে মুখর হয়ে উঠেছে এবং নাটকের অগ্রগতিকে দিয়েছে নতুনতর এক ছন্দ। সুরসৃষ্টি করেছেন মুরারী রায়-চৌধুরী। প্রতিটি গানই সুগঠিত ও সুগীত হয়েছে।

সব মিলিয়ে 'নান্দনিকে'র 'চাঁপাডাঙার মেলা' আজকের নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি সার্থকতম প্রযোজনা।

ক্ষুধা : আজকাল মাঝে মাঝে অফিস ক্লাবের নাটকও যে প্রয়োগ পরিকল্পনায় অভিনবত্বে আর অভিনয়ের নিবিড়তায় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে ওঠে, তার একটি নজীর সেদিন দেখলাম 'স্টার' থিয়েটারে। নাটকটির নাম 'ক্ষুধা', অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। অতিপরিচিত এবং পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে বহুরাত্রি অভিনীত মঞ্চসফল নাটকটির প্রযোজনায় শিল্পীরা যে নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এর জন্য প্রথমেই মঞ্চের আলোর নেপথ্যে যে মানুষটির কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী তিনি হোলেন নাট্যনির্দেশক শ্রীবিশু চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি দেখতে দেখতে বোঝা যায় নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি এবং প্রতিটি ছোট ছোট কাজে শ্রীচট্টোপাধ্যায় কি অসাধারণ পারদর্শী।

নাটকটির প্রযোজনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রতি শিল্পীই সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে 'সদা', 'গদা'র ভূমিকায় দেবী-প্রসাদ ব্যানার্জি, সমীরণ সেনের অভিনয় চমৎকার হয়েছে। দুজনের মধ্যে শ্রীব্যানার্জির চরিত্রচিত্রণই বেশী সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। তবে সুনীল মাজের 'রমেন' ততোটা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। অমরেন্দ্র সোমের 'জগৎ চৌধুরী'ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হোতে পেরেছে। রাণু রায়ের

'প্রজা' ও [illegible] ব্যানার্জি'র [illegible] হয়েছে নানা মুহূর্তে [illegible]।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন ডাঃ কল্যাণ মুখার্জি, হারাধন ব্যানার্জি, মোহনলাল মুখার্জি, দিলীপ ঘোষ, পাখিকান্তি ভট্টাচার্য, শান্তিময় মুখার্জি, অসীম ব্যানার্জি, রূপেন সাহা, সমরেন্দ্র মণ্ডল, দেবকুমার মৈত্র, গিরিধারী কুণ্ডু, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী, নমিতা গাঙ্গুলী, কুমারী মিতা ব্যানার্জি।

রাউরকেলায় বার্ষিক নাটক : রাউরকেলার এম, ই, রেলওয়ে কলোনীর ভারতী ক্লাব (মণিমালা) তিনটি নাট্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি তাদের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব পালন করলো। অগ্নিদূত রচিত 'পাথর ভাঙা কান্না' দিয়ে অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নেন কালী হালদার। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন নারায়ণ সাহা, কার্তিক দাস, ডাঃ অজিত চক্রবর্তী, শ্যামাপদ সন্ন্যাল, ক্ষুদিরাম দত্ত, সোমনাথ পণ্ডিত, মন্মথ বেরা, কালী হালদার, ফণিভূষণ দে, অসীম মিত্র, হারাধন বিশ্বাস।

পরের দিন ব্রজেন দের 'কোহিনুর' যাত্রাপালা অভিনীত হোল অভিজ্ঞ নট শিবশঙ্কর মুখার্জি'র নির্দেশনায়। দলগত অভিনয়ে মাঝে মাঝে শৈথিল্য চোখে পড়লেও কয়েকজনের চরিত্রচিত্রণ পালা পরিবেশনাকে মোটামুটিভাবে সার্থক করে তোলে। কয়েকটি ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেন চিত্তরঞ্জন মিশ্র (গোলাম কাদের), অসীম মিত্র (আলমাদম), শিবশঙ্কর মুখার্জি (খোদাবক্স), বুলবুল মুখার্জি (বাহাদুর), রমণী শাস্ত্রী (নসিবন), মৃত্যুঞ্জয় সাহা (জাফর), অশোক নিয়োগী (মেহেদী), দীপ্তি ঘোষ (রোশেনারা) ও বাবলু সামন্ত।

অরুণা দে-র 'ওরা জাগছে' নাটকটির অভিনয় ছিল তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ। মণিমালার কিশোর ভাইয়েরা প্রাণময়তার সঙ্গে এর বিভিন্ন চরিত্রগুলোকে মঞ্চের আলোয় ফুটিয়ে তোলেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন ঘনশ্যাম ব্যানার্জি, গৌতম ভট্টাচার্য, স্বপন ব্যানার্জি, তপন ব্যানার্জি।

আমি মুজিব নই : এক নকল সাজানো মুজিব কি করে আসল মুজিবের বলিষ্ঠ মানবতাবাদী জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হোল তাই নিয়ে একটি নাটক। নাটকের নাম 'আমি মুজিব নই'। স্টার রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটি সম্প্রতি পরিবেশন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাবের শিল্পীরা। প্রিয়তোষ মুখার্জি'র নির্দেশনায় নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনা বেশ উপভোগ্যই হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন হরিপদ খাসনবীশ, বিনয় ভৌমিক, পুতুল চক্রবর্তী, সমীর গুপ্ত, পঙ্কজ ব্যানার্জি, দুলাল মিত্র, বিনয়রতন চৌধুরী, প্রশান্ত চৌধুরী, গীতা প্রধান, ঝুমা মুখার্জি, প্রমোদ মুখার্জি।

সম্রাটের মৃত্যু : শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি কয়েকদিন আগে আসানসোলের ডুরান্ড ইনস্টিটিউট মঞ্চে পরিবেশিত হোল। পরিবেশন করলেন ওখানকার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা।

পার্থসারথি ব্যানার্জি নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন শ্যামল ব্যানার্জি, অরুণ চ্যাটার্জি, প্রশান্ত ব্যানার্জি, কল্যাণ চক্রবর্তী, পার্থ বোস, নির্মল সেন, তপন ব্যানার্জি, দেবেশ্বর মিত্র, রত্না মুখার্জি, বিজয়া মুখার্জি, শঙ্কর সাধুখাঁ।

মহিলা শিল্পীবৃন্দের নাট্যাভিনয়

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের মহিলা শিল্পীবৃন্দ গেল ৫ই ফেব্রুয়ারী একাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে সন্ধ্যা ৬টায় একটি নাট্যাভিনয় আয়োজন করেছিলেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন সঙ্ঘের [illegible] [illegible]। পরিচালনায় ছিলেন [illegible] চট্টোপাধ্যায়।

[illegible] পরিচালনায় : [illegible]

বিবিধ সংবাদ

গীতাঞ্জলির অনুষ্ঠান : গীতাঞ্জলির সপ্তম বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে এ্যাকাদেমী অফ ফাইন আর্টস হলে পরিবেশিত হোল 'ভানুসিংহের পদাবলী' নৃত্যনাট্য। এ নৃত্যপরিচালনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সুবীর সিংহ। সঙ্গীত-পরিকল্পনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন অপর্ণা দত্ত, বন্দনা গাঙ্গুলী। রাধার নৃত্যে অপর্ণা দত্তের গাওয়া গানগুলো এক কথায় হয়েছে অপূর্ব।

নৃত্যাংশে যাঁরা দর্শকদের মুগ্ধ করতে পেরেছেন তাঁরা হোলেন স্বপ্না ঘোষ (কৃষ্ণ), শাশ্বতী হালদার (রাখাল বালক), সেঁজুতি হালদার, পাপড়ি বসু (যশোদা), মঞ্জু দে (শিশু কৃষ্ণ) সংঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায় (সখী)।

মোহন [illegible]-এর তৃতীয় ছবি

গেল ৩ জানুয়ারী থেকে পাঁচদিন ধরে বৃহত্তর বোম্বাইয়ের চণ্ডীভিলাতে একটি গানের চিত্রায়নের মাধ্যমে লেখক-প্রযোজক-পরিচালক মোহনের তৃতীয় ছবির শ্যুটিং আরম্ভ হয়। এতে শিল্পী ছিলেন আশা পারেখ ও ফিরোজ খাঁ। এই ছবিতে ফিরোজের ছোট ভাই আকবর খাঁ প্রথম চিত্রাবতরণ করবেন একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়। ছবির অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে জালাল আগা, জগদীশ রাজ, জানকী দাস, আরতি, মদ্মির, রেবা সামা, মহাবীর, ইমতিয়াজ পাঠান প্রভৃতি শিল্পীকে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা, সংলাপ-রচনা, শিল্পনির্দেশনা, চিত্রগ্রহণ, গীতরচনা, সঙ্গীতপরিচালনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে নবেন্দু ঘোষ সাগর সহাচি, কাক্কাড়, মুকাদ্দাম ইন্দীবর, কল্যাণজী আনন্দজী এবং এস, আর, সাব্রন্ত।

'সিদ্ধার্থ' সংবাদ

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হার্মান হেস-এর সুখ্যাত উপন্যাস 'সিদ্ধার্থ' অবলম্বনে মার্কিন চিত্রনাট্যকার-প্রযোজক-পরিচালক কনরাড রুক্স যে প্যানাভিশন-ইস্টম্যান কলার ছবিটির উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৯৭১-এর ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২-এর ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত একনাগাড়ে শ্যুটিং চালিয়ে বহির্দৃশ্যের একটি বৃহৎ অংশ শেষ করেছেন, তার পরিস্ফুটন-কার্য সমাধা করবার জন্যে তিনি তাঁর ক্যামেরাম্যান সুভেন নিকভিস্টকে সঙ্গে নিয়ে ২৫ জানুয়ারী রওনা হয়ে গিয়েছেন বিমানযোগে লণ্ডন অভিমুখে। ল্যাবোরেটরীর কাজ শেষ হবার পরে তিনি ফিল্মটির গৃহীত অংশের সম্পাদনাও শেষ করবেন ঐখানেই। এরপর তিনি আবার ফিরে আসছেন ভারতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের শেষাশেষি এবং আবার একটানা শ্যুটিং চালিয়ে ভারতে চিত্রগ্রহণের যাবতীয় কাজ ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করবেন। জানা থাকে, বৌদ্ধ যুগের ঘটনা হলেও ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ হচ্ছে একজন গ্রাম্য যুবক, যে বহুবিধ অবস্থার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধের [illegible] গ্রহণ করে। ছবিটির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন শশী কাপুর এবং তাঁর সঙ্গে আছেন সিমি গারেওয়াল, পিণ্টু কাপুর, রমেশ শর্মা, অমৃক সিং ও জুল ভেলানী। পরিচালক কনরাড রুক্স ইংরেজী সংস্করণ ছাড়াও ছবিটির একটি বিশেষ হিন্দী সংস্করণও তৈরী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

[illegible]

জাপানের সাপ্পোরো শহরে একাদশ শীতকালীন অলিম্পিক গেমস উপলক্ষে বরফের তৈরী তোরণ

খেলাধুলা

দর্শক

উইণ্টার অলিম্পিক

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী এক নয়নাভিরাম বর্ণাঢ্য পরিবেশে জাপানের সাপ্পোরো শহরে একাদশ উইণ্টার গেমস-এর উদ্বোধন করেছেন জাপ-সম্রাট হিরোহিতো। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানটি শেষ হবে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী। এখানে উল্লেখ্য, এশিয়া ভূখণ্ডে শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের আসর এই প্রথম। ইতিপূর্বে ১৯৬৪ সালে জাপানের টোকিও শহরে যে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের আসর বসেছিল তাও এশিয়ার ভূখণ্ডে প্রথম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠান। জাপান ছাড়া এশিয়ার অপর কোন দেশের মাটিতে গ্রীষ্মকালীন অথবা শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের আসর বসেনি।

জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপের রাজধানী এই সাপ্পোরো শহরের জনসংখ্যা ৯,৭০,০০০। সাপ্পোরোকে বলা হয় জাপানের তুষার দেশ—'সিটি অব ইয়ুথ'।

সাপ্পোরোর এই একাদশ শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়ানু[illegible] উদ্বোধন দিনের মার্চ পাস্টে ৩৫টি দেশের ১১০০ জন অ্যাথলীট অংশ গ্রহণ করেন।

শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের আসর বসে তুষার এবং বরফের জমিতে। 'উইণ্টার অলিম্পিক গেমস'-এর উদ্বোধন ১৯২৪ সালে, ফ্রান্সে। প্রতি চতুর্থ বছরে এই আসর বসার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় [illegible] জন্যে দুবার (১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে) এই ক্রীড়ানুষ্ঠান বন্ধ ছিল। এপর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি শীতকালীন অলিম্পিক গেমসে যে-সব দেশ চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় বে-সরকারীভাবে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে তাদের নাম : ১৯২৪ সালে নরওয়ে, ১৯২৮ সালে নরওয়ে, ১৯৩২ সালে আমেরিকা, ১৯৩৬ সালে নরওয়ে, ১৯৪৮ সালে নরওয়ে, ১৯৫২ সালে রাশিয়া, ১৯৫৬ সালে রাশিয়া, ১৯৬০ সালে রাশিয়া, ১৯৬৪ সালে রাশিয়া এবং ১৯৬৮ সালে নরওয়ে।

পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট

এডিলেডের শেষ পঞ্চম টেস্টে গ্যারী সোবার্সের নেতৃত্বে বিশ্ব দল ৯ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ২—১ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ী হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল টসে জয়ী হয়ে প্রথমেই ব্যাট করার সুযোগ নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে ২১৭ রান উঠেছিল। খেলার সূচনা কিন্তু খুবই খারাপ হয়েছিল। মাত্র ৩৫ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে জন বেনো (৯৯ রান) এবং গ্রেগ চ্যাপেল (৮৫ রান) ১৭৭ রান যোগ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক প্রখ্যাত রিচি বেনোর ছোট ভাই জন বেনো মাত্র এক রানের জন্যে 'সেঞ্চুরী' করতে পারেন নি। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক ইনিংসের খেলায় শতরান করার বাসনা তাঁর অপূর্ণ থেকে গেল।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩১১ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনের প্রথম ৩২ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বাকি তিনটে উইকেট পড়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম, ইংল্যাণ্ডের চৌকস খেলোয়াড় টনি গ্রেগ অস্ট্রেলিয়ার তিনটে উইকেটই পান—তার মধ্যে উপর্যুপরি বলে দুটো উইকেট। প্রথম ইনিংসের খেলায় তাঁর বোলিংয়ের পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—৩০ রানে ৬টা উইকেট।

বিশ্ব একাদশ দলের ১ম ইনিংসের গোড়াপত্তন অস্ট্রেলিয়ার মতই হয়েছিল—৩য় উইকেট পড়ে যায় ৭৪ রানের মাথায়। শেষ পর্যন্ত দলের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন ৪র্থ উইকেটের জুটি জি পোলক এবং জাহির আব্বাস। তাঁরা ১৪৯ মিনিটের খেলায় ১৪৬ রান যোগ করেছিলেন। আব্বাস ৭৩ রান করে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে বিশ্ব একাদশ দলের ৫টা উইকেট পড়ে ২৬৫ রান দাঁড়ায়। পোলক ১০১ রান করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ২০ মিনিট পর বিশ্ব একাদশ দলের ১ম ইনিংস ৩৬৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৫৬ রানে এগিয়ে যায়। পূর্ব দিনের অপরাজিত খেলোয়াড় জি পোলক তাঁর ১৩৬ রান পূর্ণ করে আউট হন।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের ৮টা উইকেটের বিনিময়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল ১০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ব একাদশ দলের বিপক্ষে বর্তমান টেস্ট সিরিজে তাঁর এই চতুর্থ সেঞ্চুরী।

চতুর্থ দিনে মাত্র ২৫ মিনিটের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ২০১ রানের মাথায় শেষ হয়। অধিনায়ক চ্যাপেল ১১১ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

বিশ্ব একাদশ দল ২য় ইনিংসের ১ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৪৬ রান তুলে দিয়ে ৯ উইকেটে জয়ী হয়। ১ম উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার (৫০ রান) এবং অ্যাকারম্যান (নটআউট ৭৯ রান) দলের ১০০ রান সংগ্রহ করেছিলনে। পাঁচদিনের বরাদ্দ খেলা চতুর্থ দিনেই শেষ হয়। লাঞ্চের পর ৬৫ মিনিট খেলা হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩১১ রান (জন বেনো ৯৯, জি চ্যাপেল ৮৫ এবং আর মার্শ ৫৪ রান। টনি গ্রেগ ৩০ রানে ৬ এবং ইন্তিখাব ৯৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ২০১ রান (ইয়ান চ্যাপেল নটআউট ১১১ রান। ইন্তিখাব ৭৮ রানে ৪ এবং বেদী ৫৪ রানে ৩ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ : ৩৬৭ রান (জাহির আব্বাস ৭৩ এবং জি পোলক ১৩৬ রান। ম্যালেট ১১৬ রানে ৪ উইকেট)

ও ১৪৬ রান (১ উইকেটে। হিলটন অ্যাকারম্যান নটআউট ৭৯ এবং গাভাস্কার ৫০ রান)

জাপানের সাপ্পোরো [illegible] অলিম্পিক [illegible] বছরের তৈরী মহিলাটি অনুষ্ঠানের জন্য হিসাবে 'অগ্নিশিখা' প্রজ্বলিত কর

জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতা

আলিগড়ে অনুষ্ঠিত ১৯৭১ সালের জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতার ফাইনালে সতীশমোহন (গুজরাট) ৩৫৪৬-২৬৮৫ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রের গিরিশ পারেখকে পরাজিত করেন।

প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল
মোহন ১৪৫৯-১২৯৮ পয়েন্টে
শ্যাম শ্রফকে এবং গিরিশ পারেখ
০২৮ পয়েন্টে রেলওয়ের টমাস
পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন

এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে সত
উপর্যুপরি পাঁচবার ফাইনালে উঠে
চ্যাম্পিয়ান হলেন। ইতিপূর্বে তিনি
ও ১৯৭০ সালে খেতাব পেয়েছে

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযো

১৯৭১-৭২ সালের রঞ্জি ক্রিকে
যোগিতার আঞ্চলিক লীগ পর্যায়ে
যে-সব দল চ্যাম্পিয়ান এবং রা
হওয়ার সূত্রে মূল প্রতিযোগিতায়
যোগ্যতা লাভ করেছে তাদের
তালিকা নীচে দেওয়া হল।

অঞ্চল	চ্যাম্পিয়ান	রানা
পূর্ব	বাংলা	
পশ্চিম	বোম্বাই	
উত্তর	পাঞ্জাব	
দক্ষিণ	হায়দরাবাদ	
মধ্য	মধ্যপ্রদেশ	

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা [illegible] হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।